"বই মনের খাদ্য।
বেশি বেশি বই পড়ুন,
মনকে সুস্থ রাখুন।।"

মোঃ কবিরুল ইসলাম
(DMC K-69)

www.facebook.com/kabiruldmc
kabirul.dmc@gmail.com

অমৃত

ত্রৈমাসিক সূচীপত্র

১০ম বর্ষ : দ্বিতীয় খণ্ড

শুক্রবার, ২১ শ্রাবণ, ১৩৭৭—শুক্রবার, ১৩ কার্তিক, ১৩৭৭

Friday, 7th August, 1970 — Friday, 30th October, 1970

লেখক ... বিষয় ও পৃষ্ঠা

॥ অ ॥

লেখক

॥ আ ॥

লেখক		বিষয় ও পৃষ্ঠা

লেখক — বিষয় ও পৃষ্ঠা

॥ প ॥

॥ ফ ॥

॥ ব ॥

॥ ম ॥

॥ য ॥

॥ র ॥

অমৃত

লেখক — **বিষয় ও পৃষ্ঠা**

১১শ বর্ষ
২য় খণ্ড

অমৃত

১৯শ সংখ্যা
মূল্য
৫০ পয়সা

Friday 10th September, 1971 শুক্রবার, ২৪শে ভাদ্র ১৩৭৮ 50 Paise

সূচীপত্র

প্রচ্ছদ : শ্রীধ্রুব রায়

'এক নজরে'

উত্তর-পুরুষদের দাবী :

বৃটিশ পার্লামেন্টের সীমাহীন সার্বভৌম ক্ষমতার কথা বলতে গিয়ে একদা এক বৃটিশ কূটনীতিক বলেছিলেন, পুরুষকে নারী এবং নারীকে পুরুষে পরিণত করার ক্ষমতা ছাড়া বৃটিশ পার্লামেন্টের আর সব ক্ষমতাই আছে।

অস্ত্রোপচারের সাহায্যে বৃটেনের যেসব পুরুষ নারীতে পরিণত হয়েছে তাদের বিভিন্ন দাবী আইনানুমোদিত করার জন্য একটা বড় রকমের আন্দোলন শুরু করেছেন তাদেরই মত একজন নারীতে পরিণত পুরুষ (উত্তরপুরুষ বলা যায় কি?) শ্রীমতী ডেলা আলেকজাণ্ডার। তিনি আগে স্কুল শিক্ষক ছিলেন ও মাঝে-মাঝে 'ডেভেক' ছদ্মনামে অভিনয় করতেন। গত বছর কাসাব্লাঙ্কায় অস্ত্রোপচারের সাহায্যে তিনি নারীতে পরিণত হন। বৃটেনের সমাজ-বিজ্ঞান সম্পর্কিত পত্রিকা 'নিউ সোসাইটি'তে একটি চিঠি লিখে তিনি তাঁর আন্দোলনের সূচনা করেছেন। আন্দোলন পরি-চালনার জন্য তিনি যে সংস্থা গঠন করেছেন তার নাম—জেণ্ডার রিসার্চ এসোসিয়েশন ইন্টারন্যাশনাল লিয়াস', সংক্ষেপে 'গ্রেল'। তাঁর প্রধান দাবী, তাঁর সংস্থার সদস্যদের যে কোন নারীর মত বিবাহের আইনানুমোদিত অধিকার দিতে হবে। তিনি বলেছেন : ফ্রান্সে জন্মালে আমার বিবাহের অধিকার থাকতো, দুর্ভাগ্যবশত বৃটেনে আজও আমাদের এ অধিকার স্বীকৃত হ'ল না।

গত বছর ডাইভোর্স কোর্টে শ্রীমতী এপ্রিল এ্যাশলের সঙ্গে লর্ড রাওয়ালান-এর উত্তরাধিকার শ্রীআর্থার ক্যামেরন কর্বেটের বিবাহ বাতিল হয়ে যায়, কারণ শ্রীমতী এ্যাশলে ১৯৬০ সালে অস্ত্রোপচারের সাহায্যে লিঙ্গান্তর ঘটিয়ে পুরুষ থেকে নারীতে পরিণত হন। আদালতের রায়ে বলা হয়েছে, আসলে তিনি পুরুষ, সুতরাং বৃটিশ আইনমতে, পুরুষের সঙ্গে পুরুষের বিবাহ আইনসিদ্ধ হতে পারে না।—ঐ রায়ের প্রতিবাদ থেকেই উত্তর-পুরুষদের বর্তমান আন্দোলনের সূচনা। বর্তমান আইনের সংশোধনের দাবী জানিয়ে শ্রীমতী আলেকজাণ্ডার বৃটিশ পার্লা-মেন্টের বহু সদস্যদের সঙ্গে দেখা করেন, কিন্তু তাঁকে সর্বত্রই নিরাশ হ'তে হয়। তিনি বলেছেন, আজ তাঁর সংঘের সদস্যসংখ্যা দুইশত অতিক্রম করে গেছে এবং তাঁরা সকলেই ন্যূনতম মানবিক অধিকার থেকে বঞ্চিত।

তিনি বলেছেন, এটা একটা অদ্ভুত ব্যবস্থা যে, অস্ত্রো-পচারের সাহায্যে লিঙ্গান্তর ঘটান বৃটেনের আইনসিদ্ধ হলেও লিঙ্গান্তরিত মানুষগুলির আইনগত অধিকার স্বীকারে বৃটেন বিমুখ হচ্ছে। তাদের জীবনবীমা নিয়ে গণ্ডগোলে পড়তে হয়, চাকরীর ক্ষেত্রে নানা জটিলতার মীমাংসা হয় না এবং সবচেয়ে সমস্যায় পড়তে হয় বার্থ সার্টিফিকেট নিয়ে। তাদের বলা হয় এখন তোমরা যাই হও না কেন, তোমরা ত পুরুষ হয়েই জন্মে-ছিলে। বিশ-পঁচিশ বছর আগে তোমাদের জন্মের সময়ের রেকর্ড-গুলির কি করে পরিবর্তন করা যায়?

শ্রীমতী আলেকজাণ্ডার স্বীকার করেন, সমস্যা ও নানা জটিলতা অবশ্যই আছে, কিন্তু মানবিক দৃষ্টিভঙ্গী ও আন্ত-রিকতা নিয়ে অগ্রসর হ'লে নিশ্চয়ই সব সমস্যার সমাধান হতে পারে।

রাবণের শব :

লঙ্কার কোন এক শ্বাপদশঙ্কুল অরণ্য পরিবৃত দুর্গম পর্বতশৃঙ্গের এক গুহায় লঙ্কেশ্বর মহাবলী রাবণের শব সম্পূর্ণ অবিকৃত অবস্থায় শায়িত আছে—এক বৌদ্ধ পুরোহিত একথা বলায় সারা সিংহলে দারুণ সাড়া পড়ে গেছে। এক দল লোক বলেছেন—সম্পূর্ণ বাজে কথা, গাঁজাখোরের উদ্ভট কল্পনা। কিন্তু অপর দল, এবং তাঁরা সংখ্যায় অনেক বেশী, ঐ পুরোহিতের দাবী সত্য বলে মনে করছেন, এবং তাঁদের দাবীতে ইতিমধ্যেই সিংহল সরকারের এক কনিষ্ঠ মন্ত্রী শ্রী টি বি এম হেরাতকে নিয়ে একটি রাবণের শব অনুসন্ধান কমিটি গঠিত হয়েছে। শ্রীহেরাত ঐ কমিটির মুখ্য উপদেষ্টা। কমিটিতে সিংহলের আদিবাসী বেদ্দা উপজাতীয়দের থেকে তিনজনকে নেওয়া হয়েছে, যে উপজাতীয়রা নিজেদের রাবণের বংশধর বলে দাবী করে এবং তাদের সকলের নামেই রাবণ শব্দের উল্লেখ দেখা যায়—যেমন রাবাংগে বিভূষণ, রাবাংগে কইরা, রাবাঙ্গে কেন্দা ইত্যাদি।

আগষ্ট মাসের গোড়ার দিকে মধ্যসিংহলের বেলিগামণ নামক স্থানের পোটগাল বুদ্ধ মন্দিরের পুরোহিত পরমপূজ্য সিদ্ধার্থ মেদাঙ্কর দাবী জানান, বহু প্রাচীন পুঁথিপত্র ঘেঁটে তিনি জানতে পারেন যে, রাবণের দেহ একটি স্থানে সম্পূর্ণ অবিকৃত অবস্থায় সংরক্ষিত আছে, এবং সে জায়গাটিও তিনি মোটামুটিভাবে স্থির করে ফেলেছেন। কিন্তু সে দুর্গম স্থানে পৌঁছান সহজ কাজ নয়। — ঐ বৌদ্ধ পুরোহিত দাবী সিংহলের বহুল প্রচারিত রবিবাসরীয় পত্রিকা সিলুমিনাতে প্রকাশিত হওয়ার পরেই ঐ দ্বীপরাজ্যে হৈ-চৈ পড়ে যায়।

অবশ্য সিংহলের প্রথম সারির প্রত্নতত্ত্ববিদ ডঃ পরাণবিতান বলেছেন : এটা একটা বেশ বড় রকমের রসিকতা। যার কোন অস্তিত্ব ছিল না কোনদিন, যে এক পৌরাণিক কাহিনীর চরিত্র তার মৃতদেহ কি করে সংরক্ষিত থাকে তা বুঝতে পারি না।

আর এক পুরাতত্ত্ববিদ বলেছেন : রামায়ণে যে লঙ্কার উল্লেখ আছে সে আমাদের লঙ্কা নয়।

শহর ডুবছে :

অবিশ্রান্ত বর্ষণ, বদ্ধ জলার চাপ, কয়েক কোটি ঘন ফুট মাটি জমায় জল নিষ্কাশন অচলাবস্থা প্রভৃতি কারণে জব চার্ণক প্রতিষ্ঠিত, প্রায় তিনশ' বছরের পুরানো শহর কলকাতার এখানে-ওখানে বসে যাওয়ার, ভেঙে পড়ার সংবাদ প্রায়ই কাগজে প্রকাশিত হয়। বিশেষজ্ঞদের আশঙ্কা, অবিলম্বে একটা কিছু না করা হলে এই আদি শহরটির প্রাণ রক্ষাই শেষ পর্যন্ত কঠিন হয়ে পড়বে।

কলকাতা সম্বন্ধে যা সত্য, পৃথিবীর আরও কয়েকটি বড় শহর সম্বন্ধে সেকথা আরও বেশী সত্য। তবে কারণ সর্বত্র এক নয়। পূর্ব এশিয়ার দুই বৃহৎ শহর জাপান ও ব্যাঙ্কক যে আশঙ্কাজনকভাবে বসে যাচ্ছে তার প্রধান কারণ পানীয়ের প্রয়োজনে মাটির তলা থেকে অত্যধিক জল উত্তোলন। ব্যাঙ্কক ভেনিস শহরের মত বসে যাচ্ছে, এবং অবিলম্বে প্রতিকার না হলে বিশ বছরের মধ্যে থাইল্যাণ্ডের সুরম্য রাজধানীটি সমুদ্রের জল-সীমার নীচে চলে যাবে। কতকগুলি জায়গায় এখনই নিয়মিত বানের জল ঢুকছে।

টোকিও শহরেরও প্রায় বিশ শতাংশ এলাকা সমুদ্রসীমার নীচে, এবং প্রায় ৫৪ শতাংশ এলাকা প্রতি বছর এক সেন্টিমিটার হারে বসে যাচ্ছে। দুটি শহরেই এখন তাই মাটির নীচ থেকে জল তোলা বন্ধ করে সমুদ্রের জল পরিশুদ্ধ ক'রে পানীয় জলের সমস্যা মেটানোর চেষ্টা করা হচ্ছে।

ওদিকে শৈলরাণী সিমলার বিভিন্ন এলাকাও আশঙ্কা-জনকভাবে বসে যাচ্ছে বলে খবর পাওয়া গেছে। শহরের উত্তর-পূর্ব এলাকা ইতিমধ্যে তিন ফুট বসে গেছে। সিমলা শহর বসার প্রধান কারণ কয়েক বছর ধরে অবিশ্রান্ত বৃষ্টিপাত। বহু বাড়ী-ঘর ভেঙে পড়েছে, ফাটল ধরেছে এবং ঐ সবের ফলে সিমলা শহরের ক্ষতির পরিমাণ নাকি ইতিমধ্যে দুশ কোটি টাকার অঙ্ক পেরিয়ে গেছে।

২।৯।৭১ —[illegible]

সম্পাদকীয়

অর্থপূর্ণ সংলাপ

সেদিন ছিল মে দিবসের মেঘমুক্ত আকাশ। ভারতীয় ভারপ্রাপ্ত রাষ্ট্রদূত শ্রীব্রজেশ মিশ্রের দিকে তাকিয়ে মিঃ মাও সে তুং হেসেছিলেন এবং তাঁর করমর্দন করেছিলেন। অমনই সকলেই অনুমান করলেন বরফ গলতে সুরু হয়েছে। নয়াদিল্লীর টনক নড়ল। চীন-ভারত মন কষাকষির অবসান ঘটানোর জন্য একটা তোড়জোড় সুরু হল। কিন্তু মানভঞ্জনের পালা এত সহজ নয়, সুতরাং মানভঞ্জনের যত প্রকার প্রক্রিয়া আছে তা ব্যবহার করা সত্ত্বেও উভয় দেশের সম্পর্কটা স্বাভাবিক করার ব্যাপারে তেমন অগ্রগতির সম্ভাবনা দেখা গেল না। ভারত বার বার নানাভাবে চেষ্টা করেছে, ন'বছর আগেকার ঘটনাকে ভুলে গিয়ে, স্লেটের দাগ মুছে আবার সুরু হোক নতুন খেলা, কিন্তু ওপক্ষ থেকে সাড়া আসেনি। 'আজি যায় বার ফিরে যায়, বার বার ফিরে আসে, তবে ত' ফুল বিকাশে', কবির কথাটি এই ক্ষেত্রেও খেটে গেল প্রায় ঠিক ঠিক। বার বার চেষ্টা করা প্রয়োজন।

কলিকাতায় অনুষ্ঠিত এক প্রেস কনফারেন্সে গত ২রা সেপ্টেম্বর তারিখে প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী গান্ধী আভাসে জানিয়েছেন উভয় দেশের মধ্যে একটা যোগাযোগের জন্য সক্রিয়-ব্যবস্থা সরকার গ্রহণ করেছেন। বাংলাদেশের সমস্যা নিয়ে তিনি নিজেই মিঃ চৌ-এন-লাইকে একটি চিঠি দিয়েছেন এবং চীনা তরফ থেকে একটা সাড়া পাওয়ার সম্ভাবনাও প্রবল হয়ে উঠেছে। একবার যদি দুয়ার অতিক্রম করার সংশয়টুকু ঘুচে যায় তাহলে উভয় দেশের মধ্যে 'মীনিংফুল ডায়োলগ' বা অর্থপূর্ণ সংলাপ চালানোর সুবিধা হয়। এই বিলম্ব সম্পর্কে নানাবিধ জল্পনা সুরু হয়েছে। ভারত-সোভিয়েট চুক্তি সম্পর্কে সরকারিভাবে চীন কোনো মন্তব্য করে নি। জর্জ টাউন থেকে কম্যুনিস্ট চায়না ট্রেড ডেলিগেশানের একজন মুখপাত্র ৩রা সেপ্টেম্বর তারিখে মন্তব্য করেছেন এই চুক্তিটিকে চীন মিত্রজনোচিত কর্ম মনে করে না। তাঁরা আরও বলেছেন, একটা চীন বিরোধী "যুক্তরাষ্ট্র-সোভিয়েত ও ভারতের সম্মিলিত সহযোগ" গড়ে উঠছে সেদিকেও চীন লক্ষ্য রেখেছে।

এই উপ-মহাদেশের রাজনীতি বিষয়ে চীন এতদিন হিমালয়ের মত মৌন ছিল। তবে সম্প্রতি মিঃ চৌ-এন-লাই বলেছেন যে, দুটি সুবৃহৎ সাম্রাজ্যবাদী শক্তির কবল থেকে চীন এই অঞ্চলকে 'লিবারেট' বা বৃহৎ শক্তিপুঞ্জের প্রভাবমুক্ত করবেন। কলিকাতায় সাংবাদিকরা এই উক্তির প্রতি প্রধানমন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করে মন্তব্য করতে অনুরোধ করলে তিনি কিছুই বলতে অস্বীকার করেন। অনেক সময় রাজনৈতিক কর্মসূচীতে অনেক সংকল্প পালনের প্রতিশ্রুতি থাকে কিন্তু কার্যকালে তা পূরণ করা সম্ভব হয় না। সুতরাং সংবাদপত্রে প্রকাশিত সংক্ষিপ্ত সংবাদের ভিত্তিতে কোনোরকম মন্তব্য না করে প্রধানমন্ত্রী সুবিবেচনার পরিচয় দিয়েছেন।

যেদিক থেকেই হোক ভারত-চীন সম্পর্ককে সহজ করার পক্ষে এই সব সাময়িক উক্তিকে বাধা হিসাবে গ্রহণ করা যুক্তিযুক্ত নয়। ভারতের সঙ্গে চীনের দীর্ঘদিনের মিত্রতার সম্পর্ক। সেই প্রীতির সম্পর্ক আবার নতুন করে গড়ে তোলাই বুদ্ধিমানের কাজ। এই কারণে প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক প্রেরিত চিঠি এবং দিল্লীতে শ্রীব্রজেশ মিশ্রের উপস্থিতি একটা নতুন সম্ভাবনায় আশা সঞ্চার করেছে। শ্রীমিশ্র ভারত সম্পর্কে চীনের বর্তমান মনোভাবের সঠিক বিবরণ হয়ত দিতে পেরেছেন। চীনের সঙ্গে সম্পর্কটা নিবিড় করে তুলতে অতঃপর ভারতের পক্ষে কি কি করণীয় তার ইঙ্গিত শ্রীমিশ্র দিয়েছেন। চীনের বর্তমান মনোভঙ্গী অনেক সহৃদয়। কালচারাল রেভোল্যুশানের প্রকোপমুক্ত হয়ে চীনের আভ্যন্তরীণ আবহাওয়া এখন অনেক মনোরম। চীন অনেক দেশে নতুন রাষ্ট্রদূত প্রেরণ করেছে। যুগোশ্লাভিয়ার সঙ্গে পূর্ণ কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপন করেছে। ইতালী, কানাডা, ইথিওপিয়া, ইকুয়েটোরিয়াল গিনি প্রভৃতি দেশ থেকে স্বীকৃতি লাভ করেছে। বর্তমান মুহূর্তে চীন শত্রুর সংখ্যা হ্রাস করে মিত্রের সংখ্যা বৃদ্ধি করতে অধিকতর আগ্রহী। সকল দিকে সংঘর্ষের সম্ভাবনা হ্রাস করাই তার লক্ষ্য। দেশকে শক্তিশালী করতে হলে চারপাশে শত্রু রাখা সঙ্গত নয়।

ইতিমধ্যে শ্রী ডি, পি, ধর মস্কো-ভ্রমণকালে চীনা রাষ্ট্রদূতের সঙ্গে যে আলাপ-আলোচনা করেছেন অনেকে মনে করেন ভারতের তরফ থেকে পিকিং-এর সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হওয়ার এ এক গুরুত্বপূর্ণ প্রয়াস। ভারত সরকার অচিরেই পিকিং-এ একজন রাষ্ট্রদূত নিযুক্ত করুন এটা হয়ত একটা প্রাথমিক দাবী। শ্রীব্রজেশ মিশ্র সম্ভবত দিল্লীতে সেই কথাই বলেছেন। দিল্লীতে এই বিষয়ে কিছু মতভেদ থাকলেও মনে হয় অবিলম্বে একজন রাষ্ট্রদূত নিযুক্ত করে পিকিং-এ পাঠানো হবে এবং নয়াদিল্লীর চীনা দূতাবাসের সামনে থেকে 'নজররক্ষী শিবির' তুলে নেওয়া হবে। ভারত যদি সৌজন্য এবং শিষ্টাচার প্রদর্শন করে চীনের সঙ্গে একটা মধুর সম্পর্ক গড়ে তুলতে পারে তাহলে সব দিক থেকে মঙ্গল, আর ভারত যদি বিফলও হয় তাহলে তার মর্যাদা ক্ষুণ্ণ হবে না। ভারতের পররাষ্ট্রনীতির বাস্তববাদী মনোভঙ্গী প্রশংসিত হবে।

পটভূমি

বাঙ্গালোরের আবহাওয়া অবশ্য মনোরম, কিন্তু শুধু সেই কারণেই মার্কসবাদী কম্যুনিস্ট পার্টির পলিট ব্যুরো এবং কেন্দ্রীয় কমিটির বৈঠক সেখানে অনুষ্ঠিত হল কিনা বলা শক্ত। জুলাইয়ের শেষে পলিট ব্যুরোর বৈঠক বসেছিল দিল্লীতে, যদিও সর্বভারতীয় দলগুলির মধ্যে একমাত্র সি পি এমের সদর দপ্তরই দিল্লীর বাইরে, অর্থাৎ কলকাতায়। দিল্লীতে বৈঠক বসানোর উদ্দেশ্য ছিল বৈঠকের আগে বাংলাদেশ ও পশ্চিমবাংলা সম্পর্কে প্রধানমন্ত্রীর মনোভাবের একটা আগাম হদিস নেওয়া। কলকাতায় বা ত্রিবান্দ্রমে বৈঠকের আয়োজন করলে তার আগে শ্রীমতী গান্ধীর সঙ্গে শুধু মিনিট পঁচিশের আলোচনার জন্যে জ্যোতি বসুর দিল্লী যাওয়াটা হয়ত খুব মানানসই হত না।

এবার অবশ্য সে-রকম কোনো কারণ ছিল না। তবু মহীশূরের রাজধানীতে পলিট ব্যুরোর বৈঠকে অনেকে একটু অবাক হয়েছেন, কারণ ওখানে তো সি পি এমের তেমন দাপট নেই। সে-হিসেবে পশ্চিমবাংলা বা কেরলের কোথাও বৈঠকটাই হয়ত মানানসই হত, কারণ দলের সম্পাদক পি সুন্দরাইয়া নিজেই বলেছেন যে, ঐ দুটি রাজ্য ছাড়া আর সর্বত্রই সি পি এম হীনবল। দলের লাখখানেক সদস্যের মধ্যে এই দুই রাজ্যই জুগিয়েছে ৪০ হাজার। তবে কিছু দিন আগে সি পি এমের পশ্চিমবাংলা কমিটি দাবী করেছিলেন যে, এই রাজ্যে তাঁদের সদস্য সংখ্যা ৩০ হাজারের মতো। শ্রীসুন্দরাইয়ার হিসেবে ঐ সংখ্যা ২১ হাজার। পশ্চিমবাংলা বা কেরল ছাড়া আর যে রাজ্যে পার্টির কিছু তাগদ ছিল বলে অনেকে মনে করতেন, সেটি হল অন্ধ্রপ্রদেশ। কিন্তু এখন দেখা যাচ্ছে সি পি আই এবং উগ্রপন্থীদের সাঁড়াশি আক্রমণে বি টি রণদিভের নিজ রাজ্যে দলের অবস্থা বেশ কাহিল। নেতাদের অনেকেই যোগ দিয়েছেন শোধনবাদী সি পি আই-এ, আর এক দল হাত মিলিয়েছেন উগ্রপন্থীদের সঙ্গে।

পলিট ব্যুরো এবং কেন্দ্রীয় কমিটির এই বৈঠক ছিল আসন্ন পার্টি কংগ্রেসের প্রস্তুতির অঙ্গ। কংগ্রেস বসবে ডিসেম্বরে, তামিলনাড়ুতে। তামিলনাড়ুতেও অবশ্য দলের অবস্থা মোটেই ভালো নয়। গত সাধারণ নির্বাচনে লোকসভার দুটি আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছিল সি পি এম একটিতেও জিততে পারেনি। শুধু তাই নয়, ছটি আসনেই সি পি এম প্রার্থীদের জমানত হারাতে হয়। যাঁরা পরাজিত হন তাদের মধ্যে পি রামমূর্তির মতো নেতাও ছিলেন। ১৯৬৭ সালে তামিলনাড়ুতে যে সি পি এম অনেক ভালো ফল করেছিল তার কারণ ছিল ডি এম কে'র সঙ্গে আঁতাত। এবার ডি এম কে'র সঙ্গে হাত মিলিয়েছিল সি পি আই। একা পড়ে গিয়ে সি পি এম মার খেয়ে গেল প্রচুর। তামিলনাড়ুতে পার্টি কংগ্রেস অনুষ্ঠান ঐ রাজ্যে পার্টির হৃতগৌরব পুনরুদ্ধারের অঙ্গ হওয়া অসম্ভব নয়।

পার্টি কংগ্রেস সব সময়েই গুরুত্বপূর্ণ, কিন্তু এবারের কংগ্রেসের গুরুত্ব দুটি কারণে বিশেষ করে বেড়ে গেছে। প্রথম কারণ, গত পার্টি কংগ্রেসের পর অন্তবর্তী সময়ের মধ্যে ভারতের রাজনীতি নতুন মোড় নিয়েছে এবং দ্বিতীয়ত, পার্টি কংগ্রেস অনুষ্ঠিত হওয়ার কয়েক মাসের মধ্যেই কয়েকটি রাজ্যে বিধানসভার নির্বাচন।

অবশ্য যে-কটি রাজ্যে নির্বাচন হওয়ার কথা সেই সব রাজ্যে (যেমন মহীশূর, মহারাষ্ট্র, গুজরাট, অন্ধ্রপ্রদেশ, আসাম প্রভৃতি) পার্টি এমন কিছু শক্তিশালী নয়। গত লোকসভার নির্বাচনের ফলই তার শ্রেষ্ঠ প্রমাণ। ১৬টি রাজ্য ও কেন্দ্র শাসিত অঞ্চলে সি পি এম মোট ৮৬টি আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করলেও জিতেছে ২৫টিতে কিন্তু সেই ২৫টির কুড়িটিই এসেছে পশ্চিমবাংলা এবং দুটি ত্রিপুরা থেকে। কেরলের কথা মনে রেখেও এ-কথা বললে অন্যায় হয় না যে, সি পি এম এখন মোটামুটি একটা আঞ্চলিক দলের চেহারা নিচ্ছে। কেন্দ্রীয় কমিটির এবারের প্রস্তাবেও তার ইঙ্গিত স্পষ্ট। বামপন্থী ও গণতান্ত্রিক দলগুলিকে নিয়ে দেশব্যাপী আন্দোলনের কথা বলা হয়নি তা নয়, কিন্তু আসল জোরটা পশ্চিম বাংলায় নির্বাচন অনুষ্ঠানের দাবির ওপর। সারা দেশে সি পি এমের রাজ্য ইউনিটগুলি যে দাবির ভিত্তিতে অভিযান চালাবে তা হল, ১৯৭২ সালের গোড়ায় পশ্চিমবাংলায় নির্বাচন করতে হবে।

পশ্চিম বাংলার ওপর এই জোর দেওয়ার কারণটা যে দুর্বোধ্য তাও নয়। এই রাজ্য ছাড়া সি পি এম আর যেখানে ব্যালট বাক্সের রায়ে ক্ষমতা দখলের আশা করতে পারে সেটা হল কেরল। কিন্তু কেরলে বিধানসভার নির্বাচন হয়েছে সবে এক বছর হল। কংগ্রেস সেখানে মন্ত্রিসভায় যোগ দেবে কিনা, এ-নিয়ে এখনও অনিশ্চয়তা থাকলেও মন্ত্রিসভার পতনের কোনো আশু আশংকা নেই। তাই নেই শীগগির নির্বাচনের সম্ভাবনাও। এই অবস্থায় সি পি এমের সব নজর পশ্চিম বাংলার ওপর পড়াটাই স্বাভাবিক।

কিন্তু প্রধানমন্ত্রী অর্থাৎ কেন্দ্রীয় সরকার সি পি এমকে কতোটা বাধিত করবেন? আর যদি না করেন, তা হলে কি দুপক্ষের মধ্যে একটা সম্মুখ সমরের ক্ষেত্র তৈরি হবে?

প্রধানমন্ত্রী এবার কলকাতা সফরে মোটামুটি এই রকম আভাস দিয়েছেন যে, ১৯৭২ সালের গোড়ায় পশ্চিম বাংলায় নির্বাচনের আশা কম। তিনি সরাসরি অবশ্য এই সম্ভাবনা নাকচ করে দেননি, তবে আশাপ্রদ কোনো কথাও শোনাননি। তার কারণ একাধিক। প্রথম কারণ অবশ্যই এই রাজ্যে বাংলাদেশের লাখ লাখ শরণার্থীর উপস্থিতি। আগের এক 'পটভূমিতে' বলেছিলাম, শরণার্থী সমস্যার অন্যান্য রাজনৈতিক প্রতিক্রিয়ার কথা বাদ দিলেও একটি ফল শীগগিরই বোঝা যাবে এবং তা হল এই সমস্যার মীমাংসা না-হওয়া পর্যন্ত এই রাজ্যে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হতে পারবে না। এই সমস্যার গুরুভারে জেলা কর্তৃপক্ষের শিরদাঁড়া ভেঙে যাওয়ার উপক্রম, অন্যান্য সমস্যা (যেমন আইন-শৃঙ্খলা, বন্যা) তো আছেই। সুতরাং এর একটা ফয়সালা না-হওয়া পর্যন্ত রাজ্যের প্রশাসকদের নির্বাচনের বাড়তি দায়িত্ব নিতে বলা চলে কী?

এটাই প্রধান ও বাস্তব কারণ, কিন্তু প্রধানমন্ত্রী কেন যে এখনই পশ্চিমবাংলায় নির্বাচন চাইবেন না তার আরও কারণ থাকতে পারে। গত দুবারের রাষ্ট্রপতির শাসনের তুলনায় এবার পশ্চিমবাংলার উন্নয়ন সম্পর্কে, দিল্লীর আগ্রহ অনেক বেশি স্পষ্ট। শিল্প প্রসারের ১৬-দফা কর্মসূচী, কলকাতার উন্নয়ন, ভূগর্ভ রেল তৈরির কর্মসূচী অনুমোদন, দ্বিতীয় হাওড়া ব্রিজ তৈরির জন্যে উদ্যোগ, সর্বোপরি সিদ্ধার্থশঙ্কর রায়ের নিয়োগ সেই আগ্রহেরই প্রমাণ। এইসব কাজই দীর্ঘমেয়াদী, তবু এ-সবের কিছু কিছু সুফল ফলতে শুরু করার আগেই কি কেন্দ্রীয় সরকার নির্বাচন করতে চাইবেন? কারণ, এই সুফল ফললে তার কৃতিত্বটা তো শাসক কংগ্রেসের ওপরেই বর্তাবে, ফলে নির্বাচনে এই দলের সুবিধেও হবে।

আরো একটা কারণ রাজ্য কংগ্রেস নেতৃত্বে আসন্ন পরিবর্তনের সম্ভাবনা। বিজয়সিং নাহারের পদত্যাগের পর নতুন পাকা সভাপতি নির্বাচনের কাজ এ-মাসেই শেষ হবে। প্রধানমন্ত্রী চান রাজ্য কংগ্রেসকে নতুন রূপ দিতে। নতুন সভাপতির ওপর সেই দায়িত্ব পড়বে। সেটাও খুব স্বল্পমেয়াদী কাজ নয়। কারণ আসল পরিবর্তন আনতে হবে জেলাস্তরে। সেই কাজ পুরোটা শেষ না-হোক, অন্ততঃ বেশ কিছুটা না এগোলে কি শাসক কংগ্রেস নির্বাচনে উৎসাহী হবে?

স্পষ্টতঃই, এইসব হল কংগ্রেসের তথা প্রধানমন্ত্রীর নিজের অঙ্ক। পশ্চিমবাংলার

সম্পর্কে সি পি এম-এর অঙ্কের সংগে তার মিল সামান্যই। জুলাই মাসে দিল্লীতে পলিট ব্যুরোর বৈঠকে যে-প্রস্তাব গৃহীত হয় তাতে স্পষ্টই বলা হয় যে, পশ্চিমবাংলার ব্যাপারে (প্রধানতঃ আইন-শৃংখলার সমস্যার সমাধানে) সি পি এম একটি মাত্র শর্তেই কেন্দ্রীয় সরকারের সহযোগিতা করতে পারে, তা হল নভেম্বরে নির্বাচন। বৈঠকের আগে প্রধানমন্ত্রীর সংগে জ্যোতিবাবুর সাক্ষাতের উদ্দেশ্যও ছিল এই সহযোগিতার একটা ক্ষেত্র তৈরি করা। স্পষ্টতঃই, সি পি এম-এর শর্ত মেনে নেওয়ার সম্ভাবনার কোনোরকম ইঙ্গিত প্রধানমন্ত্রীর কাছ থেকে পাওয়া যায়নি, কারণ তাহলে সি পি এম-এর গলায় হয়ত কিছুটা নরম সুর বাজত।

কিন্তু বাঙ্গালোর থেকে যে-সুর ভেসে এল, তাতে ঝাঁঝ যথেষ্ট। সি পি এম-এর বিচারে শ্রীমতী গান্ধী ও তাঁর কংগ্রেস দলই এখনও 'প্রধান শত্রু'। সি পি আই যাকে 'কংগ্রেস বিরোধিতার সাবেকী নীতি' বলে গাল দেয়, সি পি এম এখনও সেই পথেরই পথিক হয়ে থাকতে চায়। এই নীতি তাকে গত নির্বাচনে পশ্চিমবাংলায় সাফল্যলাভ করতে বেশ সাহায্য করেছে, সুতরাং এই নীতি পার্টি ছাড়বেই বা কেন? শ্রীসুন্দরাইয়া এটুকু স্বীকার করতে রাজী আছেন যে, শ্রীমতী গান্ধীর সরকার এখনও জঙ্গী একনায়কতন্ত্রের চেহারা নেয়নি, কিন্তু পশ্চিমবাংলার মতো রাজ্যে অবশ্যই এই সরকারের 'আধা-ফ্যাসিস্ট' চেহারা প্রকট। তাই এই 'বড় বুর্জোয়া ও জমিদারের দল' শাসক কংগ্রেসকে কীভাবে জনসাধারণ থেকে আরো বিচ্ছিন্ন করা যায়, তা স্থির করাই হবে পার্টির কাজ।

তবে কংগ্রেস সম্বন্ধে সি পি এম-এর মনোভাব যতোটা একরোখা ও স্পষ্ট বলে মনে হচ্ছে, আসলে কি ঠিক ততোটা তাই? নাকি কিছু কিছু দ্বিধা বা বিভ্রান্তির লক্ষণও আছে? শ্রীসুন্দরাইয়ার মতে, শ্রীমতী গান্ধী মার্কসবাদীদের সঙ্গে লড়াইয়ে নেমেছেন, কিন্তু স্বতন্ত্র, জনসংঘ বা সংগঠন কংগ্রেসের সঙ্গে লড়ার সাহস পাচ্ছেন না। আবার বাঙ্গালোরে গৃহীত প্রস্তাবে বলা হল, গত সাধারণ নির্বাচনে দক্ষিণপন্থীদের চরম পরাজয় ঘটেছে। সেই পরাজয়টা কে ঘটিয়েছে? নিশ্চয়ই সি পি এম বা অপর কোনো বামপন্থী দল নয়। দক্ষিণপন্থীদের ভরাডুবি ঘটেছে কংগ্রেসেরই হাতে। আর সেই লড়াই যদি শ্রীমতী গান্ধী না চালিয়ে থাকেন তবে কে চালিয়েছে? আবার, শ্রীসুন্দরাইয়া বলছেন, শ্রীমতী গান্ধী স্বতন্ত্র, জনসংঘ প্রভৃতি দলের নীতিকে কাজে রূপ দিচ্ছেন। এ-কথা যদি সত্যি হয়, তবে তো বলতে হয় সি পি এমও সেইসব নীতিকে রূপায়িত করতে বেশ সাহায্য করছে। কারণ, সাধারণ বীমা রাষ্ট্রায়ত্তকরণ, সংবিধানের সাম্প্রতিক সংশোধন প্রভৃতি যে-সব ব্যবস্থা শ্রীমতী গান্ধীর সরকার নিয়েছেন, তাতে সি পি এমও পূর্ণ সমর্থন জানিয়েছে।

তাহলে ব্যাপারটা কি কিছুটা ঘোলাটে বলে মনে হচ্ছে না? তা হওয়াটা বোধহয় আশ্চর্যও নয়। কারণ, ১৯৬৯ সালের কংগ্রেস ভাগের পর ভারতের রাজনীতিতে যে পালা বদল শুরু হয়েছে, সি পি এম সেটাকে কোনো রকমেই স্বীকার করতে পারছে না, অথবা চাইছে না। অথচ এত বড় একটা বাস্তব ঘটনা স্বীকার না-করে নিলে গোটা রাজনৈতিক অবস্থার মূল্যায়নে বিভ্রান্তি দেখা দিতে বাধ্য। শ্রীমতী গান্ধী অবশ্যই বিপ্লব করতে নামেননি, কিন্তু গত কয়েক বছরে তাঁর কার্যাবলী অন্ততঃ অনেক বামপন্থী দলের পালের হাওয়া যে চুরি করে নিয়েছে তাতে সন্দেহ নেই। পশ্চিমবাংলা সোস্যালিস্ট পার্টির নতুন চেয়ারম্যান সমর গুহের সাম্প্রতিক আক্ষেপ থেকে এই কথা বেশ স্পষ্ট। সমরবাবু সেদিন বলেছেন, তাঁরাই অর্থাৎ সমাজতন্ত্রীরাই এত দিন আইনী পথে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার সপক্ষে বলে এসেছেন, আর আজ কংগ্রেস সেই পথে চলার চেষ্টা করে সবাইকে বিভ্রান্ত করতে চাইছে। সি পি আই অবশ্য শ্রীমতী গান্ধীর প্রগতিশীল নীতিকে তাদের থিওরির সঙ্গে খাপ খাইয়ে নিতে পেরেছে, কারণ ঐ দলের মতে, কংগ্রেসের মধ্যে যে 'প্রগতিশীল অংশ' আছে, এটা তাদেরই চাপের ফল। কিন্তু সি পি এম প্রগতিশীলতার কথা স্বীকারই করবে না।

তাই সংবিধান সংশোধনের জন্যে তারা দাবি জানাবে, সরকার সংবিধান সংশোধন করলে তারা তা সমর্থন করবে, কিন্তু আবার বলবে, সংবিধান সংশোধন করে প্রধানমন্ত্রী জনসাধারণের মনে অহেতুক একটা মোহ সৃষ্টি করছেন। আবার, সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির সঙ্গে সম্পর্ক দৃঢ়তর করার জন্যে আহ্বান সি পি এম জানাবে, কিন্তু ভারত-সোভিয়েট চুক্তি স্বাক্ষরিত হওয়ার পর বলবে, এটা প্রগতিশীলতার লক্ষণ নয়, কারণ এই চুক্তি স্বাক্ষরের দ্বারা শ্রীমতী গান্ধী রুশ-চীন-মার্কিন বিরোধের সুযোগ নিচ্ছেন মাত্র। চীনের সঙ্গে সম্পর্ক সহজতর করার দাবিও সি পি এম করেছে, লক্ষণ দেখে মনে হয় অদূর ভবিষ্যতে ভারত-চীন বোঝাপড়া সম্পূর্ণ অবাস্তব কল্পনা নয়। সেই দিন যখন আসবে তখন সি পি এম কী বলবে?

পশ্চিমবাংলায় আশু নির্বাচনের জন্যে সি পি এম অবশ্যই অভিযান শুরু করবে, কিন্তু প্রধানমন্ত্রী যদি সেই দাবি মেনে নেওয়ার কোনো লক্ষণ না দেখান, তবে সি পি এম কী করবে? পার্টির ক্যাম্পেনই বা কী রূপ নেবে?

এর আগে প্রমোদ দাশগুপ্ত, হরেকৃষ্ণ কোঙার প্রমুখ নেতারা বারবার বলেছেন, গণতান্ত্রিক অধিকার রক্ষার আন্দোলনে বন্‌ধই হবে প্রধান অস্ত্র, কারণ এছাড়া এখন আর কোনো পথ নেই। ময়দানে সভা করে অথবা রাস্তায় মিছিল করে সরকারকে দাবি মানতে বাধ্য করা যাবে বলে স্পষ্টতঃই সি পি এম আর মনে করে না।

এই অবস্থায়, যে-পার্টি এখনও প্রকাশ্যে সশস্ত্র সংগ্রামের পথ নেয়নি, তারা আর বন্‌ধ ছাড়া কোন্ পথেই বা যেতে পারে? ২৭শে আগস্ট যে বাংলা বন্‌ধ হয়ে গেল তাকে কেন্দ্র করে দিল্লীর সঙ্গে সি পি এম-এর একটা শক্তিপরীক্ষা হয়ে গেল। সিদ্ধার্থশঙ্কর রায় ও কেন্দ্রীয় শ্রমমন্ত্রী আর কে খাদিলকর বন্‌ধের উদ্যোক্তাদের মধ্যে যথেষ্ট বিভ্রান্তি সৃষ্টি করতে পেরেছিলেন, তবু প্রথম রাউণ্ডে জয় সি পি এম-এরই। কিন্তু এখন যদি পর পর বন্‌ধ ডাকা হয়, তবে দিল্লী তাকে কী চোখে দেখবে? এইবার কলকাতায় এসেও প্রধানমন্ত্রী বন্‌ধের বিরুদ্ধে অভিমত প্রকাশ করে গেছেন। সরকারের তরফ থেকে বন্‌ধের বিরুদ্ধে প্রচার অভিযান শুরু করা হয়েছে জোর উৎসাহে।

এদিকে শোনা যাচ্ছে, সি পি এম-এর ঘনিষ্ঠ সহযোগী এবং ইউ টি ইউ সি নেতা যতীন চক্রবর্তী সি পি এম-এর ট্রেড ইউনিয়ন সংস্থা সিটুর কাছে লেখা এক চিঠিতে বলেছেন, বন্‌ধে এখন আর কোনো কাজ হচ্ছে না, আরো সক্রিয় কিছু করা দরকার। তিনি আইন অমান্য আন্দোলন-গোছের কিছু করার কথা বলেছেন। সি পি এম অবশ্য এই ধরনের আন্দোলনের কথা এখনও ভাবেনি। জুনের শেষে বিধানসভা ভেঙে দেওয়ার পর পার্টির রাজ্য কমিটির বৈঠকের শেষে প্রমোদ দাশগুপ্ত কেন্দ্রের স্বৈরাচারের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনের কথা বলেছিলেন, কিন্তু কোন্ পথে আন্দোলন হবে তা স্পষ্ট করে বলেননি। তবে তিনি একটি প্রস্তাব করেছিলেন, কেন্দ্রের স্বৈরাচারের বিরুদ্ধে আইনজীবী ও গণতান্ত্রিক সংগঠনগুলি একটি কন্‌ভেনশন ডাকুন এবং সেই কন্‌ভেনশন থেকেই উঠুক প্রতিবাদ।

এ-থেকে মনে করা যেতে পারে যে, সি পি এম এখন আইনী পথেই থাকতে চায়। সি পি এম-কে মন্ত্রিসভা গঠনের সুযোগ না দিয়ে বিধানসভা ভেঙে দেওয়ায় যে-ধরনের প্রতিক্রিয়া দেখা দিতে পারে বলে অনেকে আশংকা করেছিলেন, সি পি এম সে-ধরনের কিছুই করেনি। সি পি এম-এর প্রতিবাদ ছিল নিতান্তই মামুলি প্রতিবাদ, এমনকি একটা বাংলা বন্‌ধও ডাকা হয়নি। পার্টি ক্যাডারদের সন্তুষ্ট রাখার জন্যে সি পি এম-কে একটা লড়াকু চেহারা বজায় রাখতেই হবে, কিন্তু সি পি এম আইন অমান্য আন্দোলন বা আরো চরম কোনো পথ এখনই গ্রহণ করবে বলে অনেকেই মনে করেন না। তার কারণ দুটি। প্রথমতঃ, নতুন কেন্দ্রীয় সরকারের প্রচণ্ড শক্তি এবং দ্বিতীয়তঃ, বাংলাদেশ পরিস্থিতি। এই দুটি কারণ মিলিয়ে দিল্লীর পক্ষে এখন যে-কোনো কড়া ব্যবস্থা গ্রহণ করা খুব কঠিন নয়। সি পি এম সম্বন্ধে দিল্লী সেই ধরনের কোনো কড়া ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারে, এমন কোনো সুযোগ কি সি পি এম দিল্লীর হাতে তুলে দিতে পারে? —অবন্তক

দেশ বিদেশ

সরকারী হিসাবই বলছে, ১৯৫৩ থেকে ১৯৬৮ সালের মধ্যে ভারতবর্ষে বন্যায় ক্ষতি হয়েছে মোট ১১৩৬ কোটি টাকা অর্থাৎ বছরে গড়ে ৭১ কোটি টাকা। গড়ে প্রতি বছর বন্যার ফলে দেড় কোটি মানুষ দুর্গতির মধ্যে পড়েন, ৬৫০ মানুষ মারা যান, দেড় কোটি একর জমির ক্ষতি হয়, পঞ্চাশ লক্ষ একরের বেশী জমির ফসল নষ্ট হয়, বত্রিশ হাজারখানেক গরুমহিষ মারা যায়, পাঁচ লক্ষ কুঁড়ে ও কোঠাবাড়ী নষ্ট হয়।

এই ষোল বছরে বন্যায় ক্ষতির পরিমাণ যেখানে ১১৩৬ কোটি টাকা সেখানে ১৯৫১ থেকে ১৯৬৯ সালের মধ্যে ১৮ বছরে বন্যানিয়ন্ত্রণে খরচ করা হয়েছে ১৯২ কোটি টাকা অর্থাৎ প্রতি বছর বন্যায় মোট যে পরিমাণ ক্ষতি হয় তার এক পঞ্চমাংশেরও কম টাকা খরচ করা হয় বন্যা নিয়ন্ত্রণের জন্য।

কাজ যে একেবারে কিছু হয়নি তা অবশ্য নয়। আমাদের কেন্দ্রীয় সরকার দাবী করে থাকেন, দেশের যে প্রায় ৬ কোটি একর জমিতে সাধারণত প্লাবনের সম্ভাবনা থাকত তার এক চতুর্থাংশে বন্যা আয়ত্তে আনা গেছে। নদীর পারে নূতন বাঁধ দেওয়া হয়েছে মোট ৪৩০০ মাইল, ৫৭০০ মাইল নিকাশী খাল খোঁড়া হয়েছে, ৪৫৮০টি গ্রাম নিচু জমি থেকে উঁচু ডাংগায় সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছে এবং ১৭৮টি শহরকে বন্যার প্রকোপ থেকে রক্ষা করার ব্যবস্থা হয়েছে।

কিন্তু, পশ্চিমবঙ্গ, বিহার, উত্তরপ্রদেশ ও ওড়িশার বিস্তীর্ণ এলাকায় কয়েক কোটি মানুষের পক্ষে এবার এই ফিরিস্তি কোন সান্ত্বনাই নয়। কেননা, তাঁরা প্লাবনের জলে ভাসছেন। সামনে গোটা সেপ্টেম্বর মাস এখনও বাকী। এরই মধ্যে উত্তর ভারতে সমগ্র গাংগেয় উপত্যকা জুড়ে বন্যার্ত মানুষের হাহাকার শোনা যাচ্ছে। এবারকার বর্ষায় গংগায় বিপদসীমার উপর দেড় কোটি একর-ফুট জল জমেছে, সাধারণতঃ যেখানে জমে মাত্র প্রায় ত্রিশ লক্ষ ফুট। আগস্ট মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহ পর্যন্ত এবার সারা ভারতে বন্যার দরুণ ক্ষতির পরিমাণ দাঁড়িয়েছে সর্বসাকুল্যে ৩০০ কোটি টাকা অর্থাৎ গড়ে প্রতি বছর যা হয় তার চার গুণের বেশী। আর একটি অসম্পূর্ণ হিসাব হল, বন্যায় এযাবৎ মারা গেছেন ৪৫০ জন। গংগায় জলোচ্ছ্বাসের ফলে বিহারের রাজধানী পাটনা বিপন্ন হয়েছিল এবং গুরুত্বপূর্ণ বারৌনি শহর সম্পর্কে গভীর উদ্বেগ দেখা দিয়েছিল। প্লাবনের ফলে বারৌনি বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র থেকে বিদ্যুৎ সরবরাহ কিছু সময়ের জন্য বন্ধ রাখতে হয়েছিল। বারৌনি শহর জলমগ্ন হলে অবশ্য বিপদ আরও গভীর হত। কেন না, এখানে বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র ছাড়াও সার কারখানা ও তৈল শোধনাগার রয়েছে এবং উত্তর ভারতের সংগে যোগাযোগের দিক থেকে এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ রেল জংশন। পশ্চিমবংগের নদীগুলিতে জলোচ্ছ্বাস ও অতিবর্ষণের ফলে দশটি জেলায় প্লাবন দেখা দিয়েছে। সবচেয়ে বেশী বিপন্ন হয়েছে মালদহ জেলা। ঐ জেলার বারো আনা অংশই জলের তলায়। রেলপথে, সড়কপথে ও বিমানপথে জেলার সংগে যোগাযোগ নষ্ট হয়ে যাওয়ায় মালদহে ত্রাণসামগ্রীও পাঠান যাচ্ছে না।

অন্যান্যবারের মতো এবারও অভিযোগ হয়েছে যে, নিম্ন বাংলার নদীগুলি যখন বৃষ্টির জলে এমনিতেই ফুলে ফেঁপে রয়েছে তখনই ডি-ভি-সি'র বাঁধ (এবং কংসাবতী ও ময়ূরাক্ষী বাঁধ) থেকে জল ছেড়ে মানুষের দুর্গতি আরও বাড়ান হয়েছে। ভারতবর্ষে গত কয়েক দশকে যেসব 'ড্যাম' তৈরী করা হয়েছে সেগুলির মধ্যে মাত্র তিনটিতে বন্যানিয়ন্ত্রণ অন্যতম উদ্দেশ্যরূপে রাখা হয়েছে। এই তিনটি হল : হীরাকুদ বাঁধ, পাঞ্চেৎ বাঁধ ও মাইথন বাঁধ। এদের মধ্যে শেষোক্ত দুটিই হল ডি-ভি-সি'র বাঁধ। এ দুটি বাঁধই অবশ্য একসংগে একাধিক উদ্দেশ্য সাধনের জন্য তৈরী হয়েছে। টাকার সাশ্রয় করার জন্য বন্যা নিয়ন্ত্রণের লক্ষ্যটাকে বিদ্যুৎ উৎপাদন ও সেচের লক্ষ্যের সংগে যুক্ত করা হয়েছে এবং কখনও কখনও এইসব উদ্দেশ্য পরস্পরাবিরুদ্ধ হয়ে দাঁড়ায় (যেমন, বর্ষার জল আটকাবার জন্য জলাধারে যতটা স্থান খালি রাখা দরকার তা রাখতে গেলে সেচ ও বিদ্যুৎ উৎপাদনের দিকটা মার খায়)। কিন্তু, তবু, ডি-ভি-সি'র বাঁধগুলি থেকে পশ্চিমবংগের যতটা সুফল পাওয়ার কথা তা পাওয়া যাচ্ছে না, এটা একটা পুরনো অভিযোগ। এর অনেকগুলি কারণ আছে। দামোদরের বাঁধগুলি যখন তৈরী করা হয়েছিল তখন এইসব বাঁধে প্রতি বছর যে পরিমাণ পলি পড়বে বলে অনুমান করা হয়েছিল এখন দেখা যাচ্ছে তার চেয়ে অনেক বেশী পরিমাণ পলি জমছে। অর্থাৎ এইসব বাঁধের জল ধরে রাখার ক্ষমতা দ্রুতহারে কমছে। এই প্রতিকার করার জন্য বাঁধের উজান এলাকাগুলিতে ভূমিসংরক্ষণের কাজের উপর যতটা জোর দেওয়া উচিত ছিল তা দেওয়া হচ্ছে না। দ্বিতীয়ত, পাঞ্চেৎ জলাধারে যে স্তর পর্যন্ত জল রাখার কথা ছিল তা থেকে ২৫ ফুট নিচু স্তর পর্যন্ত জল রাখতে হচ্ছে। অনুরূপভাবে, মাইথনেও পাঁচ ফুট নিচু স্তর পর্যন্ত জল রাখতে এর কারণ বেশী জল রাখতে গেলে জলাধারসংলগ্ন আরও কিছু জমি সময়মতো দখল করার দরকার ছিল। এখন সেসব জমি দখল করতে হলে সেখানে ইতিমধ্যে যাঁরা বসবাস করছেন তাঁদের সরিয়ে অন্যত্র পুনর্বাসন দিতে হবে এবং তার দায়িত্ব নিতে হবে বিহার সরকারকে। পশ্চিমবংগে বন্যার প্রকোপ কমাবার জন্য এই দায়িত্ব নিতে বিহার সরকার খুব উৎসুক নয়। তাছাড়া, সেটা করতে গেলে যে খরচ হবে সেই খরচ ভাগাভাগির জটিল প্রশ্নটাও রয়েছে।

তৃতীয়ত, ডি-ভি-সি'র জলাধারগুলি তৈরি করার সংগে সংগে জল নিকাশের যে ব্যবস্থা করা দরকার ছিল তা করা হয় নি। তার ফলে পশ্চিমবঙ্গের হুগলী ও হাওড়া জেলার নিম্ন দামোদর এলাকায় বন্যা একটা চিরস্থায়ী ব্যাধিতে পরিণত হতে চলেছে। ডি-ভি-সি'র জেনারেল ম্যানেজার দেবেশ মুখোপাধ্যায় জানিয়েছেন যে, নিম্ন দামোদর উপত্যকা পরিকল্পনার জন্য কেন্দ্রীয় সরকার যদিও প্রারম্ভিক কাজ শুরু করার বাবদ দেড় কোটি টাকা মঞ্জুর করেছেন তাহলেও ঐ কাজ আরম্ভ হয়নি এবং আগামীবার অবস্থার যে কিছু উন্নতি হবে তার নিশ্চয়তা কিছু নেই।

*

তামিলনাড়ুই বলতে গেলে ভারতের প্রথম রাজ্য যেখানে মাদকবর্জন নীতি চালু করা হয়েছিল। তামিলনাড়ুর সরকার গত ৩০ আগস্ট তারিখে ২২ বছরের পুরানো সেই মাদকবর্জন নীতি বিদায় দেওয়ার পর ভারতে এখন আর একটি মাত্র রাজ্য রইল যেখানে মদ বিক্রি করা ও খাওয়া নিষিদ্ধ। সেই একটিমাত্র রাজ্য হল গুজরাট।

তামিলনাড়ু সরকার অবশ্য সরকারীভাবে একথা বলছেন না যে, তাঁরা মাদকবর্জন নীতি বিসর্জন দিলেন। তাঁরা শুধু বলছেন এই নীতি তাঁরা 'স্থগিত' রাখছেন। মাদকবর্জন সম্পর্কে একটা সর্বভারতীয় নীতি যতক্ষণ পর্যন্ত চালু না হচ্ছে ততক্ষণ পর্যন্ত তাঁরা এককভাবে মাদক নিষিদ্ধ করে লোকসান মেনে নিতে প্রস্তুত নন। তামিলনাড়ু সরকার অনুমান করছেন,

শ্রীসুধাংশুকান্তি ঘোষ রবিবার শেকসপীয়র সরণিতে পাকিস্থানে পরিত্যক্ত সম্পত্তির ভারতীয় মালিক সমিতির এক সভায় বক্তৃতা দিচ্ছেন।

অবাধে মদ কেনা-বেচা করতে দেওয়ার ফলে রাজ্য সরকারের বছরে ২৬ কোটি টাকা আয় বেড়ে যাবে।

গত জুন মাসেই মুখ্যমন্ত্রী করুণানিধি তাঁর সরকারের সিদ্ধান্তের কথা ঘোষণা করেছিলেন। রাজ্যপালের দুটি অর্ডিন্যান্সের দ্বারা সেই সিদ্ধান্ত কার্যকর করা হল। ইতিমধ্যেই রাজ্য সরকার সারা রাজ্যে ৭৩৯৫টি তাড়ির দোকান ও ৩৫১২টি আরকের দোকান নীলাম করেছেন এবং শতখানেক বিলাতী মদের দোকানের লাইসেন্স দিয়েছেন। শুধু এই থেকেই সরকারের ১৬ কোটি টাকা রাজস্ব সংগৃহীত হয়েছে।

নূতন উদার নীতি চালু হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ফলাও কারবার ফেঁদে বসার জন্য ইতিমধ্যে আরও অনেকেই প্রস্তুত হচ্ছেন। মাদ্রাজ শহরের রাস্তায় আলোঝলমলে মদের বিজ্ঞাপন দেখা যাচ্ছে। নারকেল ও তাল গাছ জমা নেওয়ার জন্য হুড়োহুড়ি পড়ে গেছে। সুযোগ বুঝে গাছের মালিকরা দাম চড়িয়ে দিয়েছেন। লোকে তাড়ি কাটতে ভুলে গেছে। যে অল্প কয়েকজন তাড়ি-কাটা পাওয়া যাচ্ছে তাদের অনেক টাকা কবুল করতে হচ্ছে। তাড়ি-কাটাদের ইউনিয়ন তৈরি হয়ে গেছে এবং তাদের দাবির লম্বা ফিরিস্তিও দেওয়া হয়েছে।

সকলেই যে ব্যাপারটা ভাল চোখে দেখছেন তা নয়। তামিলনাড়ুর শুখা আইনটাকে এভাবে সমুদ্রের ভিতর জোলাঞ্জলি বিসর্জন দেওয়াটা যাঁরা পছন্দ করতে পারছেন না তাঁদের মধ্যে আছেন নিখিল ভারত মাদক বর্জন পরিষদের নেতারা। তাঁরা মাদক বর্জনের সপক্ষে তামিলনাড়ুর পরলোকগত মুখ্যমন্ত্রী আন্না-দুরাইয়ের উক্তি উদ্ধৃত করে আলোচনা চালাচ্ছেন। ভারতের মাদক বর্জন আন্দোলনের একজন প্রধানা নেত্রী ডাঃ সুশীলা নায়ার ঘোষণা করেছেন যে, জাতীয়জীবন থেকে পানদোষ দূর না হওয়া পর্যন্ত তিনি ক্ষান্ত হবেন না। চক্রবর্তী রাজাগোপালাচারি মনে করেন যে, মাদক বর্জনের নীতি প্রত্যাহার করে নেওয়াটা মূর্খতা এবং এজন্য ডি এম কে-কে পরে পস্তাতে হবে।

শুধু নৈতিক কারণেই নয়, অর্থনৈতিক কারণেও কিছু লোক ডি এম কে সরকারের নীতি পরিবর্তনে উদ্বিগ্ন। একজন প্রথম শ্রেণীর তামিল চিত্রাভিনেতা সম্প্রতি বিভিন্ন মঞ্চ থেকে মদ্যপানে বিরত থাকার জন্য অভিযান চালিয়ে যাচ্ছেন। তিনি যে সম্পূর্ণ নৈতিক কারণে তা করছেন তা নয়। তামিলনাড়ুর চলচ্চিত্র ও মঞ্চের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন মহলের ধারণা, তাড়ি ও আরকের দোকানের আকর্ষণে সিনেমা-থিয়েটারের চাহিদা অদূর ভবিষ্যতে অনেক কমে যাবে। একজন চলচ্চিত্র প্রযোজক বলেছেন, 'তামিলনাড়ুর গ্রামাঞ্চলে তাড়ির দোকান হলে চলচ্চিত্র শিল্পসহ ব্যবসা-বাণিজ্যের অন্যান্য শাখায় অবশ্যই মন্দা আসবে।' হোটেল-মালিক সমিতির একজন সদস্যের আশংকা, হোটেলে চা ও কফির বিক্রি কমে যাবে, এমন কি হোটেলের ব্যবসায়ও টান পড়বে। একজন পরিবহণ ব্যবসায়ীর উদ্বেগের কারণ হল, মদের পাত্রে চুমুক দেওয়ার জন্য প্রতি সপ্তাহান্তে মাদ্রাজ থেকে বাঙ্গালোর ও পন্ডিচেরি যাওয়ার যে হিড়িক পড়ত সেটা বন্ধ হয়ে যাবে। কোথাও কোথাও মেয়েরা এই নূতন মদের দোকানগুলির মধ্যে তাঁদের ও তাঁদের পরিবারের সর্বনাশ দেখতে পাচ্ছেন। মাদ্রাজ শহরের একটি এলাকায় একটি তাড়ির দোকান খোলার কথা ছিল। সেই এলাকার মেয়েরা প্রচন্ড বাধা দেওয়ায় দোকান খোলা যায় নি।

তামিলনাড়ু সরকারের একজন মন্ত্রী বলেছেন, 'সরকারের টাকা দরকার, তাই মাদক বর্জনের নীতি স্থগিত রাখা হয়েছে। কিন্তু ডি এম কে মদ্যপানের বিরোধী, তাই তারা জনসাধারণকে মদ খেতে নিষেধ করবে।

মন্ত্রী মহাশয়ের কথাটা প্রমাণ করার জন্যই যেন মুখ্যমন্ত্রী দশজনের একটি কমিটি গঠন করেছেন—যে কমিটির কাজ হবে মদ খাওয়ার কুফল সম্পর্কে জনসাধারণকে অবহিত করা।

নূতন নীতি চালু হওয়ার প্রাক্কালে সরকার শুখা আইন ভাঙ্গার অপরাধে দণ্ডিত কয়েদীদের মুক্তি দিয়েছেন। আর নূতন মদের দোকানগুলি খোলার পর মাতলামি করার জন্য গ্রেপ্তার করা হয়েছে কয়েক শ লোককে। একই দিনে গ্রেপ্তার করা হয়েছে সর্বোদয় নেতা এস আর সুব্রহ্মণ্যকে। তিনি মাদক-

চীনের প্রাচীর

বার্লিনের প্রাচীর

স্বাগতম

স্বাগতম

বর্জন নীতি চালু করার দাবিতে মাদ্রাজে সচিবালয়ের সামনে অনশন করছিলেন।

•

নারীঘটিত কেলেঙ্কারির সঙ্গে ক্ষমতাবানদের জড়িয়ে পড়ার তিনটি সাম্প্রতিক কাহিনী :—

গত ১৭ আগস্ট তারিখে লাখ্নৌ-এ চাকুরীজীবী নারীদের একটি হোস্টেলের মহিলা ওয়ার্ডেন বাইরে থেকে ফিরে এসে দেখেন, তাঁর ঘর ভিতর থেকে বন্ধ। একটি অনাথা অবিবাহিতা তরুণী মেয়ে ওয়ার্ডেনের কাছে থাকতেন। ওয়ার্ডেনের চাকরবাকররা বলেন, মেয়েটি ঘরের ভিতর রয়েছেন। অনেক ডাকাডাকি করে সাড়া না পাওয়ায় পুলিশকে খবর দেওয়া হয়। পুলিশ ঘরের দরজা ভেঙে মেয়েটিকে মৃত অবস্থায় দেখতে পায়। ময়না তদন্তে প্রমাণ হয় যে, মেয়েটি গর্ভবতী ছিলেন না। উত্তরপ্রদেশের বিধানসভায় ব্যাপারটি নিয়ে বেশ কিছু প্রশ্নোত্তর হয়ে গেছে। ভারতীয় ক্রান্তি দলের একজন সদস্য প্রশ্ন করেন, লখ্নৌ-এর ডেপুটি কমিশনার মেয়েটিকে ঐ হোস্টেলে পাঠিয়েছিলেন কি না এবং জনৈক মন্ত্রীর পুত্রের সঙ্গে মেয়েটির অবৈধ সম্পর্ক ছিল কি না। উত্তরপ্রদেশের সমাজ কল্যাণ মন্ত্রী অজিতপ্রতাপ সিং বলেন, কিসের ভিত্তিতে এইসব অভিযোগ করা হচ্ছে তিনি বুঝতে পারছেন না। মেয়েটি ওয়ার্ডেনের সঙ্গে থাকত এবং গৃহস্থালির কাজে তাঁকে সাহায্য করত, এজন্য অনুমতি নেওয়ার কোন প্রশ্ন ওঠে না। গোয়েন্দা পুলিশ ঘটনাটি সম্পর্কে তদন্ত করছে।

গঞ্জাম জেলার মহকুমা শহর ভাঞ্জনগর থেকে মহকুমা হাকিম-সহ পাঁচজন বড় অফিসারকে ওড়িশা সরকার বদলির আদেশ দিয়েছেন।

তাঁদের বিরুদ্ধে অভিযোগ, গত ১৫ আগস্ট স্বাধীনতা দিবসের ছুটি উপভোগ করতে তাঁরা ভঞ্জনগর থেকে ১৫ মাইল দূরবর্তী ছোট পাহাড়ী শহর রুম্ভাতে গিয়েছিলেন। সেখান থেকে ফেরার পথে দুজন আদিবাসী মেয়েকে দেখতে পেয়ে তাঁরা একটি মেয়েকে নিকটবর্তী ডাক বাংলোতে নিয়ে গিয়ে লাঞ্ছিত করেন। অন্য মেয়েটির চিৎকার শুনে আশেপাশের গ্রামগুলি থেকে আদিবাসীরা জড় হয়। ঐ অফিসাররা নাকি তখন জিপে করে সেখান থেকে চম্পট দেন। ডিভিশনাল কমিশনার ও জেলা ম্যাজিস্ট্রেট প্রাথমিক তদন্ত করে যে রিপোর্ট দিয়েছেন সেটা নাকি ঐ অফিসারদের বিরুদ্ধে গেছে।

অন্ধ্র রাজ্যের নেল্লোর শহরের অ্যাডভোকেট সি এল শাস্ত্রীর দুই মেয়ে কল্যাণী (২১) ও চন্দ্রিকারাণী (১৭) মাস তিনেক আগে একদিন একটি বিয়েবাড়ী থেকে বেরিয়ে বাসে উঠেছিলেন। ঐ দিন সন্ধ্যা ছ'টা নাগাদ তাঁদের নেল্লোর থেকে মাইল ১৫ দূরে সমুদ্রতীরে একটি জায়গায় দেখা গিয়েছিল। জীবিত অবস্থায় ঐ শেষবারের মতোই তাঁদের দেখা পাওয়া গিয়েছিল। এর বারো-দিন পরে ঐ সমুদ্রতীরে পাওয়া একটি মৃতদেহের কিছু পচা-গলা অংশ শাস্ত্রীকে দেখান হয়। তিনি সেই অংশগুলি, একটা আংটি ও কিছু অন্তর্বাস দেখে মৃতদেহটি তাঁর মেয়ে কল্যাণীর বলে সনাক্ত করেন। আরও কিছুদিন পরে জানা যায় যে, কাছাকাছি আর একটি জায়গায় আর একটি মৃতদেহ ভেসে এসেছিল। স্থানীয় জেলেরা স্বীকার করে যে, মৃতদেহটি থেকে একটি হাতঘড়ি আর একটি কানের দুল খুলে নিয়ে মৃতদেহটি তারা ভাসিয়ে দিয়েছে। সেই মৃতদেহটি আর খুঁজে পাওয়া যায় নি। ধরে নেওয়া হচ্ছে, সেটি চন্দ্রিকারাণীরই মৃতদেহ ছিল। 'জমিন রায়ত' নামে একটি স্থানীয় তেলেগু পত্রিকা ব্যাপারটি নিয়ে অনুসন্ধান করে এবিষয়ে অনেক তথ্য উদ্ঘাটন করে। তারপর এসম্পর্কে একজন পুলিশ অফিসারকে ও একটি মদের দোকানের মালিককে ঐ দুই আধুনিকা ফ্যাসান-দুরস্ত ভগ্নীকে হত্যার অভিযোগে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।

•

আইনের বিচারে পৃথিবীতে যত লোককে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয় তার মধ্যে প্রায় অর্ধেকই দক্ষিণ আফ্রিকার মানুষ। এত বেশী মৃত্যুদণ্ড আর কোন দেশে দেওয়া হয় না। ১৯৬৯ সালের ১ জুলাই থেকে ১৯৭০ সালের ৩০ জুন পর্যন্ত এক বছরে সেখানে ৮০ জনকে ফাঁসি দেওয়া হয়েছে। ১৯৭০ সালের ৩০ জুন সেদেশের জেলে ৫৭ জন কয়েদী ফাঁসির অপেক্ষায় ছিল। তারা প্রায় সকলেই কৃষ্ণকায়।

—পুণ্ডরীক

স্ব বিরোধ ॥

গোপাল ভৌমিক

নিসর্গ নবীন নয়, নবীন দুচোখ
পুরাতন দৃশ্য দেখে
খুঁজে পায় কি নতুন মানে।
শিল্পিত সৌন্দর্য তার
যুগে যুগে ধরা পড়ে
ছবি বা কবিতা কিংবা গানে।

যুগান্তরে ভিন্ন চোখে দেখি সেই রূপ
এবং মেলাতে চাই
অতীতের দেখা চোখ দিয়ে;
সূত্র খুঁজে পেতে পেতে যত দিন যায়
তত গূঢ় কথা বলি
স্বরূপ বোঝাতে গিয়ে ইনিয়ে বিনিয়ে।

নতুন দুচোখে যদি নাই মেলে
পুরাতন স্বাদ
ক্ষতি তাতে কোথায় কে জানে!
দুর্বিনীত অপবাদ জোটে এ কপালে
যেহেতু পাই না খুঁজে
মোটরের গতিবেগ সনাতন ভেনিসী সাম্পানে।

সময় দজ্জাল মাতা ॥

সনৎ বন্দ্যোপাধ্যায়

ফুলগুলি ছড়ান ছিটান
কথাগুলি এলোমেলো
তবু সত্য ফুটেছিল ফুল
কথাগুলি পেয়েছিল মুখের আদল

মমতায় তুলে নিলে বুকের নিকট
ফুলগুলি জয়মাল্য হতো
উষ্ণতাপে হৃদয়ের
কথাগুলি হতে পারতো আদরে আবেগে
একটি কবিতার জন্যে বাঙময়
মুখর মিছিল

ম্লান মুখ ফুলগুলি বিবর্ণ হেলায়
স্তব্ধ থেকে বোবাজল কথাগুলি মূক
সময় দজ্জাল মাতা বড়ই কঠিন
হৃদয় [illegible] আস্বাদ [illegible]।

নির্জনতার পাথর ভেঙে ॥

চন্দন সেন

দুই তালুতে উথলে ওঠে আলো
যেন একটি জলপ্রপাত
জন্মভূমির মৃত্তিকাতে
যেন একটি [illegible] যাওয়ার চিঠি
অথবা কোন বিলম্বিত নিনাদ
নির্জনতার পাথর ভেঙে
[illegible] ছড়িয়ে যাবে তাই
দুই তালুতে উথলে ওঠে
অগ্রগতির দ্যুতি।

প্রতিরোধ

শক্তিপদ রাজগুরু

বৈকালের সোনা-হলুদে আলোটুকু ইছাখালির গাং-এর ধারে আম-কাঁঠালের বাগানের গায়ে-মাথায় রং-এর আভাষ এনেছে, মিষ্টি আমেজ আনে। পাখ-পাখালির কলরবে মুখর হয়ে ওঠে। গ্রীষ্মের শুরু—তাই এখনও মাটি তেতে আছে রোদের তাপে। গাং-এর ওপারে দেওয়ারের দিকে বাবলা বনের এপাশ-ওপাশের গ্রাম-গুলোর ছায়ারেখাকে ধূসর—অবসন্ন দেখায়।

বালি ঝুরঝুরে মাঠে সবুজ পাটগাছ-গুলো বড় হয়ে উঠছে। বৃষ্টির ছোঁয়া পেলে ওরা লকলকিয়ে উঠবে—মানুষের নাগাল ছাড়িয়ে ওরা উঠবে ঢোলা ঢোলা পাতা মেলে। আকাশে জমবে কালো মেঘের দল, ইছাখালির গাং-এ তখন বর্ষার ঢল নামবে কুমারী মেয়ের সারা গায়ে যেমন করে যৌবনের ঢল নামে—ঠিক তেমনিভাবেই। তেমনি উচ্ছল হয়ে উঠবে গাং—দেওয়ারের বিস্তীর্ণ চরভূমিতে ওই বাবলাবনের কোল ছাড়িয়ে জলের সীমানা পৌঁছে যাবে।

মল্লিকা সেই ছবিটার কথা ভাবে—আজকের মেঘশূন্য রোদপোড়া আকাশ আর বৈশাখের খররোদের নিষ্করুণ তাপ মল্লিকার সারা মনে বাদলমেঘের স্নিগ্ধতার ভাবনা আনে। তখন নুরুল থাকবে অনেক দূরে।

আজ সে রয়েছে মল্লিকা খাতুনের পাশেই। আর সেইজন্যেই এই পরিবেশ ওর ভালো লাগে। এমনি করে ওরা দুজনে নির্জন দুপুরে বের হয়ে পড়ে। মল্লিকা ওকে ডাকছে—এ্যাই। ওঠবানি? কতো ঘুমাইবা, এ্যাঁ?

পাশে একটা কাঁঠালগাছের ঘন ছায়ার নীচে নরম মাটিতে শুয়েছিল নুরুল, ওর ধাক্কায় ধড়মড়িয়ে উঠল। মিষ্টি সতেজ চেহারা—তখনও ঘুমের আমেজ লেগে আছে ওর চোখেমুখে, ঠাণ্ডা হাওয়ায় আর স্নিগ্ধ ছায়ার নীচে জমাটি ঘুম দিচ্ছিল সে। নুরুল চোখ রগড়াতে রগড়াতে শুধুল—কি কইছিস?

মল্লিকার মিষ্টি গলাটা কলকলিয়ে ওঠে—ঘুমাইতে জাগা পাওনা বাড়িতে? চাচীরে কমু ছেলেডারে কি রাতভোর পড়বার জন্য ঘুমাইতেও দাও না?

হাসছে নুরুল। রোদ-লাগা গাঢ় হলুদ কাঁঠালপাতা দু-একটা দমকা বাতাসে ঝরে পড়ে। মল্লিকার চোখদুটো ইছাখালির গাং-এর পানির মতই কালো—জেগে আছে ওতে স্রোতময় একটি প্রাণচাঞ্চল্য—গভীরতার অজানা কি রহস্য। ওর মুখের গড়ন পান-পাতার মত, চিবুকটা ধারালো রেখায় ঠোঁটের কমনীয়তাকে বাঙ্ময় করে তুলেছে। এই মল্লিকাকে যেন চেনে না নুরুল।

ওর মনে হয় জানান না দিয়েই যেন ইছাখালির গাং-এ ভরা বর্ষার ঢল নেমেছে—কূলে কূলে ছাপিয়ে উঠেছে জলকল্লোল, ওর প্রবাহ সব কূলের বাঁধনকে ভাসিয়ে নিয়ে যেতে চায় কামনার সাগর বেলা মোহনায়। ওর ডাগর কালো চোখে বাগানের ছায়া-স্নিগ্ধতার ইঙ্গিত জাগে, মল্লিকা যেন তাকে এমনি দাবদাহের থেকে কোন প্রশান্তি-ভরা জগতের সন্ধান দেয়। ওর হাসি-জড়ানো পাতলা ঠোঁটে কালো মেঘের কোলে কোলে রৌদ্ররেখার ইঙ্গিত আনে। কোন আশা-জাগানো ইশারা।

সদ্য ঘুমভাঙা চোখে কি স্বপ্নজড়ানো চাহনি মেলে নূরুল আজ মল্লিকার দিকে চেয়ে থাকে। পাখী ডাকছে—বউ কথা কও পাখীর ওই ডাক মল্লিকাকে এই স্তব্ধতোর মাঝে আনমনা করে তোলে, হাওয়া-কাঁপা বাঁশবনে শির-শির শিহর জাগে, মল্লিকার সারা মনে সেই সুরের অনুরণন।

স্তব্ধ ছায়াচ্ছন্ন বাগানে ওরা দুজনে আজ দুজনকে দেখে কি বিস্মিত চাহনিতে।

গঞ্জের স্কুল থেকে পাশ করে নূরুল ঢাকায় পড়তে গেছে। নূরুলের মায়ের কাছে এটা প্রথম ভালো লাগেনি, স্বামী মারা যাবার পর ওই একটি মাত্র সন্তান নূরুলের মুখ চেয়েই মা সব কষ্ট ভুলেছিল। কিন্তু তার নিজের সামান্য সুখের জন্য ছেলেকে বন্দী করে রাখতে চায়নি সে।

নূরুলের বাবা ছিলেন গঞ্জের নামকরা ডাক্তার। তখন এখানের গঞ্জের সমৃদ্ধি ছিল, নকুল সাহা, গোবিন্দ দত্ত, বটকৃষ্ণ দাসদের রমরম কারবার। নূরুল সেই দিনগুলোর কথা ভোলেনি। সে আর মল্লিকা বাবার সঙ্গে ওদের বাড়িতে নেমন্তন্নে যেতো।

নূরুলের বাবা সৎভাবে ডাক্তারী করে বেশ কিছু বিষয়-আশয় করে গেছলেন। নূরুলের মা ফাতিমা বিবি বলতো—আমাগোর একটা মাত্র পোলা, আল্লার মর্জিতে তার দিন ঠিকই চলে যাবে। গরীবের চোখের পানি ফেলে পয়সা যেন না নাও।

স্ত্রীর এই কথাটা আজীবন মেনে গেছেন তিনি। তাই আজ বাবা মারা যাবার পরও নূরুলের পড়াশোনায় কোন বাধাই হয়নি। মা বলেছিল—ডাক্তারীই পড়বি তুই। বাপের টাটে বসতে হবে তোরে।

গঞ্জের পাট-মহাজন ইরসান খাঁ ওদের গঞ্জের বড় বাড়িটা নিতে চেয়েছিল, ফাতিমা বিবিই বিদেশী সেই খানকে ওটা ভাড়া দেয়নি। ওর আশা আছে একদিন নূরুল ডাক্তার হয়ে আবার ওখানে বসবে।

নূরুলও জানে সেটা। মা, পাশের বাড়ির মল্লিকা, আরও অনেক বন্ধুবান্ধবও সেই আশা করে। তাই ঢাকাতে ডাক্তারী পড়তে গিয়েও গ্রামের কথা, মল্লিকার কথা সে ভুলতে পারেনি। সেখানের পড়াশোনা—ক্লাশ—হাসপাতাল ডিউটির ঠাস বোঝাই কাজের জীবন থেকে ক'দিনের জন্য এখানে এসে তার হারানো দিনগুলোকে ফিরে পায় সে।

মল্লিকাও হঠাৎ যেন বদলে গেছে। ওর সুন্দর পদ্মফুলের মত মুখখানার দিকে চেয়ে থাকে নূরুল, মনে হয় ওখানে রয়েছে তার জন্য একটু নির্ভর—পরম আশ্বাস।

হঠাৎ বৈকালের পাখীডাকা সুন্দর পরিবেশে বিশ্রী কর্কশ ধাতব একটা কঠিন শব্দ ওঠে। ইছাখালির গাং-এর শান্ত জল-রাশির বুকে ঢেউ তুলে লঞ্চটা আসছে ওর পিছনে ঢাউস দুটো পাটের গাঁট-বোঝাই নৌকা, সেগুলোকে টেনে আনছে লঞ্চটা। লঞ্চের রেলিং ধরে দাঁড়িয়ে আছে ইরসান খাঁ। দীর্ঘ দেহ—রোদে-জলে ফর্সা রং তামাটে হয়ে গেছে। ওর মেহেদী রং-করা দাড়ি ছুঁচলো করে ছাঁটা, ওর মনের ক্রূরতা আর লালসাকে ফুটিয়ে তুলেছে ওই দাড়ি ছাঁটার ভাবটা। পশ্চিম পাকিস্তান থেকে সে এখানে এসে শাহানশাহের মত যেন তার সাম্রাজ্য কায়েম করেছে। গঞ্জের বিরাট গুদামগুলো তার, সেখানে গাঁট বাঁধার মেসিন বসিয়েছে। বরফকল, পাট, কাপড়ের গদি—সবই তার।

নূরুল-মল্লিকা এখানের সকলেই ওই লোকটাকে ভালো করে চেনে, শয়তান—এখানের যেন গ্রহ সে।

ওই ইরসান খাঁ-ই ছলে-বলে-কৌশলে এখানকার অন্যান্য মহাজনদের হটিয়ে দিয়েছে। প্রথমদিকে তারা ওই শয়তানকে চিনতে পারেনি। ক্রমশঃ চিনেছে।

সেবার গঞ্জের মধ্যে ওইই জোর করে ফৌজদারী বাধিয়েছিল বড় কারবারী নকুল সাহার লোকদের সঙ্গে, মোল্লাদের হাত করে এখানকার কিছু লোকের মুখ বন্ধ করে হিন্দুদের দোকান আড়তে আগুন লাগিয়ে লুটপাট করিয়ে দেয়। বটকৃষ্ণ-বাবুকেও ওরা পথের উপর নিষ্ঠুরভাবে খুন করেছিল। গঞ্জের সুন্দর সুস্থ পরি-বেশটাকে বিষিয়ে তুলেছিল ওই ইরসান খাঁ।

ওই লোকটাই, টাকা দিয়ে খুলনা থেকে বেশ কিছু বিদেশী পাঠান গুন্ডাকে এনে-ছিল। সেই দিনগুলোর বিভীষিকা আর রক্তপাতের কথা ভোলেনি নূরুল। তখন সে স্কুলের ছাত্র, দেখেছিল কিভাবে ওরা নিরীহ লোকদের হত্যা করেছিল, তারা বাধা দিতে পারেনি। নূরুল শিউরে উঠেছিল—মনে হয়েছিল তারা কত বড় অসহায়, কত বড় পাপী। ওই নিরীহ নকুল সাহা, গোপাল দত্ত, বটকৃষ্ণ দাস—আরও কতজনকে বাঁচাতে পারেনি। ওদের অনেকে পালিয়েছিল প্রাণ-ভয়ে এদেশ থেকে। তাদের এতদিনের পরিচিত চেনাজানা আপনজনকেও তারা আশ্রয় দিতে পারেনি।

ওই ইরসান খাঁ-ই এখানের কেউকেটা হয়ে বসেছে। পুলিশ এসে এখানকারই গোলাম মিঞাকে ধরে নিয়ে গেল। সে নাকি এই অশান্তির মূলে। এখানকার বড় মহাজন বাঙালী ওই গোলাম মিঞাকে এমনি করে ইরসান খাঁ সর্বস্বান্ত করে তার গুদাম দখল করেছিল। আজ ইরসান খাঁ ফুলে ফেঁপে উঠেছে। নিজের লঞ্চ, গাড়ি সবই করেছে। আরও অনেক দেশওয়ালী ভাই বেরাদারকে এনে এখানে বসিয়েছে।

নূরুল লোকটার দিকে চেয়ে থাকে।

একটা চাপা রাগে ওর মন বিষিয়ে ওঠে। মনে হয় লোকটার লোভী হাতের থাবা তাদের অনেক কিছুই কেড়ে নিয়েছে। সেবার জুম্মার নমাজের সময় বলেছিল—তারা নাকি কলমা পড়তে জানে না। সর-কারের উচিত এই বেয়াদপদের ধরে ধরে চাবুকে ঠিক মত কলমা পড়ানো।

অনেকেই কথাটা শুনেছিল, রেগে উঠেছিল। কিন্তু কিছু বলতে সাহস করেনি। কারণ, থানা-পুলিশ পর্যন্ত তার কথায় উঠবস্ করে। ডি-এম সাহেব নাকি ওর এক বসতির আদমী।

তারই জোরে ইরসান খাঁ সেবার স্কুলের রবীন্দ্র জন্মোৎসবের অনুষ্ঠান প্রায় বাতিল করতে চেয়েছিল। বলেছিল—কমিটি মিটিং-এ—ওসব কাফেরের ব্যাপার। বিধর্মীর প্রতি সম্মান দেখানোর প্রশ্নই ওঠে না। তাছাড়া গান-টান নাকি ধর্ম-বিগর্হিত কাজ।

তাই নিয়েই ছাত্ররাও প্রতিবাদ করে-ছিল। দরকার হলে ধর্মঘট করবে তারা। নূরুলও ছিল দলের পান্ডাদের অন্যতম। ইরসান খাঁ শুনেছে সব কথা। তার পা-চাটা কুকুরের অভাব নেই। ওর পাটের মোকামে কাজ করে কালু শেখ, ছমিরুদ্দি আরও অনেকে। কালু শেখই খান সাহেবকে তাদের নামগুলো দিয়েছিল।

খানসাহেব ব্যাপার একটু গড়বড় দেখে আর কথা বলেনি। কারণ, কারবারী লোক, মুখে সে মোলায়েম ভদ্রতাটুকু বজায় রাখতে চায়। তবু নামগুলো যথাস্থানে পাঠিয়ে-ছিল। আর পুলিশও হয়রান করেছিল তাদের।

ঢাকায় তখন কলেজের ছাত্ররা গুলিতে প্রাণ দিচ্ছে। বাংলাভাষাকে তারা প্রতিষ্ঠিত করতে চায়, তাদের মাতৃভাষাকে তারা ওদের হুমকিতে বিসর্জন দেবে না। রুখে উঠে-ছিল ছাত্রসমাজ।

ইরসান খাঁও বোধহয় ভয় পেয়েছিল। তাই তখনকার মত চুপ করেছিল সে।

লঞ্চটা একটানা শব্দ তুলে চলেছে। পিছনে পাটের নৌকাগুলোকে টেনে-টেনে। নূরুল বলে—

—ব্যাটা ডাকাত। লোককে দাদন দিয়ে দিয়ে কিনে নিয়েছে আধা দামে।

মল্লিকা চেয়ে থাকে ওই লঞ্চের দিকে। লোকটাকে চেনে সে। তাই বলে—তাগোর সবকিছুই এমনি লুটে নিতে চায় ওরা। শয়তানের দল!

মল্লিকা নূরুলের চেয়ে আরও বেশী করে জানে ওকে। লোকটা টাকার লোভ দেখিয়ে গঞ্জের অনেক মেয়েরই সর্বনাশ করেছে। তার নিজের কথাটাও মনে পড়ে। ওকে একদিন বলেছিল লোকটা। তেমার ভাই-এর কাম নেই আজ? উসকো ভেজ দেনা। কাম করেগা গদিমে। তুম্ ভি এতনা নারাজ কিঁউ?

মল্লিকা একলা পথে ওর সুপারী-বাগানের ছায়ায় দাঁড়িয়ে শিউরে উঠেছিল। লোকটা হাসছে। মনে হয় ওই হাসির ধারাল শব্দটা ছুরির ফলার মত তার সারা গায়ে বিঁধছে। কোনরকমে সরে এসেছিল। মনে হয়েছিল লোকটা ভেবেছে সামান্য কিছুর বিনিময়ে ওদের সবকিছু কেনা যায়। নইলে ছিনিয়ে নিতেও তার এতটুকু বাধবে না।

মল্লিকা অসহায় রাগে ফুঁসে ওঠে—শয়তান! কুত্তার বাচ্চা ওটা।

—এতো রাগছিস কেন? নুরুল ওর মুখচোখের কাঠিন্য দেখে শুধোয়।

মল্লিকার মনে হয় নুরুলের কাছে নিজের এই অপমানের কথাটা প্রকাশ করাও দুঃসহ লজ্জায়। বলে সে।

—না। চলো। ঘরে চলো।

নুরুলের মাও দেখেছে ব্যাপারটা। দিনগুলো কেমন বদলে গেছে। দেশ-বিভাগের পর ভেবেছিল, যা হয়ে গেছে সেটার পরিণাম হয়তো ভালো হবে না। এদেশে হিন্দুদের সঙ্গে তারা বাস করেছে। তাদের দোল-দুর্গোৎসবে, বিয়েতে ওরাও গেছে, তাদের পরবে তারাও সামিল হয়েছিল।

ফতিমা বিবির মনে পড়ে মায়া বৌদির কথা, চাটুজ্যেবাড়ির সেজবৌ শীলা ছিল তার বন্ধু-সই। দুজনে গাজনের মেলা দেখতে গেছে।

তার ছেলে নুরুলকে শীলা ভালোবাসতো ছেলের মত।

ওই পাড়াগুলো খালি হয়ে গেছে প্রায়। ওরা চলে গেছে—যাবার আগে ফতিমাকে জড়িয়ে ধরে কেঁদেছিল শীলা—মায়া বৌদি বললে—

—চল্লাম ফতিমা, তোরা আমাদের তাড়িয়ে দিলি?

ফতিমা জানে না কি তাদের অপরাধ। তবু ভয় হয়েছিল তার—ওরা থাকলে বেইজ্জৎ হবে। মানুষগুলো যেন খেপে উঠেছে। তখনই মনে হয়েছিল—বলেছিল তার স্বামীকে।

—এর ফল ভালো হবে না—আল্লা এই গোণাহ্-এর দাম উশুল করে নেবে।

ওরা সমর্থন করতে পারেনি, অসহায়ের মত দেখেছিল তাদেরই কতো আপনজন সব চলে গেল। তারপর ধীরে ধীরে এসেছে নোতুন মানুষ। যারা সবকিছু লুটে নিয়ে যেতে চায়। এর ফলে অশান্তিই বাড়ছে—সর্বত্রই একটা চাপা আক্রোশ ধুঁইয়ে উঠছে, ক্রমে ক্রমে চলেছে সেই বিক্ষোভ, বারুদের স্তূপে পরিণত হয়েছে। সামান্য আগুনের ছোঁয়ায় দাবানলের মত জ্বলে উঠবে।

ভয় হয় ফতিমার, তার স্বামী গেছে—প্রিয়জনরা গেছে, হারিয়ে গেছে বন্ধুবান্ধব সবকিছু, একমাত্র সন্তান নুরুলের মুখ চেয়ে বেঁচে আছে সে। তার ছেলে মানুষ হোক।

তাই ভয় করে ওই দাবানলের ছোঁয়া থেকে তার ছোট্ট এই সংসার কি রক্ষা পাবে না? মায়ের মন অজানা

বৈকালের ম্লান আলো পড়েছে কলাগাছের পাতায়, বাতাসে ওরা নিশানের মত পতপতিয়ে কাঁপছে। মল্লিকাকে ঢুকতে দেখে চেয়ে থাকে ফতিমাবিবি। মল্লিকা কয়েকটা ডিম দাওয়ায় রেখে ওর দিকে চাইল, ফতিমাবিবি মেয়েটাকে সত্যিই ভালোবাসে।

ওর বাবার অবস্থা তেমন ভালো নয়। রেজেস্ট্রি অফিসের কেরানী, এখানে ছিল, তবু বাড়ির খেয়ে টাকাটা সিকেটা হাতে পেতো। কোন নোতুন খানসাহেব এসে তাকে বদলী করেছে মাদারিপুরে। সংসারের প্রাণীগুলোর মুখের গ্রাস ছিনিয়ে নিয়েছে ওরা। তার বদলির কারণ ওই ইরসান খাঁ—ও নাকি কতকগুলো জমি বেআইনীভাবে রেজেস্ট্রি করাতে চেয়েছিল তাতে বাধা দিয়েছিল ওর বাবা। তার কিছু-দিনের মধ্যেই ওকে বদলি হতে হয়। অবশ্য জমিগুলো রেজেস্ট্রি হয়ে গেছল তারপর।

নুরুলের মা মল্লিকার হাতে দুটো টাকা দিয়ে বলে—রেখে দে এটা। মল্লিকা জানে তাদের সংসারের অবস্থা। ওদের খাবার চালটার অধিকাংশই যায় এ-বাড়ি থেকে। তাছাড়া টাকা পয়সা তো নিতেই হয়। তাই বলে সে, এখন নাইবা দিলে চাচী। মা নুরুর জন্যে পাঠিয়েছিল ওগুলো। মল্লিকার কথায় জবাব দিল না ফতিমাবিবি।

মনে হয় মেয়েটা বোধহয় তার কেউ ছিল, একটা আন্তরিক টান তাদের রয়ে গেছে। নুরুল ঢাকায় চলে যায়, মল্লিকাই তার মনের সব শূন্যতাকে পূর্ণ করে দিয়েছে। মায়ের মনে হয় কথাটা। নুরুলও মল্লিকাকে হয়তো ভালোবাসে। দুজনে দুজনের জন্য ভাবে, তাছাড়া ওকে বিশ্বাস করতে পারে ফতিমাবিবি সবদিক থেকে।

মনে হয় নুরুল ডাক্তারী পাশ করে আসুক—তখনই কথাটা পাড়বে। কিন্তু একগুঁয়ে বেপরোয়া নুরুল, পড়াশোনায় ভালো—তবু ওকে সামলানো দায়। মাঝে মাঝে ওর মধ্যে একটা আগুনের হলকা যেন ঠেলে উঠতে চায়।

সেবার বাংলাভাষা আন্দোলন নিয়ে গোলমালে ও সামিল হয়ে ছিল, ওরা বলে—চুপ করে সব সইব না ওদের জুলুমবাজি, আজ মায়ের ভাষাকে স্তব্ধ করে দিতে চায়, কাল চাইবে মাটি—একদিন ইজ্জৎও ধুলোয় লুটিয়ে দিতে চাইবে ওরা।

মল্লিকা হাসে—কি করবে?

—যা করার করবো। নুরুল ফুঁসে উঠতে চায়।

ফতিমাবিবি ছেলের দিকে চেয়ে থাকে। ভয় হয় তার—এই মাতনে তামাম জোয়ানী না মেতে ওঠে!

মল্লিকার উপর তার আশা, সে হয়তো ফেরাতে পারবে নুরুলকে ঠিক পথে। মল্লিকা বলে—

—ডাক্তার সাব হও আগে, পিছু ওসব কাম করবা। তবু লোকের জান পরাণ বাঁচানোর কাম তো আছে?

ফতিমাবিবি নানা ভাবনায় ভয়ে ভয়ে থাকে। কদিন এসেছে নুরুল, এখানেও তার কাজের বিরাম নেই। মল্লিকাকে বলে—টাকাটা রাখ তুই। হ্যাঁরে—নুরুলকে দেখিস নি? সেই দুপুরে বের হয়েছে।

মল্লিকা খাতুন ঘাবড়ে যায়। চাচী বোধহয় জানে না ওদের বাগানে বসে দুপুরভোর গল্প করার কথা। সেটা প্রকাশ করতেও লজ্জা বোধ করে মেয়েটি।

মল্লিকা জানায়—একটু আগে দেখলাম—আইনুদ্দিন সাহেবের সাথে চলে গেল গিয়া ওপাড়ার দিকে।

—খেয়ে গেল না? মা বিড় বিড় করে। দুদিনের জন্য ছেলে ঘরে এসেও ঘরে থাকে

না। দিনরাত বন্ধুবান্ধব আসছে—ফুসফাস কথাবার্তা হচ্ছে। কথার আর শেষ নেই।

কোথায় একটা জ্বালা—বুক ভরা অতৃপ্তি ওদের সব কিছুকে বিষিয়ে করে তুলেছে। কতিথা ঠিক জানে না আজকের এই তীব্র দহন এর চাঞ্চল্য।

মল্লিকা বলে—যাই গিয়া, দেখলে পাঠাই দিমু।

মল্লিকা বের হয়ে এল। তখন ইছাখালির গাং-এর বুকে বৈকাল গড়িয়ে সন্ধ্যা নামছে। গঞ্জের বাজারে আলোগুলো জ্বলে উঠছে। মসজিদ থেকে আজানের সুরটা কেঁপে কেঁপে উঠছে। বাঁশবনের মাথায় নারকেল গাছের ফাঁকে চাঁদ উঠছে। বড় একটা থালার মত চাঁদটা তখনও আলোয় ভরে ওঠেনি। ওর বুকজোড়া লালাভ ভাবটা ক্রমশঃ তরল আর ফিকে হয়ে আসছে। হাওয়ায় কাঁপছে নারকেল গাছের পাতাগুলো, আছাড় বিছাড় খাচ্ছে। বাগানের ভিতর অন্ধকার জমাট বেঁধে আছে, ওপাশের নদীর বিস্তারে চাঁদের আলো ঝলমলিয়ে উঠছে।

হঠাৎ বাগানের অন্ধকারের মধ্যে কাদের ছায়ামূর্তিগুলো দেখে থমকে দাঁড়াল মল্লিকা। নুরুলের গলা শোনা যায়, আইনুদ্দি—স্কুলের বদরুমাস্টার—ওপাড়ার মহীউদ্দিন আরও কারা রয়েছে। নুরুল বলে—

—ওরা এসব সহ্য করবে না। বন্দুক দিয়েও থামাবার চেষ্টা করবে।

মহীউদ্দিন বলে—তার জবাব ওই বন্দুকে দিয়াই দিমু। খানেদের জবাব দিমুই এবার।

ওরা কি সব সাংঘাতিক কথা বলছে। মল্লিকা অজানা ভয়ে শিউরে ওঠে। নড়বার সাধ্যও নেই তার। বাগানের শুকনো পাতায় খস খস শব্দ উঠবে, ওরা ধরে ফেলবে তাকে। মল্লিকার মনে হয় একটা প্রচন্ড কালবৈশাখী ঝড়ের কালো মেঘ যেন আকাশটাকে ভরিয়ে দিয়েছে, ওরা মুখ বুজে অন্তহীন স্তব্ধতার মাঝে সেই ঝড়টারই প্রতীক্ষা করছে। জিব্রাইলের মত আগুনের হলকায় ওরা সব পুড়িয়ে ছাই করে দিতে চায়, দরকার হলে নিজেদেরও। ওরা কোন দুর্বার দুঃসাহসী যৌবন, ওদের চেনে না মল্লিকা।

কতক্ষণ দাঁড়িয়েছিল একটা গাছের গুঁড়িতে হেলান দিয়ে ওই অন্ধকারে জানেনা মল্লিকা খাতুন। চাঁদের আলোটা গাছের ফাঁক দিয়ে বাগানের মাটিতে লুটিয়ে পড়েছে হিজিবিজি রেখায়।

—তুই! হঠাৎ নুরুলের ডাকে চমকে ওঠে মল্লিকা খাতুন।

নুরুলও ওকে এখানে এইসময় দেখবে তা ভাবে নি ঃ মল্লিকা কি একটা অন্যায় করে ফেলেছে ভেবে চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল। ওদের দুজনের মাঝে একটা স্তব্ধতা ঘনতর হয়ে ওঠে।

নুরুল বুঝেছে মল্লিকা ওদের কথাবার্তা ও শুনেছে যেগুলো অন্য কেউ শুনুক তারা চায় নি। ওরা সবাই চলে গেছে। ওরা জানতে পারে নি তাদের আলোচনা আর প্রস্তুতির কথা আর কেউ শুনেছে।

মল্লিকা ওর দিকে চেয়ে আছে।

নুরুল ওকে বিশ্বাস করতে পারে। তবু বলে সে,

—এসব কথা কাউকে বলিস না।

মল্লিকার মনে জমাট আতঙ্কের কালো পাথর যেন চেপে রয়েছে।

মল্লিকা নুরুলের কাছে এগিয়ে এসেছে, ওর মুখে পড়েছে পাতার ফাঁক দিয়ে একফালি চাঁদের আলো। কোথায় একটা কোকিল ডাকছে—সবুজ আলো আঁধারি ভরা এই পরিবেশে মল্লিকা কি ভাবনায় ব্যাকুল হয়ে ওঠে। বলে সে—

এসব করলে পড়াশোনা কখন হবে? চাচী কতো আশা করে তুমি ডাক্তার হবে, তাছাড়া—

নুরুল শান্ত মেয়েটিকে দেখছে। ওর দুচোখে কি নিবিড় আর্তি ফুটে ওঠে। নুরুল বলে তুই। তুই কি বলিস?

চমকে ওঠে মল্লিকা, নুরুল জানে না তার কুমারী মনে কি আশার জোয়ার, ওর দেহের অণুপরমাণুতে কি ব্যাকুলতা মিশিয়ে আছে, মল্লিকা নিজেকে প্রকাশ করতে চায়, এই শান্ত সুন্দর পরিবেশ আর কখন আসবে জানে না। মল্লিকা খাতুনের দু'চোখে জল নামে।

নুরুল অবাক হয়—কাঁদছিস কেন? এ্যাই ঃ

ওর অসহায় কান্না বাধা মানে না। নুরুলের দুহাতের বাঁধনে বন্ধ হয়ে মেয়েটা কান্নায় ভেঙে পড়ে। নিজেকে সামলাবার চেষ্টা করছে মল্লিকা।

এতদিন যে দুর্বলতাটাকে গোপন করে রাখতে চেয়েছিল নুরুলের কাছে, সেইটা কি বেদনায় ফেটে পড়েছে। এই কথাটা ভাবতে নিজেরই লজ্জা করে মল্লিকার।

শান্ত ইছাখালির জলের বিস্তারে চাঁদের আলো পড়েছে, ঘুমঢাকা বসত। নারকেল-কলাগাছগুলোর হাওয়া কাঁপা পাতায় বাতাসের খুশির সাড়া জাগে।

লেবুফুলের গন্ধভরা বাতাস ওর মনে অনেক স্মৃতির আবেশ আনে। নুরুল বলে—কাঁদছিস কেন? সময় একদিন আসবে, যেদিন সুখী হবো আমরা সবাই। নোতুন করে বাঁচবো সব আশা আর ভবিষ্যতের স্বপ্ন নিয়ে।

মল্লিকা ওর কথাগুলো শুনছে সারা মন দিয়ে। ওর নিবিড় ছোঁয়াটুকু তার কান্নাভরা বুকে পরম সান্ত্বনা এনেছে, ঊষর বালু-বেলায় যেন বর্ষণের তৃপ্তির আবেশ আছে।

নুরুল বলে—ততদিন আমাদের অপেক্ষা করতেই হবে। মাকেও বুঝিয়ে বলবি। মা যেন ভুল না বোঝে।

চাঁদের আলোটুকু গলে গলে পড়েছে ইছাখালির গাং-এ ওই গাছগাছালির মাথায় তারই ধারাস্নান চলছে। এই রূপকথাদের গহনে হারিয়ে গেছে আগামী দিনের স্বপ্নে দুটি তরুণ তরুণী।

...চমকে ওঠে নুরুল একটা বিস্ফোরণের শব্দে।

ওদিকের অন্ধকার দিগন্ত উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছে আগুনের শিখায়। পুড়ছে হাট-গ্রাম-বসত-গঞ্জ। শত শত মানুষের আর্তনাদ কান্নার রোল ওঠে। সব ছাপিয়ে গুলির শব্দ উঠছে।

গর্জে ওঠে আইনুদ্দি—শয়তানের বাচ্চারা জাহান্নামে যাক।

কে লাফ দিয়ে উঠতে যাবে, তাকে থামিয়ে দিল নুরুল। —খবরদার! ওরা এই দিকেই ফিরবে ওই খান কুত্তার দল। তখুনিই বদলা নিতে হবে।

বৃষ্টিভেজা বাগানের মধ্যে গর্তগুলো খুঁড়ে ওরা প্রতীক্ষা করছে, চারিদিকে গাছ-গাছালিও অক্ষত নেই। বট অশত্থ গাছটাকে ওরা মর্টারের গোলায় ছত্রখান করে দিয়েছে। ডালগুলো জ্বলে জ্বলে আংরা হয়ে গেছে, ওপাশে কাজির দরগায় ঘরগুলো ধসে পুড়ে আংরার স্তূপে পরিণত হয়েছে ওদের নেপাম বোমার আগুনে। সবুজ ইছাখালির গঞ্জ-এর সারা গায়ে যেন দগদগে ঘা, তাদের সবকিছু স্বপ্ন—সবুজ সব ভবিষ্যৎকে ওই নিষ্ঠুর শয়তানের দল কেড়ে নিয়ে পুড়িয়ে ধ্বংসস্তূপে পরিণত করেছে।

কমাসের মধ্যেই ঘটে গেছে এই আমূল পরিবর্তন।

নুরুল ভাবতেই পারে না এই কথা। নিষ্ঠুর কঠিন সত্যগুলোকে মনে হয় রাতের দেখা কোন দুঃস্বপ্ন—যা সত্যি নয়। দেখেছিল ঢাকা শহরে সেই হিংস্র রাতের অন্ধকারে একটা লোককে গুলীতে একটা হাত বিদীর্ণ হয়ে গেছে—অন্য হাতটা নেই, হঠাৎ কি প্রাণপণে দৌড়োবার চেষ্টা করেই লোকটা ছিটকে পড়ে স্তব্ধ হয়ে গেল। তার গায়ে এসে লেগেছিল তাজা গরম খুন।

সারা শহরে খানরা হানা দিয়েছে, জ্বলছে জগন্নাথ হল। ইকবাল হল মর্টারের গোলায় ধসে পড়েছে, হাসপাতালের দেওয়ালে এসে লাগছে গুলীগুলো—অন্ধকারে ঝলকে ঝলকে আগুন বের হচ্ছে মেশিন গান থেকে। দিগন্তে শুধু লাল আভা আর কান্নার আর্তরোল ওঠে। কোন সর্বনাশা তাণ্ডব নেমে এসেছে ওদের উপর, রোজ কেয়ামৎ-এর দিনের বিভীষিকা নিয়ে।

...মৃতদেহ আর ধ্বংসস্তূপের উপর দিয়ে রাতের অন্ধকারে ওরা কোনরকমে বুড়িগংগা পার হয়ে শুভড্যার পথ ধরে গ্রামের দিকে চলে এসেছিল। পিছনের সেই আগুনের শিখা তার চোখে-বুকে এনেছিল দুর্বার জ্বালা। ওদের বাঁচার সব দাবীকে বন্দুকের গুলী দিয়ে—বেয়নেট আর মর্টার দিয়ে স্তব্ধ করে দিতে চায় শয়তানের দল।

পথে পথে দেখেছে নুরুল সেই মৃত্যু আর অকথ্য অত্যাচার। বিদেশী হানাদাররা আজ তাদের শেষ করে—সেই মাটির উপর প্রেত-নৃত্য সুরু করেছে। গ্রামকে গ্রাম ওরা লুঠ করে পুড়িয়ে ছাই করে দিতেও দ্বিধা করেনি। মেয়েদের ইজ্জৎটুকুও রাখেনি তারা।

আজ নুরুলের বুক কেঁপে উঠেছে সেই জ্বালায়।

সবকিছুর জবাব দিতে হবে। বাংলাদেশের সবুজ প্রান্তর দিগন্তপ্রসারী বিলের অতল থেকে মাথা তুলেছে নব-জাগ্রত একটি সত্তা। যে ওই অত্যাচারীর কঠিন হাত তার মাতৃভূমির বুক থেকে হটিয়ে দেবে।

আজ তারা মরীয়া। হারাবার আর কিছুই নেই।

সেই অগ্নিজ্বালা, ওদের মনে, তার গ্রাম মাতৃভূমির সত্তা চারিদিকে, সর্বাঙ্গে।

...ইছাখালির গঞ্জের আর বাকী কিছু নেই।

নুরুলের চোখের সামনে ভেসে উঠেছিল সর্বনাশা ছবিটা। ক'দিন পথে পথে কেটেছে। বড় রাস্তায় দেখেছে রাতের অন্ধকারে হেডলাইট জেলে মিলিটারী ট্রাক চলেছে দুপাশে যা কিছু আছে সব তারা জালিয়ে শেষ করে দিতে চায়। মেশিনগান থেকে গুলীর ফোয়ারা ছিটিয়ে চলেছে পথের দুপাশে।

সরে গেছে দূরে নুরুল—আরও অনেকে। শিউরে উঠেছে ওই মৃত্যুর হানাদারিতে। জানে না তাদের গ্রাম গঞ্জের কি অবস্থা।

তবু আশা নিয়ে ফিরছে সে, মনে হয় ওই চরম বিপদ আর মৃত্যুর মাঝে ওই সবুজ গ্রামবাসীরা বাগান-ঘেরা বাড়িটুকুই তার একমাত্র আশ্রয়। মায়ের কথা মনে পড়ে—মনে পড়ে মল্লিকার কথা। মনে হয় যেন ওরা ঊষর মরুভূমির বুকে একটু স্নিগ্ধতার সন্ধান আনা মরুদ্যান, যেখানে পথহারানো কাফেলার জন্য রয়ে গেছে আশ্রয় আশ্বাস।

...কিন্তু সব কেড়ে নিয়েছে শয়তানরা। তার আগেই ইরসান খাঁ তৈরী হয়েছিল তার লুণ্ঠনের শেষ আঘাত হানতে।

এদের এই ষড়যন্ত্রের কথা সে জেনেছিল, এখানকার তাজা জোয়ানগুলোর কলজেতে আগুনের জ্বালা। তাই সব খতম করে দিতে চেয়েছিল—যাতে তার সাম্রাজ্য এখানে প্রতিষ্ঠিত থাকে।

খবর এনে দিয়েছিল তারই কর্মচারী ওই বসির মিঞা, লোকটা কুকুরের জাত—একমুঠো এঁটো খানা পেলেই ল্যাজ নাড়ে। ইরসান খাই দলবল ঠিক করে রেখেছিল—যথাস্থানে খবর পাঠিয়ে দিতেও কসুর করেনি।

তারপরই সুরু হয়েছিল তাণ্ডব। বসির এর দল হানা দিয়েছিল গঞ্জের বাজারে। আগুনের লেলিহান শিখায় পুড়ে গেছল গঞ্জ বাজার। অসহায় মানুষগুলোকে ধরে ধরে এনে দাঁড় করিয়ে ওরা গুলী করেছে।

মল্লিকার মাও শিউরে উঠেছিল, মানুষটা রয়েছে বাইরে চাকরির জায়গায়। সেখানেও কি হচ্ছে জানে না, গঞ্জের দিক থেকে ধোঁয়া আর আগুনের শিখা উঠছে। গুলীর শব্দ ওঠে। কারা এগিয়ে আসছে—সাহা বাড়ি লুঠ করে ওরা গোলামদের বাড়িতে আগুন ধরিয়েছে।

মল্লিকার মা ছেলে-মেয়েদের নিয়ে পিছনের বাঁশবন দিয়ে পালাচ্ছে—কোথায় যাবে জানে না, মল্লিকাই মাকে নিয়ে এসে উঠেছে নুরুলদের বাড়িতে, নুরুলের মায়ের চোখে কি জ্বালা আর ঘৃণা।

—ওরা সব শেষ করে দেবে মল্লিকা?

মেয়েটা হরিণশিশুর মত ভয়ে কাঁপছে—ওকে বুকে জড়িয়ে ধরেছে ফাতিমা বিবি।

কিন্তু রক্ষা করতে পারেনি।

খাঁকি পোষাক পরা জানোয়ারগুলো দল বেঁধে এসে হানা দিয়েছে। ঘর থেকে বাক্স তোরঙ্গ বের করে লাথি মেরে ভেঙ্গে টাকা-গয়না কুড়োচ্ছে। হঠাৎ একজন দৈত্য লাফ দিয়ে এগিয়ে আসে ওদের দিকে। তার চোখ-মুখে কি পৈশাচিক উল্লাস,—সে লুঠ করতে এসে যেন মাণিক পেয়ে গেছে।

ফাতিমাকে এক ধাক্কায় ছিটকে ফেলে দিয়ে মল্লিকার হাতখানা ধরেছে। চীৎকার করে ওঠে মল্লিকা খাতুন—বাঁচাও! বাঁচাও!

কেউ নেই যে বাঁচাতে আসবে। ফাতিমা বিবি এগিয়ে আসবার চেষ্টা করতে কে বেয়োনেটের ধারাল ফলা দিয়ে ওর দেহটাকে ঝালা ঝালা করে দেয়।

মল্লিকার জ্ঞান হারিয়ে আসছে—ওরা টেনে হিঁচড়ে নিয়ে চলেছে তার জ্ঞানহীন দেহটাকে জঙ্গলের দিকে। মল্লিকার মা লুটিয়ে পড়েছে একটা গুলী তার কলজে এ-ফোঁড় ওফোঁড় করে দিয়েছে।

ছাই আর ধ্বংসস্তূপের ওপাশে পড়ে থাকতে দেখেছিল মায়ের ক্ষতবিক্ষত দেহটা, নুরুল এসেছিল ক'দিন পর। তখন গ্রামের আর কিছু নেই, শুধু পোড়া ছাই—ভাঙ্গা ঘর, দুচারটে কুকুর এদিক ওদিকে ঘুরছে গলিত পচা মাংসের সন্ধানে।

—মা!

ক্লান্ত নুরুল থমকে দাঁড়িয়েছে। তার মাকেও চরম নিষ্ঠুরতার শিকারে পরিণত করেছে। তার শেষ আশ্রয় আশ্বাসটুকুও কেড়ে নিয়েছে ওরা। ব্যর্থ করেছে তার জীবন, স্বপ্ন, সব সাধনাকে। মা নেই!

—নুরু!

কে যেন ফিসফিসিয়ে ওঠে। চাইল নুরুল। ধ্বসে পড়া মাটির স্তূপের আড়াল থেকে বের হয়ে আসে মইনুদ্দি। ওর কাঁধে হাতখানা রেখে বলে—

—চোখের জল ফেলার সময় নাই নুরু, এখনও কাঁদবি? ফেটে গর্জে উঠবি না?

নুরুল মইনুদ্দির দিকে চেয়ে থাকে। ধ্বংসস্তূপ আর পোড়া ছাই-এর শ্মশানে কারা জেগে উঠেছে নোতুন একটি শপথ নিয়ে। মইনুদ্দির দু-চোখ জ্বলছে কি দুঃসহ জ্বালায়। নুরুল ওকে শুধোয়—মল্লিকা। মল্লিকা কোথায়?

সবুজ বাঁশবনগুলো আগুনের শিখায় ঝলসে কালো হয়ে গেছে, মইনুদ্দি ওকে টেনে নিয়ে চলেছে গড়ের জঙ্গলের দিকে। এককালে এখানে সে আর মল্লিকা কাঠচাঁপা ফুলের সন্ধানে আসতো, পাখীর ডাকে ভরে থাকতো বনভূমি, বন-খেজুর, আর বেতের গাঢ় সবুজ লতাগুলো জড়াজড়ি করে বাতাসে শির-শির করতো। ওরা বোধহয় পালিয়ে এসে এই ঘন বনের আড়ালে আশ্রয় নিয়েছে! এখুনি বের হয়ে আসবে মল্লিকা, এত সর্বনাশের মাঝেও সে একজনকে পাশে পাবে—বাঁচার আশ্বাসটুকু ফিরে আসবে। অস্ফুট আর্তনাদ করে ওঠে নুরুল। বেত বনের ওপাশে ভিজে স্যাঁতসেঁতে মাটিতে উপুড় হয়ে পড়ে আছে মল্লিকার প্রাণহীন দেহটা, কাপড়-চোপড় নেই—বে-আব্রু বেইজ্জতের বাকী আর কিছু নেই। মল্লিকাকেও চরম অপমানে আর লাঞ্ছনায় শেষ করে গেছে। নুরুলের মনে হয় সে যেন ছিটকে পড়ে যাবে। কি উত্তেজনায় ওর সারা শরীর কাঁপছে। দুঃসহ একটা অগ্নিজ্বালা ওর বুকে ছাপিয়ে উঠে তাকে প্রচণ্ড বিস্ফোরণে টুকরো টুকরো করে দেবে?

দস্যুর দল মল্লিকার সর্বস্ব লুঠ করেছিল জানোয়ারের মত, তারপর গুলী করে খতম করে যায়। তারপর শিয়াল-কুকুরের দল তার নরম দেহটাকে খুবলে খুবলে খেয়েছে। ওই দস্যুদল তাকে খেয়ে গেছে প্রাণ থাকতে, আর ওর প্রাণহীন দেহটাকে টুকরো করেছে শিয়াল কুকুরের দল। দুই শ্রেণীর মধ্যে পার্থক্য বিশেষ নেই।

নুরুলের চোখের সামনে আগেকার আশা-আনন্দে ঝলমল দিনগুলোর কথা মনে পড়ে। আজকের প্রচণ্ড আঘাতে সব কেমন ভেঙ্গে গুঁড়িয়ে পড়ছে—আর আগুনের লেলিহান শিখায় পুড়ে পুড়ে অংগার হয়ে গেছে।

মা—মল্লিকা—তার ঘর বাড়ি—ভবিষ্যৎ সব ওই ভস্মস্তূপের অতলে হারিয়ে গেছে। আজ সে নাম-পরিচয় হীন—নিঃশেষ অতীতের বুকে দাঁড়িয়ে প্রত্যক্ষ করেছে একটি সর্বনাশকে।

—নুরুল!

মইনুদ্দি ওকে ডাকছে। ওর দিকে চেয়ে অবাক হয় মইনুদ্দি। শান্ত সেই ছেলেটি ধীরে ধীরে বদলে যাচ্ছে, ওর মুখ-চোখে ফুটে ওঠে কাঠিন্য আর জ্বালার অস্থির চাঞ্চল্য। মানুষের এই সর্বনাশে আজকের মানুষ নুরুল বিক্ষুব্ধ উন্মত্ত হয়ে উঠেছে।

শক্ত হাতে নুরুল ওর হাতখানা ধরেছে।

—ঠিক বলেছিস, মইনুদ্দি। আর কান্না নয়—এবার জবাব দেবার দিন এসেছে।

—রাতের তারাজ্বলা অতন্দ্র অন্ধকারে তাই ওরা জেগে আছে প্রহরীর মত, দুচোখে ওদের অগ্নিজ্বালা। ওরা মানবিকতার সশস্ত্র প্রহরী—বর্বর অন্যায়কে রুখে দাঁড়াবার শপথে ওরা কঠিন দুর্বার।

প্রাগৈতিহাসিক যুগের নৃত্য

মঞ্জুলিকা রায়চৌধুরী

নৃত্যের ইতিহাসের উৎস সন্ধানের প্রচেষ্টা সম্প্রতিকালে বেশ বিস্তার লাভ করেছে। এই প্রচেষ্টা আমাদের পূর্বপুরুষদের মধ্যে থাকলে উত্তরপুরুষদের এতটা মাথা ঘামাতে হত না। পশ্চিমদেশে নৃত্যের তবু একটা ধারাবাহিক ইতিহাস লক্ষ্য করা যায়। কিন্তু ভারতে নৃত্যের ঐতিহ্য যদিও অতি প্রাচীন, তবুও তাকে ইতিহাস বলা চলে না। সংগীতশাস্ত্রগুলিতে আমরা নৃত্যের যে ইতিহাস পাই, তাকে ঠিক ইতিহাসের কোঠায় ফেলা যায় না। কারণ তা আমাদের কাছে বাস্তব বলে মনে হয় না। কল্পলোকের দেবদেবীদের ক্রিয়াকলাপ কল্পনাপ্রসূত কাহিনীর রূপ নিয়ে আমাদের কাছে উপস্থাপিত হয়েছে। সুতরাং এগুলি প্রামাণ্য ইতিহাস বলে অভিহিত হতে পারে না। নৃত্যের ইতিহাসের সন্ধান করতে গেলে আমাদের মানবজাতির ইতিহাসের দিকে তাকাতে হবে। ঐতিহাসিক ভিত্তিতে আলোচনা করলে দেখা যায় যে, পৃথিবীর সব দেশীয় নৃত্যের জন্ম একই সূত্রে গাঁথা। একই উৎসমুখ থেকে নিঃসৃত হয়ে পরবর্তীকালে ভৌগোলিক অবস্থান, ধর্ম, সামাজিক, আর্থিক, রাজনৈতিক প্রভাবের ফলে এবং বিভিন্ন সভ্যতার স্পর্শে বিভিন্ন রূপ পরিগ্রহ করেছে।

আধুনিক যুগে নৃত্যের মুখ্য উদ্দেশ্য আঙ্গিক অভিনয়ের সাহায্যে সৌন্দর্য সৃষ্টি করে আনন্দ পাওয়া এবং আনন্দ দেওয়া। দেনা-পাওনার হিসেবে গন্ডগোল হলেই সেখানে শিল্পবস্তু সৃষ্টিতে ব্যাঘাত ঘটে। মানুষ যত সভ্যতর হয়েছে ততই তার শৈল্পিক মন আত্মপ্রকাশের জন্য উন্মুখ হয়ে উঠেছে। নৃত্য এই আত্মপ্রকাশেরই একটি রূপ।

নৃত্যের ক্রমবিবর্তনের ধারাটি অনুসরণ করে দেখা গেছে যে, যেদিন নতুন পৃথিবীতে নতুন মানুষের আবির্ভাব ঘটে, সেইদিনই নৃত্যের বীজ মানুষের মনে উপ্ত হয়েছে। অবশ্য এখানে তর্কের অবকাশ আছে। ছন্দ অথবা ধ্বনি কোনটা প্রাচীন সে বিষয়ে অনেক বিতর্কের সৃষ্টি হয়েছে। মনে হয়, দুটি বস্তুরই একই লগ্নে জন্ম। কারণ আদিম মানুষ যে ছন্দে নেচেছিল অথবা যে স্বরে গেয়েছিল তার কোনটাই শিল্পপদবাচ্য নয়। তবে যে কোন জীবেরই জন্মমুহূর্তে প্রথমে আঙ্গিকক্রিয়া সুরু হয়। সেই সূত্রে বলা যেতে পারে ছন্দ প্রাচীনতর।

বিধাতা তখনও সৃষ্টির কাজ সম্পূর্ণ করতে পারেননি। পৃথিবীকে নিয়ে চলছে ভাঙ্গাগড়ার খেলা। অপূর্ণ মানুষও পূর্ণ [illegible] এই জগতে মানুষের না ছিল ভাষা, না ছিল মানসিক অনুভূতিকে প্রকাশ করবার কোন লক্ষ্য ও নির্দিষ্ট উপায়। কতকগুলি স্বভাবজাত জৈববৃত্তির তাড়নায় মানুষ ঘুরে বেড়াত, কখনও বেঁচে থাকবার তাগিদে প্রকৃতির সংগে লড়াই করত, আবার কখনও প্রকৃতির প্রচণ্ড রূপে ভয়ে পালিয়ে আত্মরক্ষা করত। প্রকৃতির খেয়ালের সংগে নিজেকে মানিয়ে নেবার মানুষের একটা প্রচণ্ড চেষ্টা ছিল। এই চেষ্টার ফলেই মানুষ পরস্পরের কাছে এসেছিল, ঘর বেঁধেছিল, সমাজ গড়েছিল। মানুষের মনের এই স্বভাবজাত আবেগময় অনুভূতির প্রকাশকে বলা যেতে পারে ইমোশন্যাল এক্সপ্রেশন; পরবর্তীকালে সভ্যতার আলো স্পর্শে মানুষের মধ্যে যখন শিল্পময় সত্তাটি জাগ্রত হয়ে উঠল, তখন এই মানসিক অনুভূতিগুলি বিভিন্ন রূপের মাধ্যমে আত্মপ্রকাশ করল। এইভাবে শিল্পের এক-একটি রূপ বিকশিত হয়ে ওঠে। প্রাচীন শিল্পকলার মধ্যে মিমিক্রিকে গণ্য করা হয়েছে। মিমিক্রি জীবনের বাস্তবরূপকে অনুকরণ করে অঙ্গভঙ্গীর সাহায্যে প্রকাশ করে। শিল্পতত্ত্ববিদরা এর আরও গভীর ও ব্যাপক সংজ্ঞা দিয়েছেন। এখানে অপ্রাসঙ্গিক বলে পরিত্যক্ত হলেও নৃত্যের সহোদরা বলে গণ্য করা যেতে পারে। অ্যারিস্টটল এই কারণেই শিল্পকে অনুকরণ বলেছেন। কারণ অনুকরণ মানুষের স্বভাবজাত বৃত্তি।

নৃত্য কিভাবে জন্ম নিল, সেকথা জানতে হলে আমাদের অনেক পেছনের দিকে দৃষ্টিপাত করতে হবে। পৃথিবীর প্রাথমিক সৃষ্টির যুগকে ঐতিহাসিকরা প্লিসটোসেন যুগ বলে অভিহিত করেছেন,

মন্দির-গাত্রে খোদিত নৃত্যভঙ্গী

এর ব্যাপ্তিকাল দুই লক্ষ বছর খৃষ্টপূর্ব থেকে তিরিশ হাজার বছর খৃষ্টপূর্ব পর্যন্ত। এই সকল আদিম মানুষের লিপিবদ্ধ কোন ইতিহাস নেই। এদের দেহের কোন কোন অংশ অথবা এদের ব্যবহৃত কোন বস্তুর কোন অংশ হাজার হাজার বছর ধরে পাথরের তলায় পড়ে পাথরে বা ফসিলে পরিণত হয়েছে। এইগুলি দেখে পুরাতত্ত্ববিদরা তাদের সময়, জীবনযাত্রা প্রণালী ও অবস্থান সম্পর্কে অনুমান করেছেন। তাঁদের প্রদত্ত এই তথ্য থেকে প্রাগৈতিহাসিক যুগের নৃত্যের একটি খসড়া লিপিবদ্ধ করা যেতে পারে।

কতকগুলি বিশেষ বিশেষ দেহভঙ্গি বা হস্তভঙ্গি সর্বকালে জাতিনির্বিশেষে সকল মানুষের মধ্যেই দেখা যায়, যার ইঙ্গিতগুলি আমাদের কাছে খুব স্পষ্ট হয়ে ওঠে। এখানে কয়েকটির উল্লেখ করা যেতে পারে; যেমন 'এখানে এসো', 'ওখানে যাও', না ইত্যাদি। এই সকল ভঙ্গিগুলি পরবর্তীকালে সভ্য মানুষের শিক্ষিত মনের অবদান নৃত্যকলায় আদর্শায়িত রূপ নিয়েছে। বিশেষ করে ভারতীয় নৃত্যে রেচক প্রভৃতির সাহায্যে এইগুলিকে অলংকৃত করা হয়েছে। এইরকম আরও অনেক ইঙ্গিত আছে যেগুলি আমাদের ব্যবহারিক জীবনে ব্যবহৃত হয়, সেইগুলিই শিল্পিত হয়ে সকল দেশের সকল নৃত্যেই প্রায় স্থান পেয়েছে। প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ করা যেতে পারে পূর্ব ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ ও জাপানী নৃত্যের কয়েকটি বিশেষ ভঙ্গির সঙ্গে আমেরিকার রেড ইণ্ডিয়ানদের নৃত্যের কয়েকটি সাদৃশ্য দেখা যায়।

এবার নৃত্যের পারম্পর্য লক্ষ্য করে আমরা তাদের উৎস সন্ধানে অগ্রসর হতে পারি। প্রাগৈতিহাসিক যুগের কয়েকটি ফসিল বা চিহ্নের সাহায্যে অনেক কিছুই অনুমান করে নেওয়া হয়েছে। এখানে নৃত্যও অনুমানসাপেক্ষ। এই প্রসঙ্গে প্রথমে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে ইগরট জাতির মধ্যে প্রচলিত 'বিজয় নৃত্য'। এই নৃত্যের প্রচলন এখনও পর্যন্ত আছে। কিন্তু অনুমান করা যেতে পারে যে, এই নৃত্যের উৎস ছিল আদিম জীবনের জয়গান। মরণযুদ্ধে মৃত্যু যখন হাতছানি দিচ্ছিল, তখন হঠাৎ জীবনের জয় এসেছিল। জয়ের অপরিসীম আনন্দে মানুষ তখন নৃত্য করেছিল। এই যুদ্ধ ছিল প্রকৃতির সঙ্গে, হিংস্র জীবজন্তুর সঙ্গে ও শত্রুর সঙ্গে। পদে পদে জীবন বিপন্ন হয়ে পড়ত, কখনও বা জীবনের পরিসমাপ্তি ঘটত, কখনও বা জীবন রক্ষা পেত। এই মরণঘাতী যুদ্ধে জীবন যখন রক্ষা পেত তখন সেই উল্লাস প্রকাশের হয় তো ভাষা ছিল না। তা প্রকাশ পেত দেহভঙ্গির অফুরন্ত শক্তির প্রকাশে। সেইজন্য বিজয়নৃত্যের মধ্যে অফুরন্ত শক্তির প্রকাশ লক্ষ্য করা যায়। প্লিসটোসেন যুগে এই নৃত্যের বীজ উপ্ত হয়েছিল বলে মনে হয়।

এরপর সুরু হয়েছিল প্রস্তরযুগ। এই যুগের সঙ্গে 'আদিম নৃত্যে'র একটি সূক্ষ্ম

শিকার নৃত্য

সংযোগ লক্ষ্য করা যেতে পারে। কারণ মানবচেতনার প্রাথমিক ক্রিয়া বোধহয় এই সময় থেকেই সুরু হয়েছিল। শত্রুর কবল থেকে শুধু আত্মরক্ষা নয়, আক্রমণ করবারও একটা প্রবল আকাঙ্ক্ষা মানুষের চেতনাকে উদ্দীপ্ত করেছিল। শত্রুপক্ষকে হত্যার উদ্দেশ্য নিয়ে মানুষ পাথরের অস্ত্র ব্যবহার করতে লাগল। এই যুগেই মানুষ শিকার করতে শিখেছিল।

এই সময় উত্তর ইউরোপ সম্ভবতঃ পাঁচটি বিশাল তুষার স্তূপের দ্বারা আবৃত ছিল। আফ্রিকার কিছু অংশ ও এশিয়া অপেক্ষাকৃত উষ্ণ ছিল বলে এই অঞ্চল আদি মানবের শিকারের পক্ষে ছিল অনুকূল। শিকারের পর জয়ের বন্য উল্লাসে আদি-মানব শিকারকে বেষ্টন করে নৃত্য করত; অর্থাৎ লাফাত, মাটির ওপর পা দিয়ে আঘাত করত, হাত ছুঁড়ত, মুখ দিয়ে অদ্ভুত শব্দ করত। এখনও আফ্রিকার নিবিড় পার্বত্য অঞ্চলের আদিবাসিদের মধ্যে এই ধরনের আদিম নৃত্য প্রচলিত আছে। এই সকল নৃত্যের মধ্যে পরাজিত শত্রুকে ঘিরে উল্লাস প্রকাশ করবার প্রবৃত্তি লক্ষ্য করা যায়। এতে সংগীত হিসাবে শুধুমাত্র ড্রাম বা দামামা তাল রক্ষা করে। এই সকল নৃত্যই পরবর্তীকালে শিল্পিত হয়ে 'শিকার' নৃত্য, যৌথ সমর নৃত্য ইত্যাদিতে পরিণত হয়। এখানে একটি বিষয় লক্ষণীয় যে, সকল প্রকার শিকার বা যুদ্ধের নৃত্যেই পুরুষরা অংশ গ্রহণ করে থাকেন। তবে মাদাগাস্কার, পশ্চিম আফ্রিকা, উত্তর আমেরিকার কয়েকটি উপজাতির মধ্যে নারীদেরও সমর নৃত্যে অংশ গ্রহণ করতে দেখা যায়। এঁরা গৃহের চারপাশে আগুন জ্বালিয়ে আগুনকে চার-দিকে বেষ্টন করে নাচে। প্রায় সকল উপ-জাতি এবং আদিবাসিদের মধ্যেই সমর নৃত্য প্রচলিত আছে। অনেকক্ষেত্রে দেখা যায় একজন নর্তক জন্তুর মুখোশ পরে শিকারের অভিনয় করে এবং আর একজন শিকারী সাজে। নৃত্যের ভেতর দিয়েই নানা রকম যুদ্ধের কৌশল প্রদর্শিত হয়। শিকার নৃত্যের সব থেকে প্রাচীন চিত্র পাওয়া গিয়েছে তুর্কীর অন্তর্গত দক্ষিণ অ্যানা-তোলিয়ার হ্যায়াক প্রাচীরে। দক্ষিণ অ্যানাতোলিয়ায় যখন নাগরিক সভ্যতার প্রথম উন্মেষ হয় তখন এই চিত্রটি অংকিত হয়েছিল। এই চিত্রটিকে নাগরিক সভ্যতার প্রথম নিদর্শন বলে মনে করা হয়েছিল। এগুলি প্লাস্টার করা দেওয়ালে আঁকা। এই চিত্রের মর্মার্থ হচ্ছে যে, একজন শিকারী একটি চিতাবাঘ শিকার করছে এবং চিতাবাঘটি লাফ দিয়ে উঠছে। অনুমান করা হয়েছে এই লম্ফ-প্রদানকারী চিতাবাঘটি ছদ্মবেশ পরিহিত কোন নর্তক। এই চিত্রটি ৬০০০ হাজার বছর পূর্বের বলে অনুমিত হয়েছে। প্রাচীনকালে সমর-নৃত্য যে গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করেছিল তা সক্রেটিসের এই উক্তির দ্বারা অনুমিত হয়— দি বেস্ট ডান্সার ইজ অলসো দি বেস্ট ওয়ারিয়র। সুতরাং স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে প্যালিওলিথিক যুগ এই ধরনের নৃত্যের জন্মদাতা।

এরপর পশ্চিম ইউরোপে তিরিশ থেকে চল্লিশ হাজার বছর আগে মস্টেরিয়ান সভ্যতা বিকশিত হতে থাকে। এই সভ্যতার শেষার্ধের প্রতিভূ হিসেবে আমরা নিয়ানডেরথাল মানবদের গ্রহণ করতে পারি। এই যুগের মানবদেহের প্রধান বৈশিষ্ট্য হল এই যে, তারা মৃতদেহ সমাধি দিত। এতদিন মানুষ প্রকৃতির একান্ত অনুগত ছিল এবং প্রকৃতিকে নিজ ভাগ্যের নিয়ন্ত্রণকারী বলে স্বীকার করে নিয়েছিল। সেইজন্য রহস্যময়ী প্রকৃতিকে সে ভয় করত। কিন্তু বুদ্ধি উন্মেষের সঙ্গে সঙ্গে প্রকৃতির বিরুদ্ধে মানুষের অভিযান সুরু হল। এর পূর্বে মানুষ মৃত্যু কি জানত না; মানুষের দেহ কেন বিকল হয়ে পড়ে বুঝতে পারত না। কালক্রমে বুদ্ধি উন্মেষের সঙ্গে সঙ্গে মানুষ বুঝতে পারল যে, এ প্রকৃতির অমোঘ নিয়ম। তখন থেকে মানুষের মনে জন্ম-মৃত্যু সম্বন্ধে একটি বোধের উদয় হল। জন্ম-মৃত্যুর সীমারেখা সে উপলব্ধি করতে পারল। পারলৌকিক আত্মা সম্বন্ধে মনে একটি চেতনা জাগ্রত হল। চেতনার উদ্বোধনের সঙ্গে সঙ্গে একটি শিল্পসত্তা অঙ্কুরিত হল। মৃত্যুর পরও যে আত্মা বিনাশপ্রাপ্ত হয় না, বরং বিশ্রাম লাভ করে এই চিন্তাধারাটি মানুষের মনে গুঞ্জরিত হয়ে উঠল। সেই অচেনা, অজানা, অদেখা জগতের প্রতি অপরিসীম কৌতূহল, ভয় ও শ্রদ্ধা মুকুলিত হয়ে উঠল। এই চিন্তাধারার সূত্র ধরে শিল্পবিকাশের পথ কি করে সুগম হল তাও আমরা কিছুটা অনুভব করতে পারি। এই যুগের মানব-জাতি স্তন্যপায়ী জন্তু শিকার করত। এদের অস্তিত্ব ছিল দক্ষিণ রাশিয়া, মধ্য ইউরোপ থেকে স্পেন, ফ্রান্স ও ইটালি পর্যন্ত। এরা প্রাণীহত্যার সময় মনে করত যে, তারা প্রাণীর দেহটাকে নষ্ট করেছে বটে, কিন্তু আত্মাটি অবিনশ্বর থাকছে। এই বিশ্বাসে তারা প্রাণীটির অস্থিগুলি সমাধিস্থ করত—এবং অনেক সময় পাথরের গায়ে জীবজন্তুর প্রতিকৃতি বা কঙ্কালের রূপ অংকিত করে রাখত। তাদের ধারণা ছিল আত্মাটি পুনরায় ওই সকল পরিত্যক্ত বা অঙ্কিত দেহে প্রবেশ করতে পারে। এইভাবে পাথরের গায়ে আদিম মানুষের শিল্প-চেতনার প্রথম আত্মপ্রকাশের চিহ্নটি হাজার হাজার বছর পরেও নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়নি। এখনও পার্বত্য উপজাতি ও আদিবাসিদের মধ্যে এই ধারণা বদ্ধমূল আছে।

এই নিয়ানডেরথাল মানবদের মধ্যেই এক শ্রেণীর উদ্ভব হল, যারা একাধারে দলপতি, পুরোহিত, চিকিৎসক ও শিল্পী বলে গণ্য হল। অবশ্য অনেক সময় কাজের ধারা অনু-সারে পুরোহিত ও দলপতির পদটি দ্বিধাবিভক্ত হত। পরবর্তীকালে এদের টেরপুরুষরাই যাদুকর, ডাইনী ইত্যাদি বলে অভিহিত হয়েছিল। মানুষ রোগাক্রান্ত হলে এরাই যাদুবিদ্যার দ্বারা নিরাময়ের চেষ্টা করত, মৃত্যু হলে পারলৌকিক অনুষ্ঠান-গুলি সম্পন্ন করত এবং প্রয়োজনবোধে পাহাড় অথবা পাথরের গায়ে মন্ত্রপূত রেখা টেনে দেহনির্গত আত্মাটিকে আপন আয়ত্তে রাখবার আকাশ-কুসুম কল্পনা করত। ইহ-কাল ও পরকালের সংযোগকারী সেতু হিসেবে এরা সমাজে একটি বিশেষ মর্যাদা

লাভ করত। যখন তারা এই সকল পার-লৌকিক ক্রিয়া অনুষ্ঠানে রত হত, তখন তারা বাহ্যজ্ঞান লুপ্ত হয়ে একটি রহস্যময় ভাবজগতে বিচরণ করত। ড্রামবাদ্যের গুরু-গম্ভীর আওয়াজের তালে তালে সুরু হত তাদের আত্মাকে আহবান করার অনুষ্ঠান। দামামার তালে তালে আহবানকারীর দেহ আন্দোলিত ও কম্পিত হত। ক্রমশ এই কম্পন তীব্রতর আকার ধারণ করত। অবশ্য একে শিল্পপদবাচ্য নৃত্য বলা যায় না, তবু ছন্দের তালে তালে সমস্ত দেহকম্পনের মধ্যে নৃত্যের বীজ লুক্কায়িত ছিল। এখনও ভারত এবং এশিয়ার অনেক জায়গায় ধর্মীয় ক্রিয়া অনুষ্ঠানে এই ধরনের নৃত্য প্রচলিত আছে। একে আমাদের দেশে 'ভর' নৃত্য বলা হয়ে থাকে। চড়কের গাজনে এই ধরনের নৃত্য দেখা যায়। তাছাড়া গ্রামে অনেক সময় অনেকের ওপর 'ভর' হয়েছে বলা হয় এবং তারা যে পৃথিবীর অপর পারের আত্মার সঙ্গে কথোপকথন করে এই রকম ধারণাও অনেকের মনে বদ্ধমূল হয়ে আছে। একে অনেক সময় যাদু বা ঐন্দ্রজালিক নৃত্যও বলা হয়ে থাকে।

এইসূত্রেই মৃত্যুর সময় নৃত্যগীতাদির ব্যবস্থাও প্রচলিত হয়েছিল। কারণ মৃত্যুর জন্যে শোকে এবং পুনর্জন্মের বিশ্বাসে আনন্দে মানুষ নৃত্য করত। তবে একথা ঠিক এগুলি পারলৌকিক আনুষ্ঠানিক ক্রিয়া হিসাবে গণ্য হত। নৃত্য তখনও পর্যন্ত কোন শিল্পিত রূপ নেয়নি। সে যুগে ভাষার অভাবে চিত্তের যে কোন অবস্থাকে বাইরে প্রকাশের জন্য দেহের ক্রিয়ার প্রয়োজন হত। আদিম মানুষের প্রবৃত্তিকে দমন করবার ক্ষমতা ছিল না। সেইজন্য যে কোন চিত্তবৃত্তিকে তারা বাহ্যিক আকারে প্রকাশ করত। প্রবৃত্তির দ্বারা তাড়িত চলমান দেহের ক্রিয়াগুলি বাহ্যিক আকারে প্রকাশ পেত। আনুষ্ঠানিক ক্রিয়ার মধ্যে ছিল মৃত আত্মার পুনর্জন্মের জন্য যাদুবিদ্যার প্রয়োগ, মৃত আত্মাকে রক্ষা করা এবং দুষ্টাত্মার বিতাড়ণ ইত্যাদি। এই সব ক্রিয়া অনুষ্ঠানের দ্বারা মনে হয় যে, তারা সর্ব-ক্ষেত্রেই জীবনের পরিসমাপ্তি না টেনে তাকে অখণ্ড প্রবাহে প্রবাহিত করার চেষ্টা করত। এই ধারণার বশবর্তী হয়ে আত্মীয়-পরিজন, বন্ধু-বান্ধবের দুঃখের ভারও লাঘব হত। রেড ইন্ডিয়ানদের কতকগুলি উপজাতির মধ্যে এই উপলক্ষে নৃত্যের আয়োজন দেখা যায়। ফিলিপাইনের 'ইগরট' জাতির মধ্যে যুদ্ধে নিহত মৃতদেহকে ঘিরে নৃত্য করতে দেখা যায়। (২) মৃতদেহটিকে মৃত্যুর হিমশীতল নিদ্রা থেকে জাগরিত করবার জন্যে তারা সূর্যোদয় থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত প্রাণপণ চীৎকার করে নাচতে থাকে। নিউ আয়ারল্যাণ্ডেও জুন মাসে 'জুখো' গ্রামে বৎসরে একবার করে 'শোক'-নৃত্য পালিত হয়। এই নৃত্যে সব সময় মৃতদেহের প্রয়োজন হয় না। নর্তকরা মুখোশ অথবা

(২) The Book of the Dance Agenes De Mille

দেবদাসী

শোকের বেশভূষা পরে মৃতদেহের ভূমিকা গ্রহণ করে; গ্রামবাসীরা এই নর্তককে ঘিরে প্রাণপণ শক্তিতে চীৎকার করে শোক জ্ঞাপন করে এবং শ্রদ্ধা জানায়। পশ্চিম আফ্রিকার 'জুজু' অনুষ্ঠান এই জাতীয় নৃত্য। এই অনুষ্ঠানে প্রেতাত্মাকে জাগান হয় এবং তার সঙ্গে আরও অন্যান্য ক্রিয়ানুষ্ঠানও হয়ে থাকে। প্রাচীন কোরিয়াতেও নাকি এই ধরনের নৃত্য অনুষ্ঠিত হত। শোনা যায় এই ধরনের নৃত্যে প্রচলিত ছিল, ১৯৩০ খৃঃ পর্যন্ত। এই নৃত্য সাধারণত কোন বিশেষ জন্তুর প্রতিকৃতিচিহ্নিত করা হত মুখোশে। নর্তক প্রতিকৃতিচিহ্নিত মুখোশ ব্যবহার করে নৃত্য করত।

অস্ট্রেলিয়ার আদিম অধিবাসিদের মধ্যে বিশ্বাস ছিল যে, মানুষের মৃত্যু সাধারণ-ভাবে হয় না। প্রেতাত্মা বা মানুষের দ্বারাই মৃত্যু সংঘটিত হয়। মৃত ব্যক্তির পরিবারের লোকেরা নৃত্যের ভেতর দিয়ে খুনীকে খুঁজে বার করে তার প্রতি প্রতিশোধ গ্রহণ করত অথবা তার তুষ্টিবিধান করত। আমাদের দেশেও মৃত্যুতে নৃত্যগীতাদির প্রচলন আছে। চণ্ডাল, মুচি, শবর প্রভৃতি অন্ত্যজ জাতির মধ্যে এখনও শব বহনের সময় সঙ্গীত অনুষ্ঠিত হয়।

প্রায় সব আদিজাতির মধ্যেই অন্ত্যেষ্টি-ক্রিয়ার সময় নৃত্যের প্রথা প্রচলিত ছিল। পরে অবশ্য সভ্যজাতির সংস্পর্শে নিষেধাজ্ঞা জারি হওয়ায় এই প্রথা বিলুপ্ত হয়েছে।

এই ধরণের সঙ্গীতানুষ্ঠান থেকে আমরা বুঝতে পারি যে, আদিম যুগে মানুষের মনে যখন জাগতিক এবং পার-লৌকিক চিন্তাধারার একটা প্রবাহ বয়ে যেতে থাকে, তখনই শিল্পের জন্ম-লগ্ন। পূর্বে মানুষ প্রকৃতির খামখেয়ালীকে ভয় ও শ্রদ্ধা করে তার সঙ্গে তাল রেখে চলবার চেষ্টা করত। কিন্তু এই সময় মানুষ প্রকৃতি থেকে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করে নিজের অস্তিত্ব সম্বন্ধে ভাবতে শেখে। তার ফলে প্রকৃতির নিয়মে নিজেকে সমর্পণ না করে প্রকৃতির নিয়ম লংঘন করে তার বিরোধিতা করতে চেষ্টা করল। তার ফলেই সুরু হয় নতুন করে সৃষ্টির প্রচেষ্টা, নিজেকে যুগে যুগে বাঁচিয়ে রাখার অদম্য আকাঙ্ক্ষা। কিন্তু এই প্রচেষ্টা কি করে সম্ভব হতে পারে? তার জন্য চলে নানা আয়োজন, নানা সমারোহ। এই আয়োজনের মধ্যে অংকনশিল্পই ছিল প্রধান আর ছিল নৃত্য-গীতের স্বতঃস্ফূর্ত প্রকাশ। এইভাবে শিল্পসৃষ্টির প্রারম্ভেই আমরা দেখি চিত্র, নৃত্য ও গীতের একটি অমার্জিত রূপ। এই অমার্জিত রূপেই সভ্যতা বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে ক্রমশ সূক্ষ্মতর মার্জিত আকারে পরিবেশিত হয়েছে। এই নব চেতনা উন্মেষের সঙ্গে সঙ্গে প্রাচীন প্রস্তরযুগ ও নবপ্রস্তর যুগের অবসান ঘটে।

নিওলিথিক যুগের আগে পৃথিবীর অনেক জায়গায় দারুণ প্রাকৃতিক বিপর্যয় দেখা যায়। বিশেষ করে সেই সময় ইউ-রোপের অধিকাংশ জায়গাই বরফে আবৃত ছিল। এই সব জায়গায় বরফ গলতে আরম্ভ করে। যার ফলে পৃথিবীতে দারুন ওলট-পালট হল। এই যুগকে 'বিপর্যস্ত' যুগ বলা যেতে পারে। যে সকল অঞ্চলে বরফ গলে মাটি দেখা দিল সেসব অঞ্চলের অনেক জায়গা জঙ্গলে ভর্তি হয়ে গেল। এই সব জঙ্গলে জীব-জন্তু এমন কি মানুষও আশ্রয় নিল। এই মানুষ জীবজন্তু

শিকার করে প্রাণ ধারণ করতে লাগল। এদের কাছে জীবনের রহস্য তখনও পর্যন্ত অনাবিস্কৃত। কিন্তু মানুষের মধ্যে আর একটি গোষ্ঠী দেখা দিল যারা জীবনের রহস্য জেনেছে। মৃত্যুর পরেও যে আবার জন্ম আছে এ কথা তারা বুঝেছিল। সেইজন্য তারা দলবদ্ধ হয়ে বাস করতে শিখল, মাটিতে ফসল ফলিয়ে জীবনকে অঙ্কুরিত হতে দেখল। খৃঃ পূঃ প্রায় দশ হাজার বছর আগে মানুষ কৃষিযুগের সূচনা করে। প্রকৃতির খাম-খেয়ালীকে তারা ভয় করে চলে তখনও পর্যন্ত। সেইজন্য প্রকৃতিকে তুষ্ট করতে তাদের চেষ্টার অন্ত ছিল না। এরই ফলে বৃষ্টির দেবতা, ভূমির দেবতা, বৃক্ষের দেবতার পুজোর প্রচলন হল। এখনও অনেক দেশে এই ধরনের পুজোর প্রচলন আছে এবং সেই উপলক্ষে নৃত্য-গীতের আয়োজনও হয়। গ্রামীণ সংস্কৃতিতে এই ধরনের উৎসব ও পুজোর প্রচলন বেশী দেখা যায়। বর্ষাকালে বৃক্ষরোপণ, হেমন্তকালে ধানকাটা, পৌষ মাসে নবান্ন প্রভৃতির উৎসব উল্লেখযোগ্য এবং এই সব উৎসবে নৃত্যের আয়োজনও হয়ে থাকে। এই জাতীয় নৃত্য পৃথিবীর সকল দেশেই প্রচলিত আছে। প্রাচীন রোমে 'ব্যাকানালিয়া' নৃত্য অনুষ্ঠিত হত। এই নৃত্যে স্ত্রী এবং পুরুষ উভয়েই অংশ গ্রহণ করতে পারতেন। পরস্পরের পরিচয়ের কোন প্রয়োজন ছিল না। প্রকৃতির দেবতা যৌবনের প্রতীক ব্যাকাসের পুজো উপলক্ষে এই অনুষ্ঠান হত। মধ্য বর্ণিওর মহাকাম নদীর তীরবর্তী কায়ানদের মধ্যে ধান্য উৎসব এখনও পর্যন্ত প্রচলিত আছে: গ্রামের মুক্ত অঙ্গনে নর্তকীরা মুখোশ পরে নাচেন, এই মুখোশের মধ্যে বড় বড় দাঁত ও কান থাকে। চোখের কাছে বড় গর্ত থাকে এবং ছাগলের লোমের দাড়ি থাকে। কলা-পাতা দিয়ে কোমর থেকে নীচ পর্যন্ত ঢাকা থাকে। নাচবার সময় নাচিয়েরা মনে করেন তাঁরা যেন ফসলের আত্মা।

চীনেও কৃষি উপলক্ষে নৃত্যের প্রচলন ছিল। চীনে লোলো জাতিদের মধ্যে প্রচলিত মুনান নৃত্য বিশেষ উল্লেখযোগ্য। প্রতিদিন সন্ধ্যাবেলা ক্ষেতের কাজের পর গ্রাম্য স্ত্রীলোকরা যুবকদের সঙ্গে নৃত্যে মেতে উঠত। ভারতেও এই ধরনের নৃত্যের উল্লেখ করতে পারি। পাঞ্জাবের ভাংরা, সাঁওতাল পরগণার করম, বাংলার নবান্ন প্রভৃতি অনুষ্ঠান এই বিশেষ সংস্কৃতির মধ্যে পড়ে।

এইগুলিকে আমরা লোকনৃত্য এবং লোক সংস্কৃতি বলে চিহ্নিত করেছি। লোকনৃত্য যা লোকসংস্কৃতি বিশেষ বিশেষ জাতির জাতিগত বৈশিষ্ট্য প্রকাশ করে।

যাই হোক, আমরা এইটুকু অনুমান করতে পারি যে, পরবর্তীকালে কিভাবে এই নৃত্যগুলি প্রচলিত হয়েছে এবং কালের প্রবাহে তাদের অস্তিত্ব বজায় রাখতে সক্ষম হয়েছে। কৃষিযুগে প্রকৃতিকে নৃত্যগীতের মধ্য দিয়ে কখনও অভিনন্দন জানান হয়েছে, কখনও আহ্বান জানান হয়েছে, কখনও বা পুজো করে শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করা হয়েছে। এইগুলি পরবর্তীকালে বিভিন্ন দেশাচারের সংস্পর্শে বিভিন্ন রূপ পরিগ্রহ করেছে। ভারতেও জলবায়ু, ভৌগোলিক অবস্থান হিসেবে লোকনৃত্যের মধ্যেও তারতম্য দেখা যায়। পাঞ্জাব, রাজস্থান প্রভৃতি শুষ্ক, কঠিন অঞ্চলে নৃত্যের মধ্যে একটি উদ্দাম বলিষ্ঠতা ও সুগঠিত, পেশীবহুল দেহের প্রাণপ্রাচুর্য লক্ষ্য করা যায়। বাংলা দেশের লোকনৃত্যে একটি কোমল, পেলবতা লক্ষ্যণীয়। অবশ্য রাইবিশে, ঢালী প্রভৃতি নৃত্যে যুদ্ধকৌশল প্রভৃতিও দেখা যায়।

কৃষিযুগে মানুষ দলবদ্ধভাবে বসবাস করতে শেখে এবং ধীরে ধীরে সমাজও সৃষ্টি হয়। সমাজ সৃষ্টি হলে নগরজীবনের সূত্রপাত ঘটে। ৬০০০ হাজার বছর আগে দক্ষিণ অ্যানাতোলিয়াতে যে সভ্যতা গড়ে ওঠে তাকে সব থেকে প্রাচীন বলা যায়। এরপর মধ্যপ্রাচ্যে সুমের সভ্যতা, ৩২০০ খৃষ্ট পূর্বাব্দে মিশর সভ্যতা, ২৫০০ খৃষ্ট পূর্বে সিন্ধু সভ্যতা এবং ১৫০০ খৃষ্ট-পূর্বে চীনা সভ্যতা গড়ে উঠেছিল। নগর সভ্যতার সঙ্গে ধর্মবোধও মানুষের মধ্যে জাগ্রত হয় এবং মন্দিরও গড়ে ওঠে। মন্দিরের পুজোর্চনার ভার নিলেন পুরোহিতরা। পুরোহিতদের মধ্যে অনেক স্ত্রী পুরোহিতও ছিলেন। ধর্মানুষ্ঠানে ক্রিয়াকর্মের মধ্যে সঙ্গীতও একটি প্রধান স্থান অধিকার করে। যখন থেকে নগর-জীবনের সূত্রপাত তখন থেকেই মানুষের ধর্মবোধ একটি সুস্পষ্ট রূপ নিয়েছিল এবং দেবার্চনাও একটি নির্দিষ্ট পন্থায় অগ্রসর হয়েছিল। অনুমান করা কষ্টসাধ্য নয় যে, এই সময় থেকে পুরোহিত প্রথা এবং দেবদাসী প্রথার প্রচলন ঘটে। সে যুগের মন্দির নির্মাণ-প্রণালী পুজোর্চনা পদ্ধতি এই কথাই প্রমাণিত করে।

মিশর, আসিরিয়া ও ভারতের প্রাচীন মন্দিরগুলির ধ্বংসাবশেষ লক্ষ্য করলে এই সব মন্দিরে যে পুরোহিত ও দেবদাসীদের প্রাধান্য ছিল একথা অনুমান করা যায়। পাশ্চাত্যের নৃত্যের ইতিহাস থেকে জানা যায় যে, দেবদাসী প্রথার সূচনা হয়েছিল ইজিপ্টে এবং সেখান থেকে ভারত, গ্রীস, রোম প্রভৃতি জায়গায় প্রসার লাভ করেছিল। প্রাচীনযুগের মন্দিরগুলির প্রধানত তিনটি অংশ ছিল। প্রথমাংশের অঙ্গন জনসাধারণের জন্য উন্মুক্ত ছিল। উন্মুক্ত আকাশের নীচে এই অঙ্গনে নানারকম অভিনয় হত। ইংরেজীতে একে ফোর কোর্ট বলা হত। এর পরের অংশ ইনার কোর্ট। এই দ্বিতীয় অংশে যারা প্রবেশাধিকার লাভ করত তারা নানারকম অভিনয় দেখবার সুযোগ লাভ করত। শেষের অংশটি অন্যান্য অংশ থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন থাকত। কারণ এতে প্রধান পুরোহিত এবং প্রধান প্রধান নর্তকী ছাড়া অন্য ব্যক্তি প্রবেশ করতে পারতেন না। এঁদের মধ্যে অনেক স্ত্রী-পুরোহিতও থাকতেন। এই অঙ্গনগুলি কতকগুলি বৈশিষ্ট্যের দ্বারা চিহ্নিত ছিল। প্রথম অঙ্গনে কতকগুলি বড় বড় থাম থাকত। দ্বিতীয়টিও নানা ধরনের স্তম্ভে সজ্জিত ছিল। শেষ অংশটি অন্যান্য অংশ থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন ছিল এবং এই অংশটি দিয়ে প্রধান মন্দিরে প্রবেশ করা যেত। একটি বৃহৎ সিঁড়ির দ্বারা অন্যান্য অংশের সঙ্গে এই অংশের সংযোগ থাকত। শেষ অংশটিকে জনসাধারণের কাছে কৌতূহলোদ্দীপক এবং রহস্যময় করে তোলার জন্য নির্জন ও অন্ধকারাচ্ছন্ন করে রাখা হত। এই অংশে ধর্মীয় পরিবেশ সৃষ্টির জন্যে ধর্ম-সংক্রান্ত নানারকম অভিনয়ের আয়োজনও করা হত।

ঐতিহাসিকদের মতে মিশরের প্রধান পুরোহিতের পদ বংশগত ছিল এবং ধর্মীয় ক্রিয়ানুষ্ঠানের সঙ্গে সঙ্গীতের ওতপ্রোত সম্বন্ধ ছিল। এ সম্বন্ধে স্যর ই. এ. ওয়ালিস বাজ অনেক সংবাদই প্রকাশ করেছেন। ইজিপ্ট থেকে যে এই ধরনের নৃত্য ও দেবদাসী প্রথা অন্য দেশেও স্থানান্তরিত হয়েছে তা সহজেই বোঝা যায়। মিঃ বাজ তাঁর গ্রন্থে লিখেছেন যে, চ্যান্সেলর হেমাকের সঙ্গে সেমটি আসেন। সিংহাসনের ওপর ওসিরিস দেবতা শুভ্র মুকুট পরে বসে থাকেন। তাঁর সম্মুখে রাজা সেমটি নৃত্য করেন। এই সব থেকে বোঝা যায় যে, শুধু পুরোহিত বা দেবদাসী নয়, দেবতার সম্মুখে রাজারাও নৃত্য করতেন। নৃত্য করবার সময় রাজা যখন ভক্তিমার্গের দ্বারা পরিচালিত হতেন, তখন তিনি মনে করতেন তিনি ভগবানের দাস। যখন তিনি অহংভাবের দ্বারা উদ্বুদ্ধ হয়ে নৃত্য করতেন, তখন তিনি মনে করতেন যে তিনি স্বয়ং ভগবান। ইজিপ্ট থেকেই যে দেবদাসী প্রথার সুরু হয় তা আমরা উপরোক্ত আলোচনা থেকে বুঝতে পারি। এই জন্যেই বোধ হয় হ্যাভলক এলিস ইজিপ্টকে এ গ্রেট ড্যান্সিং সেন্টার বলেছেন। ইজিপ্ট থেকেই দেবদাসী প্রথা গ্রীস, রোম, মধ্যপ্রাচ্য ও ভারতবর্ষে ব্যাপ্ত হয়ে পড়েছিল। হ্যাভলক এলিসের আর একটি উক্তিতে এই সত্যই দৃঢ়ীভূত হয়—

> ***and Nile and cadiz were thus the two great centres of ancient dancing, and Martial mentions them both together for each supplied its dancers to Rome.'

গ্রীসেরও কয়েকজন পণ্ডিত মিশরে এসে মিশরের সংস্কৃতি ও শিল্পকে গ্রীসে নিয়ে গেছেন।

ভূমধ্যসাগরের তীরবর্তী অঞ্চলে মিশরের বাদ্যযন্ত্র ও নৃত্যের প্রভাব বেশী

রকমই ছিল। প্রাচীন গ্রীসের নৃত্যের ক্রমবিবর্তন বর্ণনা করতে গিয়ে রুবি গিনার বলেছেন—

—"The cities of Knossos and Phaistos in Crete were the centre of this civilisation, and from these cities Minoan culture spread to the islands of the Aegean, and to the mainland of Greece where the fortified cities of Mykenal and Tiryhs became important centre of this era. The people native to this early Aegean world were typical Mediterranean race *** they were excitable, passionate, superstitious, imaginative, lovers of colour and beauty, and they evolved many arts.

সুতরাং গ্রীসের প্রাচীন নৃত্যকলা ভূমধ্যসাগরের তীরবর্তী অঞ্চলের দ্বারা যে প্রভাবিত হয়েছিল একথা অস্বীকার করা যায় না। চার্লস হয়েস তাঁর গ্রন্থে স্ত্রী-পুরোহিতদের সম্বন্ধে লিখেছেন—

—"The priestess of the Minoan cult used to dence in a ring before a shrine in honour of the goddess.'

এই সব উক্তিতে দুটি বিষয় স্পষ্ট হচ্ছে। প্রথমত ইজিপ্ট ছিল ধর্মীয় নৃত্যের আদিস্থল। দ্বিতীয়ত এই সকল ক্রিয়ানুষ্ঠানে স্ত্রীপুরোহিতদেরও প্রাধান্য ছিল এবং স্বভাবতই এ'রা দেবদাসী ছিলেন। এই প্রথা আমাদের ভারতেও প্রচলিত হয়েছিল এবং কালক্রমে তা দেবদাসী প্রথা বলে অভিহিত হয়।

প্রাচীন গ্রীসে ধর্মীয় নৃত্যের মধ্যে অরিঅদনে নৃত্য প্রচলিত ছিল। ক্রীটেও এই নৃত্যের প্রচলন ছিল। মহাকবি হোমার তাঁর মহাকাব্য ইলিয়াডে রঙ্গভূমির যে বর্ণনা দিয়েছেন তা এই নৃত্যেরই অনুসারী। মহাকবি ভার্জিলও এই নৃত্যের উল্লেখ [illegible] অনুষ্ঠান বিশেষ জনপ্রিয় ছিল। এই অনুষ্ঠানে 'মশাল' নৃত্য বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এই প্রসঙ্গে প্রাচীন গ্রীসের ভেস্টাল ভার্জিন অনুষ্ঠানের উল্লেখ করা যেতে পারে। এই শোভাযাত্রায় অনেক শোভাযাত্রী (দেবসেবিকা) উপাচার নিয়ে অগ্রসর হতেন। ডবলিউ জি রাফে এই স্ত্রী-পুরোহিতদের উল্লেখ করেছেন। খৃঃ পূঃ ২০০০ হাজার বছর আগে প্রাচীন ব্যাবিলনে এবং আসিরিয়াতে মন্দিরের এইসব পুরোহিতরা রাজা ও প্রজাসাধারণের ওপর বিশেষ প্রভুত্ব করতেন। এই প্রসঙ্গে তিনি বলেছেন— "The object of the hight, the solitude, the ritual was to ensure the tension required for a scene. 'The enquiry to the gods' which the priestess (deep in trance) would usually afford".

---

(1) — The Art of Dancing.
(2) — Gateway to the Dance,
(3) —দ্রঃ ঐ ঐ — 'Crete the fore-runner of Greece —by Mr. Charles Howes.

এই স্ত্রী পুরোহিতরা নৃত্যগীতের সমন্বয়ে শোভাযাত্রা সহকারে মন্দির প্রাঙ্গণের নির্জন শেষ অংশটিতে প্রবেশ করতেন, এই সম্বন্ধে ডবলিউ জি রাফেন আরও মন্তব্য করেছেন—

—'Silby priestess was escorted into the small shrinc and there enthroned."

প্রাগৈতিহাসিক যুগে যে তিনটি জাতি মধ্যপ্রাচ্য এবং মেসোপটেমিয়ায় এক বিরাট সভ্যতার সৌধ নির্মাণ করেছিল, সেই তিনটি জাতি হচ্ছে সেমিট, সুমেরীয়, ও আর্য। মেসোপটেমিয়ার সভ্যতা ইজিপ্টের সভ্যতা থেকে অনেক কিছুই গ্রহণ করে। তার মধ্যে একটি হচ্ছে সংগীত। এইভাবে প্রাচীনকালে ইজিপ্টের কাছে প্রায় সব দেশই কম বিস্তর ঋণী ছিল। সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে প্রাগৈতিহাসিক যুগে মধ্য এশিয়ায় ধর্মকে কেন্দ্র করে যে বিরাট সভ্যতা ও সংস্কৃতি গড়ে উঠেছিল, তার প্রভাব সুদূরপ্রসারী ছিল, এমন কি ইউরোপও তার থেকে বাদ যায়নি।

ভারতবর্ষের উত্তর-পশ্চিমপ্রান্তে সিন্ধু উপত্যকায় মহেঞ্জদরো ও হরপ্পাতে প্রত্নতত্ত্ববিদরা যে সব ধ্বংসস্তূপ আবিষ্কার করেছেন তাতে অনেক রকম দ্রব্যের মধ্যে দেবদাসী বা নর্তকীর ভগ্নমূর্তি, নটরাজের ভগ্নমূর্তি, বাদ্যযন্ত্রের প্রতিকৃতি প্রভৃতি পাওয়া গেছে। এই চিহ্নগুলি থেকে প্রমাণিত হয় যে, সে যুগে সংগীত সভ্যতার একটি বিশেষ অংগ ছিল এবং দেবদাসী প্রথারও প্রচলন ছিল। এটা অনুমান করা ভুল হবে না যে, মিশর বা মধ্যপ্রাচ্য থেকে এই প্রথা ভারতে এসেছিল। সুতরাং একথা বলা যায় যে, 'দেবদাসী' প্রথা প্রাগৈতিহাসিক যুগের অতি সুপরিচিত এবং জনপ্রিয় প্রথা ছিল। ভারতবর্ষেও এর ব্যতিক্রম ছিল না। প্রায় মধ্যযুগ পর্যন্ত এই প্রথা ভারতবর্ষে প্রচলিত ছিল এবং পরে নানা কারণে তা লুপ্ত হয়ে যায়।

এই অবলুপ্তির কয়েকটি কারণ এখানে সংক্ষিপ্তভাবে আলোচনা করা যেতে পারে। সিন্ধু উপত্যকায় যে সভ্যতা গড়ে উঠেছিল, তা সাধারণত দ্রাবিড় বা অনার্য সভ্যতার নিদর্শন। এই সভ্যতায় সমাজে নারীদের মর্যাদা পূর্ণমাত্রায় প্রতিষ্ঠিত ছিল এর সাক্ষ্য আমরা বহু জায়গায় পেয়েছি। সর্ব ক্ষেত্রেই নারীদের অগ্রাধিকার দেওয়া হত।

দ্রাবিড় সভ্যতা যাঁরা গড়ে তুলেছিলেন ইতিহাসে তাঁরা অনার্য এবং ধর্মগ্রন্থে তাঁরা অসুর নামে অভিহিত। সিন্ধু সভ্যতার ইতিহাসে জানা যায় যে এ'রা নগরজীবন যাপন করতেন। আর্যরা এ'দের বিতাড়িত করে উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত দিয়ে ভারতবর্ষে প্রবেশ করেন। এ'দের সঙ্গে অনার্যদের একটি চারিত্রিক বৈষম্য ছিল। অনার্যরা জীবনকে রঙে, রসে, রূপে উপভোগ করেছিলেন এবং শিল্প ও জীবনের প্রতি এ'দের একটি গভীর আকর্ষণ ছিল। মৃৎপাত্রে বিচিত্র রঙে রঞ্জিত নকসাগুলি, জীবজন্তুর প্রতিকৃতি, বাদ্যযন্ত্র ও নর্তক-নর্তকীর উৎকীর্ণ মূর্তিগুলি শিল্পবোধেরই পরিচয় দেয়।

আধ্যাত্মিক প্রেরণা কিন্তু আর্যদের জীবন সম্বন্ধে নিস্পৃহ করে তোলে। আত্মজিজ্ঞাসা আর্যদের বাস্তববিমুখ করে তুলেছিল। আর্যরা সেই 'একমেবাদ্বিতীয়ম'কে জানতে চেয়েছিলেন, যার ফলে সমস্ত জগৎ তাঁদের কাছে মায়াময় বলে প্রতিপন্ন হয়েছিল। এই সব কারণে শিল্পচেতনা তাঁদের মধ্যে তীব্র ছিল না। কারণ শিল্পসংস্কার প্রথম কথাই হচ্ছে বাস্তবজীবন বা বাস্তবজগৎকে অবলম্বন করে শিল্প সৃষ্টি করতে হবে। সুতরাং শিল্পের জগতে বাস্তবকে উপেক্ষা করে কঠিন সংযম ও ত্যাগের মধ্যে জীবনকে নিয়ন্ত্রিত করেছিলেন। এই জন্য তাঁদের মধ্যে শিল্পচেতনা তীব্রভাবে জাগ্রত হয়নি।

এ'রা অনার্যদের জয় করে তাঁদের শিল্পপ্রীতিকে ভাল চোখে দেখলেন না। ধর্মক্ষেত্রে নারীদের প্রভুত্বকে অস্বীকার করলেন। অনার্যদের ক্রিয়া অনুষ্ঠানকে বর্জন করে নিজেদের ক্রিয়া অনুষ্ঠানকে প্রতিষ্ঠিত করলেন। বেদের অংশ 'ব্রাহ্মণে' এই সব ক্রিয়াকাণ্ডের বিস্তারিত উল্লেখ আছে। এর ফলে নারীদের প্রভুত্ব ও মর্যাদা ক্ষুন্ন হল। তাঁরা একমাত্র সংগীত পরিবেশন ছাড়া মন্দিরের কোন মর্যাদা পেলেন না। অবশ্য তাঁদের ভরণপোষণের ভার মন্দির কর্তৃপক্ষ গ্রহণ করলেন। এইভাবে স্ত্রীপুরোহিত বা দেবদাসীদের হাত থেকে সমস্ত কর্তৃত্ব আর্যদের হাতে স্থানান্তরিত হল। এই দেবদাসী প্রথা তার কর্তৃত্ব হারিয়ে বহুদিন পর্যন্ত প্রচলিত ছিল। তবে একথা স্বীকার্য যে, পরবর্তীকালে আর্যরাও এই সঙ্গীতকলার দ্বারা বিশেষভাবে প্রভাবান্বিত হয়েছিলেন এবং তাঁদের অমূল্য ধর্মসাহিত্য বেদেও তার প্রচুর দৃষ্টান্ত রেখে গিয়েছিলেন।

উত্তর ভারতে বিদেশীদের উপর্যুপরি আঘাতে হিন্দুধর্ম ও সংস্কৃতি বিব্রত হয়ে পড়ল, বিশেষ করে ৭ম-৮ম শতাব্দীর মধ্যে ঐশ্লামিক অভিযান দেবদাসী প্রথার ওপর বিশেষ আঘাত হানে। তাঁদের লোলুপ দৃষ্টি এই দেবদাসীদের ওপর পড়েছিল। ১১০০ খৃঃ মামুদের সোমনাথ মন্দির আক্রমণ বিশেষ উল্লেখযোগ্য ঘটনা। এই সময় অনেক দেবদাসী ধর্মচ্যুত হন। এই ধর্মভ্রষ্ট দেবদাসীদের অনেকেই ধর্মান্তর গ্রহণে বাধ্য হন অথবা জীবিকা নির্বাহের জন্য অন্য পথ অবলম্বন করেন। দেখা যায় যে, এর ফলে এই প্রথা প্রায় অবলুপ্ত হয়ে গিয়েছিল। এ'দের উত্তরপুরুষদের, অনেকেই এই প্রথাকে ত্যাগ করতে পারেননি এবং এ'দের বংশধর বলে পরিচয় বহন করেছিলেন, তাঁদের কেউই সমাজে হৃতসম্মানকে পুনরুদ্ধার করতে পারেননি। সুতরাং দেখা যাচ্ছে কি আর্থিক, কি সামাজিক কোনদিক দিয়েই এই প্রথাকে পরবর্তীকালে উৎসাহ দেওয়া হয়নি। এর ফলে এই প্রথা একদমই বিলুপ্ত হয়ে যায়।

সাহিত্য ও সংস্কৃতি

ভারত-চীন যুদ্ধের নেপথ্য কাহিনী (২)

সমগ্র গ্রন্থটিতে মিঃ মল্লিক একজন প্রতিবাদী কৌসুলীর মত যুক্তিতর্ক-সহকারে ভারত সরকারের ক্রিয়াকলাপ তথা তাঁর মানব নেহরুজীর পক্ষ সমর্থন করার আপ্রাণ চেষ্টা করেছেন। এই প্রচেষ্টা অবশ্য দোষনীয় নয়, কারণ অধিকাংশ গ্রন্থ যা ইতিপূর্বে প্রকাশিত হয়েছে তার মধ্যে একতরফা ভারতের চীননীতি তথা চীন-ভারত যুদ্ধনীতির সমালোচনা আছে। ম্যাকসওয়েলের গ্রন্থটির নামই ত' 'ইণ্ডিয়াস্ চায়না ওয়ার' অর্থাৎ ভারতই চীনের সঙ্গে যুদ্ধ করেছে। এই সব মতবাদ খন্ডনে যুক্তি ও তথ্য প্রয়োগ করা অবশ্যই সমীচীন। তবে নিরপেক্ষ ইতিহাসের ছাত্র এই নীররাশি সরিয়ে ক্ষীরটুকুই গ্রহণ করতে পারবেন, কারণ, অনেক অবান্তর প্রসঙ্গ, আত্মম্ভরিতা, আত্মপ্রচার ও আত্ম-অহমিকা যা এই জাতীয় রচনার এক প্রধান ত্রুটী তা মিঃ মল্লিকের 'মাই ইয়ারস উইথ নেহরু (ছোট অক্ষর)—এবং 'দি চাইনিজ বিট্রেয়াল' (বড় অক্ষর) গ্রন্থটির প্রতিটি ছত্রে পাওয়া যাবে।

আত্মপক্ষ সমর্থনের এই যে প্রবণতা এটা স্বাভাবিক। যে কোনো ইনটেলিজেন্স প্রতিষ্ঠানকেই আত্মপক্ষ সমর্থন করে বলতে হবে আমরাই ঠিক, কেননা সামরিক অসাফল্যের পর সেনাবাহিনীর কর্তারা দুর্বল ইনটেলিজেন্স ব্যবস্থাকেই দায়ী করে থাকেন। সরকার ইনটেলিজেন্স এবং সমর-বিভাগের মধ্যে ভারসাম্য রক্ষা করেন।

মিঃ মল্লিকের সরকার মাত্র দুজন। নেহরুজী এবং শাস্ত্রীজী। এই দুটি মানুষেরই তিনি কাছের লোক বলে মনে হয়। কারণ কাশ্মীর প্রিনসেসের ব্যাপার থেকেই সর্ব কর্মে নেহরুজী এই ব্যক্তিটিকে জনান্তিকে ডেকে শলাপরামর্শ করেছেন। তিনি এক জায়গায় স্বীকার করেছেন—

> "To do Justice to our army leaders it must be stated that they were in complete tune with this policy (i.e. the enemy had to be met in the frontier wherever he transgressed it) and proceeded to implement it in right earnest." (P.P. 322).

অনেকরকম বাধাবিপত্তি সত্ত্বেও তাঁরা আপ্রাণ চেষ্টা করেছেন। অতঃপর তিনি 'নেফা অপারেশনে'র কথা বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করেছেন। সেই সঙ্গে একথাও বলেছেন, কৃষ্ণমেনন এই সময় লাওস কনফারেন্সের সূত্রে জেনিভা গিয়েছিলেন এবং

> "Clinked glasses with Cheni in a last minute effort to avoid conflict but apparently got little of the Chinese Marshal".

লেখক বলেছেন, কৃষ্ণমেননের এই ক্রিয়াকলাপ এদেশে বিরূপভাবে সমালোচিত হয়েছে, তথাপি তিনি এই অভিব্যক্তির সমর্থক।

তিনি এক জায়গায় কাউল এবং মেননের মতবিরোধের কারণ প্রকাশ করেছেন। কাউল ১৯৬২-র মার্চ মাসে চেস্টার বোলজের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করে মার্কিন সমরসম্ভারপ্রাপ্তির ব্যবস্থা স্থির করেছিলেন। প্রতিরক্ষামন্ত্রীকে উপেক্ষা করেছেন। একটা মার্কিন-অভিমুখী নীতি গ্রহণ করার জন্য মেননকে উপদেশ দিয়েছেন, মেনন রাজী হন নি। মেনন চেয়েছিলেন চারদিকে দরজা খুলে রেখে যেখান থেকে পাব অস্ত্র নেব। তাছাড়া মেনন বলেছিলেন আমেরিকা সামান্য মাল দিয়ে অনেকরকম শর্ত আরোপ করবে। ১৯৬২-তে কাউল ও মেননের মধ্যে বাক্যালাপ বন্ধ হয়ে গেল। এবং এই কারণে সেপ্টেম্বর মাসের আট তারিখে নেহরু যখন কমনওয়েলথ কনফারেন্সে গেলেন,. মোরারজীও ছিলেন না, সুতরাং শাস্ত্রী এবং কৃষ্ণমাচারীর হাতে রাজ্যভার দিয়ে নেহরুকে যেতে হল।

তার আগেই ২রা সেপ্টেম্বর কাউল চলে গেলেন ছুটিতে। কাউলের অনুপস্থিতির নেপথ্যহেতু পূর্বেই ব্যক্ত হয়েছে। কাউল অকটোবরে ফিরে এসে যেসব কান্ড করেছিলেন তা এখন সকলেরই জানা। 'আনটোল্ড স্টোরী'র অনেকখানি অন্য অনেকে বলে ফেলেছেন। কাউল অত্যন্ত ভয় পেয়েছিলেন চীনা অবস্থান সম্পর্কে অবস্থার পরিচয় পেয়ে এবং চীন আক্রমণে ভারতীয় সেনাবাহিনীর অসহায়ত্বের জন্য কেউ কেউ কাউলকে প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে দায়ী মনে করেন। এই বৃত্তান্ত মিঃ মল্লিকের গ্রন্থের ৩৫৭ পৃঃ থেকে ৩৬৬ পৃষ্ঠায় বিস্তারিতভাবে বর্ণিত হয়েছে। কাউল সম্পর্কে একটা মতামত গঠনের পক্ষে এই কয়টি পৃষ্ঠা যথেষ্ট।

একটি মজার ঘটনা ৩৮৯ পৃষ্ঠায় লিপিবদ্ধ আছে। কৃষ্ণ মেননের পদত্যাগের একদিন পরে জনৈক অতি প্রবীণ মন্ত্রী (নাম উল্লেখ নেই) ক্যাবিনেট মিটিং-এ অভিযোগ করেন যে তাঁর গতিবিধির ওপর আই বি নজর রেখেছে প্রতিরক্ষামন্ত্রীর নির্দেশে। প্রধান-মন্ত্রী আসল ব্যাপার জানতে চান, মল্লিক-সাহেব অস্বীকার করেন। তিনি বললেন, মন্ত্রীমহোদয়কে ক্ষমা প্রার্থনা করতে হবে এমন উক্তির জন্য। নেহরুজী প্রিন্সিপ্যাল সেক্রেটারি মারফৎ মল্লিকসাহেবকে জানালেন সেই প্রবীণ মন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করে ব্যাপারটা জানিয়ে দিতে। পরবর্তী অংশ পাঠে মনে হয় মল্লিকসাহেব একটু চটেছিলেন। তিনি মন্ত্রীর সঙ্গে সহজে দেখা করেন নি, নেহরুজীর চাপে পড়ে পরে সেই প্রবীণ মন্ত্রীটির ঘরে যেতে তিনি প্রায় নিম্নলিখিত ধরনে বলেছিলেন—

> "You have let down the country by being in league with the Defence Minister".

মল্লিকসাহেবও কম নন। তিনি বললেন, মুখ সামলে কথা বলবেন। "Minister should weigh his words carefully' ইত্যাদি।

মন্ত্রীমহোদয়ের পরবর্তী উক্তি অবশ্য হাস্যকর। তিনি বললেন, আপনি নন, 'ডি এম আই' আমার উপর নজর রেখেছে। মোদ্দাকথা যেমন মন্ত্রী তেমনই তাঁর কর্মচারী। কারণ, আর যাই হোক, ইনফরমেশন ব্যুরোর চীফ একজন মন্ত্রীর কাছে অধঃস্তন কর্মী মাত্র। মিঃ মল্লিক সমগ্র গ্রন্থটিতে যত্রতত্র যার-তার সম্পর্কে এমন সব উক্তি করেছেন যা শুধু প্রধানমন্ত্রী বা ভারতের রাষ্ট্রপতির মুখে মানায়। অতিরিক্ত আদরে যেমন কারো কারো মাথা কিঞ্চিৎ গরম হয়, মল্লিকসাহেবের গ্রন্থপাঠে তাঁর সম্বন্ধে অনুরূপ ধারণা করা অসঙ্গত হবে না। একমাত্র তাঁর নির্দেশে, উপদেশে, আদেশে আসমুদ্রহিমাচল টলটলায়মান। ভারতের রাজকীয় রেলশকটের যেন তিনি ড্রাইভার, গার্ড সিগনাল্যার ও স্টেশনমাস্টার।

প্রকান্ড বই, অনেক চমকপ্রদ এবং আমাদের কাছে হাস্যকর মনে হয়েছে এমন কথা এই গ্রন্থে ছড়ানো আছে। সব উল্লেখ করা সম্ভব নয়—তেজপুর থেকে ফিরে জেনারেল থাপার প্রধানমন্ত্রীর কাছে পদত্যাগ পেশ করলেন। জেনারেল চৌধুরীসাহেবের চাকরীটা কিভাবে মল্লিকসাহেবের দয়ায় হয়েছিল তার বিবরণ লেখক সবিস্তারে দিয়েছেন এই গ্রন্থের ৪৩১ পৃষ্ঠায়। আমরা সেই অংশটুকু অনুবাদ করে দিলাম—

"সাউথ ব্লকে শ্রীশাস্ত্রীর ঘরে রাত ১১টার সময় আমার ডাক পড়ল। তিনি একা। কোনোরকম সন্দেহ বা উদ্বেগের মুহূর্তে তিনি ঘরে পায়চারি করছেন,

এখনও তাই করছেন। তিনি আমার কাছে জানতে চাইলেন, থাপার পদত্যাগ করেছেন জানো কি! আমি সে সংবাদ জানি একথা বলার পর তিনি বল্লেন প্রধানমন্ত্রী পরবর্তী 'চীফ অব আর্মি স্টাফ' কাকে করা যায় সে সম্পর্কে তোমার সঙ্গে পরামর্শ করতে বলেছেন। তিনি আমাকে বসে বিষয়টি চিন্তা করতে বললেন। আমি দেখলাম তাঁর খাওয়া হয় নি, বাড়িতে ফোন করে বলে দিলাম, কিছু খাবার পাঠিয়ে দিতে। আধ ঘণ্টার মধ্যে খাবার এসে গেল। আমি বললাম, সরকার যদি থাপারের পদত্যাগপত্র গ্রহণ করতে মনস্থ করে থাকেন—অবশ্য তার কোনো যুক্তি নেই—তাহলে পরবর্তী জেনারেল, অর্থাৎ চৌধুরীই এই পদ গ্রহণ করবেন। শাস্ত্রীজী জানতে চাইলেন অন্য কারো কথা না বলে চৌধুরীর কথা বলছি কেন! আমি বললাম, পছন্দ অপছন্দের প্রশ্ন নয়, থাপারের পর চৌধুরীই সব থেকে সিনিয়র, আর তাঁর ঠিক পরে যাঁরা তাঁদের অভিজ্ঞতা বা যোগ্যতার যে অধিকতর উত্তম রেকর্ড আছে তা জানি না, সুতরাং স্বাভাবিকভাবেই চৌধুরীকে মনোনীত করতে হয়। শাস্ত্রীজী জানতে চাইলেন আমি ব্যক্তিগতভাবে চৌধুরীকে জানি কিনা। আমি বললাম, ১৯৫১ থেকে জানি, দুজনে অনেক ক্ষেত্রে ঘনিষ্ঠভাবে কাজ করেছি এবং তাঁর যোগ্যতা বিষয়ে আমার কোনো সংশয় নেই। তিনি আবার জানতে চাইলেন,—চৌধুরী যে কয়েক মাসের মধ্যেই সেনাবাহিনী থেকে অবসরগ্রহণ করবেন আমি তা জানি কিনা। আমি বললাম, জানি। তবে তাঁকে প্রমোশন দিলে আগের অর্ডারের কার্যকারিতা বাতিল হবে। শাস্ত্রীজী তখন বললেন, চৌধুরীকে 'চীফ অফ আর্মি স্টাফ' করার বিরুদ্ধে কিছু আপত্তি আছে, তা জানো কি! আমি জানতে চাইলাম এই চাপটা কি রাজনৈতিক? তিনি বললেন, কিছু সিভিলিয়ান এবং সার্ভিস অফিসারদের মত তাঁর বিপক্ষে। আমি বললাম আমি তা শুনেছি তবে এ সব চাকুরীগত ঈর্ষা মাত্র এর মধ্যে গুণবিচারের প্রশ্ন নেই। শাস্ত্রীজী তারপর জানতে চাইলেন আমি সর্ব ব্যাপারে চৌধুরীকে সমর্থন করব কিনা। আমি আমার সম্মতি ও তার হেতু জানালাম। শাস্ত্রীজী জানতে চাইলেন আর কিছু বিকল্প আছে! আমি বললাম সে প্রশ্ন ওঠে না। আমি শাস্ত্রীজীর সঙ্গে সে রাতে সাড়ে বারোটা অবধি ছিলাম। পরে তিনি প্রধানমন্ত্রীর কাছে গেলেন।"

পরদিন অবশ্য জেনারেল থাপারের আসনে জেঃ চৌধুরীকে প্রতিষ্ঠিত করা হল। মিঃ মল্লিক বলেছেন, জেনারেল কাউলকে এই গদীতে বসানোর কথা ছিল বলে যে গুজব আছে তার মূলে কোনো ভিত্তি নেই। তাঁর নাম কখনো ওঠেনি।

মিঃ মল্লিক জেনারেলদের সবাইকে থাপার, চৌধুরী ইত্যাদি বলে উল্লেখ করেছেন এবং একমাত্র নেহরুকে প্রাইম মিনিস্টার বা নেহরুজী এবং শাস্ত্রীজী বলেছেন লালবাহাদুর শাস্ত্রীকে। অনেকের কথা বলতে গিয়ে কোথাও ভুল যেমন বলেছেন। মিঃ মল্লিক যে একজন অত্যন্ত সুপরিচিত কর্মকর্তা তা খোশমেজাজ বোধ হয় এই রীতি।

ইনফরমেশন ব্যুরোর পদমর্যাদা ইত্যাদি সাধারণের জানার কথা নয়, মিঃ মল্লিকের গ্রন্থ পাঠ করলে একটু-আধটু ধারণা হবে। জানা যাবে, তাঁরা কত শক্তিমান। মিনিস্টার, জেনারেল, চীফ অব স্টাফ সবই তাঁদের কাছে রাম-শ্যামের মতন।

তথাপি মিঃ মল্লিকের গ্রন্থটি অনেক দিক থেকে মূল্যবান। সরকারী মতবাদ এবং সরকারী ব্যবস্থাদির প্রকৃত ছবিটি তিনি দক্ষতার সঙ্গে তুলে ধরেছেন এবং তার ফলে অনেক অস্পষ্টতা কেটে গেছে।

—অভয়ঙ্কর

MY DAYS WITH NEHRU — THE CHINESE BETRAYAL By- -B. N. MULLIK:(ALLIED PUBLISHERS — Rs. 25-00 P)

সাহিত্যের খবর

পি-ই-এনের অবনীন্দ্র শতবার্ষিকী সভা

সম্প্রতি শ্রীমতী রেখা চট্টোপাধ্যায়ের বাসভবনে পশ্চিমবঙ্গের পি ই এন-এর তরফ থেকে শিল্পগুরু অবনীন্দ্রনাথের জন্মজয়ন্তী পালন করা হয়। এই সভায় পৌরোহিত্য—করেন শ্রীযুক্ত জ্যোতিষচন্দ্র ঘোষ। শিল্পগুরু অবনীন্দ্রনাথের জীবন ও কর্মের বিভিন্ন দিক নিয়ে অধ্যাপক নির্মল ভট্টাচার্য, ডাঃ সুধীর নন্দী, বাণী রায়, বিভা সরকার, মনোমোহন ঘোষ প্রভৃতি সদস্যগণ আলোচনা করেন। অবনীন্দ্রনাথের অন্তরঙ্গ পরিচয় দান করেন সভাপতি শ্রীজ্যোতিষচন্দ্র ঘোষ তাঁর সুদীর্ঘ ভাষণে।

ছড়া পাঠের আসর

'রূপসী বাংলা' এবং 'গল্প কবিতা' নামক সাময়িক পত্রিকা গোষ্ঠীর যুগ্মপ্রচেষ্টায় সি-এল-টি হলে বাংলাদেশে ইয়াহিয়ার পৈশাচিক অত্যাচারের প্রসঙ্গ নিয়ে অনেক নবীন ও প্রবীণ কবি স্বরচিত ছড়া পাঠ করলেন। অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত, উপেন্দ্রচন্দ্র মল্লিক, অজিতকৃষ্ণ বসু, উমা ভট্টাচার্য, শান্তনু দাস, পার্থ চট্টোপাধ্যায়, রেবতীভূষণ প্রভৃতি কবিবৃন্দের সঙ্গে অনেক তরুণ কবিও ছড়া পাঠ করেন।

অতুল প্রসাদ স্মারক পত্রিকা

'বাণীবিতান' নামক কলিকাতার বিখ্যাত সাহিত্য প্রতিষ্ঠানের উদ্যোগে গঠিত অতুলপ্রসাদ জন্মশতবার্ষিকী উৎসব কমিটির পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে যে কমিটি অতুলপ্রসাদ স্মারক পত্রিকা প্রকাশের আয়োজন করছেন। এই জন্য যাঁরা অতুলপ্রসাদের ঘনিষ্ঠ সংযোগে এসেছিলেন তাঁদের কাছ থেকে কমিটি সহযোগিতা প্রার্থনা করেছেন। ৬এ, কাশী বসু লেন, কলিকাতা-৬, এই ঠিকানায় কর্মাধ্যক্ষের সঙ্গে যোগাযোগ করতে বলা হয়েছে।

বলাকা সঙ্ঘের গুণীজন সম্বর্ধনা

বলাকা সঙ্ঘের দ্বারা আয়োজিত এক সম্বর্ধনা সভায় প্রখ্যাত সাহিত্যিক শ্রীগজেন্দ্রকুমার মিত্র ও প্রবীণ ফুটবল খেলোয়াড় শ্রীশৈলেন্দ্রনাথ মান্নাকে সম্বর্ধনা

জ্ঞাপন করা হয়। রঙমহল রঙ্গমঞ্চে অনুষ্ঠিত এই সম্বর্ধনাসভায় সভাপতিত্ব করেন শ্রীবীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্র।

শ্রীতারাশংকর বন্দ্যোপাধ্যায় অসুস্থ

সংবাদে প্রকাশ প্রখ্যাত কথাসাহিত্যিক তারাশংকর বন্দ্যোপাধ্যায় বিগত ৩০শে আগস্ট থেকে প্রবল রক্তচাপজনিত ব্যাধিতে শয্যাশায়ী আছেন। বর্তমানে তিনি নিরাময়ের পথে। ডাক্তারগণ তাঁকে দু মাসের জন্য পূর্ণ বিশ্রাম গ্রহণের উপদেশ দিয়েছেন।

সংকলন ও পত্র-পত্রিকা

মানুষের মুখ—সম্পাদনা : দিলীপ বন্দ্যোপাধ্যায় ও প্রেমময় দাশগুপ্ত, বাঙ্কাবাজার, কটক-২ থেকে প্রকাশিত। দাম : একটাকা।

ভাবাই যায় না, বাংলাদেশের বাইরে এমন সুন্দর ছাপা এবং পরিচ্ছন্ন পত্রিকা প্রকাশিত হতে পারে। ওড়িশা থেকে প্রকাশিত একমাত্র বাংলা কবিতাপত্র 'মানুষের মুখ' সত্যিই বিরল ব্যতিক্রম। এতে আছে বাংলা ও ওড়িশা—দুই ভাষারই কবিতা। উদ্দেশ্য—উভয় প্রদেশের কবিদের মধ্যে ভাবের আদান-প্রদানের পথ সহজ করে তোলা। বর্তমান সংখ্যাটিতেও এই প্রয়াস লক্ষ্য করা যায়। বাংলা দেশের উপর যাঁরা কবিতা লিখেছেন তাঁদের মধ্যে বাংলাদেশের আল মাহমুদ ও মেজবাহউদ্দীন খান এবং পশ্চিমবাংলার মণীন্দ্র রায়, কিরণশংকর সেনগুপ্ত, বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত, আশিস সান্যাল, ফণিভূষণ আচার্য, গণেশ বসু, শুভ মুখোপাধ্যায়, চন্দন সেন, সৌমেন্দু গঙ্গোপাধ্যায়, নিশিনাথ সেন প্রমুখ উল্লেখ্য। এছাড়া রয়েছে বাংলাদেশের উপর লেখা ওড়িশার কবি রবি সিং, জয়ন্ত মহাপাত্র, ব্রহ্মত্রী মোহান্তি প্রমুখের বঙ্গানুবাদ। স্থানীয় বাঙালী কবিদের মধ্যে দিলীপ বন্দ্যোপাধ্যায় ও প্রেমময় দাশগুপ্তের কবিতা দুটি প্রশংসার দাবী রাখে।

লেখা ও রেখা (বৈশাখ-আষাঢ়) সম্পাদক : ভাস্কর মুখোপাধ্যায়। অক্ষয় গ্রন্থাগার। শান্তিপুর। দাম একটাকা।

লেখা ও রেখার বর্তমান সংখ্যায় দুটি গবেষণাধর্মী আলোচনা দৃষ্টি আকর্ষণ করে। 'সুকান্তর 'ছাড়পত্র'-এর ভূমিকা প্রসঙ্গে' লিখেছেন তপোবিজয় ঘোষ এবং 'মধ্য যুগের বাংলায় হিন্দু-মুসলমান' লিখেছেন সুকুমার মিত্র। আনাতোলি লুনাচারস্কির 'মার্কসবাদী সাহিত্য সমালোচনার সমস্যা' আলোচনাটি অনুবাদ করেছেন সিদ্ধার্থ ঘোষ। গল্প লিখেছেন সাধন চট্টোপাধ্যায়, অমল চক্রবর্তী এবং তারক চন্দ। কবিতা লিখেছেন জগন্নাথ চক্রবর্তী, সুশান্ত বসু, বঙ্কিম মাহাত, পরেশ সোম, রথীন ভৌমিক, রঞ্জিতকুমার সরকার, শ্যামল রায়, প্রলয় ভাদুড়ী, নারায়ণ ঘোষ এবং নন্দ চৌধুরী।

বিচিত্রা [এপ্রিল—জুন ১৯৭১]—সম্পাদক নলিনীকুমার চক্রবর্তী, সুব্রত রাহা ও জীবন ভৌমিক।। ৪০ শান্তিরাম রাস্তা, বালি, হাওড়া।। এক টাকা।

এ সংখ্যার সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য লেখা 'পূর্ববাংলার সংবাদপত্রে সমাজচিত্র', লিখেছেন শশধর রায়। এবং চলচ্চিত্র প্রসঙ্গে 'তপন সিংহের চলচ্চিত্র ভাবনা' শীর্ষক সিদ্ধার্থ দাশগুপ্তের প্রবন্ধটি। অন্যান্য লেখকদের মধ্যে আছেন কিরণশংকর সেনগুপ্ত, দীপক রুদ্র, সুনীল ভট্টাচার্য, শান্তিপ্রিয় চট্টোপাধ্যায়, রঞ্জিত সিংহ, জীবন ভৌমিক এবং আরো অনেকে। নিখিল বিশ্বাসের একটি স্কেচ ও পূর্ব বাংলার শিল্পীদের আঁকা কয়েকটি ছবির প্রতিলিপি এ সংখ্যাটিকে আকর্ষণীয় করে তুলেছে।

কৃশানু (কবিতা সংখ্যা '৭৮) সম্পাদক : দীনেশচন্দ্র সিংহ। ৯৪ বিবেকানন্দ রোড কলকাতা-৬। এক টাকা।

আটাশজন কবির নিজস্ব ভাব-ভাবনানুসারে রচিত কবিতা সংকলনে বিশেষভাবে উল্লেখ্য হলেন : বিষ্ণু দে, প্রিয়ংবদা, গণেশ বসু, অমিতাভ দাশগুপ্ত প্রমুখ। পত্রিকাটি উল্লেখযোগ্য।

শস্য (প্রথম সংগ্রহ ১৩৭৮)—অমিতাভ বসু। ২ সূর্য সেন স্ট্রীট কলকাতা-১২। পঞ্চাশ পয়সা।

'ঐতিহ্য বিচ্যুত জীবন বিমুখ সাম্প্রতিক বাংলা সাহিত্যের ভণ্ডামীর বিরুদ্ধে' বিদ্রোহ করে এবং আঘাত হেনে জনজীবন প্রবাহে নবজীবনের ঢল নামাবার দৃঢ় শপথ নিয়ে অপ্রয়োজনীয় আগাছার ভিড়ের মধ্যে নবজাতক সাহিত্যপত্রে 'শস্য'র উপস্থিতি উৎসাহজনক। কবিতার সংখ্যাই বেশি, গল্পও আছে। উৎপল চক্রবর্তীর : 'ঐতিহ্য : বাংলা সাহিত্য: একটি সমীক্ষা' এবং গৌরীশংকর দের; 'হায় ছায়াবৃতা' উল্লেখের দাবী রাখে।

ছোটদের কাগজ (১১ বর্ষ : ১ম সংখ্যা ১৩৭৮) সম্পাদক : জ্ঞানেন্দ্রনাথ কুণ্ডু। ললিতমোহন ভট্টাচার্য স্ট্রীট, শ্রীরামপুর, হুগলী। সত্তর পয়সা।

ছোটদের কাগজ ছোটদের জন্যে। বাংলা হিন্দী ও ইংরেজি ভাষার একত্র সমাবেশ দেখে চমক লাগে। অভিনব সত্যিই। আচার্য সত্যেন্দ্রনাথের আশীর্বাণী নিয়ে প্রকাশিত এই সংখ্যাটি 'রবীন্দ্র সংখ্যা' হিসেবে প্রকাশিত হয়েছে। লিখেছেন অবশ্য বড়রা—দক্ষিণারঞ্জন বসু, জ্যোতির্ময়ী দেবী, নরেন্দ্রনাথ মিত্র, ফণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, সুনীতি গুপ্ত প্রমুখ। ছোটদের লেখাও কিছু কিছু আছে।

বাংলার মুখ (২য় সংকলন '৭১) সম্পাদক : তপন বন্দ্যোপাধ্যায়। প্রকাশনের ঠিকানা নেই। পঁচিশ পয়সা।

কিছু নামী আর কিছু অনামী লেখকদের কবিতা সংকলন। কবিদের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখ্য হলেন : কিরণশংকর সেনগুপ্ত, রত্নেশ্বর হাজরা, পবিত্র মুখোপাধ্যায়, সত্য গুহ প্রমুখ।

সায়ম (জুন-জুলাই '৭১) সম্পাদক : সুদেব সানা। মানিকপুর, হাওড়া। চল্লিশ পয়সা।

বাংলাদেশ বিশেষ সংখ্যা। এপার-ওপার বাংলার নামী কবিদের কবিতা সংকলন। উল্লেখ্য হলেন : হরপ্রসাদ মিত্র, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, শক্তি চট্টোপাধ্যায়, সুশীল রায়, শামসুদ্দর রাহমান, বেগম সুফিয়া কামাল প্রমুখ।

প্রাপ্তিস্বীকার

উত্তরীয় (জুলাই '৭১)—সম্পাদক : শ্যামল ধর। ময়নাগুড়ি, জলপাইগুড়ি।

উষালোক (আষাঢ় '৭৮) সম্পাদক : সমরেন্দ্রকুমার রায়। ইমামবাজার রোড, হুগলী। পনেরো পয়সা।

সবুজ সংকেত (জুন '৭১) সম্পাদক : অশোক ভাদুড়ী, শ্যামল আচার্য। পলাশ খোলা, আদ্রা, পুরুলিয়া।

বহিন্দুত (ত্রৈমাসিক সাহিত্য পত্রিকা '৭৮) সম্পাদক : রবীন্দ্রনাথ মণ্ডল। গরিফা, হালতু, ২৪ পরগণা। পঞ্চাশ পয়সা।

নিম্ন সাহিত্য (১০ম সংকলন '৭১) সম্পাদক : সুধাংশু সেন, বিমান চট্টোপাধ্যায় ১।২১ দয়ানন্দ রোড, দুর্গাপুর-৪। কুড়ি পয়সা।

ঋতুবর্ণ (ত্রৈমাসিক : ১ম সংখ্যা '৭৮) সম্পাদক : রঞ্জিতকুমার মুখোপাধ্যায়। রামকৃষ্ণ মিশন রোড, বিদ্যাপাড়া, ধুবড়ী, আসাম।

শিশু আলেপন (শ্রাবণ '৭৮) সম্পাদক : সন্তোষকুমার সাহা। সরযূপ্রসাদ রোড, মালদহ। পঁচিশ পয়সা।

সোমসপুর পাঠচক্র পত্রিকা (নববর্ষ সংখ্যা '৭৮) সম্পাদক : অশোক বন্দ্যোপাধ্যায়, ধনিয়াখালি, হুগলী।

পদক্ষেপ (বর্ষ সংখ্যা '৭৮) সম্পাদক : গোপাল নাগ। সতীশ নন্দী রোড, কাঁচরাপাড়া ২৪ পরগণা। কুড়ি পয়সা।

গ্রামীণ (শ্রাবণ '৭৮) সম্পাদক : নারায়ণ চৌধুরী। পশ্চিমবঙ্গ খাদি ও গ্রামীণ শিল্প পর্ষদ, দি-৮ হাইড লেন, কলকাতা-১২। পঁচিশ পয়সা।

পূর্ণাবতার

প্রমথনাথ বিশী

পঞ্চম খণ্ড

(৩)

সারা দেশটাই অরাজক তবে তার মধ্যে যদি তর-তম করতে হয় তবে চর্মণ্বতী ও নর্মদা মধ্যস্থ ভূভাগকে নির্দেশ করতে হয়। এই অঞ্চলের প্রত্যেক লোক ছিনতাই; দুর্বল লোকে শক্তির অভাবে ঠগ ও চোর; প্রবল লোকে লুঠেরা ও ডাকাত, প্রত্যেকটি গ্রাম সমাজবিরোধীদের আড্ডা, প্রত্যেকটি এই সব সমাজবিরোধীদের আশ্রয় ও প্রশ্রয়দাতা। আবার দুর্গে দুর্গে বিরোধ ও দাঙ্গা, তখন নিজ নিজ অভিরুচি ও স্বার্থ অনুসারে আশেপাশের লোকেরা যে কোন দিক অবলম্বন করে; স্বার্থে সামান্য আঘাত লাগলেই দল পরিবর্তন করতে বাধে না। এই ভূভাগে যে সব অরণ্য আছে তার শ্বাপদগণ মানুষের ভয়ে সন্ত্রস্ত। দল-বহির্ভূত সজ্জনগণের পক্ষে প্রাণ বাঁচানো কঠিন, কাজেই প্রাণের দায়ে তারা কোন না কোন দলে যোগদান করতে বাধ্য হয়, শেষে এমন অবস্থা হল যে ঠগ বাছতে গাঁ উজাড়, নিরীহ সজ্জন আর থাকলো না। বিদেশী পথিক এদিকে বড় আসে না, ভুলে এসে পড়লে মারা পড়ে। সাধু-সন্ন্যাসীরা অনেকটা নিরাপদ, তবে সম্পূর্ণ নয়, জরার প্রতি তাদের ব্যবহারে তার প্রমাণ হয়ে গিয়েছে। এই পথ ধরে জরা চলছে, কারণ অন্য পথ আর নাই—মথুরা থেকে দ্বারকা যাওয়ার এই একমাত্র পথ। জরা শাস্ত্রজ্ঞ হলে 'দুর্গম পথস্তৎ কবয়ো বদন্তি' শাস্ত্রবাক্যের নতুন অর্থ করতে পারতো।

সে যতটা সম্ভব পথ ও পথিক এড়িয়ে চলে, খাদ্য প্রধানতঃ বনফল ও কন্দ,, কখনো গাঁয়ের কাছ দিয়ে যেতে বাধ্য হলে সহৃদয় গৃহস্থ বাজরার রুটি আর চাটনি দেয়, পানীয় নদী বা ঝরণার জল। কোনো কোনো গাঁয়ের লোকে রাতের বেলায় সেখানে আশ্রয় নিতে বলেছে, ক্লান্ত জরার আশ্রয়ের বড় প্রয়োজন, তবু অস্বীকার করেছে, বলেছে তার বড় তাড়া।

পথটা প্রশস্ত যদিচ অনেক কাল বেমেরামতে মাঝে মাঝে ভেঙে গিয়েছে, আর পাঁচ-ছয় ক্রোশ ব্যবধানে পথিকের আশ্রয়ের জন্য চটির চালাঘর। এগুলি এড়িয়ে যেতে বিশেষভাবে যদিরা পরামর্শ দিয়েছিল। আসল কথা রাহী লোকের সংবাদ রাখবার এগুলো ঘাঁটি। পথিক এক চটি থেকে পরবর্তী চটিতে পৌঁছবার আগেই তার খবর পৌঁছে যায়। জরা দু-চারবার লুঠেরার হাতে পড়েছে, তবে তার জীর্ণ সন্ন্যাসীর বেশ দেখে দাড়ি চুল টানাটানি পরীক্ষা করেই ছেড়ে দিয়েছে। সে দিনের বেলায় পথ চলে, সন্ধ্যা হলে রাজপথ থেকে দূরে কোন গাছতলায় আশ্রয় নেয়। এই ভাবে কালিসিন্ধু নদী পার হয়ে তার মনে হল দ্বারকায় পৌঁছলেও পৌঁছতে পারে। মালব বা মালোআ একটা মালভূমি কালিসিন্ধু চর্মণ্বতী বা চম্বলের একটি শাখা।

জরা আপনমনে না চললে এতদিনে বুঝতে পারতো তাকে অনুসরণ করে কিছু ব্যবধানে দুজন অশ্বারোহী তার পথে চলছে। ব্রিজনাথ ও ব্রিজপ্রসাদ অভিজ্ঞ ব্যক্তি। ইচ্ছা করলে নিঃসঙ্গ জরাকে যে কোন মুহূর্তে হত্যা করে রত্ন উদ্ধার করতে পারতো। কিন্তু এ কাজের বাধা তাদের অভিজ্ঞতা। তারা জানে একটা রাহা-জানি হওয়া মাত্র চারদিকে লোক ছুটে যাবে তখন লুটের মাল বেহাত হতে কতক্ষণ। পূর্বতন অভিজ্ঞতার ফলে তারা জানে যে আপাতদর্শনে শূন্যমাঠ শূন্য নয়, সম্ভব-অসম্ভব নানাস্থানে লোক ওত পেতে আছে, শিকারের গন্ধ পেলেই তারা আত্মপ্রকাশ করে। কাজেই সতর্কতা আবশ্যক। দিবা-রাত্রি জরাকে তারা চোখে চোখে রেখে অনুসরণ করছে।

কদিন পরে ভোরবেলায় তারা লক্ষ্য করলো জরার একজন সহযাত্রী জুটে গিয়েছে, তারও সন্ন্যাসীর বেশ।

ব্রিজনাথ বলল, ভাই একি হল, একটি ছিল দুটি হল যে।

ব্রিজপ্রসাদ বলল, তাই তো দেখছি। আশঙ্কা হচ্ছে ও বেটাও আমাদের মতোই শিকার সন্ধানে আছে।

সন্ন্যাসীর বেশ যে।

ভাই ব্রিজপ্রসাদ, একবার ভেবে দেখো তো কতবার ঐ বেশে আমরা কার্যসিদ্ধি করেছি।

তা বটে, কিন্তু আরও যদি সঙ্গী জুটে যায় তবে যে শিকার করা অসম্ভব হয়ে পড়বে।

দেখাই যাক না কতদূর কি হয়, বলে ব্রিজনাথ। মথুরাপ্রসাদজীর মুখে শোননি ক্ষেত্রে কর্ম বিধীয়তে, খোপ বুঝে কোপ।

জরাকে চোখ ছাড়া না করে ওরা এক জায়গায় আহার ও বিশ্রাম করে নিল।

একদিন ভোরবেলায় জেগে উঠে জরা দেখল যে অদূরে রাজপথের পাশে একটি চটি। পানীয় জলের সন্ধানে সেখানে পৌঁছলে একজন সন্ন্যাসীকে দেখতে পেল, বলল, সন্ন্যাসীজী, প্রণাম।

সেই ব্যক্তি সসংকোচে বলে উঠল, সাধুজী, আমি সন্ন্যাসী নই।

জরা শুধালো তবে চুল দাড়ি বেশ সন্ন্যাসীর মতো কেন?

সেই লোকটি হেসে উত্তর দিল, সাধুজী, এ কি জ্ঞানীর মতো কথা হল। চুল দাড়ি সন্ন্যাসী গৃহী সকলেরই গজায়, পথে ক্ষৌরকারের অভাবে কিঞ্চিৎ দীর্ঘ হয়েছে, ওদের দোষ নেই। আর বেশ! ভেক না হলে কি ভিক্ষা মেলে। সাধুজী, আমি গৃহী।

জরা বলে উঠল, আমাকে বার বার সাধু বলবেন না, আমি ঘোর পাপী, মহা-পাপী, আমি যদি সাধু হই তবে অসাধু কে?

আচ্ছা সাধু না হয় নাই বললাম, বাবা বলতে নিশ্চয় দোষ নাই—যদিচ আপনার বয়স আমার চেয়ে অনেক কম।

তাহলে তো আপনি বলাও চলে না, আমাকে তুমি বলবেন এই আমার আকিঞ্চন।

বেশ তাই বলবো, 'আপনি' হল শিষ্টতা, 'তুমি' আত্মীয়তা। তা কোথায় চলেছ বাবা?

জরা বলে, পাপমুখে কেমন করে বলবো।

প্রশ্নকর্তা হেসে উঠে বলে, বা, বা উত্তরটা তো সাধু-সন্ন্যাসীর মতো হল।

আপনি কোথায় চলেছেন।

আপাততঃ অমরকন্টকে, সামনেই, আর সামান্য ক'দিনের পথ।

জরা হতাশভাবে বলে, আমার যে সম্মুখে এখনো অনেক পথ।

সে তো আনন্দের কথা বাবা, পথ চলার মতো এমন আনন্দ আর কাছে কি!

পথে যে চোর ডাকু দাঙ্গাবাজের দল।

আজ ওরা কোথায় নেই বাবা। তবে ওরা আমাদের নেবে কি? তোমার গলায় ঐ জপের মালার থলি, আর আমার গলার থলিতে শালগ্রামশিলা।

জরা বলে, আপনাকে যদি ঠাকুর বলি।

খুব ভালো, ঠকুর বলো, প্রভু বলো, বাবাজী বলো আমার কিছুতেই আপত্তি নাই।

তবে তাই হোক। দুঃখের কথা আর কি বলবো। এর মধ্যে তিন-চারবার আমার দাড়ি চুল টেনে পরীক্ষা হয়ে গিয়েছে।

সাজা সন্ন্যাসী কিনা মনে করেতো।

হাঁ, ঠাকুর কি করে জানলেন।

আমার উপর দিয়েও যে পরীক্ষা হয়ে গিয়েছে। আমি বললাম, বাবাসব, চুল দাড়ির উপরে আমার মমতা নাই, একখানা ক্ষুর দাও কেটে দিচ্ছি। তাই শুনে ওরা বলে কি জানো?

কি বলে ঠাকুর?

আমরা কি নাপিত?

আমি বললাম, রাম রাম, নাপিতে চুল দাড়ি দেখেই বুঝতে পারে, টেনে পরীক্ষা করতে হয় না তাদের। তোমার গলার থলিতে কি? শালগ্রামশিলা। বললাম, মানলে শালগ্রাম, না মানলে পাথর। তাই না শুনে ওরা বলে ওঠে চল্ চল্ সময় যাচ্ছে। এ বেটা আসল সন্ন্যাসী! আমি বললাম, বাবারা, এবার ঠকলে আমি সন্ন্যাসী নই গৃহী। শুনে ওরা বলে গৃহী তো গৃহ কোথায়? আমি বলি, আমি তো শামুক নই যে গৃহটা পিঠে করে বেড়াবো। আমার কথা শুনে ওরা এতই বিরক্ত হয় যে আর দ্বিরুক্তি না করে চলে যায়।

জরা বলে, ঠাকুর, তোমাকে সঙ্গী পেয়ে মনের বল বাড়লো।

শুধু মনের বল বাড়লেই তো চলবে না, দেহের বল বাড়াও আবশ্যক। এই নাও রুটি আর চাটনি, আর ঐ দেখো কলসীতে জল।

তখন দুজন একত্র বসে পানাহার সমাধা করলো। ঠিক সেই সময়ে ব্রিজনাথ ও ব্রিজপ্রসাদ অদূরে গাছতলায় বসে আহার ও বিশ্রাম করছিল। তাদের হুঁস থাকলে লক্ষ্য করতো তাদের কিছু পিছনে আর একজন ঘোড়সোয়ার গাছের আড়ালে বিশ্রাম করছে, পাশে দড়ি দিয়ে বাঁধা ঘোড়াটা।

এই মানুষটিকে ভালো লেগে গিয়েছে জরার। সাধু কিন্তু ভেক বা ভড়ং নেই, গভীর কথা যে হেসে বলা যায় গাম্ভীর্যের প্রয়োজন হয় না এই প্রথম দেখলো; দেশে-বিদেশে ঘুরেছে লক্ষ্য করেছে সাধুরা হাসা-বিমুখ, ছাগার্ষি মাঝে মাঝে হাসতো বটে কিন্তু সে হাসি যেন করাতের শব্দ, গা আতঙ্কে শিউরে ওঠে, কাটলো বুঝি। সে ভাবলো যতটা পথ পারা যায় এর সঙ্গে যাওয়া যাক।

দুজনে পাশাপাশি পথ চলেছে, শাদা ধুলোর পথ, দুদিকে প্রবীণ গাছের সার, রোদ্দুরের তাত বাঁচিয়ে চলতে কষ্ট হয় না। জরা বলল ঠাকুর, আমি বড় পাপী, মহাপাতকী।

ঠাকুর সংক্ষেপে উত্তর দিল, কে নয়?

জরা বলে, আমার মতো কেউ নয়।

ওতেই তো তুমি বেঁচে গিয়েছ বাবা।

কেন ঠাকুর।

মানুষে নিজের পাপকে লঘু করে দেখে কিম্বা তার দায়িত্ব অপরের ঘাড়ে চাপিয়ে নিজেকে হাল্কা মনে করে।

আমি যে পাপের ভারে ক্রমেই ডুবে যাচ্ছি। আজ দশ বছর হল, ঠাকুর, পাহাড়ে পর্বতে অরণ্যে অরণ্যে কি করে এ পাপ থেকে মুক্তি পাওয়া যায় সন্ধান করে ফিরছি। কত সাধুসন্ন্যাসী যোগী তপস্বীর সঙ্গে দেখা হল তারা আমার প্রশ্ন শুনে শাস্ত্র আওড়ায়। কিন্তু বাবা ছবিতে জল দেখে তো তৃষ্ণা মেটে না। এদিকে যে সন্ধ্যা হয়ে এল।

ঠাকুর বলে, তবে তোমার মুক্তিও আসন্ন।

সে কি মৃত্যুর পরে।

পরে কেন আগেই।

কিছু যে বুঝতে পারছি নে বাবা।

তবে বুঝিয়ে দি। নদীতে মাঝি খেয়া পারাপার করে দেখেছ তো।

মাথা নেড়ে সম্মতি জানায় জরা।

মাঝি ঘর থেকে ঘাটে আসবার সময়ে শিশুপুত্রটিকে নিয়ে আসে, তাকে একটা-কিছু খেলনা দিয়ে বসিয়ে রাখে, বলে, বাবা বসে বসে খেলো, এদিক-ওদিক যেয়ো না। তারপরে সারাদিন ধরে খেয়ার লোক পারাপার করে, কত গাঁয়ের কত লোক এপার ওপার হচ্ছে। মাঝে মাঝে মাঝি তাকিয়ে দেখে ছেলেটা কি করছে। হাঁ, ও ঠিক জায়গায় বসে আছে, আপনমনে খেলছে। তারপরে যখন বেলা পড়ে যায়, সন্ধ্যা ঘনিয়ে আসে, পারাপার হওয়ার লোক আর থাকে না, তখন শেষ খেয়ায় ছেলেটিকে নিয়ে বাড়ীতে ফিরে আসে ঘাট-মাঝি। আপন লোক কিনা তাই তাকে অপেক্ষা করিয়ে রাখে। বুঝলে না বাবা, তুমি তাঁর আপন লোক তাই তোমাকে অপেক্ষা করিয়ে রেখেছেন। এমন সৌভাগ্য ক'জনের ঘটে।

জরা নিরক্ষর হলেও বোঝে এ শাস্ত্র-বচন নয় জীবনের অভিজ্ঞতা। সে তাহলে ভগবানের আপন লোক, তাই পার হতে দেরী হচ্ছে, কেউ এমন করে তো বোঝায়নি। সে প্রশ্ন করে, ঠাকুর, নিজের চেষ্টায় কি পাপ থেকে মুক্তি পাওয়া যায়?

ঠাকুর বলে, যায় আবার যায় না।

সে কি রকম ঠাকুর?

বাবা, তোমার আমার এমন কি সাধ্য যে পাপের ভার থেকে মুক্তি লাভ করি, তবে চেষ্টা করতে পারি এই পর্যন্ত। আমরা চেষ্টা করি আর তিনি লক্ষ্য করতে থাকেন। যখন টের পান যে লোকটা প্রাণপণ করছে তবু পেরে উঠছে না তখন তিনি এগিয়ে এসে খানিকটা ভার ঠেলে ফেলে দিয়ে বোঝাটা অনেকখানি হাল্কা করে দেন, তাতেই তো মুক্তি সম্ভব হয়।

এসব কথাও জরার কাছে নূতন।

ঠাকুর আবার বলতে থাকে, তোমার আর্তি দেখে বুঝতে পারছি এবারে তাঁর আসন টলেছে, তোমার ভার লাঘব করবার উদ্দেশ্যে তিনি এগিয়ে এসেছেন।

আর্তভাবে জরা শুধায়, কবে এসে পৌঁছবেন তিনি।

ঠাকুর হেসে বলে, ফিরে গেলে বোঝা যায় যে তিনি এসেছিলেন।

আর তো অপেক্ষা করতে পারিনে বাবা।

তবে নিশ্চয় জেনো তিনিও আর অপেক্ষা করতে পারছেন না।

সকলের বেলাতেই কি তাঁর এই রকম দয়া।

তবে কি শুধু তোমার বেলায়। বাবা, মানুষের কাছে আমি তুমি, সে আছে, তাঁর কাছে, সবাই সে। সকলকে পার করে না দেওয়া পর্যন্ত যে তাঁর ছুটি নেই।

এইভাবে প্রশ্নোত্তরে তাদের পথ অতিক্রান্ত হয়। পদাতিক, সোয়ার, শিবিকা-রোহী, সম্পন্ন ভিখারী পথিকের আর অন্ত নাই। এ অঞ্চলের দিগন্ত অবারিত, পাহাড় বা অরণ্য কোথাও বাধা সৃষ্টি করেনি। মাঝে মাঝে ছোট-বড় চটি। চলবার মুখে আবার প্রশ্ন জাগে জরার মুখে, ঠাকুর, আপনি তো গৃহী, তাহলে আপনার গৃহ আছে নিশ্চয়।

নিশ্চয়, গৃহ আছে, গৃহিণী আছে, প্রতিপাল্য আছে।

জরা শুধায়, ছেলেমেয়ে?

কারো ছেলেমেয়ে নিশ্চয়।

তার মানে কুড়িয়ে আনা?

হাঁ গো হাঁ, পথ থেকে কুড়িয়ে আনা, তিনটে খোঁড়া কুকুরের বাচ্চা, দুটো ছাগল, কয়েকটা ময়না আর শুকপাখী।

বিস্মিত জরা বলে ওঠে, এদের নিয়ে আপনার সংসার।

তা বইকি। এদের দায় কি ছেলেমেয়েদের দায়ের চেয়ে কম। ছেলেমেয়েদের একটু বয়স হলেই তাদের ভাষা বুঝতে পারা যায়, এরা যে চির-অবোলা।

তবে এদের মনের কথা বোঝেন কি ভাবে?

ভালোবাসা দিয়ে। বিধাতা ভাষা সৃষ্টি করবার আগে ভালোবাসা সৃষ্টি করেছেন।

তাহলে ঠাকুর এরাই আপনাকে মায়ার বন্ধনে বেঁধেছে।

আমিও বেঁধেছি তাদের, ছাড়া থাকে অথচ একটাও পালায় না।

শুকপাখী তো পোষ মানে না ঠাকুর।

খাঁচায় রাখে বলে পোষ মানে না, ছাড়া থাকলে আর পালাবে কেন?

এতগুলো পশুপাখীতে মাঝে মাঝে ঝগড়া বাধে না।

বাধে বইকি বাবা, মানুষের সঙ্গ যে পেয়েছে—বলে তিনি হেসে ওঠেন, জরাও হাসতে থাকে।

ঠাকুর বলে, চলো বাবা আজ এই হাট-তলাতে রাত্রিযাপন করা যাক।

বিপদ-আপদ!

চটি হলে বিপদ-আপদের আশঙ্কা ছিল বটে। কিন্তু এ পোড়ো হাটতলায় কে আসতে যাবে। সপ্তাহান্তে একবার লোকের ভিড় হয় তারপরে চারচালা-গুলো শূন্য পড়ে থাকে। চোর ডাকাতে আন্দাজে হানা দিয়ে শক্তি অপব্যয় করে না।

কাজেই দুজনে সেখানে বিশ্রামের আয়োজন করলো, তার আগে ঠাকুর তল্পি থেকে বার করলো খানকতক চাপাটি ও আচার, ইঁদারায় জল ছিল।

ঠাকুর বললেন, দেখো আমি গৃহী কিনা, অন্ততঃ দুদিনের খাদ্য সঙ্গে না নিয়ে পথ চলি না।

আহারান্তে যখন দুজন একখানি চালাঘরের মধ্যে পাশাপাশি শয়ন করলো, বাইরে তখন পূর্ণিমার আলোয় দিগ-দিগন্তের কানাটি অবধি পূর্ণ হয়ে উঠেছে, আর একবিন্দু বেশি হলে যেন উপচে পড়বে।

ঠাকুর স্নেহের সুরে বললেন, নাও, বাবা নির্ভয়ে ঘুমোও। তারপরেই হেসে উঠে বললেন, 'ভোজনং যত্রতত্র শয়নং হট্টমন্দিরে' মহাজন বাক্যের প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্ত আজ আমরা দুজনে।

ঠাকুর যখন জরাকে অভয় দিচ্ছিলেন, ঠিক সেই সময়ে হাটতলার অদূরে বট-গাছের ছায়ার আড়ালে দুজন অশ্বারোহী দণ্ডায়মান ছিল। আর তারও কিছু দূরে শাদা পথের ধূলায় অঙ্কিত হয়েছিল তৃতীয় একজন অশ্বারোহীর ছায়ামূর্তি।

(৪)

রাত্রি দ্বিপ্রহর। ব্রিজনাথ ও ব্রিজপ্রসাদ গাছের ডালে ঘোড়াদুটোকে বেঁধে রেখে [illegible] [illegible] এগিয়ে চললো সেই চালাঘরের দিকে। সকাল থেকে লক্ষ্য করেছে তাদের শিকারের সঙ্গে আর একজন সন্ন্যাসী এসে জুটেছে, তাই তারা স্থির করেছিল আজকেই কাজ সমাধা করতে হবে, আরও সন্ন্যাসী জুটে যেতে কতক্ষণ, সংখ্যায় বেশি হলে বিঘ্ন ঘটতে পারে। তবে ভরসার মধ্যে এই যে, সন্ন্যাসীরা নিরস্ত্র, নিরস্ত্র তবে সবল। কাজেই ঘুমের মধ্যে কাজ সম্পন্ন করাই নিরাপদ। মথুরাপ্রসাদের নির্দেশ ছিল, পারতপক্ষে প্রাণে মেরো না, তবে যদি বলপ্রয়োগ করে তবে তোমরাও করবে, মারা পড়লে তোমাদের উপরে সাধুহত্যার দায় বর্তাবে না।

দুজনে নিঃশব্দে কুটীরের পাশে এসে দাঁড়ালো। কান পেতে শুনলো কেউ কথা বলছে না, তারপরে নাসিকাধ্বনি শুনে নিশ্চিন্ত হল, অঘোরে ঘুমোচ্ছে। তখন ব্রিজনাথ ইসারায় ব্রিজপ্রসাদকে বাইরে অপেক্ষা করতে বলে ভিতরে ঢুকলো। বাইরে যেমন আলো ভিতরে তেমনি

অন্ধকার। কিছুক্ষণের মধ্যেই অন্ধকারে তার চোখ অভ্যস্ত হতেই বুঝতে পারলো পাশাপাশি সন্ন্যাসীদ্বয় মাটিতে শয়ান। বৃন্দাবনেই সে লক্ষ্য করেছিল রত্নহারটি (প্রভু সেই রকম জানিয়েছিল) একটি থলিতে সন্ন্যাসীর গলায় ঝোলানো। গলার সেই সুতোটি কাটবার উদ্দেশ্যে ধারালো ছুরি সঙ্গে এনেছিল। এখন পা টিপে টিপে এগিয়ে গেল। এবারে সে মস্ত একটা ভুল ক'রে বসলো যে-কেউ করতো। জরার গলায় থলিটি কাটতে গিয়ে অপর সন্ন্যাসীটির গলার থলি কাটলো। পাশাপাশি দু'জনে শয়ান। দু'জনের দীর্ঘ চুলদাড়ি, তার উপরে ঘোর অন্ধকার, কাজেই এমন ভুল খুবই স্বাভাবিক। থলিটি হাতে করে দেখল বেশ ভারি। বুঝলো ধনী বণিক মথুরাপ্রসাদের লোভ লঘু বস্তুতে হতে যাবে কেন! বাইরে এসে অপেক্ষমান ব্রিজপ্রসাদকে ইসারায় জানালো কাজ সুসম্পন্ন হয়েছে। তখন দু'জনে পূর্ববৎ নিঃশব্দে সেই বট-গাছটির দিকে চলল, ঘোড়ায় চড়ে মথুরায় ফিরতে হবে।

সেই কুটীর থেকে গাছটি খুব বেশি দূরে তো দু' রসি। এইটুকু পথ যেতে যেতেই ব্রিজনাথের মনস্তত্ত্বে বিপ্লব ঘটে গেল আর তার কর্তা স্বয়ং শয়তান। শয়তানের মনোরথ গতি। সে ভাবলো এই অমূল্য রত্ন হরণ করাতে পাপটা তার হ'ল আর সুফল ভোগ করবে মথুরাপ্রসাদ—এ হচ্ছে নৈতিক অধিকার। প্রভু তাকে বড়জোর পঞ্চাশ কি একশ' স্বর্ণমুদ্রা পুরস্কার দেবে। নতুই দিক তাতে আবার সমান সমান ভাগাভাগি হবে ব্রিজপ্রসাদের সঙ্গে। ব্রিজ-প্রসাদ কি করেছে, আর প্রভু তো কিছুই করেনি, মথুরার প্রাসাদে আরামে ঘুমোচ্ছে। তার মনে হ'ল পাপ যখন তার সুফলটাও তার হওয়া উচিত। প্রয়োজন হ'লে নিরীহ সন্ন্যাসীকে প্রাণে মারতে হ'তো, সে-পাপটা আগাম চাপিয়ে নিল নিজের ঘাড়ে। পাপ যখন করেছেই, তখন সুফলটাও তার পাওয়া উচিত। না, এটা কিছুতেই প্রভুর হাতে তুলে দেবে না। এমন কাজ করতে হ'লে ভাগ দিতে হয় ব্রিজপ্রসাদকে। কিন্তু তাতে অনেক বাধা, সে-বেটা রাজি হবে কিনা কে জানে, তার উপরে লুটের মাল ভাগাভাগি নিয়ে অনেক সময় ঝগড়া-বিবাদ হয় তার ফলে জানাজানি হয়ে যায়। ভাগে খুশী না হ'লে সে জানিয়ে দিতে পারে প্রভুকে। তখন! আর তাছাড়া ব্রিজপ্রসাদ তো একরকম কিছুই করেনি, চুরি করেছে সে প্রয়োজন হ'লে সন্ন্যাসী হত্যা করতো সে সে-পাপের ভাগ কি ব্রিজপ্রসাদ নিতো। তবে রত্নের ভাগই বা পাবে কেন? কিন্তু তাকে ফাঁকি দেওয়ার কি উপায়! তখন শয়তানের কটাক্ষে আর এক বিদ্যুৎ চমক খেলে গেল তার মস্তিষ্কে' সে হাত দিয়ে অনুভব করলো অসিখানা যথাস্থানে আছে।

মণি মাণিক্য হীরা পান্না চুনি মরকত সমস্তই প্রস্তরবিশেষ। পাথর ঐ উপল-খণ্ডের সঙ্গে তাদের প্রভেদ মনস্তত্ত্বগত বই নয়। এসব না লাগে গ্রাসাচ্ছাদনে, না লাগে আশ্রয় নির্মাণে। তবু এইসব বিচিত্র উপল প্রাপ্তির আশায় মানুষ কি পাপ, কি পণ্ডশ্রম না করে। অন্নপানীয় বিধাতার সৃষ্টি, মণিমাণিক্য সৃষ্টি শয়তানের। শত-করা নব্বইটি ক্ষেত্রে শয়তানেরই ইঙ্গিত। এক্ষেত্রেও তারই জয় হ'ল। ব্রিজপ্রসাদ ঘোড়ার বাঁধন খুলে দিয়ে ঘোড়ায় চাপতে যাবে সেই অসতর্ক মুহূর্তে ভূমিতে দণ্ডায়মান ব্রিজনাথ অসি নিষ্কাশিত ক'রে তার মুণ্ড দেহচ্যুত ক'রে ফেলল, আর তারপরেই নিজের ঘোড়ায় চড়ে সবেগে ছুটলো মথুরার বিপরীত দিকে। সে একবার পিছনে তাকিয়ে দেখল কেউ অনু-সরণ করছে না, কে আর করবে, একমাত্র যে-ব্যক্তি করতে পারতো তার দেহ দ্বি-খণ্ডিত। তবু আশঙ্কা! একেই বুঝি ভূতের ভয় বলে।

শিক্ষিত ঘোড়া সবেগে ছুটেছে। শাদা ধুলোর পথের উপরে ছায়াতরুর সমান্তরাল কালো কালো ডোরাকাটা। ব্রিজনাথ হঠাৎ মনে একপ্রকার অননুভূতপূর্ব উল্লাস অনুভব করলো। সে কি উদ্দাম গতির প্রেরণায়। না, সুনিপুণভাবে সম্পন্ন পাপের কৃতিত্বে, কিম্বা ভাবী ঐশ্বর্যের মরীচিকার প্রলোভনে। পাপের প্রারম্ভে বড় সুখ।

হঠাৎ তার মনে হ'ল পিছনে যেন ঘোড়ার খুরের শব্দ। তখনি বুঝলো এ তারই ঘোড়ার খুরের প্রতিধ্বনি। কিন্তু প্রতিধ্বনি যেন স্পষ্টতর নিকটতর হচ্ছে। সত্য কি প্রতিধ্বনি পরীক্ষা করবার আশায় ঘোড়া থামালো, না শব্দ তো থামলো না। ধ্বনি নাই প্রতিধ্বনি আছে এমন তো হয় না। তখন পিছনে তাকিয়ে দেখল দূরে পথের শাদার পটে ধাবমান একটি কালো বস্তু। তখনি দ্বিগুণ বেগে হাঁকিয়ে দিল নিজের অশ্ব। কেউ কি তাকে অনুসরণ করছে কিম্বা নিজ প্রয়োজনে ধাবমান অশ্বারোহী। যেমনি হোক এত রাতের এমন স্থানের অশ্বারোহীকে বিশ্বাস কি! অশ্ব তীরবেগে সামনে ছুটছে, মাঝে মাঝে পিছনে তাকিয়ে অনুসরণকারীর ব্যবধান লক্ষ্য করছে ব্রিজনাথ।

ছদ্মবেশী মথুরাপ্রসাদ প্রচ্ছন্নভাবে অনুচরদের গতিবিধি লক্ষ্য করছিল—এ-সংবাদ আগেই দেওয়া হয়েছে। সে দেখল দু'জনে ঘোড়া বেঁধে রেখে কুটীরের দিকে অগ্রসর হ'ল; লক্ষ্য করলো তারপরে দু'জনে গাছতলায় ফিরে এলো, লক্ষ্য করলো দু'জনের বদলে একজনমাত্র ঘোড়া ছুটিয়ে দিল তাও কিনা আবার উল্টো দিকে। দ্বিতীয় ব্যক্তির কি হ'ল? মথুরার বিপরীতে ঘোড়া ছুটলো কেন অপর ব্যক্তির। তখন মথুরাপ্রসাদ বটগাছতলায় এসে দেখতে পেল্লো একটি দ্বিখণ্ডিত মৃতদেহ। মরলো কে? তখনি বায়ুর আন্দোলনে পল্লব স'রে গিয়ে চাঁদের আলো এসে পড়ে প্রমাণ করে দিল মৃত ব্যক্তি ব্রিজপ্রসাদ। মথুরাপ্রসাদ দুনিয়াদি পাপী, কাজেই এক লহমায় ঘটনার প্রকৃতি বুঝে নিল। রত্ন উদ্ধার ক'রে, ব্রিজপ্রসাদকে মেরে ফেলে বেপাত্তা হওয়ার চেষ্টায় আছে ব্রিজনাথ। সে ভাবলো বেটা শয়তান। শয়তান না হোক শয়তানের অনুচর নিঃসন্দেহ। সে তুরন্ত ঘোড়া ছুটিয়ে দিল ব্রিজনাথের অনুসরণে। মথুরাপ্রসাদ সুদক্ষ অশ্বারোহী, অশ্ব সুশিক্ষিত।

দুটি অশ্বই শিক্ষিত, অশ্বারোহী দুজনেই শিক্ষিত, নক্ষত্রবেগে তারা ছুটেছে, একজন লোভে, একজন ব্যর্থলোভের প্রতি-হিংসায়। গতি দ্রুত থেকে দ্রুততর হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে শাদা পথের উপরে ছায়ার ডোরাকাটাগুলি দ্রুততর এসে পড়ছে, শেষে এমন মনে হয় যে, সমস্ত পথটাই ডোরাময়, আবার এমন মনে হয় যে সমস্ত পথটাই শাদা। পলায়নকারী ও অনুসরণকারীর মধ্যে ব্যবধান ক্রমেই ক্ষীয়মান। রাত্রি নিশুতি, নিস্তব্ধ, কেবল আটটি ধাবমান ক্ষুরের একটি শব্দ, একটি তবে আটগুণে প্রবল।

ব্রিজনাথ দেখল অনুসরণকারী যে-ই হোক তার লোভটা ঐ রত্নটির প্রতি, সেটি পেলে নিশ্চয় ফিরে যাবে। তাই সেই থলিটি নিক্ষেপ করলো, কিন্তু তা চোখে পড়লো না মথুরাপ্রসাদের, তার চোখ বিশ্বাসঘাতক অনুচরের দিকে নিবদ্ধ। মুহূর্ত পরে দুজনে কাছাকাছি এসে পড়লো, ঘোড়ার মুখ ফিরিয়ে নিল ব্রিজনাথ, চিনতে পারলো না ছদ্মবেশী প্রভুকে, তাকে দূরে থেকে বিদ্ধ করবার ইচ্ছা, বল্লম ঋজুভাবে ধরলো। ঝোঁক সামলাতে পারলো না, বল্লমের উপরে এসে পড়লো, বুকে পিঠে বিদ্ধ হয়ে গেল, বল্লম এ-ফোঁড় ও-ফোঁড় হ'ল, দু'জনের ব্যবধান গেল কমে, ঘোড়া থেকে টলে পড়বার আগে তলোয়ারের এক কোপে ব্রিজনাথকে নিহত করলো মথুরা-প্রসাদ। প্রভু-ভৃত্য এক শয্যায় হ'ল শয়ান।

(৫)

ব্রাহ্মমুহূর্তে ইষ্টদেবতাকে স্মরণ ক'রে সন্ন্যাসীঠাকুর শয্যাত্যাগ করলো, সেই মুহূর্তে জরাও উঠে বসলো। জরা তার বুকের দিকে তাকিয়ে বলে উঠল, ঠাকুর, তোমার শালগ্রামশিলা গেল কোথায়?

ঠাকুর চমকে বুকের দিকে তাকিয়ে বলল, তাই তো, থলিটা নেই, সুতোয় আধখানা ঝুলছে। মনে হচ্ছে রাতের বেলায় কেউ কেটে নিয়ে গিয়েছে। যাক, তোমার জপের থলি দেখছি যথাস্থানে আছে।

জরার বুঝতে বিলম্ব হ'ল না যে-ই কেটে নিক তার লক্ষ্য ছিল জরার থলিটা অন্ধকারে ঠাহর করতে না পেরে কেটে নিয়ে গিয়েছে ঠাকুরের শালগ্রামশিলার থলি। সে আরও বুঝলো যে কেটেছে সে জানে কি অমূল্য রত্ন রয়েছে জরার থলিতে। কে সে? কি ক'রে জানলো সে?

ঠাকুর বলল, বাবা, আর চিন্তা ক'রে লাভ নেই, যে নিয়েছে সে পাথরের টুকরো মাত্র নিয়েছে। কিন্তু আমি ভাবছি কি

হঠাৎ এমন কোন ভক্ত কোথা থেকে এলো যার লোভ আমার শালগ্রামটির উপরে।

জরার কাছে রহস্য পরিষ্কার হয়ে গিয়েছে তাই তার বক্তব্য কিছু ছিল না। সে অনেকবার ভেবেছে ঠাকুরকে তার পাপের প্রকৃতি বলবে, কিছু ভূমিকাও করেছিল, ঠাকুর উৎসাহ দেয়নি।

জরা বলেছিল, ঠাকুর, আমার ইচ্ছা হচ্ছে আপনাকে সব কথা খুলে বললে মনের ভার লঘু হবে।

ঠাকুর বলেছিল, বাবা, মানুষের সাধ্য কি পাপের ভার লাঘব করে। তা পারেন একমাত্র অন্তর্যামী। তাকে বলো আর নাই বলো তিনি তো সমস্তই অবগত আছেন। বাবা, মুখের বলায় কি ভার কমে?

জরা শুধায়, তবে?

ঠাকুর বলে, মনের বলায়। মন তোমার তাঁর কানে কানে নিত্যনিয়ত বলে চলেছে আজ দশ বছর ধরে।

জরা কি উত্তর দেবে ভেবে পায় না।

ঠাকুর বলে, চলো বাবা আর বসে থেকে লাভ নেই, প্রাতঃকৃত্যাদি সমাপন ক'রে যাত্রা করা যাক।

কিন্তু ঠাকুর, আপনার নিত্যপুজোর শিলা!

আবার মিলবে। আমি তো যাচ্ছি নর্মদা নদীর উৎস অমরকণ্টক তীর্থে, সেখানকার নদী-গর্ভে শালগ্রামশিলা পাওয়া যায়, এটিও ছিল সেখান থেকে পাওয়া।

এমন সময়ে ঠাকুরের মনে প'ড়ে যায় কাল রাতের ঘুমের মধ্যে ঘোড়ার দড়বড়ি যেন একবার কানে এসেছিল, তবে সেটা স্বপ্নের অভিজ্ঞতা না বাস্তব ঘটনা বুঝতে পারেনি। এখন মনে হ'ল ঐ ঘোড়ার ক্ষুরের শব্দের সঙ্গে যেন শালগ্রাম খোয়া যাওয়ার যোগাযোগ আছে। কিন্তু শাল-গ্রামের প্রতি ঘোড়সোয়ারের লোভ কেন? হ'ত মণিমাণিক্য বোঝা যেতো।

শেষের শব্দকয়টি হয়তো উচ্চারিত হ'য়ে থাকবে, জরা চমকে ওঠে। ঠাকুর কি তবে কিছু সন্দেহ করেছে নাকি।

তবু সন্দেহ নিরসন করে দিয়ে ঠাকুর বলে, এমন নির্বোধ লোকও তবে সংসারে আছে যে নাকি সন্ন্যাসীর ঝুলিতে রাজার ঐশ্বর্য কল্পনা করে।

দুজনে পথে বের হয়ে পড়েছে। ঠাকুর বলে, বাবা, মনে হচ্ছে আগামীকাল সন্ধ্যাতক অবন্তীনগরীতে গিয়ে পৌছবো। সেখানে মহাকালেশ্বর মহাদেবকে দর্শন ক'রে অমরকন্টকের দিকে চলে যাবো, তুমি যাবে তোমার পথে।

জরা বলে, ঠাকুর এদিকের পথঘাট দেখছি আপনার জানা।

কি মুস্কিল জানা হবে না। আমি যে বছরে ছ'মাস ঘুরে বেড়াই।

জরা শুধায়, তীর্থ দর্শনে?

প্রকাশ্যে তাই, মনের কথা জানেন মনের মালিক।

ঠাকুর, বিদায় নেবার আগে বলে যান আমার মুক্তি কি হবে না? কি উপায়ে হবে? [illegible], আমি জ্ঞানী নই, পণ্ডিত নই জপ-তপ ধ্যানধারণা কিছুই জানি না। আজ দশ বৎসর বাণ খাওয়া হরিণের মতো পাহাড়ে পর্বতে অরণ্যে জনপদে ছুটে ছুটে বেড়াচ্ছি, হেন তীর্থ নাই যেখানে না গিয়েছি, কত মুনি ঋষি যোগী তপস্বীকে শুধিয়েছি কই কেউ তো সন্ধান দিতে পারলো না, সবাই বলে হাত জোড়া এগিয়ে দেখো, আর কোথাও যাও, আর কাউকে জিজ্ঞাসা করো।

তারপরে অত্যন্ত নৈরাশ্যময় কাতরস্বরে বলে, আর কতদূরে এগোব বাবা, আর কোথায় যাবো আর কাকে জিজ্ঞাসা করবো। আপনাকে পেয়ে মনে বল লাভ করেছিলাম, আপনিও ছেড়ে চললেন।

তার আর্তি দর্শনে মনে ব্যথা পায় সন্ন্যাসী, বলে, বাবা, তোমার এত দুঃখ এত অনুতাপেও যদি তাঁর আসন না টলে তবে তাঁর দয়াময় নাম যে বৃথা হবে। এমন হতেই পারে না। তুমি যেখানে চলেছ যাও তোমার মনস্কামনা সেখানেই পূর্ণ হবে।

ঠাকুর পূর্ণাবতার কে? শুনেছি এক-মাত্র তিনিই আমার গতি করে দিতে পারেন।

এ প্রসঙ্গ আর গড়াতে পারলো না, হঠাৎ দুজনে দেখতে পেলো পথের মধ্যে ঠাকুরের অপহৃত সেই থলিটা। ঠাকুর তাড়া-তাড়ি কুড়িয়ে নিয়ে দেখল শালগ্রাম যথাযথ আছেন, মাথায় ঠেকালো। তারপর বলল, কেউ মণি-মাণিক্য মনে করে সংগ্রহ করেছিল তারপর পাথরের নুড়ি দেখে ফেলে গিয়েছে।

বললেন কি ঠাকুর, শালগ্রাম পাথরের নুড়ি।

যে মানে না তার আছে নুড়ি ছাড়া আর কি?

ঠাকুর পুনরায় মাথায় ঠেকিয়ে আবার দুলিয়ে নিল গলায়।

আর কিছু দূর অগ্রসর হতেই তারা দেখতে পেলো দুটো মৃতদেহ লুটোচ্ছে পথের উপরে। দুজনেই তাদের অপরিচিত।

এরা কারা ঠাকুর?

আপাতত দুটি মৃতদেহ।

এখানে মরে পড়ে আছে কেন ঠাকুর?

বাবা, তোমার প্রশ্নের উত্তরে এইটুকু মাত্র বলতে পারি যে আজকাল ঘরের চেয়ে পথেই লোক মরছে বেশি।

কেন?

কেন কি, অরাজকতার ঐ নিয়ম। সমাজ যখন সুস্থ থাকে তখন মানুষ বয়ঃপ্রাপ্ত হয়ে যথাকালে ঘরে মারা পড়ে। অসুস্থ সমাজে মানুষ ঘরে ফিরবার অবকাশ পায় না, কেউ মরে পথে, কেউ ঘরের দরজায়।

জরা শুধায়, দেশের অবস্থার কি উন্নতি হবে না?

দেশ যদি উন্নতি না চায় তবে কি করে হবে?

এমন অরাজকতা কি কারো কাম্য?

অবশ্যই, নতুবা এমন হবে কেন?

কিন্তু কেন কাম্য সেটা তো বুঝতে পারছি না।

তার মানে তুমি অরাজকতা চাও না।

ঠাকুর, আমার মতো লোক হাজার হাজার আছে।

হাজার হাজার নয়, লক্ষ লক্ষ আছে।

তবে?

শান্তিপ্রিয় লোকেরা, সঙ্ঘবদ্ধ নয়, অন্যসবে অরাজকতাকামীরা ব্যূহবদ্ধ, তাই মুষ্টিমেয় হওয়া সত্ত্বেও তারা নির্যাতিত। তারা ভাবে আমি তো প্রাণ বাঁচাই। আর তাছাড়া প্রজাকে রক্ষা করা রাজার কর্তব্য। তারা জানে না যে রাজা নেই কিম্বা রাজা অসহায়।

রাজা না থাক দলপতি আছে তো।

দলের জন্য আছে, তোমার আমার জন্যে নয়। কিম্বা বলা উচিত দলপতি থেকেও নাই!

সে আবার কেমন?

গোড়ায় দলের লোক দলপতির শাসনে থাকে, কিন্তু যখনি বুঝতে পারে তাদের শক্তিতেই দলপতি শক্তিমান তখন দলপতির শাসনের বাইরে চলে যায়। তখন দলপতি হয়ে পড়ে দলাধীন। দলের লোক যা খুশী করে, দলপতি হাঁ, হাঁ, বেশ করেছ বলে, নইলে নামের কর্তৃত্বটাও যে থাকে না। ঐ দেখো একটা সাজ পরানো ঘোড়া, মনে হচ্ছে ঐ মৃত লোক দুটোর কারো হবে।

এইভাবে কথাবার্তা বলতে বলতে অরাজকতার শত শত চিহ্ন দেখতে দেখতে তারা এগিয়ে চলে।

ঐ দেখো বাবা পথের ডানদিকে একটা দগ্ধ গ্রাম।

আগুন লেগেছিল মনে হচ্ছে।

তার চেয়ে বলো আগুন লাগিয়েছিল।

কেন? কারা?

এখনো এরকম প্রশ্ন করছো। এগিয়ে চলো আরও দেখতে পাবে।

আবার ঐ দেখো এক পাল উট নিয়ে চলেছে জনদুই লোকে।

কিনেছে নিশ্চয়।

না। আজকাল কেনাবেচা উঠে গিয়েছে, তার বদলে লুটপাট। পা চালিয়ে চলো বাবা, নইলে কালকে অবন্তীতে পেঁছতে পারবো না।

দুজনে দ্রুততর চলতে থাকে।

পরদিন অবন্তীনগরে পেঁছতে সন্ধ্যা হয়ে যায়, আরও আগে পেঁছবার কথা, কিন্তু মাঝপথে দু জায়গায় দাঙ্গা চলছিল বলে ঘুরে আসতে হয়েছে। অবন্তীনগরে সিংহদ্বার সন্ধ্যায় বন্ধ হয়ে যায়, ঠাকুরের মনে ভয় ছিল পাছে রাতটা বাইরে কাটাতে হয় কিন্তু এসে দেখল খোলা দরজা হা-হা করছে দ্বারী বা শাস্ত্রী কেউ নেই। ভিতরে ঢুকতেই জরা বাধা পেয়ে হুঁচোট খেয়ে পড়েছিল আর কি।

কি হল বাবা?

হুঁচোট খেয়েছিলাম বাবা।

তখন দুজনে তাকিয়ে দেখে অন্ধকারে পথের উপরে দুটো লোক পড়ে আছে।

জরা শুধালো, এরা অবেলায় এখানে পড়ে ঘুমোচ্ছে কেন?

এদের এ ঘুম আর ভাঙবে না, আর এখন কার যে কখন বেলা হয় তার কি ঠিক আছে।

মারা পড়েছে নাকি?

ঠাকুরের অভ্যস্ত চোখ দেখে নিয়েছে যে একজনের বুকে আর একজনের পিঠে ছোরা বিদ্ধ হয়ে আছে।

কে মারলো এদের, বাবা।

হয়তো পরস্পরকে খুন করেছে নয় আর কেউ খুন করে ফেলে রেখে গিয়েছে।

সৎকার অবধি করেনি।

সৎক্রিয়ার ভার কি হত্যাকারীর।

চলো এখন মহাকালের মন্দিরের দিকে যাওয়া যাক, আরতির সময় হয়েছে।

যেতে যেতে জরা বলে, বাবা দেশব্যাপী যে খুনের বহর চলছে তাতে আশঙ্কা হচ্ছে কিছুকাল পরে দেশ জনশূন্য হয়ে যাবে।

বিধাতার হয়তো তাই অভিপ্রায়। দেখো বাবা, পুরাকালে বিধাতা এই উদ্দেশ্যে পরশুরামের মতো অবতার পাঠাতেন। পরে দেখলেন তাতে বিস্তর ঝামেলা তাই এখন নতুন উপায় অবলম্বন করেছেন। যখন কোন সমাজকে নাশ করবার প্রয়োজন হয় তখন তাদের হাতে অস্ত্র জুগিয়ে দেন, তারা পরস্পরকে হত্যা করে বিধাতার দায়িত্ব পালন করে।

জরা শুধায়, বিধাতার এমন উৎকট ইচ্ছা হয় কেন?

সমাজে ব্রণ ধরলে তাকে সরিয়ে দিতে হয় নয়তো সেই ঘুণ ছড়িয়ে পড়বার আশঙ্কা। দেখলে না বাসুদেব কিভাবে যদু-বংশ নাশের ভূমিকা সৃষ্টি করলেন। তিনি কি ইচ্ছা করলে তাদের বাঁচাতে পারতেন না।

বাঁচালেন না কেন, শুনেছি তিনি স্বয়ং ভগবান।

সেই জন্যেই বাঁচালেন না। নিজের বিধানকে ভগবান লঙ্ঘন করেন না।

জরা কোনরকমে আত্মসংযম ক'রে জিজ্ঞাসা করে, শুনেছি তিনি এক ব্যাধের শরে মারা পড়লেন, কেন বাবা?

তুমি যা শোননি এবারে তা শুনে নাও, সেই ব্যাধ বাসুদেবের বৈমাত্র ভ্রাতা, কাজেই যে পথে যদুবংশকে প্রেরণ করেছেন সেই পথে নিজেও যাত্রা করলেন। বিধানদ্রষ্টা বিধানঘাতী হতে পারেন না।

এবারে জরা শুধায়, সেই ব্যাধটার কি হল?

নিশ্চয় করে কেউ জানে না। তবে তার সম্মুখে দুটো পথ খোলা আছে, হয় সে লোকটা নতুন নতুন দুষ্কৃতির গভীর থেকে গভীরতর পঙ্কে নিমজ্জিত হবে নতুবা অনু-শোচনার আগুনে পুড়ে পুড়ে নির্মল হয়ে মুক্তি পাবে।

বাবা কি বলতে চান যে এ হেন মহা-পাপীরও মুক্তি সম্ভব!

বাসুদেবের কৃপায় কিছুই অসম্ভব নয়।

মহাকালের আরতি দর্শন করে অতিথি-শালায় আশ্রয় নিল দুজনে। সেখানে নৈশ-ভোজন সমাপ্ত করে দুজনে শয়ন করলো।

মাঝরাতে মহা হলহল্লায় তাদের ঘুম ভেঙে গেল। ব্যাপার কি জানবার আশায় বাইরে এসে দেখে নগরের উত্তর দিকে আগুন জ্বলছে। যাদের ঘরবাড়ী পুড়ছে প্রাণভয়ে তারা ছুটে পালাচ্ছে, আর খুব সম্ভব যারা আগুন লাগিয়েছে লুটপাট শুরু করে দিয়েছে তারা। কেমন ক'রে কি ঘটলো জানবার জন্যে ঠাকুর যখন লোকের সন্ধান করছে তখন মহাকালের পুরোহিতকে সামনে দেখতে পেলো, শুধালো, ঠাকুরমশায়, আগুন কেমন করে লাগলো?

সে বলল, সন্ন্যাসীঠাকুর, আগুন আপনি লাগে না, লাগাতে হয়।

কেন লাগালো?

কেন লাগালো তারাই জানে যারা লাগিয়েছে।

তারা কারা?

সবাই তাদের জানে।

তবে বাধা দেয় না কেন?

আরে তাদেরও যে বাড়ীঘর আছে।

ঠাকুর বলে, তোষণ নীতির দ্বারা তারাই কি শেষ পর্যন্ত রক্ষা পাবে?

পাবে না তারা জানে।

তবে?

প্রত্যেকেই কুমীরকে খাদ্য জোগায় যাতে তাকে শেষে খায় এই প্রত্যাশায় আর কি?

রাজার সৈন্যরা কি করে?

লুটের ভাগ পায়, এ হাঙ্গামার মধ্যে গিয়ে তাদের কি লাভ? মাসান্তে বাঁধা বৃত্তির হ্রাস বৃদ্ধি হবে না।

রাজা কি করেন?

হয়তো তাঁর ভাণ্ডারেও লুটের ভাগ পৌঁছয়। এসব আলোচনা থাক সন্ন্যাসী-ঠাকুর, এ নগরে নিরীহ মানুষ সবচেয়ে বিপন্ন। কে কোথা থেকে শুনবে স্বয়ং মহাকালও রক্ষা করতে পারবেন না।

যা ব'লছেন ঠাকুরমশাই, ভালো মানুষের কাল গিয়েছে। নানা দেশ ভ্রমণ করে বুঝেছে পারলাম যে হয় ঐ সব লুঠেরা আর দাঙ্গা-বাজদের দলে যোগ দিতে হবে নয় মরতে হবে। তৃতীয় পথ বলে আর কিছু নেই।

তখন সন্ন্যাসীকে সহৃদয় বলে জানতে পেরে পুরোহিত মৃদুস্বরে বলতে আরম্ভ করলো—যা বলেছেন। আজ উত্তরপাড়ায় আগুন লেগেছে বলে তাদের নিরীহ মনে করবেন না, ওরাই কালকে দক্ষিণপাড়ায় আগুন লাগিয়েছিল। আজ তার বদলা চলছে।

এমন বদলা-বদলি চললে সমস্ত নগরটা যে ধ্বংস হয়ে যাবে, তখন?

কেন আশেপাশে কি আর জনপদ নেই।

এতক্ষণ জরা নীরবে শুনছিল এবারে বলে উঠল, ঠাকুর, এর চেয়ে হিমালয়ের অরণ্য নিরাপদ ছিল।

তার কথা শুনে পুরোহিত বলল, অরণ্যে থাকে শ্বাপদ তাদের উপদ্রবের প্রকৃতি তো সুপরিজ্ঞাত। এ যে মনুষ্য সমাজ।

বাবা, আজ নগরের চেয়ে পথ নিরাপদ, পথের চেয়ে অরণ্য।

পুরোহিত বলল, সন্ন্যাসী ঠাকুর, আপনাদের বিদেশী বলে মনে হচ্ছে। আমি বলি কি আজ রাতেই গন্তব্যস্থলে যাত্রা করুন, নয়তো কাল সকালে হয়তো শাস্ত্রীরা আপনাদের বন্দী করে নিয়ে যাবে।

আমাদের কেন, শুধায় জরা।

আপনারা ভালো মানুষ তায় বিদেশী। ওরা বলবে আপনারা অবন্তীপুরীর শত্রুদের চররূপে এসে এই অগ্নিকাণ্ডটি ঘটিয়েছেন। সেদিন এই রকম অন্যায় অভিযোগে দুজন বিদেশী মারা পড়েছিল।

ঠাকুর বলল, বাবা চলো, এই মহাশয়ের পরামর্শ গ্রহণ করা উচিত।

তখন তারা দুজনে পুরোহিতকে নমস্কার করে ছাউনি ছেড়ে শিপ্রা নদী পার হয়ে রাজপথের উপরে এসে দাঁড়ালো। ঠাকুর বলল, বাবা সূর্যোদয়ের আর বিলম্ব নাই, এবারে আমি দক্ষিণে যাত্রা করবো অমরকণ্টকের মুখে। তুমি কোন তীর্থে এখন যাবে শুনতে পারি কি।

জরা বলল, দ্বারকায় যাবো মনের ইচ্ছা।

খুব সদিচ্ছা বাবা, যাও, তোমার মন-স্কামনা পূর্ণ করবেন বাসুদেব।

আর কি দেখা হবে না ঠাকুর?

কে বলতে পারে যে হবে না। এ পৃথিবী যত বিশাল তত ক্ষুদ্র। আমারও দ্বারকায় যাওয়ার ইচ্ছা আছে।

ঠাকুর এ কয়দিন আপনার সঙ্গে থেকে মনে বল আর আশা পেয়েছিলাম। এখন বড় অসহায় বোধ করছি।

কোন ভয় নেই বাবা, তোমার পথে যাত্রা করো, আবার নিশ্চয় দেখা হবে।

তাই যেন হয় বাবা, তাই যেন হয়। এই বলে বিদায় নিয়ে দুজন দুদিকে যাত্রা করলো।

তখন শুকতারা দেখা দিয়েছে পূর্ব আকাশে।

[illegible]

আধুনিকতা ও শরৎচন্দ্র

শিবদাস চক্রবর্তী

অপেক্ষাকৃত একালের সাহিত্যকৃতিকে পাঠকমহলে পরিচায়িত করবার উদ্দেশ্যে 'আধুনিক' অভিধাটি অবাধে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। কবিতা, গান, উপন্যাস, নাটক প্রভৃতি সর্ববিধ সাহিত্যকৃতির পূর্বেই 'আধুনিক' শব্দটি প্রযুক্ত হয়। আবার সাহিত্যের ইতিহাসে যুগ-বিভাগের ক্ষেত্রেও অপেক্ষাকৃত একালকে 'আধুনিক যুগ' নামে চিহ্নিত করা হয়। অথচ 'আধুনিক' অভিধাটি অন্যের স্বরূপ নির্দেশ করলেও তার নিজের স্বরূপ কিন্তু এখনও তর্কাতীতভাবে অনুদ্ঘাটিত।

মধুসূদন, বিহারীলাল, হেমচন্দ্র প্রমুখ কবিদের নবীন ধারার কাব্য-কবিতা, বঙ্কিমচন্দ্র, সঞ্জীবচন্দ্র, রমেশচন্দ্র প্রমুখ কথা-সাহিত্যিকদের উপন্যাস এবং রামনারায়ণ, মধুসূদন, দীনবন্ধু প্রমুখ নাট্যকারদের নাটক অবলম্বন করে বাংলা সাহিত্যে যে আধুনিক যুগের সূচনা হয়েছিল, সেই যুগ এখনও বহমান। অথচ তখনকার দিনের কাব্য-কবিতা, উপন্যাস-নাটকের সঙ্গে সাম্প্রতিককালের কাব্য-কবিতা, উপন্যাস-নাটকের আকৃতি ও প্রকৃতিতে কতই না ব্যবধান। তখনকার সামাজিক পরিবেশ, সমাজ-মানস, রস-রুচি থেকে সাম্প্রতিককালের সামাজিক পরিবেশ, সমাজ-মানস, রস-রুচি কত ভিন্ন। তাই বলে মধুসূদন, বিহারীলাল, বঙ্কিমচন্দ্র কিংবা দীনবন্ধুকে সেকেলে বা অনাধুনিক বলে বাতিল করবার চেষ্টাও মূঢ়তার নামান্তর। কারণ, সাম্প্রতিককালের সাহিত্য রবীন্দ্রনাথের উর্বশীর মতো 'বৃন্তহীন পুষ্পসম আপনাতে আপনি' বিকশিত হয়ে ওঠেনি।

প্রবহমান ধারার সাম্প্রতিকতম অংশকেই যদি 'আধুনিক' বলে আখ্যাত করা যায়, তাহলে দেখা যাবে আধুনিকতা কোনো স্থিতিশীল ধর্ম নয়। আজ যা সাম্প্রতিক, কিছুদিনের ব্যবধানে তাই হয়ে যাবে অতীতের। কারণ,, যেখানে প্রবাহ সেখানেই গতি, যেখানে গতি সেখানেই পরিবর্তন। কোনো বিশেষ কারণে যদি বিশেষ কোনো সময় কোনো বিশেষ ভাব বা ভঙ্গী অঙ্গীকারের প্রবণতা প্রবল হয়ে ওঠে, তাহলে সেই বিশেষ ভাব বা ভঙ্গীকেই আধুনিকতা বলে ঘোষণা করা অভ্রান্ত সিদ্ধান্ত বলে মনে হয় না। অন্ততঃ রবীন্দ্রনাথ একথা স্বীকার করতে চাননি। কাব্যে আধুনিকতার আলোচনা প্রসঙ্গে তিনি বলেছেন—'ইনফ্লুয়েঞ্জা আজ হাজার হাজার লোককে [illegible] দেহের আধুনিক স্বভাব। এহ বাহ্য। ইনফ্লুয়েঞ্জার অন্তরালেই আছে সহজ দেহস্বভাব'। রবীন্দ্রনাথ তাঁর এই উক্তিতে স্পষ্টতই আধুনিকতাকে বহিরঙ্গ আকৃতির দিক থেকে না দেখে অন্তরঙ্গ প্রকৃতির দিক থেকে দেখার দিকেই অঙ্গুলি নির্দেশ করেছেন। শিল্প-সাহিত্যের ক্ষেত্রে বহিরঙ্গ আকৃতি উপেক্ষার বস্তু কখনই নয়; তবে তার সূচির মূল্যবান পরিমাপের বেলায় অন্তরঙ্গ প্রকৃতিই সম্ভবত চূড়ান্ত মানদণ্ড। কারণ প্রকৃতি বা স্বরূপ থেকেই কালে কালে বিচিত্র রূপের উদ্ভাবন ঘটে। স্বরূপের কথা বিস্মৃত হয়ে বিচারে প্রবৃত্ত হলে সিদ্ধান্ত ভ্রান্তি ঘটাই স্বাভাবিক।

শরৎ-সাহিত্যের মূল্যায়নের ক্ষেত্রে এই ধরণের কিছু কিছু ভ্রান্তি ঘটেছে। সাম্প্রতিককালের কথা-সাহিত্যিক এবং কথাসাহিত্যরসিক সমাজের একাংশ শরৎ-সাহিত্যের বিরূপ সমালোচনায় উদ্যত। তাঁদের মতে শরৎ-সাহিত্যের আবেদনের দিন অতিক্রান্ত। কারণ তার মধ্যে আধুনিক যুগ-সমস্যার প্রতিফলন অনুপস্থিত। বিশেষত একালের 'অর্থনীতি-নির্ভর সংগ্রামী মানুষের বঞ্চনা যন্ত্রণার কথা শরৎ-সাহিত্যে নেই। অতএব সাহিত্যিক হিসাবে শরৎচন্দ্র এ-যুগে বাতিল। অথচ একদা এই শরৎচন্দ্র তাঁর সমসাময়িককালে আধুনিকতার জন্য প্রাচীন রস-রুচির কাছে নিন্দিত এবং নবীন রস-রুচির কাছে নন্দিত হয়েছিলেন।

সাহিত্য সমাজ-নির্ভর, সমাজ সময়-সাপেক্ষ এবং সময় গতিশীল। সময়ের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে তাই সমাজ-কাঠামোর রূপান্তর ঘটে, সমাজ-কাঠামোর রূপান্তর ঘটলে সমাজ-মানসের উপরিতলেও পরিবর্তন দেখা দেয়। এই ধরণের পরিবর্তনের আবহাওয়ায় লালিত মানুষের কাহিনীকে অঙ্গীকার করে সাহিত্য রচনা করলে সে-সাহিত্যকৃতিতে একটা বহিরঙ্গ অভিনবত্ব প্রকাশ পাওয়া স্বাভাবিক। শরৎ-সাহিত্যের তুলনায় সাম্প্রতিককালের কথা-সাহিত্যের স্বাতন্ত্র্য ও অভিনবত্বের কারণ এখানেই। কিন্তু এই কারণেই শরৎ-সাহিত্যকে বাতিল বলে ভাববার কোনো

শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

সঙ্গত কারণ নেই। শরৎ-সাহিত্যের মৌল সম্পদ এখনও নিঃশেষিত হয়নি, হয়তো কোনোদিনই একেবারে নিঃশেষিত হবেনা। পুনর্মূল্যায়নে হয়তো আবার একদিন নব মূল্যমান আবিষ্কৃত হবে, যেমন বঙ্কিমচন্দ্র এবং মধুসূদনের ক্ষেত্রে হয়েছে। কারণ—'কালোহ্যয়ং নিরবধি বিপুলা চ পৃথ্বী'।

শরৎচন্দ্র তাঁর প্রত্যক্ষদৃষ্ট পরিবেশ ও মানুষের কাহিনীকেই তাঁর সাহিত্য রচনার উপাদানরূপে ব্যবহার করেছেন। শরৎচন্দ্র হুগলী জেলার দেবানন্দপুরে, বিহারের ভাগলপুরে এবং মজঃফরপুরে, ব্রহ্মদেশের রেঙ্গুন ও পেগুতে, বাজেশিবপুর, সামতাবেড় এবং কলকাতায় তাঁর জীবনের বিভিন্ন সময় অতিবাহিত করেছিলেন। তাঁর বিভিন্ন উপন্যাসে এই সমস্ত জায়গাই পটভূমি রচনা করেছে। কিন্তু সমগ্রভাবে তিনি সমকালীন বাঙালী সমাজের ঘাঁটি থেকেই তাঁর গল্প উপন্যাসের প্রাণরস আহরণ করেছিলেন। ঘটনাচক্রে বাংলার সেই ঘাঁটি, বাঙালীর সেই সমাজ আজ দ্বিধা-দীর্ণ। শরৎচন্দ্রের তিরোধানের এক দশকের মধ্যেই বঙ্গবিভাগ এবং স্বাধীনতা লাভের মতো দু'টি গুরুত্বপূর্ণ ঐতিহাসিক ঘটনা বাঙালী সমাজকে দ্রুত রূপান্তরের সম্মুখীন করে তোলে। লক্ষ লক্ষ ছিন্নমূল নরনারীর পুনর্বাসন সমস্যা, কৃষিমুখ্য সমাজে দ্রুত শিল্প প্রসারের ফলে একান্নবর্তী পরিবারে ভাঙন, গ্রামীন জীবনধারার রূপান্তরের ফলে বর্ণভেদ ও বৃত্তিভেদ প্রথার ক্রমবিলোপ, সুপ্রাচীন সামাজিক রীতিনীতির পূর্বতন আধিপত্য হ্রাস, জমিদারী প্রথা বিলোপ প্রভৃতি ঘটনা স্বাধীন বাংলার সামাজিক পরিবেশে গুরুতর পরিবর্তনের সূচনা করলো। ওদিকে দ্রুত শিক্ষা বিস্তারের ফলে শিক্ষিত পুরুষের মতো শিক্ষিতা নারীর সংখ্যাও ক্রমবর্ধমান হলো। বিপর্যস্ত অর্থনীতির আবর্তে পড়ে এযাবৎ অন্তঃপুরচারিণী নারী জীবিকার তাগিদে চারদেয়ালের চৌহদ্দি পার হয়ে বাইরের জগতের আলো হাওয়ায় স্বাধীনভাবে বিচরণের অবাধ সুযোগ লাভ করলো। আর্থিক প্রয়োজনে পুরুষের মুখাপেক্ষাহীনতা নারীর সুপ্ত ব্যক্তিত্বের উদ্বোধনে সহায়ক হলো। এর পর বহু বিবাহ নিবিদ্ধ এবং বিবাহ-বিচ্ছেদ আইনসম্মত হওয়ায় নারীর স্বাধিকার প্রতিষ্ঠার পথের অনেক অন্তরায় দূর হয়ে গেল। এর ফলে বাঙালীর সমাজ-মানসের উপরিতলে দেখা দিল গুরুতর পরিবর্তন। বাঙালীর যে সমাজ পরিবেশে শরৎচন্দ্র তাঁর কাহিনী গড়ে তুলেছিলেন, তাঁর কাহিনীর মধ্যে যে ধরণের নরনারীর ভিড় ছিল, তাদের অনেকেই প্রত্যক্ষ জগৎ থেকে দূরে সরে গেল। শরৎ সাহিত্যের আলোচনা প্রসঙ্গে এই সমস্ত ঘটনার অবতারণা অপরিহার্য। কারণ এই সমস্ত ঘটনা ঐতিহাসিক ঘটনা এবং ইতিহাসকে অঙ্গীকার না করে সত্যের সন্ধান করা বৃথা।

কিন্তু শরৎ-সাহিত্যে বর্ণিত সমাজের পরিবেশে এবং মানসলোকে অনেকখানি রূপান্তর ঘটেছে বলেই কি সত্যই শরৎ সাহিত্যের মূল্যমান হ্রাস পেয়েছে? সম্ভবত না। শরৎ প্রতিভার আলোচনা প্রসঙ্গে কবি-সমালোচক মোহিতলাল মজুমদার একদা বলেছিলেন—'আমাদের জীবনের জীর্ণ ভিত্তির তলদেশে অন্ধকার গহ্বরে, যে সকল প্রেতমূর্তি পিপাসিত হইয়া এক বিন্দু জল প্রার্থনা করিতেছিল, শরৎচন্দ্র তাদের রুদ্ধ আর্তনাদ আমাদের কর্ণগোচর করিয়া দিয়াছেন; আমরা ইহার জন্য প্রস্তুত ছিলাম না, তাই একটা বিভীষিকার সৃষ্টি হইয়াছে।' সত্যই এইজন্য শরৎ-সাহিত্য আধুনিক বাংলা কথা-সাহিত্যের অগ্রদূত। বঙ্কিমচন্দ্র প্রবৃত্তি-নিবৃত্তির দ্বন্দ্ব দেখিয়েছেন, কিন্তু নিবৃত্তি-মার্গের প্রতি তাঁর পক্ষপাত স্পষ্ট। রবীন্দ্রনাথ তাঁর সৃষ্ট চরিত্রাবলীর অতি সূক্ষ্ম অনুভূতিসমূহকে বাঙ্ময় করে তুলেছেন। কিন্তু প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তির দ্বন্দ্বে আন্দোলিত চিত্তের প্রবল বিক্ষোভের চিত্র রবীন্দ্র-সাহিত্যে নিঃসন্দেহে কম। কারণ রবীন্দ্রনাথের দিব্য আবেগ ও কল্পনা এই ধরণের চিত্র অঙ্কনের অনুকূলে ছিল না। শরৎচন্দ্রই প্রথম প্রবৃত্তি-নিবৃত্তি-ঘটিত অন্তর্দ্বন্দ্বের চিত্র আঁকতে গিয়ে-প্রবৃত্তির সহজ আত্মপ্রকাশকে আপন হৃদয়ের উজাড়-করা সহানুভূতির রঙে রঞ্জিত করে তুলেছেন। কারণ তিনি উপলব্ধি করেছিলেন যে, প্রাণের সহজাত তৃষ্ণা প্রবৃত্তি-চরিতার্থতার কাছেই তৃপ্তির বারি সন্ধান করে। তথচ শরৎ-সাহিত্যে উচ্ছৃঙ্খলতাও কোথাও প্রশ্রয় পায়নি। উদ্দাম প্রবৃত্তি শেষ পর্যন্ত স্বেচ্ছাকৃত সংযমের কাছে আত্মসমর্পণ করেছে।

শরৎচন্দ্র আইডিয়ালিস্ট কি রিয়ালিস্ট, বিপ্লববাদী না ক্রান্তিবাদী,—শরৎ-সাহিত্যের মূল্যায়নের ক্ষেত্রে এ বিতর্ক অনেকটা অবান্তর বলেই মনে হয়। শরৎচন্দ্র একটা বিশেষ সামাজিক আবেষ্টনীর মধ্যে জীবনকে মুক্ত দৃষ্টিতে প্রত্যক্ষ করেছেন এবং সেই প্রত্যক্ষ-দৃষ্ট জীবনের অন্তর্দ্বন্দ্ব, তার বঞ্চনা ও বেদনাকে দরদী শিল্পীর মন নিয়ে বাঙ্ময় করে তুলেছেন। তিনি নর-নারীর বঞ্চনা ও বেদনার দার্শনিক মীমাংসা বা অর্থনৈতিক সামাধানের চেষ্টা করেন নি, তিনি সেই বঞ্চনা বেদনাকে আপন সহানুভূতির শৃঙ্খলে বন্দী করে সুবিচারের আশায় মানুষের দরবারে উপস্থিত করেছেন। শরৎচন্দ্রের সেই সুপরিচিত উক্তি এখানে স্মরণীয়—'সংসারে যারা শুধু দিলে, পেল না কিছুই, যারা বঞ্চিত, যারা দুর্বল, উৎপীড়িত, মানুষে যাদের চোখের জলের কখনও হিসাব নিল না, নিরুপায় দুঃখময় জীবনে যারা কোনদিন ভেবেই পেল না সমস্ত থেকেও কেন তাদের কিছুতে অধিকার নেই, এদের বেদনাই দিল আমার মুখ খুলে. এরাই পাঠালে আমাকে মানুষের কাছে মানুষের নালিশ জানাতে। তাদের প্রতি কত দেখেছি অবিচার, কত দেখেছি নির্বিচারের দুঃসহ বিচার। তাই আমার কারবার শুধু এদের নিয়ে।' একালে আধুনিক কথা-সাহিত্যিক বলে যাঁরা নিজেদের দাবী করেন, তাঁদের উদ্দেশ্যগত অঙ্গীকার কি মূলত খুব বেশী ভিন্ন।

শরৎচন্দ্রের সাহিত্য-চর্চার স্বর্ণযুগে এদেশের সমাজ ছিল ভূমিভিত্তিক, এদের অধিকাংশ মানুষ ছিলেন যৌথ পরিবারের অধীন। তাই তখনও সমাজে আর্থিকসংকট থাকলেও তা' একালের মতো এত তীব্র ও ভয়াল ছিল না। তখন স্থাণু সমাজের অনড় বিধি-নিষেধ নরনারীর ব্যক্তিত্বের অবাধ বিকাশের. হৃদয়গত বাঞ্ছা-পূরণের ঘোর অন্তরায় ছিল। শরৎ-সাহিত্যে তাই স্বাভাবিকভাবেই অর্থনৈতিক নিষ্পেষণ অপেক্ষা সমাজনৈতিক নিষ্পেষণে নির্জিত পৌরুষ ও পরাভূত প্রেমের চিত্রই অধিকতর প্রাধান্য পেয়েছে। প্রেম-জীবনের পরাভবের চিত্র অবশ্য পুরুষ চরিত্র অপেক্ষা নারী-চরিত্র আশ্রয় করেই বেশী জীবন্ত হয়ে উঠেছে। কারণ প্রেম পুরুষের কাছে তার ব্যক্তিত্বের একটা অংশ মাত্র, কিন্তু নারীর কাছে প্রেম তার সমগ্র অস্তিত্বের নিয়ামক ভাব। অবশ্য এ কথাও স্মরণীয় যে প্রেমের পরাভবের জন্য সর্বত্র একমাত্র সামাজিক রীতিনীতিকেই দায়ী করা সমীচীন নয়, অনেক সময় এই পরাভবের বীজ প্রেমিক-প্রেমিকার চরিত্রের মধ্যেই সংগুপ্ত থাকে। আসক্তি ও বৈরাগ্যের টানা-পোড়েনে কার মন কখন আসক্তি বা বৈরাগ্যকে বরণ করে নেবে তা' প্রেমিক-প্রেমিকারও জানা থাকে না। জগতে প্রেমের সাহিত্যে তাই এত না-পাওয়ার ও পেয়ে-হারানোর ট্র্যাজেডি।

শরৎ-সাহিত্যে চিত্রিত নারী-চরিত্রগুলি মুখ্যত দুই জাতের—স্নেহময়ী জননী ও প্রেমময়ী রমণী। এই দুই জাতের নারী-চরিত্রই শরৎ-সাহিত্যে সার্থক রস-মূর্তি লাভ করেছে। তবে জননী চিত্রসমূহ একান্তভাবে বাঙালীর ঘরের জিনিস কিন্তু রমণী চিত্রগুলি সর্বদেশের, সর্বকালের। আর পরাভূতা প্রেমিকা রমণীর চরিত্র চিত্রণেই শরৎচন্দ্রের শিল্পীসুলভ সার্থকতা সর্বাধিক। প্রাণ-ভরা প্রেম নিয়েও যারা জীবনে সার্থক হতে পারল না, সেবায় সমাদরে আকৃত্রিম অনুরাগের অর্ঘ্যপত্র অহরহ এগিয়ে দিয়েও যারা ধ্যানের ধনকে লোকসমাজে প্রাকাশ্যে আপন বলে স্বীকার করে নিতে পারল না, যারা সংসারের কল্পলোকে অধরা হয়েও প্রেমিকের কল্পলোকে চিরন্তনী স্বপ্নচারিণী হয়ে রইল, তাদের হৃদয়ের দাহ ও দীপ্তি শরৎ-সাহিত্যে যে পরিমাণ সার্থকতায় স্ফূর্তিলাভ করেছে, তা' বিশ্ব-সাহিত্যের সেরা সৃষ্টির পাশাপাশি আলোচিত হবার দাবী রাখে।

প্রেম-জীবনে ভাগ্য-বিড়ম্বিতা পার্বতী মাধবী, রমা, সাবিত্রী কি কমললতা, হেমনলিনী অচলা কি রাজলক্ষ্মী জন্মসূত্রে বাঙালী। সমকালীন বাঙালীর সমাজ-পরিবেশেই লেখক তাদের মূক হৃদয়ার্তিকে মুখর করেছেন। পরিবর্তিত সমাজ-পরিবেশের পরিপ্রেক্ষিতে আপাতদৃষ্টিতে তাদের পুরাতনী বলেই মনে হবে। কিন্তু উদার দৃষ্টি

মেলে তাদের মর্মতল পর্যবেক্ষণ করলে দেখা যাবে, ভিন্ন পরিবেশবাসিনী সাগর-পারের নায়িকা নারীদের মর্মযন্ত্রণার সঙ্গে এদের মর্ম-যন্ত্রণার কোনো ভেদ নেই। এই-দিক থেকে বিচার করলে তারা চিরন্তনী আধুনিকা। ওয়াল্টার স্কটের আইভ্যানহোর পরাভূতা প্রেমিকা 'রেবেকা' গোপনে অশ্রু-মোচন করে শূন্য হৃদয় প্রেমাস্পদের জন্য যেভাবে মঙ্গলকামনায় ভরে রেখেছিল তার সঙ্গে পার্বতী, মাধবী, রমার আচরণে কি সত্যিই মূলগত কোনো পার্থক্য আছে? আলেকজান্ডার ডুমার লেডি অব্ দি ক্যামেলিয়ার 'মার্গারেট গতিয়ে' ও তো রাজলক্ষ্মীর মতোই প্রিয়তমকে কাছে পেয়েও হারিয়েছে, প্রিয়তমের কল্যাণের জন্যই নিজেকে সংযমের আগুনে দগ্ধ করেছে তবু প্রিয়তমের কোনো ক্ষতি হতে দেয়নি। টুর্গেনিভের অন দি ঈভের 'হেলেন'-এর বৈরাগিনী তপস্বিনী মূর্তির সঙ্গে পরিবেশগত ভিন্নতা সত্ত্বেও 'দেনাপাওনার' ষোড়শীর স্বরূপগত স্বাতন্ত্র্য কি খুব বেশী? মনে হয়, না। চর্মের বর্ণ এদের ভিন্ন হলেও মর্মের বর্ণ অভিন্ন। সর্বদেশের সর্বকালের প্রেমিক পুরুষের কল্পনার স্বর্গে এরা শাশ্বতী প্রেমিকা-নায়িকা।

অচলা এবং অন্নদা দিদি স্বভাবে বিপরীত ধর্মী হলেও এরা চিরন্তনী নারী। অচলা আধুনিকা শিক্ষায় শিক্ষিতা; তার মনোজগৎ সনাতনী এবং অধুনাতনী উভয় ভাবের সমবায়ে গঠিত। এই দুই বিপরীত ভাবের দ্বন্দ্বে তার চিত্ত ক্ষতবিক্ষত। যাকে সে শ্রদ্ধা করেছে তাকে সে সর্বান্তকরণে ভালোবাসতে পারেনি; অথচ যাকে সে কোনোদিন শ্রদ্ধা করতে পারে নি, অলক্ষ্যে অচলার মন তার দিকেই আকৃষ্ট হয়েছে, মনের উপরিতলের আবেগ চরিতার্থ করতে গিয়ে তার অঙ্কশায়িনী হতেও কুণ্ঠিতা হয়নি। এই দ্বন্দ্বের অনিবার্য পরিণাম যে ট্র্যাজেডি সেই ট্র্যাজিডির দীপ্তিতেই অচলা চরিত্র মনোহারিণী। অচলা চরিত্রের মাধ্যমে শরৎচন্দ্র আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিতা নায়িকা-নারীর যে চিত্র উপহার দিয়েছেন, অতি আধুনিক কথা-সাহিত্যিকের কল্পনা-ও তাকে অতিক্রম করতে পেরেছে বলে মনে হয় না। পাতিব্রত্যের পরাকাষ্ঠারূপে অন্নদা দিদি পৌরাণিক সতী নারী সীতা সাবিত্রীর সোদরা। আবার সহনশীলতার প্রতিমূর্তি-রূপে সে চিরন্তনী নারী,—যে সহনশীলতার মহিমা অস্বীকার করতে না পেরে নারী-বিদ্বেষী সোপেনহাওয়েরকেও বলতে হয়েছিল—'সে জীবনের ঋণ পরিশোধ করে কৃতকার্যের দ্বারা নয়, সহনশীলতার মাধ্যমে'।

শরৎ সাহিত্যে অর্থনৈতিক নিষ্পেষণে নিষ্পিষ্ট নরনারীর চিত্র অপেক্ষাকৃত কম সন্দেহ নেই। কিন্তু দারিদ্র্য-দলিত জীবনের রূপায়ণেও তাঁর নৈপুণ্যও উপেক্ষণীয় নয়। 'বিন্দুর ছেলে', 'অরক্ষণীয়া', 'হরিলক্ষ্মী', 'অভাগীর স্বর্গ', 'মহেশ' প্রভৃতি গল্প ও উপন্যাসোপম রচনাগুলির মধ্যে তার উজ্জ্বল স্বাক্ষর বিদ্যমান। এদের মধ্যে আবার 'মহেশ' অনন্য বৈশিষ্ট্যে ভাস্বর। শ্রদ্ধেয় তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর সাহিত্যিক জীবনে শরৎ-সাহিত্যের প্রভাব বর্ণনা প্রসঙ্গে বলেছেন—'এর আগে শরৎচন্দ্রের পল্লীজীবন নিয়ে লেখা উপন্যাসগুলির মধ্যে রমা, অন্নদা দিদি, রাজলক্ষ্মী, সাবিত্রীর জীবনের ব্যর্থতার বেদনা-হত হয়েছি এবং দেখেছি সমাজ সর্বত্র দাঁড়িয়ে আছে ত্রিভুজের এক কোণে, বিপুল তার শক্তি, কঠিন তার আক্রোশ'। শরৎচন্দ্র এই কঠিন আক্রোশপরায়ণ বিপুল শক্তিমান সমাজ-সত্তায় প্রচণ্ড আঘাত হেনে তার চিন্তায় ও চেতনায় প্রবল আলোড়ন সৃষ্টি করেছিলেন, যা রক্তপাতহীন বিপ্লবের নামান্তর। শরৎচন্দ্র-সৃষ্ট বিপ্লবোত্তর পরিবেশেই পরবর্তীকালের বাংলা কথা-সাহিত্য প্রেমেন্দ্র মিত্র, শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, নরেন্দ্র মিত্র প্রমুখ কথা-সাহিত্যিকদের লেখনী আশ্রয় করে যুগোচিত বৈশিষ্ট্য নিয়ে নবীনতার দিকে ধাপে ধাপে অগ্রসর হয়ে চলেছে। এখানেই শরৎ-সাহিত্য রবীন্দ্রনাথের পরিভাষা অনুসারে 'শাশ্বতভাবে আধুনিক'।

সমাজ-চিন্তার ক্ষেত্রে শরৎচন্দ্র ছিলেন আমূল রূপান্তরের পক্ষপাতী, সংস্কারে তাঁর বিশ্বাস ছিল না। সেই দিক থেকে তাঁকে বিপ্লববাদী বললেও অত্যুক্তি হয় না। তিনি বলেছেন—'আমি সংস্কারের পক্ষপাতী নই। পুরাণো জিনিসটার পোষাক বদলে নেওয়া আমি চাই না। 'পথের দাবী'তে বুঝিয়েছি—সংস্কার জিনিসটার মানে কী। যেটা খারাপ জিনিস, অনেকদিন চলে ধড়ধড়ে নড়বড়ে হয়ে পড়েছে—সেটা মেরামত করে আবার দাঁড় করানো।......আমার মনে হয়, মেরামত করে জিনিসটা ভালো হয় না যা' আছে তারই পরমায়ু বাড়িয়ে তোলা হয়। যেটা অচল হয়ে পড়েছে, যেটা neglect দ্বারা হয়তো আপনি ধ্বসে যেত—সেটা শক্ত মজবুত করে আবার খাড়া করা হয়। যেটা খারাপ তাকে মেরামত করে সংস্কার করে আবার দাঁড় করানো উচিত নয়।' আধুনিক প্রগতিবাদী কথা-সাহিত্যিক যিনি সাহিত্য সৃষ্টির মাধ্যমে সমাজের আমূল রূপান্তরের স্বপ্ন দেখেন, তাঁর চিন্তা কি শরৎচন্দ্রের সমাজ-চিন্তাকে অতিক্রম করতে পেরেছে?

মৃত্যুঞ্জয়ী যতীন্দ্রনাথ

সন্তোষকুমার অধিকারী

১৯২৯ সালের ১৩ই সেপ্টেম্বর, বেলা ১টা বেজে ৫ মিনিট। লাহোর বোর্স্টাল জেলের কক্ষে তেষট্টি দিন ধরে পুড়ে পুড়ে একটি জ্বলন্ত প্রদীপশিখা অবশেষে নিভে গেল। বিপ্লবী যতীন্দ্রনাথ দাস তাঁর অমর আত্মার অগ্নিশিখাকে প্রাণের আলোকে জ্বালিয়ে রেখেছিলেন। এক অদম্য ইচ্ছা-শক্তির জোরে ইংরাজ শাসকের ভ্রুকুটিকে অগ্রাহ্য করে তার পাশব বর্বরতার বিরুদ্ধে মর্যাদাবোধকে প্রতিষ্ঠিত করতে আত্মাকে তিনি আহুতি দিলেন। জহরলালের ভাষা উদ্ধৃত করে বলি—'ভারতীয় শহীদবৃন্দের গৌরবময় অধ্যায়ে আর একটি নাম যুক্ত হল। ভারতবর্ষের আর একজন যুবক মাতৃভূমির বেদীমূলে নিজেকে স্বেচ্ছায় উৎসর্গ করলো।'

লাহোর ষড়যন্ত্র মামলার অন্যতম আসামীরূপে যতীন্দ্রনাথ ১৯২৯-এর ১৪ই জুন পুলিশের হাতে বন্দী হন। হিন্দুস্থান সোস্যালিস্ট রিপাবলিক্যান আর্মির আরও উনিশজন সভ্যকে ইতিমধ্যেই লাহোর জেলে আটক করে রাখা হয়েছে। এদের বিরুদ্ধে পুলিশের অভিযোগ—

"Conspiracy to wage war against H.M. the king Emperor and to deprive him of the sovereignty of British India ..."

অর্থাৎ সম্রাটের বিরুদ্ধে যুদ্ধোদ্যম এবং তাঁকে বৃটিশ ভারতের সার্বভৌম অধিকার থেকে বঞ্চিত করার ষড়যন্ত্র...ইত্যাদি।

পুরো ঘটনাটা বুঝতে হলে আর একটু পেছিয়ে যেতে হবে। হিন্দুস্থান রিপাবলিক এ্যাসোসিয়েশন (পরে হিন্দুস্থান সোস্যালিস্ট রিপাবলিক্যাল আর্মি) বিপ্লবীদের মধ্যে একটি সর্বভারতীয় সংস্থা—যে সংস্থা গান্ধী প্রবর্তিত অহিংস অসহযোগ নীতিতে বিশ্বাসী ছিল না। ১৯২৮ সালে লাহোরে সাইমন কমিশনের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ জানাতে গিয়ে লালা লাজপত রায় পুলিশের লাঠির আঘাতে নিহত হলেন। বিপ্লবীরা এর শোধ তুললো লাহোরের প্রধান রাজপথে পুলিশ থানার সামনেই কুখ্যাত পুলিশ অফিসার স্যাণ্ডার্সকে হত্যা করে। এর কিছুদিনের মধ্যেই আর একটি রোমাঞ্চকর ঘটনা ঘটলো। দিল্লীতে কেন্দ্রীয় ব্যবস্থাপক সভার অধিবেশন— ১৯২৯ সালের ২রা এপ্রিল। সভায় উপস্থিত সাইমন কমিশনের সভাপতি সাইমন নিজে। সেই সভায় দমনমূলক একটি নতুন আইন পাশ করানোর কথা। বিলটি পেশ করার মুহূর্তে হলের মধ্যে প্রচণ্ড শব্দে পর পর দুটি বোমা ফাটলো। তারপরেই দুটি রিভলবারের গর্জন। সন্ত্রস্ত সভাবৃন্দের সামনে পুলিশ সার্জেন্টের হাতে স্বেচ্ছায় আত্মসমর্পণ করলো দুই তরুণ যুবক—ভগৎ সিং ও বটুকেশ্বর দত্ত।

এই ঘটনা সম্পর্কে আদালতের সামনে দাঁড়িয়ে ভগৎ সিং বলেছিলেন—

"The attack was not directed towards any individual but against an institution itself".

এই ঘটনা সম্পর্কে তদন্ত করতে গিয়ে পুলিশ পাঞ্জাব, উত্তরপ্রদেশ, বিহার ও বাংলাব্যাপী এক ষড়যন্ত্রের সূত্র আবিষ্কার করলো।

ঘটনাটা আরও একটু বিস্তৃত করে বলা যাক। ১৯২৪ সালে বিপ্লবী শচীন্দ্রনাথ সান্যালের উদ্যোগে যখন হিন্দুস্থান রিপাবলিক্যান এ্যাসোসিয়েশন গড়া হয়, তখনই যতীন দাস তাঁর অন্যতম বিশ্বাসভাজন কর্মীরূপে গণিত হন। ভবানীপুরের বঙ্কিমবিহারী দাসের পুত্র যতীন্দ্রনাথ বিদ্যাসাগর কলেজে যখন ১৯২৪ সালে বি-এ ক্লাসের ছাত্র, তখনই (সম্ভবতঃ) দেবেন বোসের মাধ্যমে শচীন্দ্রনাথের সান্নিধ্যে আসেন। শচীন্দ্রনাথ এই তরুণ যুবকের মধ্যে দৃঢ়তা ও প্রবল কর্মনিষ্ঠা লক্ষ্য করেছিলেন বলেই তাঁকে কলকাতায় সংগঠনের ভার দিতে পেরেছিলেন। বন্ধু বিশ্বনাথ মুখোপাধ্যায়ের (গোরা) সঙ্গে যতীন্দ্রনাথ দেওঘরে যান বোমা তৈরী শিখতে। শিক্ষক ছিলেন হরিনারায়ণ চন্দ্র।

১৯২৫-এর ৯ই আগস্ট রামপ্রসাদ বিস্মিলের নায়কত্বে কাকোরি ট্রেন ডাকাতি অনুষ্ঠিত হয়। পুলিশ এই ঘটনার বিবরণ সংগ্রহ করে ফেলে। ফলে সমস্ত ভারত জুড়ে ধরপাকড় সুরু হয়। এই ঘটনার সূত্র ধরেই দক্ষিণেশ্বরে বোমার কারখানা আবিষ্কার করে এবং অন্যান্যদের সঙ্গে যতীন্দ্রনাথকেও গ্রেপ্তার করে।

যতীন্দ্রনাথের বিরুদ্ধে পুলিশ কোন প্রমাণ দিতে পারেনি। তাই তাঁকে বেঙ্গল অর্ডিন্যান্সের ধারায় আটক করে। ১৯২৮ সালের শেষে তাঁকে মুক্তি দেওয়া হয়।

কাকোরি ষড়যন্ত্র মামলায় হিন্দুস্থান রিপাবলিক এ্যাসোসিয়েশনের প্রধান কর্মীদের চরম শাস্তি হওয়ায় এই সংস্থার প্রাণশক্তি মুমূর্ষু হয়ে আসে। যতীন্দ্রনাথ সুভাষচন্দ্রের সান্নিধ্যে এসেছেন। বেঙ্গল ভলান্টিয়ার ফোর্সের তিনি অন্যতম সংগঠক, দক্ষিণ কলিকাতা কংগ্রেস কমিটির সহকারী সম্পাদক। ঠিক এমনই সময়ে তাঁর সঙ্গে দেখা করতে এলেন লাহোর থেকে সর্দার ভগৎ সিং ও ভগবতীচরণ ভোরার সহধর্মিণী দুর্গা দেবী।

ভগৎ সিং, ভগবতীচরণ ভোরা, বিজয়কুমার সিংহ ও বীর বিপ্লবী চন্দ্রশেখর আজাদ চেষ্টা করছেন এইচ আর একে পুনরুজ্জীবিত করতে। ভগৎ সিং খবর পেয়েছিলেন যতীন্দ্রনাথ বোমা তৈরী করতে জানেন। তাঁর একান্ত আগ্রহে যতীন্দ্রনাথ অন্যান্যদের বোমা তৈরী করা শেখাতে রাজী হলেন। এর জন্যে আগ্রায় জায়গা ঠিক করা হল আর যতীন্দ্রনাথ আগ্রায় এসে বোমা তৈরী করতে লাগলেন। যতীন্দ্রনাথের তৈরী বোমা নিয়েই ভগৎ সিং ও বটুকেশ্বর দত্ত সেন্ট্রাল এ্যাসেম্বি্ল হলে গিয়ে হাজির হলেন।

ভগৎ সিং ও বি কে দত্তকে গ্রেপ্তার করার পর পুলিশ লাহোরেও একটি বোমার কারখানা আবিষ্কার করে এবং শুকদেবকে ধরতে সক্ষম হয়। এখান থেকেই তারা জানতে পারে যতীন্দ্রনাথের পরিচয় ও লাহোর ষড়যন্ত্রের ব্যাপারে তাঁর ভূমিকা।

ভগৎ সিং, যতীন দাসের সহকর্মী বিজয়কুমার সিংহ এই প্রসঙ্গে যা লিখেছেন (People's Path, Sept, 1967) তার থেকে একটু উধৃত করছি—

'I consider it my great fortune that as a member of the revolutionary party I could come in close touch with the band of martyrs of our country—Bhagat Singh, Chandra Sekhar Azad, Jatin Das; Mahabir Singh; Rajguru, Bhagwati Charan Bhora. They all belonged to the revolutionary organisation H.S.R.A.....

যতীন্দ্রনাথ দাসকে কলকাতায় গ্রেপ্তার করে লাহোরে আনা হ'ল ১৬ই জুন তারিখে। বন্দী অবস্থায় যতীন্দ্রনাথ প্রমুখ প্রত্যেকটি যুবকের প্রতি পুলিশ অত্যন্ত দুর্ব্যবহার করে। আদালতেও তাঁদের হাতকড়া দিয়েই নিয়ে আসা হয়েছে। সাধারণ চোর-ডাকাতের সঙ্গে তাঁদের রাখা হ'য়েছে। পুলিশের দুর্ব্যবহারে মর্মাহত হ'য়ে ভগৎ সিং ও বটুকেশ্বর দত্ত ১৫ই জুন থেকে অনশন সুরু করেছিলেন। সরকারী মনোভাবের কোন পরিবর্তন না হওয়ায় লাহোর জেলের অন্যান্য বন্দীরাও অনশন ধর্মঘটে যোগ দেওয়ার সিদ্ধান্ত করে। এই সিদ্ধান্তের বিরোধী ছিলেন একমাত্র যতীন দাশ। তিনি বলেছিলেন—"অনশন যদি করতেই হয় তবে মাঝপথে তা ভাঙ্গা চলবে না। আর আমি জানি কর্তৃপক্ষ কোনদিনই আমাদের দাবি মানবে না। তার মানে আমাদের কয়েকজনকে অনশন করে মরতেই হবে। আর এটা যে কি দুঃসাধ্য ব্যাপার তা আমি কিছুটা জানি।"

যতীন দাস জানতেন যে অনশন-মৃত্যুর পথ অত্যন্ত দুরূহ পথ। ঢাকা সেন্ট্রাল জেলে অনশন করে ইতিমধ্যে তাঁর অভিজ্ঞতা হয়েছিলো। কাজেই তিনি সহযোগীদের নিবৃত্ত করবার চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু তাঁর সহযোগীরা সেদিন তাঁকে উপহাস করে উড়িয়ে দিয়েছিল। ফলে ১৯২৯ এর ১৩ই জুলাই তারিখে সুরু হ'ল সেই ঐতিহাসিক অনশন যার প্রধান নায়ক যতীন দাস ৬২ দিন অনশন করে—সেই দুরূহ ও দুঃসাধ্য ব্রত সাধন করে' ৬৩ দিনের দিন মৃত্যু বরণ করলেন; প্রমাণ করলেন দেশপ্রেমিক বিপ্লবীর ইচ্ছাশক্তির দৃঢ়তা।

এই ৬২ দিনের সংগ্রামের মর্মান্তিক ইতিহাস স্বরাষ্ট্র দপ্তরের ফাইল থেকে জানা গেছে। জেলের ডাক্তার আটজন পাঠানরক্ষী এনে যতীন্দ্রনাথকে চিৎ করে ফেলে তাঁর বুকের ওপর বসে নাকের ও মুখের মধ্যে দিয়ে রবারের নল চালিয়ে দুধ পাম্প করে দেওয়ার চেষ্টা করেছেন কিন্তু সেই অদম্য শক্তির জোরে যতীন্দ্রনাথ সে চেষ্টা ব্যর্থ করেছেন। অজ্ঞান হ'য়ে পড়া বন্দীকে মুমূর্ষু অবস্থায় ফেলে রেখে ডাক্তার চলে গেছে ভেবেছে আজ হ'ল না কিন্তু কাল হ'বেই। দুর্বল দেহের প্রাণ কতক্ষণ আর লড়তে পারবে?

কিন্তু যতীন্দ্রনাথ সেই উনিশজন বন্দীর মধ্যে একা; যতীন্দ্রনাথ প্রমাণ করেছেন, বিপ্লবী যে, সে মৃত্যুকে জয় করতে পারে। জীবন তার কাছে 'পায়ের ভৃত্য' মাত্র।

২রা আগস্ট তারিখে ডাঃ গোপীচাঁদ ভার্গব যতীন্দ্রনাথকে দেখতে এলেন। (—File No. 36|IV —Hom-Poll.)

ডাঃ গোপীচাঁদ—সুপ্রভাত মিঃ দাশ।

মিঃ দাস (ফিসফিস করে)—সুপ্রভাত।

ডাঃ গোপীচাঁদ—আপনি ওষুধ খাচ্ছেন না, এমনকি একটু জল পর্যন্ত না। কেন বলুন ত?

মিঃ দাস—আমি মরতে চাই।

ডাঃ গোপীচাঁদ—কেন?

মিঃ দাস—আমার দেশের জন্যে........ ৩রা আগস্ট পাঞ্জাবের গভর্ণর এক গোপন তারবার্তায় ভারত সচিব মিঃ ইমার্সনকে জানালেন—মিঃ দাসের অবস্থা গতরাত্রে অত্যন্ত খারাপ গেছে। ভগৎ সিং তাঁকে কিছু ওষুধ নেওয়ার জন্য অনুরোধ করতে রাজি হ'য়েছেন।

এর পরের প্রতিদিনের রিপোর্ট একই রকম—অবস্থা খারাপের দিকে। আরও খারাপের দিকে।

ইতিমধ্যে শুকদেব তার অনশন ভঙ্গ করলো। ভগৎ সিং আবার দেখা করলো যতীন্দ্রনাথের সঙ্গে; অনুরোধ করলো অন্ততঃ একটু দুধ খাওয়ার জন্যে। কিন্তু যতীন্দ্রনাথ অটল। ২১শে আগস্ট তারিখে পুরুষোত্তমদাস টন্ডন ও ডাঃ গোপীচাঁদ ভার্গব আবার দেখা করতে এলেন। তাঁদের সঙ্গে রইলেন ভগৎ সিং ও বটুকেশ্বর দত্ত।

গভর্ণমেন্ট এতদিনে বুঝেছে, যতীন দাস খাঁটি ইস্পাতের তৈরী একটা মানুষ। তার অনশন ভঙ্গ করানো দরকার। কাজেই তারা ভগৎ সিং ও অন্যান্যদের বার বার আসতে দিচ্ছে তার কাছে। পুরুষোত্তমদাস টন্ডন এসে বললেন—আপনার যে বেঁচে থাকা দরকার মিঃ দাস। অন্ততঃ আরও কয়েকটা দিন। যতীন্দ্রনাথ উত্তর দিলেন—আমি ত' বেঁচে আছি।

পুরুষোত্তমদাস বললেন—কিন্তু কোন ওষুধ পর্যন্ত না খেয়ে আপনি কেমন করে বাঁচবেন?

যতীন্দ্রনাথ ক্ষীণ কিন্তু দৃঢ়স্বরে উত্তর দিলেন—আমার ইচ্ছাশক্তি দিয়ে।

পাঞ্জাব গভর্ণমেন্ট যতীন্দ্রনাথকে জামিনে মুক্তি দিতে চাইলেন। কিন্তু জামিনে মুক্তি চান না তিনি। গভর্ণমেন্ট নিজেই অনুষ্ঠান রক্ষার জন্য জামিনের একটা ব্যবস্থা করলো। কিন্তু মুক্তি কে চায়? যতীন্দ্রনাথ বললেন—আমি যাবো না।

তারপর বিয়াল্লিশ দিন অতিক্রান্ত হ'ল। আস্তে আস্তে তাঁর চোখের দৃষ্টি ক্ষীণ হ'য়ে গেল। একদিন দেখা গেল তিনি বাঁ পাটা আর নড়াতে পারছেন না। গায়ের তাপমাত্রা ৯৫' ডিগ্রীতে নেমে এলো। অবস্থা গুরুতর বুঝে ছোটভাই কিরণচন্দ্রকে তাঁর পাশে থাকবার অনুমতি দেওয়া হ'ল।

২রা সেপ্টেম্বর তারিখে অন্য সকলে অনশন ভঙ্গ করলো। কিন্তু যতীন্দ্রনাথ অচল। সকলের সমবেত অনুরোধকে উপেক্ষা করে' তিনি আপন সত্যে দৃঢ়। ফিরে গেল ভগৎ সিং। তাঁর বাবা কিষণ সিং। ফিরে গেলেন ডাঃ গোপীচাঁদ, সর্দার শার্দুলসিং কবিশের। যতীন্দ্রনাথের নিষ্কম্প বিশীর্ণ দেহ, শুধু উজ্জ্বল দুটি চোখ। একটিমাত্র উত্তর মুখে—আমি মরতেই চাই; আমার দেশের জন্যে।

মৃত্যুঞ্জয়ী বীর। মৃত্যুর খুঁটি আঁকড়ে ধরে তিনি পড়ে রইলেন। পনেরো দিন সময় চেয়েছিলেন ডাঃ গোপীচাঁদ। ৪ঠা সেপ্টেম্বর তারিখে সে সময়ের মেয়াদ শেষ হ'ল। যতীন্দ্রনাথ বমি করতে লাগলেন। গলায় কথা জড়িয়ে গেল। সমস্ত দেশ উৎকণ্ঠা আকুল হয়ে চেয়ে আছে। বেদনায় বিবর্ণ পাঞ্জাবের সাধারণ মানুষ।

এক পা এক পা করে এগিয়ে এলো শেষ মুহূর্ত। কেটে গেল ৬২ দিনের দীর্ঘ যন্ত্রণাময় প্রতীক্ষা। অবশেষে সেই ১৩ই সেপ্টেম্বর। বেলা ১টা বেজে ৫ মিনিট। অত্যাচারী বর্বর ইংরেজের কারাগারের অন্ধকার থেকে মৃত্যুত্তীর্ণ এক প্রাণ অমৃত আলোকের পথে পা বাড়িয়ে দিলো।

হরপ্পার ফুলে

নির্মল সরকার

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

হারুকাকা সুটকেস নিয়ে এল, তারপর তারা তিনজন উঠে এল ওপরে। অরুণ সিঁড়ির মুখে দাঁড়িয়েছিল। সে বলল—কোন কষ্ট হয় নি আপনার।

একটু দাঁড়িয়ে দম নিলেন অসিতবাবু, তারপর বললেন, দেখ অরুণ, বুড়ো মানুষদের বয়স সম্বন্ধে ইঙ্গিত করা যা আবার শরীর স্বাস্থ্য সম্বন্ধে প্রশ্ন করাও তাই; দুটোই বিরক্তিকর। যে প্রশ্ন-গুলো এক সময় শুধু শিষ্টাচার বলে মনে হ'ত; আমাদের মত বৃদ্ধের কাছে এখন তার মানে অন্য রকম হয়ে দাঁড়ায়। জান মা, এককালে আমার বেশ লম্বা-চওড়া চেহারা ছিল; তারপর যখন রোগে ধরল তখন রোগা হয়ে যেতে লাগলাম সেটা স্বাভাবিক। একটা অসুস্থ লোক নিশ্চয় মোটা হবে না। তবে রোগা হওয়া নিয়ে বন্ধুবান্ধব থেকে শুরু করে আত্মীয় স্বজন পর্যন্ত সকলেই যখন একই কথা বলতে লাগল তখন আমি শুধু বিপদে পড়লাম না, দস্তুরমত দমে গেলাম। রোজ আরশির সামনে দাঁড়িয়ে দেখতাম, কতটা রোগা হয়েছি। আসল রোগের চেয়ে এই দুশ্চিন্তাটাই আমায় বেশী কাবু করে দিয়েছিল। তাঁর বলার ভঙ্গীতে হেসে উঠল সকলে।

কাপড়-জামা বাথরুমে দিই। জিজ্ঞাসা করল হারুকাকা। আগে চা খেয়ে তারপর অন্য কাজ, সীমা অসিতবাবুর হয়ে উত্তর দিল।

এইবার জব্দ হয়েছে হারু। ঠিক বলেছ মা, আমি চা না খেয়ে নড়ছি না। সামনের একটা চেয়ারে বসলেন তিনি।

অনেক বোঝাবার পর অসিতবাবু রেজিস্ট্রি বিয়েতেই মত দিলেন। তবে অন্যান্য অনুষ্ঠান তাঁর মনের মতই হ'ল। বিয়ের পরই অসিতবাবু হারুকাকাকে নিয়ে

ফিরে গেলেন গ্রামে। নিতান্ত বাধ্য হয়েই তিনি কলকাতায় আসেন। তাঁর উপস্থিতিতে, সীমা স্বাভাবিক আচরণই করল, কোন বিচ্যুতি ঘটল না তার। কিন্তু সেটা যে নেহাতই অভিনয় এটা বুঝতে দেরী হয়নি অরুণের।

বক্সারকে কাছে পেয়ে খুশী হল সীমা। এতদিন এত কোলাহল আর ভিড়ের মধ্যেও সে যেন একলা আর নিঃসঙ্গ ছিল। বিয়ের সময়ও সে নির্লিপ্ত ছিল। নতুন জীবনের অর্থ বা দায়িত্বের কথা সে একবারও চিন্তা করে নি। অনুষ্ঠানে যোগ দিয়েছে পুতুলের মত। অপরের পছন্দ অনুযায়ী সেজেছে, অন্যের নির্দেশমত আচার-আচরণ মেনে নিয়েছে। কিন্তু ঐ পর্যন্ত, তার বেশী আর কিছু নয়। যন্ত্রচালিতের মত শুধু উৎসবের বিভিন্ন অঙ্গ আর নিয়মগুলো পালন করেছে মাত্র। কিন্তু মনে তার জেগে আছে রাত্রের বিভীষিকার কথা! অরুণের আচরণ কেমন হবে সেই চিন্তায় সে মুহ্যমান হয়েছিল।

ফুলশয্যার রাত্রে অরুণ ঘরে ঢুকে তাকে বলল, তুমি খাটে শুয়ে পড়, আমি কোচে শুচ্ছি।

কিছুক্ষণ আগে সীমা ড্রেসিং টেবিলের সামনে দাঁড়িয়ে নিজেকে দেখেছে। তার দেহের অলঙ্কারের মূল্য আর কিছু না হোক, বিশ তিরিশ হাজার টাকা হবে! কিন্তু কোন আকর্ষণ অনুভব করেনি তার জন্যে। গয়নাগুলো তাই বিছানায় একপাশে জড় করে রেখে দিয়েছে সে। অরুণ সেগুলো আলমারীতে তুলে রাখতে অনুরোধ করল। কথাটা শুনেও শুনল না সে, চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল খাটের বাজুটা ধরে।

কি হল—কাছে এল অরুণ।

না, কিছু নয়, আমি ভাবছি একি করলাম। যে নিয়ম চিরকাল ঘৃণা করে এসেছি, তাই শেষপর্যন্ত ঘটল আমারই জীবনে। এর জন্য দায়ী শুধু আপনি। এর ফল কিন্তু খুব খারাপ হ'তে পারে জানবেন। জোর করে আর সব পথ বন্ধ করে আপনি আমায় বিয়ে করেছেন। আমাকে নিঃসহায় জেনে আপনি এই জঘন্য সুযোগ নিলেন।

কিন্তু আমি ত কোন সুযোগই নিইনি এখনও। শুধু বিয়ের অনুষ্ঠানটা হয়েছে মাত্র। সমাজ আর আইন জেনেছে তুমি আমার বিবাহিতা স্ত্রী। এছাড়া আমাদের মধ্যে কোন বন্ধনই জন্মায়নি। তুমি যদি আমার সঙ্গ পছন্দ না কর তাহলে সাচ্ছন্দে বাবার কাছে গিয়ে থাকতে পার।

আপনার বাবার কাছেই বা আমি থাকতে যাব কেন? হারুকাকার মত আমিও কি আর একজন অনুগত ভৃত্য হ'লাম আপনাদের?

তাহলে তুমি কি করতে চাও?

তা জানি না; তবে এটুকু জেনে রাখুন পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে বড় শত্রু হয়ে দাঁড়ালেন আপনি।

একটা নতুন কথা শোনালে তুমি, একটা নতুন সম্ভাষণ শোনা গেল।

আমি আপনাকে স্বামী বলে স্বীকার করি না। সমাজ বা আইনের কোন মানে নেই আমার কাছে। একথা আগেও জানিয়েছি, এখনও বলছি।

কথা না বাড়িয়ে কোচে শুয়ে পড়ল অরুণ, ক্লান্ত বোধ করছে সে। জানলার কাছে দাঁড়িয়ে বাইরের দিকে দেখতে লাগল সীমা। উৎসব শেষ হয়ে গিয়েছে তবুও আলোগুলো জ্বেলে রেখেছে ওরা। এত আলো কোথায় ছিল? তার জীবনকে কেন্দ্র করে সে শুধু অন্ধকারই দেখেছে—কাল মিশমিশে ভয়াবহ অন্ধকার!......

সন্ধ্যে হ'লেই বাড়ীতে থাকতে ভয় হয় সীমার। আরশোলাগুলো রাত্রেই বার হয়। এত আরশোলা দিনের বেলায় কোথায় লুকিয়ে থাকে? কি বিশ্রীভাবে চলে ওগুলো। এঁকে বেঁকে ঠিক গায়ে এসে বসবেই। কদাকার বীভৎস জীব। ইলেকট্রিক বেশী পুড়বে বলে তাদের ঘরের আলোটা না জেলে একটা মিটমিটে হ্যারিকেন জ্বালান হয়। তাতেই পড়ে সীমা। কিন্তু কম তেলের জন্যে একটু পরেই সেটা দপ দপ করে নিভে যায়। তখন হয় বিপদ। বাইরের আলো এসে ঘরের মধ্যে বিচিত্র আকৃতির ছায়া সৃষ্টি করে। এক একটা এক এক রকমের। কোনটা শুধু এক বিরাট মাথার মত, কোনটা দেখলে মনে হয় একটা দেহ যেন ঝুলছে শূন্যে থেকে। এ সময়টা চোখ বুজে সে বিছানায় শুয়ে থাকে। বাবার নাইট ডিউটি। পাশের ঘরে নানুকাকা আর মায়ের চাপা গলা আর হাসির শব্দ। বাবা বলেছেন ভয় পেলে রামকৃষ্ণকে জানাতে। অনেক বার সে জানিয়েছে, কিন্তু আলোও জ্বলল না, ভয়ও গেল না। অন্ধকারে আরশোলাগুলো অদ্ভুত শব্দ করতে পারে। সামান্য কাগজের ওপর বসলে মনে হয় কে যেন দেয়ালে আঁচড়াচ্ছে। ওড়বার সময় পাখায় একটা বিশ্রী আওয়াজ করে ওরা—ফুরুরুরু। বোর্ডিংয়ে যখন ভর্তি হ'ল তখন সে ভেবেছিল এ ভয় আর থাকবে না হয়ত! কিন্তু তাও হ'ল না। রাত ন'টার পর আলো বন্ধ হয়ে যায়। লম্বা হলে পাশাপাশি বিছানা। কিন্তু তা হ'লে কি হবে? অন্ধকার হ'লেই তার মনে হয় সে যেন বাড়ীতেই রয়েছে। সেই ছায়াগুলো তাকে ঘিরে দাঁড়িয়েছে চারিদিকে।

মুখ ফিরিয়ে দেখল সীমা। অরুণ অকাতরে ঘুমোচ্ছে কোচের ওপর। একটা বাহুর ওপর মাথা রেখে পাদুটো জুড়ে পাশ ফিরে রয়েছে সে। ঘটনাটা তার কাছে একটা বিস্ময়ের বস্তু। একটা পুরুষ বন্ধ ঘরে তার সঙ্গে রয়েছে। কেউ বাধা দিচ্ছে না, এমন কি সেও আপত্তি জানাতে পারছে না। দুটো সইয়ের জোরে লোকটা নিশ্চিন্ত হয়ে ঘুমোচ্ছে। তার মনে বিন্দুমাত্র ভয় নেই, উদ্বেগ নেই। লম্বা শ্বাস-প্রশ্বাসের শব্দটা সমান তালে বয়ে চলেছে। বিছানায় রাখা গয়নার দিকে তাকাল সীমা। স্তিমিত আলোতেও ঝলমল করে উঠল সেগুলো। তার এ্যাটাচি কেসটা কোথায় লুকিয়ে রাখা হয়েছে এখনও জানে না সীমা। না হ'লে এ সুযোগ সে ছাড়ত না। উৎসবের পর সকলেই ক্লান্ত হয়ে ঘুমুচ্ছে অরুণের মত। তবে একটা বাধা রয়েছে। বক্সার। রাত্রি শেষে তাকে নিয়ে বাইরে যাওয়া অসম্ভব। তাই ফুলশয্যার রাত্রের সুযোগটা সে ব্যবহার করতে পারল না।

অসিতবাবুর গ্রামের বাড়ীতে চলে যাবার অপেক্ষায় ছিল সীমা। এই একটা লোককে সে সমীহ করে। তাঁর সমক্ষে সকলের অগোচরে পালিয়ে যেতে কোথায় যেন বেধেছিল তার। লজ্জা বা ভয় নয়। বাবার পকেট থকে যেদিন একটা আধুলি নিয়েছিল সে, সেদিনও তার মনটা এরকম হয়েছিল। এবার সে কিছুটা নিশ্চিন্ত হয়েছে।

সেদিন অরুণ অফিস যাবার পর সে একবার রান্না ঘরে গেল। দুজন লোক আছে বাড়ীতে একজন রান্নার কাজ করে অপরজন ঘরদোর পরিষ্কার করে। রান্নাঘরে গিয়ে দাঁড়াতে হেমন্ত আড়ষ্ট হয়ে গেল তাকে দেখে। বয়স তার কম, বছর সতেরোর মত হবে।

তোমার নাম কি? জিজ্ঞেস করল সীমা।

হেমন্ত দাস। লাজুক মুখে তাকিয়ে রইল সে সীমার দিকে।

কতদিন কাজ করছ? হেমন্তর শীর্ণ দেহের দিকে একবার নজর করল সীমা।

প্রায় এক বছর। আস্তে করে উত্তর দিল হেমন্ত।

তোমার বাড়ী কোথায়?

মেদিনীপুর।

কে আছে বাড়ীতে?

মা, বাবা, ভাই সবাই আছে। তাড়াতাড়ি বলতে গেলে হেমন্তর কথা আটকে যায়।

তার দিকে তাকিয়ে আর একবার দেখল সীমা। পরনে একটা হাফ প্যান্ট আর ময়লা গেঞ্জি। মাইনের কথা আর জিজ্ঞেস করল না সে। গৃহকর্ত্রী হয়ে প্রশ্নটা করা অবান্তর হবে। সেখান থেকে সীমা ড্রয়িং রুমে ঢুকল। এই ঘরটাতেই তাকে উৎসবের দিন বসান হয়েছিল। একটা ফুল দেওয়া কোচে সে বসেছিল ঘণ্টার পর ঘণ্টা। অতিথি অভ্যাগতদের সঙ্গে কথা বলেছে শিষ্টাচার বজায় রেখে। অসহ্য লাগছিল তার সেই সময়ে। ড্রইংরুম থেকে বেরিয়ে আবার সে বেডরুমে ঢুকল। ড্রেসিং টেবিলের সামনে রাখা টুলে বসে তাকাল সে নিজের ছায়ার দিকে। নিজেকে চিনতে অসুবিধে হ'ল তার। এই কয়েক সপ্তাহে এত বিরাট পরিবর্তন তার এলো কি করে সেটা চিন্তা করতে লাগল সীমা। চুলটা একটা বড় হয়েছে। মুখের, কপালের আর চোখের পাশে যে কুঞ্চিত রেখাগুলো জন্ম নিয়েছিল সেগুলো অদৃশ্য প্রায়। গালে একটা রক্তিম ছোঁয়াচ রয়েছে স্পষ্ট। অবাক হয়ে সীমা তাকিয়ে রইল অনেকক্ষণ। তারপর ধীরে ধীরে উঠে গেল বাথরুমের ভেতরে। অখণ্ড আর অজস্র তার সময়। কেউ তাকে বিরক্ত করছে না, পীড়িত করছে না কোন দুশ্চিন্তা। একটা দুঃসহ বেদনাজনক ক্লান্তি অনুভব করল সীমা। তার ব্যক্তিত্ব এমনকি তার পুরো সত্তাটা যেন পালটে গিয়েছে। প্রচণ্ড একটা টাইফুনের পর তার যেন মূর্ছা ভেঙেছে।

কষ্ট হচ্ছে তার ঠিকমত ভাবতে বা কাজ করতে। সে যেন বেলাইন হয়ে গিয়েছে। পরিচিত সুগম রাস্তাটা সে আর খুঁজে পাচ্ছে না কোনমতে। না, ভাল লাগছে না সীমার। তার কারণটা সে এতক্ষণে অনুভব করতে পেরেছে। সে নিশ্চেষ্ট হয়ে রয়েছে। দুর্জ্ঞেয় অদৃশ্য হয়ে তাকে অকর্মণ্য আর জড়বৎ করে দিয়েছে। এরা তাকে সূক্ষ্মভাবে ধীরে ধীরে অবশ করে দিচ্ছে। ভোঁতা করে দিচ্ছে তার অনুভূতিগুলো। কিছুদিন পরে সে হারুকাকার মতই এদের একজন ক্রীত-দাস হয়ে পড়বে এ বিষয়ে তার সন্দেহ নেই। এদের চালটা ধরতে পেরেছে সীমা। সাওয়ারের তলায় দাঁড়িয়ে রইল সে। জলের ধারা তার শরীরকে স্নিগ্ধ করে দিল বটে, কিন্তু মনে একটা তীব্র আক্রোশ জন্মাতে শুরু করল। নানারকম প্রয়োজনের উপ-করণ এঁরা তার চতুর্দিকে সাজিয়েছে তাকে বশ করার জন্যে। অপর্যাপ্ত সময় আর বিলাসের আরামে তাকে জড়িয়ে ফেলতে চেষ্টা করছে এরা। এত বোকা সে নয়। নিজেকে সে এতদিন চালিয়েছে, বিরুদ্ধ অবস্থার সঙ্গে যুদ্ধ করার মত শক্তি আছে কিনা, এটা সে ভালভাবেই বুঝিয়ে দেবে ওদের। তোয়ালে দিয়ে গা মুছল সীমা। তোয়ালেতে একটা মৃদু সুবাস পেল সে। অরুণের ঘরেও এ গন্ধ সে পেয়ে থাকে। র‍্যাকের ওপর তাকিয়ে সে দেখল প্রসা-ধনের জিনিসগুলো। তার নিজের জন্যে যেগুলো সাজান আছে তার মধ্যে বেশীর-ভাগই সে ব্যবহার করেনি। মাত্র তেল আর ক্রীমটাই কাজে লেগেছে তার। অরুণের সেফটি রেজর, সেভিংক্রীম, আর লোশন রয়েছে, তার টয়লেটের পাশে। তোয়ালেটা তাড়াতাড়ি টাওয়েল স্ট্যাণ্ডে ফেলে দিল সে। হঠাৎ আর একটা তোয়ালের প্রয়ো-জন বোধ করল। এতদিন এটা লক্ষ্য করেনি বলে নিজের ওপর বিরক্ত হল সীমা। কাপড় বদলে সে ঘরের মধ্যে দাঁড়াতেই হেমন্ত জানাল যে টেবিলে খাবার দেওয়া হয়ে গেছে। সীমার মনে পড়ল তাকে আর নিজের জন্য রাঁধতে হবে না। তার সুখ-সুবিধের জন্য এ-দুজন লোক সর্বদাই ব্যস্ত আর শঙ্কিত হয়ে রয়েছে। কিছু-দিনের মধ্যেই সে পঙ্গু হয়ে যাবে। তার মনের উত্তাপটা সে আর অনুভব করতে পারছে না যেন। আজকাল সে পাশের একটা ঘরে শোবার ব্যবস্থা করে নিয়েছে। তার ঘরেতেই বক্সার থাকে। হসপিটাল থেকে আসার পর আবার নতুন জায়গায় আসাতে সেও সীমার মত স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করছে না।

অরুণ সেদিন একটু সকালেই অফিস থেকে ফিরল। সীমার ঘরে গিয়ে বসল।

আজ সিনেমার টিকিট কেটেছি চল।

আপনি যান, আমি বক্সারের কাছে থাকি।

তা হয় না, তাহলে আমারও যাওয়া হয় না।

একটা চেয়ারে বসে পড়ল সে। বক্সার [illegible]

তোমার কুকুর তোমারই মত অপছন্দ করে আমাকে।

আমি ছাড়া আর কাউকেই ও পছন্দ করে না।

ভাল কথা, মোদী কোম্পানীর টাকাটা আজ দিয়ে দিলাম।

কোন উত্তর দিল না সীমা। তার একবার মনে হল এ্যাটাচিকেসটার কথা জিজ্ঞেস করতে। টাকাটা তাই থেকেই নেওয়া হয়েছে কিনা। কিন্তু পরক্ষণেই মনে হল চাবিটা এখনও তার কাছেই রয়েছে।

চল, আর দেরী কোরো না।

উঠে দাঁড়াল অরুণ। চুপ করে ভাবল সীমা। তারপর বলল, চলুন। আমি কাপড়টা ছেড়ে আসছি।

অনেক দিন সিনেমা দেখেনি সে। স্কুলের মাদার তাদের কয়েকবার নিয়ে গিয়েছিল সিনেমায়।

"সাউণ্ড অব মিউজিক"-এর টিকিট কেটেছে অরুণ।

কনভেন্টে মানুষ মারিয়া। গান ভাল-বাসে সে। সংগীতের জন্যই যেন জন্ম তার। উচ্ছল, প্রাণবন্ত মারিয়া। কনভেন্টের মাদাররা তাকে পেরে ওঠেন না। উধাও হয়ে যায় সে মাঠে ঘাটে। পাহাড়ে পর্বতে, কোথায় কেউ ঠিকানা জানে না। সেই মেয়ে কড়া মেজাজের বিপত্নীক কাউন্টের ঘরে তার ছেলেমেয়েদের দেখা-শোনার জন্য নিযুক্ত হল। কিশোর-কিশোরী আর শিশুরা এতদিন বাবার ভয়ে অস্থির ছিল। মারিয়া তাদের গান গেয়ে, নেচে মন হরণ করে নিল। গাম্ভীর্যের দেওয়াল ভেঙ্গে আনন্দের জোয়ার বইল। ......অবাক লাগল সীমার। মারিয়ার মত সেও মাদারদের সাহচর্যে মানুষ। কিন্তু সে কেন আনন্দ পায়নি কোন দিন; তার জীবন হাসি-আনন্দ থেকে বঞ্চিত ছিল কি করে।

কেমন লাগল। জিজ্ঞেস করল অরুণ।

ভাল, কিন্তু অস্বাভাবিক। উত্তর দিল সীমা।

অস্বাভাবিক কোথায় দেখলে?

অত আনন্দ আর হাসি মারিয়া পেল কোথা থেকে?

ওর স্বভাব থেকে সেটা ফুটেছে।

কিন্তু দুঃখ বেদনার কোন চিহ্ন নেই কেন?

সেটা যারা বড় করে ভাবে তাদের জীবনেই দেখা দেয় বেশী করে। কোন কথা বলল না সীমা—চুপ করে রইল বাইরের অন্ধকারের দিকে তাকিয়ে।

সাইকিয়াট্রিস্ট হিসেবে ডাক্তার সোমকে বিখ্যাত বলা যায়। অরুণ সেই কারণে তাঁর সঙ্গেই অ্যাপয়েন্টমেণ্ট করল।

ডাঃ সোম মন দিয়ে তার কথা শুনে বললেন, দেখুন, ক্লেপ্টোম্যানিয়াক যারা তারা সৌখীন চোর। এর তার বাড়ী থেকে বা দোকানের কাউন্টার থেকে সকলের অলক্ষ্যে একটা জিনিস তুলে নেওয়া তাদের কাজ। এতে তাদের দুঃখ ঘুচবে না কারণ অনেক ক্ষেত্রেই এরা ধনী বলেই জানা গিয়েছে। অল্পদামী জিনিস হলেও এদের আপত্তি নেই। ছিঁচকে চোরদের মত জিনিসটা সরাতে পারলেই ওদের আনন্দ। কিন্তু যারা ভেবেচিন্তে পরিকল্পনা করে সাজিয়ে গুছিয়ে চুরি করতে অভ্যস্ত তাদের কথা আলাদা।

আলাদা মানে?

আলাদা মানে এরা ঠাণ্ডা মাথায় কাজ করে হঠাৎ করে না এবং সেই কারণে অপ-রাধীর দিক থেকে এদের প্রথম শ্রেণীতেই ফেলা উচিত।

এদের পেছনে যদি মনোবিকার থাকে?

মুখ শুকিয়ে গেল অরুণের। প্রত্যেক অপ-রাধের পেছনেই মনোবিকার থাকে।

তাহলে আমার স্ত্রীর ক্ষেত্রে কি করা যায় ?

সাইকো এনালিসিস করলেই মনের জট খুলে যাবে। রোগী যদি তার মনের ভাব সম্পূর্ণভাবে ব্যক্ত করতে পারে, তাহলে তাকে সাহায্য করা আমাদের পক্ষে সহজ হয়।

আমার মনে হয় আমার স্ত্রী সব কথা খুলে নাও বলতে পারে। সাধারণতঃ সে মিথ্যে কথা বলতে বা সত্য কথা এড়িয়ে যেতে নানা চাতুরীর আশ্রয় নেয়।

তার জন্য আমরা প্রস্তুত থাকি। নিজের দোষ সকলেই গোপন করতে চেষ্টা করে। বিশেষতঃ এই ধরনের মানসিক ব্যাধিতে যারা ভুগে থাকে তাদের পক্ষে এটা স্বাভাবিক বলা যায়। আপনার স্ত্রীর সঙ্গে আপনার সম্পর্ক কি রকম ?

আমাদের মধ্যে স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক নেই। আমি এক ঘরে আর সে আর এক ঘরে থাকে।

অন্য ধরনের মেলামেশা ?—

প্রায় নেই। কথা বললে তার উত্তর দেয় মাত্র, এছাড়া অন্য কিছু নয়। আমাকে এড়িয়ে যেতে চেষ্টা করে বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই।

সংসারের কাজ কিছু করেন ?

না; শুধু নিজের জামা-কাপড়গুলো নিজে কাচে, কাউকে হাত দিতে দেয় না।

সাধারণতঃ কে আপনাদের কাপড় কাচে ?

চাকর আছে দুজন। তারাই এ-কাজটা করে থাকে।

ঝি নেই ?

না।

ওর ফ্যামিলির কোন খোঁজ জানেন ?

না, বিয়ের সময়ও কেউ আসেনি। জিজ্ঞেস করলে বলে ওর কেউ নেই।

বাড়ীতে অন্য কোন লোকের সঙ্গে কথা বলেন বা মেশেন বলে খবর রাখেন ?

হেমন্ত বলে যে চাকরটা আছে তার সঙ্গে বেশী কথা বলতে দেখেছি।

কোন সখ আছে ?

হ্যাঁ, কুকুর ভালবাসে; বিয়ের সময় একটা সর্ত ছিল যেন তার কুকুরকে বাড়ীতে রাখি।

আর কোন সর্ত ছিল ?

হ্যাঁ, আমার সঙ্গে এক ঘরে বাস করবে না। অবশ্য বাবা যতদিন ছিলেন ততদিন আমার ঘরেই ছিল; তবে আলাদা বিছানায় শুয়েছি আমি।

আপনার বাবাকে উনি ভয় করেন ?

না, আমার বাবাই একমাত্র লোক যাঁর সঙ্গে কথা বলতে বা সেবা করতেও আমার স্ত্রী ভালবাসে। তবে কুকুরের ওপর একটা অস্বাভাবিক টান আছে সীমার।

কি রকম ? ডাঃ সোম তাকালেন অরুণের দিকে।

নিজের ঘরের মধ্যেই কুকুরটাকে রাখে।

ছোট জাতের কুকুর ?

না, বেশ বড় জাতের। বুলডগের মত দেখতে।

আচ্ছা ঘর থেকে অন্য কিছু — কথাটা শেষ করলেন না ডাঃ সোম।

না, অন্য কিছু চুরি যায়নি এখন পর্যন্ত। গয়না বা মূল্যবান জিনিস যে আলমারীতে থাকে তার চাবি ওর কাছেই।

গয়না বা কাপড়-জামা ভালবাসেন ?

একেবারেই না। বিয়ের সময় ভাল কাপড়-জামা আর গয়না পরেছিল। তারপর থেকে সাধারণ কাপড়-জামাই পরে থাকে।

সেগুলি কি আপনাদের দেওয়া ?

হ্যাঁ, সাধারণ সুতীর কাপড়।

আপনাদের চাকর হেমন্তর কত বয়স ?

বছর সতের হবে। সেই রান্নার কাজ করে।

আমি আপনার স্ত্রীর কেস নেব — উঠে দাঁড়ালেন ডাঃ সোম, তবে একটা কথা জেনে রাখবেন, এ চিকিৎসা সময় সাপেক্ষ।

তাতে আমার আপত্তি নেই। আমি অপেক্ষা করব।

আপনার স্ত্রীকে চিকিৎসার কথা বলেছেন কিছু ?

সামান্য উল্লেখ করেছি মাত্র।

কোন মন্তব্য করেছেন ?

না, কিছুই বলেননি।

বেশ, সামনের সোমবার বেলা চারটের সময় ওঁকে পাঠিয়ে দেবেন আমার চেম্বারে। কয়েকটা সিটিংয়ের পর ফলাফল সম্বন্ধে আপনাকে জানাব।

রবিবার সকালে অরুণ কথাটা পারল সীমার কাছে। প্রস্তাবটা যে সহজ হবে না এটা সে অনুমান করেছিল। প্রশ্নের উত্তরে সীমা বলল, ডাক্তারের কাছে কেন ? আমার শরীর-ত ভালই আছে।

ডাঃ সোম মানসিক চিকিৎসক, বলল অরুণ।

পাগলের ডাক্তারে আমার কি হবে, আমি কি পাগল ?

না, তা নয়, তবে সব মানুষেরই মনের মধ্যে অনেক হেঁয়ালী আর ভয় লুকিয়ে থাকে। তার থেকে অনেক বিপর্যয় ঘটে যায়। অস্বাভাবিক রূপ নেয় মানসিক বৃত্তিগুলো। চুপ করে রইল সীমা।

দেখ তোমার কাছে আমি কিছুই চাই নি। আমায় স্বামী বলে না মান, সাধারণ ভদ্রলোক হিসেবে আমার এ অনুরোধটা রাখ।

আমি ওষুধ বা ইনজেকসন নেব না।

না, এতে ওষুধ বা ইনজেকসনের প্রয়োজনই হবে না।

তা হলে ?

ডাক্তারবাবু তোমার সঙ্গে শুধু কথা বলবেন।

তাতে কি লাভ ?

আছে, কথা বললেই উনি তোমার মনের কথা বুঝে নেবেন।

রাজী হল সীমা। এদের সব জিনিসগুলো জানতে চায় সে। এরা কিভাবে থাকে, খায়দায়, এদের চালচলন এমন কি চিকিৎসা-পদ্ধতিটাই সে জেনে নেবে।

ডাঃ সোমাকে দেখে মনে মনে হাসল সীমা। দেখতে নিতান্তই সাধারণ। প্রায় ষাট বছর বয়স। মোটা চেহারা, মুখে খোঁচা খোঁচা পাকা গোঁফ একজোড়া। একটা সাদা এ্যাপ্রন পরে আছেন তিনি। এই লোকের নাকি দেশজোড়া নাম। সামনের চেয়ারে বসল সীমা।

দেখুন আপনি যে আসতে রাজী হয়েছেন তাতে আমি খুব খুশী হয়েছি।

(তাত হবেনই, মোটা ফি তো না হলে পাবেন কি করে, ভাবল সীমা।) আমাদের সকলের মধ্যেই অবদমিত আশা-আকাঙ্ক্ষার ফলে কোন না কোন প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়। এর জন্য অনেক সময় বেশ অসুবিধেয় পড়তে হয়।

(অরুণ বাবু চুরির কথা বলেছেন হয়ত। স্বামীকে কেউ অরুণবাবু বলে ? কই ডাক্তারবাবু আপনি ত আমার মনের কথা ধরতে পারছেন না।)

অরুণবাবুকে আপনার কেমন লাগে ?

ভাল নয়।

কেন ?

অপরের সঙ্গে অযথা কৌতূহল আর অভদ্র ব্যবহারের জন্যে।

আপনি এই কৌচটায় হেলান দিয়ে শুয়ে পড়ুন, বললেন ডাঃ সোম। শুয়ে পড়ব ? চমকে উঠেছে সীমা কথাটা শুনে।

হ্যাঁ, রিল্যাক্স করলে আপনার সুবিধে হবে।

কৌচে শুয়ে পড়ল সীমা।

শরীরকে একেবারে ঢিলে করে দিন আর আমার প্রশ্নের জবাব দিন।

বেশ মজা লাগছে সীমার। প্রশ্নের জবাব সে এমনভাবে দেবে যে ডাক্তারবাবু অবাক হয়ে যাবে।

বিয়ে বললে আপনার কি মনে হয় ?

কিছু নয়, শক্ত হয়ে উত্তর দিল সীমা।

একটা কিছু মনে নিশ্চয় হয় আর সেটা আপনি যদি না বলেন তাহলে চিকিৎসা হবে কি করে ?

(চিকিৎসা না মুণ্ডু; একজনকে শুইয়ে তাকে আজেবাজে প্রশ্ন করলেই চিকিৎসা হল ?)

আচ্ছা, এবার বলুন বিয়ে বললে কি মনে হয়, কথাটা বললে আপনার মনে যা আসবে তাই বলবেন কিছু এসে যাবে না তাতে। তবে ভেবেচিন্তে বলার কোন দরকার নেই।

তবু চুপ করে রইল সীমা।

কি হল, বলুন কিছু; বিয়ে বললে কি মনে পড়ে ?

লুচি, হাসল সীমা।

বেশ, আর কি ?

সানাই, লোকজনের ভিড়—উলু-উলু-উলু—

বলুন—

গয়না - শাড়ী - ফুল - মালা-বাসরঘর-নতুন কাপড়ের খসখস আওয়াজ—হাসি-গান ফুলশয্যা-নীল আলো-খাটে মালা ঝুলছে—দরজা বন্ধ...না খোল, দরজা খুলে গেল। চুপ করল সীমা। এটা কি হল ? নিজের মনকে এড়িয়ে যেতে দেওয়া [illegible]

ছে। হঠাৎ দরজা খুলে দাও বলল কেন ?

আপনার বিয়ে কতদিন হয়েছে ?

(ডাক্তার কি নস্যি নেয়, কথাটা নাকি র কেন ?) আমার বিয়ে হয়নি। এরকম ছ করে উল্টোপাল্টা কথা বললে আমাদের সুবিধে হবে। আমি আপনাকে সাহায্য তে চাই মিসেস বসু। একথা স্মরণ খবেন। এবার বলুন আপনার কে আছেন ?

কেউ নেই।

বাবা কি করতেন ?

অফিসে কাজ করতেন।

বাবাকে মনে পড়ে ?

হ্যাঁ।

কিরকম দেখতে বলুন।

বেঁটে, মোটা চোখে চশমা, চুলটা ব্যাক-াশ করা। অবিকল নান্দুকাকার ক্ষহারার 'না দিয়ে বসল সীমা।

মা কেমন দেখতে ছিলেন ?

ভাল।

কিছুক্ষণ কেটে গেল। ডাঃ সোম চুপ করে কৌচের পিছনে বসে আছেন, সীমা তাঁকে দেখতে পাচ্ছে না।

মা নিজে রাঁধতেন ?

হ্যাঁ, নিজে রাঁধার অনেক সুখ। যা ইচ্ছে খাও, যাকে ইচ্ছে দাও, কেউ বলতে আসবে না। ডাল, ভাত, মাংস—বেশ গন্ধ! রান্নাঘর থেকে টগবগ করে আওয়াজ শোনা যাচ্ছে, মাংস ফুটছে। মাংস করতে অনেক দেরী হয়। ঘুম পায়। বাসন-থালা, বাটি, রকাবে ছাই দিয়ে মাজতে হয়। কলে একটা কাপড়ের ফালি বাঁধা, জল পড়ছে। জল নাকি বৃষ্টি? ঝড় উঠেছে—বাবা—

চুপ করলেন কেন, বলুন—। ডাঃ সোমের গলা।

কোন জবাব দিল না সীমা। এ লোকটা তার সব গোলমাল করে দিচ্ছে। সাবধান হল সীমা।

আপনি কুকুর ভালবাসেন ?

হ্যাঁ।

আপনার কুকুর আছে ?

হ্যাঁ, বক্সার, মাঝে অসুখ হয়েছিল বলে হাসপাতালে রাখতে হয়েছিল।

ছোট জাতের ?

না, বড়। একবার ধরলে শেষ করে ফেলবে। দু-একজন লোককে কামড়ে ছিঁড়ে ফেলা তারপক্ষে কিছুই নয়। ওর ভয়ে কেউ ঘেঁষতে পারে না আমার কাছে। চোখের দৃষ্টিটা রুক্ষ হয়ে উঠল সীমার।

পুরুষ বললে আপনার কি মনে হয় ?

সিগারেটের ধোঁয়া, ক্ষুর, প্যান্টসার্ট, বড় বড় জুতো, অসভ্যর মত হাসি, ঘামের গন্ধ, পুলিশ—পুরুষ আর নারী, নারীর পাশে পুরুষের প্রয়োজন নেই—নারীকে ক্রীতদাসী করে রেখেছে পুরুষ। স্বার্থপর, নির্লজ্জ ভণ্ডর জাত ওরা।

আপনি মন্দিরে গেছেন কখনও ?

কোন্ মন্দির ?

যে কোন দেবতার স্থান।

গেছি হয়ত ছোটবেলায়।

ভগবান বললে কি মনে হয় ?

ভগবান আবার কি? যীশু, মহম্মদ, কৃষ্ণ, কালী? সাঁওতাল বা নাগাদের ভগবানের নাম কি? ভগবানের লিস্ট আছে কি না কে জানে? মানুষের সংখ্যা যত ভগবানের সংখ্যা কি তার চেয়ে বেশী না কম ভগবানের পরে অবতার পাপ পুণ্য—রামকৃষ্ণ, মাদুলী। সেরে যাবে বাবা, এখুনি কাশি কমে যাবে। চুপ করল সীমা। ঘরটা নিস্তব্ধ।

ঝড় বললে আপনার কিছু মনে হয় ? জিজ্ঞেস করলেন ডাঃ সোম।

ধুলো, ঝড়ে উড়ে যাওয়া গাছের পাতা, ভিজে মাটি, স্যাঁতসেঁতে মেঝে, ভাঙ্গা জানলায় আওয়াজ—ক্যাঁচক্যাঁচ। কে ওখানে? জল পড়ছে ঝমঝম করে। মেঘ ডাকছে। বাজ পড়ল একটা। উঃ বাবা—চীৎকার করে উঠল সীমা। আবার নিস্তব্ধতা।

আপনি বাজের শব্দে ভয় পান? একটু পরে জিজ্ঞেস করলেন ডাঃ সোম।

হ্যাঁ, চোখ দিয়ে জল পড়ছে সীমার।

থ্যাঙ্কস মিসেস বসু, আজ এই পর্যন্তই থাক। আবার কবে আসবেন? মনের বাঁধন আলগা হয়েছে বলে মনে হল তাঁর।

আবার আসতে হবে? জিজ্ঞেস করল সীমা।

হ্যাঁ, তা হবে বৈকি। কেন, এতে আপনার কিছু অসুবিধে হয়?

না, তা নয়, আচ্ছা আসব।

কেমন অদ্ভুত লাগছে যেন সীমার। তার মনে হচ্ছে তার মধ্যে যেন আরও এক-জন কে রয়েছে। সে বেশ বুঝতে পারে তার অস্তিত্ব। অনেক সময় তার মনে হয় সে যেন নিজে কিছুই করছে না। তার নিষ্ক্রিয়তার সুযোগ নিয়ে তার ভেতর সেই অপরিচিত মেয়েটা তার হয়ে সব করছে। একথাটা ডাক্তারকে বা অন্য কাউকে বলেনি সীমা। তার একথা কেউ বিশ্বাস করবে না তা সে জানে। সেই জন্যেই কথাটা গোপন করে রেখেছে সে।

বাড়ী ফিরে শুয়ে পড়ল সীমা। অসীম ক্লান্তিতে ভেঙে পড়েছে সে। কি সব আবোলতাবোল বকিয়েছে লোকটা। মনটা কেমন অস্বস্তিতে ভরে গিয়েছে।

অরুণের কাশির শব্দ শুনতে পাওয়া গেল বাথরুম থেকে। রাতেও ভদ্রলোক কাশছেন কয়েকদিন ধরে। গত রাতে কাশির শব্দে বক্সারের ঘুম ভেঙে গিয়েছিল। বিরক্ত হয়ে সে আওয়াজ করেছিল বলে মনে আছে। সিগারেট খাওয়া অরুণের বেড়ে গিয়েছে এটা লক্ষ্য করেছে সীমা। বাথরুমের দরজা খোলার শব্দ শুনতে পেল সে। অরুণ পায়জামা আর গেঞ্জি পরেছে। সীমার দরজার কাছে এসে দাঁড়াল সে, তারপর বলল, আসতে পারি?

আমিই আসছি, বলল সীমা। তার ঘরে কেউ আসুক এটা পছন্দ করে না সে।

বাইরে এসে অরুণের দিকে তাকিয়ে সীমা বলল, কি বলছেন?

ডাক্তার সোম কি বললেন?

আজেবাজে কথা বলে আমার মাথা ধরিয়ে দিলেন?

বিরক্ত লাগে তোমার?

না তা নয়, বরঞ্চ মজা লাগে। ডাক্তার নিজেই পাগল বোধহয়।

একজন বিখ্যাত লোক উনি, সহজে ওঁকে পাওয়া যায় না।

হ্যাঁ, ওয়েটিং রুমে বেশ ভিড় দেখেছি।

আজ রাত্রে আমি খাব না, হেমন্তকে বলে দিও। বোধহয় জ্বর এসেছে। অফিসেই শুরু হয়েছে জ্বরটা। কথাটা বলে কাশতে শুরু করল অরুণ। লম্বা একটানা কাশি।

অরুণ চলে যাবার পর সীমার মনে হল একবার অরুণকে ভাল করে প্রশ্ন করা তার উচিত ছিল। অন্য কিছু নয়। সামান্য ভদ্রতা বা শিষ্টাচারে বিশেষ কিছু ক্ষতি হত না তার। একবার ভাবল অরুণের ঘরে যাবার কথা। কিন্তু এক-পা গিয়েই আবার থেমে গেল সে। তারপর নিজের ঘরে গিয়ে বক্সারের পাশে বসে তার গায়ে হাত বোলাতে লাগল ধীরে ধীরে।

বক্সার একবার তার দিকে তাকাল। এখানে এসে অবধি সীমা তাকে নিয়ে বেড়াতে যায়নি। এ কাজটা আর একজন চাকর করুণাই করে থাকে। বক্সার তাতে মোটেই খুশী নয়। করুণা তাকে চেনে না। তার মেজাজ অনুযায়ী থামা বা চলার ইঙ্গিতটা সে বোঝে না মোটেই। এটা বক্সারের পক্ষে বিরক্তিজনক। বিরক্তি থেকে রাগ আসে। সুতরাং তার মেজাজ যদি হঠাৎ বিগড়ে যায় তাহলে তাকে দোষারোপ করা অন্যায় হবে। আর একবার সীমার দিকে তাকিয়ে সে নিজের মনোভাব ব্যক্ত করার চেষ্টা করল। সীমা চেনটা খুলে তাকে নিয়ে গেল বেড়াতে। সামনের লনে বক্সারকে ঘুরিয়ে সে উঠে এল। রাস্তায় বার হবার ইচ্ছে তার ছিল। কিন্তু অরুণের বাড়ীটা অভিজাত পল্লীর মধ্যে। বক্সারের মত বিরাট কুকুর আর নিজে একটা চাবুক নিয়ে রাস্তায় যেতে তার বাধবাধ ঠেকল।

ঘরে এসে একটা ম্যাগাজিন নিয়ে শুয়ে পড়তে পড়তে সীমার তন্দ্রা এল।

বৌদি, হেমন্তর আর্তস্বর।

কে, তাড়াতাড়ি উঠে পড়ল সীমা, কি হয়েছে ?

দাদাবাবুকে একবার দেখবেন আসুন। বাইরে থেকে বলল সে।

হেমন্তর সঙ্গে অরুণের ঘরে গিয়ে ঢুকল সীমা। অরুণ শুয়ে আছে বিছানায় চিৎ হয়ে। কাছে গিয়ে দাঁড়াল সে। তারপর হেমন্তর দিকে তাকাতে সে বলল—

ডাকছি, সাড়া দিচ্ছেন না।

ঘুমোচ্ছেন হয়ত, তুমি একটু জোরে ডাক, বলল সীমা।

(ক্রমশঃ)

'কৌতুক' ফ্রন্টেও সুরসিক চার্চিল

সুনীলকুমার নাগ

অ্যারিস্টটলের একটা কথা আছে, যার অর্থ অনেকটা এইরকম : গাম্ভীর্যের প্রকৃত পরীক্ষাই হলো বিদ্রূপের কাছে; বিদ্রূপের আঘাতে যে গাম্ভীর্য চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে যায় এবং রসহানি ঘটায়, বুঝতে হবে, তা আদপেই প্রকৃত গাম্ভীর্য নয়। সে-ব্যক্তি তার কোনও দুর্বলতাকে ঢাকবার জন্যে গাম্ভীর্যের বর্ম এঁটে ছিল নিশ্চয়ই। যে কোনও সত্য, যথার্থ এবং গুরুত্বপূর্ণ বিষয় বা ব্যক্তি ব্যঙ্গ-বিদ্রূপের চরম পরীক্ষাও অক্লেশে উত্তীর্ণ হতে সক্ষম। বস্তুতঃপক্ষে এই অন্তর্নিহিত গুণটিই হলো তার শ্রেষ্ঠত্বের পরিচায়ক।

গ্রীক ঋষির এই কথাগুলি মনে রেখে আমরা যদি দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময়কার ইয়োরোপের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের কৌতুক-রসবোধের আলোচনা করি তাহলে সহজেই বুঝতে পারবো চরম পরাজয়ের মুখোমুখি দাঁড়িয়েও কী শক্তির বলে তাঁরা দুঃসময় কাটিয়ে উঠে শেষপর্যন্ত বিজয়ী হয়েছিলেন।

সকলেই জানেন, তৎকালীন ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী স্যার নেভিল চেম্বারলেন অ্যানুরিন বিভান যাঁকে 'কল্পনাশক্তি-বিবর্জিত বন্ধ্যা মানসিকতার অবতার' বলে খাস হাউস অব কমন্সেই গালাগাল দিয়েছিলেন তাঁর হিটলার-তোষণ নীতির চরমে উঠেও, অর্থাৎ অস্ট্রিয়া - চেকোশ্লোভাকিয়া - মেমেল-ডানজিগ প্রভৃতি দখল করে নেবার প্রচ্ছন্ন সম্মতি জানাবার পরেও হিটলারকে পোল্যান্ড আক্রমণ থেকে নিবৃত্ত করতে পারেন নি। হিটলার পোল্যান্ড আক্রমণ করার দুদিন বাদে ব্রিটেনের জাতীয় প্রতিশ্রুতি রক্ষার জন্যে বৃটেন ও ফ্রান্সকে একযোগে জার্মানীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করতে হল। শুরু হলো দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ।

এ যুদ্ধের প্রথম দিকে মিত্রশক্তি জার্মানী ও ইটালীর কাছে প্রতি রণাঙ্গণেই যাচ্ছেতাই রকমে হেরে যেতে লাগলো। ফ্রান্সে পনরো-বিশদিন অন্তর, সাতদিন অন্তর, এমনকি সপ্তাহে তিনবার করে নতুন মন্ত্রিসভা দেশ-রক্ষার দায়িত্ব নিতে শুরু করলো। কিন্তু শেষপর্যন্ত তাও পারলো না। এদিকে ব্রিটেনেও চেম্বারলেনের বিরুদ্ধে পার্লামেন্টের সদস্যরা, খবরের কাগজ এবং জনসাধারণ ক্রমশঃ সংগঠিত হয়ে উঠছিল।

একদিন চেম্বারলেন আবেগভরে পার্লামেন্টে বক্তৃতা করলেন : 'মাননীয় সদস্যগণ, আমার দৃঢ়বিশ্বাস ব্রিটিশ জাতি এ দুর্দিন কাটিয়ে উঠবে, আমিও নিশ্চয়ই নির্বান্ধব হইনি। কেবল আমার কাজের সমালোচনা না করে, সকলে আমার পাশে এসে দাঁড়ান। আত্মত্যাগে উদ্বুদ্ধ হন।'

এ বক্তৃতার জবাবে চেম্বারলেনের টোরী দলেরই অন্যতম প্রধান সদস্য (পরে চার্চিলের যুদ্ধকালীন মন্ত্রিসভার ভারত-সচিব) লিওপোল্ড আমেরী উঠে দাঁড়িয়ে বললেন : 'মাননীয় সদস্যগণ, আপনাদের সামনে আমি আমার স্মৃতিশক্তির পরীক্ষা দিতে চাইছি। লঙ্ পার্লামেন্ট বাতিল করার সময় ক্রমওয়েল যে কথাগুলি সদস্যদের বলেছিলেন, মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে সেই কথাগুলিই আমি বলছি : আপনি দীর্ঘকাল গদি-আঁকড়ে থেকে আপনার অপদার্থতা সপ্রমাণ করার সুযোগ পেয়েছেন, আর কেন! ঈশ্বরের দোহাই, আমাদের আপনার সঙ্গ-মুক্ত হবার সুযোগ দিন।'

আমেরীর উক্তিকে সব দলের তরুণ সদস্যরাই 'হিয়ার হিয়ার' বলে সমর্থন জানালো। বৃদ্ধ চেম্বারলেন অসহায়ের মতো এদিক-ওদিক তাকাতে লাগলেন তাঁকেও কেউ সমর্থন জনাবে এ আশায়। কিন্তু না। তা' হলো না। চেম্বারলেন অপেক্ষাও বয়োবৃদ্ধ, ইতিহাস-প্রসিদ্ধ ডেভিড লয়েড জর্জ (প্রথম মহাযুদ্ধের সময়ে ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী) ধীরে ধীরে চেম্বারলেনের কথার সূত্র ধরে বললেন : 'মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর আশঙ্কা করবার কোনই হেতু নেই। তিনি নির্বান্ধব নন। এখানে সকলেই তাঁর মিত্র। তবে কিনা ব্যাপারটা যা দাঁড়িয়েছে তাতে ব্যক্তি-বিশেষের কে বন্ধু বা কে শত্রু তাতে কিছুই যায় আসে না। বর্তমানের প্রশ্নটা আমাদের গোটা জাতিকে নিয়ে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী আত্মত্যাগের কথা বলেছেন। তিনিও আমাদের নেতা। তিনি স্বয়ং ছোট একটু আত্মত্যাগ করে অর্থাৎ কিনা প্রধানমন্ত্রীর পদটি ছেড়ে দিয়ে আর সকলের সামনে একটা দৃষ্টান্ত রাখুন না কেন।'

লয়েড জর্জ যথোচিত সম্ভ্রমের সঙ্গে কথা ক'টি বলে নিজের আসনে চুপচাপ বসে রইলেন। কমন্স সভার চারিদিকে নানা গুঞ্জন শোনা যেতে লাগলো। একটু পরেই সেদিনের অধিবেশন শেষ হলো। পরদিন চেম্বারলেন পদত্যাগ করলেন।

এরপরে উইনস্টন চার্চিল এলেন প্রধানমন্ত্রী হয়ে। জাতির এ দুঃসময়ে কেবল একটি দলের হয়ে যুদ্ধ-পরিচালনার দায়িত্ব বহন করা উচিত হবে না মনে করে সব প্রধান দলগুলিকে নিয়ে তিনি 'ন্যাশনাল কোয়ালিশন' সরকার গঠন করলেন।

দু'দিন বাদে প্রধানমন্ত্রীর ডাউনিং স্ট্রীটের বাসভবন থেকে পায়ে হেঁটে চার্চিল যাচ্ছিলেন নৌ-দপ্তরের অফিসে, সঙ্গে ছিলেন তাঁর অন্যতম সমর উপদেষ্টা জেনারেল লর্ড ইসমে। পথে বিভিন্ন জায়গায় সাধারণ মানুষেরা তাঁদের থামিয়ে স্বাগত জানাচ্ছিল : 'সুপ্রভাত উইনি স্বাগত মহান চার্চিল। ঈশ্বর তোমার সহায় হোন।' ইত্যাদি।

নৌ-দপ্তরে ঢুকেই চার্চিল একটা ফাঁক ঘরে ঢুকে দরজা দিলেন : "বুঝলে ইসমে আমাদের দেশের সাধারণ মানুষ সবাই আজ আমার দিকে তাকিয়ে আছে। কিন্তু কী দুর্ভাগ্যের কথা। এখনও ত বেশ কিছুদিন প্রত্যহ কিছু কিছু ক্ষয়ক্ষতি আর পরাজয়ের সংবাদ জানানো ছাড়া আমার গত্যন্তর নেই।' জেনারেল ইসমে তাঁর জীবনস্মৃতিতে বলেছেন, কথাটা বলতে বলতে চার্চিল অঝোরে কাঁদতে লাগলেন। তারপর সুস্থ হয়ে চোখ মুছে সে ঘরের দরজা খুলে কাজের জায়গায় গেলেন।

প্রধানমন্ত্রী হিসেবে পার্লামেন্ট প্রবেশের পথে একজন সাংবাদিক প্রথম দিনই চার্চিলকে বললেন : 'মিঃ চার্চিল আপনার কি স্মরণ আছে উনিশ বছর আগে প্রধানমন্ত্রী র‍্যামজে ম্যাকডোনাল্ডকে আপনি 'হাড়-গোড়হীন সার্কাসের খেলোয়াড়' বলে বিদ্রূপ করেছিলেন, যিনি আপনার মতে 'উঁচু জায়গা থেকে পতনের ব্যাপারে অদ্বিতীয় কৌশলী' ছিলেন?

প্রথম সাংবাদিকের কথা শেষ না হতেই আর একজন বলে উঠলেন : 'এবং চেম্বারলেনকে আপনি আখ্যা দিয়েছিলেন 'নিশ্চিতভাবে কিছু না করবার জন্যে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ এবং সন্দেহাতীত বন্ধ্যাত্ব সৃষ্টির মহিমায় সমুজ্জ্বল করে তুলবার জন্যে বদ্ধপরিকর' বলে!'

চার্চিল চট করে উত্তর দিলেন : 'অবাক কান্ড! এরই মধ্যে তোমরা আমার কথার ক্রিয়াপদগুলিকে কমজোরী করে ফেলেছ দেখছি!' (You have weekened my verbes).

সাংবাদিক দুজন একটু হকচকিয়ে উঠেছিলেন চার্চিলের মৃদু ভর্ৎসনার জন্যে। পুরোপুরি ব্যাপারটা বুঝে উঠবার আগেই চার্চিল কয়েকটা সিঁড়ি বেয়ে বেগে খানিকটা এগিয়ে গেলেন।

চার্চিল প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্ব গ্রহণ করলেন ১৯৪০ খৃঃ অব্দের মে মাসের প্রথম সপ্তাহে। ঐ বছরই ১৩ই মে বলদৃপ্ত কণ্ঠে হাউস অব কমন্সে ঘোষণা করলেন : 'বর্তমান সরকারে আমি যাঁদের বিভিন্ন বিভাগের দায়িত্ব দিয়েছি সেইসব মন্ত্রীদের আমি যা বলেছি আপনাদেরও সেই কথাই বলবো, বর্তমানে বেশ কিছুদিন রক্ত, অশ্রু আর শ্রম ব্যতীত আর কোন কথা নয়, শেষ পর্যন্ত বিজয়ী আমরা হবই, সমস্ত ভয়ঙ্কর প্রতিকূলতা সত্ত্বেও আমাদের বিজয়ী হতেই হবে। বিজয়ী না হলে বেঁচে থাকবার আর কোন উপায় থাকবে না।'

একটা গুরু-গম্ভীর বক্তৃতা দিয়ে যুদ্ধ পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণ করলেও চার্চিল সর্বদা এবং সর্বত্র ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ কৌতুকের আশ্রয় নিতেন। ফ্রান্সের আত্মসমর্পণের পরে সকলেই সর্বক্ষণ আশঙ্কা করতো কখন কিভাবে জার্মানরা ইংলিশ চ্যানেল অতিক্রম করে খাস ইংলন্ডে অবতরণ করে সেই জন্যে। এই সময় এক বেতার ভাষণে চার্চিল বললেন : 'ইংলিশ চ্যানেলের মাছগুলি যেমন, আমরাও তেমনি জার্মানদের অবতরণের অপেক্ষায় আছি।'

আর এক বক্তৃতায় তিনি মুসোলিনীকে আখ্যা দিলেন শৃগাল বলে : 'জার্মান নেকড়েটার পাশে ইটালীর শিয়ালটা যে চেঁচামেচি করে এটা একেবারেই অসহ্য। ক্ষিদের জ্বালায় করতো তবু না হয় বোঝা যেত, এ কিনা বিজয়দর্পে চেঁচাচ্ছে।'

হিটলার সম্পর্কে বলতে গিয়ে কমন্স সভায় একদিন চার্চিল বললেন : 'ইদানীং অনেকেই দেখছি নেপোলিয়নের সঙ্গে হিটলারের তুলনা করে থাকেন, কিন্তু এটা কি উচিত? একজন মহান সম্রাটের সঙ্গে একজন কসাইয়ের কখনো তুলনা করা চলে না।'

হিটলার রাশিয়া আক্রমণ করবার পরে চার্চিল যখন কমন্স সভায় রাশিয়াকে সাহায্যের প্রস্তাব উত্থাপন করলেন, তখন অনেক সদস্য তার প্রতিবাদ করলেন এই বলে যে 'মিঃ চার্চিল ত বরাবরই বলশেভিকদের বিরোধী।' উত্তরে চার্চিল বললেন : 'বিরোধী আমি এখনো। তবে কিনা হিটলারকে তারা প্রতিরোধ করছে তাই তাদের সাহায্য দেওয়া যেতে পারে বলে আমি মনে করি। হিটলার যদি নরক অভিযান করে তাহলে স্বয়ং শয়তান সম্পর্কেও দু'টো ভালো কথা বলবার চেষ্টা করবো।'

একজন সদস্য চার্চিলকে স্মরণ করিয়ে দিলেন কয়েক বছর আগের তাঁর একটি উক্তি। প্রথম মহাযুদ্ধের সময় জার্মানগণ কর্তৃক লেনিনকে সুইজারল্যান্ড থেকে রাশিয়া যাবার সুযোগ করে দেবার ব্যাপারটাকে তিনি বাক্সবন্দী করে প্লেগের জীবাণু পাচার করার সঙ্গে তুলনা করেছিলেন।

চার্চিল কপট বিরক্তির সঙ্গে বললেন : 'মাননীয় সদস্য মশাই অর্ধেক 'কোট' করেন কেন? 'কোট' করলে পুরোটাই করতে হয়। লেনিন সম্পর্কে আমি আরো বলেছিলাম যে তাঁর জন্ম রুশ জনসাধারণের পক্ষে প্রথম দুর্ভাগ্যজনক ঘটনা এবং তাঁর মৃত্যুটা হলো দ্বিতীয় দুর্ভাগ্যজনক ঘটনা।'

'ন্যাশন্যাল কোয়ালিশন' সরকার গঠিত হবার পরে কমন্স সভায় একটা অসুবিধে দেখা দিল। 'জাতীয় মন্ত্রিসভা' তাঁদের সিদ্ধান্তগুলি কমন্স সভায় একবার পাঠ করে যে যার কাজে চলে যান, সদস্যারা নিষ্ক্রিয়ভাবে বসে থাকেন। কারণ সরকারে ত তাঁদের প্রত্যেক দলেরই প্রতিনিধি আছেন, কে কার সমালোচনা করবেন? ব্যাপারটা অনেকেরই অসহ্য লাগছিল। অবশেষে লেবার সদস্য অ্যানুরিন বিভান একদিন ক্রোধে ফেটে পড়লেন : 'অধ্যাপক ল্যাস্কির কথাই ঠিক দেখছি, এইভাবেই দলবাজী গণতন্ত্রের [illegible] রচনা করে থাকে। কিন্তু আমি [illegible] দেব না। আমার [illegible] মন্ত্রীরাও যদি বিরক্ত বোধ [illegible], কিন্তু সরকারের প্রতিটি কাজের [illegible] আলোচনা এখানে হওয়া চাই।'

চার্চিল আশা করেছিলেন যে লেবার পার্টির নেতা, তাঁর দক্ষিণহস্ত, সহকারী প্রধানমন্ত্রী ক্লেমেন্ট এটলী বিভানের উক্তির প্রতিবাদ করবেন, কিন্তু তা' করলেন না দেখে তিনি মৃদু সুরে বললেন : 'অনেক মেষ শুনেছি সিংহের চামড়া আবরণ হিসেবে ব্যবহার করে, কিন্তু ইনি দেখছি তার বিপরীত, মেষের চামড়াটা জড়িয়েই নির্বিকারভাবে বসে আছেন।'

সেদিনের অধিবেশনের শেষে একজন চার্চিলের কথাটা এটলীর কানে তুললেন। এটলী তাঁর স্বভাব-সুলভ নম্রতার সঙ্গে একটু হেসে বললেন : 'ঐ তো হয়েছে মুস্কিল! বৃদ্ধ ভদ্রলোকটি যতক্ষণ জেগে থাকেন কেবল প্রতিদ্বন্দ্বীদের প্রতি সময়মতো ছুঁড়ে দেবার জন্যে চোখা চোখা বাক্য কুড়ানোর জন্যে মাথাটা ঝাকান। দেশের কাজ করবার তাঁর ফুরসৎ কোথায়!' লর্ড বার্কেনহেডও এটলীর মন্তব্য সমর্থন করলেন। কথাটা শুনে চার্চিল রেগে গেলেন।

'রেডি উইট' প্রমাণ করবার জন্যে ছটফট করতে লাগলেন। সুযোগ এলো ক'দিন বাদে।

নিজেদের মধ্যে আলোচনা সভায় দীর্ঘ একটি বক্তৃতা করে চার্চিল সবে বসেছেন। লেডী অ্যাস্টর বললেন : দেখুন উইনস্টন, আপনি যদি আমার স্বামী হতেন তা'হলে এরকম বাজে বক্তৃতা দেবার শাস্তিস্বরূপ আপনার কফিতে আমি বিষ মিশিয়ে দিতাম।' একগাল হেসে চার্চিল বললেন : 'আপনার স্বামী হলে হৃষ্টচিত্তে সে কফি পান করে আপনার কবল থেকে আমি রেহাই পেতাম।'

এর ঠিক দু'দিন বাদে চার্চিল তাঁর 'রেডি উইট' সপ্রমাণ করবার আর একটা সুযোগ পেয়ে গেলেন। ব্যঙ্গ-কৌতুকে অদ্বিতীয় স্বনামধন্য জর্জ বার্নার্ড শ'-এর একখানা নতুন নাটকের প্রথম রজনীর অভিনয় হবে। শ' দু'খানা পাশ পাঠিয়ে দিলেন চার্চিলের দপ্তরে। সঙ্গে ছোট্ট একখানা চিঠি : "প্রিয় উইনস্টন, দু'খানা পাশ পাঠালাম, একখানা তোমার জন্যে, অন্য খানা তোমার কোনো বন্ধুর জন্যে, অবশ্য যদি বন্ধু-বান্ধব বলে তোমার কেউ থাকে।" চার্চিলের মুখ-চোখ জ্বল জ্বল করে উঠলো উত্তেজনায়। উপস্থিত সবাই চিঠিখানা দেখে মুখ টিপে হাসতে লাগলো। চার্চিল একটা খামের মধ্যে পাশ দু'খানা পুরলেন, তার-পর চট করে দু'ছত্রের জবাব লিখে সবাইকে দেখালেন : 'মাননীয় নাট্যকার মহাশয়, সরকারী কাজে বড়ো বেশী ব্যস্ত, তাই আজ আর আপনার নাটক দেখতে যেতে পারবো না। পাশ দু'খানা ফেরৎ পাঠালাম। তবে দর্শকগণ যদি আপনার নাটকের দ্বিতীয় রজনীর অভিনয়ের প্রয়োজন বোধ করেন এবং বাস্তবিক তা হয়, তা' হলে আবার পাশ পাঠাবেন।' শোনা যায় শ' এ জবাব পেয়ে ঠোঁট কামড়েছিলেন।

মুখে রাশিয়াকে সাহায্য পাঠাবার কথা বললেও চার্চিল বাস্তবিক পক্ষে রাশিয়াতে বিশেষ সাহায্য পাঠাতেন না, অজুহাত দিতেন, যদি হিটলার অকস্মাৎ ব্রিটিশ দ্বীপপুঞ্জে অভিযান করে বসেন। একদিন বিভান রেগে মেগে বলে উঠলেন : 'মাননীয় প্রধানমন্ত্রী মহাশয় সর্বদাই 'নেকড়ের' দুঃস্বপ্ন দেখে থাকেন। কেউ কিছু বললেই 'নেকড়ে, নেকড়ে' বলে তিনি চেঁচামেচি করেন। অথচ বিশ্ববাসী সবাই জানেন যে, ঠিক এই মুহূর্তে নেকড়ে ভালুকের সঙ্গে জীবনমরণ সংগ্রামে লিপ্ত। তা' ছাড়া, তাঁর সুগোল মাথাটিতে কি একথাটা আসে না যে, নেকড়ের হাত থেকে রেহাই পাবার সর্বোত্তম পথই হচ্ছে ভালুকের হাত দুটো জোরদার করা?'

এই ধরনের কথা, যার উত্তরে বলার কিছু নেই, তার জবাবের সময় চার্চিল ক্ষোভে ফেটে পড়তেন। হয় সরাসরি পার্লামেন্টে 'আস্থাসূচক' ভোট দাবী করে বসতেন, আর না হয় বলতেন : 'চেম্বারলেন পদত্যাগ করবার পরে ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রীর শূন্যে আসনটার দিকে কেউ ফিরেও তাকাতো না, এ ক'বছরে ঐ আসনটির বাজারদরটা যে আমিই বাড়িয়েছি এ-কথা কে অস্বীকার করবে?'

১৯৪২-এর অগাস্ট আন্দোলনের সুরুতে ভারতে কংগ্রেসের নেতৃবৃন্দের গ্রেপ্তার ও দেশব্যাপী ধরপাকড় ও উৎপীড়নের প্রতিবাদ করে বিভান একটা কাগজে জোরালো প্রবন্ধ লিখলেন। কয়েক সপ্তাহ বাদে পার্লা-মেন্টে ভারত সম্পর্কে বিতর্কের সময় সেই কথাগুলিরই পুনরুক্তি করে বললেন : 'সাম্রাজ্যবাদী সিংহটা জেগে উঠেছে। শুনুন শুনুন, ক্লাইভ, হেস্টিংস ও ডায়ারের প্রেতাত্মার আশীষ কামনায় তার কি বিকট নিনাদ। গান্ধী, নেহেরু আজ কারারুদ্ধ, বাহাত্তর বছরের দিদিমা গান্ধীকেও জেলে পোরা হয়েছে, পাছে তাঁর দুর্বল কম্পিত কণ্ঠের অস্ফুট ধ্বনি এই মহান সাম্রাজ্যের ভিত্তি টলিয়ে দেয়, তাই। যে ট্যাঙ্কগুলি রাশিয়ায় পাঠালে নাৎসীদের ধ্বংসের কাজ এগিয়ে দিতো, চীনে পাঠালে ফ্যাসিস্ট জাপানকে পরাভূত করতে সাহায্য করতো, সেই ট্যাঙ্কগুলিই আমরা কোলকাতা এবং বোম্বাইয়ের রাস্তায় নামিয়ে দিয়েছি নিরস্ত্র কংগ্রেস-অনুগামীদের ছত্রভঙ্গ করবার জন্যে।' কয়েকদিনব্যাপী এই বিতর্কের শেষেই চার্চিল একটি বিখ্যাত বক্তৃতা করে বলেছিলেন : 'মহীয়সী সম্রাজ্ঞীর সাম্রাজ্য লাটে তুলবার জন্যে নিশ্চয়ই আমি প্রধান-মন্ত্রী হইনি।'

যাই হোক, যুদ্ধের মোড় ক্রমশঃ ফিরতে লাগলো। মিত্রশক্তি আফ্রিকায় জিতলেন, ইটালীসহ সমগ্র দক্ষিণ ইয়োরোপে জিততে লাগলেন, ফ্রান্সের নরম্যান্ডিতে অবতরণ করে জার্মানীর দিকে ধাবিত হলেন। ওদিকে রাশিয়াও জার্মানদের ক্রমশঃ পিছু হটিয়ে দিতে লাগলো। এমনি সময় 'ইয়ালটা' সম্মেলনের আয়োজন করা হল। এই সম্মেল-নেই একটি বিশ্ব-সংস্থা গঠনের 'প্রথম খসড়া' তৈরী হবার কথা। রুজভেল্টের শরীরটা ভালো যাচ্ছিল না। তাই তিনি চার্চিলকে জানালেন : 'প্রিয় প্রধানমন্ত্রী মহাশয়, দেখবেন যেন পাঁচ-ছয় দিনের বেশী সময় না লাগে।' উত্তরে চার্চিল লিখলেন : 'মিঃ প্রেসিডেন্ট, এটা কি কথা বললেন, বাইবেলের কথা কি ভুলে বসলেন? সর্ব-শক্তিমান স্বয়ং পরমেশ্বরও ত ব্রহ্মান্ড তৈরী করবার জন্যে সাত দিন সময় নিয়েছিলেন।'

মিত্রশক্তি বাহিনী প্যারিস দখল করে নেবার পরে একটি বিজয়-সভার আয়োজন করা হয়, এই সভায় চার্চিল ফরাসীভাষায় তাঁর যে যৎসামান্য জ্ঞান ছিল, তাই সম্বল করেই বলতে সুরু করলেন : 'আপনারা হুঁসিয়ার থাকবেন কিন্তু, আমি ফরাসী-ভাষায় বক্তৃতা আরম্ভ করছি।'

কিছুদিন বাদে জন্মদিন উপলক্ষে অনেকেই চার্চিলকে শুভেচ্ছা জানাতে এসে-ছেন। একজন জিজ্ঞাসা করলেন : 'আচ্ছা মিঃ চার্চিল, মৃত্যুর জন্যে আপনার মনে কি কোন আশঙ্কা নেই?' চুরুটটা দুই দাঁতের মধ্যে আটকে রেখে চার্চিল বললেন : 'বহু-কাল ত হয়ে গেল, কাজেই সৃষ্টিকর্তার সামনে হাজির হতে আমার দিক থেকে কোন আপত্তি নেই; তবে কি জানো, তাতে তাঁর যে-ঝামেলা বাড়বে তা সামলাতে তিনি প্রস্তুত আছেন কি না, আমার সন্দেহ আছে।'

অবহমান কাল

অসীম রায়

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

ফাল্গুনের কাঁচা রোদে দেয়ালে পিঠ ঠেস দিয়ে টুটুল চেঁচিয়ে পড়ে যায় :

রাক্ষস-খোক্কসেরা নানারকম ছল-চাতুরী করে, সকলের বড় খোক্কসটা সেই সব আরম্ভ করিল। বলিল, 'তোঁদের নঁখের ডঁগা দেঁখি?' লাল, নীলের মুকুটটা তরোয়ালের খোঁচা দিয়া বাহির করিয়া দিলেন। সেটা হাতে করিয়া খোক্কসেরা বলাবলি করিতে লাগিল—'বাঁপ' রেঁ! যাঁর নঁখের ডঁগা এঁমঁন, না জাঁনি সেঁ কিঁ রেঁ!'

আগাগোড়া চন্দ্রবিন্দুর জোরাল উচ্চারণে খোক্কসদের খোক্কসত্ব এত প্রকট করে তোলে টুটুল যে বলাই হৈ হৈ করে হেসে উঠল। তার হাঁটু পর্যন্ত ব্যান্ডেজ কাঠে বাঁধা ডান পাখানা দু-হাত দিয়ে একটু সরিয়ে দিয়ে টুটুল পড়ে চলে :

খানিক পরে খোক্কসেরা আবার আসিয়া বলিল, 'তোঁদেঁর জিঁভ দেঁখিব।' লাল, নীলের তরোয়ালখানা দুয়ারের ফাঁক দিয়া বাড়াইয়া দিলেন। বড় খোক্কস দুই হাতে তরোয়াল ধরিয়া, আর সকল খোক্কসকে বলিল, 'এঁইবাঁর জিভ টাঁনিয়া ছিঁড়িব—তোঁরা আঁমাকে ধঁরিঁয়া খুঁব জোঁরে টাঁনন নঁন।' সকলে মিলিয়া খুব জোরে টানিল, আর, তরতর ধার নেঙ্গা তরোয়ালে বড় খোক্কসের দুই হাত কাটিয়া কালো রক্তের বান ছুটিল। চেঁচাইয়া মেচাইয়া, সকল খোক্কস ডিঙাইয়া বড় খোক্কস পলাইয়া গেল।'

মাথা পিঠ দুলিয়ে দুলিয়ে সশব্দে হেসে উঠল বলাই চোখেও জল এসে যায়। কোঁচার খুঁট দিয়ে চোখ মুছতে মুছতে বলে, 'তুমি হাইকোর্টের জজ হবে ছোট-দাদাবাবু। দেখো, আমি বলে দিলাম।'

পড়বার উত্তেজনায় পায়ে বাঁধা কাঠ-খানা আবার সরে যেতে ব্যথা লাগে টুটুলের।

'এবার আমি তোমাকে তুলে দিই দাদা-বাবু। আর না।'

'আর একটু আর একটু!' ঘাড় বাঁকিয়ে মাঠ পার, জেলখানার রাস্তা, তারও ওপাশে [illegible] [illegible] ঘর, উল্টোদিকে বকুল-বন, কাছেই ব্রহ্মদৈত্যের আবাস কচি কচি সবুজ পাতায় ভরা মস্ত বেলগাছটা যার নীচ দিয়ে একজোড়া কালো ছিট ছিট বাদামি প্রজাপতি উড়ে যাচ্ছে সেদিকে ঘুরে ঘুরে তাকায়। কত দিন প্রজাপতির পেছনে দৌড়ায় নি, কতদিন দেখে নি ফাটা পাল-তোলা নৌকো চূর্ণীর ঘোলা জলে।

'নাও, নাও, আমাকে আবার যেতে হবে,' বলাই দাঁড়িয়ে ওঠে।

'আমাকে একবার নদীর ধারে নিয়ে যাবে পিঠে করে?'

'যাব যাব, এখন ওঠো তো। বাবুর খাওয়া হয়ে গেছে। জামা পরছে। এইতো, লক্ষ্মী দাদাবাবু।' টুটুলের কোন কথা না শুনেই বলাই তাকে আলগোছে তুলে নিয়ে খাটে শুইয়ে দেয়।

'মা-কে ডেকে দাও, বলাই।'

'মা, রান্নাঘরে। তুমি ডালিম কুমারের গল্পটা পড়ো দাদাবাবু। সেই নাক দিয়ে সাপ বেরোচ্ছে, চমৎকার গল্পটা।'

বলাই যেতে যেতে বলে, এইরকম বুঝ দেওয়ায় টুটুলের ঘোর আপত্তি। তারা ছোটরা নিজেদের মধ্যে এর একটা নাম-করণও করেছে—ভুজুং ভাজুং। বোধহয় ছোটরাও নয়, প্রতাপই এই নামকরণের সঙ্গে যুক্ত। স্বর্ণসুন্দরীর কোন কথায় চোঙা বুড়ী নিজেদের মধ্যে চোখ টেপে। তারপর মা চলে গেলেই সমস্বরে চেঁচিয়ে ওঠে, 'ভুজুং ভাজুং, ভুজুং ভাজুং!'

টুটুল চুপচাপ শুয়ে থাকে। চোঙা-বুড়ী আধ ঘণ্টা আগে মাঠ ভেঙে চলে গেল স্কুলে। আগে স্কুল যাওয়া টুটুলের মোটেই পছন্দ ছিল না। কিন্তু তার এই অচল অবস্থায় যে জীবনযাত্রায় সবাই চলছে ফিরছে ঘুরে বেড়াচ্ছে অবাধে তাই তাকে আকর্ষণ করে। চোঙা ছুট দিলে সে চমকে উঠে সেদিকে তাকিয়ে থাকে। তারপর সম্প্রতি স্কুল ফেরতা চোঙা বুড়ীর ঘোড়ার গাড়ির পেছনের পা-দানিতে ঝুলে পড়া কিংবা স্কুলের মাঠে সত্যিকার ফুটবল খেলার মতো চিত্তাকর্ষক ঘটনা প্রায়ই ঘটতে থাকায় ত।॥ অস্থিরতা বাড়ে। তার [illegible] ঠাকুমার ঝুলি বইখানা সে হঠাৎ খাটের একপাশে ছুঁড়ে ফেলে। তার সমস্ত গল্প মুখস্ত।

আজ তার জন্মদিন, কিন্তু আজ সকাল থেকে তার কাছে সব বিস্বাদ লাগছে। গত জন্মদিনের কথা মনে আসে টুটুলের। চালের পায়েস আর গোকুল পিঠে হয়েছিল; তারপর তার আর বুড়ীর মাথায় ধান-দুব্বো দিয়ে পঞ্চম জর্জের দুটো রুপোর টাকা দিয়েছিলেন স্বর্ণসুন্দরী। এবারেও তাই হবে কিন্তু এ জন্মদিন ও সে জন্ম-দিনের মাঝখানে এক দুরপনেয় ব্যবধান টের পায় টুটুল। প্রায় চার মাস হল শুয়ে আছে। সামনের সপ্তাহে কাঠ খুলবে হরি-চরণ ডাক্তার। তারপর? তারপর যদি সে হাঁটতে না পারে? এবকম একটা কানাঘুসো চলছে বাড়িতে। ঘা প্রায় শুকিয়ে এসেছে। বিশাল কাটা ঘা বহুদিন পর্যন্ত হাঁ হয়ে থাকত, তা প্রায় বুজে গিয়েছে, চামড়া পড়ছে, খালি গোড়ালির হাড়ের জোড়ে ছোট পয়সার মতো গোল ছোট ক্ষত এখনও চারমাস আগেকার বিরাট দুঃস্বপ্নের স্বাক্ষর। একমাত্র ব্যান্ডেজ খোলা আর ব্যান্ডেজ বন্ধ করা ছাড়া এ ব্যাপারে হরি-চরণ ডাক্তারের বোধহয় করণীয় নেই।

'আজ তিনটে গোল দিলাম' চোঙা স্কুল থেকে ফিরেই বললে। আর টুটুল ভাবে, রূপকথার রাজপুত্র হবার দরকার নেই, সে যেন ভাল মতো হাঁটতে পারে, গোল দিতে পারে।

রুপোর টাকা দুটো হাতে দিয়ে টুটুলের মাথাটা বুকে টেনে নিয়ে অনেকক্ষণ চোখ বন্ধ করেন স্বর্ণসুন্দরী, 'বাবা বৈদ্য-নাথ, বাবা বিশ্বনাথ, মা কালী ছেলেকে নীরোগ করে দাও' বলে প্রার্থনা করলেন স্বর্ণসুন্দরী।

চোঙা বললে, 'মা, তুমি খালি ঐ তিন-জনকে ডাকো, কৃষ্ণকে ডাকো না, সরস্বতীকে ডাকো না।'

'হ্যাঁ হ্যাঁ বাবা, সবাইকেই ডাকছি।'

'আর লক্ষ্মীকে? লক্ষ্মীকন্যা চুরুকে?'

স্বর্ণসুন্দরী অপ্রসন্নভাবে মেজো ছেলের দিকে তাকালেন। পরম পরিতৃপ্তিতে পায়েস

চাটতে চাটতে বুড়ী বললে, 'ভালই হবে, ভগবান পাপ দেবে। কাল তিনটে গোল খাবে।'

সাতদিন পর কাঠ আর ব্যান্ডেজ খুলে হরিচরণ ডাক্তার বললেন, 'কবি, দাঁড়াও তো।' অপারেশানের সময় টুটুলের কাব্যময় আর্তনাদে ডাক্তার এমন অবাক হয়েছিলেন যে, তারপর থেকে বরাবর তিনি ঐ নামে ডাকছেন।

টুটুল দ্বিতীয়বার হাঁটি হাঁটি পা করে অগ্রসর হয়। পা টলমল করে। পড়বার আগেই ডাক্তার ধরে ফেলেন। স্বর্ণসুন্দরী অনেক কষ্টে কান্না চেপে বসে থাকেন।

'চমৎকার, চমৎকার!' হরিচরণ ডাক্তার চেঁচিয়ে ওঠেন। তাঁর সন্দেহ যে যায় নি, তা নয়। হাড়ের জোড়ে কম্পাউন্ড ফ্র্যাকচার। নেংড়া হয়ে যাবার সম্ভাবনাও আছে। কিন্তু এই মফঃস্বলে ছেলেটার জন্যে যা করা হয়েছে তার চেয়ে কিছু সম্ভব নয়। আর হয়ত ঠিকমতো হাড় জুড়েও যেতে পারে। কাঁচ হাড়, সবই সম্ভব। কত মৃত্যুপথ যাত্রী আবার বেঁচে উঠছে। পর্দার পোল ধরে নেংচানো ছেলেটার দিকে চেয়ে তৃতীয়বার বললেন, চমৎকার!' তারপর স্বর্ণসুন্দরীর উপহার একটা সুন্দর সবুজ রংয়ের পার্কার কলমে টুটুলের জন্যে একটা টনিক লিখে দিলেন।

টুটুলের আবার দ্বিতীয় জন্ম শুরু হল। ট্রাইসাইকেলে শীতের রোদ্দুরে সে জেলখানা বরাবর চলে যায়, বকুলবন থেকে বেলগাছতলা, বেলগাছতলা থেকে গোয়ালঘর মাড়িয়ে বেড়ায়। দিন দশ বারোর মধ্যেই স্বাস্থ্যের দীপ্তিতে চোখমুখ ঝকমক করে। কিন্তু সেদিকে চেয়ে চেয়ে স্বর্ণসুন্দরী কেবল দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলেন। আর সে যত এক-পায়ে হাঁটার কসরত আয়ত্ত করে, এমন কি দৌড়য়, ততই তার মায়ের কাঁদতে ইচ্ছে করে।

বলাই সেদিন বললে যে সে ছোট দাদাবাবুর পায়ের ব্যবস্থা করে দেবে। বাজারের পাশেই সিদ্ধেশ্বরীতলায় মা-কে নিয়ে যাবে, 'দেবী খুব জাগ্রত মা। শুধু নকড়া-ছকড়াই আসে না, কলকাতা থেকে লোক আসে। পচা পড়েছিল খেজুর গাছে হাঁড়ি বসাতে। একেবারে নেংড়া। দাদাবাবু তো তাও একরকম হাঁটতে পারে। বললে বিশ্বাস করবে না মা, এখন বাজারের আগে ছোটে।'

কাজেই পরের রোববার সকালে সিদ্ধেশ্বরীতলায় একখানা কথ ঘোড়ার গাড়ি থেকে স্বপুত্র স্বর্ণসুন্দরী নামলেন। বিকেল পর্যন্ত উপুড় হয়ে পড়ে থাকলেন ঠান্ডা শান-বাঁধানো চত্বরে। টুটুলের খেলা খেলা করছিল। কারণ তার মায়ের ঠিক পাশেই এক গ্রাম্য মহিলা হত্যে দিয়ে আছে, তার বাঁ পায়ে বিশাল গোদ মায়ের শাড়ি প্রায় স্পর্শ করছে। মা-কে এখন ছুঁতে মানা, কিন্তু তা সত্ত্বেও সে আলগোছে কাপড়টা একটু সরিয়ে দেয়, একলা একলা ঠাকুর দেবতা দেখে বেড়ায়। তারপর মায়ের পাশে কখন অকাতরে ঘুমিয়ে পড়ে সেই খোলা চত্বরে।

স্বর্ণসুন্দরীর ফিরতে সন্ধ্যে হয়ে যায়। ঘোড়ার গাড়ির জানলা দিয়ে ঘনায়মান আঁধারে এবং পশ্চিম আকাশের পড়ন্ত আলোয় এমন মায়াটে আপনার লাগে মাঠের মধ্যে তাদের বাড়িটা যে টুটুল এক-দৃষ্টিতে সেদিকে চেয়ে থাকে। খড়খড় মড়মড় করে আসতে আসতে বাড়ির একটু দূরেই গাড়িটা থামে, কারণ চেঁচাতে চেঁচাতে চোঙা আর বুড়ী তাদের দিকে ছুটে আসছে।

'আশ্চর্য খবর। আশ্চর্য খবর।' চোঙা খবরের কাগজের হকারদের মতো চেঁচায়। বুড়ীও মাথা ঝাঁকিয়ে কি বলে। এতক্ষণ ঠান্ডা মেঝেতে শুয়ে থাকতে থাকতে স্বর্ণ-সুন্দরীর গা ম্যাজ ম্যাজ করছিল। তিনি ধীরে ধীরে নামলেন। টুটুল লাফিয়ে নামতেই চোঙা তার হাত ধরে ঝাঁকিয়ে বলে, 'আমাদের কি মজা! কি মজা! আমরা জলের দেশে যাচ্ছি! আর তিনদিন পরেই! সেখানে কি জল। মাইলের পর মাইল খুব জল। পাহাড়ের মতো ঢেউ, হাঙর, কুমীর ...চোঙা যে তার সদ্যপড়া ভূগোল থেকে এসব চালাচ্ছে, বুড়ী তা টের পেয়ে বলে, 'তোর সবটাতেই বাড়াবাড়ি। আর তুই সাঁতার জানিস যে বড় বলছিস!'

বারান্দায় ভবনাথ দাঁড়িয়ে। হাসিতে মুখ উজ্জ্বল। পোস্টিংটা মনঃপুত হয়েছে তাঁর। যদিও এবার তাঁর মোক্ষ লাভ হল না, জেলার চার্জ পাওয়া থেকে বঞ্চিত রইলেন তবু ঢাকা শহরের মুন্সীগঞ্জ মহকুমা একটা প্রাইজ পোস্ট। আর জলের দেশ, জলে গেলেই দৈনিক ষোল টাকা টি-এ। প্রতাপের জন্যে খরচটা ম্যানেজ দেওয়া যাবে। স্ত্রীর পেছনে নেংড়ানো ছেলেটার দিকে চেয়ে একবার দীর্ঘশ্বাস ফেললেন।

'বদলি হলে নাকি?'

'হ্যাঁ, ভাল পোস্টিং দিয়েছে। ঢাকার মুন্সীগঞ্জে। টাকায় ষোল সের দুধ।'

বলাইয়ের সামনে বলেই বোধহয় স্বর্ণ-সুন্দরী একটু বিরক্ত হলেন। পেছনে মুখ ফিরে বললেন, 'আমাদের তো পাট উঠল বলাই।'

বলাইয়ের মুখ থমথমে, চোখ ছলছল [illegible]

সে বারান্দায় এক কোণে দাঁড়ায়। স্বর্ণসুন্দরী বললেন, 'কি বলাই, কিছু বলছো না যে!'

'মা, আমি ভাবছিলাম, এত সুখ কি কপালে সইবে। কথায় বলে, সু-অদৃষ্টের আশ, নারীর মুখের হাস। এর ওপর যার বিশ্বাস, তার সাতপুরুষ কাটে ঘাস।'

স্বর্ণসুন্দরী হেসে বললেন, 'কেন, বউয়ের সঙ্গে ঝগড়া হল নাকি?'

অদ্ভুত হাসলে বলাই। তার এই হাসির সঙ্গে সারা বিকেল সিদ্ধেশ্বরীতলা থেকে অন্তর্ধানের যোগসূত্রটা আবিষ্কার করলেন স্বর্ণসুন্দরী। খেজুরের রসের সময় বলাই সন্ধ্যার পর কোন কোন দিন এরকমভাবে হাসে। বড্ড বেশী রকম চেয়ে থাকে চোখের দিকে একদৃষ্টিতে।

বলাই দেয়ালে ঠেস দিয়ে নিজের মনে হাসতে হাসতে বললে, 'কি যে বলো মা। সোয়া গাইয়ের চাটও সই। বুঝলে মা।'

'তুমি কাল সকাল সকাল এসো। অনেক গোছগাছ আছে। আর মাত্র তিনটে দিন।'

'আজ রাত্তির থেকেই গোছগাছ করি মা। আমাকেও তোমার সঙ্গে নিয়ে যাও। মা, আমার কেউ নেই!'

'যাও, যাও, উঠে পড়ো।' স্বর্ণসুন্দরী ধমকে ওঠেন।

বলাই উঠে পড়ে। মুখে হাসি, চোখে জল। বারান্দায় বুড়ীর দিকে চেয়ে বললে, 'বুড়ী মা চললাম। আর দেখা হবে না।' তারপর চিড়বিড় করে, 'সু-অদৃষ্টের আশ, নারীর মুখের হাস। এর ওপর যার বিশ্বাস, তার সাতপুরুষ কাটে ঘাস।'

'দ্যাখ দ্যাখ, বলাই কাঁদছে! আমার কি মজা লাগছে! কি মজা!' চোঙা পেছন থেকে চেঁচিয়ে বলে।

পরদিন সকালে কেন গোটা দিনেও বলাইয়ের পাত্তা নেই। বলাই এল দুদিন পার করে যখন বাঁধাছাঁদা প্রায় সব শেষ। অবশ্য অসুবিধে কিছু হয়নি। আরও দুজন আর্দালি, ভৃত্য, জেলখানা থেকে রামসুভগ সিং সবাই এসে পড়াতে চারদিকে ধুমধাড়াক্কা লেগে যায়। বাগানের বেগুন তুলে বস্তা বাঁধা হয়েছে। নারকেলের দড়ি দিয়ে স্বর্ণসুন্দরীর প্রায় গোটা ভাঁড়ারটাই বেঁধে ফেলা শেষ। বিরাট বিরাট আচারের বয়াম, অসংখ্য অব্যবহার্য তেলের শিশি-বোতল সব সঙ্গে চলেছে। স্বর্ণসুন্দরীর বিচারে বলাই মর্মাহত। বাছুর সমেত নতুন বিয়োন্ত মঙ্গলাকে গানের গোপাল মাস্টারকে দান করা হল।

আগামী কাল বিকেলেই ছোকরা আই-সি-এস কল্যাণ মিহিরের হাতে চার্জ দিয়ে ভবনাথ ট্রেনে উঠবেন। রাজ্যের মাল-পত্তরের মধ্যে স্বর্ণসুন্দরী ছুটে বেড়ান, গোপীনাথকে এটা ওটা হুকুম করেন। সরকারী অফিসারদের এ সময়টা একটা গুরুত্বপূর্ণ সময়। এক পরিবর্তনের মুখে সে পরিবর্তনে হয়তো আছে বড় প্রোমোশনের ইশারা। এই বোধ পরিবারের অনেকের [illegible] হয়। [illegible] গেল। একটু এক ঘেয়েও লাগছিল স্বর্ণসুন্দরীর। এখন এই পরিবর্তনের মুখে নতুন কর্মোদ্যমে মেতে ওঠেন। এবারে হয়ত ট্রেন ফেল করলেন তাঁর স্বামী, কিন্তু রিটায়ারের মুখে নিশ্চয় জেলার ভার পাবেন এ স্বপ্ন বাস্তব হতে চলেছে। সারা দিনটা এমন ছোটাছুটি করলেন আর সবাইকে ছুটিয়ে নিয়ে বেড়ালেন যেন সে রাত্তিরেই রানাঘাট ত্যাগ করছেন।

পরের দিন খুব সকাল সকাল বাজার করে নিয়ে আসে বলাই। গৌরীর জন্যে কেনা একটা লাল ডুরে বলাইয়ের হাতে তুলে দিতে তার মুখে স্বাভাবিক হাসি ফোটে। বলে, 'কি সুখে ছিলাম মা!'

'আবার নতুন মা আসছে!'

'সে তো মা নয়, মেমসাহেব!'

'একই ব্যাপার বলাই!'

'সব ঝিনুকে মুক্তো নেই মা!'

স্বর্ণসুন্দরী হাসতে হাসতে বলেন 'অনেক কথা ভুলে যাব বলাই, কিন্তু তোমার ছড়াকাটা চিরদিন মনে থাকবে।'

'[illegible]মার ভাগ্য মা!'

বলাই আজ তার তকমাটকমা সব এঁটে এসেছে। আজ থেকে সে নতুন সাহেবের আর্দালি।

বুড়ী বললে, 'দেখেছিস, বলাই আর আমাদের কথা শুনবে না।'

পরদিন সন্ধ্যেবেলা দুটো ফার্স্ট ক্লাস কামরা রিজার্ভ করে এস-ডি-ও সাহেব সপরিবারে রাণাঘাট ত্যাগ করলেন। তার আগে অবশ্য একটা ফেয়ারওয়েল পার্টি হল। হাইস্কুলের হেডপণ্ডিত মশাই সংস্কৃততে ভবনাথের গুণপনার প্রশংসা করলেন। পেস্কারবাবুর ভাই যে কলকাতার জলসায় গান করে, সে ছোকরা 'ভেঙেছো দুয়ার এসেছো জ্যোতির্ময়' গানটি গাইলে, সঙ্গে গলায় বেহালা লাগিয়ে গোপাল মাস্টার সঙ্গত করলেন। স্টেশনে অনেকে এলেন। মালা, ফুলের তোড়া, পায়ের ধুলো ইত্যাদির দরুণ দশ মিনিট বেশী দাঁড় করাতে হল ট্রেন। গাড়ি ছাড়লে ভবনাথ আরাম করে নরম চামড়ার বিস্তৃত গদীতে গা মেলে দেন। 'নাঃ। নাথিং টু রিগ্রেট!' অবশ্য মুন্সীগঞ্জ টেররিস্টদের জায়গা। যাঁর হাত থেকে তিনি চার্জ নেবেন তাঁর স্ত্রী প্রায়ই আতপ চাল আর সাদা থান উপহার পান বলে শুনেছেন। কিন্তু ওসব কথা ভাবলে চলে না। সে লোকটাও একটু বাড়াবাড়ি করছিল বলে তিনি শুনেছেন। বাড়াবাড়ি ভবনাথ পছন্দ করেন না, বাড়াবাড়ি ইংরেজের আইনে নেই। আইনের প্রশস্ত রাজপথ দিয়ে তিনি বরাবর হেঁটে এসেছেন, হেঁটে যাবেন কাউকে পরোয়াক্কা না করে। আর জল আছে, মোটা টি-এ আছে, টাকায় ষোল সের দুধ। আরামে চোখ বোঁজেন ভবনাথ।

স্বর্ণসুন্দরীর হঠাৎ গবার কথা মনে [illegible] চোখ [illegible] করে। ইতিমধ্যে এক পশলা কাঁদা হয়ে গেছে। আবার চোখে জল আসে। তারপর ভাবেন, প্রতাপও যদি তার মাতুলের মতো গড়াতে থাকে, একটার পর একটা বছর হুতোছাতা করে কাটিয়ে দেয় বিলেতে। তারপর সেদিক থেকে চিন্তা সরিয়ে নেন। মাতুলের প্রভাবটা বাজে কথা। আসল সমস্যা তাঁদের টাকা। বাড়িটা করতে প্রায় ষাট হাজার পড়ে গেল। তাঁর গায়ের গয়না, সব কটা লাইফ ইন্সিওরেন্স পলিসি খেয়ে নিয়েছে। তাছাড়া চায়ের ভাল শেয়ার ছিল সেগুলোও। এর মধ্যে বড় ছেলেও বেশ খিঁচে নিচ্ছে, আরও খিঁচবে। সস্তা গণ্ডার জায়গায় যাচ্ছেন, এইটাই বাঁচোয়া। পাশ ফিরে আরাম করে শোন। কলকাতায় একদিন বিশ্রাম নেবার কথা ছিল, তা আর হবে না। এই কামরা দুটো শেয়ালদায় কেটে আবার নতুন ট্রেনে জুড়ে দেবে। সারা দিনের উত্তেজনায় তাঁর চোখের পাতা জুড়ে আসে।

চোঙা বুড়ীর সঙ্গে মহাতর্ক করে। বুড়ী রাণাঘাটের স্বপক্ষে, আর চোঙা না-দেখা মুন্সীগঞ্জের ভক্ত। চূর্ণী যে আসলে নদী নয়, বড় জোর একটা খাল, সেটাই অনেকক্ষণ বোঝাবার চেষ্টা করে। তারপর ট্রেনের একটানা শব্দে চুপ করে যায়।

জানলার বাইরে চেয়েছিল টুটুল। ছুটন্ত গাছপালা অন্ধকার মাঠের দিকে চেয়ে চেয়ে তার মনে আসে জেলখানার সামনে কার্বাইডের আলোয় গরুর গাড়ির ওপর সেই সং। একটা রোগা হ্যাংলাপানা লোক গাইছিল 'রাণাঘাট সোনার শহর, খ বাবু মহাশয়,' আর সঙ্গে সঙ্গে দলের লোকেরা তালি দিয়ে বলছিল, 'তাইতো তাইতো, তাইতো।'

সেই গানটা মনের মধ্যে ঘোরে ফেরে টুটুলের আর ট্রেনের চাকা তালি দেয়, 'তাইতো, তাইতো, তাইতো।'

(ক্রমশঃ)

সুধানন্দ চট্টোপাধ্যায়

কাজের মানুষ অবনীন্দ্রনাথ

(পূর্বপ্রকাশিতের পর)

দেশীবিদেশী নানা আরব্য উপন্যাসের সংস্করণ জোগাড় করে মনে প্রবল বাসনা জাগলো, তিনি আরব্য উপন্যাস চিত্রায়িত করবেন। একাধিক সহস্র রজনী যেমন বাদশাজাদী গল্পে ভরে দিয়েছিল তিনি তাকে চিত্রে রূপায়িত করবেন, মনস্থির করলেন।

শিল্পালাপ :

তাঁর সদাসমাপ্ত একটি ছবি নিয়ে এক-দিন সন্ধ্যার আলোচনায় আমায় তিনি বললেন—

—যখনই যে ভাবের উদয় হয়েছে, তখনই তাই এঁকেছি। মাঝে মাঝে ছবির নেশা যখন পায় তখন আর ভাবনাচিন্তে নেই। অনেকদিন ছবি আঁকা স্থগিত রেখেছিলাম। হঠাৎ মনে হল 'ওমর খৈয়ামের' মত যদি আরব্য উপন্যাসের হাজার এক গল্পের ছবি আঁকি তা হলে কেমন হয়? যেমনি চিন্তার উদয়, তেমনি কাজ শুরু। নানা স্থান থেকে নানা সংস্করণের আরব্য উপন্যাস সংগ্রহ শুরু হল। প্রথমেই রামানন্দ বাবুর আরব্য উপন্যাস, বটতলার আরব্য উপন্যাস, ইংরিজি সচিত্র আরব্য উপন্যাস, উর্দু আরব্য উপন্যাস সংগ্রহ হল। পড়া হল। এবার ছবি আঁকতে শুরু করেছি। এঁকেই চলেছি। এক একটা ছবি পাঁচ-ছ' দিনে শেষ। তবে প্রথমে বেশ একটু বেশী সময় লেগেছিল যেখানে উজিরের মেয়ে শাহজাদী বাদশাকে গল্প বলা শুরু করছেন। আর লেগেছিল আলিবাবা গল্পের দর্জির দোকানের ছবি যেখানে কাসেমের চারখণ্ড মৃতদেহ দর্জি মোস্তাফার দোকানে সেলাই করিয়ে নিচ্ছিলেন আলিবাবা। সেই সময় একজন ভক্ত প্রশান্ত রায় এসে পাশে বসে নিবিষ্ট হয়ে ঘণ্টার পর ঘণ্টা ছবি আঁকা দেখতো আর নিজের চেষ্টায় শিখতো। কারুকে কোন জিনিস গিলিয়ে খাওয়ানো যায় না। আরব্য উপন্যাসের ছবির পর্ব চলেছে জসিমউদ্দিন একদিন এসে হাজির ও পরিকল্পনার কথা শুনে কি বলে, জানেন?

—তিনি তো কবি, ছবির কি বলবেন?

—তিনি বললেন এক সপ্তাহে গড়ে যদি একটা ছবি হয় তো এক হাজার এক ছবি আঁকতে আরও বিশ বছর যাবে! তাছাড়া শরীর সুস্থ-অসুস্থ, মনের উদামও থাকা চাই। একটা জীবনে কি এ কাজ সম্পূর্ণ করা সম্ভব হবে?

—আপনি তখন জসিমউদ্দিনকে কি বললেন?

—ওগো কবি, তুমি ছবির কি জানো? হয়তো তুমি জানো না শিল্পী যখন ছবি আঁকতে শুরু করে, সে কি সময়ের হিসেব করে বসে। সে জানে তার সম্মুখে অনন্তকাল পড়ে আছে। আর আছে অনন্ত জীবন। এর শেষ নেই কোনদিন। এই রং, এই তুলি আর এই তুলোট কাগজ চিরন্তন হয়ে থাকবে। অজন্তার গুহার গায়ের ছবির কথা ভেবে দেখো। কত শিল্পী বংশানুক্রমে গুহার গায়ে শিল্পের ধারা কয়েক শতাব্দী ধরে অব্যাহত এঁকে গেছেন। তাদের কেউ তো ভাবেনি 'আমি নিজের সৃষ্টির মধ্যে আমি নিজের নাম রেখে যাব'—তাদের নাম কি আজ কেউ জানে? তবে সবাই জানে অমর শিল্পীর অমর চিত্রাবলীর কথা। তুমি কবিতা লিখছ কবিতা লিখে যাও। নকসী-কাঁথার মাঠ লিখতে যেন নকসা এঁকো না। বড় বৌমা, আরব্য উপন্যাসের কতগুলো ছবি আঁকা হয়েছিল?

বড়বৌমা পারুলদেবী আমার দিকে চেয়ে বললেন—যতদূর মনে হয় সাঁইত্রিশখানা ছবি এঁকেছিলেন, বাবামশাই। তা আরব্য উপন্যাসের হাজার কাহিনীর ছবিকে ছাড়িয়ে গেছে।

অবনীন্দ্রনাথ বললেন—ছবির নেশায় ছবি আঁকি। আর্টস্কুলের ভাইস প্রিন্সিপাল করার জন্য তো ছবি আঁকিনি। আর ব্যবসায়ী বুদ্ধি তো আমাদের বংশের ধারার মধ্যে নেই যে কেমন করে ঐ শিল্পের ভেতর থেকে সোনার নির্যাস বের করতে হয়।

প্রশ্ন করলাম, আমি শুনেছি আপনাদের বাড়ীতে লাট বেলাট আসতেন?

—কত জনই না এসেছেন নানা দেশ থেকে। সেবার কি হল মণ্টেগু সাহেব আমার 'সাজাহানের মৃত্যু' ছবিখানা দেখে মুগ্ধ। রাজা রাজড়ার বাড়ীতে এসে বড়লাট সাহেব কিছুর প্রশংসা করলেই সেটী যাবার সময় গাড়ীতে তুলে দেওয়ার রীতি। তিনি দাম জানতে চাইলে আমি বললাম এগুলি পরিবারের সম্পত্তি হয়ে গেছে বিক্রীর উপায় নেই। এই ছবিই এক-খানি এঁকে দেবো। আমি ক্যানভাসে তেল রংয়ের ছবির বদলে জল রংয়ে কাগজের উপর নকল করে দি। মণ্টেগু সাহেবকে পাঠানো হল তিনি তো মহাখুশী। শুনেছি অনেককে বলতে যে ঐ জলরংগা ছবি মূল ছবির চেয়ে নাকি ভাল হয়েছিল। মণ্টেগু সাহেব যখন দেশে ফিরে গেলেন শুনেছি তিনি তাঁর নিজস্ব সংগ্রহাগারে যত্নের সঙ্গে রেখে দিয়েছিলেন ঐ ছবি।

—আমি দেখেছি বিখ্যাত শিল্পীদের আঁকা অমর চিত্র ল্যুভার সংগ্রহশালায় গিয়ে নকল নবিশরা নকল করে চলেছেন দিনের পর দিন। ওগুলো কোন না কোন সংগ্রহ-শালায় টাঙিয়ে রাখবে। এসব শিল্পী এর জন্য অর্থ উপার্জনও করেন।

—আজকাল নকল করা এও একটা ব্যবসা হয়েছে। ছবি নাকি ঐসব যাদুঘর থেকে মাঝে মাঝে চুরিও যায়।

মাঝে মাঝে চুরি যাচ্ছে। ভারতবর্ষের কত মন্দিরের গা থেকে কত না মূর্তি বাইরে বিক্রি হয়ে চলে যাচ্ছে। আমি শিল্পী নই, তাই শিল্পগুরুর শিল্পসৃষ্টির মধ্যে কতটা ভাবলাবণ্য, বর্নিকাভঙ্গম, সাদৃশ্য এনাটমী, পারস্পেকটিভ, ডেপথ্, শেড এণ্ড লাইট, স্পেশ, মুভমেন্ট প্রভৃতির নিয়মাবলী কতটা নির্ভুল প্রযুক্ত হয়েছিল তার বিশ্লেষণ করি। চিত্রের ভাবটিকে পূর্ণ-ভাবে ফুটিয়ে তুলতে যতটুকু রংয়ের প্রয়োজন, তার একটুও বেশী তিনি প্রয়োগ করতেন না। তাঁর বিখ্যাত ছবিগুলির মধ্যে চড়া রংয়ের চটক ছিল না—এই বৈশিষ্ট্যই আমার মনকে দোলা দিত। তিনি দর্শককে ভাববার অবকাশ দিতেন—দেখো আর ভাবো।

চটকদারী প্রচার শিল্প হিসেবে তিনি চিত্র-শিল্পের আদর্শ হিসেবে গ্রহণ করেন নি। শুধু তন্ময় হয়ে দেখবার সুযোগ দিয়েছেন। দেখা যেন মেটে না। মনে হয় শুধুই দেখি, আর ভাবি সেই শিল্পের যাদুকরকে। মনে পড়ে ভিক্টর হুগোর আজীবন নির্বাসনে সমুদ্রের দিকে চেয়ে থাকা আর ভাবা। আর মনে পড়ে সেই দক্ষিণের বারান্দা। সেই-খান থেকে মন চলে যায় কল্পনা রাজ্যে ৫নং দ্বারকানাথ ঠাকুর লেনের দক্ষিণের জোড়া জোড়া থাম দেওয়া বারান্দায় যেখানে তিন ভাই বসে আঁকছেন—গগনেন্দ্রনাথ, অবনীন্দ্রনাথ, সমরেন্দ্রনাথ (শেষ বয়সে)।

শিল্পজগতে অবনীন্দ্রনাথের শ্রেষ্ঠ অবদান হল তিনি বর্তমান চিত্রশিল্পে স্বকীয় ভারতীয় ধারার প্রবর্তনা আনেন। সেই ধারার মধ্যে প্রভাব পড়েছে গান্ধার শিল্পের, বৌদ্ধ শিল্পের, অজন্তার শিল্প-কলার ও অন্যান্য স্থানীয় চিত্রকলার, কিন্তু তারা আপন স্বকীয় সত্তা এখানে এসে হারিয়েছে যেমন নদী এসে সমুদ্রে আপন সত্তা হারায়। তিনিই অবহেলিত, অবজ্ঞাত, অপ্রচলিত ভারতীয় চিত্রশিল্পকে উজ্জীবিত করেন। কারণ সময় ছিল উপযোগী; সেই সময় স্বদেশী যুগ। ভারতীয় জীবনের নানা ক্ষেত্রে স্বদেশীর অভিযান চলেছে আর চলেছে বিলাতি বর্জনের পালা। স্বদেশী সঙ্গীতের গতি অব্যাহত রাখলেন রবীন্দ্র-নাথ প্রমুখ কবিগণ, রাজনীতি ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হয়েছেন সুরেন্দ্রনাথ, বালগঙ্গাধর, গোখলে, মহাত্মা গান্ধী প্রমুখ নেতারা, স্বদেশী ওষুধ শিল্পে আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র কার্তিক বসু প্রমুখ বিজ্ঞানীরা। শিল্প-ক্ষেত্রে শিল্পাচার্য অবনীন্দ্রনাথ, শিল্প-বিশ্লেষণে আনন্দকুমার স্বামী প্রমুখ দিক-পালেরা। সেই ধারা অর্ধশতাব্দী অব্যাহত ছিলো। আজ আধুনিক শিল্প হিসেবে যা চলছে, তা হল বিদেশীয় শিল্পের নানান পরীক্ষা পর্যায়ের কোথাও সার্থক, বহুক্ষেত্রে বিকৃত অনুকরণ, কোথাও বা কিছুটা দেশীয় শিল্পের জারকরসে জারিত, কোথাও বা দেশীয় শিল্পের হালকা প্রলেপে ঢাকা।

একদিন প্রখ্যাত শিল্পী শ্রদ্ধেয় বন্ধুবর পূর্ণচন্দ্র চক্রবর্তী (যিনি এযাবত অন্ততঃ পঞ্চাশ হাজার নানান ধরনের ছবি এঁকেছেন) মহাশয়কে প্রশ্ন করেছিলাম আপনার লেখা ও আঁকা আরব্য উপন্যাসের ছবির সঙ্গে অবনীন্দ্রনাথের চিত্রগুলির কি পার্থক্য?

তিনি বললেন—আমার ছবি ফরমাস মত আঁকা।

—কে ফরমাস করল? আপনি নিজের ফরমাস মতই তো এঁকেছেন।

—মোটেই তা নয়। প্রকাশকরা ছাপাবেন আরব্য উপন্যাস তাই ঐ বইয়ের জন্য আঁকতে হয়েছে। আমি এঁকেছি অর্থের জন্য। শিল্পগুরু এঁকেছেন, ভাল লেগেছে বলে। ভাব এসেছে মনে, ভাবের তাগিদে, অন্তরের প্রেরণার তাগিদে তিনি এঁকেছেন। [illegible] কোন উদ্দেশ্য নিয়ে [illegible]।

দক্ষিণেশ্বরের জলকলের বাগানে অবনীন্দ্রনাথ

—দেখুন, আপনার এই আরব্য উপ-ন্যাসের ছবিগুলির এক অপূর্ব চোখ ধাঁধানো রং। দেখলেই টেনে নিয়ে যায় ছবির গভীরে।

—আমার তো কমার্শিয়াল আর্ট। চটকদার না করলে কেউ বই কিনবে না।

—আচ্ছা, আপনার আঁকার কি পদ্ধতি?

—আরব্য উপন্যাসের ছবিগুলো কী পদ্ধতিতে এঁকেছিলেন?

—একেবারে বিলিতি কায়দায়।

—কেন একথা রহস্য করে বলছেন? অজন্তা গুহাচিত্রের অঙ্কনশৈলীর সঙ্গে আপনার ছবিগুলো কী তুলনীয় নয়?

—আরে না, না। একেবারে বিলিতি ছবির ধাঁচে আঁকা। শিখেছি সাহেবের কাছে। তাদের আঁকা বহু ছবি দেখেছি আর এঁকেছিও সেইমত। তাতে যদি কিছু স্বদেশীয় থেকে থাকে তো তা অজান্তে এসেছে।

—গান্ধার কলার সঙ্গে কী ছবিগুলি তুলনীয় নয়?

—শুনেছি অনেকে বলেন এতে গ্রীক প্রভাব রয়েছে।

—হতে পারে। নতুন কিছু এলে তার কমবেশী কিছু প্রভাব পড়বেই। সেকেন্দার সাহেব ভারত আক্রমণের পর গ্রীক শিল্প-কলার অল্প-বিস্তর প্রভাব আর্যাবর্তে এসেছিল সত্য, কিন্তু ভারতে এসে তার নিজস্ব ধারা হারিয়েছে। শিল্প হিসেবে তা সম্পূর্ণ ভারতীয়। এ নিয়ে আনন্দ কুমার-স্বামী, ঈ, বি, হ্যাভেল বারবার সেই কথাই বলে গেছেন।

শিল্পগুরুর প্রতি অগাধ শ্রদ্ধা প্রকা-শিত হয়েছিল সেদিনের এই আলাপচারে।

শিল্পী অবনীন্দ্রনাথ শিল্পশিক্ষণের এক বিশেষ ধারা প্রবর্তন করেন। তার মূল তত্ত্ব হল, 'দেখো, শেখো আর আঁকো। তিনি ঐ ওজন, গজ, দড়ি সুতো, খড়ি, মাটামের পক্ষপাতী ছিলেন না। অন্তরের অনুভূতি ও প্রেরণায় দুই চক্ষুর সাহায্যে জ্ঞান আহরণ করে তুলি ও রংয়ের স্পর্শে তাকে জীবন্ত করে তোলার শিক্ষা দিতেন। নিয়ম-তান্ত্রিক বিদেশী পদ্ধতি অনুসরণে শিল্পীর স্বাধীনতা ক্ষুণ্ণ হয় তাই বারবার চোখ আর তুলির উপর নির্ভরশীল হতে শিক্ষা দিতেন। প্রাথমিক পর্যায়ে শিক্ষার জন্য অঙ্কনের সাধারণ রীতিনীতি অবশ্যই অনুশীলনের প্রয়োজন একথা অনস্বীকার্য। শিল্পাচার্য অবনীন্দ্রনাথ চিত্রচিত্রণে যদি প্রচুর [illegible] লাভ করেছিলেন, তবুও তিনি শিশুদের কথা বিস্মৃত হন নি। তার প্রমাণ

আমরা পাই পরিণত বয়সে 'সহজ চিত্রশিক্ষা বা 'চিত্রাক্ষর' প্রভৃতি পুস্তিকায়।

শিল্পগুরু অবনীন্দ্রনাথ ভারতীয় শিল্প-কলার মূল তত্ত্বকে অতি সরল, অতি ললিত ভাষার মাধ্যমে প্রকাশিত করেন তাঁর বাগেশ্বরী বক্তৃতামালার ঊনত্রিশটি বক্তৃতায়। তাঁর বিশ্লেষণমূলক শিল্পের ব্যাখ্যা ধীরে ধীরে গড়ে তোলেন তাঁর প্রথম প্রবন্ধ 'শিল্পে অনধিকার' প্রবন্ধে। আমরা ভারতবাসী হলেও নিজের শিল্প থেকে কতখানি দূরে সরে গেছি এবং বিদেশী হলেও তাঁরা এই ভারতশিল্পের রত্নবেদীর কতখানি নিকটে পৌঁছে গেছেন, তার উদাহরণ দিয়ে শিল্প-গুরু বুঝিয়েছেন। জাপানী শিল্পী 'ওকাকুরার' একান্ত ইচ্ছা জগন্নাথের মন্দিরের ভারতীয় শিল্পীর হাতে গড়া দেব-মন্দির, বৈকুণ্ঠ, আনন্দবাজার মায় দেবতাকে পর্যন্ত দেখবেন। তিনি তাই বললেন, শিল্পের অধিকার নিজেকে অর্জন করতে হয়। পূর্বপুরুষের সঞ্চিত ধন আইনবলে আমাদের হয়, সেই প্রথায় শিল্প কিন্তু আমাদের হয় না। কেননা শিল্প হল 'নিয়তিকৃত নিয়মরহিতা'। প্রবন্ধটির উপ-সংহারে এক অসাধারণ উক্তি করলেন: এত যে আয়োজন শিল্প শেখানোর—এর প্রয়ো-জন কোনখানটায়? যুগযুগান্ত ধরে বর্ষার আবির্ভাবে আকাশ মেঘে মেঘে ভরে যায় শুধু একজন কবির জন্য মেঘ অপেক্ষা করে-ছিল যিনি তাদের অমরত্ব দেবেন। কোন এক বিশেষক্ষণে কোন এক স্ফুলিঙ্গ কার অন্তরে আগুন জ্বালিয়ে দেবে; কোন এক পরমানন্দের কণা নিয়ে কোন আর্টিস্ট নিভৃতে বিচিত্র রূপ রসের সাধনায় নিমগ্ন হবেন। পৃথিবীর প্রচুর ধনরত্ন, মণি মাণিক্য রাজশিল্পী সাজাহানের জন্য অপেক্ষা করেছিল ময়ূর সিংহাসন ও তাজমহল নির্মাণে। তেমনি যে আমরাও আয়োজন করছি, চেষ্টা করছি, শিল্পের পাঠশালা শিল্পের হাট, কারুচ্ছন্দ, কলা-ভবন —এটা ওটা বসাচ্ছি সব সেই একটী আর্টিস্টের, একটি রসিকের জন্য সে হয়তো এসেছে কিংবা হয়তো আসবে।' শিল্পের অধিকার প্রবন্ধে শিল্পাচার্য বললেন 'নিয়তিকৃত, নিয়মরহিতা, হ্লাদৈক-ময়ী, অনন্য পরতন্ত্রা নব রস রুচিরার কথা 'পাথরের রেখায়-বাঁধা রূপ, ছবির রঙে বাঁধা রেখা, ছন্দে বাঁধা বাণী, সুরে বাঁধা কথা, শিল্পের এ সবই তো যে রস ঝরছে তারি নির্মিতি ধরে প্রকাশ পাচ্ছে; অখণ্ড রসের খণ্ড-খণ্ড টুকরো তো এরা—একটি আলো থেকে জ্বালানো হাজার প্রদীপ, এক শিল্পের বিচিত্র প্রকাশ। এর অধিকার পাওয়ার জন্য কোন আয়োজন, কোন শাস্ত্র-চর্চাই দরকার করে না। শুধু দেখো আর লেখো, শুনে যাও আর বসে থাকো।

চিত্র শিল্পের বিশ্লেষণে শিল্প গুরু বললেন, কথা বলতে গেলে ব্যাকরণ মানতে হয়। কথার ব্যাকরণ হল ধাতু যা ভাষাকে ধরে থাকে তেমনি শিল্পের ব্যাকরণ হল কাঠামো বা Form। পূর্বাচার্যগণীয় ভাষায় হিসেব করে পন্ডিতরা বললেন, এটা হল 'প্রকৃত', এটা 'মাগধী', এটা 'ভোজপুরী' এটা 'অপভ্রংশ', এটা মিশ্রিত বা সংস্কৃত তেমনি আর্টের ক্ষেত্রেও শিল্পগুরুর বিশ্লেষণে শাস্ত্রীয় শিল্প (Academic Art) লোকশিল্প (Folk Art), পরশিল্প (Foreign Art) ও মিশ্রশিল্প (Mixed Art) 'লোকশিল্প' বলতে তিনি বোঝালেন যে সব আর্ট শাস্ত্রীয় লক্ষণের সঙ্গে না মিলেও মন হরণ করে যেমন পট পাটা, ঘটি বাটী, গহন গাঁটি, থালা বাসন, কাপড়-চোপড়, শাল দোশলা। শিল্পশাস্ত্রের নির্দেশ মেনে 'পণ্ডিতানাং মতম্' নিয়ে রচিত শিল্প হ'ল শাস্ত্রীয় শিল্প, যেমন দেব-দেবীর মূর্তি রচনা। পর শিল্পের উদাহরণ পাট গান্ধার শিল্প, একালের অয়েল পেন্টিং বা তৈল চিত্র। মিশ্র শিল্পের পর্যায়ে পড়ে চীনের বৌদ্ধ শিল্প, জাপানের 'নারা' মন্দিরের শিল্প, গ্রীসের ছাঁচে ঢালা স্থান বিশেষের বৌদ্ধ শিল্প, এশিয়ার ছাঁচে ঢালা এখনকার য়ুরোপীয় শিল্প এবং বর্তমানের বাংলার চিত্র কলার পদ্ধতি।

জ্ঞানের অধিষ্ঠাত্রী দেবীকে বলা হয় সরস্বতী-যিনি নদীর জলের মত সরে সরে যান, স্থির থাকেন না। স্থির থাকার রীতি নয়, স্থির থাকলেই মৃত্যু: গমন করে বলেই এই দৃশ্যমান হল জগৎ। সাহিত্যের গতি মানুষের মনের গতির সঙ্গে ভাবের গতির সঙ্গে ভাষার গতিরও পরিবর্তন হয়। গানের বেলাও সুরের গতি পরিবর্তিত হয় তেমনি ছবির বেলাও স্টাইল উল্টে-পাল্টে সামনের দিকে এগিয়ে চলে। এগিয়ে চলা ওর ধর্ম। কিন্তু অগ্রগতির মাত্রায় হয়তো সব সময় সমান উৎকর্ষতা লাভ নাও করতে পারে।

শিল্পের গতি সব সময় অব্যাহত; এর স্থবিরাবস্থা নেই পৃথিবীর মত ললিত কঠোরের মিলনে প্রবীণা হলেও চির নবীনা। যে হেতু মানব প্রকৃতি ও বিশ্ব প্রকৃতির মিলনে যখন শিল্পের জন্ম; তাই তা শাশ্বত ও চিরন্তন।

বিংশ শতাব্দীর প্রথম দশকে বিলেতের এক খ্যাতিমান শিল্প-সমালোচক অবনীন্দ্র-নাথের তৎকালীন রচিত 'ওমর খৈয়ামে'র উপর চিত্র প্রসঙ্গে বলেন:

> Omar Khayam has been illustrated by some of the best English artists, but these illustrations of Mr. Tagore's hold their own against any in the field.

যেখানে ভারতীয় শিল্পী ইংরাজি নকলনবিশি করেছে সেখানে খ্যাতি পায়নি

> "The work of those Indian artists who have so long slavishly imitated south kensington methods have not stirred so much as a ripple in European art circles, but Mr. Abanindranath Tagore's work has, been treated with the utmost reverence by our foremost art journal."

এমনি করে ধীরে ধীরে তিনি তাঁর বক্তব্য রাখলেন: বোঝাতে চাইলেন শিল্পীর পরিভাষায় নয়, সহজে সাধারণ সবার কাছে পৌঁছুতে পারে সরল ভাষায় গভীর ভাবের তত্ত্ব। দৈনন্দিন ঘটনা ও নিত্য-নৈমিত্তিক ক্রিয়াকাণ্ড থেকে উপমা টেনে বোঝালেন শিল্পের সুগভীর তত্ত্ব, অপূর্ব নন্দনতত্ত্ব। চললো তাঁর বলা—দৃষ্টি ও সৃষ্টি, শিল্প ও ভাষা, শিল্পের সচলতা ও অচলতা, সৌন্দর্যের সন্ধান, শিল্প ও দেহতত্ত্ব, অন্তর-বাহির, মত ও মন্ত্র, শিল্পশাস্ত্রের ক্রিয়াকাণ্ড, শিল্পীর ক্রিয়াকাণ্ড, শিল্পের ক্রিয়া-প্রক্রিয়ার ভালমন্দ, রস ও রচনার ধারা, শিল্পবৃত্তি, সুন্দর, অসুন্দর, জাতি ও শিল্প, অরূপ না রূপ, রূপবিদ্যা, রূপ-দেখা, স্মৃতি ও শক্তি, আর্য ও অনার্য শিল্প, আর্য শিল্পের ক্রম, রূপ, ভাব, লাবণ্য, সাদৃশ্য ও বর্ণিকাভঙ্গম।

শিল্প ও সাহিত্যের ক্ষেত্রে শিল্প-গুরুর অসামান্য দানের মূল্যায়ন শুরু হয়েছে। এই নব-মূল্যায়নের মধ্য থেকে আমরা ঠাকুরবাড়ির আর এক জ্যোতির্ময় মহাপুরুষের পূর্ণাঙ্গ পরিচয় পাব। বাংলার নবজন্মে যে-সব মনীষীদের দান অবিস্মরণীয় শিল্পগুরু তাঁদের মধ্যে এক বরণীয় পুরুষ এ-কথা বাঙালী সকৃতজ্ঞ চিত্তে স্মরণ করবে।

।। শেষ ।।

শরৎচন্দ্রের কবিমানস

প্রীতি সরকার

শরৎচন্দ্রের মনের শিল্পশালায় উপাদানগুলি উপন্যাস হিসেবে প্রকাশের পথ বেছে নিলেও শরৎচন্দ্র ছিলেন কবিপ্রাণ-পুরুষ। বোধকরি তিনি সহজ ও সরল অভিব্যক্তির জন্য গদ্যের পথ বেছে নিয়েছিলেন।

জগৎ ও জীবনের প্রতি বিশেষ দৃষ্টিই তাঁর কবিমনের স্ফুরণ ঘটিয়েছে। শরৎচন্দ্রের কাব্যসত্তার দুইটি প্রকাশ—একটি প্রাকৃতিক বর্ণনা, দ্বিতীয়টি বাঙালী মধ্যবিত্ত পরিবারের মাধুর্য উপলব্ধির কাব্যিক অভিব্যক্তি।

কবিতা সর্বকালীন, কারণ আমাদের অনুভূতির আবেগের চিন্তার বিশুদ্ধতম নির্যাস কবিতায় প্রকাশ পায়। কবিতায় সেই মানুষটাই কথা কয়, যে মৌল মানুষ ঈর্ষা-প্রেম-ইচ্ছা-আশা-সুখ-দুঃখে জড়িয়ে আমাদের সকলের ইস্পিকরা জামার তলায় ধুকধুক করছে। সমাজজীবনের বিচিত্র পরিবর্তন সত্ত্বেও কবিতার রস পুরনো হয় না। মানুষ নামে যে সামাজিক জীবটাকে আমরা বাহিজীবনে সব সময় দেখি, তার সাজপোশাক হাবভাব রীতিনীতি যুগে যুগে বদলাচ্ছে, কিন্তু তারই বুকের তলায় যে ম্যাজিক্যাল জীবটা বাস করে, আমাদের অন্তঃজীবনের ভাঙাগড়ায় যার প্রবল প্রভাব অনুভব করে থেকে থেকে চমকে উঠি তার তো পরিবর্তন নেই। কবিতা তারই জীবন-চরিত।

অন্তর্নিহিত চিন্তাশীলতা না থাকলে কোনো কবির অনুভূতি বিচিত্র সুরে বেজে উঠতে পারে না। পৃথিবীতে দুই শ্রেণীর চিন্তাশীল কবি দেখতে পাওয়া যায়। এক শ্রেণীর কবি আছেন যাঁরা চিন্তা এবং বিচার দিয়ে জীবনের অনেক প্রশ্নের ও সমস্যার সমাধান করে ফেলে একটা নির্দিষ্ট সত্যে এসে পৌঁছান; দ্বিতীয় শ্রেণীর কবিরা যত বিচিত্র ভাবেই চিন্তা করুন না কেন, কবিতা লেখার সময়ে এঁরা যে অনুভূতিকে আশ্রয় করেন তা একাধিক বিভিন্ন চিন্তাপ্রসূত সত্য। সুতরাং সত্য যখন কবির মনের মধ্যে অনুভূতি হয়ে জেগে ওঠে তখনই তা একটি অখণ্ড নির্দিষ্ট অনুভূতি। কাজেই চিন্তাশীল কবি যখন অনুভূতিতে এসে পৌঁছন তখন তাঁর মধ্যে বিচিত্র সুরের সন্ধান পাওয়া যায় না। চিন্তা যত বিচিত্র হোক না কেন —এই বিচিত্র বিভিন্ন চিন্তাপদ্ধতি পরস্পরের সঙ্গে ঘাতপ্রতিঘাতের মধ্যে যে অনুভূতির সৃষ্টি করে তা একটিমাত্র অখণ্ড অনুভূতি। কিন্তু বৈচিত্র্য তো অনুভূতিতে নয়, বৈচিত্র্য এক অনুভূতি থেকে অন্য অনুভূতিতে যাতায়াতের পথের মধ্যে। এই যে এক অনুভূতি থেকে অন্য অনুভূতিতে যাতায়াতের পথ, সেই তো চিন্তার পথ। সুতরাং অনুভূতির সঙ্গে যাদের চিন্তা জড়িত হয়ে না যায় তাদের অনুভূতির মধ্যে বৈচিত্র্য খুব একটা বেশি পাওয়া যায় না। চিন্তাশীলতা ও অনুভূতি পৃথক হয়ে থাকলে চলে না—একটির সঙ্গে অপরটির ওতপ্রোতভাবে মিশে থাকা চাই। চিন্তার যেখানে শেষ অনুভূতির আরম্ভ হয় সেইখানে। আর, অনুভূতিকে আশ্রয় করেই কবিতা গড়ে ওঠে। কবিতা হল পৃথিবীর প্রতি কবির ভাব ও আনন্দময় বাণী যার সঙ্গে জীবনের যোগাযোগ অবিচ্ছেদ্য। আর কবি তিনি, যিনি বিশ্বলোকের সকল সৌন্দর্যরস পান করে সেই সৌন্দর্য থেকে উৎসারিত আনন্দের সন্ধান পেয়েছেন।

কবিত্ব কি? কবির কাজ কি? কবি অন্তর্জগৎ ও বহির্জগৎ পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে দেখে তার বিবিধ সত্য ও সৌন্দর্য প্রদর্শন করেন। তাতে পাঠক বা শ্রোতা মুগ্ধ ও আলোকিত হয়ে উন্নতির দিকে এগিয়ে যান, যে কবি তাঁর এই কবিত্ব দিয়ে জগৎকে মুগ্ধ ও উন্নত করতে সমর্থ হয়েছেন তিনিই শ্রেষ্ঠ কবি। আর যে কাব্যে নব রস সুন্দর ও বিশদরূপে সঞ্চারিত হয়ে লোককে সুখ, দুঃখ, ভয়, ভক্তি ইত্যাদিতে অভিভূত করে তাই কাব্য। কবিত্ব লোককে উন্নত করে, কাব্য লোককে মুগ্ধ করে। আবার প্রত্যেক কাব্যেই কবিত্বের কিছু না কিছু বিকাশ থাকে। অলৌকিক বিভূতিতে অন্তর্জগৎ ও বহির্জগৎ যিনি সুন্দরভাবে দেখেন, সেই পরমবস্তুর দিকে

শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

লোকের আস্থা আকৃষ্ট করতে পারেন, তিনিই তো কবি। রূপের মধ্যে রূপাতীত ভাব প্রত্যক্ষ করেন যিনি, প্রকৃত-পক্ষে তিনিই কবি।

শরৎচন্দ্রের কবিমানসও এই দিক দিয়ে বিচার করতে হয়। সাধারণের চোখে অন্ধকারের কোনো রূপ নেই, শরৎচন্দ্র তাকে দেখেছেন অপরূপ রূপে, তাঁর গ্রন্থ শ্রীকান্তের প্রথম খন্ডে তিনি আঁধারের রূপ বর্ণনা করে বলেছেন, 'রাত্রির যে একটা রূপ আছে, তাহাকে পৃথিবীর গাছপালা, পাহাড়-পর্বত, জলমাটি, বন জঙ্গল, প্রভৃতি যাবতীয় দৃশ্যমান বস্তু হইতে পৃথক করিয়া একান্ত করিয়া দেখা যায়, ইহা যেন আজ এই প্রথম চোখে পড়িল। চাহিয়া দেখি অন্তহীন আলো আকাশের তলে পৃথিবীজোড়া আসন করিয়া গভীর রাত্রি নিমীলিত চক্ষে ধ্যানে বসিয়াছে, আর সমস্ত বিশ্বচরাচর মুখ বুজিয়া নিশ্বাস রুদ্ধ করিয়া অত্যন্ত সাবধানে স্তব্ধ হইয়া সেই অটল শান্তি রক্ষা করিতেছে। হঠাৎ চোখের উপরে যেন সৌন্দর্যের তরংগ খেলিয়া গেল, মনে হইল কোনো মিথ্যাবাদী প্রচার করিয়াছে—আলোই রূপ, আঁধারের রূপ নাই। এতবড় ফাঁকি মানুষেরা কেমন করিয়া নীরবে মানিয়া লইয়াছে। এই যে আকাশবাতাস স্বর্গ-মর্ত্য পরিব্যাপ্ত করিয়া দৃষ্টির অন্তরে বাহিরে আঁধারের প্লাবন বহিয়া যাইতেছে। মরি! মরি! এমন অপরূপ

রূপের প্রস্রবন আর কবে দেখিয়াছি। এ ব্রহ্মান্ডে যাহা যত গভীর যত অচিন্ত্য যত সীমাহীন—তাহা ততই অন্ধকার, অগাধ বারিধি মসীকৃষ্ণ, অগম্য গহন অরণ্যানী ভীষণ আঁধার, সর্বলোকাশ্রয়, আলোর আলো, গতির গতি, জীবনের জীবন, সকল সৌন্দর্যের প্রাণপুরুষও মানুষের চোখে নিবিড় আঁধার, কিন্তু সে কি রূপের অভাব? যাহাকে বুঝি না, জানি না, যাহার অন্তরে প্রবেশের পথ দেখি না—তাহাই তত অন্ধকার। মৃত্যু তাই মানুষের চোখে এত কালো, তাই তার পরলোকের পথ এমন দুস্তর আঁধারে মগ্ন। তাই রাধার দুই চক্ষু ভরিয়া যে রূপ প্রেমের বন্যায় জগৎ ভাসাইয়া দিল তাহাও ঘনশ্যাম, কখনও এ সকল কথা ভাবি নাই কোনোদিন এ পথে চলি নাই, তবুও কেমন করিয়া জানি না এই ভয়াকীর্ণ মহাশ্মশানপ্রান্তে বসিয়া নিজের এই নিরুপায় নিঃসঙ্গ একাকীত্বকে অতিক্রম করিয়া আজ হৃদয় ভরিয়া একটা অকারণ রূপের আনন্দ খেলিয়া বেড়াইতে লাগিল এবং অত্যন্ত অকস্মাৎ মনে হইল, কালোর যে এত রূপ ছিল, সে তো কোনোদিন জানি নাই। তবে হয়ত মৃত্যুও কালো বলিয়া কুৎসিত নয়, একদিন যখন সে আমাকে দেখা দিতে আসিবে, তখন হয়ত তার এমনি অফুরন্ত সুন্দর রূপে আমার দুই চক্ষু জুড়াইয়া যাইবে। আর সে দেখার দিন যদি আজই আসিয়া থাকে, তবে হে আমার কালো? হে আমার অভ্যাগ্র পদধ্বনি! হে আমার সর্ব দুঃখভয় ব্যথাহারী অনন্ত সুন্দর, তুমি তোমার আঁধারে সর্বাঙ্গ ভরিয়া আমার এই দুটি চোখের দৃষ্টিতে প্রত্যক্ষ হও। আমি তোমার অন্ধতমসাবৃত নির্জন মৃত্যুমন্দিরের দ্বারে তোমাকে নির্ভয়ে বরণ করিয়া মহানন্দে তোমার অনুসরণ করি। সহসা মনে হইল তাই তো? তাহার ওই নির্বাক আহ্বান উপেক্ষা করিয়া অত্যন্ত হীন অন্তরবাসীর মত এই বাহিরে বসিয়া আছি কি জন্য, একেবারে ভিতরে, মাঝখানে গিয়া বসি না কেন?"

শ্রীকান্ত প্রথম পর্ব সূচনাতে শরৎচন্দ্র ঘোষণা করে বলার মতন করে বলেছেন যে, তিনি কবি নন, তখন তাঁর সেই ঘোষণাই কবিত্বের দ্যোতনায় পরিপূর্ণ হয়ে উঠেছে। তিনি যে প্রকৃতই কবি তাঁর এই ঘোষণার মধ্যেই তা ঘোষিত হয়ে উঠেছে।

শরৎচন্দ্রের পরমাত্মীয় ও অন্তরঙ্গ বন্ধু উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় শরৎচন্দ্র সম্বন্ধে বিস্তারিত বিবরণ লিখে পাঠকবর্গকে শরৎচন্দ্র সম্বন্ধে জানবার সুযোগ দিয়েছেন। তিনি তাঁর 'স্মৃতিকথা' গ্রন্থের প্রথম খন্ডে লিখেছেন, "আমার জানতঃ ঔপন্যাসিক শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের প্রাথমিকতম রচনা কি, মাঝে মাঝে আমাকে এই প্রশ্নের সম্মুখীন হতে হয়। এ প্রশ্নের উত্তরে আমি সর্বদাই বলি, একটি কবিতা। উত্তর শুনে অনেকেই বিস্মিত হন। কি আশ্চর্য, শরৎচন্দ্রও কবিতা লিখেছিলেন নাকি, কিন্তু এ কথায় প্রকৃতপক্ষে বিস্মিত হবার তেমন কিছু নেই। খ্যাতনামা বহু লেখকের সাধনার ইতিহাস অনুসন্ধান করলে আমরা দেখতে পাই, তাঁদের সাহিত্যসাধনার সূত্রপাত হয়েছিল কবিতা রচনা দ্বারা। অবশ্য সময়মতো তাঁরা কাব্যলক্ষ্মীকে প্রণাম জানিয়ে গদ্যনারায়ণের সমৃদ্ধতর এলাকার মধ্যে প্রবেশ করেছিলেন বটে, কিন্তু সঙ্গে নিয়ে গিয়েছিলেন কবিতা-সাধনাকালে আহৃত ছন্দ, লয় এবং ওজন সম্বন্ধে সুতীক্ষ্ণ জ্ঞান, গদ্যরচনার কালে যা পদে পদে তাঁদের কাজে লেগেছিল। সতর্ক লেখক মাত্রেই অবগত আছেন, গদ্যও একেবারে ছন্দোবর্জিত বস্তু নয়। একটি বাক্য রচনার পর কান যেন কেমন খুঁতখুঁত করতে আরম্ভ করেছে, কোথায় যেন ওজনের কেমন একটু ঘাটতি পড়ে যাচ্ছে। একটু অভিনিবেশের ফলে যথাস্থানে যথোপযুক্ত শব্দ সংযোজিত হওয়ামাত্র পরিপূর্ণতার মহিমায় কান খুশী হয়ে উঠল। এমন অভিজ্ঞতা পাকা প্রবীণ লেখকের নিকটও বিরল নয়। গদ্যরচনাতে ছন্দ এবং মাত্রা সম্বন্ধে শরৎচন্দ্রের অতি সূক্ষ্ম চেতনা যে ছিল, ঈষৎ ধৈর্যের সহিত তাঁর কোনো একটা পান্ডুলিপি পরীক্ষা করে দেখলেই তা ধরা পড়ে। এমন অনেকবার দেখা গেছে, সামান্য একটা হয়তো দুই অক্ষরের ক্ষুদ্র শব্দকে বাক্যের একই স্থানে বারবার দুইবার যোগ করে দুবারই কেটেছেন। তারপর তৃতীয়বার সেই শব্দটিকেই বাক্যের অন্য এক জায়গায় স্থাপন করে তবে নিরস্ত হয়েছেন। ছন্দ ও মাত্রা বিষয়ে এই জ্ঞান শরৎচন্দ্র কবিতা রচনার দ্বারা অর্জন করেছিলেন, এমন কথা অবশ্য আমি বলছিনে, কারণ আমি তাঁর একটিমাত্র কবিতারই সন্ধান পেয়েছিলাম। কিন্তু এ কথাও সত্য, যে কবিতার সন্ধান পেয়েছিলাম সেটি শরৎচন্দ্রের প্রথম চেষ্টার ফল বলেও মনে হয় না। তার মধ্যে শৈশবের অপরিণতির লক্ষণের চেয়ে কৈশোরের কতকটা সুপরিণতির লক্ষণ ছিল বলে মনে হয়। সুতরাং আলোচ্য কবিতাটির রচনাকালের পূর্বেও শরৎচন্দ্র কবিতা রচনার বিষয়ে খানিকটা হাত পাকিয়েছিলেন, সে কথা অনুমান করা যেতে পারে। তার কবলে পড়ে যে কবিতাটির অস্তিত্ব সম্বন্ধে আমি নিঃসন্দেহ এবং যে কবিতাগুলির অস্তিত্ব আমি অনুমান করছি সবগুলিই সেই একই ধ্বংসের পথে পথিক হয় নি। কবিতা রচনার কথা বাদ দিলেও, শরৎচন্দ্রের ন্যায় কবিতার অনুরাগী পাঠক খুব বেশী দেখা যায় না। রবীন্দ্রনাথের বড় বড় কবিতা এমন বিস্ময়জনকভাবে তাঁর মুখস্থ ছিল যে, পুস্তকের সাহায্য কিছুমাত্র না গ্রহণ করেও নির্ভুলভাবে তিনি সেগুলি আবৃত্তি করে যেতে পারতেন।

"শরৎচন্দ্রের যে কবিতাটি আমার পড়বার সৌভাগ্য হয়েছিল, তার আয়তনের চিত্র আমার মানসপটে এখনো সুস্পষ্টভাবে অঙ্কিত হয়ে আছে। শরৎচন্দ্রের হাতের মুক্তোর মতো সুন্দর অক্ষরে বেগুনে কালিতে লেখা ফুলস্ক্যাপ কাগজের একদিকেই শেষ করা ত্রিশ-বত্রিশ লাইনের একটি কবিতা। একমাত্র প্রথম লাইনটি ছাড়া তার অন্য কিছুই আমার মনে নেই। প্রথম লাইন হচ্ছে 'ফুলবনে লেগেছে আগুন'। মাত্র দশ অক্ষরের একটি অতি ক্ষুদ্র লাইন, কিন্তু অসাধারণ না হলেও একেবারে সাধারণও নয়। ফুলবনে আগুন লাগার কল্পনার মধ্যে নূতনত্ব শুধু নেই, এমন একটু মর্মান্তিকতার স্পর্শ আছে যা আমাদের মনকে সহজেই আহত করে। গোলাপ, মালতী, মল্লিকা, অপরাজিতা অগ্নির দহনে চড়চড় করে পুড়ে যাচ্ছে এ সত্যি একটা করুণ ট্র্যাজেডি, ফুলবন যদি উপমার ফুলবন হয় তা হলেও।"

"যদি প্রশ্ন ওঠে কাব্য কি, বলা যায় বাক্য রসাত্মং কাব্য। অর্থাৎ যে বাক্যের অর্থ কেবলমাত্র বাচার্থের মধ্যে সীমিত না থেকে একটা অতিরিক্ত অর্থের দ্যোতনা করে তাই কাব্য। যেমন রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন, 'সমাজ সংসার মিছে সব / মিছে এ জীবনের কলরব।'

তেমনি শরৎচন্দ্রও শ্রীকান্ত গ্রন্থের প্রথম খন্ডে নদী ও রাত্রি বর্ণনা প্রসঙ্গে বলেছেন, 'সে কথা আমি আজও ভুলতে পারি নাই, বায়ুলেশহীন নিস্কম্প, নিস্তব্ধ, নিঃসঙ্গ নিশীথিনীর সে যেন এক বিরাট কালীমূর্তি নিবিড় কালো চুলে দ্যুলোক ও ভূলোক আচ্ছন্ন হইয়া গিয়াছে।'

কাব্য দু-রকমের —গদ্য কাব্য ও পদ্য-কাব্য। মেঘদূত পদ্যকাব্য। বিদ্যাসুন্দর গদকাব্য। গদ্যকাব্যের অভিব্যক্তি সহজ ও সরল। পদ্যকাব্য ছন্দের গন্ডীতে বাঁধা।

রবীন্দ্রনাথ তাঁর পুনশ্চ কাব্যে ছন্দ সম্বন্ধে ভীরুতা বর্জন করে কাব্যের বিষয়-বস্তু সম্পর্কে সাহসী হয়েছেন কারণ তিনি বুঝেছিলেন ছন্দোবদ্ধ কাব্যের মত প্রাত্যহিক জীবনের তুচ্ছ পদার্থকে পরিহার না করেও চলতে পারে। গদ্য ও কাব্যের সমন্বয় ভাবানুযায়ী পর্ব বিন্যাসে সহজ, তা পদ্যে একেবারেই সম্ভবপর নয়। কবি কোনো তুচ্ছ জিনিসকেই বাদ দেন নি তাঁর পুনশ্চ কাব্যে। তাই এসব কাব্যের পক্ষে গদ্য অপরিহার্য বাহন, কারণ গদ্যকাব্যের সুবিধে হচ্ছে তার অভিব্যক্তি সহজ ও সরল, পদ্য কাব্যের ঐশ্বর্য এতে নেই কিন্তু এর একটি শান্ত মধুর রস আছে যা এর নিজস্ব সম্পদ। গদ্যে লিখিত শরৎচন্দ্রের শ্রীকান্ত গ্রন্থের প্রথম খন্ডে সাইক্লোনের বর্ণনা ভাবানুযায়ী পর্ব বিন্যাস করলে যা দাঁড়ায়, তা এই—

রাক্ষসী সাত শ নয়, শতকোটি
উন্মত্ত কোলাহলে এ দিকেই ছুটিয়া
আসিতেছে
রাক্ষসী নয়—ঝড়, আসিয়াও পড়িল।
এই দুর্জয় বায়ুর শক্তি সময় চেতনা দিয়া
অনুভব
মানুষের সামর্থ্যের বাইরে।
শুধুমাত্র একটা জ্ঞান দুঃখ সমস্ত অভিভূত
অস্পষ্ট অথচ নিঃসন্দেহ ধারণা
আমাকে সাগরের মাঝখানে উড়াইয়া ফেলিবে।

শরৎ রচনাবলীতে যে লিরিক্যাল আত্মাভিব্যক্তি শ্রীকান্তর মুখেই তা ব্যক্ত হয়েছে। এই লিরিসিজম শ্রীকান্ত গ্রন্থের ঐশ্বর্য। সাধারণ উপন্যাসে এই লিরিসিজমের অবকাশ থাকে না। তাই উপন্যাস হলেও শ্রীকান্ত কাব্য। শ্রীকান্ত উপন্যাস নয়, কারণ কোনো একটি বিশিষ্ট আখ্যান বস্তুকে কেন্দ্র

করে কোনরূপে উপন্যাসে একে গড়ে তোলা হয় নি। কেবল মাত্র লক্ষ্মীর আখ্যানটিকে অনুসরণ করে একটি ছোট উপন্যাস পাওয়া যায় বটে ১ম ও ৪র্থ খণ্ডে আখ্যানের যোগ সামান্য। এই প্রেমের কাহিনীতে ঘটনা-বাহুল্য নেই তবু এই অংশই আসল উপন্যাস, এ বিষয়ে ভারতচন্দ্রের সঙ্গে শরৎচন্দ্রের মিল আছে। বিদ্যাসুন্দর যেমন অন্নদামঙ্গলের গর্ভকাব্য শ্রীকান্ত-পিয়ারীর প্রণয়কাহিনী শ্রীকান্তের গর্ভকাব্য।

শরৎচন্দ্র যে কত বড় কবি তা শুধু শ্রীকান্তের চরিত্র ও দৃষ্টিভঙ্গীতে নয়, শ্রীকান্তের ভাষণেও অভিব্যক্ত। ইন্দ্রনাথের নির্ভীক স্বার্থত্যাগ ও সহজ বৈরাগ্যে বিমুগ্ধ শ্রীকান্তের কণ্ঠে গীতিকবিতা উচ্ছ্বসিত হয়েছে। শ্রীকান্তের মুখে বর্ণিত অন্ধকারের রূপ চমৎকার অদ্ভুতরসের চিত্র-বিস্ফারিত কবিতা। বিহারের গ্রামে শখের সন্ন্যাসী শ্রীকান্ত মাধুকরী করতে গিয়ে যে অভাগিনী বাঙ্গালী কন্যার শোচনীয় দশা দেখেছিলেন তার বর্ণনা করুণ রসের চমৎকার কবিতা। সাইক্লোনের স্মৃতিকথা বিবৃতি প্রসঙ্গে সমুদ্রের যে প্রলয়ঙ্করী মূর্তির বর্ণনা দিয়েছেন তাও অদ্ভুত রসের কবিতা। শ্রীকান্ত কমললতার কথোপকথনও যেন কবিতার পংক্তি পরম্পরা। আর মুরারিপুরের আখড়া শরৎচন্দ্রের কবিমনের সৃষ্টি। তিনি লিখেছেন, 'বৈষ্ণবের আখড়া একাধিক দেখিয়াছি কিন্তু মুরারিপুরের আখড়ার মতো আখড়া দেখি নাই।' শরৎচন্দ্র তাকে আপন মনের মাধুরী দিয়ে রং ফলিয়ে সম্পূর্ণাঙ্গ করেছিলেন। এও যেন একটি কাব্য। কমললতা এই কাব্যের নায়িকা। কমললতা পুরাদস্তুর ভাববিগ্রহ নয়। মৃণালকন্দের পঙ্ক তার সুরভিত অঙ্গে এখন যেন আর বিন্দুমাত্র নেই। প্রথমজীবন তার পঙ্কে মথিত বলেই বোধ হয় সে কমল। শরৎচন্দ্র লিখেছেন, 'ওর জীবনটা যেন প্রাচীন বৈষ্ণব কবিচিত্তের অশ্রুজলের গান। ওর ছন্দে মিল নাই, ব্যাকরণে ভুল আছে, ভাষায় ত্রুটি অনেক কিন্তু ওর বিচার ত সেদিক দিয়া নয়, ও যেন তাঁহাদেরই দেওয়া কীর্তনের সুর—মর্মে যাহার পশে সেই শুধু তাহার খবর পায়। ও যেন গোধূলি আকাশে নানা রঙের ছবি। ওর নাম নাই, সংজ্ঞা নাই—কলাশাস্ত্রের সূত্র মিলাইয়া ওর পরিচয় দিতে যাওয়া বিড়ম্বনা।'

শুধু কাহিনী রচনায় কেন, শরৎচন্দ্রের পত্র-রচনায়ও কবিমনের পরিচয় আছে। রেঙ্গুন থেকে তাঁর বাল্যসহচর বিভূতিভূষণ ভট্টমশাইকে লিখিত একটি পত্রে আছে, 'আমার ইতিহাস একটু শুনিবে? মধ্যে এই রেঙ্গুনে দাম্পত্য প্রেমচর্চা করিতে গিয়া হঠাৎ দেখিলাম পুরোপুরি গৃহী হইয়া পড়িয়াছি। দেড় বৎসরের মধ্যে সেই অসীম অপার প্রণয়ের তলা দেখি নাই। একদিন মৃত্যু কলহ বাধিয়া গেল এবং [illegible] পূর্বেই দেখিলাম গৃহিণী আমার অভিমান-[illegible]

করিয়াছেন। কাজেই আমি পোটলাপুঁটলী হাতে করিয়া এই ৩৬ নম্বর গলির চার তলার একটা ঘর ভাড়া লইয়া বিছানা পাতিয়া চিৎ হইয়া চুরুট টানিতে লাগিলাম। এটা যে কি হইয়া গেল আজো তাহার মীমাংসা করিতে পারি নাই। বধূ আমার ব্রহ্মদেশিনী ছিলেন না, খাঁটি স্বদেশী, যখন শুনিলাম তিনি [illegible]কন্যা কান মলিয়া এক হাত নাক-খত দিয়া ঐরাবতীতে স্নান করিয়া আসিলাম ও পরদিনই মেডিকেল সার্টিফিকেট দিয়া প্যাসেজ বুক করিয়া বিরহ জ্বালা শান্ত করিতে হংকং চলিয়া গেলাম। ফিরতি পথে কলিকাতায় গিয়াছিলাম মাত্র। শুনিয়াছি—চণ্ডিদাস নাকি ঐ রকম কি একটা করিয়া মাথুর লিখিয়াছিলেন, আমিও স্থির করিয়াছি বহু পূর্বে 'চরিত্রহীন' বলিয়া যেটা শুরু করিয়াছিলাম এইবার সেটা শেষ করিব।'

জীবনের যে ইতিহাস তার ভিতরও কোন জায়গায় লিরিক রসের সূক্ষ্ম অবসর থাকে। শরৎচন্দ্র সূক্ষ্মতম অবসরটুকু পরিপূর্ণ সদ্ব্যবহার করে কবিদৃষ্টি ও বিশিষ্ট রস প্রবণতার পরিচয় দিয়েছেন।

যিনি জোড়া দিয়ে রাখেন তিনিই কাব্যলক্ষ্মী। এই কাব্যলক্ষ্মী যার অন্তরে তিনিই তো কবি। এই কাব্যলক্ষ্মী কবির অন্তরে দুভাবে কাজ করেন। তাঁর প্রভাবে কোন কবি জ্বলন্ত আগ্নেয়গিরির মতো নিজেকে প্রকাশ করতে পারেন আবার কোনো কবি সুপ্ত আগ্নেয়গিরির মতো আলোড়ন তুলে ভূকম্পনের সৃষ্টি করেন। কাব্যলক্ষ্মী প্রথম পর্যায় কাজ করেছেন রবীন্দ্রনাথের মধ্যে, আর দ্বিতীয় পর্যায় কাজ করেছেন শরৎচন্দ্রের মধ্যে।

যেমন শ্মশান সম্বন্ধে আমাদের সাধারণ ধারণা এই যে—শ্মশান একটি ভয়ঙ্কর স্থান। শ্মশান সম্বন্ধে আমাদের মনে ভীতিও আছে। আমরা অনেক সময় একাকী শ্মশান-ভূমিতে যেতে ইচ্ছে করিনে। এটি অত্যন্ত শান্ত জায়গা। একটা সাম্যও আছে। এখানে সবাই সমান। জ্ঞানী, মূর্খ, ধনী, দরিদ্র সকলেই সমান। তাই শ্মশানের সবই নীরব, সবই নিশ্চুপ। এই জন্যে অনেক সময় কোনো শান্ত জায়গার একটু বিকৃত বিবরণ দিতে গেলে আমরা বলি — শ্মশানের শান্তি, অর্থাৎ এ শান্তি যেন পরিচ্ছন্ন ও সুন্দর শান্তি নয়।

অথচ শ্মশানের শান্তির মধ্যেও যে শ্রী আছে সৌন্দর্য আছে — এ কথা অনেক সময় আমাদের মনে থাকে না। শ্মশানকে আমরা অন্তরঙ্গভাবে ও সহৃদয়তার সঙ্গে দেখিনে, তাই বুঝি শ্মশানের প্রতি আমাদের এই ঔদাসীন্য।

কিন্তু যিনি কবি, যিনি ভাবুক, যিনি সহৃদয় তাঁর কাছে প্রত্যেক জিনিষই মর্যাদা পেয়ে থাকে। শ্মশানও তার কাছে রূপময় হয়ে ওঠে।

শরৎচন্দ্র এই শ্মশানের নিস্তব্ধ নিরাবরণ ও নিরাভরণ মূর্তির মধ্যেও রূপ প্রত্যক্ষ করেছেন। মধুমক্ষিকা ফুল থেকে মধু আহরণ করে শরৎচন্দ্রও শ্মশানের মধ্যে থেকে রূপ আহরণ করেছেন।

শরৎচন্দ্র তাঁর শ্রীকান্ত গ্রন্থে লিখেছেন জমিদার বন্ধুর আমন্ত্রণে শিকারের জন্য গিয়ে শ্রীকান্ত যখন শুনলেন তাঁর বাঙ্গালী কর্মকালে জেগে যায়, মহাশ্মশানের মতো একটা ভয়ঙ্কর স্থানে অমাবস্যা রাত্রে এক বাঙ্গালী যাবে এটা হাস্যকর ব্যাপার ছাড়া কিছুই নয়। শ্রীকান্ত তখন বাঙ্গালীর সাহস প্রমাণ করার জন্য একাই গেল অমাবস্যা রাতে—মহাশ্মশানে, সঙ্গে বন্দুক। শ্রীকান্ত বলছে, 'বাপ, চমকিয়া উঠিলাম। সম্মুখে চাহিয়া দেখি ধূসর বালুর বিস্তীর্ণ প্রান্তর, এবং তাহাকেই বিদীর্ণ করিয়া শীর্ণ নদীর বক্র-রেখা আঁকিয়া-বাঁকিয়া কোন্ সুদূরে অন্তর্হিত হইয়া গেছে। সমস্ত প্রান্তর ব্যাপিয়া এক একটা কাশের ঝোপ। অন্ধকারে হঠাৎ মনে হইল, এগুলো যেন এক একটা মানুষ—আজিকার এই ভয়ঙ্কর অমানিশায় প্রেতাত্মা নৃত্য দেখিতে আমন্ত্রিত হইয়া আসিয়াছে—এবং বালুকার আস্তরণের উপর যে যাহার আসন গ্রহণ করিয়া নীরবে প্রতীক্ষা করিতেছে — মাথার উপর নিবিড় কালো আকাশ সংখ্যাতীত গ্রহতারাও আগ্রহে চোখ মেলিয়া চাহিয়া আছে। হাওয়া নাই, শব্দ নাই, নিজের বুকের ভিতর ছাড়া, যতদূর চোখ যায়, কোথাও এতটুকু প্রাণের সাড়া পর্যন্ত অনুভব করিবার জো নাই। যে রাত্রিচর পাখীটা একবার বাপ বলিয়াই থামিয়াছিল সেও আর কথা কহিল না। পশ্চিম মুখে ধীরে ধীরে চলিলাম — এই দিকেই সেই মহাশ্মশান। একদিন শিকারে আসিয়া সেই যে শিমুল গাছগুলো দেখিয়া গিয়াছিলাম, কিছুদূরে আসিতেই তাহাদের কালো কালো ডালপালা চোখে পড়িল। ইহারাই মহাশ্মশানের দ্বারপাল। ইহাদের অতিক্রম করিয়া যাইতে হইবে। এইবার অতি অস্ফুট প্রাণের সাড়া পাইতে লাগিলাম। কিন্তু তাহা আহ্লাদ করিবার মত নয়। আরো একটু অগ্রসর হইতে তাহা পরিস্ফুট হইল। এক-একটা মা 'কুম্ভকর্ণের ঘুম' ঘুমাইলে তাহার কচি ছেলেটা কাঁদিয়া কাঁদিয়া শেষকালে নির্জীব হইয়া যে প্রকার রহিয়া রহিয়া কাঁদে। ঠিক তেমনি করিয়া শ্মশানের একান্ত হইতে কে যেন কাঁদিতে লাগিল। যে এ ক্রন্দনের ইতিহাস জানে না, এবং পূর্বে শুনে নাই— সে যে এই গভীর অমানিশায় একাকী সেদিকে আর এক পা অগ্রসর হইতে চাহিবে না, তাহা বাজি রাখিয়া বলিতে পারি। সে যে মানব-শিশু নয় — শকুন-শিশু — অন্ধকারে মাকে দেখিতে না পাইয়া কাঁদিতেছে — না জানিলে কাহারো সাধ্য নাই, এ কথা ঠাহর করিয়া বলে। আরো কাছে আসিতে দেখিলাম—ঠিক তাই বটে। কালো কালো ঝুড়ির মত শিমুলের ডালে ডালে অসংখ্য শকুন রাত্রিবাস করিতেছে এবং তাহাদেরই একটা দুষ্টু ছেলে অমন করিয়া আর্তকণ্ঠে কাঁদিতেছে।"

এই বর্ণনার মধ্যে শরৎচন্দ্রের কবিচিত্তটি উদ্ভাসিত।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের ইতিহাস

বিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায়

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

বৃটেনের এই বিমানযুদ্ধ চারিটি পর্যায়ে বিভক্ত ছিল। প্রথম দুই পর্যায়ে জার্মান বিমানবহর ইংলিশ চ্যানেলের উপর আধিপত্য বিস্তার এবং উহা নির্বিঘ্ন করিতে চাহিল, আর বৃটিশ বিমানবহর (R. A. F.) ও বৃটিশ বিমান ময়দান ও ঘাটিগুলিকে ধ্বংস করিতে চেষ্টা করিল। ইংলণ্ড অভিযান করিতে হইলে ইহাই ছিল প্রথম প্রয়োজন। কিন্তু এই প্রাথমিক পর্বে ব্যর্থ হইয়া বাকি দুই পর্যায়ে জার্মান বিমানবহর একবারে বে-পরোয়া আক্রমণ ও ধ্বংসলীলা বিস্তার লাভ করিতে লাগিল, যার উদ্দেশ্য ছিল বৃটেন ও বৃটিশ সাম্রাজ্যের মর্মকেন্দ্র লণ্ডনকে সম্পূর্ণরূপে চুরমার করিয়া দেওয়া, উহার যানবাহন ও সরবরাহ বিপর্যস্ত করা এবং তখনকার দিনের নিঃসঙ্গ যোদ্ধা বৃটিশ জাতিকে ভীতিবিহ্বল করিয়া তার নৈতিক শক্তি ধ্বংস এবং এভাবে তাকে আত্মসমর্পণে বাধ্য করা।

যদিও অল্পবিস্তর বিমান আক্রমণ পূর্বেই আরম্ভ হইয়াছিল, তথাপি ১৯৪০ সালের ৮ই আগস্ট (এই তারিখ বিতর্কিত) ছিল বৃটেনে জার্মান বিমান অভিযানের সরকারী উদ্বোধন তারিখ। ৮ই হইতে ১৮ই আগস্ট পর্যন্ত চলিল ইংলিশ চ্যানেল দখলের যুদ্ধ। তীরবর্তী শহর ও জাহাজগুলির উপর সারা গ্রীষ্মকালই আক্রমণ চলিল বটে, কিন্তু ৪০০ বিমানের ব্যাপক অভিযান শুরু হইল ৮ই আগস্ট তারিখ একটি কনভয়ের উপর আক্রমণের দ্বারা। ব্রাইটনের দক্ষিণ হইতে পোর্টল্যাণ্ড পর্যন্ত জার্মান বোমারুর হানা আরম্ভ হইল। বৃটেনের 'হারিকেন' ও 'স্পিটফায়ার' শ্রেণীর জঙ্গী বিমানগুলি জার্মানীর 'মেসারস্মিটস' এবং 'হেঙ্কেইল' ও জুংকার বিমানগুলিকে যেন শূন্যপথের দ্বৈরথ যুদ্ধে লিপ্ত করিল। বাণবিদ্ধ বিহঙ্গের মত বিমানগুলি বিদীর্ণ হইয়া মাটিতে পড়িতে লাগিল। ১৫ই আগস্ট ১৮০ খানা নাৎসী বিমান ধ্বংস হইল, তিনদিন পর ১৫৩ খানা, আর বৃটিশ পক্ষের মাত্র ৫৬টি বিমান ও ২৭ জন পাইলট নষ্ট হইল। প্রথম ১০ দিনে জার্মানী হারাইল ৬৯৭টি বিমান আর বৃটেন ১৫৩টি।

জার্মান বিমানবহরের বড়কর্তা ফিল্ড-মার্শাল গোয়েরিং এই ক্ষতির পরিমাণ দেখিয়া কিছু সাবধান হইলেন এবং সপ্তাহখানেকের মত বিশ্রাম লইয়া নূতন উদ্যমে তাঁর স্কোয়াড্রনগুলিকে পুনর্গঠন করিলেন। ফলে ২৪শে আগস্ট হইতে ৫ই সেপ্টেম্বর (১৯৪০) পর্যন্ত চলিল দ্বিতীয় পর্যায়ের আক্রমণ এবং ক্রমেই অধিকতর জঙ্গী বিমানের পাহারায় ইংলণ্ডের ব্যাপকতর এলাকায় জার্মান বোমারু হানা দিতে লাগিল। ৩০শে আগস্ট তারিখ একদিনে ৮০০ বিমান ইংলণ্ডে হানা দিল এবং তখনকার দিনের সংবাদপত্রে ইহা হাজার বিমানের আক্রমণ বলিয়া প্রচারিত হইয়াছিল। আর এ এফ-এর সঙ্গে চলিল ঘোরতর যুদ্ধ, কিন্তু এবারও জার্মানীরই ক্ষতি হইল বেশী—৫৬২টি নাৎসী বিমান ও ২১৯টি বৃটিশ বিমান ধ্বংস হইল, আর ১৩২ জন বৃটিশ পাইলট বিমান-ছত্রযোগে নিরাপদে মাটিতে অবতরণ করিল। নাৎসী বোমারুর দল দিবাভাগের এই যুদ্ধে আঁটিয়া উঠিতে না পারিয়া ক্রমে রাত্রিযোগে হানা দিতে লাগিল।......

৬ই সেপ্টেম্বর হইতে ৫ই অক্টোবর (১৯৪০) পর্যন্ত চলিল তৃতীয় পর্যায়ের আক্রমণ, যার প্রধান লক্ষ্য হইল লণ্ডন নগরীর ধ্বংসসাধন। দিবাভাগে ৩৮ বার হানা দিয়া এই শহরকে চূর্ণ করিবার চেষ্টা হইল এবং সেই সঙ্গে ইহার সুবৃহৎ যোগাযোগ ব্যবস্থা ও নাগরিকদের মনোবল ভাঙ্গিবারও দুরন্ত চেষ্টা চলিল। স্বয়ং গোয়েরিং একবার উড়িয়া আসিলেন ইংলণ্ডে এই আক্রমণ পরিচালনার জন্য। তাঁর ধারণা ছিল এই আঘাতেই লণ্ডন ধরাশায়ী হইবে। রাজধানীর চারিদিকে বিমানমারা কামানশ্রেণী সক্রিয় হইয়া উঠিল, আর 'স্পিটফায়ার' ও 'হ্যারিকেন' শ্রেণীর জঙ্গী বিমানগুলি জার্মান বোমারু ও জঙ্গীগুলিকে পর পর তিনটি বৃহৎ অর্ধবৃত্তের মত রেখাপথ ধরিয়া লণ্ডনের আকাশে বাধা দিতে লাগিল। নাৎসী বোমারুগুলি ('হেইঙ্কেল' ও 'জুংকার') এক্ষণে দিনরাত্রি উভয় সময়ে আসিতে লাগিল। কিন্তু রাত্রির অন্ধকারে তারা আসিত একক, অর্থাৎ জঙ্গী বিমানের পাহারা ছাড়া—২০ হইতে ২৫০ খানা পর্যন্ত এক-একবারের আক্রমণে। আর দিনের আলোতে তারা দেখা দিত জঙ্গী বিমানের ('মেসারস্মিটস্') পাহারায়—জঙ্গীগুলি তাদের পার্শ্ব ও পশ্চাদ্দেশ রক্ষা করিয়া চলিত। জার্মান বোমারু মরিয়া হইয়া লণ্ডনের বিস্তীর্ণ এলাকায় ব্যাপক ধ্বংসলীলা বিস্তার করিতে লাগিল। ডক, কারখানা, রেলপথ, গ্যাস ও ইলেকট্রিক প্ল্যাণ্ট এবং শত সহস্র গৃহ ধ্বংসস্তূপে পরিণত হইল। একমাত্র সেপ্টেম্বর মাসেই ১০ হাজার বোমা লণ্ডনের উপর নিক্ষিপ্ত হইল।—যার মোট পরিমাণ ছিল ১ হাজার টন অতি-বিস্ফোরক। ৩ মাসে লণ্ডনের ১২,৬৯৬ জন অসামরিক নরনারী প্রাণ হারাইল। এভাবে জার্মান বোমারু বিমান যে তাণ্ডবলীলার সৃষ্টি করিল, তার তুলনা ছিল না। তারা অধিকতর সংখ্যক জঙ্গী-বিমানের পাহারায় আসিতে লাগিল এবং ৭ই সেপ্টেম্বর লণ্ডন ডকের উপর প্রকাশ্য দিবালোকে ভয়ংকর বোমারু আক্রমণ অনুষ্ঠিত হইল। ৩৫০টি জার্মান বোমারু এই আক্রমণে যোগ দিল এবং বিখ্যাত টেমস নদী নিদারুণ অগ্নিশিখা ও ধূম্রজালে আচ্ছন্ন হইল। এক সপ্তাহ পর এক রবিবার রাত্রে ডিনারের শেষে ৫০০ বিমান পর পর দুইটি তরঙ্গের মত লণ্ডনের উপর নিদারুণ আঘাত হানিল। কিন্তু প্রত্যেকবারেই আর এ এফ অপূর্ব দক্ষতা ও সাহসিকতার সঙ্গে বাধা দিল এবং জার্মান বিমানগুলির প্রভূত ক্ষতিসাধন করিল।

বৃটেনের উপর জার্মান বিমান অভিযানের চতুর্থ বা শেষ পর্যায় ছিল ৬ই অক্টোবর (১৯৪০) পর্যন্ত। তখন দিবাভাগের আক্রমণে ব্যর্থ হইয়া জার্মান বিমানবহর একান্তরূপে নৈশ আক্রমণেই মনোনিবেশ করিল। লণ্ডন এবং বৃটেনের অন্যান্য ছোট-বড় শহরগুলিতে ক্রমাগত আক্রমণ চলিতে লাগিল। সামরিক, অসামরিক সমস্ত বস্তু ও স্থানের উপরেই জার্মান বোমারুগুলি যেন চোখ বুজিয়া কেবল 'ধ্বংসের খাতিরে ধ্বংস' কার্য চালাইল। আর জনসাধারণের চিত্তে ত্রাস সৃষ্টির জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করিল। সমগ্র লণ্ডন নগরী আগুনে ও বিস্ফোরক বোমায় জ্বালাইয়া পুড়াইয়া ভস্মসাৎ করিবার আসুরিক চেষ্টায় গোয়েরিংয়ের বিমানবহর মাতিয়া উঠিল। সেই সময় দগ্ধ লণ্ডন নগরীর বহ্ন্যুৎসব রাত্রির আকাশকে দস্যুর মশাল আলোকে দীপ্তশিখার মত বীভৎস করিয়া তুলিল। তথাপি লণ্ডনের নরনারীরা মনোবল হারায় নাই, আতঙ্কিত দিন বা রাতে আত্মসমর্পণের কথা চিন্তা করে নাই। বরং সৈন্য ও নাগরিক, বৈমানিক ও স্বেচ্ছাসেবক, এ আর পি ও দমকল, নার্স ও পুলিশ—

অর্থাৎ সর্বশ্রেণীর নরনারী একযোগে আত্মরক্ষার ও উদ্ধারকার্যে মন দিল। এমনকি সংবাদপত্রের প্রকাশ হইতে দৈনন্দিন অফিসের কাজকর্ম পর্যন্ত চালাইয়া যাইতে লাগিল। মিঃ চার্চিল এক বক্তৃতায় বলিলেন যে, মানুষের সংগ্রামের ইতিহাসে এমন অসাধ্য সাধনের কাহিনী আর শুনা যায় নাই।

'Never in the field of human conflict was so much owed by so many to so few!

অর্থাৎ এত অল্প লোকের কাছে এত বেশী সংখ্যক মানুষের ঋণী হওয়ার কথা এর আগে যুদ্ধের ইতিহাসে শুনা যায় নাই।

১৯৪০ সালের ৩১শে অক্টোবর জার্মান বিমান অভিযানের শেষ তরঙ্গ ভাঙ্গিয়া গেলেও বৃটেনের উপর সারা শীতকাল এবং ১৯৪১ সালের গ্রীষ্মকাল পর্যন্ত বিমান হানা চলিতে লাগিল—যদিও এর পর জার্মানী পূর্ব রণাঙ্গনে রাশিয়ার দিকে আক্রমণে অগ্রসর হইল। তারপরেও অবশ্য ইংলণ্ডের বার্মিংহাম, মাঞ্চেস্টার, লিভারপুল শ্রমশিল্পের শহরগুলিতে রাত্রিযোগে ইতস্ততঃ হানাদারি চলিতে লাগিল।

কিন্তু ১৯৪০ সালের ১৪ই নভেম্বর পূর্ণিমার রাতে সুন্দর আবহাওয়ায় মিডল্যাণ্ডের বিখ্যাত কভেণ্ট্রিতে ৪৫০ খানা জার্মান বিমানের যে আক্রমণ ঘটিল, তা' আজও উল্লেখযোগ্য হইয়া রহিয়াছে। চতুর্দশ শতাব্দীতে নির্মিত এই বিখ্যাত গীর্জাটি ধ্বংস হইয়া গেল এবং ৫৫৪ জন লোক নিহত হইল। ৯০০ বছর আগেকার লেডী গডিভার উপাখ্যানের জন্য এই শহর বিখ্যাত হইয়া রহিয়াছে। প্রকাশ যে, স্থানীয় লোকদিগকে অত্যাচার থেকে উদ্ধারের জন্য তিনি স্থানীয় শাসকের খেয়াল মিটাইতে গিয়ে বিবস্ত্রা হইয়া অশ্বারোহণে শহর পরিক্রমা করিয়া গিয়াছিলেন! ......

এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে, ১৯৪০ সালের ২৯শে ডিসেম্বর লণ্ডন মহানগরীকে 'আগুনে পোড়াইয়া মারিবার' জন্য ১০০ নাৎসী বিমান ও ৩ ঘণ্টা ধরিয়া হানা দিল, ১৫০০টি অগ্নিকাণ্ডের সৃষ্টি করিল। এই দাবানলের কোন তুলনা ছিল না এবং বোধহয় এই নরককুণ্ডের কথা আজ কল্পনা করাও সহজ নয়।

১৯৪০ সালে বৃটেনের উপর জার্মান বিমান অভিযানে লণ্ডনের অন্ততঃ ১০ লক্ষাধিক গৃহ ধ্বংস বা জখম হইল। ১৯৪১ সালের শেষ পর্যন্ত এই অভিযানের ফলাফল হিসাবে দেখা যায় যে, বৃটেনের উপর জার্মানী মোট ১ লক্ষ ৯০ হাজার টন পরিমাণ বোমা নিক্ষেপ করিয়াছে এবং হতাহতের সংখ্যা ছাড়াইয়া গেল তখনকার দিনের বৃটিশবাহিনীর ক্ষতির চেয়েও বেশী। (৭)

(৭) "The World At War", 1945 U.S.A. Infantry Journal.

কিন্তু বিস্ময়ের কথা এই যে, ৮ই অক্টোবর (১৯৪০) মিঃ চার্চিল কমন্সসভায় এক বক্তৃতায় বলেন যে, বিগত মহাযুদ্ধের তুলনায় এবারের বোমাবর্ষণে আনুপাতিক মৃত্যুর হার অনেক কম। লণ্ডনের এক রাত্রির বোমাবর্ষণের উল্লেখ করিয়া তিনি বলেন যে, ঐ রাত্রে ২৫১ টন বোমাবর্ষণের ফলে ১৮০ জন নিহত হইয়াছে। কিন্তু আগেকার মহাযুদ্ধে প্রতি এক টন বোমায় ১০ জন লোক নিহত হইয়াছে। অর্থাৎ এবার ১ টন বোমায় ১ জনেরও কম লোক মারা পড়িয়াছে, কিংবা বিগত ১৯১৪-১৮ সালের তুলনায় ১৩ ভাগের একভাগ মাত্র নিহত হইয়াছে। চার্চিলের মতে আধুনিক বোমা হইতে আত্মরক্ষার উপায়গুলিই ইহার প্রধান কারণ। তিনি অবশ্য অনেক বেশী হতাহতের জন্যই প্রস্তুত ছিলেন। প্রথম রাতের বোমাবর্ষণে ৩ হাজার নিহত এবং তারপর প্রতি রাতে ১২ হাজার করিয়া আহত হইবে, এই আনুমানিক হিসাবেই হাসপাতালে গোড়ার দিকে আড়াই লক্ষ হতাহতের জন্য ব্যবস্থা করা হইয়াছিল। কিন্তু বাস্তব ক্ষেত্রে ফলাফল এত মারাত্মক হয় নাই।

*

যদিও 'বৃটেনের যুদ্ধ' সামরিক ইতিহাসে প্রসিদ্ধ হইয়া রহিয়াছে, তবু এর আরম্ভের সঠিক তারিখ সম্পর্কে খ্যাতিমান ঐতিহাসিকদের রচনায়ও যথেষ্ট মতভেদ দেখা দেয়। যেমন, মার্কিন ঐতিহাসিক লুই স্নাইডারের মতে ফিল্ড মার্শাল গোয়েরিং ৬ই আগস্ট তারিখে হুকুম জারি করিয়াছিলেন ইংলণ্ডের উপর ব্যাপক বিমান আক্রমণ আরম্ভের জন্য। মেজর-জেনারেল জে এফ সি ফুলার তাঁর বইতে আক্রমণের তারিখ ৮ই আগস্ট বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। হেনরি পোলিং বলিয়াছেন ১২ই আগস্ট। অপরপক্ষে রণ-পণ্ডিত লিডেল হার্টের মতে বৃটেনের বিরুদ্ধে বিমানযুদ্ধ শুরু হইয়াছিল ১০ই আগস্ট। কিন্তু ঐতিহাসিক এ্যালান বুলক্ ও এ জি পি টেলর উভয়েই বলিয়াছেন যে, বৃটেনের বিরুদ্ধে বিমান অভিযান জার্মানীর মতে আরম্ভ হইয়াছিল ১৩ই আগস্ট এবং এই

অভিযানের নাম ছিল 'অপারেশন ঈগল'। আবার অন্য বৃটিশ মতে, যেমন পীটার ইয়ং তাঁর 'ডিসাইসিভ্ ব্যাটলস্' নামক গ্রন্থে লিখিয়াছেন যে, ইংলিশ চ্যানেলে বৃটিশ বাণিজ্য-জাহাজ বহরের উপর আক্রমণের শুরু দিয়া এই যুদ্ধের উদ্বোধন হইয়াছিল ১০ই জুলাই তারিখ। অন্য পরে কা কথা, স্বয়ং উইনস্টোন চার্চিল তাঁর প্রামাণিক ইতিহাস গ্রন্থে (দ্বিতীয় খণ্ড) ১০ই জুলাই তারিখটির কথা উল্লেখ করিয়া বলিয়াছেন :

> It was not until July 10 that the first heavy onslaught began, and this date is usually taken as the opening of the battle.

অর্থাৎ ১০ই জুলাই তারিখটিকেই বৃটেনের বিরুদ্ধে যুদ্ধারম্ভের উদ্বোধন হিসাবে সাধারণতঃ ধরা হইয়া থাকে।

কিন্তু স্বয়ং চার্চিল বলিলে কি হইবে, ১০ই জুলাই তারিখটিকে বৃটেনের যুদ্ধ আরম্ভের নিশ্চিত তারিখরূপে গ্রহণ করা কঠিন। (লিডেলহার্ট লিখিয়াছেন যে, ১লা জুলাই থেকেই ইংলিশ চ্যানেলে বৃটিশ-জাহাজের উপর আক্রমণ শুরু হয়েছিল।) কেননা, ফ্রান্সের যুদ্ধের পর হিটলার বৃটেনের সঙ্গে যে শান্তির আশা করিয়াছিলেন, সেই বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। এজন্য তিনি ৬ সপ্তাহ অপেক্ষা করিয়াছেন এবং ১৯শে জুলাই তারিখ রাইখস্ট্যাগের এক নাটকীয় বক্তৃতায় তিনি এই শা[ন্তি] প্রস্তাব উত্থাপন করিয়াছিলেন। কিন্তু [এই] শান্তি-প্রস্তাব প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই বৃ[টেন] কর্তৃক প্রত্যাখ্যাত হওয়ার পর হিট[লার] ইংলণ্ড আক্রমণের দিকে মন দেন। সুত[রাং] ১৯শে জুলাইয়ের শান্তি-প্রস্তাবের প[ূর্বে] ১০ই জুলাই তারিখেই বৃটেনের বিরু[দ্ধে] যুদ্ধ শুরু হইয়া গেল, এটা ঐতিহা[সিক] প্রমাণরূপে গ্রহণ করা কঠিন। বরং [৮ই,] ১০ই বা ১৩ই আগস্ট, এই তিনটির ম[ধ্যে] একটা তারিখকে গ্রহণ করাই বাঞ্ছনী[য়।] কারণ, ঐ সময় থেকেই নিয়মিত বিমান-যু[দ্ধ] শুরু হইয়াছিল। অবশ্য তার আগে কি[ছু] কিছু বিক্ষিপ্ত আক্রমণ ঘটিয়াছে, যা[হা] সেগুলিকে নিয়মিত যুদ্ধের আরম্ভ বলি[য়া] ধরিয়া লওয়া যায় না। তবে, বৃটিশ বিম[ান] দপ্তর জার্মান বিমানের ক্ষয়ক্ষতি সম্প[র্কে] যে-বিবৃতি দিয়াছেন, তাতেও ১০ই জুল[াই] থেকে ৩১শে অক্টোবর পর্যন্ত হিস[াব] দেওয়া হইয়াছে। সুতরাং দেখা যাইতে[ছে] বৃটিশ সরকারী মতেও ১০ই জু[লাই] তারিখই আক্রমণ বোধনের তারিখ—য[দিও] এই সম্পর্কে মতভেদ থাকিয়াই যাইবে।

জার্মানীর দুইটি বিমানবহরের বম্ব[ার] ও ফাইটার মিলাইয়া মোট শক্তি [ছিল] ২৮৩০টি বিমানের আর বৃটেনের প্র[থম] শ্রেণীর বিমান ছিল মোট হাজার-দেড়ে[ক।] এয়ার ভাইস মার্শাল স্যার হিউ ডাউডিংয়ে[র] নেতৃত্বে রয়েল এয়ার ফোর্সের ৫৫ স্কোয়াড্রন এই যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করিয়াছি[ল] এবং সেপ্টেম্বরের শেষের দিকে এই শ[ক্তি] বৃদ্ধি পাইয়া ৫৯ স্কোয়াড্রনে দাঁড়াই[য়া]ছিল। অর্থাৎ বিমান শক্তি উভয় পক্ষে প্র[ায়] সমান সমান ছিল।

কিন্তু বৃটিশ বিমানবাহিনীর শক্তি [ও] দক্ষতার সঙ্গে জার্মান বিমানবহর শে[ষ] পর্যন্ত পারিয়া উঠিল না। তথাপি এক[থা] স্বীকার করিতেই হইবে যে, জার্মান বিমা[ন]বহরের আক্রমণে এক সময় বৃটেন প্রায় পর[াজয়] পরাজয়ের মুখে আসিয়া পড়িয়াছিল[।] কেন্ট অঞ্চলে বৃটিশ জঙ্গী বিমানের [ও] ফাইটার ঘাঁটিগুলি ধ্বংস করার জ[ন্য] জার্মানী যে আক্রমণ শুরু করিয়াছি[ল] ৩০শে আগস্ট থেকে ৬ই সেপ্টেম্বর পর্য[ন্ত] তার পরিণতি ভয়ঙ্কর বিপদ ডাকি[য়া] আনিতেছিল। কিন্তু বৃটেনের কপালগু[ণে] ঠিক সেই সন্ধিক্ষণে জার্মান বিমানব[হর] তাদের আক্রমণের রণনীতি হঠাৎ বদলাই[য়া] ফেলিয়া লণ্ডন শহরের উপর বোমাবর্ষ[ণ] করিতে শুরু করিল। উদ্দেশ্য ধ্বংস ও ত্রা[স] সৃষ্টির দ্বারা বৃটিশ জনগণের মনোবল [ও] নৈতিক শক্তি ভাঙ্গিয়া দেওয়া। যদিও এ[ই] বোমারু অভিযানের ফলে ৩০ হাজার ন[র]নারী প্রাণ হারাইয়াছিল, তথাপি বৃটেনে[র] দৈনন্দিন জীবনযাত্রার তেমন কোন প্রত[্যক্ষ] ব্যাঘাত ঘটে নাই। কলকারখানা [ও] অফিসের কাজ যথানিয়মে চলিয়াছি[ল,] এমনকি শিশু ও বালক-বালিকাদে[র] স্থানান্তরণের পরেও বোমাবর্ষণের পূর্বে[র] ...

মধ্যেও ২ লক্ষ ৭৯ হাজার স্কুল ছাত্র-ছাত্রী লন্ডনেই ছিল। বোমারু আক্রমণ থেকে আত্মরক্ষার জন্য 'এন্ডার্সন শেলটার' নামে যে আশ্রয়স্থল নির্মিত হইয়াছিল, তাতে এবং লন্ডনের ভূগর্ভস্থ টিউব রেলওয়ের স্টেশনে ১ লক্ষ ৭৭ হাজার লোকে নিরাপত্তার সন্ধানে আশ্রয় নিত। এমনকি, প্রধানমন্ত্রীর নিরাপত্তা বিধানের জন্য পিকাডেলীর ভূগর্ভে ৭০ ফুট নীচে যে প্রকাণ্ড আশ্রয়স্থল ও দপ্তর নির্মিত হইয়াছিল, চার্চিল সাধারণতঃ সন্ধ্যা থেকে সেই পাতালপুরীতেই আশ্রয় নিতেন—অক্টোবরের মাঝামাঝি থেকে বছরের (১৯৪০) শেষ পর্যন্ত। চার্চিল বলিয়াছেন যে, সেখান থেকেই তিনি কাজকর্ম চালাইতেন এবং সেই ভূগর্ভে দিব্যি নিশ্চিন্তে ঘুমাইতেন। চার্চিল তাঁর এই ঘুম সম্পর্কে খুব সতর্ক ছিলেন এবং তাঁর বইতে অনেক বার এই ঘুম সম্পর্কে উল্লেখ করিয়াছেন।

বোমাবর্ষণের ফলে হাউজ অব কমন্স ধ্বংস হইয়া গিয়াছিল এবং একদিন বাকিংহাম প্যালেসেও বোমা পড়িল ও প্রাসাদের একটি অংশের প্রভূত ক্ষতি হইল। কিন্তু ঐতিহাসিকগণ বলিতেছেন যে, রাজা ষষ্ঠ জর্জ ও রানী খুব সাহসের পরিচয় দিয়াছেন। তাঁরা রাজপ্রাসাদেই বসিতেন এবং ঐ দুঃসময়ে তাঁরা কৃচ্ছ্রসাধনের জন্য স্বেচ্ছায় ভৃত্য বা পরিচারক ছাড়াই দৈনন্দিন কাজ চালাইতেন। রাজ-পরিবারকে যখন লন্ডন ত্যাগ করিতে বলা হইল, তখন রানী বলিলেন—'ছেলেপিলেরা আমাকে ছাড়া যেতে পারে না, আমি রাজাকে ছাড়া যেতে পারি না এবং রাজা অবশ্য আমাদের ছেড়ে যাবেন না।' অবশ্য প্রাসাদের ভূগর্ভে তাঁদের জন্য আশ্রয়স্থল নির্মিত হইয়াছিল। চার্চিল লিখিয়াছেন যে, বিমান আক্রমণ আরম্ভের সময় রাজা এবং তিনি কোন কোন দিন মধ্যাহ্নভোজনের টেবিল থেকে প্লেট ও গ্লাস ইত্যাদি নিজেরাই হাতে করিয়া নিয়া শেলটারে যাইতেন। বোমাবর্ষণে ধ্বংসকাণ্ডের ফলাফল দেখার জন্য রাজা ও প্রধানমন্ত্রী অনেক সময় একত্রে পরিদর্শনে বাহির হইতেন।

জার্মান বিমানবহরের আক্রমণে বৃটেনের দুঃখ-বিপদ ঘটিয়াছিল, তাতে সন্দেহ নাই এবং এই বিপদের বিরুদ্ধে রয়েল এয়ার ফোর্স (প্রায় হাজার-দেড়েকের মত পাইলট) অত্যন্ত কৃতিত্ব ও বীরত্বের সঙ্গে লড়িয়াছিলেন বটে, কিন্তু সেই সঙ্গে এ-কথাও স্মরণীয় যে, বৃটিশ পদার্থবিজ্ঞানীরা, বিশেষভাবে হেনরি টিজার্ড ও চার্চিলের ব্যক্তিগত উপদেষ্টা অধ্যাপক লিন্ডেম্যান এই সময় যে উন্নত ধরনের রাডার যন্ত্র আবিষ্কার করিয়াছিলেন, জার্মান বোমারু ও জঙ্গী বিমানের আক্রমণ প্রতিহত করার পক্ষে সেটা অত্যন্ত ফলপ্রসূ হইয়াছিল। এমনকি, জার্মানরাও পরে এই নূতন রাডার যন্ত্রের ভূয়সী প্রশংসা করিয়াছেন।

এই সময় ইংলণ্ড ইউরোপের 'নির্বাসিত' গভর্নমেন্টসমূহের আশ্রয়স্থল হইয়া উঠিল। পোল্যান্ড, চেকোশ্লোভাকিয়া, নরওয়ে, লাক্সেমবুর্গ, হল্যান্ড ও বেলজিয়মের গবর্নমেন্টসমূহ লন্ডনে আসিয়া আশ্রয় নিলেন এবং 'ফ্রান্সের স্বাধীনতার প্রহরী' (চার্চিলের বর্ণনা অনুসারে) জেনারেল দ্য গল 'ফ্রী ফ্রান্স' আন্দোলন গড়িয়া তুলিলেন। এর ফলে বৃটেনের পক্ষে যুদ্ধক্ষম লোকের সংখ্যা, আর্থিক সম্পদে এবং ৩০ লক্ষ টনেজের জাহাজী শক্তি বৃদ্ধি পাইল। ৩রা জুলাই ডঃ বেনেস (প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট) অস্থায়ী চেকোশ্লোভাক সরকারের রাষ্ট্রপতি বলিয়া স্বীকৃত হইলেন। আর 'বামপন্থী সোসিয়েলিস্ট' স্যার স্টাফোর্ড ক্রিপস মস্কোতে বৃটিশ রাষ্ট্রদূতরূপে প্রেরিত হইলেন সোভিয়েট রাশিয়ার সঙ্গে সম্পর্কের উন্নতিবিধানের আশায়—যদিও সে-আশা তখন পূর্ণ হইল না। এদিকে লন্ডনে কমিউনিস্টদের মুখপত্র 'ডেলী ওয়ার্কার' সরকারী আদেশে নিষিদ্ধ হইয়া গেল। অবশ্য কমিউনিস্টদের শক্তিও তেমন কিছু উল্লেখযোগ্য ছিল না। অপরপক্ষে বৃটিশ ফ্যাসিস্ট এবং জার্মান পক্ষপাতী লোকেদেরও দমন করা হইল। যুদ্ধকালীন জরুরী আইনের কবলে ইংলণ্ডের বিখ্যাত ফ্যাসিস্ট নেতা স্যার অসওয়াল্ড মোজলে (চমৎকার বক্তা ছিলেন) ও তাঁর পত্নীকে এবং একজন এম-পিকে আটক-বন্দী করা হইল। মোট ১৭৬৯ জন বৃটিশ-প্রজা অন্তরীণ হইয়াছিলেন, এঁদের মধ্যে ৭৬৩ জন ছিলেন বৃটিশ ফ্যাসিস্ট পার্টির সদস্য। ১৯৪৩ সালে মোজলে দম্পতীকে মুক্তি দেওয়া হইয়াছিল। ইংলণ্ডের সমাজজীবনে সেই সময় উল্লেখযোগ্য কোন রাজনৈতিক অশান্তি ছিল না এবং যদিও বৃটেনের বিরুদ্ধে 'বিদ্যুৎগতি বোমাবাজি' বা ব্লিৎজের সময় ইংরাজ নরনারী যথেষ্ট সাহস ও ধৈর্যের পরিচয় দিয়াছেন, তথাপি জীবনযাত্রার প্রভূত কষ্ট ছিল, ব্যাপক ধ্বংসকাণ্ড ও প্রাণহানি (প্রায় ৩০ হাজার) এবং ১ লক্ষ ২০ হাজার আহত ও বিকলাঙ্গ হওয়া ছাড়াও কিছু কিছু লোকের মস্তিষ্ক বিকৃতি ঘটিয়াছিল এবং নানা কারণে অনেকের স্বাস্থ্যের অবনতি হইয়াছিল। (৮)

•

বৃটেনের সঙ্গে আপোষরফায় আসার জন্য হিটলারের জার্মানী যে সমস্ত চেষ্টা করিয়াছিল, সেগুলির মধ্যে সবচেয়ে চমকপ্রদ হইতেছে প্রাক্তন সম্রাট অষ্টম এডওয়ার্ড (যিনি ১৯৩১ সালে একজন ডাইভোর্স-করা মার্কিন মহিলাকে বিবাহ করার জন্য সিংহাসন ত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন), বা ডিউক অব উইন্ডসরকে বাগে আনিবার চেষ্টা। ফ্রান্সের পতনের পর ডিউক এবং ডাচেস্ প্যারিস থেকে (সেখানে বৃটিশ মিলিটারী মিশনের সদস্যরূপে তাঁরা ছিলেন) স্পেনে চলিয়া গেলেন জার্মানদের হাতে পড়িবার আশঙ্কার জন্য। কিন্তু সেই সময় জার্মানদের পক্ষ থেকে এমন একটা ধারণার প্রচার করা হইতেছিল যে, ডিউক একান্তরূপেই চার্চিলের বিরোধী, জার্মানীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালাইবারও পক্ষপাতী নন এবং তিনি সন্ধি চাহেন ও পুনরায় বৃটিশ সিংহাসনে বসিতে চান। এমনকি, ডিউক এবং তাঁর পত্নীকে বাহামা দ্বীপের নবনিযুক্ত গভর্নররূপে জাহাজযোগে বাহামা যাত্রার আগে লিসবনে পাকড়াও করার জন্য এবং সেখান থেকে ডিউকদম্পতীকে অপহরণ করার জন্য নাৎসী গোয়েন্দাদের এক আজগুবি চক্রান্তও হইয়াছিল। কিন্তু পরবর্তীকালে (১৯৫৭) এই সমস্ত কথা রটনা হওয়ায় ডিউক প্রকাশ্য বিবৃতির দ্বারা তীব্র প্রতিবাদ জানান এবং বলেন যে, সমস্তটাই বানানো গল্প মাত্র। আর বৃটিশ পররাষ্ট্র দপ্তরও এক বিবৃতিতে ঘোষণা করেন যে, ডিউক কখনও বৃটেনের প্রতি তাঁর আনুগত্যের ব্যাপারে বিন্দুমাত্র ইতস্ততঃ করেন নাই।

কিন্তু ডিউকদম্পতীকে অপহরণের আজগুবী পরিকল্পনায় মত্ত, আর একটি

---

(৮) ইংলিশ হিস্ট্রি—টেলর পৃঃ ৬১২

ভয়ঙ্কর পরিকল্পনাও ছিল নাৎসী জার্মানীর। যদি জার্মানী বৃটিশ দ্বীপপুঞ্জ জয় করিতে পারিত, তবে, ইংরাজদের অদৃষ্টে কি ঘটিত? ১৯৪০, ৯ই সেপ্টেম্বর তারিখ জার্মান জেনারেল স্টাফ যে নির্দেশ-নামা প্রচার করেন, তাতে স্পষ্টই বলা হয় যে, জার্মান মিলিটারী প্রশাসন বৃটেনের সমস্ত সম্পদ ও শক্তি জার্মানীর সৈন্যবাহিনী ও যুদ্ধ পরিচালনার জন্য নিয়োগ করিবে। ১৭ থেকে ৪৫ বছরের সমস্ত ইংরাজ পুরুষকে ধরিয়া ইউরোপে চালান দেওয়া হইবে এবং বৃটিশ জাতিকে চিরদিন পদানত ও দাসত্ববন্ধনে আবদ্ধ করিয়া রাখা হইবে। ইউরোপে তাদের দিয়া দাস-শ্রমিকের কাজ করানো হইবে এবং বৃদ্ধ ও দুর্বলদিগকে পাইকারি হারে সাবাড় করা হইবে। অধিকৃত বৃটেনে গেষ্টাপোর তাদের রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত হইবে এবং এর উদ্দেশ্য হইল—

> The purpose was to exterminate physically not only progressive leaders but all the cream of the British intelligentsia as well as many leaders of the Consorvative and Liberal parties.

সোজা কথায় বৃটিশ সমাজজীবনের সমস্ত প্রগতিশীল এবং বাছাই-করা বুদ্ধিজীবীদের এবং রাজনৈতিক নেতাদের হত্যা করা হইবে!

এই 'সাধু সংকল্প' কার্যে পরিণত করার জন্য মোটামুটি 'আরম্ভ' হিসাবে ২৩০০ জনের একটা নামের তালিকাও স্থির হইল। বলা বাহুল্য যে, এই তালিকায় সর্বাগ্রে ছিল চার্চিলের নাম এবং অন্যান্য বিশিষ্ট নেতা, সংবাদপত্রের মালিক, সম্পাদক ও সংবাদদাতারাও এই তালিকা থেকে বাদ যান নাই। এইচ জি ওয়েলস, ভার্জিনিয়া উলফ, এডওয়ার্ড এম ফরেস্টার, আলডুস হাক্সলি, জে বি প্রিস্টলি, স্টিফেন স্পেন্ডার, সি পি স্নো, নোয়েল কাওয়ার্ড, রেবেকা ওয়েস্ট, ফিলিপ গ্রীবস, নরম্যান এঞ্জেল, গিলবার্ট মারে, বার্টরান্ড রাসেল, জন বি হ্যালডেন প্রভৃতি জগৎ-বিখ্যাত বিজ্ঞানী, মনীষী, সাহিত্যিক ও পণ্ডিত ব্যক্তিদের নাম ছিল নাৎসীরা যাদের খুন করার জন্য পরিকল্পনা করিয়াছিল। (৯)

•

সুতরাং ইংরাজদের খুব বরাৎ জোর যে হিটলারী ঘাতকদের হাত থেকে বাঁচিয়া গিয়াছিলেন।

যুদ্ধের গোড়া থেকেই উইনস্টোন চার্চিল মার্কিন প্রেসিডেন্ট ফ্রাঙ্কলিন ডি রুজভেল্টের সঙ্গে নিবিড় যোগাযোগ রক্ষা করিয়া চলিয়াছিলেন। কারণ, তিনি বুঝিয়াছিলেন যে, আমেরিকার সাহায্য ও সহযোগিতা ছাড়া এই যুদ্ধ জয় সম্ভব নহে। এজন্য তিনি রুজভেল্টের সঙ্গে পত্র ও তার বিনিময় শুরু করিলেন। এই বিরাট 'পত্র-সাহিত্য' যুদ্ধের ইতিহাসে বিখ্যাত হইয়া রহিয়াছে এবং কেউ কেউ (যেমন এ জে পি টেলর) বলেন যে, চার্চিলের এই পত্রগুলিই তাঁর রচিত সুবিখ্যাত মহাযুদ্ধের ইতিহাসের মূল উপাদান।

জার্মানীর আক্রমণের আশংকায় অস্ত্র সাহায্যের জন্য চার্চিল মার্কিন প্রেসিডেন্টের নিকট যে আবেদন করিয়াছিলেন, তার ফলে ১৯৪০ সালের জুন মাসে আমেরিকার কাছ থেকে প্রথম কিস্তী হিসাবে প্রথম মহাযুদ্ধের আমলের (১৯১৭-১৮) ৫ লক্ষ এনফিল্ড রাইফেল, ১৩ কোটি গুলীবারুদ, ৯০০ ফিল্ডগান (৭৫ এম এম) ও ১০ লক্ষ গোলাগুলী এবং ৮০ হাজার মেসিনগান পাওয়া গেল। এগুলির মোট মূল্য ছিল ৩ কোটি ৭০ লক্ষ ডলার। এছাড়া আগস্ট মাসে আমেরিকার কাছ থেকে ৫০ খানা পুরনো ডেস্ট্রয়ারও পাওয়া গেল। কিন্তু এর বিনিময়ে বৃটেনকে ওয়েস্ট ইণ্ডিজের অন্তর্গত এবং অতলান্তিক মহাসমুদ্রে অবস্থিত নিউফাউন্ডল্যান্ড, বারমুদা, বাহামা, জ্যামাইকা, ত্রিনিদাদ, বৃটিশ গিনি ইত্যাদি দ্বীপগুলি নৌ ও বিমানঘাঁটি স্থাপনের উদ্দেশ্যে আমেরিকাকে ৯৯ বছরের জন্য লীজ দিতে হইল।

বিমান আক্রমণের দ্বারা বৃটেনকে ঘায়েল করিতে না পারিয়া অবশেষে হিটলার রণে ভঙ্গ দিলেন এবং ২১শে অক্টোবর 'অপারেশন সী-লায়ন' বা সিন্ধু ঘোটকের অভিযান বাতিল হইয়া গেল কিম্বা পরবর্তী বসন্তকালের জন্য মুলতুবী রহিল। বলা বাহুল্য যে, সেই অভিযানের আর পুনরাবৃত্তি হইল না। কারণ, ততদিনে জার্মানী রাশিয়া আক্রমণের জন্য মন দিয়াছে। তথাপি জার্মান সেনাপতিদের (যেমন, ফিল্ড-মার্শাল ম্যানস্টাইন) অভিমত এই যে, ইংলণ্ড আক্রমণ করিতে না পারা কিম্বা না করা হিটলারের পক্ষে ভুল হইয়াছিল। কারণ, জার্মানী যদি বৃটেন জয় ও দখল করিতে পারিত, তবে পরবর্তীকালে বৃটিশ দ্বীপপুঞ্জ হইতে সমুদ্র পাড়ি দিয়া ইউরোপীয় ভূভাগে অভিযান চালানো সম্ভব হইত না।

পশ্চিম জার্মানীর ঐতিহাসিকদের (যেমন, কারল্ ক্লি — Karl Klee

ধারণা এই যে, ডানকার্কের পরেই ইংলণ্ডে অবতরণ ও আক্রমণ সম্ভব ছিল এবং তখন ইংলণ্ড জয়ের সুবর্ণ সুযোগ গিয়াছে।

কিন্তু যা ঘটে নাই, তা নিয়ে তর্ক করা চলে না। তবে, অতীতের দিকে তাকাইয়া দেখা যাইতেছে যে, বৃটেনের প্রতিরক্ষা যুদ্ধে জয়লাভ করার পর চার্চিলের মর্যাদা ও ক্ষমতা এত বাড়িয়া গেল যে, তিনি যেন ইংরাজ জাতির সমগ্র যুদ্ধ প্রচেষ্টার একমাত্র নিয়ামক হইয়া উঠিলেন। সমস্ত সমর বিভাগের উপরেই তাঁর আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হইল। তথাপি পার্লামেণ্টারি গণতন্[illegible] প্রতি চার্চিল যথাসম্ভব শ্রদ্ধা বজা[illegible] রাখিয়াছিলেন এবং রাজা ও সিংহাসনে[illegible] প্রতি একটি রোমান্টিক অনুরক্তি বা আনুগ[illegible] দেখাইতেন। কিন্তু বৃটিশ ঐতিহাসিকে[illegible] যেমন—টেলর, সীডেলহার্ট ও জে এফ [illegible] ফুলার প্রভৃতি শহরের অসামরিক জ[illegible] গণের উপর বোমাবর্ষণ যাকে সামরি[illegible] শাস্ত্রানুসারে স্ট্রাটেজিক বম্বিং বা র[illegible] নৈতিক বোমারু আক্রমণ বলা হয়, [illegible] আগে শুরু করার জন্য চার্চিলের উ[illegible] দোষারোপ করিয়াছেন। কারণ, তাঁদের ম[illegible] গোড়ায় হিটলারের এদিকে তেমন ই[illegible] ছিল না। সৈন্যবাহিনীর আক্রমণের স[illegible] সহযোগিতা করার জন্য যে বোমা অভিযান ঘটিয়া থাকে, এই ক্ষেত্রে সে-ক[illegible] বলা হইতেছে না—যেমন পোল্যান্ড [illegible] পশ্চিম রণাঙ্গনে, কিন্তু যে-সামরিক জ[illegible] গণের নৈতিক শক্তি ভাঙ্গিবার জন্য [illegible] 'রণনৈতিক বোমা' বর্ষিত হইয়া থা[illegible] ঐতিহাসিকগণ তার নিন্দা করিয়াছে[illegible] প্রকৃতপক্ষে বৃটিশ কর্তৃক বার্লিনের উ[illegible] প্রথম এই ধরনের বোমা নিক্ষিপ্ত হই[illegible] ছিল ২৪শে আগস্ট, ১৯৪০, সন্ধ্যাবে[illegible] এবং তারপরেও আর এ এফ এই ধর[illegible] বোমাবর্ষণ করিতে থাকে। তখন [illegible] সেপ্টেম্বর হিটলার এর জবাবে এক বক্[illegible] দিলেন এবং যদিও হিটলারের কোন রসবে[illegible] ছিলনা, তবু সেদিনের বক্তৃতায় তিনি চার্চিল[illegible] 'সেই বিশিষ্ট সামরিক সংবাদদাতা' বলি[illegible] বিদ্রূপ করিলেন এবং তারপর গর্জন ক[illegible] বলিলেন—'আমরাও প্রতিশোধ ল[illegible] বৃটেনের শহরগুলি গুঁড়া করিয়া দিব।'

এই সভার প্রত্যক্ষদর্শী মার্কি[illegible] সাংবাদিক উইলিয়াম শাইরার লিখিয়াছে[illegible] যে, সেদিনের হিটলারের সভায় যুব[illegible] নারীদের খুব ভিড় ছিল। তারা হিটলারে[illegible] বক্তৃতা শুনিয়া এমন অভিভূত হইল [illegible] দাঁড়াইয়া উঠিয়া চিৎকার করিতে লাগি[illegible] এবং উত্তেজনায় তাদের বুক আন্দোলি[illegible] হইতে লাগিল।......

কিন্তু হিটলারী বক্তৃতার উন্মাদনা [illegible] যুবতী নারীদের উত্তেজনা ঘটিলে [illegible] হইবে, আসল সত্য এই যে, হিটল[illegible] বৃটিশ দ্বীপপুঞ্জ আক্রমণ ও জয় করি[illegible] পারিলেন না। ১৯৪১ সালের ৩[illegible] ফেব্রুয়ারীর এক গুপ্ত বৈঠকে হিটলার [illegible] সমস্ত কথা বলিলেন, তার নির্গলিতা[illegible] এই যে, 'সিন্ধু ঘোটকের' পরিকল্প[illegible] পরিত্যক্ত হইল। কিন্তু তখন থেকে তি[illegible] একবার 'অপারেশন সী-লায়ন' ও অন্যবা[illegible] 'অপারেশন বার্বারোসা' এই দুই বিকল্[illegible] পরিকল্পনার ধাপ্পা দিয়া চলিতে চাহিলে[illegible] অর্থাৎ তিনি ইংলণ্ডকে হাতে কল[illegible] আক্রমণ না করিয়াও সর্বদাই আক্রমণে[illegible] ভয়ের মধ্যে রাখিতে চাহিয়াছিলেন—যদি শেষপর্যন্ত 'সিন্ধু ঘোটকে'র ভূত অপা[illegible]রেশন 'বার্বারোসা'র কাঁধে ভর করি[illegible] রাশিয়ার বিশাল প্রান্তরে গিয়া হাজি[illegible] হইল।

(ক্রমশঃ

---

(৯) উইলিয়াম শাইরারের 'থার্ড রাইক' পুস্তক, পৃঃ ৯৩৬—৪০ এবং ভি ট্রুখানোভস্কি প্রণীত 'বৃটিশ ফরেন পলিসি ডিউরিং ওয়ার্ল্ড ওয়ার সেকেন্ড', পৃঃ ১১০।

সারা রাত্তির বৃষ্টি এবং তারপরেও...

গৌতম সেনগুপ্ত

রাত্রি তখন ঘুমন্তে চলেছে। মানুষের ভাঙার সময় হয়ে এলো। কাক ডাকার শেষ প্রহরের ঘোষণায় সোচ্চার হচ্ছে র মাঠটাকে টুকরো টুকরো করে। য়ের সঙ্গে সমস্ত বাড়িগুলোও ঘুমিয়ে ছে। কিন্তু এস, মুখার্জি লেনের শের বি, বাড়িটা মনে হচ্ছে সারা রাত কাকে যেন পাহারা দিচ্ছে।

শ্চিমের জানলার একটা পাল্লা সম্পূর্ণ া। ঘরের ভেতরের অস্পষ্ট আলো া জানলা দিয়ে প্রকৃতির দিকে মুখ য়ে আছে। আলোটাকে দেখে ঠিক লে মনে হয় না। খানিকটা মিটমিট করছে। টেবিলের ওপর প্রায় শেষ হয়ে যাওয়া র মোমবাতি ঘরটাকে আচ্ছন্ন রেখেছে।

সারা রাতে ঘুম ছেড়েছে, শ্যামল আর ঘুমোতে পারে নি। কিংবা কে জানে আবছা ঘুম তখনও চোখে জড়িয়ে ছিল কিনা। চার্চের ঘন্টা গলা ফাটিয়ে সময় বলে দিল। কে জানে এই সময়টাই পৃথিবীর ঠিক সময় কিনা।

দোল খাওয়া আলোয় ঘরটাও দুলছে। কড়িকাঠ, দেয়াল, তাক, আসবাব সবকিছুই। শ্যামল নিজের শরীর স্পর্শ করে বোঝবার চেষ্টা করল তার শরীরটাও ঐ সবকিছুর মত দুলছে কিনা। কিন্তু কিছুই বুঝল না। শ্যামল আহত হলো না মোটেই। কেন না শ্যামল তো জানে বোঝাটাই সবচেয়ে কঠিন কাজ।

এবার মোমবাতিটা আরো জোরে কাঁপছে। কাঁপতে কাঁপতে শেষবারের মতন নিজের অস্তিত্বটা জাহির করে দপ্ করে নিভে গেল। শ্যামল রীতিমত আৎকে উঠল। ওর সমস্ত শরীরে ভূমিকম্প হলো যেন।

অন্ধকার। ঘন থিকথিকে অন্ধকার চারদিকে। কড়িকাঠ, দেয়াল, তাক, আসবাব এখন সবকিছুই অন্ধকারে। শ্যামলের মনে হলো নিজের দেহটাও ঐ জমাট অন্ধকারে হারিয়ে যাচ্ছে। এমন অন্ধকার শ্যামল জীবনে কখনও দেখেনি। একবার মনে হলো উঠে গিয়ে আর একটা মোমবাতি জ্বালায়। আবার ভাবল না থাক অন্ধকারেই যদি একটু ঘুমতে পারে।

কিছুটা সময় ঘুমবার চেষ্টা করে রীতিমত হাঁপিয়ে উঠল শ্যামল। না ঘুম আসছে না। কিছুতেই। শ্যামলের মনে হলো অন্ধকার অন্ধকার হচ্ছে আরো। কেমন যেন একটা ভয়-ভয় ভাব। একটা আড়ষ্টতা আর আতঙ্ক চারপাশের অন্ধকারের গায়ে লেপটে আছে। কেমন যেন একটা অব্যক্ত অনুভূতি। সেই অন্ধকার নীরবতায় কি যেন একটা শব্দ শুনতে পেল শ্যামল। মনে হলো শব্দটা অন্য কোনো পৃথিবীর। এবার আরো স্পষ্ট শব্দটা। হ্যাঁ, শ্যামল স্থির বুঝল তার ঘরের ভেতরেই একটা শব্দ ঘুরপাক খাচ্ছে। ঝুমঝুম নূপুরের শব্দই মনে হলো। শ্যামলের মনে হচ্ছে কে যেন তার গলাটাকে দুহাত দিয়ে চেপে ধরেছে। যেন সমস্ত সচেতনতা হারিয়ে ফেলছে। শ্যামলের চোখের সামনে একটা অস্পষ্ট মেয়েলী মূর্তি স্পষ্ট হলো। হ্যাঁ ঠিকই দেখছে শ্যামল। কিন্তু কি! কে! অভ্রান্ত কিছুই বুঝতে পারছে না। শ্যামলের হৃদপিণ্ডটা এক ঝলক কেঁপে উঠলো। সমস্ত শরীর অসাড়। শ্যামলের চীৎকার করতে ইচ্ছা হচ্ছে জোরে। অনেক জোরে। কিন্তু পারছে না। অনেক চেষ্টা করেও শ্যামলের গলা দিয়ে আওয়াজ বেরোচ্ছে না। একটা অসহ্য যন্ত্রণা সারা দেহে ছড়িয়ে পড়েছে। এবার সেই মূর্তি শ্যামলেরই দিকে এগিয়ে আসছে যেন। শ্যামল তলিয়ে যাচ্ছে ক্রমশ। বিছানাটা গায়ের ঘামে স্নান করেছে। মূর্তিটা যে আরো এগিয়ে আসছে। শ্যামল মুহূর্তের মধ্যে কি করে যেন ঐ অসহায় অনুভূতির জগত থেকে নিজেকে হ্যাঁচকা টান মেরে নিয়ে এসে বিছানায় সটান উঠে বসল। সেই মূর্তিটা পিছিয়ে গেল অনেকটা নূপুরের ঝুমঝুম আওয়াজ করে। শ্যামল মেঝেতে পা রাখল শক্ত করে। আবার ঘরের কোণের সেই দুর্ভেদ্য অন্ধকারে দাঁড়িয়ে থাকা মূর্তির দিকে ছুটে গেল। আর প্রাণপণ চীৎকার করে কিছু বলতে চাইল। গলার শিরা অসম্ভব ফুলে উঠল। কিন্তু কোনো আওয়াজ বের হলো না শ্যামলের গলা দিয়ে। শ্যামল এবার আর সেই মূর্তিটা দেখতে পেল না। সেই অস্পষ্ট ধোঁয়া মূর্তি মুহূর্তের মধ্যে অদৃশ্য হয়েছে। ঘরের সেই অন্ধকার কোণে শ্যামল নিস্পন্দ হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। কিছু মুহূর্ত কেটে গেল। ক্রমে শ্যামল নিজের মধ্যে ফিরে আসছে। আবার বিছানায় বসল শ্যামল। কিন্তু কখন! কি করে! নিজেই জানে না। ঘরের মধ্যে সবকিছুই অন্ধকারে অদৃশ্য। কেবল টেবিল ঘড়িটার টিক টিক আওয়াজ অন্ধকারে জেগে আছে।

শ্যামলের কেমন যেন সব কিছু উলটে-পালটে যাচ্ছে। শ্যামলের দৃষ্টিশক্তি, শ্রবণশক্তি এমন কি অনুভূতিও যেন কিছু নেই। সেই গলা মোম, টেবিল ঘড়ির আওয়াজ নিজের ঘরের বিছানাটাও কোথায় যেন মিশে যাচ্ছে। এক দুই করে নিজেকে সম্পূর্ণ হারিয়ে ডুবে যাচ্ছে স্মৃতির নীল ঘরে। এ শ্যামলের এক জগত থেকে অন্য জগতে যাত্রা। একটা আলাদা অনুভূতি ঘিরে ফেলছে শ্যামলকে। একটা পরিতৃপ্তি। একটা শান্তি। সেখানে কোনো বাধা নেই। কোনো বন্ধন নেই। সেখানে নির্ভাবনায় নিজেকে সম্পূর্ণ ডুবিয়ে দেওয়া যায়। আবার পরিপূর্ণ খুঁজে পাওয়া যায়। সেখানে প্রত্যেকটা সত্তা এক-একটা ফুটন্ত ফুলের মত। কত কিছুই শ্যামলের চোখে এখন জলছবি হয়ে ভেসে উঠবে। কত সকাল দুপুর বিকেল রাত্রির আনাগোনায় শ্যামল চোখ রাখল। ..

ক'দিনের জন্য শ্যামল অফিস থেকে ছুটি নিয়েছিল। সেদিন কপাট বন্ধ করে বিছানায় চীত হয়ে শুয়ে একটা বই নিয়ে পড়ছিল। হঠাৎ কি একটা ছোট্ট শব্দ হলো। চোখ তুলে তাকাল শ্যামল। দেখল একটা খাম বিছানার একপাশে পড়ে। সাগ্রহে খামটা হাতে তুলে নিল। কিন্তু কে দিল চিঠি! কে দিতে পারে! কিছুই বুঝে উঠতে পারল না। খামের একটা দিক ছিঁড়ে ফেলল। তারপর এক নিশ্বাসে পড়ে নিল সবটা। চিঠির ব্যাপারটা খানিকটা অপ্রত্যাশিত হলেও আশ্চর্য হবার মত নয়। ক'দিন ধরেই এমন একটা কানাঘুষো শুনেছিল শ্যামল। তবে আশ্চর্য হলো এই ভেবে যে শেষ পর্যন্ত শ্যামলকেই এই সিদ্ধান্তের আওতায় পড়তে হলো। চিঠিটা শ্যামলের অফিস থেকে এসেছে। শ্যামলকে কালই রাণীগঞ্জ যেতে হবে। ওদের কোম্পানীর একটা ব্রাঞ্চ খোলা হচ্ছে রাণীগঞ্জের বেশ খানিকটা ভেতর দিকে। প্রাথমিক কাজ-কর্মের দায়িত্ব পড়েছে শ্যামলের ওপর। অবশ্য ইনচার্জ করে পাঠানো হচ্ছে ইঞ্জিনীয়ার সান্যালকেই। আর বেশী দিনের জন্যও নয়। ছ'মাস। চিঠিতে সেই রকমই লেখা।

ভালই হলো। কিছু দিন ধরেই শ্যামলের মনটা বাইরের দিকে টানছিল। ভাবছিল কোথাও যেতে পারলে একটু ভাল হতো। এই কোলকাতার দিনগুলো ভীষণ একঘেয়ে লাগছিল। কাটতেই চায় না। নিজের জায়গাটাকে মাঝে মাঝে সবারই বোধ হয় এ রকম লাগে।

অফিসের এই সংবাদ শ্যামলকে একটা নতুন স্বাদ এনে দিল। শ্যামল ভাবল, যাক তাহলে কিছু দিনের জন্য কোলকাতার এই নোনতা দিনগুলো থেকে রেহাই পাওয়া যাবে।

পরদিন বেলা এগারোটায় ট্রেন। শ্যামল বিশেষ প্রয়োজন মত জিনিস নিয়ে স্টেশনে এসে পৌঁছল। মিঃ সান্যালকে ফোনে বলে সবকিছুই ঠিক করা ছিল।

প্ল্যাটফর্মে বেশ খানিকটা ভিড়। শ্যা প্ল্যাটফর্ম দিয়ে হাঁটছিল আর ট্রেনের দাঁড়ানো লোকগুলোকে বেশ ভাল করে নিচ্ছিল। পাছে মিঃ সান্যাল চোখের আ হয়ে যায় এই ভয়ে। বেশ খানিকটা এগো পর মিঃ সান্যাল শ্যামলের দৃষ্টিতে এ হাতে একটা সুটকেস আর পাশে একটা বেডিং। হাত তুলে শ্যামলকে ইং করলে সান্যাল।

এগোল শ্যামল। কাছে এসে শ্যাম ছোট একটা শ্বাস পড়ল, বাব্বা, আমি ভাবছিলাম আপনি এখনও এসে পে নি। মিঃ সান্যাল স্বভাবসুলভ ভঙ্গি একটা উষ্ণ স্বর ছুঁড়েছিল শ্যামলের দি ডোন্ট টেক মি এন ইমমচিওর ওয়ান, রয়। হ্যাঁ হ্যাঁ সে তো আমি ভালো ক জানি। শ্যামল একদমে বলে গেল। এ মিঃ সান্যালকে একটু উত্তপ্ত মনে হ হাতের ঘড়িটার দিকে চট করে একবার ঘুরিয়ে মিঃ সান্যাল বলল, নিন, এব ভাল করে দেখে নিন সবকিছু ঠিক আছে তো? শ্যামল বলল, না, আর দে হবে না, আমি সব বেশ ভাল করেই দেখে ট্রেন এসে দাঁড়াতে ওরা কামরার হা দরজা দিয়ে নিজেদের ঢুকিয়ে দিল।

বাতাস কেটে গাড়ী ছুটে চলেছে। বে ভাতার বাইরে এটাই শ্যামলের প্রথম য নয়। কাজের তাগিদে আরো কয়ে এখানে সেখানে যেতে না হয়েছে এমন কিন্তু অঞ্চলের যাওয়াটা অন্য রকম একটা মিষ্টি অনুভূতি পড়েছে শ্যাম মনের ঘরে ঘরে। কোনো অদেখা পৃথি আলো প্রজ্জ্বল হচ্ছে ক্রমশ। আকাঙ্ক্ষি অথচ অপ্রত্যাশিত সব কিছুরই বো এমন একটা আলাদা স্বাদ আছে।

শ্যামল আধশোয়া হয়ে একটা বই পড়ছে। আর আয়েস করে সিগারেটে দিয়ে নিচ্ছে। মিঃ সান্যাল কিন্তু অফি কি সব কাগজপত্রে চোখ ভাসিয়ে আ কোম্পানীর হাতে চাঁদ না পাইয়ে ছাড়বে দেখছি। শ্যামল ওর চোখের আড়ালে সেঁকিয়ে মনে মনে বলে নিল, তুমি খা যত পারো। আমার অত মাথাব্যথা কোম্পানীর লাভের অংক বাড়াবার নেহাত কাজ না করলে নয় তাই। না করে...। গিয়ে তো অফিস করতেই হ অত কাগজ ঘেঁটে কি হবে, চাঁদু। সান্যাল খানিকটা তাজা করার সুরে ম মাঝে ঠোঁট ফাঁক করছেন, কি রয়, ঝিমি পড়লেন মনে হচ্ছে? না, বেশ তো লাগ উত্তর দিতে ইচ্ছে করছিল না শ্যামকে তবু কথা বলতে হবে বলেই বলল। এক মনে মনে খিস্তি দেবার মতো বলে শালা তোমার মতন কোম্পানীর টাকা পকেটে নিলে তোমার চেয়ে অনেক তাজা থাকতুম। আর নিঃস্বার্থভাবে ক খাটা কাকে বলে তাও একবার

আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দিতুম, বুঝলে বাছাধন।

সময় মতই ওরা রাণীগঞ্জ পৌঁছেছিল। মিঃ সান্যাল একটা রিকসা নিলেন। শ্যামল খানিকটা সতর্ক করবার গলায় বলল, কারেক্ট অ্যাড্রেসটা আছে তো, মিঃ সান্যাল? হ্যাঁ আছে। আর না থাকলেও অসুবিধার কারণ ছিল না। কেন না, আমি সে কাজের প্রিলিমিনারি স্টেজে একবার এসেছিলাম। একটা ঘন আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে ভেসে এলো সান্যালের গলা দিয়ে। শ্যামল বলল, প্রায় সন্ধ্যে হয়ে এসেছে কিনা, তাই ভাবছিলাম। ওরা পশ্চিম আকাশে সূর্যের শেষ হয়ে আসা লাল রঙে একবার চোখ রাখল।

রিকসটা বেশ ছুটেই চলছিল। ক্রমে ওরা শহরের সীমানা পার হয়ে গ্রামের দিকে ঢুকছে। কয়েকটা রাস্তা পেরিয়ে বড় একটা ক্ষেতের পাশ দিয়ে চলছে রিকসা। আকাশের নক্ষত্রে পশ্চিমের সেই লাল রংটুকুও পরিপূর্ণ ডুবে গেছে।

সময় দ্রুত দিয়ে রাতের অন্ধকারে পড়েছে। রাস্তায় লোকজন বেশ কমই যাতায়াত করছে। মাঝে মাঝে দু-একটা লোক রিকসার গা ঘেঁষে ছুটে যাচ্ছে যেন। আবার দূরে কোথাও মাথায় মোট নিয়ে আর হ্যারিকেন এক হাতে নিয়ে একটা-দুটো লোক অনেক দূরে অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছে। অন্ধকারে গ্রাম ঠিক বোঝা না গেলেও কিছুটা অন্তর ছোট্ট ছোট্ট আলো অন্ধকারের হাত থেকে গ্রামটাকে পাহারা দিচ্ছিল।

রিকসাটা একটু গতি কমিয়ে দিল। মনে হলো ওরা প্রায় পৌঁছে গেছে। কখনও কোনো লোক রিকসার পাশ দিয়ে যাবার সময় আলোটা তুলে রিকসার বাবুদের চেনবার চেষ্টা করে চলে যাচ্ছে। ওরা দুজনেই বেশ চুপচাপ। নীরবতার একঘেয়েমী কাটাবার চেষ্টা করল শ্যামল। এসে গেছি বলে মনে হচ্ছে মিঃ সান্যাল? সময় অনেক বেশী বলে মনে হচ্ছিল শ্যামলের। কে জানে নীরবতায়ই নাকি। মিঃ সান্যাল শ্বাস নিয়ে বলল, হ্যাঁ এই তো আর কি এবার নামব।

দু-একটা কথা বলতে বলতেই ওরা একটা বস্তির মত জায়গায় থামল। কতগুলো ছোট্ট ধুকধুকে আলো জ্বলছে সারি বেঁধে। দেখে বস্তি বলেই মনে হয়। একটু দূরে খানিকটা ফাঁকা জায়গায় হ্যাজাকের রূপালী আলো ছড়িয়ে আছে। তাতে বেশ বোঝা যাচ্ছে ঐ জায়গাটাই ফ্যাক্টরীর কাজ হচ্ছে। হ্যাজাকের আলোয় পাশের খালটাও দেখা যাচ্ছিল। আরো দেখা যাচ্ছিল একই রকম ধুকধুকে আলোয় ওপারে সারি দেওয়া নিচু ছাউনী।

কয়েকবার রিকসার হর্ণ বাজাতে কে যেন একজন লোক হ্যারিকেন জাতীয় একটা আলো হাতে ওদের দিকে এগিয়ে এলো। আলোতে দেখা গেল লোকটার খালি গা আর পরনে ভিজ হাঁটু ধুতি। কাছে এসে নমস্কার করে পাড়াগেঁয়ে ভাঙা হিন্দিতে কিসব যেন বলে গেল লোকটা। বোঝা গেল সে ওখানকার মজুর। বলল, ওদের জন্যে একটু তফাতে একটা ঘরের বন্দোবস্ত আছে। এবং লোকটাকে অনুসরণ করতে বলল। শ্যামল আর মিঃ সান্যাল ওদের জিনিস নিয়ে ওর পিছু নিল।

দু-মিনিট হেঁটে ওরা একটা ছোট ঘরের সামনে এসে দাঁড়াল। লোকটা বেশ মাতব্বরি গলায় সেই আগের মতই ভাঙ্গা-ভাঙ্গা দেহাতী ভাষায় বলল, হ্যাঁ এই ঘরটায়ই থাকবেন বাবুরা। আমি পাশের তিন নম্বর সারির একটা ঝুপরিতে থাকি। দরকার হলেই মুখিয়া বলে ডাকবেন। আবার একবার নমস্কার জানিয়ে লোকটা অন্ধকারে মিলিয়ে গেল।

মাঝারী সাইজের একখানা ঘর। খাটিয়ার মত নিচু দুখানা খাট দুপাশে পাতা। আর একখানা চেয়ার, টেবিল। শ্যামল ঘরে ঢুকে স্যুটকেস আর বেডিং নামিয়ে রেখে দাঁড়াতেই সান্যাল সিগারেটের ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে ঘরে ঢুকল। শ্যামল শান্তগলায় বলল, বেশ ঘরটা, না? মিঃ সান্যাল ভুরু কুঁচকে কথা ছুঁড়ে দিল, হ্যাঁ চলে না গেলেও চালাতে হবে। মনে হলো সান্যাল হেতো ঢোক গিলল। একটা সিগারেট শ্যামলের দিকে বাড়িয়ে দিল।

ঘরটা ভাল করে দেখে—সিগারেট খেয়ে আর গল্প করতে গিয়ে অনেক সময় চলে গেল। রাত নটা নাগাদ ওদের খাবার নিয়ে মুখিয়া এসে হাজির। ওরা খাবারের কথাই ভাবছিল। লোকটা বলল, কোনো চিন্তা করবেন না বাবুরা, আমিই আপনাদের খাবার দিয়ে যাবো। কোথায় কি আছে সব দেখিয়ে দিয়ে লোকটা বিদায় নিচ্ছিল। আবার ফিরে এল। আঙুল তুলে বলল ঐ উত্তরের জানলার পাল্লাটা রাতে খুলবেন না যেন। ওটার দুটো শিক নেই। রাতে এখানে খুব বনবিড়াল বেরোয়। সান্যাল চোখ বড় করে শ্যামলের দিকে তাকিয়ে নাক দিয়েই সবখানি ধোঁয়া ছাড়ল। মুখিয়া ততক্ষণ চলে গেছে।

পরদিন সকালে, ওরা সব ঘুরে দেখে, সব কাজ বুঝে নিল। রাতের দেখা জায়গাটা দিনের আলোয় আর এক রকম লাগল। এক চোখ দেখেই বোঝা যায় কারখানার কাজ খানিকটা এগিয়েছে। মিঃ মল্লিক, মিঃ সরকার আর সুপারভাইজার মিত্র এরা প্রায় প্রথম থেকেই আছে এখানে। ওদের ভেতর কথা বিনিময় যথারীতি প্রথম সকালেই হয়ে গেছে। কাল রাতে সার দেওয়া যে আলো দেখা যাচ্ছিল সেগুলো সাঁওতাল আর হিন্দুস্থানী মজুরদের হোগলা আর প্লাইউডের ছাউনি। কারখানার তিন পাশে আর খালের ওপারে সব ছাউনি সাজানো।

ওখানে কাজ হচ্ছে রীতিমত। পুরুষ আর মেয়েরা এক সঙ্গে পাল্লা দিয়ে খাটছে। ছবির মত খাটছে ওরা। শরীর দিয়ে গলগল করে ঘাম বেরুচ্ছে। নিঃশ্বাস ফেলার সময় নাই ওদের। দেখে মনে হয় মানুষ এখনও খাটতে ভুলে যায় নি।

দুটো পয়সার জন্য ওদের সকাল দুপুর বিকেল জলের দামে বিকিয়ে দিচ্ছে। না কি জীবনের জন্য জীবনকে দুহাতে হরির-লুটের বাতাসার মতন ছড়িয়ে দিচ্ছে! ওদিকে তাকিয়ে শ্যামল কিছু মুহূর্ত আনমোনা হলো। হয়তো বাচ্চা ছেলেটা বা অথর্ব জোয়ান ভাই কিংবা চোখে ছানি পড়া বুড়ো মা একটা রুটির জন্যে সন্ধ্যে পর্যন্ত হা-পিত্যেশ হয়ে বসে আছে ঐ মজুরের আসার পথ চেয়ে। সান্যাল শ্যামলের পিঠে হাত রেখে বলল, আসুন ওদিকটায় যাই। শ্যামল নিজের মধ্যে ফিরে এলো। সামনে পা বাড়াল।

এমন গ্রামের পরিবেশে শ্যামল এই প্রথম এলো। ছোট বেলার গ্রামের দিনগুলোর মতই এই গ্রাম মাটির ঘাসের গন্ধ শ্যামলের ভীষণ ভাল লাগছিল।

বিকেলে কাজের শেষে মাঠ ঘাস-গাছালি শ্যামলকে ভেতরের দিকে টানছিল। সান্যালের অপেক্ষা না করেই শ্যামল গ্রামের প্রাণে একাই বেরিয়ে পড়ল।

চোখ ভরে মাটি আকাশ নাম-না-জানা কত কি গাছ আর পাখী পাখালির অঢেল মেলা দেখল শ্যামল। শ্যামল যেন মাটির ওপর দিয়ে হাঁটছিলই শুধু। ঘুরতে ঘুরতে ছোট একটা শিমুলগাছের কাছাকাছি এসে শ্যামলের পা আটকে গেল। ওর দৃষ্টি থমকে দাঁড়াল গাছটার তলায়। দেখল, ফুলের মতন কতগুলো সাঁওতালী মেয়ে গা ভাসিয়ে স্নান করছে। কত গল্পে ওরা হাসছে। এ ওর গায়ে লুটিয়ে পড়ছে। চুল ধরে টেনে শুইয়ে দিচ্ছে। কখনও বা গাল টিপে দিচ্ছে সোহাগে। ভীষণ ঘন হয়ে আছে ওরা সব। ওরা কি অত কথা বলছে কে জানে!

শ্যামলের ভারী ইচ্ছে হচ্ছে ওদের কথা বুঝতে। ইচ্ছে হচ্ছে ওদের মতন বন হয়ে গল্প করতে। ওদের গাল টিপে দিতে। ওদের নরম শিশির শরীরে গড়িয়ে পড়তে। তাই আবার হয় নাকি। কি সব উদ্ভট ভাবনা। শ্যামল মনে মনে না হেসে পারল না।

শ্যামলের চোখ কিন্তু তবুও ওদের দিকেই অপলক। ওদের ভেতর মাঝখানের মেয়েটার দিকে ওর দৃষ্টি স্থির হয়ে ছিল। শ্যামলের কেমন আশ্চর্য লাগছে সব। আরো অবাক লাগছে ওই মেয়েটাকে। সাঁওতালী মেয়ে বলে মনেই হয় না একটুও। অনেক আপনার লাগছে। এমন দেখেনি কখনও শ্যামল। গাছতলাটা এক খণ্ড জ্যোৎস্না স্থির হয়ে থাকার মত। যখন হাসছে তখন ফুলের পাপড়ি খুলছে যেন একটা একটা করে। সমুদ্র ঢেউ যৌবন ওর বসন্তের গন্ধ মাখা শরীরময় ছড়িয়ে আছে। কি যেন একটা অচেনা ফুল ওর হাতে।

শ্যামল একটু এগিয়ে গেল। শ্যামলকে এগিয়ে আসতে দেখে ওরা খানিকটা থতমত খেয়ে ধড়মড়িয়ে উঠে দাঁড়াল। কিছু করতে চায় অথচ কিছুই করা যাচ্ছে না এমন একটা ভাব সকলের। কিন্তু সেই মাঝখানের মেয়েটা নড়ল না একটুও। ও আরো স্থির হলো শ্যামলের চোখে। শ্যামলও। বহু দূর

থেকে অপূর্ব মিষ্টি স্বরে একটা পাখি ডেকে উঠল। শ্যামলের মনে হলো অনেক পাতা ডাল বন অনেক প্রান্তর ধূ ধূ সৈকত পার হয়ে সে ডাক ভেসে এলো। শ্যামল জানে না এ কোন পাখির ডাক।

অবাক অবাক চোখে এ-ওর দিকে চাইছে। কোনো কথাই আসছে না। একটাও না। ঠোঁট দিয়ে ফুলটা চেপে ধরে হাত দিয়ে চুল জড়াতে জড়াতে এবার মেয়েটা উঠে দাঁড়াল। উঠে দাঁড়াতেই ওর সারা দেহের সবুজ যৌবন ঠিকরে উপচে পড়ল।

এক পা দু-পা করে মেয়েটা শ্যামলের দিকে এগিয়ে এলো। সবাই নির্বাক। ওর দিকে চেয়ে অবাক হলো আরো। দু'পা এগিয়ে শ্যামলও থেমে গেল। মেয়েটা বাতাস-লাগা ফুলের কাঁপা ঠোঁটে বলল, কুছু বলবি বাবু? শ্যামলের ভেতরে ভেতরে অনেক কথার ঢেউ তোলপাড় করল। কত কথাই বলতে ইচ্ছে হলো শ্যামলের। অনেক-অনেক-অনেক কথা। অনেক কথাই তো বলার থাকে। কত কিছুই তো বলা যায়। আর শ্যামল তো কথার জন্যে ভাবে না। ওকে তো কথার ভাবনা আজ পর্যন্ত ভাবতে হয়নি কখনও। বেশ গুছিয়ে কথার পর কথা সাজিয়ে সুন্দর করে কথা বলতে জানে শ্যামল। কিন্তু না। কোনো কথাই এখন শ্যামলের মনে এলো না। সমস্ত কথা হারিয়ে ফেলল। শুধু ওর শরীর থাসে চোখ ছড়িয়ে রইল শ্যামল। ওর সব কিছু লুটেপুটে নিতে ইচ্ছে হলো দু-চোখ দিয়ে। আবার বলল মেয়েটা, কুছু বলবি না বাবু?

নিজের শরীরে ফিরে আসতে আসতে বলল, কই কিছু না তো। এবার ওরা সবাই একসঙ্গে খিল খিল করে হাসতে লাগল। শ্যামল বেশ খানিকটা ঢিলে হয়ে যেতে যেতে স্বাভাবিক হবার চেষ্টা করে ওর হাতের ফুলটার দিকে তাকিয়ে বলল, ওটা কি ফুল তোমার হাতে? শ্যামল কথা আরম্ভ করতে ওদের হাসি থেমেছিল। কিন্তু আবার মুখ টিপে হাসল।

হাতটা একটু তুলে বলল মেয়েটা, ই পারুল ফুল রে বাবু। একটু থেমে হাতের দিকে চেয়ে আবার চোখ তুলে বলল, কেনে, তুই লিবি ই ফুলটা? হাতটা আরো তুলে শ্যামলের দিকে এগিয়ে দিল। শ্যামল হ্যাঁ না কিছুই বলতে পারল না। ওর হাতের ফুলটা ধরল শ্যামল। ওর হাতের ছোঁয়ায় শ্যামলের রক্ত এক ঝলক কেঁপে তরঙ্গ হয়ে রক্তে রক্তে ছড়িয়ে পড়ল। মনে হলো মেয়েটাও কাঁপল একটু। ক'মুহূর্ত নীরব। তারপর ঠোঁট কাঁপিয়ে আবার বলল, তুই ফুল লিবি বাবুজি? হামি অনেক ফুল আনিয়ে দিবো। ওদের মুখ চেপা হাসি এবার বন্যা হলো। ওরা সবাই ছুটতে ছুটতে বাতাসে মিশে গেল যেন।

সন্ধ্যে হয়েছে সবে। শ্যামল আজও কাজ থেকে কামরায় ফিরেছে তাড়াতাড়ি। বিছানায় সটান শুয়ে একটা কবিতার বইয়ে চোখ ডুবিয়ে আছে। কিছু সময় কেটে গেল। মুখিয়ার খাবার নিয়ে আসার সময় হলো। তাড়াতাড়িই তো আসে এখন। সান্যালের অবশ্য আসতে দেরিই হয় রোজ।

শ্যামল একবার উঠে দরজার কাছে গেল। আবার ফিরে এলো। আবার কি ভেবে গিয়ে দরজাটা ভাল করে বন্ধ করে দিল। আবার বইয়ে চোখ রাখল। বাইরে রাত আসছে ছুটতে ছুটতে। কিছু মুহূর্ত কেটে গেল নিঃসঙ্গ কবিতার সাঁতার কেটে।

এমন সময় দরজায় আওয়াজ শুনে শ্যামল সতর্ক হলো। কি যেন ভাবল শ্যামল। হয়তো নিশ্চয়ই মুখিয়া হবে। ধড়মড়িয়ে উঠে দাঁড়াল। আবার ভাবল না কি সান্যাল এলো। সান্যালের কথা ভাবতেই ভেতরে ঠাণ্ডা বোধ করল। ঘড়িটায় চোখ বুলিয়ে ভাবল, না সান্যাল এখনই আসবে কি।

দরজার কাছে এগিয়ে গেল শ্যামল। দু হাতে কপাট খুলে দিল। দরজা খুলে মুহূর্তের মধ্যে শ্যামল মূর্তির মত দাঁড়িয়ে রইল। দেখল দরজায় দাঁড়িয়ে সেই মেয়ে, যাকে শ্যামল শিমুল তলায় আবিষ্কার করেছিল কোনো এক নির্জন পড়ন্ত বিকেলে। কোনো কিছুই ভাবতে পারল না শ্যামল। কোনো কিছুই মাথায় এলো না। দুজনেই দুজনের দিকে তাকিয়ে নীরব হয়ে আছে।

শ্যামল স্বাভাবিক গলায় বলল, তুমি? মেয়েটা আরো সহজ করে উত্তর দিতে চেষ্টা করল, বাপের বিমার হোল। হামি তুর খাবার লিয়ে এলাম বাবু। শ্যামল দেখল ওকে। শক্ত করে শাড়ি পরেছে। আঁচলটা টেনে সুঠাম কোমরে পেঁচিয়েছে। ওর শরীর অদ্ভুত লাগছে। পুষ্ট পায়ের গোছে নূপুর পরেছে। হাত দিয়ে জড়ানো খোঁপায় কি সব এক গাদা ফুল গুঁজেছে। সব মিলে আশ্চর্য সুন্দর লাগছে। ওর চোখে চোখ তুলে শ্যামল বলল এসো ঘরে এসো। নূপুরের শব্দ তুলে ও ঘরে এলো।

খাবার মেঝেতে রেখে উঠে দাঁড়াল। শ্যামল সাগ্রহে জিজ্ঞেস করল, মুখিয়া বুঝি তোমার বাবা? হ্যাঁ, বাবুজি। উত্তর দিল মেয়েটা। শ্যামল আবার দেখল ওকে। তারপর আবার বলল, তোমার নাম কি? মেয়েটা স্বাচ্ছন্দ ভঙ্গিমায় জবাব দিল, ঝুমরী। শ্যামল ছোট্ট করে বলল, বেশ নাম তো। একটু লজ্জা পাবার মতো ও চোখ নামাল।

কোনো কিছু মনে পড়ে যাবার মত ঝুমরীকে মনে হলো। আঁচলের আর একটা দিক থেকে কতগুলো ফুল শ্যামলের দিকে এগিয়ে দিল।—ই পারুল আর মহুয়া ফুল বাবুজি। তুর জন্য লিয়ে এইসেছি। শ্যামল ফুলগুলো নিতে নিতে বলল, বাঃ ভারী সুন্দর তো। শ্যামল ঝুমরীর প্রোজ্জ্বল দৃষ্টির দিকে তাকাল। ঝুমরীকে মনে হলো কি যেন বলতে গিয়ে বলল না। চোখ মাটিতে রাখল আবার। শ্যামল কত কিছু ভাবতে চেষ্টা করে কিছুই ভাবতে পারল না। ঝুমরী চোখ নীচে রেখেই বলল, হামি রুজ তুর খাবার লিয়ে আসবেক। মন বলছে বাপের বিমার ভালো হবার লয়। একটা শ্বাস ছাড়ল ঝুমরী। চোখ তুলল শ্যামলের দিকে,— হামি যাচ্ছে বাবুজি। ঝুম ঝুম নূপুরের শব্দ তুলে ঝুমরী অন্ধকারে অদৃশ্য হলো।

অকাল বিকেল রাত্রি বাতাসের মত উড়ে যায়। ঝুমরী সন্ধ্যায় রোজ ওদের খাবার দিয়ে যায়। শ্যামলের কাছে বসে অনেক কথা বলে। কত কথা। শ্যামলের কাছে শহর কলকাতা চেনে। আবার ওদের গাঁয়ের মাটির কথা বলে। ওদের জীবনের কথা। ওদের দিনগুলোর কথা। কি কথা আজ আর শ্যামলের স্পষ্ট মনে পড়ে না। কিন্তু সেই সময়গুলো শ্যামলের বুকের মধ্যে চিত্রাপিত হয়ে আছে।

সেদিন সন্ধ্যায় ঝুমরী বলছিল, হামার মা লাই বাবুজি। কিন্তুক মার কোথা মনে হোয়। মা বলতো, দেখ ঝুমরী ইচ্ছা না লাগলে কুছু করবিক লাই। উতে ভালো হোয় লাইরে।" যখুন হামার বাপ ওই বুড়া মরদটাকে বিয়া করতে বল্লেক, হামি বল্লাম, মরবে তো হামি উকে বিয়া করবেক লাই। ই দিন উ বুড়াটা মারা গেলো। বাবুজি, তু বোল, হামি ঠিক করেছে লাই? শ্যামল অনেক কথা বলতে গিয়ে কোনো কথাই বলল না।

বিকেল সবে পা রেখেছে সন্ধ্যের দরজায়। অন্ধকার বৃষ্টির মত ঝরতে আরম্ভ করেছে। ঝুমরী খাবার নিয়ে এলো। একটা কপাট খোলা দরজা দিয়ে সটান ঢুকে গেল ভেতরে। শ্যামল বুকের ওপর একটা বই নিয়ে ঘুমিয়ে। রোজকার মত সান্যাল ঘরে ফেরেনি তখনও। কি করবে কিছুই বুঝতে পারল না ঝুমরী।

খাবারটা মেঝেতে রাখল। দু'পা এগিয়ে গেল খাটের দিকে। ডাকতে গেল শ্যামলকে। কিন্তু পারল না। ক'মুহূর্ত দাঁড়িয়ে রইল। আবার এগোল। কি যেন ভাবল। চোখ তুলে আবার শ্যামলকে ভাল করে দেখল। দেখল ওর শুয়ে থাকা শরীর, পা থেকে মাথা পর্যন্ত। দেখল বুকের ওপর খোলা বই। নিজের অজান্তেই ঝুমরীর গলা দিয়ে বেরিয়ে এলো, বাবুজি—বাবুজি। ...শ্যামলের ঘুম ভাঙল না।

না, আর ডাকবে না ভাবল ঝুমরী। ঝুমরী দরজার দিকে পা রাখল। দরজার কাছাকাছি গিয়ে পা আটকে গেল। আবার ফিরে এলো। একটু দাঁড়াল আবার ভাবল। খাটের ভীষণ কাছে এলো এবার। ডাকতে গিয়ে থেমে গেল। শ্যামলের পা ছুঁতে গেল। ওর হাত থেমে গেল। নূপুরের শব্দ কেঁপে গেল। শ্যামলের ঘুমন্ত মুখের দিকে একবার দৃষ্টি রাখল পরিপূর্ণ। তারপর কি ভেবে হাতের তালু দিয়ে শ্যামলের বুক ছুঁলো। ডাকল, বাবুজি—। শ্যামল চোখ খুলল। শ্যামলের ঘুম ভাঙল। ঝুমরী মাথা নামাল মাটিতে। শ্যামল ভাল করে চোখ মেলে বলল, ঝুমরী তুমি! বাবুজি তুর খাবার — মাথা না উঠিয়ে মাটির স্বরে বলল ঝুমরী।

শ্যামল মেঝেতে পা রাখল। পশ্চিমের জানলাটা দু-হাত দিয়ে খুলে দিল। বিছানায় বসল আবার। ঝুমরী দাঁড়িয়ে আছে নিশ্চুপ। শ্যামল একটা সিগারেট

ঠোঁটে লাগিয়ে ধরাল। ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তেই বলল, তোমার বাবা কেমন আছে, ঝুমরী? ঝুমরী শ্যামলের হাতের সিগারেটের দিকে তাকিয়েই উত্তর দিল, হ্যাঁ, থোরা ভালো হইয়েছে। শ্যামল ঝুমরীর চোখ দেখে বলল, কি দেখছো ঝুমরী? সিগারেট? ঝুমরী দু' ঠোঁটে হেসে চোখ নামাল। আবার বলল শ্যামল, তুমি কি সিগারেট দেখনি কখনো? ঝুমরী এবার চোখ তুলে বলল, হ্যাঁ দেখেছে বাবুজি। লেকিন হামাদের মরদরা ই খায় না। হাঁড়িয়া খায়। উ হামার ভালো লাগে না। খুব স্বাভাবিক লাগল ঝুমরীকে। শ্যামল হেসে ফেলল। ঝুমরীর ঠোঁটে লাজুক হাসি ঢেউ তুলল।

কিছু সময় চলে গেল। শ্যামল অন্য স্বরে বলল, ঝুমরী তোমার ভাই আছে তো না? হ্যাঁ, আছে বাবুজি। উ হামার সাথে কাজ কোরে। কেন বাবু? ঝুমরী শ্যামলকে দেখল মুখ তুলে। বলছিলাম... এই সন্ধ্যে বেলা রোজ তুমি না এসে তোমার ভাই-ই তো আসতে পারে। ঝুমরীর চোখ দুটো গোল হলো। গাল তামাটে হলো। ঠোঁট কেঁপে গেল। কোনো কথাই বলতে পারল না। জানলার বাইরে দৃষ্টি নিশ্চল। পায়ের নূপুরের আওয়াজ হলো না একবারও। ঝুমরীকে নিষ্পন্দ মূর্তির মত মনে হলো।

শ্যামলও কি বলবে ঠিক ভেবে পাচ্ছিল না। কিছু সময় দুজনেই নিঃশব্দ। শ্যামল বলল, কি ভাবছ ঝুমরী? মনে হলো পাতালে তলিয়ে যেতে যেতে ঝুমরী বলল, হামি না আসলে তুর ভালো হোয়? ওর গলার স্বরে বাষ্প মিশে গেল। আর কোনো কথাই বলতে পারল না। ভূমিকম্পের কাঁপুনির শেষ রেসটুকু তখনও ওর শরীরে লেগে ছিল। শ্যামলের দিকে না তাকিয়ে দরজার দিকে পা বাড়াল। শ্যামল একবার ওর নাম ধরে ডাকল। তারপর এগিয়ে গিয়ে কাঁধের ওপরে ওর নরম হাত ধরল। ঝুমরী ঘুরে দাঁড়াল। শ্যামল ওর চোখে আলতো দৃষ্টি হেনে বলল, না মানে, আমার কথাটা শোন, আমি ঠিক তোমায় ও কথা বলিনি। বলছিলাম সন্ধ্যেবেলায় তুমি একা আসো কিনা। তোমাদের কত লোকজন আছে আর যদি ... । ঝুমরী শ্যামলের মুখ থেকে কথা কেড়ে নিয়ে বলল, হামার ইচ্ছা হোয় হামি আসে। হামি কাউকে ডর করি না। একটু থামল। মুহূর্তের মধ্যে ওর উজ্জ্বল প্রদীপ্ত মুখ অনেকটা নিষ্প্রভ হলো। অসহায় করুণ স্বর বহু দূর থেকে ভেসে আসার মত গলায় আরো এগিয়ে এসে বলল, তুই হামায় কুছু বলিসনাই বাবুজি। ঝুমরীর বুকের মধ্যে বৃষ্টির প্রপাত স্বর শ্যামল শুনতে পেল। দেখল বাইরের ঝিঁ ঝিঁ ডাকা অন্ধকার। টেরও পেল না কখন ঝুমরী [illegible]।

রাত তখন ন'টা। সান্যাল আর শ্যামল ওদের খাটে আধশোয়া হয়ে সিগারেট টানছিল। সান্যাল অফিসের একটা কাগজ দেখছে। শ্যামল কড়িকাঠ দেখছিল। ভাবছিল আই, এফ, কোম্পানীর ব্রাঞ্চ খোলার কাজে রাণীগঞ্জে এই গ্রাম্য পরিবেশে আসাও যেমন অপ্রত্যাশিত, আর আশ্চর্যজনক। ছ' ছটা মাস চোখ মেলতে না মেলতেই কর্পূরের মত উবে যাওয়াটাও আজকে শ্যামলের অতিপ্রাকৃত লাগছে।

সান্যাল ধোঁয়া ছেড়ে বলল, মুখিয়াদের ঝুপেরিগুলো সব ঠিক হয়েছে তো?

হ্যাঁ সব ঠিক করে দিয়েছি। শ্যামল উত্তর দিল।

ওদের সামনে রোটার ছাউনির রিপেয়ারও তা হলে কমপ্লিট হয়েছে?

: হ্যাঁ সবই মোটামুটি ঠিক আছে।

: তা হলে অসুবিধা আর কিছুই নেই কি বলেন? তাছাড়া বিভুই বিদেশে ওদের দিকটাও একটু দেখতে হয় বইকি? সেই জন্যই তো কমপেনসেশনের কথা বললাম। একদমে কথাগুলো বলে সান্যাল যেন একটু দম নিল। আবার বলল, বাই দি বাই, আপনি এই কাগজগুলো নিয়ে যান। আপনি যখন কালই যাচ্ছেন তখন আর পোস্টে পাঠাই কেন।

শ্যামলের কোনো কথাই বলতে ইচ্ছে করল না। সান্যাল আগের মতই কাগজপত্রে চোখ রেখে বলে চলেছে।—আমার মনে হয় এবার মিঃ লাহিড়ি আপনার জায়গায় আসবেন। শ্যামল কোনো কথা শুনেছে কিনা কে জানে। শ্যামলের চোখ তখন কড়িকাঠ থেকে জানলার বাইরে আকাশে। সান্যাল মুখ ঘুরিয়ে শ্যামলকে দেখল।

ঘরের মধ্যে আলো। বাইরে অন্ধকার। ঝিঁঝিঁ আর ঝিল্লির একটানা ডাকে অন্ধকার আরো অন্ধকার হয়েছে। মাঝে মাঝে ঝোপ ঝাড় থেকে পাখির ডানা ঝাপটানির শব্দ। অথবা পাশের কোথাও জঙ্গলে শেয়ালেরা ঝগড়া করছে। দূরে থেকে ঢোল মৃদঙ্গ আরো কত কি বাজনার, আর সাঁওতালীদের সংঘবদ্ধ গান কখনও আনন্দের বা উল্লাসের উৎসব চিৎকার ভেসে আসছে অন্ধকার ভেদ করে।

শ্যামলের রাতের এই বিছানা ছেড়ে ছুটে যেতে ইচ্ছে হচ্ছে সাঁওতালীদের নাচ গানের আসরে। ইচ্ছে হচ্ছিল ওদের মতন নাচতে গাইতে হাড়িয়া খেয়ে বিভোর হয়ে থাকতে। ওরা মাতাল হয়ে আনন্দ সাগরে ভাসছে। এই সময়টা সবাই ওদের প্রাত্যহিদনের নগ্ন জীবন থেকে ছিটকে বেরিয়ে এসে অন্য কোনো অপার্থিব জীবনের ঘরে যেন একটুখানি [illegible] বসে এই নগ্ন জীবনের সমস্ত [illegible] নিশ্বাস ফেলে [illegible] দিতে চায়। আজ রাতের বিছানায় শুয়ে শ্যামল প্রথম উপলব্ধি করল এখনও পৃথিবীতে জীবনে জীবন খুঁজে পাওয়া যায়। ঐ সব ভাবতে ভাবতে শ্যামলের দু চোখে ঘুম জড়িয়ে এলো।

সূর্যের আলোয় আবার সকাল এলো। আজ সকালেই আবার শ্যামলকে কোলকাতায় ফিরতে হচ্ছে। শ্যামল নিজের জিনিসপত্র গুছিয়ে নিচ্ছিল। সান্যাল খানিকটা সহানুভূতির সুরে বলল, কিছু মনে করবেন না, রয়, আমাকে বেরুতে হচ্ছে এখনই। শ্যামল শ্বাস ছেড়ে বলল, না, না তাতে কি। আপনি যান। দু-পা এগিয়ে গিয়ে ঘুরে দাঁড়িয়ে সান্যাল বলল, গিয়েই কিন্তু একটা চিঠি দেবেন। ভুলবেন না যেন। শ্যামলের শেষ কথা শেষ হবার আগেই ঘরের বাইরে পা রাখল সান্যাল।

সব কিছু ঠিক মত গুছিয়ে নিয়ে শ্যামল যাবার জন্য প্রস্তুত হলো। আজ নিজেকে অনেক ভারী মনে হলো শ্যামলের। চলার শক্তি যেন হারিয়ে ফেলেছে। একটা মেঘলা অনুভূতি শ্যামলকে আচ্ছন্ন করে রেখেছে। মনে হচ্ছে কি যেন করা হলো না। কি যেন বলা হলো না। হয়তো করার মত। করা উচিত ছিল। হয়তো বলার মত বলা উচিত ছিল। হয়তো বলতে পারত। কিন্তু না। কিছুই মনে এলো না। কিছুই খুঁজে পাওয়া গেল না। বুকের মধ্যে একটা ব্যথা অনুভব করল শ্যামল। সে ব্যথা ক্রমে সমস্ত শরীরে ছড়িয়ে পড়ছে।

শ্যামল ভাল করে ঘরটাকে দেখল। ঘরের দেয়াল দেখল। দেখল জানলা। কড়িকাঠ। দেয়ালের বালি খসে যাওয়া জায়গাটাতে দৃষ্টি দাঁড়িয়ে পড়ল। নিজেকে কেমন নিঃসঙ্গ নিঃসঙ্গ মনে হলো। মনে হলো পৃথিবীতে তার মতন ভীষণ একা কেউ নেই।

এক পা দুপা করে এগিয়ে গেল। তারপর হাতের আঙুল আর তালু দিয়ে খাট, টেবিল, চেয়ার, জানলার পাল্লা, খসে-যাওয়া বালি এমন কি মেঝে পর্যন্ত সব কিছু ছুঁয়ে ছুঁয়ে দেখল। ঘরময় ছুটে ছুটে কি যেন খুঁজে ক্লান্ত হলো। শ্যামলের ভেতরের একটা পাগল যেন কোনো কিছুর সান্নিধ্য কামনায় নিজের ভেতর দেয়ালের ইঁটে বার বার মাথা ঠুকতে লাগল। আর ঝরে-পড়া মাথার রক্ত নিজেকে যেন স্নান করিয়ে দিল। নিজের শরীরের সব স্পন্দন বোধ হারিয়ে ফেলল। বুকের মধ্যে সেই ব্যথাটা অসম্ভব টনটন করে উঠল।

তারপর পুঁটলী বাঁধা বিছানা আর স্যুটকেসটা নিয়ে যেতে গিয়ে আবার ফিরে তাকাল সব কিছুর দিকে। নিজেকে [illegible] [illegible] এবার চোখ দুটোকে সমস্ত ঘর, খাট, দেয়াল আর

চেয়ার থেকে হ্যাঁচকা টান মেরে আছড়ে ফেলল সামনের রাস্তায়।

রাস্তায় পা রাখল। নিজের বিবর্ণ দেহটাকে টেনে হ্যাঁচড়ে নিয়ে চলল রোদ-জ্বলা রাস্তা দিয়ে। ফিনফিনে সকালের হাওয়া শ্যামলের ছুঁচ বেঁধার মত লাগল। শ্যামল হাঁটছে হাঁটছে। বাঁ দিকের ছোট্ট জল জমা জায়গাটাতে এক ঝাঁক শালিক জল ছিটিয়ে স্নান করছে। শ্যামলের স্নান ভাল লাগল। ক' মুহূর্ত দাঁড়িয়ে দেখল। তারপর আবার সামনে চলার কথা মনে হলো।

শ্যামল এগিয়ে চলেছে। মনে মনে কত কিছুর হিসাব করতে চাইল। কিন্তু কি হিসাব করবে শ্যামল। কি করেই বা করবে। কি আছে! কি থাকতে পারে হিসাবের। আর থাকলেই যে হিসাব করা যাবে এ কথাই বা বলল কে শ্যামলকে! খুঁজতে গিয়ে কোনো কিছুই মনে এলো না শ্যামলের। বস্তুতঃ কিছু নেই বলেই নাকি। ভুলে যেতে যেতে মনে পড়ল, শ্যামল এখন রাস্তায়। হাঁটছে। আর হাঁটতেও হবে শ্যামলকে এমনি করে উঁচু নীচু রাস্তা পার হয়ে যতদিন না এ রাস্তা একেবারে শেষ হয়ে যায়।

কিছুটা এগিয়ে শ্যামলের পা আটকে গেল। মনে হলো কোনো ডাক শুনতে পেল যেন। মনে হলো সে ডাক গভীর পাতাল থেকে উঠে এসে বাতাসের সিঁড়ি ভাঙ্গাতে ভাঙ্গাতে এগিয়ে আসছে। শ্যামল স্তব্ধ হলো। পিছন ফিরল। শ্যামলের অন্ধ হলেই ভাল হতো। দেখল ঝুমরী ছুটতে ছুটতে এগিয়ে আসছে। শ্যামল মাথা নামাল। চোখ বুঁজে গেল। আর তখনই দেখল একটা পাখী উড়ছে আকাশ দিয়ে। উড়তে উড়তে দূরে অনেক অনেক দূরে অনন্ত শূন্যে অদৃশ্য হয়ে গেল।

শ্যামল চোখ খুলল। দেখল ঝুমরী শ্যামলের একেবারে সামনে এসে দাঁড়িয়েছে। হাঁপাচ্ছে। ওর চোখ দুটো দেখে মনে হলো শরীর থেকে বেরিয়ে শূন্যে নিশ্চল হয়ে আছে। শ্যামল নিশ্বাসে ওঠা নামা ওর বুক দেখল। অদ্ভুত সুন্দর লাগছিল। হাঁপাতে হাঁপাতেই গভীর ঘন গলায় বলল বাবুজি, তু চলে যাইছিস? ঝুমরীর স্বর এক ঝলক রক্ত বেরিয়ে আসার মত। শ্যামলের চার পাশের বাতাসে হু হু বিষণ্ণতার সুর ঢেউ হয়ে মিশে গেল। ঝুমরীর সেই হরিণী চোখ জমাট পাথর হলো।

নিজেকে মাটির ওপর আরো শক্ত করার চেষ্টা করে ঝুমরী আবার কি যেন বলতে যাচ্ছিল। কোনো কিছু শোনার আগেই অনেক সহজ করে বলবার চেষ্টা করল শ্যামল, হ্যাঁ ঝুমরী, আমার যে কাজ শেষ হয়েছে। ঝুমরীর বুকের ওঠা-নামা মুহূর্তের মধ্যে তাল হারাল। অতল সমুদ্রে ডুবে যেতে যেতে ঝুমরী বলে উঠল, আর আসবিক নাই?

শ্যামলের শরীরের সমস্ত যন্ত্রগুলো সেই মুহূর্তে নিস্তব্ধ হলো। নিজেকে অসম্ভব ঠাণ্ডা লাগল। মনে হলো নিশ্বাস নিতেও ভুলে যাবে। জোরে ভীষণ জোরে স্বর-শব্দ চিৎকার করে বলতে ইচ্ছে হচ্ছিল, হ্যাঁ ঝুমরী আসবো। আবার ফিরে আসবো আমি। না, বলতে পারল না। কিছুই বলা গেল না। শ্যামল কোনো কথা বলতেই ভুলে গেল। বুদবুদের মতই কথাগুলো বুকের মধ্যে মিশে হারিয়ে গেল। ঝুমরীর চোখ দুটো বর্ষার মেঘ আকাশের মাঝখানে বৃষ্টি হবার অপেক্ষায় থাকার মত।

ঝুমরীর চোখ থেকে চোখ তুলে আকাশে দৃষ্টি ছড়িয়ে বলল শ্যামল, কি জানি আসব কি না। জানি না তো। ঝুমরীর পায়ের তলার মাটি থরথর করে কেঁপে উঠল। ঝুমরীর দিকে তাকিয়ে মনে হলো এ ঝুমরীকে শ্যামল দেখেনি কখনও। দেখতে চায়ওনি। ঝুমরীকে ঠিক কেমন লাগল ভাবতে গিয়ে কিছুই ভাবতে পারল না শ্যামল। ঘুম ভেঙ্গে ক' মুহূর্ত কোনো কিছু বুঝতে না পারার মতই সব কিছু মনে হলো।

শ্যামলের আকাশ ভাল লাগছিল না। শ্যামল মাটিকে দেখল। মাটি ভাল লাগল না। বাতাস দেখতে চাইল, দেখতে পেল না। তারপর দূরে শেষ হয়ে যাওয়া সবুজ প্রান্তরে দৃষ্টি ছড়িয়ে দিল, কোনো কিছু খোঁজার মত। সেদিনের রাতের বিছানায় শুয়ে সাঁওতালীদের যে আনন্দ উৎসব শুনেছিল এখন সে উৎসব মনে করতে চাইল। মনে পড়ল না কিছুতেই। মাথাটা টনটন করে উঠল।

বাতাস নেই এখন আর। সূর্য গায়ে বিঁধছে। শ্যামলের শরীরটা জ্বালা জ্বালা করছে। শালিকগুলো জল খেলা শেষ করে চলে গেছে। কেউ কোথাও নেই। নিঃসঙ্গ বিস্ময় দুটো মানুষ অনন্তকাল ধরে সময়ের ছুটন্ত সিঁড়িতে পা রেখে দাঁড়িয়ে একজন আর একজনকে ছোঁয়ার জন্য অন্তিম চেষ্টা করছে।

অনেক খুঁজে ক্লান্ত হয়ে ঝুমরী কোনো কিছু আঁকড়ে ধরল মনে হলো। বাতাসের শরীর বেয়ে জ্যোৎস্না গড়িয়ে পড়ার মত অনেক জমাট কথা ঝুমরীর গলায় ঝরে পড়ল,—হামাকে তুর সাথে লিয়ে যাবি বাবুজি? শ্যামল ঝুমরীর ঠোঁটে দৃষ্টি রাখতে পারল না। আবার মাটি, আকাশ আর প্রান্তর দেখল। মনে হলো শ্যামল কিছুই দেখতে পেল না। দৃষ্টি থেকেও যেন শ্যামলের দৃষ্টি নেই। নিজের কাছে নিজেকে আবছা আর অসহায় মনে হলো। সেই পাখিটার ডাক শুনতে পেল শ্যামল। যে ডাক প্রথম দিন শিমুল তলায় দাঁড়িয়ে শুনেছিল। কিন্তু আজ সে ডাক অনেক মাঠ, সেই ধু ধু সৈকত, নদী, সমুদ্র পার হয়ে অনেক অনেক দূরে হারিয়ে গেল। এ ডাক শ্যামলের কর্কশ লাগল। এমন ডাক শুনতে চায়নি কখনও। কিন্তু শুনতে হলো। শ্যামল কত কি ভুলে যেতে চাইল। এমন কি এই ঝুমরীকেও ওর মন, স্মৃতি আর অনুভূতি থেকে দূরে রাখতে চাইল। কিন্তু কিছুই পারল না। সামনের ঝুমরীকে আবার দেখল শ্যামল।

নিজেকে শক্ত করার চেষ্টা করল শ্যামল। —না ঝুমরী তা যে হয় না। শ্যামলের মনে হয়েছিল নিজেকে হাল্কা লাগবে। মনে হয়েছিল অনেকক্ষণ পর একটা নিশ্বাস নিতে পারবে। অথচ নিজের কোনো ওজনই বুঝল না। বুঝল না নিশ্বাস আটকে গেল নাকি।

শুধু ঝুমরীকে দেখতে হলো। দেখতে হলো ওর পাথর চোখ। দেখতে হলো স্পন্দনহীন শরীর। নিশ্বাস বন্ধ হয়ে যাওয়া অসাড় বুক। দেখতে হলো সব কিছু।

ভেতরে ভেতরে শ্যামল কেঁপে উঠল। কত কিছু যেন শ্যামলের করতে ইচ্ছে হলো। ইচ্ছে হলো দুহাত দিয়ে ঝুমরীর অনড় দেহটাকে নাড়িয়ে দিতে। ইচ্ছে হলো ওর হাত কিংবা গাল ছুঁয়ে বলতে, ঝুমরী তুমি কথা বলছ না কেন? তুমি কি কথা বলতে ভুলে গেলে? তোমার ঠোঁটে ঢেউ তোলা সেই কথা যে আমার শুনতে ভীষণ ইচ্ছে করছে।

তারপর কি হলো! কি হলো ঝুমরীর! কি কথা বলেছিল! শ্যামলের নিজেরই বা কি হলো! না। আর কিছুই মনে পড়ছে না।. ...শ্যামল সব কিছুই ভুলে গেল।...

শ্যামলের খাটটা নড়ে উঠল। শরীর কেঁপে গেল। সাঁতার কেটে তীরে ওঠার মত অনেক হাতড়ে ক্লান্ত হয়ে চেতনার মাটি পেল আবার। মাথাটা টোলছে। বুকের ব্যথাটা টনটন করছে আরো।

ঘরের অন্ধকার নেই এখন। সিঁড়ি বেয়ে নেমে আসার মত শ্যামল কড়িকাঠ দেখল। দেখল টেবিলে শেষ হয়ে যাওয়া গলা মোমবাতি। দেখল খোলা জানলার পাল্লা দিয়ে সকাল ঘরের ভেতর ঝুঁকে পড়েছে। বিছানার ওপর খবরের কাগজটা পড়ে আছে। প্রথম পাতায় বড় অক্ষরে জ্বলে জ্বলে করছে,—'রাণীগঞ্জ আই এস কোম্পানীতে অগ্নিকাণ্ড, তিনটে বস্তি সম্পূর্ণ ভস্মীভূত।' শ্যামল কিছুই ভাবতে পারল না। সকালের আলো ওর চোখে অন্ধকার হয়ে এলো। ওর প্রতিদিনের মাটিতে মনের অনেক জমাট কথা বুদ্বুদ হয়ে ঝরে পড়তে লাগল।

অঙ্গনা

প্রবাসে : বিস্তৃত কর্মকাণ্ডে

লণ্ডনে বর্ণবিদ্বেষ দিনে দিনে তীব্ররূপে আত্মপ্রকাশ করছে। কিছুদিন আগে একজন ভারতীয় ছাত্রকে লণ্ডনের এক পানশালা থেকে বের করে দেওয়া হয়। গাত্রবর্ণের জনাই তিনি বর্ণ-বিদ্বেষের শিকার হন। গাত্রবর্ণের কাছে তার কোন পরিচয়ই ধোপে টিকলো না। ছাত্রটি নিজে লণ্ডনের ছাত্র সংসদের সভাপতি এবং তার বাবা লণ্ডনের প্রাক্তন হাই কমিশনার। তবু ছাত্রটি বর্ণ-বিদ্বেষের হাত থেকে রেহাই পেলো না।

এই বর্ণবিদ্বেষের বিরুদ্ধে নানা মহল থেকে প্রতিবাদও হচ্ছে। কিন্তু বিশেষ সুফল পাওয়া যাচ্ছে না। এরই মধ্যে সবচেয়ে দুর্ভাগা হলো ভারতীয় বংশোদ্ভূতদের। যারা এক সময়ে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের নানা অংশে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে ছিল এবং এখন অবস্থার পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে ব্রিটেনে ফিরে আসতে বাধ্য হচ্ছে ব্রিটিশ সরকার তাদের দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নিচ্ছে। লণ্ডনে তাদের প্রবেশাধিকার মিলছে না। ব্রিটিশ সরকারের এই অনুদার মনোভাবের বিরুদ্ধে জনমত গঠনের উদ্দেশ্যে এধার উদ্যোগী হয়েছেন শ্রীমতী বীণা চট্টোপাধ্যায় নামে এক বাঙালী ভদ্রমহিলা। এই উদ্দেশ্যে তিনি একটি সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানও গড়ে তুলেছেন। এই সংস্থার নাম ইস্ট-ওয়েস্ট হারমনি। তিনি নিজেই এই সংস্থার চেয়ারম্যান। এই সংস্থা ছাড়াও তিনি এ-সংক্রান্ত নানা প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত।

শ্রীমতী চট্টোপাধ্যায়ের এই সংস্থা ইতিমধ্যে নানা প্রশংসনীয় কাজ করেছে। বিভিন্ন সামাজিক সমস্যার সমাধানে সংস্থার মাধ্যমে তিনি অগ্রগণী ভূমিকা নিয়েছেন। কিন্তু মূল সমস্যা সব সময়ই প্রাধান্য পেয়েছে। লণ্ডনে প্রবেশাধিকারে বঞ্চিত যে সব বহিরাগত আটকবন্দী থাকেন ডিটেনশন সেন্টারে তিনি নিজে তাঁদের তদ্বির-তদারকি করেন। একদিন তিনি ডিটেনশন সেন্টারে হাজির আর এমনি সময়ে সাতজন বহিরাগত এসে পৌঁছুলো। কর্তৃপক্ষ তাদের দেখাশোনার দায়িত্ব দিলেন একটা উৎসুক [illegible] তা আঁচ করতে পারে [illegible] সঙ্গে তিনি এই অন্যায় মনোভাবের প্রতিবাদ করলেন। কথা কাটাকাটি [illegible]। [illegible] তিনি নিজেই তাতে [illegible]। ওদের খাওয়া-দাওয়া [illegible] সব ব্যবস্থাই [illegible] তিনি [illegible] করলেন। শুধু [illegible] বক্তৃতা নয় [illegible] যে নিজে হাত লাগাতে [illegible], সে প্রমাণও তিনি রাখলেন।

এই সমস্যাভিত্তিক নানা আলোচনায় শ্রীমতী চট্টোপাধ্যায় অংশ গ্রহণ করেন। আত্মপক্ষ সমর্থনে জোরালো যুক্তি দাঁড় করান। একবার এমনি এক আলোচনা-সভায় চোখা চোখা বাক্যবাণে তিনি উত্তম করে তুললেন বিরোধী পক্ষের বক্তা এবং রক্ষণশীল এম-পি এনক পাওয়েলকে।

এসব তর্কের ঊর্ধ্বে শ্রীমতী চট্টোপাধ্যায় বিশ্বাস করেন যে জাতিগত বিদ্বেষের উৎস হলো সংস্কার এবং কিছু পরিমাণে পারস্পরিক ভুল বোঝাবুঝি। এ নিয়ে তিনি একখানা বইও লিখেছেন। বইটির নাম 'মিউচুয়াল মিসআন্ডারস্ট্যান্ডিং'। সব ইংরেজই যে বর্ণবিদ্বেষী এমন নয় বরং তিনি মনে করেন যে, উভয় জাতিই যদি এ বিষয়ে সচেতন হয়ে পারস্পরিক আলাপ-আলোচনার মধ্য দিয়ে সমঝোতার পথে এগোয়, তাহলে এই সমস্যা থেকে উত্তীর্ণ হওয়া এমন কিছু শক্ত নয়। এই সমস্যাকে আর একটু সহজতর করার জন্য তিনি এ বিষয়ে একটি চলচ্চিত্রও তৈরি করছেন। মূল সমস্যার ভিত্তিতে প্রাচ্য এবং পাশ্চাত্য সংস্কৃতির ভাবধারায় পুষ্ট হবে এই চলচ্চিত্র। তাঁর এই প্রচেষ্টাকে সর্বপ্রথম স্বাগত জানান বৃটিশ বোর্ড অব ফিল্ম সেন্সরস-এর সম্পাদক জন ট্রাভেলিয়ন এবং লণ্ডন ফিল্ম স্কুলের আর [illegible]। লণ্ডন ফিল্ম স্কুল প্রয়োজনবোধে শ্রীমতী চট্টোপাধ্যায়কে নিজস্ব স্টুডিও ব্যবহারের অনুমতি দিয়েছে। এই চলচ্চিত্রটি সম্পর্কে আর একটু উল্লেখযোগ্য তথ্য হলো যে, তিনি স্ক্রিপ্ট তৈরি করেছেন ইয়র্ক [illegible]-এর সহযোগিতায়। শ্রীমতী চট্টোপাধ্যায়-এর মতে ভারতীয় দর্শন সম্পর্কে যার পাণ্ডিত্য যে কোন ভারতীয়ের ঈর্ষা উৎপাদনে সক্ষম।

সমাজসেবী হিসেবেই শ্রীমতী চট্টোপাধ্যায় সুখ্যাত পরিচিত। আর এই সুবাদেই তিনি ঘুরে বেড়িয়েছেন সারা পৃথিবী। সেই সঙ্গে প্রাচ্য সংস্কৃতি সম্পর্কে প্রতিটি দেশেই বক্তব্য রেখেছেন। একই সঙ্গে তিনি [illegible] সঙ্গীত এবং সাহিত্যানুরাগীও বটে। কমার্শিয়াল ডিজাইনার, ইন্টিরিয়র ডেকারেটর এবং [illegible] শিল্পীর [illegible] অধিকারী। গত কয়েক বছরের মধ্যে তাঁর চিত্রসম্ভারের একাধিক প্রদর্শনী হয়েছে খোদ লণ্ডন শহরে। ইন্টিরিয়র ডেকরেশনের উপর তাঁর প্রদর্শনী উচ্ছ্বসিত প্রশংসা লাভ করেছে। এই প্রশংসার মূল কারণ হলো তাঁর স্বকীয়তা।

শ্রীমতী চট্টোপাধ্যায় কোথাও নিজেকে আটকে রাখতে চান না। নিজেকে তিনি যেমন ছড়িয়ে দিতে চান তেমনি পৃথিবী জুড়ে ছড়ানো জ্ঞানভাণ্ডারের আস্বাদ লাভে নিজেকে ধন্য করতে চান। সেজন্য তিনি লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ে ইতিহাস, সমাজবিদ্যা, ফিল্ম টেকনিক এবং অ্যাডভারটাইজিং সম্বন্ধে শিক্ষালাভ করেছেন। চলচ্চিত্র নির্মাণের থিয়োরেটিক্যাল এবং প্র্যাকটিক্যাল উভয় জ্ঞানেই নিজেকে সমৃদ্ধ করেছেন। তাঁর মতে সমাজমুখিনতাই হলো শিল্পের মূল কথা। শিল্পের যদি সামাজিক তাৎপর্য না থাকে তবে তা অর্থহীন। স্বাভাবিকভাবেই ফর্ম সম্বন্ধে তিনি বিশেষ আগ্রহী নন। থীমের উপর তিনি গুরুত্ব আরোপ করেন বেশি। ইমিগ্র্যান্টস সংক্রান্ত তাঁর বিখ্যাত চলচ্চিত্রটি থীমের দিক থেকে লক্ষ্য রেখেই তোলা হচ্ছে। শুধু এটিই নয়, তাঁর হাতে রয়েছে আরো অনেক ছবি। সব ছবিতেই ফর্মের চেয়ে থীম বেশি প্রাধান্য পাচ্ছে।

বর্ণগত সম্প্রীতির জন্য যেমন চলচ্চিত্র নির্মাণের ব্যাপারেও শ্রীমতী চট্টোপাধ্যায় তেমনি সিরিয়স। দীর্ঘদিন ধরেই তিনি সিনেমার স্ক্রিপ্ট তৈরি করছেন। হিন্দুধর্মের বিভিন্ন উৎসব নিয়ে তিনি কয়েকটি স্ক্রিপ্ট তৈরি করেছেন। এর মধ্যে আছে রাসযাত্রা, হোলি, ঝুলন, মাথুর প্রভৃতি। ধর্মীয় মোড়ক থেকে প্রতিটি উৎসবের আনন্দঘন রূপটি তিনি উপহার দেবার চেষ্টা করেছেন এবং সেই সঙ্গে উৎসব যে আমাদের জীবনের সঙ্গে একান্ত অবিচ্ছেদ্যভাবে জড়িত, সেকথাও প্রমাণ করেছেন। এগুলি যদি চলচ্চিত্রে রূপায়িত হয় তবে বিদেশে হিন্দুধর্মের যথাযথ প্রতিনিধিমূলক ব্যাখ্যা হিসেবে এদের গুরুত্ব হবে অপরিসীম। হিন্দুধর্ম এবং ভারতবর্ষ সম্বন্ধে ওদেশের ঘোর কাটাতে এই চলচ্চিত্রগুলি খুবই সাহায্য করবে। আর তা আমাদের দেশের পক্ষে হবে এক মহৎ কর্ম।

ফিল্ম স্ক্রিপ্ট তৈরি করা ছাড়াও শ্রীমতী চট্টোপাধ্যায় লণ্ডন ফিল্ম স্কুলে একাধিক রিসার্চ ফিল্ম তৈরি করেছেন। এসবই তাঁর হাত পাকানো এবং আরো অভিজ্ঞতা অর্জনের জন্য। আর এই একই উদ্দেশ্যে তিনি সাধারণ কলাকুশলী থেকে শুরু সম্পাদনা এবং পরিচালনার কাজও করেছেন। এমনিভাবে প্রতিটি কাজেই তিনি প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছেন।

শ্রীমতী চট্টোপাধ্যায় নিজেকে বহু-বিস্তৃত অধ্যায়ে বিভক্ত করেছেন। শুনলে অবাক হতে হয় যে তিনি আবার লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের অফিসার্স ক্যাডেট কোর-এর অন্যতম সদস্যা। এবং সেই সুবাদে তিনি রয়াল এলবার্ট হলে রাজমাতার 'গার্ড অব অনার'-এ বিভূষিত হয়েছেন। এই সম্মান ভারতীয় মহিলাদের মধ্যে তিনিই সর্বপ্রথম পেলেন। এছাড়া আরো একটি ব্যাপারে তিনি ভারতীয় মহিলাদের মধ্যে শীর্ষস্থানীয় হবার দুর্লভ গৌরবের অধিকারী। লণ্ডন স্কুল অব ফিল্ম টেকনিক ছাত্র ইউনিয়নের [illegible] নির্বাচিত [illegible] শ্রীমতী চট্টোপাধ্যায় [illegible] এই পদে নির্বাচিত হলেন। [illegible]

দক্ষিণ কলকাতার বিশিষ্ট প্রতিষ্ঠান নারী সেবা সংঘ প্রতি বৎসর দুর্গাপূজোর প্রাক্কালে সংঘের আবাসিক এবং কর্মীদের তৈরী জামা-কাপড়ের প্রদর্শনী আয়োজন করে। ছবিতে এবারকার প্রদর্শনীর একটি অংশ

থেকেও তিনি নিজেকে দূরে সরিয়ে রাখেননি। পড়াশোনার অবসরে ব্যাট হাতে নেমে পড়েছেন টেবিল টেনিস খেলাতে। আর খুব যে একটা খারাপ খেলতেন না তার প্রমাণ পাওয়া যায় লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের চ্যাম্পিয়নশিপ অর্জনে।

চিত্রনাট্য রচনায় শ্রীমতী চট্টোপাধ্যায়ের কৃতিত্ব সুবিদিত। কিন্তু তা বলে কেউ যদি মনে করে থাকেন যে চিত্রনাট্য ছাড়া আর কিছু লেখার হাত তাঁর নেই তবে মস্ত ভুল করবেন। সৃজনশীল রচনায়ও তিনি সমান দক্ষ। কবিতা তাঁর হাতে বেশ ভালই আসে। নিজের কয়েকটি কবিতা সংকলন ও তিনি প্রকাশ করেছেন। ভারতীয় দর্শন সম্বন্ধে তাঁর সুগভীর পাণ্ডিত্য, এদেশের সবাইকে বিশেষভাবে অভিভূত করে। তাঁর রচনায়ও এর প্রতিফলন ঘটে। এর আসল কারণ, তিনি হলেন, গোঁড়া বৈষ্ণব পরিবারের সন্তান। পরিবারের ঐতিহ্য ভারতীয় দর্শন সম্পর্কে তাঁকে উৎসাহী করেছে এবং তা প্রচারের প্রেরণাও লাভ করেছেন এখান থেকেই। বিভিন্ন সময়ে তিনি যেসব বক্তৃতা করেন তাও তাঁর দার্শনিক চেতনায় সমৃদ্ধ। বর্ণবিদ্বেষের মূল ঘাঁটিতে বসে বর্ণগত সম্প্রীতির জন্য লড়াই চালিয়ে যাওয়া বৈষ্ণব ধর্মের উত্তরাধিকারীর পক্ষে একান্ত উপযুক্ত কাজ। জাতিগত সম্পর্ক সংক্রান্ত তাঁর গবেষণা এবং মূল্যায়ন খুবই প্রশংসনীয়। তিনি লণ্ডনের সকল ভারতীয় এবং এশিয়ান সংস্থার সঙ্গে নিজেকে যুক্ত রেখেছেন।

শ্রীমতী চট্টোপাধ্যায় সঙ্গীত এবং নৃত্যে বিশেষ পারদর্শিনী। চলচ্চিত্রের ফটোগ্রাফার হিসেবেও তিনি বেশ খ্যাতনামা। সর্বোপরি তিনি একজন সমালোচক। আরো উল্লেখযোগ্য যে, এসবের প্রতিটিতেই তিনি ডিগ্রি এবং ডিপ্লোমা পেয়েছেন। এবং কোন ব্যাপারেই একেবারে চুপচাপ বসে নেই। একাধিক নৃত্যনাট্য এবং নাটক তাঁর পরিচালনাধীনে মঞ্চস্থ হয়েছে। টেলিভিশনেও তিনি নিয়মিত অংশ নিয়ে থাকেন। এছাড়া ভারতীয় হিসেবে আই টি ভি রেডিফিউসন এবং রেডিওতে তাঁর অংশ গ্রহণ বাস্তবিকই খুব গর্বের। বর্ণগত সমস্যা সম্পর্কে যেসব সংবাদপত্র উৎসাহী সেখানে প্রায়ই তাঁর সাক্ষাৎকার প্রকাশিত হয় এবং নিজেও তিনি এ সম্পর্কে নানা নিবন্ধে মতামত ব্যক্ত করেন। দেশ এবং বিদেশে ইম্প্রেসারিও হিসেবে তিনি বিশেষ খ্যাতি অর্জন করেছেন। এজন্য আমাদের রীতিমত গর্বিত হবার কারণ আছে। একাধিক আন্তর্জাতিক ব্যক্তিত্বের সংস্পর্শও তিনি লাভ করেছেন। হেনরী মুরের মত লেখক, ইহুদী মেনুহিনের মত সংগীতজ্ঞ এবং অলডাস হাক্সলীর মত বিজ্ঞানীর ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে তিনি এসেছেন। এছাড়াও আছেন ডঃ রোজার মানভিল, লেডি ক্যাথারিন এবং সত্যজিৎ রায়।

নিজের দেশকে বিদেশে আরো স্পষ্টভাবে তুলে ধরার জন্য সম্প্রতি শ্রীমতী চট্টোপাধ্যায় তিনটি স্বল্প দৈর্ঘ্যের চলচ্চিত্র নির্মাণের এক পরিকল্পনা গ্রহণ করেছেন। লণ্ডনে তিনি ইতিমধ্যে একাধিক স্বল্প দৈর্ঘ্যের চলচ্চিত্র নির্মাণ করেছেন এবং যথেষ্ট খ্যাতিও অর্জন করেছেন। ইমিগ্রান্ট সংক্রান্ত চলচ্চিত্রটিই হবে বলতে গেলে প্রথম ফিচার ফিল্ম। পরিকল্পনামত এই স্বল্প দৈর্ঘ্যের চলচ্চিত্র হবে শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী, সেতারী আবদুল হালিম জাফর এবং লেখক রাজেন্দ্র সিং বেদীকে নিয়ে। শ্রীমতী গান্ধী মাত্র পাঁচ মিনিটের জন্য অভিনয় করবেন। এবং চলচ্চিত্রে এটুকুই তাঁর ব্যক্তিগত অবদান।

দেশের সম্পদ নিয়ে চলচ্চিত্র করার আরো পরিকল্পনা তাঁর আছে। শিল্পী যামিনী রায় এবং কানন দেবীকে নিয়ে ফিচার ফিল্ম করারও পরিকল্পনা আছে শ্রীমতী চট্টোপাধ্যায়-এর। তবে তিনি এখন বাংলাদেশ সংক্রান্ত একটি ফিচার ফিল্ম করার ব্যাপারে খুবই ব্যস্ত। হাতের কাজ একটু হালকা হলেই তিনি পরিকল্পনামাফিক এগোবেন। তাঁর বাংলাদেশ সংক্রান্ত চলচ্চিত্রটি সম্পাদনা করবেন সত্যজিৎ রায়। নিজের কাজে সত্যজিৎ রায়ের প্রস্তাব তিনি স্বীকার করেন। শ্রীমতী চট্টোপাধ্যায়ের পরিকল্পনা সম্বন্ধে তিনি খুবই উৎসাহ প্রকাশ করেছেন।

এসবের সঙ্গে আরও একটি বাসনা শ্রীমতী চট্টোপাধ্যায় পোষণ করেন। কিছু প্রতিভাবান সংগীতশিল্পীকে তিনি এই সুযোগে ব্রিটেনে নিয়ে যেতে চান। তবে সবকিছুই নির্ভর করে তাঁর কাজের আন্তরিকতার উপর। এবং আন্তরিকতার বলেই তিনি সে সাফল্য অর্জন করবেন।

—প্রমীলা

ছোটি বহু/ শর্মিলা ঠাকুর

প্রেক্ষাগৃহ

বাঙলা চলচ্চিত্র প্রযোজনার ক্ষেত্রে আবার 'গেল' 'গেল' রব

বাঙলা চলচ্চিত্রের প্রযোজকরা প্রথম 'গেল' 'গেল' রব তুলেছিলেন ১৯৬২ সালে এবং তা পশ্চিমবঙ্গ সরকারকে সমস্যার সমাধানকল্পে রাইটার্স বিল্ডিংস-এর রোটান্ডা হলে একটি প্রধিামধি স্থানীয় সভা ডাকতে উদ্বুদ্ধ করেছিল। এরপরে গঙ্গানদী দিয়ে বহু কিউসেক জল প্রবাহিত হয়ে গেছে। কংগ্রেস সরকারের মেয়াদ ফুরোবার পরে নির্বাচনের মাধ্যমে গদীতে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিলেন প্রথম কোয়ালিশন সরকার এবং তারপরে আরও অনেক রকম পরিবর্তন ঘটে বর্তমানে 'প্রেসিডেন্টস রুল' চালু রয়েছে এই রাজ্যে। তবুও এত ডামাডোলের মধ্যেও তিনটি অনুসন্ধান সমিতি স্থাপিত হয়েছে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের চলচ্চিত্র শিল্পের ব্যাধি নির্ণয়ের জন্যে এবং তার প্রতিষেধক সম্বন্ধে সুপারিশ করবার জন্যে। কে সি সেন কমিটি, গুপ্ত কমিটি ও শেষ ফিল্ম কনসালটেটিভ কমিটি তাঁদের লিখিত সুপারিশ পেশ করেছেন যথাসময়ে। কিন্তু সুপারিশ অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করবে কোন সরকার? 'প্রেসিডেন্টস রুল' অর্থে দিনগত পাপক্ষয়; কোনোক্রমে নিত্য-নৈমিত্তিক কাজ চালিয়ে যাওয়া। যেখানে শান্তি ও শৃঙ্খলা যথারীতি রক্ষা করা সম্ভব হচ্ছে না, সেখানে অন্যদিকে চোখ ফিরোবার সময় কোথায়?

আঞ্চলিক ভাষায় তোলা, ছবির স্বাবলম্বী হওয়া কঠিন। একমাত্র তামিল ছবির আছে প্রকাণ্ড বাজার। তাছাড়া বাঙলা মারাঠি, আসামী, ওড়িয়া প্রভৃতি ছবির যা বাজার, তাতে নির্মাণ-ব্যয় ওঠা ভীষণ কঠিন ব্যাপার। প্রায় বছর কুড়ি আগে একটি পরিসংখ্যান থেকে প্রকাশ পেয়েছিল যে, ভারতীয় চলচ্চিত্র শিল্প যেখানে সামগ্রিকভাবে বছরে ১১ কোটি টাকা লাভ করে, সেখানে প্রযোজক শাখা বছরে ২ কোটি টাকা লোকসানের সম্মুখীন হয়।

এইটি ... বাঙলা দেশের একজন বিখ্যাত ... আমাকে বলেছিলেন, ... জন্যে প্রস্তুত এত মুখ ... পাওয়া যাবে। সর্বভারতীয় ... কথা বাদ দিয়ে মাত্র পশ্চিম-বঙ্গের ... পরিস্থিতির কথায় চলে এলে, ... প্রদর্শনী সমাপ্ত হয়েছে, এমন একটি বিশেষ জনপ্রিয় ছবির তিনটি ... চিত্রগৃহ থেকে প্রযোজক - পরিবেশকের আয় যেখানে হয়েছে কম-বেশী দু লক্ষ টাকা, সেখানে চিত্রগৃহ তিনটি নিয়েছে তিন লক্ষ ছিয়ানব্বই হাজার টাকা। অর্থাৎ প্রযোজক-পরিবেশকের মিলিত আয়ের প্রায় দ্বিগুণ নিয়েছেন প্রদর্শক। কিন্তু এ-অবস্থার পরিবর্তন আসবে কি করে? কোনো লেজিস্লেশন বা আইন-কানুনের প্রবর্তন এ-অবস্থার পরিবর্তন করতে পারবে কি?—রাজ্য সরকার কি কোনো বিধানবলে রাজ্যের প্রতিটি চিত্র-গৃহকে বাঙলা ছবি দেখাতে বাধ্য করতে পারেন? বাঙালী দর্শকের হৃদয়ের পরিবর্তন কোন আলাদীনের আশ্চর্য প্রদীপের গুণে হবে? তারা তো ক্রমেই হিন্দী ছবির অর্থহীন চটুলতার দিকে ঢলে পড়ছে।

অবস্থার পরিবর্তন হতে পারে, যদি পশ্চিমবঙ্গে ছবিঘরের সংখ্যা ৩৫০-র বদলে অন্তত ১,০০০ হাজার হয়; যদি, পশ্চিম-বঙ্গ সরকার বাঙলা ছবির প্রদর্শনী থেকে পাওয়া প্রমোদ-করের সম্পূর্ণ পরিমাণ সরাসরি ছবির প্রযোজকের হাতে তুলে দেন; যদি, বাঙলা ছবির প্রযোজক সহজ, সুবিধা-জনক শর্তে ফিল্ম ফিনান্স কর্পোরেশনের কাছ থেকে অর্থ সাহায্য পান এবং যদি বাঙলা ছবির প্রযোজকরা সম্মিলিতভাবে বাৎসরিক চিত্র-প্রযোজনা সম্পর্কে প্রতি বৎসর একটি সুচিন্তিত পরিকল্পনা গ্রহণ করেন।

অন্যথায় যতই চেঁচামেচি করি না কেন, অবস্থা যে তিমিরে সেই তিমিরেই থাকবে।

গেল শনিবার, ৪ সেপ্টেম্বর ইস্ট ইন্ডিয়া মোশান পিকচার অ্যাসোসিয়েশনের সভাগৃহে আহূত এক সাংবাদিক সম্মেলনে প্রযোজক-শাখার সভাপতি বিমল দে বললেন, অ্যাসোসিয়েশন যে প্রযোজক শাখাকে কোনো রকম সাহায্য করতে পারবে, তা তাঁর মনে হয় না। তাহলে অ্যাসোসিয়েশনের অংগ হয়ে তাঁরা কেন রয়েছেন, এ প্রশ্ন করা হলে তিনি বলেন, 'হয়ত এর সংগে সম্পর্ক ছেদ করতে হতে পারে।' সকলেই জানেন, প্রদর্শকদের স্বার্থ আর প্রযোজকের স্বার্থ কখনই এক হতে পারে না। কাজেই একই সংস্থার পক্ষে দুই বিরোধী স্বার্থবিশিষ্ট দলকে ঠাঁই দেওয়া রীতিমত কঠিন ব্যাপার। কিন্তু অপরূপ এই বাঙলাদেশ—এ দেশে একটি সংস্থার পক্ষে তিনটি দলকে প্রযোজক, পরিবেশক ও প্রদর্শকগোষ্ঠীকে একই ক্রোড়ে ধারণ করা সম্ভব হচ্ছে। এবং প্রযোজকরা বিশ্বাস করেন, ই আই এম পি এর বাইরে স্বাধীন সংস্থা গঠন করলে তাঁরা নাকি ছবিই করতে পারবেন না এবং করতে

স্ত্রী/উত্তমকুমার ও আরতি ভট্টাচার্য। পরিচালনা : সলিল দত্ত। ফটো : অমৃত

পারলেও তাঁদের তৈরী ছবি মুক্তিলাভের সুযোগ থেকে বঞ্চিত হবে। সব চিত্রগৃহই তখন হিন্দী ছবি দেখাতে থাকবে।

চিত্রসমালোচনা

নিমাই কাহিনীর নব চিত্রায়ণ

শ্রীগৌরাঙ্গ, নিমাই সন্ন্যাস, শচীদুলাল, ভগবান শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য, বিষ্ণুপ্রিয়া নীলাচলে মহাপ্রভু প্রভৃতি বহু সবাক বাঙলা ছবিই ১৯৩৩ থেকে শুরু করে আজ পর্যন্ত আমরা হতে দেখেছি নবদ্বীপের চৈতন্যদেবের জীবনী অবলম্বন করে। আর একবার মহাপ্রভুর বাল্যকাল থেকে তাঁর সন্ন্যাসগ্রহণ পর্যন্ত জীবনধারাটিকে চলচ্চিত্রে রূপায়িত করলেন পরিচালক ভূপেন রায় মালবিকা চিত্র-এর নিবেদন 'শচীমার সংসার'-এ। গৌরজননী শচীমাতার অন্তরের ব্যথা, বেদনা হাহাকারকে ব্যক্ত করাই যেন এই ছবিটির মুখ্য উদ্দেশ্য। এবং সেই উদ্দেশ্যকে সিদ্ধ করতে গিয়ে স্বাভাবিক ভাবেই ছবিতে দেখানো হয়েছে নিমাইয়ের বাল্যলীলার চপলতা, কৈশোরের পাণ্ডিত্য ও ন্যায়শাস্ত্রে দক্ষতা এবং যৌবনে ভগবদ্ভক্তি কৃষ্ণপ্রেমের আকুলতা, যে আকুলতা তাঁকে সন্ন্যাসগ্রহণ করতে বাধ্য করেছিল। গয়ায় বিষ্ণুপাদ দর্শনে মূর্চ্ছা ও ঈশ্বর পুরীর কাছ থেকে দীক্ষাগ্রহণ, সর্পাঘাতে প্রথমা পত্নী লক্ষ্মীপ্রিয়ার মৃত্যুর আকস্মিকতায় শোক এবং দ্বিতীয় পত্নী বিষ্ণুপ্রিয়ার তাঁকে সংসারবন্ধনে আবদ্ধ করবার অক্ষমতা প্রভৃতি উল্লেখ্য ঘটনাগুলিকে যথাসম্ভব নাট্যরসসিক্ত করে ছবিতে পর্যায়ক্রমে দেখানো হয়েছে। ছবির মধ্যে যে ঘটনাটিকে স্মরণীয়ভাবে দেখানো হয়েছে, সেটি হচ্ছে নিমাইয়ের রাত্রিযোগে গৃহত্যাগের পরে শচীমাতার আর্ত অন্বেষণের দৃশ্য। 'শচীমাতা কাঁদে নিমাই নিমাই প্রতিধ্বনি কহে নাই, নাই, নাই'—কবির এই উক্তিকে দৃশ্য শব্দ ও সংগীতের সুষম মিশ্রণে অসামান্য নৈপুণ্যের সঙ্গে চিত্রায়িত করেছেন পরিচালক শ্রীরায়। শচীমাতার এই হাহাকার এমন সার্থকভাবে চিত্রিত হতে আগে কখনও দেখা যায়নি।

বয়ঃপ্রাপ্ত নিমাই চরিত্রটিকে আশ্চর্য সংযমের সঙ্গে জীবন্ত করে তুলেছেন অসীমকুমার: তিনি নিমাইয়ের অপার্থিব ব্যক্তিত্বকে অবলীলাক্রমে পরিস্ফুট করেছেন—তিনি নিজেকে বিলুপ্ত করে দিতে পেরেছেন চরিত্রটির গভীরে। বালকনিমাই রূপে শ্রীমান অরিন্দম মিষ্টি। নিমাইয়ের প্রথমা স্ত্রী লক্ষ্মীপ্রিয়ার ভূমিকায় নবাগতা সংহিতা রায়কে মানিয়েছে যেমন, তেমনই মাধুর্যময় হয়েছে তাঁর অভিনয়। দ্বিতীয়া স্ত্রী বিষ্ণুপ্রিয়া বেশে জুঁই বন্দ্যোপাধ্যায় আকৃতির দিক দিয়ে সুন্দর হলেও তাঁর বাচনভঙ্গী বিশেষ করে নিমাইয়ের সন্ন্যাসগ্রহণের রাত্রে—কেমন যেন কাঠিন্যপূর্ণ—আদৌ সরস নয়। ছবির প্রধানতম শচীমার ভূমিকায় সন্ধ্যারাণীর অভিনয় আবেগের আতিশয্যপূর্ণ।—তিনি নিমাইয়ের মা—কাজেই তাঁর আবেগপ্রকাশের মধ্যে আমরা একটি স্বাতন্ত্র্য আশা করি এবং যা আমরা তাঁর অভিনয়ের মাধ্যমে প্রকাশিত হতে না দেখে কিছুটা নিরাশ হয়েছি। অদ্বৈত ও শ্রীবাসের ভূমিকায় যথাক্রমে মিহির ভট্টাচার্য ও শঙ্করনারায়ণের অভিনয় চরিত্রানুগ। অপরাপর ভূমিকায় দিলীপ রায়, অমরেশ দাস, আনন্দ মুখোপাধ্যায়, তরুণকুমার, জহর রায় প্রভৃতির অভিনয় উল্লেখ্য।

ছবির কলাকৌশলের বিভিন্ন বিভাগের কাজের মধ্যে বিভিন্ন ঘটনার অলৌকিকত্ব রূপায়ণে ফোটোগ্রাফীর কারসাজি সাথকতাময় ও প্রশংসনীয়। ছবির সুষ্ঠু সম্পাদনা, যা ছবিকে একটি ন্যায্য গতিশীলতা দান করেছে, তাও বিশেষভাবে লক্ষ্যণীয়। 'শচীমা'র সংসার'-এর একটি বিশেষ সম্পদ হচ্ছে এর গানগুলি। কিছু প্রচলিত ও বেশীর ভাগ শ্যামল গুপ্ত রচিত গান মানবেন্দ্র মুখোপাধ্যায় দ্বারা সুরসমৃদ্ধ এবং মান্না দে, ধনঞ্জয় ভট্টাচার্য, শ্যামল মিত্র, সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়, প্রতিমা বন্দ্যোপাধ্যায়, নির্মলা মিশ্র, বনশ্রী সেনগুপ্ত প্রভৃতি দ্বারা গীত হয়ে এই ছবিতে সন্নিবেশিত হয়েছে এবং হয়ে ছবিটিকে যথেষ্ট আকর্ষণীয় করে তুলেছে।

আজকের হিংসাজর্জর পশ্চিমবঙ্গে মালবিকা চিত্র নিবেদিত এবং ভূপেন রায় প্রযোজিত ও পরিচালিত 'শচীমা'র সংসার' বাঙালী দর্শককে স্নেহ, মমতা ও ভালোবাসায় উদ্বুদ্ধ করবে বলেই আমাদের বিশ্বাস।

মঞ্চাভিনয়

মঞ্চ-নাটকের যাত্রাভিনয়

একথা বোধ করি সকলেই স্বীকার করবেন, আজ যাত্রাওয়ালারা থিয়েটারের পথে পা বাড়িয়েছেন। যাত্রাভিনয়ের অংগ হিসবে তাঁরা রেখেছেন, প্রথমে যন্ত্রসংগীতের ঐকতান বাদন এবং তারপরেই একটি দ্বৈত নৃত্য। আর একটি জিনিস তাঁরা রেখেছেন, মূল পালার ভিতরে একটি গায়কের চরিত্র এবং সেই চরিত্র প্রায়ই এক পুরুষ-পাগল। আসলে সে কিন্তু নিয়তি বা বিবেকের কাজ করে। আরও যেটুকু যাত্রার ছাপ আমরা আজকের যাত্রাভিনয়ে দেখতে পাই, সেটা আসলে গুণাত্মক নয়, দোষাত্মক। সেটা হচ্ছে ত্রুটিপূর্ণ বাচনভংগী, বিশেষ করে যা প্রকট হয়ে ওঠে ছন্দোময় আবৃত্তিতে হাস্যরসের ভূমিককাভিনয়ে। সংলাপ ভাবাবেগপূর্ণ হওয়ার সঙ্গে সংগে যে অর্থবহ ও শ্রুতিগ্রাহ্যও হওয়া প্রয়োজন, এ-কথা সম্ভবত যাত্রাদলের নায়ক-নায়িকা বা হাস্যরসের ভূমিকাভিনেতারা গ্রাহ্যই করেন না। কি গদ্য কি পদ্য আবৃত্তি সুরেলা হলেও ক্ষতি নেই, কিন্তু অভিনেতা কি বলছেন, তা যদি দর্শকরা অনায়াসেই বুঝতে না পারে, তাহলে অভিনয় হৃদয়গ্রাহী হবে কি করে? এই সাধারণ কথাকটি বর্তমানের প্রায় সকল যাত্রাদল সম্বন্ধেই প্রযোজ্য।

সম্প্রতি মহাজাতি সদনে লোকনাট্য যাত্রা-সম্প্রদায় অভিনীত তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'কালিন্দী' উপন্যাসের সত্যপ্রকাশ দত্ত প্রদত্ত নাট্যরূপটি দেখতে-দেখতে উপরোক্ত কথাগুলি মনে হয়েছিল। এই যাত্রা-নাটকটিতে কিছু সংলাপের পুনরুক্তি-দোষ দেখতে পেলুম। এ-ছাড়া নাটকের দৃশ্য উপস্থাপনায় স্বাভাবিক ক্রমবিকাশও মাঝে-মাঝে বাধাপ্রাপ্ত হয়েছে। এ সম্বন্ধে ক্ষমতাশালী নট-নটীর সমন্বয়ে গঠিত এই দলটির সামগ্রিক অভিনয় বেশ উচ্চাংগের এবং সেইহেতু আকর্ষণীয়। রামেশ্বর চক্রবর্তী এবং ইন্দ্র রায়ের চরিত্র দুটিতে যথাক্রমে বিজন মুখোপাধ্যায় ও ভোলা পালের ব্যক্তিত্বপূর্ণ অভিনয় দর্শকদের প্রায় মন্ত্রমুগ্ধ করে রেখেছিল এবং তাঁদের সঙ্গে সামঞ্জস্য রক্ষা করে দক্ষ অভিনয়চাতুর্যের পরিচয় দিয়েছেন সুনীতির ভূমিকায় সোনালী গোস্বামী এবং কমল মাঝির নাতনী সারিবেশে শর্মিলা পাল। ইন্দ্র রায়ের স্ত্রী ও কন্যার চরিত্রে যথাক্রমে বিভা ভট্টাচার্য ও রীতি দত্তও যথেষ্ট হৃদয়গ্রাহী অভিনয় করেছেন। এ-ছাড়া অহীন, মহীন, মিঃ মুখার্জির ভূমিকাভিনেতারাও যথেষ্ট নাট্যনৈপুণ্যের পরিচয় প্রদান করেছেন। যোগেশ মজুমদারের খল চরিত্রে শিবদাস মুখোপাধ্যায় প্রশংসনীয় রূপদান করেছেন। জগা পাগলাবেশী বঙ্কিম মুখোপাধ্যায়ের মান সাধারণ পর্যায়ের।

মহাজাতি সদনের এক বিশেষ বাংলা দেশ সাহায্যানুষ্ঠানে তরুণ অপেরার শিব ভট্টাচার্য বাংলাদেশ তরুণ শিল্পীগোষ্ঠীর পক্ষে শ্রীমতী কল্যাণী ঘোষের হাতে অর্থ তুলে দিচ্ছেন।

লোকনাট্য পরিবেশিত 'কালিন্দী' যাত্রাদর্শককে আনন্দ দেবে।

জীবনভিত্তিক প্রদর্শনী

সেদিন এক নতুন অভিজ্ঞতা হল কলামন্দিরে লীলা কোম্পানী নিবেদিত মঞ্চ প্রদর্শনীতে উপস্থিত হয়ে। দেখলুম, কয়েকজন বিদেশীর ভারতীয় সাধন-ভজন সম্পর্কে আগ্রহকে চরিতার্থ করবার জন্যে অন্তত তিনজন ভারতীয়—এক, পূর্ণদাস বাউল, দুই, যোগ-ব্যায়ামশিক্ষক দিলীপ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং তিন, ভারতনাট্যম ও কথাকলির প্রসিদ্ধ শিল্পী গুরু কেলু নায়ার তাঁদের বহু প্রকার শিক্ষাদীক্ষা দানের প্রয়াস পেয়েছেন এবং সেই শিক্ষাকে ঐ বিদেশীরা মঞ্চ-প্রদর্শনীর বিষয়বস্তুরূপে উপস্থাপিত করেছেন।

প্রথমেই তাঁরা তাঁদের দেহকে যোগক্রিয়ার উপযোগী করে তোলবার জন্যে কেমনভাবে দেহাভ্যন্তর ও নাসিকাকে প্রক্ষালিত করেন, তাই সর্বসমক্ষে প্রদর্শন করেছেন। শান্ত, সমাহিত, শুচি দেহ-মন নিয়ে তাঁরা পরে পূজা-ভজনায় প্রবৃত্ত হন প্রথমে খঞ্জনী, খত্তাল প্রভৃতি বাদ্যযন্ত্র থেকে একে একে প্রণবনাদ 'ওঁ'—'অ-উ-ম'কে নির্গত করবার প্রক্রিয়া দেখিয়ে। পরে সবগুলি যখন তাঁরা একসঙ্গে বাজান, তখন মঞ্চে প্রবেশ করেন পূর্ণদাস বাউল নামকীর্তন করতে-করতে। যন্ত্রবাদনের মাধ্যমে ভগবানকে অন্বেষণ করায় এঁরা বিশ্বাসী মন নিয়েই যেন অগ্রসর হন।

এর পরে আসে 'মা' প্রদর্শনী; ভক্তেরা মায়ের পদতলে লুটিয়ে পড়ছে—আকুতি জানাচ্ছে 'মা', 'মা' ডাকে। নিপীড়িত, নিগৃহীত জনগণ আর্তকণ্ঠে 'মা'কে ডাকছে। মা নিজেও চিৎকার করছেন; যেন পৃথিবীর পাপী মানুষজনকে তিনি ধ্বংস করতে চান। তিনি শক্তি; যেমন সৃষ্টির, তেমনই ধ্বংসের।

যোগসাধনার একটি পর্যায়ে সকলে পদ্মাসনে বসেন। এরই মধ্যে পাপশক্তির আবির্ভাব ঘটে গুরু কেলু নায়ারের পদক্ষেপের সঙ্গে। সকলকে যোগভ্রষ্ট করতে চায় এই পাপশক্তি। কিন্তু সাধনায় অটুট থাকলে পাপশক্তি শেষ পর্যন্ত পরাজিতই হয়। কৃষ্ণের কথুয়া বলে, 'রাধাকে ভুলে যাও: সে তোমার কথা চিন্তা করে না।' কিন্তু কৃষ্ণ বাঁশী বাজতেই থাকে এবং শেষ পর্যন্ত শান্তি আসে। ... এইভাবে মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়াবার জন্যে সাধনা চলে।

সত্যিই আমরা কোন রঙ্গমঞ্চ থেকে কৃচ্ছ্রসাধন, ভজন-পূজন ও সাধনার দৃশ্য দেখতে কোন দিনই প্রস্তুত ছিলুম না এবং আজও প্রস্তুত নই। রুফাস কোলিন্স এবং তাঁর সহকর্মীরা ভারতীয় সাধন-ভজনে দীক্ষিত হয়েছেন বা হতে প্রাণপাত পরিশ্রম করছেন, এ সম্বন্ধে আমাদের 'হাঁ', 'না' কিছুই বলবার নেই। এবং তাঁদের জীবনে

তাঁরা যা পেয়েছেন, তা বিদেশের বাজারে তাঁরা যদি দেখিয়ে বেড়ান, তাতেও আমাদের আপত্তি করবার কিছু নেই। কিন্তু আমাদেরই দেশে বসে তাঁরা আমাদের ধর্মীয় আচরণ প্রভৃতিকে কতখানি আয়ত্ত করলেন, তাই প্রকাশ্য প্রদর্শনীতে দেখা আমাদের পক্ষে নিতান্তই ধৈর্যচ্যুতিকর। তবে একটি প্রশংসার বিষয় এই প্রদর্শনী মারফৎ যা পরিবেশিত হয়েছে, সে হচ্ছে নানা পরিস্থিতিতে এঁদের ভিন্নমাত্রিক কম্পোজিশন — গতিশীল জটিল সমবেত দেহভঙ্গী। আর প্রশংসনীয় হচ্ছে এঁদের— বিশেষ করে রুফাস কোলিন্স ও একমাত্র নারীশিল্পীর ভারতীয় নৃত্যকুশলতা।

বাংলাদেশের সাহায্যের জন্যে কলামন্দিরে এই 'লীলা'-প্রদর্শনী গেল ২ ও ৩ সেপ্টেম্বর অনুষ্ঠিত হয়েছে রঞ্জিতমল কাঙ্কারিয়ার সৌজন্যে।

প্রখ্যাত শিল্পী সুধাংশু চৌধুরীর ৬৮তম জন্ম দিবসে সংবর্ধনা

গেল ১২ আগস্ট সকাল ৯টায় প্রাচী সিনেমা গৃহে এক বর্ণাঢ্য অনুষ্ঠানে সাংস্কৃত প্রতিষ্ঠান আনন্দ মন্দির কর্তৃক প্রখ্যাত শিল্পী সুধাংশু চৌধুরীকে সংবর্ধনা জ্ঞাপন করা হয়। অনুষ্ঠানে অনন্য সুরশিল্পী তিমিরবরণ পৌরোহিত্য করেন। উদ্বোধন করেন মন্মথ রায় এবং প্রধান অতিথিরূপে আসন গ্রহণ করেন পূর্ণ চক্রবর্তী। জ্যোতির্ময় মৈত্র কর্তৃক মঙ্গলা চরণের পর আনন্দ মন্দিরের সভ্যগণ ভারতীয় ঐতিহ্যমণ্ডিত প্রথায় শ্রীচৌধুরীকে বরণ করেন। অতঃপর তাঁর উদ্দেশ্যে একটি সুরম্য অভিনন্দনপত্র তাঁকে প্রদান করেন আনন্দ মন্দিরের সভাপতি ধীরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় (ডি জি) শ্রীচৌধুরীর গুণমুগ্ধ অনুরাগীরা তাঁকে একটি সুবর্ণ-মণ্ডিত তুলিকা উপহার দেন এবং সেটি শ্রীচৌধুরীর হাতে তুলে দেন আনন্দ মন্দিরে সহ-সভাপতি ক্যাপ্টেন কশেব দে'। সভায় উপস্থিত সুধীবৃন্দ শ্রীচৌধুরীর বহুমুখী প্রতিভা, তাঁর জীবনের নানা কর্মোদ্যমের কথা বিবৃত করে তাঁকে অভিনন্দিত করেন। শ্রীচৌধুরী সকলকে এবং আনন্দ মন্দিরের সভ্যবৃন্দদের একটি সংক্ষিপ্ত প্রতিভাষণে ধন্যবাদ দেন।

নিউ প্রভাস অপেরার 'রাহুমুক্ত রাশিয়া' : বাংলা পালাগানের আসরে পালাবদলের জোয়ার যে কটি দলের প্রাণবন্তনায় উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠেছে, তার মধ্যে নিউ প্রভাস অপেরার প্রয়াস নিঃসন্দেহে স্বাতন্ত্র্যের দাবী রাখে। গত বছরের 'বিপ্লবী ভিয়েৎনাম', 'জ্বলন্ত বারুদ' পরিবেশন করে এই দল যে নতুনতর বিষয়বস্তু ও শৈল্পিক ভাবনার পরিচয় রেখেছিলেন, তা আরো বলিষ্ঠতর ও দৃঢ়তর সুরে মুখর হয়ে উঠেছে তাদের সাম্প্রতিক প্রযোজনা 'রাহুমুক্ত রাশিয়ায়'। রমেন লাহিড়ী রচিত এই পালাটির যে একটি ব্যাপকতর ও গভীরতর আবেদন রয়েছে, সে বিষয়ে সন্দেহের কোন অবকাশই থাকতে পারে না।

বিশেষ একটি সময়ে ১৯১৪-১৯১৭) রাশিয়ার মাটিতে একটি প্রচণ্ড জন-বিপ্লবের প্রস্তুতি ও জাগরণকে কেন্দ্র করে পালাটি গড়ে উঠেছে। মহান লেনিনের নেতৃত্বে রাশিয়ার যে অসংখ্য সাধারণ মানুষ জারতন্ত্র ও স্বৈরাচারী ধনিক-গোষ্ঠীশাসিত সরকারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করেছিল এবং সবশেষে জনতার বিপ্লবই যে জয়ের মালা পেয়েছিল : এই দৃপ্ত মানবিক সংগ্রামকেই প্রোজ্জ্বল ভাষা দিয়েছে 'রাহুমুক্ত রাশিয়া'। রাশিয়ার তখনকার সম্রাট ছিলেন জার দ্বিতীয় নিকোলাস, কর্মক্ষমতা তাঁর খুব বেশি ছিল না। তাঁর চেয়ে অনেক বেশি বুদ্ধির অধিকারিণী ছিলেন জারিনা আলেক্স্যান্ড্রানোভা ফেডোরোভনা। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে সাম্রাজ্যের অধিকর্তা ছিল তাঁদের রাজগুরু রাসপুটিন। তিনি ছিলেন ঋষিবেশী এক শয়তান, লম্পট। তাঁরই অঙ্গুলিহেলনে চলত সব-কিছু। কিন্তু রাসপুটিনের আসল স্বরূপ যেদিন সবার সামনে প্রতিভাত হোতে শুরু করলো, সেদিনই বিরুদ্ধশক্তি হোল জাগ্রত। নিকোলাসের কয়েকজন মন্ত্রী মিলে ষড়যন্ত্র করে রাসপুটিনকে হত্যা করলেন এবং তার-পর ক্ষমতা কেড়ে নিলেন নিকোলাস আর জারিনার কাছ থেকে। এ ষড়যন্ত্রের নায়ক হোলেন যুবরাজ ইউসুবফ। রাসপুটিনের মৃত্যু হোল, নিকোলাসও ক্ষমতাচ্যুত হোলেন। কিন্তু লেনিনের নেতৃত্বে বলশেভিকদের বিপ্লব থামলো না : কেননা, তাঁরা দেখলেন তখনো চলছে শাসনের নামে শোষণ, সাধারণ মানুষের বঞ্চনার অন্ধকার তখনো একই রকম ঘনীভূত হয়ে আছে, লাভ হয়েছে মুষ্টিমেয় কয়েকটি পুঁজিবাদী ও স্বার্থান্বেষীর। তাই বিপ্লব চালিয়ে যেতে হবে— বলশেভিকরা নিলেন দৃঢ়তর প্রতিজ্ঞা। প্রথম পদক্ষেপে স্বার্থান্ধ পুঁজিবাদী জারের কয়েকজন মন্ত্রীকে (যাঁরা রাসপুটিনকে হত্যা করেছিলেন) জনসাধারণের স্বার্থে অপসারণ করে দিলেন। তারপরই এলো জনসাধারণের হাতে ক্ষমতা। মহানায়ক লেনিন নতুন সূর্যালোকে উঠে দাঁড়ালেন মঞ্চের উপর। রাশিয়ার আকাশ রাহুমুক্ত হোল।

এই বিপ্লব, এই ষড়যন্ত্রের ঘটনাগুলোকে অসাধারণ কয়েকটি নাটকীয় মুহূর্তে মুখর করে তোলা হয়েছে। প্রায় প্রতিটি মুহূর্তই আমাদের মনকে তা আবিষ্ট করে রাখে। পালাটির সামগ্রিক প্রযোজনাতেও কোথাও এতটুকু শৈথিল্য ছিল বলে মনে হয় না। এর জন্য প্রতিটি শিল্পীর সঙ্গে নির্দেশক রমেন লাহিড়ী নিশ্চয়ই প্রশংসার দাবী রাখতে পারেন।

অভিনয়ের ব্যাপারে যিনি আমাদের মন একেবারে ভরিয়ে দিয়েছেন এবং প্রতিটি মুহূর্তে বিস্ময়ে আপ্লুত করেছেন আমাদে- তিনি হোলেন ননী ভট্ট। তাঁর 'রাসপুটিন' চরিত্রচিত্রণ ইদানীংকালে পালাগানের অভি- নয়ে একটি উজ্জ্বল স্বাক্ষর হয়ে থাকবে। এই চরিত্রটির রূপায়ণে অনেক আতিশয আসবার সুযোগ ছিল, কিন্তু শ্রীভট্ট তাঁ- পরিণত শিল্পবোধ দিয়ে যে স্বাভাবিক ভঙ্গিমায় চরিত্রটির রূপ দিয়েছেন তা- তুলনা সত্যিই মেলে না। তাঁকে মানিয়েছিল অপূর্ব ; চলনে-বলনে এমন নিবিড় কে- চরিত্রের অতলে মিশে যাওয়ার দৃষ্টান্ত খু- বেশী নেই। তারপরেই নাম করতে হ- 'জারিনা' বেশী কল্যাণী ভট্টাচার্যের। তাঁ- স্বচ্ছন্দ ভঙ্গিমা, সংলাপ উচ্চারণের প্রাণ- ময়তা পালাটির গতিবেগে যথেষ্ট সাহায্য করেছে। অভয় হালদার প্রচণ্ড দাপটে- সঙ্গে যুবরাজ ইউসুপভের চরিত্রে অভিন- করেছেন। কয়েকটি মুহূর্তে তাঁর চোখে অভিব্যক্তি সত্যি ভোলা যায় না। অনা- চক্রবর্তীর 'আন্দ্রেয়ি'ও হয়েছে সংযত - সংহত। আত্মভোলা, উদাসীন, অকর্ম- 'দ্বিতীয় নিকোলাস' চরিত্র চিত্রণে প্রবী- অভিনেতা রাধারমণ পালের অসাধারণ না- নৈপুণ্য আবার নতুন আলোয় আলোকি- হয়ে উঠেছে। 'লেনিনে'র ব্যক্তিত্ব প্রকা- সব সময়ই জয়ন্তকুমার আন্তরিক চে- করেছেন।

অন্যান্য কয়েকটি চরিত্রে ছিলেন অমু- ভট্টাচার্য, সাধন দাশগুপ্ত, রাজকুমার, মুকু- ঘোষ, অরুণ গোস্বামী, প্রতিমা ভট্টাচা- রীতা সেন, বিশ্বনাথ চৌধুরী, মৃত্যুঞ্জয় - শশাঙ্ক ভট্টাচার্য, হীরালাল গাঙ্গু- কালিদাস ঘোষ, মুকুল মালি, সতীশ দা-

হেমাঙ্গ বিশ্বাস রচিত ও সুরারোপি- গানগুলো পালাটিকে একটি নতুন সৌন্দ- দিয়েছে। আলোকসম্পাতে যে নাটকীয় কো- কোন মুহূর্তে অসাধারণ শৈল্পিক ব্যঞ্জ- পেতে পারে তা প্রমাণ করেছেন 'অজাতশত্রু-

কারানটের 'সেই বন্ধু' : ম্যাকি- গোর্কীর নাট্যসাহিত্যের সঙ্গে বাংল- নাট্যানুরাগীদের যে অন্তর পরিচয় আ- তারই নিবিড়তা কয়েকদিন আগে আব- নতুন করে রঙের আলোয় চিহ্নিত হোল- এবারকার নাটকের নাম 'ওল্ড ম্যান'। 'কার- নট' গোষ্ঠীর শিল্পীরা এই নাটকের কাহি-

লম্বনে লিখিত 'সেই বৃদ্ধ' নাটকটি
দেন পরিবেশন করলেন মুক্ত অঙ্গনে।
লা নাট্যরূপান্তর করেছেন ভোলা দত্ত।
কটির সামগ্রিক প্রযোজনায় কিছুটা
শিপক স্বাতন্ত্র্য ও বলিষ্ঠতার আভাস
ন। এ প্রসঙ্গে নাট্যনির্দেশক কালী ঘোষের
াস নিঃসন্দেহে অভিনন্দনযোগ্য।

গুরুপদ ও অনন্ত কারখানার ম্যানে-
রের প্ররোচনায় কারখানারই আর একটি
মককে হত্যা করলো—কিন্তু দুর্ভাগ্য-
ত শুধু মাত্র অনন্তই পুলিশের হাতে
পড়লো ও বিচারে তার কুড়ি বছরের
ল হোল। আর ইতিমধ্যে গুরুপদ নাম
রবর্তন করে হোল মহাদেব। সমাজের
না আঁকাবাঁকা পথ এবং নানা প্রতিবন্ধ-
তাকে জয় করে সে হয়ে উঠলো প্রতিপত্তি-
লী এক ধনীলোক। এদিকে অনন্ত জেল
কে ছাড়া পেয়েই তার নতুন সঙ্গিনী
গিনাকে নিয়ে মহাদেবের কাছে এসে
ড়ালো তাকে অভিযুক্ত করতে। তারপর
কেই ঘটনাস্রোত বিবর্তিত হোল নতুন
খে। সংঘাত হয়ে উঠলো মুখর সুরে
বার। প্রকৃতপক্ষে আসল নাটকের যাত্রা-
রু এখান থেকেই। বৃদ্ধবেশী অনন্তের
গমন মহাদেবের সংসারে একটা ওলট-
লট এনে দিলো, 'মীরা'কে নিয়ে মোটামুটি
বে একটি স্বচ্ছন্দ জীবনে এলো ব্যাঘাত।
ই বৃদ্ধ অনন্ত এসে মহাদেবের সামনে
লে ধরলো তার অন্যায় আর পাপের
াহিনী। জোর করে সে বললো একই
পরাধের জন্য যখন দুজনেই তারা দায়ী
ল, তখন একজন তার জন্য শাস্তি পাবে,
ার একজন নিশ্চিন্তে আরামে দিন কাটাবে
এ কিছুতেই হোতে পারে না। শাস্তি
ার একজনকে পেতেই হবে। মহাদেব, মীরা,
য়ে তনু সবাই এই বৃদ্ধের সংলাপে ও
াচরণে ভীত সন্ত্রস্ত হোল। বিশেষ করে
তীত জীবনের সবকিছু পাপের কথা জানা-
ানি হয়ে যাওয়ার জন্য চরমতম গ্লানিতে
রে গেলো মহাদেবের মন। নিজের
স্তিত্বের অর্থহীনতার কথা ভেবে শেষ-
র্যন্ত সে আত্মহত্যা করে গ্লানি থেকে
ক্তি পাবার চেষ্টা করলো। নাট্যকার মহা-
েবের মৃত্যুর মধ্য দিয়ে হয়তো এই সত্যকেই
াঝা দিতে চেয়েছেন যে পাপ হয়তো
ুকিয়ে ফেলা সম্ভব, কিন্তু পাপবোধ
ামৃত্যু আমাদের দংশন করে চলবেই।

নাটকটির প্রযোজনাকে সর্বাঙ্গসুন্দর
রে তুলতে প্রতিটি শিল্পীই আন্তরিক
ষ্ঠার পরিচয় রেখেছেন। অভিনয়ের
াপারে যে দুজনের নাম প্রথমেই উল্লেখ
রতে হয় তাঁরা হোলেন পৃথ্বীশরঞ্জন
ন্দ্যোপাধ্যায় ও গোবিন্দ চক্রবর্তী। এই দুই
শিল্পীর 'মহাদেব' ও 'বৃদ্ধ' চরিত্রের রূপায়ণ
ামগ্রিক নাট্যপ্রযোজনার দুটি বিশিষ্ট
ম্পদ। 'খগেনে'র খল চরিত্রটি নির্দেশক
ালী ঘোষের অভিনয়ে সুন্দরভাবে রূপলাভ
রেছে। 'মলিনা' চরিত্রে মমতা দে না-বলা
থাকেও চোখের তারায় তারায় ফুটিয়ে
লতে পেরেছেন। অন্যান্য চরিত্রে ছিলেন
বকী বন্দ্যোপাধ্যায়, (যাদব), মানব বোস
াজব), সত্যব্রত চক্রবর্তী (দাদু), পিন্টু
ায় (দারোয়ান), নিমাই বর্মণ (মিস্ত্রী),
মঞ্জুশ্রী রায়চৌধুরী (মীরা), শাশ্বতী
মুখোপাধ্যায় (তনু)।

সংগীত-নির্দেশনা ও আলোকসম্পাতে
দেবকী বন্দ্যোপাধ্যায় ও বিমল দাস স্বচ্ছ
শিল্পবোধের পরিচয় রাখতে পেরেছেন।

প্রণব স্মৃতিসংঘের দুটি নাটক: দক্ষিণ
কলকাতার অন্যতম সমাজসেবী গোষ্ঠী
প্রণব স্মৃতি সংঘের বাৎসরিক অনু-
ষ্ঠান উপলক্ষ্যে সম্প্রতি দুটি নাটক
পরিবেশিত হোল অন্ধ্র হলে। নাটক
দুটির নাম হোল 'ওরা কাজ করে' ও
'সুতরাং'। দুটি নাটকের স্বাভাবিক ও
স্বচ্ছন্দ অভিনয় করে এই সংঘের শিল্পীরা
প্রায় সব নাট্যরসিকদেরই মুগ্ধ করেছেন।

'ওরা কাজ করে' নাটকটির সংঘাতকে
নাট্যকার জগমোহন মজুমদার গড়ে তুলেছেন
কয়লাখনির শ্রমিক-জীবনকে কেন্দ্র করে।
বীরু, বিশু, বিলু, সর্দার ও অন্তা—এই
পাঁচজনের জীবনসংগ্রাম নিয়েই এই নাটক।
অসাধারণ বলিষ্ঠ এই নাটকটির পরিচালনার
দায়িত্ব নেন প্রভাস দত্ত। বিভিন্ন চরিত্রে
সার্থকভাবে রূপ দেন প্রভাস দত্ত (বীরু),
গোপাল ব্যানার্জী (বিশু), মানস রাহা
(বিলু), অসিত হাজরা (সর্দার), অজিত
ঘোষ (অন্তা)।

বীরু মুখার্জীর 'সুতরাং' একটি ব্যঙ্গ
নাটিকা। অবশ্য কোন ব্যক্তি বা দলকে
ইঙ্গিত করার কোন উদ্দেশ্য নাট্যকারের নেই।
বেবীফুডের চোরাকারবারী ও ভেজাল
ওষুধের কারবারী বটকৃষ্ণবাবু সমাজের একজন গণ্যমান্য ব্যক্তি। তিনি ভোটে দাঁড়িয়ে-
ছেন। স্বভাবতই তাঁকে সাহায্য করতে এগিয়ে
এসেছেন সুযোগ-সন্ধানী অনেকেই। বটকৃষ্ণ-
বাবু আর এঁদের নিয়েই এই ব্যঙ্গ নাটিকা।
নাট্যনির্দেশক তড়িৎ চৌধুরীর উপস্থাপনার
গুণে নাটকটির পরিবেশনা সার্থক হয়ে ওঠে।
অভিনয়ে অংশ নিয়েছিলেন: তড়িৎ চৌধুরী
(বটকৃষ্ণ বটব্যাল), সুবীর গাঙ্গুলী (মিঃ
দাস), ইন্দ্রজিৎ দাস (পতিতপাবন), প্রভাস
দত্ত (মদনমোহন), অজিত ঘোষ (সরকার),
সুনীল মণ্ডল, গোপাল ব্যানার্জি, সুনীল
পাল।

নাট্যানুষ্ঠানের আগে 'সংঘনাদ' পরি-
চালিত 'বাংলাদেশ' শীর্ষক গীতিআলেখ্যে
অংশ নেন মানস ভট্টাচার্য, গৌর গঙ্গো-
পাধ্যায়, দেবদাস ভট্টাচার্য, অস্মিতা
বন্দ্যোপাধ্যায়, হাসি মুখোপাধ্যায়, জলি
মুখোপাধ্যায়, অসীমা মুখোপাধ্যায়,
দীপেন মুখোপাধ্যায়, দীপক সেন-
গুপ্ত, সুনীল মজুমদার।

**ইয়ং স্টার গোষ্ঠীর 'চলচ্চিত্তচঞ্চরী' ও
'সত্যান্বেষী':** ইয়ং স্টার গোষ্ঠীর শিল্পীরা
সম্প্রতি দক্ষিণ কলকাতার ন্যাশনাল হাই-
স্কুল হলে তাঁদের বাৎসরিক অনুষ্ঠান উপ-
লক্ষ্যে সুকুমার রায়ের 'চলচ্চিত্তচঞ্চরী' ও
'পেন রায়ের 'সত্যান্বেষী' নাটক দুটি মঞ্চস্থ
করলেন। দুটি নাটকের পরিচালনায় যথার্থ
সৃজনী প্রতিভার পরিচয় রাখতে পেরেছেন
অমর বোস।

প্রথম নাটকটিতে নির্দেশক অমর বোসের
'ভবদুলাল' চরিত্রে অভিনয় স্বাভাবিক ও
প্রাণবন্ত হোতে পেরেছে। অন্য কয়েকটি
বিশিষ্ট ভূমিকায় সুন্দর অভিনয় করেন
দেবরঞ্জন ভট্টাচার্য, দীপেন মুখার্জি,
দ্যুতিমান মুখার্জি, প্রবীর ঘোষ।

শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাহিনী অব-
লম্বনে গড়ে ওঠা 'সত্যান্বেষী' নাটকে 'ঘন-
শ্যাম' চরিত্রে দেবাশীষ রায়চৌধুরী প্রতিভার
স্বাক্ষর রাখতে পেরেছেন। 'অজিত' চরিত্রে
সাত্যকী রায়কে সুন্দর মানিয়েছিল, তার
চরিত্রচিত্রণ হয়েছিল খুব সুন্দর। অন্যান্য
ভূমিকায় ছিলেন অনুপ রায়, মৃন্ময়
চক্রবর্তী, ঝন্টু ঘোষ, অনুপ রায়চৌধুরী।

নীল পাশার কাহিনী: ক'দিন আগে
ইন্দ্রজিৎ-এর প্রযোজনায় এ-বি-টি-এ হলে
নাটকাভিনয় ও বিচিত্র অনুষ্ঠানের এক
আসর বসেছিল। অনুষ্ঠান শুরু 'তরজা'র
মত 'বাংলাদেশ' বিষয়ক গানের মালা দিয়ে।
পরিচালনা দেবনাথ চক্রবর্তীর, অংশ নিলেন
আই-পি-সি-এ সভ্যবৃন্দ। এর পরেই হল
গান নাচ আর আবৃত্তি। অংশগ্রহণ করলেন
দীপক মৈত্র, সুশীল বড়াল, দীপালি সেন-
গুপ্ত, স্বপ্না মজুমদার ও ছোট্ট মেয়ে
সীমা। সবশেষে হল সেদিন সন্ধ্যার সবচেয়ে
বড় আকর্ষণ 'নীল পাশার কাহিনী'র
মঞ্চাভিনয়। পরিচালনা করলেন ইন্দ্রজিৎ,
সঙ্গীত সংযোজনার ভার নিলেন রাজেন।
বিভিন্ন চরিত্রে রূপদান করলেন: জানু
চট্টোপাধ্যায়, ইভা সরকার, ভবানী বন্দ্যো-
পাধ্যায়, ভবতোষ চক্রবর্তী ও উমা দাশ-
গুপ্ত। নির্মম নিয়তির হাতে তিন পুতুল:
নীলাক্ষী, কিপাশা এবং অমল—এই ত্রয়ী

বিলম্বিত লয়ে/গা জাহ্নবী যমুনা/মধুছন্দা। পরিচালনা ঃ হীরেন নাগ। ফটো ঃ অমৃত

জীবনের টানাপোড়েনে গড়ে উঠেছে 'কান্না হাসির দোল দোলানো পৌষ ফাগুনের পালার' এই নাটকীয় কাহিনী। সামগ্রিক অভিনয়ে শিল্পীরা মঞ্চের ওপর সার্থক ভাবে বাস্তব জীবনের প্রতিচ্ছবিকে ফুটিয়ে তুলতে পেরে ছিলেন। দুটি নাটকই উমা দাশগুপ্তের লেখা। জাদুবিদ্যা প্রদর্শনে ও অভিনয়ে কুমারী দাশগুপ্তের যেমন সুনাম আছে প্রথম রচনা হলেও নাটক রচনাতেও তেমনি দক্ষতার ছাপ তিনি রাখতে পেরেছেন। সব মিলিয়ে সেদিনের সন্ধ্যার আসরটি উপভোগ্যতার দিক দিয়ে ছিল মনে রাখবার মতো।

সত্য মারা গেছে ঃ গঙ্গাপদ বসুর 'সত্য মারা গেছে' নাটকটি সম্প্রতি বিশ্বরূপায়

অভিনীত হোল। অভিনয়ের আয়োজন করেন সি-এল-এম-বি রিক্রিয়েশন ক্লাব। সামগ্রিক অভিনয়-মান বেশ উন্নত ধরনেরই হয়েছিল। তবুও জানকীনাথ পাত্র (ক্যাবলা), সুকুমার বসু (মিঃ জি, ডি, মিটার), অলকা গাঙ্গুলী (ডলি)র অভিনয় সত্যি বিশেষভাবে উল্লেখের দাবী রাখে।

বিবিধ সংবাদ

বাংলা নাট্যমঞ্চের উদ্যোগী দলগুলির উদ্দেশ্য সম্পর্কে

পশ্চিমবঙ্গে বে-সরকারী উদ্যোগে একটি আদর্শ রঙ্গমঞ্চ নির্মাণের সংকল্প নিয়ে বহুরূপী, নান্দীকার, রূপকার প্রভৃতি সম্প্রদায় যৌথভাবে যে-সকল মঞ্চাভিনয় চালিয়ে যাচ্ছেন, প্রায় বছর-দুয়েক ধরে, তা খুব শিগ্‌গির ফলপ্রসূ হতে চলেছে বাংলা সাধারণ রঙ্গালয়ের শতবর্ষপূর্তি উৎসব আরম্ভ হবার প্রাক্কালেই। শোনা যাচ্ছে, এ'রা বিভিন্ন নাট্যাভিনয় থেকে সংগৃহীত অর্থ দিয়ে অতি সত্বরই একটি উপযুক্ত জমি খরিদ করছেন এবং যে-দিন থেকে শতবর্ষ উৎসবের শুরু, ১৯৭১-এর সেই ৭ ডিসেম্বর তারিখেই সেই জমির ওপর নিদেনপক্ষে একটি অস্থায়ী মঞ্চ খাড়া করে তার ওপর অভিনয় শুরু করবার আশা রাখেন। আমরা কামনা করি, ও'দের এই অতি শুভ প্রয়াস ফলবতী হোক।

বিস্ফোরণ ঃ বিশ্বরূপায় গত ১৫ আগস্ট এপিক থিয়েটার গ্রুপ তাঁদের নব-প্রয়াস 'বিস্ফোরণ' নাটকটি মঞ্চস্থ করেন। নাটকের চরিত্র সমাবেশ ও সংলাপে নাট্যকার অজিত নন্দীর মুন্সিয়ানার পরিচয় পাওয়া গেল। নাটকের বিষয়বস্তু মোটামুটি ভাল ও কালোপযোগী হলেও কিছু কিছু পরি-বর্জন, পরিবর্তন ও পরিবর্ধন একান্ত বাঞ্ছনীয়। বিশেষ করে স্থানে স্থানে দীর্ঘ-কালব্যাপী ও দীর্ঘ সংলাপের পুনরাবৃত্তি একঘেয়ে ও বিরক্তিকরই লাগে। পরিচালক রমেন চৌধুরী এই যুগোপযোগী নাটকটি খুবই কৃতিত্বের সঙ্গে উপস্থাপনা করেন। নাটকের চরিত্রসমষ্টির মধ্যে অভিনয়ের দিক থেকে বিচারে জগদীশের ভূমিকায় রণেন বসু সূচনা থেকেই তাঁর অভিনয়-বৈশিষ্ট্য প্রমাণ করেন। চালচলনে সংলাপ প্রক্ষেপণে, কি অভিব্যক্তি প্রকাশে তাঁর স্বকীয়তা দর্শকদের মুগ্ধ করে। এর পরে নিবারণ, নেত্য পণ্ডিত ও মোহিতের ভূমিকায় যথাক্রমে কালীশংকর ব্যানার্জি, তারাপদ দাস, নকুলেশ্বর চ্যাটার্জি, দিলীপ ঘোষের অভিনয় প্রশংসার দাবী রাখে। অজিতের চরিত্রে সুখেন্দু মুখার্জি কিছুটা ম্লান। প্রবীরবেশী কমল মিত্র ও ইন্দ্রাণীর ভূমিকায় দেবী দে কিন্তু অভিনয়ে নাট্যামোদীদের সন্তুষ্ট করতে পারেননি।

ছাত্র-যুব শরণার্থী ও দুঃস্থ ত্রাণ কমিটির উদ্বোধনী অনুষ্ঠান

১২ সেপ্টেম্বর রবিবার সকাল নটায় প্রাচী সিনেমায় ছাত্র-যুব শরণার্থী ও দুঃস্থ

প্রেম ও অপ্রেম/স্বপন রায় ও মাধবী মুখার্জি। পরিচালনা ঃ বিমল ভৌমিক। ফটো ঃ অমৃত

ত্রাণ কমিটি তাঁদের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছেন। উদ্বোধন করবেন কলকাতার মেয়র শ্যামসুন্দর গুপ্ত এবং 'যুগান্তর'-বার্তা-সম্পাদক দক্ষিণারঞ্জন বসু প্রধান অতিথিরূপে উপস্থিত থাকবেন। অনুষ্ঠানে বাংলাদেশের কবি সাংবাদিক আবদুল গফফার চৌধুরী স্বদেশের পরিস্থিতি সম্পর্কে বলবেন। সভাশেষে একটি সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ও 'হেড মাস্টার' চলচ্চিত্র প্রদর্শনের ব্যবস্থা আছে।

লুচিনো ভিসকোন্টি সম্মানিত

ইটালীর বৈদেশিক সংবাদপত্র সংস্থা (ফরেন প্রেস অ্যাসোসিয়েশন) ওয়ার্নার ব্রাদার্স প্রযোজিত 'ডেথ ইন ভেনিস' ছবিটির পরিচলনা-নৈপুণ্যের জন্যে লুচিনো ভিসকোন্টিকে বার্ষিক 'গোল্ডেন প্লেট অ্যাওয়ার্ড' দ্বারা সম্মানিত করেন। টমাস ম্যান লিখিত কাহিনী অবলম্বনে নির্মিত এই ছবির নায়ক-নায়িকার ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছেন যথাক্রমে ডার্ক বোগার্ড ও সিলভানা ম্যাঙ্গানো। ছবিটি বছরের শেষের দিকে কলকাতায় মুক্তি পাবে বলে শোনা যাচ্ছে।

'বিলি জ্যাক' ছবি পুরস্কৃত

১৭তম বার্ষিক ফেস্টিভ্যাল অব দি নেশনস ফিল্ম কম্পিটিশন উৎসবে ওয়ার্নার ব্রাদার্স নির্মিত বিলি জ্যাক ছবিটি 'গোল্ডেন ক্যারিডি' (শ্রেষ্ঠ চলচ্চিত্র পুরস্কার) লাভ করেছে।

বিসমিল্লা খান

প্রভাতী আসরে মিঞা বিসমিল্লা খান

সবরং সঙ্গীত সংস্থার পক্ষ হতে মিঞা বিসমিল্লা খাঁর একক সানাই-বাদনের একটি প্রভাতী আসর এক স্মরণযোগ্য অনুষ্ঠান।

'মিঞা কি টোড়ি' দিয়ে রাগলক্ষ্মীর আবাহন, বিষণ্ণ গাম্ভীর্যের পুঞ্জীভূত বেদনাকে আভাসিত করা অতি কোমল গান্ধারের আবেদনের কি অপরূপ বিকাশে তার সুরে রস যে ত্রিবেণীসঙ্গম ঘটেছিল তা দীর্ঘদিনের সাধনালব্ধ ঐশ্বর্য। তাই প্রথম থেকে শেষ অবধি তাঁর যাকে বলে হাই টোন অব সিরিয়সনেস অনেক কিছুর অভাবই পূর্ণ করে দিয়েছিলো। টোড়ির সঙ্গে ভাবসঙ্গতি রেখে সুরু কোলো মিশ্র-ভৈরবীর ধুন। জমাট-বাঁধা বেদনার স্বচ্ছ মুক্তি ঘটল—হঠাৎ আলোর ঝলকানির মত দুরন্ত সাপট-তানে। কখনও মাপাপর্দার রংবাজারী জমজমাট কখনও গজলের-ধাঁচের সরস ভঙ্গিতে খেয়ালের তান। ঠুংরীর বোলের নিবিড় আনন্দ কি মধুর উন্মাদনায় রসিক চিত্ত দুলিয়ে দেয়। হয়ত মাঝে মাঝে বয়সের ভারে একটানা বাজনায় ছেদ পড়ে দমের অভাবে। তবু এমন সানাই-বাদক আর হোলো না। এই দুরূহ-তম যন্ত্রে তন্ত্রকার ও গায়কী অঙ্গের এমন সর্বাঙ্গসুন্দর মিলন এর আগের কোনো সানাই-শিল্পীর বাজনায় দেখা যায়নি। পরেও অচিরাৎ দেখা যাবে সে আশা কম।

দ্বিতীয়ার্ধে জৌনপুরীতে মাপধ-মপ-র পরই অস্ফুট শ্রুতিতে মধ্যম ছুঁয়েই কোমল গান্ধারের নিষ্কলুষ স্থায়িত্বের রেশ, স্বর-লালিত্য ও ধ্বনিমাধুর্যের আবেশ কোনো-দিন ভোলবার নয়। কারণ এ আবেশ সৃষ্টি করতে পারেন তাঁরাই যত 'কোটিতে গোটিক শিল্পী'—যাঁর ধ্যান ও ধারণা এক হয়ে সঙ্গীতলক্ষ্মীর চরণে অর্ঘ্যের মতই নিবেদিত হয়েছে।

সর্বশেষে ঠুংরী, ধুন, চৈতী সব মেশানো এক মধুর অনুভূতি। সারংকে আশ্রয় করে নানা রঙে, রং-এর কারুকলায় শিল্পী যেন চিত্রকর হয়ে মেজে ধরেছিলেন এমন এক ছবি যার সুবিস্তৃত পরিসরে প্রভাতের আলো থেকে সুরু করে মধ্যাহ্নের দাহ, গোধূলির বৈরাগ্য ও রাত্রির অন্ধকারের রহস্য দোলায়িত। অসাধারণ দক্ষতা, গভীর বোধ, কল্পনার মহত্ত্বের সমন্বয়ে প্রকাশ-ভঙ্গীতে যে দরদ ফুটে উঠেছিল তার মুগ্ধকারিতা অবর্ণনীয়। সেদিন যেন নতুন করে অনুভব করলাম শিল্পী বিধাতার সনন্দ নিয়েই আসেন। তাঁকে তৈরী করা যায় না।

ওস্তাদের সঙ্গে তবলাসঙ্গতে তাঁর তরুণ পুত্র আজিম খাঁর দক্ষতায় প্রতিভার সুস্পষ্ট ছাপ আনন্দদায়ক।

ধনঞ্জয় ভট্টাচার্যের একক সঙ্গীতের আসরে

সম্প্রতিকালে রবীন্দ্রসঙ্গীতে একক শিল্পীর একাধিক আসর শোনবার সুযোগ হয়েছে—সাধারণ মঞ্চে এ ধারার প্রবর্তক অশোকতরু বন্দ্যোপাধ্যায়। আধুনিক সংগীতের আসরে প্রথম শুনলাম ধনঞ্জয় ভট্টাচার্যকে, এ অনুষ্ঠানের উদ্যোক্তা গুঞ্জন সঙ্গীতগোষ্ঠী।

ধনঞ্জয় ভট্টাচার্য

এ ধরনের আসরে ভাবনা কল্পনার আকাশে আপনাকে সার্বভৌমভাবে মেলে ধরবার প্রশস্ত অবকাশ আছে বলেই শ্রোতা ও শিল্পীর হৃদয়ের যোগ-বন্ধন হতে দেরী হয় না। অবশ্যই শিল্পী বলতে এখানে ধনঞ্জয়বাবুর মত ধ্যানী ও ভাবুক শিল্পীর কথাই বলছি। রবীন্দ্রনাথ থেকে সুরু করে তীর্থপরিক্রমার মতই দ্বিজেন্দ্রলাল, নজরুল, সুরসাগর হিমাংশু দত্ত, সুবল দাসগুপ্ত, কমল দাসগুপ্ত, শৈলেশ দত্ত-গুপ্ত, অনুপম ঘটক, সুধীরলাল, রবীন চট্টোপাধ্যায়, নির্মল ভট্টাচার্য তথা বিগত যুগের প্রতিভাধর সুরকারদের গানের পথ বেয়ে সুরের ধারায় যতি পড়ল এখনকার যুগের নচিকেতা ঘোষ ও সুধীন দাস-গুপ্ততে। গীতিকারদের মধ্যে প্রথমোক্ত তিন পথপ্রদর্শকদের উত্তরসূরী প্রণব রায়, সুবোধ পুরকায়স্থ, অনিল ভট্টাচার্য, তড়িৎ ঘোষ ও বর্তমানের শ্যামল গুপ্ত, গৌরী-প্রসন্ন, সুনীলবরণ। তেইশটি গানের দীর্ঘ দু ঘণ্টাব্যাপী অনুষ্ঠানে শিল্পীর স্বাধিকার প্রতিষ্ঠ শক্তির দীপ্তিতে বাংলা গানের এক আশ্চর্য রূপলোকই শুধু খুলে যায় নি। যেসব সুরস্রষ্টা ও রচয়িতা শিল্পীর সার্থক সঙ্গীতজীবনকে দিনে দিনে তিলে-তিলে গড়ে তুলেছেন তাঁদের প্রতি ঋণ-স্বীকারের দুরূদায়িত্বও সুন্দর-

পূর্ণিমা মুখোপাধ্যায়

ভাবে পালিত হোলো শুধু তাঁর নয়। আমাদেরও। এইখানেই এ ধরনের আসরের সার্থকতা।

'এবার নীরব করে দাও হে তোমার' শিল্পীচিত্তের ব্যাকুল মিনতির আর্ত রাগিণী শ্রোতাদের মনে বেজে উঠতে দেরী হয় নি। এরপর 'তোমারে ভালবেসেছি আমি' দরবারী-কানাড়ার ছোঁয়ায় উপ্‌গত অশ্রুকে বুকে বেদনার স্তব্ধতায় নন্দী করায় পরিণত শিল্পকুশলতায় মুগ্ধতার সঙ্গে জেগেছিল বিস্ময়। 'কেউ ভোলে না কেউ ভোলে' যখন পেঁছালেন তখন শ্রোতার সঙ্গে শিল্পী-চিত্তের সংলাপ জমে উঠেছে নিবিড় মধুর ছন্দে। 'রাধে ভুল করে তুই'—যেন বিদ্যুৎ-ঝলকের মত এক লহমায় অতীতের গৌরব-ময় অধ্যায়কে মেলে ধরেছিল। তারপরই 'মোর জীবনের দুটি রাত্তি', 'বিদায় দিতে যে পারিব না', 'তোমার চরণ চিহ্ন ধরে'তে আবেগের লালিত্যে, ভাবের সঙ্গে সুরের পরিণয়, হৃদয়ের সঙ্গে কণ্ঠের মিতালী সুরের বাদ্যে স্বতোবিরোধী ভাবাবেগের সমন্বয় যেন সাতরঙা রামধনুর বর্ণসুষমা সৃষ্টি করেছে। কখনও ভাবের রাজ্যে শিল্পী আত্মসমাহিত, কখনও ছন্দের দোলায় (কে তীরন্দাজ এই দুনিয়ায়) কৌতুক চঞ্চল। 'বিদায় দিতে যে পারিব না'য় 'হাসির আড়ালে মীড়ের কি আকুল দোতনা। আবার 'তুমি যে কাঁদাও তাই ত হে প্রিয় কাঁদি'র ভৈরবীর সজল কারুণ্যের সমৃদ্ধ পূর্ণতা যেন সৃষ্টির পর্যায়ে পড়ে। 'রাধে ভুল করে তুই' নতুন করে স্মরণ করিয়ে দিল তাঁর অনন্যসাধারণ কণ্ঠসম্পদকে যা অনায়াসে স্বচ্ছন্দে মন্দ্রসপ্তক থেকে তার-সপ্তকের শেষ পর্দায় অচঞ্চল স্থায়িত্বে আপনাকে প্রতিষ্ঠিত করে কোন রকম হেঁচকা-টানের চমক না লাগিয়ে।

কিন্তু শিল্পীসৃষ্ট সুরের এমন বর্ণ-বৈভব যেন স্তিমিতদ্যুতি হয়ে পড়ল শেষের চারটি গানে। ধনঞ্জয়বাবুরই গাওয়া সলিল চৌধুরীর সুন্দর গানের অভাব ত ছিল না। 'ঝির ঝির ঝির বরষা'য়, 'আমায় তুমি ভুলতে পার', 'অলিরে ডাকে আজ', 'কি ছাঁদে বেঁধেছ কবরী', 'আমি চেয়েছি তোমায়' 'কবির খেয়ালে' গানগুলি আজও শ্রোতাদের অন্তঃশ্রুতিতে উচ্ছ্বসিত। এ গানগুলি প্রথমের উচ্চমান গানগুলির সঙ্গে ভারসাম্য বজায় রাখতে পারত।

তবে সকল বিতর্ক ও সমালোচনার কণ্ঠ যেন স্তব্ধ হয়ে গেল দ্বিতীয়ার্ধে যখন ভক্তিমূলক সাতখানি গানের সোপান বেয়ে শিল্পী পেঁছে গেলেন নিস্তব্ধ অনুভূতির রাজ্যে। যখন বহিরঙ্গ আনন্দ শিল্পীর চোখে নিষ্প্রভ হয়ে আসে তখনই আসে সেই বৈরাগ্য যে বৈরাগ্য আমাদের গুরুর মতই পথ দেখায়। অভিপ্সাকে চেনায় অন্তঃদৃষ্টিকে উন্মীলিত করে। সৌন্দর্য বিকাশের অনুভূতি থেকে উদ্বুদ্ধ হলেও এই রকম লগ্নেই প্রাণের পরম প্রিয়-তমকে বুঝি বলা যায় 'দাঁড়িয়ে আছ তুমি আমার গানের ওপারে' ভাবসঙ্গীতে আবেশ জাগে। কিন্তু তা স্থায়ী হতে পারে না এই জন্য যে, সে কিছুতেই ভুলতে পারে না যে, সমঝদার শ্রোতার সাড়া তার চাই-ই। কিন্তু ভজন বা আরাধনার গানে গুণী রূপান্তরিত হন ভাগবতে। সেদিন গানের শেষে দু হাতে মুখ-ঢাকা ধনঞ্জয়-বাবুর ভক্তিবিহ্বল আত্মহারা রূপ দেখে এই কথাই মনে হয়েছিল।

শিল্পীর সঙ্গে সার্থক তবলাসঙ্গতে ছিলেন রাধাকান্ত নন্দী। শ্রীনন্দীর সরস সুন্দর সংগতে শিল্পীকে অনুপ্রেণিত করেছে।

রাধাকান্তবাবু গতানুগতিক তবলা-বাদক নন। উঁচুদরের শিল্পীমন আছে বলেই শিল্পীর গানের ছন্দই শুধু নয়, সুক্ষ্মাতি-সূক্ষ্ম ভাব ও অনুভূতির সঙ্গে সঙ্গতি রেখে রসসৃষ্টি করতে জানেন। সেদিন তবলা ও পাখোয়াজে দাদরা, কাহারবা, ত্রিতাল, চাচরের বিভিন্ন মাত্রায় তাঁর লাগসই জবাব কখনও মৃদুধ্বনিতে কখনও ক্ষিপ্র-তালে যে উপভোগ্য মাধুর্য রচনা করেছে তার তুলনা বিরল।

হিমাংশু বিশ্বাসের বাঁশী সঙ্গত বিশেষ উল্লেখের দাবী রাখে। আপনাকে জানান না দিয়েও অনুষ্ঠান সার্থকতার মস্ত সহায়ক শ্রীবিশ্বাস। নির্মল বিশ্বাস ও কুমুদ ঘোষের অবদানও সুরসংহতিতে যথেষ্ট পরিমাণ ছিল।

সুরসপ্তয়নের সাগরিকা

'সাগরিকা' রবীন্দ্রনাথের এক বিচিত্র অভিজ্ঞতার ফসল। জাভা ও বলিদ্বীপ ভ্রমণকালে সেখানের জীবনযাত্রায় ভারতীয় সংস্কৃতি ও সাধনার প্রভাব কবিকে বিহ্বল করে। অতীত সভ্যতায় দীপ্যমান কোন ভারতসন্তান আপন ঐশ্বর্যকে বহন করে নিয়ে সমুদ্রস্নাত এই দ্বীপটিকে সজ্জিত করেছেন। এই ভাবকল্পনাশ্রিত 'সাগরিকা'র এক পরিচ্ছন্ন নৃত্যনাট্য-রূপ সুর-সপ্তয়নের পক্ষ হতে রবীন্দ্রসদনে নিবেদন করেন বাবুল বন্দ্যোপাধ্যায়।

অসিত চট্টোপাধ্যায় পরিকল্পিত নৃত্য-রূপকে উল্লেখযোগ্য দক্ষতায় মেলে ধরেন নামভূমিকায় অবতীর্ণা পূর্ণিমা মুখো-পাধ্যায়। তাঁর অভিনয়েও আন্তরিকতার স্পর্শ ছিল। নায়ক নরেশকুমারের নৃত্য-কুশলতা অনস্বীকার্য। অভাব ছিল চরিত্রোপযোগী ভাবের। সমবেত নৃত্যে ভারতনাট্যমের বোল ও নৃত্যে ভারতের এবং বলিদ্বীপের লোকনৃত্যের মাধ্যমে দুটি দেশের দৃষ্টিভঙ্গী ও চিন্তার পার্থক্য মেলে ধরার প্রচেষ্টা প্রশংসনীয়। আবহসঙ্গীত রচনা ও সঙ্গীত নির্বাচনে যোগ্যতার পরিচয় দিয়েছেন ভাস্কর মিত্র। পার্থ ঘোষের আবৃত্তিও সুন্দর। সকলের বড় আকর্ষণ ছিল দেবব্রত বিশ্বাস ও কণিকার গান এবং তাঁরা শ্রোতাদের আশা পূর্ণই করেছেন।

পুজোয় এবার এঁদের কণ্ঠে শোনা যাবে নতুন গান।

রাজকুমার বিশ্বাস (রাজু)

ললিতা ধরচৌধুরী

নির্মলা মিশ্র

বৃটেনের ব্রায়েন স্ট্রেঞ্জ (বয়স ১৭) আন্তর্জাতিক ভারোত্তোলন প্রতিযোগিতার জুনিয়ার বিভাগে চ্যাম্পিয়ান হয়েছেন।
তিনি মোট ৪৫২ কিলো ওজন তুলেছিলেন।

খেলাধুলা

দর্শক

এম সি সি'র ভারত সফর বাতিল

বৃটিশ ক্রিকেট কাউন্সিলের পক্ষ থেকে ঘোষণা করা হয়েছে ১৯৭১-৭২ সালের শীতকালে এম সি সির ভারত, পাকিস্থান এবং সিংহল সফরে যাওয়া সম্ভব হবে না। ভারতে শরণার্থী সমস্যা এবং পাকিস্থানের রাজনৈতিক টালমাটালের দোহাই দিয়ে এম সি সি প্রথমে যে সফর বাতিল করেছিল তারই পরিপ্রেক্ষিতে ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ড শুধু ভারত সফরের জন্য অনুরোধ করেছিল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত কাউন্সিলের কাছে সে অনুরোধের কোন মর্যাদা রইল না। নানা অজুহাত দেখিয়ে বিলেতী কর্তারা আন্তরিক দুঃখ প্রকাশ করে বলা হয়েছে, ১৯৬৬ সালেই স্থির হয়েছিল এম-সি সি ভারত, পাকিস্থান এবং সিংহল—এই তিন দেশে একত্রে সফর করবে। সুতরাং পাকিস্থান এবং সিংহল সফর বাদ দিয়ে শুধু ভারত সফরে গেলে তাঁদের পক্ষে কথার খেলাপ করা হবে। এই সফর বাতিলের পক্ষে কাউন্সিলের আর একটা যুক্তি—এক-নাগাড়ে ক্রিকেট খেলার ধকল খেলোয়াড়দের দেহ ও মনে সহ্য হচ্ছে না। কাউন্সিলের এই সব যুক্তির কোনটাই সমর্থনযোগ্য নয়। এক-নাগাড়ে খেলার ধকল সম্বন্ধে সফর তালিকা তৈরীর আগে কি চিন্তা করা হয়নি? কর্তাদের এই কি দূরদর্শিতার পরিচয়? তাছাড়া বর্তমানে যারা ইংল্যাণ্ডের পক্ষে টেস্ট ম্যাচ খেলছেন তাঁদের ভিন্ন সারা ইংল্যাণ্ডে কি বিদেশ সফরে পাঠাবার মত আর খেলোয়াড় নেই? এমনই ইংলণ্ডের হাঘরে অবস্থা দাঁড়িয়েছে আজ? ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ডের সভাপতি বলেছেন, রাজ-নৈতিক কারণেই এম সি সির ভারত সফর বাতিল করা হয়েছে। এ ছাড়া আর একটা কারণ থাকা অসম্ভব নয়। ভারতবর্ষের কাছে ১৯৭১ সালের টেস্ট সিরিজে পরাজয়ের ফলে ইংল্যাণ্ডের মনোবল আজ ভেঙে গেছে। বিভিন্ন দেশের বিপক্ষে একটানা 'রাবার' জয়ী হয়ে ইংল্যাণ্ড যেভাবে এগিয়ে যাচ্ছিল ভারত-বর্ষের কাছে তাদের পরাজয় একটা মস্ত ধাক্কা। এই ধাক্কার অব্যবহিত পর যদি ভারত সফরে আর একটা ধাক্কা আসে, তাহলে স্বদেশে ফিরে এম সি সির খেলো-য়াড়দের পক্ষে লোকের সামনে মুখ দেখানো ভার হবে। অতএব সফর বাতিলই এখন একমাত্র মুখরক্ষার পথ।

এশিয়ান মুষ্টিযুদ্ধ প্রতিযোগিতা

তেহেরানে আয়োজিত এশিয়ান মুষ্টি-যুদ্ধ প্রতিযোগিতায় চূড়ান্ত পদক জয়ের তালিকায় শীর্ষস্থান লাভ করেছে ইরাণ (স্বর্ণ ৩, রৌপ্য ২ এবং ব্রোঞ্জ ৪)। দ্বিতীয় স্থান পেয়েছে দক্ষিণ কোরিয়া এবং তৃতীয় স্থান ভারতবর্ষ। ভারতবর্ষের পক্ষে স্বর্ণ-পদক পেয়েছেন ফ্লাইওয়েট বিভাগে চন্দ্র নারায়ণ এবং লাইট হেভীওয়েট বিভাগে মহতাব সিং। লাইটওয়েট বিভাগে ভারত-বর্ষের এম ভেনু রৌপ্য পদক পেয়েছেন।

চূড়ান্ত পদক জয়ের তালিকা

	স্বর্ণ	রৌপ্য	ব্রোঞ্জ
ইরাণ	৩	২	৪
দঃ কোরিয়া	৩	০	০
ভারতবর্ষ	২	১	১
থাইল্যাণ্ড	১	২	৪
মঙ্গোলিয়া	১	২	২
ইন্দোনেশিয়া	১	০	২
ফিলিপাইন	০	২	১
পাকিস্থান	০	১	৩
জাপান	০	০	১
কুয়াইত	০	০	০

বিশ্ব হকি প্রতিযোগিতা

অকটোবর মাসের ১৫ই তারিখে স্পেনের বার্সেলোনায় প্রথম বিশ্ব হকি প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণকারী ১০টি দেশ সমান ভাগ হয়ে প্রথমে লীগ প্রথায় খেলবে; তারপর প্রতি গ্রুপের চ্যাম্পিয়ান এবং রানার্স-আপ দলকে নিয়ে নকআউট প্রথায় খেলা হবে। ১৯৬৮ সালের অলিম্পিক ব্রোঞ্জপদক বিজয়ী ভারতবর্ষের খেলা পড়েছে 'এ' গ্রুপে এবং 'বি' গ্রুপে খেলবে ১৯৬৮ সালের অলিম্পিক স্বর্ণপদক বিজয়ী পাকিস্থান এবং রৌপ্যপদক বিজয়ী অস্ট্রেলিয়া।

যোগদানকারী দেশ

'এ' গ্রুপ : ভারতবর্ষ, পশ্চিম জার্মানী, কেনিয়া, ফ্রান্স এবং আর্জেন্টিনা।

'বি' গ্রুপ : পাকিস্থান, অস্ট্রেলিয়া, জাপান, হল্যান্ড এবং স্পেন।

ভারতবর্ষের খেলার তালিকা

১৫ অক্টোবর : ভারত বনাম ফ্রান্স
১৬ " : ভারত বনাম আর্জেন্টিনা
১৭ " : ভারত বনাম কেনিয়া
১৯ " : ভারত বনাম পঃ জার্মানী

পেস্তা সুকান ফুটবল প্রতিযোগিতা

সিঙ্গাপুরে আয়োজিত পেস্তা সুকান ফুটবল প্রতিযোগিতায় ভারতবর্ষ এবং দক্ষিণ ভিয়েৎনাম যুগ্মভাবে চ্যাম্পিয়ান হয়েছে। ফাইনাল খেলায় কোন গোল হয়নি।

ন্যাশনাল ক্রস কান্ট্রি রেস

হায়দরাবাদে ন্যাশনাল ক্রস কান্ট্রি রেস মহা আড়ম্বরের সঙ্গে অনুষ্ঠিত হয়েছে। সার্ভিসেস দলের বাজরাং রাম গত বছরের মত এ বছরও পুরুষ বিভাগে ব্যক্তিগত চ্যাম্পিয়ান হয়েছেন। পুরুষ বিভাগের দলগত চ্যাম্পিয়ান হয়েছে গত বছরের বিজয়ী সার্ভিসেস দল।

চূড়ান্ত ফলাফল

দলগত অনুষ্ঠান

পুরুষ বিভাগ : ১ম সার্ভিসেস, ২য় পুলিশ এবং ৩য় ভারতীয় রেল;

মহিলা বিভাগ : ১ম রেলওয়ে এবং ২য় দিল্লী।

জুনিয়র বালক বিভাগ : ১ম পশ্চিম বাংলা এবং ২য় অন্ধ্রপ্রদেশ;

সিনিয়র বালক বিভাগ : ১ম মহীশূর, ২য় দিল্লী এবং ৩য় অন্ধ্রপ্রদেশ;

বালিকা বিভাগ : ১ম অন্ধ্রপ্রদেশ এবং ২য় পশ্চিম বাংলা।

ব্যক্তিগত অনুষ্ঠান

পুরুষ বিভাগ : চ্যাম্পিয়ান—বাজরাং রাম (সার্ভিসেস), **সিনিয়র বালক বিভাগ :** দিলীপ সিং (দিল্লী), **মহিলা বিভাগ :** উমা দাস (বাংলা), **বালিকা বিভাগ :** ফাতিমা জ্যাকব (অন্ধ্রপ্রদেশ), **জুনিয়র বালক বিভাগ :** হরমিন্দর সিং (দিল্লী)।

এখানে উল্লেখ্য পশ্চিম বাংলার শ্রীমতী উমা দাস গত বছরও মহিলা বিভাগে চ্যাম্পিয়ান হয়েছিলেন।

ইংল্যান্ডে ভারতীয় ক্রিকেট দল

ইংল্যান্ডের বিপক্ষে টেস্ট সিরিজে 'রাবার' জয়ের পর ভারতীয় ক্রিকেট দল পরবর্তী তিনটি কাউন্টি ক্রিকেট দলের সঙ্গে খেলা ড্র করেছে।

ভারতীয় দল বনাম সাসেক্স

প্রথম দিনেই ভারতীয় দলের ১ম ইনিংস ২২০ রানের মাথায় শেষ হলে খেলার বাকি সময়ে কোন উইকেট না খুইয়ে সাসেক্স ২৯ রান সংগ্রহ করেছিল।

দ্বিতীয় দিনে সাসেক্স তাদের ৩৮৬ রানের মাথায় (৯ উইকেটে) প্রথম ইনিংসের সমাপ্তি ঘোষণা করে। প্রথম উইকেটের জুটিতে মাইক বুস এবং জিওফ গ্রিনীজ ১৯১ রান তুলেছিলেন। ১৬৬ রানের পিছনে পড়ে ভারতীয় দল কোন উইকেট না খুইয়ে ২য় ইনিংসের খেলায় ২০ রান তুলেছিল।

তৃতীয় অর্থাৎ শেষ দিনে ভারতীয় দলের ২৭৬ রানের মাথায় (৭ উইকেটে) খেলাটি শেষ হয়। চা-পানের সময় ভারতীয় দলের রান ছিল ১৯৬ (৬ উইকেটে)। খেলা ড্র রাখতে ভারতীয় দলকে খুবই লড়তে হয়েছিল। ভারতীয় অফস্পিনার উদয় যোশী সাসেক্স দলের পক্ষে খেলে ১০৭ রানে ৫টি উইকেট পেয়েছিলেন।

সংক্ষিপ্ত স্কোর

ভারতীয় দল : ২২০ রান (সোলকার ৯০ রান। গ্রেগ ৭৮ রানে ৪ উইকেট)।

ও ২৭৬ রান (৭ উইকেটে। জয়ন্তীলাল ৫৭ এবং গোবিন্দরাজ ৪০ নটআউট। উদয় যোশী ১০৭ রানে ৫ উইকেট)।

সাসেক্স : ৩৮৬ রান (৯ উইকেটে ডিঃ। বুস ১৪০ এবং গ্রীনিজ ৬২ রান। প্রসন্ন ১৩৭ রানে ৫ এবং বেদী ১০৫ রানে ৩ উইকেট)।

ভারতীয় দল বনাম সমারসেট

প্রথম দিনে ভারতীয় দল প্রথম ইনিংসের ৭টা উইকেট খুইয়ে ৩২০ রান তুলেছিল। সোলকার ১১৩ রান করে আউট হন এবং আবিদ আলি ৮৩ রানে অপরাজিত থাকেন। প্রাক্তন টেস্ট খেলোয়াড় কার্টরাইট পাঁচটা উইকেট পান।

দ্বিতীয় দিনে ভারতীয় দল ১ম ইনিংসের ৩৪৯ রানের মাথায় (৮ উইকেটে) খেলার সমাপ্তি ঘোষণা করে। আবিদ আলি ১০২ রান করে নট আউট থাকেন। এই নিয়ে ইংল্যান্ড সফরে দ্বিতীয়বার ভারতীয় দলের এক ইনিংসের খেলায় দুটো সেঞ্চুরী হল। খেলার বাকি সময়ে সমারসেট তিন উইকেটের বিনিময়ে ১৭৭ রান সংগ্রহ করে। ব্রায়ান ক্লোজ ৭৩ রানে নট আউট ছিলেন।

তৃতীয় দিনে ইনিংস সমাপ্তি ঘোষণার হিড়িক পড়ে যায়। সমারসেট ২২৬ রানের মাথায় (৪ উইকেটে) প্রথম ইনিংসের সমাপ্তি ঘোষণা করে। অপরদিকে ভারতীয় দল ১৬২ রানের মাথায় (৬ উইকেটে) দ্বিতীয় ইনিংসের সমাপ্তি ঘোষণা করে। সমারসেট দলের জয়লাভের জন্যে ২৮৬ রানের প্রয়োজন ছিল। ঘন্টায় ৮০ রান তুলে তাদের পক্ষে জয়লাভ সম্ভব হয়নি। তাদের ১২৭ রানের মাথায় (২ উইকেটে) খেলাটি শেষ হয়।

সংক্ষিপ্ত স্কোর

ভারতীয় দল : ৩৪৯ রান (৮ উইকেটে ডিক্লেয়ার্ড। সোলকার ১১৩ এবং আবিদ আলি ১০২ নট আউট। কার্টরাইট ৭৯ রানে ৫টা উইকেট)।

ও ১৬২ রান (৬ উইকেটে ডিক্লেয়ার্ড। ওয়াদেকার ৭৪ রান)

সমারসেট : ২২৬ রান (৪ উইকেটে ডিক্লেয়ার্ড। ক্লোজ ১০৩ নট আউট)।

ও ১২৭ রান (২ উইকেটে)

ভারতীয় দল বনাম উরসেস্টারশায়ার

প্রথম দিনে ভারতীয় দল দুটো উইকেট খুইয়ে ৩৬৩ রান তুলেছিল। দ্বিতীয় উইকেটের জুটিতে গাভাস্কার এবং ওয়াদেকার ৩২৭ রান সংগ্রহ করেছিলেন।

দ্বিতীয় দিনে ৩৮৩ রানের মাথায় (৩ উইকেটে) ভারতীয় দল ১ম ইনিংসের সমাপ্তি ঘোষণা করে। এইদিন উরসেস্টারশায়ার দলের ১ম ইনিংস ২৪৮ রানের মাথায় শেষ হলে ভারতীয় দল ২য় ইনিংসে কোন উইকেট না খুইয়ে ৩ রান তুলেছিল।

তৃতীয় দিনে ভারতীয় দল ১৫০ রানের মাথায় (৮ উইকেটে) ২য় ইনিংসের সমাপ্তি ঘোষণা করে। খেলায় জয়লাভের জন্য উরসেস্টারশায়ার দলের যেখানে ২৮৬ রানের প্রয়োজন ছিল সেখানে তাদের ২৫০ রানের মাথায় (৫ উইকেটে) খেলা শেষ হয়।

সংক্ষিপ্ত স্কোর

ভারতীয় দল : ৩৮৩ রান (৩ উইকেটে ডিক্লেয়ার্ড। গাভাস্কার ১৯৪ এবং ওয়াদেকার ১৫০ রান)।

ও ১৫০ রান (৮ উইকেটে ডিক্লেয়ার্ড। বিশ্বনাথ ৫৩ রান। উইলকিনসন ৫ রানে ৩ এবং গ্রিফিথ ৫৮ রানে ৩ উইকেট)

উরসেস্টারশায়ার : ২৪৮ রান (জন পার্কার ৯১ রান। ভেঙ্কটরাঘবন ৬০ রানে ৫ উইকেট)

ও ২৫০ রান (৫ উইকেটে। ওরমরড ৭২ রান এবং ইয়ার্ডলি নট আউট ১০৪ রান।)

অমৃত পাবলিশার্স প্রাইভেট লিঃ-এর পক্ষে শ্রীসুপ্রিয় সরকার কর্তৃক পত্রিকা প্রেস, ১৪, আনন্দ চ্যাটার্জি লেন, কলিকাতা-৩ হইতে মুদ্রিত ও তৎকর্তৃক ১১।১, আনন্দ চ্যাটার্জি লেন, কলিকাতা—৩ হইতে প্রকাশিত।

১১শ বর্ষ
২য় খণ্ড

অমৃত

২০শ সংখ্যা
মূল্য
৫০ পয়সা

Friday, 17th September 1971 শুক্রবার, ৩১শে ভাদ্র ১৩৭৮ 50 Paise

সূচীপত্র

প্রচ্ছদ : শ্রীশচীন দাশ

নিয়মাবলী

বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

লেখকদের প্রতি

১। অমৃতে প্রকাশের জন্য প্রেরিত সমস্ত রচনার নকল রেখে পাঠাবেন। মনোনীত রচনার খবর দু-মাসের মধ্যে জানান হয়। অমনোনীত রচনা কোনক্রমেই ফেরৎ পাঠান সম্ভব নয়। লেখার সঙ্গে কোন ডাকটিকিট পাঠাবেন না।

২। প্রেরিত রচনা কাগজের এক পৃষ্ঠায় স্পষ্টাক্ষরে লিখিত হওয়া আবশ্যক। অস্পষ্ট ও দুর্বোধ্য হস্তাক্ষরে লেখা প্রকাশের জন্যে গৃহীত হয় না।

৩। রচনার সঙ্গে লেখকের নাম ও ঠিকানা না থাকলে 'অমৃতে' প্রকাশের জন্যে গৃহীত হয় না।

এজেন্টদের প্রতি

এজেন্সীর নিয়মাবলী এবং সে সম্পর্কিত অন্যান্য জ্ঞাতব্য তথ্য 'অমৃত' কার্যালয়ে পত্র দ্বারা জ্ঞাতব্য।

গ্রাহকদের প্রতি

১। গ্রাহকের ঠিকানা পরিবর্তনের জন্যে অন্তত ১৫ দিন আগে 'অমৃত' কার্যালয়ে সংবাদ দেওয়া আবশ্যক।

২। ভি-পি-তে পত্রিকা পাঠানো হয় না। গ্রাহকের চাঁদা নিম্নলিখিত হারে মণিঅর্ডারযোগে 'অমৃত' কার্যালয়ে পাঠানো আবশ্যক।

চাঁদার হার

	কলিকাতা	মফস্বল
বার্ষিক	টাকা ২৫.০০	টাকা ৩০.০০
ষান্মাসিক	টাকা ১২.৫০	টাকা ১৫.০০
ত্রৈমাসিক	টাকা ৬.২৫	টাকা ৮.০০

'অমৃত' কার্যালয়

১১/১ আনন্দ চ্যাটার্জি লেন,
কলিকাতা—৩
ফোন : ৫৫-৫২৩১ (১৪ লাইন)

এক নজরে

হারেম উন্মুক্ত হল :

তুরস্কের প্রাক্তন সুলতানদের বন্ধ হারেম এতদিনে পর্যটকদের আকৃষ্ট করতে অর্গলমুক্ত হল। দীর্ঘদিন পরে প্রথম যে সার্বভৌম ঐ হারেমের অন্তঃপুরে প্রবেশ করবেন, তিনি রাজা নন, রাণী। ইংলণ্ডেশ্বরী দ্বিতীয় এলিজাবেথ যখন অক্টোবর মাসের মাঝামাঝি সময়ে তুরস্কে রাষ্ট্রীয় সফরে আসবেন তখন প্রাক্তন সুলতানদের হারেম হবে তাঁর অন্যতম দ্রষ্টব্য বিষয়। ১৪৫৪ সালে তপ্‌কাপি প্রাসাদের অভ্যন্তরে ঐ হারেম নির্মিত হয়। তখন থেকে ১৯০৯ সালে তুরস্কে হারেম প্রথা লুপ্ত হওয়ার দিন পর্যন্ত ঐ হারেমে পুরুষ বলতে শুধু মহাপরাক্রম অটোমান সম্রাটদেরই প্রবেশাধিকার ছিল; আর সেবকরূপে বন্দী অবস্থায় বাস করতো কিছুসংখ্যক একদা-পুরুষ খোজা, যাদের উপস্থিতিতে সম্রাটদের শত শত নারীসম্ভোগের একক সার্বভৌম অধিকার কোনভাবে বিঘ্নিত হত না। ১৯০৯, অর্থাৎ এই বিংশ শতাব্দীর প্রথম দশক পর্যন্ত তুরস্ক-সম্রাটদের হারেম ছিল চাঁদের অপর পৃষ্ঠের মতো পৃথিবীর মানুষের কাছে সম্পূর্ণ অজ্ঞাত ও রহস্যঘেরা এক দুনিয়া। তারপর ঐ বছর যখন অটোমান সুলতান আবদুল হামিদ সালোনিকায় নির্বাসিত হলেন এবং হারেম প্রথার অবসান হল তখন ঐ হারেম থেকে মুক্তি পায় ৩৭০ জন নারী ও ১২৭টি খোজা। ১৫ থেকে ৫০ বছর বয়সের নারীরা তাদের মালপত্র নিয়ে যখন ৩১টি গাড়িতে চেপে ঐ বন্দীশালা থেকে মিছিল করে বেরিয়ে আসে তখন তাদের মুখে কোন আবরণ ছিল না। সে শুধু মুক্তির আনন্দ আস্বাদনের জন্যই নয়, দুধারে সমবেত অগণিত কৌতূহলী মানুষের মধ্যে কেউ যদি তাদের চিনতে পেরে আশ্রয় দেয় সে আশাতেও। অবমানিত মানবাত্মার মুক্তি দিয়ে ক্ষুধিত পাষাণ সেই যে অবগুণ্ঠনে আত্মগোপন করে আজ তারও মুক্তি হচ্ছে।

হারেমের মধ্যে আছে ৩৬০টি ক্ষুদ্র প্রকোষ্ঠ, কয়েকটি হলঘর, অগণিত সংকীর্ণ বৃত্তাকার বারান্দা ও অন্ধকার চোরাপথ, নানা ছাঁদের স্নানাগার ও বাঁধানো প্রাঙ্গণ। প্রায় সাতাশ কোটি টাকা ব্যয় করে তুরস্ক সরকার ঐ বিশাল জেনানা মহলটিকে সুসজ্জিত করে পর্যটক আকর্ষণের ব্যবস্থা করছেন। মূক পাষাণ যখন মুখর হবে তখন কতজনের কানে সে কত কথাই না বলবে। কেউ সেখানে শুনতে পাবে শিঞ্জিনী নিক্কণ ও প্রমোদপ্রমত্তা ললনাদের কলোচ্ছ্বাস, কারও বা কানে ভেসে আসবে অসহায়া বন্দিনী মানবীর বুকফাটা কান্না। হারেমের প্রতিটি ইষ্টক-খণ্ড তার কাছে নিগৃহীতা লাঞ্ছিতা অগণিত নারীর সকরুণ দীর্ঘশ্বাসে অভিশপ্ত বলে মনে হবে। কিন্তু, একটানা সাড়ে তিনশ বছরের নিষ্ঠুর নির্লজ্জ সম্ভোগ ও অসহায় আত্মদানের নীরব স্বাক্ষী ঐ ঐতিহাসিক প্রাসাদটি যে রহস্যময়ী নারীর মতো দুর্নিবার আকর্ষণে সকলকে কাছে টানবে তাতে কোন সন্দেহ নেই।

স্বামীজির শান্তিমন্ত্র : উত্তর আয়ারল্যাণ্ডে শান্তি প্রতিষ্ঠার কাজে শেষ পর্যন্ত এক ভারতীয় সাধু, স্বামী বিষ্ণু দেবানন্দ, এগিয়ে এসেছেন। তিনি বলেছেন, উত্তর আয়ারল্যাণ্ডে গত কয়েক মাস, এবং সত্য কথা বলতে কি, গত কয়েক বছর ধরে যে ক্যাথলিক-প্রোটেস্টাণ্ট দাঙ্গা চলেছে, আর বৃটিশ সরকার বেপরোয়াভাবে পীড়ননীতি চালিয়েও যার মীমাংসা করতে পারছে না, তিনি শান্তির বাণী প্রচার করে সে অশান্ত পরিস্থিতিকে আয়ত্তে আনবেন। লণ্ডনের অভিজাত পল্লীর এক বড় হোটেলে সাংবাদিকদের এক ভোজসভার আয়োজন করে স্বামীজি তাঁর পরিকল্পনার কথা ঘোষণা করেন। ইউরোপ ও আমেরিকায় স্বামীজির এখন অগণিত শিষ্য এবং সেই সূত্রে স্বভাবতই তিনি এখন বিপুল বিত্তের অধিকারী ও অত্যন্ত ব্যস্ত ব্যক্তি। শিষ্যদের সঙ্গে নিয়মিত সংযোগরক্ষা করতে তাঁকে চার্টার্ড বিমানে তিন মহাদেশ ছোটাছুটি করতে হয়। সাংবাদিকদের তিনি জানান যে, দেবী লক্ষ্মী তাঁকে অশান্ত বিশ্বে শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য উদ্যোগী হতে নির্দেশ দিয়েছেন। তাঁর শান্তি অভিযানও হবে অতি সহজ সরল। একটি স্বয়ংচালিত বিমানে তিনি উপদ্রুত অঞ্চলগুলির উপর দিয়ে উড়ে যাবেন (যেমন করে বন্যাদুর্গত অঞ্চলগুলি পরিদর্শন করেন দেশের ভাগ্যবিধাতারা), আর তাঁর দেবী নির্দিষ্ট বাণীসম্বলিত কয়েক হাজার প্রচারপত্র উড়িয়ে দেবেন ঐ এলাকার অশান্ত মানুষগুলির মধ্যে। তাতেই নাকি কাজ হয়ে যাবে। তারপর তিনি শান্তি অভিযান চালাবেন বার্লিন প্রাচীরের উভয় দিকে এবং তারও পরে বিশ্বের অন্যান্য অশান্ত ও উপদ্রুত স্থানে।

পশ্চিমের মানুষ আজ নানা কারণে দিশাহারা। হানাহানি, কাটাকাটি, ব্যভিচারে অসহনীয় হয়ে উঠেছে তাদের গার্হস্থ্য ও সামাজিক জীবন। যে ধর্ম ও নীতিবোধের ভিত্তিতে গড়ে উঠেছে তাদের সভ্যতা, তা দেউলিয়া হয়ে গেছে এবং তার আর কিছুই দেওয়ার নেই—এমন একটা ধারণা হয়েছে পশ্চিমি দুনিয়ার অনেকের মনে। বিভ্রান্ত মানুষগুলির সেই মনের 'ভ্যাকুয়াম' পূরণের একটা বড় সুযোগ এসে গেছে ভারতের সাধুসন্তদের। যে কোন মহাযোগী মহাঋষি বা মহাপ্রভু কোনরকমে একবার পৌঁছাতে পারলেই হাজার হাজার শিষ্য জুটে যায় তাঁর। ভক্তদের উজাড়করা প্রণামীতে গুরুর ভিক্ষার ঝুলি পূর্ণ হতেও খুব একটা সময় লাগে না। কিন্তু বেশি ভেল্কি দেখাতে গিয়ে অনেক বিরিঞ্চিবাবাকেই শেষ পর্যন্ত বিপাকে পড়তে হয়। একদিন বীটলদের শিষ্যরূপে পাওয়ার সৌভাগ্যে যে মহাঋষির মাটিতে পা পড়ার অবকাশ হচ্ছিল না আজ তাঁকে কাগজে বিজ্ঞাপন দিয়ে তাঁর সাধনভবনের জন্য লোক জোটাতে হচ্ছে। আলস্টারে শান্তি প্রতিষ্ঠার সঙ্কল্প ঘোষণা করে স্বামী বিষ্ণু দেবানন্দজিও যে খুব বড় ঝুঁকি নিয়েছেন তাতে কোন সন্দেহ নেই।

হত্যা নজিরবিহীন : মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে গত বছরে খুন হয়েছে ১৫,৮১০ জন এবং মার্কিন গোয়েন্দা দপ্তরের প্রধান, এডগার হুভার বলেছেন, যে হারে হত্যাকাণ্ড বেড়ে চলেছে মার্কিন মুল্লুকে তা পুলিশের পক্ষে আয়ত্তে রাখা সম্ভব হবে না। পুলিশ দপ্তরের বক্তব্য, যত মানুষ খুন হয় তার এক-চতুর্থাংশের প্রাণ যায় পারিবারিক বিরোধের ফলে। সে কারণে সেসব মৃত্যু প্রতিরোধে পুলিশের পক্ষে বিশেষ কিছু করা সম্ভব নয়। আর অন্যান্য কারণে হত্যা যে ব্যাপক হারে বেড়ে চলেছে তাতে সমস্যাটিকে আর কোনমতেই আইনশৃঙ্খলার সমস্যা বলা যায় না, সেটি এখন জাতীয় সমস্যায় পরিণত হয়েছে।

১৯৭০ সালে যুক্তরাষ্ট্রে প্রতিদিন গড়ে ৪০ জন মানুষ খুন হয়েছে। মোট যা মানুষ খুন হয়েছে সেটা দশ বছর আগের তুলনায় ৭০ শতাংশ বেশি। ১৯৬০ সালে খুন হয়েছিল নয় হাজার মানুষ। পুলিশ খুনও ইতিমধ্যে অনেক বেড়ে গেছে সে দেশে; '৬৯ সালে খুন হয়েছিল ৮৬ জন, গত বছর তা বৃদ্ধি পেয়ে হয় ১০০, অর্থাৎ এক বছরে ষোল শতাংশ বৃদ্ধি।

১।৯।৭১ —প্রত্যক্ষদর্শী

সম্পাদকীয়

সর্বজনপ্রিয় শ্রদ্ধেয় সাহিত্যকার তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় মাত্র কয়েকদিন রোগভোগের পর লোকান্তরিত হলেন, বাংলার এই সংকট মুহূর্তে এই নিদারুণ দুঃসংবাদে আমরা মর্মাহত। বাংলা কথাসাহিত্যের রবীন্দ্রনাথ-শরৎচন্দ্রের উত্তরসাধক তারাশঙ্কর এক বর্ধিষ্ণু পরিবারে জন্মগ্রহণ করলেও সাম্রাজ্যের ভগ্নশেষ যে সাধারণ মানুষ চিরকাল নীরবে দুঃখক্লেশ যন্ত্রণা সহ্য করে এসেছে সেই মূক জনসাধারণের কথা তুলে ধরেছেন তাঁর সাহিত্যে, অবক্ষয়ী সমাজের ছবি এঁকেছেন। শরৎচন্দ্রে যার সূত্রপাত তারাশঙ্করে তা বিকশিত হয়ে উঠল। মাটির বুক থেকে যেন তিনি উঠে এসেছিলেন। বৈচিত্র্য, বলিষ্ঠতা, কল্পনাকুশলতা, নাটকীয়ত্ব ও বিশালতায় তাঁর সাহিত্যসৃষ্টি সমৃদ্ধ। অগ্রজ ও অনুজ সাহিত্যিকদের পরম প্রিয় এই মানুষটি বর্তমান বাংলাকে এক নতুন মর্যাদার আসনে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। তাঁর অমর আত্মার প্রতি আমরা সুগভীর শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করি।

পটভূমি

আসছে বছরের গোড়ায় যে-সব রাজ্যে **বিধানসভার** নির্বাচন হওয়ার কথা, তার **কয়েকটিতে প্রদেশ** কংগ্রেসকে ঢেলে সাজার **ইচ্ছে প্রধানমন্ত্রীর** বেশ কিছু দিনের। তার **মধ্যে রাজস্থান** ও মধ্য প্রদেশ সম্বন্ধে তিনি **ছিলেন** বিশেষ আগ্রহী। বিহার বা পশ্চিম **বাংলায়** অবশ্য ঐ সময়ে নির্বাচন হওয়ার **কথা** নেই, তবু এ দুটি রাজ্যের প্রদেশ **কংগ্রেসের** দিকেও যে তাঁর নজর আছে, **এ-কথা** শ্রীমতী গান্ধীর ঘনিষ্ঠ মহল **জানতেন**।

প্রধানমন্ত্রী এই সেদিন যখন কলকাতায় **এলেন তখনও** তিনি জানিয়েছিলেন যে, **রাজ্যের কংগ্রেসের** নেতৃত্ব এমন লোকেদের **হাতে থাকা** উচিত যাঁরা দলকে নতুন রূপ **দিতে** পারবেন। পশ্চিম বাংলায় যে একটি **বিশেষ** বামপন্থী আবহাওয়া রয়েছে তার **কথা** মনে রেখেই তিনি এই কথা বলে**ছিলেন**। তবে বিশেষ একজন প্রার্থীকেই **তিনি** রাজ্য কংগ্রেস সভাপতি হিসেবে **দেখতে** চান বলে যে-খবর রটানো হয়েছিল, **পরে জানা** গেল সেটা ঠিক নয়।

পশ্চিম বাংলাতে যেমন, অন্যান্য **কয়েকটি** রাজ্যেও প্রদেশ কংগ্রেসকে ঢেলে **সাজার** প্রস্তাবে সকলেই উৎফুল্ল হতে **পারেন** নি। যাঁরা বেশ কিছু দিন ধরে **সংগঠন** আঁকড়ে ধরে বসে আছেন তাঁরা সহজে **নতুন** লোকেদের জায়গা করে দিতে চাইবেন, **এটা অবশ্য** আশাও করা যায় না। তাই **প্রধানমন্ত্রীর** প্রস্তাবের বিরুদ্ধে বাধা, এবং **বেশ** বড় রকমের বাধাই, আসে তাঁদের পক্ষ **থেকে**। গত মে মাসে সারা দেশের জেলা **কংগ্রেস কমিটির** নেতাদের যে-বৈঠকে প্রধান**মন্ত্রী ভাষণ** দেন সেখানেও দলকে জোরদার **করার** প্রয়োজনীয়তার ওপর তিনি গুরুত্ব **দেন**, কিন্তু তারপরে ফলো-আপ অ্যাকশন **আর** বিশেষ কিছু হয়নি।

পশ্চিম বাংলা কংগ্রেসের কাহিনী বিশদ **আলোচনার** আগে অন্যান্য রাজ্যের ছবিটা **একটু** দেখে নেওয়া যাক। অবশ্য সর্বত্রই **বিবাদের** কারণ দুটি গোষ্ঠীর স্বার্থের **সংঘাত**। যেমন বিহারে লড়াইটা প্রধানতঃ **জগজীবন** রামের সমর্থকদের সঙ্গে রামলক্ষণ **যাদবের** সমর্থকদের। ঐ রাজ্যে দলকে **ঢেলে সাজানোর** বা অ্যাড হক কমিটি গঠনের অর্থ হল জগজীবনবাবুর গোষ্ঠীর অস্তগমন এবং বিরুদ্ধ গোষ্ঠীর উদয়। সুতরাং প্রথমোক্ত গোষ্ঠী তো এই ঢেলে সাজার চেষ্টার বিরুদ্ধতা করবেই। মধ্যপ্রদেশে ঝগড়াটা চলছে মুখমন্ত্রী এস সি শুক্লার গোষ্ঠীর সঙ্গে বর্ষীয়ান নেতা ডি পি মিশ্রের গোষ্ঠীর।। পশ্চিম বাংলার মতো ওখানেও প্রদেশ কংগ্রেসের হাল ধরেছিলেন একজন অস্থায়ী সভাপতি। নতুন পাকা সভাপতি কে হবেন, তাই নিয়েই দুই গোষ্ঠীর মধ্যে মতানৈক্য দেখা দেয়। শেষ পর্যন্ত তার কোনো সন্তোষজনক মীমাংসা হয়নি। রাজস্থানে মুখ্যমন্ত্রীর পদ থেকে মোহনলাল সুখাড়িয়াকে সম্প্রতি সরে যেতে হয়েছে প্রধানতঃ প্রধানমন্ত্রীরই ইচ্ছা অনুসারে। তাঁর জায়গায় বসেছেন বরকতুল্লা সাহেব। নাথুরাম মির্ধাও প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতির পদে ইস্তফা দিয়েছেন। কিন্তু এখন যাঁরা প্রদেশ কংগ্রেস চালাচ্ছেন তাঁরা সকলেই সুখাড়িয়া ও মির্ধার লোক। সরকার যাঁরা চালাচ্ছেন তাঁরা স্বভাবতঃই চাইছেন যে, প্রদেশ কংগ্রেসের নেতৃত্বও তাঁদের গোষ্ঠীর লোকেদের হাতেই থাক। তাঁরা তাই প্রার্থিত পরিবর্তন আনতে চান। কিন্তু বাধা 'আসছে কায়েমী স্বার্থের কাছ থেকে।

এটা জানাই ছিল, প্রদেশ কংগ্রেস নেতারা যদি সংগঠনে বড় রকমের পরিবর্তন আনতে না চান তবে তংগ্রেসের কেন্দ্রীয় নেতারা একটা চরম ব্যবস্থা নিতে চাইবেন। ৯ সেপ্টেম্বরের ওয়ার্কিং কমিটির বৈঠকের ওপর সকলের বিশেষ দৃষ্টি ছিল ঐ কারণেই। ওয়ার্কিং কমিটি প্রত্যাশিত সিদ্ধান্তই নিয়েছেন। ঐ চারটি রাজ্যে প্রদেশ কংগ্রেস ভেঙে দিয়ে অ্যাড হক কমিটি গঠনের সুপারিশ করা হয়েছে।

নির্বাচনের মুখে কেন্দ্রীয় নেতারা এত বড় একটা সিদ্ধান্ত নিতে গেলেন কেন? রাজনৈতিক মহলের ধারণা নির্বাচনের মুখে বলেই এত বড় সিদ্ধান্ত নিতে হল। নির্বাচনের আগে যাঁদের হাতে সংগঠনের ভার থাকবে তাঁরাই প্রার্থী মনোনয়ন করার সুযোগ পাবেন। নতুন নেতাদের যদি দলের নেতৃত্বে নিয়ে আসা যায় তবে তাঁরাই নতুন প্রার্থীদের নির্বাচনে মনোনয়ন দিতে পারবেন। **এইভাবে নতুন ও তরুণ মুখের** আমদানিতে দলের চেহারাও পাল্টে যাবে—**অন্ততঃ** সেটাই হল উদ্দেশ্য।

•

পশ্চিম বাংলায় প্রথম অ্যাড হক কংগ্রেস **হয়** ১৯৬৭ সালে। তখন কারণটা ছিল একেবারেই ভিন্ন। এখন যদি প্রয়োজনটা হয় নিজের দলকে নতুন করে গড়ার, তবে তখন প্রয়োজনটা ছিল বিপক্ষ শিবিরে ভাঙন ধরানোর। বিপক্ষ শিবির বলতে প্রথম যুক্ত ফ্রন্ট। অজয়কুমার মুখোপাধ্যায় যে যুক্ত ফ্রন্টের মধ্যে সুখে দিন কাটাচ্ছিলেন না, একথা সকলেই জানতেন। তদানীন্তন অবিভক্ত কংগ্রেস অজয়বাবুর সেই অসন্তোষের সুযোগ নিতে চাইলেন। কিন্তু অজয়বাবু সাফ জানিয়ে দিলেন যে, যতো দিন অতুল্য ঘোষ ও তাঁর গোষ্ঠী প্রদেশ কংগ্রেসের নেতৃত্বে থাকবেন ততো দিন কংগ্রেসের সঙ্গে হাত মিলিয়ে বিকল্প মন্ত্রিসভা গঠনের কোনো প্রশ্নই ওঠে না। তাই প্রদেশ কংগ্রেসের নেতৃত্ব বদলের জন্যে অ্যাড হক কমিটি গড়ার প্রস্তাব ওঠে।

সেই উদ্দেশ্যেই ঐ বছর সেপ্টেম্বর মাসে গুলজারিলাল নন্দা কলকাতায় আসেন এবং কংগ্রেসের নানা গোষ্ঠীর সঙ্গে আলোচনার পর কলকাতাতেই ঘোষণা করেন যে, পশ্চিমবাংলা প্রদেশ কংগ্রেস ভেঙে দিয়ে অ্যাড হক কমিটি গঠন করা হবে। কিন্তু নন্দাজী একটা ভুল করে ফেলেছিলেন। তখন কংগ্রেস সভাপতি ছিলেন কামরাজ। কামরাজের সঙ্গে কোনো আলোচনা না করেই প্রধানতঃ প্রধানমন্ত্রীর পরামর্শেই অ্যাড হক কমিটি গঠনের সিদ্ধান্তের কথা ঘোষণা করেন। **পরে** ওয়ার্কিং কমিটির বৈঠকে প্রশ্ন ওঠে, নন্দাজী কোন অধিকারে অ্যাড হক কমিটি গঠনের কথা ঘোষণা করেছেন? কারণ তাঁকে তো শুধু পশ্চিম বাংলা কংগ্রেস সম্বন্ধে বিশেষ রিপোর্ট দেওয়ার জন্যে কলকাতায় পাঠানো হয়েছিল, ঐখানে বসেই অ্যাড হক কমিটি গঠনের কথা ঘোষণা করার জন্যে নয়।

•

ফলে হল কী, অ্যাড হক কমিটি গঠন করা হবে বলে নন্দাজী কলকাতায় ঘোষণা করে গেলেও কমিটির সদস্যদের নাম সঙ্গে সঙ্গে ঘোষণা করা গেল না। কামরাজ যথেষ্ট সময় নিয়ে অক্টোবর মাসের বেশ কিছুদিন কেটে

যাওয়ার পর প্রফুল্ল সেনকে আহ্বায়ক করে অ্যাড হক কমিটির অন্যান্য সদস্যদের নাম ঘোষণা করলেন। কিন্তু যার জন্যে এত আয়োজন, সেই কমিটিই হল না। যথাসময়ে অ্যাড হক কমিটি গঠিত না-হওয়ায় অজয়বাবু কংগ্রেসের কথায় বিশ্বাস করতে পারলেন না, আর তাঁর পদত্যাগ করাও হল না।

•

এবারে এই রাজ্যে কংগ্রেসের মধ্যে গোলযোগের সুরু মধ্যবর্তী নির্বাচনের পর থেকেই। কেন্দ্রীয় কংগ্রেস নেতারা স্থির করেন যে, একই লোক দলের বড় কর্মকর্তা এবং মন্ত্রীর পদে থাকতে পারবেন না। 'ওয়ান ম্যান ওয়ান পোস্ট' নীতির এইটেই হল সার কথা। এই নীতি চালু হওয়ার পরই জগজীবনবাবুকে খানিকটা অনিচ্ছাতেই কংগ্রেস সভাপতির পদে ইস্তফা দিতে হয়। কেন্দ্রীয় নেতৃত্বে যখন এই নীতি কার্যকর করা হচ্ছে তখন রাজ্যেই বা হবে না কেন? এপ্রিল মাসে যখন পশ্চিম বাংলায় গণতান্ত্রিক কোয়ালিশন সরকার হল তখন বিজয়সিং নাহার হলেন তার উপ-মুখ্যমন্ত্রী। বিজয়বাবু আবার কংগ্রেস সভাপতিও। তাই তখন দলের মধ্যে বিশেষতঃ তরুণ সদস্যরা প্রশ্ন তুললেন যে, বিজয়বাবুকে হয় কংগ্রেস সভাপতি থাকতে হবে, নয় মন্ত্রী থাকতে হবে, দুটো পদই আঁকড়ে থাকা চলবে না। মে মাসে সে-সর্বভারতীয় জেলা কংগ্রেস কমিটির বৈঠকের কথা আগে বলেছি সেখানে তো পশ্চিম বাংলার একজন প্রতিনিধি এমন কথাও বললেন যে, রাজ্য কংগ্রেসের গোটা সদর দপ্তরটাই রাইটার্স বিল্ডিংসে চলে গেছে। তখন থেকেই নতুন সভাপতি কে হবেন, সেই জল্পনা সুরু হয়ে যায়। এমন কি, অ্যাড হক কমিটি গঠনের সম্ভাবনার কথাও তখন থেকেই শোনা যেতে থাকে।

কিন্তু বিজয়বাবু যে কংগ্রেস সভাপতির পদে ইস্তফা দিতে তখন রাজী ছিলেন না তার কারণ তিনি জানতেন যে গণতান্ত্রিক কোয়ালিশন সরকারের আয়ু বেশিদিন নয়। আবার উপ-মুখ্যমন্ত্রীর পদও যে তিনি চট করে ছাড়তে রাজী হন নি, তার কারণ সম্ভবতঃ তাঁর মতো পাকা রাজনীতিকের এটুকু বুঝতে অসুবিধে হয়নি যে, তিনি বেশিদিন দলের সভাপতি পদে থাকতে পারবেন না, কারণ তাঁর বিরুদ্ধে চাপ ক্রমশঃই বড় হয়ে উঠছিল।

গণতান্ত্রিক কোয়ালিশন বেশিদিন টিঁকল না, সুতরাং তারপর মন্ত্রী ও কংগ্রেস সভাপতির পদ একই সঙ্গে আঁকড়ে থাকা সংক্রান্ত বিতর্কেরও শেষ হওয়া উচিত ছিল। কিন্তু তা হল না। নানা রকম পরস্পরবিরোধী সংবাদের মধ্যে বিজয়বাবু জুলাই মাসে জানালেন, তাঁর স্বাস্থ্য ভালো যাচ্ছে না, তাই দিন সাতেকের জন্যে তিনি গোপালপুরে যাচ্ছেন, ফিরে এসে হয়ত কংগ্রেস সভাপতির পদে ইস্তফা দেবেন। সুরু হয়ে গেল আরো জল্পনা—বিজয়বাবুর পদত্যাগের পর কে সভাপতি হবেন? বিজয়বাবু গোপালপুর থেকে ফিরে এসে যখন সত্যিই পদত্যাগ করলেন তখন নাটক আরো জমে উঠল।

প্রদেশ কংগ্রেসের নেতৃত্বে যাঁরা পরিবর্তন আনতে চাইছিলেন তাঁদের পুরোভাগে ছিলেন ছাত্র পরিষদ, যুব কংগ্রেস, আই এন টি ইউ সি এবং কংগ্রেস সোস্যালিস্ট ফোরামের নেতারা। তাদের স্পষ্টই ধারণা যে, চলতি নেতৃত্ব দিয়ে দলকে নতুন করে গড়া যাবে না। ছাত্র পরিষদ বা যুব কংগ্রেসকে অবহেলা করাও সম্ভব নয়। এখন শাসক কংগ্রেসের তারা দুটি বিশেষ শক্তিশালী স্তম্ভ। গত বিধান সভায় কংগ্রেসের ১০৫ জন সদস্যের মধ্যে যুব কংগ্রেস ও ছাত্র পরিষদের লোকই ছিল জন কুড়ি। প্রধানতঃ এই দুটি সংস্থার চাপেই গণতান্ত্রিক কোয়ালিশন সরকারকে পদত্যাগ করতে হয়। ছাত্র পরিষদ নেতা সুব্রত মুখার্জি প্রকাশ্যেই কোয়ালিশন সরকারকে 'কেরাণীদের সরকার' বলে অভিহিত করেছিলেন। যুব কংগ্রেস নেতা নারায়ণ কর খুন হওয়াই যে তার পদত্যাগের অন্যতম কারণ, অজয়বাবু নিজেই সে কথা স্বীকার করেছেন। সুতরাং যুব কংগ্রেস-ছাত্র পরিষদকে উপেক্ষা করা কি সহজ?

অবশ্য চাপে পড়ে বিজয়বাবু কংগ্রেস সভাপতির পদ ত্যাগ করলেও তিনি বা তাঁর গোষ্ঠী একেবারে হাল ছেড়ে দিলেন না। যুব কংগ্রেস, ছাত্র পরিষদ প্রমুখ যাঁকে চাইবে তিনিই যাতে সভাপতি না হতে পারেন এবং দিল্লী থেকেও যাতে কাউকে চাপিয়ে দেওয়া না হয় তার জন্যে চেষ্টা সুরু হয়ে গেল। যুব কংগ্রেস প্রভৃতি গোড়া থেকেই চাইছিল কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য দপ্তরের প্রতিমন্ত্রী অধ্যাপক দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়কে। দেবীবাবু কংগ্রেসে নতুন। ১৯৬৫ সাল নাগাদ তিনি কংগ্রেসে যোগ দেন। তার আগে তার ঝোঁকটা ছিল কম্যুনিস্ট পার্টির দিকে। শোনা যায়, দিল্লীরও ইচ্ছে দেবীবাবুই রাজ্য কংগ্রেসের হাল ধরুন। এদিকে বিরোধী গোষ্ঠী এসে মিলিত হন অস্থায়ী কংগ্রেস সভাপতি আবদুস সাত্তার সাহেবের পেছনে।

নির্বাচন এড়িয়ে একটা সমঝোতায় (বা কনসেনসাসে) পৌঁছানোই কংগ্রেসের বরাবরের রীতি। এক্ষেত্রেও সেই চেষ্টা চলতে থাকে। কিন্তু প্রথমে তা সফল হওয়ার কোনো সম্ভাবনা দেখা যায় না। নির্বাচন এড়ানোটাই যে সর্বশ্রেষ্ঠ পথ, এ-কথাও সকলে মেনে নিতে রাজী হন না। যেখানে মত-বিরোধ রয়েছে সেখানে ভোটের সাহায্যে সব কিছু ফয়সালা হতেই বা বাধা কোথায়। —এই হল তাঁদের যুক্তি। ইতিমধ্যে দিল্লীতে প্রধানমন্ত্রী ও অন্যান্য নেতাদের কাছে চিঠি-পত্র লেখাও সুরু হয়ে যায়। ঐ সব চিঠিতে বলা হয়, পশ্চিম বাংলা কংগ্রেস পরিচালনার ভার এমন একজনের হাতে দেওয়া উচিত যিনি অভিজ্ঞ, পশ্চিম বাংলার অবস্থা সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল এবং স্বাধীনতা সংগ্রামে যাঁর গৌরবময় ভূমিকা আছে। স্পষ্টতঃই এর লক্ষ্য ছিলেন দেবীবাবু।

এর পর একটা মিটমাটের চেষ্টায় সিদ্ধার্থশংকর রায় ৭ সেপ্টেম্বর তাঁর বাড়িতে জেলা কমিটির সভাপতি ও সম্পাদকদের বৈঠক ডাকেন। সেখানে স্থির হয়, দেবীবাবু সভাপতি পদের জন্যে প্রার্থী হবেন না, আবদুস সত্তারকেই সকলে সমর্থন করবেন। অবশ্য তার আগেই বর্ধমানের নারায়ণ চৌধুরী মনোনয়ন পত্র পেশ করেছিলেন। কিন্তু তিনিও হয়ত শেষ পর্যন্ত প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন না, এটাই অনেকে ধরে নিয়েছিলেন।

আবদুস সত্তারকে যাঁরা চাইছিলেন তাঁরা হয়ত ঐ সময় খুশিই হয়েছিলেন ওঁদের এই জয়লাভে, কিন্তু অ্যাড হক কমিটির খড়্গ নেমে আসতে দেরি হল না। এখন এ-কথা মনে করতে দোষ নেই যে, দেবীবাবুর নাম প্রত্যাহারের সিদ্ধান্তটা ছিল দেবীবাবু - সিদ্ধার্থবাবুর ট্যাকটিক্যাল রিট্রিট। কারণ দিল্লী কী সিদ্ধান্ত নিতে চলেছে তা সম্ভবতঃ তাঁদের অজানা ছিল না। অবশ্য বিপক্ষের নেতারা এই কথা ভেবে খুশি হতে পারেন যে, আবদুস সত্তার সাহেবকেই অ্যাড হক কমিটির আহ্বায়ক মনোনীত করা হয়েছে।

১০।৯।৭১　　—দেবদত্ত

দেশে বিদেশে

ভারত-চীন সম্পর্কের বরফ গলবার সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে, এমন অনুমান যাঁরা করেন তাঁরা তাঁদের অনুমানের সপক্ষে এখনও স্পষ্ট করে কিছু দেখতে পাচ্ছেন না।

সত্যি বটে যে, আগামী নভেম্বর মাসে চীনে আফ্রিকা ও এশিয়ার দেশগুলির মধ্যে যে টেবিল টেনিস প্রতিযোগিতা হওয়ার কথা আছে তাতে যোগ দেওয়ার জন্য কম্যুনিস্ট চীন সরকারীভাবে ভারত সরকারকে একদল টেবিল টেনিস খেলোয়াড় পাঠাতে আমন্ত্রণ জানিয়েছেন। এটাও ঠিক যে ভারতীয় টেবিল টেনিস ফেডারেশনের সঙ্গে পরামর্শ করে ভারত সরকার এই আমন্ত্রণ গ্রহণ করেছেন।

কিন্তু এই ঘটনাকে কি ভারতের সঙ্গে চীনের তথাকথিত পিংপং কূটনীতির সূচনা বলে গ্রহণ করা যাবে? কিছু পর্যবেক্ষক আছেন যাঁরা চীন-আমেরিকার পিংপং কূট-নীতির সঙ্গে এই ঘটনার সাদৃশ্য খোঁজেন। মার্কিন টেবিল টেনিস খেলোয়াড়দের চীনে আমন্ত্রণ করে নিয়ে যাওয়ার মধ্য দিয়েই ইদানীংকালে সর্বপ্রথম চীন ও আমেরিকার যোগাযোগের একটা রাস্তা খোলা হয়েছিল। সেকথা যাঁরা এই প্রসঙ্গে মনে করতে চান তাঁরাই বিশেষ করে চীনে ভারতীয় টেবিল টেনিস খেলোয়াড়দের আমন্ত্রণের মধ্যে বিশেষ তাৎপর্য দেখতে পাচ্ছেন। দুটি ঘটনার মধ্যে যেমন সাদৃশ্য আছে তেমনি বৈসাদৃশ্যও আছে। সবচেয়ে বড় কথা হল এই যে, কম্যুনিস্ট চীন ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে যখন কোন কূটনৈতিক যোগ ছিল না (এখনও নেই) তখন পিকিংয়ে আমন্ত্রিত পিংপং খেলোয়াড়রা এবং তাঁদের পিছু পিছু মার্কিন সাংবাদিকরা দুই দেশের মধ্যে একটি সেতু রচনা করেছিলেন। কিন্তু ভারত-চীন সম্পর্কটা এমন শূন্যোশ্রয়ী নয়। দুই দেশের মধ্যে কূটনৈতিক সম্পর্ক রয়েছে। যদিও সম্পর্কটা পুরোপুরি রাষ্ট্রদূত পর্যায়ে নয়, তাহলেও দুই দেশের মধ্যে একটা প্রাথমিক সংলাপ শুরু করার পক্ষে এই সম্পর্কের সূত্রটা যথেষ্ট মজবুত। সুতরাং, এক্ষেত্রে পিংপং কূটনীতির ছল আশ্রয় করার কোন প্রয়োজন ছিল না। দ্বিতীয়ত, যে আমন্ত্রণের তালিকায় ভারতের নাম রয়েছে সেটি তৈরি করেছেন চীন, কোরিয়া, জাপান, নেপাল, মরিশাস ও সংযুক্ত আরব প্রজাতন্ত্রকে নিয়ে গঠিত একটি 'স্পনসরিং কমিটি' এবং ঐ তালিকায় ভারতের সঙ্গে সঙ্গে এশিয়া ও আফ্রিকার প্রায় সব দেশের নাম আছে, বাদ শুধু দক্ষিণ আফ্রিকা, ইজরায়েল ও জর্ডান।

আশাবাদীরা অন্যান্য কয়েকটি সুলক্ষণও দেখতে পাচ্ছেন। একটির জন্য সাক্ষী মানা হয়েছে নিউইয়র্ক টাইমস পত্রিকার জেমস রেস্টনকে। তিনি সম্প্রতি পিকিংয়ে গিয়েছিলেন। সেখানে তাঁর সঙ্গে চীনের প্রধানমন্ত্রী চৌ এন-লাইয়ের প্রায় পাঁচ ঘণ্টা ধরে বিভিন্ন বিষয়ে কথা হয়েছে। পিকিং থেকে ফিরে এসে হংকং-এ একটি ভোজসভায় 'স্কটি' রেস্টন সাংবাদিকদের কাছে বলেছেন, ভারত-সোভিয়েট চুক্তি সম্পর্কে চীনের যে সরকারী অভিমত তিনি জানতে পেরেছিলেন সেটা চীনারা তাঁকে প্রকাশ করতে নিষেধ করে দিয়েছিলেন। তাঁরা বলেছিলেন, এ বিষয়ে পিকিংয়ের সরকারী বক্তব্য শীঘ্রই প্রকাশ করা হবে। যদি সে সময়ে এই বক্তব্য প্রকাশ করা হত তাহলে চীন এই চুক্তিকে পাকিস্থানের বিরুদ্ধে ভারত ও সোভিয়েট রাশিয়ার সম্মিলিত ষড়যন্ত্র বলেই অভিহিত করত, এই হচ্ছে রেস্টনের খবর। কিন্তু ভারত-সোভিয়েট চুক্তি সম্পর্কে চীন এখন পর্যন্ত নীরব, সরকারীভাবে শুধু বলা হচ্ছে, তারা চুক্তিটি পর্যালোচনা করে দেখছে।

চীনের এই নীরবতা কি ভারত সম্পর্কে তার দ্বিতীয় চিন্তারই ইঙ্গিত?

যাঁরা ব্যাপারটা এইভাবে দেখতে চান তাঁরা দেখাচ্ছেন যে, নয়াদিল্লিস্থিত পিকিং-এর ভারপ্রাপ্ত প্রতিনিধি হুয়াং মিং-টাও রাওয়ালপিন্ডিস্থিত চীনা রাষ্ট্রদূতকে প্রায় একই সময়ে পিকিংয়ে আলোচনার জন্য ডেকে পাঠান হয়েছিল, যার অর্থ হচ্ছে, পিকিং-এর নেতারা হয়ত ভারত-পাকিস্থান উপ-মহাদেশে তাঁদের নীতি খতিয়ে দেখতে চাইছেন।

ইতিমধ্যে পিকিংয়ে ভারতের শার্জ দ্যাফেয়ার্স শ্রীব্রজেশ মিশ্র আলাপ-আলোচনার জন্য দিল্লিতে এসেছেন। প্রথমে শোনা গিয়েছিল যে, তিনি প্রধানমন্ত্রী চৌ এন-লাইয়ের কাছ থেকে প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর কাছে লেখা একটি চিঠি নিয়ে এসেছেন। বাংলাদেশ প্রশ্ন নিয়ে পৃথিবীর অন্যান্য দেশের নেতাদের মতো চৌ এন-লাইয়ের কাছেও শ্রীমতী গান্ধী কিছুকাল আগে যে পত্র পাঠিয়েছিলেন তারই জবাব নাকি শ্রীমিশ্র নিয়ে এসেছেন, এমন একটা খবর শোনা গিয়েছিল। কিন্তু পরে জানা গেল, সে খবর ঠিক নয়। সর্বশেষ অনুমান হল এই যে, দুই দেশের মধ্যে অ্যাম্বাসেডর পর্যায়ে কূটনৈতিক প্রতিনিধি বিনিময়ের জন্য ভারত যে প্রস্তাব দিয়েছিল চীন এখন সেই প্রস্তাব গ্রহণ করতে ইচ্ছুক। ভারতের পররাষ্ট্র দপ্তরের পলিসি প্ল্যানিং কমিটির নবনিযুক্ত চেয়ারম্যান শ্রীদুর্গাপ্রসাদ ধর যখন মস্কোতে ভারতীয় রাষ্ট্রদূত ছিলেন সেইসময়ে একবার তিনি নাকি মস্কোস্থিত চীনা রাষ্ট্রদূতের কাছে ভারত ও চীনের মধ্যে আবার রাষ্ট্রদূত পর্যায়ে সম্পর্ক স্থাপনের প্রস্তাবটা পেড়েছিলেন। এতদিন চীন সেই প্রস্তাব সম্পর্কে কোন উচ্চবাচ্য করে নি। নূতন চীন-মার্কিন সংলাপ ও ভারত-সোভিয়েট চুক্তির পর এখন পিকিংয়ের কম্যুনিস্টরা সেই পুরানো প্রস্তাবটির দিকে নজর দিয়েছেন, এই হচ্ছে হালের জল্পনা।

আর একটি চাঞ্চল্যকর গবেষণা হল, ডাঃ হেনরি কিসিঙ্গারের মতো শ্রীদুর্গাপ্রসাদ ধরও ইতিমধ্যে পিকিংয়ে একটি গোপন দৌত্য সেরে এসেছেন। বোম্বাইয়ের একটি ইংরাজী দৈনিক সংবাদ দিয়েছেন যে, গত ২৪ আগষ্টের আগে সপ্তাহখানেক যাবৎ ধর মহাশয়ের গতিবিধি খুবই রহস্যাবৃত ছিল: এই সপ্তাহখানেক তিনি কোথায় ছিলেন সেবিষয়ে দিল্লির সরকারী মহল এক একবার এক একরকম খবর দিয়েছেন। কোন খবরই মেলে নি। একবার বলা হল, শ্রীধর কাশ্মীরে আছেন, একবার বলা হল তিনি আগরতলায়

মস্কো, ১১ই সেপ্টেম্বর। সোভিয়েট সূত্র থেকে জানা গেছে, প্রাক্তন সোভিয়েট প্রধানমন্ত্রী নিকিতা ক্রুশ্চেভ আজ পরলোকগমন করেছেন।

সরকারীভাবে বলা হয়েছে যে, ১৯৬৪ সালে নেতৃত্ব থেকে অপসারিত হওয়ার পর তিনি অবসর ভোগ করছিলেন এবং হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে তিনি মস্কোর উপকণ্ঠে এক হাসপাতালে মারা গেছেন।

শ্রীক্রুশ্চেভ তাঁর বাড়ীতে কিংবা হাসপাতালে মারা গেছেন সে সম্পর্কে উক্ত সূত্র এখনই কোন খবর দিতে পারেন নি।

শ্রীক্রুশ্চেভ ১১ বৎসর ক্রেমলিনে প্রভাবশালী ব্যক্তি ছিলেন এবং সোভিয়েট ইতিহাসে তিনি স্মরণীয় ব্যক্তিরূপে চিহ্নিত থাকবেন।

তিনি ক্ষমতাসীন থাকাকালে সোভিয়েট নভশ্চরেরা চন্দ্রাভিযান আরম্ভ করেন এবং এই সময়েই রাশিয়া চন্দ্র ও অন্যান্য গ্রহে অভিযানের প্রতিদ্বন্দ্বিতায় যুক্তরাষ্ট্রকে চ্যালেঞ্জ জানায়।

প্রচারে বিচক্ষণতা এবং তাঁর বিদেশ ভ্রমণে আগ্রহ সোভিয়েট ইতিহাসে তাঁকে অন্যতম জনপ্রিয় ব্যক্তিরূপে পরিগণিত করেছে।

গেছেন, আরও একবার বলা হল তাঁকে অসুস্থ অবস্থায় নার্সিং হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। কিন্তু সাংবাদিকরা তাঁকে কাশ্মীরে, আগরতলায় অথবা নার্সিং হোমে, কোথাও খুঁজে পান নি। অপরপক্ষে, কেউ কেউ নাকি শ্রীধরকে দিল্লির এয়ারপোর্টে কায়দাদুরস্ত পোষাকপরা অবস্থায় দেখেছেন। সেই সঙ্গে সাংবাদদাতার টিপ্পনি: শ্রীধর দেশের ভিতরে এক জায়গা থেকে অন্যত্র যেতে আসতে এই ধরনের কায়দাদুরস্ত পোষাক পরেন না। অতএব প্রশ্ন, এই সপ্তাহখানেক সময় শ্রীদুর্গাপ্রসাদ ধর কোথায় ছিলেন। সংবাদদাতার গবেষণা : তিনি হয় ওয়াশিংটন বা পিকিং ঘুরে এসেছেন।

এই গবেষণা সত্য হোক বা না হোক, দিল্লির মানুষ ভারত-চীন সম্পর্কের ক্ষেত্রে দীর্ঘ হিমঋতুর অবসানের আর একটি লক্ষণ দেখতে পেয়েছেন। সেটা হচ্ছে এই যে, দিল্লিতে চীনা দূতাবাসের সামনে গত প্রায় আট বছর ধরে ভারতীয় পুলিশের যে তাঁবু গাড়া ছিল সেটা তুলে দেওয়া হয়েছে।

শীত বিদায়ের এসব লক্ষণ দেখা গেলেও বসন্তের মলয়সমীরণ স্পষ্টতই এখনও অনেক দূরে। যুগোশ্লাভিয়ার একজন সংবাদপত্র-সম্পাদকের সঙ্গে সাক্ষাৎকারে চীনের প্রধান মন্ত্রী চৌ-এন-লাই যা বলেছেন তাতে আর যাই হোক, ভারত-চীন রাজনৈতিক বোঝা-পড়ার অনুকূলে মনোভাব প্রকাশ পায় নি। এই সাক্ষাৎকারে চৌ বলেছেন, ভারতীয় উপমহাদেশ ও ভারত মহাসাগর এখন দুই মহাশক্তিধর রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণে রয়েছে, চীন এই অঞ্চলকে 'মুক্ত' করার জন্য সব কিছু করবে। আগামী দিনগুলিতে যদি চীনের এই মনোভাব অপরিবর্তিত থাকে তাহলে ভারত ও চীনের মধ্যে দুই সমকক্ষ দেশ হিসাবে বন্ধুত্বপূর্ণ আলোচনার সম্ভাবনা খুবই কম।

●

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের শিকাগো শহরের নিগ্রো মহল্লার সন্তান জর্জ জ্যাকসন কিশোর বয়স থেকেই জেল খাটছিল। ১৯ বছর বয়সে সে তৃতীয়বার জেলে যায়। অপরাধ : একটি পেট্রল পাম্প থেকে ৭০ ডলার ছিনিয়ে নিয়ে যেতে সাহায্য করা। সে আজ এগার বছর আগেকার কথা। এই একটা অপেক্ষাকৃত সামান্য অপরাধে সে ১১ বছরের মধ্যে জেল থেকে বেরোতে পারল না। আর কোনদিনই পারবে না। কেননা, ক্যালি-ফোর্নিয়ার সান কোয়েন্টিন কারাগারের রৌদ্রালোকিত প্রাঙ্গনে সেদিন কারারক্ষীদের গুলী জর্জ জ্যাকসনের মাথা ভেদ করে চলে গেছে।

বছর খানেক আগে আর এক আগষ্ট মাসে ক্যালিফোর্নিয়ার মেরিন কাউন্টি আদালতে গুলী খেয়ে মারা গিয়েছিল জর্জ জ্যাকসনের ছোট ভাই ১৭ বছর বয়সের জোনাথন। মেরিন কাউন্টি আদালতে সেদিনকার সেই রক্তাক্ত ঘটনার একা জোনা-থনই মারা যায় নি, মারা গিয়েছিলেন ঐ আদালতের বিচারপতি ও দুইজন আসামী। জোনাথন সেদিন আদালতের বিচারপতি ও ঐ আসামীদের জামিন রেখে তাঁর দাদা জর্জ ও জর্জের দুই সংগীর মুক্তি আদায়ের চেষ্টা করেছিল। জর্জের ঐ দুই সঙ্গীর একজনের নাম ফ্লিটা ড্রাম্বো আর একজনের নাম জন ক্লাচেট। দুজনই নিগ্রো। আর এই জর্জ জ্যাকসন, ফ্লিটা ড্রাম্বো ও জন ক্লাচেট, তিন-জন মিলেই সেই ত্রয়ী যাঁরা ইদানীংকালে 'সোলেদাদ ভ্রাতৃবৃন্দ' নামে সারা আমে-রিকায় ও আমেরিকার বাইরে ব্যাপক পরি-চিতি লাভ করেছে।

এই 'সোলেদাদ ভ্রাতৃবৃন্দ' পরিচয়ের পিছনে আছে সাম্প্রতিককালে ক্যালিফোর্নিয়া রাজ্যের আর একটি রক্তাক্ত ইতিহাস। ১৯৭০ সালের জানুয়ারি মাসের ঘটনা। জর্জ জ্যাকসন, ফ্লিটা ড্রাম্বো ও জন ক্লাচেট তিন-জনই তখন ক্যালিফোর্নিয়ার কারাগারে বন্দী। ঐ কারাগারের একজন শ্বেতাঙ্গ রক্ষী গুলী করে মেরে ফেললেন তিনজন কৃষ্ণকায় বন্দীকে। গ্র্যান্ড জুরি সেই শ্বেতাংগ রক্ষীকে সম্পূর্ণ অব্যাহতি দিলেন এই বলে যে, ঐ তিন নিগ্রো বন্দীকে মারাটা 'ন্যায়সঙ্গত নরহত্যার ঘটনা'। এর কিছুদিন পরেই সোলেদাদ কারাগারে আটক নিগ্রো বন্দীরা একজন শ্বেতাংগ কারারক্ষীকে মেরে ফেললেন। যদিও এর আগে তিনজন নিগ্রো বন্দীর মুক্তির জন্য কাউকে সাজা পেতে হয়নি তাহলেও একজন শ্বেতাঙ্গ কারারক্ষী হত্যার ঘটনায় আমেরিকার আইন ও শৃংখলার রক্ষকরা ব্যস্তসমস্ত হয়ে উঠলেন। এই হত্যার দায়ে আদালতে সোপর্দ করা হল জর্জ জ্যাকসন, ফ্লিট ড্রাম্বো ও জন ক্লাচেটকে। সেই থেকে এই তিনজন নিগ্রো বন্দী 'সোলে-দাদ ভ্রাতৃবৃন্দ' নামে পরিচিত হয়ে-ছেন। এই 'সোলেদাদ ভ্রাতৃবৃন্দ' এখন মার্কিন সমাজের অবিচারের বিরুদ্ধে সাধারণভাবে নিগ্রোদের এবং বিশেষ করে নিগ্রো বন্দীদের সোচ্চার প্রতিবাদের মূর্তি-মান প্রতীকে পরিণত হয়েছেন। এই 'সোলে-দাদ ত্রয়ী'র মধ্যে যে সবচেয়ে বেশী পরিচিত ছিল সেই জর্জ জ্যাকসন এক সময়ে লিখেছিল, 'কালো মানুষের নম্রতা ও সংকোচের সবটুকু চরিত্রবৈশিষ্ট্য আমার হৃদয় থেকে নির্মমভাবে নিংড়ে বের করে দেওয়া হয়েছে। এই সব-পাওয়া ও সবহারা সমাজ আমাকে যে আঘাত দিয়েছে তাতে আমার মধ্যে একটা অগ্নিশিখা জ্বলে উঠছে। এই অগ্নিশিখা জ্বলতেই থাকবে, বাড়তেই থাকবে যতক্ষণ না তার আগুনে হয় আমার নির্যাতনকারীই শেষ হয় অথবা আমি নিজে শেষ হয়ে যাই।'

সান কোয়েন্টিনের রৌদ্রালোকিত প্রাংগনে চিরমুক্তি লাভ করার আগে পর্যন্ত জর্জ জ্যাকসন তার দেশের সমাজ ও সর-কারের কাছ থেকে যে ব্যবহার লাভ করেছে তাতে তার এই ক্রোধের অভিব্যক্তি অপ্রত্যা-শিত নয়। পেট্রল পাম্প থেকে ৭০ ডলার ছিনিয়ে নিতে সাহায্য করার অপরাধে বিচারক তাকে যে শাস্তি দিয়েছিলেন তার মেয়াদ নির্দিষ্ট ছিল না। বিচারকের রায়ে বলা হয়েছিল, তাকে এক বছর থেকে আজীবন পর্যন্ত যে কোন মেয়াদের শাস্তি ভোগ করতে হতে পারে। ক্যালিফোর্নিয়ার আইন অনুসারে এই ধরনের অনির্দিষ্ট মেয়াদের শাস্তি দেওয়ার ঘোষিত উদ্দেশ্য এই যে, জেলের ভিতরে গিয়ে চরিত্র সংশোধন হয়ে গেছে মনে করলেই কারা-রক্ষীরা আসামীকে ছেড়ে দিতে পারবেন। কিন্তু জেলের ভিতরে গিয়ে জর্জ জ্যাকসন দেখতে পেল, একবার জেলে ঢুকলে

ফটো : নেপাল মুখোপাধ্যায়

নিগ্রো বন্দীদের সেখান থেকে বেরিয়ে আসার সম্ভাবনা খুবই কম। নানাভাবে জেলের ভিতরে নিগ্রো বন্দীদের উপর অত্যাচার করা হয়। যারা এইসব অত্যাচার মুখ বুজে নেয় অথবা এই ধরনের অত্যাচার করতে কারারক্ষীদের সাহায্য করে একমাত্র তারাই জেল থেকে বেরিয়ে আসার আশা করতে পারে। আস্তে আস্তে জেলের মধ্যে জর্জ জ্যাকসন বিদ্রোহী হয়ে উঠল। সাত বছরের বেশী সময় তাকে নির্জন কারাকক্ষে আটকে রাখা হল। এই সময় সে ব্যবহার করল পড়াশুনা করে। আস্তে আস্তে সে মার্কসবাদের প্রতি আকৃষ্ট হল, বিপ্লবের কথা বলতে লাগল এবং পুঁজিবাদী সমাজ ধ্বংস করার পক্ষে মতপ্রকাশ করতে থাকল। কারাগার থেকে তার লেখা চিঠির সংকলন-গ্রন্থ প্রকাশিত হল 'সোলেদাদ ব্রাদার' নাম দিয়ে।

শিকাগো নিগ্রো বস্তীর বাউণ্ডুলে ছেলে জর্জ জ্যাকসনের এই রূপান্তর ইদানীংকালে আমেরিকার প্রতিবাদ আন্দোলনগুলির ক্ষেত্রে একটি চমকপ্রদ ঘটনা। জর্জ নিজেই এক জায়গায় লিখেছে, "আমি জন্মেই এমন ছিলাম না। হয়তো (কোন) মনোরোগ-বিশেষজ্ঞ আমার অতিরিক্ত ক্রোধপরায়ণতা দেখে এই সিদ্ধান্ত করবেন যে, আমি খুব ভদ্র, সভ্য মানুষ নেই। কিন্তু আবার আমি আমাকে বলতে চাই যে, নিরীহ ও বিশ্বাস-প্রবণ স্বভাব নিয়েই আমি জন্মেছিলাম।"

সান কোয়েন্টিনের কারাগারে যখন জর্জ জ্যাকসনের অন্তরের ভিতরকার সেই বহ্নি-শিখা নিভল তখন সেই শিখার আগুনে সে নিজেই জ্বলল। কারারক্ষীরা বলেন, সে জেল থেকে পালাবার চেষ্টা করেছিল, মাথার চুলের মধ্যে বন্দুক লুকিয়ে রেখেছিল এবং টুথ-ব্রাশের হাতলের মধ্যে ভাঙা ব্লেড ঢুকিয়ে হামলা করেছিল। অন্যান্য বন্দীদের সাহায্য নিয়ে সে তিনজন কারারক্ষী ও দুজন 'দালাল' কয়েদীকে খুন করেছিল। শেষ-পর্যন্ত প্রাচীর টপকে পালাতে গিয়ে সে গুলী খেয়ে মারা যায়। জর্জের মা জর্জিয়া এবং আরও অনেকে বিশ্বাস করেন যে, এসব বানানো গল্প, আসলে জর্জকে খুন করা হয়েছে। জর্জিয়া জানিয়েছেন, তাঁর ছেলে তাঁকে কয়েক সপ্তাহ আগেই বলেছিল যে, জেলের ভিতরে তাকে মারার চেষ্টা হবে। মাথার চুলের মধ্যে একটা নয় ইঞ্চি লম্বা বন্দুক কি লুকিয়ে রাখা সম্ভব? বিশেষ করে সান কোয়েনটিন কারাগারে, যেখানে কয়েদীদের মাথার চুল থেকে পায়ের নখ পর্যন্ত তল্লাসীর নিখুঁত ব্যবস্থা আছে?

জর্জ জ্যাকসন জীবিত থাকতে তাকে ঘিরে অনেক নাটকীয় ঘটনা ঘটেছে। নিভে যাওয়ার আগে তার অন্তরের বহ্নিশিখার অনেক আগুন [illegible] গেছে। তাকে মুক্ত করে আনার জন্যই বন্দুক চালান দেবার অভিযোগে অভিযুক্ত হয়ে প্রাক্তন অধ্যাপিকা ও নিগ্রো কম্যুনিস্ট অ্যাঞ্জেলা ডেভিস এখন আদালতে বিচারাধীন। তার জন্যই ক্যালিফোর্নিয়ার কারাগারগুলিতে কারারক্ষীরা ও আদালতগুলিতে বিচারকরা সন্ত্রস্ত। বিচারকরা বুলেটপ্রুফ কাচের আড়ালে বসছেন, কারারক্ষীরা সভা করে কারাগারের ভিতরকার অবস্থা সম্পর্কে অনুসন্ধানের জন্য সরকারের কাছে দাবী জানিয়েছেন।

মারা যাওয়ার পর জর্জ জ্যাকসন আমেরিকার কোন কোন মহলের কাছে একটি প্রতীকে পরিণত হয়েছে। লাল রেশমী ঝাণ্ডায় জর্জ জ্যাকসনের প্রতিকৃতি লাগিয়ে মিছিল বার করা হয়েছে।

*

হিমাচলের বাগিচা মালিকরা আপেল ফলিয়ে পস্তাচ্ছেন। বিলাসপুর-মাণ্ডি রোডের ধারে স্তূপীকৃত আপেল পচছে। ২৫ পয়সা কিলো করেও সেখানে আপেলের খরিদ্দার নেই এবং বাইরে যে চালান দেওয়া হবে সেজন্য প্যাকিং বাক্স পাওয়া যাচ্ছে না।

হিমাচল বিধানসভায় এই খবর দিয়েছেন শ্রীশিবুরাম ও শ্রী[illegible] চৌহান মাত্র দুইজন সদস্য।

১০-৯-৭১ —[illegible]

খোঁজার শেষ

অনুকণা খাসনবিশ

মায়ের একটি পাশে আট বছরের ছোট ছেলে করিম ও অন্য পাশে এক বছরের ছোট্ট মেয়ে মমতাজ। তিনজনই নিশ্চিন্ত মনে ঘুমিয়ে আছে। বাবা শুয়েছে বাইরের দাওয়ায়—বেশ গরম পড়ে গিয়েছে তাই। সারাদিনের পরিশ্রমের পরে সে অঘোরে ঘুমোচ্ছে। শ্রান্ত দেহ চায় পরিপূর্ণ বিশ্রাম।

ঘুম ভেঙে গেল। সবারই ঘুম ভাঙলো। চীৎকার, চারিদিকে চীৎকার—পালাও, পালাও। কান্নার রোল উঠেছে—কী ভয়ঙ্কর। সবাই উঠে বসে। মা মেয়েকে বুকে চেপে ধরে—বাবা শক্ত করে ছেলের হাত ধরে। তারপর তারা বেরিয়ে পড়লো—বাড়ির বাইরে। তাদের সুখ-শান্তির আশ্রয় পিছনে পড়ে রইলো। ছুটছে, সবাই ছুটছে। তারাও ছুটতে লাগলো। কেন ছুটছে? কেউ জানে না। শুধু জানে ছুটতে হবে। কোন দিকে ছুটতে হবে? তাও কেউ জানে না। পিছনের এক ভয়াবহ দানবের আক্রমণ থেকে বাঁচতে হবে। তাই দলে দলে লোক বিপরীত দিকে ছুটে চলেছে। করিমের বাবাও সেদিকেই ছুটছে—করিমের হাত শক্ত করে ধরে। করিমের মা-ও মমতাজকে বুকে চেপে সেদিকেই ছুটছে। ভাববার আর কিছু নেই। প্রতিটি লোকের শুধু একমাত্র ভাবনা—বাঁচতে হবে, বাঁচতে হবে।

কিন্তু বাঁচতে কি সবাই পারে? কেউ পারে কেউ পারে না। দানব যে দেখতে দেখতে বড় কাছে এসে পড়লো। গুরুম, গুরুম, ফটাস ফটাস কতরকম ভীষণ শব্দে মুখরিত হয়ে উঠলো চারিদিক। তারপরেই দাউ-দাউ করে জ্বলতে লাগলো—চারিদিকের বাড়ি, ঘর দোর সব। ছোট ছোট খড়ের ছাউনি বাঁশের বেড়ার ঘরগুলি—এক নিমেষে পুড়ে ছাই হয়ে ভেঙে পড়ছে। কিছুই বাকি থাকছে না।

করিম একবার তাকায় পিছন ফিরে। তাদের বাড়িও জ্বলছে। কত সুখ-স্মৃতি পুড়ে নিঃশেষ হয়ে যাচ্ছে। আগুনের শিখায় শিখায় চারিদিক উদ্ভাসিত। এক মুহূর্তের জন্য করিমের যেন মনে হয়—কী সুন্দর! হাজার হাজার বাজির খেলা। পর মুহূর্তেই বুকের ভিতর প্রচণ্ড এক আঘাতে ধাক্কা দেয়। এ-কী বাজি! কী ভয়ঙ্কর, কী ভীষণ বাজি। মরণ বাজি—মৃত্যু নিয়ে যার খেলা! কী সর্বনাশের সামনে এসে পড়লো তারা! কেন, কেন? কেন এ-সর্বনাশ? কি করেছে তারা? করিম কিছুই বুঝতে পারে না। কিন্তু ভাববার সময় তো নেই। বাবার হাত ধরে ছুটছে করিম। মা আছে, নিশ্চয়ই আছে, বোনটিকে কোলে নিয়ে তাদেরই পিছনে আছে।

কত লোক—গ্রামের প্রায় সব লোকই। আগুনের লাল হলদে আলোর আভায় পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে। আগুনের হলকা তাদের মুখে এসে লাগছে—ঝলসে যাচ্ছে—জ্বালা করছে কিন্তু সে আর কতটুকু ক্ষতি। সম্পূর্ণ দেহটাতে পুড়ে ছাই হয়ে যায়নি এখনও! কিন্তু তা হতেই বা [illegible]

ক্ষণ? ব্যর্থ, ব্যর্থ—ব্যর্থ হয় প্রাণপণ বাঁচবার চেষ্টা। অসহায় মানুষগুলির উপর এসে পড়ছে আগুন—জ্বলন্ত বাঁশ, টিন, কাঠ, খড় আর সেই দানবের লেলিহান জিহ্বা। পিঁপড়ের মতো ছোট ছোট শক্তি-হীন মানুষগুলিকে পুড়িয়ে শেষ করে দিয়ে যাচ্ছে—চিরদিনের মতো তারা মাটির উপর মাটি হয়ে ঝরে পড়ছে।

আবার, আর একবার করিম পিছন দিকে তাকায়। মাম্মা মাম্মা কোথায়? মাম্মাজান তো নেই ওদের পিছনে? বোনটিও তো নেই, এতক্ষণ যে আম্মাকে আঁকড়ে ধরে ছিল। আতঙ্কে চীৎকার করে ওঠে করিম—'আম্মা, আম্মা, আম্মা নেই, মমতাজ নেই।' বাবা কথা বলে না—একটি কথাও না। করিমের হাত আরও একটু শক্ত করে ধরে— আরও একটু জোরে দৌড়তে থাকে। করিমকেও দৌড়তে হয় তার সংগে সংগে।

থাক্ মাম্মা—থাক মমতাজ—যেখানে ইচ্ছে থাক। মায়ের আদরের ছেলে করিম—বোনের আদরের ভাই করিম তাদের জন্য দাঁড়াতে পারবে না। করিমের বাবাও তার প্রিয় স্ত্রী, কন্যার খোঁজ নিতে পারবে না। শুধু ছুটবেই তারা। যতক্ষণ বেঁচে থাকবে —যতক্ষণ না মাটির উপর শুয়ে পড়বে। আর তখনই হবে এই ছুটে চলার শেষ—হবে তাদেরও শেষ বিশ্রাম।

ভীষণ জোরে কি যেন একটা এসে ধাক্কা দিল করিমকে। সে পড়তে পড়তেও কি করে যেন উঠে দাঁড়াতে পারলো। কিন্তু আম্মাজানের হাত? আব্বার সে হাতটি তো নেই। এতক্ষণ শক্ত করে যে হাতটি তার হাত ধরে ছিল। সে-যে একা—একেবারে একা। চারিদিকে তাকিয়ে দেখে—একটি নিমেষ! না, আমার আম্মাজান নেই—কোথাও নেই। তবুও ছুটতে হয়—একাই ছুটতে হয়—কেবলই ছুটতে হয়।

আরও অনেক পরে, কত পরে জানে না, করিমের মনে হোল তার চারিদিকের লোকজন যেন বেশ কম। ভোর হয়ে আসছে। পূব দিকে সূর্য উঠছে। কিন্তু আজ ভোরের স্নিগ্ধ আলো আগুনের জ্বলন্ত আলোর মাঝে হারিয়ে গিয়েছে। সূর্য তার সোনার আলো নিয়ে যেন লুকিয়ে থাকতে চাইছে। কে দেখবে আজ তার এই সৌন্দর্য? কে অনুভব করবে তার উত্তাপ? আজ তার কোনই প্রয়োজন নেই। আজ যে জন্ম নেই, জীবন নেই—আছে শুধু মৃত্যু, ধ্বংস, বিনাশ।

করিম আর ছুটতে পারে না। পড়ে যায় মাটির উপর। উঠতে সে আর চেষ্টাও করে না। যেন শুয়ে পড়েছে নিজের বিছানায়। হোক্—যা হবার হোক—আর সে কিছু করবেও না—আর সে কিছু ভাববেও না।

ভাবতে হয়ও না। তারপরে যে কি ঘটেছিল সে কিছুই জানে না। অজ্ঞান অবস্থাতেই সে অনেকক্ষণ সেখানে পড়ে ছিল। চোখ খুলল যখন, তখন বুঝতে পারলো সে এক খাটিয়ার উপর শুয়ে আছে। বড় তেষ্টা, বড় খিদে! 'পানি, পানি' বলে সে চেঁচিয়ে উঠলো। কেউ কি দেবে না তাকে পানি? মা কি এখনও এসে দাঁড়াবে না, গেলাস ভরা ঠাণ্ডা পানি হাতে নিয়ে? হঠাৎ দুনিয়াটা এমন নিষ্ঠুর হয়ে উঠলো কেন?

আরও অনেক লোক যে চেঁচাচ্ছে তারই মতো! সে কোথায়? কোথায় এসে পড়েছে? কে একজন জল হাতে নিয়ে এসে দাঁড়ালো—কিন্তু এ-তো আম্মাজান নয়? একে তো করিম চেনে না? এ-তো পিপাসা, হাত বাড়িয়ে পানির গেলাস নিতে হোল—কিন্তু চোখ জলে ভরে উঠলো। মার উপর বড়ই অভিমান। জল খেতে খেতে করিম মেয়েটির দিকে তাকিয়ে দেখলো—যেন তার মায়েরই মতো স্নেহে ভরা দুটি চোখ। জিজ্ঞেস করলো—'আমি কোথায়?' মেয়েটি কাছে এসে একটু আদর করে বললো—'তুমি হাসপাতালে আছ। আমরা তোমাকে ভাল করে তুলবো—কিছু ভেবো না।'

সে হাসপাতালে—কেন? তারপর ধীরে ধীরে সেই বিভীষিকাময় রাতের কথা সব মনে পড়ে। উঠে বসে—অন্য খাটিয়াগুলিতে নিশ্চয়ই বাবা, মা, মমতাজ শুয়ে আছে। তারা কি এখনও ঘুমোচ্ছে? তারা কি করিমকে দেখতে পাচ্ছে না? কেন তাকে কেউ আদর করে ডাকছে না। প্রত্যেকটি খাটিয়ার উপর দৃষ্টি পড়ে—একটি একটি করে। কিন্তু সব মুখ অচেনা। কেউ নয় তার বাবা—কেউ নয় মা, কেউ নয় মমতাজ। তারা নেই—নেই—যেন ধোঁয়া হয়ে আকাশে মিলিয়ে গিয়েছে। করিম শুয়ে পড়লো আবার। খোলা জানালার ভিতর দিয়ে আকাশের দিকে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলো —সেখানেই কি খুঁজে পাবে তাদের? তার আম্মাকে, আব্বাকে আর ছোট্ট মমতাজকে?

আবার এল নার্স। যত্ন করে, আদর করে তাকে দুধ আর রুটি খেতে দিল। শরীর যত সুস্থ হয়—মন ততই অসুস্থ হয়ে ওঠে। বাড়িতে করিম মনে করতো সে বড় হয়েছে—দাদা হয়েছে। আজ মনে হচ্ছে—সে কত ছোট। এত ছোটরা কি মা বাবাকে হারিয়ে বাঁচতে পারে? হাহাকার করে ওঠে মন—'আম্মা, আম্মাজান কোথায় তুই?' কেঁদে দিন কাটে রাত কাটে। সময় তবুও বসে থাকে না। চলতেই থাকে।
— মন ভাল হয় না, কিন্তু শরীর ভাল হয়। ধীরে ধীরে করিম সুস্থ হয়ে ওঠে। আট বছরের ছেলে—অবস্থাপন্ন চাষীর ছেলে সে। মোটা ভাত, মোটা কাপড়, বাড়ির গরুর খাঁটি দুধ, পুকুরের মাছ কিছুরই অভাব ছিল না। বাংলা দেশের ছেলে বাবুয়ানা শেখেনি—কাজ করতে শিখেছে, খাটতে শিখেছে। স্বাস্থ্য তাই ভাল ছিল, শরীর শক্ত ছিল। একটু যত্ন পেয়েই সে আগেকার স্বাস্থ্য ফিরে পেল—চেহারা সুন্দর হোল।

কিন্তু মন ভাল হবার কোন উপায়ই নেই। গভীর বিষাদের চিহ্ন লেগে থাকে ওই সুন্দর কচি মুখখানিতে। কাজের ফাঁকে ফাঁকে চোখ বেয়ে টপ্ টপ্ করে জল পড়ে —জল শুকোয়—আবার পড়ে। এমনি করে কাটে দিন।

কত লোক আসে সেই হাসপাতালে আসে না শুধু করিমের আপনার জনেরা

কেউ। কত স্বামী তার স্ত্রীকে, কত স্ত্রী তার স্বামীকে খ‍ুঁজে পায়—কত বাবা কিংবা মা তাদের ছেলে-মেয়েদের দেখা পায় এখানে —কিন্তু কই করিমকে চিনতে পেরে, বুকে টেনে নেয় না তো কেউ?

করিম যখন সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে উঠলো, তখন তাকে পাঠিয়ে দেওয়া হোল একটি রেফিউজি ক্যাম্পে। ছোট ছেলেমেয়েদের ক্যাম্প। যেসব লেমেয়েদের তখনও কেউ খোঁজ করেনি, তারাই রয়েছে এই ক্যাম্পে। এখানে করিমের আগের চেয়ে অনেক ভাল লাগে। এখানে ছেলেমেয়েরা সুস্থ তাই তারা কাজ করে। লেখাপড়াও কিছু কিছু শেখে, খেলাধুলোও করে। নানা কাজের ভার তাদের দেওয়া হয়। করিমের সব চেয়ে ভাল লাগে, যখন ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের দেখাশুনা করবার ভার পায় সে। ছোট মেয়েদের মধ্যে করিম যেন মমতাজকে খ‍ুঁজে পায়—খুশিতে মন ভরে।

এখানেও কত লোক আসে। মাঝে মাঝে করিম দেখে, কোন কোন ভদ্রলোক বা ভদ্রমহিলা এসেছে—ঘুরে ঘুরে দেখছেন ক্যাম্পটি। কথা বলছেন ছেলেমেয়েদের সঙ্গে। তারপর তাঁরা যখন ফিরে যান কোন একটি ছেলে কিংবা মেয়েও তাঁদের সঙ্গে চলে যায়। তারা আর কোনদিন ফিরে আসে না ক্যাম্পে। তাদের শূন্য জায়গা অন্য ছেলেমেয়েরা এসে পূর্ণ করে। করিম দেখে আর অপেক্ষা করে থাকে—কবে তার জীবনেও এমন দিন আসবে। আব্বাজান এসে বলবে—'চল করিম বাড়ি চল।' আম্মা এসে বলবে—'করিম, আয় আমার বুকে আয়।' মমতাজ আধ আধ কথায় বলবে—'দাদা আয়।' কিন্তু স্বপ্ন সবই স্বপ্ন!

একদিন ছেলেরা সবাই খেতে বসেছে। রোজ রোজ তাদের নিরামিষ খাওয়া—একদিন শুধু মাংস। কোন ছেলেমেয়েরই নিরামিষ খাওয়া ভাল লাগে না। মাছ ছাড়া যে খাওয়া যায়, তারা ভাবতেই পারতো না। সেদিনটি ছিল মাংস খাওয়ার দিন—কিন্তু খেতে বসে সবাই মাংসে ভীষণ পোড়া পোড়া গন্ধ পেলো—চেঁচামেচি শুরু হয়ে গেল। বিশেষ করে বড় ছেলেদের মধ্যে। ক্যাম্পের কর্মীরা এসে তাদেরই বকতে লাগলেন—যে রেঁধেছে আর গাফিলতিতে পুড়িয়ে ফেলেছে তাকে নয়। বেচারী করিম—সে বড় ছেলেদের দলেই—তাই তাকেও বকুনি খেতে হোল। তাদের শাস্তি হোল সেদিন শুকনো ভাত খেয়ে থাকতে হবে। দুঃখে লজ্জায় সে মাথা নীচু করে বসে রইলো। শুকনো ভাত নিয়ে নাড়াচাড়া করছে আর চোখের জল টপ্ টপ্ করে থালার উপর ঝরে পড়ছে।

মনে পড়ছে—রোজ দু-বেলা কাঁসি ভরতি মাছ রান্না করতো আম্মাজান। খেতে না চাইলেই বকুনি খেতে হোত—আর আজ! তার মন ডানা মেলে দিল। চলে গেল বাংলাদেশের সেই স্নিগ্ধ শীতল বাড়িটির দিকে। বাঁশবাগানে ঘেরা বাড়ি। আম, জাম, কাঁঠালের বাগান বাড়ির পাশে। গোয়ালঘরে আম্মা গরু দোয়াচ্ছে। আব্বাজান হাল কাঁধে মাঠে চলেছে—আর করিম পাঠশালা যাবার আগে মমতাজের সঙ্গে একটু খেলা করে নিচ্ছে। তার মন থেকে এই ক্যাম্পের পরিবেশ একেবারে লুপ্ত হয়ে গেল। সে আছে—সে আছে—তার গ্রামেই আছে—তার বাড়িতেই আছে—নিশ্চয়ই আছে।

পিঠে কার কোমল হাতের স্পর্শ! 'আম্মা' বলে ডেকেই সে উঠে দাঁড়ালো—পিছন ফিরে তাকালো। স্বপ্ন গেল চুরমার হয়ে! কী লজ্জা! তার মুখ লাল হয়ে উঠলো—এ কী ভুল তার। ইনি কি মনে করবেন? সে ধপ্ করে আবার বসে পড়লো। মাথা তার আরও নীচু হোল। চোখের জলও আর বাধা মানছে না। ঝরে পড়তে লাগলো—এনামেলের থালার উপর, ভাতের উপর।

ঘুরে সামনে এসে দাঁড়ালেন যিনি পিঠে হাত রেখেছিলেন। করিমের নীচু মুখখানি দুহাতে তুলে ধরলেন—'আমিই মা—সত্যিই আমি মা। তোমারই মা হতে চাই, যদি তুমি আমাকে মা বলে ডাক—ডাকবে না? আমাকে মা হতে দেবে না?'

তাঁর চোখের জলও ঝরতে লাগলো করিমের সেই ভাতের থালাখানির উপর। দুজনের চোখের জল মিললো এক জায়গায়—মার আর ছেলের। করিম মুখ তুলে তাকালো তাঁর দিকে। কী মধুমাখা মুখখানি। উঠে দাঁড়ালো—এক মুহূর্ত, তার পরই 'আম্মা, আম্মা, আমার আম্মা' বলেই তাঁকে দুহাত দিয়ে জড়িয়ে ধরলো। তিনিও করিমকে জড়িয়ে ধরলেন।

পিছন থেকে একজন ভদ্রলোক এগিয়ে এসে তাদের সামনে দাঁড়ালেন। বললেন—'চল, কমলা, ছেলে পেয়েছো, এবার চল ছেলেকে বাড়ি নিয়ে যাই।'

করিম এল তার নতুন বাড়িতে। মস্ত বড় বাড়ি—জিনিসপত্র, চাকর-বাকর কিছুরই অভাব নেই। অভাব ছিল শুধু একটি সন্তানের। তাও ছিল—তাঁদেরই ছিল একটি ছেলে। আড়াই বছর বয়স হতেই হঠাৎ একদিনের অসুখে সে মারা যায়। এই শোক এই আঘাত কাটিয়ে ওঠা মায়ের পক্ষে অসাধ্য হয়ে ওঠে। আর সেই থেকেই এই ভদ্রমহিলার স্বাস্থ্য ক্রমে ক্রমে খারাপ হয়ে যেতে থাকে। এমনকি ইদানিং ডাক্তাররাও সন্দেহ করছেন যে এমনিভাবে চললে তাঁর মাথারও গোলমাল হয়ে যাবার সম্ভাবনা আছে। ডাক্তারেরা বলেন তাঁর এই অবস্থায় একমাত্র ওষুধ তাঁর সন্তানস্নেহ ফিরে পাওয়া। যদি কোনও শিশুকে দেখে আপন অন্তরের বাৎসল্য স্বতঃস্ফূর্ত জেগে ওঠে, তবেই তিনি আবার স্বাভাবিকভাবে জীবন কাটাতে পারবেন। মনের আনন্দ ফিরে পেলে স্বাস্থ্যও ফিরে পাবেন।

ডাক্তারদের অভিমত শুনবার পর থেকে, ভদ্রলোক নানা ছুতোয় স্ত্রীকে নিয়ে বাপ-মা-হারা ছোট ছেলেমেয়েদের অরফেনেজে, হাসপাতালে ঘুরে বেড়াতেন। ইদানিং অনাথ শিশুদের রেফিউজি ক্যাম্পের কথা শুনে স্ত্রীকে নিয়ে এমনি একটি ক্যাম্পে এসেছিলেন। আশা ছিল, এবার যদি কাউকে দেখে কমলা নিজের হারানো ছেলের স্থানটি পূরণ করতে পারে। তাই হোল, এই ঘুরে বেড়ানোর কাজ এবার শেষ হোল। ছোট একটি ছেলের সর্বহারা শোকের মূর্তি মহিলাটির কোমল মাতৃহৃদয় স্পর্শ করলো। বাছারে, তোর দুঃখ আমি দূর করবো—আয় তুই আমার বুকে—আমারও বুক জুড়োবে।

এই ভাবটিতে তাঁর মন ব্যাকুল হয়ে ওঠা মাত্র সব ঠিক হয়ে গেল। শান্তি এল প্রাণে।

মহিমবাবু ও কমলা তাঁদের হারানো সন্তান ফিরে পেলেন। করিমও তার মাকে বাবাকে ফিরে পেলো। করিম নয়—করুণকুমার। পুরোনো জীবনের সমাপ্তি ঘটলো, নতুন জীবন শুরু হোল। অতি যত্নে, অতি আদরে করুণকুমার বড় হতে লাগলো। স্কুলে যায়। লেখাপড়ায় সে ভাল। খেলাধুলোয় উৎসাহ, গান-বাজনা শেখে, ছবি আঁকে। এই সচ্ছলতার মধ্যে যে সুযোগই পায় তার কোনোটাই সে ব্যর্থ হতে দেয় না।

ছোট ছেলে যে ছিল করিম আর আজ যে হয়েছে করুণকুমার, তার কাছে আগেকার সেই ভয়ঙ্কর দিনরাতগুলো এবং তারও আগেকার সুমধুর দিনরাতগুলো সবই ধীরে ধীরে কেবল মাত্র স্মৃতিপটের ছবি হয়ে উঠছে। এই নতুন জীবনে মগ্ন হতে শৈশবধর্মই তাকে সাহায্য করছে। তার মন আজ শান্ত। যা পাচ্ছে তাকেই পরিপূর্ণ সত্যতায় অপার আনন্দে গ্রহণ করছে। নতুন পাওয়া এই বাবা, এই মা তার আপনারই জন, এতে কোনই ভুল নেই।

কি হয়েছে করিমের মা, বাবা, বোনের? সেই সে নির্মম রাতে—যখন করিম চীৎকার করে উঠেছিল, 'আম্মা নেই, মমতাজ নেই'—তখনই করিমের বাবা বুঝতে পেরেছিল তার জীবন থেকে মমতাজ ও তার মা চিরদিনের মতো লুপ্ত হয়ে গেল। তবুও, সেও ছিটকে কোথায় হারিয়ে গেল। পায়ে আঘাত পেয়ে করিমের বাবা সেখানেই পড়ে ছিল। কতক্ষণ কে জানে? যখন জ্ঞান হোল দেখলো মাটিতে একটা ছেঁড়া চাটাইয়ের উপর শুয়ে আছে। নড়বার ক্ষমতা নেই। জানতে পারলো তার উদ্ধারকর্তা ও আশ্রয়দাতা এক অতি গরীব মুসলমান চাষী। ক্ষতবিক্ষত দেহ দুটি পা অকর্মণ্য। করিমের বাবা চাষীভাইকে বার বার বলে—'আমাকে কোনও হাসপাতালে পাঠিয়ে দেবার বন্দোবস্ত কর, ভাই। কেন মিথ্যে আমাকে নিয়ে বিব্রত হচ্ছ?'

মুসলমান চাষী বলে—'আমাকে আমাদের পাপের প্রায়শ্চিত্ত করতে দাও ভাই। আমার যতটুকু সাধ্য ততটুকু দিয়েই তোমাকে সাহায্য করতে দাও। যদি না করি, আল্লার কাছে আমি কি জবাবদিহি দেব? মানুষ চরম নিষ্ঠুরতায় মানুষের প্রাণ নিচ্ছে। যদি একটি মানুষের প্রাণও আমি বাঁচাতে পারি, তবে হয়তো আল্লার কাছে ক্ষমা চাইবার যোগ্য হবো—নয়তো ক্ষমা চাইবারও আমার অধিকার থাকবে না। এ পাপের কি ক্ষমা আছে ভাই?'

কতদিন কেটে গেল। করিমের বাবাকে নিজের অসহ দুঃখের বোঝা নিয়ে চুপ করে থাকতে হয়। চাষীভাইকে সে নিজের জীবনের কোনও কথাই বলে না। কি হবে বলে। চাষীভাইকে আরও বিব্রত করা হবে। সে জানে স্ত্রী আর মেয়ের খোঁজ করা বৃথা। কিন্তু করিম? তার কথাই বার বার মনে হয়। চাষীভাইকে বললে সে নিশ্চয়ই খোঁজ নিতে চেষ্টা করবে কিন্তু সে কি সহজ কাজ? নিজেই সে এক বোঝা, তার উপর সে আরও এক কঠিন কাজের বোঝা চাপাবে কি করে? তাই কিছুই বলা হয় না। থাক—আল্লার হয়তো এই ইচ্ছা। একটু সুস্থ হয়ে উঠলে আমি নিজেই তাকে খুঁজতে যাব—যতদিন না পাবো খুঁজবো, শুধুই খুঁজবো—জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত। আল্লার দয়া হলে নিশ্চয়ই পাব করিমকে। এমনি করে ভেবে ভেবেই তার দিন কাটে।

যেদিন করিমের বাবা লাঠিতে ভর দিয়ে হাঁটতে পারলো সেদিনই সে বেরিয়ে পড়লো। করিমের হাতটি অনেকক্ষণ তার হাতের মুঠোয় শক্ত করে ধরা ছিল। তখন তারা নিশ্চয়ই বাংলাদেশের সীমানা পার হয়ে পশ্চিমবাংলায় এসে পড়েছিল। সেজন্যই সে আশ্রয় পেয়েছে পশ্চিম বাংলারই এই মুসলমান চাষীর বাড়িতে। করিমও তবে এখানেই আছে—পশ্চিম বাংলাতেই আছে। নিশ্চয়ই আছে আর ভালই আছে। আল্লা কি তাকে একেবারে নিঃস্ব করতে পারে? আশা হয়। প্রাণে বল আসে, পায় জোর বাড়ে।

হাসপাতালের পর হাসপাতালে খুঁজে বেড়ায়। খোঁড়া পা নিয়ে লাঠিতে ভর করে হাঁটে—কষ্ট হয়, সময় লাগে। তা লাগুক, হোক কষ্ট। সব সার্থক হবে, সব কষ্ট ভুলে যাবে যখন করিমকে সে বুকে জড়িয়ে ধরতে পারবে।

একদিন শুনতে পেল, নানা জায়গায় ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের ক্যাম্প হয়েছিল, এখনও আছে কয়েকটি। সুরু হোল তার ক্যাম্পে ক্যাম্পে যাওয়া। একটি একটি করে সে সব ক্যাম্পগুলোতে যেতে লাগলো। এসব ক্যাম্পে যেসব ছেলেমেয়েরা একবার এসেছে, কিংবা তখনও আছে তাদের সকলেরই ফোটো তুলে রাখা হয়। বলা তো যায় না—বহুদিন পরেও ছেলেমেয়েদের আত্মীয়স্বজনেরা তাদের হারানো সন্তানদের খোঁজ নিতে এসে উপস্থিত হত পারে। তখন এই ছবি থেকেই হয়তো খোঁজ পাওয়া সম্ভব হবে। প্রতি ক্যাম্পে ছেলেমেয়েরা তখন কে কোথায় আছে সে ঠিকানাও লিখে রাখা হয়।

খুঁজতে খুঁজতে করিমের বাবা সেই ক্যাম্পটিতেই এসে উপস্থিত হয়। যেখানে কতদিন কত রাত কত দুঃখে কেটেছিল করিমের। ক্যাম্পের কর্মীরা তাকে ঘুরে ঘুরে দেখে তার ছেলেকে খুঁজবার অনুমতি দিলেন। কিন্তু কোথায় করিম? নেই তো তার করিম এদের মধ্যে? নিরাশায় নিরানন্দে মন আচ্ছন্ন হয়ে উঠছে—ঠিক সেই সময়ে একজন কর্মী অনেকগুলো ফোটো এনে তাকে দেখতে দিয়ে বললেন—'ছবিগুলি দেখতে পার—যারা এখন এখানে নেই, অন্য আশ্রয়ে চলে গিয়েছে, তাদের ছবি রয়েছে এর মধ্যে—দেখ, তোমার ছেলের ছবি থাকতে পারে।'

আবার আশা উঁকি দেয়। একটি একটি করে দেখে ছবি। না, না এটা নয়—এটা নয়, নয় এটাও। তারপর হঠাৎ চীৎকার করে ওঠে—'পেয়েছি, পেয়েছি। পেয়েছি আমার ছেলেকে, এইতো, এইতো আমার ছেলে,—এই তো আমার করিম। বেঁচে আছে, সে বেঁচে আছে, আল্লার কী অসীম দয়া।'

মহিমবাবুর বাড়ির ঠিকানা নিয়ে করিমের বাবা তখনই চললো সে বাড়ির খোঁজে। খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে হেঁটে চলেছে। বাড়ি যে অনেক দূরে। তা সে যতই দূরে হোক—পথের শেষ হবেই। আর তারই শেষে আছে সকল দুঃখের অবসান।

সন্ধ্যা তখনও হয়নি। আলো আছে, করিমকে দেখতে কোন অসুবিধাই নেই। পেঁৗছল করিমের বাবা, মহিমবাবুর বাড়ির গেটের সামনে।

কী বিরাট বাড়ি। কী জাঁকজমকের চিহ্ন সবকিছুতে। এখানে, এ বাড়িতে আছে করিম? অনেক দিন যে সে আছে এখানে। এঁদেরই ছেলের মতো? তবে? তবে কি সে আমাকে চিনবে? হয়তো বলবে—না, এ আমার বাবা নয়। না, না, এ হতেই পারে না। করিম কখনও এমন কথা বলবে না। খুশী হবে সে—দৌড়ে এসে আমার বুকে ঝাঁপিয়ে পড়বে। আমার বুক জুড়াবে।

দাঁড়ালো গিয়ে গেটের এক পাশে। ঢুকবে কি বাড়ির ভিতর? মনে বড় দ্বিধা! কিন্তু কেন, কেন এ দ্বিধা? ঠিক সেই মুহূর্তে হর্ন বাজাতে বাজাতে মস্ত এক মোটরগাড়ি ঢুকছে সেই গেটের ভিতর দিয়ে।

ওই, ওই তো বসে আছে করিম। এক ভদ্রলোক আর এক ভদ্রমহিলার মাঝখানটিতে কি সুন্দর দেখাচ্ছে করিমকে। কি খুশিতে হাসিতে ভরা মুখখানি।

এখনই, এখনই, থামাতে হবে গাড়ি। এখনই ডাকতে হবে—করিম, ওরে করিম—আমি এসেছি—আমি তোর বাবা—আমি তোকে খুঁজে পেয়েছি।

কিন্তু এ কি? মুখ দিয়ে একটি শব্দও বের হোল না। এত আদরের নাম সে উচ্চারণ করতে পারে না। কে যেন সজোরে বুকে এক ধাক্কা দিয়ে বলে উঠলো—'কি স্বার্থপর তুই। করিমকে নিয়ে যেতে এসেছিস? কোথায় নিয়ে যাবি? কি করবি তাকে নিয়ে? দুঃখ দৈন্যের মধ্যে তাকে নিয়ে লাভ কি তোর?'

ডাকা আর হোল না। পিছন ফিরে খোঁড়াতে খোঁড়াতে আবার সে পথ চলতে লাগলো। ঠিকই করেছি—আমি ঠিকই করেছি। আল্লারই এই ইচ্ছা। এমনি করেই আল্লা করিমকে মানুষ করবে—মানুষের মত মানুষ, হিংসা, দ্বেষ, পাপহীন মানুষ। দুহাত জোড় করে সে আল্লার উদ্দেশে প্রণাম জানায়। করিমের উদ্দেশে আশীর্বাদ জানায়, অন্তরের নিঃশব্দ ভাষায় বলে—যাই, করিম আমি যাই। তুই ভাল হবি—খুব ভাল হবি, খাঁটি মানুষ কাকে বলে দুনিয়াকে তাই বুঝিয়ে দিবি, আমি শান্তি পাব।'

চলতে থাকে সে রাগ-রক্তিম সূর্যের দিকে চোখ রেখে যেন পলকহীন। ছেলেকে সে পেয়েছে—এবার পাবে আমিনাকে, পাবে মমতাজকে। পাবে নিশ্চয়ই পাবে তাদের। মিলবে আবার তদের সাথে।

আর দেরী নেই—বেশী দেরী নেই। এ পথটুকু অতি সহজেই সে পার হয়ে যাবে।

এগিয়ে চলে করিমের বাবা পশ্চিম দিগন্তের দিকে—ধীরে ধীরে মিলিয়ে যায় অস্তরবির শেষ রশ্মির সঙ্গে সঙ্গে।

ম্যাঙ্গালোরে সমুদ্র নেই

সুবোধকুমার চক্রবর্তী

দক্ষিণ ভারতের নতুন প্রাণকেন্দ্র ব্যাঙ্গালোর নয়, ম্যাঙ্গালোর। ভারতের মানচিত্র খুলে দেখুন, ঠিক আরব সাগরের তীরে একটি বিন্দু। তার নাম ম্যাঙ্গালোর। এই নামের কয়েকটা অক্ষর আরব সাগরের নীল জলের উপরেই পড়েছে। দক্ষিণে কালিকট, উত্তরে গোয়া। এরাও আরব সাগরের তীরে। ম্যাঙ্গালোর বন্দর, কিন্তু ম্যাঙ্গালোরে নাকি সমুদ্র নেই।

শৈশবে ভূগোলে পড়েছিলাম যে রাশিয়ায় মস্কো থেকে ব্লাডিভোস্টকের মধ্যে চলে সবচেয়ে দূরপাল্লার ট্রেন। কিলোমিটারের হিসাব জানি না। মাইলের হিসাবও ভুলে গেছি। কিন্তু ভারতবর্ষে এমন দূরপাল্লার ট্রেন আছে কিনা খোঁজ নেবার চেষ্টা করে জেনেছিলাম যে ট্রেন না থাকলেও থ্রু কোচ আছে। পেশোওয়ার থেকে যে ফ্রন্টিয়ার মেল দিল্লী আসে, তাতে একটা ম্যাঙ্গালোরের কোচ আছে। দিল্লীতে সেই কোচ গ্র্যান্ড ট্রাঙ্ক এক্সপ্রেসে লাগে, তারপরে মাদ্রাজ থেকে ম্যাঙ্গালোর মেলে যায় সেই কোচ। কত মাইল পথ আর কতদিন সময় লাগে, সে সব কথা এখন মনে নেই। আর মনে থাকলেও কোন লাভ হত না। পেশোওয়ার এখন পাকিস্তানের শহর। অমৃতসর থেকে আজকাল ফ্রন্টিয়ার মেল ছাড়ে। দূরত্ব তাই অনেক কমে গেছে।

পাটনা থেকে যখন আমি দিল্লী এক্সপ্রেসে উঠেছিলাম, তখন আবার এইসব কথা মনে এসেছিল। ম্যাঙ্গালোর কতদূর হবে, টাইমটেবল থেকে একটা আন্দাজ করেছিলাম—প্রায় তিন হাজার কিলোমিটার, মাইলের হিসাবে দু হাজার মাইলের কম। ম্যাঙ্গালোরে পৌঁছতে কতদিন সময় লাগবে, তার হিসাবও পেয়ে গিয়েছিলাম। চার দিনের যাত্রা। কলকাতা থেকে পুরো তিনটি দিন। অবশ্য ম্যাঙ্গালোর মেল ধরলে মাদ্রাজে একটা দিন সময় যায়—সকাল থেকে সন্ধ্যা অবধি সময়।

এত দীর্ঘ পথ একা কাটাবার কথা ভাবতেও ভয় হয়। পয়সা থাকলে লোকে কয়েক ঘণ্টায় উড়ে চলে যায়। আর তা না হলে রেল গাড়িতে শুয়ে — ঘুমিয়ে বই পড়ে অপরিচিত যাত্রীদের সঙ্গে কথা বলে সময় কাটানো একটা দুরূহ ব্যাপার। অভ্যাস না থাকলে নরকযন্ত্রণা বলে বোধ হয়। আর অভ্যাস থাকলে—

না থাক সে কথা। নিজের চোখে না দেখা থাকলে বিশ্বাস হবে না আপনাদের। ম্যাঙ্গালোরে সমুদ্র নেই বললে যেমন আপনাদের বিশ্বাস হবে না, এও তেমনি। মানচিত্রে সমুদ্র দেখেছেন নিজের চোখে, তেমনি রেলগাড়িতে পথ চলার অভিজ্ঞতাও আপনাদের আছে। তিন দিনের পথ ক্লান্তিকর হবে না, এ কথা নিশ্চয়ই অবিশ্বাস্য মনে হবে।

কিন্তু বলেছি তো, মোটর গাড়ি চালাবার মতো ভ্রমণ করাও শিখতে হয়। হিমালয়ের বেলায় শুধু শিক্ষার দরকার নেই। হিমালয় নিজেই শেখায়। দুর্গম পথ অতিক্রম করার শিক্ষা দুর্গম পথই শেখায়। কিন্তু রেলে বেড়াবার শিক্ষা অন্যরকম। সেই শিক্ষাও হয় রেলে বেড়াতে বেড়াতে।

আমি তো কাজ নিয়ে যাচ্ছি। আমি নিজের বার্থে শুয়ে ঘুমিয়ে সময় কাটাতে পারতাম। কিন্তু অভ্যাসের দোষেই আমি রিজার্ভেসন চার্টটা আদ্যোপান্ত দেখি নিজের জায়গাটি খুঁজে জিনিসপত্র রাখবার পরে। কত বিচিত্র নাম, ভারতবর্ষের মতো বিচিত্র দেশের মতোই কৌতূহলজনক। একটু লক্ষ্য করলেই দেখা যাবে এই মাদ্রাজগামী ট্রেনে শুধু দক্ষিণ ভারতীয়রাই যাচ্ছে না, তাদের চেয়ে বেশি যাচ্ছে উত্তর ভারতের লোক। চেহারা দেখেই দেশ বোঝা যায় এমন লোকও আছে।

হ্যাঁ, আমি একজন সর্দারজীর কথাই বলছি। তাঁর বিরাট পাগড়ি বাঁধা মাথাটি সরিয়ে নেবার পরেই পুরো চার্টটি আমি দেখতে পেলাম। এ থেকে জি পর্যন্ত সাতটি কম্পার্টমেন্ট, দুটি দু বার্থের কুপে, বাকিগুলি চার বার্থের। চব্বিশটি বার্থেই প্যাসেঞ্জার আছে। নাম ছাপা হয়েছে গোটা কুড়ি। তার কারণ, মিস্টার ও মিসেস আছেন, আর আছেন মিস্টার রঙ্গরাজন ও ফ্যামিলি। বাঙালী একজনও নেই।

তারপরে যাত্রীদের দেখবার পালা। প্রতিটি কম্পার্টমেন্টের দরজায় দাঁড়িয়ে যাত্রীদের দেখে নিলাম। সবাই নিজেদের নিয়েই ব্যস্ত। জিনিসপত্র গোছাচ্ছেন, কিংবা সব শেষ করে নিশ্চিন্ত হয়ে বসেছেন। কেউ বা প্ল্যাটফর্মে দাঁড়িয়ে ফলের দাম করছেন, কিংবা বই-এর পাতা ওল্টাচ্ছেন। ট্রেনে ওঠবার সময় দু-একখানা পেপার ব্যাক বই কেনার একটা রেওয়াজ আছে। কিন্তু সে সবই বিদেশী বই। হিন্দী বইও কিছু আছে, কিন্তু তার আভিজাত্য নেই। যাঁরা বই পড়েন, তাঁরা বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই বাড়ি থেকে বই নিয়ে বেরোন, আর যাঁরা স্টেশনে বই কেনেন তাঁরা কতকটা দেখানোর জন্যেই কেনেন। গোটা কতক পাতা উল্টেই বন্ধ করেন বই। তবে গল্প করে সময় কাটাতে চান, এমন যাত্রীর অভাব নেই। আমি সেই-রকম যাত্রী খুঁজি। কখনও পাই, কখনও পাই না। এমনি অভ্যাসের দোষে যদি কেউ আমাকে খুঁজে বার করেন, তাহলে আমার আনন্দের সীমা থাকে না।

এ যাত্রাতেও সেই রকমের ঘটনা ঘটল। গাড়ি ছাড়বার পরে কতকটা হতাশ হয়ে যখন আমি নিজের জায়গায় এসে বসে পড়লাম, তখন এক ভদ্রলোক এসে আমাদের কামরায় মুখ বাড়ালেন, আর আমাকেই লক্ষ্য করে বললেন : অনেক দূর যাবেন বুঝি ?

পরিষ্কার বাংলায় প্রশ্ন শুনে আমি চমকে উঠলাম। আর আমার অবস্থাটা উপভোগ করে ভদ্রলোক বললেন : আপনার সঙ্গী থোঁজা দেখেই বুঝেছিলাম যে আপনি দূরের যাত্রী।

নিজের বার্থে একটু সরে বসে আমি বললাম : বসুন।

ভদ্রলোক বসবার জন্যেই এসেছিলেন, বসে বললেন : কোন বাঙালী নাম না দেখেই দমে গিয়েছিলেন, কিন্তু কলকাতার অনেক বাঙালী-মাদ্রাজী আছে। বাপের দেওয়া মাদ্রাজী নামটি ছাড়া আর সব ব্যাপারেই তারা বাঙালী।

এ'র নামই যে রঙ্গরাজন তা আমি বুঝতে পারলাম। তার কারণ এ'র সঙ্গে স্ত্রী ও এক কন্যা আছে বলে আমি তাঁর কামরার সামনে থেকে তাড়াতাড়ি সরে এসে-

ছিলাম। খুব অল্প সময়ে তাঁর সঙ্গে আলাপ জমে উঠল। তিনি আমার নাম নিবাস পেশা ইত্যাদি সব কথাই জেনে নিলেন, নিজের পরিচয়ও দিলেন। দেখলাম যে এইখানে তাঁদের সঙ্গে আমাদের একটু প্রভেদ আছে। আমরা বাঙালীরা দুদিন একসঙ্গে থেকেও যে সব প্রশ্ন করা সৌজন্য বিরুদ্ধ বলে ভাবি, এঁরা তা পরিচয়ের প্রথমেই জেনে নেন, এবং নিজের পরিচয়ও দেন অকপটে। আলাপ সহজ হয়ে যায়, অন্তরঙ্গ হয়, এবং অনেক সময়েই উভয়ের পরিচিত বন্ধুবান্ধবের কথা প্রকাশ হয়ে পড়ে।

ভদ্রলোক বললেন : ক'দিন থাকবেন ম্যাঙ্গালোরে?

বললাম : থাকা কি আর হবে! কাজ হলেই ফিরে আসব।

কিছু দেখবেন না সেখানে!

বললাম : সময় পেলে সমুদ্র দেখে আসব।

সমুদ্র !

বলে অনেকক্ষণ ধরে হাসলেন রঙ্গরাজন, তারপরে বললেন : ম্যাঙ্গালোরে পাহাড় দেখতে চাইলে পাহাড় দেখতে পাবেন, কিন্তু সমুদ্র দেখবার ইচ্ছা হলে নৌকোয় চেপে সমুদ্রের ধারে যেতে হবে।

মানে ?

বলে আমি তাঁর মুখের দিকে তাকালাম।

আর তিনি বললেন : মানে বুঝতে পারলেন না! পশ্চিমঘাট পাহাড়ের ছিটে-ফোঁটা প্রায় সর্বত্রই আছে, কিন্তু শহরটি হল নেত্রবতী নদীর তীরে। সেই নদী গিয়ে সমুদ্রে পড়েছে।

আমি বললাম : নদীর নামটিতো মিষ্টি।

রঙ্গরাজন বললেন : নদী একটি নয়, দুটি নদী ম্যাঙ্গালোরে—নেত্রবতী ও গুরুপুর। এই দুই নদী মিলিত হয়ে সমুদ্রে পড়েছে। ম্যাঙ্গালোর শহর হল নদীর তীরে, সমুদ্র শহর থেকে অনেক দূরে।

জিজ্ঞাসা করলাম : বন্দর তাহলে কোথায় ? সেও কি নদীর ধারে ?

ভদ্রলোক বললেন : বন্দর দেখতে হলে বাসে চেপে যেতে হবে। মাইল ছয়েকের কম নয় সেই পথ।

সমুদ্রের দূরত্ব শুনে আমি বললাম : যাক, সমুদ্র তাহলে আছে।

ভদ্রলোক হেসে বললেন : সমুদ্র দেখার লোভ থাকলে কোড়িকোড়ে নামবেন।

সে আবার কোথায় ?

বলে আমি তাঁর দিকে তাকালাম।

তিনি সহাস্যে বললেন : ইংরেজী বানান কোঝিকোড, আর আপনারা বলেন কালিকট। পুরাকালে ভাস্কোডাগামা এসে যেখানে নেমেছিলেন সেই বন্দর।

তারপরে বললেন : এই শহরের গায়েই হল সমুদ্র। স্টেশন থেকে একখানা অটো রিক্সায় চেপে সমুদ্রের ধারে বালির উপরে গিয়ে বসুন, সূর্যাস্ত দেখুন, আর দেখুন স্নানুযজনের মেলা। সমুদ্র দেখবার শখ মিটবে সেখানে।

আমি বললাম : কালিকটে নামা কি আর সম্ভব হবে!

কেন হবে না !

বলে ভদ্রলোক আমাকে বোঝালেন : কালিকট তো আর অন্য পথে নয়। ম্যাঙ্গালোরের পথেই কালিকট। এক ট্রেন থেকে নেমে আর এক ট্রেনে এগিয়ে যাবেন। ট্রেনের কোন অভাব নেই।

আমি প্রতিবাদ করলাম না। এ যাত্রা আমার বেড়ানোর উদ্দেশ্যে নয়, কাজ নিয়ে যাচ্ছি। কাজের পরে যতটুকু দেখা যায় ততটুকুই দেখব। তাড়াতাড়ি কাজ চুকে গেলে অবশ্য অন্য কথা।

ভদ্রলোক বললেন : আর একটা কাজ করতে পারেন। তাহলে আরও ভাল লাগবে আপনার।

কী কাজ ?

ম্যাড্রাস থেকে ম্যাঙ্গালোর মেল ধরবেন না, চলে যান ব্যাঙ্গালোরে। ব্যাঙ্গালোর থেকে বাসে চলে যান ম্যাঙ্গালোরে। পথের শোভা দেখে মন ভরে যাবে।

আমি যখন আমার রিজার্ভেশনের কথা ভাবছিলাম, ভদ্রলোক তখন আমাকে সাহস দিয়ে বললেন : ভাববার কিছু নেই, বুঝলেন! ভোরবেলায় ম্যাড্রাস পেঁছে ওপরতলায় ওয়েটিং রুমে চলে যাবেন, আর ব্রেকফাস্ট করবেন পাশের রিফ্রেশমেন্ট রুমে। তারপরে ব্যাঙ্গালোরের ট্রেন ধরবেন। বৃন্দাবন এক্সপ্রেস পেলে তো কথাই নেই, ও অঞ্চলের সবচেয়ে ভাল ট্রেন, দিল্লীর যেমন তাজ এক্সপ্রেস আর বম্বের ডেকান কুইন।

তারপর ?

তারপর ব্যাঙ্গালোরের রিটায়ারিং রুমে রাত কাটিয়ে পরদিন সকালে ম্যাঙ্গালোরের বাস ধরুন, কিম্বা রাতের ট্রেনেই মাইসোরে গিয়ে সকালবেলায় বাস। সন্ধ্যাবেলায় কেন, বিকেলেই পেঁছে যাবেন ম্যাঙ্গালোরে। ট্রেনে গেলেও আপনার এই সময় লাগবে। তবে—

বলে তিনি ভাবলেন খানিকক্ষণ। তারপরে বললেন : সকালবেলায় ওয়েস্ট কোস্ট এক্সপ্রেস ধরলে অবশ্য আগেই পেঁছতে পারবেন। সে ট্রেন ম্যাঙ্গালোরে বোধ হয় সকালেই পেঁছয়। কিন্তু—

কিন্তু কি ?

এ ট্রেন সময়মতো না পেঁছলে কানেকসন মিস হতে পারে। এত দূরের যাত্রা, বুঝতেই পারছেন।

ভারতবর্ষের মানচিত্রটা আমার চোখের সামনে ফুটে উঠল। পূর্বদিকে বঙ্গোপসাগরের তীরে মাদ্রাজ শহর। আর ম্যাঙ্গালোর পশ্চিমে আরব সাগরের তীরে। এক-প্রান্ত থেকে অপর প্রান্তে যেতে হবে। ট্রেন দক্ষিণে নেমে পশ্চিম প্রান্তের কোচিনের দিকে গেছে। তারপর মালাবার উপকূল ধরে উঠেছে উত্তরে। আর ব্যাঙ্গালোর হল দেশের মাঝখানে, মাঝ পথে। ট্রেনে সেখানে গিয়ে বাসে যেতে হয় ম্যাঙ্গালোর।

রঙ্গরাজন কিন্তু থামলেন না, বললেন : ব্যাঙ্গালোর থেকে ম্যাঙ্গালোরে আর বেশি-দিন বাসে যেতে হবে না। হাসান পর্যন্ত ছোট লাইন আছে, হাসান থেকে ম্যাঙ্গালোর লাইন পাতা হচ্ছে দ্রুতগতিতে। আর কিছু-দিন পরেই ট্রেন চলবে। তখন ব্যাঙ্গালোরে রাতের গাড়িতে চেপে সকালবেলায় ম্যাঙ্গালোরে পেঁছবেন।

দেশ দেখতে বেরোলে এসব কথা শুনতে ভাল লাগে। আমি ভাবছিলাম আমার কাজের কথা। নির্দিষ্ট দিনে আমাকে পেঁছতে হবে। তাই বললাম : এখন কোন রিস্ক নেওয়া ঠিক হবে না।

কেন ?

যানবাহনের গোলমালে পেঁছতে দেরি হলেই কেলেঙ্কারি।

ট্রেনেও তো দেরি হতে পারে!

তার জন্যে আমি দায়ী হব না। দায়ী হবে ট্রেন। রেল কর্তৃপক্ষের উপরে দোষারোপ করে নিস্তার পেয়ে যাব।

ভদ্রলোক আমার কথা মেনে নিয়ে বললেন : হুঁ। চাকুরে লোক বলেই আমাদের চিন্তার ধারাটা এইরকম। নিজের কাজ হলে অন্য কথা ভাবতাম।

এই মন্তব্যের ভিতরে একটা খোঁচা আছে, কিন্তু কথাটা সত্যি বলেই তার যন্ত্রণা নেই। আর ভদ্রলোক যে কোনও আঘাত দেবার জন্যে একথা বলেননি, তা বুঝতে পারলাম তাঁর পরের কথায়। বললেন : তবে একটা কাজ করুন।

বললাম : বলুন।

যেমন ব্যবস্থা করেছেন, তেমনি ভাবেই যান। বরং ওয়েস্ট কোস্ট এক্সপ্রেস ধরতে পারলে তাই ধরুন। বিকেলের বদলে সকালে পেঁছতে পারলে আপনার আরও সুবিধা হবে। কাজকর্ম হয়তো আগেই মিটিয়ে ফেলতে পারবেন। ফেরার পথে আসুন ব্যাঙ্গালোর হয়ে।

আমি বললাম : এ খুব ভাল পরামর্শ।

ভদ্রলোক পুলকিত হয়ে বললেন : পরামর্শ যে আমি ভাল দিই, এ কথা সবাই বলে। ১ আর যদি একটা দিন আপনি বেশি খরচ করেন তো এমন পরামর্শ দিতে পারি যে আপনি লাফিয়ে উঠবেন।

ভদ্রলোকের দুর্বলতা আমি ধরে ফেলেছি। বললাম : সত্যি নাকি!

রঙ্গরাজন এবারে তাঁর জুতো খুলে বার্থের উপরে পা তুলে বসলেন। ওধারের বার্থে বসেছিলেন তিনজন, তাঁদের দুজন ওপরের বাঙ্কের মালিক। এখন সাময়িক পত্রের পাতা ওল্টাচ্ছেন। আর যিনি জানালার ধারে বসেছিলেন, তিনি চোখ বুজে বাইরের বাতাস উপভোগ করছেন। রঙ্গরাজন তাঁদের দিকে ভ্রূক্ষেপ করলেন না, বললেন : আপনার ধর্মের টান বেশি, না প্রাকৃতিক সৌন্দর্য আপনি বেশি ভালবাসেন ?

উত্তর দিতে একটু দ্বিধায় পড়ে গেলাম। আর আমার এই দ্বিধা দেখে ভদ্রলোক যেন বেশি খুশী হলেন, বললেন : দুটোর কথাই আপনাকে বলছি।

আমি বললাম : সেই ভাল।

রঙ্গরাজন বললেন : আপনাদের আমি প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের দিকেই বেশি আকর্ষণ দেখেছি। বিশেষভাবে আপনার মতো এক

মানুষের আমি তীর্থযাত্রা করতে দেখিনি। আপনারা সস্ত্রীক তীর্থ করেন, তাই না?

এ কথা আমি মেনে নিতেই ভদ্রলোক বললেন: তবে আপনি সকালের প্রথম বাস ধরে ম্যাঙ্গালোর থেকে কুর্গের মার্কারা চলে আসুন। আশি পঁচাশি মাইল পথ, সময় লাগবে ঘণ্টা তিনচার। কেমন উঁচুনিচু পাহাড়ী শহর, দেখে ভাল লাগবে আপনার। ইচ্ছা হয় এক রাত থাকুন, না হয় শেষ বাসে মাইসোরে চলে আসুন, কিংবা হাসানে। মাইসোর পঁচাত্তর মাইল, আর হাসান বোধহয় আরও কাছে। ট্রেন ধরে ব্যাঙ্গালোরে এসে বড় লাইনের গাড়িতে ম্যাড্রাসে চলে আসুন। যাবার পথে ম্যাড্রাসেই ফেরার রিজার্ভেসনটা করে নেবেন, আর কোন ভাবনা থাকবে না।

আমি বললাম: খুব চমৎকার আইডিয়া। এই সুযোগে কুর্গ দেখা না হলে জীবনে আর এ রকম সুযোগ আসবে না।

রঙ্গরাজন আরও উৎসাহিত হয়ে বললেন: কোডাগুদের দেশ এই কুর্গ। পাহাড়ী দেশ। পাহাড়ের গায়ে কফির চাষ, গোলমরিচ আর এলাচ। বড়লোক সব প্লাণ্টার, দুর্ধর্ষ সৈনিক, ভারতের প্রধান সেনাপতিরা এসেছেন এই দেশ থেকে। দীর্ঘদিনের বৃটিশ শাসনেও এরা নিজেদের ঐতিহ্য হারায়নি।

মনে মনে আমি ঠিক করে ফেললাম যে সুযোগ পেলে কুর্গের উপর দিয়েই ফিরব। কিন্তু কিছু বলার আগে রঙ্গরাজনই বললেন: যদি পারেন তো তলাকাবেরী না দেখে ফিরবেন না।

তলাকাবেরী নাম আমি আগে শুনিনি। বললাম: এ কোন্ জায়গা?

রঙ্গরাজন বললেন: কাবেরী নদীর নাম নিশ্চয়ই জানেন।

বললাম: জানি।

রঙ্গরাজন বললেন: কাবেরীর উৎস হল তলাকাবেরীতে। মার্কারা থেকে মাইল পাঁচেক দূরে ব্রহ্মগিরি পাহাড়। সেই পাহাড় থেকে কাবেরী নেমেছে। জনপ্রিয় তীর্থস্থান এটি, বাসেই যাতায়াত করা যায়।

আমি জিজ্ঞাসা করলাম: আপনি বুঝি এই তীর্থের কথা বলছিলেন?

না।

বলেই ভদ্রলোক থামলেন অপ্রস্তুত ভাবে। দরজার দিকে আমি চেয়ে দেখলাম যে একটি মেয়ে এসে দেখা দিয়েই সরে গেল।

পরে কথা হবে।

বলে ভদ্রলোক তৎপর ভাবে বিদায় নিলেন।

আমি ভেবেছিলাম যে ভদ্রলোক আবার ফিরে আসবেন। কিন্তু এলেন না। অনেক আগেই অন্ধকার নেমেছিল বাইরে, ক্রমে সেই অন্ধকার গভীর হল। যাঁরা বই পড়ছিলেন, তাঁরা বই মুড়ে রাখলেন। যাঁদের সঙ্গে খাবার ছিল, তাঁরা খাবার খেয়ে নিলেন। খড়্গপুরে খাবার এল আমাদের। আমরাও খেয়ে নিলাম। তারপরে শোবার পালা। বাথরুম থেকে আসবার সময় আমি একবার রঙ্গরাজনের কামরার দিকে তাকিয়েছিলাম। সে কামরা তখন বন্ধ হয়ে গেছে।

পরদিন সকালেও আমি রঙ্গরাজনের দেখা পেলাম না। ব্রেকফাস্টের পরে খবরের কাগজ খানা আমার শেষ হয়ে গেল। বাইরের দিকে তাকিয়ে দেখলাম যে, প্রসন্ন রোদ চারিদিক এখন ঝলমল করছে। আজ সারা দিন আমার এই গাড়িতেই কাটাতে হবে। আমার সঙ্গীরা সবাই স্বল্পভাষী। আজ তাঁরা অল্পক্ষণের জন্য বই খুলেছিলেন। তারপর উপরে উঠে আবার শুয়ে পড়েছেন। শুয়ে সময় কাটানোই সবচেয়ে সহজ মনে হয়েছে তাঁদের।

কিন্তু এ সময়ে আমার শোবার ইচ্ছা হল না। পলসোয় চা খেয়েছি, বিজয়নগরমে প্ল্যাটফর্মে নেমে খানিকক্ষণ পায়চারি করলাম। ওয়ালটেয়ারে লাঞ্চ পাওয়া যাবে। তার আগে স্নান করে নেব, খেয়ে দেয়ে ঘুম। রাজা-মন্দ্রীতে চোখ মেলে চা খাব, তার পরে বিজয়ওয়াড়ার বিরিয়ানি খেয়ে আবার ঘুম। এ সময়টায় রঙ্গরাজনকে পেলে গল্প করে খানিকটা সময় কাটানো যেত।

বিজয়নগরম থেকে ট্রেন ছাড়বার পর আমি তাঁদের কামরার দিকে আমার মুখ বাড়ালাম। ভদ্রলোক চুপচাপ বসে আছেন, আর তাঁর স্ত্রী বোধ হয় স্নান করতে যাবার জন্য তৈরি হচ্ছেন। ভদ্রলোক এমন নির্বিকার যে আমাকে যেন দেখতেই পেলেন না।

নিজের কামরায় ফিরে এসে আমি তাঁর কথাই ভাবছিলাম। সহসা ভদ্রলোক এমন বদলে গেলেন কেন! কাল তো নিজেই এসেছিলেন গল্প করতে। আজ আমার দিকে ফিরেও তাকালেন না!

কিন্তু বেশিক্ষণ এ সব কথা ভাববার অবকাশ পেলাম না। ব্যস্ত সমস্ত ভাবে ভদ্রলোক এসে আমাদের কামরায় ঢুকলেন, বললেন: কাল একটা কথা বলতে ভুলে গেছি।

আমি আশ্চর্য হয়ে তাঁর মুখের দিকে তাকালাম।

তিনি বললেন: ম্যাঙ্গালোর থেকে যদি আপনি হাসান হয়ে ফেরেন তো একটি দিন আপনাকে হাসানে থাকতেই হবে। এক বাস থেকে নেমে আর এক বাস ধরলে চলবে না। শুধু বাসে চেপে হাসানের উপর দিয়ে চলে আসাও আমি সমর্থন করব না।

ভদ্রলোক যে আমার ভ্রমণের কথাই ভাবছেন, এ কথা জেনেই আমি বেশি আশ্চর্য হয়েছিলাম। হাসানে কেন নামতে হবে, সে সম্বন্ধে আমার কৌতূহল খুবই কম ছিল। কিন্তু রঙ্গরাজন আমার কোন প্রশ্নের অপেক্ষা না করে বললেন: হাসানের কাছাকাছি দুটি এমন সুন্দর মন্দির আছে যে তা দেখে না এলে আপনার দক্ষিণ ভারতে আসা ব্যর্থ হয়েছে মনে হবে।

ভদ্রলোককে আমি আমার পাশে বসবার জন্যে জায়গা দিয়েছিলাম, কিন্তু আজ তিনি দরজার কাছেই দাঁড়িয়ে রইলেন। বললেন: বেলুড় আর হালেবিদ—হয়শাল রাজাদের তৈরি এই দুটি মন্দিরের তুলনা সারা ভারতে বোধ-হয় নেই। অথচ এ দুটি মন্দির দেখতে আপনার কয়েক ঘণ্টা সময় লাগবে। হাসান থেকে একটা ট্যাক্‌সি নিয়ে এই মন্দির দুটি দেখে আসতে আপনার এক বেলা সময় লাগবে, আর পুরো দিনটা থাকলে শ্রবণবেলগোলাও দেখে আসতে পারবেন। শ্রবণবেলগোলার নাম শুনেছেন তো?

আমি কিছু বলবার আগেই ভদ্রলোক বললেন: ছোট একটা পাহাড়ের মাথায় গোমতেশ্বরের জৈন মূর্তি। একটা পাথর থেকে কেটে বার করা এত বড় মূর্তি নাকি পৃথিবীর আর কোথাও নেই। বলে ভদ্রলোক নিজের কামরার দিকে একবার তাকালেন।

আমি বললাম: দাঁড়িয়ে রইলেন কেন!

রঙ্গরাজন এ কথার উত্তর দিলেন না, বললেন: আর একটা কথাও এই সময়ে বলে রাখি।

বলুন।

বলে আমি তাঁর মুখের দিকে সাগ্রহে তাকালাম।

তিনি বললেন: ম্যাঙ্গালোর পর্যন্ত গিয়ে উডিপি না দেখে ফিরবেন না। এ রকমের সুযোগ জীবনে বার বার আসে না। উডিপি জানেন তো?

উডিপি নামটা শোনা মনে হচ্ছিল, কিন্তু কী প্রসঙ্গে শুনেছিলাম তা মনে পড়বার আগেই ভদ্রলোক বললেন: উডিপি হল মাধবাচার্য স্বামীর সাধনার স্থল। কৃষ্ণের মন্দির আছে। খুবই বড় তীর্থ। ম্যাঙ্গালোর থেকে বাসে যেতে হয় উত্তরে। ট্রেন যায় না।

চৈতন্য দেবের তীর্থ পরিক্রমায় বোধ হয় উডিপির কথা শুনেছি। উড়ুপ কৃষ্ণের কথা। কিন্তু এ সম্বন্ধে কিছু জিজ্ঞাসা করবার আগে আমি বললাম: আপনি দেখছি অনেক জায়গা দেখেছেন!

ভদ্রলোকের দুচোখ চক চক করে উঠে সহসা নিবে গেল। একটু বিমর্ষ ভাবে বললেন: অনেক জায়গা আর দেখলাম কোথায়!

বলতে বলতেই দরজার কাছ থেকে সরে গেলেন। আর ফিরলেন না।

ওয়ালটেয়ারে নতুন স্টেশন হয়েছে। সীমাচলমের পরে ওয়ালটেয়ার স্টেশন। সীমাচলমের পাহাড় দেখতে পেয়েছিলাম, কিন্তু পাহাড়ের উপরে নৃসিংহদেবের মন্দির দেখতে পাই নি। তেমনি ওয়ালটেয়ার শহরটি সমুদ্রের উপরে। কিন্তু ট্রেন থেকে সমুদ্র দেখতেও পাওয়া গেল না। খানিকক্ষণ চেয়ে থাকবার পরে শুয়ে পড়লাম। দুপুরের আহারের পরে ঘুমটা ভালই হল।

বিকালে চায়ের অর্ডার দেওয়াই ছিল। রাজামন্দ্রীতে চা পাওয়া গেল। তারপরে গোদাবরী নদীর পুল পেরোলাম। এত বড় রেলের পুল নাকি এ দেশে আর একটি আছে, সেটি ডেহরি অন শোন নদীর পুল। দিল্লী যাতায়াতের পথে সে পুল আমরা আঁধারাতে রাতে পেরোই বলে দেখতে পাইনে।

তারপরে একটু একটু করে অন্ধকার নামল। রঙ্গরাজন আর আমাদের কামরায় এলেন না।

বিজয়ওয়াড়ায় যাবার পরে আর একবার দেখা হল রঙ্গরাজনের সঙ্গে। বাথরুম থেকে তিনি যখন বার হচ্ছিলেন, আমি তখন দরজার দাঁড়িয়েছিলাম। বললাম: সারাদিন আপনি ব্যস্ত ছিলেন, তা না হলে আপনার কাছে আরও অনেক খবর পাওয়া যেত।

ভদ্রলোক যেন দুঃখ পেলেন আমার কথায়। বড় কাতর দেখাল তাঁর দৃষ্টি। জিজ্ঞাসা করলেন : কবে ফিরছেন আপনি?

তারিখটা আমি জানালাম। বললাম : ম্যাড্রাস থেকে রিজার্ভেসনের জন্যে টেলিগ্রাম করে দিয়েছি।

ভদ্রলোক এক মুহূর্তে পুলকিত হয়ে উঠলেন, বললেন : তবে ঠিক আছে।

কেন বলুন তো!

আমরাও ঐ দিনে ফিরব।

দেশে থাকবেন না কিছু দিন?

তিনি বললেন : দেশে যাচ্ছি না তো যাচ্ছি তিরুপতি। মেয়ে বড় হয়েছে, ভাল একটা বিয়ে দিতে হবে। ভেঙ্কটেশ্বরের পায়ে প্রণাম জানিয়ে আসব।

বলে তিনি আর অপেক্ষা করলেন না। ত্বরিতপদে নিজের কামরার দিকে চলে গেলেন।

রঙ্গরাজনের সঙ্গে যে কাল আর দেখা হবে না আমি তা জানতাম। মাঝরাতে গুন্টুরে গাড়ি বদল করে তাঁরা তিরুপতি যাবেন। আর ভোর বেলায় আমরা পৌঁছব ম্যাড্রাসে। ফেরার পথে আবার দেখা হবে কিনা কে জানে!

ভোরবেলায় প্রায় সময় মতোই আমরা ম্যাড্রাসে পৌঁছলাম। রঙ্গরাজনের পরামর্শ মতো উপরের ওয়েটিং-রুমে গিয়ে মুখ হাত ধুয়ে উপরেই ব্রেকফাস্ট করে নিলাম। তার পরে এলাম নিচের রিজার্ভেসন অফিসে। রঙ্গরাজন ঠিকই বলেছিলেন। ওয়েস্টকোস্ট এক্সপ্রেস ছাড়ে বেলা একটায়। আর ম্যাঙ্গালোরে পৌঁছয় ভোর বেলায়। চেষ্টা-চরিত্র করে এই ট্রেনেই রিজার্ভেসন পাওয়া গেল। লাঞ্চ সেরে আমি আবার ট্রেনে উঠে পড়লাম।

এবারে আর ঘুমোবার কথা মনে আসছে না, মনে আসছে রঙ্গরাজনের কথাই। গোটা একটা দিন আমার বেঁচে গেল। তবে কি সমুদ্র দেখবার জন্যে কালিকটে নামব। না উডিপি দেখে আসব ম্যাঙ্গালোর থেকে? কুর্গের কথাও আমার মনে এল, বাড়তি দিনটা আমি ইচ্ছা করলে কুর্গে কাটাতে পারি।

আমাদের ট্রেন এখন পশ্চিম মুখো চলেছে। একটার পরে একটা বড় জংসন আসছে। বোম্বে যেতে হলে আর্কোলাম থেকে উত্তরে যেতে হবে। ব্যাঙ্গালোর যেতে হয় জলারপেট থেকে, কোইম্বাতুর থেকে উটি আর শোরানুর থেকে কোচিনের পথ। এ ছাড়াও অনেক ছোট-বড় জংসন আছে, ছোট ও বড় লাইনের গাড়ি। ইরোড পৌঁছবার আগেই অন্ধকার হল, ডিনার পাওয়া গেল কোইম্বাতুরে। তারপর ঘুম।

ঘুম ভেঙে দেখলাম যে ম্যাঙ্গালোরে পৌঁছতে আর দেরি নেই। তাড়াতাড়ি আমি তৈরি হয়ে নিলাম। একটা ভ্রমণের বাসনা মনের মধ্যে প্রবল হয়ে উঠেছিল। সময় নষ্ট করবার ইচ্ছা তাই আদৌ ছিল না।

ট্রেন এসে স্টেশনের প্ল্যাটফর্মে দাঁড়াল। নেমে দেখলাম যে একটা বেশ পুরনো স্টেশন। দক্ষিণ রেলের শেষ স্টেশন এটি। কিন্তু খুব পরিচ্ছন্ন মনে হল না। কুলিকে জিজ্ঞাসা করে জানলাম যে স্টেশনে রিটায়ারিং রুম আছে, কিন্তু রেস্তোরা নেই, লাইট রিফ্রেশমেন্টের ব্যবস্থা আছে। ভাবলাম, দরকার নেই স্টেশনে থেকে। বাইরে একটা অটো-রিকসা ধরে আমি একটা হোটেলে গেলাম।

বেশ বড় শহর। দোকান-পাট বাজার জমজমাট হয়ে উঠল খানিকক্ষণ পরেই। যানবাহন প্রচুর, বাস চলাচল করছে। কলকাতাকে বাদ দিলে বাংলাদেশে এ রকম শহর আমরা দেখতে পাই নে।

আমার কাজ যে এমন সহজে মিটে যাবে, একথা আমি ভাবতে পারিনি। বিকেলের রোদ পড়বার আগেই আমার ছুটি হয়ে গেল।

যাদের সঙ্গে কাজ ছিল, তাদেরই একজনকে জিজ্ঞাসা করলাম : শহরে কী দেখবার আছে?

সেই পরিচিত বিস্ময় দেখলাম ভদ্রলোকের দৃষ্টিতে। অন্যত্র যেমন শুনেছি, এখানেও তেমনি শুনলাম : এখানে আর দেখবার কি আছে?

সমুদ্র?

সমুদ্র! সমুদ্রে কী দেখবেন! আর শহরে তো সমুদ্র নেই!

বললাম : তা হলে?

ভদ্রলোক বললেন : ম্যাঙ্গালোরে দেখবার কিছু নেই। কিছু দেখতে হলে আপনাকে দূরে যেতে হবে।

জিজ্ঞাসা করলাম : কত দূরে?

দু-একজনকে জিজ্ঞাসা করে ভদ্রলোক খবর দিলেন। বললেন : উডিপি যেতে পারেন।

সে কত দূরে?

আবার জিজ্ঞাসাবাদ করলেন তিনি। তারপরে বললেন : মাইল পঞ্চাশেক দূরে। কাল গেলে পরশু ফিরতে পারবেন।

কালই ফিরতে পারব কিনা, এ কথা আমি জানতে চাইলাম না। ধন্যবাদ দিয়ে আমি বিদায় নিলাম।

পথে নেমে আবার আমার রঙ্গরাজনের কথা মনে পড়ল। রঙ্গরাজনের মতো একজন সঙ্গী থাকলে আমার কোন ভাবনা ছিল না। সাগ্রহে তিনি যে আমাকে সবকিছু দেখিয়ে আনতেন, তাতে আমার সন্দেহ ছিল না। নিজের কাজের ক্ষতি স্বীকার করেও হয়তো এ কাজ করতেন।

এই শহরে অটো রিকসা খুব ছুটোছুটি করছে। একটা রিকসা ধরে তারই উপরে উঠে বসলাম।

কোথায় যেতে হবে?

বললাম : নদীর ধারে।

রঙ্গরাজন আমাকে নেত্রবতী নদীর নাম বলেছিলেন। আর বলেছিলেন গুরুপুর নদী। কোনটা কাছে আর কোনটা দূরে তা জানি না। নদীর ধারে শহর। এ কথাটা মনে ছিল বলেই আমি নদীর কথা বললাম।

অনেকটা পথ ঘুরে, ফিরে, আমি নদীর ধারে এসে পৌঁছলাম। খেয়াঘাট এটি। মোটর লঞ্চ পারাপার করছে, দেশী নৌকোও আছে। কিন্তু সেসব ঠিক ওপারে যাচ্ছে না, যাচ্ছে অনেকটা দূরে। সেখানেও বোধ হয় বর্ধিষ্ণু গ্রাম আছে।

সমুদ্রের কথা আমি জিজ্ঞাসা করলাম। শুনলাম যে এইসব নৌকোয় চেপে সমুদ্রে দেখে আসা যায়। মোটর লঞ্চ তখন ছেড়ে গেছে, দেশী নৌকো ছাড়বার জন্যে তৈরি হচ্ছে। কিন্তু কেন জানি না। আমি নৌকোর চেপে সমুদ্র দেখতে যাবার কথায় উৎসাহ পেলাম না। জিজ্ঞাসা করলাম : বন্দর কত দূরে।

উত্তর পেলাম, বন্দরে যেতে হলে আমাকে শহরের বাস-স্ট্যান্ডে যেতে হবে। সেখান থেকে মাইল ছয়েক দূরে।

রঙ্গরাজনও আমাকে এই কথাই বলেছিলেন। সমুদ্রের চেয়ে নাকি পাহাড়

কাছে। কিন্তু কোনও পাহাড় দেখতে পাই নি বলে সে কথাও জিজ্ঞাসা করলাম।

উত্তর তখনই পেয়ে গেলাম : কাদ্রি পাহাড়। সে বেশি দূরে নয়। ঐ রিকসায় চেপে চলে যান, মঞ্জুনাথ শিবের মন্দিরও দেখতে পাবেন।

তাহলে শিবের মন্দিরই দেখা যাক।

বলে সমুদ্রের দিকে না গিয়ে আমি একখানা অটো-রিকসায় পাহাড়ের দিকেই চলে গেলাম।

শহরের উপকণ্ঠে এই কাদ্রি পাহাড়, মাথা নিচু করে একটি মন্দিরকে যেন ঘিরে রেখেছে। পাহাড়ের গায়ে সুন্দর ঘরবাড়ি, নারিকেলের বন। আর নিচে প্রশস্ত প্রাঙ্গণের মাঝে মন্দির। তার সাদা চূড়া দিনান্তের আলোয় ঝলমল করছে। ব্যারাকের মতো যে গৃহ মন্দিরের চারিদিক ঘিরে আছে, কেরালায় তাকে বলে নালাম্বলম। কিন্তু ম্যাঙ্গালোর হল দক্ষিণ কানাড়ার শহর। এখানে তার কী নাম তা জানিনে। কানাড়া ভাষী এই অঞ্চল মহীশূর রাজ্যের ভাগে পড়েছে, আর দক্ষিণের মালাবার অঞ্চল পড়েছে কেরালার ভাগে। ভাষার ভিত্তিতে রাজ্য গঠনের সময় এই সব অঞ্চল ভাগাভাগি হয়েছে নূতন মানচিত্রে। সব সময় আমরা সব কথা মনে রাখতে পারি নে।

মন্দির দেখে যখন বাহিরে এলাম, তখন একটা ভুল বুঝতে পারলাম নিজের। অটো-রিকসাটা আমি ছেড়ে দিয়েছিলাম। কিন্তু এখানে যে রিকসা পাওয়া যাবে না, সে-কথা তখন মনে হয় নি। তাই এবারে নির্জন পথ ধরে আমাকে হাঁটতে হল।

ধীরে ধীরে অন্ধকার এল নেমে। নির্জন পথ হল নিস্তব্ধ। পথের দু'ধারের ঘরবাড়িতে একটা দুটো করে আলো জ্বলে উঠল, কিন্তু রিকসা মিলল না একটাও। পথের দূরত্বের একটা অনুমান ছিল আমার, তাই কোন দুর্ভাবনা ছিল না। হাঁটতে হাঁটতেই আমি শহরের পথে পৌঁছে গেলাম। তারপরে একটা রিকসা পেয়ে ফিরে এলাম হোটেলে।

রঙ্গরাজন আমাকে ঠিকই বলেছিলেন। ভোর ছটা থেকেই মার্কারার বাস ছাড়ে। মার্কারা হল কুর্গের রাজধানী। ছোট পাহাড়ী শহর যে দিনে দিনে প্রাণবন্ত হয়ে উঠেছে, তারই পরিচয় পেলাম বাসে উঠে। বহু যাত্রী নিত্য যাতায়াত করে। চুরাশি মাইল পথ সাড়ে তিন ঘন্টাতেই পৌঁছে দেয়।

এই রাজ্যের অধিবাসীদেরও দেখলাম। এদের কোডাভা বলে। কিন্তু নীলগিরির টোডাদের মতো আদিবাসী এরা নয়। এরা সভ্য শিক্ষিত জাত, ভারতের যে কোন রাজ্যের অধিবাসীদের মতো। কিন্তু বীরত্বের গৌরব এদের অন্য রকম।

মার্কারা থেকে মাইশোরের পথে আমি ম্যাড্রাসে ফিরলাম। মোটর বাসে মাইশোর পঁচাত্তর মাইল, তারপর ছোট লাইনের ট্রেনে ব্যাঙ্গালোর। ব্যাঙ্গালোর থেকে বড় লাইনের গাড়িতে এলাম ম্যাড্রাস।

আমি ভাবতে পারিনি যে রঙ্গরাজনের সঙ্গে আমার আবার দেখা হবে। তাই সন্ধ্যাবেলায় ম্যাড্রাসের ওয়েটিং রুমে ঢুকেই আশ্চর্য হয়ে গেলাম। রঙ্গরাজনই আমাকে আগে দেখেছিলেন। দম দেওয়া পুতুলের মতো লাফিয়ে উঠলেন চেয়ার থেকে।

প্রথমে তিনি আমার সব কথা জেনে নিলেন, তারপর বললেন, নিজের কথা। তিরুপতি থেকে তাঁরা এইমাত্র এসে পৌঁছেছেন এক্সপ্রেস গাড়িতে। আমরা একসঙ্গেই ফিরব।

হঠাৎ আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন, ম্যাঙ্গালোরে সমুদ্র দেখেছেন?

বললাম, না। কিন্তু আপনার কথা মতো পাহাড় দেখেছি।

মঙ্গলা দেবীর মন্দির দেখেছেন, যাঁর নামে শহরের নাম হয়েছে ম্যাঙ্গলোর?

আশ্চর্য হয়ে বললাম, এ মন্দিরের কথা তো আপনি আমাকে বলেননি?

দেখেননি? গণপতির মন্দির?

তাও দেখিনি।

সুলতানস ব্যাটারি নিশ্চয়ই দেখেছেন? টিপু সুলতানের দুর্গে? এ সবতো শহরের মধ্যেই ছিল।

বললাম, এসব দেখবার কথা তো কেউ আমাকে বলেননি!

ভদ্রলোক বললেন, তবে নিশ্চয়ই জৈন-তীর্থ মুদবিদ্রি আর উডিপির পথে কারকলার বিরাট গোমাতা মূর্তি দেখে এসেছেন!

আমি নিঃশব্দে মাথা নাড়লাম।

রঙ্গরাজন বললেন, তাহলে বোধহয় অন্য ধারে সুব্রহ্মণ্যের মন্দির দেখতে গিয়েছিলেন?

আমি না বলতেই ভদ্রলোক বললেন, তবে এ কদিন আপনি কী দেখে এলেন?

আমি বললাম, যতটুকু বলেছিলেন, ততটুকুই দেখে এসেছি। আপনার পরামর্শ মতো ওয়েস্ট কোস্ট এক্সপ্রেস ধরে যাবার জন্যে একটা দিন সময় বেশি পেয়েছিলাম। তাই ঠিক যেমনটি বলেছিলেন, তেমনি করে কুর্গ রাজ্যটা দেখে এসেছি। এই যাত্রায় এইটিই আমার সবচেয়ে বড় লাভ হয়েছে।

আমার এই কথায় প্রচুর আত্মপ্রসাদ পেলেন ভদ্রলোক। তারপরে নিজের স্ত্রী-কন্যার দিকে তাকিয়ে নিজেদের ভাষায় গড়-গড় করে যা বলে গেলেন তার একবর্ণও আমি বুঝতে পারলাম না।

তারপর আমার দিকে ফিরে বললেন, স্ত্রীলোকের এই একটা দোষ। নিজেরাও কিছু জানে না, জানবার চেষ্টাও করে না। আর ভাবে যে পুরুষেরা সুবিধা পেলেই মিথ্যা কথা বলে। তা বলব কেন! নিজের জানা থাকলে বলব, না থাকলে বলব না। তা নয়, আমাকে এরা ধরল যে কোনও কথা বলতে পারব না! তীর্থ করতে যাচ্ছি। কথা বললেই যখন মিথ্যা বলব, তখন বলবার দরকার কি! আপনার যে কিছুই দেখা হল না, তাতে কোন পুণ্য হল আমার!

ভদ্রমহিলাও বোধহয় বাংলা বোঝেন, অল্প অল্প, লজ্জিতভাবে তিনি মুখ ফিরিয়ে নিলেন। আর কৌতুকের হাসি দেখলাম তাঁর কন্যার মুখে।

সাহিত্য সংস্কৃতি

দুঃস্বপনের দিন

'সেকালের আদর্শবাদী মুরুব্বিরা যেন খিচুড়ি পাকিয়ে গেছেন চালে আর ডালে মিশিয়ে। মুসলমানে আর হিন্দুতে। এর কানাচ ওর ঘর, ওর উঠান দিয়ে এর বাড়ি যাবার পথ। কে হিন্দু, কে মুসলমান—এখন বাছাবাছি ও ভাগাভাগির দিন এসে গেল। র‍্যাডক্লিফ সাহেব বিলেত থেকে বাঁটোয়ারা করতে এসে ভেবে পাচ্ছেন না, লাইনটা কোনখান দিয়ে টানবেন।'

এ হল র‍্যাডক্লিফ রোয়েদাদ ঘোষণার মুহূর্তের চিন্তা। কী বাঙালী হিন্দু-মুসলমান, পরস্পর পরস্পরকে নিয়ে পাশাপাশি ছিল অনেককাল সুখ-দুঃখের ভাগীদার হয়ে। মান-অভিমান, মনকষাকষি, মনান্তর মতান্তর হয়েছে। তবু ভাই-ভাই হয়েই ছিল বাঙালী হিন্দু-মুসলমান: রাগের মাথায় যার যা খুশী বলে কিন্তু আবার সব ভুলে যায়। একদিন কিন্তু পালে বাঘ পড়ল, দেশবিভাগের ব্যবস্থাটা র‍্যাডক্লিফ পাকা করে দিলেন। খুলনা জেলাটার হল ত্রিশঙ্কু অবস্থা। 'একদিন শোনা গেল, হিন্দুস্থানে দিয়ে দিয়েছে,—যেহেতু গুনতিতে বেশী এ জেলায়। মুসলমানের মধ্যে সাজ-সাজ রব পড়ে যায়: কোনদিকে নৌকা ভাসাবে, ফরিদপুর না বাখরগঞ্জ—' কিন্তু পরে সেটা হল পাকিস্থান। হিন্দুর মুখ শুকনো।

দেশবিভাগের ফলে দুটি আলাদা অঞ্চল শুধু সৃষ্টি হয়নি। হিন্দু ও মুসলমান একই ধরনের সমস্যার সম্মুখীন হয়ে বিনিদ্র রজনী কাটিয়েছেন উদ্বেগে আর অজানা আশংকায়।

শক্তিমান কথাকার মনোজ বসু স্বয়ং পূর্ব পাকিস্তানের মানুষ। পূর্ব পাকিস্থানের সমস্তঅঞ্চলেই তাঁর প্রাণ-মন ছড়িয়ে পড়ে আছে। ঠিক এই মানসিকতার ফলেই তিনি অজস্র গল্প, উপন্যাস, নাটক ইত্যাদির মাধ্যমে দেশবিভাগজনিত সমস্যার অনেক দিক অনেক ভাবে প্রকাশ করেছেন। তাঁর সেইসব রচনার একটি সুনির্বাচিত একত্রিত সংস্করণ 'সে এক দুঃস্বপ্ন ছিল' সম্প্রতি প্রকাশিত হয়েছে। এই অমনিবাস গ্রন্থটির ভূমিকায় অন্নদাশংকর রায় অনেক কথার মধ্যে বলেছেন—

'বন্ধুবর মনোজ বসু দুই প্রান্তের মুসলমানের সঙ্গে একপ্রকার নাড়ীর টান অনুভব করেন। এ শুধু আজ নয়, [illegible] তাঁর [illegible] যাঁরাই [illegible] আছে তিনিই জানেন যে তিনি সাম্প্রদায়িকতার দ্বারা কখনো লক্ষ্যভ্রষ্ট হননি।'

কথাটি ঠিক। মনোজ বসুর মন সাম্প্রদায়িক বিষবাষ্প কলুষিত নয়। ১৯৫০-৫১ খ্রীষ্টাব্দে রচিত তাঁর অনেক গল্পের মধ্যে এই সাম্প্রদায়িক সমস্যার সর্বনাশা দিকটির প্রতি বিশেষ ইঙ্গিত আছে। দেশবিভাগ হয়েছে। কিন্তু ভাষা এক, সাংস্কৃতিক আবহাওয়া এক। আচার-আচরণে ফারাক সামান্য। অথচ রোয়েদাদের নির্দেশে পূর্বজার্মানী পশ্চিম জার্মানীর মত বাংলার মাঝখানে কাঁটা তারের বেড়া বসানো হল। ওপারের মানুষ আসবে না এপারে, এপার যাবে না ওপারে। ঠোকাঠুকি, মারপিট, দাঙ্গা-হাঙ্গামা সে অবশ্য অব্যাহত রইল। যারা লোভী, যারা পরস্ব-অপহরণে সদাজাগ্রত তারা চিরদিনই প্রতিবেশীর ধন-সম্পদ, সম্মান সবকিছু লুঠতরাজ করে এসেছে। দেশবিভাগের পরবর্তীকালেও সেই হানাহানির অবসান ঘটেনি। চোখের জল মুছতে মুছতে ওপারের হিন্দু এপারে এসেছে লাখে লাখে। যাঁরা রাজা ছিলেন তাঁরা ফকীর হয়েছেন। যার আশ্রয় ছিল নিরাপদ তাকে রাস্তার ফুটপাথে শেষ নিঃশ্বাস ফেলতে হয়েছে। এ সবই দেশবিভাগের অভিশাপ। বহু বছরের পুঞ্জীভূত পাপের অভিব্যক্তি।

কিন্তু হাওয়া বদল হল। সাত শতাব্দী ধরে যারা একত্রে বাস করেছে, তাদের এক জায়গায় মিল ছিল। হোক না ধনী, হোক না নিঃস্ব, তবু একটা মিল ছিল। সে মিল ছিল মুখের ভাষায়।

ডাঃ মুহম্মদ শহীদুল্লাহ সাহেব সর্বপ্রথম প্রতিবাদ জানালেন বাংলা ভাষার কণ্ঠরোধ করার চক্রান্তের বিরুদ্ধে। ঢাকা থেকে প্রকাশিত একটি সাপ্তাহিক পত্রে বাঙালী-মুসলিমের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যে বাংলা-ভাষার প্রভাব [illegible] একটি প্রবন্ধে শহীদুল্লাহ সাহেব তাঁর বক্তব্য সবিস্তারে প্রকাশ করেন। বাংলা ভাষা ও সংস্কৃতির বিলুপ্তি সাধনে পশ্চিম পাকিস্তানে একটা চক্রান্ত চলছে এটা তিনি বুঝেছিলেন। সাম্প্রতিক পাকিস্তানী বর্বরতায় নিহত অশীতিপর বৃদ্ধ ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত পাকিস্থান সংবিধান প্রণয়নী সংসদে একটি সংশোধনী প্রস্তাব উত্থাপন করে দাবী করেন যে, উর্দুর মতো বাংলা ভাষাতেও এই সংসদের কার্যসূচী পরিচালিত হোক। তখন প্রধানমন্ত্রী ছিলেন লিয়াকৎ আলি খান সাহেব, তিনি এই প্রস্তাব নাকচ করলেন নিম্নলিখিত মন্তব্য করে—

> "Pakistan as a Muslim State must have a lingua-franca, language of the Muslim nation and that language can only be Urdu and no other language.".

১৯৪৮-এর মার্চ মাসে মহম্মদ আলি জিন্না কার্জন হলে সমাবর্তন ভাষণে বলেন যে, পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা হবে উর্দু আর কিছু নয়। যে ভ্রান্তপথে চালিত করার চেষ্টা করবে সে হল পাকিস্তানের শত্রু।

সেই সভায় ছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র মুজিবর রহমান। তিনি তীব্র প্রতিবাদ জানালেন এবং এই অপরাধে তাঁর কারাদণ্ড হল। সেই বছর ১৮ই মে তারিখে ঢাকা শহরে ডাঃ হবিবুল্লা বাহারের নেতৃত্বে মহা সমারোহে রবীন্দ্র-জয়ন্তী পালিত হল। শত্রুর চর বলে তাঁরা ধিকৃত হলেন। তারপর ১৯৪৮-এ যে ভাষা আন্দোলন শুরু হল তার পরিসমাপ্তি ১৯৫২-র একুশে ফেব্রুয়ারী। বাঙালী মুসলমানের সাংস্কৃতিক পুনর্বাসন ঘটল। তারপর ২৫শে মার্চ ১৯৭১ তারিখ থেকে শুরু হল বাংলাদেশ বনাম ইয়াহিয়া চক্রের যুদ্ধ। তারপর বাংলাদেশ স্থাপিত হয়েছে এবং বাংলাদেশ স্বাধীনতা ঘোষণা করেছে।

এই গ্রন্থের ভূমিকায় অন্নদাশংকর রায় বলেছেন—'বাংলাদেশ স্বাধীনতা ঘোষণা করেছে। এ আমাদের জীবনের পরম সৌভাগ্য।' কারণ বাংলাদেশ স্বাধীন হলে হিন্দু-মুসলমানের মনকষাকষির অবসান ঘটবে। যে দুঃস্বপ্নের রাত্রির বিভীষিকায় সমগ্র বাংলাদেশ আতংকিত হয়েছিল—সেই দুঃস্বপ্নের শেষ হবে।

মনোজ বসু দীর্ঘদিন ধরে এই দুঃস্বপ্নের অবসান ঘোচানোর কামনায় নানাভাবে কাজ করে এসেছেন। তাঁর 'রক্তের বদলে রক্ত' উপন্যাস ও 'মানুষ নামক জন্তু' নামক উপন্যাস দুটি ১৩৬৬ সালে প্রকাশিত হয়। এই দুটি উপন্যাসই প্রকাশিত হওয়ার পর সর্বত্র প্রশংসিত হয় তার বক্তব্যের জন্য। গতানুগতিক বিষয়-বস্তুর পথ পরিহার করে যে-কাহিনী লেখক পরিবেশন করেছেন তা বাঙালীর কাছে অজানা নয়। এই সমস্যা এইভাবে তুলে ধরার মধ্যে লেখক এক অত্যাশ্চর্য সাহসিকতার পরিচয় দিয়েছিলেন। তাঁর নাটক 'নতুন প্রভাতে'ও এই সমস্যাই তিনি

অসামান্য লিপিকুশলতায় ফুটিয়ে তুলেছিলেন।

এই সব উপন্যাস, নাটক ও গল্পগুলির মধ্যে যে চিত্র আঁকা হয়েছে তা বাস্তবানুগ এবং সুস্পষ্ট। চরিত্রগুলি সর্বজনপরিচিত। তাদের কথাবার্তা আচার-আচরণ সকলেরই জানা। মনোজ বসুর কৃতিত্ব সেইখানে, সেই আটপৌরে ভঙ্গীটুকু তাঁর এই কাহিনীগুলিকে মর্যাদামণ্ডিত করেছে।

আজ নতুন প্রভাতের সম্ভাবনা। পূর্ব বাংলার সাম্প্রতিক ঘটনাবলী প্রমাণ করেছে ধর্মগত ঐক্যের কোন মূল্য নেই। মুসলমানও মুসলমানকে নির্বিচারে হত্যা করতে পারে। নারী, শিশু, বৃদ্ধ সবই তার কাছে কীট-পতঙ্গের মতো তুচ্ছ। যে অত্যাচারী যে শোষণ করে, তার কাছে শাসনের একমাত্র অর্থ শোষণ। পূর্ব পাকিস্থানের মানুষেরা এতাবৎ পশ্চিম পাকিস্তানের মুরুব্বিদের দ্বারা শোষিত হয়েছে আজ তারা রুখে দাঁড়িয়েছে পশ্চিমের অত্যাচারের প্রতিবাদে। এই সূত্রে তাদের এক মহৎ উপলব্ধি ঘটেছে, তারা বুঝেছে ভাষার বন্ধনই সবচেয়ে প্রবল। এই মুখের ভাষাই আজ তাদের নব-চেতনায় প্রতিষ্ঠিত করেছে।

দুঃস্বপ্নের যে অমানিশায় আকাশ আচ্ছন্ন ছিল সেই দুঃস্বপ্নের ঘোর কেটে এসেছে—নতুন প্রভাত সমাগত। এই পরম লগ্নে মনোজ বসুর এই কাহিনীগুলি নতুন মৈত্রীর রাখীবন্ধনে দুই বাংলার মানুষকে বাঁধবে আর সেই তার চরম সার্থকতা।

—অভয়ঙ্কর

সে এক দুঃস্বপ্ন ছিল (অমনিবাস) মনোজ বসু। প্রকাশক : বেঙ্গল পাবলিসার্স প্রাইভেট লিমিটেড। কলিকাতা—১২। দাম : এগার টাকা মাত্র।

সাহিত্যের খবর

বাংলাদেশ ও আঁদ্রে মালরো :

বিখ্যাত ফরাসী লেখক এবং জেনারেল দ্য গলের মন্ত্রিসভার সংস্কৃতি বিভাগের মন্ত্রী মঃ আঁদ্রে মালরো সম্প্রতি মন্তব্য করেছেন—বাংলাদেশের সমস্যা বিশ্বের বৃহত্তম ট্রাজেডিগুলির অন্যতম। দিল্লীতে বাংলাদেশ বিষয়ে যে আন্তর্জাতিক সম্মেলন বসবে তার উদ্যোক্তা শ্রীযুক্ত জয়প্রকাশ নারায়ণকে একটি পত্রে মঁসিয়ে আঁদ্রে মালরো এই উক্তি করেছেন। তিনি বলেছেন বাংলাদেশের মানুষের কণ্ঠে ধ্বনিত হোক—আমরা সবাই হয়ত মরব, তবু আমরা আত্মসমর্পণ করবো না। বাংলাদেশ চিরদিন তার সাহসিকতার জন্য পরিচিত। আবেদননিবেদনের পথ নিরর্থক। যার প্রয়োজন সর্বাধিক তা হল বাংলাদেশের সামরিক সংগঠন। যুক্তরাষ্ট্রও ভিয়েতনামকে ধ্বংস করতে পারেনি।

শেকস্‌পীয়র ও একজন অভিনেত্রী :

শেকস্‌পীয়রের 'ওথেলো' মঞ্চস্থ হবে। ডাইরেক্‌টার পিটার ওইসটন মারমেড থিয়েটারে নিয়মিত মহড়ার ব্যবস্থা করেছেন। ডেসডেমনার ভূমিকায় অভিনয় করবেন বিভিন্ন পুরস্কারবিজয়িনী কে বার্লো (২৪)। সবই স্থির, কিন্তু শেষ মুহূর্তে অভিনেত্রী বেঁকে বসেছেন, তিনি সম্পূর্ণ নগ্নদেহ প্রদর্শন করতে পারবেন না। তিনি সাংবাদিকদের বলেছেন—

"The idea was ridiculous. Nudity is just not necessary in this Classical Shakespearean role. I am sure the Bard of Avon never wanted a nude death scene"

অভিনেত্রীর উক্তিতে মহাকবির সম্মান অক্ষুণ্ণ রইল।

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় অসুস্থ :

সংবাদে জানা গেল, তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় সহসা গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়েন। বিগত বৃহস্পতিবার ৯ই সেপ্টেম্বর তাঁর শারীরিক অবস্থা সংকটাপন্ন হয়। শনিবার প্রাতে সংবাদ নিয়ে জানা গেল, তাঁর শারীরিক অবস্থা বর্তমানে উন্নতির পথে।

মহিলা সাহিত্যিকের শোচনীয় মৃত্যু :

অন্নপূর্ণা ভাদুড়ী ছোটগল্প, উপন্যাস প্রভৃতি রচনা করে যথেষ্ট খ্যাতি অর্জন করেন। সম্প্রতি উত্তর কলিকাতার একটি সরকারী বাসভবনে রক্তাপ্লুত অবস্থায় তাঁর প্রাণহীন দেহটি আবিষ্কৃত হয়। অন্নপূর্ণা ভাদুড়ী চিরকুমারী ছিলেন এবং টেলিফোন বিভাগের উচ্চপদস্থ কর্মী ছিলেন।

সাহিত্যিকের দুর্গতি :

ভারতবর্ষ সম্পাদক ফণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় জনপ্রিয় সাংবাদিক ও সাহিত্যিক। একদা তিনি 'বসুমতী', 'বঙ্গবাণী', 'বাংলার কথা' প্রভৃতি বাংলা দৈনিকপত্রে কৃতিত্বের সঙ্গে কাজ করেছেন। 'ভারতবর্ষ' পত্রিকার সঙ্গেও সম্পাদনাসূত্রে অনেকদিন যুক্ত ছিলেন। বর্তমানে 'ভারতবর্ষ' পত্রিকাটি অবলুপ্ত এবং ফণীন্দ্রনাথ রোগজীর্ণ এবং অন্ধ অবস্থায় তাঁর আগরপাড়ার বাসভবনে অতিকষ্টে দিনযাপন করছেন। সরকার থেকে তাঁকে যে পেন্সন দেওয়া হয় তা কিছুকাল পূর্বে হ্রাস করে মাত্র পঁচাত্তর টাকা করা হয়েছে। সাংবাদিক শ্রীপার্থ চট্টোপাধ্যায় একটি আবেদনপত্রে প্রবীণ সাংবাদিকের এই করুণ অবস্থার কথা প্রকাশ করেছেন। ফণীন্দ্রনাথের গুণগ্রাহীদের এই দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করি।

অশ্লীলতার বিরুদ্ধে :

পুজোর বাজারে যখন বহুবর্ণে মুদ্রিত কামোদ্দীপক প্রচ্ছদভূষিত অজস্র সাময়িকপত্রের বিশেষ সংখ্যা অবাধে বিক্রয় হচ্ছে, তখন অশ্লীলতার বিরুদ্ধে অভিযান নিঃসন্দেহে একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা। বিগত শুক্রবার ১০ই তারিখে শিল্প ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে অশ্লীলতা প্রচারের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য গণতান্ত্রিক যুব সংগঠনের পক্ষ থেকে একটি বিরাট মিছিল রাজপথে নানাবিধ শ্লোগান উচ্চারণ করে রাজভবনের সামনে বিক্ষোভ প্রদর্শন করে। মানসিক সুস্থতার ভারসাম্য বজায় রাখার জন্য এই দাবীকে অযৌক্তিক বলা যায় না।

নতুন বই

বিদ্যাসাগর পরিচয় — রাসবিহারী রায়। কিশোরকল্যাণ পরিষদ। মূল্য—তিন টাকা।

এই অবক্ষয়ের যুগে 'বিদ্যাসাগর পরিচয়' আমাদের চোখের সামনে নতুনভাবে বাঁচার বাণী বহন করে আনল। বইটি কিশোর কল্যাণকল্পে প্রকাশিত, কিন্তু বড়দের কাছেও এর একটা পৃথক গুরুত্ব আছে। বর্ণপরিচয়ের সময়ে জীবনের প্রথম পাঠে হোক বা চরিত্র গড়ার প্রথম পাঠে হোক বিদ্যাসাগর হচ্ছেন আমাদের মহান আদর্শ। গ্রন্থটি বিভিন্ন অধ্যায়ে বিদ্যাসাগরের সমগ্র জীবনের সংক্ষিপ্ত অথচ গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাবলী লিপিবদ্ধ হয়েছে। বিদ্যাসাগরের ব্যক্তিজীবনের কাহিনী আমাদের মনকে গভীরভাবে নাড়া দেয়। এই প্রসঙ্গে উল্লিখিত বিদ্যাসাগরের মায়ের চরিত্র-সুষমা লেখক অত্যন্ত সুন্দরভাবে প্রকাশ করেছেন। ভগবতী দেবী সন্তানের কাছ থেকে তিনটি গহনা চেয়েছিলেন—গ্রামের ছেলেদের জন্য একটি দাতব্য বিদ্যালয়, গরীব মানুষদের জন্য দাতব্য চিকিৎসালয়, আর দরিদ্র ছেলেমেয়েদের থাকা-খাওয়ার ব্যবস্থা। মাতৃভক্ত বিদ্যাসাগর মায়ের সকল ইচ্ছাই পূর্ণ করেন।

লেখক ভাবের এবং ভাষার আতিশয্য সর্বদা পরিহার করেছেন। মাঝে মাঝে অবশ্য একই ধরনের উক্তির পুনঃ ব্যবহার দেখি। অবশ্য লেখক যতটা সম্ভব সহজ সরল ভাষায় শিশুদের উপযোগী করে গ্রন্থটি রচনা করেছেন। বিদ্যাসাগর সেই প্রকৃতির ব্যক্তি যাঁর নিজের আচরণই

আমাদের কাছে মহান বাণীস্বরূপ। লেখক যতটা সম্ভব বিদ্যাসাগরের ব্যক্তিত্বটিকে তুলে ধরেছেন।

চাঁদে পাড়ি—সুনির্মল রায়। বিদ্যাভারতী, ৮/সি ট্যামার লেন, কলিকাতা—৯। এক টাকা পঞ্চাশ পয়সা।

লেখক অ্যাপোলো — ১১ অভিযানের কাহিনী গল্পের মতো করে ছোটদের শুনিয়েছেন এবং সেই সঙ্গে কিছু বিজ্ঞানের কথা জানাতে চেষ্টা করেছেন। জাতীয় অধ্যাপক শ্রীসত্যেন্দ্র বসু এই বইয়ে একটি ভূমিকা লিখে আশা প্রকাশ করেছেন যে, 'অল্পবয়স্ক পাঠক মহলে বইখানির যথেষ্ট সমাদর হবে।' বইয়ের গল্পের অংশটি ছোটদের নিশ্চয়ই ভাল লাগবে। বিজ্ঞানের কথার অংশে অল্প জায়গায় অনেক কথা বলতে চেষ্টা করার দরুন কিছুটা দুরূহতা ও অস্পষ্টতা এসে গিয়েছে। তাহলেও এই বইটি ছোটদের মনে বিজ্ঞান সম্পর্কে আগ্রহ তৈরী করবে নিশ্চয়ই। অনেকগুলো ছবি থাকার জন্যে গল্পের আকর্ষণ বেড়েছে।

লোহ ও ইস্পাত—ডক্টর হরেন্দ্রনাথ রায়। কল্যাণী প্রকাশন, ৩ বৃটিশ ইণ্ডিয়ান স্ট্রীট, কলিকাতা—১। নয় টাকা।

এই বইটি বিশেষ করে টেকনিক্যাল ও ইঞ্জিনীয়ারিং কলেজের প্রথম পর্যায়ের ছাত্রদের উপযোগী। পরিবর্ধিত ও পরিমার্জিত দ্বিতীয় সংস্করণ। প্রথম তিনটি পরিচ্ছেদে আলোচনা আছে লাল মাটি, কোক ও চুনাপাথর সম্পর্কে। তার পরে একটি পরিচ্ছেদে লোহ ও অন্য একটি পরিচ্ছেদে পিগ আয়রন। বাকী এগারোটি পরিচ্ছেদে ইস্পাত। বিষয়টি দুরূহ, কিন্তু লেখক একদিকে উচ্চ ডিগ্রীধারী, অন্যদিকে ব্যাপক অভিজ্ঞতাসম্পন্ন, তাই বিষয়টিকে সুন্দর বোধগম্যরূপে উপস্থিত করতে পেরেছেন। ধাতুবিদ্যা যাঁরা শিখতে চান তাঁরা তো বটেই, সাধারণ পাঠকরাও বইটি পড়ে উপকৃত হবেন।

প্রশ্নোত্তরে রবীন্দ্রসংগীত — শম্ভুনাথ ঘোষ ও কালিদাস চট্টোপাধ্যায়। ইন্দ্রনাথ ঘোষ, ১৬৬ বি বি গাঙ্গুলী স্ট্রীট, লিলি লজ, কলিকাতা-১২। মূল্য ছয় টাকা।

রবীন্দ্রনাথের অসামান্য প্রতিভায় যাদুতে উন্মোচিত হল বৈচিত্র্যময় বাংলা গানের এক নূতন দিগন্ত। জারি, সারি, বাউল, ভাটিয়ালী, কীর্তন প্রভৃতির সঙ্গে আসরে এল এক নবীন আগন্তুক, বাণী ও সুরের ঐশ্বর্যে যে অচিরেই নিজের জন্য একটি স্বতন্ত্র স্থান করে নিল। ক্রমে ক্রমে প্রতিটি হৃদয়েই এর জন্য সংরক্ষিত হল একটি চিরস্থায়ী আসন। তাই আজকের বাংলাদেশে প্রতিটি গৃহেই রবীন্দ্রসংগীতের চর্চা। কিন্তু রবীন্দ্রসঙ্গীতের ক্রিয়াত্মক অংশের যতটা চর্চা হচ্ছে, ঔপপত্তিক অংশ সেই পরিমাণে উপেক্ষিত। এই বিষয়ে কিছু পুস্তক থাকলেও তা যথেষ্ট নয়, বিশেষ করে শিক্ষার্থীদের পক্ষে উপযোগী পুস্তকের সংখ্যা নিতান্তই সীমিত। অধ্যাপক ঘোষ ও চট্টোপাধ্যায়ের 'প্রশ্নোত্তরে রবীন্দ্রসঙ্গীত' সেই অভাব অনেকাংশে পূরণ করবে। বিশেষ করে রবীন্দ্রসংগীত সম্বন্ধীয় আলোচনাগুলি, যেমন—ঠাকুর-পরিবারের সঙ্গীতচর্চা, রবীন্দ্রনাথের বাল্য-জীবনে শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের প্রভাব, রবীন্দ্র-সঙ্গীতে বাউল, কীর্তন, প্রাদেশিক ও পাশ্চাত্য সংগীতের প্রভাব, রবীন্দ্র-সঙ্গীতে শব্দোচ্চারণের মহত্ব, বিষয়বস্তুর বৈচিত্র্য, ভানুসিংহ পদাবলীর বৈশিষ্ট্য প্রভৃতি যথেষ্ট তথ্যপূর্ণ এবং মনোগ্রাহী হয়েছে। পুস্তকটিতে রবীন্দ্রসঙ্গীত ব্যতীত শাস্ত্রীয় সঙ্গীতেরও একাধিক বিষয়ের উপর আলোচনা রয়েছে। যেমন—সঙ্গীত, শ্রুতি, ঠাট, গ্রাম, মূর্ছনা, অলংকার, ছন্দ, লয় ইত্যাদি। বিভিন্ন তাল এবং বাদ্যযন্ত্রাদির বিষয়ে আলোচনাও লেখকদ্বয় এই পুস্তকের অন্তর্ভুক্ত করেছেন। প্রত্যেকটি বিষয়ের আলোচনা সংযত এবং পরিমিত। বিশেষ করে এইগুলি দক্ষ উপস্থাপনার গুণে এবং সহজ-সরল বাচনিক ভঙ্গীর বৈশিষ্ট্যতায় আরও আকর্ষণীয় হয়েছে। সামগ্রিকভাবে পুস্তকটি রবীন্দ্রসঙ্গীত এবং শাস্ত্রীয়-সঙ্গীতের যুগল-মিলনে সঙ্গীতের তত্ত্বগত শিক্ষার একটি অপরিহার্য পুস্তক হিসাবে পরিগণিত হবে। আশা করা যায় পুস্তকটি সুনাম অর্জন করবে।

হেসে খুন (কৌতুক কাহিনী) — প্রবন্ধ। কোয়ালিটি পাবলিশার্স, ৩ রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট, কলকাতা : ৯। ছ' টাকা।

টুকরো টুকরো কৌতুককর ঘটনা, শুরু কিন্তু গুরুগম্ভীর প্রেক্ষাপটে। গোয়েন্দা গল্পের শ্বাসরুদ্ধকর পরিবেশ যেন। গল্পের গাঁথুনি একেবারে উঁচু পর্দায় বাঁধা, যাতে পাঠকমন শুরুতেই সচকিত হয়ে ওঠে। কাহিনীতে হঠাৎ ইতি টানার আকস্মিকতা পাঠককে সজোরে নাড়া দেয়, হাসির তরঙ্গে ভাসিয়ে নিয়ে যায়। 'প্রবন্ধ' নামের আড়ালের মানুষ পাকা কলমবাজ—ঘটনার স্বাভাবিক বুননে, কাহিনীর কূট বিস্তারে, শব্দের কারু-কৃতিতে এবং ব্যঙ্গ-কৌতুককর ঘটনার সমাবেশে তারই সুস্পষ্ট ছাপ। জমিয়ে গল্প বলতে পারেন লেখক। কুড়িটি হাসির ঘটনা নিয়েই 'হেসে খুন'। সবচেয়ে ভালো লেগেছে অথ 'হরধনু ঘটিত', 'বিজ্ঞাপন', 'কুকুর নিরুদ্দেশ' ও 'গল্প-লেখকের গল্পের গল্প'। আজকের এই বিষন্ন পরিবেশে বইটি 'স্পিরিলিফের' মতো কিন্তু নামকরণে কেমন যেন নাবালক-নাবালক গন্ধ।

মানব মন (জুলাই-সেপ্টেম্বর '৭১) — সম্পাদক : ডাঃ ধীরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়। পাভলভ ইনস্টিটিউট, ১৩২।১এ, বিধান সরণী, কলকাতা : ৪। ১.২৫ টাকা।

আনন্দের কথা আজকে সাধারণ মানুষের মধ্যে বিজ্ঞান সম্পর্কে ঔৎসুক্য এবং চেতনা ধীরে ধীরে জাগ্রত হচ্ছে। বিজ্ঞান বিষয়ে সাময়িক পত্রিকার 'ফিচার' এরই ফলশ্রুতি। সাধারণ মানুষের মধ্যে বিজ্ঞানচেতনা আনবার মূলে এ-দেশের যে স্বল্পসংখ্যক বিজ্ঞান-বিষয়ক পত্রিকা আন্তরিকভাবে কাজ করে যাচ্ছে তার মধ্যে 'মানব মন' বিশেষ উল্লেখযোগ্য ভূমিকা গ্রহণ করেছে। মনোবিজ্ঞান, জীববিজ্ঞান ও সমাজবিজ্ঞানের বিবিধ দুরূহ তত্ত্ব ও ধারার সঙ্গে জনমনের সংযোগসাধন করে আসছে এপত্রিকা দীর্ঘ দশ বছর ধরে। এটা একটা সাময়িক পত্রিকার, বিশেষ করে বিজ্ঞান-বিষয়ক পত্রিকার জীবনে কম গুরুত্বপূর্ণ ও গৌরবজনক অধ্যায় নয়। এই পত্রিকার পিছনে যাঁরা নিরলসভাবে বিজ্ঞান এবং জনমনের সেবা করে যাচ্ছেন তাঁরা অবশ্যই ধন্যবাদার্হ। এই ত্রৈমাসিক পত্রিকার আলোচ্য সংখ্যায় লিখেছেন : জি নেদোশিভিন, মনোবিদ, সন্তোষকুমার দে, কে তারাসভ ও এম কেলনার, সাঁইৎ রায়, ধীরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়, নারায়ণ চৌধুরী, জ্যোতির্ময় চট্টোপাধ্যায় ও সন্তোষ বসু। বিজ্ঞানতত্ত্ব জিজ্ঞাসুরা পত্রিকাটি দেখতে পারেন।

নবাঙ্কুর (বাংলাদেশ সংখ্যা) — সম্পাদক ধনঞ্জয় দাস ও বিকাশচন্দ্র দাস।। ৩০, রামকৃষ্ণ সমাধি রোড, কলকাতা-৫৪।। দাম : এক টাকা।।

বাংলাদেশের মুক্তিসংগ্রামের সমর্থনে লেখা কবিতা নিয়ে প্রকাশিত হয়েছে 'নবাঙ্কুর'-এর এই সংখ্যাটি। অন্যতম সম্পাদক বিকাশচন্দ্র দাস সঙ্কলিত কবিতাগুলো সম্পর্কে লিখেছেন : 'এই কবিতাগুলোর মধ্যে রয়েছে মহৎ কাজে বাঙালীর পাথরের মত শক্ত হয়ে যাওয়া আর ইস্পাতদৃঢ় ঐক্য গড়ে তুলে শত্রুর মোকাবিলা করবার জন্য দৃঢ় প্রত্যয়ের সুর।' উল্লেখযোগ্য কবিদের মধ্যে আছেন হাসান হাফিজুর রহমান, আলাউদ্দিন আল আজাদ, ফজলে লোহানী, বিমলচন্দ্র ঘোষ, নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী, দক্ষিণারঞ্জন বসু, মণীন্দ্র রায়, তরুণ সান্যাল, ধনঞ্জয় দাশ, সিদ্ধেশ্বর সেন, কৃষ্ণ ধর, গৌরাঙ্গ ভৌমিক, গণেশ বসু, সত্য গুহ, তুলসী মুখোপাধ্যায়, চিত্ত ঘোষ প্রমুখ। রবীন্দ্রনাথ, নজরুল, জীবনানন্দ, রজনীকান্ত, সুকান্ত ভট্টাচার্যের কবিতাগুলির পুনর্মুদ্রণ সময়োপযোগী হয়েছে।

শতবর্ষ পরে (সংকলন) — সম্পাদনা : মৈত্রেয়ী দেবী। ১৩।১, পাম অ্যাভেন্যু। কলকাতা-১৯। দাম পাঁচ টাকা।

রবীন্দ্রনাথের সম্বন্ধে লেখা এই প্রবন্ধ সংকলনটি রবীন্দ্র অনুরাগী পাঠককে মুগ্ধ করবে। দুই বাংলার লেখকদের সঙ্গে কয়েকজন বিদেশীর রচনাও সংকলিত হয়েছে। যাঁদের রচনা আছে প্রতিমা ঠাকুর, বিষ্ণু দে, সুসান কার্পেলেস, লুডোমিলা স্তোয়ানভ, জে বেপী, মৈত্রেয়ী দেবী, আনিসুজ্জামান, বদরুদ্দিন ওমর, মুহম্মদ আবদুল হাই, শামসুর রাহমান, সৈয়দ মুর্তাজা আলি, হায়াৎ মামুদ, আবদুল মান্নান সৈয়দ এবং আবদুল ফজল।

এখন সত্তায় বাঁচি ॥ দক্ষিণারঞ্জন বসু

অনাদিকালের প্রথা নকলনবিশী,
আবির্ভাব অবস্থান আর তিরোধান!
বিশ্ব জুড়ে পুনরাবৃত্তি। অন্ধকার সৃষ্টি
আমাদেরই। প্রয়োজনে প্রদীপ জ্বালাই।
স্বপ্নেরা সহস্র চোখে আমাদের দেখে,
ঘটে তাই অস্তিত্বের বিস্তৃতি সহজে।
রাত্রির শরীরে হাত দিলেই চমক,
সুনিবিড় আত্মীয়তা এখন কোথায়?
সর্বত্রই অতি দীন ভিখারী মানুষ,
আশার টুকরোগুলি সীসের ওজন।
তবু চেষ্টা, বিষণ্ণতামাখা ক্লান্তিকালে
ধর্মনাশা কর্মনাশা গণ-টোকাটুকি!
কলকাতা নৈরাশ্যে কাঁদে বড়ই দুর্দিন,
প্রকল্পের গল্পে গল্পে বিমূঢ় যৌবন!
এখন পাহারা নেই নীতিবোধ শেষ,
জীবনকে ছুঁয়ে ছুঁয়ে কেবল সত্তায়
কোনোক্রমে বেঁচে থাকা নিঃশর্ত সঙ্কোচে।
উভয় গোলার্ধব্যাপী শুধু গোলাগুলী—
নির্ভরতা নেই কিছু হতভম্ব ব্যথা,
তবু আমি দিগ্বিজয়ী সম্ভাব্য সংগ্রামে!

বাইরে থেকে ভেতর থেকে ॥

দীপেন রায়

বাইরে থেকে কে যেন ডেকেছিলো আয়
কে যেন ভেতর থেকে বলেছিলো যা—
বছর কুড়ি কি আরো দুচার বছর
আগে পিছুর কথা এসব।
ভেতরে ভেতরে এত যে আনাগোনা
এত কথা উপকথার গাঁথুনি
রক্তে এত মেলামেশা
মেলায় না এলে যেন এত মানুষের অনুভূতি
তার কি চেতনা ছুঁয়ে ধরা পড়তো এতই সহজে।

বাইরে থেকে সে বলেছিলো আয়
ভেতর থেকে যে বাইরে আনলো
তারা দুজনে এই উৎসব আলোয়
জন্মসাক্ষী হয়ে রইলো।
কাল আমাকে তারা ভেঙে ভেঙে
টুকরো বহু অস্তিত্বের প্রবাল ছড়িয়েই
যেন ডাক দেবে সংক্রান্তিতে পৌষের মেলায়
কপিল মুনির জন্য অদম্য উৎসাহে
সমুদ্রের মুখ থেকে ঠেলে আসা নতুন মাটিতে।

প্রার্থনার তন্ময়তায় ॥ রবীন শূর

যাকে চাই তার উদাসীন ব্যবহার ক্রমশ কুড়িটি আঙুলের
বাড়ন্ত নখের ধার বাড়ায়   হিংসায় ক্রোধে
বত্রিশ দাঁতের গোড়ায় কালকূট আক্ষেপের সঞ্চিত গরল
দু বাহুর পেশীর আগ্রহে ভয়ংকর জেদ
ময়ালের মত ক্রমাগত চারধারের বাতাস হাতড়াচ্ছে

বিস্তারিত দুই করতলে আবহমান প্রার্থনায়
অলীক পুরস্কারের শূন্যতায় যার অলৌকিক প্রতিমা
মূর্তির মহিমায় কিছুতেই উষ্ণ হতে পারে না
সেই কুহকিনীর জ্বালায়
অহোরাত্র জ্বলে জ্বলে ঘুম নেই স্বপ্নের স্থপতি
নিজের নখেই ক্ষতবিক্ষত
ক্ষিপ্ত কামড়ে হৃৎপিণ্ডের রক্তাক্ত গহ্বরে
কোথাও নীলিমাবন্দিত নক্ষত্রের আকাশ নেই
ছত্রাকার গরলের দগ্ধ হাহাকারে

স্বপ্নগুলি নষ্ট হতে হতে হন্তারক চৈতন্যের অস্থির দুর্নীতি
একা একা নিজেকেই নষ্ট করে
বিষাদ এড়িয়ে জন্মান্তরের প্রার্থনার তন্ময়তায়
স্বপ্নের ভিতর স্বপ্নে চিরকালের মত স্তব্ধ হয়ে থাকা
বুঝি বড় কঠোর!

চিত্তরঞ্জন ও সুভাষচন্দ্র

শংকরীপ্রসাদ বসু

দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন

সুভাষচন্দ্র তাঁর রাজনৈতিক জীবনের একেবারে সূচনায় দেশবন্ধুর কাছে নিজেকে নিবেদন করেছিলেন। সে হল ১৯২১ সালের ফেব্রুয়ারি মাসের কথা। আরও প্রায় কুড়ি বছর পরে, ১৯৪০-এর জুন মাসে সুভাষচন্দ্র যখন কংগ্রেস থেকে বিতাড়িত বিদ্রোহী নায়ক, যখন রাজনৈতিক জীবনের পরিণত পর্যায়ে পৌঁছে গেছেন, তখনো তিনি নিজেকে দেশবন্ধুর একনিষ্ঠ ভক্ত-শিষ্য বলেই ঘোষণা করেছিলেন। ১* মধ্যবর্তী-কালেও সুভাষচন্দ্র দেশবন্ধুকে নিজ রাজনৈতিক গুরু বলে ঘোষণা করতে কখনো কুণ্ঠিত হননি। তার মধ্যে সবচেয়ে বলিষ্ঠ ও বিস্তৃত স্বীকৃতি পাই ১৯৩৪ সালে লেখা তাঁর সুবিখ্যাত 'ইণ্ডিয়ান স্ট্রাগল' গ্রন্থের মধ্যে।

প্রথমেই প্রশ্ন করা যায়—এইসব স্বীকারোক্তি সত্ত্বেও সত্যই কি দেশবন্ধু সুভাষচন্দ্রের রাজনৈতিক গুরু ছিলেন? উভয়ের রাজনৈতিক কর্মজীবনে ঐক্যের মত পার্থক্যও কি কিছু কম ছিল? শেষ পর্যন্ত মনে হয়—মূলগত ব্যাপারে পার্থক্যই বোধহয় বেশী।

১৫ জুন, ১৯৪০ তারিখের 'ফরোয়ার্ড ব্লক' পত্রিকায় Long live Desbondu নামক স্বাক্ষরিত সম্পাদকীয়ের শেষভাগে সুভাষচন্দ্র লিখেছিলেন :

> "The writer was a devoted disciple of the Deshbandhu and when speaking of the departed great, it is difficult for him to do so with restraint. The debt he owes him is one that cannot be repaid. In fact, Deshbandhu's teachings have become a part of his being". (Crossroads)

সুভাষচন্দ্রের এই লেখাটির একটি বিশেষ গুরুত্ব আছে। এর দ্বারা তিনি পরিষ্কার জানিয়ে দিয়েছিলেন—তিনি কোনোভাবেই গান্ধী-প্রভাবিত নন। তৎকালীন ভারতীয় রাজনীতিতে এই ঘোষণার মূল্য যথেষ্টই ছিল। এর ৬ মাস পরেই সুভাষচন্দ্র ভারত ত্যাগ করে যাবেন।

বাহ্য ঐক্য অবশ্য ছিল। ১৯২২ সালে গয়া-কংগ্রেসের সভাপতি চিত্তরঞ্জন, তাঁর কাউন্সিল-প্রবেশ প্রস্তাব কংগ্রেসে পরাভূত হলে পদত্যাগ করেছিলেন, এবং তারপরে স্বরাজ্য দল গঠন করেছিলেন। ১৯৩৯ সালে ত্রিপুরী কংগ্রেসের সভাপতি সুভাষচন্দ্রের বিরুদ্ধে পন্থ-প্রস্তাব পাস করা হলে সুভাষচন্দ্র শেষ পর্যন্ত পদত্যাগ করতে বাধ্য হন এবং ফরোয়ার্ড ব্লক দল গঠন করেন। স্বরাজ্য দলের মধ্যে যেমন চিত্তরঞ্জন কয়েকটি নীতির ভিত্তিতে নানা ধরনের মানুষকে সমবেত করতে চেয়েছিলেন, তেমনি প্রথম দিকে ফরোয়ার্ড ব্লকও কোনো পার্টি ছিল না, কংগ্রেসের অভ্যন্তরে বামপন্থী দলগুলির একটি সাধারণ "প্ল্যাটফর্ম" ছিল। হিন্দু-মুসলমান সমস্যার সমাধানে দেশবন্ধুর 'বেঙ্গল প্যাক্টের' ধারাপথেই সুভাষচন্দ্র কলকাতা কর্পোরেশনে কংগ্রেস-লীগ চুক্তি করেছিলেন।

সুভাষচন্দ্র

পার্থক্যও যথেষ্ট। দেশবন্ধুর দেহ-ত্যাগের কয়েক বৎসর পরে কারামুক্ত সুভাষচন্দ্রের প্রথম যে স্পষ্ট চেহারা দেখা গিয়েছিল সে মূর্তি দেশবন্ধুর অভিপ্রেত হত কি? গান্ধীজী তো তা দেখে আঁতকে উঠেছিলেন, কিংবা মহাবিরক্তিতে অত্যন্ত হেসে ফেলেছিলেন। ১৯২৮-এর ঐ কলকাতা কংগ্রেসে সুভাষচন্দ্র 'সামরিক' চেহারায় হাজির। শুধু তাই নয়—খোলা-খুলিভাবে পণ্ডিচেরীর ধ্যান-প্রস্থান কিংবা সবরমতীর গো-যানে উত্থানের সমালোচক। দেশবন্ধুর মুখের কথায় যদি বিশ্বাস করতে হয়, বলতেই হবে, তিনি শেষ পর্যন্ত অহিংসায় সত্যই বিশ্বাসী হয়েছিলেন। গান্ধীজীর রাজনৈতিক ভ্রান্তির বিরুদ্ধে

১* ১৬ ফেব্রুয়ারী, ১৯২১ তারিখে সুভাষচন্দ্র কেমব্রিজ থেকে দেশবন্ধুকে এক দীর্ঘ পত্রের মধ্যে লিখেছিলেন :

'আপনি বাংলাদেশে আমাদের সেবা-যজ্ঞের প্রধান ঋত্বিক—তাই আপনার নিকট আমি আজ উপস্থিত হইয়াছি—আমার যৎসামান্য বিদ্যা বুদ্ধি শক্তি ও উৎসাহ লইয়া। মাতৃভূমির চরণে উৎসর্গ করিবার আমার বিশেষ কিছুই নাই—আছে শুধু নিজের মন ও নিজের এই তুচ্ছ শরীর।...... আমি আজ প্রস্তুত—আপনি শুধু কর্মের আদেশ দিন।' ('তরুণের স্বপ্ন')

২ মার্চ তারিখের আর একটি চিঠিতেও সুভাষচন্দ্র একই কথা লিখেছিলেন।

DECEMBER 11 1921

MR C R DAS ARRESTED

ALSO OTHER CONGRESS & KHILAFAT LEADERS

PICKETING AT BARA BAZAR CONTINUES

FORTY VOLUNTEERS ARRESTED

GREAT SENSATION IN THE CITY

দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ গ্রেপ্তার। আগুনের মত ছড়িয়ে পড়েছিল সংবাদ। মডারেটদের মুখপত্র বেঙ্গলী পত্রিকায় ১১ ডিসেম্বর, ১৯২১-এর সংবাদ

তিনি সমালোচনা করতে পারেন কিন্তু গান্ধী-জীবননীতির প্রতি যথেষ্ট পক্ষপাত বোধ করেছিলেন। *২ সুভাষচন্দ্র অপরদিকে কেবল রাজনীতিতে নয়, জীবননীতিতেও গান্ধী-বিরোধী। তাঁকে আমরা কংগ্রেসে 'ন্যাশন্যাল প্ল্যানিং'-এর প্রবর্তকরূপে দেখতে পাই, যার মধ্যে বৃহৎ শিল্পায়নকে অগ্রাধিকার দেওয়া হয়েছিল। এই বৃহৎ শিল্পায়ন কেবল গান্ধীজীর কুটীরশিল্প কেন্দ্রিক জীবনধর্মকে আঘাত করেনি—তার রূঢ়তা ও কলুষ চিত্তরঞ্জনের আধ্যাত্মিক স্পর্শকাতরতাকেও আহত করতে পারত।

দেশবন্ধুর সঙ্গে সুভাষচন্দ্রের পার্থক্যের আরও নানা বিষয় দেখিয়ে দেওয়া যায়। অপরপক্ষে এ-একথাও মনে রাখতে হবে, সুভাষচন্দ্রের মত তীক্ষ্মবুদ্ধি মনস্বী মানুষ দেশবন্ধু সম্বন্ধে তাঁর বক্তব্যের পক্ষ সমর্থনে যুক্তি দেখাতে নিশ্চয়ই সমর্থ ছিলেন। দেশবন্ধু কিভাবে, কোন্ অর্থে সুভাষচন্দ্রের রাজনৈতিক গুরু, তার প্রসঙ্গে পুনশ্চ আমরা আসব, কিন্তু তার আগে উভয়ের ব্যক্তি-সম্পর্কের ইতিহাসে অবশ্যই প্রবেশ করতে হবে, কারণ কেবল তাঁদের রাজনৈতিক সম্পর্কের স্বরূপ নির্ণয়ই এই রচনার একমাত্র উদ্দেশ্য নয়।

॥ ২ ॥

দেশবন্ধুর সঙ্গে সুভাষচন্দ্রের প্রথম সাক্ষাৎ-পরিচয়ের চিত্রটি শ্রীমতী বাসন্তী দেবীর স্মৃতি-অনুযায়ী এই রকম:

'প্রথম তাকে (সুভাষকে) কবে দেখি জানো? সে অনেককাল আগের কথা। ওটেনকে যেদিন প্রেসিডেন্সী কলেজ থেকে মার দেওয়া হয় সেদিন। ওটেনকে প্রহার দিয়ে তো বাবুরা এসে হাজির। আমরা-সব রাত্রে খাবার টেবিলে বসেছি—বয়টা এসে খবর দিল, প্রেসিডেন্সী কলেজের কয়েকটি ছেলে দেখা করতে চায়। উনি (দেশবন্ধু) তো অমনি বললেন, ডেকে দাও এখানে। আমি বলি কি কাণ্ড! আমরা যে খাচ্ছি, এখানে ডাকব কি! উনি বললেন, তা কি আর হয়েছে! ছেলের দলের সঙ্গে সুভাষ এসে দাঁড়ালো। সেই প্রথম দেখা। উনি মনোযোগ দিয়ে সমস্ত ঘটনাটা শুনলেন। তারপর বললেন, থাক, যা হবার তা হ'য়ে গেছে, এখন দেখা যাক ব্যাপার কি দাঁড়ায়।' *৩

চিত্তরঞ্জন সুভাষচন্দ্রের দ্বিতীয় সাক্ষাৎ—আই সি এস ত্যাগ করে সুভাষচন্দ্র কলকাতায় ফিরে আসার পরে। গান্ধীজীর সঙ্গে নৈরাশ্যজনক সাক্ষাৎকারের পরে কী বিপুল

২* অহিংসা এবং অহিংসার ঋষি গান্ধীজী সম্বন্ধে দেশবন্ধুর অনেক স্তুতি তাঁর বক্তৃতা বা রচনায় দেখা যায়। সেগুলিকে নিছক 'রাজনৈতিক' বলে উড়িয়ে দেবার ইচ্ছে আমার নেই। এখানে আমি উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রয়োজনীয় রচনাংশ উদ্ধৃত করছি:

'বিপ্লববাদীদের সঙ্গে তাঁহার কি সম্বন্ধ ছিল এ সম্বন্ধে সংবাদপত্রে ও লোকের মুখে অনেক গবেষণা শুনিয়াছি। দু' একখানা ফিরিঙ্গি সংবাদপত্র একথাও বলিয়াছে যে, তিনি প্রচ্ছন্নভাবে উহাদিগকে প্রশ্রয় দিতেন। এসব কথা যে, কতদূর হেয় তাহা আমি নিজের অভিজ্ঞতা হইতে জানি। আমি যখন স্বরাজ্য দলের সংস্রবে আসি তখন তিনি আমার নিকট হইতে প্রতিশ্রুতি লইয়াছিলেন যে, অহিংসা সম্বন্ধে স্বরাজ্য দলের আদর্শ ও কার্যপ্রণালী আমি নিজে মানিয়া চলিব, এবং এমন কোনো লোককে স্বরাজ্য দলে টানিয়া আনিব না যিনি ঐ আদর্শে আস্থাবান নহেন। আমি একথা ভাল করিয়াই জানি যে, অহিংসাকে তিনি নিজের creed হিসাবেই মানিয়া লইয়াছিলেন।'

(ডাঃ হেমেন্দ্রনাথ দাশগুপ্তের 'দেশবন্ধু-স্মৃতি' গ্রন্থে উদ্ধৃত)

এইসঙ্গে একথাও জানাতে হবে, ১৯২৪, ২৫ জুন, আমেদাবাদে অল ইন্ডিয়া কংগ্রেস কমিটির সভায় বিপ্লবী গোপীনাথ সাহার ফাঁসি ও তার প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন-সূচক প্রস্তাব নিয়ে দেশবন্ধুর সঙ্গে মহাত্মা গান্ধীর সংঘর্ষ হয়েছিল। সেই সংঘর্ষকে গান্ধীজী পরবর্তীকালে যতই প্রেমিকের কলহ বলুন, ব্যাপারটা ঠিক তাই ছিল না। কিছু পূর্বে সিরাজগঞ্জ সম্মিলনীতে দেশবন্ধুর নেতৃত্বে উক্ত ফাঁসি সম্বন্ধে গৃহীত শর্তাধীন শ্রদ্ধাপ্রস্তাবকেও গান্ধীজী নিতান্ত অপছন্দ করেছিলেন এবং এ ব্যাপারে কি ধরনের তিক্ততার সৃষ্টি হয়েছিল, তার বিষয়ে সাক্ষ্য দেবার জন্য এখনো অনেকেই বেঁচে আছেন। গান্ধীজীর অবুঝ অহিংসা ১৯২৯ সালে বিপ্লবী যতীন দাসের অনশনে আত্মোৎসর্গের পরেও দেখা গিয়েছিল। ঐ মৃত্যুতে সারা দেশ যখন বিচলিত তখন গান্ধীজী অহিংসায় স্থির-কঠিন, তিনি বাণী মাত্র দেননি, কারণ তা অনুকূল হবার সম্ভাবনা ছিল না—একথা তিনিই বলেছিলেন। খুব অল্পদিনের মধ্যে অবশ্য কৃপাণধারী পাঞ্জাব ঐ কংগ্রেসী অহিংসাকে কিছু সুবিধাবাদী বা বিবেচক করতে পেরেছিল, ভগৎ সিংহের ফাঁসীর পরে কংগ্রেসেই ভগৎ সিংহের উপরে শ্রদ্ধাসূচক প্রস্তাব গৃহীত হয়।

৩* উপরের স্মৃতিকথা বাসন্তী দেবীর কাছ থেকে সংগ্রহ করে শ্রীমতী কৃষ্ণা বসু যুগান্তর পত্রিকায় ২৩ জানুয়ারী ১৯৬২ সংখ্যায় প্রকাশ করেছিলেন। সমগ্র স্মৃতি-কথাটি অতি চমৎকার।

চিত্তরঞ্জনের সঙ্গে সুভাষচন্দ্রের এই প্রথম সাক্ষাতের কথা শ্রীমতী অপর্ণা দেবীও তাঁর 'মানুষ চিত্তরঞ্জন' গ্রন্থে লিখেছেন। সেখানে কিন্তু ঈষৎ ভিন্ন বিবরণ। চিত্তরঞ্জন খাওয়া ফেলে দেখা করতে গিয়েছিলেন, ফিরে এসে বলেছিলেন, 'আশ্চর্য তেজী ছেলে। তার কলেজের প্রিন্সিপ্যাল (না, প্রফেসার) মিঃ ওটেন ছাত্রদের সঙ্গে অশিষ্ট ব্যবহার করাতে সুভাষ তাতে ভালভাবেই শিক্ষা দিয়ে এসেছে। কিন্তু এর ফল কী হবে ভাবছি!'

সুভাষচন্দ্র ইন্ডিয়ান স্ট্রাগলের মধ্যেও এই প্রথম সাক্ষাতের উল্লেখ করেছেন। 'কলকাতা হাইকোর্টের অন্যতম স্তম্ভ... মিঃ দাশ, যাঁর কাছে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বিতাড়িত হয়ে আমি একদা প্রয়োজনে গিয়েছিলাম, ...যিনি একদিনে বহু হাজার টাকা রোজগার করেন—তাকে খরচ করেন কয়েক ঘণ্টায়,...যিনি ছিলেন, তরুণদের চিরবন্ধু, তাদের আশা-আকাঙ্ক্ষাকে বুঝতে সমর্থ ও তাদের বেদনায় সমবেদনা জানাতে প্রস্তুত...।'

ওটেন-প্রহারপর্বের পরেই সুভাষচন্দ্র চিত্তরঞ্জনের কাছে গিয়েছিলেন, বাসন্তী দেবীর এই কথা ঠিক নয় বলেই মনে হয়; সুভাষচন্দ্র যা বলেছেন তাই ঠিক, বিশ্ব-বিদ্যালয় থেকে বিতাড়িত হবার পরে আইনের পরামর্শ নেবার জন্যই সম্ভবত তিনি গিয়েছিলেন।

আশা নিয়ে সুভাষচন্দ্র কলকাতায় এসেছিলেন দেশবন্ধুর সঙ্গে সাক্ষাতের জন্য. দেশবন্ধু তখন সফরে বেরিয়ে গিয়েছিলেন বলে অবিলম্বে সাক্ষাৎ পাননি, কিন্তু স্নেহময়ী বাসন্তী দেবীর সঙ্গে পরিচয় হয়েছিল. তার পরে দেশবন্ধু ফিরেছিলেন এবং উভয়ের দেখা হয়েছিল—সুভাষচন্দ্র ইন্ডিয়ান স্ট্রাগলে সে সব বিষয়ে লিখেছেন সংক্ষেপে কিন্তু অব্যর্থভাবে। 'আমার দিকে তিনি এগিয়ে আসছেন—তাঁর সেই বিরাট আকারকে এখনো মনশ্চক্ষে দেখতে পাচ্ছি—' সুভাষচন্দ্র লিখেছিলেন ঃ অত্যন্ত আত্মসচেতন, দৃঢ় ব্যক্তিত্বের অধিকারী তিনি, আদর্শের এবং মনস্বিতার দৃঢ় ভিত্তিতে তাঁর চরিত্র স্থাপিত—তিনি কিন্তু তাঁর দিকে অগ্রসর সেই বিরাট আকারের আগ্রাসী মানুষটির আক্রমণ থেকে আত্মরক্ষা করতে পারেননি। সেই পরাজয়ের আনন্দকথা সুভাষচন্দ্র লিখেছেন ;

'আমাদের কথাবার্তার মধ্যে আমি অনুভব করতে লাগলাম, আমি সেই মানুষটির কাছে পৌঁছে গেছি, যিনি জানেন তিনি কি করতে চান, যিনি নিজের সর্বস্ব দিতে পারেন, প্রতিদানে অপরের সর্বস্ব দাবি করতে পারেন, যাঁর কাছে যৌবনোচ্ছ্বাস দোষ নয় গুণ। কথাবার্তা শেষ হবার আগেই আমি মনস্থির করে ফেললাম। আমার নেতাকে আমি পেয়ে গেছি—যাঁকে আমি অনুসরণ করব।'

নেতার সান্নিধ্যে অনুগত সৈনিক সুভাষচন্দ্র অতঃপর মাত্র তিন বছর থাকবার সুযোগ

পেয়েছিলেন। ১৯২৪, ২৪ অক্টোবর সুভাষচন্দ্র গ্রেপ্তার হন, এবং তাঁর অন্তরীণ-কালেই ১৬ জুন, ১৯২৫ তারিখে দেশবন্ধুর মৃত্যু হয়।

দেশবন্ধু-সান্নিধ্যের তিনটি বছরকে সুভাষচন্দ্র তাঁর জীবনের এক শ্রেষ্ঠ অধ্যায় বিবেচনা করেছেন। কোনো ব্যক্তিমানুষ মহিমার কোন্ সমুচ্চ শিখরে উত্থিত হতে পারেন, অথচ সেখান থেকে নামতে পারেন স্বচ্ছন্দে সাধারণের কক্ষে—সেই ভালবাসা দিতে পারেন যা মানব সংসারের চিরদিনের প্রাণশক্তি—দেশবন্ধুর মধ্যে তার অপূর্ব রূপকে স্তব্ধ বিস্ময়ে সুভাষচন্দ্র দেখেছিলেন। রাজনীতির প্রবল আবর্তের মধ্যেও মহৎ চরিত্রের বিচ্ছুরিত আলোকে স্নাত হাসি-কান্নার সেই অপরূপ দিনগুলি! কান্না? হাঁ, কান্নার কথাই আগে শোনা যাক। দেশবন্ধু সুভাষচন্দ্র সম্বন্ধে সস্নেহ কৌতুকে বলতেন, My Crying Captain.

ঐ বিষয়ে দেশবন্ধু পত্নীর স্নিগ্ধ স্মৃতি এই প্রকার:

'সেইদিনই খুব আলাপ হয়ে গেল। অনেকক্ষণ ছিল।...সেই যে শুরু হয়ে গেল আসা-যাওয়া—সেই থেকে সমানেই চলল। কত দিন এসেছে, কত রাত্রি পর্যন্ত থেকেছে। মনে হয় সেদিনের কথা। এই তো এই বারান্দায়, এই চৌকিতে শুয়ে থাকত। ঐ যে বাইরে ফুটপাথের কাছে আলোটা দেখছ, ঐখানে একটা লোক চুপ করে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ভিজছে। বুঝতেই তো পারছ কি লোক! আমি বলি, ও সুভাষ, এবার তুমি বাড়ি যাও, ওদিকে লোকটা যে মরে যাবে। ও রেগে বলত, কক্খনো যাব না—ভিজুক দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে।

'সুভাষ বড় সহজে কাঁদতে পারত। উনি তো নামই রেখেছিলেন Crying Captain. উনি বললেন কর্পোরেশনের চীফ এক্সিকিউটিভ অফিসার হতে হবে। শুনে তার কি কান্না। বলে, আমি কি এই জন্য আই সি এস ছেড়ে দিয়ে এলাম!...উনি তো সুভাষের রকম দেখে হতাশ। আমাকে বললেন, দেখো, তুমি যদি বুঝিয়ে সামলাতে পারো।

'কি, ব্যাপারটা কি সুভাষ?' জিজ্ঞাসা করলাম আমি। 'তোমার হয়ত টাকার দরকার না থাকতে পারে, আমার অনেক দরকার আছে। তোমার চাকরির টাকাটা না হয় আমাকে এনে দিও, আমার অনেক কাজে লাগবে।'

'আরও কান্নার গল্প শুনবে? উনি হুকুম করলেন আমাকে পিকেটিং করতে যাব হতে হবে। সুভাষের প্রচণ্ড আপত্তি। বাড়ির মেয়েরা কেন যাবে আমরা থাকতে—আমি যাব। উনি বললেন, সে হয় না, তোমার যে বাইরে অনেক কাজ, তুমি জেলে গেলে এ সময় চলবে না। যাই হোক, তার সঙ্গে তারি গাড়িতে আমি গেলাম। খদ্দর হাতে আমাকে রাস্তায় ছেড়ে দিয়ে ওরা চলে গেল। পুলিশ আমাকে ধরল, জেলে গেলাম। তারপরের ঘটনা তোমরা সব জানো। আগুনের মত এ-খবর দেশ জুড়ে ছড়িয়ে পড়ল! সমস্ত বাংলাদেশ সেদিন বিচলিত। সেইদিনই গভীর রাত্রে হঠাৎ গভর্ণমেন্ট আমাকে ছেড়ে দিল। আমাকে ধরে রাখলে জনসাধারণের অসন্তোষ যে ফেটে পড়বে, তা তারা বুঝেছিল। আমি অতশত কিছু জানি না। বাড়ি ফিরে আসতে আমাকে দেখে খুশি হওয়া দূরে থাক, উনি তো চটেই গেলেন। খালি বলেন, এ তুমি কি করলে, কেন তুমি এলে?' সেদিন চাপা আক্রোশে সমস্ত দেশ ঝড়ের আগের মত স্তব্ধ হয়েছিল। একটা তুমুল আন্দোলনের সুযোগ হাতছাড়া হয়ে গেল।

'আমার কি মুশকিল দেখ তো! আমি বলি, গভর্ণমেন্ট আমাকে জেলেও স্থান দেবে না, আবার তুমিও ঘরে ঠাঁই দেবে না, আমি তাহলে দাঁড়াই কোথা?'

'এমন সময় সুভাষ এসে হাজির। সে আমার ছাড়া পাবার খবর আগে পায়নি। আমাকে হঠাৎ সেখানে দেখেই তো শুরু হবে গেল তার কান্না। কি বিপদ! যত বলি—ও সুভাষ, কাঁদছ কেন? এই তো আমি এসে গেছি! আমার তো কিছু হয়নি!—তত সে আরো বেশী কাঁদে। এ-রকম ছেলেমানুষ কেউ দেখেছ কখনো!'

সুভাষের ওহেন 'ছেলেমানুষি' রোধ করবার জন্য বাসন্তী দেবীকে বছর পাঁচেক পরে একবার কঠিনতম আত্মসংযম দেখাতে হয়েছিল। সুভাষচন্দ্র মুক্তি পেয়ে এসে দাঁড়িয়েছেন তাঁর জীবনের চরমতম শোক-দৃশ্যের সামনে—'চিরকল্যাণময়ী তুমি ধন্য' বাসন্তী দেবী বৈধব্যের শুভ্রবাসে!! তারপর—বাসন্তী দেবী স্বয়ং বলেছেন—

'সুভাষের শরীর তখন অসুস্থ। আমি আগেই নিজেকে শক্ত করলাম—সুভাষের সামনে কিছুতেই ভেঙে পড়ব না। ছিলামও শক্ত, আমার চোখে এক ফোঁটা জল ছিল না।

কিন্তু সুভাষকে সামলাবে কে? শেষে আমি বললাম, তুমি যদি এ রকম করো, আমি কিন্তু এখনি চলে যাব।'

সুভাষকে যিনি 'কাঁদুনে সেনাপতি' বলে ঠাট্টা করতেন, সেই দেশবন্ধুই কি সুভাষচন্দ্রকে অশ্রুব্রতে দীক্ষা দেন নি—সেই করুণা দেননি যা পবিত্র বারিতে বিগলিত হয়ে মানুষকে উদ্ধার করে? দেশবন্ধু-প্রসঙ্গে ডাঃ হেমেন্দ্রনাথ দাশগুপ্তকে লেখা সুভাষচন্দ্রের একটি চিঠির মধ্যে পাই :

'একটি ঘটনা আমার স্পষ্ট মনে আছে। তাঁহার কারামুক্তির পরে কলিকাতার ছাত্রবৃন্দ তাঁহাকে অভিনন্দন প্রদানের জন্য সভা করেন। অভিনন্দন-পত্রে দেশবন্ধুর গুণগ্রামের উল্লেখ ছিল এবং দেশের জন্য তিনি কিরূপ ত্যাগ স্বীকার করিয়াছিলেন তাহারও বর্ণনা ছিল। তরুণের ভক্তি ও ভালবাসার অর্ঘ্য যখন তাঁহার নিকট নিবেদিত হইল তখন দেশবন্ধুর হৃদয় উদ্বেলিত হইয়া উঠিল।...তিনি যখন সভায় অভিনন্দনপত্রের উত্তর দিবার জন্য উঠিলেন, তখন তাঁহার অন্তরে ভাবের জোয়ার ছুটিতেছে! নিজের ত্যাগ ও কষ্টের কথা তুচ্ছ করিয়া তিনি বাংলার তরুণ-সম্প্রদায়ের ত্যাগের কথা বলিতে আরম্ভ করিলেন কিন্তু বেশী দূর বলিতে পারিলেন না, উচ্ছ্বসিত ভাবরাশি তাঁহার কণ্ঠরোধ করিল। নির্বাক নিস্পন্দভাবে দাঁড়াইয়া রহিলেন, দুই গণ্ড বাহিয়া পবিত্র অশ্রুবারি ঝরিতে লাগিল। তরুণের রাজা কাঁদিলেন, তরুণেরাও কাঁদিল।'

এতো গঙ্গার মুক্তধারা! ব্যক্তিগত একান্ত অশ্রুর সেই কয়েকটি বিন্দুও কি কম মর্মস্পর্শী?

শ্রীযুক্ত সত্যরঞ্জন বকসী আমাকে কাহিনীটি বলেছেন। দেশবন্ধুর আর্থিক অবস্থা তখন খুব খারাপ, প্রায় ভাতে টান পড়ার দশা। কিরণশঙ্কর এবং সুভাষচন্দ্র চা-তেষ্টায় এবং 'কর্তার প্রতি সহানুভূতিতে' অস্থির হয়ে কর্তার বাড়ি থেকে নেমে নীচের চায়ের দোকানে ঢুকে পড়লেন, দেশবন্ধুর চোখে পড়ল তা। তাঁরা ফিরে আসার পরে বড় ব্যথিত কণ্ঠে চোখের জল নিয়ে তিনি বলেছিলেন, 'তোমরা কি মনে করো, এক কাপ চা খেতে দেওয়ার ক্ষমতাও আমার নেই!'

এই কান্না। হাসিও কিছু কম ছিল না। তার বিষয়ে বলতে গিয়ে সুভাষচন্দ্রের বর্ণনার স্বাভাবিক নিরলঙ্কার ঋজুতা পর্যন্ত উৎসাহে অলঙ্কারসন্ধান করেছে—"পর্বত নির্ঝরিণীর ন্যায় তাঁহার (দেশবন্ধুর) রসিকতা আপনার প্রেরণায় আপনি ছুটিত।" দেশবন্ধু সারাক্ষণই নানা রকম রসিকতার দ্বারা 'সকলকে আমোদিত' করে রাখতেন। তাদের মধ্যে সুভাষ মাত্র একটিকেই স্মরণ করে লিখতে পেরেছেন। দেশবন্ধ-সুভাষচন্দ্র প্রভৃতির পাহারার জন্য জেলে সঙ্গীনধারী গুর্খা সৈনিক নিযুক্ত ছিল, পরে তাদের বদলে রুলধারী হিন্দুস্থানী সিপাহী দেওয়া হয়। তাদের দেখেই দেশবন্ধু বলে ওঠেন, "কি হে সুভাষচন্দ্র, শেষটা অসি ছেড়ে বাঁশী। আমরা কি এতই নিরীহ!"

সুভাষচন্দ্র রসিকতা অবশ্যই বুঝতেন, কিন্তু জীবনের এই পর্বে পরাধীনতার জ্বালায় এবং নিজের 'মিশন' সফল করার চিন্তায় এতই ব্যস্ত যে, ঠাট্টা-তামাশা করবার বা শুনবার বিশেষ সুযোগ করে উঠতে পারতেন না এবং তিনি এতই সুগভীর আত্মস্থ মানুষ ছিলেন যে, খুব কম জনই তাঁকে নিয়ে নাড়াচাড়া করার সাহস করতে পারতেন। যাঁরা পারতেন, তাঁদের মধ্যে চিত্তরঞ্জন ও শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ই প্রধান। সুভাষচন্দ্রকে নিয়ে দেশবন্ধুর একটি প্র্যাকটিক্যাল তামাশার কথা বাসন্তী দেবীর স্মৃতিকথায় পাই। ব্যাপারটা সুভাষচন্দ্রের 'অরক্ষণীয়তা' নিয়ে। কন্যাদায়গ্রস্ত পিতা-মাতারা স্বতঃই দেশবন্ধুকে, বিশেষতঃ বাসন্তীদেবীকে এব্যাপারে ধরে পড়তেন, এবং ওহেন সুপাত্রের লোভে কন্যাজননীরা পর্যন্ত বৈপ্লবিক মনোভাব অর্জন করে বসেছিলেন! বাসন্তীদেবী তাঁদের ঠেকাবার জন্য বলেছিলেন —"ওর আবার বিয়ে; ও-ছেলে কোন্‌দিন ফাঁসীকাঠে ঝুলবে ঠিক নেই"—তাতে স্তম্ভিত হয়ে মেয়ের মায়ের বাণী শুনেছিলেন—"আমার মেয়ে যদি বিধবা হয়ে বেঁচে থাকে, তাও জানব পরম ভাগ্য।' সুভাষের জন্য কন্যাপক্ষে দু'-একটা হৃদয়ঘটিত ট্রাজেডিও ঘটে গিয়েছিল সেকথা বলার পরে বাসন্তীদেবী মজাদার ঘটনাটি বলেছেন :

"তারপর এক মেয়ের বাপ আমাকে খুব ধরলেন। মেয়েটিও উপযুক্ত ছিল না তা নয়। ওরা খুব নাম করা বড়লোক। বললেন, বিয়ে যদি হয় আমি এক লক্ষ টাকা যৌতুক দেব। কথাটা কি করে যেন ওঁর কানে গেল। হঠাৎ উনি বললেন, শীগ্‌গির সুভাষকে টেলিফোন করো, বলো, আমি ডাকছি। রাত তখন এগারোটা। টেলিফোন করা হল—সুভাষ তখনো বাড়ি ফেরেনি। তখন তার খুব খাটুনি যাচ্ছে, আমাদেরও। তিলকফাণ্ডের টাকা তোলার ব্যাপারে সবাই ব্যস্ত। সুভাষ বাড়ি ফিরল আরও অনেক রাত্রে। সবে বুঝি খেতে বসেছিল এমন সময় শুনলে, দেশবন্ধুর কাছ থেকে টেলিফোন এসেছে—জরুরী দরকার। ব্যস, রইল তার খাওয়া দাওয়া—তখনি ছুটতে ছুটতে এসে উপস্থিত। তাকে দেখে উনি মুখ-চোখ খুব গম্ভীর করে বললেন, 'দেখো, একটা খবর আছে। একজন ভদ্রলোক তিলক-ফাণ্ডের জন্য একলক্ষ টাকা দিতে প্রতিশ্রুত হয়েছেন।' কি! সুভাষ তো আনন্দে প্রায় লাফিয়ে উঠল। 'কে দেবে, কে দেবে' করে সে একেবারে অস্থির। উনি আরো গম্ভীর মুখে বললেন, 'কিন্তু একটা শর্ত আছে।' কী এমন শর্ত—সুভাষ ভাবছে—দেশের কাজে এক লক্ষ টাকা—তার জন্য সে তো সব করতে প্রস্তুত।

'ভদ্রলোকের মেয়েটিকে তোমায় বিয়ে করতে হবে।'

সুভাষ একেবারে বসে পড়ল। আমরা সবাই হাসতে শুরু করেছি। চালটা বুঝতে পেরে সুভাষ তখন চটেছে। বলল, 'আজ আমার সারাদিন খাওয়া হয়নি, আর এই জন্য আমাকে দৌড়ে আসতে হল! এখন শীগ্‌গির সেদ্ধ ভাত খাওয়ান।' তাড়াতাড়ি তাকে তখন ভাতেভাত খাইয়ে ঠাণ্ডা করি।"

বাসন্তীদেবীর রান্না ভাতে ভাতের ভক্ত সুভাষচন্দ্র স্বয়ং কিন্তু দেশবন্ধুকে রীতিমত দামী রান্না করে খাওয়াতেন, যখন দেশবন্ধুর সঙ্গে তিনি একই জেলে ছিলেন। সত্যই তিনি ভাল রাঁধতে পারতেন, এবং সেই অহঙ্কার ত্যাগ করতে পারতেন না। জেলে দেশবন্ধু খুব অসুস্থ ছিলেন বলে সরকার তাঁর এবং (তাঁর জেদে) তাঁর সঙ্গীদের আহার্য বাইরে থেকে নিয়ে যাওয়ার অনুমতি দিয়েছিলেন। নচেৎ গোড়ার দিকে সকলের আহার্য ছিল, অপর্ণাদেবীর রচনা অনুযায়ী, লোহার থালায় বেদানার দানার মত চাল, তার মধ্যে দাঁড়ির টুকরো, দেশলাই কাঠি ব্যাটিং, কেশগুচ্ছ, এবং ডাল, 'যার মত কালো ডাল আগে দেখিনি।'

সুভাষচন্দ্র অসুস্থ দেশবন্ধুর কেবল রান্নার ভার নয়, সেবাভারও কিছুটা তুলে নিয়েছিলেন। 'সুভাষ খুব ভাল নার্স'—একথা দেশবন্ধু বলতেন। দেশবন্ধু তাঁর কন্তু বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক হেমন্তকুমার সরকারকে ভৃত্যরূপে পেয়েছিলেন। 'দাশ'-এর এই সৌভাগ্য একটি ঐতিহাসিক রসিকতার কারণ হয়ে আছে। কারা বিভাগের ভার প্রাপ্ত মন্ত্রী স্যার আবদার রহমান জেল পরিদর্শনে এসে সকৌতুকে বলেছিলেন, "দাশ, তোমার মত ব্যয়সাপেক্ষ কয়েদী তো হয় না। একজন আই সি এস তোমার পাচক এবং একজন বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক তোমার চাকর।"

১৯২১-২২ সালে প্রেসিডেন্সী জেলে এবং আলিপুরে সেণ্ট্রাল জেলে আট মাস কাটাবার সুযোগ সুভাষচন্দ্রের হয়েছিল। এই কয়েক মাসের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার পরে সুভাষচন্দ্র দেশবন্ধু সম্বন্ধে যে কথা বলেছেন, দেশবন্ধু-চরিত্র সম্বন্ধে একদিক থেকে তা চরম কথা, কারণ, একথা মনে রাখতে হবে, ব্যক্তি চরিত্রে সুভাষচন্দ্রের চেয়ে বড় মানুষ অল্পই সম্ভবপর। 'ঘনিষ্ঠতা দেশবন্ধু সম্বন্ধে শ্রদ্ধা কমায় নি, বাড়িয়ে দিয়েছিল শতগুণে'—সুভাষচন্দ্রের এই উক্তির চেয়ে বড় প্রশস্তি আর কি সম্ভব? দেশবন্ধুর পাণ্ডিত্য, মনীষা, দূরদর্শিতার অজস্র যে-পরিচয় সুভাষচন্দ্র পেয়েছিলেন, সেগুলি নয়, সুভাষচন্দ্রকে চিরদিনের জন্য কিনে নিয়েছিল অন্য বস্তু—সেই প্রেম তিনি দেখেছিলেন, যা খ্যাতী ডাকাত মথুরকে বদলে লে মিজারেবল-এর চরিত্র করে তুলেছিল, এবং দেখেছিলেন সেই প্রাণকে, যা চিরদিনের জন্য নীচতাকে বর্জন করেছে। 'যে আটমাস কাল তাঁহার সঙ্গে ছিলাম, সেই সময়ে তাঁহার অন্তরের সকল কথা ও অনুভূতি জানিবার সুযোগ আমার ঘটিয়াছিল, কিন্তু আমি কোনো দিন কোনো কাজে অথবা কোনো কথার মধ্যে নীচতার চিহ্ন পর্যন্ত পাই নাই।"

(ক্রমশঃ)

পূর্ণাবতার

প্রমথনাথ বিশী

(পূর্বপ্রকাশিতের পর)

আনাড়ি মানুষ কলার গাছে ভর দিয়ে বেশ ভেসে থাকে হঠাৎ গাছটা সরে গেলে যেমন অসহায় বোধ করে তেমনি অবস্থা হল জরার। বৃন্দাবনে মদিরার এবং পথে সন্ন্যাসীঠাকুরের সাহচর্য লাভে জরা মনে শান্তি না পেলেও স্বস্তি অনুভব করেছিল, গত দশ বছরের মধ্যে যার অনুরূপ অনুভূতি ঘটেনি তার জীবনে। মদিরার স্নেহ আর সেই সঙ্গে স্থানমাহাত্ম্য, সন্ন্যাসীর সঞ্জীবনের স্পর্শ আর সেই সঙ্গে নিত্য চলমানতা অনেক পরিমাণে ভুলিয়ে দিয়েছিল তার মনে আমূলাবিদ্ধ শল্যানি। পাপ আর দুঃখ, মুক্তি আর সদ্‌গতি প্রভৃতি দুশ্চিন্তার দোলাতে দুলতে দুলতে ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল। অনেকবার আত্মহত্যা করে সমস্ত সমস্যার সমূলে সমাধান করবার কথা ভেবেছে কিন্তু মরণে নরকে গতি হবে এই আশঙ্কা তাকে নিবৃত্ত করেছে।

কিন্তু বৃন্দাবনে এসে যখন ঘটনাধীন মদিরার সাক্ষাৎ পেলো আশার ক্ষীণ রশ্মি ফুটলো তার মনে। মদিরার মত বারাঙ্গনা যদি শান্তি লাভ করে থাকে তবে সে-ই বা না পাবে কেন? অবশ্য মদিরার তুলনায় তার পাপের বোঝা অনেক ভারি তবে তার দুঃখও অনেক দুঃসহ তাতে কি বোঝা পড়ে গিয়ে খানিকটা হাল্কা হয়নি।

নরেন্দ্রনগর থেকে পলায়নের পরে যে বিচিত্র অভিজ্ঞতার আলোছায়া অতিক্রম করেছে ভাবতে গেলে তার বিস্ময়ের অন্ত থাকে না। ছাগার্ষ, কিন্নররাজ্য, চার্বাক আশ্রম, হিমালয়ের নির্জন পথে যষ্ঠিধারী কুকুরমাত্রসঙ্গী নিঃসঙ্গ পথিক, বদরিকাশ্রমে শূন্যমন্দির দর্শন, গুহাবাসিনী বুড়িমা এমন অভিজ্ঞতার বৈচিত্র্য কখনো কি একজন মানুষের জীবনে ঘটেছে। পাপ থেকে মুক্তি পাওয়ার উপায় কেউ জানে না; চিরানন্দময় কিন্নররাজ্য পাপ শব্দটাই জানে না; মহাজ্ঞানী চার্বাক আনন্দের ভাণ্ডারী কিন্তু দুঃখ থেকে মুক্তির উপায় জানেন না; আর সেই নিঃসঙ্গ পথিক জিজ্ঞাসিত হয়ে স্বীকার করলেন মুক্তির উপায় সন্ধানেই তিনি চলেছেন। জরার ইচ্ছা হয়েছিল, তাঁর সঙ্গে যায় সে-ও তো মুক্তিসন্ধানী কিন্তু মনঃস্থির করবার আগেই তিনি পাহাড়ের বাঁকের আড়ালে অদৃশ্য হয়েছেন, এগিয়ে দেখবার সাহস তার হল না।

সকলের দ্বারে দ্বারে জিজ্ঞাসার প্রদীপ নিয়ে ঘুরেছে শিখা জ্বালিয়ে দিতে কেউ পারে নি। কেবল বুড়িমা, সেই নিরক্ষর অজ্ঞ বৃদ্ধাটি একবার আলোর ফুলকি জেলেছিল, প্রদীপ জ্বলল না সত্য তবে বোঝা গেল এখনো নিরাশ হওয়ার সময় আসে নি। তার কথাতেই এলো বৃন্দাবনে। কই সেখানেও তো দেখল মন্দির শূন্য। ঠিক তার মনে নেই কে তার মনে ঢুকিয়ে দিয়েছিল যে পূর্ণাবতার ছাড়া কেউ তাকে মুক্তি দিতে পারবে না। কিন্তু কেউ বুঝিয়ে দিতে পারে নি পূর্ণাবতার কে? অবতারের সঙ্গে পূর্ণাবতারের প্রভেদ কি? এ প্রশ্নের সমাধান করতে হয়তো পারতেন সন্ন্যাসী ঠাকুর, প্রসঙ্গটা জরা তুলেছিল, এমন সময়ে পথের উপরে মৃতদেহ দর্শনে বিষয়টা চাপা পড়ে গেল।

জরা আশা করেছিল অবন্তীপুরীতে পৌঁছে রাতের বেলায় নিরিবিলি প্রসঙ্গটার মীমাংসা জেনে নেবে। কিন্তু সেখানে যে অরাজক অবস্থা মাঝরাতেই নগর ছেড়ে বের হয়ে পড়তে হল। সন্ন্যাসী গেলেন অমরকণ্টকে জরার ইচ্ছা হয়েছিল সে-ও যায় কিন্তু সন্ন্যাসী তেমন উৎসাহ দিলেন না, তাছাড়া কৌস্তুভমণিটা সত্বর [illegible] সমুদ্রজলে সমর্পণ করতে হবে। কতজনের কত লোভ এড়িয়ে মদিরা তাকে রক্ষা করে এসেছে আর পথের মধ্যে রাহাজানি হতে হতেও রক্ষা পেয়ে গিয়েছে মণিটা। না, আর কাছে রাখা নিরাপদ নয়। সে তাড়াতাড়ি পা চালায়।

কিন্তু পা চলবে কি। এমন উচ্চাবচ, অনুর্বর দগ্ধ তাম্র ভূখণ্ড আগে তার চোখে পড়ে নি, আর রাস্তা! মানুষের আর গো-মহিষের যাতায়াতে একটা নিরিখ পড়েছে লোকে তাকেই রাস্তা বলে। ছায়াতরু বলতে কিছু নেই, উদ্ভিদের মধ্যে বুনো কুল আর বুনো খেজুরের গুল্ম—আর অখণ্ড কাঁটা-গাছের ঝাড় যার নাম জানে না জরা। সে জেনে নিয়েছিল অবন্তী থেকে পশ্চিম দিকে দ্বারকা। সেই নির্দেশ অনুসারে চলেছে পশ্চিমে। তার উপরে আবার পথটা এমন বিরলপথিক যে প্রয়োজন হলে জিজ্ঞাসা করবার লোক মেলে না।

ও ভাই এই পথ তো দ্বারকায় গিয়েছে? শুধালো জরা দীর্ঘদেহী, দীর্ঘতর লাঠি-কাঁধে এক রাহী আদমিকে।

জরার প্রশ্ন শুনে অনেকক্ষণ লোকটা অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকলো তার দিকে, তারপরে হেসে উঠে বলল, ঐ চুল দাড়ি যদি পরচুলা না হয় তবে বেঁচেকলে পৌঁছতেও পারো—হাঁ, এই পথটাই দ্বারকায় গিয়েছে বটে।

কেন এমন কথা বলছ ভাই?

এগোলেই বুঝতে পারবে।

কেন ডাকু আছে?

আজকে ডাকু নয় কেও রাতের বেলায় আমও ডাকাতি করি।

এই স্পষ্ট স্বীকৃতিতে অবাক হয়ে গেল জরা। শুধালো, আর দিনের বেলায় কি করো ভাই?

যা করতে দেখছ। দিনের বেলায় যে-সব পথিককে পথ বাৎলে দি রাতের বেলায়

তাদেরই মাথায় এই লাঠি—বলে লাঠি দিয়ে এমন একটি ভংগী করলো যার একটিই মাত্র অর্থ হয়।

তাহলে মনে হচ্ছে রাতের বেলায় পেলে আমাকেও মারবে।

না, তোমার চুল-দাড়িগুলো সত্যি বলে মনে হচ্ছে, সাধু-সন্ন্যাসীকে আমরা কিছু বলি নে।

তোমরা কি চুল দাড়ি দেখে সাধু-সন্ন্যাসী বোঝো নাকি?

আর কি দিয়ে বুঝবো বলো, ভিতরে ভিতরে তো সব শালা লোপ্‌ড়া।

আচ্ছা তবে আসি বলে জরা দ্রুত পা চালাল, এমন লোকের সান্নিধ্যে বেশিক্ষণ থাকা অনুচিত। যা লাঠির দৈর্ঘ্য আর গোঁফের বহর, রাতের কাজ দিনের বেলায় করলে ঠেকায় কে। তবে কিনা তার চুল দাড়ি পরচুলা নয়।

সূর্য যখন মাথার উপরে উঠেছে তখন দারুণ তৃষ্ণা পেলো জরার। কাছেপিঠে কোথাও না আছে গ্রাম না আছে নদীনালা। এমন সময়ে সে দেখতে পেলে অদূরে এক-জন রাখাল বালক কতকগুলো গরু চড়াচ্ছে, তাকে শুধালো, ভাই এখানে কোথাও ঝরণা কি নদী আছে?

প্রশ্ন শুনে রাখালটি হঠাৎ ত্রিভঙ্গ হয়ে দাঁড়িয়ে পাচনিখানি বাঁশীর মতো আড় করে ধরলো মুখের কাছে আর তারস্বরে গেয়ে উঠল, 'যমুনাকি তীরে নীরে গাও চরাওয়ে, মিঠি তান শুনাওয়ে।'

তার ভাবভংগীতে জরা তো অবাক। গান থামলে জিজ্ঞাসা করলো, চাইলাম জল, আর তুমি গান ধরলে ব্যাপার কি!

কেন, গানের মধ্যেই তো যমুনা আছে যত খুশী জল পান করে নাও।

তারপরে হেসে উঠে বলল, আজ রাতে আমাদের গাঁয়ে যাত্রাপালা আছে, আমি সাজবো শ্রীকৃষ্ণ, তাই একটু মহড়া দিয়ে নিলাম, সুযোগ পেলাম কিনা। জল খাবে তো আমার সংগে এসো।

জরা চলল তার সংগে, তিন-চার রশি ব্যবধানে পৌঁছে দেখতে পেলো একটা উঁট ইঁদারার চারদিকে ঘুরে ঘুরে জল টেনে তুলছে, সেই জল সরু নালা দিয়ে চাষের ক্ষেতে চলেছে।

নাও খেয়ে নাও, এই বলে ছোকরা উঁট-টাকে থামালো। একটা মাটির পাত্রে জল নিয়ে দিল জরাকে। জরা আকণ্ঠ পান করলো। আঃ কি শীতল আর নির্মল, পাতাল থেকে উঠছে কিনা।

স্নান করে নাও না ভাই, এমন জল আর কাছেভিতে পাবে না।

দ্বিতীয়বার বলবার প্রয়োজন ছিল না, জরা দেহ শীতল করে স্নান করে নিল। স্নান সমাধা হলে ছোকরা বলল, স্নানের পরে আহার। বলি খাবে কি?

ছেলেটিকে রসিক মনে হয়েছিল জরার, তাই সুরে সুরে মিলিয়ে বলল, বাতাস।

বাতাস নয় বাতাসা আর তার সঙ্গে দহি চুড়া, চলো আমার ঘরে। সাধুভোজন করিয়ে আজ একটু উপরি পুণ্য লাভ করবো।

ক্ষুধায় জরার নাড়ি জ্বলে যাচ্ছিল, বিনা ওজরে চলল রাখালের ঘরে। ঘরে পৌঁছতেই ছেলের সংগে জরাকে দেখে তার বুড়ি মা হাউ মাউ করে কেঁদে উঠল, ওরে পচা আজ হাউ মাউ করে কেঁদে উঠল, ওরে পচা, আজ একটা সন্ন্যাসীকে ভুলিয়ে ভালিয়ে নিয়ে এসেছিস, তোদের পাপের ভারে মা বসুমতী যে তলিয়ে যাবে।

পচা অপ্রতিভ ভাবে বলে উঠল, পাপের ভার হাল্কা করবার আশাতেই এঁকে নিয়ে এসেছি, সন্ন্যাসীভোজন করিয়ে পুণ্য করো।

জরা বুঝতে পারে না ব্যাপার কি! পাপই বা কোথায়, পুণ্যই বা কেন?

তবে নে শীগ্গির খাইয়ে বিদায় করে দে, তোর দাদারা ফিরে এলে আর রক্ষা পাবে না। ওরা আবার এমনি পাষণ্ড যে সাধু-সন্ন্যাসী ব্রাহ্মণ কিছু মানে না।

নাও ঠাকুর বসে পড়ো, বলে পচা।

পচার মা শালপাতায় চিড়ে দই গুড় সাজিয়ে দিয়েছে, লোটাতে জল দিয়েছে। জরা বিনাবাক্যব্যয়ে বসে খেতে সুরু করলো। বুড়ি না শুনতে পায় এমন স্বরে জিজ্ঞাসা করলো, তোমার মা কি সব বলছিল।

পচা চোখের ইসারায় ও প্রসংগে যেতে নিষেধ করলো, বলল, এখন খাও পরে হবে।

জরার আহার শেষ হলে বুড়ির কাছে বিদায় নিল। পচা বলল, চলো তোমাকে একটু এগিয়ে দিয়ে আসি।

তার মা বলল, দেখিস তোর দাদাদের সম্মুখে না পড়ে। আর কাকে ছেড়ে কার কথা বা বলি, একেবারে গাঁয়ের বাইরে নিয়ে গিয়ে ছেড়ে দিস।

খানিকটা অগ্রসর হয়ে জরা শুধালো, ভাই পচা, ব্যাপার কি বল তো।

ব্যাপার বুঝতে পারলে না? এ গাঁয়ে বিদেশী লোক এসে পড়লে মারা পড়ে।

কেন?

আরে কেন কি, এ গাঁয়ের লোকের ওটাই ব্যবসা, বেশ ভালো উপার্জন হয়। কালকেও তিনজন মরেছে।

তোমার দাদারা?

আমার সাত দাদা, তারা ঐ তিনের দুই জনকে মেরেছিল। টাকার ভাগ নিয়ে তার-পরে নিজেদের মধ্যে মারামারি।

কেন?

জোড়ায় জোড়ায় ভাগ করা সহজ, কিন্তু তিন পাঁচ সাত বেজোড় সংখ্যাগুলো ভারি বেয়াড়া, সহজে ভাগের আওতায় আসে না।

জরা বলে, তোমাকে ধরলেই তো আট হতো, দিব্যি মিলে যেতো।

আমি ওর মধ্যে নেই।

হঠাৎ দৈত্যপুরে প্রহ্লাদ হতে গেলে কেন?

যোধকরি যাত্রাদলে কৃষ্ণ সাজতে সাজতে মনে দয়ামায়া কিছু জন্মেছে।

জরা তার মনের কথা আরও জানবার আশায় বলে, কৃষ্ণ কি দয়াময়?

উত্তর শোনে, বেশ ঠাকুর, এদিকে বলছ চলেছ দ্বারকায় আর শুধাচ্ছো কৃষ্ণ কি দয়াময়?

দ্বারকায় যে তীর্থ করতে যাচ্ছি কে বলল?

ও বুঝেছি, বলে পচা, তবে নিশ্চয় যাচ্ছ মাছ ধরতে। তবে তা তোমার কম্ম নয়।

কেন বলো তো?

সে জায়গা নদী নালা পুকুর নয়।

তবে কি?

যাও গেলেই দেখতে পাবে। তবে সাবধান করে দি পথে কোন গাঁয়ে আশ্রয় নিয়ো না।

সে ভয় করো না, আমি গাছতলায় থাকবো।

তার চেয়ে নিরাপদ যদি গাছের উপরে থাকতে পারো, বেশ ঝাঁকড়া দেখে গাছ বেছে নিয়ো।

তার পরামর্শ শুনে জরা হেসে উঠল। হাসির কথা নয় সন্ন্যাসী, মনে রেখো। ভুলবে না বলে বালকটির কাছে বিদায় নিয়ে জরা চলতে সুরু করে। পচা গান ধরে 'যমুনাকি নীরে তীরে গাও চরাওয়ে মিঠি তান শুনাওয়ে।' আজ রাতে যাত্রাপালায় তাকে কৃষ্ণ সাজতে হবে।

অনেক দূরে চলে এসেছে জরা, তবু তার কানে বাজতে থাকে ঐ গানের কথা আর সুর। সে ভাবে এত দূরে কি ঐ কচি বালকের কণ্ঠস্বর আসছে না ঐ সুর মনের মধ্যে বহন করে এনেছে তাই শুনতে পাচ্ছে। সে ভাবে এ কি শুধু যাত্রাপালার মহড়া না ঐ গানের মধ্যে অবোধ বালক এমন কিছু খুঁজে পেয়েছে যাতে কিছুতেই ভুলতে পারছে না। ঐ সাত ডাকাতের ভাই কৃষ্ণ সাজতে সাজতে জাতব্যবসা অস্বীকার করে ফেলেছে তাই মনে মনে যমুনার তীরে গোরু চরাচ্ছে —আর মধুর গান শুনতে পাচ্ছে। আর সে জরা এমনি হতভাগা যে জলতীরে যমুনা তীরে গিয়ে না পেলো শান্তি, না পেলো মধুর সঙ্গীতের রেশ।

সেদিন মরীয়া হয়ে রাতের বেলায় মদিরার নিষেধ সত্ত্বেও নিকুঞ্জ বনে গিয়ে-ছিল, সঙ্কল্প করেছিল হয় দর্শন লাভ করবো নয় মৃত্যু হবে। কিন্তু না পেলো দর্শন না হোল মৃত্যু। তখনি তার মনে হয় মূর্ছা

হতে গেল কেন? হয়তো বাসুদেব ঐ মূর্চ্ছার ইঙ্গিত দিয়ে বুঝিয়ে দিলেন ওরে নির্বোধ তোর মুক্তি এখানে নয়, এতকাল বাসুদেবরূপে যাকে মনন করলি তারই পীঠস্থানে অপেক্ষা করছে তোর জন্যে মুক্তি। এই চিন্তা মনে উদিত হওয়া মাত্র কেমন একটা প্রসন্নতা অনুভব করে, যেন সমস্ত শরীর থেকে রক্ত-মাংসের ভার ঝরে পড়ে গিয়ে অশরীরী রূপ লাভ করেছে সে। আশায় আশ্বাসে দ্রুততর বেগে চলতে থাকে।

আবার তার হিসাব থেকে দিনের গণনা স্খলিত হয়ে গিয়েছে, যেমন গিয়েছিল হিমালয়ে। কতদিন গেল, কত রাত গেল মনে থাকে না, সূর্য অস্ত যায় সে পশ্চিমে সেই দিক লক্ষ্য করে চলে। কত সূর্য উদিত হয় কত সূর্য অস্তমিত হয় জরার চলার আর বিরাম হয় না। অবশেষে একদিন রাত্রি প্রথম প্রহর অতিক্রান্ত হলে একটি পাহাড়ের পাদদেশে এসে উপস্থিত হয়। পরিশ্রান্ত দেহের শক্তি নাই সে পাহাড় লঙ্ঘনের, তাই সূর্যোদয়ের প্রত্যাশা নিয়ে ঘুমিয়ে পড়লো পাহাড়ের নীচে। কাল সকালে গিরি অতিক্রম করে আবার চলতে আরম্ভ করবে।

(৭)

ভোরবেলা জরা ধীরে ধীরে পাহাড়ে উঠতে সুরু করলো, কিছুক্ষণের মধ্যেই পাহাড়ের চূড়ায় উপস্থিত হতেই তার চোখের সম্মুখে যে দৃশ্য উদ্ঘাটিত হল তা সম্পূর্ণ অভাবিত। সে দেখতে পেলো যতদূর দেখা

যায় অবারিত সমুদ্র। এখানে সমুদ্র এলো কোথা থেকে। সম্মুখে আর তো পথ নেই, কোথা দিয়ে কি ভাবে যাবে। সমস্ত পথ লুপ্ত করে দিয়ে প্রকাণ্ড সমুদ্র শায়িত। বন নীল তার জল, সিন্ধুর বক্ষস্পন্দনের মতো মৃদুমন্দ কাঁপছে। তীরের কাছে সমুদ্রের জল যেমন সবুজ এখানে তা মোটেই নয়, গভীর সমুদ্রের মতো গাঢ় নীল তার জল। বিস্মিত হয়ে বসে পড়লো। এবারে কি করবে সে।

জরা দেখতে পেলো পাহাড়ের উপরে একজন কাঠুরে কাঠ সংগ্রহ রছে। তার কাছে গিয়ে শুধালো, ভাই এখানে যদুদের রাজধানীতে যাবার পথ কোথায়?

কাঠুরে তার কথায় অবাক হয়ে গেল, বলল, এখানেই তো তাদের রাজধানী ছিল।

কোথায় সেই রাজধানী?

কাঠুরে একটুকরো কাঠ জলের মধ্যে ফেলে দিয়ে বলল, ঐখানে।

তার মানে?

তুমি বুঝি বিদেশী?

জরা বলল, হ্যাঁ।

তাই! সে রাজধানী তো আজ দশ বছরের উপর সমুদ্রে তলিয়ে গিয়েছে।

বলো কি—বলে হতাশ হয়ে বসে পড়লো, তবে তো তার সমস্ত আশা ঐ সমুদ্রে তলিয়ে গিয়েছে। তখন তার মনে পড়লো খট্টাসের দলের সংগে যাত্রা করবার সময় এই রকম একটা জনশ্রুতি তার কানে এসেছিল, তবে বিশ্বাস হয় নি। তখন আবার শুধালো, কাঠুরে ভাই, লোকজন সব গেল কোথায়?

যারা পেরেছে পালিয়েছে, যারা পারেনি হাঙর কুমীরের পেটে গিয়েছে।

তবে এখন উপায়? একথাটা ঠিক কাঠুরের প্রতি নয়, নিজের উদ্দেশ্যেই।

কাঠুরে বলল, উপায় আর কি, যেখান থেকে এসেছ ফিরে যাও, নইলে জলে ঝাঁপ দিয়ে পড়ো, কুমীর হাঙরের পেটে চলে যাও, সেখানে দেখা হলে হতেও পারে—এই বলে সে হাসলো।

জরা লক্ষ্য করলো, তার পুরু ঠোঁট দুখানি হাসিতে তরঙ্গিত। কাঠুরে নিজের কাজে মন দিল, জরা বসে রইলো মাথায় হাত দিয়ে। তার মনের মধ্যে সুক্ষ্ম স্থূল সুতোর বুনন চলছিল তবে সে বিষয়ে জরা সম্পূর্ণ অবহিত ছিল না। মানুষ মনের গতিবিধি সম্পূর্ণ জানতে পারলে তার জীবনযাত্রা অসম্ভব হয়ে পড়তো।

জরা ভাবছিল তবে তো তার পাপ থেকে মুক্তিলাভ হল না। মনে পড়লো মদিরার কথা, মদিরাও জানতো না যদুবংশের রাজধানী অতলে তলিয়ে গিয়েছে, তার আগেই সে-ও রাজধানী ছেড়ে যাত্রা করেছিল। তার মনে পড়লো মদিরা বলেছিল, জরা-ভাই, কৃষ্ণ বাসুদেব এখানেও তোমার মনস্কামনা পূরণ করলেন না, তোমাকে ফিরে যেতে হবে, যেখানে তিনি তোমার শরে নিহত হয়েছিলেন সেখানে তোমার মনস্কামনা পূরণ করবেন। কিন্তু এখানে যে অতল সমুদ্র।

বেলা বেড়ে ওঠে, সূর্যের তাপ প্রখরতর হয়, সেদিকে খেয়াল নেই জরার। তার এমনি মূঢ় অবস্থা যে, কিছু চিন্তা করছে বললে ভুল হবে। সে শক্তিও তার লোপ পেয়েছিল। তার মনের সম্পূর্ণ অরাজক অবস্থা, যেমন অরাজক অবস্থা আজ দেশের। দেশে যেমন নিরন্তর হানাহানি চলছে, নিরর্থক উদ্দেশ্যহীন তেমনি হানাহানি তার মনের মধ্যে। একজন বলছিল, ওরে মূঢ় পাপ, পাপ করে এমন দুর্লভ মানব জন্মটা নষ্ট করলি, এত ঐশ্বর্য কিছুই ভোগে লাগল না। এ হচ্ছে মোটা সুতোর বুনন। আর সরু সুতোর বুনন, অত্যন্ত সূক্ষ্ম, প্রায় অদৃশ্য তাতে বিপরীত কথা। পাপীর আবার ভোগ কি, কেবলি দুর্ভোগ। মনে নাই ছাগর্ষির দৃষ্টান্ত, রাজার ছেলে হয়েও কেন সে গুহাবাসী। আবার চার্বাক ঋষি তো আনন্দেই আছে, কিন্তু দুঃখ থেকে মুক্তির উপায় তো তিনি জানেন না। আর ঐ যে গিরিসঙ্কটে যষ্ঠিধারী নিঃসঙ্গ যাত্রী, হয়তো কোন রাজার ছেলে হবে, তিনিও তো স্বীকার করলেন পাপ থেকে মুক্তির উপায় জানেন না। আরে তোর মতো মহাপাপী তো ভূমণ্ডলে জন্মগ্রহণ করে নি, তুই হত্যা করেছিস, স্বয়ং পূর্ণাবতারকে। তোর আবার মুক্তি কি, তোর আবার সদগতি কি। ডুবে মর, মর, তাহলে আর কিছু না হোক এই যমযন্ত্রণা থেকে উদ্ধার পেয়ে যাবি। জরা দুই কানে এই দুই পরামর্শ শুনতে পায়। একজন বলে ভোগ কর, ভোগ কর, এখনো সময় আছে, ইন্দ্রিয়সমূহ সতেজ আছে। আর একজন বলে এখনো তোর প্রায়শ্চিত্ত শেষ হয় নি, আরো দুর্ভোগ, আরো দুঃখ তোর কপালে আছে। আবার শুনতে পায়, দেখলি তো এত হাঁটাহাঁটি, এত দুঃখ ভোগ সমস্ত নিষ্ফল হল, কোথায় তোর যদুবংশের রাজধানী, সমস্ত সমুদ্রে সৎ, সেই সঙ্গেই কি সমুদ্রসাৎ হয় নি তোর আশা-ভরসা। দেখ তো কিন্নররাজ্যে সবই কেমন খোলা আছে। তা নয় কোথায় মুক্তি, কোথায় সদ্গতি বলে হন্যে কুকুরের মতো ঘুরে মরছিস। আবার তখনি অতিশয় মৃদু একটি কণ্ঠস্বর শ্রুত হয়, ওরে জরা, এখনো তোর চলা শেষ হয় নি, হতাশ হয়ে বসে থাকিস না, উঠে পড়, চল-চল। সমুদ্র? এমন সমুদ্র আর নেই যার তল না আছে, এমন সমুদ্র নেই যার পাড় না আছে। আর নৌকা থাকলে অতলে অপারে কি ভয়? কতক্ষণ সে স্থাণুবৎ বসেছিল তার খেয়াল ছিল না, হঠাৎ পিঠের উপরে একটা আঘাত পেয়ে সম্বিৎ লাভ করলো, নড়তেই একটা কাঠঠোকরা পাখি ভয় পেয়ে উড়ে গেল। তাকে শুষ্ক কাষ্ঠখণ্ড মনে করে কাঠঠোকরা পাখিটা তাকে ঠোকরাচ্ছিল। সে উঠে দাঁড়ালো।

এবারে সে লক্ষ্য করলো অদূরে একখণ্ড ডাঙা জমি, তার উপরে কয়েকটা গাছও আছে। জমিটা পাহাড়ের লাগোয়া, অর্থাৎ সমুদ্রের জলে না নেমেও সেখানে যাওয়া যায়। বিস্মিত হল এতক্ষণ দেখে নি কেন ভেবে, ভাবলো একবার ওখানে যাওয়াই যাক না, দেখা যাক কি আছে। সেই দিকে সে যাত্রা করলো।

তার আগে একটা কাজ করলো। গলার থলি থেকে কৌস্তুভমণি হারটা বের করে নিয়ে ঘুটো পাথরগুলো খুলে ফেলে দিল। তারপরে কৌস্তুভটা সমুদ্রের জলে ধুয়ে পরিষ্কার করে নিল, সোনার সুতোয় উজ্জ্বল রত্ন ঝকমক করে উঠে সূর্যের আলোর সঙ্গে পাল্লা দিল। তার মনে হয়েছিল এখন আর গোপনীয়তার কারণ নেই, কারণ হয় এখানেই তার মুক্তি হবে, নয় মৃত্যু—খুব সম্ভব মৃত্যু। যদি মরে মলিন রত্ন সঙ্গে নিয়ে যাবে কেন? যার রত্ন অমলিন তার কাছে ফিরিয়ে দেবে।

ধীরে-ধীরে পাহাড়ের কোল ঘেঁষে চলতে-চলতে এক সময় সেই শুকনো ডাঙায় এসে পৌঁছল, দেখতে পেল শুধু গাছপালা নয়, মোটা দুই গরু-ছাগল চরছে, আর দেখতে পেল একখানি কুটির। এখানে এই নির্বান্ধব পুরীতে অতল সমুদ্রের মধ্যে বাস করে কে? হয় সাধু, নয় ডাকু। তার পক্ষে এখন দু-ই সমান। নির্ভয়ে সে এগিয়ে গেল, কুটিরের কাছে পৌঁছতেই শুনতে পেলো, এসেছ বাবা, বলেছিলাম না যে আবার দেখা হবে।

একি ঠাকুর যে। বলে জরা প্রণাম করলো, প্রভুদয়াল জড়িয়ে ধরলো তাকে বুকে। বলল, চলো বাবা বসিগে।

(আগামী সংখ্যায় সমাপ্য)

বালুচর বুটিদার শাড়ী

মৃণাল গুপ্ত

(১)

দশ বছরের ব্যবধানে আসাতেই সঠিক হদিসটা ভুলে গিয়েছিলাম। পথ হাতড়িয়ে তাই কিছুটা সময় হারিয়ে সন্ন্যাসীতলায় এসেছিলাম। লালগোলা রেলপথের স্টেশন জিয়াগঞ্জ থেকে মাইল দুয়েকের হাঁটাপথ। তবে বর্ষার বিগলিত করুণায় সে পথ বড় বিপজ্জনক ছিল। কাদা ভেঙে চারপাশের দৃশ্য দেখে আমরা সন্ন্যাসীতলার গ্রামে ঢুকেছিলাম। বারোয়ারী থানের পাশে সরু পথ, পানাপুকুর, বর্ণালী আলিম্পনে চিত্রিত নিকানো দেয়াল,—কোন কিছুই পাল্টায়নি। কেবল দুটো জিনিসের পরিবর্তন আমাকে বড় পীড়া দিয়েছিল। শশীবাবু ভয়ানক শীর্ণকায় হয়ে গেছেন। তাঁর হাতের নকশা তাঁতটি অকেজো হয়ে পড়ে থেকে ভেঙে গেছে। এই তাঁতেই এক দশক আগে আমি ও'কে বালুচরী 'টেবিল ক্লথ' নকশা তুলতে দেখেছিলাম। নানা রংয়ের সমন্বয়ে সুন্দর টেবিল ক্লথ. কিন্তু কালের অনিবার্যতায়, সরকারী উদাসীনতায় বড় বেদনা বোধ নিয়ে এই সূক্ষ্ম কাজের পাট তিনি চুকিয়েছেন। সাথে সাথে মুর্শিদাবাদের বালুচরী বয়ন-চাতুর্যের সামান্যতম ক্ষীণ ধারাটিরও সমাধি হয়েছে। বৃদ্ধ শশীবাবু—শ্রীযুক্ত শশীভূষণ দাস তাঁর সুখস্মৃতির দুটো নজীর আমাদের দেখিয়েছিলেন। তাঁর হাতে বোনা বালুচরী একটি রেশমী টেবিল ক্লথ। আপে এলেমেলো সুতো বাঁধা জটিল নকশা তোলার একটি জড়ানো কাঠি,—পুরনো বালুচরী নকশার সকল রহস্যের চাবিকাঠি।

আধুনিক শাড়ীর নানা নামের সমারোহে 'বালুচরী' এখন এক বিস্মৃতপ্রায় নাম। কিন্তু যাঁরা কলারসিক, বাংলার চারু ও কারুশিল্পের প্রতি যাঁদের মমত্ববোধ রয়েছে, মাঝে মাঝে সংগ্রহশালায় ঘোরাটা যাঁদের নেশার বস্তু, চার অক্ষরের 'বালুচরী' নাম তাঁদের মনে দৃশ্য-অনুভূতির এক সুখকর আলোড়ন তোলে। তাই ছেঁড়া ফাটা বালুচর শাড়ীর শতাধিক টাকার বেচা-কেনার খবরেও এঁরা বিস্মিত নন।

বয়নশিল্পে বাংলার সুখ্যাতি চিরকালই ছিল দিগন্তপ্রসারী। সুপ্রাচীন কাল থেকে বিদেশে দেশীয় সংস্কৃতির প্রচারে বাংলার বয়ন-শিল্পের প্রশংসনীয় ভূমিকা আজও আমরা বিস্মিত হয়ে স্মরণ করি। সাজগোজের প্রতি বাঙালী সমাজের অতি সচেতনতা আর বয়নশিল্পীদের সৃজনী প্রতিভার মিলনে অতীতের বাংলায় বৈচিত্র্যপূর্ণ বয়ন-সামগ্রীর সমারোহ। বাংলাদেশের বিভিন্ন এলাকা থেকে সংগৃহীত খৃষ্টপূর্ব কাল থেকে শুরু করে পোড়ামাটি ও পাথরের নানা মূর্তির অঙ্গ-আভরণে এই বসন-বৈচিত্র্যের কিছু কিছু নজীর আমাদের চোখে পড়ে। উপাদানের অপ্রতুলতায় এই

শাড়ীতে তোলবার জন্য অক্ষয়বাবুর হাতে তৈরী একটি নকসা

বিষ্ণুপুরের জনৈক মহিলা শিল্পী বালুচরী স্টোল বোনার কাজে ব্যস্ত

বিচিত্রতার বিস্তারিত ইতিহাস, খুঁটিনাটি তথ্য আমাদের জানা নেই। তবে এইটুকু আমাদের অজানা নয় যে, সূক্ষ্মতা ও সুচারুতায় ঢাকার মসলিনের যেমন জুড়ি ছিল না, তেমনি রংয়ের ঔজ্জ্বল্যে ও বয়ন-নৈপুণ্যে মুর্শিদাবাদের রেশমও ছিল অপ্রতিদ্বন্দ্বী। মুর্শিদাবাদের রেশম তাঁতী-দের উদ্ভাবনী প্রতিভার এক বিস্ময়কর সৃষ্টি ছিল বালুচর বুটিদার শাড়ী।

শাড়ীর সাথে 'বালুচর' নাম শুধুমাত্র অর্থহীন সংযোজন নয়। কোন আঞ্চলিক বয়ন-শিল্পীদের বিশিষ্ট ঘরোয়ানায় তৈরী বসনের নামকরণ সাধারণতঃ সেই অঞ্চলের নাম অনুসারে হবার রেওয়াজটি বহুকালের। খৃঃ পূঃ সহস্রাধিক বছর আগেও সিন্ধু উপত্যকায় তৈরী বসন বিদেশীদের কাছে 'সিন্ধু' নামে পরিচিত ছিল। পালি সাহিত্যে ও কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রে কাশীতে তৈরী বিখ্যাত শাড়ীকে 'কাশেয়ক' ও বাংলার তুষার শুভ্র নরম মসলিনকে 'বঙ্গক' নামে চিহ্নিত করা হয়েছিল। একই রীতিতে পরবর্তী-কালে বেনারসী, ঢাকাই, টাঙ্গাইল ও শান্তি-পুরী শাড়ীর নামকরণ। বালুচর শাড়ীর ক্ষেত্রেও এই রীতির কোন ব্যতিক্রম দেখি না। ভাগীরথীর গতি পরিবর্তনের ভাঙ্গা-গড়ায় 'বালুচরে'র উদ্ভব। কালক্রমে এই বালুচরের উপর ঘনবসতির পত্তন। এই বালুচর গ্রামের রেশম তাঁতীদের বয়ন-কুশলতায় শাড়ী বালুচরীর জন্ম। কিন্তু বালুচর গ্রাম আজ আর গ্রাম নেই,—মুর্শিদাবাদ জেলার লালবাগ মহকুমার জিয়াগঞ্জ টাউনে রূপান্তরিত।

কোন গুণে, কোন বৈশিষ্ট্যে বালুচর শাড়ী ভারতীয় বস্ত্রশিল্পের ইতিহাসে অবিস্মরণীয়? এই প্রসঙ্গ এখন স্বাভা-বিকভাবেই এসে পড়ে। সংক্ষেপে বলা যায়, বালুচর শাড়ীর বিচিত্র নকশা, সূক্ষ্ম অল-ঙ্করণ, রংয়ের ঔজ্জ্বল্য ও সুচারু সমন্বয় বর্তমান যুগের কলারসিকদের বড় বিস্ময়ের বিষয়বস্তু। আনুপূর্বিকভাবে রেশম অথবা মটকা জাতীয় সুতো দিয়ে তৈরী বালুচর শাড়ী দৈর্ঘ্যে-প্রস্থে সাধারণ শাড়ীর মতই। এর অসাধারণত্ব হস্তচালিত তাঁতে বোনা নকশায়,—নানা রংয়ের সুষম সমন্বয়ে যা এর গায়ের সর্বত্র ছড়িয়ে রয়েছে। হস্ত-চালিত তাঁতে বস্ত্র বয়নের সাথে সাথে যে কি পরিমাণ উচ্চাঙ্গের শিল্প সৃষ্টি করা সম্ভব দেড়শো দুশো বছরের পুরনো বালুচর শাড়ী প্রত্যক্ষ করেই তা উপলব্ধি করা যায়। বালুচর শাড়ীর সকল সৌন্দর্যের কেন্দ্রস্থল এর আঁচলা। শিল্পী তার সমস্ত কুশলতার পূর্ণ বিকাশ অসীম ধৈর্য নিয়ে এখানেই ফোটাতে চাইতেন। শাড়ীর প্রান্তভাগে ৩½"×৫" আয়তক্ষেত্রাকার বা সাড়ে তিন ইঞ্চি বর্গাকার পরিসরকে নানা বর্ণালী রেশমে বুনটের মাধ্যমেই বিচিত্র ধরনের নকশা ও অলঙ্করণে শোভিত করার প্রবণতা দেখা যেতো। এই শোভিত করার পদ্ধতিটি বড় আকর্ষণীয় ছিল। মূল আয়তক্ষেত্র বা বর্গক্ষেত্রাকার পরিসরের ভেতরে নানা ধরনের অল-করণ বা নকশাকে ক্রম হ্রস্ব-মান আয়তাকার বা বর্গাকার প্যানেলে পর-পর সাজিয়ে আঁচলের কেন্দ্রভাগের দিকে নিয়ে যাওয়া হতো। এই ক্রমহ্রস্বমান প্যানেলগুলির পর্যায়ক্রমে একটিতে থাকতো বলিষ্ঠভঙ্গীতে প্রস্ফুটিত ফুল-লতা-পাতার লীলায়িত প্রকাশ আর অপরটিতে থাকতো বিভিন্ন ধরনের বেশভূষায় নারী অথবা পুরুষের চলমান জীবনযাত্রার আকর্ষণীয় খণ্ডচিত্র। এ ধরনের একটি খণ্ড-চিত্রকেই শিল্পী বারবার বুনটের মাধ্যমে বিভিন্ন রংয়ের বিন্যাসে প্যানেলের আকারে প্রকাশ করে একঘেয়েমি ক্লান্তির পরিবর্তে দৃশ্যগত বৈচিত্র্যের আস্বাস দিতেন। আঁচলের মূল কেন্দ্রীয় পরিসরটিকে ভরাট করতেন এক বা একাধিক সূক্ষ্ম কারুকার্য-ময় অনিন্দ্যসুন্দর কলকা দিয়ে। আঁচলার এই পর্যাপ্ত অলঙ্করণের সাথে সামঞ্জস্য রেখে শাড়ীর দুই পাড়ে থাকতো ফুল-লতা-পাতার বলিষ্ঠ 'মটিফ'। শাড়ীর বিস্তীর্ণ রঙ্গীন জমিনের উপর আড়াআড়ি সারি-বদ্ধভাবে ছড়ানো থাকতো নানা রংয়ের ছোট ছোট কলকা, উড়ে চলা হংসবলাকা, সারিবদ্ধ চকিত চপল হরিণ, বা প্রস্ফুটিত ফুলের সুষমা। ঘন রঙ্গীন জমির উপর প্রস্ফুটিত ফুলের 'মটিফ' কৃষ্ণপক্ষের রাত্রির নক্ষত্রখচিত আকাশের কথা মনে করিয়ে দিত অথবা স্নিগ্ধ প্রভাতের শিউলি ছড়ানো নিকানো আঙ্গিনার কথা। জমির এই অলঙ্করণের জন্যই এই শাড়ীর নাম-করণ হয়েছিল 'বালুচর বুটিদার শাড়ী'। দেশীয় রীতিতে রঞ্জিত নানা বর্ণালী রেশমের পরিমিত সমন্বয় বালুচর বুটিদার শাড়ীর অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য। শাড়ীর জমিতে হলুদ, ম্যাজেন্টা, ময়ূরপঙ্খী, বেগুনী, হালকা নীল রংয়ের প্রাধান্য থাকতো। এই জমির রংয়ের সাথে চমৎকার সামঞ্জস্য রেখে লাল, গেরুয়া, হলুদ, সবুজ প্রভৃতি রংয়ের বিভিন্ন 'সেডে' শাড়ীর উপর নকশা বা অলঙ্করণের কাজ তোলা হতো।

পুরনো বালুচর শাড়ীর সংগ্রহ কল-কাতার একাডেমী অফ ফাইন আর্টস, ভারতীয় যাদুঘর, আশুতোষ সংগ্রহশালা ও রাজ্য প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের সংগ্রহশালায়—গেলে দেখা যাবে। এছাড়া কিছু কিছু ব্যক্তি-গত সংগ্রহেও রয়েছে। এদের মধ্যে একাডেমীর সংগ্রহই সবচেয়ে বেশী ব্যাপক। এই বিভিন্ন সংগ্রহের শাড়ীগুলির মধ্যে যে

সমস্ত 'মটিফ' বা 'ডিজাইন' চোখে পড়ে আলোচনার সুবিধার জন্য সেগুলোকে তিন শ্রেণীতে রাখা যেতে পারে— (১) ফুল-লতা-পাতার ফ্লোরাল মটিফ, (২) নারী-পুরুষ ও জীবজন্তুর 'ফিগার মটিফ', ও '৩) নানা ধরনের কল্কা 'মটিফ'।

যে কোন দেশের প্রাকৃতিক পরিবেশ তার স্বকীয় বৈশিষ্ট্য নিয়ে দেশীয় শিল্পী মানসিকতাকে প্রভাবিত করে। তাই স্বাভাবিকভাবেই সুজলা, সুফলা, শ্যামল বাংলার রকমারী গাছ ফুল লতা-পাতার বিচিত্র বিন্যাস ও গঠন বাঙালী শিল্পী মানসকে যথেষ্ট প্রভাবিত করেছে। গ্রামীণ আল্পনায়, সূচীশিল্পে ও অন্যান্য কারুশিল্পে নানা ধরনের ও গঠনের 'ফ্লোরাল মটিফে'র ব্যাপক ব্যবহার আমাদের চোখে পড়ে। মৃৎশিল্পের অলঙ্করণের ক্ষেত্রেও 'ফ্লোরাল মটিফকে' যে একটা বড় মাধ্যম হিসাবে কাজে লাগানো হয়েছে বাংলাদেশ থেকে সংগৃহীত সীলমোহরে ও প্রাচীন পোড়ামাটির গাত্র অলঙ্করণে তার নজীর আমাদের চোখে পড়ে। বয়ন-শিল্পেও এর কোন ব্যতিক্রম দেখি না। ফ্লোরাল মটিফকে বিশেষ করে বালুচর বুটিদার শাড়ীর অঙ্গ অলংকরণে চমৎকারভাবে ব্যবহার করা হয়েছে। শাড়ীর প্রান্তসীমার পাড়ের পরিসরকে ফুল লতাপাতার বর্ণালী মটিফে ভরাট করা হতো। তাছাড়া অন্যান্য ধরনের অলংকরণের ক্ষেত্রেও ফ্লোরাল মটিফের পরিপূরক ব্যবহার ব্যাপকভাবে চোখে পড়ে।

এবার অবয়ব বা ফিগার মটিফের কথা ধরা যাক। ফিগার মটিফ বালুচর শাড়ীর সবচেয়ে বেশী কৌতূহলোদ্দীপক বৈশিষ্ট্য। সংগ্রহশালায় ও ব্যক্তিগত সংগ্রহে আমরা যে সমস্ত বালুচর বুটিদার শাড়ী সচরাচর দেখে থাকি তাদের সময়কাল অনুমান করা হয় খৃষ্টীয় অষ্টাদশ ও ঊনবিংশ শতকের মধ্যে। বিগত দু-তিন শতকে আমাদের দেশীয় শিল্পীরা এমন এক সামাজিক পারিপার্শ্বিকের মধ্যে বসবাস করেছেন যেখানে বিভিন্ন স্তরের মানুষের ধ্যান-ধারণা, চালচলন ও জীবনযাত্রার মধ্যে অপরিসীম বৈচিত্র্য ও পার্থক্য ছিল। অফুরন্ত ঐশ্বর্য আর ভোগবিলাসের রাজকীয় চৌহদ্দির মধ্যে যে সমস্ত নবাব-নাজিম, রাজা-মহারাজা, জমিদার, সুবেদার ও আমীর-ওমরাহরা জীবন কাটিয়েছেন শিল্পীরা যেমন তাদের জীবনযাত্রা লক্ষ্য করেছেন, তেমনি তাঁরা অবাক বিস্ময়ে তাকিয়ে দেখেছেন নবাগত ফিরিঙ্গী সাহেবসুবোদের চলন-বলন ও অশন-বসনের সর্বপ্রকার অভিনব ভঙ্গীগুলোকে। তাঁদের এই অভিনিবেশের সফল রূপায়ণ আমরা দেখতে পাই পুরনো মন্দিরের গায়ের পোড়ামাটির অলঙ্করণে, পটচিত্রে ও শাড়ী বালুচরীর আকর্ষণীয় ফিগার মটিফে। বালুচর শাড়ীর এই ফিগার মটিফগুলোর মধ্যে সাধারণতঃ চোখে পড়ে অলংকৃত সিংহাসনে উপবিষ্ট তাম্রকূট সেবনরত অথবা অশ্বারোহী নবাব, যুদ্ধের বেশে কিংবা মজলিসে ফিরিঙ্গী সৈন্য, অশ্বারূঢ়া নারী, ফুলের সৌন্দর্য-

অশ্বারূঢ়া নারী। পাড়ের ফুল লতা-পাতার বলিষ্ঠ মোটিভ লক্ষণীয়।

দর্শনে বেগম, সুন্দর ভঙ্গিমায় ময়ূর, ভ্রমর, প্যানেলের মত করে হাতির সমাবেশ প্রভৃতি। কয়েকটি মটিফের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিই। একটি শাড়ীর প্যানেলে দেখা যায় সজ্জিত চলমান অশ্বের উপর কেশবতী সুবেশা কন্যা, মাথার উপর অলংকৃত ছত্রের ছায়া আর তার চারপাশে ভাসমান ফুল-লতা-পাতা—যেন রূপকথার কোন রাজকন্যা অজানা দেশে অভিসারের যাত্রী। নদীবক্ষে স্টীমার ও রেলগাড়ীর প্রচলন বালুচর শাড়ীর বয়নশিল্পীদের মনে যে যথেষ্ট বিস্ময় ও কৌতুকের সঞ্চার করেছিল কয়েকটি মটিফে তার চমৎকার পরিচয় পাই। একটিতে দেখি দ্বিতল স্টীমারের মাথার উপর প্রলম্বিত পতাকা উড়ছে, তার পাশে চোঙ থেকে ধুঁয়ো উঠছে। ফ্লোরাল মটিফের মাধ্যমে উড়ে চলা ধূম্রশিখাকে রূপ দিতে চেয়েছেন শিল্পী। স্টীমারের প্রান্তসীমা দুটোকে মকরের মুখাবয়বে অলংকৃত করা হয়েছে। স্টীমারের দ্বিতলে বিচিত্র বেশভূষায় সাহেব-মেম মুখোমুখি বসে। মেমসাহেবের হাতে পোষা পাখি। সাহেবের ডান হাতে ডাঁটিযুক্ত প্রস্ফুটিত ফুল। তাদের মাথার উপর বেলোয়ারী ঝাড় লণ্ঠনের বাতি জ্বলছে। অনুরূপভাবে [illegible] ফুল হাতে বসে সাহেব-মেম। ডেকে [illegible] দূরবীন হাতে দণ্ডায়মান জনৈক ফিরিঙ্গী। পাশে নির্দেশদানের ভঙ্গীতে বোধহয় ক্যাপ্টেন। আর একটি শাড়ীর প্যানেলে দেখি রেল-গাড়ীর মত দ্বিতল দ্বিচক্রযান। তলায় শায়িত কুকুর। দুই তলেই উপবিষ্ট সাহেব-মেম। পাশে সশস্ত্র ফিরিঙ্গী। বাণিজ্যিক দ্বন্দ্ব অনেক সময় ফিরিঙ্গীদের মধ্যে জঙ্গী মোকাবিলাতেও পরিণত হতো। বাংলার নবাবদের সাথে ফিরিঙ্গীদের দ্বন্দ্ব মূলতঃ বাণিজ্যকে কেন্দ্র করেই এবং এই দ্বন্দ্বেরই চূড়ান্ত পরিণতি পলাশীর প্রান্তরে। যুদ্ধবাজ ফিরিঙ্গীদের এই জঙ্গী মনোভাবের কিছু কিছু চিত্রও বালুচর শাড়ীতে দেখা যায়। যেমন, বড় কামানবাহী শকটের দুপাশে যুদ্ধবেশে তিনজন ফিরিঙ্গী সাহেব। পদক্ষেপের ললিতভায়, অঙ্গের বেশভূষায়, শিরস্থাপিত টুপির গঠনের পারিপাট্যে কোন ত্রুটি নেই। ফিরিঙ্গী বেশ-ভূষা ও রাজকীয় পরিচ্ছদের প্রতি শিল্পীদের সচেতনতা বালুচর শাড়ীতে আকর্ষণীয়ভাবে চোখে পড়ে। নানা রংয়ের সমাবেশে ও সুচারু বয়নের কারিগরীতে ফিগার মটিফগুলোর মধ্যে এক আশ্চর্য সুন্দর রিলিফের মত এফেক্ট আনা হতো যা প্রায় প্লাস্টিক আর্টেরই সমগোত্রীয়। বাংলার পুরনো মন্দিরের পোড়ামাটির গাত্র অলংকরণের মতই বালুচর শাড়ীর ফিগার

বিষ্ণুপুরে তৈরি বালুচরী স্টোল

মোটিফগুলো দর্শককে এক কথা ও কাহিনীর জগতে নিয়ে যেতে চায়—যে জগতে রাজা আছে, মহারাজা আছে, ফিরিঙ্গী সাহেবসুবা আছে, আবার ভারতীয় মহিলাদের শৌর্যের কথাও রয়েছে। ভারতবর্ষের অন্যান্য শৌখীন শাড়ীর সাথে বালুচর শাড়ীর পার্থক্যটা এখানেই। বেনারসী শাড়ী বা দক্ষিণ ভারতীয় টেম্পেল শাড়ীর দৃশ্যগত চটক আছে ঠিকই, কিন্তু বালুচর শাড়ীর মত এরা চোখের চৌকাঠ ছাড়িয়ে মনের অন্দরে ঢুকে আমাদের ভাবনা ও কল্পনাগুলোকে আন্দোলিত করে না,—একটা সামাজিক কাহিনীর জগতে নিয়ে যায় না।

যে মোটিফকে বাদ দিয়ে বালুচর শাড়ীকে কল্পনা করাও সম্ভব নয় তা হল এর অনবদ্য কলকা মোটিফ। শিল্পমানের দিক থেকে কলকা মোটিফ বালুচর শাড়ীর সর্বাপেক্ষা আকর্ষণীয় বৈশিষ্ট্য। সাধারণতঃ আঁচলার আয়তাকার বা বর্গাকার প্যানেলগুলোকে ক্রমহ্রস্বমানভাবে যে কেন্দ্রীয় পরিসরের দিকে নিয়ে যাওয়া হতো তাকে নানা বর্ণের ও গঠনের এক বা একাধিক সারিবদ্ধ কলকায় একনিষ্ঠভাবে শোভিত করার প্রবণতা দেখা যেতো। ভারতীয় শিল্পকলায় ব্যবহৃত কলকার কয়েকটি উৎকৃষ্ট ও বৈচিত্র্যপূর্ণ নিদর্শন আমরা বালুচর শাড়ীতে দেখতে পাই। অর্ধবৃত্তাকার একটি পরিসরকে ক্রমহ্রস্বমানভাবে উর্ধমুখী অথবা নিম্নমুখী করে বঙ্কিমভঙ্গীতে এক বিন্দুতে মিলিত করার নামই কলকা মোটিফ। এই কলকা মোটিফ কখন বালুচর শাড়ীর সর্বাঙ্গে বুটি হিসাবে ব্যবহৃত হতো আবার কখন শাড়ীর আঁচলের কোণায় কোণায় একটি করে বড় কলকাকে উপস্থাপন করা হতো। তবে কলকার গঠন নিয়ে বালুচরী বয়ন-শিল্পীদের পরীক্ষা-নিরীক্ষার সফল অভিব্যক্তি আমরা শাড়ীর আঁচলের কেন্দ্রীয় পরিসরেই দেখতে পাই। বড় কলকার অর্ধবৃত্তাকার প্রান্তসীমাটি পদ্মে শোভিত বৃত্তের সাথে যুক্ত করা হতো। ভেতরের ক্রমহ্রস্বমান পরিসরকে কলকার গতিময় গঠনের সাথে সামঞ্জস্য রেখে রকমারী ফুল লতা পাতার খুব সূক্ষ্ম কাজে শোভিত করা হতো। বঙ্কিম প্রান্তসীমাটিকে টিয়াপাখীর ঠোঁটের আকারে আনা হতো। পদ্মে পুষ্পে শোভিত একটি বৃত্তকে প্রান্তসীমার শেষ বিন্দুটির সাথে কখন কখন এমনভাবে ঝুলিয়ে দেওয়া হতো যে অনেক সময়ই দেখে মনে হতো কোন পাখী যেন নীড় বাঁধার অভিলাষে অভিসারী। বিভিন্ন কলারসিক বিভিন্ন বস্তুর গঠনের সাথে কলকার আদল খুঁজতে চেয়েছেন — যেমন আমের মঞ্জরীর সাথে, শঙ্খের সাথে, চেনার গাছের পাতার সাথে। কেউ কেউ মনে করেন যে, অলঙ্করণের ক্ষেত্রে কলকা মোটিফের ক্রমবিকাশের সূত্রটি মুঘল যুগের চিত্রিত পুঁথির অলংকরণের মধ্যেই খোঁজা উচিত। স্বাভাবিকভাবেই তাঁরা বলে থাকেন, বালুচর শাড়ীতে কলকা মোটিফ পারসিক প্রভাবের বহিঃপ্রকাশ। তাঁদের সপক্ষের যুক্তি হিসেবে বলা যায়, মধ্যপ্রাচ্য এলাকায় বহু প্রাচীনকাল থেকেই বয়ন-শিল্পে কলকা মোটিফের প্রচলন চোখে পড়ে। সাসানিয়ান (খৃষ্টীয় ২য় শতক—৭ম শতক) যুগের রেশম বয়নেও আমরা কলকা মোটিফের নিদর্শন পাই। পরবর্তীকালে পারস্যদেশীয় বিভিন্ন বয়ন-সামগ্রীতে যেমন, কম্বলে, কাপড়ে, শালে নানা ঢংয়ের কলকা (মীর-ই-কলকা) মোটিফ ব্যবহৃত হয়েছে। সেইজন্য ভারতীয় শিল্পে কলকা মোটিফের বহুল প্রচলন মুসলিম প্রভাবের ফল বলে অনেকে মনে করেন। পক্ষান্তরে বলা যায়, কলকার অবয়ব যে পুরোপুরি পারস্য-প্রভাবেই উদ্ভূত এমন সিদ্ধান্তে আসা বোধহয় সঙ্গত নয়। কারণ, কলকা মোটিফের সমভাবাপন্ন অনেক বস্তুই বহু প্রাচীনকাল থেকেই আমাদের দেশীয় শিল্পীদের কাছে দৃশ্যমান ছিল। মহেঞ্জোদারোতে প্রাপ্ত "Shell motif" -এর সাথে কলকার অর্ধবৃত্তাকার অবয়বের ঘনিষ্ঠ সাদৃশ্য কেউ কেউ লক্ষ্য করে থাকেন। সাঁচী ও ভারহুতের স্থাপত্য-ভাস্কর্যে কলকার ধাঁচে কিছু কিছু অলঙ্করণও আমাদের চোখে পড়ে। পরবর্তীকালে অজন্তার গুহাচিত্রে অঙ্কিত আমের গঠনের সাথে কলকার অবয়ব সাদৃশ্যও লক্ষণীয়। তাই এমন অনুমান করা বোধহয় অসঙ্গত নয় যে, পরিদৃশ্যমান অর্ধবৃত্তাকার বস্তুর গঠন-বিন্যাসের মধ্যেই দেশীয় শিল্পীদের কলকা সৃষ্টির প্রেরণাটি নিহিত ছিল এবং পরবর্তীকালে তাঁদের এই সৃজনশীলতা পারসিক প্রভাবে আরও বেশী পুষ্ট ও শ্রীমণ্ডিত হয়ে আকর্ষণীয় এবং কলকা মোটিফে প্রকাশিত হয়। বালুচর বুটিদার শাড়ীর অনন্যসুন্দর কলকাগুলি মনে হয় এই মিশ্র প্রভাবেরই সফল অভিব্যক্তি।

বালুচর শাড়ীতে এত ভিন্ন ধর্মীয় অলঙ্করণের পাশাপাশি সমাবেশ থাকা সত্ত্বেও কখনই তারা পারস্পরিক বিরোধী ভাব নিয়ে দর্শকের চোখকে পীড়িত করে না; বরং বিভিন্ন রং ও নানা অলঙ্করণ পরস্পরকে পরিপূরক হিসেবে সহযোগিতা করে সামগ্রিক সৌন্দর্য সৃষ্টির অংশীদার হতো। এই অলঙ্করণের কাজগুলো এতই সূক্ষ্ম, নিখুঁত ও পরিমিতিবোধসম্পন্ন যে এগুলো অনেক ক্ষেত্রেই সূচীশিল্প বলে ভ্রম হয়। বয়ন-শিল্পীদের এতো পরিমিতিবোধ, সমন্বয় সাধনের এমন যাদুকরী বিদ্যায় বিস্মিত না হয়ে পারা যায় না।

এই বয়ন-কুশলতার সঠিক উদ্ভবকালটি নির্ধারণ করা যদিও সম্ভব নয়, তবে যে সামাজিক পটভূমিতে এই শাড়ীর শ্রীবৃদ্ধি ও বিকাশ সে সম্পর্কে কিছুটা আলোকপাতে সচেষ্ট হওয়াটা খুবই প্রাসঙ্গিক হবে। একথা স্বাভাবিক, যে কোন চারু বা কারুশিল্পই তার সমৃদ্ধির শিখরে পৌঁছোবার পশ্চাতে বেশ কয়েক যুগের শিল্পীদের পরীক্ষা-নিরীক্ষার একনিষ্ঠ সাধনার অবদান থাকে। যে বিশিষ্ট ও স্বতন্ত্র বয়ন-পদ্ধতিতে আঠারো বা উনিশ শতকের বালুচর শাড়ীতে নকশা তোলা হতো তার পরীক্ষা-নিরীক্ষার পূর্ববর্তীকালের ধারাটির কোন সঠিক নজির দুর্ভাগ্যবশত আমাদের হাতে নেই। যে যুগ কারিগরি ও যন্ত্রবিদ্যায় যথেষ্ট পরিমাণে অগ্রসর ছিল, সে যুগে শুধুমাত্র বয়নশিল্পীদের বুদ্ধি ও হাতের কারিগরির সমন্বয়ে তাঁকে নকশা তোলার কাজটি নিঃসন্দেহে বিস্ময়কর। তাঁতে কাপড় বুননের চেয়ে বোনার সাথে সাথে নকশা

তোলার পদ্ধতিটি অবিশ্বাস্য রকমের বেশী জটিলতর। এই জটিলতর শিল্পকর্মটির প্রচলন পূর্বে ভারতে তথা ভারতে প্রাচীনকালে ছিল কি না তাও সঠিকভাবে আমাদের জানা নেই। তবে মুসলিম-পূর্ব যুগের মূর্তি ভাস্কর্য ও চিত্রকলার নারীমূর্তির অংগবসনে ডিজাইন বা নকশার কিছু কিছু চিহ্ন আমাদের চোখে পড়ে। তবে সে নকশা কাপড়ের উপর চিত্রিত নকশা হতে পারে, সূচী-শিল্পও হতে পারে, আবার তাঁতে বোনা নকশা হওয়াও অস্বাভাবিক নয়। যে হেতু সুপ্রাচীনকাল থেকেই সূক্ষ্মতা ও সুচারুতায় পূর্ণ ভারতীয় বসনসামগ্রী এক গৌরবময় ঐতিহ্যের অধিকারী, সেই হেতু যুগে যুগে বয়ন-শিল্পীরা তাঁদের উদ্ভাবনী প্রতিভাকে নানাভাবে কাজে লাগিয়ে তাঁদের বসন-সামগ্রীকে যে আরও বেশী জনপ্রিয় ও চিত্তাকর্ষক করে তুলবেন একথা স্বাভাবিক-ভাবেই ধরে নেওয়া যায়। প্রসঙ্গত এখানে উল্লেখ করা যায়, বহিরাগত সংস্কৃতির প্রভাবমুক্ত ভারতের কোন কোন আদিবাসী সমাজে 'কোমর তাঁতে' স্বল্প পরিসর কাপড় বয়নের সাথে সাথে হাতে নকশা তোলার এক পদ্ধতি এখনও প্রচলিত রয়েছে। তাই তাঁতে এই নকশা তোলার পদ্ধতিটি সম্পর্কে প্রাক-মুসলমান যুগের ভারতীয় বয়ন-শিল্পীরা একেবারেই অজ্ঞ ছিলেন এবং একমাত্র মুসলমান প্রভাবেই এই কুশলতার উদ্ভব এমন সিদ্ধান্ত দ্বিধাহীন ভাবে মেনে নেওয়া যায় না। তবে একথা ঠিক, মুঘল যুগে মুসলিম সভ্যতার প্রভাবে ও পৃষ্ঠপোষকতায় ভারতীয় বস্ত্র-শিল্প উন্নততর কলা-কৌশলে ও রকমারির অলংকরণের সাজসজ্জায় নতুনভাবে সঞ্জীবিত হয়েছিল। ইসলামী সভ্যতার কেন্দ্র-স্থল মধ্যপ্রাচ্য এলাকায় তাঁতে এই নকশা তোলার পদ্ধতিটি বহু প্রাচীনকাল থেকেই যেমন প্রচলিত ছিল খৃষ্টীয় তৃতীয় ও চতুর্থ শতকের Coptic textile এ ও পরবর্তী সাসানীয় যুগের রেশমবস্ত্রে ফিগার, জিওমেট্রিক ও ফ্লোরাল মটিফের সমাবেশই তার প্রমাণ। পরবর্তীকালে তাঁতে এই নকশা তোলার পদ্ধতিটি ইসলাম জগতে যথেষ্ট জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিল। বালু-চরী বয়ন-চাতুর্য এই ইসলামী সভ্যতার সংস্পর্শে উদ্ভূত না কি ভারতীয় বয়ন-শিল্পধারার নিজস্ব বৈশিষ্ট্য সঞ্জাত আমাদের বর্তমান জ্ঞানের পরিধিতে তা সুনিশ্চিত করে বলা সম্ভব নয়। তবে আমরা এটুকু জানি, বহু প্রাচীনকাল থেকে মসলিন ও রেশমবস্ত্র বয়নে বাংলাদেশের এক গৌরব-ময় ঐতিহ্য ছিল। পশ্চিমবাংলার বাঁকুড়া, বীরভূম, মালদহ ও মুর্শিদাবাদ জেলা বহু কাল যাবৎই রেশম চাষ ও বয়নের কেন্দ্র হিসেবে পরিচিত ছিল। সপ্তদশ শতকের গোড়াতেই মুর্শিদাবাদের লাভজনক রেশম ব্যবসার উপর বৃটিশ বেনিয়ানদের সন্ধানী দৃষ্টি পড়েছিল। সপ্তদশ শতকের মাঝা-মাঝিতে ডাচ, ফ্রেঞ্চ, ইংরেজ ও আর্মানীয় বণিকেরা মুর্শিদাবাদ জেলার বিভিন্ন অংশে কুঠি স্থাপন করে বিদেশে কাঁচা রেশম ও রেশমজাত দ্রব্য চালান দিতে শুরু করায় এই শিল্পের গুরুত্ব অনেকখানি বেড়ে যায়। পরবর্তীকালে আঠারো শতকের একেবারে গোড়াতেই মুর্শিদকুলি খাঁ ঢাকা থেকে বাংলার রাজধানী মুর্শিদাবাদে স্থানান্তরিত করায় স্থানীয় শিল্পকলার ক্ষেত্রে এক নব-যুগের সূচনা হয়। যে কোন দেশের রাজ-ধানী তার চতুষ্পার্শ্বস্থিত জনজীবনের উপর রাজনৈতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক বিভিন্ন দিক থেকেই এক পরিদৃশ্যমান প্রভাবের সৃষ্টি করে। অষ্টাদশ শতকের গোড়ায় মুর্শিদাবাদকে কেন্দ্র করে একদিকে যেমন নবাব কর্মচারী, আমীর ওমরাহ, জায়গীরদার ও উচ্চ মধ্যবিত্ত শ্রেণীর সমাবেশ ঘটেছিল, তেমনি বিভিন্ন স্থানের কুশলী চারু ও কারু শিল্পীরা আমিরী পৃষ্ঠ-পোষকতায় নিশ্চিন্ত ছায়াতলে এসে সমবেত হয়েছিল। এই সহৃদয় পৃষ্ঠপোষকতায় নতুন নতুন শিল্পেরও যেমন প্রচলন হয়েছিল, তেমনি প্রাচীন শিল্পগুলোর শিল্পোৎ-কর্ষতাও উল্লেখযোগ্য ভাবে বেড়ে গিয়েছিল। এই আমিরী রুচি ও চাহিদার সাথে সঙ্গতি রেখেই মনে হয় অষ্টাদশ শতকের কোন এক সময় স্থানীয় শিল্পীদের বয়ন-কুশলতায় কিংবা কোন বহিরাগত শিল্পীর সহযোগিতায় এই বালুচরী বয়ন-চাতুর্যের উদ্ভব হয়। একটি বালুচর শাড়ী বয়নের পশ্চাতে যে পরিমাণ শিল্পীজনোচিত নিষ্ঠা শ্রম ও সময়ের প্রয়োজন হত একমাত্র সক্রিয় পৃষ্ঠপোষকতাতেই তা সম্ভব ছিল। এমন জনশ্রুতি আছে যে, অনেকক্ষেত্রেই জমিদার ও উচ্চমধ্যবিত্ত শ্রেণীর লোকেরা নিষ্কর জায়গীর দিয়ে বালুচরী বয়ন-শিল্পীদের শিল্প সৃষ্টির প্রেরণা জোগাতেন। তদানীন্তন বাংলার জনপ্রিয় ফ্যাশান হিসাবে বিবেচিত হত। সাধারণ শাড়ী অপেক্ষা এই শাড়ীর মূল্যমান বেশী থাকায় একটি বিশেষ সমাজেই এর জনপ্রিয়তা সীমাবদ্ধ ছিল বলে মনে হয়। উনবিংশ শতকে একটি ভাল বালুচর শাড়ীর মূল্য ৪০,—৫০, টাকার মত ছিল। অভিজাত মুসলমান সমাজেও এই শাড়ীর প্রচলন ছিল কি না তা নিশ্চিত করে বলা সম্ভব নয় কারণ অবিমিশ্র বিশুদ্ধ রেশমবস্ত্র পরিধান মুসলমান শাস্ত্রবিরোধী বলে মনে করা হতো। পক্ষান্তরে হিন্দু ধর্মীয় ও বিবাহ অনুষ্ঠানে আবশ্যকীয় পট্ট, অর্থাৎ রেশম বস্ত্র হিসেবে অভিজাত হিন্দু পরিবারে বালুচর শাড়ীর প্রচলন ছিল। একাডেমী অফ ফাইন আর্টসের সংগ্রহের অনেক বালুচর শাড়ীই উত্তর ভারতের বিভিন্ন প্রদেশ থেকে সংগৃহীত হওয়ায়, উত্তর ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের অভিজাত মহলেও এই বালুচর শাড়ীর বাজার ছিল বলে মনে হয়।

বালুচর শাড়ীর জটিল বয়ন-পদ্ধতি ভাষায় সহজ করে প্রকাশ করা রীতিমত দুঃসাধ্য। সাধারণভাবে বলা যায় এই শাড়ীর অলংকরণের সমস্ত কাজই পূর্ব পরিকল্পিত কোন প্রকারের নকশা চিত্র (graphic design) ছাড়াই শিল্পীরা 'নকশা তাঁত' নামে এক বিশেষ ধরনের হস্ত-চালিত তাঁতে কাপড় বোনার সাথে সাথেই করে থাকতেন। শাড়ীর উপর প্রয়োজনীয় নকশাগুলো একটা বাঁশের কঞ্চিতে সুতো বাঁধার নানা রকমের জটিল কারিগরিতে সাজিয়ে নিয়ে একাধিক রংয়ের রেশমী সুতোয় তাঁতে বয়নের সাথে সাথে শাড়ীতে তোলা হত। সুতো বেঁধে এই নকশা তোলার পদ্ধতিকে আঞ্চলিক ভাষায় বলা হতো 'ঝাঁপে তোলা।' শাড়ীর গায়ের বুটি ও আঁচলের অলংকরণের জন্য প্রতি ক্ষেত্রেই দুটি করে নকশা ঝাঁপ ব্যবহৃত হত। অলংকরনের প্রাচুর্যের জন্য ১৭টি নকশা ঝাঁপ একত্রে ব্যবহারেরও রীতি ছিল। শাড়ী বয়নের সাথে সাথে এত বিভিন্ন রংয়ের

শাড়ীর আঁচলায় ফিগার মোটিভের মিলন
শ্বিতলযানে উপবিষ্ট সাহেব সুবারা।

আঁচলায় প্রস্ফুটিত ফুল-বুটির মাঝে
অনন্য একক কলকা।

সুতো একই সঙ্গে তাঁতের মধ্য দিয়ে যে কেমন করে চালানো হতো তা সত্যি এক বিস্ময়ের ব্যাপার। বয়নের সময় মূল শিল্পীকে সহযোগিতা করতেন আরও দুজন সহশিল্পী। এই তিনের সহযোগে একটি উচ্চমানের বালুচর শাড়ী বুনতে প্রায় ছ'মাস অতিবাহিত হতো। এই শাড়ী বয়নের সবচেয়ে জটিলতম নৈপুণ্য হচ্ছে অলংকরণের বর্গাকার বা আয়তাকার প্যানেলগুলোর কোণ মেলানো। শাড়ী ছাড়াও শিল্পীরা একই পদ্ধতিতে বালুচরী টেবিল ক্লথ, গায়ের চাদর, নামাবলী প্রভৃতি বুনতেন।

যে সমস্ত শিল্পী বালুচরী বয়নচাতুর্যের গৌরবময় ধারাটি বহন করে চলেছিলেন দুর্ভাগ্যবশতঃ আমাদের দেশের আর পাঁচটি চারু ও কারুশিল্পীর মতই তারা নেপথ্যে রয়ে গেছেন। তাদের ব্যক্তিগত ও সমাজজীবন সম্পর্কে বিশেষ কিছুই আমরা জানি না। তবে সৌভাগ্যবশত এঁদের মধ্যে একজন শিল্পী যথেষ্ট বুদ্ধিমান ও আত্মসচেতন ছিলেন, যিনি তাঁর হাতে বোনা সকল বালুচরী সামগ্রীর উপর স্বীয় নাম ঠিকানার স্বাক্ষর রেখে নিজেকে অবিস্মরণীয় করে রেখে গেছেন। তিনি হলেন স্বনামধন্য শ্রীদুবরাজ দাস—এই শিল্পকর্মের শেষ শ্রেষ্ঠ শিল্পী। কলকাতার সংগ্রহশালাগুলোতে 'শ্রীদুবরাজ দাস মীরপুর' শ্রীদুবরাজ দাস—[illegible] এই নাম ঠিকানার স্বাক্ষর সম্বলিত অনেক বালুচর শাড়ী সযত্নে রাখা আছে। ঊনবিংশ শতক শেষ হবার মুখে প্রায় আশি বছর বয়সে তাঁর মৃত্যু হয়। যতদূর জানা যায় শ্রীদুবরাজ দাস চামারের বংশে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী দুবরাজ জীবন শুরু করেছিলেন ঢোলক নির্মাণের কারিগর হিসাবে। পরবর্তীকালে নিরক্ষর দুবরাজ কবিগানের মূল কবিয়াল হিসেবে সৃজনীশক্তির পরিচয় দিয়ে নিজেকে জনপ্রিয় করে তোলেন। মধ্যে জীবনে বালুচর গ্রামের একজন বিখ্যাত মুসলমান বালুচরী শিল্পীর সংস্পর্শে এসে তাঁর জীবনের আর এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা হয়। দুবরাজ তাঁর জীবনে নানা ধরনের বালুচরী বস্ত্র সামগ্রী বয়ন করেছেন। যে কোন ধরনের অলংকরণের জন্য তিনি নকশা-তাঁত সাজাতে দক্ষ ছিলেন। দুবরাজ দাসের নাম ছাড়াও 'গোষ্ঠ কারিকর' নামে আর একজন শিল্পীর নাম স্বাক্ষরিত একটি মাত্র বালুচর শাড়ী একাডেমীর সংগ্রহে রয়েছে।*

গোষ্ঠ কারিগরকে দুবরাজের পূর্ববর্তী অথবা সমসাময়িক বলে মনে হয়। দুবরাজের অধিকাংশ শাড়ীর অলংকরণ তাঁর পূর্বসূরীদের শাড়ীর অলংকরণের তুলনায় বেশ কিছুটা সহজ সৌন্দর্যমণ্ডিত ছিল। অলংকরণের বিষয়বস্তুর ভারে ভারাক্রান্ত করার চেয়ে সরল আবেদনের প্রতি ঝোঁকটাই যেন তাঁর বেশী ছিল। দুবরাজের শাড়ীর অলংকরণের মধ্যে বুটি ও ডিজাইনের পারস্পরিক বিবর্তনের ধারাটি কিছুটা উপলব্ধি করা যায়। জনপ্রিয়তা হারাবার আশংকায় দুবরাজ দাস বালুচরী বয়ন চাতুর্যের সকল কলা-কৌশল তাঁর উত্তরসূরীদের কাছে প্রকাশ করে যাননি। তাই তাঁর মৃত্যুর সাথে সাথে এই শিল্পের স্বর্ণযুগের অবসান হয়েছে বলা যায়। দুবরাজের গ্রামবাসী শ্রীহেম ভট্টাচার্য তাঁর শিক্ষানবীশ হিসাবে কাজ করে এর কলাকৌশল কিছুটা রপ্ত করেছিলেন। শ্রীযুক্ত শশীভূষণ দাস, যাঁর পরিচয় দিয়ে এই নিবন্ধের সূত্রপাত করেছিলাম, স্বর্গীয় হেম ভট্টাচার্যের সহযোগী ছিলেন। তাঁর কাছে গিয়ে এই বালুচরী বয়ন শিল্প ও শিল্পীদের সম্পর্কে কিছু তথ্য সংগ্রহের চেষ্টা করেছিলাম। তাঁর বর্ণনায় ও পুরনো নথি-পত্রের বিবরণে জানা যায় বর্তমান জিয়াগঞ্জ (বালুচর) শহরকে কেন্দ্র করে বালুচরী শিল্পী [illegible]

* (যোগেশ্বর কর সাং জিয়াগঞ্জ—' এই রকম একটি লাইন আঁচলায় বোনা আর একটি শাড়ীর সন্ধানও আমি কলকাতায় পেয়েছি, তবে এই শাড়ীটি বেশী [illegible] স্বাক্ষরিত।)

পাড়া, রমনাপাড়া, রামজহর, বালিয়াগ্রাম, বাগড়হর, বোলিয়াপুকুর, আমজহর ও রণ্ণা গ্রাম। জিয়াগঞ্জের উত্তরে , গঙ্গার পাশেই বাহাদুরপুর গ্রামে ছিল দুবরাজের বাস। মূলত তিনি ছিলেন বাহাদুরপুরের পার্শ্ববর্তী গ্রাম মীরপুরবাসী। তাঁর অধিকাংশ শিল্পকর্মই মীরপুরে বসে করা। মীরপুর গঙ্গার ভাঙনে বিলীন হলে তিনি বাহাদুরপুরে উঠে আসেন। বালুচরী শিল্পী প্রধান গ্রামগুলোতে জাতিধর্ম নির্বিশেষে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মানুষ পাশাপাশি বাস করে শিল্পকর্মে নিয়োজিত ছিলেন। এঁদের মধ্যে ছিলেন কৈবর্ত, বৈষ্ণব, মাল, বাগদী, চণ্ডাল, মুসলমান ও জুগী সম্প্রদায়। আজ অবশ্য কোন গ্রামেই জীবিত কোন শিল্পীর সন্ধান পাওয়া যাবে না। শিল্পের ক্রমাবনতির সাথে সাথে বাঁচার জন্যে সমধর্মীয় কিংবা ভিন্ন ধর্মীয় কোন জীবিকাকে তাঁরা জীবনের সহযোগী করে নিয়েছেন।

সামাজিক রুচি ও চাহিদাকে সামনে রেখে যেমন শিল্পের উদ্ভব ও বিকাশ হয়, তেমনি কোন শিল্পের ক্রমাবলুপ্তির পশ্চাতে কতকগুলো সামাজিক, অর্থনৈতিক ও ঐতিহাসিক কারণকে সক্রিয় থাকতে দেখা যায়। বালুচরী বয়ন চাতুর্যের এমন অনুপম শিল্পধারার অবলুপ্তির সম্ভাব্য কারণগুলোর অনুসন্ধানের ঔৎসুক্য তাই খুব স্বাভাবিকভাবেই আমাদের হতে পারে। রাজনৈতিক ছাড়াও পলাশীর যুদ্ধ আমাদের সামাজিক ও অর্থনৈতিক জীবনকে এক সুদূরপ্রসারী প্রভাবে আন্দোলিত করেছিল। যে অভিজাত ও উচ্চ মধ্যবিত্ত বঙ্গসমাজ আবহমানকাল থেকেই বাংলার চারু ও কারু শিল্পের পৃষ্ঠপোষকতার ক্ষেত্রে প্রধান স্তম্ভ হিসেবে দাঁড়িয়েছিল ইংরেজ প্রভুত্বের নতুন ছত্রছায়ায় তাদের দ্রুত মানসিক রূপান্তরের সূত্রপাত হল। এক ইঙ্গ-বঙ্গ কলচারের আবর্তে পড়ে দেশজ শিল্প সংস্কৃতির পৃষ্ঠপোষকতার পরিবর্তে সাহেবীয়ানার খাতে তারা বেশী পরিমাণে অর্থ-ব্যয় শুরু করলেন। দ্বিতীয়তঃ, পলাশীর যুদ্ধোত্তর কাল থেকেই মুর্শিদাবাদের গুরুত্ব কমার সাথে সাথে সাহেবী ধাঁচে কলকাতার নগর কেন্দ্রিক জীবনের জনপ্রিয়তা বাড়তে থাকায় মুর্শিদাবাদের অভিজাত উচ্চমধ্যবিত্ত জনস্রোত ইংরেজ অনুগ্রহ, ব্যবসা-বাণিজ্য ও স্বচ্ছন্দ্যের আশায় কলকাতামুখী হলে অন্যান্য শিল্পীদের মত বালুচরী বয়ন শিল্পীরাও প্রত্যক্ষ পৃষ্ঠপোষকতা থেকে বঞ্চিত হতে শুরু করলেন। তৃতীয়তঃ, ইংরেজ প্রভুত্বের পূর্বে বাংলার গ্রামকেন্দ্রিক স্বয়ংসম্পূর্ণ অর্থনীতি চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের কুফলে ভাঙতে শুরু করায় সমস্ত গ্রামীণ শিল্পের সজীব ধারা আর্থিক প্রতিকূলতায় ক্রমশ ক্ষীণ হতে ক্ষীণতর হয়ে পড়ে। চতুর্থতঃ, কাশিমবাজারের ডাচ, ফ্রেঞ্চ, আর্মেনীয় ও ইংরেজ কুঠীগুলো সপ্তদশ শতকের মাঝামাঝি থেকে [illegible] [illegible] খাতিরে রেশম বয়ন শিল্পীদের যে সক্রিয় পৃষ্ঠপোষকতা করে আসছিলেন ইউরোপের শিল্পবিপ্লব তাদের এই পৃষ্ঠপোষকতার প্রকৃতি ও পদ্ধতিতে এক আমূল পরিবর্তনের সূচনা করল। তারা রেশম বসন সামগ্রীর উৎপাদনকে আর উৎসাহিত না করে কাঁচা রেশম চাষ ও নীল চাষে অর্থ বিনিয়োগ করতে শুরু করায় রেশম শিল্পীরা যথেষ্ট পরিমাণে ক্ষতিগ্রস্ত হল। এ সমস্তই হচ্ছে এই বালুচরী শিল্পের অবলুপ্তির অপ্রত্যক্ষ কারণ। প্রত্যক্ষ কারণ হিসেবে বলা যায়, এই শিল্প একটি নির্দিষ্ট সংখ্যক শিল্পীদের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। বালুচরী নকশা বয়নের মূল কলাকৌশল 'খাপে সুতো তোলা' সাধারণ রেশম বয়ন শিল্পীদের কাছে সম্পূর্ণ অজ্ঞাত ছিল। এমন কি এই বয়ন-চাতুর্যের পুরোপুরি ওস্তাদ শিল্পীরা তাঁদের গোষ্ঠীর সহশিল্পীদেরকেও এর সকল কলাকৌশল সম্পর্কে ওয়াকিবহাল হতে সাহায্য করতেন না। তাই খুব স্বাভাবিকভাবেই এই শিল্পকৌশল ক্রমশই এক সঙ্কীর্ণতর শিল্পীগোষ্ঠীর মধ্যে সীমিত হতে থাকে। দুবরাজ দাসকেই এখানে উদাহরণ স্বরূপ রাখা যেতে পারে। জনপ্রিয়তা হারাবার আশঙ্কায় নকশা তাঁতে সাজাবার কৌশলটি পর্যন্ত তিনি সম্পূর্ণ নিজস্ব করে রেখেছিলেন। তাই তাঁর মৃত্যুর পর এমন কোন দক্ষ একনিষ্ঠ শিল্পীকে পেলাম না যিনি যথেষ্ট আত্মবিশ্বাস নিয়ে এই শিল্পধারাকে আঁকড়ে থাকতে পারেন। অবশ্য শিল্পকে বাঁচিয়ে রাখার নিয়ামক একমাত্র শিল্পী নন, অনুকূল পরিবেশেরও প্রয়োজন। প্রতিকূলতার একাধিক কারণগুলোর সাথে যোগ করা যেতে পারে ঊনবিংশ শতকের শুরুতে মুর্শিদাবাদের ম্যালেরিয়ার মহামারী ও পরবর্তীকালে রেশম-কীটে পেব্রিন রোগের প্রাদুর্ভাব। অবলুপ্তির সর্বশেষ, কিন্তু গুরুত্বে সর্বকনিষ্ঠ নয়, কারণ হিসেবে অবশ্যই উল্লেখ করতে হয় রুচির বিবর্তন ও

দুবরাজের নাম-ঠিকানাসহ ওঁর হাতের বালুচর শাড়ীর আঁচলার একাংশ। ওপরে ওঁর নাম ঠিকানা বর্ধিতাকারে দেখান হয়েছে।

সাথে সাথে ফ্যাশানের ক্ষেত্রে বালুচরীকে হটিয়ে বেনারসী শাড়ীর দ্রুত অনুপ্রবেশ। ইংরেজ প্রভুত্বের পূর্বে অন্তর্দেশীয় বাণিজ্যের ও যোগাযোগ ব্যবস্থার অব্যবস্থার দরুণ পণ্যসামগ্রী একটি নির্দিষ্ট পরিধির বাইরে স্থানান্তরিত হবার যথেষ্ট অসুবিধা ছিল। ভারতে ইংরেজ শাসনের ক্রম প্রসারের সাথে সাথে এই দুই অসুবিধাই ক্রমে দূর হয়ে বিদেশে ও দেশের বিভিন্ন স্থানের বসন সামগ্রী কলকাতার বাজারে আসতে শুরু করে। হেস্টিংসের বেনারস বিজয়ের পর কলকাতার সাথে বেনারসের যোগাযোগ আরও বেশী ঘনিষ্ঠ হলে বেনারসী শাড়ীর বাংলার অভিজাত ও মধ্যবিত্ত সমাজের মন জয়ের পালা শুরু হয়। বিংশ শতকের একেবারে গোড়ায় জাপান ও জার্মানীর মেশিন তৈরী কৃত্রিম জরির ব্যবহারে বেনারসী শাড়ীর জৌলুষ বেড়ে গিয়ে অথচ মূল্যমান নেমে গিয়ে তা মধ্যবিত্ত সমাজে আরও জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। নানা প্রদেশের ও বিদেশের প্রভাবে বাংলাদেশে রুচি বা ফ্যাশানের যে বিবর্তন শুরু হয়েছিল বালুচরী শিল্পীরা তার সমধর্মী হতে পারল্যে না। তাই বাংলাদেশের ভেতরে ও বাইরে বিয়ের ও ফ্যাশানের বাজারে তাদের যে জনপ্রিয়তা ছিল বেনারসী শাড়ীর প্রতিদ্বন্দ্বিতায় তা হারিয়ে গেল।

(২)

বাংলার বয়ন শিল্পধারার বিস্ময়কর প্রকাশ এই বালুচর শাড়ীর পুরনো নিদর্শন অনেক মধ্যবিত্ত পরিবারেই বংশপরম্পরায় তোরঙ্গে রক্ষিত হচ্ছিল। শ্রদ্ধেয় দীনেশচন্দ্র সেন তাঁর 'বৃহৎ বঙ্গ' গ্রন্থের মাধ্যমে বাংলার চারু ও কারুশিল্পের প্রতি বাঙালী সমাজে যে আগ্রহের সৃষ্টি করেন তারই পরিপ্রেক্ষিতে শিল্পরসিকেরা বালুচর শাড়ীর গুরুত্ব সম্পর্কে সচেতন হতে শুরু করেন। দীনেশবাবু নিজেও কিছু কিছু বালুচর শাড়ী ব্যক্তিগতভাবে সংগ্রহ করেছিলেন। শ্রীগুরুসদয় দত্ত সরকারী সফরের সূত্রে কিছু বালুচর শাড়ী বিভিন্ন জেলা থেকে সংগ্রহ করেছিলেন বলে শোনা যায়। প্রায় একই সাথে ভারতীয় জাতীয় সংগ্রহশালা ও কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আশুতোষ সংগ্রহশালা বালুচর শাড়ী সংগ্রহে উদ্যোগী হয়ে পড়েন। স্বাধীনতা-উত্তর যুগে শিল্পরসিকেরা এর শিল্পমান ও বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে আরও বেশী করে সচেতন হতে শুরু করেন। সংগ্রহের কাজ চলতে থাকে দুভাবে—ব্যক্তিগতভাবে ও সংগ্রহশালার মাধ্যমে। পুরোনো বনেদী পরিবার থেকে যেমন তাঁরা বালুচর শাড়ী সংগ্রহ করতে শুরু করেন, তেমনি উচ্চমূল্যে সংগ্রহ করেন এক ধরনের ফেরিওয়ালা ব্যবসায়ীদের কাছ থেকে যারা পুরনো শাড়ীর বিনিময়ে মনোহারী জিনিসের লেনদেন করে থাকেন। বালুচর শাড়ীর ব্যক্তিগত সংগ্রাহকদের মধ্যে সাম্প্রতিককালে প্রথমেই নাম মনে আসে শ্রীযুক্ত শুভ ঠাকুর ও লেডী রাণু মুখোপাধ্যায়ের। ১৯৫৮ সালে শ্রীঅশোক মিত্র ও কতিপয় শিল্পরসিকজনের উদ্যোগে শ্রীঠাকুরের সংগ্রহের ৫৭টি বালুচর শাড়ীর এক প্রদর্শনী কলকাতায় উদ্বোধন করা হয়। এই প্রদর্শনী উদ্বোধনের উদ্দেশ্য ছিল দ্বিবিধ—বালুচরী বয়ন চাতুর্যের বৈশিষ্ট্য জনসাধারণের কাছে তুলে ধরা ও এই শিল্পের পুনরুজ্জীবনে সরকার ও জনসাধারণকে অনুপ্রাণিত করা। একই উদ্দেশ্য নিয়ে '৬১ সালে একাডেমী অফ ফাইন আর্টসে লেডি রাণু মুখোপাধ্যায়ের সংগ্রহের ৭৫টি বালুচর শাড়ীর এক প্রদর্শনীর উদ্বোধন হয়। এই দুই প্রদর্শনী কলকাতার শিল্প ও শাড়ী-রসিক মহলে বালুচর শাড়ীর পরিচিতি ও জনপ্রিয়তা বাড়াতে যথেষ্ট সহায়তা করেছিল। এই শিল্পের পুনরুজ্জীবনের চেষ্টা বিভিন্ন সংস্থার মাধ্যমে চলতে থাকে। দুবরাজের ছাত্র হেম ভট্টাচার্যকে দিয়ে বহরমপুর টেক্সটাইল টেকনোলজি পুরনো পদ্ধতিতে বালুচরী বয়নের যে প্রচেষ্টা শুরু করেছিলেন হেমবাবুর মৃত্যুর সাথে সাথেই তা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়। অল ইণ্ডিয়া হ্যাণ্ডলুম বোর্ডের কলকাতার উইভার্স সার্ভিস সেন্টারের অধিকর্তা শ্রীনীরেন ঘোষের তত্ত্বাবধানে সম্পূর্ণ প্রথাগত পদ্ধতিতে বালুচর শাড়ী বয়নের পরীক্ষা-নিরীক্ষা শুরু হয় '৬০ সাল থেকে। শ্রীঘোষ একজন দক্ষ চিত্রশিল্পী। প্রথাগত বালুচরী মটিফ ও বর্তমান ক্রেতাদের রুচির মধ্যে একটা সামঞ্জস্য বিধানের চেষ্টা করে তিনি বালুচরী ডিজাইন তৈরী করছেন। এর ভিত্তিতেই তাঁর সংস্থার কর্মী শ্রীলক্ষ্মীনারায়ণ মনিগ্রাম (মুর্শিদাবাদ জেলার গণকর মির্জাপুরের বাসিন্দা) বিগত দশ বছরে যে সমস্ত বালুচর শাড়ী বয়ন করেছেন তা স্বদেশের ও বিদেশের ভারতীয় পণ্যের প্রদর্শনীতে স্থান পেয়ে রসিকজনের প্রশংসা অর্জন করেছে। সম্পূর্ণ প্রথাগত পদ্ধতিতে এই শাড়ী তৈরীতে যে শ্রম ও সময়ের প্রয়োজন হয়, তার ফলে প্রতিটি শাড়ীর মূল্যমান নির্ধারিত হয় প্রায় অবিশ্বাস্য রকমের - শাড়ী প্রতি প্রায় দু হাজার টাকা। বলা বাহুল্য, একমাত্র প্রথাগত বয়ন পদ্ধতির একটি নজীর বাঁচিয়ে রাখা ছাড়া এই মূল্যমানে বালুচরী শাড়ীর জনপ্রিয়তা ফিরিয়ে আনার চেষ্টা নিরর্থক। সম্প্রতি জ্যাকার্ড তাঁতের সাহায্যে শ্রম ও সময় বাঁচিয়ে বালুচর শাড়ীকে জনপ্রিয় করে তোলার যে এক বেসরকারী প্রচেষ্টা বাঁকুড়া-বিষ্ণুপুরে শুরু হয়েছে তা চাক্ষুষ দেখতে বিষ্ণুপুরে গিয়েছিলাম। মন্দিরময় বিষ্ণুপুর শহরের আশে পাশে রেশমশিল্পীরা ছড়িয়ে ছিটিয়ে বসবাস করছেন। যে সমস্ত শিল্পীরা কেবলমাত্র বালুচর শাড়ী বা তার সমগোত্রীয় 'মল্লভূম' শাড়ীর কাজ করে থাকেন তাদেরকে সাধারণতঃ কয়েকটি এলাকায় একজোট হয়ে বসবাস করতে দেখেছি—কালীতলা, পাটরাপাড়া, কৈলাসতলা, খাপাড়া, কৃষ্ণগঞ্জ ইত্যাদি। বিষ্ণুপুরে বালুচর শাড়ীর পুনরুজ্জীবনের প্রচেষ্টার পিছনে যে শিল্পীর প্রাথমিক উৎসাহ ও প্রতিভা সক্রিয়ভাবে কাজ করেছে, তিনি হলেন অশীতিপর যুবা শ্রীঅক্ষয়কুমার দাস। আশ্চর্য উৎসাহী ও প্রাণবন্ত মানুষ অক্ষয়বাবু। বয়সের ভারে কিঞ্চিৎ নুয়ে পড়েছেন। মুখের নানা জায়গায় বলিরেখার সমাবেশ। চোখের দৃষ্টিও সমান সতেজ নয়। তবু তাঁর উৎসাহ, আত্মবিশ্বাস আমাদের মত যুবা পুরুষদের রীতিমত লজ্জা দেয়। ছোটবেলা থেকে বিভিন্ন কাজে উৎসাহ ছিল অফুরন্ত। আঁকার নেশা ছাড়াও ছোটবেলায় ঢালাইয়ের কাজ, ডাকের সাজের কাজ, পাকা রং তৈরীর কাজে হাত পাকিয়েছেন। জাতিতে তাঁতী। তাই তাঁত চালাতে তো জানবেনই।

আলোকচিত্রশিল্পী হিসাবেও একদা বিষ্ণুপুরে অক্ষয়বাবুর একটা পরিচিতি ছিল। এ হেন অক্ষয়বাবুকে মধ্যমণি করে বিষ্ণুপুরের বালুচরী শিল্পীরা 'সিল্ক খাদি সেবা মণ্ডল' নামে এক সোসাইটির মধ্যে থেকে বালুচর শাড়ীর কাজ করছেন। অক্ষয়বাবু বালুচর শাড়ীর প্রতি তাঁর অনুরাগের সূচনাটি এক রোমান্টিক স্মৃতির মাধ্যমে আমাদের বলেছিলেন। বয়স তখন তাঁর পঁচিশ কি ছাব্বিশ। ভরা যৌবন তখন। রাঢ় বাংলার প্রান্তরে ঘুরে ঘুরে কাপড় ফিরি করেন। বাঁকুড়ার সোনামুখীতে মনোহর ঠাকুরের উৎসব। বহু দূর-দূরান্ত থেকে অনেক মিছিল। সেই মিছিলের ভীড়ে এক সুবেশী যুবতী অক্ষয়বাবুর চোখ কেড়ে নিয়েছিল। তার শাড়ীর গায়ের বিচিত্র রং ও রকমারী নকশায় যুবক অক্ষয় একেবারে মোহাবিষ্ট। স্থান-কাল ও শালীনতা ভুলে রং ও নকশার টানে যুবতীটির পিছু নিয়েছিলেন বহুক্ষণ। সেদিনই বালুচর শাড়ীর সাথে অক্ষয়বাবুর প্রথম পরিচয়। তারপর লোকারণ্যের ভীড়ে যুবতী হারিয়ে গেল কোথায়, কিন্তু শাড়ীটি অক্ষয়ের চোখে বাঁধা পড়লো চিরকালের মত। অনেক অনুসন্ধানের পর বালুচর শাড়ীর শিল্পী সন্ধানে এক রকম প্রায় পায়ে হেঁটেই মুর্শিদাবাদের জিয়াগঞ্জে এসেছিলেন। কিন্তু বালুচর গ্রামে তখন আর তেমন ওস্তাদ শিল্পী নেই। তাই এই কাজে হাত দেবার উৎসাহ পেলেন না। শেষ বয়সে কলকাতার ডিজাইন সেন্টারে কাজ করার সময় শ্রীশুভ ঠাকুর তাঁকে বালুচর শাড়ী বয়নে উৎসাহিত করেছিলেন। ডিজাইন সেন্টার থেকে অবসর নিয়ে বিষ্ণুপুরে এলে বালুচর শাড়ী সম্পর্কে তাঁর এই আগ্রহকে পুরোপুরি কাজে লাগান স্থানীয় অবাঙ্গালী ব্যবসায়ী শ্রীভগবান দাস। ব্যবসায়ীক বুদ্ধির সীমাবদ্ধতার মধ্যে থেকেও অবাঙ্গালী ভগবানবাবু বাংলার সাবেকী বয়ন শিল্পের পুনরুজ্জীবনে আর্থিক ঝুঁকি ও দায়দায়িত্ব নিয়ে যে সহৃদয়তার পরিচয় দিয়েছেন আমাদের নির্ভেজাল বাঙ্গালী ব্যবসায়ী মহলে তা সুলভ হলে শিল্প-রসিকেরা উৎফুল্ল হতে পারতেন। এটা বড় আক্ষেপের কথা যে, মুর্শিদাবাদের কোন রেশম ব্যবসায়ী জেলার এই গৌরবময় শিল্পটিকে বাঁচিয়ে রাখতে বিন্দুমাত্র সচেষ্ট হচ্ছেন না।

অক্ষয়বাবু কাজ করেন মাথা দিয়ে আর অন্য শিল্পীরা কাজ করেন হাত দিয়ে। উনি মাথা খাটিয়ে মাপজোক করে বড় বড় গ্রাফ কাগজে নকশা রচনা করেন। আর অন্য শিল্পীরা মাপ অনুযায়ী অসংখ্য পাঞ্চকার্ড কেটে তা জ্যাকার্ড তাঁতে চাপিয়ে শাড়ীতে রূপ দিয়ে থাকেন। সময় ও শ্রমের সাশ্রয়ের জন্য বিষ্ণুপুরের এই বালুচর শাড়ীর দাম পড়ছে ৩০০-৩৫০ টাকার মধ্যে। বালুচর শাড়ী ছাড়াও তাঁরা স্টোল ও দেয়াল সজ্জার জন্য প্যানেলাকৃতি বালুচরী পিস তৈরী করছেন। তাঁদের তৈরী সামগ্রী দেশের বাজারে পরিচিত হতে শুরু করেছে এবং বিদেশের বিভিন্ন প্রদর্শনীতেও প্রদর্শিত হচ্ছে। বিষ্ণুপুরী এই বালুচরী সামগ্রীর সাথে প্রথাগত বালুচরীর যে দুটো পার্থক্য প্রকট হয়ে ধরা পড়ে তা হচ্ছে—রং ও অলংকরণ। পুরনো বালুচর শাড়ীতে ছয়-সাত রকম রংয়ের যে সুষম ব্যবহার দেখা যেত বিষ্ণুপুরের সাম্প্রতিক বালুচরীতে তা অনুপস্থিত। জ্যাকার্ডে তৈরী এই শাড়ীগুলোতে তিন-চারটের বেশী রং ব্যবহার করা সম্ভব হচ্ছে না। দ্বিতীয়তঃ, সাবেকী বালুচরী শিল্পীরা শাড়ীর আঁচলায় অলঙ্করণ সমাবেশের ক্ষেত্রে পরিমিতি বোধ ও সামগ্রিক সৌন্দর্যসৃষ্টির প্রতি অনন্যসাধারণ সচেতনতার পরিচয় দিতেন তা বিষ্ণুপুরের শিল্পীদের কাজে একান্তই দুর্লভ। অক্ষয়বাবুর হাতে তৈরী বালুচরী ডিজাইনে বিভিন্ন মটিফের সমাবেশ পারস্পরিক পরিপূরকতায় কাজে না লেগে পরস্পরের বিরোধী হতে দেখেছি। অক্ষয়বাবুর মত প্রবীণ ও সপ্রতিভ শিল্পীর কাছ থেকে বালুচরী কাজে এ ধরনের বেমানান মটিফের সমাবেশ আশা করা যায় না। অক্ষয়বাবু অবশ্য সমালোচনার হাত থেকে রেহাই পাবার জন্য এ ধরনের ডিজাইন সম্বলিত শাড়ীর নতুন নামকরণ করেছেন 'মল্লভূম শাড়ী'। নামকরণ যাই হোক, শিল্পের সামগ্রিক সৌন্দর্যসৃষ্টির আবেদনটুকু তো চিরন্তনই। বালুচর মটিফের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ যদি কোন নতুন মটিফের আমদানী উনি করতে চান তবে এই মটিফচর্চার বিস্তৃত পরিধি রয়েছে বিষ্ণুপুরের অসংখ্য মন্দিরের পোড়ামাটির গাত্রাভরণে। শিল্পী অক্ষয়বাবুকে এই অমূল্য সম্পদ সম্পর্কে সচেতন হতে অনুরোধ করি।

যুগের পরিবর্তনের সাথে মানুষের রুচি ও চাহিদার বিবর্তনের একটি প্রত্যক্ষ যোগসূত্র রয়েছে এবং এই যোগের সুবাদেই প্রত্যেক দেশেরই একদা জনপ্রিয় অনেক চারু ও কারুশিল্প মিউজিয়ামের সংরক্ষিত বস্তু হিসেবে বিবেচিত হয়। তবে অতীতের প্রতি মানুষের আকর্ষণ ও রুচির আবর্তনশীলতায় কখনও কখনও মৃত শিল্পও পুনরুজ্জীবিত হয়ে থাকে। তাই বালুচরী শিল্পের পুনরুজ্জীবনের সম্ভাব্যতা নিয়ে কলকাতার উইভার্স সার্ভিস সেন্টারের অধিকর্তা শ্রীনীরেন ঘোষ, কলাসমালোচক অধ্যাপক ডঃ কল্যাণকুমার গঙ্গোপাধ্যায় ও বিষ্ণুপুরের রেশম খাদি সেবামণ্ডলের সম্পাদক শ্রীভগবান দাসের সঙ্গে মত বিনিময় করেছিলাম। এ বিষয়ে সকলেই আমরা একমত যে, সরকারী পৃষ্ঠপোষকতায় ও ব্যবসায়ী মহলের সহযোগিতা পেলে ক্রেতাদের চাহিদার সাথে সামঞ্জস্য রেখে পুরোপুরি না হলেও কিছুটা পরিবর্তিত আকারে বালুচর শিল্পের পুনরুজ্জীবন সম্ভব। সাবেকী পদ্ধতিতে বালুচরী বয়নের প্রচেষ্টায় শাড়ী প্রতি অবিশ্বাস্য মূল্য নির্ধারিত হওয়াতেই এই শিল্পের পুনরুজ্জীবনে জ্যাকার্ড তাঁতের সাহায্য অপরিহার্য। একথা ঠিক, জ্যাকার্ডের বালুচর শাড়ী প্রথাগত প্রথায় বোনা বালুচরীর মত উচ্চমানের নয়। কিন্তু শিল্পের পুনরুজ্জীবনের আশায় জনপ্রিয়তার স্বার্থে এর মূল্যমান নামাতে গিয়ে শিল্পমান সম্পর্কে নিতান্ত নিরুপায় হয়েই কিঞ্চিৎ শিথিলতা দেখানো ছাড়া গত্যন্তর কৈ। পুনরুজ্জীবনের এই প্রচেষ্টায় সরকারী তরফের দায়িত্বের মধ্যে পড়ে ক্রেতাদের রুচি ও চাহিদার পরিপ্রেক্ষিতে বালুচরী ডিজাইন ও মটিফের উপর পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালানো। বালুচরী ফুল-লতা-পাতা ও কল্কা মটিফের এক চিরন্তন আবেদন রয়েছে বলে এই দুই মটিফের উপর যথাসম্ভব বেশী গুরুত্ব দিয়ে অপ্রচলিত ফিগার মটিফগুলোর পরিবর্জন ও পরিমার্জনের প্রয়োজন। পাইলট স্কীম হিসেবে সরকার নিজেই বালুচরী বয়নে উদ্যোগী হতে পারেন ও কয়েকটি উচ্চ মানের রেশম বয়ন সংস্থাকে অনুদান দিয়ে এই শিল্পকর্মে উদ্যোগী করতে পারেন। বিষ্ণুপুর ছাড়াও মুর্শিদাবাদের গণকর মির্জাপুরের দক্ষ রেশম তাঁতীরা এই জটিল শিল্পকর্মের পক্ষে যথেষ্ট উপযুক্ত বলে আমার মনে হয়েছে। এই শিল্পের বাজার সৃষ্টির জন্য ব্যবসায়ী মহলের সক্রিয় সাহায্য ও সহযোগিতা একান্ত প্রয়োজন। জ্যাকার্ড তাঁতে বেশী সংখ্যায় বালুচর শাড়ীর উৎপাদন হলে শাড়ী প্রতি মূল্য আড়াইশো থেকে তিনশো টাকার মধ্যে রাখা সম্ভব। সৌখীন শাড়ীর তুলনায় এই বালুচর শাড়ীর মূল্য বেশী এ কথা মনে রেখেও বলা যায়, সরকারী ও বেসরকারী প্রচার ও উদ্যোগ একজোটে কাজ করলে এই ঐতিহ্যপূর্ণ বয়নশিল্পের পুনরুজ্জীবনের জন্য বাজার সৃষ্টি করা মোটেই অসম্ভব নয়। বিয়ের ব্যাপারে ধর্মীয় সংস্কারগুলোকে আজও আমরা প্রায় পুরোপুরি বজায় রেখে চলেছি। পট্ট বা রেশম বস্ত্র বিয়ের এক অত্যাবশ্যকীয় অঙ্গ। ঊনবিংশ শতকে বাংলাদেশের বিয়ের বাজারে বালুচর শাড়ীর যে বিশেষ চাহিদা ছিল পরবর্তীকালে বেনারসী শাড়ী তা জবরদখল করে বসে। বিয়ের বাজারে বালুচর শাড়ীর সেই পুরনো জমিদারীটির পুনরুদ্ধার কি একেবারেই অসম্ভব? মধ্যবিত্ত অনেক পরিবারই বিয়ের বেনারসীর জন্য শ'তিনেক টাকা বরাদ্দ করে থাকেন। জরির আপাত চটকটুকু বাদ দিলে যেহেতু বর্ণালী মটিফে ও স্থায়িত্বে বালুচরী শাড়ী বেনারসী শাড়ীর তুলনায় উচ্চমানের, সেইহেতু ক্রেতা সমাজে এর জনপ্রিয়তা সৃষ্টি করা অসাধ্য কিছু নয়। যেটা প্রয়োজন সেটা হচ্ছে কলকাতার কিছু প্রতিপত্তিশালী বস্ত্র-ব্যবসায়ীর সক্রিয় সহযোগিতা। সম্প্রতি জাপান ও ইউরোপের বিভিন্ন দেশে বালুচরী মটিফের প্রতি আগ্রহের সৃষ্টি হয়েছে। শাড়ী ছাড়াও বালুচরী দেয়াল সজ্জা Wall decoration দরজা ও জানলার পর্দা, স্টোল জাতীয় সামগ্রী ক্রয় করতে অনেক বিদেশী সংস্থা আগ্রহী বলে বিষ্ণুপুরের শিল্পীরা আমাকে জানিয়েছেন। তাই দেশের ও বিদেশের বাজারের সম্ভাব্যতাকে অনুধাবন করে এই শিল্পের পুনরুজ্জীবনের প্রচেষ্টায় সরকার ও বস্ত্র ব্যবসায়ী মহলকে যৌথভাবে এগোতে অনুরোধ করি।*

(*প্রবন্ধে ব্যবহৃত আলোকচিত্র লেখক কর্তৃক গৃহীত)

বাঘ ছাল

মানবেন্দ্র পাল

এ অঞ্চলে শিকারী বলে আমার একটু নামডাক আছে। প্রত্যক্ষ প্রমাণও কেউ কেউ পেয়েছেন। বন্ধুবান্ধবরা আবার 'শিকারী' কথাটার অন্যরকম অর্থ করে আমায় ঠাট্টা করে। তাদের মতে, এই যে আমার একক স্ত্রীসংসর্গবর্জিত জীবন এটা আর কিছুই নয় নারী শিকারের জন্যেই সুনিপুণ জালবিস্তার।

এ ধরনের ঠাট্টায় আমি মোটেই খুশী হই না, বরঞ্চ কষ্ট পাই। কিন্তু সে কষ্ট মনের মধ্যেই চাপা থাকে। প্রতিবাদ করতেও প্রবৃত্তি হয় না।

যাই হোক, আমি যে একজন শিকারী—তা যে ধরনেরই হোক, লোকে তা মেনে নিয়েছে। কিন্তু এই স্বীকৃতি যে ইতিমধ্যে বহুদূর ছড়িয়ে গেছে তা আমি প্রথম জানলাম আমার বন্ধু রণেন চ্যাটার্জির চিঠিতে।

রণেন চ্যাটার্জি থাকে কলকাতায়। একটা মস্তবড়ো বাড়ি তৈরির কনট্রাক্ট পেয়েছে রাঁচিতে। সেই উপলক্ষ্যে তাকে এখানে প্রায়ই আসতে হয়। আর এই আসা-যাওয়া করতে করতেই তার সঙ্গে আলাপ।

রণেন চ্যাটার্জিকে দু'একবার শিকারে নিয়ে যেতেই শিকারে ওর বেজায় নেশা ধরে গেল। পরের বার যখন কলকাতা থেকে এল সঙ্গে ·৩৭৫ ম্যাগনাম রাইফেল।

আমি অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করেছিলাম—এত দামী রাইফেল পেলে কোথায়?

চ্যাটার্জি একটু হেসে উত্তর দিয়েছিল—শিকার যখন ধরেছি তখন ভালো করেই নামব। কিনে ফেললাম।

এই চ্যাটার্জি হঠাৎ চিঠি লিখল ওর একই ক্লাবের বন্ধু জ্যাক কার্লসন শিকারের জন্যে পাগল হয়ে উঠেছে। বিশেষ করে ওর ঝোঁক লেপার্ডের ওপর। লেপার্ড স্কিন তার চাইই। অতএব—

অতএব নাকি আমিই একমাত্র ভরসা। নইলে বন্ধুর মুখরক্ষা হয় না।

পরিশেষে লিখেছে—সাহেব একা যাবে না। সঙ্গে বিবি থাকবে। সাহেবের চোখের মণি। একদন্ড কাছ-ছাড়া করতে পারে না। আরো থাকবে আড়াই জন। তার মধ্যে ড্রাই-ভার আছে, সাহেবের দু' বছরের শিশুপুত্র আছে আর আছি আমি। যদিও আমার প্রতিজ্ঞার ব্যাপারটা ভালো করেই জানো।

প্রতিজ্ঞার কথায় আমার আর একদিনের কথা মনে পড়ল। চ্যাটার্জির স্ত্রী চন্দনা-দেবী কিন্তু কিছুতেই বিশ্বাস করতেন না স্বামী শিকার করতে পারে। যে মানুষ কোনোদিন বন্দুক ধরেনি সে যে হঠাৎ একটা বড়ো শিকারী হয়ে উঠতে পারে এটা বিশ্বাস করা কঠিন বটে। চ্যাটার্জি তাই বেট ধরে স্ত্রীকে নিয়ে এসেছিল। শিকারের ব্যবস্থা আমাকেই করতে হল। আর সেই শিকারে চ্যাটার্জি একজন দক্ষ শিকারীর পরিচয় দিয়েছিল একটা ছুটন্ত ডো মেরে। কিন্তু ডোটাকে তুলতে গিয়ে দেখা গেল পেটে তার বাচ্চা।

নিঃসন্তান চন্দনা চ্যাটার্জি সে দৃশ্যে এমন মর্মাহত হয়েছিলেন যে, স্বামীকে প্রতিজ্ঞা করিয়ে নিয়েছিলেন আর সে কখনো শিকার করতে পারবে না।

চ্যাটার্জি সে প্রতিজ্ঞা তারপর রেখে-ছিল। তবে শিকারীর সঙ্গ ত্যাগ করার শর্ত ছিল না বলেই বোধহয় এবারের এই নতুন অভিযান।

অনেকদিন পর শিকারের প্রেরণা পেয়ে মন চনমন করে উঠল। রাঁচী থেকে প্রায় সাতাশি মাইল দূরে চাতরায় রিজার্ভড ফরেস্ট। ছুটলাম চাতরা। সেখানে আমার আর এক শিকারী-বন্ধু বাবন জয়সোয়াল।

তার সাহায্যে আমার গান লাইসেন্সের এগেনস্টে একটা ভালো ব্লক রিজার্ভ করা হল। ভালো, অর্থাৎ যেখানে বেশি শিকার মিলবে—বিশেষ করে লেপার্ড।

ব্লক রিজার্ভ করে এসে পড়লাম বাড়ি নিয়ে। একা থাকি—সে একরকম। কিন্তু মাননীয় অতিথিরা কেউ কেউ এলে তখন বাড়ির ছিরি ফেরাতে হয়। আর বাড়িটা নিতান্ত ছোটো নয়। একতলা বাড়ি হলে কি হয় ঘরের যেন শেষ নেই। সব ঘরে তালা ঝুলিয়ে একটা ঘরে আমি শুই খাটে আর নাস্তা ছেলেটা যে আমায় রেঁধেবেড়ে দেয়, সে শোয় মাটিতে। ভূতের ভয় বলে একা শুতে চায় না।

শূন্য ঘরের ভার যে কতখানি তা এক এক সময়ে বুঝতে পারি। হাঁপিয়ে উঠি। তখন যে একটিমাত্র ঘরে আমার অস্তিত্ব সেই ঘরখানিতেও তালা ঝুলিয়ে বেরিয়ে পড়ে বাঁচি।

তাই যখনই কেউ আসে—বিশেষ করে সস্ত্রীক, তখনই আমার মরা গাঙে যেন উৎসাহের জোয়ার বয়ে যায়। কোন্ ঘরটি তাদের বেডরুমের পক্ষে উপযুক্ত হবে, কোন্ ঘরটি বেশ নিরিবিলি, বা কোন্ ঘরটির কাছাকাছি বাথরুম এইসব হিসেব করে বেশ আনন্দ পাই।

কলকাতা থেকে যেবার চ্যাটার্জি এসেছিল মিসেসকে নিয়ে সেবার তারা কতখানি আনন্দ পেয়েছিল জানি না, কিন্তু আমাকে কিছুদিন একেবারে অভিভূত করে ফেলেছিল। আমি তাদের সুখশান্তির জন্যে এতদূর করেছিলাম যেটা দেখলে যে কেউ বলবে, বাড়াবাড়ি। শুধু ওদের ঘরে রোজ টাটকা ফুল জোগাবার জন্যে একটা মালীকে পুরো এক মাসের মাইনে দিয়ে রাখতে হয়েছিল।

কেউ কেউ এমন ভাবতে পারেন, দাম্পত্যজীবনের ওপর এতই যদি মোহ তাহলে বাপু সময় থাকতে ব্যবস্থা করে নিলেই পারতে।

যুক্তিটা অকাট্য। কিন্তু ওই যে একটি কথা 'সময় থাকতে' ওইখানেই গণ্ডগোল। আসলে সময় যখন আসে তখন তো মানুষ টের পায় না, টের পায় সময় চলে গেলে।

তাহলে একটা গোপন লজ্জার কথা বলি। এই বয়েসেও হঠাৎ ঘর বাঁধার শখ হয়েছিল। না, যাকে বলে বায়োলজিক্যাল নেসেশিটি ঠিক তার জন্যে নয়। আমি বরাবর আদর্শ স্বামী-স্ত্রীর জীবনে এই একটা জিনিস লক্ষ্য করে অভিভূত হতাম যে, সামান্য একটি মেয়ের ভালো লাগার জন্যে একটা জাঁদরেল পুরুষও অবলীলাক্রমে কতখানি ত্যাগ করতে পারে। চোখের সামনেই এই সেদিনও দেখলাম চ্যাটার্জিকে। শিকারের অত নেশা—অথচ কী অক্লেশে স্ত্রীর একটি মাত্র সজল অনুনয়ে শিকারই ছেড়ে দিল।

ত্যাগের এই আনন্দটা কতখানি সেটা দেখার ইচ্ছেই একবার প্রবল হয়ে উঠেছিল। সুযোগও জুটে গেল।

একজন নাচের শিক্ষিকা এসেছিলেন কিছুদিনের জন্যে এখানকার একটা মেয়ে-ইস্কুলে। দেখতে এমনকিছু আহা-মরি নয়, কিন্তু মেয়েটির ফিগার আর চলার ভঙ্গিতে কেমন যেন শিকারী চিতার মতো লিকলিকে ভাব। ভারী ভালো লেগে গিয়েছিল। শুধু ভালো লাগাই নয়, বলব কী মাথাটাই খারাপ হয়ে গিয়েছিল। শেষপর্যন্ত আমার এক পরিচিত মহিলা মারফৎ তাঁর কাছে বিয়ের প্রস্তাব পাঠালাম। শিকারী চিতাটি আমাকে দেখতে চাইলেন। গেলাম। কিন্তু ভাল্লুকে-কামড়ানো আমার এই ক্ষতবিক্ষত মুখটা দেখে তিনি আঁৎকে উঠলেন। ঘর-বাঁধার কথা আর উঠল না কোনো পক্ষ থেকেই।

যাই হোক, আমার কথা থাক। গল্প আমাকে বা চ্যাটার্জিকে নিয়ে নয়। যাকে নিয়ে তিনি এই সপ্তাহের মধ্যেই এসে পড়ছেন।

আমি মনের আনন্দে সাহেব-মেমের জন্যে ঘর সাজাতে লাগলাম আর ভাবতে লাগলাম

সাহেবের হঠাৎ চিতাবাঘের চামড়ার জন্যে ঝোঁক চাপল কেন? নিশ্চয় তাঁর মিসেসের শখ হয়েছে। আর সম্ভবত স্ত্রীর এই সামান্য ইচ্ছাটুকু পূরণের জন্যেই অতবড়ো একটা ম্যানেজারকে কলকাতা থেকে বন্দুক ঘাড়ে ছুটে আসতে হচ্ছে। ঠাট্টা করব কি শ্রদ্ধা করব ভেবে পাই না।

সাহেব এলেন যথাসময়ে। জাতে সুইডিস। বছর তিরিশ বয়েস। ছিপছিপে টল ফিগার। ব্যাকব্রাস করা কটা চুল, ব্রাউন চোখ প্রাণের আতিশয্যে ঝকঝক করছে।

চ্যাটার্জি আলাপ করিয়ে দিল। —দিস ইজ মিস্টার নন্দী।

—আই হ্যাভ হ্যার্ড অব য়ু এনাফ। বলেই হ্যান্ডসেক নয়, একেবারে বুকে জড়িয়ে ধরল তরুণ সাহেব।

সেই আলিঙ্গনে সাহেবের বুকের উত্তাপটুকু অনুভব করতে পারলাম। বুঝলাম এর সঙ্গ কিছু দুঃসহ হবে না।

কিন্তু সাহেব একা কেন? মিসেস?

ম্লান একটু হাসল কার্লসন। বললে, ও আসতে পারল না। শরীরটা খারাপ হয়েছে।

আমি কিছু বলার আগেই সাহেব বললে, ও আসতে না পারায় আমার উৎসাহ এতদূর কমে গেল যে আমিও আসব না ঠিক করেছিলাম, কিন্তু আমার প্রাণাধিক ইনগ্রিড আমাকে জোর করে পাঠিয়ে দিল। বললে, জ্যাক, তুমি নন্দীবাবুকে কথা দিয়েছ, এখন না গেলে বড়ো অশোভন হয়।

বলে কার্লসন আবার একটু হাসবার চেষ্টা করল।

তারপর গলার স্বর পরিষ্কার করে নিয়ে বললে, যাই হোক, ও নিয়ে মন খারাপ করলে চলবে না। আমরাই এনজয় করব। লেট আস ওপন এ স্কচ।

মন খারাপ শুধু সাহেবেরই হয়েছে যে তা নয়, আমিও যেন কেমন মিমিয়ে গেলাম। আমি যে অনেক কল্পনায় ওদের জন্যে বেডরুম সাজিয়ে ছিলাম।

পরের দিন ভোরেই শিকারে বেরোন হল। সে এক এলাহি কান্ড!

সাহেব কলকাতা থেকে এসেছিল কারে। পেছনে ছিল লংচেসিস জিপ দুর্গম জঙ্গলে চালাবার জন্যে। খাদ্যের আয়োজন কম ছিল না। প্রচুর র‍্যাসান, টিনফুড, বিয়ার, হুইস্কি, চীজ। এছাড়া সঙ্গে এনেছে ষোলো মিলিমিটারের সিনে ক্যামেরা আর প্রচুর কালার্ড ফিল্ম।

আমাদের শিকারবাহিনী স্টার্ট করল। কার্লসন বলে উঠল, ওয়েট, আমাদের স্টার্টিংটা সিনেমায় তুলে নিই।

বলেই চট করে কার থেকে নেমে পড়ল। হাতে তুলে নিল সিনে ক্যামেরাটা। এক্স-পোজার মিটারে লাইটটা দেখে নিয়ে ঝরঝর করে ছবি তুলে যেতে লাগল।

একপ্রস্থ ছবি তোলা হলে সাহেব গাড়িতে উঠে এল। গাড়ি চলতে শুরু করল। কার্লসন বললে, এই সিনে ক্যামেরাটা ইনগ্রিডের উৎসাহেই কেনা। ভেবেছিলাম শিকারেও থাকবে। এই ফিল্মে সকলের সঙ্গে ওকেও তুলে নেব। বাট ম্যান প্রোপোসেস গড ডিসপোসেস।

আমি বললাম, মিসেস কি সুইডেনে খুব শিকার করতেন?

—ওহ্, শী ইজ ভেরি ফন্ড অব শ্যুটিং। কিন্তু আপনি জানেন আমাদের দেশে কার্নি-ভোরাস জন্তু পাওয়া যায় না। তাই নিরামিষ শিকার করেই মন ভরাতে হত। ওর সাধ ছিল লেপার্ড মারা। লেপার্ডের স্কিনের ওপর ভারী ঝোঁক। ঐ বিশেষ স্কিন দিয়ে এমন একটা কিছু তৈরি করবে যাতে আমার তাক লেগে যাবে।

আমি সান্ত্বনা দিয়ে বললাম, তাঁর বদলে না হয় আপনিই লেপার্ড মারবেন। আমাদের দেশে একটা কথা আছে—সতীর পুণ্যে পতির পুণ্য। ইনার মিনিংটা যদি মেনে নেওয়া যায় তাহলে শাস্ত্রবাক্যটা একটু এদিকওদিক ঘুরিয়ে নিলে কিছু ক্ষতি হয় না।

কার্লসন কথাটা অন্যমনস্কভাবে শুনল। একটু হেসে মাথা দোলালো। তারপর দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললে, তা ঠিক। তবু ও থাকলে আমাদের সকলেরই বেশ ভালো লাগত। শী উড হ্যাভ বীন এ ওয়ান্ডারফুল কম্প্যানিয়ন।

আঁকাবাঁকা রাস্তা দিয়ে গাড়ি উঠছে পাহাড়ে। বাঁদিকে গভীর খাদ, ডানদিকে পাহাড়ের পাঁচিল। দূরে টোরী রেল স্টেশন।

রেল স্টেশন।

অর্ধেক পথ আসা গেল। বাঁদিকে ডাল-টনগঞ্জ। ডানদিকে চাতরা। গাড়ি ঘুরল ডানদিকে।

এখান থেকে জঙ্গল শুরু। দুপাশে সাল-পলাশ কেন্দ আর খয়েরের গাছ। মাঝে মাঝে ইউক্যালিপ্টাসের সারি।

কত যে নদী পার হয়ে এলাম— বালি ধু ধু, মাঝে সুতোর মতো জল। বরফের দেশের সাহেব এ-এক নতুন জগৎ দেখছে দু-চোখ ভরে।

একটা নদীর ধারে আসতেই আমি চ্যাটার্জিকে বললাম, মনে আছে এখানে একটা বাঘ মারা হয়েছিল?

চ্যাটার্জি হাসল একটু। সাহেব অমনি উঠে বললে, ওহ! লেট আস শ্যুট দ্য প্লেস অ্যান্ড ব্রিং আওয়ার লাক।

বলেই সিনে ক্যামেরাটা নিয়ে ছেলে-মানুষের মতো বালির ওপর লাফিয়ে পড়ল।

সাহেবের এইসব ছেলেমানুষী আমার খারাপ লাগছিল তা নয়, কিন্তু মাঝে মাঝে আমি নানা চিন্তায় ডুবে যাচ্ছিলাম। অন্য-বার যে শিকারে বেরোই সে যেন অনেকটা নিজের খেয়ালে। কি পেলাম, কি পেলাম না তার জবাবদিহির দায় নেই কারো কাছে। কিন্তু এবার তেমন নয়। এবার কার্লসনের সঙ্গে এমনকি চ্যাটার্জির সঙ্গেও যেন একটা অলিখিত শর্ত আছে। সে শর্ত —আর যা-ই শিকার কর লেপার্ড চাই-ই। আমি বোকার মতো আবার এখনো কথা দিয়েছি, লেপার্ড পাওয়া শুধু নয় লেপার্ড মারবে সাহেব নিজে হাতে।

কোথায় কোন বিদেশিনী নীলনয়না শিকারবিলাসিনী তরুণী। —তাঁর এই একটি খেয়াল চরিতার্থ করার জন্যে বিরাট ম্যাচ কোম্পানির সর্বেসর্বা জ্যাক কার্ল-সনকে ছুটে আসতে হল এই হতভাগ্যের কুটিরে। আর সেই না-দেখা বিদেশিনীর কৌতুকোজ্জ্বল মুখের একটি মিষ্টি হাসির কল্পনায় এ মধ্যবিত্ত বাঙালি অমনি কথা দিয়ে বসল লেপার্ড দেবই।

কিন্তু লেপার্ড পাওয়া যাবে তো? নাকি কতকগুলো হরিণ আর বনশুয়োর মেরে ফিরতে হবে?

বেলা একটা নাগাদ চাতরায় পৌঁছনো গেল। সেখান থেকে তুলে নেওয়া গেল জয়সোয়ালকে। জয়সোয়াল এবার নিয়ে চলল জঙ্গলে যেখানে আমাদের জন্যে বাংলো নেওয়া হয়েছে।

লোয়ালং ফরেস্ট বাংলো। গভীর জঙ্গলের মধ্যে যেন আসমান থেকে ছিটকে-আসা এক টুকরো স্বর্গ। পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ঝকঝকে তকতকে। লাল সিমেন্টের বারান্দা ফুলগাছ দিয়ে সাজানো। চওড়া সিঁড়ি নেমে এসেছে সবুজ ঘাসের মধ্যে।

বাংলোর চারিদিকে কাঁটাতারের বেড়া। তারপরেই বন আর বন। এইখান থেকে আমাদের প্রত্যেক দিন যেতে হবে ঐ বনের মধ্যে শিকারের সন্ধানে।

সাহেবও যে বেশ খুশী তা ওর চোখ-মুখ দেখেই বোঝা যায়। একটু আগেই বনের মধ্যে স্বাভাবিক পরিবেশে ময়ূরে দেখেছে। জঙ্গলের এত কাছে এসে শিকারের নেশায় হাত নিশপিশ করে উঠল। একটা কিছু মারা চাই। মেরেও বসল একটা বন-মুর্গি। অব্যর্থ লক্ষ্য!

সবই শুভ সূচনা। সাহেব কেবলই বলছে—যেন আমারই মনের কথার প্রতি-ধ্বনি লেপার্ড তাহলে নিশ্চয় পাওয়া যাবে।

আমি অনামনস্কভাবে বলি, হ্যাঁ, নিশ্চয়ই। —বাট মিঃ নন্দী আই অ্যাম মিসিং মাই ওয়াইফ।

এই বলে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল সাহেব।

আমিও সেই পরস্ত্রীর কথাই ভাব-ছিলাম। যদি তিনি সঙ্গে থাকতেন তাহলে আমি কি এতক্ষণ নির্জীবের মতো বাংলোর এই বারান্দায় কাউকে বসে থাকতে দিতাম! সন্ধ্যে হয়ে আসছে। আর একটু পরেই অন্ধকার হয়ে যাবে চারিদিক। তবু আমি এই রহস্য ঘেরা অন্ধকারের মধ্যেই জঙ্গল-অভিযানের জন্যে ব্যস্ত হয়ে উঠতাম। হুড নামিয়ে দুর্ধর্ষ জিপটা ছুটত গভীর অরণ্যে। পিছন থেকে স্পটার স্পট করছে —জয়সোয়ালের হাতে স্টিয়ারিং কাঁপছে থর থর। রুদ্ধ নিশ্বাসে মাঝের রো-এ বসে আছে কার্লসন, ইনগ্রিড আর চ্যাটার্জি। আমার হাতে উদ্যত -৩৭৫ ম্যাগনাম রাইফেল।

এই রকম একটা ছবি কল্পনা করতেও রোমাঞ্চ লাগে। কিন্তু তা তো বাস্তবে ঘটল না। তাই সাহেব যখন বললে, চলুন না, এখনই একবার ফরেস্টটা হান্ট করে দেখা যাক আমি তখন ক্লান্তস্বরে বললাম, আজ থাক।

সাহেবের উৎসাহ মুহূর্তে নিভে গেল। একটা হুইস্কির বোতল খুলতে খুলতে ভাঙ্গাভাঙ্গা স্বরে বললে, তাহলে এখন এমনিভাবে চুপচাপ বসে থাকা? এই পরি-বেশটা কি মনের ওপর খুব একটা চাপ দেবে না?

বুঝলাম, সাহেব স্ত্রীর কথা ভোলবার জন্যেই একটা অ্যাকসনের মধ্যে ডুবে থাকতে চাচ্ছে।

স্ত্রীকে যে এতখানি ভালোবাসা যায় এও আমাকে মুগ্ধ করল। আমি অতি গোপনে একটা দীর্ঘশ্বাস চেপে বললাম, আচ্ছা মিস্টার জ্যাক, এখন যদি সমাজ সংসারের বাইরে, একেবারে যাকে বুনো স্বভাবের মধ্যে বসে খোলাখুলি দাম্পত্য-জীবন সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করি তাহলে কি অন্যায় হবে?

কার্লসন উৎসাহে সোজা হয়ে বসে বললে, কখনোই না। বরঞ্চ আমার মনে হয় এমন নিরিবিলি পরিবেশে আলোচনার যোগ্য ঐ একটিই বিষয় আছে—দাম্পত্য-জীবন সম্বন্ধে অন্তত ডজনখানেক প্রশ্ন করতে পার।

বলে চোখের কোণে হেসে চ্যাটার্জির দিকে তাকালো।

উত্তরে গম্ভীর প্রকৃতির চ্যাটার্জিও নিঃশব্দে একটু হাসল।

—আপনি ইনগ্রিডকে দেখেন নি, কিন্তু চ্যাটার্জি দেখেছেন। তিনিই সাক্ষী দেবেন আমার ইনগ্রিড শুধু সুন্দরীই রূপসীই নয়, গ্রেসফুল।

সাহেব একটু থামল। তারপর আপন মনেই বলতে লাগল, দেখুন আমার মনে হয় প্রখর রূপের মধ্যে একটা প্রচণ্ড যন্ত্রণা থাকে। তাতে নিজেও জ্বলে, পরকেও জ্বলায়। কিন্তু রূপের সঙ্গে যদি গ্রেস থাকে তাহলেই রূপ সৌন্দর্যে পরিণত হয়ে যায়। ইনগ্রিড সেই ইটারনাল সৌন্দর্যের অধিকারিণী!

এই বলে কার্লসন গেলাসে সোডা ঢেলে আমার দিকে এগিয়ে দিল।

আমি বললাম, দেখুন মিস্টার জ্যাক, আমি বিয়ে সাদী করিনি। জীবনে কাউকে ভালোবাসিনি, কারো ভালোবাসা কখনো পেয়েছি এমন তো মনে পড়ে না। কাজেই আমার কৌতূহলের জন্যে দয়া করে ক্ষমা করবেন। আমার জানতে ইচ্ছে করে আপনাদের বিবাহটা প্রণয়ঘটিত কিনা।

—অর্থাৎ? সাহেব ঘোর ঘোর চোখে তাকালো।

—অর্থাৎ স্ত্রীর প্রতি আপনার এই অকৃত্রিম ভালোবাসা সেটা কি বিয়ের পর, না এইরকম ভালোবাসা ছিল বলেই বিয়ে করতে হয়েছে?

সাহেব হেসে বললে, দুটো স্টেজ—ভালোবাসাও দুরকম। বিয়ের আগে এক-রকমের ভালোবাসা, একই মানুষকে বিয়ের পর আর একরকমের ভালোবাসা। ইন-গ্রিডকে আমি এক ভালোবাসা থেকে আর এক ভালোবাসায় ভাসিয়ে নিয়ে এসেছি। আর শুধু ভালোবেসে পাওয়াই নয়, ইন-গ্রিডকে ভালোবেসে জয় করে এনেছি। ডু য়ু আন্ডারস্টান্ড মি?

সাহেবের এই একটা স্বভাব—প্রশ্ন করে উত্তরের জন্যে ধৈর্য ধরে বসে থাকেন না। নিজেই উত্তর দিয়ে যান। এক্ষেত্রেও তাই

করলেন। নিজেই নিজের প্রশ্নের উত্তর দিলেন।

—রাইভাল কম ছিল না মিস্টার মন্দী, আর তাদের যোগ্যতাও যথেষ্ট। তবু তাদের সবাইকে ফেলে ইনগ্রিড আমাকেই বেছে নিল। তার জন্যে আমি অবশ্যই ওর কাছে গ্রেটফুল।

আমি তৎক্ষণাৎ বলে উঠলাম, গ্রেট-ফুল কেন? এ কি একতরফা ব্যাপার? তোমাকে বিয়ে করে তিনিও নিশ্চয় কৃতার্থ হয়েছেন?

সাহেব এই প্রতিবাদে নিজের ভুল বুঝতে পেরে ভারি লজ্জা পেল। এতক্ষণ সে কেবল নিজের দৈন্যই প্রকাশ করে এসেছে। কিন্তু তারও তো কোনো ঐশ্বর্য থাকতে পারে। নিশ্চয় আছে নইলে ইনগ্রিড তাকে বিয়ে করল কেন?

বন্ধু লজ্জা পেয়েছে দেখে এতক্ষণে চ্যাটার্জি মুখ খুলল। বললে, ব্যাপারটা যে এক-তরফা নয়, তার প্রমাণ ওঁর মিসেস ওঁরই জন্যে দেশ ছেড়ে ইণ্ডিয়ায় এসে ডেরা বেঁধেছেন।

কার্লসন এ কথায় চুপ করে থাকলেই পারত। কিন্তু স্বভাবটা সরল তাই সত্য কথা না বলে ফেলে পারল না। বললে, আপনি যা বলেছেন তা ঠিক। কিন্তু মিস্টার চ্যাটার্জি, আপনি জানেন না ইণ্ডিয়ায় আসা নিয়ে ইনগ্রিডের সঙ্গে আমার বেশ গোল বেধেছিল। ও প্রথমে দেশ ছাড়তে রাজি হয়নি। কিন্তু আমার তখন এখানে আসা ঠিক হয়ে গেছে। আমাদের মধ্যে ছাড়াছাড়ি অবশ্যম্ভাবী। শেষ পর্যন্ত ওর মন বদলাল। ও আমার সঙ্গে আসতে রাজি হল। এও আমার একটা ট্রাম্প! ওর অন্য প্রণয়ীরা ভেবেছিল ইনগ্রিড কিছুতেই ইণ্ডিয়ায় যাবে না। কিন্তু ইনগ্রিড তাদের কাড়া ভাতে ছাই দিয়ে এসেছে।

এই বলে কার্লসন আত্মপ্রসাদের হাসি হেসে আমাদের সকলের দিকে একবার তাকিয়ে নিল।

কিন্তু স্ত্রীর কথা তার সহজে শেষ হতে চায় না। বললে, ও শিকারে আসতে না পারায় আমার সব আনন্দ মাটি। তবু যখন আমাকে একা আসতেই হল তখন ওর জন্যে ভালোরকমের প্রেজেন্টেশন কিছু নিয়ে যেতে হবে। এক নম্বর—লেপার্ডস্কিন, আর দু নম্বর হচ্ছে সিনে ক্যামেরায় তোলা এই শিকার-অভিযানের ছবি। আমি ওকে পাশে নিয়ে এই ছবিগুলো পর্দায় দেখাবো।

কিন্তু—কিন্তু আমার এই বিচ্ছেদ ব্যথা কোন্ ফিল্মে কেমন করে তার জন্যে ধরে রাখি বলতে পারেন?

এর পর হুইস্কি পেটে পড়তেই চ্যাটার্জিও মুখ খুললেন। একটু চাপ দিতেই তিনিও তাঁর স্ত্রী সম্বন্ধে মুখর হয়ে উঠলেন। বললেন, বিয়ের আগে প্রণয় ঘটা দূরে থাক বিয়ের আগে আমাদের কোনোদিন দেখাই হয়নি। যা কিছু ঘটেছে বিয়ের পর। আমি তো সুখীই, আমার বিশ্বাস তিনিও আমাকে পেয়ে কিছু কম সুখী নন। তবে—

এই পর্যন্ত বলে চ্যাটার্জি একটু থামলেন। মুখটা নিচু করে রইলেন।

আমি উদগ্রীব হয়ে জিজ্ঞেস করলাম, থামলেন কেন?

—সেতো আপনারা সকলেই জানেন, আমরা নিঃসন্তান। এটা চন্দনার যে কি দুঃখ তা এক আমিই বুঝি।

কার্লসন খুব অন্তরঙ্গের মতো চাপা গলায় বললে, আচ্ছা মিস্টার চ্যাটার্জি, আপনি ডাক্তার দিয়ে নিজেকে ভালো করে পরীক্ষা করিয়েছিলেন?

—অবশ্য।

কার্লসন চিন্তিত মুখে ইজিচেয়ারে শুয়ে পড়লেন। তার পর একটু ভেবে প্রাচ্য দার্শনিকের মতো বললে, ঈশ্বরের কী বিচিত্র লীলা! কেউ সন্তান চায় না, কেউ সন্তানের জন্যে পাগল। আমরা দুজনে আবার এত উর্বর যে একটা না হলে ভালোই হত। খুব ভয়ে ভয়েই থাকি। কী জানি কখন—আমরা তো আবার ঘর-পোড়া গোরু!

বলেই সকৌতুকে আমাদের দিকে তাকালো।

—ব্যাপারটা আপনারা নিশ্চয় বুঝতে পারছেন। উদ্দাম প্রণয়। বহু প্রতীক্ষিত মিলনটাও হয়েছিল এমন জায়গায় যেখানে কারো উঁকিঝুঁকির সুযোগ ছিল না। আমার মতো আমার প্রণয়িণীরও বিশ্বাস ছিল যে, দুনিয়ায় প্লেটোনিক লাভ বলে কিছু নেই। কাজেই বুঝতে পারছেন ব্যাপারটা ঘটে গেল বিয়ের আগেই। আর সে মিলন ব্যর্থ হয়নি।

একটু থেমে বললে, আচ্ছা, আপনাদের দেশে কি বলে—এই ধরনের মিলনে যে সন্তান জন্মায় তারা নাকি খুব প্রেমিক হয়?

এই নিয়ে অনেক রাত পর্যন্ত আলোচনা চলল। আমার কেবল এই কথাটাই মনে হচ্ছিল—চ্যাটার্জি তাঁর স্ত্রীকে ভালোবাসে, কার্লসনও ইনগ্রিডকে ভালোবাসে। কিন্তু দুজনের একজন নীরব—আর একজন শুধু সরব নয় উচ্চরব। কার ভালোবাসা বেশি গভীর কে জানে!

পরের দিন বেলা দশটার জঙ্গল থেকে 'মুখিয়া' এসে খবর দিল বিটিংএর ব্যবস্থা হয়েছে। দেড়শো লোক তৈরি।

যথাসময়ে আমরা সদলবলে জঙ্গলে ঢুকলাম। কিছু দূরে চওড়া একটা নদী। জল নেই, শুধু বালি আর মাঝে মাঝে বিরাট বোল্ডার আর পাথরে স্ল্যাপ। লাইন করে বিটাররা পার হচ্ছে। কারো হাতে টাঙ্গি, কারো হাতে বর্শা, কারো হাতে তীরধনুক। এছাড়া ঢোল মাদল ক্যানেস্তারা তো আছেই।

কার্লসন আবার ছুটল সিনে ক্যামেরা নিয়ে। এমন মিছিলের ছবি তুলতেই হবে।

মুখিয়া আমাদের মাচানের পোজিসন দেখিয়ে দিল। মাচায় উঠলাম। প্রায় কুড়ি-পঁচিশ মিনিট পরে বিট আরম্ভ হল। দূরে ঢোল, মাদল আর ক্যানেস্তারার শব্দ। সেই

সংগে লোকের হৈ হৈ চিৎকার। আদিম অসভ্য মানুষ যেন জেগে উঠেছে।

কার্লসনকে নিয়েছিলাম আমার মাচায়। হাত ওর নিশপিশ করছে। ও রাইফেল লোড করে কাঁধে তুলে নিল যেন এখনি জন্তু এসে পড়বে।

আমি বললাম, ব্যস্ত হোয়ো না। জন্তু এলে তোমায় জানাব।

মিনিট দশ বাদে হঠাৎ জঙ্গলের ধার থেকে জানোয়ারের আওয়াজ পেলাম...... পৃথিবীর সব জন্তু যেন প্রাণভয়ে এদিকে পালিয়ে আসছে। তাদের পায়ের গতিতে ঝড়ের শব্দ......ধুলোয় জংগল অন্ধকার।

ঠিক আমাদের সামনেই হঠাৎ একটা মাদী সাম্বার বেরিয়ে এল। কার্লসন মারতে যাচ্ছিল আমি ইশারায় অপেক্ষা করতে বললাম।

তারপর তিনটে হরিণ বেরিয়ে এল। তারপর এল বিরাট শিংওলা একটা স্ট্যাগ।

ইশারা করে কার্লসনকে পয়েন্ট আউট করতেই তার রাইফেল গর্জে উঠল জঙ্গল কাঁপিয়ে। গুড নেক-শট।

একটু পরে অন্য মাচা থেকে গুলির আওয়াজ। মনে হল জয়সোয়ালের মাচা থেকে শব্দটা এল।

কার্লসন ফিস ফিস করে বললে, হোপ ইট ইজ এ লেপার্ড।

আমি মাথা নাড়লাম। বুঝিয়ে দিলাম, বাঘ নয়। বড়ো জন্তু হলে দুটো ফায়ারের আওয়াজ পেতাম।

বিট শেষ হয়ে গেল। জানা গেল বাবন একটা ভালো শুয়োর মেরেছে।

কার্লসন মন-মরা। ও বোধহয় আশা করেছিল প্রথম দিনেই লেপার্ড পাবে—নিদেন একটা টাইগার।

কিন্তু মন-মরা হলেও ছবি তুলতে ভুলল না। আটজন লোকে মিলে সাম্বারটা বয়ে নিয়ে যাচ্ছে এ দৃশ্য ফিল্মে তুলতে তুলতে কার্লসন বললে, এর মধ্যে যেমন করে পারি ইনগ্রিডকে ধরে রাখবই। আশ্চর্য হচ্ছেন? ওকে নিয়ে যাব বোটানিক্যাল গার্ডেনে। বন্দুক হাতে দাঁড় করিয়ে ছবি নেব পর পর। তারপর এডিটিং-এর সময়ে এইখানে ঢুকিয়ে দেব। আপনারা যখন দেখবেন তখন ধরতে পারবেন না ব্যাপারটা।

প্রথম দিনটা গেল ভালোই। কার্লসনের হাতে কিছু একটা বউনি হল। কিন্তু তারপর থেকে আট দিন কাটল সমস্ত বন ঢুঁড়েও বাঘ মিলল না। অস্বস্তির শেষ নেই। এত আশা এত আশ্বাস দিয়ে শেষ পর্যন্ত সাহেবকে কি ফিরতে হবে শূন্য-হাতে? কি করে মুখ দেখাবে ইনগ্রিডের কাছে? ইনগ্রিডই বা কি ভাববে এই বাঙালী শিকারী বন্ধুটিকে?

এদিকে সাহেবও যেন কেমন নিরুৎসাহ হয়ে পড়েছে। ঘন ঘন কেবল হুইস্কি খাচ্ছে। জিজ্ঞেস করলে বলে, বাড়ির জন্যে মন কেমন করছে। ক-ত দিন ঘরছাড়া।

আসলে, আমার মনে হল, লেপার্ড পাচ্ছে না বলেই মনের এই অবস্থা

এক এক দিন দেখি সাহেব একা একাই রাইফেল নিয়ে জংগলে ঘুরে বেড়াচ্ছে। আশা, হয়তো লেপার্ড পেয়ে যাবে।

কিন্তু আমার ভয় হয়, অনভিজ্ঞ বিদেশী শিকারী—বেঘোরে প্রাণ হারাবে না তো?

এ কথা মনে করতেই ইনগ্রিডের প্রেম-বিহ্বল করুণ মুখখানি কল্পনায় ভেসে ওঠে। বিদেশে এই বিদেশিনী এত বড়ো দুর্ঘটনার মুখে একলা কোন অবলম্বনের জন্যে তখন হাত বাড়াবে? ভাবতেও শিউরে উঠি।

আমিও তখনি রাইফেল হাতে সাহেবের সঙ্গে বেরিয়ে পড়ি।

এমনি সময়ে একদিন সকালে খবর পাওয়া গেল একটা 'কীল' হয়েছে।

কার্লসনের কী আনন্দ। ও যেন বাঘ মেরেই ফেলেছে।

সকালেই লোক পাঠিয়ে দেওয়া হল মাচা বাঁধবার জন্যে। বিকেল তিনটে নাগাদ কফি আর কিছু স্ন্যাক নিয়ে মাচায় গিয়ে বসলাম। আগেই পাগমার্ক দেখে বুঝতে পারা গেছে ওটা লেপার্ডের 'কীল'। তাছাড়া পিছনের খানিকটা খাওয়া। এও একটা মস্তবড়ো লক্ষণ।

রাত হল। আকাশে অল্প অল্প চাঁদের আলো। প্রায় পনেরো গজ দূরে কীলটা পড়ে আছে।

আমার পাশে কার্লসন। আনন্দে উত্তেজনায় ওর মুখটা চক চক করছে। ও কেবলই ফিসফিস করে বলছে, লেপার্ডটা দয়া করে আমায় মারতে দিয়ো। ইনগ্রিড তাহলে ভারি খুশী হবে।

ওর ধারণা, আমি হয়তো শেষ পর্যন্ত লেপার্ড মারার কৃতিত্বটা নিয়ে নেব।

কিন্তু সাহেবের অনুরোধে আমি 'হ্যাঁ' 'না' কিছুই বললাম না।

রাত এগারোটা নাগাদ বুঝতে পারা গেল বাঘ কীলে এসেছে। দুজনের রাইফেলে ক্ল্যাম্প দিয়ে টর্চ ফিট করে নেওয়া হয়েছে। বাঘ কীলে বসতেই কার্লসন নিশ্বাস আটকে নিয়ে তাড়াতাড়ি রাইফেল তুললে আমি বাধা দিলাম। ইশারা করলাম অপেক্ষা করতে।

জন্তুটা ধীরে ধীরে কীলে মনোযোগ করল। এক মিনিট...দু মিনিট...তিন মিনিট জন্তুটা ছিঁড়ে ছিঁড়ে মোষের বাচ্ছাটাকে খাচ্ছে...আমি কার্লসনকে গুলি করার নির্দেশ দিয়েই টর্চ জ্বাললাম। টর্চের আলোয় চমকে উঠে জন্তুটা মুখ তুলল। সংগে সঙ্গে কার্লসনের রাইফেল থেকে গুলি ছুটল। জন্তুটা শূন্যে লাফিয়ে উঠে মাটিতে পড়তেই আমি আর একটা গুলি ছুঁড়লাম। ব্যাস সব ঠাণ্ডা।

যাক মুখরক্ষা হল।

সাহেব মনের আনন্দে সদল বলে কলকাতায় ফিরে গেল। যাবার সময়ে আমায় বার বার করে অনুরোধ করে গেল কলকাতায় গেলে আমি যেন অতি অবশ্য তার সঙ্গে দেখা করি।

আমি কথা দিয়েছিলাম।

পরের বছর কি একটা কাজে কলকাতা যেতে হয়েছিল। কার্লসনের কথা ভুলিনি। চ্যাটার্জির সংগে যোগাযোগ করে কার্লসনের সংগে দেখা করতে গেলাম।

বাইরের ঘরে ঢুকতেই দেখি সেই বাঘছালটা দেওয়ালে ঝুলছে। আমি একটু আশ্চর্য হলাম। এমন তো কথা ছিল না। তবে কি ইনগ্রিডের স্কিনটা পছন্দ হয়নি?

কার্লসন আমায় দেখেই ঠিক সেই প্রথম দিনের মতো আমায় আনন্দে বুকে জড়িয়ে ধরলে।

হাউ ক্যান আই রিপে য়ু? লেট আস ওপেন এ স্কচ।

আদর আপ্যায়ন যথেষ্ট হল। তারপর খাবার পালা। খেতে বসলাম আমরা তিন-জন। কিন্তু যে চতুর্থ জনটিকে প্রতি মুহূর্তে আশা করছিলাম তার দেখা পেলাম না। সাহেব তার গৃহলক্ষ্মীটির সঙ্গে আলাপ করিয়ে দেওয়া তো দূরের কথা একবারের জন্যেও তার কথা তুলল না। বুঝলাম তরুণ সাহেব বড়ো কনসারভেটিভ।

সেই ফিল্মটা দেখার ইচ্ছেও ছিল। কিন্তু সাহেব যখন নিজে থেকে কোনো কথা বলল না তখন আমিও আগ্রহ দেখালাম না।

চলে আসবার সময়ে কার্লসন আবার আমাকে বুকে জড়িয়ে ধরল—আই শ্যাল নেভার ফরগেট য়ু।

সেই আবেগপূর্ণ কথা। কিন্তু আর দেখা হবে কিনা সেকথা বলল না একটি-বারও। যেন এই শেষ দেখা।

রাস্তায় বেরিয়ে চ্যাটার্জিকে জিজ্ঞেস করলাম ইনগ্রিডের কথা। চ্যাটার্জি অবাক হয়ে বললে, জ্যাক তোমায় কিছু লেখেনি?

আমি মাথা নাড়লাম।

চ্যাটার্জি বললে, অত বড়ো লজ্জার কথা লিখবেই বা কী করে? ও যখন শিকারে ব্যস্ত সেই সময়ে ইনগ্রিড তার এক পূর্ব-প্রণয়ীর সঙ্গে সুইডেনে চলে যায়। সাহেব ফিরে এসে দেখে শূন্যবাড়ি খাঁ খাঁ করছে।

কেমন একটা অস্বস্তি নিয়ে রাঁচি ফিরে এলাম। দেখি আমার নামে একটা খাম ডাকঘরের ছাপ মারা। সকৌতূহলে খামটা ছিঁড়ে ফেললাম। বেশ লম্বা চিঠি। সুন্দর গোটা গোটা অক্ষরে লেখা। এ সেই নাচের শিক্ষিকা। অনেক আবেগপূর্ণ কথার পর লিখেছেন—একবার তিনি দেখা করতে চান। নয় আমি কলকাতায় গিয়ে তাঁর সঙ্গে দেখা করি, অথবা ডাকলে উনিই এখানে আসবেন।

এ চিঠিটাকে কি বলব—প্রহসন? সৌভাগ্য? অথবা ভাগ্যের ভ্রূকুটি?

চিঠিটা টেবিলের ওপর পড়েই রইল। ওটা নিয়ে মাথা ঘামাতে আপাতত বিশেষ ইচ্ছে করল না। কারণ তখনো কার্লসনের বাইরের ঘরে সেই বাঘছালটার কথা মনে হচ্ছিল। দেহশূন্য, অবলম্বনশূন্য নির্মম একটা অস্তিত্বের আভাস।

বিজ্ঞানের কথা

কখনো বুড়ো না হওয়া

একটি মানব-শিশুর জন্ম হল।

এমন যদি হয় যে দু-সপ্তাহের মধ্যেই শিশুটির শৈশব শেষ, এক সপ্তাহের মধ্যে যৌবন, তিন থেকে চার সপ্তাহের মধ্যে প্রৌঢ়ত্ব ও বার্ধক্য—তাহলে? প্রকৃতিজগতে অবশ্য এমন বহু প্রাণী আছে যাদের আয়ু চার মাসের বেশি নয়। কিন্তু মানুষের বেলায় নিশ্চয়ই আশা করা যেতে পারে যে ষাট-সত্তর-আশি বা এমনকি একশো বছর পরমায়ু তার আছে। ঢোলবাদক শ্রীক্ষিরোদ নট্ট তিন বছর আগেই একশো পেরিয়েছেন এবং এখনো তিনি জোয়ান মানুষের মতো ঢোল বাজাতে পারেন। শিল্পী যামিনী রায় অবশ্য একশোতে পৌঁছন নি, পৌঁছবেন আশা করা চলে কেননা এখনো তাঁর হাতের টান জোয়ানের মতো ঋজু। রবীন্দ্রনাথ প্রায় একাশিতে পৌঁছেও মৃত্যুর আগে যে কবিতা মুখে মুখে বলে গিয়েছেন তা থেকে বোঝা যায় শরীর যতোই ব্যাধিগ্রস্ত হোক তাঁর চিন্তা ছিল তরুণের মতো। এই ক্ষণজন্মাদের কথা বাদ দিলেও আমাদের মতো সাধারণ মানুষেরাও কম আয়ু নিয়ে বেঁচে আছি নাকি! তবে চার মাস বয়সে পৌঁছবার আগেই কারও যে মৃত্যু ঘটতে পারে না তা নয়। কিন্তু তখন আমরা বলে থাকি, চারমাসের একটি শিশুর মৃত্যু হল। কিন্তু চারমাসের মধ্যেই একটি মানুষের জীবনচক্র শেষ—তা কেমন করে হয়?

হয় না, কিন্তু হওয়াটা অসম্ভব নয়। মানুষের শরীরে রক্তের লাল কণিকা যদি নতুন করে তৈরী হয়ে না চলত তাহলে কতখানি হত এক-একজন মানুষের পরমায়ু? সাড়ে তিন মাসের বেশি কোনো ক্রমেই নয়। কেননা এই সাড়ে তিন মাসই হচ্ছে একটি লাল রক্ত-কণিকার আয়ু। রক্তের ক্যানসার বা লিউকোমিয়া ধরলে কদিন মানুষ বাঁচে? বারে বারে রক্ত দেবার পরেও একটা সময়ের পরে আর বাঁচানো যায় না। এখানেও কারণ একই। শরীরে লাল রক্ত-কণিকা তৈরি বন্ধ হয়ে যাওয়া।

সুখের বিষয়, রক্তের ক্যানসার মোটেই ব্যাপক রোগ নয়। লাখে একজনকেও ধরে কিনা সন্দেহ। আশা করা চলে আর কিছু-দিনের মধ্যেই রোগটি কেন হয় তা জানা যাবে, কী করলে সারে তাও জানা যাবে।

যাই হোক, দেখা যাচ্ছে মানুষের শরীরের মধ্যেই এমন আয়োজন আছে যে রক্তের একটি কোষ মারা পড়বার আগেই তার জায়গা নেবার জন্য নতুন একটি কোষ তৈরি হয়। আমাদের শরীরের রক্তে যতো লাল কণিকা আছে তার ত্রিশ ভাগের একভাগ প্রতিদিন এভাবে মরছে আর তাদের জায়গা নিচ্ছে নতুন কণিকা।

আর শুধু কি রক্তের লাল কণিকা? যাকে বলা হয় রক্তের অক্‌সিজেন বাহক—সেই হিমোগ্লোবিনও এমনিভাবে তৈরি হয়ে চলেছে।

মানুষের দেহযন্ত্রের এই এক আশ্চর্য গুণ। যন্ত্রটি চালু থাকছে কিন্তু তার মেরামতীও সমানে চলেছে। চালু যন্ত্র নিজেই নিজেকে সারিয়ে নিচ্ছে এমন দৃষ্টান্ত আর কোথায়?

মানুষ কি একটা যন্ত্র হল! মানুষের শরীরটাকে একটা যন্ত্রের সঙ্গে তুলনা করাতে অনেকেই একথা ভাবতে পারেন। না, মানুষ অবশ্যই যন্ত্র নয়। আজ পর্যন্ত যতো নিখুঁত যতো আশ্চর্য যন্ত্র মানুষের হাতে তৈরি হয়ে থাকুন না কেন, মানুষকে তৈরি করা হয়েছে তার চেয়েও হাজারগুণ নিখুঁত আর আশ্চর্য রূপে! কেন? ইস্পাত বা কংক্রিট বা প্লাস্টিক তৈরি হতে পারে সবচেয়ে সেরা মানের, তা দিয়ে যন্ত্র তৈরি হতে পারে সর্বোত্তম ডিজাইনের—কিন্তু এই যন্ত্রের কোনো অংশ অচল হলে তার মেরামতী কি নিজের থেকেই হতে পারবে? কখনো নয়। কিন্তু মানুষের শরীরে তা অনবরত হয়ে চলেছে, জন্ম থেকে শেষ নিশ্বাস পর্যন্ত। পুরনো অংশের জায়গায় বসছে নতুন অংশ, বিনা হট্টগোলে, বিন্দুমাত্র বিশৃঙ্খলার কারণ না ঘটিয়ে। এবং সবচেয়ে আশ্চর্য ব্যাপার, যেখানকার যা হুবহু তাই। হাড়ের জায়গায় হাড়, পেশীর জায়গায় পেশী, চামড়ার জায়গায় চামড়া। একটির জায়গায় অপরটি কদাচ নয়। মানুষের হাতে তৈরি যন্ত্রে আজ পর্যন্ত এই আশ্চর্য গুণের পরিচয় পাওয়া যায় নি। ব্যোমযানের কক্ষে একটি ফুটো হয়েছিল বলে আমরা তিন-তিনজন নভশ্চরকে হারিয়েছি। মানুষের শরীরযন্ত্রে কিন্তু এমন বৃহৎ একটি দুর্ঘটনার কারণ ঘটলে তার মেরামতীর আয়োজনটিও প্রস্তুত থাকত।

মানুষের হাতে তৈরী অনেক কিছুই মানুষের শরীরের নকল। ইলেকট্রনিক কম্পিউটারকে বলা হয় নকল মস্তিষ্ক, সেটা কিন্তু যান্ত্রিক গড়নের মিলের দিক থেকে নয়, অনুরূপ কাজ করার ক্ষমতার জন্যে। কিন্তু যান্ত্রিক গড়ন ও বিন্যাসের দিক থেকে হুবহু মিলের দৃষ্টান্ত অনেক আছে, এবং মিল যেখানে যতো বেশি সম্পূর্ণ, সেখানে দক্ষতা ও স্থায়িত্বও ততো অবাক হবার মতো। প্রায় একশো বছরের পুরনো একটি দৃষ্টান্ত দেওয়া যেতে পারে।

দৃষ্টান্তটি প্যারিসের ঈফেল টাওয়ার। ১৮৮৯ সালে প্যারিসের বিশ্বমেলা শুরু হবার আগে এই টাওয়ারটি তৈরি করেছিলেন ফরাসী ইঞ্জিনিয়ার আলেক্‌সান্দর ঈফেল। তিনি শুনলে হয়তো অবাক হতেন যে, তিনি মৌলিক বা অভিনব কিছু সৃষ্টি করেননি, প্রকৃতিজগতে সংখ্যাতীত বার যা সৃষ্টি হয়েছে তিনি তারই একটি নিখুঁত নকল করেছেন মাত্র। জীব-বিজ্ঞানীরা দেখিয়েছেন, মানুষের শরীরের নলের মতো হাড়ের গড়ন (জঙ্ঘাস্থি বা টিবিয়া) আর ঈফেল টাওয়ারের বিন্যাস হুবহু একরকম। এমনকি হাড়ের সঙ্গে হাড়ের কোণ আর ভারবাহী সমতলগুলোর কোণ পর্যন্ত মাপের দিক থেকে অভিন্ন। এই আশ্চর্য মিল থাকার জন্যেই সম্ভবত ঈফেল টাওয়ার এখনো চিড় খায়নি এবং আরো বহুকাল টিকে থাকবে। একজন তরুণ ইঞ্জিনিয়ারের কল্পনা আর লক্ষ লক্ষ বছরের বিবর্তনের মধ্যে দিয়ে নিখুঁত হয়ে ওঠা জীবন্ত শরীরের হাড়ের বিন্যাসের মধ্যে কী আশ্চর্য মিল!

আর মিল তো শুধু বাইরের দিকের নয়! এ-ধরনের একটি কাঠামো তৈরি করার সময়ে নির্মাণকারীদের সবচেয়ে বেশি নজর থাকে দুটি জিনিসের ওপর: ক্ষমতা ও হালকা ওজন। আর দুটি ব্যাপারেই টাওয়ারের সঙ্গে জীবন্ত শরীরের হাড়ের অসাধারণ মিল। খাড়া উঁচু দিকে উঠে যাওয়া ঈফেলের টাওয়ার আর আধ টন ভার বহনে সক্ষম মানুষের শরীরের হাড় উভয়েই তৈরি হয়েছে ক্ষমতা ও হালকা ওজন দুই-ই বজায় রেখে। বাড়তি বা ফালতু অংশ কিছুমাত্র নেই, না টাওয়ারে না হাড়ের বিন্যাসে।

ঈফেল টাওয়ার দেখে সবাই অবাক হন। একজন ইঞ্জিনিয়ারের এই কৃতিত্ব অবশ্যই অবাক হবার মতো। কিন্তু তার চেয়েও অনেক বেশি অবাক হতে হবে হাড়ের টিশুর জ্যামিতিক বিন্যাস দেখে। এমন শৈলী ও সামঞ্জস্যের দৃষ্টান্ত বড়ো একটা পাওয়া যায় না।

শরীরের একটুকরো হাড়—নির্মাণ-কার্যের অতি নিখুঁত একটি দৃষ্টান্ত সেটি। প্রথমত সেখানে বাহুল্য বলে কিছু নেই। ঠিক যতোটুকু দরকার ততোটুকু, যেখানে যা দরকার তাই। হাড়ের কাঠামোটি শরীরের ভার বহন করে। আর নলের মতো হাড়গুলোর ভিতরে রয়েছে—সুড়ঙ্গের ভিতরে থাকার মতো—রক্ত তৈরির কারখানা। যাকে বলা হয় মজ্জা। এই কারখানায় প্রতি সেকেন্ডে তৈরি হয়ে চলেছে লক্ষ লক্ষ কণিকা।

ঠেকা দেওয়া ও ঢাকনা দেওয়া—হাড়ের কাজ শুধু এইটুকুই নয়। আরো আছে তা আরো গুরুত্বপূর্ণ। শরীরের ক্যালসিয়াম বিপাকক্রিয়ার সঙ্গে হাড়ের যোগাযোগ আছে। রক্তে ক্যালসিয়ামের অভাব ঘটলে

প্রাণ নিয়েই টানাটানি পড়ে যায়। ব্যাপারটা কত মারাত্মক তা শল্য-চিকিৎসকদের অজানা নয়। থাইরয়েড গ্ল্যান্ডে অপারেশন করার সময়ে যদি কোনোক্রমে সঙ্গের প্যারাথাইরয়েড গ্ল্যান্ডও কাটা পড়ে, তাহলে রুগীকে বাঁচানো প্রায় অসাধ্য।। কেন? প্যারাথাইরেড গ্ল্যান্ড না থাকা মানেই শরীরের ক্যালসিয়াম বিপাকক্রিয়া বন্ধ।

রক্তে অনবরত ক্যালসিয়াম ছেড়ে দিচ্ছে হাড়, বেশ ভালমতোই। আরো সঠিকভাবে বলতে হলে, রক্তের গা থেকে ক্যালসিয়াম ধুয়ে নিয়ে যাচ্ছে রক্ত। হাড় থেকে রক্তে ক্যালসিয়ামের যোগানে কখনো ছেদ পড়ে না। অর্থনীতির ভাষায়, রক্তে ক্যালসিয়াম যোগান দেবার ব্যাপারে হাড়ের ব্যবসাটি একচেটিয়া।

কখনো কি ঘাটতি পড়ে না? পড়ে। তাহলে শেষরক্ষা হয় কি করে, কিন্তু-পরিমাণ ঘাটতি পড়লেই যেখানে প্রাণহানির আশংকা? হাড় এক্ষেত্রে খুবই উদার। ঘাটতি পূরণ করার জন্যে নিজেকেই রক্তের মধ্যে গলিয়ে দেয়। মাত্রা নিতান্ত কম নয় —প্রতি মিনিটে কয়েকশত গ্রাম। তাহলে তো এই পরিকার বর্তমান সংখ্যাটি পড়তে যতো সময় লাগার কথা ততোক্ষণের মধ্যে শরীরের গোটা কাঠামোই জলের মধ্যে নুনের মতো গলে যাবার আশংকা! ভয় পাবার কারণ নেই, শুধু গলে যাওয়ার ব্যাপারটি হলে তাই হত, কিন্তু একদিকে যতো গলে অন্যদিকে ততো তৈরি হয়ে চলে।

অর্থাৎ মানুষের শরীরে রয়েছে প্রচুর একটি অফুরন্ত ভান্ডার তৈরি হবার মতো আয়োজন। যতোই ঘাটতি পড়ুক, যতোই ক্ষতি হোক, তা পূরণ হয়। শরীরের কোনো অংশ অচল হলে তার জায়গায় নতুন অংশ এসে যায়।

কিন্তু রক্ত ও হাড় ছাড়াও তো শরীরে আরো অনেক উপাদান আছে যেগুলোর গুরুত্ব কিছুমাত্র কম নয়। সেখানকার ক্ষতিগুলোর কি-ভাবে পূরণ হয়?

এক্ষেত্রে সাবধানতা অন্যদিক থেকে। শরীরের যে-সব অঙ্গের গুরুত্ব খুব বেশি সেগুলো তৈরি হয়েছে অতিরিক্ত রকমেই টেকসই পেশী ও নার্ভ দিয়ে। অর্থাৎ, এই অংগগুলোতে ক্ষতি হবার কোনো সম্ভাবনাই নেই। যেমন—হৃদপিন্ড, মস্তিষ্কের প্রায় দেড় হাজার কোটি নার্ভকোষ ইত্যাদি। যদি বাইরে থেকে রোগ এসে এই অংগগুলোকে আক্রমণ না করে তাহলে অন্তত দেড়শো বছর ধরে এই অঙ্গগুলো পুরোপুরি চালু থাকার সম্ভাবনা।

হালের বিজ্ঞানীরা প্রমাণ পেয়েছেন, এমনকি 'চিরস্থায়ী' টিশুগুলোরও বাড়-বৃদ্ধি ঘটে। হৃদপিন্ড নিয়ে মস্তিষ্ক নিয়ে পরীক্ষা করতে গিয়ে জীব-বিজ্ঞানীরা লক্ষ করেছেন ক্ষতিগ্রস্ত হবার পরেও এই অঙ্গগুলো বিশেষ বিশেষ অবস্থায় নিজের থেকেই মেরামতির কাজ সম্পূর্ণ করতে পেরেছে।

অথচ বিজ্ঞানীদের মধ্যে বহুকাল পর্যন্ত ধারণা ছিল যে, স্নায়ুকোষ বা নিউরন কখনো ভাগ হয় না। পদার্থ-বিজ্ঞানীদের যেমন ধারণা ছিল পরমাণু অবিভাজ্য, এও অনেকটা তেমনি। আর কোষ যদি ভাগ হতেই না পারে তাহলে কোষের বৃদ্ধিও নেই। কেননা কোষের বৃদ্ধি ঘটে একটি থেকে দুটি, দুটি থেকে চারটি, চারটি থেকে আটটি, এমনিভাবে ভাগ হয়ে। তাহলে, স্নায়ুকোষ ভাগ হয় না কথাটা ধরে নিলে তার মানে কী দাঁড়ায়? মানুষের শরীরে স্নায়ুকোষ যা আছে তাই থাকে, সারা জীবনেও তা বাড়ে না। অর্থাৎ, মস্তিষ্ক যেমন আছে তেমনিই থেকে যায়, এ-ব্যাপারে কারও কিছু করার নেই। তার ক্ষয় হতে পারে, পূরণ হয় না।

পরবর্তী কালে বিজ্ঞানীরা অবশ্য চাক্ষুষ প্রমাণ পেয়েছেন, নিউরনের কেন্দ্রীন ভেঙে দু-ভাগ হয়ে যাচ্ছে। মস্তিষ্কের কোষও যে 'চিরস্থায়ী' নয় তাও এখন পরীক্ষিত সত্য।

রক্তের সাদা কণিকা সম্পর্কে এই তথ্যটি সবাই জানেন যে শরীরে যদি জীবাণু প্রবেশ করে তাহলে এই সাদা কণিকারা তাদের বাধা দেয়। অর্থাৎ যাকে বলা হয় 'জীবন দিয়ে জীবন দান'—এই সাদা কণিকাদের ভূমিকা তাই। তাহলে ধরে নিতে হবে শান্তির সময়ে—অর্থাৎ যে সময়ে অনুপ্রবেশকারী জীবাণুদের বিরুদ্ধে লড়াই চালাতে হচ্ছে না তখন—সাদা কণিকাদের কোনো ভূমিকা নেই। তাও আছে। রক্তের প্রতি চতুর্থ সাদা কণিকা গঠনমূলক কাজ করে থাকে। এর জন্ম প্লীহায়, বিশেষ একটি লিমফয়েড বা লসিকা-নালীতে। সেজন্যে নাম লিম-ফোসাইট। গঠনমূলক ভূমিকায় রয়েছে এই লিমফোসাইটরাই।

বিজ্ঞানীরা, একসময়ে টের পেলেন প্রতি ত্রিশটি লিম্ফোসাইটের মধ্যে রক্তের প্রবাহে পাওয়া যাচ্ছে মাত্র একটিকে, বাকি উনত্রিশটি একেবারেই বেপাত্তা। গেল কোথায়? খোঁজ, খোঁজ। উবে গেল নাকি?

প্রায় উবে যাওয়াই। কিংবা মিলিয়ে যাওয়া। লিমফোসাইটরা মিলিয়েই যায়, আর কোথাও নয়, শরীরেরই টিশুতে। নিজেদের মিলিয়ে দিয়ে তারা দান করে অতি মূল্যবান একটি পদার্থ—রাইবোনিউক্লিয়াইক অ্যাসিড বা সংক্ষেপে আর-এন-এ। শরীরের প্রোটিন নির্মাণের ক্ষেত্রে এই এ্যাসিডটি অতি সক্রিয় ভূমিকা থাকে। প্রাণ বাঁচিয়ে রাখার জন্যে যেমন চাই নিশ্বাসের বাতাস, তেমনি এই প্রোটিন নির্মাণের আয়োজন। এবং এই গুরুত্বপূর্ণ আয়োজনটি বজায় রাখার জন্যেই সাদা কণিকারা নিঃশেষে মিলিয়ে যাচ্ছে।

শরীরের মধ্যে এমনি নানা আয়োজনের আর শেষ নেই যেন। কিডনি বা যকৃতের কথাই ধরা যাক। শূন্য স্থান পূরণের ক্ষমতা এই অঙ্গটিরও আছে পুরোমাত্রায়। বাঁদরের ওপরে পরীক্ষা করে দেখা গিয়েছে যকৃৎ আধখানা কেটে ফেললেও পুরো যকৃতটি আবার তৈরি হয়ে যেতে খুব বেশী সময় লাগে না।

কিডনি বা বৃক্কের বেলাতেও একই ব্যাপার লক্ষ্য করা গিয়েছে। আগেকার কালের ডাক্তাররা শরীরের দুটি কিডনির একটিতেও হাত দিতে চাইতেন না। তাঁদের ভয় ছিল, একটি সরালেই অপরটি অচল হয়ে যাবে। হালের ডাক্তাররা এবিষয়ে একেবারেই নিঃশংক। শরীরে যদি একটি কিডনিও থাকে (কোনো কারণে অপরটি আগেই সরানো হয়েছে) তাহলেও তাঁরা সেই একমাত্র কিডনির খানিকটা অংশ সরাতেও ইতস্তত করেন না। তাঁরা জানেন, কিডনির এক-চতুর্থাংশও যদি শরীরের মধ্যে থাকে তাহলে একবছর কি দু-বছরের মধ্যে তা পুরোমাত্রায় তার ভূমিকাটি পালনের অবস্থায় এসে যাবে।

আর হাড়ের বেলায় তো আরো নিশ্চিন্ত হওয়া চলে। খানিকটা অংশ রাখারও প্রয়োজন নেই, পরিষ্কার জায়গা পেলেই নতুন হাড় গজিয়ে থাকে। হাড়ের একটি অংশে যদি অসুখ দেখা দেয় তাহলে ডাক্তাররা কী করেন? হাড়ের এই বিশেষ অংশটা বেমালুম কেটে বাদ দিয়ে দেন এবং সে-জায়গায় বসিয়ে দেন একটি জিপসাম রড বা দন্ড। ব্যাপারটা কি? শরীরের মধ্যে খামখা একটা বিজাতীয় জিনিস থেকে যাবে নাকি? ভয়ের কোনো কারণ নেই। অকরুণ হাতে রুগ্ন হাড়ের অংশ বাদ দেওয়া হয়েছে বটে কিন্তু তার আবরণীটি —যাকে বলা হয় পেরিঅস্টিয়াম—সযত্নে রেখে দেওয়া হয়েছে। রডটি ঢোকানো হয়েছে এই আবরণীর মধ্যে। কিছুকালের মধ্যে এই রডটিকে ঘিরেই তৈরি হবে নতুন হাড়। শূন্য স্থান পূরণ করার আয়োজন শরীরের মধ্যেই আছে। ডাক্তার তারই ওপরে নির্ভর করেছেন।

শরীরের এইসমস্ত আয়োজনকে পুরো মাত্রায় জানা গিয়েছে, এখনো পর্যন্ত দাবি করা চলে না। তবে লক্ষণ দেখে মনে হয়, শরীরের যে-কোনো অসুখ সারিয়ে তোলার মতো আয়োজন শরীরের মধ্যেই সক্রিয় করে তোলা সম্ভব। একই পদ্ধতিতে অবশ্যই নয়, ভিন্ন ভিন্ন অসুখে ভিন্ন ভিন্ন পদ্ধতি। যেমন, কিডনির কতকগুলো অসুখের বেলায় বিশেষ বিশেষ পদ্ধতিতে কিডনির মধ্যেই অসুখ সারাবার আয়োজন সক্রিয় করে তোলা গেছে। আশা করা চলে, হৃদপিন্ড বা মস্তিষ্ক বা অন্যান্য অঙ্গের বেলাতেও অনুরূপ পদ্ধতি আবিষ্কৃত হবে। মানুষ যে বুড়ো হয় তাও, বলতে পারা যায়, একটা অসুখেরই লক্ষণ। কোনো না কোনো দিন এই অসুখের বিরুদ্ধেও লড়াই চালাবার আয়োজন শরীরের মধ্যেই তৈরি করা যাবে হয়তো।

সেদিন?

সেদিন—মানুষ আর বুড়ো হবে না।

—[illegible]

হরপ্পার ফুল

নির্মল সরকার

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

দাদাবাবু, জোরে ডাকল হেমন্ত। কোন সাড়া নেই।

গায়ে হাত দিয়ে ডাক, বলল সীমা।

জ্বরে গা পুড়ে যাচ্ছে বৌদি। হেমন্তর মুখটা বিকৃত হ'ল।

তাহলে, সামনে রাখা চেয়ারে বসল সীমা।

মাথাটা ধুয়ে দিলে ভাল হয় বৌদি, বড্ড জ্বর। বলল হেমন্ত।

তুমি এক কাজ কর, ফ্রিজ থেকে ঠাণ্ডা জল আর পরিষ্কার এক টুকরো কাপড় নিয়ে এস।

পায়জামা আর হাতকাটা গেঞ্জি পরে শুয়ে আছে অরুণ। সীমা একবার তাকাল সেদিকে। মাথার চুল ভালভাবে আঁচড়ানো হয় নি। কোঁচকানো চুলগুলো অবিন্যস্ত-ভাবে ছড়িয়ে রয়েছে। ভ্রু দুটো মোটা আর [illegible] কপাল [illegible] হয়ে গিয়েছে জ্বরের তাড়নায়। নাকের পাতাদুটো নিশ্বাসের সঙ্গে কাঁপছে বার-বার। শ্বাসটা তার অস্বাভাবিক দ্রুত চলছে বলে মনে হল সীমার। ঠোঁট দুটো জোরে বন্ধ রয়েছে যন্ত্রণার আধিক্যে। দাড়ি গোঁফ পরিষ্কার-ভাবে কামান তবে জায়গাটা জুড়ে একটা লাল আভা ফুটে রয়েছে। হেমন্ত একটা প্লেটে ঠাণ্ডা জল আর এক টুকরো কাপড় এনেছে।

জলপটি দাও কপালে, অভিজ্ঞ নার্সের ভঙ্গীতে বলল সীমা। হেমন্ত কাপড়টা চওড়া করে ছিঁড়ে জলে ভিজিয়ে নিল তারপর সেটা অরুণের কপালে দিতে তার চোখ দুটো শুদ্ধ ঢাকা পড়ে গেল। তার সঙ্গে জল গড়িয়ে পড়ল চারিদিকে। সীমা তাড়াতাড়ি জলপটি তুলে নিয়ে অতিরিক্ত জলটা নিংড়ে ঠিকমত পাট করে অরুণের কপালের ওপর দিয়ে দিল। কাজটা করতে দ্বিধা হল না তার। অরুণ শুধু অসুস্থ নয়, অজ্ঞান। কিন্তু তাকে বেশ বিপদে ফেললেন ভদ্রলোক।

ডাক্তারবাবুর ফোন নম্বর জান? জিজ্ঞেস করল সীমা।

না, ঘাড় নাড়ল হেমন্ত। কি নাম তাও জানি না তবে ঐ মোড়ে তার ডাক্তারখানা।

তাহলে ডেকে নিয়ে এস তাড়াতাড়ি। ব্যস্ত হয়ে উঠল সীমা।

হেমন্ত চলে গেল। হাত দুটো বুক থেকে নামিয়ে বিছানার ওপর রাখল অরুণ। যন্ত্রণায় একটা অস্ফুট শব্দ করল সে।

শুনছেন, ডাকল সীমা। কোন সাড়া নেই। অরুণের চোখের পাতা দুটো শুধু কাঁপল কয়েকবার।

এক মুহূর্তে তাকিয়ে রইল সীমা অবাক হয়ে। এভাবে কোন পুরুষকে সে দেখে নি। [illegible] একটা অসহায়

পুরুষকে এরকম অবস্থায় আর এত কাছ থেকে সীমা কোনদিন লক্ষ্য করে নি। অরুণের কান দুটো লাল হয়ে রয়েছে। কানের ধার থেকে সূক্ষ্ম লোম বেরিয়েছে, ওপর থেকে প্রায় নীচ পর্যন্ত। জুলপীটা তির্যক কিন্তু নিখুঁতভাবে কাটা। ঠোঁটের বাঁদিকে একটা কালচে দাগ। সীমার মনে পড়ল অরুণ এই দিকেই সিগারেট খেতে অভ্যস্ত। বুকের ওপর সূক্ষ্ম লোম আর কাল চুল। পুষ্ট বাহু থেকে সুগোল কাঁধ, তারপর গলা, তার পাশ থেকে শক্ত চিবুক দেখা যাচ্ছে। গলার ওপর একটা শিরা কাঁপছে বার-বার।

একটু পরে ডাক্তারবাবু এসে রোগ-নির্ণয় করে ইনজেকশন দিল। আর কয়েক দিনের মধ্যেই সেরে উঠবে বলে আশ্বাস দিলেন সেই সঙ্গে।

বৌদি খাবেন চলুন, আমি বসছি এখানে। বলল হেমন্ত।

না, আমি কিছু খাব না। উত্তর দিল সীমা। খাওয়ার ইচ্ছে তার ছিল না। দুঃখ বা ভয়ের কথা নয়, আকস্মিক একাগ্রতা তার ক্ষুধাটাকে নষ্ট করে দিয়েছে।

তাহলে দাদাবাবু রাগ করবেন আমার ওপর।

তুমি বার্লি করতে পার? অন্য কথায় গেল সীমা।

হ্যাঁ।

তাহলে তোমার দাদাবাবুর জন্যে এক গ্লাস বার্লি করে নিয়ে এস।

হেমন্ত চলে গেল বার্লি করতে।

কপালের জলপটি বদলে দিল সীমা। তারপর আলতোভাবে অরুণের বাহুটা স্পর্শ করে দেখল উত্তাপটা। এখনও জ্বর রয়েছে একই রকম। সীমা আশা করেছিল ইনজেকশন দেওয়ার পর জ্বরটা কমবে, কিন্তু তা হল না। এবার দুর্ভাবনায় পড়ল সে। একবার ভাবল অরুণের বাবার কাছে খবর পাঠানোর কথা। কিন্তু এত রাত্রে তার কোন উপায় নেই। সারা রাত একজন অচৈতন্য রোগীকে নিয়ে সে কি করবে তাই ভাবতে লাগল। একটু পরে চোখ মেলল অরুণ। সীমা একটু জল দিল তার মুখে। কোন আপত্তি করল না অরুণ, অনেকটা জল খেল সে। একটা অস্ফুট কাতরোক্তি করল অরুণ।

কি কষ্ট হচ্ছে? জিজ্ঞেস করল সীমা। কোন উত্তর নেই।

হেমন্ত বার্লি এনেছে এক গ্লাস। পাশের টেবিলে সেটা ঢাকা দিয়ে রাখল সে। সীমা তাকে ঘরের মেঝেতে শুতে বলল। রাত্রে দরকার হলে তার সাহায্য পাওয়া যাবে। শুধু তাই নয় অরুণকে নিয়ে সে একা ঘরে থাকতে দ্বিধাবোধ করছে।

একটু পরে সে লক্ষ্য করল অরুণের শ্বাসপ্রশ্বাস অনেকটা স্বাভাবিকভাবে পড়ছে যেন। ক্লান্তিবোধ করল সীমা। পাশের লম্বা কৌচটায় হেলান দিয়ে শুয়ে পড়ল সে। কাল সকালেই হারুকাকা আর অরুণের বাবাকে খবর দিতে হবে। কিন্তু রাত্রে যদি কিছু হয়! ডাক্তারবাবু অবশ্য ভরসা দিয়ে গেছেন। সেটা বড় কথা নয়, কারণ ডাক্তাররা দু' ধরনের স্তোক দিয়ে থাকেন। যদি এ রাত্রে অরুণ মারা যায় তাহলে কি করবে সে। তার আগে অ্যাম্বুলেন্সে ফোন করে হাসপাতালে পাঠালে তার দায়িত্ব থাকে না। কিন্তু সঙ্গে কে যাবে? চাকর দিয়ে পাঠালে অরুণের বাবাকে কি জবাব দেবে সে? অবশ্য সে নিজে সঙ্গে যেতে পারে। তাতেই বা লাভ কি? হাঁটু দুটো মুড়ে তার মধ্যে হাত দুটো দিয়ে পাশ ফিরে শুল অরুণ।

বৌদি, ডাকল হেমন্ত।

কি?

দাদাবাবুর শীত করছে বোধহয়। একটা চাদর চাপা দিয়ে দেব।

দাও। সিলিংয়ের দিকে তাকিয়ে রইল সীমা।

বাইরে চাদর দেখছি না, আপনি একটা বার করে দিন। উঠল সীমা। অরুণের আলমারীর চাবি অরুণের কাছেই থাকে। সাইড টেবিলের কাছে গিয়ে সে দেখল সেখানে অরুণের ব্যবহার-করা জিনিসগুলো ছড়ান রয়েছে। পাশে একটা কাল রঙের ডাইরী, গাড়ীর চাবি, সিগারেট কেস, লাইটার, পেন আর এক গোছা চাবি। বিপদে পড়ল সীমা। কোনটা আলমারীর চাবি তা সে জানেই না। হেমন্ত তার দিকে তাকিয়ে আছে। আর দেরী না করে আলমারীর সামনে গিয়ে সব থেকে বড় চাবিটা দিয়ে চেষ্টা করল সে। চাবিটা আলমারীরই। দরজা খুলে তাকাতেই প্রথমে নজর পড়ল তার এটাচি কেসটার দিকে। একবার সেটা খুলে দেখার অদম্য ইচ্ছা হল সীমার। তার নীচের তাকে গোছা করা সার্ট, নানা রঙের আর ডিজাইনের। এ ছাড়া প্যান্ট, গেঞ্জি আর অন্যান্য কাপড়ে প্রায় বোঝাই রয়েছে। তার নীচের তাক থেকে অনেক খোঁজার পর একটা সিল্কের চাদর পাওয়া গেল। হেমন্তকে সেটা দিয়ে অরুণের গায়ে সেটা ঢাকা দিয়ে দিতে বলল সীমা। তারপর খোলা আলমারীর সামনে গিয়ে দাঁড়াল আবার। অ্যাটাচি কেসের চাবি তার কাছেই ছিল। সেটা নামিয়ে, চাবি দিয়ে খুলে সীমা দেখল সব জিনিষই একইভাবে রাখা রয়েছে। কেউ স্পর্শ করে নি। তারপর কি মনে হতে অ্যাটাচি কেসটা বন্ধ করে রেখে দিল যথাস্থানে।

অরুণ ঘুমোচ্ছে। নীল আলোটা জেলে হেমন্ত মেঝের এক পাশে শুয়ে পড়ল। অরুণ মারা গেলে তার কি হতে পারে তাই আবার ভাবতে লাগল সীমা। বিবাহিতা স্ত্রী হিসেবে সেই সব সম্পত্তির অধিকারী হবে। কত টাকা হতে পারে। দশ-পনেরো লক্ষ টাকা নিশ্চয়। তখন সে কি করবে এত টাকা নিয়ে। গ্রামে অরুণের বাবার কাছে থাকবে? তাই বা থাকবে কেন? তাহলে এই চাকর দুটো নিয়ে একলা থাকলে ক্ষতি কি? কৌচে শুয়ে ভাবতে লাগল সীমা। মারা যাবার পর অরুণকে কি রকম দেখতে হবে কে জানে। মরে গেলে লোকে কোথায় যায়? বাড়ীতে মরলেই বা কি আর হাসপাতালে মরলেই বা কি? লোকটাকে ত আর ফিরে পাওয়া যাবে না। হাসপাতাল সম্বন্ধে তার ধারণা ভল নয়।...

...ডাক্তারবাবু বাবাকে ভর্তি করে নিন। বাবাকে হাসপাতালে এনেছে সীমা।

বললেই ত হবে না। ফ্রি বেড খালি না থাকলে নেব কি করে?

বাবাকে এমার্জেন্সীতে রেখে সে বড় ডাক্তারবাবুর কাছে গেল।

আমার বাবাকে একবার দেখে যান দয়া করে, মিনতি করে বলল সীমা। ভদ্রলোকের দয়া হল। এসে দেখলেন তিনি তারপর নিজেই ভর্তি করিয়ে দিলেন।

বেডে বাবাকে ঠেস দিয়ে বসিয়ে দিয়েছে দেখতে পেল সীমা। তাকে দেখে হাসতে চেষ্টা করল বাবা। সীমা বোর্ডিং থেকে রোজ বিকেলে বাবাকে দেখতে যায়।

সেদিন শনিবার, একটু সকালেই গিয়ে পৌঁছল সে। বাবার চেহারাটা একেবারে পাল্টে গিয়েছে। একটু জল চাইল বাবা। সীমা জল খাইয়ে দিল একটু-একটু করে। তেষ্টা বেশ পেয়েছিল বলে মনে হল তার। লক্ষ্য করে দেখল অপরিষ্কার ময়লা বিছানায় শুয়ে রয়েছে বাবা। মেঝেতে জল, তার ওপরেই কয়েকটা রোগীর বিছানা। দু-তিনটে বেড়াল ঘুরে বেড়াচ্ছে ইতস্তত। রোগীরা চিৎকার করে কথা বলছে নানা সুরে। বাবার অনেক অসুবিধে হচ্ছে বলে বুঝল সীমা। বড় ডাক্তারবাবুকে জানাতে তিনি সমবেদনা জানালেন, প্রতিকারের চেষ্টা করলেন কিন্তু বিশেষ ফল হল না। অসুবিধে ও'র রয়েই গেল। সোমবার বাবার অবস্থা খারাপের দিকে গেল। নাকে একটা নল দিয়ে অক্সিজেন দেওয়া হল, তার সঙ্গে সঙ্গে কয়েকটা ইনজেকসন। মঙ্গলবার সীমা দেখল ডাক্তার আর নার্সরা দাঁড়িয়ে আছে বাবার বেডের পাশে। করুণ দৃষ্টিতে তারা তাকাল সীমার দিকে। হাত দিয়ে দেখল বাবার শরীর যেন ঠান্ডা। শ্বাস পড়ছে অনেক দেরী করে। একটা লম্বা শ্বাস নিয়ে বাবার দেহটা স্থির হয়ে গেল। চাদরটা নার্স ঢাকা দিয়ে দিল সর্বাঙ্গে। বুঝতে একটু দেরী হল সীমার। তারপরে হঠাৎ নানা রঙ-ভরা বেলুন তার চোখের সামনে ফেটে গেল। গাঢ় বেগুনী, জরদা, উজ্জ্বল হলুদ, আর গাঢ় নীল রং ফোয়ারার মত গিয়ে তার চোখে পড়ল একসঙ্গে। সব রঙ মিশে একাকার হয়ে গেল...

বৌদি, বৌদি, হেমন্তের গলা।

কি হয়েছে? উঠে বসল সীমা।

আপনি চেঁচিয়ে উঠলেন কেন? দাদাবাবুর ঘুম ভেঙে গিয়েছে। অরুণ তার দিকে তাকিয়ে আছে। কয়েক মুহূর্ত উদ্‌ভ্রান্তের মত তাকিয়ে তাড়াতাড়ি ঘর থেকে বেরিয়ে গেল সীমা।

দু-তিন দিনের মধ্যেই অরুণ স্বাভাবিক হয়ে উঠল। তার যে একটা অসুখ হয়েছিল তাকে দেখলে কেউ বলবে না।

তোমাকে খুব কষ্ট দিয়েছি সেই রাতে— বলল অরুণ।

না, হেমন্তই সব করেছে, আমি একবার গিয়েছিলাম মাত্র।

ডাঃ সোমের কাছে আজ যাওয়ার দিন না।

হ্যাঁ, কিন্তু এতে কি ফল হবে তা আমি বুঝি না।

তা হোক, যেও, তোমার ত মজা লাগে বল। ও প্যাকেটে কি আছে?

হেমন্তর প্যান্ট, কোট, জুতো—বলল সীমা।

বেশ বড় প্যাকেট বলে মনে হচ্ছে।

হ্যাঁ, ছটা করে আছে।

ড্রেনপাইপ প্যান্ট আর ছুঁচলো জুতো?

না, হেসে ফেলল সীমা। হাসলে সীমাকে বেশ দেখায়।

ডাঃ সোমকে আজ বেশ হাসিখুশী বলে মনে হল সীমার।

কেমন আছেন? জিজ্ঞেস করলেন তিনি।

ভালই. চেয়ারে বসল সীমা।

আপনি সেদিন বলেছিলেন কুকুর ভালবাসেন। তাছাড়া আর কি পছন্দ করেন?

আর কিছু না। (লোকটার গোঁফ ঠিক টুথব্রাশের মত)

সেদিন আপনাকে মায়ের কথা জিজ্ঞেস করেছি, কিন্তু আপনি তাঁর বিশেষ কিছু বলেননি।

আবার কি বলব? আপনি যা জিজ্ঞেস করেছেন তাই বলেছি, বিরক্ত হল সীমা। (লোকের নিন্দে শুনতে খুব ভালবাসে বলে মনে হচ্ছে)

তা দিয়েছেন। আচ্ছা আপনি রাঁধতে পারেন?

হ্যাঁ, পারি বৈকি! (খাবে নাকি? এমন ঝাল দেব যে গোঁফ ঝলসে যাবে!)

আপনাদের বাড়ীতে কে রাঁধে?

হেমন্ত (এবার কত মাইনে পায় নিশ্চয় জিজ্ঞেস করবে)।

আপনাদের দুজন চাকর আছে?

হ্যাঁ, হেমন্ত আর করুণা।

এদের মধ্যে কে ভাল কাজ করতে পারে?

হেমন্তই বেশ ভাল পারে।

আপনি এবার কোচে হেলান দিয়ে শুয়ে পড়ুন সেদিনের মত।

কোচে শুলে সীমা।

হেমন্তকে আপনি ভাল বললেন তার মানে খুব খাটতে পারে বলছেন?

না না, তা কেন, সব কাজেই ও এগিয়ে আসে সাহায্য করতে।

রান্না ছাড়া অন্য কিছু করে হেমন্ত?

না, অন্য আর কি করবে।

যেমন ধরুন আপনাদের কাপড়-জামা কাচা।

আমার কাপড়-জামা আমি নিজেই কেচে নিই।

স্বাবলম্বী হওয়া খুবই ভাল, কিন্তু মাঝে মাঝে যদি চাকররা কেচে দেয়, তাহলে আপনার আপত্তি হবে?

নিশ্চয়; মেয়েদের জামা-কাপড়ে পুরুষ হাত দেবে কি? সীমার স্বরে বিরক্তি। (ডাক্তারদের সামান্য বুদ্ধিও নেই)

মিঃ বোসকে আপনার ভাল লাগে না, সেদিন বলেছিলেন, তার বিশেষ কোন কারণ আছে কি?

না।

আপনি ছোট ছেলেমেয়ে ভালবাসেন?

ছোট ছেলেমেয়ে?

হ্যাঁ।

ছোট ছেলেমেয়ে দেখলে আমার মারতে ইচ্ছে করে।

কেন?

এমনি; বেশ কাঁদবে, প্রতিবাদ করবে না, কাউকে বলতে পারবে না। (তোমার নাতি থাকলে এমন গলা টিপে দিতুম, তখন বুঝতে)

আপনার যদি নিজের ছেলেমেয়ে হয়?

হবে না; স্বামী-স্ত্রীর নোংরা সম্পর্কটাকে আমি ঘৃণা করি।

আপনাদের চাকর করুণার চেয়ে আপনি হেমন্তকে বেশী ভালবাসেন; হেমন্তর মত দেখতে কাউকে চিনতেন?

হ্যাঁ, চিনতাম, আপনি কি করে জানলেন? হেমন্তর চেয়ে ছোট ছিল সে। আমাদের বাড়ীর কাছে থাকত ওরা। ওর সৎমা ছিল। ময়লা প্যান্ট আর গেঞ্জী পরে রকে বসে থাকত। আর প্রায়ই কাঁদতে দেখতাম।

আপনি তখন কি করতেন?

কি করব; আমার খুব ইচ্ছে হত ওকে সব জিজ্ঞেস করতে। ওর কান্নার সুরটা এখনও আমার কানে বেজে আছে।

হেমন্তকে তার মত দেখতে?

হ্যাঁ, তাছাড়া হেমন্ত গরীব।

আপনি বড়লোকদের পছন্দ করেন না বুঝি?

ঘৃণা করি। (তোমাকেও। লোক ঠকিয়ে অনেক টাকা করেছ তুমি।)

কেন?

তারা অপরের উপর সুযোগ নেয়।

আপনার বাবা কিসে মারা গিয়েছিলেন?

হাঁপানি ছিল বাবার।

আপনার কোন ছোট ভাই-বোন ছিল?

না না—সীমার স্বরে আতঙ্ক।

আপনার কোন কাকা বা জেঠা ছিল?

কাকা! চমকে উঠল সীমা।

হ্যাঁ।

না, একটু পরে উত্তর দিল সীমা।

আপনি ছোটবেলার কথা কিছু বলুন।

কি বলব। (অরুণের চাবির গোছাতে সেফের চাবি আছে নিশ্চয়)

যা হোক বলুন। মিসেস বসু, আপনি আজ ঠিক আমার সঙ্গে সহযোগিতা করছেন না। এর আগের দিন আপনি নিজের মনের ওপর এতটা চাপ দেননি। আজ আপনি উত্তর দিচ্ছেন খুব ভেবে-চিন্তে, নিজের মন আর কথাকে সংযত করে। (তাহলে কি করব, সৌম্য দত্ত আর কি তার পিছু নেবে?)

সেদিনের মত, মনে যা আসে তাই বলুন।

(মনে যা আসে তাই যদি বলি তাহলে তুমি অজ্ঞান হয়ে যাবে)

বেশ জিজ্ঞেস করুন।

লাল রং বললে কি মনে হয়?

লাল—? সিঁদুর—রক্ত—মাংস—চাপা গেছে একটা কুকুর—চারিদিকে রক্ত নাড়ী বেরিয়ে এসেছে। সধবা মরলে মাথায় চওড়া করে সিঁদুর দিয়ে নিয়ে যায়। তাতে কি হয়? মায়েরা সিঁদুর পরলে ভাল লাগে। রেখার মা স্কুলে সিঁদুর পরে আসতেন।

আপনার মা? জিজ্ঞেস করলেন ডাঃ সোম।

আমার মা সিঁদুর পরতেন কিনা মনে নেই। গায়ে কেমন একটা আঁশটে গন্ধ মায়ের। ঘরে ঢুকলেই বোঝা যায়। ভারী পায়ের চলা দুম-দুম করে, চিৎকার করে কথা বলা, ঝগড়া-ঝগড়া—না জিনিস ছুঁড়ে ফেলে দিল—ঝনঝন। কাঁচের কাপ-ডিস, গ্লাস, ভেঙে ছড়িয়ে গেল চতুর্দিকে। আমার হাত কেটে রক্ত পড়ছে—লাল টকটকে রক্ত। আবার গুলিয়ে যাচ্ছে সীমার। আমি কি বললাম আবোল-তাবোল, আস্তে বলল সীমা।

না, ঠিকই বলেছেন।

(তোমার মাথা বলেছি)

সাদা বললে আপনার কি মনে হয়?

চুন,—

বেশ বলুন, উৎসাহ দেন ডাঃ সোম।

খড়ি, কাগজ, সাদা গাউন-পরা মাদার, থান-পরা বিধবা,—মা কিন্তু থান পরে নি, হাতের চুড়িও খোলে নি; মরে গেলে সাদা ফুল দেয় কেন? ফুলশয্যার দিনও যুঁইয়ের গোড়ে, রজনী-গন্ধা—বেশ গন্ধ। (আবার কি বলছি)।

থামলেন কেন, বলুন।

আমাদের স্কুলে একটা মেয়ে পড়ত, তার গালে সাদা দাগ ছিল, কি নাম যেন? ইলা। তাকে খুব রাগিয়ে দিতাম। কুষ্ঠ-রোগী বললেই কাঁদত ইলা, বেশ মজা লাগত আমার।

দুজনেই নিস্তব্ধ। লোকটা চুপ করে আছে কেন? আর কি জিজ্ঞেস করবে, কর না। আরে লোকটা মরে গেছে নাকি? আমিও কিছু বলব না। চুপ করে আমি খুব থাকতে পারি। নানুকাকা একটা কথাও আমায় বলাতে পারে নি' মারলে কি হয়? লাগে হয়ত! বেত দিয়ে বা অন্য কিছু দিয়ে মারলে রক্ত পড়ে, ব্যথা হয়, তারপর ঠিক হয়ে যায়। ওতে আমার কি হবে? লাল, সাদা হল, এবার কি সবুজ না হলুদ? লোকটা ঘোর উন্মাদ।

আপনার স্কুল ভাল লাগত? জিজ্ঞেস করলেন ডাঃ সোম।

ভাল লাগত না।

কেন?

এমনি।

মাদারদের কেমন লাগত?

মাদার ইলাইজা আমায় খুব ভাল-বাসতেন। উনি খুব লম্বা ছিলেন। ছুটে-ছুটে চলতেন। তাঁর সঙ্গে আমরা চলতেই পারতাম না।

আবার নিস্তব্ধতা। ডাঃ সোম অপেক্ষা করছেন সীমার জন্য। এই রে আবার চুপ করেছে। লোকটা কত মানুষকেই যে যন্ত্রণা দিয়েছে এইভাবে। ডাক্তারবাবুর বয়স কত হবে। সত্তর-আশি হতে পারে। মর না তুমি। অরুণবাবু মারা গেলে সে বিধবা হবে। বিধবা কথাটা কি অদ্ভুত শুনতে? পিসিমা বিধবা হওয়ার পর শুচিবায়ু হয়েছে। তার কি হবে? ছাই হবে, সে বিয়েই করে নি। অরুণবাবুর রংটা তার চেয়ে ফর্সা। দাড়িতে অমন নীলচে রঙ হয় কেন? ডায়েরীটা সে রাতে খুলে দেখলেই হোত। পার্সটা মোটা ছিল। সেটাই বা দেখলাম না কেন? হেমন্ত থাকলেই বা, ও আমার কি করতে পারত? কিছু না। মোদীকে টাকাটা দিয়ে দিয়েছেন, ভেবেছেন আমায় কিনে নিয়েছেন। অত সস্তা নয়।

কি ভাবছেন? ডাঃ সোম বললেন।

না কিছু নয়।

আজ এই পর্যন্ত থাক।

উঠে পড়ল সীমা।

ডাঃ সোমের চেম্বার থেকে বেরিয়ে স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে বাঁচল সে। স্বরূপ

আলোতে, কোঁচের পেছনে অদৃশ্য থেকে কি সব আজে-বাজে প্রশ্ন করেন তিনি। তার মর্ম বোঝা সীমার পক্ষে শক্ত হয়ে পড়েছে। উত্তর দিতে গিয়ে যতই সামলে থাকার চেষ্টা করে ততই উল্টোপাল্টা জবাব দিয়ে ফেলে। এটা কেন হয় তারও কারণ সে ধরতে পারছে না। লোকটাকে খানু বলে মনে হচ্ছে এবার। শুধু কৌশল জানে তা নয়, সম্ভবত হিপনোটিজম জাতীয় কোন প্রক্রিয়া প্রয়োগ করে বলে তার সন্দেহ হচ্ছে। তা না হলে ও ধরনের দু-একটা তুচ্ছ কথা কি করে ছোটবেলার ঘটনাগুলোকে মনে করিয়ে দিচ্ছে। সে অবশ্য প্রাণপণ চেষ্টা করছে সাজিয়ে-গুছিয়ে উত্তরগুলো দিতে কিন্তু আশ্চর্যের বিষয়, সেটা বুঝতেও লোকটার দেরী হয় না। এতদিন সীমা অ্যানালিসিস এবং তার পদ্ধতি ও তার ফলকে শুধু ব্যঙ্গ নয় উপেক্ষা করেছে। এবার কিন্তু তার মনের কোণে একটা আশংকার উদ্রেক হচ্ছে বলে সে অনুভব করল।

সামনের ছোট রাস্তাটা পার হয়ে বড় রাস্তায় পড়ল সীমা। মোড়ে একটা ট্যাক্সি পেয়ে খুশী হল সে। এ রাস্তায় ট্যাক্সি পেতে এর আগের দিন তাকে নাকাল হতে হয়েছে। নিউ মার্কেটের দিকে যেতে বলে সে গাড়ীতে হেলান দিয়ে বসল চোখ বন্ধ করে। অরুণ বসু তাকে বিয়ে করল কেন এ ভাবনাটা তাকে আর পীড়ন দেয় না। উদ্দেশ্য যাই থাক না কেন, লোকটা ভদ্র। তার কাছ থেকে কিই বা পেয়েছে অরুণ? অসুখ অবস্থায় তার ঘরে সে কিছুক্ষণ অবশ্য ছিল এবং হয়ত দেখাশুনাও করেছে কিছুটা; কিন্তু তার বেশী কিছুই নয়। এমন কি মেয়েরো সাধারণত সংসারে যে সমস্ত কাজ করে থাকে তাও সে করে নি। কোন অবজ্ঞা বা বিতৃষ্ণার জন্য নয় একটা ক্রমবর্ধমান নিষ্ক্রিয়তা তার যেন মন আর শরীরকে অকেজো আর আচ্ছন্ন করে দিচ্ছে। এটা সে ইদানীং বেশ ভালভাবেই বুঝতে পারছে। কেমন যেন হারিয়ে-যাওয়া ভাব জাগছে তার মনে। একটা শূন্যতা অনুভব করছে সে প্রত্যেক পদে-পদে। তার মনের দিক দিয়েও একটা পরিবর্তন আসছে বলে তার সন্দেহ হয়। না, অরুণকে সে ভাল-বেসে ফেলে নি। সেদিক দিয়ে হৃদয়াবেগকে সংযত করার মত কোন প্রয়োজন ঘটে নি এ পর্যন্ত। সে বন্ধারকে ভালবাসে, এখনও তার ভালবাসা অটুট আছে। সীমার কাছে বন্ধার চিরদিনই বন্ধু আর রক্ষক হয়ে থাকবে।

সৌম্য দত্তর কথা মনে পড়ল সীমার। তাকে যে সময় সৌম্য দত্ত অপমান করার চেষ্টা করেছিল সে সময় বন্ধার হাতের কাছে থাকলে উপযুক্ত শিক্ষা দিতে পারত। অরুণ তার ঘরে ঢুকতে সাহস করে না একই কারণে বলে মনে হল সীমার। কথাটা ভেবে সে প্রচুর আনন্দ পেল। আর একটা বিষয়ে অস্বস্তিবোধ করছে সে আজকাল। সেটা হল অরুণের বাড়ীর লোকের দ্বারা বিতাড়িত তাদের সম্ভ্রম ব্যবহার। সকলেই তাকে সমীহ করে এটা আশ্চর্যের কথা নয়। কিন্তু সীমার পক্ষে এটা নতুন অভিজ্ঞতা, একটা অনাস্বাদিত রোমাঞ্চের মত। ইতিপূর্বে তার জীবনে এটা ঘটে নি। অরুণের বাড়ীতে সকলেই তাকিয়ে থাকে তার দিকে আদেশের অপেক্ষায়। সেখানে অরুণের চেয়ে তার সম্মান আর মূল্য অনেক বেশী। এতে একটা মোহ আছে, মাদকতার ছোঁয়াচ আছে; সেটা অনুভব করে সীমা শঙ্কিত হয়ে পড়ছে। বন্ধনের মধ্যে গিয়ে সে পড়ছে বলে বুঝতে পারছে। অদৃশ্য নাগপাশের মত সেটা তাকে গ্রাস করে ফেলবে বলেই তার বিশ্বাস। অরুণকে তার ভয় করে না। তবে সন্দেহ আর অবিশ্বাস জেগে রয়েছে এখনও। সব পুরুষের মত অরুণেরও কর্তৃত্ব করার স্বভাব আছে এটা সে জানে। অসুখের সময় অরুণের ঘরে সে রাত্রে একটা অদ্ভুত অনুভূতি জেগেছিল বলে তার মনে পড়ে। অরুণের পার্স বা চাবি তাকে প্রলোভিত করে নি কেন তার কারণটা এখনও পর্যন্ত তার কাছে হেঁয়ালির মত ঠেকছে। স্বচ্ছন্দে সে অরুণের যথাসর্বস্ব নিয়ে পালিয়ে যেতে পারত; সেইটেই তার কাছে স্বাভাবিক হত। কিন্তু সেই অদৃশ্য নেশাটা যেন অকর্মণ্য হয়ে গিয়েছিল তখন। দু-একবার কথাটা মনে হয়েছে হয়ত। তবে অদ্ভুত পরিস্থিতিটা তার কাছে অভিনব বলে মনে হয়েছিল। কিন্তু আর নয়। এবারে সে পালিয়ে যাবে। না অরুণের কোন জিনিস সে চায় না। তার অ্যাটাচি কেসটা পেলেই যথেষ্ট। এখনও অরুণের জিনিসকে সে নিজের বলে ভাবতে পারছে না। অরুণকেও যেমন সে তার ওপর দখল প্রতিষ্ঠায় নিশ্চেষ্ট দেখেছে তারও তেমনি অরুণের ঐশ্বর্যের ওপর লোভ জন্মায় নি। গাড়ীটা থামতেই সীমা তাকিয়ে দেখল সে নিউ মার্কেটে পৌঁচেছে। আজ তার মনটা বেশ প্রফুল্ল রয়েছে। মনের গুমোট কেটে গিয়েছে কি কারণে তা সে নিজেই জানে না। ভাড়াটা চুকিয়ে দিয়ে সে এগিয়ে গেল মার্কেটের ভেতরে।

কাপড়-জামার ওপর তার বিশেষ লোভ নেই। শোকেসে উজ্জ্বল ঝকমকে শাড়ী-গুলোর দিকে তাকিয়ে দেখল একবার। এ ধরনের কাপড় সে সম্প্রতি অনেক দেখেছে বিয়ে উপলক্ষ্যে। তার বিয়ে, একথাটা এখনও সে ভাবতে পারে না বা চায় না। বিয়েটা সে সাময়িক আশ্রয় বলে মেনে নিয়েছে মাত্র। এতে তার হাতও নেই, দায়িত্বও থাকার কথা নয়। মার্কেটে তার কয়েকটা প্রয়োজনীয় জিনিস কিনতে হবে। অ্যাটাচি কেস ছাড়া আর তার কিছুই নেই, সেই কারণে প্রথমে যে দিকে স্যুটকেশের ষ্টক আছে সেইদিকেই গেল।

গৃহত্যাগ করতে গেলে যে প্রস্তুতির দরকার সেদিকে নজর দিয়েছে সীমা। এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় যেতে হলে সাধারণত সে কতকগুলো নিয়ম মেনে চলে। তার ব্যবহার-করা জিনিস সে পারতপক্ষে ফেলে রেখে যেতে চায় না। কাপড়-জামা তার বিশেষ লক্ষ্যের বিষয়। অন্য লোক তার পোশাক স্পর্শ করে এটা সে চায় না। তার কাছে এটা শালীনতার কথা নয়, সম্মানের ব্যাপার। তার অদৃশ্য হওয়ার পর অরুণ কি করবে সীমা তাই চিন্তা করছিল। সাধারণত অরুণ শান্ত প্রকৃতির। কিন্তু বিশেষ কোন কারণে রাগ হলে তার প্রকাশভঙ্গী ভিন্ন ধরনের হয়। এ অবস্থায় অসংগত আচরণ সে করে না। বরং আরও যেন ধীর, স্থির হয় অকস্মাৎ। তার মনের ভাবটা প্রকাশ করে না সে সহজে। সীমা এটা লক্ষ্য করেছে।

মোড় ঘুরতেই সীমা সৌম্য দত্তর সামনা-সামনি পড়ে গেল।

কোথায় যাচ্ছেন? এগিয়ে এল সৌম্য।

স্যুটকেশ কিনব একটা, বিরত বোধ করে সীমা।

আসুন, আমার চেনা আছে একটা দোকান।

ব্যস্ত হবেন না, আমি নিজেই পারব।

তা পারবেন বৈকি। এটা আর এমন শক্ত কি? কিন্তু আমার প্রেজেন্টেশনগুলো ফিরিয়ে দিলেন কেন, পছন্দ হয় নি? ভদ্র-ভাবে তাকাল সৌম্য দত্ত।

প্রেজেন্টেশন আমি যার-তার কাছ থেকে নিই না।

একটু জোরে চলতে চেষ্টা করল সীমা।

ক্লাসি টাইপ, বুঝেছি। কিন্তু নিলে ক্ষতি হত না।

আপনি আমায় বিরক্ত করবেন না।

না করব না, কিন্তু কোথায় গা-ঢাকা দিয়েছিলেন এতদিন? আমি ভাবছিলাম হয়ত শ্রীঘরে আবার দেখতে পাব আপনাকে।

শ্রীঘরে!

হ্যাঁ, জেলে; আমরা একগোত্রের লোক এটা বুঝেছি।

সীমা একটা অসীম সাহসের কাজ করল। সৌম্য দত্তর গালে একটা প্রচণ্ড চড় মেরে বসল অকস্মাৎ।

সৌম্য দত্ত অবাক হয়ে গেল। এতটা আশা করে নি। জায়গাটায় ছোটখাট, একটা ভিড় জমে গেল সংগে-সংগে। অনেক রকম সরস মন্তব্য শোনা গেল আশ-পাশ থেকে। কোন কৈফিয়ৎ না দিয়ে পাশ কাটিয়ে চলে গেল সীমা। সে যে প্রকাশ্যে এ ধরনের দুঃসাহসের কাজ করতে পারে সে কথা ভাবতেই পারে না। তার জীবনে এটা একটা আশ্চর্য ঘটনা। এ সাহস সে পেল কোথায়? নিজেই বিস্মিত হল সীমা। মনটা তার চঞ্চল হয়ে উঠল। জায়গাটা থেকে কিছুটা দূরে গিয়ে দাঁড়াল সে চুপ করে। মার্কেটে আসার কারণটা পর্যন্ত ভুলে গিয়েছে সে। এতক্ষণে আবার তার স্মরণ হল স্যুট-কেশের কথাটা। একটা স্যুটকেশ নিয়ে আবার যখন ফিরে গেল বাড়ীতে তখন অরুণ এসে গিয়েছে। হেমন্ত বা করুণা কাউকে না দেখতে পেয়ে সে নিজেই স্যুটকেশটা নিয়ে উপরে উঠল। সিঁড়ির পাশে ড্রইংরুম পেরিয়ে যাবার সময় সে অরুণকে টেলি-ফোনে কথা বলতে শুনল।

(ক্রমশঃ)

মহাকাশের মানুষ ও নতুন সমস্যা

দিলীপ বসু

এই শতাব্দীর গোড়ার দিক থেকে সুরু করে আজ যেমন এরোপ্লেনে পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলে স্বচ্ছন্দ যাতায়াত একেবারে যেন রোজানা ব্যাপার হয়ে গেছে, মহাকাশে রকেটে করে, চাঁদে বা গ্রহান্তরে গমন নিশ্চয়ই একশ' বছর পর সেইরকমই হবে। উপস্থিত মহাকাশযানে চারবার আমেরিকানরা চাঁদে দু'জন করে মানুষ পাঠিয়ে নিরাপদে ফিরিয়ে এনেছেন, খরচ পড়েছে অত্যন্ত বেশী, একবারে প্রায় আমাদের একটা পঞ্চবার্ষিকী যোজনার সমান। কিন্তু ভবিষ্যতে এতো খরচ পড়বে না, কারণ আমরা যখন একই মহাকাশযান বা চন্দ্রগামী ব্যোমযানকে বার বার যাত্রীবাহী গাড়ী বা এরোপ্লেনের মতো ব্যবহার করতে শিখবো, তখনই আমাদের খরচ বহুলাংশে কমে যাবে। উপস্থিত চাঁদে পৃথিবীতে একবার যাতায়াত করেই চন্দ্রগামী ব্যোমযান বা মহাকাশযানের সব কিছু বরবাদ করতে হয় বলেই খরচ এতো বেশী।

অবশ্যই এরোপ্লেনে পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলের ভেতরে একপ্রান্ত থেকে অন্যপ্রান্তে যাতায়াত, আর মহাকাশে (বায়ুমণ্ডলের বাইরে) ব্যোমযানে যাতায়াত এক বস্তু নয়। পৃথিবীর জল, মাটি ও বাতাস—এ তিনের পরিবেশ আমাদের জীবনযাত্রার পক্ষে অভ্যস্ত, প্রত্যেক ক্ষেত্রেই নিজস্ব কিছু কিছু সমস্যা থাকলেও, সেগুলি একেবারে আলাদা প্রতিকূল পরিবেশ নয়।

মহাকাশে কিন্তু অবস্থা তা' নয়। প্রথমত, বায়ুমণ্ডলের আবরণের মধ্যে বাস করে আমরা যেমন আমাদের অতি-প্রয়োজনীয় অক্সিজেন পেয়ে থাকি তেমনি বায়ুমণ্ডলের আবরণের বাইরে, মহাকাশে অক্সিজেনের অভাব ছাড়াও (সেটা মেটানো অপেক্ষাকৃত সহজ) নানারকম প্রাণঘাতী রশ্মি রয়েছে যার আঘাত থেকে আমাদের বাঁচতে হবে।

দ্বিতীয়ত, পৃথিবীর জল-মাটি-বাতাসে সামনে চলা বা পুরো ঘুরিয়ে (১০০ ডিগ্রি) পেছনে ফিরে চলা, অথবা ইচ্ছা মতো বাঁয়ে বা ডাইনে পাশ ফেরা সহজেই করা সম্ভব। মোটর গাড়ীর ষ্টিয়ারিং চাকা, বা জাহাজের হাল বা এরোপ্লেনেরও হাল বা চাকা ইচ্ছা মতো (অবশ্যই খানিকটা হিসাব মতো) ঘোরালেই চলবে। মহাকাশে এটা করা অসম্ভব। কারণ, মহাকাশে সব সময়ই আমাদের রকেটযুক্ত ব্যোমযান একটা-না-একটা নির্দিষ্ট কক্ষপথ ধরে চলেছে, যে কক্ষপথটির বৃত্তরেখা (মহাকাশে কোনো বস্তুই সরলরেখা ধরে চলতে পারে না) পৃথিবীর বা চাঁদের বা সূর্যের বা অন্য গ্রহাদির মহাকর্ষের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত।

ধরা যাক, আমাদের ব্যোমযান পৃথিবী-প্রদক্ষিণ করছে, পৃথিবীর সমুদ্রতল থেকে ২০০ মাইল উচ্চে বা দূরে; তার উপর দুটো বল (ফোর্স) যুগপৎ কাজ করছে—এক, পৃথিবীর মহাকর্ষ (কেন্দ্রানুগ বল, যেন দড়ির টান একটি হাতের চার ধারে ঘূর্ণমান ঢিলের ওপরে), দুই, তার নিজস্ব গতিবেগ (কেন্দ্রাতিগ বল, দড়িটা ছেড়ে দিলে যেমন সেই মুহূর্তেই ঢিলটা ছিটকে বেরিয়ে যাবে)। এই দুই বল-এর সমন্বয়ে ব্যোমযানটি একটি নির্দিষ্ট কক্ষপথে পৃথিবী প্রদক্ষিণ করছে। এখন, ইচ্ছা করলেই এর ঘূর্ণনের গতিমুখকে ঘুরিয়ে উল্টো করা যায় না, (সেটা প্রায় অসম্ভব), এমন কি এক কক্ষপথ থেকে অন্য কক্ষপথে তাকে চালনা বা স্থাপন করতে গেলেও বিশেষ শক্তি (energy) ক্ষয় করতে হবে। এক কথায়, মহাকাশে ব্যোমযান নিজেই যেন আর একটি ছোট গ্রহ বা উপগ্রহের মতো খ-বর্লবিদ্যার নিয়মাধীনে চলতে থাকে, যে খ-বর্লবিদ্যার নিয়ম পৃথিবীর জল-মাটি-বাতাসের মধ্যে যাতায়াত করে এমন কোনো যানের প্রতি প্রযোজ্য নয়।

তৃতীয়ত, মহাকাশে ব্যোমযানকে একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ নকল পৃথিবীর পরিবেশ (অক্সিজেন, আর্দ্রতা, ইত্যাদি) সৃষ্টি করে নিয়ে যেতে হয় এবং যেটি নষ্ট হয়ে গেলে বা কাজ না করলে ব্যোমযানের আরোহীদের মৃত্যু অবধারিত। এ সম্পর্কে বেশ কিছু বক্তব্য পরে আমরা পেশ করবো।

চতুর্থত, মহাকাশ ব্যোমযানের গতিবেগ এতো বেশী যে তার জন্য বিশেষ কিছু নতুন সমস্যা দেখা দেয়। সেগুলি এবারে আলোচনা করা যাক। পৃথিবী প্রদক্ষিণরত ব্যোমযানের ন্যূনতম গতিবেগ প্রতি সেকেণ্ডে ৫ মাইল, আবার পৃথিবী ছাড়িয়ে চাঁদে বা গ্রহান্তরে যেতে আরো বেশী, সেকেণ্ডে ৭ মাইল। কোনো কিছু ঘটলে একজন মানুষের তার বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়া হতে সময় লাগে ১/১০ থেকে ১/৫ সেকেণ্ড, অবশ্যই হাঁদা লোক হলে অনেক বেশী লাগবে, তবে মহাকাশচারীরা নিশ্চয়ই হাঁদা লোক হবেন না। আচ্ছা, ১/১০ সেকেণ্ডে আমাদের ব্যোমযান কিন্তু সরে যাচ্ছে ৫/১০ মাইল বা ৮৮০ গজ। অর্থাৎ বলা যেতে পারে একটা দ্রুতগামী ব্যোমযানের আরোহীদের সামনে প্রায় ৮০০ থেকে ১০০০ গজ জায়গাটা হিসাবের মধ্যে ধরা চলবে না। আর এই হিসাব হলো খুব তাড়াতাড়ি প্রক্রিয়ার সময় ব্যবধান সম্পর্কে (যেমন সামনে সাপ দেখলে পা সরিয়ে নেওয়া গোছের আর কি!)। জেট-বিমানের পাইলট বা মহাকাশচারীরা যতো বুদ্ধিমান ও চালাক-চটপটেই হন না কেন, একটা বিশেষ ঘটনার সবকিছু বুঝে সেই অনুসারে কাজ করতে তাদের সময় লেগে যাচ্ছে (পরীক্ষা করা হয়েছে এ সম্পর্কে) ১½ থেকে ২ সেকেণ্ড, অর্থাৎ, ততক্ষণে তাঁদের ব্যোমযান সরে গেছে ৭½ থেকে ১০ মাইল।

এই জন্যই স্বয়ংক্রিয় যন্ত্রপাতির উপর নির্ভর না করলে দ্রুতগামী জেটবিমান (যা আজকাল দু' ঘণ্টায় কলকাতা-দিল্লী যাচ্ছে) বা মহাকাশযান চালানো সম্ভব নয়। তথাপি এটা বলাও দরকার যে, সব সময়েই যন্ত্রের অপেক্ষা যন্ত্রী বড়ো—যন্ত্র একটা বিশেষ কাজ দ্রুততার সঙ্গে করতে পারে বটে, কিন্তু বিচার-বিশ্লেষণ করে সিদ্ধান্ত নেবার ক্ষমতা থাকে যন্ত্রীরই।

একটি নকল পৃথিবী

ব্যোমযান যেখানে চলছে সেটা একেবারে বায়ুশূন্য মহাকাশ। যাত্রার সুরুতে এবং অন্তে মাত্র কয়েক মিনিটের জন্য ব্যোমযানটি পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলের ভেতরে (বা আকাশে) যাতায়াত করে। পৃথিবীতে যেমন বাস করতেন মহাকাশযাত্রীরা তেমনভাবে করতে প্রয়োজনীয় অক্সিজেন, জল, খাদ্য সামগ্রী ইত্যাদি তাকে বয়ে নিয়ে যেতে হবে। আবার শরীর থেকে নিঃসৃত দূষিত কার্বন ডাই-অকসাইড গ্যাস (নিঃশ্বাসের সঙ্গে), মলমূত্র, গায়ের ঘাম প্রভৃতি সবই বার করে দেবার ব্যবস্থা করতে হবে।

সারা পৃথিবী জুড়ে একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ ব্যবস্থা চালু আছে, আমাদের নিঃশ্বাসের সঙ্গে নির্গত কার্বন ডাই-অকসাইড গাছ-পালা বা উদ্ভিদরা গ্রহণ করে, সূর্যালোকের সাহায্যে সংশ্লেষ করে তাকে আবার অক্সিজেনরূপে ফেরত দেয়। প্রক্রিয়াটির নাম সালোক-সংশ্লেষ বা ফটো-সিনথেসিস। একটু ভেবে দেখলেই হয় যে, পৃথিবী গ্রহের বাসিন্দা আমরা ৩৩০ কোটি মানুষ প্রতি ঘণ্টায় যে পরিমাণ অক্সিজেন প্রশ্বাসের সঙ্গে গ্রহণ ক'রে নিশ্বাসের দ্বারা কার্বন ডাই অকসাইডরূপে নির্গত করি, তাকে উদ্ভিদের সালোক-সংশ্লেষের সাহায্যে আবার অক্সিজেন রূপে ফেরত না পেলে, পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলে অক্সিজেন অল্প দিনের মধ্যেই শেষ হয়ে যেতো। প্রসঙ্গত, পৃথিবীর জন্মের সুদূর অতীতে (৪৫০ কোটি বছর অতীতে) বহু কোটি বছর অবধি তার বায়ুমণ্ডলে কোনো অক্সিজেন ছিল না, আমাদের আজকার শতকরা ২১ ভাগ অক্সিজেন প্রায় সবটাই এসেছে সালোক-সংশ্লেষের সাহায্যে।

তেমনি আমরা খাদ্য গ্রহণ করে তাকে আবার নাইট্রোজেনরূপে নিষ্কাশন করি, যে নাইট্রোজেন আবার পৃথিবীর জমিতে মিশে সারের কাজ করে খাদ্য উৎপাদনে সাহায্য করে। পৃথিবীর জলরাশি বাষ্প হয়ে আকাশে

উঠে আবার বৃষ্টির জলের আকারে নেমে আসে। এইভাবে যে অকসিজেন-কারবন ডাই-অকসাইড চক্র বা নাইট্রোজেন চক্র তৈয়ারী হয়েছে, তাকে আমরা বলে থাকি "বাস্তব্য চক্র" (ecological circuit) এক কথায়, আমরা সহজেই ভেবে নিতে পারি যে, বাস্তব্য-চক্র দিয়ে সৃষ্টি আমাদের গোটা পৃথিবীটাই (অবশ্যই আমরা তার মাটি, জল, বাতাস, সব কিছুই বোঝাচ্ছি) যেন একটি অতিকায় ব্যোমযান বা স্পেসসীপ, যার বাসিন্দা আমরা ৩৩০ কোটি মানুষ ও অন্যান্য প্রাণী মহাকাশে সততই ভ্রাম্যমান—সূর্য-প্রদক্ষিণ করছি, করতে করতে আমাদের তারা-জগত বা গ্যালাকসির অন্যান্য বহু কোটি নক্ষত্রের সঙ্গে বিরাট চাকার মতন (যার ব্যাস এক লক্ষ আলো-বর্ষ) পাক খাচ্ছি।

যাই হোক, পৃথিবী যেমন একটি অতিকায় ব্যোমযান, যেখানে নানা রকমের স্বয়ংসম্পূর্ণ বাস্তব্য-চক্র রয়েছে, তেমনি পৃথিবীর বাইরের মহাকাশে যখন আমাদের মনুষ্যনির্মিত ক্ষুদ্র ব্যোমযানগুলি চলাফেরা করবে বা ভেসে বেড়াবে, তখন তাদেরও যতোটা সম্ভব স্বয়ংসম্পূর্ণ বাস্তব্য-চক্র তৈরী করে দিতে হবে।

অবশ্যই প্রথম গাগারিন যখন মাত্র দুই ঘন্টার সামান্য কম সময় মহাকাশে কাটিয়ে ধরার বুকে ফিরে এসেছিলেন, তখন হয়তো তাঁর না খেলেও চলতো, মলমূত্র নিষ্কাশনের সুষ্ঠু ব্যবস্থাও হয়তো না করলেই চলতো, অকসিজেন প্রয়োজন মতো তাঁর 'ভোস্টক' মহাকাশযানে পুরে দিয়। কারবন ডাই-অকসাইডকে বার করে দেবার একটা সাধারণ ব্যবস্থা করা যেতে পারতো। কিন্তু গাগারিনের সময় থেকেই (১২ই এপ্রিল, ১৯৬১) বাস্তব্য-চক্রের দিকে কিছুটা নজর দেওয়া হয়েছিল। গাগারিনের পরেই আগষ্ট মাসে (১৯৬১) টিটভ কাটালেন ১৭ ঘন্টা, তারপর পরে পরে অনেকেই রাশিয়ান ও আমেরিকান, সপ্তাহাধিক এবং সম্প্রতি তিনজন সোভিয়েত মহাকাশচারী প্রায় এক মাস সময় কাটিয়েছেন। এই তিনজন অবশ্য মারা গেছেন, তবে বাস্তব্য-চক্রের কোনো গোলযোগে নয়।

এপোলো-১১, ১২, ১৪ ও ১৫-তে যে তিনজন করে আমেরিকান চাঁদে যাত্রা করেছিলেন, যার মধ্যে প্রত্যেকবারই দুজন করে চাঁদে নেমেছিলেন, তাঁরা মহাকাশযানে সময় কাটিয়েছেন মোটামুটি দশ দিন বা ২৪০ ঘন্টা করে। কিন্তু ভবিষ্যতে যেমন চাঁদে পৌঁছে, কিছুদিন বাস করার প্রয়োজন হতে পারে (এবং চাঁদে জল, অকসিজেন খাদ্য, প্রভৃতি কিছুই পাওয়া যাবে না) তেমনি গ্রহান্তরে যাত্রা করতে হলে, (যেমন মঙ্গলগ্রহ) যেতে আসতে এবং সেখানে থাকতে সময় লাগবে প্রায় আড়াই বছর। বা ৩৬৫×২৪×১½ =১৩,১৪০ ঘন্টা।

এখন, প্রতি ২৪ ঘন্টায় মাথাপিছু আমরা খাদ্য, পানীয় এবং অন্যান্য কাজে ৪ লিটার ওজনের মতন ব্যবহার করি, এবং অকসিজেন গ্রহণ করি প্রায় এক কিলোগ্রাম ওজনের। মূত্র হিসাবে জল নিষ্কাশিত হয় প্রতি ২৪ ঘন্টায় প্রায় এক লিটারের সামান্য বেশী এবং কারবন ডাই-অকসাইড সোয়া-এক কিলোগ্রাম ওজনের মতন। সমস্যা তাহলে দাঁড়াচ্ছে, প্রতি ২৪ ঘন্টায় এমন একটি বাস্তব্য-চক্র তৈরী করতে হবে, যাতে যতদূর সম্ভব স্বয়ংসম্পূর্ণ হওয়া যায়। বহু পরীক্ষা-নিরীক্ষা হয়েছে এবং হচ্ছে, যার কিছু কিছু আমরা এখানে পেশ করবো।

ক্লরেলা নামে এক ধরনের এলজি বা শ্যাওলার সন্ধান পাওয়া গেছে, যা কার্বন ডাই-অকসাইড গ্রহণ করে প্রায় চক্রবৃদ্ধি হারে অকসিজেনরূপে ফেরত দেয়। অবশ্য এর জন্য সূর্যালোক দরকার, কিন্তু মহাকাশে রয়েছে অফুরন্ত সূর্যালোক, সূর্যের কোনো উদয়াস্ত নেই। ক্লরেলার চাষ করার জন্য প্রয়োজন নাইট্রোজেনের, যেটা অবশ্য আমাদের শরীর থেকে নির্গত হবে। জলের প্রয়োজনটা ডিসটিল করার বা জলকে পরিশুদ্ধ করার প্রক্রিয়ার দ্বারা হতে পারে। উত্তাপের সমতা রক্ষা করার জন্য এমনিতে শীততাপ-নিয়ন্ত্রণ (air-conditioning) ব্যবস্থা থাকবে। অবশ্যই এ ধরনের অনেক কাজের জন্য প্রয়োজন বিদ্যুৎ-শক্তির, যেটা সূর্যালোক থেকে বৈদ্যুতিক ব্যাটারির সাহায্যে উৎপন্ন হচ্ছে। প্রসঙ্গত, চাঁদের বুকে সোভিয়েতের তৈরী যে স্বয়ংক্রিয় ক্যাটারপিলারের মতন ছোট যান চলাফেরা করেছিল, তারও চালনা-শক্তি ছিল সৌরশক্তি থেকে উৎপন্ন বিদ্যুৎশক্তি।

তারপর, অন্যতম প্রধান প্রশ্ন হচ্ছে পৃথিবী প্রদক্ষিণরত অবস্থায় বা সাধারণ ভাবে ব্যোমযানটি এবং তার অভ্যন্তরস্থিত সব বস্তুরই ওজন থাকবে না। কেন?

ওজনবিহীনতা

একটা অত্যন্ত ভ্রান্ত চালু ধারণা আছে যে, ব্যোমযানটি পৃথিবীর মহাকর্ষের আওতার বাইরে বলে, যেন মহাকর্ষ শূন্য স্থানে রয়েছে বলে তার ওজন থাকছে না। অসলে ইংরাজীতে 'ওজনবিহীনতা'কে বলা হয় 'Zero-g' কিন্তু তার মানে এই নয় যে, ব্যোমযান কোনো 'মহাকর্ষ-শূন্য' স্থানে গিয়ে পৌঁছেছে।

একটু ভাবলেই বোঝা যাবে যে, সূর্যের প্রচন্ড মহাকর্ষের আওতাতেই সকল গ্রহাদি ঘুরছে, অর্থাৎ পৃথিবীর মহাকর্ষের বাইরে পৌঁছলেও সূর্যের মহাকর্ষের অধীনে থাকতে হবে। আর ব্যোমযান যখন সমুদ্রতল থেকে মাত্র ১৫০।২০০ মাইল বা তদূর্ধ্বে পৃথিবী প্রদক্ষিণ করে, তখনও পৃথিবীর মহাকর্ষের পুরো প্রভাবেই সে রয়েছে। তাহলে ওজন থাকছে না কেন?

ওজনটা হচ্ছে, যে বল (ফোর্স) দিয়ে পৃথিবী আমাদের তার কেন্দ্রের দিকে আকর্ষণ করছে, তার বিরুদ্ধে যে প্রতিরোধী বল, সেইটে। এই প্রতিরোধী বল যদি বেড়ে যায়, তাহলে ওজন বৃদ্ধি হবে, আর কমে গেলে বা কোনো কারণে প্রতিরোধ করার প্রয়োজন না হলে, ওজন লোপাট পাবে। কি রকম?

মহাকাশযানের রকেট-মোটর যখন প্রথম অবস্থায় চালিয়ে পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণের বা মহাকর্ষের টানকে কাটাতে কাটাতে মহাকাশযানকে উপর আকাশে তোলা হচ্ছে, তখন মাধ্যাকর্ষণের টানকে ঠিক সমান সমান প্রতিরোধ করলে (এক-জি বলা হয়) মহাকাশযানটি উঠবেও না নামবেও না, দুই-জি বা ডবল জোরে প্রতিরোধ করলে মহাকাশযানটি উপর আকাশে উঠতে আরম্ভ করবে, ভেতরের আরোহীদের ওজন বেড়ে ডবল দাঁড়াবে, রকেট মোটর তিন-জি হলে (প্রতিরোধী বলের হিসাব) ওজন বেড়ে তিন গুণ হবে ইত্যাদি। আর তারপর রকেট-মোটরটি যখন বন্ধ করে দেওয়া হবে, অর্থাৎ পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণকে প্রতিরোধ যখন করা আর হবে না, ঠিক সেই মুহূর্ত থেকেই ওজন চলে যাবে। অবশ্যই রকেট মোটরটি বন্ধ করলেই মহাকাশযান কিছু তৎক্ষণাৎ পৃথিবীর জমির দিকে পড়ে যাবে না, জাড্যের টানে উপর-আকাশে উঠতেই থাকবে, কিন্তু ওজন থাকবে না।

তেমনি যদি উঁচু জায়গা থেকে অবাধে জমির দিকে পতন হয়, তাহলেও ওজন থাকে না, কারণ এক্ষেত্রেও আমরা মাধ্যাকর্ষণ প্রতিরোধ করছি না।

ওজনবিহীন অবস্থায় মানুষের দেহ তথা মন কিভাবে কাজ করবে এ নিয়ে পূর্বে বহু জল্পনা-কল্পনা ও খানিকটা আন্দাজ ছিল, এখন অনেক তথ্য পাওয়া গেছে।

মহাকাশে জল বা পানীয় গেলাস থেকে ঢেলে পান করার নিশ্চয়ই অসুবিধা হবে, সেজন্য ফিডিং বোতলের মতো চুষে বা পাইপ দিয়ে খেতে হবে। খাদ্য গ্রহণ করতে অসুবিধা হবে এই ভেবে গাগারিনের প্রথম মহাকাশযাত্রাতে তাঁকে টিউবে করে টুথপেস্টের মতো খাদ্য দেওয়া হয়: টিটভের ১৭ ঘন্টা ধরে পৃথিবী প্রদক্ষিণেও একই ব্যবস্থা ছিল। পরে অবশ্য অন্যদের সাধারণ খাদ্যদ্রব্যই দেওয়া হয়েছিল, অবশ্যই তাদের শরীরের প্রয়োজনানুসারে ক্যালরি মেপে খাবার দেওয়া হয়েছিল।

মহাকাশে বমির উদ্রেক হ'তে পারে বলে আশঙ্কা করা হয়েছিল। কার্যক্ষেত্রে তা অমূলক বলে প্রমাণিত হয়েছে। আসলে ওজনবিহীন অবস্থায় আমাদের কানের 'অটোলিথ' যন্ত্রগুলি (কানের পাথর বলা যেতে পারে) কাজ করবে না ঠিকই, অতএব উপর-নীচ জ্ঞান গোলমাল হয়ে যাবে এই রকম আশঙ্কা করা গিয়েছিল। তার প্রতি-'বেধক ব্যবস্থা করা সম্ভব হয়েছে।

মহাকাশে ভ্রাম্যমান অবস্থার দরুন নিঃসঙ্গতাবোধের যে ভয় ছিল, কার্যক্ষেত্রে পৃথিবীর গ্রাউণ্ড ষ্টেশনের সঙ্গে অবিরাম রেডিও যোগাযোগ এবং সঙ্গীতের সাহায্যে এটা দূর করা সম্ভব হয়েছে। পরীক্ষা করে একথা আজ জোর করেই বলা যায় যে, আমাদের দেহের স্নায়ুর (নার্ভের) উপর অত্যধিক চাপ পড়লে সঙ্গীতের চেয়ে ভালো আর কিছু ওষুধ নেই।

এক কথায় বলা যেতে পারে যে, মানুষের দেহযন্ত্র যদিও খুবই সূক্ষ্ম নিয়ন্ত্রণে বাঁধা, তথাপি তাকে বিভিন্ন এবং একেবারে ভিন্ন পরিবেশে (ওজনবিহীনতা, ইত্যাদি) খাপ খাইয়ে ধাতস্থ করে নেওয়া কিছু শক্ত নয়।

নতুন যুগের নতুন মানুষ নতুন পরিবেশে প্রকৃতিকে জয় করতে নতুন নতুন উপায় উদ্ভাবন করে চিরকাল এগিয়ে যাবে।

অঙ্গনা

সমাজসেবা : আর এক ভূমিকা

হাসপাতাল মানে ডাক্তার আর নার্স। এর বাইরে আর কিছু নেই। দীর্ঘদিনের সংস্কারে এরকম ভাবনায়ই আমরা অভ্যস্ত। কিন্তু কালের ভারে সংস্কারের পলেস্তারা জীর্ণ হয়ে পড়েছে। এখন সেখানে শুরু হয়েছে নতুন চুনকাম। সঙ্গে সঙ্গে আমাদের অভ্যাসও বদলাচ্ছে। একদিন হাসপাতাল সম্বন্ধে ভীষণভাবে ভীত ছিলাম আমরা। প্রাণ ধরে কাউকে সেখানে পাঠাতে পারতাম না। কি জানি যদি আর ফিরে না আসে।

এমনি ছিল হাসপাতাল-ভীতি আর সংস্কার। দিনে দিনে সব কিছুই বদল হচ্ছে। হাসপাতাল সম্বন্ধে এই সংস্কারও ফিকে হচ্ছে। এখন হাসপাতাল সম্বন্ধে অনেকেই আগ্রহী। সবাই বুঝতে শিখেছেন যে বাড়িতে রেখে রোগীর ঠিকমত পরিচর্যা সম্ভব নয়। সেখানে ডাক্তার-নার্সের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধান রোগীর নিরাময়ের প্রচন্ড সহায়ক। আর দিনে দিনে যা সব রোগ বেরুচ্ছে তাতে রোগীকে বাড়িতে ভরসা করে রাখতেও সাহস হয় না। ফলে অবস্থাটা দাঁড়িয়েছে এই যে, হাসপাতালে রোগী আর ধরছে না। বিশেষ ক্ষেত্রে রোগীকে অনেকদিন ওয়েটিং লিস্টে থাকতে হচ্ছে। অবস্থাটা ঠিক সেই রকম যখন কলকাতায় প্রথম ইংরেজী স্কুল চালু হলো তখন ছাত্র জুটতো না। ছাত্র জোগাড় করা ছিল এক সমস্যা। বাড়ি বাড়ি ঘুরে ছাত্র ধরে আনতে হতো। সেদিনের সংস্কার ছিল যে, ম্লেচ্ছ স্কুলে পড়লে ছেলে-পুলে উচ্ছন্নে যাবে। যখন দেখা গেল যে যারা উচ্ছন্নে যাবার তারা বাদে আর সবাই জীবনে মোটামুটি প্রতিষ্ঠা পেয়েছে তখন স্কুলে যাবার জন্যে হুড়োহুড়ি পড়ে গেল। আর এখন তো স্কুলে সীট পাওয়াই দুষ্কর। কোন কোন স্কুলে বছর দুয়েক ওয়েটিং লিস্টে থাকার পর হয়তো চান্স মেলে।

স্কুলের কথা আপাতত থাক। আবার হাসপাতালের কথায় আসা যাক। হাসপাতাল সম্বন্ধে আমাদের এই যে মনোভাব বদলে গেল এটা কিন্তু রাতারাতি সম্ভব হয়নি। বরং এখনো কেউ কেউ হাসপাতালের সংস্পর্শ এড়িয়ে চলতে পারলেই বাঁচেন। তবু হাসপাতাল সম্পর্কে পূর্বের সেই ভীতির মনোভাব কমছে। এর আসল কারণ অবশ্যই যে, হাসাতালে রোগীর সুষ্ঠু পরিচর্যা। এবং এই কৃতিত্ব পুরোপুরি পাওনা হচ্ছে ডাক্তার আর নার্সদের। এটা বাস্তব সত্য হলেও এই কৃতিত্বের এখন আরো কিছু অংশীদার এসে গেছে। আর হাসপাতালের পরিবেশকে ভীতিমুক্ত করতে এঁদের অবদান অনেকখানি। রোগী এবং ডাক্তারের মধ্যে এঁরা হলেন যোগসূত্রস্বরূপ। সরাসরি ডাক্তার-নার্সের সংস্পর্শে না এসে এমনিভাবে একজনের সাহায্য পাওয়া যায় যিনি ডাক্তার নন। এটা সাধারণ রোগীর পক্ষের অনেকখানি ভরসার। হাসপাতালের এই পরিবেশই এখন রোগীকে টানছে। আর একাজে যিনি সাহায্য করছেন তিনি হলেন সোসাল ওয়েলফেয়ার অরগানাইজার।

সোসাল ওয়েলফেয়ার অরগানাইজার। সাদা বাংলায় সমাজসেবী। সমাজ যেমন বিস্তৃত তার সেবার পরিধিও তেমনি। তাই সমাজসেবীর ডাক পড়েছে এবার হাস-পাতালে—ইমার্জেন্সী এবং আউটডোরে। রোগী প্রথমে আসবে এই সমাজসেবীর কাছে। তিনি রোগ এবং রোগী সম্বন্ধে সম্পূর্ণ তথ্য অবগত হয়ে একটি পূর্ণ বিবরণ তৈরী করবেন। তারপর তা পাঠাবেন ডাক্তারের কাছে। এবার শুরু হবে ডাক্তারের কাজ। ডাক্তার রোগীর চিকিৎসা করবেন। ওষুধপত্র দেবেন। কিন্তু ওষুধপত্র সম্বন্ধেও সমাজসেবীর দায়িত্ব আছে। রোগী যাতে ঠিকমত ওষুধপত্র ব্যবহার করে সেজন্য রোগীর সঙ্গে সবসময় তাঁকে নিবিড় যোগ-সূত্র বজায় রাখতে হয়। রোগী নিজের রোগ যতটা বোঝে এই সমাজসেবীকে তা আরো ভাল করে বুঝিয়েপড়িয়ে দিতে হয়। যাতে রোগী ভীত না হয়ে নিজের রোগের গুরুত্ব বুঝতে পারে এবং সমাজ ও নিজের জন্য ওষুধপত্র ঠিকমত খেয়ে রোগটা সারিয়ে নেয়।

এই কাজই করতে হয় শ্রীমতী চিত্রা রায়কে। নীলরতন সরকার হাসপাতালের ইমার্জেন্সীতে বসে তাঁকে এমনিভাবে সাহায্য করতে হয় রোগীকে। রোগী আসার সঙ্গে সঙ্গে তাঁকে কর্মতৎপর হয়ে উঠতে হয়। রোগীর বিশদ বিবরণ তিনি সংগ্রহ করেন। তারপর ডাক্তারের কাছে পাঠান। একে তো ইমার্জেন্সী। এখানে আর রোগীকে বেশিক্ষণ আটকে রাখা সম্ভব হয় না। সঙ্গে সঙ্গে তাকে রিমুভ করতে হয় টেবিলে। টেবিল থেকে প্রয়োজনবোধে বেডে। শ্রীমতী রায়কেও চলতে হয় রোগীর সঙ্গে সঙ্গে। সব তথ্য যে তাঁর জানা চাই। নাহলে যেমন তাঁর কাজ হবে না, তেমনি চিকিৎসারও ত্রুটি হতে পারে। আর রোগী সম্পর্কে সম্পূর্ণ জিনিষটা রেডিমেড হাতের কাছে পেলে ডাক্তারের সুবিধা অনেকখানি। পাক্কা ছ' ঘণ্টা ডিউটির মধ্যে তাঁকে এমনিভাবে ভীষণ ব্যস্ত থাকতে হয়।

শ্রীমতী রায় কিন্তু এতে একটুও ক্লান্ত নন। সমাজসেবার নেশা তাঁর রক্তে। সায়েন্স গ্রাজুয়েট হওয়ার পরই তিনি ভলান্টারি সোসালওয়ার্কার হিসেবে যোগদান করেন সোসাইটি ফর দি প্রোটেকশন অফ চিলড্রেন ইন ইন্ডিয়া নামক সুবিখ্যাত সংস্থায়। প্রায় ছ' বছর তিনি এর সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। এখানে তিনি হাতেকলমে সমাজসেবার পাঠ নেন। সঙ্গে সঙ্গে তাঁর আগ্রহ আরো বেড়ে যায়। পুরোদস্তুর সমাজসেবী হিসেবে নিজেকে গড়ে তোলার আকাঙ্ক্ষায় তিনি ভর্তি হন ইন্ডিয়ান ইনষ্টিটিউট অফ সোসাল ওয়েলফেয়ার অ্যান্ড বিসনেস ম্যানেজমেন্টে। এখানে ভর্তি হওয়া খুব একটা সহজ ব্যাপার নয়। সমাজসেবার তকমা থাকা সত্ত্বেও ইন্টারভিউ দিয়ে নিজের যোগ্যতা প্রমাণ করতে হয়। অবশ্যই সেদিক থেকে তাঁর কোন অসুবিধা হয়নি। তারপর দু' বছরের কোর্স।

অবশ্য এক বছরের কোর্সও আছে। কিন্তু তিনি সেদিকে গেলেন না। দু' বছরের সমাজসেবার লম্বা কোর্সই তাঁকে টানলো। আর সমাজসেবা করতে এসে এক বছরের জেনারেল সোসাল ওয়েলফেয়ারের তুলনায় দু' বছরের অ্যাডভান্স জেনারেল সোসাল ওয়েলফেয়ার-এর ডিপ্লোমা নিঃসন্দেহে বরণীয়। আবার দুটোই যখন পোস্ট গ্রাজু-য়েট ডিপ্লোমা। বলা বাহুল্য, দু' বছর বাদে তিনি অ্যাডভান্স কোর্সে সমাজসেবীর ডিপ্লোমা পেয়ে কৃতিত্বের সঙ্গে বেরিয়ে এলেন। তবে এ ব্যাপারে তিনি একটু দুঃখিত যে, এই ডিপ্লোমা যদিও পোস্ট গ্রাজুয়েট কিন্তু এতে বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বীকৃতি নেই। এতো খেটেখুটে যে ডিপ্লোমা পাওয়া গেল তাতে যেন একটু ফাঁক রয়ে গেল। এই ডিপ্লোমায় বিশ্ব-বিদ্যালয়ের অনুমোদন থাকলে সবদিক থেকেই সুবিধা হয়।

চিত্রা রায়

ডিপ্লোমা পাওয়ার পরই শ্রীমতী রায় চাকরি পেয়ে গেলেন। এবং এই চাকরি। সেদিন থেকে তিনি সমাজসেবায় উৎসর্গীকৃত প্রাণ। এরপর থেকে শ্রীমতী রায়ের জবানীতেই শোনা যাক সমাজসেবায় তাঁর এবং সগোত্রদের ভূমিকার কথা। 'রোগী আসার সঙ্গে সঙ্গেই আমার কাজ শুরু হয়ে যায়। খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে সব কথা জানতে হয় রোগীর কাছ থেকে। পুরো বিবরণ ডাক্তারকে পাঠাতে হয়। নীলরতন সরকার হাসপাতালে ইমার্জেন্সীতে আছেন আমার আর একজন সহকর্মী। সকাল আটটা থেকে সন্ধ্যে সাতটা পর্যন্ত দুজনে ভাগ করে ডিউটি দিই। ডিউটির সময় খুবেই ব্যস্ত থাকতে হয়। কিন্তু কোন সময়ই একটুও ক্লান্তি অনুভব করি না। রোগীর রোগ নিরাময়ে সাহায্য করে সমাজসেবায় যে মহৎ ভূমিকা পালন করা যায় এমনটি আর কোথাও সম্ভব কিনা জানি না।

কলকাতা এবং সব জেলা হাসপাতালেই এখন সোসাল ওয়েলফেয়ার অরগানাইজার আছেন। যাঁরা আউটডোরে কাজ করেন তাঁদের একদিক থেকে একটু সুবিধা হলেও আরেকদিক থেকে একটু বেশি খাটতে হয়। আউটডোরের কাজ শেষ হয়ে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে এঁদের কাজ শেষ হয়ে যায়। কিন্তু কিছু কিছু রোগীকে এঁরা হোম ভিজিট করেন। কথাটা শুনে চমকে উঠবেন না। হয়তো ভাবছেন যে, এঁরা ডাক্তার নয় অথচ রোগীকে হোম ভিজিট করে কি করে? গোড়াতেই বলেছি যে রোগ এবং রোগীকে আমাদের জানতে বুঝতে হয় চিকিৎসার সুব্যবস্থার জন্য। আর তাই এই হোম ভিজিট। রোগীর বাড়ীতে গিয়ে সামাজিক এবং আর্থিক অবস্থার একটা পূর্ণ বিবরণ আমরা ডাক্তারদের দিই। সেই সঙ্গে পারিপার্শ্বিকটা দেখার সুযোগ হয়। বুঝতেই তো পারেন, সব রোগীকে হাসপাতালে রেখে চিকিৎসা করা সম্ভব নয়। কিন্তু সেজন্য যাতে চিকিৎসার ত্রুটি না হয় তাই এই ব্যবস্থা। আবার কোন কোন রোগী একটু সুস্থ হলেই ওষুধপত্র খাওয়া বন্ধ করে বসে থাকে। হোম ভিজিটের আর একটা উদ্দেশ্য হলো যাতে রোগী এই অন্যায় সুযোগ নিতে না পারে।

ফটো : আর এন সিংহ

একটু মুশকিলে পড়তে হয় যখন সন্তানসম্ভবা কোন অবিবাহিতা মেয়ে হাসপাতালের শরণ নেয়। তখন আমাদের কাজও বেশ বেড়ে যায়। সব জেনেশুনে নিতে হয় মেয়েটির কাছ থেকে। সে কি আর সব কথা সহজে বলতে চায়। গল্প করে আর নানারকমভাবে ভুলিয়ে সব কথা তার কাছ থেকে আদায় করা হয়। এরপর চেষ্টা করা হয় সেই ছেলেটিকে ধরার। যাতে বিয়েটা হয়ে যায়। কাজটা যে খুব সহজ নয় সে তো বুঝতেই পারছেন। কিন্তু এই অসহজ কাজটাকে সহজ করার জন্য আমাদের খুব চেষ্টা করতে হয়। কোন কোন ক্ষেত্রে আমরা সফল হই। কিন্তু বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই নয়। তখন আমাদের ভাবনা বাচ্চাটার জন্যে। অনেক মা-ই বাচ্চা নিতে চায় না। সে বাচ্চার ব্যবস্থা করতে হয়। কোন অনাথ আশ্রমে তাকে পাঠানো হয়। এ ব্যাপারে ডাক্তাররাও সাহায্য করেন। তবু আমরা যে এত খাটাখাটনি করি ডাক্তাররা ঠিক যেন সেটা উপলব্ধি করতে পারেন না। কৃতিত্বের সিংহভাগটাই ওঁরা দাবী করে বসেন।

এতো গেল আমাদের হাসপাতালের কাজ। এবং হাসপাতাল সংক্রান্ত। এর বাইরেও আমাদের কাজ আছে। ফ্যামিলি প্ল্যানিংয়ে আমাদের ভূমিকা খুবই উল্লেখযোগ্য। সেখানে আর আমরা সোসাল ওয়েলফেয়ার অরগানাইজার নই। এক্সটেনসন এডুকেটর হিসাবে সেখানে আমরা পরিচিত। পরিকল্পনার সুফল এবং প্রয়োজনীয়তা সকলের কাছে আমরা বিশদ ব্যাখ্যা করি। তাদের সুবিধা-অসুবিধার কথা আমরা শুনি। সব শুনে সেরকম ব্যবস্থা নিই। এখানে বেশ কিছুটা স্বাধীনভাবে কাজ করার সুযোগ আমাদের আছে। তবে বিস্তর ঘোরাঘুরি করতে হয়। তবু সমাজসেবার বিস্তীর্ণ ক্ষেত্রে আমরা ছড়িয়ে আছি এতো কম আনন্দের কথা নয়।

হাসপাতালের আউটডোর-ইমার্জেন্সী এবং ফ্যামিলি প্ল্যানিংয়ে আমাদের সংখ্যা প্রায় বারশো। চাকরি আমাদের ভালই লাগে। কিন্তু একটা অসুবিধা কি জানেন, ছুটিছাটা একদম নেই। এমন কি ছুটির দিন কাজ করলে তার বদলে কোন ছুটি পর্যন্ত পাওয়া যায় না। ইমার্জেন্সীতে এই অসুবিধা আরো বেশি। তারপর ডাক্তারদের অবহেলা ভীষণ খারাপ লাগে। অবশ্য সবাই সমান নন। ব্যতিক্রম নিশ্চয়ই আছে। আর আমার স্বামীই তো ডাক্তার। তিনি কাউকে কোন দিন আণ্ডার এস্টিমেট করেন বলে শুনিনি।' এবার শ্রীমতী রায় ফিরে এলেন নিজের কথায়। চাকরি করি ঠিকই এবং চাকরিতে অনেক সময়ও যায়। কিন্তু দু বছরের মেয়ের জন্য সারাক্ষণ মন চঞ্চল থাকে। কাজ করতে করতে একটু অবসর পেলেই মেয়ের মুখটা মনে ছায়া ফেলে। ও যেন কাতর নয়নে আমার পথ চেয়ে বসে আছে। সঙ্গে সঙ্গে বাড়ি ফেরার জন্য মন অস্থির হয়ে যায়। আর একদণ্ড কাজ করতে ভালো লাগে না। রোগীর রেজিস্টার মুহূর্তের জন্য ঝাপসা দেখি। মেয়ে আর একটু বড় হয়ে গেলে এ ভাবনা শুধু আমার আর থাকবে না। এ ভাবনা শুধু আমার একারই নয়। সব চাকরিজীবী মায়েরই এক ভাবনা। চাকরি করতে এসে এ ভাবনা থেকে কোন মা-ই রেহাই পাবে না।

শ্রীমতী রায় নিজের কথা শেষ করলেন। ঠিক নিজের কথা নয়। ওঁদের সকলের কথা। কোন সময়ই তিনি নিজের জীবিকাকে শুধু একার মধ্যে আটকে রাখেন নি। সবাইকে সমান অংশ দিয়েছেন, পরিশেষে নিজেকে যুক্ত করেছেন চাকরিজীবী সব মায়েদের সঙ্গে। এবং বলেছেন, আমার তো তবু একটু সুবিধা আছে। কিন্তু আর সব মায়েদের তো সারাদিনই প্রায় বাচ্চাকে ছেড়ে থাকতে হয়। এ কি প্রচণ্ড পানিশমেন্ট বলুন তো?

সত্যিই তো এই ভাবনা থেকে চাকরিজীবী মায়েরা কবে রেহাই পাবেন?

—প্রমীলা

অবহমান কাল

অসীম রায়

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

দ্বিতীয় পর্ব

জল ফুঁসছে, জল ফুলছে, বাদামি জল আছড়াচ্ছে দুই পাড়ে, রৌদ্রকরোজ্জ্বল সকালে যেখানে জল আদিগন্ত রুপোলী ইলিশ, মাথায় ঘন মেঘের ছায়ায় তার থমথমে সমান্তরাল বিস্তার। স্টিমার যখন চলে তখন ইঞ্জিনের ধক-ধকিতে পাড়ের আওয়াজ কানে পৌঁছয় না, কিন্তু গঞ্জে পৌঁছনোর আগে যখন ইঞ্জিন বন্ধ করে ভাসিয়ে নিয়ে যাওয়া হয় তখন ঝুপ ঝুপ করে পাড় ভাঙ্গার শব্দ আসে। আর বাদামি জলে কমলালেবু রংয়ের পাল তুলে বড় বড় নৌকো আসে, বাতাসে পতপত করে মাস্তুলের জোড়া। স্টিমারে পাক খাওয়া ঢেউ নাচায় নৌকোগুলো, জলের ওপর কখনও কখনও সাদা পেট উলিমারা আবার কখনও অক্ষত রোদ-খোঁচা লাগা আকাশে গৈরিক পালগুলো ওঠে নামে।

'জলের একটা গন্ধ আছে, নারে?' দোতলার ডেকে রেলিংএর ওপর ঝুঁকে চোঙা বলে।

টুটুল অবাক হয়ে চেয়ে থাকে স্টীমারের বিশাল প্যাডেলের দিকে। কয়েক ফোঁটা জল ছিটিয়ে পড়ে তাদের মুখে চোখে।

'নানা যেন দুধ জ্বাল দিচ্ছে, হাওয়ায় করে দুধ উঠছে আর নামছে, উঠছে আর নামছে!' বুড়ী বললে।

'দ্যাখ, দ্যাখ, ডুবে গেল!' চোঙা চেঁচিয়ে উঠল। এপার ওপার দেখা যায় না নদীর মাঝখান দিয়ে ডিঙ্গি বাইছে দশ-বারো বছরের ছেলেটা স্টিমার কাছে আসতেই ঢেউয়ের উথালিপাথালিতে মনে হচ্ছে এই ডুবে গেল। বিশাল ঢেউয়ের নীচে ডিঙ্গি সমেত ছেলেটা এই অদৃশ্য হচ্ছে, এই ভেসে উঠছে চোখের সামনে। দোতলার ওপর থেকে স্পষ্ট দেখা যায় ছেলেটাকে। কালো ভেজা গা ঝলকাচ্ছে রোদ্দুরে, ঠিক যন্ত্রের মতো ক্ষিপ্র গতিতে বৈঠা উঠছে নামছে। কোন দিকে দৃষ্টি নেই, সামনের অতিকায় গর্জমান ঢেউয়ের ব্যাদন্তগুলো ভ্রূক্ষেপ না করে সে বৈঠা বেয়ে চলেছে। স্টিমার অনেক দূরে চলে গেলেও বিশাল জলরাশির ওপর কালো বিন্দুর মতো সে নড়ে।

এবার একটা গঞ্জ আসছে। ইঞ্জিন বন্ধ হতেই পাড় থেকে ঝুপ ঝুপ শব্দ বেশ স্পষ্ট। ভাসমান ফ্ল্যাটের প্রায় অর্ধেকটা জুড়ে পাটের গাঁইট, গুড়ের নাগরীর পাহাড়। সবুজ নীল চকরাবকরা লুঙ্গির উপর জালি-কাটা গেঞ্জী পরে দু-তিনটে লোক কাছি হাতে দাঁড়িয়ে, জাহাজ আসতেই কাছি ছুড়ে দিয়ে বাঁশের লম্বা পোল দিয়ে ফ্ল্যাটের পা ঠেকা দিয়ে দাঁড়ায়। ফ্ল্যাটের এক পাশে চুলকাটার সেলুন। সাদা বোর্ডের ওপর বড় বড় লাল হরফে লেখা : প্রফেসর রমণীমোহন কর্মকার। দুটো সরু লম্বা পাটাতন ফেলে দিতেই দুড়দাড় করে নীচতলার লোক ওঠে। ডগডগে লাল, সবুজ আর নীল শাড়ির প্রাধান্য বেশী। বেশীর ভাগেরই কাঁখে ছেলে, হাতে ছেলের হাত। সরু তক্তার ওপর দিয়ে দৌড়ে দৌড়ে পরস্পরের সঙ্গে চীৎকার করে গল্প করতে করতে সামনের লোককে ডাক দিতে দিতে তারা নীচ তলায় ওঠে। অনেকের হাতে লাউ। কয়েকটা ছেলে আখ চিবোতে চিবোতে স্টিমারে ওঠে। পাকা কলা আর গুড়ের চাপা গন্ধে সমস্ত গঞ্জ এলাকা ভুর ভুর করে।

এতক্ষণ পরম নিশ্চিন্তে যে লোকটা তার গলা প্রচুর সাবানের ফেনায় সাদা করে বসেছিল তার দাড়ি কাটা হয়। স্টিমারের ঘণ্টা দেয়। লোকটা চেয়ার থেকে আড়মোড়া ভাংতে ভাংতে, হঠাৎ দৌড় মারে। তারপর শূন্যে লাফ মেরে অপসৃয়মান পাটাতনে উঠে প্রচুর গালাগাল দিতে দিতে খেতে খেতে জাহাজে ওঠে।

'আমাদের জাহাজের নাম কি বলতো?' চোঙা জিজ্ঞেস করে ধাঁধার প্রশ্নের মতো।

রেলিংয়ের ওপরে একটু ঝুঁকে টুটুল পড়ে পাশ থেকে, 'কে-আই-ডবলিউ-আই।'

'পারলি না, কিউই, কিউই। মানে কি বলতো?'

'একটা পাখি, আমি দেখেছি, বাবার জুতোর কালির ঢাকনিতে। কিউই ব্ল্যাক কালি।'

'আমি চিড়িয়াখানায় দেখেছি।'

টুটুল যদিও বাবার জুতোর কালির ঢাকনায় পাখিটার ছবি দেখেছে কিন্তু সেই পাখির সঙ্গে এই সুন্দর ভাসমান অবলীলাক্রমে জল কেটে যাওয়া জাহাজটার সাদৃশ্য খুঁজে পায় না। বরঞ্চ 'সোয়ান' রাখলে পারত। 'সোয়ান' মানে রাজহাঁস, সম্প্রতি সে, জেনেছে। একটু পর আস্তে আস্তে বলে, 'আমার চূর্ণী নদীটাই ভাল ছিল।'

বুড়ী ও চোঙা সশব্দে হেসে ওঠে। 'চূর্ণী নদীতো একটা নালা রে' বুড়ী বললে।

বিশাল ঢেউ আর ফেনা সমুত্থিত প্যাডেল-স্টিমারের অগ্রভাগের দিকে স্থির দৃষ্টি রেখে টুটুল বলে, 'আমার ছোট নদীই ভাল লাগে।' বলার সঙ্গে সঙ্গেই স্টিমার ভোঁ দেয়। আর আদিগন্ত বিস্তৃত নদীর মাঝখানে সেই গম্ভীর আওয়াজ প্রতিধ্বনি তোলে তার ছোট্ট হৃদয়ে। এ আর এক জগত, জলের জগত, মাঝ নদীতে ডিঙ্গি বাওয়া শক্তির জগত, গঞ্জে গঞ্জে প্রাণচাঞ্চল্যের জগত, নৌকোর হালে সাদা-দাড়ি মাল্লার স্থির দৃষ্টিতে দাঁড়িয়ে থাকার জগত—এ জগত রাণাঘাটের ছোট্ট ছায়ায় ঘেরা এস ডি ও কোয়ার্টারের দ্বীপ থেকে আলাদা। টুটুল বুক ভরে বাতাসে জলের গন্ধের সঙ্গে এই নবীন জগতের আঘ্রাণ নেয়। নিজের মনেই বলে, 'এত জল, আমার ভয় করে।'

'তোর ভয় করে, আমার ভাল লাগে। আমার বিপদ ভাল লাগে।' চোঙা বললে।

এবার যে গঞ্জটা আসছে তা আগের চেয়েও বড়। কাদায় বাঁশপোতা ভিতের ওপর নদীর দিকে পেছন করে সার সার টিনের ঘর। তাদের একটায় মস্ত বড় করে সাইন বোর্ড 'গ্রান্ড হোটেল।' কাছেই ফ্ল্যাট, তার গায়েই আর এক হোটেল। মাংসের ঝোলের গন্ধ মিশে থাকে নদীর তীরে পলিমাটির গন্ধে।

ডেক চেয়ারে বসে আছেন কমলনাথ। চাঁদিতে টাক কিছুদিন হল বিস্তার লাভ করেছে, কিন্তু কানের পাশ দিয়ে কোঁকড়া চুলের গুচ্ছ হাওয়ায় দোলে। এতক্ষণ রৌদ্র-ঝলকিত নদীবক্ষে গুনগুন করছিলেন। গোপাল মাস্টার সম্প্রতি তাঁর বেহালায় শ্যামাসঙ্গীতের অব্যবহিত পরেই যে রবীন্দ্রসঙ্গীত তুলছিলেন গৌরীর জন্যে

সেই গানটাঃ অয়ি ভুবন মনমোহিনী; অয়ি নির্মল সূর্যকরোজ্জ্বল ধরণী......রবীন্দ্রনাথের কবিতা তাঁর ভাল লাগে না। কিন্তু কোন কোন গানের ভাষায় যদি যুক্তাক্ষর সন্ধি সমাসের বাহুল্য থাকে তবে সে গানগুলো তাঁর কাছে উৎকৃষ্ট ঠেকে। স্বর্ণসুন্দরী পাশে বসে চোঙার পুল-ওভার বোনেন। একবার স্বামীর প্রশান্ত মুখের দিকে চেয়ে বলেন, 'প্রতাপটার চিঠি পেতে এবার এত দেরী হচ্ছে, কেন বল তো। তুমি গিয়েই টেলিগ্রাম করে দাও। আবার ঠান্ডাটান্ডা বেশী লাগলে...

ভবনাথ সেদিকে কান দেন না। বলেন, 'ভোলার কথা মনে আছে?'

'কোন কথা?'

'সেই রাতগুলোর কথা? হিন্দু-মুসলমান দাঙ্গার কথা। উঃ কি মুস্কিলেই ফেলেছিল। সতীন সেনের দল খঞ্জনী বাজিয়ে যাবেই সেই রাস্তা দিয়ে, আর ওদিকে সর্ডাক আর লাঠির একেবারে জঙ্গল। মিউজিক বিফোর মস্ক! উঃ কি সব দিন গিয়েছে।'

'সেইরকম দেশেই তো আবার যাচ্ছো।'

'তা যাচ্ছি।' ভবনাথ বলেন লোকজনে টৈপুরে টুপুরে জেটিটার দিকে চেয়ে চেয়ে। পাশেই দুটো মস্ত গহনা নৌকায় গাদি করে লোক উঠছে। জানলা দিয়ে বোধহয় নববিবাহিত এক কিশোরী তাকিয়ে আছে জলের দিকে। 'গ্রান্ড হোটেল' থেকে লোকে বেরোচ্ছে পান চিবুতে চিবুতে, কোঁচার খুঁটে মুখ মুছছে কেউ।

স্বর্ণসুন্দরী হঠাৎ চোখ তুলে বললেন, 'এই যে সব কাগজে কাগজে লিখছে, ছেলেরা জেল খাটছে। ......তুমি ভাবতে পারো, ইংরেজরা নেই আমাদের দেশে? আমি ভাবতে পারি না।'

'আমিও পারি না স্বর্ণ। আমাদের মধ্যে একরকম দল, এত মত। ইংরেজ চলে গেলে আমাদের কি অবস্থা হবে জানো? ইংরেজদের আসার আগে অযোধ্যার রাজা যেমন দেশ শাসন করত ঠিক তেমনি। নিজেদের মধ্যে মারামারি, কাটাকাটি, অরাজকতা, এই হিন্দু-মুসলমান নিয়েই দেখবে কি ব্যাপার হয়ে যাবে।'

অদূরে সাদা কালো স্টীমার খানা গল গল করে ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে আসছে। সেদিকে চেয়ে দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে স্বর্ণসুন্দরী বলেন, 'আমরা তো বলতে গেলে পার করে দিলাম আমাদের জীবন। ভাবছি ছেলেমেয়েদের কথা। তাদের সময়ে পাল্টে যাবে অনেক কিছু। বলাই বলত......

'ও বাবা! তুমি এখনও বলাইকে ভুলতে পারো নি।'

'নাঃ বলাইটা বেশ ছিল।'

'বলাই বলত, মা গাঁয়ের লোকে ইংরেজও বোঝে না, কংগ্রেসও বোঝে না, তারা দুবেলা পেট ভরে খেতে চায়।'

ভবনাথ উৎসাহিত হয়ে বললেন, 'আমিও তাই বলি স্বর্ণ, আমিও তাই বলি। গাঁয়ে রাস্তা নেই, স্কুল নেই, শহরে চাকরীর ব্যবস্থা নেই, তার আগে একটা হিল্লে করো। বড়দা আমাকে খোঁটা দিতেন ইংরেজের গোলাম বলে, কিন্তু গোলাম না হয়ে যদি পাবনা বাড়ি পড়ে থাকতাম, তাহলে কি এমন দেশের উপকারটা করতাম। যেখানেই গিয়েছি মেয়েদের স্কুল বসিয়েছি, রাস্তা বানিয়েছি, দু-চারটে লোকের চাকরীর ব্যবস্থা করেছি। আর ইংরেজ লোকগুলো তো খারাপ না। এই ব্র্যান্ডি বলো, ফকাস বলো, চমৎকার এডমিনিস্ট্রেটার। কোন ব্যাপারে মাথা গরম করে না। সব ব্যাপার বুঝতে চেষ্টা করে। ওদের কাছ থেকে আমাদের অনেক শেখার আছে।'

'আমার বাবা একটু ভয় ভয় করছে, তোমার এ নতুন জায়গা। যেরকম সব শুনছি টেররিস্টদের ব্যাপার।'

আমার তো আইন আছে স্বর্ণ। আমি আইনমাফিক চলব। আমার কাউকে ভয় নেই।'

মা, ইলিশ মাছ! ইলিশ মাছ। চোঙা দৌড়তে দৌড়তে আসে। স্বর্ণসুন্দরী নীচের দিকে চেয়ে দেখলেন, আর একটা নৌকা আসছে। কয়েকটা পানসী এগিয়ে আসছে মন্থরগতিতে।

স্বর্ণসুন্দরী উঠে আসেন ক্যাবিনে। ক্যাবিনের ভেতর স্টোভ ফোঁস ফোঁস করছে। এক কোণে লুচি বেলছে গোপীনাথ। কিছুক্ষণ পর বড় বড় চাকা চাকা করে বেগুন ভাজা আর একথালা ভর্তি লুচি নিয়ে আসে গোপীনাথ। জলের হাওয়ায় প্রচণ্ড খিদে পেয়ে গেছে ছেলেমেয়েদের। প্রায় কাড়াকাড়ি করে ছেলেমেয়েরা খায়। আর সেদিকে চেয়ে চেয়ে স্নেহে ও প্রশান্তিতে ভবনাথ আনমনা হয়ে পড়েন। বন্দেমাতরম টেররিস্ট, ইংরেজ, চাকরীর জগতে উচ্চাশা তার মন থেকে সরে যায়। জন্তুর মতো বড়ো বড়ো মায়াবী দৃষ্টি দিয়ে তিনি চেয়ে থাকেন। বুঝতে পারেন তিনি ঈশান চৌধুরী নন, নতুন নতুন দিকে কর্মৈষণায় উদ্যোগী পুরুষ নন, তিনি একজন শান্তিপ্রিয় আত্মমুখীন মানুষ। বাইরের জগতের উত্থান পতন আলোড়ন তাঁকে স্পর্শ করে কিন্তু তাকে প্রচণ্ডভাবে আলোড়িত করে না। ইংরেজের চাকরী তাই কোনদিন তাঁর পক্ষে ঠিক একটা মিশান নয়। আর মিশান নয় বলেই যে ঝপাঝপ উন্নতি তাঁদের বয়সী অফিসারদের ঘটে তা তাঁর ক্ষেত্রে ঘটেনি। ব্র্যান্ডি ফকাস সত্যিই ভাল এডমিনিস্ট্রেটার, তাঁরা বাজে ঘোড়া ধরেন না। ইংরেজের চাকরী যাঁদের কাছে মিশান না, যাঁরা আইনের বইয়ের বাঁধা রাস্তায় যতটুকু বলা আছে ততটুকুই করবেন, অথবা আরও পরিষ্কার করে বলতে পারা যায় যতটুকু না করলে নয় ততটুকুই করবেন এরকম লোক তাঁরা পছন্দ করেন না। তাঁরা নিজেরাই রুটিন বেঁধে দিয়েছেন, কিন্তু রুটিনের চৌহদ্দীতে কাজ সীমাবদ্ধ থাকলে মুস্কিল, আরও কিছু উপরি আছে, ক্লাব আছে, মেলামেশা করার ব্যাপার আছে, ভারতবর্ষে ইংরেজদের ভবিষ্যৎ নিয়ে ভাবিত হবার ব্যাপার আছে এ সবের মধ্যে যারা নেই সে সব অফিসার কখনই আদর্শ অফিসার নন।

খাওয়া পর্ব মিটলে স্বর্ণসুন্দরী ধীরে ধীরে বললেন, 'তোমার এই সাতে নেই পাঁচে নেই ভাবখানা আমি বুঝি না একদম। বাবা বলতেন, কাজ করতে গেলে ঝাঁপিয়ে পড়তে হয়, সব সময় তাই নিয়ে ভাবতে হয়। শুধু ছাড়াছাড়াভাবে থাকলে চলে না।'

ভবনাথ হাসেন। 'তুমি যে কি বল স্বর্ণ। এমন জবরদস্ত চাকরি করছি, লোককে জেলে পাঠাচ্ছি, কলকাতায় বাড়ি বানাচ্ছি, ছেলেকে বিলেত পাঠাচ্ছি, তবু তুমি বলবে ছাড়াছাড়াভাবে থাকি।'

আর ভবনাথের সেই শান্ত চোখভরা কোমল দৃষ্টির দিকে চেয়ে চেয়ে পাবনা বাড়ির বৈঠকখানার দেয়ালে ভবনাথের প্রপিতামহ রুদ্রনাথের ছবিখানা ভেসে ওঠে স্বর্ণর মনে। এমনি শান্ত কোমল মায়াবী চাহনি। এর ঠিক উল্টো ঈশান চৌধুরীর চোখ দুটো, তীক্ষ্ণ তীর, সব কিছু খুঁটিয়ে বিচার করে দেখবার চাহনি। তাঁর নিজের বাপের চোখও ছিল বেশ আয়ত ভাবগম্ভীর কিন্তু তা ভবনাথের মতন কোমল মায়াবী নয়। বেশ আত্মবিশ্বাসের ছায়া ছিল সে দৃষ্টিতে।

'এটা কি নদী?'

'ধলেশ্বরী।'

'সেই একইরকম তো দেখতে।'

'একই রকম।'

ভবনাথ ও স্বর্ণ দুজনেই সেই নিস্তরঙ্গ বাদামি জলে রোদ্দুরের খেলা দেখতে থাকে। নদীর হাওয়ায় দুজনেরই মুখচোখ বেশ সতেজ।

'আর দুবছর পর থেকেই আমার বৃহস্পতি খুব তুঙ্গী, বুঝলে স্বর্ণ।'

'ওসব আমি বুঝি না। সাহেবদের সঙ্গে দহরম-মহরম করবে না! জগৎ কি হেঁটে হেঁটে তোমার দোর গোড়ায় আসবে?'

'প্রতাপটা ফার্স্ট চান্সে বোধ হয় পারবে না। কিন্তু সেকেন্ড চান্সে যদি পারে, তাহলে মার দিয়া।' শিশুর মত ঝলমল করে ভবনাথের মুখখানা।

'তোমার নিজের জামাকাপড়গুলো একটু ভাল করো। একটা ভাল স্যুট নেই তোমার। সেই কবে গোলাম মহম্মদ থেকে একটা সার্জের স্যুট করিয়েছিলে। সুতো সরে গেছে, কেটে গেছে।'

'চেনা বামুনের পৈতে লাগে না।'

'ওসব কথা আমায় বোল না। ওরকম গেঁয়ো কথা ভাব বলেই এই দুর্দশা।' স্বর্ণসুন্দরীর গলায় ঝাঁঝ।

ছেলেমেয়েরা এতক্ষণ ক্যাবিনের সামনেই ডেকের এককোনে চাক বেঁধে আছে গোপীনাথের চারধারে।

'এররম জল তুমি কখনো দেখেছো নানা?' টুটুল প্রশ্ন করে।

'এরকম জল পারা কত দেখেছি তোমার জন্মস্থানে। এত ঢেউ, বাবুর বুকে হাঁফ ধরিয়ে গেল।'

'নানা সব দেখেছে, নানা সব দেখেছে। তুমি হিমালয় পাহাড়ে উঠেছো? বল উঠেছি!' চোংগা বললে।

'দার্জিলিং-এ হিমালয় পাহাড় নেই? কত বরফ পাহাড়ের মাথায়!'

'তুমি বিলেত গিয়েছো নানা, বিলেত?' চোংগা মুখ ভেঙ্গায়।

'এই যাঃ।' বলে টুটুল তাকে ধাক্কা দিয়ে সরাবার চেষ্টা করতেই কুরুক্ষেত্র বাধে। দুজনে জড়াজড়ি করে ডেকে গড়াতে থাকে। চোংগা টুটুলের চুল পড়পড় করে টানতে থাকে। থামাবার বৃথা চেষ্টায় ক্ষান্তি দিয়ে বুড়ী দৌড়য় মায়ের সন্ধানে। কিন্তু স্বর্ণসুন্দরী যখন এলেন তখন ব্যাপারটা মিটে গেছে। দুজনেই সামনের রেলিঙে ঝুঁকে পড়ে উল্লসিত হয়ে চেঁচিয়ে ওঠে, 'নারায়ণগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ।'

এবার অনেক লোক নামে, অনেক লোক ওঠে। লোকজনের ওঠানামায় তাড়া নেই। জাহাজ বেশ খানিকক্ষণ থাকে। গুড়ের নাগরীতে ঢাকা কয়েকটা নৌকো জাহাজের গায়ে এসে লাগে। ঝাঁকাভর্তি লাউ-শশা কুমড়ো নামে জাহাজ থেকে। ধুতি লুঙ্গি পাঞ্জাবী গেঞ্জি, হাফশার্ট, খালি গা কম। কুচিৎ প্যান্টপরা একটা দুটো লোক, শোলার টুপি মাথায় একটা সাহেবও দেখা গেল। দুতিনটে সম্পন্ন হিন্দু পরিবার উঠলেন জাহাজে। চওড়া লাল পেড়ে সাদা শাড়ি কপালে গোল সিঁদুরের টিপ, কারুর হাতে পানের বাটা। এক ভদ্রলোকের পাঞ্জাবীর হাতায় জাঁকাল গোড়ের মালা।

'কিসের জন্যে নারায়ণগঞ্জ বিখ্যাত বলতো?' বুড়ী হঠাৎ প্রশ্ন করে প্রশ্ন করলে।

দু ভাইকেই বিব্রত দেখায়, বিশেষ করে চোংগাকে।

বুড়ী উল্লাসে চেঁচিয়ে ওঠে, 'ঢাকেশ্বরী কটন মিল।'

'মুন্সীগঞ্জ বলতো কিসের জন্যে বিখ্যাত?'

'মুন্সীগঞ্জ মুন্সীগঞ্জ? পাটের জন্য' বুড়ীর গলায় মরিয়া ভাব।

হিঁ করে একটা বুড়ীর গালে চড় কষিয়ে চোঙা চেঁচায় 'পারলি না, পারলি না।'

বুড়ীর চোখ ফেটে জল আসে। কিন্তু সে চেপে ধরে, 'বল, বল, তুই বল।'

এক মুহূর্ত বিপন্ন দেখায় টুটুলকে। তারপর তার দিদিকে রেলিং এর দিকে ধাক্কা দিয়ে বললে, 'এই জন্যে!' বলেই সে দোতলার ডেক দিয়ে পড়ি কি মরি করে দৌড়য়।

সামনেই সিঁড়ি, তার পাশে একদল বৌ ছোট ছেলে মেয়ে। ডেকের পেছন দিকে এক বৃদ্ধ নামাজ পড়ছে। চোঙা থমকে দাঁড়ায়। তারপর তড়বড় করে সিঁড়ি বেয়ে ওঠে। ওপরের দিকে চার পাশটা খোলা, আরও হাওয়া, চোঙার মুখে কানে হাওয়া ঝাপটায়। দুপাশে খালি রেলিং তারপর স্টিমারের দীর্ঘ ছাতে দৃষ্টি আবদ্ধ হয়ে যায়। সিঁড়ির মুখে কাঁচ দিয়ে ঢাকা একটা ঘর। হুইলে বসে, সাদা ধবধবে দাড়িওয়ালা একটা লোক, পরনে পাটভাংগা বেগনে লুঙ্গি।

বুড়ো কোনদিকে তাকায় না। ফুরফুরে হাওয়ায় তার দাড়ি সামনের দিকে ওড়ায় আরও ছুঁচলো দৃঢ়প্রতিজ্ঞ দেখায় তার মুখ। সামনে খোলা কাচের জানলা দিয়ে আরও প্রসারিত লাগে নদীর বুক:

'এবার আমরা কোথায় আসছি?'

'মুন্সীগঞ্জ।'

একবার পেছনে তাকাতেই চোঙার মেজাজ খারাপ হয়। বুড়ী ও টুটুলও ওপরে উঠে এসেছে।

এবার সারেঙ আঙ্গুল দিয়ে সামনের দিকে দেখায়। দিগন্তবিস্তীর্ণ পাটক্ষেতের মাঝখানে ছোট্ট একটা ফ্ল্যাট জলে ভাসছে। তিনজনই উদগ্রীব হয়ে সামনের দিকে চেয়ে থাকে। এই বিস্তীর্ণ বাদামি জলের গায়ে আকাশ পর্যন্ত ঘন সবুজের মাঝখানে, তাদের জীবনযাত্রা আবার কিভাবে শুরু হবে ভেবে তারা অবাক হয়। সিঁড়ির নীচ থেকে গোপীনাথের হাঁক আসে। তারা উৎসাহে নামতে থাকে। মালপত্তর ইতি-মধ্যেই নীচে নামানো হয়েছে। মুন্সীগঞ্জ মানে সেই ভাসন্ত ফ্ল্যাটখানা ক্রমশঃ এগিয়ে আসতে থাকে। চোঙা আর সহ্য না করতে পেরে কট করে একটা চিমটি দিল বুড়ীকে। আবার একটা গোলমাল পাকাচ্ছিল কিন্তু ইতিমধ্যে জাহাজ ভোঁ দিতে সুরু করেছে। নদীর মাঝখান থেকে অর্ধবৃত্তাকারে পাক নিতে থাকে জাহাজখানা। জেটিতে পাটাতন

লাগাবার সঙ্গে সঙ্গে একজন ছিপছিপে দাড়িওয়ালা লোক এক লাফে জাহাজে ওঠে। বেঁটে রোগা শক্ত চেহারার ওপর তার নীল উর্দিটা একটু বেমানান রকম বড় কিন্তু তার কাঁচা পাকা দাড়ি ভর্তি মুখ হাসিতে আধবোজা তীক্ষ্ন চোখ, আর মাথায় পাগড়ির ওপর সদ্য পালিশ করা ইংরেজ রাজার তকমা—সবটা মিলিয়ে জাঁকাল চেহারা।

ভবনাথকে সেলাম করে স্বর্ণসুন্দরীর দিকে তার হাসিভরা মুখখানা তুলে বললে, 'আমার নাম সায়েদ।' তারপর সায়েদ আর্দালি টুটুলের হাতখানা ধরে। টুটুল অবাক হয়ে শোনে, বাজখাঁই গলায় সায়েদের চীৎকার, 'খবর্দার, হট যাও, হট যাও।' যাত্রীরা সবাই অপেক্ষা করে। ভবনাথ, স্বর্ণসুন্দরী ছেলেমেয়েরা, কুলির মাথায় মাল এবং সবার শেষে সায়েদ তক্তাপার হয়ে জেটিতে নেমে জেটি ছাড়ার পর যাত্রীরা একে একে নামে। উঁচু বাঁধের ওপর পায়ে চলার রাস্তা। মস্ত এক বাদাম গাছের চেটাল পাতাগুলো যেন এইমাত্র কেউ গলা তামায় চুবিয়ে তুলেছে। তার নীচেই খালে অপেক্ষমাণ নৌকো। সমস্ত ব্যাপারটাই আশ্চর্য লাগে ছেলেমেয়েদের। টুটুলকে হঠাৎ আঙুল দেখিয়ে ফিসফিস করে কি বললে চোত্তা। বোধহয় নৌকোর পেছনে খাটো ত্রিপলে ঘেরা পায়খানার ব্যবস্থাও তাদের অবাক করে।

নীল উর্দিপরা সায়েদ নৌকোর গলুইয়ে দাঁড়িয়ে থাকে ঠিক পতাকার মতো। খালের জল থেকে মৃদু কলকল আওয়াজ আসে, টুটুল হাত জলে ডুবিয়ে খানিকটা শেওলা দাম তুলে আবার ছুঁড়ে ফেলে দেয়। দুপাশে পড়ন্ত বাঁশ ঝোপ, জলের ওপর শুকনো পাতা একরাশ ছড়িয়ে আছে নুয়েপড়া কাঁঠাল। এক এক জায়গায় খালের দুপাশ দিয়ে নেয়ানো গাছ, বাঁশ ঝাড় নৌকোর ঠিক মাথার ওপর এসে পড়ে! দেখতে দেখতে খাল চওড়া হয়। এক জায়গায় আর একটা খালের সংযোগে নদীর মতো দেখায়।

জলে আরও বড় বড় ঢেউ দেয়। সায়েদ জানিয়ে দেয়, এ জায়গার নাম কাটাখালি। নদীর সঙ্গে সরাসরি যোগ। বড় একটা নৌকো থেকে পালের মতো চেটাল জাল একবার জলে ডোবে, আবার ওঠে। যতবার ওপরে ওঠে চাঁদা, পুঁটি, আর রুপোলী ছোট ছোট মাছ ঝকমক করে রোদে। এবার বাঁক নেয় নৌকো। গাছের মাথার ওপর দিয়ে দেখা যায়, তাদের গন্তব্য স্থল। সায়েদ তার সরু লম্বা আঙুল তুলে দেখায় খাপরায় ছাওয়া সাদা ধপধপে একতলা বাড়ি। টুটুল চোত্তা বুড়ী আগে থেকেই ইব্রাকপুর ফোর্টের নাম শুনেছিল। একটা অদ্ভুত কেল্লা, যার সামনে দুটো কালো কামান মুখ উঁচিয়ে আছে এরকম কল্পনা তাদের তিনজনেরই মাথায় চেপে বসেছিল। কিন্তু কাছে আসতে সেরকম ভয়ঙ্কর কিছু মনে হোল না। তবে চারপাশের উঁচু পুরু পাঁচিলের গায়ে গায়ে কামান দাগবার জন্যে বড় বড় ফোকরগুলো দেখে তাদের বিস্ময় জাগে। কোয়ার্টারের ঠিক নীচেই পুকুর, তার আগে সারি সারি কামিনী জবা আর ফলন্ত ঝুমকো লতার গাছ। মগেদের হাত থেকে বাঁচবার জন্যে তিন-চারশো বছর আগেকার এই কেল্লা মানে এখন মাটি ভর্তি তেতলা সমান উঁচু গোলাকার পুরু ইঁটের পাঁচিলের ওপর বিশাল বাঁধানো চত্বর, আর তার ওপর একতলা খাপরায় ছাওয়া সাদা ধবধবে এস ডি ও কোয়ার্টার। ছেলেদের সবচেয়ে ভাল লাগে ওপরে ওঠবার বিস্তৃত সিঁড়ি, যেন বিশাল ঘাটের সিঁড়ি নেমেছে অনেক উঁচু থেকে। ছেলেরা রেস দেয়। বুড়ীর এসব ছেলেমানুষী ভাল লাগে না। অল্প অল্প হাওয়ায় কাঁপা উঁচু সুপুরিগাছগুলোর দিকে এক দৃষ্টিতে চেয়ে থাকে। কিছুক্ষণের মধ্যেই স্টোভের শব্দ শোনা যায়। গরম দুধ উথলায়। মালভর্তি আর একখানা নৌকোও ঘাটে এসে লাগে। একটু পরে মাল উঠতে থাকে। চারপাশে খাট আলমারী বেডিং ট্রাঙ্ক। নীচের জেলখানা থেকে ওয়ার্ডাররা ওপরে নিয়ে জমা করতে থাকে একটার পর একটা মাল। গোপীনাথকে লাগে মেজর জেনারেলের মতো। এইসব গুরুত্বপূর্ণ সময় তার হাঁকডাক শোনা যায়। এখানে রান্নাবাড়িটা খুব কাছে কিন্তু একেবারে স্বতন্ত্র। সামনে দালানে খুব হাওয়া খেলে। বড় বড় গেলাসে ভর্তি দুধ নিয়ে গোপীনাথ ঘোরে। রুপোর গেলাসে দুধ চুমুক দিতে দিতে ভবনাথ বলেন, 'মারভেলাস!' টাকায় বারো সের বলে বোধ হয় আরও সুস্বাদু লাগে।

॥২॥

মাস তিনেক পর মর্নিং স্কুল সেরে টুটুল দৌড়ে দৌড়ে বাড়ি ফিরছে। দু' চোখে জল ঝরছে আর সেই জল মুছবার চেষ্টায় হাতের কালি মুখে লেবড়ে একাকার। স্কুলের প্রায় গায়েই বিশাল জলের আয়তক্ষেত্র যেখানে সে আর দাদা পুঁটি মাছ ধরবার ব্যর্থ চেষ্টা করেছে ইতিমধ্যেই। বাড়ির ফটকের সামনেই হাওয়ায় দোলা বিশাল তিন-চারটে শিরিষ, তার একটার নিচে কয়েক দিন আগে চোখফেরানো অনির্বচনীয় শোভায় ঝলমল চারটে বাদামি সাদা কুকুরের বাচ্চার খেলা, জলের ধারে শ্যাওলা দামের ওপর কখনও স্পন্দিত কখনও স্থির নীলচে লম্বাটে দুটো ফড়িং প্রকাণ্ড চওড়া ফাটা পুরনো ফটকের গায়ে স্পর্ধিত পঞ্চজবার ছড়া, তাদের বাড়ির নীচেই টলটলে জলেভরা ঘাট বাঁধানো পুকুর, সিঁড়িতে রিভলভার খুলে সাফ করতে ব্যস্ত ভবনাথের দুই বডিগার্ড, প্রাণপ্রসাদ আর রামস্বরূপ, ওপরে চাতালের কোণে রোদ্দুরে আচারের বয়াম—এগুলোর কোনটাই তার দৃষ্টি আকর্ষণ করে না।

ওপরেই তাদের পড়ার ঘরের সামনে গৃহশিক্ষক মধুবাবু দাঁড়িয়ে। দুই ছেলেকে ও মেয়েকে পড়ানোর বেতন দশ টাকার নোটখানা নীল শার্টের বুকপকেটে গুঁজতে গুঁজতে শীর্ণ বৃদ্ধ ভদ্রলোকটি থমকে দাঁড়ান।

'কি হল? পরীক্ষা কেমন হল?'

টুটুল ফোঁপাতে ফোঁপাতে বলে, 'আমি স্যার রাইনোসেরাস...স্যার... পারিনি।'

'কি বানান লিখেছো?'

'আর এইচ আই এন ও সি ই আর ও ইউ এস' এতক্ষণ মন্ত্রের মতো যে অক্ষরগুলো জপ করতে করতে আসছিল সেগুলো টুটুল উগরে দেয়।

মধুবাবু বিরক্ত হয়ে বললেন, 'কেন ঠিকই তো আছে।' বিরক্ত হলেই শীর্ণ মুখখানা আরও ছুঁচোলো দেখায় মধুবাবুর। শার্টের হাতায় মুখ মুছতে মুছতে টুটুল হেসে ফেলে।

'ঠিক আছে স্যার, ঠিক আছে? তাহলে ভাল করেছি।'

দুদিন পর রেজাল্ট বেরোল। টুটুল বেয়াড়ারকম ভাল করেছে প্রায় সব বিষয়ে। শুধু প্রথম নয়, দ্বিতীয় থেকে অনেক এগিয়ে প্রথম। দু' ক্লাস ওপরে চোত্তা সপ্তম বুড়ী পঞ্চম। ছেলেমেয়েদের পরীক্ষার ডিপার্টমেন্ট স্বর্ণময়ীর। ভবনাথের এদিকে তাকাবার সময় নেই। সন্ত্রাসবাদীদের কার্যকলাপে ইতিমধ্যেই প্রাণ অস্থির। বজ্রযোগিনী গ্রামে কিছু বোমা ও তাজা কার্তুজ পাওয়া গেছে। ঘন ঘন ইন্টেলিজেন্স রিপোর্ট আসছে, তার সবগুলোই নির্ভরযোগ্য নয়, কিন্তু সাবধানের মার নেই।

সেদিন দুপুরবেলায় চাতালের কোণে দুই ভাইয়ের তর্ক বাধে পরীক্ষার ফল নিয়ে। 'পরীক্ষায় কারা ভাল করে জানিস? জানিস টুটুল? কারা ভাল করে?'

'যারা ভালভাবে পড়াশোনা করে।' টুটুল সাবধানে জবাব দেয়।

'ঠিক বলেছিস, যারা আর কিছু জানে না, একেবারে বইয়ের পোকা।'

(ক্রমশঃ)

প্রদর্শনী

অ্যাকাডেমি অব ফাইন আর্টসে ২৯ আগস্ট থেকে ১২ সেপ্টেম্বর মিডসামার প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হয়ে গেল। এটি অ্যাকাডেমির সপ্তম প্রদর্শনী, একশ' আটষট্টিটি ছবি ও ভাস্কর্যের নিদর্শনের মধ্যে চমকপ্রদ বিশেষ কিছু ছিল না। কিছু ছবি হয়ত বাদ দেওয়াও যেতে পারত। সর্বাধুনিক বিলিতী কাজের অনুপ্রেরণালব্ধ ক্ষুদ্র ভাস্কর্যও ছিল—যেমন উৎপল চক্রবর্তীর মুভমেণ্ট ১ ও ২ এবং তপন মিত্রের দুখানি 'রিলিফ কনস্ট্রাকশন'। এই ধরনের কাজ আমেরিকান ক্ষুদ্র ভাস্কর্যের প্রদর্শনীতে দেখা গিয়েছে।

রিপ্রেজেণ্টেশনাল ছবির মধ্যে বিনোদ কর্মকারের দুখানি নিসর্গ দৃশ্য উল্লেখ-যোগ্য। এর মধ্যে ধানক্ষেতের ছবিখানিই রং ও প্যাটার্নের সারল্যে বেশী আকর্ষণীয়। নির্মল দত্তের ছোট্ট সবুজ ও ধূসরের সমাবেশে তৈরী 'ঝড়' ছবিতে আসন্ন দুর্যোগের শুরু হওয়ার চেহারাটি সুপরিস্ফুট। দীপ্তি পালের স্বপ্ন ও রাজকন্যা ছবি দুটির মধ্যে শেষোক্ত ছবিটি সুগঠিত। খানিক সুররিয়ালিস্টিক দৃষ্টি-ভঙ্গী ও কিছুটা ভারতীয় মিনিয়েচারের আমেজ মিলিয়ে মন্দ কাজ হয়নি। শ্যামল বসুর দুস্থারমণী মূর্তিটি সুঅঙ্কিত। গীতা বর্মণের দুখানি কম্পোজিশনে সত্যেন ঘোষালের রীতি পরিস্ফুট। দেবব্রত চক্রবর্তীর প্রতিদ্বন্দ্বী ও মহাবীরের মূর্তিতে ভারতীয় পুঁথি চিত্রণের সঙ্গে মিল ঘটানোর চেষ্টা হয়েছে। ব্রজগোপালের টিম্বার মার্চেণ্ট ও জেনারেল পোস্ট অফিসের দুখানি ড্রয়িং যদিও তাঁর শ্রেষ্ঠ কাজ নয় তবু গ্রাফিক বিভাগের সাধারণ দুর্বলতাপূর্ণ ছবির ভেতর থেকে এই কাজ দুটোই বেশী করে চোখে পড়ে। সুরেন দের কাঠ খোদাই করা বিরাট শায়িত টর্সো-খানি বেশ সুগঠিত মূর্তি। তবে পুরুষ না নারী মূর্তি তা বোঝা যায় না। সম্ভবত এটিকে এক ধরনের স্বার্থবোধক মূর্তি হিসেবেই ধরতে হবে। ডরিউ. আর কাপুরের ভাঙা দালানের ছবিখানি মন্দ হয়নি। একটা বিশেষ ধরনের নৈকট্যবোধ আছে। তবে পেণ্টিং আর একটু উন্নত হতে পারত। সুরেন দের কাঠের তৈরী শায়িত রমণী মূর্তিটি ছোট মাপের সুন্দর পালিশ করা কাজ। বোধহয় কোন গর্ভিণীর প্রতিমূর্তি। বাসন্তী সেনের বসন্তের পূর্বে ছবির রঙের প্যাটার্ন প্রশংসনীয়। গণেশ হালোই-এর জলরং-এর দুখানি নিসর্গ দৃশ্যে সূক্ষ্ম ক্যালিগ্রাফিক রীতি দেখা গেল। ইন্দ্র দুগড়ের রাজগৃহের দৃশ্যটি জাপানী কাঠ খোদাই চিত্রের অনুরূপ। কল্পা দাশগুপ্তের একটি প্রতিকৃতি মডেলিং হিসেবে ভালই। অ্যাবস্ট্র্যাক্ট ভাস্কর্যের মধ্যে অতুল বড়ুয়া, সালেহা আমেদ, তারক গড়াই, সুবল সাহা ইত্যাদি কয়েকজনের নাম করা যায়।

*

বিখ্যাত কমার্শিয়াল শিল্পী অন্নদা মুন্সী বর্তমানে আধ্যাত্মবাদ নিয়ে ছবি আঁকছেন। তাঁর আধুনিক ছবিগুলির উনত্রিশখানির নিদর্শন ১ থেকে ৬ সেপ্টেম্বর অবধি ইউ, এস, আই, এস অডিটোরিয়াম গৃহে প্রদর্শিত হয়ে গেল। তাঁর অধিকাংশই যীশুখৃষ্টকে অবলম্বন করে আঁকা। প্রধানত সবুজ, নীল, বাদামী ঘেঁষা লাল রং ও শাদা ক্যালিগ্রাফির সাহায্যে তিনি তাঁর ছবিগুলি ফুটিয়ে তুলেছেন। শেষ বিচার, রিভীলেশন, লাইফ পত্রিকার লোগোটাইপের সঙ্গে মেরী মূর্তি, যীশুর ঝড় থামানো মূর্তি, যীশু সবাইকে ডাক দিচ্ছেন—যার ওপরে লেখা 'যীসাস রেভোলিউশন', শাদা ক্যালিগ্রাফিতে লেখা লর্ডস প্রেয়ার এবং 'ও ক্যালক্যাটা' যেখানে কলকাতা শহরের ওপর শূন্যে নানা প্রতীকচিহ্নের মধ্যে একটি 'বিলাতী পরী ভেঁপু বাজাইতেছে' ইত্যাদি বিষয় নিয়ে ছবি দেখা গেল। এ ছাড়া ওম্, কালীয়দমন, পাণ্ডবদের প্রত্যাবর্তন ও বেটোফেনের ছবিও ছিল। আর ছিল অনেকগুলি ছোট ছোট কার্ড সাইজের ডেকরেশন যার ওপর লেখা কিংডম অব হেভন। কিছু মথি লিখিত সুসমাচার থাকলেই প্রদর্শনীটি পূর্ণতা লাভ করতো বলে মনে হয়।

•

১ থেকে ১৩ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত বিড়লা অ্যাকাডেমিতে 'বাংলাদেশ সহায়ক শিল্পী সাহিত্যিক বুদ্ধিজীবি সমিতি'র উদ্যোগে বাংলাদেশের শিল্পীদের ছবি ও ড্রয়িং-এর একটি প্রদর্শনী হয়ে গেল। সতেরোজন শিল্পীর ছেষট্টিটি ছবিতে বাংলাদেশের সাম্প্রতিক দুর্ঘটনাবলীর একটা রূপ দেবার চেষ্টা করা হয়েছে। এ ধরনের কাজ অনেকটা সংবাদ পরিবেশনের মত হয়ে থাকে। নির্দিষ্ট ঘটনার ওপরেই অনেক সময় জোর দেওয়া হয়। যদিও সেটাই সব নয়। শিল্পরীতিতেও তাই রিপ্রেজেণ্টেশনের দিকেই জোর দিতে হয় এবং এখানেও তাই দেওয়া হয়েছে। কামরুল হাসানের বৈশাখী পূর্ণিমায় ভূপাতিত শবদেহের মূর্তি এবং বাংলাদেশ, গণহত্যার পূর্বে ও পরে ছবিতে পরিস্থিতির একটা সামগ্রিক রূপ দেবার চেষ্টা করেছেন। শেষোক্ত ছবি দুটির প্রথমটিতে তিনটি রমণী মূর্তি জল আনতে যাচ্ছে ও দ্বিতীয়টিতে তারাই কঙ্কালে পরিণত হয়েছে। প্রাণেশ মণ্ডলের বাস্তুহারা ছবিতে সূর্যকে পেছনে ফেলে বাস্তুহারার দলকে আশ্রয়লাভের আশায় আসতে দেখা যায়। মোস্তাফা মানোয়ারের ছবিগুলি পোস্টারধর্মী এবং দু-একটি কাজে বক্তব্যকে জোরের সঙ্গে উপস্থিত করা হয়েছে। যেমন একটি ছবিতে এক ডজন জান্তব মুখ ভূপাতিত রমণী মূর্তির ওপর ঝাঁপিয়ে পড়তে দেখা যায়। আরেকটিতে অর্ধচন্দ্র ও তারকা চিহ্নের সঙ্গে ক্রুশবিদ্ধ অবস্থায় কয়েকটি মনুষ্য মূর্তি দেখতে পাই। চন্দ্রশেখরের ছবিতে ফৌজী বর্বরতার শিকার হিসেবে অসহায় তরুণীর করুণ রূপ ফোটাবার চেষ্টা আছে। নাসির বিশ্বাসের ধর্ষণ ছবিটির ড্রয়িং রং ও কম্পোজিশনের দুর্বলতায় সাফল্য লাভ করতে পারেনি। কাজী গিয়াসুদ্দিনের বাস্তুহারাদের জলরঙের ছবি সুঅঙ্কিত। কিন্তু সবসুদ্ধ মিলিয়ে প্রদর্শনী দেখলে বাংলাদেশের ট্র্যাজেডির যে ছাপ দেখা যায় তার চাইতে প্রেস ফটোগ্রাফের প্রদর্শনীতে মনে অনেক বেশী দাগ পড়ে।

•

ক্যারিয়ন ম্যাককান রিক্রিয়েশন ক্লাবের সদস্যরা অ্যাকাডেমি অব ফাইন আর্টসে ৫ থেকে ১১ সেপ্টেম্বর বত্রিশখানি ছবি ও ভাস্কর্য এবং পঁচিশখানি ফটোগ্রাফির প্রদর্শনী করলেন। এঁদের অনেকে সাধারণ চিত্রপ্রদর্শনীতেও প্রদর্শন করে থাকেন। অমরেন্দ্রলাল চৌধুরী বিভিন্ন টোনের জমির ওপর সরু রেখায় কয়েকটি সুন্দর ফিগার ড্রয়িং করেছেন। লোকশিল্পের মেজাজ ও আধুনিক ডিজাইন এগুলির বৈশিষ্ট্য। আশিসকুমার সেন ভারতীয় রীতিতে দুখানি পরিচ্ছন্ন মিনিয়েচার উপস্থিত করেছেন। অমল ঘোষের দুখানি মূর্তির মধ্যে স্নানরতা মূর্তিটিই উল্লেখ করার মত।

বিনোদ কর্মকারের ছোট ল্যাণ্ডস্কেপ উইণ্টার মর্নিংটি বেশ সুগঠিত কাজ। জ্যোতিপ্রসাদ রায়ের অ্যাবস্ট্র্যাক্ট ঘেঁষা ল্যাণ্ডস্কেপ মন্দ নয়। কনক মুখার্জির মারমেড ছবির প্যাটার্ন মন্দ হয়নি রঙের ব্যবহার সুন্দর। 'ন্যুড' ছবিটি ছাপা কমার্শিয়াল ডিজাইনের মত। সুশান্ত দাসের দুখানি নিসর্গ দৃশ্যে সুন্দরভাবে স্পেস সৃষ্টি করা হয়েছে। তাপস দত্তের সূর্যালোকিত জলরংটি প্রশংসনীয়।

ফটোগ্রাফের মধ্যে অনেকগুলিই উন্নত মানের কাজ। এর মধ্যে বঙ্কিম মুখার্জির একটি মাথার স্টাডি, অরুণ গাঙ্গুলীর ছেলেদের খেলা, সুনীল দত্তের একটি পরিচ্ছন্ন গ্রুপ ও অতিকায় অবয়বটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। সব মিলিয়ে প্রদর্শনীটি খুব পরিচ্ছন্ন হয়েছিল।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের ইতিহাস

বিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায়

তৃতীয় পর্ব

প্রথম অধ্যায়

ভূমধ্যসাগরীয় রণনীতি

বৃটিশ ও ইতালীয় সাম্রাজ্যবাদের সংঘাত

ইতিহাসের ঊষাকাল থেকে ভূমধ্যসাগর ও নীল নদকে কেন্দ্র করিয়া যেমন প্রাচীনতম সভ্যতা গড়িয়া উঠিয়াছে এবং সেই সভ্যতা আধুনিক কাল পর্যন্ত বিস্তার লাভ করিয়াছে, তেমনি এর গতিপথে যুদ্ধ-বিগ্রহ, রক্তপাত, হানাহানি এবং রাজ্যলোভী ও ভাগ্যসন্ধানীদের অভিযানও এর ইতিহাসকে ভারী করিয়া তুলিয়াছে। সেই দূর প্রাচীনকালের রোমক দিগ্বিজয়ীদের সময় থেকে আধুনিক যুগের নেপোলিয়ন রোমেলের দুঃসাহসিক অভিযান পর্যন্ত এখানকার সামরিক উত্থান-পতনের কাহিনী কম চিত্তাকর্ষক নয়। কিন্তু জার্মান সেনাপতি রোমেলের রোমাঞ্চকর আবির্ভাবের আগে নূতন রোমক সাম্রাজ্যবিলাসী যে ব্যক্তিটি ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলে তাণ্ডব নৃত্য জুড়িয়া দিয়াছিল মহাযুদ্ধের আসরে 'যাত্রার দলের ভীমের' মত সেই মুসোলিনীকে যেন আমরা ভুলিয়া না যাই এবং ভুলিয়া যাওয়া সম্ভবও নয়। কেননা ১৯৪০ সালের পশ্চিম রণাঙ্গনে ফ্রান্স ও বৃটেনের পরাজয়ের অনেক আগে থেকেই এই ভদ্রলোক ভূমধ্যসাগরের জল ঘোলা করিতেছিলেন। ১৯২২ সালের অক্টোবরে ফ্যাসিজমের গুরু মুসোলিনী কর্তৃক ইতালীর রাষ্ট্রক্ষমতা দখলের পর থেকে সাম্রাজ্য বিস্তারের যে স্বপ্ন ইতালীর পররাষ্ট্রনীতির লক্ষ্যরূপে তিনি স্থির করিয়াছিলেন, সেই লক্ষ্য থেকে তিনি কোনদিন বিচ্যুত হন নাই। ১৯৩৯, ৪ঠা ফেব্রুয়ারী ফ্যাসিস্ট গ্রাণ্ড কাউন্সিলের এক বৈঠকে তিনি একজন তত্ত্ববিশারদের মত ইতালীর অবস্থান, ভাগ্য ও লক্ষ্যের বিশ্লেষণ করিয়া বলেন :

> Italy is borded by an inland sea which communicates with the ocean through the Suez Canal — an artificial means of communication which is easily blocked even by accident — and by the straits of Gibralter dominated by the government of Great Britain. Italy has in fact no free access to the oceans. She is really a prisoner in the Mediteranean and the more populas and powerful she becomes, the more she will suffer from her imprisonment The bars of this prison are Corsica, Tunisia, Malta and Cyprus. Its sentinels are Gibralter and Suez. (1)

সোজা কথায় 'ইতালী একটি অন্তর্দেশীয় সমুদ্রের দ্বারা সীমাবদ্ধ, মহাসমুদ্রের সঙ্গে যার যোগাযোগ রহিয়াছে সুয়েজ খালের মধ্য দিয়া, যে-খালটি ক্রমে এবং যে-কোন দিন একটা দুর্ঘটনায় অবরুদ্ধ হইয়া যাইতে পারে, আর তার যোগাযোগ রহিয়াছে জিব্রাল্টারের মধ্য দিয়া, যার উপর প্রভুত্ব করিতেছে গ্রেট বৃটেন। অতএব কার্যতঃ ইতালীর পক্ষে স্বাধীনভাবে মহাসমুদ্রে প্রবেশের কোন পথ নাই। সুতরাং ইতালী আসলে ভূমধ্যসাগরে বন্দী মাত্র এবং আগামী দিনে যতই তার জনসংখ্যা ও শক্তি বৃদ্ধি পাইবে, ততই এই বন্দীশালার দুর্ভোগ তার বাড়িতে থাকিবে। এই বন্দীশালার গারদ হইতেছে কর্সিকা, টিউনিসিয়া, মাল্টা এবং সাইপ্রাস। আর এর প্রহরী হইতেছে জিব্রাল্টার ও সুয়েজ'।

বর্ণনাটা খুব হৃদয়গ্রাহী সন্দেহ নাই এবং এই বর্ণনায় উপস্থাপিত তত্ত্ব থেকে মুসোলিনীর সিদ্ধান্ত এই যে, ইউরোপীয় ভূভাগে একমাত্র আলবেনিয়া ছাড়া ইতালীর আর কোন ভৌমিক লক্ষ্য থাকা উচিত নয়। কিন্তু প্রথমেই তাকে এই বন্দীশালার গারদ ভাঙ্গিতে হইবে এবং একবার এই গারদ ভাঙ্গিতে পারিলে ইতালীর একমাত্র জিগির হইবে :

> The March to the Ocean. Which Ocean? The Indian Ocean linking across the Sudan and Libya to Abyssinia or the Atlantic Ocean across French North Africa?

'চলো মহাসমুদ্রের দিকে মার্চ করি। কিন্তু কোন্ মহাসমুদ্র? সুদান-লিবিয়ার উপর দিয়া আবিসিনিয়া হইয়া ভারত মহাসমুদ্রের দিকে, কিম্বা ফরাসী উত্তর আফ্রিকা হইয়া অতলান্তিক মহাসমুদ্রের দিকে?'

---

(1) The Brutal Friendship —by F.W. Deakin Penguin, 1966 P. 19

মুসোলিনী নিজেই এই প্রশ্নের ব্যাখ্যা করিয়া বলিলেন যে, যে দিকেই মার্চ করি না কেন বৃটেন ও ফ্রান্সের বিরোধিতার মুখে পড়িতে হইবে। সুতরাং এমন অবস্থায় ইউরোপীয় ভূভাগে আমাদের পৃষ্ঠদেশের নিরাপত্তা বিধান না করিয়া আমরা এই সমস্যার মীমাংসার জন্য কোন বিপদের ঝুঁকি নিতে পারি না। রোম-বার্লিন এ্যাক্সিস এই ঐতিহাসিক প্রশ্নেরই জবাব-স্বরূপ।

—(পূর্বোদ্ধৃত পুস্তক, পৃঃ ১৯)

অর্থাৎ নাৎসী জার্মানীর সঙ্গে ফ্যাসিস্ট ইতালীর যে মিত্রতা মুসোলিনীর পক্ষে তার প্রধান লক্ষ্য হইতেছে ইউরোপীয় ভূভাগে নিরাপত্তা বিধানের পর ভূমধ্যসাগরীয় বন্দীশালা থেকে মুক্তিলাভে এবং এই বন্দীশালার গারদগুলি ভাঙ্গিয়া ফেলিয়া নূতন রোমক সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা!

কিন্তু আফ্রিকা মহাদেশ এবং তার অগাধ ঐশ্বর্য তো ইউরোপীয় শক্তিবর্গের কাছে দুই শতাব্দী ধরিয়াই লুটের মাল ছিল এবং এই লুটেরাদের মধ্যে প্রধান ছিল বৃটেন, ফ্রান্স, বেলজিয়ম, জার্মানী ও পর্তুগাল। ঊনবিংশ শতকে ইউরোপীয় জাতীয় রাষ্ট্রগুলির (নেশন স্টেটস) মধ্যে যখন আফ্রিকা নিয়া কাড়াকাড়ি পড়িয়া গেল, তখন ইতালী ছিল তাদের মধ্যে বহু বিলম্বে উপস্থিত নবাগতের মত। পশ্চিম ইউরোপীয় শক্তিগুলির মত তার শ্রম-শিল্পের শক্তি যথেষ্ট ছিল না। সুতরাং সামরিক বলও তার সামান্য ছিল। তবু আফ্রিকান সাম্রাজ্যের লুঠের বখরায় সে পিছনে থাকিবে কেন! ১৮৬৯ খৃস্টাব্দে সুয়েজ খাল খুলিবার পর ইতালীও আফ্রিকার দিকে নজর দিল এবং ১৬ বছর পর পূর্ব আফ্রিকায় মাসাওয়া দখল ও এরিট্রিয়ার উপনিবেশ প্রতিষ্ঠিত হইল। তারপর পূর্ব আফ্রিকায় ভারত মহাসাগরের কূলে ইতালীয় সোমালিল্যান্ড গড়িয়া উঠিল এবং এই দুই উপনিবেশের মাঝখানে ছিল বহু প্রাচীন রাজ্য ইথিওপিয়া (আবিসিনিয়া)। কিন্তু মাঝখানের এই রাজ্যটা কেনই বা ইতালী কাড়িয়া নিবে না? আর এটি দখল করিতে পারিলেই ইউরোপীয় ঔপনিবেশিক শক্তিবর্গের অন্যতমরূপে তার প্রেস্টিজ বাড়িয়া যাইবে। সুতরাং ঊনবিংশ শতকের শেষ দশকে সিনর ক্রিসপি মার্চ করিলেন সদর্পে আবিসিনিয়ার বিরুদ্ধে। কিন্তু ইতালীর দুর্ভাগ্য (এবং সেদিনও দুর্ভাগ্য!) ওই কালো আবিসিনীয়ানদের হাতে ইতালীর সৈন্যরা এমন প্রচণ্ড মার খাইল যে, ১৮৯৬ সালে আদোয়াতে তাদের একেবারে বিপর্যয় ঘটিয়া গেল। ইতালীয় ঔপনিবেশিক যুদ্ধের ইতিহাসে এজন্য 'Adowa' -এর নাম স্মরণীয় হইয়া রহিয়াছে। এই মার খাওয়ার পর ইতালী অনেক দিন আর আফ্রিকা অভিযানে বাহির হয় নাই। কিন্তু সে সুযোগের অপেক্ষায় ছিল। ১৯১১ সালে তুরস্কের বিরুদ্ধে বলকান যুদ্ধের ডামাডোলে ইতালীর সেই সুযোগ আসিয়া

গেল এবং ইতালী উত্তর আফ্রিকার ভূমধ্য-সাগরীয় উপকূলে ট্রিপোলি ও সাইরেনাইকা (নূতন নাম সিরিয়া) নিজের দখলে আনিয়া ফেলিল। তখন জার্মানীর বিরুদ্ধে মিত্র লাভের (প্রথম মহাযুদ্ধ) আশায় ফ্রান্স ও বৃটেন ইতালীর এই ঔপনিবেশিক সম্পত্তি দখল অনুমোদন করিয়া লইল। পশ্চিম ইউরোপীয় সাম্রাজ্যবাদীরা আফ্রিকার স্থানীয় বাসিন্দাদিগকে যেরূপ হিংস্রতা ও নির্মমতার সহিত দমন করিয়াছে এবং শ্বেতাঙ্গদের বসবাস ও ঐশ্বর্য যেভাবে ক্রমাগত বাড়িয়াছে, ইতালীর নতুন সাম্রাজ্যেও তারই পুনরাবৃত্তি ঘটিল।

মুসোলিনীর আমলে উত্তর আফ্রিকায় ইতালীয় উপনিবেশগুলিতে জেনারেল গ্রাৎসিয়ানীর কঠোর সামরিক শাসন প্রবর্তিত হইল। স্থানীয় অধিবাসীদের বিদ্রোহ নিষ্ঠুরভাবে দমন করা হইল, ইতালীয় নাগরিকদের সংখ্যা বহুগুণ বাড়িয়া গেল, মরুভূমির পুনরুদ্ধার করা হইল, দুর্গ, বিমানঘাঁটি এবং ভূমধ্য-সাগরের উপকূল ভাগ ধরিয়া নূতন-নূতন সড়ক, রেলপথ ইত্যাদি প্রতিষ্ঠিত হইল। কিন্তু এই সমস্ত নবনির্মাণ ও আয়োজনের পিছনে ইতালীয় জাত্যাভিমানের প্রেরণা ছিল—সেই ১৮৯৬ সালের আদোয়া যুদ্ধের শোচনীয় ও মর্মান্তিক পরাজয়ের প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য মুসোলিনী ১৯৩৫-৩৬ সালে আবিসিনীয়া আক্রমণ ও দখল করিলেন। এভাবে পূর্ব আফ্রিকায় ইতালীর ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্য গড়িয়া উঠিল। লিবিয়া, এরিত্রিয়া, আবিসিনীয়া, সোমালিল্যান্ড—এই সুবৃহৎ সাম্রাজ্যে ইতালীয় ঔপনিবেশিকদের সংখ্যা দাঁড়াইল প্রায় আড়াই লক্ষ এবং এই সাম্রাজ্য রক্ষার জন্য নেটিভ ও ইতালীয়সহ মোট ৪ লক্ষেরও বেশী সৈন্য সর্বদাই প্রস্তুত ছিল। লোহিত সাগর এবং ভূমধ্যসাগরের তীরে উৎকৃষ্ট বন্দর ও নৌঘাঁটি স্থাপিত হইল।

তখন ১৯৪০ সালের জুন মাস। ইতালী পরাজিত ফ্রান্সকে পিছন থেকে ছুরি মারিয়াছে এবং ইংলিশ চ্যানেলের ওপারে নিঃসঙ্গ বৃটেন বিপন্ন — সর্বদাই হিটলারী আক্রমণের মুখে। লোভী মুসোলিনীর পক্ষে এই সুযোগ। ডুসের ধারণা হইল ফ্রান্স তো ধরাশায়ী এবং বৃটিশ সাম্রাজ্যের পতনও আসন্ন। সুতরাং মিশর, বৃটিশ সোমালিল্যান্ড, ও বৃটিশ পূর্ব আফ্রিকা—বহুদূর বিস্তৃত এই বিশাল সাম্রাজ্যের তিনি মালিক হইবেন। এত বড় সাম্রাজ্য দিগ্বিজয়ী সীজারের পর আর প্রতিষ্ঠিত হয় নাই। কাউন্ট সীয়ানো (ইতালীর পররাষ্ট্রমন্ত্রী) এই অবস্থার দিকে তাকাইয়াই বলিয়াছিলেন—৫ হাজার বছরেও এমন সুযোগ আর মিলিবে না!(২)

(2) The Second World War — Churchill Vol. 3, P 70-72.

১৯৪০ সালের শেষ ভাগ থেকে ভূমধ্য-সাগরের নীল বারিরাশি উদ্বেলিত হইয়া উঠিল এবং তার তরঙ্গে-তরঙ্গে যেন রণ-ডঙ্কা বাজিতে লাগিল। এই সাগরের রণনৈতিক গুরুত্ব অসাধারণ। কারণ, এর চারি পাশে যে সমস্ত দেশ, যেমন উত্তর আফ্রিকা, মিশর, বলকান রাষ্ট্রপুঞ্জ এবং মধ্যপ্রাচ্য, আর সেই সঙ্গে খাস ভূমধ্যসাগরের জলপথ —এই বিশাল এলাকা ছিল পুরাতন ও নূতন সাম্রাজ্যবাদীদের কাছে অত্যন্ত মূল্যবান। বিশেষতঃ বৃটেনের কাছে তো এই অঞ্চল ছিল বৃটিশ সাম্রাজ্যের হৃদ-পিণ্ডের তুল্য। কারণ, জিব্রাল্টার, মাল্টা ও সুয়েজ খাল দিয়া এই পথ চলিয়া গিয়াছে হাজার-হাজার মাইল দূরবর্তী ভারতবর্ষ ও ভারত মহাসাগর পর্যন্ত এবং সেখান থেকে দূরপ্রাচ্যের সিঙ্গাপুর অবধি, যেখানে প্রশান্ত মহাসাগরের প্রবেশপথ। সুতরাং এক কথায় এটা বহুদূর বিস্তৃত বৃটিশ সাম্রাজ্যের 'লাইফ লাইন' বা প্রাণ-প্রবাহের মত। এই প্রাণপ্রবাহের উপর লোভার্ত দৃষ্টি ছিল মুসোলিনীর ইতালী। আরও মনে রাখা দরকার যে, ভূমধ্যসাগরের দক্ষিণ দিকে উত্তর আফ্রিকার সিরিয়া, মিশর ও সুয়েজ খাল কিম্বা লোহিত সাগরের উপকূলবর্তী এরিত্রিয়া, সোমালিল্যান্ড ইত্যাদি। অথবা উত্তর দিকে গ্রীস, যুগো-শ্লাভিয়া, রুমানিয়া কিম্বা পূর্ব দিক মধ্যপ্রাচ্যের সিরিয়া, ইরাক প্রভৃতি সমস্তই ভূমধ্যসাগরীয় রণনীতির অন্তর্গত এবং যদিও ভৌগোলিক বিচারে এগুলি বাহ্যতঃ পরস্পরের সহিত বিচ্ছিন্ন, তথাপি রণনীতির বিচারে এগুলিকে পরস্পরের সঙ্গে যুক্ত বলিয়া ধরা যায়।......

১৯৪০ সালে ফ্রান্সের পতনের পর পশ্চিম ও মধ্য আফ্রিকায় ফরাসী ও বেল-জিয়ান উপনিবেশগুলি মোটামুটি মিত্র-পক্ষের দলে থাকিয়াই 'স্বাধীনতা' রক্ষা করে। সুতরাং দক্ষিণ আফ্রিকা হইতে মিশর কিংবা দক্ষিণ আমেরিকা ও অতলান্তিক মহাসমুদ্র হইতে মধ্য আফ্রিকা হইয়া ভারত মহাসাগর পর্যন্ত মিত্রপক্ষের বিমানপথের যোগাযোগ অব্যাহত রহিল। কিন্তু ইউরোপ হইতে ভূমধ্যসাগর ও সুয়েজখাল দিয়া ভারতবর্ষ পর্যন্ত বৃটিশ সাম্রাজ্যের প্রধান ও সংক্ষিপ্ততম যোগাযোগের জলপথ বিপন্ন হইল। ফ্রান্সের পতনের পর ইতালী দ্রুত আঘাত হানিয়া এই ভূমধ্যসাগরীয় সাম্রাজ্য দখল করিতে চাহিল। তখন থেকে ১৯৪৩ সালের মে মাস পর্যন্ত বৃটিশ জাহাজগুলিকে উত্তমাশা অন্তরীপ ঘুরিয়া ভারতের দিকে যাইতে হইত। তখন বৃটেনের ঘোরতর দুর্দিন—ইংলন্ডের উপর জার্মানীর ভয়াবহ বিমান অভিযান চলিয়াছে এবং ইংরাজ জাতি আত্মরক্ষার সঙ্কটে বিব্রত। ইতালী উত্তর ও পূর্বের দুইটি আর্মি সহ মোট প্রায় ৫ লক্ষ সৈন্য সমবেত করিল—ট্যাঙ্ক, এরোপ্লেন, ট্রাক ইত্যাদি আধুনিক গতিশীল যুদ্ধের বাহনগুলি একত্র করা হইল। আফ্রিকায় ইতালী এক সুবৃহৎ সাঁড়াশীর চাপ অনু-সরণের জন্য উদ্যোগী হইল। আবিসিনিয়া বা ইথিওপিয়ার 'ভাইসরয়' ডিউক অফ ডি'আওস্টার অধীন একটি আর্মি মিশরে অভিযান করিতে চাহিল দক্ষিণ দিকের ইতালীয় পূর্ব আফ্রিকা হইতে এবং মার্শাল রডলফো গ্রাৎসিয়ানীর অধীন আর একটি আর্মি উত্তর আফ্রিকার লিবিয়া হইতে পূর্ব-দিকে মিশর অভিমুখী অগ্রসর হইতে চাহিল। অর্থাৎ দুইদিকের চাপে মিশর দখল করাই ছিল মুসোলিনীর উদ্দেশ্য। এই অভিযানে বাধা দেওয়ার জন্য বৃটেন জোড়াতালি দিয়া মোট মাত্র ৭৫ হাজার সৈন্য সমবেত করিল— যাদের বলা যাইতে পারে 'সাম্রাজ্য বাহিনী'। কেননা, অষ্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যান্ড দক্ষিণ আফ্রিকা, ভারতবর্ষ এবং বৃটেন—সাম্রাজ্যের এই সমস্ত অংশ হইতেই সৈন্যদল সংগৃহীত হইল। অস্ত্রবলের মধ্যে তাদের সম্বল ছিল কিছু পুরানো এরোপ্লেন এবং দুই শতেরও কম হাল্কা ট্যাঙ্ক। জেনারেল স্যার আর্চিবল্ড ওয়েভেল (যিনি পরবর্তীকালে ভারতবর্ষ ও ব্রহ্মদেশের প্রধান সেনাপতি এবং তারও পরে ভারতবর্ষের বড়লাট হইয়াছিলেন) এই সাম্রাজ্য বাহিনীর প্রধান অধিনায়ক ছিলেন। কয়েক সপ্তাহের মধ্যে লিবিয়া ও আবি-সিনিয়ায় ইতালীয় সৈন্যরা পরাজিত ও নষ্ট হইল। যদিও পরবর্তীকালে এই যুদ্ধ চলিল প্রধানতঃ জার্মান সেনাপতি রোমেলের সঙ্গে প্রায় তিন বৎসর ধরিয়া।

১৯৪০ সালের ১৩ই সেপ্টেম্বর লিবিয়ার মরুভূমি হইতে ইতালীয় বাহিনীর অধিনায়ক ফিল্ড মার্শাল গ্রাৎসিয়ানী মিশর আক্রমণ করিলেন। এখানে মনে রাখা দরকার যে, লিবিয়া ও মিশর উভয়ের সীমানা মিশিয়া গিয়াছে এই মরুভূমির অন্তহীন উত্তপ্ত বালুকারাশির মধ্যে এবং একমাত্র ভূমধ্যসাগরের উপকূলে ছাড়া যোগাযোগের কোন উৎকৃষ্ট পথ ছিল না। এখানে তোব্রুক ও সিদিবারানীর প্রায় মধ্যস্থলে উভয়ের সীমান্তের সংযোগ। লিবিয়ার পশ্চিমে টিউনিসিয়া, কিন্তু ফ্রান্সের পরাজয়ের জন্য এই পশ্চাদ্ভাগ সম্পর্কে ইতালী নিশ্চিন্ত ছিল। ইতালীয় সৈন্যেরা মিশরের সীমানা পার হইয়া সিদিবারানী পর্যন্ত পৌঁছিল এবং সেখানে ঘাঁটি আগলাইয়া রহিল, যদিও বৃটিশের আত্মরক্ষার প্রধান ব্যূহ ছিল মার্সা মাত্রুতে—সমুদ্রোপকূলের এই স্থানটি রাস্তা ও রেলওয়ের সংযোগের জন্য উল্লেখযোগ্য।

গ্রাৎসিয়ানির সৈন্যেরা মরুভূমি এড়াইয়া যথাস্থানে সমুদ্রোপকূল ধরিয়া অগ্রসর হইতেছিল। কিন্তু ভূমধ্যসাগরীয় বৃটিশ নৌবহর তাদের বিরুদ্ধে সক্রিয় হইয়া উঠিল এবং ইতালীয়দের সরবরাহ লাইন বিধ্বস্ত করিতে লাগিল। কিন্তু মুসোলিনী ইতালীয় উপকূল ভাগ আক্রান্ত হওয়ার আশঙ্কায় তাঁর নৌবহরের অধিকাংশই ইতালীর একেবারে দক্ষিণ প্রান্তস্থিত টারান্টো নৌঘাঁটিতে রাখিয়া দিয়াছিলেন। বৃটিশ নৌ-কর্তৃপক্ষ টের পাইয়া ১১ই নভেম্বর ১৯৪০ সন্ধ্যাবেলা হঠাৎ সেই নৌবহর আক্রমণ করিলেন।

'ইলাসট্রিয়াস' নামক বিমানবাহী যুদ্ধজাহাজ থেকে ৯টি বিমান পর পর দুই সারিতে উড়িয়া গিয়া ইতালীয় নৌবহরের উপর আক্রমণ চালাইল টর্পেডোযোগে। সেদিনের মহাযুদ্ধে বিমান থেকে টর্পেডোযোগে জাহাজ আক্রমণের প্রথম ঘটনাবলীর মধ্যে এটিই ছিল অন্যতম এবং এর সাফল্যও ছিল অপরিহার্য। কয়েক মিনিটের মধ্যেই টরেন্টো নৌপোতাশ্রয় অগ্নিশিখায় জ্বলিয়া উঠিল। ৬টি ইতালীয় যুদ্ধজাহাজ বা ব্যাটলশিপের মধ্যে তিনটি ধ্বংস হইয়া গেল এবং আরও দুইটি ক্রুজার ও দুইটি সাহায্যকারী জাহাজও খতম হইয়া গেল। মাত্র দুইটি বৃটিশ প্লেন নষ্ট এবং একজন অফিসার নিহত হইল এই বড় আক্রমণে। বৃটিশ নৌ-শক্তির হাতে এভাবে মার খাইয়া ইতালীয় নৌবহর নিরাপদ দূরত্বে গিয়া আশ্রয় নিল এবং ভূমধ্যসাগরের জলপথে বৃটিশ নৌ-শক্তির কর্তৃত্ব আবার প্রতিষ্ঠিত হইল।

• •

১৯৪০ সালের ৯ই ডিসেম্বর জেনারেল ওয়েভেলের সাম্রাজ্যবাহিনী সিদিবারানীতে ইতালীয়দিগকে অতর্কিতে আক্রমণ করিল এবং বৃটিশ পক্ষে 'ধুরন্ধর রণকৌশলী' জেনারেল ও'কনোর তাদের লিবিয়ার উপকূল ভাগ ধরিয়া তাড়াইয়া লইয়া গেল। দুই মাসের মধ্যে এল সোলমে, বারদিয়া, তোব্রুক এবং বেন্গাজী সাম্রাজ্য বাহিনীর দখলে আসিল। বেন্গাজী হইতে পলায়মান ইতালীয়দিগকে বিচ্ছিন্ন করিবার জন্য দুর্নোর দক্ষিণ-পশ্চিমে এল মোকিলি হইতে মাত্র ২৫টি ট্যাংকসহ একটি মোটরায়িত সৈন্যদল ১৫০ মাইল মরুভূমি অতিক্রম করিয়া অগ্রসর হইল। ইতালীয়দের পৌঁছিবার মাত্র দুই ঘণ্টা আগে সাম্রাজ্য সৈন্যরা সেই ঘাঁটিতে গিয়া উপস্থিত হইল এবং ইতালীয় বাহিনী ফাঁদে পড়িল। বৃটিশ পক্ষের হাতে ১ লক্ষ ৩৩ হাজার ইতালীয় বন্দী হইল, এবং এই দ্রুত অগ্রগতিতে সাম্রাজ্য সৈন্যদলের মাত্র ৬০৪ জন লোক খোয়া গেল। এল আঘেইলা পর্যন্ত লিবিয়ার পূর্বার্ধ বা সাইরেনিকা দখল হইল—১৯৪১ সালের ৮ই ফেব্রুয়ারী।

আফ্রিকায় নূতন সাম্রাজ্য জয় করিতে গিয়া মুসোলিনীর এই পরিণাম! ইতালীয় সৈন্যদের রণকৌশলে বহু ত্রুটি ছিল, তাদের সংবাদ আদান-প্রদানের ব্যবস্থা অত্যন্ত খারাপ ছিল, বিমানগুলি মাটিতেই ধ্বংস হইয়াছিল এবং তারা বহুপ্রকার ভুল করিয়াছিল। উপকূলবর্তী প্রত্যেকটি শহরকে তারা কামান, কাঁটাতার ও ট্যাঙ্ক-মারা ফাঁদের দ্বারা কেল্লায় পরিণত করিতে চাহিয়াছিল। কিন্তু বৃটিশ পক্ষ গতিশীল রণকৌশল অনুসরণ করিয়া ইতালীয়দের এই সমস্ত কেল্লা মাটি করিয়া দিল। তারা দ্রুততা, অতর্কিত আঘাত এবং প্রয়োজন মত ধাপ্পা দেওয়ার কৌশল বুদ্ধি সহকারে অনুসরণ করিল। সামরিক ইতিহাসে এই প্রথম ট্যাঙ্ক ও ট্রাক এবং সাঁজোয়া গাড়ী বিস্তীর্ণ মরুভূমিতে সমুদ্রের যুদ্ধজাহাজের অনুরূপ ভূমিকা গ্রহণ করিল, যাহা ইতালীয়দিগকে বেকুব বানাইয়া দিল।

কেবল লিবিয়া নহে, ইতালীয় পূর্ব আফ্রিকার আবিসিনিয়ারও অনুরূপ দশা হইল। এরিত্রিয়া, সোমালিল্যান্ড ও আবিসিনিয়ার দুই লক্ষ ইতালীয় সৈন্যের বিরুদ্ধে জেনারেল ওয়েভেল মাত্র ৩০ হাজার সৈন্য সমবেত করিতে পারিলেন। (৩) বিস্ময়ের কথা এই যে, লিবিয়ায় জয়লাভের পর জেনারেল ওয়েভেল এই সামান্য সৈন্যশক্তির সাহায্যেই ইতালীয় পূর্ব আফ্রিকায় মুসোলিনীর সাম্রাজ্যকে ধূলিসাৎ করিয়া দিলেন। গতিশীল যুদ্ধ, অতর্কিত আক্রমণ এবং নৌবহর ও বিমান বহরের সহযোগিতায়ই ইহা সম্ভব হইল। আর ইহার সংগে যুক্ত হইল শ্রেষ্ঠতর রণনীতি এবং দ্রুত আঘাত হানিবার রণকৌশল। ইতালীয় পূর্ব আফ্রিকার পশ্চিম সীমান্তের দৈর্ঘ প্রায় ২৫০০ মাইল, সমুদ্রতীরের দৈর্ঘও অনুরূপ। আর এই বিচিত্র ভূভাগের ভৌগোলিক অবস্থাও অতি বিসদৃশ—মরুভূমি, দুর্গম ঝোপজঙ্গল, প্রচণ্ড গ্রীষ্মের তাপ, খাড়া পাহাড় এবং মাইলের পর মাইল আশ্রয়হীন, খাদ্যহীন, জলহীন শুষ্কদেশ। সুতরাং এখানকার সংগ্রামকে 'পেট্রোল ও জলের যুদ্ধ' বলা যাইতে পারে। (৪)

এখানে বৃটিশ পক্ষের দ্রুত আক্রমণের সংগে যুক্ত হইল কর্নেল উইনগেটের নেতৃত্বে অসন্তুষ্ট স্থানীয় আদিবাসীদের বিদ্রোহাত্মক কার্যকলাপ। এর ফলে আবিসিনিয়ার যুদ্ধে বৃটিশ পক্ষের বেশ সুবিধা হইয়াছিল। বৃটিশ সোমালিল্যান্ড ইতালীয়দের হাতে পড়িয়াছিল ১৯৪০ সালের আগস্ট মাসে। কিন্তু ১৯৪১ সালের জানুয়ারী মাসে বৃটিশ সাম্রাজ্য বাহিনী পাল্টা আক্রমণ আরম্ভ করিল। প্রথমতঃ পশ্চিম দিকের ইঙ্গ-মিশরীয় সুদানের ক্যাসলো হইতে তারা এরিত্রিয়ার অভ্যন্তরে অগ্রসর হইল এবং ৭ সপ্তাহ অবরোধ যুদ্ধের পর ২৭শে মার্চ কেরেনের পার্বত্য দুর্গ দখল করিল। তারপর তারা সম্মুখের দিকে অগ্রসর হইয়া আসমারা এবং লোহিত সাগরের মাসাওয়া বন্দর অধিকার করিল। ফেব্রুয়ারীর মধ্যভাগে যান্ত্রিক সৈন্যেরা পূর্ব আফ্রিকার কেনিয়া হইতে ইতালীয় সোমালিল্যান্ডে প্রবেশ করিল এবং ১০ দিনে ৩০০ মাইল অতিক্রম করিয়া মোগাদিসু দখল করিল। মোগাদিসু হইতে দুই সপ্তাহের মধ্যে তারা ওয়েবি সেবেলি নদী উপত্যকা ধরিয়া আবিসিনিয়ার ভিতর দুকিয়া ও ডাগাবুর দখল করিল। ১৭ই মার্চ জিজিগা অধিকৃত হইল। এদিকে ১৬ই মার্চ নৌ, বিমান ও স্থলবাহিনীর একত্র আক্রমণে এডেন উপসাগরের বারবেরা বন্দর দখল হইয়া গেল এবং এভাবে জিজিগা ও বারবেরার মধ্যে সংযোগ স্থাপিত হইল। জিজিগা হইতে হারার হইয়া তারা আদ্দিস আবাবার দিকে অগ্রসর হইল এবং ৫ই এপ্রিল আবিসিনিয়ার রাজধানীর পতন হইল। এভাবে ইতালীয় পূর্ব আফ্রিকার অন্যান্য স্থানও যেন চক্ষুর নিমিষে দখল হইয়া গেল এবং আম্বা আলাগির পতনের পর ১৯৪১ সালের ২২শে জুলাই সরকারীভাবে ঘোষণা করা হইল যে, ইতালীয় পূর্ব আফ্রিকা এক্ষণে বৃটিশ সাম্রাজ্যের অধিকারে গিয়াছে। এটাই ছিল সেদিনের মহাযুদ্ধে বৃটেনের সব চেয়ে বড় জয়।

মুসোলিনীর আফ্রিকার সাম্রাজ্য নষ্ট হইয়া গেল এবং ১৯৩৫-৩৬ সালে যে আবিসিনিয়ার স্বাধীনতা হরণ করিয়া ফ্যাসিস্ট নায়ক মহাযুদ্ধের ভূমিকা রচনা করিতে ছিলেন, সেই রাজাই প্রথম ত্রাণলাভ করিল এবং সম্রাট হাইলে সেলাসী বৃটিশের সহযোগিতায় ২০শে জানুয়ারী তাঁর রাজধানী আদ্দিস আবাবায় প্রত্যাবর্তন করিলেন।

কিন্তু মুসোলিনী হারিলেও হিটলার হটিবার পাত্র নহেন। অক্ষশক্তির প্রেস্টিজের খাতিরেই হিটলার মুসোলিনীকে আফ্রিকা ও বলকান সংকট হইতে উদ্ধারের সংকল্প করিয়াছিলেন। সুতরাং তিনি এমন একজন প্রতিভাশালী দক্ষ সেনাপতিকে প্রেরণ করিলেন, যাঁর বুদ্ধির দীপ্তি দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সামরিক ইতিহাসকে বহুদূর পর্যন্ত উজ্জ্বল করিয়া রাখিয়াছে। তাঁর নাম জেনারেল এরাইন রোমেল।

১৯৪১ সালের মার্চ মাসে জেনারেল রোমেল বিখ্যাত আফ্রিকা কোরের অধিনায়ক রূপে লিবিয়ায় প্রেরিত হইলেন। এই বাহিনীতে ছিল দুইটি সংগ্রামপটু সাঁজোয়া ডিভিসন, উৎকৃষ্ট সৈন্যদল লইয়া ইহারা গঠিত ছিল। এই ১৫নং ও ২১নং ডিভিসনে আট হাজার করিয়া সৈন্য এবং ১৩৫টি করিয়া ট্যাঙ্ক ছিল, আর ছিল ৯০নং হাল্কা পদাতিক ডিভিসন। রোমেলের নেতৃত্বে ট্যাঙ্কের অপরিসীম কৃতিত্ব দেখাইয়া এই সৈন্যেরা মরুভূমি যুদ্ধের নূতন ইতিহাস রচনা করিল। জার্মানীর নূতন বৈজ্ঞানিক বুদ্ধি এই সংগ্রামে প্রয়োগ করা হইল এবং প্রকাশ যে, হ্যাম্বুর্গের ট্রপিক্যাল ইনস্টিটিউটের তত্ত্বাবধানে এজন্য বিশেষ ধরণের সাজসরঞ্জাম এবং মরুভূমির বালি ও উত্তাপের উপযোগী খাদ্য, পোষাক, আশ্রয় এবং ঔষধ ইত্যাদির ব্যবস্থা করা হইল। যন্ত্রণাদায়ক গ্রীষ্মের প্রতিষেধক সাজসজ্জায় রোমেল বাহিনী প্রস্তুত হইয়া আক্রমণে অবতীর্ণ হইল। আর ইহাদের সংগে সহযোগিতা করিল ৭ ডিভিসন ইতালীয় সৈন্য—ইহার মধ্যে এক ডিভিসন ছিল ট্যাঙ্ক এবং ইহারা প্রধানতঃ রোমেলের যোগাযোগ ও সরবরাহ লাইন রক্ষায় নিযুক্ত হইল। এবং তারা রোমেলেরই পরিচালনাধীন ছিল।

(ক্রমশঃ)

---

(3) 'The World At War' — page 70 U.S.A. 1945

(4) From Tobruk to Smolensk — by Strategicus P. 16.

চলচ্চিত্রে প্রতীকের ব্যবহার

সমর বন্দ্যোপাধ্যায়

সাহিত্য, চিত্রকলা বা অপরাপর সুকুমার শিল্পে প্রতীকের প্রয়োগ যেমন ইংগিতময় ব্যঞ্জনা সৃষ্টিতে অন্যতম মুখ্য ভূমিকা গ্রহণ করে, তেমনি চলচ্চিত্রেও এর সূক্ষ্ম ব্যবহার ভাব-দ্যোতনায় নান্দনিক তাৎপর্যে চিহ্নিত করতে সাহায্য করে। চলচ্চিত্রের প্রতীক প্রত্যক্ষভাবে দৃষ্টিবাহিত বলেই তা অধিকতর প্রভাবশালী হয়ে দেখা দেয়।

সব কলাশিল্পের মধ্যেই কিছু না কিছু বিমূর্তন বা ভাবময়তা (অ্যাবস্ট্রাকশন) আছে। শিল্পের অভিব্যক্তিতে সবটুকু প্রকাশ পায় না। কিছুটা অনুক্ত, কিছুটা অব্যক্ত থাকে। এই ফাঁকটুকু ইংগিতপূর্ণ ব্যঞ্জনায় পূরণ করে দেবার দায়িত্ব পালন করে প্রতীক। কবি ইয়েট্‌স্ যথার্থই বলেছেন,

'A symbol is indeed the only possible expression of some invisible essence'.

প্রকৃতপক্ষে 'আর্ট'-এর ব্যঞ্জনাই নির্ভর করে 'সিম্বল' বা 'ইমেজ' সৃষ্টির ওপর। এবং কলালক্ষ্মীর অলংকারই হল এই প্রতীক। এ নইলে শিল্পের কোন লাবণ্যই থাকে না। আর একটু ঘুরিয়েও বলা চলে যে, 'ডাইরেক্টকে ইনডাইরেক্টলি' প্রকাশ করার মধ্যেই থাকে আর্ট সৃষ্টির বৈশিষ্ট্য এবং এই 'ইনডাইরেক্টলি' দেখানো মানেই 'সিম্বল'-এর প্রয়োগসাধন। মনের ক্ষণিক উল্লাস বোঝাতে আকাশে আতস বাজির ফুল ফোটানো যতখানি ইংগিতবহ ব্যঞ্জনায় মনে রেখাপাত করে, ততখানি নিশ্চয়ই করে না যদি সেই উল্লসিত ব্যক্তিকে ধেই ধেই করে চোখের সামনে নাচতে দেখি।

চলচ্চিত্রে সার্থক প্রতীকের প্রয়োগ নির্ভর করে চলচ্চিত্রকারের পরিণত শিল্প-প্রজ্ঞার ওপর। এই প্রজ্ঞার অভাবের দরুণই অনেক পরিচালককে যত্র তত্র সিম্বল ব্যবহার করতে দেখা গেছে, যেখানে এসবের কোন আবেদন সৃষ্টির অবকাশই থাকে না। স্থূল প্রতীকের ব্যবহারে চলচ্চিত্রের সৌন্দর্য হানিও করে থাকেন অনেকে। প্রতীক ব্যবহারে লক্ষ্য রাখা উচিত, কখনও তা কষ্ট কল্পনায় আরোপিত হচ্ছে কি না। কারণ, কষ্টকল্পিত বা উদ্ভট অথবা অসংলগ্ন প্রক্ষিপ্ত প্রতীক কখনও রসাবেদন সৃষ্টিতে ব্যঞ্জনাধর্মী হয়ে ওঠে না।

প্রতীক ব্যবহারের বিষয়গত বিশেষ প্রবণতাটুকু অনেক সময় চিত্র-পরিচালকের শিল্পী মানসিকতাকেও উদ্‌ঘাটন করে দেয়। কোন নৈরাশ্যপীড়িত পরিচালক তাঁর ছবিতে প্রায়ই মরা ব্যাঙ বা টিকটিকি অথবা ঐ জাতীয় কিছু প্রতীক ব্যবহার করেন কিংবা ক্রুশবিদ্ধ যীশুর রক্তাক্ত দেহের প্রতীকী প্রয়োগ করেন। তাঁদের ছবিতে বক্তব্য প্রায়শঃই নেতিবাচক অবশ্য। আবার আশাবাদী প্রগতিশীল চলচ্চিত্রকার তাঁদের ছবিতে হয়তো সূর্যের আলো, কচিপাতা, প্রস্ফুটিত ফুল, আকাশবিহঙ্গী, শিশুর মুখ ইত্যাদি প্রতীকের ব্যবহার করতে পছন্দ করেন বেশী। অবশ্য প্রতীকের প্রয়োগসিদ্ধি ঘটে বিষয়বস্তুর সংগে সামঞ্জস্য রক্ষা করেই। এবং সামান্য দু'একটি অর্থপূর্ণ প্রতীক ব্যবহারে বক্তব্যের জোরালো প্রকাশ ঘটে তাত্ত্বিক ভাব-দ্যোতনায়, যা হয়তো সম্ভব হয় না অনেক অনেক সংলাপ উচ্চারণের মধ্য দিয়েও।

আইজেনস্টাইনের 'স্ট্রাইক' ছবিতে ধর্মঘটের কর্মবিরতি প্রত্যক্ষ রূপ নিয়েছে পর্দায় স্তব্ধ কারখানার ধোঁয়াবিহীন চিমনির ক্লোজ-শটে। 'অক্টোবর'-এ নিধন লীলার বীভৎসতা ফুটিয়ে তোলা হয়েছে কসাইখানায় পশুহত্যার রক্তাক্ত প্রতীকের আশ্রয়ে। 'ব্যাটলশিপ পোটেমকিন'-এ অত্যাচারের প্রতিবাদে পোটেমকিনের কামান গর্জে ওঠার পর মুহূর্তেই 'কাট্' করে তিনটি ভিন্ন ভিন্ন ভংগীর সিংহের ভাস্কর্যমূর্তি পর পর তিনটি ক্লোজ-শটে অতি দ্রুততায় দেখিয়ে জনমনে বিদ্রোহের পূর্বাভাসকে বোঝানো হয়েছে আশ্চর্য প্রতীকী ব্যঞ্জনায়। এ জাতীয় 'মন্টাজ এফেক্ট্' আইজেনস্টাইন আরও বহু ক্ষেত্রেই সৃষ্টি করেছেন বিস্ময়কর মুন্সিয়ানায়।

চ্যাপলিনের 'গোল্ডরাশ' ছবিতে ক্ষুধার্ত জিমের চোখে চ্যাপলিনের মোরগ হয়ে যাওয়ার প্রতীকী কল্পনা কিংবা 'মঁসিয়ে ভের্দুর' প্রথম দৃশ্যেই মতলবী নারীঘাতী নায়কের ফুলবাগানে গোলাপফুল গন্ধে মোহিত হওয়া ও কাঁচি দিয়ে ফুলগুলি ছিন্ন করার নিষ্ঠুর উল্লাস সকৌতুকে দেখিয়ে সমগ্র চরিত্রকে ইংগিতময়তায় প্রকাশ করা অথবা 'লাইম লাইট'-এ ক্যালভেরোর মৃত্যুর পর মঞ্চে নর্তকীর অবিরাম নৃত্যলীলার 'ইমেজ' ব্যঞ্জনা মনকে অবাক না করে পারে না। গুরুর মৃত্যুর পর যোগ্য উত্তরাধিকার যার, তার তো থেমে থাকা চলে না। আরব্ধ কাজ তাকে শেষ করতেই হবে। গুরুর সাধনাকে দিতে হবে ব্যাপ্তি। এভাবেই মৃত্যুকে অস্বীকার করে জীবন এগিয়ে চলেছে। চ্যাপলিনেরই মুখের কথা— 'Progress is [illegible].' এই মহৎ বাণীটি ছবির শেষ পর্বে যে 'সিম্বলিক' দ্যোতনায় মূর্ত হয়েছে, তা সত্যিই ভোলবার নয়।

মুরনোর 'সানরাইজ' ছবিতে ঝড় তুফানকে আশ্চর্য প্রতীকী ব্যঞ্জনায় রূপায়িত করা হয়েছে। হীন ষড়যন্ত্রের পাপচক্রে লিপ্ত স্বামী যখন নিষ্পাপ সরলপ্রাণা স্ত্রীকে হত্যা করতে অগ্রসর, তখন তার মানসিক দ্বন্দ্ব সংঘাতকে অপূর্ব ফিল্মি ভাষায় প্রকাশ করা হয়েছে নদীবক্ষে প্রচণ্ড তুফান আর দুর্যোগের দৃশ্য পরিকল্পনায়। কার্ল ড্রেয়ার পরিচালিত 'দি প্যাশন অফ্ জোয়ান অফ্ আর্ক' ছবিটিতে মানুষের মুখের 'ক্লোজ-আপ' যে কতখানি প্রকাশধর্মী হতে পারে, তার উজ্জ্বল নিদর্শন স্বাক্ষরিত আছে। জোয়ান যখন সাহায্যের জন্য পাদ্রীর দিকে মুখ তুলল, তখন পাদ্রী ধীরে ধীরে মুখ নীচু করল। এই অংশে 'ক্লোজ-আপ'-এর ব্যঞ্জনাপূর্ণ রূপকল্প তীব্র আবেদন সঞ্চার করে।

ডি সিকার 'দি বাইসাইকেল থীফ্' ছবিতে কর্মজীবনের ঘটনাচক্রকে 'ক্লোজ-আপ'-এ সাইকেলের চাকার সংগে প্রতীকায়িত করা, আন্তোনিওনির 'ব্লো-আপ'-এ ফটো-প্রিন্টগুলির সাহায্যে হত্যাদৃশ্যের উন্মোচন ইত্যাদি চলচ্চিত্রের দৃশ্যধর্মিতাকে শিল্প-তাৎপর্যে চিহ্নিত করেছে নির্ভুলভাবে। ফেলিনির 'লা দোল্‌চে ভিতা' ছবিটির শেষ দৃশ্যে ভয়ংকর এক সামুদ্রিক মাছের বীভৎস চোখকে প্রতীকায়িত করে পাশ্চাত্য সভ্যতার কুৎসিত পাপাচারকে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে বিস্ময়কর দৃশ্যধর্মী ব্যঞ্জনায়।

ত্রুফো পরিচালিত 'ফোর হান্‌ড্রেড ব্লোজ' ছবির উৎকণ্ঠিত অন্তিম মুহূর্তে দ্রুত ধাবমান কিশোরটির সম্মুখে প্রচণ্ড তরংগবিক্ষুব্ধ সমুদ্রকে অকস্মাৎ 'ফ্রিজ' করে দিয়ে যে-রূপকল্পের আশ্রয় নেওয়া হয়েছে, তা আমাদের রীতিমত হতবাক করে দেয়। কুরোসাওয়ার 'রশোমন' ছবিটিতে অবিরাম অন্তহীন প্রাকৃতিক দুর্যোগকে প্রাচীনকালের 'মীথ্'-এর স্তর থেকে এ যুগের পাপ আর গ্লানিতে সৃষ্ট নাশের অশুভ ইংগিতে রূপান্তর সাধনও অসাধারণ।

বেয়ারম্যানের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ছবি হল 'ওয়াইল্ড স্ট্রবেরীজ'। ছবির টাইটেলটিই হল প্রেম ও প্রশান্তির প্রতীক। কিন্তু ছবিটির প্রারম্ভেই এক ভয়াবহ স্বপ্নের ইমেজে প্রধান চরিত্র অধ্যাপকটির মানসিক জগৎকে উন্মোচিত করা হয়েছে অপূর্ব নৈপুণ্যে। মৃত দণ্ডায়মান বিকৃত মুখ মানুষ, স্পর্শমাত্র তার পড়ে যাওয়া, মাথা থেকে জল পড়া, কাঁটাহীন ঘড়ি, খাঁ খাঁ শূন্য শহর, মৃতদেহ, কফিন—এই সব খণ্ড খণ্ড দৃশ্যের যোজনায় যুগের নৈরাশ্য অন্তঃসারশূন্যতা ও আত্মিক মৃত্যু অভিব্যক্ত হয়েছে। গাড়ীর মধ্যে স্বপ্ন-প্রতীকে অধ্যাপকের অপরাধ-চেতনা, বিজ্ঞানসাধনা ও অতীত জীবনের ব্যর্থতাকে প্রকাশ করে সংগে সংগে বিপরীত ঘটনার উপস্থাপনায় মৃত্যু চেতনা থেকে উত্তরণের ইংগিত দেওয়া হয়েছে।

আমাদের দেশে বিগতকালের চলচ্চিত্রে বেশ কিছু শিল্পসম্মত চিত্রকল্পের ব্যবহার

দেখা গেছে, যেগুলি ভাব-দ্যোতনায় উজ্জ্বল কৃতিত্বের পরিচায়ক নিঃসন্দেহে এবং প্রমথেশ বড়ুয়াই সে-যুগে সর্বপ্রথম তাঁর ছবিতে এ জাতীয় শিল্পব্যঞ্জনাপূর্ণ প্রতীকের সার্থক প্রয়োগসাধন করেছিলেন। বড়ুয়ার ছবিতেই আমরা প্রথম লক্ষ্য করেছি, ডাইরেক্ট কিছুকে ইন-ডাইরেক্টগুলি প্রকাশ করার সেই বিশেষ শৈল্পিক স্টাইলটি এবং বুদ্ধিদীপ্ত শিল্প-সুন্দর ইমেজ-এর মাধ্যমে মানব-মন ও চরিত্রের অন্তর্দ্বন্দ্বকে ফুটিয়ে তোলার সেই অসাধারণ ব্যঞ্জনা। 'ক্লোজ-আপ', 'মন্টাজ' ও 'কাট শট'-এর মধ্য দিয়ে প্রতীকীময়তা সৃষ্টি করে সে যুগেও তিনি যে নৈপুণ্যের স্বাক্ষর রেখেছেন, তা আগামীকালেও স্মরণীয় হয়ে থাকবে।

প্রমথেশের 'রূপলেখা' ছবিতে দেখি, কারাগারে অরূপ গভীর রাত্রে মৃত্যুর প্রহর গুনছে। একক অরূপের প্রতীক হ'য়ে একটি মোমবাতি শুধু অরূপের কাছে জ্বলছে। বাতির শিখা থর থর করে কাঁপছে অরূপের মানসিক অবস্থা বিশ্লেষণের সহায়ক হয়ে। 'দেবদাস' ছবিতে নায়কের মুখের বিগ ক্লোজে ফাস-ট্রেনের মর্মন্তুদ রূপকে ফুটিয়ে তোলা, তার উদ্‌ভ্রান্তভাকে ট্রেনের দুরন্তগতির সঙ্গে একাত্ম করা, ট্রেনের বেসিনে মুখ দিয়ে রক্ত ওঠা দেখে দেবদাসের আর্তনাদ—'ধর্মদা, রক্ত', মুহূর্তে ইন্টারকাট্ টেলিপ্যাথী শটে দূর হাতিপোতা গ্রামে পার্বতীর হাত থেকে নৈবেদ্যের থালা পড়ে যাওয়ার দৃশ্য দেখিয়ে উভয় মনের অভিন্নতা ও সর্বনাশের অশুভ ইঙ্গিত দেওয়া, দেবদাসের মৃত্যু সংবাদে উন্মাদিনী পার্বতীর ছুটে বেরিয়ে আসার মুখে বিরাট সদর দরজাটি ধীরে ধীরে তার সামনে বন্ধ হয়ে যাওয়া ইত্যাদি রূপকল্প রচনার বিস্ময়কর মুন্সিয়ানা আমরা প্রত্যক্ষ করেছি সেই ১৯৩৫ সালেই।

বড়ুয়ার 'গৃহদাহ' চিত্রে অচলার চলে যাবার পর কিম্বসংসারে একা মহিমের সঙ্গে বিশাল প্রান্তরে একটি ভাঙাবাড়ি লং শটে কম্পোজ করা, 'মায়া' ছবিতে ডবল এক্সপোজারে সেতারের ওপর আজুরির নাচ, 'মুক্তি' ছবির শুরুতেই নায়কের একটির পর একটি দরজা খুলে নায়িকার সমীপবর্তী হওয়া, নিজের হাতে স্টুডিও চুরমার করার পূর্ব মুহূর্তে নায়কের দ্রুত পদক্ষেপের ক্লোজ-আপ শট্, মুখের বিগ ক্লোজ, কাট্ করে দুটি মিড শটে রাস্তার ধারে রিক্সাওয়ালা ও শিশুকোলে ভিখারিণীকে দেখিয়ে মন্টাজ সিকোয়েন্স সৃষ্টি, 'অধিকার'-এর সূচনাতেই সুপার ইম্পোজিসন শটে নায়িকার স্বপ্ন দৃশ্যের অবতারণা, নায়কের প্রস্তর নিক্ষেপে সৃষ্ট জলাশয়ে তরঙ্গবৃত্তের সঙ্গে মনের ভাব তরঙ্গকে একীকরণ, শেষ দৃশ্যে লতাগুল্মের প্রতীকের আশ্রয়ে নায়িকার পরনির্ভরতাকে প্রত্যক্ষীভূত করা ইত্যাদি সিম্বলিক ব্যঞ্জনার মধ্য দিয়ে মনের অনেক কথাই সুন্দর ও স্পষ্টভাবে ব্যক্ত হয়েছে এবং ইমেজগুলি হয়েছে আশ্চর্য শিল্প-সুষমায় রসোত্তীর্ণ সৃষ্টির মর্যাদায় ধন্য।

দেবকী বসুর 'বিদ্যাপতি' ছবিতে অনুরাধার রঙ্গলাস্য রাণী লছমীর মনোবেদনাকে সোচ্চার করে ফুটিয়েছে কনট্রাস্ট এফেকটের মধ্যে। নীতিন বসুর 'জীবনমরণ'-এ উন্মাদ বেহালাবাদককে নায়ক নায়িকার সাময়িক বিচ্ছেদ বেদনার প্রতীকী চরিত্র হিসেবে হাজির করা হয়েছে। ফণী মজুমদারের 'সাথী' চিত্রে ভুলুয়া চলে যাবার পর মজুর মনের হাহাকারকে মুখের ক্লোজ-আপ এবং ঘরের মধ্যে ভুলুয়ার ব্যবহৃত জিনিসগুলোকে পরিত্যক্ত অবস্থায় মিড শটে কাট্ করে দেখিয়ে প্রকাশ করা হয়েছে। বিমল রায়ের 'উদয়ের পথে' ছবিতে অভিজাতের উচ্চ মিনার থেকে নায়িকার অবতরণ ও জনতার মধ্যে জনান্তিক হয়ে নব অরুণোদয়ের আলোকিত পথে হেঁটে চলার রূপকল্পটিও সুন্দর।

এ যুগের ছবিতে শিল্পব্যঞ্জনা ধন্য চিত্রকল্পের ব্যবহারে সত্যজিৎ রায়, ঋত্বিক ঘটক, মৃণাল সেন, তপন সিংহ প্রমুখ চলচ্চিত্রকার বিশেষ নৈপুণ্যের নিদর্শন রেখেছেন। সত্যজিৎ রায়ের প্রতীক ব্যবহার সরল হয়েও আবেদন সঞ্চারে অমোঘ। তুলনায় ঋত্বিক ঘটকের প্রতীকী ব্যঞ্জনা কিছুটা জটিল হলেও রসোত্তীর্ণ।

সত্যজিৎ রায়ের 'পথের পাঁচালী'তে ইন্দির ঠাকরুণের মৃত্যুর পর পুকুরে তার ঘটির গড়িয়ে পড়ার দৃশ্য ও ছবির শেষে সপরিবারে হরিহরের বাস্তুত্যাগের পর পরিত্যক্ত জীর্ণ বাড়িটিতে একটি সাপের প্রবেশ, 'অপরাজিত' চিত্রে হরিহরের মৃত্যু-মুহূর্তে কাশীর গঙ্গাঘাটের এক মন্দিরের স্তম্ভ থেকে এক ঝাঁক পায়রাকে অসীম আকাশে উড়িয়ে দেওয়া, 'অপুর সংসার'-এ অপর্ণার অকাল মৃত্যুতে তার মায়ের কান্নায় ভেঙে পড়ার দৃশ্যটির অব্যবহিত পরেই কাট্ করে সমুদ্রের উত্তাল ঢেউয়ের বেলা-ভূমিতে আছড়ে পড়া, 'কাঞ্চনজঙ্ঘা' ছবিতে কাঞ্চনজঙ্ঘাকেই ব্যাকগ্রাউন্ডে ভাব-দ্যোতনায় তুলে ধরা, 'দেবী' চিত্রে গৃহ পুজোমণ্ডপে একটি ছোট ছেলেকে দেখিয়ে কাট্ করে বলিদানের খড়্গ উত্তোলন ও সেই মুহূর্তে আকাশে আতসবাজির ঝিলিক ফোটানোর মধ্য দিয়ে ছেলেটির আগামী মৃত্যুকে সাংকেতিকতায় প্রকাশ করা, 'জলসাঘর'-এর শেষ পর্বে নদীতটে বিশ্বম্ভরের জীর্ণ পরিত্যক্ত নৌকো ও অপর প্রান্তে নবীন সূর্যের অভ্যুদয়, 'চারুলতা'য় বায়নাকুলারের ব্যবহার ও ফিজশটের প্রয়োগ, 'নায়ক' ছবিতে চরম ভোগস্পৃহায় অরিন্দমের টাকার পাহাড়ের ওপর স্বপ্নময় বিহার ও ধীরে ধীরে টাকার চোরা ঘূর্ণিতে ডুবে যাওয়া, 'প্রতিদ্বন্দ্বী' ছবির সূচনায় নেগেটিভ ব্যবহারের রূপকল্প ইত্যাদি ছবির শিল্পশ্রীকেই বৃদ্ধি করেছে অভিনব ব্যঞ্জনায়।

ঋত্বিক ঘটকের 'কোমল গান্ধার'-এ ছিন্ন রেল সংযোগকে বিভক্ত বাংলার প্রতীকরূপে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। 'সুবর্ণরেখা' ছবিতে পথ চলতে চলতে বালিকা সীতার হঠাৎ বহুরূপীর ভয়ঙ্কর কালীমূর্তির সামনে পড়ে শিহরিত হওয়ার দৃশ্যকল্পনাটুকু অনবদ্য। অকস্মাৎ ঐ কালীমূর্তির আবির্ভাবকে পরিচালক সমগ্র মানব সভ্যতা যে ভয়াবহ সংকটের সম্মুখীন হচ্ছে, তারই প্রতীক রূপে ব্যবহার করেছেন। আত্মহত্যায় ব্যর্থ ঈশ্বরকে হরপ্রসাদের সঙ্গে এক পোড়ো ভুতুড়ে বাড়ির পরিবেশের মধ্যে যুগলবন্দী দেখিয়ে উভয়-জীবনের ট্র্যাজেডীকে প্রতিমায়িত করা হয়েছে অসামান্য দৃশ্যধর্মিতায়। স্টেশনে অভিরামের মায়ের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে সশব্দে ইঞ্জিন প্রবেশ ও অপর দিকে নির্বিকার এক শিশুর দোল খাওয়ার দৃশ্য যোজনার মধ্য দিয়ে মানুষের প্রাত্যহিক জীবনের দুর্বিপাক ও ব্যক্তিগত ব্যথা-বেদনার প্রতি বহির্জগতের নিষ্ঠুর ঔদাসীন্যকে প্রকাশ করা হয়েছে চমৎকার প্রতীকীময়তায়।

মৃণাল সেনের 'ভুবন সোম' ছবিতে নায়কের আদর্শনিষ্ঠ সুশৃংখল জীবনকে সমান্তরাল রেল লাইনের সঙ্গে প্রতীকায়িত করা, তপন সিংহের 'অতিথি' ছবির শেষে নৌকার পালের গায়ে আঁকা এক দুরন্ত হরিণের সিম্বল মাধ্যমে বাঁধন ছেঁড়া পলাতক তারাপদর মুক্তিকামী চঞ্চলতাকে রূপ দেওয়া, অজয় করের 'মাল্যদান'-এ কুড়ানির হৃদয় উল্লাসকে তারই দ্রুতপদের ক্লোজ-শটকে নদীর তরঙ্গভঙ্গে 'মিক্স' করে চিত্রধর্মী ব্যঞ্জনায় প্রকাশ করা সত্যিই সুন্দর। তরুণ মজুমদারের 'নিমন্ত্রণ' ছবির শেষ দৃশ্যে নোঙরকে মাটির বুক চিরে টেনে নিয়ে জলে নৌকো ভাসানোর প্রতীকটি নায়ক নায়িকার বিচ্ছেদ-মুহূর্তকে বিক্ষত রক্তিম করেছে আশ্চর্য ভাব-দ্যোতনায়।

আরও অনেক ছবিতেই শিল্পসার্থক প্রতীক প্রয়োগের বহু নিদর্শন ছড়িয়ে আছে। কিন্তু প্রতীক বস্তুটি আসলে কি এবং তার সুষ্ঠু ব্যবহার ছবিকে কি পরিমাণ বাঙ্ময় করে তোলে শুধুমাত্র দৃশ্য ব্যঞ্জনায়, তাই প্রতিপন্ন করতেই গুটি কয়েক দৃষ্টান্তের শুধু উল্লেখ করলাম এখানে।

প্রেক্ষাগৃহ

কিউবার চলচ্চিত্রশিল্প

কিউবাকে আপনাদের মনে আছে? সেই যে ছোট্ট দ্বীপটি আটলান্টিক সাগরের বুকে ভাসছে দক্ষিণ আমেরিকার উত্তর-পূর্ব বরাবর? সেই যে যে-দ্বীপ অভিমুখে রুশ-জাহাজকে আগুয়ান হতে দেখে আমেরিকার প্রেসিডেন্ট কেনেডি সাবধান-বাণী উচ্চারণ করে গর্জে উঠেছিলেন : কিউবা থেকে তফাত থাকো! কিউবাকে কিন্তু আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র দাবিয়ে রাখতে পারেনি। ফাইডেল ক্যাস্ট্রোর নেতৃত্বে কিউবা শেষ পর্যন্ত স্বাধীনতার পতাকাকে উড্ডীন করতে সমর্থ হয়েছে।

সেই কিউবার চলচ্চিত্রশিল্পের ইতিহাস কত আর দীর্ঘ হতে পারে? মাত্র দ্বাদশটি বছর পূর্ণ হয়েছে। —কিন্তু এই নবজাত শিশুর শক্তি দেখলে স্তম্ভিত হতে হয়, বিস্মিত হতে হয় এর বিচিত্র বিকাশ দেখে।

শিক্ষা ও সংস্কৃতির প্রথম জাতীয় মহাসম্মেলনের শেষে ১৯৭১-এর ৯ মে তারিখে সাম্যবাদী কিউবা সরকারের প্রধানমন্ত্রীরূপে ফাইডেল কাস্ট্রো যে-কথা বলেছেন, সে-কথা মনে রাখলে কিউবার ছবির বিস্ময়কর রূপ কি কারণে সম্ভব হয়েছে, তা জানবার কিছুটা সুযোগ পাওয়া যাবে। তিনি বলেছেন : কায়েমী স্বার্থ-বিশিষ্ট লোকেদের কাছে যা-কিছু তাদের আনন্দ দেয়, যা-কিছু তাদের জীবনের একঘেয়েমি থেকে মুক্তি দেয়, তারই নাকি নান্দনিক মূল্য আছে। কিন্তু যে কর্মী, যে বিপ্লবী, যে সাম্যবাদী, তার কাছে এইগুলি শিল্পবিচারের মাপকাঠি হতে পারে না। তার কাছে কোনো সাংস্কৃতিক ও নান্দনিক সৃষ্টির মূল্য নিরূপিত হবে জনগণের জন্যে তার উপযোগিতা দ্বারা, মানুষকে সে কি দান করল, তার দ্বারা, মানুষের মুক্তি ও সুখের জন্যে সে কি দান করে, তার দ্বারা। তাই সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে আমরা বৃহত্তর জনসাধারণকে কাজে লাগাতে চেয়েছি, অগণিত মানুষকে উপার্জনের মাধ্যমস্বরূপ শিল্পসৃষ্টির কাজে লাগাতে চেয়েছি। আমরা যদি জানি, সমগ্র জাতিকে সৃষ্টিশীল করবার সম্ভাবনা আছে, তাদের লেখক, শিল্পী, বুদ্ধিজীবীতে পরিণত করা যাবে, তাহলে আর চিন্তার কি আছে? সমগ্র জাতি! একেই তো বলি বিপ্লব, এরই নাম তো সমাজতন্ত্র, সাম্যবাদ!

জনশিক্ষার মাধ্যম হিসেবে বর্তমান শতাব্দীতে চলচ্চিত্রই হচ্ছে সর্বোত্তম শিল্পকলা। লেনিন বলেছেন, 'সকল শিল্পকলার মধ্যে চলচ্চিত্রই হচ্ছে সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ।'

আমাদের কাছে শিল্পকলা হচ্ছে বিপ্লবের হাতিয়ার।

কিউবার ছবি মেমোরিজ অফ আন্ডার ডেভেলপমেন্ট-এর একটি দৃশ্য

মিনার্ভা থিয়েটার কর্মী সংসদ প্রযোজিত প্রবাহ নাটকের একটি দৃশ্য

ইউথ পাপেট থিয়েটারের পুতুলনাচের দৃশ্য

আমাদের জনগণের সংগ্রামী প্রেরণা থেকে তার জন্ম।

শত্রুর অনুপ্রবেশের বিরুদ্ধে ব্যবহারের জন্যে অস্ত্র।

●

আমাদের কিউবার সংস্কৃতির সবচেয়ে বড়ো অর্জন হোলো এই সামাজিক বিপ্লব।

—শিল্পকলা সম্পর্কে এই বৈপ্লবিক চেতনা থেকে জন্মগ্রহণ করেছে বলেই কিউবার চলচ্চিত্র কি চিত্রগ্রহণ, কি শব্দ-যোজনা, কি সম্পাদনা, কি আবহসংগীত, কি সামগ্রিক পরিচালনা—সব দিক দিয়েই আমাদের কাছে সম্পূর্ণ অভিনব।

মাত্র ১৯৫৯ সালের ২৪ মার্চ বিপ্লবী সরকার অনুমোদিত আইন অনুসারে 'কিউবান ইনস্টিটিউট অব সিনেমা আর্ট' (আই-সি-এ-আই-সি) স্থাপিত হয়। আদর্শগত ও সাংস্কৃতিক কর্মপ্রচেষ্টা সম্পর্কে এইটিই হচ্ছে প্রথম বৈপ্লবিক আইন।

এই আইন বলছে : 'চলচ্চিত্র একটি শিল্পকলা।

এর বৈশিষ্ট্যগুণে চলচ্চিত্র একটি বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গীকে প্রতিফলিত করবার এবং ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত সচেতনতা বিকশিত করবার একটি যন্ত্র। চলচ্চিত্র গভীরতর ও স্পষ্টতর বৈপ্লবিক মানসিকতার বিকাশে এবং বৈপ্লবিক প্রেরণার পোষণে সাহায্য করতে পারে।

●

চলচ্চিত্রশিল্পের কাঠামো এমনই যে, এর জন্যে একদিকে যেমন উচ্চাঙ্গের কলা-কৌশলের, অন্যদিকে তেমনই আধুনিক জটিল ব্যবসায়িক সংস্থা ও বিচক্ষণ পরিবেশনার প্রয়োজন।

চলচ্চিত্র বিবেকের কাছে আবেদনের রূপ পরিগ্রহ করবে এবং অজ্ঞতা দূরীকরণে, সমস্যা সমাধানে, সমস্যা পূরণের বিভিন্ন প্রস্তাব উত্থাপনেও মানবসমাজের সমস্যাবলী সম্পর্কে আধুনিক ও নাটকীয় দৃষ্টিভঙ্গীর উপস্থাপনে যথেষ্ট সহায়তা করতে পারে।

—এই দৃষ্টিভঙ্গীকে অনুসরণ করে যথার্থ জাতীয় চলচ্চিত্রশিল্প গড়ে তুলেছেন কিউবা সরকার এবং প্রথম থেকেই তাঁদের ছবি যাতে আন্তর্জাতিক মান পর্যন্ত পেঁছুতে পারে, সেই উদ্দেশ্যে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে ত্রুটি করেননি। এর জন্যে পুঁথিগত ও ব্যবহারিক শিক্ষা দেওয়া হয়েছে খুব কড়াকড়িভাবে প্রত্যালয়ে। গেল দশ বছর ধরে চলচ্চিত্রকে জাতীয় বিপ্লবের সামিল করে চালনা করবার ফলেই কিউবার চলচ্চিত্র চলচ্চিত্রজগতে বৈপ্লবিক ভূমিকা গ্রহণ করতে সমর্থ হয়েছে। কিউবার চলচ্চিত্রশিল্প কিউবাবাসীর শতবর্ষব্যাপী বিপ্লবের সফল পরিণতির সঙ্গে ওতপ্রোত-ভাবে জড়িত।

কিউবার চলচ্চিত্রকারেরা—পরিচালক, আলোকচিত্রশিল্পী, চিত্রনাট্যলেখক, সম্পাদক, সঙ্গীত-রচয়িতা—অপর দেশের বিখ্যাত কুশলী কর্মীদের সঙ্গে কাজ করবার এবং তাঁদের কাছ থেকে শিক্ষালাভের সুযোগ পেয়েছেন। অনেক সময়ে তাঁদের কারুর বক্তৃতা শুনেছেন, তাঁদের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করেছেন। নীতিগতভাবে কিউবার বিপ্লবাত্মক কর্মসূচীর সঙ্গে যোগ রেখে দৃঢ়ভাবে প্রাণপাত পরিশ্রম করে কাজ চালিয়ে আ-সি-এ-আই-সি (কিউবান ইনস্টিটিউট অব সিনেমা আর্ট) গেল ১৯৬০ থেকে ১৯৬৮-র মধ্যে উৎপাদন করেছে :

পূর্ণদৈর্ঘ্য ও মধ্যদৈর্ঘ্য ছবি.....	৪৪টি
তথ্যমূলক ছবি...........	২০৪ „
শিক্ষামূলক ছবি...........	৭৭ „
কার্টুন ছবি..............	৪৯ „
সাধারণ জ্ঞানবিষয়ক ছবি.....	৯৪ „
ল্যাটিন-আমেরিকান সংবাদচিত্র......	৪৩৫ „

১৯৫৯ ও ১৯৬১ সালের মধ্যে তৈরী হয়েছিল : দিস ল্যান্ড অব আওয়ার্স, ফরগটন্ ল্যান্ড, কুসংস্কার, গৃহসমস্যা, জাতিবৈষম্য, হিস্ট্রি অব এ ব্যাটল, অ্যান্ড আই বিকেম এ টীচার, এভরি ফ্যাক্টরী এ স্কুল প্রভৃতি।

কিউবার চলচ্চিত্র ইতিমধ্যেই নানা আন্তর্জাতিক পুরস্কার লাভ করেছে। লিপজিগ তথ্যচিত্র ও স্বল্পদৈর্ঘ্য চিত্রের আন্তর্জাতিক উৎসব এবং লণ্ডন, কার্লভি ভেরী, ভারত, মস্কো প্রভৃতির আন্তর্জাতিক উৎসব কিউবার চলচ্চিত্রকে স্বীকৃতি দান করেছে।

আই-সি-এ-আই-সির সাংস্কৃতিক বিভাগ হিসেবে ১৯৬০ সালে সিনেমাথেক অব কিউবা স্থাপিত হয়ে আইজেনস্টাইন, চ্যাপলিন, দে সিকা, ফোর্ড, রেনী ক্লেয়ার, পুডভকিন, মুর্নো, প্যাবস্ট, রোসেলিনী, ফ্রিজ ল্যাং, অর্সন ওয়েলস্, কুরোসাওয়া, ভিগো, সিয়োস্ট্রোম, বুনুয়েল, ভিস্কণ্টী, আইভেন্স, বেয়ারম্যান, হিচকক, আন্ত-নিওনি, ডেভিড লীন, বার্দেম, সত্যজিৎ রায় প্রভৃতি জগদ্বিখ্যাত চলচ্চিত্রকারদের ছবি সংগ্রহ করেছে। বর্তমানে কলকাতায় কিউবা চলচ্চিত্রোৎসব অনুষ্ঠিত হয়ে গেল।

স্টুডিও থেকে

পুজোয় 'ছোটি বহু' :

শরৎচন্দ্রের অমর কাহিনী 'বিন্দুর ছেলে'র হিন্দী রূপ 'ছোটি বহু' নামে মুক্তিলাভ করছে কলকাতার দুর্গাপুজোর মরশুমে। ডিল্যাক্স প্রোডাকসন্স নিবেদিত, দারিয়াস গোটলা ও সিরু দরিয়ানী প্রযোজিত এই ইস্টম্যান কলারে তোলা ছবিটির পরিচালনা করেছেন কে বি তিলক। এর বিভিন্ন ভূমিকায় আছেন শর্মিলা ঠাকুর, রাজেশ খান্না, নিরুপা রায়, শশিকলা, আই এস জোহর, মাস্টার সুরজ, ছোট মেহমুদ, চন্দ্রিমা ভাদুড়ী, মধুমতী প্রভৃতি শিল্পী। সুরযোজনা করেছেন কল্যাণজী আনন্দজী। চিত্রনিকেতন ছবিটির পরিবেশক।

পরলোকে জয়কিষেণ :

বিখ্যাত সুরকার-জুটি শঙ্কর-জয়কিষেণ-এর অন্যতম জয়কিষেণ পানচাল কিছুদিন ধরে হাসপাতালে চিকিৎসিত হবার পরে ১২ সেপ্টেম্বর, রবিবার মাত্র বিয়াল্লিশ বছর বয়সে পরলোকগমন করেছেন।

জয়কিষেণের জন্ম হয় বুলসারে। চলচ্চিত্রজগতে যোগ দেবার আগে তিনি পৃথ্বিরাজ কাপুর পরিচালিত ও প্রতিষ্ঠিত 'পৃথ্বী থিয়েটার'-এর সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। পৃথ্বিরাজ-পুত্র রাজকাপুরের আগ্রহে তিনি চলচ্চিত্রজগতে পদার্পণ করেন এবং 'বরসাত' ছবিতে প্রথম সঙ্গীত-পরিচালনা করেন।

তাঁর স্ত্রী ও তিনটি সন্তানকে শোকসাগরে ভাসিয়ে তিনি অকালে ইহজগৎ থেকে বিদায় নিলেন।

আমরা তাঁর আত্মার শান্তি কামনা করি।

প্রেম ও অপ্রেম

একটি প্রেমের জটিল বিবর্তনকে কেন্দ্র করে চারজন মানুষের চতুষ্কোণ বিশ্লেষণের ভিত্তিতে রচিত হয়েছে 'প্রেম ও অপ্রেম'র চিত্র কাহিনী। চিত্রনাট্য রচনা ও পরিচালনার ভার নিয়েছেন বিমল ভৌমিক। প্রযোজনার দায়িত্ব গ্রহণ করেছে স্প্যান প্রোডাক্সন্স। আসছে ১৮ সেপ্টেম্বর থেকে ছবিটির দ্বিতীয় পর্যায়ের সুটিংয়ের প্রধান শিল্পীদের মধ্যে থাকবেন মাধবী চক্রবর্তী, সুব্রতা চট্টোপাধ্যায়, তরুণকুমার, নির্মলকুমার ও স্বপন রায়। ছবিটির অধিকাংশই বহির্দৃশ্যে গৃহীত হবে।

'খুঁজে বেড়াই' : পুজোর আকর্ষণ

এই দশকের জীবন-যন্ত্রণাকে কেন্দ্র করে পীতালি পিকচার্স নিবেদিত 'খুঁজে বেড়াই' পুজো-আকর্ষণরূপে রূপবাণী,

ভারতী ও অরুণায় মুক্তিলাভ করবে। ছবির কাহিনীকার সলিল দত্তই চিত্রনাট্য, সংলাপ ও পরিচালনার দায়িত্ব নিয়েছেন। সংগীত, চিত্রগ্রহণ ও সম্পাদনায় আছেন যথাক্রমে রবীন চট্টোপাধ্যায়, বিজয় ঘোষ ও অমিয় মুখোপাধ্যায়।

নায়ক-নায়িকার চরিত্রে রূপদান করেছেন সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় ও অপর্ণা সেন। অনিল চট্টোপাধ্যায় একটি বিশিষ্ট চরিত্রের রূপকার। অন্যান্য চরিত্রে আছেন বিকাশ রায়, উৎপল দত্ত, দিলীপ রায়, আনন্দ মুখোপাধ্যায়, তরুণকুমার, সুনীলেশ ভট্টাচার্য, শোভা সেন এবং জুঁই বন্দ্যোপাধ্যায় ও আরো অনেকে।

পরিবেশনার দায়িত্ব নিয়েছেন এস বি ফিল্মস।

মহাপূজায় মাতৃ-আবির্ভাব : 'ত্রিনয়নী মা'

রূপঋষি চিত্রম নিবেদিত দেবী-মাহাত্ম্য অবলম্বনে 'ত্রিনয়নী মা' মহাপূজার লগ্নেই মুক্তি পাচ্ছে। ভক্তিরসাপ্লুত ছবিটির প্রযোজনা করেছেন হৃষিকেশ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং পরিচালনার দায়িত্ব পূর্ণেন্দু রায়-চৌধুরীর। সংগীত পরিচালনা, চিত্রনাট্য ও সংলাপ এবং সম্পাদনার দায়িত্ব নিয়েছেন যথাক্রমে অনিল বাগচী, বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্র ও অমিয় মুখোপাধ্যায়।

গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, কমল মিত্র, অজিত বন্দ্যোপাধ্যায়, অসিতবরণ, পদ্মা দেবী, শমিতা বিশ্বাস ও নবাগতা রূপা ছবির প্রধান শিল্পীবৃন্দ। নৃত্যে: দেবপ্রিয়া (মাদ্রাজ)।

ছবিটির পরিবেশনা করছেন এ্যালায়েড ফিল্ম ডিস্ট্রিবিউটার্স।

মঞ্চাভিনয়

সায়ম

দঃ কলকাতার 'সায়ম' গোষ্ঠী গেল ৫ই সেপ্টেম্বর রবিবার 'মুক্ত অঙ্গনে' দুটি একাঙ্ক নাটক সাফল্যের সঙ্গে মঞ্চস্থ করলেন। প্রথমটি অমিয় মিত্রের 'রিদম' এবং দ্বিতীয়টি সুভাষ বসুর 'মিছিল'।

নোরা র‍্যাটক্লিফের 'উই গট রিদম' নাটক অবলম্বনে রচিত এই 'রিদম' নাটকে বর্তমান যুগের সামাজিক, অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিক পটভূমিকায় লেখক যে, যুগোপযোগী বক্তব্য তুলে ধরেছেন, প্রতিটি চরিত্রের ভিতর দিয়ে সেই বক্তব্য খুব স্পষ্ট এবং সাবলীলভাবে অভিনেতারা ফুটিয়ে তুলতে সক্ষম হয়েছেন।

কিছু 'টেকনিক্যাল' ভুল ভ্রান্তি থাকা সত্ত্বেও বলিষ্ঠ অভিনয়ের দরুণ সেগুলি দর্শকদের কাছে প্রাধান্য লাভ করতে পারে নি। বিশেষ ভাবে সুজয়ের ভূমিকায় সৌমেন চট্টোপাধ্যায়, বৃদ্ধের ভূমিকায় সলিল ঘোষ এবং আদর্শবাদীর ভূমিকায় প্রীতিনাথ চৌধুরীর অভিনয় প্রশংসনীয়। সুনীল মুখোপাধ্যায় নাটকটির নির্দেশনায় ছিলেন।

বনফুল/ববিতা/পরিচালনা : বিজয় ভাট্ ফটো : অমৃত।

জটিল জিজ্ঞাসা/উত্তমকুমার এবং কুমার রায়। পরিচালনা পীযূষ বসু। ফটো : অমৃত।

সীমাবদ্ধ/বরুণ চন্দ ও শর্মিলা ঠাকুর/পরিচালনা : সত্যজিৎ রায় ফটো : অমৃত।

অপর নাট্য প্রযোজনা সুভাষ বসু রচিত 'মিছিল' নাটকটির মধ্য দিয়ে লেখক সাম্প্রতিক কালের বিভিন্ন সমস্যার কথা সুন্দর ভাবে পেশ করেন। অভিনয় দক্ষতায় নাটকটির মূল বক্তব্য অত্যন্ত সহজ ও স্বাভাবিকতার সঙ্গে দর্শকগণের মন জয় করতে সক্ষম হয়।

দক্ষতার পরিচয় দেন মধুর ভূমিকায় মানবেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, রাধুর ভূমিকায় শম্ভু ভট্টাচার্য এবং সতীশবাবুর ভূমিকায় সুনীল মুখোপাধ্যায়। নাট্য নির্দেশনায় ছিলেন শ্রীপ্রীতি প্রতিম।

ক্লাস থিয়েটারের নতুন প্রযোজনা 'সওয়াল'

'শৃংখল' নাটকটির অভাবনীয় সাফল্যের পর ক্লাস থিয়েটারের নতুন প্রযোজনা 'সওয়াল' মঞ্চস্থ হবে মুক্তাঙ্গনে আসছে ২৪ সেপ্টেম্বর ও ১৫ নভেম্বর। ১৯২৯ সালের ঐতিহাসিক মীরাট ষড়যন্ত্র মামলার পট ভূমিকায় রচিত নাটকটির নির্দেশনায় আছেন নিমাই ঘোষ।

স্টেট ব্যাঙ্ক (হাওড়া শাখা) দ্বারা "সাহেব-বিবি-গোলাম"-এর অভিনয়

সম্প্রতি বিমল মিত্রের বহু পঠিত জনপ্রিয় উপন্যাসের এক সুন্দর নাট্যরূপ উপহার দিলেন "স্টেট ব্যাঙ্ক"-এর (হাওড়া শাখা) সভাবৃন্দ "স্টার রঙ্গালয়ে"।

শিল্পীদের দলগত অভিনয়ের ফলে নাটকটির পরিবেশনা খুব উচ্চাঙ্গের হয়। কয়েকটি দৃশ্যের উপস্থাপনায় পরিচালক কালী দে বিশেষ কৃতিত্বের স্বাক্ষর রাখেন। সংগীতের সুকল্পিত ব্যবহার সত্যই চমৎকার।

অভিনয়াংশে প্রথমেই কৃতিত্বের দাবী রাখেন পটেশ্বরীর চরিত্রে বাসন্তী চট্টোপাধ্যায়। শিল্পীর কণ্ঠের গান ঐদিন নাটক পরিবেশনার অন্যতম বিশেষ অংশ বলে অভিহিত করা যায়। এরপরেই ভূতনাথ চরিত্রাভিনেতা বিভাস রায়চৌধুরীর নাম বিশেষভাবে উল্লেখের দাবী রাখে। এই চরিত্রে তিনি যে ভাবরসের সৃষ্টি করেন তা সত্যই অনবদ্য। এরপরেই শশাঙ্ক রায়-চৌধুরীর (কৌস্তভমণি) ও সুধীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়ের (বদ্রিকা) উল্লেখযোগ্য চরিত্র সৃষ্টি। কমলেশ মুখোপাধ্যায় (বংশী), সমরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী (সুবিনয়বাবু) ও রেণু বসুমল্লিকের (মেজবৌ) অভিনয় খুবই উচ্চাঙ্গের হয়। অন্যান্য চরিত্রে হিমাংশু চট্টোপাধ্যায়, অঞ্জলি চট্টোপাধ্যায়, কল্পনা মুখোপাধ্যায়, অচিন্ত্য বন্দ্যোপাধ্যায় ও তিমিরবরণ দত্ত সুঅভিনয় করেন।

অগ্রগামীর 'কেদার রায়'

অগ্রগামীর পঞ্চম নিবেদন রমেশ গোস্বামী রচিত 'কেদার রায়' বিশ্বরূপা রঙ্গমঞ্চে অভিনীত হয় ৫ সেপ্টেম্বর। নাট্যাভিনয়ে অগ্রগামী গোষ্ঠীর শিল্পীরা উল্লেখযোগ্য কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন। শ্রীমন্তের ভূমিকায় শম্ভুনাথ সিনহা অভিনয় দক্ষতার গুণে দর্শকসাধারণকে মুগ্ধ করেন। অন্যান্য চরিত্রাভিনয়ে সব্যসাচী মুস্তাফী (চাঁদ রায়), স্বপন সেনগুপ্ত (কেদার রায়), সুব্রত সাহা (কালু সর্দার), অরুণ মিত্র (কার্ভালো), পুষ্পেন্দু মুখোপাধ্যায় (সোনা) বিশেষ কৃতিত্বের পরিচয় দেন। নেপথ্য সংগীতে নীলিমা সেনগুপ্তের দক্ষতা লক্ষ্য করার মতো। মঞ্চ স্থাপনা ভালো। তপন সেনগুপ্ত এবং শম্ভুনাথ সাহার ব্যবস্থানৈপুণ্যে অনুষ্ঠানটি সুষ্ঠু-ভাবে সম্পন্ন হয়।

থিয়েতর লাইবরের 'পৃথিবীর কণ্ঠস্বর':

থিয়েতর লাইবরের প্রযোজনায় প্রতাপ মেমোরিয়াল হলে সম্প্রতি অভিনীত হল 'পৃথিবীর কণ্ঠস্বর'। জাহির রয়হানের 'লেট দেয়ার বি লাইটে'র অনুপ্রেরণায় পরিচালক ধূর্জটিপ্রসাদ ভট্টাচার্য, স্বয়ং নাটকটি রচনা করেন বাংলাদেশের পটভূমিকায়। বাংলাদেশের ঘটনাবলীর সঙ্গে আন্তর্জাতিক ব্যভিচার, অত্যাচার, বর্বরতা ও মুক্তিকামী ইতিহাসের যে নিগূঢ় সম্পর্ক আছে তা পরিস্ফুট হয়ে উঠেছে এই নাটকে বিভিন্ন শিল্পীর অভিনয়গুণে। এদের দলগত অভিনয়ও প্রশংসার দাবী রাখে। বর্বর অত্যাচারের দৃশ্যটি এতই নিখুঁত এবং মর্মান্তিক হয়ে উঠেছে যে প্রত্যেকটি দর্শককেই মনে করিয়ে দেয় আজকের বাংলাদেশের মুক্তিকামী ভাইদের ওপর জঙ্গী শাসকদের নিষ্ঠুর পীড়নের কথা।

অভিনয়ের ব্যাপারে বৃদ্ধের ভূমিকায় ধূর্জটিপ্রসাদ ভট্টাচার্য, 'মায়ে'র ভূমিকায় শ্রীমতী তিলোত্তমা ভট্টাচার্য, রোগসাহেব ও মেজর কায়ুমের চরিত্রে অশেষ দে বৈশিষ্ট চিহ্নিত অভিনয় প্রতিভার নজীর রাখেন।

এ ছাড়াও অন্যান্য চরিত্রে ছিলেন শ্রীমতী লিলি ভট্টাচার্য, বিমল রায়,

দীপঙ্কর দাশগুপ্ত, দেবজ্যোতি রায়-চৌধুরী, শ্যামল ভট্টাচার্য, দিলীপ চট্টোপাধ্যায়, সজল দে, তপন গাঙ্গুলী, সমীর রায়চৌধুরী, শচীন বড়াল, অনিল দাস এবং রামগোপাল গোস্বামী।

পাঞ্চজন্য'র নাট্যাভিনয় ঃ

আসছে ১৯ সেপ্টেম্বর, রবিবার সকাল ১০টায় 'পাঞ্চজন্য' নাট্য সংস্থা 'বখাটে' নামক নাটকটিকে মঞ্চস্থ করবেন বন্দনা প্রেক্ষাগৃহে। নাটকটি পরিচালনা করবেন মণ্টু গুপ্ত।

বিবিধ সংবাদ

মজিলপুরে দুশো বছরের বার্ষিক উৎসব

চারদিকে আজ ভাঙচুর আর পালা-বদলের পালা। পুরনো যা কিছু সবই যেন ভেঙ্গে ভেঙ্গে পড়ছে. সব কিছুই কেমন যেন ফিকে আর হতশ্রী হয়ে যাচ্ছে। সংস্কার আর বিশ্বাসের ভিত্তিভূমি কালের প্রহারে আলগা হয়ে গেছে।

তবু এই ভাঙচুর আর অবিশ্বাসের বন্যা বেগ এড়িয়ে বাংলার নিজস্ব ধর্ম-উৎসবের শাশ্বত ধারা অব্যাহতভাবে বহে চলেছে আজও আপন বিশ্বাসে মর্যাদায় ও প্রাণৈশ্বর্যে—মজিলপুরের প্রখ্যাত দত্ত-বাড়ির প্রায় দুশো বছরের গৃহদেবতা শ্রীশ্রীগোপালজিউ ও শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ জীউ বলেন, জন্মাষ্টমী ও নন্দোৎসব দেখতে দেখতে বারবার এই কথাই অনুভূত হচ্ছিল।

উৎসব হয়েছে তিনদিন ঃ ৬ই, ১৩ই ও ১৪ আগস্ট। আড়ম্বরের সঙ্গে অনুষ্ঠিত এই উৎসবে যোগ দিয়েছিলেন অসংখ্য মানুষ। উৎসবের নানান—প্রধানত পূজাপাঠ ও হোমযজ্ঞ। এছাড়াও ছিল 'সুবল মিলন' ও 'নিমাই সন্ন্যাস' গীতাভিনয়। ১৩ ও ১৪ আগস্ট ভবানীপুরের আদি কৃষ্ণলীলা নাট্য-সমাজ অত্যন্ত কৃতিত্বের সঙ্গে এই পালা দুটি রূপাভিনয় করেন। রসের বিচারে ও উপভোগ্যতার দিক দিয়ে পালা দুটি হয়েছিল সর্বাঙ্গসুন্দর।

পশ্চিম বাংলার দক্ষিণ অঞ্চলের এক-কালীন সংস্কৃতি আন্দোলনের পীঠভূমি ছিল মজিলপুরের এই দত্তবাড়ি। এককালে সাহিত্য-সংস্কৃতির স্মরণীয় পুরুষেরা—ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র, কবি অতুলপ্রসাদ প্রমুখ এই ধরনের উৎসবে উপস্থিত থাকতেন। 'কালিদাসের কাল' শেষ হয়ে গেলেও মজিলপুরের দত্তবাড়ি পুরানো ঐতিহ্য ও উৎসবের ধারাকে আজও অব্যাহত রাখতে পেরেছেন—এইটাই আজকের তমসায় আলোকশিখার কাজ করবে।

দক্ষিণীর বার্ষিক সমাবর্তন উৎসব

আসছে ১৯ সেপ্টেম্বর, রবিবার সকাল সাড়ে দশটায় কলা-মন্দিরে দক্ষিণী'র বার্ষিক সমাবর্তন-উৎসব অনুষ্ঠিত হবে। উৎসবে সৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর ভাষণ দেবেন ও স্নাতকদের যোগ্যতাপত্র বিতরণ করবেন।

এই উপলক্ষ্যে রবীন্দ্রসঙ্গীতের একটি বিশেষ অনুষ্ঠান পরিবেশিত হবে যাতে দক্ষিণীর শতাধিক শিক্ষার্থী অংশ গ্রহণ করবে।

পরলোকে অমিয় সেন

উত্তর কলিকাতার আদর্শ শিশু বিদ্যালয় 'মুকুল বীথি'র প্রতিষ্ঠাতা অমিয় সেন গেল বুধবার ২৫ আগস্ট তারিখে পরলোকগমন করেন।

১৯২১ সালের ২৫ ডিসেম্বর শ্রীসেন বরিশাল জেলার গৈঠিয়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। ছেলেবেলা থেকেই তিনি ছিলেন মেধাবী, স্পষ্টবাদী দৃঢ়চেতা ও দেশ-প্রেমিক। গৈঠিয়া হাইস্কুল থেকে ম্যাট্রিকু-লেশন পাশ করবার পরে তিনি কৃতিত্বের সঙ্গে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইতিহাস ও দর্শন শাস্ত্রে এম-এ পাশ করেন। তাঁর পত্নী শ্রীমতী রেণুকা সেনও উচ্চ-শিক্ষিতা। বিবাহের পর থেকেই শ্রী ও শ্রীমতী সেন আমাদের দেশের শিশুদের জন্যে একটি আদর্শ বিদ্যালয় স্থাপনের সংকল্প করেন এবং একই সঙ্গে ইংল্যান্ডে 'লীডস বিশ্ববিদ্যালয়' থেকে শিশুশিক্ষা বিষয়ে স্নাতক হয়ে পাশ্চাত্য দেশের বিভিন্ন শিশুশিক্ষা পদ্ধতি সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান লাভ করবার জন্য বিভিন্ন দেশ পরিভ্রমণ করেন এবং ১৯৫৬ সালে দেশে ফিরে 'মন্তেসরী' প্রথায় ভাবধারায় 'মুকুলবীথি' শিশু বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন। মৃত্যুকালে নিঃসন্তান শ্রীসেন তাঁহার স্ত্রী শ্রীমতী রেণুকা সেন, বহু আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব ও বিদ্যালয়ের সন্তানসম ছাত্র-ছাত্রী-দের রেখে গেছেন।

থিয়েটার ওঅর্কশপ-এর দিল্লী অভিযান

কলকাতার প্রখ্যাত নাট্যসংস্থা থিয়েটার ওঅর্কশপ এই প্রথম দিল্লী যাচ্ছেন। দিল্লী কালীবাড়িতে আসছে ২৯ সেপ্টেম্বর তাঁদের মঞ্চসফল সাম্প্রতিকতম প্রযোজনা মোহিত চট্টোপাধ্যায়ের 'রাজরক্ত' মঞ্চস্থ হবে। দিল্লী থেকে ফিরে এসে থিয়েটার ওঅর্কশপ নতুন প্রযোজনায় কাজ শুরু করবেন পূর্ণোদ্যমে।

বলাকা ঃ উত্তর কলকাতার বিশিষ্ট সাংস্কৃতিক সংস্থা 'বলাকা'র বার্ষিক মিলনোৎসব উপলক্ষ্যে গত ৩০ আগস্ট সোমবার সন্ধ্যায় রঙমহল থিয়েটারে যে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানটি উদযাপন করা হয়, তার মধুর স্মৃতি সেদিনের পূর্ণ প্রেক্ষা-গৃহের অগণিত শ্রোতা বহুকাল স্মরণে রাখবেন সন্দেহ নেই। সমগ্র অনুষ্ঠানটি দুটি পর্যায়ে বিভক্ত ছিল। প্রথম পর্যায়ে গুণীজন সম্বর্ধনা, দ্বিতীয় পর্যায়ে জরা-সন্ধ রচিত 'লৌহকপাট' নাটকের অভিনয়। গুণীজন সম্বর্ধনা অনুষ্ঠানে প্রখ্যাত সাহিত্যিক গজেন্দ্রকুমার মিত্র ও ভারতীয় ফুটবল দলের প্রাক্তন অধিনায়ক শৈলেন মান্নাকে সম্বর্ধিত করা হয়। অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি ছিলেন ডাঃ দিলীপ মালাকার প্রধান অতিথি ডঃ রমা চৌধুরী, অনুষ্ঠান সভাপতি বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্র ও উদ্বোধক প্রখ্যাত সাহিত্যিক জরাসন্ধ।

শ্রাবণ সন্ধ্যায়/পরিচালনা ঃ প্রান্তিক/উৎপল দত্ত, সুমিত্রা মুখোপাধ্যায় এবং বনানী চৌধুরী।		ফটো ঃ অমৃত।

মঞ্চে অন্যান্য বিশিষ্ট অতিথিদের মধ্যে ছিলেন অভিনেত্রী ছায়া দেবী ও বাংলাদেশের প্রখ্যাত সাংবাদিক শ্রীএম আর আখতার। বিশিষ্ট বক্তাদের মনোরম আলোচনা ও ভাষণে সমগ্র অনুষ্ঠানটি প্রাণবন্ত হয়ে ওঠে। 'বলাকা'র সদস্যদের 'লৌহকপাট' অভিনয় সকলের মনোরঞ্জন করেছিল। অপেশাদার দলের প্রচেষ্টা সফল বলা চলে।

পলিডর রেকর্ডে মহাপূজায় বাংলা গান :

পলিডর রেকর্ড কোম্পানী ইংরাজী ও হিন্দী ফিল্ম সঙ্গীতের মাধ্যমে ইতিমধ্যেই যথেষ্ট জনপ্রিয়তা অর্জন করেছেন। এবার পূজোর বিশেষ উল্লেখযোগ্য খবর পলিডর রেকর্ডে সর্বপ্রথম বাংলা গানের প্রকাশ।

পলিডর শারদডালি সাজিয়েছেন আটটি রেকর্ডে। যার মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখ করার দাবী রাখে এল, পি রেকর্ডে 'শ্রীশ্রীদুর্গাপূজো'। বিশুদ্ধ মন্ত্রোচ্চারণে, পূজোর বাদ্যধ্বনিসহকারে ভাবমধুর ভক্তিগীতি মনে আনে এক অপূর্ব চেতনা।

পলিডর আরও যেসব শিল্পীর গান উপহার দিচ্ছেন তাঁদের মধ্যে রয়েছেন : সনৎ সিংহ (দুটি কাব্যগীতি), জপমালা ঘোষ (দুটি ছড়া-গান), প্রশান্ত ভট্টাচার্য (বাংলা আধুনিক গান), কুমকুম চট্টোপাধ্যায় (আধুনিক), ইন্দ্রাণী গঙ্গোপাধ্যায় (আধুনিক)। শ্রীবটুক নন্দী ইলেকট্রিক গীটারে বাজিয়েছেন চারটি দেশাত্মবোধক গানের সুর পলিডর এক্‌সটেনডেড প্লে রেকর্ডে।

প্রখ্যাত সুরকার শ্রীসলিল চৌধুরীর রচনা ও সুরে গান গেয়েছেন বোম্বাই-প্রবাসী নতুন শিল্পী মানস মুখোপাধ্যায়।

পলিডর নিয়মিত বাংলা গান, কবিতা, নাটক ইত্যাদি প্রকাশের প্রতিশ্রুতি দিচ্ছেন।

গীতিমাল্যের বাৎসরিক উৎসব :

গীতিমাল্যের বাৎসরিক উৎসব গেল ১৪ সেপ্টেম্বর, মঙ্গলবার সন্ধ্যা ৭টায় মহাজাতি সদনে অনুষ্ঠিত হয়েছে। এই উপলক্ষ্যে সংস্থার পক্ষ থেকে শিশুববরেণ্য উদয়শঙ্করকে সশ্রদ্ধ সংবর্ধনা জ্ঞাপন করা হয়েছে এবং রবীন্দ্রনাথের 'শাপমোচন' নৃত্যনাট্যটি মঞ্চস্থ করেছেন সংস্থার শিল্পিবৃন্দ। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেছিলেন ডঃ রমা চৌধুরী ও প্রধান অতিথির আসন গ্রহণ করেছিলেন সৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

'নূপুর ধ্বনি'র নৃত্যনাট্য

গত ২৮ আগস্ট তারিখে বালিগঞ্জ শিক্ষাসদন হলে "নূপুর ধ্বনি" সংস্থা আয়োজিত "শিল্পী" নৃত্যনাট্য অনুষ্ঠিত হয়। নৃত্যনাট্যটি পরিচালনা করেন শ্রীমতী ছায়া হালদার। প্রধান ভূমিকায় শ্রীমতী ছায়া হালদার, দীপিকা দাশ ও সুব্রতা রায়ের ভূমিকা উল্লেখযোগ্য। অন্যান্য ভূমিকায় ছিলেন কুমারী শিখা মুস্তাফি, গোপা দে সরকার, পার্বতী দাস ও অমৃতা মিত্রের নৃত্য উল্লেখ করবার মতো।

বিদেশে ইউথ পাপেট থিয়েটার

ইউথ পাপেট থিয়েটার, ইণ্ডিয়া 'পাপেট ফেস্টিভ্যাল' ও 'কনফারেন্সে' যোগদানের উদ্দেশ্যে আমেরিকার সঙ্গীত নগরী ন্যাসভিল-এ যাত্রা করেন গত ২ আগস্ট। সেখানে বিমানবন্দরে রাত্রি ১১টায় ভারতীয় এই সংস্থাকে স্বাগত জানাবার জন্য উপস্থিত ছিলেন স্বয়ং 'ফেস্টিভ্যাল চেয়ারম্যান' টমাস এইচ, নানকারভিস এবং আরও অনেকে।

শ্রীসুমন্ত চট্টোপাধ্যায় ৫ আগস্ট সকাল ৯টায় উৎসব কমিটি কর্তৃক আহূত হয়ে ইউথ পাপেট থিয়েটার-এর পক্ষে বেতার সাক্ষাতকারে অংশ গ্রহণ করেন সুমন্ত চট্টোপাধ্যায়— আরও দুই দেশের প্রতিনিধি শ্রীমতী ভায়লেট ফিলপট (ব্রিটেন) ও টম টিচেনার (আমেরিকা)-এর সহযোগে। বিষয় বস্তু ছিল—ভারতীয় পুতুলনাচের ঐতিহ্যের পরিপ্রেক্ষিতে পুতুলনাচের শিক্ষাগত যোগ্যতার মূল্য রূপায়ণ। এছাড়া ভারতীয় পুতুলনাচের অতীত ও বর্তমান বিশ্লেষণ। সাক্ষাৎকারটি ওখানকার বেতারে প্রচারিত হয় ৮ আগস্ট। ৬ আগস্ট সন্ধ্যা সাড়ে ৭টায় শুরু হয় আলোচনাচক্রের উদ্বোধন উৎসব। সভাপতির ভাষণে এই 'কনফারেন্স'ও ফেস্টিভ্যালের তাৎপর্য বিশ্লেষণের পরে, অংশগ্রহণকারী ১৫টি দেশের প্রতিনিধিদের মধ্যে থেকে ভারতের প্রতিনিধি ইউথ পাপেট থিয়েটারের দলনেতা হিসাবে শিশিরকুমার বিশ্বাস আহূত হন সেই উদ্বোধনী সভায় তাঁর বক্তব্য উপস্থাপিত করবার জন্যে। আলোচনাচক্র চলে ৬ আগস্ট থেকে ১৩ আগস্ট পর্যন্ত। ১৪ আগস্ট উৎসব কমিটির বিশেষ অনুরোধে আমেরিকান কম্যুনিটির জন্যে চিল্ড্রেনস থিয়েটার হলে ইউথ পাপেট থিয়েটার পুতুলনাচের একটি বিশেষ অনুষ্ঠান করেন। অনুষ্ঠানটি সর্বশ্রেণীর দর্শক তথা শ্রোতাদের দ্বারা ভীষণভাবে সমাদৃত হয়। স্থানীয় সংবাদপত্রের ভাষায়—

"Cleverly manipulated ....Verbal economy"

১৫ থেকে ২০ আগস্ট পর্যন্ত চলে আমেরিকা ও বিভিন্ন অতিথি দেশগুলির পুতুলনাচের উৎসব। এই উৎসবে অংশ গ্রহণ করেন পৃথিবীখ্যাত বহু পেশাদার 'পাপেট' গোষ্ঠী ও 'পাপেটিয়াস' যার মধ্যে উল্লেখ্য—রাশিয়ার সার্গেই ওব্রাদজভ, পঃ জার্মানীর আলব্রেস্ট রোসার, আমেরিকার জিম হেনসন, হল্যাণ্ডের শ্রীমতী বেক, কানাড়ার কেন ম্যাকে প্রভৃতি। ১৯ আগস্ট তারিখে উক্ত উৎসবে ইউথ পাপেট থিয়েটার দুটি এক ঘণ্টাব্যাপী অনুষ্ঠান করেন —এই অনুষ্ঠানে অংশ গ্রহণের নিয়মানুযায়ী। বলাই বাহুল্য, দুটি অনুষ্ঠানই চিত্তাকর্ষক হওয়ার ফলে অত্যন্ত সমাদৃত হয় চতুর্দিকে ধন্যবাদ ও করতালির মাধ্যমে এবং ফলশ্রুতি স্বরূপ আমেরিকান গভর্নমেণ্টের ইনফরমেশন এজেন্সী, তাদের অনুষ্ঠানে টেলিভিশন-এ প্রদর্শনীর জন্য 'টেলিভিশন ক্যামেরা' ও 'টেপ'-এ অনুষ্ঠানটি ধরে রাখেন। জানানো হয়েছে—ভারতীয় ওই পুতুলনাচটি টেলিভিশনে সমগ্র পৃথিবীব্যাপী নেটওয়ার্কে প্রদর্শন করা হচ্ছে এই সেপ্টেম্বরের প্রথম সপ্তাহ থেকেই। বলে রাখা ভালো, এই দুর্লভ সম্মান লাভ করেছে একমাত্র ভারতীয় দল ইউথ পাপেট থিয়েটার।

ভারতীয় 'টেলিভিশন' নেটওয়ার্কে সেপ্টেম্বরের দ্বিতীয় বা তৃতীয় সপ্তাহে দেখা যাবে বলে আশা করা যাচ্ছে। ৬ থেকে ২০ আগস্ট পর্যন্ত ভারতীয় পাপেট গোষ্ঠীটি বিভিন্ন আলোচনাচক্রে অংশ গ্রহণ করে, 'এডুকেশন ইন পাপেট্রি' ওয়ার্কশপে যোগ দেয় ও 'পাপেট' সংক্রান্ত সর্ব বিষয়ে সর্বদেশীয়দের সঙ্গে পারস্পরিক আদান-প্রদানের মাধ্যমে, দেশীয় সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের কথা স্মরণে রেখে বিশ্ব ভ্রাতৃত্বের ও প্রীতির বন্ধন দৃঢ় করার চেষ্টায় নিযুক্ত হয় এবং উদারভাবে শিক্ষণীয় বিষয় গ্রহণ ও প্রদান করে। এখানেই বিশ্ববিখ্যাত পাপেটিয়ার্স—যথা, পশ্চিম জার্মানীর রোসার, চেকোশ্লোভাকিয়ার ডাঃ জান মালিক, রাশিয়ার সার্গেই ও ব্রাদজভ, কানাডার কেন ম্যকে, ব্রাজিলের শ্রীমতী ভালি, আমেরিকার জিম হেনসন, টম টিচেনার, জন মিলার, ফ্রেড কোয়েন প্রমুখ ও অন্যান্য দেশের সুধীদের সঙ্গে এরা সাক্ষাৎকার এবং আলোচনা করেন। তাঁদের শুভেচ্ছা ও 'স্যুভেনির' পাথেয় করে নিয়ে এসেছেন (স্মারক গ্রন্থের মন্তব্য) ইউথ পাপেট থিয়েটার ন্যাসভিল-এ থাকাকালীনই অন্যান্য স্থানে পুতুলনাচ প্রদর্শনের জন্য নিমন্ত্রণ পান, সময়াভাবে তাদের সেগুলি গ্রহণ করা সম্ভব হয় নি।

ইউথ পাপেট থিয়েটারের অভূতপূর্ব সাফল্যের জন্য আমেরিকার টেনিসি প্রদেশের গভর্নর এই গোষ্ঠীর দলনেতাকে 'অনারারী সিটিজেন অফ টেনিসি' সম্মানে ভূষিত করেন।

উল্লেখ্য, আরিজোনার শ্রীমতী ফ্রান্ গ্রীমসবার্গ স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে নিজ ব্যয়ে এই গোষ্ঠীকে Puppeteers of America র এক বছরের সভ্য করে নিয়ে এদের বিশেষ সম্মানে ভূষিত করেছেন।

উৎসব শেষে, বৃটেন, ফ্রান্স, পশ্চিম জার্মানী, সুইটজারল্যাণ্ড ইতালী প্রভৃতি ঘুরে গেল ৯ সেপ্টেম্বর ইউথ পাপেট থিয়েটার, ইণ্ডিয়া স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করেছেন।

দিল্লী বিমানঘাঁটিতে স্বদেশ প্রত্যাগত ভারতীয় ক্রিকেট দল। অধিনায়ক ওয়াদেকার হাত তুলে জনতার অভিনন্দন গ্রহণ করছেন।

খেলাধুলা

দর্শক

ইংল্যান্ড সফরের পর্যালোচনা

সদ্যসমাপ্ত ইংল্যান্ড সফরে ভারতীয় ক্রিকেট দল বিরাট সাফল্যের সূত্রে আন্তর্জাতিক খেলাধুলোর আসরে স্বদেশের মর্যাদা যথেষ্ট বৃদ্ধি করেছে। ১৯৭১ সালের টেস্ট সিরিজে 'রাবার' জয় ইংল্যান্ডের মাটিতে ভারতের প্রথম সাফল্য। এবছরের ইংল্যান্ড সফরে ভারতীয় ক্রিকেট দলের ১৯টি খেলার ফলাফল এই রকম দাঁড়িয়েছে : ভারতের জয় ৭, হার ১ (বিপক্ষে এসেক্স কাউন্টি) এবং খেলা ড্র ১১। এবছরের ঠিক আগের ইংল্যান্ড সফরে অর্থাৎ ১৯৬৭ সালে) পতৌদির নবাবের নেতৃত্বে ভারতীয় ক্রিকেট দল কি শোচনীয় ব্যর্থতারই না পরিচয় দিয়েছিল--তিনটে টেস্ট খেলা নিয়ে মোট ৭টা খেলায় হার এবং জয় মাত্র ২টো --ডার্বিশায়ার এবং কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের বিপক্ষে।

ব্যাটিং ও বোলিংয়ের গড়

এবারের ইংল্যান্ড সফরে ব্যাটিংয়ের গড় তালিকায় শীর্ষস্থান পেয়েছেন ফারুক ইঞ্জিনীয়ার খেলা ৪, ইনিংস ৭, নটআউট ২ বার, মোট রান ২৬২, এক ইনিংসে সর্বোচ্চ রাণ ৬২ নটআউট এবং গড় ৫২-৪০)। তিনি ছাড়া গড় ৪০ রান করেছেন আরও পাঁচজন—সোলকার (৪৭-১৮), গাভাস্কার (৪৩-৮৮), মানকাদ (৪১-৮৪), বিশ্বনাথ (৪০-৭৮) এবং ওয়াদেকার (৪০-৬৫)। সফরে মোট ১০০০ রান বা তার বেশী সংগ্রহ করার গৌরব লাভ করেছেন মাত্র এই দুজন —গাভাস্কার (১১৪১ রান) এবং ওয়াদেকার (মোট ১০৫৭ রান)। এই দুজন ছাড়া আরও তিনজন খেলোয়াড় ৭০০ বা তার বেশী রান করেছেন—বিশ্বনাথ (৯৩৮ রান), সোলকার (৮০২ রান) এবং মানকাদ (৭৯৫ রান)। ভারতীয় দলের পক্ষে এই ৭ জন খেলোয়াড় মোট ১৩টা সেঞ্চুরী করেছেন--গাভাস্কার (৩টে), বিশ্বনাথ (৩টে), ওয়াদেকার (২টো), মানকাদ (২টো), সরদেশাই (১), সোলকার (১) এবং আবিদ আলি (১)। এক ইনিংসে সর্বোচ্চ রান করেছেন গাভাস্কার—১৯৪ রান (বিপক্ষে উরস্টারশায়ার)।

টেস্ট খেলায় ভারতবর্ষের পক্ষে কোন সেঞ্চুরী হয় নি। অপরদিকে ইংল্যান্ডের এই দুজন সেঞ্চুরী করেছেন ২য় টেস্টে—ইলিংওয়ার্থ (১০৭ রান) এবং লাকহার্স্ট (১০১ রান)। অন্যান্য খেলায় ভারতীয় দলের বিপক্ষে ৭টা সেঞ্চুরী করেছেন—ব্রায়ান লাকহার্স্ট (কেন্ট), কিথ ফ্লেচার (এসেক্স), জন জেমসন (ওয়ারউইকশায়ার), মাইক বাস (সাসেক্স), ব্রায়ান ক্লোজ (সমারসেট), জিম ইয়ার্ডলি (উরস্টারশায়ার) এবং রে ভিজিন (টি এন পিয়ার্স একাদশ)। ভারতীয় দলের বিপক্ষে এক ইনিংসের খেলায় সর্বোচ্চ রান (২৩১ রান)

রোল্যান্ড ম্যাথেজ (পূর্ব জার্মানী)

করেছেন ওয়ারউইকসায়ার কাউন্টি দলের জন জেমসন।

এক ইনিংসের খেলায় ভারতীয় দলের দুজন খেলোয়াড় সেঞ্চুরী করেছেন এমন নজির আছে চারটি :

(১) গাভাস্কার (১৬৫) এবং ওয়াদেকার (১২৬), বিপক্ষে লিসেস্টারসায়ার
(২) গাভাস্কার (১৯৪) এবং ওয়াদেকার (১৫০), বিপক্ষে উরসেস্টারসায়ার
(৩) মানকাদ (১০৯) এবং বিশ্বনাথ (১২২), বিপক্ষে হ্যামসায়ার
(৪) সোলকার (১১৩ এবং আবিদ আলি (১০২ নট আউট), বিপক্ষে সমারসেট

টেস্ট সিরিজে ভারতীয় দলের কোন জুটিই শতরান সংগ্রহ করতে পারেন নি। অবিশ্যি সফরের অন্যান্য খেলায় জুটিতে শতরান উঠেছে এমন নজির আছে ১২টি। উরসেস্টারসায়ার কাউন্টি দলের বিপক্ষে গাভাস্কার এবং ওয়াদেকার ২ উইকেটের জুটিতে যে ৩২৭ রান সংগ্রহ করেন তা ইংল্যান্ডের ১৯৭১ সালের ক্রিকেট মরশুমে যে-কোন উইকেট জুটির সর্বোচ্চ রান।

বোলিংয়ের গড় তালিকায় শীর্ষস্থান পেয়েছেন চন্দ্রশেখর (১২৪২ রানে ৫০ উইকেট এবং গড় ২৪-৮৫)। সর্বাধিক উইকেট লাভ করেছেন ভেঙ্কটরাঘবন—১৫৬৯ রানে ৬৩ উইকেট (২৪-৯০)। ভারতীয় দলের চারজন স্পিন বোলার—চন্দ্রশেখর (৫০টি), ভেঙ্কটরাঘবন (৬৩টি), বেদী (৫৮টি) এবং প্রসন্ন (২৬টি), যেখানে মোট ১৯৭ উইকেট পেয়েছেন সেখানে আবিদ আলি (১৬টি), সোলকার (১৪টি), গোবিন্দরাজ (১০টি), গাভাস্কার (৪টি) এবং মানকাদ (২টি) পেয়েছেন মাত্র ৪৬টি উইকেট।

ইংল্যান্ডের বিপক্ষে ভারতবর্ষের এই ঐতিহাসিক 'রাবার' জয়ের আনন্দের মধ্যেও আমাদের কিছুটা আক্ষেপ থেকে গেছে—টেস্ট সিরিজে আমাদের একটাও সেঞ্চুরী নেই। অথচ এই বছরেই শক্তিশালী ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে ভারতবর্ষের দুটো ডাবল সেঞ্চুরী নিয়ে মোট ৭টা সেঞ্চুরী ছিল—গাভাস্কারের ৪টে এবং সারদেশাইয়ের ৩টে। টেস্টের এক ইনিংসের খেলায় গাভাস্কারের সর্বোচ্চ রান ছিল ২২০ এবং সারদেশাইয়ের ২১২।

১৯৭১ সালে ওয়েস্ট ইন্ডিজ এবং ইংল্যান্ড—এই দুই দেশের সফরেই গাভাস্কার ১০০০ রান পূর্ণ করে ব্যাটিংয়ে অসাধারণ কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন। তাঁর ওয়েস্ট ইন্ডিজ সফরে ছিল মোট ১১৬৯ রান (খেলা ৮, ইনিংস ১৬, নট আউট ৪ বার এবং গড় ৯৭-৪১); অপরদিকে ইংল্যান্ড সফরে মোট ১১৪১ রান (খেলা ১৫, ইনিংস ২৭, নট আউট ১ বার, এক ইনিংসে সর্বোচ্চ রান ১৯৪ এবং গড় ৪৩-৮৮)। দলের নবাগত খেলোয়াড় হিসাবে আর কোন ভারতীয় ক্রিকেটার বিদেশ সফরে গাভাস্কারের মত এইভাবে কৃতিত্বের পরিচয় দিতে পারেন নি।

চন্দ্রশেখর

সদ্য প্রত্যাগত ভারতীয় ক্রিকেট দলের অধিনায়ক অজিত ওয়াদেকার বোম্বাইয়ে সম্বর্ধনা সভায় বলেন, ইংল্যান্ড সফরে ভারতীয় ক্রিকেট দলের সাফল্যের মূলে ছিল এই তিনটি কারণ—স্পিন বোলিং, খুব ভাল ব্যাটিং এবং ফিল্ডিং। বেদী, ভেঙ্কটরাঘবন এবং চন্দ্রশেখর যেভাবে প্রাণপণ করে বল করেছেন তাতে সবার তাঁদেরই অভিনন্দন প্রাপ্য। ওয়েস্ট ইন্ডিজ এবং ইংল্যান্ড সফরে ভারতীয় ক্রিকেট দলের সাফল্যের পার্থক্য প্রসঙ্গে তিনি বলেন, ওয়েস্ট ইন্ডিজ সফরে রানের জন্য আমাদের প্রধানত গাভাস্কার এবং সারদেশাইয়ের মুখ চেয়ে থাকতে হয়েছিল। অপরদিকে ইংল্যান্ড সফরে রান সংগৃহীত হয়েছে দলগতভাবে।

দক্ষিণ আফ্রিকান ক্রিকেট দল

বর্ণবৈষম্য নীতির ধারক এবং বাহক দক্ষিণ আফ্রিকা সরকার অস্ট্রেলিয়ার জনসাধারণের হাতে আর একটা থাপ্পড় খেয়েছে। অস্ট্রেলিয়ার জনমতের চাপে দক্ষিণ আফ্রিকান ক্রিকেট দলের ১৯৭১ সালের প্রস্তাবিত অস্ট্রেলিয়া সফর বাতিল হয়ে গেছে।

দক্ষিণ আফ্রিকার খেলাধুলায় বর্ণ বৈষম্য নীতির কারণে তাদের ১৯৭০ সালের ইংল্যান্ড সফরও এইভাবে বাতিল হয়েছিল। তবু কি লজ্জা আছে। দক্ষিণ আফ্রিকার ক্রীড়ামন্ত্রী মন্তব্য করেছেন, দক্ষিণ আফ্রিকান দলে সর্বদাই সাদাদের দলভুক্ত করা হবে, দল নির্বাচন ব্যাপারে আমাদের পূর্ব নীতির কোনমতেই পরিবর্তন হবে না।

সাঁতারে বিশ্বরেকর্ড

আমেরিকা বনাম পূর্ব জার্মানীর দ্বৈত সন্তরণ প্রতিযোগিতায় পূর্ব জার্মানীর বিশ্ববিখ্যাত সাঁতারু রোল্যান্ড ম্যাথেজ ২০০ মিটার ব্যাকস্ট্রোক সাঁতার দুই মিনিট ৫-৬ সেকেন্ডে শেষ করে স্ব-প্রতিষ্ঠিত বিশ্ব রেকর্ড (২ মিঃ ৬-১ সেঃ) ভেঙেছেন।

অমৃত পাবলিশার্স প্রাইভেট লিঃ-এর পক্ষে শ্রীসুপ্রিয় সরকার কর্তৃক পত্রিকা প্রেস, ১৪, আনন্দ চ্যাটার্জি লেন, কলিকাতা-৩ হইতে মুদ্রিত ও তৎকর্তৃক ১১।১, আনন্দ চ্যাটার্জি লেন, কলিকাতা—৩ হইতে প্রকাশিত।

নিয়মাবলী

বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

লেখকদের প্রতি

১। অমৃতে প্রকাশের জন্যে প্রেরিত সমস্ত রচনার নকল রেখে পাঠাবেন। মনোনীত রচনার খবর দু-মাসের মধ্যে জানান হয়। অমনোনীত রচনা কোনক্রমেই ফেরৎ পাঠান সম্ভব নয়। লেখার সংগে কোন ডাকটিকিট পাঠাবেন না।

২। প্রেরিত রচনা কাগজের এক পৃষ্ঠায় স্পষ্টাক্ষরে লিখিত হওয়া আবশ্যক। অস্পষ্ট ও দুর্বোধ্য হস্তাক্ষরে লেখা প্রকাশের জন্যে গৃহীত হয় না।

৩। রচনার সংগে লেখকের নাম ও ঠিকানা না থাকলে 'অমৃতে' প্রকাশের জন্যে গৃহীত হয় না।

এজেন্টদের প্রতি

এজেন্সীর নিয়মাবলী এবং সে সম্পর্কিত অন্যান্য জ্ঞাতব্য তথ্য 'অমৃত' কার্যালয়ে পত্র দ্বারা জ্ঞাতব্য।

গ্রাহকদের প্রতি

১। গ্রাহকের ঠিকানা পরিবর্তনের জন্যে অন্তত ২৫ দিন আগে 'অমৃত' কার্যালয়ে সংবাদ দেওয়া আবশ্যক।

২। ভি-পিতে পত্রিকা পাঠানো হয় না। গ্রাহকের চাঁদা নিম্নলিখিত হারে মণিঅর্ডারযোগে 'অমৃত' কার্যালয়ে পাঠানো আবশ্যক।

চাঁদার হার

		কলিকাতা		মফঃস্বল
বার্ষিক	টাকা	২৫.০০	টাকা	৩০.০০
ষাণ্মাষিক	টাকা	১২.৫০	টাকা	১৫.৫০
ত্রৈমাসিক	টাকা	৬.২৫	টাকা	৮.০০

'অমৃত' কার্যালয়

১১/১ আনন্দ চ্যাটার্জি লেন,

কলিকাতা—৩

ফোন : ৫৫-৫২৩১ (১৪ লাইন)

১১শ বর্ষ
২য় খণ্ড

অমৃত

২১শ সংখ্যা
মূল্য
৫০ পয়সা

Friday, 24th September 1971 শুক্রবার, ৭ই আশ্বিন ১৩৭৮ **50 Paise**

সূচীপত্র

প্রচ্ছদ : শ্রীমলয়শংকর দাশগুপ্ত

এক নজরে

সাদা-কালো বুদ্ধিতে সমান :

যুক্তরাষ্ট্র সরকারের শিক্ষা ও সমাজ-কল্যাণ দপ্তরের দুই প্রখ্যাত মনস্তত্ত্ববিদ ডঃ জর্জ মায়েস্কে ও ডঃ জেন মার্সার দীর্ঘদিন ধরে যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন রাজ্যের এক লক্ষ চব্বিশ হাজার শ্বেতাঙ্গ, নিগ্রো, রেড ইন্ডিয়ান, চীনা, পুর্তোরিকান ছাত্রের উপর পরীক্ষা নিরীক্ষা চালিয়ে এবং তাদের বিভিন্ন পরীক্ষার ফলাফল বিশ্লেষণ করে এই সুনিশ্চিত সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন যে, বর্ণভেদে বংশভেদে মানুষের বুদ্ধি ও প্রতিভার ইতরবিশেষ হয় না। তবু যে সর্বক্ষেত্রে অশ্বেতকায়রা শ্বেতকায়দের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় পেরে ওঠে না তার প্রধান কারণ পরিবেশের পার্থক্য। একই বুদ্ধি নিয়ে জন্মায় সবাই, কিন্তু শ্বেতাঙ্গ শিশুরা জন্মের পর আহারে বিহারে বাসস্থানে—একক আয় জীবনের সর্বক্ষেত্রে যে বিশেষ সুযোগ সুবিধা পায়, অন্যরা তা থেকেই বঞ্চিত বলেই শেষ পর্যন্ত অসম প্রতিদ্বন্দ্বিতায় পেছিয়ে পড়ে। তাঁরা সমীক্ষাকার্য চালিয়েছিলেন মার্কিন নাগরিক অধিকার রক্ষা কমিশনের পক্ষ থেকে। গত সপ্তাহে আমেরিকান সাইকোলজিকাল এসোসিয়েশনের বাৎসরিক সভায় তাঁরা তাঁদের রিপোর্ট দাখিল করেন। ঐ রিপোর্টের ভিত্তিতে নাগরিক অধিকার রক্ষায় কমিশনের পক্ষে ডঃ এডওয়ার্ড জে কাসাভান্তেজ বলেছেন—দুজন মনস্তত্ত্ববিদ সম্পূর্ণ আলাদাভাবে ও নিজ নিজ ব্যবস্থামতো সমীক্ষাকার্য চালিয়ে যে একই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন তা হয়ত শ্বেতাঙ্গদের ভ্রান্ত ধারণাপ্রসূত আত্মাভিমান দূর করার কাজে কিছুটা সহায়ক হবে।

কিন্তু তার চেয়েও বড় কথা, নোবেল পুরস্কার বিজয়ী বিজ্ঞানী ডঃ উইলিয়াম শকলে যে বলেছিলেন, নিগ্রোরা বংশগত কারণেই শ্বেতাঙ্গদের তুলনায় বুদ্ধি মেধা ও প্রতিভায় হীন—দুই মনস্তত্ত্ববিদের এই বিজ্ঞান ভিত্তিক সমীক্ষা ও সিদ্ধান্ত, এতদিনের সুপ্রচারিত ও সুপ্রতিষ্ঠিত সেই মতবাদের বনিয়াদকেই সর্বাধিক কঠিন আঘাত হানবে।

প্রাণের বদলে প্রাণ?

অনেকদিন আগের কথা, ১৯২৪ সালে, আমেরিকার আদরে-মাথা-খাওয়া এক ধনীর দুলাল নাথান লিওপোল্ড শুধু মানুষ খুনের প্রতিক্রিয়া অনুভবের জন্য খেলার ছলে চৌদ্দ বছরের একটি বালককে হত্যা করেছিল। সে অপরাধে তার মৃত্যুদণ্ডই হওয়ার কথা, কিন্তু বিচারক অপরাধীর অল্প বয়সের কথা চিন্তা করে (লিওপোল্ডের বয়স তখন ১৯ বছর) তাকে ছেলেচুরি করে হত্যার অভিযোগে ৯৯ বছর সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত করেন। দণ্ডদানের সময় বিচারপতি একথাও বলেন যে, অপরাধীর দণ্ডের মেয়াদ কোন সময়েই হ্রাস করা সঙ্গত হবে না। যাই হ'ক, দণ্ড শিরোধার্য করে লিওপোল্ড জেলে প্রবেশ করে জেলের লাইব্রেরীটির সংস্কার করে, তারপর ভাষা শিক্ষায় মনোনিবেশ করে এবং একে একে সাতাশটি ভাষা তার অধিগত হয়। সেই একই সঙ্গে সে গণিতেও বিশেষ পারদর্শিতা লাভ করে এবং অবকাশবিনোদনের বিষয়রূপে চর্চা করে পক্ষীতত্ত্ব। আর ঐ অধ্যয়ন ও অধীত বিদ্যার চর্চার মধ্য দিয়ে যে পঁচিশটি বছর অতিক্রান্ত হয়ে গেছে তা লিওপোল্ডের খেয়ালই থাকে না।

১৯৪৯ সালে ম্যালেরিয়ার নতুন ওষুধ পরীক্ষার জন্য একজনের দেহে ম্যালেরিয়ার জীবাণু ঢুকিয়ে তার উপর ওষুধের প্রতিক্রিয়া নিরীক্ষণের জন্য যখন একজন মানুষের প্রয়োজন হ'ল, জেল থেকে লিওপোল্ড জানাল, ও পরীক্ষা তার উপর করা যেতে পারে। লিওপোল্ডের আগ্রহে তারই উপরে পরীক্ষা চালানো হ'ল, আর তার ঐ আচরণে খুশি হয়ে ইলিনয় রাজ্যের তৎকালীন গভর্ণর এডলাই ষ্টিভেনসন লিওপোল্ডের দণ্ডের মেয়াদ ৯৯ বছর থেকে কমিয়ে ৮৫ বছর করে দিলেন। আর ঐ দণ্ড হ্রাসের ফলে লিওপোল্ড ১৯৫৩ সালে প্রথম সাময়িক মুক্তির (প্যারোল) জন্য আবেদনের সুযোগ পায়। কিন্তু তার আবেদন বার বার প্রত্যাখ্যাত হওয়ার পর ১৯৫৮ সালে মঞ্জুর হয়। ৩৪ বছর পরে মুক্তি পেয়ে লিওপোল্ড মাসে দশ ডলার বেতনের এক চাকরি নিয়ে পুর্তোরিকা দ্বীপে চলে যায় এবং এক বছর বাদেই সেখানকার বিশ্ববিদ্যালয় থেকে 'স্পেশ্যাল মেডিসিন' বিষয়ে স্নাতকোত্তর ডিগ্রী লাভ করে। সেখানেই সে রাষ্ট্রের স্বাস্থ্য দপ্তরে একটি কাজ নেয় এবং এক বিধবার পাণিগ্রহণ করে।

সম্প্রতি ৬৬ বছর বয়সে মৃত্যু হয়েছে লিওপোল্ডের, মৃত্যুর পূর্বে সে তার চোখ দুটি স্থানীয় হাসপাতালে দান করে গেছে। সাতচল্লিশ বছর আগে এক বিপথগামী যুবক যে নিষ্ঠুর হত্যাকাণ্ডে লিপ্ত হয়েছিল তার জন্য তারও প্রাণ নেওয়া উচিত ছিল কিনা—এ প্রশ্নের উত্তর ঐ হত্যাকারীর জীবনের শেষ সাতচল্লিশটি বছরের আচরণ ও কার্যকলাপ থেকেই পাওয়া যাবে।

ইতালি এগোতে চায় :

শতাব্দীকাল সংগ্রামের শেষে ইতালিতে ডাইভোর্স আইন চালু হওয়ার পর নিষেধবিধির একটা বড় অচলায়তন যেন ভেঙে গেছে সেদেশে। বন্ধনমুক্ত স্রোতধারার মতো ইতালির সমাজজীবন এখন দুর্নিবার গতিতে এগিয়ে চলতে চায়। সেদেশের প্রগতিশীল সমাজ দাবি জানিয়েছেন, অবিলম্বে ইতালিতে ইংলণ্ডের মতো গর্ভপাত আইনানুমোদিত করা হ'ক। তার জন্য ফ্রান্সের মতো ইতালিতেও চলচ্চিত্রাভিনেত্রী, লেখিকা, সমাজনেত্রী প্রভৃতির স্বাক্ষর সংগ্রহ শুরু হয়েছে যাঁরা প্রকাশ্যে কবুল করবেন যে, আইনের অনুমোদন না থাকা সত্ত্বেও জীবনের কোন না কোন সময় গর্ভপাত ঘটিয়ে তাঁরা অবাঞ্ছিত মাতৃত্বের থেকে অব্যাহতি পেয়েছেন। এ ঘোষণা ইতালি সরকারের পক্ষে মর্যাদারক্ষা করে সহজভাবে নেওয়া সম্ভব নয়, কারণ ইতালির আইন অনুসারে গর্ভপাতের সাজা দুই থেকে পাঁচ বছর সশ্রম কারাদণ্ড। আইনের মর্যাদারক্ষা করতে হলে ইতালি সরকারকে ঐ ঘোষণাপত্রে স্বাক্ষরকারিণী দেশের কয়েক শত বিশিষ্ট মহিলাকে জেলে পাঠাতে হবে। কিন্তু সেটা ইতালি সরকারের পক্ষে সম্ভব হবে কি?

ওয়াদিপাউস : এক সঙ্গে ওরা বাস করেছে কয়েক বছর, সন্তানও হয়েছে ওদের একটি, কিন্তু ভাগ্যের এমনই নির্মম নিষ্ঠুর পরিহাস যে ওরা জানত না, ওরা মা ও ছেলে। পুত্রের নাম উইলে কিজমিলার (বয়স ২৩), আর মায়ের নাম জেবেকা শেল্টার, বয়স ৪১। জন্মের পরেই পুত্রকে মা আর একজনকে দত্তক দিয়েছিল, তারপর আর তাকে সে কখনও দেখেনি; পুত্রও মা বলতে জানতো তার পালিকা মাকে। ইতিমধ্যে তার নিজের মাকে ত্যাগ করে যায় তার বাবা, কিন্তু ডাইভোর্স দেয় না। সেই পরিত্যক্ত অবস্থায় জেবেকা আসে যুবক উইলের সংস্পর্শে যে তখন নাবিক হয়েছে। জেবেকার আরও দুর্ভাগ্য, স্বামী, সৌভাগ্য, আত্মীয়পরিজন সকলে তাকে ত্যাগ করলেও ত্যাগ করেনি তার দুরন্ত যৌবন, যার আকর্ষণে আগুনের নেশায় মত্ত পতঙ্গের মতো ছুটে আসে যুবক উইলে। তারপর নাটকের শেষ অঙ্ক উদ্ঘাটিত হয় ব্যভিচারের অভিযোগে ওরা ক্যালিফোর্নিয়ার এক আদালতে অভিযুক্ত হওয়ার পর।

—প্রত্যক্ষদর্শী

সম্পাদকীয়

বন্যা মরণ জ্বালা

সাম্প্রতিক কালে ভারতবর্ষে যে ধরনের বন্যার আক্রমণ ঘটে গেছে তার তুলনায় এইবার পূর্ব ও উত্তর ভারতের কোনো কোনো অঞ্চলে যে বন্যা হয়ে গেছে তার ধারাটা অভিনব। মাত্র কয়েক বছর আগে জলপাইগুড়িতে সর্বনাশা বন্যা হয়ে গেছে। ব্রহ্মপুত্রের প্রচন্ড প্রকোপে আসাম অঞ্চলে বন্যার আক্রমণ প্রায় নিয়মিত হয়ে পড়েছে। বর্তমান বছরে বিহার ও পশ্চিমবঙ্গের সুদীর্ঘ অঞ্চল গঙ্গার জলে ভেসে গেছে। গঙ্গার এই আক্রমণ খানিকটা অভাবিত। তারপর লক্ষ্ণৌ শহরে গোমতী নদীর আক্রমণ। জল বাড়ছেই, কখনো গঙ্গা, কখনো গোমতী, কখনো পুন পুন। গঙ্গা এইবার মালদহ, পাটনা, বারৌনি, মুঙ্গের, খাগারিয়া প্রভৃতি অঞ্চল প্লাবিত করেছে। বিগত পূর্ণিমার কোটালে গঙ্গার বানের প্রবাহে খাস কলিকাতা শহরও ভাসমান হয়েছিল। অনেক বাড়িঘর গঙ্গাজলে ধৌত হয়ে পরিশুদ্ধ হয়েছে। অনেকে অনুমান করছেন এই বছর বর্ষা তার 'মেঘময় বেণী এলাইয়া' যেভাবে দীর্ঘকাল অবিশ্রান্ত বর্ষণে ভারতের পূর্বাঞ্চলে করুণাধারা বিতরণ করেছেন এই জলোচ্ছ্বাস নাকি তার অন্যতম হেতু। সাধারণ হিসাবে দু'বছর উত্তম বর্ষা ও দু'বছর মধ্যম বা অধম বর্ষা হয়ে থাকে। কিন্তু এই বছর সবই বিচিত্র। অন্য সব জায়গায় বন্যার প্রকোপটা প্রায় স্তিমিত হওয়াতে যখন দুর্গতদের দুঃখহরণের জন্য আকাশ থেকে চাল-ডাল বর্ষণ করার তোড়জোড় চলছে, তখন জানা গেল লক্ষ্ণৌ শহর ডুবুডুবু। বাংলায় এইবার মালদহ ভেসেছে এবং নদে ভেসে যায়। রাজস্থানে সম্বর হ্রদের জলের চাপে সেই অঞ্চলেও বন্যা হয়েছে। সুতরাং ভারী বর্ষার জন্য হয়ত এই বছরের বন্যা একটা বিচিত্র গতিপথে পরিক্রমণ করছে।

প্রতিবারই বন্যাজনিত ক্ষয়ক্ষতির হিসাব-নিকাশ করার সময় কি কি করা উচিত ছিল এবং কি করা হয়নি সেইসব জল্পনা হয়ে থাকে। চোর তার কর্তব্য সম্পন্ন করে পিছন ফেরার পর যেমন তার কৌশল সম্পর্কে আলোচনা হয়ে থাকে, বন্যাজনিত ক্ষয়ক্ষতির পর যে-ধরনের আলোচনা হয় তা প্রায় অনুরূপ। কোথায় বাঁধ আরো উঁচু করা প্রয়োজন, কোথাও বা বাঁধের ফাটল পূর্বে লক্ষ্য করা হয়নি, কোথাও বা নতুন বাঁধ দেওয়া দরকার—এইসব জল্পনায় কারো কল্যাণ হয় না। কারণ ক্ষতির পরিমাণ তখন এমনই বেশী যে ঠিক এইসব কথায় কর্ণপাত করার মত প্রবৃত্তি থাকে না।

যেসব রাজ্যগুলিতে বন্যার আক্রমণের সম্ভাবনা সর্বাধিক, তাদের উচিত সারাবছরব্যাপী কর্ম ও পরিকল্পনার দ্বারা বন্যা-নিরোধের জন্য সচেষ্ট হওয়া। মধ্যম শ্রেণীর বন্যায় অনেক সময় ফসল জন্মানোর সুবিধা হয়, কিন্তু জলের চাপ যদি নিয়মিতভাবেই বৃদ্ধি পেয়ে কৃষিভূমিকে প্লাবিত করে তাহলে তা চাষের পক্ষে ক্ষতিকর হয়। পশ্চিমবঙ্গে অজস্র সমস্যা এবং সেইসব সমস্যা সমাধানেই সরকারের অনেক সময় ও অর্থ ব্যয়িত হয়, কিন্তু প্রতি বছর ফসল, গবাদি পশু এবং মানুষ ও ঘরবাড়ি ধ্বংস হওয়ার ফলে যে পরিমাণ আর্থিক ক্ষতি হয় তা কোনোমতেই উপেক্ষনীয় নয়। কেন্দ্রীয় সেচমন্ত্রী একটি ঘূর্ণ্যমান তহবিলের পরিকল্পনা করেছেন। এই তহবিলের অর্থে বন্যা-নিরোধক পরিকল্পনাগুলিকে অর্থ সাহায্য করা হবে। বাকী টাকা হয়ত করদাতাদের কাছ থেকেই আদায় করা হবে। পশ্চিমবঙ্গ সরকার দান এবং ঋণ হিসাবে ছিয়াশী ক্রোর টাকার জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে আবেদন জানিয়েছেন। সাহায্য, পুনর্বাসন এবং পুনর্গঠনের জন্য এই অর্থের প্রয়োজন। স্বয়ং প্রধানমন্ত্রী একটি কেন্দ্রীয় স্টাডি টীম এবং কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী স্বচক্ষে পশ্চিমবঙ্গের বন্যা-প্রপীড়িত অঞ্চল সরেজমিনে তদন্ত করে গেছেন এবং পশ্চিমবঙ্গের দাবী সহৃদয়তার সঙ্গে বিবেচনা করবেন এই আশ্বাস দিয়েছেন। সরকারী লালফিতার দীর্ঘসূত্রতার বদনাম দীর্ঘদিনের, অন্ততঃ এই ক্ষেত্রে সরকার যদি একটু দ্রুত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন, তাহলে বন্যা-প্রপীড়িত অঞ্চলের মানুষগুলি নিদারুণ সংকটের হাত থেকে ত্রাণ পাবে।

'এক নজরে'

সাদা-কালো বুদ্ধিতে সমান :

যুক্তরাষ্ট্র সরকারের শিক্ষা ও সমাজ-কল্যাণ দপ্তরের দুই প্রখ্যাত মনস্তত্ত্ববিদ ডঃ জর্জ মায়েস্কে ও ডঃ জেন মার্সার দীর্ঘ-দিন ধরে যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন রাজ্যের এক লক্ষ চব্বিশ হাজার শ্বেতাঙ্গ , নিগ্রো, রেড ইণ্ডিয়ান, চীনা, পুর্তোরিকান ছাত্রের উপর পরীক্ষা নিরীক্ষা চালিয়ে এবং তাদের বিভিন্ন পরীক্ষার ফলাফল বিশ্লেষণ করে এই সুনিশ্চিত সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন যে, বর্ণভেদে বংশভেদে মানুষের বুদ্ধি ও প্রতিভার ইতর-বিশেষ হয় না। তবু যে সর্বক্ষেত্রে অশ্বেতকায়রা শ্বেতকায়দের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় পেরে ওঠে না তার প্রধান কারণ পরিবেশের পার্থক্য। একই বুদ্ধি নিয়ে জন্মায় সবাই, কিন্তু শ্বেতাঙ্গ শিশুরা জন্মের পর আহারে বিহারে বাসস্থানে—একক আয় জীবনের সর্বক্ষেত্রে যে বিশেষ সুযোগ সুবিধা পায়, অন্যরা তা থেকেই বঞ্চিত বলেই শেষ পর্যন্ত অসম প্রতিদ্বন্দ্বিতায় পেছিয়ে পড়ে। তাঁরা সমীক্ষাকার্য চালিয়েছিলেন মার্কিন নাগরিক অধিকার রক্ষা কমিশনের পক্ষ থেকে। গত সপ্তাহে আমেরিকান সাইকোলজিকাল এসোসিয়েশনের বাৎসরিক সভায় তাঁরা তাঁদের রিপোর্ট দাখিল করেন। ঐ রিপোর্টের ভিত্তিতে নাগরিক অধিকার রক্ষায় কমিশনের পক্ষে ডঃ এডওয়ার্ড জে কাসাভান্তেজ বলেছেন—দুজন মনস্তত্ত্ববিদ সম্পূর্ণ আলাদাভাবে ও নিজ নিজ ব্যবস্থামতো সমীক্ষাকার্য চালিয়ে যে একই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন তা হয়ত শ্বেতাঙ্গদের ভ্রান্ত ধারণাপ্রসূত আত্মাভিমান দূর করার কাজে কিছুটা সহায়ক হবে।

কিন্তু তার চেয়েও বড় কথা, নোবেল পুরস্কার বিজয়ী বিজ্ঞানী ডঃ উইলিয়াম শকলে যে বলেছিলেন, নিগ্রোরা বংশগত কারণেই শ্বেতাঙ্গদের তুলনায় বুদ্ধি মেধা ও প্রতিভায় হীন—দুই মনস্তত্ত্ববিদের এই বিজ্ঞান ভিত্তিক সমীক্ষা ও সিদ্ধান্ত, এতদিনের সুপ্রচারিত ও সুপ্রতিষ্ঠিত সেই মতবাদের বনিয়াদ-কেই সর্বাধিক কঠিন আঘাত হানবে।

প্রাণের বদলে প্রাণ?

অনেকদিন আগের কথা, ১৯২৪ সালে, আমেরিকার আদরে-মাথা-খাওয়া এক ধনীর দুলাল নাথান লিওপোল্ড শুধু মানুষ খুনের প্রতিক্রিয়া অনুভবের জন্য খেলার ছলে চোদ্দ বছরের একটি বালককে হত্যা করেছিল। সে অপরাধে তার মৃত্যুদণ্ডই হওয়ার কথা, কিন্তু বিচারক অপরাধীর অল্প বয়সের কথা চিন্তা করে (লিওপোল্ডের বয়স তখন ১৯ বছর) তাকে ছেলেচুরি করে হত্যার অভিযোগে ৯৯ বছর সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত করেন। দণ্ডদানের সময় বিচারপতি একথাও বলেন যে, অপরাধীর দণ্ডের মেয়াদ কোন সময়েই হ্রাস করা সঙ্গত হবে না। যাই হ'ক, দণ্ড শিরোধার্য করে লিওপোল্ড জেলে প্রবেশ করে জেলের লাইব্রেরীটির সংস্কার করে, তারপর ভাষা শিক্ষায় মনোনিবেশ করে এবং একে একে সাতাশটি ভাষা তার অধিগত হয়। সেই একই সঙ্গে সে গণিতেও বিশেষ পারদর্শিতা লাভ করে এবং অবকাশবিনোদনের বিষয়রূপে চর্চা করে পক্ষীতত্ত্ব। আর ঐ অধ্যয়ন ও অধীত বিদ্যার চর্চার মধ্য দিয়ে যে পঁচিশটি বছর অতিক্রান্ত হয়ে গেছে তা লিওপোল্ডের খেয়ালই থাকে না।

১৯৪৯ সালে ম্যালেরিয়ার নতুন ওষুধ পরীক্ষার জন্য একজনের দেহে ম্যালেরিয়ার জীবাণু ঢুকিয়ে তার উপর ওষুধের প্রতিক্রিয়া নিরীক্ষণের জন্য যখন একজন মানুষের প্রয়োজন হ'ল, জেল থেকে লিওপোল্ড জানাল, ও পরীক্ষা তার উপর করা যেতে পারে। লিওপোল্ডের আগ্রহে তারই উপরে পরীক্ষা চালানো হ'ল, আর তার ঐ আচরণে খুশি হয়ে ইলিনয় রাজ্যের তৎকালীন গভর্ণর এডলাই ষ্টিভেনসন লিওপোল্ডের দণ্ডের মেয়াদ ৯৯ বছর থেকে কমিয়ে ৮৫ বছর করে দিলেন। আর ঐ দণ্ড হ্রাসের ফলে লিওপোল্ড ১৯৫৩ সালে প্রথম সাময়িক মুক্তির (প্যারোল) জন্য আবেদনের সুযোগ পায়। কিন্তু তার আবেদন বার বার প্রত্যাখ্যাত হওয়ার পর ১৯৫৮ সালে মঞ্জুর হয়। ৩৪ বছর পরে মুক্তি পেয়ে লিওপোল্ড মাসে দশ ডলার বেতনের এক চাকরি নিয়ে পুর্তোরিকা দ্বীপে চলে যায় এবং এক বছর বাদেই সেখানকার বিশ্ববিদ্যালয় থেকে 'স্পেশ্যাল মেডিসিন' বিষয়ে স্নাতকোত্তর ডিগ্রী লাভ করে। সেখানেই সে রাষ্ট্রের স্বাস্থ্য দপ্তরে একটি কাজ নেয় এবং এক বিধবার পাণিগ্রহণ করে।

সম্প্রতি ৬৬ বছর বয়সে মৃত্যু হয়েছে লিওপোল্ডের, মৃত্যুর পূর্বে সে তার চোখ দুটি স্থানীয় হাসপাতালে দান করে গেছে। সাতচল্লিশ বছর আগে এক বিপথগামী যুবক যে নিষ্ঠুর হত্যাকাণ্ডে লিপ্ত হয়েছিল তার জন্য তারও প্রাণ নেওয়া উচিত ছিল কিনা—এ প্রশ্নের উত্তর ঐ হত্যাকারীর জীবনের শেষ সাতচল্লিশটি বছরের আচরণ ও কার্যকলাপ থেকেই পাওয়া যাবে।

ইতালি এগোতে চায় :

শতাব্দীকাল সংগ্রামের শেষে ইতালিতে ডাইভোর্স আইন চালু হওয়ার পর নিষেধবিধির একটা বড় অচলায়তন যেন ভেঙে গেছে সেদেশে। বন্ধনমুক্ত স্রোতধারার মতো ইতালির সমাজজীবন এখন দুর্নিবার গতিতে এগিয়ে চলতে চায়। সেদেশের প্রগতিশীল সমাজ দাবি জানিয়েছেন, অবিলম্বে ইতালিতে ইংলণ্ডের মতো গর্ভপাত আইনানুমোদিত করা হ'ক। তার জন্য ফ্রান্সের মতো ইতালিতেও চলচ্চিত্রাভিনেত্রী, লেখিকা, সমাজনেত্রী প্রভৃতির স্বাক্ষর সংগ্রহ শুরু হয়েছে যাঁরা প্রকাশ্যে কবুল করবেন যে, আইনের অনুমোদন না থাকা সত্ত্বেও জীবনের কোন না কোন সময় গর্ভপাত ঘটিয়ে তাঁরা অবাঞ্ছিত মাতৃত্বের থেকে অব্যাহতি পেয়েছেন। এ ঘোষণা ইতালি সরকারের পক্ষে মর্যাদারক্ষা করে সহজভাবে নেওয়া সম্ভব নয়। কারণ ইতালির আইন অনুসারে গর্ভপাতের সাজা দুই থেকে পাঁচ বছর সশ্রম কারাদণ্ড। আইনের মর্যাদারক্ষা করতে হলে ইতালি সরকারকে ঐ ঘোষণাপত্রে স্বাক্ষরকারিণী দেশের কয়েক শত বিশিষ্ট মহিলাকে জেলে পাঠাতে হবে। কিন্তু সেটা ইতালি সরকারের পক্ষে সম্ভব হবে কি?

ওয়াদিপাউস : এক সঙ্গে ওরা বাস করেছে কয়েক বছর, সন্তানও হয়েছে ওদের একটি, কিন্তু ভাগ্যের এমনই নির্মম নিষ্ঠুর পরিহাস যে ওরা জানত না, ওরা মা ও ছেলে। পুত্রের নাম উইলে কিজমিলার (বয়স ২৩), আর মায়ের নাম জেবেকা শেল্টার, বয়স ৪১। জন্মের পরেই পুত্রকে মা আর একজনকে দত্তক দিয়েছিল, তারপর আর তাকে সে কখনও দেখেনি; পুত্রও মা বলতে জানতো তার পালিকা মাকে। ইতিমধ্যে তার নিজের মাকে ত্যাগ করে যায় তার বাবা, কিন্তু ডাইভোর্স দেয় না। সেই পরিত্যক্ত অবস্থায় জেবেকা আসে যুবক উইলের সংস্পর্শে যে তখন নাবিক হয়েছে। জেবেকার আরও দুর্ভাগ্য, স্বামী, সৌভাগ্য, আত্মীয়পরিজন সকলে তাকে ত্যাগ করলেও ত্যাগ করেনি তার দুরন্ত যৌবন, যার আকর্ষণে আগুনের নেশায় মত্ত পতঙ্গের মতো ছুটে আসে যুবক উইলে। তারপর নাটকের শেষ অঙ্ক উদ্‌ঘাটিত হয় ব্যভিচারের অভিযোগে ওরা কালিফোর্নিয়ার এক আদালতে অভিযুক্ত হওয়ার পর।

—প্রত্যক্ষদর্শী

সম্পাদকীয়

বন্যা মরণ জ্বালা

সাম্প্রতিক কালে ভারতবর্ষে যে ধরনের বন্যার আক্রমণ ঘটে গেছে তার তুলনায় এইবার পূর্ব ও উত্তর ভারতের কোনো কোনো অঞ্চলে যে বন্যা হয়ে গেছে তার ধারাটা অভিনব। মাত্র কয়েক বছর আগে জলপাইগুড়িতে সর্বনাশা বন্যা হয়ে গেছে। ব্রহ্মপুত্রের প্রচন্ড প্রকোপে আসাম অঞ্চলে বন্যার আক্রমণ প্রায় নিয়মিত হয়ে পড়েছে। বর্তমান বছরে বিহার ও পশ্চিমবঙ্গের সুদীর্ঘ অঞ্চল গঙ্গার জলে ভেসে গেছে। গঙ্গার এই আক্রমণ খানিকটা অভাবিত। তারপর লক্ষ্ণৌ শহরে গোমতী নদীর আক্রমণ। জল বাড়ছেই, কখনো গঙ্গা, কখনো গোমতী, কখনো পুন পুন। গঙ্গা এইবার মালদহ, পাটনা, বারৌনি, মুঙ্গের, খাগারিয়া প্রভৃতি অঞ্চল প্লাবিত করেছে। বিগত পূর্ণিমার কোটালে গঙ্গার বানের প্রবাহে খাস কলিকাতা শহরও ভাসমান হয়েছিল। অনেক বাড়িঘর গঙ্গাজলে ধৌত হয়ে পরিশুদ্ধ হয়েছে। অনেকে অনুমান করছেন এই বছর বর্ষা তার 'মেঘময় বেণী এলাইয়া' যেভাবে দীর্ঘকাল অবিশ্রান্ত বর্ষণে ভারতের পূর্বাঞ্চলে করুণাধারা বিতরণ করেছেন এই জলোচ্ছ্বাস নাকি তার অন্যতম হেতু। সাধারণ হিসাবে দু'বছর উত্তম বর্ষা ও দু'বছর মধ্যম বা অধম বর্ষা হয়ে থাকে। কিন্তু এই বছর সবই বিচিত্র। অন্য সব জায়গায় বন্যার প্রকোপটা প্রায় স্তিমিত হওয়াতে যখন দুর্গতদের দুঃখহরণের জন্য আকাশ থেকে চাল-ডাল বর্ষণ করার তোড়জোড় চলছে, তখন জানা গেল লক্ষ্ণৌ শহর ডুবুডুবু। বাংলায় এইবার মালদহ ভেসেছে এবং নদে ভেসে যায়। রাজস্থানে সম্বর হ্রদের জলের চাপে সেই অঞ্চলেও বন্যা হয়েছে। সুতরাং ভারী বর্ষার জন্য হয়ত এই বছরের বন্যা একটা বিচিত্র গতিপথে পরিক্রমণ করছে।

প্রতিবারই বন্যাজনিত ক্ষয়ক্ষতির হিসাব-নিকাশ করার সময় কি কি করা উচিত ছিল এবং কি করা হয়নি সেইসব জল্পনা হয়ে থাকে। চোর তার কর্তব্য সম্পন্ন করে পিছন ফেরার পর যেমন তার কৌশল সম্পর্কে আলোচনা হয়ে থাকে, বন্যাজনিত ক্ষয়ক্ষতির পর যে-ধরনের আলোচনা হয় তা প্রায় অনুরূপ। কোথায় বাঁধ আরো উঁচু করা প্রয়োজন, কোথাও বা বাঁধের ফাটল পূর্বে লক্ষ্য করা হয়নি, কোথাও বা নতুন বাঁধ দেওয়া দরকার—এইসব জল্পনায় কারো কল্যাণ হয় না। কারণ ক্ষতির পরিমাণ তখন এমনই বেশী যে ঠিক এইসব কথায় কর্ণপাত করার মত প্রবৃত্তি থাকে না।

যেসব রাজ্যগুলিতে বন্যার আক্রমণের সম্ভাবনা সর্বাধিক, তাদের উচিত সারাবছরব্যাপী কর্ম ও পরিকল্পনার দ্বারা বন্যা-নিরোধের জন্য সচেষ্ট হওয়া। মধ্যম শ্রেণীর বন্যায় অনেক সময় ফসল জন্মানোর সুবিধা হয়, কিন্তু জলের চাপ যদি নিয়মিতভাবেই বৃদ্ধি পেয়ে কৃষিভূমিকে প্লাবিত করে তাহলে তা চাষের পক্ষে ক্ষতিকর হয়। পশ্চিমবঙ্গে অজস্র সমস্যা এবং সেইসব সমস্যা সমাধানেই সরকারের অনেক সময় ও অর্থ ব্যয়িত হয়, কিন্তু প্রতি বছর ফসল, গবাদি পশু এবং মানুষ ও ঘরবাড়ি ধ্বংস হওয়ার ফলে যে পরিমাণ আর্থিক ক্ষতি হয় তা কোনোমতেই উপেক্ষনীয় নয়। কেন্দ্রীয় সেচমন্ত্রী একটি ঘূর্ণ্যমান তহবিলের পরিকল্পনা করেছেন। এই তহবিলের অর্থে বন্যা-নিরোধক পরিকল্পনাগুলিকে অর্থ সাহায্য করা হবে। বাকী টাকা হয়ত করদাতাদের কাছ থেকেই আদায় করা হবে। পশ্চিমবঙ্গ সরকার দান এবং ঋণ হিসাবে ছিয়াশী ক্রোর টাকার জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে আবেদন জানিয়েছেন। সাহায্য, পুনর্বাসন এবং পুনর্গঠনের জন্য এই অর্থের প্রয়োজন। স্বয়ং প্রধানমন্ত্রী একটি কেন্দ্রীয় স্টাডি টীম এবং কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী স্বচক্ষে পশ্চিমবঙ্গের বন্যা-প্রপীড়িত অঞ্চল সরেজমিনে তদন্ত করে গেছেন এবং পশ্চিমবঙ্গের দাবী সহৃদয়তার সঙ্গে বিবেচনা করবেন এই আশ্বাস দিয়েছেন। সরকারী লালফিতার দীর্ঘসূত্রতার বদনাম দীর্ঘদিনের, অন্ততঃ এই ক্ষেত্রে সরকার যদি একটু দ্রুত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন, তাহলে বন্যা-প্রপীড়িত অঞ্চলের মানুষগুলি নিদারুণ সংকটের হাত থেকে ত্রাণ পাবে।

আমাদের তারাশঙ্কর

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের মৃত্যুতে বাঙলা তথা ভারতীয় সাহিত্যে এক অপূরণীয় ক্ষতি হইল। আধুনিক ভারতীয় সাহিত্যে যে পরম্পরা, যে ধারা প্রাচীন আর্য যুগ হইতে চলিয়া আসিয়াছে—বৈদিক, সংস্কৃত, পালি, ও নানা প্রাকৃত এবং অপভ্রংশ, এবং তাহার পরে নানা নব্য বা আধুনিক আর্য ভাষা, যেমন বাঙলা, মৈথিল, ভোজপুরী, অসমিয়া, উড়িয়া, কোশলী, ব্রজভাষা, খড়ীবোলী, হিন্দী, উর্দু, নেপালী, রাজস্থানী, গুজরাটী, মারাঠী, কোঙ্কনী, সিন্ধী, পাঞ্জাবী, ডোগরী, কাশ্মীরী, ইত্যাদি—সেই মহান ধারা এ যুগেও ক্ষুণ্ণ হয় নাই। মানুষের জীবনের বাহ্য এবং আভ্যন্তর তথ্য ও তত্ত্ব এবং সত্য, শিব ও সুন্দর ভারতীয় সাহিত্যের এই প্রবহমান ধারায় নানা কাব্য ও মহাকাব্য, উপাখ্যান, আখ্যায়িকা এবং আধুনিক কালে উপন্যাস বা নবল-কথা ও গল্পে যে প্রকাশ লাভ করিয়াছে, তাহা পৃথিবীর সাহিত্যের মধ্যে অন্যতম দুর্লভ বস্তু। এ যুগে এই ধারা যাঁহারা উপন্যাসের মাধ্যমে শক্তিশালী ও মহিমময় করিয়া গিয়াছেন, তাঁহাদের গৌরবপূর্ণ পরম্পরার মধ্যে তারাশঙ্করের স্থান অতি উচ্চে। এই পরম্পরায় আছেন বাংলাদেশের বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র, প্রভাতকুমার ও আরও অনেকে, আসামের লক্ষ্মীনাথ বেজবরুয়া, উড়িষ্যার ফকিরমোহন সেনাপতি, উত্তর ভারতের পণ্ডিত রতননাথ দার 'সরশার' ও প্রেমচন্দ, মহারাষ্ট্রের হরিনারায়ণ আপটে, গুজরাটের গোবর্ধনরাম ত্রিপাঠী, পাঞ্জাবের ভাই বীরসিংহ প্রভৃতি। উপরন্তু সমগ্র ভারতে আর্য, দ্রাবিড় ও কিরাত গোষ্ঠীর ভাষাগুলিতে এমন বহু লেখক এখনও জীবিত আছেন, যাঁহারা ভারতীয় সাহিত্যের গৌরব বৃদ্ধি করিতেছেন। তারাশঙ্করের স্থান ছিল আধুনিক ভারতীয় সাহিত্যিকদের মধ্যে প্রথম শ্রেণীতে, এবং সেই হিসাবে ভারতের বাহিরেও ভারতবর্ষের প্রতিভূস্থানীয় সাহিত্যিক বলিয়া তাঁহার মর্যাদা ছিল। তাঁহার তিরোধানে বাংলাদেশ ও ভারতের সেই মর্যাদার বিশেষ হানি হইল।

তারাশঙ্করের প্রতিভা ছিল নানামুখী—কারয়িত্রী প্রতিভা, যাহা অপূর্ব সাহিত্য সর্জনা করিয়া গিয়াছে, তাহা তো ছিলই, উপরন্তু সামাজিক ও অন্যান্য নানা সমস্যা সম্বন্ধে তাঁহার ভাবয়িত্রী প্রতিভারও পরিচয় পাওয়া গিয়াছে। মানুষ হিসাবে তারাশঙ্কর সকলেরই শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা পাইয়া গিয়াছেন। পরিণত বয়সে দেশের ও বিদেশের অশেষ সমাদরের পাত্র হইয়া তিনি [illegible]

করিলেন। আমাদের তো আর কিছু করিবার নাই, আমরা কেবল শোকসন্তপ্ত হৃদয়ে তাঁহার লোকোত্তর সাহিত্যিক গুণাবলীর এবং তাঁহার চারিত্রিক মাধুর্যের অনুধ্যান করিতে পারি।

—সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়

বহুকাল আগে পড়া একটি লেখার কথা মনে পড়েছে। এক দিকপাল সাহিত্যিক আরেক দিকপাল সম্বন্ধে একটি আশ্চর্য লেখা লিখেছিলেন। দুই সাহিত্যিকের দেশ আলাদা, ভাষাও আলাদা, তবে দুজনেই পৃথিবীর অবিস্মরণীয় সাহিত্যিকদের মধ্যে গণ্য। সাহিত্যিকেরা হলেন নুট হামসুন ও ম্যাকসিম গর্কি। গর্কিই সে প্রবন্ধ লিখেছিলেন হামসুন সম্বন্ধে।

তখন দ্বিতীয় বিশ্বসংগ্রামের অনেক দেরী। পৃথিবী সবে প্রথম মহাযুদ্ধের অভিশাপ কাটিয়ে উঠেছে। হামসুনের নাম তখনও ফ্যাসিজম্-সংশ্রবের সন্দেহে কলঙ্কিত হয়নি। 'হাঙ্গার', 'প্যান' পর্যন্ত হয়ে 'গ্রোথ্ অফ্ দ্য সয়েল' 'সেগেলফস্‌টাউন'-এর মত অসামান্য উপন্যাসে হামসুন তখন পৃথিবীর সাহিত্য সমাজকে বিস্মিত মুগ্ধ করে তুলেছেন।

ম্যাকসিম গর্কি হামসুনের সাহিত্যসাধনার কথা বলতে গিয়ে সাহিত্য-সৃষ্টির রহস্য বিষয়েই এমন ক'টি কথা বলেছিলেন যা এখনো যেন মনে গাঁথা হয়ে আছে। সাহিত্যিক নানা জাতের হয়। তিনি বলেছিলেন, কুক্কুটবর্গের মত যারা একদিকে সরবে সাড়ম্বরে নিজেদের জাহির করার সঙ্গে পৃথিবীতে অণ্ড ও মাংসে প্রচুর সুখাদ্যের যোগান দেয় তারাও অবহেলার যোগ্য নয়। কিন্তু এ সবার ওপরে সাহিত্যিকের আরেক জাত আছে যাদের রচনা হামসুনের মত তাদের 'লোকি'-এর কাছে অবিরাম স্বগতোক্তি। 'লোকি' হলেন নরওয়ে সুইডেন নিয়ে স্ক্যাণ্ডিনেভিয়ান দেশের এক পৌরাণিক দেবতা। গর্কি স্বগত ভাষণ শোনাবার দেবতা হিসেবে 'লোকি'র নাম নিয়ে হয়ত একটু ভুল করেছিলেন, কারণ স্ক্যাণ্ডিনেভিয় পুরাণে এই দেবতাটির পরিচয় মোটেই সুবিধের নয়। তিনি সেখানে ধ্বংসের নায়ক ও মূর্তিমান অকল্যাণ। দেবতার নাম নেওয়ায় ভুল হলেও গর্কির আসল বক্তব্যে কোন ভুল ছিল না। সাহিত্য বিচারের একদিক দিয়ে শেষ কথাই তিনি বলেছিলেন। যে সাহিত্য সর্বোত্তম তা নিজের কাছে, নিজের অন্তর্দেবতার কাছে স্বগতোক্তি। সে অন্তর্দেবতার নাম যেখানে যার কাছে যেমনই হোক না কেন!

তারাশঙ্করকে সবে মাত্র হারিয়ে তাঁর সাহিত্য সাধনার কথা ভাবতে গিয়ে প্রথমেই গর্কির ওই উক্তিটি বিশেষ করে মনে পড়ল। তারাশঙ্করের সমস্ত সাহিত্যজীবন যেন ওই উক্তিটিরই প্রমাণালেখ্য।

ক'দিন আগে তারাশঙ্করের রোজনামচার ক'টি উদ্ধৃতি পড়লাম। সে রোজনামচা তারাশঙ্করের সত্তর বছর বয়সের লেখা, কিন্তু সম্মান প্রতিপত্তির শিখরে পৌঁছেও তারাশঙ্করের মনের আকুতি যে কি তা ওই সামান্য একটু উদ্ধৃতিতেই স্পষ্ট হয়ে উঠেছে।

তারাশঙ্কর এক জায়গায় লিখছেন,...উদাসীনতায় আচ্ছন্ন হয়ে রয়েছি, জীবন ব্যর্থ মনে হচ্ছে। ...প্রশ্ন করেছি নিজেকে, বার বার প্রশ্ন করেছি, কিছু পেয়েছি কি?......নিজের জীবন বা অস্তিত্ব ছাড়া আর কি কিছু তেমন পেয়েছি? না পাইনি।

......গতকালের লেখা বাতিল করে দিয়ে নতুন করে লিখছি, আড়াই পৃষ্ঠা লিখলাম। লেখার প্রতি অনুরাগহীন মনের জন্যে লেখা ভালো লাগছে না......

এই অকপট আত্মবিচার, সাফল্যের চূড়ায় বসেও অনুপলব্ধির আকুলতার সঙ্গে এই অসন্তোষ, নিজের অন্তর পুরুষের কাছে নিজেকে এই মুক্ত করে দেওয়া, মহৎ সাহিত্যস্রষ্টার নিশ্চিত চরিত্রলক্ষণ যদি কিছু থাকে তা কি এই নয়!

তারাশঙ্করকে সবে আমরা হারিয়েছি। তাঁর সাহিত্যবিচারে প্রবৃত্ত হবার মত মন ও মেজাজ এখন নেই। সে সময়ও এখনো আসেনি। এইটুকু শুধু সে বিষয়ে বলা যায় যে তারাশঙ্করের মত সাহিত্যিকদের শুধু তাঁদের সৃষ্টির শিল্পবিচার দিয়ে বুঝতে চেষ্টা করা নিষ্ফল। কারণ সাহিত্য আর জীবনসাধনা তাঁদের অভিন্ন।

রচনায় রচয়িতার ছায়া থাকে একথা সবাই মানবেন কিন্তু তারাশঙ্করের মত স্রষ্টার রচনাও জীবনের অভিন্নতা একটু আলাদা ধরনের। সাহিত্য রচনা এঁদের একটা স্বতন্ত্র মনের কাজ নয়, তা তাঁদের জীবন-সন্ধানী অভিযানেরই একটা অঙ্গ।

এঁদের বেলায় রেশমের গুটি বুনে ও কেটে প্রজাপতির তা থেকে বেরিয়ে আসার উপমাটা মনে পড়ে।

গুটি কাটা প্রজাপতি রেশম যা ফেলে যায় তা পরম সম্পদ আমাদের মুগ্ধ বিস্ময় জাগায়, কিন্তু গুটি কেটে বেরিয়ে যে গেল তার কাছে এ অধ্যায়টা জীবন-সন্ধানের একটা ধাপ মাত্র।

সাহিত্য শিল্প জাতীয় সব কিছুরই প্রধানত দুটি দিক আছে। একদিকটা তার নিখুঁত নিটোল কারুকাজের, আর একদিক প্রাণোচ্ছল বিশাল বিস্তৃতির। প্রজাপতির পাখায় যেমন সূক্ষ্ম কারুকাজের বিন্যাস সামঞ্জস্যে আমরা মুগ্ধ হই, তেমনি আমরা অভিভূত হই সমুদ্র পাহাড় অরণ্যের বিশালতার মহিমায়।

তারাশঙ্কর সূক্ষ্ম কারুকাজ সম্বন্ধে উদাসীন নন, কিন্তু আমার মনে হয় যে তিনি মুক্ত অরণ্য পর্বতের মত বিশালতার শিল্পী। জন নয় জনপদ তাঁর সাহিত্যবস্তু, ব্যক্তিকেই তিনি আঁকেন কিন্তু তার পেছনে থাকে ইতিহাসের পরিপ্রেক্ষিত ও প্রবাহ। আঙ্গিক ও বিন্যাসের পারিপাট্যই যাঁদের কাছে সাহিত্যসৃষ্টির সার কথা তাঁদের কাছে তারাশঙ্করের সম্পূর্ণ তাৎপর্য ধরা না পড়লে আশ্চর্য হবার কিছু নেই। তাঁর সাহিত্যকর্ম নিছক নৈপুণ্য ও নিটোল সম্পূর্ণতা ছাড়িয়ে—

মানুষ তারাশঙ্কর ও লেখক তারাশঙ্করের বিবর্তনের ধারা এককালে হয়ত আলাদা ছিল কিন্তু সবিস্ময়ে লক্ষ্য করেছি একই স্রোতে শেষ পর্যন্ত তারা কিভাবে মিলিত হয়েছে। তাঁর গল্পে উপন্যাসে শুধু নয় যে কোন রচনাতেই জীবনের পরম রহস্য উদ্ঘাটন ও গহন সত্য উপলব্ধির একটি তীব্র আকুতির শিখা দীপ্যমান।

এ শিখা তারাশঙ্করের ব্যক্তিগত জীবন-সাধনা থেকেই জ্বালানো।

নাতিস্বল্পজীবনে আমৃত্যু পর্যন্ত তারাশঙ্করের মধ্যে একটি বিস্ময়কর বৈশিষ্ট্য স্মরণ করে রাখবার মত। সাধারণত সাফল্য-মণ্ডিত জীবনে যা স্বাভাবিক 'সব পেয়েছি' বলে সেই আত্ম-সন্তোষের জড়তা কোনদিন তাঁকে অধিকার করেনি, পাবার নয় বলে বিপ্রতিপত্তিও তিনি হয়ে ওঠেন নি কখনো। অলভ্য বলে যা মনে হয় তারই অন্বেষণেই যে জীবনেরও সার্থকতা এই সুদৃঢ় প্রত্যয় জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত তাঁকে অনলসভাবে এগিয়ে যাওয়ার প্রেরণা দিয়েছে।

পৃথিবীতে কোনো খ্যাতিই চির অম্লান হয়ত থাকে না। সময়ের পরিবর্তনে অপব্যাখ্যার কুজ্ঝটিকায় তা আচ্ছন্ন হয়। নতুন যুগের দৃষ্টিভঙ্গি তার ওপর সংশয়ের ছায়া ফেলে। তারাশঙ্কর এ নিয়মের ব্যতিক্রম হয়ত হবেন না। কিন্তু সাময়িক বিচারের হাওয়া যে দিকেই ফিরুক, বর্তমানকালের বিরাট এক দিক্‌চিহ্ন হিসাবে তারাশঙ্করের সাহিত্যমূর্তি কোনদিনই বিলুপ্ত হবার নয় বলে মনে করি।

—প্রেমেন্দ্র মিত্র

সাহিত্যে তারাশঙ্করের আবির্ভাব ছিল নাটকীয় এবং আকস্মিক। আগে থেকে ভূমিকা নেই, অনুশীলনের ইতিহাস কিছু নেই, তিনি হঠাৎ সামনে এসে দাঁড়ালেন কক্ষচ্যুত এক জাজ্বল্যমান জ্যোতিষ্কের মতো। তাঁর পাকা হাতের কারুকার্য, প্রকাশের অভিনব ভঙ্গী এবং তাঁর ভাবনার সংবেদনশীলতা—তাঁকে শ্রেষ্ঠ গল্পলেখকের আসনে বসিয়েছিল। তাঁর প্রথম তিনটি গল্পই 'কল্লোলে' প্রকাশিত হয়। সে-গল্পগুলি অম্লান ঔজ্জ্বল্যে আজও ঝলমল করছে। তাদের নাম 'রসকলি, হারানো সুর ও স্থলপদ্ম'।

সাহিত্যের আদর্শে তারাশঙ্কর ছিলেন ঐতিহ্যপন্থী। তাঁর প্রত্যেক রচনায় মৌলিক চিন্তাধারার এমন সমাবেশ থাকত যেটি অনন্য। রাঢ়ভূমির জীবন, সমাজ, সংস্কৃতি, লোকযাত্রা,—এদের অনবদ্য ছবি তাঁর প্রতি গল্পে, গ্রন্থে, চরিত্রে এবং বর্ণনায় ভাস্বর হয়ে উঠত। এ সম্বন্ধে তিনি ছিলেন অদ্বিতীয়। তাঁর সাহিত্যের অমৃতের আস্বাদ পেয়েছি বহুবার।

সাহিত্যের প্রতি তাঁর একাগ্র অনুরাগ ও নিষ্ঠা তাঁকে বহু সময়ে কঠোর পরিশ্রমে অনুপ্রাণিত করত। শিল্পের শ্রেষ্ঠতা অনেক সময়েই শ্রমের উপর নির্ভর করে—এ তিনি জানতেন। একখানির পর একখানি গ্রন্থ তিনি নতুন করে লিখেছেন—এই সংবাদ তাঁর অন্তরঙ্গ মহলের জানা ছিল।

তারাশঙ্করের মৃত্যুও অনেকটা যেন আকস্মিক। তাঁর মৃত্যুর মাত্র তিন সপ্তাহ আগে তাঁকে দেখেছি সুস্থ, সবল ও সহজ। মৃত্যুর আগে কোনও দুরারোগ্য ব্যাধির ভূমিকা নেই, আগেভাগে নোটিশ দেওয়া নেই, শ্যেনপক্ষীর মতো মৃত্যু যেন নেমে এল নীলাকাশ থেকে। তাঁর প্রথম ছোটগল্প একদা যে বিস্ময় এনেছিল, তাঁর এই মৃত্যুও তেমনি হতবাক করে রেখে গেল।

তারাশঙ্কর ছিলেন হৃদয়বান মানুষ এবং নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ। তাঁর ভাবপ্রবণতা এবং আবেগ আকুলতা—একজন পরম বৈষ্ণবকে স্মরণ করিয়ে দিত। দেবদ্বিজে তাঁর মতো ভক্তিমান মানুষ লেখক-সমাজে বিরল। কিন্তু ইতিহাসে ব্যক্তি-চরিত্রের এ সকল গুণপনা হয়ত দাঁড়িয়ে থাকবে না,—থাকবে তাঁর কীর্তি। তাঁর বিশাল সাহিত্যকীর্তিই তাঁর জীবন।

—প্রবোধকুমার সান্যাল

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের তিরোধান সারা বাংলার জীবন ও সাহিত্যক্ষেত্রে ইন্দ্রপাততুল্য।

নিয়তি নিয়ত অবাধ্য। তাকে ধিক্কার না হয় না-ই দিলাম। জীবনে পূর্ণতার কথঞ্চিৎ আস্বাদ তিনি অবশ্যই পেয়েছিলেন, নইলে অজস্র রচনায় তাঁর এমন সহৃদয়তা ছড়িয়ে থাকে কেমন করে? কাল ব্যাধি তাঁকে পঙ্গু করে রাখার মতো কদাকার করেনি। সময় হয়েছিল; বাঁধন ছিঁড়ে তিনি চলে গেছেন।

কিন্তু বাঙালী জীবনে তারাশঙ্করের তিরোভাব যে বঞ্চনার সৃষ্টি করল তার পূরণ নেই। হয়তো এ-বঞ্চনা তেমন তীব্র মনে হবে না তাদের কাছে, যারা তারুণ্যের অভিমানবশে আমাদের এই মান্ধাতাগন্ধী দেশের পরম্পরাকে নস্যাৎ করার জন্য উদ্‌গ্রীব। হয়তো এ-বঞ্চনাবোধ আসবে না তাদের, যারা বিশ্ববিরাজী বৈদগ্ধ্যের মোহে স্বদেশজিজ্ঞাসা বিষয়ে জ্ঞাতে বা অজ্ঞাতে নাসিকা সঙ্কুচন করে থাকেন। সে যাই হোক্, অগণিত বাঙালী, এপার-ওপার দুই বাংলার মানুষ, যারা ছিল তাঁর অনুরক্ত পাঠক, আজ অনুভব করছে এই বঞ্চনার বেদনা, তারা জানে অনুরূপ কারও সন্ধান আর মিলবে না।

সন্দেহ নেই যে সমকালীন বাংলার শ্রেষ্ঠ কাহিনীকার ছিলেন তারাশঙ্কর। তাঁর রচনার নিছক শিল্পগুণ নিয়ে অনেক তর্ক উঠতে পারে। অত্যন্ত নিষ্ঠাবান লেখক হলেও তাঁর লিখনভঙ্গীতে অচেতন শৈথিল্য খুঁজে পাওয়া কঠিন নয়। বিচিত্র জীবনবার্তায় যখন মুগ্ধ করছেন, তখনও যেন ভাষার উজ্জ্বল নীলমণি রূপের অভাব। বিষয়বিন্যাসে, রচনারীতিতে প্রায় যেন একরকম পৌনঃপুনিকতা। অনুভূতির গভীরে বিচরণের মধ্যেই যেন মাঝে মাঝে একধরনের অচেতন তরলতার লক্ষণ তাঁর অনেক রচনায়। কিন্তু খুঁৎ-সন্ধানী সমালোচককেও মানতে হবে, সব কিছু ছাপিয়ে তারাশঙ্করের মমতা, তাঁর জিজ্ঞাসু মন, তাঁর অধ্যবসায়, আপাত-দৃষ্টিতে তুচ্ছ মানুষেরও মহিমা সম্বন্ধে নিশ্চিতি, তাঁকে মহৎ লেখকের গরিমায় প্রতিষ্ঠিত করেছে। যিনি লিখেছেন 'কবি' আর 'হাঁসুলী বাঁকের উপকথা', 'গণদেবতা' আর 'পঞ্চগ্রাম', "মঞ্জরী অপেরা' আর 'ঝড় ও ঝরা পাতা', সঙ্গে সঙ্গে লিখেছেন সংখ্যাহীন ছোট-বড়-মাঝারি গল্প যাতে বাংলার রূপ রস শব্দ স্পর্শ গন্ধ মিশে এক সম্ভারের সৃষ্টি করেছে, তাঁর লেখনী সার্থক, জীবনের যোগমায়ায় তাঁর রচনা সিদ্ধি পেয়েছে।

প্রায় ত্রিশ বৎসরকাল এই প্রতিভাধর মানুষটিকে জেনেছি, তাঁর মনের বিস্তৃতি দেখে বিস্মিত হয়েছি, তাঁর সহজ সরল আত্মীয়তার স্পর্শে আনন্দ পেয়েছি, হঠাৎ বহুদিন অদর্শনের পর ক্ষুদ্র এক পত্রে একান্ত বিপরীত চরিত্রের মানুষ সম্বন্ধে তাঁর আশ্চর্য মমতার পরিচয় পেয়ে অভিভূত হয়েছি। বুঝেছি যে তারাশঙ্কর প্রকৃতই দোষে গুণে গড়া সকল মানুষকে আপন করতে পেরেছিলেন। বুঝেছি কেন তাঁকে যথার্থ মানব মাহাত্ম্যের সন্ধানে প্রায়শ যেতে হয়েছে সমাজের অন্তেবাসীদের কাছে। জেনেছি কেন শিল্পকর্মে ত্রুটি এবং সুনিবদ্ধ চিন্তায় দক্ষতার অভাব সত্ত্বেও তিনিই ছিলেন অবিসম্বাদিতভাবে সমকালীন বাংলার লেখক-শিরোমণি। তারাশঙ্করের দেহাবসান ঘটেছে, কিন্তু তাঁর কীর্তি ও তাঁর স্মৃতি অক্ষয় হয়ে রইল।

—হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

তারাশঙ্করের সাহিত্য সম্বন্ধে বলব না। বলবার মতন গুণীজ্ঞানী বিস্তর আছেন, ভবিষ্যতে আরও সব আসবেন। ব্যক্তি-পরিচয়ও সৌভাগ্যক্রমে নিজেই তিনি অনেক লিখে গেছেন। সজনীকান্ত মধ্যমণি, তাঁকে ঘিরে শনিবারের চিঠির আসর গড়ে উঠেছিল। তারাশঙ্কর ঐ আসরের। এমন কি, শনিবারের চিঠির সহ-সম্পাদকও ছিলেন তিনি কিছুদিন। আমিও সেখানে যেতাম। বিস্তরকাল আগের কথা—সাল-টাল অত আমার হিসাবে আসে না। খুব গোড়ার দিকে 'আপনি' 'আপনি' ছিল নিশ্চয়, কবে সেই সম্পর্ক 'তুমি'তে নেমে এলো মালুম নেই। নাট্যনিকেতনে 'কালিন্দী'

নাটকের অভিনয়—মনোহরপুকুরের অন্ধ গলি খুঁজে খুঁজে তারাশঙ্কর আমায় নিমন্ত্রণ করতে এলেন। আমি নেই, বাড়িতে কেউ না—চিঠিতে অনুরোধ জানিয়ে ভৃত্যের কাছে রেখে গেলেন। নাট্যভারতীতে আমারও 'প্লাবন' নাটকের অভিনয়—আমি নিজে গেছি নিমন্ত্রণ করতে। বেলগাছিয়ার ঐ তল্লাটে শহর গড়ে উঠছে—তখন, মাটি খুঁড়ে ডাঁই করেছে—সনৎ আলো ধরে আমায় বরানগরের রাস্তায় তুলে দিয়ে গেলেন মনে আছে। যশোরের সাহিত্য-সভায় যাচ্ছি—কলকাতা থেকে তারাশঙ্কর ও আমি। বিভূতিভূষণ বনগাঁ থেকে উঠলেন। বিভূতি-দা ও আমি উভয়ে যশোরের মানুষ বলে বাকি পথ আমরা তারাশঙ্করকে যশোর সম্পর্কে মহোৎসাহে জ্ঞানদান করে চলেছি। বেনাপোল বিখ্যাত স্থান, বৈষ্ণবতীর্থ শ্রীচৈতন্যপার্ষদ হরিদাসের তুলসিমঞ্চ ওখানে আছে। কিন্তু বিভূতি-দার সে পরিচয় মনে পড়ল না—বললেন, মস্ত বড় গোহাটা এই বেনাপোলে, হাটেরদিন বিস্তর গরু ওঠে। তারাশঙ্কর বললেন, ভাল হল, আমাদের জানা রইল তোমায় কখনো না পাওয়া গেলে এইখানে এসে খুঁজতে হবে। কেদার বন্দ্যোপাধ্যায় দাদামশায়কে সম্বর্ধনা জানাতে কামরা বোঝাই করে কলকাতা থেকে বিস্তর সাহিত্যিক আমরা পূর্ণিয়ায় যাচ্ছি। রাত-দুপুরে গাড়ি লাভপুর স্টেশনে থেমেছে, তারাশঙ্কর উঠলেন—খালি হাতে নয়। প্রবল হই-হই রব উঠল, প্রকাণ্ড ভোলোহাঁড়ি লহমায় লোপাট, হাঁড়ির চাড়াগুলো রইল শুধু। সকালবেলা মনিহারি বলাইদা-দের বাড়িতে। তাঁর ঋষিতুল্য বাবা তখন আছেন, দেড়দিন জুড়ে সকলে মিলে সেখানেই বা কী উল্লাস! এই দেখুন, পুঁথি বেড়ে যাচ্ছে। অতএব থাক।

তারাশঙ্করের শরীরটা সে সময় বেশ খারাপ যাচ্ছে। আচমকা ফোন : তোমার বাড়ি যাবো আমি, কখন থাকবে?

এখনই হয়ে যাক না। অসুস্থ শরীরে কষ্ট করে এতদূর কি দরকার?

না, যেতেই হবে।

সেরেছে! তখন বেঙ্গল পাবলিশার্সের সঙ্গে জড়িত ছিলাম। মনে মনে প্রমাদ গণি : খুব সম্ভব গোলমেলে কিছু-একটা ঘটেছে, প্রতিষ্ঠানের উপর রেগে টং হয়েছেন। টালা থেকে চলে এলেন বালিগঞ্জে, ধুঁকতে ধুঁকতে উঠলেন আমার তিনতলার ঘরে। উদ্বেগে তাকিয়ে আছি। বললেন, অমুক বইটা তুমি বড্ড ভাল লিখেছ হে—ইত্যাদি, ইত্যাদি। বইটা হয়তো আমি তাঁকে দিয়েছিলাম, অথবা নিজে থেকেও পড়তে পারেন। উৎকণ্ঠা গিয়ে আমার এইবার ক্রোধ প্রকাশের পালা : এটা কি টেলিফোনে হতে পারত না? এমন কী জরুরি জিনিস এই শরীর নিয়ে এতদূর ঠেলে আসতে হল?

টেলিফোনে হলে আসতে যাবো কেন, তারাশঙ্কর বললেন। লেখা ভাল লাগলে অধীর হয়ে উঠতেন, তার এক দৃষ্টান্ত।

আটুই শ্রাবণের জন্মদিনে সকালবেলা টালার বাড়ি গিয়ে প্রণাম করলাম। এবং তারাশঙ্কর আলিঙ্গনে জড়িয়ে ধরলেন। সন্তোষকুমার ঘোষ, নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী ও গৌরকিশোর ঘোষ একটু আগে এসেছেন। বয়সের গুণে আমিই প্রণাম পেয়ে থাকি—সেই আমিও মাথা নুইয়ে প্রণাম করছি, ওঁদের কাছে কৌতুকাবহ দৃশ্য। বলাবলি করছেন তাই। পরের দিন আমার জন্মদিন। প্রহরখানেক বেলায় তারাশঙ্কর ফুল মালা ও বই নিয়ে আশীর্বাদ করতে এলেন। ঘোর অপরাধ আমার—ঐ সময়টা একটু বেরিয়েছি, উপহার উনি রেখে গেলেন, হাত পেতে নেবার ভাগ্য থেকে বঞ্চিত হলাম আমি। বাড়ি এসেই অপরাধ স্বীকার করে ফোন করলাম : উপহার নিয়ে মাথায় ঠেকিয়েছি, পায়ের গোড়ায় মাথা ঠেকিয়ে প্রণামটা বাকি রয়ে গেছে—একদিন গিয়ে সেরে আসব।

কথা রেখেছি আমি একমাস উনিশ দিন পরে, আঠাশে ভাদ্র সকালবেলা। সজল-দৃষ্টি অগণ্য মানুষ শয্যা পরিক্রমা করে চলে যাচ্ছেন। মুদিত-নেত্র তারাশঙ্কর। এত রোগযন্ত্রণা সয়েছেন, কিন্তু ক্ষীণ হাসি মুখের উপর—যেন ঈষৎ বিদ্রূপ মেশানো চরণোপান্তে শ্বেত কুসুমাঞ্জলি দিয়ে দু-হাত দুই পদতলে রেখে অনেকক্ষণ ধরে আমি শেষ প্রণাম নিবেদন করলাম।

—মনোজ বসু

আমাকে লেখা তারাশঙ্করের একটি অধুনাতন চিঠি :

টালাপার্ক,
তারাশঙ্কর কলিকাতা-২
ফোন ৫৬-৩০৭৬

পরমানন্দেষু,

ভাই অচিন্ত্য, সেই সে পরমানন্দ যে আমারে ভালবাসে। যে আমাকে ভালবাসে সেই তাঁকে ভালবাসে। তোমার ভালবাসার মধ্যে আমি তাঁর প্রেমের যেন স্পর্শ পাই।

তোমার চিঠির প্রতীক্ষায় ছিলাম। জানতাম তোমার চিঠি আসবে এবং সে চিঠিতে গভীর অনুরাগীজনের অনুরাগের স্বাদ পাব।

ভয় হচ্ছে ভাই। কেন জান?

তাঁকে মা বলে ডাকি, পুজো করি। আমাকে খেলনা দিয়ে ভুলিয়ে দেবে না তো? যাকে কান্নায় মেলে তাকে কি হাসিতে ভেঙে পড়ে পাওয়া যায়? কাঁদলেই মা ছুটে এসে কোলে তোলে। হাসলে, ভাবে, বেশ আছে, ছেলে হাসছে।

আমার নিভৃত মনের গোপন ভালবাসা গ্রহণ করো। যে ভালবাসার ডাক বাঁশীতে বাজে। ইতি তোমার
তারাশঙ্কর

এই সম্পর্কে ভক্ত কবি মহাপ্রস্থিত কুমুদরঞ্জন মল্লিকের কবিতা মনে পড়ছে :

ডেকে ডেকে ক্লান্ত যখন চেষ্টা করো কাঁদতে,
ডাকের চেয়ে কান্না দামী মাকে কাছে আনতে।।

সেই 'কল্লোলে'র তারাশঙ্কর আজ মহামৌনের তারাশঙ্কর। সেই মহামৌনে নিরন্ত কাল শোনা যাবে তার ভালোবাসার ডাক, মাটিকে ভালোবাসা, মানুষকে ভালোবাসা, মানুষের মাঝে যে পরমতম তাঁকে ভালোবাসা। লেখনী বিরাম মেনেছে কিন্তু বংশীধ্বনির বিরাম নেই।

—অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত

শেষ দেখার পর ফিরছি, সমস্ত মন জুড়ে রয়েছে এক বিরাট বাঙালীর মুখখানি। দেখলাম পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায় গাড়ি থেকে নামছেন, অগণিত প্রিয়জনের মধ্যে তিনিও এসেছেন শেষ দেখা দেখতে। মনে পড়ে গেল, পল্লীগ্রামের এক অজ্ঞাত অখ্যাত লেখককে 'কল্লোলে'র এই পবিত্র গাঙ্গুলী একদিন তাঁর প্রথম গল্প 'রসকলি' পড়ে পোস্টকার্ডে লিখেছিলেন—"এতদিন কোথায় ছিলেন?" নবীন লেখকের অন্তরে সেই পোস্টকার্ডটি সঞ্জীবনী মন্ত্রের কাজ করেছিল। 'কল্লোলে' সেই গল্প অচিরাৎ প্রকাশিত হল।

এসব কথা যার জন্য লিখেছেন সেদিনের সেই লেখক তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়। শরৎচন্দ্রের পর যে কজন প্রথম শ্রেণীর কথাকার বাংলা সাহিত্যে আবির্ভূত হয়েছিলেন তিনি তাঁদের অন্যতম। সমাজ সচেতনতা তাঁর সাহিত্যে যে ভাবে প্রকাশিত তা ইতিপূর্বে চোখে পড়েনি। ক্ষয়িষ্ণু সামন্ততান্ত্রিক সমাজের অবলুপ্তি তাঁর সাহিত্যে এক নতুন শিল্পসত্তা সৃষ্টি করেছে। কিন্তু তারাশঙ্কর সম্পর্কে সর্বদা এই একটি কথাই বার বার উচ্চারিত হলেও তারাশঙ্কর কিন্তু শুধু মধ্যযুগীয় সামন্ততান্ত্রিক সমাজের ছবি এঁকেই ক্ষান্ত হননি, তাঁর সাহিত্যে বিভিন্ন পর্ব, বিভিন্ন স্তর। পিকাসোর ছবি আঁকার ভঙ্গীতে যেমন বিভিন্ন পর্ব, তারাশঙ্করের সাহিত্যে তেমনই বিভিন্ন পর্ব। এক একটি তরঙ্গ এসে তাঁর অন্তরকে প্লাবিত করেছে আর সেই প্লাবনের অভিব্যক্তি ফুটে উঠেছে তাঁর অজস্র রচনায়। তিনি নিজে এক জায়গায় বলেছেন—"পৃথিবীর মায়াপুরীতে এটা ওটা নাড়তে নাড়তে সোনার কাঠি কুড়িয়ে পেলাম।" —তাঁর সেই সোনার কাঠি হল গ্রামবাংলার মাটি আর মানুষ। আজ থেকে ছ' বছর আগে তাঁকে প্রশ্ন করেছিলাম—এই সোনার কাঠিটা বোধহয় হাতছাড়া করতে পারেন নি আজো?

তিনি সেদিন একটু গম্ভীর হয়ে বলেছিলেন—"ও জিনিস কি কেউ হাত ছাড়া করে ভাই, ও হারিয়ে যায়। আজো তা আমার কাছে আছে কি নেই, তোমরাই বলবে।"

এখানে এই 'তোমরা' শুধু আমি নই, বাংলা সাহিত্যের অগণিত পাঠকমণ্ডলী একথা বলা বাহুল্য।

তারাশঙ্করের সঙ্গে কল্লোলের কালে পরিচয় ঘটেনি, পরিচয় হয়েছিল আজ থেকে প্রায় চল্লিশ বছর আগে ১৯৩২ খৃষ্টাব্দে হয়ত। তখন 'নবশক্তি' সাপ্তাহিক পত্রে ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হচ্ছে 'পাষাণপুরী' উপন্যাস—লেখকের নামের পাশে তাঁর গ্রামের নামও উল্লেখ করা সেকালে রীতি ছিল। 'তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়—লাভপুর' এই নাম 'পাষাণপুরী'র প্রতিটি কিস্তির ওপর ছাপা হত। সেই নবশক্তি অফিসেই সম্পাদক স্বর্গীয় তারানাথ রায়। সেই 'পাষাণপুরী'তেই তারাশঙ্করের রাষ্ট্রচেতনার পরিচয় ছিল। তিনি সেদিন লিখেছিলেন—মানুষ মানুষের বিচার করিয়া প্রাণদণ্ডের বিধান দেয়—এর মধ্যে যে চরম দীনতা, তার চেয়ে দুর্ভাগ্য মানুষের আর কিছু নাই। এর পরে 'চৈতালী ঘূর্ণী'তে গোষ্ঠ ও দামিনীর মধ্যে শ্রমিক আন্দোলনের ইঙ্গিত আছে। এ এক দিক। অপর দিকে 'আগুন' আর 'কবি'। তিনি যখন চন্দনাথ—মীরা ও হীরু—যাযাবরীর কথা লিখেছিলেন তখনই তিনি যে আগামীদিনের লেখক এই ধারণা বাঙালী পাঠকের মনে বদ্ধমূল হয়ে গিছল। কবিয়াল আর ঝুমুরওয়ালাদের কাহিনী 'কবি' তাঁকে অসামান্য মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করল। তারাশঙ্কর আমাকে একদিন বলেছিলেন—জানো, একজন আমাকে 'কবি'র জন্য অভিনন্দন জানিয়েছিলেন, তিনি মোহিতলাল, তিনি একটি স্বতন্ত্র প্রবন্ধ লিখেছিলেন 'কবি' সম্পর্কে।

তাঁকে বলেছিলাম—অনেক প্রশ্নই ত' করা যায়, তাতে অনেক সময় লাগবে। আপনার 'পৌষলক্ষ্মী'র কাহিনীটি যেন অতীতের অন্তিম কাহিনী। তারাশঙ্কর সেদিন সহাস্যে বলেছিলেন, —"এ গল্প বোধ হয় ১৯৪৩-এর রচনা। মুকুন্দ পাল অতীতের প্রতীক। আমি জীবনে অনেক মৃত্যু দেখেছি। তাই বলেছি—গাড়ি চলে গেল, পাল মাটিতে পড়ে গেল মহাপ্রস্থানের পথের ভীমের মত—সেই সঙ্গে গেল অতীত।"

কথাটা শুনে মনটা কেমন বিষণ্ণ হয়ে গেল।

মঙ্গলবার চোদ্দই সেপ্টেম্বর তারাশঙ্করের মহানিদ্রামগ্ন পুষ্পসজ্জিত চন্দনচর্চিত দেহখানির দিকে তাকিয়ে মনে পড়ল তাঁরই সেই কথাগুলি—

"গাড়ি চলে গেল। পাল মাটিতে পড়ে গেল। মহাপ্রস্থানের পথের ভীমের মত, সেই সঙ্গে গেল অতীত।"

তারাশঙ্করের সঙ্গে চলে গেল একটা অতীত। বাংলা ও বাঙালীজীবনের অতীত গৌরবের প্রতীক তারাশঙ্কর মহাপ্রস্থানের পথের সেই অসীম শক্তিমান পাণ্ডবের মত আজ পড়ে আছেন।

—ভবানী মুখোপাধ্যায়

অনেক মানুষ প্রথম দর্শনেই আকৃষ্ট করে, মনের উপর ছাপ রেখে যায়, কিন্তু তারাশঙ্করের ক্ষেত্রে আমার তা হয়নি। কিন্তু মানুষের বাইরের রূপটাই যে সব নয়, রুক্ষতার অন্তরালেও একটি মধুর, কোমল, হৃদয়বান মানুষ যে থাকতে পারে, তা পরে বুঝেছিলুম তাঁর সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হবার পর।

অন্য মানুষজনের সঙ্গে, বিশেষভাবে সাহিত্যিকদের প্রতি তারাশঙ্করের ছিল একটা অনন্যসাধারণ আন্তরিকতা। কেউ সাহিত্যকর্ম করছে শুনলে তিনি তাকে তাঁর সবচেয়ে আপনজন মনে করতেন এবং তাকে সাহায্য করতে ও সহানুভূতি দেখাতে কখনও বিমুখ হননি।

ব্যক্তিগতভাবে আমার সাহিত্যিক-জীবনে নানাভাবে তাঁর কাছ থেকে উৎসাহিত ও উপকৃত হয়েছি। তাঁর তিরোধানে অনেক কাহিনী, অনেক ঘটনা আজ ভিড় করে আসছে মনের মধ্যে। সব গুছিয়ে বলা এখন সম্ভব নয়। তবু দু' একটি বলি। সম্প্রতি সুধীরচন্দ্র সরকার তাঁর সম্পাদিত 'কথাগুচ্ছ' নামক গল্প-সংগ্রহ গ্রন্থের ২য় সংস্করণে লেখকদের সংক্ষিপ্ত জীবনী রচনার জন্য আমার উপর ভার দেন। এই উপলক্ষে একবার আমি তারাশঙ্কর দা'র (আমি তাঁকে তখন দাদা বলি) বাড়িতে গিয়ে তাঁর সাহিত্য নিয়ে আলাপ-আলোচনা করি এবং তিনি আমাকে যথাসাধ্য সাহায্য করেন। কিন্তু সেই সময় প্রসঙ্গত রহস্য করে তিনি যে কথাগুলি বলেন, সেগুলি বিশেষ প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলেন, 'ভাই, তুমি সাহিত্যিকদের এসব সাহিত্যালোচনার মধ্যে না গিয়ে, বরং তাদের ব্যক্তিগত চরিত্র ও ঘরোয়া জীবনের কথা বেশী করে বলো, তাহলে সাধারণের কাছে সেটাই বেশী উপভোগ্য হবে।' তার উত্তরে আমি বলি, 'দাদা, এতে তো মারধোর খাবার বা অনেকের বিরাগভাজন হবার যথেষ্ট সম্ভাবনা আছে।' তার উত্তরে তিনি আরও রসিকতা করে বলেছিলেন, 'তুমি সাহিত্যকর্ম করবে, সাহিত্যিকদের সমালোচনা করবে, অথচ কারুর বিরাগভাজন হবে না, এ কেমন কথা!'

সামান্য বা নগণ্য সাহিত্যিকদের প্রতি সহানুভূতিতে তাঁর হৃদয় ছিল যেমন ভরা, তেমনি ছিল তাঁর সামাজিকতাবোধ। কোথাও কেউ তাঁকে সাদরে আমন্ত্রণ করলে, (যতদিন শরীর ভাল ছিল) তিনি তা রক্ষা করার যথাসাধ্য চেষ্টা করতেন। বদান্যতা ও উদারতাও ছিল তাঁর মধ্যে যথেষ্ট। তাছাড়া প্রবীণ ও দুস্থ সাহিত্যিকদের সরকারী সাহায্য পাইয়ে দেওয়ার ব্যাপারে তাঁর আগ্রহের অন্ত ছিল না। জগদীশ গুপ্তের সাহিত্য-ভাতা একবার বন্ধ হয়ে গেলে আমি নিজে গিয়ে ঘটনাটি তাঁর কাছে ব্যক্ত করায়, তিনি তৎক্ষণাৎ অত্যন্ত আগ্রহের সঙ্গে সরকারের সঙ্গে যোগাযোগ করে, ঐ সাহায্য যাতে অব্যাহত থাকে তার ব্যবস্থা করে দেন।

হেমেন্দ্রকুমার রায় ও রামপদ মুখোপাধ্যায়ের সাহিত্য-ভাতা সম্পর্কে তিনি সচেষ্ট না হলে হত কিনা সন্দেহ। এই ব্যাপারে তাঁর কাছে আমি কয়েকবার যাতায়াত করার সময় একদিন তিনি যে কথা বলেছিলেন, তার চেয়ে বড় কথা আমি আর কোন

জ্ঞানপীঠ পুরস্কার প্রাপ্তির পর বন্ধুগণ কর্তৃক স্বর্গতঃ সুধীরচন্দ্র সরকারের বাসভবনে অনুষ্ঠিত সম্বর্ধনা ।। (পিছনের সারিতে দাঁড়ানো—বামদিক থেকে) বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়, বিশু মুখোপাধ্যায়, তুষারকান্তি ঘোষ, ভবানী মুখোপাধ্যায় এবং ডাঃ নির্মল সরকার। (উপবিষ্ট—বামদিক থেকে) বুদ্ধদেব বসু, চারু রায়, মনোজ বসু, শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়, অন্নদাশংকর রায়, তারাশংকর বন্দ্যোপাধ্যায়, অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত, প্রবোধকুমার সান্যাল, সুধীরচন্দ্র সরকার এবং বিমল মিত্র।

সাহিত্যিকের মুখে শুনেছি কিনা সন্দেহ। এই ব্যাপারে তাঁর কাছে আমি কয়েকবার যাতায়াত করার সময় একদিন তিনি যে কথা বলেছিলেন, তার চেয়ে বড় কথা আমি আর কোন সাহিত্যিকের মুখে শুনেছি কিনা সন্দেহ। তিনি বলেছিলেন, 'বিশু, এত করে কারু জন্যেই তোমায় আমায় বলতে হবে না; এর চেয়ে বড় কোন পুণ্যকর্ম আছে বলে আমি মনে করি না। টাকা আমি নিজে দিচ্ছি না, অন্যের কাছ থেকে পাইয়ে দেবার চেষ্টা করছি মাত্র। কে জানে, একদিন এই সাহায্যের জন্যে আমাকেই কারু কাছে হাত পাততে হবে কিনা!'

তখন অবশ্য তিনি 'জ্ঞানপীঠ' পুরস্কার পাননি।

—বিশু মুখোপাধ্যায়

প্রথমে শরৎচন্দ্র এবং পরে স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ বিদায় নেবার পর বাংলা সাহিত্যে বিরাট একটা শূন্যতা দেখা দিয়েছিল। যে কোনো সাহিত্যিক তা তিনি যতো ছোটোই হন, মারা গেলে শূন্যতা একটা দেখা দেয়ই—কেননা প্রত্যেক সাহিত্যিকই স্বতন্ত্র, তাঁর বিশেষ স্থানটি অন্য কেউ পূর্ণ করতে পারেন না। কাজেই রবীন্দ্রনাথ এবং শরৎচন্দ্রের মতো মহৎ সাহিত্যিকের প্রয়াণে যে আমাদের মনে মহাবিনষ্টির আশঙ্কা দেখা দেবে তাতে অবাক হবার কিছু নেই। কিন্তু এখানে আমি একটু অন্য ধরনের শূন্যতার কথা বলছিলাম। এ অভাববোধ জেগেছিল বিশেষ করে এই কারণে যে বাংলা সাহিত্যের পাঠক এবং লেখকরাও প্রায় অনেকেই তখন মেনে নিয়েছিলেন, রবীন্দ্রনাথ-শরৎচন্দ্র যা লিখে গেছেন তারপর নতুন আর বিশেষ কিছু লেখার নেই। অন্তত এমন কিছু লেখার নেই যা খুচরো কাজ নয়, বড় মাপের জিনিস, এবং স্বকীয় চরিত্রধর্মে যা নতুন পথের দিশারী। এই বোধ কাজ করছিল আমাদের মধ্যে অনেকদিন ধরে। তারপর ধীরে ধীরে বিকাশ ঘটতে লাগল একজন নতুন লেখকের, যাঁর সূচনায় ছিল না তেমন কোনো সোরগোল, যিনি ছিলেন অনেক নতুন লেখকের মধ্যে একজন, তিনি প্রায় বটগাছের চারার মতো বাড়তে লাগলেন, এবং বাড়তে বাড়তে হয়ে উঠলেন একটি মহীরুহের মতো। বলা বাহুল্য, এই লেখক তারাশংকর।

কিন্তু এইটুকুই তারাশংকরের সম্বন্ধে শেষ কথা নয়। বরং আসল কথা বোধকরি এইটেই যে, তিনিও চলে যাবার সময়ে রেখে গেছেন একটা শূন্যতা। আর এ শূন্যতা একটি চ্যালেঞ্জের মতো —আমাদের মধ্যে যা কিছু বড় হয়ে ওঠার অঙ্কুর, তাকে কেবলই সূর্যালোকিত নীলাকাশে মাথা তুলে বনস্পতি হয়ে উঠতে তাগিদ দেয়।

—রবীন্দ্র রায়

ফটো : সুকুমার রায়

পটভূমি

কম্যুনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় নেতারা গত বছর যা করতে পারেননি, এ-বছর তা পেরেছেন। পশ্চিম বাংলায় পার্টি শেষ পর্যন্ত সরকারীভাবে কেন্দ্রীয় নেতাদের লাইনই মেনে নিয়েছে।

অবশ্য গত বারে পার্টির জাতীয় পরিষদের সিদ্ধান্তটা পশ্চিম বাংলায় পার্টির ঘাড়ে যেন চাপিয়ে দেওয়া হয়েছিল, সে-ও এই সেপ্টেম্বর মাসেই। আর এ-বছর পার্টির রাজ্য সম্মেলনেই প্রস্তাব গ্রহণ করে জাতীয় পরিষদের লাইন মেনে নেওয়া হল। গত বছরে জাতীয় পরিষদ নির্দেশ দিয়েছিল, বাংলা কংগ্রেসকে দলে নিয়ে আট-পার্টি জোটকে ব্যাপকতর করো, তারপর শাসক কংগ্রেসের সঙ্গে একটা সমঝোতায় এসো (এবং মার্কসবাদীদের একঘরে করো)। বন্ধনীর মধ্যে যেটুকু বললাম, জাতীয় পরিষদের প্রস্তাবে অবশ্যই তা বলা হয়নি, কিন্তু উহ্য থাকলেও ঐটেই ছিল উদ্দেশ্য। তবে শেষ পর্যন্ত পশ্চিম বাংলা রাজ্য কমিটি জাতীয় পরিষদের ঐ নির্দেশ কার্যকর করেনি। তার কারণ, অনেক নেতার মতেই, পশ্চিম বাংলায় কংগ্রেসের চেহারা প্রগতিশীল ছিল না, তাই কংগ্রেসের সঙ্গে সমঝোতার কথা ওঠেনি।

এ বছর আগস্ট মাসে দিল্লীতে পার্টির জাতীয় পরিষদের বৈঠকে আসন্ন পার্টি কংগ্রেসের জন্যে যে খসড়া প্রস্তাব গৃহীত হয়েছে তাতে শাসক কংগ্রেসের মধ্যে দক্ষিণপন্থীদের কথা স্বীকার করা হলেও তার মূল সুরটা কিন্তু কংগ্রেসের প্রগতিশীল অংশের সঙ্গে সহযোগিতার। এর বিশদ আলোচনা আগেই 'পটভূমিতে' করেছি, তাই পুনরুল্লেখ এখানে অপ্রয়োজনীয়। যেটা উল্লেখযোগ্য তা হল, সি পি আইয়ের রাজ্য সম্মেলনও এবার কংগ্রেসের প্রগতিশীল অংশের সঙ্গে সহযোগিতার পথই মেনে নিলেন।

রাজ্য সম্মেলন অনুষ্ঠিত হল বছর তিনেক পরে। এই সময়ের মধ্যে গোটা দেশে তো বটেই, এমন কি পশ্চিম বাংলার রাজনীতিতেও যে-বিরাট পরিবর্তন এসেছে কোনো চক্ষুষ্মান রাজনৈতিক দলের পক্ষেই তা অস্বীকার করা সম্ভব নয়। ১৯৬৮ সালে যে কংগ্রেসকে মনে হয়েছিল অস্তগামী, ১৯৭১ সালে সেই কংগ্রেসই নতুন শক্তিতে আবির্ভূত। মার্কসবাদী কম্যুনিস্ট পার্টি পর্যন্ত এখনও এই রাজ্যে কংগ্রেসকেই প্রধান শত্রু হিসেবে চিহ্নিত না-করে পারে নি। তবে মার্কসবাদীরা কংগ্রেসের চরিত্রগত কোনো পরিবর্তন দেখতে পাচ্ছেন না, সি পি আই তা পাচ্ছে। তাই কেন্দ্রীয় নেতাদের মতো পার্টির পশ্চিম বাংলা শাখাও অন্ধ কংগ্রেস-বিরোধিতার সাবেকী নীতি পরিত্যাগ করে কংগ্রেসের প্রগতিশীল অংশের সঙ্গে হাত মিলিয়ে বামপন্থী ও গণতান্ত্রিক ঐক্য গড়ে তুলতে চায়। পার্টি কংগ্রেসের খসড়া রাজনৈতিক প্রস্তাবের মতো রাজ্য সম্মেলনের প্রস্তাবেও বামপন্থী ঐক্য বানচাল করার জন্যে সব দোষই মার্কসবাদীদের দোরগোড়াতেই জমা করা হয়েছে।

তবে এ-কথা মনে করা ভুল যে, পার্টির রাজ্য সম্মেলনে প্রগতিশীল কংগ্রেসীদের সঙ্গে সহযোগিতার নীতি সম্পর্কে কেউই কোনো প্রশ্ন তোলেননি। মূল প্রস্তাবের অন্ততঃ একটি সংশোধনী প্রস্তাব উঠেছিল, যাতে বামপন্থী ঐক্য গড়ে তোলার জন্যে সি পি এমের সঙ্গে সহযোগিতার কথা বলা হয়েছিল। কিন্তু সেই প্রস্তাবে তেমন সাড়া মেলেনি, তাই ভোটাভুটিতে সেটা অগ্রাহ্য হয়ে যায়।

সম্মেলনে কোনো কোনো প্রতিনিধি কংগ্রেস ও সি পি এম দু'দল থেকেই সমদূরত্বের নীতি অনুসরণের কথাও বলেন। তাঁদের ধারণা, তাতে পার্টির ইমেজ অনেক ভালো হবে, শক্তিও বাড়বে। কারণ এই নীতি অনুসরণ করলে দু'দল থেকেই লোক ভাঙানো যাবে। কিন্তু তাঁরাও বিশেষ সমর্থন পাননি।

আগস্টে জাতীয় পরিষদের বৈঠকে কংগ্রেসের সঙ্গে সহযোগিতার নীতির যাঁরা বিরোধিতা করেছিলেন তাঁদের মধ্যে ছিলেন পশ্চিম বাংলার বিশ্বনাথ মুখোপাধ্যায়। তিনি স্পষ্টই বলেছিলেন যে, এই নীতি পার্টিকে কংগ্রেসের লেজুড় করে তুলবে, ফলে পার্টির শক্তি কমে যাবে। বিহারের জন-দুই প্রতিনিধি বিশ্বনাথবাবুকে সমর্থন করেছিলেন, কিন্তু ঐ দুজনই মাত্র। কারণ জাতীয় পরিষদের শ'খানেক সদস্যের মধ্যে ঐ তিনজন ছাড়া আর সবাই খসড়া প্রস্তাবকেই সমর্থন করেছিলেন (এমন কি এস এ ডাঙ্গে পর্যন্ত, যিনি কংগ্রেসের সঙ্গে সহযোগিতার বিরোধী বলেই এতদিন শোনা যেত)।

রাজ্য সম্মেলনেও বিশ্বনাথবাবু একই ধরনের যুক্তি দেখাবার চেষ্টা করেন, কিন্তু তাতে বিশেষ ফল হয় না। সোমনাথ লাহিড়ীও জাতীয় পরিষদের লাইনের বিরোধী, কিন্তু গত নির্বাচনের পর থেকে সেই যে তিনি মুখ বন্ধ করেছেন রাজ্য সম্মেলনেও তিনি বিশেষ মুখ খুললেন না। তবে এই মৌন সম্মতির লক্ষণ হতেই হবে, এমন কোনো কথা নেই।

অবশ্য কেন্দ্রীয় লাইনের যাঁরা বিরোধী তাঁরা নেতাদের বিশেষ বেগ দেননি। তাই মূল প্রস্তাব গ্রহণেও কোনো অসুবিধে হয়নি। আর পার্টিকে যে কেন এখন একটা সুস্পষ্ট নীতি গ্রহণ করতে হল দলের সাধারণ সম্পাদক ডঃ গোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় তা বেশ স্পষ্ট করেই বলেছেন। এই ধরনের স্পষ্ট নীতি ছিল না বলেই গত নির্বাচনে পার্টির আসন সংখ্যা কমে যায়। এদিকে পার্টির সদস্য সংখ্যাও কমতে থাকে। তাই এখন সময় এসেছে একটা নির্দিষ্ট ট্যাকটিক্যাল লাইন বেছে নেওয়ার। স্পষ্টতই, পার্টির জাতীয় পরিষদ এবং রাজ্য স্তরের নেতাদের অধিকাংশের ধারণা, কংগ্রেসের প্রগতিশীল অংশের সঙ্গে সহযোগিতার নীতিই পার্টির হৃতগৌরব ফিরিয়ে আনবে। তাঁদের এই নীতির যাথার্থ্যের প্রমাণ পাওয়া যাবে ব্যালট বাক্সের রায় কোন দিকে যায় তার মধ্যে দিয়ে।

অবশ্য গোপালবাবু যে-কথাটা বলেন নি, আমরা সেটা এখানে যোগ করতে পারি। সি পি আই একটা সর্বভারতীয় এবং মোটামুটি শৃঙ্খলাবদ্ধ পার্টি। সুতরাং দলের কেন্দ্রীয় নেতারা এক পথে চলবেন এবং পার্টির কয়েকটি রাজ্য শাখা নিজেদের ইচ্ছানুযায়ী চলবে, এটা বেশি দিন চলতে পারে না। তা ছাড়া, কেরলে কংগ্রেসকে মন্ত্রিসভায় আনার জন্যে সি পি আই কাকুতি-মিনতি করবে এবং কংগ্রেসের যে-কোনো শর্তই মেনে নেবে, অথচ অন্যত্র কংগ্রেসের বিরোধিতা করবে, এটাও রীতিমতোই বিসদৃশ নয় কি?

•

ইতিমধ্যে যে পশ্চিম বাংলায় কংগ্রেসের অ্যাড হক কমিটি তৈরি হয়েছে, তাতে অবশ্য কম্যুনিস্ট পার্টির নীতি কার্যকর করার পক্ষে বেশ কিছুটা সুবিধে হয়ে গেল। পুরোনো প্রদেশ কংগ্রেসের জায়গায় যে নতুন অ্যাড হক কমিটি তৈরি হল তার দ্বারা কংগ্রেসের মধ্যে প্রগতিশীলদেরই শক্তি বৃদ্ধি হল, এ-কথা বলতে ভবানী সেন কিন্তু একটুও সময় নষ্ট করেননি।

গত বছর যে কংগ্রেস সম্পর্কে কম্যুনিস্ট পার্টির ছুৎমার্গ বজায় ছিল তার কারণ তখন কংগ্রেস সভাপতি পদে নিযুক্ত ছিলেন বিজয় সিং নাহার। বিজয়বাবুর পার্টি স্থিতাবস্থার প্রতিনিধি বলে মনে করে। কিন্তু এখন যে শুধু বিজয়বাবু প্রগতিশীলদের চাপে পদত্যাগ করতেই বাধ্য হয়েছেন তাই নয়, নতুন অ্যাড হক কমিটিতে প্রগতিশীলদেরই প্রাধান্য। সেখানে প্রিয়রঞ্জন দাসমুন্সী, সুব্রত মুখার্জী প্রভৃতি যুব ও ছাত্র নেতারা তো আছেনই, তা ছাড়া আছেন ডঃ দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়, অধ্যাপক শান্তি দাশগুপ্ত ও সতীন্দ্রনাথ চক্রবর্তীর মতো প্রগতিশীল বুদ্ধিজীবীরা। সুতরাং এখন আর কংগ্রেসের সঙ্গে সমঝোতার বাধা কোথায়?

তবে অনেকে বলতে পারেন তালি বাজাবার জন্যে যেমন, মিলনের জন্যেও তো তেমনই দুখানি হাত দরকার। সি পি আই বাম হাত বাড়ালেও কংগ্রেস ডান হাত বাড়াবে কী? নির্বাচনী বোঝাপড়া নিয়ে কংগ্রেসের এখনও ভাবার সময় আসে নি, তবে সব দলের মতো কংগ্রেসের মধ্যেও এ-বিষয়ে নানা মত আছে। অনেকে 'একলা চলো' নীতিতে বিশ্বাসী, অনেকে আবার সি পি এমকে একঘরে করার জন্যে যে-কোনো দলের সঙ্গে হাত মেলাতেও রাজী। তবে অ্যাড হক কমিটিতে প্রগতিশীলদের প্রাধান্য সি পি আইয়ের সঙ্গে সমঝোতার পক্ষে বেশি চাপ সৃষ্টি করতে পারে বলে মনে হয়।

সি পি আইয়ের পক্ষে এ-বিষয়ে আরো একটি আশার লক্ষণ ফুটে ওঠে প্রধানমন্ত্রীর সাম্প্রতিক কলকাতা সফরের সময়। প্রধানমন্ত্রী গণতান্ত্রিক কোয়ালিশনের অন্তর্ভুক্ত বিভিন্ন দলের নেতাদের সঙ্গে আলোচনার সময় এই অভিমত প্রকাশ করেন যে, এই কোয়ালিশনকে বাঁচিয়ে রাখা উচিত। প্রধানমন্ত্রী যদি সত্যিই চান যে, আগামী নির্বাচনে কংগ্রেস এই রাজ্যে গণতান্ত্রিক কোয়ালিশনের অন্তর্ভুক্ত দলগুলির সঙ্গে একত্রে সি পি এমের বিরোধিতা করুক, তবে রাজ্য নেতারা সেই সুপারিশ অগ্রাহ্য করতে পারবেন বলে মনে হয় না।

কিন্তু কংগ্রেস সহযোগিতায় ইচ্ছুক হলেও কি কম্যুনিস্ট পার্টি সি পি এম বিরোধিতার জন্যে এ-ব্যাপারে একাই অগ্রসর হবে? অথবা সি পি এম-বিরোধী অন্যান্য বামপন্থী দলকেও নিজের সঙ্গে পেতে চাইবে? অন্যান্য বামপন্থী দল বলতে অবশ্য প্রধানত ফরওয়ার্ড ব্লক এবং এস ইউ সি।

কোয়ালিশন মন্ত্রিসভা ভেঙে যাওয়ার পরই বিজয়বাবু গণতান্ত্রিক কোয়ালিশনকে টিঁকিয়ে রাখতে উদ্যোগী হন। অজয়বাবুও সেই চেষ্টা সমর্থন করেন। কিন্তু ফরওয়ার্ড ব্লক এই উদ্যোগে বিশেষ উৎসাহ দেখায়নি। দলের সম্পাদক অশোক ঘোষের মতে, ঐ কোয়ালিশন একটা বিশেষ উদ্দেশ্যে গড়া হয়েছিল এবং বিধানসভা ভেঙে যাওয়ার পর ঐ কোয়ালিশনের আর কোনো অস্তিত্ব নেই। ঐ একই যুক্তিতে এবার তাঁর দল প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে আলোচনার আমন্ত্রণ গ্রহণ করেনি, কারণ গণতান্ত্রিক কোয়ালিশনের অংশীদার হিসেবেই প্রধানমন্ত্রী ফরওয়ার্ড ব্লক নেতাদের সঙ্গে আলোচনা করতে চেয়েছিলেন।

গণতান্ত্রিক কোয়ালিশন সম্পর্কে এই মনোভাব গ্রহণ করলেও ফরওয়ার্ড ব্লক কিন্তু কংগ্রেসের সঙ্গে সমঝোতার সম্ভাবনার পথ তখনও বন্ধ করে দেয়নি। কংগ্রেস যে বামপন্থী ও গণতান্ত্রিক দল, এই প্রশস্তিও আমরা অশোকবাবুর মুখ থেকেই শুনেছি। এখন দিল্লী থেকে আর একটি আকর্ষণীয় সংবাদ এসেছে। ফরোয়ার্ড ব্লকের ছজন নেতা এই সপ্তাহে প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করে জানান যে, তাঁরা পশ্চিম বাংলায় কংগ্রেসের সঙ্গে ফ্রন্ট তৈরি করে নির্বাচনে লড়তে চান। ফরওয়ার্ড ব্লক যদি এই নীতি গ্রহণ করে তবে কম্যুনিস্ট পার্টির কাজটা অনেক সহজ হয়ে আসে।

বাকি থাকে এস ইউ সি। এই দলের কথা অবশ্যই আলাদা। তারা কোয়ালিশনে তো ছিলই না, বরং বিধানসভায় সব ক্ষেত্রেই কোয়ালিশনের বিরুদ্ধে ভোট দিয়েছিল। তা ছাড়া যে-দল নিজেদের সাচ্চা কম্যুনিস্ট পার্টি বলে দাবি করে, তাদের পক্ষে কংগ্রেসের সঙ্গে হাত মেলানো কঠিন বৈকি? দলের নীতির বিচারে এস ইউ সি তো সি-পি-এমের তুলনায় দক্ষিণপন্থী নয়ই, বরং বামপন্থীই। তবু যে এই দল এখন সি-পি-এম সম্পর্কে ঘোরতর সন্দিহান তার কারণ গত দুটি যুক্তফ্রন্টের অভিজ্ঞতা। তবে আগামী নির্বাচনের আগে এস-ইউ-সিকেও একটা মনস্থির করে ফেলতে হবে, কারণ কংগ্রেস-সি-পি-আই ফ্রন্ট যদি সত্যিই তৈরি হয় তবে এই ফ্রন্ট এবং সি-পি-এমের ফ্রন্ট—দুই রণাঙ্গনে লড়াই চালানোওকি এস-ইউ-সি'র পক্ষে সম্ভব হবে?

অবশ্য, মনস্থির করার মতো যথেষ্ট সময় পাওয়া যাবে বলেই মনে হয়, কারণ পশ্চিম বাংলায় আবার কবে নির্বাচন হবে তা এখনও কেউ ঠিক করে বলতে পারে না—যদিও সি-পি-এম, সি-পি-আই, ফরওয়ার্ড ব্লক, এস ইউ সি সকলেই আশু নির্বাচনের দাবিতে এক কাট্টা।

১৭-৯-১৯৭১ **অনুব্রত**

দেশে বিদেশে

কুমারটুলি থেকে দুর্গা প্রতিমা উত্তর কলকাতার একটা সার্বজনীন পূজামণ্ডপে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে।

রাজস্থানের মুখ্যমন্ত্রী মোহনলাল সুখাড়িয়ার পর শাসক কংগ্রেসের আর একজন মুখ্যমন্ত্রীও তাঁর গদী ছাড়লেন। তিনি হলেন অন্ধ্রপ্রদেশের কাসু ব্রহ্মানন্দ রেড্ডি। সাত বছরের কিছু বেশী সময় মুখ্যমন্ত্রিত্ব করার পর তাঁকে বিদায় নিতে হল। আসলে তেলেঙ্গানা প্রজা সমিতির সঙ্গে শাসক কংগ্রেসের সমঝোতার মূল্য দিতে হল তাঁকে সরে গিয়ে। এই মূল্য তাঁকে দিতে হল দলের সর্বোচ্চ নেতাদের চাপে।

গত বছর অবশ্য তিনি নিজেই বলেছিলেন, তেলেঙ্গানাকে পৃথক রাজ্যে পরিণত করার আন্দোলন শান্ত হলে তিনি সরে দাঁড়াবেন। বেশ কিছুকাল যাবৎ এই আন্দোলন স্তিমিত হয়ে রয়েছে। কিন্তু ইদানীং রেড্ডি তাঁর সেই পুরানো প্রতিশ্রুতির কথা আর মনে করতে চাইছিলেন না। তিনি ও তাঁর সমর্থকরা বলছিলেন, কেন্দ্রীয় নেতারা হস্তক্ষেপের চেষ্টা না করে যদি অন্ধ্রের নেতাদের হাতেই ছেড়ে দেন তাহলে তেলেঙ্গানা সমস্যা তাঁরা মিটিয়ে দেবেন। এজন্য তেলেঙ্গানা প্রজা সমিতির সঙ্গে কোন রাজনৈতিক আপোষ করার প্রয়োজন তাঁরা দেখেন না।

এদিকে শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী সমিতির নেতাদের সঙ্গে একটা আপোষ-মীমাংসায় পৌঁছবার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছিলেন। সমিতির নেতা ডাঃ চেন্না রেড্ডির সঙ্গে শ্রীমতী গান্ধীর আলাপ-আলোচনার মধ্য দিয়ে এমন একটা সম্ভাবনার সৃষ্টি হয়েছিল যে, ব্রহ্মানন্দ মুখ্যমন্ত্রীর পদ থেকে সরে যাবেন, তেলেঙ্গানা অঞ্চল থেকে নির্বাচিত অন্য কেউ মুখ্যমন্ত্রী হবেন, তেলেঙ্গানা অঞ্চলের জন্য একটি পৃথক প্রদেশ কংগ্রেস কমিটি গঠিত হবে এবং নূতন ব্যবস্থায় যদি ঠিকমত কাজ না হয়, তাহলে ১৯৭০ সালে আবার তেলেঙ্গানার স্বাতন্ত্র্যের দাবী তোলা যাবে ও তখন প্রধানমন্ত্রী নিজে সেই দাবী বিবেচনা করে দেখবেন, এই সব সর্তে তেলেঙ্গানা প্রজা সমিতি পৃথক তেলেঙ্গানার দাবী আপাতত তুলে নিতে এবং শাসক কংগ্রেসের সঙ্গে মিলে যেতে রাজী হবে।

এই আপোষ-মীমাংসায় আসার জন্য শ্রীমতী গান্ধীর তরফে একটা বিশেষ তাগিদ ছিল। গত মার্চ মাসে লোকসভার অন্তর্বর্তী নির্বাচনে তেলেঙ্গানা প্রজা সমিতি রাজনৈতিক দল হিসাবে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে তেলেঙ্গানা অঞ্চল থেকে ১৪টি আসনের মধ্যে দশটি দখল করে নেয়। এই নির্বাচনে সমিতি যে শক্তির পরিচয় দিয়েছে তাতে শ্রীমতী গান্ধী ও শাসক কংগ্রেসের অন্যান্য নেতাদের উদ্বেগের কারণ ছিল। আগামী বছর অন্যান্য কয়েকটি রাজ্যের সঙ্গে একযোগে অন্ধ্রেরও বিধানসভায় নির্বাচন হবে। তেলেঙ্গানা অঞ্চল থেকে অন্ধ্র বিধানসভায় ১০০টি আসন রয়েছে। নয়াদিল্লীর খবর হচ্ছে, তেলেঙ্গানা প্রজা সমিতির নামে প্রার্থী দাঁড়ালে এই ১০০টির মধ্যে ৭০টিই সমিতি দখল করে নেবে। অন্যদিকে, ব্রহ্মানন্দ ও তাঁর সমর্থকরা নয়াদিল্লীকে ভরসা দিচ্ছিলেন, রাজ্যে সংগঠন কংগ্রেস এখন নিশ্চিহ্নপ্রায়, স্বতন্ত্র পার্টিও শক্তিহীন, এই অবস্থায় আগামী নির্বাচনে সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করতে শাসক কংগ্রেসের অসুবিধা হবে না।

কিন্তু শাসক কংগ্রেসের কেন্দ্রীয় নেতারা অন্ধ্রের নেতাদের এই আশ্বাসে নিশ্চিন্ত হতে পারেন নি। দলের কেন্দ্রীয় পার্লামেন্টারি বোর্ডে যখন প্রসঙ্গটি উঠল তখন বোর্ডের সদস্যরা একবাক্যেই মত দিলেন যে, সমিতির

সঙ্গে লোঝাপড়ার পথের কাঁটাটিকে সরাতে হবে অর্থাৎ ব্রহ্মানন্দ রেড্ডিকে বিদায় দিতে হবে। শ্রীমতী গান্ধী রেড্ডিকে দিল্লিতে ডেকে পাঠালেন। শ্রীমতী গান্ধীর সঙ্গে দেখা করে বেরিয়ে এসে রেড্ডি সংক্ষেপে বললেন, যেহেতু প্রধানমন্ত্রী আমাকে সরে যেতে বলেছেন, সেহেতু আমি সরে যেতে রাজী হয়েছি।' এই মন্তব্যের আর কোন বিশদ ব্যাখ্যা দিতেও তিনি রাজী হননি। অপরপক্ষে শ্রীমতী গান্ধী একটি বিবৃতিতে বলেছেন যে, 'রাজ্যের ঐক্য ও অখণ্ডতা অক্ষুন্ন রাখার উদ্দেশ্যে' ও সৌহার্দ্যপূর্ণ আবহাওয়া সৃষ্টিতে সাহায্য করার জন্য রেড্ডি নিজেই পদত্যাগের প্রস্তাব দিয়েছেন।

রেড্ডির পদত্যাগের পর এখন প্রশ্ন উঠেছে, তাঁর জায়গায় মুখ্যমন্ত্রী কে হবেন? এই প্রসঙ্গে প্রদেশ কংগ্রেস কমিটির সভাপতি নারাসা রেড্ডি, উপমুখ্যমন্ত্রী জে ভি নরসিং রাও, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বেঙ্গল রাও, আঞ্চলিক কমিটির চেয়ারম্যান জে চোক্কা রাও, প্রাক্তন মন্ত্রী কোণ্ডালক্ষ্মণ বাপুজী প্রভৃতির নাম উঠেছে। যিনিই হোন তাঁকে তেলেঙ্গানার মানুষ হতে হবে এবং তাঁকে সমিতির সমর্থনও পেতে হবে। অন্য কাউকে যদি না পাওয়া যায়, তাহলে শাসক কংগ্রেসের সভাপতি সঞ্জীবায়াকে অন্ধ্রপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রিত্ব গ্রহণ করতে বলা হতে পারে বলে শোনা যাচ্ছে। এই মুখ্যমন্ত্রিত্ব যদি শুধু আগামী নির্বাচন পর্যন্ত হয় তাহলে অবশ্য সঞ্জীবায়া এ ব্যাপারে বিশেষ আগ্রহী নন।

ইতিমধ্যে এরকম একটা ইঙ্গিত পাওয়া গিয়েছিল যে, ব্রহ্মানন্দ রেড্ডি পদত্যাগ করে বিধানসভা ভেঙ্গে দেওয়ার সুপারিশ করতে পারেন। কিন্তু শাসক কংগ্রেসের কেন্দ্রীয় নেতারা সেই সম্ভাবনা বাতিল করে দিয়েছেন। অন্ধ্র বিধানসভায় শাসক কংগ্রেস দলের নূতন নেতা নির্বাচনের তত্ত্বাবধান করার জন্য সুব্রহ্মণ্যম হায়দরাবাদে গেছেন। তিনি স্পষ্ট করেই জানিয়ে দিয়েছেন যে, বিধানসভা ভাঙ্গা বা রাষ্ট্রপতির শাসন প্রবর্তন করা হবে না।

আর একটি প্রশ্ন হচ্ছে, ৬২ বছর বয়স্ক ব্রহ্মানন্দ রেড্ডির এখন ভবিষ্যৎ কি? শ্রীমতী গান্ধী তাঁর বিবৃতিতে শেষে বলেছেন, 'আমরা এবিষয়ে নিশ্চিত যে, সামনে যে কঠিন দিন আসছে সেই দিনগুলিতে দল ও দেশ তাঁর কাছ থেকে কাজ পাবে।' শ্রীমতী গান্ধীর কথার মধ্যে হয়তো এই আশ্বাস রয়েছে যে, রেড্ডিকে ভবিষ্যতে অন্য কোন দায়িত্ব দেওয়া হতে পারে। সেই দায়িত্বটা যে কি তা এখনও কেউ স্পষ্ট করে বলেননি।

•

সেচমন্ত্রী ডাঃ কে এল রাও বলেছেন যে, এবার বন্যায় উত্তরপ্রদেশ, বিহার পশ্চিমবঙ্গ ও ওড়িশায় মোট ৪০০ কোটি টাকা ক্ষতি হয়েছে বলে অনুমান করা হচ্ছে। রাজ্য সরকারগুলির কাছ থেকে চূড়ান্ত হিসাব এখনও আসেনি।

ডাঃ রাও বলেছেন, গঙ্গায় এবারকার বন্যা গত ২৫ বছরের রেকর্ড অতিক্রম করে গেছে। এর আগে ২৫ বছরে গঙ্গার সর্বোচ্চ বন্যায় ত্রিশ লক্ষ একর ফুট জল (ত্রিশ লক্ষ একর জমিতে এক ফুট উঁচু হয়ে দাঁড়াতে পারে এমন জল) হয়েছিল। আর এবার ঐ নদীর বন্যায় দু কোটি তিরিশ লক্ষ একর-ফুট জল হয়েছে। গঙ্গার এই বন্যায় উত্তরপ্রদেশ ও বিহারে যা হয়েছে তারই ফলভোগ করতে হয়েছে পশ্চিমবঙ্গের মালদহ জেলাকে। সেখানে গঙ্গার সঙ্গে মহানন্দাও যুক্ত হয়েছে। গঙ্গা নদীতে জল বাড়ায় ভাগীরথী ও হুগলীও ফেঁপে গেছে এবং মুর্শিবাদ ও নদীয়া জেলা তাতে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে।

সেচমন্ত্রী বলেছেন যে, ড্যাম তৈরী করে গঙ্গার বন্যা ঠেকান যেতে পারে; কিন্তু সমতলে ড্যাম তৈরীর উপযুক্ত জায়গা নেই। তবে সরকার উত্তরপ্রদেশের পাহাড়ে ড্যাম তৈরীর কথা বিবেচনা করছেন।

হাওড়া ও হুগলী জেলার বন্যার জন্য ডি-ভি-সি দায়ী, একথা অস্বীকার করে ডাঃ রাও বলেন যে, ডি-ভি-সি'র ড্যামগুলি না থাকলে পাঁচ লক্ষ কিউসিক জলের চাপ পড়ত। এই ড্যামগুলি ছিল বলেই বন্যার বেগ কমে মাত্র দেড় লক্ষ কিউসেক হয়েছে। তবে তিনি একথা স্বীকার করেন যে, দুর্গাপুরের নীচে নদীর পাড় না বেঁধে যে ভুল করা হয়েছে তার খেসারৎ হাওড়া ও হুগলী জেলাকে দিতে হচ্ছে। পাড় না বাঁধা পর্যন্ত। ঐ দুটি জেলায় বন্যা হতেই থাকবে। এই উদ্দেশ্যে ১৪ কোটি টাকার একটি পরিকল্পনা তৈরী করেও টাকার অভাবে ফেলে রাখা হয়েছে। এখন দুটি পর্যায়ে এই পরিকল্পনা রূপায়ণের কথা হচ্ছে। প্রথম পর্যায়ের কাজ ইতিমধ্যে অনুমোদিত হয়েছে এবং সেই কাজ শীঘ্র আরম্ভ করা হবে।

বন্যার সমস্যাটি খুটিয়ে দেখার জন্য ও তার প্রতিকারে কি করা যায় বিবেচনা করার জন্য অকটোবর মাসের গোড়ার দিকে দিল্লীতে বন্যাদুর্গত রাজ্যগুলির মন্ত্রী ও প্রতিনিধিদের একটি বৈঠক আহ্বান করা হচ্ছে।

•

১৯৬০ সালে রাষ্ট্রসঙ্ঘের অধিবেশনে বৃটিশ প্রধানমন্ত্রী হ্যারল্ড ম্যাকমিলান যখন বক্তৃতা করছিলেন সে সময়ে তৎকালীন রুশ প্রধানমন্ত্রী নিকিতা সার্গেভিচ ক্রুশ্চেভ সেই বক্তৃতার মাঝখানে হঠাৎ নিজের পা থেকে জুতো খুলে টেবিল চাপড়াতে থাকেন। রাষ্ট্রসঙ্ঘের বৈঠকে এমন অভাবিত কাণ্ড এর আগে কখনও ঘটে নি, এর পরেও না। বিশেষ করে, একজন রাষ্ট্রনায়কের কাছ থেকে এমন আচরণ প্রত্যাশিত ছিল না। ঘটনাটি নিয়ে সে সময়ে তুমুল হৈ-চৈ হয়েছিল। যাঁর বক্তৃতায় বিরক্তি প্রকাশ করার জন্য ক্রুশ্চেভ সেদিন এমন অভূতপূর্ব আচরণ করেছিলেন সেই হ্যারল্ড ম্যাকমিলান কিন্তু তাঁর এই আচরণের অন্য একটা দিক দেখেছিলেন। ম্যাকমিলান মন্তব্য করেছিলেন, 'একথা স্বীকার করতেই হবে যে, মানুষটি মানবিক গুণসম্পন্ন। যখন তিনি টেবিল চাপড়ান তখনও সেটা প্রকৃতপক্ষে মানবিক আচরণ।'

নিকিতা সার্গেভিচ ক্রুশ্চেভ সম্পর্কে এটাই সম্ভবত বড় কথা। দোষে-গুণে তিনি একজন জীবন্ত মানুষ ছিলেন। স্তালিনের মৃত্যুর পর যিনি প্রায় দশ বছর কাল সোভিয়েট রাশিয়ার রাজনীতিতে ও আন্তর্জাতিক কম্যুনিস্ট রাজনীতিতে নেতৃত্ব করেছেন সেই মানুষটির নাম এক সময়ে সারা পৃথিবীর ঘরে-ঘরে ছড়িয়ে পড়েছিল। একজন খনি শ্রমিকের সন্তান ও প্রাক্তন ফিটারের মধ্যে এই প্রথম একজন বড় কম্যুনিস্ট নেতাকে দুনিয়ার মানুষ দেখতে পেল যিনি অনায়াসে ও যখন-তখন ক্রেমলিনের প্রাচীর অতিক্রম করে পৃথিবী পর্যটনে বেরোন, যিনি হাসতে ও হাসাতে, এমন কি কাঁদাতে ও কাঁদতে জানেন। ইনিই সেই মানুষ যিনি স্তালিনকে ব্যক্তিপূজার সিংহাসন থেকে নামিয়ে কম্যুনিজমের একটি নূতন চেহারা দিয়েছেন। তার জন্য তাঁকে কোন কোন কম্যুনিস্ট মহল থেকে তীব্র ধিক্কারও শুনতে হয়েছে।

ক্রুশ্চেভের মৃত্যুর পর তাঁর সমাধিস্থলে দাঁড়িয়ে তাঁর ছেলে সার্গেই ঠিকই বলেছেন, 'খুব কম লোকই তাঁর প্রতি উদাসীন থাকতে পেরেছেন। কেউ-কেউ তাঁকে ভালবাসতেন, কেউ-কেউ তাঁকে ঘৃণা করতেন। কিন্তু তাঁকে এড়িয়ে গেছেন খুব অল্প কয়েকজনই।'

গত ১৩ জুন তারিখে মস্কোর একটি স্কুল বাড়ীতে তাঁকে সস্ত্রীক ভোট দিতে আসতে দেখা গিয়েছিল। প্রকাশ্যে বাইরে বেরোন সেই তাঁর শেষ। সে সময়ে দুজন পাশ্চাত্য সাংবাদিককে তিনি বলেছিলেন, 'আমি তো এখন পেন্সনভোগী। একজন পেন্সনভোগীর আর বলার কি থাকতে পারে?'

একদিনকার এই সুপরিচিত রাষ্ট্রনায়ক ৭৪ বছর বয়সে যখন মস্কোর শহরতলীর একটি হাসপাতালে মারা গেলেন তখন তাঁর কাছে তাঁর স্ত্রী নিনা ও মেয়ে রাদা ছাড়া আর কেউ ছিলেন না। তাঁর মৃত্যু-সংবাদ সরকারীভাবে ঘোষণা করা হয় নি, তাঁর শেষকৃত্য রাষ্ট্রীয় মর্যাদায় অনুষ্ঠিত হয় নি, তাঁর শেষকৃত্য সম্পন্ন হয়ে যাওয়ার আগে পর্যন্ত রুশ সংবাদ প্রতিষ্ঠান ও সংবাদপত্র ও বেতার তাঁর মৃত্যু-সংবাদ প্রচারও করে নি।

ভারতের প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা

গান্ধী তাঁর শোকবার্তা পাঠিয়েছেন ক্রুশ্চভের বিধবা পত্নীর কাছে, রুশ সরকারের কাছে নয়। রাশিয়ার একজন বেসরকারী নাগরিকের মৃত্যুতে এটা শ্রীমতী গান্ধীর ব্যক্তিগত শোক। তাঁর বার্তাটিকে সেভাবেই গণ্য করা হবে।

●

সংবাদের স্তম্ভে সম্প্রতি প্রকাশিত কয়েকটি অকথিত ইতিহাসের কাহিনী :—

জোসেফ ল্যাগ নামক একজন মার্কিন লেখক মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ভূতপূর্ব প্রেসিডেন্টের পত্নী এলিনর রুজভেল্টের ব্যক্তিগত কাগজপত্রের ভিত্তিতে 'এলিনর ও ফ্রাঙ্কলিন' নামে একটি বই লিখেছেন। এই বইয়ে প্রকাশ পেয়েছে যে, ফ্রাঙ্কলিন রুজভেল্ট তাঁর সেক্রেটারী লুসি পেজ মার্সারের সঙ্গে গোপন প্রণয় বন্ধ না করলে তাঁর স্ত্রী এলিনর বিবাহ-বিচ্ছেদ করবেন বলে ফ্রাঙ্কলিনকে ভয় দেখিয়েছিলেন। শেষ পর্যন্ত ফ্রাঙ্কলিন ও লুসি দেখা-সাক্ষাৎ বন্ধ করে দিতে রাজী হন।

এলিনর রুজভেল্ট ১৯৬২ সালে মারা গেছেন। জোসেফ ল্যাশ তাঁর ঘনিষ্ঠ বন্ধু ও রাজনৈতিক সহযোগী ছিলেন।

ভারতে প্রাক্তন মার্কিন রাষ্ট্রদূত চেস্টার বোলজ সম্প্রতি একটা প্রবন্ধে এই তথ্য প্রকাশ করেছেন যে, ১৯৬৩ সালের নভেম্বর মাসে একবার আর ১৯৬৪ সালের মে মাসে দ্বিতীয়বার ভারতকে মার্কিন সামরিক সাহায্য দেওয়া সম্পর্কে চুক্তি প্রায় সম্পন্ন হওয়ার মুখে এসে বানচাল হয়ে গিয়েছিল। ১৯৬৩ সালের নভেম্বর মাসে নেহরু নাকি দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার মার্কিন ভূমিকাকে সমর্থন করতে এবং সামরিক ব্যয়ের একটা সর্বোচ্চ সীমা স্থির করার জন্য পাকিস্তানের সঙ্গে আলোচনা করতে প্রস্তুত হয়েছিলেন। তার ফলে ভারত ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে নূতন সম্পর্ক স্থাপনের পথ মুক্ত হয়েছিল। ১৯৬৩ সালের নভেম্বর মাসে এ বিষয়ে তাঁর সরকারের সঙ্গে আলোচনা চালাবার জন্য বোলজ ওয়াশিংটনে গিয়েছিলেন। তিনি সেখানে পৌঁছবার ছয় দিনের মধ্যে প্রেসিডেন্ট কেনেডি নিহত হলেন। ব্যাপারটা তখনকার মত চাপা পড়ল। ১৯৬৪ সালের মে মাসে আবার যখন এই বিষয়ে এক দল ভারতীয় প্রতিনিধির সঙ্গে মার্কিন সরকারের আলোচনা চলছিল এবং একটা বোঝাপড়া যখন প্রায় হয়ে এসেছিল সে সময়ে নেহরু মারা গেলেন। তার ফলে আলোচনা পিছিয়ে গেল এবং শেষ পর্যন্ত মার্কিন সরকার ঠিক করলেন 'পরিস্থিতি পরিষ্কার না হওয়া পর্যন্ত এই বিষয়ে বিবেচনা স্থগিত রাখা হবে।' এর তিন মাস পরে ঐ একই ভারতীয় দল মস্কোতে গিয়ে ভারত যা কিছু চেয়েছিল সব নিয়ে নয়া-দিল্লীতে ফিরে এলেন।

প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট জন এফ কেনেডির প্রেস সেক্রেটারী পিয়ের স্যালিঞ্জার বি-বি-সি'র প্রতিনিধির সঙ্গে এক সাক্ষাৎকারে বলেছেন যে, প্রেসিডেন্ট কেনেডি যদি দ্বিতীয়বার হোয়াইট হাউসে যাওয়ার সুযোগ পেতেন তাহলে তিনি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও চীনের মধ্যে ব্যবধান দূর করার চেষ্টা করতেন।

স্যালিঞ্জার বলেছেন, প্রেসিডেন্ট কেনেডি খুব সামান্য ভোটে জিতেছিলেন। তিনি প্রেসিডেন্টগিরি করাটা আট বছরের কাজ বলে গণ্য করেছিলেন। এবং চীনকে তিনি তাঁর শাসনের দ্বিতীয় চার বছর-কালের জন্য চিহ্নিত করে রেখেছিলেন। তিনি বেঁচে থাকলে ঐ চার বছরে চীনের সঙ্গে সম্পর্ক প্রতিষ্ঠায় অগ্রসর হতেন।

●

পূর্ববঙ্গ থেকে আগত শরণার্থীদের হাত দিয়ে খেতে দেখে খুবই ব্যথিত হয়েছেন এক দল ইউরোপীয় সেবাকর্মী। তাঁরা তাঁদের দেশ থেকে বিমানযোগে শরণার্থী ক্যাম্পগুলিতে ছুরি, কাঁটা ও চামচ পাঠাবার পরিকল্পনা করেছেন।

১৭।৯।৭১ —পুণ্ডরীক

মহিষাসুরমর্দিনীর প্রাচীন মূর্তি

সুপ্রাচীনকাল হতেই আসমুদ্রহিমাচলে শক্তি পূজা প্রচলিত আছে। শক্তিদেবীর অন্যতম রূপে হলো দুর্গা বা মহিষাসুর-মর্দিনী। বিভিন্ন রূপে দুর্গাদেবী ভারতের সর্বত্র (এমনকি এক সময়ে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়াতেও) আদৃত ও পূজিত হতেন।

সঠিক কাল নির্ণয় করতে না পারলেও দুর্গাদেবী যে খ্রীঃ পূঃ প্রথম শতকে জনগণের আরাধ্যা দেবী ছিলেন ইহার সাক্ষ্য বহন করছে রাজস্থানের নগরে (প্রাচীন কর্কোট নগর) সম্প্রতিকালে আবিষ্কৃত মহিষাসুরমর্দিনীর একটি পোড়া-মাটির মূর্তি। অভ্র-চর্চিত এই চতুর্ভুজ মূর্তিটি শ্বেতমৃত্তিকায় গঠিত; উচ্চতায় আট ইঞ্চি, প্রস্থে চার ইঞ্চি। দেবীর নিম্ন-দক্ষিণভুজ মহিষের পৃষ্ঠোপরি রয়েছে; ঊর্ধ্ব দক্ষিণভুজে রয়েছে ত্রিশূল; বামপদ অর্ধশায়িত সিংহশিরোপরি স্থাপিত; ভালে শোভা পাচ্ছে চন্দ্রপ্রভ-তিলক। মহিষের সম্মুখের পা-জোড়া ঊর্ধ্বোত্থিত, পুচ্ছ খাড়া, আর মুখ দেবীর নিম্নস্থ বামভুজের তলদেশে। মূর্তিটি পোড়ামাটির; তাই ইহাকে জনপ্রিয়তা ও প্রাচীনত্বের নিদর্শন মনে করা যেতে পারে।

বৈদিক সাহিত্যে, তন্ত্রে, পুরাণে ও স্মৃতিশাস্ত্রেও দুর্গাদেবীর উল্লেখ রয়েছে; মার্কণ্ডেয় পুরাণে মহিষাসুরের বধের কাহিনী সবিস্তারে বলা হয়েছে। অসুর-কুলাধিপতি মহিষাসুর দেবরাজ্য আক্রমণ করেন; যুদ্ধে দেবকুল পরাজিত হল; অসুররাজ দেবরাজ্য দখল করে নির্মম অত্যাচারে দেবরাজ্যবাসীদের জর্জরিত করেন। নিষ্পেষিত দেবকুল ব্রহ্মার দরবারে প্রতিকারের জন্য উপস্থিত হলেন; ব্রহ্মা ওদের নিয়ে বিষ্ণুলোকে গিয়ে দেবতাদের করুণ কাহিনী বিষ্ণুর কাছে সবিস্তারে বর্ণনা করেন। সমস্ত শুনে বিষ্ণু ক্ষোভিত হলেন। তখন ক্রুদ্ধ বিষ্ণুর বদন হতে তেজোরাশি নির্গত হতে লাগলো। উপস্থিত দেবতাদের দেহ হতেও তেজোরাশি বিস্ফুরিত হলো। এই পুঞ্জীভূত তেজোরাশি এক অপূর্ব প্রাণবন্ত শক্তিতে রূপান্তরিত হলো। ইনিই হলেন দুর্গতি-নাশিনী দুর্গা বা মহিষাসুরমর্দিনী। ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর ও উপস্থিত দেবকুল দেবীকে আয়ুধাদি ও মনোরম বসনভূষণাদি দিয়ে সজ্জিত করলেন। প্রচণ্ড সংগ্রামের পরে মহিষাসুরকে দেবী বধ করলে দেবরাজ্যে শান্তি ফিরে আসে। তখন হতেই বোধহয় দুর্গতিনাশিনীর পূজা ঘরে ঘরে প্রচলিত হয়। বাংলাদেশে এই পূজা জাতীয় উৎসব রূপে শরৎকালে তিন চারদিন ধরে অনুষ্ঠিত হয়।

—শিবদাস চৌধুরী

আগমনী ও বিজয়া গানে বাঙালী ও বাংলা দেশ

গোবিন্দচন্দ্র বালা

অনাধুনিক বাংলা সাহিত্যের একটি বাঁধাধরা ছক ছিল। অবশ্য কোন কোন বিশিষ্ট কবির রচনায় তার একটু-আধটু ব্যতিক্রমও দেখা যায়। তবে তখনকার অধিকাংশ রচনাতেই কম-বেশী জীবন-রস পরিবেশিত হয়েছে। সর্বোপরি বাংলার আদিতম কাব্য 'চর্যাপদাবলী' থেকে আরম্ভ করে মঙ্গলকাব্য, বৈষ্ণব-সাহিত্য, শাক্ত-সাহিত্য মুসলমানী সাহিত্য এবং লোকসাহিত্য ইত্যাদি প্রায় সকল শ্রেণীর সাহিত্যে বাঙালী ও বাংলাদেশের বিচিত্র চিত্র, জীবন-সত্তা এবং বৈশিষ্ট্য চমৎকারভাবে আত্মপ্রকাশ করেছে; আর এটাই হয়তো স্বাভাবিক, কারণ সাহিত্য যতই ভাবমূলক—(এ্যাবস্ট্রাক্ট) এবং প্রতীকধর্মী (সিমবলিক) হোক না কেন; তবু দেশ-কাল- এবং পাত্রকে সম্পূর্ণ অস্বীকার করতে পারে না। বাংলার অনাধুনিক সাহিত্যও নিতান্ত ধর্মভিত্তিক হলেও পারেনি। কারণ, যখনি কবি রচনায় আত্মনিয়োগ করেছেন তখনই মনে পড়েছে অসংখ্য দেশীয় অভিজ্ঞতার কথা, মনে পড়েছে বাংলার ঐতিহ্যের কথা, বাংলার স্নিগ্ধ-যৌবনা প্রকৃতির কথা, মাঠ-ঘাট-পথ-প্রান্তর, পূজা-পার্বন ইত্যাদির কথা। তা ছাড়া, এখনকার মতো তখন বসুজননী বিশ্বজননীর সঙ্গে একাকার হয়ে যায়নি। ফলে সাম্প্রতিক সাহিত্যে দেশ-কাল-পাত্রের যে ব্যাপকতা লক্ষ্য করা যায়, তখন তাও ছিল না। ফলে বাংলার হৃদয়কে আবিষ্কার ও নতুন প্রাণ-প্রতিষ্ঠা করতে অনাধুনিক কবিরা তাঁদের সবটুকু যত্ন আরোপ করেছেন। তবে কখনো কখনো ভাবের আতিশয্যে চরিত্র এবং চিত্র অস্পষ্ট এবং ছায়াচ্ছন্ন হয়ে গেছে।

অনাধুনিক বাংলা সাহিত্যে শাক্তপদাবলীর একটি বিশিষ্ট ভূমিকা আছে; শাক্তপদাবলী ও বৈষ্ণব-পদাবলীর একটি তত্ত্বগত দিকও আছে; কিন্তু রসিক পাঠকের কাছে এদের শিল্পরসগত দিকই মুখ্য। এগুলি তত্ত্বের চেয়ে কাব্যাংশেই শ্রেষ্ঠতর। বিশেষত শাক্তপদাবলীর 'আগমনী ও বিজয়া' সংগীতে তত্ত্বের দিকটা একেবারে গৌণ; বরং বাঙালীর জন-জীবনের একটি চিরন্তন আর্তিকে শাক্ত-কবিরা সুর-ছন্দ-কাহিনী এবং রসের সমন্বয়ে বেঁধে রেখেছেন। এর মধ্যে সাংসারিক বস্তুগত রূঢ় যন্ত্রণার চেয়ে মানসিক বিরহ-বোধের হাহাকারই বেশী।

'আগমনী ও বিজয়া' গানের ফাঁকে ফাঁকে কচিৎ বাংলার চিরন্তনী এবং প্রতিনিধি-স্থানীয়া বধূ উমার জগজ্জননী রূপে ফুটে উঠেছে। কেননা,—যখন দেখিয়াছে মা আপনার সন্তানের মধ্যে আনন্দের আর অবধি পায় না, সমস্ত হৃদয়খানি মুহূর্তে মুহূর্তে ভাঁজে ভাঁজে খুলিয়া ঐ ক্ষুদ্র মানব-কুটিরটিকে সম্পূর্ণ বেষ্টন করিয়া শেষ করিতে পারে না, তখন আপনার সন্তানের মধ্যে আপনার ঈশ্বরকে আরাধনা করিয়াছে।' ১

এই একাধারে মানবী ও দেবীতে মেশামেশি—এমনটি বাঙালী কবি ও বাংলার জলবায়ু ছাড়া অন্যত্র সুদুর্লভ। কারণ এ দেশ বাঙালী কবিরই,—

'দেবতারে প্রিয় করি প্রিয়েরে দেবতা।' ২

প্রাচীন সংস্কৃত সাহিত্যে জগজ্জননীর রূপ ও কাহিনী বিচিত্রভাবে বর্ণিত হয়েছে কিন্তু সেখানে দেবীর উমা-সুলভ মানবী-মাধুর্যের প্রতিফলন লক্ষ্য করা যায় না! সমস্ত উগ্রতা ও রুক্ষতার তেজ স্তিমিত করে বাংলার 'সুজলাং সুফলাং মলয়জশীতলাং শস্যশ্যামলাং' পরিবেশের আবেশে বাঙালী শাক্ত কবিরা সমস্ত দেব-দেবীকে স্নিগ্ধ মমতাসিক্ত এবং বাঙালী-প্রকৃতি-সম্পন্ন করে তুলেছেন। রবীন্দ্রনাথও এক স্থানে অন্য ভাষায় এই কথাই ব্যক্ত করেছেন।৩

'আগমনী ও বিজয়া' গানের সমাজ-সচেতনতা এবং জীবনবোধের নিবিড়তা ও গভীরতার দিকে দৃষ্টিপাত করলে আমরা বিস্মিত হয়ে যাই। তাই অনেক সমালোচক এই গানকে লোকনাট্য কিম্বা ঔপন্যাসিক কাহিনী ও গুণসুলভ কবিতাবলী আখ্যা দিয়ে থাকেন।৪

'আগমনী ও বিজয়া' বাঙালী সংসারের আনন্দ ও বিরহ সংগীত। এর মাধ্যমে বাঙালী ধর্মচেতনা ও সমাজচেতনার অপূর্ব সমন্বয় সাধিত হয়েছে।

শাক্তপদাবলীর উৎস রয়েছে প্রাচীন সংস্কৃত সাহিত্যের মধ্যে।৫ তারপর রামায়ণ, মহাভারত ও পুরাণের কাহিনী যেমন লোক-সাধারণের মধ্যে অশেষ প্রভাব বিস্তার করায় জনসাধারণের কল্পনার প্রভাবে প্রভাবিত উপাদান ছড়া এবং গাথা ইত্যাদিতে অংকারিত হয়ে উঠেছে, তেমনি উক্ত প্রাচীন সংস্কৃত সাহিত্যের প্রভাবে বিচিত্র ধরনের লোকসাহিত্য গড়ে উঠেছিল।৬

'আগমনী ও বিজয়া' সংগীতেও সম্প্রদায়ভিত্তিক লোকসাহিত্যের একটি বিশেষ রূপ। তাই এতে লোকজীবনের সুস্পষ্ট ছাপ পড়েছে।

প্রথমটা মনে হওয়া স্বাভাবিক যে, 'আগমনী ও বিজয়া' সংগীতের রঙ্গভূমি কৈলাস এবং পাত্র-পাত্রী সকলে দেবতা এবং দেবী ও এঁদের ক্রিয়াকর্ম দেবতার লীলা ছাড়া কিছুই নয়; কিন্তু ব্যাখ্যা করলে দেখা যায় যে, পল্লীবাংলার নিখুঁত সকরুণ পারিবারিক চিত্র এই গানগুলির মধ্যে সরসভাবে অংকিত হয়েছে; যেখানে জগজ্জননী মহামায়া দুর্গার শুভ উদ্বোধন প্রতি বছরই হয়, বালিকা কন্যাকে যে কোন প্রকার বুড়ো এবং কুলীন স্বামীর হাতে সমর্পণ করতে হয়, সংবৎসরের পরে মায়ের আবাহনের সময়ে বিরহিনী জননীর সঙ্গে অভাগিনী কন্যার করুণ-রসঘন মিলন এবং আগমনী শেষ না হতেই বিজয়ার বেহাগ রাগিনীর সুরে মাতৃহৃদয়ের অনন্ত ব্যাকুলতার সৃষ্টি হয়।

বাংলাদেশের সাধনায় প্রেমই হলো সর্বসাধ্যসার। শাক্তপদাবলী সম্পর্কেও এ-কথা খাটে। এসম্পর্কে ক্ষিতিমোহন সেনের মন্তব্য প্রণিধানযোগ্য,—'বাংলাদেশে এই মানবের মধ্যেই সাধনা, প্রেমই হলো ধর্মের প্রাণ। প্রেমের সাধনায় অনেক দুঃখ, অনেক বিপদ আছে: তবুও বাংলা তাকেই স্বীকার করেছে; তবুও শুষ্ক আচার ও জ্ঞানের পথে যায়নি।' ৭ 'আগমনী ও বিজয়া'তে এই প্রেমই প্রেমভক্তি অবলম্বন বিভাব। বাৎসল্য রসই এখানকার প্রধান রস।

সুতরাং রবীন্দ্রনাথের একটি উদ্ধৃতিকে একটু অন্যরূপে শাক্ত-কবিদের জিজ্ঞাসা করা যায়,—

'হেরি কাহার নয়ান মেনকার (রাধিকার) অশ্রুআঁখি পড়েছিল মনে?'৮

সত্যই তো শাক্তকবিরা মেনকার 'অশ্রু-আঁখি' পল্লীবাংলার অসংখ্য মায়ের অশ্রু-সিক্ত নয়ন থেকেই সংগ্রহ করেছিলেন আর পারিবারিক চিত্র পেয়েছিলেন বাংলার পারিবারিক থেকে। বরং বৈষ্ণব কবিদের চেয়ে জীবন-রস পরিবেশনের বাস্তব অভিজ্ঞতা শাক্তকবিদেরই বেশী।

পুরাণের জগজ্জননী 'আগমনী ও বিজয়াতে' হিমালয়কন্যা হয়ে জন্মগ্রহণ করে কবিদের সৃষ্টিপ্রভাবে বাঙালী ঘরের ননীর পুতলী, স্নেহধন্যা অঞ্চলের নিধি, অনন্ত ব্যাকুল বাঙালী মায়ের প্রিয়তমা কন্যারূপে চিত্রিত হয়েছেন। এখানে দেবীকে কন্যারূপে আরাধনা করা হয়েছে।

গিরিরাজ বাঙালী মধ্যবিত্ত মানুষ। তার স্ত্রী মেনকা কন্যাগতপ্রাণ। ভিখারী শিবের সঙ্গে কন্যা-বিবাহের পর থেকে তাঁর দুঃখ এবং দুশ্চিন্তার অবধি নেই। অভিমান, স্বামীর দারিদ্র্য ঢাকার চেষ্টা, আত্মসম্মানবোধ, মাতৃস্নেহব্যাকুলতা,— সব মিলে উমা বাঙালী ঘরের কন্যা ও বধূরূপে জীবন্তভাবে চিত্রিত হয়েছে।

মেনকাও স্নেহশালিনী ও বিরহ-ব্যাকুলা বাঙালী মা। কন্যাকে দেখার জন্য অতিরিক্ত আকুলতা, স্বপ্নদর্শনে ক্রন্দন, স্বামীকে মান অভিমান ও তাড়না-ক্রন্দনের সাহায্যে কন্যাগৃহে প্রেরণ ইত্যাদি ঘটনায় এ সত্য অতি-স্পষ্ট। তারপর কন্যা এলে,—

"শুনিয়া এ শুভবাণী এলোচুলে
ধায় রাণী বসন না সম্বরে।
গদগদ ভাবভরে ঝরঝর আঁখি ঝরে
পাছে করি গিরিবরে
অমনি কাঁদে গলাধরে।"

দীর্ঘ উৎকণ্ঠার পর বাঙালী মাও কন্যাকে কাছে পেলে ঠিক এমনি ভাবাতিশয্যই প্রকাশ করে।

দৈবক্রমে ভিখারী শ্মশানবাসী ভোলানাথের সঙ্গে উমার বিয়ে হলো সেই থেকে রাজনন্দিনী হলো ভিখারিনী। এ কথা চিন্তা করে মা মেনকা বাধাতুরা। তৃষ্ণার্ত চাতকিনীর মতো শরৎকালের দিকে চেয়ে থাকেন; কেননা ঐ সময় তাঁর প্রাণাধিকা কন্যাকে তিনি দেখতে পাবেন। এই ভাব ও উৎকণ্ঠাকে কেন্দ্র করে মাতৃহৃদয়ের যে বেদনা-সুন্দর আর্তি—তা সবটুকুই বাঙালী মায়ের মধ্যে লক্ষ্য করা যায়।

প্রকৃতি মুখরিত, শরৎ সমাগত, পূজার আগমনীতে আকাশবাতাস আমোদিত। কন্যা-মিলনের কল্পনায় মাতৃহৃদয় পুলকিত, শঙ্কিত এবং রোমাঞ্চিত। তাই মেনকা গিরিরাজের কাছে নিবেদন করছেন,

"গিরি এবার আমার উমা এলে
আর উমা পাঠাবো না।
বলে বলবে লোকে মন্দ, কারো
কথা শুনবো না।।"

বাঙালী মায়ের হৃদয়ের এমন স্বতঃস্ফূর্ত প্রকাশ—অন্ততঃ মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে সুদুর্লভ।

উমা পূর্বজন্মে পতিনিন্দার ফলে দেহত্যাগ করেছিল বলে—মেনকা বলেন,

"আমি সেইটে করি ভয় ঝি-জামাই
আনতে হয়,
এস কৈলাসবাসীদের সব নিমন্ত্রণ
করে।"

এখানে জাতিস্মরত্ব এবং জন্মান্তরবাদের ইঙ্গিত লক্ষণীয়—যা আমাদের হিন্দু-দর্শনের তত্ত্বে স্বীকৃত। তাছাড়া, ঝি-জামাই আনা এবং সেই উপলক্ষে একটি উৎসব ও প্রতিবেশীদের নিমন্ত্রণ ইত্যাদি প্রথা পল্লীবাংলায় অতি-চেনা মধ্যবিত্ত ঘরে সুপ্রচলিত। তাছাড়া,—

"আছে কন্যা সন্তান যার, দেখতে
হয় আনতে হয়,
সদাই দয়ামায়া ভাবতে হয় হে
অন্তরে।" (মেনকা)

এগুলি বাঙালী মায়ের উপযুক্ত উপদেশই বটে। এই সংলাপ আমাদের অত্যন্ত পরিচিত। বাঙালী পিতারা অপেক্ষাকৃত কঠিন বলে মাকে মাঝে মাঝে এমন উপদেশের কথা শুনতে হয়।

ভোলানাথ বৃদ্ধ-কুলীন বাঙালী পুরুষের প্রতীক। বৃদ্ধ স্বামীর সঙ্গে কচি মেয়ের বিয়ের প্রসঙ্গে ১০ কৌলীন্য-প্রথার কথা এবং বাল্যবিবাহের কথা মনে পড়ে। উমাকে সতীনের ঘর করতে হয়। এখানে বহুবিবাহের কথা মনে পড়ে। বাংলাদেশে এই দুটি প্রথা বহুদিন থেকে প্রচলিত।

বিশেষতঃ "নারীর জনম শুধু যন্ত্রণা সহিতে"—মেনকার এই উক্তির মধ্য দিয়ে বাঙালী নারীর জীবনের রূঢ় বাস্তবতা ফুটে উঠেছে। সত্যই তো বাঙালী নারী যুগ-যুগান্তর ধরে অসহনীয় যন্ত্রণা সহ্য করছে। তারই সত্যরূপ এতে প্রকাশিত।

বাংলার আর একটি সংস্কার হচ্ছে মেয়েকে সামাজিক মতে বিয়ে দিয়ে শ্বশুর বাড়ী পাঠিয়ে দেওয়া। এই নিয়মে মেয়েও কাঁদে; কিন্তু তার চেয়ে বোঁচকা বাঁধে বেশী। আর অবলা অসহায়া জননীরই হাহাকার মর্মন্তুদ। কন্যা আনার জন্যে মা বার বার স্বামীকে অনুরোধ করেন, মিনতি করেন, কিন্তু পিতার পাষাণ হৃদয় এতো সহজে বিগলিত হয় না। তাই মার অভিযোগের মাধ্যমে সেই সত্য প্রকাশিত হয়েছে,—

"উমার কারণে প্রাণে যে যাতনা
নিশিদিন,
মা হতে বুঝিতে চিতে, ছলিতে
না দিতে এনে।"

এ অভিযোগ বাঙালী মায়েদের চিরন্তন অভিযোগ। তাছাড়া পূজার সময় জামাই-মেয়েকে আনা বাংলার একটি নিয়ম। এবং মেয়ের সঙ্গে যে জামাইকে আনতে হয় এ সাধারণ জ্ঞান মায়েরই বেশী—

"গিরিরাজ হে জামাই এনো
মেয়ের সঙ্গে।
মেয়ের যেমন মন মায়ে বোঝে
যেমন।" ইত্যাদি

গিরিরাজ বাঙালী পিতার প্রতিমূর্তি। তিনি যুক্তিশীল, অচল, অটল এবং স্তব্ধ। কন্যার প্রতি তাঁরও মমতা কম নেই; কিন্তু তিনি জামাই-এর মনস্তত্ত্ব বুঝে বলেন,—

"অবশ্য ত্যজিয়ে মণি ক্ষণিক বাঁচিয়ে
ফণী;
ততোধিক শূলপাণি ভাবে উমা
মারে।"

এখানে স্ত্রৈণ বাঙালী পুরুষের চিত্র উদ্ধৃত হয়েছে। যাদের স্ত্রীই পরন্তপঃ।

গিরিরাজ উমাকে জানান যে, তার ভাই মৈনাক শুধু তারই বিরহে সমুদ্রে ঝাঁপ দিয়েছে, পাঠকের ঘোরতর সন্দেহ যে, কোন ভাই বোনের বিরহে আত্মবিসর্জন করেছে কিনা। কাজেই এখানে কিছুটা অবাস্তবতার স্পর্শ লেগেছে।

গার্হস্থ্যপ্রধান হওয়ায় 'আগমনী ও বিজয়া' পর্বের প্রত্যেকটি চরিত্র মানবীয় রসে জীবন্ত। দেবাদিদেব মহাদেবের দৈব-মহিমা এখানে লেশমাত্র নেই। তিনি এখানে রক্ত-মাংসে গঠিত পরিপূর্ণ বাঙালী পুরুষে রূপান্তরিত হয়েছেন। তিনি ভিখারী, নিরাসক্ত, নিশাখোর, পত্নীগতপ্রাণ এবং রসরাজ। কারণ তাঁর উক্তি—

"জনক ভবনে যাবে ভাবনা কি তার।
আমি তব সঙ্গে যাব ভাব কেন আর।।"
(উমাকে)

উমাও সম্পূর্ণ বাস্তব। মুনি যাঁকে ধ্যানযোগে পান না, যে পদপঙ্কজ লাগি শংকর যোগী হইয়া তাঁহাকে যতনে হৃদি-মাঝে ধারণ করিয়াছেন, সেই উমা এখানে একদিকে চপলা, চঞ্চলা, অভিমানিনী পল্লীবালা, অন্যদিকে কর্তব্যপরায়ণ পতি-সোহাগিনী পল্লীবধূ।১১ তাঁর স্বামীর কাছে অনুমতি ভিক্ষা এবং অতীতের অশেষ সোহাগমমতার স্মৃতি উত্থাপন—এই সবকিছুর মধ্যে চমৎকার জীবনরস পরিবেশিত। মায়ের প্রতিও তাঁর অপরিসীম মমত্ববোধ। তাই মার কাছে সতীনের জ্বালা এবং অভাবের যন্ত্রণার কথা তিনি গোপন করে যান,—

"শুনেছো সতীনের ভয় সে সকল
কিছু নয় মা।
তোমায় অধিক ভালোবাসে সুরধনী..."
...ইত্যাদি।

তারপর উমা বাপের বাড়ীতে এলে তাঁর সন্তান, বাপ-মা শিব—ইত্যাদিকে নিয়ে সত্যই বাঙালী পরিবারের একটি পূর্ণাঙ্গ মধুর চিত্র ফুটে উঠেছে। আমাদের ঘরের চির-পরিচিত চিত্রগুলি এর মধ্যে দেখে আমাদের মন আরো মুগ্ধ হয়।

পুরবাসীদের চরিত্র আমাদের প্রতিবেশীদের মত। বিজয়ার পদে মেনকার বিচ্ছেদ—বেদনাভরা হৃদয়স্পর্শী আর্তি হাহাকার বাস্তবভাবেই আকাশ-বাতাসকে কাঁদিয়ে তুলেছে।

বাংলার মাতৃহৃদয়ের চিরন্তন বিচ্ছেদজনিত হাহাকার, সংশয় এবং দীর্ঘশ্বাস বহু কবির ভাষায় এমনি মর্মস্পর্শীভাবে অভিব্যক্ত হয়েছে।—

"যেয়ো না রজনী আজি লয়ে
তারাদলে
গেলে তুমি দয়াময়ী এ পরাণ যাবে।"
ইত্যাদি।

যখন উমা থাকতে নারাজ তখন মেনকার যুক্তি আরো স্বভাব-সুন্দর হয়ে উঠেছে,—

"তোমার মায়ের বাথা গণেশকে
তোর আটকে রেখে।"

তাছাড়া তিনি উমাকে একটি রূঢ় বাস্তব সত্যের কথা স্মরণ করিয়ে দেন,—

"এখন বুঝি ঘর চিনেছিস
তাই হয়েছিস পর;
কেঁদে কেঁদে ভাসিয়ে দিতিস
নিতে এলে হর।"

শিবের শিশু-সুলভ সরল এবং স্ত্রী-নির্ভরতার চিত্রে বাঙালী পুরুষেরই প্রতিচ্ছবি সুন্দর এবং প্রাঞ্জলভাবে ফুটেছে,—

"দিতে হয় মা মুখে তুলে
নয়তো খেতে যায় গো ভুলে।"(উমা)।

বাংলাদেশে বৃক্ষমূলে দেবতার নামে পূজাপদ্ধতি আদিকাল থেকে প্রচলিত আছে। এখানে সেই বৃক্ষপূজার স্পষ্ট প্রমাণ মেনকার উক্তির মধ্য দিয়ে প্রকাশিত হয়েছে।—

"বিল্বমূলে করিব বোধন।"

ঘর-জামাই করে রাখার নিয়ম আমাদের দেশে বহু পরিচিত। তার দৃষ্টান্তও এখানে উদ্ধৃত হয়েছে।—

"ঘর-জামাতা করে রাখবো কৃত্তিবাসে।"

বাংলার প্রসন্ন প্রকৃতির সুশোভিত এবং মনোমুগ্ধকর চিত্রের কথা বাংলার বহু কবির রচনায় অত্যন্ত আস্বাদ্য হয়ে উঠেছে। এখানেও শারদীয়া প্রকৃতির কতকগুলি অপরূপ রূপকল্প উপমার মাধ্যমে আত্মপ্রকাশ করেছে,—

"শিফালিকা এলো উমার বর্ণমাখি"
বা,
"এই এল হেসে শান্ত শতদল"—ইত্যাদি।

আরো পরবর্তীকালে বঙ্কিমচন্দ্র যে "সুজলাং সুফলাং মলয়জ শীতলাং" ইত্যাদি গান গেয়েছিলেন, তারই সমতুল বর্ণনা যেন আরো সহজ, আরো প্রাণবন্তভাবে মেনকার অনুভূতির মধ্যে ধরা পড়েছে,—

"শরতের বায়ু লাগে গায়
উমার স্পর্শ পাই প্রাণরাখা দায়।"

বাংলার শরৎ ও বসন্তের বায়ুতে যে যাদু আছে, আর কোথায়ও তেমন দুর্লভ।

বাংলার পূজো উপাচারের কিছু বর্ণনা এখানে তুলে ধরা হয়েছে,—

"শিবকে পূজিবে বিল্বদলে
সচন্দন আর গঙ্গাজলে।"

শিবপূজোয় বেশী উপচার লাগে না; কেননা বাংলার শিব সর্বদিনই একটু উদাসীন এবং অতি সহজে সন্তুষ্ট।

চন্ডীমঙ্গল কাব্য বাংলা সাহিত্যের মধ্যযুগের একটি বিশিষ্ট সম্পদ। তার প্রভাব যেমন বাংলার মানুষের উপরে প্রবল, তেমনি পরবর্তী মধ্যযুগীয় কাব্যেও বর্তমান। এখান থেকে তার নমুনা তোলা যায়,—

"ঘটে চন্ডী, পটে চন্ডী,
স্থানে স্থানে মঙ্গলচন্ডী।"

দরিদ্র বাঙালীর উদর যন্ত্রণার কথা এখানে উল্লেখিত,—

"তাহে কি উদর ভরে, পেটের জ্বালায় মরে।"

উমার উক্তির বিশ্লেষণ করে বাংলাদেশের পারিবারিক সম্পর্কের একটি চিত্র তুলে ধরা গেল,—মেয়ের ছেলে কিম্বা মেয়ে তাদের মার মাকে এবং বাবাকে দিদি এবং দাদা (অর্থাৎ দিদিমা এবং দাদু) বলে সম্বোধন করে।

বাংলার মাটিতে ঘটক বা দালাল বড় কম জন্মায় না। এরা কম বেশী পাওনার আশায় অপরের ছেলে-মেয়ের বিয়ের ব্যবস্থা করে। মিথ্যা কথা এবং জোড়াতালি দেওয়ার অভ্যাস এদের চেয়ে বড়ো একটা বেশী কারো থাকে না। এরা অন্ধকে 'পদ্মলোচন' এবং খাঁদা বা বোচাকে চন্দ্রবদনী করে তুলতে পারে শুধু কথার কৌশলে। এখানে এদের এক প্রতিনিধিকে মেনকা তুলে ধরেছে,—

"নারদের বাক্য কৌশলে,
না জেনে-শুনে কি ব'লে,
মেয়েকে ফেলিলে জলে ভূধর রমণি।"

আমাদের বহু প্রতিবেশী ভাল করতে পারুক আর না পারুক মন্দ করতে পারে। সেই ধরনের একটি চিত্র,—

"প্রতিবেশীর বাক্যবাণে,
কাতর হইয়া প্রাণে", ইত্যাদি।

বাংলাদেশে গুরুজন-প্রণামরীতি বর্তমান। কিন্তু অনেক শ্রদ্ধেয়রা ছোটদের এতো ভালোবাসেন যে, ভূমিষ্ঠ হবার আগেই দু-হাত দিয়ে তুলে দিয়ে আশীর্বাদ করেন। তেমনি একটি চিত্র,—

"জগতজননী তায়, প্রণাম করিতে চায়,
নিষেধ করায় গিরি ধরি দুটি করে।"

বাপের বাড়ী যাওয়ার সময় বধূ ঠিক এমনিভাবে স্বামীর কাছে অনুমতি প্রার্থনা করে,—

"গঙ্গাধরহে শিব-শংকর, কর অনুমতি হর,
যাইতে জনকভবনে।" (উমা)।

বাংলার মা এবং মেয়ে বাংলার জলবায়ুর প্রভাবেই অতিবিমলা এবং শান্তশীলা। মায়েরা কখনো তাঁর কন্যাকে রণচন্ডীবেশে দেখতে নারাজ,

"হায়, আমার সেই বিমলা, অতি শান্তশীলা,
রণবেশী কেন আসবে ঘরে?" (মেনকা)।

মেয়ে শ্বশুরবাড়ী থেকে বাপের বাড়ীতে পদার্পণ করার সময় মায়ের সঙ্গে যেমনভাবে তাঁর মিলন হয়,—

"রথ হতে নামিয়া শংকরী,
মায়েরে প্রণাম করি,
সান্ত্বনা করে বারবার।"

তারপরে স্নেহে গদগদ হয়ে মাকে যেমন করে দোষারোপ করে তার মধ্যে অভিমান ঝরে পড়ছে —

"তোমার পাষাণ প্রাণ,
আমার পিতাও পাষাণ,
জেনে এলাম আপনা হতে।" (উমা)।

মেয়েকে শ্বশুরবাড়ীতে পাঠাবার পরও তার জন্যে বাংলার মায়েরা নানারকমের খাবার জিনিস সযত্নে তুলে রেখে দেয়,—

"যত্নে ক্ষীর-সর রেখেছি, মা ধর,
দিব বদন কমলে।" (মেনকা)।

মেয়ে অনেক দিন পরে মায়ের কাছে এলে মায়েরা এমন করে, এমনি মিনতিভরা সুরেই তাকে থাকতে বলেন,—

"এসেছিস মা, থাক না মা উমা দিন কত।"
(মেনকা)।

কিন্তু জোর করে জামাই যদি নিয়ে যায়, তাহলে অবলা-অসহায়া বঙ্গজননীর কি করার আছে?

"সঁপে দিছি পরের হাতে,
জোর আমার তো নেই তত।" (মেনকা)

সুতরাং বাংলাদেশের আকাশ-বাতাস-প্রকৃতির সঙ্গে বাংলার পরিবারের হাসি-কান্না-বিরহ-বেদনার সুর এখানে চমৎকারভাবে প্রকাশিত হয়েছে।

১। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর :
২। " : "বৈষ্ণব কবিতা"
"মানসী"।
৩। " : প্রাচীন সাহিত্য।
৪। ব্রজেন ভট্টাচার্য : "শাক্তপদাবলী—সাধনতত্ত্ব ও কাব্যবিশ্লেষণ"।
সাধনতত্ত্ব ও কাব্যবিশ্লেষণ"।
৫। "বেদ থেকে আরম্ভ করে বিভিন্ন দর্শন ও পুরাণগ্রন্থ, বিরাট তন্ত্রশাস্ত্র ইত্যাদির মধ্যে এর উৎস নিহিত। (ব্রজেন ভট্টাচার্যের —শাক্তপদাবলী — সাধনতত্ত্ব ও কাব্যবিশ্লেষণ)।"
৬। চর্যাপদ, মঙ্গলকাব্যগুলি, শিবায়ন, শাক্তপদাবলী ইত্যাদি। (শাক্তপদাবলী ও শক্তিসাধনা : জাহ্নবী চক্রবর্তী)।
৭। "বাংলার সাধনা" : ক্ষিতিমোহন সেন।
৮। "বৈষ্ণব কবিতা" : রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।
৯। "শাক্তপদাবলী ও শক্তিসাধনা" : জাহ্নবী চক্রবর্তী।
১০। কমলাকান্ত ভট্টাচার্য পদ (১৬,১৮), ঈশ্বর গুপ্ত (১৯), অন্ধচন্ডী (২০) ইত্যাদি।
১১। শাক্তপদাবলী ও শক্তিসাধনা : জাহ্নবী চক্রবর্তী।

মিলুকে নিয়ে

দিব্যেন্দু পালিত

প্রিয়ব্রত

রাস্তায় বেরিয়ে মনে পড়ল মিলু শুধু আমাদের মেয়েই নয়, আমাদের একমাত্র সন্তান। ওর আগে জন্ম নিয়েছিল আমাদের প্রথম সন্তান, একটি ছেলে। মৃত্যু নিয়েই ভূমিষ্ঠ হয়েছিল সে, তার জন্যে এখন আর কোনো মায়া নেই। দুঃস্বপ্নময় সে এক দিন গেছে! মিলু এসেছিল তারও দু'বছর পরে। আঠারো বছর ধরে রোদ ঝড় জল থেকে ওকে নিঃশব্দে আগলে রেখেছি কি এইভাবে চলে যাবার জন্যে!

বুলু কীভাবে ব্যাপারটা নিয়েছে জানি না। বেরুবার আগে দেখে এসেছি ওর পাথরের মতো মুখ। অনুভবের ব্যাপারে সে আমার চেয়ে অনেক বেশি শক্ত—আবেগ ধরে রাখে সহজে। এ-রকম অনেক ইতিহাসই আমার জানা। তিন বছর বয়সে একবার আয়োডিনের শিশি গলায় উপুড় করেছিল মিলু। যন্ত্রণায় নীল-হয়ে-আসা ওর স্তব্ধ মুখের দিকে তাকিয়ে আমি যখন আর-একটি দুর্ভাগ্যের কথা ভেবে ভেঙে যাচ্ছি, তখনো আশ্চর্য সংযমে নিজেকে ধরে রেখেছিল বুলু। পুরো দুটো দিন আর রাত হাসপাতালে কাটিয়ে মেয়েকে নিয়ে বাড়ি ফিরল ও, মুহ্যমান আমাকে ডেকে বলল, 'তুমি যে এতো দুর্বল জানতাম না। ছেলেমেয়ে মানুষ করা কি সহজ! তুমি সত্যি এতো আগেই হাল ছেড়ে দাও!' সেদিন যাই ঘটে থাকুক, মিলু সারাক্ষণ ছিল চোখের সামনে, স্পর্শের মধ্যে—আজ ও সেদিনের ঘটনার মধ্যে তফাত অনেকখানি। আজ যা বলার আমাকেই বলতে হবে। আশংকায় হৃৎপিণ্ডটা লাফিয়ে উঠল বুকের মধ্যে। নিশ্বাসে অধৈর্য নিয়ে চীৎকার করে উঠলুম, 'মিলু, ফিরে আয়—!' শব্দ ফুটল না গলায়।

রাত এখনো খুব বেশি হয়নি। তবু এরই মধ্যে নিঝুম হয়ে এসেছে রাস্তা। দূর থেকে কাছে এসে আবার খুব দূর দিয়ে চলে যাচ্ছে এক একটি মানুষ। প্রায় সকলেই একরকম দেখতে : আলোর স্বল্পতার জন্যেই সম্ভবত নিরাকার দেখাচ্ছে মুখগুলি, আর অস্পষ্ট, ইতিহাসহীন। এখন সূর্য ডুবলেই রাত, কার্ফ্যুর সম্ভাবনা বুকে নিয়ে যে যতো তাড়াতাড়ি পেরেছে ঢুকে পড়েছে ঘরে। ব্রীজের চড়াইয়ে উঠতে আমার পাশ দিয়ে যাত্রীহীন একটা বাস ছুটে গেল দ্রুত। দূর থেকে হুইসল দিতে দিতে ছুটে আসছে একটা মালগাড়ি—ইস্পাতের লাইনের হৃৎকম্প ঢুকে পড়ল আমারও বুকে। খুঁজতে বেরিয়ে বুঝতে পারছি আশেপাশের সব দরজাগুলিই বন্ধ, এগোবার রাস্তা নেই। পুলিশকে জানাবো?

নিরাপত্তার জন্যে পকেট হাতড়ে একটা সিগারেট বের করলুম। হাত কাঁপছে। দেশলাইয়ের আগুনে আমার নখ পুড়ে গেল। আটচল্লিশে পৌঁছে বুঝতে পারছি তোর বয়সটা কী খারাপ। বাড়িতে বসে এখন তোর বাবার সঙ্গে কলেজের গল্প করার কথা— এই আশ্বিনে তোর জন্যে কতো কী করার কথা ভেবে রেখেছিলুম। মিলু ফিরে আয়—

এটা মিলুর একা হারিয়ে যাওয়ার বয়স নয়। এখন সেই বয়স যখন প্রবল আত্মবিশ্বাস ছেঁকে ধরে চারদিক থেকে, রক্ত থাকে স্বচ্ছ, চতুর্দিকে আত্মরক্ষার দুর্ভেদ্য দেয়াল। এই বয়সেই বুলু এসেছিল আমার স্ত্রী হয়ে; কী-রকম মাপা পদক্ষেপ ছিল তার এখনো মনে পড়ে। আমি সাত পা হাঁটলে সে এগতো মাত্র তিন পা। বুলুরই মেয়ে তো! এক একদিন আমার সঙ্গে বেরিয়ে যখন হেঁটে যেতো রাস্তা দিয়ে, লক্ষ করতাম চারপাশ থেকে উড়ে-আসা মাছির চোখ জিভ কনুইয়ের গুঁতোকে কেমন অবলীলায় পাশ কাটিয়ে যাচ্ছে মিলু, দৃপ্ত, রাজহাঁসের মতো ভঙ্গি। আমার আনন্দ হতো, সুখ উপচে পড়তো সর্বশরীর ও অনুভূত জুড়ে। ভাবতাম বুলু কি এতোটা স্বাবলম্বী ছিল! আত্মরক্ষার মধ্যেও এতোখানি নিরহঙ্কার! আঠারো বছরের অভিজ্ঞতা থেকে মিলু কি কিছুই নেয়নি!

গত মার্চে মিলু দিল্লী যাবে। ছুটি-ছাটা নেই. আমি পড়লুম ফাঁপড়ে। একা মেয়েকে ছাড়বো কী করে! মিলু বলল, 'তুমি এতো ভাবছ কেন, বাবা। রাজধানী এক্সপ্রেসে তুলে দিও আমাকে. মামা-মামীরা নামিয়ে নেবে, দিল্লীতে। কতোক্ষণের আর জার্নি।' আমি তবু স্বস্তি পাচ্ছি না, একা একা ছেড়ে দেবো। মিলু বলল, 'এসব তোমার মিথ্যে ভাবনা। মাঝপথে অ্যাক্সিডেন্ট ছাড়া আর কোনো বিপদ নেই, কতোজনই তো যাচ্ছে একা একা। আর কপালে অ্যাক্সিডেন্ট থাকলে তো বাড়ি বসেই হতে পারে। প্রত্যেকটা কথা আলাদা আলাদা করে কী সুন্দর কথা বলতিস তুই, মিলু। ঠিক চলে গেলি একা একা, ঠিক ফিরে এলি। এর পর থেকে তোর সম্পর্কে আমার কোনো দুর্ভাবনা ছিল না. গানের স্কুল, কোচিং ক্লাশ সবই তোকে ফিরিয়ে দিয়ে গেছে নিরাপদে, ঠিক ঠিক সময়ে। আজ তোর কী হলো।

ভাবনাগুলো এলিয়ে পড়ছে এ ওর গায়ে। আমি কিছু ভাবতে পারছি না। মিলু, মা আমার। ফিরে এসো।

আমি কি এক জায়গায় দাঁড়িয়ে আছি। নাকি এগিয়ে যাচ্ছি! নাকি থেমে-থাকা বা এগনো দুটোই এখন সমান নিরর্থক.

বিস্বাদ সিগারেটটা ব্রীজের ওপর থেকে ছুঁড়ে দিলুম নিচে— সেটা পড়তে লাগল ঘুরতে ঘুরতে। জ্বলন্ত আগুনের ফুলকিটা খানিকক্ষণ পর্যন্ত ভেসে থাকল চোখে। তারপরেই নিরাকার। অন্ধকার। বোধহয় অনেকক্ষণ কেউ হেঁটে যায়নি আমার পাশ দিয়ে। শুধু দূরে থেকে ছুটে-আসা হাওয়ায় নিমের গন্ধ, শব্দহীন মাথার ওপর দিয়ে অতর্কিতে আওয়াজ তুলে উড়ে গেল একটা পেঁচা।

মিলু ফেরেনি জেনেও কাছেই কোনো বাড়িতে পুজোর ঘন্টা বাজছে! হাত-পা আড়ষ্ট হয়ে এলো শীতে, যদিও এটা জুলাই মাস—আত্মরক্ষার জন্যে কংক্রিটের পাঁচিলটা আঁকড়ে ধরলুম মুঠোয়। একটা মেরুন গাড়ি হাড়-পাঁজর গুঁড়োতে গুঁড়োতে চলে গেল আমার বুকের ওপর দিয়ে।

গাড়িটার রঙ কি মেরুন ছিল! এতো স্পষ্টতা যাদের চোখে তারা কেন নম্বরটা দেখে রাখল না। বিকেল চারটেয় এমন কী নির্জন ছিল রাস্তা যে তারা চীৎকার করে জানাতে পারল না সকলকে, মিলুকে গুণ্ডারা ধরে নিয়ে যাচ্ছে, তোমরা বাঁচাও! তারা কজন ছিল। সত্যি চারজন! চারটে পাষণ্ডের ধকল তোর ওই একলা রেশমের মতো শরীরে কি করে সামলাবি তুই, মিলু।

মিলু, ফিরে আয়।

গলার চামড়া ছুঁয়ে নিরস্ত হলো আমার ডান হাতের পাঁচটি আঙুল। মুখের ভিতর জিভটা কাত হয়ে পড়ছে বার বার, গলা ভেজানোর মতো পর্যাপ্ত থুথুও এখন বুকে নেই। থেকে থেকে হিম শীত নেমে যাচ্ছে মেরুদণ্ড বেয়ে। আমার কপাল জুড়ে ঘাম। অসম্ভব কাঁপা হাতে, আত্মরক্ষার জন্যে, আর একটা সিগারেট ধরালুম আমি। ফুটো কৌটার মতো খালি বুকে ধোঁয়াটা নেমে গেল নিমেষে। এতোক্ষণে হয়তো সবাই জেনে গেছে, সবার কৌতূহল কি আর তন্ন তন্ন করে খুঁজে দেখছে না মিলুকে। গুণ্ডারা ধরে নিয়ে যাওয়া মেয়ে তুই মিলু, এখন কোন রাস্তা দিয়ে বাড়ি ফিরবি। তুই কি একা ফিরবি। হতভাগা মেয়ে, যদি এভাবেই যাবি, কেন তুই সাক্ষী রেখে গেলি। কেন তুই আরো আগে অরুণের সঙ্গে পালিয়ে গেলি না। আমাদের অস্বস্তি, আমাদের অভিমান, রাগ—এই সামান্য ব্যাপারেই তুচ্ছ হয়ে গেল তোর ভালোবাসার জোর।

মিলু, তোর সবকিছুর সঙ্গে জড়িয়ে আছে আমাদের ভবিষ্যৎ। ফিরে আয়

বুলু

দশটার কিছু পরে ও ফিরল। সঙ্গে অরুণ।

আলো না জ্বাললেই নয়. তাই কোনোরকমে ভিতর-ঘরের একটা আলো জ্বেলে আমি বসেছিলাম অন্ধকার সদরে। প্রিয়ব্রত ফিরলে দরজা খুলে দিতে হবে। এ-কাজটা মিলুই করতো। কি জানি কেন মনে হচ্ছে দিনের পর দিন এই একটা কাজই আমি করে যাচ্ছি। মিলু ফিরবে, প্রিয়ব্রত ফিরবে, দরজাটা খুলে দিও।

অরুণকে দেখে ক্লান্ত করে উঠল বুকের মধ্যে। প্রিয়ব্রত আর অরুণ, কিছুতেই মেলাতে পারছি না ঘটনাটা। শুধু বুঝতে পারছি মিলুকে পাওয়া যায়নি।

নতুন করে বিচলিত হলাম না। মনে মনে জানতাম আঠারো বছরের যুবতী একটি মেয়েকে গুণ্ডারা ধরে নিয়ে গেলে এতো সহজে ফিরিয়ে দেয় না। আমার প্রায় চল্লিশ হলো। কিন্তু ওবয়স তো একদিন আমিও পেরিয়ে এসেছি।

ঘরে ঢুকে আলো জ্বালল প্রিয়ব্রত, দরজাটা ভেজিয়ে দিল। আমাকে দেখেও দেখল না। বসো অরুণ, তোমার সঙ্গে একটু পরামর্শ করি। বলে তাকালো আমার দিকে। ওই চোখের ভাষা আমি বুঝি। চোখের মধ্যে দিয়ে আমি ওর বুকের ভিতর অনেক দূর পর্যন্ত দেখতে পেলাম। হাড়-পাঁজরগুলো আঁটি করে বাঁধা, অনুভূতিগুলো একত্র করতে পারছে না। কদিন আগে মিলু হঠাৎ বলল, 'বাবা, তুমি যেন কেমন বুড়ো হয়ে যাচ্ছ দিন দিন।' সেদিন হাসলেও কথাটার অর্থ এখনই স্পষ্ট হয়ে ধরা দিল।

বুলু, আমাদের একটু চা দেবে? প্রিয়ব্রত গলার স্বর বেঁকে গেল। আবার ভিতরে যাবার আগে আমি অরুণকে দেখলাম। সে বসে আছে মুখ নিচু করে। এক অপরাধের গ্লানি থেকে আর-এক অপরাধের মধ্যে কেন ওকে নিয়ে এলো প্রিয়ব্রত। আবার কোনোদিন অরুণ এ-বাড়িতে আসবে আমি কি ভেবেছিলাম। কখনো।

চায়ের জল চাপিয়ে আমি চলে এলাম ঘরে। চা-টা উপলক্ষ, বুঝি, আসলে প্রিয়ব্রত সরাতে চাইল আমাকে। হয়তো আমি বিব্রত হবো ভেবে, হয়তো অরুণ অস্বস্তি বোধ করবে ভেবে। হয়তো ওরা এমন কোনো আলোচনায় ব্যস্ত, যেখানে আমার উপস্থিতিও কাম্য নয়। হঠাৎ কি-রকম একটা নিঃশ্বাস উঠে এলো আমার গলা পর্যন্ত, শরীর এ-ফোঁড় ও-ফোঁড় করে ছুটে গেল কান্না। দেয়ালে মিলুর ছবি, আলনার থাকে থাকে সাজানো মিলুর শাড়ি, জামা ব্যাগ। নতুন জরির স্লীপারটা এখনো পড়ে আছে। বাক্সবন্দী হয়ে। শ্রাবণের শেষদিকে ওর বন্ধু শর্মিষ্ঠার বিয়ে—জুতোটা সেদিনই ব্যবহার করবে বলে তুলে রেখেছিল। মিলুহীন মিলুর ঘর আমার চোখে ছুঁচ বিঁধিয়ে দিল। বাইরে আকাশে গরগর করে উঠল মেঘ। ঘরপোড়া গরুর মতো দিগ্বিদিক ছুটে যাওয়া ছাড়া এখন আর কিছু করার নেই।

চা দিতে গিয়ে হঠাৎ মনে হলো অরুণের সঙ্গে কি কোনো কথা বলা উচিত? অরুণ মুখ তুলছে না। আমার হাত থেকে কাপটা নেবার সময় সামান্য কেঁপে উঠল ওর হাত। নাকি আমারই হাত! কাপে ডিসে ঠোকাঠুকি লেগে শব্দ উঠল মৃদু। ওদের আলোচনা বন্ধ। চোখের কোণ দিয়ে প্রিয়ব্রতকে দেখলাম আমি—চোয়াল ঝুলে পড়েছে, ঠিক দুটো আঙুল রগের ওপর চেপে ধরেছে ও। চোখের দৃষ্টি অরুণের ওপর নিবদ্ধ। আমাদের কোনো ছেলে থাকলে এই সময় প্রিয়ব্রতর মতো তার এইরকম সম্পর্ক হতো। 'আমি বিয়ে করবো না, ইদানীং মিলু বলতো, তোমাদের দেখবে কে। বলেছিলাম, আমরা মরে গেলে তোকে কে দেখবে। আমরা এখনো বেঁচে আছি প্রবল ও জীবন্ত হয়ে, মিলু এখন কোথায়! মিলু কি জানে আমাদেরই বাড়িতে প্রিয়ব্রত আর অরুণ এখন বসে আছে মুখোমুখি—হয়তো এমন কোনো সুতোয় গেঁথে তুলছে পরস্পরকে, যার রূপ আমিও জানি না। এ-দৃশ্য দেখে মিলু কি হাসত না ঠোঁট টিপে!

খানিক আগে পর্যন্ত মিলু ছিল আমার ভাবনার সবটুকু জুড়ে। মিলু আর অরুণ এখন একাকার হয়ে যাচ্ছে। ভাবছি এই দুঃসময়ে অরুণ কীভাবে সাহায্য করতে পারে আমাদের। যে-অপমান নিয়ে একদিন ও চলে গিয়েছিল, এ-বাড়ি থেকে, তারপরও কি ওর পক্ষে ফিরে আসা সম্ভব! কী বলেছে ওকে প্রিয়ব্রত! এ কেমন লুকোচুরির খেলা তার: মিলু নেই, এই কি প্রিয়ব্রতর আমার থেকে দূরে যাবার সময়!

ছবিটা এখনো স্পষ্ট ভাসছে চোখে। মিলু প্রি-ইউনিভার্সিটি দেবে। কোচিং দরকার। অরুণকে নিয়ে এলো প্রিয়ব্রত। 'ছেলেটি ব্রিলিয়ান্ট, বুঝলে, এম-এতে ফার্স্ট ক্লাশ পেয়েছিল। নতুন ঢুকেছে কলেজে।' আমাকে বলল, 'কাছেই থাকে; সুধেন্দুবাবু আলাপ করিয়ে দিলেন। মিলুকে পড়িয়ে দিয়ে যাবে—'

পড়াশুনোর এলাকাটা প্রিয়ব্রতর। এ বিষয়ে আমার বলার কিছু ছিল না। ছেলেটিকে দেখে ভালোই লাগল। শান্ত, নম্র, কথাবার্তায় সুন্দর। মিলুকে পড়াতে আসতো সন্ধ্যাবেলায়। প্রথমে হপ্তায় তিন দিন, ক্রমশ রোজই। মিলুকে জিজ্ঞেস করলাম, 'ব্যাপার কিরে!' মিলু বলল, 'পরীক্ষা এসে যাচ্ছে। অরুণদা বলেছে—।' কথাটা শেষ করল না। বুঝে নেওয়ার ভার আমার। অরুণের সংস্পর্শেই কিনা জানি না, আজকাল মিলুও কথাবার্তা কম বলছে, আজকাল প্রায়ই ওকে গম্ভীর ও অন্যমনস্ক দেখি। কথায় কথায় একদিন প্রিয়ব্রত বলল, 'একটু সীরিয়াস হওয়া ভালো।' হয়তো। কিন্তু, মিলুর অন্যমনস্কতা চঞ্চল করে তুলল আমাকে। মিলু যেন ক্রমশ নিজের মধ্যে ডুবে যাচ্ছে। পরীক্ষার পর প্রিয়ব্রতর যাতায়াত কমে গেল, মিলুর বাড়ল। এখন ও বন্ধুদের সঙ্গে সিনেমায় যায়, গানের স্কুলে যায়, কোনো কিছু স্পষ্ট না বলেই বেরিয়ে যায় মাঝে মাঝে। দূরে থেকে কি সব যাওয়ার মানে বোঝা সম্ভব!

এইভাবেই চলছিল। একদিন হঠাৎ গোলমাল হয়ে গেল। বড় রাস্তার দিকে এ-পাড়ার শেষ বাড়িতে থাকেন যমুনাদি, আমার মাসতুতো দিদি। একদিন এসে বললেন, 'বুলু, এবার মেয়ের বিয়ে দিয়ে দে। লোকে নানা কথা বলছে। আজ নিজেই দেখলাম, তোদের সেই প্রফেসর ছেলেটির সঙ্গে মিলু ময়দানের রাস্তায় ঘুরে বেড়াচ্ছে। আমি ট্রামে আসছিলাম—।' শুনে বুক শুকিয়ে গেল। বললাম, 'দেখাদেখির কী আছে সেজদি, মিলু তো বলেই গেছে।' 'ও। তাই বল, তোরা জানিস।'

মিলু ঘুমনোর পর সেদিন রাত্রে কথাটা বললাম প্রিয়ব্রতকে। প্রিয়ব্রত গম্ভীর হয়ে গেল। পরে বলল, আমিও দেখেছি একদিন। সেটা অবশ্য বাসস্টপে। ভেবেছিলাম হঠাৎই দেখা হয়েছে বুঝি! তুমি কি মেয়েকে কিছু বলেছো?'

বললাম, 'না। বলবো?'

প্রিয়ব্রত কঠিন হয়ে এলো। 'যা বলার আমিই বলবো অরুণকে। যে-জন্যে ওর বাড়িতে আসা, সে-কাজ তো হয়ে গেছে। এখন বিদেয় করে দিলেই হয়—

প্রিয়ব্রত যে-ভাবে ভাবছে আমি সে-ভাবে ভাবি না। ওকে কঠিন দেখে ভয় পেলাম। দুয়ে দুয়ে চার মিলিয়ে নিজের মেয়েকেও তো বুঝতে পারি কিছুটা—তার সবটাই কি মিথ্যে? মিলুর পড়ার টেবিল গুছোতে গুছোতে একদিন আমি যে নীল চিঠি পেয়েছিলাম সে-কথা প্রিয়ব্রতকে বলা যাবে না। বলা যাবে না মিলুর অন্যমনস্ক চোখে আমি দেখেছি উড়ন্ত পাখির ছায়া। সেদিন দেরি করে বাড়ি ফেরার পর ওর নরম হয়ে-আসা ঠোঁটও আমার দৃষ্টি এড়ায়নি। সবই কী অরুণের দোষ? প্রিয়ব্রত যেন মিলুকে আড়াল করে দাঁড়াল, এখন ওকে নিজের চেয়ে অনেক বেশি লম্বা দেখাচ্ছে। ও দেখছে না আড়াল পড়ে কেমন অন্ধকার হয়ে গেছে মিলু।

ভয়ে ভয়ে বললাম, 'তুমিই তো বলে-ছিলে ছেলেটি ভালো। ওদের বিয়ে দিলে হয় না?'

'বিয়ে ওর সঙ্গে!' কথাটা ক্ষুরের মতো চকচক করে উঠল প্রিয়ব্রতর ঠোঁটে। 'বুলু, ভুলে যেওনা মিলু আমাদের একমাত্র সন্তান। নিজের ভালোমন্দ ও এখনো বুঝতে শেখেনি। যা করার আমাদেরই করতে হবে।'

এর আগে কখনো প্রিয়ব্রতকে এতো শক্ত হতে দেখিনি।। প্রিয়ব্রত কী করবে জানি না। কিছু নিশ্চয়ই করবে। ব্যাপারটা ভেবে ঝিম ধরে এলো শরীরে। খানিক পরে ওর পাশ থেকে উঠে মেয়ের ঘরে ঢুকলাম; মিলুর ঘুম ভেঙে না যায় এইভাবে আস্তে হাতে নীল আলোটা জ্বাললাম। ছায়াচ্ছন্ন আলোয় চোখের ওপর হাত চাপা দিয়ে শুয়ে আছে মিলু, ঢেউ-খেলানো নিস্পন্দ শরীরে সমুদ্রের মৌন। ওই বয়সে আমি কেমন ছিলাম আজ আর মনে পড়ে না। এটুকু বুঝি আমার ছোটখাটো শরীরে ধরে রাখতে পারিনি ওকে। মিলু যেন বুঝতে পেরেছিল ও আমাদের একমাত্র—আমার আর প্রিয়ব্রতর সবটুকুতেই ওর অধিকার। কপালে হাত রাখতেই হাতটা ধরে ফেলল ও, 'মা!' বললাম, ঘুমোস নি! মিলু বলল, ঘুম আসছে না মা। শুনে কপালটা চিনচিন করে উঠল কেমন।

বাইরে দরজা বন্ধ করার শব্দ শুনছি। তার মানে অরুণ চলে গেল। ওর আসা এবং যাওয়া দুটোই আমার কাছে সমান অর্থহীন। তবু অরুণের আবির্ভাব যে আমার মনে মিলু সম্পর্কে কিছুটা আশার সঞ্চার করেছিল, তাই বা অস্বীকার করি কী করে। তাহলে কি মিলুর আশা ছেড়ে দিল প্রিয়ব্রত! না। ও-কথা ভাববো না। প্রিয়ব্রত কি জানে না মিলু যতোক্ষণ চোখের সামনে, আছে আমার স্পর্শের মধ্যে, এমন কি ঘোর মুমূর্ষু অবস্থাতেও ততক্ষণ আমি তার সব দায়িত্ব নিতে পারি। আজ আমি অক্ষম, মিলুকে ফিরিয়ে দিক প্রিয়ব্রত।

'বুলু—'

অন্ধকার দরজার বাইরে ওর গলা পেয়ে আঁচলের খুঁটটা দ্রুত বুলিয়ে নিলাম চোখে। বরাবর প্রিয়ব্রত আমাকে শক্ত ভাবে, বরাবর ও আমার খোলসটাকে দেখে। এখনও আমি এমন কিছু করবো না যাতে ও অন্য রকম ভাবে। নিজেকে আড়াল করা যে কী কষ্টের—অন্তত এই মুহূর্তে। মিলু মেয়ে, মিলু হয়তো বুঝতো।

অন্ধকারেই আমার মাথায় হাত রাখল প্রিয়ব্রত। মোটা সরু রেখায় ওর আঙুল-গুলো কী খুঁজছে বুঝতে পারলাম না। খোকার জন্মের পর যখন আমি একাই ফিরে এলাম হাসপাতালের কেবিনে, নিঃশোষিত শরীর শূন্যতা ছাড়া আর কিছু চিনতে পারছে না, তখনো, মনে পড়ে, একইভাবে আমার চুলের ভিতর ঘোরাফেরা করেছিল প্রিয়ব্রতর আঙুল। কতোদিন হয়ে গেল। তবু, সব স্পর্শ কি ভুলে যাওয়া যায়? মিলুর জন্মের সমস্ত অনুভূতিও তো ধরা আছে শরীরে। চোরাকাদায় ডুবে যাওয়া শরীরটাকে কোনোরকমে টেনে তুলে জিজ্ঞেস করলাম ওকে, 'অরুণ কেন এসেছিল?'

সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিল না প্রিয়ব্রত। পাশে বসল। আমি ওর গাঢ় নিঃশ্বাসের শব্দ শুনলাম। যেন বহুক্ষণ নিঃশ্বাসটা এক জায়গায় জমিয়ে রেখেছিল ও, এইবার আস্তে আস্তে ছেড়ে দিল।

'ভেবেছিলাম ব্যাপারটায় ওর হাত আছে। এ-রকম তো কতোই হয় শুনি—'

'অরুণকে সন্দেহ করছো! তুমি কি পাগল হলে!'

উত্তরটা এড়িয়ে গেল প্রিয়ব্রত। আমার এলানো হাতটা হঠাৎই তুলে নিল নিজের মুঠোয়।

'বুলু, তখন যদি তোমার কথা শুনতাম!

'সে আর ভেবে কী হবে।'

যথেষ্ট সাবধান থেকেও আমার গলা কেঁপে গেল। সম্ভবত এই রূপান্তরের অপেক্ষাতেই ছিল প্রিয়ব্রত। প্রথম বৃষ্টির স্পর্শে গাছ যেমন আকস্মিক নুয়ে পড়ে, তেমনি, হঠাৎই আমার জানুর ওপর নুয়ে এলো ও—এমন অবর্ণনীয় স্মৃতি আমার আর নেই।।

'বুলু, আমি কিছুই বুঝতে পারছি না। এ আমাদের কী হলো, আমি যে কিছুই বুঝতে পারছি না—'

দু হাতে আগলে ধরলাম প্রিয়ব্রতকে। ফুটন্ত জলের মতো কান্নার আবেগে ওর শরীর এখন দাপাদাপি করছে; কথাগুলো জড়িয়ে যাচ্ছে কণ্ঠস্বরের বিচিত্র ধাতবতায়। মিলু শুধু প্রিয়ব্রতরই সন্তান নয়, আমারও। নাড়ি শুঁকলে এখনো মিলুর গন্ধ পাওয়া যাবে। কিন্তু, প্রিয়ব্রত জানে আমি শক্ত। জেনেশুনেই বুঝি একবুক ব্যর্থতা নিয়ে ফিরে এসেছে আমার কাছে।

ভগবান, আমার বুক ছিঁড়ে যাচ্ছে, তুমি আমাকে শক্তি দাও—শক্তি দাও।

অরুণ

'যদি আমরা বিয়ে করি?'

কথাটা বলেছিলাম অনেক ভেবেচিন্তে, কিছুটা ঝুঁকি নিয়ে। মিলুর সঙ্গে একটা অন্তরঙ্গতা গড়ে উঠলেও তখনো আমরা

বিয়ের কথা ভাবিনি। আমি মিলুকে বুঝতাম, হয়তো মিলুও আমাকে। এ-সব ক্ষেত্রে যা হয়—সিদ্ধান্ত নেবার একটা সময় থাকে, বিদ্যুৎসঞ্চারের মতো দুটি তার একই সময় পরস্পরের ইচ্ছার পরিপূরক হয়ে ওঠে। হয়তো আরো কিছুদিন লাগতো। প্রিয়ব্রতবাবুর কথায় আমার সিদ্ধান্ত ত্বরান্বিত হলো।

সন্দেহ কী, আমার প্রস্তাব তাঁকে উত্তেজিত করেছিল। এমন ক্রুররূপে আগে কখনো দেখিনি তাঁকে। খানিক স্তম্ভিত থেকে বললেন 'তোমাকে ওয়ার্ন করে দিচ্ছি, অরুণ। আমার মেয়ের ত্রিসীমানায় ঘেঁষবার চেষ্টা কোর না। তাহলে ফল খারাপ হবে।'

এতো অপমান আমি জীবনে বোধ করিনি। জ্বালাটা আরো বেশি লাগল, কারণ সেই মুহূর্তেই স্পষ্ট অনুভব করলাম, আমি মিলুকে ভালোবাসি। ভুল আমারই, পরে বুঝতে পেরেছিলাম। যে-আমাকে প্রিয়ব্রতবাবু স্নেহ করতেন সে ছিল মিলুর টীচার, যে-অরুণকে তিনি অপমান করে বের করে দিলেন বাড়ি থেকে, সে তার মেয়ের, একমাত্র মেয়ের, পাণিপ্রার্থী। দুজনকে দেখায় দৃষ্টিভঙ্গির পার্থক্য থাকতেই পারে। আজ, অনেক দিন পরে, প্রিয়ব্রতবাবুর মুখোমুখি হয়ে আমার সেদিনের কথাই কেন মনে পড়ল জানি না। অপমানের স্মৃতি বোধ হয় অগোচরে থেকেও পাহারা দেয় সারাক্ষণ।

আমার ঘরটা রাস্তার ধারে। একা থাকি। সন্ধ্যের পর আজকাল প্রায়ই বেরুই না। আজ হোটেল থেকে খেয়ে এসে টিউটোরিয়ালের খাতা দেখছি। জানলায় প্রিয়ব্রতবাবুর মুখ ভেসে উঠল। চেনা সহজ নয়। মুখটা আমার মনে মোটা রেখায় দাগানো আছে বলেই চিনতে পারলাম ; না হলে প্রিয়ব্রত-বাবুর এ-রকম চেহারা কল্পনা করা যায় না। সেই সময় দু হাতে জানলার শিক আঁকড়ে ধরা ছাড়া তাঁর আর কোনো উপায় ছিল না। তাড়াতাড়ি দরজা খুললাম।

'আপনি! ভেতরে আসুন—'

'অরুণ, তুমি কি জানো মিলু কোথায়?'

'মিলু!'

'জানো না! শুনছি গুণ্ডারা তাকে ধরে নিয়ে গেছে।' উদভ্রান্ত প্রিয়ব্রতবাবুর চোখসর্বস্ব মুখটা এগিয়ে এলো আমার দিক। 'সত্যিই কিছু জানো না?'

মুহূর্তের জন্য বিভ্রান্ত বোধ করলাম আমি। এমন নয় যে ব্যাপারটা নতুন শুনছি। হোটেলে খেতে গিয়ে শুনেছিলাম একটি মেয়েকে কারা জবরদস্তি ধরে নিয়ে গেছে। যারা আলাপ করছিল তারা চট করে অন্য প্রসঙ্গে চলে গেল। এরপর আরো দুটো ঘটনা শুনলাম আমি। একজন এস-আইয়ের রিভলবার কেড়ে নেওয়া হয়েছে—অতর্কিত আক্রমণে লোকটি ও আক্রমণকারীদের একজন মারা গেছে এবং আগামীকাল টালীগঞ্জ বনধ্ পালন করা হবে। রোজই এ-রকম একটা না একটা ঘটনা শুনি, তারতম্যহীনভাবে এগিয়ে চলে জীবন। আপাতত প্রিয়ব্রতবাবুর কথায় বিমূঢ় বোধ করলাম। মেয়েটি তবে মিলু। মেঝেয় উপুড়-করা কানাকড়ির মধ্যে থেকে একখণ্ড হীরে যেন ছিটকে বেরুলো, পা দুটো নড়ে উঠলো ঈষৎ। পরমুহূর্তেই প্রিয়ব্রতবাবুর চোখের দিকে তাকিয়ে কঠিন হয়ে এলো মুঠো। রূঢ় গলায় বললাম, 'গুন্ডারা আপনার মেয়েকে ধরে নিয়ে গেছে, আমি তার খোঁজ রাখবো মানে!'

'অরুণ!'

স্বরভঙ্গির তফাতটা বোধ হয় ধরতে পেরেছিলেন প্রিয়ব্রতবাবু। তাড়াতাড়ি আমার হাত দুটো ধরে ফেলে কাতর, প্রায় ভেঙে-পড়া গলায় বললেন, 'অরুণ, আমাদের বড়ো বিপদ। গুন্ডারা ধরে নিয়ে গেল, এখন মেয়েটার কী হবে! আমাদের মান সম্মান—'

কথাটা মুখেই থেকে গেল। শেষ হল না।

প্রিয়ব্রতবাবুর ধারণা তাঁর উদ্বেগের কিছুই আমাকে স্পর্শ করছে না, সত্যিই আমি ব্যাপারটার গুরুত্ব উপলব্ধি করতে পারছি না। এটা সত্যি নয়। তাঁর ব্যবহার আমাকে ক্রুদ্ধ করতে পারে, কিন্তু এই মুহূর্তে আমি আদৌ তাঁর কথা ভাবছি না। মান-সম্মানের প্রশ্নই বা এখন ওঠে কী করে! ঘটনাটা মিলুকে নিয়ে। সেই মিলু, সেদিন আর-একটু সাহসী হলে যে অনায়াসে আজ আমার স্ত্রী হতে পারত ; স্তব্ধ অবস্থায় যার তপ্ত নিঃশ্বাস এখনো বয়ে যায় আমার মুখের ওপর দিয়ে। রক্তের যদি কোনো বিনিময় ক্ষমতা থাকে, কিংবা গাঢ়তম অনুভূতির, আমি কি অস্বীকার করতে পারবো মিলুর সঙ্গে আমি তা বিনিময় করেছি। এ-অপমান আমারও, ব্যক্তিগত।

কিন্তু, এখন আমি কী করবো! প্রিয়ব্রত-বাবুর বর্ণনা ঠিক হলে ঘটনাটা ঘটেছে বিকেল চারটেয়, এখন প্রায় দশটা বাজতে চলল। ছ' ঘণ্টায় অনুমেয় যে-কোনো ক্ষতিই সম্ভব হতে পারে। এ-রকম নারীহরণের খবর প্রায়ই চোখে পড়ে—অপহৃত হয়ে, ব্যবহৃত হয়ে একদিন তারা ফিরে আসে। ততোদিনে অনেক ঝড় বয়ে গেছে তাদের শরীর আর মনের ওপর দিয়ে—এই পর্যন্ত এসেই খবরের শেষ টানা হয়। সম্ভবত তাদের সম্পর্কে আর-কিছু জানার থাকে না! পুরো বিষয়টা চিন্তা করে থরথর করে কেঁপে উঠল শরীর। অসম্ভব রাগে শক্ত হয়ে উঠল চোয়াল; সম্মুখ-যুদ্ধে এখন আমি যে-কোনো শত্রুকেই ধরাশায়ী করতে পারি। কী লাভ, একই সঙ্গে ভাবলাম, সময় কী আর অপেক্ষা করে আছে আমার প্রতিবাদের জন্য! ছ ঘণ্টা তো অনেকটা সময়! মিলুর সারল্য মাঝে মাঝে বিব্রত করতো আমাকে। জানি না, সেই সারল্যই হয়তো তাকে টেনে নিয়ে গেল প্রবল ঘূর্ণী-বর্তের মধ্যে। বিপুল অভিমান নিয়ে একদিন সে সরে গিয়েছিল আমার কাছ থেকে। অভিমান যায়, আকর্ষণও হয়তো যায়, কিন্তু বুকের মধ্যে এখন যে অস্থিরতা অনুভব করছি, সে তো যায় না!

প্রিয়ব্রতবাবু তখনো তাকিয়ে আছেন আমার দিকে; স্তব্ধ ও অপলক এমন এক চোখে যাতে মনে হতে পারে মিলুকে খুঁজে পাবার চাবিকাঠি আমারই হাতে; আমার নির্দেশটুকু পেলেই নিশ্চিন্ত মনে চলে যেতে পারবেন। খুব বেশি দুশ্চিন্তায় মানুষ এই রকম দিশেহারা হয়ে পড়ে—পূর্বাপর, সম্ভব-অসম্ভবের জ্ঞান থাকে না কোনো। প্রিয়ব্রত-বাবুরও তাই হয়েছে, না হলে এই মুহূর্তে তাঁর আমার ওপর নির্ভর করার কোনো কারণ ছিল না। আর, সত্যি সত্যিই কি আমি কারো নির্ভর হতে পারি! যদি পারতাম, তাহলে নিজের কাছেই আজ এতোটা দীন মনে হতো না নিজেকে। যদি পারতাম, তাহলে আজ হয়তো এই বিড়ম্বনার সুযোগ থাকতো না কোনো—মিলু থাকতো আমারই কাছে, ঠিক যেমনটি উচিত তেমনি হয়ে। এ-সব অনুভবের কথা প্রিয়ব্রতবাবুকে বলা যাবে না। আমার অনেকটা সময় দ্বিধায় কেটে গেল।

পরে বললাম, 'পুলিশে জানিয়েছেন?'

প্রিয়ব্রতবাবু মাথা নাড়লেন, যার অর্থ না। কেন তা জানি না। এটা উচিত ছিল। এ-সব ক্ষেত্রে মানুষ যে-কথা ভাবে এবং যেমন করে, আমিও সেভাবে ভাবলাম। নানারূপে বিভক্ত হয়ে বার বার চোখের সামনে ভেসে উঠছিল মিলু, যেন আস্তে আস্তে আমাকে সম্পূর্ণ অধিকার করে নিচ্ছে ও, ভাবনাগুলো এক পাও এগোতে দিচ্ছে না। তবু, বুঝতে পারছি, যা করার আপাতত আমাকেই তা করতে হবে। আমি করবো। অসমান হাওয়ায় পতপত করে উড়তে থাকলো টিউটোরিয়ালের খাতার পাতা। ভ্রূক্ষেপহীন আমি চলে এলাম প্রিয়ব্রতবাবুর পাশে। একজন মিলু অসংখ্য মিলু হয়ে ছড়িয়ে পড়ছে চারিদিকে। আমি কি কোনো-দিন ভেবেছিলাম আমি আর প্রিয়ব্রতবাবু এইভাবে হাঁটবো পাশাপাশি—একই লক্ষ্যের দিকে!

বাড়ি থেকে থানায়। সেখান থেকে আমাকে জোর করে নিজের বাড়িতে টেনে নিয়ে গেলেন প্রিয়ব্রতবাবু। বুঝি, এই মুহূর্তে আমাকে তাঁর খুব বেশি প্রয়োজন। আর কিছু পারি না-পারি, সম্ভবত ভরসা দিতে পারবো তাঁকে।

ভরসা! নিজের কানেই কথাটা ঠাট্টা হয়ে বাজলো।

মিলুদের বাড়িতে যখন পৌঁছলাম তখন দশটা বেজে গেছে। রাস্তা অসম্ভব নির্জন, তেমনি অন্ধকার। কোথাও কোনো শব্দ নেই বললেই হয়। আকাশে তাকালাম। ঘন, থোকা থোকা মেঘ ছুটে যাচ্ছে একদিক থেকে অন্যদিকে। বাতাসে থম্। চারিদিকে মিলুর অভাব ছড়ানো। হয়তো আর কিছুক্ষণের মধ্যেই বৃষ্টি নামবে।

দরজা খুললেন মিলুর মা। অন্ধকার অন্ধকার মুখ। আলো জ্বালার পর দুর্বোধ্য চোখে একবার আমার দিকে তাকিয়েই মুখ ফিরিয়ে নিলেন চকিতে। এইমাত্র আমি আকাশ দেখেছি, এইবার তার উপমা ধরা পড়লো। দরজাটা ভেজিয়ে দিয়ে প্রিয়ব্রতবাবু বললেন, 'বসো অরুণ, তোমার সঙ্গে একটু পরামর্শ করি।'

স্পষ্ট না জানলেও অনুমান করতে পারি কী বলবেন প্রিয়ব্রতবাবু। এতোক্ষণে যেটুকু বুঝেছি, তার সামনে এখন দুটি প্রশ্ন, মিলু ফিরবে কি না এবং যদি সে ফিরে আসে—! মনে হচ্ছে দ্বিতীয় প্রশ্নটাই তাঁর কাছে বড়ো সমস্যা। উপায়হীন শূন্যতায় আমার নিঃশ্বাস বিশৃঙ্খল হয়ে উঠলো।

আজ মনে পড়ছে সেই দিনটির কথা, যেদিন আমার ঘর থেকে ছুটন্ত তারার মতো কাঁদতে কাঁদতে বেরিয়ে গেল মিলু। সে জানতো না তার অগোচরেই কবে দুর্ঘটনা ঘটে গেছে আমাদের পরিচয়ের মধ্যে; জানতো না ঠিক কবে এবং কেন আমাদের পারস্পরিক যোগসূত্র এগিয়ে গেল বিচ্ছিন্নতার দিকে। সেদিন ওর চেহারা অন্যরকম—দেখে চেনা যায় না এ সেই মিলু, যার প্রতি মুহূর্তের আচরণে ঝরে পড়ে শিশুর উচ্ছলতা। মিলুর এমন সংহত রূপ আগে কখনো দেখিনি। ঘরে ঢুকে কিছুক্ষণ এলোমেলোভাবে তাকায় ও দেখলো আমার দিকে, যেন তার আসার উদ্দেশ্য কী বুঝতে পারছে না। পরে বললো, 'আজ আমি বলতে এসেছি। আপনি আমায় বিয়ে করুন।'

এতো সোজাসুজি কথাটা বলা যায় আমি ভাবিনি। মিলুর কথায় কোথাও এতোটুকু অস্পষ্টতা নেই। অবাক হয়ে, কিছুটা হতবুদ্ধির মতো, আমি তাকিয়ে থাকলাম ওর আরক্ত হয়ে-আসা মুখ ও স্ফুরিত ঠোঁটের দিকে।

'সেটা সম্ভব নয়, মিলু।'

'কেন!'

কেন! আমি একটু ভাবলাম, সময় নিলাম। 'তুমি কি তোমার বাবা মাকে ছেড়ে চলে আসতে পারবে! ভুলে যেও না—'

কথাটা শেষ করতে না দিয়েই মিলু বলল, 'সমস্যাটা আমাকে নিয়ে নয়। আমি জানতে এসেছি। তুমি তোমার কথা বলো।'

এই প্রথম তুমি-তে নেমে এলো মিলু। ওর সমস্ত উপস্থিতি থেকে খসে পড়েছে সরল কৈশোর। আমি কী বলবো! মিলু জানে না প্রশ্নটা যতো সরল, উত্তরটা তা নয়। হয়তো উত্তরের জন্যে আরো কিছুদিন আমাদের অপেক্ষা করতে হবে।

দ্বিধাগ্রস্তভাবে বললাম, 'আমাকে ভাবতে দাও—'

মিলু চুপ করে থাকল। ক্রমশ মিলিয়ে গেল ওর মুখের রক্তাভা। ত্বক জুড়ে ফ্যাকাশে শূন্যতা, চোখ দুটো অস্বাভাবিক চকচকে—যেন বালির ভিতর থেকে জল উঠে আসছে ক্রমশ। সেইভাবে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে বলল, 'ঠিক আছে। আমি যাচ্ছি—'

মিলুর কথার জবাব আজও আমি দিতে পারিনি। অপমানবোধ নয়, হয়তো অন্য কিছু আমাকে বিরত করেছিল। সম্ভবত আমার কাপুরুষতা, সম্ভবত সাহসের অভাব, হয়তো ভালোবাসা সম্পর্কে তখনো নিশ্চিত হতে পারিনি। মিলু চলে গেল গাঢ় অভিমান নিয়ে, একটি তারা যেভাবে খসে পড়ে আকাশ থেকে—সে কোথায় যায় কেউ তার হদিশ পায় না!

আমার সামনে প্রিয়ব্রতবাবু। মিলুর মা খানিক আগে চা দিয়ে চলে গেছেন, আর আসেননি। কাপটা যখন আমার হাতে তুলে দিচ্ছেন, ও'র হাত ছুঁয়ে গেল আমার হাত—কেন জানি না, হাতটা কেঁপে গেল হঠাৎ। তখনই আমি অনেকক্ষণের দ্বিধা কাটিয়ে মনঃস্থির করে ফেললাম। চেঁচিয়ে বলে উঠতে ইচ্ছে করলো, মিলু, ফিরে এসো। সেদিন তোমাকে ফিরিয়ে দিয়েছিলাম, আজ আমিই ফিরে যেতে চাইছি তোমার কাছে।

হাত-পা শিথিল হয়ে আসছে। কিছুই গুছিয়ে ভাবতে পারছি না। এখন শুধু একটি কথাই মনে হচ্ছে, হয়তো মিলুর বিপর্যয়ের জন্য আমিই দায়ী। যারা তাকে জোর করে ধরে নিয়ে গেল, তাদের সঙ্গে আমার তফাৎ কোথায়! কেউ ফেলে দেয়, কেউ জোর করে কেড়ে নেয়—ভালোবাসার সঙ্গে এদের দূরত্ব সমান।

মিলু

চারিদিকে এতো উদ্বেগ, এতো ভালোবাসা, এতো আত্মদানের প্রস্তুতি, এ-সবের কিছুই স্পর্শ করল না মিলুকে। পদ্মপাতার মতো তার টলটলে বুকে লেগে আছে এক-বিন্দু জল—একটা পোড়ো বাড়ি, তার শেষ স্মৃতি। পর পর ও ক্রমাগত, চারটি লোক বলাৎকার করার পর গায়ে নুন-ছড়ানো কেঁচোর মতো তার আঠারো বছরের শরীরটা সামান্য কুঁকড়ে উঠলো; অস্ফুট শব্দে নড়ে উঠলো ঠোঁট দুটো, চোখের কোণ থেকে ঝরে পড়লো শেষ জলকণা। অন্ধকার মুখে নিয়ে সে ভাসতে থাকল রক্তনাম্নী এক নদীর ওপর।

দুটি ছড়া— বনফুল

পরিস্থিতি

সবাই চোর, সবাই চোর, সবাই চোর,
দিবারাত্রি এইটে শুধু শুনেছি,
এবং বসে' ঘরের কোণে আপন মনে
ট্যাঁকের টাকা গুণছি।

বৃহৎ কাজ, মহৎ কাজ, দেশের ডাক, মায়ের ডাক
মাইকেতে বাজছে ঢাক
ঢাকীরা সব মাইনে পায়
তাই বাজায়
বেশ বাজায়
ডিউটি সেরে কিন্তু তারাও একই ভুলো ধুনছে
ট্যাঁকের টাকা গুণছে।
হায়রে হায়
দেশ কোথায়
মা কোথায়!
বৃহৎ কাজ, মহৎ কাজ করবে কে
এই তুফানে হালটি এসে ধরবে কে
স্বার্থ-ঢেঁকি সকলকে করছে চিঁড়ে
শকুনিরা খাচ্ছে মড়ার মাংস ছিঁড়ে
কিন্তু তবু আকাশ জুড়ে বাজছে ঢাক
মহৎ কাজ, বৃহৎ কাজ
দেশের ডাক, মায়ের ডাক
ঢাকীরা সব মাইনে পায়
তাই বাজায়
হায়রে হায়।

গুজব

নানা রঙের, ভালো 'ফিনিশ'
গুজব একটা আজব জিনিস।
তার বহু পিতা, বহু মাতা,
নিজেও তিনি জন্মদাতা
অনেক কিছুর,
অনেক উঁচুর, অনেক নীচুর।
পাহাড়, নদী, সাগর, মরু, পর্বত
সব শরবত্
করে' গুলে খেয়েছেন তিনি।
কখনো 'কুইনিন', কখনও চিনি।
খুব চটপটে, খুব ছটফটে,
দেশের লোক তার কথায় বসে ওঠে।
দুম দুম বোমা ফাটায়, বোঁ বোঁ করে' ছোটে
কখনও মোটরে, কখনও প্লেনে, কখনও 'বোটে'।
তাঁকে ভয় করি কি? আরে না—না—
এলে আহ্লাদে হই আটখানা,
কৃতার্থ হয়ে উঠি বিলকুল
আড্ডা হয় জমজমাট, বন্ধুরা হন মশগুল।
কেটে যায় সব মেঘ
কাপের পর কাপ চা আসে
পেগের পর পেগ।

নদীর নাম ভালোবাসা ॥

মৃত্যুঞ্জয় মাইতি

শেষের খেয়ার মতো সে কখন চলে গেছে নদীর ওপারে
যে-নদীর অন্য নাম ভালোবাসা ; সে নদীতে সূর্যাস্তের আলো,
যে আলো দেখার নয়—অনুভব, শুধু শান্ত অনুভব,
জীবনের সব দুঃখ যে আলোয় সন্ধ্যাবেলা স্থিতপ্রজ্ঞ হয়।

সব খেয়া চলে যাক। সব প্রেম ভালোবাসা বিকেলের মতো
নিস্প্রভ রোদের দৃশ্যে মহৎ বিষাদ হোক। আমি জানি, তবু
কোথাও সমুদ্র আছে, যে-সমুদ্রে যতো নদী বেলা শেষ হ'লে
শব্দহীন নিঃশেষিত। তখন পৃথিবী যেন নিভৃত আশ্রম!

জীবন সমুদ্র সেই, জীবন বিস্ময় সেই ; ভালোবাসা শুধু
নির্জন পবিত্র নদী, দুপারে অচেনা শস্য, ওপরে আকাশ!!

অগ্নিকাণ্ড ॥

গৌরাঙ্গ ভৌমিক

এমন কাণ্ড ঘটে গেলো অসম্ভবের রাত-মোহনায়।
আমরা যখন খেলার সাথী মধ্যরাতে পালটেছিলাম,
সেই মুহূর্তে আগুন লাগলো,
অতর্কিতে, পাখির ঘরে।
অনভ্যস্ত হাতের মুঠোয়, মুখোস পরে, অস্ত্র নিলাম।

এখন দেখছি, জ্বলে যাচ্ছে—সারা জীবন, সকল শস্য।
সকল ঘরেই আগুন আগুন। ভয়-পাওয়া সব পায়রাগুলি
কেবল উড়ছে, উড়ে যাচ্ছে,
উড়ে উড়ে আকাশ ডিঙোয়।
মুঠোর মধ্যে রাখছি ধরে পোড়া-চিঠির চিতা-ভস্ম।

ভাবছি, কোথায় হৃদয় ছিল, স্মৃতিমুখর ভালোবাসা?
সে সব এখন অর্থবিহীন, কেবল দেখছি চতুর্দিকে
যে-ঘরামি ঘর বানাতো,
(তার বুকে আজ কী পিপাসা!)
সে মানুষই চেঁচিয়ে মরছে, একটি শুধু সিঁড়ির খোঁজে।

সাহিত্য সংস্কৃতি

নতুন বই

মাঝি (উপন্যাস) — পরেশ ভট্টাচার্য। ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েটেড পাবলিশিং প্রাঃ লিঃ, ৯৩ মহাত্মা গান্ধী রোড, কলকাতা-৯। সাড়ে ছ' টাকা।

উচ্চ ও মধ্যবিত্তের জীবনযন্ত্রণা, প্রেম-প্যাশান ও মন দেয়ানেয়ার কাহিনী নিয়েই প্রায়শই নতুন নতুন বই প্রকাশিত হচ্ছে। প্রায় সমস্ত কাহিনীর পটভূমি নগর-জীবন। শহুরে জীবনের 'বাবু' কাহিনীরই প্রাধান্য এতে বেশি। কিন্তু মাটির সন্তান যারা, যারা রয়েছে বাস্তব জীবনের সবচেয়ে কাছাকাছি, যারা ছড়িয়ে আছে জলে-জঙ্গলে ক্ষেতে-খামারে—যারা নিচুতলার মানুষ—তাদের জীবন সার্থকভাবে সাহিত্যে ইদানীং বড় একটা প্রতিবিম্বিত হয় না। সম্ভবত চার দেয়ালের বাইরের জীবনের সঙ্গে কথাশিল্পীদের সংযোগ-সম্পর্কহীনতা এবং অনভিজ্ঞতা এর কারণ। আনন্দের কথা, স্বল্পখ্যাত কিন্তু শক্তিমান লেখক শ্রীপরেশ ভট্টাচার্য এই নিচুতলার এক মানুষকে নিয়ে লিখেছেন একটি ভালো উপন্যাস সুন্দরবনের পটভূমিকায়।

প্যাঞ্জাট-বয়ারমারির জীবন ভূঁইয়ার ছেলে ধনপতি—বাপের মৃত্যুর পর মাটি থেকে হঠাৎ উৎখাত হয়ে যেন জলে পড়ল। আর এই জলই—সুন্দরবনের গহন নদী, নোনা গাঙ আর বাদাবন হয়ে উঠল তার জীবন। ঘর গেল ঝড়ে আর জাতি-পাতির ভেদবিচারে ভালোবাসার মানুষ বারুণীবালাও হয়ে গেল পর। সং দিলখোলা পরোপকারী 'মাল-কাঠ-ঝাঁকা' ধনপতি মাঝি হয়ে এক নদী থেকে আরেক নদীতে এক গাঙ থেকে আর এক গাঙে এক ঘাট থেকে আর এক ঘাটে মানুষ পারাপার করে, কখনও শূন্যমনে উদভ্রান্তভাবে জলে-জঙ্গলে বাদাবনে ঘুরে বেড়াতে লাগল। ঘরের চেয়ে পর, বসতের চেয়ে বন তার প্রিয়তর হল। বাঘ-সাপ কুমীর-কামটভরা সুন্দরবনের ভূপ্রকৃতি, বন, নদীনালা, অরণ্যচারী পশু-পক্ষী যেন তার প্রাণের দোসর হয়ে উঠল। দু চোখ ভরে তখনও চাঁদনী রাতের কখনও শ্রাবণধারায় স্নাত সুন্দরবনের রঙফেরা ঘন্টার পর ঘন্টা ধরে দেখে যেন তার আশা মেটে না। পাগল গাঙ আর বাদাবন তার মনের মধ্যে যেন ঝড় তোলে। বুকের মধ্যে যেন সাগরের ডাক শুনতে পায়। একদিন ধনপতি ডিঙি নিয়ে সাগরে উধাও হল কিন্তু আর ফিরে এল না।

প্রকৃতিপ্রেমী জীবনদরদী দুদান্ত অথচ স্নেহময় ধনপতির জীবন-নদীতে কল্লোল তুলেছে বহু জীবনের ধারা। যেন তাকে ঘিরেই আবর্তিত হয়েছে সুন্দরবনের বনজীবন ও জনজীবন। ভাষিতা বারুণীবালা, নির্যাতিতা সেজুতি, গানপাগল নটবর ঘরামী, বন্ধ্যা বধূ ফুলটুসি, যাত্রা-পাগল কেষ্টো নস্কর প্রভৃতি চরিত্রগুলি সুন্দরবনের ভয়ালসুন্দর বিশাল প্রেক্ষাপটে জীবন্ত হয়ে উঠেছে। চরিত্র-চিত্রণে, কাহিনী বুননে-বিন্যাসে ঘটনার টানা-পোড়েনে এবং সর্বোপরি সুন্দরবনের প্রাণময় আলেখ্য অংকনে লেখক গভীর অন্তর্দৃষ্টি, উপলব্ধি, মমতা এবং লিপি-কুশলতার পরিচয় রেখেছেন। দুই কেন্দ্রচরিত্র : বারুণীবালা ও ধনপতি—উভয়ের জন্যে উভয়ের অনুচ্চারিত ভালোবাসা নদীর মতো মনের গভীরে বয়ে কাহিনীকে আরো মানবিক ও চিত্তাকর্ষী করে তুলেছে। এটুকু বুঝতে পারা যায় যে লেখক স্বয়ং সুন্দরবনের প্রকৃতি ও জনজীবনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ এবং আত্মস্থ হতে পেরেছিলেন বলেই প্রায়-অপরিচিত সুন্দরবন ছবির মতো ফুটে উঠে সমগ্র উপন্যাসটিকে প্রাণময় করে তুলতে পেরেছে।

সৌখীন সাহারায় অসংখ্য জোনাকি (কাব্য-গ্রন্থ)—কবি বন্দ্যোপাধ্যায়।। লিটল ম্যাগাজিন ফোরাম, ৫এ, ওল্ড মেয়রস' কোর্ট, কলকাতা-৫। দাম : দু টাকা তিরিশ পয়সা।

কবি বন্দ্যোপাধ্যায় নিভুল ছন্দে একটি কবিতা লিখেছেন। তার কয়েকটি লাইন :

'সকাল বিকেল সন্ধে দুপুর
উড়ুক উড়ুক প্রেমের নূপুরে।
তারায় তারায় জ্বলছে আগুন
জন্ম কি মাস? ধুসর ফাগুনে?

প্রায় প্রতিটি কবিতাতেই তিনি সাবলীল ও সচ্ছন্দ। অনেক কবিতাতেই নতুনত্ব লক্ষ্য করা যায়। লাইন-ভাঙ্গা, আঁকা-বাঁকা হরফের কবিতাও আছে একটি। তরুণ কবিদের কাছে সঙ্কলনটি উপভোগ্য মনে হবে।

সংকলন ও পত্র-পত্রিকা

পদক্ষেপ (শারদীয়া ১৩৭৮)—সম্পাদক সতীকান্ত গুহ।। ১০, হিন্দুস্থান রোড কলকাতা-১৯।। দাম: চার টাকা।

বহুল বিজ্ঞাপিত এই শারদ-সংকলনটি এবারের পুজো সাহিত্যের অন্যতম প্রধান আকর্ষণ। সাহিত্য মহলে চাঞ্চল্য সৃষ্টি করেছে প্রথম প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গেই। ১৯২৭ সালে লেখা জাতীয় অধ্যাপক সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের একটি অপ্রকাশিত প্রবন্ধ ছাপা হয়েছে সংকলনটির গোড়ারদিকে। অন্যান্য প্রবন্ধকারদের মধ্যে আছেন অন্নদাশংকর রায়, বিশু মুখোপাধ্যায়, শচীকান্ত গুহ, সাবিত্রী সেনগুপ্ত, ইন্দুনাথ গুহ, ভবানী মুখোপাধ্যায় ও কমলকুমার মজুমদার। জীবনানন্দ দাশের একটি অপ্রকাশিত কবিতা এবং সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের দীর্ঘ কবিতা সময়ের জালে এ সংখ্যার মূল্য বৃদ্ধি করেছে। উল্লেখযোগ্য কবিদের মধ্যে আছেন বিষ্ণু দে, মণীন্দ্র রায়, কৃষ্ণ ধর, আলোক সরকার, তরুণ সান্যাল, গণেশ বসু, অরুণ মিত্র, নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী, গৌরাঙ্গ ভৌমিক, জগন্নাথ চক্রবর্তী, হিমাদ্রিশেখর বসু, চন্দন সেন, সৌমেন্দু গঙ্গোপাধ্যায়, অমল ভৌমিক ও শুভ মুখোপাধ্যায়। অসাধারণ একটি উপন্যাসের লেখক সতীকান্ত গুহ। নাম চৌধুরী পাসল। ভাব ভাষা ও চরিত্র-চিত্রণে অনবদ্য। গল্পকারদের মধ্যে আছেন প্রেমেন্দ্র মিত্র, দক্ষিণারঞ্জন বসু, অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়, সুভাষ সিংহ, সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ, আশিস সান্যাল, সুধীরঞ্জন মুখোপাধ্যায়, প্রফুল্ল রায়, শওকত ওসমান, বিমল কর, কামাক্ষীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়, জীনা মজুমদার ও প্রতিমা সেনগুপ্ত। সন্তোষকুমার ঘোষের 'স উবাচ', অমিতাভ চৌধুরীর কয়েকটি ছড়া (প্রণেতি, পরী বিচিত্রিত), গৌরকিশোর ঘোষ, জ্যোতিপ্রসাদ বসু ও শিবরাম চক্রবর্তীর রম্যরচনাগুলি বিস্ময়কর। চলচ্চিত্র ও খেলাধূলা প্রসঙ্গে লিখেছেন সেবাব্রত গুপ্ত, ক্ষেত্রনাথ রায় ও মতি নন্দী। পরিচ্ছন্ন ছাপা ঝকঝকে। অঙ্গসজ্জা চমৎকার। দাম সে হিসেবে কমই বলতে হবে।

মৌসুমী—সম্পাদক মনোজ সেনগুপ্ত। ১০।১, রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট, কলকাতা—৯। মূল্য ৫-০০।

অন্যান্য বছরের মত এবারেও মৌসুমীর শারদীয়া সংখ্যা প্রকাশিত হয়েছে। মৌসুমীর সম্পাদকের রুচি ও প্রয়াস নিঃসন্দেহে প্রশংসনীয়। এর প্রধান বিশেষত্ব হল, এর সুনির্বাচিত রচনা সংগ্রহ। বনফুল, নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, আশুতোষ মুখোপাধ্যায়, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, সৈয়দ

মুস্তাফা সিরাজ, হাসান মুরশিদ, কুমার মিত্র ইত্যাদির লেখা মোট বারটি সুলিখিত ছোট বড় উপন্যাস, প্রেমেন্দ্র মিত্র, শিবরাম চক্রবর্তী, সমীর রক্ষিত ইত্যাদির রসোত্তীর্ণ গল্প এবং ভিন্ন রসের কয়েকটি চমকপ্রদ ফিচার ও সিনেমা সংক্রান্ত বিশেষ আলোচনা শারদীয়া সংখ্যাটির রীতিমত গৌরব বলা যায়।

অধুনা সাহিত্য... (ভাদ্র '৭৮)—সম্পাদক : সুধাংকুর মুখোপাধ্যায়। হালিশহর, ২৪ পরগণা। এক টাকা।

আলোচ্য সাহিত্য পত্রিকাটি স্বকালের ভাবনা-জিজ্ঞাসায় সমৃদ্ধ। সাহিত্যে নবচিন্তার এবং লেখনরীতিতে পরীক্ষা-নিরীক্ষার যে ঢল নেমেছে তারই স্বাক্ষর রয়েছে 'বিশেষ গল্প' সংখ্যার গল্পগুলিতে। লিখেছেন : উদয়ন ঘোষ, সমীরণ দাশগুপ্ত, শেখর বসু, জীবন সরকার, ভরত সিংহ, সুবিমল মিশ্র, অমল চন্দ, সুবিমল বসাক, সমীরকান্তি বিশ্বাস, জ্যোৎস্নাময় ঘোষ, সুধাংকুর মুখোপাধ্যায় ও হৃষীকেশ মুখোপাধ্যায়।

প্রাপ্তিস্বীকার

সাহিত্য মেলা (প্রথম সংখ্যা, ভাদ্র '৭৮)—পূর্ণেন্দুপ্রসাদ ভট্টাচার্য। ২৮।১ মান্নাপাড়া রোড, কলকাতা-৫০। ৫০ পয়সা।

বেদুইন (৫ম বর্ষ : ৭ম সংখ্যা, ভাদ্র, '৭৮) —সত্যেন্দ্রনাথ জানা। সুহাসিনী রায়, তমলুক রাজবাটি, তমলুক, মেদিনীপুর

অবেক্ষণ—সম্পাদক : রাধু গোস্বামী। বঙ্কিম পল্লী, সোদপুর, ২৪ পরগণা।

তরুণের অভিযান (জুলাই, ৭১)—সম্পাদক : সুনির্মল চট্টোপাধ্যায়, নারায়ণ দেবনাথ। ১৭ জাস্টিস দ্বারকানাথ রোড, কলকাতা—২০।

প্রচন্দন (বিশেষ সংখ্যা, '৭১)—সম্পাদক : অনুপম মিত্র ও মহাদেব মিত্র। ১৩৩ নলিনী বসু রোড, কাঁচরাপাড়া, ২৪ পরগণা। ৫০ পয়সা।

বুলবুল (আগস্ট, '৭১)—সম্পাদক : এস এম সিরাজুল ইসলাম। ২ ওয়ালিউল্লা লেন, কলকাতা—১৬। ৭৫ পয়সা।

উত্তর দিগন্ত (ত্রৈমাসিক) — সম্পাদক : সন্তোষকুমার চক্রবর্তী, মালদহ কাল চারাল ইউনিট, মালদহ। ৫০ পয়সা

জলার্ক (ত্রৈমাসিক)—সম্পাদক : স্বপন দাসাধিকারী ও সরোজ দাস। ৩৬ শাঁকারীটোলা ... শাক্তিগড়, কলকাতা—৩২। এক টাকা।

নবজাতক ত্রৈমাসিক সাহিত্য পত্রিকায় প্রবন্ধ, গল্প, সাক্ষাৎকার অন্য ভাষার কবিতা, পুস্তক সমালোচনা ইত্যাদির সমাবেশে পূর্ণাঙ্গ রূপ দেওয়া হয়েছে। প্রশংসনীয় প্রচেষ্টা।

একটি প্রাচীন যাদুঘর

সাবিত্রী সেনগুপ্ত

'পুতুলের দেশ ন্যুরেমবার্গ' এ কথাটা জার্মান দেশে খুবই প্রচলিত। এককালে ন্যুরেমবার্গের মৃৎশিল্পীরা তাদের কারুকার্যে দেশবিদেশের লোকদের মুগ্ধ করত। আজ হয়তো সে দিন আর নেই, কিন্তু ঐতিহ্য রয়েছে। জার্মানীর যাদুঘর সেই ঐতিহ্যকে বহন করে বেড়াচ্ছে। ন্যুরেমবার্গেই রয়েছে জার্মানীর সেই যাদুঘর।

ব্যারন হান্স ফন অ্যান্ড জু অফ সেস নামে একজন ব্যক্তি এই মিউজিয়ামটির প্রতিষ্ঠাতা। তিনি ছিলেন উচ্চ আদর্শবাদী অমিত উৎসাহী দেশপ্রেমিক। ১৮৩৩ সালে জার্মানিতে যে বিদ্রোহ হয় তা ছিল খুবই তাৎপর্যপূর্ণ। সে সময় জার্মান দেশের সমস্ত মানুষকে একটি উদার, গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থার অধীনে ঐক্যবদ্ধ করার জন্য যে আন্দোলন শুরু হয়, তার ফলে ফ্রাঙ্কোফুর্টে স্থাপিত হয় আইনসভা। আর সেই বিদ্রোহের ফলে একটি জাতীয় যাদুঘর স্থাপনেরই পরিকল্পনা গৃহীত হয়।

এ পরিকল্পনাটি বাস্তবে রূপায়িত হয় ১৮৫২ সালে। জার্মান ভাষাভাষী সকল জাতির শিল্প নিদর্শন ও সংস্কৃতির নমুনা সংগ্রহ এখানে একত্রিত করা হয়।

অতি প্রাচীনকাল থেকে ঊনবিংশ শতাব্দী পর্যন্ত সময়ের বিভিন্ন নিদর্শন এখানে সংগৃহীত হয়েছে। ব্যারন ভন অফ সেস বিভিন্ন দুর্গ থেকে প্রাচীন শিল্পকলার বিপুল সংগ্রহ ন্যুরেমবার্গে নিয়ে আসেন। সেগুলিই হয়ে দাঁড়ায় মিউজিয়ামের ভিত্তি। ১৮৫৭ সালে একটি পুরানো কার্থেনীয় আশ্রমে এই যাদুঘরটি স্থানান্তরিত করা হয়। আলব্রেখডুরার শহরে চতুর্দশ শতকে এই আশ্রমটি তৈরী হয়েছিল। গথিক পদ্ধতিতে তৈরী এই বাড়ীটির চারদিকে যাদুঘরের জন্যে আরও বাড়ী সংযুক্ত হয়।

প্রাচীন কার্থেনিয়ান আশ্রম ও গীর্জার চতুর্দিকে এ পর্যন্ত এরকম ১২টি বাড়ী তৈরী হয়েছে, এবং এগুলিতে মোট ২০০টি কক্ষ আছে।

১৯৪৪ সালে তিনটি প্রকোষ্ঠ বোমা ও আগুনে ধ্বংস হয়ে যায়। বহু কষ্টে সেখানকার অমূল্য সংগ্রহগুলি উদ্ধার করা সম্ভব হয়। বর্তমানে প্রায় একশোটি কক্ষ পুনরায় শিল্পকলা সামগ্রীতে সুসজ্জিত করে জনগণের জন্য উন্মুক্ত করা হয়েছে।

এই মিউজিয়ামের প্রাগৈতিহাসিক ও ঐতিহাসিক সংগ্রহগুলির সংখ্যা হল দশ হাজার। জার্মান চিত্রকলা ও ভাস্কর্যের ক্রমবিকাশ সম্পর্কে চমৎকার সংগ্রহ রয়েছে এখানে। প্রাচীনকালে যুদ্ধের সময়ে যেসব সাজপোশাক পরা হত এবং যুদ্ধ ও শিকার প্রভৃতিতে যে সব অস্ত্রশস্ত্র ব্যবহার করা হত তার প্রচুরসংখ্যক সংগ্রহ রয়েছে যাদুঘরে। আগেই উল্লেখ করা হয়েছে পুতুল নির্মাতা হিসাবে ন্যুরেমবার্গের একটা আন্তর্জাতিক খ্যাতি রয়েছে। কাজেই পুতুল সংগ্রহাগারটি হয়ে উঠেছে একটি অতুলনীয় সম্পদ।

মুদ্রা সংগ্রহ বিভাগে পঞ্চাশ হাজার মুদ্রা ও পনের হাজার পদক সংগৃহীত হয়েছে। এখানে সংগৃহীত অন্যান্য সম্পদগুলি হল—জার্মান সম্রাটদের নানারকম সীলমোহর, ঐতিহাসিক গুরুত্বপূর্ণ কয়েক হাজার জার্মান দলিল, নানা ব্যক্তির স্বাক্ষর এবং জার্মান সাহিত্যের প্রথম ও প্রাচীন সংস্করণসমূহ। প্রথম যুগের স্প্রিং ঘড়ি বা মার্টিন বেহাইসের বিখ্যাত 'টার্বানিকা' ঘড়ি আজও দর্শকদের মনে কৌতূহল সৃষ্টি করে। আমেরিকা আবিষ্কৃত হওয়ার আগে এই ঘড়ি তৈরী হয়েছিল।

প্রাচীন জার্মানীর সর্বশ্রেষ্ঠ শিল্পীগণের নানা নিদর্শন যাদুঘরটিকে দান করেছে বিরাট ঐতিহাসিক মর্যাদা।

আমাদের কলকাতাতেও একটি যাদুঘর আছে। সেটা ছোট না হলেও তার সম্প্রসারণ সম্ভাবনা যথেষ্টই রয়েছে। সেদিকে দৃষ্টি দিলে এখানেও একটি বড় আকারের যাদুঘর তৈরী করা সম্ভব।

পূর্ণাবতার

প্রমথনাথ বিশী

পঞ্চম খণ্ড

(৮)

জরা বলল, ঠাকুর এখন থেকে আপনাকে প্রভু বলে সম্বোধন করবো।

বেশ বাবা, তাই করো—ওটাই যে আমার নাম।

বুঝতে পারে না জরা।

আমার নাম প্রভুদয়াল, লোকে প্রভু বলে ডাকে, কেউ কেউ আবার বলে প্রভুজী।

তবে আমিও তাই বলবো।

তারপর বলে, প্রভু এই কি আপনার কুটীর?

কুটীর বলবে কেন, বলো প্রাসাদ। প্রাসাদ তো ইট-পাথর দিয়ে তৈরি হয় না, তৈরি হয় মনের সন্তোষ দিয়ে। আমি যদি এখানে সন্তুষ্ট হয়ে বাস করি তবে এই আমার প্রাসাদ। তাছাড়া যেখানে বাসুদেবের পায়ের ধুলো পড়েছে তার চেয়ে উত্তম প্রাসাদ আর কোথায়?

বাসুদেবের পায়ের ধুলো। প্রভু, আপনি কি তাকে দেখেছেন?

প্রভুদয়াল হেসে উত্তর দেয়, দেখব না, এখানেই যে তিনি বাস করতেন।

এই সমুদ্রে—বিস্ময় প্রকাশ করে জরা।

সমুদ্রে বললে অন্যায় হয় না, শোন নি যে সমুদ্রে ছিল নারায়ণের অনন্তশয্যা। কিন্তু সে কথা ছেড়ে দিলেও এখানেই যে ছিল তাঁর রাজধানী।

ছিল যদি তবে এখন কোথায়—এ যে অতল সমুদ্র!

যজ্ঞ শেষ হয়ে গেলে যজ্ঞস্থল জল দিয়ে প্লাবিত করে দিতে হয়। যে-কর্মযজ্ঞের জন্য তিনি আবির্ভূত হয়েছিলেন তা শেষ হয়ে যেতেই সমস্ত প্লাবিত করে দিয়ে লীলা-সম্বরণ করেছেন তিনি।

তবে তো এখানে আসা আমার সম্পূর্ণ নিষ্ফল হয়েছে!

সম্পূর্ণ সফল হয়েছে বাবা, তাঁর আদিশয্যায় তাঁকে দেখতে পেলে।

ব্যাকুলভাবে জরা বলে, কই দেখতে পেলাম প্রভুজী।

আর সকলকে চোখে দেখতে হয়, পূর্ণাবতারকে দেখবার ইচ্ছাতেই তাঁকে দেখা হয়। তাঁকে দর্শনের এমন ব্যগ্র ব্যাকুলতা তো আর কারো মধ্যে দেখিনি বাবা।

প্রভু, পূর্ণাবতার কি বুঝিয়ে দিলেন না তো, সেদিন কথা তুলতেই চাপা পড়ে গিয়েছিল।

এখন আবার চাপা পড়ুক, যথাসময়ে হবে, আগে তোমার আহারাদির ব্যবস্থা করে দি।

এই বলে তিনি ডাকলেন, ওগো কাশ্যপের মা, এদিকে এসো, তোমার আর একটি ছেলে এসেছে।

ডাক শুনে কুটীর থেকে একজন বয়সে প্রৌঢ়া, ভাবে তরুণ নারী বের হয়ে এলো—কই বাবা।

প্রভুদয়াল বলল—এই যে।

জরাকে দেখে প্রভুদয়ালের পত্নী বলে উঠল এ ছেলেটি যে আমার রীতিমত সন্ন্যাসী।

না মা, আমি মহাপাপিষ্ঠ নরাধম বলে এগিয়ে গিয়ে তার পায়ের ধুলো নিল।

সন্ন্যাসী পায়ে হাত দিল—না জানি কত পাপ হল আমার।

মা তোমাকে আর বাবাকে দেখে মনে হয় পাপের এখানে প্রবেশের পথ নেই।

কেবল পাপীর আছে কি বলো বাবা—এই বলে প্রাণখোলা হাসি হেসে ওঠে প্রভুজী।

প্রাণখুলে যে হাসতে পারে পাপ তার মনে জমতে পারে না। স্রোতের মুখে কি আবর্জনা জমে।

নাও এখন তোমার সন্ন্যাসী ছেলের আহারের ব্যবস্থা করে দাও।

এসো বাবা আমার সঙ্গে।

এই সময় গোটা দুই নৌড়কুত্তা, তার মধ্যে আবার একটা খোঁড়া, আর গোটা দুই ছাগল এসে উপস্থিত হয়। একটা ছাগল তার আঁচল ধরে টানে।

কাশ্যপের মা তার উদ্দেশ্যে বলে—বুঝেছি, বুঝেছি খিদে পেয়েছে, একটু সবুর কর বাবা খেতে দিচ্ছি।

তারপরে জরাকে বলে, এরাই আমার ছেলেমেয়ে। আরও একজন আছে জগন্নাথ-বুড়ো, সে আমাদের ভরণপোষণ করে।

কুটীরে প্রবেশ করে দেখে সেখানে তৈজসপত্র, খাট তক্তপোষ বলতে কিছু নেই। মনে পড়ে তার কুটীরের কথা, যে কুটীর সেই কালরাত্রিতে পুড়ে গিয়েছিল তারপর ভেসে গিয়েছে, এ কুটীর তার চেয়েও নিঃস্ব। অথচ কুটীরবাসীদের মনে শান্তি ও সন্তোষের অভাব নাই।

আহার শেষ হলে প্রভুদয়াল জরাকে নিয়ে সমুদ্রের তীরে গিয়ে একখানি পাথরের উপরে বসে। জরা বলে—প্রভুজী, এবারে আমার উপর দয়া করুন, পূর্ণাবতারতত্ত্ব বুঝিয়ে দেন আমাকে।

প্রভুদয়াল বলে—দেখো বাবা, ঐ যে পাহাড়ের কোলে একখণ্ড জমি দেখা যাচ্ছে—যেখানে একটা লোক লাঙল দিয়ে জমি চষছে।

জরা বলে হাঁ দেখতে পাচ্ছি।

ঐ হচ্ছে পূর্ণাবতারের প্রথম কলা। শুক্লা দ্বিতীয়ার চাঁদ যেমন কলায় কলায় পূর্ণতর হতে হতে পরিপূর্ণ রাকায় পরিণত হয়, ঐ দেখো আকাশের প্রান্তে পূর্ণচন্দ্র, তেমনি মানুষের কলায় কলায় পূর্ণতর হতে হতে পূর্ণাবতার পরিপূর্ণতা লাভ করেন। তবে প্রভেদের মধ্য চাঁদের ষোল কলা, পূর্ণাবতারের অনন্ত কলা, যত মানুষ তত কলা। বাবা, তুমি আমি সকলেই পূর্ণাবতারের খণ্ডকলা।

প্রভু, আমার মতো কলঙ্কীও কি সেই পূর্ণাবতারচন্দ্রের অংশ?

কেন নয় বাবা, চাঁদে কি কলঙ্ক নেই?

প্রভু, তাহলে রাবণ, কংস, হিরণ্যকশিপু ভগবদ্‌বিদ্বেষী প্রভৃতিও—এরা কি?

পূর্ণচন্দ্রকে মাঝে মাঝে রাহুতে আচ্ছন্ন করে নাকি? এরা সেই রাহু।

এদের সৃষ্টি কেন?

এদের ক্ষণিকত্ব প্রদর্শনের জন্যই। দেখো বাবা, অনুগত ভক্তের কলঙ্ককে আদরে তিনি বক্ষে ধারণ করেন, আর অভক্তের নশ্বরতা জ্ঞাপন করেন চন্দ্রগ্রহণের দৃষ্টান্তচ্ছলে।

প্রভু, ক্ষমা করবেন আমি স্বল্পবুদ্ধি। মানুষ তো অনন্তকাল ধরে জন্মগ্রহণ করতে থাকবে তবে অখণ্ড কলা সমন্বয়ে পূর্ণাবতারচন্দ্র পূর্ণতা লাভ করবেন কবে? কবে হবে সেই পূর্ণাবতারের পূর্ণিমা?

বাবা, এ বড় কঠিন প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করলে।

আপনার কাছেও কঠিন?

আমার কাছেও—তবু বলবার চেষ্টা করে দেখি পারি কিনা? এই যে সমগ্র মনুষ্যসমাজ, মৃত, জাত ও অজাত নিজেদের অগোচরে সেই পূর্ণতার দিকে চলেছে, এই পূর্ণতার অভিমুখিনতাই পূর্ণতা। তুমি আমি কে যে সেই পূর্ণিমা প্রত্যক্ষ করবার স্পর্ধা রাখি?

তবে পূর্ণাবতারের মধ্যে ভগবানের স্থান কোথায়?

তোমার আমার মধ্যে ভগবানের স্থান কোথায়?

কোথায়—প্রতিধ্বনি করে জরা।

হৃদয়ে হোক বা বুদ্ধিতে হোক বা রক্তরন্ধ্রে হোক অবশ্যই তিনি আছেন। সেই সমুদয় 'আছের' সমষ্টিগতরূপে তিনিও আছেন, মানুষ যেদিন পূর্ণ হবে তিনিও হবেন পূর্ণ।

প্রভু, শুনেছি তিনি তো নিত্যপূর্ণ।

ভুল শোননি বাবা, তিনি নিত্যপূর্ণ, তবে কেন এই অপূর্ণতার ভান।

এতক্ষণে ঠিক শব্দটি উচ্চারণ করেছ—ভানই বটে। তোমার জিজ্ঞাসা যিনি নিত্যপূর্ণ তার অপূর্ণতার ভান কেন? আচ্ছা বলতো, বাসুদেব হস্তিনায় গিয়ে রাজা মহারাজার আতিথ্য গ্রহণ না করে বিদুরের খুদকুঁড়ো ভোজন করলেন কেন?

কেন?

তিনি যে ভক্তের অনুগত, ভক্তকে উৎসাহিত করতে চান, বললেন—দেখো আমি তোমার মতোই সামান্য ব্যক্তি। তিনি জানেন তার ঐশ্বর্যময় রূপ সহ্য করবার শক্তি মানুষের নেই। অর্জুনের মতো বীর যোগী পুরুষও সে রূপ সহ্য করতে পারেনি। ভীত হয়ে অনুরোধ করেছিল—প্রভু, তোমার বিশ্বরূপ সম্বরণ করে বন্ধুরূপ আমাকে দেখাও। এ সেই বিদুরের খুদকুঁড়োর প্রার্থনা। শোন বাবা, তিনি অপূর্ণতার ভান করে মানুষকে উৎসাহিত করে আহ্বান করছেন পূর্ণতার পথে। শিশু চলতে গিয়ে পড়ে পড়ে যাচ্ছে তাকে উৎসাহিত করে বাপও মাঝে মাঝে ইচ্ছা করে পড়ে যাচ্ছে—যাতে শিশু নিরুৎসাহিত না হয়। নিজেকে পূর্ণতার অভিমুখী করে রাখাই পূর্ণতা, যার শাস্ত্রীয় নাম পূর্ণাবতার। নিরুৎসাহ হলেই সব পণ্ড হয়ে গেল—নিরন্তর চলা চাই, থামলে চলবে না। আরও শোনো, সত্যযুগে চার পোয়া গতি, ত্রেতায় তিন পোয়া, দ্বাপরে দুই পোয়া, আর কলিযুগে এক পোয়া। পাছে মানুষ গতির মন্থরতা দেখে হতাশ হয়ে থেমে যায় তাই ভগবান বাসুদেব দ্বাপর আর কলির সন্ধি-সঙ্কটে জন্মগ্রহণ করে মানুষের সম্মুখে পূর্ণাবতারের দৃষ্টান্ত দেখিয়ে গিয়েছেন। পূর্ববর্তী যুগসমূহে যেসব অবতার জন্মগ্রহণ করেছেন তাদের পূর্ণাবতার হওয়ার প্রয়োজন ছিল না, গতি তখন প্রবল ছিল, মানুষও ছিল চলিষ্ণু। কলিতে পাছে তার ব্যত্যয় ঘটে তাই কলির প্রারম্ভে তাঁর পূর্ণাবতার জন্মদৃষ্টান্ত। চলা চাই বাবা চলা, কখনো কোন বাধায় কোন বিপত্তিতে থামলে চলবে না। তবে শুধু দেহটা চলালেই যথেষ্ট নয়, সঙ্গে সঙ্গে মন বুদ্ধি হৃদয় সমস্ত দিয়া চলা চাই, তাতেই পাপের ক্ষয় তাতেই পূর্ণত্বের উপলব্ধি।

প্রভুদয়াল থামেন, ইচ্ছা করেই থামেন যাতে জরা সমস্ত বিষয়টা হৃদয়ঙ্গম করতে পারে। তারপরে আবার, আবার আরম্ভ করেন, বাবা, তুমি কি পাপ করেছ জানি না, জানতেও চাই না, তবে এ জানি তুমি যত চলেছ, চলবার পথে বাধা-বিপত্তির ঐরাবত ঠেলে চলেছ, সঙ্গে সঙ্গে চলেছে তোমার মন বুদ্ধি হৃদয় তাতে তুমি তো সামান্য পাপী, পাপিষ্ঠের অধম জল্লাদদেরও মুক্তিলাভ ঘটে যেতো।

বিস্মিত হয়ে জরা শুধায়, কি বলছেন প্রভু! সে লোকটা যে বাসুদেবকে হত্যা করেছিল।

চলার বেগে এতদিনে সে পাপ ধুয়েমুছে গিয়েছে যদি সে সত্যই তোমার মতো আর্তি নিয়ে নিরন্তর চলতে থাকে।

সত্যি বলছেন প্রভু?

সত্যই বলছি।

এখন জরা আর্তচীৎকারে কেঁদে উঠে তার পা জড়িয়ে ধরে মাথা কুটতে কুটতে বলে, প্রভু, আমি সেই নরাধম, পাপিষ্ঠের অধম জরা।

প্রভুদয়াল তাকে বুকে জড়িয়ে ধরে বলেন, বাবা তুমি তো মুক্তপুরুষ, চলার গঙ্গাস্রোতে কবে তোমার পাপ-তাপ ধুয়েমুছে গিয়েছে। পূর্ণাবতারের পথে তুমি আমার চেয়ে একধাপ এগিয়ে আছ।

জরা প্রবোধ মানে না, কেবলই মাথা কুটতে থাকে তার পায়ে।

অনেকক্ষণ পরে জরা বলে—বাবা, আমি যদি মুক্তি পেয়ে থাকি তবে মনে এত তাপ কেন?

স্পর্শমণির স্পর্শে তোমার লোহার মাদুলি যে সোনা হয়ে গিয়েছে তা দেখবার অবসর হয়নি বলে।

তারপর বললেন, চলো বাবা, তোমাকে মুক্তিস্নান করিয়ে আনি। যে ভূখণ্ডে যে মহানিম বৃক্ষতলে তিনি লীলা সম্বরণ করেছিলেন সেই ভূখণ্ড, সেই বৃক্ষটি আজও অক্ষয় হয়ে আছে—হয়তো বা তুমি ফিরে আসবে প্রতীক্ষাতেই। এসো আমার সঙ্গে।

মন্ত্রচালিতবৎ প্রভুদয়ালের পিছু পিছু চলতে থাকে জরা।

৯

সমুদ্রপ্লাবনে যদু-রাজধানী সর্বাংশে ডুবে গেল কেবল জেগে রইলো দুটি উচ্চ ভূখণ্ড, প্রভুদয়ালের বাসস্থান আর যেখানে বাসুদেব নিহত হয়েছিলেন। জরতী বাস

করতো প্রভুদয়ালের কুটীরে, মাঝে মাঝে যে বৃক্ষ-তলে শয়ান অবস্থায় বাসুদেব দেহত্যাগ করেছিলেন সেখানে গিয়ে প্রণাম করে আসতো। একদিন তার মনে হল এখানেই একখানা কুটীর তুলে বাস করি না কেন। মনোবাসনা জানালো প্রভুদয়ালকে। প্রভুদয়াল ও কাশ্যপের মা প্রথমে আপত্তি করলেন, শেষে তার মনের অবস্থা অনুমান করে অনুমতি দিলেন, তাঁরাই কুটীর তুলে দিলেন, গ্রাসাচ্ছাদনও জোগাতেন তাঁরাই, এই জল মরুতে জরতী আর কোথায় কী পাবে।

জরতী দিবারাত্র ঐ গাছতলায় পড়ে থেকে স্বামীর পাপস্খালন আশায় বাসুদেবের কাছে প্রার্থনা করতো, তার বিশ্বাস হয়েছিল যে জরা জীবিত আছে, প্রভুজীর আশ্বাসবাক্য তার একটি প্রধান কারণ। কালক্রমে মাটি দিয়ে বাসুদেবের একটি মূর্তি গড়লো সে, জলে ঝড়ে নষ্ট না হয় তার উপরে একটা ছাউনি তুললো। আর কাজের মধ্যে একটিমাত্র বাসুদেবের পুজো ও আরাধনা। মাঝে মাঝে প্রভুদয়াল ও তাঁর স্ত্রী আসতেন, যোগ দিতেন তার সঙ্গে পুজোয়। প্রভুজী বলতেন—বাছা, জরা যতই পাপীষ্ঠ হোক তুমি তার হয়ে প্রায়শ্চিত্ত করছ, সে কি মুক্তিলাভ না করে পারে।

জরতী শুধালো---বাবা, তার কি আর দেখা পাবো না।

প্রভুজী বলতো, সে কোথায় আছে জানি না তবে আমার কেমন বিশ্বাস শেষ-

পর্যন্ত ঘুরে আসবেই এখানে। নিমজ্জমান ব্যক্তি অকিঞ্চিৎকর কাষ্ঠখণ্ড ধরে—আর প্রভুদয়ালের আশ্বাস তো নৌকা, জরতী আশ্বস্ত হতো, কালক্রমে সে আশ্বাস প্রত্যয়ে পরিণত হল। এমনভাবে দশ বৎসর অতিক্রান্ত হল।

জরতীর আরাধনায় জরা পাপমুক্ত হল কিনা জানি না, তবে তার দেহে মনে বিপুল পরিবর্তন ঘটলো। প্রৌঢ়া জরতীর এখন দেবীমূর্তি, দেবকান্তি, একটা স্নিগ্ধ আভা, একটা পবিত্রতা সারা দেহ থেকে বিচ্ছুরিত হতো। এ যেন একালের তপস্যারতা উমা। তার সৌন্দর্যের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করলেই চোখ আপনি নত হয়ে পড়ে। আর মনের পরিবর্তন। সে তো এত সহজে বুঝবার নয়, তবু বুঝতে বিলম্ব হয় না, কারণ দেহের সৌন্দর্য মনের সৌন্দর্যেরই প্রতি-ফলন। মন যার সুন্দর তার দেহ অসুন্দর হতে পারে না, মন যার পবিত্র দেহ তার অপবিত্র হওয়ার উপায় কি? পুষ্প ভিতরে বাইরে সুন্দর বলেই দেবতার অর্ঘ্য!

তখন পূর্ণ-চাঁদের পরিপূর্ণ জ্যোৎস্নায় আকাশ টলমল করছে, সমুদ্রও। প্রভুদয়াল ও জরা চলেছে বাসুদেবের আশ্রমে। জরতী ঐ স্থানটাকে বাসুদেবের আশ্রম বলতো।

জরা শুধাচ্ছিল, প্রভু আপনি এইমাত্র বললেন যে কলিযুগে এক পোয়া গতি, তিন পোয়া স্থিতি, আরও বললেন যে ধর্ম ও পুণ্য এই গতিরই প্রতিক্রিয়া। কিন্তু সারা দেশে আজ যে সার্বজনীন অরাজকতা চলছে তা দেখে মনে হয় না যে ধর্মের এক পোয়াও অবশিষ্ট আছে।

প্রভুজী বললেন—দেখো বাবা, ধর্ম ও পুণ্য এখনো আছে তবে ঐ এক পোয়ার অধিক নয় কারণ কলিতে এখন গতি এক পোয়া। এই যে অরাজকতা, মারামারি হানা-হানি সমস্তই সে একপাদ গতি। এ থেকেই প্রমাণ হয় যে, লোকে এখনো চলিষ্ণু আছে, তবে যদি তারা ভুলপথ অবলম্বন করে, কিম্বা সংকীর্ণ পথে সবাই মিলে চলতে সুরু করে তবে ঠেলাঠেলি গুঁতোগুঁতি না হয়ে যায় না। তাকেই তো বলি অরা-জকতা হানাহানি।

জরা অবাক হয়ে শোনে, ভাবে কি আশ্চর্য এই নিদারুণ অব্যবস্থার মধ্যেই ঠাকুর আশার আলো দেখতে পান, ভাবে সাধুপুরুষের চোখের গড়নই আলাদা। শুধোয় কখন কিভাবে এর অবসান হবে।

অবসান। চক্রাবর্তন পূর্ণ হলে তবে অবসান।

জরা বুঝতে পারে না চক্রাবর্তন বলতে কি বোঝায়।

প্রভুদয়াল বলেন, কলির শেষে একটা সময় আসবে যখন এই এক পোয়া গতিও লোপ পাবে, তখন চরাচর আর সেই সঙ্গে মনুষ্যসমাজ স্থবিরত্ব লাভ করবে গতিশূন্য হবে তখন—

জরা প্রতিধ্বনি করে তখন—

তখন বাসুকি মাথা নাড়া দেবেন, প্রচলিত ব্যবস্থা সমস্ত ওলটপালট হয়ে যাবে, বিধাতা ঢেলে সাজাবেন আপন সৃষ্টিকে। একেই আমাদের শাস্ত্রে বলেছে মন্বন্তর, কল্পান্ত, মহাপ্রলয়, রাজনীতিক-গণ বলে মহাবিপ্লব। তখনই পূর্ণ হবে চক্রাবর্তন, আবার আরম্ভ হবে সত্য যুগের যার চার পোয়া গতি। কেন এমন হয়? নবনীত তুলতে গেলে দধিকে মন্থন করা আবশ্যক। যে দীর্ঘিকা এক সময়ে অমৃত জলের আধার ছিল কালক্রমে তা পঙ্ককুণ্ডে পরিণত হয়—তখন আসে পঙ্কোদ্ধারের পালা, নাড়া খেয়ে ভেসে ওঠে কত যুগের আবর্জনা। বিধাতা মাঝে মাঝে বিশ্ব-সরোবরে পঙ্কোদ্ধার করেন। এই যে এসে পড়েছি—ঐ দেখো বৃক্ষতলে কুটীরের মধ্যে বাসুদেবের মূর্তি।

জরা এক মুহূর্ত সেই মূর্তি নিরীক্ষণ করে বলল—প্রভু, তাঁর কৌস্তুভমণিহারটি নানা হাত ঘুরে আমার কাছে এসে পৌঁছেছে এটিকেই হরণ করবার উদ্দেশ্যে চটিতে আমাদের উপর আক্রমণ হয়েছিল, এবার যার জিনিস তাকে সমর্পণ করবো। কিন্তু ঠাকুর, একি এখানে মনে হচ্ছে, প্রত্যহ পূজার্চনা হয়—কে করে?

প্রভুদয়াল ভাবলো প্রথমেই জরতীর নাম বলা উচিত হবে না, তাই বলল—এক-জন ভক্ত আছে।

ঠিক সেই সময়ে জরতী অদূরস্থ পল্বলে পানীয় জল আনতে গিয়েছিল—তাই তারা পরস্পরকে দেখতে পেলো না। জরা যখন মণিহার নিয়ে অগ্রসর হতে যাচ্ছে সেই সময় জল নিয়ে ফিরে এলো জরতী।

প্রভুদয়াল বলল—এই সেই ভক্ত।

জরা চিনতে পারলো না, কেমন করে পারবে, একদিন স্বহস্তে যাকে হত্যা করেছে তার অস্তিত্ব অকল্পনীয়। কিন্তু দশ বৎসরের পরিবর্তন সত্ত্বেও এক পলকেই জরতী চিনলো তাকে, ব্যাকুলভাবে বলে উঠলো—জরা, তুমি এসেছ, তুমি এসেছ, আমি জানতাম তুমি ফিরে আসবেই, কালকে শেষ রাত্রে বাসুদেব স্বপ্নে দেখা দিয়ে বলে দিলেন।

আর গোপনীয়তা রক্ষার প্রয়োজন ছিল না, প্রভুদয়াল বলল—জরা, এই হচ্ছে জরতী, সে মরেনি, বাসুদেবের কৃপায় সে বেঁচে উঠেছিল।

কিন্তু এই ব্যাপারে, সেই বাসুদেব মূর্তি সেই জরতী, সেই স্থান, সেই কাল, সেই পূর্ণিমার চন্দ্র সবশুদ্ধ মিলে এক অভাবিত পরিবর্তন ঘটালো জরার জীবনে। জরতীর সম্বোধনের উত্তর না দিয়ে সে চীৎকার করে উঠল একি, একি, চাঁদে গেরণ লাগলো কেন, চারদিক যে অন্ধকার হয়ে এলো, আকাশে এত অসংখ্য উল্কাপাত কেন, একি পায়ের তলায় পৃথিবী কেন কাঁপছে, ঐ যে তাড়া করে আসছে সমুদ্র! রক্ষা করো, বাসুদেব রক্ষা করো।

জরতী বলে উঠল—ঠাকুর, একি!

প্রভুদয়ালও বুঝতে পারলো না হঠাৎ কেন এই পরিবর্তন।

একি জরা ও কোথায় চললে? ওদিকে যেয়ো না, যেয়ো না, ওখানে অতল সমুদ্র—চেঁচিয়ে বলে জরতী।

রক্ষা করো! বাসুদেব, রক্ষা করো! চীৎকার করতে করতে জরা ছুটেছে সমুদ্রের দিকে।

ঠাকুর, ধরো, ধরো, বলে পিছু পিছু ছুটলো জরতী ও প্রভুদয়াল, কিন্তু তারা কাছে পৌঁছবার আগেই ব্যাকুল বাসুদেব ধ্বনি উচ্চারণ করে জোয়ারের উন্মত্ত জলের মধ্যে ঝাঁপ দিয়ে পড়লো জরা।

জরতী লুটিয়ে পড়ে শুধালো —প্রভু একি হল?

প্রভুদয়াল বললেন— দুঃখ করো না মা, মুক্তপুরুষের জীবন-মৃত্যু সমান, জরা মুক্ত-পুরুষ।

শরাহত মৃগীর মতো ছটফট করতে করতে জরতী বলল, সে কি বলা না কান্না, প্রভু, আমার মুক্তপুরুষে প্রয়োজন নেই, আমি পাপী-তাপী নরাধম জরাকে চাই, মুক্তপুরুষ নিয়ে আমি কি করবো।

প্রভুদয়াল সান্ত্বনা দিয়ে বলল—[illegible] দশ বৎসরের সাধনার এই কি পরিণাম!

প্রভু, আমি কি বাসুদেবের সাধনা করেছি? মনে মনে তাই ভেবেছি বটে, কিন্তু তখন কে জানতো কখন অগোচরে বাসু-দেবের স্থানে বসিয়েছি জরাকে। আমি যে তাঁর কাছে পাপ থেকে মুক্তি চাই নি, চেয়েছি পাপপঙ্কে নিমগ্ন জরাকে। প্রভু প্রভু, এতকাল নিজেকে নিজে ঠকিয়েছি আজ বুঝি তার দণ্ড দিলেন বাসুদেব পেয়েও রাখতে পারলাম না, হাতে পেয়েও হারালাম। এখন আমার জীবনের আর কোনো আশ্রয় থাকলো। এখন আমি কি নিয়ে বাঁচবো।

চলো আবার সাধনায় বসি।

ক্ষিপ্তভাবে জরতী বলল, জিজ্ঞাসা ও উত্তরের মাঝামাঝি স্বরে, কিসের সাধনা, কেন আর সাধনা!

প্রভুদয়াল বলল—পাপ থেকে মুক্তির আমরা সকলেই জরা, প্রত্যেকেই আমরা আদর্শঘাতী।

সেকথা বুঝি কানেও প্রবেশ করলো না জরতীর, মণিহারা ফণিনীর মতো লুটিয়ে লুটিয়ে গড়িয়ে গড়িয়ে ছটফট করে মাথা নাড়তে লাগলো। হয় প্রভুদয়ালের কথা তার কানে ঢোকে নি, নয় মনে ধরে নি, হয়তো দু-ই।

(সমাপ্ত)

দ্বিতীয় সত্তা

—আশা দেবী

আজ রাতে সে বাড়ী ছেড়ে চলে যাবে।

বাড়ীর সবাই নিশ্চয়ই ঠাট্টা করবে, বলবে বৌটার মনে মনে এই ছিল। দেখে তো একটুও বোঝা যায়নি।

ভাবতে অনুপমার কান লাল হয়ে যায়। মুক্তোর মত ঘামের বিন্দু জমে ওঠে কপালে। মাথা নিচু করে অনেকক্ষণ ভেবে নেয় যেন কী। তারপর আপনাকেই আপনি বলে—পুরুষরা হাজার দোষ করুক কিছু এসে যায়না, আর আমার? যাই ভাবি মনে মনে, কাজে কিন্তু কিছুই করা যায় না। বুক কাঁপে, কেমন ভয় ভয় করে।

মনে হয় ঘর থেকে যেন সে চলেই যাবে কিন্তু খোকার কি হবে? এখন না হয় মাত্র সাত মাসের ছেলে কিছুই বোঝে না। কিন্তু আরো পরে ও বড় হবে। স্কুলে যাবে—। তখন যখন বন্ধুরা জিজ্ঞেস করবে : তোর মা বুঝি বাড়ী থেকে পালিয়ে গেছেন? অনুপমা ভাবে, নাঃ— পারা যাবে না। যত ভাবে তত ভয় পায়, কান লাল হয়ে ওঠে, কপালে মুক্তোর মত ঘামের বিন্দু জমে। কিন্তু স্বামী যে যা খুশী তাই করে বেড়াবে তাতে বুঝি কিছু না—যত দোষ তার বেলাতেই।

না! ওদের বেলায় কিছু না। ও যে পুরুষ মানুষ। শাশুড়ীর কথা মনে পড়ে। ছোটখাট মানুষটি কপালে মস্ত করে সিঁদুরের টিপ পরেন—হাতীর দাঁতের মত গায়ের রং। ভাবলেই যেন কেমন গা-টা ছম-ছম করে ওঠে, ভয় হয়। জোনাকি-ঝিল-মিল এই অন্ধকার রাতের কুয়ো থেকে কলসীতে জল ভরতে ভরতে অনুপমার গা ছমছম করে, শাশুড়ীর কথা মনে করে।

শাশুড়ীই সবার অমতে অনুপমার সঙ্গে রঞ্জনের বিয়ে দিয়েছিলেন। বলে-ছিলেন : না, মেয়েটি খুব লক্ষ্মীমন্ত—ওর মুখে-চোখে একটা বেশ ব্যক্তিত্বের ছাপ আছে। বারমুখো ছেলেকে ও ঘরে ফেরাতে পারবে—এ আমার বিশ্বাস।

বাড়ীতে একটা চাপা গুঞ্জন ওঠে। দিদি শাশুড়ী বলেন : তুই কি ছেলের জীবন নিয়ে ছেলেখেলা শুরু করলি! রঞ্জনের যখন পছন্দ নয় তখন কি দরকার!

: তুমি দেখো—, এখন পছন্দ নয়, পরে পছন্দ না হয়ে যাবে না। তাছাড়া পছন্দ-অপছন্দের ও বোঝে কি?—আমি ওর মা : আমি বুঝি না কিসে ওর ভালো হবে? আমার একটাই ছেলে, ও সুখী হোক এটা কি আমি চাইবো না?

ঃ তা ঠিক তবু আজকালকার দিন। ওর অমতে এমন করে—জোর করে শাশুড়ী রেগে ওঠেন ঃ অমত আছে এ কথা তো ও একবারও বলেনি—। বরং মৌনতা-কেই সম্মতির লক্ষণ ধরে নিয়েছি।

ঃ মত আছে তাও তো বলেনি!—

ঃ তা অবশ্য বলেনি।—শাশুড়ী মাথা চুলকোতে থাকেন।

তারপর অনুপমার বিয়ের পর থেকে আরো যেন বাড়াবাড়ি শুরু করলো রঞ্জন। বাড়ীতেই আসতো না সে। আর যদি আসতো দুপুরে শুয়ে শুয়ে নভেল পড়তো। সন্ধ্যায় গিলে করা পাঞ্জাবীতে সেন্ট দিয়ে বেরিয়ে যেত, কখনও ফিরতো এগারটায়, কখনও বারোটায়, বাড়ীতে একটা চাপা অশান্তি ছিল তা নিয়ে।

বাড়ীতে ফিরলে শাশুড়ীর সংগে রাতে দেরীতে ফেরা নিয়ে ঝগড়া বাধতো। মা বলতেন ঃ আমায় কাশী দিয়ে আর রঞ্জন, আমি আর এখানে থাকবো না।

ঃ যাবার সময় তোমার আদরের বৌকেও সংগে নিয়ে যেও।

ঃ বেশ তাই হবে। শাশুড়ী বলতেন। আমি যখন ওর বিয়ে দিয়েছি। ওর সব দায়িত্বই আমার। হীরে ফেলে কাচের পেছনে ছুটছিস—কিন্তু তুই।

ছেলে যেন কেমন মুখ বাঁকা করে হাসতো ঃ হীরে? ফুঃ—যত সব বাজে কথা তোমার।

কিন্তু শাশুড়ীকে ভারি ভালো লাগতো অনুপমার। বৃষ্টি নামার আগে যে ভিজে হাওয়া শরীর ও মনকে জুড়িয়ে দেয়, ঠিক তেমনি একটা স্নিগ্ধতা যেন তাঁকে ঘিরে থাকতো। মা ভোরবেলায় ভারি মিষ্টি গলায় সুর ধরতেন "ভোর ভ'য়ি শচীমাতা বোলায়ে উঠ নন্দলালরে"—কথাগুলো সব কানে যেত না অনুপমার তবু গলার স্বরে আকাশটা যেন ভরে উঠতো—; তাঁর গলায় যেন ভোরের পাখির কাকলী। টিপটিপে ভোরের ভিজে ভিজে হাওয়ায় বয়ে আনতো সে গান। মিশে যেত ভিজে পাতার মর্মরের সংগে। মনটা যেন ভরে উঠতো তার। সারা রাত খালি ঘরে একা থাকার শূন্যতা যেন পূর্ণ বোধ হতো মুহূর্তের মধ্যে অনুপমার।

কিন্তু ছেলের এই উচ্ছৃংখলতা মার মনে আঘাত করেছিল। তিনি অর্ধোদয়যোগে স্নান করার উপলক্ষ্যে কাশী রওনা হলেন, আর ফিরলেন না। যারা তাঁকে নিয়ে গিয়েছিল তাঁরা বললেন স্নানের সময় ওঁকে দেখেছে তারপর আর—

অনেক খুঁজেছে ওরা। কাগজে বিজ্ঞাপন দিয়েছে। কিন্তু কোন খবরই পায়নি।

অনুপমার যখন মনে হতো চলে যাব—ঠিক তখনই যেন দূরে থেকে শিমুল বন পেরিয়ে,—মাঠ পেরিয়ে—নদীর বুকে কাঁপিয়ে একটা তীব্র ঝড়ো হাওয়ার ঝলক হা—হা করে বয়ে আসছে যেন, আর ঠিক মার মত মিষ্টি গলায় কান্নায় ভেংগে পড়ছে সে স্বর ঃ না—না। যেও না, বংশের মর্যাদা—খোকার মর্যাদা। চমকে উঠতো সে। বুকটা কেঁপে উঠতো তার। ঠিক! স্বামী যা করে অনুপমার তা করা শোভা পায় না। অন্তত খোকার মুখ চেয়ে তাকে সব সহ্য করে থাকতে হবে—। আর বাইরে একবার গেলে তার ফেরার পথ বন্ধ। তখন খোকাকে কে দেখবে? সে কার মুখের দিকে চাইবে?

বাড়ীর সামনে একটা মজা নদী ছিল তাদের। অনেকখানি বালি মাঝখান দিয়ে কটা তিরতিরে জলের ধারা। ওপারে বন—এপারেও ডানদিকে বুনো কুলের ঝোপ, পিচ, পলাশ, বিলিতি পাকুড় নোনা আর জিনো গাছ ঘেঁষাঘেঁষি করে দূরে-দূরান্তরে এগিয়ে গেছে। দিনের বেলা জায়গাটাকে বেশ ভালোই লাগে কিন্তু সন্ধ্যা হতে না হতেই নানা রকম ছায়া নামে। অচেনা পাখির তীব্র ডাক ওঠে। গা যেন কেমন ছম ছম

করে। হঠাৎ একদিন অনুপমার চোখে পড়লো বাজপড়া ন্যাড়া তালগাছে শকুন দেখলে যেমন বুক কেঁপে ওঠে;—গৃহস্থ বাড়ীর ছাদে শকুনকে ডানা শুকোতে দেখলে যেমন বুকের মধ্যে দুড় দুড় করে কেঁপে ওঠে ঠিক তেমনি করে কেঁপে উঠলো তার বুক। পাড়ার একটি বিধবা মেয়ের হাত ধরে সন্ধ্যের সেই আলোছায়ার মধ্যে জংগলের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে রঞ্জন। আলো-অন্ধকারেও মেয়েটির গোলগাল চোখের অশুভ দৃষ্টি—শকুনের ঠোঁটের মত ঝোলানো ঠোঁটের মত নাক ওর চোখ এড়ালো না। মেয়েটি যেন শ্মশানে শবের গন্ধ শুঁকছে। বুকটার মধ্যে ধপ করে উঠলো অনুপমার সেই অশুভ প্রেতমূর্ত্তি ডাইনীকে দেখে। বুঝতে বাকী রইল না—এই স্বামীকে গ্রাস করেছে।

না—আর নয়। ওকে প্রেত হাতছানি দিয়েছে। ও ধ্বংসের পথে যাবেই। তার আগে বাড়ী ছেড়ে চলে যাবে সে। এখানে আর নয়; একদণ্ডও নয়। কারণ আমি বেশ জানি সে জিজ্ঞাসা করলেও সত্যি কথা বলবে না রঞ্জন। আর ওকেও বিধবার লোভের হাত থেকে বাঁচান যাবে না। সর্বনাশ হবার আগে চলে যাবে সে। যাবেই—। বাঘ যখন রক্তের স্বাদ পেয়েছে—স্বামীর আর নিস্তার নেই। চুপ-চুপ—। বলতে নেই। কে যেন গাছের পাতায় পাতায় ফিস ফিস করে বলে গেল। চুপ-চুপ ও অলুক্ষুণে কথা।

কেন চুপ করবো। কিসের প্রত্যাশায়। স্বামীর মংগলের জন্যই আমায় সংসার ছাড়তে হবে মনে মনে বললো অনুপমা। যে লোভের ফাঁদে উনি একবার পা দিয়েছেন সেখান থেকে পালাবার সাধ্য ও'র নেই। জাল কাটতে চাইলেই ডাইনী ব্ল্যাকমেল করবে। সুতরাং—আর নয়। খোকা বড় হবে ও জানবে ওর মা মরে গেছে বাবার দুর্ব্যবহারে। তারপর আরো পাঁচজনের মত ও মার প্রসংগ ভুলে যেতে চেষ্টা করবে। কখনও কারুর কাছে তুলবে না। কোন মতেই না। আর রঞ্জন সে ধাপে ধাপে নেমে যাবে ধ্বংসের অতলে বিধবার লালসার শীকার হয়ে। ফিরতে পারা তার পক্ষে একেবারেই সম্ভব নয়, কারণ মানসিক দিক থেকে যে সে দুর্বল সেটা ও ডাইনীর আগুনের ভাঁটার মত গোল গোল চোখে এড়ায়নি। শকুনের ঠোঁটের মত বাঁকা নাক যেন শবের পূতিগন্ধ পেয়েছে। সুতরাং—সর্বনাশ আসবেই।

বিকেলের রোদ পড়ে এসেছে। চারিদিক যেন কেমন কালো কালো হয়ে আসছে। আগেই পাশের বাড়ীতে খোকাকে দিয়ে এসেছে অনুপমা। ওরা বললে : ব্যাপার কী? আজ কী খোকাবাবু আমাদের বাড়ী রাতেও থাকবে? ও বাড়ীর গিন্নীর ছেলে-পুলে নেই তিনি খোকাকে খুব ভালো-বাসেন। রাতে রাখলে তো খুশীই হব খুব। অনুপমা বল্ল : আজ আমার একটু কাজ আছে। রাতে ও আজ ওর কাকীমার কাছেই থাকবে।—কাকীমা এ প্রস্তাবে অত্যন্ত খুশীই হলেন যেন।

রঞ্জন তো আসবেই না। আজকাল সে প্রায় বাড়ীতে আসে না। সুতরাং বাড়ীতে থাকবার আর কোন আকর্ষণ ছিল না অনুপমার।

রাতে একা বেরিয়ে পড়লো সে। মিঠে মিঠে হাওয়ায় মজা নদীর পাড় ধরে এগিয়ে চলতে লাগলো হন হন করে। হঠাৎ আম, কাঁঠাল, জারুল গাছের একটা বন শুরু হবার আগে মা এসে পথে দাঁড়ালেন : বৌমা কোথায় যাচ্ছ এতো রাতে? ঠিক কি যে বলবে উত্তরটা খুঁজে না পেয়ে বললো অনুপমা : না, কোথাও না। এই এখানে—যাচ্ছি—।

: এখানে? এতো রাতে—ঘরের বৌ কখনও এতো রাতে বাড়ীর বাইরে বেরোয়? খোকাকে কার কাছে রেখে এলে?

: ও বাড়ীর কাকীমার কাছে।—বল্ল অনুপমা।

: ছি—ছি। সাপেও রাতে বাচ্চা ছেড়ে ঘরের বাইরে যায় না। আর তুমি এতটুকু বাচ্চাটাকে অনায়াসে পরের কাছে রেখে দিয়ে এলে। রঞ্জন?—তার কি হবে ভেবেছ?

: সে তো আর রাতে আসে না। মুখ ভার করে বল্ল অনুপমা।

: আসে না? ঘরে ফেরাবার জন্য তুমি কি চেষ্টা করেছ বলো তো? সে ধ্বংসের পথে নেমে যাচ্ছে, তুমি তার স্ত্রী—সব জেনেও প্রতিকারের কোন চেষ্টা করছো না। আরো ধ্বংসের দিকে ঠেলে দিচ্ছ। অনেক পথ হেঁটে এসেছি। বড্ড তেষ্টা পেয়েছে আমায় একটু জল দিতে পার?

: নিশ্চয়ই পারি। পেছন ফিরলো অনুপমা। কিন্তু হঠাৎ উপলব্ধি করলো অনেক দূরে এসে পড়েছে সে। বাড়ী এখান থেকে বহু দূর—সেই হু-হু করা বাতাস ভরা মাঠ—সেই শাল-শিমুল আর বৈঁচির বন পেরিয়ে সেই মজা নদীর চরের বালির ওপর দিয়ে বাড়ী গিয়ে জল আনতে অনেক সময় লাগবে তার।

: মা; অনেকক্ষণ কিন্তু অপেক্ষা করতে হবে। আমি জল আনতে যাচ্ছি ওই বাড়ীর দিক থেকে।—থাক চাইবার দরকার নেই মা বল্লেন। কিন্তু বাড়ী ছেড়ে এতদূরে এত রাতে একা চলে এসেছ। এখুনি ফিরে যাও।—তুমি বৌ—বাড়ীর সম্মান তোমার হাতে। খোকার কথাও মা হয়ে ভাবলে না? ছি-ছি-ছি।

: চুপ-চুপ করুন মা। ফিরেই যাব। কিন্তু আপনাকে জল—? একটু দাঁড়ান। ব্যতিব্যস্ত হয়ে অনুপমা বললো। আমি পেছন ফিরলাম।—আচ্ছা আমার সঙ্গেই আসুন না। এত রাত আমি একাই বা যাব কেন? আর ওতো আপনারই বাড়ী। এতো সংকোচের কারণ কি। বাড়ী চলুন। যেতেই হবে আপনাকে—আমি নিয়ে যাব। অনুপমা বললে আবেগে কাঁপতে কাঁপতে।—মা—আসুন—। অনুপমা ডাকলো।—মা?—

কেউ এলো না। কেউ সাড়াও দিল না। শুধু বুনো ফুল, পলাশ, জিনো, নোনা আর বিলিতী আমড়ার জঙ্গল থেকে তীব্র কর্কশ স্বরে রাত জাগা পাখি ডাকল একটা অন্ধকার আকাশ চিরে।

পথ রোধ করে আবার বাড়ী ফিরিয়ে দিলো কে অনুপমাকে—তার মা?—না তার দ্বিতীয় সত্তা?

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের ইতিহাস

বিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায়

(পূর্বপ্রকাশিতের পর)

সাম্রাজ্যবাহিনী তখন লিবিয়ার এল-আঘালিয়ায় দণ্ডায়মান। আসন্ন বলকান বা গ্রীসের যুদ্ধের জন্য তখন ইহাদের মধ্য হইতে বহু সৈন্য ও অস্ত্র সেখানে প্রেরিত হইয়াছিল। সুতরাং তারা স্বভাবতঃই দুর্বল হইয়া পড়িয়াছিল। চতুর জার্মান সেনাপতি দেখিলেন আঘাত হানিবার এই সুযোগ। সুতরাং ১৯৪১ সালের ২৪শে মার্চ রোমেল আঘালিয়ার ঘাঁটি (যেখানে মাত্র দুই ডিভিসন সাম্রাজ্য সৈন্য ছিল) বিদীর্ণ করিয়া ফেলিলেন এবং বিদ্যুৎগতিতে বেঙ্গাজী, ডের্না ইত্যাদি উপকূলবর্তী সহর ও ঘাঁটিগুলি দখল করিয়া মিশরের সীমানায় পৌঁছিলেন। ৭ই এপ্রিল ডের্না এলাকায় 'ধুরন্ধর রণকৌশলী' জেনারেল ও' কোনার, জেনারেল নিম, জেনারেল প্যারি (সাঁজোয়া বাহিনীর বিশেষজ্ঞ) প্রভৃতি ৬ জন বৃটিশ সেনাপতি, ২ জন কর্নেল এবং ২ হাজার সৈন্য বন্দী হইলেন। এই আকস্মিক ঘটনা বজ্রাঘাতের মত চারিদিকে হুলস্থূল সৃষ্টি করিল এবং মরুভূমিতে রোমেলের প্রথম আবির্ভাব বহু উপকথা ও রোমাঞ্চকর গল্পের খোরাক জোগাইল! মাত্র ১০ দিনের বিদ্যুৎগতি আক্রমণে রোমেল এই অঘটন ঘটাইলেন।

সাম্রাজ্য বাহিনী বিতাড়িত হইয়া মিশর পর্যন্ত ফিরিয়া আসিল। কিন্তু পথিমধ্যে তোব্রুক বন্দর উপকূলভাগে আত্মরক্ষা করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। রোমেল এই বন্দরের পাশ কাটাইয়া দ্রুত মিশর সীমান্তে চলিয়া গেলেন এবং যাহাতে তোব্রুক তাঁহার সরবরাহ পথে বিঘ্ন সৃষ্টি করিতে না পারে, এজন্য উহাকে অবরোধ করিলেন। হালফায়া পাস, সিডি ওমর এবং বার্দিয়া—এই তিন বিন্দুকে সংযুক্ত করিয়া তিনি এক ত্রিভুজাকৃতি ব্যূহ রচনা করিয়া তোব্রুককে অবরুদ্ধ করিলেন। সাম্রাজ্য বাহিনীর এক ডিভিসন অস্ট্রেলিয়ান সৈন্য এই বন্দর রক্ষায় রহিল এবং এই অবস্থায় দীর্ঘ ৮ মাসকাল অবরুদ্ধ থাকিয়া তোব্রুক অবরোধ যুদ্ধের ইতিহাসে এক নূতন অধ্যায় রচনা করিল। বৃটিশ নৌবহর ও বিমানবহর তোব্রুকের অবরুদ্ধ দুর্গরক্ষীদিগকে সরবরাহ দিতে লাগিল, কিন্তু জার্মান বোমারুর প্রবল আক্রমণে তাহাদের প্রভূত ক্ষতি হইতে লাগিল। ১৯৪১ সালের ১৫ই হইতে ১৭ই জুন তোব্রুকের উদ্ধারের জন্য বৃটিশ বাহিনী ট্যাঙ্কযোগে জোর আক্রমণ চালাইল। কিন্তু ট্যাঙ্কের নিয়োগ কৌশলে যেমন ভুল হইল, তেমনি গুণগত দিক দিয়াও এগুলি ত্রুটিপূর্ণ ছিল। এদের স্পীড ছিল অত্যন্ত কম এবং ইঞ্জিনগুলি অত্যন্ত দুর্বল। ফলে, এই ট্যাঙ্কগুলি জার্মানদের সহিত আঁটিয়া উঠিতে পারিল না। (৫)

মধ্যপ্রাচ্য কমাণ্ডের প্রধান সেনাপতি জেনারেল ওয়েভেলের প্রতি চার্চিল প্রসন্ন ছিলেন না। ওয়েভেল ছিলেন স্বল্পবাক, সতর্ক এবং হঠাৎ কোন রণক্ষেত্রে ঝাঁপাইয়া পড়ার মত বেপরোয়া ঝোঁক তাঁর ছিল না। কিন্তু উত্তর আফ্রিকা, গ্রীসে ও মধ্যপ্রাচ্যের রণক্ষেত্রের জন্য চার্চিল তাঁকে ক্রমাগত তাগিদ দিতেছিলেন। অথচ তাঁর অধীনে না ছিল উপযুক্ত সৈন্যবল কিম্বা অস্ত্রবল—যদিও পূর্ব ভূমধ্যসাগর থেকে প্রায় ভারতবর্ষ পর্যন্ত বিশাল এলাকা তাঁর দায়িত্বের অন্তর্গত ছিল। সেনাপতি হিসাবে তিনি ছিলেন প্রথম শ্রেণীর একথা বৃটিশ ঐতিহাসিকেরা স্বীকার করিয়াছেন। কিন্তু চার্চিলের সঙ্গে মতান্তরের জন্য তাঁকে অপসারিত হইতে হইল। ১৯৪১ সালের ২১শে জুন জেনারেল ওয়েভেল ভারতবর্ষ ও ব্রহ্মদেশের প্রধান সেনাপতির পদে নিযুক্ত হইলেন এবং জেনারেল স্যার ক্লড অকিনলেক তাঁর স্থানে আসিলেন মধ্যপ্রাচ্যের প্রধান অধিনায়করূপে। অকিনলেকও দক্ষ সেনাপতি ছিলেন, কিন্তু তাঁর সৌভাগ্য এই যে, ওয়েভেল যে সাহায্য ও সহযোগিতা পান নি (ইংরাজ ঐতিহাসিক টেলরের মতে) অকিনলেক সেই সমস্তই পাইয়াছিলেন।

উত্তর আফ্রিকার যুদ্ধে জেনারেল রোমেল 'মরুভূমির মায়াবী' বলিয়া অসাধারণ খ্যাতি অর্জন করিয়াছিলেন। ভারতীয় সামরিক মহলে সুপরিচিত ডেসমণ্ড ইয়ং তাঁর রচিত রোমেলের জীবনীগ্রন্থে লিখিয়াছেন যে, স্ট্রাটিজি বা রণনীতির ক্ষেত্রে জেনারেল ওয়েভেল ছিলেন রোমেলের উপযুক্ত প্রতিদ্বন্দ্বী, তব্রুকের অবরোধ যুদ্ধ ওয়েভেলেরই সাহসিক সিদ্ধান্তের ফল

(5) British History 1914 to 1945—Taylor, Pelican 1970.

এবং রোমেল পর্যন্ত ওয়েভেলকে 'একজন শীর্ষস্থানীয় সামরিক প্রতিভা' বলিয়া স্বীকার করিতেন। এবং রোমেলের ব্যক্তিগত লাইব্রেরীতে সৈনাপত্য সংক্রান্ত ওয়েভেলের লেখা একটি পুস্তিকাও রক্ষিত ছিল। (৬)

•

মধ্যপ্রাচ্যের রণাঙ্গনের বৃটিশ সেনাপতি ওয়েভেলের হাতে ১৯৪০ সালের এই দুর্দিনে মিশরে ৩৬ হাজার, প্যালেস্টাইনে ২৭ হাজার, সুদানে ৯ হাজার, কেনিয়াতে ৮ হাজার ৫ শত এবং বৃটিশ সোমালিল্যাণ্ডে ১ হাজার ৫ শত মাত্র সৈন্য ছিল। এছাড়া কোন ভারী সামরিক সজ্জা তাঁর ছিল না এবং ট্যাঙ্কমারা গোলন্দাজী শক্তিও তাঁর সামান্য ছিল। কিন্তু এই সামান্য শক্তি নিয়াই ওয়েভেলের পক্ষে বহুগুণ শক্তিশালী ইতালীয় সামরিক বাহিনীর সম্মুখীন হওয়া ছাড়া উপায় ছিল না। সুতরাং তাঁর সাফল্যকে বিস্ময়কর বলিলে নিশ্চয় অত্যুক্তি হইবে না।

আফ্রিকার এই যুদ্ধ সম্পর্কে চার্চিল তাঁর মহাযুদ্ধের ইতিহাসে উল্লেখ করিয়াছেন যে, আবিসিনিয়া, এরিট্রিয়া ও সোমালিল্যাণ্ডের (পূর্ব আফ্রিকা) সৈন্য ছাড়াই উত্তর আফ্রিকার উপকূল ভাগে ত্রিপোলিটানিয়া ও সাইরেনাইকায় ইতালীর ২ লক্ষ ১৫ হাজার সৈন্য ছিল এবং অনেক দিন ধরিয়াই তাদের যুদ্ধের আয়োজন ও প্রস্তুতি চলিতেছিল। এজন্য ত্রিপোলিতে ছিল তাদের মূল সামরিক ঘাঁটি এবং সেখান থেকে ত্রিপোলিটানিয়া ও সাইরেনাইকা (সিরিয়া) হইয়া মিশরের সীমান্ত পর্যন্ত হাজার মাইলেরও বেশী দীর্ঘ একটি চমৎকার সামরিক সড়ক নির্মিত হইয়াছিল। এই উপকূল ভাগ ও সড়কের পার্শ্বে যুদ্ধের উপযোগী সরবরাহ ডিপো ও ঘাঁটি তৈয়ার হইয়াছিল এবং শরৎকালের (১৯৪০) মধ্যে এই সমস্ত এলাকায় অন্ততঃ ৩ লক্ষ ইতালীয় সমবেত হইল।...

ইতালীয়রা আগস্টে বৃটিশ সোমালিল্যাণ্ড আক্রমণ করিল এবং এখানকার সামান্য সংখ্যক বৃটিশ সৈন্যেরা জেনারেল গডউইন অস্টিনের নেতৃত্বে প্রতিরোধ করিল বটে, কিন্তু পারিয়া উঠিল না, তারা পশ্চাদপসরণ করিল। আফ্রিকায় এই একটিমাত্র সামান্য যুদ্ধক্ষেত্রে বৃটিশের পরাজয় ঘটিল ইতালীর হাতে। কিন্তু এই সামান্য ঘটনাতেই মুসোলিনী একেবারে উল্লসিত হইয়া উঠিলেন এবং রোম নগরী থেকে বৃটিশ সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে তর্জন-গর্জন শুরু করিয়া দিলেন। কিন্তু মার্শাল গ্রাৎসিয়ানি মিশর বা নীল নদের উপত্যকা আক্রমণের জন্য উৎসাহী ছিলেন না। কারণ, তাঁর মতে ইতালীয় সামরিক শক্তি মিশর জয়ের উপযোগী ছিল না। কাউন্ট সিয়ানো তাঁর ডায়েরীতে ৮ই আগস্ট, ১৯৪০,

(6) Rommel —The Desert Fox—Desmond Young. Fantana Books 1969, P. 102-3.

মন্তব্য করিয়াছেন যে, এই আক্রমণের প্রস্তুতির সম্পূর্ণতা ঘটাইতে গ্রাৎসিয়ানি আরও ২।৩ মাস সময় চাহিয়াছিলেন। কিন্তু মুসোলিনী এতে অত্যন্ত চটিয়া গেলেন এবং শ্লেষের সুরে মন্তব্য করিলেন যে, গ্রাৎসিয়ানির মার্শাল হওয়া ছাড়া আর কোন উচ্চাশা নাই!

এই ঘটনার এক মাস পরে গ্রাৎসিয়ানি আরও এক মাস অপেক্ষা করিতে চাহিলেন। তখন মুসোলিনী ধৈর্য হারাইয়া হুকুম দিলেন—যদি সোমবার দিন তুমি আক্রমণ না করো, তবে তোমাকে পদচ্যুত করা হইবে। মার্শাল তখন জবাব দিলেন—যথা আজ্ঞা! সিয়ানো মন্তব্য করিতেছেন যে, সেনাপতিদের এত অনিচ্ছা সত্ত্বেও এমন যুদ্ধযাত্রা আর কখনও দেখা যায় নাই। ১৩ই সেপ্টেম্বর মিশরে আক্রমণ শুরু হইয়াছিল।

এই পটভূমিকা থেকেই ইতালীর যুদ্ধের ফলাফল অনুমান করা যাইতে পারে। খাদ্যহীন, জলহীন মরুভূমিতে ইতালীয় বাহিনী বৃটিশের হাতে অতিদ্রুত বিধ্বস্ত হইয়া গেল, ১ লক্ষ ১৩ হাজার সৈন্য বন্দী হইল এবং ৭ শ'য়ের বেশী কামান ধরা পড়িল। ১২ই ডিসেম্বর গ্রাৎসিয়ানির কাছ থেকে এই বিপর্যয়ের বার্তাবাহী টেলিগ্রাম মুসোলিনীর নিকট পৌঁছিল এবং গ্রাৎসিয়ানী সেই তারবার্তায় অত্যন্ত রাগতভাবে অনুযোগ করিয়াছিলেন যে, তাঁকে এক অসম যুদ্ধে পাঠান হইয়াছিল—এ যেন হাতীর সঙ্গে মাছির লড়াই। আর মুসোলিনী মন্তব্য করিলেন যে, তিনি লোকটার উপর রাগিতেও পারিতেছেন না, কারণ, লোকটিকে তিনি ঘৃণা করেন!

•

সোমালিল্যান্ড, আবিসিনিয়া ইত্যাদি পূর্ব আফ্রিকার উপনিবেশগুলিতে বৃটিশ পক্ষের আক্রমণের অনেক কৃতিত্বের কথা উল্লেখ করিয়া চার্চিল বলিয়াছেন যে, মোগাদিসুর গুরুত্বপূর্ণ ইতালীয় বন্দর দখলের ফলে প্রচুর সরবরাহদ্রব্য বৃটিশের হস্তগত হইল। সেগুলির মধ্যে সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য হইতেছে ৪ লক্ষ গ্যালন মূল্যবান পেট্রোল। একসঙ্গে এত পেট্রোল ধরা পড়া নিশ্চয়ই অদ্ভুত।

এই প্রসঙ্গে আরও উল্লেখ করা যাইতে পারে যে, ইতালীর রাজার খুল্লতাত ভ্রাতা ডিউক অব ডি'আওস্টা যিনি পূর্ব আফ্রিকার ইতালীয় বাহিনীর প্রধান সেনাপতি ছিলেন, তিনি পরাজিত হইয়া ১৭ই মে আত্মসমর্পণ করেন এবং ১৯৪২ সালে নাইরোবিতে বন্দী অবস্থায় মারা যান। তিনি একজন ফরাসী রাজকন্যাকে বিবাহ করিয়াছিলেন এবং ব্যক্তিগতভাবে পরিচ্ছন্ন ভদ্রলোক ছিলেন—চার্চিলের মন্তব্য।

মিশর দখলের যুদ্ধে পরাজিত হওয়ার ফলে ১ লক্ষ ৩০ হাজার ইতালীয় সৈন্য বন্দী, ৪০০ ট্যাংক ও ১২৯০টি কামান ধরা পড়ে। মিঃ ডেসমণ্ড ইয়ং তাঁর রোমেল সংক্রান্ত বইতে উল্লেখ করিয়াছেন যে, এই সমস্ত সমরিকসম্ভার ছাড়াও অন্যান্য প্রচুর দ্রব্যসামগ্রী বৃটিশ পক্ষের হাতে ধরা পড়িয়াছিল এবং এগুলির মধ্যে ছিল অজস্র প্রকারের শয্যাদ্রব্য, বিলাস ও প্রসাধনী দ্রব্য, দামী টয়লেট-সেট, গন্ধদ্রব্য, সুবাসিত জল এবং নানা প্রকারের উৎকৃষ্ট মদ্য! আর সেই সঙ্গে কয়েক গাড়ীভর্তি ইতালীয় যুবতী নারী—

"a motor caravan of young women, of flevrs for the use of...."

অর্থাৎ ইতালীয় যুদ্ধযাত্রা বেশ আরামদায়কই ছিল।—(ডেসমণ্ড ইয়ংয়ের মন্তব্য)। একেবারে মদ ও মেয়েমানুষ সহ। আর এর বিপরীত দৃশ্যে দেখা যায় যে, মুসোলিনী ১৭ই জুন ১৯৪০ তাঁর যুদ্ধযাত্রার সমর্থনে মার্শাল গ্রাৎসিয়ানির কাছে বলিয়াছিলেন—

I need a few thousand dead to Justify my pre:ence at the peace table.

অর্থাৎ শান্তি সম্মেলনে উপস্থিত থাকার সাফাই হিসাবে আমার দরকার কয়েক হাজার মানুষের মড়া।' (৭)

অবশ্য ইউরোপে ও আফ্রিকায় ইতিমধ্যেই অজস্র মানুষের মড়া মুসোলিনীর বরাতে জুটিয়াছিল, তবু কিন্তু শান্তির টেবিলে যোগ দেওয়ার সুযোগ মুসোলিনীর কপালে আর জুটিল না!...

ইরাকের বিদ্রোহ

জেনারেল রোমেল যখন মিশরের দ্বারদেশে তখন মধ্যপ্রাচ্যে অকস্মাৎ একটি বিস্ফোরণ ঘটিল, যার গুরুত্ব নিতান্ত কম ছিল না। ইরাকের জাতীয়তাবাদী নেতা রসিদ আলী জিলানী ১৯৪১ সালের ১লা এপ্রিল তারিখ অফিসারদের সহায়তায় গভর্নমেন্টের বিরুদ্ধে অকস্মাৎ বিদ্রোহ করিলেন। এর আগে জানুয়ারী মাসে তিনি ইরাকের মন্ত্রিসভা হইতে পদত্যাগে বাধ্য হইয়াছিলেন। বিদ্রোহী রসিদ আলী রাজধানী বাগদাদ দখল এবং ইরাকের রাষ্ট্রশক্তি নিজের হাতে আনিলেন। এই ঘটনায় বৃটিশ গভর্নমেন্ট বিচলিত হইলেন। কেন না উগ্র জাতীয়তাবাদী রসিদ আলীর সহিত জার্মানীর কোনও একটা গোপন সম্পর্ক আছে বলিয়া তাঁরা সন্দেহ করিলেন। কারণ, ১৯৩৯ সালে যুদ্ধ বাধিবার পর যদিও ইরাক জার্মানীর সহিত সম্পর্ক ছিন্ন করিয়াছিল, তথাপি ফ্রান্সের পরাজয় এবং ইতালী কর্তৃক যুদ্ধ ঘোষণা সত্ত্বেও ইতালীর

(7) The War 1939-1945 by Snyder 1964. P. 170

সহিত ইরাকের সম্পর্ক রহিয়াই গেল। বাগদাদের ইতালীয় দূতাবাসে নাৎসী চর ও প্রচারকদের আড্ডা হইয়া উঠিল এবং নিখিল আরব ঐক্য প্রয়াসী জাতীয়তাবাদী মুশ্লিমগণ বৃটিশ বিদ্বেষের দ্বারা অসন্তোষ ছড়াইতে লাগিলেন। যদিও ইরাক বাহ্যতঃ স্বাধীন রাষ্ট্র বলিয়া বিবেচিত ছিল, তথাপি ১৯৩০ সালে বৃটেনের সহিত সন্ধি-সর্তানুসারে ইরাকে বৃটিশ মিলিটারি মিশন, বিমানবহর, বিমানঘাটি এবং ইরাকী পুলিশ বাহিনীতে বৃটিশ ইন্সপেকটরগণ ছিলেন। ইহা ছাড়া ইরাকের পেট্রোল লাইন, যাহা হাইফা বন্দর পর্যন্ত পৌঁছিয়াছে, তাহা সুরক্ষিত ও পাহারা দেওয়ার অধিকারও বৃটেনের ছিল। অর্থাৎ বৃটিশ সাম্রাজ্যস্বার্থের অন্যতম ঘাঁটি ছিল ইরাক, ফলে বৃটেনের সহিত ইরাকের জাতীয়তাবাদীগণের সম্পর্ক আদৌ বন্ধুত্বাত্মক ছিল না। যেমন ছিল না মিশরে, ভারতবর্ষে ও ব্রহ্মদেশে। বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদ এই সমস্ত দেশে শোষণ ও শাসনের জন্য যে চাতুরীর খেলিয়াছে, তাহা লইয়া তুরস্কের সঙ্গে পর্যন্ত দীর্ঘকাল মন কষাকষি ছিল। যদিও তুরস্ক বর্তমানে নিরপেক্ষ এবং ইরাকের আধুনিকতম বন্ধুরূপে মধ্যস্থ হিসাবে আপোষ রফা করিতে পর্যন্ত প্রস্তুত ছিল, তথাপি অতীত ইতিহাসের বিবেচনায় তার আচরণ সম্পর্কেও সেই সময় প্রবল গবেষণা উদ্রেক করিয়াছিল। প্রকৃতপক্ষে বিগত মহাযুদ্ধের তুর্কী সাম্রাজ্য ভাঙিয়াই বর্তমান ইরাক, প্যালেস্টাইন, ট্রান্সজর্ডান,

সিরিয়া প্রভৃতি গড়িয়া উঠিয়াছে। এই রাজ্যগুলির মধ্যে মেসোপটেমিয়া বা আধুনিকতম ইরাকের স্বতন্ত্র সত্তা তুরস্ক মানিয়া লইলেও মসুল প্রদেশ লইয়া দীর্ঘকাল পর্যন্ত এমন কি মহাযুদ্ধের অবসানে ১৯২৬ সাল পর্যন্ত বৃটেনের সহিত তুরস্কের তিক্ত মন কষাকষি ছিল। কামাল আতাতুর্ক ও মসুলের বিরাট তৈল সম্পদ বৃটেনের হাতে চলিয়া যাওয়ার পক্ষপাতী ছিলেন না। বিশেষতঃ এখানকার কুর্দ অধিবাসীদের লইয়া তুরস্কের মনে নানা আশঙ্কা ছিল। গোটা মসুল প্রদেশটা তুরস্কের হাতছাড়া হইয়া যাওয়ায় আত্মরক্ষার দিক হইতে তুরস্ক দুর্বল হইয়াছে। সমর বিশেষজ্ঞদের মতে এই যে, মসুলের উপর যাহাদের অধিকার থাকিবে, বসরা পর্যন্ত আত্মরক্ষার প্রশ্নে তাহারাই লাভবান হইবে। যুদ্ধের পর নানা সন্ধিপত্রের আলোচনার সময় তুর্কী গভর্নমেন্ট মসুলের উপর অধিকার দাবী করলেও সেই দাবী স্বীকৃত হয় নাই। বিশ্বরাষ্ট্র সংঘ যখন মসুলের বাটোয়ারা ইঙ্গ-ইরাকীদের পক্ষে ঘোষণা করেন, তুর্কী গভর্নমেন্ট তখন উহা গ্রহণে অসম্মত হইয়াছিলেন। ইরাকের উপর বৃটেনের ২৫ বৎসরের জন্য ম্যান্ডেট ঘোষিত হইয়াছিল। ইহার ফলে তুরস্ক আরও ক্ষুব্ধ হইয়াছিল। জনৈক ঐতিহাসিক বলেন,

"It was felt that the the twenty-five years' extension of the British mandate over Iraq was committing Great Britain to the danger of future war with Turkey." .... *

২৫ বৎসরের জন্য বৃটেনকে ইরাকের ইজারা দেওয়ায় গ্রেটবৃটেনকে ভবিষ্যতে তুরস্কের সহিত যুদ্ধের দিকে ঠেলিয়া দিল। অবশ্য ১৯২৬ সালের পর মসুল সমস্যার মীমাংসা তুরস্ক মানিয়া লইয়াছিল।'

কিন্তু ১৯১৪-১৮ সালের রাজনীতি ও রাজনীতির সংঘর্ষে অসন্তুষ্ট তুরস্কের মত মিশর এবং 'প্যালেস্টাইন, সিরিয়া ও ইরাকে প্রবল জাতীয় আন্দোলন দেখা দিয়াছিল এবং প্যালেস্টাইনের অসন্তুষ্ট আরবদের নেতা গ্রান্ড মুফতি ইরাকে আশ্রয় পাইয়াছিলেন। বিগত মহাসমরে বিভিন্ন উপজাতি, সম্প্রদায় ও সর্দারগণের মধ্যে পারস্পরিক ভেদ সৃষ্টি করিয়া এবং কর্নেল লরেন্সের মারফৎ স্বাধীনতা লাভ ও তুরস্কের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করিবার উস্কানি দিয়া মিত্রশক্তি কূটনীতির যে খেলা দেখাইয়াছিলেন, আজিকের দিনে উহা পাল্টা প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করিয়াছে। অবশ্য আরব দেশে বৃটেনের রাজ্যগত কোন লোভ নাই, কিন্তু ইরাকের প্রচুর তৈল ও ভারতবর্ষের সহিত রাস্তাঘাটের যোগাযোগের দিক হইতে বৃটেনের অর্থনৈতিক ও রণনৈতিক স্বার্থ এখানে প্রচুর। সুতরাং আরবদের অগ্রগতি সম্পর্কে বৃটেন সম্পূর্ণ নিশ্চিন্ত থাকিতে পারে না। জার্মানী ও ইতালীর প্রচারকার্য যাহাতে ঘোরতর অনিষ্ট করিতে না পারে, এখানকার বৃটিশ কর্তৃপক্ষ এজন্য পূর্বাহ্নে সতর্ক ছিলেন। ১৯৩৪ সালে 'লণ্ডন টাইমস্' পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছিল যে, আরবদের মধ্যে বন্ধুর মত প্রচারকার্য ও সহৃদয়তা লাভ করিবার জন্য মেজর প্লাব নামে একজন বৃটিশ অফিসারকে কর্ণেল লরেন্সের স্থানে নিয়োগ করা হইয়াছিল। ইরাক পেট্রোল কোম্পানী ও বৃটিশ সরকার ইহার সমস্ত খরচ বহন করিতেন কারণ, এই দুইয়ের স্বার্থরক্ষাই মেজর প্লাবের কর্তব্য ছিল। অবশ্য যুদ্ধের সময় ও যুদ্ধের পরে কর্ণেল লরেন্স ও মিস বেল ছাড়াও জন ফিল্বি, কর্ণেল উইলসন, গিলবার্ট ক্লেটন, স্যার পার্সি কক্স প্রভৃতি বৃটেনের অনুকূলে আরবদের মধ্যে প্রচারকার্য চালাইয়াছেন— দুর্দান্ত বেদুইনেরা আরব দেশকে আধুনিক সভ্যতার উত্তরাধিকারী করিতে উৎসাহী নহে, কারণ, তাহাদের উষ্ট্র ও লুণ্ঠন ব্যবসায় ইহা দ্বারা প্রতিহত হইতেছে। মোটর, এরোপ্লেন ও রেলওয়ে বিস্তারের জন্য এই সমস্ত স্বচ্ছন্দচারী আরবেরা স্বাভাবিক জীবিকার্জনের অধিকার হইতে বঞ্চিত হইতেছে অথচ ইরাকের যাহা প্রধান সম্পদ সেই পেট্রোল বিদেশীর হাতে। পূর্বে এই পেট্রোল ব্যবসায়ে ইতালীরও অংশ ছিল, কিন্তু আবিসিনিয়া যুদ্ধে ইতালীর আর্থিক দুর্গতির জন্য এই সমস্ত শেয়ার ইংরাজের হাতে চলিয়া গিয়াছে। এক্ষণে মসুলের বিরাট তৈলখনির সম্পদগুলির শতকরা সাড়ে ৫২ ভাগই বৃটেনের হস্তগত এবং এই ইরাক পেট্রোলিয়াম কোম্পানীর প্রধান অংশীদার রহিয়াছেন ইঙ্গ-ইরানীয় (পারস্য) অয়েল কোং, রয়েল ডাচ শেল, ষ্টাণ্ডার্ড অয়েল কোং এবং একটি ফরাসী কোম্পানী। (এই শেষোক্ত কোম্পানীর অংশ সিরিয়ার ভিতর দিয়া ট্রিপোলিতে পৌঁছে)। অসন্তুষ্ট আরবেরা এই সমস্ত ব্যবসায় সন্দেহের চক্ষে দেখিয়া থাকে এবং তাহারা সুযোগ পাইলেই পাইপ লাইন, মোটর বা রেলপথের উপর বিভ্রাট ঘটাইবার চেষ্টা করে। সমর-বিশেষজ্ঞগণ বলিয়া থাকেন যে, কোনও স্থানে রণক্ষেত্র সৃষ্টি করিবার পূর্বে উহার রাজনৈতিক অবস্থা বিশেষভাবে বিচার করিতে হইবে। যদি স্থানীয় অধিবাসিগণ আমাদের অসন্তুষ্ট থাকে, তবে যুদ্ধযাত্রায় বিঘ্ন দেখা দিবে। প্যালেস্টাইন, সিরিয়ায় ও ইরাকে জাতীয় আন্দোলন প্রবল, তাহারা স্বাধীনতা চাহে, কোন বিদেশীর প্রভুত্ব কামনা করে না। সুতরাং জার্মানীর সহিত যোগাযোগ ঘটাইয়া রসিদ আলী কিলানী যেমন বৃটেনের বিরুদ্ধে অন্যায় করিয়াছেন, তেমনই বৃটিশ কর্তৃক ইরাক আক্রান্ত হওয়ায় আরবদের স্বাধীনতার স্বাভাবিক আগ্রহের প্রতি প্রতিক্রিয়া ঘটিবার সুযোগ বৃটেনও দিয়াছেন। ১৯১৪-১৮ সালে যাঁহারা তুরস্কের বিরুদ্ধে আরবদের ক্ষেপাইয়াছিলেন, বিদ্রোহের সেই অস্ত্র পাল্টা তাঁহাদের বিরুদ্ধে আর প্রযুক্ত হইবে না—এরূপ আশা করা ঐতিহাসিক বা রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গীর লক্ষণ নহে। কিন্তু বিগত বারের তুলনায় অবস্থা এবার আরও খারাপ। শক্তিশালী জার্মানবাহিনী মিশরের দ্বারদেশে উপস্থিত।' *

লিবিয়ায় ব্রিটিশ বাহিনীর আক্রমণ

প্রভূত পেট্রোল সম্পদ (যাহার উপর ভূমধ্যসাগরীয় বৃটিশ নৌবহর নির্ভরশীল) এবং মধ্যপ্রাচ্য ও ভারতবর্ষের যোগাযোগের জন্য ইরাকের গুরুত্ব ভাবিবার মত। কিন্তু এই গুরুত্ব অতীতেও অনুভূত হইয়াছিল। পুরাণো ইতিহাসের পাতা খুঁজিলে দেখা যায় যে, মেসোপটেমিয়া বা বর্তমান ইরাকের গুরুত্ব সম্পর্কে কেবলমাত্র খাস বৃটেন নহেন, আমাদের ভারত গভর্ণমেণ্টও অত্যন্ত সচেতন ছিলেন। তাঁহাদের ধারণা ছিল যে, বাগদাদ ও বসরা যদি ভারত গভর্ণমেণ্টের প্রত্যক্ষ নিয়ন্ত্রণাধীনে থাকে, তবে আত্মরক্ষার দিক হইতে ভারতবর্ষ লাভবান হইবে। এই জন্য ১৯১৫ সালে ভারত গভর্ণমেণ্ট 'অন্ততঃপক্ষে' বাগদাদ ও বসরা দখল করিতে চাহিয়াছিলেন! ইউরোপীয় যুদ্ধে যখন মন্দা দেখা দিয়াছিল, তখন মিত্রশক্তি আত্মসম্মান ও সামরিক পৌরুষ দেখাইবার জন্য দার্দানেলিসের পরাজয়ের পর মেসোপোটেমিয়ার অভিযানে মন দিয়াছিলেন। ভারত গভর্ণমেণ্টও খুব উল্লসিত হইয়া উঠিয়াছিলেন। ১৯১৫ খৃষ্টাব্দের ৬ই অক্টোবর তারিখ বড়লাট লর্ড হার্ডিঞ্জ তদানীন্তন ভারত-সচিব মিঃ অস্টেন চেম্বারলেনের নিকট নিম্নলিখিত গোপন (private) টেলিগ্রাম প্রেরণ করেন—

The advance to Baghdad would create an immense impression in

---

* 'যুগান্তর' সম্পাদকীয় হইতে উদ্ধৃত মে, ১৯৩৬।

* 'যুগান্তর' সম্পাদকীয়, মে, ১৯৪১

ইতালির পূর্ব-আফ্রিকা সাম্রাজ্যের পতন

the Middle East, especially in Persia, Afganisthan and on our frontier and would counter-act the unfortunate impression in the Middle East created by want of success in the Dardanelles. It would also isolate German parties in Persia probably produce a pacifying effect in that country and frustrate the German plan of raising Afganisthan and the tribes while the impression throughout Arabia would be striking. In India the effect would be undoubtedly good.

বড়লাটের এই টেলিগ্রামের সংগে ভারতবর্ষের সেনানীমণ্ডলের অধ্যক্ষের (চীফ অব দি জেনারেল স্টাফ) নিম্নলিখিত তারবার্তাও উল্লেখযোগ্য।

"...that the possession of Baghdad would deprive the Turks of a well-equipped place of concentration; place us in a good possession to defeat them in detail as they moved down the rivers from Asia Minor or Syria; deprive the Turks of steamers material and resources and increase our prestige".

ভারতবর্ষের বৃটিশ কর্তৃপক্ষীয় মহলের এই মতবাদ যদিও পুরানো, তথাপি আজিকার দিনেও অবস্থাটা একই প্রকারের রহিয়াছে। আজও সেই পারস্য বা ইরাণ, আফগানিস্তান ও সীমান্ত প্রদেশের পাহাড়িয়াদের মধ্যে জার্মানীর প্রোপাগাণ্ডা ও কার্যকলাপের গুজব শুনা যাইতেছে এবং ভারতবর্ষের রাজনৈতিক মতামতের উপর জোর দেওয়া হইতেছে। সেদিনও বসরা ও বাগদাদ ভারতবর্ষের আত্মরক্ষার দিক হইতে দূরবর্তী ঘাটিস্বরূপ ছিল এবং আজও তাহাই আছে।' *

ইরাকে রসিদ আলীর বিদ্রোহ এবং উহার রাজনৈতিক জটিলতা সম্পর্কে সেদিনের সংবাদপত্র থেকে যে সমস্ত কথা উদ্ধৃত করা গেল, সেগুলি থেকেই ঘটনার গতি ও প্রকৃতি উপলব্ধি করা যাইবে। বলা বাহুল্য যে, বৃটিশ গভর্নমেণ্ট এই বিদ্রোহ সম্পর্কে আদৌ উদাসীন ছিলেন না। ১৯৪১ সালের ১৭ই ও ১৮ই এপ্রিল পারস্য উপসাগরের বসরা বন্দরে বৃটিশ সৈন্যেরা জাহাজযোগে উপস্থিত হইল এবং বাগদাদ ও হাব্বানিয়া বিমানঘাটির উপর আক্রমণ চালানো হইল। এদিকে প্যালেস্টাইন হইতে ৪০০ মাইল মরুপথ অতিক্রম করিয়া সাঁজোয়া গাড়ীযোগেও বৃটিশ সৈন্যেরা আসিয়া হাজির হইল। সুতরাং জার্মানী হইতে প্রেরিত কিছু কিছু সাহায্য সত্ত্বেও ১৯৪১ সালের ১লা জুনে জেনারেল ওয়েভেল ইরাকের বিদ্রোহ দমন করিতে সমর্থ হন। রসিদ আলী এবং জেরুজালেমের মুফতি উহার একদিন আগেই ইরানে পলায়ন করিয়াছিলেন।

ইরাকের পর ফরাসী ভিসি গভর্নমেণ্টের অধীন সিরিয়াও দখল করা হইল—১২ই জুলাই, ১৯৪১। কারণ, সেখানেও জার্মানী চক্রান্ত করিতেছিল এবং জার্মান বিমান ও কারিগর সেখানে পাঠানো হইতেছিল। মিশর, সুয়েজ খাল ও ভারতবর্ষের যোগাযোগ পথের দিকে চাহিয়া বৃটিশ গভর্নমেণ্ট ইরাকের মত সিরিয়াও নিজের অধিকারে আনিলেন এবং এভাবে মধ্যপ্রাচ্যে নাৎসী অগ্রগতি রোধ করিলেন।

* * *

পরে ১৯৪২ সালের জানুয়ারী মাসে ইরাণ সম্পর্কেও একই কারণে বৃটেন ও সোভিয়েত রাশিয়া একত্রে ব্যবস্থা গ্রহণে বাধ্য হইয়াছিলেন। কোন কোন ঐতিহাসিক মনে করেন যে, ক্রীট্ দখলের পর হিটলার যদি রাশিয়ার বদলে মধ্যপ্রাচ্য জয় করার জন্য সর্বশক্তি নিয়োগ করিতেন, তবে অনেক বেশী লাভবান হইতেন। তাঁর রণনৈতিক ভুলগুলির ত্রুটিও ছিল অন্যতম।

(ক্রমশঃ)

* 'যুগান্তর' সম্পাদকীয়

বার্তিক

সন্তোষকুমার দে

সকাল থেকে অঝর বৃষ্টি চলছিল দেখে রবিবারের দিনেও বাজারে বের হইনি। চায়ের কাপ আর খবরের কাগজ নিয়ে বসবার ঘরে সময় কাটাচ্ছি এমন সময় এক হাঁটু জল ভেঙে এক ভদ্রলোক আমার কাছে এসে হাজির হলেন। মুখখানা চেনা মনে হলেও নামটি ঠিক স্মরণ করতে পারলাম না, তবু মৌখিক সৌজন্য প্রকাশ করে ভদ্রলোককে বসালাম।

তিনি সবিনয়ে বললেন, মুখুজ্জে মশাই পাঠালেন, আমিও ভাবলাম এমন ভর-বর্ষায় নিশ্চয় বাড়িতেই পাবো, তাই চলেই এলাম।

মুখুজ্জে মশাই আমার সম্বন্ধী, বড় একটা বাইন্ডিং কারখানার মালিক। তাঁর কাছে নানা ধরণের লোকের যাতায়াত—বলা বাহুল্য পাবলিশার প্রেস-ওনার এ সবই বেশী। কিন্তু আমার সঙ্গে এই ভদ্রলোকের কি প্রয়োজন সেটা ধরতে না পেরে জিজ্ঞাসা করলাম—আমি কি করতে পারি?

ভদ্রলোক বিনয়ে একেবারে নুয়ে পড়লেন, বললেন—মুখুজ্জে মশাই-ও বললেন, আমিও জানি,—আপনি না পারলে একাজ আর কেউ পারবে না। সেদিন নিজকানে শুনলাম-তো আপনার বক্তৃতা, রেডিওতে আপনি বললেন সেদিন বাংলা দেশ সম্বন্ধে। আপনার এ বিষয়ে ইনটারেস্ট আছে।

রেডিওতে কত বিষয়ই বলতে হয়। খবরের কাগজে চাকরি করি, আমাদের কাজই তো খবরের সন্ধান নেওয়া আর খবর বিতরণ করা।

বল্লাম—আপনি কি জানতে চান? কার কথা বলছেন?

তিনি বললেন—আজ্ঞে—মুজিবর।

মুজিবরের খবর আমি আর নতুন কি বলতে পারি? সবাই যেটুকু জানেন আমিও তাই জানি। তাঁকে বললাম সে কথা।

তিনি বললেন—আজ্ঞে তা নয়, মুজিবরের নামে আমি একটি গান বেঁধেছি, গানটি আপনাকে শোনাতে চাই!

আমি যে গানের একজন সমঝদার শ্রোতা এমন কথা আমার নিন্দুকেও বলবে না, তবু ভদ্রলোক এই অঝর বৃষ্টিতে এক হাঁটু জল

ছেড়েছেন আমায় একটি স্বরচিত গান গেয়ে শোনাতে এসেছেন আর আমি কি সে গান না শুনে তাঁকে ফিরিয়ে দিতে পারি?

বললাম—বেশ তো, গেয়ে শোনান তবে।

ভদ্রলোক এবার গুছিয়ে বসলেন, তারপর বললেন,—তার আগে এই বর্ষার দিনে একটু গরম জল গলায় না পড়লে তো 'রা' সরবে না। যদি কিছু মনে না করেন—

আমি কিছু মনে না করলেও আমার গৃহিনীর বিলক্ষণ কিছু মনে করবার আশঙ্কা ছিল, কারণ ইতিমধ্যেই বৃষ্টির অজুহাতে আমার তিন পেয়ালা চা খাওয়া হয়ে গেছে, চতুর্থ পেয়ালা তখনও আমার হাতে। তবু ভয়ে ভয়ে খবর পাঠালাম—আর এক পেয়ালা চায়ের জন্য।

চা নিয়ে তার সঙ্গে একটা মুখঝঙ্কার ফাউ দিতে এসে গৃহিণী লজ্জায় পড়লেন। আগন্তুককে দেখে দোর গোড়ায় থেমে গেলেন।

ভদ্রলোক কিন্তু খুব সপ্রতিভ, বললেন—বৌদি, বিরক্ত হলেন না তো। আপনাদের গান শোনাতে এলাম কিনা, তাই তার আগে একটু গলা ভিজিয়ে নিতে চাই, এই আর কি। তা আপনি ওখানে দাঁড়িয়ে রইলেন কেন, বসুন না দাদার কাছে তক্তপোষটায়। আমি এক্ষুণি একটা দেশ-নাড়ানো সাড়া জাগানো গান শোনাচ্ছি!

গৃহিণী রান্না চাপিয়ে এসেছেন, সুতরাং তক্ষুণি বসতে পারলেন না, তবে চা-পর্ব শেষ হতে হতেই তিনি এসে পড়বেন এই আশ্বাস দিয়ে ভিতরে চলে গেলেন।

চা পর্ব শেষ করে আগন্তুক গান ধরলেন, মামুলি কথায় এবং পরিচিত সুরে মুজিবরের জন্য লক্ষ লক্ষ হাত হাতিয়ার নিয়ে গর্জে ওঠার শপথ মন্দ লাগল না। আমার মৃদু-অভিনন্দনে সেই ভদ্রলোক পরম উৎসাহিত হয়ে উঠলেন এবং বললেন, জানি, ভালো লাগবেই। সেই জন্যই তো মুখার্জি মশাইকে ধরে বৃষ্টি মাথায় করে আসা। কিন্তু দাদা, শুধু ভালো বললেই তো হবে না, এখন গানটা যাতে রেকর্ড করা যায় তার একটা ব্যবস্থা করে দিন। তার জন্যই আপনার কাছে আসা। আপনি ইচ্ছা করলেই এটা হতে পারে।

মহা ফ্যাসাদে পড়া গেল। এ জানলে গানের প্রশংসা না করে চুপ চাপ থাকতাম। কিন্তু হাতের ঢিল ছুঁড়ে ফেলেছি, এখন তো আর উপায় নেই। তাই অসহায়ের মত বললাম—রেকর্ড করাবার হাত তো আমার নেই। সে যারা রেকর্ড তৈরী করেন তাঁদের সঙ্গে যোগাযোগ করুন। আমার তো কোন আর্টিস্ট বন্ধুও নেই, মিউজিক ডিরেক্টরও জানাশোনা নেই!

ভদ্রলোক বললেন—কিন্তু খবরের কাগজ তো হাতে আছে। তাতে লিখে কিছু করতে পারেন না? অন্তত আমার এই গানটি ছাপিয়ে দিন্ না কাগজে!

ভদ্রলোক যে বেশ মতলববাজ এখন তা স্পষ্ট বুঝতে পারলাম, তাকে একটু বাজিয়ে নেবার জন্য বললাম, খবরের কাগজে গান ছাপা হয় না, গান ছাপতে হয়তো কোন সাপ্তাহিক কি মাসিকে পাঠান।

ভদ্রলোক বললেন—বেশ তো, আপনার জানাশোনা আছে তো সব পত্রিকার সম্পাদকের সঙ্গেই, একখানা চিঠি লিখে দিন, এখুনি দিয়ে আসি।

আমি তবু বললাম—তা ছাড়া খবরের কাগজে টাটকা জিনিস চাই। এ গানটা নিশ্চয় অনেক দিন আগে লিখেছিলেন—তখন সবাই মুজিব মুজিব বলছিল। এখন সবাই চিল্লাচ্ছে—নিক্সন নিক্সন করে। জাহাজ জাহাজ গুলি বারুদ বোমারু বিমান ট্যাঙ্ক পাঠাচ্ছে যে যুদ্ধ জিইয়ে রাখতে তার চোদ্দ-পুরুষ উদ্ধার করছে সবাই। এমন কোন টপিক্যাল বিষয়ের উপর লেখা চলে খবরের কাগজে চলে।

ভদ্রলোক এক মিনিট ইতস্তত করে বললেন,—একটা দিন সময় দিন, আগামী-কালই আমি দুদুটো গান বেঁধে নিয়ে আসবো,—একটা ইয়াহিয়ার উপর আর একটা মার্কিন সমরাস্ত্র সরবরাহের উপর—সেটা আপনার পছন্দ হয় ছাপবেন।

লোকটা দেখছি নাছোড়বান্দা, যেনতেন প্রকারেণ তার একটা লেখা ছাপানোই চাই। ভদ্রলোকের জন্য আমার কেমন সহানুভূতি জাগল—আহা বেচারী, হয়ত নিজের নামটা ছাপার অক্ষরে দেখবার সুযোগই পায়নি।

কৌতূহল বশত জিজ্ঞাসা করলাম—আপনি কি কাজ করেন?

আমার অন্তরঙ্গতায় উৎসাহিত হয়ে তিনি বললেন—বারো বছর মার্টিন রেলে ছিলাম, রেল উঠে গেল, এখন আছি লোফার্স এন্ড বাফার্স কোম্পানিতে, মেকানিক্যাল ডিপার্ট-মেন্টে হেড অ্যাসিস্ট্যান্ট। হাতের কাজ, সূক্ষ্ম যন্ত্রপাতির—কাজ ভালো জানি। তবে কবিতা লেখা, গান বাঁধা এটা আমার শখ, আমার স্ত্রী বলেন—বাতিক। এটা নিয়ে কিছু করতে চাই, সে প্রতিভা আমার আছে, কিন্তু বিকাশের পথ খুঁজে পাচ্ছি না।

আমার দুঃখ হল। মানুষ তো কেবল রুটি পেলেই বেঁচে থাকতে পারে না, তার জন্যই সে কবিতা লেখে, গান গায়, ছবি আঁকে—এমন কত কি করে!

লোফার্স এন্ড বাফার্স কোম্পানীর মেকানিক্যাল ওয়ার্কশপে যে লোকটি ডিউটি দেয় সে আর আমার সম্মুখে উপবিষ্ট লেখা ছাপাবার উমেদার এই দুজন কি এক ব্যক্তি? বাহ্যত এক দেহধারী হলেও বস্তুত তারা দুই পৃথক সত্তা। একজন যন্ত্রের পৌন-পুনিকতায় ক্ষিপ্র হাতে নিপুণভাবে কাজ চালাতে ওস্তাদ। সে শুধু দিনগত পাপক্ষয়ের মত একটা কিছু কাজে জীবিকা উপার্জন মাত্রই উদ্দেশ্য।

কিন্তু যে মন তাঁকে এক হাঁটু জল ভেঙে এই ঘোর বর্ষায় লেখা ছাপাবার উমেদারীতে নিযুক্ত করেছে সে হল স্রষ্টার মন, শিল্পীর মন—এখানে সে অনেক বড়, অনেক মহৎ।—ভাবছিলাম এই সব কথা।

এমন সময় বর্ষাতি গুটিয়ে আমার ভাগ্নী ঝন্টি ঘরে এসে ঢুকলো এবং আগন্তুক ভদ্র-লোককে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে বলতে লাগলো বড় মামা, তুমি এখনো তৈরী হও নি। আজ যে আমাদের ফাংসান। তোমাদের কাগজের তরফে তোমায় নেমন্তন্ন করেছিলাম—তাই তোমায় নিতে এসেছি, এক্ষুনি তৈরী হয়ে নাও।

ভদ্রলোককে আর একদিন আসতে বলে উঠতেই হল। ঝন্টি শুধু আমার ভাগ্নী নয়—আমাদের পারিবারিক চিকিৎসক, সে একজন ভালো ডাক্তার, বিলিতি ডিগ্রিও আছে।

কিন্তু তার-ও কি এটা বাতিক—এই জলসায় গান গাওয়া, শিল্পী হিসাবে নাম কেনার চেষ্টা। কাগজে ছবি ছাপানো?

তাকে কল্ দিয়ে রোগী দেখবার জন্য বালিগঞ্জ থেকে কসবায় নিতে হিমসিম খেতে হয়, কিন্তু গানের জলসায় গাইতে নেমন্তন্ন করলে কোন্নগর চুঁচুড়া শ্রীরামপুরে যেতেও বাধা পেতে হবে না। একবার তো দল বেঁধে দিল্লী ঘুরে এলো, শুধালাম ব্যাপার কি? না—রাজধানীতে গান শুনিয়ে এলাম।

ঝন্টির সঙ্গে তার গাড়িতে উঠে বসে নিজের কথাই ভাবতে লাগলাম। করি খবরের কাগজের চাকরি, কলম পেশা কাজ। কিন্তু তুলির টান কেন আমাকে এতো টানে? সেই ছোটবেলায় ড্রইং ক্লাসে ছবি আঁকবার যে ঝোঁক ছিল তা-তো মরেও মরে না। অ্যাকা-ডেমিতে যখনি কোন প্রদর্শনী হয়, তন্ন তন্ন করে দেখি, সময় সুযোগ পেলে শিল্পীদের স্টুডিওতেও যাই এবং বলতে দ্বিধা নেই, এখনও আমি ছবি আঁকি। আশায় আশায় আছি, শীঘ্রই একটা একক প্রদর্শনীর আয়োজন করব—যাতে সাংবাদিকরা আমাকে শিল্পী হিসাবেই প্রতিষ্ঠা দেবে।

সংসারে এমন বাতিকগ্রস্ত লোক তবে আমি একা নই। আমি সাংবাদিক কিন্তু হতে চাই শিল্পী, ঝন্টি পাশ করা ডাক্তার—প্রতিষ্ঠা পেতে চায় গায়িকা হিসাবে, আর ঐ আগন্তুক ভদ্রলোক নিপুণ কারিগর কিন্তু তার মন পড়ে থাকে কবিতার আর গানের দরবারে। তবে কি যে যা হতে পারে নি তার উপরেই তার আকর্ষণটা আন্তরিক?

গাড়ি নিউ এম্পায়ারের কাছে এসে দাঁড়াল, সম্মুখে দেখলাম ঝন্টির মস্ত বড় একখানা মুখ এঁকে বিজ্ঞাপন দিয়েছে—কারণ আজকের আসরে সেই প্রধান শিল্পী।

হরপ্পার ফুল

নির্মল সরকার

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

ডাঃ সোমের সঙ্গে অরুণ সীমার চিকিৎসা সম্বন্ধে কথা বলছিল।

আপনার কি মনে হয়? জিজ্ঞেস করল অরুণ।

শিশুকালের একটা অসন্তোষ আর আঘাতের ফলে এ ধরনের অস্বাভাবিকতা আসতে পারে।

সেটা কি বুঝতে পারা যায়?

সঠিক এখনও জানা যাচ্ছে না অন্তত কারণটা এখনও অজ্ঞাত রয়েছে। তবে এটা বেশ স্পষ্ট যে, প্রবৃত্তিটা প্রতিশোধ বলে মনে হয়। এমন একজন কেউ ছিল যাকে উনি ঘৃণা করতেন, কিন্তু তার বিরুদ্ধে কিছু করার মত শক্তি ছিল না।

বাবা, মা, কিংবা অন্য কোন নিকট আত্মীয়ের ওপর এধরনের বিদ্বেষ জন্মাতে পারে। নিকট আত্মীয়ের ওপরই বিদ্বেষ বিশেষ ভাবে জন্মায়, অন্য লোক হলে এতটা অসহ্য লাগে না। প্রতিশোধ স্পৃহাটা এত প্রকট হয় না। বাই দি ওয়ে ও'র ভেতর কোন অস্থিরতা লক্ষ্য করেছেন?

একটু ভেবে উত্তর দিল অরুণ—না। তাছাড়া ও'র মনের ভাবও সহজে প্রকাশ করে না। তবে সম্প্রতি একটা ঘটনায় কিছুটা পরিবর্তন দেখা গিয়েছিল।

কি ঘটনা? ডাঃ সোম উৎসুক হলেন।

কিছুদিন আগে আমার জ্বর হয়েছিল। আমার অজ্ঞান অবস্থায় ও সে রাতে আমার পরিচর্যা করেছিল। হেমন্ত মানে আমাদের একজন চাকরের কাছে শুনেছি সে সময় নাকি খুব উতলা হয়ে পড়েছিল।

দিস্ ইজ স্ট্রেঞ্জ, মন্তব্য করলেন ডাঃ সোম; একলা ছিলেন উনি?

না হেমন্তকে রেখেছিল ঘরে।

আই সি; আচ্ছা, কুকুরটা সম্বন্ধে ও'র মনোভাব এখন কেমন?

আতিশয্যটা এখন কমেছে বলে মনে হয়।

কি করে বুঝলেন?

একজন চাকর ওকে নিয়ে যায় বেড়াতে; এখন আর ও ওদিকে নজর দেয় না।

উনি কি খেতে ভালবাসেন?

একটু ভাবতে সময় লাগল অরুণের। এটা সে লক্ষ্য করে নি। বা করার মত সুযোগও হয় নি। সীমা তার সঙ্গে কদাচিৎ খাবার টেবিলে বসে। তাছাড়া এ জিনিসটা মেয়েদের ব্যাপার, সচরাচর কেউ লক্ষ্য করে বলে মনে হয় না অরুণের। তাই সে বলল, আমি এটা ঠিক বলতে পারব না ডাঃ সোম।

ডিম কিংবা চিংড়ি মাছ ভালবাসে বলে জানেন?

ঠিক তার উল্টো: ব্রেকফাস্টে ডিম ও কোনদিনই খায় নি বলে জানি।

আমার কাছে কিন্তু উনি বলেছেন যে ডিম আর চিংড়ি মাছ ওঁর প্রিয় খাদ্য। যাই হোক্ একটা খেই খুঁজে পেলে জট ছাড়াতে সুবিধে হয়।

আর কটা সিটিং দিতে চান? জিজ্ঞেস করল অরুণ।

বলা শক্ত, এটা সম্পূর্ণ রোগীর ওপর নির্ভর করে। যদি সহযোগিতা করেন আর বাধা সৃষ্টি না করেন তাহলে দেরী হবে না। আর কোন পরিবর্তন লক্ষ্য করেছেন সংসার বা আপনার সম্বন্ধে।

না, কয়েকদিন ধরে দেখছি একটু গম্ভীর হয়েছে, কথা কম বলে।

ঠিক আছে, আপনি বুধবার পাঠিয়ে দেবেন।

ফোনটা রেখে অরুণ প্যাসেজ দিয়ে বারান্দায় গিয়ে দাঁড়াল। সীমার ঘরে আলো জ্বলছে দেখে সে ফিরে এসেছে বলে অনুমান করল। কিন্তু ডাঃ সোমের কথা অনুসারে তার প্রায় দেড়ঘন্টা আগে বাড়ী আসা উচিৎ ছিল। এসময়টা সীমা কাটাল কোথায়। চিন্তাগ্রস্ত হয়ে পড়ল অরুণ। সীমার দায়িত্ব সে নিয়েছে। সুতরাং সেদিক দিয়ে তার কোন ত্রুটি হলে লজ্জার কথা হবে। সীমার বন্ধ দরজায় টোকা দিল অরুণ।

কে? সীমা তাড়াতাড়ি স্যুটকেশটা খাটের তলায় রেখে দিল।

আমি, একবার আসবে, বলল অরুণ।

বেরিয়ে এল সীমা। এতক্ষণ অরুণ ডাঃ সোমের সঙ্গে কথা কইছিল এটা জানে সে।

কোথায় ছিলে এতক্ষণ? সোজা ঠান্ডা দৃষ্টিতে তাকাল অরুণ।

ডাঃ সোমের চেম্বারে।

তারপর কোথায় গিয়েছিলে?

তাতে আপনার কি? চেঁচিয়ে উঠল সীমা।

না আমার কিছু নয়, কিন্তু তুমি ভুলে যাচ্ছ আমরা পরস্পরের দিকে না নজর রাখলে আমাদের ক্ষতি হবে। শান্ত কণ্ঠে কথাটা বলল অরুণ।

আমি একথা মানি না, আপনার মতে আমি সায় দিতে পারি না।

কেন?

গোয়েন্দাগিরি করার মত আমার স্পৃহা নেই। এটা গোয়েন্দাগিরি নয়। স্বামী-স্ত্রী পরস্পরের মঙ্গল কামনা করবে এতে অস্বাভাবিক কিছু নেই।

আছে, আমি কি করি না করি সেদিকে আপনার নজর দেবার কোন অধিকার নেই।

আছে। মুখের ভাবটা শক্ত হল অরুণের।

আমার নিজের স্বাধীনতা বলে কিছু নেই?

স্বাভাবিক হলে থাকত, কিন্তু তা তুমি নও।

এটা আপনার একটা জঘন্য চাল, আপনি একজন স্যাডিস্ট। জেনেশুনে একজন অপরিচিতা আর অসহায় মেয়েকে বিয়ে করেছেন কেন, তা বোঝার মত বুদ্ধি আমার আছে।

তোমার বুদ্ধির শেষ নেই; তবে তুমি অপরিচিতাও নও আর অসহায় ত নয়ই। তোমার পরিচয় আমি ভালভাবেই জানি।

কি জানেন? হঠাৎ জ্বলে উঠল সীমা। মুখটা তার পাংশু হয়ে গেল সঙ্গে সঙ্গে।

অসহায় বলে হাজার হাজার টাকা আত্মসাৎ করার মত সাহস হত না। আস্তে আস্তে বলল অরুণ।

আমি চোর, কিন্তু আপনার মত স্যাডিস্ট নই। আমার ওপর অত্যাচার করার সুবিধে হবে বলে, আমায় এভাবে বিয়ে করে আটকে রেখেছেন।

অত্যাচার আবার করলাম কোথায়?

ভদ্রতার মুখোশ পরে সেই সুযোগের অপেক্ষায় আছেন এটা আমি বেশ বুঝতে পারি।

ওটা তোমার মনগড়া কথা; তুমি নিজে ভালভাবেই জান আমি কোনদিন সুযোগ নিইনি বা নিতে চাই না। আর আমি আর যাই হই না কেন, স্যাডিস্ট যে নই, সেটা তোমার কাছে আবার নতুন করে প্রমাণ দিতে হবে বলে মনে হয় না। এবার বল, ডাঃ সোমের চেম্বার থেকে কোথায় গিয়েছিলে? গলার স্বরটা কঠিন হয়ে উঠল অরুণের।

বলব না, শক্ত হয়ে দাঁড়িয়ে বলল সীমা।

সীমার মুখ থেকে কথা বার করা শক্ত।

......গ্রীষ্মের ছুটি, স্কুল বন্ধ হয়ে গিয়েছে। বাড়ী এসেছে সীমা। বোর্ডিং খোলা থাকলে সে নিশ্চয় আসত না, কিন্তু উপায় নেই। আবার সেই স্যাঁৎসেঁতে নোনা ধরা বাড়ী। এখন সীমার বয়সের চেয়ে বুদ্ধিটা বেড়ে গিয়েছে। তার ফিরে আসাতে নানুকাকা বা মা, কেউ খুশী নয়। এটা সে জানে, তাই মনটা তার প্রস্তুত আছে। সে এবার ওদের সঙ্গে শক্ত পরীক্ষা করতে চায়।

আমার সিল্কের নতুন শাড়ীটা ছিঁড়লে কে? হঠাৎ মা চেঁচিয়ে উঠল।

আরে এতো ব্লেড দিয়ে কাটা মনে হচ্ছে—নানুকাকার মন্তব্য।

এই, তুই আমার শাড়ী ব্লেড দিয়ে কেটেছিস কেন? সরাসরি আক্রমণ।

আমি ব্লেড কোথায় পাব? ভালমানুষের মত মুখ করল সীমা।

পেন্সিল কাটিস কি দিয়ে? জেরা করে নানুকাকা।

আমি ত পরশু মাত্র এসেছি, বই খাতা ত বার করিনি এখনও।

খোল্ তোর ট্রাঙ্ক, আমি দেখব—মা এগিয়ে এল।

বেশ, বাবা এলে দেখো, বাবার কাছে চাবি আছে।

সীমা নানুকাকার ব্লেড দিয়ে মায়ের কাপড় কেটেছে সকলের অলক্ষ্যে। বাবা আসতে তুলকালাম কাণ্ড হল। সীমার ট্রাঙ্ক খুলে ব্লেড পাওয়া গেল না। বাবা তার হয়ে ঝগড়া করল খুব। সীমার এটা খুব ভাল লাগে। অবশ্য বাবা, মা আর নানুকাকার সঙ্গে পেরে ওঠেন না। মা একাই একশ। নানুকাকা মাঝে মাঝে শুধু ফোড়ন দেয়। তার পরের ঘটনায় সীমা আনন্দ পেয়েছিল প্রচুর কিন্তু খেসারতও দিতে হয়েছিল সেই সঙ্গে। মাংস চেপেছে উনুনে। বাবা নাইট ডিউটিতে। সীমা ঘুমের ভান করে বিছানায় পড়ে আছে। নানুকাকা একটা নভেল পড়ছে দালানে বসে। মা ব্যস্ত হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে। দুজনেরই বেশ হাসি হাসি ভাব। আজ একটা নতুন সিল্কের শাড়ী এসেছে মায়ের জন্য। দুজনে মাঝে মাঝে ফিস ফিস করে কি যেন বলছে। কথাগুলো বুঝতে পারছে না সীমা তবে হাসির আওয়াজ বেশ স্পষ্ট শোনা যাচ্ছে।

যাও তুমি মুখ ধুয়ে নাও, মাংস হয়ে এল।

আর যাচ্ছি, আর একটু বাকি আছে, বইটা ভারী ইন্টারেস্টিং। নানুকাকা মাঝে মাঝে ইংরেজী বলে।

না, আর একটুও দেরী নয়, কপট রাগ করল মা।

যাচ্ছি রে বাবা, নানুকাকা টেবিলের ওপর বইটা ছুঁড়ে দিল সশব্দে।

নানুকাকা কলে গেলে মা রান্নাঘর থেকে শোবার ঘরে এসে বিছানা ঝাড়বে। এই সুযোগ। থালা, বাটি, গ্লাসের ঠুংঠাং শব্দ হচ্ছে। মা এবার আসন পেতে খাবার দিচ্ছে নানুকাকাকে। সীমা উৎকর্ণ হয়ে রইল।

ওরে বাপরে, নানুকাকার গলা।

কি হল? জিজ্ঞেস করল মা।

মুখ জ্বলে গেল রে বাবা—।

সীমা হাসি বন্ধ করার চেষ্টা করছে আপ্রাণ।

কেন?

ঝাল আবার কেন? হিস হিস করছে নানুকাকা।

ঝাল, দেখি; ইস, তাইত, এ যে আগুনের মত; কিন্তু এত নুন হল কেন?

তা আমি কি করে বলব? নানুকাকার প্রায় কেঁদে ফেলার অবস্থা।

আমি জানি। মা দুম দুম করে সীমার ঘরে ঢুকল।

এই সর্বনাশী ওঠ, চুলের মুঠি ধরে তুলল সীমাকে।

কি! সীমা অবাক হবার ভান করে।

কি? হারামজাদী নচ্ছার মেয়ে, আবার জিজ্ঞেস করছে, কি?

ওকি করছ? নানুকাকা ব্যাপারটা বুঝতে পারছে না তখনও।

সব লঙ্কা বাটা আর অর্ধেক নুন মাংসতে ঢেলেছে আর কিছু নয়।

না আমি করিনি, জোরের সঙ্গে বলল সীমা।

অমানুষিক অত্যাচার হল সীমার ওপর। গরম মাংসের ঝোল তার গায়ে ঢেলে দিল মা। মোটা জামা ছিল বলে কয়েকটা ফোস্কার ওপর দিয়ে গেল, তা না হলে বিপদ ঘটত। সীমা কিন্তু অত অত্যাচার সত্ত্বেও স্বীকার করল না শেষ পর্যন্ত।

কি ভাবছ অত? ভাববার কিছু নেই, বলল অরুণ. তুমি যদি নিজের গলায় ফাঁস দিতে চাও তাহলে তোমায় কেউ বাঁচাতে পারবে না।

ফাঁসটা আপনিই পরিয়েছেন আমি সেটা খুলতে চাইছি।

তুমি তাহলে যা বোঝ কর কথাটা বলে অরুণ তার ঘরে চলে গেল।

তার পরের দিনের ঘটনা। সকালবেলা অফিস যাবার জন্যে তৈরী হচ্ছে অরুণ। কাপড়জামা পরে তার হঠাৎ নজরে পড়ল দেয়ালের ঘড়ির ওপর। অনেক দেরী হয়ে গিয়েছে। কিন্তু হাতঘড়িটা অন্যরকম বলছে। প্রায় আধঘন্টা স্লো। টেবিলের ওপর থেকে তাড়াতাড়ি খুচরো জিনিসগুলো পকেটে ফেলে সে গাড়ীটা বার করে জোরে ড্রাইভ করল অফিসের দিকে।

অরুণের গাড়ীর আওয়াজ মিলিয়ে যাবার পর ধীরে সুস্থে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল সীমা। তার প্রাথমিক কাজগুলো সাফল্যলাভ করেছে। দেয়ালের ঘড়িটা সে আধঘন্টা ফাস্ট করে রেখেছিল অরুণ যখন স্নানে ব্যস্ত। অরুণের হঠাৎ ঘড়ি দেখে উত্তেজনা হওয়ায় নিজের হাতঘড়ির সময়ের সঙ্গে মিলিয়ে অবাক আর বিরক্ত হওয়ায় এবং শেষকালে টেবিলের ওপর তার সমস্ত জিনিসগুলো একত্র করে পকেটে পুরে তার কোনরকমে দৌড়ান, এ সবেই সীমা আনন্দ পেয়েছে। অরুণ সময় মেনে চলে বলে সীমা জানে। হাতের ঘড়িটা সে পারতপক্ষে খোলে না। সময়টা তার ছকে বাঁধা। একটু তফাৎ হলেই সে অস্থির হয়ে পড়ে। বিরক্ত দেখা দেয় তার কপালের কুঞ্চিত রেখায়। সেটা জেনেই সীমা দেয়ালের ঘড়ির কাঁটাটা আধ-ঘন্টা এগিয়ে দিয়েছিল। অরুণের মনের অবস্থা এতে কি হবে সেটাই আন্দাজ করেছিল সে। উত্তেজনায় টেবিলে রাখা তার নিত্য ব্যবহার্য জিনিসগুলোর দিকে না তাকিয়ে সেগুলো পকেটে ভরে নিয়েছিল তাড়াতাড়ি। তার চাবির গোছা যে সীমা ইতিমধ্যে বদল করে নিয়েছে এটা লক্ষ্য করার মত মনের অবস্থা অরুণের ছিল না। খুশী হল সীমা সাফল্যের সূচনায়। এবার সে নিশ্চিন্ত মনে আবার আগের মত কাজ করে যাবে প্রাণের আনন্দে। এবার সে মুক্তি পাবে। বন্দী জীবন থেকে।

অরুণের ঘরে ঢুকে সে দরজা বন্ধ করে দিল। সবদিকেই তার নজর আছে। মস্তিষ্ক তার সজাগ থাকে সর্বদা। আলমারীর চাবি লাগিয়ে দরজা খুলে ফেলল সে। ধীরে সুস্থে সব জিনিসগুলো দেখতে লাগল সীমা। ওপরের তাকে অ্যাটাচি কেসটা পূর্ববৎ একই জায়গায় রাখা আছে। আগের বারই সে দেখেছে তার সবই অক্ষুণ্ণ আছে। তাই সে দিকে আর নজর দিল না। কেসটা সে মেঝেতে নামিয়ে রাখল। তার কেসের তলা থেকে এক গোছা পাট করা রুমাল, এলোমেলো মুচড়ে যাওয়া কতকগুলো টাই আর একটা ফটো বার হল।

ঝন ঝন করে টেলিফোনের ঘন্টা বেজে উঠল ড্রইং রুমে। চমকে উঠেছে সীমা হঠাৎ আওয়াজ শুনে। হেমন্ত রান্নাঘরে, করুণা বাইরে, সুতরাং তাকেই ধরতে হবে ফোনটা। দরজা খুলে বেরিয়ে এল সীমা।

হ্যালো, বুকের ভেতর কাঁপছে সীমার।

মিঃ বোস আছেন?

না বেরিয়ে গেছেন, উত্তর দিল সীমা।

আপনি কে কথা বলছেন?

আপনার কি দরকার বলুন। সম্পর্কের কথাটা বলতে চায় না সে।

আমি "হীরালাল জুয়েলার্স" থেকে ফোন করছি। মিঃ বোস ওঁর স্ত্রীর জন্যে একটা নেকলেসের অর্ডার দিয়েছেন, সেটা রেডি হয়ে গিয়েছে। বাড়ীতে পাঠিয়ে দেব না উনি নিজে ডেলিভারী নেবেন?

আমি বলতে পারছি না, মিঃ বোস এলে জানাব।

ধন্যবাদ; ফোনটা কেটে গেল।

অদ্ভুত একটা এলোমেলো অনুভূতি সীমার মনে এল। কে স্ত্রী? সে? তার জন্যে নেকলেস অর্ডার দিয়েছে অরুণ বসু। ধোঁয়া ধোঁয়া কুয়াশা তার চেতনা আচ্ছন্ন করে দিচ্ছে যেন। ধীরে ধীরে আবার

অরুণের ঘরে গিয়ে দরজা বন্ধ করল সে। আলমারীর কাছে এসে তার ফটোর কথাটা মনে পড়ে গেল। একটা মেয়ের ছবি। ভাল করে তাকিয়ে দেখতে লাগল সে। ছবি দেখে ঠিক বোঝা যায় না তবে অত সুন্দর মুখ সীমা খুব কমই দেখেছে। ছবিটা নিয়ে সে হঠাৎ অন্যমনস্ক হয়ে গেল। মাথার ভেতর সব ওলোট পালট হয়ে যাচ্ছে বলে অনুভব করল সীমা। নিজের ভাবটা তার বুঝতে কষ্ট হচ্ছে রীতিমত। টুকরো টুকরো কথা কতকগুলো শুধু তার কানে বাজতে থাকে। স্ত্রীর জন্যে নেকলেস, আপনি কে?.........তোমার পরিচয় আমি জানি, নিজের গলায় ফাঁস লাগাচ্ছ তুমি। দু'হাতে মাথা চেপে বসে রইল সীমা কিছুক্ষণ। একটু পরেই তার সম্বিত ফিরতে সে দেখল অরুণের বিছানায় এসে বসেছে। বিদ্যুৎ-স্পৃষ্টের মত দাঁড়িয়ে উঠল সীমা। হাতে মেয়ের ছবিটা তখনও ধরা রয়েছে। আর একবার সেটা দেখে নিয়ে ছবিটা সে রেখে দিল যথাস্থানে।

অরুণের বাথরুমে গিয়ে অঞ্জলিপুরে জল নিয়ে সীমা মুখে দিল তারপর ঘরে ঢুকে কুঁজো থেকে এক গ্লাস জল গড়িয়ে খেয়ে নিল এক নিশ্বাসে। তৃষ্ণায় গলাটা কাঠ হয়ে গিয়েছে তার। অসুস্থবোধ করল সীমা। ক্লান্তি আর অবসাদ তাকে দুর্বল করে দিয়েছে অকস্মাৎ।

একটু পরে আবার আলমারীর সামনে দেখতে লাগল সে মনযোগ দিয়ে। সার্ট—হরেকরকমের আর ডিজাইনের। ক'টা হবে? পঁচিশ না তার চেয়ে বেশী? এক একটা করে গুনতে লাগল সীমা। ঠিকই, বত্রিশটা সার্ট। প্যান্ট ক'টা হবে? সেগুলোতে হাত দিতে প্রথমে একটু ইতস্ততঃ করল। তারপর এদিক ওদিক তাকিয়ে গুনতে লাগল সেগুলো। প্যান্টের সংখ্যা কম, মাত্র চব্বিশ। অবাক হয়ে ভাবতে লাগল সীমা। এত পোশাক একটা লোকের কি দরকার হতে পারে!

......বাবার ক'টা জামা ছিল? তিনটে জামা আর তিনটে ধুতি; ব্যাস, আর কিছু নয়। নান্দুকাকার অবশ্য অনেক ছিল। সেদিকে সীমা কোনদিন তাকায়নি ভাল করে। তাদের আলমারী ছিল না। খাটের তলায় বাবার ট্রাঙ্ক থাকত। দরকারের সময় সেটা বাবা টেনে বার করত। সে সময় একটা ঘড়ঘড় করে আওয়াজ হত। সেটা অনেক সময় তার মনে পড়ে এখনও। বাবার ট্রাঙ্কের রঙ ছিল কালো। মায়ের ঘরে একটা দেরাজ ছিল। তাতে মায়ের আর নান্দুকাকার কাপড়জামা থাকত। দেরাজ আর আলমারীতে তফাৎ কি? ওটাকে দেরাজই বলত কেন? আলমারীর চেয়ে সাইজে ছোট। তাতে দুটো পাল্লা, দুটো টানা আর মাঝে তিনটে থাক। মা সেটা রোজ পুঁছত বস করে।......

বৌদি,

কে? বুকটা ধড়াস করে উঠেছে সীমার।

আমি হেমন্ত, দুটো বাজে, কখন খাবেন?

আশ্চর্য হল সীমা। দুটো বেজেছে। এই ত সে ঘরে ঢুকল। অরুণ বেরিয়েছে আজ অন্যাদিনের চেয়ে সকালে। কথাটা মনে পড়তেই সে দেয়ালের ঘড়িটার দিকে নজর দিল, আড়াইটে বেজেছে তাতে। সকালের কথাগুলো মনে পড়ল এবার। তার সমস্ত পরিকল্পনাটা সে সম্পূর্ণ ভুলে গিয়েছিল ইতিমধ্যে। আলমারীর জিনিসগুলো মায় তার অ্যাটাসি কেসটাও সে তুলে রাখল। চাবি বন্ধ করে দিল সীমা। তারপর দরজা খুলে বাইরে এসে দেখল হেমন্ত তার দিকে তাকিয়ে রয়েছে অবাক হয়ে। কারণটা একটু পরেই বুঝল সে আরশির দিকে তাকাতে। মুখটা তার নিজের কাছেই অস্বাভাবিক লাগছে যেন। চোখ দুটো ফুলে গিয়েছে। মুখটাও যেন আরক্ত হয়েছে তার সঙ্গে। কাঁদলে এধরনের চেহারা হয় বটে। কি মুস্কিল, কিন্তু সে কাঁদল কখন? তাড়াতাড়ি নিজের ঘরে গিয়ে ঢুকল সীমা।

সচরাচর অরুণ যে কাজটার ভার নেয় সেটা শেষ পর্যন্ত করতে চেষ্টা করে। ব্যবসাক্ষেত্রে এধরনের বিশেষ শিক্ষা সে পেয়েছে। এটা তার প্রায় মজ্জাগত হয়ে গিয়েছে। সীমা একটা তার কাছে বিরাট সমস্যা। কিন্তু এ সমস্যার সমাধান শেষ পর্যন্ত করতে পারবে কিনা সেবিষয়ে তার সন্দেহ জাগছে এবার। সীমার ব্যবহারে সে বিরক্ত হচ্ছে বলে অনুভব করল। অন্য কিছু নয় তবে যদি আবার চুরি করার কিছু মতলব করে থাকে তাহলে সে শুধু বিপদে পড়বে এবার। সীমার এজিনিসটা কেন মাথায় আসছে না যে এত টাকার সম্পত্তির ওপর তারও ন্যায্য অধিকার আছে। পরক্ষণেই অরুণের মনে পড়ে গেল সীমার স্বভাবের মধ্যেই এ প্রকৃতিটা জোরাল শেকড় গেড়েছে। কিভাবে এবং কত জায়গায় সে সীমাকে রক্ষা করবে? কেসে জড়িয়ে পড়লে পুলিসও তাকে রেহাই দেবে না। সব থেকে লজ্জা হবে তার বাবার কাছে। অসুস্থ বৃদ্ধ ভদ্রলোক অসঙ্কোচচিত্তে সীমাকে কন্যার স্থান দিয়েছেন তার মনে। হঠাৎ এরকম একটা দুর্ঘটনায় তাঁর অবস্থা কিরকম হবে সেটা চিন্তা করে অরুণ বিমূঢ় হয়ে পড়ল। তার নিজের ব্যবসার ক্ষেত্রে দুর্নাম যদি একারণে ঘটে যায় তাহলে সেটাও তার কাছে অসহনীয় হয়ে যেতে পারে হয়ত। নিজের কথা অরুণ ভাবছে না। সে ভাবছে সীমাকে কেন্দ্র করে যে তুমুল ঝড় উঠবে তার কথা। কিন্তু পিছিয়ে যাবার উপায় নেই। ঘুঁটি চালা হয়ে গিয়েছে। ফল যাই হোক না কেন, তাকে মেনে নেওয়া ছাড়া অরুণের অন্য কোন উপায় নেই। আজ কাজ করতে তার মন লাগছে না। সকালের কাজগুলো কোনরকমে সারা হয়ে গিয়েছে। লাঞ্চের পর আবার একরাশ কাজ পড়ে রয়েছে। সেগুলোর কথা ভেবে অরুণ বিরক্ত অনুভব করল। কাজ করতে সাধারণতঃ সে ভালই বাসে। যুক্তি এবং ব্যবসা বুদ্ধিকে কাজে লাগাতে পারলে সে খুশী হয়। আনন্দ পায় সাফল্যের আশায়। এখন কিন্তু অরুণের সে মনোভাব নেই। এখন একটা অজ্ঞাত অঘটনের আশঙ্কায় সঙ্কুচিত হয়ে রয়েছে অরুণ। ঝড়ের আগে গুমোট আর থমথমে আব-হাওয়ার গন্ধ পাচ্ছে যেন সে।

অরুণ কোন কোন দিন বাইরে লাঞ্চ খায়। এটা প্রয়োজনের খাতিরে তাকে মানতে হয়। ব্যবসা-সংক্রান্ত আলোচনায় এধরনের পরিবেশের মূল্য আছে। সম্প্রীতির মধ্যে আদান প্রদানের সুবিধে আছে। পকেট থেকে গাড়ীর চাবি বার করতে গিয়ে সে অন্যমনস্কভাবে তার ঘরের চাবির গোছাটা বের করল। সেটার দিকে নজর করে পকেটে ফেলে দেবার সময় হঠাৎ দেখতে পেল চাবি-গুলো তার নয়। প্রচণ্ড ধাক্কা লাগল অরুণের। বুদ্ধি, অনুভূতি, নিশ্বাস স্তব্ধ হয়ে গেল মুহূর্তকালের জন্যে।

সৌম্য দত্ত সহজ লোক নয়। জুয়েলারী ব্যবসাটা তার পৈত্রিক। সেটা তাকে অনেক সুযোগ দিয়েছে। এর আড়াল থেকে মণি-মুক্তো ছাড়াও অনেক জিনিসের কারবার করে সে। সৌম্য দত্তর চেহারা ভাল। কথা-বার্তা মার্জিত না হলেও চলনসই। মাঝে মাঝে অবশ্য 'শ' এর জায়গায় 'স' এর ব্যবহারটা বেশী করে ফেলে। কোঁচান ধুতি আর গিলেকরা পাঞ্জাবী পরাই পছন্দ করে সে। ব্যবসাবুদ্ধি তার ভালই; তা নাহলে বৌবাজারের ছোট গয়নার দোকান থেকে সে লিণ্ডসে স্ট্রীটে এয়ার কণ্ডিশন করা প্রকাণ্ড দোকান দিতে পারত না। বৌবাজারের আদি দোকান আজও রয়েছে। "নটবর দত্ত এ্যাণ্ড সন্সে"র কর্মচারী আর কারিগররা এখনও পুরনো পদ্ধতিতে কাঁচা কয়লার আগুনে বা প্রদীপের শিখায় পাইপে ফুঁ দিয়ে কাজ করে যায় একমনে। লিণ্ডসে স্ট্রীটের অর্ডার এখানেই তৈরী হয়ে থাকে। তারপর সুদৃশ্য ভেলভেটের কেসে ড্যাজলে গেলে তার দাম বহুগুণ বেড়ে যায়। এতে আরও একটা সুবিধে আছে। বৌবাজারের কারিগরকে লিণ্ডসে স্ট্রীটের দোকানে বসালে বেশী মজুরি চেয়ে বসে। অবশ্য সৌম্য দত্তর এছাড়া আরও ব্যবসা আছে নানারকম। দেশে সোনার চাহিদা ক্রমশঃ বেড়ে যাচ্ছে। মেয়েরা গয়না পরা কমিয়েছেন বলে শোনা যায়, কিন্তু বিয়ের সময় উভয়পক্ষ থেকে যে পরিমাণ সোনার অর্ডার আসে তুলনা করলে আগের দিনের চেয়ে কম বলে মনে হয় না। বিদেশ থেকে বহু উপায়ে সোনা আসে এবং সৌম্য দত্ত ড্যাজেল ও কাউণ্টারের আড়ালে তার সামান্যতম অংশ নিয়ে থাকে। এসপ্ল্যানেড, চৌরঙ্গী অঞ্চলে এধরনের অনেক (বিলাইতি) মাল কিছু মুদ্রার বিনিময়ে আদানপ্রদান হয়ে থাকে নিয়মিতভাবে। কাঞ্চন ছাড়া কামিনীর ওপরও লোভ আছে সৌম্য দত্তর।

(ক্রমশঃ)

ভারততত্ত্ববিদ

ডঃ সুচিপ্তো বীর্যসুপার্থো

ধ্রুবকুমার মুখোপাধ্যায়

ভারততত্ত্ববিদ ডঃ সুচিপ্তো বীর্য-সুপার্থ আর ইহজগতে নেই। মাত্র তিন মাস আগে তিনি অস্ট্রেলিয়ান ন্যাশনাল য়ুনিভার্সিটিতে কর্মরত অবস্থায় পরলোক-গমন করেছেন। কলকাতায় বসে ডঃ সুচিপ্তোর পরলোকগমনের খবর আমাদের কারুরই জানা ছিল না; জুলাইয়ের অপরাহ্নে একথা জানা গেল ডঃ এ এল ব্যাসহামের কাছ থেকে: ডঃ ব্যাসহামের নাম ভারততত্ত্বের ক্ষেত্রে সুপরিচিত। তিনিও অস্ট্রেলিয়ান ন্যাশনাল য়ুনিভার্সিটির ডিপার্টমেন্ট অফ এশিয়ান সিভিলাই-জেশনের অধ্যাপক।

ভারততত্ত্ব ও ইন্দোনেশীয় প্রাচীন ইতিহাস, সাহিত্য, সংস্কৃতি সম্বন্ধে আলোচনার প্রসঙ্গান্তরে ডঃ এ এল ব্যাসহাম ভারাক্রান্ত কণ্ঠস্বরে ডঃ সুচিপ্তোর প্রয়াণ সংবাদ জানালেন। পূর্বসূরীদের শ্রদ্ধা না জানালে জাতিগত ঋণ অপরিশোধ্য থাকে। তাই তাঁর জীবনের সংক্ষিপ্ত পরি-চিতি ও শ্রদ্ধা জানানো অবশ্যকর্তব্য মনে করে স্মৃতিচারণায় প্রবৃত্ত হওয়া।

আমি ডঃ সুচিপ্তোর প্রত্যক্ষ ছাত্র না হলেও তাঁর কার্যক্রম, পদ্ধতি ও ভারতবিদ্যা সম্পর্কে অভিজ্ঞতার সঙ্গে জড়িত ছিলাম। তিনি আমাকে নানাভাবে উপদেশ ও পরামর্শ দান করেছেন; প্রয়োজনমত চিঠি লিখেছি, সঙ্গে-সঙ্গে উত্তরও পেয়েছি। শুধু উত্তরই নয়; বই, ফটো, প্রবন্ধাদি পাঠাতেও তিনি ছিলেন মুক্তহস্ত। পরিচিতির দিক থেকে ইন্দোনেশিয়ান হয়েও তিনি বৃহত্তর মানব সংসারের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। তাঁর তীক্ষ্ণ বিশ্লেষণী ক্ষমতা, চিন্তার স্বচ্ছতা ও যুক্তি পারম্পর্য অনুযায়ী তথ্যবিন্যাস শুধু ইন্দোনেশীয় সংস্কৃতি চর্চার ইতিহাসেই নয়, ভারতবিদ্যার ক্ষেত্রেও এক নতুন অধ্যায় উন্মুক্ত করেছে।

মধ্য জাভার সুরাকার্তায় ডঃ সুচিপ্তোর জন্ম। যোগ্যাকার্তার গাজামাদা বিশ্ব-বিদ্যালয় থেকে বি-এ ডিগ্রী পাবার পর ইন্দোনেশিয়া বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ১৯৫২ খৃঃ এম-এ ডিগ্রী লাভ করেন। ১৯৫২ খৃঃ ইন্দোনেশিয়া সরকার তাঁকে উচ্চতর অধ্যয়ন-এর জন্য কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রেরণ করেন। ১৯৫২—৫৪ সাল, মোট দু বছর তিনি দেবপ্রসাদ ঘোষ, ডঃ কল্যাণকুমার গঙ্গোপাধ্যায় প্রভৃতি সুধী অধ্যাপকদের কাছে ভারতবর্ষের প্রাচীন ইতিহাস ও সংস্কৃতি অধ্যয়ন করেন। তাঁর বিশেষ অধ্যয়নের বিষয় ছিল—ফাইন আর্টস। বিশ্ব-ভারতীতেও তিনি কিছুকাল অধ্যয়ন করেন। এর পর স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করে তিনি ইন্দোনেশিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রত্নতত্ত্ব ও সংস্কৃতি বিভাগের অধ্যাপক নিযুক্ত হন। ১৯৬০ খৃঃ তিনি 'ঘটোৎকচ' গবেষণা নিবন্ধের জন্য ইন্দোনেশিয়া বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পি-এইচ-ডি ডিগ্রী লাভ করেন। এর পর তিনি ঐ বিশ্ববিদ্যালয়েরই প্রত্নতত্ত্ব ও সংস্কৃতি বিভাগের প্রধান অধ্যাপক হন। সম্প্রতি অস্ট্রেলিয়ান ন্যাশনাল য়ুনিভার্সিটিতে ডিপার্টমেন্ট অফ এশিয়ান সিভিলাইজেশনের অধ্যাপক ছিলেন।

ডঃ সুচিপ্তো তাঁর মনীষা পাণ্ডিত্যকে নিম্নলিখিত গ্রন্থগুলিতে বিকীর্ণ করে রেখেছেন—বিশ্ব ইতিহাস (৩ খণ্ড), ইন্দোনেশিয়ার ইতিহাস (দু খণ্ড), ভারত-বর্ষের সুকুমার শিল্পের ইতিহাস, দিয়েঙ উপত্যকায় প্রাচীন প্রত্নতত্ত্ব, ভারতবর্ষের সাংস্কৃতিক ইতিহাস, কাভ-ইন্দোনেশিয়ান অভিধান। এই বইগুলোর সমস্তই ইন্দো-নেশীয় ভাষায় রচিত। ইন্দোনেশীয় সংস্কৃতির ইতিহাস, সর্ট গাইড টু বোর-বুদুর—ইংরাজীতে রচিত। সম্প্রতি প্রকাশিত 'রাম স্টোরিস ইন ইন্দোনেশিয়া' ইংরাজীতে রচিত। রামায়ণ মহাকাব্যের ক্রমবিকাশের (ইন্দোনেশিয়ায়) আলোচনা, রামায়ণ কাকা-বিনের ৩য় সর্গ, প্রাচীন যবদ্বীপীয় রামায়ণ, কাকাবিন প্রভৃতি বইতে আলোচিত হয়েছে। 'ভারত যুদ্ধ' অর্থাৎ মহাভারতের কাহিনী ও ইন্দোনেশিয়ায় তার রূপান্তর সম্পর্কে গবেষণামূলক প্রবন্ধাবলী প্রকাশিত হয়েছে।

ভারতবর্ষ ও ইন্দোনেশিয়ার সাংস্কৃতিক সম্পর্ক নির্ণয়ের ক্ষেত্রে যাঁরা বৃহত্তর মানব সমাজের পটভূমিকায় আপন দৃষ্টি স্থাপন করেছেন তাঁদের মধ্যে ডঃ সুচিপ্তো অন্য-তম। 'ইন্দোনেশীয় সংস্কৃতির ইতিহাস' গ্রন্থে তিনি শান্তিনিকেতনের আত্মিক সৌন্দর্যকে অপরূপ ভাষায় ধরে রেখেছেন। এই প্রবন্ধে তিনি তাঁর ধীমান শ্রুতকীর্তি অধ্যাপকবৃন্দের ঋণ স্বীকার করতে ও তাঁদের শ্রদ্ধা জানাতে গিয়ে মুক্তকণ্ঠ হয়ে-ছেন। ইন্দোনেশিয়ায় রামায়ণ সম্পর্কিত গবেষণার ক্ষেত্রে ডঃ সুচিপ্তোর দান উল্লেখ-যোগ্য। প্রভাব নির্ণয়ের ক্ষেত্রে তিনি পূর্বতন পদ্ধতি পরিহার করে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি ব্যবহার করেছেন। ভারতবর্ষ ও ইন্দোনেশিয়ার সাংস্কৃতিক যোগসূত্র নির্ণয়ের ও আলোচনার ক্ষেত্রে ডঃ সুচিপ্তো একালের অগ্রগণ্য মনীষাসম্পন্ন ব্যক্তি ছিলেন। তাঁর অপরিণত মৃত্যু ভারতবিদ্যার ক্ষেত্রে এক শূন্যতার সৃষ্টি করল। আমরা বঞ্চিত হলাম এক প্রজ্ঞাবান ভারততত্ত্ববিদের অসাধারণ ধীশক্তি থেকে — নিত্যনতুন গবেষণার ক্ষেত্র থেকে।

অবিস্মরণ কাল

অসীম রায়

(পূর্বপ্রকাশিতের পর)

টুটুল চুপ করে থাকে। সম্প্রতি তার পরীক্ষার ফলাফল নিজের কাছে ভাল লাগলেও একটু অস্বস্তিরও কারণ ঘটিয়েছে। চোঙা যদি তৃতীয় স্থানের ভেতর পড়ত তাহলে তার সাফল্যের সার্থকতা ছিল। কিন্তু যা ঘটেছে তাতে দু ভাইয়ের মধ্যে একটা সরু অথচ ধারাল বিভেদের রেখা মাথা তুলছে।

'রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তো পড়াশোনাই করে নি। খালি গান করত আর লিখত।'

টুটুলকে এবার বিরক্ত দেখায়। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের স্কুলপালানো ব্যাপারটা অস্পষ্টভাবে শুনেলেও ঠিক এভাবে শোনে নি।

দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে বললে, 'হয়তো আনুয়েলে আর লাল করব না।'

'তুই আবার করবি না! যেরকম গবেট হয়ে যাচ্ছিস!'

এরপর কথা চলে না। কিন্তু পরীক্ষায় সার্থকতা ও জীবনের সার্থকতা সম্পর্কে দুই ভাইয়ের আলোচনায় হঠাৎ ছেদ পড়ে। এতদিন ভাল করে নজর করেনি। চাতালের কোণে বেঁটে কাঁঠাল গাছটা, তার পাশেই পাতার ফাঁক দিয়ে উঁকি দিচ্ছে থ্যাংরা তামাটে গাছের মাথাভর্তি পাকা নারকোল কুল। কিছুক্ষণ পরেই লাগি নিয়ে কুল পাড়ার ধুম লেগে যায়।

হঠাৎ নীচ থেকে পাঁড়ের গলা আসে, 'ও দাদাবাবু, দাদাবাবু!' দুজনে তিড়িং তিড়িং করে নীচে দৌড়য়। পুকুর ঘাটে তাদের সাঁতার শিক্ষক, জেলখানার হেড জমাদার ছাপরা জেলার অধিবাসী পাঁড়ে। ঘাটে পাতাকাটা কলাগাছ। উত্তেজনায় ধক ধক করতে থাকে টুটুলের বুক। চোঙা চেঁচাতে থাকে, 'আমি অলিম্পিক চ্যাম্পিয়ন হব।' কিন্তু কলা গাছটা জলে নামানো মাত্র কোথা থেকে বুড়ী এসে ঝাঁপিয়ে পাঁড়ের গায়ে হেঁচড়েমেঁচড়ে উঠে কলাগাছটার ওপর চেপে বসে, তারপর তাদের চোখের সামনে দিয়ে বুড়ী সারা পুকুর ঘুরে বেড়ায়। পাঁড়ে সাঁতরে সাঁতরে তার সঙ্গে ভেসে চলে। একবার পুকুরটা ঘুরে আসার যে বিলম্ব তা দুজনের কাছেই ক্রমশঃ অসহ্য লাগে। চোঙা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে বললে, 'আমাদের আর শেখা হবে না।'

তারপর চোঙার পুকুর পরিক্রমায় টুটুল স্তব্ধ দৃষ্টিতে চেয়ে থাকে। বুড়ী সমানে ফোড়ন কাটে, 'জল টান, হাত দিয়ে জল টান একদম হচ্ছে না।' কত যুগ পরে এক কোমর জলে দাঁড়িয়ে যেন পাঁড়ে ডাকে, 'টুটুলবাবু, এসো।' টুটুল আড়ষ্টভাবে বসে থাকে কলাগাছের ওপর। গোল পুকুরটার ওপরে নুয়ে আসা বটের নীচে জলটা ঠান্ডা আর কালো, টুটুলের একটু ভয় ভয়ও করে। মুখ দিয়ে কুলকুচি করতে করতে পাঁড়ের পাশে পাশে এগোতে থাকে। টুটুল প্রাণপণে দুহাত দিয়ে জল টানে। হঠাৎ হুড়কে কলাগাছ থেকে সড়াৎ করে জলে পড়েই দুর্দান্ত চীৎকার শুরু করে। 'আমাকে উদ্ধার করো, আমাকে উদ্ধার করো।' চোঙা ফূর্তিতে হাততালি দেয়। 'ইস্, কি রকম থিয়েটার করতে পারে টুটুলটা!' বুড়ী চেঁচিয়ে বলে। পাঁড়ে সঙ্গে সঙ্গেই টুটুলকে তুলে দিয়েছে কলাগাছে, কিন্তু তার মুখেচোখে তখনও আতঙ্কের ভাব কাটে নি।

যে দিন সাঁতার শেখা নেই সে দিন, বিশেষ করে ছুটির সকালে, জেলখানার কনস্টেবলদের কোয়ার্টারে ব্যায়ামের ক্লাসে যোগ দেয় ছেলেরা। ছ ফুট লম্বা নেংটিপরা পাঁড়ে পাঁচশো ডন, পাঁচশো বৈঠক দেয়। তার ফর্সা তেলে ঘামে ভেজা চকচকে শরীরখানা ওঠে আর নামে, আর যত পরিশ্রম বাড়ে নিঃশ্বাস সশব্দে ওঠে পড়ে। পাঁড়েকে দেখে টুটুলের মনে হয় সে যেন যুদ্ধের জন্যে তৈরী হয়। কাদের সঙ্গে এই যুদ্ধ? সেই সব ছেলেরা যারা 'বন্দেমাতরম' বলে চেঁচায়, জেলে যায়, যাদের সম্পর্কে মাঝে মাঝে বাবা-মা মাঝে মাঝে উদ্বিগ্নভাবে কথাবার্তা বলে, তারা?

পাঁড়ে আধঘন্টা ধরে জিরোয়, বারান্দার সিঁড়িতে বসে হাওয়া খায়, আর এক কনস্টেবল পেস্তা আর ভাঙ ঘোঁটে কালো পাথরের বড় গেলাসে। এক গেলাস সরবত এক চুমুকে শেষ করে ভারি মদালস চোখে ছেলেদের কাপড় ছাড়তে বলে।

পাশের ঘর থেকে লেংটি পরে দুটো ক্ষুদে তালপাতার সেপাই বেরিয়ে আসে। এ অবস্থায় দুজনকে দেখে দুজনেই হেসে গড়িয়ে পড়ে। চোঙার নাম সার্থক, পশ্চাদ্দেশ বলে কিছুই নেই। তার দিকে তাকিয়ে হাসতে হাসতে টুটুলের চোখে জল আসে। দুজো ইঁটে হাতে ভর দিয়ে বুকটা নামতেই পাঁড়ে বাঁ হাত দিয়ে চেপে মেঝের সঙ্গে ঘসে দেয়। কয়েকবার ডন দেওয়ার পরই হাত ছিঁড়ে পড়ে। পাঁড়ে বিষণ্ণভাবে তাদের দিকে চেয়ে থাকে। তার দেশে এই বয়সের ছেলেদের স্বাস্থ্য মনে করে ঘাড় নাড়ে।

ছেলেদের সম্প্রতি হাসিতে পেয়েছে। বিশেষ করে শরীরের কোন কোন অঙ্গপ্রত্যঙ্গের নাম প্রায়ই তাদের অকারণ হর্ষের কারণ ঘটায়। কয়েকদিন পর সেলাইয়ের কলে কমলালেবু রঙের পর্দা সেলাই করছিলেন স্বর্ণসুন্দরী। হঠাৎ আতঙ্কিত হয়ে শুনলেন, চাতালে চোঙা হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠল, 'পোঁদ, পোঁদ।' বলবার সঙ্গে সঙ্গেই দুভাই হেসে গড়িয়ে পড়ছে। স্বর্ণসুন্দরী গলা ভারী করে হাঁকলেন, 'চোঙা!' দুই ভাই-ই এগিয়ে আসে পুলকিত উৎফুল্ল মুখে। স্বর্ণসুন্দরী ধমক দিলেন, কিন্তু খুব সুবিধে হল না। দুদিনের পর টুটুলের গলায় আবার সেই লজ্জাকর ধ্বনির উচ্চারিত হল।

হাসির তরঙ্গ ছড়িয়ে পড়ে সন্ধ্যাবেলা চাতালে সতরঞ্চি পেতে লণ্ঠনের আলোয় দুভাই পড়ে মধুবাবুর সামনে। হঠাৎ চোঙার নজর পড়ে মধুবাবুর নাকের ওপর। নাকের ফুটো দিয়ে কাঁচাপাকা নাসিকাবা কয়েকগাছা চুল বেরিয়ে আছে। রসায়ন করতে করতে খাটো গলায় সেই চোঙা বলে, 'নাকে চুল।' অমনি ভয়ে কাঠ হয়ে যায় টুটুল। ব্যাপারটাকে আগেও খেয়াল করেছে কিন্তু এমন বিপজ্জনকভাবে হাসির দমক উঠে আসে যে, চাপতে গিয়ে চোঙার দিকে চেয়ে সে একেবারে স্তম্ভিত। চোঙা মাথা নীচু করে খিঁচিয়ে

খিঁচিয়ে হাসছে। এর পর সহ্য করা যায় না, হা হা হা হা করে দিগ্বিদিগ্ জ্ঞানশূন্য টুটুল হাসতে থাকে। 'ও স্যর হাসছে স্যর, ও স্যর হাসছে,' বলে চোঙাও সে হাসিতে যোগ দেয়। মধুবাবু এমনিতেই তিরিক্ষে, তার ওপর অর্শের প্রাতঃকালীন আক্রমণে সম্প্রতি বিপর্যস্ত। চেঁচিয়ে উঠলেন, 'কী হয়েছে তোমাদের, মদ খেয়েছো?'

এরপর বাঁধ বাঁধার কোন ব্যাপার থাকে না। মদ খাওয়ার সম্ভাবনায় দুভাই হাসিতে আবার গড়িয়ে পড়ে। মধুবাবু তাঁর শীর্ণ আঙুলে কট কট করে কান মলে দিলেন চোঙাকে। তাতে সাময়িক কাজ হল। কিন্তু অনেকক্ষণ পর্যন্ত হাসির ফোঁপানি চলল। মধুবাবু সংস্কৃত শ্লোক লিখে দেন দুই ছেলেকে, মুখস্ত করবার জন্যে। 'রোজ সকালে উঠে বলবে, বুঝেছো?

পাপহং পাপকর্মাহং
পাপাত্মা পাপসম্ভবম।
ত্রাহি মাং পুন্ডরীকাক্ষ
সর্বোপাপ হর ভব।।

মধুবাবু চলে গেলে চোঙা বললে, 'আমরা পাপী, আমরা মদ খাই, কি মজা।'

কয়েকদিন পর থেকেই সাঁতারের ধুম পড়ে যায়। ছুটি হলেই দশটা না বাজতে ছেলেমেয়েরা জলে পড়ে। উঠতে উঠতে কোন কোনদিন শোনে জেলখানার পেটা ঘণ্টায় বারোটা বাজার ধ্বনি। 'ছেলে-মেয়েগুলো লোহা হয়ে গেল। তুমি তো একটা কথাও ওদের বলবে না। সবই যেন আমার গরজ,' প্রায়ই স্বর্ণসুন্দরী অনুযোগ করেন স্বামীকে কিন্তু ভবনাথের কোন দিকে আর তাকাবার সময় নাই। টেররিস্ট গ্যাং ধরা পড়েছে। তাদের চালান দেওয়া হয়েছে মুন্সীগঞ্জের জেলে। তার মানে তাঁদের বাড়িও এবার সন্ত্রাসবাদীদের লক্ষ্য হয়ে পড়তে পারে।

ভবনাথের এ দুর্ভাবনার শরিক তাঁর ছেলে-মেয়েরা নয়, এমন কি স্বর্ণসুন্দরীও নন। কলকাতার নতুন বাড়ির ভাড়া বাবদ একশো কুড়ি টাকা আসছে গত মাস থেকে, যদিও মরগেজ, ধার মিটাতে অনেক বছরের ধাক্‌কা তবু এই নতুন প্রাপ্তিযোগ স্বর্ণসুন্দরীকে আরও স্বপ্রতিষ্ঠ করেছে তাঁর স্বাভাবিক আত্মবিশ্বাসে।

চোঙা সাঁতরায় মাছের মতো। নিখুঁত হাতের পায়ের কাজ মাত্র কয়েক দিনের মধ্যেই সে আয়ত্ত করে ফেলে। সে যখন নিঃশ্বাস প্রশ্বাস সমান তালে ছেড়ে ফেলে তরতর করে জল কেটে এগোয় তখন পাড়েরই বিস্ময় জাগে। টুটুল আর বুড়ী ততো এগোয় নি। দুজনেই পায়ের কাজে বেমানান, প্রায় ব্যাংয়ের মতো দুপা চেদরিয়ে জল কাটে, গতিও অনেক মন্দ।

কিন্তু ব্যাং কিংবা মাছ যাই তার তুলনা হোক এই জলে দাপাদাপি টুটুলের শৈশবের সবচেয়ে বড় ঘটনা। যেদিন হাওয়া দেয় সেদিন রোদ্দুরে জল ছল ছল করে, জল ডাকে। যাকে ভালবাসা যায়, আদর করা যায় এমনি একটা সত্তা পুকুরের। আবার যেদিন সাঁতরে সাঁতরে ওপারে বটের ছায়ায় আরও ঠান্ডা জল কেটে এগোয় তখন ভয় করে, ভয়ে আরও হাঁফ ধরে, কোন রকমে জল ঠেলে ঘাটে উঠতে ইচ্ছে করে। আর তাদের ছোট ছোট শরীরগুলোয় রক্ত চনমন করে। তিন-জনেরই মুখে বেশ কালো ছোপ পড়েছে। কিন্তু চোখগুলো আরও জ্বলজ্বলে। সারা দিন ব্যাপী তাদের তিড়িংমিড়িং প্রবণতায় স্বর্ণসুন্দরীর প্রাণ আরও অস্থির।

একদিন আর থাকতে পারলেন না। সকাল সাড়ে এগারোটা বাজে। ভবনাথ বৈঠকখানায় অফিসের ফাইলপত্তর দেখ-ছিলেন। তাঁর বেড়ানোর ছড়িখানা আলনার কোণ থেকে তুলে নিয়ে এসে স্বর্ণসুন্দরী তাঁর হাতে গুঁজে দিলেন। 'আজ তোমাকে শাসন করতেই হবে। এর পর যদি নিউ-মোনিয়া হয় তখন তো আমাকেই দুর্ভোগ পোয়াতে হবে।'

নীচে তখন সাঁতারের রেস চলেছে। একবার ও ঘাট ছুঁয়ে ফিরে আসা। চোঙা প্রায় দশ-পনেরো হাত সামনে সাঁতরে আসছে। ভবনাথ ও স্বর্ণসুন্দরী শাসনের প্রতিমূর্তি রূপে ঘাটে দাঁড়িয়ে থাকলেও চোঙার পারদর্শিতায় তাঁরা মুগ্ধ না হয়ে পারেন না। 'একেবারে নিউমোনিয়ায় না পড়ে ছাড়বে না', স্বর্ণসুন্দরী বিড় বিড় করেন। তিনজনেই হুড়মুড় করে ঘাটে উঠে ছড়ি হাতে ভবনাথকে দেখে মুহূর্তের জন্যে ভড়কে দাঁড়ায়। তার পর তিড়িং তিড়িং করে তিনজনেই পাশ কাটিয়ে লাফিয়ে লাফিয়ে চওড়া সিঁড়ি ভাঙতে ভাঙতে ওপরে উঠে যায়। বুড়ী উঠেই ভেজা গায়ে ফ্রক পরে নেয়, দুভাই ভেজা প্যাণ্ট ঘাটের এক কোণে দেয়াল ঘেঁষে গুটিসুটি মেরে হাঁপায়। কিন্তু স্বর্ণসুন্দরী স্বামীকে সে ঘরে নিয়ে আসেন। হেঁট হয়ে খাটের নীচ দেখেই বলে, 'বাঁদরগুলো ঐখানে আছে, মারো, মারো।'

ছড়ি হাতে ভবনাথ যখন গুঁড়ি মেরে তাদের দিকে এগিয়ে আসেন তখন সেই দৃশ্যের অভাবনীয়তায় দুই ছেলেই স্তম্ভিত হয়ে থাকে। খুব আস্তে একবার করে ছড়ির আঘাত করে ভবনাথ বলে ওঠেন, 'স্টুপিড!' ভেজা গায়ে সে আঘাত জ্বলে।

সেবার বর্ষা শেষ হতে না হতেই ভবনাথের জলপথে যাতায়াত খুব বেড়ে যায়। গত মাসে একশো সাঁইত্রিশ টাকা টি, এ বিল হয়েছিল। প্রতাপের পরীক্ষার ফি, শীতের জামা বাবদ চাহিদা যত বাড়ে ভবনাথের জলপথে ভ্রমণ তত বেড়ে যায়। অবশ্য সাইকেলে টুরের চেয়ে জলপথে ঘোরা অনেক আরামদায়ক। কিন্তু মাঝে মাঝে পদ্মা পার হতে হতে নৌকোর ক্রমাগত দোলানিতে, বিশেষ করে রাত্তিরে, একলা লাগে। একটু একঘেয়েও যে ঠেকে না তা নয়। এবার তাই সপরিবারে জলপথে যাত্রা।

ভবনাথের নৌকো যখন লৌহজঙের পথে তখন ভোর হয়। সারা রাত্তির নৌকোর দুলুনি, গলুইয়ে জলের ছলছল আওয়াজ এখন শান্ত। ভোরের হাওয়ায় চরে বেঁধেছে নৌকো। হাওয়ায় যখন

নৌকো কাত হল তখন কাঠে কাঠে মৃদু মট মট শব্দ। টুটুলের মাথার কাছেই এক বিঘত চৌকো ফোকর। সেখান দিয়ে এক ঝলক রোদ তার মুখে এসে পড়ে। চার দেড় মানুষ উঁচু ঠাসা আখবন। গোপীনাথ মাল্লারা নেমে গেছে সেই বনের ধার দিয়ে প্রাতঃকৃত্যের জন্যে। খড়ি দিয়ে দাঁত মাজছেন স্বর্ণসুন্দরী। সামনে বিরাট চর ধু-ধু করছে। আখের সবুজ আয়তক্ষেত্র বাদ দিলে সামনে বহুদূর প্রান্ত বালিতে ভোরের সোনালী রং। স্বর্ণসুন্দরী দাঁত মেজে তোলা জলে কুলকুচো করেন নদীতে। পাটাতনের ওপর ডেক চেয়ারে ভবনাথ স্তব্ধ হয়ে বসে! স্বর্ণসুন্দরী মুখ মুছে পাশের মোড়াটায় বসে বলেন, 'কি ভাবছো?'

'তোমায় বলি নি একটা কথা। কাল প্রতাপের চিঠি পেয়েছি। প্রথম চান্সে অবশ্য আই, সি, এস পাশ করা খুব মুশকিল।......'

'প্রতাপ পাশ করে নি? আরও তো দুটো চান্স পাবে।'

'হ্যাঁ তাই ভাবছি।'

আখক্ষেতের পাশ দিয়ে ঘটি হাতে গোপীনাথ আসছে। কিছুক্ষণ পরই গোপীনাথ স্টোভ ধরায়। আর স্পিরিটের গন্ধে টুটুলের ঘুম ভাঙে। এই স্টোভের গন্ধের সঙ্গে বাইরে যাওয়া যেন জড়িয়ে আছে তার। আড়মোড়া ভাঙতে ভাঙতেই চোত্তা উঠে পড়ে ধড়মড় করে, তারপর ভোরের আলোয় রাঙা বিস্তীর্ণ চরের দিকে চেয়ে সে চিৎকার দেয়, 'জাঁহাপনা, কন্দী আমার প্রাণেশ্বর।' টুটুলের ঘাড়ে ঝাঁকি দিয়ে বলে, 'চল চল, আমরা নামি।' চরে নেমে দুই ভাই ছোটে এত দূরে পর্যন্ত যে প্রায় দুটো কালো বিন্দুর মতো লাগে। সেই বিস্তীর্ণ বালির মাঝখানে আবার একটু জল চিকচিক করে। তার পাশে কতগুলো কাঠি, আখের শুকনো পাতা। মাথার ওপরে কালো, সাদা, পেটের কাছটায় খয়েরি দুটো লম্বাটে পাখি ক্রমাগত তাদের মাথার ওপর পাক খায় আর ডাকতে থাকে। 'টি-টি-টি-টি-টি, টি-টি-টি।' একবার তারা মাথার পাশ দিয়ে গালের কাছ দিয়ে পাক খেয়ে গেল। সেদিকে চেয়ে এক মুহূর্ত ভাবলে চোত্তা, তারপর টপ করে বালির ওপর পাতা আড়কাঠির ঢাকনাটা সরিয়ে দেয়। সরিয়ে দিয়ে দুজনেই অবাক। পাঁচটা ছুঁতে-লাল ছোট ডিম। এমন মুগ্ধ দৃষ্টিতে তারা চেয়ে থাকে যে তাদের গা ঘেঁসে নীচু হয়ে সশব্দ পাখি দুটোর পাক-খাওয়া তাদের নজরে পড়ে না। খেয়াল হয় গোপীনাথের ডাকে, 'চল চল, নৌকো ছাড়ছে।' ডিমগুলো নেওয়ার প্রস্তাবে গোপীনাথ বললে যে, ওগুলো সাপের ডিম, আসবার সময় একটা গোখরো দেখেছে, এবং চর ভর্তি সাপ।

হাঁসাড়ায় এক জমিদারবাড়িতে দুপুরে খাওয়ার ব্যবস্থা। এ অঞ্চল বেশ বর্ধিষ্ণু, মধ্যবিত্তের বাস। নৌকো থেকেই খালের পাশ দিয়ে নারকেল সুপুরিতে ছাওয়া টিনের চাল, মাঝে-মাঝে কোঠাবাড়ী নজরে আসে। মেয়েরা বাসন মাজছে, ছেলেরা পুকুরের জলে দাপাদাপি করছে। অনেক বছর পর যখন টুটুলেরা কলকাতার পাকা পাকি বাসিন্দে এবং জলের দেশ থেকে একেবারে নির্বাসিত তখন বাংলা কবিতায় জল নদীর বর্ণনা পড়ামাত্রই তাদের এই জলপথে সফরের ছবিগুলো ভেসে উঠত মনে। যেমন সত্যেন দত্তের 'কার বহুড়ী বাসন মাজে' হাঁসাড়ার খাল পাড়ে বাসনের পাঁজা নিয়ে ব্যস্ত লালপেড়ে শাড়ি-পরা বউটার সঙ্গে অবিচ্ছেদ্য। এমন কি 'ঘরেতে ভ্রমর এল গুনগুনিয়ে' আসলে সেই ভ্রমর যেটা ঘাটে নৌকো ভিড়িয়ে গলা-জলে তাদের চান করবার সময় পাড়ে শ্যাওলার ওপর একই জায়গায় ভোঁ-ভোঁ করে উড়ছিল হেলিকপ্টারের মতো।

হাঁসাড়ায় দুপুরের খাওয়াটা এক ভয়াবহ ব্যাপার। এত বড় ভাজা গলদা চিংড়ির মুড়ো তারা কখনও দেখে নি। ভয়ে-ভয়ে একটু খুঁটো করতেই গল-গল করে লাল ঘিলুতে থালার এক পাশ ভরে যায়। টুটুল ভয়ে-ভয়ে খেতে পারে না। তাছাড়া সবই এত বড়-বড় যে ছেলেদের কাছে বড় অপরিচিত লাগে। এক জোড়া করে কই মাছ প্রায় থালা জুড়ে। ফেলে-ছেড়ে খেয়ে তারা কোন রকমে ওঠে। তবে মনে-মনে মুগ্ধ স্বর্ণসুন্দরী। তিনি কাঁটা চিবোবার যম। এত রকমারী সুন্দর মাছ আগে কখনও খান নি।

খাওয়ার চেয়েও জমিদারবাড়ীর এক মেয়ে, বোধহয় নাতনীর সঙ্গে দুই ছেলের অসম্ভব ভাব হয়ে গেল। সারা দুপুর গাছে, খালের পাড়ে মেয়েটা বুড়ী, চোত্তা আর টুটুলকে চরিয়ে নিয়ে বেড়ায়। লাল ফ্রক-পরা মেয়েটার ওপর প্রভুত্ব জোগে যায় চোত্তার। বিকেলে নৌকো ছাড়বার আগে ঘাটের ধারে একটা ছড়ি জোগাড় করে চোত্তা। 'তুই কাকে ভালবাসিস গৌরী? আমি, টুটুল, না বুড়ী?' ছড়ি হাতে চোত্তা জিজ্ঞাসা করে।

মেয়েটার মুখটা ছুঁচলো, কটাশে রঙ, মাথা ভর্তি কোঁকড়া চুল। ছোট-ছোট চোখ দুষ্টুমিতে চকচক করে। বোধহয় চোত্তারই বয়েস, বললে, 'বাঃ, আমি তো বুড়ীদিকে...'

'হাত পাত, হাত পাত।' মেয়েটা বোকার মতো হাত পাততেই সপাং করে ছড়ি বসিয়ে দেয় চোত্তা। মেয়েটার চোখে জল আসে। 'আমি বাবাকে বলে দিচ্ছি', বলতে-বলতে গলায় টলমল কান্না নিয়ে সে বাড়ীর দিকে দৌড়য়। বুড়ীও চেঁচিয়ে উঠল, 'আমিও মা-কে বলে দিচ্ছি।' বলে সেও গৌরীকে অনুসরণ করে।

বিদায়ের সময় যখন জমিদারমশাইয়ের ছেলে বউ মেয়ে নিয়ে তাদের সঙ্গে ঘাটে আসেন তখন সব মিটমাট। চোত্তা গলা নীচু করে জলের দিকে চেয়ে বলল, 'আমাকে কেউ না ভালবাসলে আমার বয়ে গেল।' গৌরীও তেমনি খাটো গলায় বললে, 'দূরে, আমি তখন মিছিমিছি বলেছিলাম।' ছইয়ের ওপর উঠে অনেকক্ষণ পর্যন্ত ছেলেমেয়েরা হাত নাড়ায়, খালের বাঁক পর্যন্ত লাল ফ্রক-পরা মেয়েটাকে দেখা যায় হাত নাড়াতে।

পর দিন দুপুরে মীরকাদিম। সেদিন হাট। দূরে থেকে চাপা গুঞ্জন ভেসে আসে। কাছে আসতেই কলা আর গুড়ের গন্ধে বাতাস ভারী লাগে। অন্তত পাঁচ-ছশো নৌকো গঞ্জের পাড়ে বাঁধা। ঢুকতেই জলের ওপরে মাচার মতো লম্বা পাটাতন। নীল উর্দি-পরা সায়েব হাঁকে, 'খবরদার, খবরদার', পাশের নৌকো সরে যায়। স্বর্ণসুন্দরী নৌকোয় বসে-বসেই বিশাল এক গুড়ের নাগরী আর প্রকাণ্ড এক কাঁদি পাকা কলা কিনলেন। সায়েবদের সঙ্গে ছেলে-মেয়েরা গঞ্জে নামে। প্রচুর কাপড়ের দোকান, নারকেলের আড়ত, পাকা, আধ-পাকা কলার পাহাড়, কাচের চুড়ি, কেরোসিন, চাল-ডাল। অনেক খুঁজে-খুঁজে দরদাম করে দুটো রবারের বল, আর বুড়ীর জন্যে লাল ফুল তোলা মাথার ক্লিপ আর রিবন কিনলে সায়েব। রিবনটা প্রায় দাম না দিয়েই সায়েব যখন তুলে নেয় তখন দোকানী মৃদু আপত্তি জানালে সায়েব ভর্ৎসনা করে, 'কার সঙ্গে কথা কও সেডা খেয়াল আছে?' দোকানী কিছু বলে না। চোত্তার গর্বে বুক ভরে যায় কিন্তু দোকানীর মুখের দিকে চেয়ে টুটুলের নিজেকে অপরাধী লাগে।

পরদিন ভাগ্যকুল। পদ্মার পাড়ে তাদের বজরা এসে লাগে সকালে। এখানে নদী খুব চওড়া, ওপার দেখা যায় না। ছেলে-মেয়েরা সাঁতার শিখছে ভালই। কিন্তু জলের অসম্ভব টান। দুটো বজরা তেরছা করে লাগিয়ে মাঝখানে ছেলে-

মেয়েরা চানে নামে। টুটুল কোরা একখানা ধুতি পরে জলে নেমেছিল। তারপর স্রোতের টানে তা পায়ে জড়িয়ে যায়। তাছাড়া পদ্মায় নেমেছি এই বোধটাই এমন অভাবনীয় লাগছিল তার কাছে যে, পা জড়িয়ে যাবার পরই সে এত বেশী হাত-পা ছোঁড়ে যে ক্রমশ তলিয়ে যেতে থাকে। কিছু বুঝবার আগেই ব্যাপারটা ঘটে যায়। চোঙার চিৎকারে সামেদ নৌকোর ওপর থেকে ঝুঁকে পড়ে। তারপর পাগড়ি ফেলে দিয়ে উর্দি-পরা অবস্থাতেই ঝাঁপিয়ে পড়ে জলে। নদীর স্রোতে তখন দুই বজরার মুখে যে তিন-চার হাত ফাঁক ছিল সেই ফাঁক দিয়ে টুটুল জল খেতে-খেতে বেরিয়ে যাচ্ছে। উর্দি-পরা সামেদ জলে পড়েই এক থাবলায় টুটুলকে ধরে ভেতরের দিকে ঠেলে দেয়। তারপর মাথা দিয়ে ঠেলতে-ঠেলতে নৌকোর ভেতরে ঘেরা জায়গায় নিয়ে গিয়ে দম নেয়। ইতিমধ্যে স্বর্ণসুন্দরী চেঁচিয়ে কাঁদতে শুরু করেছিলেন। ভবনাথও জলে নেমে পড়েছিলেন। স্বর্ণসুন্দরী বললেন, 'সামেদ ছিল বলে, ছেলেটা বেঁচে গেল।' সামেদ আস্তে-আস্তে জল ছেড়ে নৌকোয় উঠল। খালি মাথায় তার ছোট খুলির ওপর লেপ্টে-থাকা কাঁচা-পাকা চুলে অদ্ভুত দেখাচ্ছিল তাকে। সামেদ আস্তে-আস্তে বললে, 'সব আল্লার দয়া মা, আমরা কে?'

দুপুরে ভারে ভারে খাবার আসে। তিনটে না চারটে থালায় প্রায় দশজনের মতো খাবার আনে। আবার সেই পেল্লাই জলদা চিংড়ির মুড়ো, ফুটো করতেই গল-গল করে রক্তের মতো ঘিলু, সম্মানিত অতিথিদের জন্যে ছাগলের মাথার মুড়ো, ইলিশ, রুই, রকমারী সন্দেশ, রাজভোগ, দই। এত খাওয়া দেখলেই ছেলে-মেয়েদের অক্ষিদে বেড়ে যায়। সবচেয়ে তাদের ভাল লাগল আলুবখরার চাটনি। ভবনাথ ও স্বর্ণসুন্দরীও খাওয়ার ব্যাপারে খুব দড় নয়। তবে গোপীনাথ, সামেদ আর তিন মাঝিমাল্লা খুব উৎসব করে খাওয়া-দাওয়া করলে।

সকালবেলার দুর্ঘটনার রেশ খুব তাড়াতাড়ি কেটে যায়। সন্ধ্যেবেলা জমিদার বাড়ি নেমন্তন্ন। অনেকখানি জায়গা জুড়ে অনেকগুলো দালান, ইলেকট্রিক আলো। প্রায় শখানেক লোকের সঙ্গে খাওয়া শেষ হতে রাত প্রায় দশটা। ছেলেরা তাদের বজরায় ফেরবার মতলব করছিল, কিন্তু শোনা গেল গানের জলসার আয়োজন হয়েছে। জলসা মানে কলকাতা থেকে দুটি মহিলা প্রথমে ঠুংরি গাইলেন, তারপর খেমটা নাচলেন। শেষের দিকে ঘুম পেয়ে যাচ্ছিল প্রচণ্ড তবলার চাঁটি সত্ত্বেও। ফর্সা চোখ কুতকুতে আঁটসাঁট করে হলদে জর্জেট-পরা ঢ্যাঙা মহিলাটি ভবনাথদের সামনে ঘুরে ঘুরে নাচতে লাগলেন, দ্বিতীয়টির পরনেও জরির বুটিক তোলা চকোলেট জর্জেট, কাজল দেওয়া তার ঢলঢল চোখ দুটি ছেলেদের মন্দ লাগে না। তিনি মাথায় মদের গেলাস রেখে নাচলেন, চারদিকে চটা-পট হাততালি পড়ল। বড়দের সঙ্গে সঙ্গে টুটুল চোঙাও হাততালিতে যোগ দিল। এরপর আবার দুজনে হাত ধরাধরি করে নাচতে লাগলো। সঙ্গে ক্লারিওনেট ও তবলা। চিকের অন্তরালে মহিলাবর্গের মধ্যে স্বর্ণসুন্দরী ও বুড়ীকেও দেখা যাচ্ছিল। তাঁরই নির্দেশে দুই পাইক ঘুমন্ত দুই ছেলেকে বজরায় তুলে দিল। পরদিনও প্রায় একই প্রোগ্রাম। টুটুল তোলা জলে স্নান করলে। ভবনাথ সাঁতরালেন পদ্মায়, পেছনে সামেদ। ভবনাথের সাঁতার দেখে ছেলেরা অবাক হল। বাবা কাছারি যায়, বৈঠকখানায় টেবিল ল্যাম্প জেবলে রায় লেখে, ভোরে চাতালে পায়চারি করে, বিকেলে কাপিব ক্ষেতে মালিকে নির্দেশ দেয়। 'বাবা আবার সাঁতরায় রে!' চোঙার গলায় প্রবল বিস্ময়!

সন্ধ্যেবেলা নৌকো ছাড়ে। চাঁদ ওঠে। চাঁদনি রাতে ছইয়ের ওপর সামেদের কোল ঘেঁষে বসে ছেলেরা। আলো ফেলতে ফেলতে স্টিমার চলে যায়। বজরা দুলতে থাকে মাঝ নদীতে। আর এমন হু হু করে মুখে কানে হাওয়া দেয় যে, ছই থেকে প্রায় পড়ে যাওয়ার জোগাড়। ভবনাথ হাঁক দেন, 'ওপর থেকে নেমে এসো, তোমরা।' স্বর্ণসুন্দরী অনেকগুলো দেবতার নাম করে যান, 'বাবা বদ্রিনাথ, বিশ্বনাথ, মা কালী মা জগদ্ধাত্রী।'

সামেদ ধীরে ধীরে ছেলেমেয়েদের নামিয়ে আনে ছই থেকে। সামনে হাওয়ায় লুটো-পুটি খাওয়া বিশাল রুপোলী পদ্মার দিকে চেয়ে চেয়ে নিজের মনে বলে, 'সব খোদার ইচ্ছে, আমরা কে?'

হাওয়ায় আর জলের শব্দে টুটুল কখন ঘুমিয়ে পড়েছে। ভোর বোধহয় চারটে, থালের ওপর একটু একটু আলো ফুটছে। বুড়ীকে জড়িয়ে টুটুল ঘুমোচ্ছিল। টুটুলের ঘুম ভাঙতেই জলের শব্দ হাওয়ায় কেমন বিভ্রান্ত বোধ করে। বুড়ীর দিক থেকে পাশ ফিরে ফের ঘুমিয়ে পড়ে।

তিন

গরমের ছুটির বিকেল। এতক্ষণ বাড়ির সামনেই পুকুরটা ঝলকাচ্ছিল রোদ্দুরে। কিন্তু জেলখানার দিকটা বেশ ঠাণ্ডা, ছায়ায় ঢাকা। পুকুর পাড়ে ঝাঁকড়া বটের ছায়া সেপাইদের কোয়ার্টারের মাথাগুলো ঢেকে রেখেছে পশ্চিমের রোদ থেকে। পাঁড়ে পুকুরে ঘাট মেজে খড়ম পায়ে খট খট করে আসছে। বাঁধানো রাস্তা দিয়ে আসতে আসতে ভাঙা বেসুরো গলায় গান করে, 'ইয়ে ভবসংসার হ্যায় রামো কি মায়া। কঁহি ধূপ হ্যায় কঁহি ছায়া।।'

পাঁড়ে সম্প্রতি দেশ থেকে ফিরেছে। দু মাস ছিল ছাপরার গ্রামে। এক বিঘে মতো জল শুদ্ধ আমের বাগান কিনেছে। তার গপ্প করে হিন্দি বাংলা মিশিয়ে ছেলেদের সঙ্গে, 'যব ফুল আসে আমের পেড়ের পর তব কত পঁখ আসে। জলে নামে জলে ওঠে, ফিন উড়ে যায়। হামি আর ভাই ঝোপড়ি বেঁধে পাহারা দিই। সারা রাত কি বাস। বুল কি বাস ফল কি বাস। হাম সমঝে কি বৈকুণ্ঠ মে হ্যায়।' বলবার সময় পাঁচশো ডন পাঁচশো বৈঠক দেওয়া শরীরখানার ওপর ছোট মুখখানায় এক বেমানান স্নিগ্ধতা নামে।

তারা জেলের গেটের দিকে এগোতেই পাঁড়ে তাদের সাবধান করে দেয়, তারা যেন এখন জেলখানার ভেতরে না যায়। গত রাত্তিরে একদল 'ভারি বড়া ডাকু' এ জেলে স্থানান্তরিত হয়েছে ঢাকা থেকে। সে জন্যই এই সাবধানবাণী।

টুটুল আর চোঙা বাড়ির দিকে না গিয়ে স্থানীয় সাঁতার চ্যাম্পিয়ান, ক্লাস সিক্সের ছাত্র গোপালের সঙ্গে লাট্টু খেলে। গোপাল ছবির মতো সাঁতরায়, এক ঘাট থেকে ডুব সাঁতার দিয়ে আর এক ঘাটে ওঠে। তিনটে কাপ পেয়েছে সাঁতারে। তবে সম্প্রতি সে দু ভাইকে দেহতাত্ত্বিক কিছু জ্ঞান দিতে শুরু করেছে। তাতে চোঙার উৎসাহ জোরাল। কিন্তু টুটুল ব্যাপারটা হদিস করতে পারে না। পুকুর পাড়ে বসে বসে গোপাল মানুষের জন্মরহস্য অঙ্গভঙ্গী সহযোগে বর্ণনা করে। টুটুলের কাছে গোপালের আলাপ একেবারেই দুর্বোধ্য লাগে আর চোঙা কিছুটা অস্বস্তি বোধ করে। গোপাল শুধু চমৎকার সাঁতারই কাটে না, কি করে ছেলে জন্মায় সে খবরও রাখে। চোঙা উত্তেজনা বোধ করে। আগে সে যা যা শুনেছে সবই স্বর্ণসুন্দরীকে বলেছে, কিন্তু এবার তার ভয় হয়, তার মা এসব শুনলে ঝড় তুলবে। আর টুটুলের সঙ্গে আলাপ করলে মন একটু হাল্কা হত, কিন্তু ও একটা গবেট' এই চিন্তা করে সে বাড়ির দিকে এগোয়।

মাঝপথে জেল গেট। গেটের গরাদ ধরে তাদের কে ডাকল, 'খোকা শোনো।'

টুটুল চমকে তাকায়। ধুতির ওপর সাদাকালো ডোরাকাটা ফুলহাতা শার্ট পরা এক যুবক। কালো চশমার ভেতর থেকে কোমল চোখ দুটো মেলে চেয়ে আছে।

টুটুল এগিয়ে যায় গেটের দিকে। 'এস-ডি-ও সাহেব তোমাদের বাবা?' যুবকটি জিজ্ঞেস করে।

টুটুল কিছু বলবার আগেই তার পেছনে চোঙা কটাস করে চিমটি কাটল। টুটুল থতমত খেয়ে দাঁড়িয়ে পড়ে। চোঙা পেছন থেকে তার হাত ধরে হ্যাঁচকা টান মেরে ডাকে, 'আয় না।'

গেট থেকে সরে আসতেই চোঙা ফিসফিস করে বললে, 'ওরা ডাকাত। বাবাকে মেরে ফেলতে চায়।'

'কিন্তু ...

'কিন্তু কি? ওরা বোমা মারে, পিস্তল মারে। ওরা সব করতে পারে।'

টুটুলের এতক্ষণে খেয়াল হয় পাঁড়ের সাবধানবাণী। কিন্তু লোকটাকে দেখে মোটেই তো ডাকাত বলে মনে হয় না। প্রতাপের মতো ফর্সা নয়, কিন্তু হাসিতে ভরা মুখ-খানা, বিশেষ করে ঠোঁটের ভাঁজ আর থুতনি অনেকটা বড়দার মতো। এদের সঙ্গে

বোমা-পিস্তল নিয়ে ডাকাতির সম্পর্ক বড্ড খাপছাড়া লাগে তার কাছে।

ফুটবল খেলে সন্ধ্যের পর বাড়িতে ঢুকতে গিয়ে তারা থমকে দাঁড়ায়। সাত হাতে অন্তর অন্তর সমস্ত চাতাল জুড়ে সশস্ত্র শান্ত্রী। বেলুচ রেজিমেন্টের এক কম্পানি সন্ধ্যের পর সহরে এসেছে পুলিশ লঞ্চে। গত রাত্তিরে জেলখানার দেয়ালের ওপাশ থেকে আওয়াজ এসেছিল। ইন্টেলিজেন্স রিপোর্ট অনুযায়ী আজ রাতে সন্ত্রাস-বাদীরা জেলখানা ও ইদ্রাকপুর কোর্ট আক্রমণ করবে। ভবনাথ বৈঠকখানায় পুলিশ কর্তাদের সঙ্গে কনফারেন্স করছেন। তাঁর নিজের আপত্তি সত্ত্বেও স্থানীয় ছোকরা ডি-এস-পি এবং জেলা সদর কর্তৃপক্ষের চাপাচাপিতে প্রায় সামরিক বাহিনী তলব করতে হয়েছে।

টুটুল এক চাপা উত্তেজনা নিয়ে ঘুমোতে যায়। সাড়ে ছ' ফুট লম্বা সঙ্গীন-আঁটা নিস্তব্ধ উত্তরভারতীয় শান্ত্রী না চশমার ভেতর থেকে হাসিতে উদ্ভাসিত মুখ বাঙালী তরুণ—এ দুজনার কোনজন বন্ধু, কোনজন শত্রু তা তার কাছে ঘুলিয়ে যায়। লড়াই হলে এদের দুজনের মধ্যে কার জেতা উচিত সে সম্পর্কে সে মনস্থির করতে পারে না।

চোঙা বললে সে আজ রাত্তিরে ঘুমোবে না। রাত্তিরে লড়াই বাধবে। শান্ত্রীরা ওপর থেকে রাইফেল ছুঁড়বে। তুমুল একটা হট্টগোল বাধবে। বুড়ী বললে, 'যাই বল ইংরেজের সঙ্গে কেউ পারবে না।' চোঙা আর এক ধাপ এগিয়ে যায়। তার মতে রাত্তিরে কামান আসবে। কারণ কামান না হলে কখনও কেল্লা রক্ষা করা যায় না।

'তুই সবটাতে বাড়াবাড়ি করিস চোঙা।' বুড়ী আপত্তি করলে।

'তুই কি জানিস রে? তুই তো মেয়ে। আমি সব শুনেছি। আজ রাত্তিরে কামান আসবে। বাবা কামান চালাবে।'

টুটুলের সঙ্গে সঙ্গে বুড়ীও সচকিত। ভবনাথের ক্ষমতা সম্পর্কে তাঁর ছেলে-মেয়েরা সচেতন থাকলেও তাঁকে গোলন্দাজ রূপে কল্পনায় হঠাৎ খিলখিল করে হেসে ওঠে বুড়ী। 'তোর মাথাটা খারাপ হয়ে গেছে চোঙা।' বলেই সে চট করে কথাটা ঘুরিয়ে নেয়। কারণ চোঙা এখন মারলে স্বর্ণসুন্দরীকে নালিশ করে কিছু হবে না। স্বর্ণসুন্দরী এত রাত্তিরে বৈঠকখানায় লুচি আলুভাজা চা পাঠাতে ব্যস্ত। তাছাড়া ঘুমও পেয়েছে তার।

শেষ রাতে জানলা দিয়ে টুটুল অবাক হয়ে দেখলে ভোরের তারার নীচে খাড়া নিস্পন্দ ইংরেজ সাম্রাজ্যের প্রহরী। শিশিরে সঙ্গীনগুলো আরও চকচক করে।

সে বছর বর্ষা শেষ না হতে হতেই জেঁকে শীত পড়ল। দুটো সবুজ আলোয়ান কিনে দিলেন দুই ছেলের জন্যে স্বর্ণসুন্দরী। তারা আলোয়ান মুড়ি দিয়ে বসে মধুবাবুর সামনে চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে চাণক্য শ্লোক আওড়ায়ঃ

বিদ্বত্বঞ্চ নৃপত্বঞ্চ নৈবতুল্যং কদাচন।
স্বদেশে পূজ্যতে রাজা বিদ্বান সর্বত্র পূজ্যতে।।

অংক হোক, ইংরেজী হোক, চাণক্য শ্লোক একবার আওড়াতে হবেই। একদিকে সংস্কৃত শ্লোক আর ইংরেজী ব্যাকরণ অন্যদিকে অংক—এর মাঝখান দিয়ে মধু-বাবু প্রতি সন্ধেবেলা তাঁর নৌকো বেয়ে চলেন। নৌকোর আরোহীরা এবং তাঁদের অভিভাবকও নিশ্চিন্ত। কোন এক ঘাটে নিশ্চয়ই ভিড়বে। প্রোগ্রেস রিপোর্টে সই মারা ছাড়া ভবনাথ কোনদিন ছেলেমেয়েদের পড়াশোনা খবরদারি করেননি, তবে পড়াতে বসানোর ব্যাপারে স্বর্ণসুন্দরীর শাসনে ঢিলেমি ছিল না একদম।

বড়দিনের ছুটি এগিয়ে আসছে। ম্যাপে কক্সবাজার দেখানোতে কিঞ্চিৎ বিলম্ব হওয়া ছাড়া টুটুলের সব পরীক্ষাই ভাল হয়েছে। চোঙা আটকেছে ফুলমার্কস, তবে ইতিহাস ভূগোলে খেঁড়িয়েছে। বুড়ীর যে এবার কি হল, বোঝা গেল না, কোন-রকমে হেঁচড়ে মেচড়ে বেরিয়েছে।

কিন্তু শৈশবে বিষাদ তালপাতার ছায়া। কয়েকদিন যেতে না যেতেই রৌদ্র-কলংকিত কৈশোরের আনন্দে ঝলমল করে বুড়ী। গত কয়েক মাসে অনেকটা লম্বা হয়েছে সে। কাঁধও চওড়া হচ্ছে। গাল ভাঙছে। মাথাভর্তি কোঁকড়া চুলে লম্বা শ্যামলা মেয়েটা দিন-রাত্তির এদিক-ওদিক লাফিয়ে বেড়াচ্ছে।

বড়দিনের ছুটির আগে বাদলা দিচ্ছিল। চারদিকে ভাঁক ভাঁক করছিল টাঙ্গায়। তারপর আবার মিঠে রোদ্দুরে ভরে যায়। এদিকে সচরাচর দুষ্প্রাপ্য একটা কমলা লেবু বুড়ী আর টুটুল দুই ভাইবোনে ভাগাভাগি করে খাচ্ছিল আর গোপীনাথ কাঠ চিড়ছিল কুড়োল দিয়ে। জেলখানার পাশে দুটো মোটা আমের ডাল ঝড়ে পড়েছিল। সে দুটো শুকিয়ে নিয়ে চেলা করা হচ্ছে। তালে তালে গোপীনাথের কুড়োল পড়ে আর শুনো ছিটকায় চেলাগুলো। প্রায় ঘন্টাখানেক কাঠ কাটা হচ্ছে। রান্নাঘরের এককোণে চাতালে সিঁড়িতে বসে বসে দুজনে দেখে।

এমন সময় উত্তেজিত চোঙার আবির্ভাব। 'দেখে যা দেখে যা আমাদের বাড়ি কত জিনিস আসছে।'

তিনজনেই সিঁড়ির দিকে দৌড়ে আসে। প্রায় জনা পনেরো লোক ভারে ভারে রকমারি খাবার আনছে।

চোঙা উত্তেজিত হয়ে চেঁচাতে থাকে, 'ভীম নাগ ভীম নাগ, আমি খেয়েছি কলকাতায়।'

সামনের থালায় ভীম নাগের সন্দেশ। সন্দেশের বাকসগুলো একটা পিরামিডের মতো উঁচু করে সাজানো, পরের থালাটা ভর্তি আপেল, দুটো বিশাল বড়দিনের কেক—জরিতে মোড়া চিত্র-বিচিত্র করা, এক পরাত ভর্তি মোটা মোটা কালো আঙুর আর পিন খেজুরের মোড়ক। থরে থরে দইয়ের ভাঁড় সাজানো দুটো থালা, এক থালা ভর্তি কিসমিস পেস্তা বাদাম, প্যাস্ট্রি, শেষে পেল্লাই পাকা মর্তমান কলা।

স্বর্ণসুন্দরী প্রথমে অবাক হয়েছিলেন। কিন্তু খাবারের এই অতুলনীয় বৈভবে মুগ্ধ না হয়ে পারেন না। রাজকীয় গাম্ভীর্যে হাঁক দেন, 'গোপীনাথ!' গোপীনাথও বোঝে এটা এক গুরুত্বপূর্ণ মুহূর্ত। তাড়াতাড়ি হাঁটুর ওপর কাপড় নামিয়ে, বারান্দার কোণায় টাঙানো সাদা ফতুয়াটা চাপিয়ে বেরিয়ে আসে। তারপর পথ দেখিয়ে ভারীদের ভাঁড়ারঘরের দিকে নিয়ে যায়। দেখতে দেখতে ভাঁড়ারঘর ভরে ওঠে। ফলের মিষ্টির গন্ধে ছেলেমেয়েদের উত্তেজনা আরও বাড়ে।

ইতিমধ্যে হন্তদন্ত হয়ে সামেদের আবির্ভাব। হাতে ভবনাথের চিরকুট। তাড়াতাড়িতে ভবনাথের বাংলা হরফগুলো তাদের স্বাভাবিক ক্ষুদ্রাকার হারিয়ে ফেলেছে। ভবনাথ লিখেছেনঃ 'দুই ভাই দুই বড় জমিদার। চরের জমি নিয়ে দুজনে দুজনের বিরুদ্ধে মোকদ্দমা লড়ছে। আমার কোর্টে মামলা। শুনলাম ঘাটে নৌকো ভিড়েছে, উপহার আসছে আমাদের বাড়ি। পত্রপাঠ সব বিদায় দেবে।'

স্বর্ণসুন্দরী হতভম্বের মতো দাঁড়িয়ে থাকেন, সঙ্গে সঙ্গে আতঙ্কিতভাবে লক্ষ করলেন পেছনে দাসী পরিবৃতা দুই মাঝ বয়সী মহিলা সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠছেন। কাছে আসতে চেহারাগুলো আরও স্পষ্ট হয়। জমিদারবাড়ির বউ কে বলে দেওয়া যায়। নাকে হীরের নাক পরনে চওড়া লালপেড়ে ফরাসডাঙার শাড়ি, আলতাপরা খালি পা, পেছনে দুই দাসীর হাতে দুজোড়া চটি। সিঁড়ির নীচ-থান থেকেই সারা মুখে হাসি ফুটিয়ে রেখেছে দুই বউ।

সন্দেশ আর আপেলের থালার পাশে পাশে দাঁড়ানো ছেলেমেয়েগুলোর মুখ এক মুহূর্তে ভেসে ওঠার সঙ্গে সঙ্গেই প্রায় এক শারীরিক ব্যথা নড়ে ওঠে স্বর্ণসুন্দরীর বুকের মধ্যে। তারচেয়েও মুশকিল সামনেই উদিত দুখানি হাসিভরা মুখ। মুহূর্তে নিজেকে শক্ত করেন। স্বামীকে চেনেন স্বর্ণ-সুন্দরী। অনেক ব্যাপারে ভবনাথ খুব গোঁড়া, কিন্তু নীতিগত কোন কোন ব্যাপারে তাঁর বাবার চেয়েও ভবনাথ কড়া। ভবনাথের চিঠিও এই জাতের কড়া হুকুম। গেটের থামের পাশে সরে গিয়ে বললেন, 'সামেদ, পেছনের জমাদারের সিঁড়ি দিয়ে সব খাবার ওদের লোকজনদের দিয়ে নৌকোয় তুলে দাও। কোন চেঁচামেচি হবে না। গোপীনাথ, লুচি ভাজো।'

তারপর সামনে এসে ছোট করে নমস্কার করলেন।

(ক্রমশঃ)

চিত্তরঞ্জন ও সুভাষচন্দ্র

শঙ্করীপ্রসাদ বসু

(পূর্ব প্রকাশিতের পর

সুভাষচন্দ্র প্রকাশ্যতঃ কিন্তু দেশবন্ধুকে নিজের রাজনৈতিক গুরুই বলেছেন, ব্যক্তিগত গুরু বলেননি। দেশবন্ধুভক্ত এই রাজনৈতিকের সঙ্গে এক্ষেত্রে গান্ধীভক্ত অনেক রাজনৈতিকের দৃষ্টিভঙ্গির পার্থক্য ঘটবে। শেষোক্ত জনেরা গান্ধীজীকে আগে গুরু মেনেছিলেন, পরে রাজনৈতিক নেতা-রূপে তাঁর আনুগত্য করেছিলেন। সুভাষ-চন্দ্রের কাছে অপরপক্ষে আগে থেকেই এখন একজন মানুষের মূর্তি জ্যোতির্ময় আকারে বিরাজিত ছিল, যাঁর থেকে পূর্ণাঙ্গ ব্যক্তিত্ব তৎকালীন ভারতীয় ইতিহাসে তিনি পাননি বা পাবার আশা করেননি—তিনি অবশ্যই স্বামী বিবেকানন্দ। দেশবন্ধুর প্রতি তাঁর বিশেষভাবে আকৃষ্ট হবার কারণ—যে-বিবেকানন্দকে তিনি সাক্ষাতে পান নি, তাঁকেই কিছু অংশে যেন বাস্তবে প্রকাশিত দেখেছিলেন দেশবন্ধুর মধ্যে। সুভাষচন্দ্র দেশবন্ধু-চরিত্রের যে-ব্যাখ্যা করেছেন, তাতে দেখা যায়, তিনি দেশবন্ধুর বহুমুখিতার দিকে বিশেষ জোর দিয়েছেন। "মানুষ একাধারে কি করিয়া বড় ব্যারিস্টার, উদার প্রেমিক, পরম বৈষ্ণব, চতুর রাজনীতিজ্ঞ ও দিগ্বিজয়ী বীর হইতে পারে"—তাই ছিল তাঁর বিস্ময়ের বস্তু। বিবেকানন্দের মধ্যে সুভাষচন্দ্র যে 'সুগভীর জটিল ঋদ্ধিসমন্বিত ব্যক্তিত্বের'র আশ্চর্য প্রকাশের বিষয়ে জেনেছিলেন—দেশবন্ধুর মধ্যে তারই কিছু রূপ বাস্তবে দেখে অভিভূত হয়েছিলেন সন্দেহ নেই। বিবেকানন্দ যে-সমুচ্চ প্রতিভায় এবং উচ্চ আধ্যাত্মিকতায় উত্তোলিত ছিলেন, দেশবন্ধু সেই লোকের অধিবাসী নন, একথা বুঝতে তাঁর অসুবিধা হয় নি, কিন্তু একথাও সত্য, লোকজীবনের ক্ষেত্রে বিচরণশীল মানুষদের মধ্যে দেশবন্ধুর মত বৃহৎ মানুষের সাক্ষাৎও তিনি পাননি। সুতরাং সুভাষ-চন্দ্রের আত্মসমর্পণ যতখানি রাজনৈতিক চিত্তরঞ্জনের কাছে, ততোধিক মানবিক চিত্ত-রঞ্জনের কাছে, তা স্বীকার করতেই হয়।

কিন্তু ভারতীয় ইতিহাসের কাছে নেতাজী সুভাষচন্দ্রের রাজনৈতিক গুরু দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনই প্রধান বিবেচ্য বিষয় হবেন। বর্তমান রচনা সেই প্রসঙ্গ দিয়েই শুরু করেছি। সুভাষচন্দ্র রাজনৈতিকভাবে দেশবন্ধুর কাছে কি পেয়েছিলেন? কয়েকটি দিক থেকে বিষয়টিকে লক্ষ্য করা যায়।

প্রথমেই বলা যায়, রাজনীতির একটা বাস্তব দিক আছে, যাকে সাধারণভাবে 'সংগঠন' বলেই অভিহিত করা হয়—সেই সংগঠনের খুঁটিনাটি সুভাষচন্দ্র দেশবন্ধুর কাছ থেকেই শিখেছিলেন। সংগঠন অবশ্য সুভাষচন্দ্রের স্নায়ুশিরার মধ্যেই ছিল—সামরিক শৃঙ্খলার প্রতি তাঁর আবাল্য আকর্ষণ—কিন্তু সেই সংগঠনের মধ্যে পদক্ষেপ করতে হলে মাটির মধ্যে পা কতখানি গেঁথে যায় এবং সেই অবস্থায় কিভাবে মাথা উঁচু রেখে চলবার শক্তি জাগিয়ে রাখতে হয়—সে শিক্ষা মনে হয় চিত্তরঞ্জনই তাঁকে বিশেষভাবে দিয়েছিলেন। দেশবন্ধুর তত্ত্বাবধানে আন্দোলন-সংগঠনে স্বরাজ্য পার্টির সংগঠনে, কর্পোরেশন পরিচালনায় ব্যাপৃত থেকে সুভাষচন্দ্র যে-অভিজ্ঞতা অর্জন করেছিলেন, তা পরবর্তী কর্মজীবনের জন্য তাঁকে প্রস্তুত করে দিয়েছিল। মনে রাখতে হবে, সুভাষ-চন্দ্রের মত বৈপ্লবিক চরিত্রসম্পন্ন নেতার কাছে পার্টি সংগঠন ব্যাপারটি মূলগত। ভারতীয় রাজনীতিতে ভাসমান মহত্ত্বের অভিনয়ে পরিতৃপ্ত নেতৃত্বের রূপে মুগ্ধ অনেক সাধু ব্যক্তি বুঝতে সমর্থ ছিলেন না, কংগ্রেস-সভাপতি দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন কেন কর্পোরেশনের মেয়র হতে ব্যস্ত এবং কংগ্রেস-সভাপতি সুভাষচন্দ্র কেন কর্পোরেশনের অল্ডারম্যান হবার লোভ ত্যাগ করতে পারেননি।

*(৪) এঁরা জানতেন না সত্যকার সংগঠন শুরু হয় একেবারে তলার স্তর থেকে এবং ভিত্তিকে বাদ দিয়ে যে-নেতৃত্ব গড়ে উঠতে চায়, সেই পরগাছা-নেতৃত্ব জাতীয় জীবনে মূলগত পরিবর্তন আনতে পারে না। স্বাধীনতা-উত্তর ভারতীয় রাজ-নৈতিক জীবনই তার প্রমাণ।

সুভাষচন্দ্র দেশবন্ধুর মধ্যে অধিকন্তু প্রবল ভাবাবেগের সঙ্গে ক্ষুরধার বুদ্ধির সমন্বয়ের রূপ লক্ষ্য করেছিলেন এবং নিজ জীবনে তার প্রকাশ আনতে চেয়েছিলেন। সম্পূর্ণ ত্যাগ—কিন্তু বুদ্ধিত্যাগ নয়। আই সি এস ত্যাগ করে ইংলণ্ড থেকে ফেরার পথে সুভাষচন্দ্র প্রথম গান্ধীজীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছিলেন। সেই সাক্ষাতের যে-বিবরণ তিনি দিয়েছেন তাতে দেখতে পাই, গান্ধীজীর অস্পষ্ট ধোঁয়াটে কথাবার্তা তাঁকে সম্পূর্ণ হতাশ করেছিল। গান্ধীজীর কাছ থেকে ধর্ম ও ত্যাগ শেখার দরকার আর যারই থাক, সুভাষচন্দ্রের ছিল না। বিবেকানন্দ যাঁর ভাবগুরু তিনি ধর্ম ও ত্যাগের চরম আদর্শ ইতিপূর্বেই পেয়ে গেছেন। আর লৌকিক অর্থে ত্যাগ যাকে বলে তার অত্যাশ্চর্য প্রকাশ অল্পপূর্বে চিত্তরঞ্জনের মধ্যে দেখেছেন। ইংলণ্ডে থাকা-কালেই চিত্তরঞ্জনের বিরাট ত্যাগের কাহিনী কিভাবে তাঁকে শিহরিত করেছিল, তা নিজেই তিনি লিখে জানিয়েছেন। গান্ধীজীর ত্যাগ অন্ততঃ চিত্তরঞ্জনের চেয়ে বড় ছিল না। সুতরাং গান্ধীজীর সঙ্গে তিনি দেখা করেছিলেন—ভারতীয় রাজনীতির তৎ-কালীন মূল নেতার কাছ থেকে তাঁর রাজ-নৈতিক দৃষ্টিভঙ্গির যথার্থ রূপ জানবার জন্যই। তার অল্প পরেই চিত্তরঞ্জনকে যদি তিনি নিজ নেতারূপে বরণ করে থাকেন, তার মূল কারণ—চিত্তরঞ্জনের রাজনৈতিক প্রজ্ঞা তাঁকে মুগ্ধ করেছিল। চিত্তরঞ্জন, সুভাষচন্দ্রের কাছে "আদর্শবাদ ও বাস্তব-বাদের বিরল সমন্বয়" বলে প্রতিভাত হয়েছিলেন। রাজনীতিতে 'প্র্যাগম্যাটিক' দৃষ্টিভঙ্গীর প্রয়োজনীয়তা সুভাষচন্দ্র সর্বদা অনুভব করেছেন—তার বিশেষ প্রকাশ তিনি দেশবন্ধুর মধ্যে দেখেছিলেন, অথচ দেশবন্ধুর থেকে অধিক আদর্শবাদীও কল্পনা করা শক্ত। দেশবন্ধুর বাস্তববাদ কদাপি সুবিধাবাদ নয়, আপোষমুখিতা নয়; তা হল মূল আদর্শকে অম্লান ও অপরিহার্য রেখে চলতি পথের পরিস্থিতির সম্বন্ধে অবহিত থাকা, যাতে পথচলা ঊর্ধ্বমুখ নির্বুদ্ধিতায় ব্যাহত না হয়। নচেৎ দেশবন্ধুর থেকে গতিশীল আশাবাদী আর কে, যিনি তাঁর 'যুবক-বন্ধু' সহকারী-দের হতাশার সামনে অস্থির আক্ষেপের সঙ্গে বারবার না বলে পারতেন না—যদি আমি তোমাদের মধ্যে আমার গতি একটু সঞ্চারিত করতে পারতাম! সুভাষচন্দ্র এই

---

*৪ যেমন ধরা যাক, সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় A Nation in Making গ্রন্থে চিত্তরঞ্জনের মেয়র হওয়ার কঠোর সমালোচনা করেছেন। জহরলাল প্রমুখ ব্যক্তিও কংগ্রেস-সভাপতির রাজসিংহাসন থেকে সুভাষচন্দ্রের কর্পোরেশনে অল্ডার-ম্যানত্বের বেঞ্চে উপবেশনকে যথেষ্ট করুণার চোখে দেখেছিলেন।

১৮ নভেম্বর, ১৯২১ তারিখের স্টেটসম্যানের রিপোর্ট। প্রিন্স অব ওয়েলস পূর্বদিন বোম্বাইয়ে পদার্পণ করেছেন। কংগ্রেস হরতাল ডাকলেও গান্ধীদুর্গ বোম্বাইয়ে কিন্তু তা সফল হয়নি।

THE STATESMAN

GREAT WELCOME TO THE PRINCE AT THE GATEWAY OF INDIA

H. R. H.'S AMBITION TO RIPEN GOODWILL

THE KING-EMPEROR'S MESSAGE "INDIA'S ANXIETIES AND REJOICINGS ARE MY OWN"

HUGE AND ENTHUSIASTIC CROWDS IN BOMBAY STREETS

ROYAL APPEAL FOR LOYAL CO-OPERATION: DESIRE TO UNDERSTAND INDIA'S DIFFICULTIES AND ASPIRATIONS

Sir Percival Phillips, the special correspondent of "The Statesman" travelling with the Prince, paints a glowing word picture of the spontaneous greeting accorded H. R. H. when he landed at Bombay.

দেশবন্ধুর সম্বন্ধে বলেছেন, "তাঁর গতিশীলতা তাঁকে বিশ্রামের সুযোগ দেয়নি—টেনে নিয়ে গিয়েছিল সংগ্রাম থেকে সংগ্রামের মধ্যে।" দেশবন্ধু ছিলেন সেই নেতা, যিনি যাকে সত্য বলে মনে করতেন—তাকে পাবার জন্য নিজের জনপ্রিয়তাকে বলি দিতেও প্রস্তুত ছিলেন। 'কাউন্সিল প্রবেশ' প্রস্তাব বা 'বেঙ্গল প্যাক্ট' তার প্রমাণ।

বেঙ্গল প্যাক্ট সূত্রেই বলে নেওয়া যায়, হিন্দু-মুসলমান সম্পর্কের বিষয়ে সুভাষচন্দ্রের উদার দৃষ্টিভঙ্গী দেশবন্ধুর দ্বারাই সংগঠিত হয়েছিল। ভারতীয় রাজনীতিক্ষেত্রে মুসলমানদের সবচেয়ে বড় বন্ধু দেশবন্ধু—সুভাষচন্দ্র সঙ্গতভাবেই দাবি করেছেন। বেঙ্গল প্যাক্টের মধ্যে দেশবন্ধু মুসলমানদের প্রাপ্যের অতিরিক্ত সুবিধা দিয়েছিলেন, এই জন্যই তিনি মুসলমানদের বড় বন্ধু নন এবং তাঁর বেঙ্গল প্যাক্ট অবশ্যই হিন্দু-মুসলমান সমস্যার সর্বোত্তম সমাধান নয়—এ প্যাক্টের পিছনে তাঁর যে-চিন্তা ছিল, সেটার জন্যই তিনি অভ্রান্ত রাজনৈতিক। দেশবন্ধু বুঝেছিলেন, মুসলমানদের হিন্দু-বিরোধিতায় একটা বড় কারণ তাদের অর্থনৈতিক অনগ্রসরতা। কিছু সময়ের বিশেষাধিকারের দ্বারা যদি অনগ্রসর সমাজকে অগ্রবর্তীদের সমপর্যায়ে তুলে আনা যায়, তাহলেই সুস্থ সম্পর্কের ভিত্তি স্থাপিত হতে পারে। সুভাষচন্দ্র যে এক্ষেত্রে দেশবন্ধুর দ্বারা প্রভাবিত তা সহজেই বোঝা যায়।

শ্রমিক ও কৃষকদের অধিকার সম্বন্ধে দেশবন্ধুর মনোভাব সুভাষচন্দ্রকে তাঁর রাজনৈতিক জীবনের প্রথম পর্যায়ে চালিত করেছিল। সুভাষচন্দ্র নিজেকে সমাজতন্ত্রী মনে করতেন এবং পরবর্তীকালে সমাজতন্ত্র ও সাম্যবাদের বিশেষ অনুশীলন করেছিলেন—কিন্তু প্রথমে বা শেষে তিনি কখনই সমাজতন্ত্রকে আমদানীযোগ্য পদার্থ মনে করেননি। দেশীয় ইতিহাসের সঙ্গে নিঃসম্পর্কিত আকারে সমাজতন্ত্র সত্যই সফল হতে পারে, তাও তিনি মনে করেননি—অন্ততঃ ভারতের মত সুপ্রাচীন সমৃদ্ধ সংস্কৃতির অধিকারী কোনো দেশে। গায়ের জোরে যদি তাকে প্রবর্তন করা যায়ও, তা কল্যাণকর হবে, এমন ধারণা তাঁর ছিল না। সুতরাং ভারতীয় সমাজতান্ত্রিক ভাবধারার প্রসঙ্গে তিনি বিবেকানন্দ বা চিত্তরঞ্জনের চিন্তাধারার কথা না বলে পারেন নি। মান্দালয় জেল থেকে ২০ ফেব্রুয়ারী, ১৯২৬ খৃষ্টাব্দে লেখা তাঁর নিম্নের কথাগুলি পরেও পরিবর্তনের কোনো হেতু তিনি দেখেছেন মনে হয় না :

"ভারতে স্বরাজের প্রতিষ্ঠা হইবে উচ্চশ্রেণীর স্বার্থসিদ্ধির জন্য নয়, জনসাধারণের উপকার ও মঙ্গলের জন্য, একথা দেশবন্ধু যেরূপ জোর গলায় প্রচার করিয়াছেন, প্রথম শ্রেণীর আর কোনো নেতা সেরূপ করিয়াছিলেন বলিয়া মনে হয় না।...অবশ্য স্বামী বিবেকানন্দ তাঁর 'বর্তমান ভারতে' প্রায় ত্রিশ বৎসর পূর্বে একথা লিখিয়া গিয়াছেন, কিন্তু স্বামীজীর সে ভবিষ্যৎবাণীর প্রতিধ্বনি (ভারতীয়) রাজনীতির রঙ্গমঞ্চে শুনা যায় নাই।"

এই দৃষ্টিভঙ্গির জন্যই দেশবন্ধু ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনে অংশ নিয়েছিলেন এবং ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসে সভাপতিত্বও করেছেন। ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনকে সমগ্র জাতীয় আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত করাই ছিল তাঁর অভিপ্রায়। তার দ্বারা তিনি ভেবেছিলেন, যাতীয় স্বাধীনতা-আন্দোলনকে দেশীয় ধনতন্ত্রের স্বাধীন বিস্তারের পরিণতি থেকে দূরে রাখা যাবে, অন্যদিকে ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনকেও জাতীয় আশা-আকাঙ্ক্ষার সঙ্গে সম্পর্কহীন নিছক অর্থনৈতিক সুবিধাবাদের সঙ্কীর্ণতা থেকে রক্ষা করা যাবে। ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনে অংশ নিয়ে এবং ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের সভাপতিত্ব করে সুভাষচন্দ্র পরবর্তীকালে দেশবন্ধুর পথেই চলেছিলেন।

এই সমস্ত দিক থেকে এবং অন্যান্য দিক থেকে সুভাষচন্দ্রের কাছে দেশবন্ধুই ছিলেন ভারতীয় রাজনীতির শ্রেষ্ঠ চরিত্র। এবং সুভাষচন্দ্র দেশবন্ধুকে সর্বদা প্রগতিশীল চরিত্র হিসাবেই রাজনীতিতে দেখেছেন। একদিকে অনুন্নত অনগ্রসরদের প্রতি

Thursday, April 24, 1924

CALCUTTA CORPORATION

ELECTION OF CHIEF EXECUTIVE OFFICER

MR. SUBHAS BOSE'S CHANCE SECURE.

AMENDMENT FOR ADVERTISING THE POST DEFEATED

DISCUSSION ADJOURNED FOR TO-DAY

আই-সি-এস ত্যাগী মার্কামারা ছোকরা সুভাষচন্দ্রকে চীফ একসিকিউটিভ অফিসার সহজে করা যায় নি। অনেক টানা-হেঁচড়া এই নিয়ে হয়েছিল। অমৃতবাজারের ২৪ এপ্রিল, ১৯২৪-এর সংবাদে তার ইঙ্গিত।

সুবিচারের আত্যন্তিক প্রয়াস, অন্যদিকে দুর্ধর্ষ প্রতিপক্ষের সঙ্গে সমানে লড়বার ক্ষমতা—দেশবন্ধুর মধ্যে এই দুই গুণের বিকাশই সুভাষচন্দ্রের ঐ উচ্চ ধারণার মূলে। রাজনৈতিক হিসাবে গান্ধীজীকে সুভাষচন্দ্র কখনই দেশবন্ধুর সমতুল মনে করতেন না—এবং সেকথা তিনি খোলাখুলিভাবে তাঁর ইন্ডিয়ান স্ট্রাগল গ্রন্থে লিখেছিলেন। দেশবন্ধুর পাশে থেকে গান্ধীজীকে বিচার করবার সুযোগ তাঁর হয়েছিল। গান্ধীজীর শক্তি ও দুর্বলতা দুইই তিনি লক্ষ্য করতে পেরেছিলেন। দেশবন্ধুর মত তিনিও দেখেছিলেন, "গান্ধীজী আন্দোলন আরম্ভ করেন অপূর্বভাবে, অভ্রান্ত নৈপুণ্যতাকে গড়ে তোলেন, সাফল্যের পর সাফল্যের মধ্য দিয়ে এগিয়ে গিয়ে আন্দোলনের শিখরে পৌঁছে যান—তারপরেই তাঁর স্নায়ু দুর্বল হয়ে যায়, দ্বিধায় ভয়ে তিনি আচ্ছন্ন হয়ে যান, কি করবেন ঠিক করতে পারেন না।" এই দ্বিধা বা ভয়ের চূড়ান্ত দৃষ্টান্ত—চৌরিচৌরার ক্ষুদ্র ঘটনায় সর্বভারতীয় আন্দোলন প্রত্যাহার করে নেওয়া। ১৯২১ ফেব্রুয়ারী মাসের গোড়ায় যুক্তপ্রদেশের চৌরিচৌরা গ্রামের অধিবাসীরা পুলিশের দ্বারা নির্যাতিত হবার পরে উত্তেজনাবশে একটি পুলিশ থানায় আগুন ধরিয়ে দেয় ও কয়েকজন পুলিশকে মেরে ফেলে। গান্ধীজীর কাছে সে সংবাদ পৌঁছলে "ঘটনার গতি দেখে আতঙ্কিত হয়ে গান্ধীজী তখন বরদৌলিতে কংগ্রেস

ওয়ার্কিং কমিটির সভা ডাকেন। তাঁর প্ররোচনায় ওয়ার্কিং কমিটি অনির্দিষ্ট কালের জন্য অসহযোগ আন্দোলন স্থগিত রাখার নির্দেশ দিয়ে বলে, সকল কংগ্রেস-সেবী যেন অতঃপর নিজেদের শান্তিপূর্ণ গঠনমূলক কাজে নিযুক্ত রাখেন।"

সমস্ত ভারতবর্ষ এবং পৃথিবী গান্ধীজীর এই কান্ডে স্তম্ভিত হয়ে গিয়েছিল। ইংরেজরা স্তম্ভিত হয়েছিল আনন্দে—এরকম ঐতিহাসিক নির্বুদ্ধিতা কোনো আন্দোলনের নেতা করতে পারেন তা তাঁদের কল্পনার অতীত ছিল। নৈষ্ঠিক গান্ধীভক্তেরা স্তম্ভিত হয়েছিলেন আনন্দে—এতবড় মূল্যে ইতিপূর্বে আর কেউ অহিংসাকে কেনেননি (বিবেকানন্দের মতে অবশ্য অশোক তা কিনেছিলেন, যিনি অস্ত্রের জোরে গোটা জাতকে নিরামিষাশী করে বহু শত বৎসরের পরাধীনতার কারণ হয়েছিলেন)। এবং বাকি সকলে স্তম্ভিত ক্ষোভে ও হতাশায়—জাতির ভাগ্য নিয়ে একটি মানুষের ছিনিমিনি খেলার এই ডিক্টেটরীতে। "ডিক্টেটরের নির্দেশ তখন মেনে নেওয়া হয়েছিল বটে, কিন্তু কংগ্রেস-শিবিরে রীতিমত বিদ্রোহ দেখা দিয়েছিল: কেউ বুঝে উঠতে পারল না—মহাত্মা চৌরিচৌরার বিচ্ছিন্ন ঘটনাকে কেন সারা ভারতের আন্দোলনের গলা টিপে মারার কাজে ব্যবহার করলেন"—সুভাষচন্দ্র লিখেছেন। * পন্ডিত মতিলাল, লালা লাজপত রায় প্রমুখ সকল বড় নেতাই গান্ধীজীর কাজের প্রতিবাদ করলেন। আর দেশবন্ধু, অসহযোগ আন্দোলনকে প্রচন্ড করে তোলার মূলে যাঁর দান গান্ধীজীর পরেই এবং খুব পরে নয়, তাঁর অবস্থা, সুভাষচন্দ্রের সাক্ষ্য অনুযায়ী এই প্রকার :

"সেই সময়ে আমি দেশবন্ধুর সঙ্গে ছিলাম। দেখলাম—মহাত্মার ক্রমাগত আনাড়িপনা রাগে দুঃখে তাঁকে আত্মহারা করে ফেলেছে। (লর্ড রীডিং-এর সঙ্গে বোঝাপড়ার ব্যাপারে) ১৯২১ ডিসেম্বরের বিকট ভ্রান্তির স্মৃতি তিনি যখন সবে ভুলতে শুরু করেছেন—তখনি এল বরদৌলির পশ্চাৎ-অপসরণ—মর্মান্তিক আঘাতের মত।"

ভারতবর্ষে গান্ধী-প্রভাবের পূর্ণ প্রকোপের মধ্যে সুভাষচন্দ্র তাঁর স্বাভাবিক সাহসিকতার সঙ্গে গান্ধী ও দেশবন্ধুর রাজনৈতিক ভূমিকার তুলনা করে যেকথা লিখেছিলেন, সেই কথাগুলি আজকের পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে অভ্রান্ত সহজ সত্য মনে হলেও সেদিন তা সুভাষচন্দ্রের গুরু-ভক্তির পরিচয় বা গোঁড়া গান্ধী-বিরোধী মনোভাবের নিদর্শন বলেই গৃহীত হয়েছিল। সুভাষচন্দ্র লিখেছিলেন :

"১৬ জুন, ১৯২৫ তারিখে দেশবন্ধুর মৃত্যু ভারতের পক্ষে প্রচন্ড ধরনের দৈব দুর্বিপাক। তাঁর সক্রিয় রাজনৈতিক জীবন পাঁচ বছরও নয়—কিন্তু তাঁর উত্থান অদ্ভুত। বৈষ্ণব ভক্তের বৌহসেবী উন্মাদনায় সর্ব-মনপ্রাণ নিয়ে তিনি রাজনীতিতে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন। তিনি কেবল নিজেকেই দেননি—যা-কিছু তাঁর অধিকারে ছিল, সে সকলই দিয়েছিলেন স্বরাজের সংগ্রামে। তিনি যখন মারা গেলেন দেখা গেল—তখনো অবশিষ্ট সমস্ত পার্থিব সম্পত্তি তিনি জাতির জন্য উৎসর্গ করে গেছেন। সরকার তাঁকে ভয় করতেন, আবার শ্রদ্ধা করতেন। তাঁর শক্তিকে করতেন ভয়, শ্রদ্ধা করতেন তাঁর চরিত্রকে। তাঁরা জানতেন, তিনি কথার মানুষ। তাঁরা এও জানতেন, তিনি সংগ্রামে কঠোর কিন্তু তাতে কোনো মালিন্য নেই। অধিকন্তু তিনি সেই মানুষ যাঁর সঙ্গে চুক্তির জন্য দরকষাকষি করা যায়। পরিষ্কার তাঁর মাথা, রাজনৈতিক অন্তর্দৃষ্টি নিখুঁত, ভারতীয় রাজনীতিতে কোন্ ভূমিকা গ্রহণ করতে হবে সে-বিষয়ে সম্পূর্ণ সচেতন—যে-সচেতনতা মহাত্মা গান্ধীর মধ্যে ছিল না। অপর যে-কোনো মানুষের চেয়ে তিনি বেশী করে জানতেন যে, শত্রুর হাত থেকে রাজনৈতিক ক্ষমতা কেড়ে নেবার সুযোগ সহজে মেলে না; যখন সত্যই তা এসে হাজির হয়— বেশীক্ষণ থাকেও না। সংকট-ক্ষণ বজায় থাকার মধ্যেই দরকষাকষি সেরে নিতে হয়। তিনি আরও জানতেন, জনসাধারণের উন্মাদনা যখন চরমে, তখন কোনো বোঝাপড়া করতে হলে খুব সাহসের দরকার হয়—তাতে কিছু জনপ্রিয়তা খোয়াতেও হতে পারে। কিন্তু তাঁর অন্ততঃ সাহসের অভাব ছিল না। নিজের সঠিক ভূমিকা সম্বন্ধে তিনি সচেতন ছিলেন—তা বাস্তববাদী রাজনীতিকের—তাই জনপ্রিয়তা হারাবার ভয় তিনি করতেন না।

"দেশবন্ধুর পাশে মহাত্মা গান্ধীর ভূমিকা মোটেই পরিষ্কার নয়। বহু ব্যাপারে গান্ধী চূড়ান্ত রকমের আদর্শবাদী ও স্বপ্নবাদী। অন্য অনেক ক্ষেত্রে ঘাঘী রাজনীতিক। কখনো তিনি ধর্মান্ধের মত অবুঝ একগুঁয়ে, অন্যত্র শিশুর মত আত্ম-সমর্পণকারী। রাজনৈতিক দরাদরির জন্য প্রয়োজনীয় সহজ-বোধ বা বিচারবুদ্ধির প্রকট অভাব তাঁর মধ্যে। দরাদরির যথার্থ সুযোগ যখন আসে, ১৯২১ সালে যেমন এসেছিল, তখন সামান্য জিনিস আঁকড়ে থেকে মূল জিনিস তিনি ভন্ডুল করে দেন। আর তিনি নিজে যখন বোঝাপড়ার জন্য যান, যেমন ১৯৩১ সালে, তখন নিয়ে আসার চেয়ে দিয়ে আসেন বেশী। সব জড়িয়ে ধুরন্ধর বৃটিশ রাজনীতিকদের সঙ্গে যুঝবার যোগ্য মানুষ তিনি নন।"

।।৪।।

দেশবন্ধু তাঁর সর্বাত্মক রাজনৈতিক জীবনের প্রথম পর্বে গান্ধী-নেতৃত্বে অসহযোগ-আন্দোলনের সহ-নেতা। অসহযোগ আন্দোলন তারপর নেতৃত্বের ত্রুটিতে ব্যর্থ হলে দেশবন্ধু আন্দোলনকে নূতন খাতে প্রবাহিত করার ব্যাপারে স্বয়ং মূল নেতা। অসহযোগকে আইনসভার ভিতরে প্রবেশ করাবার জন্য তাঁর পরি-কল্পনা, ১৯২২-এর গয়া-কংগ্রেসে সভাপতিরূপে তাঁর সেই প্রস্তাব পেশ, পরিবর্তন-বিরোধী গোঁড়া গান্ধীবাদীদের হাতে তাঁর পরাজয়, কংগ্রেস-সভাপতি পদ থেকে তাঁর পদত্যাগ ও স্বরাজ্য পার্টি গঠন, মতিলাল নেহরু প্রমুখের সহযোগিতায় সেই স্বরাজ্য দলকে ভারতীয় রাজনীতির বৃহৎ শক্তিতে পরিণত করা, ক্রমে গান্ধী-বাদীদের পরাজয়ের মুখে এগিয়ে নিয়ে

কলকাতায় কিন্তু প্রিন্স অব ওয়েলসের সংবর্ধনা বয়কটের হরতাল সম্পূর্ণ সফল হয়েছিল। ১৮ নভেম্বর, ১৯২১ তারিখে স্টেটসম্যানের আক্রোশপূর্ণ সংবাদ থেকে তা দেখা যাচ্ছে।

THREATS OBTAIN "HARTAL"

CALCUTTA HELD UP

"VOLUNTEER" GANGS' INTIMIDATION

---

* (৫) চৌরিচৌরার পরে খাস গান্ধী-মহলেও যে তাঁকে 'ডিক্টেটার' মনে করা হয়েছে, একথা টেণ্ডুলকরের জীবনীতেও পাই। অল ইণ্ডিয়া কংগ্রেস কমিটি শেষ পর্যন্ত গান্ধীজীর চাপে পড়ে আন্দোলন-বন্ধের সিদ্ধান্ত নিতে বাধ্য হয়, কিন্তু প্রস্তাবটি অক্ষত আত্মায় বেরিয়ে আসেনি। টেণ্ডুলকর তাঁর 'মহাত্মা' গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ডে লিখেছেন :

"In the end Gandhi triumphed. But he suffered keenly, for he realised the majority was not backing him sincerely. He knew that some of those who voted for him called him 'dictator' behind his back. He knew that he no longer reflected the sentiment of the country.'

গিয়ে কংগ্রেসের কাছ থেকে স্বরাজ্য-নীতির অনুমোদন আদায় করে নেওয়া, নির্বাচনে অংশগ্রহণ, কয়েকটি ক্ষেত্রে বিশেষ সাফল্য, এবং কয়েকটি ক্ষেত্রে দ্বৈতশাসনকে অচল করে দেওয়া—দেশবন্ধুর এই সকল রাজনৈতিক কীর্তিকলাপ বিস্তারিত বর্ণনার প্রয়োজন এখানে নেই। আমরা যেহেতু দেশবন্ধু-সুভাষচন্দ্রের সম্পর্ক নির্ণয় করতে চাইছি তাই প্রথমতঃ সুভাষচন্দ্রের দিক থেকে বিষয়টিকে পর্যবেক্ষণ করে এসেছি—সুভাষচন্দ্র দেশবন্ধু-চরিত্রের কোন্ গুণে মুগ্ধ ছিলেন এবং দেশবন্ধুকে কেন নিজের রাজনৈতিক গুরু বলেছেন। এর উল্টোদিকে আছে সুভাষচন্দ্র সম্বন্ধে দেশবন্ধুর মনোভাব। সেক্ষেত্রে সংক্ষেপে এইটুকু বললেই চলবে—সুভাষচন্দ্রকে তিনি নিজের পুত্র এবং রাজনৈতিক পুত্র—উভয়ই মনে করতেন। দেশবন্ধুর বিপুল ব্যক্তিগত ভালবাসা সুভাষচন্দ্র পেয়েছিলেন—দেশবন্ধুপত্নী বাসন্তীদেবী, দেশবন্ধুকন্যা অপর্ণাদেবী থেকে আরম্ভ করে সকল সূত্র থেকেই এই কথার সমর্থন পাওয়া যায়। দেশবন্ধুর অপূর্ব ভালবাসাকে অনুভব করে সুভাষচন্দ্র অবরুদ্ধ ভাষায় লিখেছিলেন, "ব্যক্তিগতভাবে তাঁহার সহিত আমার সম্বন্ধ এত গভীর রকমের ছিল যে, অত্যন্ত অন্তরঙ্গ ভিন্ন আর কাহারও নিকট তাঁহার বিষয় কিছুই বলিতে ইচ্ছা হয় না।"

রাজনৈতিক ভাবেও দেশবন্ধু সুভাষচন্দ্রকে নিজের 'ডান হাত' বলে মনে করতেন—একথা সেকালে সকলেরই জানা ছিল: একালে হয়ত প্রমাণ দেবার দরকার হতে পারে। তাহলে জীবনীকার ডাঃ হেমেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত, হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ, অপর্ণাদেবী প্রভৃতির সাক্ষ্য সহজেই উদ্ধৃত করা যায়। (৬) দেশবন্ধুর একান্ত অনুগত এবং সুভাষচন্দ্রের ঘনিষ্ঠ বন্ধু সহকর্মী শ্রীযুক্ত সত্যরঞ্জন বক্সীর কথা আর নাই উল্লেখ করলাম।

---

(৬) ডাঃ হেমেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত তাঁর স্মৃতিতে লিখেছেন :

"সুভাষচন্দ্রকে ধরিবার পর তিনি বড়ই বিচলিত হইয়াছিলেন। প্রায়ই তিনি বলিতেন, "মানুষের ডান হাত কাটিয়া নিলে যেরূপ অবস্থা হয়, আমারও ঠিক সেই অবস্থা হইয়াছে, আমিও সেইরূপ যন্ত্রণা ও অসুবিধা ভোগ করিতেছি।"

শ্রীমতী অপর্ণা দেবী 'মানুষ চিত্তরঞ্জন' গ্রন্থে লিখেছেন :

"প্রিয় সহকর্মীদের অভাবে তিনি খুবই ম্রিয়মান হয়ে পড়েছিলেন। বিশেষ করে সুভাষচন্দ্রের অভাব তিনি বেশী উপলব্ধি করতেন। সুভাষচন্দ্রকে গ্রেপ্তার করে বৃটিশ গভর্নমেন্ট সত্যিই পিতৃদেবের ডান হাতখানাই যেন কেটে দিল।"

হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ মাসিক বসুমতীর ১৩৩২, ভাদ্র সংখ্যায় 'রাজনীতিক চিত্তরঞ্জন' প্রবন্ধের মধ্যে লিখেছেন :

"সুভাষের পরিচয় আর নূতন করিয়া কি দিব?......তিনি চিত্তরঞ্জনের দক্ষিণহস্ত হইয়াছিলেন বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। সেইজন্যই তাঁহার যোগ্যতা বিবেচনা করিয়া চিত্তরঞ্জন তাঁহার উপর কর্পোরেশনের গুরুভার অর্পণ করেন।"

চৌরিচৌরার ঘটনার পরে সহসা গান্ধীজীর আন্দোলন প্রত্যাহার ভারতের মত ইংলণ্ডকেও বিস্মিত করেছিল। টাইমস অব ইণ্ডিয়ার ১৫ জানুয়ারী, ১৯২২-এর এই রিপোর্টে দেখা যায়, গান্ধীজী আন্দোলন প্রত্যাহার করা সত্ত্বেও ডেইলী টেলিগ্রাফ প্রভৃতি কাগজ কী প্রচণ্ড আক্রোশের মনোভাব দেখিয়েছিল।

FEBRUARY 15, 1922

SURPRISE

MR. GANDHI'S DECISION

THE ... ENGLAND

LONDON, February 13.

[illegible]

"THE TIME IS PAST"

[illegible]

এখন প্রশ্ন—বহু প্রবীণ দেশকর্মী থাকতেও সুভাষচন্দ্র কেন দেশবন্ধুর ডান হাত? কেন দেশবন্ধু শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের কাছে সুভাষচন্দ্রের বিষয়ে বলেছিলেন 'My best man?' আমার স্পষ্ট উত্তর—দেশবন্ধুর অধিকাংশ রাজনৈতিক পরিকল্পনা বা প্রয়াসকে সফল করার মূলে ছিলেন সুভাষচন্দ্র। তেমন কয়েকটিকে পরীক্ষা করে দেখা যাক।

(ক) অন্য প্রসঙ্গে আসার আগে বলে নেওয়া যায়, সুভাষচন্দ্রের আই সি এস-ত্যাগ ব্যাপারটিই বাংলার অসহযোগ আন্দোলনের পক্ষে যথেষ্ট সহায়ক ছিল। চিত্তরঞ্জন আদালত ত্যাগ করেছিলেন, আর তাঁর পিছনে এসে দাঁড়িয়েছিলেন আই সি এস ত্যাগ করে সুভাষচন্দ্র—যে আই সি এস তখন ভারতবাসীর কাছে 'স্বর্গোদ্ভূত চাকরি।' গণ-উন্মাদনা বৃদ্ধিতে আই সি এস-ত্যাগের বিশেষ মূল্য ছিল।

(খ) অসহযোগ যে-সমস্ত 'ত্যাগে' আহ্বান জানিয়েছিল, তাদের মধ্যে সর্বাধিক সমালোচনার লক্ষ্য হয়েছিল, স্কুল কলেজ-ত্যাগ। শিক্ষার সঙ্গে এই 'বিরোধকে' রবীন্দ্রনাথসহ অনেকেই বিশেষ অপছন্দ করেছিলেন। এবং বিকল্প শিক্ষার ব্যবস্থা না করে শিক্ষা-নামক সামান্য যেটুকু বস্তু পাওয়া যাচ্ছে, তার বর্জন সত্যই মনঃপূত হওয়ার কথা নয়। অসহযোগীরা এসম্পর্কে সচেতন ছিলেন এবং জাতীয় শিক্ষার নমুনাব্যবস্থা অন্ততঃ করবার চেষ্টা করেছিলেন বাংলাদেশে 'গৌড়ীয় সর্ব-বিদ্যায়তন' স্থাপন করে, যার অধীনে ছিল 'কলিকাতা বিদ্যাপীঠ' বা ন্যাশন্যাল কলেজ। এই জাতীয় শিক্ষা ব্যাপারটি পরিকল্পনায় যত বড় ছিল কাজে তত বড় হয়ে উঠছিল না, 'বিদ্যাপীঠ' রবীন্দ্রনাথের কথামত 'বিদ্যার প্রতি পৃষ্ঠপ্রদর্শন' হয়ে দাঁড়াচ্ছিল, কারণ প্রথম অবস্থায় যাঁরা ভার পেয়েছিলেন বা নিয়েছিলেন, তাঁরা এই ব্যবস্থার ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে মোটেই আশান্বিত ছিলেন না, উল্টোপক্ষে বিদ্যাপীঠের আসরকে দলাদলি চর্চায় ঢালাও আসর বলেই মনে করেছিলেন। ফলে অল্পদিনের মধ্যেই বিশৃঙ্খলার চূড়ান্ত ঘটে এবং ছাত্ররা সরে পড়তে থাকে। যারা তখনও বজায় থাকে তারা বিদ্রোহী হয়ে ওঠে। বিদ্যাপীঠের অন্যতম অধ্যাপক কবি সাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায় এসব কথা তাঁর 'সুভাষচন্দ্র ও নেতাজী সুভাষচন্দ্র' গ্রন্থে সবিশেষ জানিয়েছেন।

সুভাষচন্দ্র ইতিমধ্যে কলকাতায় ফিরে দেশবন্ধুর কর্মীদলভুক্ত হয়ে পড়েছেন। ইংলণ্ডে থাকাকালে যখন আই সি এস-ত্যাগের মতলব করেছেন, তখনি তিনি 'বাংলাদেশের স্বদেশ সেবাযজ্ঞের প্রধান ঋত্বিক' দেশবন্ধুর কাছে পেট-ভাতায়

স্বদেশ সেবার চাকরির ("অবশ্য আমার থাকা ও খাওয়ার খরচ দিবেন, কারণ চাকুরি ছাড়ার পর বাড়ি থেকে টাকা লওয়া বোধহয় যুক্তিসংগত হইবে না") আবেদন জানিয়েছিলেন এবং ঠিক আবেদনকারীর ভঙ্গিতে নিজের যোগ্যতার পরিচয় দিয়ে যেসব কথা লিখেছিলেন, তার মধ্যে জাতীয় কলেজে 'নিম্নশ্রেণীতে অধ্যাপনার' জন্য বিশেষ আবেদন ছিল।

* (৭) কলিকাতা বিদ্যাপীঠে' উক্ত অব্যবস্থার পটভূমিকায় দেশবন্ধু সুভাষচন্দ্রের আবেদন মঞ্জুর করতে বাধ্য হলেন—তাঁকে অধ্যক্ষ ও কিরণশঙ্কর রায়কে গৌড়ীয় সর্ববিদ্যায়তনের সম্পাদক নিযুক্ত করলেন। বিদ্যায়তনের তৎকালীন কর্তারা এই নিয়োগকে পছন্দ করবেন না বলে দেশবন্ধুকে 'দখল' নেবার হুকুমনামা পর্যন্ত দিতে হয়েছিল।

* (৮) এবং সুভাষচন্দ্র যতদিন এই চাকুরিতে নিযুক্ত ছিলেন ততদিন ঝাড়ুদারি থেকে প্রিন্সিপালি—সর্বকার্য সুচারুরূপে সমাধা করে বিদ্যাপীঠের লুপ্ত মর্যাদা কিছু উদ্ধার করতে সমর্থ হয়েছিলেন।

(গ) কংগ্রেসের 'ইনটেলিজেন্স ডিপার্টমেন্ট' এবং 'পাবলিশিটি ডিপার্টমেন্ট' থাকার প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধেও সুভাষচন্দ্র পূর্বোক্ত পত্রে দেশবন্ধুকে অবহিত করতে চেয়েছিলেন। 'অবহিত' দেশবন্ধু সুভাষচন্দ্রের প্রার্থনামত তাঁকে কংগ্রেসের পাবলিশিটি অফিসার নিযুক্ত করেছিলেন। একাজে সুভাষচন্দ্রের সাফল্য বিষয়ে তথ্যাভিজ্ঞ শ্রীযুক্ত কালীচরণ ঘোষের বক্তব্য উদ্ধৃত করা যায় ঃ

"কংগ্রেসের প্রচারসচিব হিসাবে সুভাষচন্দ্রের কাজ শত্রু মিত্র সকলেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল। অপূর্ব ছিল তাঁর কর্মপদ্ধতি। প্রচারের ব্যাপারে সরকার কংগ্রেস-নেতৃবৃন্দের উপর চড়ে বসতে চেয়েছে কি সুভাষচন্দ্রের শ্যেনচক্ষু সেখানে গিয়ে পড়েছে। পরদিনই কংগ্রেসের পক্ষে বেরুত মোক্ষম উত্তর, যা সরকারকে ধূলিসাৎ করে দিত। সরকারের প্রেসনোট বা বুলেটিনের মধ্যে যেখানেই দুর্বলতার লক্ষণ, অবিলম্বে তিনি তা ধরে ফেলতেন এবং কৌশলী বিশ্লেষণের দ্বারা তার ভ্রান্ত চেহারাকে খুলে ধরতেন। কলকাতার ইউরোপীয়-পরিচালিত সংবাদপত্রগুলি পর্যন্ত এসব ক্ষেত্রে অস্বস্তি গোপন করতে পারত না। তাদের একটি লিখেছিল, সুভাষ বোসের পদত্যাগের দ্বারা সরকার সেরা একজন সেবক হারিয়েছে—যাকে পুরোপুরি পেয়ে অপরপক্ষে কংগ্রেস বলীয়ান হয়েছে। কংগ্রেস-প্রচারপত্রে তাঁর ভাষা সর্বদা অতি স্পষ্ট পরিষ্কার; তার আবেদন সরাসরি জনগণের হৃদয়ে পৌঁছে প্রচণ্ড তরঙ্গ তুলত। কী জানাতে চাইছেন, সে বিষয়ে সন্দেহমাত্র জাগত না কখনো, কারণ ভাবের অস্পষ্টতা কখনো তাঁর মধ্যে ছিল না এবং বক্তব্যকে পরিষ্কার করবার উপযুক্ত ভাষার অভাবও ঘটত না।"

(খ) সুভাষচন্দ্র আবাল্য সামরিক শৃঙ্খলার পক্ষপাতী। সুতরাং কংগ্রেস স্বেচ্ছাসেবক দলের অধিনায়কত্বের পদকে বিশেষ পছন্দ করেছিলেন তাতে সন্দেহ নেই—বিশেষতঃ এই সূত্রে যখন তাঁর প্রিয় তরুণদের সংগঠিত করার সুযোগ পেয়েছিলেন। অসহযোগের পূর্ণ প্রাবল্যের সময়ে স্বেচ্ছাসেবকবাহিনীর অধিনায়কত্বের কাজের গুরুত্বের কথা না বললেও চলবে।

স্বেচ্ছাসেবকবাহিনীর অধিনায়কত্ব সুভাষচন্দ্র সত্যই কী দারুণ দক্ষতার সঙ্গে করতে পেরেছিলেন, তার চরম দৃষ্টান্ত প্রিন্স অব ওয়েলস বয়কট আন্দোলনে। এই বয়কট আন্দোলনে সাফল্য দেশবন্ধুকে বিরাট মর্যাদা দিয়েছিল—এবং তা সংগ্রহ করে দেওয়ার ব্যাপারে সুভাষচন্দ্রেরই ছিল মুখ্য ভূমিকা, যদিও আরও বহু জিনিস সক্রিয় ছিল এক্ষেত্রে, তার মধ্যে অন্যতম প্রধান—খিলাফতী স্বেচ্ছাসেবকদের সহযোগিতা।

১৯২১, নভেম্বরের মাঝামাঝি প্রিন্স অব ওয়েলসের ভারত আগমনকে সুভাষচন্দ্র অসহযোগ আন্দোলনের পক্ষে অতি মঙ্গলজনক মনে করেছিলেন, কারণ ডিসেম্বরের মধ্যে গান্ধীজীর প্রতিশ্রুত স্বরাজের চিহ্নমাত্র দেখা যাচ্ছিল না এবং জনসাধারণের উৎসাহ ঝিমিয়ে পড়েছিল। এই সময়েই প্রিন্স অব ওয়েলসের আগমন সংবাদ ঘোষিত হল এবং কংগ্রেস অবিলম্বে তাঁর সংবর্ধনা বয়কটের ডাক দিয়ে গণ-উন্মাদনা সৃষ্টির নতুন সুযোগ পেল। খুবই বিস্ময়ের কথা, গান্ধীজীর মূল প্রভাবক্ষেত্র বোম্বাইয়ে, কিন্তু ১৭ নভেম্বরের বয়কট (যেদিন প্রিন্স বোম্বাইয়ে অবতরণ করেন) মোটেই সাফল্যমণ্ডিত হয়নি—অপরদিকে তা বিস্ময়করভাবে সফল হয়েছিল কলকাতায়—সে সাফল্য এমনই সর্বাত্মক যে, সরকার বিচলিত হয়ে পড়েছিল রীতিমত। অথচ স্মরণ রাখতে হবে, কলকাতা তখন বৃটিশ-বাণিজ্যের প্রধান কেন্দ্র, আর বোম্বাইয়ে দেশীয় শিল্পবাণিজ্যের প্রভূত শক্তি।

(ক্রমশঃ)

(*৭) দেশবন্ধুর কাছে স্বদেশ সেবার আবেদনপত্রটি সত্যই আবেদনপত্র ছিল। সুভাষচন্দ্রের ১৬ ফেব্রুয়ারী, ১৯২১-এর চিঠিটির অংশবিশেষ সত্যই কৌতুকজনক, কিন্তু সুভাষচন্দ্রের ঋজু স্পষ্ট চরিত্রের আর কোন্ অব্যর্থ প্রমাণ সম্ভব ?—

"আপনি আমাকে বোধহয় চিনেন না—কিন্তু আমার পরিচয় দিলে বোধহয় চিনিতে পারিবেন।...কাজের কথা আরম্ভ করিবার পূর্বে আমাকে নিজের sencerity আগে প্রমাণ করিতে হইবে।...

"আমার পিতা জানকীনাথ বসু কটকে ওকালতি করেন এবং কয়েক বৎসর পূর্বে সেখানকার গভর্ণমেন্ট প্লিডার ছিলেন। আমার একজন দাদা শ্রীশরৎচন্দ্র বসু কলিকাতা হাইকোর্টে ব্যারিস্টার...। পাঁচ বৎসর পূর্বে আমি কলিকাতায় প্রেসিডেন্সী কলেজে পড়িতাম। ১৯১৬ সালের গোলমালের সময়ে আমি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে expelled হই। দুই বৎসর নষ্ট হইবার পর আমি কলেজে পড়িবার অনুমতি পাই। তারপর ১৯১৯ সালে আমি বি-এ পাস করি এবং অনার্সে প্রথম শ্রেণীতে স্থান পাই। ১৯১৯ সালের অকটোবর মাসে এখানে আসিয়াছি। ১৯২০ সালের অগস্ট মাসে আমি সিভিল সার্ভিস পরীক্ষা পাস করি। এই বৎসর জুন মাসে আমি Moral Science Tripos পরীক্ষা দিব। সেই মাসে আমি এখানকার বি-এ ডিগ্রি পাইব।...

"আমি জানিতে ইচ্ছা করি, আমাকে স্বদেশসেবার যজ্ঞে কি কাজ দিতে পারেন। আমার বিদ্যাবুদ্ধি কিছুই নাই—কিন্তু আমার বিশ্বাস যে, যৌবনোচিত উৎসাহ আমার আছে। আমি অবিবাহিত।

"লেখাপড়ার মধ্যে আমি Philosophy-টা একটু পড়েছি কারণ কলিকাতায় আমার ঐ বিষয়ে অনার্স ছিল এবং এখানেও আমি ঐ বিষয়ে Tripos পড়িতেছি। সিভিল সার্ভিস পরীক্ষার কৃপায় সর্বাঙ্গীণ শিক্ষা খানিকটা হইয়াছে—যেমন Econom/cs Political Scinece, English and European History, English Law, Sanskrit, Geopraphy ইত্যাদি।"

* (৮) সাবিত্রীপ্রসন্ন এসম্পর্কে লিখেছেন ঃ

"আমরা সেদিন যখন ট্রামে চেপে ওয়েলিংটন স্কোয়ারের মোড়ে নামলাম তখন বেলা তিনটে বেজেছে। ফরবসম্যানসনে বিদ্যাপীঠের অফিসে প্রবেশ করে দেখলাম—কেবল মাখনচন্দ্র সেন, শৈলেন্দ্র চক্রবর্তী ও অমূল্য সেনকে। সুভাষচন্দ্র মাখনবাবুর হাতে দেশবন্ধুর চিঠিখানি দিয়ে বসে পড়লেন—আমি ও কিরণবাবু তখন দাঁড়িয়ে। মাখনবাবু চিঠিখানি পড়ে যেন একটু উষ্ণ হয়ে উঠলেন, বললেন—'এরকম peremptory নির্দেশের অর্থ ঠিক বুঝলাম না। যাহোক, ভালই তো, আপনারা চালান না, আমরা তো বেঁচে যাই।' সুভাষবাবু ইঙ্গিতপূর্ণ দৃষ্টিতে আমাদের দিকে তাকালেন। মাখনবাবু বললেন, 'চার্জ-ফার্জ বোঝানোর কিছু নেই—আমরা উঠলাম—আপনারা বসে পড়ুন।' এই বলেই তিনি শৈলেনবাবু, অমূল্যবাবুকে ডেকে নিয়ে বাইরে চলে গেলেন—আমরা সত্যসত্যই বসে পড়লাম।"

এর আগেকার বিবরণ, সাবিত্রীপ্রসন্ন প্রভৃতি দেশবন্ধুকে বিদ্যাপীঠের বিশৃঙ্খলার ও ছাত্র-বিদ্রোহের কথা জানিয়েছেন। "প্রায় ঘন্টাখানেক কথাবার্তা হওয়ার পরে ঠিক হয়ে গেল যে, সুভাষচন্দ্র, কিরণশঙ্কর ও আমাকে সেইদিনই কলিকাতা বিদ্যাপীঠের ও গৌড়ীয় সর্ববিদ্যায়তনের 'দখল' নিতে হবে। এই মর্মে বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির সভাপতি হিসাবে দেশবন্ধু একখানি ক্ষমতাপত্রে নিজের নাম সই করে সুভাষচন্দ্রের হাতে দিলেন।"

মার্সার সাহেব

বীরেন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়

কি জানি কেন অঘটন ঘটল আমার জীবনে। পথ চলতে চলতে হঠাৎ এই অঘটনের আবির্ভাব। যতদূর মনে পড়ে সালটা ছিল ১৯৪৭। মাসটা আমার মনে নেই। কলকাতা গোয়েন্দা বিভাগে অভি-যোগ আসতে লাগলো একটার পর একটা। সে ঠকিয়েছে হাজার হাজার টাকা, লাখ-লাখ টাকা। শুধু টাকা নয়, মহামূল্য বস্ত্র, অলঙ্কার, হীরা মণিরত্ন, আরও কত কি?

কিন্তু কে ঠকিয়েছে? এক স্ত্রীলোক। এক বিত্তশালী, সম্ভ্রান্ত পরিবারের স্ত্রী। একের পর এক এল নালিশ। নালিশের স্রোত। নালিশ এল কলকাতার বণিক সম্প্রদায়ের কাছ থেকে, নালিশ এল বিখ্যাত বস্ত্রালংকার-বিপণির মালিকদের কাছ থেকে, নালিশ এল মাদ্রাজ, বম্বে, সুদূর চট্টগ্রামের বণিক সম্প্রদায়ের কাছ থেকে। গোয়েন্দা বিভাগ নাজেহাল। কে এই নারী? কে এই অশরীরি নারী যিনি নিমেষে উধাও হয়ে যান অপরাধের শেষ চিহ্নটুকুও বিলুপ্ত করে দিয়ে? কে সেই নারী যিনি রহস্যময় বিভীষিকার সৃষ্টি করেছিলেন শুধু কলকাতায় নয়, চট্টগ্রামে, মাদ্রাজে, বম্বেতে ও সুদূর প্রাচ্যে? রহস্য-ময়ী নারী এক হাতে হাজার হাজার টাকার দ্রব্যসামগ্রী গ্রহণ করেন এবং অন্য হাতে ভুয়া চেক লিখে দেন? সেই নারী ইংলণ্ডবাসিনীর মত কথা বলেন অপ্রতি-রোধ গতিতে, নিমেষে জয় করে নেন ব্যবসায়ীদের সংশয়ভরা মন। তাদের দক্ষ চক্ষে ধুলো দিয়ে, ক্ষিপ্রগতিতে তাদের মহামূল্য দ্রব্যভার গ্রহণ করেন—তারপরই মিথ্যা নাম, মিথ্যা ধাম, মিথ্যা পরিচিতি দিয়ে হাসিমুখে অদৃশ্য হয়ে যান? কে এই নারী?

কে সেই নারী জানি না—জানি না তার সত্যকারের পরিচয়। আমরা তাঁর নাম জানি বিনীতা—যেহেতু তিনি বিনীতার অপভ্রংশ। তাঁর নামের সঙ্গে মনের মিল নেই—দেহেরও নেই। গৌরবর্ণা, ঋজু তাঁর শরীর, স্থূলকায়া নন। দীর্ঘাঙ্গী বলতে পারেন, বিস্ফারিত নেত্র, ক্ষিপ্রগতি, তির্যক ভাব—আর ছিল সেই দেহে অনন্যসাধারণ রূপ, যে রূপ ছিল উদ্ধত, অপ্রতিহত,

ফটো : রামকিংকর সিংহ

অপরাজিত। যে রূপ ছিল নিম্নগামী, চিত্তবিভ্রান্তকারী ও বিকৃত, যার মধ্যে বিনয়ের কোন চিহ্নই ছিল না। এই রূপই তাঁর জীবনে নিয়ে এসেছিল অকরুণ পরিহাস, নিষ্ঠুর পরিণাম। সবটাই কি জীবনে পাওয়া যায়? কিন্তু পাওয়া না গেলেও তাঁর জীবনে সবটাই যেন পাওয়া যেত। তিনি ছিলেন অর্থকারিণী, বিভ্রান্ত সৃষ্টিমাতা, বিপদের পথে অপরূপ রণ-রাঙ্গনী।

প্রথম অভিযোগপত্র এল কলকাতা থেকে—হগ মার্কেটের কোন এক বিশিষ্ট 'শাড়ী-মহারানীর' কাছ থেকে। তাঁরা আদালতের শরণাপন্ন হয়েছিলেন। তারপর এল পার্ক স্ট্রীটের 'মাদাম মঁদ'-এর দোকান থেকে—সে 'মাদাম মঁদ' আজ আর নেই—তারপর এল বিভিন্ন ব্যবসায়ীদের কাছ থেকে। সবশুদ্ধ বারোটি নালিশ। পুলিশ অনুসন্ধানের পর এল আরও নালিশ—বম্বে, মাদ্রাজের বিশিষ্ট বণিকদের কাছ থেকে। কি করা যায়? সবই এক নালিশ—তিনি দ্রব্যসম্ভার নিয়ে গেছেন, আর তার বিনিময়ে দিয়ে গেছেন ভুয়া চেক—যে-চেক ব্যাঙ্ক থেকে ফিরে এসেছে, যেহেতু সই জাল এবং যাদের নামে সই হয়েছে তারা বিখ্যাত রাজন্যবর্গের পরিবার। তাঁরা কেউ হয়তো বেঁচে আছেন—কেউ হয়ত বা বেঁচে নেই।

শুরু হোল পুলিশী অনুসন্ধান। হগ মার্কেটে যেখানে তিনি ভুয়া চেক দিয়ে দ্রব্যসম্ভার নিয়েছিলেন, তাঁরা শ্রীমতী বিনীতারই এক পরিচিত ব্যক্তিকে চিনতে পেরেছিলেন তাঁদের বিপণিতে তাঁর আকস্মিক উপস্থিতিতে। তাঁর কাছেই জানতে পেরেছিলেন পরে কে এই রূপ-লাবণ্যময়ী নারী, যিনি তাঁদের ঠকিয়ে চলে গেছেন।

ভয় পেয়েছিলেন তাঁরাও আদালতে নালিশ জানাতে। প্রথমে চেয়েছিলেন সোজাসুজি পথ। যে-পথে নেই দাঙ্গা-হাঙ্গামা, কলরব, নেই কোলাহল, আদালতের কঠিন বিড়ম্বনা, কেই বা চায়? কিন্তু বিধির বিধান? তাঁরা সদলবলে শ্রীমতী বিনীতার গৃহে উপস্থিত হলেন, অভিযোগ জানালেন, কিন্তু উপেক্ষিত হবার জন্যে। যে নারীমূর্তির আবির্ভাব হোল তাঁদের সমীপে, তাঁকে তাঁরা তৎক্ষণাৎ চিনতে পারলেন, কিন্তু শ্রীমতী বিনীতা তাঁদের চিনতে পারলেন না। তিনি সম্পূর্ণ অস্বীকার করলেন তাঁর অপরাধের কথা। যিনি কোনদিন হিন্দু দেবদেবীর নাম নেননি, তিনিই অঙ্গীকার করলেন দেবতার নামে, যে কোনদিন কোন সময়েই হগ মার্কেটে অভিযোগকারীদের বিপণিতে যাননি। এ-শপথ বাক্য শুধু যে তাঁদের সামনে হোল, তা নয়, তাঁর স্বামীর সম্মুখে। তাঁর এই শপথকে পুরোপুরি মর্যাদা দিলেন তাঁর স্বামী। শুরু হল ঝড়।

শুরু হোল গোয়েন্দার কাজ। তিনি কে? কোথাকার লোক তিনি? তাঁর হৃদয় কোথায় ছিল? কে তাঁর মাতাপিতা? কে তাঁর স্বামী, যে ভুয়ো চেক তিনি ছাড়িয়েছেন বিভিন্ন শহরের বিভিন্ন বিপণিতে, সারা দেশ জুড়ে, সেই চেকগুলির সবই কি তিনি মালিক? ব্যাঙ্ক থেকে উত্তর আসতে দেরী হোল না। উত্তর এলো এই জাল চেকের অর্ধভাগ এক ইংলণ্ড বিদেশিনীর, যিনি জানিয়েছিলেন তাঁর চেক বই খোওয়া গেছে আর বাকী চেক শ্রীমতী বিনীতাকেই দেওয়া হয়েছিল তাঁর স্বামীর সংগে কোন বিদেশী ব্যাঙ্কে তাঁর যৌথ হিসাব ছিল এবং যেদিন সে চেক বই বিনীতা গ্রহণ করেন তার দুদিন পরেই শ্রীমতী ব্যাঙ্ককে জানান যে, তাঁর চেক বই খোয়া গেছে এবং নতুন চেক বই নেন।

কিন্তু কে তাঁর স্বামী? তার নাম মর্মর মিত্র—সবাই তাকে 'মারমার' বলে ডাকতেন। শিক্ষা তাঁর ইংলণ্ডে, কর্মস্থল ভারতে। তিনি ছিলেন ভারতের কোন এক রেল শাখার বিরাট রাজকর্মচারী। তিনি বিশ্বাস করলেন না, বিশ্বাস করলেন না তাঁর স্ত্রী এত অবৈধ কাজ করতে পারে বলে? কি করেই বা পারবেন? কোথায় তাঁদের অর্থের অভাব? কোথায় অর্থের অনটন? কিসের প্রয়োজনে তাঁর স্ত্রীর এই অবৈধ আচরণ? অবাস্তব! অসম্ভব! তাঁকে আর তাঁর সুন্দরী স্ত্রীকে শত্রুমহল বে-ইজ্জত করতে চাইছে।

একদিন সকালে আমার অফিসে মার্মার সাহেব এসে হাজির। মুখ থেকে চেস্টনাট পাইপটা নামিয়ে গুরুগম্ভীর স্বরে বললেন, 'জানেন, এরা কি করতে চাইছে? করতে চাইছে ব্ল্যাকমেইল, আমি কিছু বলব না। শুধু আমার অনুরোধ, আপনি সত্যকারের তদন্ত করুন-নিশ্চয়ই হদিশ পাবেন। তারপর, আমি তাদের ক্রাস করব, গুঁড়িয়ে দেবো'। এই ছিল আমার কাছে তাঁর আবেদন।

গোয়েন্দা বিভাগ অনুসন্ধান একের পর এক চালালো। কিন্তু বারে বারেই, কি গুপ্ত, কি মুক্ত তদন্তের শেষ অঙ্গুলী-নির্দেশ বিনীতারই ওপর। যেথায়, যখন, যেভাবেই তদন্ত করেছি, সেইখানেই এক কথা, এক প্রশ্ন—উচ্চ পরিবারের ঘরণী, উচ্চশিক্ষিতা ও বৈভবশালী পরিবারের যদি কোন জায় শঠতা, চতুরতা করে লক্ষ লক্ষ টাকা ঠকিয়ে নিয়ে যায় এবং বেশ নির্লিপ্ত-ভাবে ঘুরে ঘুরে বেড়াতে পারে, তবে কি বলতে হবে আমাদের দেশের আইন পঙ্গু? এদেশের এক আইন দরিদ্রের এবং আর এক আইন বিত্তশালীদের জন্যে? ভারতের অপরাধ আইনবিধি কি সবাকার জন্যে নয়?

বিনীতা খবর পেলেন যে, আদালতের নির্দেশে গোয়েন্দা দপ্তর তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগের তদন্ত করছে এবং শীঘ্রই পুলিশী তদন্তের রিপোর্ট আদালতের

কাছে পেশ হবে। তিনি তখন অস্থির, চঞ্চল। কিন্তু কেন এ-অস্থিরতা? তিনি খবর পেলেন গোয়েন্দা সর্বত্রই তাঁর সম্বন্ধে অনুসন্ধান করছে অথচ তাঁর কাছে জিজ্ঞাসাবাদের জন্যে আসছে না।

মনে মনে তিনি হাজারও জবানবন্দীর খসড়া করে ফেলেছেন, তাঁর স্বপক্ষে নির্ভুল নির্ভেজাল বক্তব্য খাড়া করে ফেলেছেন—শুধু পুলিশ এলেই হোল—তারপরই অবলীলাক্রমে তাঁর মন্তব্য বলে যাবেন যার মাঝে প্রমাণ পাবে কিভাবে তাঁকে আর তাঁর সংসারকে কয়েকটি লোক নেহাৎই অপদস্থ করার জন্যে ব্যস্ত, কিভাবে তাঁরা তাঁর সুনামকে হনন করে তাঁদের ব্যক্তিগত আক্রোশের চরিতার্থ করাতে চায়।

কিন্তু হায়! পুলিশ এলো না। একবারও প্রশ্ন করলে না। যতদিন যায়, ততদিন তিনি গোয়েন্দারা তাঁর সম্বন্ধে কি জানতে পেরেছে তাই ভেবেই উদ্বিগ্ন হয়ে উঠলেন। বুঝতে পারলেন না এতটুকু যে, যে গোয়েন্দা তাঁর সম্বন্ধে তদন্ত করছে, সে ইচ্ছে করেই আসেনি, ইচ্ছে করেই গা-ঢাকা দিয়েছিল, শুধু জানতে বিনীতার মানসিক প্রতিক্রিয়া।

এইখানেই বিনীতার হোল পরাজয়। তিনি আর পারলেন না। এক সকালে যখন আমি অফিসের কাজে ব্যস্ত, শ্রীমতীর টেলিফোন এল। রুদ্ধস্বরে প্রশ্ন করলেন, 'এ আবার আপনাদের কি রকম তদন্ত? অপরাধীকে আপনাদের খুঁজে বার করার একি প্রয়াস? আপনারা আমার বিরুদ্ধে অভিযোগের তদন্ত করছেন অথচ আমাকে প্রশ্ন করার অবকাশ পাচ্ছেন না? একি একতরফা তদন্ত? কবে আসছেন তাই বলুন? আগে থেকে না বললে আমি বাড়ী নাও থাকতে পারি তো!' কথাগুলি বাংলায় বললেন না—তকতকে, ঝরঝরে ইংরেজি ভাষায়—অক্সোনিয়ান ঢঙে। কথায় বিষম ঝাঁজ—তিনি যে প্রভাবশালিনী, বিত্তশালিনী সে-কথা আমায় সুস্পষ্টরূপে বুঝিয়ে দিতে তাঁর এতটুকুও বিলম্ব হোল না। প্রত্যুত্তরে সবিনয়ে তাঁকে জানালাম—আমি যথাসময়ে যাব, তবে যাবার দিনক্ষণ বলতে পারছিনে। তার কারণ একধারের তদন্ত এখনও শেষ হয়নি।

ইতিমধ্যে অনেকদূর এগিয়ে গেছি। স্কটল্যান্ড ইয়ার্ডের পুলিশের সাহায্যে যে বিদেশিনীর চেক ভুয়া নামে বিভিন্ন ব্যক্তিকে দেওয়া হয়েছিল তাঁর বক্তব্য গ্রহণ করা হোল। তিনি জানালেন ১৯৪৬ খৃঃ যখন চট্টগ্রাম থেকে কলকাতায় আসছেন এক প্রথম শ্রেণীর কামরায়— সেই সময়ে তাঁর সহযাত্রিণী ছিলেন শ্রীমতী বিনীতা মিটার। কিছু সময়ের জন্যে তিনি স্নানঘরে যান। ফিরে এসে তাঁর চেকবুক পাননি। কি করে তাঁর চেক-বই অদৃশ্য হোল তা তিনি জানেন না। তবে ঐ সময়ে প্রচণ্ড বেগে রেলগাড়ী ছুটছিল এবং তাঁর কামরায় শ্রীমতী বিনীতা ছাড়া আর কেউ ছিল না।

বিনীতার খবর আরও পাওয়া গেল। কোন সুদূর দক্ষিণে, কোন এক মিশনারী স্কুলে পড়ার সময় তাঁকে স্কুলের কর্তৃপক্ষ বিদায় দিতে বাধ্য হয়েছিলেন চুরির দায়ে। একটা শুধু চুরি নয়, একটার পর একটা অজস্র চুরি।

বিনীতার স্বামী বিদগ্ধ, বিত্তশালী এবং বিরাট সরকারী কর্মচারী। তাঁর না ছিল অর্থের অভাব, না ছিল সামর্থের। উত্তরাধিকারী সূত্রে তিনি বহু অর্থের অধিকারী। কিন্তু এই আর্থিক অনুকূলতা সত্ত্বেও কিভাবে তাঁর স্ত্রী এই অবৈধ কাজ করতে পারে সেটা তাঁরও যেমন চিন্তার বাইরে, আমারও বাইরে।

ইতিমধ্যে এক অঘটন ঘটে গেল। এক সন্ধ্যায় গ্লোব সিনেমার সাড়ে ছটার প্রদর্শনী শেষ হবার পর যখন সিনেমা-যাত্রীরা ঘরমুখপানে চলেছেন, সেই সময় ভিড়ের মাঝে কোন এক বিখ্যাত বিপণির মালিক এবং তাঁর কর্মচারীরা বিনীতার পথরুদ্ধ করলেন—তাঁরা চিনতে পেরেছেন বিনীতাকে, যিনি হাজার হাজার টাকার রেশমী বস্ত্র নিয়ে তার বদলে ভুয়ো চেক দিয়েছিলেন। হায়! সেদিনই বিনীতার সঙ্গে ছিলেন এক বিরাট দেশকর্মীর সহধর্মিণী। সবাই হতবাক। হতবুদ্ধি। সে-যাত্রায় নিস্তার পেলেন বটে। কিন্তু তাঁর নাম-ধাম সর্বসমক্ষে দিয়ে যেতে হোল। সর্বসমক্ষে তিনি হলেন হতমানিনী।

ঠিক তার তিন-চারদিন পরের ঘটনা। আমাকে মারমোর সাহেব টেলিফোন করলেন—জানতে চাইলেন কবে আসছি? দিন, তারিখ, ক্ষণ সব বলে দিলাম। জানালাম, আমি তদন্তে যা পেয়েছি সেই সম্পর্কে তাঁর স্ত্রীর জবানবন্দী নিতে হবে আর নিতে হবে শ্রীমতীর হস্তলিপির নমুনা।

যথাসময়ে গেলাম মারমার সাহেবের গৃহে। তিনি উপস্থিত। তার উপস্থিতিতে তার সহধর্মিনীর জবানবন্দী গ্রহণ করলাম—কিন্তু সেই জবানবন্দীতে আমার কোন প্রশ্নের সম্যক উত্তর দিতে পারলেন না। এরপরই আমি তাঁর হস্তলিপির নমুনা নিলাম। যে নাম, যে কথা তিনি চেকে লিখেছিলেন, সে কথা এবং অক্ষরগুলি সমন্বিত করে এক ভাষণ আমি পূর্বেই তৈরী করেছিলাম, সেই ভাষণ আমি পড়তে লাগলাম আর তিনি লিখতে লাগলেন।

ক্ষিপ্রগতিতে লিখে চলেছেন, লিখে চলেছেন বিদ্যুৎবেগে আমার বলার আগেই তাঁর যেন লেখা শেষ হয়ে যাচ্ছে—শুধু লক্ষ্য করছি সারি সারি ইংরাজী অক্ষরের আঁচড়ের দাগ—ঢেউয়ের পর ঢেউ। তাঁর লেখার সঙ্গে চেকের লেখার মিল কোথায়? ঠিক এই সময়ে বিনীতা চিৎকার করে উঠলেন

"Do you want my fingers to get cramped ?"

সবিনয়ে জানালাম যে আমার কাজ শেষ হয়নি। হঠাৎ মারমার সাহেব বাধা দিয়ে বলে উঠলেন,

'No Binita! Let him be satisfied that there is nothing wrong with your writing. Anyway, would you care for a dash of Port and whisky for a pick up?'

তিনি ঘাড় নেড়ে সম্মতি দিলেন। বেয়ারা Whisky Port punch নিয়ে এলো। এই হোল আমার সুযোগ—শ্রীমতী আর আগেকার মত স্বার্থরক্ষার্থ লেখনী নিয়োজন করতে পারলেন না—ধীরে ধীরে তিনি নিজের হস্তলিপিকে কোনভাবেই গোপন করতে পারলেন না। তাঁর হস্তলিপির নমুনা সর্বতোভাবে চেকের লেখার সঙ্গে আপাতঃ দৃষ্টিতে মিলে গেল। পরে হস্তলিপিবিদ যে অভিমত দিলেন তাতে দেখা গেল যে, হস্তলিপির নমুনা সর্বাঙ্গীনভাবে চেকের লেখার সঙ্গে এক। এবং আরও এক অভিমত পাওয়া গেল যে, যিনি এই সব ভুয়া চেক দিয়েছেন এবং যিনি হস্তলিপির নমুনা দিয়েছেন তাঁরা একই লোক।

আদালতে চীফ প্রেসিডেন্সি ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে আমার তদন্ত বিবরণী পেশ করলাম। হাকিম হতবাক, হতবুদ্ধি। তিনি শ্রীমতীকে জানতেন পূর্ব থেকে—প্রশ্ন করলেন আমাকে, 'কেন সে করবে? টাকাকড়ির কোথায় তাঁর অভাব?' উত্তর দিলাম 'জানিনে। তবে যা ঘটেছে, তাই লিখেছি।' হাকিম শমনজারীর নির্দেশ দিলেন।

তারপরই সুরু হোল অশান্ত বাতাস, ঝড়। সে ঝড়ের দোলা যে তদন্তকারীর মনে শুধু লাগলো তা নয়, সে দোলা লাগলো শ্রীমতী এবং শ্রীমতীর স্বামীর মনে। অন্তর্দ্বন্দ্বের সৃষ্টি হোল। চারধার থেকে চাপ আসতে লাগল—কোন রকমে মিটিয়ে নাও—এ তো খুন-খারাপি নয়? এ এক ঠকবাজি। যাঁরা অভিযোগ করেছেন, সে সম্বন্ধে তো তদন্ত করা হয়েছে। তারা তো খুসী। আর তারা যে টাকা ঠকেছেন সে টাকা যদি সাহেব দিয়ে দেন তো গোলমাল চুকে গেল? আর আইনে তো মিটমাটের কোন বাধা নেই?

মারমার সাহেব তখন বুঝতে পেরেছেন গোটা ব্যাপারটা। বুঝতে পেরেছেন যে, যেটা তিনি সহজ সরল করে ভাবছিলেন সেটা অতটা সহজ নয়। তাঁর কাছে সমস্ত জিনিসটা গভীর জটিল বলে মনে হোল। মনে হোল যেন তিনিই অপরাধী, তিনিই অভিযুক্ত, সব আস্থা যেন হারিয়ে ফেলেছেন নিজের ওপর। তিনি বিশ্বাস করলেন না—বিশ্বাস করলেন না পুলিশকে, বিশ্বাস করলেন না তাঁর স্ত্রীকে, বিশ্বাস করলেন না অভিযোগকারীদের। তিনি

নিজেই নেমে পড়লেন মঞ্চে—নিজেই তদন্ত সুরু করলেন, শুধু আমাকে জানালেন 'ডুবে যাবার পূর্বে তিনি যাচাই করতে চান কোনটা সত্যি। কোনটা মিথ্যে। পুলিশের ভাষণ? না তাঁর স্ত্রীর ভাষণ? ফল ভালই হোল। তদন্ত করে তাঁর স্ত্রীকে অভিযুক্ত করার মত বেশ কতকগুলি অকাট্য প্রমাণ পেলেন। আর তাঁর কোন আবেদন নেই, নিবেদন নেই, তিনি বুঝলেন ব্ল্যাক-মেইল যদি কেউ কাউকে করে থাকে, তবে তাঁর স্ত্রী বিনীতা নিজেকেই নিজে করেছেন।

এক সন্ধ্যায়, আমার ক্ষুদ্র আলয়ে মারমার সাহেবের অপ্রত্যাশিত আবির্ভাব। সঙ্গে এসেছেন তাঁর কতিপয় বিশিষ্ট বন্ধু ও রাজকর্মচারী। সাদরে অভ্যর্থনা জানালাম। তিনি কৌচে উপবেশন করেই বললেন, 'আপনার কাছে আজ এসেছি তদন্তের জন্যে নয়, সাহায্যের জন্যে। আপনি মিটমিটিতে সাহায্য করুন—এই প্রার্থনা। আমি সবাইকে টাকা দিয়ে যাবো।' মারমার সাহেবকে তখন দেখাচ্ছিল উদভ্রান্ত, অসহায়, অবলম্বনহীন, সম্পূর্ণ রিক্ত, সম্পূর্ণ বিধ্বস্ত। তাঁর দৃষ্টি যেন কোথায় হারিয়ে গেছে কোন অজানা ব্যথায়। ধীরে ধীরে ক্লান্ত জড়িত কণ্ঠস্বরে তিনি বললেন, 'জানেন আমি বিনীতাকে ইউরোপে পাঠিয়ে দিচ্ছি শুশ্রূষার জন্যে।'

মিটমিটি হয়ে গেল। যাঁরা যে টাকা হারিয়েছিলেন তার কড়াক্রান্তি হিসাবে সবই ফিরে পেলেন। কারুর কোন অভিযোগ রইলো না। আদালতে হাকিম মামলা খারিজের হুকুম দিলেন। এইখানেই সব নালিশের নিষ্পত্তি। এইখানেই যবনিকার পতন।

কিন্তু কয়েকটি প্রশ্ন থেকে গেল। বিনীতা কি করে এ কাজ করতেন? তদন্তে দেখা গেল আজ হয়তো কলকাতায় কোন এক বিখ্যাত ব্যবসায়ীকে ঠকালেন—সেই রাত্রেই তিনি চলে গেলেন মাদ্রাজে পনের দিনের সফরে। যেদিন মাদ্রাজ ত্যাগ করবেন সেই সন্ধ্যায় মাদ্রাজের এক ব্যবসায়ীকে ঠকালেন এবং সেই রাত্রেই বম্বে পাড়ি দিলেন। বম্বেতে পক্ষকাল থাকার পর আবার কলকাতায় প্রত্যাবর্তন। বম্বে ত্যাগের শেষের দিন কোন বম্বে ব্যবসায়ীকে ঠকানো। এইভাবে চক্রবৎ তাঁর অপরাধ অনুষ্ঠিত হচ্ছিল। ফলে কলকাতায় এক অপরাধ অনুষ্ঠানের পর যখন পুনরায় কলকাতায় ফিরে আসতেন তখন প্রায় মাস দেড়েক গড়িয়ে গেছে। ক্ষণিকের দেখা মুখ কে মনে করে রাখে? ক্ষয়িষ্ণু স্মৃতির সুবিধাই তিনি পুরোপুরি নিয়েছিলেন।

অপরাধীর মনস্তত্ত্বে দেখা যায় যে, অপরাধী যে সব স্থানে অপরাধ করে, সেই সব স্থানেই পরবর্তীকালে তার আবির্ভাব হয় এবং এর কারণও আছে। অপরাধীদের মনে নিহিত থাকে এক সাফল্যের স্পর্ধা, পূর্ণকামের স্পর্ধা—এই স্পর্ধার যতক্ষণ উৎকট প্রকাশ না হয় ততক্ষণ সে অপরাধী শান্তি পায় না। বিনীতার ক্ষেত্রে এই মনস্তত্ত্বের কোন ব্যতিক্রম হয়নি।

দ্বিতীয়তঃ দেখা গেল বিনীতা যেখানেই অপরাধ অনুষ্ঠানে ব্যাপৃত থাকতেন, সেখানে তাঁর একাকিনী কখনও আবির্ভাব হোত না। তাঁকে ঘিরে থাকত কয়েকজন শক্তিধর রাজন্যবর্গ যাঁরা বিনীতার দুরভিসন্ধির সম্বন্ধে বিন্দুবিসর্গও জানতেন না। তাঁরা সুন্দরী বিনীতার বাজার অভিযানে সঙ্গ দিয়েই কৃতার্থ বোধ করতেন।

বিনীতার কিন্তু তাদের প্রয়োজন ছিল দুই কারণে। প্রথমতঃ বিনীতার স্নায়ুজাল ছিল দুর্বল, ভীরুতার কঠিন আবরণ থেকে কোনদিনই তিনি মুক্তি পাননি। তাই সাহস সঙ্কলনের উদ্দেশ্যে তাঁর প্রয়োজন হোত রাজন্যবর্গের সঙ্গ। দ্বিতীয়তঃ যদি তিনি কোনক্রমে ধরা পড়েন, বিপদে পড়েন, তবে সেই রাজন্যবর্গের উপস্থিতি তার পক্ষে অনেক সহায় হবে। কিন্তু এই চিন্তাধারাই তার কাল হোল। যথাসময়ে এই রাজন্যবর্গের কেউই তার পক্ষে সাক্ষ্য দিলেন না—যা দিলেন তা বিনীতারই বিপক্ষে গেল।

দ্বিতীয় প্রশ্ন যা সাধারণভাবে মানুষের মনে জাগে সে এই যে, তিনি বস্ত্র-অলঙ্কারাদি, মণিরত্ন ঠকিয়ে নিতেন তা নিয়ে কি করতেন—সে কি তার সত্যিই প্রয়োজনীয় ছিল? তদন্তে দেখা গেল সেইসব দ্রব্যের তার ব্যক্তিগত ভাবে কোনও প্রয়োজন ছিল না—প্রয়োজন ছিল শুধু আহরণ করবার। এক ঘাটে তিনি আহরণ করেছেন, আর অন্য ঘাটে তিনি দিয়েছেন বিসর্জন। এক ঘাটে চুরি করেছেন, ঠকিয়েছেন, অন্য ঘাটে দ্রব্য-সামগ্রীর বহু নিম্ন মূল্যে বিকিয়ে দিয়ে এসেছেন। এটা যেন সবটাই খেয়াল, সর্বনাশা খেয়াল, যে খেয়ালের বশে ধ্বংসের শেষ অস্তিত্ব ঘরে জমা করেছিলেন।

তৃতীয় প্রশ্ন যা স্বাধিকারে মনে দেখা দেয় সে হচ্ছে বিনীতা কেন এই শঠতা-প্রবঞ্চনতার জাল-জুয়াচুরির আশ্রয় নিয়েছিলেন? কেন এই সম্ভ্রান্ত ঘরণীর এই বিত্তশালিনীর জঘন্য চৌর্য-মনোবৃত্তি? তিনি তো অর্থের স্বর্ণ-সিংহাসনে অধিষ্ঠাত্রী দেবী? তাঁর কোথায় ছিল অভাব, অনটন, সংসারের দৃষ্টিহীন অর্থের দাবী? প্রশ্ন আমাকে করেছেন অনেকে। সম্যক উত্তর দিতে পারিনি। এটা কি সেই ভীষণ উন্মত্ততা, একটা প্রবল উন্মাদনা যা ব্যর্থ যৌবনের সঙ্গে জড়িয়ে আছে? যা মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে ব্যর্থ আশা আকাঙ্ক্ষা, কামনা বাসনার শেষ ভস্মরাশি থেকে? যা উন্মাদ-বাসনায় ফেটে পড়ে প্রতিশোধ নেবার জন্যে প্রথমে ব্যক্তি-বিশেষের বিরুদ্ধে, তারপর সমাজের বিরুদ্ধে? এ-কি সেই উন্মত্ততা যা বাধা মানে না, যা তার অন্তস্তলে জ্বলছে অনির্বাণ চিতার মত?—যে আগুনের শান্তি হয় শুধু তখনই, যখন আঘাত করা যায় সমাজকে, সংসারকে? কি জানি? জানি না, আমি মনোবিজ্ঞানবিদ নই। কেমন করে জানাবো মনের কোন ঈশান কোণ থেকে জেগেছে ঝড়ের সূচনা, ঝড়ের ইঙ্গিত। কেমন করে সে ঝড় ছড়িয়ে পড়ল দিক-দিগন্তে, ধূলিসাৎ করে দিল অনেকদিনের গড়া খেলাঘর, নিশ্চিহ্ন করে দিল মান-সম্ভ্রমের বিশাল মহীরুহ, আত্মপ্রত্যয়ের শেষ চিহ্ন। এ কি মন? না মতিভ্রম?

মনে পড়ে নালিশ নিষ্পত্তির শেষ দিকে আমাকে তলব করেছিলেন তদানীন্তন বাংলাদেশের মন্ত্রীসভার এক গুরুজন। তিনি আমাকে এই একই প্রশ্ন করেছিলেন—সে করবে কেন? কেন'র তুমি জবাব দাও। তুমি কি জানো সে কে? ধীরে ধীরে আমার বিবৃতি এগিয়ে দিলাম তাঁর হাতে। পাঠ করলেন। পাঠান্তরে আমায় বললেন, তোমার কি মনে হয়? কেন সে এ কাজ করলে?

উত্তর দিলাম সভয়ে, বোধহয় চৌর্য প্রবণতা ওঁর জন্মগত।

বাধা দিয়ে বললেন, না, না এতে চৌর্যপ্রবণতা বলে না। যেখানে প্ল্যান থাকে, যেখানে পূর্ব পরিকল্পিত অভিপ্রায় বা অভিসন্ধি থাকে সেখানে চৌর্যপ্রবণতা হয় না। অপহরণ প্রবৃত্তি একটা মানসিক দুর্বলতা থেকে উদ্ভূত। সেটা হয় অকস্মাৎ—একটা ক্ষণিকের ভুলে হঠাৎ সম্পন্ন হয়ে গেলে তার পরেই শান্তি। অপরাধপ্রবণতার সঙ্গে তোমার মামলার অনেক তফাৎ। আমার প্রশ্নকারী ছিলেন বিরাট চিকিৎসক। তাঁর প্রচণ্ড জ্ঞানের সম্মুখে আমি মনস্তত্ত্ব নিয়ে কি বিশ্লেষণ করব?

বহু দিন বহু মাস গত হয়ে গেছে। একদিন লিন্ডসে স্ট্রীটের পথে যাচ্ছি, হঠাৎ আমার সামনে এক বিরাট গাড়ী এসে থামলো। চেয়ে দেখি মারমার সাহেব। এড়িয়ে চলে যেতে চেষ্টা করছিলাম, কিন্তু তিনি স্বয়ং আমার কাছে হাজির। প্রশ্ন করলেন, 'কোথায় যাবেন বলুন, আমি নিয়ে যাবো? আপনি আমাকে এড়িয়ে যাচ্ছেন কেন?'

উত্তর দিলাম, 'আমি পথচারী। আমার ঘুরে বেড়ানোই কাজ, আমার কোথাও যাবার নেই, আমার পথের নির্দেশ কে দেবে? অসংখ্য ধন্যবাদ জানাচ্ছি আপনাকে। আমার মত দরিদ্র পদাতিককে দেখে আপনি গাড়ী থামালেন।' তিনি লজ্জিত হলেন মনে হোল। উত্তর দিলেন এমন কি জায়গা নেই যেখানে দুদণ্ডের জন্যে কথা বলতে পারি আপনার সঙ্গে? জানেন? কেন দাঁড়িয়েছি, শুধু একটা কথা বলবার জন্যে। বিনীতাকে সমুদ্রপারাবারে পাঠিয়ে দিয়েছি চিকিৎসার জন্যে। আপনি যা বলেছিলেন সব সত্যি—আমারই বোঝবার ভুল হয়েছিল। আপনি বলুন সে ভালো হয়ে আসবে কি না?'

কি উত্তর দেবো জানি না। আমার ভবিষ্যৎবাণী সত্যি করে ফলবে কিনা তাও জানি না। তবু সহাস্যে বললাম, 'নিশ্চয়, নিশ্চয়ই তিনি ভালো হয়ে ফিরে আসবেন

—কেন আপনি ভাবছেন? মারমার সাহেব গাড়ীর স্টার্টারে পা চাপলেন, আমার দিকে চাইলেন—মনে হোল তাঁর চোখ দিয়ে দু-ফোটা অশ্রু গড়িয়ে পড়লো। বাঁ হাত ওপরে তুললেন আমাকে বিদায় অভিবাদন জানাতে, তারপরই ভীড়ের মধ্যে অদৃশ্য হয়ে গেলেন। কিছু হয়তো আমায় বলতে চেষ্টা করেছিলেন—কিন্তু শেষ পর্যন্ত বলবার সুযোগ হয়নি।

আর মারমার সাহেবের সঙ্গে দেখা হয়নি। অনেককাল পরে হঠাৎ দৈনিক সংবাদপত্রে পেলাম মারমার সাহেবের মৃত্যু সংবাদ। পাঠমাত্র ঠিক করলাম আমি তাঁর গৃহে যাব, তাঁকে আমার শ্রদ্ধাঞ্জলি দিয়ে আসবো। যিনি নিঃসংশয়ে পার্থিব, হীনতা-দীনতা, মিথ্যা প্রবঞ্চনা, ক্ষোভ-দ্বন্দ্বের অনেক উপরে। যিনি সরলতা, সহজতার মূর্ত প্রকাশ। কিন্তু শেষ বিবেচনায় গেলাম না—আমায় তো কেউ চিনবে না? আর যদি বা কেউ চেনে তারা আমার উপস্থিতিকে ভুল মনে করবে। কেউ মনে করবে না এক পথচারী পথিক তাঁর অমর আত্মার উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধা নিবেদন করতে এসেছে।

তিনি চলে গেছেন কিন্তু আমি তাঁকে ভুলতে পারিনি। যাঁকে তিনি মনে করলেন শত্রু, সেই তাঁর বিশ্বস্ত বন্ধুত্বে উপনীত হোল। এখনও দেখা দেন অন্ধকারের মাঝে, স্বপ্নের ফাঁকে ফাঁকে। প্রশ্ন করেন বারে বারে—সে একই প্রশ্ন, 'বলুন, বিনীতা ভালো হয়ে ফিরে আসবে তো?'

অঙ্গনা

সমস্যা সুতীব্র

বিয়ের কথা উঠলেই যেন মাথায় আকাশ ভেঙে পড়ে। এই একটি ব্যাপারে ছেলে এবং মেয়েদের মধ্যে মতের কোন তফাৎ নেই। সবাই প্রশ্নটাকে পাশ কাটিয়ে যেতে চায়। যেন এরকম একটি দায়িত্বের ভার বহন করা কোন মতেই সম্ভব নয়। এর ফলে অবিবাহিত জীবনের পরিধি ক্রমশ বিস্তৃত হচ্ছে। কিন্তু পুরোপুরি উপেক্ষা করা কারো পক্ষে সম্ভব নয়। তাই প্রায়ই দেখা যায় যে বয়সের কোঠা অনেকটা পেরিয়ে ছেলে এবং মেয়ে অর্থাৎ ভদ্রলোক এবং ভদ্রমহিলা শেষ পর্যন্ত ছাদনাতলায় গিয়ে দাঁড়ান। কেউ কেউ আবার লোকলজ্জা এড়ানোর জন্য ইদানীং কালের সহজ পন্থা গ্রহণ করেন। ম্যারেজ রেজিস্ট্রারের অফিসে বিয়ের পাটটা চুকিয়ে বন্ধু-বান্ধব নিয়ে হোটেলে ভোজে বসেন। কিন্তু বিয়ে তাঁদের করতেই হচ্ছে। যে বিয়ের নাম শুনলে তাঁরা ভূত দেখার মতো চমকে উঠতেন অবশেষে সেই ভূত তাঁদের ঘাড় মটকালো। রেহাই তাঁরা পেলেন না। লাভের মধ্যে এই হলো যে বয়স অনেকটা গড়িয়ে গেল। বিবাহিত জীবনের পুরো স্বাদ তাঁরা পেলেন না।

এই প্রসঙ্গে মনে পড়ে আমার কলেজ-জীবনের একটি ঘটনা। সে এক বিরাট অভিজ্ঞতাও বটে। কলেজের প্রথম দিনের প্রথম ক্লাশ। সবে স্কুল ছেড়ে এসেছি। সবাই চুপচাপ বসে অধ্যাপকের জন্য অপেক্ষা করছি। একটু পরেই তিনি এলেন। রোলকল শুরু হলো। এরই ফাঁকে তিনি সকলের পরিচয় নিচ্ছেন। প্রথম ক্লাশে যেটা স্বাভাবিক। রোলকল হয়ে যাওয়ার পরই তিনি বক্তৃতা শুরু করলেন। কিন্তু প্রসঙ্গ সম্পূর্ণ ভিন্ন। সব ছেলেমেয়ের দিকে তাকিয়ে তিনি বললেন, তোমাদের কাউকে তো বিবাহিত মনে হচ্ছে না। অধ্যাপকের এই মন্তব্যে আমরা সবাই সবার দিকে তাকিয়ে হাসছিলাম। সে হাসি লক্ষ্য করে তিনি হঠাৎ একটু গম্ভীর হয়ে বললেন, সেদিন আমার এক বন্ধুকে দেখলাম। আমারই বয়সী। একটি বাচ্চা কোলে নিয়ে পার্কে বেড়াচ্ছে। আমিও পার্কে ঢুকেছি নাতির হাত ধরে। বন্ধুটির সঙ্গে অনেকদিন পর দেখা। কুশল প্রশ্নের পর জিগ্যেস করলাম, নাতি নাকি? উত্তর পেলাম, না ছেলে। আমার তো প্রায় আকাশ থেকে পড়ার দশা। যে বয়সে নাতি কোলে নিয়ে ঘুরে বেড়ানোর কথা সেই বয়সে ছেলে। আমার এই সসেমিরা অবস্থা দেখে বন্ধুটি বললো, জানো তো আমি লেট ম্যারেজ করেছি। তাই ছেলেও বিলম্বেই এসেছে।

অধ্যাপক ঘটনাটি বলে একবার পরিপূর্ণ চোখে ছেলেমেয়েদের দিকে তাকালেন। একটু বিরতি দিয়ে শুরু করলেন, লেট ম্যারেজের ব্যাপারটা বলতে গেলে আমাদের সময় থেকেই শুরু হয়েছে। কিন্তু তখন এতটা ব্যাপক হয়নি। আমার সমসাময়িক এই একটি ঘটনার কথাই আমার জানা। আর এমন ঘটনা ঘটেনি বলেই মনে হয়। অন্তত আমার বন্ধু-বান্ধবের মধ্যে তো নয়ই। কিন্তু লেট ম্যারেজ এখন বেশ বিস্তার লাভ করেছে। এর আসল কারণ, উপযুক্ত সময়ে এ ব্যাপারটাকে কেউ সহজভাবে মেনে নিতে চায় না। ছেলেরা বোঝা ভেবে বিয়ে করতে চায় না। মেয়েরা সংসারের দায়িত্ব নেবার ভয়ে বিয়ের কথা ভালভাবে উচ্চারণ পর্যন্ত করতে পারে না। এমনিভাবে জীবনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দিককে অস্বীকার করে তারা এগিয়ে যেতে চাইছে। কোথায় এবং কোনদিকে এগুবে তা তারা জানে না। জীবনের মৌল প্রশ্নই যে অনুপস্থিত। কিন্তু আমরা তা করিনি। আমাদের মত ও পথ ছিল ভিন্ন। সময়কে আমরা মূল্য দিয়েছি। দায়িত্বকে মর্যাদামন্ডিত করেছি। তাই কোনদিন কোথাও আটকালো না। আর আজ সব উল্টো। জীবন-সংগ্রামের দ্বারপ্রান্তে গিয়ে সবাই মন্ত্র ভুলে বসে আছে।

সেদিন এই সমস্যা নিয়ে তেমন মাথা ঘামাবার কোন কারণ খুঁজে পাইনি এবং মানসিক প্রস্তুতিও সেরকম ছিল না। এখন কলেজ ছেড়ে, বাইরে এসেছি। বৃহৎ পরিবেশের সঙ্গে নিজেকে যুক্ত করার সুযোগ পাচ্ছি। তাই সমস্যার ইতরবিশেষ বাদ দিয়ে সর্বকিছু বিশ্লেষণ করার চেষ্টা করি। মনে মনে ভাবি কেন এরকম হলো?

এই নিয়ে সেদিন একজনের সঙ্গে কথা হলো। যার সঙ্গে কথা হলো তিনি একজন বিখ্যাত আইনজীবী ভদ্রমহিলা এবং আইনব্যবসার অবসরে সমাজসেবার সঙ্গে নিজেকে যুক্ত রেখেছেন। তাঁর কাছেই প্রশ্নটা তুলে ধরলাম। তিনি এজন্য সরাসরি ছেলেদের দায়ী করলেন। তাঁর সোজা বক্তব্য হলো যে সাংসারিক চাপের ভয়ে ছেলেরা বিয়ে করতে রাজি হচ্ছে না। ছেলরা যদি বিয়ে করতে রাজি না হয় তবে মেয়েদের বিয়ে হবে কি করে? একথাও তিনি স্বীকার করেন যে মেয়েরাও এখন চট করে বিয়ের পিঁড়িতে বসতে রাজি হয় না। এটা ওরা করছে ছেলেদের দেখা দেখি আর এই ভাব-হাওয়া আমদানির জন্য মূলত দায়ী হলো আজকের অর্থনৈতিক সঙ্কট। একজনের আয়ে আর সংসার চালানো সম্ভব নয়। ছেলেরা অপেক্ষা করে থাকে যদি চাকরিজীবী মেয়ে পাওয়া যায়। এরকম ক্ষেত্রে কিন্তু বিয়ে খুব একটা দেরি হচ্ছে না। যেখানে মনের মতো হচ্ছে না সেখানেই দেরি। আর এই সংখ্যাটা ক্রমেই স্ফীত হচ্ছে। সবাই এই দোহাই পেড়ে বিয়ে থেকে পেছিয়ে আসছে।

মনে মনে ভাবি সেদিনের সঙ্গে আজকের তফাৎ অনেকখানি। অধ্যাপকের যুগে বিয়েতে আপত্তি করাটা ছিল গুরুতর অপরাধ। তাহলে সবাই ধরে নিত যে ছেলে বয়ে গেছে। আর তখন মেয়েদের আপত্তির কোন প্রশ্নই উঠতো না। সবাইকে নির্দিষ্ট দিনে ছাদনাতলায় হাজির থাকতে হতো। সেদিন ছেলেমেয়ের মতামতের সামান্যই মূল্য দেওয়া হতো। যা করার অভিভাবকরাই ঠিক করতেন। আর একটা সুবিধা সেদিন ছিল। মেয়ে বিয়ে দিতে তাঁরা শুধু ছেলেই দেখতেন। স্বভাব চরিত্রের খোঁজ নিতেন। কিন্তু ছেলের আয় সম্বন্ধে তারা খুব একটা আগ্রহ প্রকাশ করতেন না। ছেলের বাপের অবস্থা দেখেই তাঁরা মেয়ে পাত্রস্থ করতেন।

কিন্তু এখন ছেলের ব্যাপারটাই মুখ্য। মেয়ে দেওয়া হয় ছেলের কাছে। সুতরাং তাকে বাদ দিয়ে আর সব ব্যাপারে খোঁজ নিয়ে বিশেষ কোন লাভ নেই। ছেলেরা এখন এটা বেশ বোঝে। দায়িত্বের গুরুত্বও তাদের অবিদিত নয়। তাই বেশ সতর্ক হয়ে পা ফেলে। এদিক থেকে মেয়েরাও অনেক সতর্ক হয়েছে। সেই সমাজ বদলে গেছে যখন কিনা মেয়েদের কোন প্রতিবাদ চলতো না। এখন তাদের কথা মোটেই ফেলনার নয়। ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যের বিকাশ ঘটেছে। নিজেদের তারা তুচ্ছ করে দেখতে প্রস্তুত নয়। তাই বিয়ের প্রশ্নে তারাও ধরা দিতে চায় না। সমানে তারা ধ্বনি তুলছে বিয়ের কথা এখন আমাদের চিন্তায় অনুপস্থিত।

সেদিন একজন বললো, বিয়ে তো নিশ্চয়ই করবো। কিন্তু সকলের মতো অমুক, পটলের সংসার আমি করবো না। আমার সংসার হবে বেশ ছিমছাম। সেখানে উনুন ধরানো বা রান্নাবান্নার পাট রাখবো না। সব কিছু হবে হোটেল থেকে। আর নিজে যদি রান্নাও করি তা হবে শখের। কোন ছুটির দিনে নিজে রান্না করে সেলিব্রেট করবো। রোজ রোজ রাঁধুনির কাজ অসম্ভব।

সে যতটা সহজে বললো কাজটা তত সহজ হবে বলে মনে হয় না। ঘর-সংসার পতি-পুত্র এই তো আমাদের কামনা। এই যদি কামনা হয়, তবে রান্নাবান্নার প্রশ্ন এসে যায়। উনুন ধরানো এরই একটি। তা সে যে উনুনই হোক। সংসারকে স্মার্ট করতে গিয়ে সব সময় হোটেলের সঙ্গে বন্দোবস্ত রাখতে গেলে খরচের আধিক্যটা নেহাৎ কম হবে না। তাছাড়া আমাদের নারীত্ব তো ডুকরে মরবে। দু'দিন এ-ব্যবস্থা ভাল লাগবে। কিন্তু তারপরই মনে হবে, কি অধিকার যেন আমার নেই। সে অধিকার ফিরে পাওয়ার জন্য নিজেই অস্থির হয়ে যাবো। যতক্ষণ না অধিকার ফিরে পাবো ততক্ষণ সোয়াস্তি নেই। এর পরের অধ্যায়েই শুরু হবে আমার স্বাভাবিক জীবন-যাত্রা যা আমাদের দেশে যুগ-যুগান্ত বহমান।

বিয়ে করতে রাজি না হওয়া এবং বিয়ে না করাই এতদিন প্রব্লেম ছিল। এখন সেই সমস্যা ধীরে ধীরে কাটছে। পশ্চিমী দেশগুলিতে বিয়ের ব্যাপারে কেউ দেরি করার পক্ষপাতী নয়। একসময় সেসব দেশে বিয়ের বয়স খুব উঠে গিয়েছিল। কিন্তু এখন তারা আর সেই ভুল করছে না। যথাসময়ে বিয়ের পর্বটা চুকিয়ে ফেলে পরে অন্য কথা। সেদেশে হিসেব নিয়ে দেখা গেছে যে, মেয়েরা বিয়ের ব্যাপারে অগ্রণী

সীমান্ত পেরিয়ে বাঙলাদেশের মায়েরা এখনও অবিরাম স্রোতের মত এগিয়ে আসছেন এপার বাঙলায়।

ভূমিকা নিচ্ছে। খুব বেশী কুড়ি বছরের পর আর তারা অপেক্ষা করতে রাজি হচ্ছে না। লেট ম্যারেজের কুফল ওরা হাড়ে হাড়ে টের পেয়েছে।

লেট ম্যারেজের কুফল এখন আমরা টের পাচ্ছি। বিয়ে করবো না করে করে সবাই বেশ দেরি করেন। প্রায় বিগত-যৌবনের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে বিয়ে করা যে অপরিহার্য সে বোধ জন্মে আমাদের। এই বিয়েতে স্বাভাবিক যৌবনের উল্লাস থাকা সম্ভব নয়। তখন সবচেয়ে বেশি প্রাধান্য পায় ছেলেমেয়ে মানুষ করার সমস্যা। এর ফলে বিবাহিত জীবনের সব আনন্দই প্রায় শেষ হয়ে যায়। লেট-ম্যারেজের আর এক কুফল হলো ভুল বোঝাবোঝি। সামান্য কারণ নিয়ে মতান্তর গিয়ে পৌঁছায় মনান্তরের পর্যায়ে। এর অবশ্যম্ভাবী ফল ফলতে দেরি হয় না। কোর্ট-কাছারিতে দৌড়োদৌড়ি শুরু হয়ে যায়। বিবাহ-বিচ্ছেদ করে তখন দুজনেই নিষ্কৃতি পেতে চায়। এর বলি হয় ছেলে-মেয়েরা। তাদের জীবনে এঘটনা বিষময় প্রভাব সৃষ্টি করে। এর আসল কারণ হলো কিন্তু দুজনের জীবনেরই নানা আকাঙ্ক্ষার অতৃপ্তি। সময়ে বিয়ে হলে যেটা সম্ভব অসময়ে সেটা নিশ্চয়ই সম্ভব নয়। তাছাড়া তেমন বোঝাপড়াও গড়ে ওঠে না। সবকিছু মিলিয়ে শুরু হয় অশান্তি। তাতে সবকিছু ভেঙেচুরে যায়।

লেট-ম্যারেজের কুফল মোটামুটি আমাদের সকলেরই এখন জানা হয়ে গেছে। বিয়ের ব্যাপারে গড়িমসি করা এখন অনেকেই পছন্দ করে না। বরং সম্ভব হলে বিয়ে যথাসময়ে মিটিয়ে ফেলার পক্ষে প্রায় সবাই। কিন্তু ইচ্ছে থাকলেই সবসময় উপায় হয় না। সে পথে সবচেয়ে বড় অন্তরায় হলো আর্থিক সংকট। এই সংকটে পড়ে অনেকেই হাবুডুবু খাচ্ছে। দুজনে চাকরি করলে চলে কিন্তু সেরকম দুজন পাওয়া সব সময় সম্ভব নয়। পশ্চিমে এই সমস্যা তেমন অন্তরায় সৃষ্টি করতে পারে না। ওদেশে চাকরির খুব সংকট নেই। এমনকি ওখানকার মেয়েরা বিয়ের পর চাকরি ছেড়ে দিয়ে ঘর-সংসার করে। তারপর আবার চাকরিতে ফিরে আসে। কিন্তু যে-দেশে চাকরি পাওয়াই দুষ্কর সেদেশে চাকরি ছেড়ে দেওয়ার কোন প্রশ্নই আসে না। এ প্রসঙ্গে একটি তথ্য আমার জানা আছে যে বিয়ের পর কোন মেয়ে চাকরি ছেড়েছে বিভিন্ন জীবিকায় এরকম কারো সংস্পর্শে আজ পর্যন্ত আসিনি। বরং একাধিক জায়গায় একটি বেমক্কা প্রশ্নের মুখোমুখি আমাকে দাঁড়াতে হয়েছে। একটা চাকরির ব্যবস্থা করে দেওয়ার জন্য একাধিক অনুরোধ শুনেছি। সবিনয়ে জানিয়েছি যে সেরকম কোন ক্ষমতা আমার নেই।

এ অবস্থায় বিয়ের ব্যাপারে কোন সুস্পষ্ট সমাধান নেই। তবু এটা সুখের কথা যে লেট-ম্যারেজের বদলে এখন অনেকেই উপযুক্ত সময়ে বিয়ের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করছেন এবং সে অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণেও এগিয়ে আসছেন। এবার সকলের উদ্যোগী হওয়া উচিত এ পথের যে সবচেয়ে বড়ো প্রতিবন্ধক আর্থিক সংকট তা নিরসনে উদ্যোগী হওয়া।

—প্রমীলা

জলসা

নৃত্যম প্রযোজিত রূপকথা : নৃত্যমের বার্ষিক উৎসবের উদ্বোধনী সভায় শ্রীপাহাড়ী সান্যাল অভিনন্দন জানালেন উদ্যোক্তাদের নিষ্ঠাকে। ডঃ রমা চৌধুরী সভাপতিত্বকালে বলেন, "শিক্ষার দুটি দিক—একটি পঠন-পাঠন তথা জ্ঞানের, অন্যটি ললিতকলা তথা সুকুমার অনুভূতির লালন ও পরিমার্জনা। প্রথমটিকে আমরা শিক্ষা-ক্ষেত্রে যতটা মূল্য দিয়ে থাকি দ্বিতীয়টিকে দেওয়া হয় না—যদিও মানুষের চরিত্রগঠনে দ্বিতীয়টির মূল্য কোনো অংশে কম নয়। কিন্তু শিক্ষালয়ে আমরা এ দিকটিতে সব সময় দৃষ্টি দিতে পারি না। আমাদের অবহেলিত এই সূক্ষ্ম দিকটির চর্চা করে এঁরা এই সব নৃত্য ও সঙ্গীত প্রতিষ্ঠান-গুলি দেশের সেবাই করছেন।

"বিম্বাবতী" কবিতাবলম্বী নৃত্যনাট্য "রূপকথা"কে রূপকথারই স্বপ্ন ও মাধুর্যে ভরে তুলে ধরেছেন যেসব শিল্পী তাঁদের মধ্যে প্রথমেই মনে আসে রাজকন্যার ভূমিকায় পূর্ণিমা চট্টোপাধ্যায়, রাজপুত্র-রূপী ভানু দে ও বিম্বাবতীর চরিত্রায়ণে সুনন্দা মুখোপাধ্যায়ের কথা। রাজকুমারীর কুমারীচিত্তের লজ্জা, বিস্ময় ও নিষ্পাপ অনুরাগকে, নৃত্যকুশলতা ও ভাবসৌকর্যে মধুর করেছেন পূর্ণিমা। রাজপুত্রের বীর্য, কৌতুক ও প্রেম—ভানু দের দৃপ্ত পদক্ষেপ ও ভঙ্গীতে অভিব্যক্ত। সুনন্দা মুখো-পাধ্যায়ের অভিনয় প্রতিভায় অনেক কিছুর আশ্বাস পাওয়া গেল। সঙ্গীতাংশে সুনির্বাচিত গানগুলি সুন্দর গেয়েছেন—অপর্ণা চ্যাটার্জি, সৌমেন্দ্র ঘোষ, চন্দনা চক্রবর্তী।

গীতালির পঞ্চদশ বার্ষিকোৎসবে সঙ্গীত পরিবেশনরত (বামদিক থেকে) গৌরী সরকার, উমা সরকার, বাণী মুখোপাধ্যায়, ইন্দ্রাণী দাস ও পলি ভট্টাচার্য।

গীতালির অনুষ্ঠান : সম্প্রতি মহাজাতি সদনে শ্যামবাজারের ৪বি, ললিত মিত্র লেনস্থ প্রখ্যাত সঙ্গীত শিক্ষায়তন গীতালির পঞ্চদশ বার্ষিক অধিবেশন ও চতুর্থ বার্ষিক সঙ্গীত প্রতিযোগিতার পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান হয়ে গেল। অনুষ্ঠানে সভাপতির ভাষণে যুগান্তর সম্পাদক শ্রীসুকমলকান্তি ঘোষ বলেন যে সঙ্গীতের প্রভাব দেশের তরুণদের মনে বিশেষ মঙ্গলবোধ জাগরিত করে—তাই সঙ্গীতের প্রসার অতি প্রয়োজনীয়। প্রধান অতিথি বিখ্যাত সঙ্গীতাচার্য শ্রীজয়কৃষ্ণ সান্যাল গীতালির শিক্ষাপদ্ধতির ভূয়সী প্রশংসা করেন। উদ্বোধনে গীতালির উপাধ্যক্ষা শান্তা সাহার নেতৃত্বে ২৫ জন ছাত্র-ছাত্রীর ধ্রুপদ সঙ্গীত বিশেষ উল্লেখ-যোগ্য। অনুষ্ঠানে সমবেত দেশাত্মবোধক সঙ্গীত, রবীন্দ্রসঙ্গীত ও নজরুলগীত এবং শিবনাথ সাহা ও শিবানী গাঙ্গুলীর সম্প্রদায়ের গীটার আকর্ষণীয় হয়েছিল। শিশুশিল্পী মধুমিতা দাসের কণ্ঠসঙ্গীত ও পম্পা চৌধুরীর নৃত্যে সকলেই মুগ্ধ হন। বিশেষ আকর্ষণ হিসাবে বিখ্যাত শিল্পী শ্রীঅনুপ ঘোষালের সঙ্গীত পরিবেশন অপূর্ব হয়েছিল। অনুষ্ঠানের সাফল্যের জন্য অধ্যক্ষ শ্রীপঙ্কজ সাহা কৃতিত্বের দাবী করতে পারেন।

গ্রামোফোন কোম্পানীর শারদসম্ভার : গ্রামোফোন কোম্পানী আনন্দময়ীর আগমনকে প্রণাম জানালেন ই, পি, রেকর্ডে ভক্ত শিল্পী শ্রীগোবিন্দগোপাল মুখোপাধ্যায় ও তৎপত্নী মাধুরী মুখোপাধ্যায়ের ভাব-মধুর ধ্বনিগভীর কণ্ঠের শ্রীশ্রীচণ্ডীস্তোত্র, উমাস্তোত্রম, শ্রীমদ্‌ভাগবতগীতা ও জগন্নাথ স্তোত্রম দিয়ে। উচ্চারণ সৌকর্যে, আরাধনার পুণ্য আবেগে এই স্তোত্রগীত চারটি পূজা-মণ্ডপকে স্মরণ করিয়ে দেয়।

ছবি বন্দ্যোপাধ্যায়ের কীর্তন সঙ্গীত "রাহিরাখালে" শ্রীরাধার গোবিন্দদরশনের ব্যাকুল আবেগে রাখাল সেজে গোচারণে যাওয়া, যোগমায়ার প্রভাবে বিমোহিত শ্রীকৃষ্ণের শঙ্কা, পরিশেষে যুগলমিলন, ভক্তির উচ্ছলতা, নাটকীয় চমক ও আত্ম-নিবেদন শিল্পীকে যেন নতুন করে চিনিয়ে দিল।

শৈলেন দত্তরায়ের সুর ও দীপঙ্কর সেনগুপ্তের সঙ্গীত-পরিচালনায় শান্তিময় কারফরমা রচিত শিশুগীতি নাটিকা "চড়ুইভাতি" বনের ধারের পুকুর পাড়ে খিচুড়ী ভাজার চড়ুইভাতির এক উপভোগ্য ছবি মেলে ধরেছে।

আবৃত্তি শিল্পের জনপ্রিয় তারকা দেবদুলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের উদার, ভাব-স্পন্দিত কণ্ঠে রবীন্দ্রনাথের আফ্রিকা, শঙ্খ (কবিতা) ও উদাসীন, মেঘলা দিনে (গদ্য) কবির মনের ভাবপরিবর্তনের আলোছায়ায় এক চিত্রগ্রাহী রূপকে প্রত্যক্ষ করায়।

বেগম আখতারের কণ্ঠে ঠুংরী ও দাদরা শিল্পীর আশ্চর্য ক্ষমতাকে যেন জীবনের গোধূলিবেলার রাঙা আলোয় করুণ-মধুর করে তুলেছে। কথা ও সুর রবি গুহর।

৪৫ আর পি এম সিঙ্গলস-এর কলম্বিয়া সিরিজে প্রতিমা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সুরোচ্ছল রঙিন কণ্ঠে দুটি গানের একটিতে খেলার সাথীকে কৌতুকী ডাকের আনন্দমুখরতা চিত্তে উল্লাস জাগায়। কিন্তু মধুর করে তোলে উল্লাসের অন্তরে আভাসিত বেদনার চকিত দ্যুতিতে। অপর একটি গান প্রেমসঙ্গীত।

ধনঞ্জয় ভট্টাচার্য ভক্তি, বেদনা ও নানামুখী অভিজ্ঞতায় যে জীবনবেদ রচনা করেছেন—তা তাঁর একারই নয় সকলেরই এ অনুভূতিতে সমান অধিকার। এবং এই কথা মনে করানোতেই শিল্পীর শিল্পীত্ব।

হেমন্ত মুখোপাধ্যায় সমসাময়িক রুচির স্রোতে আপনাকে ভাসিয়ে দেননি। আপন প্রকাশবৈশিষ্ট্যে অটল থেকে মনে করিয়ে দিয়েছেন তিনি হেমন্ত মুখার্জি ছাড়া অন্য কিছু হতে পারেন না, হবেনও না।

সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়ের দুটি গান তাঁর জীবন্ত গায়নশৈলীতে সুপরিবেশিত। আরতি মুখোপাধ্যায়ের দুটি গানই প্রাণোচ্ছলতায় যেন ঝলমল করছে। বারবার শুনতে ইচ্ছে করে তাঁর "আমি রাতকে বলেছি কাল।"

ভূপেন হাজারিকার কাহিনীগীতি, ঘটনায়, বেদনায় প্রকাশের উদ্বেলতায় চিত্তস্পর্শী।

পিন্টু ভট্টাচার্যর গান এবারে যেন আরো সুন্দর ও পরিমার্জিত।

দ্বিজেন মুখোপাধ্যায়ের সুগম্ভীর কণ্ঠে পরিবেশিত দুটি গানে তাঁর শিল্পী-মনের পথ হারানোর খবরটি শান্ত মাধুর্যে ব্যক্ত। ইলা বসুর দুটি গানে নাটকীয়তার নতুনত্ব উপভোগ্য। নির্মলা মিশ্রের দুটি গান তাঁর আপন মনেই প্রতিষ্ঠিত। **হিজ মাস্টারস ভয়েস লেবেলে** মাধুরী চট্টোপাধ্যায় হিমাংশু বিশ্বাসের সুরকে যথাযথভাবে মূর্ত করতে পেরেছেন। নির্মলেন্দু চৌধুরীর দুটি পল্লীগীতিতে আপন আনন্দে আত্মহারা ত হয়েইছেন। তাঁর ভক্তদেরও ভাসিয়ে নিয়ে গেছেন অনাবিল আনন্দের স্রোতে। হতাশ করেছেন মান্না দে। শিল্পীর শ্রেষ্ঠত্ব ব্যবসায়িক সাফল্যেই শুধু নয়— অনুভবের মহত্বেও একটা বড় স্থান আছে তাঁর শিল্পকৃতিত্বে। জনপ্রিয় শিল্পীদের এ দায়িত্বজ্ঞান আরো সজাগ থাকা উচিত। কিন্তু মান্না দের এবারের গান শুনে মনে হোলো এ দায়িত্ব সম্বন্ধে তিনি মোটেই সচেতন নন।

ললিতা ধরচৌধুরীর প্রথম গানটি—(আকাশের সময়টা এখন) যে প্রতিশ্রুতি জাগিয়েছিল—এবারের গান সেই আকাঙ্ক্ষিত পরিণতিতে পৌছবার আশ্বাসই দিয়েছে।

মানবেন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের গায়নশৈলী, মার্জিত কণ্ঠ ও আন্তরিকতা প্রশ্নাতীত। কিন্তু কোনো কোনো কথায় উচ্চারণ দক্ষতা —প্রকাশের অতি সচেতনতা একটা কৃত্রিমতা সৃষ্টি করে গানের মাধুর্য ব্যাহত করেছে।

মঞ্জু বন্দ্যোপাধ্যায় গীত গান দুটি সুশ্রাব্য। রানু মুখোপাধ্যায় সুন্দর গেয়েছেন হেমন্ত মুখোপাধ্যায় সুরারোপিত দুটি গান। তরুণ বন্দ্যোপাধ্যায় যথাযোগ্যমানে সুপ্রতিষ্ঠিত আছেন। বনশ্রী সেনগুপ্তর দুটি গানই প্রসাদগুণসম্পন্ন। চন্দ্রাণী মুখোপাধ্যায়ের সপ্রতিভ ভঙ্গীতে গাওয়া গান শুনলেই ভাল লাগে। শ্যামল মিত্রর গান তাঁর অনিবার্য আকর্ষণের এতটুকুও ঘাটতি নেই। অনুপ ঘোষাল তাঁর প্রাণচঞ্চল কৌতুকী ঢঙেই দুটি গান গেয়েছেন এবং সফলও হয়েছেন। ইতিমধ্যেই প্রাক পুজার মাইক্রোফোনে গান দুটি শোনা যাচ্ছে। শ্রাবন্তী মজুমদারের দুটি গান সুগীত।

বোম্বাই শিল্পীদের গান—শচীন দেববর্মণের গানে অতীতের একটি গানের ছায়া—তাঁর জীবনের স্বর্ণোজ্জ্বল মুহূর্তকেই স্মরণ করিয়ে দিয়েছে। রাহুল দেববর্মণ—পিতার পুত্র না হয়ে এ যুগেরই প্রতিধ্বনি হতে চেয়েছেন। হয়ত পথ-নির্বাচন তাঁর স্বধর্মেরই অনুকূল। সবিতা চৌধুরী—গীত দুটি গান আনন্দদায়ক। বোম্বাই প্রবাসী গীতা দত্তর মধুর কণ্ঠে যেন বাংলার মাটিরই এক ঝলক সজল হাওয়ার আশ্বাস পাওয়া গেল।

নায়ক বিশ্বজিতের গায়ক হয়ে ওঠার প্রচেষ্টা অনেককেই আনন্দ দেবে। এবারে স্ব-গীত তিনি সুরও দিয়েছেন।

সুমন কল্যাণপুর শ্রোতাদের প্রত্যাশা অপূর্ণ রাখেননি।

লতা মুঙ্গেশকার ও আশা ভোঁসলের গান রত্নের মতই শিল্পীদের আপন মূল্যে মূল্যবান। প্রতিভা যা স্পর্শ করে তাই সোনা হয়ে ওঠে সেই কথাই স্মরণ করিয়ে দিল আশা ও লতার রাগসঙ্গীতের ছোঁয়ালাগা ও সরগম অলঙ্কৃত গানগুলি। এ গান কোনোদিন পুরানো হবে না। সাধারণের অনুকরণের ধরাছোঁয়ার বাইরে বলেই এ গানের আকর্ষণ আরো বেশী।

অন্যান্য গানের মধ্যে নির্মল মুখোপাধ্যায়ের শ্যামাসঙ্গীতে ধনঞ্জয়বাবুর সুরের সঙ্গে ভঙ্গির ছায়াও শিল্পীর সম্বন্ধে আমাদের আশান্বিত করেছে।

এ ছাড়া রাজকুমার বিশ্বাসের শিশুগীতি, মিন্টু দাসগুপ্তর কৌতুকগীতি বৈচিত্র্যবর্ধক। ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়ের কৌতুক নক্সার কথা বলাই বাহুল্য।

এল পি ডিস্কে "রামী চন্ডীদাস" ও "অতুলপ্রসাদের" ১২ খানি গান পরে আলোচিত হবে।

যেসব গীতিকার ও সুরকারবৃন্দ গানের ডালি সাজিয়েছেন তাঁরা হলেন—সুধীন দাসগুপ্ত, পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়, গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার, আনন্দ মুখোপাধ্যায়, মানস মুখোপাধ্যায়, মুকুল দত্ত, ভবেশ গুপ্ত, সলিল চৌধুরী, শ্যামল গুপ্ত, সত্যচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, সুনীলবরণ, ডাঃ শৈলেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য ও নারায়ণচন্দ্র মহাপাত্র, বরুণ বিশ্বাস, শিবদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, মিন্টু ঘোষ, শচীন ভৌমিক, মীরা দেববর্মণ, অভিজিত, নচিকেতা ঘোষ, রাহুল দেববর্মণ, শৈলেন মুখোপাধ্যায়, স্বপন, জগমোহন, রবীন্দ্র জৈন, ধনঞ্জয় ভট্টাচার্য, রতু মুখোপাধ্যায়, শ্যামল মিত্র, ভূপেন হাজারিকা, অনল চট্টোপাধ্যায় হিমাংশু বিশ্বাস, মানব মুখোপাধ্যায়, রবীন বন্দ্যোপাধ্যায়, অভিজিৎ এবং ভি, বালসারা।

ভারতী রেকর্ড কোম্পানীর পুজোর গান : ভারতী রেকর্ড কোম্পানীর ২০খানি গানের সীমিত পরিসরেই আছে আধুনিক গান, রবীন্দ্রসঙ্গীত, ছড়াগান এবং কৌতুক-গীতি।

রবীন্দ্রসঙ্গীতে সর্বপ্রথম উল্লেখযোগ্য সমর গুপ্তের নাম। তাঁর গাওয়া "বিরহ মধুর হোলো" ও "হার মানা হার" রবীন্দ্র-বারতাকে মনে ঠিকই পৌছে দেয়।

সুপ্তি সেনের "অরূপ বীণা" ও "ওদের কথায়" নিষ্ঠার সঙ্গে পরিবেশিত।

বাণীবিদ্যাবীথির শিশুশিল্পীদের পতুলের বিয়ে নৃত্যনাট্যের দৃশ্য। ফটো ঃ অমৃত

সঙ্গীত পরিচালকরূপে হিমাংশু বিশ্বাস উল্লেখযোগ্য যোগ্যতার পরিচয় দিয়েছেন জয়ন্তী সেন, সুলীনা দাসগুপ্তা, চন্দনা মুখোপাধ্যায় এবং মীনা চৌধুরীর গানগুলির সুররচনায়।

পুলক বন্দ্যোপাধ্যায় রচিত গান দুটি যথাযোগ্য অভিব্যক্তি দিয়েছেন জয়ন্তী সেন।

চন্দনা মুখোপাধ্যায়ও সুরের ধারাকে অনাহত রেখেছেন।

বাংলাদেশের মর্মন্তুদ কাহিনীর পটভূমিকায় গাওয়া সুলীনা দাসগুপ্তর দুটি গান বিষয়বস্তুর গাম্ভীর্য এবং গাওয়ার ভঙ্গিমা উভয় বিচারেই চিত্তস্পর্শী।

অন্যান্য শিল্পীরা হলেন দিলীপ ভট্টাচার্য, শিশির সরকার, দেবকুমার সরকার, সুব্রত চন্দ, নির্মাল্য পাল, রঞ্জিত বসুরায়, ফ্যান্সি রায়, ভূপেন কুন্ডু, রঞ্জিৎ ঘোষাল, বিদ্যুৎ দত্ত, গৌরীশঙ্কর, উদয় সরকার, সোমেন দত্ত, মীনা চৌধুরী (ছড়া গান), মলয় রাহা (নকসা) এবং স্বপন বন্দ্যোপাধ্যায় (কৌতুকগীতি)।

উল্লেখযোগ্য বিষয় হোলো এই যে প্রধানত অজানা তরুণ শিল্পীদেরই উদ্যোক্তারা আত্মপ্রকাশের প্রশস্ত অবকাশ দিয়েছেন এবং এ'রা অনেকেই তাঁর মর্যাদা রেখেছেন। প্রতিভাবান রচয়িতা ও সুরস্রষ্টা প্রশান্ত ভট্টাচার্যর নাম বিশেষ উল্লেখের দাবীদার।

শারদ অর্ঘ

হিন্দুস্থান মিউজিক্যাল প্রোডাক্ট নিবেদিত শারদ অর্ঘ্যের ডালির প্রতিটি গান পুষ্পস্তবকের মতই সতেজ, সুন্দর ও মধুরই শুধু নয়—নতুনত্ব প্রয়াসী মনের এত শিল্পসুন্দর প্রকাশ।

এই কোম্পানীর এবারের পুজোর রেকর্ড আলোচনা প্রসঙ্গে প্রথমেই মনে আসে সীমাহীন জনপ্রিয়তা ও অতুলনীয় কণ্ঠমাধুর্যের অধিকারী 'বড়ে গোলাম আলি খাঁর কথা—ওস্তাদ বিলায়েৎ খাঁ যাঁকে বলেন এ যুগের তানসেন। ১৯৩৮ অব্দে হিন্দুস্থান রেকর্ডে গৃহীত খাঁ সাহেবের চারখানি গান ই পি রেকর্ডে গ্রথিত হয়ে যেন নতুন করে শিল্পীকে মেলে ধরল। যৌবনের আবেগ, সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম কারুকৃতি ও আবেশের এক চিত্রকল্প রূপে তার পাহাড়ী, কালেংড়া, মেঘ ও ধুন। কালেংড়ার রেখাব ও কোমল ধৈবতের রেশ গানের পরেও কানে বাজে।

শচীন দেববর্মনের ৪খানি গানের ই পি—'বধূ গো এই মধুমাস, প্রেমযমুনায়, প্রিয় আজো নয় ও মলয়া চল ধীরে তাঁর অতীতের এক গৌরবময় অধ্যায়কে মেলে ধরে। সে যুগের এইসব গান—এক চিরন্তন সৌন্দর্যদ্যুতিকে যেন ধরে রেখেছে।

অমর পালের চারখানি পল্লীগীতিতে, গ্রামীণ ধারার এক সরস রূপকে তা ব্যক্ত করেইছে। শিল্পীর নিজস্ব ভাবনা ছায়া-এ রূপকে মধুরতর করে।

কীর্তনের একনিষ্ঠ গায়িকা রাধারাণী দেবীর কীর্তন সঙ্গীত নাটিকা মাথুর—অবশ্যই এবারের পুজোর গানের মণিহারে এক উজ্জ্বল সংযোজন। সঙ্গীত পরিচালনা করেছেন বংশধারী চক্রবর্তী।

'সাতভাই চম্পা' রূপকথা নাটিকাটি ছোটদের জন্যই। কিন্তু শুনতে শুনতে বড়রাও মশগুল হয়ে উঠি। সাতভাই-চম্পা ও তাদের বোন পারুলের—আনন্দময় পরিণতি শোনবার জন্যও যেন ব্যাকুল হয়ে ওঠেন। গীতিনাট্য রচয়িতা আশীষ চট্টোপাধ্যায়, সঙ্গীত পরিচালনায় আছেন শৈলেন মুখোপাধ্যায় এবং চরিত্র রূপায়ন করেছেন হৈমন্তী শুক্ল, জোনাকী মুখোপাধ্যায় ও রুমকী রায়, কবি মজুমদার, মালবিকা ভৌমিক, সুস্মিতা মজুমদার, লক্ষ্মী সেনগুপ্তা, জ্যোৎস্না দাস, কুমকুম চক্রবর্তী, প্রভাবতী বন্দ্যোপাধ্যায়, শিখা বন্দ্যোপাধ্যায়, দীপেন মুখোপাধ্যায়, রীণা সেনগুপ্ত, উপর্ণা মুখোপাধ্যায়, ঋমেকী রায়, উমা মুখোপাধ্যায়, অনুরাধা দত্তগুপ্তা, অজন্তা সেনগুপ্ত, প্রিন্স সেনগুপ্ত, রাজকল্যাণ রায় ও মধুছন্দা রায়।

এস এল এইচ স্টান্ডার্ড প্লে রেকর্ডে হীরালাল সরখেলের দুখানি ভক্তিমূলক গান শিল্পীর গাইবার আন্তরিকতা হৃদয় স্পর্শ করে।

রামকুমার চট্টোপাধ্যায়ের দেহতত্ত্ব ও শ্যামাসঙ্গীত ঐ ভাবেরই অনুসারী হয়েও পুজো নিবেদনের আর একটি দিককে প্রকাশ করছে।

অংশুমান রায়ের একটি মুজিবরের কাহিনী ইতিমধ্যেই তাঁকে জনপ্রিয়তায় প্রতিষ্ঠিত করেছে। পুজোয় গাওয়া পল্লীগীতি দুটি সেই প্রতিষ্ঠাকেই দৃঢ়তর করবে।

কবি মজুমদারের রবীন্দ্রসঙ্গীত আমাদের আনন্দ দিয়েছিলো। আধুনিক গানেও ইনি সমান কৃতিত্ব দেখিয়েছেন—এ অভিজ্ঞতাও কম আনন্দের নয়।

ওপারের শিল্পীর কণ্ঠের গান শীর্ষক সিরিজে কিশোর শিল্পী মহম্মদ আবদুল জব্বরের দেশাত্মবোধক দুটি গান শুনতে ভাল লাগে সমসাময়িক যুগের এক চিত্তস্পর্শী নজীর হিসাবে। গান দুটির রচয়িতা শ্যামল গুপ্ত সুর দিয়েছেন বাপী লাহিড়ী। আর একটি ডিসকে লালন ফকিরের কথা ও সুরে এবং অপরেশ লাহিড়ীর পরিচালনায় মকছেদ আলী খাঁর গান দুটি মন দিয়ে শোনবার মত।

এপারের শিল্পীর ওপারের গান দুটি আমরা পাইনি। রবি ঘোষ ও ভোলা দত্তর কৌতুকনাট্য বর্তমান যুগের সামঞ্জস্যহীনতার ওপর এক উপভোগ্য স্যাটায়ার।

সুপ্রভা সরকার গীত দুটি নজরুলগীতি—জনম জনম গেল ও ভুলি কেমনে যুগপৎ কবির গানের এক বিশেষ দিককে এবং প্রতিভাময়ী শিল্পীর খ্যাতির মধ্যগগনকে উদ্ভাসিত করছে।

অনেক সম্ভাবনার আভাষ পাওয়া গেল দ্বিজেন মুখোপাধ্যায়ের সুরে গাওয়া শ্যামলী বসুর দুটি গান। রচয়িতা কামাখ্যা ঘোষ। একই কথা বলা যায় দীপেন মুখোপাধ্যায়ের সুরে গীত নিতাই গোস্বামীর দুটি গানে।

প্রসূন দাশগুপ্তর ভরাট কণ্ঠে মিষ্টি করে গাওয়া দুটি গানে—রবীন্দ্র সঙ্গীতে আর এক নবাগতের আগমনবার্তা জানিয়ে দিল। যন্ত্রসঙ্গীতে আছে গীটার। বাজিয়েছেন অভিজিৎ নাথ ও বিদ্যুৎ বসু।

পূর্ণদাস বাউলের **১২খানি** গানের একটি এল পি এক মূল্যবান সম্পদ। বিভিন্ন বিষয়ক গানগুলি হোলো—প্রেম করা কি জ্যালাগো, উচিত কথা বলবো বন্ধু, যদি মন করতে পার, মন ফকিরা মনের কথা, যদি প্রেমানন্দে যাবি, শেষের দিনে, প্রেম কথাটি শুনতে ভালো, ওহে রাম রঘোবর, কে বানালো এমন ঘর, ও মানুষ কে আছে। —চিত্রাঙ্গদা

বি, এফ, জে-এর শংসাপত্র বিতরণী উৎসব : বেঙ্গল ফিল্ম জার্নালিস্টস অ্যাসোসিয়েশনের ৩৪তম বার্ষিক শংসাপত্র বিতরণী উৎসব যথারীতি সমারোহের সঙ্গে সুসম্পন্ন হল' গেল সোমবার সন্ধ্যায় রবীন্দ্র সদনের সুরম্য প্রেক্ষাগৃহে। সংস্থা-সভাপতি মনুজেন্দ্র ভঞ্জের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এই উৎসবের উদ্বোধন করেন বাঙলা চলচ্চিত্র শিল্পের পুরোধা বীরেন্দ্রনাথ সরকার এবং প্রধান অতিথির আসন অলঙ্কৃত করেন কলিকাতা হাইকোর্টের মহামান্য প্রধান বিচারপতি প্রশান্তবিহারী মুখোপাধ্যায়।

বি এফ জে-এর অনুষ্ঠানে বি এন সরকারের কাছ থেকে শংসাপত্র গ্রহণ করছেন মাধবী মুখোপাধ্যায়, সৌমেন্দু রায় এবং অনুপ ঘোষাল। ফটো : অমৃত

প্রেক্ষাগৃহ

বি এফ জে-এর নির্বাচিত সহ-অভিনেতার পুরস্কার বিজয়ী অনিল চট্টোপাধ্যায় এবং দিলীপকুমার। ফটো : অমৃত

ফিল্ম ফিনান্স কর্পোরেশন ও বাংলা ছবি

কেন্দ্রীয় সরকারের মালিকানায় প্রতিষ্ঠিত দি ফিল্ম ফিনান্স কর্পোরেশন লিমিটেড ১৯৬০ সালের মার্চ মাস থেকে কাজ শুরু করেছে। বর্তমানে এর আদায়ীকৃত মূলধন হচ্ছে ৫০ লক্ষ টাকা। এছাড়া ভারত সরকার প্রতিষ্ঠানটিকে ৭০ লক্ষ টাকা ঋণ স্বরূপ দান করেছে।

ফিল্ম ফিনান্স কর্পোরেশনের প্রধান উদ্দেশ্য হচ্ছে, ভারতীয় ছবির মনোন্নয়ন-কল্পে যে ছবির উচ্চ মান এবং উৎকর্ষ বিশিষ্ট হবার সম্ভাবনা, তাকে আর্থিক ঋণ দেওয়া। যাঁরা এই সংস্থার উদ্দেশ্যাবলী ও কর্মসূচী (পরিমেল বন্ধ ও নিয়মাবলী—মেমোরান্ডাম অ্যান্ড আর্টিকলস অব অ্যাসোসিয়েশন) রচনা করেছিলেন, তাঁদের মনে এও ছিল যে, কোনো ছবিতে লগ্নীকৃত টাকাটি উদ্ধারের দিকে চেয়েও ছবিটি যেন জাতীয় সংস্কৃতি ও শিক্ষামূলক এবং সুস্থ প্রমোদোপকরণ হয়।

কিন্তু কার্যত যে-সব ছবি কর্পোরেশনের সাহায্য পেয়েছে, সেগুলি অন্য পাঁচটি ব্যবসায়িক ছবির মতোই স্টার' যুক্ত হওয়ায় আর্থিক সাফল্য সম্ভাবনাযুক্ত হওয়া সত্ত্বেও শেষ পর্যন্ত দেখা গেছে এইসব ছবিকে যে অর্থ ঋণ হিসেবে দেওয়া হয়েছে, তার অধিকাংশই ফেরত পাওয়া যায়নি। সেই অপরিশোধিত ঋণের বোঝা আজও সংস্থাটির স্কন্ধে চেপে আছে বলে বর্তমানের চেয়ারম্যান বি কে করঞ্জিয়া সেদিন এক সাংবাদিক সম্মেলনে আমাদের জানালেন। কিন্তু আমাদের জিজ্ঞাসা, যখন কোনো ছবির জন্যে কাউকে ঋণ দেওয়া হত, তখন তার কাছ থেকে উপযুক্ত জামিন নিয়েই তা করা হত। তাই যদি হয় তাহলে ঋণ আদায় হওয়ার পথে বাধা কোথায়?

তিন বছর আগে সংস্থার ডিরেক্টারেরা এই ঋণদান ব্যাপারে একটি নতুন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। তাঁরা স্থির করেন, অতঃপর তাঁরা প্রধানত মাত্র নিম্ন ব্যয়ের ছবিকেই—যা সাধারণত সাদা-কালোতে তোলা হবে তাকেই—আর্থিক সাহায্য দেবেন। এই সিদ্ধান্তকে সফল করবার জন্যে তাঁরা তিনটি বিশেষ দিকে মনোনিবেশ করেছিলেনঃ (১) হিন্দী এবং আঞ্চলিক ভাষায় মানবিকতা গুণে সমৃদ্ধ কাহিনী নির্বাচন করা; (২) যে-সব শক্তিশালী ও সম্ভাবনাপূর্ণ চলচ্চিত্রকারের পক্ষে সহজে অর্থ যোগাড় করা সম্ভব নয়, তাঁদের বেশী করে সাহায্য করা এবং (৩) পুণায় অবস্থিত ভারতীয় ফিল্ম ও টেলিভিশন ইনস্টিটিউটে শিক্ষিত শক্তিমান চলচ্চিত্রকারদের সন্ধান করা।

সংস্থার ডিরেকটারের মতে এই পন্থা সাফল্যমণ্ডিত হয়েছে বলে মনে করা যেতে পারে। কারণ, এই পথে চলে তাঁরা কিছু কিছু লাভের মুখ দেখতে পেয়েছেন। ১৯৬৮ থেকে শুরু করে গেল তিন বছরে তাঁদের লাভ হয়েছে যথাক্রমে ১৩, সাড়ে ১৬ এবং সাড়ে ১৮ হাজার টাকা। এই পদ্ধতি অনুসারে চলবার আগের যুগে যে-টাকা ঋণ স্বরূপে দেওয়া হয়েছিল তার মধ্যে ১২ লক্ষ টাকা একেবারেই আদায় হবে না বলে ধরে নেওয়া হয়েছে এবং আরও ৩৭ লক্ষ টাকা উদ্ধার করা যাবে কিনা সে সম্পর্কে সন্দেহ প্রকাশ করা হয়েছে। কিন্তু নতুন কর্মপন্থা গ্রহণের পরে আজ পর্যন্ত কোনো ঋণকে অনাদায়ী বা ফেরৎ পাবার সম্ভাবনা কম বলে মনে করবার প্রয়োজন হয়নি।

এই নতুন যুগের সূচনা হয়েছে মৃণাল সেনকৃত হিন্দী ছবি 'ভুবন সোম' থেকে। এর আগের যুগে যে-সব ছবিকে আর্থিক ঋণ দেওয়া হয়েছে, সেই সব ছবির মধ্যে অন্ততঃ ১৬ খানি আজ পর্যন্ত শেষই হয়নি এবং কোনো কোনোটি শেষ হতে ৬ বছর পর্যন্ত সময় লেগেছে। কিন্তু 'ভুবন সোম' থেকে শুরু করে যে-সব ছবি ফিল্ম ফিনান্স কর্পোরেশন-এর আর্থিক ঋণ পেয়েছে, সে-সব ছবিকে ঋণও যেমন কম দিতে হয়েছে,

জয়বাংলা/মমতা চট্টোপাধ্যায়। পরিচালনা : উমাপ্রসাদ মৈত্র।

বি এফ জে-এ নির্বাচিত শ্রেষ্ঠ সহ-অভিনেত্রী কাবেরী বসু, শ্রেষ্ঠ নায়ক দিলীপকুমার এবং শ্রেষ্ঠ পরিচালক সত্যজিৎ রায়।
ফটো : অমৃত

সেগুলি তৈরী হতেও তেমনই ঢের কম সময় লেগেছে। অবশ্য মাত্র আড়াই বছর হল এই নতুন ব্যবস্থা চালু হয়েছে। এবং এই সময়ের মধ্যে 'ভুবন সোম' সমেত মাত্র ৫ খানি ছবি মুক্তি লাভ করেছে। আরও ৩ খানি কাহিনী-চিত্র মুক্তির অপেক্ষায় রয়েছে এবং ২টি তথ্যচিত্র সমেত ১৫ খানি নির্মীয়মান।

একটি অসুবিধা যা দেখা যাচ্ছে সে হচ্ছে নিম্ন ব্যয় বিশিষ্ট ছবির মুক্তিলাভ সহজসাধ্য নয়। এমন কি, 'ভুবন সোম'ও কলকাতায় হিন্দী ছবির নিয়মিত ছবিঘর-গুলিতে মুক্তিলাভ করতে পায়নি। তার মুক্তি হয়েছিল ইংরাজী চিত্রগৃহ 'এলিট' সিনেমায়। বোম্বাই শহরে ছবিটি দেখানো হয়েছে প্রাতঃ-কালীন প্রদর্শনীতে।—এই মুক্তি সমস্যা মেটাবার জন্যে ফিল্ম ফিনান্স কর্পোরেশন দিল্লী, কলকাতা, বোম্বাই ও মাদ্রাজে তাদের অধীনে প্রাথমিক পর্যায়ে একটি করে 'আর্ট সিনেমা' খুলতে মনস্থ করেছেন। শোনা গেছে, আমাদের মধ্য কলকাতায় একটি ৫০০ আসনবিশিষ্ট চিত্রগৃহ ও'রা 'লীজ' নেবার ব্যবস্থা প্রায় পাকাপাকি করে ফেলেছেন। এই 'আর্ট সিনেমা'র মাধ্যমে ও'দের ঋণলব্ধ নিম্ন ব্যয়ের ছবিগুলির মুক্তিলাভের পথ সহজ করে ও'রা এই ছবিগুলি 'মিনিমাম গ্যারাণ্টি' লাভে অসমর্থ হওয়ায় যে সমস্যার উদ্ভব হয়েছিল, তার সমাধান করতে পারবেন বলে আশা করা যাচ্ছে।

'ভুবন সোম' থেকে শুরু করে আজ পর্যন্ত আড়াই বছরের মধ্যে ৩০ খানি ছবির জন্যে ঋণ ধার্য করা হয়েছে। এই তিরিশ খানির মধ্যে ভাষাভিত্তিক হিসাব হচ্ছেঃ

(১) হিন্দী—১৬ খানি
(২) মারাঠি—৩ "
(৩) গুজরাটি—২ "
(৪) মালয়লম—২ "
(৫) তামিল—১ "
(৬) ওড়িয়া—৩ "
(৭) বাংলা—৩ "

নতুন আঙ্গিকের ও নতুন ভাবনার ছবিগুলি যে শুধু আমাদের দেশের চিত্র-কারদের মধ্যে নবধারার প্রবর্তন করছে, তাই নয়, এই ছবিগুলি রপ্তানীর ক্ষেত্রে নতুন বাজারেরও সৃষ্টি করছে। 'ভুবন সোম', 'দাস্তাক', 'ফির ভী' (হিন্দী) ও 'কানকু' (গুজরাটী)—এই ৪ খানি ছবি ফিনিশ টেলিভিশনে বিক্রীত হয়েছে। আমেরিকা ও কানাডার বাজারে প্রদর্শিত হবার জন্যে 'দাস্তাক' ছবিটিকে একটি সংস্থা কিনেছেন। এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে যে, এই 'দাস্তাক' ছবির জন্যে যে-অর্থ ঋণ স্বরূপ দেওয়া হয়েছিল, তার সবটুকুই ফেরত পাওয়া গেছে মাত্র দিল্লী অঞ্চলে ছবিটির প্রদর্শনীলব্ধ অর্থ থেকে।

এইভাবে তোলা ছবিগুলির জন্যে নতুন ও প্রতিযোগিতামূলক বৈদেশিক বাজারে ভালোভাবে প্রদর্শনী ব্যবস্থা করতে হলে ফিল্ম ফিনান্স কর্পোরেশন এবং ইণ্ডিয়ান মোশান পিকচার এক্সপোর্ট কর্পোরেশনের মধ্যে ঘনিষ্ঠতর সহযোগিতা স্থাপনকল্পে একটি কার্যকরী সংস্থার সৃষ্টি হওয়া দরকার।

নতুন কর্মপন্থা গ্রহণের আগে যে-সাড়ে আট বছর কেটেছে, সেই সময়ের মধ্যে ন'টি বাংলা ছবি ফিল্ম ফিনান্স কর্পোরেশনের কাছ থেকে ঋণ পেয়েছেনঃ (১) সাত পাকে বাঁধা, (২) ঘুমভাঙার গান, (৩) চারুলতা, (৪) কাঁচ-কাটা হীরে, (৫) নায়ক, (৬) স্বর্গ হতে বিদায়, (৭) পঞ্চশর, (৮) আঁধার সূর্য এবং (৯) গুপী গাইন বাঘা বাইন। দেখা যাচ্ছে, এক আর-ডি বনসালই ন'খানির মধ্যে চারখানির প্রযোজক। বাকী পাঁচখানি ছবির প্রযোজক হচ্ছেন ভিন্ন ভিন্ন পাঁচজন। সংবাদে প্রকাশ, এই ন'খানি ছবির মধ্যে ঘুমভাঙার গান, স্বর্গ হতে বিদায়, পঞ্চশর এবং আঁধার সূর্য—এই চারখানি ছবি আর্থিক সাফল্য লাভ করতে পারেনি। এবং মনে হয়, এই ছবি ক'খানিকে প্রদত্ত ঋণের অর্থও কর্পোরেশন ফিরে

পাননি, যদিও ঋণ প্রদানের চুক্তি অনুসারে ফিরে পাওয়া উচিত ছিল।

গেল আড়াই বছরের মধ্যে যে-দুখানি বাংলা ছবি ইতিমধ্যেই ঋণ পেয়েছে, সে দুটি হচ্ছেঃ চিদানন্দ দাশগুপ্ত প্রযোজিত ও পরিচালিত 'বিলেত ফেরত' এবং অরুন্ধতী দেবী প্রযোজিত ও পরিচালিত 'পদ্মা পিসির বর্মী বাক্স।' এছাড়া আর যে ছবিখানির প্রযোজক সংস্থা ঋণ মঞ্জুর হওয়া সত্ত্বেও ঋণের টাকা এখনও পর্যন্ত গ্রহণ করেননি, তার নাম হচ্ছে-'সংসার সীমান্তে।' ছবিখানির পরিচালনা দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন রাজেন তরফদার।

আমরা ঠিক জানি না, দরখাস্তকারী প্রযোজককে ঋণ পেতে গেলে কিভাবে তাঁকে যোগ্যতার নিদর্শন পেশ করতে হয় এবং তাঁর যোগ্যতার বিচারই বা কিভাবে হয়। যতদূর জানি, আজ পর্যন্ত ফিল্ম ফিনান্স কর্পোরেশনের কোনো আঞ্চলিক পরিষদ নেই। কাজেই আঞ্চলিক ভাষার ছবির ক্ষেত্রে সুবিচার হয় কি করে তাও জানবার কথা। শুনেছি, যে-সমিতি বিচার-বিবেচনা করেন, তাতে পশ্চিমবঙ্গ থেকে মাত্র একজন সদস্য বর্তমানে আছেন।

নতুন ছবি

সত্যজিৎ রায়ের **সীমাবদ্ধ** ছবিটি আসছে ২৪ সেপ্টেম্বর থেকে শ্রী, প্রাচী এবং ইন্দিরা ও শহরতলীর আরও ১২টি চিত্রগৃহে শারদীয়া পূজার শ্রেষ্ঠ আকর্ষণ হিসেবে মুক্তি পাচ্ছে। প্রধান চরিত্রে আছেন শর্মিলা ঠাকুর, বরুণচন্দ্র ও পারমিতা চৌধুরী এবং পার্শ্বচরিত্রে আছেন হারীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, হারাধন বন্দ্যোপাধ্যায়, অজয় বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রশান্ত মল্লিক, প্রমোদ গাঙ্গুলী, দীপঙ্কর দে, মীন আয়ার ও শেফালী, চিত্রনাট্য সংগীত ও পরিচালনায় সত্যজিৎ রায়, শ্রীভরত সমশের জংগ বাহাদুর রাণা প্রযোজিত এবং চিত্রাঞ্জলি নিবেদিত ছবি। বিশ্ব পরিবেশনায় পিয়ালী।

মহাপূজার মহা-আকর্ষণ ত্রিনয়নী মা

দেবী মাহাত্ম্য গাথা অবলম্বনে রূপ-ঋষি চিত্রমের শ্রদ্ধাঞ্জলি ত্রিনয়নী মা মহাপূজায় শহর ও শহরতলীর বিশিষ্ট চিত্রগৃহে মুক্তিলাভ করছে।

হৃষিকেশ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রযোজিত ছবিটির চিত্রনাট্য ও সংলাপের দায়িত্ব নিয়েছেন বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্র। চিত্রগ্রহণ, গীত রচনা ও সম্পাদনার দায়িত্ব নিয়েছেন যথাক্রমে রামানন্দ সেনগুপ্ত, শ্যামল গুপ্ত ও অমিয় মুখোপাধ্যায়।

অনিল বাগচী সুরারোপিত এ ছবির ভক্তিরসাশ্রিত গানগুলিতে কন্ঠদান করেছেন মান্না দে, সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়, ধনঞ্জয় ভট্টাচার্য, মানবেন্দ্র মুখোপাধ্যায় ও অলোক বাগচী।

প্রধান চরিত্রের শিল্পীবৃন্দ : কমল মিত্র অসিতবরণ, অজিত বন্দ্যোপাধ্যায়, কালীপদ চক্রবর্তী, আনন্দ মুখোপাধ্যায়, মণি শ্রীমানী, অমরেশ দাস পদ্মা দেবী, সীমা জানা, নবাগতা রূপা, এবং দ্বিজু ভাওয়াল, নমিতা বিশ্বাস ও গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, নৃত্যাংশে দেবপ্রিয়া (মাদ্রাজ)

বিশ্ব-পরিবেশক : এ্যালায়েড ফিল্ম ডিস্ট্রিবিউটার্স।

মহাপূজার আকর্ষণ খুঁজে বেড়াই

অনিল দত্তের যুগযন্ত্রণা ও যুগচেতনার ছবি **খুঁজে বেড়াই** শুক্রবার ২৪ সেপ্টেম্বর রূপবাণী, অরুণা, ভারতী, পদ্মশ্রী ও শহরতলীর অন্যান্য ১২টি চিত্রগৃহে মুক্তিলাভ করবে। শ্রীমতী গীতালি দত্ত প্রযোজিত গীতালি পিকচার্সের এই অসাধারণ ছবিটি কেবলমাত্র প্রাপ্তবয়স্কদের জন্য সেন্সরের ছাড়পত্র পেয়েছে। ছবিটির কাহিনী, চিত্রনাট্য ও সংলাপ রচনা করেছেন—পরিচালক শ্রীদত্ত স্বয়ং। রবীন চট্টোপাধ্যায় ছবিটির সুরকার। চিত্রগ্রহণ ও সম্পাদনায় আছেন যথাক্রমে : বিজয় ঘোষ এবং অমিয় মুখোপাধ্যায়। চরিত্র চিত্রণে আছেন—সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়, অপর্ণা সেন, অনিল চট্টোপাধ্যায় বিকাশ রায়, উৎপল দত্ত, শোভা সেন, জহর বন্দ্যোপাধ্যায়, দিলীপ

রায়, অমরনাথ মুখোপাধ্যায়, আনন্দ মুখোপাধ্যায়, এন বিশ্বনাথন, সুনীলেশ ভট্টাচার্য প্রভৃতি।

এস বি ফিল্মস ছবিটির পরিবেশক।

এপার ওপার

অরুণ রায়চৌধুরী প্রযোজিত ও পরিবেশিত সমরেশ বসুর—**এপার ওপার** ছবির চিত্রগ্রহণ কাজ বর্তমানে স্টুডিওর বাইরে কলকাতার বিভিন্ন এলাকায় গৃহীত হচ্ছে। ছবিখানি পরিচালনা করছেন : আশুতোষ বন্দ্যোপাধ্যায়। বিভিন্ন চরিত্রে এখন পর্যন্ত যাঁদের অংশ গ্রহণ করতে দেখা গেছে তাঁরা হলেন : সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়, অপর্ণা সেন, দিলীপ রায়, সুমিত্রা মুখোপাধ্যায়, শ্যামল ঘোষাল, অজিত বন্দ্যোপাধ্যায়, পদ্মাদেবী, সমিতা বিশ্বাস, নির্মল ঘোষ, শম্ভু ভট্টাচার্য, দিলীপ বসু প্রভৃতি। এন এ ফিল্মস ছবিটির পরিবেশক।

'ফাঁকি' ছবির আউটডোর

তরুণ সাংবাদিক চিত্রপরিচালক রুণু চক্রবর্তী তার দলবল নিয়ে বোঁয়ো খালি ও তমলুক অঞ্চলে রবীন্দ্রনাথের কবিতা অবলম্বনে 'ফাঁকি' ছবির কিছু বহির্দৃশ্য গ্রহণ করেছেন গেল ১১ থেকে ২৪ আগস্ট পর্যন্ত। এ পর্যায়ের শিল্পীদের মধ্যে ছিলেন জয়শ্রী রায়, সুবোধ দাশ, কল্যাণ চট্টোঃ, সূর্য পাত্র, শ্যাম লাহা, অজন্তা দেবী, অণু দত্ত, ও মাঃ অশোক, অমিত এবং বেবী, আলপনা। সঙ্গীত পরিচালনা করছেন বিলায়েৎ খাঁ। চিত্রগ্রহণ করছেন বিমান সিনহা। রূপসজ্জা দুর্গা চট্টোঃ। রুণু ফিল্মস-এর পতাকাতলে গৃহীত এ ছবির চিত্রনাট্য ও সংলাপ রচনা করেছেন পরিচালক নিজেই।

স্বরবর্ণ ব্যঞ্জনবর্ণ

চিত্রপরিচালক পীযূষ বসু সম্প্রতি 'স্বরবর্ণ ব্যঞ্জনবর্ণ' উপন্যাসটিকে চলচ্চিত্রে রূপায়িত করার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। শ্রীবসু পরিচালিত নির্মীয়মান ছবি জীবন জিজ্ঞাসা'র কাজ প্রায় শেষ হয়ে এসেছে। এর পরেই তিনি 'স্বরবর্ণ ব্যঞ্জনবর্ণ'-এর চিত্রনাট্য রচনায় হাত দিচ্ছেন।

সমসাময়িক অস্থির সমাজজীবনের পটভূমিকায় সদ্য প্রকাশিত 'স্বরবর্ণ ব্যঞ্জনবর্ণ' উপন্যাসটি লিখেছেন তরুণ কাহিনীকার ও সাংবাদিক শ্রীরণেন মোদক।

'সবুজ নক্ষত্র' : সম্প্রতি পরিচালক সুব্রত সেন সাহিত্যিক সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজের 'সবুজ নক্ষত্র' উপন্যাসটি নিয়ে একটি ছবি করবেন বলে স্থির করেছেন। প্রাথমিক কাজ ইতিমধ্যেই সারা হয়ে গেছে। আজকের দিনের উন্মার্গগামী এক শিক্ষিত তরুণের একটি ট্রাজিক ঘটনার মধ্য দিয়ে মহত্তর জীবনসত্যে উত্তীর্ণ হবার কাহিনীই এই ছবির বিষয়বস্তু। ছবিটির প্রযোজনা [illegible] শিকচর্চা।

মঞ্চাভিনয়

নিউ গণেশ অপেরার 'সাধক বামাখ্যাপা'

সমাজ জীবনের জটিল সমস্যা ও বিশ্লেষণমূলক জীবনজিজ্ঞাসা নিয়ে অথবা দেশের বা বিদেশের স্বাধীনতা আন্দোলন কিংবা বিশেষ বিশেষ রাজনৈতিক আলোড়নের ইতিহাসকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠা আজকের পালাগান যেমন এক নতুনতর বৈশিষ্ট্যকে উজ্জ্বলভাবে মূর্ত করে তুলেছে; তেমনি আবার আমাদের দেশের ধর্মচিন্তা এবং কিছু কিছু ধার্মিক ও সাধকের বাস্তব ও অলৌকিক জীবনকেও আন্তরিকতায় পরিস্ফুট করে তুলছে। এ ধরণের একটি প্রয়াসের নিখুঁত রূপায়ণ হয়েছে সম্প্রতি নিউ গণেশ অপেরা প্রযোজিত সাধক বামাখ্যাপা। মিনার্ভায় পরিবেশিত এই পালাগানটি সামগ্রিকভাবে আমাদের মন স্পর্শ করতে পেরেছে।

তারাপীঠের কাহিনী অবলম্বন করে গড়ে উঠেছে সাধক বামাখ্যাপার সংঘাত। বামা কি করে শেষ পর্যন্ত তারাদেবীর দেখা পেলো, তাকে কেন্দ্র করেই এই পালাগানের সংলাপ, সংঘাত আর সুর দ্যুতিময় হয়ে উঠেছে। প্রযোজনার দিক থেকে আঙ্গিকগত কিছু স্বাতন্ত্র না থাকলেও, শিল্পীদের আন্তরিকতায় ভরা এই প্রয়াসটি সত্যি অভিনন্দনযোগ্য।

এই ভক্তিমূলক নাটকটিকে প্রাণময় করে তুলতে যে কজন শিল্পীর প্রতিভার প্রোজ্জ্বলতা সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে, তার মধ্যে প্রথমেই নাম করতে হয় বামাখ্যাপার রূপদাতা গোপাল চট্টোপাধ্যায়ের। সত্যি কি আন্তরিকতা আর দরদ দিয়ে তিনি চরিত্রটিকে ফুটিয়ে তুলেছেন। শ্রীচট্টোপাধ্যায় যে একজন প্রথম শ্রেণীর অভিনেতা আর একবার নতুন করে এই চরিত্রাভিনয়ে তা প্রমাণিত হোল বলে মনে হয়। মিতা চট্টোপাধ্যায়ের তারাদেবী একটি মরমী চরিত্র সৃষ্টি, তাঁর গান আমাদের সমস্ত আবেগকে আপ্লুত করেছে। পালাগানের আসরে এমন মাধুর্যে ভরা সুমিষ্ট কণ্ঠ খুব কম শোনা যায়। আনন্দময়ের দুর্গাদাসও একটি স্বাভাবিক ও সংযত চরিত্র সৃষ্টি হোতে পেরেছে। অন্যান্য ভূমিকায় ছিলেন মোহিত বিশ্বাস (কৈলাসপতি), সুধীর অধিকারী (যোগদানন্দ), গোকুল দে (ভরত মৈত্র), মোহন চট্টোপাধ্যায় (সাধন), দাশরথী শেঠ (নগেন), নন্দদুলাল চট্টোপাধ্যায় (গদাই), অনিল দাস (সর্বেশ্বর), ইন্দ্র লাহিড়ী (উপেন), অজিত মুখার্জি, অরূপ ব্যানার্জি, প্রজাপতি পাত্র, আরতি দত্ত (অন্নদাসুন্দরী) রিক্তা সরকার (রাজকুমারী) বিথীকা বাগচী (মৃণালিনী)।

সুরসৃষ্টিতে ও আলোকসম্পাতে ছিলেন পঞ্চানন মিত্র ও ফাল্গুনী।

পুজোয় নান্দীকারের নতুন নাটক

আসছে মহাসপ্তমীতে রঙ্গনায় নান্দীকারের নিয়মিত অভিনয়ের এক বৎসর পূর্ণ হবে। সেই উপলক্ষে নান্দীকার গোষ্ঠী ঐদিন (২৬ সেপ্টেম্বর) তাঁদের নতুন নাটক মঞ্চস্থ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন।

নাটকটির নাম **হে সময় উত্তাল সময়**। অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায় রচিত এবং নির্দেশিত উক্ত নাটকটি মৌলিকতা ও সাম্প্রতিকতার দাবী নিয়ে নান্দীকার গোষ্ঠী প্রযোজনা করবেন।

বক্তব্য ও আঙ্গিক উভয় দিক থেকেই নাটকটির মৌলিকত্ব দর্শকদের আকর্ষণ করবে। অভিনয়ে অংশ গ্রহণ করবেন গোষ্ঠী শিল্পীরা।

*পুজোর সপ্তমীর (২৬ সেপ্টে) ও নবমীর (২৩ সেপ্টে) দিন **হে সময় উত্তাল সময়** ও ষষ্ঠী (২৫ সেপ্টে) ও অষ্টমীর (২৭ সেপ্টে) দিন হবে তিন পয়সার পালা।

নক্ষত্র-র নিয়মিত নাট্য-প্রয়াস : উত্তর কলকাতার প্রখ্যাত নাট্য সংস্থা নক্ষত্র **২রা** অকটোবর ৭১ শনিবার থেকে নিয়মিতভাবে প্রতি শনিবার থিয়েটার সেন্টার হলে একান্তরক্রমে মোহিত চট্টোপাধ্যায়ের ক্যাপটেন হুররা এবং নবেন্দু সেনের 'নয়ন কবীরের পালা' নাটক দুটি অভিনয় করার আয়োজন করেছে।

অবনীন্দ্রনাথ জন্মশতবর্ষ স্মরণে এঁদের শ্রদ্ধার্ঘ, পরশুরামের কাহিনী অবলম্বনে স্বয়ং অবনীন্দ্রনাথ কর্তৃক নাট্য রূপায়িত সংগীতবহুল অপেরাধর্মী নাটক লম্বকর্ণপালা-র প্রস্তুতিও সমাপ্ত প্রায়।

"চেনা অচেনার নতুন নাটক" : উত্তর কোলকাতার প্রখ্যাত নাট্য সংস্থা 'চেনা অচেনা' এবারের শারদ অর্ঘ্য হিসাবে অভিজিতের লেখা দুটি নতুন নাটক **অথঃ শিব পার্বতী কথা ও ঝরাফুলের মালা** আসছে ১১ অকটোবর সন্ধ্যে সাতটায় মুক্ত অঙ্গনে উপস্থাপিত করছেন। প্রয়োগ-প্রধান অসীম গুহের নেতৃত্বে চেনা অচেনার বিশিষ্ট শিল্পীবৃন্দ এতে অংশ নিচ্ছেন।

বিবিধ সংবাদ

ক্যালকাটা মিউজিক এন্ড আর্ট সেন্টারের ত্রয়োদশ বার্ষিক উৎসব অনুষ্ঠিত হয় গত ৭ সেপ্টেম্বর কাশী বিশ্বনাথ মঞ্চে। এদিনের অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন শঙ্করদাস বাগচী এবং প্রধান অতিথি ছিলেন ডঃ রমা চৌধুরী। একক সংগীত পরিবেশন করেন মণিদীপা দাস, কল্পনা সাহা রায়, দেবী দাস, রিনি সাহা, দীপ্তি রায়, সুপ্রিয়া দে ও শিবানী ঘোষ। নৃত্যের আসরে দক্ষতার পরিচয় দেন রেশমী চৌধুরী, সোমা নায়েক, বৈশালী রায়চৌধুরী, চুমকী চৌধুরী ও সঙ্গীতা দাস। গীটারে উল্লেখযোগ্য বীণা নায়েক, কল্যাণী রায়, মায়া রায় ও বাণী চট্টোপাধ্যায়।

পরিশেষে ছাত্রীরা অভিনয় করেন বীরেশ্বর বসু রচিত **পরীক্ষিতের ব্রহ্মশাপ**। নাট্য নির্দেশক পুলিনবিহারী চক্রবর্তী কয়েকটি মুহূর্তে রচনায় কল্পনা-শক্তির পরিচয় দিয়েছেন। শিল্পী দলের সংঘবদ্ধ অভিনয় উল্লেখযোগ্য। চরিত্র সৃষ্টিতে প্রতিভার স্বাক্ষর রাখতে পারেন মণিদীপা দাস, পদ্মসোনা সেনগুপ্ত, শম্পা পাল, দেবী দাস, কল্পনা সাহা রায়, আইভি পাল, রীণা রায়, কল্যাণী চট্টোপাধ্যায়, কাজল চক্রবর্তী, জয়া সাহা, আরতি চট্টোপাধ্যায়, মিতালী বসু ও আল্পনা মিত্র। পরিচালনার গুণে নাটকটি রসোত্তীর্ণ করে তোলেন পঞ্চানন মিত্র।

সারা বাংলা সঙ্গীত প্রতিযোগিতা

গত ৪ সেপ্টেম্বর শনিবার শিল্পী সংস্থা আয়োজিত সারা বাংলা সঙ্গীত প্রতিযোগিতার পুরস্কার বিতরণী উৎসব সোদপুর এইচ-বি-টাউন, টাউন হলে মহা-সমারোহের সহিত অনুষ্ঠিত হয়েছে। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন আর্যকুমার মুখোপাধ্যায়, প্রধান অতিথির পদ গ্রহণ করেন সঙ্গীতাচার্য জয়কৃষ্ণ সান্যাল মহাশয়। অনুষ্ঠানের প্রারম্ভে মনোজ্ঞ-দীক্ষান্ত ভাষণ প্রদান করেন জয়কৃষ্ণ সান্যাল মহাশয়।

এর পর পুরস্কার বিতরণী উৎসবে বিভিন্ন বিভাগে বিজয়ী প্রতিযোগীগণ পুরস্কার ও মানপত্র গ্রহণ করেন। অতঃপর সারারাত্রিব্যাপী শাস্ত্রীয় সঙ্গীত সম্মেলন আরম্ভ হয়। জয়কৃষ্ণ সান্যাল মহাশয় ধ্রুপদ ও ধামার পরিবেশন করিয়া সকলকে আনন্দিত করেন। এর পর সুভাষ চাকলাদার, মণীন্দ্রচন্দ্র দে, অসিত তপাদার, সুখময় মজুমদার, সুহাস মুখোপাধ্যায় খেয়াল ও ঠুংরী পরিবেশন করেন।

যন্ত্রসঙ্গীতের আসরে ভি. জি. যোগ মহাশয়ের ছাত্রী শ্রীমতী নিভা দাস বেহালায় শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের অপূর্ব স্বাক্ষর রাখেন। সেতারে দেবাশীষ বন্দ্যোপাধ্যায় ও রথীন মজুমদার সাধনশৈলিতা প্রকাশ করেন।

খেলাধুলা

দর্শক

বিশ্ব ক্রিকেট প্রতিযোগিতা

এ পর্যন্ত বিশ্ব পর্যায়ে ক্রিকেট প্রতিযোগিতার আসর বসেনি। অথচ ফুটবল, ভলিবল, বাস্কেটবল, টেবল টেনিস প্রভৃতি খেলার বিশ্ব প্রতিযোগিতা অনেক দিনের পুরনো। দীর্ঘ আলাপ-আলোচনার পর সম্প্রতি ইন্টার ন্যাশনাল ক্রিকেট কনফারেন্সে বিশ্ব ক্রিকেট প্রতিযোগিতায় প্রস্তাব গৃহীত হয়েছে। ফলে ক্রিকেট অনুরাগীদের দীর্ঘদিনের পুঞ্জীভূত বেদনার অনেকটা আজ লাঘব হল। ইংরেজদের গোঁড়ামিই এই বিলম্বের প্রধান কারণ। অস্ট্রেলিয়া, দক্ষিণ আফ্রিকা, নিউজিল্যান্ড, ওয়েস্ট ইন্ডিজ, ভারতবর্ষ এবং পরবর্তীকালে পাকিস্থানকে নিয়ে ইংলিশ ক্রিকেটের প্রতিভূ মেরীলিবন ক্রিকেট ক্লাব (সংক্ষেপে এম সি সি) যে গোষ্ঠী তৈরী করেছিল সেখানে এম সি সি ছিল একচ্ছত্র সম্রাট। ক্রিকেটের আইন সম্পর্কে এম সি সির ক্ষমতা ছিল সুপ্রীম কোর্টের সমান। অর্থাৎ তার উপরে কথা বলার অধিকার আর দেশগুলির ছিল না।

বর্তমানের রাজনৈতিক পটভূমিকায় আগের মত এম সি সির দোর্দণ্ড প্রতাপ নেই। সারা পৃথিবীর রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক আসরে ইংল্যান্ডের যেমন আজ পড়তি অবস্থা তেমনি আন্তর্জাতিক ক্রিকেট খেলার নিয়ন্ত্রণ ব্যাপারেও এম সি সির অবস্থা। যাক দীর্ঘদিন অপেক্ষার পর ক্রিকেট খেলা নিয়ে যে বিশ্ব প্রতিযোগিতার আসর বসছে ক্রিকেট অনুরাগীদের কাছে আজ তা নিঃসন্দেহে সরস আনন্দের খবর।

খবরে প্রকাশ, প্রস্তাবিত বিশ্ব ক্রিকেট কাপ প্রতিযোগিতায় ১৭টি দেশ চারটি গ্রুপে প্রথমে লীগ প্রথায় খেলবে। তারপর প্রতি গ্রুপের প্রথম এবং দ্বিতীয় স্থান অধিকারী দেশকে নিয়ে নক-আউট প্রথায় খেলা হবে। এই প্রতিযোগিতা চলবে দীর্ঘ চার বছর (১৯৭২—৭৫) প্রতিযোগিতার নক আউট প্রথায় খেলার আসর বসবে ইংল্যান্ডে, ১৯৭৫ সালে। লীগ পর্যায়ের প্রতিটি খেলার মেয়াদ তিনদিন এবং নক-আউট পর্যায়ের খেলা অর্থাৎ কোয়ার্টার ফাইনাল থেকে, ফাইনাল পর্যন্ত প্রতিটি খেলা পাঁচ দিন করে হবে।

লীগ পর্যায়ের তালিকায় যোগদানকারী ১৭টি দেশকে নীচের চারটি গ্রুপে ভাগ করা হয়েছে।

১নং গ্রুপঃ (১) ফিজি, (২) হংকং, (৩) নিউজিল্যান্ড এবং (৪) পাকিস্তান।

২নং গ্রুপ ঃ (১) অস্ট্রেলিয়া, (২) সিংহল, (৩) ভারতবর্ষ এবং (৪) মালয়েশিয়া

মিউনিখে আয়োজিত প্রাক-অলিম্পিক গেমসের ৩,০০০ মিটার ক্রশ কান্ট্রি দৌড়ে প্রথম স্থান অধিকারী কেনিয়ার বেন জিমচো (ডানদিকে)। এই দৌড় শেষ করতে তাঁর ৮ মিঃ ২৯-৬ সেকেন্ড সময় লাগে।

৩নং গ্রুপঃ (১) বারমুদা, (২) কানাডা, (৩) আমেরিকা এবং (৪) ওয়েস্ট ইন্ডিজ

৪নং গ্রুপঃ (১) ইংল্যান্ড, (২) হল্যান্ড, (৩) ডেনমার্ক, (৪) জিব্রাল্টার এবং (৫) পূর্ব আফ্রিকা

ইউরোপীয় বাস্কেটবল প্রতিযোগিতা

১৯৭১ সালের ইউরোপীয়ান বাস্কেট বল প্রতিযোগিতায় রাশিয়া প্রথম স্থান লাভ করেছে। এই নিয়ে রাশিয়া ১১ বার চ্যাম্পিয়ান হল।

চ্যানেল সাঁতারে নতুন রেকর্ড

হল্যান্ডের মহিলা সাঁতারু কোরি অ্যাবলেয়ার ১০ ঘণ্টা ৪০ মিনিট সময়ে ইংলিশ চ্যানেল (ইংল্যান্ডের উপকূল থেকে ফ্রান্সের উপকূল পর্যন্ত) অতিক্রম করে চ্যানেল সাঁতারে মেয়েদের পক্ষে নতুন রেকর্ড করেছেন। পূর্ব রেকর্ড (১৩ ঘণ্টা ৪০ মিনিট) ছিল আমেরিকার গ্রেটা এ্যান্ডারসনের। এখানে উল্লেখ্য পুরুষদের পক্ষে চ্যানেল সাঁতারে যে রেকর্ড আছে তার থেকে কোরি অ্যাবলেয়ার মাত্র ২০ মিনিট বেশী সময়ে ইংলিশ চ্যানেল অতিক্রম করেছেন।

অস্ট্রেলিয়া সফরে বিশ্ব ক্রিকেট দল

শেষ পর্যন্ত জনমতের চাপে অস্ট্রেলিয়ার ক্রিকেট কণ্ট্রোল বোর্ডের সভায় দক্ষিণ আফ্রিকান ক্রিকেট দলের ১৯৭১-৭২ সালের অস্ট্রেলিয়া সফর বাতিল হওয়াতে বোর্ডের সভারা বিভিন্ন দেশের খ্যাতনামা খেলোয়াড়পুষ্ট একটি বিশ্ব ক্রিকেট দলকে আমন্ত্রণ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। বোর্ডের চেয়ারম্যান স্যার ডোনাল্ড ব্র্যাডম্যানের ঘোষণায় জানা গেছে, এই বিশ্ব ক্রিকেট দলের অস্ট্রেলিয়া সফর আগামী নভেম্বর মাসে শুরু হয়ে ১৯৭২ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে শেষ হবে। অস্ট্রেলিয়ার সংবাদপত্রগুলির কাছ থেকে এই সফরের খরচ বাবদ মোট ৯০০০ স্টার্লিংয়ের প্রতিশ্রুতি পাওয়া

গেছে। সংবাদে প্রকাশ, ভারতবর্ষের সুনীল গাভাস্কার, দুই স্পিন বোলার ভেঙ্কটরাঘবন এবং চন্দ্রশেখরের এই বিশ্ব ক্রিকেট দলে স্থান পাওয়ার যথেষ্ট সম্ভাবনা আছে।

ফুটবল প্রসঙ্গ

পুজোর আগে কলকাতার প্রথম বিভাগের ফুটবল লীগ এবং আই এফ এ শীল্ড প্রতিযোগিতা শেষ হওয়ার কোনই সম্ভাবনা নেই। নানা কারণে দেরী হয়েছে—যেমন মারদেকা ফুটবল প্রতিযোগিতা, একনাগাড়ে বৃষ্টিপাত, খেলার মাঠে গঙ্গার বান, ভারতীয় ফুটবল দলের রাশিয়া সফর ইত্যাদি। প্রথম বিভাগের এখনও ৮টি খেলা বাকি। আগামী ১৩ই অকটোবর থেকে প্রথম বিভাগের ফুটবল লীগ খেলা পুনরায় আরম্ভ হবে। আই এফ এ শীল্ডের ফাইনাল খেলা নাকি নভেম্বর মাসের প্রথম সপ্তাহে হবে।

ওয়ার্ল্ড ইউনিভার্সিটি অ্যাথলেটিক্স

ওয়ার্ল্ড ইউনিভার্সিটি অ্যাথলেটিকস অনুষ্ঠানে রাশিয়া মোট ১১টি পদক (স্বর্ণ ৭ এবং ব্রোঞ্জ ৪) জয় করে পদক জয়ের চূড়ান্ত তালিকায় প্রথম স্থান লাভ করেছে। দ্বিতীয় স্থান পেয়েছে ইতালী—মোট পদক ৮টি (স্বর্ণ ৪, রৌপ্য ৩ এবং ব্রোঞ্জ ১)।

ভারতবর্ষের টেস্ট ক্রিকেট সিরিজের ফলাফল (১৯৩২—১৯৭১)

বিপক্ষে	মোট সিরিজ	জয়	পরাজয়	ড্র
ইংল্যান্ড	১১	২	৭	২
অস্ট্রেলিয়া	৬	০	৫	১
ওয়েস্ট ইণ্ডিজ	৬	১	৫	০
নিউজিল্যান্ড	৪	৩	০	১
পাকিস্তান	৩	১	০	২
মোট	৩০	৭	১৭	৬

ভারতবর্ষের টেস্ট খেলায় জয়

ইংল্যান্ডের বিপক্ষে—৪

১৯৫১-৫২: এক ইনিংস ও ৮ রানে মাদ্রাজ
১৯৬১-৬২: ১৮৭ রানে, কলকাতা
১২৮ রানে, মাদ্রাজ
১৯৭১: ৪ উইকেটে, ওভাল

নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে ৭

১৯৫৫-৫৬: এক ইনিংস ও ২৭ রানে, বোম্বাই
: এক ইনিংস ও ১০৯ রানে, মাদ্রাজ
১৯৬৪-৬৫: ৭ উইকেটে, দিল্লী
১৯৬৭-৬৮: ৫ উইকেটে, দুনেদিন
: ৮ উইকেটে, ওয়েলিংটন
: ২৭২ রানে, অকল্যান্ড
১৯৬৯-৭০: ৬০ রানে, বোম্বাই

অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে ৩

১৯৫৯-৬০: ১১৯ রানে, কানপুরে
১৯৬৪-৬৫: ২ উইকেটে, বোম্বাই
১৯৬৯-৭০: ৭ উইকেটে, দিল্লী

পাকিস্তানের বিপক্ষে ২

১৯৫২-৫৩: এক ইনিংস ও ৭০ রানে, দিল্লী
: ১০ উইকেটে, বোম্বাই

ওয়েস্ট ইণ্ডিজের বিপক্ষে ১

১৯৭০-৭১: ৭ উইকেটে, পোর্ট অব স্পেন (২য় টেস্ট)

আমেরিকান টেনিস প্রতিযোগিতা

১৯৭১ সালের আমেরিকান লন টেনিস প্রতিযোগিতায় পুরুষদের সিঙ্গলস খেতাব পেয়েছেন স্ট্যান স্মিথ এবং মহিলাদের সিঙ্গলস খেতাব জয়ী হয়েছেন শ্রীমতী বিলি

শ্রীমতী বিলি জিন কিং

জিন কিং। দুজনেই আমেরিকার খেলোয়াড়। এখানে উল্লেখ্য, একই বছরে আমেরিকান খেলোয়াড়রা পুরুষ এবং মহিলাদের সিঙ্গলস খেতাব পেয়েছিলেন ১৬ বছর আগে—১৯৫৫ সালে পুরুষদের সিঙ্গলসে টনি ট্রাবার্ট এবং মহিলাদের সিঙ্গলসে কুমারী ডরিস হার্ট। স্ট্যান স্মিথের পক্ষে এই প্রথম আমেরিকান সিঙ্গলস খেতাব জয়, অপরদিকে শ্রীমতী কিংয়ের পক্ষে দ্বিতীয়বার। শ্রীমতী কিং ১৯৬৭ সালের সিঙ্গলস ফাইনালে তাঁর ডাবলস খেলার দীর্ঘদিনের জুটি রোজমেরী ক্যাসলকে পরাজিত করে প্রথম আমেরিকান খেতাব জয়ী হন।

১৯৭১ সালের আমেরিকান লন টেনিস প্রতিযোগিতাকে 'শিরহীন বস্তু' বলা যায়; কারণ বিশ্ববিশ্রুত টেনিস খেলোয়াড়রা—যেমন রড লেভার, কেন রোজওয়াল, গত বছরের আমেরিকান সিঙ্গলস চ্যাম্পিয়ান এবং 'গ্র্যান্ড স্ল্যাম' খেতাব বিজয়িনী শ্রীমতী মার্গারেট কোর্ট (অস্ট্রেলিয়া), ১৯৭১ সালের উইম্বলেডন চ্যাম্পিয়ান কুমারী ইভোন গুলাগং (অস্ট্রেলিয়ার আদিবাসী) প্রভৃতি প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণ করেননি। তারপর পুরুষদের সিঙ্গলস খেলায় প্রথম রাউন্ডে চেক খেলোয়াড় কোডেসের কাছে ১৯৭১ সালের উইম্বলেডন চ্যাম্পিয়ান জন নিউকম্ব (অস্ট্রেলিয়া) অপ্রত্যাশিতভাবে হেরে যাওয়াতে স্ট্যান স্মিথের পক্ষে সিঙ্গলস খেতাব জয়ের পথ পরিষ্কার হয়ে যায়। স্ট্যান স্মিথ ১৯৭১ সালের উইম্বলেডন সিঙ্গলস ফাইনালে নিউকম্বের কাছে হেরেছিলেন।

প্রতিযোগিতার অন্যান্য বিভাগে খেতাব পেয়েছেন—পুরুষদের ডাবলসে জন নিউকম্ব (অস্ট্রেলিয়া) এবং রোজার টেলর (বৃটেন), মহিলাদের ডাবলসে রোজমেরী ক্যাসলস (আমেরিকা) এবং জুডি ডাল্টন (অস্ট্রেলিয়া) এবং মিকসড ডাবলসে শ্রীমতী বিলি জিন কিং (আমেরিকা) এবং ওয়েন ডেভিডসন (অস্ট্রেলিয়া)।

বিশ্ব কুস্তি প্রতিযোগিতা

সোফিয়াতে (বুলগেরিয়া) অনুষ্ঠিত বিশ্ব গ্রিকো-রোমান কুস্তি প্রতিযোগিতায় বুলগেরিয়া ৪৬ পয়েন্ট সংগ্রহের সূত্রে দলগত চ্যাম্পিয়ানশীপ লাভ করেছে। অপরদিকে রাশিয়া ৩১-৫ পয়েন্ট সংগ্রহ করে দ্বিতীয় স্থান পেয়েছে। এখানে উল্লেখ্য, রাশিয়া ১৯৫২ সাল থেকে বিশ্ব কুস্তি প্রতিযোগিতায় যে একটানা শীর্ষস্থান অধিকার করে ছিল তার অবসান হল।

চিঠিপত্র

'বাঘ' প্রসঙ্গে

১৭শ সংখ্যা 'অমৃত' পত্রিকায় জনাব মহম্মদ আবদুল হক মিঞা লিখিত 'বাঘ' নামক রচনাটি পাঠ করে যুগপৎ বিস্মিত এবং আনন্দিত হলাম। জনাব হক মিঞার 'বাঘ' গল্পটি প্রখ্যাত কথাশিল্পী প্রেমেন্দ্র মিত্র রচিত 'বাঘ' গল্পটির অনুকরণে এবং অনুসরণে রচিত। এই গল্পের মিত্রজী যে প্রেমেন্দ্র মিত্র তা পাঠকের জানা প্রয়োজন। গল্পের সঙ্গে এই নামেরই অন্য লেখকের গল্প থেকে অনুপ্রাণিত হয়ে সেই একই কাহিনীর জের টেনেছেন লেখক—তাঁর এই প্রচেষ্টার জন্য আনন্দিত বোধ করি, কিন্তু কোনোরূপ টীকা না দিয়েই গল্পটি এভাবে প্রকাশ করতে দেওয়া অশোভন মনে করি, তাই এই উৎসাহ দেখে বিস্মিত হয়েছি। প্রেমেন্দ্র মিত্রের 'বাঘ' গল্পটি তাঁর 'কদাচিৎ কখনো' গ্রন্থের ১৭ পৃষ্ঠায় সংযোজিত হয়েছে।

এণাক্ষী মুখোপাধ্যায়
কলিকাতা-৩৪।

সাহিত্যিক বর্ষপঞ্জী প্রসঙ্গে

সাহিত্যিক বর্ষপঞ্জী প্রসঙ্গে ২০শে শ্রাবণের অমৃত পত্রিকায় শ্রীযুক্ত অশোক কুণ্ডুর চিঠি পড়ে ভালো লাগল। বাংলা সাহিত্যে সাহিত্যিক বর্ষপঞ্জী জাতীয় একটি সৎ ও নিষ্ঠ গ্রন্থের প্রয়োজনীয়তা অনেকদিন থেকেই অনুভব করছিলুম। শ্রীযুক্ত অশোক কুণ্ডু ব্যক্তিগতভাবে সে দায়িত্ব গ্রহণ করায় এবং সম্প্রতি একটি গ্রন্থ প্রকাশ করে আমাদের অশেষ কৃতজ্ঞতাভাজন হলেন। কিন্তু কেবলমাত্র লেখকদের ঠিকানা, ছদ্মনামের তালিকা, সাহিত্যিকদের পুরস্কারের বিবরণ, তাঁদের জন্মমৃত্যুর তারিখ, তাঁদের জীবন ও জীবিকা, গ্রন্থ পরিচিতিই যথেষ্ট নয়, আমাদের অভিষ্ট আরো কিছু, অর্থাৎ গ্রন্থটিকে তথ্যনিষ্ঠ এবং প্রামাণিক করতে হলে শ্রীযুক্ত কুণ্ডুকে আরো শ্রম স্বীকার করতে হবে, আরো সচেতন হতে হবে। সাহিত্যিকদের দ্বারা পরিচালিত বিশিষ্ট পত্র-পত্রিকা ও সাহিত্য সংকলন, সাহিত্যিকদের দ্বারা পরিচালিত পুস্তক প্রকাশন প্রতিষ্ঠান, স্মরণীয় সাহিত্য সভা, উল্লেখযোগ্য বাংলা গ্রন্থের বিদেশী ভাষায় তর্জমা, হাল্‌ফিলের সাহিত্য সম্পর্কে সাম্প্রতিক লেখকদের ধারণা, স্বনামধন্য লেখকদের ফোটো ও স্বাক্ষর, পশ্চিমবাংলার বিভিন্ন জেলায় এবং ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে বাংলা সাহিত্য বিষয়ে তৎপরতা ইত্যাদি বিষয়ও বর্ষপঞ্জীটির অন্তর্ভুক্ত হলে তার গুরুত্ব বাড়বে এবং জনসমাদৃত হবে। বলা বাহুল্য, কাজটি সোজা নয় ততটা। অশোকবাবু তো অগ্রণী হয়েছেন আগেই, আমরা যারা সাহিত্যের বিভিন্ন শাখায় বিভিন্নভাবে নিজেদের নিয়োজিত রেখেছি, তাদেরও যথাসাধ্য সহযোগিতার প্রতিশ্রুতি নিয়ে তাঁর পাশে এসে দাঁড়াতে হবে, নইলে কাজটি অপূর্ণ থেকে যায়, তাঁর পরিশ্রম পন্ডশ্রমে পরিণত হতে বাধ্য। কাজটা তাঁর একার নয়, আমাদের সকলের। আমাদের সম্মিলিত সহযোগিতার উপর এই সৎ প্রচেষ্টার সার্থকতা নির্ভর করছে।

গ্রামবাংলায় তো বটেই, ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে এবং ভারতের বাইরেও অনেক বাঙালি লেখক ছড়িয়ে রয়েছেন। তাঁদের সঙ্গে প্রয়োজনীয় তথ্যাদির ব্যাপারে অবিলম্বে যোগাযোগ করবার জন্যেও শ্রীযুক্ত কুণ্ডুকে অনুরোধ জানাব।

শ্যামলকান্তি দাশ
মহিষাদল রাজ কলেজ
মেদিনীপুর

কাশ্মীর * শ্যামাপ্রসাদ * আবদুল্লা

অমৃতয় (১০ই ভাদ্র, ১৩৭৮) পুলকেশ দে সরকারের লেখা উপরোক্ত প্রবন্ধ ভালো লাগল। তাঁকে অভিনন্দন জানাই স্পষ্ট কথা বলার জন্যে। তবে একটা ভুল সংশোধন করার বিশেষ প্রয়োজন বোধ করছি। তিনি লিখেছেন : 'পণ্ডিত নেহরু নেই, তার বৃটিশ কূটনৈতিক পৃষ্ঠপোষক লর্ড মাউন্টব্যাটেন নেই। ভারতের তৎকালীন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ডাঃ কৈলাশনাথ কাটজু নেই।' তাঁর লেখা পড়ে মনে হতে পারে লর্ড মাউন্টব্যাটেনও মৃত, কিন্তু তা নয়, তিনি বেঁচে আছেন। টেলিভিশনে প্রোগ্রাম করেন। এবং ভারতকে তিনি শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করেন।

আবদুল্লা প্রসঙ্গে একটা সমান্তরাল ঘটনা ইতিহাসরসিক পাঠকের ভাল লাগতে পারে। শেখ আবদুল্লার প্রতি নেহেরুর মনে হয়ত কোন দুর্বলতা ছিল। তাই আবদুল্লার দোষ তাঁর নজরে পড়েনি। যা উপলব্ধি করেছিলেন শ্যামাপ্রসাদ।

নিজের কথা প্রমাণ করার জন্যে শ্যামাপ্রসাদকে জীবন দিতে হয়।

হিরন্ময় ভট্টাচার্য
এসেক্স, যুক্তরাজ্য।

ন্যাশনাল কো-অর্ডিনেশন কমিটি ফর বাংলাদেশ

'বাংলাদেশ'-এর শরণার্থী ও মুক্তিযোদ্ধাদের আরো সুষ্ঠুভাবে সেবা ও ও সহায়তা দেবার উদ্দেশ্যে 'ন্যাশনাল কো-অর্ডিনেশন কমিটি ফর বাংলাদেশ'-এর নেতাজী ভবন: ৩৮।২ এলগিন রোড, কলকাতা-২০, ফোন : ৪৭-০৪৯৩] তরফ থেকে শ্রীবীণা ভৌমিক এদেশের শুভানুধ্যায়ীদের কাছে অর্থ সাহায্যের জন্যে যে আবেদন করেছেন তাতে আমাদের পূর্ণ সহানুভূতি ও সমর্থন আছে। তাই আমরা আপনাদের সকলকে অনুরোধ করছি সেবা-সাহায্যের এই ডাকে সাড়া দিয়ে উদার হস্তে কমিটি ফান্ডে অর্থ সাহায্য করবার জন্যে।

—ডঃ রমা চৌধুরী
(উপাচার্য রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়)
— ডঃ আশা দেবী
(সম্পাদিকা, মহিলা)
—কানন দেবী
(মহিলা শিল্পীমহল)
—ইন্দিরা দেবী
(আকাশবাণী কলকাতা)
প্রমুখ

বেহুলার কাহিনী প্রসঙ্গে

'অমৃতে'র ১১ বর্ষ, ২য় খণ্ড, ১৭শ সংখ্যায় চিঠিপত্র বিভাগে শ্রীসুরেশচন্দ্র দেবনাথ (এলাহাবাদ) মহাশয়ের 'বেহুলা ও লক্ষ্মীন্দর' শীর্ষক চিঠি প্রসংগে আমি কিছু বক্তব্য রাখছি। আশাকরি সুরেশবাবুর কৌতূহল মেটাতে সক্ষম হবে। 'বেহুলা ও লক্ষ্মীন্দরে'র কাহিনীটি কবে ঘটেছিল এবং কোথায় ঘটেছিল এসম্পর্কে শ্রদ্ধেয় অধ্যাপক ডঃ প্রদ্যোৎকুমার মাইতি মহাশয় তাঁর গবেষণামূলক পুস্তক

'Historical studies in the cult of the Goddess Manasa — a socia-cultural study'

(প্রকাশক 'পুঁথি-পুস্তক', ৩৪, মোহনবাগান লেন, কলিকাতা—৪), পৃষ্ঠা—১৩১-১৬৮এ যথেষ্ট আলোকপাত করেছেন।

কাহিনীটির উদ্ভবকাল প্রসংগে সুরেশবাবু লিখেছেন 'খৃষ্টজন্মের পূর্বে এবং মহাভারতীয় যুগের পরে'। কিন্তু ঐতিহাসিকরা সুরেশবাবুর মতের সমর্থক নন (দ্রষ্টব্য)—পি কে মাইতি

'Historical studies in the cult of the Goddess Manasa'

পৃষ্ঠা ১৬৭)।

মনোরঞ্জন ভৌমিক
ছাত্র, প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগ, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়।

অমৃত পাবলিশার্স প্রাইভেট লিঃ-এর পক্ষে শ্রীসুপ্রিয় সরকার কর্তৃক পত্রিকা প্রেস, ১৪, আনন্দ চ্যাটার্জি লেন, কলিকাতা-৩ হইতে মুদ্রিত ও তৎকর্তৃক ১১।১, আনন্দ চ্যাটার্জি লেন, কলিকাতা—৩ হইতে প্রকাশিত।

নিয়মাবলী

বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

লেখকদের প্রতি

১। অমৃতে প্রকাশের জন্য প্রেরিত সমস্ত রচনার নকল রেখে পাঠাবেন। মনোনীত রচনার খবর দু-মাসের মধ্যে জানান হয়। অমনোনীত রচনা কোনক্রমেই ফেরৎ পাঠান সম্ভব নয়। লেখার সঙ্গে কোন ডাকটিকিট পাঠাবেন না।

২। প্রেরিত রচনা কাগজের এক পৃষ্ঠায় স্পষ্টাক্ষরে লিখিত হওয়া আবশ্যক। অস্পষ্ট ও দুর্বোধ্য হস্তাক্ষরে লেখা প্রকাশের জন্যে গৃহীত হয় না।

৩। রচনার সঙ্গে লেখকের নাম ও ঠিকানা না থাকলে 'অমৃতে' প্রকাশের জন্যে গৃহীত হয় না।

এজেন্টদের প্রতি

এজেন্সীর নিয়মাবলী এবং সে সম্পর্কিত অন্যান্য জ্ঞাতব্য তথ্য 'অমৃত' কার্যালয়ে পত্র দ্বারা জ্ঞাতব্য।

গ্রাহকদের প্রতি

১। গ্রাহকের ঠিকানা পরিবর্তনের জন্যে অন্ততঃ ১৫ দিন আগে 'অমৃত' কার্যালয়ে সংবাদ দেওয়া আবশ্যক।

২। ভি-পি-তে পত্রিকা পাঠানো হয় না। গ্রাহকের চাঁদা নিম্নলিখিত হারে মণিঅর্ডারযোগে 'অমৃত' কার্যালয়ে পাঠানো আবশ্যক।

চাঁদার হার

	কলিকাতা	মফঃস্বল
বার্ষিক	টাকা ২৫.০০	টাকা ৩০.০০
ষান্মাসিক	টাকা ১২.৫০	টাকা ১৫.৫০
ত্রৈমাসিক	টাকা ৬.২৫	টাকা ৮.০০

'অমৃত' কার্যালয়

১১/১ আনন্দ চ্যাটার্জি লেন,

কলিকাতা—৩

ফোন : ৫৫-৫২৩১ (১৪ লাইন)

১১শ বর্ষ
২য় খণ্ড

অমৃত

২২শ সংখ্যা
মূল্য
৫০ পয়সা

Friday, 8th October, 1971 শুক্রবার, ২১শে আশ্বিন, ১৩৭৮ **50 Paise**

সূচীপত্র

প্রচ্ছদ : শ্রীমলয়শঙ্কর দাশগুপ্ত

'এক নজরে'

জনহীন জার্মানী : সারা পৃথিবী যখন জনবিস্ফোরণের আতঙ্কে দিশাহারা, জার্মানীতে তখন জনসংখ্যার ক্রমহ্রাসমান বৃদ্ধির হার দুশ্চিন্তার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে, এবং এ ব্যাপারে উভয় জার্মানীরই সমান অবস্থা। তবে পূর্ব জার্মানীর পরিস্থিতি বেশী উদ্বেগজনক এবং তার জন্ম-মৃত্যুর বর্তমান হার যদি অপরিবর্তিত থাকে, তবে জনতত্ত্ববিদদের সুনিশ্চিত অভিমত, ২০০০ খৃস্টাব্দে পূর্ব জার্মানী সম্পূর্ণ জনহীন প্রান্তরে পরিণত হবে।

পশ্চিম জার্মানীর বর্তমান লোকসংখ্যা ছয় কোটি। পূর্বে অনুমান করা হয়েছিল, এই শতাব্দীর শেষে ঐ রাষ্ট্রের সংখ্যা হবে ৬ কোটি ৯৭ লক্ষ। কিন্তু পশ্চিম জার্মানীর জন্মহার যে দ্রুতগতিতে হ্রাস পাচ্ছে তা যদি পরে আরও হ্রাস না পায় তবে দু হাজার খৃস্টাব্দে সেখানকার লোকসংখ্যা দাঁড়াবে ৬ কোটি ২৭ লক্ষ। জনতত্ত্ববিদদের মতে, কোন রাষ্ট্রের জনসংখ্যা অপরিবর্তিত রাখতে হলে প্রতি ১০০ দম্পতির অন্তত ২১৮টি সন্তান ভূমিষ্ঠ হওয়া প্রয়োজন। কিন্তু পশ্চিম জার্মানীতে গত বছরেই প্রথম ঐ সংখ্যা ২০০-তে নেমে আসে। ১৯৬৪ সালে যে সংখ্যা ছিল ২৫৯, চার বছর পরে ১৯৬৮ সালে তা নেমে হয় ২৪২, পরের বছর তা আরও নেমে হয় ২২৪, এবং গত বছর তা জনসংখ্যা অপরিবর্তিত রাখার জন্য ন্যূনতম জন্মহার সংখ্যা থেকেও নীচে নেমে আসে। পশ্চিম জার্মানীর সরকারী হিসাবমতে ১৯৬৫ সালে সেদেশে ৩১,০০০ কম শিশু ভূমিষ্ঠ হয়েছে; ১৯৭০ সালে ৯৩,০০০ কম শিশু জন্মেছে এবং এ বছর লক্ষাধিক কম শিশু ভূমিষ্ঠ হবে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে। পশ্চিম জার্মানীর এই দ্রুত জন্মহার হ্রাসের কারণ হিসাবে বলা হয়েছে, সেদেশের প্রতি দুজন বিবাহিতা নারীর মধ্যে একজন জন্মনিরোধক বিভিন্ন ব্যবস্থা অবলম্বন করে থাকেন। তার ওপর আছে প্রতি বছর অন্তত দশ লক্ষ গর্ভপাতের ঘটনা। বিজ্ঞান ও জনস্বাস্থ্যের উন্নতির ফলে মানুষের আয়ু এখন পূর্বের তুলনায় অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে। তার সঙ্গে জন্মহার দ্রুত হ্রাস পাওয়ায় পশ্চিম জার্মানীর কর্মকর্তারা আশঙ্কা করছেন, অনতিবিলম্বে জার্মানী এক বৃদ্ধের জাতিতে পরিণত হবে।

পূর্ব জার্মানীর পরিস্থিতি আরও বেশী আশঙ্কাজনক এই কারণে যে সেখানে জন্মহার প্রতি হাজার লোকপিছু তিন-এ নেমে এসেছে, যা ইউরোপের হিসাবে সর্বনিম্ন হার। এ ব্যাপারে পূর্ব জার্মানীর বিশেষজ্ঞদের অভিমত, একটি দম্পতির কাছে সন্তানের চেয়ে মোটর গাড়ী বেশী আকর্ষণের বস্তু হওয়ায় অধিকাংশ দম্পতি যতদিন সম্ভব নিঃসন্তান থাকার চেষ্টা করছে। এ কারণে তাঁরা জার্মানীর যুবক-যুবতীদের মনে অপত্য স্নেহ জাগিয়ে তোলার উপর বেশী জোর দিতে বলেছেন। পূর্ব জার্মানীর সরকারও সন্তানবতীদের নানা সুযোগ-সুবিধা দিয়ে আরও বেশী সন্তানের জননী হওয়ার জন্য উৎসাহিত করছেন। কিন্তু এ ব্যাপারে কতটুকু কি সাড়া পাওয়া যাচ্ছে তা উপরের হিসাব থেকেই বোঝা যাবে।

পূর্ব ইউরোপের হাঙ্গেরী, চেকোশ্লোভাকিয়া, রুমানিয়া প্রভৃতি দেশগুলিতে এখন জন্মহার দ্রুত হ্রাসমান। বর্তমান যুবক-যুবতীদের বিলীয়মান অপত্যস্নেহ ও পার্থিব ভোগ-বিলাসের প্রতি অন্ধ আকর্ষণ এই অভাবিত সঙ্কটের কারণ বলে মনে করা হচ্ছে।

প্রাগৈতিহাসিক গণ-সহমরণ : যুগোশ্লাভিয়ার রাজধানী বেলগ্রেড থেকে আটচল্লিশ কিলোমিটার উত্তরে, সাভা নদীর তীরবর্তী গোমোলাভা নামক স্থানে লৌহযুগের সূচনাকালের একটি গণসমাধি আবিষ্কৃত হয়েছে। তাতে প্রথমে গত আগস্ট মাসে ১৫টি নারীর কঙ্কাল পাওয়া যায়। তারপর আরও উৎখনন চালিয়ে এ পর্যন্ত ৫০টিরও বেশী নারী কঙ্কালের সন্ধান মিলেছে। কিন্তু এক স্থানে এতগুলি নারী সমাহিত হওয়ার প্রকৃত কারণ প্রত্নতত্ত্ববিদরা উপলব্ধি করতে পারেন একটি পুরুষের কঙ্কালের সন্ধান লাভের পর। ঐ বিশাল সমাধিটির মধ্যস্থলে শায়িত ছিল পুরুষের কঙ্কালটি। ঐতিহাসিক ও প্রত্নতাত্ত্বিকরা অনুমান করছেন, ব্যক্তিটি হয়ত গোষ্ঠীপতি ছিল, এবং তার মৃত্যুর পর তার অর্ধশতাধিক স্ত্রীকে সহমরণে যেতে হয়। দক্ষিণ-পূর্ব ইউরোপে কোনকালে সহমরণ প্রথা প্রচলিত থাকার কোন প্রমাণ আজ পর্যন্ত মেলে নি। এই কারণেই পুরুষটির কঙ্কাল আবিষ্কৃত না হওয়া পর্যন্ত পুরাতত্ত্ববিদরা ঐ অর্ধশতাধিক নারীর একই কবরে সমাহিত থাকার কোন যুক্তিগ্রাহ্য কারণ খুঁজে পাচ্ছিলেন না।

পুরুত ছাড়া বিয়ে : পুরোহিতবিহীন বিবাহানুষ্ঠান যে আমাদের কাছে শিবহীন যজ্ঞের মতোই অর্থহীন অধর্মীয় অনুষ্ঠান বলে মনে হয়, তামিলনাড়ুর 'আত্মমর্যাদা' আন্দোলন দীর্ঘ সংগ্রামের শেষে প্রমাণ করেছে যে, সেটা একটা অবাঞ্ছিত সংস্কার ছাড়া কিছুই নয়। বৈদ্যুতিক আলোয় উজ্জ্বল সুসজ্জিত বিবাহ মন্ডপে আলপনা অঙ্কিত কাষ্ঠাসনে বসে সুবেশ বর সালঙ্করা বধূর পাণিগ্রহণ করবে আর মুহুর্মুহু উলুধ্বনি ও পুরোহিতের উদাত্ত কণ্ঠের বৈদিক মন্ত্রোচ্চারণে বিবাহবাসর মুখরিত হবে, অদূরে চলবে আমন্ত্রিত ব্যক্তিদের আপ্যায়নে রসাল ভোজ্যের অমেয় অপচয়—এমন না হলে বিবাহানুষ্ঠান সার্থক ও সম্পূর্ণাঙ্গ হল বলেই মনে হয় না আমাদের। কিন্তু ঐ আনন্দোচ্ছাসের অন্তরালে একটি মানুষের যে কী গভীর দীর্ঘশ্বাস লুকিয়ে থাকে তা জেনেও আমরা যেন জানতে চাই না। ধরে নিই, মেয়ের বাবা হওয়ার 'অপরাধে' ও সমাজে মর্যাদা নিয়ে বাস করার জন্য এ গুরুভার অসহনীয় হলেও বহন করতে হবে। তার জন্য যদি ভদ্রাসন বিক্রি হয় হক, ঋণের ভারে যদি মাথা নুয়ে পড়ে পড়ুক। কিন্তু তামিলনাড়ুতে 'আত্মমর্যাদা' আন্দোলনের প্রবক্তারা ঘোষণা করলেন, বিবাহানুষ্ঠানের কোন আড়ম্বর বা অপচয়ই অনিবার্য নয়। নরনারীর মিলন ও দম্পতির সুখময় ভবিষ্যৎ যদি বিবাহের উদ্দেশ্য হয় তবে সে মিলনবাসরে অঙ্গুরী বিনিময়ই যথেষ্ট অনুষ্ঠান এবং প্রবীণের উপদেশ ও প্রিয়জনের শুভেচ্ছাই সে মিলন মুহূর্তকে পূত পবিত্র করতে পারে। আর যে হিন্দুধর্মের শুরুতে কোন বর্ণবিভেদ ছিল না, তার ধর্মীয় অনুষ্ঠানে ব্রাহ্মণের বিশেষ অধিকার ও মর্যাদাই বা থাকবে কেন? বোধগম্য ভাষায় আপনজনের শুভকামনা বড় না একজন পেশাদার পুরোহিতের যন্ত্রবৎ মন্ত্রোচ্চারণ বড়?

দীর্ঘ চল্লিশ বছরের নিরলস প্রয়াসে 'আত্মমর্যাদা' আন্দোলন এখন তামিলনাড়ুর সমাজজীবনে সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েছে। সেখানে এখন হাজার-হাজার হিন্দু বিবাহ পুরোহিত ও বৈদিক মন্ত্রপাঠ ছাড়াই সম্পন্ন হচ্ছে। অনাড়ম্বর বিবাহ-বাসরের একমাত্র মাঙ্গলিক অনুষ্ঠান অঙ্গুরী বিনিময়, এবং তারপর প্রবীণদের উপদেশ ও আপনজনদের শুভাশীর্বাদ আধ ঘন্টার মধ্যেই অনুষ্ঠানের পরিসমাপ্তি। বঙ্গললনাদের হতভাগ্য পিতারা এমন সুদিনের মুখ কি কোনদিন দেখতে পাবেন?

৩০।৯।৭১ —প্রত্যক্ষদর্শী

সম্পাদকীয়

পুনরাগমনায় চ

গজে আগমন। নৌকায় গমন। আসতে জল, যেতেও জল। জল, জল, জল। চারিদিকে জল থৈথৈ—তার উপর নবমীর মধ্যাহ্ন থেকে বিজয়াদশমী এবং একাদশী জুড়ে প্রচন্ড আশ্বিনে ঝড়। এবার দেবীর আগমন এবং বিসর্জন দীর্ঘকাল স্মরণীয় হয়ে থাকবে। যেমন ১৯৪২-এর মহাঅষ্টমী ও মহানবমীর বিয়োগান্ত দিনগুলির বেদনাদায়ক স্মৃতি আজো অনেকের মনে সুস্পষ্ট হয়ে আছে। অশ্রুভরা এ বিজয়া। সব দিক থেকেই অশ্রুর স্রোত প্রবাহিত। আনন্দময়ীর আগমনে যে আনন্দের সূত্রপাত বিসর্জনে তার অবসান। বিজয়ার প্রভাতে দেবীকে আনুষ্ঠানিকভাবে বিসর্জনদানের সময় সজল নয়নে পুরোহিতের কণ্ঠে ধ্বনিত হয়—

"ওঁ গচ্ছ গচ্ছ পরং স্থানং যত্র দেবো মহেশ্বরঃ
সংবৎসর ব্যতীতে তু পুনরাগমনায় চ।"

মহেশ্বর সকাশে যাও, সেটি পরস্থান, আবার সংবৎসরান্তে আগমন করে আমাদের আনন্দবর্ধন কোরো, হে জননী এই প্রার্থনা।

বাঙালীর কাছে দেবী দুর্গা জননী ও কন্যাস্বরূপিণী। বিসর্জন তাই স্নেহময়ী কন্যার শ্বশুরালয়ে গমনের সমতুল, সেইজন্যই পরস্থান। মাত্র তিনটি দিনের অধিষ্ঠান, আর সেই তিনটি দিনকে কেন্দ্র করে চলে বাঙালীর আনন্দোৎসব। ভক্তের কাছে এই তিনটি পুণ্য দিবসের মূল্য অসীম। সারা বছরের দুর্বিসহ ক্লেশভার, দুঃখ জ্বালা বিস্মৃত হয়ে সকল শ্রেণীর মানুষই এ কদিন আনন্দসাগরে অবগাহন করেন।

জননী দুর্গা তাঁর সন্তানদের কিন্তু ত্যাগ করে যেতে পারেন না। তিনিই পরমা মায়া, পরমা বৈষ্ণবী, সর্বরূপিণী জগতের আধার স্বরূপিণী। সেই অখিল জগৎজননী প্রসন্ন হলে জগৎ প্রসন্ন হয়। তাঁর উপস্থিতি অজ্ঞানতায় আচ্ছন্ন মর্তের মানুষ উপলব্ধি করতে অক্ষম, তাই তাঁর মৃন্ময়ী মূর্তির সলিল সমাধিতে আমাদের অন্তর দুঃখ ও বেদনায় ভরে ওঠে। শক্তি আরাধনার অন্তর্নিহিত অর্থ শক্তির পুজারী বাঙালীর কাছে অজানা নয়। দেবীর এই বিসর্জন বাঙালীর মনে বেদনা সৃষ্টি করলেও, বাঙালীর অন্তরে দেবীর সাধনার ধারা নিরন্তর প্রবহমান।

শারদোৎসবের অপর নাম অকালবোধন। শ্রীরামচন্দ্র নাকি রাবণবধের জন্য অকালে দেবীর বোধন করেন এই ধারণা সাধারণে প্রচলিত। সারা ভারতে এই কালটি উৎসবের কাল।

উত্তর ভারতে দশেরা উৎসব, দশানন রাবণরাজাকে বধ করার সমগ্র বৃত্তান্ত পক্ষকাল ধরে এক বিচিত্র লোক-নাট্যের মাধ্যমে পরিবেশন করা হয় এবং দশেরা দিবসে রাক্ষসকুলতিলক রাবণের দশমুন্ডবিশিষ্ট বিরাট কুশপুত্তলিকা দাহ করা হয়। এই উৎসবটি রামলীলা নামে পরিচিত। পশ্চিম এবং দক্ষিণ ভারতে প্রচলিত আছে নবরাত্র উৎসব। এই উৎসবগুলির সমাপ্তির পর আত্মীয়স্বজন এমনকি অপরিচিতকেও অভিনন্দন জ্ঞাপনের রীতি আছে।

উপলক্ষ্য যাই হোক উৎসবের শুচিশুভ্র স্পর্শ অন্তরের কালিমাকে মুছে দেয়। হিংসা, দ্বেষ, জ্বালা সব কিছুরই একটা সাময়িক বিরতি ঘটে। বাংলাদেশে বিজয়াদশমী এক অতি আশ্চর্য দিন।

তিমিরবিদারী এক আশ্চর্য উজ্জ্বল দিনের অভ্যুদয়ে সকল অন্ধকার বিদূরিত হয়। অন্তরের অন্ধকারকে দূর করার এই ঐন্দ্রজালিক শক্তিকে অস্বীকার করা যায় না।

এই পুণ্য লগ্নে আমরা প্রার্থনা করি দেবীর শুভ আশীর্বাদ সকলের শিরে বর্ষিত হোক। পরিচিত, অপরিচিত, দূর এবং নিকটস্থ সকল মানুষের কল্যাণ হোক। সকলে সকলের মধ্যে মঙ্গল দর্শন করুন, রোগমুক্ত হোন, সুখী হোন। দুঃখের দুঃসহ জ্বালা থেকে মুক্তি হোক। আমাদের অসংখ্য শুভানুধ্যায়ীকে শুভেচ্ছা জানাই।

পটভূমি

একথা কোনো রকমেই অস্বীকার করা যাবে না যে, পশ্চিম বাংলা দিল্লীর কাছ থেকে তার প্রাপ্য পুরোপুরি পায়নি এবং এই ভঙ্গ বঙ্গের অনেক দুর্গতির জন্যেই কেন্দ্রীয় সরকারের নানা ভ্রান্ত নীতিই দায়ী। সেই সব নীতি কীভাবে পশ্চিম বাংলার স্বার্থকে ক্ষুণ্ণ করেছে তার কিছু কিছু আলোচনা এই বিভাগেই আগে করেছি। আজ এই রাজ্য সম্পর্কে দিল্লীর উদ্বেগ যে অনেক ক্ষেত্রে সেই সব নীতির পরিবর্তন ঘটাতে চলেছে সেটা অবশ্যই সুলক্ষণ। শ্রীমতী গান্ধীর সরকার যদি নিতান্তই রাজনৈতিক কারণে এই বিষয়ে উদ্যোগী হয়ে থাকেন তবে তার মধ্যেও দোষের কিছু দেখি না। কিন্তু আজ পশ্চিম বাংলার সমস্যার প্রতি মনোযোগ সহকারে নজর দিতে গিয়ে দিল্লীর নানা ত্রুটি-বিচ্যুতির সঙ্গে সঙ্গে আরো যে-সব বিষয় আবিষ্কৃত হচ্ছে তার গুরুত্বও কিন্তু মোটেই কম নয়।

এই রাজ্যের প্রশাসনের ভার যাঁদের ওপর ন্যস্ত তাঁদের দায়িত্বের কথাই বলছি। পশ্চিম বাংলার বৈষয়িক অবক্ষয়ের সবটুকুই কি দিল্লীর উপেক্ষা দিয়ে ব্যাখ্যা করা যায়? দিল্লীর কাছ থেকে হকের পাওনা আদায় করে নেওয়ার জন্যে রাইটার্স বিল্ডিংসে যাঁদের অবস্থান তাঁরা কতোটুকু চেষ্টা করেছেন? এবং যতোটুকু পাওয়া গেছে তার পুরো সদ্ব্যবহারও সব জায়গায় হয়েছে কী?

সেদিন কলকাতার এক সেমিনারে কেন্দ্রের জনৈক মন্ত্রী যে অভিযোগ করলেন তাকে চাঞ্চল্যকর বললে বাড়িয়ে বলা হয় না। অভিযোগটা ছিল কৃষির উন্নতির প্রয়াসের ব্যাপারে। খাদ্য ও কৃষি দপ্তরের রাষ্ট্রমন্ত্রী শ্রীএ পি সিন্ধে জানালেন যে, তিনি নিজে যে-জেলার লোক (মহারাষ্ট্রের আমেদনগর) সেই জেলায় চাষের জন্যে বছরে ২২ কোটি টাকা ঋণ বন্টন করা হয় চাষীদের মধ্যে। আর গোটা পশ্চিম বাংলায় এই বাবদ প্রদত্ত ঋণের পরিমাণ মাত্র দশ কোটি টাকা। চাষের কাজে ঋণ দেওয়ার জন্যে কেন্দ্রীয় সরকারের একটি সংস্থা আছে যার নাম এগ্রিকালচারাল রিফিনান্স কর্পোরেশন। ঐ কর্পোরেশন থেকে তামিলনাড়ু, উত্তরপ্রদেশ, মহীশূর এবং অন্ধ্র প্রদেশ ঋণ নিয়েছে ৩০ থেকে ৪০ কোটি টাকা, আর সেই জায়গায় পশ্চিম বাংলা নিয়েছে মাত্র দুই কোটি টাকা। আরো যেটা পরিতাপের কথা, ঐ দুই কোটির মধ্যে আসলে খরচ হয়েছে মাত্র বারো হাজার টাকা!

খবরটা প্রথমে বিশ্বাসযোগ্য মনে হয় না, কিন্তু শ্রীসিন্ধে বাড়িয়ে বলেন নি। তবে এ-বিষয়ে আরো আলোচনার আগে এই কর্পোরেশন সম্বন্ধে দু-চার কথা বলে নিলে ভালো হয়। রিজার্ভ ব্যাংক, জীবন-বীমা কর্পোরেশন, বিভিন্ন সমবায় ব্যাংক, কমার্শিয়াল ব্যাংক প্রভৃতি এই কর্পোরেশনের অংশীদার। এই কর্পোরেশন যে সরাসরি চাষীদের ঋণ দেয় তা নয়। সমবায় ব্যাংক বা ল্যান্ড মর্টগেজ ব্যাংক চাষীদের যে ঋণ দেয় তার বড় অংশটাই ঐ সব ব্যাংক আবার ঋণ হিসেবে পায় রিফিনান্স কর্পোরেশনের কাছ থেকে।

বছর আষ্টেক হল এই কর্পোরেশন তৈরি হয়েছে। এই সময়ের মধ্যে কর্পোরেশন ৪৫৮টি কর্মসূচী রূপায়ণের জন্যে মোট ২৯৩ কোটি টাকা মঞ্জুর করেছে। যে-সব কর্মসূচীর জন্যে ঐ টাকা মঞ্জুর হয়েছে তার মধ্যে প্রধান হল ছোট আকারের সেচের কর্মসূচী। এই সব কর্মসূচী অনুযায়ী সারা দেশে ৬২ হাজারের বেশি নলকূপ এবং প্রায় ৫৩ হাজার কূপ খনন করা হয়েছে, তাছাড়া এক লাখ ১৩ হাজারের বেশি বিদ্যুৎচালিত পাম্প বসানোর ব্যবস্থা হয়েছে। এই কর্মসূচীর ফলে গোটা দেশে মোট ছ'লাখ ৮৩ হাজার একর এলাকায় বছরে দু'বার ফসল তোলার ব্যবস্থা করা গেছে। কিন্তু এই কর্মসূচীর ফলে লাভবান হয়েছে কোন কোন রাজ্য? নলকূপ খনন কর্মসূচীর লাভের ভাগ গিয়ে পড়েছে প্রধানত পাঞ্জাব, হরিয়ানা ও উত্তরপ্রদেশে এবং কূপ খনন কর্মসূচীতে লাভ হয়েছে অন্ধ্র, তামিলনাড়ু, গুজরাট, মহারাষ্ট্র, উত্তরপ্রদেশ ও মধ্যপ্রদেশের। না, পশ্চিম বাংলার নাম কোনো তালিকাতেই নেই। তা ছাড়া, রিফিনান্স কর্পোরেশনের পয়সায় প্রায় সোয়া সাত লাখ একর জমির উন্নতি সাধন করে সেখানে বড় সেচ প্রকল্প থেকে জল আনার ব্যবস্থা করা হয়েছে, কিন্তু এক্ষেত্রেও লাভবান হয়েছে প্রধানত বিহার ও মধ্যপ্রদেশ। তুলনামূলক হিসেবে দেখা যায় যে, পশ্চিম বাংলার জন্যেই এ পর্যন্ত সবচেয়ে কম কর্মসূচী মঞ্জুর হয়েছে (মাত্র ছ'টি)।

কেন এমন হল? সব ব্যাপারের মতো এক্ষেত্রেও দিল্লীর বৈষম্যমূলক নীতির প্রতি আঙুল দেখিয়েই চুপ করে বসে থাকা যেত, কিন্তু মুস্কিল এই যে, কৃষির উন্নতির দায়িত্বটা রাজ্য সরকারের। রাজ্য সরকারের কৃষি দপ্তরকেই উদ্যোগী হয়ে চাষীদের জন্যে ঋণের ব্যবস্থা করতে হবে, কোথা থেকে কীভাবে ঋণের টাকা জোগাড় করা যায় তা ভেবে দেখতে হবে, কর্মসূচী পেশ করতে হবে। পশ্চিম বাংলার কৃষি দপ্তর কি সেই দায়িত্ব পালন করেছেন?

এখন এই সব তথ্য ফাঁস হওয়ার পর রাইটার্স বিল্ডিংসের আমলারা একটা যুক্তি খাড়া করেছেন। এগ্রিকালচারাল রিফিনান্স কর্পোরেশনের ঋণ শুধু তারাই পায় যাদের অন্তত তিন থেকে পাঁচ একর পর্যন্ত চাষের জমি আছে। পশ্চিম বাংলায় যেহেতু সাধারণ চাষীর এই পরিমাণ জমি নেই, তাই অধিকাংশ চাষীই এই ঋণের ব্যবস্থার সুবিধে নিতে পারে নি। এ-কথা ঠিক যে, এই রাজ্যে জোতের পরিমাণ সাধারণত ছোট। কিন্তু এ-কথাও কি সত্যি নয় যে, মোট যতো জোত আছে তার মধ্যে বেশ একটা বড় অংশের আকারই তিন একরের ওপর? সেই সব জোতের মালিকেরা যাতে রিফিনান্স কর্পোরেশনের ঋণ পেতে পারে তার জন্যে আমাদের কৃষি দপ্তর কতোটা চেষ্টা করেছে? আর যেটুকু টাকা পাওয়াও গেছে তার একশ ভাগের এক ভাগও যে খরচ করা যায়নি, তার কৈফিয়ৎটাই বা কী?

•

রাইটার্স বিল্ডিংসের আমলারা আরো একটা অক্ষম যুক্তির আড়ালে আশ্রয় নিতে চাইছেন। তাঁরা বলতে চান, পশ্চিম বাংলার চাষীরা স্বল্পমেয়াদী ঋণ চায় যা দিয়ে তারা সার, বীজ প্রভৃতি কিনতে পারে। কিন্তু রিফিনান্স কর্পোরেশনের ঋণ প্রধানত দেওয়া হয় দীর্ঘমেয়াদী কাজের জন্যে (যেমন সেচ)। সেই জন্যেই ঐ কর্পোরেশনের টাকা এই রাজ্যে কাজে লাগানো যায়নি। কিন্তু এখানে কয়েকটি প্রশ্ন ওঠে। সার, বীজ প্রভৃতি কেনার জন্যে টাকা সব চাষীরই দরকার হয়, শুধু পশ্চিম বাংলার চাষীদের নয়। দ্বিতীয়ত, দীর্ঘমেয়াদী ঋণকে কাজে লাগাতে পারেন এমন চাষী কি এই রাজ্যে একেবারেই নেই? আর ছোট চাষীদের জন্যে ঋণ দিতে এগিয়ে এলেই কি রাজ্য সরকার দু'হাত তুলে সাহায্য করতে এগিয়ে আসতেন?

একটা সাম্প্রতিক ঘটনার কথা এখানে বলা যাক। একটি রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংক এই রাজ্যে ভাগচাষীদের ঋণ দেওয়া কাজ সম্প্রতি সুরু করেছে। এই কর্মসূচী অনুযায়ী সার, বীজ প্রভৃতি কেনার জন্যে ভাগচাষীদের ছ'-সাত শ' টাকা ঋণ দেওয়া হচ্ছে। কিন্তু সে জন্যে চাষীদের জমি [illegible]

কোনো সম্পত্তি বন্ধক রাখতে হচ্ছে না। ভাবী ফসল বন্ধক রেখেই তারা এই ঋণ পাচ্ছে। এই প্রশংসনীয় পরিকল্পনার উদ্দেশ্য মহাজনের কবল থেকে ভাগচাষীদের বাঁচানো। কিন্তু এই পরিকল্পনাটিও কতো দূর কার্যকর হবে সে-সম্বন্ধে সন্দেহ দেখা দিয়েছে। তার জন্যে কিন্তু চাষীদের কোনো দোষ নেই দোষটা শেষ পর্যন্ত রাইটার্স বিল্ডিংসের ওপরেই বর্তাতে বাধ্য। কারণ, এখন পর্যন্ত বর্গাদারের পুরো তালিকাই তৈরি হয়নি। অথচ সরকারী নথিপত্রে বর্গাদার হিসেবে নাম না-উঠলে ব্যাংকের ঋণ পাওয়ার অসুবিধে।

আসলে, কৃষি দপ্তর যাই বোঝাতে চান না কেন, এই রাজ্যের কৃষির অধোগতির জন্যে তাঁরা যে বিশেষভাবে দায়ী, একথা ঢাকা দেওয়ার চেষ্টা করে লাভ নেই। চাষবাসের যে-কোনো ব্যাপারের দিকেই তাকানো যাক না কেন, পশ্চিম বাংলা পড়ে রয়েছে অন্যান্য অনেক রাজ্যেরই নিচে। পর পর দু' বছর এই রাজ্যে সারা দেশের মধ্যে সবচেয়ে বেশি চাল উৎপন্ন হয়েছে বলে কৃষি দপ্তর নিশ্চয়ই নিজেদের পিঠ চাপড়াচ্ছেন, কিন্তু সেই হিসেব নিয়ে কি অপ্রিয় সত্যটা ঢাকা যাবে যে, এখানে বিঘা প্রতি ধানের ফলন অন্যান্য অনেক রাজ্যের চেয়েই কম? ১৯৫২ থেকে ১৯৬২ সালের একটি হিসেবে দেখা যায়, পশ্চিম বাংলায় চালের ফলন বেড়েছে শতকরা এক ভাগের তিন ভাগ মাত্র, অথচ সেখানে পাঞ্জাবে বেড়েছে শতকরা প্রায় পৌনে দু'ভাগ হারে এবং গোটা দেশের গড়পড়তা হার শতকরা প্রায় দেড় ভাগ। অন্যান্য ফসলের ক্ষেত্রেও অবস্থা প্রায় তথৈবচ। ১৯৬২ সালের পরও এ অবস্থার লক্ষণীয় তারতম্য ঘটেছে তা নয়। একটি হিসেবে তো দেখা যাচ্ছে, প্রথম ও দ্বিতীয় পাঁচসালা পরিকল্পনার আমলে পশ্চিম বাংলায় কৃষিতে মাথাপিছু উৎপাদন কমে গেছে, অথচ অন্যান্য অনেক রাজ্যে তা বেশ বেড়েছে। কৃষি উৎপাদন বাড়বেই বা কী করে? ফলন বৃদ্ধির চেষ্টার একটা বড় প্রমাণ জমিতে চাষের ব্যবহার। এক্ষেত্রেও পশ্চিম বাংলা বেশ পিছিয়ে আছে। তামিলনাড়ু, পাঞ্জাব বা অন্ধ্র প্রদেশ তো বটেই, এমন কি কেরলও তাকে এই ব্যাপারে পিছনে ফেলে এগিয়ে গেছে।

•

পশ্চিম বাংলায় চাষবাসের এই হাঁড়ির হাল কিন্তু রাজ্য সরকারের অক্ষমতার জন্যেই। দেশভাগের পর থেকে এই রাজ্যে খাদ্য সংকটের কথা সুবিদিত, কিন্তু তবু খাদ্যোৎপাদনের দিকে কখনোই তেমন নজর দেওয়া হয়নি। ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়ের আমলে শিল্প ও অন্যান্য ক্ষেত্রে কিছু কিছু দূরপ্রসারী প্রকল্পের কাজ সুরু হয়েছিল, কিন্তু কৃষি ছিল উপেক্ষিত। ডাঃ রায় নাকি বলতেন, তিনি চাষবাসের কিছু বোঝেন-না। কিন্তু তাঁর মন্ত্রিসভার কেউই এ-সব বুঝতেন না তা সত্য নয়। এমন কি, গাঁয়ের মানুষ প্রফুল্লচন্দ্র সেন যখন ডাঃ রায়ের স্থলাভিষিক্ত হলেন তখনও তেমন কোনো পরিবর্তন দেখা গেল না।

প্রথম পাঁচসালা পরিকল্পনায় কৃষি উৎপাদন খাতে বরাদ্দ করা হয়েছিল মোট লগ্নীর শতকরা মাত্র সাড়ে চার ভাগ। সেটাই যথেষ্ট লজ্জার ব্যাপার, কিন্তু দ্বিতীয় পাঁচসালা পরিকল্পনায় ঐ পরিমাণ আরো কমে গিয়ে দাঁড়াল শতকরা সাড়ে তিন ভাগেরও কম। তৃতীয় পরিকল্পনাতে অবশ্য এই পরিমাণ কিছু বাড়ল (শতকরা প্রায় ৮ ভাগ), কিন্তু সেটাও প্রয়োজনের তুলনায় যথেষ্ট নয়। আরো যেটা পরিতাপের কথা, কৃষি খাতে যতোটুকু টাকাও বরাদ্দ হয়েছে তার পুরোটা কোনোবারেই খরচ হয়নি। অর্থাৎ, দেখা যাচ্ছে বরাদ্দ টাকা খরচ না-করতে পারার ব্যাপারে আমাদের কৃষি দপ্তরের ঐতিহ্য বেশ পুরোনো।

এখন চাষবাসের প্রতি এই উপেক্ষার ফল কী হয়েছে? প্রথমতঃ সাধারণ চাষীদের অবস্থার উন্নতি হয়নি। ফলে গ্রামাঞ্চলে অসন্তোষ বেড়েছে। দ্বিতীয়তঃ রাজ্যের মধ্যে যে-পরিমাণ খাদ্যশস্য উৎপন্ন হয়েছে তা দিয়ে রাজ্যের চাহিদা মেটেনি। আর সেই ঘাটতি মেটাবার জন্যে বাইরে থেকে খাদ্যশস্য আমদানি করতে হয়েছে এবং সেই আমদানির পরিমাণ ক্রমশ বেড়েই চলেছে। প্রথম পাঁচসালা পরিকল্পনার আমলে যেখানে বছরে গড়পড়তা সাড়ে পাঁচ লাখ টন খাদ্যশস্য আমদানি করতে হয়েছিল, দ্বিতীয় পরিকল্পনাকালে সেখানে ঐ পরিমাণ দাঁড়ায় বছরে সাড়ে সাত লাখ টনের বেশি। এইভাবে বাড়তে বাড়তে এখন বছরে প্রায় কুড়ি লাখ টন খাদ্যশস্য আমদানি করে এই রাজ্যের সাড়ে চার কোটি বাসিন্দার গ্রাসাচ্ছদনের ব্যবস্থা করতে হচ্ছে (অবশ্য সকলেই যে দু'বেলা পেট ভরে খেতে পাচ্ছে, তা নয়)। কিন্তু এই বিপুল পরিমাণ খাদ্যশস্য আমদানির পরেও রাজ্যের পুরো চাহিদা মেটানো যাচ্ছে না।

এই ঘাটতির ফলে সরবরাহ ঠিক মতো না-থাকায় শুধু যে দাম ক্রমশ চড়েছে তাই নয়, এর রাজনৈতিক প্রতিক্রিয়াও প্রায়শঃই দেখা দিয়েছে। ১৯৬৭ সাল থেকে এই রাজ্যে রাজনৈতিক অস্থিরতার সূচনা হয়েছে ঠিকই, কিন্তু সেই অস্থিরতার আসল সূচনা ১৯৬৬ সালে এবং রাজ্যব্যাপী খাদ্য আন্দোলনের মধ্যে দিয়েই তা চরমে ওঠে।

পশ্চিম বাংলার বৈষয়িক উন্নয়নের জন্যে এখন নতুন করে যে উদ্যোগ সুরু হয়েছে তাতে সমস্ত মনোযোগটাই গিয়ে পড়েছে শিল্পের উন্নতির দিকে। কিন্তু খাদ্যশস্য তথা চাষবাসের সমস্যার সমাধান না-করে যে কী করে এ রাজ্যের সর্বাঙ্গীণ উন্নয়ন সম্ভব তা বোঝা মুস্কিল।

১।১০।৭১ —দেবদত্ত

দেশে বিদেশে

নয়াদিল্লীর সম্মেলনে প্রতিনিধি হিসাবে যাঁরা উপস্থিত ছিলেন তাঁরা কেউ অবশ্য তাঁদের সরকারের হ'য়ে কথা বলার অধিকারী নন। সম্পূর্ণ বেসরকারী প্রতিনিধি হিসাবেই তাঁরা ঐ সম্মেলনে যোগ দিয়েছিলেন। কিন্তু এই প্রথম একটা আন্তর্জাতিক সমাবেশের মঞ্চ থেকে এমন সুস্পষ্টভাবে বাংলাদেশে পশ্চিম পাকিস্থানের নির্মম সামরিক তাণ্ডবের নিন্দা করা হল, বাঙলাদেশ সরকারকে স্বীকৃতি দেওয়ার জন্য এবং বাংলাদেশ সরকার যে লড়াই চালিয়ে যাচ্ছেন তাতে সামরিক সহায়তাসহ সর্বপ্রকার সাহায্য দেওয়ার জন্য আহ্বান জানান হল।

২৪টি দেশ থেকে সমবেত দেড়শতজন প্রতিনিধির এই সম্মেলনে যে প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়েছে তাতে বলা হয়েছে বাংলাদেশের জনগণ ও বর্তমান বাংলাদেশ সরকারের পক্ষে একটা গ্রহণযোগ্য রাজনৈতিক মীমাংসা করতেই হবে। প্রস্তাবে ঘোষণা করা হয় যে, বাংলাদেশের জনগণ যে রাজনৈতিক লড়াই চালিয়ে যাচ্ছে সেই লড়াইকে স্বাধীনতার জন্য জাতীয় সংগ্রাম হিসাবেই বিশ্ব-সমাজের গণ্য করা উচিত।

প্রস্তাবের মধ্যে আর একটি লক্ষণীয় বিষয় হল, এতে পৃথিবীর বিভিন্ন রাষ্ট্রের সরকারগুলির প্রতি এই বলে আবেদন জানান হয়েছে যে, পাকিস্থান সরকারকে তাঁরা যেন অস্ত্রশস্ত্র, যন্ত্রাংশ ও সামরিক সুযোগ সুবিধা দেওয়া বন্ধ করেন।

প্রস্তাবের আর একটি অংশে বাংলাদেশের সরকারকে আশু ও কার্যকর সাহায্য দেওয়ার কথা বলা হয়েছে। এই অংশে স্পষ্ট করেই বলা হয়েছে যে, কোন কোন দেশ ও কোন কোন ব্যক্তির পক্ষে এই সাহায্য দেওয়ার মানে হবে 'সামরিক সাহায্য' দেওয়া।

পাকিস্থানের বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্য বাংলাদেশের মানুষকে অস্ত্রশস্ত্র দেওয়ার এই প্রস্তাব নিয়ে সম্মেলনে কিছুটা বিতর্কের সৃষ্টি হয়েছিল। কোন কোন প্রতিনিধি এভাবে সামরিক সাহায্য দেওয়ার কথা স্পষ্টাস্পষ্টি উল্লেখের বিরোধী ছিলেন। এই সম্মেলনের প্রধান উদ্যোক্তা জয়প্রকাশ নারায়ণ নিজে গান্ধীবাদী এবং তাঁর আমন্ত্রণে সম্মেলনে বিদেশ থেকেও কয়েকজন গান্ধীবাদী নেতা যোগ দিয়েছিলেন। তাঁরা মনে করেন, এই সম্মেলন থেকে শুধু অহিংস কর্মপদ্ধতিরই নির্দেশ দেওয়া উচিত। কিন্তু জয়প্রকাশজী বলেন যে, এই সম্মেলন শুধু গান্ধীবাদীদের নয় এবং গান্ধীবাদীদের দ্বারা আহূতও হয়নি। উপরন্তু তিনি প্রস্তাব দেন যে, স্পেনের গৃহযুদ্ধের সময় গণতন্ত্রীদের হয়ে লড়াই করার জন্য যেমন আন্তর্জাতিক ব্রিগেড গঠন করা হয়েছিল এবারও তেমনি বাংলাদেশের জন্য একটি আন্তর্জাতিক স্বেচ্ছাসৈনিক বাহিনী গঠন করা হোক।

আন্তর্জাতিক ব্রিগেড গঠনের এই প্রস্তাব অবশ্য সম্মেলনে গৃহীত হয়নি। অন্যদিকে, সম্মেলনের কিছু প্রতিনিধি একটি অহিংস কর্মপন্থা গ্রহণের সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেও পরে সেটা বাতিল করে দেন। এঁরা ঘোষণা করেছিলেন যে, এঁরা আনুষ্ঠানিকভাবে বাংলাদেশ সরকারের অনুমতি নিয়ে পশ্চিমবঙ্গ থেকে সীমান্ত অতিক্রম করে বাংলাদেশে প্রবেশ করবেন। এর ফলে বাংলাদেশ সরকারকে স্বীকৃতিদানের প্রশ্নটি 'গান্ধী-প্রদর্শিত পথে নাটকীয় আকার' দেওয়া যাবে বলে তাঁরা আশা করেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত এই কর্মসূচী পালন করা হয়নি। বলা হয় যে, এই কর্মসূচী অনুসরণ করলে ভারত সরকারকে বিড়ম্বনার মধ্যে ফেলতে হত, সেটা তাঁরা চান না বলেই তাঁদের সিদ্ধান্ত প্রত্যাহার করে নিলেন।

তিনদিন ব্যাপী এই সম্মেলনের মধ্য দিয়ে বাংলাদেশের সংগ্রামী মানুষদের সাহায্য করার কোন বাস্তব কর্মপদ্ধতি গড়ে তোলা যায়নি, একথা সত্য। কিন্তু আশা করা যাচ্ছে যে, এই সম্মেলনে সমবেত প্রতিনিধিরা নিজের নিজের দেশে ফিরে গিয়ে বাংলাদেশের মানুষের স্বাধীনতা সংগ্রামের কাহিনী বিশ্ব-জনমতের সামনে তুলে ধরে রাখবেন। ইয়াহিয়া খাঁর সরকার জোর গলায় প্রচার করছেন যে, পূর্ব বাংলায় অসামরিক গবর্ণরের নেতৃত্বে অসামরিক শাসন প্রবর্তন করা হয়েছে। তিনি বোঝাবার চেষ্টা করছেন যে, তাঁকে সময় দেওয়া হলে তিনি সবকিছু আবার স্বাভাবিক করে দেবেন। পৃথিবীর অন্যান্য বহু সমস্যা নিয়ে বিব্রত বিশ্ব-জনমতও বাংলাদেশ নামক আর একটা উৎকট সমস্যার কথা ভুলতে আগ্রহী হবে তাতে আশ্চর্যের কিছু নেই। এই অবসরে নয়াদিল্লীতে অনুষ্ঠিত সম্মেলন হয়ত বাংলাদেশ প্রশ্নটির উপর বিভিন্ন দেশের মানুষের দৃষ্টি আরও কিছুকাল ধরে রাখতে সাহায্য করতে পারে।

*

এই প্রথম কোন রাজ্যে শাসক কংগ্রেস দল সি-পি-আই সহ অন্যান্য দলের সঙ্গে মিলিত হয়ে কোয়ালিশন সরকার গঠন করল। এতদিন পর্যন্ত এই ধরণের কোয়ালিশন সরকারকে শাসক কংগ্রেস দল বাইরে থেকেই সমর্থন দিয়ে আসছিল।

কিন্তু গত প্রায় তিন মাস যাবং সি-পি আই কেরলের মন্ত্রিসভার ভিতরে কংগ্রেসকে টেনে আনার চেষ্টা করছে। বিধানসভায় যেসব দলের সমর্থনের উপর কেরলের মন্ত্রিসভা টিকে রয়েছে তাদের মধ্যে শাসক কংগ্রেস দলই সংখ্যায় সবচেয়ে ভারী। এই দলকে সরকারের বাইরে রেখে সি-পি-আই সহ যুক্তফ্রন্টের শরিক দলগুলি নিজেদের শাসনের স্থায়িত্ব সম্পর্কে নিশ্চিন্ত হতে পারছিল না। তাছাড়া, শাসক কংগ্রেস দলের যুব শাখা সম্প্রতি কেরলে নানা বিষয়ে আন্দোলন করে অচ্যুত মেননের সরকারকে বিব্রত করছিলেন। তাঁদের সংযত করার জন্যও যুক্তফ্রন্ট শাসক কংগ্রেস দলকে সরকারের ভিতর টেনে আনার প্রয়োজন অনুভব করছিল।

এর পর সম্প্রতি ভারতীয় কম্যুনিষ্ট পার্টির জাতীয় পরিষদ যখন শাসক কংগ্রেস দলের প্রগতিশীল অংশের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতর সম্পর্ক স্থাপনের প্রস্তাব গ্রহণ করল তখন থেকে কেরলে সি-পি-আই অধিকতর উৎসাহ নিয়ে শাসক কংগ্রেস দলকে সরকারের শরিক করার চেষ্টা করতে লাগল।

যদিও কেরল বিধানসভায় শাসক কংগ্রেস দলের তরফ থেকে মন্ত্রিসভায় যোগ দিতে কখনই বিশেষ আপত্তি ছিল না। তাহলেও তাদের যুব শাখা প্রথম থেকেই এই ব্যাপারে বাধা দিয়ে আসছিলেন। মন্ত্রিসভায় যোগদানের জন্য শাসক কংগ্রেসদল যুক্তফ্রন্টকে অনেকগুলি সর্ত দিল। প্রধান প্রধান সর্তগুলি হল, বর্ধিত মন্ত্রিসভার আয়তন তের-জনের বেশী হবে না এবং ঐ ১৩টির মধ্যে শাসক কংগ্রেস দলকে পাঁচটি আসন দিতে হবে, শাসক কংগ্রেস দল থেকে একজনকে উপ-মুখ্যমন্ত্রীর পদ দিতে হবে, স্বরাষ্ট্র, শিল্প ইত্যাদি গুরুত্বপূর্ণ দপ্তরগুলি শাসক কংগ্রেসকে ছেড়ে দিতে হবে ইত্যাদি। এই সব সর্ত নিয়ে দীর্ঘ আলোচনা চলছিল। যুক্তফ্রন্টের সামনে অসুবিধা দেখা দিল, ১৩ জনের মন্ত্রিসভায় শাসক কংগ্রেসকে পাঁচটি আসন দিতে হলে বর্তমান মন্ত্রীদের মধ্যে একজনকে বিদায় দিতে হয়। কোন দলকে তার মন্ত্রী সরিয়ে নিতে বলা হবে? এই অসুবিধা এড়াবার জন্য যুক্তফ্রন্ট প্রস্তাব দিল, ১৫ জনের মন্ত্রিসভা হোক এবং তার মধ্যে ছয়টি আসন শাসক কংগ্রেস নিক। কিন্তু শাসক-কংগ্রেস সেই প্রস্তাব সরাসরি অগ্রাহ্য করল।

শেষ পর্যন্ত সি-পি-আই সমস্যার সমাধান করে দিল। তারা বলল, তারা মুখ্যমন্ত্রী বাদে তাদের অন্য তিনজন মন্ত্রীকেই সরিয়ে নেবে এবং ঐ তিনজনের জায়গায় এম এন গোবিন্দম্ নায়ার ও টি ভি টমাসকে বসাবে। এই প্রস্তাব দিয়ে সি-পি-আই এক ঢিলে দুই পাখী মারল। একদিকে তারা শাসক কংগ্রেসের মন্ত্রিসভায় যোগ দেওয়ার পথ করে দিল, অন্যদিকে

তাদের দুজন প্রাক্তন মন্ত্রীকেও তারা রাজনৈতিক পুনর্বাসন দিল।

সি-পি-আই দলভুক্ত দুজন প্রাক্তন মন্ত্রী—এম এন গোবিন্দন নায়ার ও টি ভি টমাস—দুর্নীতির দায়ে অভিযুক্ত হয়েছিলেন এবং কেরলের প্রাক্তন নাম্বুদ্রিপাদ সরকারের আমলে ঐ অভিযোগ সম্পর্কে তদন্ত করার জন্য প্রাক্তন বিচারপতি আনন্দনারায়ণ মোল্লাকে নিয়ে একটি তদন্ত কমিশন গঠন করা হয়েছিল। এই কমিশনের রায়ের মেয়াদ মোট ১৪ বার বাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে এবং কমিশনের পিছনে বেশ কয়েক লক্ষ টাকা খরচ হয়ে গেছে। নতুন কোয়ালিশন সরকার গঠিত হওয়ার ঠিক প্রাক্কালেই এই কমিশনের রিপোর্ট পাওয়া গেল। কমিশন ঐ দুইজন কম্যুনিষ্ট নেতাকে সমস্ত অভিযোগ থেকে অব্যাহতি দিয়েছেন। বিচারপতি মোল্লা বলেছেন, এই ধরনের অসার অভিযোগ নিয়ে মাতামাতি করারই কোন দরকার ছিল-না। তিনি শ্রীনাম্বুদ্রিপাদের আচরণ সম্পর্কে কঠোর মন্তব্য করে বলেছেন শ্রীনাম্বুদ্রিপাদকে বারবার তলব করা সত্ত্বেও তিনি কমিশনের সামনে সাক্ষ্য দিতে আসেননি।

এটা তাৎপর্যপূর্ণ যে কেরলে যখন শাসক কংগ্রেসের সঙ্গে সি-পি-আই ও অন্যান্য দলের কোয়ালিশন সরকার গঠনের নতুন পরীক্ষা চলছে তখনই এই রাজ্যের এর্ণাকুলাম শহরে সি-পি-আইয়ের পার্টি কংগ্রেস অনুষ্ঠিত হচ্ছে। শাসক কংগ্রেসের প্রগতিশীল অংশের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ রাজনৈতিক সম্পর্ক স্থাপনের যে লাইন ভারতীয় কম্যুনিষ্ট পার্টি গ্রহণ করেছে সেটি অনুমোদনের জন্য এই পার্টি কংগ্রেসে উপস্থিত করা হবে।

•

মহারাষ্ট্রের ভিওয়াণ্ডিতে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা হয়ে গেছে যোল মাস আগে। এই ষোল মাস ধরে ঐ দাঙ্গার দায়িত্ব স্থানীয় কিছু মুসলমানের উপর চাপাবার চেষ্টা করে শেষ পর্যন্ত মহারাষ্ট্র সরকার যেভাবে হার মেনেছেন তার রাজনৈতিক প্রতিক্রিয়া খুবই গুরুতর হওয়ার সম্ভাবনা। ঘটনাটি হল এই রকম:—

গত বছর মে মাসে ভিওয়াণ্ডির দাঙ্গার পর যেসব স্থানীয় মুসলমানকে পুলিশ গ্রেপ্তার করেছিল দীর্ঘকাল তাদের বিরুদ্ধে কোন চার্জই দেওয়া হয়নি। এই নিয়ে হৈ-চৈ হওয়ার পর ভিওয়াণ্ডির আদালতে মোট ১২৩ জন মুসলমানের বিরুদ্ধে নয়টি পৃথক পৃথক মামলা দায়ের করা হয়। তাদের বিরুদ্ধে প্রধান অভিযোগ, তারা ঐ দাঙ্গা বাধাবার জন্য ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়েছিল। এরপর মুখ্যমন্ত্রী মামলার ভারপ্রাপ্ত সি আই ডি অফিসারদের আচরণ সম্পর্কে কিছু অভিযোগ পান। এই অভিযোগ সম্পর্কে তদন্ত করে মুখ্যমন্ত্রী নিঃসন্দেহ হন যে, অভিযোগগুলি মিথ্যা। তখন তিনি মামলা চালিয়ে যাওয়ার নির্দেশ দেন।

এদিকে তখন ঐ দাঙ্গা সম্পর্কে অনুসন্ধান করার জন্য বোম্বাই হাইকোর্টের বিচারপতি মদনের সভাপতিত্বে একটি তদন্ত কমিশন গঠিত হয়েছে। ভিওয়াণ্ডির আদালতে দাঙ্গার ষড়যন্ত্রের মামলার কথাটা যখন কমিশনের নজরে আসে তখন কমিশন পুলিশের কৌঁসুলীকে নির্দেশ দিলেন, 'ষড়যন্ত্রকারীদের নাম এবং তাদের বিরুদ্ধে অভিযোগের সমর্থনে সাক্ষ্য-প্রমাণ কমিশনের সামনে পেশ করা হোক।' দুই সপ্তাহ পরে সরকারী কৌঁসুলী ১৬ জন 'ষড়যন্ত্রকারী'দের নামের তালিকা দেন। আদালতে অভিযুক্ত ১২৩ জন মুসলমানের মধ্যে থেকেই এই ১৬টি নাম দেওয়া হয়। সরকারী কৌঁসুলী গত ৩০ জুলাই তারিখে তদন্ত কমিশনের সামনে ঐ ষোল-জনের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রের অভিযোগ আনেন। কিন্তু এই অভিযোগের সমর্থনে যখন সরকারী সাক্ষীদের দাঁড় করান হতে থাকে তখন সরকারী বক্তব্যে গুরুতর গলদ ধরা পড়ে। কতকগুলি গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার সরকারী নথিপত্রে তারিখের কারচুপিও ধরা পড়ে। তদন্ত কমিশন তলব করা সত্ত্বেও ভিওয়াণ্ডি থানার কেস ডায়েরির কপি সরকারের কাছ থেকে পাননি। অগত্যা, সরকারী কৌঁসুলী রাজ্য সরকারকে অভিযোগ প্রত্যাহার করার পরামর্শ দিলেন এবং তাঁর সেই পরামর্শমত মহারাষ্ট্র সরকার কমিশনের সামনে থেকে অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা বাধাবার পূর্ব পরিকল্পিত ষড়যন্ত্রের অভিযোগ প্রত্যাহার করে নেওয়ার অনুমতি চাইলেন। বিচারপতি মদন অবশ্য সেই অনুমতি দিলেন; কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে তিনি বললেন, 'পুলিশের সাক্ষীদের কথা সত্য হলে বুঝতে হবে, মিথ্যা অভিযোগে মানুষকে ফাঁসান হচ্ছে। এও যদি সম্ভব হয় তাহলে পুলিশের হাত থেকে নিরাপদ কে? এটা এখন আর রাজনৈতিক বা সাম্প্রদায়িক প্রশ্ন না, আসলে নাগরিকদের জীবন ও নিরাপত্তারই প্রশ্ন।'

•

ফরাসী রেডিওর মতে, কম্যুনিষ্ট চীনের উপরতলার নেতৃত্বের মধ্যে রদ-বদল হয়ে থাকতে পারে। অথবা হয়তো প্রেসিডেণ্ট নিকসনের পিকিং সফর আসন্ন। কিম্বা চেয়ারম্যান মাও অসুস্থ বা মৃত। আবার জাপানের সংবাদ হল, আমুর নদী অঞ্চলে চীন-সোভিয়েট সঙ্ঘর্ষের সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে।

কারণটা যে কি হতে পারে তা নিয়ে মতভেদ আছে; কিন্তু পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ এবিষয়ে একমত যে, কাল চীনের ভিতরে গুরুতর কিছু ঘটনা ঘটছে।

জল্পনা-কল্পনার সূত্রপাত হয় পিকিংয়েরই একটি ঘোষণা থেকে। ঐ ঘোষণায় বলা হয় যে, এবার ১ অকটোবর তারিখে চীনের জাতীয় দিবস উপলক্ষে পিকিংয়ে অন্যান্যবারের মতো কুচকাওয়াজ হবে না। জাতীয় দিবসের দুই সপ্তাহখানেক আগে এই ঘোষণা করা হয়। পিকিংস্থিত বিদেশী দূতাবাসের প্রতিনিধিরা যখন চীনা পররাষ্ট্র দপ্তরে ১ অকটোবরের, কুচকাওয়াজের জন্য আমন্ত্রণপত্র চান তখনই তাঁদের একথা জানান হয়।

জাতীয় দিবসের এই প্রথাগত কুচকাওয়াজ বন্ধ রাখার যে সরকারী কারণ পিকিং থেকে দেখান হয়েছে তাতে বলা হয়েছে যে, ব্যয়সংক্ষেপের জন্যই এবার এই কুচকাওয়াজ বন্ধ রাখা হয়েছে। তার বদলে চীনের জনসাধারণ উৎপাদন ও নির্মাণের ক্ষেত্রে বাস্তব উদ্যোগ গ্রহণ করে তাঁদের জাতীয় দিবস উদযাপন করবেন।

অন্যদিকে প্যারিসস্থিত চীনা দূতাবাসের মুখপাত্র বলেছেন, এই কুচকাওয়াজ বন্ধ রাখা 'সম্পূর্ণ স্বাভাবিক ঘটনা।' চীনের জাতীয় দিবস পালনের পদ্ধতি বদলাবার অভিপ্রায়ই এই সিদ্ধান্তের মধ্য দিয়ে সূচিত হচ্ছে।

পিকিং ও অন্যান্য স্থানে চীনের মুখপাত্ররা মাও সে তুংয়ের মৃত্যু অথবা অসুস্থতার সংবাদ দৃঢ়তার সঙ্গে অস্বীকার করেছেন।

কিন্তু এই সব কৈফিয়তের কোনটিই পাশ্চাত্যের দেশগুলির কাছে গ্রহণযোগ্য বলে মনে হয়নি। কেননা, ১ অক্টোবরের কুচকাওয়াজ বন্ধ রাখার সঙ্গে সঙ্গে চীনের ভিতর থেকে ভেসে আসা আরও কতকগুলি সংবাদ লক্ষ্য করা গেছে। যেমন, চীনে সামরিক বাহিনীর সমস্ত ছুটি বাতিল করা হয়েছে দেশের ভিতরে সামরিক ও অসামরিক বিমান চলাচল বন্ধ রাখা হয়েছে। চীনা বেতার থেকে মাও বাণী প্রচার বন্ধ করা হয়েছে। হৃদরোগ বিশেষজ্ঞ মার্কিন সার্জন ডাঃ পল ডাডলি হোয়াইট সম্প্রতি পিকিংয়ে গিয়েছিলেন। ইত্যাদি।

এই 'চীনা ধাঁধার' কোন নির্ভরযোগ্য উত্তর এখনও পাওয়া যায় নি। তবে, পশ্চিমের চীনা বিশেষজ্ঞরা মোটামুটি এ বিষয়ে একমত যে, কারণ যাই হোক না কেন, চীনে কোনরকম ক্ষমতার দ্বন্দ্ব চলছে।

চীনের ৭৮ বছর বয়স্ক নেতা মাও সে তুংয়ের নিজের নির্বাচিত উত্তরাধিকারী হচ্ছেন প্রতিরক্ষা মন্ত্রী লিন পিয়াও। কিন্তু লিন পিয়াও খুব সুস্থ বলে মনে হয় না। তাঁকে প্রকাশ্যে বেরোতে বিশেষ দেখা যায় না। তাছাড়া, চীনের সাংস্কৃতিক বিপ্লবের প্রবক্তাদের সঙ্গে (তাঁদের মধ্যে

চেয়ারম্যান মাওয়ের স্মৃতি অন্যতম। সৈন্যবাহিনীর ক্ষমতার স্পন্দন রয়েছে। ১ অক্টোবর তারিখে জাতীয় দিবসের কুচকাওয়াজে দেশের নেতারা উপস্থিত হলে এই ক্ষমতার স্পন্দন প্রকাশ পেয়ে যেত বলেই কি এই কুচকাওয়াজ বন্ধ রাখা হয়েছে?

আপাতত এবিষয়ে জল্পনা-কল্পনাই সার। কেননা সঠিক সংবাদ জানার উপায় নেই।

*

বারাণসীর নিকটবর্তী একটি গ্রামে চামারদের উপর বর্ণহিন্দুদের দলবদ্ধ আক্রমণ, খুন ও অগ্নিসংযোগের ঘটনা জানা গেছে।

বারাণসী থেকে ৩৫ কিলোমিটার পশ্চিমে বেহারা নামক এই গ্রামের চামাররা দীর্ঘকাল ধরে মরা গরু সরাবার কাজ করে এসেছেন। তাঁদের ঘরের মেয়েদের প্রথাগত বৃত্তি হচ্ছে দাইয়ের কাজ। গত ১২ সেপ্টেম্বর গ্রামবাসীরা স্থির করেন যে, তাঁদের পুরুষরা আর মরা গরু সরাবেন না এবং তাঁদের মেয়েরা আর দাইয়ের কাজ করবেন না। রামেশ্বর প্রসাদ নামে ঐ গ্রামের একজন শিক্ষিত চামার গ্রামবাসীদের সভায় বক্তৃতা দিয়ে বলেন যে, তাঁরা যেন এই 'নোংরা কাজ' করতে অস্বীকার করেন।

এই সংবাদ পাওয়ার পর পার্শ্ববর্তী একটি গ্রামের ঠাকুররা নাকি সংঘবদ্ধ হয়ে বেহারার অধিবাসীদের শাস্তি দেওয়ার সিদ্ধান্ত করে। আরো চামারেরা মরা গরু নিয়ে তারা একটি স্থানীয় কাপড়ের ফ্যাক্টরিতে থানা দেয়। সেখানে কিছু হরিজন যুবক কাজ করে। কিন্তু পাল্টা মারের ভয়ে ঠাকুররা সেদিনকার মতো সেখান থেকে হঠে আসে।

বর্ণহিন্দুরা নিজেরাই নিজেদের কয়েকটি ঘরে আগুন লাগিয়ে থানায় এজাহার দিতে আসে। থানার দারোগার সন্দেহ হলে তিনি অভিযোগকারীদের সংগে নিয়ে তদন্ত করতে যেতে চান। তখন অভিযোগকারীরা সেখান থেকে পালিয়ে যায়।

দুদিন বাদে অর্থাৎ ১৫ সেপ্টেম্বর প্রায় পাঁচ শত বর্ণহিন্দুর এক জনতা হরিজন বস্তীতে হামলা করে। তারা খড়ের চালে আগুন লাগিয়ে দেয়। হাঁড়ি-কলসী ভেঙ্গে দেওয়া হয়। এমনকি নারী ও শিশুদেরও প্রহার করা হয়। প্রহারের চোটে একজন মারা যান। নারী সহ ১৮ জন গুরুতরভাবে আহত হন।

একজন বৃদ্ধ হরিজন অভিযোগ করেছেন যে, তাঁরা দুদিন কিছুই খেতে পান নি, কেননা, গ্রামের দোকানগুলি থেকে তাঁদের কাছে জিনিস বিক্রি করা বন্ধ করে দেওয়া হয়েছিল।

এই ঘটনার পর জানা গেছে যে, বারাণসী জেলার বেহারা গ্রামের হরিজন দাস হরিজনরা আজও ভূমিদাসের জীবন যাপন করতে বাধ্য হচ্ছেন। বর্ণহিন্দুদের জমি চাষ করে তাঁরা দিনে মাত্র দেড় কিলো পাঁচ মিশালী খাদ্যশস্য অথবা এক কিলো গম এবং মাসে নগদ মাত্র আড়াই টাকা পান।

অত্যাচারিত হরিজনরা উত্তরপ্রদেশের সেচমন্ত্রী রামলক্ষণের কাছে তাঁদের কাহিনী বলেছেন। রামলক্ষণ নিজে একজন হরিজন। তাঁর কাছে হরিজনরা অভিযোগ করেছেন যে, বিধানসভার কোন বর্ণহিন্দু সদস্য ঘটনার পর তাঁদের দেখতে যাননি। তাঁদের আরও অভিযোগ এই যে, বর্ণহিন্দুদের আক্রমণাত্মক পরিকল্পনা সম্পর্কে আগে থেকে জানান সত্ত্বেও বারাণসী জেলা কর্তৃপক্ষ সতর্ক হন নি।

স্থানীয় গ্রাম সভাপতি সমেত যে ৫০ জনের বিরুদ্ধে থানায় এজাহার দেওয়া হয়েছে তাদের মধ্যে মাত্র ১১ জনকে পুলিশ এযাবৎ গ্রেপ্তার করতে পেরেছে।

●

একান্তভাবে হরিজনদের ব্যবহারের জন্য একটি নতুন রাস্তা তৈরি করা হয়েছে। আগে যে রাস্তাটি ছিল সেটি হরিজনদের ব্যবহার করতে দিতে বর্ণহিন্দুরা আপত্তি করেছিল।

১।১০।৭১ —পুণ্ডরীক

কাশীপুরের বাঘের আত্মহত্যা

গিরিজাপতি ভট্টাচার্য

আমার বসবার ঘরের চৌকিতে বিছানো কাশীপুরে শিকার করা বাঘের ছাল আমার অতিথি অভ্যাগতদের মুগ্ধদৃষ্টি ও কৌতুহল জাগায়। কোথায় কবে কী ভাবে বাঘ মেরেছিলাম জানতে চান তাঁরা। আমি সকলকে আমার বাঘ মারার গল্প বলি।

পশুচর্ম-সজ্জাকুশলী ভ্যান - ইনগেন, ভ্যান-ইনগেনের কাছ থেকে ক্রোম ধোলাই করা বাঘছালটি যেদিন ফিরে পেলাম—লাল বনাতের পাড় লাগানো, খাকি জিনের অস্তর দেওয়া হলদে জমিতে কালো আঁজি-কাটা মসৃন বাঘছাল, সেদিন পরম আনন্দে আমার প্রতিবেশী বন্ধু হিরণকুমারকে ডেকে পাঠালাম তা দেখতে। পশুপাখীর হালচাল সম্বন্ধে যেমন ওয়াকিবহাল তেমনি তিনি শিকার কাহিনী, শিকার সাহিত্য অনুরাগী। বেশ করে শিকারের গল্প জমানো যাবে।

হিরণকুমার ঘরে ঢুকে বাঘছালটি পর্যবেক্ষণ করে বললেন—এ যে দেখছি পেল্লায় বড়। এই কি সেই বাঘ যে আপনার গুলিতে আত্মহত্যা করেছিল? কোথায় যেন মেরেছিলেন—কাশীপুরে; তরাইয়ে। জিম করবেটের শিকারের আঞ্চলিক প্রদেশে?

আত্মহত্যাই বটে! দুর্ভেদ্য শরবনে ভরা নালার ভেতর থেকে হাতীর তাড়া খেয়ে যেভাবে নির্ভয়ে নালার পাড়ে উঠে এসে আমার মাচানের সামনে উপস্থিত হয়ে আমার গুলি চালাবার সুযোগ করে দিলো তাতে তাকে আত্মহত্যা ভিন্ন আর কী বলা চলে? অসংশয়ে শরবনের আড়াল ছেড়ে না এলে তাকে মারতে পারতাম কিনা সন্দেহ। কত না বার বাঘ শিকার করতে গিয়ে বিফল হয়েছি চতুর বাঘ গুলি করার সুযোগ না দেওয়ায়। গয়া, গরপাগুর্মোন্ডির জঙ্গলে, চাতরা, বোলাইগড়, বারবারা ও সুন্দরবনের অরণ্যে, তরাইয়ে,—আরও কত স্থানে। বাঘের চলেফেরার পথ সন্ধান করে টোপ বেঁধে আটার (hide) পেছনে ওৎ পেতে বসে বা গাছের ডালে মাচা বেঁধে বসে শিকারী বাঘকে পাল্লার ভেতর পাবার চেষ্টা করেন। নিজেকে নিভৃত রেখে নিঃশব্দে হেঁটে গিয়ে বাঘের,—নরখাদকের অনুসরণ করেছি। উদ্দেশ্য বাঘের অগোচরে বা তাকে আতঙ্কিত না করে তার নিকটস্থ হওয়া। এই সুযোগ লাভ হলে শিকারীর আগ্নেয়াস্ত্রের চোট থেকে বাঘের পরিত্রাণ সম্ভাবনা স্বল্পই। অবশ্য শিকারীর নিপুণতা থাকা চাই; কিন্তু সুযোগই হোলো প্রধান নিয়ন্ত্রক। সুযোগ হলে অনিপুণ শিকারীও সফলতা লাভ করেন। চতুর বাঘ যথাসম্ভব শিকারীকে এই সুযোগ লাভ থেকে বঞ্চিত করে।

কাশীপুরে সে সুযোগ আমি পেয়েছিলাম। বাঘটি ছিল উত্তীর্ণ যৌবন বিশাল আকৃতি, চাতুর্যে সুনিপুণ। অনেক লুকোচুরি খেলার পর সে ভুল করলো, ও আমি সে ভুলের চূড়ান্ত গুণাগার আদায় করলাম।

আমার শিকার অভিযান সফল হোলো সেখানকার এক শরবনে (elephant grass) ভরা নালায়।

এই শিকারের শেষাঙ্ক ছিল অতি মর্মন্তুদ, বিষাদময়। আমার মর্মের নিভৃতে তাকে এতোদিন একপাশে সরিয়ে রেখেছিলাম। এবার তা উন্মোচন করলাম।

হিরণকুমার জিগ্যেস করলেন, কোথায় বুলেট লেগেছিলো। চোখের কোলে বুলেট প্রবেশ করার জায়গাটা বার করে দেখালাম। কড়ে আঙুলের ডগার মত ছিদ্র:—ভ্যান-ইনগেন সেটা সেলাই করে দিয়েছেন। এখন দেখায় যেন মিহি কাজলের দাগ। চোখের কোল দিয়ে বুলেট ঢুকে মাথার ঘিলুকে ঘেঁটে ঘুঁটে বিনষ্ট করে দিয়েছিল। মৃত্যু ঘটে নিমেষে।

হিরণকুমারকে আগাগোড়া সমস্তটা বলে গেলাম।

শিকার দিনের মধ্যাহ্ন চলে গেলেও সে সময় তখনও তার সায়াহ্ন সমাগত হয়নি। বন্যপশু সংরক্ষণ সংকল্প সরকার কর্তৃক গৃহীত বা সাধারণের কাছে সম্যক উপস্থাপিত করা হয়নি। মামুলি ব্যবস্থায় প্রাদেশিক বনাঞ্চলের কিছুটা এলাকা সংরক্ষিত হোতো যেখানে শিকার করা চলতো বনবিভাগের হুকুমৎ নিয়ে। চল্লিশ দশকে কয়েকটি বন 'অভয় অরণ্যে' (Sanctuary) রূপান্তরিত করা হয়। কাশীপুরে শিকারের মাত্র এক বছর পূর্বে ভারত সরকার বন্য-পশু সংরক্ষণ সংস্থা—Wild Life Board প্রতিষ্ঠিত করেন। এদিকে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের অবসানে বন্দুক রাইফেলের ব্যাপক মঞ্জুরীতে, শিকারের দ্রুত প্রসার ও উন্মাদনায়, তাছাড়া বিশেষ করে, চাষের সম্প্রসারণ প্রচেষ্টায় ও বাস্তুগঠনের তাগিদে বনাঞ্চলের দ্রুত সংকোচসাধন চলতে থাকে। ফলে বাঘ, কৃষ্ণসার চিতল প্রভৃতি কয়েকটি জগদ্দুর্লভ পশুপাখীর বিলোপ সাধন ত্বরান্বিত হয়। ত্রিশ চল্লিশ দশকে দিল্লী থেকে কলকাতাগামী মেলে আলিগড় আসতে সদ্য-ফোটা সকালের আলোয় দেখা যেত রেল-লাইনের দুপাশে ট্রেনের শব্দ পেয়ে কৃষ্ণসার হরিণের দল এখানে ওখানে খেতের ফসল ডিঙ্গিয়ে লাফ দিয়ে ছুটে পালাচ্ছে। দলপতি ঊর্ধ্বমুখ করে ২০-২২ ইঞ্চি শিং পিঠে ফেলে আকাশ মার্গে যেন উড়ে চলেছে। আজ আর কোন রেলযাত্রীর অপরূপ এ দৃশ্য দেখার বরাত হয় না। আগের মত আর খেতে, রেলের দুপাশে ময়ূর চরে বেড়াতে দেখা যায় না। ফিকে জঙ্গলে নীলগাই, চিতল, পারা, কাকর প্রভৃতির দেখা পাওয়াও দুর্লভ হয়েছে। বন্য পশুপাখীর বিলুপ্তি বিষয়ে দেশবাসীর কোন সম্বিত ছিল না। শিকারের নেশাও আমাকে আচ্ছন্ন করেছিল।

সেবার আমার শিকারে যাবার এক বিশেষ কারণ হয়েছিল। কাশীপুর থেকে আমার বন্ধু অনিল দেব তার করেছিলেন—'তিনটি বাঘ উদ্বাস্তু পুনর্বাসনের গরু-মোষ সাবাড় করছে শিকার ব্যবস্থা প্রস্তুত অবিলম্বে রওনা হোন।'

(২)

১৯৪৭ অব্দে লর্ড মাউন্টব্যাটেন মারফৎ প্রস্তাবিত ব্রিটিশের ভারত ত্যাগ সর্তের মূলসূত্র ভারত বিভাগ দেশনায়করা মেনে নিয়ে সাম্প্রদায়িক ঐক্য-কল্প ভারত সাগরে বিসর্জন দিলেন। দেশবাসী কর্তৃক এর ফলাফল উপলব্ধি ও বিচার করে দেখবার আগেই স্বল্প কালের মেয়াদে র‍্যাডক্লিফ রায় বিঘোষিত হোলো। যে অতিকায় উদ্বাস্তু সমস্যা এর ফলে দেখা দেবে তার না ছিল কোন ধারণা, চিন্তা বা তার জন্য কোন প্রস্তুতি। একেবারে অকস্মাৎ আনুমানিক বিশ পঁচিশ লক্ষ পাঞ্জাববাসী সর্বস্বান্ত ও বাস্তুত্যাগী হয়ে পথাশ্রয়ী হয়। অগণিত নরনারী শিশু আততায়ীর হাতে, পথকষ্টে ও রোগে প্রাণ হারায়। সংখ্যাতীত নারী হয় ধর্ষিত ও অপহৃত। এ রকম মানব-সংহার ইতিহাসের পৃষ্ঠায় এর আগে লেখা হয়নি।

অপ্রস্তুতির প্রথম ধাক্কার পর সরকার এই হতভাগ্যদের জন্য উত্তরপ্রদেশে দুটি বৃহৎ প্রকল্প অনুষ্ঠিত করেন। প্রথমটি হস্তিনাপুর গঙ্গা-খাদের প্রকল্প ও অপরটি কাশীপুর প্রকল্প।* প্রথমটি বিশেষ যোগ্যতার সঙ্গে সম্পাদিত করে অনিল দেব কাশীপুর প্রকল্পের অধিকর্তা নিযুক্ত হন। পুনর্বাসন কাজে তিনি যেমন সুনাম অর্জন করেছিলেন, তেমনি তিনি ছিলেন নাম-করা শিকারী। সরকারী ও বন্ধুমহলে তাঁর ডাকনাম—'এ-ডি'। কাশীপুর প্রকল্পের শরণার্থীদের বসবাস ব্যবস্থা, জমি বন্টন, রাস্তা তৈরী, ইঁদারা কাটা, জলসেচ, গরু-মোষ লাঙ্গল শষ্যবীজ কেনার ঋণ, ট্রাক্টর ব্যবস্থা, ঘর তৈরী, চিকিৎসা প্রভৃতি যাবতীয় কিছুর সুরাহা করার ভার অর্পিত হয় এ-ডি'র ওপর।

•

মোরাদাবাদ স্টেশন থেকে বেরিয়ে রামগঙ্গা নদীর পুলের ওপর দিয়ে রেললাইনের এক শাখা রামগড় পর্যন্ত বিস্তৃত হয়েছে। তারই দুই স্টেশন আগে কাশীপুর জংসন। হিমালয়ের তরাই অঞ্চল। রামগড় থেকে ধীরে-ধীরে খাড়াই শুরু হয়েছে। নৈনীতাল কম-বেশী পঁচিশ কিলোমিটার রাস্তা। কাশীপুরের পূব কূল ঘেঁষে কোশী নদী। পশ্চিমে একটু দূরে দিয়ে চলে গেছে খরস্রোতা রামগঙ্গা। কাশীপুরের সন্নিহিত নিচু জমির আর্দ্রতা চাষের অনুকূল। এক সময়ে এ জায়গা ফলন্ত চাষে ও জনবসতিতে বর্ধিষ্ণু ছিল। রেল লাইন খোলার পর বর্ষার জলের বহতা বিঘ্নিত হওয়ায় প্রচন্ড ম্যালেরিয়া মহামারীতে দারুণ লোকক্ষয় হয়। জীবিতরা দেশ ত্যাগ করে। সারা অঞ্চল আগাছা ঝোপ-ঝাড় ও জঙ্গলে ভরে ওঠে। সেই সঙ্গে বন্য পশু ও শ্বাপদের আমদানীতে ও তাদের বংশ বৃদ্ধিতে অঞ্চলটি ছেয়ে যায়। গোঁদ (Swamp deer) কাকর (barving barking deer dek) পারা (hog deer) চিতল, শুয়োর, হায়না গুলবাঘ আর ডোরাকাটা বাঘের আবাসে পরিণত হয়ে শিকারের পীঠস্থান হয়ে ওঠে। কাশীপুর প্রকল্পে এ-ডি'র অন্যতম কার্যসূচী হয় এ অঞ্চলের ঝোপ ঝাড় জঙ্গল পরিষ্কার করে বন্যপশুর প্রাচুর্য কমিয়ে জমি চাষোপযোগী করে তোলা তাতে এক নতুন সমস্যা দেখা দেয়। জঙ্গল সাফ করার ফলে হরিণ শুয়োর প্রভৃতি তৃণভোজীরা অন্যত্র চলে যাওয়ায় সাম্য বিনষ্ট হয়। পর্যাপ্ত খাদ্য না পেয়ে বাঘ সাহসী হয়ে উদ্বাস্তু বসতিতে এসে গরু-মোষ বধ করা শুরু করে। আবার দূরে থেকে এসে খেতে ঢুকে শস্যনাশ করতে আরম্ভ করে সম্বর, চিতল পারা গোঁদ প্রভৃতি। বাধ্য হয়ে এই সব পশুর বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ অনিবার্য হয়ে ওঠে। এই সূত্রে বাঘ শিকারের আয়োজন।

(৩)

আগের বছরেও বাঘ শিকারে যোগ দিতে আমন্ত্রিত হয়ে কাশীপুরে এসেছিলাম। দুটি বাঘ উদ্বাস্তু চাষীদের গরু-মোষদের ওপর হামলা চালাচ্ছিল। আর দুজনও এসেছিলেন 'এ-ডি'র আমন্ত্রণে; দুজন আমেরিকান। একজন কাশীপুরবাসীও যোগ দেন এই শিকারে। বাঘ দুটির একটি উদ্বাস্তুদের গোয়াল থেকে একটা ছোট মোষ মেরে তাকে কাশীপুরের উপকণ্ঠে একই শরবনের নালায় টেনে নিয়ে যায়। বাঘের পাঞ্জা অনুসরণ করে খুঁজি-শিকারী 'এ-ডি'কে জানায়। দুটি শিকারদক্ষ হাতীতে সওয়ার হয়ে 'এ-ডি' তাঁর তিন অতিথিকে নিয়ে নালায় নামেন। আমার স্থান হয়েছিল নালার এক প্রান্তে এক আম গাছে-বাঁধা মাচায়। হাতীর তাড়া খেয়ে বাঘের এই দিক দিয়ে পালাবার কথা। পালাতে গেলে আমি তাকে মারতে বা রুখতে পারবো। হাতী দুটি শরবন ছেঁকে বাঘকে বার করে। তারপর চলে দু পক্ষের এক ভয়ংকর সংগ্রাম। বাঘকে দেখতে পেয়ে আমেরিকানরা বেঠিক গুলী চালান। বাঘের লাগে না। ক্ষিপ্ত হয়ে সে শত্রুপক্ষকে আক্রমণ করে। লাফিয়ে কাছের হাতীটার শুঁড়ে থাবা গেঁথে সওয়ারীকে ধরতে চেষ্টা করে। হাতী ছিল শিকারপোক্ত; সে শুঁড় চালনা করে বাঘকে আছড়ে ফেলে। সওয়ারীরা ফের গুলী চালান, কিন্তু সেও যায় ফসকে। বাঘ আবার হাতীর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে তাকে ক্ষতবিক্ষত করে। হাতী আবার বাঘকে আছড়ে পা দিয়ে টিপে ধরে। আঁচড়ে কামড়ে বাঘ আবার নিজেকে মুক্ত করে শরবনের এক ঝোপে লুকিয়ে পড়ে। আম গাছের মাচায় বসে হাতী বাঘের যুদ্ধের অলৌকিক দৃশ্যের অনেকখানি প্রত্যক্ষ করলাম উত্তেজনা-অভিভূত হয়ে। মাহুতের বুলি, হাতীর নাদ, বাঘের হুঙ্কার রাইফেলবন্দুকের আওয়াজ এক জোটে একটা আতঙ্ক-ঘোগ সৃজন করেছিল। মিনিট পনেরো খুঁজে হাতীরা বাঘকে আবার বার করলো। এবার আমেরিকানদের নিরস্ত করে 'এ-ডি' তাঁর ৪৫০।৪০০ রাইফেল থেকে একটি বুলেট চালান। সেটি যথাস্থানে লাগল মনে হোল; বাঘ মাটিতে ছিটকে পড়লো ও সঙ্গে-সঙ্গে উঠে পড়ে রণেভঙ্গ দিল। সন্ধ্যা হব-হব; 'এ-ডি' তখনকার মত শিকার থামাতে বললেন। আহত বাঘ শরবনে কোথায় লুকিয়েছিল। 'এ-ডি' বললেন সকালে তাকে হয় মরা নয়ত সাংঘাতিক জখম অবস্থায় পাওয়া যাবে। পর দিন সকালে হাতীতে চড়ে 'এ-ডি'র

---

* পাঞ্জাব আগত উদ্বাস্তুদের ক্ষতিপূরণ ও পুনর্বাসন বাবদ সরকার ব্যয় করেন ২৫০০ কোটি টাকা। তুলনায় পূর্ববঙ্গীয় উদ্বাস্তুদের জন্য খরচ হয় ৩২০ কোটি। ক্ষতিপূরণাঙ্ক ছিল শূন্য।

সংগে আমি শরবনে নামলাম। অল্পক্ষণ খ্‌ঁজতেই মরা বাঘ পাওয়া গেল। দেখা গেল এ-ডির ব্‌লেট ঘাড়ের কাছে শিরদাঁড়া ভেঙে দিয়েছে ও তাতেই বাঘের মৃত্যু হয়। আরও দ্‌টি ব্‌লেট বাঘের গায়ে বিদ্ধ হয়েছিল কিন্তু সেগ্‌লি কোনটি মোক্ষম হয় নি।

দ্বিতীয় গর্‌-মোষ মারা বাঘটিও 'এ-ডি'র হাতে মারা পড়ে। আমরা চলে গেলে হাতী দিয়ে শরবন ঝালাই করে পাড়ের একটা গাছের মাচা থেকে সেটি মারেন।

সেবার আমার এক গোঁদ (বারো শিঙা) শিকারও হয়েছিল বড় চমৎকার। শহর থেকে দশ-বারো কিলোমিটার দূরে মালধন নামের এক পাতলা জঙ্গলে শ'দ্‌ই গোঁদের এক বিরাট দঙ্গল আড্ডা গেড়ে কাশীপ্‌রের শরণার্থীদের চাষের জমিতে এসে ফসল খেয়ে ও নষ্ট করে বড় উৎপাত করছিল। তাদের দ্‌-চারটি মেরে ত্রাসের সঞ্চার করে কোন স্‌রাহা হয় কিনা তাই দেখা স্থির হয়। 'এ-ডি'র জীপে এসে মালধন জঙ্গলের ম্‌খে নেমে একটা বয়েল গাড়ীতে চড়ে এ-ডি ও আমি জঙ্গলে প্রবেশ করলাম। প্রায় এক কিলোমিটার ভেতরে ঢ্‌কে গিয়ে একটা খোলা ফর্দা জায়গার এক প্রান্তে এসে পড়লাম। দ্‌ই-তিন ভাগে ভাগ করা সেই বিরাট গোঁদের দঙ্গলকে দেখলাম সেখানে। বয়েল গাড়ীতে বসে থাকায় তারা বিশেষ কোন রকম আতঙ্কিত হোল না। শার্ট-শার্ট- না পরে ময়লা কাপড় পরে ময়লা চাদর ম্‌ড়ি দিয়ে চাষীদের মত সেজে গিয়েছিলাম, ওদের আশ্বস্ত করবার জন্য। দ্‌শ' সওয়া দ্‌শ' মিটার পর্যন্ত ওদের কাছে অগ্রসর হলে ওরা সন্ত্রস্ত হোল না; শ্‌ধ্‌ চেয়ে-চেয়ে বার-বার দেখতে লাগল। আর একট্‌ কাছে যাবার প্রয়াস করতেই ওরা চলতে শ্‌র্‌ করলো। দ্‌-তিন সেকেণ্ডেই সেটা দ্‌লকি কদমে ছোটায় দাঁড়াল। আর দেরী করা নয় 'এ-ডি' ইঙ্গিত করাতে আমি মাথায় বেশ বড় শিঙের ঝাড়ওলা গোঁদ বেছে নিয়ে রাইফেল সঞ্চালিত করে নলির ম্‌খ তার দেহরেখা পার হতেই ঘোড়া চাপলাম। রাইফেলের আওয়াজে গোঁদের দল ঊর্ধ্বশ্বাসে ধ্‌লো উড়িয়ে ছ্‌টেছিল। মাটিতে যেন তাদের পা ছ্‌ঁচ্ছে না, ধরাতল থেকে পাঁচ-ছ ফ্‌ট ওপর দিয়ে একটা গোঁদের স্রোত বয়ে চলেছে। বিমোহিত হয়ে সে দৃশ্য দেখতে লাগলাম। কিন্তু কৈ,—যার ওপর আওয়াজ করলাম সে পড়ল না ত? লাগে নি, মিস হয়েছে। তখনই সবিস্ময়ে দেখি, একটি গোঁদ দলের মধ্যে দৌড়তে থেকে ক্রমেই পিছিয়ে পড়ছে। অকস্মাৎ সে হ্‌ড়ম্‌ড় করে পড়ে গেল, দলের বাকী সব তাকে ফেলে অদৃশ্য হয়ে গেল। লম্বা পা ফেলে তাড়াতাড়ি শিকারের কাছে গিয়ে দেখি সে একেবারে প্রাণহীন; শিঙে এগারোটি চ্‌ড়ো। বিরাট সাইজ। গ্‌লীটা সরাসরি

কলজিতে বিদ্ধ হয়েছে। কলজিতে গুলী বিঁধলে অনেক সময়েই শিকার প্রথমটা পূর্ণ বেগে ছুটতে থাকে তারপর হঠাৎ নিষ্প্রাণ হয়ে পড়ে যায়। পাখীর বেলায়ও ঠিক এই রকম হয়। কলজিতে ছিটে বিঁধলে পাখী সটান উড়ে গিয়ে হঠাৎ ঝুপ করে পড়ে।

সেদিন 'এ-ডি' পারা চিতল বরা প্রভৃতি লঘু শিকারের উপযোগী এক আনকোরা ২৫০।৩০০ উইনচেস্টার ব্যবহার করতে দিয়েছিলেন। দূরপাল্লাতেও সিধে মার এর। লম্বা পা ফেলার মাপে গোঁদীটি ২৩০ পা দূরে ছিল।

(৪)

এ হোলো গত বছরের কথা।

এ বছর এ-ডি'র তার পেয়ে অমৃতসর মেলে এসে মোরাদাবাদ স্টেশনে নেমে গাড়ী বদল করে কাশীপুরের গাড়ীতে উঠলাম। জুন মাস, দুর্দান্ত গরম, লু চলছিল। সোরাইয়ে বরফ ভেঙ্গে দিয়েছিলাম। সঙ্গে নিয়েছিলাম চিনি ও পাতি লেবু। সরবৎ তৈরী করে সারা পথ তৃষ্ণা মেটালাম।

মোরাদাবাদে আমার কামরায় উঠলেন দুজন সম্ভ্রান্ত পাঞ্জাবী ও তাঁদের সঙ্গী পরিপাটি গেরুয়াবসনধারী একজন সাধু। অল্প সময়ের মধ্যে আমার সঙ্গে আলাপ জমে গেল। ওঁরা বললেন সন্তজীর আশ্রম দিল্লীতে, যাচ্ছেন রামগড়ে। সন্তজী কয়েকটি গান করলেন মধুর সুরে, ভজন গান। আমি একটি গানের মর্ম জানতে চাইলে বললেন মর্মার্থ।—ভক্ত বলছেন প্রভু আমায় যদি দিবালোকে দেখা না দাও ও কৃপা করে স্বপ্নে দেখা দিও। সেই আশায় থাকব আমি। সন্তজী বললেন গান স্বয়ং নানকের রচনা। আমার মনে পড়লো রবীন্দ্রনাথের গান—'জাগরণে তার নাহি দেখা পাই থাকি স্বপনের আশে, ঘুমের আড়ালে যদি ধরা দেয় বাঁধিব প্রণয় পাশে।' কান্ত কবির গানে আছে ঃ—'স্বপনে তাহারে কুড়ায়ে পেয়েছি, রেখেছি স্বপনে বাঁধিয়া।' সত্যই ঘুমের আবেশে আকাঙ্ক্ষিতের সঙ্গে মিলন কী প্রাণোন্মাদক! শিখ গুরুরা ভক্তের জন্য কত বন্দনা গান রচনা করে গেছেন। অমৃতসর স্বর্ণ মন্দিরে দিবারাত্র সেসব গান কীর্তন হয়।

সন্তজী আমার বন্দুক রাইফেলের সরঞ্জাম লক্ষ্য করেছিলেন। গান হয়ে গেলে অস্ত্রগুলি চেয়ে নিয়ে দেখলেন। বলতে হোলো বাঘ শিকার উদ্দেশ্যে যাচ্ছি কাশীপুরে। আমায় বললেন নানক ও অন্যান্য শিখ গুরুরা গান বাজনায় বাঘ ও বনের পশু-পাখীদের বশ করতেন। তারা কাছে এসে নিরীহভাবে বসে গান শুনে চলে যেত। ট্রেনে বাকি সময়টুকু সন্তজীর কথা মনের ভেতর টানা-পোড়েন করলো।

তখনও সূর্যাস্ত হয়নি, কাশীপুরে স্টেশনে ট্রেন পৌঁছলে দেখলাম 'এ-ডি' হাজির। মাল-পত্তর নামিয়ে তাঁর জীপে উঠে তাঁর বাংলোয় রওনা হলাম। পথে যেতে যেতে বললেন, রাত্রে এক জায়গায় ডিনারের নেমন্তন্ন আছে। বাংলোয় পৌঁছে একটু জিরিয়ে সেখানে যেতে হবে। তারপর শিকারের যা আয়োজন হয়েছে তা বললেন। অত্যাচার করছিলো তিনটি বাঘ, 'পরতাপপুরে' (প্রতাপপুরে) শরণার্থীদের বস্তিতে। তার দুটির খবর করা গেছে। কাছের একটা পাতলা জঙ্গলে মোষের কাটরা (বাছুর) বেঁধে একটাতে কিল হয়েছে দিন চার আগে। সেই বাঘটার জন্য দিন তিনেক আগেই এসেছেন স্যার আত্তার সিং, পশু-বিভাগের একজন ওপরঅলা ও বড় শিকারী। মাচার ওপর মড়ির সামনে তিন রাত্রি বসেছেন। বাঘ কাটরা মেরে কিছুটা খেয়ে চলে গেছে, আর আসেনি। দু-নম্বর কাটরারা মারা হয়েছে গতকাল, খানিকটা তার খেয়ে গেছে বাঘ। সেই মড়ির কাছে একটা গাছের মাচানে বসেছেন স্যার আত্তার সিং আজ বিকেলে। রাত্রি দশটা অব্দি তাতে থাকবেন। যদি বাঘ আসে মারা হয়ে যায় ভালো, নয়ত দশটার পর চলে আসবেন ডিনারের জায়গায়। আমরা অপেক্ষা করবো তাঁর না ফেরা পর্যন্ত।

'এ-ডি'র বাংলোয় পৌঁছে চা-নাস্তা খেয়ে সন্ধ্যা হলে নিমন্ত্রণ স্থানে যাবার জন্য তৈরী হলাম। 'এ-ডি'র আরও দুজন অতিথি ছিলেন বাংলোয়, তাঁরাও নিমন্ত্রিত। কৃষি-ইঞ্জিনীয়ার নন্দী ও তাঁর স্ত্রী যমুনাদেবী। সস্ত্রীক এ-ডি, নন্দী দম্পতি ও আমি পাঁচ-জন 'এ-ডি'র জীপে চড়ে রওনা হলাম। নিমন্ত্রণ স্থান কিছু কম দশ কিলোমিটার দূরে,—এক ট্রাকটর ও কৃষিযন্ত্রপাতি সরবাহকারী কারবারের ম্যানেজারের বাংলোয়। শহর পল্লী ছাড়িয়ে, চাষের খেত মাঠের ভেতর দিয়ে জীপের তেজী বাতির আলো ফেলে চলেছি পাঁচজন সওয়ারী। কী রাগপ্রধান, কী রবীন্দ্রসঙ্গীতে ও অতুল-প্রসাদের গানে নন্দী ছিলেন সমানে সিদ্ধ। তাঁর গাওয়া ঠুংরি ও কাবিগুরুর গানে সারা দিন নির্জন পথ হোলো মুখরিত। তাঁর সঙ্গে গলা মিলিয়ে আমাদের বাকি চার-জনকে বাধ্য করালেন গাইতে, 'সে কোন বনের হরিণ ছিলো আমার মনে।' নির্জন পটভূমিতে মানুষের গলার আওয়াজে আতঙ্কিত হয়ে দুটি পারা রাস্তার ধারের কুশ বন থেকে বেরিয়ে জীপের সামনে এক পার থেকে অন্য পারে চলে গেল।

আতিথ্যদাতার বাংলোয় পৌঁছুতে বেশী সময় লাগলো না। কেয়ারি করা ছাতা, তাতে কাঁকরা বিছানো ঘোরানো রাস্তা। রাস্তার ধারে ও কেয়ারিতে বেল ফুলের ঝাড়ে অজস্র বেল ফুল ফুটে বাতাস আমোদিত করেছে। গোলাপ গাছের গোলাপও মৃদু গন্ধ বিলোচ্ছে। লনেতে টেবল চেয়ার পেতে অতিথি বসবার ব্যবস্থা করা হয়েছে। গৃহস্বামী ও গৃহস্বামীনী আমাদের সাদরে অভ্যর্থনা করে বসালেন। বেয়ারা টেবলে মিঠে ও কড়া পানীয় আর ভোজ্য রেখে গেল। নানা গল্পে ও প্রসঙ্গে আমরা সময় কাটালাম সিংজীর অপেক্ষায়।

আত্তার সিং ফিরে এলেন রাত্রি সাড়ে দশটায়। শুধু হাতে ফিরলেন, মড়িতে বাঘ আসেনি। চতুর বাঘ কাটরা মেরে কিছুটা খেয়ে চলে যায় আর আসে না। দুবারই এই হোলো।

'এ-ডি' আমার সঙ্গে তাঁর পরিচয় করিয়ে দিলেন;—আত্তার সিং বললেন—শুনেছি আপনার নাম আপনার দোস্তের কাছে। আমি ত বাঘ মারতে পারলাম না, বাঘ আপনি মারবেন।

আমি বললাম, নিশ্চয়।

ডিনার শেষে আমাদের ফিরতি রওনা হতে রাত বারোটা হোলো। দুটি মোটরে ভাগাভাগী করে বসলাম আমরা। একটিতে সিংজী 'এ-ডি', অপরটিতে বাকি ক'জন। আবার সেই তেজী বাতিতে খেত মাঠ কুশ-বনের ভেতর দিয়ে পথ আলো করে চলা। সিংজী এবার এ-ডি'র দেওয়া বন্দুকে বুলেট ও এস-এসজি ভরে নিয়েছেন। সামনে চলেছে ওঁদের গাড়ী। কুশবনের ভেতর দিয়ে যেতে যেতে গাড়ী গেল দাঁড়িয়ে। আলোর কিরণে দেখা গেল একটা জানোয়ার রাস্তা পার হচ্ছে। সঙ্গে সঙ্গে হোলো বন্দুকের আওয়াজ; 'এ-ডি' বলে উঠলেন 'গির গায়া।' তাকে তুলে এনে সামনের গাড়ীতে রাখা হোলো। একটা পারা। পথে আর জন্তু-জানোয়ার দেখা গেল না। বাংলোয় এসে বেশ পরিবর্তন ক'রে সকলে শুয়ে পড়লাম। লনে খাটিয়া পেতে দেওয়া হয়েছিলো। উত্তাপ মাত্রা ছিল ১০৫ ফাঃ ঘরের ভেতরে শোয়া নরক যন্ত্রণা।

পরের দিন প্রত্যুষে উঠে চা খেয়ে আত্তার সিং চলে গেলেন। যাবার সময় বিদায় নিয়ে আমায় বলে গেলেন—কথা যেন ঠিক থাকে। বাঘ মেরে শরণার্থী চাষীদের আতঙ্ক দূর করা চাই। আমি আমার মত সামান্য ব্যক্তির প্রতি তাঁর এই সৌজন্যে মুগ্ধ হয়ে আবার আশ্বাস দিলাম চাষীদের শত্রু অন্তত একটি বিনষ্ট করব ও সে খবর দিল্লী গিয়ে নিজে জানিয়ে যাবো।

(৫)

'এ-ডি' বললেন, সন্ধ্যায় সিংজীর পরি-ত্যক্ত মাচায় বসা হবে। কাল মড়িতে বাঘ আসেনি, আজ যদি আসে।...বেলা থাকতে 'এ-ডি'র গাড়ীতে আমরা দুজনা রওনা হলাম। পাঁচ-ছয় কিলোমিটার গিয়ে একটা জঙ্গলের কোলে পৌঁছে গাড়ী ছেড়ে একটা হাতীর পিঠে উঠলাম। দুজনে। হাতীটাকে

সেখানে পাঠানো হয়েছিলো আগেই। আমাদের দুজনের হাতিয়ার, কার্তুজ, রাত্রের খাবার জল কফি ও শোয়ার সরঞ্জাম প্রভৃতি গাড়ী থেকে বার করে হাতীতে তুলে নেওয়া হোলো। 'এ-ডি'র ছিলো ·৪৫০/৪০০ ওয়াটসন ক্রস দোনলা রাইফেল, আমার ছিলো টমাস র‍্যান্ডের ·৩৭৫ ম্যাগনাম, দোনলা। গজগমনে হেলে দুলে চলে হাতী বনের ভেতর একটা পাকুড় গাছের নিচে এসে দাঁড়ালো। হাতীর পিঠের ওপর দাঁড়িয়ে গাছের ডাল ধরে মাচায় উঠে গেলাম। একটা চারপাই উল্টে দুটি ডালে শক্ত ক'রে বাঁধা। দড়ির বোনা জমির ওপরে একটা তোষক ও গাঢ় সবুজ রঙের চাদর পাতা। পায়াগুলি ওপর মুখে, তাতে সরু ডালের বাঁধা যেমন ঠেস দিয়ে বসার সুবিধে তেমনি রাইফেলের নল ঠেকিয়ে হাতের কাছে শুইয়ে রাখারও যুৎ। স্যর আক্তার সিং এই মাচাতে আগের রাতে দশটা পর্যন্ত বসেছিলেন। মাড়ীটা গাছের গুঁড়ি থেকে হাত দশেক দূরে খুঁটিতে বাঁধা, তাতে গাছের ডাল পালা দিয়ে চাপা দেওয়া,—শকুনের গ্রাস থেকে বাঁচানোর জন্য। আমরা মাচায় উঠলে শিকারীরা সেগুলো সরিয়ে দিল। মড়িটা পচ ধরে ফুলে বীভৎস হয়েছে। দুঃসহ দুর্গন্ধ। 'এ-ডি' মাচায় উঠে আমার পাশে বসলেন। অনুচরেরা আমাদের হাতিয়ার কার্তুজ ব্যাগ, রাতের খাবার, জলের বোতল, কফির ফ্লাস্ক, রাত্রে গায়ে দেবার পাতলা কম্বল তুলে দিল। উভয়ের মধ্যে যথেষ্ট ফাঁক রেখে ঠেস দিয়ে যুৎ ক'রে আমরা বসলাম। যে যার রাইফেলে টর্চ-বাতি লাগিয়ে কার্তুজ ভরে নিলাম। আমারটা একবার আমি হাতে ধরে কাঁধে চেপে মড়ির ওপরে নলের ডগার মাছি ও পাছ-নিশানী এক নজর ক'রে ধরলাম। তার পর সেটা নামিয়ে হাতের কাছে মাচার বেড়ায় নল ঠেকিয়ে রেখে পরবর্তী পরিস্থিতির উৎকণ্ঠিত অপেক্ষায় বসে রইলাম। ঘন জংগল, তাতে নিবিড় ছায়ার আস্তরণ। গাছের ডালপালা ও পাতার ফাঁকে ফাঁকে এখানে ওখানে বিকেলের রোদ পড়ে আলো-ছায়ার নকশা তৈরী হয়েছে। মাচায় বসে মাথাটা এদিক ওদিক সরালে সূর্যের পাটে বসা দেখতে বড় মনোরম। নিস্তব্ধ প্রকৃতি। মাঝে মাঝে বাতাসে দোলা লেগে পাতার শর-শর শব্দ হচ্ছে। শুকনো ডাল খসে পড়লে তার আওয়াজটুকু শোনা যায়। পাইপে তামাক ঠেসে তা ধরিয়ে ধূমপান করলাম। চরকায় সুতোকাটার মত সময় দীর্ঘ থেকে দীর্ঘতর হয়ে চলেছে। 'এ-ডি' মৃদুস্বরে বেশী তামাকের ধোঁয়া ছাড়তে নিষেধ করলেন। যদি বাঘ কাছে এসে ঘাপটি মেরে বসে থাকে; মাচায় আমাদের উপস্থিতি টের পাবে। বাঘকে নাগালে পাবার জন্য কত না সতর্কতা চাই। নিশ্চল নিথর হয়ে বসে থাকা চাই, যদি বাঘ এসে আড়াল থেকে মাচানে নজর চালিয়ে দেখে তবে আমাদের ভাববে গাছ পালারই সামিল। হাত মাথা নাড়তে হ'লে এমন ধীর সঞ্চালন হওয়া চাই যে তা বাঘের বোধগম্যই হবে না। তিলমাত্র স্থানচ্যুতিও বাঘের চোখে বেবাক ধরা পড়ে।

সূর্যাস্ত হ'তে মনে হোল যেন যুগ-যুগান্ত সময় লাগলো। দিগন্তের পিছনে সূর্য ঢাকা পড়ার সঙ্গে সঙ্গে পাখীদের একটা চঞ্চলতা প্রকট হোলো। নিস্তব্ধতা ভংগ করে ঝট-পট আওয়াজ করে তারা উড়ে গেল তাদের বাসার খোঁজে। দূর থেকে ময়ূরের ডাক শোনা গেল 'ময়-উর', দু-তিন বার। তারপর নিস্তব্ধতা। এ ঋতুতে এ সময়ে মাঠে, উন্মুক্ত স্থানে গোধূলির আলো বেশ কিছুক্ষণ অব্যাহত থাকে। কিন্তু জংগলে তার বিপরীত। অন্ধকার তাড়াতাড়ি ঘনিয়ে এলো ও ক্রমেই গাঢ়তর হ'তে লাগলো। মনে হ'তে লাগলো আরও গাঢ় হলে অন্ধকার কি নিরেট হয়ে যাবে? কই বাঘের আসার ত কোন লক্ষণ নেই! বাঘ আসবে না জানা কথা, তবু তার আশায় এসে বসা! চাঁদের মনে উদয় হোলো খোলা জায়গাটাতে কি মড়িটা দেখা যাচ্ছে? স্পষ্ট নয় অস্পষ্ট, চারিপাশের পরিবেশ থেকে বিচ্ছিন্ন একটা অংশ। বাঘ এসে মড়ি খেতে সুরু করলে কি দেখতে পাবো? না হোক মাংস ছিঁড়ে খাবার সময় আওয়াজ টের পাবো। একবার রাইফেল তুলে ধরে টর্চের আলো ফেলে দেখে নিলে নিঃসন্দেহ হওয়া যায়। তার চেষ্টা করতেই 'এ-ডি' আমার হাতের ওপর হাত রেখে থামিয়ে দিলেন। কানের কাছে মুখ এনে ফিস্ ফিস্ করে বললেন—বাঘ হয়ত আড়ালে এসে বসে আছে, আমাদের ভালো করে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখছে। এখন আলো ফেলা ঠিক হবে না। অনেকক্ষণ ধরে—আধ ঘণ্টা এক ঘণ্টা—সে খুঁটিয়ে দেখবে; তার পর সন্দেহ মিটে গেলে মড়িতে আসবে। রাইফেল রেখে নিশ্চল হয়ে থাকুন। অগত্যা আলো ফেলার মতলব ছেড়ে দিলাম।

অতি বিলম্বিত লয়ে রাত্রির দ্বিতীয় প্রহর রঙ্গমঞ্চে প্রবেশ করলো। সেই সঙ্গে অরণ্য যেন ঘুম ভেঙে জেগে উঠলো। এক পালা কীটপতঙ্গের জোট বাঁধা চির-ইরন্থির ঐকতান মুখর হয়ে উঠলো। নিশাচর ছেপকাদের (night jar) টচুক-টচক আওয়াজ ধ্বনিত হোলো। রাত্তিরে ওরা মাটিতে নেমে কীট-পতঙ্গ ধরে খায়। একটু পরেই কানে এলো চিতল হরিণের ভয়ার্ত 'টাউ-টাউ' ডাক। তার পরেই শোনা গেলো ফেউ-এর ডাক। বনের প্রান্তে ডাইনে থেকে বাঁয়ে সরে সরে গেলো সে ডাক। তার পর আবার নিস্তব্ধতা ভংগ করা কীটপতঙ্গের ঝিনুর, ঝিনুর আওয়াজ ও ছেপকার টুকু শব্দ। অন্ধকার ছাঁকা ঈষৎ একটা আভার ছোপ অনুভূত হোলো। অরণ্য প্রকৃতি তাঁর রহস্যের আবরণ খুলে দিয়েছেন। বিশ বছর ধরে কতবার তাঁর সঙ্গে আমার অন্তরের যোগ সাধিত হয়েছে,—শিকারে এসে। প্রথম প্রথম চাক্ষুস পরিচয়, তার পর অন্তরের যোগ, তারপর একাত্ম মিলন। সেই মিলনে নিজেকে সমর্পণ করলাম।

কিন্তু ফেউ ডেকে যায় কেন? বাঘের সঙ্গে কি তার মিতালী? শিকারের সন্ধান যোগান দেওয়া ডাক না শিকার লাভ না হওয়ার নিরাশা? অথবা শিকারের ভাগ পাবার আশায় আগাম আনন্দ? এই চিন্তার সঙ্গে বাঘের প্রতীক্ষায় সময় কাটতে লাগলো।

এই রাত্তিরে সাড়া হলে ঠিকমত বাকান

খুলে আমরা নিঃশব্দে রাত্রির খাবার খেয়ে নিলাম। 'এ-ডি'র অপছন্দ ভয়ে পাইপ ধরালাম না। রাত্রি দশটা নাগাদ অভ্যস্ত ঘুমের ঝোঁকে চোখ জড়িয়ে এলো। 'এ-ডি' আমার ডেল্দুনি লক্ষ্য করে কানের কাছে মুখ এনে বললেন শুতে। ঘণ্টা দুই পরে বা বাঘ এলে তুলে দেবেন। শুয়ে পরম আরামে ঘুমিয়ে পড়লাম।

কখন হঠাৎ ঘুম ভেঙ্গে গেলো। সন্তপর্ণে ধীরে ধীরে উঠে বসলাম। চট্-চট্, ও কিসের শব্দ? নিশ্চয় বাঘ এসে গেছে, মড়ির মাংস ছিঁড়ে খাচ্ছে। 'এ-ডি' আমার গায়ে হাত দিয়ে জেগেছি বুঝে হাত বাড়িয়ে মড়ির দিকে দেখালেন। নিঃশব্দে আস্তে আস্তে রাইফেল তুলে নিয়ে আঙ্গুলের চাপ দিয়ে দেখে নিলাম ঘোড়ার খিল খোলা। কাঁধে চেপে বাগিয়ে ধ'রে রাইফেল মড়ির দিক তাগ করে রাখলাম দু-তিন সেকেন্ড। মাংস ছিঁড়ে খাওয়ার শব্দ স্পষ্টতর হয়ে উঠেছে। নিচে ছোট স্তূপাকৃতি কালো একটা কিছু। কিন্তু বাঘের আয়তনের কোন বস্তু নেই। বাঘ হলে হলুদ ও কালোতে মিলে একটা আকৃতির আভাস পাওয়া যাবে। কিন্তু সে রকম কিছু ঠাহর হোলো না। টর্চের বোতাম টিপে কালো স্তূপের মত জিনিসের ওপর আলো ফেললাম। আলোটা এদিক ওদিক নাড়ালাম। মড়ি ছাড়া আর কিছু মালুম হোলো না। আলো নিভিয়ে রাইফেল নামিয়ে রাখলাম।

(ক্রমশঃ)

সাহিত্য ও সংস্কৃতি

প্রতি বৎসরের ন্যায় এই বছরও দুর্গাপূজা উপলক্ষ্যে প্রকাশিত হয়েছে অজস্র পত্র-পত্রিকা। নিয়মিত সাময়িক পত্রগুলির বিশেষ পূজা-সংখ্যা ছাড়া অনেক অ-সাময়িক পত্রিকা যাদের মাত্র বৎসরে একবার মাত্র দেখা যায়, সেই সব পত্রিকাও সংখ্যায় নগণ্য নয়। এ-ছাড়া সিনেমা সম্পর্কিত কয়েকটি বিখ্যাত পত্রিকার বিশেষ সংখ্যাও পূজা উপলক্ষ্যে প্রকাশিত হয়েছে। আর এক শ্রেণীর পত্রিকা এ-বছর ব্যাঙের ছাতার মত আত্মপ্রকাশ করেছিল—তাদের নামও যেমন বিচিত্র, প্রচ্ছদপটও ততোধিক বিচিত্র। বহুবর্ণে রঞ্জিত কামোদ্দীপক ভঙ্গীর ছবি দিয়ে এঁরা প্রচ্ছদ সাজিয়ে যৌন বিষয়ক রুচি বিগর্হিত নিবন্ধসমূহ দিয়ে পাতা ভরিয়ে শ্রাবণ মাসের প্রায় শেষ সপ্তাহেই ফুটপাথে আবির্ভূত হয়েছিল। অনেকদিন ফুটপাথ আলো করে থাকার পর সম্প্রতি পুলিশের ভয়ে একটু অন্তরালে লুকিয়ে আছে।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের আগে অবশ্য মহালয়ার পূর্বে কোনো পত্রিকার পূজা-সংখ্যা প্রকাশ করার রীতি ছিল না। পত্রিকাগুলির দামও চার আনা, আট আনা কিংবা বড়জোর এক টাকা ছিল। আকারও অনেক ক্ষীণ ছিল। ইদানীং দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির খাতিরে পত্রিকাগুলির দামও অনেক বেড়েছে এবং আকারও অনেকখানি পুষ্ট। সিনেমা পত্রিকাগুলি পত্রিকাগুলির চেয়েও স্থূলাঙ্গ।

সরাসরি পূজা সংখ্যা বলতে যাদের বোঝে তাঁরা, শারদীয় সংখ্যা, শারদ অর্ঘ্য ইত্যাদি নাম দিয়ে বিশেষ সংখ্যা প্রকাশ করে থাকেন। এইসব পত্রিকাগুলির আর্থিক সামর্থ্য যথেষ্ট না হলেও উৎসাহ ও উদ্যম এঁদের কম নয়। রচনা সংগ্রহ এবং পরিবেশন পদ্ধতিতে এই সব পত্রিকা যে কৃতিত্ব প্রদর্শন করে থাকেন তা প্রশংসা যোগ্য।

কিন্তু যাঁদের কৃতিত্ব সম্পর্কে প্রশংসায় পঞ্চমুখ হতে হয় তাঁরা হলেন লিটল ম্যাগাজিনের সহায় সম্পদহীন উৎসাহী তরুণদল। এঁদের পত্রিকার আকৃতি ক্ষুদ্র, সাজ-সজ্জা সাধারণ, অনেক সময় দ্রুত-মুদ্রণের জন্য অজস্র ছাপার ভুল প্রভৃতি হ্যাণ্ডিক্যাপ সত্ত্বেও এই সব পত্রিকায় অনেক নতুন প্রতিভার সন্ধান পাওয়া যায়। অনেক প্রতিভাধর তরুণ গল্পলেখক এবং কবি একালে সর্বপ্রথম আত্মপ্রকাশ করেন লিটল-ম্যাগাজিনের পৃষ্ঠায়।

একটু অতীতের দিকে পিছন হটে যাওয়া যাক। আমরা যতদূর জানি, সুরেশচন্দ্র সমাজপতি সম্পাদিত 'আগমনী' নামক পূজা-বার্ষিকী ১৩২০-২২ সালে এক উল্লেখযোগ্য সাহিত্যপত্র। এই পূজা-বার্ষিকীতে রবীন্দ্রনাথ, স্বর্ণকুমারী, প্রমথ চৌধুরী, হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, জলধর সেন প্রভৃতি সে যুগের সাহিত্য-মহারথীদের রচনা সুন্দরভাবে পরিবেশিত হয়েছিল। এই সময়ে নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত সম্পাদিত একটি পূজা-বার্ষিকী প্রকাশিত হয় এবং সেই পূজাবার্ষিকীর প্রথম পৃষ্ঠায় রবীন্দ্রনাথের হস্তলিপি ব্লক করে ছাপানো হয়। স্মৃতিনির্ভর করে লিখছি, সম্ভবতঃ রবীন্দ্রনাথের **'ওগো শেফালী'** কবিতাটি এই বার্ষিকীতে প্রকাশিত হয়। ক্রমে ভারতবর্ষ, **প্রবাসী, মানসী ও মর্মবাণী** প্রভৃতি পত্রিকাগুলির আশ্বিন সংখ্যাটি বিশেষ শারদীয় সংখ্যা হিসাবে প্রকাশিত হত। রবীন্দ্রনাথের 'রক্তকরবী' নাটক প্রবাসী পত্রিকার একটি পূজাসংখ্যাতেই ক্রোড়পত্র হিসাবে সম্পূর্ণ প্রকাশিত হয়।

এর কিছু পরেই 'মাসিক বসুমতী' পত্রিকা মহা-সমারোহে প্রকাশ সুরু হল। 'মাসিক বসুমতী'র বার্ষিক সংখ্যার নাম ছিল 'বার্ষিক বসুমতী'। তখনকার কালের এমন কোনো খ্যাতনামা লেখক ছিলেন না 'বার্ষিক বসুমতী'তে যাঁদের রচনা প্রকাশিত হয়নি। রবীন্দ্রনাথের 'শেষ রক্ষা', 'পরিত্রাণ' প্রভৃতি নাটক এই বার্ষিক বসুমতীতে প্রকাশিত হয়। রবীন্দ্রনাথ যে সময় বিদেশে সম্পাদক হেমেন্দ্রপ্রসাদ কেবলের পর কেবল পাঠিয়ে রচনা সংগ্রহ করেছেন। একথা রবীন্দ্রনাথই একবার আলোচনা প্রসঙ্গে বলেছিলেন।

সেই সময় সংবাদপত্রগুলির সাধারণ সংখ্যাই পূজাসংখ্যা হিসাবে প্রকাশিত হত—পৃষ্ঠা সংখ্যা অনেক বৃদ্ধি পেত, এবং অনেক সময় আগাগোড়া লাল রঙে ছাপা হত। সাধারণ সংখ্যার আকারে প্রকাশিত এইসব সংবাদপত্রে অনেক গল্প, প্রবন্ধ এবং রঙ্গ-কবিতাদি প্রকাশিত হত।

একদা প্রেমেন্দ্র মিত্র, প্রবোধকুমার সান্যাল, বিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি এই সব দৈনিক পত্রিকার বিশেষ সংখ্যায় ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক হিসাবে কাজ করেছেন। তাঁরা তখন বয়সে তরুণ, তাই তাঁদের সম্পাদনার ভঙ্গীতে তারুণ্যের ছাপ সুস্পষ্ট ছিল। তিরিশের দশকেই একটি সংবাদপত্রকে আধা-আধি ভাঁজ করলে যে আকার হয় সেই আকারে একটি হরিদ্রাভ মলাটে বাঁধাই করা অবস্থায় দৈনিক ও সাপ্তাহিক পত্রিকার পূজা-সংখ্যা প্রকাশ করার রীতি চালু হল। এখন যখন পূজা সংখ্যাগুলির আয়তন ও দাম বৃদ্ধি পেয়েছে তখন একটু ভালো বাঁধাই ব্যবস্থা করে পূজা সংখ্যাগুলিকে মুদ্রিত গ্রন্থের মত প্রকাশ করলে বোধহয় অনেক দিক থেকে সুবিধা হয়। বহু মূল্যবান রচনা সম্বলিত এইসব পূজার সংখ্যা আর দুই-এক মাস পরে বিক্রিওলার কবলে পড়ে ঠোঙায় পরিণত হবে। তখন আর মাথা খুঁড়লেও এই সব সংখ্যার সন্ধান পাওয়া যাবে না। আমরা জানি ন্যাশন্যাল লাইব্রেরীতেও সেকালের অনেক পত্রিকার পূজা সংখ্যা পাওয়া যাবে না। য়ুরোপে এই জাতীয় বিশেষ সংখ্যার নাম এ্যানুয়েল নাম্বার, এবং সেইসব সংখ্যাগুলির বাঁধাই করা পরিচ্ছন্ন সংস্করণ ক্রিসমাসের অনেক পূর্বেই বাজারে প্রকাশিত হয়, ফলে উপহার দেওয়ার সুবিধা হয়।

শারদীয় সংখ্যায় সাহিত্য-সমারোহ। সর্বসাধারণের পক্ষে এত সহজে এবং সুলভে সমকালীন সাহিত্যের সঙ্গে সংযোগ সাধনের সুযোগ আর মেলে না। রচনার মান বৃদ্ধি পেয়েছে কি হ্রাস পেয়েছে তা বিচার করার অনুকূল সময় ঠিক এই মুহূর্তে নয়। একথা স্বীকার করতেই হবে যে জাতির সাহিত্যের প্রতি এতখানি প্রচণ্ড অনুরাগ, সে জাতির ক্ষয় নেই, ভয় নেই।

শারদ-সাহিত্যের একটি ব্যবসায়িক দিকও আছে। লাভ-লোকসানের খতিয়ান করার প্রয়োজন নেই। পাঠকের লাভ কতখানি সেটুকু দেখাই শ্রেয়। মনে হয় সতর্ক পাঠক হংসের মতো নীরটুকু বাদ দিয়ে ক্ষীরটুকু গ্রহণ করতে সমর্থ হবেন।

—অভয়ঙ্কর

'সাহিত্যের খবর'

তারাশঙ্করের মরণোত্তর সম্মান : বিগত শুক্রবার তারাশংকরের টালা পার্কস্থিত বাসভবনে এক বিশেষভাবে নির্মিত সামিয়ানায় উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক মরণোত্তর ডি-লিট ডিগ্রী দান করা হয়। রাজ্যপাল মিঃ ডায়াস এই বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ হিসাবে তারাশংকরের সহধর্মিনী উমা দেবীর হাতে সনদটি অর্পণ করেন। উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক এই বৎসর যাঁদের সম্মানিত করা হবে সেই তালিকার মধ্যে তারাশংকরও অন্যতম ছিলেন। দুঃখের বিষয় অনুষ্ঠানের পূর্বে তাঁর দেহান্ত হয়। সেই কারণে এই বিশেষ সমাবর্তনের আয়োজন করা হয়। রূপান্তরের কালের মানবিক চরিত্রের অন্তরঙ্গ প্রকাশে তারাশংকরের অনন্যসাধারণ কৃতিত্বের কথা সনদ দানের মুহূর্তে উল্লিখিত হয়। সভায় অনেক বিশিষ্ট অতিথি উপস্থিত ছিলেন।

সাহিত্যিকের প্রশংসনীয় প্রচেষ্টা : পল পোয়েরনমো একজন ইন্দোনেশীয় লেখক। তিনি প্রায় এক পক্ষকাল মেলবোর্ণের জেনারেল পোস্টঅফিসের সামনে অনশনে ছিলেন। পূর্ব বাংলা আগত শরণার্থীদের দুর্দশার প্রতি অস্ট্রেলিয়ার জনসাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করা তাঁর উদ্দেশ্য ছিল। বিগত ২০শে সেপ্টেম্বর তিনি অনশন ভঙ্গ করেছেন। মিঃ পোয়েরনমো পবিত্র এবং মধুপান করে অনশন ভঙ্গ করেছেন। তাঁর বর্তমান বয়স সাঁইত্রিশ। এই অনশনকালে পথচারীদের কাছ থেকে তিনি ২০,০০০ অস্ট্রেলিয়ান ডলার সংগ্রহ করেছেন। ভারতীয় অঙ্কে এই অর্থের পরিমাণ ১,৬৭,১১৭। মিঃ পোয়েরনমো ৪৪-১ মিলিয়ন টাকা শরণার্থীদের জন্য অস্ট্রেলিয় সরকারের কাছ থেকে সংগ্রহ করতে মনস্থ করেছেন এবং যদি সেই অর্থ না পাওয়া যায় তিনি পুনরায় অনশন করবেন।

খুশবন্ত সিং-এর ভাষণ : ইলাস্ট্রেটেড উইকলী অব ইন্ডিয়া পত্রিকার সম্পাদক এবং ইংরাজী ভাষার উপন্যাস লেখক খুশবন্ত সিং পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয়ের দেওয়ান চাঁদ স্মারক বক্তৃতাদান প্রসঙ্গে বলেছেন—ভারতীয় ভাষায় বিগত বিশ বছরের মধ্যে কোনো উল্লেখযোগ্য উপন্যাস প্রকাশিত হয়নি। এর একটি কারণ হিসাবে তিনি বলেছেন যে, চাকুরী সূত্রে অনেক প্রতিভা নষ্ট হয়। যাঁরা ছাত্র-জীবনে চমৎকার গল্প লিখেছেন উত্তরকালে চাকরীতে জড়িয়ে পড়ে তারা একেবারে 'মূর্খ' (খুশবন্তের ভাষায় ইডিয়ট) হয়ে পড়েছেন। নোট এবং মেমোরান্ডাম ভিন্ন আর কিছু লেখার শক্তি তাঁদের নেই। যে-সব ভারতীয় ইংরাজী ভাষায় উপন্যাস লেখেন তিনি বিশেষ করে তাদের উল্লেখ করেছেন। ভারতীয় আঞ্চলিক ভাষা সম্পর্কে তাঁর জ্ঞান যে ভাষাভাষা সেকথা তিনি স্বীকার করেন। তৎসত্ত্বেও ভারতীয় লেখকদের সম্পর্কে তিনি নাম উল্লেখ না করে মন্তব্য করলেও ইংরাজী ভাষায় লেখকদের অবশ্য নামোল্লেখ করে সমালোচনা করেন।

তিনি বলেছেন—ভারতবর্ষের একটি প্রধানতম সাপ্তাহিক পত্রিকার সম্পাদক হিসাবে তিনি অজস্র ছোট গল্প নিয়মিত পেয়ে থাকেন। কিন্তু সবচেয়ে উৎকৃষ্ট গল্প আসে পশ্চিমবঙ্গ থেকে। তাঁর ধারণা ভারতবর্ষের সব শ্রেষ্ঠ গল্প লেখকরাই এই বাঙালী সম্প্রদায়ের।

অতঃপর তিনি বলেন—'আমি স্বয়ং আর উপন্যাস বা গল্প লিখবো না। কালি শুকিয়ে এলে লেখকের সেখানেই থামা উচিত। তাঁর ক্ষেত্রে তাই ঘটেছে।

এই বক্তৃতাটি যে বাংলা সাহিত্যের লেখক এবং সাহিত্য পাঠকদের কাছে নতুন চিন্তার খোরাক এনে দেবে সে বিষয়ে সন্দেহ নেই।

শারদ সংকলন

বৈতানিক—সম্পাদনা : ভবানী মুখোপাধ্যায়। এম সি সরকার অ্যান্ড সন্স প্রাঃ লিঃ ১৪ বঙ্কিম চাটুজ্জ্যে স্ট্রীট, কলকাতা-১২। দু টাকা।

সাময়িক সাহিত্যে ত্রৈমাসিক সাহিত্যপত্র 'বৈতানিক' একটি সুপরিচিত নাম বিশেষ করে সৎ সাহিত্য পাঠকের কাছে। বিষয়-বৈচিত্র্য এবং চিত্তাকর্ষী নিবন্ধ আলোচনায় পত্রিকাটি সকল বয়স এবং রুচির পাঠকদের সুদীর্ঘকাল ধরে মানসিক তৃপ্তিবিধান করে আসছে। আলোচ্য শারদ-সংকলনটির লেখক তালিকা এবং লিখিত নিবন্ধসমূহের দিকে নজর ফেরালেই তা স্পষ্ট হয়ে উঠবে। 'দেবী দুর্গার' বন্দনা করেছেন সূচনাতেই অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত। মনোজ্ঞ প্রবন্ধ লিখেছেন : মনোজ বসু ('যুগপুরুষ মুজিবর'), প্রবোধকুমার সান্যাল ('রাজা রামমোহন'), সন্তোষকুমার অধিকারী ('রাজা রামমোহন'), ডকটর আশুতোষ ভট্টাচার্য ('মেয়েলী রামায়ণ'), বিভা সরকার ('অবনী স্মৃতি'), ডকটর দ্বিজেন্দ্রলাল নাথ ('সাহিত্যে কালচেতনা'), ডকটর শুক্লা দাশ ('হাব্বা খাতুন ও কাশ্মীরী লোল')। গল্প লিখেছেন প্রখ্যাত কথাকার নন কিন্তু প্রতিশ্রুতি আছে এমন কজন তরুণ গল্পলিখিয়ে। নামের ভার না থাকলেও ধার আছে পূর্ণমাত্রায়। এঁরা হলেন : অশোককুমার সেনগুপ্ত, নির্মলেন্দু গৌতম, অমরেন্দ্র সান্যাল ও মিহির পাল। বিরস বাংলায় সরস রচনা বড়-একটা দেখা যায় না। বিশেষ করে শারদ-সংকলনে। প্রাত্যহিক জীবন থেকে একটি-দুটি ঘটনার ওপর জমিয়ে সরস কাহিনী : ডকটর সুনীল বন্দ্যোপাধ্যায় ('আমাদের পুরাতন ধোপা') ও সন্তোষকুমার দে ('কমপ্লিমেনটারি')। বিদেশী গল্প এবং বিদেশী উপন্যাস অনুবাদ করেছেন যথাক্রমে নির্মলেন্দু রায়চৌধুরী এবং সম্পাদক স্বয়ং। শারদ সাহিত্যে অনুপস্থিত এবং প্রায় অবজ্ঞাত অনুবাদ-সাহিত্য কর্মটি এ সংকলনে সমাদৃত হতে দেখে সাহিত্য পাঠকরা নিশ্চয়ই খুশী হবেন। সুসম্পাদনা ও সুনির্বাচিত রচনাসম্ভারের সন্নিবেশ গুণে 'বৈতানিক' শারদ সংকলনের প্রবাহের মধ্যে অনায়াসেই আপন বৈশিষ্ট্যে পাঠক সম্বর্ধনা লাভ করবে।

লোকসংস্কৃতি (প্রথম বর্ষ, দ্বিতীয় সংখ্যা) সম্পাদক : দুলাল চৌধুরী। অ্যাকাডেমি অব ফোকলোর। ২৬৫, ঘোষপুকুর পার্ক। কলকাতা-৩১। দাম দেড় টাকা।

লোকসংস্কৃতি চর্চার প্রসারের সংগে সংগে বাঙলা ভাষায় এই জাতীয় গ্রন্থ ও পত্র-পত্রিকার প্রচারও ক্রমশ বাড়ছে। অ্যাকাডেমি অব ফোকলোরের উদ্যম এক্ষেত্রে প্রশংসনীয়। সংস্থার মুখপত্র 'লোকসংস্কৃতি'র নির্বাচিত রচনাবলীর দিকে তাকালেই বেশ স্পষ্ট উপলব্ধি করা যায় এদের গবেষণার গভীরতা কত ব্যাপক এবং আন্তরিকতাপূর্ণ। বর্তমান সংখ্যায় লিখেছেন : চারুচন্দ্র সান্যাল (মেচ উপজাতির বিবাহ-সংস্কার ও পদ্ধতি), রবীন্দ্র মজুমদার (দুর্গাপূজার উৎস সন্ধানে), হরেন ঘোষ (নেপালীদের উৎসব : দশাই-তিহার) বিশ্বনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় (ভারতীয় 'কালচারাল অ্যানথ্রোপলজী' অনুধ্যানে সংগীতের ভূমিকা অসীমকুমার চট্টোপাধ্যায় (লোকনৃত্যে শাস্ত্রীয় নৃত্যের প্রভাব), আবদুল হাফিজ (লোকসংস্কার ও সংখ্যা মাহাত্ম্য), বিনয় ভট্টাচার্য (লোককথায় পটুয়া জাতির উৎস), বীণা মজুমদার (পূর্ব বাঙলার

বিবাহ-গীতি), মহম্মদ আয়ুব হোসেন (আঞ্চলিক শব্দ : বর্ধমান), তারাপদ সাঁতরা (মেদিনীপুরের জেলার বিরিঞ্চি পূজা), আবদুর বরখান (মুর্শিদাবাদের মুসলমান সমাজে লতার পূজা)। তাছাড়া আরো কয়েকজন লিখেছেন এবং লেখক পরিচিতি দেওয়া হয়েছে। দুটি পটের আলোকচিত্র এবং আরো কয়েকটি আলোকচিত্র আছে।

নহবৎ—সম্পাদকমণ্ডলী সম্পাদিত। ২নং হরিহরপুর। বারাসাত। ২৪-পরগণা। দাম দু' টাকা।

নহবৎ বাজার-চলতি রকমারি রচনার সংকলন নয়। সুস্থ জীবনধর্মী চিন্তার প্রসারে নহবৎ গোষ্ঠীর আন্তরিকতা স্পষ্ট লক্ষ্য করা যায়। মফঃস্বলে বাঙলা থেকে প্রকাশিত এই ধরনের উন্নত রুচির পত্রিকা খুব কমই চোখে পড়ে। বর্তমান সংখ্যায় প্রবন্ধ, গল্প, কবিতা, অনুবাদ কবিতা এবং বিচিত্র স্বাদের কয়েকটি রচনা লিখেছেন : বিজয় দেব, রথীন্দ্র ভট্টাচার্য, রঞ্জত শঙ্কর দত্ত, অমিয়শংকর দেওয়ান, উৎপল চক্রবর্তী, সুজিত মুখোপাধ্যায়, অমিতাভ চক্রবর্তী, সুভাষ সিংহ, তুষার সাহা, সনৎ মুখোপাধ্যায়, তরুণ সান্যাল, সত্য গুহ, শংকর দে, তুলসী মুখোপাধ্যায়, বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, অমিতাভ দাশগুপ্ত, তুষার রায়, রত্নেশ্বর হাজরা, অঞ্জন সেন, দীপেন রায় এবং আরো কয়েকজন।

নক্ষত্রের রোদ (শ্রাবণ-আশ্বিন)-সম্পাদনা : সব্যসাচী দেব এবং সুব্রত ভট্টাচার্য। ১১০।১ অশোকগড় পূর্ব। কলকাতা-৩৫। দাম এক টাকা।

প্রচলিত চিন্তা ও ধ্যান ধারণা থেকে বেশ কিছুটা স্বতন্ত্র মানসিকতার পরিচয় পাওয়া যায় পত্রিকাটি হাতে নিলেই। সমকালীন রাজনৈতিক ঘটনাবলী পর্যালোচনা করা হয়েছে। অনুবাদ কবিতা, অনুবাদ গল্প সংখ্যাটির বিশেষ আকর্ষণ। কবিতা লিখেছেন সুশান্ত বসু, সমর ঘোষ, সুশান্ত দত্ত, সুব্রত ভট্টাচার্য, অমিত দাশগুপ্ত, সুজন গুপ্ত, সব্যসাচী দেব। তাছাড়া আছে আরো কয়েকটি আলোচনা।

তরঙ্গিমা— সম্পাদক শ্রীহরিদাস ঘোষ। ৪০।১ বনমালি সরকার স্ট্রীট, কলিকাতা-৫ থেকে প্রকাশিত। দাম দু টাকা।

'তরঙ্গিমা'র শারদ সঙ্কলনটি হাতে করলেই প্রথমেই দৃষ্টি আকর্ষণ করে এর সম্পাদকীয় নিবন্ধটি। স্পষ্ট এবং নির্ভীক ভাষায় লেখা। মায়ের কাছে অভিমান এবং অভিযোগ করে বর্তমান পশ্চিমবঙ্গের সংকটের এক বৃহদ ছবি সম্পাদক তাঁর জোরালো লেখনীর মাধ্যমে তুলে ধরেছেন। সম্পাদক হরিদাস ঘোষের 'বঞ্চিতের মিছিল' একটি সম্পূর্ণ উপন্যাস। বর্তমান যুগের ধনিক শ্রেণীর অবিচার অত্যাচার এবং ভণ্ডামিকে কেন্দ্র করে রচিত। উপন্যাসখানি বেশ হৃদয়গ্রাহী। সদ্য পরলোকগত অমর সাহিত্যিক তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাণী সম্বলিত এই 'তরঙ্গিমা'র অন্যান্য লেখকদের মধ্যে আছেন সর্বশ্রী কবিশেখর কালিদাস রায়, দক্ষিণারঞ্জন বসু, নগরপাল আর এন চ্যাটার্জি, বিভূতিভূষণ চক্রবর্তী, জয়দেব রায়, গোরাচাঁদ নন্দী, পুষ্পকুমার পাল, অলোক ঘোষ, পঙ্কজ, রমেশ ধর, মিহিরকুমার মুরারি, অলোক কাঞ্জিলাল, অধ্যাপক সুশান্ত অধিকারী, দীপক চক্রবর্তী, সুবিমল, প্রদীপ পালচৌধুরী, অমরেন্দ্র বসাক, অমল ভট্টাচার্য, দীপককুমার পাল প্রভৃতি।

বেদুইন—সম্পাদক : সত্যেন্দ্রনাথ জানা। তমলুক রাজবাটী, তমলুক, মেদিনীপুর। দেড় টাকা।

পঞ্চম বর্ষের ৬ষ্ঠ সংখ্যাটি শারদ সংখ্যারূপে প্রকাশিত হয়েছে। গল্প, প্রবন্ধ, কবিতা, ভ্রমণ কাহিনী ইত্যাদি লিখেছেন পরিচিত এবং প্রতিশ্রুতিবান কথাকাররা। এঁদের মধ্যে আছেন ডকটর রমা চৌধুরী, ডকটর আশুতোষ ভট্টাচার্য, কুমারেশ ঘোষ, গোপাল ভৌমিক, ফণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, নচিকেতা ভরদ্বাজ প্রমুখ। মোহিনীমোহন গঙ্গোপাধ্যায়ের 'আগমনী' ও সত্যেন্দ্রনাথ জানার নাটক 'মধুরেন' উল্লেখিত হবার মতো।

সাহিত্য ও বিজ্ঞান—সম্পাদক : মুরারিমোহন চক্রবর্তী। সাহিত্য ও বিজ্ঞান পরিষদ, সোদপুর, ২৪-পরগণা। ১-৫০ পয়সা।

বিজ্ঞান ও সাহিত্যের রচনাসম্ভারে বিশিষ্ট এই পত্রিকাটিতে লিখেছেন : ডকটর সুরেশ মৈত্র, ডাঃ গোরাচাঁদ কুণ্ডু, কবিশেখর কালিদাস রায়, গোপাল ভৌমিক, জয়দেব রায়, ডকটর গোপেশচন্দ্র দত্ত নচিকেতা ভরদ্বাজ, ডঃ ক্ষেত্রপ্রসাদ সেনশর্মা, দিলীপকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, মাধবলাল বক্সী প্রমুখ। এই সংখ্যা থেকে ধারাবাহিকভাবে 'যৌনরোগ প্রসঙ্গে' লিখছেন 'সিফিলিস' গ্রন্থের লেখক গোবিন্দ বিশ্বাস।

চিকিৎসক সমাজ—সম্পাদক : ডাঃ অমল ঘোষ হাজরা। ১৫১ ডায়মণ্ডহারবার রোড, কলকাতা—৩৪। তিন টাকা।

সকল শ্রেণীর চিকিৎসকদের মুখপত্র 'চিকিৎসক সমাজ'-এর শারদ সংখ্যাটিতে সাহিত্য ও বিজ্ঞান বিষয়ক রচনার সন্নিবেশ সকল রুচির পাঠকদের খুশী করবে। গল্প, কবিতা, উপন্যাস, নাটক ইত্যাদি লেখকদের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখ্য হলেন : কবিতায় : বনফুল, ডাঃ কালিকিংকর সেনগুপ্ত, ছোট গল্পে : ডাঃ নির্মল সরকার, ডাঃ গোরাচাঁদ নন্দী, উপন্যাসে : সতু বদি ও ডাঃ বিশ্বনাথ রায়, বিশেষ রচনায় : আনন্দকিশোর মুন্সী, ডাঃ পশুপতি ভট্টাচার্য, ডাঃ অশোক বাগচী, বিজ্ঞান বিষয়ক রচনায় : ডাঃ গৌরীনাথ মুখোপাধ্যায়, ডাঃ দীনবন্ধু বন্দ্যোপাধ্যায় ও কবিরাজ শিবকালী ভট্টাচার্য।

গন্ধবণিক—সম্পাদক : নারায়ণচন্দ্র কুণ্ডু। ২১সি রাজেন্দ্রদেব রোড, কলকাতা—৭।

একান্ন বছরের আশ্বিন সংখ্যা 'গন্ধবণিক'-এর শারদ সংকলনে সাহিত্যের কোন বিভাগই উপেক্ষিত হয় নি। প্রবন্ধ, সাক্ষাৎকার, জীবনী, উপন্যাস, উপন্যাসোপম গল্প, গল্প, স্কেচ, কৌতুক নক্সা, বিচিত্রা বৈঠকী, চিকিৎসা বিজ্ঞান, খেলাধূলা, কবিতা, ভোরের আলো (শিশু-কিশোর বিভাগ) চলচ্চিত্র প্রভৃতি বিভাগের বিশিষ্টরা হলেন : শঙ্কর, শিবরাম চক্রবর্তী, চণ্ডী লাহিড়ী, বেবতীভূষণ, কাফী খাঁ, কৃষ্ণধন দে, পূর্ণচন্দ্র চক্রবর্তী, শান্ত মিত্র, সুধীর কর্মকার, রূপো মুখার্জি, অম্বর রায়, বিমল ঘোষ, ডাঃ মণীশচন্দ্র প্রধান। গল্প-প্রবন্ধগুলি সুলিখিত। অবনীন্দ্রনাথ সম্পর্কে দেবীপ্রসাদ রায়চৌধুরী (সাক্ষাৎকার : বিষ্ণু দাস) বক্তব্য শিল্পরসিকদের চিন্তার খোরাক যোগাবে। তরুণ লেখক সুখেন্দু ভট্টাচার্য লিখেছেন নতুন স্বাদের উপন্যাস 'বিবর্ণ ঘোড়া'। শিল্পী দেবীপ্রসাদ রায়চৌধুরীর গ্রুপ কম্পোজিশন-এর প্রতিলিপি, অজন্ত দে-র 'মিস আফ্রিকা, এসরাজ বাদনরত অবনীন্দ্রনাথ আর্ট প্লেটগুলি শারদ সংখ্যাটিকে বিশেষ মর্যাদা এনে দিয়েছে।

প্রাপ্তিস্বীকার

অভিনব অগ্রণী : সম্পাদক—দিলীপকুমার নাগ। ৮০ বৈষ্ণবপাড়া লেন, হাওড়া—১। এক টাকা।

ভুবন—সম্পাদক : নয়নকুমার রায়। ২ ভুবননগর, চন্দননগর, হুগলী। এক টাকা।

নতুন মুখ—সম্পাদক : ফণিভূষণ জানা। নোনাকুড়ি, বললুক-হাট, মেদিনীপুর। এক টাকা।

কিন্তু—পরিতোষকান্তি পাল, স্বপনকুমার প্রামাণিক। সপ্তক ১৪৮ এম বি রোড, নিমতা, কলকাতা—৪৯। পঞ্চাশ পয়সা।

পল্লীশ্রী—সম্পাদিকা : বিশাখা বিশ্বাস। শান্তিকুটির, মাধাইপুর, বীরভূম। এক টাকা পঁচিশ পয়সা।

মনন—সম্পাদক : আনন্দকুমার গঙ্গোপাধ্যায়। আনন্দভবন, ১১।৩, শশিভূষণ ঘোষ লেন, মাহেশ, রিষড়া, হুগলী। পঞ্চাশ পয়সা।

উন্মেষ—সম্পাদক : নৌশাদ মল্লিক। হিরণ্যবাটী, ধনিয়াখালি, হুগলী।

উদ্দীপ্ত—সুভাষচন্দ্র পাল। ৭৩, এম।৪ নিউ কেরল টাউন, জামসেদপুর-৩।

প্রতিশ্রুতি — মৃণালবন্ধু চৌধুরী। ৪২ গড়পাড় রোড, কলকাতা—৯। পঞ্চাশ পয়সা।

প্রতিবিম্ব — সম্পাদনায় প্রতিবিম্বগোষ্ঠী। ১১২ বি বি ঘোষ রোড, বর্ধমান। পঁচিশ পয়সা।

শতাব্দীর অভিশাপ (নাটিকা) — শংকর ভট্টাচার্য। এরু প্রকাশনী, ২৭ বাবুরাম শীল লেন, কলকাতা-১২। এক টাকা পঁচিশ পয়সা।

শেষবার

আনন্দ বাগচী

মনে হয় শেষবার চাঁদ উঠেছে শৈশবের বিস্মৃত শহরে
পোড়ো পাঁচিলের ধারে মজাদীঘি কিংবদন্তী ভরা
এখনো গ্রামীণ শব্দে বৃক্ষশাখা দোলে দ্বিপ্রহরে
বুকের গহনে বাজে আজো কার তবলা-লহরা।
সেই চেনা পদ্মা ভেঙে ফিরে আসছি গয়নার নৌকোয়
রূপসী বিলের মধ্যে যেন আশ্বিনের গন্ধ ভাসে,
মনে হয় শেষবার স্মৃতি ভীরু কিশোরীকে ছোঁয়
ভর দুপুরের ফেরিওলা শঙ্খচিল হাঁকে গভীর আকাশে।

ডিনামাইটের পরে মাথা রেখে শুয়ে আছে উলঙ্গ নগরী
নারীও নিঃশেষ; স্বপ্নে আগ্নেয়াস্ত্র বুকে বন্ধ ঘড়ি।
গীর্জায় মন্দিরে শুধু দমকলের ঘণ্টা বেজে যায়
আঁধার মগজে বাজে ফিরতি শব্দ ডায়াল করার,
তবু মনে হয় বুঝি চাঁদ উঠেছে, ফিরে আসছি গয়নার নৌকায়
শায়িত নারীর কাছে শেষবার, বিস্মৃতির কাছে শেষবার।

আবর্ত

অভয় বন্দ্যোপাধ্যায়

হিংসার সঙ্গে মিতালি পাতালে নিজেকে শূন্য মনে হয়;
চওড়া বুকে ঝকঝক করে নিষ্ঠুরতা।
আমি ইতিহাস দেখি, ইতিহাসের মানুষ
জীবন যৌবনের সন্ধিক্ষণে আলোছায়ার বিশালতা।
দেখি, স্বপ্নের মুহূর্ত মাপা হয়
জ্যামিতির কৌতুক সূত্রে;
জীবনের মর্মমূলে আশ্চর্য কুয়াশা।
এইতো জীবন—
চারিদিকে ছড়ানো নিষ্ঠুরতা আমার রক্তে
বর্শার মতো মাঝে মাঝে মাথা তোলে।
তবু এই মুহূর্তে
আমি জীবনের নতুন ইতিহাস দেখি।

প্রত্নতাত্ত্বিক

সন্তোষ কর

ঝুরঝুর করে ইট কাঠ পাথরের একগুঁয়েমি
পরাজয়ের বিষণ্ণ ক্লান্তিতে ঝরে পড়ল।
যন্ত্রণাক্ত বালুর মেঝেয়
দুটো বিমের উপর ভর করা শরীর আজ অবসন্ন প্রাসাদ;
মাটির মাধ্যাকর্ষণ ছাড়িয়ে
মাথা তুলে দাঁড়াবার সরব প্রতিবাদ
আজ আর নেই!

এখন শুধু একটানা আকাশকে তাকিয়ে দ্যাখা :
বিরল সাদা মেঘগুলোর বৈচিত্র্য
রিটায়ার্ড হাতে ডাকপিয়নের চিঠির মতোই সুসম্বাদ;
এ ছাড়া নিঃসঙ্গ বিকেল।

অথচ অদূরেই সমৃদ্ধির উজ্জ্বল বন্দর!
ট্রামবাসগুলোর ভিড়ে পিঁপড়ের ব্যস্ততা।
বিক্ষুব্ধ নাবিকদের হাতে মৃত্যুর সচিত্র বিজ্ঞাপন
কিংবা লেকের ধারে মেয়ে-মাখামাখির উৎকৃষ্ট পানীয়
সন্ধ্যের সুদৃশ্য কাপে উপচে পড়ছে।

বাঁশি বাজিয়ে জাহাজ এসে থামলে

মাঝে মাঝে কিছু ইতিহাসের ছাত্র আমাকে ঘিরে ধরে,
আমার হাতটা পাটা মাথাটা খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দ্যাখে;
এবং অবশেষে আইগ্লাসে কিছু বিসদৃশ ধরা পড়তেই
ওরা সব ছুটে পালায়।

এই বিংশ শতকেও
আমার বুকের উপর
বহু আবিষ্কৃত কোনো শিলালিপিকেই
দেখতে পেয়ে হয়তো।

(উপন্যাস)

সুবনশিরি

অমরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

।। এক ।।

সুবর্ণশ্রীর জলে ঝাঁপ দেবে মেঘনাদ। তাই দূর থেকে ডিগবাজী দিয়ে এগিয়ে চলেছে। ওদিক থেকে আসছে মেয়েরা। বাঁই-বাঁই করে ঘুরছে মেঘনাদের বলিষ্ঠ দেহটা। ঘূর্ণি ধরেছে মাথায়—চোখেও দেখে না, কানেও শোনে না। ছেলেটা চলে যায় মেয়েগুলোর মাঝখান দিয়ে। এপাশ ওপাশ সরে গিয়ে তারা রক্ষা পায়—খিলখিল করে হেসে ওঠে।

সুবর্ণশ্রী নদীতে স্নান করে সখীদের সঙ্গে ফিরে আসছে শর্মিষ্ঠা। গায়ে ভিজে কাপড় জড়ানো। লাফিয়ে-ঝাঁপিয়ে কল-কল-রবে বনবীথিকা মুখরিত করে চলেছে সখীরা। তাদের সঙ্গে তাল রাখতে না পেরে শর্মিষ্ঠা বেশ একটু পিছিয়ে পড়েছে। এধার-ওধার ঘুরেও সে রেহাই পায় না, পড়ে গেল একেবারে মেঘনাদের সামনে।

হঠাৎ তীক্ষ্ণ কন্ঠের স্বর!

মেঘনাদও থমকে দাঁড়ায়—একেবারে শর্মিষ্ঠার মুখোমুখি। টালটা সামলে নিয়েছে কোনমতে—নইলে পড়ে যেত তার গায়ের ওপর। তবুও সে অপ্রতিভ হয়।

সবে ঘাট থেকে উঠেছে, জল ঝরছে ভিজে কাপড় থেকে। কাপড়টা জড়িয়ে রয়েছে শর্মিষ্ঠার দেহের রেখায় রেখায়। নিষ্ফল আবরণের ভিতর থেকে ঠিকরে আসে দেহসৌষ্ঠব, যৌবনের দীপ্তি। সে দীপ্তির প্রভায় মেঘনাদের চোখদুটো মোহমুগ্ধ হয়ে যায়, মুহূর্তে মাতাল হয়ে ওঠে তার মন। সারাদিন কর্মরত পেশীগুলো সারা দেহে যে উদ্দাম উত্তেজনা এনেছে, দিনের প্রখর রৌদ্র-রশ্মির তেজ মেঘনাদের মস্তিষ্কে যে আগুন জ্বালিয়েছে সেই আগুনের আভায় তার চোখে পড়ে একটি তরুণীর পরিপুষ্ট অবয়ব, যেন একটি জীবন্ত সুষমা। কামনার বিকাশোন্মুখ রক্তের ঔজ্জ্বল্যে ঝলমল করছে। মেঘনাদের নিরঙ্কুশ দৃষ্টি তা লেহন করে উন্মাদ হয়ে ওঠে, লুব্ধ ভ্রমরের মতো। অন্তর ছুঁয়ে উঠে আসা রক্তের ঝলকে রক্তিম তার মুখ। সেই রক্তিম মুখে ফুটে ওঠে একটা লোলুপ হাঁসি। সে বলে—হাই রে শর্মি!

সুবনশিরির টি এস্টেট-এর কলম-কাটার (চা-গাছ ছাঁটাই করবার কাজ) সর্দার রাঘবের একমাত্র মেয়ে শর্মিষ্ঠা। তন্বী, শ্যামা, সুগঠিতা, ষোড়শী, মুখে তার শিক্ষা ও বংশ গরিমার ছাপ—সযত্ন-সংযত চলাফেরা।

মেঘনাদের অমন চাহনি, তার হাসি শর্মিষ্ঠার মোটেই ভাল লাগে না। বড় অস্বস্তি বোধ করে। মেঘনাদের অমন অশিষ্ট উন্মাদ আচরণে হতবুদ্ধি হয়ে পড়ে শর্মিষ্ঠা।

চাহনির প্রতিবাদে চাহনি!

নিজেকে রক্ষা করতে শর্মিষ্ঠা রুখে দাঁড়ায়—কটমট করে তাকিয়ে থাকে মেঘনাদের পানে।

শর্মিষ্ঠার মুখের আভা মেঘনাদের সারা দেহে এনে দেয় রক্তের ঝলক। তার মনের সকল বন্ধন শিথিল হয়ে পড়ে। সে খপ করে শর্মিষ্ঠার বাঁ-হাতটা নিজের ডান হাতে চেপে ধরে। আবার বলে—হাই রে শর্মি!

আরো কিছু চায়—সময় হল না, সুযোগ পেল না।

শর্মিষ্ঠার দুটি হাত এক সঙ্গে সক্রিয় হয়ে ওঠে। এক হাত সজোরে পড়ে মেঘনাদের গালে, আর এক ঝাঁকানিতে ছাড়িয়ে নেয় অপর হাতটা। সঙ্গে সঙ্গে চিৎকার করে ওঠে।

ঝোপঝাপের আড়াল থেকে বেরিয়ে আসে সখীরা, যেন এক ঝাঁক পাখী। কিচির মিচির করে ওঠে—কী হোইলো রে?

মেঘনাদের সকল উদাম যেন মুহূর্তে অন্তর্হিত হয়—তার মনের সকল আয়োজন চুরমার হয়ে পড়ে। গালে হাত দিয়ে ফ্যাল-ফ্যাল করে তাকিয়ে থাকে।

উন্মত্ত মহাসাগরের ঢেউ-এর মত তরঙ্গায়িত পর্বত বেষ্টিত একটি দেশ—অপূর্ব মোহময় সুষমা শোভিত, প্রাচীন কাহিনী-কিম্বদন্তী ও রূপকথার রহস্যজালে আবৃত কবিমানসের ধাত্রী। তৃণ-মাংস ভোজী হিংস্র জন্তু অধ্যুষিত মহাঅরণ্য আকীর্ণ, ধরিত্রীর স্তন-সুধা-সিক্ত, হিমালয়ের তুষার বিগলিত সলিল বিধৌত উপত্যকা। যে দেশের প্রস্তরের মুখ আজও স্মরণ করিয়ে দেয় প্রাগৈতিহাসিক যুগের কথা—সাক্ষ্য দেয় গিরিবর্ত্ম বিভিন্ন নরগোষ্ঠীর অন্তঃপ্রবাহের কথা, স্মরণাতীত দিন থেকে অদূর অতীত পর্যন্ত। যে দেশের জলস্থল পৃথিবীর আদিম নরগোষ্ঠীর উর্বর রক্তে রঞ্জিত—গগনচুম্বী পর্বত পরিবৃত উর্বর উপত্যকা মানুষের অন্ন সমস্যার সমাধান করে—প্রাকৃতিক সৌন্দর্য মানুষের মনোরম, ভাবময় জীবনে ভাবরসের সঞ্চার করে সেই দেশ। যে দেশের নদী-নদ, জনপদ, পর্বতের নামের মধ্যে বিভিন্ন মানুষের যাযাবর জীবনের স্থিতিবিন্যাসের প্রমাণ পাওয়া যায়, বিভিন্ন মানুষের বর্ণ-রক্ষণ ও বর্ণমিশ্রণের প্রমাণ পাওয়া যায় সেই দেশ।

রামায়ণ মহাভারতে উল্লিখিত কৌলীন্যের দেশ—পুরাণ কথিত মানুষের কীর্তিবীর্যের দেশ। দেবাসুর অধ্যুষিত দেশ।

আর্য-পূর্ব যুগে বিভিন্ন আদিম নরগোষ্ঠীর দেশ—বিভিন্ন নরগোষ্ঠী উদ্ভূত বর্ণসঙ্করের দেশ; মঙ্গোল রক্ত মিশ্রিত জাতির উপনিবেশ প্রাগয্যোতিষপুর।

হরপার্বতীর প্রসাদ-সলিল বিধৌত পবিত্র ব্রহ্মপুত্রের উপত্যকা—ভীষ্মকের বিদর্ভ, বাণরাজার শোণিতপুর, নরকাসুর শাসিত প্রাগজ্যোতিষ, ভাস্কর বর্মণের কামরূপভুক্তি, অহোম শাসিত অসম—ইংরাজ বিজিত অ-সম অসম।

ভারত স্বাধীন হল: বিভিন্ন পাহাড়ের বুক জুড়ে বিভিন্ন নরগোষ্ঠীর বংশধরের সাবলীল স্বতন্ত্র জীবন প্রবাহে স্বায়ত্ত শাসন সুনিয়ন্ত্রিত করবার জন্য কত বিধিব্যবস্থার প্রবর্তন হল : নাগারা নাঙ্গা থাকতে চাইল; লুসাই হল মিজোরাম, খাসিদের বাঁশীর চলল ভাঙ্গাগড়া, গারোদেরও রূঢ় হতে হল; অকারা বাঁকা পথ ধরল না, ডাফলা থাকল গামলার এক ধারে. কয়েক লক্ষ আবর অধ্যুষিত আবর পাহাড় রইল উত্তর-পূর্ব সীমান্ত শাসনের আবরণে।

আসামের উত্তরে সেই আবর পাহাড়ের পাদদেশে।

বিস্তীর্ণ প্রান্তর। মাঝে মাঝে উঁচুনীচু ঢিপি। উত্তরে আবর পশ্চিমে ডাফলা পর্বতমালা—দূরদিগন্তে যেন ধরে রেখেছে

আকাশটা। উত্তর-পশ্চিম কোণে হিমাবৃত অতিকায় হিমালয়—সূর্যকিরণে নানা রঙে ঝকমক করে, চন্দ্রালোকে পড়ে থাকে একরাশ তুলার মতো।

আবর পাহাড় বেয়ে নেমে এসেছে একটি উন্মত্ত উপলব্যথিত স্রোত। সুবর্ণশ্রী নদী—প্রান্তরের অন্তর চিরে মিলেছে ব্রহ্মপুত্র নদের উত্তর কোলে, অদূরে দক্ষিণে। ব্রহ্মপুত্র ও সুবর্ণশ্রীর সংযোগ—সুবনশিরি মুখ।

সুবর্ণশ্রীর পূর্ব কূল ধরে কিছু উত্তরে এক চা-বাগান—সুবনশিরি টি এস্টেট। শাল-শিরীষের ছায়ায় ঢাকা পূর্ব-পশ্চিমের প্রশস্ত একটা পথ চা-ক্ষেতটাকে দু-ভাগে ভাগ করে মিলিয়ে গেছে সুবর্ণশ্রীর কোলে একটা বাঁধানো ঘাটে। তারই পাশে ফলের বাগানের ভিতর দিয়ে চলেছে পাতা তোলার মেয়েরা—শর্মিষ্ঠার সখীরা।

পশ্চিম দিগন্তে ডাফ্‌লা পাহাড়ের মাথার আড়ালে সূর্যদেব তখনও দীপ্তি-মান। গোধূলির দেরি নেই।

রক্তিম আকাশে ভাসাভাসা মেঘের কোলে দুতে অপসৃয়মান নানা রঙের খেলা। পলকে-পলকে কত রঙের খেলা। বনতলে কুজন-গুঞ্জন, তরুণীর কল-কাকলি মুখর বসন্ত বাতাস।

—কী হোইলো রে শর্মি ? হেসে গড়িয়ে পড়ে সখীরা।

—শর্মিকে ধর নারে মেঘু! কেউ বা খিলখিলিয়ে ওঠে।

আর কোন কথা নেই। একটি শিকার—আর একটি শিকারী যেন। সব ভেস্তে গেছে। তবুও বড় ব্যস্ত, বড় অস্থির। অন্য কোন দিকে চোখকান দেবার ফুরসৎ নেই তাদের—মেজাজও নেই।

দেহের হিল্লোল, কণ্ঠের কল্লোল, হাসির জলতরঙ্গ। সখীরা এগিয়ে আসে কাছে।

—ঈস্ রাম! শর্মি মারি দিল কেনে রে মেঘু?

—তুঁ এত্‌না যোয়ান মরদ—আরু এ'টা মাইকী মানুর থাপ্পড় খাইলি!

—খাইলি তো। মেঘুর জবাবে যেন লজ্জার বাহাদুরী।

—খাইলি তো! -বেহায়া জ—! জহরা-র (বেজাতক) জ-পর্যন্ত বলে থেমে যায় শর্মিষ্ঠা।

মেঘু হাসে—থাপ্পড় বি দিলি, আউর খং (রাগ) বি উঠাইলি!

শর্মিষ্ঠা ফুঁসে ওঠে—দূর দূর, বেহায়া নিলাজ!

সখী হাসে—হাঁ, উ'র তো লাজ নাই আছে—সি খাতিরে থাপ্পড় তো খাইলো—

—তুঁ আবার খং উঠাইছিস কেনে রে?

সখীদের ধম্‌কে ওঠে শর্মিষ্ঠা—মেঘুর পানে তাকিয়ে থাকে আহত ফণিনীর মতো।

সুবর্ণশিরি চা-বাগানের পাতা-তোলার সর্দার রাবণের ছেলে, মেঘনাদ। সুশ্রী, বলিষ্ঠ, পেশল, গৌরাঙ্গ যুবক। কর্মের তৎপরতা, শক্তির নির্ভীকতা, অশিক্ষার নির্বিকারত্ব ভরা মুখ—চোখে তার সহজাত বুদ্ধি-নম্রতা। বাধাবন্ধহীন চালচলন। চোখ দুটো তার কোথাও স্থির রাখতে পারে না—একবার মাটিতে একবার শর্মিষ্ঠার মুখের ওপর, তার সমস্ত দেহের ওপর ঘুরে বেড়ায়। মেঘনাদের অজ্ঞাতে ডান হাতটা গাল বেয়ে উঠে যায় নিজের মাথাটাকে সান্ত্বনা দিতে।

শর্মিষ্ঠার স্থির প্রখর দৃষ্টির ওপর আবার মেঘনাদের চোখ পড়ে, তার মুখ ফোটে—ঈঁ রকম ভালি (তাকিয়ে) আছিস কেনে রে শর্মি ?

নিজের নামটা অপরের মুখে বহুভাবে বিকৃত হয়ে রোজই শর্মিষ্ঠার কানে আসে। আশৈশব মেঘনাদের মুখেও সে তেমন শুনে আসছে। কখনো কিছু মনে হয়নি। কিন্তু সেদিন মেঘনাদের সব কিছুই তার অসহ্য লাগে। এক অজানা পরিস্থিতির আশঙ্কায় কেঁপে ওঠে তার মন। তাই মেঘনাদের আচরণ, অমন দরদ-ঢালা কথা, তার নামের বিকৃতি সবই বেখাপ্পা লাগে। সে উত্ত্যক্ত হয়, জ্বলে ওঠে।

—তুঁ'র পানে ভালি থাকতে মোর দায় কাঁদিছে। বলে, শর্মিষ্ঠা মুখ ফিরিয়ে নেয়। নিজের পিঠ দিয়ে আড়াল করে দেহটাকে, মেঘনাদের দুষ্ট দৃষ্টির কবল থেকে রক্ষা পাবার জন্য।

ধাক্কা লেগে মুখর মূক হয়—আবার মূক মুখর হয়ে ওঠে। মেঘনাদ স্থান-কাল বিবেচনা করে দেখল না। একান্ত নিভৃতের কথাটা নিতান্ত নির্বোধের মতো অকস্মাৎ রাস্তার কোলাহলের মধ্যে ফেলে দিতে যায়। বলে,—হামার বলব-লগা (বলার মতো) বহুত্ বাত্ আছিলু রে, তুঁ না দেখ্‌লে হামি কাহি কি রকম?

কথাটা তেমন কিছু নতুন নয়। এমন সে অনেক বলেছে—শর্মিষ্ঠাও শুনেছে। কান দিয়ে না হলেও চোখ দিয়ে শুনেছে, না হলেও মন দিয়ে শুনেছে। কিন্তু আজ মেঘনাদের কথা বলার ভাবভঙ্গির যতখানি পরিবর্তন হয়েছে তার চাইতে অনেক বেশী পরিবর্তন হয়েছে শর্মিষ্ঠার। বেচারা জানে না—যে মন একদিন মেঘনাদের জন উদ্‌গ্রীব হয়ে থাকত, সে মন পুড়ে ছাই হয়ে গেছে, অভিমান-অপমানের চাপে ভূগর্ভস্থ আগ্নেয় শিলার মতো জমাট বেঁধে গেছে।

শর্মিষ্ঠা তাচ্ছিল্য করে—মেঘনাদের কথায় তার কোন দরকার নেই।

মেঘনাদ তার মাঝে খুঁজে পায় শর্মিষ্ঠার আবদ্ধ অভিমান।

কৌতূহলি মেয়েরা এগিয়ে যায়, হাসে। বাল্য-বান্ধবীদের ঐ হাসিই মেঘনাদের ভরসা। যে কথা সে বলতে চায় তার জন্য মুহূর্ত অপেক্ষা করতে পারে না। বলে—বহুত্ দিনর বাত্ হামার বুকের ভিতর জাপি গুমরি আছে রে।

সখীদের মনে জেগে ওঠে কৌতুক। শর্মিষ্ঠা প্রমাদ গণে। সে ধমক দেয়—চুপ থাকিবি। লাজ নাই আছে?

—লাজ!

বাল্যের সাথী—তাদের সামনে লজ্জা করবার কি আছে? লজ্জার বাঁধ ভেঙে দিয়ে মেঘু বলে—এত্‌না দিন তো চুপ কইরে ছিলাম রে। এতোদিন তুঁকে দেইখে আসেছি, আউর কেত্‌না মহু তাইবে আসেহি। দিনমে কাম কোরতে নাই পারছি, রাতি টোপনি (ঘুম) নাই আসছে।

সখীদের হাসি ফেটে পড়ে।

রাগে দিশাহারা শর্মিষ্ঠা। মারমুখী হয়ে সে ঘাড় নাড়ে—তু'র টোপনি নাই তো মোর কী আছে?

মেঘনাদ ভেঙে দিতে চায় তার অভি-মান। বলে—তুঁ'র কারণেই তো মোর নিদ্ নাই রে।

বিরক্তির আসনে ভালবাসার স্থান হয় না। শর্মিষ্ঠার চোখ থেকে ঠিকরে পড়ে রাগের আগুন। কণ্ঠে মেঘেরই নাদ—দূর হ ইয়ার পরা (এখান থেকে)—বেহায়া!

রাগ দিয়ে প্রেমও দগ্ধ করা যায় না। শর্মিষ্ঠার চোখের আগুন মেঘনাদের গায়ে লাগে—তা পোড়ায় না, ঠাণ্ডা করে। সারসের নীরস কণ্ঠে দোয়েলের গান শোনে, হারিয়ে ফেলে নিজেকে। শর্মিষ্ঠার প্রীতি-মমতার দ্বারে সে দাঁড়ায়, যেন এক শাশ্বত ভিখারী। বলে—ঈস্‌রাম! ইমান খং (রাগ) করছিস কিয় (কেন)? চাইল (দেখ) তর কারণে (তোর জন্য) ভাবি ভাবি কি মান দুব্‌লা হই গেছু!

কথার সঙ্গে মেঘনাদের হাত দুটো চলে যায় দক্ষিণে ও বামে অর্ধমণ্ডলাকার রেখা টেনে। হাওয়ার গায়ে যেন উৎকীর্ণ করে তোলে নিজের বিরহ-দগ্ধ অর্ধনগ্ন দেহ।

শর্মিষ্ঠা তাকায় না। মুখ ফিরিয়ে বিড়-বিড় করে—দুব্‌লা কিয় (কেন)—তয় মরি গেলে মোর কি আছে?

ব্যথার গভীর স্পর্শে বেজে ওঠে বতীর কণ্ঠস্বর—ছিঃ ছিঃ! এমন বলে? আমাদেরও ভাইবোন আছে—ওর মা শুনলে কত কষ্ট পাবে!

বতীর মমতা মেঘনাদের মনে জাগিয়ে তোলে ভালবাসার ব্যথা।

শর্মিষ্ঠা মচকায় না। দোষটা ঢাকতে ওপর-চাপ দিয়ে কথা বলে। ঘরে ফিরে সেও মাকে জানাবে—তাদের সঙ্গে এসে কি দিক-দারি, কি মুশকিলেই না পড়েছে সে।

ওরাও ছেড়ে দেবার পাত্রী নয়।

হেসে কাত হয় কৌত, বলে—কবে কেমন করে মেঘুর চোখে 'সুর্মা' লেগেছিল তা'ও জানাবি।

খেঁদি ঘাড় হেলিয়ে চায় কৌতর পানে—'সুর্মা' মুছে মেঘুর চোখে কেতকীর বীজ ছড়িয়ে দে রে।

বাতাসী টিপ্পনী কাটে—আহা! বেচারার চোখ দুটো অন্ধ হয়ে যাবে।

কৌতর কণ্ঠ হেলেদোলে—ভয় নাই রে, 'সুর্মার' আবাদে কেতকী ফুটবে না।

গেনী জ্ঞান দেখায়—তোরা থাম! যত বাজে কথা! মেঘুর কথাটা শোনা হল না। —বলরে মেঘু—

শর্মিষ্ঠা চলে যেতে চায় সেখান থেকে। বাতাসী চেপে ধরে তার হাত দুটো।

গেনী হাত নাড়ে—শর্মিষ্ঠার মুখের ওপর। তাকে শুনতে হবে না কিছু—তারাই শুনবে।

মেঘু হতাশ হয়। ওর কথা, ও যদি না শোনে—

গেনীর চোখদুটো বড় হয়—তুই কি বোকা হলি রে! আমরা শুনলে, ওকি না শুনে থাকবে নাকি?

—আর ও শুনলে, আমরা কি—

কেতি মুখ ভার করে—তোর যদি কোন গোপন কথা থাকে, তবে আমরা যাই।

কেতির কথায় সায় দিয়ে সবাই এগিয়ে যেতে চায়। শর্মিষ্ঠা টেনে ধরে রাগ করে।

—না, কেন যাব? মেঘুর কথাটা শুনব, তবে যাব।

শর্মিষ্ঠা মুখ ফেরায়—তবে তোরা থাক, আমি—

আঁচলটা কোমরে জড়িয়ে কেতি ধমক দেয়—এখন কে যেতে চাইছে? চুপ করে দাঁড়া।

—বল ভাই মেঘু।

—ঘরে ফিরতে আন্ধার হবে।

—শুরুমির পায়ে কাঁটা বিন্থে পারে।

—বল্-বল্, ভিজে কাপড়—চটপট বল।

কথাটা মেঘুর মনের একান্তে অনেক দিন ধরে চাপা ছিল। শর্মিষ্ঠার সামনা-সামনি হতে হঠাৎ তার সমস্ত সংযমের বাঁধ সেদিন ভেঙে যায়। তখনই তা গড়িয়ে ফেলে দিতে চায় শর্মিষ্ঠার অন্তরে। তার রাগের স্পর্শে তা রাগিনীর মতো মুখর হয়ে ওঠে। কিন্তু এতগুলো কৌতুক-কৌতূহলের দোলা লেগে তা অন্তর্মুখী হয়ে যায়। লজ্জা নয়তো সংকোচ বা অমনই কিছু। মেঘুর আঙুলগুলো তার মাথার চুলের গোড়ায় কি যেন একটা খুঁজে বেড়াতে থাকে। সে বলে—কি বলব সব ভুলে গেলাম।

সখীরা হেসে ওঠে—ভুলাই গেলি!

—ইমান ডাঙ্গর কথা! এত্না দুখ্ করলি—

—হামুদের বাট আগলি ধরলি—

—তোর কথা শোনাবার জন্য আমরা শর্মিকে ধরে রাখলাম।

—আর তুঁ ভুইলে গেলি!

এদের সব কথার প্রতিক্রিয়া হল শর্মিষ্ঠার চোখেমুখে, সে রাগে ফুলছে।

এমন মজার কথা! ভুলতে দেবে না ওরা।

বতী শাসন করে, সবাই যেন চুপ থাকে। আবার মেঘুর কথাগুলোর পুনরাবৃত্তি করে মনে করিয়ে দেয় তার বক্তব্য।

মেঘুর হাসিটা যেন ফ্যালফ্যালে—হাঁ, মনে পড়েছে।

—পড়েছে? সখীরা ঘিরে দাঁড়ায়।

ব্যাগ পাইপ-এর থলিটা ভরে গেছে। শর্মিষ্ঠা বেজে ওঠে—তবে আমি যাই। তোরা কর ইয়ারকি-ধামাশী, যত পারিস। মাকে বলব—

—আবার রাগ করবি তো মেঘু আবার ভুলে যাবে। শুধু শুধু দেরী হবে—চুপ থাক!

—আয় রে মেঘু, দেখি আমরা যদি কিছু করতে পারি।

—সব ওলট-পালট হয়ে গেছে। কোন্‌টা আগে বলব, কোন্‌টা পিছে—

—আগেরটা আগে বল।

—সিটাই তো বুঝতে নারছি।

—তুই বলে যা, আমরা বুঝে নেব।

—কিন্তু যদি শর্মা—

ঝাঁউ ঝাঁউ করে ওঠে শর্মিষ্ঠা—তোর কথায় আমার কিছু হবে না। আমার নাম মুখে আনবি না, অমন গো-মুখ্যুর মুখ থেকে তা বার হবে না।

তবু মেঘু হাসে—সত্যি, জিব বৌল্টে (উল্টে) যায়, তবু ওটা পারি না। অনেক চেষ্টা করি, তবুও—

—তোকে পারতে হবে না! তুই মর মর! বলে, মাথা ঝাঁকিয়ে চলে যেতে চায় শর্মিষ্ঠা।

বোবা হয়ে গেল মেঘনাদ। এতদিন তবে কি দেখেছে, কি ভেবেছে? ফুলে ওঠে বুকটা—রাগে নয়, দুঃখে অভিমানে। নাঃ আর কিছু বলবে না। চোখে পড়ে শর্মিষ্ঠার মুখ। যেন সেই মুখ! যে মুখের ধ্যান সে করে আসছে এতদিন। মন ফিরে আসে। তবে কার কথা শুনছে?—নাঃ! আজই শেষ করতে হবে।

খেঁদির মুখ দেখে সবাই চুপ! গোমরা মুখে শর্মিষ্ঠার পানে তাকিয়ে আছে খেঁদি। একটা কাজ পায় সে। শর্মিষ্ঠার চোখা নাকটা ভোঁতা করে দেবে—তুই লেখাপড়া-করা ছোয়ালি (মেয়ে)—আমরা পাতা তুলে খাই। তোর নামতো আমরাও বলতে পারি না, তোর বাপ-মাও পারে না। তাতেই তোর এত গরব!

—বাবা—বাবাঃ!

এক ঝঞ্ঝাটের ওপর আর এক ঝামেলা! এদেরই সঙ্গে শর্মিষ্ঠার চলাফেরা। সে মিটিয়ে নিতে ব্যস্ত হয়।

হাসির ঢেউটা ঠোঁট দিয়ে চেপে রাখে গেনী, চোখদুটো করে গম্ভীর। বলে—তবে চুপ থাক। আগে মেঘুর কথাটা শুনি—পরে তোর বিচার হবে। —আয়রে মেঘু?

—কেনে ভাত খাঁতে নাই পারছিস্ রে?

—কেনে কাম কোরতে ন'র্‌ছিস্ রে?

—রাতি নিদ্ নাই আইছে—

যেন তুবড়ি ফাটল। শর্মিষ্ঠা ঠোঁট জোড়া ছাড়িয়ে নিল নিজের দু-পাটি দাঁতের চাপ থেকে—কেন মরতে এলি?

দে-খ! কথা ভেঙে দায় বাড়াবি না!

শর্মিষ্ঠা মুখ ফেরাল।

—বলরে মেঘু, ভিজে কাপড়—আর থাকতে পারছি না। জল্‌দি বল।

পদে পদে বাধা। এমন্ করে কি এমন কথা বলা যায়? এ যেন টেনে বার করা। মেঘুর হাতটা তার মুখটাকে পালিশ করে নেয়। মিনমিন করে বলে—কথাটা কি জানিস? —কোন ধরনে কথাটা পাড়ব?

—ভাল করে বল, আমরা যাতে বুঝতে পারি। বেলাটা (সূর্য) উঠলে চা-পাতির কুঁড়ি যেমন মুকুলি ওঠে—

গেনীর কথাটা মেঘুর মনের মধ্যে সব গোছগাছ করে দেয়। সে তার রেশ টেনে বললে—মুকুলি ওঠে! ঠিক ঠিক। কে যেন একদিন মুকুলি উঠেছে। আর আমার মনেও কুঁড়ি ফুটিয়ে তুলেছে।

—তাই নাকি রে? বল বল—

—হাঁ, একটা পুলি (চারা)।

দিনরাত ওদের গাছগাছড়া নিয়ে কাজ। তাই গাছের সঙ্গে জীবনের ধারা মিলিয়ে কথা বলতে ওরা জানে।

—একটা পুলি! মেঘু বলে—সেই পুলি আমার চোখের সামনে বড় হয়েছে। একদিন তাতে কুঁড়ি ধরে—আজ তা ফুটে উঠেছে। সেই ফুলের গন্ধ! আমার মনটাকে পাগল করে তুলেছে।—এই কথাটা মনের মধ্যে চেপে রেখে বড় কষ্ট পাচ্ছিলাম—আজ হালকা হলাম।

—হালকা হলি?

—হাঁ।

যতখানি উৎসাহ নিয়ে সবাই কান পেতে ছিল, ততখানি নিরুৎসাহ হল। মেঘুর মুখে মুখে পালা গান। ছেলেমেয়েদের কত কথা শিখিয়ে দেয় সে। সবাই ভেবেছিল তেমনই ধরনের কত কথা শুনবে। তার কিছুই হল না। ওরা বোঝে না—পালাগান আর নিজের ভালবাসার কথা বলা, দুটো এক জিনিস নয়। তবুও বেয়েচেয়ে দেখতে চায় তারা।

গেনী বলে—বাস্, এরই মধ্যে হালকা হয়ে গেলি?

মেঘু বোঝে না গেনীর কথাটা। সে যখন হালকা হয়েছে, তখন শর্মিষ্ঠাও হালকা হয়ে প্রজাপতির ডানায় বসে উড়ে আসবে। তাই বলে—হাঁ শর্মার নামটা আমি শিখে নেব। ও যদি মরম করে শিখিয়ে দেয়—

শর্মিষ্ঠার গায়ে যেন জল-বিছুটি লাগে। সে খেঁকে ওঠে—আমায় অপমান করাবার জন্য ধরে রেখেছিস তোরা। এই অসভ্যটার মুখ দেখতে চাই না, জংলীটা ফের আমার নাম—

অসভ্য! জংলী! মেঘুর চোখদুটো ঘুরে আসে সকলের মুখের ওপর দিয়ে।

জল-বিছুটির ডগাটা সখীরা ভাল করে বুলিয়ে দেয় শর্মিষ্ঠার গায়ে, বলে—কি এমন খারাপ কথা বলেছে মেঘু? নামটা শিখাই দিব কহিছে—তো এত্না খং (রাগ) উঠাই দিলি!

—আর ন্যাকামি করতে হবে না। ইতরটা জানে না আমি কার ছোয়ালি? ওর আর আমার মধ্যে কতখানি ভেদ বোঝে না?

কথাটা গোলমেলে হয়ে গেল। সখীরা ধাঁধায় পড়ল।

মেঘু বিনয় করে—জানি তোর বাপ পুরানো সর্দার—আর আমার বাপ নতুন। এই কথা?—

শর্মিষ্ঠা নিরুত্তর।

মেঘু বলে যায়—আমার বাপ এতদিন সর্দার হয়নি, আমিও বলিনি কিছু। তোর বাবা কলম-সর্দার আর আমার বাবা পাতা-তোলার। তাই যদি তুই ধরে থাকিস তো বল—আমি কালই বড়সাহেবকে ধরে বাবাকে

রাবণ-সর্দার বলে যেন। বড় শর্মা, তাতে হবে তো?

শর্মিষ্ঠার মনের গগনে তখন বৈশাখের উগ্র সূর্য। যেন স্টীম-ভরা বয়লারের এগ-জস্ট-পাইপটার মুখ খুলে গেল—ফের আমার নাম করছিস! তোর ফচ্‌টামি বেড়েছে। কথাটা বলবার ইচ্ছা ছিল না, কিন্তু তোর ফচ্‌টামিটা ভাঙতে হবে—।

পাকার বদলে পচা ফল পড়ে বাঁশ গাছ থেকে!

শর্মিষ্ঠা থমকে গেল।

পড়েও পড়ে না। সখীদের চোখেমুখে ফুটে ওঠে বাকীটুকু শোনবার আগ্রহ।

অমনি শর্মিষ্ঠার মনে ভেসে ওঠে ওদের কৌতূহলের পিছনকার যত কথা—মেঘুদের দেমাকের কথা, তাদের ব্যবহার আচরণের কথা। মুহূর্তে জ্বলে উঠল শর্মিষ্ঠার দেহ-মন। সব সংকোচ পুড়ে ছাই হয়ে উড়ে গেল কালবৈশাখীর ঝড়ে। সে বললে—বাপের নাম মুখে আনবি না—কে তোর বাবা?

—কি বললি? মেঘু থতমত খেয়ে গেল, নয়তো বুঝল না কথাটা। তাই জানতে চাইল—কি বললি?

এক হাসি থেকে আর এক হাসিতে—। হাসি? ও যদি বলতে পারে—তারাই বা হাসবে না কেন?

যাদের কলকণ্ঠে এতক্ষণ প্রবাহিত হচ্ছিল হাস্যরসের ধারা তাদেরই চোখেমুখে ফুটে ওঠে বিদ্রূপের বাঁকা হাসি। দাঁত দিয়ে তারা চেপে রাখতে চায় ঠোঁটের কথা।

—কে তোর বাবা? দপ্‌দপ্‌ করে জ্বলে ওঠে শর্মিষ্ঠার চোখদুটো।

—কেন? আমার বাবার নাম, রাবণ সর্দারের নাম, তুই—তোরা জানিস না? বলে, হতভম্ব মেঘনাদ তাকায় এর পানে, ওর পানে।

তার ওপর নির্মম কশাঘাত করে শর্মিষ্ঠা—ঘরে গিয়ে তোর মাকে জিজ্ঞেস করবি। তারপর ভেবে দেখিস—তুই আমার সামনে দাঁড়াবার যোগ্য কি না?

মেরুদেশের জলে ঝাঁপিয়ে পড়তে চায় শর্মিষ্ঠা—সে হনহন করে চলে গেল।

অঙ্কুশাহতের মতো আর্তনাদ করে ওঠে মেঘনাদ—কী! এত্‌না অপ্‌মান্‌।

যে শর্মিষ্ঠা তার মাকে এত সম্মান, এত ভালবাসা দিয়ে এসেছে; যে শর্মিষ্ঠার প্রতি তার মায়ের অন্তরে সন্তানতুল্য মায়া-মমতা সেই শর্মিষ্ঠার মুখে এমন কথা।

সেখানে দাঁড়িয়ে মেঘনাদ কাঁপতে থাকে। তার পায়ের তলা থেকে যেন দাউদাউ করে জ্বলে ওঠে আগুন।

সেই আগুনে ইন্ধন যোগ করে শর্মিষ্ঠার সখীদের খিলখিল হাসির রোল।

(ক্রমশঃ)

কালীপ্রসন্ন ঘোষ ও বাংলার উনিশ শতক

ত্রিপুরাশঙ্কর সেন •

উনিশ শতকের শিক্ষিত বাঙালীর চোখে মধুসূদন ছিলেন বাংলার মিলটন, বঙ্কিমচন্দ্র বাংলার স্কট, নবীনচন্দ্র বাংলার বায়রন, আর কালীপ্রসন্ন ঘোষ বাংলার জনসন বা কার্লাইল। সেকালের বাঙালীরা যে স্বদেশের প্রতিভাবান ও মনস্বী লেখকদের এইসব বিশেষণে বিশেষিত করেছিলেন, এর মূলে ছিল তাঁদের প্রতীচ্য সাহিত্যের প্রতি অনুরাগের আতিশয্য ও মোহাচ্ছন্ন দৃষ্টি। তাই বলা যায়, বঙ্গবাণীর এইসব একনিষ্ঠ সেবকের প্রতি তাঁরা যথেষ্ট সুবিচার করেননি, তথাপি, তাঁদের রচনা থেকে যে তাঁরা আনন্দ আহরণ করেছেন, এ-কথা নিঃসংশয়ে বলা চলে।

কালীপ্রসন্ন ছিলেন সে-যুগের একজন অসাধারণ বাগ্মী, গুরুগম্ভীর ও হাস্যরসোজ্জ্বল প্রবন্ধের লেখক, কবি ও সংগীত-রচয়িতা। তিনি বাংলাদেশে 'প্রভাত-চিন্তা', 'নিভৃত-চিন্তা' ও 'নিশীথ-চিন্তা'র লেখক এবং 'বান্ধব' নামে মাসিকপত্রের সম্পাদকরূপেই প্রসিদ্ধি লাভ করেছিলেন। স্বয়ং বঙ্কিমচন্দ্র পূর্ববঙ্গ থেকে প্রকাশিত, নানা তত্ত্ব ও তথ্যে সমৃদ্ধ এই পত্রিকাখানিকে সশ্রদ্ধ অভিনন্দন জানিয়েছিলেন। লব্ধপ্রতিষ্ঠ 'বঙ্গদর্শনের মতো 'বান্ধব'কে কেন্দ্র করেও একটি লেখকগোষ্ঠী গড়ে উঠেছিল. এঁদের মধ্যে ছিলেন প্রখ্যাত ঔপন্যাসিক ও ঐতিহাসিক রমেশচন্দ্র দত্ত, কবি দীনেশচরণ বসু, 'রঘুবংশ' প্রভৃতি মহাকাব্যের পদ্যানুবাদক কবি নবীনচন্দ্র দাশ, ঐতিহাসিক কৈলাসচন্দ্র ঘোষ, মনস্বী চন্দ্রশেখর কর, গঙ্গাচরণ সরকার ও তদীয় পুত্র অক্ষয়চন্দ্র সরকার প্রভৃতি। কালীপ্রসন্নের অধিকাংশ রচনাই বান্ধবে প্রকাশিত হয়েছিল। তাছাড়া, জ্ঞানানন্দ সরস্বতী এই ছদ্মনামে তাঁর দুটি ধারাবাহিক রচনা—'কিশোর গৌরাঙ্গ' ও 'স্বামী না তো কি' 'বান্ধবে' আত্মপ্রকাশ করে। এ দুটি রচনা পুস্তকাকারে মুদ্রিত হয়নি।

বাংলাদেশের স্মরণীয় ও বরণীয় পুরুষের মধ্যে আমরা তিনজন কালীপ্রসন্নের সাক্ষাৎ পাই.—'হুতোম প্যাঁচার নকশার' লেখক ও মহাভারতের অনুবাদক বিদ্যোৎসাহী কালীপ্রসন্ন সিংহ, 'হিতবাদী' সম্পাদক, স্বদেশপ্রেমিক, কবি ও সংগীত-রচয়িতা কালীপ্রসন্ন কাব্য-বিশারদ ও [illegible] বিশিষ্ট প্রবন্ধকার, মনস্বী, 'বান্ধব' পত্রিকার সম্পাদক কালীপ্রসন্ন ঘোষ। বাংলার সমালোচনা-সাহিত্যে এঁদের তিনজনেরই উল্লেখযোগ্য দান আছে। কিন্তু পূর্ববঙ্গ থেকে 'বান্ধব' নামে একখানি সর্বাঙ্গসম্পন্ন মাসিকপত্রের সম্পাদনা (১৮৭৪) ও শক্তিমান সাহিত্যিকদের সারস্বত-সাধনায় উৎসাহদানের জন্যে 'সাহিত্যসমালোচনী সভার' প্রতিষ্ঠা—কালীপ্রসন্নের এই দুটি প্রধান কীর্তি। এই সভার পরিচালক সমিতির (অধ্যক্ষ কমিটির) সভ্যদের মধ্যে বাংলার অনেক বরেণ্য সাহিত্যিক ছিলেন, যথা—বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, ডাক্তার রাজেন্দ্রলাল মিত্র, রেভারেন্ড কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, সমালোচক চন্দ্রনাথ বসু, ঐতিহাসিক রজনীকান্ত গুপ্ত প্রভৃতি। ভাওয়ালের রাজা রাজেন্দ্রনারায়ণের অর্থানুকূল্যে এই সভা স্থাপিত হয় এবং ইনি কবি রাজকৃষ্ণ রায়ের মহাভারতের পদ্যানুবাদের সম্পূর্ণ মুদ্রণ-ব্যয় (বারো হাজার টাকা) বহন করেন।

কালীপ্রসন্ন যে-কালে জন্মগ্রহণ করেন (৮ই শ্রাবণ, ১২৫০ বঙ্গাব্দ, ২৩শে জুলাই ১৮৪৩ খৃষ্টাব্দ), সেটা ছিল প্রাচ্য ও প্রতীচ্য সংস্কৃতির ভেতর সংঘর্ষ ও সমন্বয়ের যুগ। তখন বিভ্রান্তবুদ্ধি ও মোহগ্রস্ত ইয়ং বেঙ্গলের দলের অনেকে কথঞ্চিৎ আত্মস্থ হয়েছেন, 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা'কে আশ্রয় করে ব্রাহ্মধর্মের প্রতিষ্ঠাতা মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ও যুক্তিবাদী অক্ষয়কুমার খৃষ্টধর্মের প্রবল স্রোতকে বাধা দিচ্ছেন এবং 'তত্ত্ববোধিনী সভা'কে আশ্রয় করে শিক্ষিত বাঙালীরা পরস্পর ভাবের আদান-প্রদান করছেন। পরবর্তী কালে দেখি, কেশবচন্দ্র ব্রাহ্মধর্মকে নব-নব ভাবরসে পুষ্ট করছেন, তাঁর অনুগামিরা বিভিন্ন ধর্মের প্রচারে আত্মনিয়োগ করে বাংলা সাহিত্যকে পরিপুষ্ট করছেন, আর মতভেদ সত্ত্বেও শ্রীরামকৃষ্ণ ও কেশবচন্দ্র পরস্পরের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছেন। এদিকে জিজ্ঞাসু ও যুক্তিবাদী নরেন্দ্রনাথ শ্রীরামকৃষ্ণের সান্নিধ্যে এসে ধীরে ধীরে নবজন্ম লাভ করছেন। অথবার, ব্রাহ্মসমাজের আচার্য শ্রীবিজয়কৃষ্ণও শ্রীমন্মহাপ্রভু-প্রচারিত প্রেমধর্মের প্রতি প্রবল আকর্ষণ অনুভব করছেন, আর ধীরে ধীরে তিনি হয়ে উঠেছেন রাগানুগা ভক্তির মূর্ত বিগ্রহ। এই সময়ে যাঁরা প্রতীচ্য জ্ঞান-বিজ্ঞানের আলোকে সর্বাঙ্গীণ হিন্দুধর্মের যুগোপযোগী আদর্শ স্থাপনে প্রয়াস পেয়েছেন তাঁদের ভেতর বঙ্কিমচন্দ্র ও নবীনচন্দ্রের নামই সর্বাগ্রে উল্লেখযোগ্য। কবি হেমচন্দ্রও পাশ্চাত্য ভাবাদর্শের ভিত্তির ওপর নতুন যুগের ধর্মের আদর্শকে স্থাপন করেছেন। আর কালীপ্রসন্ন অসাধারণ মনীষার বলে প্রাচী ও প্রতীচীর ভেতর সেতুবন্ধনের প্রয়াস পেয়েছেন।

তরুণ বয়সে কালীপ্রসন্ন ব্রাহ্মসমাজের দিকে প্রবলভাবে আকৃষ্ট হয়েছিলেন। কয়েকটি ব্রহ্মসংগীতও তিনি রচনা করেছিলেন। তাঁর রচিত প্রথম পুস্তক 'নারীজাতি-বিষয়ক প্রস্তাবে' সম্ভবত রাজা রামমোহনের 'সহমরণ-বিষয়ঃ প্রবর্তক ও নিবর্তক সংবাদের' প্রভাব আছে। তারপর, ফরাসী দার্শনিক অগাস্ট কোঁতের মতবাদ তাঁর চিন্তাধারার ওপর বিপুল প্রভাব বিস্তার করে। শুধু কালীপ্রসন্ন নন, বঙ্কিমচন্দ্র প্রমুখ মনস্বী পুরুষেরাও কোঁতের প্রভাবকে অতিক্রম করতে পারেননি। কালীপ্রসন্ন-রচিত 'নিভৃত চিন্তার' দুটি প্রবন্ধ 'ঐহিক অমরতা' ও 'বিরাট পুরুষে' আমরা কোঁতের মতের প্রতিধ্বনি শুনতে পাই। 'ঐহিক অমরতা' প্রবন্ধে তিনি লিখেছিলেন—'পৃথিবীর এক দৃশ্য সূতিকা-গৃহ, আর এক দৃশ্য শ্মশান।' প্রত্যক্ষবাদী কোঁতের মতে মানুষের স্মৃতিতে চিরকাল সঞ্জীবিত থাকাই অমরতা,—যিনি কীর্তিমান, তিনিই অমর,—এই সমষ্টিগত অমরতাই যথার্থ অমরতা। কালীপ্রসন্ন এই নিবন্ধে পরলোক সম্পর্কে প্রশ্ন উত্থাপন করলেও, শেষপর্যন্ত এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন যে, ইতিহাস যাঁদের ভোলে না, যাঁরা মানবস্মৃতিতে নিত্য বিরাজমান, তাঁরাই অমর, 'পৃথিবী তাঁহাদের তপশ্চর্যার পদ্মাসন, শ্মশান তাঁহাদের স্বর্গারোহণের সোপানমঞ্চ'। 'বিরাট পুরুষ' প্রবন্ধে কালীপ্রসন্ন বলেছেন—ঋগ্বেদে পুরুষসূক্তের ঋষি যে সহস্রশীর্ষ সহস্রাক্ষ সহস্রপাৎ পুরুষের বন্দনা করেছেন, তিনি কে? তিনি প্রকৃত-পক্ষে সেই Grand Etre বা Collective Humanity, তিনি সেই মানব-সমষ্টি কোঁতের মতে যিনি আমাদের বন্দনীয়। (কবি অক্ষয়কুমার বড়ালের 'মানব-বন্দনা' ও কবি সত্যেন্দ্রনাথের 'জাতির পাঁতি' কবিতায়ও কোঁতের প্রভাব লক্ষণীয়।)

জীবনের তৃতীয় পর্বে কালীপ্রসন্ন বৈষ্ণব-সাহিত্যের প্রতি অনুরক্ত হন। পরলোক সম্পর্কে তাঁর মনে পূর্বেই জিজ্ঞাসা জেগেছিল, তারপর শ্রীচৈতন্য ভাগবতে শ্রীগৌরাঙ্গ ও শচীর কথোপকথন পাঠ করে তিনি বিচলিত হন। শ্রীচৈতন্য-ভাগবতে শ্রীগৌরাঙ্গ শচীদেবীকে বলছেন—

'গর্ভবাসে যত দুঃখ জন্ম বা মরণে।
কৃষ্ণের সেবক মাতা কিছুই না জানে।।
জগতের পিতা কৃষ্ণ যে না ভজে বাপ,
পিতৃদ্রোহী পাতকীর জন্ম জন্ম পাপ।।

'চিত্ত দিয়া শোন মাতা জীবের যে গতি।
না ভজিলে কৃষ্ণপায় যতেক দুর্গতি ।।
মরিয়া মরিয়া পুনঃ পায় গর্ভবাস।
সর্ব অঙ্গে হয় পূর্ব পাপের প্রকাশ'।।
ইত্যাদি

বৈষ্ণব সাহিত্যের প্রতি তাঁর অনুরাগের নিদর্শন মিলে তাঁর রচিত 'ভক্তির জয় বা হরিদাসের জীবন-যজ্ঞ' গ্রন্থে এবং 'বান্ধবে' প্রকাশিত 'কিশোর গোরাঙ্গ' নামক ধারাবাহিক রচনায়। ভারতীয় শক্তিতত্ত্ব সম্পর্কেও তিনি কৌতূহলী হয়েছিলেন। 'মা না মহাশক্তি' গ্রন্থে তিনি পাশ্চাত্য জড়বিজ্ঞানের শক্তিতত্ত্ব ও শ্রীশ্রীচণ্ডীর শক্তিতত্ত্ব সম্পর্কে তুলনামূলক আলোচনা করেছেন।

ভগবদ্গীতায় বলা হয়েছে—প্রাণিসকল উৎপত্তির পূর্বে অব্যক্ত, স্থিতিকালে ব্যক্ত, আবার বিনাশের পরে অব্যক্ত। অর্থাৎ সোজা কথায় বলতে গেলে বলতে হয়—আমরা কেউ জানি নে, জন্মের পূর্বে কোথায় ছিলাম, আবার মৃত্যুর পরেই বা কোথায় যাব। তাই জন্ম-মৃত্যু মানুষের চক্ষে একটা দুর্জ্ঞেয়, দুরধিগম্য রহস্য। তথাপি মানুষ অনাদি কাল থেকে মৃত্যুর যবনিকা উত্তোলন করার চেষ্টা পেয়েছে। মৃত্যুরাজের নিকট বালক নচিকেতার যে-জিজ্ঞাসা, সেটা চিন্তাশীল মানুষমাত্রেরই চিরন্তনী জিজ্ঞাসা। মৃত্যু-রহস্য জানবার জন্যে কালীপ্রসন্নের মনে যখন গভীর আগ্রহ দেখা দিল, তখন তিনি পৃথিবীর প্রধান-প্রধান ধর্মশাস্ত্র অধ্যয়ন করেই ক্ষান্ত হন নি, পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের রচিত ব্রহ্মবিদ্যা ও প্রেত-তত্ত্ব সম্পর্কে রাশি-রাশি গ্রন্থ আলোচনা করেছেন। তাঁর রচিত 'জানকীর অগ্নি-পরীক্ষা' ও 'ছায়াদর্শনে' পাশ্চাত্য আধ্যাত্ম-তত্ত্বের প্রভাব সুস্পষ্ট। 'ছায়াদর্শনে' তিনি অধ্যাত্মতত্ত্বের আধুনিক ইতিবৃত্তেরও আলোচনা করেছেন। ভারতের মহাকাব্যে ও পুরাণে পরলোকতত্ত্বের যে আলোচনা আছে, তিনি শ্রদ্ধার সঙ্গে তারও উল্লেখ করেছেন কিন্তু পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত বাঙালীদের জন্যে গ্রন্থ রচনা করেছেন বলে তিনি গ্রন্থ মধ্যে শুধু বিদেশী কাহিনী সন্নিবিষ্ট করেছেন। প্রসঙ্গক্রমে তিনি প্রতীচীর বহু বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিকের উক্তিও উদ্ধৃত করেছেন। এই সব কাহিনী যেমন চিত্তাকর্ষক তেমনি রোমাঞ্চকর। যিনি একদিন ছিলেন পরলোক-সম্পর্কে সন্দেহবাদী, তিনি পরবর্তী জীবনে এই কথাই প্রতিপন্ন করতে চেয়েছেন যে, ইহকালে হোক বা পরকালে হোক, পাপের দণ্ড ও পুণ্যের পুরস্কার অবশ্যম্ভাবী। মানুষের কর্মফল অখণ্ডনীয়, তাই 'কৃত-প্রণাশ' বলে কিছু হতেই পারে না, অর্থাৎ ভোগ ভিন্ন কর্ম-ফলের ক্ষয় হতে পারে না, 'নাভুক্তং ক্ষীয়তে কর্ম কল্পকোটিশতৈরপি'। এ কালের বাঙালী পাঠকের সঙ্গে 'ছায়াদর্শনের' পরিচয় না থাকলেও সেকালে যে গ্রন্থখানি যথেষ্ট জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিল, তা আমরা দেখেছি।

দার্শনিক কালীপ্রসন্ন যে পরিহাস-রসিকও ছিলেন, তার পরিচয় আছে 'প্রমোদলহরী বা বিবাহরহস্যে' ও 'ভ্রান্তি-বিনোদ' নামক প্রবন্ধ পুস্তকে। 'প্রমোদলহরীর' অন্তর্গত 'বিবাহ (ব্যাকরণ-রহস্য) ও 'মুখরা ভার্যা অথবা গৃহিণীরোগ' এবং 'ভ্রান্তিবিনোদের' অন্তর্গত 'ষট্‌কারক', 'বাংশক্তিবাদ' প্রভৃতি প্রবন্ধ বিশেষ সুখপাঠ্য। দুঃখের বিষয়, যাঁরা আধুনিক যুগে বাংলা সাহিত্যে হাস্যরস সম্পর্কে আলোচনা করেছেন, কালীপ্রসন্ন ঘোষ তাঁদের নিকট উপেক্ষিত।

শুধু তথাকথিত রম্য রচনাই নয়, শিশুপাঠ্য পুস্তক-রচনায়ও তাঁর দক্ষতা ছিল। তাঁর রচিত 'কোমল কবিতা' এককালে বহু শিশুর কণ্ঠস্থ ছিল। 'পারিব না', 'বদর বদর' প্রভৃতি কবিতাগুলো নানা সংকলন-গ্রন্থেও স্থানলাভ করেছিল। 'নয়ন মেলরে শিশু জয় জগদীশ বলে' 'পারিব না এ-কথাটি বলিও না আর' 'সারি গেয়ে দাঁড়ী নেয়ে বেয়ে যায় তরী',—এই পংক্তিগুলো একদিন সহজেই শিশুমনকে আকর্ষণ করেছে।

কালীপ্রসন্ন যে সকল ভক্তিরসাত্মক গান রচনা করেছেন, 'সংগীত-মঞ্জরী' নামক পুস্তকে সেগুলো স্থান পেয়েছে।

কালীপ্রসন্নের 'ছায়াদর্শন' থেকে তাঁর গুরুগম্ভীর রচনার একটি নিদর্শন দিচ্ছি।

'নিখিল জগৎ জ্ঞানীদিগের মধ্যে কাহারও চক্ষে এক অনন্ত-বিস্তারিত রূপ-সাগর, কাহারও চক্ষে এক অপার, অতুলনীয় প্রেম-সাগর। যিনি এই রূপ-সাগর ও প্রেম-সাগরে ওতপ্রোত জড়িত রহিয়া, জগজ্জীবন জগদীশ্বর নামে, জীবের প্রাণে প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছেন,—জীবের প্রাণভরা ভক্তি ও ভালবাসার আরাধনা সতত গ্রহণ করিতেছেন, তাঁহার বিশেষ লক্ষণ কি? ভক্ত জ্ঞানীরা বলিয়াছেন, তিনি রূপ-সাগরের অনাদি ও অনন্ত প্রস্রবণ রূপনিধান ব্রহ্ম, সেইরূপ আবার তিনি প্রেম-সাগরের অনাদি অনন্ত প্রস্রবণস্বরূপ প্রেম-নিধান জগদীশ্বর'।

সংস্কৃত ব্যাকরণ ও সাহিত্যে কালীপ্রসন্নের পাণ্ডিত্য ছিল অসাধারণ। পাশ্চাত্য সাহিত্য ও দর্শনের সঙ্গেও তাঁর পরিচয় ছিল গভীর। তিনি উপলব্ধি করেছিলেন, বাংলাভাষাকে সম্পন্ন করতে হলে নতুন নতুন শব্দের সৃষ্টি করা দরকার। তিনি স্বয়ং যে-সব নতুন শব্দের প্রয়োগ করেছেন, তার কয়েকটি নিম্নে উদ্ধৃত হোলো—

Tornado — তূর্ণড (তূর্ণম্ উড্ডীয়তে, যা অতি দ্রুত উড়ে যায়।)
Agnostic — অস্তিবিমুখ বা অজ্ঞমানী, যে নিজেকে অজ্ঞ মনে করে।
Theosophist — দিব্যতাত্ত্বিক।
Seance — তত্ত্বাধিবেশন।
Psychic Philosophy — অধ্যাত্মদর্শন।
Psychic Science — অধ্যাত্মবিজ্ঞান।
Thought Body — চিদাত্মিকা তনু
Crutch — পঙ্গুপ্রশ্রয়া যষ্টি।

এছাড়া 'মাক্ষিক স্বভাব', 'অজগর-ক্রোধ' প্রভৃতি শব্দগুলির প্রয়োগ লক্ষণীয়। কালীপ্রসন্ন সর্বদাই বলতেন—শব্দপ্রয়োগে বিশেষ সাবধানতা আবশ্যক। অশুদ্ধ শব্দ ব্যবহার করলে মায়ের অবমাননা করা হয়।' (সাহিত্যসাধক চরিতমালা, পৃঃ ৬৪)। এই প্রসঙ্গে এ-কথা বলতেই হবে যে, একালের অনেক লেখক শব্দের সুষ্ঠু প্রয়োগ সম্পর্কে সম্পূর্ণ সচেতন নন। কালীপ্রসন্নের ভাষা ছিল ওজস্বিনী, অথচ সে-ভাষায় স্থানে স্থানে কবিত্ব-শক্তিরও অভাব ছিল না। অবশ্য, কালীপ্রসন্নের রচনার কোথাও কোথাও ডাক্তার জনসনের রচনার মতো শব্দাড়ম্বর-প্রিয়তারও পরিচয় আছে। তথাপি, তিনি যে বাংলার নিবন্ধকারদের ভেতর একটি বিশিষ্ট স্থানের অধিকারী, তাতে সন্দেহ নেই। তাঁর মৃত্যুর পর (১৩ই শ্রাবণ, ১৩১৭, ২৯শে জুলাই, ১৯১০) একষট্টি বৎসর অতিক্রান্ত হয়েছে, ইতিমধ্যে আমরা তাঁকে বিস্মৃত হতে চলেছি। তাঁর রচনাবলী দুষ্প্রাপ্য, 'বঙ্গদর্শনের' মতো 'বান্ধবের' সংখ্যাগুলোও পুনর্মুদ্রিত হয়নি। তিনি যে ছদ্মনামে (জ্ঞানানন্দ সরস্বতী) প্রবন্ধ লিখতেন, সে-কথাও একালে কেউ কড়া একটা জানেন না। তাই পল্লবগ্রাহী সমালোচকেরা তাঁর প্রতি অবিচার করেছেন। কিন্তু যাঁরা বাংলা-সাহিত্যের প্রতি যথার্থ অনুরাগী, তাঁদের এ-বিষয়ে এক মহান দায়িত্ব রয়েছে। বাংলা-সাহিত্যে প্রবন্ধকার, দার্শনিক ও চিন্তানায়ক কালীপ্রসন্নের দান সম্পর্কে যিনি নিরপেক্ষ আলোচনায় প্রবৃত্ত হবেন, তিনি সাহিত্য-রসিক বাঙালীমাত্রেরই কৃতজ্ঞতাভাজন হবেন। আমরা এই বরেণ্য মনীষীর মৃত্যু-বার্ষিকী উপলক্ষে তাঁকে আমাদের অন্তরের শ্রদ্ধা নিবেদন করি, আর কবির ভাষায় বলি—

'Thou hadst a voice whose sound
was like the sea,
Pure as the naked heavens,
majestic, free'.

নির্মল সরকার

হরপ্পার ফুল

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

পারিবারিক প্রথা অনুযায়ী অল্পবয়সেই তার বিয়ে হয়েছিল। ঈশ্বরের আশীর্বাদে বছর দুই পরে বৌটি মারা গিয়ে সৌম্য দত্তর রাস্তা পরিষ্কার করে দিয়েছে। আষ্টেপৃষ্ঠে সোনা মোড়া পনের বছরের মেয়েটির কথা ভেবে এখনও সে ভয়ে আঁৎকে ওঠে। থাকলে সে এতদিন কোথায় পৌঁছুত। কোথায় থাকত কোঁচান ধুতি, কোথায় থাকত লিণ্ডসে স্ট্রীটের এয়ার-কাণ্ডিশন করা জাজস। সোনা নিয়ে যত নাড়াচাড়া করেছে সৌম্য দত্ত তার চেয়ে বেশী মাখামাখি করেছে মেয়েদের সঙ্গে। বৌবাজারের ওপর তার রীতিমত ঘৃণা জন্মেছে। নেহাত ব্যবসার খাতিরে তাকে সেখানে যেতে হয় তা না হলে সে রাস্তার নামও সে ভুলে যেত এতদিনে। সাবেকী বাড়ীতে কখনও ভুলে পদার্পণ করে না সৌম্য দত্ত। লিণ্ডসে স্ট্রীট জায়গা ভাল। আশপাশ খুঁজলে সব প্রয়োজনীয় জিনিসই পাওয়া যায়। গঙ্গার ধার থেকে খিদিরপুর ডক পর্যন্ত তার ব্যবসার পক্ষে স্বর্গভূমি বলা যায়। তার পাশে আছে বিরাট ময়দান, সেটাও ভাল লাগে তার। অনেক মেয়ের নাগাল পেয়েছে এই জায়গায় দোকান করে। সোনার মত মেয়েও তার কাছে মূল্যবান পণ্য। সেন্টস্ গুলো থেকে শুরু করে তার দোকানের বিশেষ বিশেষ খদ্দেরদের মনোরঞ্জনের জন্য সে এদের ব্যবহার করে। ভাল ব্যবসায়ী হতে হলে মানবতা বা হৃদয়াবেগ থাকলে চলে না। একথা সৌম্যদত্ত ভালভাবে জানে। সোনা ধরার মত মেয়ে ধরারও বিভিন্ন কায়দা জানা আছে তার। চেহারা আর ঐশ্বর্য দেখিয়ে সান্নিধ্য আলাপ করা, কারণে অকারণে সাহায্য করা তারপর কিছুটা নিস্পৃহতা এবং শেষকালে প্রলোভনের পর গ্রাস করা, এইটাই হল সৌম্য দত্তর মোক্ষম টেকনিক। প্রচুর সাফল্য সে লাভ করেছে এতে। সৌখীন লোকের এ জিনিস বেশীদিন ভাল না লাগাই উচিত। তাই কিছুদিন পরে প্রিয়াকে তার দোকানের সেলস্ গার্ল হতে হয়। তারপর সুযোগ বুঝে খরিদ্দার তুষ্টি বা আদি ব্যবসা স্থানে চালান করে দেওয়া তার পক্ষে শক্ত হয় না। বিভিন্ন জায়গায় তার লোক আছে। এরা তার সঙ্গে নানা উপায়ে যোগাযোগ রেখে যায়। রোজগার করতে গেলে টাকা ঢালতে হয় এটা তার অজানা নয়। সুতরাং এদিক দিয়ে তাকে কার্পণ্য করতে কেউ দেখেনি। বরঞ্চ দিলদরিয়া মেজাজের জন্য তার সুনাম আছে। এটা তাকে বাধ্য হয়ে করতে হয় তা না হলে অনেক সময় অবাঞ্ছিত বিপদ এসে পড়ে। বিপদে সৌম্য দত্ত কয়েকবার পড়েছে কিন্তু বিশেষ ক্ষতি হয় নি। স্থানে স্থানে দর্শনীর অঙ্কটা বেড়েছে মাত্র।

সেদিন জাজস থেকে বেরিয়েই সীমার দেখা পেয়েছিল সে। সুযোগটা ছাড়ে নি। কিন্তু সীমা তাকে ওভাবে লোকের সমক্ষে যে ওভাবে একটা চড় কসিয়ে দেবে এটা সৌম্য দত্ত স্বপ্নেও ভাবে নি। মেয়েটার গ্ল্যামার আছে, তেজ আছে; তাছাড়া অফিসে কাজ করে এবং একলা থাকে, এ কয়েকটা তথ্য তার জানা আছে। কিন্তু গড়ীর কাছে ফ্ল্যাটটা তার অজ্ঞাতে সে কবে ছেড়ে পালিয়েছে তা সে টের পায়নি। সেদিকে তার লক্ষ্য রাখা উচিত ছিল। সেটা করলে তাকে এভাবে লজ্জায় পড়তে হত না। কারণ অনেকদিন আগেই তাকে করতলগত করতে পারত সে। অনেক তেজী আর বেয়াড়া চালের মেয়েদের সে পোষা তোতা পাখী বানিয়েছে। কোন্ ঠাকুরের

কিভাবে পুজো করতে হয় সেটা তার বিলক্ষণ জানা আছে। কিন্তু এটা কি হল। তার মানসম্ভ্রম যে ধুলোতে মিশিয়ে গেল। একে ব্যবসার জায়গা তায় অপরিচিত মানুষের ভিড়। এত সাহস মেয়েটা পেল কোথা থেকে। সুগন্ধি রুমাল দিয়ে মুখটা মুছতে মুছতে লিন্ডসে স্ট্রীটের ডাক্তারখানায় ঢুকল সোম্য দত্ত। কাউণ্টারে অবন্তী বসে আছে তার সঙ্গে গগনচাঁদ। গগনচাঁদের বয়স কত জিজ্ঞেস করলে বলে পঁয়তাল্লিশ কিন্তু তার চেহারা দেখলে মনে হয় পঁয়ষট্টি। সোম্য দত্তর ডান হাত গগনচাঁদ, আস্ত পাকা ঘুঘু। শুকনো, শীর্ণ চেহারা, মাথার চুলে কলপ, গাল দুটো বসা, চোখের দৃষ্টি অতলস্পর্শী, সামনের দাঁত সোনা দিয়ে বাঁধান; পরনে ধুতি এবং পাঞ্জাবী। সোম্য দত্ত অপরদিকের কাউণ্টারে নিজের জায়গায় বসে ডাকল গগনচাঁদকে। শশব্যস্ত হয়ে গগনচাঁদ ছুটে এল তার কাছে।

খবর কিছু পেলে? জিজ্ঞেস করল সোম্য।

এখনও পাইনি।

এখনও পাইনি, ভেংচে উঠল সোম্য দত্ত, অবন্তীকে আবার কি ফুসমন্তর দিচ্ছিলে?

লম্বা জিব বার করল গগনচাঁদ—কি যে বলেন বাবু, আমি আবার ওকে কি বলব? তবে আমেদাবাদের জন্যে ওর মন কেমন করছে বলছিল।

তাই নাকি? মনের কথা তাহলে তোমায় বলছে আজকাল? সে যাক, তুমি আজ সকাল থেকে কি করলে বল শুনি, একটা সিগারেট ধরাল সে।

ভোর সাড়ে চারটের সময় পাটোয়ারী বাগানে ভর্তু সাউকে এক কিলো আটা দিয়েছি।

কি বললে, ভর্তু সাউ?

জিজ্ঞেস করলে আমার বাবার নাম কি?

তুমি কি বললে? জিজ্ঞেস করল সোম্য।

বনমালী।

যাক, আসল নামটা বলে ফেলনি, এই ঢের। হাসল সোম্য।

বললে কি হত, গগনচাঁদ তাকাল ওর দিকে।

তাহলে আর গুজরাটী মেয়ে অবন্তীর সঙ্গে হেসে হেসে কথা বলতে হত না। ফেরার পথে গলিতে একটা লরি তোমায় চাপা দিয়ে চলে যেত।

গগন জিব দিয়ে তার শুকনো তালুটা সরস করতে চেষ্টা করল।

তোমায় কি দিয়েছে? জিজ্ঞেস করল সোম্য।

কামারের দোকান থেকে একটা লোহার সাঁড়াশি আর হাতা দিয়েছে।

সে দুটো কোথায়?

ঐ যে শোকেসের তলায় রেখেছি।

যাও এবার ও দুটো ওজন করিয়ে বৌবাজারে গলাতে দাও।

সেদুটো নিয়ে গগনচাঁদ চলে যাবার পরই সোম্য দত্ত ভেতরের ঘরে ঢুকে হাতঘড়িতে সময়টা দেখে নিল। তারপর কাবার্ড থেকে একটা জিনের বোতল বার করল। এ সময়ে সে জিন খায়। একটু পরেই একটা নম্বর ডায়াল করে সোম্য কথা বলল,

হ্যালো, স্যানিটারী ফিটিংস?

হ্যাঁ কথা বলছি।

এক কিলো আটা পেয়েছেন? জিজ্ঞেস করল সোম্য।

পেয়েছি। উত্তর এল।

একটু পরে পাইপও পাবেন। ফিট করে বেসিনটা বম্বের ঠিকানায় পাঠিয়ে দিন তাহলে।

দেবো।

লাইনটা কেটে গেল।

বোতল থেকে গ্লাসে জিন ঢেলে তাতে একটু লেমন স্কোয়াশ মিশিয়ে নিল সোম্য। তারপর একটু একটু করে খেতে লাগল।

এদের ব্যবসার কোড নামগুলো অদ্ভুত। এমনকি কোনটার মানে কি তাও বোঝা অনেক সময় শক্ত হয়ে পড়ে। এক কিলো আটার মানে কি সেও জানে না, ভর্তু সাউও না। স্যানিটারী ফিটিংসের মালিক হয়ত বেসিনটা পাঠাবার আগের মুহূর্তে এক কিলো আটার মর্ম বুঝতে পারবে। সেটা কার পক্ষে মঙ্গল বা অমঙ্গলজনক এটা কেউ জানে না।

এক গ্লাস জিন পানের পর সোম্য দত্তর মেজাজ শরিফ আর মাথাও ঠাণ্ডা হল। একটু পরে কাঁচের দরজা খুলে একজন কুলি এল একটা বাক্স নিয়ে। সেটা নিয়ে অবন্তীর কাছে দাঁড়িয়ে একটা চালান বার করে দিল, এটা সই করবে সোম্য দত্ত। তাই চালানটা নিয়ে সোম্য দত্তর দরজায় টোকা দিল অবন্তী।

কে?

আমি অবন্তী।

কাম ইন।

এই চালানটায় সই দিতে হবে।

কি ওটা?

একটা টাইপ মেসিন।

কথাটা শুনে সোজা হয়ে বসল সোম্য। গোলাবী নেশাটাও উবে গেল সঙ্গে সঙ্গে।

ওকে পাঠিয়ে দাও, জিনিসটাকে দেখে নিই ভাল করে।

বাক্সটা নিয়ে ঘরে ঢুকল কুলি। সোম্য দত্ত দরজাটা লক করে দিল সঙ্গে সঙ্গে।

সকালেই বোতল চালাচ্ছ?

কুলি সোম্য দত্তর চেয়ারে বসল।

না, এই একটু, মেজাজটা বড় খারাপ লাগছে ভাই।

ভাল, মেসিনটা আজই পাঠিয়ে দাও ভাগলপুরে।

কাকে দিয়ে পাঠাব?

সে তুমি জান। তবে আটশ ভরি ওজন আছে মনে রেখ। তোমার টাইপ মেশিনটা ঠিক এইভাবে এখানে রেখে ওটা অন্য কোথাও রাখ।

তাই করল সোম্য। লকারে মূল্যবান টাইপরাইটারটা রেখে দিল।

ও মেয়েটা কি গুজরাটী?

হ্যাঁ, সোম্য দত্ত মাথা চুলকাল।

ঝামেলায় না ফেলে।

না, আমি সাবধানে আছি।

ছাই আছ, তাহলে মেয়ের পিছু নিতে গিয়ে মার্কেটে চড় খেয়ে বেইজ্জত হতে না।

অবাক হল সোম্য দত্ত। এরই মধ্যে কথাটা চাউড় হয়ে গিয়েছে।

মেয়েটা কে? টেবিলের ওপর দুটো পা তুলল কুলি।

ঠিক চিনি না তবে পুলিশকে ভয় করে বলে জানি।

ও তোমার দ্বারা হবে না, আমি আরও লোক দেব তোমার সঙ্গে। প্রথমে ওর পেছনে লেগে থাক তারপর হালকান করে সরিয়ে দিও অন্য জায়গায়। আমি চলি। টেবিলের ওপর থেকে ময়লা পা দুটো নামিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল কুলি।

সোম্য দত্ত চোখ বন্ধ করে দাঁড়িয়ে রইল বেশ কয়েক মিনিট।

হেমন্তের পীড়াপীড়িতে সীমাকে কিছু মুখে দিতে হল। খাওয়ার ইচ্ছা তার ছিল না। একটা অদ্ভুত যন্ত্রণা হচ্ছিল তার। মাদক দ্রব্যের প্রভাবে যেন তার মস্তিষ্ক অসাড় হয়ে গিয়েছে। নিজের মনের সঙ্গে যুদ্ধ করে আবার অরুণের ঘরে ফিরে গেল সে। আর দেরী করলে তার চলবে না। নতুন সুটকেশটায় তার কাপড়জামা আগেই ভর্তি করে নিয়েছিল। দুটো জিনিসই সে সঙ্গে নেবে, একটা এ্যাটাচি কেস আর সুটকেশ। আলমারী বন্ধ করে চাবিটা অরুণের টেবিলের ওপর রেখে দেয়ালের ঘড়িটা কাঁটা পিছিয়ে দিল আধঘণ্টা। হাতের চুড়ি এবং গলার হারটা খুলে সে টেবিলের ওপর চাবির সঙ্গে রাখল তারপর হাতের আংটিটা খুলতে গিয়ে মনে পড়ল অসিতবাবু তাকে এটা কোনদিন খুলতে বারণ করেছিলেন। শান্ত ভদ্রলোক, আর শান্ত কোমল চোখ ও হাসিটার কথা মনে পড়ল সীমার। আংটিটা আর খুলল না সে। এবার বক্সারের কথা মনে পড়ল তার। তার কাছে গিয়ে দাঁড়াতেই সে উচ্ছ্বাস প্রকাশ করতে শুরু করল নানাভাবে। তার গায়ে হাত বুলিয়ে আদর করল সীমা। তার গলাটা রুদ্ধ হয়ে এল ভাবাবেগে। ঘরের চতুর্দিকটা একবার ভাল করে দেখে নিল। অনেকদিন কাটিয়েছে সীমা এই ঘরে। মন্থরতা নেমেছিল তার শরীরে আর মনে, এতদিনের আরাম আর আলস্যে। এর আগে এ ধরনের ভাবালুতা তার জন্মায়নি। অবিশ্রান্ত চলনে নুড়িতে শ্যাওলা ধরতে পারেনি এতদিন পর্যন্ত। এক জায়গা থেকে আর এক জায়গায় যাযাবরের মত সে গিয়েছে আর এসেছে মাত্র। কোন জায়গায় বা বিশেষ কোন ঘটনার দিকে সে মন দিতে পারেনি।

সাইড টেবিলে ট্রানজিস্টার, অনেকগুলো বই, টুকিটাকি প্রসাধনের সামগ্রী ছড়ান রয়েছে এলোমেলোভাবে। বিয়ের সময় এগুলো উপহার পেয়েছে সে, এতদিন এদের সঙ্গ ভাল লেগেছে তার। তার জীবনে উপহারের স্থান ছিল না। উপহারের মূল্য কি সেটাও কোনদিন অনুভব করেনি সীমা। নিজে কেনা আর উপহারের

পার্থক্যটা সে এতদিনে বুঝেছে। অস্বাভাবিক লাগছে, আশ্চর্য লাগছে এই নবলব্ধ অনুভূতি। আর দেরী করলে চলবে না। বক্সারের দিকে একবার তাকাল সে। বক্সারকে সে ফিরে পাবে কি করে? বোধহয় পাবে না। এই শেষ। বাবাকে ছাড়তে হয়েছে, দাদার ইলাইজাকে ছাড়তে হয়েছে, এবার বক্সারকে। আরও দুজনের কথা মনে পড়ল সীমার। অসিতবাবু আর হেমন্ত। অসিতবাবুর প্রশান্ত হাসি আর স্নেহময় ব্যবহার। হেমন্তর শ্রদ্ধা, সেবা, নিষ্ঠা সহজে ভুলবে না সে। হেমন্ত আর করুণা খেতে বসেছে। এই তার সুযোগ। স্যুটকেস আর অ্যাটাচিটা নিয়ে ধীরে ধীরে নামল সীমা।

সৌম্য দত্ত কিন্তু উপদেশ অনুযায়ী অন্যের সাহায্যের জন্য অপেক্ষা করল না। তার পৌরুষে ভীষণ আঘাত লেগেছে। একটা সামান্য মেয়ে তাকে অপমান করবে আর দলের লোকের সাহায্য নিয়ে তার শোধ তুলবে, অসম্ভব! যে ট্যাক্সিটায় সীমা ফিরে গিয়েছিল, তার নম্বরটা জোগাড় করতে দেরী হল না সৌম্যের। নোংরা পোশাক পরা মার্কেটের আশেপাশে যে ছেলেগুলো ট্যাক্সি ডেকে দেয়, তারা অন্য কাজও করে থাকে অনেক। এরা চটপটে, চতুর এবং নানা বিষয়ের খবরও সংগ্রহ করে থাকে। সীমার ঠিকানা জেনে একাই অরুণের বাড়ীর কাছে এসে উপস্থিত হল সে। সৌম্য দত্তর ভাগ্য ভাল। কিছুক্ষণের মধ্যেই সীমাকে তার স্যুটকেস আর

কিভাবে পুজো করতে হয় সেটা তার বিলক্ষণ জানা আছে। কিন্তু এটা কি হল। তার মানসম্ভ্রম যে ধুলোতে মিশিয়ে গেল। একে ব্যবসার জায়গা তায় অপরিচিত মানুষের ভিড়। এত সাহস মেয়েটা পেল কোথা থেকে। সুগন্ধি রুমাল দিয়ে মুখটা মুছতে মুছতে লিন্ডসে স্ট্রীটের ড্যাজলে ঢুকল সৌম্য দত্ত। কাউন্টারে অবন্তী বসে আছে তার সঙ্গে গগনচাঁদ। গগনচাঁদের বয়স কত জিজ্ঞেস করলে বলে পঁয়তাল্লিশ কিন্তু তার চেহারা দেখলে মনে হয় পঁয়ষট্টি। সৌম্য দত্তর ডান হাত গগনচাঁদ, আস্ত পাকা ঘুঘু। শুকনো, শীর্ণ চেহারা, মাথার চুলে কলপ, গাল দুটো বসা, চোখের দৃষ্টি অতলস্পর্শী, সামনের দাঁত সোনা দিয়ে বাঁধান; পরনে ধুতি এবং পাঞ্জাবী। সৌম্য দত্ত অপরদিকের কাউণ্টারে নিজের জায়গায় বসে ডাকল গগনচাঁদকে। শশব্যস্ত হয়ে গগনচাঁদ ছুটে এল তার কাছে।

খবর কিছু পেলে? জিজ্ঞেস করল সৌম্য।

এখনও পাইনি।

এখনও পাইনি, ভেংচে উঠল সৌম্য দত্ত, অবন্তীকে আবার কি ফুসমন্তর দিচ্ছিলে?

লম্বা জিব বার করল গগনচাঁদ—কি যে বলেন বাবু, আমি আবার ওকে কি বলব? তবে আমেদাবাদের জন্যে ওর মন কেমন করছে বলছিল।

তাই নাকি? মনের কথা তাহলে তোমায় বলছে আজকাল? সে যাক, তুমি আজ সকাল থেকে কি করলে বল শুনি, একটা সিগারেট ধরাল সে।

ভোর সাড়ে চারটের সময় পাটোয়ারী বাগানে ভর্তু সাউকে এক কিলো আটা দিয়েছি।

কি বললে, ভর্তু সাউ?

জিজ্ঞেস করলে আমার বাবার নাম কি?

তুমি কি বললে? জিজ্ঞেস করল সৌম্য।

বনমালী।

যাক, আসল নামটা বলে ফেলনি, এই ঢের। হাসল সৌম্য।

বললে কি হত, গগনচাঁদ তাকাল ওর দিকে।

তাহলে আর গুজরাটী মেয়ে অবন্তীর সঙ্গে হেসে হেসে কথা বলতে হত না। ফেরার পথে গলিতে একটা লরি তোমায় চাপা দিয়ে চলে যেত।

গগন জিব দিয়ে তার শুকনো তালুটা সরস করতে চেষ্টা করল।

তোমায় কি দিয়েছে? জিজ্ঞেস করল সৌম্য।

কামারের দোকান থেকে একটা লোহার সাঁড়াশি আর হাতা দিয়েছে।

সে দুটো কোথায়?

ঐ যে শোকেসের তলায় রেখেছি।

যাও এবার ও দুটো ওজন করিয়ে বৌবাজারে গলাতে দাও।

সে দুটো নিয়ে গগনচাঁদ চলে যাবার পরই সৌম্য দত্ত ভেতরের ঘরে ঢুকে হাতঘড়িতে সময়টা দেখে নিল। তারপর কাবার্ড থেকে একটা জিনের বোতল বার করল। এ সময়ে সে জিন খায়। একটু পরেই একটা নম্বর ডায়াল করে সৌম্য কথা বলল,

হ্যালো, স্যানিটারী ফিটিংস?

হ্যাঁ কথা বলছি।

এক কিলো আটা পেয়েছেন? জিজ্ঞেস করল সৌম্য।

পেয়েছি। উত্তর এল।

একটু পরে পাইপও পাবেন। ফিট করে বেসিনটা বম্বের ঠিকানায় পাঠিয়ে দিন তাহলে।

দেবো।

লাইনটা কেটে গেল।

বোতল থেকে গ্লাসে জিন ঢেলে তাতে একটু লেমন স্কোয়াশ মিলিয়ে নিল সৌম্য। তারপর একটু একটু করে খেতে লাগল।

এদের ব্যবসার কোড নামগুলো অদ্ভুত। এমনকি কোনটার মানে কি তাও বোঝা অনেক সময় শক্ত হয়ে পড়ে। এক কিলো আটার মানে কি সেও জানে না, ভর্তু সাউও না। স্যানিটারী ফিটিংসের মালিক হয়ত বেসিনটা পাঠাবার আগের মুহূর্তে এক কিলো আটার মর্ম বুঝতে পারবে। সেটা কার পক্ষে মঙ্গল বা অমঙ্গলজনক এটা কেউ জানে না।

এক গ্লাস জিন পানের পর সৌম্য দত্তর মেজাজ শরিফ আর মাথাও ঠাণ্ডা হল। একটু পরে কাঁচের দরজা খুলে একজন কুলি এল একটা বাক্স নিয়ে। সেটা নিয়ে অবন্তীর কাছে দাঁড়িয়ে একটা চালান বার করে দিল। এটা সই করবে সৌম্য দত্ত। তাই চালানটা নিয়ে সৌম্য দত্তর দরজায় টোকা দিল অবন্তী।

কে?

আমি অবন্তী।

কাম ইন।

এই চালানটায় সই দিতে হবে।

কি ওটা?

একটা টাইপ মেসিন।

কথাটা শুনে সোজা হয়ে বসল সৌম্য। গোলাবী নেশাটাও উবে গেল সঙ্গে সঙ্গে।

ওকে পাঠিয়ে দাও, জিনিসটাকে দেখে নিই ভাল করে।

বাক্সটা নিয়ে ঘরে ঢুকল কুলি। সৌম্য দত্ত দরজাটা লক করে দিল সঙ্গে সঙ্গে।

সকালেই বোতল চালাচ্ছ?

কুলি সৌম্য দত্তর চেয়ারে বসল।

না, এই একটু, মেজাজটা বড় খারাপ লাগছে তাই।

ভাল, মেসিনটা আজই পাঠিয়ে দাও ভাগলপুরে।

কাকে দিয়ে পাঠাব?

সে তুমি জান। তবে আটশ ভরি ওজন আছে মনে রেখ। তোমার টাইপ মেশিনটা ঠিক এইভাবে এখানে রেখে ওটা অন্য কোথাও রাখ।

তাই করল সৌম্য। লকারে মূল্যবান টাইপরাইটারটা রেখে দিল।

ও মেয়েটা কি গুজরাটী?

হ্যাঁ, সৌম্য দত্ত মাথা চুলকাল।

ঝামেলায় না ফেলে।

না, আমি সাবধানে আছি।

ছাই আছ, তাহলে মেয়ের পিছু নিতে গিয়ে মার্কেটে চড় খেয়ে বেইজ্জত হতে না।

অবাক হল সৌম্য দত্ত। এরই মধ্যে কথাটা চাউড় হয়ে গিয়েছে।

মেয়েটা কে? টেবিলের ওপর দুটো পা তুলল কুলি।

ঠিক চিনি না তবে পুলিশকে ভয় করে বলে জানি।

ও তোমার দ্বারা হবে না, আমি আরও লোক দেব তোমার সঙ্গে। প্রথমে ওর পেছনে লেগে থাক তারপর হালকান করে সরিয়ে দিও অন্য জায়গায়। আমি চলি। টেবিলের ওপর থেকে ময়লা পা দুটো নামিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল কুলি।

সৌম্য দত্ত চোখ বন্ধ করে দাঁড়িয়ে রইল বেশ কয়েক মিনিট।

হেমন্তের পীড়াপীড়িতে সীমাকে কিছু মুখে দিতে হল। খাওয়ার ইচ্ছা তার ছিল না। একটা অদ্ভুত যন্ত্রণা হচ্ছিল তার। মাদক দ্রব্যের প্রভাবে যেন তার মস্তিষ্ক অসাড় হয়ে গিয়েছে। নিজের মনের সঙ্গে যুদ্ধ করে আবার অরুণের ঘরে ফিরে গেল সে। আর দেরী করলে তার চলবে না। নতুন স্যুটকেসটায় তার কাপড়জামা আগেই ভর্তি করে নিয়েছিল। দুটো জিনিসই সে সঙ্গে নেবে, একটা এ্যাটাচি কেস আর স্যুটকেশ। আলমারি বন্ধ করে চাবিটা অরুণের টেবিলের ওপর রেখে দেয়ালের ঘড়িটা কাঁটা পিছিয়ে দিল আধঘণ্টা। হাতের চুড়ি এবং গলার হারটা খুলে সে টেবিলের ওপর চাবির সঙ্গে রাখল তারপর হাতের আংটিটা খুলতে গিয়ে মনে পড়ল অসিতবাবু তাকে এটা কোনদিন খুলতে বারণ করেছিলেন। শীর্ণ ভদ্রলোক, আর শান্ত কোমল চোখ ও হাসিটার কথা মনে পড়ল সীমার। আংটিটা আর খুলল না সে। এবার বক্সারের কথা মনে পড়ল তার। তার কাছে গিয়ে দাঁড়াতেই সে উচ্ছ্বাস প্রকাশ করতে শুরু করল নানাভাবে। তার গায়ে হাত বুলিয়ে আদর করল সীমা। তার গলাটা রুদ্ধ হয়ে এল ভাবাবেগে। ঘরের চতুর্দিকটা একবার ভাল করে দেখে নিল। অনেকদিন কাটিয়েছে সীমা এই ঘরে। মন্থরতা নেমেছিল তার শরীরে আর মনে, এতদিনের আরাম আর আলস্যে। এর আগে এ ধরনের ভাবালুতা তার জন্মায়নি। অবিশ্রান্ত চলনে নুড়িতে শ্যাওলা ধরতে পারেনি এতদিন পর্যন্ত। এক জায়গা থেকে আর এক জায়গায় যাযাবরের মত সে গিয়েছে আর এসেছে মাত্র। কোন জায়গায় বা বিশেষ কোন ঘটনার দিকে সে মন দিতে পারেনি।

সাইড টেবিলে ট্রানজিস্টার, অনেকগুলো বই, টুকিটাকি প্রসাধনের সামগ্রী ছড়ান রয়েছে এলোমেলোভাবে। বিয়ের সময় এগুলো উপহার পেয়েছে সে, এতদিন এদের সঙ্গ ভাল লেগেছে তার। তার জীবনে উপহারের স্থান ছিল না। উপহারের মূল্য কি সেটাও কোনদিন অনুভব করেনি সীমা। নিজে কেনা আর উপহারের

পার্ককাটা সে এতদিনে বুঝেছে। অস্বাভাবিক লাগছে, আশ্চর্য লাগছে এই নবলব্ধ অনুভূতি। আর দেরী করলে চলবে না। বক্সারের দিকে একবার তাকাল সে। বক্সারকে সে ফিরে পাবে কি করে? বোধহয় পাবে না। এই শেষ। বাবাকে ছাড়তে হয়েছে, দাদার ইস্পাইজাকে ছাড়তে হয়েছে, এবার বক্সারকে। আরও দুজনের কথা মনে পড়ল সীমার। অসিতবাবু আর হেমন্ত। অসিত-বাবুর প্রশান্ত হাসি আর স্নেহময় ব্যবহার। হেমন্তর শ্রদ্ধা, সেবা, নিষ্ঠা সহজে ভুলবে না সে। হেমন্ত আর করুণা খেতে বসেছে। এই তার সুযোগ। স্যুটকেশ আর অ্যাটাচিটা নিয়ে ধীরে ধীরে নামল সীমা।

সৌম্য দত্ত কিন্তু উপদেশ অনুযায়ী অন্যের সাহায্যের জন্য অপেক্ষা করল না। তার পৌরুষে ভীষণ আঘাত লেগেছে। একটা সামান্য মেয়ে তাকে অপমান করবে আর দলের লোকের সাহায্য নিয়ে তার শোধ তুলবে, অসম্ভব! যে ট্যাক্সিটায় সীমা ফিরে গিয়েছিল, তার নম্বরটা জোগাড় করতে দেরী হল না সৌম্যের। নোংরা পোশাক পরা মার্কেটের আশেপাশে যে ছেলেগুলো ট্যাক্সি ডেকে দেয়, তারা অন্য কাজও করে থাকে অনেক। এরা চটপটে, চতুর এবং নানা বিষয়ের খবরও সংগ্রহ করে থাকে। সীমার ঠিকানা জেনে একাই অরুণের বাড়ীর কাছে এসে উপস্থিত হল সে। সৌম্য দত্তর ভাগ্য ভাল। কিছুক্ষণের মধ্যেই সীমাকে তার স্যুটকেশ আর

এ্যাটাচি সমেত দেখতে পেল গেটের কাছে। দুপুরবেলা, জায়গাটা ফাঁকা। অদূরে একটা পানের দোকানে আধখানা পাল্লা বন্ধ করে পানের দোকানী নিদ্রা যাচ্ছে।

সময় আর সুযোগ দুটোই তার অনুকূলে। খুশী হল সোম্য দত্ত।

তোমার স্যুটকেশটা আমায় দাও, বলল সৌম্য দত্ত। পেছনে তাকিয়ে তাকে দেখে অবাক হল সীমা। তার মুখ দিয়ে কোন কথা বার হল না। তার হতবুদ্ধি ভাবটায় আনন্দ পেল সোম্য। স্যুটকেশটা সীমার হাত থেকে ছিনিয়ে নিল সে। হতভম্ব হয়ে গিয়েছে সীমা। মুখটা তার ফ্যাকাশে হয়ে গিয়েছে। ঠোঁট দুটো কাঁপছে থরথর করে।

ভয় পাচ্ছ, ভয় কিসের? সীমার হাতটা ধরল সোম্য।

ছাড়ুন, চীৎকার করে উঠল সীমা।

পাগল, এত সহজেই কি ছাড়া যায়? সোম্যর মুখে ক্রুর হাসি। হাতটা ঝাঁকি দিয়ে ছাড়াতে চেষ্টা করে সীমা বললে, আমাকে ছেড়ে দিন না হলে পুলিশ ডাকব আমি। সঙ্গে সঙ্গে চীৎকার করে উঠল সীমা। পানওয়ালা উঠে পড়ল তার চীৎকার শুনে।

এ বাবু, ক্যা হুয়া?

হামারা জেনানা, গোসসে ভাগনে মাংতা। সীমার হাতটা সজোরে ধরে রয়েছে সোম্য দত্ত।

বাঙালীরা হরদম ঝুটঝামেলা করে। দুপুরে একটু ঘুমোবার তারও জো নেই। বিরক্ত হয়ে পাল্লাটা আরও একটু বন্ধ করে দিল পানওয়ালা।

এবার লক্ষ্মীমেয়ের মত চল। ঝামেলা করলে কোন ফলই হবে না। দেখছ, পান-ওয়ালা দরজা বন্ধ করে দিব্যি ঘুমিয়ে পড়ল। স্ত্রীকে স্বামী নিয়ে যাবে এতে কেউ বাধা দেবে না। চল—। সীমার হাতটা মুচড়ে ধরল সোম্য। যন্ত্রণায় আর্তনাদ করে উঠল সে।

ছেড়ে দিন আমায়, এবার মিনতি করল সীমা।

দেবো বৈকি, দাঁড়াও, অনেক কাজ বাকী আছে যে।

আমি যাব না, শক্ত হয়ে দাঁড়িয়ে রইল সীমা।

বিয়ে করা বউ, বাড়ী যাবে না মানে, লোকে বলবে কি? জোরে টানল সোম্য।

আমার এ্যাটাচি কেসে সাতাশ হাজার টাকা আছে, এটা নিয়ে আমাকে ছেড়ে দিন।

কথাটা শুনে সীমার হাত থেকে এ্যাটাচি কেসটা ছিনিয়ে নিল সোম্য। থ্যাঙ্ক য়ু, এটা আমার উপরি পাওনা। তোমার কোমল হাতের চড়ের দাম বলতে পার। এরপর দিনের আলোতে সকলের সামনে তোমায় তুলে নিয়ে যাব আমি। স্বামী স্ত্রীকে ওভাবে নিয়ে গেলে কেউ আপত্তি করবে না বরঞ্চ বাহবা দেবে। সজোরে সে সীমাকে কাছে টেনে নিল।

দূরে একটা গাড়ী আসতে দেখল সীমা। এবার ধস্তাধস্তি শুরু হল দুজনে। বাক্স দুটো রাস্তার ওপর পড়ে গেল সশব্দে। ব্রেকের তীব্র আওয়াজটা শুনতে পেল সীমা।

কি ব্যাপার, অরুণ দাঁড়িয়েছে সীমার সামনে।

আমায় বাঁচান, অস্ফুট স্বরে বলে উঠল সীমা। তার হাতটা ছেড়ে দিল সোম্য দত্ত সঙ্গে সঙ্গে।

আমার স্ত্রী, ঝগড়া করে চলে যেতে চাইছেন। একটা কৈফিয়ৎ দিতে চায় সোম্য দত্ত।

স্যুটকেশ আর এ্যাটাচি দুটো তুলে নিল অরুণ। সীমা তার পাশে এসে দাঁড়িয়েছে ততক্ষণে। সকলে মিলে বাড়ীর ভেতরে ঢুকল তারা। ঘরের দরজাটা বন্ধ করে অরুণ সোম্য দত্তর দিকে তাকিয়ে রইল কিছুক্ষণ। সোম্য দত্ত কিছুই বুঝতে পারছে না।

এবার বলুন, কি বলছিলেন!

বলছিলাম, উনি আমার স্ত্রী।

তাই নাকি, কবে বিয়ে করেছেন? অরুণের মুখে কৌতুক। এই কয়েক বছর। একটা যেন বিপদের গন্ধ পেল সোম্য।

আপনার নামটা বলেননি এখনও। অরুণ গলার টাইটা ঢিলে করল।

আমার নাম সোম্য দত্ত। লিণ্ডসে স্ট্রীটের জ্যাজক্লের মালিক আমি।

আলাপ করে খুশী হলাম। আমার নাম অরুণকান্তি বসু। কিন্তু একটা বিপদ হয়েছে।

বিপদ! সোম্য তাকাল তার দিকে।

হ্যাঁ, এই মহিলাটিকে আমিও বিয়ে করে ফেলেছি; মাত্র মাসতিনেক আগে। অরুণের মুখে হাসি, এবার বলুন কি করা যায়।

আপনি আবার কি করবেন, আমিই নালিশ করব, রাগ দেখাবার চেষ্টা করে সোম্য।

ভাল কথা, তাহলে প্রথমেই পুলিশকে ফোন করাই উচিত। অরুণ ডায়াল করল পুলিশে!

পুলিশের সঙ্গে সোম্য দত্ত চলে যাবার পর সীমা কাঠের পুতুলের মত বসে রইল অনেকক্ষণ। সোম্য দত্তর হাত থেকে সে যে রেহাই পাবে এটা সে ভাবতেই পারেনি। সিনেমার ছবির মত সব ঘটনাগুলো তার চোখের সামনে ঘটে গেল একটার পর একটা। কত অসহায় সে। প্রতিবাদ করার মত জোরটুকুও তার ছিল না সে সময়ে। তার সাহায্যের জন্যেও এগিয়ে এল না কেউ। অরুণই বা এত সকালে এসে পড়ল কি করে? অরুণই তাকে সোম্য দত্তর হাত থেকে রক্ষা করল। কিন্তু কি লজ্জার কথা, অরুণের কাছে সে হাতে নাতে ধরা পড়ে গেল। কথাটা মনে হতে সীমার মুখটা জ্বালা করে উঠল।

এই নাও, তোমার জাল চাবিটা। অরুণ এসেছে আবার ঘরের মধ্যে। চাবিটা সে ছুঁড়ে ফেলে দিল সামনের টেবিলের ওপর। মাথা নীচু করে রইল সীমা।

ঘড়িটাও ঠিক করে দিয়েছ, কোমরে হাত দিয়ে দাঁড়াল অরুণ, তুমি কি ভেবেছিলে, তোমার এই জঘন্য ষড়যন্ত্র কেউ ধরতে পারবে না। আর এক পা এগিয়ে এল অরুণ, আমার কথা ছেড়ে দিলেও এই বাড়ী, এই সংসার, আমার বাবার স্নেহ, লোকজনের শ্রদ্ধা, তোমায় কি একবারও শুভবুদ্ধি জাগিয়ে দিতে পারল না? আমার তুমি চুরি করলে?

না, আমি চুরি করিনি, বলল সীমা, আমি আমার নিজের জিনিসই নিয়েছিলাম।

সাতাশ হাজার টাকা কোথা থেকে পেয়েছিলে, এরই মধ্যে সেটা ভুলে গেলে? তার বদলে আমাকেও ঠিক ঐ পরিমাণ টাকা শুধু ফেরত দিতে হয় নি, মোনাকে অনেক অনুনয় করার পর সে কেসটা তুলে নিয়েছে, এটা জানতে?

আমায় পুলিশেই দিন, আমার আর সহ্য হচ্ছে না। অন্য দিকে মুখ ফেরাল সীমা।

তাই দিতে পারতাম। পিছু ফিরে দাঁড়াল অরুণ, যদি না আমার বা বাবার সম্মান এতে ক্ষুন্ন হত। এখন তুমি কি করতে চাও আমায় বল।

কোন উত্তর দিল না সীমা।

তুমি কোথায় যাচ্ছিলে? সামনে ফিরে দাঁড়াল অরুণ।

হাওড়া স্টেশনে!

সোম্য দত্তর সঙ্গে?

না, ও আমায় রাস্তায় ধরেছিল।

তাহলে সোম্য দত্তর সঙ্গে তোমার কোন যোগসাজস নেই।

না, প্রতিবাদের দৃষ্টিতে তাকাল সীমা, তারপর বলল, কোন লোকেরই সঙ্গে আমার সম্পর্ক নেই, একথা আগেও বলেছি আপনাকে।

তাহলে সোম্য দত্ত তোমায় ঠিক সময়ে রাস্তায় পেল কি করে?

সোম্য দত্তর সঙ্গে আমার ব্যবহার লক্ষ্য করে এটা বোঝা উচিত ছিল আপনার; তাছাড়া আমি আপনাদের সকলকেই ঘৃণা করি।

আই সি, তাহলে হাওড়া স্টেশন থেকে কোথায় যাচ্ছিলে?

শিমুলতলায়, পিসিমার কাছে।

সেখানে কি করতে? কয়েক মাস গা-ঢাকা দেওয়া ছাড়া আর কোনও মতলব ছিল নাকি?

সেকথা আপনাকে বলতে আমি বাধ্য নই।

হ্যাঁ, বলতে বাধ্য তুমি, গলার স্বরটা একটু চড়াল অরুণ।

জোর দেখাবার চেষ্টা করবেন না। তাতে কোন ফল হবে না।

(ক্রমশঃ)

চিত্তরঞ্জন ও সুভাষচন্দ্র

শংকরীপ্রসাদ বসু

(পূর্বপ্রকাশিতের পর)

কলকাতায় এই বয়কটের সাফল্যের পক্ষে সর্ববৃহৎ প্রমাণ নিশ্চয়ই হবে বৃটিশ স্বার্থের মুখ্য মুখপত্র স্টেটসম্যানের বিবরণী—যে-সংবাদপত্র সর্বদা অসহযোগ আন্দোলনের সাফল্যকে সামান্য ক'রে দেখাতে চেয়েছে। বয়কটের সাফল্যের মূলে ছিল স্বেচ্ছাসেবক গুন্ডাদের শাসানি—স্টেটসম্যানের রিপোর্টে একথা তারস্বরে জানানো হয়েছিল, কিন্তু পত্রিকাটিকে স্বীকার করতে হয়েছিল, কলকাতার ইতিহাসে অভূতপূর্ব এই হরতাল। সে সাফল্য পত্রিকাটির আর্ত স্বীকারোক্তি নিষ্কাশন করেছিল—ইংরেজ সরকারের বদলে বুঝি কংগ্রেস সরকার কায়েম হয়ে গেছে শহরে!! অথচ, স্টেটসম্যান উল্টোদিকে উল্লাসের সঙ্গে না লিখে পারেনি—গান্ধীর দুর্গ বোম্বাইয়ে প্রিন্সকে বিরাট সম্বর্ধনা জানানো হয়েছে।

১৮ নভেম্বর, ১৯২১-এ স্টেটসম্যানে দীর্ঘ সম্পাদকীয়ের সূচনার কিছু অংশ :

"The Hartal observed in Calcutta by the order of Mr. Gandhi was a great and dramatic success. A more than Sabbath-like silence reigned in the city.. No vehicles were to be seen in the streets except a few motor-cars, most of which were driven by their owners. No horse gharry was on hire, the taxi cars were at rest. All Indian shops were closed and the New Market, owned and controlled by the Corporation of Calcutta was deserted by customers. In a large number of workshops, probably in the majority of them, the workmen were absent. According to the desire of Mr. Gandhi, the whole city seemed to be in mourning over the arrival of the Prince of Wales in India. Not only was there the semblance of general sorrow, but the closing of doors of many private houses in the Indian portions of the city indicated a wide-spread, if vague, apprehension of impending trouble against which it was useless to look for protection from the constituted Government. The timorous may well be excused, for there was little evidence of the existence of British rule..... To be perfectly frank, it must be admitted that the Indian city of Calcutta spent yesterday under the Gandhi Raj."

কলকাতার এই বয়কট-সাফল্যের রাজনৈতিক তাৎপর্য ছিল প্রচণ্ড। প্রথমতঃ ইংরেজ মহলে এই হরতালের মুখ্য সংগঠক কংগ্রেস স্বেচ্ছাসেবক দলের বিরুদ্ধে যে দারুণ সোরগোল পড়ে গিয়েছিল, তার ফলে পরদিনই স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীকে বে-আইনী ঘোষণা ক'রে দেওয়া হয়। (এবং কংগ্রেস পক্ষে সুভাষচন্দ্র বহুগুণ অধিক উৎসাহে ঐ বাহিনী সংগঠিত করার কাজে লিপ্ত হয়ে পড়েন)। দ্বিতীয়তঃ এই সাফল্য কংগ্রেসের বিরাট প্রভাবের পরিচয় দিয়েছিল বলে লর্ড রীডিং কংগ্রেসের সঙ্গে একটা বোঝাপড়ায় আসবার জন্য উদ্‌গ্রীব হন। গান্ধীজীর রাজনৈতিক বুদ্ধির অভাব সেই সুযোগকে কিভাবে নষ্ট ক'রে দেয়, সেকথা আগে বলেছি।

স্বেচ্ছাসেবকবাহিনীর অধিনায়ক ছিলেন বলেই নয়, বাস্তবপক্ষে সুভাষচন্দ্রের সংগঠনী শক্তিই যে ঐ বয়কটের সাফল্যের মূলে ছিল, তা নানা সূত্রেই জানা যায়। আমি সাবিত্রীপ্রসন্নের সাক্ষ্য উদ্ধৃত করছি। তা আগে স্মরণ করিয়ে দেয়, এই সময়ে সুভাষচন্দ্রের বয়স মাত্র ২৪।

সাবিত্রীপ্রসন্ন লিখেছেন :

'যুবরাজের আগমন ও সম্বর্ধনা বয়কট করার আন্দোলনে অগ্রণী হলেন সুভাষচন্দ্র। এ বিষয়ে কলকাতা শহরে বিপুল উৎসাহ ও উত্তেজনা সৃষ্টি করার মূলে ছিলেন সুভাষচন্দ্র। সে এক অদ্ভুত ব্যাপার। যাঁরা যুবরাজের এই সম্বর্ধনা-বর্জনের বিপুল আয়োজন কলকাতায় কি রকম নিখুঁতভাবে হয়েছিল তা প্রত্যক্ষ করবার সুযোগ পেয়েছেন—তাঁরাই বলবেন যে, কী অদ্ভূতকর্মা দৃঢ়প্রতিজ্ঞ যুবক এই সুভাষচন্দ্র। ১৯২১ সালের প্রবল পরাক্রান্ত বাংলা গভর্ণমেণ্ট, তার ছায়ানুগ অসীম ক্ষমতাসম্পন্ন পুলিশ ও গোয়েন্দা বিভাগ সর্বদা সজাগ পাহারায় নিযুক্ত। ... তখন ইংরেজ শাসনে পরিতৃপ্ত, অনুগ্রহপুষ্ট রাজভক্ত প্রজার সংখ্যাও কম ছিল না। চারিধারের বেড়াজালের সতর্কতা এবং বিরুদ্ধবাদী আত্মদ্রোহী ভারতীয়দের সহায়তা সত্ত্বেও স্বীয় ক্ষমতায় দৃঢ় বিশ্বাসী রাজসরকারকে সেদিন বোধহয় আশংকাতে স্তব্ধ হয়ে যেতে হয়েছিল। একমাত্র সুভাষচন্দ্রের ব্যক্তিত্ব ও সংগঠনশক্তির ফলেই এই যুবরাজের সম্বর্ধনা-বর্জনের চেষ্টা জনসাধারণের দিক থেকে সম্পূর্ণভাবে সার্থক হয়েছিল।'

বাংলা হিন্দী ও ইংরাজিতে লক্ষ লক্ষ প্রচারপত্র কী দারুণ পরিশ্রমে ছাপানো হয়েছিল সেকথা সাবিত্রীপ্রসন্নের বিবরণে পাই, সুভাষচন্দ্র কিভাবে সর্বত্র ঘুরে সংগঠন করেছিলেন, ইন্টালি এলাকার মুসলমান মহল্লায় সুভাষচন্দ্রের কি রকম যাতায়াত ছিল, সেকথাও ঐ বিবরণ থেকে জেনেছি, এবং জেনেছি বাংলায় যুবকদের নিয়ে তিনি যে শক্তিশালী স্বেচ্ছাসেবকবাহিনী গড়ে তুলেছিলেন, তার সদস্যরা তাঁকে কী গভীর অনুরাগ ও শ্রদ্ধার চোখে দেখতেন।

বয়কট আন্দোলনের সাফল্যের পরেই ১৯২১ ডিসেম্বরের গোড়ার দিকে বাংলায় প্রত্যক্ষ আইন অমান্য আন্দোলন আরম্ভ করে দিলেন দেশবন্ধু এবং সেই আন্দোলন পরিচালনার ভার গিয়ে পড়ল সুভাষচন্দ্রের উপরে—স্বয়ং সুভাষচন্দ্রই তা লিখেছেন। ২৪ বছরের একটি তরুণের উপরে আন্দোলন সংগঠনের ভার—বিস্ময়কর বটে। এই আন্দোলনের পরিণতি দেশবন্ধুসহ সুভাষচন্দ্র প্রমুখের গ্রেপ্তারে—তার আগেই কিন্তু হাজার হাজার দেশপ্রেমিক কয়েদীতে জেল ভরে গিয়েছে। 'হাজার হাজার স্বেচ্ছাসেবকে কলিকাতা ও বাংলাদেশের বিভিন্ন স্থানের জেল পরিপূর্ণ হয়ে গেল। স্থানসঙ্কুলানে অসমর্থ হয়ে অবশেষে খিদিরপুর ও দমদমে স্পেশাল জেলখানা তৈরী হল।

...সেদিন আমরা দেখলাম, যৌবন জলতরঙ্গের গতিবেগে গভর্ণমেণ্ট চঞ্চল, বিব্রত ও বিপর্যস্ত হয়ে উঠল। গভর্ণমেণ্টের যে যুদ্ধ-আহ্বান দেশবন্ধু দৃঢ়তার সঙ্গে গ্রহণ করেছিলেন, তাতে পরাজয় হল গভর্ণমেণ্টের, সার্থক হল সুভাষচন্দ্রের অমানুষিক পরিশ্রম ও সুশৃঙ্খল শান্তিপূর্ণ সংগঠন ব্যবস্থা।' (সাবিত্রীপ্রসন্ন)

(ঙ) জেল থেকে বেরিয়ে সুভাষচন্দ্র উত্তরবঙ্গের ভয়াবহ বন্যায় সেবাকাজে নেতৃত্ব করেছিলেন এবং সে নেতৃত্ব ঐতিহাসিক হয়ে আছে। এ বিষয়ে অধিক তথ্য

তখনকার দিনে সংবাদপত্রে পাতাজোড়া শিরোনামা বেশী বেরুত না। ২৬ অক্টোবর, ১৯২৪ তারিখের অমৃতবাজার পত্রিকায় এই সংবাদ দেখিয়ে দিচ্ছে সুভাষচন্দ্রের গ্রেপ্তারের কী বিরাট গুরুত্ব দিল জনসমাজে।

Chief Executive Officer Arrested

1916 REPEATED!

REPRESSION AGAIN!

ERA OF REPRESSION

VICEROY'S NEW ORDINANCE

সমাবেশের প্রয়োজন নেই, শুধু বললেই যথেষ্ট হবে, দেশবন্ধুর অন্যতম প্রধান অনুচর মানবপ্রেমে উদ্বুদ্ধ হয়ে এতবড় সেবাকাজ চালাচ্ছেন—এটা শেষ পর্যন্ত কংগ্রেসের মর্যাদাভাণ্ডারে জমা পড়েছিল, এবং জনগণের বাস্তব দুঃখকষ্টের সঙ্গে রাজনৈতিক আন্দোলন সংশ্লিষ্ট নয়—এই অভিযোগ কিছুটা দূর করতে পেরেছিল। এই সেবাকাজের প্রশংসা করেছিলেন বাংলার তৎকালীন গভর্ণর পর্যন্ত। প্রমাণ হয়েছিল অসহযোগীরা শুধু ভাঙতেই চান না—গঠন করতেও প্রস্তুত এবং পটু।

(চ) গয়া কংগ্রেসে দেশবন্ধুর স্বরাজ্য-পরিকল্পনার পরাজয়ের পরে তিনি কংগ্রেসকে অধিকার করার লড়াইয়ে নেমে পড়েছিলেন,—সে লড়াইয়ে সুভাষচন্দ্র ছিলেন দেশবন্ধুর শ্রেষ্ঠ সেনাপতি—একথা রাজনৈতিক লেখক শ্রীযুক্ত কালীচরণ ঘোষ সুস্পষ্টভাবে জানিয়েছেন। অন্য সূত্র থেকেও একই কথা জানা যায়। স্বরাজ্য দলের আভ্যন্তরীণ সংগঠনে এবং ঐ দলের সাফল্যে কার্য নির্বাচন পরিচালনায় সুভাষচন্দ্রের নিশ্চিদ্র পরিশ্রমের ইতিহাসকে সম্পূর্ণ উদ্ঘাটিত করা সম্ভব নয়, এখানে সে চেষ্টার প্রয়োজনও নেই। কেবল এইটুকু বললেই যথেষ্ট হবে, দেশবন্ধুর সমস্ত রাজনৈতিক জীবনের ভবিষ্যৎ যে-ব্যাপারে সাফল্যের উপরে নির্ভর করছিল, সেই কাজে তিনি একটি 'বলিপ্রদত্ত' তরুণ প্রতিভাকে বজ্ররূপে ব্যবহার করতে পেরেছিলেন—এর থেকে বড় স্বস্তি তিনি আর কিছুতে পাননি।

(ছ) গয়া কংগ্রেসে গান্ধীপন্থীদের হাতে পরাজয়ের পরে দেশবন্ধুর অবস্থাকে মাত্র একবাক্যে প্রকাশ করতে পেরেছিল শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের প্রতিভা : 'লোক নাই, অর্থ নাই, হাতে একখানা কাগজ নাই ; অতি ছোট যাহারা তাহারা গালিগালাজ না করিয়া কথা কহে না—দেশবন্ধুর সে কী অবস্থা!' এই সূত্রে সুভাষচন্দ্র লিখেছেন : 'সেদিনকার কথা এখনো আমার স্পষ্ট মনে অঙ্কিত আছে। আমরা যখন গয়া কংগ্রেসের পর কলিকাতায় ফিরি—তখন নানাপ্রকার অসত্যে এবং অর্ধসত্যে বাংলার সব খবর কাগজ ভরপুর। আমাদের সপক্ষে তো কথা বলেই নাই, একটির [illegible] তাদের কাগজে স্থান দিতে চায় নাই। তখন স্বরাজ্য ভান্ডার প্রায় নিঃশেষ। ......যে-বাড়িতে এক সময়ে লোক ধরত না, সেখানে কি বন্ধু, কি শত্রু—কাহারও চরণধূলি আর পড়ে না। কাজেই আমরা কয়েকটি প্রাণী মিলে আসর জমাতুম।' সেই বাড়ির 'পূর্ণ গৌরব' ফিরে এসেছিল, কিন্তু কি রকম হাড়ভাঙা পরিশ্রম করে (স্বরাজ্য) ভাণ্ডারে অর্থসংগ্রহ হল, নিজেদের খবর কাগজ প্রকাশিত হল, এবং জনমত অনুকূল দিকে ফেরান হল, তা বাহিরের লোক জানে না, বোধহয় কোনোদিন জানবেও না।' 'এই যজ্ঞের হোতা, ঋত্বিক, প্রধান পুরোহিত' দেশবন্ধু তাঁর সর্বকার্যেই সুভাষচন্দ্রকে পেয়েছিলেন—এখানে তার মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখ করতে চাই দলের সংবাদপত্রের ব্যাপারটিকে।

আই সি এস-ত্যাগী সুভাষচন্দ্র দেশবন্ধুর কাছে তাঁর পূর্বে-উল্লিখিত 'আবেদন পত্রে' সংবাদপত্রের ব্যাপারে আগ্রহের কথা জানিয়েছিলেন। আবেদনপত্রে উল্লিখিত অন্যান্য আগ্রহ মেটানোর মত এই আগ্রহ মেটাতেও দেশবন্ধু স্নেহকাতরতা দেখালেন। না দেখিয়েও উপায় ছিল না। জাতীয়তাবাদী সংবাদপত্র সমগ্রতঃ স্বরাজ্য দল বিরোধী।......প্রচার-সহায়তার জন্য কলকাতা থেকে 'বাংলার কথা' নামে একটি দৈনিক পত্র বার করা হল। নেতার নির্দেশে আমি রাতারাতি তার সম্পাদক হয়ে পড়লাম'—সুভাষচন্দ্র লিখেছেন।

'বাংলার কথা' নয়, দৈনিক ইংরাজি সংবাদপত্র 'ফরোয়ার্ড'ই দেশবন্ধুর ও তাঁর দলের কাগজ বলে ভারতবর্ষের রাজনৈতিক ইতিহাসে বিখ্যাত। প্রকাশিত হবার কিছুদিনের মধ্যে ফরোয়ার্ড ভারতবর্ষের জাতীয়তাবাদী সংবাদপত্রগুলির মধ্যে অগ্রণী ভূমিকা নিয়েছিল—সুভাষচন্দ্র দাবী করেছেন। এবং 'ফরোয়ার্ডের প্রথম পর্বের ইতিহাস সুভাষচন্দ্র বসুরই ইতিহাস'—একথাও জেনেছি ফরোয়ার্ডের তৎকালীন অন্যতম রিপোর্টার, পরে বিশিষ্ট সাংবাদিক শচীন দাশগুপ্তের স্মৃতিকথা থেকে।

কেবল কি ঐ স্মৃতিকথা—সকল স্মৃতিতেই একই কথা। ফরোয়ার্ড প্রেসের ম্যানেজার সাবিত্রীপ্রসন্ন তা জানিয়েছেন, জানিয়েছেন সত্যরঞ্জন বক্সী—ঐ পত্রিকার পরবর্তীকালের অতিখ্যাত সম্পাদক। সকলেই সুভাষচন্দ্রের অতিমানবিক পরিশ্রম, সাংবাদিকতার নূতন নূতন উচ্চাঙ্গের রীতি-প্রবর্তনের নৈপুণ্য, তীক্ষ্ম মর্মভেদী সম্পাদকীয় প্রবন্ধ রচনার সামর্থ্যের কথা বলেছেন। দেশীয় সাংবাদিকতার ক্ষেত্রে ফরোয়ার্ড কার্যতঃ বৈপ্লবিক পরিবর্তন এনেছিল। ফরোয়ার্ড পত্রিকায় ১৯২[illegible] সালের অক্টোবর মাসে প্রকাশিত 'হিস্টরি অব ফরোয়ার্ড' নামক প্রবন্ধে সুভাষচন্দ্রের ভূমিকা সম্বন্ধে বলা হয়েছে :

"Subhas Chandra Bose, had been the moving spirit of Forward during its strenuous days of storm and stress".

ফরোয়ার্ড প্রকাশিত হবে, এই সংবাদ শোনবার পরে সরকার দেশবন্ধুর রাজনৈতিক কণ্ঠস্বরকে স্তব্ধ করে দেবার জন্য ফরোয়ার্ডের ম্যানেজার মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য ও সম্পাদকীয় বিভাগের উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়কে অকস্মাৎ কারারুদ্ধ করেন। 'তখন শ্রীযুক্ত সুভাষচন্দ্র বসু আমলাতন্ত্রের এ কর্মতৎপরতাকে ব্যর্থ করবার জন্য দ্বিগুণ উৎসাহে কাজে নেমে পড়লেন। আমলাতন্ত্রের চ্যালেঞ্জের সামনে, সুভাষচন্দ্র বসুর যেমন স্বভাব, তিনি ঝাঁপিয়ে পড়লেন যুদ্ধে। অবিলম্বে তিনি ফরোয়ার্ডের সেক্রেটারী ও ম্যানেজার নিযুক্ত হলেন এবং অদম্য উৎসাহে কাজ করে যেতে লাগলেন'—ফরোয়ার্ডের উক্ত প্রবন্ধে বলা হয়েছিল।

কীভাবে সুভাষচন্দ্র কাজ করেছিলেন, সেই আকর্ষক ও শিক্ষাপ্রদ ইতিহাসে প্রবেশ করবার সুযোগ এখানে নেই, কিন্তু ১৯২৬ সালে ফরোয়ার্ডের একই প্রবন্ধে ৩১ বছরের সুভাষচন্দ্র সম্বন্ধে বলা হয়েছিল 'দেশবন্ধুর পরে সুভাষচন্দ্রই ছিলেন ফরোয়ার্ডের প্রেরণাশক্তি।'

ফরোয়ার্ডের প্রথম পর্বের ইতিহাস যদি সুভাষচন্দ্র বসুর ইতিহাস হয়, তাহলে একই সঙ্গে বলতে হবে, সুভাষচন্দ্র ঐ ইতিহাস সৃষ্টিতে নিযুক্ত ছিলেন দেশ ও দেশবন্ধুর প্রয়োজন সাধনের জন্যই। জাতীয় আন্দোলনে নেমে পড়ার সময় থেকেই দেশবন্ধু জাতীয় সংবাদপত্রের প্রয়োজন অনুভব করেছিলেন, স্বরাজ্য দল গঠনের আগেই তিনি দৈনিক পত্র প্রকাশের অভিজ্ঞতার যোগ

দেশবন্ধুর মৃত্যুতে বাঙালী যত বেদনা পেয়েছিল—এমন আর কোনো মানুষের মৃত্যুতে সে পায়নি। কলকাতার ইতিহাসের সর্বাধিক শোকাচ্ছন্ন শোভাযাত্রা দেশবন্ধুর মরদেহ নিয়েই হয়েছিল। স্টেটসম্যানের ১৯ জুন, ১৯২৫-এর রিপোর্টে তার কিছু আভাস।

...L OF MR

UNPARALLELED SCE...
CALCUTTA

HOMAGE TO LOST LEADER

CONDOLENCE MESSAGES FROM FAR AND NEAR

...when the body of Mr. C. R. Das was borne through the streets ... from Sealdah Station to Kalighat for cremation.

করেছিলেন, গান্ধীবাদী শ্যামসুন্দর চক্রবর্তীর সার্ভেন্ট পত্রিকার নিত্য গালা-গালি তাঁর অসহ্য ঠেকেছিল, ১৯২১-এর শেষে আলিপুর সেন্ট্রাল জেলে থাকাকালে এই পত্রিকা-পরিকল্পনা নিয়ে সহকর্মীদের সংগে আলোচনা করেছিলেন, জেল থেকে বেরিয়েই 'ফরোয়ার্ড পাবলিশিং কোম্পানী লিমিটেড' গঠন করেছিলেন, গয়া কংগ্রেসের পরে পত্রিকা-প্রবর্তন অপরিহার্য মনে করে-ছিলেন, সার্ভেন্ট পত্রিকাত্যাগী মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য এ-ব্যাপারে তাঁর প্রধান সহায়ক হয়েছিলেন—কিন্তু দেশবন্ধুর সমস্ত ইচ্ছাই বিফলে পর্যবসিত হত যদি না সরকারী চ্যালেঞ্জের সামনে দাঁড়িয়ে সুভাষচন্দ্র হাল ধরতেন। এক্ষেত্রে সুভাষচন্দ্রের ভূমিকাকে দেশবন্ধু কোন্ চোখে দেখেছিলেন, না বললেও চলে। মনে রাখতে হবে, দেশবন্ধু-নীতিকে সর্বসাধারণের গোচর করার ব্যাপারে ফরোয়ার্ড পত্রিকার ভূমিকা কোনো কিছুর থেকে কম নয়।

কর্পোরেশনের চীফ এক্সিকিউটিভ অফিসার হয়ে 'ক্যালকাটা মিউনিসিপ্যাল গেজেট' সুভাষচন্দ্রই প্রবর্তন করেন।

(জ) সুভাষচন্দ্র প্রমুখের কয়েক মাসের কঠোর পরিশ্রমে ফরোয়ার্ড পত্রিকা যখন স্বচ্ছন্দ গৌরবের জীবন লাভ করেছে, তখন দেশবন্ধু সুভাষচন্দ্রের জন্য নতুন কাজ জোগাড় করে ফেললেন— একেবারে পরিষ্কার একটি চাকরি, এমন চাকরি যাকে ভাইসরয় লর্ড কার্জন পর্যন্ত নাকি সরস চিত্তে আকাঙ্ক্ষার বস্তু বলে ঘোষণা করে-ছিলেন, এবং সুভাষচন্দ্র আই সি এস ত্যাগ না করলেও তাকে অবিলম্বে পাবার আশা করতে পারতেন না—সেই তিন হাজার টাকা মাইনের চাকরির নাম—কলকাতা কর্পো-রেশনের চীফ এক্জিকিউটিভ অফিসার। দেশবন্ধুর নেতৃত্বে স্বরাজ্য দল কলকাতা কর্পোরেশন অধিকার করলে দেশবন্ধু স্বয়ং মেয়র হন, সুভাষচন্দ্রকে দেন পূর্বোক্ত পদটি। দেশের জন্য সর্বস্বত্যাগে প্রস্তুত সুভাষচন্দ্র এই মোটা মাইনের চাকরি (যার অর্থ সক্রিয় রাজনীতি ত্যাগ) মোটেই পছন্দ করেননি, তা দেখেছি, দেশবন্ধুর কোনো কোনো সহকর্মীও তা পছন্দ করেননি, কারণ দেশবন্ধু নাকি তাঁকে বা তাঁদের উক্ত চাকরি দেবেন প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, এবং সবচেয়ে অপছন্দ করে-ছিলেন শাসক সরকার, যাঁরা কলকাতা কর্পোরেশনকে একজন সন্দেহজনক চরিত্রের ক্ষমতাশালী তরুণের হাতে ছেড়ে দিতে রাজী ছিলেন না, বিশেষত উক্ত তরুণের অধীনে যখন বহু জাঁদরেল ইংরেজকে চাকরি করতে হবে।

দেশবন্ধু তাঁর 'সেরা লোকটিকে' কেন কর্পোরেশনের জন্য উৎসর্গ" করেছিলেন যখন তার অর্থ—সেরা লোকটির সাহায্য থেকে তাঁর দলের সাক্ষাৎভাবে বঞ্চিত হওয়া? কারণটি স্পষ্ট। দেশবন্ধু কাউন্সিলের মধ্যে শাসনতন্ত্রকে ধ্বংস করবার নীতি নিয়েছিলেন, কিন্তু একই সংগে দেখাতে চাইছিলেন—ধ্বংসের পিছনে রয়েছে তাঁর গঠনের পরি-কল্পনা। কাউন্সিলে দেশবন্ধুর ধ্বংসের হাত আর কর্পোরেশনে গঠনের হাত। কাউন্সিলে নেতৃত্ব করছিলেন তিনি স্বয়ং, কর্পোরেশনে বলা বাহুল্য সুভাষচন্দ্র ছাড়া কেউ হতে পারেন না, যাঁর সামর্থের উপরে ছিল দেশবন্ধুর নিঃসংশয় বিশ্বাস।

এই গঠনাত্মক কর্মের ক্ষেত্রে আবার দেশবন্ধুর নিজস্ব কিছু পরিকল্পনাও ছিল—তিনি কর্পোরেশনের গতানুগতিক কর্মপদ্ধতির অনুসৃতিই চাইছিলেন না, যা বৃটিশ বাণিজ্য স্বার্থের ও সুবিধাভোগীদের প্রয়োজনে প্রস্তুত ছিল। দরিদ্রদের, অনুন্নত-দের জন্য কর্পোরেশন—এই ছিল দেশবন্ধুর নীতি। মেয়ররূপে প্রথম ভাষণে দেশবন্ধু মিউনিসিপ্যাল সোসিয়ালিজমের সেই নীতি নির্ধারণ করে দিয়েছিলেন, যার কয়েকটি দফা ছিল:

"Free Primary Education, free Medical Relief for the poor, purer and cheaper food and milk supply, better supply of filtered and unfiltered water, better sanitation in bustees and congested areas. Housing of the poor, development of the suburban areas, improved transport facilities and lastly greater efficiency of administration at a cheaper cost."

'সুভাষ বোস ছাড়া আর কে কর্পো-রেশনের আবর্জনা পর্যন্ত নাড়াতে পারবে'—এই ছিল বিশ্বাস, এবং কয়েক মাসের মধ্যে

ঐ আবর্জনা নাড়ানোর কাজ সুভাষচন্দ্র এমন সাফল্যের সঙ্গে করেছিলেন যে, তাঁর কীর্তি নিয়ে রূপকথার কাহিনী তৈরী হয়ে গিয়েছিল।'

॥৫॥

স্বরাজ্য দলের শক্তি ও মর্যাদা যখন তুঙ্গে, তখন সরকারকে একটা কিছু করতে হলই—দেশবন্ধুকে খর্ব করার জন্য—দেশবন্ধুর 'ডান হাত' সরকার কেটে নিলেন, আরো দু-একটি প্রত্যঙ্গের সঙ্গে। মিথ্যা অছিলায় সুভাষচন্দ্রকে গ্রেপ্তার করা হল, সেই সঙ্গে আরও কয়েকজন দেশকর্মীকে। সুভাষচন্দ্র ছাড়া আরও যাঁদের গ্রেপ্তার করা হয়েছিল, তাঁরা স্বরাজ্যদলের বড় কর্মী ছিলেন, কেউ কেউ আইনসভার সদস্যও ছিলেন, কিন্তু সুভাষচন্দ্রের গ্রেপ্তারই প্রধান উত্তেজনার কারণ হল, কারণ এই কয়েক বৎসরের মধ্যে সকলেই জেনে গিয়েছে—দেশবন্ধুর ঠিক পাশে দুর্ধর্ষ শক্তি নিয়ে কে দাঁড়িয়ে আছেন। সুভাষচন্দ্রাদির গ্রেপ্তারে সারা দেশ প্রচণ্ড বিক্ষোভে ফেটে পড়ল, সরকারের নীচতার বিরুদ্ধে ঘৃণা ও রাগ প্রকাশ হতে লাগল সহস্র সহস্র কণ্ঠে—সেই দারুণ উন্মাদনার মধ্যে, ঠিকভাবে বলতে গেলে, অসহায় হয়ে পড়েছিলেন একজনই—সুভাষচন্দ্রের নেতা দেশবন্ধু। সরকারী আক্রমণের হীনতা তাঁকে পীড়িত করল, এবং তার নিষ্ঠুর মর্মভেদ শাস্তি তাঁকে রক্তাক্ত করে তুলল। সীমাহীন বেদনায় তিনি ছটফট ক'রে বেড়াতে লাগলেন। প্রতিবাদে যেসব ভাষণ দিতে লাগলেন সেগুলি বেদনার রক্তবমন ছাড়া আর কিছু নয়।*

চীফ এক্সিকিউটিভ অফিসার সুভাষচন্দ্র বসুর গ্রেপ্তারের প্রতিবাদে মেয়র চিত্তরঞ্জন দাশ ২৯ অক্টোবর, ১৯২৪ খৃষ্টাব্দে যে-ভাষণ দিয়েছিলেন কর্পোরেশনে—কর্পোরেশনের ইতিহাসে তা স্মরণীয়তম বক্তৃতা তো বটেই, ভারতীয় বাগ্মিতার ইতিহাসে তা অন্যতম শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি। যুক্তির সঙ্গে আবেগের তেমন সমন্বয় কদাচিৎ দেখা যায়। সন্তোষকুমার বসু ঐ ঘটনার স্মরণে লিখেছেন, 'অগ্নি ও উত্তাপের বিপুলতা বক্তৃতাটিকে তুলে দিয়েছিল বাগ্মিতার এক অলভ্য শিখরে।' কলকাতার ইংরাজ বাণিজ্যস্বার্থের মুখপত্র 'ক্যাপিটাল' পত্রিকার বিশেষ প্রতিনিধি এই বক্তৃতার প্রসঙ্গে লিখেছিলেন: 'মিঃ সি আর দাশের রাজনীতির বিষয়ে যার যাই ধারণা থাক না কেন, সভার শেষে তাঁর বক্তৃতা তাঁকে অসাধারণ বাগ্মীরূপে দেখিয়ে দিয়েছিল। যুক্তি গ্রন্থন ছিল অপূর্ব, বাচনভঙ্গি অনবদ্য। সহজ যুক্তিতর্ক দিয়ে শুরু ক'রে তিনি যখন তীব্রতম আবেগশিখরে উত্থিত হয়েছিলেন তখন তাঁর ভাষণ শুনে একথা মনে না হয়ে পারেনি—এখন এমন একজন মানুষের কথা আমরা শুনছি যিনি সাধারণের বহু ঊর্ধ্বে স্থাপিত।' 'সূচীপতননিঃশব্দ কর্পোরেশনের সভায় দাঁড়িয়ে কলিকাতার মেয়র দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ...তাঁর চক্ষে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ; কণ্ঠে বজ্ররন্দ্র; দৃঢ় মুষ্টিবদ্ধ দক্ষিণ হস্ত বার বার সজোরে সশব্দে নেমে আসছে তাঁর আসন-সম্মুখস্থ টেবিলের উপরে। চৌত্রিশ বছর হয়ে গিয়েছে, কিন্তু আজও দেখছি—সেদিন যেমন দেখেছিলাম—সেই শুভ্র বসন, দীর্ঘদেহ, দীপ্ত মূর্তি; আজও শুনছি যেন সেই আবেগকম্পিত ভাষণ'—অমল হোম লিখেছেন।

দেশবন্ধু কর্পোরেশনের উক্ত সভায় সরকারের 'বে-আইনি আইনের' স্বরূপ খুলে ধরেছিলেন—ন্যায়ের অধিকার রক্ষায় না সেবায় বে-আইনের কোনো লক্ষ্য নেই, যা ধ্বংসাত্মক এবং মানবের মূলগত অধিকারের বিরোধী। এমন বে-আইনি আইন একদা ইংলণ্ডেও ছিল—স্টুয়ার্ট রাজত্বের অনাচারের দিনে। সরকার হিংসা নিবারণের জন্য এই আইন প্রবর্তন করেছেন—কিন্তু এই আইন সরকারের হিংসাকে নগ্ন ক'রে খুলে ধরেছে। সরকার দেখিয়ে দিয়েছেন, হিংসার প্রয়োগ ভিন্ন তাঁরা ভারত শাসনে সমর্থ নন। বিপ্লবীর বোমা বা পিস্তলের হিংসার চেয়ে সরকারের হিংসার পাপ অল্প নয়। এই হিংসার দ্বারা সরকার অর্জন করেছেন কতটুকু? বৈপ্লবিক আন্দোলনের পিছনে রয়েছে স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা, সেই স্বাধীনতা পাবার আগে যত অত্যাচারই চালানো যাক না কেন, তাকে দমন করা যাবে না। দেশবন্ধু বলেছিলেন, 'পৃথিবীর বুক থেকে তোমরা একটা জাতিকে মুছে ফেলতে পারবে না; স্বাধীনতা চায় এমন জাতিকে তোমরা নোয়াতে পারবে না।' দেশবন্ধু প্রশ্ন করেছিলেন, সুভাষচন্দ্রের প্রতি সরকারের এ কী আচরণ? কর্পোরেশন তাঁকে চীফ এক্সিকিউটিভ অফিসার নিয়োগ করার পরে সরকার দীর্ঘ একমাস টাল-বাহানা চালিয়ে তবে অনুমোদন দিয়েছিলেন; সুভাষচন্দ্র কাজ আরম্ভ করেছিলেন। 'তারপর এক শুভ প্রভাতে যখন তিনি কর্পোরেশনের চীফ এক্সিকিউটিভ অফিসাররূপে কাজে বেরুচ্ছেন—দেখলেন যে, বাড়ির দরজায় পুলিশ বাহিনী। তাঁর বিরুদ্ধে কোনো অভিযোগ দেওয়া হল না, তাঁর কাছে

---

* (৯) সুভাষচন্দ্রের গ্রেপ্তারে দেশবন্ধুর মানসিক অবস্থা সম্বন্ধে কিছু সাক্ষাৎ স্মৃতিকথা বলেছেন অপর্ণা দেবী:

'প্রিয় শিষ্যদের ধৃত হওয়ার সংবাদে পিতৃদেবের সে উত্তেজিত অবস্থা কখনো ভুলবো না। 'সুভাষকে ধরেছে! এবার গভর্ণমেণ্টকে কাঁপিয়ে ছাড়ব।' সে দৃঢ়-সংকল্প তাঁর বলার ভঙ্গিতে এমন মূর্ত হয়ে উঠেছিল যে, ভাষায় তা প্রকাশ করতে আমি অক্ষম।...

"সুভাষ প্রভৃতির গ্রেপ্তারের প্রতিবাদে কলকাতা টাউন হলে এক বিরাট সভা আহূত হল। সে সভায় পিতৃদেব জ্বালাময়ী ভাষায় বললেন, 'বাংলায়' যুবক তোমাদের হৃদয়ে স্বাধীনতার আগুন জ্বলিয়া উঠুক; স্বাধীনতার জন্য মৃত্যুকে আলিঙ্গন করিতে ছুটিয়া এসো, আত্মবিসর্জন দিতে দ্বিগুণ তেজে জ্বলিয়া ওঠো। এই জরাজীর্ণ দেহ লইয়া সর্বাগ্রে আমি সম্মুখীন হইব—তোমরা অনুসরণ করো। মা, একবার সংহারমূর্তিতে প্রকাশিত হও মা, আমরা সকলে তোমার সম্মুখে আত্মোৎসর্গ করিয়া স্বাধীনতার পথ উন্মুক্ত করিয়া রাখি।"

যে-অর্ডিন্যান্স বলে সরকার সুভাষচন্দ্রদের গ্রেপ্তার করেছিল, তাকে স্থায়ী আইনে পরিণত করবার চেষ্টা হয় বেঙ্গল কাউন্সিলে। দেশবন্ধু তখন নিতান্ত অসুস্থ—একেবারে শয্যাশায়ী। অপর্ণা দেবী লিখেছেন—'গিয়ে দেখলাম অত অসহ্য ব্যথার মধ্যে তাঁর এক কথা—'৭ই আমাকে কাউন্সিলে যেতেই হবে। ডাক্তারদের বলো, আমার ব্যথা ভাল করে দিতে।'...মরফিয়া ইনজেকশন করে ব্যথার উপশম অনেকটা হল, কিন্তু জ্বরে শরীর খুবই দুর্বল হয়ে পড়ল। পরদিন রাত্রে যন্ত্রণা বৃদ্ধি পাওয়াতে আবার মরফিয়া ইনজেকশন। তাঁর মুখে শিশুর মত এক কথা '৭ই আমাকে কাউন্সিলে যেতেই হবে, মরি আর বাঁচি।' অসুখ ক্রমেই বেড়ে চলল। ৪ জানুয়ারী অবস্থা দেখে ডাক্তাররা প্রমাদ গুণলেন। সমস্ত রাত্রি অসহ্য যন্ত্রণার পর ভোরের দিকে তিনি একটু শান্ত হয়ে ঘুমিয়ে পড়লেন। তখন তাঁর হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া অত্যন্ত ক্ষীণ।...৬ জানুয়ারী যন্ত্রণা না থাকলেও এতই দুর্বল ছিলেন যে, মা (বাসন্তী দেবী) শঙ্কিত হয়ে— আমার স্বামীকে বললেন, '৭ই যখন কাউন্সিলে যাবেন বলেছেন, তখন বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড লয় পেলেও ও'কে নিবৃত্ত করা যাবে না।' ৭ জানুয়ারী তিনি এতই দুর্বল হয়ে পড়েছিলেন যে, কথা বলতেও কষ্ট হচ্ছিল। তবু সকলকে ডেকে বললেন, 'আজ আমাকে যেতে হবে। আমার শরীরের আগে কর্তব্য। এতে যদি মরেও যাই, তবু কারো বাধাই শুনবো না।...আমার দেশের সোনার ছেলেরা বিনা-বিচারে নির্বাসিত, আর আমি নিজের তুচ্ছ শারীরিক কষ্টের জন্য কি আমলাতন্ত্রকে দেশের প্রতিনিধিদের দ্বারা সে প্রস্তাব গ্রাহ্য করিয়ে নেবার সুযোগ দেব? প্রাণ থাকতেও তা হতে দেব না।' উত্তেজিত হয়ে একথা বলেই অবসন্ন হয়ে পড়লেন।...কাউন্সিল থেকে জীবন্ত ফিরে আসবেন কিনা সন্দেহ হয়েছিল তখন।"

স্ট্রেচারে শায়িত দেশবন্ধুকে কাউন্সিলে দেখে 'দেশের প্রতিনিধিদের' বিবেক জাগ্রত হয়েছিল তখনকার মত—সরকারের প্রস্তাব পরাভূত হয়েছিল, যদিও বিশেষ ক্ষমতাবলে সরকার প্রস্তাবকে আইনে পরিণত করে। এই ঘটনাটি আর কিছু যদি প্রমাণ করে—অনুচরদের প্রতি দেশবন্ধুর ভালবাসার পরিমাণ দেখিয়ে দেয়। ভালবাসার কাছে দেশবন্ধু নিজ মৃত্যুকেও চরম মূল্য মনে করেননি।

কোনো কৈফিয়ত চাওয়া হল না, কোনো যুক্তি দেখানো হল না, কেবল জানানো হল, আমাদের আছে পাশব শারীরিক শক্তি—আমরা তোমাকে জেলে টেনে নিয়ে যাব।' দেশবন্ধু প্রশ্ন করেছিলেন—এর নাম কি হিংসা নয়? সুভাষচন্দ্রের একমাত্র অপরাধ—তিনি দেশপ্রেমিক। তিনি দেশের জন্য ত্যাগ-স্বীকার করেছেন। দেশবন্ধু বললেন, 'স্বাধীনতার জন্য যদি সংগ্রাম, ও দুঃখবরণ অনিবার্য হয়—যদি প্রয়োজন হয় প্রতিটি রক্তবিন্দু দানের—আমি প্রস্তুত।... আমি আমার দেশকে ভালবাসি—আমার স্বাধীনতাকে ভালবাসি—সে অধিকার আমার চাই—চাই-ই স্বায়ত্তশাসনের জন্মগত অধিকার।'

তারপরে দেশবন্ধুর কন্ঠে সেই কথাগুলি অনিবার্য বেগে উৎসারিত হয়েছিল—অনু বিশ্বাসের অংগীকার বাণী যা:

'স্বাধীনতার দাবি যদি অপরাধ হয়—আমি স্বীকার করছি আমি অপরাধী। ঐ পাপের জন্য আমি ফাঁসিতে ঝুলতে রাজি আছি।...এইটুকু বলতে পারি, সুভাষচন্দ্র বসু আমার চেয়ে বড় বিপ্লবী নন। আমাকে ওরা গ্রেপ্তার করছে না কেন? কেন—আমি জানতে চাই। দেশকে ভালবাসা যদি অপরাধ হয় আমি অপরাধী। সুভাষচন্দ্র বসু যদি অপরাধী হন—আমি অপরাধী। কলকাতা কর্পোরেশনের চীফ এক্সিকিউটিভ অফিসার কেবল নন, তার মেয়রও সমদোষে দোষী।'

কর্পোরেশনের সভায় বৃটিশ স্বার্থের অনেক প্রতিনিধিই উপস্থিত ছিলেন—সর্বশক্তিতে সেখানে দেশবন্ধু নিজেকে সংযত রেখে ভাষণ সমাপ্ত করতে পেরেছিলেন—পারেননি টাউন হলের বিরাট প্রতিবাদসভায়, যেখানে তাঁর ভালবাসার দেশবাসীরাই কেবল সমবেত হয়েছিলেন। দু'চারটি কথা বলতে না বলতে দরদর ক'রে চোখের জল গড়িয়ে পড়েছিল—হা-হা স্বরে বলেছিলেন : মা মা গো, বাংলার ঘরে ঘরে আগুন জেবলে দে, আগুন জেবলে দে,— সব ছারখার হয়ে যাক।'

দেশবন্ধুর সেদিনকার চেহারা আমার কাছে বর্ণনা করেছিলেন শ্রীযুক্ত সত্যরঞ্জন বক্সী। তারপরে দেশবন্ধুর বেদনাকে একটি বাক্যে খুঁজে ধরেছিলেন—

"It was the total reaction of a total man".

।। ৬ ।।

দেশবন্ধু হার মানতে চাননি। গান্ধী-নীতির বিরুদ্ধে অতঃপর আরও সংগ্রাম চালিয়ে জয়ী হয়েছিলেন, দাশ-গান্ধী চুক্তি হয়েছিল, গান্ধীজী যার পরে বলেছিলেন, 'শিশু যেমন মাকে আঁকড়ে ধরে, আমি তেমনি আঁকড়ে থাকব স্বরাজীদের।' সরকারের বিরুদ্ধে তিনি তুমুল বিক্ষোভের আয়োজন ক'রে গিয়েছিলেন, কিন্তু তার ফলে দৈহিক শক্তি নিঃশেষিত হয়ে শেষ সীমায় পৌঁছে গিয়েছিল। তিনি বোধহয় তা বুঝতে পেরেছিলেন। দেশের উপর বিরাট সংকট ঘনাচ্ছে, এমন একটা ধারণা তাঁর মনকে গ্রাস করেছিল। তিনি নিঃসঙ্গ বোধ করেছিলেন—ফিরে পেতে চেয়েছিলেন সুভাষচন্দ্র প্রভৃতিকে নিজের পাশে। ফরিদপুর সম্মেলনে তাঁর কন্ঠে যে নরম সুর শোনা গিয়েছিল, তার পিছনে তাঁর দুর্বলতা ছিল না—ছিল পরবর্তী সংগ্রামের প্রস্তুতির জন্য প্রয়োজনীয় শান্তি-কামনা। দেশবন্ধুর জীবনীকার এমন ইঙ্গিতও করতে চেয়েছেন, ফরিদপুর সম্মেলনে দেশবন্ধুর কন্ঠে আপোষের সুরের পিছনে ছিল সুভাষচন্দ্রের দীর্ঘ কারাবাসের জন্য বিচলিত হৃদয়ের কাতরতা। রাজনীতিতে ব্যক্তিগত সুখদুঃখকে এতখানি প্রাধান্য দেবার মানুষ অবশ্যই দেশবন্ধু ছিলেন না, কিন্তু এমন কথাটা যে উঠতে পেরেছিল, তাতেই বোঝা যায়, সুভাষচন্দ্র দেশবন্ধুর কতখানি হৃদয়ের মানুষ ছিলেন।

দেশবন্ধুর জীবনঝঞ্ঝা হঠাৎ গতিহারা হয়ে গেল—১৬ জুন, ১৯২৫। গৌরবের শিখরে অবস্থিত যখন, তখনই তাঁর প্রস্থান। তাঁর মৃত্যু, সুভাষচন্দ্রের মতে, ভারতের এককালীন রাজনৈতিক সর্বনাশ। "১৯২৫ সালের দিকে পিছন ফিরে তাকিয়ে আমরা একথা অনুভব না করে পারি না যে, বিধাতা যদি দেশবন্ধুকে আরও কয়েক বছর বেশী আয়ু দিতেন, ভারতের ইতিহাস তাহলে সম্ভবতঃ ভিন্নগতি ধারণ করত"—সুভাষচন্দ্র লিখেছেন।

জাতীয় জীবনের কথা থাক—ব্যক্তিজীবনে সুভাষচন্দ্র কতখানি হারিয়েছিলেন? তাঁর বেদনার পরিমাপ করবে কে? কারাপ্রাচীরের মধ্যে কেবল বেদনার—আনন্দময় স্মৃতির জ্বালাময় দংশনের সাহচর্যে সুভাষচন্দ্রের দিন কেটেছিল অতঃপর, দিনের পর দিন, মাসের পর মাস। মান্দালয় জেলে কারারুদ্ধ কয়েকজনের সঙ্গে সুভাষচন্দ্র শ্রীমতী

কারান্তরালে সুভাষচন্দ্র—যাঁকে হারিয়ে দেশবন্ধু ভেঙে পড়েছিলেন। ২৭ বছরের তরুণ—কিন্তু অত্যন্ত ব্যক্তিত্বব্যঞ্জক আকার—সৌম্য অথচ সুদৃঢ়। ফরোয়ার্ড পত্রিকায় ১৯২৬, কংগ্রেস সংখ্যা থেকে গৃহীত।

বাসন্তী দেবীকে লিখেছিলেন : "বাংলার যেসব তরুণ প্রাণ তাহাদের ক্ষুদ্র জীবনের যজ্ঞাগ্নিতে সম্পদ উৎসর্গ করিয়া তাঁহার উন্মুক্ত পতাকার তলে সমবেত হইয়াছিল—যাহারা সুখে-দুঃখে আঁধারে-আলোয় তাঁহার আদেশবাণী অনুসরণ করিয়াছে, কখনো বা কারার শৃঙ্খলে আবদ্ধ হইয়াছে—নৈরাশ্যের রজনীতে অথবা সফলতার প্রভাতে যাহারা কখনও তাঁহার পার্শ্ব ছাড়ে নাই—যাহারা তাঁহার মধ্যে পিতা সখা ও গুরুর অপূর্ব সমাবেশ পাইয়াছিল—আজ সেইসব তরুণ প্রাণের অবস্থা কি কথায় বর্ণনা করা যায়? ঐ চিঠিতেই সুভাষচন্দ্র আরও লিখেছিলেন, "আজ আমাদের বাহিরে তিমির, অন্তরে শূন্যতা। যতদূর দৃষ্টি যায় কেবল মেঘের পর মেঘ জমাট বাঁধিয়া রহিয়াছে।"

এমনকি ঐ চিঠিতেও নিজের ব্যক্তিগত যাতনাকে সুভাষচন্দ্র প্রকাশ করতে পারেন নি, পারা সম্ভব ছিল না—কেবল শরৎচন্দ্রের লেখা একটি ছত্রে নিজের হৃদয়ের ছায়া দেখতে পেয়েছিলেন :

"একান্ত প্রিয়, একান্ত আপনার জনের জন্য মানুষের বুকের মধ্যে যেমন জ্বালা করিতে থাকে—এ সেই। আজ আমরা যাহারা তাঁহার পাশে ছিলাম, আমাদের ভয়ানক দুঃখ জানাইবার ভাষাও নাই, পরের কাছে জানাইতে ভালোও লাগে না।"

।। ৭ ।।

একটা শেষ প্রশ্নের মীমাংসা বাকি আছে, যার মীমাংসা কিন্তু সত্যই সম্ভব নয়, কেবল অনুমানমূলক কিছু সিদ্ধান্ত করা যায়। দেশবন্ধুর মৃত্যুতে সুভাষচন্দ্র ব্যক্তিগতভাবে অনেক কিছু হারিয়েছিলেন—রাজনৈতিকভাবে হারিয়েছিলেন কতখানি? দেশবন্ধু আরও কিছুকাল জীবিত থেকে সুভাষচন্দ্রের রাজনৈতিক জীবনকে নিয়ন্ত্রিত করতে পারলে কি সুভাষচন্দ্রের পক্ষে মঙ্গলকর হত?

'খুবই মঙ্গলকর হত'—সুভাষচন্দ্রের আপোষবিরোধী রাজনীতিকে আপোষহীন বিরাগের সঙ্গে যাঁরা লক্ষ্য করেছেন, তাঁরা সুস্পষ্টভাবে একথা বলে থাকেন। সুভাষচন্দ্রের রাজনীতির বিরোধী নন, অথচ দেশবন্ধুর বিশেষ ভক্ত, এমন কোনো কোনো মানুষও একথা ভাবতে চান।

প্রথম ধরনের মানুষের বক্তব্যকে আমরা অগ্রাহ্য করতে পারি, কারণ এঁদের কাছে দেশবন্ধু শেষপর্যন্ত ব্যারিস্টার-রাজনৈতিক। কিন্তু দ্বিতীয় শ্রেণীর মানুষদের বক্তব্যে কিছু জোর অবশ্যই আছে। এঁদের মতানুসারে, সুভাষচন্দ্র যদি দেশবন্ধুর অধীনে আরও কিছুদিন থাকতে পারতেন, তাহলে দেশবন্ধু তাঁর বিপুল প্রভাবের দ্বারা সুভাষচন্দ্রকে ভারতের বৃহত্তর রাজনৈতিক জীবনে প্রতিষ্ঠিত করে দিতেন, ফলে তিনি গান্ধী-বিরোধী ভাবধারার সফল নেতৃত্ব করতে পারতেন। 'গান্ধী-বিরোধী নেতৃত্ব'—এই কথাটা উগ্র আকারে বলবার প্রয়োজনও ঘটতে না পারত, কারণ দেশবন্ধুর উপস্থিতিতে গান্ধীজীর একচ্ছত্র নেতৃত্ব হয়ত সম্ভবপর হত না। যে-সংগ্রামে গান্ধীজীকে নামাতে বামপন্থীদের অবিরত চেষ্টা এবং শক্তিক্ষয় করতে হয়েছে—দেশবন্ধু থাকলে সেই প্রচেষ্টার সংঘাতের অংশ হয়ত তিনিই প্রধানাংশে গ্রহণ করে গান্ধীজীকে উপযুক্ত ক্ষণে সংগ্রামে নামাতে পারতেন, এবং পরে যখন বোঝাপড়ার সময় আসত তখন গান্ধী-ভ্রান্তির পুনরাবৃত্তি নিবারণ করতে পারতেন—যে-ভ্রান্তির সমারোহ বজায় ছিল ১৯৩০-এর আন্দোলনের পরেও, যখন গান্ধীজী গোলটেবিল বৈঠকে একক দায়িত্বে উপস্থিত হয়ে প্রাপ্তি-সম্ভাবনাকে নষ্ট করে এসেছিলেন।

যেসব সম্ভাবনার কথা বললাম, তার উল্টোদিকেও কতকগুলি কথা আছে। দেশবন্ধুর দ্বারা রাজনৈতিক যৌবরাজ্যে আসীন হওয়ার মূল্য কি সুভাষচন্দ্রকে দিতে হত না—জহরলাল নেহরু যা দিয়েছিলেন, তাঁর সমাজতন্ত্রকে গান্ধীবাদের সঙ্গে মিশ্রিত করার দুশ্চেষ্টা করে? গান্ধী-মহারাজের যুবরাজ জহরলালের মিশ্র-নীতি ভারতবর্ষকে যে চিন্তাগত অস্পষ্টতা এবং কর্মগত শিথিলতার দিকে এগিয়ে দিয়েছে—তেমন কিছু কি সুভাষচন্দ্রের ক্ষেত্রেও ঘটত না? সুভাষচন্দ্রের স্বাধীন ব্যক্তিত্বের যে-প্রকাশ ভারতবর্ষ দেখেছে, দেশবন্ধুর নিয়ন্ত্রণাধীন সুভাষচন্দ্রের মধ্যে তা কি বজায় থাকত—সেই সামরিকতা, আপোষহীনতা, বাঁধনছেঁড়া বৈপ্লবিক নেতৃত্ব? কিংবা যদি সুভাষচন্দ্র নিজের প্রত্যয়ে স্থির থাকতেন—কোনো বেদনাদায়ক সংঘর্ষ কি ঘটত না দেশবন্ধুর সঙ্গে? সুভাষচন্দ্র স্নেহে ধরা দিতে পারেন, কিন্তু আদর্শের গলায় স্নেহের হার পরাতে পারেন না। দেশবন্ধুকে সহসা হারানোর অন্ধকারের ভিতরেই কি সুভাষচন্দ্রের আত্ম-নির্মাণ এবং জ্যোতির্ময় উত্থান সম্ভব হয়নি?

এসব প্রশ্নের যথাযথ উত্তর দিতে আমরা পারি না, এবং বোধহয় কেউই পারেন না। কিন্তু একটি বিষয় স্পষ্টভাবে জানানো যায়—দেশবন্ধু বর্তমান থাকলে ভারতীয় রাজনীতিতে ধনতন্ত্রের যে-প্রবল প্রতাপ দেখা গিয়েছে পরবর্তীকালে, তা ঐ আকারে দেখা যেত না। শ্রেণীসংগ্রামে দেশবন্ধুর অবশ্যই বিশ্বাস ছিল না কিন্তু শ্রেণীপার্থক্য বজায় রাখারও তিনি প্রচণ্ড বিরোধী ছিলেন। স্বাধীনতা আন্দোলনের সঙ্গে অর্থনৈতিক সুবিচার-প্রচেষ্টাকে তিনি যুক্ত করতে চেয়েছিলেন, এবং ব্যাপারটা তাঁর কাছে এতই মূলগত ছিল যে, এক্ষেত্রে কোনো আপোষ তিনি করতেন না। এবং তিনি যে-ধরনের বাস্তববাদী ছিলেন তাতে প্রয়োজনের ক্ষেত্রে সংগ্রামের নতুন পথ ধরতেন না—একথা কদাপি বলা যাবে না। বেংগল প্যাক্টের মধ্যে অর্থনৈতিক সুবিচারের সবচেয়ে সাহসী চেষ্টা কি তিনিই ভারতের স্বাধীনতাপূর্ব রাজনৈতিক ইতিহাসে করে যান নি? কলকাতা কর্পোরেশনকে গরীবের কর্পোরেশন করার ইচ্ছার মধ্যে কি একই মানুষকে পাই না? দেশবন্ধুর এই কথাগুলি কি তাঁকে অব্যর্থভাবে প্রকাশ করেনি?

> "We are in the midst of a great Revolution in thought, word and deed......Revolution means complete change and we want complete change. I do not want that sort of Swaraj which will be for the middle classes alone. I want Swaraj for the masses, not for the classes. I do not care for the bourgeoise. How few are they! Swaraj must be for the masses and Swaraj must be won by the masses".

ভারতের স্বরাজ বুর্জোয়ারাই কিন্তু অর্জন করেছেন, সেইজন্য তার ফলভোগ বুর্জোয়ারাই করছেন। ফরোয়ার্ড পত্রিকার ১৯২৭ সালের দেশবন্ধু সংখ্যায় প্যারিস-বাসী ইব্রাহিম এক চমৎকার প্রবন্ধে দেখিয়েছেন, ভারতীয় রাজনীতিতে দেশবন্ধুর বৈপ্লবিক অভিপ্রায় কিভাবে শান্তিবাদী গান্ধী এবং রক্ষণশীল স্বরাজীদের দ্বারা নষ্ট হয়েছিল। গান্ধীদলের কথা থাক, দেশবন্ধু তাঁর সামাজিক-অর্থনৈতিক পরিকল্পনাকে সমর্থন ও সফল করার উপযুক্ত মানুষ নিজ দলেও যথেষ্ট পাননি। যে দু'একজনকে পেয়েছিলেন, তাঁদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ মানুষ সুভাষচন্দ্র। সুভাষচন্দ্র দেশবন্ধুকে সর্বসময়ে প্রগতিশীল বলে অনুভব করেছেন, এবং সেইভাবে দেখাবার চেষ্টা করেছেন। দেশবন্ধুর রাজনীতির বিচারের কালে তাই তাঁর সঙ্গে অন্য অনেকেরই মতপার্থক্য দেখা গেছে; যেমন ধরা যাক, জহরলালের দেশবন্ধু সম্পর্কিত বক্তব্য, যা তাঁর আত্মজীবনীতে পেয়েছি। সেখানে জহরলাল ভারতীয় রাজনীতিতে চিত্তরঞ্জনের বিরাট ভূমিকা সম্বন্ধে কোনো সাধুবাক্য বলে ওঠার সুযোগ করতে পারেন নি। চিত্তরঞ্জন যে, স্বরাজ্য দলের প্রবর্তক, একথা জহরলালের লেখা থেকে আবিষ্কার করা দুরূহ। উল্টোপক্ষে দেখি, জহরলালের রচনায় স্বরাজ্য দলের ব্যাপারে তাঁর পিতা মোতিলাল ও চিত্তরঞ্জনের সমভূমিকা, যা কিন্তু সত্যই ছিল না। মোতিলালের চিন্তাশক্তি এবং ব্যক্তিত্ব অবশ্যই ছিল, [illegible] কথা বলার সামর্থ্যও ছিল, কিন্তু ছিল না সেই প্রাণের প্লাবন, যা না থাকলে [illegible] ও জিনিস

মাত্র চিত্তরঞ্জনেরই ছিল, তিনি বুদ্ধিশক্তিতেও কারো চেয়ে পিছনে নন। স্বরাজ্যদলের প্রগতিশীল ভূমিকা সম্বন্ধেও জহরলাল নীরব, কারণ যে গান্ধীনীতির বিরুদ্ধে এই দলের উদ্ভব, সেই নীতির সঙ্গে সম্পূর্ণ না হলেও সেই নীতির প্রবক্তার সঙ্গে জহরলালের প্রাণের সম্পর্ক। আমরা দেখি, আত্মজীবনীতে স্বরাজ্য দলের যথাসম্ভব নিন্দা করার চেষ্টা জহরলাল করেছেন, এবং দেশবন্ধুর মৃত্যুর পরে তাঁর পিতার নেতৃত্বে স্বরাজ্য দল যখন সত্যই প্রতিক্রিয়াশীল হয়ে উঠেছিল (যা সুভাষচন্দ্রও স্বীকার করেছেন) তখন জহরলাল স্বস্তির সঙ্গে 'লেবিচার' ঘোষণা করতে পেরেছেন।

সুভাষচন্দ্র অপরপক্ষে মার্নাসক বা আত্মিকভাবে কখনই নিজেকে গান্ধীজীর সঙ্গে যুক্ত করেন নি, এবং সাধারণভাবে গান্ধীনীতিকে প্রতিক্রিয়াশীল মনে করতেন। তাই তাঁর কাছে গান্ধীজীর বিরুদ্ধে স্বরাজ্যবিদ্রোহ প্রগতিশীল উত্থান ভিন্ন কিছু নয়। ইন্ডিয়ান স্ট্রাগল গ্রন্থে তিনি পরিষ্কার লিখেছেন, "১৯২১ ও ১৯২২ সালে মহাত্মা গান্ধীর প্রবল প্রভাবের বিষয়ে বিবেচনা করলে দেখা যাবে, স্বরাজ্য দলের চমকপ্রদ অভ্যুদয়কে কোনো হিসাবেই মাপা যায় না। মহাত্মা গান্ধীর প্রতি এই দলের নেতৃগণ ও সাধারণ কর্মীদের সর্বোচ্চ শ্রদ্ধা ছিল সত্য, কিন্তু এই দল মৌলিকভাবে গান্ধীবিরোধী এবং এই দল মহাত্মা গান্ধীকে রাজনীতি থেকে স্বেচ্ছা-অবসরগ্রহণে বাধ্য করাবার মত শক্তিশালী হয়ে উঠেছিল।" সুভাষচন্দ্র অতঃপর বিস্তারিতভাবে (বিস্তারিত নির্মমতার সঙ্গে) ব্যাখ্যা করে বলেছেন, গান্ধীজীর 'মহাত্মাভাব', অর্থাৎ তাঁর কৃচ্ছ্রসাধনা, নিরামিষ আহার, সত্যনিষ্ঠা প্রভৃতি তাঁর চতুর্দিকে ঋষিত্বের জ্যোতির্বলয় দিয়েছিল। "তাঁর হাঁটুর উপরে কাপড় খুঁটিকে স্মরণ করাত, বক্তৃতার সময়ে বসার ভঙ্গি মনে করিয়ে দিত বুদ্ধকে।" গান্ধীজীর যাদু এমনই ছড়িয়েছিল যে, তিনি অবতার হয়ে পূজিত হচ্ছিলেন, এবং কংগ্রেসের লক্ষ্য রাজনৈতিক স্বরাজ না আধ্যাত্মিক স্বরাজ এ প্রশ্ন পর্যন্ত বৃহৎ আকার ধারণ করেছিল। এই অবস্থায় চিত্তরঞ্জনের বিদ্রোহ সুভাষচন্দ্রের কাছে যুক্তিহীন অলৌকিকতার মোহের বিরুদ্ধে আধুনিক বিচারবুদ্ধির বিদ্রোহ। এই বিদ্রোহে চিত্তরঞ্জন দক্ষিণপন্থী ও বামপন্থী উভয় অংশেরই সমর্থন পেয়েছিলেন। রাজনীতিতে মডারেটরা অনেক সময়ে আবার অলৌকিকতা-বিরোধী—তাই তাঁরা আংশিকভাবে চিত্তরঞ্জনকে সমর্থন জানিয়েছিলেন; আর বামপন্থীরা চিত্তরঞ্জনকে মহাত্মার তুলনায় বৈপ্লবিক মনে করতেন। সুভাষচন্দ্র শেষোক্ত দলের মানুষ ছিলেন। দক্ষিণপন্থী যুক্তিবাদীদের মধ্যে চিত্তরঞ্জনের প্রভাব সত্ত্বেও তিনি জানতেন,

দেশবন্ধুর দেহান্ত সংবাদ—১৭ জুন, ১৯২৫-এর বেঙ্গলীতে।

Bengal In Mourning

Sudden End Of A Great Career

Swarajya Leader Passes Away At Darjeeling

দেশবন্ধু চরিত্রে বামপন্থী, এবং যখন প্রয়োজন ঘটবে তখন তিনি বামপন্থীদের দলেই ঝাঁপিয়ে পড়বেন। সুভাষচন্দ্রের এই ধারণার মূলে ছিল—গণমানুষের প্রতি দেশবন্ধুর দায়িত্ববোধ। ভারতীয় পদ্ধতিতে সমাজতন্ত্রকে সফল করবার জন্য দেশবন্ধুর মধ্যে যে উৎকণ্ঠা তিনি দেখেছিলেন, তার মধ্যে রাজনৈতিক মুক্তির সঙ্গে অর্থনৈতিক মুক্তির সম্ভাবনাও থেকে গিয়েছিল। জনজীবনের সঙ্গে গান্ধীজীর ব্যক্তিগত যোগ সত্ত্বেও গান্ধী-আন্দোলন থেকে গণমুক্তি ঘটবে, এমন ধারণা তাঁর হয়নি, বরং বিপরীত আশঙ্কাই ছিল, কারণ আধুনিক সমাজতান্ত্রিক ভাবধারা সম্বন্ধে গান্ধীজীর বিপুল ঔদাসীন্যই তিনি লক্ষ্য করেছিলেন। সুভাষচন্দ্রের কাছে জনগণের বাস্তব অধিকারই ছিল সমস্যা—এবং ভারতের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অবস্থার হিসাব না নিয়ে ঐ গণমুক্তি ঘটানো যাবে—এ বিশ্বাসও তাঁর ছিল না। একমাত্র চিত্তরঞ্জনকেই দেখেছিলেন—বাস্তব অবস্থা সম্বন্ধে তিনি সচেতন, এবং যথার্থই সর্বমানুষের অধিকারপ্রতিষ্ঠায় ব্রতী। সমাজতন্ত্র বিদেশী গ্রন্থ বা স্বদেশী ভাবালুতা থেকে আসবে—এমন বিশ্বাস তাঁর ছিল না। কিছুদিনের মধ্যেই তিনি দেখবেন—দেখতে হবে তিনি জানতেন—জহরলাল নেহরুর কী বিচিত্র চেহারা!—এক হাত কার্ল মার্কসের গ্রন্থের উপরে, অন্য হাত গান্ধীজীর পায়ে।

বিদেশীয় চিন্তা ও অভিজ্ঞতার হিসাব নেওয়ার পরে ভারতীয় পদ্ধতিকে সফল করার ভাবনাতেও সুভাষচন্দ্র দেশবন্ধুর শিষ্যই ছিলেন মনে হয়।*

* সংবাদপত্রের ছবিগুলি জাতীয় গ্রন্থাগারে রক্ষিত সংবাদপত্র থেকে গৃহীত।

অবিস্মরণ কাল

অসীম রায়

(পূর্বপ্রকাশিতের পর)

ছেলেমেয়েদের কাছে সমস্ত ঘটনাটাই ভোজের মতো লাগে। কেনই বা ভাঁড়ারঘর ভর্তি করে রকমারি খাবার উঠল আবার কেনই বা সায়েবদের আদেশে বিস্মিত ভারীরা প্রথমে একটু ওজর-আপত্তি করে শেষে নিমরাজি হয়ে পেছনের ছোট নোংরা সিঁড়ি দিয়ে খাবারের থালাগুলো নিয়ে যাচ্ছে তার হদিস করতে পারে না তারা। চোঙা তো হরিয়া ভারের একটা সন্দেশের বাকস তুলে নিল। কিন্তু বুড়ী সেটা তার হাত থেকে ছিনিয়ে নিয়ে আবার রেখে দেয়, শেষ পর্যন্ত একছড়া কালো আঙুর তুলে দেয় চোঙা। টুটুল দুটো প্যাসট্রি সরাল।

ইতিমধ্যে গোপীনাথ লুচি আলু ভাজছে। চায়ের সঙ্গে সঙ্গে লুচি খেতে খেতে জমিদার বাড়ির বড় আর ছোট বউ গল্প করতে থাকেন।

কলকাতায় গিয়ে তাঁরা 'চন্ডীদাস' ও 'ভাগ্য চক্র' বলে দুখানা বাংলা ফিলম দেখেছেন। 'বিশেষ করে উমাশশীর যা পার্ট, বুঝলেন মাসীমা।' ছোট বউয়ের কাননবালা পছন্দ। শরৎচন্দ্রের 'দেবদাস' বইতে পার্বতীর পার্ট —'অমন হয় না।' স্বর্ণসুন্দরী 'চন্ডীদাস' ছাড়া কোনটাই দেখেন নি। তবে উৎসাহের সঙ্গে জিজ্ঞাসাবাদ করেন। বুকটা যে দুরদুর করে না একেবারে তা নয়। ঘরের কোনের জানলাটা দিয়ে তিনি যে দিকটায় বসেছিলেন সেখান থেকে নীল উর্দিপরা সায়েদের চেহারা আর মাঝে মাঝে কেকের কিংবা দইয়ের পরাত ভেসে ওঠে। উমাশশী যাতে কেলেংকারী আটকাতে পারে এজন্যে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে বাংলা চিত্রজগতের নায়িকাদের চেহারা সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করেন।

লুচি আলুভাজা চা খেয়ে বড় বৌ ছোট বউ উঠলেন। সামনের পুজোয় আসতে বললেন তাঁদের বাড়ি। বাড়ির সামনের মাঠে মস্ত মেলা বসে, চমৎকার পুতুল খেলার দল আসে, ছোট সার্কাসেরও তাঁবু পড়ে। টুটুলের গাল টিপে আদর করে ছোট বউ বললেন, 'ছেলেমেয়েদেরও নিয়ে আসবেন কিন্তু। খুব মজা পাবে।'

স্বর্ণসুন্দরী সায়েদের সঙ্গে ছেলেমেয়েদের পাঠালেন অতিথিদের ঘাট পর্যন্ত এগিয়ে দিতে। দুভাই একটা ভাল কাজ পেয়েছে ভেবে সারা রাস্তা গল্প করতে করতে চলল। চোঙা সম্প্রতি যে ডাকটিকিট জমাচ্ছে এবং তিনটে সেট জার্মাণীর স্ট্যাম্প পেয়েছে তার জামাইবাবুর কাছ থেকে সে সংবাদ দিতেও ছাড়ল না। খালি বুড়ী মুখ ভার করে সঙ্গে সঙ্গে যাচ্ছিল। তার মায়ের উদ্বিগ্নতার কারণ সঠিক বুঝতে না পারলেও কিছু অঘটন ঘটেছে এরকম ব্যাপার সে আঁচ করতে পারে। আর ঘটলও প্রায় সঙ্গে সঙ্গে। ঘাটে একখানা গ্রীণবোট। পেছনে আর একটা নৌকো। বুড়ী লক্ষ্য করলে দুজন ভারী এগিয়ে এসে বড় বৌকে কি যেন বললে। সঙ্গে সঙ্গে এক বৈপ্লবিক পরিবর্তন ঘটল। বড় বৌ ফুঁসে উঠলেন বুড়ীর দিকে চেয়ে, 'কি! আমাদের এরকম অপমান! আমরা নিজেরা এলাম বাড়িতে।' ছোট বউও চীৎকার করতে থাকেন, 'অসভ্য, ইতর!' ইত্যাদি কথাগুলো কানে যেতে বুড়ীর কান ঝাঁ ঝাঁ করে। প্রায় কেঁদে ফেলে বুড়ী। কাঁদো কাঁদো গলায় বলে, 'আমি কি জানি! আমায় কেন বলছেন?'

বড় বউ বোটে উঠতে উঠতে বললেন, 'তোমার মা-কে বলে দিও, আমরা অনেক হাকিম দেখেছি। কেউ আমাদের এমন অপমান করে নি।'

বুড়ীর চোখ ফেটে জল আসে। এতগুলো জিহ্বাআকর্ষক খাবার বরবাদ যাওয়ায় তারও অন্তরের সায় ছিল না। প্রায় কেঁদেই ফেলে বুড়ী, 'আমাকে বকবেন না।'

চোঙা চেঁচিয়ে বলে, 'আমরা কি জানি? আমরা কি জানি?'

টিংটিং-এ দাদাবাবুর রণমূর্তি দেখে সাহসও এগিয়ে আসে। 'না, তোমাদের আমরা কিছু বলছি না।' বলে ছোট বউ নৌকোয় উঠলেন, বাটা থেকে বার করা পান তখনও তাঁর হাতেই ধরা আছে।

চার

নীচু কামিনী গাছটায় দোলনা বেঁধে দোল খাচ্ছিল বুড়ী বাড়ির নীচেই। হঠাৎ এক সাহেব আসছে দেখে দোল খাওয়া বন্ধ করে কাঠ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। একবার ভাবলে পালিয়ে যাবে জেলখানার দিকে কিন্তু এত কাছে সাহেবটা এসে গেছে যে পালানো বিসদৃশ। বাদামি রংয়ের সুট আর চকোলেট ফেল্টের টুপি পরা সাহেবটি বুড়ীর কাছে এসে পরিস্কার বাংলায় বললে, 'চলো, আমাকে তোমাদের বাড়ি নিয়ে চল।'

স্বর্ণসুন্দরী আগেই খবর পেয়েছিলেন কিন্তু এরকম না জানিয়ে নব-র সহসা আবির্ভাবে তিনি একেবারে আনন্দে থই পান না কি করবেন। কিছুক্ষণ পরেই তাঁর হাঁকডাকে বাড়ি গরম। নব যে তার যৌবনের আটদশটা বছর দায়হীন আরামের ডাস্টবিনে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে এসেছে সেদিকে তাঁর স্বামীর মতো দৃষ্টি দিলেন না স্বর্ণসুন্দরী। নব-র সাহেবের মতো চেহারা, তাঁর উচ্চকণ্ঠ হাসি, কোটের ভাঁজে বিলাতি সেন্টের গন্ধ, অসংখ্য বিলেতের গল্প—'আমরা কতদিন খাটারে ফ্রন্ট ফ্রাই করে খেতাম দিদি। যোগেন চাটুজ্জের ছেলে রামু, সে বেটা আমার সঙ্গে পাল্লা দিত। বেটা তোর বাপ ছিল তো ইস্কুল মাস্টার!' ইত্যাদি নানা ধরণের গলপগুজবে কথাবার্তায় স্বর্ণসুন্দরী মুগ্ধ। এই ভাইকেই তিনি আরায় বটল পামের ছায়ায় ঢাকা মোরামের রাস্তায় পিঠে ফেলে ফেলে ঘুম পাড়িয়েছেন ভেবে গর্বিত বোধ করেন।

সে দুদিন নব ছিল সে দুদিন ছেলেরা চানাপে চান করত কারণ প্রায় দু ঘণ্টা স্নানের পর্ব চলত। স্নান শেষ হবার পর অবশ্য স্নানঘরে ঢুকতে ছেলেদের খুব ভাল লাগত। বিলিতি ওডিকোলনের গন্ধে ভুরভুর করত চারদিক। ভবনাথ বিকেলবেলায় শ্যালককে ধুতি-পরা শেখাতে গলদঘর্ম। 'দাদাবাবু, হাউ ডু ইউ ম্যানেজ এ ধোতি, আই ওয়ান্ডার।' ঘন ঘন নব বললে। শেষে আপোষ স্থির হল। দুভাঁজ করে লুঙ্গির মতো ধুতি পরলে নব।

ছেলেদের একটা নতুন কাজ গজাল। দুপুরবেলা সাহেব মামা-র গা টেপা, ঘণ্টায় এক আনা। এ ব্যাপারে চোঙার উৎসাহই বেশী। দুদিনে চার আনা কামালে। টুটুলের বিশেষ পছন্দ নয় একেবারে অপরিচিত ঠ্যাং

মেলে দেওয়া মানুষটার গায়ে পায়ে হাত বুলানো। অবশ্য স্বর্ণসুন্দরীর দিবানিদ্রার সময় আগে মাঝে মাঝে তাঁর গায়ে পাউডার বেশ উৎসাহের সঙ্গেই লাগিয়েছে টুটুল। সঙ্গে সঙ্গে ইংরেজ ছেলেরা কিরকম চলে ফেরে, তাদের সৌজন্যবোধ আয়ত্ত করার রিহার্সাল চলে।

'এ একটা আপদ জুটেল কোথা থেকে রে?' টুটুল বুড়ীকে ফিস ফিস করে বলে।

স্বর্ণসুন্দরীর এনার্জির ব্যাটারী প্রায় ডাউন মেরে গিয়েছিল। কোন ব্যাপারে উদ্দীপনা উত্তেজনায় নিজেকে ছুঁড়ে না দিলে তাঁর নিজের কাছে জীবনটা শুকিয়ে ওঠে। আগে জানাই ছিল, খানিকটা ছিল প্রতাপ, সকলের ওপরে ছিলেন তাঁর বাবা এই গমগমে সরগরম করা জীবনের প্রতীক। ভবনাথ তাঁর এ চাহিদা মেটাতে পারেন না। তিনি কতগুলো ব্যাপারে, বিশেষ করে নীতির ক্ষেত্রে অভ্রান্ত। যেমন তাঁর আদালতে মামলা পড়েছে বলে তিনি অসম্ভব কঠিনতা দেখালেন সেদিন কিন্তু এ কাঠিন্যের লক্ষ্য কি? ইংরেজ সাম্রাজ্যের বনেদ আরও পাকা করা কিংবা নীতিজ্ঞানে নিষ্ঠার ব্যক্তিগত সন্তোষ?

নব যখন তাই পিতৃস্মরণে রুমালে নাক ঝাড়তে ঝাড়তে কেঁদে ফেললে তখন স্বর্ণসুন্দরীও অভিভূত না হয়ে পারেন না। চোখ মুখ লাল করে নব বললে, 'তোমরা তো ভাব আমি হার্টলেস্। দাদাবাবুও নিশ্চয় আমাকে তাই ভাবেন। কিন্তু তোমরা তো জন না হোয়াট এমাউন্ট অফ্ মিজারি আই সাফার্ড।' আবার প্রবল বিক্রমে নাক ঝাড়তে থাকে নব।

টুটুল পদাদাকে ফিস ফিস করে বললে, 'সাহেবরা এরকমভাবে কাঁদে না রে?'

'আমাকে তোর কিছু বলতে হবে না নব। আমার কাছে তুই যেরকম ছিলি তেমনিই আছিস।' স্বর্ণসুন্দরীও কাঁদতে থাকেন।

'মধুবাবু এসেছিলেন', চোঙার দিকে মুখ ফিরিয়ে ভবনাথ হঠাৎ জিজ্ঞাসা করেন।

'মধুবাবুর মা মারা গেছেন', বুড়ী বললে।

'ও, তোমরা তাহলে নিজেরা পড়তে বোস।'

উত্তেজনা যেমন সহজে আসে, কান্নাও তেমনি সহজে আসে স্বর্ণসুন্দরীর। ভালবাসা মানেই উত্তাপ, চেঁচামেচি কান্না, হৈহৈ, শূন্য ভালবাসার কোন স্বতন্ত্র অস্তিত্ব নেই। অন্তত বড় বড় বিপদে ভরা গরুর মতো চোখ মেলে থাকা ভবনাথের যে ভালবাসা ও মমত্ববোধ তা থেকে এ ভালবাসার জাত আলাদা। ভবনাথ কষ্ট পান কিন্তু কষ্টের প্রকাশ নেই, আনন্দিত হলে উছলে ওঠেন না কখনও। এ জন্যেই বোধহয় কোনো কোনো মহলে রাশভারি আখ্যা পেয়েছেন তিনি।

বাইরে চাতালে চেয়ার পাতা, মাথার ওপর ঘন নীল মখমলে অজস্র ঝলকানো হীরকখণ্ড। সে দিকে চেয়ে চেয়ে ভবনাথ সামনের টুর প্রোগ্রাম ঠিক করে ফেলেন মনে মনে। স্বর্ণসুন্দরী হঠাৎ ভাইয়ের হাত ধরে বললেন, 'সবই তো হোল নব। আবার শুনছি বিলেত যাবি, আবার কেন? অতো বড় প্রাসাদের মতো, বাড়ি। সবই তো তোর। এবারে একটা ..'

নব কথাটা লুফে নিলে, 'কিসের জন্যে এলাম বড়দি তোমার কাছে? সেই কথাটাই তো বলতে। বিয়ে ঠিকঠাক করেই এসেছি।'

উদ্বেগে গলা আটকে যায় স্বর্ণসুন্দরীর, 'মানে, আমাদের...'

'হ্যাঁ হ্যাঁ বড়দি। আমি কি সাহেব হয়ে গেছি নাকি? তাছাড়া অনেক ঘাঁটাঘাঁটি তো করলাম। ওরা অন্যরকম, আমরা অন্যরকম। মানে আমি চাই আপ-টু-ডেট মেয়ে—এ তোমাদের চচ্চড়ি পড়পড়ি রাঁধলেই চলবে না। কিন্তু তার সোল-টা হবে ইণ্ডিয়ান।'

'ঠিক বলেছিস নব, ঠিক বলেছিস। ঠিক বোস বাড়ির ছেলের মতো কথা।'

'গোপীনাথ, বড়ির টিনটা চাতালে পড়ে আছে, ভেতরে নিয়ে যাও,' ভবনাথ রান্নাঘরের দিকে চেয়ে বললেন।

'হাইকোর্টের জজের একমাত্র মেয়ে। বেশ আপ-টু-ডেট, ঘরোয়াও আছে।'

'দেনাপাওনার কথা কিছু?'

'তুমি বড়দি সেই রকমই আছো। ওসব যৌতুক-ফৌতুক নেওয়া আজকাল উঠে গেছে। আর আমিই বা কি তাতে রাজী হব? তবে...'

'তবে কি?'

'আমি ওসব জানি না বড়দি। তবে মা বলছিলেন, বাবা নেই, বিয়ের খরচা বাবদ হাজার ছ-সাতেক টাকা ...'

'কি এমন অন্যায় বলেছেন?'

'আমি ও সবের মধ্যে নেই বড়দি।'

'তারিখ ঠিক হয়েছে?'

'সাতই অঘ্রাণ। দাদাবাবু, আপনাকে কিন্তু ছুটি নিতে হবে। ছেলেমেয়েদের নিয়ে যাবেন, সেই জন্যেই তো এলাম।'

ইজিচেয়ারে গা এলিয়ে ভবনাথ এক দৃষ্টিতে চেয়েছিলেন কালপুরুষের দিকে। কোমরে বেল্টপরা যোদ্ধা আশ্চর্য ঝকমক করছে আজ রাতে। সম্প্রতি ঠিকুজি মিলিয়ে দেখেছেন বৃহস্পতি তাঁর তুঙ্গীতে। এ বছরটা বরাবর ভাল সময়। অঘ্রাণের আগে কিছু হবে না? বললেন, 'নিশ্চয় যাব নব, এতদিন পর বিয়ে করবে, যাব না?'

স্বামীর কথায় স্বর্ণসুন্দরী কিঞ্চিৎ অসন্তুষ্ট হলেন। খেলোয়াড়ি চেহারায় মেদশ্রীর আধিক্য এবং ঘনায়মান টাক সত্ত্বেও নব হাবেভাবে যথেষ্ট তরুণ। বললেন, 'আমাদের সময় কি আর আছে এখন? তাছাড়া, পুরুষমানুষের আবার বয়স কি?

'প্রতাপের সঙ্গে দেখাসাক্ষাত হয়?'

ভবনাথের প্রশ্নে নব হঠাৎ গম্ভীর হয়ে পড়ে। গাঢ় চকোলেটের ওপর মোটা সোনালী ডোরাকাটা ড্রেসিং গাউনে দাঁড়ির ঝুঁটি শূন্যে নাচাতে থাকে।

'কি, দেখা হয় না?'

'নাঃ!' দাঁড়ির ঝুঁটি নাচানো আরও বেড়ে যায় নবর।

ভবনাথ বললেন, 'সে কি! একই জায়গায় থাকো!' তার গলায় চাপা উদ্বেগ।

'আচ্ছা দাদাবাবু, প্রতাপ কি রাজনীতি-টাজনীতি করত?'

'কেন? কি হয়েছে?' এমন কাতর বিস্ময়ে ভবনাথ ধড়মড়িয়ে উঠে বসেন যে নব প্রায় অপ্রস্তুত। 'না, না, সেরকম কিছু না, সেরকম কিছু হয়নি। হি ইজ এ সেনসেবল বয়। কিন্তু হি ইজ ইন ব্যাড কম্পানি, আই মাস্ট সে।'

খুব ঘটা করে নব বললে, গম্ভীরভাবে। এতক্ষণ তাদের আলাপে ভবনাথের ঔদাসিন্যের ভাল জবাব দিতে পেরেছে ভেবে

চাপা আনন্দে মুখটা আরও লালচে ফর্সা দেখায়।

ভবনাথ দুতিনবার কেশে গলা সাফ করেন। কি একটা বলতে গিয়ে চুপ করে যান। স্বর্ণসুন্দরী বললেন, মেমসাহেবদের ফাঁদে পড়ে নি তো?'

'বড়দি যে কি বলো। ওখানকার মেয়েরা তো...কি যে বলে...তোমাদের অসূর্যম্পশ্যা নয়। মেয়েরা সব জায়গায়, কলেজে বাড়িতে, রাস্তাঘাটে। ওদের সমাজটা অনেক জীবন্ত বড়দি।'

'ঐ যে রজনীপাম ডাট বলে একটা কমিউনিস্ট উঠেছে আজকাল, খুব ক্রেজ হয়েছে। ওর মিটিংএ প্রতাপকে দেখা গিয়েছিল। তাছাড়া ওর কথাবার্তাগুলো একটু অন্যরকম হয়ে গেছে। ফ্যামিলি ফিলিংগুলো ঠিক ...'

ভবনাথ গুম মেরে বসে থাকেন। বারো চোদ্দ বছর বিলেতে যৌবন উড়িয়ে যে ছোকরা পারিবারিক কর্তব্য করে এসেছে তার মুখে পরিবারপ্রীতির কথা শোভা পায় না। অনেক সময়ই হয়ে থাকে নানা কারণে নিজেদের মধ্যে অমিল। সেটা আলাদা কথা। কিন্তু প্রতাপ বিলেতে গিয়ে একেবারে বিপথে চলে যাবে তাঁর সমস্ত আশা-আকাঙ্ক্ষা পা দিয়ে মাড়িয়ে একথাটা ভেবে ভবনাথ বিচলিত হন। অন্ধকারে আবার জ্বলজ্বলে কালপুরুষের দিক থেকে চোখ ফিরিয়ে নেন। তাঁর বাবার কথাটা মনের মধ্যে ভেসে ওঠে, 'সার্ভিস ইন এনি ফর্ম ইজ এ সার্ভিচিউড অ্যান্ড কেনট বি এনিবডিজ এম্বিশান।' প্রতাপ কি তাই ভাবছে? তাহলে সিভিল সার্ভিস ছেড়ে ব্যারিস্টারি পড়ুক, চার্টার একাউন্টেন্ট হোক। কিন্তু যে কথা নব বলছে সে তো আত্মহত্যার সামিল। সে পথে প্রতাপ পা বাড়াবে কেন?

পরদিনই তেড়ে ছেলেকে চিঠি লিখলেন ভবনাথ।

পর দিন সকাল-বিকেল বিলেতের গল্প করে নব বিদায় নিল।

বিদায় নেবার মুখে সে একটা কাণ্ড ঘটালে যে কথা ছেলেমেয়েরা বহুদিন ভুলতে পারেনি। সকালে উঠে তারা তাদের বাবাকে চিনতে পারে না। তাঁর মুখে জাঁদরেল বাহারে গোঁফের চিহ্ন নেই। নব খুব ভোরে তার ছোট কাঁচি দিয়ে কাঁচ করে গোঁফ উড়িয়ে দিয়েছে।

'বাবাকে কেমন অদ্ভুত লাগছে রে!' বুড়ী বললে।

'হ্যাঁ, কেমন বোকা বোকা।' চোঙা ফোড়ন কাটে।

গরমের ছুটির সঙ্গে সঙ্গে সাঁতারের ধুম পড়ে। এ বছর হাত আর পায়ের কাজে বুড়ী আর টুটুল কিছুটা রপ্ত হয়েছে। চোঙার সঙ্গে পাল্লা না দিলেও জলটানা আরও সাবলীল। টুটুল আবার ডুব সাঁতারও দিচ্ছে। আর চোঙা ছবির মতো সাঁতার কাটে। পাঁড়েকে আর জলে নামতে হয় না। একবার ঘটি মলতে মলতে অথবা দাঁতন করতে করতে ঘুরে যায়।

তবে প্রথম প্রেমের মতো জলের প্রথম আকর্ষণও কমে গেছে। এখন আর ভয়ডর নেই, ভাবনা নেই, কল্পনাও নেই। এখন অনেকটা রুটিন ব্যাপার। চোঙা পাঁচ-ছবার পারাপার করে, টুটুল বুড়ী তিনবার, অবশ্য জিরিয়ে জিরিয়ে! বুড়ী ফ্রকের ওপর তোয়ালে জড়িয়ে ঘাটে বসে থাকে, কখনও কখনও জলে নিজের ছায়া দেখে। আর টুটুল ঘাট ধরে পায়ের কাজ করে, মাঝে মাঝে অতিরিক্ত জল ছিটোলে বুড়ী চেঁচায়।

ছেলেমেয়েদের কিছুদিন হল মন খারাপ। পাঁড়ে দেশে যাচ্ছে ছ মাসের জন্যে। তিন-চার বছর ছুটি জমিয়েছে। ছোট ভাইয়ের বিয়ে দেবে, চোঙার মতো বয়স। আর হয়ত দেখা নাও হতে পারে। চোঙা ঘাটে উঠে বললে, 'কি হয়েছে পাঁড়ে যাচ্ছে? পাঁড়ে আমাদের আত্মীয়?'

'আত্মীয়রাই সব সময় আপনার হয় না, টুটুল গা মুছতে মুছতে বলে।

'ঠিক বলেছিস টুটুল,' বুড়ী সায় দেয়।

ক্রমে ক্রমে পাঁড়ের যাবার দিন ঘনিয়ে এল। তার আগের দিন বিকেলে ঠিক হল, পাঁড়ের সঙ্গে নৌকোয় ঘুরে আসবে। ছই-তোলা ছোট্ট নৌকো পাঁড়ে ঠিক করেছে, বোধহয় বিনে পয়সায়। পাঁড়ের সঙ্গে যাবে বলে স্বর্ণসুন্দরী আপত্তি করলেন না।

সেদিন বোধহয় পূর্ণিমা। যখন নৌকো কাটাখালিতে পড়েছে তখন দূরে মেঠো রাস্তায় ধানক্ষেতের ওপরে জেগে থাকা কালভার্টের পেছনে থালার মতো গোল হলুদ চাঁদ উঠছে। ফুর ফুর করে হাওয়া দেয়। বুড়ী গান ধরলে, নিজে নিজেই, 'আমার সোনার বালুচর, তোর কিনারে বেঁধেছিলেম আমার পাতার ঘর।'

ভাটিয়ালি সুরে বুড়ী যখন গাইলে
নৌকা বেয়ে মাঝ দরিয়ায় গিয়াছিলাম ভেসে
আমি সেই যে গেলাম আর না তারে
দেখতে পেলাম এসে

তখন চারদিক থেকে ছুটে আসা হাওয়ায়, ঢেউয়ের ছলাৎ ছলাৎ শব্দে আর জলের ওপর কাঁচ চাঁদের স্নিগ্ধ আলোয় দুই ভাই স্তব্ধ হয়ে বসে থাকে পাঁড়ের বিশাল কাঁধের দিকে চেয়ে। দুজনের মনেই বিদ্যুতের মতো খেলে যায় তেলে ঘামে চকচকে পাঁড়ের ডন-দেওয়া বিশাল বুকের ওঠা পড়া, খড়মের শব্দে মুখরিত তুলসীদাসের কলি।

'ইয়ে ভবসংসার হ্যায় রামো কি মায়া,
কহি ধুপ হ্যায় কহি ছায়া।।

ফিরতি পথে অবশ্য এই চন্দ্রালোকিত ইন্দ্রজাল কেটে যায়। চোঙা সেদিনের খবরের কাগজের প্রথম পাতায় একটা মোটর বোটের ছবি দেখেছে। স্টিমার আগে যায় না মোটর বোট আগে যায় এ নিয়ে দুভাইয়ের মধ্যে তর্ক বাধে। ঘাটে যখন নৌকো ভিড়ল তখন বেশ সন্ধে।

পরদিন ভোরে এক কাণ্ড। টুটুল চোঙা তখনও ঘুমোচ্ছে। বাথরুম থেকে বড়ীর আতঙ্ক-তীক্ষ্ম গলা ভেসে আসে, 'মা, মা...দেখে যাও কি হয়েছে?'

স্বর্ণসুন্দরী তাড়াতাড়ি সেদিকে যেতেই বড়ীর আবার সেইরকম গলা ভেসে আসে, 'মা, আমার কি হবে? আমার টি-বি হয়েছে।'

বড়ী সেদিন প্রথম ঋতুমতী।

পাঁচ

সে বছর অঘ্রাণ মাসের মাঝামাঝি মস্ত লনে ম্যারাপ বেঁধে এলগিন রোডে রাধা মিত্তিরের সঙ্গে বিয়ে হল নবেন্দু বোসের। সন্ধেটা ছেলেমেয়েদের মনে অনেক দিন পর্যন্ত গেঁথে ছিল। বিশেষ করে কলকাতার সম্ভ্রান্ত পরিবারের বরকে একদিনকা সুলতান বানাবার যে পদ্ধতি তা সবচেয়ে ভাল লাগল তাদের। লনের মাঝখানে দেবদারু পাতায় মোড়া কুঞ্জ, তার গায়ে থোকা থোকা নীল বালব জ্বলছে আর নিভছে। সামনেটা খোলা। সেখানে প্রায় সিংহাসনসদৃশ মেহগিনী রঙের বাহারে পুরু গদি আঁটা চেয়ারে ছলায়মান টাকে হাত বুলোতে বুলোতে নবেন্দু বোস তাঁর দুই ভাগ্নের দিকে চেয়ে তাঁর বাঁ চোখ মারলেন। আগে থেকেই ভাগ্নেদের সঙ্গে কথা ছিল—যদি খুশি লাগে তাহলে বাঁ চোখ এবং নার্ভাস বোধ হলে ডান চোখ মারবেন।

'মামার খুব স্ফূর্তি লেগেছে রে', চোঙা চাপা উত্তেজনায় বললে।

তাছাড়া উৎসাহবোধ করবার আরও কারণ ছিল। মুর্সীগঞ্জের জলকাদা লণ্ঠন থেকে এই আলোয় ঝলমল চাঁদোয়ায় ঢাকা লন, পামের টবে টবে লাল নীল হলুদ বালব, বৈদ্যুতিক আলো খচিত বেলোয়ারি ঝাড়, আর লম্বা সার দেওয়া সাদা আলোর ডোম, হাতে রজনীগন্ধার মালা জড়ানো ধুতি আর গিলে করা আদ্দির পাঞ্জাবি পরা সমবয়সী ছেলেদের স্বচ্ছন্দ বিচরণ, গাড়ি থেকে নামা মুখে গলায় গোলা রং গড়ানো জড়োয়া হীরে পরা ঝকমকে বেনারসীর পুঁটলি, পোলাউ আর চিংড়িমাছের মালাই কারির গন্ধ—এই সমস্ত ব্যাপারটার মানে যে বিয়ে একথা ভেবে দুভাই-ই আনন্দে টগবগ করে। এতদিন পর্যন্ত বিয়ের কোন প্রত্যক্ষ বাস্তব রূপ তাদের সামনে ছিল না। এখন এই আলো চাঁদোয়া শাড়ি গয়নার বর্ণাঢ্য, হাঁকডাক আর রকমারি খাবারের গন্ধে তা এক রূপ পায়। 'মামা-র কি মজা!' টুটুল বললে।

তারপর সায়েবদের মতো সাদা পাগড়িপরা বেয়ারাগুলো হাতে ট্রে নিয়ে যখন কোল্ড ড্রিঙ্ক দেবার জন্যে ঘুরে বেড়ায়, আর কাঠি দিয়ে ঘেঁষে ঘেঁষে সেই কনকনে ঠাণ্ডা সরবত খায় তখন তারা প্রায় স্বর্গে। চোঙা পরে খেয়ালে সে তিনটে কাঠি হাতসাফাই করেছে। এইরকম আর এক স্বর্গ উপস্থিত খাওয়ার শেষে আইসক্রিম সন্দেশে। এরকম জিনিস তারা জীবনে খায় নি। টুটুল-কে চাপা গলায় চোঙা ধমকায়। 'ওরকম ইস্ ইস্ করিস নে। লোকে ভাববে গেঁয়ো। কোনদিন কিছু খায় নি।'

অনেক রাতে তারা ফিরল। বোধহয় শেষ ব্যাচ তখন বসেছে। গরদের পাঞ্জাবি-পরা টকটকে ফর্সা মাঝবয়সী এক ভদ্রলোক তখনও চেঁচাচ্ছেন, 'পোলোয়া, পোলোয়া।'

পানের পিকে টুটুলের পাঞ্জাবি রঞ্জিত। 'টুটুল-টা একেবারে গেঁয়ো।' ট্যাকসিতে উঠতে উঠতে চোঙা বললে।

পরের দুদিনও স্বপ্নের মতো কাটল। তবে সাজগোজ যথেষ্ট হলেও ঠিক হাই-কোর্টের জজবাড়ির মতো হয়নি অক্ষয় বোসের বাড়ি। অবশ্য চেষ্টার ত্রুটি ছিল না। এখানেও বউয়ের জন্যে সিংহাসন। জ্বলছে নিভছে বালব, সানাই, ফিশফ্রাই মাংস দই। তবে কোল্ড ড্রিঙ্ক ছিল না, আর ওরকম খোলা বাগানও নেই। সব ছাতে ব্যবস্থা।

এখানেও সেই রংমাখা বেনারসীর পুঁটলি, বাড়ির সামনে গাড়ির সার। চোঙা তো উত্তেজিত হয়ে পরিবেশনের পার্টিতে প্রায় যোগ দিয়ে ফেলেছিল। তারপর ঠোঁটে টেটোল লিপস্টিক মাখা জ্বলজ্বলে চোখ এক মহিলা ফাঁপানো চুলে মৃদুস্বরে দ্বিতীয়বার ফিস ফ্রাই-এ অভিরুচি জানাতেই উত্তেজনায় ঠাকুরদের কাছ থেকে ছোঁ মেরে বিরাট ফাইভর্তি থালা নিয়ে দৌড় দিতে গিয়ে ধুতিতে পা জড়িয়ে থালা উলটিয়ে পড়ে যায় চোঙা। লুঙ্গিপরা এক মাঝবয়সী ভদ্রলোক, মামার সহপাঠী ছিলেন ভাঁড়ারের ইনচার্জ। তিনি চট করে থালাটা টেনে নিয়ে ক্ষিপ্র আঙুলে টকাটক করে প্রায় সব কটা ফ্রাই তুলে নিলেন। অপরিচিত আতঙ্কে ছেলেটির সামনে তর্জনী তুলে বললেন, 'এক একটা ফ্রাই এক এক ফোঁটা রক্ত, জানোহে ছোকরা! যাও, তোমার আর পরিবেশন করতে হবে না।'

চোঙা আশেপাশে চেয়ে দেখলে টুটুল কিংবা বড়ী আছে কিনা। কিন্তু টুটুল পানের থালা নিয়ে সিঁড়ির মুখে দাঁড়িয়ে। আর বড়ী ভেতরের ছোট উঠোনে, আলোকিত সিংহাসনে উপবিষ্টা মামীর সঙ্গে মাথা ঝাঁকিয়ে কথা বলছে।

চোঙা এসে টুটুলের হাত থেকে পানের থালা টেনে নেয়। ফিস ফিস করে বলে, 'মামাবাড়িটা একেবারে বাজে। কোন কিছুর ব্যবস্থা নেই।'

সবচেয়ে টগবগ করেন স্বর্ণসুন্দরী। বোসবাড়ির ঐতিহ্য যেন পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হতে চলেছে তার ভাইয়ের এ বিয়ে মারফত। তাছাড়া রাধা মিত্তিরের বাপের বাড়ির গৌরবে যে এখন তাঁদের বাড়ির গৌরব আরও বাড়ল এ ভাবনায় তিনি অনেকখানি গুরুত্ব দেন। নব যে শেষ পর্যন্ত এক হেঁজি পেঁজি মেম নিয়ে আসে নি, সম্ভ্রান্ত ঘরে বিয়ে করে নিজের সম্ভ্রম বাড়িয়েছে এ জন্যে তিনি গর্ববোধ করেন। বস্তুত তাঁর স্বামীর দেশের বাড়ির পড়ন্ত গৌরবের পাশে তাঁদের পরিবারের মর্যাদা আরও উন্নত বোধ হয়। গৌরী ও প্রতাপকেও যদি দুতিন বছরের মধ্যে এরকম এক সম্ভ্রান্ত ঘরে বিয়ে দিতে পারেন তাহলে তাঁর জীবনে মূল কর্তব্যগুলো সম্পন্ন হয়েছে ভাবতে পারবেন।

গৌরী কদিন হল হস্টেল থেকে মামাবাড়িতেই আছে। তার চেহারা চমৎকার খুলেছে আজকাল। তার এই ফর্সা লাফানো ফাঁপানো মেয়েটি বয়সের দাক্ষিণ্যে কিঞ্চিৎ মন্থর হয়েছে লক্ষ করলেন স্বর্ণসুন্দরী। বেগনি হাত কাটা জর্জেট ব্লাউজে এমন মানিয়েছিল বৌভাতের রাত্তিরে তাকে যে স্বর্ণসুন্দরী ফিরে ফিরে মেয়েকে লক্ষ করছিলেন।

কেবল একটু পথহারা দেখাচ্ছিল ভবনাথকে। বিয়ের কেনাকাটি, মাছ মাংসের জোগানদারদের সঙ্গে ব্যবস্থা এই দুটি প্রধান ব্যাপারের দায়িত্বই ছিল তাঁর ওপর। কিন্তু তিনি থেকেও ঠিক নেই। বিয়েবাড়ির ফাঁকে ফোকে বয়স্কলোকজনদের যে জমাট পারিবারিক আড্ডা তাতে তিনি ধাতস্থ নন। তাঁর মন কেমন করে ইন্দ্রাকপুর কোর্টের নীচেই সবে লাগানো কপির ক্ষেতের জন্যে। চারাগুলো ঠিকমত লাগল কিনা এক একবার ভাবেন। প্রতাপের দরুণ মাঝে মাঝে দুশ্চিন্তা হয়। তাঁর শ্বশুর মশাই নব-র জন্যে যে সাম্রাজ্য রেখে গেছেন তার তুলনায় প্রতাপ খুব একটা কিছু পাবে না, তাঁর বাড়িও খুব বড় নয়, তার তিন ভাগের এক ভাগে মাথা গুঁজবার জায়গা হবে মাত্র। পাঁচ দিন যেতে না যেতেই ভবনাথ তাড়া দিতে থাকেন স্বর্ণসুন্দরীকে।

'তোমার কপির চারা মরবে না, আমি বলছি। গোপীনাথ আছে। ওর সব দিকে খেয়াল আছে। তোমার কোন ভাবনা নেই।' স্বর্ণসুন্দরী বললেন।

কলকাতা ছাড়ার আগের দিন বিকেলে বাড়ির ঠিক সামনেই বিভৎস এক ব্যাপার ঘটে। ধূপকাঠি কিনতে গিয়েছিল রাস্তার ওপারে টুটুলের সমবয়সী একটা ছেলে। তার বাপের ডেকরেটারের দোকান এ ফুটে। পেছন থেকে লরিতে চাপা পড়ল ছেলেটা। মাথা চাকায় চেপ্টে ঘিলু মাংস ছিটিয়ে পড়ে রাস্তার ঠিক মাঝখানে। ছেলেটার বাপের পাগলের মতো চীৎকার, লোকজনদের হল্লা, পলায়মান লরীর পেছনে জনতার নিষ্ফল আক্রোশ, পুলিশের ভ্যান, এক মুহূর্তে নীল চাঁদোয়ায় ঢাকা স্বপ্নের শহরকে রূপ দেয় শত্রুপুরীতে। ভবনাথের নিষেধ সত্ত্বেও টুটুল চোঙা বড়ী ব্যালকনি থেকে ঝুঁকে পড়ে দেখতে থাকে। বাপ এক হাতে ছেলের রক্তমাংসের পুঁটলী আর এক হাতে ধূপকাঠির মোড়কটা হাতে নিয়ে ভিড় ঠেলে দোকানের দিকে এগোয়। চোঙা বললে, 'দ্যাখ দ্যাখ।' তারা ফিরে দেখলে দুটো চিল রাস্তার ওপর পাখসাট খাচ্ছে আর বারাটি বার্লাটি জল রাস্তার মাঝখানটা ধুয়ে দিলেও আনাচে কানাচে যে সব ছিলু মাংসের কুচি আটকে আছে তাই ছোঁ মেরে মেরে ঠোঁটে করে নিয়ে ওপরে উঠছে।

স্বর্ণসুন্দরী চীৎকার করে ডাকেন, 'চলে এসো, চলে এসো তোমরা ওখান থেকে।'

পরদিন যখন তারা ইন্দ্রাকপুর কোর্টের চওড়া সিঁড়ি ভেঙে ওপরে উঠছিল তখন

এই গাছপালা পুকুর জেলখানা সুপুরি-গাছে ঢাকা বাড়িটাই তাদের নিজেদের বাড়ি মনে হচ্ছিল। কলকাতায় একদিন বিকেলে বেড়াতে বেড়াতে সম্প্রতি ভাড়া নেওয়া তাদের নতুন ঝকমকে বাড়িতে নিয়ে গেছিলেন ভবনাথ। সেখানে গ্যারাজ থেকে ভাড়াটের নতুন নীল মরিস গাড়ি বেরোচ্ছে, ওপরের বারান্দা থেকে কুকুরের ডাক আসছে—সে বাড়ি ঠিক তাদের নয়। তার সঙ্গে তারা সামান্য আত্মীয়তাও বোধ করে নি।

আসবার সময় গৌরী দুখানা বই তার ভাইদের উপহার দিলে, বুড়ীকে চুলের রিবন আর তিনজনের জন্যে তিনটে চকলেট। হেমেন্দ্রকুমার রায়ের 'যকের ধন' আর 'আবার যকের ধন' পড়তে পড়তে তাদের শৈশবে বিস্ময় এল। বিশেষ করে টুটুলের রূপকথা আর কল্পনার রাজ্যে এল গুপ্তধন, বিভীষিকা। তারপর তিনখানা চিঠি গেল কলকাতায়। গৌরীর পার্সেলে এল ব্লেকের বই। 'সাংকো পাঞ্জার প্রতিহিংসা', 'মরণের ভয়ঙ্কর' আরও কয়েকটা মরণ-আতঙ্ক বিভীষিকা।

কিছুদিন হল টুটুলকে দেখা যায় সন্ধেবেলাতেও বইয়ের ওপরে হুমড়ি খেয়ে পড়ে আছে চাতালের এক কোণে।

'টুটুল এবার নির্ঘাত ফেল করবে,' বুড়ী অনুযোগ করলে মা-র কাছে। স্বর্ণসুন্দরীর ভর্ৎসনায় ত্রুটি নেই। কিন্তু কাজ হয় না। দুই ভাই পেছনের সিঁড়ি দিয়ে সারা দুপুর গুপ্তধনের সন্ধানে জেলখানার পাঁচিলের পাশ দিয়ে টই টই করে ঘুরে বেড়ায়, কামান বসাবার ফোকরে পর্দার পোল গুঁজে বোম্বেটেদের আক্রমণের জন্যে অপেক্ষা করে, এক একবার সত্যি সত্যি বোধ হয় খালের পার ধরে যদি মাইলখানেক হাঁটা যায় তাহলে মাঠের ধারে বিশাল নেড়া ঝাউগাছটার গোড়ায় হীরের খনি আবিষ্কার হতেও পারে। কিন্তু পথে বিপদের জন্যে পিস্তলের প্রয়োজন। বাবার বডিগার্ড রাম-স্বরূপের পিস্তলটার চুরি করবার সাধও জাগে চোত্তার। কিন্তু তা করতে গেলে, গল্পে যে রকম থাকে অর্থাৎ ক্লোরোফোর্ম মাখানো রুমাল দরকার। ক্লোরোফোর্ম পাবে কোথায় ? মাত্র এক শিশি ক্লোরোফোর্মের অভাবে এত বড় সম্ভাবনা ব্যর্থ হয়ে যাচ্ছে ভেবে চোত্তার ক্ষোভ জাগে।

কিন্তু বুড়ীর ভবিষ্যৎবাণী ব্যর্থ করে টুটুল এবারও প্রথম হল বাৎসরিক পরীক্ষায়। চোত্তা হল তাদের ক্লাসে দ্বিতীয়। টুটুলের পরীক্ষায় প্রথম হওয়া এখন একটা অভ্যাসে দাঁড়িয়ে গেছে। আর যেমন লোকেদের নেশার অভ্যাস হয়ে যায়, সিগারেটের অভ্যাস হয় তেমনি টুটুলের প্রথম হওয়া এক নিত্য প্রয়োজনীয় গতানুগতিক ব্যাপার। আর এ অভ্যাস এমন জোরাল যে সামান্য ব্যতিক্রম হলে, অর্থাৎ দ্বিতীয় তৃতীয় হলেই টুটুল কেঁদে ভাসায়, নিজেকে ভাবে একেবারে অপদার্থ। টুটুল বড় হয়েও ভেবেছে ব্যাপারটা কেন এরকম হত বারেবারে। আর একটা উত্তরই সে খুঁজে পেয়েছে। আসলে ইতিহাস ভূগোল বাংলা ইংরেজী অঙ্ক সমস্ত বইয়ের বাড়ির কাজের আদ্যোপান্ত মুখস্থ হয়ে যেত। আর মুখস্থ প্রশ্নের যেখানে মুখস্থ উত্তরই আশা করা হয় সেখানে সে ভাল করবে না কেন ?

কিন্তু আর সব ছেলেমেয়েদের পরীক্ষার ফলাফল সম্পর্কে ভবনাথের উৎসাহ নেই। কিছুদিনের মধ্যেই আই সি এস পরীক্ষার ফলাফল বেরোবে। ভবনাথ সেদিকে তাকিয়ে আছেন, একটা কেবলের দিকে যে কেবল তাঁর জীবন, তাঁদের সকলের পারিবারিক জীবনে এক নবীন গৌরব ও সমৃদ্ধি বয়ে আনবে।

গত বছর ব্রাইটন থেকে প্রতাপ যে ছবিটা পাঠিয়েছিল সেটা তিনি তাঁর মনের মধ্যে বাঁধিয়ে রেখেছেন। পেছনে ব্রাইটনের সমুদ্র আর বালির ওপরে চানের জাঙিয়া পরে প্রতাপ, একহাত কোমরে। প্রতাপ যেন যৌবনের, আশাবাদের মূর্ত প্রতীক। সঙ্গে সঙ্গে হাওড়া স্টেশনে বিদায় নেবার মুহূর্তে ট্রেনের কামরার হাতলে আলগোছে হাত লাগানো গোলাপের মালা গলায় প্রতাপের চেহারাটা মনে আসে। এইরকম ছেলেরাই তো আই সি এস হবে, ভবনাথ ভাবেন। তাঁর বড় ছেলে তাঁর মতো মেজাজি এটা তিনি টের পান। তুখোড় অথচ অকারণ বাচাল নয়, সকলের সঙ্গে মিশতে পারে অথচ স্বতন্ত্র এরকম ছেলের কদর নিশ্চয় বুঝতে পারবেন। গতবার ভাইবাতে খারাপ হয়েছিল। কিন্তু প্রতাপ লিখেছে এবার সে এ বিষয়ে বিশেষ যত্ন নিচ্ছে। আর সব [illegible] বলেছে, তা তিনি মানেন না। প্রতাপ এ ব্যাপারে তীব্র প্রতিবাদ জানিয়েছে। তাঁর প্রতাপের ওপর আস্থা এতটুকু টাল খায় নি।

পারিবারিক কল্যাণের আশায় স্বর্ণসুন্দরী কিছুকাল যাবৎ প্রতি বৃহস্পতিবার লক্ষ্মীপুজো করছেন। মেঘভাঙা পূর্ণিমার চাতালের এক কোণে কাটাফলের থালা, নারকেলি কুল, নারকেলের চিঁড়ে নাড়ু সাজিয়ে সেই চুক আর কুবেরের উপাখ্যান সমান উৎসাহেই বলেন। কিন্তু মালিনীর মালঞ্চ ধবলময় হল কি হল না তাতে কিংবা জঙ্গলের মধ্যে চুককে বেঙ্গমা বেঙ্গমী কি উপায় বাতলেছিল নদী পার হতে সে সম্পর্কে ছেলেদের কৌতূহল কিঞ্চিৎ ফিকে। এমনকি টুটুলও ব্রতকথা শোনার চেয়ে নারকেলের নাড়ু কটা সাঁটাবে সেদিকেই বেশী মন দেয়। চুক আর কুবেরের উপাখ্যানের চেয়ে ছুটির দিনে দুপুরে গুপ্তধনের সন্ধানে অভিযান আরও অনেক কৌতূহলোদ্দীপক।

সেবার সন্ধ্যায় পুজো শেষ হবার আগেই চাঁদ ঢেকে যায় মেঘে। কুঁই কুঁই করে বৃষ্টি নামে। বুড়ী চোত্তা টুটুল সোরগোল করে ফলফলারির ডালা ঘরের মধ্যে টেনে তোলে। সারা রাত বৃষ্টি চলে। ভোররাত্তির থেকে বৃষ্টির জোর বাড়ে, সঙ্গে সঙ্গে হাওয়ার দাপট, হাওয়া আর বৃষ্টির শব্দ এত বাড়ে যে ভয় হয়, বাংলোর চাল উড়ে যাবে, সমস্ত পূর্ব বাংলা জুড়েই সে রাত্তিরে ঘূর্ণিবাত্যা আর ঝড় চলেছিল। অনেক চাল ওড়ে, গাছ ওপড়ায়, গরু মোষ মানুষের প্রাণহানি ঘটে। এই অসময়ে বৃষ্টি ঝঞ্ঝায় ছেলেমেয়েরা বিছানার চাদরে মুড়িসুড়ি দিয়ে অকাতরে ঘুমোয়। স্বর্ণসুন্দরীর সারাদিন উপোসের পর ভালমন্দ খেয়ে গভীর নিদ্রা যান, ঝড় বর্ষায় বিশেষ বিঘ্ন হয় না। কিন্তু ভবনাথের ভাল ঘুম আসে না। এপাশ ওপাশ করেন। একবার স্বপ্নে দেখলেন তাঁদের পাবনার বাড়ি জলে ভেসে যাচ্ছে। ইদ্রাকপুর কোর্টের চারদিকেও জল। লন্ঠনের পলতে উঠিয়ে বাথরুমের দিকে যেতে যেতে ভাবলেন নিশ্চয় অনেক চাল উড়েছে, ক্ষতি-টতির একটা হিসেব কালই নিতে হবে। এক চিলতে খোলা বারান্দার পরেই বাথরুম। হঠাৎ সমস্ত আকাশ জুড়ে বিদ্যুৎ ঝিলিক মারে, ভবনাথের মনে হল বাড়ির ওপরেই বাজ পড়ল। সকালে উঠেই দেখলেন ফটকের সামনে সবচেয়ে সতেজ সরস সুপুরী গাছটার ওপরেই বাজ পড়েছে। কয়েকদিন পরই পোড়া পাতাগুলো ঝরে গিয়ে গাছটার ন্যাড়াবোচা মাথা আকাশের দিকে চেয়ে থাকে।

(ক্রমশ)

নামে আসে বিস্তর যায়ও বহুত

বিমল বসু

নামে কি আসে যায়? 'হোয়াট ইজ ইন দ্য নেম'!

সর্বকালের শ্রেষ্ঠ নাট্যকার শেকসপীয়র তাঁর নাট্য-চরিত্রের মুখে এই চমকপ্রদ উক্তিটি বিশেষ উদ্দেশ্যসাধনের জন্যে ধরতাইয়ে অংশ করে লাগিয়েছিলেন। কিন্তু তিনি কোনদিন তাঁর দিবাস্বপ্নে অথবা মধ্যনিশীথের নিদাঘ স্বপ্ন-চারণে ক্ষণমাত্রের জন্যে কল্পনাও করতে পারেননি যে এই উক্তি স্বদেশের গণ্ডী ছাড়িয়ে আর এক দেশে আর এক কালে সর্বজনীন প্রবাদবাক্যে পরিণত হবে।

একথা তিনি জানতেন না। জানলে ভারতের ঋষিবাক্য ঃ 'শতং বদ মা লিখ' শিরোধার্য করে একেবারে 'নিশার মতো নীরব' হয়ে থাকতেন।

ভারতের আদিকবি বাল্মীকি। শেকসপীয়রকে ইংলণ্ডের আদিকবি-অভিধায় যদি ভূষিত করি তাহলে ভারতীয় পেনালকোডের কোনও ধারায় অভিযুক্ত হয়ে অর্বাচীন বলে জনতার আদালতে ধিকৃত হতে পারি তা সত্ত্বেও উভয়ের মধ্যে সৌসাদৃশ্যের দিকে গুণীজনের নজর ফেরাতে চাই। দস্যু রত্নাকর রামনাম জপ করে বহুত 'লিফট' আর 'প্রমোশন' পেয়েই না আদিকবি বাল্মীকি-পদে অভিষিক্ত হয়েছিলেন—স্টেজের 'সীন সিফটার' থেকেই তো শেকসপীয়র শ্রেষ্ঠ নাট্যকারের পদে পাকা হতে পেরেছিলেন আপন স্বপ্নসাধনায়। উভয়েই কবি—চারিত্রলক্ষণ লক্ষ্য করবার মতো। নাট্যকার মাত্রেই কবি—শূন্যগগনবিহারী। আর এদেশে ওদেশে সবদেশে কবিদের তো সাতখুন মাপ—আমাদের দেশে তো আগে-ভাগেই বেশ জোর গলায় বলা হয়েছে 'নিরঙ্কুশ কবয়ঃ' আর ইংরেজের দেশে কোন-রকম পরীক্ষা-টরিক্ষা না করেই একেবারে 'এল' মার্কা লাইসেন্স দেওয়া হয়েছে 'পোয়েটিক লাপসেন্স' বলে। ইংরেজরা বিস্তর বুদ্ধি ধরে—সাহিত্য এবং ব্যবসা—সকল রসের রসিক ওরা। সাটে বা সঙ্কেত কবিদের সম্পর্কে 'রায়' দিয়ে দিয়েছে 'লাইসেন্স' শব্দটা কায়দা করে বসিয়ে। যাদের 'সেন্স' (জ্ঞান-বুদ্ধি-বিবেচনা) 'লাই' (অলীক-মিথ্যা-অসার) তারাই সত্যিকারের কবি। কাজেই নাট্যকার শেকসপীয়র কবি-লক্ষণাক্রান্ত বলে তাঁর এ হেন অসার উক্তি ঃ 'নামে কি আসে যায়' —পোয়েটিক লাইসেন্সের রবার-স্ট্যাম্প মেরে অনায়াসে বাতিল বলে গণ্য করা যায়। তা না হলে শেকসপীয়রের মতো সত্যদ্রষ্টা কি করে এমন ভ্রমোক্তি করতে পারলেন! অথবা এ উক্তি কবিযশপ্রার্থী কোন তরুণ কবি শেকসপীয়রের নাটক কপি করবার সময় কাব্য করার এবং দার্শনিক বচন ঝাড়ার লোভ সামলাতে না পেরে ঐ উক্তিটি জুড়ে দিয়ে রিপুকর্মটি মাকেরহাটের পাকা দরজির মতো এমন চমৎকারভাবে করেছেন যে আসল নকল চেনবার জোটি নেই। 'সাত নকলে আসল খাস্তা' এই হয়েছে আর কি। শেকসপীয়রের নামে কবি-জনোচিত এই অসার উক্তিটি চালিয়ে দেওয়া হয়েছে। আসলে এটি প্রক্ষিপ্ত। একাধিক কালিদাস-চণ্ডীদাস-জয়দেবের মতো একাধিক শেকসপীয়রের সম্ভাব্য অস্তিত্ব নিয়ে শেকসপীয়র-দেশের গুণীজ্ঞানী-রসিকজনেরা মধ্যরাত্রের প্রদীপের তেল-সলতে পুড়িয়ে গবেষণা কর্মটি চালিয়ে প্রায় ইনসোমেনিয়া ধরাবার উপক্রম করেছিলেন।

'নামে কি আসে যায়' এমন ভ্রমোক্তি সত্যিকারের শেকসপীয়র কিছুতেই করতে পারেন না। নামে আসে যায় বলেই তিনি বেছে বেছে নাম নিয়েছেন শেকসপীয়র—'পিয়র' (জ্ঞানী-গুণী-রসিক-প্রজ্ঞাবান)-দের তিনি শেখ (শাহানশাহ)। তাঁর নাম চালিয়ে দেয়া উক্তিটি তাঁর নামের আলোয় বিচার দিনের আলোর মতো সব স্পষ্ট হয়ে ওঠে না কি?

আর সত্যিই যদি এটি 'আসল' শেকসপীয়রের উক্তি হয় তাহলে গান্ধীজীর কথা ধার করে বলতে হয় ঃ উনি এমন 'হিমালয়ান (নাকি আলপসপয়ান?) ব্লাণ্ডার' করলেন কি করে? আমার মতে শেকসপীরিয় উক্তি 'নামে কি আসে যায়' সেকেলে এবং 'ব্যাকডেটেড' কেননা এতে আসে বিস্তর যায়ও বহুত।

নামায়ন নিয়েই তো রামায়ণ। জীবন-রঙ্গমঞ্চে পা রাখবার প্রাক-মুহূর্তে আমরা কাঁদি আর প্রস্থানের সময় কাঁদিয়ে যাই। জীবনের আদিতে কান্না এবং অন্তেও তাই। শুরু ও শেষ এই কান্না দিয়ে। কান্না দিয়ে ঘেরা মানুষের সারাজীবন বিভিন্ন স্তরে ও পর্যায়ে বিভক্ত হলেও এর আদ্যোপান্ত—আদ্য মধ্য অন্ত—এই নামের নামাবলী দিয়ে জড়ানো। অর্থে-সামর্থ্যে-সম্পদে মানুষে মানুষে আসমান-জমিন ফারাক থাকলেও জীবনের শ্রেণীবিন্যাসের নানান স্তরে কখনো নিম্নগ্রামে কখনো উচ্চগ্রামে উচ্চারিত নানান নামের ধ্বনিতে অল্পবিস্তর আমরা সকলেই ধনী। রাজা-প্রজা, কালো-ফর্সা, বেঁটে-লম্বা-কুৎসিত, সুন্দর, ধনবান-ধনহীন সকলেরই অঙ্গে এই নামের নামাবলী। এর হাত থেকে কারো রেহাই নেই। আমরণ অক্টোপাশের মতো তা জড়িয়ে থাকে পৃথিবীতে পা রাখবার সঙ্গে সঙ্গেই। 'ধর্মের ষাঁড়' দাগানোর মতো সবাইকে নামের দাগে দাগী হতে হয়। এক নাম নয়, একাধিক নামে। 'অধিকন্তু ন দোষায়'-র মতো গুরুকে আর 'এলাইস'-এর ছড়াছড়ি। জড়াজড়ি নেহাৎ কম নয় যদিচ পোষাকী আর আটপৌরে প্রধানত দুটি নামের মাদুলি সব্বাইয়ের গলায় ঝোলানো। একটা নাম ঘরোয়া, একান্তভাবে অন্তরঙ্গরাই আর আপনজনেরা তা জানে আর একটা বাইরের নাম—মিটিংকা কাপড়া আর কি।

সাধু-সন্ত, আউল-বাউল, ফকির-দরবেশেরা 'মার'-এর হাত থেকে রেহাই পেলেও পেতে পারেন কিন্তু নামের মার থেকে নৈব নৈব চ। অন্য ব্যাপার-স্যাপারে 'লীলাখেলা' বলে চালালেও দেবতারা শুদ্ধ নন স্বয়ং দেবীরাও এর হাত এড়াতে পারেন না। বরং বলা যায় নামের মালা এ'দের গলায়ই দোলে সবচেয়ে বেশি। শিব-কালী-কৃষ্ণ তাবৎ দেব-দেবীদের কণ্ঠে নামের সাতনারী হার—'স্তবকবচমালা'র পাতায় শতশত নামের ছড়াছড়ি। দেব-দেবীদের বেলায় এই যদি হয় 'কুতো মনুষ্যাঃ'। একটি মানুষের মাত্র একটি নাম 'রাত্তিরেতে বেজায় রোদ দিনের চাঁদের আলো'র মতো অসম্ভব। সম্বল যাদের কানাকড়ি, সামর্থ্য যাদের এক নয়া পয়সার সমান এমন মানুষরা সহায়-সম্পদশূন্যতাটা 'নাস্পে সুখমস্তি' শিরোধার্য করে পুষিয়ে নেন একাধিক নামের সমারোহে।

ধরুন না কেন থার্ড পারসন, সিঙ্গুলার নাম্বার, নমেনেটিভ কেস হরিহর হালদারের কথা যাঁর হালসাকিন হালিশহর। শ্রীকৃষ্ণের মতো ও'র শতনাম না থাকতে পারে কিন্তু বাদসাদ দিয়ে অনায়াসেই বলা যায় স মতের মতে অন্তত পাঁচটা নাম ও'র। শৈশবের অবোধ কাকলি, বিচিত্র রঙ্গ দেখেই সবার মনে প্রশ্ন জেগেছিল ঃ 'একটি ছোটো মানুষ', তাঁহার একশো রকম রঙ্গ তো/এমন লোককে একটি নামে ডাকা কি হয় সঙ্গত?' তাই এক হলেও একাধিক নাম হরিহরের। মা-বাবার কাছে 'খোকা' তিনি আজও, অফিস-পাঠশালে নামে না হলে 'সারনেমে' [হালদার] সুখ্যাত। ইয়ার-বক্সি আর অন্তরঙ্গরা ডাকেন 'হরো' বলে। বিবাহের মন্ত্রমালায় যে আয়ুষ্মতীকে তিনি বন্দিনী করেছেন সেই একাঙ্গিনী পুরাঙ্গনা তাঁকে ডাকেন নাম ধরে—কখনো হরি কখনো হর। আর 'বিবাহের চেয়ে বড় সম্পর্ক' যাঁর সঙ্গে—যিনি হরিহরের 'ঘড়ায় তোলা জল' নন—'শেষের কবিতা'র লাবণ্যের মতো যিনি তাঁর ভালবাসার দীঘি, তিনি ডাকেন কানে কানে অস্ফুট আধ-উচ্চারণে চিরমধুর একটি নামে। সে নাম 'বীজমন্ত্রের মতো'। কারো কাছে ফাঁস করতে নেই। এ নাম আছে অন্তরতমসার মুখে আর ওর

কানে।' এ নাম হল যে-সরকারী নাম। সংসার বা অফিসের খাতায় একে খ‍ুঁজে পাওয়া যাবে না। এক কানের ধন পাঁচ কানে গেলে খাস্তা হয়ে যাবে তাই এই কানে কানে ডাক ও'রা দ‍ুজনে ছাড়া আর কার‍ুর জানবার এক্তিয়ার নেই। 'সব পাখিতেই মাছ খায় কেবল ধরা পড়েছে মাছরাঙা' কি হয়? শ‍ুধ‍ু হরিপদ হালদার কেন, আপনি আমি তিনি সে—কেউই এর ব্যতিক্রম নই। আপনি আমি সিঙ্গ‍ুলার নাম্বার হয়েও আসলে নামের দিক দিয়ে বহ‍ু। আমাদের এই পোষাকী নাম, আটপৌরে নাম, ডাকনাম, সারনেম, আদ‍ুরে নাম—পঞ্চনাম থেকে যদি একটি নাম বাদ যায় তাহলে ব্যাপারটা দাঁড়ায় বিয়েতে বর বরযাত্রীদের মতো—জীবন তখন বিস্বাদ মনে হয়। কেমন যেন খালি লাগে।

তা যদি হয় তাহলে কেমন করে বলি : নামে কি আসে যায়!

আসলে অসার এই খল‍ু সংসারে এই নশ্বর প‍ৃথিবীতে পদ্মপত্রে নীরসদ‍ৃশ জীবনে নামই সারসত্য। ইহকাল, পরকাল, ধর্ম অর্থ কাম মোক্ষ—'নাম' হলেই কান টানলেই মাথা আসার মতো সবকিছ‍ু অতি-অবশ্যই এসে হাজির হয়—যাকে বলে একেবারে চত‍ুর্বর্গ লাভ। সেজন্যেই নাম কামার, নাম অক্ষয় অক্ষরে লেখার, নিজ নামের জয়ধ্বনি তোলার বাসনা ও ইন্ধন চারদিকে এত ব্যাপক। উত্তরাধিকারস‍ূত্রেই যেন এটা আমাদের মধ্যে। নশ্বর প‍ৃথিবীতে স্বল্পায়‍ু জীবনে কিছ‍ু চিহ্ন কিছ‍ু দাগ রেখে যাবার ব্যাকুল বাসনাই নাম-এর আর এক নাম। ছোট বড় মাঝারি সব মাপের মান‍ুষের মধ্যে এই আসক্তি অতি তীব্র—অকটোপাশের মতো তা ওতপ্রোতভাবে মান‍ুষের জীবনকে জড়িয়ে থাকে। কোন-মতেই এর হাত থেকে রেহাই নেই কারো। মনের অনেক গভীরে এই বোধ ল‍ুকিয়ে থাকে।

শৈশব পার হয়ে কৈশোরে পা দেবার সঙ্গে সঙ্গেই নাম-এর ব্যাকুল বাঁশরী বাজতে থাকে এবং যতই বয়স বাড়ে ততই ম‍ুগ্ধতা এবং উন্মত্ততা বেড়ে যায়। বালক-বয়সে কৈশোর-যৌবনের সন্ধিক্ষণে স্কুল-কলেজের হাই বেঞ্চে নিজ নামের কাঠখোদাই করার অপ‍ূর্ব রোমাঞ্চ আপনার জীবনে যদি না এসে থাকে তাহলে আপনি জানেন না আপনি কি হারিয়েছেন! মন্দির-মসজিদ-মিনারে কাঁচা হাতে ভুল বানানে লেখা কতশত নাম নিশ্চয়ই আপনার নজর এড়ায়নি। 'যেমন আছ তেমনি এসো নাইবা হল সাজ' বলে হাঁক দিয়ে ডাক দেবার এক্তিয়ার যদি কার‍ুর ওপর না থাকে, যদি বিষণ্ণ সন্ধ্যার আলোছায়াঘেরা ক্ষণে সাগর-তীরের বাল‍ুকাবেলায় সঙ্গীহীন জীবনের অলস ম‍ুহ‍ূর্তে আনমনে বসে থাকতে থাকতে নিজের অজ্ঞাতসারে নিজের নামের পাশে আর একটি প্রিয় নাম যদি আপনি কখনো না লিখে থাকেন তাহলে আপনার বিপ‍ুল সম্পদ অত‍ুল ঐশ্বর্য এবং ভারতজোড়া নাম সত্ত্বেও কিন্তু আপনাকে ঈর্ষা নয়, কর‍ুণা করতে ইচ্ছা হয় আমার। আপনার জীবনের কোন কোণে যদি এই ধরনের 'অকৃত কার্য', অকথিত বাণী, অগীত গান বিফল বাসনা-রাশি' থেকেও থাকে তা কিন্তু শ্মশান-বন্ধ‍ুরা সম্প‍ূর্ণ ও সার্থক করে দেবে মড়া-পোড়ানো ইতস্তত-বিক্ষিপ্ত কাঠকয়লা দিয়ে আপনার নাম শবযাত্রীদের বিশ্রাম-ঘরের দেওয়ালে কালো অক্ষরে লিখে—এ আমি হলফ করে বলতে পারি।

বালক-বয়সে যে বাসনার শ‍ুর‍ু অন্তিম-শয়নের ভববৈতরণী নিরাপদে পার করাবার সদিচ্ছায় প্রায়-বধির কর্ণ-কুহরে হরি-নারায়ণ-ব্রহ্মের নাম প্রক্ষেপে তার পরিসমাপ্তি। জীবন থেকে মরণে নাম শতর‍ূপে পাছে পাছে নয় সঙ্গে সঙ্গে ফেরে। শিল্প-সাহিত্য-বিজ্ঞান, চার‍ু এবং কার‍ুকলার যাঁরা মোহন্ত-মহারাজ তাঁরা কেউই এই নাম-র‍ূপ ব্যাকরণের ব্যতিক্রম নন। বরং বলা যেতে পারে কম্পাসের কাঁটার মতো স্থিরলক্ষ্য সব স‍ুকুমার কলা এবং বিজ্ঞান-আবিষ্কারের গভীরে প্রোথিত রয়েছে ব্যক্তিনাম স‍ুপ্রতিষ্ঠ করার আন্তরিক আয়োজন—'আমি আছি আমি থাকব' সোচ্চারে। আমার আপনার কথায় গাড়‍ু মার‍ুন, 'বহ‍ু ব্যবহারে মলিন' কবিগ‍ুর‍ু রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং বালক-বয়সে গোলাপ-ফ‍ুলের নির্যাসে কলম ড‍ুবিয়ে নিজের নামটা স‍ুরভিত করবার চেষ্টা করেছিলেন এবং পেরেওছিলেন। আর 'দিল্লীশ্বরো জগদীশ্বরো বা' সম্রাট সাজাহান স্বয়ং 'কানে কানে ডাক' 'অনন্তের কানে' রাখবার জন্যেই তো প‍ৃথিবীর বিস্ময় 'তাজমহল'-এর প্রতিষ্ঠা করলেন যখন বাংলা এবং গ‍ুজরাটে নিদার‍ুণ দ‍ুর্ভিক্ষ।

রাজা-বাদশার কথা বাদ দিয়ে হরিপদ কেরানীর কথাই ধর‍ুন না কেন। কালের পাতায় নাম লেখার প‍ুঁজি বিন্দ‍ুমাত্র নেই। প্রতিভা কানাকড়ি, উদ্যম ও চেষ্টা শ‍ূন্য, এক পারসেন্ট ইনসপিরেশন এবং নিরেনব্বই পারসেন্ট পারসপিরেশন ডায়লেট করে কিছ‍ুএকটা স‍ৃষ্টি করাবার দ‍ুর্বার বাসনার বাষ্পমাত্র যখন নেই তখনও কিন্তু নিজের নামটা জিইয়ে রাখতে আমরা পিছপা হইনে। নিজের নামটা বাঁচিয়ে রাখতে চাই বলেই তো রামভক্ত হন‍ুমানের মতো ভক্তির পরাকাষ্ঠা দেখিয়ে মা-বাপের অতি বাধ্য সন্তানের ভূমিকায় আমরা সক্রিয় হয়ে উঠি বি-বহ ধাতু ঘঞ করবার বেলায়। দ্বিপদ থেকে চত‍ুষ্পদ হই। প‍ুন্নাম নামক নরক থেকে ত্রাণ পাবার অভিপ্রায়ে 'ইট টেকস ট‍ু ট‍ু মেক ওয়ান' ফলো করে 'স‍ৃষ্টি নেশার উল্লাসে' উন্মাদ হয়ে উঠি। যে আসে সাদরে তার নামকরণ করি 'বংশলোচন'। কালে এই বংশলোচনরাই যখন বংশদণ্ড হয়ে দাঁড়ায় তখন অবস্থা হয় 'ছেড়ে দে মা কেঁদে বাঁচি' নবাগতরা যখন বাঁচে না, অথবা হেজে মজে যায় তখন ঠাকুর, দেবতার দোর ধরি। বাঁচলে, হরি রেখেছেন বলেই নাম হয় রাখহরি। হরি যখন রাখতে শ‍ুর‍ু করলেন তখন 'প‍ুত্রকন্যা প্রবল বন্যায়' ভরাডুবি হবার যোগাড়। তখন আর দেবতা নয় দেবীদেরই শরণ নিতে হয়। সেকালে 'ল‍ুপ' লাইনে যাবার রেওয়াজ উঠেনি, আয়োজনও ছিল না কোন দিক দিয়েই। ছোট পরিবার স‍ুখী পরিবার এবং 'দো বাচ্চা আউর এক ব্যস খতম' শ্লোগানের সঙ্গে পরিচয়ও ছিল না। 'পনেরো পয়সায় তিনটি' পান আর ম‍ুড়ি-ম‍ুড়কির দোকানে তখন আর পাওয়ার ব্যবস্থা ছিল না বলেই দেবতা নয় দেবীদের সাক্ষী মানা হত—'আর না কালী'। আন্নাকালী নাম ধরে ডেকেও যদি পার পাওয়া না যেত তখন অযাচিত আগন্তুককে অভিনব নামে অভিহিত করা হত—হত 'ঘেন্না' নাম। আন্নার সঙ্গে ঘেন্না মিলের দিক থেকে চমৎকার। দেশ-কাল-য‍ুগ বদলেছে, নাম-করণের রকমফের ঘটেছে—আদ্যিকালের 'আন্না-ঘেন্নারা' মাঝের কালে 'ক্ষ্যান্তময়ী'-'ক্ষ্যান্তমণি' হয়ে একালে এসে পেয়েছে অতি আধ‍ুনিক নাম: 'ইতি'। ইতি দিয়েই যতি টানবার স‍ুখপ্রদ সনাতন ব্যবস্থা আজও অটুট জন-বিস্ফোরণ-রোধের নানান আধ‍ুনিক আয়োজন সত্ত্বেও।

জনতা থেকে বিশেষ জনকে চিহ্নিত এবং প‍ৃথক করার জন্যেই নাম। নামটা আবার সম্বোধন করার জন্যেও। স্বয়ং কবিগ‍ুর‍ু কব‍ুল করেছেন: 'নাম না পেলে সম্ভাষণ করা চলে না।' ফলে নাম না জানার জন্যে কম বিপত্তি আর বিরক্তির উদ্ভব হয় না। ইংরেজ-অ্যামেরিকানদের কিন্তু ভারী স‍ুবিধে, ওদের ঝঞ্ঝাট কম। নাম-না-জানার ঝঞ্ঝাট ওরা এড়াতে পারে হেসে 'হ্যালো' বলে ডাক দিয়ে কিন্তু আমাদের বেলায় তেমন য‍ুতসই শব্দ কই। 'ওহে 'এই যে' শব্দগ‍ুলো যেন কেমন-কেমন। এই নাম-না-জানার জন্যে আমার আপনার কথা বাদ দিন স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণই কাহিল হয়ে পড়েছিলেন : প্রথম দর্শনে শ্রীরাধা সম্পর্কে শ্রীকৃষ্ণের কাতর উক্তি : 'নাম নাহি জানি তার সে থাকে গোকুলে।'

পোশাকী নামটা জানা থাকলে তার পিছনে একটা লেজ‍ুড় (বাব‍ু) বসিয়ে অপ্রস্তুতির খামতি খানিকটা প‍ুষিয়ে নেয়া যায়। ভদ্রলোকের বেলায় না হয় বাব‍ু বসালাম কিন্তু মহিলাদের নামের সঙ্গে যদি বিবি য‍ুক্ত করি তাহলে দেবীরা বিস্তর গোঁসা করবেন, অভিসম্পাৎ দেবেন। সত্যি 'আ মরি বাংলা ভাষা' বলে উচ্চকিত কণ্ঠে যতই ম‍ুক্তকচ্ছ হই না কেন পথেঘাটে 'পল্লবিনী সঞ্চারিণী লতেব' সদ‍ৃশ পটে-আঁকা ছবির মতো বিবিদের সম্বোধন করার মতো শব্দের অভাব যথেষ্টই আমাদের এই ভাষা-ভাণ্ডারে 'বিবিধ রতন' সত্ত্বেও। যাইই বল‍ুন এদিক দিয়ে রাষ্ট্রভাষা হিন্দি তব‍ু পদে আছে 'জী' অক্ষরটি উজিয়ে রেখে। হিন্দি-ভাষা যতই দ‍ুর্বল হোক এই অক্ষরটিকে কবচ-কুণ্ডল করে অকতোভয়ে অবলাদের সঙ্গে সবলে ডায়লগ চালিয়ে যাওয়া যায়। আবার সাহেবি কায়দায় সারনেমটাকে নাম ধরে নিয়ে অন্তরঙ্গ কাউকে মিঃ রায়, মিঃ

বোস বলে ডাকা গেলেও অন্তরঙ্গতার চেয়ে রঙ্গাই হয়ে উঠবে। আসলে সারনেম ধরে এই ডাক 'একেবারে সমুদ্রের ওপারের ওটা দূরের নাম। নামের দূরত্ব ঠিক করতে গেলে মেপে দেখতে হয় শব্দটা সদর থেকে কানের অন্দরে পৌঁছতে কতক্ষণ লাগে।' এতে নৈকট্যের চেয়ে কাপট্যই বড় বেশি সোচ্চার। দেশে কালে ভেদ আছে অথচ নামে ভেদ নেই এটা অবৈজ্ঞানিক। তাই 'রিলেটিভিটি অব নেমস' প্রচার করে নামজাদা হবার আকাঙ্ক্ষায় মুখর হয়ে উঠেছিল 'শেষের কবিতা'র অমিত রায়।

আর এই নামের কী বাহার। কত রূপ কত রঙ কত ঢঙ তার। আছে আকারে ছোট-বড়-মাঝারি নানান ধরন আর ধাঁচের নাম। অন্নপ্রাশন তো নামকরণের মহোৎসব। এই নামকরণের ফৈজতে কম নাকাল হতে হয়নি স্বয়ং রবীন্দ্রনাথকে। আসলে তিনি ছিলেন নামকরণের কুলগুরু। এ ব্যাপারে তাঁর ছিল স্বাভাবিক স্বাধিকার। তাই বিদেশী নাম বেমালুম নিশ্চিহ্ন, 'বোগেন-ভেলিয়া' হয়েছে 'বাগানবিলাস'। বিদেশী ফুল 'পেট্রিয়া' হয়েছে 'নীলমণিলতা'। রূপের স্মৃতি নামের দাবী করলে দূর-প্রবাসে কবি এই বিদেশী ফুলের নামকরণ করেন।

নামকরণের পংক্তিবিচারে প্রধানত দুটি ভাগ : আদি আর নব। আদিরা বুঝতেই পারছেন এইটটিনথ সেঞ্চুরীর—ব্যাকডেটেড সেকেলে—একবারে পুরাতনপন্থী। কাজেই সেকেলে খুড়ো-জ্যাঠা দাদু-বাবা-কাকার দেয়া নাম থেকে পুরনো বাজারের রদ্দি মালের পুরনো-পুরানো গন্ধ ছড়াবে এ আর বেশি কথা কি। নবরা 'চলতি হাওয়ার পন্থী', রূপান্তর ও সংক্ষিপ্তকরণের ঝোঁক এদের মধ্যে বড় বেশি উগ্র। পরিমলহাসিনী শতদলবাসিনী নির্মলনলিনী নৃপবালা প্রমীলাসুন্দরী, হরিনফর বিপদবারণ-বৈকুণ্ঠ বিহারী, দোলগোবিন্দ, ভজহরি প্রভৃতি ভজকট নামগুলো বেজায় রকমের কড়া কর্তা-ব্যক্তিদের নামকরণের নজর-টানা নজীর একালেও গরহাজির নয়। সেলুলার সেলের শাস্তি ডাণ্ডা-বেড়ির মতো এই সেকেলে নামগুলো একেলে ছেলে-ছোকরাদের এবং তরুণদের অসহ্য হয়েছে বলেই চটপট আধুনিকীকরণ হচ্ছে ধর্মাধিকরণে নাম-বদলের আর্জি পেশ করে। শুধু নাম নয় 'সারনেম' বদল হচ্ছে নির্বিবাদে। কিন্তু নবরা জানেন না এই নামের মধ্যেই নিহিত থাকে পিতৃ-ঋণ দেবঋণ ও কুলঋণের স্বীকৃতি। নিজের খুশীমতো পছন্দমতো নাম-বদল সেই তিন ঋণের নীতি অস্বীকৃতি—আসলে তা আত্ম-অস্বীকৃতির সামিল। 'যাবৎ জীবেৎ সুখম জীবেৎ ঋণম কৃত্বা ঘৃতম পিবেৎ'-এর যুগে 'আপনি বাঁচালে বাপের নামই' হয়তো সবচেয়ে নিরাপদ আশ্রয়। নাম আধুনিকীকরণের ব্যাপারে একালিনী কন্যেরাও পিছিয়ে নেই এক কদমও। 'ফিগার স্লিম' করার সঙ্গে তাল রেখে নাম ও পদবী ছেঁটে-কেটে ছোট করে নিচ্ছেন ওঁরাও। কেতকী মিত্র এখন রূপান্তরিত হয়ে হয়েছেন কেটি মিটার। জলসা-কারখানার যন্ত্রপরম্পরায় শোধিত তৃতীয় ক্রমের চোলাই-করা বিলিতি কৌলিন্যের ঝাঁঝালো এসেন্স আর কি। নামের নবীকরণের সঙ্গে সামঞ্জস্য বিধানের জন্যে যুক্ত হয়েছে বেশে-বাসে বহিরঙ্গে বাহুল্য বর্জনের উদগ্র আগ্রহ।

কিন্তু মজা দেখুন নামের সঙ্গে নাম-ধরের বা নামধারীর মিলের চেয়ে গর-মিলটাই বেশি। বৈপরিত্য নামে এবং অবয়বে। কানা ছেলের নাম পদ্মলোচন আর কি। নিকষ কালো মেয়েকে কৃষ্ণকলি বলে ডেকে কবিত্ব করা চলে কিন্তু সে ডাকে 'মলিনত্বং ন মুঞ্চতি। অপ্সরাসদৃশ সুন্দরীর নাম কৃষ্ণা। বাঁকা তরোয়ালের মতো সরু গোঁফ, ছোমার হ্যান্ডেলের মতো জুলপি, মোষকালো ভয়ালদর্শন তরুণের নাম শান্তি-ময় আর বীরেন্দ্রকুমার যিনি তাঁর রোগা হাড়গিলে চেহারা গলায় মাদুলি হাতে কবচ —নড়তে চড়তেই আঠারো মাস। রমণীরঞ্জন-বাবু কোন পাণফাণ না করেই বিশেষজ্ঞ একটি বিশেষ ব্যাপারে—ডিভোর্সে। কিন্তু আশ্চর্য মিল দেখেছি একটি নামে—বিকলাঙ্গ, বধির ও দৃষ্টিহীনদের শিক্ষায় ও সেবায় নিবেদিতপ্রাণ শ্রীমতী অনুভূতি বসু। মহারাষ্ট্রীয় ও মদ্রদেশীয়দের মতো আমাদের নামের মধ্যে বাপ-ঠাকুরদার নাম বহন না করলেও রসসাহিত্যিক 'দাদা ঠাকুর'-এর কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের কথা : 'খুঁট ধরে টানলে তিন পুরুষ বেরিয়ে আসে—মেনকা— মেয়ে দুর্গা— নাতনী লক্ষ্মী আজও।

এহ বাহ্য। ডাকনামে নামডাক কারো কারো। কেউবা নামের চেয়ে 'সারনেম'-এ পরিচিত বেশি। কালীঘাটের কীর্তিবাস লেনের নৃপেন্দ্রনারায়ণ নাগচৌধুরীর খোঁজ করতে গিয়ে একেবারে নাজেহাল, ডাকনাম বলতেই মুখিয়ে উঠল ছেলেছোকরারা : ওহ, তাই বলুন ন্যাড়া, আমাদের নেড়ুদা... চন্দ্রবদন বসুর নাম শুনলে পটে-আঁকা ছবির মতো দেখতে রিসেপসনিস্ট চোখ কপালে তুলবে কিন্তু যেই বলবেন : মিঃ সি বি আপনার কথা কেড়ে নিয়ে চোখেমুখে হাসি ফুটিয়ে বরাননা বলে উঠবেন : ওহ, মিঃ বাসু...। আবার দেখুন স্যার জে সি বোসের চেয়ে আচার্য জগদীশ-চন্দ্রকে আমরা বেশি চিনি যেমন চিনি আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের চেয়ে স্যার পি সি রায়কে। হলিয়ুডের ছায়াচিত্রের অভিনেত্রী পঞ্চদশবার স্বামী-বদলের পরেও স্টেজ-নেমে মিলটাই বজায় রাখেন। ভারতীয় ছায়া-চিত্রের জগতে তার কার্বন কপি শুরু হয়ে গেছে।

আর 'পেন-নেম'—যাকে 'ছদ্মনাম' তাও খুব কমজোরী নয়। এই ছদ্মনামের চলন, মহাভারতের যুগ থেকে—অজ্ঞাতবাসকালে পাণ্ডু-পুত্রেরা এই ছদ্মনামের আশ্রয়ে থেকেই মান এবং জান দুইই বাঁচিয়েছিলেন। রবীন্দ্রনাথকে জানেন বিশ্বজগতের বিদগ্ধ ব্যক্তিরা কিন্তু ভানুসিংহকে? ঠাকুরবাড়ির পরিচিত জনৈক নিশিকান্ত চট্টোপাধ্যায় 'ভানুসিংহ নব-আবিষ্কৃত পুরাতন লেখক' এই বিষয়ে গবেষণা-কর্মটি করে জার্মানী থেকে ডক্টরেট ডিগ্রী নাকি লাভ করেছিলেন। ছদ্মনাম অন্য সব পরিচয় মুছে দিয়ে কখনোসখনো আসল নাম হয়ে ওঠে : আন্তর্জাতিকতাবাদী চিন্তানায়ক মানবেন্দ্রনাথ রায় (নরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য), নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় (তারকনাথ গঙ্গোপাধ্যায়), ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায় (ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়), কিশোর-বন্ধু গল্পদাদু (যোগেশচন্দ্র বসু) বঙ্গরঙ্গমঞ্চের দানীবাবু (সুরেন্দ্রনাথ ঘোষ), রসসাহিত্যিক পরশুরাম (রাজশেখর বসু) এরই এক উজ্জ্বল নজীর। হালফিল বাংলা-সাহিত্যে ছদ্মনামধারীদের যেন জোয়ার এসেছে। ছদ্মনামের আড়ালে থেকে মেঘনাদের মতো অন্তরীক্ষ থেকে তীক্ষ্ম শারকে প্রতিপক্ষকে ক্ষতবিক্ষত ও ঘায়েল করার বিচিত্র কাহিনী ছড়িয়ে আছে সেকালের সাহিত্যের পাতায় পাতায়। উপ-নামও কখনোসখনো সোনার অক্ষরে ইতিহাসের পাতায় লেখা হয়ে যায় যেমন হয়েছে 'হিন্দুস্থান সোসালিস্ট রিপাবলিকান পার্টি'র বিপ্লবী তরুণ চন্দ্রশেখর আজাদের বেলায়। স্বাধীনতাপ্রেমী নিজ নামের সঙ্গে নিজেই যুক্ত করেছেন 'আজাদ' এই উপ-নামটি।

নামগুণে ধন পায়, শিলা জলে ভাসে, পঙ্গু পর্বত লঙ্ঘন করে—এ যুগে এ আর কবিকল্পনা নয়, বাস্তব সত্য। এ নামের গুণে কত অঘটন ঘটে যাচ্ছে আপনার চারপাশে তা আপনার এখনও অজানা? বিদ্যা-বুদ্ধি-সামর্থ্য-অভিজ্ঞতা সত্ত্বেও নামরূপ বীজমন্ত্র ভুলে ভ্যাবাগঙ্গারাম হয়ে আপনি যাদু ফাঁক উচ্ছে ফাঁক বিড়বিড়িয়ে বন্ধ দরজায় মাথা কুটছেন আর ওদিকে আমার, মেশোর নিদেনপক্ষে শালাবাবুর নামে কত আঘাটের মড়া কি কান্তটাই না করে বেড়াচ্ছে! 'মুকুব্বির লোক' এই ব্যারনেমটাকে সার করে বিনাটিকিটে হিল্লি-দিল্লি প্রমোদভ্রমণে ঘুরে বেড়াতে দেখেছি কাথিক ব্যক্তিকে।

আসলে নামই হল সারাৎসার—সৈনিকদের 'পাশ-ওয়ার্ড', চোরাকারবারীদের গুপ্তসঙ্কেত, স্বার্থশিকারীদের 'বুলস আই' আর সুযোগসন্ধানীদের সাফল্যের সিঁড়ি। নামে রূপ যেমন আগুণও তেমনি। পাত্রাপাত্র ভেদে শুধু মাত্রা নির্ধারিত করে নিতে হয়। আপনার যদি টাইম-জ্ঞান থাকে তাহলে নামের টাইম-বোম দিয়ে আপনার প্রতিপক্ষকে অনায়াসেই ঘায়েল করতে পারেন রোজ নয়-অন্ত কর্তাব্যক্তিদের কানে একটি বশেষ নামধারীর বিরুদ্ধে বিষ ঢেলে, [illegible] করেও [illegible] না, কোম্পানীর চাকা সচল রাখতে আপনি কি খাটুনিই না খাটেন, মাস গেলে যা পান তা নিজের বউকে পর্যন্ত জানাতে লজ্জা করে আর ওদিকে কুটোটি না নেড়ে আপনার 'বস' ভবতারণের মাতজামাই ভুজঙ্গবাবু কর্তার কানে শুধু ভুজুং দিয়েই মোটারকম কামাচ্ছেন।

আবার নাম নেয়া মানেই প্রশংসা করা যাকে অনার্যভাষায় বলে 'অয়েলিফাই' করা। 'স্যর, আপনার খুব নাম', একথা শুনলে কোন সাহেবই না 'তর' হয়ে যান। আসলে নামের টোটকা সর্বরোগহর দাওয়াই, যাকে বলে একেবারে ধন্বন্তরী। শুধু পাত্রাপাত্রভেদে প্রযোজ্য। মানুষ তো ছার!—বাঘা বাঘা দেব-দেবীরা এই নামের গুঁতোয় কাত হয়ে পড়েন—রামায়ণ-মহাভারতের কাহিনী আর পুরাণের গল্পে তার ঝুড়ি ঝুড়ি প্রমাণ মেলে। সামান্য কারণে ও'রা যেমন ফুঁসে ওঠেন 'তর' হয়ে গলে যেতেও ও'দের তেমনি তর সয় না।

অন্তরঙ্গ আলাপে বাধা পড়তেই বাংলা-সাহিত্যের এক দিকপাল রেগে 'দুর্বাশা' হয়ে ফোন ধরেই হুঙ্কার দিলেন, অপরপ্রান্ত থেকে একটি বিশেষ নাম ফোন-বাহিত হয়ে তাঁর কর্ণগোচর হতেই দীপকরাগিণী থেকে তিনি নেমে এলেন একেবারে কড়ি-কোমলে—শুধু উনি কেন—আমি আপনি তিনি—আমরা সবাই সেই এশই পাখির পালক' নই কি এই দিক দিয়ে? 'সখি কেবা শুনাইল শ্যামনাম' বলে শ্রীরাধিকার মতো পরিচিত প্রিয়জনদের সামনে আকুল-ব্যাকুল না হতে পারি কিন্তু একটি পরিচিত প্রিয়নাম শুনলে হৃদয়-সরোবরে দোলা—এখনও এই 'পঞ্চাশোর্ধে বনং ব্রজেং'-এর বয়সে—লাগে না ধর্মাধিকরণে তামা-তুলসী-গঙ্গাজল নিয়ে সত্যভাষণের শপথের মতো তা অসার। প্রগাঢ় প্রমত্ততার চিহ্ন— স্বেদ-হর্ষ-পুলক-কম্পন আপনার দেহে দেখা না দিতে পারে কিন্তু পুরনোদিনের মিলন-বিরহ-কাহিনীর টুকরো টুকরো ছবি 'ফ্লিজ শট'-এর মতো স্মৃতির পর্দায় চকিতে ভেসে উঠে দেশকাল সময়-সীমার পারে অন্য কোথা অন্য কোনখানে সহসা নিয়ে গিয়ে আপনাকে একদিনও বিষন্ন ও আনমনা করে তোলে নিতা কি বুক ঠুকে আপনি বলতে পারেন? তবু বলবেন : নামে কি আসে যায়...

নামে আসে বিস্তর, যারও বহুত। নামী হলেই যার ব্যক্তি-স্বাধীনতা—যা মন চায় তা করে বেড়ানোর অবাধ অধিকার। সাধারণ মানুষের মতো প্রাণ খুলে তখন হাসা নয়, মেপে-জুপে কথা বলতে হয়। অনুগ্রহপ্রার্থী আর উমেদারদের জ্বালায় ডাক ছেড়ে কাঁদতে ইচ্ছে করে, সাত কথায় এমনভাবে ঘাড় নাড়তে হয় যাতে 'হ্যাঁ' 'না' দুই-ই হতে পারে। পার্টি আর পাব্লিক রাখতে এমন সদাব্যস্ত থাকতে হয় যে আপনজনের সঙ্গে সম্পর্ক ক্ষীণ হয়ে আসে—সংসার ও স্বাভাবিক জীবন থেকে বিচ্যুত হতে হয়—নামী আর দামী মানুষদেরই এই হাল হয়। হারমিলিয়নের নামের বাঁশিতে ঘরের চেয়ে বাইরের জন্যে আপনার মন উচাটন হয়ে থাকে। স্বয়ং কবিগুরুই কবুল করেছেন : 'নাম যার বড়ো তার সংসারটা ঘরে অল্প বাইরেই বেশি। নামী মানুষের অতি অল্প অংশই পড়ে স্ত্রীর ভাগে। নামজাদা মানুষের বিবাহ স্বল্প-বিবাহ বহু-বিবাহের মতোই গর্হিত।'

আপনার নাম নেই। কেউ পোঁছে না। কিন্তু এক পারসেন্ট ইনসপিরেসন আর নিরেনব্বই পারসেন্ট পারস্পিরেসন মিশিয়ে অনেক খেটেখুটে যেই একটু নাম করলেন অমনি হু হু করে অনেক কিছুই আসতে লাগল। হাতে হাতে ফললাভ। নামী হলেই দামী হবেন তখন আপনাকে নিয়ে কি নাচানাচিই না শুরু হবে। পরিবাদ ধুয়েমুছে যাবে চোখের পলক ফেলতে না ফেলতেই। প্রশংসার পোঁ কানে তালা ধরিয়ে দেবে। গুণীজন-সম্বর্ধনার গুঁতোয় আপনি হাঁফিয়ে উঠবেন। আপনি যদি শিল্পী বা সাহিত্যিক হন তাহলে তো আর কথাই নেই। আপনার লেখা বা রেখা পাবার জন্যে বইপাড়ায় বা সাময়িকপত্রের কর্ণধারমহলে 'ম্যারট' বেঁধে যাবার যোগাড় হবে। চাহিদা অনুযায়ী সরবরাহের ঢেউ চঞ্চল ও অব্যাহত রাখার জন্যে ভাড়া-করা তৃতীয় শ্রেণীর লেখক ও শিল্পীদের শিল্পনামধেয় অখাদ্য বস্তুগুলোয় আপনার নামী ও দামী নামের ঢ্যাড়া বসিয়ে 'টু পাইস' আমদানী করে ব্যাঙ্ক-ব্যালেন্স স্ফীত করতে থাকবেন। স্কুলের বিদ্যে নিয়ে লেখা অপরের কলেজের নোটবইয়ে নামী অধ্যাপক হিসেবে, নাম ধার দিতে আপনার বিবেকে বাধবে না। নামভাঁড়ানো আর নাম-ভাঙানোর কাজ বেমালুমভাবে চালিয়ে আপনি বাড়ি গাড়ি করতে পারবেন অতি অল্পদিনেই।

এইভাবে নামে আসবে বিস্তর।

আর ঢাক আর কাঠি যদি দুই-ই আপনার কবজায় থাকে তাহলে আর কাল-বিলম্ব না করে নিজ নামের জয়ঢাক বাজাতে শুরু করুন, নাম-ঢাকের আওয়াজ শুনলেই ধুনো ধরবার জন্যে আপনার ধ্বজাধারীরা আপনি এসে জুটবে। ছলেবলে কৌশলে যেভাবেই হোক নাম করুন : কুরু নামম অহোরাত্রম স্মর নিত্যম অনিত্যতাম।'

আর নাম যদি না-ও হয় তাহলে বদনামই সই—বদুরে বলে গুরু আর কি—অন্ততঃ একালে নামের বদনাম নেহাৎ কম ডিভিডেন্ড দেয় না—অতএব বন্ধুগণ—নামে কি আসে যায় সে প্রশ্ন না তুলে নামগান শুরু করে দিন :

নিজনাম, নিজনাম, নিজনামের [illegible]
[illegible] নামের [illegible] মানেন্দ
[illegible]।

সুখের জন্যে

নির্মলেন্দু রক্ষিত

সারা দুপুর ছটফট করল দীপক। চোখে-মুখে জল দিয়ে এল বারকয়েক। কিন্তু ঘুম এল না তবুও। অথচ যেদিন নাইট ডিউটি থাকত, এসে তাড়াতাড়ি চান-খাওয়া সেরে ও পড়ে পড়ে ঘুমোত সেই বিকেল পর্যন্ত। এক-একদিন মা এসে ঠেলে তুলত ওকে।

আসলে তন্দ্রার মতো একটু এসেছিল একবার। কিন্তু একটা দুঃস্বপ্ন দেখে ও ধড়মড় করে উঠে বসেছে। সারা শরীর ঘামে ভিজে গেছে। একটা অস্বস্তিকর ভয় ছেয়ে আছে। এখনও যেন দীপক দেখতে পাচ্ছে টোনাকে। কুতকুতে দুটো চোখ। মুখের এখানে-ওখানে কাটা দাগ। ইস্পাতের মতো কঠিন মজবুত একটা কালো কাঠামো।

প্রথমে গা ঘিন-ঘিন করে উঠল দীপকের। কিন্তু তার পরেই কেমন যেন একটা আতঙ্ক ওকে ছেয়ে ফেলল। একটা নিদারুণ আশঙ্কা আর অসহায়তায় ও চোখ বুজল। যেন দিনের আলোয় ও দেখতে পাচ্ছে ভয়ঙ্কর কিছু। যেন চোখ বুজে থাকলেই সেই বীভৎসতাকে এড়িয়ে যাওয়া যাবে।

বাবার কথা মনে পড়ল দীপকের। বাবা থাকলে নিজেকে এত অসহায় মনে হত না। অবশ্য শেষ দিকে উনি কেমন যেন অথর্ব হয়ে গিয়েছিলেন। তবু ছিলেন তো মাথার ওপরে ছায়ার মতো।

সেদিনটার কথা মনে আছে দীপকের। বাবা বেরিয়ে যাওয়ার ঘন্টাখানেক পরেই ওকে খবর দেওয়া হয়েছিল। মাকে নিয়ে ছুটল হাসপাতালে। পড়াতে পড়াতে হঠাৎ মাথা ঘুরে পড়ে গেছেন। সেই বয়সেও দীপকের মনে হয়েছিল যেন শুধু বাবা নয়, সংসারটাও যেন মুখ থুবড়ে পড়ে গেছে।

সাধ্যমত চিকিৎসা হল। বাবার সহকর্মীরাও কিছু কিছু সাহায্য করলেন। কিন্তু শেষরক্ষা হল না।

দীপকের পড়াশোনার সেখানেই ইতি।

ও অবশ্য ক্লাশে স্ট্যান্ড করত। মাস্টারমশাইরা চেষ্টা করেছিলেন। হেডমাস্টারমশাইও যথেষ্ট সহানুভূতি দেখিয়েছিলেন।

পড়ার সুবিধে হয়ত পাওয়া যেত। কিন্তু সংসারের জোয়াল কাঁধে নেবে কে?

ছোটবেলায় বাবা ওকে ঘুম থেকে তুলে বেড়াতে নিয়ে যেতেন। সূর্যস্তব করাতেন—ওঁ জবাকুসুম—

বলতেন—বুঝলি, সূর্যের সঙ্গে আমাদের প্রাণের সম্পর্ক। ঘুম থেকে উঠবি সূর্যোদয়ের আগেই। প্রাণশক্তি প্রার্থনা করবি। তারপর প্রাতঃভ্রমণ এবং অধ্যয়ন। অধ্যয়ন হল তপস্যা। আমাদের মুনি-ঋষিরা বলে গেছেন রে। মন্ত্রের মতো মনে করবি এসব কথা। বড় হতে হবে। মানুষ হতে হবে।

বলতেন—অমৃতস্য পুত্রাঃ—

এমনি আরও কত কি। দীপক সব কথা বুঝত না। কিন্তু ভীষণ ভাল লাগত কথাগুলো।

বাবার বন্ধু সদাশিববাবু ওদের স্কুলে পড়াতেন। উনিও দীপককে খুব ভালবাসতেন। ও যেবার ফার্স্ট হল ক্লাস নাইনে, উনি দীপককে ডেকে অনেক আশীর্বাদ করেছিলেন।

বলেছিলেন—বড়ো হও বাবা, উন্নতি করো—

ওঁর দু চোখ জলে ভরে গিয়েছিল।

দীপক মনে-মনে ঠিক করেছিল আরও ভাল করে পড়বে এবার থেকে। বড় হতে হবে। মানুষ হতে হবে। রাতে বাবা ওকে কাছে ডাকলেন। বললেন—দ্যাখো, তোমার ওপর এখন আমার অনেক আশা। একদিন আমিও স্বপ্ন দেখতাম অনেক। অনেক সাধই ছিল। কিন্তু সংসারের জন্য পারি নি। আমি চাই—

উনি আর বলতে পারেন নি।

তার কিছুদিন পরেই ওই দুর্ঘটনা। কিন্তু আকস্মিক আঘাতে ভেঙে পড়ে নি দীপক। একটা প্রেসে কাজ জুটিয়ে নিল। সামান্য মাইনে। ওভারটাইম করলে আরও কিছু। নিজেকে অনেক বোঝাল দীপক। এছাড়া করার কি ছিল। তাছাড়া ওর হাত দিয়ে কত বইপত্র ছাপা হয়ে বেরুবে। কত ছেলে-মেয়ে পড়বে সেসব।

ওরা বড় হবে। মানুষ হবে।

ঝুমা বড় হবে। ঝুমাও হবে। একদিন।

ওদের ভালো করে বিয়ে দিতে হবে। বেশ সুখের সংসারে। ব্যাস, তারপর নিশ্চিন্ত। মাকে নিয়ে একটা ভালো ঘরে—

এদিক-ওদিক তাকাল দীপক। মনটা মুহূর্তে বিষিয়ে উঠল। এখানে-ওখানে ছেঁড়া জামা-কাপড় ছড়ান। ভাঙা ট্রাঙ্ক। একটা ছাতা ঝুলে রয়েছে। একদিকে একটা আলনা করেকটা ছাপা শাড়ি আর মেয়েদের টুকিটাকি জিনিস। একটা চেয়ারে কয়েকখানা এলোমেলো বই। ঘরের একটা দিকের বেড়া হাঁ করে আছে।

ওর মনে পড়ল এবার বর্ষায় ঘরে জল পড়বে টিনের চাল থেকে।

নাঃ, এভাবে বেঁচে থাকার কোন মানে হয় না।

প্রেসে স্ট্রাইক চলছে আজ সতেরো দিন হল।

প্রথম দিন ইউনিয়নের প্রেসিডেন্ট বলছিলেন—বন্ধুগণ, আমরা ঐক্যবদ্ধ। জয় আমাদের হবেই। মানুষের দাবীকে কিছুতেই আর চাপিয়ে রাখা যাবে না। এই লড়াই বাঁচার লড়াই। এই লড়াইতে সবাইকে সামিল হতে হবে।

কি বিপুল উদ্দীপনা তখন। কি হাততালি।

অনির্দিষ্ট কালের জন্য স্ট্রাইকের কথা শুনে দীপকের বুকটা কেঁপে উঠল। যদি মালিক মেনে না নেয় দাবী? যদি মেসিন বন্ধ করে দেয় একেবারে?

কিন্তু কখন কে জানে, ও সবার সঙ্গে একাত্ম হয়ে গেছে। এক কঠিন প্রতিজ্ঞার মধ্য দিয়ে আজ এতদিন পরে এই মানুষগুলোকে ওর আত্মীয় বলে মনে হল। মনে হল এতগুলো লোক যদি এগিয়ে যেতে পারে, ও কেন ভয়ে পিছিয়ে যাবে?

প্রেসিডেন্ট আরও বললেন — আসুন, আমরা সব দ্বিধা, সব বিভেদ ভুলে আমাদের এই লড়াইতে সামিল হই।

দাঁতে দাঁত চেপে দীপক বলেছিল—হ্যাঁ, আমিও আছি। জয় আমাদের হবেই।

অথচ—
মা এসে ঢুকল।
বলল—কি রে, উঠবি না?

একবার তাকিয়েই চোখ ফিরিয়ে নিল দীপক। এ যেন মা নয়, অন্য এক মানুষ। বিবর্ণ একটা থান পরণে। শীর্ণ এক কারুণ্য।

মা ওর কপালে হাত দিল।

আর তখনই টোনার কথা মনে পড়ল দীপকের। সেই কুতকুতে দু চোখ। শক্ত চোয়াল।

দীপক আস্তে আস্তে বলল—মা, আমার না, কেন কে জানে, ভীষণ ভয় করছে।

মা হাসল। বলল—তুই কি যে ভাবিস এত? এত লোকের যা হবে, আমাদেরও তাই হবে। ওঠ, চা খেয়ে নে।

দীপক উঠে বসল। তবু বলি-বলি করে মাকে সেই কথাটা কিছুতেই বলতে পারল না। একটা অব্যক্ত যন্ত্রণা যেন বুকের মধ্যে গুমরে উঠল।

সেদিন চাকরীর খোঁজে এক জায়গায় যেতে হয়েছিল। সন্ধ্যার দিকে হেঁটে ফিরছে লেকের মধ্যে দিয়ে। হঠাৎ চোখে পড়ল দৃশ্যটা। নিজেকেই যেন বিশ্বাস করতে পারেনি ও প্রথমে।

একটা গাছের নীচে ঝুমা ঘনিষ্ঠভাবে বসে রয়েছে টোনার সঙ্গে।

মুহূর্তে আগুন হয়ে গিয়েছিল দীপক। কিন্তু সামলে নিল নিজেকে। বাড়ী ফিরে এল এক বিধ্বস্ত সৈনিকের মতো।

বিষিয়ে উঠেছিল মনটা। মনে হয়েছিল এত কষ্টে-গড়া সংসারটা যেন দুলে উঠেছে। যেন অমোঘ রন্ধ্রপথ দিয়ে পাপের বীজ আমদানি হয়েছে ঘরে।

রাতে দীপক ঝুমাকে কলতলায় ডেকে নিয়ে গেল।

বলল — আজ সন্ধ্যের সময় কোথায় গিয়েছিলি?

ঝুমা চুপ করে রইল।

চাপা গর্জন করল দীপক—ননসেন্স। লজ্জা করল না? একটা লোফারের সঙ্গে—উঃ। তুই বাবার কথা ভুলে গেছিস? ছিছি—

ঝুমা একটা কথাও বলে নি।

দীপক বলেছিল—আর যেন কখনও না হয়।

পরদিন বিকেলেই টোনা দীপককে ডেকেছিল।

কোমরে হাত রেখে বলেছিল—কি রে, খুব যে রঙ, এ্যাঁ—

গাম্ভীর্য রেখেই দীপক বলল—ভালভাবে কথা বলো। কি হয়েছে—

টোনা বলেছিল—খুব যে দিদিকে শাসন করছিস। বড় বড় বাত শুধু। এতদিন তো ঘুরলি খুব। বিয়ে দিতে পারলি? হাওড়ার ওরা পণ চেয়ে বসতেই তো ভিরমি খেলি। শালার বুলে পার্টি।

থেমে গিয়ে টোনা বলল—চল, তোকে এগিয়ে দিই।

হাঁটতে হাঁটতে দীপকের কোমরে কি যেন শক্ত কোন বস্তুর স্পর্শ লাগল। একটু চমকে উঠল ও। হা-হা করে হেসে উঠল টোনা। বলল—ভয় পেলি? ও কিছু না রে।

মুহূর্তে একটা শীতল স্রোত দীপকের মেরুদণ্ড বেয়ে নেমে এল।

টোনা খুব ঘনিষ্ঠভাবে বলল—যাকগে, শোন, শুনলাম তুই নাকি ওই শালাদের দালাল পার্টি করছিস?

দীপক গাঢ়স্বরে বলল—আমি কোন রাজনীতিই করি না।

টোনা বলেছিল—হুঁ, একটু সামলে। তারপরেই ও ফিরে গেল।

ঘৃণায় সারা শরীর বিষিয়ে গেল দীপকের। তাহলে ঝুমা প্রতিশোধ নিয়েছে। যাকগে, এই ভালো।

আর কিছু বলবে না দীপক। যার যা ইচ্ছে করুক।

এখন একমাত্র—

—দাদা, তোমার খাবার।

রুমা বাটিটা টেবিলে রাখল।

মুহূর্তে প্রসন্নতায় ছেয়ে গেল দীপকের মন। আহা, এই একটি বোন তার। ফুলের মতো নিটোল নিষ্পাপ। ক্লাস এইট-এ ফার্স্ট হয়েছে। মাইনে, বই এসব কিছু লাগে না। হেডমিস্ট্রেস একদিন দীপককে ডেকে রুমা সম্বন্ধে অনেক প্রশংসা করেছিলেন। কেয়ার নিতে বলেছিলেন একটু। দীপকের অবস্থার কথা শুনে ফ্রি করে দিলেন।

গর্বে দীপকের মন ভরে গিয়েছিল।

রুমার প্রাইজের বইগুলো আর গুড কন্ডাক্টের মেডেলটা দীপক নিজের কাছেই রাখে। আনমনে নাড়াচাড়া করে। যদি একটু উন্নতি হয় ওর চাকরীর, রুমার জন্য প্রাইভেট টিউটার রাখতে হবে। বইপত্র—

দীপক ডাকল, রুমা শোন, কাছে আয়—

—বলো। পাশে এসে দাঁড়াল রুমা।

দীপক বলল—নারে, কিছু বলব না। তোকে একটু দেখি। কি মিষ্টি হয়েছিস রে তুই। ঠিক বাবার চোখ, বাবার মুখ। শোন, তোকে একটা কথা বলি।

দীপক এবার ফিসফিস করে উঠল যেন। বলল—তুই কিন্তু দিদির মতো হবি না। রুমা, তুই আমার একটা মাত্র বোন। আমি জানি তুই আমার দুঃখ বুঝবি। বাবারও কত সাধ ছিল—

রুমা মাথা নীচু করে রইল।

দীপক বলল—যা, খা গিয়ে কিছু।

রুমা বেরিয়ে গেল। ফিরে এল একটা বই নিয়ে।

বলল—দাদা, সীমাদি এসেছিলেন। এই বইটা দিয়ে গেছেন।

নিস্পৃহভাবে দীপক বইটা নিল।

খবরের কাগজের মলাটটা খুলতেই একটা চিঠি বেরিয়ে এল। সন্ধ্যার সময় সেই গাছটার নীচে দাঁড়াতে বলেছে।

কিন্তু কোন তাগিদ অনুভব করল না দীপক।

কি হবে কে জানে? তবে কষ্ট হয়। মাঝে মাঝে বুকের ভেতরটা মোচড় দিয়ে ওঠে। এর মধ্যে দেখা করার দুটো দিন গেছে। পালিয়ে বেড়িয়েছে দীপক। মনে হয়েছে সাক্ষাৎকারের সংগ্রাম শুরু হয়েছে। এখন পিছনে সরে যাওয়া কাপুরুষতা।

কিন্তু এত কি দরকার? তবে কি ভবানীপুরের সেই সম্বন্ধটা ঠিক হয়ে গেল?

একটা দীর্ঘশ্বাস ঠেলে বেরিয়ে এল।

জামা প্যান্ট পরল দীপক।

মা শুয়ে আছে।

দীপক জিজ্ঞেস করল—ওষুধটা খেয়েছো মা?

মা বললেন—হ্যাঁ। শোন, বেশি রাত করিস না।

ও ঘরটায় উঁকি দিল দীপক। মা, রুমা নেই। থাক, মরুক গে।

ভেবেছিল রুমা পড়ছে। কিন্তু ওকেও দেখা গেল না।

সীমার সঙ্গে দেখা করতে হবে। জানাতে হবে সব কথা। পরামর্শ করতে হবে দুপুরের ব্যাপারটা নিয়ে।

এখন পর্যন্ত কাউকে বলতে পারে নি। এমনকি মাকেও না।

ছোটবাবু ওকে ডেকেছিলেন।

ও তো শুনে অবাক। কিন্তু গেল, ছোট-বাবু ডেকেছেন বলেই। ওঁর বয়স অল্প। মিষ্টি কথাবার্তা। মালিকদের মধ্যে উনিই এদের দুঃখেকষ্টে সাহায্য করেন ডেকে।

উনি বলেছেন—দীপক কয়েকদিন আগে একটা কথা জানলাম। তুমি তো আমাদের স্বর্গীয় রাজকমলবাবুর ছেলে?

দীপ সায় দিল।

উনি বললেন—দ্যাখো, কি দুঃখের কথা। এতদিন আমি জানতামই না। তিনি আমার মাস্টারমশাই। যাই হোক, এতদিন না হয় ভুলই হয়েছে। এখন বরং একটা—

দীপক চমকে উঠল।

উনি বললেন—না, তুমি যা ভাবছ, তা নয়। তোমার ওপরেই নাকি সংসার। আমি শুধু চাইছি তোমায় একটু সাহায্য করতে। বলতো পারো গুরুঋণ—

উনি কি যেন ভাবছিলেন।

বললেন—শোন, আমাদের বিহারে একটা প্রেস আছে মস্তো বড়ো। মেজভাই দেখেন, জানো নিশ্চয়। তুমি বরং সেখানে চলে যাও। আমি লিখে দিচ্ছি। এটার আশা করো না। তোমাদের দাবি মানতে গেলে আমরা দেউলে হয়ে যাবো।

স্তব্ধ হয়ে বসে রইল দীপক।

মনে পড়ল—প্রেসিডেন্টের কথা। আমরা সবাই ঐক্যবদ্ধ। এই লড়াইতে সকলে সামিল হলে জয় আমাদের হবেই। দাবি কিছুতেই—

কিন্তু বিহার কতদূর? মায়ের কথা মনে পড়ল দীপকের। চিকিৎসা হচ্ছে না। পথ্য দিতে পারছে না। আর কদিন কে জানে। রুমা খরচের খাতায় অবশ্য। কিন্তু রুমা? আহা, কি মিষ্টি, কি শান্ত। ঠিক বাবার চোখ, বাবার মুখ। ও নিশ্চয়ই বড়ো হবে। অনেক বড়ো হবে। একটু শুধু সুযোগ দেওয়া দরকার। বইপত্র, একজন প্রাই-ভেট টিউটার, কতকিছু চাই। সামনের বছর ও শাড়ি পরবে। রংবেরংয়ের শাড়ি ঝোলানো শোকেসে। ওর হঠাৎ রুমার কথা মনে পড়ে গিয়েছিল। রুমাকে বড়ো ঘরে বিয়ে দিতে হবে। বর হবে বিদ্বান হবেন। স্বচ্ছল অবস্থার কোন মাস্টারমশাই বা প্রফেসার। তাঁর ঘরেও প্রাইজের বই থাকবে, গুড কন্ডাক্টের মেডেল—

ছোটবাবু বললেন—কি ভাবছো?

দীপক হঠাৎ বলল—আমি যাবো।

উনি হাসলেন। বললেন—গুড।

খসখস করে কি যেন লিখে দিলেন একটা প্যাডের কাগজে।

তারপর উঠে দাঁড়িয়ে বললেন—আচ্ছা একটা কথা, যোগাযোগ অবশ্য ছিল না। কিন্তু তুমি কি জানতে যে আমি তোমার বাবার ছাত্র?

দীপক বলল—হ্যাঁ। কিন্তু বাবা পরিচয় দিতে বারণ করেছিলেন। বলেছিলেন যে, আপনি যদি নিজে থেকে—

ও থেমে গেল।

ওর কিন্তু মনে হচ্ছে কাজটা ভালো হল না। এভাবে পালানো ভীরুতা। একবার ভাবল, চিঠিটা ছিঁড়ে ফেলবে। কিন্তু পরমুহূর্তেই মনে হল যে আগে সীমার সঙ্গে একটা পরামর্শ করা দরকার।

বাইরে থেকে দরজাটা টেনে দিয়ে দীপক রাস্তায় নামল।

সন্ধ্যে হয়ে গেছে। সেই গাছের নীচে থাকতে হবে। এতক্ষণে নিশ্চয়ই সীমা পৌঁছে গেছে। হাল্কা একটা সুগন্ধ যেন ভেসে এল। সীমার চোখদুটো মনে পড়ল দীপকের।

এই রে—

দীপক একটা গাড়ির আড়ালে দাঁড়িয়ে পড়ল। সদাশিববাবু আসছেন।

ওঁর সামনে আজ আর দাঁড়ানো যায় না। একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল দীপক।

ও হ্যাঁ, বাধা পড়েছে ভালই হয়েছে। তাড়াহুড়োয় চিঠিটা আনতে মনে নেই।

দীপক বাড়ির দিকে ফিরল।

কলতলার ওখানে একটা ফিসফিস শব্দ ও থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল।

কে ওখানে? নিশ্চয় রুমা। সঙ্গে ছুকতো সেই মেঁটে শয়তানটা। একটা নিষ্ফল আক্রোশে ওর হাতদুটো নিশপিশ করে উঠল।

এবার কথাগুলো শোনা যাচ্ছে।

একটা পুরুষকণ্ঠ বলছে—কিন্তু রুমা, তাহলে তুমি এতদিন আমায় শুধু শুধু ঘোরালে কেন? বলো, জবাব দাও।

রুমার গলা শোনা গেল—আমার ভুল হয়েছিল। আমি আপনাকে বোঝাতে পারব না মানিকদা। আমাদের বড়ো দুঃখের সংসার। বাবা দাদা—এঁদের অনেক আশা—

থাক, আর শোনার দরকার নেই। চিঠিটা নিয়ে ও বেরিয়ে পড়ল।

আচমকা একটা গুলী যেন এসে বিঁধেছে দীপকের বুকে।

আহারে, রুমা রুমা! তুইও? কি সরল নিষ্পাপ চেহারা। বাবার চোখ, বাবার মুখ—মা। থাক। দুঃখ করে লাভ নেই।

যে যার পথ করে নিক্। কারো জন্য ভেবে লাভ নেই।

সীমাকে সব কথা জানাতে হবে। মাকে আর ওকে নিয়ে কালই বিহার চলে যাবে। নতুন করে ঘর বাঁধতে হবে। ছোট্ট একটা নিরালা সংসার। টুকিটাকি কিছু সাধ-আহ্লাদ। আবার ও পড়াশোনা করবে। সীমা কতদিন বলেছে প্রাইভেটে পরীক্ষা দিয়ে দিতে। কিন্তু এই সংসারটার জন্য হয়নি কিছু। নাঃ, আর নয় এই গোলকধাঁধায়।

বাবার কত স্বপ্ন ছিল। সূর্যের সেই প্রাণশক্তি—

—এই যে চাঁদ, তোমাকেই খুঁজছিলাম।

অন্ধকারে ছয়-সাতজন লোক ওকে ঘিরে ফেললে।

—এই শালা, শুয়োরের বাচ্চা, দুপুরে মালিকের কাছে গিয়েছিলি কেন? ভেবে-ছিলি কেউ টের পাবে না, না?

দীপকের জামার কলার টেনে ধরল একজন।

—বল শালা, কেন গেছিলি।

কলার ধরে ঝাঁকুনি দিতে লাগল লোকটা।

—শালা দালাল—

—মার শালাকে, মার, মার—

হঠাৎ লোকগুলো ক্ষেপে গেল। এলো-পাথারি ঘুঁসি আর লাথি পড়তে লাগল।

উঃ।

দীপক লুটিয়ে পড়ল। মুখ নোনতা হয়ে গেছে। ঝলকে ঝলকে রক্ত। ছিঁড়ে টুকরো টুকরো হয়ে গেছে জামা-প্যান্ট। শরীর দুমড়ে গেল যেন।

অনেকক্ষণ পরে মনে হল সব শান্ত হয়ে গেছে। রাত এখন কত? কেউ কোথাও নেই কেন? সব যে এত অন্ধকার লাগছে। পৃথিবীটা কি ঘুমিয়ে পড়েছে? নাকি মরে গেল?

বাবা বলতেন—সূর্যের সঙ্গে প্রাণের সম্পর্ক। হ্যাঁ, প্রাণ। শুধু বাঁচা নয়। বড়ো হতে হবে। মানুষ হতে হবে। অমৃতস্য পুত্রাঃ—

ওই সুন্দর মুখটা কার? আহারে, কি সরল, কি নিষ্পাপ। কে, রুমা? এঃ, তুই তোর প্রাইজের বই, গুড কন্ডাক্টের মেডেল—

না না, তুইও আমার বোন না। তুই কেউ না আমার। আমার কোনো বোন নেই। তুই কাঁদছিস? কিন্তু, শোন্, কাঁদিস না। তুই যদি মানিককে সত্যিই ভালবাসিস, কি আর করবি। আমার জন্য শুধুশুধু কষ্ট পাবি কেন? তোমাকে কি আমি কষ্ট দিয়েছি। দিই নি তো।

এই তো সীমা। সীমা, তুমি এসেছো? আমি তো তোমার কাছেই যাচ্ছিলাম। জানো বিহারেও একটা প্রেস আছে—আমার পকেটে চিঠি—এটা দেখালেই—বিশ্বাস হচ্ছে না? তোমায় ছুঁয়ে বলছি, বিশ্বাস করো। আমি আবার পরীক্ষা দেবো, বাবা বলতেন ছাত্রানাং অধ্যয়নং তপঃ। মুনি-ঋষিরা—

ওঃ, মা, মাগো। কি রোগা হয়ে গেছ তুমি। ময়লা একটা থান পড়েছ কেন মা? তোমার আর শাড়ি কই? সেই যে ছোটবেলা আমায় নিয়ে পরেশনাথের মন্দিরে গেছিলে—ঝিকমিক করছিল মন্দিরটা। ঢং-ঢং করে বাজছিল ঘণ্টা—আরতি হচ্ছিল। আর তখন, তখন তোমাকে প্রতিমা বলে মনে হচ্ছিল—ঠিক যেন—

আ, কি ঘুম পাচ্ছে। কি ঘুম। সব অন্ধকার হয়ে যাচ্ছে। একটা সমুদ্র, নীল একটা আকাশ—একটা গাড়ি এসে তখন ওর পাশে থামলে।

পলিও ও পিতামাতার কর্তব্য

মৃণালকান্তি দত্ত

সাধারণের কাছে পরিচিত 'পলিও' সকল রকম শিশুদের জীবনেই একটা সাংঘাতিক রোগ হোয়ে আসতে পারে নানা কারণে। এদের মধ্যে প্রধান কারণ হচ্ছে মাত্র দুটি। প্রথমোক্ত কারণে শিশুরা কোন অঙ্গে বা অঙ্গবিশেষে পক্ষাঘাতগ্রস্ত হয় এবং সারাজীবন এইভাবে কাটাতে থাকে। শেষোক্ত কারণে শিশুদেহকেই এই রোগ আশ্রয় করে বেশি। সাধারণতঃ খাদ্য, বিশেষ করে ঠাণ্ডা খাদ্য ও পানীয়ের মাধ্যমে এই রোগ সংক্রামিত হয়। এই সংক্রমণ শ্বাস-প্রশ্বাস, থুথু এবং অন্যান্য প্রত্যক্ষ মাধ্যম সহযোগেও হোতে পারে।

পলিও কি?

* এই রোগটা বাচ্চাদের ছেলেবেলা থেকেই পঙ্গু করে দেয়—যাকে বলে বাল্য পক্ষাঘাত। যদিও সামান্য কিছু দৃষ্টান্ত বয়স্কদের মধ্যেও দেখা গিয়েছে।
* হাত, পা বা অন্যান্য স্বয়ংক্রিয় পেশী-গুলিই হয় এই রোগের শিকার।
* সাধারণতঃ ছয় থেকে বার বছরের মধ্যে ছেলেমেয়েরাই এই রোগের আক্রমণে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়। তবে এক থেকে তিন-চার বছরের মধ্যে যখন নাকি শিশুদের পেশীচালনা শুরু হয়, তখনই এই রোগের দ্বারা আক্রান্ত হওয়ার বেশি সম্ভাবনা।
* পলিও আক্রান্ত রোগীদের মধ্যে শতকরা ৯৯ ভাগই অঙ্গপ্রত্যঙ্গজনিত অসাড়তায় ভোগে। তবে দেহের অন্যান্য অংশেও এই অসাড়তা দেখা দিতে পারে—যেমন মস্তিষ্ক ইত্যাদি। তবে সেরকম দৃষ্টান্ত খুবই যৎসামান্য।
* পলিও জীবাণুসংক্রান্ত একটি রোগ। এর জীবাণুগুলি মেরুদণ্ডে কোষের ঝিল্লীতে সাধারণতঃ জমা হবার স্থান করে নেয়। পক্ষাঘাত আরম্ভ হবার আগে রোগের প্রাথমিক স্তরে এই রোগ নির্ণয় অত্যন্ত দুরূহ। এর জন্য সম্পূর্ণ পৃথক এবং অতিশক্তিশালী অনুবীক্ষণ যন্ত্র, মাধ্যম এবং বিশেষ পদ্ধতির প্রয়োজন।

রোগের প্রাথমিক লক্ষণ :

* পলিও রোগ আরম্ভ হয় ইনফ্লুয়েঞ্জার মত অত্যন্ত সাধারণ অসুস্থতা নিয়ে। সুতরাং প্রথমেই এই রোগকে পলিও বলা অত্যন্ত কঠিন। এক হাজার ইনফ্লুয়েঞ্জা আক্রান্ত রোগের মধ্যে মাত্র পাঁচটি পলিও হিসাবে নির্ণীত হতে পারে।
* এই রোগের প্রারম্ভে ২।৩ দিন ধরে অত্যন্ত অল্প বা বেশি জ্বর হয়, সঙ্গে গায়ের ব্যথা এবং মাথার যন্ত্রণা ইত্যাদি থাকে। এর পর ঐ যন্ত্রণা শরীরের কোন নির্দিষ্ট অংশে কেন্দ্রীভূত হয়।
* ইনফ্লুয়েঞ্জায় সারা শরীরে একটা অস্পষ্ট ব্যথা হয়। কিন্তু পলিও রোগে ঐ অস্পষ্ট ব্যথা দেহের কোন নির্দিষ্ট অংশে হতে থাকে।
* তারপরেই আরম্ভ হয় অঙ্গে অসাড়তা অর্থাৎ অঙ্গ বা পেশী-শৈথিল্য শুরু হোয়ে যায়। ক্ষতিগ্রস্ত বা আক্রান্ত দেহাংশের প্রতিরোধ ক্ষমতা লোপ পায়।
* এই রোগের প্রারম্ভে অবশ্য অধিকাংশ পেশীর অসাড়তা অনুভূত হয়। শেষ-পর্যন্ত ২।৩ দিন পরে ঐ অসাড়তা কিছু নির্দিষ্ট পেশীতে এসে সীমাবদ্ধ হয় এবং ঐখানেই স্থায়ী হয়।

যত্ন :

পলিও রোগে আক্রান্ত রোগীর প্রাথমিক অবস্থায় নিম্নোক্ত জিনিসগুলো খুব ভালো করে অনুধাবন করা দরকার:—

(১) শক্ত বিছানায় একেবারে বিশ্রাম
(২) কোনরকম নড়াচড়া করা নিষেধ
(৩) কোনরকম মেসেজ একেবারে বন্ধ
(৪) কোন ইনজেক্‌সন দেওয়া চলবে না
(৫) কেবলমাত্র গরম সেক দেওয়া যেতে পারে

বহরমপুর হাসপাতালে একটি শিশুকে চামচে করে পোলিও ভ্যাকসিন খাওয়ানো হচ্ছে।

খাদ্য ঃ

এই রোগে আক্রান্ত রোগীকে ভাল এবং টাটকা প্রোটিনযুক্ত খাদ্যই খাওয়ান উচিত।

চিকিৎসা ঃ

দুই সপ্তাহ পরে পেশীর যা-কিছু চিকিৎসা আরম্ভ হওয়া উচিত। স্বাস্থ্যকর এবং আদর্শ বাসস্থান ও খাদ্য প্রত্যেক শিশুর পক্ষেই অত্যন্ত প্রয়োজন।

পলিও ভ্যাকসিন ঃ

* আজকাল পলিও ইনজেকসনের বদলে পাশ্চাত্য থেকে আমদানি 'ওরাল ভ্যাকসিন' (তরল) বেশী ব্যবহৃত হচ্ছে।
* পলিও ভ্যাকসিন-এর পরীক্ষা-নিরীক্ষার স্তর পনের বছরেরও বেশী শেষ হয়েছে।
* এই 'ওরাল ভ্যাকসিন' খুবই কার্যকরী এবং প্রত্যেক শিশুকে অবশ্যই দেওয়া উচিত।
* এই পলিও ভ্যাকসিন খুব সূক্ষ্মভাবে পরিমাপ মত ডোজে তৈরী। এর তিনটি ডোজ বাচ্চাদের দেওয়া উচিত।
* শিশু যখন সাধারণতঃ সুস্থ থাকে অর্থাৎ জ্বর, ডাইরিয়া, সর্দি, ইনফ্লুয়েঞ্জা —এই রকম কোন রোগে না ভোগে, তখনই এই ভ্যাকসিন দিয়ে দেওয়া উচিত।

ভ্যাকসিনের প্রকৃষ্ট সময় ঃ

* 'ভ্যাকসিনেশন'-এর প্রথম ডোজ শিশুর ৫ মাস বয়সের সময় দেওয়া উচিত। তারপর দুই ডোজ প্রত্যেকটি ৪ থেকে ৬ সপ্তাহের ব্যবধানে দিলেই হয়।
* পলিও ভ্যাকসিন-এর ফল খুব সুদূর-প্রসারী। তবুও ২।৩ বছরের সময় অতিরিক্ত ডোজও দেওয়া যেতে পারে বেশী সাবধানতার জন্যে।

আরও কিছু জ্ঞাতব্য বিষয় ঃ

— ভারতে বেশির ভাগ পলিও রোগে আক্রান্ত হয় শিশুর বয়স যখন ১২ বছরের মধ্যে এবং এ-সংখ্যা বেড়েই চলেছে। অবশ্য যদিও এটা পাশ্চাত্যের মত তত তীব্র নয়।

— আমাদের দেশের বেশির ভাগ শিশুর জন্যে প্রচুর ভ্যাকসিন আমাদের থাকে না।

— রোগ নির্ণয়ের ভুলের জন্যে এবং যথা-যথ চিকিৎসার অভাবে আমাদের দেশে বহু শিশু পলিওতে ভোগে।

— সঠিক চিকিৎসা যদি সঠিক সময়ে করা যায়, তবে পলিও থেকে রোগমুক্তি নিশ্চিত।

— পিতামাতা যদি শিশুর জন্মমুহূর্ত থেকে সতর্ক সজাগ দৃষ্টি রাখেন, তাহলে পলিও আক্রমণ থেকে শিশুকে সম্পূর্ণ দূরে রাখা সম্ভব।

প্রদর্শনী

পশ্চিমবঙ্গ নৃত্য, নাট্য, সঙ্গীত ও চারুশিল্প আকাদেমির বার্ষিক শিল্প প্রদর্শনী রবীন্দ্রভারতীর প্রদর্শনী গৃহে গত ১ থেকে ১৮ সেপ্টেম্বর অনুষ্ঠিত হয়। পঞ্চাশখানি চিত্র ও ভাস্কর্যের নিদর্শনের মধ্যে কলকাতার খ্যাতনামা শিল্পীদের অল্প কাজই উপস্থিত ছিল। শিল্প বিদ্যালয়ের ছাত্রদের বার্ষিক প্রদর্শনীর কাজও কিছু কিছু এখানে উপস্থিত করা হয়েছিল। পুরস্কারপ্রাপ্ত শিল্পকর্মগুলির উৎকর্ষ সম্পর্কে বিতর্কের অবকাশ আছে। পেন্টিং-এর দিক দিয়ে উল্লেখযোগ্য কাজের নিদর্শন অতি সামান্য। নির্বাচন কমিটির কাজ আরো প্রশংসনীয় হতে পারত। অমরেন্দুলাল চৌধুরীর 'লাভার' ড্রয়িংটি মন্দ নয়। অমিতাভ ব্যানার্জির সিটিং ফিগার একটু বেশী ডেকরেটিভ লাগল। গণেশ পাইনের 'ফল' একটু গুরুভার বিষয়বস্তু নিয়ে আঁকা। তবে পতনোন্মুখ আকৃতিটি পড়ছে না উঠছে তা নিশ্চয় করে বলা যায় না। কার্তিক সিংহের অ্যাবস্ট্রাক্ট ছবি সী স্কেপ কালো জমির ওপর শাদা অংশ যেন চিচিংফাঁক হয়ে দেখা দিয়েছে। সমর ভৌমিকের ইনভোকিং দি হোলি স্পিরিট ভারতীয়ত্বের ছাপ বহন করছে। গ্র্যাফিক বিভাগে শ্যামল দত্তরায়, লালু শা ও শৈলেন মিত্র কয়েকটি অপেক্ষাকৃত পরিচ্ছন্ন অ্যাবস্ট্রাকশন উপস্থিত করেছেন।

ভাস্কর্য বিভাগেও উল্লেখযোগ্য কাজের মধ্যে মাণিক তালুকদারের টর্সো এবং বাড ও সরল ঘোষের শরণার্থীর নাম করা যায়।

নির্মলকুমার দত্ত ম্যাক্সমুলার ভবনে ৯ থেকে ১২ সেপ্টেম্বর তাঁর টাইপরাইটারে আঁকা বিখ্যাত ব্যক্তিদের প্রতিকৃতির একটি সুন্দর প্রদর্শনী করলেন। মা সারদামণি, বিপিন পাল, রাধাকৃষ্ণণ, গ্যাগারিন, ম্যাক্সিম গর্কি, রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী, জওহরলাল প্রমুখ কয়েকজনের প্রতিকৃতি উল্লেখযোগ্য কাজ হয়েছিল।

●

১৪ থেকে ২০ সেপ্টেম্বর অ্যাকাডেমি অব ফাইন আর্টসে বাংলাদেশের বিয়োগান্ত ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে শিল্পী সুবল পাল কুড়িখানি শাদা কালো এবং পেন্সিল স্কেচের প্রদর্শনী করলেন। ছবিগুলি ফিগারেটিভ ও প্রতীকধর্মী। পাক সৈন্যদের গোপন আক্রমণ থেকে শুরু করে তাদের বীভৎস হত্যালীলা, শরণার্থীদের পলায়ন ও দুর্দশা এবং বাংলাদেশের শৃংখলমুক্তির অভিযান তাঁর স্কেচগুলির বিষয়বস্তু। শরণার্থী সিরিজের কয়েকটি ছবি বক্তব্যকে পরিষ্কারভাবে উপস্থিত করতে সমর্থ হয়েছে। পলায়নপর পিতা ও খেলনা নিয়ে মত্ত শিশুর ছবিটি মর্মস্পর্শী।

●

বিড়লা অ্যাকাডেমিতে বাংলাদেশ সহায়ক শিল্পী সাহিত্যিক বুদ্ধিজীবী সমিতি ১৪ থেকে ২৬ সেপ্টেম্বর এপার বাংলার শিল্পীদের চিত্র ও ভাস্কর্যের এক বিরাট প্রদর্শনী করলেন। পঞ্চাশখানির অধিক শিল্পকর্মের এই প্রদর্শনীতে বাংলা-দেশের দুর্ঘটনার ভিত্তিতে অনেক বৃহদায়তন ও বর্ণাঢ্য ছবির সাক্ষাৎ মিলেছিল। বিপ্লবের শুরু, ধ্বংসের শিকার, স্বাধীনতার লড়াই ইত্যাদি বিষয় নিয়ে শিল্পীদের চিন্তাধারার বিকাশ প্রদর্শনীতে দেখা গেল। বেশীর ভাগই অ্যাবস্ট্র্যাকশন ঘেঁষা বা আধা ফিগারেটিভ কাজ। প্রচুর করণ কৌশলের সাক্ষাৎ এখানে মিলল। কোন একটি রাজনৈতিক গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা এবং মানবিক ট্র্যাজেডি কলকাতার আধুনিক শিল্পীদের মনে কিভাবে প্রতিফলিত হয়েছে তার নিদর্শন হিসেবে এটি বেশ তথ্যপূর্ণ প্রদর্শনী। প্রকৃতপক্ষে ওপার বাংলা ও এপার বাংলার শিল্পীদের এই প্রদর্শনী দুটি যদি কোন সংগ্রহশালায় রেখে দেওয়া যায় ত ভবিষ্যতের দর্শকবৃন্দ এর থেকে অনেক ইণ্টারেস্টিং বিষয় অনুভব করতে পারবেন এবং সেদিক থেকে বুদ্ধিজীবীদের আয়োজিত এই প্রদর্শনী দুটি বিশেষ মূল্যবান। সমকালীনের চোখে এর সম্পূর্ণ তাৎপর্য উদ্ঘাটিত হওয়া সম্ভব নাও হতে পারে। তবে একটা কথা মনে হয়েছিল যে এই শিল্পকর্মগুলি দর্শনের পর রাগ দুঃখ

যা সমবেদনা ইত্যাদি বিশেষ তীব্রভাবে অনুভব করা যায়নি।

●

নেপালে প্রবাসী শিল্পী, বি, আর গড়ের অ্যাকাডেমি অব ফাইন আর্টসে ২১ থেকে ২৭ সেপ্টেম্বর নেপালের নাগরিক ও প্রাকৃতিক দৃশ্যের আটাশখান ছবির একটি প্রদর্শনী করেন। খাড়াই এবং আড়াআড়ি কম্পোজিশনের ছবিগুলির ফ্ল্যাট ট্রিটমেণ্ট উজ্জ্বলবর্ণ ছবিগুলির বিশেষ আকর্ষণ। অবশ্য এই ধরনের কাজে মাঝে মাঝে পোস্টারের এফেক্ট এসে যায়। কিন্তু তা সত্ত্বেও অনেক ছবির স্পেস সৃষ্টি এবং বিশেষ বিশেষ মুড সৃষ্টি খুবই প্রশংসনীয়। ক্যানভাসের জ্যামিতিক ও আর্কিটেকচারাল বিভাজন বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই সাফল্য লাভ করেছে। কখনো কখনো সরল কিউবিস্ট ঘেঁষা কাজ ছবিতে একটা বিশেষ দৃঢ়তা আনতে পেরেছে। আর ভিলেজ, চিতওয়ান, কাঠমাণ্ডুর মন্দির তামাঙ্গ গ্রাম ও পার্বত্য দৃশ্য, পাটানের স্তব্ধতা, হনুমানধোকা ইত্যাদি ছবিগুলিতে তাঁর কাজের বৈচিত্র্যের পরিচয় পাওয়া যায়।

●

১৫ সেপ্টেম্বর থেকে ৩ অকটোবর পর্যন্ত ইণ্ডিয়ান মিউজিয়ামে অবনীন্দ্রনাথ গগনেন্দ্রনাথ ও রবীন্দ্রনাথের প্রায় পঁচিশ-খানির মত ছবির একটি প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হল। অবনীন্দ্রনাথের গোড়ার দিকের কাজের বিখ্যাত নিদর্শনের মধ্যে অভিসারিকা, সিদ্ধগণ, দেওয়ালী, রুক্মিণীর পত্র, ওমর খৈয়াম ইত্যাদি ছবিগুলি এবং শাজাহানের তাজ নির্মাণের স্বপ্ন ছবিখানি প্রদর্শিত হয়। শেষোক্ত ছবিটি তাঁর ওয়াশ টেকনিকের একটি উৎকৃষ্ট নিদর্শন। গগনেন্দ্রনাথের ছবির মধ্যে তাঁর কুরুক্ষেত্রের পর সহস্র বিধবা, কিউবিস্টিক ভঙ্গীর রহস্যপুরী এবং রাজনৈতিক ও সামাজিক তিনখানি ব্যঙ্গচিত্র এবং রবীন্দ্রনাথের আঁকা নিজের ও অন্য কয়েকটি মুখমণ্ডল উপস্থিত করা হয়েছিল। ছবিগুলি সুন্দরভাবে বাঁধান কিন্তু প্রদর্শনের ব্যবস্থার দোষে ছবির ভেতর আলোর প্রতিফলন হওয়ায় দেখতে যথেষ্ট অসুবিধা হয়েছিল।

ইণ্ডিয়ান অরিগ্যামিস্ট-এর পক্ষ থেকে দুর্গা পূজায় পাঁচ দিন গোপীমোহন দত্ত লেনে কাগজ ভাঁজ করা মডেলের যে প্রদর্শনীটি হয়ে গেল, তার একটি মডেল—ব্যাঙ ও ব্যাঙের ছাতা। প্রদর্শনীটি শিল্পরসিকদের কাছে অকুণ্ঠ অভিনন্দন লাভ করে।

●

২৩ থেকে ২৭ সেপ্টেম্বর ইউ এস, আই এস অডিটোরিয়ামে শ্যামল দত্তরায়, অমিতাভ ব্যানার্জি ও মৈত্রেয়ী ব্যানার্জির একটি যৌথ চিত্রপ্রদর্শনী হয়ে গেল। প্রদর্শনীটি পরে ১৭ থেকে ২৩ অকটোবর দিল্লীতে প্রদর্শিত হবে। তিনজনের কাজেই অ্যাবস্ট্র্যাকশন ও ফিগারেটিভ ঘেঁষা কাজ দেখা গেল। মৈত্রেয়ী ব্যানার্জির রং ও কম্পোজিশনের মধ্যে ফ্ল্যাট ভাবটাই প্রধান। রঙের টোনাল এফেক্ট আনবার চেষ্টাও তিনি করেন নি। কোথাও কোথাও আর্কিটেকচারাল গঠনের দিকে ঝোঁক দিয়েছেন। অমিতাভ ব্যানার্জি ও শ্যামল দত্তরায়ের ডেকরেটিভ ডিজাইন খুব কাছাকাছি এসে গিয়েছে অবশ্য উভয়ের প্যালেট আলাদা। শ্যামল দত্তরায়ের ডিপার্চার, প্রমিথিউস বাউণ্ড ও রিভীলিং সেলফ এবং অমিতাভ ব্যানার্জির নিউ বরন, রিদম অব লাইফ ও আদিউ উল্লেখযোগ্য ছবি। সমগ্র প্রদর্শনীর সজ্জা প্রশংসনীয়।

"ইণ্ডিয়ান অরিগ্যামিস্ট" সংস্থার উদ্যোগে বাগবাজারের গোপীমোহন দত্ত লেনে পূজার সময় কাগজ ভাঁজ করা মডেলের একটি সুন্দর প্রদর্শনী হয়েছিল। অনেকগুলি কাজ ছোট ছেলেদের ছড়ার ভিত্তিতে গঠিত হয়। জাপানী প্রথায় কাগজ ভাঁজ করে নানারকম জীবজন্তু পশুপাখি ইত্যাদি গড়ার কাজে ৮ থেকে ১৬ বছরের ছেলেরা বিশেষ দক্ষতার পরিচয় দিয়েছে। দেবাশীষ বন্দ্যোপাধ্যায়, অমিতাভ চট্টোপাধ্যায়, নীহার চট্টোপাধ্যায় ও সুস্মিতা গুহ বেশ সুবেশ কয়েকটি কাজ উপস্থিত করেন।

—চিত্ররসিক

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের ইতিহাস

বিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায়

তৃতীয় পর্ব

দ্বিতীয় অধ্যায়

ভূমধ্যসাগরীয় রণনীতিতে তিন ডিক্টেটর ফ্রাঙ্কো, হিটলার ও মুসোলিনীর কাহিনী

আফ্রিকায় প্রচণ্ড মার খাইয়া মুসোলিনীর রোমক সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন একেবারে চুরমার হইয়া গেল এবং হতাশায় ও অপমানে তিনি অবসন্ন হইলেন। কিন্তু হিটলার তাঁকে এবং অক্ষশক্তির মর্যাদাকে পুনরুদ্ধারের জন্য জেনারেল রোমেলকে পাঠাইয়াছিলেন আফ্রিকার রণক্ষেত্রে। সেকথা আগেই উল্লেখ করা হইয়াছে। রোমেলের এই ঐতিহাসিক ভূমিকা পরে বিস্তৃতরূপে আলোচিত হইবে। কিন্তু ভূমধ্যসাগরীয় রণনীতি সম্পর্কে ফ্রাঙ্কো এবং হিটলার এই দুই ডিক্টেটরের নাটকীয় কাহিনী কম চিত্তাকর্ষক নয়। এখানে সেই কাহিনী উল্লেখ করা যাইতেছে।

পশ্চিম রণাঙ্গনে পরাজয়ের পর উইনস্টোন চার্চিল বৃটেন ও বৃটিশ সাম্রাজ্যের নিরাপত্তা নিয়া স্বভাবতঃই অত্যন্ত উদ্বিগ্ন ছিলেন। দক্ষ সামরিক নেতা হিসাবে তিনি জানিতেন যে, কেবল ইংলিশ চ্যানেল নয়, ভূমধ্যসাগর নিয়াও টান পড়িবে এবং সেই ক্ষেত্রে স্পেন ও জেনারেল ফ্রাঙ্কোর ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হইবে। কারণ, পশ্চিম দিক থেকে ভূমধ্যসাগরে প্রবেশের চাবিকাঠি জিব্রাল্টারে এবং সেই জিব্রাল্টার স্পেনের ভৌগোলিক আওতায়—যদিও জিব্রাল্টার দুর্গ বৃটেনের অধিকারে ও নিয়ন্ত্রণের মধ্যে। কিন্তু চার্চিল জানিতেন যে, স্পেনের সিভিল ওয়ারে বা গৃহযুদ্ধে হিটলার ও মুসোলিনী যেভাবে সাহায্য দিয়াছেন এবং যার ফলে ফ্রাঙ্কো স্পেনের রাষ্ট্রক্ষমতা দখল করিতে পারিয়াছেন, সেই 'কৃতজ্ঞতা' দ্বারা ফ্রাঙ্কো হয়তো হিটলার-মুসোলিনীর দলে ভিড়িয়া পড়িতে পারেন এবং জিব্রাল্টার দুর্গ ও প্রণালী ফ্যাসিস্ট শক্তিবর্গের দখলে চলিয়া যাইতে পারে! এজন্য বৃটিশ সরকারের দুর্ভাবনার অন্ত ছিল না। এই পরিণতি ঠেকাইবার জন্য এবং স্পেনের নিরপেক্ষতা [illegible] মৌখিক-[illegible] রাখিবার জন্য চার্চিল তাঁর একজন প্রাক্তন সহকর্মী ও দক্ষ কূটনীতিবিদ—স্যার স্যামুয়েল হোরকে মাদ্রিদে পাঠাইলেন বৃটেনের নূতন রাষ্ট্রদূতরূপে এবং পাঁচ বছর ধরিয়া এই দায়িত্ব তিনি অত্যন্ত কৃতিত্বের সঙ্গে পালন করিয়াছিলেন—অন্ততঃ চার্চিলের এই অভিমত।

এদিকে হিটলার ও জার্মান নৌবিভাগকে কেন্দ্র করিয়া ভূমধ্যসাগরীয় রণনীতি যেন এক নূতন চমকের অপেক্ষায় ছিল। কারণ, পশ্চিম রণাঙ্গনে জয়লাভের পর হিটলার বুঝিয়া উঠিতে পারিতেছিলেন না তিনি কোন্ দিকে যাইবেন—বৃটেনের দিকে, না রাশিয়ার দিকে। এই সময় জার্মান নৌবহরের গ্র্যান্ড এডমিরাল ও জার্মান নৌবাহিনীর প্রধান সেনাপতি (১৯৩৫-৪৩ সাল) এরিক রেইডার হিটলারের নিকট এক বিকল্প প্রস্তাব উত্থাপন করিলেন। তিনি হিটলারকে ভূমধ্যসাগর, উত্তর আফ্রিকার সন্নিহিত অঞ্চল এবং মধ্যপ্রাচ্যের গুরুত্ব বুঝাইবার জন্য চেষ্টা করিলেন। তিনি বলিলেন যে, ইম্পিরিয়েল বৃটেনের সবচেয়ে দুর্বল স্থান এখানে এবং এখানে আঘাত হানিলে বৃটেন কাবু হইবেই! ৬ই এবং ২৬শে সেপ্টেম্বর, ১৯৪০, হিটলারের সঙ্গে দুই দিনের বৈঠকে এডমিরাল রেইডার রণনৈতিক ছাড়াও অর্থনৈতিক যুক্তি খাড়া করিলেন এবং এই বিরাট অঞ্চলের প্রভূত কাঁচামালের (পেট্রোলসহ) সম্পদের প্রতি হিটলারের দৃষ্টি আকর্ষণ করিলেন—যুদ্ধের মধ্যে জার্মানীর পক্ষে এই কাঁচামাল যে অত্যন্ত মূল্যবান ছিল, তা বলা বাহুল্য মাত্র। তা ছাড়া রেইডার আর একটি তথ্যের উপরেও জোর দিলেন—অতলান্তিক মহাসমুদ্রের পর্তুগীজ ও স্প্যানিশ দ্বীপপুঞ্জ হইয়া বৃটিশ, এমন কি মার্কিন নৌবহরও ফরাসী পশ্চিম আফ্রিকায় অবতরণ ঘটাইতে পারে। এজন্য রেইডার কয়েকটি 'বাস্তব প্রস্তাব' উপস্থিত করিলেন। তিনি বলিলেন যে, জিব্রাল্টার ও ক্যানারি দ্বীপপুঞ্জ দখলে আনিতে হইবে এবং ভিসি ফ্রান্সের বা মার্শাল পেতাঁর সরকারের সহযোগিতায় ফরাসী উত্তর-পশ্চিম আফ্রিকার রক্ষা ব্যবস্থা আরও দৃঢ় ও শক্তিশালী করিতে হইবে। সেই সঙ্গে ইতালীর সহযোগিতায় জার্মানীর উচিত হইবে সুয়েজ বা মিশরের বিরুদ্ধে একটি প্রকাণ্ড অভিযানে অবতীর্ণ হওয়া এবং সেখান থেকে প্যালেস্টাইন ও সিরিয়ার মধ্য দিয়া উত্তর দিকে অগ্রসর হইতে হইবে তুরস্ক পর্যন্ত।

বলা বাহুল্য যে, যুদ্ধের সময় ভবিষ্যতের পক্ষেই এটি ছিল একটি স্বতন্ত্র রণ পরিকল্পনা এবং রেইডার হিটলারকে স্পষ্টই বলিলেন যে, যদি তাঁর এই পরিকল্পনা গৃহীত এবং সাফল্যের সঙ্গে অনুসৃত হয়, তবে, সোভিয়েত রাশিয়ার বিরুদ্ধে অভিযানের বোধহয় আর দরকার হইবে না। অর্থাৎ এই রণ-পরিকল্পনায় বৃটেনকেই জার্মানীর আসল শত্রু বলিয়া গ্রহণ করিতে হইবে—জার্মান নৌবিভাগের পক্ষে অবশ্য এই চিন্তা অস্বাভাবিক ছিল না। এই পরিকল্পনার বাস্তব রূপায়ণে ইতালী ও স্পেনের সহিত জার্মানীর মিত্রতার পূর্ণ ব্যবহার করা হইত এবং সোভিয়েত রাশিয়া জয় করার চেয়ে জার্মান সমরশক্তির পক্ষে এই পরিকল্পিত জয় অনেক বেশী সহজসাধ্য বলিয়া প্রতিভাত ছিল। এমন কি রাইখ-মার্শাল গোয়েরিং যাঁর সঙ্গে এডমিরাল রেইডারের মোটেই সদ্ভাব ছিল না, এমন কি রেইডারকে যিনি দুচোখে দেখিতে পারিতেন না, সেই গোয়েরিং পর্যন্ত এই বিকল্প পরিকল্পনা অত্যন্ত দৃঢ়তার সঙ্গে সমর্থন করিলেন। (১)

যদি সমুদ্র ও নৌশক্তির কার্যকারিতা সম্পর্কে হিটলারের সম্যক উপলব্ধি থাকিত, তবে হয়তো রেইডারের এই বিকল্প প্রস্তাবের গুরুত্ব তিনি অনুধাবন করিতে পারিতেন। কিন্তু নৌশক্তি সম্পর্কে হিটলারের তেমন উৎসাহ ছিল না, তবু রেইডারের পরামর্শে তিনি কান দিলেন, এমন কি মন দিলেন এবং মোটামুটিভাবে তাঁর সঙ্গে একমতও হইলেন। এমন কি, মুসোলিনী এবং সম্ভব হইলে ফ্রাঙ্কোর সঙ্গে আলোচনা করিতেও রাজী হইলেন। তিনি কেবল মৌখিক সম্মতিই জানাইলেন না, ১৯৪০ সালের শেষ চার মাস পশ্চিম ভূমধ্যসাগরের রণ-পরিকল্পনা লইয়া দস্তুরমত অনেক মাথা ঘামাইলেন। রেইডার প্রথমে মনে করিলেন যে, হিটলারকে বুঝি তিনি দলে টানিতে পারিয়াছেন, কিন্তু পরে তিনি বুঝিতে পারিলেন যে, তাঁর এই ধারণা ভুল। কারণ, সেপ্টেম্বর মাসের এই সমস্ত আলোচনা হইতেই বুঝা গেল যে, হিটলার সোভিয়েত রাশিয়া আক্রমণের জন্য ইতিমধ্যেই তাঁর মন স্থির করিয়া ফেলিয়াছেন এবং ভূমধ্যসাগরীয় রণনীতি সম্পর্কে জার্মান নেভাল স্টাফ বা নৌসেনানীমণ্ডলী যে দৃষ্টিকোণ থেকে চিন্তা করিতেছেন,

---

(1) Hitler—Allan Bullock Pelican, 1963, P. 600

হিটলারের চিন্তা ছিল তার থেকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র।

ভূমধ্যসাগর ও আফ্রিকার রণাঙ্গন সম্পর্কে হিটলারের উদ্দেশ্য ছিল দুরকমের। প্রথমতঃ ভূমধ্যসাগরে বৃটিশ জাহাজের যাতায়াত বন্ধকরণের দ্বারা বৃটেনকে আরও বিব্রত করা এবং জার্মানীর সঙ্গে আপোষ রফায় আসার জন্য বৃটেনের উপর আরও চাপ সৃষ্টি করা। অর্থাৎ বৃটেনের বিরুদ্ধে বোমারু অভিযান ও আক্রমণের ভয় দেখাইয়া জার্মানী যে উদ্দেশ্য সিদ্ধ করিতে চাহিতেছিল, প্রস্তাবিত ভূমধ্যসাগরীয় রণক্রিয়ার দ্বারাও হিটলার অনুরূপ লক্ষ্যই পূরণ করিতে চাহিলেন। তথাপি পূর্বদিকের সঙ্কল্পিত অভিযান ত্যাগ করিয়া তিনি নিশ্চয়ই দক্ষিণ দিকে ঝাঁপাইয়া পড়িতে রাজী ছিলেন না।

হিটলারের দ্বিতীয় উদ্দেশ্য ছিল নিতান্তই প্রতিরক্ষামূলক -- প্রতিপক্ষের সম্ভাব্য আক্রমণের বিরুদ্ধে উত্তর-পশ্চিম আফ্রিকা ও অতলান্তিকের দ্বীপগুলি, যেমন—কেপ ভার্দে দ্বীপপুঞ্জ, এজোর্স, ক্যানারিস ও ম্যাডেইরা দ্বীপসমূহকে রক্ষা করা। কারণ, ইউরোপকে "পিছনের দরজা" দিয়া আক্রমণ করার উদ্দেশ্যে অতলান্তিকের এই সমস্ত দ্বীপ অবলম্বন করিয়া ইঙ্গ-মার্কিন পক্ষ পশ্চিম আফ্রিকায় কিম্বা উত্তর আফ্রিকার অবতরণ করিতে পারে এবং এভাবে পশ্চিম ইউরোপের সুরক্ষিত উপকূল তারা এড়াইয়া যাইতে পারে। হিটলারের এই অনুমান অবশ্য মিথ্যা ছিল না, কারণ, দুই বছর পর ওটা হাতেকলমে ঘটিয়াছিল। কিন্তু হিটলার এই আলোচ্য রণাঙ্গনের দায়িত্ব কখনও নিজের স্কন্ধে গ্রহণ করিতে রাজী ছিলেন না। তাঁর আগাগোড়াই ইচ্ছা ছিল পশ্চিম ভূমধ্যসাগরের সম্পূর্ণ দায়িত্ব ফ্রাঙ্কোর স্পেনের ঘাড়ে চাপাইয়া দেওয়ার জন্য, উত্তর-পশ্চিম আফ্রিকার প্রতিরক্ষার দায়িত্ব যথাসম্ভব ভিসি ফ্রান্সের এবং পূর্ব ভূমধ্যসাগরের রণক্রিয়ার আসল দায়িত্ব ইতালীর হাতে অর্পণ করিবার জন্য। অর্থাৎ মুখ্য দায়িত্ব তাঁর নিজের বহনের ইচ্ছা কখনও ছিল না। বড় জোর দুই এক ডিভিসন জার্মান সৈন্য দিয়া তিনি ইতালী বা স্পেনের সঙ্গে সহযোগিতা করিতে প্রস্তুত ছিলেন। অবশ্য জিব্রাল্টার দুর্গের প্রতিরোধ ভাঙিবার জন্য যে স্পেশালিস্ট বা বিশেষজ্ঞ সৈন্যের দরকার হইত, সেই সৈন্য এবং কয়েক স্কোয়াড্রন ডাইভ বম্বার (ছোঁ মারা বোমারু) দিতেও তিনি রাজী ছিলেন। কিন্তু তার চেয়ে বেশী কিছু নয়। কারণ, রাশিয়া আক্রমণের বিকল্প প্ল্যান হিসাবে তিনি রেইডারের পরিকল্পনা গ্রহণ করিতে কিম্বা ভূমধ্যসাগরকে জার্মানীর প্রধান রণক্ষেত্ররূপে গ্রহণের জন্য তিনি আদৌ প্রস্তুত ছিলেন না।

কিন্তু ডিকটেটর হিটলারের এই সীমাবদ্ধ রণনৈতিক অভিপ্রায়ও চড়ায় আটকাইয়া গেল আর এক ডিকটেটরের পাল্লায় পড়িয়া—তিনি হইতেছেন স্পেনের সর্বময় প্রভু জেনারেল ফ্রাঙ্কো। তিনি হিটলারের চেয়ে কম ঘুঘু ছিলেন না, বরং তিনি নিজেও ফ্যাসিস্ট ছিলেন বলিয়া বোধহয় সমধর্মী ফ্যাসিস্টদের ভালো করিয়া চিনিতেন। অতএব কূটনৈতিক প্যাঁচে তিনি হিটলার ও মুসোলিনীকে খুব খেলাইলেন, কিন্তু ফাঁদে পা দিলেন না।

১৯৪০ সালের জুন মাসে পশ্চিম রণাঙ্গনে যখন জার্মানী জয়লাভ করিতেছিল এবং যখন বাহ্যত মনে হইয়াছিল যে, যুদ্ধ শেষ হইয়া আসিল এবং সামনে লুটের মাল ভাগবাঁটোয়ারার দিন আসিতেছে, তখন জেনারেল ফ্রাঙ্কো যুদ্ধে যোগদানের ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছিলেন। কিন্তু যখন তিনি দেখিলেন যে, বৃটেন আত্মসমর্পণ করিল না এবং ইংলণ্ড দ্বীপ আক্রান্তও হইল না, তখন থেকেই ফ্রাঙ্কোর উৎসাহে ভাঁটা পড়িতে লাগিল এবং যুদ্ধে যোগদানের প্রস্তাব এড়াইবার জন্য তিনি এমন সব সর্ত উপস্থিত করিতে লাগিলেন যেগুলি হিটলারের পক্ষে গ্রহণ করা সম্ভব ছিল না।

যুদ্ধে যোগদানের সর্ত দ্বারা ফ্রাঙ্কো ফরাসী উত্তর-পশ্চিম আফ্রিকা থেকে শুরু করিয়া খাদ্য, অস্ত্রসম্ভার এবং পেট্রোল পর্যন্ত এক দীর্ঘ তালিকা পেশ করিলেন। সুবিখ্যাত ইংরাজ ঐতিহাসিক এ্যালান বুলক তাঁর 'হিটলার' গ্রন্থে লিখিয়াছেন যে, সেপ্টেম্বর মাসে ফ্রাঙ্কো পাঠাইলেন তাঁর ভাবী পররাষ্ট্রমন্ত্রী সেরানো সুনেরকে বার্লিনে আলোচনার উদ্দেশ্যে। কিন্তু জার্মান পররাষ্ট্রমন্ত্রী রিবেনট্রপের ভাবভঙ্গীতে ও দাম্ভিকতায় তিনি খুব বিরক্ত হইলেন, কিন্তু হিটলার কৌশলী এবং ধূর্ত ছিলেন, তিনি সুনেরের প্রতি এমন আচরণ করিলেন যে, হিটলার সম্পর্কে তাঁর ধারণা খুব ভালো হইল। ১৭ই সেপ্টেম্বর, ১৯৪০, প্রথম দিনের সাক্ষাতের আগে হিটলার সমগ্র ব্যাপারটা বেশ রঙ্গমঞ্চের মত সাজাইয়া রাখিয়াছিলেন। সুনেরকে রাইখ চ্যান্সেলারির বিরাট সৌধের শ্রেণীবদ্ধ স্তম্ভের সারি এবং বিশাল মার্বেল গ্যালারির মধ্য দিয়া হিটলারের সামনে নিয়া উপস্থিত করানো হইল—যেন সেকালের কোন রাজদরবারে পৌঁছানোর মত। হিটলার স্পেনীয় রাষ্ট্র-প্রতিনিধির কাছে এমন একটা অভিনয়ের ভঙ্গী দেখাইলেন যেন তিনি একজন 'World historical genius' বা পৃথিবীর ঐতিহাসিক ভাগ্যনিয়ন্ত্রণকারী এক বিরাট প্রতিভা। তাঁর মুখের ভাব অত্যন্ত শান্ত এবং আত্মপ্রত্যয়ে দৃঢ়—যেন সমগ্র ইউরোপীয় মহাদেশের তিনিই প্রভু। তিনি ম্যাপের উপর ঝুঁকিয়া পড়িয়া এমন সহজ ভঙ্গী দেখাইলেন যে, যেন যে কোন দিন ইচ্ছা করিলেই জিব্রাল্টার দখল করিতে পারেন। হিটলারের চোখের দৃষ্টিতে চুম্বকের মত যে আকর্ষণশক্তি ছিল, এবং যে দৃষ্টি ও ব্যক্তিত্বের প্রশংসা অনেক পশ্চিমী ঐতিহাসিক করিয়াছেন, সেই দৃষ্টি দিয়া তিনি সেরানো সুনেরকে সাদর সম্বর্ধনা জানাইলেন এবং সারা কক্ষটির মেঝের উপর তিনি অত্যন্ত সতর্ক ও নিয়ন্ত্রিত পদক্ষেপ করিয়া গেলেন বিড়ালের পা ফেলিবার মত। পৃথিবীর সমস্ত মহাদেশের মানচিত্রের উপর তিনি চোখ বুলাইয়া দেখেন এবং খুব শান্ত কণ্ঠে বলিলেন যে, সমগ্র ইউরোপ ও সমগ্র আফ্রিকা নিয়া একটি ব্লক গঠন করাই তাঁর উদ্দেশ্য এবং বলাই বাহুল্য যে, এই নতুন ব্লকে বাইরের কাহাকেও হস্তক্ষেপ করিতে দেওয়া হইবে না—একটি নতুন 'মনরো ডকট্রিন' ঘোষণা করা হইবে। রিবেনট্রপের মত তিনি কোন মেজাজ দেখাইলেন না, কোন অভিযোগ করিলেন না এবং তাঁর দর্শনার্থীর উপর কোন চাপ সৃষ্টিও করিলেন না। কিন্তু জার্মান রাষ্ট্রের বা তৃতীয় রাইখের সমস্ত জাঁকজমক ও ক্ষমতার দম্ভ দিয়া স্পেনীয় প্রতিনিধিকে ভুলাইবার চেষ্টা করা হইল। কিন্তু ফ্রাঙ্কোর প্রতিনিধি ভুলিবার পাত্র নন। যুদ্ধে যোগদানের ব্যাপারে তিনি কোন কথাই দিলেন না, অথচ দাবীর তালিকা দীর্ঘই রাখিলেন। কিন্তু বার্লিন ত্যাগ করার আগে দ্বিতীয় দিনের সাক্ষাতের সময় সুনের তাঁর প্রভু ফ্রাঙ্কোর পক্ষ থেকে যে দামী উপহার দ্রব্য হিটলারকে দিলেন, তাতে হিটলারের ছেলেমানুষী দেখিয়া সুনের অবাক হইলেন। কারণ, জার্মানী ও ইউরোপের সর্বময় প্রভু এতক্ষণ যে বিরাট মহিমান্বিত ভাব দেখাইতেছিলেন, তার সঙ্গে এই ছেলেমানুষী একেবারেই বেমানান ছিল।...

এই ঘটনার পর ইতালীর পররাষ্ট্রমন্ত্রী চিয়ানো ২৮শে সেপ্টেম্বর যখন হিটলারের সঙ্গে দেখা করিলেন তখন হিটলার দুঃখিত স্বরে মন্তব্য করিলেন, 'ফ্রাঙ্কো যত নিতে চান, তত দিতে চান না!'

এক সপ্তাহ পরে হিটলার ও মুসোলিনী ব্রেনার গিরিবর্ত্মে একত্রিত হইলেন সমগ্র পরিস্থিতির পর্যালোচনার জন্য। ফ্রাঙ্কোর দাবীর আলোচনা প্রসঙ্গে তিনি মুসোলিনীকে বুঝাইলেন কেন ফরাসী মরক্কো স্পেনকে দেওয়া হয় না। কারণ, মধ্য আফ্রিকায় এক সুবৃহৎ জার্মান সাম্রাজ্য তিনি প্রতিষ্ঠা করিতে চান এবং এই সাম্রাজ্যের জনাই তাঁর নিজের দরকার ফরাসী মরক্কোর উপকূলবর্তী ঘাঁটি। দ্বিতীয়তঃ এই মুহূর্তে ফরাসী উপনিবেশগুলিতে হাত দিতে গেলে উত্তর ও পশ্চিম আফ্রিকা দ্য গলের ফ্রী ফ্রেঞ্চের সঙ্গে হাত মিলাইতে পারে। বরং তিনি ভিসি ফ্রান্সের সঙ্গে আরও বেশী ঘনিষ্ঠ সহযোগিতার পক্ষপাতী। কিন্তু ফ্রান্সকে অক্ষশক্তিবর্গের আরও দলে টানিবার প্রস্তাবে মুসোলিনী খুশী হইলেন না। কারণ, ফরাসী ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্যের একটা মোটা অংশ তিনি নিজে গ্রাস করিবেন এই ছিল তাঁর মনে-মনে ইচ্ছা।

অবশেষে হিটলার স্থির করিলেন যে, তিনি নিজেই স্পেনীয় সীমান্তে গিয়া ফ্রাঙ্কোর সঙ্গে সাক্ষাৎ করিবেন। (২)

জীবনে ডিক্টেটর হিটলার এমন জব্দ বোধহয় আর কখনও হন নাই। তিনি গায়ে পড়িয়া জেনারেল ফ্রাঙ্কোকে খোসামোদ করিতে গেলেন এবং স্বেচ্ছায় দীর্ঘ রেল ভ্রমণের ক্লেশ স্বীকার করিয়া গোটা ফ্রান্স পাড়ি দিলেন এবং ফরাসী-স্পেনীয় সীমান্তের হেন্ডারে শহরে গিয়া হাজির হইলেন স্পেশাল ট্রেনযোগে ২৩শে অক্টোবর তারিখ। ফ্রাঙ্কোর সঙ্গে আলোচনায় হিটলার গোড়াতেই জার্মানীর শক্তি ও ক্ষমতার বিজ্ঞাপন দিয়া বুঝাইতে চাহিলেন যে, ইংলন্ডের দফা শেষ হইয়াছে। তিনি অবিলম্বেই স্পেনের সঙ্গে একটি সন্ধিপত্র স্বাক্ষর করিতে উৎসুক এবং এই সন্ধি অনুসারে স্পেন ১৯৪১ সালের জানুয়ারী মাসে যুদ্ধে যোগদান করিবে। ১০ই জানুয়ারী জার্মানীর দুর্গ-বিশেষজ্ঞ সৈন্যদের (যে সৈন্যেরা বেলজিয়ামের বিখ্যাত দুর্ভেদ্য দুর্গ 'ইবেন ইমায়েল' দখল করিয়াছিল) সাহায্যে জিব্রাল্টার দুর্গ দখল করা হইবে এবং এই দুর্গ তৎক্ষণাৎ স্পেনের অধিকারভুক্ত হইবে।

কিন্তু হিটলার যে এত আশা, এত প্রলোভন দেখাইলেন তাতেও ফ্রাঙ্কো কিন্তু এতটুকু সাড়া দিলেন না। অথচ মুসোলিনীর মত পাকা ডিক্টেটরকেও তিনি যখন অনায়াসে বাগে আনিতে পারিয়াছেন, তখন এই স্পেনীয় ডিক্টেটর অনড় রহিয়া গেলেন—জার্মান ডিক্টেটরের কাছে এই অভিজ্ঞতা নতুন! ফ্রাঙ্কো তো হিটলারের কথায় সায় দিলেন না বটেই, উপরন্তু ভূমিগত (আফ্রিকার ফরাসী উপনিবেশসমূহে), অর্থনৈতিক এবং সামরিক দাবীগুলির উপর জোর দিতে লাগিলেন, এমন কি দাবীর পরিমাণগুলি পূরণ করার ক্ষমতা জার্মানীর আছে কিনা, ফ্রাঙ্কো এমন প্রশ্ন তুলিয়াও হিটলারকে বিব্রত করিলেন। অধিকন্তু বৃটেন সম্পর্কে হিটলারের মতে সায় না দিয়া ফ্রাঙ্কো আরও বলিলেন যে, যুদ্ধে হারিয়া গেলেও বৃটিশ গবর্নমেন্ট বশ্যতা স্বীকার করিবে না। বৃটিশ নৌ-বহরের সহায়তায় বৃটিশ সরকার কানাডা থেকে আমেরিকার সহযোগিতায় যুদ্ধ চালাইয়া যাইবে! এই সমস্ত কথার পর হিটলারের আর ধৈর্য রহিল না, এক সময় কথার মাঝখানেই তিনি উঠিয়া দাঁড়াইলেন এবং বলিলেন যে, আর আলোচনা চালাইয়া লাভ নাই! (৩)

৯ ঘন্টা ধরিয়া এই ব্যর্থ আলোচনা চলিল এবং রাত অনেক হইয়া গেল। স্পেশাল ডাইনিং কারে হিটলারের নৈশ-ভোজের অনেক দেরী হইয়া গেল। হিটলার তখন রিবেনট্রপের (পররাষ্ট্রমন্ত্রী) উপর ভার দিলেন সেরানো সুনেরের সঙ্গে এই বিষয়ে কথাবার্তা চালাইবার জন্য। যা হোক একটা চুক্তি স্বাক্ষরের দ্বারা স্পেনের সাহায্যে ইংরাজকে জিব্রাল্টার থেকে তাড়াইতে এবং পশ্চিম ভূমধ্যসাগরে তাদের প্রবেশ বন্ধ করিয়া দিতে হইবে—হিটলার রিবেনট্রপকে এই মর্মে উপদেশ দিলেন। বেচারা রিবেনট্রপ রাতে ঘুমাইতে পারিলেন না, সারা রাত জাগিয়া একটা চুক্তিপত্রের খসড়া তৈরী করিলেন, কিন্তু সবই বৃথা। স্পেনকে দলে টানা গেল না। পর দিন সকালে রিবেনট্রপ হিটলারের একজন পার্শ্বচরের নিকট ফ্রাঙ্কোকে অভিশাপ দিতে-দিতে ক্রুদ্ধ স্বরে বলিলেন—অকৃতজ্ঞ কাপুরুষ! ব্যাটা আমাদের জন্যই সব কিছু পেয়েছে। আর আজ আমাদের দলে ভিড়তে রাজী নয়!"

আর হিটলার এই সাক্ষাৎকার বিষয়ে মুসোলিনীর কাছে তীব্র ক্ষোভের সঙ্গে মন্তব্য করিয়াছিলেন 'আমার বরং তিনটা দাঁত তুলে ফেলা ভালো। তবু আর ফ্রাঙ্কোর সঙ্গে সাক্ষাৎ নয়!' (৪)

স্পেন ও ফ্রাঙ্কো সম্পর্কে এখানে চার্চিলের মন্তব্য স্মরণীয়। কারণ, জিব্রাল্টার নিয়া তাঁর যে দুশ্চিন্তার অবধি ছিল না, সেকথা আগেই উল্লেখ করা হইয়াছে। চার্চিল ফ্রাঙ্কো সম্পর্কে তীব্র মন্তব্য করিয়া বলিতেছেন—

> General Franco's policy througho·' the war was entirely selfish and cold-blooded. He thought only of Spain and Spanish interest. Gratitude to Hitler and Mussolini for their help never entered his head ....They had enough of war A million men had been slaughtered by their brothers' hands, Poverty, high prices, and hard times froze the stony peninsula. No more war for spain and no more war for Franco! (5)

অর্থাৎ সারা যুদ্ধব্যাপী জেনারেল ফ্রাঙ্কোর নীতি ছিল একেবারে স্বার্থান্ধ এবং নিষ্ঠুর। স্পেন ও স্পেনীয় স্বার্থ ছাড়া তাঁর আর কোন ভাবনা ছিল না। হিটলার ও মুসোলিনী তাঁকে যে সাহায্য দিয়াছিলেন (স্পেনীয় গৃহযুদ্ধের সময়) সেই সম্পর্কে কৃতজ্ঞতাবোধের বালাইও তাঁর ছিল না। স্পেনীয়রা ঢের যুদ্ধের স্বাদ পাইয়াছে। ভাইয়ের হাত দিয়া ভাইয়ের হত্যায় ১০ লক্ষ লোক খতম হইয়াছে। দারিদ্র্য, অতিমূল্যবৃদ্ধি এবং দুর্ভোগের দ্বারা এই পাথুরে উপদ্বীপ যেন জমাট বাঁধিয়া গিয়াছিল। অতএব স্পেন আর যুদ্ধ চায় না, ফ্রাঙ্কোও আর যুদ্ধ চায় না!

চার্চিল আরও লিখিয়াছেন যে, ফ্রাঙ্কো স্পেনের নিরপেক্ষতা বজায় রাখিয়াছিলেন এবং বৃটেন এটাই চাহিতেছিল। কেননা, ভূমধ্যসাগরে বৃটেনের সমস্ত উদ্যোগের চাবিকাঠিই ছিল স্পেনের হাতে এবং চরমতম দুর্দিনেও সেই চাবি ফ্রাঙ্কো বৃটেনের প্রতিপক্ষের হাতে তুলিয়া দেন নাই। ভূমধ্যসাগরে বৃটেনের বিপদ এত গুরুতর ছিল যে, বৃটেনকে দুই বছর ধরিয়া ক্রমাগত পাঁচ হাজার সৈন্য ও যুদ্ধ জাহাজ মাত্র কয়েক ঘন্টার নোটিশে রেডি থাকার জন্য তৈয়ার রাখিতে হইয়াছিল ক্যানারি দ্বীপ দখলের জন্য। কারণ, ওই দ্বীপ দখলে রাখিতে পারিলে এবং জিব্রাল্টার প্রণালী বন্ধ হইয়া গেলে বৃটেন অন্ততঃ ওখানকার আকাশ ও সমুদ্রপথের উপর নিয়ন্ত্রণ রাখিয়া উত্তমাশা অন্তরীপের পথ ঘুরিয়া অস্ট্রেলিয়ার সঙ্গে যোগাযোগ রাখিতে পারিত।

বৃহৎ সাম্রাজ্য রক্ষার ও পাহারা দেওয়ার ঝামেলা অনেক সন্দেহ নাই এবং এই ঝামেলার জনাই স্পেন সম্পর্কেও বৃটেনের এত উদ্বেগ।

চার্চিল ফ্রাঙ্কোর প্রসঙ্গে উপসংহারে মন্তব্য করিতেছেন যে, হিটলার ও মুসোলিনীর সঙ্গে ফ্রাঙ্কোর এই সমস্ত চালবাজি এবং তাঁর অকৃতজ্ঞতা যতই তাঁর চরিত্রের মন্দ দিকের লক্ষণ হোক, যুদ্ধের সময়ে মিত্রশক্তি কিন্তু এর দ্বারা উপকৃতই হইয়াছিল!...

ফ্রাঙ্কোর সঙ্গে হিটলারের সাক্ষাৎকার ব্যর্থ হইল বটে, কিন্তু পর দিন (২৪শে অক্টোবর) ভিসি সরকারের রাষ্ট্রপ্রধান মার্শাল পেতাঁর সঙ্গে মন্টোয়ারে হিটলারের যে সাক্ষাৎ হইল, তাতে ফুয়েরার খুব খুশীই হইলেন। কারণ, বৃদ্ধ পেতাঁ ফ্রান্সের পক্ষ থেকে বৃটেনকে নতজানু করার হিটলারী প্রস্তাবে সম্মতি দিলেন এবং এই উদ্দেশ্যে ফ্যাসিস্ট শক্তিবর্গের সঙ্গে ভিসি সরকারের পূর্ণতর সহযোগিতার প্রতিশ্রুতি দিলেন। এমন কি, কাগজে পত্রে এমন কথাও লিখিয়া দিলেন—

> The Axis Powers and France have an identical interest in seeing the defeat of Eng'and acomplished as soon as possible. ...."

---

(২) পূর্বোদ্ধৃত পুস্তক, পৃষ্ঠা ৬০৩-৪

(৩) পূর্বোদ্ধৃত পুস্তক, পৃষ্ঠা ৬০৫

(৪) উইলিয়াম শায়ার প্রণীত দি রাইজ এণ্ড ফল অব দি থার্ড রাইখ, পৃষ্ঠা ৯৭৪

(5) The Second World War—Churchill, Vol. 2 P. 459.

অর্থাৎ 'অক্ষশক্তিবর্গ' এবং ফ্রান্স উভয় পক্ষই তাদের সমান স্বার্থের খাতিরে যত দ্রুত সম্ভব বৃটেনের পরাজয় দেখিতে চায়।...'

পেতাঁর এই নূতন বিশ্বাসঘাতকতার দলিলে স্বাক্ষরের পুরস্কারস্বরূপ হিটলার প্রতিশ্রুতি দিলেন যে, 'নয়া ইউরোপে' ফ্রান্সকে তার 'যথাযোগ্য আসন' দেওয়া হইবে এবং ফ্রান্সকে বাধ্য হইয়া সমস্ত ভূখণ্ড জার্মানীকে ছাড়িয়া দিতে হইবে, তার বিনিময়ে ফ্রান্স ক্ষতিপূরণস্বরূপ আফ্রিকায় বৃটিশ সাম্রাজ্য থেকে উপযুক্ত ভূখণ্ড পাইবে এবং সেটা ফ্রান্সের বর্তমান সাম্রাজ্যের সমান হইবে।

এই চুক্তি উভয় পক্ষই 'অত্যন্ত গোপন' রাখার প্রতিশ্রুতি দিলেন।

কিন্তু এই চুক্তির বিস্তৃত রূপায়ণ আদৌ সহজসাধ্য ছিল না। সুতরাং পেতাঁ তাঁর এক বন্ধুর কাছে যে মন্তব্য করিলেন, সেটাও কম চমকপ্রদ ছিল না। তিনি বলিলেন :

It will take six months to discuss this programme and another six months to forget it!

অর্থাৎ এই চুক্তির কর্মসূচী আলোচনা করিতে ছয় মাস লাগিবে এবং আরও ছয় মাস লাগিবে এগুলি ভুলিয়া যাইতে!

কিন্তু মার্শাল পেতাঁর এই বিশ্বাসঘাতকতায় গোপন চুক্তি সত্ত্বেও হিটলার পুরাপুরি খুশী হইলেন না। কেননা, তিনি চাহিয়াছিলেন ফ্রান্স ফ্যাসিস্ট শক্তিবর্গের দলে যোগ দিয়া হাতে-কলমে বৃটেনের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতীর্ণ হোক!

বিশ্বাসঘাতকতার পথ কত ভয়াবহ তা' এই ঘটনা থেকে আর একবার বুঝা যাইবে।

ফ্রাঙ্কো ও পেতাঁর সঙ্গে সাক্ষাতের পরেই হিটলার মুসোলিনীর সঙ্গে আর একবার দেখা করিলেন ২৮শে অকটোবর ফ্লোরেন্সে। কিন্তু এই সাক্ষাতের পিছনে ছিল একটি ঘটনা যার জন্য হিটলার খুব বিস্ময় বোধ করিয়াছিলেন। অর্থাৎ ২৮শে অকটোবর ইতালী হঠাৎ গ্রীস আক্রমণ করিয়া বসিল, হিটলারের সম্মতি ছাড়া তো বটেই, এমন কি হিটলারের ইচ্ছার বিরুদ্ধে। হিটলার এতে বিরক্ত হইলেন। কারণ, হিটলারী রণনৈতিক বলকান সম্পর্কে হিটলারী রণনৈতিক পরিকল্পনা এই আকস্মিক ইতালীর আক্রমণের দ্বারা ব্যাহত হইল। আসলে বলকান অঞ্চলের উপর মুসোলিনীরও লোভ ছিল এবং হিটলার সর্বত্র এভাবে দখল বিস্তার করুক, এটা মুসোলিনীর পছন্দসই ছিল না। আর হিটলার তো মুসোলিনীর সঙ্গে পরামর্শ ছাড়াই অনেক কার্য করিতেছেন, এমন কি রাজ্য দখল করিতেছেন। অতএব মুসোলিনীও হিটলারের সম্মতি ছাড়াই গ্রীস আক্রমণ করিলেন। কিন্তু অন্যান্য স্থানে যেমন এখানেও ইতালীর আক্রমণ ব্যাহত হইল এবং হিটলারকে মুসোলিনীর উদ্ধারের জন্য বলকানেও সাহায্য দিতে হইল। ওদিকে বৃটেন ক্রীট দ্বীপ এবং অজিয়েন দ্বীপপুঞ্জের কয়েকটি দখল করিয়া নিল। ফলে, পূর্ব ভূমধ্যসাগরে জার্মান অভিযানের প্রস্তাব এবং সুয়েজ খালের দিকে ইতালীর অগ্রগতিতে সহায়তা দানের পরিকল্পনা বন্ধ রাখিতে হইল।

কিন্তু ৪ঠা নভেম্বরের সামরিক বৈঠকে পশ্চিম ভূমধ্যসাগরে রণক্রিয়ার জন্য যে পরিকল্পনা স্থির হইল, তার সাঙ্কেতিক নাম দেওয়া হইল 'অপারেশন ফেলিকস'। জার্মান সৈন্যেরা স্পেনীয় দেশের সহযোগিতায় জিব্রাল্টার দখল করিয়া নিবে। কিন্তু হিটলার তখনও এই বিষয়ে নির্ভর করিতেছিলেন ফ্রাঙ্কোর উপরে। নভেম্বর মাসে তিনি ফ্রাঙ্কোকে তাগিদ দিলেন, কিন্তু ফ্রাঙ্কো যথারীতি এড়াইয়া গেলেন। ৭ই ডিসেম্বর এডমিরাল ক্যানারিস স্পেনীয় ডিকটেটরকে প্রস্তাব দিলেন ১০ই জানুয়ারী জার্মান সৈন্যেরা স্পেনে প্রবেশ করিবে এবং বৃটেনের বিরুদ্ধে আক্রমণ শুরু করিবে। ফ্রাঙ্কো এই প্রস্তাবের জবাবে সরাসরি 'না' বলিয়া পাঠাইলেন। এদিকে ইতালীর সৈন্যেরা উত্তর আফ্রিকার মরুভূমির যুদ্ধে শোচনীয়ভাবে হারিয়া গেল। এই অবস্থায় হিটলার বাধ্য হইয়া 'অপারেশন ফেলিক্স' বাতিল করিয়া দিলেন।

উত্তর আফ্রিকায় বৃটিশের জয়লাভে হিটলার শঙ্কিত হইলেন। কারণ, তাঁর ভয় হইল এই জয়ের পথ ধরিয়া ফরাসী ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্য জেনারেল ওয়েগাঁর নেতৃত্বে বিগড়াইয়া যাইতে পারে এবং বৃটিশের দিকে ভিড়িতে পারে। সুতরাং ১০ই ডিসেম্বর তারিখ হিটলার তাড়াতাড়ি 'অপারেশন এ্যাটিলা' নামে এক জরুরী অভিযানের সিদ্ধান্ত করিলেন। এই অপারেশনের লক্ষ্য ছিল দরকার মত সমগ্র ফ্রান্স দখল করা এবং সমগ্র ফরাসী নৌবহর ও বিমানবহর করায়ত্ত করা। কিন্তু ওয়েগাঁর দিক থেকে কোন নড়াচড়ার লক্ষণ দেখা গেল না। বরং জার্মানীর সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সহযোগিতার বিধি সবচেয়ে বড় পাণ্ডা ছিলেন ভিসি মন্ত্রিসভার মধ্যে সেই লাভালকে পদচ্যুত ও গ্রেপ্তার করা হইল। অবশ্য জার্মানরা তাদের মিতা লাভালকে ছাড়াইয়া আনিলেন। মার্শাল পেতাঁর কাছ থেকেও সহযোগিতার আর সূত্র পাওয়া গেল না। এভাবে অপারেশন এ্যাটিলাও পরিত্যক্ত হইল।

১৯৪১ সালের নববর্ষে হিটলার আর একবার শেষ চেষ্টা করিয়া দেখিলেন ফ্রাঙ্কোকে দলে ভিড়াইবার জন্য। তিনি মুসোলিনীকে দিয়াও ফ্রাঙ্কোর মন ভিজাইবার চেষ্টা করিলেন। কারণ, ফ্রাঙ্কো যদিও হিটলারকে পছন্দ করিতেন না, বরং তাঁকে ভয় করিতেন, কিন্তু মুসোলিনীর সঙ্গে তাঁর খুব ভাব ছিল। অতএব ১২ই ফেব্রুয়ারী মুসোলিনী বোর্ডিঘেরাতে ফ্রাঙ্কোর সঙ্গে সাক্ষাৎ করিলেন। এর আগে অবশ্য ২৫শে আগষ্ট (১৯৪০) তারিখ মুসোলিনী ফ্রাঙ্কোকে সনির্বন্ধ অনুরোধ জানাইয়াছিলেন যেন তিনি "ইউরোপের ইতিহাস থেকে নিজকে বিচ্ছিন্ন না করেন।" কিন্তু ফ্রাঙ্কোর মন গলিল না। অবশেষে হিটলার ৬ই ফেব্রুয়ারী ১৯৪১, জেনারেল ফ্রাঙ্কোকে একটি ব্যক্তিগত পত্র লিখিলেন এবং তাঁর দর কষাকষি মনোভাবের জবাবে কড়া ভাষা জানাইলেন :

'একটি বিষয় আপনার অত্যন্ত পরিষ্কারভাবে জানা উচিত। আমরা আমাদের জীবন-মৃত্যুর জন্য কঠোর সংগ্রামে লিপ্ত এবং এই সময় আপনাকে কোন উপহার দিতে পারি না'—

(We are fighting a battle of life and death and cannot at this time make any gift......)

তিন সপ্তাহ পরে ফ্রাঙ্কো হিটলারের চিঠির জবাব দিলেন এবং তাতে জানাইলেন যে, তাঁর আনুগত্য যথাস্থানে ঠিকই আছে এবং তিনি নিশ্চিতই জানেন যে, ইতালী ও জার্মানীর সহিতই তাঁর ভাগ্য জড়িত......।

কিন্তু ওই পর্যন্ত। ধূর্ত ফ্রাঙ্কো হিটলারের সঙ্গে যোগ দিয়া একত্র যুদ্ধযাত্রার আসল প্রশ্নটি এড়াইয়া গেলেন।

এর পর হিটলার আর কি করিবেন? তিনি মুসোলিনীকে লিখিলেন যে, তাঁর আশঙ্কা হইতেছে ফ্রাঙ্কো তাঁর জীবনের সবচেয়ে বড় ভুল করিলেন।

কিন্তু ভূমধ্যসাগরীয় রণনীতিতে তিন ডিকটেটরের মধ্যে দুই ডিকটেটরই বরং ভুল করিয়াছেন। কারণ, মুসোলিনী হারিয়া ভূত হইতেছেন, আর তাঁকে উদ্ধারের জন্য হিটলার তার পিছন পিছন ছুটিয়াছেন। কিন্তু তৃতীয় ডিকটেটর ফ্রাঙ্কো কোন ভুল করেন নাই। অর্থাৎ স্পেনের ভবিষ্যতকে এই যুদ্ধে জড়াইয়া তিনি ধ্বংস করেন নাই। কিম্বা হিটলার মুসোলিনীর সঙ্গে একত্রে প্রলয়তাণ্ডবে নৃত্য জুড়িয়া দেন নাই।

(ক্রমশঃ)

মর্মর মেঝের উপর শায়িত পুলকেশের মৃতদেহ। বুকে দুটো গভীর ক্ষতচিহ্ন— রিভলবারের বুলেটের। পুলকেশ সুপুরুষ। সুন্দর সুঠাম তার দেহ। চোখ দুটো মুদ্রিত, মুখে গভীর প্রশান্তির ছায়া। দেখে মনে হয় যেন গাঢ় ঘুমে আচ্ছন্ন। মৃত্যুও তার দৈহিক সৌষ্ঠব আর কান্তিকে খর্ব করতে পারেনি যা একদা বহু নারীকে প্রলুব্ধ করেছিল।

মিনিট দুই হয়তো একদৃষ্টে তাকিয়ে-ছিলাম পুলকেশের মৃতদেহের দিকে। তারপর সেদিক থেকে চোখ সরিয়ে নিয়ে তাকালাম সমীর ঘোষালের দিকে। আমার পাশেই দাঁড়িয়েছিল সমীর ঘোষাল আর প্রবীর চৌধুরী। সমীর ঘোষাল কলকাতা পুলিশের মার্ডার স্কোয়াডের অ্যাসিস্ট্যান্ট কমিশনার। ওর সঙ্গে আমার অনেক দিনের পরিচয়। এক সময় কলেজে পড়েছিলাম একসঙ্গে। তাছাড়া কাজের খাতিরে হামে-শাই দেখ,সাক্ষাৎ হয় আমাদের। প্রবীর 'ডেইলি নিউজ' পত্রিকার রিপোর্টার। ওর সঙ্গে পরিচয় ছিল বটে, তবে অন্তরঙ্গতা ছিল না। ও ছিল পুলকেশের বন্ধু। আমাদের অফিসে আসত মাঝে মাঝে আর সেই সূত্রেই পরিচয়।

গোয়েন্দার বিপদ

সুধাংশুকুমার গুপ্ত

লাইটারটা জ্বালিয়ে সিগারেট ধরাচ্ছিল সমীর। সিগারেট ধরাতে বেশ একটু সময় নিল যেন। আড়চোখে ও বারবার তাকাচ্ছিল আমার দিকে। ওর ঐ চোরা চাউনিটা খুবই খারাপ লাগল আমার। সিগারেটটা ধরিয়ে জোরে একটা টান দিয়ে আস্তে আস্তে ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে শান্ত গলায় সমীর বললে, "তোমাকে একটা কথা জিজ্ঞেস করতে চাই, অজয়।"

"কী কথা ?" প্রশ্ন করলাম ঈষৎ বিরক্তির সুরে।

মর্গের একজন জমাদার একখানা সাদা চাদরে মুড়ে ফেলছিল লাশটা।

সেদিকে আঙগুল বাড়িয়ে সমীর বললে 'এ ব্যাপারটা সম্পর্কে কী জানো তুমি?'

"এ সম্বন্ধে আমি কিছু জানি এ আইডিয়াটা তোমার মাথায় এল কি করে ?" একটু রাগতভাবেই কথাটা বললাম আমি।

সমীর মৃদু হাসল। "তোমার পার্টনার ছিল পুলকেশ, তাই না ?"

"এক সময় পার্টনার ছিল বটে, কিন্তু সম্প্রতি ওকে সরিয়ে দিয়ে একাই আমি কাম চালাচ্ছি।"

আমার কথা সমর্থন করে প্রবীর বললে, "কথাটা ঠিকই। তুমি কি শোনো নি হালদার এণ্ড মুখার্জি, প্রাইভেট ইনভেস্টি-গেটার্স, পার্টনারশিপ ডিজলভ করেছে মাসখানেক আগে ? এখন অজয়ই একমাত্র মালিক।"

সমীর লম্বা আর বলিষ্ঠ। প্রবীর খুলকায় আর বেঁটে। দুজনের প্রকৃতিও বিভিন্ন। সমীর সব বিষয়েই সিরিয়াস আর প্রবীর লঘুচিত্ত। সমীরের বোনকে বিবাহ করেছে প্রবীরের ছোট ভাই। আত্মীয়তা থাকায় প্রবীর সমীরকে তেমন সমীহ করে চলে না।

"না, শুনিনি তো!" কৃত্রিম বিস্ময়ের সুরে জবাব দিলে সমীর।

মনে মনে ভারী চটে গেলাম আমি।

"তুমি ভালরকমই জানো পুলকেশ ইদানীং আমার ফার্মে ছিল না। পুলিশের লোক সবাই জানে আর তুমি জানো না এটা আমি বিশ্বাস করতে পারছি না। যাক্, তুমি যা বলতে চাও অনায়াসে বলতে পারো। তুমি কি মনে কর পুলকেশকে খুন করেছি আমি ?"

সমীর যেন একটু আহত হল। "আমায় তুমি ভুল বুঝেছ অজয়। আমি তা মনে করি না।"

"বেশ। তুমি কি জানতে চাও বলো।"

সমীর এবার খুশী হল। হাসি মুখে বললে, "এখানে সুবিধে হবে না। চলো আমার অফিসে।"

আমরা তিনজনই রওনা হলাম পুলিশ হেড কোয়ার্টার্সের দিকে। মিনিট দশেকের মধ্যেই ওখানে পৌঁছে গেলাম। মোটর থেকে নেমে সমীর এসে ঢুকল তার ঘরে। প্রবীর আর আমি ঢুকলাম তার পিছু পিছু। টেবিলের ওপাশে তার চেয়ারটায় গিয়ে বসল সমীর। পাশের একখানা সোফায় বসে পড়ল প্রবীর। তারপর সিগারকেস থেকে দামী একটা সিগার বের করে ধরাল। আমি দাঁড়িয়েই রইলাম।

চেয়ারের পিঠে হেলান দিয়ে সমীর বললে, "পুলকেশকে তুমি ফার্ম থেকে সরিয়ে দিলে কেন ? আমার ধারণা ছিল তোমরা দুজন শুধু পার্টনার নয়, বন্ধুও বটে।"

"পুলকেশকে কেন ফার্ম থেকে সরালাম সেটা আমার নিজস্ব ব্যাপার। অপরের কাছে তার কৈফিয়ৎ দিতে আমি অপারগ।" শান্তগলায় জবাব দিলাম আমি।

সমীরের ঠোঁটে যেন একটু মৃদু হাসির রেখা দেখা দিল। মনে মনে বিরক্ত হলাম আমি।

"আমি শুনেছি", একটু ইতস্ততঃ করে সমীর বললে, "পুলকেশ নাকি তোমার স্ত্রীর সঙ্গে একটু বেশী রকম ঘনিষ্ঠতা করবার চেষ্টা করেছিল।"

প্রবীরের দিকে তাকালাম রুষ্টমুখে। নিশ্চয় প্রবীরই একথা বলেছে সমীরকে। প্রবীরের মুখখানা লজ্জায় লাল হয়ে উঠল। বিব্রতভাবে সে বললে, "ওসব কথায় কান দিও না, অজয়। কত মিথ্যে গুজবও তো রটে।"

"তাই যদি সত্যিই ঘটে থাকে, তার জন্যে কি আমি পুলকেশকে—"

কথাটা শেষ করতে পারলাম না আমি। রাগে আমার সর্বশরীর জ্বলতে লাগল।

"তোমার সঙ্গে ছাড়াছাড়ি হবার ঠিক আগে পুলকেশ কি কোনো কেস হাতে নিয়েছিল ?" প্রশ্ন করল সমীর তীক্ষ্ন দৃষ্টিতে আমার পানে তাকিয়ে।

"না—অবশ্য আমি যতদূর জানি।"

"পুলকেশ কতদিন তোমার পার্টনার ছিল ?"

"সেটা তুমি ভালরকমই জানো। আমায় জিজ্ঞেস করছ কেন ?"

"দু বছর ?"

"হ্যাঁ, ঠিক তাই।"

"তুমি কি জানো ঠিক কখন পুলকেশকে গুলি করা হয় ?"

"আমি জ্যোতিষী নই।"

"গত রাত্রে দশটা থেকে এগারোটার মধ্যে।"

"আমার মনে হয় এখন তুমি জানতে চাইবে ঐ সময়ে আমি কোথায় ছিলাম। তাই না ?"

সমীর মৃদু হাসল। "ধরেছ ঠিকই। জানতে পারলে খুশী হব আমি।"

"গত রাত্রে দশটা থেকে প্রায় বারোটা পর্যন্ত আমি ছিলাম ভবানীপুরে জাস্টিস মল্লিকের বাড়িতে। ওঁর ছেলের বিয়েতে নিমন্ত্রিত হয়েছিলাম। সঙ্গে ছিলেন আমার স্ত্রী।"

সমীর শুনল মনোযোগ দিয়ে। কিন্তু তার কোন ভাবান্তর লক্ষ্য করলাম না।

"আর কোনো প্রশ্ন আছে ?" জিজ্ঞেস করলাম আমি।

"হ্যাঁ। আরও দু-একটা প্রশ্ন আছে। পুলকেশের কোন শত্রু ছিল কি ?"

"প্রাইভেট ডিটেকটিভ মাত্রেরই শত্রু আছে।"

ভ্রূ কুঞ্চিত করল সমীর। ও যে মনে মনে খুবই বিরক্ত হয়ে উঠছে তা বুঝতে পারলাম। কিন্তু ও যদি বিরক্ত হয় তাতে আমার কিছু যায় আসে না।

"সেটা আমি জানি, অজয়। কিন্তু এমন কোনো শত্রু কি ওর ছিল যার সম্বন্ধে সহজেই সন্দেহ হতে পারে ?"

ঘাড় নাড়লাম আমি। "সে রকম কাউকে মনে পড়ছে না আমার।"

"মনে পড়ছে না, না তুমি ঐ সম্পর্কে মাথা ঘামাতে অনিচ্ছুক ?"

"যা খুশী তুমি ধরে নিতে পারো।" বিরক্তির সুরে জবাব দিলাম আমি।

প্রবীর এতক্ষণ চুপ করে শুনছিল আমাদের কথাবার্তা। হঠাৎ সে প্রশ্ন করে বসল, "বীরেশ সান্যালের ব্যাপারটা মনে আছে তোমাদের ?"

প্রবীরের দিকে তাকাল সমীর। "বীরেশ সান্যাল কে ? কৈ, তার সম্বন্ধে তো কিছুই শুনিনি আজ পর্যন্ত।"

সমীরের দিক থেকে চোখ সরিয়ে আমার পানে তাকাল প্রবীর। "সিনেমা স্টার রুবী নন্দীকে নিয়ে পুলকেশের সঙ্গে বীরেশ সান্যালের যে সংঘর্ষ হয় সেটা তোমরা জানো না এ আমি মোটেই বিশ্বাস করতে পারি না।"

"পুলকেশের সঙ্গে তোমার বন্ধুত্ব ছিল দীর্ঘদিনের, তার সব কিছুই তুমি জানো, আমরা জানবো কি করে ? যাক সে কথা, বীরেশ সান্যালের ব্যাপারটা বলো দেখি।" প্রবীরকে লক্ষ্য করে বললাম আমি।

প্রবীর হাসল মুরুব্বিয়ানার ভঙ্গীতে। তারপর নিবে-যাওয়া সিগারটা ধরিয়ে নিয়ে এক রাশ ধোঁয়া ছাড়ল সিলিংয়ের দিকে। এক মিনিট চুপ করে থাকার পর সে বলতে শুরু করল, "বীরেশ সান্যাল ধানবাদের এক কোলিয়ারি মালিকের ছেলে। রুবী নন্দীর পেছনে অনেক টাকা খরচ করেছে সে। মেয়েটার চেহারা খুব চটকদার, পুরুষকে আকৃষ্ট করার মত রংঢংও জানে। পুলকেশের নজর পড়ে ওর ওপর। ওকে নিয়ে বেড়াতে যেত মাঝে মাঝে। বীরেশ সেটা জানতে পেরে একদিন চড়াও হল পুলকেশের ফ্ল্যাটে। মারপিট একটা হত নিশ্চয়ই, তবে আমি তখন ওখানে ছিলাম বলে বীরেশকে শান্ত করি কোনরকমে।

বীরেশ গুন্ডা প্রকৃতির যুবক, রাগের বশে সে যে অনায়াসে খুন করতে পারে এ মনে করা অসঙ্গত নয়।"

এক মুহূর্ত চিন্তা করল সমীর; তারপর আমার দিকে তাকিয়ে বললে, "ব্যাপারটা শুনে মনে হচ্ছে, বীরেশ সান্যাল হয়তো এই খুনের জন্যে দায়ী। তোমার কী মনে হয়?"

"পুলকেশকে কে খুন করেছে, কেন খুন করেছে এ নিয়ে মোটেই মাথা ঘামাই না আমি।" নীরস কণ্ঠে জবাব দিলাম আমি। তারপর সমীরের দিকে না তাকিয়ে সোজা চলে এলাম বাইরে।

দুই

বাড়ি ফিরে দেখি শোবার ঘরে একখানা কৌচের উপর সুলতা বসে আছে চুপ করে। এ সময় ও শোবার ঘরে থাকে না। নীচতলায় চাকরবাকরদের কাজকর্মের তদারকি করে। সুলতা সুন্দরী। গায়ের রং চাঁপাকলির মত না হলেও মুখশ্রী অতি চমৎকার। কালো ভুরুর নীচে তার টানা টানা চোখের তুলনা হয় না। তাছাড়া তার সারা দেহে এমন একটা স্নিগ্ধ মাধুর্য ছড়ানো যা সহজেই অপরের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। তবে নিজের সৌন্দর্য সম্বন্ধে সে তেমন সচেতন নয়। কেউ যদি তার রূপের প্রশংসা করে সে কেমন অস্বস্তি বোধ করে—সাধারণ মেয়েদের মতো আহ্লাদে আটখানা হয় না।

আমাকে দেখে উঠে দাঁড়িয়ে সুলতা উদ্বিগ্ন কণ্ঠে বললে, 'খবরটা কি সত্যি?'

রুমালে মুখের ঘাম মুছতে মুছতে বললাম, 'হ্যাঁ। পুলকেশ খুন হয়েছে।' তারপর এক মিনিট চুপ করে থেকে বললাম, 'আজ ভোরে বালিগঞ্জ অঞ্চলে একটা গলির মধ্যে পুলিশ ওর মৃতদেহ দেখতে পায়। বুকে রিভলবারের গুলির দাগ।'

ভয়ে বিস্ময়ে বিমূঢ়ভাবে সুলতা একবার তাকাল আমার মুখের দিকে। তারপর আস্তে আস্তে জানলার ধারে গিয়ে দাঁড়াল আমার দিকে পিছন করে। সুলতা কী ভাবছে কে জানে। মাস খানেক আগে পুলকেশের সঙ্গে আমার যে সংঘর্ষ ঘটেছিল হয়তো সেটাই ওর মনের মধ্যে ঘোরাফেরা করছে। সুলতাকে আমি যে কত ভালবাসি তা হয়তো কেউ ধারণা করতে পারবে না। সুলতাও যে আমাকে ভালবাসে সমস্ত অন্তর দিয়ে তাও আমি বিলক্ষণ জানি। পুলকেশের লালসাদৃষ্টি যে সুলতার উপর পড়েছে এ আমি ভাবতেই পারিনি। সেদিন যখন দেখলাম পুলকেশ সুলতার সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা করবার চেষ্টা করছে নিতান্ত নির্লজ্জের মতো আর সুলতা ঘৃণায় ও বিরক্তিতে তার কাছ থেকে সরে যাচ্ছে দূরে তখন আমার সমস্ত রক্ত যেন নিমেষে মাথায় উঠে গেল। বাঁ হাতে ওর গলাটা চেপে ধরে ডান হাত মুষ্টিবদ্ধ করে ওর মুখে আর নাকে আঘাত করতে লাগলাম ক্ষিপ্তের মতো। সুলতা যদি বাধা না দিত তবে ঐদিনই ওর ভবলীলা সাঙ্গ হত হয়তো।

মিনিট দুই তিন পরে সুলতা মুখ ফেরাল আমার দিকে। আস্তে আস্তে বললে 'কে খুন করেছে পুলিশ কি জানে?'

'না।' ঘাড় নেড়ে জবাব দিলাম আমি।

আমার চোখের উপর চোখ রাখল সুলতা। 'এ ব্যাপারে পুলিশ কি সন্দেহ করে কাউকে?'

আমি সত্য কথাই বললাম। 'হ্যাঁ, আমাকে।'

আমার অসঙ্কোচ ভাবভঙ্গী লক্ষ্য করে সুলতা নিশ্চয়ই বুঝতে পেরেছিল এ হত্যাকান্ডের সঙ্গে আমার আদৌ সংস্রব নেই।

আস্তে আস্তে আমার দিকে এগিয়ে এল সুলতা। তার মুখ বিবর্ণ চোখ দুটো জলে ভরা। পরম মমতায় আমি ওকে জড়িয়ে ধরলাম বুকে। ওর চোখের জলে আমার বুক ভিজে গেল। আমি ওকে আশ্বাস দিয়ে বললাম, 'ভয় পেও না সুলতা। ভয় করবার কিছু নেই। সবই ঠিক হয়ে যাবে। পুলকেশ খুন হয়েছে কাল রাত্রে দশটা থেকে এগারোটার মধ্যে তুমি তো জানো ঐ সময় আমরা ছিলাম জাস্টিস মল্লিকের বাড়িতে। কাজেই পুলিশ আমাকে সন্দেহ করলেও আমার কোনো ক্ষতি করতে পারবে না।'

সুলতার চোখের জল বাধা মানে না। আমার বুকে মুখ লুকিয়ে আর্দ্রকণ্ঠে বলল, 'যদি কোনো ফ্যাসাদ হয় তখন কী করবো আমি?'

ওর মাথায় হাত বুলিয়ে সান্ত্বনার সুরে বললাম, 'তুমি মিছামিছি ভয় পাচ্ছ সুলতা। আমি বলছি সব ঠিক হয়ে যাবে। কেউ আমার কেশাগ্র স্পর্শ করতে পারবে না।'

সুলতাকে বললাম বটে, বিপদের কোনো সম্ভাবনা নেই, কিন্তু আমি নিজে আদৌ নিশ্চিন্ত হতে পারছিলাম না এ সম্বন্ধে। এক আসন্ন বিপদের অশান্ত চিন্তা আমার মনকে যেন আচ্ছন্ন করে রেখেছিল [illegible]। তাই আরো নিবিড়ভাবে সুলতাকে [illegible] ধরলাম বুকে।

কদিন সমীর ঘোষালের কাজের বিরাম ছিল না। সে [illegible] পুলকেশ খুন হবার [illegible] জাস্টিস মল্লিকের [illegible] সত্যিই উপস্থিত ছিলাম কিনা এ সম্বন্ধে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে তদন্ত করল সে। শুধু আমার [illegible] উপর নির্ভর না করে [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ছিল ঐ উপস্থিতি। [illegible] সর্বত্রই আমার উক্তির সমর্থন পেল সে [illegible] [illegible] না। তবে সে যে আমার সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত হয়ে বসে রইল তা নয়। আমার উপর তার যে সন্দেহ রয়েছে এটা মুখে প্রকাশ না করলেও তার ব্যবহারে প্রতিফলিত হতে লাগল। বসে রইল তা নয়। আমার উপর তার যে বিশ্বাস করত না ঠিকই [illegible] ধারণা ছিল আমার কাছ থেকে [illegible] [illegible] [illegible] রহস্য উদ্ঘাটনে বিশেষ সাহায্য করবে। সমীর ভাবছিল আমাকে যদি সে [illegible] করে একবার জেলে পুরতে পারে তাহলে তার উদ্দেশ্য সিদ্ধ করা শক্ত হবে না। নিজের গর্দান বাঁচাবার জন্যে আমি তখন অকপটে প্রকাশ করবো যা কিছু জানি। সত্য কথা বলতে কি, খুনের ব্যাপারে বিন্দুবিসর্গও জানতাম না আমি। পুলকেশকে কে খুন করেছে তা যেমন পুলিশ জানত না, তেমনি আমারও জানা ছিল না। আমি শুধু জানতাম, পুলকেশ ছিল এক ঘৃণ্য বিবেকহীন লম্পট মৃত্যুই যার উপযুক্ত শাস্তি।

বীরেশ সান্যালকেও রেহাই দিল না সমীর। তাকে একদিন পুলিশের সদর দপ্তরে ডেকে এনে জেরা করল এক ঘন্টা ধরে। বীরেশ স্বীকার করল, পুলকেশ যে তার প্রণয়পাত্রী রুবী নন্দীর পেছনে ঘুরত এটা সে জানত, কিন্তু সে এত নির্বোধ নয় যে ঐ সামান্য কারণে খুন করতে যাবে একজনকে। রুবীকে সে ভালবাসে ঠিকই, তবে সিনেমা স্টারদের ওপর অনেকের যে নজর থাকে তা কে না জানে? সে যদি রুবীকে ঠিকমতো খুশী করতে না পারে, তবে রুবী যে তার হাতছাড়া হবে এটা সে বিলক্ষণ জানে। তাছাড়া পুলকেশ যে সময় খুন হয় সেই সময় রুবীর শুটিং দেখছিল টালিগঞ্জের এক ফিলম স্টুডিওতে।

রুবী নন্দীকেও হাজির করা হল সমীর ঘোষালের সামনে। রুবী স্বীকার করল, পুলকেশের সঙ্গে তার পরিচয় ছিল। কিন্তু রীতিমতো চটে গিয়ে সে বললে, এত বড় বোকা মেয়ে সে নয় যে ঐ আধবুড়ো কুখ্যাত লম্পটটাকে প্রশ্রয় দিয়ে নিজের আখের নষ্ট করতে চাইবে।

খুনের কিনারা করতে না পেরে সমীর ঘোষাল অসহিষ্ণু হয়ে উঠল। আর তার ঐ অসহিষ্ণুতার ফলে রাগ জমতে লাগল তার মনে। ঐ সঞ্চিত ক্রোধের লক্ষ্যবস্তু যে আমি তা অনুমান করতে কষ্ট হল না আমার। অতি সাবধানে আমি চলতে লাগলাম, বিচার বিবেচনা না করে কোনো কাজেই এগোতাম না কি জানি যদি কোথাও সামান্য একটু ভুল করে বসি তাহলে আমার নিস্তার নেই। সমীরকে আমি জানতাম—ভালো করেই জানতাম। মেজাজ বিগড়ে গেলে ও সাংঘাতিক হয়ে ওঠে। কখন যে বিস্ফোরণ ঘটবে তা বলা কঠিন—অনেকটা টাইমবোমার মতো।

(তিন)

পুলকেশ খুন হবার ঠিক পাঁচদিন পরে একদিন সকালে মেয়েটি আমার অফিসঘরে এল। তখন দশটা বেজে পাঁচ সাত মিনিট। ড্রয়ার থেকে ফাইলপত্র বের করে কাজ শুরু করতে যাব এমন সময় দরজায় ধাক্কা দিয়ে ঘরে ঢুকল মেয়েটি। অনাহূতভাবে হঠাৎ ঘরে ঢুকে পড়ায় প্রথমটা একটু বিরক্ত হয়েছিলাম মেয়েটির উপর, ভেবেছিলাম ওকে বলবো বাইরে অপেক্ষা করতে। কিন্তু মুখ তুলে ওর পানে তাকাতেই চিনতে পারলাম ওকে। মেয়েটি আমার খুবই পরিচিত। নাম সুজাতা। একসময় আমাদের কলেজে [illegible] নিয়েছিল ভয়ানক একটা বিপদে পড়ে। লক্ষ্য করলাম ওর চোখে জল। অবাক

হয়ে আমি একদৃষ্টে তাকিয়ে রইলাম ওর মুখের দিকে। ওর মুখ বিবর্ণ, চোখের চাউনি মৃতের চোখের মত দীপ্তিহীন। ওকে আমি লক্ষ্য করছিলাম বটে, কিন্তু ওর ডান হাতে যে একটা ছোট রিভলবার ছিল তা আমার নজরে পড়েনি। হঠাৎ রিভলবারের নল থেকে এক ঝলক আগুন বেরিয়ে এল প্রচণ্ড বেগে এবং সঙ্গে-সঙ্গে সব কিছু মুছে গেল আমার চোখের সামনে থেকে।

মাথায় একটা তীব্র যাতনা অনুভব করছিলাম এবং মনে হল আমার গাল বেয়ে গড়িয়ে পড়ছে কি একটা তপ্ত তরল পদার্থ। হাত দিয়ে স্পর্শ করে দেখলাম, রক্ত। অন্ধের মতো মেয়েটির দিকে এক পা এগিয়েছিলাম এটা বেশ মনে আছে। তারপর মনে হল ঘরের মেঝেটা সরে গেল আমার পায়ের তলা থেকে এবং আমি এক বিরাট অতলস্পর্শী—গহ্বরের মধ্যে নিক্ষিপ্ত হলাম।

যখন আমার চেতনা ফিরে এল তখন অফিসঘরে ভীড় জমে গেছে। লক্ষ্য করলাম একপাশে লম্বা একখানা কৌচের উপর শুয়ে আছি আমি। ডাক্তার মৈত্র ঐ বাড়িরই নীচের তলায় যাঁর চেম্বার—উদ্বিগ্নমুখে ঝুঁকে রয়েছেন আমার মুখের উপর।

দেখলাম, ভীড়ের মধ্যে একজন পুলিশ সার্জেন্ট দাঁড়িয়ে রয়েছে। চার্টার্ড অ্যাকাউণ্ট্যান্ট পরেশ গাঙ্গুলীর ক্লার্ক গোবিন্দ তাকে বলছে, দুবার সে গুলির আওয়াজ শোনে তারপর আমার ঘরে ঢুকে দেখে, রক্তাক্তদেহে আমি পড়ে আছি মেঝের উপর।

গুলির আওয়াজ শোনার কতক্ষণ পরে সে আমার ঘরে প্রবেশ করে সেটা জানতে চাইলে সার্জেন্ট। গোবিন্দ তখনও ভয় ও উত্তেজনায় হাঁপাচ্ছে। বললে, 'আমাদের অফিসঘরটা হলের শেষপ্রান্তে, সম্ভবতঃ তিন চার মিনিট পরেই এ ঘরে ঢুকেছিলাম আমি। আওয়াজটা শুনে প্রথমে এমনি ঘাবড়ে গিয়েছিলাম যে নড়বার ক্ষমতা ছিল না আমার। তারপর যখন এদিকে এলাম তখন দেখি বিস্তর লোক জমা হয়েছে করিডরে। কোন্ কামরা থেকে যে গুলির আওয়াজটা এসেছে তা কেউই ঠিক করতে পারছে না। আমার মনে হল, অজয়বাবু যখন প্রাইভেট ডিটেকটিভ আর আওয়াজটা যখন এদিক থেকেই এসেছে তখন ওঁর চেম্বারেই হয়তো গুলিটা কেউ ছুঁড়েছে। সঙ্গে সঙ্গে আমি ঢুকে পড়লাম এ ঘরে, দেখলাম যা অনুমান করেছি ঠিক তাই।'

আমাকে চোখ মেলে তাকাতে দেখে গোবিন্দ খুশীমুখে এগিয়ে এল আমার দিকে। ডাক্তার মৈত্র আমাকে জিজ্ঞেস করলেন আমার কোন কষ্ট হচ্ছে কি না।

উঠে বসে হাত দিয়ে মাথাটা স্পর্শ করলাম। বললাম, 'না এমন কিছু নয়।'

ডাক্তার মৈত্র বললেন, 'কয়েক ঘন্টা আপনার মাথায় একটা যাতনা থাকবে, তবে ভয় পাবার কিছু নেই। দু-একদিনের মধ্যেই সব ঠিক হয়ে যাবে। আপনার ভাগটা ভাল। বুলেটটা আপনার মাথার চামড়া সামান্য স্পর্শ করে চলে গিয়েছে। আর ইঞ্চি নীচে দিয়ে যদি যেত তাহলে আপনার রক্ষা ছিল না।'

পুলিশ সার্জেন্ট এগিয়ে এসে আমায় জিজ্ঞেস করল, 'কে আপনাকে গুলি করল, অজয়বাবু?'

সার্জেন্ট আমার পরিচিত। একবার একটা কেসে ওর সাহায্য নিয়েছিলাম।

পকেট থেকে সিগারেট কেসটা বের করে একটা সিগারেট ধরালাম। সিগারেটের ধোঁয়া অত্যন্ত বিস্বাদ মনে হল। সার্জেন্টের দিকে তাকিয়ে বললাম, 'জানি না।' ইচ্ছে করেই সত্য গোপন করলাম।

'জানেন না?' সার্জেন্ট রীতিমত বিস্মিত হল।

আস্তে আস্তে আমি উঠে দাঁড়ালাম। হাঁটু দুটো একটু দুর্বল মনে হল, মাথার যাতনাটাও যেন ক্রমশঃ বাড়তে লাগল।

'বললাম তো জানি না। দরজার দিকে পিছন করে দাঁড়িয়েছিলাম, দরজা ঠেলে কে একজন ঘরে ঢুকল, তাকে দেখবার আগেই আমার দিকে দুবার গুলি ছুঁড়ে চম্পট দিল সে।'

গোবিন্দর দিকে ফিরে জিজ্ঞেস করলাম সে কাউকে আমার ঘর থেকে বেরিয়ে আসতে দেখেছে কিনা।

গোবিন্দ ঘাড় নাড়ল। অপর কেউ সে দেখেছে তাও মনে হল না। কেউই কোন উচ্চবাচ্য করল না। ভালোই হল। এমনটাই চাইছিলাম আমি।

সার্জেন্ট বললে, 'মনে হচ্ছে আপনার পার্টনার পুলকেশবাবুকে যে খুন করেছে সে-ই এসেছিল আপনাকে খুন করতে।'

'আশ্চর্য কিছু নয়,' মন্তব্য করলাম আমি।

'আমার বিশ্বাস মিস্টার ঘোষাল এ ব্যাপারটা জানবার জন্যে উদ্গ্রীব হয়ে আছেন। আপনার ফোনটা যদি একবার ব্যবহার করতে দেন তাহলে বড় সুবিধে হয়।' টেবিলের উপর রাখা টেলিফোনটার দিকে হাত তুলে দেখাল সে।

'স্বচ্ছন্দে ব্যবহার করতে পারো', জবাব দিলাম আমি।

মিনিট পনেরোর মধ্যেই সমীর ঘোষাল এসে হাজির হল। সঙ্গে প্রবীর। সার্জেন্টের কাছে যে কাহিনী বলেছি তারই পুনরাবৃত্তি করলাম ওদের কাছে। সমীর একটু শুষ্ক হাসি হাসল। আমার কথা ও যে মোটেই বিশ্বাস করেনি এটা ওর মুখভাবে স্পষ্ট হয়ে উঠল। বেশ একটু রেগে গিয়ে সে বললে, তুমি কী ভাবছ অজয়, তা বুঝতে পারছি না। মিথ্যে কথা বলার জায়গা পাওনি? এখন আমি বুঝতে পারছি পুলকেশের খুনের ব্যাপারটা তুমি জানো, কিন্তু কোনো কারণে তা চেপে যাচ্ছ। আমি তোমায় জানিয়ে দিতে চাই, তোমার এই লুকোচুরির খেলা চলবে না বেশী দিন। তোমাকে আমি খতম করে ছাড়বো।'

'খতম করতে চাও, বেশ তাই করো। এতে আমার পূর্ণ সমর্থন আছে। তুমি যে এরকম স্থূলবুদ্ধি এ আমার আগে জানা ছিল না।'

অযথা তর্ক না করে ধাক্কা দিয়ে দরজাটা খুলে বেরিয়ে এলাম আমি। রাগে গরগর করতে লাগল সমীর।

চার

রাস্তার ওধারে এক পরিচিত ডিস্পেনসারিতে ঢুকে ক্ষতস্থানে ওষুধ লাগিয়ে নিলাম। এক আউন্স ব্র্যান্ডিও জল মিশিয়ে গলাধঃকরণ করলাম। কিছুক্ষণের মধ্যেই শরীরটা বেশ চাঙ্গা হয়ে উঠল। মাথার যন্ত্রণাটাও কমে এল ধীরে ধীরে। এতক্ষণে গোবিন্দকে দুচার মিনিট জেরা করে সমীর ঘোষাল চলে গিয়েছে নিশ্চয়। হয়তো হেড কোয়ারটার্সে ফিরে প্রবীরের সঙ্গে মতলব আঁটছে আমায় কি করে জব্দ করবে। ওর যা খুশী ও করুক, তা নিয়ে মাথা ঘামাবার দরকার নেই আমার। সুজাতার কথাও মনে এল। সুজাতা আমাদের অফিসে এসেছিল বছর দুই আগে। বনেদী বংশের মেয়ে। লেখাপড়াও শিখেছে। কলকাতার এক মেয়ে স্কুলের শিক্ষিকা। ছোটবেলায় মা-বাবাকে হারিয়ে ও মানুষ হয় ওর মাসির কাছে। মারা যাবার সময় মাসি নগদ প্রায় লাখ খানেক টাকা দিয়ে যায় ওকে। দুর্ভাগ্যক্রমে এক ধনী লম্পটের চক্রান্তে ও জড়িয়ে পড়ে এক প্রতারণার কেসে। পুলকেশ আর আমি সেই বিপদ থেকে ওকে উদ্ধার করি অনেক কষ্টে। যতদূর আমি জানি, মেয়েটি সৎ ও শান্ত প্রকৃতির। ও যে কেন আমাকে খুন করতে চাইবে তা আমি কিছুতেই বুঝে উঠতে পারলাম না। মনে মনে সংকল্প করলাম, যেমন করেই হোক এ রহস্যের উদ্ঘাটন করতে হবে আর এ কাজে আমাকে লাগতে হবে এখনই।

অফিসে ফিরে এলাম আমি। পুরোনো ফাইল বের করে সুজাতার ঠিকানাটা টুকে নিলাম নোটবুকে। তারপর বাইরে এসে রাস্তায় দাঁড়-করানো আমার টু-সীটার মোটরে উঠে পড়লাম। দুচার মিনিট পরেই বুঝতে পারলাম আমার গাড়ির পিছু নিয়েছে পুলিসের একখানা জীপ। আড়চোখে দেখলাম, জীপের আরোহী পুলিসের গোয়েন্দা বিকাশ সমাদ্দার। বুঝতে দেরী হল না, সমীর ঘোষাল ওকে নির্দেশ দিয়েছে আমার গতিবিধি লক্ষ্য করবার জন্য। জোরে গাড়ি চালিয়ে পাঁচ মিনিটের মধ্যেই ওকে অনেক পিছনে ফেলে এগিয়ে চললাম নিউ আলিপুরের দিকে।

নিউ আলিপুরের 'বি' ব্লকে একখানা বাড়ির দোতলায় একটা ফ্ল্যাট ভাড়া নিয়ে থাকে সুজাতা। এ বাড়িতে বাস করে যারা, তারা যে পদমর্যাদায় ও আর্থিক সম্পদে সাধারণ মধ্যবিত্তদের অনেক উর্ধ্বে তা বুঝতে দেরী হয় না কারো। নীচতলায় দারোয়ানের কাছে খোঁজ করতে জানা গেল, মাস পাঁচেক

আগে সুজাতা ও বাড়ি ছেড়ে দিয়ে অন্যত্র চলে গিয়েছে। সুজাতার নতুন ঠিকানা সে জানে কিনা জিজ্ঞেস করলাম দারোয়ানকে। পকেট থেকে এক টুকরো কাগজ বের করে দারোয়ান বললে, যাবার সময় দিদিমণি তাঁর নতুন বাড়ির ঠিকানা রেখে গেছেন। যদি কেউ আসে তাঁর খোঁজে, তাকে পাঠিয়ে দেবার জন্য।

সুজাতার নতুন বাসার ঠিকানাটা নোট-বুকে লিখে নিয়ে ফিরে এলাম গাড়িতে।

মিনিট পনেরোর মধ্যেই ঢাকুরিয়ার এক সংকীর্ণ গলির মধ্যে ঢুকলাম। নম্বর দেখে বাড়ি ঠিক করলাম। এক পুরোনো ছোট্ট একতলা বাড়ি। সদর দরজা খোলাই ছিল। ভিতরে ঢুকে দেখলাম, মাত্র দুখানা মাঝারি সাইজের ঘর, মাঝখানে একটু খোলা জায়গা। একখানা ঘরে তৈজসপত্র সাজানো রয়েছে। রান্নাঘর বলেই মনে হল। অন্য ঘরটির দরজা ভেজানো। আস্তে আস্তে দরজায় টোকা মারলাম। ভিতর থেকে কোন আওয়াজ এল না। আবার দরজায় আঘাত করলাম। এবার বেশ একটু জোরে। তবু কোনো সাড়াশব্দ নেই। একটু ইতস্ততঃ করে আস্তে আস্তে দরজা ঠেলে ভিতরে ঢুকলাম।

ঘরের একপাশে জানালার ধারে খাটের উপর শুয়ে রয়েছে সুজাতা। পরনে ক্রাম-রঙের সেই শাড়ীটা যা পরে আমার অফিসে এসেছিল আমায় খুন করতে। চিত হয়ে শুয়েছিল সে। চোখ দুটো বোজা, মেক-আপ করা গালে চোখের জলের সুস্পষ্ট দাগ। বাঁ হাতটা বুকের উপর ন্যস্ত, ডান হাতটা রয়েছে পাশে, মুঠোর মধ্যে তখনও ধরে আছে ছোট্ট একটা ভিজে রুমাল। ওকে দেখে মনে হচ্ছিল যেন একটি ছোট্ট মেয়ে কাঁদতে কাঁদতে এক সময় ঘুমিয়ে পড়েছে। কিন্তু ও যে সত্যিই ঘুমোচ্ছিল তা নয়। ওর দেহ বরফের মতো ঠাণ্ডা, জীবনের কোনো লক্ষণই ছিল না তাতে।

খাটের কাছে ছোট্ট একটা টেবিলের উপর একটা খালি কাচের গ্লাস আর এক শিশি ঘুমের ওষুধও দেখতে পেলাম। শিশিটা তুলে নিয়ে দেখি তার অর্ধেক খালি। বুঝতে দেরী হল না কীভাবে সুজাতার মৃত্যু ঘটেছে।

খাটের কাছ থেকে সরে এসে ওপাশে ড্রেসিং ব্যুরোর কাছে গেলাম। ওর টপের উপরেই দেখতে পেলাম সুজাতার হ্যান্ড-ব্যাগটা তার ভিতরে অন্যান্য জিনিসের সঙ্গে অটোমেটিক পিস্তলটাও নজরে পড়ল। পিস্তলটা তুলে নিয়ে পরীক্ষা করে দেখলাম, দুটো শেল নেই।

ড্রেসিং ব্যুরোর উপরকার ড্রয়ারে ব্যাঙ্কের পাস বই পেলাম। পাস বই খুলে যা দেখলাম তা একটু আশ্চর্য রকমের। এক বছর আগে ব্যাঙ্কে জমা ছিল প্রায় পঞ্চাশ হাজার টাকা। এখন রয়েছে মাত্র দু' হাজার টাকা। প্রতি মাসেই চার হাজার টাকা তোলা হয়েছে আমানত থেকে।

পিস্তলটা হ্যান্ডব্যাগে পুরে, ব্যাঙ্কের পাস বইটা ড্রয়ারের মধ্যে যথাস্থানে রেখে চলে এলাম বাইরে। তারপর গাড়িতে উঠে ফিরে চললাম অফিসে।

অফিসে সুলেতা অপেক্ষা করছিল আমার জন্য। কে একজন অফিসে এসে আমায় খুন করার চেষ্টা করেছিল এ খবর পেয়ে ভয়ে সে একেবারে আধমরা হয়ে গেছে। তাকে আমি বোঝালাম, ভালোই আছি আমি এবং একজন বেয়ারাকে বললাম, সুলেতাকে সাবধানে বাড়ি পৌঁছে দেবার জন্য।

পুরোনো ফাইল বের করে আমার ও পুলকেশের পুরোনো মক্কেলদের বারো-জনের নাম ও ঠিকানা টুকে নিলাম নোটবুকে। তারপর বেরিয়ে পড়লাম অফিস থেকে।

সুজাতার ব্যাপারটা আমার কাছে অত্যন্ত রহস্যময় মনে হচ্ছিল। ঐ বারোজন মক্কেলের সঙ্গে দেখা করে নানা প্রশ্নের জবাবের মাধ্যমে যে তথ্যটুকু সংগ্রহ করলাম তাতে ঐ রহস্য উন্মোচনের সম্ভাবনা ঈষৎ উজ্জ্বল হল: বারোজন মক্কেলের মধ্যে তিনজন স্বীকার করল, বৎসরাধিক কাল তারা পুলকেশ ও অন্য একটি লোককে প্রতি মাসেই মোটা টাকা দিয়ে আসছে লোক নিন্দার ভয়ে। ওরা দুজন এদের শাসিয়েছিল, নিয়মিত ওদের টাকা না দিলে ওরা তাদের গোপন ব্যাপার ফাঁস করে দেবে। এই তিনজন মক্কেলই বললে, সে-দিন সকালে পুলকেশের সহযোগী অন্য লোকটি তাদের ফোন করেছিল টাকাটা তার বাড়ি পাঠিয়ে দেবার জন্য। তিনজন মক্কেলের মধ্যে মাত্র একজন অন্য লোকটিকে চেনে, কারণ কিছুকাল আগে পুলকেশকে সঙ্গে করে সে ওর কাছে একবার এসেছিল টাকার তাগাদা করতে। তার নামটাও ও জানে। এই অজ্ঞাত মহাপুরুষটি যে কে সে সম্বন্ধে আগে থেকেই আমার একটা অস্পষ্ট ধারণা ছিল। তাই নামটা শুনে একটুও আশ্চর্য হলাম না।

পাঁচ

ঘণ্টাখানেক নানা জায়গায় খোঁজাখুঁজি করে অবশেষে প্রবীরের দেখা পেলাম বালিগঞ্জে তার ফ্ল্যাটে।

আমায় দেখে একটু আশ্চর্য হল প্রবীর। সহাস্যে বললে, "এ যে দেখছি মেঘ না চাইতে জল! হঠাৎ কী মনে করে?"

একখানা চেয়ার টেনে নিয়ে বসলাম। তারপর সিগারেট ধরিয়ে আস্তে আস্তে ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে বললাম, "সুজাতা চক্রবর্তী নামে একটি মেয়ের ব্যাপারে এলাম এখানে।"

সুজাতার নামটা শুনেই মুহূর্তের জন্য প্রবীরের চোখে একটা আতঙ্ক ফুটে উঠল। আমার সামনে একখানা চেয়ারে বসে পড়ে বললে, "সুজাতা চক্রবর্তী? মেয়েটির নাম কোনোদিন শুনেছি বলে তো মনে পড়ে না।" তারপর একটা সিগার ধরিয়ে অলসভাবে আমার দিকে ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে বললে, "ওর ব্যাপারে আমার কাছে এলে কেন?"

"সুজাতা মারা গেছে", মৃদুকণ্ঠে বললাম আমি।

'মারা গেছে?' প্রবীর যেন একটু চমকে উঠল। ওর গলার আওয়াজটা যেন একটু শঙ্কাজড়িত।

'সুজাতা আত্মহত্যা করেছে।'

চিন্তান্বিত মুখে ঘন ঘন সিগারে টান দিতে লাগল প্রবীর। 'কত লোকই তো আত্মহত্যা করছে। আমাকে কী করতে হবে এখন? শোকযাত্রায় যোগ দিতে হবে কি?'

'ও আত্মহত্যা করেছে শুধু এই কারণে যে ওকে কেউ ভয় দেখিয়ে দীর্ঘকাল ধরে টাকা আদায় করে যাবে এটা ওর অসহ্য হয়ে পড়েছিল।' কণ্ঠস্বরে গাম্ভীর্য এনে বললাম আমি।

'ও!' নিরাসক্তভাবে বললে প্রবীর।

সিগারেটে শেষ টান দিয়ে ছুঁড়ে দিলাম অ্যাশ-ট্রের ওপর। তারপর চেয়ারে সোজা হয়ে বসে শান্ত গলায় বললাম, 'তুমি আর পুলকেশ—তোমরা দুজনে মিলে মেয়েটিকে দীর্ঘকাল ধরে শোষণ করে একেবারে নিঃস্ব করে দিয়েছিলে। পুলকেশ যখন খুন হল তখন মেয়েটি ভাবল, এবার বুঝি শোষণ থেকে মুক্তি পেল সে। সে জানত না এ ব্যাপারে ওর একজন অংশীদার ছিল। তার ধারণা ছিল, পুলকেশ একাই শোষণ করছিল তাকে। আজ সকালে তুমি যখন ফোন করলে তাকে, তখন সে জানতে পারল তুমিও আছ এ ব্যাপারের মধ্যে। তবে তুমি যে কে তা সে ধরতে পারেনি। সে অনুমান করল, যেহেতু পুলকেশ আমার পার্টনার ছিল, ঐ দ্বিতীয় ব্যক্তি আমিই। অনেক চিন্তাভাবনার পর সে স্থির করল এতকাল যে অন্যায় অত্যাচার সে নীরবে সহ্য করে এসেছে সেটাকে আর প্রশ্রয় না দিয়ে সে হত্যা করবে আমাকে। নিজেকে মুক্ত করার এ ছাড়া আর কোনো পথ সে দেখতে পেল না। আমার অফিসে এল সে এবং সে যা করবে স্থির করেছিল ঠিক তাই করল। আমাকে লক্ষ্য করে গুলি করল, ভাবল উদ্দেশ্য সফল হয়েছে তার। বাড়ি ফিরে এসে যখন সে বুঝতে পারল তার ঐ কৃতকর্মের ফল কী মারাত্মক হতে পারে তখন সে আত্মহত্যা করল ভয়ে ও নৈরাশ্যে।'

কয়েক মুহূর্ত চুপ করে আমার দিকে তাকিয়ে রইল প্রবীর। তারপর সহজ স্বাভাবিক গলায় বললে, 'তোমার গল্পটা খুবই ইনটারেস্টিং, অজয়; তবে কিনা প্রমাণ হাতে না করেই ঐসব আজগুবি গল্প বলে বেড়ানো বুদ্ধিমান পরিচায়ক নয় বলে আমি মনে করি। বিশেষ করে গল্পের সেই অংশটা যার মধ্যে আমাকে টেনে আনা হয়েছে।'

'প্রমাণ? প্রমাণ আছে বৈকি—বিশেষ করে সেই অংশটার যাতে তোমার ভূমিকা রয়েছে।' নিরুত্তাপ কণ্ঠে বললাম আমি।

আরেকটা সিগারেট ধরালাম। 'তোমার ও পুলকেশের শিকার হয়েছিল ক-জন তা

আমি ঠিক জানি না। আমি শুধু চারজনের নাম করতে পারি। সুজাতা চক্রবর্তী, মীনা গাঙ্গুলী, মিসেস মজুমদার আর মিসেস ঘটক—এরা সবাই একসময় আমার ও পুলকেশের ক্লায়েন্ট ছিল, সুজাতা মারা গেছে, বাকী তিনজনের দুজন পুলকেশের গোপন ভাগীদারের সংস্পর্শে আসেনি কোনদিন। কিন্তু তৃতীয়জনের সে সৌভাগ্য হয়েছে। সে নাম করেছে তোমার। শুধু তাই নয়, আমাকে সঙ্গে করে সমীরের কাছে গিয়ে সব কথা প্রকাশ করতে সে খুবই উৎসুক।'

উত্তেজিতভাবে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল প্রবীর। কুৎসিত ভাষায় গালি দিল আমাকে। তারপর চোখ রক্তবর্ণ করে বললে, 'তোমার মতলবটা কী? আমাকে জেলে দিতে চাও?'

আস্তে-আস্তে আমিও চেয়ার থেকে উঠলাম। শান্ত গলায় বললাম, 'জেলে যাবার কাজ যদি করে থাকো, জেলে যাবে বৈকি।'

রাগে উত্তেজনায় দুহাত মুষ্টিবদ্ধ করে এগিয়ে এল প্রবীর।

এক পা পিছিয়ে গেলাম আমি। 'আমায় তুমি ভয় দেখাবার চেষ্টা করো না, প্রবীর। তুমি যদি বল প্রয়োগ করো, আমি তার উত্তর দিতে জানি। গল্পের শেষটুকু তোমাকে বলা হয়নি এখনও। মানে পুল-কেশের হত্যা সংক্রান্ত অংশটা।' পকেটে ডান হাতটা ঢুকিয়ে চেপে রইলাম রিভলবারটা।

'পুলকেশের হত্যার সঙ্গে আমার

সম্পর্ক কী?' গর্জে উঠল প্রবীর। তার কপালে ঘাম জমতে শুরু হল।

'সম্পর্ক আছে বৈকি; এ ব্যাপারটা নিয়ে বেশ একটু চিন্তা করেছি আমি। পুলকেশকে খুন করেছে দুটো পার্টির একটা। পুলকেশ যাদের কাছ থেকে ভয় দেখিয়ে টাকা আদায় করত তারা হল এক নম্বর পার্টি। সুজাতা যে ওকে খুন করেনি তা আমি জানি। পুলকেশকে খুন করা হয়েছে -৩৮ ক্যালিবারের রিভলবার দিয়ে। সুজাতার কাছে যে রিভলবার ছিল সেটা -২৫ ক্যালিবারের। মীনা গাঙ্গুলী, মিসেস মজুমদার বা মিসেস ঘোষ—এদের কেউ যে পুলকেশকে খুন করেনি সেটাও সহজে অনুমান করা যায়, কারণ ওদের মধ্যে কেউ যদি খুন করে থাকতো, তাহলে পুলকেশ যে তাকে ব্ল্যাকমেল করেছে একথা আমার কাছে স্বীকার করে বিপন্ন করত না নিজেকে। ঐ চারজন ছাড়া আরও কয়েকটা শিকার হয়তো জুটিয়েছিলে তোমরা—যাদের নাম আমার জানা নেই। তাদের কেউ অবশ্য খুন করে থাকতে পারে। এ সম্ভাবনা যে নেই তা আমি বলি না।

দু' নম্বর পার্টি হলে তুমি, প্রবীর। কেন তুমি পুলকেশকে খুন করলে তা আমি জানি না। হয়তো ঝগড়া হয়েছিল তোমাদের কোনো ব্যাপার নিয়ে: হয়তো একজন অপরকে ফাঁকি দেবার চেষ্টা করেছিল। কিন্তু কারণ যাই হোক না কেন, আমার দৃঢ় ধারণা তুমিই ঐ ব্যাপারে প্রথমে জড়াবার চেষ্টা করেছিলে আমাকে এবং তার পর বীরেশ সান্যালকে।

তোমার বিরুদ্ধে অবশ্য এখনও তেমন কোন বিশ্বাসযোগ্য প্রমাণ পাওয়া যায়নি, তবে প্রমাণ সংগ্রহ করার পথ রয়েছে অনেক। দৃষ্টান্তস্বরূপ ধরা যাক, পুলকেশকে যে রিভলবার দিয়ে খুন করা হয়েছে সেই রিভলবারের ব্যাপারটা:

রিভলবারটা পাওয়া যায়নি। হয়তো তুমি ওটা ইতিমধ্যে বিক্রি করে ফেলেছ। হয়তো বা তুমি ওটা কাছেই রেখে দিয়েছ, বিক্রি করতে ভরসা পাওনি। কারণ ওটা হয়তো রেজিস্ট্রি করা হয়েছিল তোমার নামে এবং দৈবাৎ যদি ওটা কোথাও দেখতে পাওয়া যায় তাহলে তোমার শাস্তি অনিবার্য। এর পর অ্যালিবাই-এর প্রশ্ন আসতে পারে। যে সময় পুলকেশ খুন হয় সেই সময় ঘটনাস্থলে তুমি যে ছিলে না এটা দেখাবার ব্যবস্থা হয়তো তুমি করে রেখেছ, কিন্তু জেনো মিথ্যা গল্প বানিয়ে পুলিশকে ধোঁকা দেওয়া যায় না, বিশেষ করে সমীর ঘোষালের মতো ধুরন্ধর পুলিশ অফিসারকে। জানি সমীর তোমার আত্মীয়, কিন্তু ওকে যতদূর জানি, আত্মীয়তার সম্পর্ক ওকে কর্তব্যচ্যুত করতে পারবে না।'

বক্তব্য শেষ করে পা বাড়ালাম দরজার দিকে। দরজার কাছে এসে ঘুরে দাঁড়ালাম আস্তে-আস্তে। আমি যে কর্তব্যসাধনে কৃতসংকল্প এটা প্রবীরকে জানিয়ে দেওয়া দরকার।

'সমীরের কাছে চললাম আমি। সব কথা জানাবো ওকে। হয়তো খুনের অপরাধে তোমাকে অভিযুক্ত করতে পারবে না সে। তুমি হয়তো যথাসম্ভব সতর্কতার সংগে নিজেকে বাঁচিয়ে রেখেছ সেদিক থেকে। কিন্তু এটা নিশ্চিত যে, আমার এক পুরোনো ক্লায়েন্ট-এর সাক্ষ্যের সাহায্যে সে তোমায় গ্রেপ্তার করতে পারবে ব্ল্যাকমেলের অপরাধে। কাজেই তুমি যদি ফাঁসির দড়ি থেকে নিষ্কৃতি পাও, জেলে তোমায় পচতেই হবে।'

প্রবীর কি যেন বলবার চেষ্টা করল, কিন্তু তার কথায় কান না দিয়ে দরজা খুলে বেরিয়ে গেলাম আমি।

আমার মোটরটা দাঁড় করানো ছিল সামনের রাস্তার ওপর। সেদিকে যখন চলেছি তখন ওখান থেকে প্রায় পঞ্চাশ গজ দূরে দাঁড়-করানো আরেকখানা মোটরের ওপর নজর পড়ল আমার। গাড়িখানা চিনতে দেরী হল না, গাড়ির চালককেও চিনতে পারলাম। দেখলাম, বিকাশ সমাদ্দার আমার পিছু ছাড়েনি—যদিও ঘণ্টা কয়েক আগে ওর দৃষ্টির বাইরে চলে গিয়েছিলাম দ্রুত গাড়ি চালিয়ে। লক্ষ্য করলাম মোটরের দরজা খুলে বিকাশ বেরিয়ে আসার উদ্যোগ করছে। হঠাৎ পিছনে কার পায়ের আওয়াজ পেলাম। ঘাড় ঘুরিয়ে দেখি প্রবীর এগিয়ে আসছে আমার দিকে। তার দুই হাত কোটের দুই পকেটের মধ্যে, মুখের চেহারা বীভৎস।

'সমীরের কাছে যাবে মনে করেছ? ওখানে যাওয়া তোমার হবে না।' ওর গলার আওয়াজটা বিকৃত—'ওর কাছে যাওয়া কোনোদিনই ঘটবে না তোমার।'

হাতটা পকেটে ভরতে যাচ্ছিলাম রিভলবারটার সন্ধানে।

'খবরদার!' গর্জন করে উঠল প্রবীর, 'আমারও পকেটে রিভলবার রয়েছে। যদি কোনরকম চালাকি করো, এখনই গুলি করে মাথার খুলিটা উড়িয়ে দেবো।'

'তাহলে কি আমি ধরে নেবো তুমিই খুন করেছ পুলকেশকে?'

'চুপ করো বেয়াদব। ভালো মানুষের মতো গাড়িতে গিয়ে উঠে বসো। আমি যেখানে বলবো, সেখানে নিয়ে চল আমায়।'

আস্তে আস্তে গাড়িতে উঠলাম। আড়চোখে লক্ষ্য করলাম। বিকাশ এগিয়ে আসছে আমাদের দিকে। প্রবীরও লক্ষ্য করল তাকে। একবার সে তাকায় আমার দিকে, একবার তাকায় বিকাশের দিকে। তার এই ভুলের সুযোগ নিলাম আমি। চট্ করে পকেটে হাত ঢুকিয়ে রিভলবারটা বাগিয়ে ধরলাম শক্ত করে। তারপর গাড়ি থেকে লাফিয়ে পড়লাম প্রবীরের সামনে।

'হুঁশিয়ার, বিকাশ। চট্ করে তৈরী হয়ে নাও।' চেঁচিয়ে বললাম আমি।

প্রবীর আমাদের দিকে তাকাল উদ্‌ভ্রান্তের মতো। তারপর ভয়ংকর একটা চীৎকার করে বেপরোয়াভাবে গুলি চালাতে লাগল আমাদের দুজনকে লক্ষ্য করে। বিকাশ হতচকিত। একটা গুলি এসে লাগল তার বাঁ কাঁধে, আরেকটা আমার পায়ে। আমরাও নিষ্ক্রিয় হয়ে রইলাম না। গুলির জবাব দিলাম গুলিতে। দু' এক মিনিট পরেই প্রবীরের রক্তাক্ত দেহ লুটিয়ে পড়ল রাস্তার উপর।

পায়ের যন্ত্রণায় আমি বসে পড়েছিলাম মাটিতে। আস্তে আস্তে উঠে দাঁড়িয়ে এগিয়ে গেলাম প্রবীরের দিকে। তিনটে গুলি লেগেছে ওর গায়ে। জ্ঞান হারিয়েছে প্রবীর, মরেনি। ওর ডান হাতের কাছে পড়ে রয়েছে ওর রিভলবারটা। পরীক্ষা করে দেখলাম, ওটা '৩৮ ক্যালিবারের রিভলবার।

বাঁ কাঁধটা রুমাল দিয়ে চেপে ধরে বিকাশ গালমন্দ করছে প্রবীরের দিকে তাকিয়ে। ওকে আমি জিজ্ঞেস করলাম আঘাতটা গুরুতর কিনা। বিকাশ জানাল, তেমন গুরুতর নয়।

ঐ ঘটনার পর দুদিন বেঁচেছিল প্রবীর। পরীক্ষায় জানা গেল, ওরই রিভলবারের গুলিতে পুলকেশের মৃত্যু ঘটে। খবরটা প্রবীরকে জানানো হলে সব কিছুই সে সমীরের কাছে স্বীকার করল মরবার কিছুক্ষণ আগে। সে বললে, পুলকেশ একজনের কাছে ব্ল্যাকমেলের টাকা আদায় করে তাকে ভাগ দিতে অস্বীকার করে, এ নিয়ে দুজনের মধ্যে ঝগড়া বাধে, প্রথমে হয় ঘুসোঘুসি, তারপর দুজনেই চালায় রিভলবার, ফলে পুলকেশের মৃত্যু ব্যাপারটা এমন কিছু জটিল নয়।

অঙ্গনা

পথ কি—পথ কই?

সন্দেহ ছিল। আশংকাও কম ছিল না। কিন্তু সব সন্দেহ এবং আশংকাকে অমূলক প্রতিপন্ন করে সবগুলি পরীক্ষা যথারীতি অনুষ্ঠিত হয়েছে। দুরুদুরু বুকে সবাই এবার রেজাল্টের অপেক্ষা করছিল। রেজাল্টও বেরিয়ে গেছে। ফলাফলে দেখা গেল মেয়েদের জয়জয়কার। হায়ার সেকেন্ডারী পরীক্ষায় প্রথম দুটি স্থানই মেয়েদের দখলে। কৃতিত্বের দিক থেকে একে নয়া নজির বলা চলে। কয়েক বছর আগে একটি মেয়ে হায়ার সেকেন্ডারীতে প্রথম স্থান অধিকার করে সাফল্যের নয়া ভিৎ স্থাপন করে। সেই ভিতে এবার সুদৃঢ় ইমারত গড়েছে ইন্দ্রাণী এবং অরুন্ধতী। প্রথম এবং দ্বিতীয় স্থানের অধিকারী ওরা। দুজনে একই স্কুলে পড়াশোনা করেছে। স্কুলের পরীক্ষায় প্রথম দুটি স্থান সবসময় ওদের দখলেই থাকতো। এক বছর ইন্দ্রাণী প্রথম তো অন্য বছর অরুন্ধতী। এমনিভাবে পরস্পর পরস্পরের কাঁধে হাত রেখে ওরা এগুচ্ছিল পাশাপাশি। জীবনের সর্বপ্রথম পাবলিক এক্সামিনেশনেও ওদের পাশাপাশি অবস্থান অক্ষুণ্ণ রইলো।

ইন্দ্রাণী এবং অরুন্ধতী শুধু একই স্কুলের পড়ুয়া নয়, বাড়িও ওদের পাশাপাশি। আবার ভবিষ্যৎ জীবনের প্রস্তুতি উপলক্ষ্যেও ওরা একই জায়গায় সমবেত হয়েছে। দুজনেই ভর্তি হয়েছে খড়্গপুর আই. আই. টিতে। এবার পথ অবশ্য একটু স্বতন্ত্র। ইন্দ্রাণী ম্যাথমেটিকসে অনার্স নিয়েছে আর অরুন্ধতী ভর্তি হয়েছে ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনীয়ারিং-এ। হায়ার সেকেন্ডারীতে দুজনেই চারটি বিষয়ে লেটার পেয়েছে।

হায়ার সেকেন্ডারীতে সাফল্যের সূচনা মাত্র বলা চলে। দু'একদিনের ব্যবধানেই প্রি-ইউনিভার্সিটির রেজাল্ট বেরোয়। এই পরীক্ষায়ও মেয়েদের সামনে ছেলেরা পিছু হটেছে। আর্টস এবং সায়েন্স এই দুই বিভাগেই প্রথম হয়েছে মেয়েরা। পি, কে, বালা এবং এন, কে, জয়লক্ষ্মী এগিয়ে এসেছে সাফল্যের এই ধারা অক্ষুণ্ণ রাখতে। প্রথম দুটি স্থান যেমন ওরা দুজন দখল করেছে তেমনি আরো সহযোগী এগিয়ে এসেছে নিজ নিজ যোগ্যতার পরিচয় বহন করে। এই সার্বিক যোগ্যতার যোগফলে দেখা যায় যে, আর্টসে সাতটি এবং সায়েন্সে চারটি স্থান ওরা দখল করেছে। হায়ার সেকেন্ডারী এবং প্রি-ইউনিভার্সিটি পরীক্ষায় সাফল্যের কৃতিত্ব আরো উজ্জ্বল হবে অন্যান্য পরীক্ষায়। কারণ, এখনো অনেক পরীক্ষার রেজাল্ট বেরুতে বাকি।

এবার আর একটি জরুরী সমস্যার দিকে নজর দেয়া যাক। এই সমস্যা কলকাতা শহরে যতটা তীব্র মফস্বলে ততটা নয়। স্কুল থেকে পাশ করে বেরুনোর পর অনেকেই কলকাতায় এসে পড়াশোনা করতে চায়। কিন্তু কলকাতা শহর দরাজ হস্তে সে সুযোগটুকু সবাইকে দিতে রাজি নয়। নানা কারণে এবার সমস্যার তীব্রতা সেরকম উপলব্ধি করা যাচ্ছে না কিন্তু আমাদের প্রতি বছরের অভিজ্ঞতায় যে তিক্ততা সঞ্চিত আছে তা থেকে একথা কারো অজানা নেই যে কলেজে সীট পাওয়া কি শক্ত ব্যাপার। আগে আগে এই সমস্যা এতটা তীব্র ছিল না। দিনে দিনে সব ক্রমবর্ধমান সমস্যার মতো এটিও আমাদের নাকানিচোবানি খাওয়াচ্ছে কম নয়। একটু দেরি হলে তো কোন কথাই নেই যথাসময়ে হাজিরা দিয়েও সীট না পেয়ে অনেককে মলিন মুখে ফিরে যেতে হয়েছে কলেজের দোরগোড়া থেকে।

সীট পাওয়া নিয়েই কিন্তু সমস্যা মিটে যায় না। আর একটি গুরুতর সমস্যা হলো হোস্টেল নিয়ে। বিশেষ, মেয়েদের প্রায়ই এই সমস্যায় ভুগতে হয়। কলেজে সীট পাওয়া গেল তো হোস্টেল বিমুখ করলো। কলকাতার অনেক কলেজে মেয়েদের জন্য আলাদা পড়বার ব্যবস্থা আছে কিন্তু থাকবার ব্যবস্থা কলেজ কর্তৃপক্ষ করেন না। কো-এডুকেশন কলেজগুলিতেও মেয়েদের হোস্টেলের ব্যবস্থা আছে বলে জানি না। এর অর্থ দাঁড়ায় এরকম, তুমি বাইরে থেকে এসেছ তাই দয়াপরবশ হয়ে তোমাকে কলেজে সীট দিয়েছি তা বলে থাকার ব্যবস্থা করতে পারবো না। ওটুকু নিজেকে করে নিতে হবে। কলকাতা শহরে এই থাকার ব্যবস্থা করে নেওয়া যে কি দুঃসাধ্য ব্যাপার সে কথা আমাদের কারো অজানা নয়।

আসল কথা হলো যে মেয়েদের হোস্টেলের ব্যাপারে যথাযথ গুরুত্ব দিয়ে ভাববার প্রয়োজনীয়তা এতদিন কেউ উপলব্ধি করেননি। অথচ কলেজে ভর্তি হয়ে হোস্টেলে সীট না পেয়ে যে কি বিপাকে পড়তে হয় সেকথা একমাত্র ভুক্তভোগী মাত্রেই জানে। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে কয়েকটি হোস্টেল অবশ্য আছে। প্রয়োজনের তুলনায় তার সংখ্যাল্পতার কথা বলাই বাহুল্য। এসব হোস্টেলে সীট পাওয়ার জন্য মেয়েদের মধ্যে কাড়াকাড়ি পড়ে যায়। এই দুর্ভোগের কাহিনী সবারই জানা, কিন্তু কার্যকরী ব্যবস্থা তেমন গ্রহণ করা হয় না। অথচ শুনেছি যে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক মেয়েদের কয়েকটি নতুন হোস্টেলের জন্য অর্থ বরাদ্দ করা আছে অথচ কাজে লাগানোর কোন ব্যবস্থা আজো হচ্ছে না। আর এ ব্যাপারে শুধু একা বিশ্ববিদ্যালয় দায়ী নয় প্রতিটি কলেজও সমানভাবে দায়ী। প্রত্যেক কলেজের উচিত মেয়েদের জন্য স্বতন্ত্র হোস্টেলের ব্যবস্থা করা। কো-এডুকেশন কলেজগুলির দায়িত্ব এ ব্যাপারে সমধিক। সবাই এগিয়ে এলে কলকাতায় পড়তে-আসা মেয়েরা অনেক দুর্গতির হাত থেকে রেহাই পায়। এ ব্যাপারে আর কোন বিলম্ব করা চলে না।

কিন্তু সমস্যা তো একটা নয়। হাজারো সমস্যা লাইন দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। কলেজে সীট জোগাড় করে হোস্টেলের সমস্যা পাশ কাটিয়ে না হয় বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রি নিয়ে বেরুনো গেল কিন্তু তারপর তো নিঃসীম অন্ধকার। চাকরি পাওয়া খুব সহজ ব্যাপার নয়। বিশেষ, যে দেশে এখনো অনেকের ধারণা যে মেয়েরা চাকরি করতে আসা মানেই একটি ছেলেকে বঞ্চিত করা। তাঁদের এহেন ধারণার কারণ যে, বিয়ের পর তো আর চাকরির দরকার হয় না মেয়েদের। সুতরাং স্বল্প সময়ের জন্য চাকরি করতে না এসে বরং চাকরির চেষ্টা থেকে মেয়েদের বিরত থাকাই ভাল। কিন্তু ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতায় আজকাল অনেকেই জানেন যে, এই ধারণাটি একান্তই ভ্রমাত্মক। অবশ্য বিয়ের পর যে কোন মেয়ে চাকরি ছাড়ে না এমন নয়। দু'একজন তো ছাড়তেই পারে। কিন্তু চাকুরিজীবী অধিকাংশ মেয়ের ক্ষেত্রে একথাটি খাটে না। বিভিন্ন জীবিকায় নিযুক্ত একাধিক মেয়ের সংস্পর্শে এসে আমি এই অভিজ্ঞতা লাভ করেছি যে বিয়ের পর চাকরি তো কেউ ছাড়েই না বরং যারা বিয়ের আগে চাকরি করতো না তাদের কেউ কেউ চাকরির সন্ধান করে।

কে একজন কথাপ্রসঙ্গে বলেছিলেন যে, যে দেশে চাকরি পাওয়া এতো কঠিন ব্যাপার সে দেশে ডিগ্রির বদলে হাতে হাতে অ্যাপয়েন্টমেন্ট লেটার তুলে দিলে অনেক সুবিধা হয়। কথাটা এমন সত্যি যে, পাশ করে বেরিয়ে চাকরির চেষ্টা করতে গিয়ে হাড়ে হাড়ে টের পাওয়া যায়। চাকরি পাওয়া আর ভগবানের দেখা পাওয়া একই রকম। দুইই দুর্নিরীক্ষ্য। হাঁটিতে হাঁটিতে আর ধর্ণা দিতে দিতে জান বেরিয়ে যাওয়ার উপক্রম কিন্তু চাকরির দেখা মেলে না। একটা চাকরির খবর পাওয়া গেলে কয়েক হাজারের ভিড় হয়। সে চাপ থেকে নিজেকে সুস্থ দেহে ফিরিয়ে নিয়ে আসাই এক সমস্যা হয়ে দাঁড়ায়। এই ভিড়ের মধ্যে কার ভাগ্যে যে শিকে ছিঁড়বে কে জানে? যে বা যারা চাকরি পেল তারা ভাগ্যবান। তাদের ভাগ্যকে ঈর্ষা করতে করতে বাদবাকি সবাই নতুন চাকরির চেষ্টা দেখে।

কিন্তু চাকরির ভরসায় আজ আর বসে থাকা যাচ্ছে না। না ছেলে না মেয়ে। কেউ চাকরির স্বপ্নে নিশ্চিন্ত বিলাসে কাটাতে সাহস পাচ্ছে না। তাই ছেলেদের দেখাদেখি মেয়েরাও পথে নেমে পড়েছে। নিজেদের পথ তারা নিজেরাই করে নিতে চায়। ছড়ানো-ছিটানো নানা জীবিকায় তারা নিজেদের জায়গা করে নিচ্ছে। হকার্স কর্ণারে স্টল নিয়ে ভাগ্যপরীক্ষায় তারা অনেক আগেই নেমে এসেছে। ফুটপাথেও তাদের অনেককেই এখন দেখা যায়। কিন্তু যেটা দেখা যেতো না তা হলো পুজোর ভিড়ে ফুটপাথে পশরা সাজিয়ে বসতে তারা ঠিক ভরসা পাচ্ছিল না। এবারের পুজোয় সে সংকোচও কেটে গেছে। এই কলকাতা শহরের কোন এক জনবহুল ফুটপাথে তারা এবার বসে পড়েছে। আশে-পাশে অসংখ্য পুরুষ প্রতিযোগী। সবাই বসেছে পুজোর আসল আকর্ষণ জামাকাপড় নিয়ে। ওরা কিন্তু সেদিক দিয়ে যায়নি। ওরা নজর দিয়েছে মেয়েদের দরকারী জিনিসপত্রের দিকে। নানা কাচের জিনিস, হার আর মালা নিয়ে ওদের ছোট ছোট দোকান। বাঙালী মেয়ে পুজোর মরশুমে নিজের ব্যবস্থা নিজে করে নেওয়ার উদ্যোগকে স্বাগত জানাতে অনেক ক্রেতাই সাগ্রহে এগিয়ে আসছেন।

এরকম দুটি দোকান দেখা গেছে। একই অঞ্চলে। ওরা দুজনেই শিক্ষিত অর্থাৎ চাকরি পাওয়ার যোগ্যতা অর্জন করেছে। কিন্তু চাকরি পায়নি। চেষ্টা চরিত্র কম করেনি। ধরাকরা করতে করতে প্রাণ ওষ্ঠাগত তবু কোন ব্যবস্থা হয়নি। এদিকে বাড়ির চাপ বাড়ছে। কজনের বাড়ির অবস্থা আর স্বচ্ছল? চাকরির যোগ্য ছেলে বা মেয়ে তা সে যেই হোক কেউ বসিয়ে খাওয়াতে পারে না। এতদিন ধরে লেখাপড়া শেখানোর পর সবাই আশা করে যে এবার ওরা রোজগার করবে, সংসার স্বচ্ছল হবে। কিন্তু দিনের পর দিন সবাই সে আশায় হতাশ হচ্ছেন। চাকরি নেই। সংসারের দৈন্য ঘুচছে না। উপরন্তু উপযুক্ত ছেলেমেয়ে সংসারের বোঝা বাড়াচ্ছে। বাড়ির সবাইকে ক্ষণিক স্বস্তি দেবার উদ্দেশ্য নিয়েই ওরা এই দুঃসাহসে পাড়ি জমিয়েছে। সেই সঙ্গে নিজের ব্যবস্থা করে নেওয়ার সদিচ্ছা তো আছেই। ফুটপাথে বসতে বসতে ভবিষ্যতে যদি একটা দোকানের ব্যবস্থা করে নেওয়া যায়।

উদ্দেশ্য ভালো। উদ্যোগ আরও প্রশংসনীয়। কিন্তু এ পথে কি সমস্যার সমাধান হবে? জড়তা এবং সংকোচ কাটিয়ে যারা ফুটপাথ আশ্রয় করে নতুনভাবে বাঁচার স্বপ্ন দেখছে তাদের না হতাশ হতে হয়? কারণ, এবারই তো অনেক ফুটপাথ-দোকানের কাছে একটা কথা বারবার শুনেছি খরিদ্দারের চেয়ে বেচবার লোক বেশি এই যদি অবস্থা হয় তা ওদের সকল আশা অচিরেই শুকিয়ে যাবে। ওরা টিঁকে থাকলেও ওদের কথা শুনে যারা উৎসাহিত হবে তাদের হাল কি হবে? পুজোর আনন্দ উৎসবের রেশ না মিলোতে মিলোতেই সেই জ্বলজ্বলে প্রশ্নটা আবার ঘুরেফিরে বিরাট জিজ্ঞাসাবোধক চিহ্ন হয়ে চোখের সামনে দাপাদাপি শুরু করেছে, এই ক্রমবর্ধমান সমস্যা সমাধানের পথ কি? **প্রমীলা**

প্রিয়ংবদা দেবী ১৮৭১-১৯৭১

দীপন চট্টোপাধ্যায়

রবীন্দ্রনাথের প্রতিভা যখন সাহিত্য গগনের সর্বশেষ সীমারেখা পর্যন্ত উদ্ভাসিত সেই সময় আবির্ভূতা হন প্রিয়ংবদা দেবী। রবিরশ্মির চারপাশে তিনি একটি সূর্যমন্ডল রচনায় ব্রতী হন। অসামান্য প্রতিভা না থাকলেও আন্তরিকতা এবং সারল্যের জন্য অবশ্যই তাঁকে অভিনন্দন জানাতে হয়।

একটি প্রায়বিস্মৃত নাম : প্রিয়ংবদা দেবী। তাই বোধহয় তিনি অবহেলিত। বাংলা সাহিত্যের সুবৃহৎ ইতিহাসে সমালোচকরা কেউ কেউ তাঁর নামটি শুধুই উল্লেখ করেছেন। তাঁর সম্পর্কে কিছুই লেখেননি। আমরাও কিছু জানতে পারি নি। তাই শতবর্ষের আলোকে প্রিয়ংবদা দেবী আলোকিত হন নি। ব্যক্তিগত জীবনের নৈরাশ্যের অন্ধকারের মতই সহৃদয় পাঠকের অন্তরাল থেকে বিস্মৃতির অতল গহ্বরে বিলীন হয়েছেন।

প্রিয়ংবদা দেবীর জন্ম ১৮৭১ খৃষ্টাব্দে। পূর্ব বাংলার অন্তর্গত পাবনার গুনাই-গাছাতে তাঁর জন্ম হয়। অশান্ত জলকল্লোলে তিনি কৃষ্ণনগরে এসে শান্তির নিঃশ্বাস ফেলেন। নতুন জীবন শুরু হয়। মাতামহ ছিলেন ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট। নাম দুর্গাদাস চৌধুরী। তাঁরই প্রচেষ্টায় কৃষ্ণনগর বালিকা বিদ্যালয়ে তাঁর শিক্ষাজীবন শুরু হয়। এই কিশোরী বালিকার ভাসা-ভাসা চোখে ছিল সজল কবিত্ব। স্কুল পত্রিকায় তাঁর কবিতাই ছিল উত্তরকালের প্রদীপ্ত প্রতিশ্রুতি। আবার পালাবদলের নাটক শুরু হয়। ১৮৮৮তে প্রবেশিকা উত্তীর্ণ হন। এর পর এফ-এ পরীক্ষাও পাশ করেন দু বছর পরে। ১৮৮২ থেকেই বেথুন স্কুলে তাঁর শিক্ষাজীবন কবিত্বের মোড় ঘুরিয়ে দেয়। শহরের কংক্রিটের উপশিরায় তাঁর কাব্যস্রোত প্রবাহিত হচ্ছিল। স্নাতক মানে অধ্যয়নের সময় তাঁর কবিত্ব-শক্তি সুচারুভাবে বিকশিত হচ্ছিল। এর পর তিনি গ্রাজুয়েট হন। সে যুগে মহিলা স্নাতক ছিল না বললেই হয়। ১৮৯২তে স্নাতক হন এবং সংস্কৃতে বিশেষ কৃতিত্বের স্বীকৃতিতে তিনি রৌপ্যপদক বিজয়ী হন। এই তাঁর জীবনের প্রথম পুরস্কার।

প্রিয়ংবদা দেবীর জীবননাট্যের দ্বিতীয় অঙ্ক শুরু হয় ১৮৯২তে। ছোটখাট পত্রিকায় তখন লেখার ডাক আসছে। আত্ম-প্রতিষ্ঠার জন্য মহিলা কবিও খুব সচেতন। তবু সুযোগ-সুবিধা প্রথম দিকে পান নি। অক্লান্ত নিষ্ঠা নিয়ে আর অপরিসীম অধ্যবসায় নিয়ে প্রিয়ংবদা দেবী এগিয়ে চললেন। এই সময় হঠাৎ তাঁরি বিবাহ হয় মধ্যপ্রদেশের এক সুখ্যাত ব্যবহারজীবীর সঙ্গে। তাঁর নাম তারাদাশ বন্দ্যোপাধ্যায়। প্রিয়ংবদা বাগচীর নাম এই সময় বদলে যায়। এর পর কবিতাগুলি 'দেবী' নামে প্রকাশিত হয়। তাঁর দাম্পত্য জীবন খুবই অল্প সময় স্থায়ী ছিল। ১৮৯৪-তে পুত্র তারাকুমার জন্মায় এবং পরের বছর স্বামীর মৃত্যু হয়। কিছু দিন পরে তাঁর একমাত্র সন্তানও মৃত্যুমুখে পতিত হয়। এত শোক তিনি সহ্য করতে পারেন নি। ফলে কাব্যের মধ্যে এর ছাপ পড়ে। অধিকাংশ কবিতাই শোকগীতি হয়।

তাঁর জীবনের এই দুর্ঘটনার জন্য কাব্যের মধ্যে একটি করুণ সুর প্রকাশিত হয়। একটি 'ট্র্যাজিক' অনুভূতি কাব্যে প্রলম্বিত হয়।

কাব্যরচনার অনুপ্রেরণা প্রিয়ংবদা দেবী মাতা প্রসন্নময়ী দেবীর কাছ থেকেই পেয়েছিলেন। মাতা ছিলেন তাৎকালিক সুখ্যাত 'বনলতা'র রচয়িতা। মায়ের কাছ থেকেই তাঁর কাব্যপ্রেরণা হয়েছিল; আবার পিতা কৃষ্ণকুমার বাগচীও তাঁকে যথেষ্ট উৎসাহ দিয়েছিলেন। তিনি প্রথমে পিতামাতার প্রভাবে কিছু আধ্যাত্মিক এবং রোমাণ্টিক কবিতা লিখেছিলেন। তবে পারিবারিক দাম্পত্য জীবনের গভীর শোক তাঁর প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'রেণু'তে প্রোৎসাহিত হয়। তিনি চিরবিরহের ব্যথা নিয়ে আবেগ দিয়ে বলেছেন :

'মেঘ নামিয়াছে আজ ঘোর চারিপাশ,
নব স্নিগ্ধ অন্ধকার। সজল বাতাস
ধরণীর আদ্রবক্ষে নিবিড় পরশে
রোমাঞ্চ জাগায়ে তুলি উদাস হরষে
ছোটে গর্বভরে।'

এই 'রেণু'তে অমর শোক আছে। দিব্য-ব্যথা আছে। আকুল আর্তিও রয়েছে। অনেক শোকগীতি টেনিসনের 'ইন মেমোরিয়ম'কে স্মরণ করায়; আবার কখন-বা কবি কামিনী রায়ের পুত্রশোককেও মনে করিয়ে দেয়। তবে প্রিয়ংবদা দেবীর কাব্য-রচনার মধ্যে পূত সংযম ও তপস্যার ভাব-তন্ময়তা প্রতীয়মান হয়।

রবীন্দ্রনাথের ভাবশিষ্যা প্রিয়ংবদা দেবী। রবীন্দ্রনাথ ছিলেন জহুরী—তাই মণি-মুক্তা তিনি চিনতে পেরেছিলেন। তিনি প্রিয়ংবদা দেবীকে প্রথম প্রতিষ্ঠার মর্যাদা দেন। এটি প্রিয়ংবদা দেবীর জীবনের সবচেয়ে স্মরণীয় অভিজ্ঞতারূপে স্বীকৃত।

১৩০৫ বঙ্গাব্দে রবীন্দ্রনাথ ছিলেন 'ভারতী' পত্রিকার সম্পাদক। এখানে কার্তিক সংখ্যায় পর-পর প্রিয়ংবদা দেবীর পাঁচটি কবিতা ছাপেন। সকলেই এই ঘটনায় বিস্মিত হয়। রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং প্রিয়ংবদা দেবীর কবিতার নিয়মিত পাঠক ছিলেন। তারই ফলশ্রুতি ঠাকুরবাড়ীর পত্রিকাগুলি। এর মধ্যে উল্লেখ্য অবশ্যই 'ভারতী' বা 'বালক' — এমন কি রবীন্দ্র-সম্পাদিত 'বঙ্গদর্শনে'—তবে প্রিয়ংবদা দেবীর সঙ্গে 'লেখন' গ্রন্থের সম্পর্ক স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ স্বীকার করেছেন।

১৯০০ সালে 'রেণু' কাব্যগ্রন্থের পর একটি শোককাব্যগাথারূপে 'তারা' ১৯০৭-এ প্রকাশিত হয়। এর পর পর্যায়-ক্রমে তিনি 'পত্রলেখা' এবং 'অংশু' কাব্যগ্রন্থ লেখেন। এগুলি যথাক্রমে ১৯১১ এবং ১৯২৭-এ প্রকাশিত হয়। তারপর উল্লেখ-যোগ্য কাব্যগ্রন্থ 'চম্পা ও পারুল' যা ১৯৩৯-এ প্রকাশিত হয়। কাব্যগ্রন্থের প্রকাশকাল দীর্ঘায়িত। গ্রন্থ প্রকাশের মধ্যবর্তীকালে তাঁর কবিতা নির্বাচনে যে সংযম ও স্থৈর্য চিহ্নিত হয় তা সত্যই বিস্ময়কর। তার কাব্যসাধনার আরাধনা 'সাধনা' কবিতায় বিধৃত :

'শিখাও আমায়
সে পুণ্য রহস্য-মন্ত্র যার মহিমায়
প্রত্যেক নিমেষে সহি' বিয়োগ বেদনা।।'

তিনি অজস্র কাব্য রচনা করেছেন। সব কাব্যই তাঁর মনে রেখাপাত করে নি। এজন্যই কাব্যগ্রন্থের সংখ্যা স্বল্প। আবেগ বা উচ্ছাস নিয়ে অজস্র কাব্য তিনি রচনা করেন নি। এই সংযম মহৎ কবিরই নিদর্শন। প্রিয়ংবদা দেবী এইভাবে আপন ধৈর্যে ও অধ্যবসায়ে যে কাব্য লেখেন তার পাঠকের সংখ্যা অল্পই থেকে গেছে।

প্রিয়ংবদা দেবীর কাব্যের মধ্যে গীতি-সুর মৌল হয়ে আত্মপ্রকাশ করেছে। অবশ্য কয়েকটি ক্ষেত্রে 'লিরিকের' অতিরঞ্জনও দেখা দিয়েছে। বাউলের বৈরাগী সুরের এক-তারায় যে সুর ধ্বনিত হয়, প্রিয়ংবদা দেবীর রচনায় তার প্রতিধ্বনি ফিরে আসে। 'আশাতীত' কবিতায় তার নিদর্শন পাওয়া যায় একটি বিশিষ্ট শিল্পিত ভাবনায় :

'ওরে মোর ভালবাসা,
তোমায় পারি না বাঁধিতে, ভাবে রূপ দিতে
তেমন নাহিকো ভাষা।'

গীতিসুরের উন্মাদনায় তিনি তন্ময় কবিতা লিখেছেন। ফলে 'সাবজেকটিভ' দৃষ্টিকোণ প্রিয়ংবদা দেবীর কাব্যে দেখা গিয়েছে। কবিতা আত্মকেন্দ্রিক হয়েছে; রবীন্দ্রনাথের মত তন্ময়তায় বিশ্বজনীনতায় সমুদ্ভাসিত হয় নি। তবু আত্মগত ধ্যান-ধারণার মাঝখানে শোকে দুঃখে ক্লান্ত মহিলা কবি প্রিয়ংবদা যে আর্তি প্রকাশ করেন, তার আবেদন অসামান্য :

'আমার সকল আলো অঞ্জলি ভরিয়া,
প্রিয় সে, আপন ঘরে রেখেছ হরিয়া।'

প্রিয়ংবদা দেবীর কাব্যসাধনার মধ্যে রোমাণ্টিক সুর থাকলেও, শোকগীতির বাহুল্যের জন্য এটি রহস্যময়তার মাঝখানে ক্রমশই মিসটিক হয়ে যায়। তবে শেষকালে একটি 'সাবলাইম ভাবে আত্মজিজ্ঞাসা রচিত হয়। এখানে তিনি সংকোচ বা স্খলন দূর করে বিশ্বস্রষ্টার শ্রীচরণে আত্মসমর্পণ করেছেন। এই অংশের কবিতাগুলি তিনি অধ্যাত্ম সুর-মূর্ছনায় উদ্বেলিত করেছেন। এর আবেদন অন্তরস্পর্শী। এর কাব্য-মূল্যও অসীম। এখানে তিনি সুখ-দুঃখ বিরহ-মিলনের ঊর্ধে গমন করেছেন। পরম প্রাপ্তিকে তিনি দু হাত বাড়িয়ে গ্রহণ করেছেন। আর আবেগ দিয়ে উপলব্ধি করেছেন :

'তুমি যে অসীমে তাও জেনেছি হৃদয়ে
আপনার হৃদয়ের প্রেমের বিস্তারে।'

রবীন্দ্র প্রতিভার স্পর্শে থেকেও রবীন্দ্রনাথকে প্রিয়ংবদা দেবী কাব্যচেতনায় গ্রহণ করেন নি। এটি অবশ্যই বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। অনেক সমালোচক 'খেয়া' (১৯১০) কাব্যের মধ্যে প্রিয়ংবদা দেবীর 'রেণু' (১৯০০)-র কিছু প্রভাব আছে বলে মনে করেন। তবে একথা নিঃসন্দেহে স্বীকার করে নিতে পারা যায় যে, রবীন্দ্র-নাথ স্বয়ং প্রিয়ংবদা দেবীর ভক্ত পাঠক ছিলেন। তার ফলশ্রুতি হিসেবে রবীন্দ্রনাথ সম্পাদিত 'বাংলা কাব্য পরিচয়ে' প্রিয়ংবদা দেবীর কাব্যকে স্থান দেন। এখানে তার 'আশাতীত' এবং 'সাধনা' কবিতা দুটি সুমুদ্রিত হয়। ১৩৪১-এ তাঁর মৃত্যু একটি বিশিষ্ট কাব্যচেতনার যবনিকা টেনেছিল। একটি যুগের অবসান হয়েছিল। তবে পরবর্তী যুগে তার প্রভাব পড়ে নি। নতুন যুগান্তরের বার্তা তিনি বহন করলেও, মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে তা সবই পঞ্চভূতে বিলীন হয়ে যায়।

যে ফুল ঝরে যায়, তাকে ত আর বৃন্তে স্থাপন করা যায় না; কিন্তু তার সৌরভ ধূপের ধোঁয়ার মত চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে। কালবৈশাখীর দমকা বাতাসে একটি জীবনদীপ একটি ফুৎকারে নিভে গেলেও প্রিয়ংবদা দেবী তার কাব্য রচনার মধ্যে অমর হয়েছেন। অন্ধ তিমিরের মানবযাত্রীর নব আলোকের সন্ধানে চলে অভিসারে—এই অভিসারের পথে যাঁরা সার্থক পদচিহ্ন রেখেছেন প্রিয়ংবদা দেবী তাদেরই অন্যতম।

রূপ ও লাবণ্যে হংসেশ্বরী

অঞ্জলি চৌধুরী

কথা হচ্ছিল মনসুর আলির সঙ্গে। মনসুর রিকসাওয়ালা, আমাদের পথ-প্রদর্শক। গুনগুন গান গাইতে গাইতে বোধ হয় মনসুর আমাদের গল্প বলার জন্য প্রস্তুত হচ্ছিল। এক সময় রিকসা চালাতে চালাতে পিছন ফিরে সামান্য একটু হেসে বললো, 'আমি শুনেছি অনেক দিন আগে, তা কত দিন সে আর বলতে পারবো না, এখানে দেবরায়দের রাজবাড়ীতে খুব ঘটা করে একটা মন্দির তৈরী হয়েছিল কোন একজন রাজার সময়ে। রাজামশাই-এর নামটা আমার মনে নেই। লোকে বলে সেই কালীমন্দিরের কালীমূর্তিকে স্বপ্নে একজন মুসলমান পেয়েছিলেন। আর সেই মূর্তিটি হিন্দুদেবী হওয়ার জন্য তিনি এনে সঁপে দিলেন রাজার হাতে। এই রাজা মূর্তিটিকে কেন্দ্র করে গড়ে তুললেন এত সুন্দর এক মন্দির।

এরপর মনসুর আর বিশেষ কথা বলে নি। কি জানি তার কোন পূর্বপুরুষের স্মৃতিতে মনটা চঞ্চল হয়ে উঠলো কিনা!

প্রায় পঞ্চাশ মিনিট বাদে অনেক চওড়া রাস্তা, সরু গলি পেরিয়ে মনসুর বললো, 'ঐ যে মন্দিরের চূড়া দেখা যাচ্ছে।' ধীরে খোয়াফেলা রাস্তা দিয়ে অতি সন্তর্পণে রিকসা এসে দাঁড়ালো রাজবাড়ীর নহবতখানার ভগ্নাবশেষের কাছে।

মনসুর বড় একটা গাছ দেখে তার নীচে রিকসা দাঁড় করিয়ে বিশ্রাম করতে লাগলো। আমরা দুজন এগিয়ে চললাম। সামনে প্রশস্ত চাতাল পেরিয়ে তবে মন্দিরের গর্ভগৃহে পৌঁছতে হয়। ওখানে আলাপ হয়েছিল মন্দিরের পুজারী শ্রীযুক্ত অনিলকুমার চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে। অমায়িক ভদ্রলোক হাসি হাসি মুখ নিয়ে আমাদের প্রশ্নের জবাবে বলেছিলেন 'প্রায় ত্রিশ বছর এ মন্দিরের পুজোর কাজ আমিই তত্ত্বাবধান করছি। তাছাড়া উত্তরাধিকার সূত্রে আমিই এ মন্দিরের পুরোহিত। শুনেছি আজ থেকে একশো তিরাশি বছর পূর্বে রাজা নৃসিংহ দেবরায় মহাশয় তান্ত্রিক সাধনায় কাশীতে স্বপ্নে এই বিগ্রহটির সাক্ষাৎ পেয়েছিলেন। পরে এই মন্দিরটি নির্মাণ করে বিগ্রহটিকে এখানে স্থাপন করেন।'

হঠাৎ পাশ থেকে নারীকণ্ঠের আওয়াজে মনসুর আলির কিংবদন্তী আবার শুনলাম। কথা শুনে তাকিয়ে দেখি একজন স্থানীয় বর্ষীয়সী মহিলা উত্তরের অপেক্ষায় পুরোহিত মহাশয়ের দিকে তাকিয়ে আছেন। মহিলাটি যে কখন এসে ঠিক আমাদের পাশটিতে দাঁড়িয়েছিলেন লক্ষ্যই করি নি। সম্বিৎ ফিরতে তাকিয়ে দেখি বাইরে অঝোরে বর্ষণ হচ্ছে। ঝড়ের দাপটে বড় বড় তাল, বটের সে কি মাতামাতি। মনে হচ্ছে নিমেষে সব ভূমিসাৎ হয়ে যাবে।

ততক্ষণে সময় অনেক পেরিয়ে গেছে। আবার ফিরতে হবে, বাইরে জলে-কাদায় অপেক্ষমান মনসুর আলি। যত ঝড়-জলই হোক এরই মধ্যে ধন্য হতে হবে নিজেদের রাজা নৃসিংহদেব রায়ের অমর কীর্তিকে উপলব্ধি করে।

ইতিহাস বলে বাংলার নবাব তখন আলিবর্দী খাঁ। এ সময় বংশবাটীর রাজা গোবিন্দ দেব অপুত্রক অবস্থায় পরলোকগমন করলে তার বিশাল সম্পত্তি জমিদারের সঙ্গে বন্দোবস্ত হয়ে যায়। গোবিন্দ দেবের মৃত্যুর তিন মাস পরে রাজপুত্র নৃসিংহ দেবরায় জন্মগ্রহণ করলেও বিপুল সম্পত্তির মালিক হবার সৌভাগ্য তাঁর হলো না। তখন কোম্পানীর আমল। রাজা নৃসিংহদেব একবার সতের বছর বয়সে হেস্টিংসের কাছে ও পরে ১৭৮৯ খৃষ্টাব্দে লর্ড কর্ণওয়ালিসের দরবারে তদ্বির করে নিজের হৃত জমিদারীর কিয়দংশ পুনরুদ্ধার করতে সক্ষম হন।

১৭৯১ খৃষ্টাব্দে নৃসিংহদেব রায় কাশীতে গিয়ে সাধু-সন্ন্যাসীদের সহায়তায় তান্ত্রিক সাধনায় বিশেষ পারদর্শিতা অর্জন করেন। ১৭৯৯ সালে তিনি ফিরে এলেন বংশবাটীর রাজবাড়ীতে। কোম্পানী থেকে এসময় তাঁকে বিলাতে কোর্ট অফ ডিরেক্টরগণের নিকট আবেদন করতে পরামর্শ দেওয়া হয়। কিন্তু আবেদন-নিবেদনের জন্য প্রচুর অর্থ ব্যয় করার পরিবর্তে রাজা সেই ব্যয়ে একটি মন্দির নির্মাণ করার চিন্তা করলেন। শোনা যায় মন্দির নির্মাণ পরিকল্পনা রাজা নৃসিংহদেব রায় নিজেই করেছিলেন। 'মানবের দেহমধ্যে ঈড়া, পিঙ্গলা, বজ্রাক্ষ, সুষুম্না ও চিত্রিনী নামক যেরূপ নাড়ী বিদ্যমান আছে, সেইরূপ পঞ্চতোলা ও ত্রয়োদশ মিনার বিশিষ্ট একটি সুউচ্চ মন্দির মধ্যে কুণ্ডলিনী শক্তিরূপে দেবী হংসেশ্বরীর মন্দির প্রতিষ্ঠার তিনি সঙ্কল্প করেন এবং পরে ষট্চক্রভেদ প্রণালীতে মন্দির নির্মাণ আরম্ভ করলেন'—'হুগলী জেলার ইতিহাস ও বঙ্গসমাজ', সুধীরকুমার মিত্র।

দুর্ভাগ্যবশতঃ মন্দিরটির দ্বিতলের কাজ অসমাপ্ত রেখে রাজা নৃসিংহদেব রায় ইহলোক ত্যাগ করলেন। তাঁর আরব্ধ কাজ তাঁর সাধ্বী স্ত্রী রানী শঙ্করী দেবী স্বামীর নির্দেশানুযায়ী সমাপ্ত করেন ও শ্রীশ্রীহংসেশ্বরীদেবী মূর্তির প্রতিষ্ঠা করেন। রেভারেন্ড লং সাহেবের উদ্ধৃতি থেকে মন্দির প্রতিষ্ঠার একটি মনোরম ইতিহাস জানা যায়। দেবীর উদ্দেশ্যে মন্দিরটি যখন উৎসর্গ করা হয় তখন প্রতিবেশী দেশগুলো হতে বহু পণ্ডিতব্যক্তিদের রানী আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন।

ত্রয়োদশ চূড়াবিশিষ্ট এই হংসেশ্বরী মন্দিরটির পরিকল্পনা রথ চিহ্নের মত। প্রথম সারিতে আটটি, দ্বিতীয় সারিতে চারিটি ও সর্বোপরি এবং সর্বোচ্চ একটি চূড়া। শিখর বা চূড়ার গড়ন ফুলের কুঁড়ির মত ও পাতার মত অলংকরণ দিয়ে চূড়াগুলি অলংকৃত। মন্দিরের চারিদিকে বারোটি কালো ও উপরে একটি সাদা শিবলিঙ্গ আছে। প্রবেশপথে একজোড়া করে চারিটি ও ভিতরে একটি ফোয়ারার পাশে চারিটি স্তম্ভ আছে। বছর পঞ্চাশেক পূর্বে এই ফোয়ারা দিয়ে গঙ্গা থেকে সরাসরি জল এলে তাই দিয়ে পুজোর নানাবিধ কর্ম সমাধা হত। গর্ভগৃহের সম্মুখে অংশের ছাদ অর্ধ-গোলাকার। গর্ভগৃহের খিলানে গণেশমূর্তির পাশে চামরধারী নারীমূর্তি। গণেশ পদ্মাসনে উপবিষ্ট ও তার দুপাশে সিংহমূর্তি। দর্শকের বাঁ-দিকের জানলায় মহিষাসুরমর্দিনীর মূর্তি আছে। বর্তমানে এই মূর্তিটির মন্দির ভগ্ন হওয়ায় মূর্তিটিকে এখানে স্থাপন করা হয়েছে—ত্রিকোণাকৃতিভাবে। ফলে গোলাকার গর্ভগৃহ চৌকো আকার ধারণ করেছে। শোনা যায় রাজা রঘুদেব রায় মহাশয় পুষ্করিণী

বিষ্ণু মন্দির

হংসেশ্বরী মন্দির।

থেকে এই মূর্তিটিকে উদ্ধার করেছিলেন। এই মন্দিরটিকে গড়বাটী বলা হয়।

মন্দিরের কালীমূর্তিটি নিমকাঠের তৈরী ও গায়ের রং নীলবর্ণ। বেদি থেকে মহাদেব পর্যন্ত একটি পাথর কেটে তৈরী। দেবী স্বয়ং পদ্মের ওপর উপবিষ্টা। মূর্তির চারিটি হাতের নিচের বামহস্তে মুণ্ডমালা, ওপরের বামহস্তে খড়্গ, ডান দিকের নিচের হস্তে অভয়মুদ্রা, ডানদিকের ওপরের হস্তে বরমুদ্রা।

মন্দিরটি কতক ইট ও কতক পাথর দিয়ে তৈরী। মন্দিরটি নির্মাণ করতে খুব সম্ভবতঃ পাঁচ লক্ষ অর্থ ব্যয় করতে হয়েছিল। বাংলা ১২২৬ সালে হংসেশ্বরী মন্দির হতে দেবীর অনেক অলংকার চুরি হয়ে যায়। স্নানযাত্রা, গঙ্গাপুজো, প্রতিপদ, দুর্গাপুজোয়, কালীপুজোয় মন্দিরে দেবীর সম্মুখে বলি দেবার রীতি এখনও প্রচলিত।

হংসেশ্বরী মন্দির থেকে বেড়িয়ে বাসুদেব মন্দির অথবা শ্রীশ্রীঅনন্তদেবের মন্দিরে যাবার পথে জলের স্রোত বয়ে চলেছে। মাথার ওপর প্রবল বর্ষণ। তবুও দুর্বার আকর্ষণে এগিয়ে চললাম: মন্দিরটির সবচেয়ে আকর্ষণ পোড়ামাটির কাজ। ১৬৭৯ খৃষ্টাব্দে রাজা রামেশ্বর পরম ভাগবত মন্দিরটির প্রতিষ্ঠা করেন। মন্দিরের কষ্ঠিপাথরের বিষ্ণুমূর্তিটি বছর দশেক আগে চুরি হয়। বর্তমানের মূর্তিটি পরে প্রতিষ্ঠা করা হয়। মন্দিরটির প্রদক্ষিণ পথের চারপাশে এক সময় অপূর্ব পোড়ামাটির কাজে অলংকৃত করা হয়েছিল। বর্তমানে তার অল্প নিদর্শনই আছে। বর্ষণসিক্ত হয়ে এই পোড়ামাটির কাজগুলি যেন আবার পূর্বাবস্থা ফিরে পেয়েছে। এই পোড়ামাটির কাজ দেখে ছোটলাট সার জন উডবার্ণ মুগ্ধ হয়ে গিয়েছিলেন। তিনি ভেবেছিলেন প্রতিটি পোড়ামাটির ফলক দিয়েই গৃহ অতি সুন্দরভাবে সজ্জিত করা যায়। এই ফলকগুলি প্রধানতঃ দেবদেবীর মূর্তি যেমন—শ্রীকৃষ্ণের রাসলীলা, কালী, শিব, দুর্গা, নৌকাবিলাস, নারায়ণের অনন্তশয্যা প্রভৃতি দিয়ে অলংকৃত। এছাড়া নৃত্যরতা নারীমূর্তি, বিভিন্ন যন্ত্রসংগীত বাজনরতা নারী ও পুরুষ মূর্তি, ধাবমান অশ্ব, অশ্বারোহী সৈনিক, যুদ্ধচিত্র, সশস্ত্র সৈন্যবাহিনী সমেত দুতলা জাহাজ, বাঘ, হরিণ ইত্যাদির প্রতিকৃতি যেমনি বাস্তবানুগ তেমনি প্রাণবন্ত। বিশেষ করে ধাবমান অশ্বের গতিশীলতা, পরিপুষ্ট গড়ন, সুচারু রেখা অপূর্ব।

মন্দিরটি বাংলার প্রথাগত এক চূড়া রত্নমন্দির। উচ্চবেদিকার ওপর সংস্থাপিত এই মন্দিরটি বাংলার স্থাপত্য শিল্পের একটি উল্লেখযোগ্য সৌধ। মন্দিরগাত্রের পোড়ামাটির ফলকের অবশিষ্টাংশ হয়তো অল্পকালের মধ্যে অবলুপ্তি ঘটবে। এই ঐতিহ্যমণ্ডিত মন্দিরগাত্র আজ ক্ষত-বিক্ষত। অধিকাংশ স্থানেই (যেখানের পোড়ামাটির ফলক অপহৃত হয়েছে) আধুনিক যুগের বড় বড় ইটের গাঁথুনি, পুরাতন ছোট ছোট ইটের সঙ্গে ও পোড়ামাটির ফলকগুলির সঙ্গে এতই বৈসাদৃশ্য যে বিশেষ পীড়াদায়ক। অবহেলিত, অনাদরে ভগ্নাবশিষ্ট, অপূর্ব কারুকার্যখোদিত মন্দিরটি শিল্পরসিক মাত্রকেই বিস্ময়ে মুগ্ধ করবে। কিন্তু এতই দুর্ভাগ্য আমাদের যে প্রাচীন ঐতিহ্যকে রক্ষা করার মত সহায়সম্বল আমাদের নেই বললেই হয়। তবে বর্তমানে মন্দিরদুটির তত্ত্বাবধানের দায়িত্ব প্রত্নতাত্ত্বিক বিভাগের হাতে। সুতরাং যথাসময়ে যদি মন্দির দুটির ওপর নজর দেওয়া চলে তবে হয়তো ভবিষ্যৎ বংশধরেরা বাংলাদেশের ঐতিহ্যকে প্রত্যক্ষ করবার কিছুটা সুযোগ পাবে।

ততক্ষণে সন্ধ্যা ঘনিয়ে এলো। ইলশেগুঁড়ি বৃষ্টির সঙ্গে বাতাস একেবারে বন্ধ। মনে হয় কোন যাদুকরের স্পর্শে পৃথিবী স্থির, নিশ্চল, দূরে-দূরে আলো জ্বলে উঠেছে। আমাদেরও ফেরার পালা।

মন্দিরের পূজারীর সঙ্গে বিদায়পর্ব সমাধা করতে গিয়ে মনে হল এত স্বল্প আলোতে দেবীমূর্তি যেন বড় ম্লান। অবাক হলাম বিংশ শতকের এই প্রগতির যুগে কেন এখানে বৈদ্যুতিক আলো আনা হয় নি—অথবা পূর্বের সেই ছায়াঘেরা স্বপ্নময় ঐতিহ্যকে বজায় রাখতে হ্যারিকেন আর প্রদীপের আলোই যথেষ্ট?

'বড় আঁধার হয়ে গেল' মনসুর চঞ্চল হয়ে উঠলো। পায়ে পায়ে এগিয়ে চললাম। চারিদিক কেমন ঝাপসা হয়ে এলো।

[লেখার সঙ্গে ব্যবহৃত মন্দিরের আলোকচিত্র অমিয় নন্দী গৃহীত]

সত্যজিৎ রায়ের নতুন ছবি

সত্যজিৎ রায় পরিচালিত 'সীমাবদ্ধ' চিত্রে পারমিতা চৌধুরী

অকস্মাৎ শ্যামলেন্দুকে একটা গভীর সংকটের সামনে পড়তে হয়। মধ্য-প্রাচ্যে রপ্তানির জন্য তৈরি পিটার্স কোম্পানীর দশ হাজার পাখায় হঠাৎ শেষ মুহূর্তে একটা গলদ ধরা পড়ে। শ্যামলেন্দু বুঝতে পারে পাখা বাইরে গেলে চুক্তি নাকচ হয়ে যাবার সম্ভাবনা।

শেষ পর্যন্ত পিটার্স কোম্পানীকে ক্ষতিপূরণ ও দুর্নামের হাত থেকে রেহাই দেবার জন্য শ্যামলেন্দুকে দুর্নীতির পথ বেছে নিতে হয়। এর ফলে মুস্কিল আসান হয় ঠিকই। শুধু তাই নয়, শ্যামলেন্দুর কারসাজি তাকে ডিরেক্টরের পদে উন্নীত করতে সাহায্য করে।

চিত্রাঞ্জলি নিবেদিত, ভক্ত সমশের জংবাহাদুর রাণা প্রযোজিত, শংকরের কাহিনী অবলম্বনে সত্যজিৎ রায় পরিচালিত ছবি 'সীমাবদ্ধ'-তে ঘটনা বলতে এই একটি মাত্রই ঘটনা আছে। এবং এই ঘটনাটিই শ্যামলেন্দুর শ্যালিকা সুদর্শনার একমাত্র নায়কনিষ্ঠ উজ্জ্বল মনে বিরূপতার সৃষ্টি করে এবং শ্যামলেন্দুর পদোন্নতির মূল্যের ফাঁকিটাকে বড়ো করে তুলে ধরে।

একটি মাত্র ঘটনাকে সম্বল করে একটি পূর্ণদৈর্ঘ্য বাংলা কাহিনীচিত্র তৈরী করা নিশ্চয়ই অতি মাত্রায় দুঃসাহসিকতার পরিচায়ক এবং সত্যজিৎ রায় সেই দুঃসাহসিকতারই পরিচয় দিয়েছেন।

সত্যজিৎ রায় পরিচালিত অন্যান্য ছবির মতো এ-ছবিতেও আঙ্গিকের পারিপাট্য ও কলাকৌশলের দক্ষতা লক্ষণীয়। এ-ছবিতে কোনটি যে কৃত্রিম সেট এবং কোন দৃশ্যই বা আসল ঘরবাড়ীতে তোলা হয়েছে, তা নির্ণয় করা কঠিন এবং তার প্রয়োজনও নেই। নিখুঁত চিত্রগ্রহণ এবং 'অপটিকালস্'-এর ব্যবহার ছবিটিকে একটি বৈশিষ্ট্য দিয়েছে। তবে আমরা সবচেয়ে বেশী মুগ্ধ হয়েছি, ছবির মধ্যে হিন্দুস্থান পিটার্স লিমিটেডের পাখার রঙীন 'বিজ্ঞাপনী চিত্র'টি দেখে। পিটার্স-এর তৈরী পাখা 'হট'-কে 'কুল'-এ পরিণত করে—এ-ব্যাপারটা চমৎকারভাবে দেখানো হয়েছে এই 'বিজ্ঞাপনী চিত্র'-এর সাহায্যে।

সংযত, অথচ আন্তরিকতাপূর্ণ জীবন্ত অভিনয়ে সুদর্শনা ওরফে টুটুল চরিত্রটিকে চিত্রিত করেছেন শর্মিলা ঠাকুর। দোলনচাঁপা শ্যামলেন্দুর স্ত্রী হলেও আসবাবের সামিল। এই রূপটি সহজেই ফুটে উঠেছে নবাগতা পারমিতা চৌধুরীর অভিনয়ের মাধ্যমে। জীবনে-নায়ক শ্যামলেন্দুর মেটিরিয়ালিস্টিক উন্নতির রূপটি প্রতিফলিত হয়েছে বরুণ চন্দের পোশাকে-আসাকে, চালচলনে। একদা তার অন্তরে বলে একটি সম্পদ ছিল, কিন্তু তাকে সে নিজের হাতেই টুঁটি টিপে হত্যা করেছে—এটিও তার কিছু কিছু সংলাপ, অস্থির পাদচারণা এবং চিন্তামগ্নভাবে স্থির হয়ে থাকার মাধ্যমে প্রকাশিত হয়েছে। শ্যামলেন্দুর প্রতিদ্বন্দ্বী এবং তার প্রতি কিছুটা ঈর্ষাপরায়ণ রুণু সান্যালের ভূমিকায় প্রশান্ত মল্লিক সুযোগমতো সুঅভিনয় করেছেন। অহংকারী মিঃ সান্যাল বেশে [illegible] দেবনন্দণ চরিত্রটিতে ত্রুটি রাখেননি। শ্যামলেন্দুর সাহায্যকারী হালদাররূপে অজয় বন্দ্যোপাধ্যায় একটি জীবন্ত চরিত্র। কোম্পানীর ডিরেক্টর সার বরেন রায়ের ভূমিকায় হারীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়ের হাবভঙ্গী, চালচলন চমৎকার, কিন্তু তাঁর বাচনে কিছু অস্পষ্টতা আছে। অপরাপর ভূমিকায় হারাধন বন্দ্যোপাধ্যায় (নীলাম্বর), মণি আয়ার (রামলিঙ্গম), প্রমোদ গাঙ্গুলী (শ্যামলেন্দুর বাবা) দীপংকর দে (মিঠু সেন), অনিতা চট্টোপাধ্যায় (মিসেস পালিত) প্রভৃতির অভিনয় উল্লেখযোগ্য।

ছবিতে আবহ-সঙ্গীতের ব্যবহার সুষম। ক্যাবারে দৃশ্যে শেফালি এবং তার সঙ্গিনীর নৃত্যের সঙ্গে যন্ত্রসঙ্গীত তাৎপর্যপূর্ণ।

প্রেক্ষাগৃহ

অশান্ত যুবমানসিকতা ও ব্যর্থতার ছবি

আজকের শহরবাসী বাঙালী মধ্যবিত্ত সমাজের শিক্ষিত যুবকদের মধ্যে ভবিষ্যৎ সম্পর্কে অনিশ্চয়তা তাদের কি পরিমাণ অশান্ত করে তুলেছে এবং ফলে তারা কি রকম বিপথগামী হতে বাধ্য হচ্ছে, তারই একটি সম্ভাব্য চিত্র ফুটিয়ে তুলতে চেষ্টা করেছেন **কাহিনী ও চিত্রনাট্যকার এবং পরিচালক সলিল দত্ত গীতাঞ্জলি পিকচার্স-এর নিবেদন 'খুঁজে বেড়াই' ছবিতে।**

কলেজের অধ্যক্ষের বিরূপতা কোনো ছাত্রের বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষার ফলকে অন্যায়ভাবে প্রভাবিত করতে পারে কিনা, সে-বিষয়ে সন্দেহের যথেষ্ট অবকাশ থাকলেও এ-কথা অনস্বীকার্য যে, আজ কোনো ভালো ছেলে যদি দুর্ভাগ্যক্রমে অনার্সে দ্বিতীয় শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হয়, তাহলে যথেষ্ট খুঁটির জোর না থাকলে তাকে এম এস-সি পড়বার আশায় জলাঞ্জলি দিতে হয়। এবং তারপরে খবরের কাগজের পাতা থেকে কর্মখালির বিজ্ঞাপন দেখে সে যতই দরখাস্ত পাঠাক না কেন, তার শতকরা আশীখানারই জবাব আসে না, এবং নেহাৎ যে-জবাবগুলি আসে, তার মধ্যে বেশীর ভাগই 'দুঃখিত'-মার্কা। কালেভদ্রে যদি বা এক-আধটা 'ইন্টারভিউ'-এর সুযোগ আসে, সেখানেও 'অতীত কোনো অভিজ্ঞতা আছে কিনা'—এই বাঁধা প্রশ্ন চাকরীর উমেদারকে নিরাশ হতে বাধ্য করে। মনে হয়, প্রশ্নটি আসলে হচ্ছে : তোমার কোনো মুরুব্বির সুপারিশ আছে কিনা।

এই ধরনের ইন্টারভিউ-এর দরুণ মরীয়া হয়ে যখন কোনো ভদ্রসন্তান 'খুঁজে বেড়াই'-এর নায়ক শঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতো বি এস-সি-তে ফিজিক্সে সেকেণ্ড ক্লাশ অনার্স পাওয়া সত্ত্বেও আপিসের দরওয়ানীর জন্যে দরখাস্ত দিয়ে বসে, তখন ও-পক্ষ থেকে উপদেশবাণী বর্ষিত হয় : তোমার মতো শিক্ষিত, গুণসম্পন্ন, ভদ্র-

বংশসম্ভূত ছেলেকে আমরা দরওয়ানের কাজ করতে দিতে পারি না, তোমার ভবিষ্যৎ বলে একটা জিনিস আছে। যাকে নিয়ে ঘর বাঁধার স্বপ্ন, সেই বান্ধবীর মুখেও একই কথা ঃ তোমার পক্ষে ছোট কাজ করা সাজে না, অন্য কোনো ভালো কাজ করে সমাজে প্রতিষ্ঠিত হবার চেষ্টা কর।

অতএব, হয় ছিনতাই, বোম-বাজী বা ডাকাতী, আর নয়তো চোরাকারবারি—সে আন্তরাজ্য বা আন্তর্জাতিক, যাই হোক না কেন—এই সব ব্যাপারে যোগ দেওয়া ছাড়া ঐ ভদ্রসন্তানের গত্যন্তর কি? তাই নায়ক শঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ও তার পাঠ্যাবস্থার বন্ধু গোরার সাহায্যে আন্তর্জাতিক চোরাকারবারীর দলে ভর্তি হয় এবং প্রচুর অর্থের অধিকারী হয়ে বান্ধবী সীমাকে বিবাহ করবার প্রস্তাব করে। কিন্তু যখন জেরার ফলে সীমা জানতে পারে, শঙ্কর কোন্ পাপের পথে পা বাড়িয়েছে, তখন সে তাকে সেই পাপ পথ থেকে ফেরাবার জন্যে আপ্রাণ চেষ্টাও করেছে। শেষপর্যন্ত অবশ্য শঙ্কর দলের লোকের হাত থেকে গুলীর দ্বারা আহত হয়েছে এবং হাসপাতালে চিকিৎসিত হয়ে সুস্থ হবার পরে জেল-হাজতে প্রেরিত হয়েছে।

কাহিনীকাররূপে সলিল দত্ত নায়ক শঙ্করকে 'নিয়মিত ঘুষ নেওয়া মস্ত বড় অফিসারের' ছেলেরূপে উপস্থাপিত করেছেন কেন, এতে তাঁর কি সুবিধে হয়েছে, তা বোঝা শক্ত। আমাদের তো মনে হয়, ঐ ধরনের অফিসারের ছেলেদেরই খুঁটির জোর সবচেয়ে বেশী এবং তাদের পক্ষে পরীক্ষায় ভালো ফল দেখানো বা চাকরী

মেরা গাঁও মেরা দেশ/ধর্মেন্দ্র, আশা পারেখ, লক্ষ্মীছায়া, পরিচালনা ঃ রাজ খোশলা

শুভক্ষণে ছবির মহরত ও সংগীত গ্রহণানুষ্ঠানে শ্যামল মিত্র, অনুপকুমার, সংগীত পরিচালক নিখিল চট্টোপাধ্যায়, প্রতিমা বন্দ্যোপাধ্যায়, পরিচালক তপেশ্বর প্রসাদ ও ক্যামেরাম্যান কানাই দে। ফটো ঃ অমৃত

পাওয়া যথেষ্ট সহজ। এর চেয়ে যদি তিনি শঙ্করকে যথার্থ মধ্যবিত্ত ঘরের একজন গরীব কেরানীর সন্তান হিসেবে দেখাতেন, তাহলে তা ঢের বেশী বাস্তব হত। এমনকি শঙ্করের বিজয়েরও ভাত রাঁধা ও ঘর ঝাঁট দেওয়ার মধ্যে যথেষ্ট যুক্তি খুঁজে পাওয়া যেত। শঙ্কর এবং বিজয়ের পিতাকে ধনী করায় কাহিনীটি যথেষ্ট বাস্তব ও বিশ্বাস্য হয়ে উঠতে পায়নি।

কাহিনী বিস্তারে চিত্রনাট্য রচনায় দুটি সামান্য ত্রুটি দেখা গেছে। এক, একটি দৃশ্যে শঙ্করের সঙ্গে কথা কইতে কইতে সীমার গান গেয়ে ওঠা : জানি না স্বপ্ন সত্যি হয় কি হয় না। দুই, শঙ্কর অন্যায় পথে পা বাড়িয়েছে, এটা জানার পরে সীমার কান্নায় ভেঙে পড়ার ছোট্ট দৃশ্যটি। —এই দুটি জিনিসই নির্মমভাবে কেটে বাদ দিলে চিত্রনাট্যটি নিখুঁত হয়ে উঠতে পারে।

নায়ক শঙ্করের ভূমিকায় সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় চরিত্রটির আশাহত অবস্থা, স্বপ্নভঙ্গের হাহাকারকে অত্যন্ত দরদের সঙ্গে, অথচ বাস্তবভাবে পরিস্ফুট করেছেন। সামাজিক অমানুষিকতার বিরুদ্ধে তার প্রতিবাদকে তিনি সোচ্চার করে তুলেছেন। শঙ্করের প্রেমিকা সীমার চরিত্রের ভালোবাসা, ব্যথা-বেদনা, পঙ্গু মায়ের জন্যে চিন্তা, সাফল্যপূর্ণ স্বচ্ছন্দ জীবনের প্রতি লোভ, শঙ্করের বিপদসংকুল অবস্থা উপলব্ধি করায় পরে তার সম্পর্কে উৎকণ্ঠা—

বাংলাদেশ সাহায্য তহবিলের জন্য যাদুকর শ্রীপি সি সরকার (জুনিয়র) প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর হাতে ৫০,০০১ টাকার চেক দিচ্ছেন।

সমস্তই অত্যন্ত নিপুণতার সঙ্গে অভিব্যক্ত হয়েছে অপর্ণা সেনের অভিনয় মাধ্যমে।

শঙ্করদের প্রতিবেশিনী, প্রবঞ্চিতা অনুর ভূমিকায় জুঁই বন্দ্যোপাধ্যায় একটি শান্ত, সুন্দর চরিত্রচিত্রণ করেছেন। এবং অনুর প্রতি একান্ত সহানুভূতিশীল বিজয়ের চরিত্রটিও অত্যন্ত স্বচ্ছন্দে রূপায়িত করেছেন অনিল চট্টোপাধ্যায়। মাতাল মোটর-মেকানিক মদনদা জীবন্ত হয়ে উঠেছে তরুণকুমারের সু-অভিনয়গুণে। প্রতিশোধপরায়ণ কলেজ প্রিন্সিপ্যালের চরিত্রে এন বিশ্বনাথন-এর অভিনয় বাস্তবঘেঁষা। নারীলোভী বিভাসের ভূমিকায় সুনীলেশ ভট্টাচার্য চরিত্রটিকে সুন্দরভাবে ব্যক্ত করেছেন; বিশেষ করে দ্বৈত-নৃত্যের মাধ্যমে চরিত্রটির লোলুপতা সুপরিস্ফুট। অপরাপর ভূমিকায় বিকাশ রায় (নায়কের পিতা), দিলীপ রায় (স্মাগলিংদলভুক্ত গোরা), অমরনাথ মুখোপাধ্যায় (স্মাগলিং দলনেতা), উৎপল দত্ত (সীমার প্রতি লোভাতুর ভূপতি), আনন্দ মুখোপাধ্যায় (অনুর মামাতো ভাই অলক) এবং 'না না চলে যেও না' গান-গাওয়া বারবণিতার ভূমিকাভিনেত্রী ও 'একটু আরো সরেই না হয় আসলে গো'—গানের সঙ্গে বিভাসের সঙ্গে দ্বৈত-নৃত্যরতা তরুণী প্রভৃতির অভিনয় উল্লেখ্য।

ছবির কলাকৌশলের বিভিন্ন বিভাগের কাজ অত্যন্ত প্রশংসনীয়। চিত্রগ্রহণ, শিল্পনির্দেশনা ও সম্পাদনায় যথাক্রমে বিজয় ঘোষ, সত্যেন রায়চৌধুরী এবং অমিয় মুখোপাধ্যায় তাঁদের গুণপনার যথেষ্ট পরিচয় দিয়েছেন। ছবির চারখানি গানের মধ্যে রবীন্দ্রনাথের 'আগুন জ্বালো, আগুন জ্বালো' গানটি ছাড়া বাকী তিনটি গৌরীপ্রসন্ন মজুমদারের রচনা এবং এগুলিতে সুরযোজনা করেছেন রবীন চট্টোপাধ্যায়। সুরযোজনা গানের ভাব ও ভাষা এবং পরিস্থিতি অনুযায়ী। অবশ্য প্রথম গানখানি যে অপ্রয়োজনীয়, সে-কথা আগেই বলেছি। কিন্তু সবচেয়ে সার্থকভাবে প্রযুক্ত হয়েছে রবীন্দ্রনাথের গানখানি। 'ব্যর্থ প্রাণের আবর্জনা পুড়িয়ে ফেলে আগুন জ্বালো' গানখানি যেন দর্শকচিত্তেও আগুন ধরিয়ে দেয়।

আধুনিক যুবমানসের অস্থিরতা, নিরাশা, যন্ত্রণার ছবি হিসেবে গীতালি পিকচার্সের নিবেদন, সলিল দত্ত পরিচালিত 'খুঁজে বেড়াই' একখানি অতিসার্থক চিত্র।

মঞ্চাভিনয়

বহুরূপীর নতুন নাটক 'অপরাজিতা' : কিছু স্মৃতি, কিছু প্রীতি; কিছু স্বপ্ন, কিছু যন্ত্রণা নিয়ে উদ্বেলিত একটি নিঃসঙ্গ মেয়ের হৃদয়। একটি নিবিড় নিরিবিলি সন্ধ্যায় সে হোল সমুদ্রের মতো মুখর, উচ্ছ্বসিত অনুভূতির দোলা লাগিয়ে জড়াতে চাইলো ওর জীবন আর হৃদয়ের গভীরে। মেয়েটির নাম

অপরাজিতা—ডাক নাম অপু। ওর জীবনকে ঘিরে আছে দাদা, বৌদি, আর ওদের ছোট্ট ছেলেটি বাবুনটু। স্বামীর সান্নিধ্যও ও পেয়েছিল, কিন্তু হয়তো পায়নি ভালো-বাসার প্রগাঢ় প্রশান্তি। দাদার বাড়ীতে এসে নিষ্করুণ বাস্তব জীবনের রক্তাক্ত রূপকে ও প্রত্যক্ষ করলো; আবিষ্কার করলো চারধারের অবিশ্রান্ত কলরবের মধ্যে ওর মন কি এক নিদারুণ নির্জনতার অন্ধকারে গুমরে গুমরে কাঁদছে। ওর মনে হলো সবার মাঝে থেকেও ও একেবারে একা। একটা চাকরীর চেষ্টা করেও কিছু হোল না। ওর আদর্শপুরুষ সঞ্জীবদার ওপর এব্যাপারে খুব ভরসা করেছিল ও, কিন্তু শেষ পর্যন্ত টেলিফোন এলো হতাশার খবর নিয়ে। তাই ওকে সবশেষে বেরিয়ে পড়তে হোল কিছু পাবার উদ্দেশ্য নিয়ে। অপরাজিতা স্নিগ্ধ জীবন চেয়ে হয়তো হোল পরাজিতা; হয়তো বা আবার সমাজ-ব্যবস্থাকে বিদ্রূপ করে নিজের নামের সার্থকতা খুঁজতে ও নতুন করে যাত্রা শুরু করলো। 'বহুরূপী'র নতুন নাটক 'অপরাজিতা' এই একটি মেয়ের কথাই বলেছে মঞ্চের আলো আঁধারে। এই একটি মেয়েই মঞ্চের বিভিন্ন বৃত্ত ঘুরেছে, আর বিভিন্ন মুহূর্তের সংলাপে নিজের মানসিকতাকে সঞ্চারিত করেছে সবার অনুভূতিলোকে।

নীতীশ সেনের একক চরিত্রের এই নাটকটির মধ্যে সাজানো গোছানো মাপা-জোকা কোন কাহিনী নেই। অপরাজিতা তার জীবনের টুকরো টুকরো গল্প বলেছে নিবিড়তার সুরে। হয়তো তার মধ্য দিয়ে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে ওর সংঘাতমুখর জীবনের প্রতিটি প্রহর। একটি নির্জন ঘরে, ও আমাদের আমন্ত্রণ জানিয়েছে একটি বিশেষ খবর দেবার জন্যে। টেলিফোনে আসবে সে খবর। কি জানি কেন এই টেলিফোনটাকে বারবার মনে হয়েছে একটি প্রাণবন্ত চরিত্র। সংলাপ রচনার দিক থেকে 'অপরাজিতা' নাটকটির একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য আছে; পর পর প্রতিটি ঘটনার আভাস, আর মুহূর্তগুলো এমনভাবে সৃষ্টি করা হয়েছে যে তার মধ্যে শৈথিল্য বা একঘেয়েমি আসেনি এতটুকু।

এই প্রযোজনার সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ব্যাপারটি হোল একটি পূর্ণাঙ্গ নাটকে সব সময় ধরে একজন অভিনেত্রী শুধু একলা অভিনয় করেছেন। এ ধরনের প্রয়াস বোধ হয় আগে আমাদের দেশে কোথাও দেখা যায়নি। এই বলিষ্ঠ এবং সম্পূর্ণভাবে নতুনতর নাট্য প্রযোজনায় 'বহুরূপী'র নিরীক্ষামূলক নাট্যচর্চার বিস্তৃতি আর গভীরতা আরো অনেক বেশী করে প্রোজ্জ্বল হয়ে উঠলো।

নিঃসঙ্গ মেয়ে 'অপরাজিতা' চরিত্রে রূপ দিয়েছেন শ্রীমতী তৃপ্তি মিত্র। পরিকল্পনা আর নির্দেশনার দায়িত্ব নিয়েছেন তিনি নিজে। আশ্চর্যের কথা শ্রীমতী মিত্র অপরিসীম নিষ্ঠার সঙ্গে এই দ্বৈত দায়িত্ব সাবলীলভাবে সম্পাদন করতে পেরেছেন। অপরাজিতার বিভিন্ন উচ্ছলতা আর বেদনার অভিব্যক্তি প্রকাশে শ্রীমতী মিত্র অসাধারণ দক্ষতার নজীর মেলে ধরেছেন। অপরাজিতার সংস্পর্শে আসা, কিংবা দেখা কিছু লোকের সংলাপ যখন তিনি বলেছেন, তখন মনে হয়েছে সেই সেই বিশেষ লোকটি আমাদের চোখের সামনে উপস্থিত হয়েছেন। এ ধরনের অভিনয় নৈপুণ্য খুব বেশী চোখে পড়ে না। শ্রীমতী তৃপ্তি মিত্র যে অসাধারণ প্রতিভাময়ী অন্যতমা এক মঞ্চাভিনেত্রী, 'অপরাজিতা' নাটকে তাঁর অপূর্ব অভিনয় বোধ হয় তা আবার নতুন করে প্রমাণ করলো। অক্লান্ত পরিশ্রম, অবিচল নিষ্ঠা আর সূক্ষ্ম শৈল্পিক চিন্তা--এই তিনের মরমী সম্মিলনই শ্রীমতী মিত্রের প্রয়াসে প্রদীপ্ত হয়ে উঠেছে।

মঞ্চে তাপস সেনের আলো যে অন্তরতম অনুভূতির ছন্দ তুলে কথা বলতে পারে; আর প্রতিটি মুহূর্তকে প্রাণময়তার ভাষায় মুখর আর ব্যঞ্জনাময় করে তুলতে পারে, 'অপরাজিতা' নাটকের দর্শক আর একবার সে কথা নিশ্চয়ই উপলব্ধি করতে পারবেন। পরিচ্ছন্ন মঞ্চসজ্জায় দীপেন সেন আন্তরিক শিল্পবোধের পরিচয় রাখতে পেরেছেন।

বিশ্বরূপার নূতন আকর্ষণ রাসবিহারী সরকার পরিচালিত 'চৌরঙ্গী'

বিশ্বরূপার নূতন আকর্ষণ শঙ্করের "চৌরঙ্গী"। বহু পঠিত এবং বহু আলোচিত এই উপন্যাসটির মঞ্চ-রূপায়ণ নিঃসন্দেহে এক দুঃসাহসিক প্রচেষ্টা। চৌরঙ্গী ইন্টারন্যাশনাল হোটেলের উজ্জ্বল আলোর অন্তরালে একালের সমাজজীবনের ঘোরতর অন্ধকারের চেহারাটা লুকিয়ে আছে। সেখানে বঞ্চনা, বেদনা আর হাহাকার যতটা মানবিকতা, মহত্ত্ব আর ভালবাসা ঠিক ততটাই। এ দশকের শক্তিমান নাট্যকার নির্দেশক-প্রযোজক রাসবিহারী সরকার বর্তমান যুগযন্ত্রণার চেহারাটি এই নাটকের কয়েকটি চরিত্রের মধ্য দিয়ে জীবন্ত করে তুলেছেন। চরিত্র রূপায়ণে আছেন—বিকাশ রায়, মঞ্জু দে, সত্য বন্দ্যোপাধ্যায়,

দিলীপ রায়, রবীন মজুমদার, তরুণকুমার, অজয় গাঙ্গুলী, নির্মল ঘোষ, প্রমোদ গাঙ্গুলী, মনু মুখার্জি, মিস জয়া, ব্রতী দত্ত, পুতুল দত্ত এবং জয়শ্রী সেন প্রমুখ শক্তিমান শিল্পিগোষ্ঠী। সঙ্গে আলো তাপন সেন, মঞ্চ সুরেশ দত্ত এবং সংগীত রূপায়ণের দায়িত্ব ভি, বালসারার। ধ্বনি—কমল চৌধুরী। রূপসজ্জা ও সাজসজ্জা যথাক্রমে মহম্মদ সাত্তার ও দানী দাশগুপ্ত। এই প্রথম বাংলা রঙ্গমঞ্চের পাদপ্রদীপের আলোয় একজন সত্যিকারের ক্যাবারে নর্তকী এসে দাঁড়াচ্ছেন।

কানাই বলাই মুক্তিতীর্থের পরিচালনায় সম্প্রতি মহাজাতি সদনে পরিবেশিত হল স্বপনবুড়ো রচিত পৌরাণিক নৃত্যনাট্য 'কানাই বলাই'। নৃত্যনাট্যটি সর্বাঙ্গীণ সুন্দর হতে পারত যদি সঙ্গীত-পরিচালক সুনীল সাহা কণ্ঠশিল্পী নির্বাচনে একটু যত্ন নিতেন। নৃত্য-পরিচালক সুধীর সিংহ নৃত্যের জন্য প্রশংসার দাবী করতে পারেন নিঃসন্দেহে। যন্ত্রসঙ্গীত সুন্দর। নৃত্য-শিল্পীরা প্রত্যেকেই দর্শকদের প্রশংসা লাভ করেছেন তাঁদের কুশলী নৃত্যপটুতার জন্য। সবচেয়ে দর্শকদের অবাক করে দিয়েছিল চার-পাঁচ বছরের মেয়ে সংগীতা শীল শিশু কানাইয়ের ভূমিকায়। এ ছাড়া মঞ্জু দে, গায়ত্রী মুখোপাধ্যায়, শুভ্রা দাস, শাশ্বতী হালদার, সেঁজুতি হালদার, সঙ্ঘমিত্রা চট্টোপাধ্যায়, স্বপ্না ঘোষ, রুমা মুখোপাধ্যায় অনুশ্রী চট্টোপাধ্যায়, স্মৃতি কুণ্ডু ও সুধীর সিংহের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

পরলোকে চারু রায়

কেমন একে একে ঊনবিংশ শতাব্দীর সঙ্গে আমাদের যোগসূত্র ছিন্ন হয়ে যাচ্ছে। এই কিছুদিন আগে নরেন্দ্র দেব, তারাশঙ্কর গেলেন, আবার গেল মঙ্গলবার, মহা-নবমীর রাত্রে গেলেন প্রথিতযশা শিল্পী চারু রায়। ১৮৯০-এর ৬ সেপ্টেম্বর হয়েছিল তাঁর জন্ম। প্রেসিডেন্সী কলেজ থেকে বি-এস-সি পাশ করবার পরে তিনি ১৯১৯-এ বার্ড কোম্পানীর ভূতত্ত্ব বহির্কর্মী (ফিল্ড জিওলজিস্ট) হিসাবে যোগ দেন। কিন্তু খারাপ স্বাস্থ্যের দরুণ তিনি বছর দুয়েকের মধ্যে কাজে ইস্তফা দেন। অবনীন্দ্রনাথের শিষ্যরূপে তিনি একজন ভারতীয় চারুকলার সার্থক শিল্পীরূপে খ্যাতি অর্জন করেন। শীঘ্রই তিনি মঞ্চ ও চলচ্চিত্রজগতেও শিল্প-নির্দেশকরূপে যশের মাল্য ভূষিত হন। শিশিরকুমার যখন সাধারণ নাট্যজগতে তাঁর "সীতা" নাটক নিয়ে আত্মপ্রকাশ করেন, তখন শ্রীরায়ই নতুন শিল্প-নির্দেশনার পরিচয় দেন ত্রিমাত্রিক দৃশ্য-পরিকল্পনা করে। আর্ট থিয়েটারের "শ্রীকৃষ্ণ"তে তাঁর শিল্পসম্মত দৃশ্যাবলী গুণিজনের অকুণ্ঠ প্রশংসা অর্জন করে।

চলচ্চিত্রের পরিচালকরূপেও তিনি নির্বাক ও সবাক যুগে তাঁর শিল্পভাবনার পরিচয় দেন। প্রথমে 'লাইট অব এশিয়া', পরে 'সিরাজ' ও 'থ্রো অব এ ডাইস'-এ শিল্পনির্দেশক ও নায়করূপে তিনি চলচ্চিত্রজগতে আত্মপ্রকাশ করেন। পরে ১৯২৯ থেকে ১৯৩৪-এর মধ্যে 'আনারকলি', 'বিগ্রহ', 'চোরকাঁটা', 'স্বামী'—এই চারটি নির্বাক ছবি পরিচালনা করবার পরে সবাক ছবিতে তিনি 'রাজনটী বসন্তসেনা', 'বাঙ্গালী', 'গ্রহের ফের' 'পথিক' প্রভৃতি ছবি পরিচালনা করেন। শিল্পনির্দেশকরূপে তিনি 'মাইকেল মধুসূদন' ও 'মালঞ্চ' ছবিতে সুনাম অর্জন করেন।

শ্রীরায়ের স্ত্রী কয়েক বৎসর পূর্বেই ধরাধাম ত্যাগ করেছেন। মৃত্যুকালে তিনি একমাত্র পুত্র, পুত্রবধূ, পৌত্রী ও অগণিত বন্ধুবান্ধবকে শোকে নিমজ্জিত করে গেছেন।

বিবিধ সংবাদ

যাদুকর পি সি সরকারের (জুনিয়ার) বদান্যতা : গত ২২শে সেপ্টেম্বর, '৭১ তারিখে যাদুকর শ্রীপ্রদীপচন্দ্র সরকার ভারতের প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর ভবনে তাঁর হাতে বাঙলাদেশ সাহায্য তহবিলের জন্য পঞ্চাশ হাজার এক টাকা দান করেন। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বলেন যে জুনিয়র সরকারের এই মনোবৃত্তি সারা ভারতের শিল্পীদের অনুসরণ করা কর্তব্য। যাদুকর সরকার (জুনিয়ার) দৃষ্টান্তস্বরূপ।

জয়কিষণের মৃত্যুতে 'সংস্কৃতি'র শোক-সভা : চাকপোতার (হাওড়া) ঐতিহ্যশালী প্রতিষ্ঠান 'সংস্কৃতি' গত ১৬ সেপ্টেম্বর এক ভাবগম্ভীর ও পবিত্র পরিবেশের মাঝে ভারতীয় চলচ্চিত্রের প্রখ্যাত সুরকার শঙ্কর-জয়কিষণ জুটীর অন্যতম সঙ্গী শ্রীজয়কিষণের পরলোকগমনে এক শোক-সভার আয়োজন করেন। নিমাই মান্না সভাপতির পদ অলংকৃত করেন। সংস্থার বিভিন্ন সদস্য এবং সভাপতি পরলোকগত জয়কিষণের ভারতীয় চলচ্চিত্র-জগতে অবদানের কথা আলোচনা করেন।

হিমাংশু সঙ্গীত সম্মেলন : গত ১৯শে সেপ্টেম্বর রবীন্দ্র সরোবর হলে হিমাংশু সঙ্গীত সম্মেলন কর্তৃক 'বর্ষামঙ্গল' পরিবেশিত হলো। রবীন্দ্রসঙ্গীতে ও নৃত্যে সমৃদ্ধ এই অনুষ্ঠানটির সব কটি গানই সুগীত। বিশেষ করে অনুরাধা বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'আজ কিছুতেই যায় না,' 'বীথি দাসের 'যেতে দাও গেল যারা', শাশ্বতী গুপ্তের 'ঐ আকাশ পরে' ও প্রমিতা শীলের 'শ্যামল ছায়া নাইবা গেলে' উপস্থিত শ্রোতৃমণ্ডলীর অকুণ্ঠ প্রশংসা অর্জন করে। অন্যান্য শিল্পীদের মধ্যে মণিদীপা শ্যাম, দীপ্তি রায়, শিপ্রা ভট্টাচার্য, সুস্মিতা রায়চৌধুরী ও তোড়া সরকারের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। নৃত্যে শান্তা বসুরায়, চন্দনা বসু, শকুন্তলা বসুরায় ও সুপ্রিয়া মুখোপাধ্যায় সকলের সপ্রশংস দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। সঙ্গীত পরিচালনা করেন রথীন চৌধুরী। যন্ত্রসঙ্গীতে ও সঙ্গতে সহযোগিতা করেন স্বপন মুখোপাধ্যায়, সুশীল দে ভৌমিক, গৌর বসাক, কিশোর নন্দী ও দুলাল ভট্টাচার্য। রূপ-সজ্জায় ননী দাশগুপ্তের অবদান বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

যাত্রাবদল অভিনয় : দুর্গাপুরের বিশিষ্ট নাট্য সংস্থা মিশ্র ইস্পাত সংগঠনী ইস্পাত নগরীর কম্যুনিটি সেন্টার হলে স্বপন সেনগুপ্তের নাটক 'যাত্রাবদল' মঞ্চস্থ করেন গত ২৪ সেপ্টেম্বর সন্ধ্যায়। সংগঠনীর সভ্যরা তাঁদের অন্যান্য নাটকের মতই প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে স্বকীয় বৈশিষ্ট্যের দাবী করতে পারেন। নাটকের সমাজসচেতন বক্তব্য প্রতিটি অভিনেতা ফুটিয়ে তুলতে সক্ষম হয়েছেন। মঞ্চের কাজ ও সঙ্গীত নাটকের বক্তব্যকে দর্শকসাধারণের মধ্যে ছড়িয়ে দিতে সহযোগিতা করে।

খেলাধুলা

দর্শক

ভ্যাসিলি আলেক্সিয়েভ (রাশিয়া) : সদ্যসমাপ্ত ২৫তম বিশ্ব ভারোত্তোলন প্রতিযোগিতার সুপার হেভীওয়েট বিভাগের স্বর্ণ পদক বিজয়ী এবং বিশ্ব রেকর্ডধারী

বিশ্ব ভারোত্তোলন প্রতিযোগিতা

পেরুর লিমা শহরে অনুষ্ঠিত ২৫তম বিশ্ব ভারোত্তোলন প্রতিযোগিতায় রাশিয়া ৪৪ পয়েন্ট সংগ্রহের সূত্রে দলগত খেতাব লাভ করেছে। এই নিয়ে রাশিয়া ১৭বার দলগত খেতাব পেল গত ১৯বারের বিশ্ব ভারোত্তোলন প্রতিযোগিতায়। ১৯৭১ সালের প্রতিযোগিতার চূড়ান্ত ফলাফল এই রকম দাঁড়িয়েছে : ১ম রাশিয়া (৪৪ পয়েন্ট), ২য় পোল্যাণ্ড (২৪ পয়েন্ট), ৩য় জাপান এবং বুলগেরিয়া (প্রত্যেকে ১১ পয়েন্ট), ৪র্থ হাঙ্গেরী (১৫ পয়েন্ট), ৫ম আমেরিকা, ফিনল্যাণ্ড এবং পূর্ব জার্মাণী (প্রত্যেকে ৮ পয়েন্ট), ৬ষ্ঠ ইরাণ (৭ পয়েন্ট)। ৫ পয়েন্ট করে পেয়েছে ইতালী, [illegible] এবং সুইডেন।

প্রতিযোগিতায় সুপার হেভিওয়েট বিভাগেরই আকর্ষণ বেশী। রাশিয়ার ভ্যাসিলি আলেকজেভ এই বিভাগের চারটি পর্যায়েই (প্রেস, স্ন্যাচ, জার্ক এবং মোট ওজন) বিশ্ব রেকর্ড ভেঙে চারটি স্বর্ণ-পদক জয়ী হয়েছেন। তিনি প্রেসে ২৩০ কিলো, স্ন্যাচে ১৭০ কিলো এবং জার্কে ২৩০ কিলো ওজন উত্তোলন করেন। তাঁর এই উত্তোলনের মোট ওজন দাঁড়ায় ৬৩০ কিলোগ্রাম। প্রতিযোগিতার অপর কোন বিভাগে তাঁর মত চারটি নতুন বিশ্ব রেকর্ড এবং চারটি স্বর্ণপদক কেউ পান নি।

জাপান ৩য় স্থান পেয়ে এশিয়া মহাদেশের মুখোজ্জ্বল করেছে। জাপান মোট ১৩টি পদক পেয়েছে (স্বর্ণ ৪, রৌপ্য ৫ ও ব্রোঞ্জ ৪)। ফেদারওয়েট বিভাগের চারটি স্বর্ণপদকই জয় করেন জাপানের জোসিনুবি মিয়াকে। তাছাড়া জাপানেরই কেনিচি আন্দো এই বিভাগের চারটি রৌপ্যপদক জয় করেন।

কম্প্যুটারে টেস্ট ক্রিকেট খেলা

ঐতিহাসিক লর্ডস মাঠের হলঘরে কম্প্যুটার মেশিনের সাহায্যে অনুষ্ঠিত ইংল্যাণ্ড-অস্ট্রেলিয়ার কৃত্রিম টেস্ট ক্রিকেট খেলাটি সারা পৃথিবীর ক্রিকেট অনুরাগী দেশে যথেষ্ট আগ্রহ এবং উদ্দীপনা সঞ্চার করেছিল। এই টেস্ট খেলায় অস্ট্রেলিয়া শেষ পর্যন্ত ১৬৫ রানে জয়ী হয়। খেলাটির নাম দেওয়া হয়েছিল 'শতাব্দীর টেস্ট খেলা'। গত ৫০ বছরে ইংল্যাণ্ড-অস্ট্রেলিয়ার টেস্ট ক্রিকেট খেলায় যাঁরা ব্যক্তিগত ক্রীড়াচাতুর্যে আন্তর্জাতিক খ্যাতি লাভ করেছেন তাঁদের থেকে বাছাই করে দল গঠন করা হয়েছিল। ইংল্যাণ্ড দলের খেলোয়াড় নির্বাচন করেন ইংল্যাণ্ডের প্রাক্তন অধিনায়ক 'গ্যাবি' অ্যালেন এবং অস্ট্রেলিয়া দল গঠন করেন অস্ট্রেলিয়ার প্রাক্তন অধিনায়ক স্যার ডোনাল্ড ব্র্যাডম্যান। এই দল গঠন উপলক্ষ করে যথেষ্ট বিরূপ সমালোচনা হয়েছে। কাজটা খুবই কঠিন ছিল—'বাঁশ বনে ডোম কানা' হওয়ার মত দিশেহারা অবস্থা।

ইংল্যাণ্ড-অস্ট্রেলিয়ার গত ৫০ বছরের টেস্ট ক্রিকেট খেলার যাবতীয় তথ্য এবং পরিসংখ্যান উদরস্থ করে এই কম্প্যুটার মেশিনটি পাঁচদিন ধরে ইংল্যাণ্ড-অস্ট্রেলিয়ার পক্ষে টেস্ট ক্রিকেট ম্যাচ খেলেছিল। তবে আসল-নকলের মধ্যে যে ফারাক থেকে যায় এক্ষেত্রেও তার ব্যতিক্রম হয় নি। যে বৈচিত্র্যে ক্রিকেট খেলার এত মহিমা তা কম্প্যুটার মেশিনের পক্ষে পরিবেশন করা মোটেই সম্ভব নয়।

আলোচ্য কম্প্যুটার টেস্ট খেলায় অস্ট্রেলিয়ান দলের অধিনায়ক ডন ব্র্যাডম্যান টসে জিতে প্রথম ব্যাট করার দান নিয়েছিলেন। প্রথম দিনের খেলায় অস্ট্রেলিয়ার ৮টা উইকেট পড়ে ২৮৯ রান উঠেছিল। দ্বিতীয় দিনে অস্ট্রেলিয়ার ৩২১ রানের মাথায় প্রথম ইনিংস শেষ হয়। সর্বকালের শ্রেষ্ঠ ব্যাটসম্যান ডন ব্র্যাডম্যান মাত্র ২২ রান করে তাঁর অনুরাগীদের হতাশ করেন। তিনি ভেরিটির বল থেকে তাঁরই হাতে 'ক্যাচ' তুলে খেলা থেকে বিদায় নেন।

ডন ব্র্যাডম্যান

'বডি লাইন' বোলিংয়ের উদ্ভাবক লারউড একটাও উইকেট পান নি। তাঁকে অস্ট্রেলিয়ার খেলোয়াড়রা পরোয়া করেন নি। লারউডের বোলিংয়ে অস্ট্রেলিয়ার ৭৫ রান উঠেছিল।

দ্বিতীয় দিনের বাকি সময়ের খেলায় ইংল্যান্ড ৮ উইকেটের বিনিময়ে ২১৮ রান তুলেছিল।

তৃতীয় দিনে ইংল্যান্ডের ২৬৬ রানের মাথায় প্রথম ইনিংস শেষ হলে অস্ট্রেলিয়া ২য় ইনিংসের মাত্র একটা উইকেট খুইয়ে ২৫০ রান তুলে ৩০৫ রানে এগিয়ে যায়। ব্র্যাডম্যান ১১৮ রান এবং মরিস ১১৬ রান করে খেলায় অপরাজিত থাকেন।

চতুর্থ দিনে অস্ট্রেলিয়ার দ্বিতীয় ইনিংস ৪৩৭ রানের মাথায় শেষ হয়। অস্ট্রেলিয়ার এই ৪৩৭ রানের মধ্যে ব্র্যাডম্যান একাই ২২২ রান করেছিলেন। মরিস করেছিলেন ১৪২ রান। এবারও লারউড শূন্য হাতে ফিরলেন—৭৮ রান দিয়ে একটাও উইকেট পেলেন না। খেলায় জয়লাভের জন্যে ইংল্যান্ডের ৪৯৩ রানের প্রয়োজন ছিল। হাতে ছিল ৮ ঘণ্টা সময়। চতুর্থ দিনের খেলায় ইংল্যান্ড ২য় ইনিংসের ২টো উইকেট খুইয়ে ১৩১ রান সংগ্রহ করেছিল।

পঞ্চম অর্থাৎ খেলার শেষদিনে ইংল্যান্ডের ২য় ইনিংস ৩২৭ রানের মাথায় শেষ হলে অস্ট্রেলিয়া ১৬৫ রানে জিতে যায়। ইংল্যান্ডের চারজন খেলোয়াড় হবস (৬০ রান), লেল্যান্ড (৬০ রান), হ্যামণ্ড (৫৮ রান) এবং অধিনায়ক মে (৫৪) ৫০ রানের গণ্ডি অতিক্রম করলেও পরবর্তী খেলোয়াড়রা রিচি বেনোর লেগ-স্পিন বোলিংয়ে ঘায়েল হয়েছিলেন।

নির্বাচিত খেলোয়াড়বৃন্দ

অস্ট্রেলিয়া : আর্থার মরিস, বিল পন্সফোর্ড, ডন ব্র্যাডম্যান (অধিনায়ক), চার্লস ম্যাকার্টনি, নীল হার্ভে, বব সিম্পসন, কিথ মিলার, রিচি বেনো, রে লিন্ডওয়াল, ডন ট্যালন এবং বিল ও'রেলী।

ইংল্যান্ড : জ্যাক হবস, লেন হাটন, ওয়ালি হ্যামণ্ড, ডেনিস কম্পটন, মরিস লেল্যান্ড, পিটার মে (অধিনায়ক), গডফ্রে ইভান্স, হ্যারল্ড লারউড, মরিস টেট, জিম লেকার এবং হেডলে ভেরিটি।

সংক্ষিপ্ত স্কোর

অস্ট্রেলিয়া : ৩২১ রান (পন্সফোর্ড ৮১ এবং মিলার ৭৫ রান। টেট ৮৫ রানে ৩, ভেরিটি ৩১ রানে ৪ এবং লেকার ৪৭ রানে ২ উইকেট)

ও ৪৩৭ রান (মরিস ১৪২ এবং ব্র্যাডম্যান ২২২ রান। লেকার ১০৫ রানে ৪, ভেরিটি ৭৪ রানে ৩ এবং টেট ৭৩ রানে ২ উইকেট)

ইংল্যান্ড : ২৬৬ রান (হাটন ৮৬ এবং লেল্যান্ড ৮০ রান। লিন্ডওয়াল ৫৭ রানে ৩ এবং মিলার ৪৬ রানে ৫ উইকেট)

ও ৩২৭ রান (হবস ৬০, হ্যামণ্ড ৫৮, লেল্যান্ড ৬০ এবং মে ৫৪ রান। বেনো ৬৬ রানে ৪ এবং মিলার ৬৫ রানে ৩ উইকেট)

রিচি বেনো

এশিয়ান জুনিয়র টেনিস প্রতিযোগিতা

সিউলে (কোরিয়া) অনুষ্ঠিত ১ম এশিয়ান জুনিয়র টেনিস প্রতিযোগিতায় মোট ৬টি খেতাবের মধ্যে ভারতবর্ষ বালক বিভাগের তিনটি খেতাব জয় করে অসাধারণ কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছে। সাতটি দেশের ৩০ জন বালক এবং ১৭ জন বালিকা প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণ করেছিল। ভারতবর্ষের পক্ষে খেলেছিল মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র বিজয় অমৃতরাজ এবং জয়কুমার রায়। বালকদের সিঙ্গলস ফাইনালে ভারতবর্ষের দু'জন খেলেছিল—অমৃতরাজ এবং রায়। বালকদের দলগত বিভাগের ফাইনালে ভারতবর্ষের অমৃতরাজ এবং রায় ফিলিপাইনের খেলোয়াড়দের ৩—০ খেলায় পরাজিত করে 'উ শান্ট' কাপ জয়ী হয়। বালিকা বিভাগে ভারতবর্ষ অংশ গ্রহণ করে নি।

বিশ্ব হকি প্রতিযোগিতা

আগামী ১৫ই অক্টোবর স্পেনের বার্সিলোনায় প্রথম বিশ্ব কাপ হকি প্রতিযোগিতার উদ্বোধন হবে। এই প্রতিযোগিতায় যোগদানকারী ১০টি দেশ সমান দু'ভাগ হয়ে প্রথমে লীগ প্রথায় খেলবে। ভারতবর্ষের খেলা পড়েছে 'এ' গ্রুপে। সেখানে ভারতবর্ষের প্রতিদ্বন্দ্বী পশ্চিম জার্মানী, ফ্রান্স, আর্জেন্টিনা এবং কেনিয়া। 'বি' গ্রুপে খেলবে পাকিস্তান, নেদারল্যান্ড, অস্ট্রেলিয়া, জাপান এবং স্পেন।

এই প্রতিযোগিতায় যোগদানের উদ্দেশ্যে ১৬ জন খেলোয়াড় নিয়ে ভারতীয় হকি দল গঠন করা হয়েছে। এই দলে পাঞ্জাবের ৬ জন, বাংলার ২ জন, বিশ্ববিদ্যালয়ের ২ জন, বোম্বাইয়ের ২ জন, সামরিক বিভাগের ২ জন, তামিলনাড়ু ও ভূপালের ১ জন করে খেলোয়াড় আছে

অমৃত পাবলিশার্স প্রাইভেট লিঃ-এর পক্ষে শ্রীসুপ্রিয় সরকার কর্তৃক পত্রিকা প্রেস, ১৪, আনন্দ চ্যাটার্জি লেন, কলিকাতা-৩ হইতে মুদ্রিত ও তৎকর্তৃক ১১।১, আনন্দ চ্যাটার্জি লেন, কলিকাতা—৩ হইতে প্রকাশিত।

১১শ বর্ষ
২য় খণ্ড

অমৃত

২৩শ সংখ্যা
মূল্য ৫০ পয়সা

Friday, 15th October, 1971 শুক্রবার, ২৮শে আশ্বিন, ১৩৭৮ 50 Paise

সূচীপত্র

পৃষ্ঠা	বিষয়	লেখক

প্রচ্ছদ : শ্রীনলরশঙ্কর দাশগুপ্ত

নিয়মাবলী

বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

লেখকদের প্রতি

১। অমৃতে প্রকাশের জন্যে প্রেরিত সমস্ত রচনার নকল রেখে পাঠাবেন। মনোনীত রচনার খবর দু-মাসের মধ্যে জানান হয়। অমনোনীত রচনা কোনক্রমেই ফেরৎ পাঠান সম্ভব নয়। লেখার সঙ্গে কোন ডাকটিকিট পাঠাবেন না।

২। প্রেরিত রচনা কাগজের এক পৃষ্ঠায় স্পষ্টাক্ষরে লিখিত হওয়া আবশ্যক। অস্পষ্ট ও দুর্বোধ্য হস্তাক্ষরে লেখা প্রকাশের জন্যে গৃহীত হয় না।

৩। রচনার সঙ্গে লেখকের নাম ও ঠিকানা না থাকলে 'অমৃতে' প্রকাশের জন্যে গৃহীত হয় না।

এজেণ্টদের প্রতি

এজেন্সীর নিয়মাবলী এবং সে সম্পর্কিত অন্যান্য জ্ঞাতব্য তথ্য 'অমৃত' কার্যালয়ে পত্র দ্বারা জ্ঞাতব্য।

গ্রাহকদের প্রতি

১। গ্রাহকের ঠিকানা পরিবর্তনের জন্যে অন্তত ১৫ দিন আগে 'অমৃত' কার্যালয়ে সংবাদ দেওয়া আবশ্যক।

২। ভি-পি-তে পত্রিকা পাঠানো হয় না। গ্রাহকের চাঁদা নিম্নলিখিত হারে মণিঅর্ডারযোগে 'অমৃত' কার্যালয়ে পাঠানো আবশ্যক।

চাঁদার হার

	কলিকাতা	মফঃস্বল
বার্ষিক	টাকা ২৫.০০	টাকা ৩০.০০
ষান্মাষিক	টাকা ১২.৫০	টাকা ১৫.৫০
ত্রৈমাসিক	টাকা ৬.২৫	টাকা ৮.০০

'অমৃত' কার্যালয়

১১/১ আনন্দ চ্যাটার্জি লেন,
কলিকাতা—৩

ফোন : ৫৫-৫২৩১ (১৪ লাইন)

এক নজরে

টোঙ্গা রাজ্য :

টোঙ্গার রাজদম্পতি এসেছেন ভারতে রাষ্ট্রীয় সফরে। সার্বভৌমের শুভাগমন, তাই রাজধানীর বিমানবন্দরে একুশবার তোপধ্বনি করে তাঁদের স্বাগত জানানো হয়। রাষ্ট্রপতি এগিয়ে আসেন রাজদম্পতিকে সাদর সম্ভাষণ জানাতে, এবং সম্বর্ধনার উত্তরে টোঙ্গার রাজা আশা প্রকাশ করেন যে, তাঁর এদেশে আগমনের ফলে ভারত-টোঙ্গা মৈত্রী বন্ধন আরও দৃঢ় হবে।

ভারত-টোঙ্গা মৈত্রী বন্ধন! দুটি সার্বভৌম রাষ্ট্রের সমমর্যাদায় পাশাপাশি চলার সংকল্প ঘোষণা। স্বভাবতই জানতে ইচ্ছা হবে, মিত্রতার যাত্রায় কে এই ভারতের নবসাথী? তাই এই প্রসঙ্গে প্রতিবেদিত হচ্ছে টোঙ্গার সংক্ষিপ্ত ভৌগোলিক ও ঐতিহাসিক পরিচিতি।

টোঙ্গা দক্ষিণ প্রশান্ত মহাসাগরের দূরপ্রান্তে, ফিজির পূর্বে ও সামোয়ার দক্ষিণে অবস্থিত একটি নিঃসঙ্গ দ্বীপপুঞ্জ। আয়তন ২৬৯ বর্গমাইল (৬৯৭ বর্গ কিলোমিটার); লোকসংখ্যা, ১৯৭০ সালের হিসাবমতো কিঞ্চিদধিক ৮৭ হাজার। টোঙ্গাটাপু দ্বীপে অবস্থিত রাজধানী নুকুয়ালোফার লোকসংখ্যা ষোল হাজার। প্রায় দশম শতাব্দী থেকে একটি রাজপরিবার বংশপরম্পরায় টোঙ্গা দ্বীপপুঞ্জ শাসন করে আসছে। পাশ্চাত্য সভ্যতার সঙ্গে টোঙ্গার সংযোগ ঘটে, ১৬১৬ খৃষ্টাব্দে ওলন্দাজ নাবিক জেকব লিমেয়ার ঐ দ্বীপরাজ্যে উপস্থিত হওয়ার পর। তারপর অস্ট্রেলিয়া মহাদেশের আবিষ্কর্তা ক্যাপ্টেন কুক টোঙ্গা দ্বীপপুঞ্জ পরিদর্শন করেন ১৭৭৩ খৃষ্টাব্দে। সেই সময় টোঙ্গার রাজাকে অস্ট্রেলিয়ার উপকূলের একটি বিরাট সামুদ্রিক কচ্ছপ উপহার দিয়েছিলেন ক্যাপ্টেন কুক। ১৯০০ খৃষ্টাব্দে এক সন্ধিবলে টোঙ্গা বৃটেনের রক্ষণাধীন রাজ্যে পরিণত হয়, কিন্তু ১৯৭০ খৃষ্টাব্দের ৪ঠা জুন আর এক সন্ধি অনুসারে টোঙ্গা পূর্ণ স্বাধীন রাজ্যরূপে প্রতিষ্ঠিত হয়। কিন্তু রাষ্ট্রসঙ্ঘের সদস্য হওয়ার সামর্থ্য টোঙ্গার নেই, তাই কমনওয়েলথের সদস্য হয়েই টোঙ্গা খুশি।

কৃষি-নির্ভর টোঙ্গার শিল্পের সম্ভাবনা সীমিত, অথচ জনসংখ্যার চাপ ক্রমবর্ধমান। এখনই তার প্রতি বর্গমাইলে জনসংখ্যার ঘনত্ব ৩২৩, যা ভারতের চেয়ে বেশি। তাই, ভারতের আন্দামান দ্বীপপুঞ্জের আয়তনের নয় ভাগের এক ভাগ—টোঙ্গার অর্ধেক লোক কর্মহীন। টোঙ্গার একমাত্র আশা, অচিরে তার উপকূলে আবিষ্কৃত হবে খনিজ তেলের অন্তহীন উৎস, যা টোঙ্গাকে করে তুলবে দূরপ্রাচ্যের কুয়েট। সে অনুসন্ধানের কাজে ভারতীয় বিশেষজ্ঞদের সহায়তার প্রার্থনা জানাতেই টোঙ্গার রাজা এসেছেন ভারতে।

টোঙ্গার জনজীবন প্রশান্ত মহাসাগরের মতোই নিস্তরঙ্গ, তাই টোঙ্গা কখনও সংবাদের বিষয় হয় না। কিন্তু তারও ব্যতিক্রম ঘটে কয়েক মাস আগে যখন টোঙ্গা জানায় যে তার রাজোদ্যানের শ্রেষ্ঠ সম্পদ ক্যাপ্টেন কুকের উপহার সেই কচ্ছপটির মৃত্যু হয়েছে।

রাজ উৎসব :

পারশ্যে রাজ শাসনের সার্ধ-দ্বিসহস্র বর্ষপূর্তি উপলক্ষে যে উৎসবের আয়োজন চলেছে ইতিহাসে তা নাকি প্রায় নজিরবিহীন। বিশাল বৃটিশ সাম্রাজ্যে যেদিন সূর্য অস্ত যেত না সেদিনও এমন জাঁকজমকের উৎসব খুব বেশি হয়নি। ঐতিহাসিক মহলের অভিমত, ইংরেজ সম্রাট অষ্টম হেনরি যখন ১৫২০ সালে ফরাসি সম্রাট প্রথম ফ্রান্সিসের সঙ্গে দেখা করেছিলেন সেই সময় যে উৎসবের প্লাবন বয়েছিল ফ্রান্সে তাও ম্লান হয়ে যাবে ইরানের রাজকীয় উৎসবের কাছে। উৎসব কাকে বলে, জাঁকজমক বলতে কি বোঝায় বা রাজ-বিলাসিতাই বা কি—তা ফ্রান্সের বনেদি সমাজের চেয়ে আর কে ভাল বোঝে? তাই এ ব্যাপারে সব আয়োজনের দায়িত্ব ইরানের রাজকীয় প্রশাসন ফ্রান্সের শিল্পী, কারিগর ও বিলাসব্যবসায়ীদের উপর অর্পণ করেছে। ফলে সারা ফ্রান্সের অভিজাত ব্যবসায়ী মহলে একটা সাজ সাজ রব পড়ে গেছে।

গত ছয় মাস ধরে প্রতি সপ্তাহে দুটি জেট বিমান প্যারী-তেহরান ছোটাছুটি করছে উৎসব সামগ্রী পৌঁছিয়ে দিতে বা উৎসবের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা করতে। ফ্রান্সের শতাধিক কারখানা এখন শুধু নানা সুগন্ধি প্রস্তুতির কাজে লিপ্ত। ঐ সুগন্ধিতে সিক্ত হবে সম্মানিত অতিথিদের জন্য নির্মিত শিবিরগুলি। সোনালী কাপড়ের শিবিরগুলিও প্রস্তুত হচ্ছে ফ্রান্সের কয়েকটি কারখানায়।

ইরানের রাজদরবারের শীর্ষ-পারিষদরা যে স্বর্ণসূত্রের পরিচ্ছদ ধারণ করবেন তার জন্য এ পর্যন্ত ৩৫ মাইল দীর্ঘ স্বর্ণসূত্র প্রস্তুত হয়েছে। ঐ পোষাকগুলির 'ট্রায়াল' দেওয়া হয়েছে এ পর্যন্ত ছয়বার, তার জন্য ফ্রান্সের দরজিরা ছয়বার প্যারী-তেহরান ছোটাছুটি করেছেন। আমন্ত্রিত রাষ্ট্রপ্রধান ও রাষ্ট্র প্রতিনিধিরা যে শিবিরে বসে পানাহার করবেন, নীল ও সোনালী রঙে মেশানো সেই শিবির থেকে সর্বদা ইরানের আতরের গন্ধ বিচ্ছুরিত হবে, যদিও সে সুগন্ধিও নির্মিত হচ্ছে ফ্রান্সে। শিবিরের আলোকসজ্জা নিয়ন্ত্রণের জন্য ফ্রান্স থেকে দশজন আলোকশিল্পী আসবেন।

শুধু উৎসবটাই হচ্ছে না ফ্রান্সে। কিন্তু তার জন্য ফরাসীদের কোন দুঃখ নেই। কারণ রাজ-উৎসবের প্রায় সব টাকাই চলে যাচ্ছে সে দেশে, যে দেশ রাজার শিরশ্ছেদ করে একদিন ইতিহাস সৃষ্টি করেছিল।

ব্যাঙ্ক ব্যবস্থা সম্প্রসারণে ইউ-বি-আই

বাঁকুড়া জেলার গ্রামাঞ্চল। নাম গঙ্গাজলঘাটি। এতদিন এখানে ছিল না কোন ব্যাঙ্ক। ছিল না আধুনিক অর্থ-ব্যবস্থার স্মারক-চিহ্ন। দেশের ব্যাঙ্কিং মানচিত্রে গঙ্গাজলঘাটি ছিল তাই অনুপস্থিত। অজানা অচেনা নামমাত্র। গত ৮ অকটোবর সেই গঙ্গাজলঘাটিতেই খোলা হল ইউনাইটেড ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়ার নতুনতম শাখাটি। আর এই উদ্বোধনের মধ্য দিয়ে ইউ-বি-আই-র শাখা সংখ্যা দাঁড়ালো পাক্কা তিনশো।

ভারতের ব্যাঙ্ক জাতীয়করণ হয়েছিল উনিশশো উনসত্তরের জুলাইয়ে। ইউ-বি-আই হল সেই ১৪টি বৃহৎ ব্যাঙ্কেরই অন্যতম। রাষ্ট্রায়ত্ত হবার পর এই প্রতিষ্ঠানের সম্প্রসারণ সত্যি সত্যিই বিস্ময়ের। তাই জাতীয়করণের সময় যেখানে ছিল ১৭৪টি শাখা, আজ সেখানে দাঁড়িয়েছে ৩০০টি। সবচেয়ে বড় কথা এর মধ্যে দুশোরও বেশি শাখা রয়েছে শহরতলি ও গ্রাম-এলাকায়। সম্প্রতি একটি খবরে জানা যায় চলতি বছরেই ইউ-বি-আই খুলবে আরো ৩১টির মতো শাখা, আর তার ভিতর ২১টিই কাজ করবে শহরতলিতে অথবা গ্রামাঞ্চলে।

৭।১০।৭১

—প্রত্যক্ষদর্শী

সম্পাদকীয়

রেল নিয়ে

স্বাধীনতাউত্তরকালে ভারতীয় রেল বিভাগ নিয়ে যে ধরনের নাড়াচাড়া হয়েছে তা অভূতপূর্ব। এক মন্ত্রী যাত্রীবাহী ট্রেনের শ্রেণীবিন্যাস করে ফার্স্টক্লাস ও ইন্টারক্লাস লোপ করলেন। পরে আবার অন্য হুকুমে ফার্স্টক্লাস হল তবে তা আসলে পুরাতন সেকেন্ড ক্লাস। রেলের পুনর্বিন্যাসের নামে কোথাও দুটি রেলকে এক করা হল, কোথাও একটি রেলকে দুটি করা হল, যখন যে অঞ্চলের দাবী প্রবল হয়েছে সেখানেই একটি নতুন রেলওয়ে "জোন" স্থাপন করা হয়েছে। এখানকার মাটি ওখানে এবং ওখানকার মাটি এইখানে এই নীতির ফলে রেলওয়ের কর্মদক্ষতা যথেষ্ট পরিমাণে হ্রাস পেয়েছে এবং সেই সঙ্গে আর্থিক ক্ষতিও হয়েছে প্রচুর। গুলজারিলাল নন্দা এবং লালবাহাদুর শাস্ত্রী ছাড়া রেল বিভাগের মন্ত্রীরা বরাবরই দক্ষিণ ভারতের কোনো না কোন অঞ্চল থেকে নির্বাচিত হয়েছেন—এর পিছনে কোনো টেকনিক্যাল কারণ আছে কিনা তা সাধারণের অজ্ঞাত। বর্তমানে মহীশূরের কে, হনুমন্তিয়া রেলমন্ত্রকের সর্বোচ্চ শিখরে অধিষ্ঠিত। যাঁদের ওপর রেল পরিচালনার ভার তাঁদের সঙ্গে দফতরচূড়ামণি রাজনৈতিক নেতাদের সঙ্গে সম্পর্কটা কোনোদিনই তেমন প্রীতিজনক হয়নি। কৃষ্ণ মেননের আমলের প্রতিরক্ষা দপ্তরের হালচাল ত' অবসরপ্রাপ্ত একাধিক সেনানায়ক রচিত গ্রন্থে সুস্পষ্টভাবে ফাঁস করে দেওয়া হয়েছে। এইবার রেল দফতরের অন্তর্বিরোধের জঘন্য কাহিনীও প্রকাশিত হল। উপর মহলের কোন্দলের ফলে রেল বিভাগ ক্রমশই তার দক্ষতা হারাবে এই আশংকা শুভবুদ্ধিসম্পন্ন সকল ভারতবাসীর মনে জেগেছে। অনেকগুলি বিষয়ে রেল বোর্ডের অভ্যন্তরে প্রচন্ড মতভেদ শুরু হয়েছে। ২২শে সেপ্টেম্বর তারিখে দিল্লী থেকে প্রকাশিত একটি দৈনিক পত্রের বিশেষ সংবাদদাতার সংবাদে জানা যায় যে রেল বোর্ডের ভিতরকার কলহ আর চাপা যাচ্ছে না। দফতরের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রীমহোদয় এবং বোর্ডের চেয়ারম্যান শ্রী বি, সি, গঙ্গোপাধ্যায়ের সঙ্গে প্রচন্ড লড়াই শুরু হয়েছে। যে সব কারণে মতভেদ ঘটেছে তার সঙ্গে রেলওয়ের আয় বৃদ্ধি বা দক্ষতা বর্ধনের কোনো সম্পর্ক নেই। প্রায় সত্তরজন উচ্চপদস্থ রেলওয়ে অফিসরের ট্রানসফার নিয়ে প্রথম মতবিরোধ শুরু হয়; তারপর রাজধানী একস্প্রেস কানপুরে থামবে কি থামবে না তাই নিয়ে বিতর্ক। ট্রানসফার নাকি কর্মক্ষমতা বা এফিসিয়েন্সি বৃদ্ধির প্রয়োজনে করা হয়, অন্য কারণও থাকতে পারে। এরপর আগস্ট মাসে বোর্ডের ট্রান্সপোর্ট মেম্বারের সঙ্গে চেয়ারম্যানের প্রকাশ্য বিরোধ বাধে নর্থ-ইস্টার্ন রেলওয়ে থেকে একজন অফিসারকে নর্দার্ন রেলওয়ে বদলী করা নিয়ে; আদেশ, পুনরাদেশ ইত্যাদির ফলে একই পদের জন্য দুজন দাবীদার এসে হাজির হন। এর পর চক্রান্ত হল চেয়ারম্যানকে বিতাড়ন করা এবং বোধকরি তার পূর্ব ব্যবস্থানুসারে ২১শে সেপ্টেম্বরের মধ্যেই তাঁর উত্তরাধিকারীও স্থির হয়ে গেল। এইখানে বলা প্রয়োজন যে চেয়ারম্যানের ৫৮ বছর বয়সে ১৫ই জানুয়ারী তারিখে অবসর গ্রহণ করার কথা। তাঁর স্থলাভিষিক্ত মিঃ বি, এস, ডি বালিগার আজ থেকে এক বছর পরে অবসর গ্রহণের কথা, তাঁকে আগেভাগে আরো এক বছর একস্টেনসন দিয়ে গদীতে বসানো হবে। এই সিদ্ধান্ত এডমিনিস্ট্রেটিভ রিফর্মস কমিশনের সুপারিশ মত নাকি করা হয়েছে। এই কমিশনের চেয়ারম্যান ছিলেন মিঃ হনুমন্তিয়া। ট্রান্সপোর্টেশন মেম্বার মিঃ স্বামীনাথনও ডিসেম্বরে অবসর নেবেন তাঁর জায়গায় বসবেন ওয়েস্টার্ন রেলওয়ের মিঃ কাউল। এর পর চেয়ারম্যান দাঁতের ডাক্তারের কাছে যাবেন বলে ছুটি প্রার্থনা করায় তাঁকে পুরা ছুটি নেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয় এবং তিনি তিনদিনের ক্যাজুয়েল লিভ নিলে তাঁর দফতর অপরকে বণ্টন করা হয়। বি, সি, গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয় একটি সাংবাদিক সম্মেলনে জানান চাণক্যপুরীতে পরিবহণ মুজিয়মের জন্য নতুন ভবনের ভিত্তি স্থাপনের সময় রটনা করা হয় তিনি তিন মাস পূর্বেই অবসর গ্রহণ করেছেন। বোর্ডের (অধঃস্তন কর্মচারী) সেক্রেটারী চেয়ারম্যানকে সতর্ক করে দেন যে, সাংবাদিকদের সঙ্গে আলোচনা করার অধিকার তাঁর নেই। দুর্নীতি দূর করার প্রচেষ্টায় আজ রেল বোর্ডের সর্বাধিনায়কের এই অবস্থা। তিনি বলেছেন, "রেলওয়ে বিভাগকে কর্মক্ষম করার জন্য সচেষ্ট হয়েছিলাম সেই আমার অপরাধ।" এর পর সম্ভবতঃ তাঁর বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গৃহীত হবে। কিন্তু কলঙ্ক চাপা যাবে না। আজ সরকারী প্রশাসনযন্ত্রে ব্যক্তিগত খেয়ালখুশীর ফলে কি দুঃখজনক পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়েছে তা এই ঘটনায় আরো সুস্পষ্ট হল।

পূর্ব জার্মাণীর ২২তম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী উপলক্ষে কলকাতা তথ্যকেন্দ্রে একটি আলোকচিত্র প্রদর্শনীর উদ্বোধন করছেন শ্রীতুষারকান্তি ঘোষ। তাঁর দক্ষিণে পূর্ব জার্মাণীর কনসাল জেনারেল মিঃ মে।

কাম্বোডিয়ার ক্রেক শহরে উত্তর ভিয়েৎনামী বাহিনীর আক্রমণ প্রতিরোধের জন্য মার্কিণ ট্যাঙ্ক বহর ভিয়েৎনামের টৌনিনে এসে সমবেত হচ্ছে।

রাষ্ট্রপতি শ্রীভি ভি গিরি ৫ই অক্টোবর নয়াদিল্লীতে এক উপাধি বিতরণ অনুষ্ঠানে ওড়িশার বিখ্যাত কবি, ঔপন্যাসিক ও সাংবাদিক শ্রীকালিন্দীচরণ পাণিগ্রাহীকে 'পদ্মভূষণ' উপাধিতে ভূষিত করেছেন।

খিদিরপুরের ভুকৈলাস রোডের এক বিস্তৃত এলাকা জুড়ে ময়লা জল জমে নরককুণ্ডের সৃষ্টি হয়েছে। গত কয়েক মাস যাবৎ মোমিনপুরে পাম্পিং ষ্টেশন অকেজো হয়ে আছে। তারই ফলে এই অবস্থা।

পটভূমি

এ আই টি ইউ সি ভেঙে দু' টুকরো করে যখন মার্কসবাদী কম্যুনিষ্ট পার্টি নিজস্ব ট্রেড ইউনিয়ন সংস্থা সিটু গড়ে তুলে ময়দানে বিরাট সমাবেশ করলেন তখনও সেখানে বড় বড় হরফে প্রধান শ্লোগান অবশ্যই এই লেখা ছিল—'দুনিয়ার মজদুর এক হও।' সেটা গত বছর মে মাসের কথা। এ-বছর পুজোর মুখে আসানসোলে সিটুর যে প্রথম সম্মেলন হয়ে গেল সেখানেও ট্রেড ইউনিয়ন ঐক্য গড়ে তোলার জন্যে আহ্বান জানানো হল। তার ঠিক আগে বাঙ্গালোরে মার্কসবাদী কম্যুনিষ্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির বৈঠকে গৃহীত প্রস্তাবেও 'ইন্দিরা কংগ্রেস সরকারের' জন-বিরোধী নীতির বিরুদ্ধে মিলিত সংগ্রাম গড়ে তুলতে বামপন্থী ও গণতান্ত্রিক দলগুলির আহ্বান জানানো হয়। কেন্দ্রীয় কমিটি বললেন, সি পি এম শুধু একটা নির্বাচনী ফ্রন্ট চায় না, আরো বেশী কিছু চায়। সেই 'বেশিটা' কী? তা হল, সব গণতান্ত্রিক দল ও তাদের নেতৃত্বাধীন বিভিন্ন গণ-সংগঠন গণ-সংগ্রাম গড়ে তুলবে। অর্থনৈতিক বোঝার বিরুদ্ধে এবং সাধারণ মানুষের আত্মরক্ষার সপক্ষে গড়ে উঠবে এই সংগ্রাম। ঐভাবেই শাসকশ্রেণীর ক্রমবর্ধমান চ্যালেঞ্জের মোকাবিলা করা যাবে। তা যদি না-করা হয়, তবে জনসাধারণের অসন্তোষ অপরিচিত হবে, এবং প্রতিক্রিয়াশীল পথে প্রবাহিত হবে, ফলে শাসকশ্রেণী খুব সহজেই গণ-সংগ্রামকে দমন করতে পারবে।

এই সব ঘোষণা ও প্রস্তাবের পরেই কিন্তু মার্কসবাদী কম্যুনিষ্ট পার্টির সাত বছরের পৃথক অস্তিত্বের ইতিহাসে এসে হাজির হয়েছে একটা দারুণ সংকটের সময়। প্রমোদ দাশগুপ্ত প্রায়ই বলেন, গণতান্ত্রিক অধিকারের ওপর প্রথম আঘাত আসে শাসক শ্রেণীর কাছ থেকে। রাজ্য ও কেন্দ্রীয় সরকারের ট্রেড ইউনিয়ন নেতাদের বরখাস্তের ঘটনাকে মার্কসবাদীরা নিশ্চয়ই সেই আঘাতের একটা বড় উদাহরণ হিসেবে গ্রহণ করেছেন। সম্মিলিত আন্দোলন গড়ে তোলার এমন একটা উপলক্ষ্যও চট করে খুঁজে পাওয়া মুস্কিল। তবু কিন্তু পশ্চিম বাংলায় সংগ্রামী মানুষ এখনও সম্মিলিতভাবে সংগ্রাম করতে রাস্তায় নেমে পড়েন নি।

বন্ধ একটা হচ্ছে। সেটা যে এমন কিছু বড় কথা নয়, বিভিন্ন ট্রেড ইউনিয়ন নেতারাই তা স্বীকার করেছেন। বন্ধ দিয়ে আজকাল কিছু বোঝার উপায় নেই। এই তো গত জুন মাসে যুব কংগ্রেসের ডাকে কলকাতা এক দিন বন্ধ ছিল। তা থেকে নিশ্চয়ই একথা বোঝায় না যে, কলকাতার সব লোক কংগ্রেসের সমর্থক। এখন একদিন বাংলা বন্ধ হলেও একথা প্রমাণ হবে না যে, সরকারী কর্মচারীদের বরখাস্ত করার প্রতিবাদে পশ্চিম বাংলার সব মানুষ কেন্দ্রীয় সরকারের বিরুদ্ধে সংগ্রামে নেমেছেন। অবশ্য সি পি এম নেতারা এর আগে বারবারই বলেছেন, বন্ধ ছাড়া এখন আর প্রতিবাদ জানাবার কোন পথ নেই, তাই বার-বার তাঁদের বন্ধ ডাকতে হচ্ছে।

ট্রেড ইউনিয়ন মহলেরও সকলে অবশ্য এ যুক্তি মানেন না। ২৭শে আগস্ট যখন বাংলা বন্ধ হয় তখনও বন্ধের যৌক্তিকতা নিয়ে আলোচনা হয়েছিল। তখন মোটামুটি এই রকম একটা বোঝাপড়া হয়েছিল যে বন্ধ হচ্ছে হোক, বন্ধের পর সংগ্রামকে আরো 'উচ্চ পর্যায়ে' নিয়ে যাওয়া হবে। সেই উচ্চ পর্যায়টা কি হবে, তা ইউ টি ইউ সি (আর এস পি শাখা) নেতা যতীন চক্রবর্তী সিটুর কাছে লেখা একটা চিঠিতে ব্যাখ্যা করেছিলেন। যতীনবাবুর একটা প্রস্তাব ছিল, আইন অমান্য আন্দোলন শুরু করা, যেটা বন্ধের চেয়ে অনেক বেশি সক্রিয় প্রতিবাদ হবে। লক্ষণীয় যে, সি পি এম এই ধরনের প্রস্তাবে বিশেষ আগ্রহ দেখায় নি।

•

সরকারী কর্মচারীদের পুনর্বহালের দাবীর সপক্ষে সংগ্রামের রূপ কি হবে, তা নিয়েও বিভিন্ন ট্রেড ইউনিয়ন সংস্থা একমত হতে পারছে না। কিন্তু মিলিত সংগ্রাম গড়ে তোলার পথে এইটেই যে একমাত্র বাধা তা ভাবলে ভুল হবে। একটু তলিয়ে দেখলে বোঝা যাবে, যে-কারণে সাম্প্রতিক কালে পশ্চিম বাংলায় বামপন্থী আন্দোলন বহুধা বিভক্ত, ঠিক সেই কারণেই সরকার

আগামী সংখ্যা থেকে

প্রখ্যাত সাহিত্যিক

শ্রীগজেন্দ্রকুমার মিত্রের

নতুন উপন্যাস

পূর্ব পুরুষ

ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হচ্ছে

কর্মচারীদের বরখাস্তের বিরুদ্ধে আন্দোলন দানা বাঁধতে পারছে না। সেই কারণটা কি? স্পষ্ট করে বলতে গেলে বলতে হয়, এক-দিকে মার্কসবাদী কম্যুনিস্ট পার্টি বা তাদের [illegible] এই আন্দোলনের নেতৃত্ব পুরোপুরি নিজেদের হাতে রাখতে বদ্ধ-পরিকর। আর অপর দিকে, অন্যান্য বাম-পন্থী দল চায় এই সুযোগে তারাও এই আন্দোলনের নেতৃত্বের অংশভাক হয়ে উঠুক। এই টানাপোড়েনই মিলিত আন্দোলনের ব্যর্থতার অন্যতম প্রধান কারণ।

রাজ্য সরকারী কর্মচারীদের সংগঠনের কথাই ধরা যাক। সেখানে কো-অর্ডিনেশন কমিটির দাপটই বেশী। এই কমিটি আবার সি পি এম-নিয়ন্ত্রিত। যুক্তফ্রন্টের শাসনের সময় এই কমিটির প্রভাব ক্রমশঃই বেড়েছে। গত বছর রাষ্ট্রপতির শাসনের সময় এই কমিটিরই ডাকে সরকারী কর্মচারীরা তিন দিন ধর্মঘট করেন। কো-অর্ডিনেশন কমিটি বা সি পি এম অবশ্যই দাবী করবে এই ধর্মঘট বেশ সফল হয়েছিল, কিন্তু একথাও সত্যি যে, ঐ ধর্মঘটের পরেই সি পি এম ছাড়া অন্যান্য বামপন্থী দলগুলি সরকারী কর্মচারীদের মধ্যে পৃথক-পৃথক সংগঠন গড়ে তুলতে উদ্যোগী হয়। ফরোয়ার্ড ব্লক গড়ে তোলে যুক্ত কমিটি, সি পি আইয়ের নেতৃত্বে গঠিত হয় অস্থায়ী যুক্ত কমিটি এবং এস ইউ সি গড়ে তোলে জয়েন্ট কাউন্সিল অফ অ্যাকশন।

রাজ্যপাল রাজ্য সরকারের যে ১৩ জন কর্মচারীকে বরখাস্ত করেছেন তাঁরা যেহেতু প্রধানতঃ কো-অর্ডিনেশন কমিটির সঙ্গেই জড়িত তাই বিপদ এখন সি পি এমের এবং সেই জন্যেই মিলিত আন্দোলন গড়ে তুলতে তাদের দায়টাই বেশী হওয়ার কথা। তাই অন্যান্য বামপন্থী দল তথা ট্রেড ইউ-নিয়নের সহযোগিতা পাওয়ার জন্যে তাদের বাধ্য হয়েই খানিকটা নরম হতে হবে—এই কথা ভেবেই অন্যান্য বামপন্থী দল এই সুযোগে গণসংগ্রামের নেতৃত্বের ভাগ পাওয়ার জন্যে দাবী তুলেছে। বিভিন্ন ট্রেড ইউনিয়ন এবং গণসংগঠনের মিলিত নেতৃত্বে এখন সি পি এমেরই অপ্রতিহত প্রভাব—১২ই জুলাই কমিটি থেকে শুরু করে রাজ্যীয় সংগ্রাম সমিতি পর্যন্ত সর্বত্রই। তাই এই সুযোগে অন্যান্য বামপন্থী দল ও ট্রেড ইউনিয়ন সংস্থা দাবী করলে যে, অন্ততঃ সরকারী কর্মচারীদের আন্দোলন পরিচালনার ভার শুধু সি পি এমের ওপর না রেখে সকলকেই দেওয়া হোক। একটি যুক্ত সংগ্রাম পরিষদ গড়ে তোলার জন্যে তাই তারা প্রথম থেকেই জিদ ধরে।

কিন্তু সি পি এম তাতে প্রথমে রাজী ছিল না। সি পি এমের ওপর সরকারের তরফ থেকে এই প্রত্যক্ষ আঘাত এসে পড়ার পরও পার্টি এই নীতিতে অটল যে, গণসংগ্রামের নেতৃত্ব পার্টির হাতেই থাকতে হবে। অন্যান্য ট্রেড ইউনিয়ন ও বামপন্থী দলের সহযোগিতা অবশ্যই চাই, কিন্তু সেই সহযোগিতা আসবে সি পি এমের নেতৃত্ব মেনে নিয়েই। এখানে সাময়িক লাভের জন্যেও সি পি এম কোন আপস করবে না। এই ধরনের কোন আপসে রাজী থাকলে অন্ততঃ সরকারী কর্মচারীদের আন্দোলনের ক্ষেত্রে সব দলের প্রতিনিধিদের নিয়ে গোড়াতেই যুক্ত সংগ্রাম পরিষদ গড়ে তুলতে সি পি এমের কোন বাধা ছিল না। সি পি এম বড় জোর ১৩ই অকটোবরের বন্ধ পরিচালনার জন্যে একটা যুক্ত পরিষদ গঠনে রাজী হতে পারত। এক-বার তা হয়েও ছিল। কিন্তু তখন অন্যান্য বামপন্থী দলের নেতারা বললেন যে, শুধু বন্ধের জন্যে একটা যুক্ত পরিষদ গঠনের প্রস্তাবে তাঁরা রাজী নন। তখন যতীন চক্রবর্তীর উদ্যোগে এই সিদ্ধান্তে পৌঁছানো গেল যে, শুধু বন্ধ নয়, সমগ্র সংগ্রাম পরি-চালনার জন্যেই এই যুক্ত পরিষদ গঠিত হবে। তখন রাজী হয়ে গেলেও কিন্তু পরের দিনই কো-অর্ডিনেশন কমিটির প্রতিনিধিরা আবার পিছিয়ে গেলেন। আগের দিন জ্যোতি বসুর সঙ্গে যতীনবাবুর আলো-চনার পরেই একটা আপস হয়েছিল, কিন্তু সে-আপস টিকল না, কারণ পার্টির নেতৃত্বের একটা বড় অংশ এর বিরোধী। তারপর সি পি এম যুক্ত পরিষদের দাবি মেনে নিয়েছে বটে, কিন্তু সেটা কতো দূর কার্যকর হবে তা বলা মুস্কিল।

কেন সি পি এম এই পথ নিচ্ছে? একটা কারণ এই যে, সব বামপন্থী দল সম্বন্ধে সি পি এম সম্পূর্ণ নিঃসন্দেহ নয়। যেমন সি পি আই। যুক্ত সংগ্রাম পরিষদ গড়ে তুলতে সেখানে সি পি আই প্রতিনিধিকেও রাখতে হয়। কিন্তু শেষ পর্যন্ত যদি সত্যিই কোন বড় রকমের সংগ্রাম গড়ে তোলার প্রস্তুতি হয় তবে তাতে সি পি আইয়ের

সমর্থন বা সাহায্য সত্যি করে কতটা পাওয়া যাবে, তাতে মার্কসবাদীদের মধ্যে অনেকেরই সন্দেহ আছে। সেই সন্দেহের কারণ, সি পি আই এখন কংগ্রেসের সঙ্গে মাখামাখি করতে খুবই আগ্রহী। এই অবস্থায় তারা কেন্দ্রের কংগ্রেসী সরকারের সঙ্গে লড়াইয়ে কি বেশী দূর যেতে পারবে?

তবে এইটেই যে একমাত্র কারণ তা নয়। সি পি এম এটাও চায় যে, পশ্চিম বাংলার সব গণসংগ্রামের অবিসম্বাদী নেতৃত্ব তাদের হাতেই থাক। সেখানে ওয়ার্কার্স পার্টি বা সুধীনকুমারের আর সি পি আইয়ের মত ছোট পার্টির নেতাদের স্থান হতে পারে, কিন্তু অন্য কারুর নয়। এটা রাজনৈতিক দিক দিয়েও দরকার। একমাত্র সংগ্রামী বামপন্থী দলের ইমেজ পার্টিকে গত নির্বাচনে সাফল্য-লাভে বিশেষ সাহায্য করেছিল। আর সেই সাফল্যের একটা বড় কারণ ছিল গণ-সংগঠনগুলির সাহায্য। পরবর্তী নির্বাচনের ওপর সি পি এমের অনেক আশা। কারণ ঐ নির্বাচনে সি পি এম এককভাবেই ক্ষমতায় আসতে চায়। তাদের সঙ্গে যদি কেউ হাত মেলাতে চায় তবে সি পি এমের শর্ত মেনে নিয়েই তা করতে হবে।

•

অন্যান্য দলের সম্মতির অপেক্ষা না-করেই তাই এখন সিটু একাই বাংলা বন্ধের ডাক দিয়েছিল। ২৭শে আগস্টের বাংলা বন্ধের ডাকের কথা এই প্রসঙ্গে স্মরণ করুন। তখনও সিটু একাই প্রথম বন্ধের ডাক দেয়। কিছু টানাপোড়েনের পর অন্যান্য ট্রেড ইউনিয়ন সংস্থাগুলিও ঐ ডাকে গলা মেলায়—এমন কি আই এন টি ইউ সি পর্যন্ত। পরে অবশ্য সিদ্ধার্থশঙ্কর রায় এবং কেন্দ্রীয় শ্রমমন্ত্রী আর কে খাদিল-কর বিভিন্ন ট্রেড ইউনিয়নের মধ্যে কিছুটা বিভ্রান্তি সৃষ্টি করতে সক্ষম হন। আই এন টি ইউ সি শেষ পর্যন্ত পিছিয়ে আসে। এ আই টি ইউ সি প্রভৃতির মধ্যেও দ্বিধার ভাব দেখা দেয়। কিন্তু সিটু অটল থাকে। তখন আই এন টি ইউ সি ছাড়া অন্যান্য ট্রেড ইউনিয়নকেও বাধ্য হয়ে বন্ধের ডাক দিতে হয়।

তার কারণ, কোন ট্রেড ইউনিয়নই চায় না যে, তারা অন্যান্যদের চেয়ে কম সংগ্রামী এমন একটা ধারণা সৃষ্টি হোক। ঐ ধারণা ট্রেড ইউনিয়ন সংগঠন গড়ে তোলার পথে একটা প্রতিবন্ধক। এমনিতেই সিটু এখন এই রাজ্যে সবচেয়ে বড় কেন্দ্রীয় ট্রেড ইউনিয়ন সংস্থা। প্রায় এক হাজার ট্রেড ইউনিয়ন রয়েছে সিটুর অধীনে। মোট সদস্য সংখ্যা পৌনে পাঁচ লাখের মত। এ আই টি ইউ সি ভেঙে যখন সিটু তৈরী হয় তখনকার চেয়ে এই সংখ্যা বেশী। মোটা-মুটি বলা চলে যে, সিটুর যা সদস্য সংখ্যা অন্যান্য সব কেন্দ্রীয় ট্রেড ইউনিয়ন সংস্থার মোট সদস্য সংখ্যা তার সমান। এখন সিটু তথা সি পি এম যদি আরো সংগ্রামী ভূমিকা নেয় তবে অন্যান্য ট্রেড ইউনিয়ন কোন্ পথ নেবে? তারা কি পৃথক সংগ্রাম গড়ে তুলবে? সেই সংগ্রামই বা কি রূপ নেবে? সি পি এমই যখন বন্ধ ছাড়া অন্য অস্ত্রের কথা এখনও ভাবতে পারছে না, তখন তারা কি আরো সক্রিয় পথ নিতে পারবে? আর বন্ধই যদি ডাকতে হয় তবে আবার অন্য এক দিন বন্ধ ডাকার সার্থকতা থাকে কি? যুক্ত সংগ্রাম পরিষদ সম্পর্কে সন্দেহ থাকা সত্ত্বেও তাই অন্যান্য ট্রেড ইউনিয়নকে বন্ধের ডাকে গলা মেলাতে হচ্ছে।

১০-১০-৭১ —[illegible]

ভালবাসার ঘর

কণা (বসু) মিশ্র

একটা বুড়ো ঘোড়ার মতন হাঁফাতে হাঁফাতে মাদ্রাজ এক্সপ্রেস ট্রেনটা শেষ পর্যন্ত এসে পৌঁছুলে আগ্রা ক্যান্টনমেন্ট স্টেশনে। কুলির মাথায় মালপত্র চাপিয়ে ওভারব্রিজ পেরিয়ে ওরা প্ল্যাটফরমে এসে দাঁড়াল। অরিন্দম বলল, হোটেলেই যাবে তো?

একটা রাতের তো ব্যাপার, চল রিটায়ারিং রুমেই যাই।—নীলা বলল। অরিন্দম আর কথা কাটাকাটি করল না। কুলিকে বলল, চল ভাই, রিটায়ারিং রুম কোথায় আছে নিয়ে চল।

দোতলার ওপরে রিটায়ারিং রুম। কুলি আগে আগে চলল। পেছনে ওরা দুজন। দিল্লী থেকে ট্রেনে উঠেছিল ওরা সাড়ে পাঁচ ঘন্টা আগে। ট্রেনটা অযথা লেট করল পথে। একালের মেয়েদের যেমন ফ্যাশান তেলের বদলে মাথায় শ্যাম্পু করা, নীলাও তো সেই দলের। তারপর আবার ট্রেন জার্নির ধকল, ওর চুল সব রুক্ষ দেখাচ্ছিল। ওর চোখের কোণে ক্লান্তির ছাপ। কয়লার গুঁড়ো পড়ে মুখখানা কালচে দেখাচ্ছিল নীলার। মুখে প্রসাধনের চিহ্নমাত্র নেই। শুধু ওর কপালের ওপর জ্বল জ্বল করছিল লাল লিপস্টিকের ফোঁটাটা। বরং সেই তুলনায় অনেক বেশী তাজা দেখাচ্ছিল অরিন্দমকে। মালপত্রগুলো বন্ধ ঘরের সামনে নামাল অরিন্দম। নীলাকে বলল, তুমি এখানে দাঁড়াও, আমি রুমটা বুক করে আসি।

নীলা দেখছিল, বারান্দার কোণটায় কয়েকজন হিপি শুয়ে রয়েছে। শুয়ে শুয়ে তারা কল্কে টানছে আর কি সব বলাবলি করে হাসছে যেন। ওদের পরণে গেরুয়া রংয়ের পাঞ্জাবি, লুঙ্গির মতন করে জড়ান ধুতি, পায়ে ধুলোর পুরু স্তর। নীলা ভাবছিল, আমাদের দেশের যুবকদের এর পরের ফ্যাশানটা হয়ত দাঁড়াবে গেরুয়ারংয়ের আলখেল্লা। সিগারেটের বদলে কল্কে। কথাগুলো ভেবে নীলা হাসল।

বারান্দার সাজান টবগুলোয় কিছু অর্কিড, জিনিয়া ফুটে রয়েছে। উর্দিপরা বেয়ারাটা বার কয়েক ঘুরে গেল নীলার সামনে দিয়ে। রেলিংয়ে ভর দিয়ে তাকাল নীচের, দেখলে, স্টেশনের পেছনের পোর্টিকোয় টাঙ্গা, ট্যাক্সি, স্কুটারের হাঁক-ডাক। জায়গাটা ওর পরিচিত। নীলা আগ্রায় আগেও এসেছে। খুব বেশী দিন আগের কথাও নয়, মাত্র বছর চারেক। আকাশ বেশ পরিষ্কার। কয়েকটা তারা উঠেছে। এখন শুক্লপক্ষ। চাঁদটা ঝিনুকের মতন সাদা, গায়ে তার কালো কালো ছবি। তাজে গেলে হয়, নীলা ভাবল। রাত তো খুব বেশী হয়নি। আর এই পূর্ণিমায় তাজ দেখবার জন্যেই তো এত তাড়াহুড়ো করে এখানে আসা।

নীলা ডাকল বেয়ারাকে, এই শুনো। কিতনা রাত মে তাজ বন্ধ হোতা?—কথাগুলো বলেই নীলা হাসল। ভাবল, হিন্দীটা ঠিক হ'ল তো? বেয়ারা বলল, সাড়ে এগারো।

তবে তো তারা যেতেই পারে, নীলা ভাবল। সেবার যখন এখানে আসে, তখনও পূর্ণিমাই ছিল। কিন্তু সে তাজ দেখা আর নীলার হয়নি। এই চার বছরের মধ্যে ওর অনেক পরিবর্তন হয়েছে। ওর সিঁথিতে উঠেছে সিঁদুর। ওর একটা ঘর হয়েছে ভালবাসার ঘর। আর ওকে সম্পূর্ণ নিরাপত্তা দেবার মতন একটি পুরুষ। কিন্তু আগ্রা ক্যান্টনমেন্টের কোন পরিবর্তন নীলার চোখে পড়ল না। স্টেশনে নেমেই ও দেখছিল, হুইলারের বইয়ের স্টলটা তেমনিই রয়েছে। টিকিট কাউন্টার, রিফ্রেসমেণ্ট রুম কোন কিছুরই পরিবর্তন হয়নি। এমনকি স্টেশনের পেছনের পোর্টিকোর চেহারাটাও একই রকম রয়েছে। খোঁড়া ভিখারীটা এখনও ওখানে নিয়ম মতন বসছে তাহ'লে? তারপর তার উপন্যাসের নায়ক সুমেন প্যাটেল এখন কোথায়? নায়িকা নীলা টাণ্ডার কথা কি আর সে মনে রেখেছে এত দিনে? আরে দূর, কে জানে, এখন ও আবার নতুন কোন নাটক করছে কিনা! নীলা যেন নিজেকেই নিজে ব্যঙ্গ করল। ভাবল, সেটা মিথ্যে নয়। নায়ক হবার মতন চেহারা, চরিত্র আর

অভিনয়, এ সব কিছুরই তো সে অধিকারী। মেয়েদের বাণ মারার মতন অস্ত্র রয়েছে বইকি ওর চোখে, অসম্ভব বড় বড় আর টানা-টানা চোখের পাতাগুলো এত ঘন আর কালো, মনে হয় যেন সুর্মা পরেছে।

না, তবু নায়িকা দাঁড়ায়নি। নায়ককে ফেলে রেখে হন্ হন্ করে চলে এল' স্টেশনে। চলতে চলতে হয়ত একবার না তাকিয়ে পারেনি নীলা। চোখে ওর আগুন জ্বললেও পাতাগুলো কাঁপছিল। থর-থর করে কাঁপছিল ওর শরীর। সুমন কি পারত না ওকে জোর করে টেনে রাখতে?......ওই তো ওই পোর্টিকোয় সুমন দাঁড়িয়েছিল স্কুটার নিয়ে, মাত্র চার বছর আগে।...ওর বলিষ্ঠ হাতের কব্জিতে একটা স্টীলের বালা। চওড়া বুক, শক্ত চোয়াল। ওর দাঁড়ানোর ভঙ্গিতে পৌরুষের বলিষ্ঠ প্রকাশ। ওর শরীর দীর্ঘ কয়েক ফুট লম্বা।...বিশ্বাসঘাতক, অকৃতজ্ঞ।—নীলা যেন সামনাসামনি লোকটাকে পেয়ে বলল।...ওইতো স্টেশনের পেছনের ওই সেই গেট। ওখান দিয়েই তো নীলা সোজা চলে এসেছিল লেডিস ওয়েটিং রুমে। পুরনো অ্যালবামের পাতা উল্টে নীলা দেখছিল। ওর ঘাড়ের ওপর ভেঙে পড়েছে এলোখোঁপা, ভুরু বাঁকা, চোখে যেন আগুন জ্বলছে।

আমি আম্বালায় যাচ্ছি, আর আধঘণ্টা বাদেই আমার প্লেন ছেড়ে যাবে, তুমি আমার জন্যে অপেক্ষা কর।—সুমন বলল। নীলার গলায় দৃঢ়তার সুর, সম্ভব নয়।

তুমি আমায় ভুল বুঝছ।

ভুল নয়, যা সত্যি তাই।

আমি কাল প্রলাপ বকেছিলাম।

সত্যটা মাঝে মাঝে প্রলাপের রূপ ধরে বেরিয়ে পড়ে।—কাটাকাটা কয়েকটা কথার বিনিময় হয়েছিল দুজনের। মাত্র চার বছর আগে। সেই চার বছর আগে কি নীলা ভেবেছিল, চার বছর পরে ও দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তার স্মৃতিচারণ করবে? মাথায় ঘোমটা তুলে আরেকজনের বউ হবে?......ওয়েটিং রুমের চেহারাটা ওর দেখতে ইচ্ছে করল সেই আগের মতই আছে কি না? কিন্তু কি লাভ?...... তবু ওর মনে পড়ে গেল রায়নাকে, সুহৃতাকে, মিসেস সিনাকে। ওরা একটা গোটা দল মিলে এসেছিল আগ্রায়। আজ ওরাও যেন হারিয়ে গিয়ে অ্যালবামের ছবি হয়ে রয়েছে। রায়না কোন একটা স্কুলের টিচার, সুহৃতা লেকচারার হুগলীর কাছে কোন একটা কলেজে যেন। আর মিসেস সিনারা তো বিদেশেই পাড়ি দিয়েছেন। এদের সবার সঙ্গেই তো আগে চিঠিপত্রের আদান-প্রদান হতো নীলার। এখন আর হয় না। ওর মধ্যে কেমন যেন একটা আলস্য এসে গেছে লেখা-টেখার ব্যাপারে। হয়ত এককালে একজনকে অনেক বেশী লিখেছে বলে।...ওয়েটিং রুমে ঢুকল নীলা, তখন যেন ঝড়ে বিধ্বস্ত ওর চেহারা। সঙ্গীরা তখন হট্টগোলে গুলজার করছিল চারদিক। নীলার মধ্যে কি অভিনয়ের বীজ রয়েছে? নইলে ও সেদিন তার উনিশ বছরের সবচেয়ে বড় অপমান চেপে রেখে সঙ্গীদের সঙ্গে অত হেসেছিল কি করে? হাসির একেবারে বন্যা বইয়ে দিয়েছিল নীলা। হাসতে হাসতে কেঁদেছিল। কিন্তু সে কান্নার অর্থ কেউ বুঝতে পারেনি।... হয়ত অনেকক্ষণ অপেক্ষা করেছিল সুমন। তার স্কুটারের ইঞ্জিনের আওয়াজ হচ্ছিল বাইরে। আচ্ছা, সুমন কি আগ্রায় আসে মাঝে মাঝে? জানতে আগ্রহ হ'ল নীলার। কিন্তু এই অদম্য কৌতূহলটুকু তাকে চেপেই রাখতে হবে। কারণ, এখন ও বিবাহিতা, স্বামীর সঙ্গে হনিমুন করতে এসেছে এখানে।

সিঁড়িতে একটি ভারী জুতোর আওয়াজ। নীলা অন্যমনস্কের মতন একটু তাকাল। ভাবল, অরিন্দম কি? আওয়াজটা কাছে আসতে আসতে একেবারে শেষ সিঁড়িতে এসে থামল। নীলা দেখল, সানগ্লাস পরা এক লাস্যময়ী যুবতীর পাশে যুবক। ওরা বিবাহিত, কি অবিবাহিত বোঝা যায় না। বছর পঁচিশেক বয়েস ছেলেটির, মেয়েটির বয়েস অবশ্য ধরা যায় না। কুড়িও হতে পারে, আবার পঁচিশও। সিঁথিতে সিঁদুর নেই মেয়েটির। অথচ......। না বলা যায় না ওরা কেন এসেছে? ওরা কি মাদ্রাজী অথবা খৃশ্চান? যাদের সমাজে চল নেই সিঁদুরের। (যদিও অনেক খৃশ্চান, মাদ্রাজী সখ করে সিঁদুর পরেন সিঁথিতে।) কোন মালপত্র, সুটকেশ কিংবা অ্যাটাচী কিছুই নেই ওদের সঙ্গে। আরেকটা বন্ধ ঘরের দিকে ওরা এগিয়ে গেল। বেয়ারা মুখ টিপে হেসে লম্বা একটা সেলাম জানাল। ওরা কিছু টাকা গুঁজে দিল ওর হাতে। লোকটা দরজা খুলল। ওরা ঘরে ঢুকল। সঙ্গে সঙ্গে বন্ধ হয়ে গেল দরজাটা। রিটায়ারিং রুমের অতিথি আজ তাহ'লে আরও এক পেয়ার! নীলা ভাবল।

কেমন যেন একটা সন্দেহ হল ওর, হয়ত ওরা বিবাহিতা নয়, প্রেম-টেম করছে।... সুমনও কি ঠিক এভাবেই ভাড়া করতে চেয়েছিল রিটায়ারিং রুম। ও তো বলেছিল, তোমার সঙ্গীরা যাচ্ছে যাক না, তুমি ফিরে যাও, আমি কালই ফিরছি।—দপ্ করে জ্বলে উঠেছিল নীলা, না।

নীলা!—সুমন যেন কাঙালের মতন বলল, কোন অসুবিধে হবে না, বেয়ারারা যদি জানে তুমি প্যাটেল সাহেবের রিলেটিভ।

চুপ কর। তোমার সঙ্গে আমার কোন সম্পর্কের প্রশ্নই উঠতে পারে না। এই আমার শেষ কথা।

নীলার আজ খুব আশ্চর্য লাগছে। ও ভাবছে, অত কথা ও সেদিন বলতে পারল কি করে? যৌবনের দেমাক? নাকি আত্মসম্মানে আঘাত! কোন্‌টা নীলাকে অতখানি হৃদয়হীন করে তুলেছিল সেদিন? অপমানের চাবুক পড়ল যেন সুমনের মুখে। ওর ফর্সা মুখ সেদিন একেবারে লাল হয়ে গিয়েছিল। ওকে যন্ত্রণা দিয়ে সে আঘাত কি নীলার বুকেই ফিরে আসেনি? এসেছিল অনেক পরে। তবে সেদিন সে-মুহূর্তে ওর কোন কষ্টই হয়নি। আচ্ছা, রিটায়ারিং রুমের বেয়ারাটা ওকে চিনত কি করে! কিছু সময় আগে ওই বন্ধ ঘরে ঢুকল যারা, তাদেরও তো আগেই চিনত বেয়ারা। তবে কি?...না, সুমনকে অত ছোট নীলার ভাবতে খারাপ লাগে। হোক তা সত্যি। তবু...। ও কি বেয়ারাকে ডেকে জিজ্ঞেস করবে সুমনকে এরা চেনে কিনা? না থাক। নীলা ভাবল, উত্তরটা যা শুনবে, তা হয়ত ওর ভাল লাগবে না।

আধঘণ্টা হতে চলল, অরিন্দমের কোন পাত্তাই নেই। হয়ত ও জায়গার ব্যবস্থা করতে পারেনি। নীলা ভাবল, শেষপর্যন্ত কি প্যাটেল সাহেবের আত্মীয়া বলেই নিজের পরিচয় দিতে হবে নাকি? ঠোঁট টিপে ও একটু হাসল। নীলার মাথায় ঘোমটা। সিঁথিতে গাঢ় সিঁদুর। ও ভুরু কুঁচকে চিন্তা করল, প্যাটেল সাহেবের আত্মীয়া বলে নিজেকে বলা যায় কিনা। রিলেটিভ কথাটা তো ব্যাপক। আত্মীয় আত্মীয়। দাঁত দিয়ে ঠোঁট চাপল নীলা। ভাবল, প্যাটেলের আত্মীয় বলে নিজের পরিচয় দিতেই বা যাবে কেন? নীলা এখন অরিন্দমের স্ত্রী। সুমনের ছাড়পত্র তার না হলেও চলবে। থাকবার মতন একটা জায়গা ঠিকই মিলবে। বেয়ারা সামনে দিয়ে একশোবার যাতায়াত করছিল। নীলা এক সময় ডাকল তাকে, এই শুনো।

কেয়া বাত?—ঘুরে দাঁড়াল বেয়ারা। নীলা আবারও একটু ভাবল। তবু কৌতূহলটুকু চেপে রাখতে পারল না।

নীলা বলল, তোম্ প্যাটেল সাবকো জানতা হ্যায়?

কোন্ প্যাটেল সাব?

এয়ার, এয়ারফোর্স কা?

হাঁ, হাঁ, জরুর জানতা হ্যায়। হাম তো তিন মাহিনা আগারী মে উস্‌কো দেখা হ্যায়। লেডী ডকডর ডারোথী ব্যানার্জি বহুৎ আচ্ছি লেড়কী হ্যায়, উস্‌কো সাথ্‌মে...।

নীলা তখন অন্যমনস্কের মতন আকাশ দেখতে লাগল। মনটন ও খারাপ করতে চায় না। তবু যেন খচ্ করে কোথায় একটু লাগল। ওরা তাহলে এখনও স্বামী-স্ত্রীর মতন রাত-টাত কাটায়। আর ঠিক এই ঘরেই? যে-ঘরটা নীলারা হয়ত নেবে। আশ্চর্য, জীবনটা যেন নাটকের মতন। নীলা জোর করে হাল্‌কা হতে চাইল। ও ভাবল, কি লাভ? ওর সঙ্গে তো আজ আর কোন সম্পর্ক নেই। নীলা ভাবল, এই মজার খবরটা শুনিয়ে দেবে অরিন্দমকে। হ্যাঁ, অরিন্দম খুব উদার। নীলা তাকে গড় গড় করে বলে গেছে পূর্ব প্রেমিকের কথা, এতে সে অনুদারতার পরিচয় দেয়নি। বরং খুশি হয়েছে একদা কোন এক সুপুরুষকে ঘায়েল করে নীলা তার কাছে এসেছে বলে। প্যাটেল যে সুপুরুষ, এ-গল্পটা নীলা অনেকবার করেছে তার কাছে। সেজন্য অরিন্দমের ঈর্ষা হয়নি। বরং পৌরুষের দিক থেকে নিজেকে সে অনেক বেশি বড় বলে মনে করেছে।

হিপিরা হাঁটুর ওপর পা তুলে ইংরিজী সুরে কি একটা গান গাইছে যেন। যার অর্থ বোঝা যাচ্ছে না। তুতুড়ে গাছের

পাতাগুলোয় অন্ধকার। ওরা খুব কাঁপছে। নীলার চোখের কোণে জল নেই, জ্বালা নেই। সুমনকে এখন ওর ঘটনার মতন মনে হল। ওর অবিশ্বাস্য লাগল। নীলা খুব স্বাভাবিকভাবে কাঁধের ফ্লাস্ক থেকে একটু জল খেল।

অরিন্দম এল আরো মিনিট-দশেক পরে। লম্বা লম্বা পা ফেলে আসছে অরিন্দম। এখন ওকে বেশ ক্লান্ত দেখাচ্ছে। ঘামে তেল তেল করছে ওর ফর্সা চওড়া কপাল। ওর আঁটোসাঁটো বুশ সার্টটা ঘামে ভিজে গায়ের সঙ্গে একেবারে লেপ্টে রয়েছে। চশমার মধ্যে দিয়ে একজোড়া ব্যস্ত অশান্ত চোখ। নীলা বলল, কিগো জায়গা পেলে? অরিন্দমের পেছনে দাঁড়িয়েছিল উর্দিপরা একজন ওয়েটার রিফ্রেশমেন্ট-রুমের। নীলার কথার জবাব না দিয়ে তাকেই অরিন্দম বলল, আভি খানা মিলেগা?

কি আভি আভি কচ্ছ?—নীলা প্রায় ধমকে উঠল। তারপর খবরদারীর সুরে ওয়েটারকে বলল, আভি তুম্ যাও।

আরে সাড়ে ন'টার মধ্যে মিল বন্ধ হয়ে যাবে যে।—অরিন্দম বলল চাপা বিরক্তির গলায়। কিন্তু নীলা গ্রাহ্যই করল না।

হাত নেড়ে ওকে বলল, আমরা বাইরে কোথাও খেয়ে নোব'খন। চল, আগে তাজ দেখে আসি।

এই অবস্থায়? এখুনি? —পোড়া সিগারেটটাকে মাটিতে পিষতে পিষতে অরিন্দম বলল। বলল, একটু স্নান করে নিলে হত না? আর তুমিও তো কাপড় বদলাবে বলেছিলে?

ঘুরে এসে।—ছটফটে মেয়ের মতন নীলা বলল। যদিও ট্যারা চোখে ও তাকিয়ে একবার দেখে নিল নিজের লাট হয়ে যাওয়া সিল্কের শাড়ীটার দিকে। রুমাল দিয়ে কপালের ঘাম মুছতে মুছতে পকেট থেকে রসিদটা বার করে দিল অরিন্দম। বলল, এটা রাখো।—রসিদটার ওপর চোখ বুলিয়ে নীলা ভুরু কোঁচকাল। বলল, রিটায়ারিং-রুমের ভাড়া চব্বিশ ঘণ্টার জন্য কুড়ি টাকা?

তাই তো দেখলাম।

অথচ হাওড়া স্টেশনে শুনেছিলাম মাত্র পাঁচ টাকা লাগে?

প্যান্টের পকেটে রুমাল রেখে প্যাকেট থেকে একটা সিগারেট বার করল অরিন্দম। ও মউজ করে একটা সিগারেট ধরাল। বলল, পাঁচ টাকায় এখানেও হয়, তবে সে-ঘরে পাঁচজনকে একসঙ্গে থাকতে হবে।

ঘরে ঢুকে নীলা তো অবাক, আর তার সঙ্গে খানিকটা খুশিও। ও দেখল, সিঙ্গল বেডের দুটো ইংলিশ খাট জোড়া দেওয়া রয়েছে একেবারে মাঝখানে। খাটের পায়ের দিকে দুটো সোফা, আর দুজন বিছানায় শুয়ে পড়লে তাদের উল্টো দিকে মুখো-মুখি একটা ড্রেসিং টেবিল। ওয়ার্ডরোবটা রয়েছে আরেক কোণে। ডানলোপিলোর গদির বিছানায় ধপ্ করে শুয়ে পড়ল অরিন্দম। খুশির মেজাজে শুই করে একটা শিস্ই দিয়ে ফেলল। বলল, স্বামী-স্ত্রীর রাত কাটানোর মতন নিখুঁত সাজান একটি ঘরই বটে।

ঘরের সঙ্গে লাগান বাথরুম। নীলা বাথরুমে গেল। সেখানেও দেখল, শাওয়ার, বেসিন, আয়না। কোন আয়োজনেরই ত্রুটি নেই।...এই ঘরেই রাত কাটিয়েছে সুমন ডরোথির সঙ্গে। এই বিছানাটা, এই বাথরুমটাই ব্যবহার করেছে তারা। নীলা হঠাৎ শিউরে উঠল। ওর কেমন যেন ভয় ভয় করল। ও কিছু সময় যেন পুতুলের মত দাঁড়িয়ে থাকল। ভাবল, আরও কত বেওয়ারিশ মেয়েছেলেকে নিয়ে সুমন এখানে রাত কাটিয়েছে কে জানে! ওর ইচ্ছে হল, এখুনি ছুটে পালাতে, এ-ঘর থেকে। ও যেন নাটকের এক পরাজিতা নায়িকা, নায়কের কাছ থেকে যার মুক্তি নেই। ও হাসল আয়নায়। হাসিটা আত্মধিক্কারের। ভাবল, নায়ক তো বহাল তবিয়তে দিব্যি রয়েছে, ফুর্তি মারছে। অথচ...। ছেলেদের চেয়ে মেয়েদের ভালবাসাটাই হয়ত গভীর। ও ভাবল, বিয়ের পর প্রেমিকের কথা ভেবে তো কত মেয়ে আত্মহত্যাও করে। সেকালে মা, দিদিমার আমলেও করত। কেউ কেউ গোপন অভিসারেও যেত। একালেও যায়। কিন্তু ও নিজে কেন পারে না। ও কি ভীতু? ওর কি কোন সংস্কার আছে? কিছু না। স্বামীর ভালবাসায় যেখানে কৃপণতা থাকে, সেই মেয়েরাই প্রেমিকের কাছে যায়। অন্ততঃ সে-ব্যাপারে নীলার কোন ফাঁক নেই। তাই তার অন্য কোন অভিসারে যাবার প্রয়োজন হয় না। কিন্তু মন? মনটা কেন বিশ্বাসঘাতকতা করে মাঝে মাঝে? বুকের মধ্যেটা কেন পোড়ায়।

ল্যাভেন্ডার-ডিউ সাবান মেখে নীলা শাওয়ারের তলায় গিয়ে দাঁড়াল। সাবধানে মাথাটা বাঁচিয়ে শুধু শরীরটা ভেজাল নীলা। ভাবল, চুলোয় যাক্ সুমন প্যাটেল। ও মনটাকে তাজা রাখতে চেষ্টা করল। মুখে, ঠোঁটে ঘষে ঘষে মাখল ল্যাভেন্ডার-ডিউ। কোন এক দিনের সুমনের আঁকা চিহ্নটা বোধহয় মুছে ফেলতে চাইল। গুন্ গুন্ করে সুর ভাঁজতে ভাঁজতে মনে করল, অ্যাটাচীর মধ্যে রয়েছে ওর বিয়ের লাল বেনারসী। বেনারসী পরেই ও আজ যাবে তাজে। হোক্ দেরী তবু। ওর স্বামী অরিন্দম যত অপছন্দই করুক, তাকে ও আজ পরাবে মটকার পাঞ্জাবি। মাত্র কয়েক মাস আগে তো বিয়ে হয়েছে, এমন কিছু পুরনো হয়ে যায় নি তারা। অদ্ভুত এক প্রশান্তিতে ভরে গেল ওর মন। একখানা হাত কপালে রেখে, আর এক খানা হাত কপালের ওপর আড়াআড়িভাবে ভাঁজ করা, অরিন্দম চিত হয়ে শুয়েছিল বিছানায়। শুয়ে শুয়ে পা নাচাচ্ছিল অরিন্দম। নীলা এসে তাড়া দিল, এই ওঠো, ওঠো। উঁ। —বলে সাড়া দিয়েই অরিন্দম চুপ করে গেল। নীলা বলল, কি গো যাবে না?

ছোট একটা হাই তুলল অরিন্দম। নীলার দিকে তাকিয়ে থাকল। অগোছালো ওর তাকানোর ভঙ্গিটা। ওর ওঠার কোন লক্ষণ দেখা গেল না। কিছু সময় আগের উৎসাহটা যেন চুপ্‌সে গেল নীলার। ও আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে গা মুছছিল। বেশ গম্ভীর ভাবেই বলল, তোমায় গরদের পাঞ্জাবিটা পরতে হবে বলে দিচ্ছি।—অরিন্দম বলল, হুম্।—নীলা বলল, আমরা কি এত তাড়াতাড়ি বুড়িয়ে যাব বল?

আমরা না চাইলেও সংসার আমাদের বুড়ো করে ছাড়বে। আমাদের কোম্পানী হয়ত লক-আউট হয়ে যাবে তারপর...

তুমি এখানে এসেও ওসব কথা ভাবছ?

না ভেবে উপায়? অবশ্য আমার বি-এস-সি পাশ বউ।

আহ্ থামবে?—নীলা ধমকে বলল। অরিন্দম হাসল। ও চেয়ে চেয়ে দেখছিল আয়নায় নীলার বুকের পুষ্ট স্তন, ওর সরু কোমর, ওর নিতম্ব। শরীরের

প্যান্টিটি ভাঁজ নীলা আলগোছে তোয়ালে দিয়েই মুছছিল যেন। ওকি তাকে উত্তেজিত করতে চায় ? অথচ আবার যাবার তাড়া দিচ্ছে। কোনটা সত্যি ? নাহ্ মেয়েরা বড় অস্পষ্ট, বড় দুর্বোধ্য। ওদের বোঝা দায়। অরিন্দম দেখছিল, ও শুধু ব্রা আর শায়াটা পরা অবস্থায় প্রসাধন সারছে। ঘরের বাতাসে ভুর্ ভুর্ করছে ল্যাভেন্ডার ডিউ-এর গন্ধ। নেশা ধরে গেল অরিন্দমের ওর মাখনের মত নরম আর ফর্সা দেহটার দিকে তাকিয়ে। ঘামে জব জব করছিল ওর নিজের শরীর। ক্লান্তি, ঘাম আর ল্যাভেণ্ডারডিউ এই তিনটে জিনিস ওকে অবশ করে ফেলল। অরিন্দম আর থাকতে পারল না। ও ঝাপটে ধরল নীলাকে। আধো আধো গলায় বলল, মোহিনী, ছলনাময়ী!

এই কি হচ্ছে ছাড়?

অরিন্দম ছাড়ল না। বলল, তোমের চেয়েও আপাততঃ আরেকটা জিনিস আমার অনেক বেশী লোভনীয় মনে হচ্ছে। নীলা ঠান্ডা নিষ্প্রাণ গলায় আবারও বলল, ছাড়! —সুরটা অরিন্দমের কানে বাজল। ও বোকার মতন তাকিয়ে থাকল। তারপর ছেড়েও দিল। নীলা তবুও হাঁপাচ্ছিল। অরিন্দম দাড়িতে হাত বুলোতে বুলোতে বাথরুমে চলে গেল। বাথরুমের আয়নায় নিজের ক্লান্ত চেহারাটা একবার দেখে নিল অরিন্দম। তারপর রেজারটা টেনে নিয়ে দাড়ি কামাতে লাগল। কিছু সময় আগে যে পাশবিক উত্তেজনাটা এসেছিল ওর, এখন আর তা নেই। নিভে গেছে। মেয়েরা বড় অদ্ভুত। ও ভাবল, ওরা যে কি চায় আর কি চায় না, সেটা বোঝা দায়। অরিন্দম ভাবে, তার তো সুখী হবার অধিকার রয়েছে, তার স্ত্রীরও রয়েছে। একথা নীলা বোঝে। অথচ একেক সময় কাছে এসেও কেন দূরে সরে যায় ? নীলার মধ্যে তো উত্তেজনার অভাব নেই। তবুও—অরিন্দম ভাবল, আমি তো অক্ষম পুরুষ নই। আসলে মেয়েরা হয়ত একেক সময় বাইরে অমনি একটা ভাব দেখায়, ভান করে নিজেকে দুর্লভ করার জন্যে।

সাজগোজের জন্যে নীলা সময় নিল আরো আধ ঘন্টা। সিঁড়ি দিয়ে নামতে নামতে অরিন্দম বলল, সিল্কের পাঞ্জাবিই পরাও আর যাই কর, 'বিবাহের প্রথম রাত্রিতে যে সুর বাজে সে রাগিণী চিরদিনের নহে।” কিন্তু সে রস আস্বাদন করার মতন রসিক মন নীলার তখন নেই। ও হঠাৎ বলে বসল, জানলে গো, রিটায়ারিং রুমের বেয়ারা না সুমনকে চেনে।

সুমন, সুমন কে?—অরিন্দম যেন আকাশ থেকে পড়ল।

ওকি বুঝেও না বোঝার ভাব করছে? নীলা সন্দেহজনকভাবে তাকাল। তারপর ফ্যাশ ফেশে গলায় বলল, আহা, সুমনকে তুমি চেনো না না? সুমন, সুমন প্যাটেল।

অহো! তোমার সেই পার্সে প্রেমিকটি? হ্যাঁ, ওকে তো আমি জরুর চিনি।—কপালে ভুরু তুলে অরিন্দম ঠাট্টার গলায় বলল। একি ওর ঠাট্টা ? না রাগ ? নীলা অনুভব করতে চেষ্টা করল। অরিন্দম অধৈর্যের মত বলল, তারপর? থামলে কেন?

বেয়ারা বলল, ও নাকি রাত টাত কাটায়।—নীলা বন্ধুর মতন বলল। বলল, তোমায় যে লেডী ডাক্তারটার কথা বলেছিলাম না, তার সংগে।

তুমি বেয়ারাকে জিজ্ঞেস করেছিলে ?

হ্যাঁ। সুমন তো বলেছিল রিটায়ারিং রুমের বেয়ারারা ওকে চেনে টেনে।

তাই নাকি ? তা ওর মতন তুমিও অমনি অফার টফার পেয়েছিলে নাকি ?

মোটেই না, মশাই। —নীলা কৌতুকের সুরে বলল, সে সাহস ওর ছিল নাকি ? আমি কি ডরোথির মত ওর বেওয়ারিশ মাল।

আচ্ছা, তোমার কষ্ট হয় না?—অরিন্দমের গলায় সহানুভূতি। সরল একটা বাচ্চা মেয়ের মত নীলা তাকাল। বলল, কেন?

এই যে তোমার ফিঁয়াসে একটি মেয়েছেলেকে নিয়ে রাত টাত কাটায়?

নীলা হাসল। ওর হাসির আওয়াজটা যেন কান্নার মত বাজল অরিন্দমের কানে। নীলা বলল, যখন ফিঁয়াসে ছিল তখন খারাপ লেগেছিল। তবে এখন আর লাগে না, এখন তো ও আমার কেউ নয়। —অরিন্দম ঠাট্টার হাসি হাসল। বলল, কেউ নয় নাকি ? আহা।

স্টেশনের পেছনের পোর্টিকোয় যেখানে টাঙ্গা, ট্যাকসি, রিকস, স্কুটারের ভিড়, সেইখানে এসে ওরা দাঁড়াল। নীলা বলল, টাঙ্গায় যাব জানলে ?—অরিন্দম বলতে যাচ্ছিল, কেন স্কুটার নয় কেন ?—তার আগেই সামনে একটা টাঙাওলা এসে হাজির হয়েছিল। ওদের কথা শুনে বলল, বাবু, উ জাদা রূপেয়া লেতা হ্যায়, হামকো টাঙ্গেমে আইয়ে।

ঘোড়া ছুটছে। বেপরোয়া চাবুক মেরে ঘোড়াকে উত্তেজিত করছে সাহিস। সওয়ারীর আরামের দিকে তার লক্ষ্য নেই। জীবনে এই প্রথম টাঙ্গায় উঠল নীলা। অবশ্য আরেকবার ঘোড়ার গাড়িতে চেপেছিল নীলা কলেজে পড়ার সময়। হঠাৎ একদিন খেয়াল হল ওর ঘোড়ার গাড়ীতে চড়বে। প্রচন্ড বৃষ্টি তখন। কলেজ স্ট্রীটে প্রায় কোমর জল। তার মধ্যেই ঘোড়ার গাড়ীতে চেপে সমস্ত কলেজস্ট্রীট চষে বেড়িয়েছিল ওরা কয়েক বন্ধু মিলে। সে এক হই হই কান্ড। সেসব দিনগুলো আজ কোথায় ?...অরিন্দম বলল, পিঠে লাগছে নাকি তোমার ?—অরিন্দম ডান হাতটা লম্বালম্বিভাবে ছড়িয়ে দিল নীলার সীটের পেছনে। বলল, এবার আর লাগবে না।—নীলা তখন ভাবছে, এখন যদি সুমনের সংগে দেখা হয় ? বলা কি যায় হতেও তো পারে ? দেখা হলে নীলা সামান্য পরিচিতির হাসি হাসবে। কিম্বা নাটকের নায়িকার মত মুখ ঘুরিয়ে চলে যাবে। শেষেরটা হয়ত ও পারবে না। ও হাসবেই। চেনা লোকের সংগে দেখা হলে লোকে যেমন হাসে টাসে। এখন তো ওর আর কোন অভিমান নেই, অভিযোগও নেই। অরিন্দমের একটা হাত নীলার পিঠে অন্য হাতে সিগারেট। মেজাজটা ওর বিগড়ে রয়েছে। চরম উত্তেজনার মুহূর্তে নীলা নিজেকে গুটিয়ে নিল। ওকি তাহলে সুমনের কথাই ভাবছিল ? শালা, মেয়ে জাতটাই এমন। বিয়ের বাজারে সেকেন্ড-হ্যান্ড। প্রেম করে একজনের সঙ্গে বিয়ে করে আরেকজনকে।...যাহ্ শালা, আর একটা সিগারেট ধরাল অরিন্দম, ভাবল, যাকগে ওসব তুচ্ছ ব্যাপার ট্যাপার নিয়ে ও আর মাথা ঘামাবে না। নীলার দিকে ও তাকাল। দেখল, ও ঠান্ডা, নিষ্প্রাণ, বিষণ্ণ। কিছু সময় চুপ করে থাকল। ওর উদারতায় ফাটল ধরল। ও স্ত্রীকে ফেরাতে চাইল তার ভাবনার সূত্র থেকে।—তবু এ স্কুটার ট্যাকসির থেকে ভাল।—এক মুখ ধোঁওয়া ছেড়ে অরিন্দম বিনা ভূমিকায় বলল। ওর কথা বুঝতে না পেরে নীলা তাকাল। অরিন্দম বলল, এই টাঙ্গার কথা বলছি আর কি। স্কুটার ট্যাকসির থেকে ভাল, তাই না ? ওরা হলে সারা আগ্রা শহর ঘুরিয়ে ডবল করে ছাড়তো। দেখলে না দিল্লীতে ?

না মশাই, তুমি কিছু জানো না।—ঘুরে বসল নীলা। বলল, দিল্লীর মতন স্কুটার, ট্যাকসি এখানে মিটারে চলে না। জায়গার দূরত্ব বুঝে ওরা ভাড়া নেয়।

তাই নাকি ?—বিদ্রূপের হাসি হাসল অরিন্দম। বলল, এসব বুঝি প্যাটেল সাহেবের কাছে থেকে শোনা ?

তুমি, তুমি একটা পশু।—নীলা বলতে চাইল। পারল না। ভাবল, আশ্চর্য এই লোকটাই কত আদর্শের বুলি আওড়ে তাকে ভাঁওতা দেয়। মনে পড়ল কদিন আগে অরিন্দমের কথা। ও বলেছিল, তোমার আর আমার পরস্পরের প্রতি সহানুভূতি থাকা দরকার নীলা। তোমার তেইশ বছর বয়েসে আমার সংগে পরিচয়। এই তেইশ বছরের মধ্যে তোমার জীবনে আর কোন পুরুষ আসবে না, সে কি হতে পারে ? তুমি বললেও আমিই বা বিশ্বাস করব কেন ? স্কুল, কলেজের এতগুলো দিন তুমি পেরিয়ে এসেছো যখন, নিশ্চয় বোরখা পরে হাঁটো নি?—নীলা বলেছিল একথা কি আমিও তোমায় বলতে পারি না ?—অরিন্দম বলেছিল, নিশ্চয় পারো। বলেছি তো কলেজ জীবনে আমিও...

এই পথটাই সোজা চলে গেছে তাজমহলের দিকে। নির্জন হয়ে এসেছে ক্যান্টনমেন্টের রাস্তাঘাট। স্টেশনের সীমানা পেরোতেই ওদের চোখে পড়ল কিছু দোকান পাট, গোটা দুই সরাইখানা। অরিন্দম রসিকের মত বলল, ফেরার পথে লাগাও চাপাটি আর কষামাংস। এখানেই পাতা পেতে বসে পড়ব কি বল ? যা ভাল গন্ধ বেরিয়েছে না ! এরাই তো কলকাতায় গিয়ে হয় হোটেলের বিখ্যাত বাবুর্চি।—নীলা কোন মন্তব্য করল না। দূরে কোথায় যেন কর্কশ সুরে একটা ময়ূর ডাকছিল। টাঙ্গার ঘোড়ার ক্ষুরের আওয়াজ হচ্ছে খটাখট। যেন তুফান ছুটছে রাত দশটার ফাঁকা রাস্তায়। এই পথ এই [illegible] দিয়েই তো সুমনের সঙ্গে নীলা [illegible] [illegible]। একটা হাত দিয়ে ও ধরেছিল ওর সীটের

পেছন অন্য হাতে জড়িয়েছিল ওর কোমর। ওরা তাজমহলে যাচ্ছিল। যাওয়া আর হয় নি। আজ অরিন্দমের সঙ্গে যেতে যেতে নীলার মনে হল, জীবনটা যেন সত্যিই নাটক। একেবারে গল্পের মত। ওকি হনিমুন করার আর জায়গা পেল না! সেই আগ্রা, সেই তাজ ওকে আবার টেনে নিয়ে এল।...অনেকগুলো কাগজে নানা জায়গার নাম লিখে অরিন্দম লটারী ধরেছিল। অনেকগুলো দলা পাকানো কাগজের বল। নীলা যে বলটা ধরল, খুলে দেখল, তাতে লেখা দিল্লী, আগ্রা। বাঃ চমৎকার!—উল্লাসে ফেটে পড়ল অরিন্দম। কিন্তু বুক কেঁপে উঠেছিল নীলার।

একটার পর একটা সিগারেট উড়িয়ে চলছে অরিন্দম। মনোযোগ দিয়ে ও দেখছে রাস্তাঘাট। আর কখনও ও আসেনি আগ্রায়। ওর চোখে অপরিচিতের বিস্ময় এবং কৌতূহল। অরিন্দমের এখন আর মনে নেই সুমনকে। পাশে যে যুবতী স্ত্রী রয়েছে তাকেও। যার বেনারসির আঁচল উড়ে উড়ে পড়ছে তার গায়ে। নীলা ভাবছে, এখন তো ও ইচ্ছে করলে অনেক কিছুই করতে পারে তাকে। এই ফাঁকা রাস্তায়, নির্জন টাঙায় অরিন্দম তাকে অন্ততঃ একটা চুমু খেতে পারে। অবশ্য এই নির্জনতাই যে ভাল লাগছে নীলার। ভালই লাগছে অরিন্দমের এই অবহেলা কিম্বা ঔদাসীন্য। ওর বুকের মধ্যে পাথরের মতন ভারী একটা ব্যথা, অথচ ও কাঁদতে পারছে না। পাশে বসে থাকা এই লোকটা তার স্বামী নীলা ভাবছে। আশ্চর্য, যাকে সে চিনত না, কয়েক মাস আগেও সে হল তার স্বামী, সবচেয়ে নিকট আত্মীয়।

আর যাকে পাঁচ বছর ধরে চিনে এসেছিল, সে তার আজ কেউ না।

টাঙাঅলা বলল দাদা, আপলোক কালসে হিঁয়া রহেগা?

হ্যাঁ, ভাই।—সিগারেটের ছাই ঝেড়ে বলল অরিন্দম।

আপলোক রাতমে তাজ দেখ লিজিয়ে আউর কাল সুবে ফিরতি আইয়ে।—টাঙাঅলা বলছিল, তাজমহল যে সব ধূপ লাগতা, তব বহুৎ আচ্ছা লাগতা দাদা। —নীলা অন্যমনস্কের মতন বলল, জানি, আমি দেখেছি।

হ্যাঁ, হ্যাঁ, দিদি। আপতো পহেলী দেখা হ্যায়, লেকেন দাদা কো সাথমে নেহি দেখা। কাল ফিরতি আজা ও হামকো টাংগেমে।

আচ্ছা লোকের পাল্লায় পড়েছি, কালকের কনট্রাক্টটা আজই করতে চায়।—অরিন্দম কথাগুলো বলে হাসতে লাগল। অরিন্দম বলল, এদের এই কাজ টুরিস্ট ঠকিয়েই খাওয়া। —নীলা এবারেও চুপ। মাথার ওপরে চাঁদোয়ার মতন আকাশে অনেকগুলো তারা। সোনালী জরির বেনারসির আঁচলের গায়ে অসংখ্য বুটি, মিহি কাজ, সেই সূক্ষ্ম কাজের দিকে তাকিয়ে থাকল অরিন্দম। ও ভাবল অফিসের কথা। ছুটির মেয়াদ কদিন বাড়িয়ে নিলে হত। ফিরে গিয়ে তো আবার সেই একঘেয়েমী। সেই অফিস, অফিস থেকে বাড়ী। এখন কলকাতায় খুব গণ্ডগোল। খুনখারাপী রোজ লেগেই আছে। বোমা, পাইপগান, ছাত্রের মৃত্যু, পুলিশের গুলি...। এসব কলকাতার নিত্য দিনের ঘটনা। তাই অরিন্দম ভাবছিল, এখানে এসে এই কটা দিন বেশ নিশ্চিন্ত-ভাবে কাটানো গেল। বেশ লাগল।

নীলা ভাবছিল, ডরোথির কথা। স্কুটারে যেতে যেতে লেডী ডাক্তার ডরোথির কথা বলছিল সুমন। ও নাকি একটা সস্তা মেয়ে, অথচ ওকে নিয়ে যমুনার পারে যাবার লোভটুকু ছাড়তে পারেনি সুমন। ওকে ভালবাসত না, কিন্তু কাছে টানত। প্রথম প্রথম নাকি ফিরিয়ে দিয়েছে। শেষের দিকে আর পারেনি। ক্ষুধার্তের সামনে খাবার বেশীদিন ফেলে রাখা যায় না। এই ছিল সুমনের যুক্তি। উলঙ্গ হ'য়ে মেয়েটি নাচত হোটেলের নির্জন ঘরে। মডেল হবার মতনও ছিল নাকি ক্লাসিক সুন্দরী। কিন্তু আমি? নীলা ভাবল, আমি তো আর অসাধারণ রূপসী টুপসী নই, লোকে বলে মিষ্টি আমার যৌবন আছে এই পর্যন্তই। পুরুষের মনটন ভোলানোর মত অত ছলনাই কি আমার জানা আছে? আজ-কাল মনটোনের দাম আর কজনই বা দেয়? অসৎ, ছলনাময়ীদের দিকেই লোকে হাত বাড়ায়। সমাজের প্রায় সব শ্রেণীর যুবক-দেরই তো মনের কথাটা এই। সুমন তো বলেই ছিল, পেটের যেমন ক্ষিধে থাকে, তেমনি শরীরেরও তো একটা ক্ষিধে রয়েছে, ডরোথির মতন মেয়েরা সেই ক্ষিধেই মেটায়।...সাবাস্ সুমন! নীলার আজ প্রাণপণে চেঁচাতে ইচ্ছে করল। জানতে ইচ্ছে করল, ওকি সুখী হয়েছে? ও বলতে চাইল, আমি সুখী হয়েছি সুমন। কোন-রকমে খেয়ে পড়ে বেঁচে আছি, বেঁচে থাকবও। স্বামী আমার প্রতি কর্তব্য করছে, আমিও করছি। বন্ধুর মত আমরা একে অন্যের মন মেলে ধরতে পারছি! বন্ধুর মতনই কি? নীলা হাসল আবার। বন্ধুর মতন উদারতা স্বামীর থাকে না।...কলেজের এক মেয়ে বন্ধু বলেছিল, ছেলেরা উদার কখন জানিস? পকেটের পয়সা খরচা করে ফিঁয়াসেকে যখন সিনেমা [illegible]।...বন্ধুর স্ত্রীকে ভালবাসার ব্যাপারে তাদের উদারতার সীমা থাকে না।...পরিচিত কোন মহিলার প্রেমের ব্যাপারে তারা উদার থাকে। অথচ নিজের স্ত্রীর যখন এসব ব্যাপার থাকে, তখন তারা অনুদার।...আজ নীলার মনে হ'ল, বন্ধু ঠিকই বলেছিল।

অরিন্দম খুব গম্ভীর। নীলা দেখল, ওর সিগারেটের কষ। ওকি কিছু ভাবছে টাবছে নাকি? সাধারণতঃ কোন ভাবনা চিন্তার সময় ও এত ঘন ঘন সিগারেট খায়। চাপা প্রকৃতির মানুষ অরিন্দম। মুখ ফুটে কিছু বলে না। জ্যোৎস্নার সামান্য আলোয় ওর মুখ দেখল নীলা। ওর গায়ে গরদের পাঞ্জাবী। কয়েকটা বোতাম খোলা বুকের। ওর লোমশ চওড়া বুক। ওর সেই মুখে কেমন যেন পবিত্র ছাপ। দুর্বলতা বোধ করল নীলা। ওর মনে হ'ল, সুমন যদি একবার দেখত! চুপ করে থাকতে থাকতে কোন এক সময় নীলা বলল, জানলে গো, সুমনের সঙ্গে না ঠিক এই রাস্তা দিয়েই আমি স্কুটারে গিয়ে-ছিলাম।—অরিন্দম বলল, ওর সঙ্গে তুমি আবার স্কুটারেও চড়েছিলে নাকি?

বাঃ, চাড়নি? ওই তো স্কুটারে করে আমায় তাজে নিয়ে গেছিল। অবশ্য তাজে আমি ঢুকিনি।

আধশোওয়া ভঙ্গিতে বসে রয়েছে অরিন্দম। ও চেয়ে চেয়ে দেখছিল, টাঙাঅলার মাথার পাগড়ি, ওর যোয়ান দুটো ঘোড়া। নীলার কথার উত্তরে একটু হাসল। বলল, কেন? তাজে ঢোকোনি কেন সেদিন?

ও শুধু ডরোথি, ডরোথি করছিল বলে।

তা আর না করে কি করবে বল? তুমি তো ছিলে সেই হাজার মাইল দূরে।

চমৎকার। হাজার মাইল দূরে ছিলাম বলেই কি...

সেদিন ও তোমায় চুমুটুমু খায়নি?

যাঃ অসভ্য। হাজার মাইল দূরে ছিলাম বলেই...

আর কি কি করেছিল ও?

সাহস পায়নি। হাজার মাইল দূরে ছিলাম...।

তারপর তুমি কি করলে?—অরিন্দম যেন চাপা দিতে চাইল ওই পুরনো প্রসঙ্গটা।

তারপরে আর কি?—নীলা বলল, কোন মেয়ে প্রেমিকের মুখে আর এক মেয়ের নাম শুনতে পারে বল?

ওর গালে ঠাস্ করে একটা চড় মেরে আমি নেমে পড়েছিলাম।

বাঃ ফার্স্টকেলাস। একেবারে হিন্দী ছবির হিরোইন।

নীলা হেসে ফেলল। ওর চোখের মণি দুটো জ্বল জ্বল করছিল। বলল, তুমি ঠাট্টা করছ?

ঠাট্টা কেন করব? ভাবছি, তোমার চড়ও ছিল কত সুইট।

নীলা আর সহ্য করতে পারল না। বলল, থাক্ তুমি আর বল না। তুমিও তো অনুরাধা না কি যেন মেডিকেল কলেজের একটা নার্সের সঙ্গে প্রেমট্রেম করেছিলে?

হ্যাঁ, করেছিলাম।

মশাইয়ের আর কি কি করা হয়েছিল?—গলার স্বর খাদে নামিয়ে নীলা বলল। অরিন্দম চোখে চোখে তাকাল। বলল বেশী কিছু না। এই লেকে গিয়ে চুমুটুমু খেয়েছিলাম, সিনেমা, টিনেমা দেখিয়েছিলাম।

ছিটকে সরে গেল নীলা। বাঘিনীর মত জ্বলে উঠল ওর চোখ। খুব আস্তে বলল, শুধু ওই পর্যন্তই?

এই পর্যন্তই। বলার মতন সুযোগ ছিল তবে ইচ্ছে হয়নি। মেয়েটা বড় সস্তা ছিল, ওকে ছুঁতে ঘেন্না করত।

তবুও নীলা তাকিয়ে থাকল। ও যেন দেখছিল, স্বামীর চোখের ভেতর মিথ্যাবাদীর ছায়া। অরিন্দম জ্বলছিল তীব্র এক অনুশোচনার জ্বালায়। ভাবল, না বললেই হত' কথাটা নীলাকে। মাত্র ছ মাসের ঘনিষ্ঠতায় এত কথা বলাটা হয়ত ঠিক নয়। কিন্তু নীলাই বা এত সংকীর্ণ হবে কেন? অরিন্দম ভাবছিল, আমার মা ঠাকুরমা মুখ বুজে সহ্য করেছেন আমার বাপ ঠাকুরদার প্রতাপ। ওরা তো বেশ্যাখানায়ও যেতেন। আমার ঠাকুরমার শাশুড়ী নিজে হাতে স্বামীকে সাজিয়ে দিতেন বাঈজীর ঘরে ঢোকার আগে। সে সব কি খুব বেশীদিন আগের কথা?...

ইয়ে সাজাহান গার্ডেন দাদা।—টাঙাঅলা বলে উঠল হঠাৎ। ওরা দুজনেই ফিরে তাকাল। দুদিকে বড় বড় গাছের সারিতে ঘেরা বাগান। চাঁদের আলোর লুকোচুরী চলছে পাতার জাফরীর ফাঁকে ফাঁকে। ঠিক এইখানে এই পর্যন্ত এসেই সুমনের স্কুটার থেকে নেমে পড়েছিল নীলা। নীলা! নীলা! সুমন ডাকল। ফিরেও তাকাল না নীলা। ও হাত দেখিয়ে একটা রিক্স থামিয়ে সোজা চলে এসেছিল বেঙ্গল লজে, যেখানে তার বন্ধুরা অপেক্ষা করছিল।

এই শোনো,—অরিন্দম ডাকল। নীলা চমকে উঠল। একটা সরীসৃপ যেন নেমে গেল নীলার শরীর বেয়ে। ওর গায়ে হাত রাখল অরিন্দম। অরিন্দম

গরম। নীলা শীতল। অরিন্দম বলল, আরে দূর, কবে কোন একটা মেয়ের সঙ্গে একটু হৈচৈ করেছিলাম, সেজন্যে তুমি মন খারাপ করছ?

নীলা চুপ করে রইল। ভেতরে ভেতরে ও অবাক হ'ল। ও দেখছিল, ওর স্বামীর মধ্যে কি অসঙ্গতি। কিছু সময় আগের ব্যবহারের সঙ্গে কিছু সময় পরের ব্যবহার, কথাবার্তার কোন সঙ্গতি থাকে না। টাঙাটা খুব জোর দুলেছে। ছুটতে পারছিল না বাঁ দিকের ঘোড়াটা। সহিসের চাবুক পড়ল ওর পিঠে। একটা দুটো গাড়ীর হর্ণ, স্কুটারের আওয়াজ ভেসে আসছিল। ওদের পাশ কাটিয়ে চলে গেল একটা সাইকেল রিকস। বাতাসের সোঁ সোঁ আওয়াজ হচ্ছে সাজাহান গার্ডেনে। নীলার কাছে থেকে কোন জবাব পেল না অরিন্দম। বিরক্ত হ'ল। ভাবল, তার স্ত্রীও তো সাধু নয়। ওকে আরেকবার একটু খোঁচা দিতে ইচ্ছে হ'ল অরিন্দমের, সুমন বোধ হয় এখানেই আছে, যাবে নাকি একবার এয়ার ফোর্সের মেসে?

লাইট পোস্টের মরা আলো আর জ্যোৎস্নায় নীলা দেখল স্বামীকে। ও ভুরু কুঁচকে সরু করে তাকাল। বলল, উদারতা? নাকি দয়া?

যদি বলি সহানুভূতি?

কথা নয়, যেন চাবুক। নীলা আরেকবার আশ্চর্য হ'ল। হা হা করে হেসে উঠল অরিন্দম। সে হাসির অর্থ নীলা বুঝল না। টাঙা এসে থামল, তাজমহলের গেটে। টিম টিম করে একটা হ্যারিকেন জ্বলছিল টিকিট কাউন্টারে। ওরা থামল। দাদা—বলল টাঙাঅলা। আপ্‌ লোক অন্দরমে যাইয়ে হাম ইধার রহেগা। তোমার টাকাটা!—বলে পার্সটা বার করতে যাচ্ছিল অরিন্দম। টাঙাঅলা বলল নেহি দাদা, এক সাথমে দেনেসে হো জায়গা।

আট আনা, আট আনা করে মোট একটি টাকা লাগল দুজনের টিকিটে। নীলা ব্যাগে রেখে দিল টিকিটের ছেঁড়া টুকরোটা, কেন যেন এসব টিকিট ফিকিটের ওপর তার খুব মায়া। কলেজে পড়ার সময় বাসের পুরনো টিকিট জমাতো নীলা। কি লাভ ওসব রেখে?—চশমার মধ্যে দিয়ে একটা অর্থপূর্ণ হাসি ছুঁড়ল অরিন্দম। বলল, অবশ্য চিরকুট রেখে দেওয়াই ভাল। কে বলতে পারে আজকের এই চিরকুটই আবার চার বছর আগের মতন নতুন কোন স্মৃতি হয়ে থাকবে কি না?

বোবা দৃষ্টিতে তাকাল নীলা। কি বলতে চায় অরিন্দম? ওর সমস্ত বুকের মধ্যে একটা হাহাকার বাজছিল যেন।

কয়েকজন শ্বেতাঙ্গী ঘুরছিল তাজে। ওদের পিঠে ট্যুরিস্ট ব্যাগ, কাঁধে ক্যামেরা। ওরা তাজমহলের ছবি তুলছিল ফ্ল্যাশে। চাঁদটা ক্রমেই বড় হয়ে উঠছে আকাশে। জ্যোৎস্নার আলোয় ধব ধব করছে মার্বেল পাথর। স্পষ্ট ফুটে উঠেছে অসংখ্য কারুকার্য। কোথাও বিন্দুমাত্র অন্ধকার নেই। শুধু লনের গাছের মাথায় মাথায় কাজলা কালো অন্ধকার। গোনা যায় না আকাশে এখন কটা তারা। নীলা একপা, একপা করে এগিয়ে চলল তাজের দিকে। ওর পেছনে পায়ে পায়ে এল অরিন্দম। ওর হাতে টর্চ। ও টর্চ ফেলে ফেলে দেখাচ্ছিল কোন কোন জায়গা। অরিন্দম পেছনের ইতিহাস আওড়াচ্ছিল গাইডের মত। কোথাও কোন শব্দ নেই। একটা ভারী কণ্ঠস্বর গম গম করছিল প্রচণ্ড উঁচু তাজের ঘরে ঘরে। নকল সমাধি ঘরের আশে পাশে এই ঘরগুলো। দেওয়ালের গায়ে ছোট ছোট ঘুলঘুলি। চাপা গুমোট অন্ধকার ঘরগুলোয়। ওরা নকল সমাধি দেখল সাজাহান, মমতাজের। তারপর আসল সমাধি। সুড়ঙ্গের মতন একটা সিঁড়ি চলে গেছে মাটির নীচে একটি ঘরে। নীলা খুব আস্তে বলল, নীচের ওই ঘরটায় রয়েছে আসল সমাধি।

নাকি?—অরিন্দম তাকাল। অনেকক্ষণ পর এই প্রথম দুজনের খুব স্বাভাবিকভাবে কথার বিনিময় হ'ল। ওর মুখে হাসির আভাস পেল নীলা। অরিন্দম ধুতির কোঁচাটাকে হাতের মুঠোয় করে খুব সাবধানে নামছিল সিঁড়ি বেয়ে। সিঁড়ির মুখে এসেই থমকে দাঁড়াল নীলা। চোখে পড়ল দেওয়ালের গায়ের একটা নাম। ও যেন একেবারে স্তব্ধ হয়ে গেল। আশ্চর্য, চার বছরেও এতটুকু পরিবর্তন হয়নি। এখনও স্পষ্ট পড়া যায় ওটা। ব্লেড দিয়ে সেদিন দুপুরে লিখে গেছিল সুমনের নাম।

কি গো কি হ'ল?

কিছু না।

টর্চ জেবলে জেবলে তো চলছে অরিন্দম। ও কি দেখতে পেল? না না, হয়ত দেখেনি। স্বামীর আড়ালে নীলা আলগোছে হাত বুলোল নামটায়।...সব সবতো বলেছে ও ওকে, শুধু এটুকুই বলতে পারেনি কেন যেন। ও যেন লুকোতে চাইল ছোট্ট এই লেখাটুকু মনের একান্ত গোপন জায়গায়।

সেদিন দুপুরে কাঠফাটা রোদে এসেছিল এখানে, ওরা কজন বন্ধু মিলে। নামটা তখনই লেখা। সুমনের সঙ্গে দেখা হয়নি তখনও। ও ভেবেছিল, সন্ধ্যেবেলা তাজে এসে বসবে দুজনে. আবার ওরা নাম লিখে যাবে।...অতীতকে কখনও কবর দেওয়া যায় না, সে ঠিক জেগে ওঠে বর্তমানের কোন এক সময়ে।

কি ব্যাপার পড়ে যাচ্ছিলে নাকি তুমি?—নীলার হত ধরল অরিন্দম।

না, পড়িনি।

চাঁদের এমন আলো তবু তুমি পড়ে যাচ্ছিলে?

কথাটা খট্‌ করে বাজল নীলার কানে। ও বুঝতে পারল না কি বলতে চায় অরিন্দম? অন্ধকার সিঁড়িতে চাঁদের আলো এলো কি করে? ওতো ওর টর্চের আলো। নীলা তাকাল। স্বামীর চোখ দুটোকে ওর অচেনার মতন মনে হ'ল।

দামী ধূপের গন্ধে ভুরভুর করছিল সমাধি ঘরটা। অসংখ্য মোমবাতি জ্বলছিল সমাধির গায়ে আশেপাশে। কোরান পাঠ করছিলেন মোল্লা সাহেব। নীলাও একটা মোম জেবলে দিল। সেদিন দিয়েছিল আজও দিল।

রাত এগারোটা বাজল। ট্যুরিস্টরা ফিরে গেল অনেকেই। ফাঁকা হয়ে এলো চারদিক। একেবারে নির্জন। একপা একপা করে নীলা এগিয়ে গেল। ঠাণ্ডা মার্বেল পাথরের ওপর পা ফেলতে খুব আরাম লাগছিল নীলার। ও ঘুরতে ঘুরতে যমুনার দিকে চলে এল। তাজের পেছনে, অরিন্দম গেল লনের দিকে তাজের সামনে। অন্তত কিছু সময়ের জন্য ওরা দুজনেই যেন একা থাকতে চায়।

মার্বেল পাথরের গায়ে এখানেও তো রয়েছে সুমনের নাম। ধবধবে জ্যোৎস্নার আলোয় নীলা দেখল স্পষ্ট। একদৃষ্টে ও তাকিয়েই থাকল। এ যেন নাম নয়, নামের মালিক। অসহ্য লাগল হঠাৎ, শ্বেতপাথরের গায়ের এই কঠিন কয়েকটি আঁচড়। এই দাগগুলোই তো তার সেদিনের দুর্বলতার সাক্ষী।

আরে দূর, দূর, সব ছেলেমানুষী। নীলা চোখ ফিরিয়ে নিল। ও যমুনার দিকে তাকাল। শুকিয়ে এসেছে যমুনা। তার গায়ে এঁকেবেঁকে চলে গেছে বালির সাদা চর। কোথাও কোথাও খানিকটা করে জল। নীলা দেখল, দূরের রেললাইনের ব্রিজটা, তারও খানিক দূরে আগ্রা ফোর্টের উঁচু মাথা। এত রাতেও এক ঝাঁক পাখী উড়ে গেল যমুনার আকাশে। ওর গলাটা আটকে আটকে আসছিল। কেন যেন ওর কান্না পাচ্ছিল। ও একান্ত নিঃস্বের মতন দাঁড়িয়ে থাকল।......পেছনে একটা পায়ের শব্দ। নীলা তাকাল। ও দেখল, অরিন্দম।

কি গো যাবে না?—ওর থুতনীটা তুলে ধরল অরিন্দম। ও দেখল, ওর চোখে জল। একটু যেন অবাক হল। তারপর গভীর মমতার সঙ্গে ওর মাথায় ঘোমটা টেনে দিয়ে বলল, চল, কালই ফিরে যাই।

ওদের মাথার ওপরে নক্ষত্রের আলো, নক্ষত্রের আকাশ।

সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায় রচিত
অনাবিষ্কৃত বৈজ্ঞানিক রচনা

বৈজিকতত্ত্ব

অমিত্রসূদন ভট্টাচার্য সংকলিত

[বঙ্কিমচন্দ্রের অগ্রজ, বিখ্যাত পালামৌ ভ্রমণ-কাহিনীর রচয়িতা, বঙ্কিম-পরবর্তী বঙ্গদর্শন পত্রিকার সম্পাদক—সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় যে একদা বাংলা ভাষায় বিজ্ঞানতত্ত্বের অনুশীলন করেছিলেন, এবং তাঁর রচিত পূর্ণাঙ্গ বৈজ্ঞানিক নিবন্ধ যে দীর্ঘকাল বঙ্গদর্শন পত্রিকার পৃষ্ঠায় ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়েছিল, এ তথ্য এতকাল আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে নি। সঞ্জীবচন্দ্রের এই রচনাটি তাঁর কোনো রচনাবলীতে অদ্যাবধি সংকলিত হয় নি, এবং আমাদের কোনো সাহিত্যের ইতিহাস বা অন্যত্রও এই রচনাটির সংবাদ নেই। ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় 'সাহিত্য-সাধক-চরিতমালা ৩২' গ্রন্থে সঞ্জীবচন্দ্রের রচনার যে বিস্তৃত বিবরণ দিয়েছেন তাতেও এই রচনাটির কথা নেই। বঙ্গদর্শন পত্রিকায় 'বৈজিকতত্ত্ব' নিবন্ধটিতে রচয়িতার নাম ছিল না। পরে রচনাটি আর পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয় নি। এই লেখাটি যে সঞ্জীবচন্দ্রের, তার প্রমাণ পাওয়া যাচ্ছে স্বয়ং বঙ্কিমচন্দ্রের একটি উক্তি থেকে। 'সঞ্জীবনী সুধার' ভূমিকায় বঙ্কিমচন্দ্রের মন্তব্য, " 'কৃষ্ণকান্তের উইল' 'রাজসিংহ', 'আনন্দমঠ', 'দেবী চৌধুরাণী' তাঁহার (সঞ্জীবচন্দ্রের) সম্পাদকতা কালেই বঙ্গদর্শনে প্রকাশিত হয়। তিনি নিজেও তাঁহার তেজস্বিনী প্রতিভার সাহায্য গ্রহণ করিয়া, 'জাল প্রতাপচাঁদ', 'পালামৌ', 'বৈজিকতত্ত্ব' প্রভৃতি প্রবন্ধ লিখিতে লাগিলেন।" বঙ্গদর্শনে ১২৮৪ বঙ্গাব্দের অগ্রহায়ণ, পৌষ, চৈত্র এবং ১২৮৫ বঙ্গাব্দের বৈশাখ ও শ্রাবণ—এই পাঁচ সংখ্যায় 'বৈজিকতত্ত্ব' প্রকাশিত হয়।

শুধু সঞ্জীবচন্দ্রের রচিত দুষ্প্রাপ্য রচনা বলেই নয়, বাংলা ভাষায় বিজ্ঞানচর্চার ইতিহাসেও এই রচনাটির মূল্য অপরিসীম। বঙ্গদর্শন পত্রিকায় বঙ্কিমচন্দ্রও বৈজ্ঞানিক বিষয় অবলম্বনে অনেকগুলি প্রবন্ধ রচনা করেছিলেন, কিন্তু সঞ্জীবচন্দ্র বিজ্ঞানতত্ত্বের একটিমাত্র বিষয় অবলম্বনে বাঙালী পাঠকের উদ্দেশে যে সুবৃহৎ পূর্ণাঙ্গ আলোচনা উপহার দেন, তা উনবিংশ শতকে বাংলায় বিজ্ঞানচর্চার ইতিহাসে একটি দুর্লভ উদাহরণ হিসাবে পরিগণিত হবে।

লেখকের ভাষা সম্পূর্ণ অবিকৃত রেখে পূর্ণাঙ্গ 'বৈজিকতত্ত্ব' রচনাটির সংক্ষেপিত রূপ এখানে সংকলিত হল। পাদটীকায় প্রয়োজনীয় বৈজ্ঞানিক তথ্য পরিবেশিত হয়েছে। টীকা-নির্মাণে সহায়তা করেছেন বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাণীতত্ত্ব বিভাগের অধ্যাপক শ্রীনির্মলচন্দ্র সুকুল।]

বৈজিকতত্ত্ব

বৈজিকতত্ত্বের (১) প্রথম কথা এই যে সন্তানের গঠন ও প্রকৃতি বংশানুরূপ হয়;

১। বৈজিকতত্ত্ব বা Genetics -এর মূল সূত্রগুলি প্রথম আবিষ্কার করেন গ্রেগর মেণ্ডেল (১৮২২—১৮৮৪) এবং প্রকাশ করেন ১৮৬৬ খৃষ্টাব্দে। কিন্তু বিশ্বের বিজ্ঞানীসমাজ তা সম্পূর্ণ অপরিজ্ঞাত থাকে। ১৯০০ খৃষ্টাব্দে মেণ্ডেলবাদ পুনরাবিষ্কৃত হয় এবং তারপর থেকে মেণ্ডেলবাদের দ্রুত অগ্রগতি হতে থাকে। সঞ্জীবচন্দ্রের রচনা প্রকাশিত হয় ১৮৭৭ খৃষ্টাব্দে এবং স্বভাবতই ধারণা করা যায় যে প্রবন্ধকার মেণ্ডেলসূত্র সম্বন্ধে পূর্বে অবগত ছিলেন না। কিন্তু ডারউইন, হার্বার্ট স্পেন্সার প্রমুখ বিজ্ঞানীদের রচনা থেকে তিনি উত্তরাধিকারতত্ত্বের সমস্যাগুলি উপলব্ধি করেন এবং উক্ত বিষয় অবলম্বনে বর্তমান প্রবন্ধ রচনা করেন। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে Genetics -এর প্রচলিত পরিভাষা উত্তরাধিকারতত্ত্ব প্রজননতত্ত্ব বংশগতিতত্ত্ব ইত্যাদি অপেক্ষা বৈজিকতত্ত্ব শব্দটি অধিকতর গ্রহণযোগ্য বলে মনে হয়।

সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

অর্থাৎ জাতি, অন্তর্জাতি এবং গোষ্ঠী, অনুরূপ হয়। সাধারণতঃ জানা আছে যে কখন গোজাতিতে ঘোটক জন্মে না, অথবা ঘোটকজাতিতে গো জন্মে না। বিজাতীয় জন্ম যে অসম্ভব তাহা বালকেরাও অবগত আছে। তাহার পর অন্তর্জাতির মধ্যেও ঐ নিয়ম সম্পূর্ণ বলবৎ, এক প্রকার মেষের বংশে অন্য প্রকার মেষ জন্মে না। চিতা ব্যাঘ্রের বংশে নাগেশ্বরী ব্যাঘ্র জন্মে না। গোষ্ঠীসম্বন্ধেও ঐরূপ নিয়ম; আমাদের দেশী ক্ষুদ্রকায় বেটুয়া ঘোটকের গোষ্ঠীতে কখন ওয়েলার বা আরব্য ঘোটক জন্মে না অথবা আরবা ঘোটকের গোষ্ঠীতে কখন আমাদের পক্ষিরাজেরা জন্মগ্রহণ করেন না। আবার, অতি কৃষ্ণবর্ণ কাফ্রিগোষ্ঠীতে কখন ইংরেজদিগের মত শ্বেতকায় সন্তান জন্মে না অথবা শ্বেতকায় ইংরেজদিগের গোষ্ঠীতে কখন কাফ্রিদিগের ন্যায় কৃষ্ণবর্ণ সন্তান জন্মে না। যদি কেহ কোন বংশে ইহার অন্যথা দেখিয়া থাকেন তাহা হইলে বুঝিবেন যে সে বংশ অমিশ্রিত নহে, তাহাতে সংকর দোষ এক সময় না এক সময়ে ঘটিয়াছে।

হারবার্ট স্পেনসর সাহেব বিলাতের কতকগুলি বিখ্যাতনামা সঙ্গীতবিদ্দিগের নাম উল্লেখ করিয়া দেখাইয়াছেন যে তাঁহাদের প্রত্যেকের জনক সঙ্গীতব্যবসায়ী ছিলেন এবং সেই জন্যই তাঁহারা সঙ্গীতশাস্ত্রে বিশেষ নিপুণ হইয়াছিলেন। অর্থাৎ বৌজিক নিয়মানুসারে তাঁহারা পৈতৃবিদ্যায় পটুতা লাভ করিয়াছিলেন। আমাদের দেশেও এরূপ দেখিতে পাওয়া যায়; সঙ্গীতবিদ্যায় এক্ষণে বাঙ্গালির মধ্যে যদুনাথ ভট্টাচার্য একজন প্রধান বলিয়া গণ্য, তাঁহার পিতা সঙ্গীতব্যবসায়ে নিপুণ ছিলেন। শ্রীক্ষেত্রনাথ গোস্বামী দেশীয় সঙ্গীত বিদ্যার অধ্যাপক, তাঁহার পিতা ঐ বিদ্যায় একজন পণ্ডিত ছিলেন। পশ্চিমাঞ্চল হইতে যে সকল খেয়ালি ও ধ্রুপদী আমাদের দেশে আইসেন, তাঁহার প্রায় সকলেই তানসেন বা অন্য কোন না কোন 'ওস্তাদ ঘরনা' বলিয়া পরিচয় দেন। প্রকৃতপক্ষে তাহা সত্য হউক বা না হউক, তাঁহাদের পরিচয় দ্বারা স্পষ্ট বুঝা যাইতেছে যে 'ওস্তাদের' বংশে 'ভাল ওস্তাদ' জন্মে এ কথা কি বাঙ্গালা কি হিন্দুস্থান সর্বত্র চলিত আছে। (২)

প্রায় চিরস্থায়ী রোগমাত্রেই বীজানুগামী। জনক জননীর হইতে সন্তান সন্ততির হইয়া থাকে, অস্থির রোগ, মাংসের রোগ, চক্ষের রোগ, পাকস্থলীর রোগ, বায়ুস্থলীর রোগ, যে অঙ্গের রোগ হউক না কেন, চিরস্থায়ী হইলেই প্রায় সন্তানের হইয়া থাকে। তন্মধ্যে চক্ষের রোগ বিশেষরূপে বীজানুবর্তী। চক্ষের যে প্রকার পীড়া হউক সন্তানের প্রায়ই তাহা জন্মে। দূরদৃষ্টি, নিকটদৃষ্টি, বক্রদৃষ্টি এ সকল পুত্রে যায়। রাত্র্যন্ধ, দিবান্ধ, বর্ণান্ধ সম্বন্ধেও ঐ নিয়ম। ইহার মধ্যে বর্ণান্ধতা পুত্রে যায় না প্রায় দৌহিত্রে যায়। যে প্রকার পীড়াগ্রস্তকে লোকে সচরাচর 'সূর্যকানা' (৩) বলে তাহাও সন্তানে যায়। নিকটদৃষ্টি অনেক প্রকার আছে; আমরা একজনের তাহার আঁত প্রবল অবস্থা দেখিয়াছি, তিনি সম্মুখস্থ কোন দ্রব্য দেখিতে হইলে তাহা চক্ষের নিকট লইয়া চক্ষু অতি সংকুচিত না করিলে দেখিতে পান না। একদিন বালিকা কালে তাঁহার স্ত্রী তাঁহাকে উপহাস করিবার নিমিত্ত একটি দ্রব্য আপন চক্ষের নিকট ধরিয়া নানা ভঙ্গী করিতেছিল। অন্ধের মাতা এই উপহাস দেখিতে পাইয়া রাগতভাবে পুত্রবধূকে অভিসম্পাত করিলেন যে 'তুই যেমন আমার সন্তানকে উপহাস করিতেছিস আমি বলিতেছি তোর সন্তানেরাও ঐরূপ অন্ধ হইবে।' পুত্রবধূর ক্রমে দুই তিন সন্তান হইল, আমরা সন্তানগুলি দেখিয়াছি তাহারা অবিকল পিতার ন্যায় অন্ধ হইয়াছে। প্রতিবেশীরা বলেন যে, ব্রাহ্মণ কন্যার অভিসম্পাত অতি আশ্চর্য ফলিয়াছে। কিন্তু যিনি বৈজিক নিয়ম জানেন তিনি বলিবেন অভিসম্পাতের বড় আবশ্যকতা ছিল না। যাহারা জন্মান্ধ নহে তাহাদের সম্বন্ধে এই নিয়মের ব্যতিক্রম আছে অর্থাৎ যাহাদের পূর্বাবস্থায় চক্ষুর কোন দোষ ছিল না পরে কোনরূপ আঘাত লাগিয়া বা বিষাক্ত দ্রব্যাদি সংস্পর্শে বা অন্য কোন কারণে চক্ষু গিয়াছে তাহাদের সন্তান অন্ধ হয় না। কেবল চক্ষুরোগ সম্বন্ধে কেন, শারীরিক যে কোন পীড়া বা পরিবর্তন আপন হইতে হয় নাই, বাহিক কোন কারণবশতঃ হইয়াছে, সে পীড়া বা পরিবর্তন সন্তানে প্রায় যায় না। খঞ্জের সন্তান খঞ্জ হয় না। যাহার অস্থি আঘাতে বা পতনে ভাঙ্গিয়া গিয়াছে তাহার সন্তানেরা ভগ্নাস্থি হয় না। তথাপি কেহ কেহ বলেন যে সময়ে সময়ে এরূপও জন্মে। একজনের একটি অংগুলি অস্ত্রাঘাতে সম্পূর্ণরূপে না কাটিয়া কতকাংশে কাটে, অংগুলিটি হস্ত হইতে ছিন্ন হয় নাই কিন্তু বাঁকিয়া যায়। তাহার পর ঐ ব্যক্তির কয়েকটি সন্তান জন্মে। সন্তানগুলির সকলেরই সেই অঙ্গুলি বক্র হইয়াছিল। প্রোফেসর রোলেস্টান বলেন যে একজনের জানু কাটিয়া গিয়াছিল তাহার সন্তানের জানুতে ক্ষতচিহ্ন হইয়াছিল। তিনি আর একজনের কথা বলেন যে, তাহার চিবুকে অস্ত্রাঘাতের চিহ্ন ছিল সন্তানের চিবুকেও ঐরূপ ক্ষতচিহ্ন হইয়াছিল। কিন্তু এরূপ ঘটনা অতি বিরল। বসন্তরোগের ক্ষতচিহ্ন কখন সন্তানে যায় না। আমাদের দেশে পুরুষানুক্রমে স্ত্রীলোকদিগের নাসিকা ও কর্ণ বিদ্ধ করা রীতি চলিয়া আসিতেছে, কিন্তু কখন তাহার চিহ্ন সন্তানে দেখা যায় নাই। (৪) আমাদের বিশ্বাস যে, যে শারীরিক পরিবর্তন আপনা হইতে না জন্মে অথবা যে পরিবর্তন শরীরের আভ্যন্তরিক নিয়ম সংস্পর্শ না করে সে পরিবর্তন সন্তানে যায় না। তদ্ভিন্ন সকল পরিবর্তন, সকল পীড়া, সকল দোষ সকল গুণ বীজাবলম্বন করিয়া সন্তানে যাইতে পারে।

এক বংশে যদি কোন রোগ থাকে জ্ঞাতিবিবাহে সে রোগ দৃঢ়বদ্ধ হয়। জনক-জননী উভয়েরই রক্ত আশ্রয় করিয়া সেই রোগ সন্তানে আইসে। জনক জননী ভিন্ন ভিন্ন বংশের হইলে একের রোগাংশ অপরের রক্তদ্বারা (৫) সংশোধিত হইতে পারে। যে সকল দেশে বহুকালাবধি জ্ঞাতিবিবাহ

২। বিভিন্ন গায়ক-গায়িকার কুলজি অনুধাবন করে বর্তমানে বিজ্ঞানীরা স্থির নিশ্চিত হয়েছেন যে গানের গলা বা কণ্ঠমাধুর্য উত্তরাধিকার সূত্রে আসে এবং 'ডমিনেন্ট জিন্' দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। (দ্রঃ Principles of Human Genetics, C. Stern, 1949.)

৩। সূর্যকানা বা 'রড্-মনক্রোমেটিজম' একটি বংশগত রোগ। ১৯২৮ খৃষ্টাব্দে ফ্রান্সিসকেটি প্রথম এই রোগটির বিবরণ দেন। (দ্রঃ System of Ophthalmology, vol. III, Part, 2, Duke-Elder 1964). রোগটি সচরাচর 'অটোজোম্যাল রিসিসিভ জিন' দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। সম্প্রতি পশ্চিমবঙ্গের শঙ্খবণিকদের মধ্যে এই বংশগত রোগটির প্রাদুর্ভাব আবিষ্কৃত হয়েছে (দ্রঃ Obs[illegible]tions on Rod Monochromatism, Bose, Joardar and sukul, 1968, In Transactions of the Asia Pacific Academy [illegible]thalmology, vol. III) রোগটির বংশানুক্রমিক সংক্রমণ বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে প্রমাণিত হওয়ার বহু পূর্বেই একে বংশগত রোগ হিসাবে চিহ্নিত করে লেখক সঞ্জীবচন্দ্র তাঁর বৈজ্ঞানিক পর্যবেক্ষণ ক্ষমতার পরিচয় দিয়েছেন।

৪। এই অংশে 'ল্যামার্কবাদ' সম্বন্ধে আলোচনা আছে। ১৯০২ খৃষ্টাব্দে ল্যামার্ক বলেছিলেন যে, কোন প্রাণীর জীবদ্দশায় অর্জিত বৈশিষ্ট্য তার সন্তান-সন্ততিতে সংক্রামিত হবে। পরে ভাইসম্যান (১৮৩৪—১৯১৪) এই তত্ত্বের খণ্ডন করেন। তিনি একটি মূষিক বংশের ৪০ পুরুষ ধরে লেজ কেটে যান এবং দেখান যে ৪০ পুরুষ পরেও ঐ ইঁদুরবংশের বংশধরদের স্বাভাবিক লেজ আছে। সঞ্জীবচন্দ্রপ্রদত্ত নাক কান বিন্ধ করার উদাহরণ অত্যন্ত সহজভাবে ল্যামার্কবাদকে অপ্রমাণিত করে। এখানে লেখক বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিতে সামাজিক রীতি ও বিজ্ঞানতত্ত্বের সমন্বয় সাধন করেছেন।

৫। তৎকালে প্রচলিত ধারণা ছিল যে রক্তই জীবদেহের সমস্ত বৈশিষ্ট্যের ধারক এবং বাহক। বর্তমানে প্রমাণিত হয়েছে যে জীবের প্রতিটি বৈশিষ্ট্যের ধারক এবং বাহক হল 'জিন্'। এই জিন্ জীবকোষের নউক্লিয়াসে যে ক্রোমোজোম বা জৈবসূত্র আছে তার মধ্যে নিহিত। প্রতিটি বৈশিষ্ট্যের বিকাশের মূলে আছে একটি যুগল জিনের ক্রিয়া। এই যুগল জিনের একটি আসে জনকের শুক্রকীট থেকে এবং অপরটি জননীর ডিম্বাণু থেকে। জনক-জননী ভিন্ন বংশের হলে জিনযুগল ভিন্নধর্মী (heterozygous) হওয়াই স্বাভাবিক। বেশির ভাগ বংশগত রোগের উৎপত্তি নির্ভর করে জিনযুগলের সমধর্মিতার (homozygosity) উপর।

প্রচলিত আছে সে সকল দেশে সকল বিবাহই জ্ঞাতির মধ্যে হয় না অধিকাংশ বিবাহই ভিন্ন ভিন্ন বংশে হইয়া থাকে। মধ্যে মধ্যে এখানে সেখানে যে দুই একটি জ্ঞাতিবিবাহ ঘটে তাহাতে দেশের মঙ্গলামঙ্গল জানা যায় না। তদ্ভিন্ন এই বিবাহ কোন বংশেই পুরুষানুক্রমে হয় না, একবার যদি কেহ নিজগোষ্ঠীর মধ্যে বিবাহ করে, হয়ত তাঁহার সন্তানেরা আবার অপর বংশে বিবাহ করে। কাজেই অনিষ্ট বড় লক্ষ্য উপযোগী হয় না।

স্বগোত্রে বিবাহ করা আমাদের নিষেধ আছে সত্য, কিন্তু তাহা পিতৃগোত্র সম্বন্ধে; মাতৃগোত্র সম্বন্ধে বিশেষ নিষেধ নাই। শাস্ত্রকারদিগের বিশ্বাস ছিল যে পিতাই জনক, সন্তান কেবল পিতা হইতে জন্মে, মাতা ক্ষেত্র মাত্র। এই জন্য পিতৃগোত্রে বিবাহ নিষেধ করিয়া গিয়াছেন, কিন্তু এক্ষণে প্রতিপন্ন হইয়াছে যে, জন্ম সম্বন্ধে মাতাই প্রধানা পিতৃবীজ কেবল উত্তেজক মাত্র, (৬) পিতৃবীজ অভাবেও গর্ভ হইতে পারে তবে গর্ভরক্ষা বড় হয় না। অনেকেই দেখিয়াছেন পিঞ্জরবদ্ধা পালিতা পক্ষিণী গর্ভবতী হইয়া অণ্ড প্রসব করিয়াছে, পক্ষীর সহিত সাক্ষাৎ নাই অথচ পক্ষিণী অণ্ড প্রসব করে। যাঁহারা গৃহে হংসী পালন করেন তাঁহারাই দেখিয়াছেন নিকটে কোথাও হংস নাই অথচ হংসী অণ্ড প্রসব করে। অতএব পক্ষী ব্যতীত পক্ষিণী গর্ভবতী হয়। কীট পতঙ্গের মধ্যে এরূপ গর্ভে শাবক পর্যন্তও জন্মে; তবে অধিক নহে, যাহাও জন্মে, তাহাও দীর্ঘজীবী হয় না। পুরুষ সংস্রব ব্যতীত জন্মকে ইংরেজিতে parthenogenisis বলে। জীবজন্তুর মধ্যে এরূপ জন্মের প্রমাণ অনেক পাওয়া যায়। মনুষ্য মধ্যে এরূপ জন্মের কোন বিশেষ প্রমাণ নেই, কেবল প্রবাদ আছে। খৃষ্টানদিগের খৃষ্টের জন্ম, হিন্দুদিগের ভগীরথের জন্ম তাহার উদাহরণের স্থল।

মনুষ্য মধ্যে বাস্তবিক এরূপ জন্ম কখন ঘটে বলিয়া কাহারও কাহারও বিশ্বাস থাকায় পূর্বতন শরীরতত্ত্ববিদেরা এই সম্বন্ধে মীমাংসা করিতে চেষ্টা পাইয়াছিলেন; সে সকল পরিচয় এ স্থলে অনাবশ্যক।

যাহা বলা হইল তাহাতেই প্রতীতি জন্মিতে পারে যে জন্মবিষয়ে মাতাই মূল। তাহা যদি সত্য হয়, তবে বিবাহকার্যে পিতৃগোত্র অপেক্ষা মাতৃগোত্র বর্জন করা আবশ্যক। (৭) আমাদের শাস্ত্রকারদিগের বিশ্বাস ছিল যে জন্মসম্বন্ধে পিতাই প্রধান, তাই পিতৃগোত্রে বিবাহ নিষিদ্ধ হইয়াছিল। কিন্তু এক্ষণে দেখা যাইতেছে যে, পিতৃবংশ অপেক্ষা মাতৃবংশ আরও নিকট। বোধহয় সেই মূলে 'নরাণাং মাতুলক্রমঃ' কথা প্রচলিত হইয়াছিল। মাতৃগোত্রে বিবাহ নিষিদ্ধ না থাকায় আমাদের দেশে প্রকারান্তরে জ্ঞাতিবিবাহ প্রচলিত হইয়াছে।

বল্লালের সমুদয় নিয়ম বৈজ্ঞিকতত্ত্বের অনুযায়ী। বিজ্ঞানশাস্ত্র তখন বাঙ্গালায় ছিল না, না থাকুক বল্লাল তাহা বুঝিয়াছিলেন, শারীরিক ও মানসিক উন্নতির একেবারে মূল ধরিয়া তিনি আইন করিয়াছিলেন। গুণবানের সন্তান গুণবান হয়। অতএব গুণবানের বংশে গুণবানের বিবাহ দিয়া রাজ্যে গুণবানের সংখ্যা বৃদ্ধি করিতে হইবে এই তিনি স্থির করেন। পরে বাঙ্গালার মধ্যে ১১ জন অতি শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিকে মনোনীত করিয়া, তাঁহাদিগকে কুলীন করিলেন এবং তৎসঙ্গে তাঁহাদের বিবাহ কিরূপ কাহার সহিত হইবে তাহার নিয়মবদ্ধ করিয়া দিলেন। এই শেষ ভাগটি নূতন। সকল রাজ্যেই রাজারা ইচ্ছানুরূপ কৌলীন্য বিতরণ করিয়া থাকেন। তাঁহারা গুণগ্রাহী, গুণের পুরস্কার করেন, অর্থ দেন, সম্পদ দেন, কৌলীন্য দেন তাঁহাদের রাজ্যে আর গুণবানের অভাব থাকে না, কিন্তু তাহাতে একটি দোষ ঘটে, তথায় পুরস্কারের লোভে গুণের বর্ধন হয় কাজেই পুরস্কারের শিথিলতা হইলে গুণোন্নতির হ্রাস হয়। বল্লাল যে নূতন নিয়মবদ্ধ করিলেন তাহাতে সে দোষ রহিল না। গুণবানের বংশে গুণবানের বিবাহ হইলে সন্তান অবশ্য গুণবান হইবে, ইহা বৈজ্ঞিক নিয়ম, প্রায় অকাট্য, পুরস্কার থাকুক বা না থাকুক, রাজ্যে গুণবানের অভাব থাকিবে না।

কিন্তু যে নয়টি গুণ (আচার, বিনয়, বিদ্যা, প্রতিষ্ঠা, তীর্থদর্শন, নিষ্ঠা, আবৃত্তি, তপ, দান, এই কুললক্ষণ) বল্লাল আপন রাজ্যে বিস্তার করিবার নিয়ম স্থাপন করিলেন তাহাতে রাজ্যের বড় উন্নতি বা খ্যাতির সম্ভাবনা ছিল না। গুণগুলি প্রার্থনীয় বটে, থাকিলে সংসার উজ্জ্বল হয় কিন্তু রাজ্য সম্বন্ধে তাহার কোনটিই কিছুই নহে; সেই জন্য রাজ্যের কোন উপকারই হয় নাই। কিন্তু সংসার সম্বন্ধে ফল অতি চমৎকার হইয়াছিল। বাঙ্গালার ন্যায় পবিত্র সংসার, সুখের সংসার, বোধহয় আর কোন রাজ্যেই ছিল না। বহুদিন অবধি তাহা নষ্ট হইতে আরম্ভ হইয়াছে তথাপি যাহা অদ্যাপি আছে তাহা বোধহয় আর অন্যত্র বড় অধিক নাই।

অন্য দেশের রাজারা কুলীনদিগের বিবাহে হস্তক্ষেপ করেন নাই, করিলে হয় ত রাজ্যের উপকার হইত। এক্ষণে প্রায় লোকে নিজ নিজ প্রণয় পরিতৃপ্তির নিমিত্ত অথবা মর্যাদা রক্ষার্থ বিবাহ করেন। যে সকল বিবাহে নিজ সুখ সমৃদ্ধি ভিন্ন দেশের কোন উন্নতি হয় না সে সকল বিবাহ লোকবিশেষের নিকট স্বার্থপর বলিয়া ঘৃণিত। আমরা এই পর্যন্ত বলিতে পারি যে, যে বিবাহ প্রণয় পরিতৃপ্তির নিমিত্ত হইত, তাহার অন্যথা করিলে অনিষ্ট আছে, কিন্তু যে বিবাহ কেবল মর্যাদা রক্ষা নিমিত্ত সে বিবাহ অনেক সময় না হইলেই ভাল। যাঁহারা পুরুষানুক্রমে ধনবান বা উচ্চপদস্থ তাঁহাদের সন্তানেরা প্রায় নিশ্চেষ্ট হইয়া পড়ে। আমাদের দেশে প্রায় দেখা যায় তাঁহারা আপন আপন বিষয় কার্যে অক্ষম, তাঁহাদিগের অপ্রাপ্ত বয়সে কোর্ট অব ওয়ার্ডস, প্রাপ্ত বয়সে দেওয়ান, বিষয় রক্ষা করে। এরূপ ব্যক্তি যদি তদবস্থাগ্রস্ত বংশে বিবাহ করেন তাহা হইলে তাঁহার সন্তান আরও অপদার্থ হইবার সম্ভাবনা।

৬। মানুষ ও অন্যান্য উন্নত প্রাণীর ক্ষেত্রে এ কথা প্রযোজ্য নয়। সন্তানের কোষের মোট জৈবসূত্রের অর্ধেক মাতা এবং অর্ধেক পিতার কাছ থেকে আসে। সুতরাং গর্ভাধানের (fertilization) পর একটি ডিম্বাণুর পূর্ণাঙ্গ শিশুতে পরিণতি লাভের জন্য মা বাবা উভয়ের জৈবসূত্রের সমান অবদান আছে।

৭। আধুনিককালে বৈজ্ঞানিক গবেষণার আলোতেও কথাটি বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। হিমোফিলিয়া, লোহিত-হরিৎ বর্ণান্ধতা প্রভৃতি যৌনজৈবসূত্রজ ব্যাধি সাধারণত ছেলেদের হয়, মেয়েদের কদাচিৎ হয়। কারণ ছেলেদের যৌনজৈবসূত্রের X-সূত্রটি মাতা এবং y-টি পিতার কাছ থেকে আসে। y সাধারণত নিষ্ক্রিয় বলে X-এর রোগবাহী জিন সহজেই পুরুষের মধ্যে সক্রিয় হয়ে ওঠে। কিন্তু মেয়েদের দুটি X-সূত্র থাকায় একটির দোষ অপরটি খণ্ডন করতে পারে। মাতৃবংশে বিবাহ হলে ঐ বংশের রোগবাহী X-এর সঙ্গে যখন পিতার ঐ একই প্রকারের X সূত্র হয় তখন কন্যা সন্তানও যৌনজৈবসূত্রজ ব্যাধিতে আক্রান্ত হয়ে পড়ে।

সাহিত্য ও সংস্কৃতি

ভারত-চিত্র

বেদ মেহতা ইংরাজী ভাষায় ভারতীয় লেখক হিসাবে খ্যাতি অর্জন করেছেন। তিনি মার্কিন মুল্লুকে থাকেন এবং 'নিউ ইয়র্কার' নামক বিখ্যাত পত্রিকার নিয়মিত লেখক। সম্প্রতি তিনি আর একবার ভারত ঘুরে গেলেন। একটি বিদেশী প্রকাশন প্রতিষ্ঠান কর্তৃক ভারপ্রাপ্ত হয়ে গান্ধীজীর সম্পর্কে একটি গ্রন্থ রচনার জন্য মাল-মশলা সংগ্রহ করাটাই তাঁর উপলক্ষ্য ছিল। চোখে তিনি দেখতে পান না, কিন্তু দৃষ্টিহীন হলেও তাঁর বোধশক্তি অসীম এবং মনে হয় চক্ষুষ্মান ব্যক্তিদের চেয়ে তিনি একটু বেশীই দেখতে পান।

শুধু বেদ মেহতা কেন, জন্মসূত্রে ভারতীয় হলেও যে সব ভারতীয় মানসিকতার দিক থেকে বিদেশী তাঁরা প্রায় সকলেই ভারতবর্ষের সমাজ ও জীবন বিষয়ে লিখতে বসলে মিস মেয়োর প্রেতাত্মা তাঁদের কাঁধে ভর করে। ভারতবর্ষের বিকৃত এবং একতরফা চিত্রপ্রকাশেই এই সব লেখকদের উৎসাহ বেশী। এর একটি প্রধান কারণ হল বিদেশের হাটে এই জাতীয় রচনাই বিকায় বেশী। তাই ভারতীয়দের নানাবিধ কুসংস্কার, চরিত্রগত ত্রুটী-বিচ্যুতি (অবশ্য য়ুরোপীয় মাপকাঠিতে), এবং সমাজব্যবস্থাকে হেয় প্রতিপন্ন করাই এই সব লেখকদের এক এবং সর্বপ্রধান নীতি। এই নীতি বা দুর্নীতি কিন্তু নিশ্চিত আর্থিক সাফল্যের পথে ভাগ্যবান লেখককে নিয়ে যেতে পারে। যাই হোক, বেদ মেহতা এই সব লেখকদের সমগোত্রীয় হলেও তাঁর একটু বৈশিষ্ট্য আছে। তাঁর মতামত অনেকখানি স্নিগ্ধ, উৎকট উগ্রতায় ভরা নয়।

বেদ মেহতার 'পোর্ট্রেট অফ ইণ্ডিয়া' নামক গ্রন্থটিও মনে হয় প্রকাশকের দ্বারা ভারপ্রাপ্ত হয়েই লিখিত। এই গ্রন্থে নানান প্রসঙ্গ কলকাতা, নেফা, নাগাল্যাণ্ড, ভুটান, সিকিম, লাডক, নেপাল, তিব্বত, কাশ্মীর, [illegible] নারায়ণ মেনন, কলকাতার উৎপল দত্ত ও সমর সেন সেই সঙ্গে আছে ভিকটোরিয়া মেমোরিয়াল আর অকটারলোনী মনুমেন্ট। হায়দ্রাবাদ ইত্যাদি ইত্যাদি কোনো কিছুই বাদ পড়েনি—সেই দিক থেকে স্বর্গতঃ দুর্গাচরণ রায় প্রণীত 'দেবগণের মর্তে আগমন' গ্রন্থটির সঙ্গে পার্থক্য থাকলেও সাদৃশ্যের অভাব নেই।

ভারতবর্ষ হিন্দু সংখ্যাগরিষ্ঠের দেশ, তাই যতই কেন সেকুলার বলে প্রচার করা হোক, বিদেশীর দৃষ্টিতে ভারতবর্ষে শুধু হিন্দুরাই বাস করে, এবং সেই হিন্দুরা অতি গোঁড়া প্রকৃতির। এবং জাতিভেদপ্রথা মেনে চলে। বেদ মেহতা যে সময় এসেছিলেন সেই সময় এলাহাবাদে কুম্ভমেলা হচ্ছিল, তিনি কুম্ভমেলায় গেলেন হিন্দু-ভারতের আরতি দেখার জন্য। তারপর কাশ্মীর। সেই সময়টা কাশ্মীরে হজরতবাল মসজিদে হজরত মোহম্মদের কেশ অপহৃত হয়। বেদ মেহতা এই ঘটনাটি ফলাও করে লিখেছেন। এই ঘটনার পিছে যে একটা রাজনৈতিক গুপ্তলীলা আছে তার সন্ধান পেয়ে তিনি প্রচুর তথ্যাদি সংগ্রহ করেছেন এবং স্টেটসম্যানের তদানীন্তন রাজনৈতিক ভাষ্যকারের বিবরণ বিস্তারিত ভাবে উদ্ধৃত করেছেন। এই উপলক্ষ্যে তিনি কাশ্মীরের সামগ্রিক রাজনৈতিক পটভূমির সন্ধানে নানা তথ্য সংগ্রহ করে পরিবেশন করেছেন। রাজনৈতিক তিক্ততার মধ্যেও কাশ্মীরে সাম্প্রদায়ি[illegible] [illegible]রেষির তেমন প্রাবল্য নেই একথা তি[illegible] [illegible]লেছেন।

কলকাতায় বিদগ্ধসমাজে উৎপল দত্ত এবং সমর সেনের সঙ্গে তিনি আলাপ করেছেন, কলকাতার মেজাজ এবং মর্জির সঙ্গে এই দুটি মানুষ বেশ খাপ খেয়ে গেছেন। বেদ মেহতা বলেছেন—

> "I fear Calcutta. I reject Calcutta. But how can I prevent Calcutta from obsessing me?"

শুধু বেদ মেহতা কেন খাস কলকাতার [illegible] মনেও এই একই প্রশ্ন জেগেছে। ভয় করি, বাতিল করি, তবু কলকাতার ঘোর কাটিয়ে উঠতে পারি না। কলকাতার লোকের কাছে কলকাতার মোহ অসীম। রবীন্দ্রনাথের কথায় 'কলকাতা রয়ে গেছে কলকাতাতেই!'—তাই বোধ হয় কলকাতা ভয়ংকরী এবং সুন্দরী। সি-এম-পি-ও-র কর্তাদের সঙ্গেও তিনি দীর্ঘ আলোচনা করেছেন। ভিকটোরিয়া মেমোরিয়াল এবং অকটারলোনী মনুমেন্টের পর আছে মাদার টেরেসার আশ্রম এবং সেখানকার আশ্রিতের কথাও আছে। তারপর মনে পড়েছে রুশ লেখক লিওনিদ আঁদ্রিয়েভের 'লাজারাসে'র কাহিনী। তিনি আঁদ্রিয়েভের এই লাজারাসের মুখোমুখি এসে পড়েছেন এই কলকাতায়।

লাজারাসের ইঙ্গিতটা যথাস্থানে পৌঁছাবে কি? এর আগের যাত্রায় বেদ মেহতা এবং তাঁর কবিবন্ধু ডোম মোরায়েস যে ছবি এঁকেছিলেন এবারকার ছবিটা তার চেয়েও কিঞ্চিৎ সহৃদয়।

আগেই বলা হয়েছে মিঃ বেদ মেহতা 'নিউ ইয়র্কার' সাপ্তাহিক পত্রের নিয়মিত লেখক এবং তাঁর ভারতচিত্র ধারাবাহিক ভাবে সেই পত্রিকায় প্রথম প্রকাশিত হয়েছে। সাময়িকপত্রের দাবী মেটানোর জন্য রচিত এই আলেখ্য রচনায় মিঃ বেদ মেহতা ধারাবাহিকত্ব রক্ষা করতে পারেননি। কুম্ভমেলা, কাশ্মীর-চীন যুদ্ধ সবই প্রায় পাশাপাশি ঘেঁষাঘেঁষি পরিবেশিত।

১৯৬২-র চীন-ভারত যুদ্ধ সম্পর্কিত পরিস্থিতির নামকরণ করেছেন—
'Chini-Hindi Bye-Bye".

চীনি-হিন্দি ভাই-ভাইকে ব্যঙ্গ করে এই শিরোনাম রচিত হয়েছে একথা বলাবাহুল্য তবে ভাই-ভাই যেমন বাই-বাই হয়েছে তেমনই আবার যে কোনো মুহূর্তে ভাই-ভাই হতেও পারে, কারণ চীনদেশ এশিয়ার অন্তর্গত। এশিয়ায় মানুষের বিভেদ-বিসংবাদ ভুলে মিলেমিশে যাওয়ার দৃষ্টান্ত বিরল নয়।

চীন-ভারত যুদ্ধ বিষয়ে মিঃ বেদ মেহতা যে তথ্যরাজীর স্তূপ সংগ্রহ করেছেন তা মুখ্যত তৃতীয় ব্যক্তি মারফত সংগৃহীত, সম্ভবত সমসাময়িক সংবাদপত্রাদির সাহায্যও তিনি গ্রহণ করে থাকবেন। মিঃ বেদ মেহতা বিভিন্ন ব্যক্তি এবং সূত্রে প্রাপ্ত এই সব তথ্যাদি যথাযথ পরিবেশন করেছেন এবং তাঁর নিজের মন্তব্যগুলি সর্বদা সুপ্রযুক্ত না হলেও তার মধ্যে একটি পরিশীলিত মনের পরিচয় পাওয়া যায়। তিনি এই ব্যাপারে চীনা বক্তব্যও যেমন গ্রহণ করেছেন তেমনই আবার ভারতীয় কর্তৃপক্ষের কথাও মেনে নিয়েছেন। চীনারা বলেছেন যে আমরা কোনো যুদ্ধ করিনি, অন্তত যুদ্ধ করতে চাইনি, আর ভারতের রাজপুরুষরা বলেছেন এটা সুস্পষ্ট আক্রমণ। মিঃ বেদ মেহতা ভারতীয় ভাষ্য মেনে নিয়েছেন। এই চীনা-ভারত দ্বন্দ্বের কালে যে বিপর্যয় ঘটে গেছে মিঃ বেদ মেহতা তার উল্লেখ করে তার জন্য যাঁরা দায়ী তাঁদের কথাও বলেছেন।

রিপোর্টধর্মী এই আলেখ্য কিন্তু পাঠকের আগ্রহকে তৃপ্ত করে। মিঃ বেদ মেহতার রচনাভঙ্গীর মধ্যে একটা স্নিগ্ধতা আছে, মনে হয়, এই স্নিগ্ধতার জন্যই তাঁর বক্রোক্তিও তেমন কটু মনে হয় না। তথ্য-নির্ভর বিভিন্ন ধরণের মাল-মশলার সাহায্যেই তিনি তাঁর বক্তব্য বলার চেষ্টা করেছেন। কোনো কোনো ক্ষেত্রে এই সব তথ্য ভার হয়ে উঠেছে পরিমাণের বাহুল্যে। এর চেয়ে অল্প কথাতেও এসব বলা হয়ত যেত, কিন্তু তিনি যাদের জন্য লিখেছেন সেই সব পাঠকদের নাড়ীজ্ঞান নিশ্চয়ই তাঁর জানা আছে।

নেফা থেকে তিব্বত পর্যন্ত বিস্তীর্ণ অঞ্চলের সম্পর্কে বলতে গিয়ে মিঃ বেদ মেহতা যে সব মাল-মশলা সংগ্রহ করেছেন তা যে শুধু বিরাট তা নয়, ভারতীয়দের পক্ষে এসব তথ্য সংগ্রহ করা সহজ নয়। নেফা, নাগাল্যাণ্ড, ভূটান, সিকিম, লাদক এসব অঞ্চল সম্পর্কিত তথ্যাবলী দীর্ঘকাল ধরে গোপন করে রাখার চেষ্টা হয়েছে। ইংরাজ আমলেও এই হাল ছিল, দেশ স্বাধীন হওয়ার পর নিরাপত্তার প্রয়োজনে কড়াকড়ি বেড়েছে। মিঃ বেদ মেহতা একটি মূল্যবান ইঙ্গিত করেছেন ভারতের এই গুরুত্বপূর্ণ পূর্বাঞ্চল প্রসঙ্গে। ভারতের পররাষ্ট্র দপ্তরের কর্মীদের ঘাড়ে এখনও বৃটিশের ভূত চেপে বসে আছে। আগে চীন দেশ দুর্বল ছিল তাই তাঁরা এসব দেশ নিয়ে তেমন মাথা ঘামায়নি। ব্রিটিশের পরাক্রমও কম ছিল না তাই এই দৃষ্টিভংগী গ্রহণ করা হয়ত তাঁদের পক্ষে সহজ ছিল। কিন্তু স্বাধীন ভারতের রাজপুরুষরাও সেই মনোভংগী আঁকড়ে বসে আছেন এবং সেখানেই তাঁদের দুর্বলতা। চীনদেশ যে ইতিমধ্যে এক প্রবল শক্তিসম্পন্ন পরিপূর্ণ রাষ্ট্রে পরিণত হয়েছে এবং ভারতবর্ষের গদীতে যে ব্রিটিশ রাজ-পুরুষরা নেই একথা দিল্লীর দফতরের কর্তাব্যক্তিরা এখনও ঠিক বুঝতে পারেন নি।

বেদ মেহতার 'ভারতচিত্র' এই মন্তব্যের জন্য নিখুঁত হয়ে উঠেছে একথা বলা যায়।

—অভয়ংকর

PORTRAIT OF INDIA : By: VED MEHTA. Published by WIDENFIELD & NICHOLSON : LONDON Price : 70 Shillings only :

জর্জ সেফেরিস পরলোকে

নোবেল পুরস্কৃত গ্রীক-কবি জর্জ সেফেরিস গত ২০ সেপ্টেম্বর মারা গেছেন, দুরারোগ্য ব্যাধিতে ভুগে, বাহাত্তর বছরে পা দিয়ে। ১৯০০ সালে তাঁর জন্ম, স্মির্ণায়। প্রকৃত নাম জর্গস সেফেরিয়াডিস। আইন শাস্ত্র নিয়ে পড়াশোনা করেছেন এথেন্সে ও প্যারিসে। ছাব্বিশ বছর থেকেই প্রবাসী। কূটনৈতিক উপদেষ্টা হিসেবে কখনো থেকেছেন লণ্ডনে, কখনো তিরানায়, কখনো ফ্রান্সে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় ছিলেন মধ্যপ্রাচ্যে।

১৯৩৫ সালে বেরোয় তাঁর প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'মিথিস্তেরিমা'। ঠিক সেই বছরই বেরোয় গ্রীক-কাব্যে আধুনিকতার জনক নামে অভিহিত 'কাবাফি'র পূর্ণ কাব্য সংগ্রহ। অনেকে মনে করেন, আধুনিক গ্রীক-কাব্যের ইতিহাসে 'কাবাফি'র পরেই তাঁর স্থান। 'নিয়া গ্রামাতা' বা নতুন সাহিত্য নামে একটি সাহিত্যপত্রের তিনিই ছিলেন প্রধান উদ্যোক্তা। এবং এককালে প্রসিদ্ধি লাভ করেছিলেন গ্রীক-ভাষায় এলিয়টের অনুবাদক হিসেবে।

১৯৫০ সালে বেরোয় তাঁর ১৯২৪ থেকে ৪৬ সালের মধ্যে লেখা কবিতাবলীর একটি নির্বাচিত সংকলন : 'পোঈমাতা।' অবশ্য এর আগেই বেরোয় তাঁর লেখা দিনালের দুখণ্ড। প্রথম খণ্ড ১৯৪০, দ্বিতীয় খণ্ড ১৯৪৪ সালে। এবং ১৯৪৭ সালে বেরোয় তাঁর পরবর্তী গ্রন্থ 'কিচলি'। এই গ্রন্থে সেফেরিসকে মনে হয়, ক্লান্ত, বিষণ্ণ এবং গৃহকাতর। যেন প্রবাসের পালা শেষ করে ঘরে ফেরার জন্যই ব্যাকুল হয়ে পড়েছিলেন তিনি।

আমরা তাঁর প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'মিথি-স্তেরিমা'র প্রথম কবিতাটির অনুবাদ প্রকাশ করলাম, প্রয়াণোত্তর শোকে আক্রান্ত হয়ে।

পৌরাণিকী : এক

সেই দূতের অপেক্ষায় ছিলাম
তিন বছর।
কাছ থেকে লক্ষ্য করেছি,
উপকূলের ভূমি, নক্ষত্র এবং ঝাউবন।

আমি ছিলাম
আদি-বীজের খোঁজে নিবদ্ধ,
লাঙলের ফলায়, আর জাহাজের
গলুইয়ে
একাত্ম হয়ে,
যার মধ্যে আবার সূত্রপাত হ'ল
পুরোনো পালার।

অবশেষে, নিজের ঘরে ফিরেছি
ভগ্ন হৃদয়ে,
নুন আর মরচের আস্বাদে
সারা শরীর অবশ এবং বিধ্বস্ত।

ঘুম ভাঙতেই,
আবার চলা শুরু করলাম উত্তরে
অচেনা পথিক,
এমন এক কুয়াশায় আচ্ছন্ন হয়ে,
যে-কুয়াশা শ্বেতহংসদের
অকলঙ্ক ডানায়
প্রসারিত।
নিয়ত গ্রীষ্মে, মৃত্যুর মতো অবশ
কোনো এক দিনের যন্ত্রণায়
যেন হারিয়ে গিয়েছি।

দ্যাখো,
ফিরিয়ে এনেছি
কেবল এক দীন শিল্পের
ক্ষোদিত উপহার।

—শুভংকর পাঠক

নতুন বই

জলবিন্দু (গল্প সংকলন)—**বীরেন্দ্র দত্ত**। দেবশ্রী সাহিত্য সমিধ। ৫৭সি, কলেজ স্ট্রীট। কলকাতা—১২। মূল্য—২-৭৫ পয়সা।

বাংলা ছোটগল্প তার পরীক্ষা-নিরীক্ষায় ইতিহাস পেরিয়ে প্রকাশ রীতির ও বক্তব্যের ঋজু ভূমিতে দণ্ডায়মান। আজকের এই পূর্ণায়ত পরিণতির পেছনে বহু লেখকের অতন্দ্র নিষ্ঠা ও পরিশ্রম রয়েছে। বীরেন্দ্র দত্তও তাঁদের মধ্যে অন্যতম, যিনি সাম্প্রতিক বাংলা ছোটগল্পের ইতিহাসে আপন বক্তব্য ও রূপরীতি প্রতিষ্ঠায় সক্ষম। সম্প্রতি প্রকাশিত লেখকের 'জলবিন্দু' উপরিউক্ত মন্তব্যের ইঙ্গিত বহন করে। আলোচ্য গল্পসংকলনে মোট সাতটি গল্প সংকলিত হয়েছে। গল্পগুলির পটভূমিকা সাম্প্রতিক বাংলাদেশ; রচনাকাল আলোচ্য দশক। স্বাভাবিকভাবেই লেখক সামাজিক সমস্যা, অক্ষয় ও মনোবিকলন ইত্যাদি এড়িয়ে যেতে পারেন নি। প্রত্যেকটি গল্পেই লেখকের পরিমিতিবোধ, সংলাপ, পরিবেশ রচনা, চিত্রকল্প প্রভৃতি কৃতিত্বের দাবী রাখে। পৃথকভাবে প্রত্যেকটি গল্পের বক্তব্য ও কায়াগঠন আলোচনা করা সম্ভব নয়; যৌথভাবে এদের আলোচনায় দেখা যাবে যে, গল্পকার একটি/দুইটি বা তিনটি চরিত্রের মাধ্যমে মূল বক্তব্যকে প্রকাশ করেছেন। 'অসুখ' গল্পের বক্তব্য অভিনব; লেখক সুকৌশলে ভূপতির মনের বিকৃত বাসনাকে পোকার মাধ্যমে ব্যক্ত করেছেন। 'আলোর উৎস' প্রত্যয় দীক্ষিত গল্প। আধুনিক সমাজের নাস্তিক্যবোধে অভিশপ্ত নিরুপম শেষ পর্যন্ত তথাকথিত সোসাইটি গার্ল—মধুমিতা, কল্লরী, তনুশ্রী ইত্যাদির হাত থেকে মুক্তি পেয়ে মধ্যবিত্ত পরিবারের শিক্ষিকা অসিতার কাছে পরম নির্ভরতার আশ্রয় খুঁজে পেলো। জীবনের অর্থ খুঁজে পাওয়ার জন্য গল্পকার এই আস্তিক্যবোধের মন্ত্রে নায়ককে দীক্ষিত করলেন—আর এইখানেই গল্পকারের সদর্থক জীবনবোধের ইঙ্গিত। 'জলবিন্দু' সাধারণ গল্প; তবে গল্পকার কেন যে আলোচ্য গল্পের নামে বইয়ের নামকরণ করলেন তা বোঝা গেল না। 'কান্না' গল্পে, বাঙালী পরিবারের চিরন্তন অভিশাপ মেয়ে দেখা অথচ পছন্দ না-হওয়ার কথা বলা হয়েছে আর সেই সঙ্গে লেখক সাম্প্রতিক সমাজ-জীবনের ছেলেমেয়েদের প্রাক্-বিবাহ জীবনের ইঙ্গিত দিয়েছেন। 'ঘর' গল্পে মান্নীমনের এক শাশ্বত আকাঙ্ক্ষা ব্যক্ত—যেখানে প্রবাসী স্বামী মলয়ের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হবার জন্য রমা ইচ্ছা পোষণ করে। 'অন্য মনে' নিখিলেশ সোমার জন্য বেদনা পোষণ করে; বিয়ের রাত্রে আলোকসজ্জায় সজ্জিত বাড়ী তার কাছে বেদনার উৎস হয়ে দেখা দিল। গল্পের শেষে নিখিলেশ কিন্তু সোমার চোখের জলে তার জীবনের ভাষা খুঁজে পেলো। সোমার অনুচ্চারিত সংলাপ তাকে আশ্রয় দিলো। 'একটি নায়িকার জন্য' এক অসাধারণ মিনি গল্প। সমস্যা প্রধানত আধুনিক। আনন্দের ভলবাসায় প্রবঞ্চিতা লেখা মাতৃত্বের অবলম্বনকে আশ্রয় করে বাঁচতে চেয়েছে।

এ গল্পসংকলনের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হল সদর্থক জীবনদর্শন। চিত্রকল্প সৃষ্টিতেও গল্পকারের কৃতিত্ব অবিসংবাদিত। 'অমাবস্যার নক্ষত্রের আলো', 'নীল নির্জন সময়', 'পরিচ্ছন্ন আকাশ দু-একটা নক্ষত্রের আলোর কাঁপতে শুরু করেছিল'—ইত্যাদি যেন আধুনিক কবিতার কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। গল্পসংকলনটির প্রচ্ছদ ও মুদ্রণ প্রশংসনীয়।

স্বরবর্ণ ব্যঞ্জনবর্ণ। রণেন মোদক। সুজাতা, ৬০-এ, বেচু চ্যাটার্জি স্ট্রীট, কলকাতা ৯। দাম পাঁচ টাকা।

শ্রীরণেন মোদক আলোচ্য গ্রন্থের আগে একখানি উপন্যাস, একটি গল্প-সংকলন ও একখানি নাটিকা রচনা করেছেন। 'স্বরবর্ণ ব্যঞ্জনবর্ণ' সম্ভবত লেখকের চতুর্থ প্রকাশিত গ্রন্থ এবং দ্বিতীয় উপন্যাস। কাহিনীর পটভূমি কলকাতা ও তার উপকণ্ঠ। কাহিনীর নায়ক অজয়, নায়িকা রিক্তা। কিন্তু লেখক শ্রীরণেন মোদক কাহিনীর নায়ককে করেছেন লেখক—যে লেখক তার কাহিনীর নায়িকা চরিত্রকে করেছে রিক্তার জীবনের বেদনাদায়ক কাহিনী এবং তা ব্যক্ত করেছে তাঁর সৃষ্ট স্বপ্না চরিত্রের মাধ্যমে। একদিকে বাস্তব জগতের সত্য রিক্তার মত নারী চরিত্র, অন্যদিকে স্বপ্নার মত তার কাল্পনিক চরিত্র,—এই বাস্তব ও কল্পনাকে পাশাপাশি রেখে লেখক কাহিনী শেষ করেছেন। উপন্যাসের শেষে কাহিনীর নায়কের লেখা অসমাপ্ত উপন্যাসের পাণ্ডুলিপির ছড়ানো পৃষ্ঠাগুলিই পড়ে থাকে। নায়ক বাস্তব রিক্তাকে কাছে পায়। উপেক্ষা ও বঞ্চনার ইতিহাসের শেষে দুটি তরুণ হৃদয় পাশাপাশি দাঁড়ায়। এদেরই সূত্র ধরে স্বপ্নার শ্বশুর, বন্দনা, মধুদা, বিভূতি, সুবোধদা, বিজয়, স্বপ্নার মা, মাসি, সুবিনয়, নিবারণবাবু ইত্যাদি বিবিধ বিচিত্র ও জটিল চরিত্রের ভিড় জমে ওঠে। লেখকের কাহিনী নির্মাণক্ষমতা ও লেখক-চরিত্রের অভিজ্ঞতা প্রশংসনীয়। তবে কাহিনী বর্ণনায় একটি বাক্যে একটি প্যারাগ্রাফ রচনার চেষ্টা এবং অহেতুক একই চিন্তাকে এক-একটি বাক্যের প্যারাগ্রাফে সাজানোর ব্যাপারটি অত্যন্ত ক্লান্তিকর লাগে পাঠকের কাছে। ব্যবসার খাতিরে বইটির কলেবর বড় করার জন্যই কি এই প্রয়াস?

গৌড়মল্লার। শ্রীশাশ্বত। সুপ্রকাশন, ৩০/১, কলেজ রো, কলকাতা ৯। দাম চার টাকা মাত্র।

'গৌড়মল্লার' উপন্যাসটি একটি ইতিহাসাশ্রিত রোমান্স। ইতিহাসকে পটভূমি করে উপন্যাস রচনার প্রয়াস বিশ শতকের প্রথম দিকে বন্ধ ছিল। বিগত দুই দশকে বেশ কিছু ইতিহাসাশ্রিত রোমান্স লেখা হয়েছে। আলোচ্য গ্রন্থটি সেই ধারায় একটি উল্লেখযোগ্য সংযোজন। মধ্যযুগের সুলতানী আমলের বাংলাদেশ-এর পটভূমি। এই পটভূমিতে রাজা গণেশের কালের গৌড়-পাণ্ডুয়ার কথায় সামান্য ঐতিহাসিক অংশ ও অধিকতর কল্পনারস মিশ্রিত করে লেখক কাহিনী রচনা করেছেন। কাহিনী সুখপাঠ্য।

এক দশক। শঙ্কর রুদ্র। স্ট্যাণ্ডার্ড বুক কোম্পানী, ১০১১, জি টি রোড, হাওড়া ময়দান, হাওড়া। দাম পাঁচ টাকা।

'এক দশক' গ্রন্থটি লেখক শঙ্কর রুদ্রের দিনলিপি। লেখকের ১৯৬১ থেকে ১৯৭০ সালের মধ্যে বেশ কিছু উল্লেখ্য তারিখে বিশেষ মুহূর্তে যে সমস্ত মানসিক প্রতিক্রিয়া—তা বহির্ঘটনা থেকে জাত বা অন্তর্দ্বন্দ্বময় অস্তিত্ব থেকে ব্যক্ত—দেখা দিয়েছে, তারই কালানুক্রমিক প্রকাশ এ-গ্রন্থে সংকলিত। ডায়েরীর পাতায় যুক্তি নেই, আছে আবেগ। যেখানে সামান্য যুক্তি আছে, বা থাকতে পারত, সেখানে লেখক কবিত্বময় প্রকাশভঙ্গিতে তা ঢেকে দিয়েছেন। পাপ, মৃত্যু, ধনী হওয়া, প্রেম, জীবন, সাম্প্রতিক খুন-জখম, পরোপকার ইত্যাদি বিষয় তাঁর ব্যক্তিগত মনে কি ধরনের চিন্তার উদ্রেক করে, 'এক দশক' তারই দিনলিপি। লেখকের গদ্যভঙ্গি সহজ, সরস, সুখপাঠ্য।

শারদ সংকলন

লা পয়েজি—সম্পাদক : বার্ণিক রায়। ৫, গগন সরকার রোড, কলকাতা-১০। দেড় টাকা।

বাংলা-সাহিত্যে পরীক্ষা-নিরীক্ষামূলক সাহিত্যের একমাত্র দ্বিভাষিক ত্রৈমাসিক পত্রিকাটির পঞ্চম বর্ষের চতুর্থ সংখ্যাটি শারদ-সংকলন হিসেবে প্রকাশিত হয়েছে। কবিতা, কবিতা-বিষয়ক ও ললিতকলাশিল্প সম্পর্কীয় ভাবনাকে জনমানসে পৌঁছে দেওয়াই এ পত্রিকার আদর্শ ও লক্ষ্য। রোমান হরফে বাংলা কবিতার প্রকাশ, ভিন দেশী কবিতায় বাংলায় রূপান্তরকরণ এবং বাংলা কবিতার ইংরেজি অনুবাদ-এর এই বৈশিষ্ট্যই লা-পয়েজিকে বিদগ্ধমহলে সমাদরের আসন দিয়েছে। শারদ সংখ্যায় এই বৈশিষ্ট্যের পূর্ণ প্রকাশ ঘটেছে। কবিতা লিখেছেন : হরপ্রসাদ মিত্র, বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, মণীন্দ্র রায়, গৌরাঙ্গ ভৌমিক, সুশীল রায়, কিরণশংকর সেনগুপ্ত, গোপাল ভৌমিক, রাম বসু, শঙ্খ ঘোষ, শক্তি চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ। ভিনদেশী কবিতা অনুবাদ করেছেন : বার্ণিক রায় ও গীতা দাশগুপ্ত, দক্ষিণারঞ্জন বসু, সন্দীপন চট্টোপাধ্যায়। রবীন্দ্রনাথ, হরপ্রসাদ মিত্র, বীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী, সুশীল রায়, মণীন্দ্র রায়, রাম বসু প্রমুখ কবিদের কবিতা রোমান হরফে রূপান্তরকরণ ও ইংরেজিতে অনুবাদ করেছেন যথাক্রমে অতীশরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়, বিবেকানন্দ রায়, বিশ্বনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বার্ণিক রায় প্রমুখরা। ননীগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের রবীন্দ্রনাথের ঋতুনাট্য ও নৃত্যনাট্য প্রসঙ্গে তাত্ত্বিক আলোচনা ও ডোরা বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'একটি চিত্রবিচার : পিকাসো অঙ্কিত একটি ক্রন্দনরতা রমণী'র নিবন্ধটি কলা-রসিকদের নতুন চিন্তার খোরাক দেবে।

সাতপুরা—সম্পাদক : শ্যামল মুখোপাধ্যায়। ৩২১, পূর্ব যামাপুর, জব্বলপুর, মধ্যপ্রদেশ। এক টাকা।

'সাতপুরা' ত্রৈমাসিক সাহিত্য পত্রিকাটি প্রবাসী বাঙালীদের সাহিত্য-প্রীতির রচনা-রীতির উজ্জ্বল নিদর্শন। অনেকগুলি গল্প আছে, কবিতা এবং প্রবন্ধও। বিশেষ ভাবে উল্লেখ্য হল : বিষ্ণু দে, দেবল দেববর্মা, শোভন সোম, হেনা হালদার, নারায়ণ সেনগুপ্ত, সুধেন্দু চন্দ প্রমুখ।

সীমান্ত—সম্পাদক : তরুণ সান্যাল, গণেশ বসু। ৩১।১, হরতুকীবাগান লেন, কলকাতা : ৬। এক টাকা।

পরিচ্ছন্ন শারদ সংকলন। ভাবের ও ভাবনার দিক দিয়ে প্রতিটি রচনাই সুলিখিত—আরো পাঁচটা গতানুগতিক পাঁচমিশেলী পত্রিকা 'সীমান্ত' নয়—তারই দীপ্ত দীপ্তি সাময়িকীর সর্বাঙ্গে। তরুণ সান্যালের 'বাঙালির মাতৃভূমি আবিষ্কার' ও সংকর্ষণ রায়ের নিবন্ধটি স্বাতন্ত্র্যধর্মিতার জন্যে পাঠক দৃষ্টি অবশ্যই আকর্ষণ করবে। সমরেশ দাশগুপ্ত ও দিলীপ সেনগুপ্তর গল্প দুটি নতুন স্বাদের। কবিতায় বিশিষ্ট হলেন রাম বসু, গোলাম কুদ্দুস, কৃষ্ণ ধর, আবদুল হাফিজ, সত্য গুহ, তুলসী মুখোপাধ্যায় প্রমুখ। প্রায় সমস্ত কবিতার পটভূমি বাংলাদেশ।

আর্য—সম্পাদক : প্রশান্তকুমার গঙ্গোপাধ্যায়। ১৭৮, বি বি ঘোষ রোড, বর্ধমান। তিন টাকা।

গল্প, প্রবন্ধ, উপন্যাস, কবিতা ইত্যাদি নিয়েই আর্য-এর শারদ সংখ্যা। লেখক-তালিকায় নামী লেখকদের দর্শন না পাওয়া গেলেও রচনাগুলি সুনির্বাচিত। একাধিক উপন্যাস আছে কিন্তু বিবিধ বিষয়ে অভিজ্ঞদের দিয়ে রচিত প্রবন্ধগুলিও উল্লেখ করার মতো। বলাই দেবশর্মার প্রবন্ধ-নিবন্ধনিচয় ও ভূপেন্দ্রনাথ দত্তর 'শ্রীকৃষ্ণ' শারদ সংকলনটিকে স্বতন্ত্র মর্যাদা এনে দিয়েছে।

একালীন—সম্পাদিকা : কুমকুম দে। ৭৮।১ মহাত্মা গান্ধী রোড, কলকাতা—৯। দু' টাকা।

সপ্তম বর্ষের শারদ সংখ্যা।

গল্প, প্রবন্ধ, একাঙ্কিকা, কবিতা, সাক্ষাৎকার প্রভৃতি বিষয়ে সুলিখিত রচনাগুলি একালীনকে বিশিষ্ট করে তুলেছে। উল্লেখ্য হলেন : শঙ্খ ঘোষ, শুভংকর ঘোষ, মণীন্দ্র গুপ্ত, অনীতা গুপ্ত, সুধা বসু, ভবানী মুখোপাধ্যায়, মনীশ ঘটক, অমিতাভ দাশগুপ্ত, রাজলক্ষ্মী দেবী, কবিতা সিংহ, কুমকুম দে প্রমুখ। বিবিধ বিষয়ের উপর লেখা চিত্তাকর্ষী নানা সাহিত্য-ভাবনায় প্রোজ্জ্বল প্রবন্ধগুলি [বন্ধুর ছন্দের দুর্গে, বিষ্ণু দে-র কাব্য-পরিচয় অলীক অলিন্দ, প্রতিধ্বনির গুহা, সুন্দরের সাধনায় অবনীন্দ্রনাথ, অবনীন্দ্র শিল্প-জিজ্ঞাসা ও বায়রণ ও আনাবেলা] সাহিত্য-পাঠকদের খুশী করবে।

[illegible]— সম্পাদক : উৎপলকুমার দত্ত। ৩, গোয়ালপাড়া লেন, বহরমপুর, মুর্শিদাবাদ। এক টাকা।

তরুণ লেখক-লেখিকাদের ত্রৈমাসিক সাহিত্য পত্রিকার অষ্টম বার্ষিক শারদ-সংকলনে প্রবীণের চেয়ে নবীনদের প্রাধান্যই বেশি। গল্প-কবিতা, প্রবন্ধের মধ্যে কবিতাই বেশি। বিশেষভাবে উল্লেখ্য হলেন : সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ, প্রলয় সেন, মানস রায়-চৌধুরী, শঙ্কর চট্টোপাধ্যায়, মনীশ ঘটক, কুমকুম দে, তাপস ঘোষ প্রমুখ। গল্পগুলি নতুন স্বাদের।

ঝংকার—সম্পাদক নুরুল ইসলাম। কনখুলি, পোঃ গার্ডেনরীচ, ২৪-পরগণা। দাম : সাড়ে তিন টাকা।

প্রেমেন্দ্র মিত্রের লেখা 'আমার চোখে তারাশংকর' ও নন্দগোপাল সেনগুপ্তের 'তারাশংকর নেই' শীর্ষক রচনা দুটি মূল্যবান। উল্লেখযোগ্য লেখকদের মধ্যে আছেন দক্ষিণারঞ্জন বসু, শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়, স্বরাজ বন্দ্যোপাধ্যায়, নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় ও নরেন্দ্রনাথ মিত্র। প্রচ্ছদে চিত্রতারকার ছবিসহ অন্যান্য রম্যরচনাগুলি সাধারণ পাঠককে আকৃষ্ট করবে।

মহুয়া—সম্পাদক : সৌমেন বন্দ্যোপাধ্যায়। ২৩বি।৭, গোয়ালপাড়া রোড, বেহালা, কলকাতা-৬০। এক টাকা।

তরুণদের দ্বিমাসিক পত্রিকা। গল্প, কবিতা, প্রবন্ধ ইত্যাদি নানান লেখায় ভরা। বিশেষভাবে উল্লেখ্য হলেন : বিমল মিত্র, প্রফুল্ল রায়, নচিকেতা ভরদ্বাজ, সরোজ সেনগুপ্ত প্রমুখ।

চলন্ত—সম্পাদক : দিগ্বিজয় চৌধুরী। ১০৮বি, রায়বাহাদুর রোড, কলকাতা-৩৪। দাম এক টাকা।

আর যারই অভাব থাক, বাংলা-সাহিত্যে এবং বাঙালী জীবনে বৈচিত্র্যের অভাব নেই। তার প্রমাণ হাতের কাছে 'চলন্ত'—বিশ্বের প্রথম যাত্রী সাধারণের নিজস্ব মাসিক পত্রিকাটি। অভিনব এবং কৌতূহলোদ্দীপকও। বিশেষ সংখ্যার বিশিষ্ট লেখক হলেন : দক্ষিণারঞ্জন বসু, শক্তিপদ রাজগুরু, বিমল মিত্র প্রমুখ।

ভাগীরথী—সম্পাদক : প্রভাত মুখোপাধ্যায়। খাগড়া, গোয়ালপাড়া, মুর্শিদাবাদ।

ত্রৈমাসিক সাহিত্য-পত্রিকার শারদীয় সাহিত্য সম্ভার বহন করে এনেছেন নবীন ও প্রবীণ কথাকাররা। নানান ধরনের লেখা পাঠকমনকে খুশী করবে। বিশেষভাবে উল্লেখ্য হলেন : রেজাউল করিম, সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ, বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, শক্তি চট্টোপাধ্যায়, নির্মলেন্দু গুণ, নচিকেতা ভরদ্বাজ এবং আরো অনেকে। দিগেন্দ্রচন্দ্র মণ্ডল-এর প্রবন্ধটিতে (আত্মা ও পরমাত্মার) চিন্তার খোরাক আছে।

অধুনা—সম্পাদনা : বেতাল গোকী। কামাখ্যা কলোনী, গৌহাটি—১২, আসাম। পঞ্চাশ পয়সা।

প্রবাসী বাঙালীদের আন্তরিক প্রচেষ্টা হিসেবে প্রশংসনীয় উদ্যম। লেখাগুলি সুনির্বাচিত। প্রচ্ছদ ও মুদ্রণ সুখ্যাতি করার মতো।

মানব মন (বিশেষ অক্টোবর পাক্ষিক সংখ্যা)—সম্পাদক : ধীরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়। ১৩২।১এ, বিধান সরণি, কলকাতা-৩। তিন টাকা।

আলোচ্য ত্রৈমাসিক পত্রিকাটি বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গির জন্যে সাহিত্যপাঠক এবং সমাজকল্যাণকামীদের সানুরাগ সম্বর্ধনা ইতিমধ্যেই লাভ করেছে। বিজ্ঞানকে সাহিত্যের হাতিয়ার করে পত্রিকাটি প্রশংসনীয়ভাবে যুগপৎ সাহিত্য ও বিজ্ঞানের সেবা করে আসছে নিরলসভাবে। নিছক সাহিত্যসৃষ্টিই নয়—সামাজিক সমস্যাকে বিজ্ঞানের আলোয় তীক্ষ্ণভাবে বিচার-বিশ্লেষণ করে সমাধানের পথনির্দেশ করার বিজ্ঞানসম্মতভাবে চেষ্টাও চলছে। এই বিশেষ সংখ্যায় উল্লেখ্য রচনা হল মনোবিদের : 'আক্রামকের মন ও সমাজ', সুরেন্দ্রকুমার পালের : বার্ধক্যজনিত মানসিকতা ও তার প্রতিরোধ', জ্যোতির্ময় চট্টোপাধ্যায়ের 'কথায় কথায়', অরুণ চক্রবর্তীর 'মস্তিষ্কে উচ্চতর স্নায়ু প্রক্রিয়ার ক্রমবিকাশের বৈশিষ্ট্য'—অনুবাদ, আশুতোষ ভট্টাচার্যের : 'লোকায়ত সাহিত্য', বি মুখার্জির : 'মানব-মস্তিষ্ক ও মন', গোপাল হালদারের : 'অপরাধকৃতের মন', বেলা দত্তগুপ্তের : সমাজবিজ্ঞান ও সোভিয়েট রাশিয়া', পরিতোষ গুপ্তের : 'সম্মোহন শক্তির প্রয়োগ' এবং ধীরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের অসম্পূর্ণ বাস্তবধর্মী নাটক : 'নাটকীয় সংলাপ'। আজকের রুগ্ন সমাজকে অন্ধকার থেকে চেতনার আলোয় ফিরিয়ে আনার নাটকীয় কাহিনী এ-নাটকের পটভূমি। এই নাটকটির জন্যে নাট্যকার এ-দেশের শুভানুধ্যায়ীদের অবশ্যই প্রশংসাধন্য হবেন।

সমকালীন— সম্পাদক : আনন্দগোপাল সেনগুপ্ত। ২৪, চৌরঙ্গী রোড, কলকাতা-১৩। পঞ্চাশ পয়সা।

'সমকালীন' প্রবন্ধের মাসিক পত্রিকাটি সাহিত্য-সংসারের 'জাত-কুলীন'। উনিশ বছর ধরে সে তার আভিজাত্য এবং বৈশিষ্ট্য মর্যাদার সঙ্গে রক্ষা করে চলেছে—ভাবতে অবাক লাগে। সমকালীন রচনাবৈচিত্র্যে বৈশিষ্ট্য এবং মুদ্রণ-পরিচ্ছন্নতায় সৎ সাহিত্যপাঠকের স্বতঃস্ফূর্ত পৃষ্ঠপোষকতা পেয়েছে এবং পাচ্ছে বলেই সস্তা এবং লঘু রচনার গোঁজামিল দিয়ে অস্তিত্ব রক্ষার লজ্জাকর প্রচেষ্টায় নিমজ্জিত হতে হয়নি। আজকের এই ভাঙচুর ও অবক্ষয়ের কালে এটাই সবচেয়ে আনন্দের ও গর্বের কথা। এই সর্বাঙ্গীণ কৃতিত্বের সিংহভাগ সম্পাদক আনন্দগোপাল সেনগুপ্তের।

আলোচ্য সংখ্যায় অল্পবিস্তর সব নিবন্ধগুলিই পাঠককে প্রভূত চিন্তার খোরাক যোগাবে। বিশেষ উল্লেখ্য রচনা হল : অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের টপ্পা-গানের ভূমিকা, গৌরাঙ্গগোপাল সেনগুপ্তের অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়, পূর্ণচন্দ্র দাসের মেদিনীপুর জেলার একটি লোকাচার, অতুলচন্দ্র ভৌমিকের নকসী কাঁথা, সলিল বিশ্বাসের লোকায়ত নদীয়া ও বসন্ত সরকারের ভারতীয় রাগসঙ্গীতে শ্রুতি-স্বর সম্বন্ধ।

গল্প-সম্ভার (বিচিত্র গল্প-সংকলন) — সম্পাদনা : শ্যামলরঞ্জন ভট্টাচার্য। পড়ুয়ামহল, ১৬, বিদ্যাসাগর স্ট্রীট কলকাতা-৯। দু' টাকা।

এতকাল ধরে চলছিল যে-প্রথা, একালে দেখি তারই উল্ট-পুরাণ ঘটছে। লেখক-লেখিকাদের পশ্চাদ্ধাবনে সম্পাদককুল ব্যস্ত বিব্রত বিপন্ন কিন্তু হঠাৎ দেখছি সম্পাদকই পশ্চাদ্ধাবন করছেন সাহিত্য-যশপ্রার্থীদের নতুন 'তারা'র আবিষ্কার-অন্বেষণে। গল্প প্রতিযোগিতায় আমন্ত্রিত রচনার পাহাড় থেকে কয়েকটি গল্পের সমাহারে 'গল্পসম্ভার'-এর প্রথম খণ্ডের প্রকাশ—'যেখানে দেখিবে ছাই/উড়াইয়া দেখো তাই/মিলিলে মিলিতে পারে অমূল্য রতন'। সম্পাদকের উদ্যম প্রশংসনীয়।

লেখা ও রেখা—সম্পাদক : ভাস্কর মুখোপাধ্যায়। অক্ষয় গ্রন্থাগার, শান্তিপুর, নদীয়া, দু টাকা।

'লেখা ও রেখা' ত্রৈমাসিক সাহিত্য পত্রিকাটি সুনির্বাচিত সাহিত্যগুণান্বিত রচনার আধেয় হিসেবে ইতিমধ্যে সাময়িক সাহিত্যে বিশিষ্টতা অর্জন করেছে। এই স্বীকৃতি শারদ সংখ্যায়ও সুপরিস্ফুট। নবীন ও প্রবীণ লেখকদের মধ্যে বিশিষ্টরা হলেন : কবিতায় : মনীশ ঘটক, গোপাল ভৌমিক, কিরণশঙ্কর সেনগুপ্ত, মণীন্দ্র রায়, রাম বসু, শুদ্ধসত্ত্ব বসু, তরুণ সান্যাল, গৌরাঙ্গ ভৌমিক, আশিস সান্যাল, তুলসী মুখোপাধ্যায়, অনুবাদ কবিতায় : বিষ্ণু দে ও বিশ্ব বন্দ্যোপাধ্যায়, গদ্য রচনায় নন্দগোপাল সেনগুপ্ত, মৃদুলকান্তি বসু, অমিতাভ চট্টোপাধ্যায়, ছোটগল্পে : শচীন বিশ্বাস, অশোককুমার সেনগুপ্ত, তপোবিজয় ঘোষ। সজল রায় ও মংপক কাওড-এর স্কেচ দুটি 'সতর্ক হও' ও 'প্রতীক' উল্লেখের দাবী রাখে।

মুকুর—সম্পাদক : জয়দেব রায়, অজয় মল্লিক। বাওয়ালী, রথতলা, ২৪-পরগণা। এক টাকা।

তরুণদের ষাণ্মাসিক সাহিত্য পত্রিকা 'মুকুর' গ্রাম-বাংলা থেকে প্রকাশিত হলেও সুখ্যাত লেখক এবং প্রতিশ্রুতিময় নবীনদের রচনার যে সমাবেশ ঘটিয়েছে তা প্রশংসা করার মতো। এই সংখ্যার বিশিষ্ট কথাকাররা হলেন : বিষ্ণু দে, বুদ্ধদেব বসু, কবিতা সিংহ, মণীন্দ্র রায়, শক্তি চট্টোপাধ্যায়, পবিত্র মুখোপাধ্যায়, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, প্রফুল্ল রায়, সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ, আবদুল জব্বার, সন্ধ্যা কর, তীর্থঙ্কর গুপ্ত প্রমুখ।

জাগরী—সম্পাদক : অপূর্বকুমার সাহা। ৭৪।৫এ বাগবাজার স্ট্রীট, কলকাতা—৩। এক টাকা।

ষোল বছরের আশ্বিন সংখ্যাটি শারদ সংকলন হিসেবে প্রকাশিত হয়েছে শ্রীঅরবিন্দ-এর দুর্গাদেবী-বন্দনা দিয়ে। গল্প, কবিতা, প্রবন্ধ ছাড়াও আছে বঙ্গবন্ধু মুজিব ও বাংলা দেশ প্রসঙ্গ এবং তারাশঙ্কর স্মৃতি-স্মরণও। এই সংখ্যায় বিশেষভাবে উল্লেখ্য হলেন : বিমল কর, গৌরকিশোর ঘোষ, ঋত্বিক ঘটক, দিব্যেন্দু পালিত, পশুপতি ভট্টাচার্য, মলয়শঙ্কর দাশগুপ্ত, চিরঞ্জীব, নবকুমার শীল প্রমুখ। আকারে সংক্ষিপ্ত হলেও রচনাগুলি সুলিখিত ও চিত্তাকর্ষী।

তীর-তির্যক—সম্পাদক : শেখ সদরউদ্দিন। ১৪বি সাহিত্য পরিষদ স্ট্রীট, কলকাতা—৬। দেড় টাকা।

গল্প, প্রবন্ধ, কবিতা, নাটক, উপন্যাস নিয়েই শারদ সংখ্যা। ছায়াচিত্র সম্পর্কে আলোচনাও আছে। বিশিষ্ট লেখকদের মধ্যে আছেন : বনফুল, জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী, ফণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, শান্তশীল দাস, নরেন্দ্রনাথ মিত্র, গোপাল ভৌমিক, রণজিৎকুমার সেন প্রমুখ। সত্যেন মিত্রের 'বিপন্ন বিস্ময়', শেখ সদরউদ্দিনের 'আমার সোনার বাংলা' নাটিকা এবং সৌম্যেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের বড় গল্পটি উল্লেখ্য হবার মতো। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের পটভূমিকায় আঁকা 'প্রয়োজন হলে দেব এক নদী'—বাণী চিহ্নিত সুগভীর অর্থবহ প্রচ্ছদটি সময়োপযোগী ও সুন্দর।

বিজয় তোরণ—সম্পাদক : সুধীরচন্দ্র দাঁ। বর্ধমান। দু টাকা পঁচিশ পয়সা।

বর্ধমান জেলার সাপ্তাহিক পত্রিকার শারদ সংখ্যায় উপন্যাস, ছোটগল্প, রম্য-রচনা, নাটিকা, কবিতা, বিজ্ঞান বিচিত্রা প্রভৃতি সুনির্বাচিত রচনায় সমৃদ্ধ। বিশিষ্ট লেখকদের মধ্যে আছেন : তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, বাণী রায়, শিবরাম চক্রবর্তী, বিষ্ণু দে প্রমুখ। 'বাংলাদেশ'-এর মুক্তি-সংগ্রামের পটভূমিকায় লেখা বেগম বুলবুল গোমেশের 'অশান্ত পদ্মা ও অন্তহীন কান্না' এবং দামোদরের এক মাঝির জীবন-কাহিনীকে কেন্দ্র করে রচিত সুধীরচন্দ্র দাঁর 'নৌকো'—উপন্যাস দুটি ভিন্ন ধরনের উপন্যাস বলে বিশেষভাবে উল্লেখ্য হবার মতো।

কান্দী-বান্ধব — সম্পাদক : সত্যনারায়ণ মুখোপাধ্যায়। কান্দী, মুর্শিদাবাদ। দেড় টাকা।

মুর্শিদাবাদ জেলার কান্দী মহকুমার একমাত্র সাপ্তাহিক পত্রিকার শারদ সংখ্যাটিতে নামী-অনামী বহু লেখক-লেখিকার রচনা প্রকাশিত হয়েছে। সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় ও সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজের ছোটগল্প, শান্তি হালদার, ডঃ পুলকেন্দু সিংহ, ডঃ হলধর দে, সোমনাথ চট্টোপাধ্যায়, ফজলুক হক, ডক্টর শিশিরকুমার সিংহ, ডঃ সত্যেন্দ্রনাথ ঘোষাল, সোমনাথ পান্ডে, দেবকুমার চক্রবর্তী, ডঃ পঞ্চানন মণ্ডলের প্রবন্ধ এবং ইন্দ্রজিৎ শান্ডিল্যের 'ধ্যানে কান্দি' উল্লেখ্য। অন্য রচনাগুলিও সুলিখিত।

খোলা কথা—সম্পাদক : সদানন্দ দাস। ঠাকুরপল্লী, বর্ধমান। ১·৫০ টাকা।

সাপ্তাহিক 'খোলা কথা'র নবম বর্ষের শারদ সংখ্যাটি নানান ধরনের রচনায় সমৃদ্ধ। গল্প, কবিতা, প্রবন্ধ, ভ্রমণকাহিনী ইত্যাদি। লেখক তালিকায় আছেন সাহিত্যের সুখ্যাতরা। কুমুদরঞ্জন মল্লিক, তারাশংকর বন্দ্যোপাধ্যায়, কুমারেশ ঘোষ, হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় ডঃ দিলীপ মালাকার প্রমুখ। ডঃ গোপেশচন্দ্র দত্তের 'শরৎচন্দ্রের গৃহদাহ' অসিত রায়ের 'ছবি লেখক অবন ঠাকুর' রচনাদুটিও উল্লেখ্য।

দেয়ালা—সম্পাদনা শুভেন্দু গঙ্গোপাধ্যায় : ১৯।৪ ঈশ্বর গাঙ্গুলী স্ট্রীট, কলিঃ-২৬। দেড় টাকা।

আকারে ছোট হলেও ছোটদের জন্যে ছোটদের সম্পাদিত ছোট্ট মাসিক পত্রিকা 'দেয়ালা'র শারদ সংকলনটি বাংলা-সাহিত্যের সেরা লেখক-লেখিকাদের সমাবেশ ঘটেছে। বিষয়-বৈচিত্র্যও এজন্যে কম ঘটেনি। নানান ধরনের রকমারী লেখায় এই শারদ সংকলনটি একেবারে ঠাসা। মজার মজার ছড়া আছে, আছে ছবি, গল্প, কাহিনী প্রবন্ধ, এমনকি অবনীন্দ্রনাথকৃত ধাঁধাও। সংকলনটি ছোটদের মন ভুলিয়ে দেবে। বড়দের মন দোলাবে। ছোটদের লেখাও এর মধ্যে কিছু কিছু আছে। সেরা লেখকদের সবাইয়ের নাম করা যাবে না, স্থানাভাব। বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য হলেন : সুভাষ মুখোপাধ্যায়, অবনীন্দ্রনাথ, তারাশংকর বাফী খাঁ, প্রেমেন্দ্র মিত্র, শিবরাম চক্রবর্তী, গজেন্দ্র মিত্র, অন্নদাশংকর রায়, নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, লীলা মজুমদার, সত্যজিৎ রায়, স্বপনবুড়ো, আশা দেবী, কুমারেশ ঘোষ, মহাশ্বেতা দেবী, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, অজেয় বসু, রমাপদ চৌধুরী এবং আরো অনেকে।

অভিনয়—সম্পাদক : দিলীপ বন্দ্যোপাধ্যায়। ১৩১, হরিশ মুখার্জি রোড, কলিঃ-২৬। চার টাকা।

মঞ্চ এবং চিত্রজগতের মাসিকপত্র হিসেবে 'অভিনয়' নিজ বৈশিষ্ট্যে কলা-রসিকদের দৃষ্টি-ধন্য হয়েছে। শুধু প্রমোদ উপকরণের বিবিধ সম্ভার জনমনের কাছে পৌঁছে দিয়ে অভিনয়-এর কর্তব্য শেষ হয়নি—মঞ্চ ও ছায়াচিত্র জগতের নানাবিধ ভাবনা সমস্যার দিকে সাধারণ মানুষের নজর ফেরানোর সঙ্গে সঙ্গেই সমাধানের সূত্র খুঁজে বেড়ানোর আন্তরিক প্রচেষ্টার মধ্য দিয়ে 'নতুন আলো' আন্দোলনের সামিল হওয়ার কৃতিত্ব তার। শারদ সংখ্যায় তার সুস্পষ্ট ছাপ আছে। এই সংখ্যায় সাতটি পূর্ণাঙ্গ নাটক, দুটি একাঙ্কিকা স্থান পেয়েছে। বর্তমান যুগ-জীবনের সমস্যাই এই সব নাটকের পটভূমি। 'বাংলা দেশ' মুক্তি-আন্দোলন নিয়েও রচিত হয়েছে পূর্ণাঙ্গ নাটক। নাটাকারদের পুরোধায় আছেন মন্মথ রায়। অন্যান্য উল্লেখ্যরা হলেন দীপেন সেনগুপ্ত, অমিতাভ গুপ্ত, মোহিত চট্টোপাধ্যায়। আসিফ করিমভয়-এর বিতর্কিত নাটক 'ইনকিলাব' সবিশেষ উল্লেখের দাবী রাখে। গ্রুপ থিয়েটারের আজকের সমস্যার ওপর আলোকপাত করেছেন সবিতা মুখোপাধ্যায়।

পুষ্পাঞ্জলি—সম্পাদিকা : অনিলা দেবী। শ্রীসারদা আশ্রম, পি-৬১৫, ব্লক : ও, নিউ আলিপুর, কলকাতা—৫৩।

শ্রীসারদা আশ্রম-এর মুখপত্রটি 'পুষ্পাঞ্জলি' ভাবে-ভাবনায় রচনা-বৈশিষ্ট্যে সবিশেষ উল্লেখযোগ্য শারদ-সংকলন। 'পুষ্পাঞ্জলি' অর্পণ করেছেন যাঁরা তাঁদের মধ্যে বিশিষ্টরা হলেন : ডঃ রমা চৌধুরী, আশাপূর্ণা দেবী, ডঃ কমলা রায়, চিত্রিতা দেবী, অঞ্জলি বসু, অরুন্ধতী রায়চৌধুরী, বিজয়া সেন, বিজয়া দাশগুপ্ত। শ্রীরামকৃষ্ণ ও শ্রীসারদা মায়ের ওপর রচিত দুটি গান (স্বরলিপি সহ) লিখেছেন সবিতা আচার্য। ছোটদের কিছু লেখা এবং কিছু ইংরেজি রচনাও এতে স্থান পেয়েছে। পত্রিকাটির সর্ব-অবয়বে শুভ্র-শুচী ও পরিচ্ছন্নতার ভাব পাঠকমনকে স্পর্শ করে।

আসানসোল—সম্পাদনা : অমিয়রঞ্জন দাশ ও দুলাল কর্মকার। হরি ভট্টাচার্য রোড, আসানসোল।

এই বন্ধ্যাভূমিতে সাহিত্য পত্রিকা প্রকাশের আন্তরিক বাসনায় প্রতিনিয়ত আকুলিত অথচ কালিমাখা সিসের সামনে এগিয়ে যাওয়ার স্ব-ভরসার ফলশ্রুতিই ডুপ্লিকেটিং মেশিনে মুদ্রণ এবং আত্ম-প্রকাশ। ছবি, অলংকরণও আছে যথারীতি প্রচলিত নিয়মানুসারে। স্বাবলম্বন প্রশংসনীয় উদ্যম।

প্রাপ্তিস্বীকার

শতদ্রু—সম্পাদনা : লোকেশ হোমরায়, গৌতম গোস্বামী প্রমুখ। ৫৩ডি, হর-মোহন ঘোষ বায়। কলকাতা-১০।

নবীন সূর্য — সম্পাদক : সমীরকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়। ১৮ চণ্ডীপাড়া রোড, বেহালা কলকাতা-৩৪। চল্লিশ পয়সা।

শিশু আলেপন—সম্পাদক : সঞ্জিতকুমার সাহা। সরযুপ্রসাদ রোড, মালদহ। ২৫ পয়সা।

লিরিক—সম্পাদনা : সমর জোয়ারদার। ৮০।১৩, বারুইপাড়া লেন, কলকাতা-৩৫। পনেরো পয়সা।

সৈকত—সম্পাদক : মাধব ভট্টাচার্য। রবীন্দ্র পার্ক, ফুলিয়া কলোনী।

উষালোক—সম্পাদক : সমরেন্দ্রকুমার রায়। ইমামবাজার রোড, হুগলী। ত্রিশ পয়সা।

গান্ধার—২৬ মহেশ সরকার লেন, খাগড়া বহরমপুর। পঞ্চাশ পয়সা।

কালস্রোত—সম্পাদনা : রঞ্জিতকুমার সরকার, শচীন বন্দ্যোপাধ্যায়, মদনগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায়। উখরা, বর্ধমান। পঞ্চাশ পয়সা।

অনুপম—সম্পাদক : মৃগাঙ্ক রায়, সমরেন্দ্র দাস। ১০ সিদ্ধেশ্বরীতলা লেন, হাওড়া-১। ষাট পয়সা।

সংকেত—সম্পাদক : পূর্ণচন্দ্র সাহা। ৩৩।৬ মুরারীপুকুর রোড, কলকাতা-৬। পঞ্চাশ পয়সা।

লেখনী—সম্পাদনা : মহাদেব নন্দী। হাটখোলা, চন্দননগর। পঞ্চাশ পয়সা।

প্রান্তিকা—সম্পাদক : তারাপদ দে। গড়-গড়িয়া, বাঁকুড়া। ত্রিশ পয়সা।

প্রশ্ন—সম্পাদক : বিনয়ভূষণ ভট্টাচার্য। শিলচর-১। আসাম। এক টাকা।

তৃষ্ণা—সম্পাদক : শিমুল রায়। ১ কালিচন্দ্র গোস্বামী লেন, বালী হাওড়া। এক টাকা।

জাগরণ—সম্পাদক : গোবিন্দলাল বন্দ্যোপাধ্যায়। মৈত্রী সংঘ, দেভোগ [illegible] ২৪-পরগণা।

চন্দন—সম্পাদনায় : স্বরূপ গুপ্ত। [illegible] যোগেশ্বরী শ্রীমানী রোড, চন্দননগর হুগলী। চল্লিশ পয়সা।

রক্ত স্বাক্ষর—সম্পাদক : নির্মল [illegible]। কাবাবীণা, ১৬ ধীরেন ধর সরণী, কলকাতা-১২। দু-টাকা।

বার্তাদূত—সম্পাদক : রবীন্দ্রনাথ মণ্ডল। গরিফা, হালতু, ২৪-পরগণা। এক টাকা।

কিশোর কল্যাণ বার্ষিকী—কিশোর কল্যাণ পরিষদ, ২২ টেগোর ক্যাসল স্ট্রীট, কলকাতা-৬। পঞ্চাশ পয়সা।

অরুণাভ : সম্পাদনা : অমূল্য গঙ্গোপাধ্যায়। সারাঙ্গাবাদ। বজবজ। ২৪-পরগণা। চল্লিশ পয়সা।

সাহানা : সম্পাদনা—গোপেন লাহিড়ী। ২৫।১ চন্দ্রনাথ চ্যাটার্জি স্ট্রীট। কলকাতা—২৫। দাম দু' টাকা।

সপ্তস্বর—সম্পাদক : সেখ নজরুল ইসলাম। ধুলাসিমলা, হাওড়া। দেড় টাকা।

বর্ণালী—সম্পাদক : জয়দেব দাস। মধুবাটী, বলরামবাটি, হুগলী। পঞ্চাশ পয়সা।

পার্থসারথি—সম্পাদক : প্রীতিকুমার ঘোষ। ৩০, রাজকুমার মুখার্জি রোড, কলকাতা-৩০। পঁয়তাল্লিশ পয়সা।

রোদ্দুর—সম্পাদনা : বিজলী চট্টোপাধ্যায়, ধীরেন দেব, প্রণব রায়। ১৭।২৭, এডিসন রোড, দুর্গাপুর-৫। পঁচাত্তর পয়সা।

কাশীপুরের বাঘের আত্মহত্যা

গিরিজাপতি ভট্টাচার্য

(পূর্বপ্রকাশিতের পর)

শব্দ বন্ধ হয়ে গেছে, বাঘ নিশ্চয় মাচা থেকে সরে গেছে। বেশ বুঝলাম পাশে বসে বন্ধু অসন্তুষ্ট হয়েছেন। তাঁর কানের কাছে মুখ নিয়ে গিয়ে বললাম, বাঘ দেখি নি। 'এ-ডি' বিরক্তি-স্বরে চুপ চুপ বললেন,—বাঘ এসেছিলো। অত দেরী করলে কি হয়? দূর থেকে মড়ির কাছে আসা ও তার পাশে গিয়ে বসা তিনি বেশ দেখেছেন,—আমি দেখতে পাইনি। অমন সুযোগ নষ্ট করেছি। বাঘ চলে গেছে আর সে আসবে না। রাত একটার পর আমি তাঁকে শুতে বললাম। যদি বাঘ আসে আমি ঠিক তাকে কায়দা করব। তিনি শুয়ে ঘুমিয়ে পড়লেন। রাত্রি তিনটের পর গাছের মাথায় মাথায় চাঁদের আলোর ছোঁয়া লাগলো। মশার ভন ভন শব্দ, পোকার মিশ্র ডাক, নিশাচরের কর্কশ আওয়াজ অব্যাহত হয়ে রইলো। শুকনো পাতা ডাল নাড়িয়ে বাঘ আসার কোন শব্দ পাওয়া গেল না। সেই থেকে জমাট-বাঁধা অন্ধকার একটু পাতলা হয়েছে দ্বাদশীর চাঁদের আলোয়, আমাদের কাছে এসেছে। বসে থেকে মাঝে মাঝে ঢুলুনি এলো, দুদ্দশবার চোখ বুজে গেলো। ঘুম কাটানোর জন্য ফ্লাস্ক থেকে একটু কফি খেলাম। ক্রমে অন্ধকারের নিবিড়তা একটু তরল হোলো। আকাশে ঊষার ছটা ছড়িয়ে গেলো। ঘুম ভেঙে 'এ-ডি' উঠে বসলেন। এবার যত্ন করে পাইপ ধরালাম। বেশ ফর্সা হয়ে এলো। হঠাৎ একটা, তারপর কয়েকটা মোরগ ডেকে উঠলো। দূর থেকে ময়ূরের ডাক নির্ঘোষিত হোলো 'কি-কও', 'কি-কও'। বনের পথ ধরে হাতী আসার আওয়াজ ও মাহুতের গলার স্বর শোনা গেলো। আমরা যে যার রাইফেল থেকে টোটা খালি করে নিলাম। একটু পরেই হাতী মাচার নিচে এসে দাঁড়ালো। মাচান থেকে একটা ডালে নেমে সেখান থেকে হাতীর পিঠে নেমে এলাম। 'এ-ডি' আমাদের জিনিসপত্তরগুলো নামিয়ে দিয়ে নিজে নেমে এলেন। তারপর হাতীকে মড়ির কাছে নিয়ে যেতে বললেন 'এ-ডি'। আমরা নেমে মড়িটা ও তার চারপাশ পরীক্ষা করে দেখে বুঝলাম যে জানোয়ার রাতে এসে মড়িটার মাংস ছিঁড়ে ছিঁড়ে খাচ্ছিল সে বাঘ নয়, শুয়োর। শুয়োরের খুরের দাগ রয়েছে স্পষ্ট। কাছেই ছিল একটা ভেজা ভেজা নালা, আর কাদায়ও ওই খুরের দাগ। বেশ বোঝা গেলো রাইফেল তুলে ধরবার সময় আমার নড়া-চড়ায় ও টর্চের আলো ফেলায় সে নালা পার হয়ে চলে গেছে।

৬

বাংলোয় ফিরে এসে সেদিন শুধু বিশ্রাম ও নিদ্রায় কাটালাম। বাঘের খবরটি পেয়েও দুবার শিকার চেষ্টা ব্যর্থ হোলো, 'এ-ডি' বললেন, খুঁজি শিকারী দুজন নতুন খবরের চেষ্টায় গেছে, বিকেলে তারা আসবে।

বিকেলে দুজন খুঁজি শিকারী এসে 'এ-ডি'কে সেলাম দিলো,—একজন ছ' ফুট দীর্ঘ শিখ হীরা সিং, দ্বিতীয়, মুসলিম যুবক নবি রাজা। ওদের খবর—দুটি কাটরা বাঁধা হয়েছিলো বাঘ চলাচলের পাঞ্জা দেখে দু-জায়গায়, তার একটারও মার হয়নি।

তাদের 'এ-ডি' বলে দিলেন দুটির একটিকে শরবনের নালার ধারে বাঁধতে, সেখানে গেলো বছর বাঘ শিকার হয়েছিলো। অপরটিকে একটু দূরে একটা হোগলার বিল আছে, তারই পাড়ে বাঁধতে। সেখানেও একবার বাঘ মারা হয়েছে। জায়গাটা একটু গ্রাম বসতির অন্তরালে ও বাঘের চলাফেরার রেওয়াজ আছে।

ওরা একটা নতুন প্রস্তাব করলো, কোশী নদীর কোল বরাবর আখের খেতে হাতী দিয়ে হাঁকা করে দেখতে পরদিন সকালে। কয়েকদিন আগে ওরা বাঘের পাঞ্জা ওখানে দেখছে। স্থির হোলো পরের দিন সকালে আখের খেতে বাঘের চেষ্টায় বসে না পাওয়া গেলে রাত্রে অন্য এক জঙ্গলে গাছে মাচা বেঁধে কাটরা রেখে বসা যাবে। সেখান দিয়েও বাঘের যাতায়াত হয়।

শিকারী দুজন চলে গেলে 'এ-ডি' বললেন,—হীরা সিং বাস্তুহারা শরণার্থীদের একজন। চাষের জমি ও থাকবার কুটীর পেয়েছে। ওদের কজন একজোটে চাষের বলদ আর দুধেলা গরু পালে। সেই গোয়াল থেকে বাঘ গরু মেরে নিয়ে গেছে। তাই হীরা সিং-এর আক্রোশ।

নবি রাজা এই অঞ্চলেরই মুসলিম। আদি পেশা ছিল মোরাদাবাদি বাসনে মিনের কাজ করা। সে কাজে মন্দা আসায় তার বাবা আলিরাজা ও সে মোরাদাবাদ ছেড়ে দিয়ে এখানে এসে বসবাস করছে ও মোটর মেকানিকের কাজে কিছু উপায় করে। তা ছাড়া বাপ বেটা দুজনেই শিকারীর কাজ করেও রোজগার করে। (সম্প্রতি নবি রাজার একটা খুব ক্ষতি হয়েছে। উদ্বাস্তুদের একটি মেয়ের সঙ্গে ওর আশনাই হওয়ায় মেয়েটি স্বেচ্ছায় চলে এসে মুসলমান ধর্মে দীক্ষা নিয়ে নবি রাজাকে বিয়ে করে। মেয়েটির জাত-ভাইরা এতে ক্ষিপ্ত হয়ে ওদের বাড়ী চড়াও হয়ে মেয়েটির ধর্মনাশ করে। আদালতে আসামীদের বিরুদ্ধে মামলা হয়। কিন্তু উদ্বাস্তু ও পুলিশের কারসাজিতে ধর্ষণ প্রমাণ হয় না। মাত্র দিন দশ-পনেরো আগে রায় বেরিয়েছে যে আসামীরা নির্দোষ। মামলা সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষমূলক। মামলায় জিতে আসামীর দল নবি রাজাদের ওপর খড়্গহস্ত হয়ে উঠেছে। নবির অবস্থা কাহিল। কিন্তু বাঘের খোঁজ-খবর নিতে ও শিকারের সংগত জায়গা বাছতে একেবারে ওস্তাদ। তাই ওকে ডেকেছি। আর এতে ওর মন একটু চাঙ্গা হবে।

সে রাত্তিরে স্বপ্ন দেখলাম, গাছের ওপর মাচায় বসেছি। নিচে মোষের মুড়িতে বাঘ এসেছে। আমি রাইফেল তুলে তাগ করতে যাবো এমন সময় মোষ জ্যান্ত হয়ে উঠে পড়ে বাঘকে তার শিংদিয়ে গুঁতিয়ে মেরে ফেললো আর বললো—আমি নবিরাজার জেনানা। তুমি আমার ধর্মনাশ করেছিলে মনে আছে? এখন আমি মোষ হয়ে তার শোধ নিলাম।)

পরের দিন সকালে চা'র পর আখের খেতের উদ্দেশ্যে 'এ-ডি'র সঙ্গে তাঁর গাড়ীতে রওনা হলাম। জায়গাটায় পৌঁছে গাড়ী থেকে নেমে হাতীর পিঠে উঠে দাঁড়িয়ে একটা শিরীষ গাছের ডালে উঠে বসলাম। 'এ-ডি' উঠে এসে আর একটা ডালে বসলেন। শিকারী অনুচররা রাইফেল টোটা জলের বোতল তুলে দিল। ঠিক করে বসে রাইফেলে উভয়েই টোটা ভরে নিলাম। বিস্তৃ ডালে পা ঝুলিয়ে বসে মনে চিন্তা খেলে গেলো বাঘ দৌড়ে এসে লাফিয়ে যদি পা-টা ধরে নেয়? না, কখনই না। বেশ উঁচুতে আছি। বাঘ এলে লাফ দেবার আগেই তাকে গুলি করতে পারবো। কত উঁচুতে বাঘ লাফাতে পারে? ডালটা হবে আন্দাজ এগারো বারো ফুট উঁচু, বাঘ কি অতটা লাফিয়ে উঠতে পারে? কোনো কোনো শিকারের গল্পে পড়েছি বাঘ লাফিয়ে মাচায় উঠে শিকারীকে জখম ও হত্যা করেছে। কিন্তু নির্ভরযোগ্য মনে হয়নি। গুঁড়ি বেয়ে মাচায় উঠতে পারে কিন্তু লাফ দিয়ে অতটা না। অবশ্য গুঁড়ি বেয়ে ওঠা বাঘকে মাচা থেকে গুলি করা শক্ত।

খানিকক্ষণ অন্যমনা হয়েছিলাম; দূর থেকে একটা অস্পষ্ট আওয়াজ আসতে লাগলো। আখের খেতের প্রান্ত থেকে হাঁকাই সুরু হয়েছে। দুটি হাতী আগে থেকে পাঠানো হয়েছিলো; আমাদের গাছে তুলে দেওয়া হলে মাহুত শিকার অনুচরদের আরোহী করে হাতীদের খেতের প্রান্তে নিয়ে গিয়েছিলো। হাঁকাইয়ের আওয়াজ কানে আসতেই উৎকর্ণ হয়ে সেই দিকে প্রখর নজর রেখে নিস্পন্দ হয়ে বসলাম। রাত্রে আলো ফেলে স্থানু বাঘের ওপর স্থির নিশানা করে গুলি চালানো আর দিনে তাড়া দেওয়া পালায়নপর বাঘের ওপর নিশানা নিয়েই গুলি চালানো আসমান-জমিন তফাৎ। বিস্তৃ গাছের ডালে বসে থেকে জাঙের নিচের দিকে বেদনা বোধ হতে লাগলো, যেন ভোঁতা দা দিয়ে ডাল আঘাত করছে। ঘড়িতে বেলা দশটা। রোদ্দুর ঝাঁ-ঝাঁ করছে, বাতাস তেতে উঠেছে। দেখা গেল দূরে আখের দোল। দুটি হাতীর পিঠে বসা মাহুত ও হাঁকাই-কার শিকারীদের কাঁধ পর্যন্ত দেখা যাচ্ছে; হাতীরা ঢাকা পড়েছে আখের আড়ালে আর মানুষগুলো যেন সাঁতরে আসছে আখের ডগার ওপর দিয়ে। এই সময় হঠাৎ দুটি হাতীরই আরোহী বলে উঠলো— 'উয় যাতা হয় শের'। মুহূর্তের মধ্যে যে দৃশ্য দেখা গেলো তা যেমন অভূতপূর্ব তেমনি সম্মোহক। কমবেশী শ'দেড় মিটার দূরে একটা প্রোজ্জ্বল আগুন রঙের বিরাট জানোয়ার আখের ওপর দিয়ে আকাশ সটান বিলম্বিত হয়ে তীরের মত গিয়ে দূরে পড়ে আখের ভেতর মিলিয়ে গেলো। পলকের ভেতর আবার দিল লাফ। রাইফেল হাতে আড়ষ্ট হয়ে ধরা রইলো; মন সম্মোহিত। তিনবার হোলো বাঘের লাফ; তিনবারই আট-ন ফুট আখের ওপর দিয়ে দৈর্ঘ্যে বিশ-বাইশ ফুট জমি উত্তীর্ণ হয়ে। গল্প-বিবরণের কথা নয়, প্রত্যক্ষ দেখা। বাঘ কত উঁচুতে লাফাতে পারে, এক লাফে কতটা দৈর্ঘ্য ডিঙোতে পারে আমার কাছে তার মীমাংসা হোলো সেদিন।

হাতী দুটি এলে আমরা গাছ থেকে নেমে তাদের পিঠে সওয়ার হলাম, একটিতে 'এ-ডি', অপরটিতে আমি। 'এ-ডি' মাহুতদের বললেন পাশের খেতে যেতে—যাতে বাঘ গিয়ে ঢুকলো—হাতী চালিয়ে ছেঁকে দেখতে। রাইফেলে টোটা ভর্তি করে হাতে ঠিক করে নিয়ে [illegible] রইলাম, হাতী দুটি পরস্পরের মধ্যে [illegible] মিটার ব্যবধান রেখে সারা খেত ছেঁকে এলো। এক একবার মাহুত 'শের উধর যাতা' বলে ফিস ফিস করলো, কিন্তু [illegible] করে কিছু দেখা গেলো না। সে খেত ও পাশের আরও দুটি খেত ছেঁকে শেষে বিফল হয়ে অবসন্ন মনে বাংলোয় ফিরলাম।

বিকেলে গোধূলির আগেই পূর্ব সংকল্প মত নিচে কাটরা বেঁধে [illegible] গাছে মাচায় উঠে আমরা বসলাম। [illegible] জঙ্গলে সার আত্তার সিং-এর জন্য মাচা বাঁধা হয়েছিল ঐ জায়গাটা [illegible] প্রান্তে। চারপাইয়ের মাচায় তোষক চাদর বিছানো, ডাল পালা দিয়ে আড়াল [illegible] রাইফেল টোটা বাতি চা খাবার [illegible] ব্যাগ—সব মজুত। প্রথম রাতে শিকারে বসার পুনরাবৃত্তি। ধীরে ধীরে আলো মিলিয়ে গেলো। বনের পশু পাখীরা ওদিক-ওদিক চলে গেল। ক্রমে অন্ধকার, তারপর তা হোলো গাঢ়, গাঢ়তর [illegible] দূরে মিলিয়ে গেলো ময়ূর, চিতল, [illegible] ডাক। ঝেঁপকর ঠিক শব্দ [illegible] হয়ে উঠলো। তার সঙ্গে যোগ দিলো ঝিঁঝির—সব মিলে [illegible] বনের ঘুম ভাঙা নানা শব্দ। [illegible] গাছ হতেই কাটরাটা ওর পাড়ার [illegible] ডাকতে লাগলো। এতক্ষণ সে মানুষের উপস্থিতি টের পেয়ে নিশ্চিন্তে [illegible] মুখের সামনে রাখা ঘাস খাচ্ছিলো। [illegible] ভয়ার্ত ডাক বার বার মনে হচ্ছিল [illegible] বাঘ এসে পড়েছে তা সে বুঝতে পেরেছে। কিন্তু বাঘ আসার কোন চিহ্ন দেখা গেলো না।

রাত একটার পর একটা কাকরের ভয়ার্ত ডাক দূরে শোনা গেলো। কাটরা ততক্ষণ ডেকে ডেকে ক্লান্ত হয়ে পা গুটিয়ে বসে পড়েছে, আর ডাকছে না। কিছু পরে বনের অপর প্রান্তে ফেউ ডাকতে ডাকতে চলে গেলো। 'এ-ডি' কানের কাছে মুখ এনে বললেন—ওই দূর দিয়ে বাঘ চলে গেলো, তাই কাকরের ভয়ার্ত ডাক। ফেউটাও বাঘের পাশে পাশে বনের বেড় দিয়ে চলে গেলো। বাঘ এদিকে আর আসবে না। শুয়ে পড়ুন বলে নিজে শুয়ে পড়লেন। আমিও নিদ্রাগত হলাম।

ভোরের আলো হলে দেখা গেলো কাটরাটি পা মুড়ে নিশ্চিন্তভাবে বসে

আছে। বাঘ আসেনি। হাতী দুটি এলে আমরা গাছ থেকে নেমে এলাম। চারপাই নামিয়ে নেওয়া হলো।

আগেই স্থির হয়েছিলো বাংলোয় ফেরা হবে না। শরণার্থীদের যাতায়াতের সুবিধার জন্য একটা নতুন রাস্তা পত্তন করা হচ্ছে, তার ভারাক্রান্ত ওবারসিয়ারের একটা তাঁবু পাতা হয়েছে,—যাওয়া হবে সেখানে। শরবনের নালায় আর হোগলা-জলার পাড়ে যে দুটি কাটরা বাঁধা হয়েছিলো তাদের কারুর মার হয়েছে কিনা, শিকারী দুজন, ধরা সিং আর নবি রাজা খবর আনবে সেখানে। যদি কোনটির মার হয়ে থাকে ও তাঁবু থেকেই যাওয়া হবে আর হাঁকা করা হবে হাতী দিয়ে। বাঘকে ফুরসৎ দেওয়া হবে না—বড় চতুর বাঘ।

তাঁবুতে পৌঁছে মুখ ধোয়া গোসলাদি সেরে হালুয়া-চা-এর প্রাতরাশ হোলো। দুজনের জন্য দুটি ডেক চেয়ার পেতে দেওয়া হয়েছিলো। তাতে গা এলিয়ে দিতেই ঘুমে চোখ বুজে এলো। মাচায় দু রাত্তির আর গাছের ডালে একবেলা বসে কাটিয়ে গা-গতর আড়ষ্ট হয়ে উঠেছিলো। নিষ্ফলতা থেকে এসেছিলো মানসিক ক্লান্তি, অবসাদ। ঘুমের ভেতর স্বপ্ন দেখলাম মাচায় বসেছি। —একটা বাঘ এলো নিচে। মাচা বাঁধা, ৮—৯ ফুট উঁচু আখের ওপর দিয়ে ও অনায়াসে লাফ দিয়ে গেলো দেখলাম। কই লাফ দিয়ে উঠে এসো ত এই ১২ ফুট উঁচুতে। একটা উত্তেজিত কণ্ঠস্বরে ঘুম ভেঙে গেলো। শিকারী হীরা সিং-এর সঙ্গে এ-ডি উত্তেজিত স্বরে জিজ্ঞাসাবাদ করছেন। হীরা সিং-এর খবর, কাটরা মার হো গয়া শের ভি বৈঠ গয়া। মোষের বাচ্চা মেরে বাঘ শরবনে ঢুকেছে আর বেরিয়ে আসেনি। বাঘের আক্রমণ কালের পায়ের দাগ, কাটরার আত্মরক্ষার চেষ্টায় খুরের দাগ, শরবনে বাঘের প্রবেশের পাঞ্জার দাগ আর বেরিয়ে আসার পাঞ্জার অভাব দেখে শিকারী সিদ্ধান্ত করেছে। হীরা সিং বলল, যেখানে বাঘ ঠাঁই নিয়েছে সেই প্রান্ত থেকে হাতী দিয়ে হাঁকা করে বাঘ তারা বের করে দেবে, তারপর তাকে মারতে পারা আমাদের হাতযশ।

খবর শুনে মুহূর্তে মধ্যে শরীর মনের অবসাদ দূরে হোলো। চেয়ার ছেড়ে লাফিয়ে উঠলাম। অন্ততঃ পাল্লার ভেতর বাঘকে পাবো; আর আমার রাইফেল হোলো সিদ্ধ মার। পাল্লার ভেতর বাঘ পেলে মার ফস্কাবে না। রাইফেল কার্তুজ ব্যাগ নিয়ে হাতীতে উঠতে যাবো এমন সময় নবিরাজা এসে খবর দিলো দ্বিতীয় কাটরারও মার হয়েছে। শুনে এ-ডি'র মুখ হলো উজ্জ্বল, বললেন, এবেলা প্রথমটা সেরে ওবেলা দ্বিতীয়টায় বসা যাবে।

যে হাতী দুটি গত রাতের মাচা থেকে আমাদের নিয়ে এসেছিলো। তাতে আমরা এক একজন বসলাম। এবার এ-ডি সঙ্গে নিলেন লণ্ডনের বিখ্যাত কারিগর বীসলির তৈরী তাঁর দোনলা ১২-ফাঁদের বন্দুক। তাঁবু থেকে শরবনের নালাটি ছিল কম-বেশী তিন কিলোমিটার। পথে পড়ে খানিকটা পতিত জমি, কুশ ঝাড়ে আগাছায় ভরা। এর ভেতর পারা হরিণ পাওয়া যাবে এই আশ্বাসে 'এ-ডি' রাইফেলে কার্তুজ ভরে নিতে বলে নিজের বন্দুকেও 'এল-জি' ও বুলেট ভরে নিলেন। বাঘের ওপর গুলিক্ষেপের প্রথম চাল আমার। না পারলে বা দরকার হলে তিনি চালাবেন তাঁর বন্দুক। এই বন্দুকে তাঁর হাতে ভেল্কি খেলতো। আমিই সংগ্রহ করে দিয়েছিলাম এই সেরা হাতিয়ার।

যা বলেছিলেন 'এ-ডি' ঠিক তাই। মাঠ দিয়ে একটু যেতেই সামনের একটা কুশবন থেকে একটা 'পারা' বেরিয়ে এসে একবার দাঁড়ালো। পর মুহূর্তে অল্প একটু দৌড়ে গিয়ে আবার দাঁড়ালো। আমার হাতীর মাহুতকে বলে হাতী দাঁড় করিয়ে তাগ করে ১৮০ গ্রেন বুলেট একটা ছুড়লাম। 'পারা'টা পড়ে গেলো। অনুচররা

তাকে হাতীতে তুলে দিলো। হাতীরা আবার চলতে সুরু করতেই আবার এক 'পারা' ঝোপ থেকে বেরিয়ে চোখে চমকলাগা বিরাট কয়েকটা লাফ দিয়ে আমাদের ডানদিকে ছুটলো। 'এ-ডি'র হাতীটি ছিলো ডাইনে। হাতীর চলার প্রতি ভ্রূক্ষেপ না করে, তাকে না থামিয়ে, চলন্ত হাতী থেকেই তাঁর বন্দুকের এক গুলী ছাড়লেন। ডিগবাজি খেয়ে উল্টে পড়লো পারা। এই অসামান্য গুলি চালানো দেখে সকলে সমস্বরে বলে উঠলো 'সাবাস'। সেটাকেও তুলে নেওয়া হোলো। সেদিনের এই প্রাথমিক সাফল্যে আমার মনে বাঘ শিকারের সাফল্যের আভাস অনুভূত হলো।

৮

শিকারের জায়গায় পেঁাছে দেখলাম লম্বায় চওড়ায় প্রকাণ্ড নালা, বেবাক শরগাছে—যার নাম Elephant grass. ভরা। আগের বছরের দেখা ; দৈর্ঘ্যে কিছু বেশী এক কিলোমিটার, প্রস্থে আধা। নালার জল শুকোয় না, পায়ের পাতা ডোবা, কোথাও আধ হাঁটু জল থাকে। জল থাকায় শরগাছ খুব সরস তেজি,—অনেকের ডগায় তখনও ফুটে আছে শাদা ফুলের পালক। নালাটা এঁকে বেঁকে গেছে, শরগাছগুলি তাতে টগমগ করছে। নালার পাড়েও ইতস্তত শরগাছ ঝাড় ও কুশের ঝাড়—জলাভাবে ও গরমে সেগুলো শুকিয়ে গেরুয়া রং-এর হয়েছে। মাঝে মাঝে ফাঁকায়, ঢাক (পলাশ), জাম শিরিষ, বাবলা-গাছ, আর ছোট আগাছার ঝোপঝাপ। নালার দুই প্রান্তের মাঝ বরাবর পাড়ের এক ঢাক গাছে আন্দাজ বারো চোদ্দ ফুট ওপরে পাশাপাশি দুটো ডালে দড়ি বেঁধে গত-রাতের ব্যবহৃত চারপাইটা ঝুলিয়ে দিয়ে একটা ঝুলন-মাচা বানানো হলো। আর দুটো ডালের সঙ্গে টানা বেঁধে তাকে সংযত করা হয়েছে। মাচার সামনে আড়াল করা ডাল-পালা ছেঁটে দেওয়া হলো। তারপর 'এ-ডি'র নির্দেশে শিকারী অনুচররা মাচার আড়াআড়ি সোজা নালার শরগাছ হাত তিন চওড়া স্থানে কেটে শুইয়ে দিল, যাতে মাচা থেকে একটা ফাঁকা গলি দেখতে পাওয়া যায়, শরবনের এপার থেকে ওপার পর্যন্ত। হাতীর তাড়ায় বাঘ যখন এই গলি পার হবে ঠিক সেই সুযোগে তাকে গুলি লাগাতে হবে। নয়ত শরের ভেতর দিয়ে বাঘ নিজেকে লুকিয়ে রেখে চলে যেতে পারবে; অস্পষ্ট বা অংশত দেখা গেলেও তাকে নিঃসংশয় মারা যাবে না।

হাতীর পিঠে দাঁড়িয়ে গাছের ডাল ধরে গাছে চড়ে মাচায় গিয়ে বসলাম 'এ-ডি' ও আমি। চারপাইটায় তোষক ও খাকি রঙের চাদর বিছিয়ে দেওয়া হয়েছিল। পাড়ের আর কয়েকটা গাছে পঞ্চাশ-ষাট মিটার দূরে দূরে এক-একজন 'রুখ' (stop) শিকারী বসে গেল। ওদের কাজ, বাঘ মাচা বরাবর পেঁাছ-বার আগেই যদি মাঝপথে নালা ছেড়ে পাড়ে উঠে আসার চেষ্টা করে ত নিকটের রুখ তার হাতের কুড়ুল বা অন্য হাতিয়ার দিয়ে গাছের ডালে আঘাত করে তার শব্দে বাঘকে নিরস্ত করবে। তাড়াখাওয়া বাঘ যাতে শরবনে বানানো গলিটা ইস্তক পেঁাছে যায় তাতে নিশ্চিত হওয়ার জন্য এই ব্যবস্থা। মাচার কাছাকাছি কয়েকটা ঝোপে খবরের কাগজ মেলে বেঁধে দেওয়া হলো।—ওই একই উদ্দেশ্যে।

শিকারের প্রস্তুতি পুরো হলে হাতী দুটিকে পাঠানো হোলো যেদিকে বাঘ থাকার কথা নালার সেই দিকের প্রান্তে; প্রায় আধ কিলোমিটার দূরে। হাতী খানিক ডাইনে, খানিক বাঁয়ে ঢুঁড়তে ঢুঁড়তে সামনে এগিয়ে আসবে এক লাইন ধরে যাতে সারা শরবন-নালা ছেঁকে দেখা হয়। হাঁকা শুরু হতে বিশ-পঁচিশ মিনিট লাগার কথা, —'এ-ডি' আমায় জানালেন। রাইফেলে কার্তুজ পুরে ঠিক-ঠাক করে রেডি হয়ে বসতে বললেন, আর নিজের বন্দুকে বুলেট ও 'এল্-জি' ভরে নিলেন। আমার ·৩৭৫ ম্যাগনামে আমি ৩০০ গ্রেণ বুলেট ভরে নিয়ে ঘোড়ার খিল খুলে দিয়ে রাইফেলটাকে দু-হাতে নিয়ে কোলের ওপর রাখলাম, মুখটা একটু উঁচুদিক করে। বাঘ এসে গেলে পলকের ভেতর তুলে নিয়ে কাঁধে ঠেকিয়ে ধরতে পারবো। 'এ-ডি' আমাকে সাবধান করে দিতে বললেন, 'শরবনের ভেতর দিয়ে বাঘের চলে আসা ঠাহর করতে পারবেন না। নজর রাখবেন গলির আগের শরগাছগুলোর ওপর; ওদের ডগা দুললে বুঝবেন নিচেই বাঘ। তারপর চোখের নিমেষে গলিতে এসে পড়বে। বড়জোর দু-সেকেন্ড নেবে গলিটা পার হয়ে যেতে। ওইটুকু সময় আপনি পাবেন তাকে মারতে। ওর ভেতর গুলি ছুঁড়তে না পারলে আপনাকে আর সময় দেবো না, আমি চালাবো বন্দুক।' আমি সম্মতি জানালে আমার রাইফেলের দিকে দৃষ্টিপাত করে বললেন,—'আপনারা ওই নিজের তৈরী যন্তরটি খুলে রাখুন রাইফেল থেকে। ওর নিজ্-যন্তরটি ব্যবহার করুন। নয়ত পস্তাবেন শেষ পর্যন্ত।

যন্তরটি মানে পাছ-নিশানী, backsight, যা হয় সাধারণত খুপাকৃতি। কিছু অসুবিধা হয়ে থাকে এতে। শিকার-পশুর দেহ অনেকটা ঢাকা পড়ে টিপ করার সময়। বয়সের সঙ্গে দৃষ্টি-সংকট হয়ে এলে পরিচ্ছন্ন ঠিক্ হয় না। একনলি রাইফেলে খুপাকৃতি নিশানীর বিকল্পে বিঁধ করা ছিদ্র নিশানী peep sight লাগানো হয়, অনেক ক্ষেত্রে। দোনলায় এর ব্যবহারের রেওয়াজ নেই। আমি কিন্তু আমার দোনলায় নিজের তৈরী বিঁধ করা পাছ-নিশানী বসিয়েছিলাম কেননা এতে শিকার পুরোপুরি দেখা যায় ও বয়স বৃদ্ধিতেও পরিচ্ছন্ন টিক্ করা যায়। চাঁদমারিতে ও শিকারে দুয়েতেই আমি সন্তোষজনক ফল পেয়েছিলাম। অতএব আমি 'এ-ডি'র আপত্তি অগ্রাহ্য করে আমার নিশানী অপরিবর্তিত রেখে বাঘ আসার অপেক্ষায় প্রস্তুত হয়ে বসলাম।

একটু পরেই দূরে থেকে একটা অস্পষ্ট আওয়াজ ভেসে এলো। হাঁকাই সুরু হয়েছে। হাঁকার আওয়াজ ও শিকারীদের কথা ক্রমেই এগিয়ে আসতে লাগলো। উৎকর্ণ হয়ে রইলাম,—এই বুঝি বাঘ দেখতে পাবো; গলির কাছের শরের ডগা দুলে উঠবে। শিকারীদের কথা ভালো বোঝা যাচ্ছিল না। 'এ-ডি' আমার দিকে মুখ বাড়িয়ে মৃদুস্বরে বললেন—বাঘ হাতীর পাশ কাটিয়ে সরে পড়েছে। ওদের কথা থেকে তিনি বুঝেছিলেন। মুখে তাঁর গাঢ় হতাশার ছাপ। হাতী দুটি কাছে এলে মাহুতদের ও শিকারীদের কাছে ওই খবরই পাকাপাকি পাওয়া গেলো। বাঘ মাড়ি দিয়ে বসেছিলো, হাতী কাছে এসে পড়লে সামনে না গিয়ে পাশ কাটিয়ে নিখোঁজ হয়েছে। অত্যন্ত উত্তপ্ত হয়ে 'এ-ডি' মাহুত ও শিকারীদের বললেন, দিল্লী ও কলকাতার তাঁর দুজন দোস্ত শিকারী এসেছেন; পাঁচ-দিন ধরে খেল চলেছে বাঘের পিছনে। গ্রামের গরু মোষ মেরে সাবাড় করছে বাঘ। হাতে পাওয়া বাঘ এই পাঁচ-পাঁচ দিনে সামনে হাজির করে দিতে পারলে না তারা! যত সব বেকুবের দল! আজ বাঘ বার করে দিতেই হবে, যাও আবার ফিরে, নতুন করে শরবন ছেঁকে হাঁকা করো। মাহুতে দুজন একটু মৃদু আপত্তি জানালো; প্রত্যহ পাঁচদিন হাঁকা করে ও বনে ঘোরাঘুরি করে হাতীরা বেদম হয়ে পড়েছে। কিন্তু 'এ-ডি' তাদের আপত্তি নামঞ্জুর করলেন। বলে দিলেন বাঘ হলে প্রত্যেকে তাদের বখ্শিশ ওপর একটি করে রুপেয়া পাবে। মাহুতেরা খুসী হয়ে শিকারীদের নিয়ে ফিরে গেলো নালার আগা থেকে আবার হাঁকা করে আসতে।

৯

হাতীরা চলে যাবার পর অনেকটা সময় কেটে গেলো। ফিরতি হাঁকা সুরু হতে। বেলা তখন বারোটা। রোদ্দুরে ঝাঁ ঝাঁ করছে। তপ্ত হাওয়ায় আকাশের নীল রং গৈরিক হয়ে আসছে। ক'দিন ধরে উত্তাপাঙ্ক চলেছে ১০৫।১০৬ ডিগ্রী। চোখে ঝিমুনি আসছে গত রাতের পাওনা ঘুমের আর্তি। আস্তে আস্তে দূর থেকে প্রথমে অতি ক্ষীণ পরে স্পষ্ট আওয়াজ কানে এলো। বোঝা গেলো এবার হাঁকায় বাঘ কাবু হয়েছে। পাশ কাটিয়ে সরে পড়তে পারে নি। হাতী দুটো লাইনের আগে আগে আসছে। আমাদেরই দিকে। সব জড়তা নিঃশেষে কোথায় চলে গেলো। দু-হাতে রাইফেল ধরে নির্নিমেষ চোখে কতদূরে হাতী আসছে, শরের ডগা দুলে উঠছে কিনা, দেখতে লাগলাম। সেকেন্ড মিনিট কাটতে লাগলো যেন গুনে গুনে। ওই যে শরগাছের ডগায় নড়া দেখা যাচ্ছে। আরও কাছে,— আরও কাছে। হঠাৎ পি সি সরকারের ইন্দ্রজালের খেলায় আকাশ থেকে পড়ার মত দেখলাম ডোরা কাটা ধুলো মাখা বাঘ গলিতে উপস্থাপিত হয়েছে। সঙ্গে সঙ্গে কখন রাইফেল কাঁধে ঠেসে ধরলাম, নিশানীর বিঁধের ভেতর দিয়ে দেখা নজর মাছি বাঘের বাঁ কাঁধের কোলে স্থির রেখে ট্রিগারে চাপ দিলাম, বুঝতেও পারি নি। যেন সম্বিতের অগোচরে। সম্বিত হোলো যখন কার্তুজ ফাটল না। হাতটা জোরে কেঁপে গেলো, চেতনায় যেন বাজ পড়লো। রাগে ফেটে পড়ে 'এ-ডি' ধমক দিলেন,—'কোত্থেকে পুরনো কার্তুজ নিয়ে এসেছেন বাঘ মারতে!'

আমার জানত আমি তাজা কার্তুজই এনেছিলাম। আমার সন্দেহ হলো হয়ত আমি রাইফেলের গর্ভে কার্তুজ ভরে দিইনি। তাড়াতাড়ি রাইফেল ভেঙে দেখি, কার্তুজ ভরাই আছে; পিনের ঘা-এর দাগও আছে। ফোটে নি,—যে কোন কারণে হোক।

বাঘ ইত্যবসরে গলির পথ ধরে উঠে এসেছে পাড়ের ওপর ফাঁকায়। রাইফেলের আওয়াজ হলো না, 'এ-ডি' যা বললেন তা ফিস ফিস করে,—বাঘ আমাদের উপস্থিতি টের পায় নি। এক মনে সে চলতে লাগলো পাড়ের ধার দিয়ে, ব্যগ্রভাবে নয়, সহজ কদমে। আমার রাইফেল চালানো ব্যর্থ দেখে 'এ-ডি' তাঁর বন্দুক তুলে বাঘের ওপর বুলেট ছুঁড়লেন। এক চিলকে সেকেন্ডে দাঁড়িয়ে তার সামনে ডান পা'টা ঝেঁকে নিয়ে বাঘ এবার আমার দিকে একটু মুখ ঘুরিয়ে দ্রুত কদমে চলতে সুরু করলো। গোড়া থেকে সব সমেত খুব বেশী হয়ত আড়াই তিন সেকেন্ড সময় অতিবাহিত হয়েছে। আমি ততক্ষণে বেশ প্রকৃতিস্থ হয়েছি। ভাঁজ খোলা রাইফেল বন্ধ করে আমি বাঘের দু-চোখের ঠিক মাঝখানে, কপালে অতি সযত্নে টিক্ করে রাইফেলের অপর নলের—বাঁ-দিকের, বুলেট ছুঁড়লাম। বাঘের মুখটা আমাদের দিকে ফেরানো ছিল,—তাই টিক্ করলাম কপালে। সঙ্গে সঙ্গে বাঘ থমকে দাঁড়ালো; লাফ বা দৌড় দিল না, গর্জন করলো না। যেন চিন্তিত, কে আওয়াজ করলো, কোন্ দিকে? পর মুহূর্তে তার পিছনের পা, প্রথমে ডাইনের তারপর বাঁয়ের মুড়ে জমিতে বসে পড়লো। যেন বসতে আদিষ্ট সার্কাসের বাঘ। হতভম্ব হয়ে আমি দেখছি,—'এ-ডি' বার দুই বললেন, 'আর একটা গুলি চালান, আর একটা—!' ততক্ষণে বাঘ তার সামনের পা দুটিও মুড়ে কাৎ হয়ে শুয়ে পড়লো। অবাক হয়ে আমি ভাবছি,—'শেষ?' 'এ-ডি' উল্লাস স্বরে বলে ফেললেন—'ও ত মরে গেলো!' বাঘের ল্যাজটা সিধে লম্বা শক্ত হয়ে বার দুই-চার আন্দোলিত হয়ে মাটিতে নেতিয়ে পড়লো। 'এ-ডি' আবার বললেন,—'ওই রকম ন্যাজ শক্ত হয়ে কেঁপে কেঁপে উঠে নেতিয়ে পড়া বাঘের জীবন ত্যাগের লক্ষণ।'

চুপচাপ বসে বসে ভাবছিলাম—কী নিরুত্তেজক এই জীবন অবসান! এই মাত্র যে ছিল কত জীবন্ত, বলদৃপ্ত সে হলো এক নিমেষে একেবারে প্রাণহীন, মাংসপিণ্ড মাত্র?

হাতী দুটি এসে পড়লো। মাহুতের নির্দেশে এক হাতী পায়ের কাছ থেকে একটা বড় মাটির চাঙড় তুলে নিয়ে মাহুতের হাতে দিল। মাহুত সেটা বাঘের পিঠে ছুঁড়ে মারলেও বাঘ রইল নিস্পন্দ। তার পর বাঘের কাছে হাতীকে চালিয়ে এনে এক বল্লম দিয়ে মাহুত বাঘের পাঁজরায় খোঁচা দিল। কোন সাড়া পাওয়া গেলো না। তখন মাহুত ও শিকারীরা রায় দিল—'একদম খতম!' বেলা তখন দেড়টা।

পুনরায় আমার মন অবসাদক্লিষ্ট হলো:—একদম শেষ! কী দরকার ছিলো আমার তাকে বধ করবার? শুধু একটা নির্জন খেয়ালের ঝোঁকে। বাঘ শিকারের বাহাদুরী নেবার লোভে।

হাতী এসে আমাদের উভয়কে মাচা থেকে নামিয়ে নিল। আমাদের হাতিয়ার সরঞ্জামও নামিয়ে নেওয়া হলো। বড় পদক্ষেপে মাপ নিলাম মাচা থেকে বাঘ ছিলো কম-বেশী ষাট কদম দূরে। খুব হৃষ্টপুষ্ট বাঘ। কিন্তু লেজ ছোট। চিৎ করে দিয়ে বাঘের নাকের ও লেজের ডগায় খুঁটি মেরে বাঘের লাস সরিয়ে খুঁটি দুটির ব্যবধান হলো—নফুট পাঁচ ইঞ্চি। লেজের মাপ, দু ফুট ন' ইঞ্চি। দেহের মাপের অনুপাতে লেজের মাপ ছ-সাত ইঞ্চি কম। লেজ প্রমাণ মাপের হলে বাঘের মাপ হতো পাকা দশ ফুট। আধুনিক কালের বাঘের দীর্ঘতমের তালিকায় পড়তো।

কোথায় গুলি লেগেছিল পরীক্ষা করে দেখা গেলো ডান পায়ের উরুতে 'এ-ডি'র বন্দুকের গুলি লেগে চামড়ার নিচে চর্বিতে পিছলে কনুয়ের কাছে মাংসপেশিতে আটকে উঁচু হয়ে আছে; হাতে ঠেকে। রাইফেলের গুলি লেগেছিলো বাঁ চোখের কোলে কানের দিকে চোয়ালে। সেইখানে রাইফেল বুলেটের প্রবেশ চিহ্ন। চামড়ায় কড়ে আঙুলের ডগার মত গোল করে কাটা। এই বুলেটই মাথার ভিতরে পৌঁছে ওর মৃত্যু ঘটিয়েছিল। যাতনাহীন আনিমিষ মৃত্যু।

শিকারী অনুচরেরা সকলে ধরাধরি করে বাঘের লাস হাতীর পিঠে তুলে দিল। আমার সঙ্গে সিনে ক্যামেরা ছিল; বাঘ শুয়ে পড়লে মাচা থেকে সেটা চালিয়ে ছবি নিয়েছিলাম। গলি ধরে বাঘ পাড়ে উঠে আসার সময় রাইফেল ব্যবহারের আগে তার ছবি নেবার উদ্যোগ করেছিলাম কিন্তু ক্যামেরার আওয়াজ বাঘের কানে যাবে বলে 'এ-ডি' আমায় নিরস্ত করেছিলেন। হাতীতে বাঘ তোলার সময় আর এক প্রস্থ ছবি নিলাম। হাতীদের রওনা করিয়ে দিয়ে আমরাও বাংলোয় ফিরলাম।

স্নানাহার সেরে সামান্য বিশ্রামের পর সেই দিনই বেলা থাকতে দ্বিতীয় কাটরার হত্যাকারীর তল্লাসে আমরা রওনা হলাম। হাতী দুটিকে সেখানে পাঠানো হয়েছিল আগেই। কাটরা মেরে বাঘ একটা শরবন-হোগলা-আগাছা ভর্তি নিচু জলা জমিতে ঢুকেছিলো। তার পায়ের থাবার দাগ জলাটার কিনারায় দেখলাম। বিরাট থাবা; দেখে আমরা অনুমান করলাম বাঘ দশ ফুটেরও বড়। এখানকার বাঘেদের বড় ঠাকুর্দা। যথারীতি জলাটার পাড়ে একটা গাছের মাচায় আমরা রাইফেল বন্দুকাদি নিয়ে উঠে বসলাম। হাতী দুটি চলে গেলো জলার দূরে প্রান্তে, হাঁকা করে ছেঁকে আসতে। সেখান থেকে সুরু করে শরবন হোগলা চুঁড়ে শেষে মড়ির কাছে পৌঁছলে মাহুতে ও হাতীতে আরোহী শিকারীরা দেখলো বাঘ মড়ি খেয়ে নিঃশেষ করে ফেলেছে। কটা বড় হাড় আর চর্ম, ভাঙ্গা মাথার খুলি [illegible] পড়বারই কথা। সকালে [illegible] শিকার করেছিলাম তখন এ বাঘ [illegible] আহার পর্ব শেষ করেছে।

খানিকটা নিরাশ মনে ও অতি ক্লান্ত শরীরে সন্ধ্যার আগেই বাংলোয় ফিরলাম। ইচ্ছা ছিল যে বাঘটি সেদিন মড়ির সবটা খেয়ে সরে পড়েছিল, পরের বছর এসে সেটির মোকাবেলা করতে হবে। কিন্তু তা ঘটে ওঠে নি।

তার পরিবর্তে সে বছর এ-ডি'র আমন্ত্রণে আমেরিকার প্রখ্যাত শিকারী ও শিকার মাসিক আউটডোর লাইফের সম্পাদক মিঃ জ্যাক ও কনোর কাশীপুরে এসে বাঘটিকে ছুটন্ত অবস্থায় অনন্য দক্ষতায় তাঁর ·৩৭৫ ম্যাগনাম 'ওয়েদারবির' বুলেটে ধরাশায়ী করেন। নাকের ও লেজের ডগায় খুঁটি পোঁতা মাপ দশ ফুট দু ইঞ্চি।

কাশীপুরের গোখাদক গোষ্ঠীর বৃদ্ধ পিতামহ বাঘ শার্ট পরা একহারা চেহারা যেন লঘু-কালো পাথরে খোদাই করা অবয়ব। ছাল ছাড়ানোর ছুরির কোপের সঙ্গে তার বাহুর ও বুকের মাংস পেশী ছন্দিত হচ্ছে। হঠাৎ আমার মনে হলো সে যেন আমার দোনলা রাইফেলের দোসর, বিশ্বরচায়িতার ছিমছাম লাগসই হাতিয়ার। সরু হয়ে আসা পা-জোড়া যেন রাইফেলের সরু হয়ে আসা জোড়া নলি, কোমরের খাঁজ যেন রাইফেলের বাঁটের ভাঁজ, সুডোল ঊর্ধ্বাঙ্গ যেন রাইফেলের কুঁদো। দেহের রংও স্টীল—নীল। এটা অবশ্য নিতান্তই আমার মনের খেয়াল। কিন্তু ওর সারা দেহ জুড়ে এমন একটি সঙ্গতি ও সুষমা ছিল যা দেখে সুনির্মিত রাইফেলের সঙ্গতি ও সুষমার কথা আমার মনে উদয় হয়েছিল।

জামগাছের ডালে একটা জোরদার বিজলী বাতি টাঙ্গানো হয়েছিল, সন্ধ্যা হয়ে আসায় তা জেলে দেওয়া হলো। মাথার ছাল ছাড়াবার সময় খুলির পেছনে ছালের নিচে থেকে খেঁতলানো বুলেটটি বার করে আমার হাতে দিয়ে নবিরাজা বলল, 'বিলকুল সাবাস মার হুয়া থা!' হাঁকাই করা হাতীর পিঠে বসে সে আমার শিকার দেখেছিল। চোয়ালের গণ্ডাস্থি ভেদ করে বুলেট মস্তিষ্কের ভেতর দিয়ে গিয়ে খুলি পার হয়ে চামড়ার নিচে আটকে ছিল। বুলেটটা হাতে নিয়ে খুশি হয়ে তাকে বললাম,—বেশ ত, আসছে বছর আবার আসা যাবে বাঘ মারতে। হাত দুটি নামিয়ে রেখে অত্যন্ত বিমর্ষমুখে সে বলল,—কাশীপুরে ওদের দানাপানি শেষ হয়েছে। এবার তাদের এ শহর ছেড়ে চলে যেতেই হবে। আমার প্রশ্নে সে বলে গেল তার দুর্দশা ও দুঃখের কাহিনী, তার স্ত্রী মুনিযার শরম, লাঞ্ছনার সব কথা। বিভক্ত পাঞ্জাবের বাস্তুহারা পাঞ্জাবী জাঠের মেয়ে মুনিয়া।

পাঞ্জাব ত্যাগ করে আসার সময় পথ-কষ্টে ও রোগে পথেই তার মার মৃত্যু হয়। মুনিয়ার বাবাও মুনিয়া আশ্রয় পায় কাশীপুরের উদ্বাস্তু পত্তনিতে। নিকটেই নবিরাজার বাবা আলি রাজার বাসা। আলি রাজা ও তার ছেলের কোন সাম্প্রদায়িক গোঁড়ামী ছিল না। দেশওয়ালী সকল শ্রেণীর

সঙ্গেই তাদের অবাধ মেলামেশা ও ভ্রাতৃ-ভাব ছিল। মুনিয়ার বাবা ও জ্ঞাতীরা কাশীপুরে এলে আলি রাজা তাদের বাসা নির্মাণ কাজে, চাষের বলদ লাঙ্গল সরঞ্জাম প্রভৃতি যোগাড় করে দিতে সাহায্য করত। এদিকে জেনানা শূন্যে আলি রাজার ঘরে এসে মুনিয়া গৃহস্থালীর নানাবিধ কাজে সাহায্য করতে থাকে। আস্তে আস্তে নবি রাজার সঙ্গে তার আসনাই আরম্ভ হয়। পরিশেষে বাবার আশ্রয় ত্যাগ করে স্বেচ্ছায় মুনিয়া নবি রাজাকে স্বামীত্বে বরণ করে। মুনিয়ার বাবার এ বিয়েতে অমত ছিল না, শুধু আত্মীয়-স্বজনের অমত ও বিরোধিতার ভয়ে বাবার আশ্রয় ছেড়ে,—মুসলমান ধর্মে দীক্ষা নিয়ে নবিকে বিয়ে করে। তারপর থেকে সুরু হয় তাদের ওপর মুনিয়ার জ্ঞাতীবর্গের নানা জুলুম-বাজী ও ভয় প্রদর্শন। তারা চায় মুনিয়া নবি রাজাকে ত্যাগ করে চলে আসুক। মুনিয়ার পণ জীবন থাকতে নয়। এর ফলে, একদিন নবি রাজা আর একদল দিল্লী আগত শিকারীদের নিয়ে বাঘ শিকারে গেলে, মুনিয়ার জ্ঞাতীভাই কয়েকজন ওদের বাসায় চড়াও হয়। আলি রাজাও গিয়েছিল তার আপন কাজে। মুনিয়াকে একলা পেয়ে এদের দু-তিনজনে বলপ্রয়োগে ধর্ষণ করে। একটা টাঙ্গি দিয়ে তাদের একজনকে সে আঘাত করতে সমর্থ হয়। কিন্তু সে তেমন অনিষ্টকর হয়নি। সংখ্যায় তারা ছিল বেশী, অল্প আয়াসে তারা মুনিয়াকে দমন করে এ একে একে দু-তিনজনে চরম বে-ইজ্জত করে। মুনিয়া কামড়ে ও অস্ত্রাঘাতে প্রত্যেকের রক্তপাত করে, কিন্তু রোধ করতে অপরাগ হয়। নবি রাজা বাসায় ফিরে এসে সব শুনে থানায় নালিশ লেখায়। আদালতে মামলা হয়, কিন্তু জাঠ জ্ঞাতীদের মিথ্যা সাক্ষ্য ও কতকটা পুলিশের কারসাজিতে ফরিয়াদি পক্ষের সাজানো মামলা এই রায় হয় ও আসামীরা বেকসুর খালাস পায়। এরপর কাশীপুরে বাস করা নবি রাজা ও মুনিয়ার পক্ষে প্রাণহানিকর হবে। রায় বেরিয়েছে মাত্র কিছুদিন আগে। এর মধ্যে আতংক দেখা দিচ্ছে নানাভাবে।

শুনে নিষ্ফল উত্তেজনা ও ক্ষোভে জর্জরিত হয়ে কিছুকাল বসে রইলাম। রাত্রি দশটা বেজে গেলো ছাল ছাড়ানো শেষ হতে। নবি রাজা বিদায় চাইলে তাকে বললাম—পরের দিন সে যেন বাংলোয় এসে তাদের বাসায় আমায় নিয়ে যায়। তার পাওনা বখশিসও তখন দেব ও অমন যার মনোবল ও সংকল্প নিষ্ঠা সেই মেয়ে মুনিয়াকে দেখে আসবো।

(১১)

সেদিনের চিত্র স্পষ্ট করে মনে মুদ্রিত হয়ে আছে। খাপরার চালের ইঁটের ছোট একটি কুটির। সামনে একটু বারান্দা। সকালে এক দফা হীরা সিং, নবি রাজা মাহুত দুজন আর শিকারী অনুচরদের তাদের পাওনা রোজ, বখশিস আর একটি করে কম্বল দিয়ে বিদায় করা হয়েছে। বিকেলে একটু তাপ কমলে নবি আমায় নিয়ে গেছে তাদের বাসায়। ঘরের ভেতর নিয়ে গিয়ে আমায় পরিষ্কার সুজনি পাতা এক চারপাইয়ে বসতে দিলো। কটি বালুসাই রাখা প্লেট হাতে নিয়ে তার স্ত্রী মুনিয়া ভেতর থেকে এসে আমার সামনে এক টুলে রেখে দু-হাত জোড় করে নমস্কার করলো। জাঠ মেয়ের দেহে উদ্ধত যৌবনের বড় লাবণ্য। নবি রাজার হাতে চায়ের পেয়ালা পিরিচ।

দুষমণরা তার ওপর হামলা করেছে কিন্তু সে সুবিচার পায়নি বলে কত দুঃখিত হয়েছি। আর তাদের সঙ্গে সে লড়েছে, তাদের আহত করেছে,—এমন সাহসিকাকে দেখতে ও সাবাস জানাতে এসেছি,—বললাম মুনিয়াকে। আনত মুখে তার একটা ম্লান ছায়াপাত হলো। বললো, একলা সে ওই জানোয়ারদের রোখ সামলাতে পারেনি। জখম হয়েছে। কিন্তু জিৎ তারই হয়েছে। স্বামীর সঙ্গে বিচ্ছেদ ঘটাতে পারেনি।

একটু চুপ করে থেকে সে বললো,—আদালতে সুবিচার পাওয়া যায়নি বলে তার দুঃখ নেই। তার আপশোষ ধর্ম নিয়ে হিন্দু-মুশ্লিমের বিভেদ দুনিয়ার এই সেরা দেশের রাষ্ট্রীয় জীবন, তেমনি ব্যক্তিগত জীবনকে কী বিপুল বিপর্যস্ত ক'রে চলেছে। এই সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ হিন্দুস্থানকে ভেঙ্গে ছারখার করে দিলো। সেই একই বিদ্বেষ তার ব্যক্তিগত জীবনকে চুরমার করে দিতে চায়। কিন্তু ধর্ম নয় মানব প্রীতি, প্রেমই বড় তার এই আদর্শ চ্যুতি ঘটাতে পারেনি। সে জাঠ চাষীর মেয়ে হলেও স্কুলে লেখাপড়া শিখেছে। ইতিহাসের কেতাবে পড়েছে পাঠান মোগল যখন হিন্দুস্থানে সাম্রাজ্য গড়েছিল তখন এ বিদ্বেষ মাথা তুলে ওঠেনি। অনেক জাতি অনেক ধর্ম-বিশ্বাসের সমন্বয় [illegible] এখানে বলেই এদেশের গৌরব। [illegible] বাদশা হিন্দু মুশ্লিম নির্বিশেষে [illegible] হারেমে রমণী বরণ করেছিলেন। [illegible] জাতধর্মনির্বিশেষে মন্ত্রীত্ব ও সেনানায়ক পদে বসিয়েছিলেন। স্থাপত্যে, চিত্রে, শিল্পে, সংগীতে ও নানা বিষয়ে হিন্দু মুশ্লিম অবদান সমন্বয় হয়েছিল। [illegible] ধর্মে হিন্দু-মুশ্লিম ধর্ম সমন্বয়ের [illegible] হয়েছে। বৈষ্ণব ধর্মের উৎপত্তি ও কবীরের ছোটখাটো ধর্ম-সংস্কারও মুসলিম [illegible] স্পর্শ ও ধাক্কা লাগার ফল। মুনিয়া [illegible] গেলো এসব কথা তার স্কুলের ইতিহাসের শিক্ষক ক্লাসের ছাত্রীদের বুঝিয়ে [illegible] ছিলেন। আর ইংরেজ বণিক এসে [illegible] অধিকার করে তাদের স্বার্থে [illegible] মুসলিম সমন্বয় বিনাশ [illegible] ভাঙ্গাতে আজ দেশ নায়কদের [illegible] বিভাগ সম্পন্ন করে [illegible] সর্বনাশ সাধন করলো। [illegible] সমন্বয়,—হিন্দু-মুসলিম ঐক্য [illegible] এতদিনে সুসাধিত হয়ে [illegible] বৈজয়ন্তী ওড়াতে পারতো। [illegible] কখনও তা হবে?

মুনিয়ার [illegible] কথা শুনে [illegible] হতভম্ব হয়ে রইলাম। উত্তর দিতে [illegible] নীরবে ফিরে এলাম।

আমার গল্প বলা শেষ হলো [illegible] বললেন,—ওদের তারপর কী হলো?

বললাম, পরের বছরে আবার [illegible] আমন্ত্রণে কাশীপুরে গিয়ে শুনেছিলাম [illegible] রাজা মুনিয়া ও নবির বাবা আলি [illegible] কাশীপুর ত্যাগ করে গেছে।

কৃত্রিম মুক্তা

বিজ্ঞান প্রিয়

অন্ধকারময় শুক্তির গর্ভ থেকে মুক্তি পেয়ে মুক্তা কবে যে আলোর মুখ দেখেছিল, আর কবেই বা সে মানুষের দৃষ্টির গোচরে এসে তাকে মুগ্ধ করেছিল, অথবা কে যে তার আবিষ্কারক আমরা তা জানি না; তবে, এ-কথা বলতে পারি—হীরা যদি হয় রত্নরাজ, মুক্তা রত্নরানী।

সাগর-মণি মুক্তা হলো অন্যতম বিরল রত্ন বা জহরত। আমাদের শুধু বলি কেন, বোধহয় সকল দেশের সমুখ প্রাচীন সাহিত্যে, মুক্তার উল্লেখ পাওয়া যায়। পুরাণাদি প্রাচীন গ্রন্থে ভূষণের উপাদানরূপে মুক্তার কথার ছড়াছড়ি। দেবদেবীর বর্ণনামূলক স্তোত্রে বন্দনায় যেমন মুক্তাভরণের উল্লেখ আছে, তেমনি প্রাচীন চিত্র ও ভাস্কর্যে দেখা যায় মুক্তার অলঙ্করণ। মুক্তার অপর নাম মৌক্তিক বা মোতি। আয়ুর্বেদ চিকিৎসায় মুক্তাকে তেজস্কর ভেষজের উপাদান হিসাবেও ব্যবহার করা হয়। মুক্তাভস্ম-কে আধুনিক 'কোরামিন'-এর সঙ্গে বোধহয় তুলনা করা যেতে পারে। তবে, মুক্তার সবচেয়ে আদর নারীর সম্ভ্রান্ত অলঙ্কারের উপকরণ হিসাবে। তার একটি বিশেষ কারণ হয়তো এই যে, একমাত্র মুক্তাই অদ্বিতীয় রত্ন যা সকল বয়সের সকল গাত্রবর্ণের মেয়েদের গহনায় মানানসই হয়।

এ কাহিনী হয়তো অনেকেরই জানা যে, 'নীল নদের রানী' ক্লিওপেট্রা মুক্তাকে সির্কাতে গলিয়ে পান করেছিলেন তাঁর অনিন্দ্য রূপকে উজ্জ্বলতর ও অধিকতর আকর্ষণীয় করবার জন্যে। তাঁর ইয়ারিঙের পৃথিবীর বৃহত্তম দুটি মুক্তার একটিকে ঐ ভাবে ব্যবহার করে অপরটি তিনি দিয়েছিলেন তাঁর প্রেমিক মার্ক অ্যান্টনিকে। তখনকার দিনে সেটির মূল্য প্রায় পৌনে চার লক্ষ পাউন্ড অর্থাৎ প্রায় সাড়ে সাতষট্টি লক্ষ টাকা।

আধুনিক যুগে রানী দ্বিতীয় এলিজাবেথ তাঁর বিয়ের সময় যে গাউনটি পরেছিলেন সেটি নানা বর্ণের নানান আকারের মুক্তাখচিত। তিনি তাঁর মা'র কাছ থেকে সে সময় যে নেকলেসটি যৌতুক পেয়েছিলেন সেটি মানানসই নিখুঁত পঁয়তাল্লিশটি মুক্তার তৈরি।

ভূষণ-প্রিয়ারা সাধারণত মুক্তাপ্রেমী। জাপানে যে-সব ভ্রমণকারিণী যান • তাঁদের অধিকাংশেরই বাসনা থাকে সেখান থেকে মুক্তা কেনবার। কৃত্রিম উপায়ে সৃষ্ট মুক্তার (কালচার্ড পার্ল) জন্যে জাপান বিখ্যাত। জাপানের নারীদের মুক্তার হার, আংটির শখ সবচেয়ে বেশি। সেখানকার পুরুষদের মধ্যেও নেকটাইয়ে, জামার বোতামে মুক্তা ব্যবহার করবার প্রবণতা কম নয়।

জাপানের এই কৃত্রিম মুক্তার আবাদ বা উৎপাদন প্রক্রিয়াও রীতিমত কৌতূহলউদ্দীপক। মুক্তাকে সাধারণত তিন শ্রেণীতে ভাগ করা হয়—স্বাভাবিক বা আসল, কৃত্রিম (কালচার্ড) আর নকল। রত্ন বললে আমরা যা বুঝি, সে অর্থে কৃত্রিম মুক্তাও রত্ন; তবে, এর দাম আসলের দামের তুলনায় অনেক কম। সেই জন্যে এর জগৎ-জোড়া চাহিদা এবং জাপানই তার প্রধান যোগানদার।

এই কৃত্রিম মুক্তার জন্মস্থান বা প্রজনন ক্ষেত্র দক্ষিণপূর্ব জাপানের শিমা উপদ্বীপের অদূরবর্তী মাই এলাকায়। কৃত্রিম মুক্তা আবাদের পথ-প্রদর্শক ছিলেন কোকিচি মিকিমোতো (১৮৫৮-১৯৫৪)। কেমন করে শুক্তি বা ঝিনুকের গর্ভে মুক্তার জন্ম হয় সে-সম্বন্ধে বিশদ জ্ঞান অর্জনের পর তিনি এই কাজে লিপ্ত হয়েছিলেন। বালির অতি ক্ষুদ্র কণা বা উত্তেজক অনুরূপ কোনো বাইরের বস্তু শুক্তির ভিতরে ঢুকে গেলে তাকে ঘিরেই সৃষ্টি হয় মুক্তার। এই তথ্য উদ্ঘাটন করবার পর মিকিমোতো ঠিক করলেন—সজীব শুক্তির মধ্যে একটি অতি ক্ষুদ্র বিন্দুবৎ কোনো কেন্দ্রী-অংশ (নিউক্লিয়াস) প্রবেশ করিয়ে শুক্তিকে সমুদ্রে ছেড়ে রাখলে হয়তো তার ভিতরে আসল মুক্তার সদৃশ-মুক্তা গড়ে উঠতে পারে। এই পদ্ধতিতে পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর মিকিমোতো সাফল্য লাভ করলেন ১৮৯০ খৃষ্টাব্দে একটি অর্ধ-গোলকের আকারের মুক্তা সৃষ্টি করে। ১৯০৬ খৃষ্টাব্দে নিখুঁত গোলাকার মুক্তার সৃষ্টিতে সফলকাম হয়ে পৃথিবীতে সর্বপ্রথম তিনিই জাপানকে দিয়ে গেলেন কৃত্রিম মুক্তা উৎপাদনরূপ শিল্পকর্মটি।

এখন জাপানে মুক্তা-আবাদীর সংখ্যা প্রায় চার হাজারের কাছাকাছি এবং তাদের সমগ্র উৎপাদনের অর্থ-মূল্য বহু কোটি ইয়েন। এখানকার কৃত্রিম মুক্তা পৃথিবীর দশ-বারোটি দেশে, প্রধানত যুক্তরাষ্ট্র এবং ইউরোপে রপ্তানী হয়ে থাকে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর মিকিমোতো গর্বের সঙ্গে বলেছিলেন, "আমার মুক্তার পৃথিবীর সকল নারীর কণ্ঠহার হবে"

মুক্তার জন্ম

রঙ অনুযায়ী মুক্তার শ্রেণীকরণ বিশেষ নৈপুণ্যের কাজ

যে জাতের শুক্তি বা ঝিনুকের মধ্যে স্বাভাবিক মুক্তার জন্ম, কৃত্রিম মুক্তার জন্যে সেই জাতের ঝিনুকের চাষ করা হয়। গ্রীষ্মকালে সমুদ্রে যখন ঝিনুক-পোনা অর্থাৎ খুদে বাচ্চা ঝিনুক ভেসে বেড়ায় তখন তাদের সংগ্রহ ক'রে তারের খাঁচায় দু-তিন বছর রাখা হয় সমুদ্রের জলেই। সে ঝিনুকের ওজন ২৫ থেকে ৪০ গ্রামের মতো হ'লে সেটি মুক্তার জননী অর্থাৎ মুক্তার জন্যে গর্ভ ধারণের যোগ্য হয়। তখন সেই ঝিনুকের মুখ এক সেন্টিমিটারের মতো ফাঁক ক'রে তার যে অংশে প্রজনন ক্রিয়া হয় সেখানে অতি ক্ষুদ্র একটি অংশ কেটে নিয়ে সেই খাঁজে একটি নিউক্লিয়াস বসিয়ে দেওয়া হয়। মিসিসিপি নদীতে এক রকম শ্বিপুটক (biva lve) মাছ, ক্ল্যাম (clam) পাওয়া যায়, তারই খোলা থেকে কয়েক মিলিমিটার ব্যাসার্ধের গোলাকার অংশ কেটে নিয়ে সেটিকে নিউক্লিয়াস হিসাবে ব্যবহার করা হয়ে থাকে। আমাদের চোখে বালিকণা সদৃশ সূক্ষ্ম কিছু পড়লে যে অস্বোয়াস্তিকর যন্ত্রণা হয়, ঐ নিউক্লিয়াস ঝিনুকের ভিতরে সেই রকম যন্ত্রণার সৃষ্টি করে; তার ফলে অতি স্বচ্ছ রস ক্ষরিত হয়ে সূক্ষ্ম সরের আবরণ পরতে পরতে পড়তে থাকে সেই নিউক্লিয়সকে বেষ্টন করে; এবং ক্রমে ক্রমে তা উজ্জ্বল চমৎকার একটি মুক্তায় পরিণত হয়।

ঝিনুকের ভিতরকার শাঁসের একটি নির্দিষ্ট জায়গায় ঐ স্বচ্ছ রসের মতো পদার্থ ক্ষরিত হয়। একটি পরিপুষ্ট মুক্তা-ঝিনুকের ভিতরকার ঐ রসক্ষরণকারী অংশ থেকে প্রায় পাঁচ মিলিমিটার বর্গ পরিমাণ শাঁস কেটে কৃত্রিম মুক্তার শুক্তির ভিতরে অনুরূপ অংশে সেটিকে জুড়ে দেওয়া (গ্রাফ্‌ট করা) হয়। সেটি যখন কৃত্রিম মুক্তার ঝিনুকের মধ্যে জুড়ে গিয়ে স্বাভাবিক হয়ে যায় তখন সেই ঝিনুকের ভিতরে রসক্ষরণের কাজ দ্রুততর চলে। এই সূক্ষ্ম অস্ত্রোপচার এবং শাঁস বসানোর কাজে (গ্রাফটিং) জাপানীদের দক্ষতা অসাধারণ। অস্ত্রোপচার ও গ্রাফ্‌টিং-এর পর ঝিনুকগুলিকে তারের খাঁচায় রেখে খাঁচাগুলিকে ভেলার সাহায্যে সমুদ্রের জলে পাঁচ মিটার গভীরে ঝুলিয়ে রাখা হয়।

যদিও এক বছরের মধ্যেই এই ঝিনুক থেকে বাজারে ছাড়বার মতো মুক্তা পাওয়া যায়, তবে, মাঝারি বা বড়ো আকারের মুক্তা পেতে হলে ঝিনুককে দুই থেকে চার বছর রাখা হয় জলের তলায়। সমুদ্রের যেমন পরিবেশে মুক্তা-ঝিনুক স্বাভাবিক অবস্থায় থাকে, কৃত্রিম মুক্তার ঝিনুকের জন্যেও তেমনি পরিবেশ তৈরি করে দিতে হয়; এবং এদের পুষ্টি, বৃদ্ধি ও স্বাস্থ্য-রক্ষার দিকেও কড়া নজর রাখা হয়ে থাকে। যেসব সামুদ্রিক আগাছা প্রভৃতি ঝিনুকের মুখ আটকে ফেলে তার পুষ্টি ও বৃদ্ধি ব্যাহত করে সেগুলিকে হাতে ক'রে সন্তর্পণে ছাড়িয়ে দিতে হয় নিয়মিত। যতদিন না ঝিনুক পূর্ণাবয়ব প্রাপ্ত হচ্ছে ততদিন এই রকম পরিচর্যার আবশ্যক। মুক্তাগর্ভ পূর্ণাবয়ব ঝিনুক জল থেকে তোলবার পর তা-থেকে মুক্তাটি বের করে পরিষ্কার জলে ধুয়ে নিলেই তা ব্যবহার উপযোগী হয়—পালিস করার বা কাটার দরকার হয় না; হারে গাঁথবার জন্যে কেবল সূক্ষ্ম ছিদ্র করে নিতে হয়। মুক্তায় ছিদ্র করবার তুরপুনও অতি সূক্ষ্ম।

মাঝে মাঝে ঝিনুক মড়কও দেখা দেয়—তাতে অনেক ঝিনুক নষ্ট হয়ে যায়-; অনেক ঝিনুক এই সময় তার ভিতরকার নিউক্লিয়সটা উগরে দেয়। তার ফলে কৃত্রিম মুক্তার জন্যে পালা-ঝিনুকের প্রায় অর্ধেক থেকে মুক্তা পাবার আশা থাকে না।

সাধারণত দশ হাজার পালন করা বা পালা ঝিনুকের মধ্যে চার হাজার ঝিনুক থেকে বড়ো আকারের মুক্ত পাবার সম্ভাবনা থাকে। সেই চার হাজার মুক্তার মধ্যে বাজারে ছাড়বার মতো বেরোয় শতকরা দশ থেকে পনরটি। বাকি যা থাকে, তা থেকে, যে-মুক্তাকে সাগর-রত্ন বলা হয় তেমনটি কদাচিৎ পাওয়া যায়। এইভাবে চাষ-করা মুক্তার শতকরা নব্বই ভাগ বাইরে রপ্তানি করা হলেও তার চাহিদা বেড়েই চলেছে।

কৃত্রিম মুক্তা কেনবার সময় তা ভালো জাতের কিনা চেনবার সচরাচর পাঁচটি লক্ষণ দেখা হয়। প্রথম হলো—ঘনত্ব; কেন্দ্রী অংশ—যাকে 'কোর' বলা হয় তার উপর সূক্ষ্ম ঝিল্লির আবরণ যতো পুরু, হবে মুক্তা ততো উঁচুস্তরের বলে গণ্য হবে। সাধারণত ঐ আবরণ ·১৫ মিলিমিটারের কম পুরু হলে সে মুক্তাকে বিক্রি বা রপ্তানির যোগ্য মনে করা হয় না। মুক্তার আবরণের ঘনত্ব পরিমাপ করবার এক রকম যন্ত্রও আছে; তবে পাকা জুহুরীরা দেখেই তা বলতে পারেন। দ্বিতীয় লক্ষণ—ঔজ্জ্বল্য বা দীপ্তি। এই দীপ্তিই মুক্তার জীবন, অর্থাৎ ঐটির উপরই নির্ভর করে তার দাম। ঝিল্লির আবরণের ঘণত্ব যতো বেশি হয়, মুক্তার দ্যুতিও হয় ততো বেশি। অন্য শ্রেণীর মুক্তার সঙ্গে পাশাপাশি রেখে মেলালে, মুক্তার দীপ্তির তারতম্য বোঝা যায়। তৃতীয় দ্রষ্টব্য হলো তার গঠন। নিটোল গোলাকার গড়নই মুক্তার শ্রেণী বা ঘরানা নির্দিষ্ট করে দেয়। অবশ্য শিশিরবিন্দু অথবা অর্ধ-গোলক আকারের মুক্তারও আদর কম নেই—যথাক্রমে কানের দুল আর জামার হাতার বোতামে ঐগুলি ব্যবহার করা হয়। চতুর্থ লক্ষণ—মুক্তার বর্ণ। নির্ভেজাল এক-রঙা মুক্তা নেই বা হয় না বললেই চলে; রকমারি রঙের মিশ্রণে সৃষ্টি হয় মুক্তার রঙ। সচরাচর সাদা, রুপালী, ফিকে লাল, নবনী বা ক্রিম, সোনালি আর নীল রঙের মুক্তা পাওয়া

যায়—রঙের মোটামুটি সীমারেখার হিসাবে। কদাচিৎ কালো রঙেরও মুক্তা পাওয়া যায়।

মুক্তার বর্ণ নির্ধারণে ক্রেতার (নিজের) চোখের, চুলের বা গাত্রবর্ণের সঙ্গে মানানসই হয় সেইমতো মুক্তা বাছাই করাই রীতি। আবার, দেশবিশেষের লোকের এক-একটা বিশেষ রঙের দিকে ঝোঁক দেখা যায়। যেমন, ইওরোপ এবং জাপানেও ফিকে লাল রঙটাই লোকের পছন্দ। যুক্তরাষ্ট্র এবং জাপানের কোনো কোনো অঞ্চলে সাদাটাই লোকে পছন্দ করে। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দেশগুলিতে সোনালি রঙের মুক্তাই জনপ্রিয়।

মুক্তার রঙ নির্ভর করে সমুদ্রের অবস্থা আর ঝিনুক-বিশেষের উপর। যেমন, মাই অঞ্চলের তোবা জেলার মুক্তায় রুপোলি আর ফিকে লালের প্রাধান্য বেশি। ওয়াকাইয়ামা এলাকায় জলের তাপ অপেক্ষাকৃত বেশি—সেখানে ক্রিম বা নবনী রঙের মুক্তাই জন্মায় বেশি। মুক্তার রঙ সম্বন্ধে বোধহয় এই কথা বললে অত্যুক্তি হবে না যে, মানুষের মুখ যেমন হুবহু এক কদাচিৎ হয়ে থাকে—মুক্তার রঙও তেমনি।

মুক্তা বাছাইয়ের ব্যাপারে রঙের পর দেখতে হয় তার গলদ বা খুঁত। অন্যান্য রত্নেও যেমন খুঁত থাকে, মুক্তাতেও থাকে। তবে মুক্তায় খুঁত বা গলদ থাকার ব্যাপারটা অপরিহার্য, অবশ্য তা হয়তো এতো সূক্ষ্ম যে সেটা ধরা খুব শক্ত।

আভরণের আনুষঙ্গিক হিসাবে মুক্তার চলন বহু প্রাচীনকাল থেকেই যে আছে তার অনুমান করতে পারি প্রাচীন গ্রন্থাদিতে মুক্তার গয়নার উল্লেখ থেকে। বর্তমান সভ্যতার কালে, মিশরে মুক্তার হারের ব্যবহার শুরু হয়, অনেকে অনুমান করেন, ষোড়শ শতকে—ষোড়শ থেকে অষ্টাদশ শতক পর্যন্ত সময়কে মিশরে চটকদার চারুকলার যুগ বলা হতো। এই সময়ে অসম-গড়নের মুক্তার হারের চাহিদা ছিল সেখানে বেশি। কিন্তু এখন, নিটোল গোলাকার সুষম গড়নের প্রখর প্রভা-বিচ্ছুরণকারী সরেস বলে গণ্য হয়ে থাকে এবং হারের জন্যে তার চাহিদাও বেশি।

হারের গড়নে সচরাচর তার কেন্দ্রের মুক্তাটি হয় সবচেয়ে বড়ো, তার দুদিকে থাকে ক্রমশ ছোট আকারের;—ধাপে ধাপে ছোট হতে থাকে। আবার সব সমান গড়নের মুক্তার হারও অনেকে পছন্দ করেন; কণ্ঠহার—সমান আকারের মুক্তায় গাঁথা, গলার সঙ্গে তা লেপ্টে থাকে। আংটিতে মুক্তার ব্যবহারেও মিশরীয়রাই নাকি পথপ্রদর্শক। আধুনিককাল পর্যন্ত তা সমাদরের সঙ্গে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। জ্যোতিষী মতে নাকি জুন-মাসে জাতকের ধারণ করবার রত্ন হচ্ছে মুক্তা।

স্বাভাবিক মুক্তা প্রসবকারী ঝিনুকেই কৃত্রিম মুক্তারও জন্ম বলে তার দীপ্তি বজায় রাখবার জন্যে পৃথকভাবে কোনো যত্ন নেবার দরকার হয় না, নরম কাপড়ে পরিষ্কার করে মুছে দিলেই তার রূপ আর ঔজ্জ্বল্য ঠিক থেকে যায়। মুক্তার হার নিয়মিত পরা হলে সেটা বছরে দুবার নূতন সুতোয় গেঁথে নিলে হঠাৎ সুতো ছেঁড়বার আশঙ্কা থাকে না। আংটিতে বসানো মুক্তাকে মাঝে মাঝে নরম ব্রুশের সাহায্যে সাবান জল দিয়ে পরিষ্কার করে নিতে হয়; তাহলে তাতে ময়লা জমতে পারে না।

মুক্তার মধ্যে থাকে শতকরা আশি ভাগ কার্বনিক য়্যাসিড কাজেই মুক্তার গয়নাকে ভিনিগার বা গন্ধক থেকে সাবধানে রাখতে হয়। রান্নার সময় অথবা উষ্ণ প্রস্রবনে স্নানের সময় মুক্তার গয়না খুলে রাখাই নিরাপদ। প্রত্যক্ষ তাপ থেকেও মুক্তাকে দূরে রাখা দরকার।

স্বাভাবিক বা আসল মুক্তা আর কৃত্রিম উপায়ে সৃষ্ট বা 'কালচার্ড' মুক্তায় তফাত মাত্র একটি জিনিসে—কৃত্রিম মুক্তায় 'কোর' বা কেন্দ্রী অংশটি, যাকে ঘিরে ঝিল্লির পরদা পড়তে থাকে পরতে পরতে, সেটিকে প্রবেশ করানো হয় ঝিনুকের ভিতরে; তার ফলে ঝিল্লির আবরণ সেই কোরের উপর দ্রুততর গতিতে পড়ে থাকে। দীপ্তি আর স্থায়িত্বের দিক থেকে আসল ও কৃত্রিম এই দুই শ্রেণীর মুক্তাই সমান।

আসল ও কৃত্রিম মুক্তা থেকে নকল মুক্তা চিনে বার করা বেশ কঠিন। কারণ, আসল ও কৃত্রিম মুক্তার যাবতীয় গুণ, এমন কি তার খুঁতও রাখা হয় নকল মুক্তায়। তৈরি করা হারের মুক্তাগুলো নকল কিনা, একটু খুঁটিয়ে দেখলেই তা ধরা যায়। আসল বা কৃত্রিম মুক্তা হুবহু এক রঙের বা একই গড়নের হয় না, খুব সূক্ষ্ম তফাত থাকেই; কিন্তু নকল মুক্তার রঙ আর গড়ন একই রকমের হয়। তৈরি-করা হারে মুক্তা পাশাপাশি একসঙ্গে দেখা যায় তাই নকল কিনা ধরা শক্ত হয় না। কিন্তু একটিমাত্র মুক্তার বেলা চেনা খুবই কঠিন।

কৃত্রিম উপায়ে মুক্তার অর্থাৎ 'কালচার্ড' মুক্তার আবাদীরা সাধারণত আকার অনুসারে মুক্তাকে পাঁচ শ্রেণীতে ভাগ করে থাকেন : যেমন, ব্যাসার্ধে তিন মিলি-মিটারের কম, তিন থেকে পাঁচ মিলিমিটারের মধ্যে, পাঁচ থেকে ছয় মিলিমিটার, ছয় থেকে আট মিলিমিটার, এবং আট মিলিমিটারের উর্ধ্ব ব্যাসার্ধের। নয় মিলিমিটারের বেশি ব্যাসার্ধের মুক্তার সৃষ্টি করা অত্যন্ত কঠিন ব্যাপার, তার দামও হয় সবচেয়ে বেশি। অবশ্য, মুক্তাচাষীরা বারো মিলিমিটার ব্যাসার্ধের মুক্তাও সাফল্যের সহিত উৎপাদন করেছেন। এ-পর্যন্ত নাকি কৃত্রিম মুক্তার আকারের ঐ সীমা অনতিক্রান্তই রয়েছে।

সমুদ্রে মুক্তা আহরণ দৃশ্য

মুক্তাকে যন্ত্র সাহায্যে ব্যবহারোপযোগী করা হচ্ছে

চাই

গণেশ বসু

কেউ কেউ রেখে যেতে চায়
যেমন চাষীর ঘাম শিরার লবণ স্বাদ করে তোলে চারা শস্যবতী
খর মৃত্তিকার বুক চিরে রি রি যন্ত্রণার রাগে;
কেউ কেউ রেখে যেতে চায়
যেমন বন্দীর চোখ অনির্বাণ জ্বলে শুধু কুরে কুরে খায়
অবাধ্য স্মৃতিকে, পোষে তৃষ্ণা, অসহায় ভালোবাসা;
কেউ কেউ রেখে যেতে চায়
যেমন পিতার ভার সন্ততির কাঁধ ছুঁয়ে পরম্পরা বাড়ায় গজাল,
মৃত দুঃস্বপ্নের ভিড় ঠেলে ঠেলে দিগন্ত উজ্জ্বল;
কেউ কেউ রেখে যেতে চায়
যেমন মায়ের ডুকরে কেঁদে ওঠা গলা টিপে মেরে ফেলে নিজেরই ছেলেকে
পাথর চাপিয়ে বুকে হা হা স্পর্ধা দীর্ণ আকালের;

আমি শুধু রেখে যেতে চাই এই সময় তিমিরে
সহস্বপ্নব্রতীদের না-বোঝা বুকের চাপা অভিমান ফালা ফালা মেঘের বিদ্যুতে
উপেক্ষার, সমুদ্রে ক্রুজার যেন ছোটে,
রক্তের চেয়েও নোনা স্বাদ যার সেই অশ্রু দীর্ঘশ্বাসগুলি
অশ্বারোহী শব্দের আড়ালে।

অবিরাম লিখে যেতে থাকে

আসাদ চৌধুরী

মৌন পাহাড়ের ধ্যানের দোসর হতে সাধ ছিল,
সাধু সন্ত বাঘ, বিষধর সাপ ঘুমায় পাহাড়ে।
সাধ ছিল, আমার শিক্ষক হবে বিনয়ী দরিয়া
তাঁর কাছ থেকে পাঠ নেব সংযমের গোপন চর্চার।
পাহাড় শেখায় কেমন সহজে নিসর্গ স্বীকার করে
মানুষের আনুগত্য,
নখদন্তহীন অসহায় জীবের মতন
মানচিত্রে শুয়ে থাকে—
মানুষের নির্মমতা, দর্প, স্বার্থ পৃথিবীর মুখ কালো করে—
অভিশাপ, মৌন প্রতিবাদ, করুণ বিলাপ
মহাগ্রন্থ লিখে যায়—
অবিরাম লিখে যেতে থাকে রক্তে, ঘামে, অদৃশ্য অশ্রুতে—
অথচ কী গভীর তৃপ্তির ছাপ নিসর্গের ঠোঁটে।

এ-বাঙলা ও-বাঙলা

সুতপা চক্রবর্তী

অসংখ্য নিহত মানুষের আত্মা
আমায় যেন সর্বক্ষণ ঘিরে আছে।
সেই আত্মাগুলিকে দু'হাতে সরিয়ে
কষ্টেই আমাকে পথ চলতে হয়।
অভিশাপের তপ্ত নিঃশ্বাসের স্রোত
দিনরাত আমায় অস্থির করে রাখে।
দিশেহারা হয়ে যাই প্রতি মুহূর্তে,
চলতে গিয়ে কেবলি চমকে উঠি।
দিন যাচ্ছে আর হত্যার সংখ্যাও
যেন পাহাড়-প্রমাণ হয়ে উঠছে।
এরপর পাহাড়ের স্তূপ ডিঙিয়ে
কোনোদিকে আর যাওয়াই যাবে না।

ওদিকের সবুজ বাঙলাদেশও
এখন একেবারে পুরো লালে লাল।
রক্তপলাশ আর কৃষ্ণচূড়ার মতো
চাপ চাপ রক্ত সে দেশের সর্বত্র।
তবে মানুষের আত্মার রুদ্ররূপ
বাঙলাদেশে বড়ো বেশি ভয়ঙ্কর।
সেখানকার জনতা কৃতসঙ্কল্প—
অত্যাচারের বন্যাকে এক গণ্ডূষে
পান করে নিয়ে জন্মভূমিকে তারা
মানুষের বাসযোগ্য করে তুলবে।

উপন্যাস

সুবর্ণশিখর

অমরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

।। দুই ।।

কার্সিয়াং-এর এক চা-বাগান। তন্নাই হাসপাতালের ল্যাপচো ধাত্রী রাজকুমারী। যার গোপন প্রণয়ের পরিণতি মাতৃত্বে। সকল সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের উৎস, প্রাণের সকল আশা-আকাঙ্ক্ষা নিঙড়ে সৃষ্টি, ধাত্রীর কোলে এক ফোঁটা শিশু, মেঘনাদের মা—বিলি। স্বপ্নের স্বর্গ মর্তের বাস্তবতা, এরই মাঝে বিলি। বিলির বুক ভরে আছে মায়ের স্নেহ-মমতার স্মৃতি—এই তার সম্বল। এই দিয়ে সে ঢেকে রেখেছে মেঘনাদকে।

স্বর্গের দেবতা মর্তের জননী—তারই মাঝে মেঘনাদ। মেঘনাদের বুক জুড়ে আছে মায়ের গভীর স্নেহ-মমতা।

অতীতের ঘৃণা ও গৌরব থেকে বিলি মুক্ত করে রেখেছে তার মেঘুকে। নিজের জীবনের গ্লানি ও গৌরব এবং পার্থিব সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের সব কিছুই একদিন তার ছিল। কালের পলিমাটির চাপে, হৃদয়ের তাপে সে-সব স্মৃতি পাথরের মতো জমাট বেঁধে গেছে। সে-সব কথা ভুলে থাকতে চেয়েছিল বিলি। কিন্তু সংসারে যা অনিবার্য তা ঘটবেই। তাই একদিন বিলির বিস্মৃতির স্তূপ কেঁপে উঠল। তার স্মৃতির বন্ধ লৌহ কপাটও গেল ভেঙে।

বিলির শৈশব পার হল কনভেন্টের কঠোর ডিসিপ্লিনের মধ্যে। যৌবনে মাতৃ-হারা—সংসারের কিছুই জানবার বা বোঝ-বার অবকাশ হয়নি তার। সেদিনকার রূপ-লাবণ্যের স্রোতে তার ভেসে যাবারই কথা। ভেসেই যেত। এমন সময় যেন একটা কূল পায়। জানতে পারল—দুরেথরিয়া টি এস্টেটের মালিক মিঃ জনসন তার প্রতি আকৃষ্ট। সুন্দর সুপুরুষ অবিবাহিত জনসন। বিনিদ্র রজনী সুযোগ দিল তাকে ভাবতে।

একদিকে কনভেন্টের শিক্ষা অপর দিকে অতীত। মাতার স্নেহ, কনভেন্টের শিক্ষা—মহিমান্বিত করে তুলতে চায় তার জীবনকে। তার অতীত, তার জন্মের গ্লানি—এতটুকু হয়ে পড়ে মন। সংস্কারমুক্ত শিক্ষার পরি-বেশ তাকে মুক্তির পথ দেখিয়ে দিতে পারে না। এ জীবন দিয়ে কি করবে সে। ভাবে, আর ভাবে—।

রাত্রির অন্ধকারে তার সমস্যার কোন সমাধান হল না। শরতের স্বচ্ছ প্রভাত। নীল দিগন্তে অরুণ আভা। সীমান্তের ভালে ফুটে উঠল একটি রক্তলাল তিলক। এ-যেন সেই তিলক, যা সে আশৈশব পথেঘাটে দেখে আসছে। যা সে দেখেও দেখেনি এতকাল। যে তিলকের এতখানি মহিমার কথা ভাবতেও পারেনি কখনো। একটি তিলকের মাধুর্য, একটি তিলকের গৌরব চায় বিলি।

জনসনের কাছে বিলি জানতে চাইল—সে তাকে স্ত্রীর মর্যাদা দেবে কি না?

ইংরেজের আভিজাত্যে সে পথে বাধ সাধে। হলই বা বিলি শিক্ষিতা, সুন্দরী—নাই বা রইল তার চোখেমুখে পাহাড়ীর ছাপ। তবুও ল্যাপচো নার্সের অবিবাহিত জীবনের সন্তান সে, চা-বাগানের ইংরেজ কর্মচারীর ঔরসজাত। তার সঙ্গে ইংরেজ প্ল্যান্টারের বিয়ে? অসম্ভব! প্রণয় চলতে পারে। যেদিন বিলি জনসনের ঘরে যাবে, সেদিন তার তৃপ্তির জন্য একটা ছোটখাটো পার্টিও দিতে পারে। তার ভবিষ্যতের সংস্থানও করে দেবে। এক কথায় বিয়ের সকল সুবিধা, সমস্ত সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য দিতে পারে—কিন্তু গির্জায় গিয়ে তা হলফ করতে পারবে না। ইংরেজ কথায় পটু, তার ওপর জনসনের মতো শিক্ষিত লোক। মনের কথাটা জনসন বেশ মোলায়েম করে পরিবেশন করল বিলির সামনে।

জনসনের কথায় বিলির মন গলে গেল, ভরে গেল। ভেবে দেখল নিজেদের সমাজ। তার তো নেই—তার মায়ের সমাজ, ল্যাপচো সমাজের পাঁচজনের রীতিনীতি। বিয়ে আর হয় ক'টা! দুজন পালিয়ে যায় দূর দেশে। হয় থেকে গেল সেখানে, নয়তো কিছুদিন পর ফিরে এসে রইল বস্তিতে। ক'টা লোক আর লামা সামনে রেখে, গাঁ-শুদ্ধু লোক খাইয়ে বিয়ে করে! তাই তো তার মায়েরও বিয়ে হয়নি। যৌবনে এমন একটা পুরুষ পায়নি সে, যে তার ভার নিতে পারে। সেই সমাজের লোকই নানাভাবে তাকে নিগ্রহ করে, তার জন্মের প্রতি কটাক্ষ করে।

জনসন যা দিতে চায় তার চাইতে বেশী দাবী করবার মতো কিছু খুঁজে পায় না বিলি। তবুও কি যেন একটা কথা বড় হয়ে উঠতে চায় তার মনে। কনভেন্টে পড়া বিলিও সজাগ হয়। সঙ্গে সঙ্গে মায়ের সমস্ত জীবন ভেসে ওঠে তার মনের আকাশে—মায়ের সুখদুঃখের কত ছবি। বিলির সদ্য শোকসন্তপ্ত মন বিচলিত হয়, বিচলিত মন শেষে স্থির হয়। মন থেকে উপড়ে ফেলে দেয় যত বাসনা-কামনা। সংসারে সে চায় একটু ঠাঁই—দুটি অন্ন। আর! আর চোখের সামনে তুলে ধরতে চায় কামনার প্রতিশ্রুতি। তার মায়ের কাছ থেকে সে সম্পদ সে পেয়েছে, রেখে যেতে চায় তার উত্তরাধিকারী, তার মায়ের স্নেহের উত্তরাধিকারী। এইটুকু দিয়েই সার্থক করে তুলতে চায় নিজের জীবন। তার মা এ সংসারে যা পেয়েছে তার চাইতে অনেক বেশী সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের প্রতিশ্রুতি জনসন দিয়েছে তাকে। তার ওপর বিয়ের মর্যাদা! তা সে চায় না। জনসনের অনুরোধেও না।

জনসনকে বিলি পাকা কথা দিয়ে দিলে।

কর্তব্যপরায়ণ মিষ্টভাষী জনসন। ভাল-বাসার উপযুক্ত পাত্র। প্রণয়ের রসসমুদ্রে বিলি ডুবে রইল। কেটে গেল কয়েকটা শীত-বসন্ত। শীত নয়, শরৎ নয়, হেমন্তও নয়—সে যেন একটানা বসন্ত। এক বসন্তের হাওয়া লেগে তার ইচ্ছার গাছে ফুল ফুটল। ফল ফলবে। দুজনে দিনরাত ব্যস্ত। পাশ্চাত্য দেশীয় প্রথামতে প্রসূতি ও শিশু রক্ষণা-বেক্ষণের যেসব বিধিনিষেধের পুস্তিকা বর্তমান সেসব দুজনে মিলে শেষ করল, আয়ত্ত করল। সেখানকার বিধিব্যবস্থার সঙ্গে বিলি খতিয়ে মিলিয়ে দেখল তার নিজের সমাজের ব্যবস্থা—নিজের কেন, সারা ভারতবর্ষের। ঐ শীতের স্বাস্থ্যকর দেশেই যদি এত নিয়ম মেনে চলতে হয় প্রসূতিকে, এত সাবধানে লালন-পালন করতে হয় শিশু-দের, তবে তো এখানে আরো বেশী দরকার। কত অজ্ঞ এখানকার মায়েরা, কত তাচ্ছিল্য এখানকার শিশুদের লালন-পালনে। তাই না এত শিশুরিষ্টি এদেশে—এদের মৃত্যুটা কিছু নয়, বেঁচে থাকাটাই দৈব ঘটনা। দৈবের হাতে পড়তে চায় না বিলি। তাই সে-সবের প্রত্যেকটি অক্ষর শিরোধার্য তার কাছে, সন্তানের কল্যাণ উন্মুখ বিলির কাছে।

ডাক্তার ও ধাত্রী আসে, দেখে যায় নিয়মিত-ভাবে। উপদেশ দিয়ে যায় বেদনা-বিহীন প্রসবের কথা। শেষের প্রসংগে যেসব অনুশীলনের পদ্ধতি পেল তার সংগে মিল পায় ভারতীয় যৌগিক প্রথার।

অনাগতের অভ্যর্থনার আয়োজনে ঘর ভরে যায়। সকালে বিলি চোখ খুললেই ধরে কুরুশকাঠি, পশম। ঘুমের মধ্যেও তার আঙুল চলে বোনার ভংগিতে। আশা আর মেটে না যেন। যতখানি ইচ্ছার মধ্যে তার গর্ভে সৃষ্টি হয়েছে, ততখানি ইচ্ছা যেন ফুটে উঠছে না তার অভ্যর্থনার আয়োজনে, তাকে লালন-পালনের প্রতিকল্পনার মধ্যে।

বিলির ইচ্ছার প্রতীক তখন অন্তরালে পূর্ণ অবয়ব ধারণ করেছে। দেখতে চায় সে পৃথিবীর মুখ। ঝাঁপিয়ে পড়বে সে ধরিত্রীর কোলে, দেখবে তার মায়ের মুখ। যে কোন দিন দেখবে। এমন অবস্থায় জনসনের ডাক পড়ল দেশে। জরুরী কাজ। এ অবস্থায় বিলিকে নিয়ে এতদূরে যেতে পারে না, ছেড়েও যেতে পারে না। সে যাবে না। 'কেবল'-এর ওপর 'কেবল'। বিলি জোর করে তার বিলেতে যাবার ব্যবস্থা করল। জনসন গেল, কিন্তু নিতান্ত অনিচ্ছায়।

প্রতিদিন সকালে বিকেলে বিলির হাতে জনসনের খবর—জনসনের হাতে বিলির।

হঠাৎ খবর আসা বন্ধ হল। বিলি অস্থির হয়ে জনসনের আত্মীয়-বন্ধুদের কাছে 'কেবল' পাঠাল। জবাব এল জনসনের এটর্নির কাছ থেকে :

'জনসনের সেরিব্রাল আবসেস হয়েছিল, তাতেই তার আকস্মিক মৃত্যু হয়। যদিও চিকিৎসার কোন ত্রুটি হয়নি। পরে বিস্তারিত খবর দেব।"

আকাশটা ভেংগে পড়ল বিলির মাথার ওপর। জনসনের সংগে বিলির সর্বকিছু গেল। এমন কি তার বোধশক্তিও হারাল।

বিপদ যত বড়ই হোক একটু স্থৈর্য ফিরে পাওয়া চাই। তা সে পেল—জনসনের ম্যানেজারের ব্যবহারে। আগে রোজই সে দু-চারবার বিলির খবর নিয়ে যেত, কিন্তু জনসনের মৃত্যুর খবর পাওয়ার পর আর সে এ-মুখো হয় না।

কি হল? কি হবে? কোথায় যাবে? কার কাছে?—কিছুই ভেবে পায় না সে।

পাশে এসে দাঁড়াল রাবণ আর লছমী।

।। তিন ।।

রাজকুমারী যে বাগানে কাজ করত সে বাগানের এক বৃদ্ধ সর্দারের একমাত্র মাতৃহীন সন্তান রাবণ। আশৈশব বিলির খেলার সাথী। সর্দার ছিল রাজকুমারীর বড় অনুগত, রাবণও বিলির। সর্দারের সংগে রাজকুমারীর দেখাশোনা পরিণত বয়সে। তবুও তাদের মধ্যে কোন কৃত্রিমতা ছিল না। বিলি ও রাবণের সম্বন্ধটা অন্য ধরনের।

নামেই রাবণ, যেন রামই—চেহারায়, স্বভাবে ও শক্তিতে। তাই সকলেরই প্রিয় সে। শৈশবের খেলাধুলো, মান-অভিমানের মধ্য দিয়ে বিলির সঙ্গে রাবণের সম্পর্কটা আরো বেশী গভীর হয়ে ওঠে। রাবণকে পেয়ে রাজকুমারীর পুত্রস্নেহ পরিতৃপ্ত হয়েছে। রাবণও কি না পেয়েছে এদের কাছ থেকে।

বয়সের সংগে জীবনধারার কত পরিবর্তন হয়েছে দুজনের। বিলির বর্ণপরিচয়ের সংগে রাবণেরও বর্ণপরিচয় শেষ হয়েছে। বিলি চলে গেছে কতদূরে—কত ওপরে, আর রাবণ পড়ে থেকেছে নীচে। বিলি যায় পড়াশোনা করতে ইস্কুলে, দার্জিলিং-এ। রাবণ যায় বাপের সংগে কাজ করতে, বাগানে। তবুও কেউ কাউকে হারায়নি।

বিলির অদল-বদল হয়েছে—দেহের রূপ-লাবণ্যের, খেলার প্রথার। পুঁথির পাতা ওলটানোর সংগে বেড়েছে মনের প্রসারতা, বদলেছে কথার ধরন-করন। শীতের ছুটিতে বিলি ফিরে এসেছে মায়ের কাছে। সংগে এনেছে নতুন খেলা, নতুন জ্ঞানের ভাণ্ডার। অমনি রাবণ ছুটে এসেছে। ভালমন্দ জিজ্ঞাসা করেছে, তারপর বলেছে—ওঃ! গেলবার পৃথ্বীরাজের কথাটা শেষ না করেই চলে গেলি—আমি হাঁকপাঁক করে বেড়িয়েছি বাকীটা জানতে। শেষে টি-হাউস বাবুর ছেলেকে মিঠাই খাইয়ে শুনে নিলাম।

বলবার মতো একটা জিনিস বিলির হাত-ছাড়া হয়ে গেল। তার আশংকা হল—হয়তো রাবণও চলে যেতে পারে বাবুর ছেলের হাতে। তাই সে রেখে উঠল—কেন আজেবাজে খরচা করতে গেলি? দুদিন সবুর সইলো না!

—দুদিন? কতদিন পর এলি। অমন অর্ধেক শুনিয়ে গেলি কেন? আমার যে আধ-কপালে ধরে। ছেলেটা যে আমার সংগে কথাই বলতে চায় না।

বাবুর ছেলে তাকে পাত্তা দেয় না শুনে বিলি নিশ্চিন্ত হল। খুশী হয়ে বললে—আচ্ছা, আচ্ছা, বেশ করেছিস। আর যাবি না কাছে, বুঝলি?

যাক, অল্পতেই রাগটা নেমে গেছে। রাবণ তাড়াতাড়ি বললে—আচ্ছা, এবার কিন্তু ছাড়াছাড়ি নয়। নতুন যা-যা পড়েছিস সব শুনে তবে ছাড়ব। আর অর্ধেক নয়।

বিলির বিদ্যা জাহির করবার একটি মাত্র স্থান। তাই রাবণ যেমন বলেছে তেমনই চলতে হয়েছে তাকে।

—ইতিহাস! রাজা-বাদশার কথা? বল বল, চটপট।

বিলিকে বলতে হয়েছে ইতিহাসের কথা। তারপর ভূগোল।

—ভূগোল!—পৃথিবী গোল? চোখের সামনে দেখে কার্সিয়াং থেকে দেখতে পায় শিলিগুড়ি—সমান পড়ে আছে। হো-হো করে হেসে ওঠে রাবণ—এইবার ধরেছে।

—বটে!—এই দেখ ম্যাপ।

—ম্যাপ কি? এতো আঁকাজোকা না হিজিবিজি—ছবির মতো রঙ খেবড়ানো। ছবিও নয়! ছবি তো হয় রাম-সীতার, ঠাকুর-দেবতার।

আবার হাসতে গিয়ে বিলির বকুনি খেয়েছে রাবণ।

—একটুও খেলবি না?

—না-না, এবার আর খেলা নয়। ঐ করে তুই বড় ফাঁকি দিস আমায়।

—আচ্ছা আর ফাঁকি দেব না। কিন্তু একটা নতুন খেলার জিনিস এনেছিলাম।

—কই দেখি।

—নাঃ, তোর যখন ভাল লাগে না—

—রাগ করলি? আচ্ছা, একটা একটু খেলব। রাগ করিস নি, দেখা না।

রাবণের বাপ মারা গেল। ছেলেটাকে তুলে দিয়ে গেল বিলির মায়ের হাতে। রাবণের দুপাশে দাঁড়িয়ে তাকে পিতৃশোক ভুলিয়ে রেখেছিল দুজনে মিলে, মায়ে-ঝিয়ে।

রাবণ আরো নিবিড় করে এদের পেল। তাদের অনবদ্য স্নেহ-মমতায় ভরে রইল রাবণের বুক।

রাজকুমারী চায় নিজের ঘরেই রাবণকে রেখে দিতে। অত কষ্টের কাজ করতে দেবে না।

বিলি বলে—বাগানের কাজ করলে উন্নতি হবে। ওকে তো সংসার করে দিতে হবে একদিন।

খুকির মুখের পাকা কথায় নিরস্ত হয় বিলির মা।

রাবণ সর্দার হল। ঘর-সংসার পাতল। বিলি দেখেশুনে জংলু-সর্দারের মেয়ে লছমীর সংগে রাবণের বিয়ে দিলে। লছমীর রঙটাই যা কালো—নইলে আর সবই নামের মানানসই। আশৈশব বিলির খেলার সাথী।

জনসনকে হারাবার পর পথচলা বিলির একান্ত প্রয়োজন। কিন্তু দেহটা অবশ হয়ে লুটিয়ে পড়ে বিছানায়। লছমী কোলে তুলে নেয় তার মাথা—রাবণ দাঁড়ায় পাশে। দুজনে কত সান্ত্বনা দেয় বিলিকে। অন্ততঃ অনাগতের কল্যাণের জন্য তাকে উঠে দাঁড়াতে হবে—তারা বোঝায়।

বিলির মুখের ওপর ঝুঁকে পড়ে লছমী—কাতর আবেদন ভরা দুটি ছলছল চোখে।

বিলির শোক-বিহ্বল চোখ দুটো পড়ে থাকে লছমীর মুখের ওপর। যেন লছমীর কথা সে বুঝতে পারেনি, বলবার মতো কিছু হাতড়ে পায়নি, তেমন কিছু করবার শক্তিও সে হারায়।

দিনে দিনে ভেংগে পড়ে তার দেহমন।

এক মৃত্যুর দিনে আর একটি মৃত্যুর কথা জড়িয়ে গেল। যেদিন বিলির মা মারা যায়, সেদিনও তো এরাই দুজনে এমনি ভাবে ছিল তার পাশে। মা যখন রোগশয্যায় এরাই তো তখন তার সেবা করতো। বিলি তখন ইস্কুলে। খবর পেয়ে ইস্কুল থেকে ছুটি নিয়ে যায় সে।

রাজকুমারী সংসার ছেড়ে চলে গেল, এদের দুজনের হাতে বিলিকে তুলে দিয়ে। বলে গেল—এদের কাছে থাকতে, এদের অবাধ্য না হতে।

মায়ের শেষ কথা, শেষ ইচ্ছা বিলি সব সময় মেনে চলেছে। তার সকল সমস্যা সে তুলে ধরেছে রাবণ ও লছমীর কাছে। জনসনের সঙ্গে যেদিন যেকথা হয়েছে সবই সে পুনরাবৃত্তি করে গেছে লছমী ও রাবণের সামনে।

সাহেব রাখতে চায়? ভাল কথা, ভাগ্যের কথা! ক-জনের ভাগ্যে এমন আসে?

তারা যেমন পরামর্শ দিয়েছে তেমন-ভাবেই সে কথা বলেছে, কাজ করেছে।

এবার জনসনের সঙ্গে যেতে হবে। এক সমস্যা যায়, আসে আর একটা। এদের ছেড়ে যেতে হবে। কথাটা এতদিন মনে হয়নি। বড় সমস্যায় পড়ে যায় বিলি।

রাবণ বোঝায়, ঐ তো দার্জিলিং। যখন তখন যাওয়া-আসা যায়। ইস্কুলের বোর্ডিং-এও তো সে থাকতে গেছে এতকাল।

সে যাওয়া, আর এ যাওয়া অনেক তফাৎ। বিশেষ করে তার মায়ের মৃত্যুর পর। বিলি চায়, তাদের সঙ্গে করে নিয়ে যাবে। লছমী সাবধান করে—না-না, এখনই একটা করো না। দু-চার মাস গেলে, মন-মেজাজ বুঝে তবে সাহেবকে আমাদের কথা বলবে।

বিলি তা পারবে না, ওদের কথা মানতে চায় না। সাহেবের কাছে সে বলে দিল মায়ের মৃত্যু-কালীন ইচ্ছার কথাটা। রাবণ তখন সর্দার, তাকে অমন একটা কাজ দিলেই সে খুশী। আর লছমী বাগানের সব কাজই জানে।

সাহেব রাজী হয়: সে সর্দারের বেতনই পাবে—বাংলোর মালী, বেয়ারা-বাবুর্চীর কাজকর্মের তদারক করবে। থাকবে বাংলোর পাশেই ছোট্টো একটা কটেজে। লছমী দেখাশোনা করবে ঘর-সংসারের কাজ, অর্থাৎ বিলিকে সাহায্য করবে।

ঠিক যেমনটি সে চায়। বলার কিছু থাকে না আর। জনসনের প্রতি কৃতজ্ঞতায় ভরে যায় বিলির মন। এমনই সুখ-দুঃখের মধ্য দিয়ে রাবণের সঙ্গে বিলির সম্বন্ধ অবিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। রাবণের মধ্যে বিলি পায় একনিষ্ঠ বিশ্বাস, স্নেহ-মমতা যেন আরো কিছু যা মন দিয়ে উপলব্ধি করা যায়, কিন্তু ব্যক্ত করা যায় না।

রাবণের বিচিত্র পরিবেশ তাকে বিচিত্র-ভাবে গড়ে তোলে। একদিকে শ্রমজীবীর সহজ-সরল ঘরকন্না—অপরদিকে বিলিদের আঁকাবাঁকা পথের বিচিত্র জীবন। একটি নিছক জীবন ধারণের উপযোগী অনুষ্ঠান আচার-ব্যবহার সমাচ্ছন্ন এক প্রাচীন কোনা; অপরটি অ্যাংলো-পাহাড়ীর সংমিশ্রণে এক অপরূপ সৃষ্টি—সহজ, সরল জীবনের অন্তঃ-প্রবাহের সঙ্গে মিলিত হয়েছে বৈদেশিক আচার-বিচার ও সুদূর প্রসারী ভাবধারা—যা নিছক জীবনধারণের বাইরে আরও কিছু পাওয়ার জন্য উন্মুখ, উৎসুক। এই দুটি বিরোধী জীবন-প্রবাহের মধ্যে রাবণ যেন এক উভচর জীব। তবুও তার শ্রমিক দেহ-পিঞ্জরের মধ্যে রূপ নিয়েছে একটি ভক্তের মন। বিলির ভক্ত সে। সে চায় তার সেবা করতে। এতেই আনন্দ তার। এই আনন্দের আড়ালে থেকে অনেক জিনিস সে দেখতে পায় না, চায়ও না। ম্যানেজারের ব্যবহারটা তাই তার চোখে পড়েনি। তার কোন চিন্তা হয়নি সেজন্য। বিলিকে এক্ষেত্রে বাদ দেওয়া যেতে পারে তার মনের অবস্থা ভেবে। কিন্তু লছমী অন্য ধরনের। সে নিজের সমাজের সুখ-দুঃখের কোলে মানুষ। সে কথা কম কয়। কিন্তু শোনে সব, বোঝেও। নিজেকে দেখাতে চায় না, কিন্তু দেখতে পায় সবই। ম্যানেজারের ঔদাসীন্য তার চোখ এড়ায় না।

কোন মতেই যখন বিলিকে প্রকৃতিস্থ করা গেল না, তখন লছমী তুলে ধরল ম্যানেজারের উদাস ব্যবহারের কথা। দুঃখের দিনে একটা খোঁজ নিয়ে দেখেনি কেউ। দেখবার মতো মনও ছিল না। রাবণের উৎকণ্ঠা বাড়ল। বিলি পড়ল আর এক ভাবনায়।

এটর্নির টেলিগ্রামটা বারবার উল্টেপাল্টে দেখল, পড়ল। কোন আশার কথা খুঁজে পেল না তাতে। জনসনের বাবা, ভাই! তারা তো কোন খবর দিল না। কি আর খবর আছে? দুদিন পর হুকুম আসবে ম্যানেজারের কাছে। বার করে দেবে এখান থেকে! এ অপমান সে সহ্য করবে কি করে? এত নির্দয় হবে জনসনের ভাই, বাবা? হবে নাই বা কেন? সম্পত্তি হাতছাড়া করে কে? যাদের বিষয়বুদ্ধি আছে, তারা করুণা দেখাতে যাবে কেন? তাদের কাছে বিলি দয়ার পাত্রী হতে পারে না। খাল কেটে কে কুমির আনবার পথ করতে যাবে। তাকে বিতাড়িত করাই কর্তব্য। আর দুদিন পর সেও দেখিয়ে দিতে পারে জনসনের উত্তরাধি-কারী। সন্তানের জন্য সেও তো দাঁড়াতে পারবে! প্রমাণ? প্রমাণ সংসার ছড়ে চলে গেছে। প্রকাশ্য আদালতে কত কলঙ্কের কথা উঠবে! কত বিদ্রূপ-ভরা চোখের সামনে দাঁড়িয়ে থাকতে হবে তাকে!

ম্যানেজারের কাছেও নিশ্চয়ই একটা টেলিগ্রাম এসেছে—দেখায় নি তো সেটা। কি লেখা তাতে? যদি ভালই কিছু থাকবে, তবে সে এমন গা-ঢাকা দিয়ে থাকবে কেন? চক্ষুলজ্জার খাতিরে কিছু বলতে চায় না হয়তো। অপেক্ষা করছে, মানে মানে তারা বিদায় হয় কিনা—নিশ্চয়ই তাই। তাই সে একবারও আসে না।

ঠিক করল বিলি নিজের পথ।

(ক্রমশঃ)

লালন সাঁই-এর মাজারে

মোহিত রায়

সেঁউড়িয়া।

বাংলাদেশের কুষ্ঠিয়া শহরের উপকণ্ঠে কালীগঙ্গা (মরা কালি গাঙ) নদীর বুকে জেগে ওঠা তীরভূমি। এখানে ধর্মপ্রাণ বাউল লালন ফকিরের সাধনপীঠ আখড়ায় আছে এক অপরূপ স্থাপত্যকীর্তি সমাধি-গৃহ। সকলের কাছে 'লালন সাঁই-এর মাজার' নামে পরিচিত। সমাধিগৃহের ভিতরে লালনের কবরের পাশে লালনের সাধন-সঙ্গিনীরূপে পরিচিতা মতিবিবির কবর। মাজারের চারপাশে লালনশিষ্যদের কবর।

দ্রুত এগিয়ে এসে মাজারের বর্তমান অধিকারী ফকির বেলাল শাহ বলতে লাগলেন : ভাবের ভাবি নেই একথা ভেবো না। সাঁইজী আছেন। চিরদিন থাকবেন। আমাদের সকলের হৃদয়ে। লোকের মুখে মুখে সাঁইজীর গান......।

সমস্ত হৃদয় দিয়ে অনুভব করার চেষ্টা করি ফকিরের কথা। ফকির ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে আমাদের মাজারের সবকিছু দেখালেন। দেখলাম—'লালন সাহিত্যকেন্দ্র'। উদ্বোধন করেন প্রাদেশিক গভর্ণর জনাব আবদুল মোনায়েম খাঁ ১৩ আশ্বিন ১৩৭০। এখানে লালনের ছাড়াও অন্যান্য লোকায়ত সংগীতের বিরাট সংগ্রহ আছে, আছে লোকসাহিত্য গবেষণারও সুব্যবস্থা। বকুলগাছের তলায় ছায়াসুনিবিড় বিশ্রামস্থানে বসতেই গুনগুন করে ওঠেন ফকির বেলাল :

সব লোকে কয় লালন কি জাত সংসারে
লালন কয় জাতের কি রূপ
দেখলাম না এ নজরে।

লালন বলে হাতে পেলে
জাত পোড়াতাম আগুন দিয়ে।

—হঠাৎ এ গান কেন? কুষ্ঠিয়ার সাংবাদিক বন্ধুদ্বয় এম. এ. রেজা (ইত্তেফাক) এবং কাজী রাশিদুল হক পাশা (পূর্বদেশ) স্মরণ করিয়ে দিলেন আমাকে : মাজারে ধর্মের ভেদাভেদ নেই। সব ধর্মের সব বর্ণের মানুষ এখানে এসে একাকার।

চৈত্র পূর্ণিমায় মাজারে বসে বিরাট মেলা। হাজার হাজার মানুষের মেলা। ভক্তপ্রাণ বাউলেরা আসেন, একতারাতে বেজে ওঠে লালনের গান :

আমি একদিনও না দেখলেম তারে—
আমার বাড়ির কাছে আরশিনগর
পড়শি বসত করে।

কুষ্ঠিয়া শহরের কাছে গড়াই (গৌরী) নদীর তীরে ভাঁড়ারা গ্রামে লালনের জন্ম ১ কার্তিক ১১৭৯ (১৭ অকটোবর ১৭৭২) এবং দেহত্যাগ সেঁউড়িয়ায় ১ কার্তিক ১২৯৫ (১৭ অকটোবর ১৮৮৮)। বিচিত্র লালনের জীবনকাহিনী। গাঁয়ের লোকজন নিয়ে নৌকায় গঙ্গাস্নানে চলেছেন বাউল দাস, সঙ্গী হলেন তরুণ লালন। ফেরার পথে লালনের বসন্ত রোগ হলে নৌকার গলুইয়ের কাছে তাঁকে রেখে সকলে দূরে সরে রইলেন। শেষে বাউল দাসের কুপরামর্শে সকলে অচেতন লালনের মুখে আগুন দিয়ে গঙ্গায় ফেলে দিলেন। গাঁয়ে ফিরে বাউল দাসের সঙ্গে গলা মিলিয়ে সকলে বললেন যে, পুণ্যবান লালনের গঙ্গাস্নানে গিয়ে গঙ্গালাভ হয়েছে। যথারীতি শ্রাদ্ধাদি পারলৌকিক ক্রিয়াও হয়ে গেল। এদিকে মৃতপ্রায় লালন ভাসতে ভাসতে এক ঘাটে গিয়ে ঠেকলেন। এক দয়াবতী মুসলমান রমণী স্নান করছিলেন। তিনি লালনকে দেখে তুলে বাড়ি নিয়ে গিয়ে সেবাশুশ্রূষা করতে লাগলেন। লালন সুস্থ সবল হলেন অল্পদিনের ভিতরেই। এমন সময় সিরাজ সাঁই নামে এক মুসলমান দরবেশ তাঁকে প্রকৃত ধর্মপথের সন্ধান দিলেন।

লালন নিজের গাঁয়ে ফিরে গেলেন কিন্তু সমাজ তাঁকে গ্রহণ করল না। সবাই বলল যে লালনের ভূত এসেছে। স্বাভাবিকভাবেই লালনের জীবনের আদর্শের সঙ্গে সমাজের বিরোধ বাধল। নিঃসঙ্গ লালন সমাজ ছেড়ে লোকালয় থেকে দূরে নীরবে নিভৃতে সেঁউড়িয়ার আখড়ায় একমনে সাধনায় রত হলেন। সাধক লালন সহজ সরল গানের মধ্যে দিয়ে জীবনের আদর্শের কথা প্রচার করে গেছেন।

অনেকে বলেন যে, লালন নিরক্ষর ছিলেন। মুখে মুখে গান বেঁধেছেন, লেখেন নি। লালন দীর্ঘদিন নবদ্বীপে ছিলেন। নবদ্বীপের পণ্ডিত সমাজ যবন বলে তাঁকে দূরে আহার্য দিয়েছেন কিন্তু শাস্ত্রচর্চা করেছেন পাশাপাশি বসে। অনেকেই মনে করেন যে, লালন জন্মত হিন্দু ছিলেন। নিজের জীবন সম্পর্কে লালনের সীমাহীন নির্লিপ্ত থাকায় এ সম্পর্কে প্রমাণের অভাব রয়েছে।

রবীন্দ্রনাথ লালনের গান সংগ্রহ করে প্রথম প্রকাশ করেন। তিনি লালনের আখড়ায় নিয়মিত আসতেন। নিরক্ষর গাঁয়ের মানুষ থেকে প্রাজ্ঞ মানুষেরাও লালনের সঙ্গে ধর্মালাপ করতেন। লালনের শিষ্যের সংখ্যা আনুমানিক দশ হাজারের উপর।

ফেরার সময় কেমন যেন গোলমাল হয়ে গেল। ফকির আমার চোখের দিকে এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে বললেন : মনের ময়লা ভক্তি চন্দনের গন্ধে ধুয়ে মুছে ফেললে মনের মধ্যেই তাকে মেলে—যাকে খুঁজছ। সাঁইজীর কথা—এই মানুষে চেয়ে দেখ্—সেই মানুষ আছে।

হালে বন্ধ মোহিনী মিলের পাশ দিয়ে সিরাজ-উদ-দৌলা সড়ক ধরে বোমাবিধ্বস্ত কুষ্ঠিয়া শহরে ফেরার পথে তখনও ভেসে আসছিল ফকিরের উদাত্ত গলায় লালনের গান :

'আমার আপন খবর আপনার হয় না—
আপনারে চিনলে পরে
যায় অচেনারে চেনা।।

হরপ্পার ফুল

নির্মল সরকার

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

ঠিক বলেছ, কোন ফল হবে না; কোন লাভ নেই তোমার সংগে এভাবে যুদ্ধ করে। হঠাৎ গলার স্বরটা নেমে গেল অরুণেরও, মুহূর্তে শান্ত হয়ে গেল সে। জানলার কাছে গিয়ে চুপ করে দাঁড়াল কিছুক্ষণ। তারপর ঘর থেকে বেরিয়ে গেল ধীরে ধীরে।

সীমা ঘরে ঢুকে দেখল তার অবর্তমানে হেমন্ত আজ ঘরটা পরিষ্কার করে গুছিয়ে রেখেছে। সে যে কিছুক্ষণের মধ্যেই ফিরে আসবে, এটা যেন হেমন্ত জানত। বকসার দিকে একবার দৃষ্টিপাত করে সঞ্চিত ক্ষোভ প্রকাশের চেষ্টা করল। একটু আগেই অরুণ তাকে বেড়িয়ে নিয়ে এসেছে, তাতে তার মন ভরেনি। ঘরের আলোটা নিভিয়ে সীমা নিজের কথা ভাবতে লাগল। এখনও তার মনটা স্বাভাবিক হতে পারছে না। সৌম্য দত্তর ব্যবহার, তার নিজের দুর্বল অবস্থার কথা আর অরুণের নির্লিপ্তভাব দেখে সে বিমূঢ় হয়ে গিয়েছে। অরুণ তাকে নিয়ে কি করতে পারে? পুলিশের ব্যাপারে সে কিছুটা নিশ্চিন্ত হয়েছে। তাকে অভিযুক্ত করতে হলে অরুণকে নিয়েই টানাটানি পড়বে। এটা বন্ধ করতেই অরুণ সচেষ্ট থাকবে এ বিষয়ে তার সন্দেহ নেই। নিজের বংশ মর্যাদা এবং অসিতবাবুর সম্বন্ধে অরুণ যেন বিশেষভাবে স্পর্শকাতর। অবশ্য তাকে ডাইভোর্স করতে পারে অরুণ। এটাতে অসুবিধে নেই। তার নামে কলঙ্ক দেওয়ার মত অনেক প্রমাণ অরুণের হাতে মজুত আছে বলে সে জানে। ডাইভোর্স হয়ে গেলে সবদিক থেকেই মঙ্গল। সীমা লক্ষ্য করল একটা নতুন হীনমন্যতা তাকে যেন পেয়ে বসেছে। অরুণ যদি তার ওপর জোর করে অধিকার প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করত, যদি সে রূঢ় আর অভদ্র ব্যবহার করত, তাহলে তাকে নিজের কাছে এত ছোট মনে হত না। অন্ততঃ এ অসহায়তাবটা সে কাটিয়ে উঠতে পারত সহজেই। এ ধরণের নিদারুণ লজ্জায় পড়তে হত না বারবার।

রাতটা কেটে গেল অস্বস্তি আর অনিদ্রার মধ্য দিয়ে। সকাল হতে তার মনে পড়ল ডাঃ সোমের সঙ্গে আজ অ্যাপয়েন্টমেন্ট আছে। অরুণ অফিস চলে গেল নিঃশব্দে। তার গলার স্বরটাও আজ শুনতে পায়নি সীমা। হঠাৎ যেন সে স্তব্ধ হয়ে গিয়েছে।

একটু আগেই হাজির হল সে ডাঃ সোমের চেম্বারে। আজ তাকে অন্য ধরণের বলে মনে হল ডাঃ সোমের। কোথায় যেন একটা পরিবর্তন হয়েছে সীমার মধ্যে। মুখটা তার শুষ্ক, চোখ দুটো নিষ্প্রভ।

যথারীতি কৌচে হেলান দিয়ে বসল সীমা।

আপনার শরীর ভাল আছে? জিজ্ঞেস করলেন ডাঃ সোম।

হ্যাঁ।

আজ আপনাকে নতুন কোন প্রশ্ন করব না। আপনি নিজেই বলুন কিছু?

ডাক্তার কৌচের পেছনে প্যাড নিয়ে বসলেন। কি বলব?

যা ইচ্ছে।

চুপ করে রইল সীমা।

আচ্ছা, বিয়ের আগে আপনি কাকে ভালবাসতেন?

কাউকে না।

আপনি আমার প্রশ্নটা বুঝতে পারছেন না, বললেন ডাঃ সোম, আমি বলতে চাই, বিয়ের আগে কাকে ভাল লাগত আপনার।

এতক্ষণে প্রশ্নটা যেন বুঝল সীমা। বলল, বাবাকে আর মাদার ইলাইজাকে।

মাকে?

একটু চুপ করে রইল সীমা; তারপর বলল, না, মাকে আমার ভাল লাগত না।

মায়ের কথা মনে পড়ে?

মায়ের কথা আমি ভাবতে চাই না। মা আমার কেউ নয়। আমি জন্মাবার পরই শুনেছি মায়ের খুব অসুখ করেছিল; সেই সময় মরে গেলে ভাল হত। মা না থাকলে নানু—হঠাৎ চুপ করল সীমা।

বলুন, নানু কে?

নানুকাকা, বাবার বন্ধু বলে ঢুকেছিল কিন্তু শেষ পর্যন্ত সর্বনাশ করে ছাড়ল আমাদের।

আপনার মা মারা গেছেন?

জানি না।

সেদিন বলেছিলেন, মারা গেছেন।

মিথ্যে কথা বলেছিলাম, মাকে আমি কিছুদিন আগেই দেখেছি।

কোথায়?

রাস্তায়, ট্রামের ধারে দাঁড়িয়ে ভিক্ষে করছিল। হ্যাঁ, ভিক্ষে করছে, আমি ভাল করে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখতে লাগলাম। ভাল লাগল আমার, বেশ ভাল লাগল। কত যন্ত্রণা দিয়েছে বাবাকে। ও আর নানুকাকা বাবা মারা যাবার পরও বাড়ীতে থাকত। আমি সেই বছরেই পাশ করে চাকরি নিলাম। তারপর মেয়েদের হোস্টেলেই থাকতাম। ও বাড়ীতে আর একদিনও যাইনি। নানুকাকা কোথায় গেল? তাকে একবার দেখতে ইচ্ছে করে, সেও নিশ্চয় ভিক্ষে করছে কোথাও। না, মরেনি, মরে গেলে ত সব শেষ হয়ে যাবে, শাস্তি পাবে কখন? আমি দিনের পর দিন ওদের নোংরামি দেখেছি, ওদের নির্লজ্জ অত্যাচার সয়েছি মুখ বুজে। ওদের লজ্জা ছিল না, ঘৃণা ছিল না। ওদের কথা ভেবে ভেবে আমি নিষ্ফল আক্রোশে জ্বলেছি শুধু। কিছুই করতে পারিনি, কোন শোধই তুলতে পারিনি। এখন আমি সব করতে পারি। অনেক টাকা আছে আমার। অনেক সাহস সঞ্চয় করেছি। কিন্তু টাকার অভাবে বাবার বড় কষ্ট হয়েছে। এখন আমার এত টাকা কিন্তু বাবার জন্যেই ত সব। কাঁদতে লাগল সীমা। এর আগে সে কোনদিন কাঁদেনি এভাবে। ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগল সে। কাঁদতে যে এত আনন্দ তা সে কোনদিন বোঝেনি।

সীমা বাড়ী ঢুকেই দেখল অফিসের কাপড় পরে অরুণ বসে রয়েছে ড্রইংরুমে। তাকে দেখে অরুণ উঠে দাঁড়িয়ে বলল, বাবার কাছে যেতে হবে।

কেন? থমকে দাঁড়াল সীমা।

সব জিনিসটা আমি তার কাছে পরিষ্কারভাবে বলতে চাই।

তাতে কি হবে, তার চেয়ে আপনি আমায় ডাইভোর্স করে দিন।

আমার তাতে আপত্তি নেই, কিন্তু বাবার সামনে সব কথা হওয়ার দরকার বলে আমি মনে করি।

আমি করি না, তাকে এর মধ্যে টেনে আনার কি প্রয়োজন?

আছে, সেটা বোঝার মত সুবুদ্ধি তোমার নেই।

কিন্তু আমি যদি যেতে না চাই!

তাহলে জোর করব, দৃঢ়কণ্ঠে উত্তর দিল অরুণ।

জোর করবেন? একজন ভদ্রলোক হয়ে একথা বলতে বাধল না আপনার?

না, সৌম্য দত্তর মত আমি অবশ্য সিন ক্রিয়েট করতে চাই না, কিন্তু প্রয়োজন হলে তাতেও পেছপা হব না। ওই ভাষাটাই তুমি বোঝ এখন জেনেছি। ক্রোধে মুখটা আরক্ত হয়ে উঠল অরুণের।

সীমার ক্লান্তি লাগছে। সমস্ত দিন ধরে তার উপর দিয়ে যেন একটা প্রচণ্ড ঝড় বয়ে গিয়েছে। তার জের এখনও সীমার স্নায়ুতন্ত্রী আর মনকে আচ্ছন্ন করে রেখেছে। নিজের সংগে যুদ্ধ আর করল না সে। গাড়ীতে গিয়ে বসল পিছনের সিটে। অরুণ একবার তাকিয়ে দেখল তার দিকে, কোন আপত্তি করল না সে। গাড়ীটা জোরে চালিয়ে দিল।

রাস্তার ভিড় তার গতি প্রতিহত করতে লাগল বারবার। বিরক্তবোধ করছে অরুণ। তার মনটা যত বেগে ছুটে চলেছে, তার গাড়ীটা কিন্তু সে তুলনায় মন্থর। এই তার চাঞ্চল্যের কারণ। অবশেষে কলকাতা ছাড়িয়ে সে মনোমত ফাঁকা রাস্তা পেল। গাড়ীর স্পিড বাড়িয়ে দিল অরুণ।

পিছনের সিটে মাথা রেখে সীমা চোখ দুটো বন্ধ করে রইল। এইবার তার যেন যাত্রা শেষ হয়। ভাবল সে মনে মনে।

নিজেকে আজ বড় দুর্বল মনে হচ্ছে তার। পৃথিবী যেন অকস্মাৎ তার কাছে বড় বেশী শান্ত আর স্তব্ধ হয়ে গেছে। তার মধ্যে সমুদ্রের যে গর্জনটা অহর্নিশ জেগেছিল আজ সেটার শব্দ যেন দূরে মিলিয়ে যাচ্ছে ধীরে ধীরে। রক্তের নিরন্তর যে দুঃসহ জ্বালা আর বিষের ক্রিয়াটা অনুভব করত হঠাৎ সেটা হিম স্রোতে পরিণত হয়েছে বলে বুঝতে পারল সীমা। এতদিন পরে বাড়ীর সেই রামকৃষ্ণদেবের ছবির কথা মনে পড়ল তার। করুণামাখা দৃষ্টিতে তার দিকে যেন তাকিয়ে রয়েছেন তিনি।

মনটা তার এরকম বিকল হল কেন তাই ভাবতে চেষ্টা করল সে। তার শরীরের কথা সে ভাবল এবার। না, শরীর তার ভালই আছে ত। বরঞ্চ মাথার সেই অসহনীয় চাপটা আর অনুভব করতে পারছে না। কানের মধ্যে যে অস্বস্তিকর আওয়াজটা তাকে কোনদিনই নিষ্কৃতি দেয়নি, সেটাই যেন মিলিয়ে গিয়েছে হাওয়ার সঙ্গে।

মাদার ইলাইজা এখন কোথায় কে জানে? আবার তার স্কুলে ফিরে যেতে ইচ্ছে করে। চোখ দিয়ে তার জল গড়িয়ে পড়ল। অরুণের দিকে তাকাল সীমা। ধার থেকে অরুণের মুখটা অন্যরকম দেখাচ্ছে। গালের ওপরে একটা কাটার দাগ রয়েছে দেখতে পেল সে। হয়ত ছোটবেলায় কেটে গিয়ে থাকবে। তারও থুতনিতে একটা দাগ আছে। স্কুলে পড়ে গিয়েছিল খেলতে খেলতে। রক্ত বেরিয়েছিল বেশ কিছুটা। মাদার ইলাইজা তাকে নিয়ে খুব হৈচৈ করেছিলেন। মাদার জানতেন না তার কতবার রক্তপাত হয়েছে অন্য ধরণের আঘাতের ফলে।

অরুণবাবুর এই দাগটা কিসের হতে পারে?

সম্ভবত দাড়ি কামাতে গিয়ে কেটে গিয়ে থাকবে।

বাবাও নিজে দাড়ি কামাত। একটা ভাঙ্গা সাবানের বাক্সের মধ্যে বাবার দাড়ি কামাবার সরঞ্জাম থাকত। একটা লম্বা ক্ষুর, একটা ছোট পাথর, একটুকরো চামড়া, এক কুচি সাবান, আর একটা ব্রাশ। বাবা যখন দাড়ি কামাত সীমা দেখত অবাক হয়ে। ভারি ভাল লাগত তার। প্রথমে ক্ষুরটা বার করে একবার পাথরের ওপর তারপরে চামড়ার টুকরোতে ঘসত ধীরে ধীরে। তারপর মুখে জল মাখাত ব্রাশটা ভিজিয়ে। তারপর সাবানের ওপর ব্রাশ দিয়ে ফেণা করে সেটা লাগাত দাড়ির ওপর। এরপর হাতের তালুতে ক্ষুরটা বারকতক ঘষে নিত। এসময় তার বেশ ভয় করত। যদি ক্ষুরে হাতটা কেটে যায়। কিন্তু কোনদিনই যেত না। ক্ষুরটা তারপর সাবানের ওপর দিয়ে বুলিয়ে যেত বাবা নিশ্চিন্ত মনে। এসময়ে কিন্তু সীমার ভীষণ হাসি পেত। বাবা এসময়ে কতরকম যে মুখভঙ্গী করত তার ঠিক নেই। কখনও গাল দুটো ফুলিয়ে নিত, কখনও ঠোঁট দুটো বেঁকিয়ে রাখত অদ্ভুতভাবে আবার কখনও বা হাতের সাহায্যে মুখের চামড়া টেনে ধরত বাঁকাভাবে। ভারি অবাক লাগত তার। বাবা মুখের ওপর নানারকমের কায়দা দেখাত ম্যাজিকের মত। সেটা দেখে সে মুগ্ধ হয়েছে অনেকদিন পর্যন্ত। অবশ্য অরুণবাবুকে সে দাড়ি কামাতে দেখেনি। তবে এটা সে জানে বাবার মত লম্বা ক্ষুর অরুণবাবু ব্যবহার করে না। বাথরুমের র‍্যাকে তার কয়েকটা রেজার এমন কি ইলেকট্রিক রেজারের সেটও চোখে পড়েছে তার।

অরুণের জ্বরের সময় সে লক্ষ্য করেছে, অরুণ নিখুঁতভাবে দাড়ি কামায়। বাবা কিন্তু অত পরিষ্কার দাড়ি কামাতে পারত না। যখন হাঁপানি বাড়ত তখন আর কামানই হত না। দু-তিন দিন ধরে দাড়ি জমা হয়ে মুখ ভর্তি হয়ে যেত। খুব খারাপ লাগত তখন বাবাকে।

ডাঃ সোমের কথা মনে পড়ে গেল সীমার। ভদ্রলোকের গোঁপটা ঠিক টুথব্রাশের মত খোঁচা খোঁচা। কিন্তু ভারি ভাল লোক। প্রথমে তাকে সন্দেহের চোখে দেখেছিল সে। শুধু গল্প করে মোটা ফি নিতেন বলে মনে হত সে সময়। কিন্তু আজ তার চোখ খুলে গিয়েছে। আজ তার কি হয়েছিল তা সে নিজেই জানে না। গতকাল সৌম্য দত্ত আর অরুণের সঙ্গে গোলযোগের ফলে তার মনটা হয়ত এলোমেলো হয়ে গিয়েছিল। সেই কারণেই সে ডাঃ সোমের কাছে সব কথা বলতে পেরেছিল মন খুলে। নিজেকে কোন বাধা দেয়নি। বানিয়ে আজে-বাজে কথাও বলেনি কিছু। এমন কি জোর করে নিজের মনের কথা লজ্জা পেয়ে চেপেও রাখেনি। সহজ সরলভাবে সে সবকথাগুলোই খুলে বলেছিল অকপটে। দ্বিধা হয়নি তার মায়ের আর নানুকাকার বিশেষ বর্ণনা দিতে। বাবার অসহায়তা, তার নিজের মনের ভয় আর দ্বন্দ্ব, কোন কথাই গোপন করেনি সে। কিন্তু ভাল লেগেছিল সীমার। কথাগুলো বলার পর তার মন থেকে জগদ্দল পাথরটা কে যেন সরিয়ে দিয়েছিল ম্যাজিকের মত। সবচেয়ে ভাল লেগেছিল তার কাঁদতে। চোখের জলে যে এত আনন্দ তা সে কোনদিনই কল্পনা করতে পারেনি। অদ্ভুত স্বস্তি পেয়েছিল সে। এক অনির্বচনীয় আনন্দের স্রোত বয়ে চলেছে তাকে ঘিরে। ডাঃ সোমের কথাগুলো মনে পড়ল তার—'জীবনে দুঃখ সকলেরই আসে, আপনার একা নয়। শিশুকালের মানসিক আঘাত অবশ্য সাংঘাতিক হয় অনেক সময়। স্নেহ, আদর আর যত্নের জন্যে মন উন্মুখ হয়ে থাকে। মানসিক দুর্যোগের ফলে শিশুর দৃষ্টিভঙ্গী পাল্টে যায়। এজন্যে সে কখনও নিষ্ঠুর হয়ে পড়ে কখনও বা অন্য ধরনের অস্বাভাবিকতা এসে তার ভবিষ্যৎ নষ্ট করে দেয়। সকলের বিরুদ্ধে সে একটা কল্পিত অভিযোগ খাড়া করে দাঁড়ায়।'

হঠাৎ গাড়ীটা দাঁড় করাল অরুণ।

কী হল? জিজ্ঞেস করল সীমা।

দেখি কি হল, বুঝতে পারছি না। স্টার্ট বন্ধ করে অরুণ গাড়ী থেকে নেমে বনেটের তলায় মাথা গলিয়ে কি দেখতে লাগল।

সীমাও নামল। একটা মাঠের পাশে গাড়ী দাঁড়িয়েছে। তার পাশেই একটা পুকুর। সবুজ পানাতে প্রায় সবটাই ভরে গিয়েছে। ফুল হয়েছে তার মাঝে মাঝে ভায়লেট রঙের ফুল। বেশ দেখতে লাগছে সীমার। সে একটু এগিয়ে গেল মাঠের ওপর দিয়ে। হাওয়া দিচ্ছে এলোমেলোভাবে। সূর্য দূরের বটগাছটার ওপর এসে পড়েছে। তেজ কমে গিয়েছে তার। পুকুরের অপরদিকে গিয়ে ভাঙ্গা ঘাটের সিঁড়ির ওপর গিয়ে বসল সে। জলের দিকে তাকিয়ে রইল সীমা চুপ করে। ছোট ছোট অদ্ভুত আকৃতির মাছ আর পোকাগুলো অশান্তভাবে ছুটে চলেছে চতুর্দিকে। একবার দেখল সে গাড়ীটার দিকে। অরুণ একটা ছোট বালতি নিয়ে পুকুরের অপরদিক থেকে জল নিচ্ছে। জল নিয়ে অরুণ রেডিয়েটারে ঢালতে লাগল। ভদ্রলোকের বিপদ লক্ষ্য করে সে একটু অস্বস্তি বোধ করল। এ অবস্থায় সে অরুণকে কোনদিন দেখেনি। পুকুরের ধার ঘেঁষে আস্তে আস্তে সন্তর্পণে নীচে নামার অরুণের ভঙ্গী দেখে তার বেশ মজা লাগল। পা পিছলে পুকুরে পড়লে ভদ্রলোকের দামী স্যুটটা নষ্ট হয়ে যাবে নির্ঘাৎ।

সূর্য এবার বটগাছের আড়ালে চলে গেছে। রাস্তার ওপর দিয়ে সাইকেল রিক্সা আর গরুর গাড়ী চলছে। বেশ লাগছে সীমার। হঠাৎ খেয়াল হল অরুণ তাকে ইশারা করে ডাকছে। মাঠ দিয়ে ধীরে ধীরে হাঁটতে লাগল সে। এতক্ষণে গতকালকের কথাটা মনে পড়ল তার।

অসিতবাবুর কাছে অরুণ তার বিরুদ্ধে যখন বলবে তখন তিনি কি বলবেন? অসিতবাবু নিশ্চয়ই তাকে কোন রূঢ় কথা বলবেন না। হয়ত বেদনাকাতর চোখ দিয়ে তার দিকে তাকিয়ে থাকবেন নির্বাক হয়ে। অরুণ তার সঙ্গে রূঢ় ব্যবহার করেছে কি না এমন কিছু নয়। বরঞ্চ তার উদাসীনতা অনেক সময় তাকে অবাক করেছে। ব্যথা পেয়েছে সে সেই কারণে কোন কোন সময়। সৌম্য দত্তর সঙ্গে জড়িয়ে গতকাল যে ইঙ্গিত করেছিল অরুণ তার জন্য সে রীতিমত দুঃখ পেয়েছে, অপমান বোধ করেছে। অরুণের আলমারীর মেয়ের ছবিটার কথা হঠাৎ মনে পড়ে গেল সীমার। লুকিয়ে আলমারীর ভেতরে সুন্দরী মেয়ের ছবি রেখে অপরকে দোষারোপ করতে একটুও বাধল না ভদ্রলোকের।

অরুণ এবার তার পাশের দরজাটা খুলে দিল। দ্বিরুক্তি না করে সীমা তার পাশে গিয়ে বসল। গিয়ার চেঞ্জ করে অরুণ একবার সীমার দিকে তাকিয়ে দেখল সে সামনের দিকে তাকিয়ে রয়েছে।

আজ ডাঃ সোমের কাছে যাবার কথা ছিল না? জিজ্ঞেস করল অরুণ।

হ্যাঁ।

কি বললেন ডাঃ সোম, প্রশ্ন করল অরুণ।

আপনার জেনে কি হবে? আমার ভাল হোক, মন্দ হোক তাতে আপনার কি এসে যায়। সীমার স্বরে অভিমান।

তাহলেও বল; আর তোমার ভালমন্দে আমার কিছু এসে যায় কিনা, সেটা এখন না বলাই ভাল।

আপনি আমাকে নিয়ে একটা এক্সপেরিমেন্ট করেছিলেন মাত্র। আপনার গিনি-পিগ হয়েছি আমি, আর কিছু না।

কথাটা শুনেই জোরে হেসে উঠল অরুণ।

অনেকদিন সীমা এ ধরনের হাসি শোনে নি। ভাল লাগল তার।

হাসলেন যে, সীমা তাকাল অরুণের দিকে।

হাসলাম তোমার মত পরিবর্তন লক্ষ্য করে। এর আগের বারে তুমি আমায় স্যাডিস্ট বলেছিলে এবার আমায় সায়েন্টিস্ট বানালে। আমি দুটোর মধ্যে একটাও নই।

তাহলে?

যদি বলি তোমায় আমি ভালবাসি তাহলে কি মনে হয়?

চুপ করে রইল সীমা কিছুক্ষণ, বলল— অন্যদিনে হলে হয়ত এর একটা রূঢ় জবাব দিতাম কিন্তু—

কিন্তু কি? সীমার মুখের দিকে ভাল করে তাকিয়ে দেখল অরুণ।

আজ যুগে জবাবটা দিতে পিঁজর বাজছে।

কেন বল ত, খুব আশ্চর্য লাগছে তোমার পরিবর্তন দেখে।

কোন জবাবই দিল না সীমা। বাইরের দিকে একমনে তাকিয়ে দেখতে লাগল পল্লীর মনোরম গোধূলিদৃশ্য।

এবার আপনি নিশ্চিন্ত হবেন। হঠাৎ বলল সীমা।

এ ধারণা তোমার হ'ল কি করে ?

তা না হ'লে এধরনের চরম ব্যবস্থা নিতেন না. লোকের সামনে ছোট করার চেষ্টা করতেন না আমাকে।

সীমার কথা শুনে হঠাৎ গাড়ী দাঁড় করাল অরুণ। সীমা তাকে অবাক করে দিয়েছে।

আমি তোমায় ছোট করতে চাইছি, কি বলছ তুমি! অরুণ এত বিস্মিত কোনদিন হয়েছে কিনা সন্দেহ!

ঠিকই বলছি, ভেবে দেখুন, আপনি আমার বিরুদ্ধে যে সব অভিযোগগুলো বাবার সামনে বলবেন—

বাবার সামনে? তুমি ত কোন-দিন আমার বাবাকে এ সম্বোধন করনি! বিস্ময়ের সীমা নেই অরুণের। তাই বুঝি? সীমার ভঙ্গীটা অপরূপ লাগল অরুণের কাছে। তোমার পরিবর্তন লক্ষ্য করে আমি অবাক হচ্ছি শ্যামলী—

আমার নাম সীমা' শ্যামলী ডাঃ সোমের চেম্বারে মারা গিয়েছে আজ।

সীমার মুখের দিকে একবার তাকিয়ে গাড়ীটা ছাড়ল অরুণ। সন্ধ্যার আগেই সে পৌঁছতে চায় বাবার কাছে। গাড়ীর স্পীডটা তাই বাড়িয়ে দিল সে।

আমি একটা অন্যায় করেছি, হঠাৎ বলল সীমা।

আবার কি? ভয় পেল অরুণ।

আপনাকে না বলে আলমারী থেকে একটি মেয়ের ছবি দেখেছি।

বুঝেছি, বন্দনার ছবি। স্বস্তির নিশ্বাস ফেলল অরুণ।

কে বন্দনা? কথাটা সীমার মুখ থেকে হঠাৎ বেরিয়ে এল।

আমার বোন—কাকার মেয়ে বন্দনা; এখন স্বামীর সঙ্গে বিলেতে আছে।

নিস্তেজ হয়ে সিটের ওপর হেলান দিল সীমা। একটা দুর্দমনীয় লজ্জার বেগ তাকে যেন সংজ্ঞাহীন করে দিল সেই মুহূর্তে।

রাস্তাটা ক্রমশঃ নির্জন হয়ে আসছে। বাস কিংবা সাইকেল রিক্সা এ রাস্তায় চলে না। বড় রাস্তা থেকে এটা উত্তর দিকে বেঁকে গিয়েছে। গাড়ীর গতিটা আরও বাড়িয়ে দিল অরুণ। সীমা তাকিয়ে দেখতে লাগল বাইরের দিকে। বড় বড় গাছগুলো এক এক করে চলে যাচ্ছে গাড়ীর পাশ দিয়ে। জায়গাটা চিনতে পারল সীমা। গতবার ঝড় জলের জন্যে এখানেই অরুণ গাড়ী থামিয়েছিল। রাস্তায় আজ লোক নেই। এমনকি দূরে মাঠের মধ্যেও কাউকে নজরে পড়ল না তার। আজ নিশ্চয়ই হাটবার নয়, ভাবল সীমা। তাহলে লোকের বেশ ভিড় থাকত। সন্ধ্যা হয়ে আসছে। অন্ধকার নামছে ধীরে ধীরে।

একটু আস্তে চালান, বলল সীমা আর থাকতে না পেরে। অরুণের এই খুদে গাড়ীটা যে এভাবে উড়ে যেতে পারে এটা জানত না সে। কিন্তু কেমন যেন একটা ভয় করছে তার। নিস্তব্ধ, নির্জন আর অন্ধকারের মধ্য দিয়ে তীব্র বেগে গাড়ীটা ছুটে চলেছে। অরুণের মুখের দিকে তাকাল সে। শক্ত চোয়ালের রেখাটা স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। মুষ্টিবদ্ধ হাত দুটো দিয়ে স্টিয়ারিংটা ধরে আছে সে। অপলক দৃষ্টিটা তার অন্ধকারের দিকে নিবদ্ধ। পাশের চওড়া নালার দিকে তাকাল সীমা। গতবারের মত সেটা আর ভর্তি নেই বটে তবে জল আর কাদা রয়েছে প্রচুর। ঘন অন্ধকার এখনও নামেনি। তাই হেডলাইট দুটো জ্বালেনি অরুণ।

প্রায় অর্ধেকের ওপর রাস্তা পার হয়ে এসে অরুণ এবার ভাবছে, কিভাবে সে বাবার কাছে এই অপ্রিয় প্রসঙ্গটা উত্থাপন করবে। কথাটা মনে পড়তেই তার মনটা বিষাদে ভরে গেল। না, সে হেরে গেল। এত চেষ্টা করেও সে সফল হল না। শেষ অবধি পরাজয়ের গ্লানি আর লজ্জা তাকে স্বীকার করতে হচ্ছে। আশ্চর্য! তাহলে ডাঃ সোম কি করলেন? সাইকো এনালিসিস, তার নিজের সহিষ্ণুতা, বাবার অকুণ্ঠ স্নেহ, কোনটাই কাজে লাগল না, ফেরাতে পারল না সীমাকে স্বাভাবিক পথে। ডাইভোর্স হলেও লজ্জার কথা হয়। সমাজের কথা বাদ দিলেও তার বাবার মুখের দিকে সে তাকাবে কি করে? কি কৈফিয়ৎ দেবে সে নিজেকে? একটা অসঙ্গত খামখেয়ালীর পরিণতি এছাড়া আর কি হতে পারে! একটা মূল্যবান প্রচেষ্টার অর্থহীন পরিশেষ!

পাশের ঝোপের আড়াল থেকে হঠাৎ একটা গরু এসে পড়ল রাস্তার ওপরে। তাকে বাঁচাতে চকিতে স্টিয়ারিংটা অপর দিকে ঘোরালো অরুণ। সীমার কণ্ঠের একটা ক্ষীণ আর্তস্বর তার কানে পৌঁছে-ছিল মাত্র; তারপর আর সে কিছুই জানে না।

প্রচণ্ড শব্দে গাড়ীটা উল্টে খানার ভেতরে গিয়ে পড়ল। সীমা ছিটকে খানার পাশে পড়েছে। একটু পরেই জ্ঞান হয়েছে তার। এতক্ষণে সে বুঝেছে যে একটা মারাত্মক দুর্ঘটনা ঘটে গিয়েছে। এটা ভাবতেও সময় লেগেছে। নিস্তব্ধ অন্ধকারে তার মনটাও কোথায় যেন হারিয়ে গিয়েছিল। হাতে ভর দিয়ে সীমা উঠে দাঁড়াল কোন মতে। একটা তীব্র নেশায় তার সমস্ত শরীর আর মস্তিষ্ক অসাড় হয়ে রয়েছে। লক্ষ্য করে দেখল একটু দূরে গাড়ীটার প্রায় তলায় অরুণ শুয়ে রয়েছে। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব এগিয়ে গেল সে। অরুণের পায়ের দিকটা জলের নীচে রয়েছে, সেটা দেখতে পাওয়া যাচ্ছে না। কোমরের নীচে থেকে দেহটা কাদায় প্রায় বসে রয়েছে। সীমা অরুণের দিকে দেখল। ফোঁটা ফোঁটা রক্ত পড়ছে তার ঠোঁটের পাশ দিয়ে। মুখটা ফ্যাকাশে, রক্ত-শূন্য, চোখদুটো বন্ধ। গলা থেকে টাইটা খুলে দিল সীমা। তারপর অরুণকে ওপর দিকে টানতে লাগল প্রাণপণ শক্তিতে। কিছুটা তোলা সম্ভব হল। কিন্তু আর পারছে না সীমা। অরুণ আর বেঁচে নেই, ভাবল সীমা। একটা অস্বাভাবিক গোঙানীর আওয়াজ শুনতে পেল সে। গাড়ীর ভাঙা যন্ত্রের না অরুণের গলা থেকে আওয়াজটা বেরোচ্ছে? একটু পরে সীমা বুঝল এটা তারই কান্নার শব্দ।

অরুণের মুখটা শাড়ীর আঁচল দিয়ে মুছিয়ে দিল সে। সর্বাঙ্গে তার কাঁচের টুকরো আর কাদা। কিছু সরিয়ে দেবার পরই তার হঠাৎ মনে পড়ল অরুণ আর বেঁচে নেই। উঠে দাঁড়িয়ে উদ্‌ভ্রান্তের মত চারিদিকে দেখতে লাগল সে। না, কেউ কোথাও নেই। শরীরের মধ্যে অসহ্য একটা কাঁপুনির বেগ এল তার। চীৎকার করে কাঁদবার ইচ্ছে হল। কিন্তু কোন স্বর ফুটল না তার গলার ভেতর। হাত দুটো বুকের কাছে জড়ো করে বোবার মত তাকিয়ে রইল সে।

প্রচণ্ড বিস্ফোরণের আওয়াজ কিন্তু অনেকদূর পর্যন্ত পৌঁচেছে। তাই একটু পরেই লোকজন এসে উপস্থিত হল। সকলে মিলে অরুণকে তুলে আনল। অরুণের পায়ের একটা হাড় ভেঙ্গে গিয়েছে। সাদা হাড়টা রক্তাক্ত ক্ষতের মধ্য দিয়ে পরিষ্কারভাবে দেখা যাচ্ছে বাইরের দিকে। একটা গাড়ীও জোগাড় করল ওরা। তারপর অরুণ আর সীমাকে নিয়ে পৌঁছে দিল হাসপাতালে।

অরুণকে নিয়ে গেল ভেতরে। সীমা বাইরে বসে রইল চুপ করে। এতক্ষণে কিছুটা সামলে নিয়েছে সে। ভাবতে পারছে সব জিনিসটাকে ঠিকভাবে। তার নিজের দেহেরও বেশ কয়েক জায়গায় চোট লেগেছে। এতক্ষণে সেটা অনুভব করতে পারল সীমা।

একটু পরেই ডাক্তার এল।

উনি আপনার কে হন? জিজ্ঞেস করল ডাক্তার।

আমার স্বামী। বুকটা কেঁপে উঠল তার অজানা ভয়ে। আবার একটা প্রচণ্ড আঘাত আসছে তার। ভয়ে তার স্নায়ু আর দেহ শক্ত হয়ে উঠল। মুখটা ফ্যাকাশে হয়ে উঠল সঙ্গে সঙ্গে।

কি হয়েছে? জিজ্ঞেস করল সে।

না, কিছু হয়নি। উত্তর দিল ডাক্তার. পায়ে একটা ছোট অপারেশন করতে হবে. তাই কাগজটায় আপনার একটা সই দর-কার।

কেমন আছেন? বিবর্ণ মুখে তাকাল সীমা।

ভয় নেই, ভাল হয়ে যাবেন, আশ্বাস দিল ডাক্তার।

কাগজটায় বড় বড় অক্ষরে নিজের নামটা লিখল সে— সীমা রুদ্র।

।। সমাপ্ত ।।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের ইতিহাস

বিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায়

তৃতীয় পর্ব

তৃতীয় অধ্যায়

নাৎসী গ্রাসে বলকান অঞ্চল।

ইতালী জার্মান ও বৃটিশ সংঘাত

১৯১৪ সালেরও পূর্ব হইতেই বলকান অঞ্চল ইউরোপের বারুদাগার নামে পরিচিত ছিল। বহু জাতি ও খণ্ডজাতি এবং মাইনরিটি সমস্যায় বিব্রত এই বিচিত্র পর্বতবহুল দেশ ইউরোপীয় সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধের একটা মর্মকেন্দ্র ছিল। ১৯১২-১৩ সালের বলকান যুদ্ধ এবং ১৯১৪ সালের প্রথম মহাযুদ্ধের আরম্ভের জন্য এখানকার ইতিহাস রণকীর্তির 'গৌরব' দাবী করিতে পারে। যুগোশ্লাভিয়া, রুমানিয়া, বুলগেরিয়া, গ্রীস, আলবেনিয়া এবং ইউরোপীয় তুরস্ক—মোট এই ছয়টি দেশের একত্র ভৌগোলিক সংস্থাপনকেই বলকান অঞ্চল বলা হইয়া থাকে। এই অঞ্চলে খাদ্য আছে, পেট্রোল আছে এবং জনগণের শতকরা ৮০ জনই কৃষক, অর্থাৎ দরিদ্র। কিন্তু ইহার রণনৈতিক অবস্থান অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কেননা এই অঞ্চল দিয়াই এশিয়া মহাদেশের সঙ্গে ইহার ভূমিপথের সংযোগ এবং ভূমধ্যসাগরের পূর্বাংশের উপর আধিপত্য বিস্তারের ইহা পথ। জার্মাণীতে কাইজারের আমল হইতেই ইতিহাসের পাঠক এখান দিয়া বার্লিন-বাগদাদ লাইনের কথা শুনিয়া আসিয়াছেন। কল্পনা ছিল এই যে, বার্লিন হইতে একটা রেলপথ বলকান অঞ্চল অতিক্রম করিয়া এবং তুরস্ক হইয়া বাগদাদ ও মশুলের তৈলখনি, এমনকি ভারত সীমান্ত পর্যন্ত পৌঁছিবে। কিন্তু এই রেলপথ কল্পনাতেই রহিয়া গিয়াছে।

বৃটেন, ফ্রান্স, জার্মানী ও রাশিয়া (এবং কিছু পরিমাণে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র) সকলেই বলকান অঞ্চলে প্রভাব খাটাইতে চাহিয়াছে। কিন্তু ১৯১৮ সালের প্রথম মহাযুদ্ধে পরাজিত জার্মানী দীর্ঘকাল আর সুবিধা করিতে পারে নাই। সেই সুযোগ আসিল ১৯৩১—৩২ সালের পৃথিবীব্যাপী আর্থিক মন্দার এবং জার্মানীতে হিটলারের ক্ষমতা লাভের পর। হিটলারের দৃষ্টি ছিল পূর্ব এবং দক্ষিণ—পূর্ব ইউরোপের দিকে। নাৎসী জার্মানীর 'অর্থনীতির যাদুকর' ডাঃ শাক্ট এ বিষয়ে হিট্লারের সহায় হইলেন এবং তিনি এই তত্ত্ব প্রচার করিলেন যে রাজনৈতিক আধিপত্য বিস্তারের আগে 'অর্থনৈতিক অনুপ্রবেশের প্রয়োজন। এই তত্ত্ব অনুযায়ী বুদ্ধিমান ডাঃ শাক্ট দক্ষিণ-পূর্ব ইউরোপের বলকান রাজ্যে হানা দিলেন—এই রাজ্যের দ্বার তখন বহিঃপৃথিবীর আর্থিক মন্দা, শুল্ক প্রাচীর বিনিময় ঘটিত নিষেধাবিধি ইত্যাদির জন্য রুদ্ধ ছিল। ১৯৩৩ সাল হইতে ১৯৩৫ সালের মধ্যে দক্ষিণ-পূর্ব ইউরোপের প্রধান খরিদ্দার হইল জার্মানী। যুগোশ্লাভিয়া, গ্রীস, বুলগেরিয়া ইত্যাদি বলকান অঞ্চলের রাজ্যগুলি হইতে ডাঃ শাক্ট প্রভূত পণ্য আমদানী করিতে লাগিলেন এবং বিনিময়ে জার্মানী 'শস্যের বদলে শেল' অর্থাৎ গোলাগুলী ও অস্ত্র জোগাইতে লাগিলেন। গ্রীসের রাজা খুসী হইয়া ডাঃ শাক্টকে একটা সম্মানজনক পদবীতে পর্যন্ত ভূষিত করিলেন। আর এথেন্সের হোটেলে ইউরো-মার্কিন অস্ত্র ব্যবসায়ীরা কপালে করাঘাত করিতে লাগিলেন—

> "in the Hotel Granade Bretagne at Athens arms merchants from Britain, France, Italy, Sweden and the United States mourned their six months of wasted hotel bills tipsters' fees". (1)

ডাঃ শাক্টের এই অর্থনৈতিক অনুপ্রবেশ সত্য সত্যই বলকান রাজ্যে নাৎসী প্রভুত্বের প্রতিষ্ঠা দিল এবং 'শস্যের বদলে শেল' সরবরাহের নীতি এই অধমর্ণ দেশগুলিতে প্রভূত সাফল্য অর্জন করিল। কিন্তু কেন?—এর উত্তর পাওয়া যাইবে একে একে সমস্ত বলকান রাজ্যে। অতি সংক্ষেপে এর সারমর্ম উল্লেখ করা যাইতে পারে।

(1) 'Hitler's Drive to the East—by F. Elwyn Jones, Page 44 — 1937

গ্রীস

৬০ লক্ষ অধিবাসীর দেশ গ্রীস ১৯৩৬ সালের ৫ই আগষ্ট তারিখ সকাল বেলা সহসা সৈন্যদলের কুচকাওয়াজে চমকিত হইয়া গেল। আগের দিন রাত্রে পুলিশ সমস্ত ট্রেড ইউনিয়ন প্রতিষ্ঠান দখল করিল সংবাদপত্রের অফিস বন্ধ করিয়া দিল এবং রাজধানী এথেন্সে রাজা দ্বিতীয় জর্জের ঘোষণা অনুযায়ী জেনারেল মেটাক্সাস গভর্ণমেণ্ট দখল করিলেন—'কমিউনিষ্ট উপদ্রব হইতে দেশকে রক্ষার জন্য'—'মস্কোর বেতনভুক রক্তপিপাসু এই কমিউনিষ্ট, সমাজশৃংখলা, পিতৃভূমি, পরিবার এবং ধর্মের ঘোরতর শত্রু।'

কিন্তু কমিউনিষ্টদের বিরুদ্ধে এই আক্রমণের কোন যুক্তিসঙ্গত কারণ ছিল না। তাদের সংখ্যা ও শক্তি উভয়ই ছিল তখন সামান্য। তথাপি এই আক্রোশ তাদের বিরুদ্ধে ফাটিয়া পড়িল এই কারণে যে, ৫ই আগষ্ট তারিখ একদিনের জন্য জেনারেল ষ্ট্রাইক বা সর্বাত্মক ধর্মঘট ডাকা হইয়াছিল এবং সমস্ত ট্রেড ইউনিয়নগুলি একত্র হইয়াই শ্রমিকদের বিরুদ্ধে পীড়ননীতি ও তাদের ন্যায়সঙ্গত অধিকার হরণের বিরুদ্ধে এই ধর্মঘট আহ্বান করিয়াছিল। গ্রীসের জনসাধারণ ছিল অত্যন্ত দরিদ্র—বহু স্থানে অর্ধনগ্ন ভিক্ষুকের দল ভীড় করিত। হাজার হাজার স্ত্রীলোকের ভদ্রভাবে জীবননির্বাহের কিংবা জীবিকার্জনের কোন পথ ছিল না। গ্রাম্য অঞ্চলে কৃষকেরা ছিল মহাজনের নিকট ঋণে আবদ্ধ। এই অবস্থায় দেশব্যাপী প্রতিবাদ ও ধর্মঘট ছিল স্বতঃস্ফূর্ত। কিন্তু জেনারেল মেটাক্সাস সাম্যবাদ আতঙ্কের ছুতা ধরিয়া এই সুযোগে রাজা, ব্যাঙ্কার ও সেনাপতিবৃন্দের সাহায্যে সমস্ত ট্রেড ইউনিয়ন, পার্লামেণ্ট ও গণতন্ত্রী দলগুলিকে দমন করিলেন, সংবাদপত্রের কণ্ঠরোধ করিলেন এবং বিরোধী দলকে কারাগারে নিক্ষেপ করিলেন। এই সময় গ্রীসে বৃটিশ প্রভুদের বদলে নাৎসী প্রভুত্ব প্রসারলাভ করিল। জেনারেল মেটাক্সাস জার্মানভক্ত ছিলেন. তিনি বার্লিনের সামরিক শিক্ষার্থীরূপে 'ক্ষুদে মলটকে' নামে পরিচিত ছিলেন। (২)

সুতরাং নাৎসী অর্থনীতিবিদ ডাঃ শাকটের পক্ষে গ্রীসের শাসকমণ্ডলীকে হাত করা এবং 'শস্যের বদলে অস্ত্র' সরবরাহে বেগ পাইতে হইল না। মেটাক্সাসের ফ্যাসিস্ট অত্যাচারে জনগণ উৎপীড়িত হইতে লাগিল আর জেলখানাগুলি নরককুণ্ডে পরিণত হইল। মেটাক্সাস 'আমৃত্যু প্রধানমন্ত্রী' বলিয়া ঘোষিত হইলেন। এই অবস্থা চলিল ১৯৩৯ সাল পর্যন্ত। কিন্তু এদিকে ইউরোপীয় যুদ্ধের সঙ্কটে গ্রীস ফ্যাসাদে পড়িল। ভূমধ্যসাগরে গ্রীসের অবস্থানের গুরুত্বের জন্য বৃটেন তাকে হাতছাড়া করিতে পারে না এবং গ্রীসের রাজপরিবারের সঙ্গে বৃটেনের ছিল একান্ত যোগ। আর রাজাকে কেন্দ্র করিয়া ছিল একদল বৃটিশ পক্ষপাতী রাজনীতিক। তাঁদের সহিত শলাপরামর্শে ১৯৩৯ সালের এপ্রিল মাসে বৃটেন গ্রীসকে রক্ষার প্রতিশ্রুতি দিলেন এবং গ্রীস নিরপেক্ষতা ঘোষণা করিল। কিন্তু তার মনপ্রাণ রহিয়া গেল ফ্যাসিজমের দিকে। ডাঃ শাক্টের ছায়ামূর্তি গ্রীক শাসকদিগকে অনুসরণ করিতে লাগিল। আর ডাঃ গোয়েবল্সের প্রচারবিদ্যায় গ্রীসে নাৎসীবাদের জয়ধ্বনি চলিতে লাগিল।......

(২) পূর্বোল্লিখিত পুস্তক।

রুমানিয়া

বলকান রাষ্ট্রগুলির মধ্যে রুমানিয়া সর্ববৃহৎ, এর লোকসংখ্যা প্রায় দুই কোটি। রাজা দ্বিতীয় ক্যারলকে কেন্দ্র করিয়া রুমানিয়া দস্তুরমত 'রোমাণ্টিক' দেশে পরিণত হইয়াছিল। একদিকে অভিজাত মহলের প্রেম, ব্যাভিচার বিলাস এবং অন্যদিকে ঘরহারা জিপসী ও দরিদ্রের দল। রাজধানী বুখারেস্ট শহর রাজনৈতিক চক্রান্ত এবং বীভৎস দুর্নীতির একটা বৃহৎ আড্ডা। রাজা ক্যারল তাঁর বিবাহিতা পত্নীকে ত্যাগ করিয়া মাদাম লুপেস্কু নাম্নী এক রক্ষিতাকে লইয়া বাস করিতেন এবং এক সময় এই নারীর জন্য তিনি পিতার মৃত্যুর সময় সিংহাসনের দাবী পর্যন্ত ত্যাগ করিয়াছিলেন। রাজ দরবারের অন্তরালে মাদাম লুপেস্কুই আসল ক্ষমতা পরিচালনা করিতেন এবং এই 'রাজকীয় কেলেঙ্কারি' একদা ইউরোপীয় সমাজের রসালোচনার বস্তু ছিল। কিন্তু একা ক্যারলই নহেন আরও অনেকে এই পথের পথিক ছিলেন।

রুমানিয়ার জনগণের দারিদ্র্য ছিল ভয়াবহ। উপবাসী ক্ষুধার্ত নরনারীর অদৃষ্টে রুটির টুকরাও জুটিত না অনেকে আবর্জনা কুণ্ড হইতে খাদ্য কুড়াইয়া খাইত। স্বভাবতঃই এই দরিদ্র কৃষকেরা অজ্ঞ ও কুসংস্কারাচ্ছন্ন ছিল। আমাদের দেশের গরীব ও অজ্ঞ গ্রামবাসীরা যেমন অদৃষ্টের দোহাই দিয়া এবং পরলোকের উপর নির্ভর করিয়া চলে, এখানেও সেই একই দৃশ্য দেখিতে পাওয়া যায়। এই সম্পর্কে একটি অদ্ভুত ঘটনার কথা উল্লেখ করা যাইতে পারে। ১৯৩৬ সালের নভেম্বর মাসে বোরোবিয়ার কিসিনেভ গ্রামে একজন পুরোহিত পুলিশের হাতে ধরা পড়ে। এই পুরোহিতের কাছে 'স্বর্গের মানচিত্র' ছিল এবং 'মানচিত্রে' বিস্তৃত ঘর কাটা ছিল। অজ্ঞ ও সরলবিশ্বাসী কৃষকেরা বিশেষভাবে স্ত্রীলোকেরা আসিয়া পুরোহিতের নিকট 'স্বর্গের জমির' জন্য অগ্রিম টাকা জমা দিয়া যাইত। যে 'জমি' ভগবানের যত নিকটে উহার দাম তত বেশী চড়া ছিল এবং ভগবানের কাছ হইতে যত দূরে তত কম দাম। স্বর্গের এই কম দামী স্থানগুলির মূল্য ছিল ৩০ টাকার মত। অনেক কৃষক তাদের জোত-জমি বা ঘরের শেষ গরুটি পর্যন্ত বিক্রি করিয়া ভগবানের একান্ত কাছের স্থানগুলি কিনিয়া রাখিত। (৩)

এই যেখানে অবস্থা সেখানকার রাজনৈতিক আবহাওয়া চিন্তা করিবার মত। রুমানিয়ার ভৌগোলিক সংস্থান, পেট্রোল এবং গম জার্মানীর পক্ষে লোভনীয়। ডাঃ শাক্টের অর্থনৈতিক দৃষ্টি রুমানিয়ার উপর পড়িল, ১৯৩৯ সালের এপ্রিল মাসে জার্মানীর সহিত রুমানিয়ার বাণিজ্যচুক্তি স্বাক্ষরিত হইল এবং রুমানিয়ার এক-তৃতীয়াংশ বাণিজ্য জার্মানীর হাতে গেল। পেট্রোলের জন্য রুমানিয়া প্রসিদ্ধ, ১৯৩৯ সালে ৮০ লক্ষ টন পেট্রোল সেখানে উৎপন্ন হইয়াছিল। সুতরাং একদিকে পেট্রোল এবং অন্যদিকে সোভিয়েট রাশিয়াকে বিচ্ছিন্ন করার কৌশল জার্মানী অনুসরণ করিল। ১৯৩৬ সাল হইতে ইহার সূত্র।

মঃ টিটুলেস্কু যতদিন পররাষ্ট্রসচিব ছিলেন ততদিন রুমানিয়া বিশ্বরাষ্ট্র সংঘের সমষ্টিগত নিরাপত্তার নীতি এবং ফ্রান্স, রাশিয়া বা চেকোশ্লোভাকিয়ার সঙ্গে মৈত্রী রক্ষা করিয়া চলিতেছিল। কিন্তু বার্লিন ও বুখারেস্টের ফ্যাসিস্টপন্থীদের মধ্যে পারস্পরিক যোগাযোগের ফলে ১৯৩৬ সালের আগষ্ট মাসে মঃ টিটুলেস্কু পদচ্যুত হন। বলা বাহুল্য যে রাজা ক্যারলের নির্দেশ অনুসারেই ইহা ঘটিল। তিনি ছিলেন জার্মানী ও রাশিয়ার ভূতপূর্ব সম্রাট পরিবারদের সঙ্গে আত্মীয়তার সূত্রে আবদ্ধ। সুতরাং ক্যারল একদিকে হিটলারপন্থী এবং অন্যদিকে নিদারুণ সোভিয়েট বিদ্বেষী ছিলেন। আর ফ্যাসিস্ট ও আধা ফ্যাসিস্টপন্থী রাজনৈতিক ও সন্ত্রাসবাদী দলেরও অভাব ছিল না। ইহাদের মধ্যে 'লৌহরক্ষীর' দল ছিল সর্বাপেক্ষা মারাত্মক। তারা মাদাম লুপেস্কু এবং রাজপরিবারের আশ্রয়ে পুষ্ট হইয়া ইচ্ছামত খুন-জখম করিয়া বেড়াইত। প্রকাশ্যে আইন অমান্য করিত এবং শেষ পর্যন্ত রাজা ক্যারলেরও সিংহাসন নড়িয়া উঠিল। তখন ক্যারল স্বয়ং ডিক্টেটারী ক্ষমতা হাতে লইয়া দমনকার্য সুরু করিলেন। কিন্তু তাতেও কুলাইল না। ১৯৪০ সালের সেপ্টেম্বর মাসে তাঁকে সিংহাসন ত্যাগ করিতে হইল—পুত্র মাইকেলের হাতে শাসনভার অর্পণ করিয়া। এদিকে ফ্যাসিস্ট দলপতি এবং 'Iron Guard' এর নেতা আন্তনেস্কু ডিক্টেটার হইয়া বসিলেন। উহার আগে ১৯৩৬ সাল হইতে রুমানিয়ায় ফ্যাসিস্টবিরোধীদের উপর অত্যাচারের বান ডাকিল। বেসারাবিয়ায় একটি ১৩ বৎসরের মেয়েকে ১০ বৎসরের কারাদণ্ড দেওয়া হইল এবং জেলখানাগুলি এমন সাংঘাতিক হইয়া উঠিল যে মৃত্যুদণ্ড দেওয়ার আর দরকার রহিল না। (৪)

(৩) পূর্বোল্লিখিত পুস্তক।

(৪) পূর্বোল্লিখিত পুস্তক। পৃঃ ৭৩

বুলগেরিয়া ও যুগোশ্লাভিয়া

বুলগেরিয়া এবং যুগোশ্লাভিয়ার ইতিহাসও প্রায় একই রকম—সেই সাম্যবাদ বিরোধিতা, গণতন্ত্রবাদীদের পীড়ন, জনসাধারণের দারিদ্র্য এবং ফ্যাসিজম ও মিলিটারীর দৌরাত্ম্য। ম্যাসিডোনিয়ায় সন্ত্রাসবাদীরা এই অবস্থাকে আরও জটিল করিয়া তুলিয়াছিল,— যেমন যুগোশ্লাভিয়ায় ক্রোট সন্ত্রাসবাদীরা এই ক্ষুদ্রদেশে দলাদলি ও মারামারির ইয়ত্তা ছিল না। জনৈক ফরাসী বিদ্রূপরসিক বুলগেরিয়ার আভ্যন্তরীণ রাজনৈতিক অবস্থা সম্পর্কে ঠাট্টা করিয়া লিখিয়াছিলেন—

"One Bulgarian is a peasant
Two Bulgarians are a political party.
Three Bulgarians are three political parties".

অর্থাৎ একজন বুলগেরিয়ান চাষী মাত্র, দুজন বুলগেরিয়ান মিলে একটি রাজনৈতিক দল, আর তিনজন বুলগেরিয়ান তিনটি রাজনৈতিক দল।

তথাপি বুলগেরিয়ার রাজা বোরিস ১৯৩৮ সালের মিউনিক সংকটের সময় ফ্রান্স ও বৃটেনের দলে ভিড়িতে চেষ্টা করিতেছিলেন। কিন্তু হিটলারের অসন্তোষ উৎপাদনের ভয়ে বৃটিশ প্রধানমন্ত্রী মিঃ চেম্বারলেন তাঁকে পাত্তাই দিলেন না। প্রকাশ যে, অনেক কষ্টে তিনি চেম্বারলেনের সহিত ৭ মিনিটের আলাপ করিতে পারিয়াছিলেন। (৫)

যুগোশ্লাভিয়ার রাজা আলেকজাণ্ডার ১৯৩৪ সালের অকটোবর মাসে নিহত হইবার পর তার জ্ঞাতি ভ্রাতা প্রিন্স পল রাজপ্রতিভূরূপে শাসনভার গ্রহণ করিলেন। কিন্তু সোভিয়েট বিদ্বেষ ও নাৎসীবাদের এবং হিটলারের প্রতি আনুগত্যের জন্য ১৯৪০ সালের সেপ্টেম্বরে জার্মানীর সহিত যুগোশ্লাভিয়া প্রকাশ্যেই চুক্তি স্বাক্ষর করিল। বলা বাহুল্য যে, বলকান রাজ্যগুলিতে জার্মানীর এই আধিপত্য বিস্তারের জন্য বৃটেন শঙ্কিত ছিল এবং বৃটিশ কূটনীতিবিদগণও যথাসম্ভব পর্দার আড়ালে কলকাঠি নাড়িতেছিলেন। আর বৃটিশ ও মার্কিন পক্ষপাতী একদল প্রভাবশালী গণতন্ত্রবাদী লোকও ছিলেন। এদিকে নির্যাতিত জনসাধারণও ফ্যাসিস্টদের ও শাসক শ্রেণীর প্রতি অত্যন্ত রুষ্ট ছিল। সুতরাং একদিন মধ্যরাত্রে (মার্চ ১৯৪১) অকস্মাৎ এক নাটকীয় বিদ্রোহ ঘটিল অক্ষশক্তিবর্গের সহিত যুগোশ্লাভিয়ার চুক্তি স্বাক্ষরের পর। সৈন্যবাহিনী ও বিমানবাহিনীর পদস্থ ব্যক্তিরা এক চক্রান্ত করিলেন, রাজপ্রাসাদের রক্ষীরাও ইহাতে যোগ দিলেন—বালক রাজা পিটারকে রক্ষার জন্য। মন্ত্রীদিগকে গ্রেপ্তার এবং সরকারী ভবনগুলি দখল করিবার জন্য একটা পরিকল্পনা স্থির হইল। সেই অনুসারে মধ্যরাত্রির পর কাপ্তেন র‍্যাকোৎচেভিস প্রধানমন্ত্রীর গৃহে হানা দিলেন এবং তাঁহাকে ঘুম হইতে জাগাইয়া অনুরোধ করিলেন অনুসরণের জন্য। বিস্মিত প্রধানমন্ত্রী স্বেৎকোভিস্ ক্রুদ্ধস্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'হুকুম দেওয়ার তুমি কে? তোমার কথা আমি গ্রাহ্য করি না।' কাপ্তেন তৎক্ষণাৎ রিভলবার বাহির করিয়া হুকুম করিলেন— 'March or I fire' 'হয় আমার অনুসরণ কর নতুবা আমি গুলী চালাইব।' প্রধানমন্ত্রী সুবোধ বালকের মত অনুসরণ করিলেন। এভাবে পুলিশ হেড কোয়ার্টার ও সমস্ত সরকারী ভবন দ্রুত দখল হইয়া গেল। বিদ্রোহী বাহিনীর অধিনায়ক জেনারেল সিমোভিচ রাজপ্রসাদে গেলেন এবং নিদ্রামগ্ন বালক রাজা পিটারকে জাগাইয়া অনুগত প্রজার মত অভিবাদন করিয়া বলিলেন,

(Your Majesty from now you are king of Yugoslavia exercising full sovereign right"

এই অভিনব ঘটনাটি অত্যন্ত নাটকীয় এবং বাহ্যতঃ ক্ষুদ্র। কিন্তু এই ঘটনাটি হইতেই ১৯১৪ সালের প্রথম মহাযুদ্ধের সেরাজেভোর ঘটনার মত 'বলকানের বারুদাগারে' বিস্ফোরণ ঘটিয়া গেল। সে কথা নিম্নে বলা যাইতেছে। (৬)

• •

হিটলারের দিগ্বিজয়ের দৃষ্টান্তে মুসোলিনী লুব্ধ হইয়া উঠিলেন। নিজের ব্যক্তিগত রণপিপাসার সঙ্গে রোমক সাম্রাজ্য বিস্তারের নেশাও তাঁকে পাইয়া বসিল। সুতরাং প্রথমত তিনি হাতের কাছে গ্রীস এবং পরে উত্তর আফ্রিকা আক্রমণ করিলেন। মুমূর্ষু ফরাসী সাম্রাজ্যের দখল এবং বৃটেনকে ভূমধ্যসাগরীয় এলাকা হইতে উচ্ছেদসাধনই ছিল তাঁর উদ্দেশ্য। ১৯৪০ সালের ২৮শে অকটোবর মুসোলিনী আলবেনিয়ার ভিতর দিয়া গ্রীসকে আক্রমণ করিলেন।

বলকান ও ভূমধ্যসাগরের উপর এভাবে ইতালী ও জার্মানীর আধিপত্য বিস্তারের আশঙ্কায় বৃটেন স্বভাবতই শঙ্কিত হইল। ১৯৪০ সালের ২৩শে ডিসেম্বর চেম্বারলেনীয় আপোষ ও তোষণনীতির সঙ্গী পররাষ্ট্রসচিব লর্ড হ্যালিফাক্স মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে প্রেরিত হইলেন বৃটিশ রাজদূতরূপে এবং মিঃ ইডেন তাঁর স্থলে পুনরায় পররাষ্ট্রসচিব নিযুক্ত হইলেন। বলকান অঞ্চলে ক্রমবর্ধমান নাৎসী আধিপত্যের বিরুদ্ধে বাধা দেওয়ার জন্য মিঃ ইডেন, বৃটিশ সেনানীমণ্ডলীর অধ্যক্ষ স্যার জন ডিল এবং অন্যান্য পদস্থ সামরিক কর্মচারিগণ ১৯৪১ সালের ২৭শে ফেব্রুয়ারী তুরস্কের রাজধানী আঙ্কারায় গেলেন তুর্কি নেতাদের সঙ্গে পরামর্শের জন্য। দুর্বল তুরস্কের পক্ষে জার্মানী বা বৃটেন কাহাকেও চটানো সম্ভব ছিল না। সুতরাং তুর্কি গভর্নমেন্ট উভয়ের নিকটই শান্তি ও নিরাপত্তা রক্ষার প্রতিশ্রুতি দিলেন।

আঙ্কারা ভ্রমণের পর মিঃ ইডেন ও স্যার জন ডিল গেলেন গ্রীসের রাজধানী এথেন্সে। তখন গ্রীস ইতালীর দ্বারা আক্রান্ত (যাহা হিটলারের পছন্দসই ছিল না) এবং এথেন্সে রাজতন্ত্রবাদী ও বৃটিশ পক্ষপাতী দলও শক্তিশালী ছিল। বিশেষত গ্রীস আক্রান্ত হওয়ায় স্বভাবতই মিঃ ইডেন গ্রীক গভর্নমেন্টের পূর্ণ সমর্থন ও সহযোগিতা লাভ করিলেন এবং পূর্ব ভূমধ্যসাগরের নিরাপত্তা, উত্তর আফ্রিকা ও সুয়েজের দিকে চাহিয়া বৃটিশ গভর্নমেন্ট পূর্ণ সামরিক সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দিলেন। গ্রীসে বৃটিশ সৈন্য পাঠানো হইবে এবং ক্রীট ইত্যাদি দ্বীপে বৃটিশ ঘাঁটি তৈয়ার হইবে ইত্যাদি পরামর্শ ও প্ল্যান স্থির হইল। ইহার পর মিঃ ইডেন সদলবলে চলিয়া গেলেন কাইরোতে উত্তর আফ্রিকার অবস্থা সম্পর্কে পরামর্শের জন্য।

১৯৪০ ও ১৯৪১ সালের বসন্তকালের মধ্যে ইতালী-জার্মানী এবং বৃটেন, উভয়ের মধ্যে বলকান রাষ্ট্রপুঞ্জ ও উত্তর আফ্রিকা লইয়া কূটনৈতিক ও সামরিক দ্বন্দ্ব আরম্ভ হইল। হিটলার অনেক আগেই বলকান অঞ্চলে প্রবেশ করিলেন ডাঃ শাকটের অর্থনৈতিক অনুপ্রবেশের কৌশল দ্বারা এবং তারপর ঘটাইলেন রাজনৈতিক ও কূটনৈতিক চাপ। এই সমস্ত দেশ সামরিক দিক দিয়া শক্তিহীন এবং রাজনৈতিক বিচারে ফ্যাসিস্ট পক্ষপাতী ছিল। সুতরাং বলকান রাজ্য গ্রাস করিতে হিটলারের বেগ পাইতে হইল না। বিগত মহাযুদ্ধের ভার্সাই সন্ধির জন্য এই সমস্ত রাজ্যের পরস্পরের মধ্যে সীমানা ও ভূমিগত দখল লইয়া বিরোধ ছিল, আর ছিল বহু জাতি, খণ্ড জাতি ও মাইনরিটির সমস্যা। সুতরাং 'divide and rule' নীতি অনুসারে প্রথমেই হিটলার বলকান রাষ্ট্রগুলির মধ্যে বিভেদ ঘটাইলেন রুমানিয়া ও যুগোশ্লাভিয়ার ভূমির বিনিময়ে হাঙ্গেরী ও বুলগেরিয়ার প্রতি পক্ষপাতিত্বের দ্বারা। ১৯৪০ সালের ৩০শে আগস্ট তিনি "ভিয়েনা বাঁটোয়ারা" দ্বারা রুমানিয়ার উত্তর ট্রান্স-সিলভানিয়া হাঙ্গেরীকে এবং যুগোশ্লাভিয়ার দক্ষিণ ডবরুজা বুলগেরিয়াকে অর্পণ করিলেন। ইহার ফলে রুমানিয়ার রাজা ক্যারল সিংহাসন ত্যাগে বাধ্য হইলেন এবং ১৯৪০ সালের ২৩শে নভেম্বর রুমানিয়া অক্ষশক্তিবর্গের সঙ্গে যোগ দিল। হাঙ্গেরীও নভেম্বর মাসে রোম-বার্লিন-টোকিও চক্রে যোগ দিল এবং ১৯৪১ সালের ১লা মার্চ জার্মানীর সহিত চুক্তি অনুসারে বুলগেরিয়াও নাৎসী সৈন্যদলের গ্রাসে পড়িল। বাকি রহিল যুগোশ্লাভিয়া ও গ্রীস। এখানে উল্লেখযোগ্য যে অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক চাপ দিয়া এবং পারস্পরিক ভূমিগত লোভের উস্কানি দিয়া জার্মানী ধূর্তের মত বলকান রাজ্যগুলিকে একটি একটি করিয়া গ্রাস করিল। যে দুইটি বাকি রহিল, সেগুলিকে [illegible] তারা সামরিক থাবা মারিয়া [illegible] হইল।

কিন্তু [illegible] যবনিকা অন্তরালবর্তী একটু গোপন ইতিহাস আছে, যাহা অত্যন্ত শিক্ষাপ্রদ ও চমকপ্রদ।

---

(5) Quarterly Record of the War —Vol. 6 P. 105-8.

(৬) পূর্বোদ্ধৃত পুস্তক

১৯৪০ সালের ২৮শে অক্টোবর মুসোলিনীর সৈন্যেরা আলবেনিয়ার পর্বত-সঙ্কুল সীমান্ত দিয়া গ্রীস আক্রমণ করিতে গিয়া অত্যন্ত ফ্যাসাদে পড়িল এবং করিটজা ও আর্জিরোকাস্ট্রো রণাঙ্গনে পরাজিত হইয়া পশ্চাদপসরণে বাধ্য হইল। ক্ষুদ্র গ্রীসের কাছে সমরগর্বী ইতালীর এই পরাজয় এবং অন্যদিকে ১৯৪১ সালের মার্চ মাসে যুগোশ্লাভিয়ায় অকস্মাৎ বৃটিশ পক্ষপাতী বিদ্রোহ ও বালক রাজা পিটারকে পুরোভাগে রাখিয়া জার্মানীর বিরুদ্ধে দাঁড়াইবার দুঃসাহস—এই সমস্ত অপ্রত্যাশিত ঘটনায় হিটলার বিচলিত এবং ক্রুদ্ধ হইলেন। এই প্রসঙ্গে আবার উত্তর আফ্রিকায় ইতালীয় যুদ্ধের শোচনীয় অবস্থাও স্মরণীয়।

সুতরাং পর্দার আড়ালের ইতিহাস উদ্ঘাটন করিলে দেখা যায় যে, হিটলার এই অবস্থায় বিরক্ত ও বিব্রত হইয়া পড়িয়াছিলেন।

১৯৩৯ সালের ১২ই আগস্ট, তখনও যুদ্ধ বাধে নাই। কিন্তু জার্মান সামরিক চক্রান্তের নক্সা পূর্ণবেগে অগ্রসর হইতেছিল। ইতালীয় পররাষ্ট্রসচিব সিয়ানো এবং জার্মান পররাষ্ট্রসচিব রিবেনট্রপ উভয়েই বার্সেটসগাডেনে হিটলারের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। এই সাক্ষাতের গুপ্ত বিবরণীতে দেখা যায় যে, সিয়ানো হিটলারের নিকট স্বীকার করেন যে, আলবেনিয়া নিতান্তই অনুন্নত দেশ, সুতরাং বলকান রাজ্যগুলির বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রায় এই দেশকে কোন সক্রিয় সামরিক ঘাঁটিতে পরিণত করা যাইতে পারে না। অন্তত কয়েক বৎসর সময় লাগিবে। কারণ রাস্তাঘাট তৈয়ার করিতে হইবে, খনিজ সম্পদ যথা, লোহা, তামা, ক্রোম, পেট্রোল ইত্যাদির ব্যবস্থা করিতে হইবে। তারপর স্যালোনিকা কিংবা বলকানের অন্য কোন দিকে অভিযান চালানো যাইতে পারে। (৭)

অথচ এই অভিমত সত্ত্বেও মুসোলিনী আলবেনিয়া হইতে গ্রীস আক্রমণ করিয়া বসিলেন এবং পরাজিত হইলেন। কিন্তু এই আক্রমণের পিছনে হিটলার ও তাঁর হাইকম্যাণ্ডের সমর্থন ছিল না। অর্থাৎ জার্মানীর মতে আক্রমণটা 'সময়োচিত' হয় নাই। ইহার প্রমাণ এই যে, ১৯৪৩ সালের ৭ই নভেম্বর জেনারেল জড্‌ল এক 'গোপনীয় বক্তৃতায়' বলিলেন,

> "The attack which they (Italians) launched in the autumn of 1940 from Albania with totally inadequate means was contrary to all agreements......"

ইহাতে স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে যে ১৯৪০ সালের শরৎকালে আলবেনিয়া হইতে ইতালী কর্তৃক গ্রীস আক্রমণ জার্মানীর অভিপ্রেত ছিল না, যদিও জেনারেল জড্‌ল ঐ বক্তৃতারই শেষাংশে বলিয়াছেন যে, পরে অবশ্য এই আক্রমণের প্রয়োজন হইত বৃটেনকে গ্রীসের ঘাঁটি ব্যবহারে বাধা দেওয়ার জন্য। এজন্য হিটলারের প্ল্যান ছিল আগে যুগোশ্লাভিয়াকে জব্দ করা এবং গ্রীসের বিরুদ্ধে বুলগেরিয়ার ঘাঁটি ব্যবহার করা। কিন্তু মুসোলিনীর 'অপ্রত্যাশিত' গ্রীস আক্রমণে এই প্ল্যান বানচাল হইবার জো হইল। (এই সম্পর্কে হিটলারের অসন্তোষের কথা আগের অধ্যায়েই উল্লেখ করা হইয়াছে।) সুতরাং ১৯৪০ সালের নভেম্বর মাসের মধ্যভাগে হিটলার বিরক্ত হইয়া মুসোলিনীকে এক দীর্ঘপত্র লিখিয়াছিলেন এবং তাতে তিনি বলেন, "ফ্লোরেন্সে যখন আপনার সঙ্গে সাক্ষাৎ হইয়াছিল, তখন গ্রীস আক্রমণের আগে আমার মনের ভাব আপনাকে জানাইবার চেষ্টা করিয়াছিলাম। যদি সম্ভব হয়, তবে, এই আক্রমণ স্থগিত রাখিবার জন্য, অন্ততঃ অনুকূল সময়ের আশায় অপেক্ষা করিবার জন্য আপনাকে পরামর্শ দিতে চাহিয়াছিলাম। বিদ্যুৎগতিতে ক্রীট দ্বীপ দখল করার আগে গ্রীসের বিরুদ্ধে অভিযান করা আপনার পক্ষে উচিত ছিল না।......যুগোশ্লাভিয়াকে দলে টানা উচিত ছিল এবং যুগোশ্লাভিয়ার দিক হইতে নিরাপদ না হইয়া বলকানে সাফল্যমণ্ডিত যুদ্ধ কখনো সম্ভব ছিল না। সুতরাং আমি দুঃখের সহিত বলিতে বাধ্য হইতেছি যে, মার্চ মাসের (১৯৪১) আগে আমার পক্ষে বলকান সংগ্রামে কোন সাহায্য দান সম্ভব হইবে না।" (৮)

সুতরাং বুঝা যাইতেছে মুসোলিনীকে এই যুদ্ধে অন্তত কয়েক মাসের জন্য নিজ বাহুবলের উপরেই নির্ভর করিতে বলা হইয়াছে। কিন্তু হিটলার বুঝিয়াছিলেন যে, মুসোলিনীর দ্বারা এই কার্য সম্ভব নহে। সুতরাং ১৯৪০ সালের ১৩ই ডিসেম্বর তিনি যুদ্ধসংক্রান্ত নির্দেশে (ওয়ার ডিরেকটিভ নং ২০) গ্রীস আক্রমণের পরিকল্পনা করিলেন সাঙ্কেতিক ভাষায় যাহার নাম ছিল 'অপারেশন মেরিটা' এবং যুগোশ্লাভিয়া আক্রমণের নাম ছিল 'অপারেশন-২৫'— কারণ, আলবেনিয়ার ইতালীয় যুদ্ধ 'বিপজ্জনক অবস্থায়' পৌঁছিল। উত্তর আফ্রিকায়ও অনুরূপ ফল দেখা দিল এবং ট্রিপোলিটানিয়ায় প্রস্তাবিত জার্মান আক্রমণের সাংকেতিক নাম দেওয়া হইল—'অপারেশন সান ফ্লাওয়ার'।

১৯৪১ সালের ১৯শে এবং ২০শে জানুয়ারী হিটলারের সদর দপ্তরে মুসোলিনী ও উভয়পক্ষের বড় বড় নায়কগণ একত্র হইলেন। তাঁরা স্ব স্ব দিক হইতে যুদ্ধের অবস্থা আলোচনা করিলেন এবং হিটলার বলকান ও উত্তর আফ্রিকার যুদ্ধে হস্তক্ষেপের সিদ্ধান্ত করিলেন। ঐ বৎসর ৩রা ফেব্রুয়ারী তারিখ হিটলার তাঁর সেনাপতিবৃন্দের সহিত এক গুপ্ত বৈঠকে মিলিত হইলেন এবং রাশিয়া আক্রমণের আগে বলকান ও আফ্রিকার সমস্যা মিটাইতে চাহিলেন। উত্তর আফ্রিকা ও গ্রীসে ইতালীর সামরিক শক্তির দৈন্য এবং ইতিমধ্যে যুগোশ্লাভিয়ার অতর্কিত বিদ্রোহের ফলে হিটলার উদ্বিগ্ন হইলেন। ১৯৪১ সালের ২৭শে মার্চ এই বিদ্রোহ অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। তখন হিটলার এক গুপ্ত বৈঠকে ঘোষণা করিলেন, "যুগোশ্লাভিয়ার অবস্থা সর্বদাই অনিশ্চিত; সুতরাং নূতন গভর্নমেণ্টের কাছ হইতে জার্মানীর প্রতি আনুগত্যের ঘোষণার জন্য অপেক্ষা না করিয়াই এবং কোন চরমপত্র না দিয়াই উহাকে আক্রমণ ও ধ্বংস করা হইবে।' এই সমস্ত দেশের ভূমিগত বিরোধেরও সুযোগ লওয়ার সিদ্ধান্ত হইল।

১৯৪১ সালের ২৮শে মার্চ হিটলার রোমের জার্মান দূতের মারফৎ মুসোলিনীকে আর একটি পত্র পাঠাইলেন। উহার আগের দিনই তিনি জার্মান হাই-কম্যাণ্ডকে যুগোশ্লাভিয়া আক্রমণের নির্দেশ দিয়াছিলেন। মুসোলিনীকে এই সিদ্ধান্ত জানাইয়া তিনি লিখিলেন,

> 'Now I would cordially request you, Duce, not to undertake further operations in Albania in the course of the next few days.

অর্থাৎ গ্রীসের বিরুদ্ধে আলবেনিয়া হইতে আগামী কয়েকদিনের জন্য তিনি যুদ্ধ না চালাইবার জন্য মুসোলিনীকে অনুরোধ করিলেন এবং উহার বদলে যুগোশ্লাভিয়া হইতে আলবেনিয়া যাইবার গিরিসঙ্কটগুলি 'পাহারা' দিতে বলিলেন! কিন্তু এই সমস্ত 'খুব গোপনীয়তার অন্ধকারে আবৃত' করিয়া রাখিতে হইবে এবং গোপনীয়তার উপর তিনি চিঠির শেষাংশেও আবার জোর দিলেন—যার দ্বারা প্রমাণিত হইতেছে যে মুসোলিনী ও ইতালীর উপর হিটলারের বিশ্বাস ছিল না (৯)

যুগোশ্লাভিয়াকে কেন্দ্র করিয়া (অবশ্য সেই সঙ্গে গ্রীসও) বলকান বারুদাগারে অগ্নিসংযোগের এই সংক্ষিপ্ত কাহিনীর মধ্যে ইতালী ও জার্মানীর পারস্পরিক সম্পর্কের যেমন আভাস পাওয়া যাইতেছে, তেমনই জার্মানীর পূর্বে সঙ্কল্পিত চক্রান্তের সন্ধান পাওয়া যাইতেছে।

* * *

বলকান অঞ্চলের উপর ইতালী ও জার্মানীর লুব্ধ দৃষ্টি ও পরস্পরের দ্বন্দ্ব সম্পর্কে খ্যাতনামা বৃটিশ ঐতিহাসিক অ্যালান বুলক হিটলারের জীবনীগ্রন্থে লিখিয়াছেন যে, দীর্ঘকাল যাবৎ মুসোলিনী বলকান অঞ্চলে এবং দানিয়ুব নদী এলাকায় ইতালীয় আধিপত্য বিস্তারের জন্য চিন্তা করিয়া আসিতেছিলেন। সুতরাং এই অঞ্চলে জার্মানীও যদি থাবা মারে, তবে তাঁর উচ্চাশা পূরণের পক্ষে বাধা হইবে। এমন কি দক্ষিণ পৃষ্ঠ থেকে জার্মানীর এই থাবা বিস্তারের আশঙ্কাতেই মুসোলিনী গোড়ার দিকে জার্মানী কর্তৃক অস্ট্রিয়া দখলের (যাহাকে আমরা বলি 'আন্স্লা-জার্মান মিলন' নামে অভিহিত) বিরোধিতা করিয়াছিলেন এই সম্পর্কে হিটলারের

---

(7) The Nuremberg Documents—by Peter De Mendelssohn, page 171

(৮) পূর্বোল্লিখিত পুস্তক—পৃষ্ঠা ১৮৩-৮৭

(৯) পূর্বোল্লিখিত পুস্তক।

অনেক মিষ্টবাক্য সত্ত্বেও মুসোলিনীর সন্দেহ কিন্তু যায় নাই— দানিয়ুব বা আদ্রিয়াতিকের দিকে জার্মানীর যে কোন অগ্রগতির লক্ষণকে মুসোলিনী ভয়ের চক্ষে দেখিয়াছেন। অবশ্য হিটলার মুসোলিনীর মনের ভাব জানিতেন এবং তিনি একথা বুঝিয়াছিলেন যে, বলকান অঞ্চলে জার্মানীর সহিত ইতালীর প্রতিযোগিতার সম্ভাবনায় ডুসে মনে মনে বিরক্ত। এমন কি, জার্মানীর উপর টেক্কা দেওয়ার জন্য মুসোলিনী আগেই এই অঞ্চলে ঢুকিয়া পড়িতে পারেন। এজন্য ৭ই জুলাই, ১৯৪০, ইতালীয় পররাষ্ট্র সচিব কাউন্ট সিয়ানোর সঙ্গে এক সাক্ষাৎকারে হিটলার তাঁকে বুঝাইবার জন্য চেষ্টা করিলেন যে, ইতালীর পক্ষে যুগোশ্লাভিয়ায় এখন হানা দেওয়া ঠিক হইবে না। এদিকে পরিকল্পিত ইতালীয় সাম্রাজ্যের মধ্যে যুগোশ্লাভিয়াকেও মুসোলিনী মনে মনে চিহ্নিত করিয়া রাখিয়াছিলেন এবং তারপর গ্রীসকে। কিন্তু হিটলার তাঁর নিজস্ব প্রয়োজনে এই দুই রাজ্যের উপরেই মুসোলিনীর লুব্ধ দৃষ্টিকে সংযত করিতে চাহিলেন এবং সীয়ানোর সঙ্গে পরে একটি সাক্ষাৎকারে হিটলার আবার বলকান পরিস্থিতির ব্যাখ্যা করিয়া বলিলেন যে, এখন এই অঞ্চলে হস্তক্ষেপ করিতে গেলে খুব বিপজ্জনক পরিস্থিতির সৃষ্টি হইবে। তবে, হিটলার সঙ্গে সঙ্গে একথাও স্বীকার করিলেন যে, যুগোশ্লাভিয়া ও গ্রীসের উপর ইতালীর যে দাবী আছে, সেই দাবীর মীমাংসা করার অধিকার মুসোলিনীর আছে, তবে সেটা অবস্থা আরও একটু অনুকূল হইলে করিতে হইবে।

সীয়ানো বুঝিলেন যে, হিটলারের এই সমস্ত পরামর্শের উদ্দেশ্য হইতেছে ইতালীকে আর বলকানের দিকে অগ্রসর হইতে না দেওয়া— 'It is a complete order to halt all along the line' অর্থাৎ এই লাইনে আর আগাইয়া না যাওয়ার হুকুম। বলা বাহুল্য যে, মুসোলিনী বিরক্ত হইলেন, তবু হিটলারের মন রক্ষার জন্য ২৭শে আগস্টের এক চিঠিতে তাঁকে এই বলিয়া ভরসা দিলেন যে, গ্রীস ও যুগোশ্লাভ সীমান্তে ইতালী যা কিছু ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়াছে, তা সমস্তই আত্মরক্ষামূলক। আসলে ইতালীর সমস্ত সামরিক শক্তি মিশর আক্রমণেই নিয়োগ করা হইবে। কিন্তু এই সমস্ত লেখা সত্ত্বেও সেপ্টেম্বর মাসের মাঝামাঝি যখন রিবেনট্রপ রোমে গেলেন, তখন কিন্তু মুসোলিনী গ্রীস আক্রমণ সম্পর্কে তাঁর মনোভাব গোপন করিলেন না। বরং তিনি বলিলেন যে, গত এপ্রিল মাসের (জার্মানীর আক্রমণ) আগে নরওয়ের যে প্রয়োজন ছিল জার্মানীর কাছে, গ্রীসেরও প্রয়োজন তেমনি ইতালীর কাছে। তবে, তিনি রিবেনট্রপকে এই আশ্বাসও দিলেন যে, পূর্ব ভূমধ্যসাগর থেকে বৃটিশ শক্তিকে বিতাড়িত না করার আগে তিনি গ্রীসে অভিযান করিবেন না।

এই সময় সেপ্টেম্বর, ১৯৪০ জার্মানী, ইতালী ও জাপানের মধ্যে যে নূতন ত্রিশক্তির চুক্তি স্বাক্ষরের প্রস্তাব চলিয়াছিল সেটা দানা বাঁধিয়া উঠে। অবশ্য রিবেনট্রপ অনেক আগেই, ১৯৩৮ অকটোবরে এই ধরনের একটা চুক্তির প্রস্তাবের কথা বলিয়াছিলেন। দুই বছর পর তিনি পুনরায় মুসোলিনীর নিকট সেই আগেকার চুক্তিগুলির পুনরাবৃত্তি করিয়া বলিলেন যে, প্রস্তাবিত ত্রিশক্তির চুক্তি স্বাক্ষরিত হইলে আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের নীতির বিরুদ্ধবাদীগণের হাত শক্তিশালী হইবে এবং যাঁরা নির্লিপ্ততা বা বিচ্ছিন্নতাবাদী তাঁরা আরও জোর পাইবেন। তবে, রিবেনট্রপ স্বীকার করিলেন যে, ইতালী জার্মানী ও জাপানের মধ্যে এই নূতন চুক্তি স্বাক্ষরিত হইলে রাশিয়ার মনে সন্দেহ উদ্রেক করিতে পারে। তবে, একথাও মনে রাখিতে হইবে যে, (রিবেনট্রপের মতে) রাশিয়ার সঙ্গে বন্ধুত্বের নীতি নির্দিষ্ট একটা সীমারেখার মধ্যে রাশিয়াকেই অনুসরণ করিতে হইবে। (১০)

২৭শে সেপ্টেম্বর, ১৯৪০ এই চুক্তি বার্লিনে স্বাক্ষরিত হইল। চুক্তির ১ নং ও ২ নং অনুচ্ছেদে ইতালী ও জার্মানী কর্তৃক ইউরোপে নূতন ব্যবস্থা (নিউ অর্ডার) প্রবর্তনের অধিকার জাপান মানিয়া লইল এবং এর পাল্টা জার্মানী ও ইতালীও বৃহত্তর পূর্ব এশিয়াতে জাপানের নয়া ব্যবস্থা প্রবর্তনের অধিকার স্বীকার করিল। ৩ নং অনুচ্ছেদে বলা হইল যে, যদি চুক্তি স্বাক্ষরকারীর কোন এক পক্ষ আমেরিকা কর্তৃক আক্রান্ত হয়, তবে, পারস্পরিক সাহায্য দেওয়া হইবে। অবশ্য চুক্তির মধ্যে স্পষ্ট করিয়া আমেরিকার নামোল্লেখ ছিল না।

সিয়ানো এই চুক্তি স্বাক্ষরের জন্য বার্লিনে গিয়াছিলেন। তখন সেপ্টেম্বরের শেষ, অর্থাৎ যুদ্ধের দ্বিতীয় বছর। অর্থাৎ কবে যুদ্ধ শেষ হইবে তা নিয়া স্বভাবতঃই লোকে বলাবলি করিতেছিল। এজন্য মহা-সমারোহে ঢাকঢোল পিটানো হইল এই চুক্তি স্বাক্ষর উপলক্ষে এবং গোয়েবলসের দপ্তর দারুণ প্রোপাগান্ডা চালাইল জনচিত্তে বিভ্রান্তি সৃষ্টির জন্য। দিন সাতেক পরে আবার ব্রেনার গিরিবর্ত্মে হিটলার ও মুসোলিনীর মধ্যে সাক্ষাৎ হইল এবং অক্ষ শক্তি-বর্গের ঐক্য ও সংহতির উপর বিশেষ জোর দেওয়া হইল। সিয়ানো মন্তব্য করিলেন যে, উভয়ের সাক্ষাৎ ও আলোচনা যথেষ্ট হৃদ্যতাপূর্ণ ছিল এবং হিটলার সরলভাবেই তাঁর ভবিষ্যৎ পরিকল্পনাগুলি সম্পর্কে অনেক কথা বলিলেন এবং বলশেভিক মতবাদের বিরুদ্ধে তাঁর ঘৃণা আবার অকপটে প্রকাশ করিলেন এবং মন্তব্য করিলেন—'এই মতবাদ সেই সমস্ত লোকের যারা সভ্যতার একেবারে নীচু ধাপে রহিয়াছে।' কিন্তু হিটলার সব কথা বলিলেও জার্মানী যে ইতিমধ্যেই রুমানিয়ার উপর আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করিতে যাইতেছে, সেই আসল কথাটি কিন্তু গোপন করিয়া গেলেন।

অতএব পরের সপ্তাহে যখন রুমানিয়া থেকে জার্মান সৈন্যদের চলাচল সুরু হইল, তখন মুসোলিনী হিটলারের কপটতায় রাগিয়া টং হইলেন। তাঁর মনে হইল হিটলার এবারও তাঁর উপর এক হাত নিয়াছেন। অথচ তিনিও যে এক দফা ইতালীয় সৈন্য রুমানিয়া দখল করিতে পাঠাইবেন, এমন সুযোগও তাঁর ছিল না। সুতরাং ক্রুদ্ধ মুসোলিনী সীয়ানোর কাছে একেবারে ফাটিয়া পড়িলেন :

> Hitler always faces me with a fait accompli. This time I am going to pay him back in his own coin. He will find out from the newspapers that I have occupied Greece. In this way the equilibrium will be re-established. I shall send in my resignation as an Italian if anyone objects to our fighting the Greek (11).

—হিটলার সব সময়েই সব ঘটনা আমার কাছে যেন নিয়তির বিধান রূপে হাজির করেন। কিন্তু এবার আমি তাঁর পয়সাতেই তাঁর দাম দিব। আমি যে গ্রীস দেশ দখল করিয়া নিয়াছি এই সংবাদ তাঁকে এবার খবরের কাগজ পড়িয়া জানিতে হইবে। এভাবেই আমাদের পরস্পরের মধ্যে সমতা প্রতিষ্ঠিত হইবে। গ্রীসের বিরুদ্ধে যুদ্ধের ব্যাপারে যদি কেউ আপত্তি তোলেন, তবে, একজন ইতালীয়ান হিসাবে আমি পদত্যাগ-পত্র পেশ করিব।'...

ওদিকে তখন (১৩ই সেপ্টেম্বর) উত্তর আফ্রিকার মিশরে মার্শাল গ্রাৎসীয়ানির আক্রমণ সুরু হইয়াছে। বলা বাহুল্য যে, অনেক বেশী সৈন্যশক্তি থাকা সত্ত্বেও ইতালীয় বাহিনী মুষ্টিমেয় বৃটিশ সৈন্যের কাছে হারিয়া যাইতেছিল। এই অবস্থায় ইতালীর জেনারেল ষ্টাফের অধ্যক্ষ মার্শাল বাদোগোলিও নূতন কোন যুদ্ধের দায়িত্ব নিতে অনিচ্ছুক ছিলেন। কিন্তু মুসোলিনীর জিদের জন্য সেই আপত্তি টিকিল না। ২৮শে অকটোবর আলবেনিয়া থেকে ইতালীয় সৈন্যেরা গ্রীস আক্রমণ সুরু করিল।

হিটলার তখন ফ্রাঙ্কোর সঙ্গে ব্যর্থ সাক্ষাৎকারের নৈরাশ্যপূর্ণ মন লইয়া ফিরিতেছিলেন। রাস্তায় তিনি গ্রীস আক্রমণের খবর পাইলেন। এই সম্পর্কে শেষ পর্যন্ত মুসোলিনী তাঁকে এক পত্র দিয়াছিলেন বটে, কিন্তু ২৪শে অকটোবরের রাত্রির আগে সেটা তাঁর কাছে পৌঁছিল না। হিটলার অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইলেন। কিন্তু তখন মুসোলিনীর বন্ধুত্ব ছাড়া তাঁর উপায়ও ছিল না। সুতরাং সমস্ত ক্রোধ সম্বরণ করিয়া অত্যন্ত ধৈর্য সহকারে তিনি ফ্লোরেন্সে গিয়া হাজির হইলেন তাঁর স্পেশাল ট্রেনযোগে। (এই ট্রেনে করিয়াই তিনি স্পেনীয় সীমান্তে ফ্রাঙ্কোর সঙ্গে দেখা করিতে গিয়াছিলেন।) সেখানে পিটি প্যালেসে হিটলার ও মুসোলিনীর মধ্যে সাক্ষাৎ হইল এবং হিটলার তাঁর সমস্ত মনের ভাব গোপন করিয়া মুসোলিনীর

(10) Hitler—Allan Bullock—Pelican P. 6 12-13.

(11) Ciano's Diary—London, 1947 p 297

সংগে অত্যন্ত অন্তরঙ্গভাবে আলোচনা চালাইলেন এবং গ্রীস ও ক্রীট আক্রমণে তিনি জার্মান বিমান বাহিনীর সহায়তা দানেও প্রতিশ্রুতি দিলেন। ভিসি ফ্রান্স ও রুমানিয়া সম্পর্কে মুখরক্ষা গোছের একটা রিপোর্ট দিলেন মুসোলিনীকে আশ্বস্ত করার জন্য। বাহ্যতঃ দুই পক্ষের মধ্যে যথেষ্ট মনের মিল ও পারস্পরিক মতৈক্য দেখা গেল। কূটনৈতিক ক্ষেত্রে হিটলার যে পাকা অভিনেতা ছিলেন, এই ঘটনা তার আর একটি প্রমাণ। কিন্তু হিটলারের পার্শ্বচর পল স্মীড্‌ট্‌ এই সাক্ষাৎকার সম্পর্কে লিখিয়াছেন—বাহ্যতঃ দুই নেতার মধ্যে মতের মিল দেখা গেল বটে, কিন্তু ভিতরে ভিতরে হিটলারের মনের ভাব অত্যন্ত তীব্র ও তিক্ত ছিল। কারণ, পরপর তিনবার তিনি হতাশ হইলেন—ফ্রাঙ্কোর নিকট, পেতাঁর নিকট এবং এক্ষণে মুসোলিনীর নিকট। আগামী কয়েক বছর দীর্ঘ শীতের সন্ধ্যায় এই দীর্ঘ ক্লেশকর ভ্রমণ এবং সেই সংগে অকৃতজ্ঞ ও বিশ্বাসের অমুপযুক্ত অক্ষশক্তির অংশীদার বন্ধুগণ ও প্রতারক ফরাসীদের স্মৃতি হিটলারকে বারবার পীড়া দিয়াছিল।' (১২)

বলাই বাহুল্য যে, মুসোলিনী ও ইতালীর সামরিক শক্তির উপর তাঁর বিশেষ কোন ভরসা ছিল না। সুতরাং জার্মানীতে প্রত্যাবর্তন করিয়াই তিনি সামরিক নেতাদের সংগে পরামর্শ করিলেন এবং ১২ই নভেম্বর ১৮ নং নির্দেশনামায় উত্তর আফ্রিকা ও বলকান অঞ্চল অভিযান সম্পর্কে হুকুম জারী করিলেন।

●

বলকান দখল

১৯৪০ সালের ২৮শে অকটোবর ইতালী আলবেনিয়া হইতে গ্রীস আক্রমণ করিল এবং ১৯৪১ সালের এপ্রিল মাসের আরম্ভ পর্যন্ত যুদ্ধ চালাইল। কোরিট্‌জা এবং আদ্রিয়াতিক উপসাগরের উপকূল ও ক্যাশমাস নদী উপত্যকা ধরিয়া—মোটামুটি এই দুই পার্শ্ব হইতে যে আক্রমণ অনুষ্ঠিত হইল, কিছুকাল যুদ্ধের পরেই ইতালী তাতে পরাজিত হইল। কিন্তু শীতকালের প্রচণ্ড বরফ ও ঝড়ের জন্য উভয়ের অবস্থাই অচল হইয়া পড়িল। পর্বতারোহী সৈন্যেরা অনেক কষ্টে পাঁচ মাসের অধিক কাল ধরিয়া যে অনিশ্চিত যুদ্ধ চালাইল, তার চূড়ান্ত মীমাংসা হইল জার্মানীর অভিযানের দ্বারা।

১৯৪১ সালের ৬ই এপ্রিল জার্মানী যুগোশ্লাভিয়া আক্রমণ করিল এবং ১১ দিনের মধ্যে উহা দখল করিয়া ফেলিল। রাজধানী বেলগ্রেড 'খোলা শহর' বলিয়া ঘোষিত হওয়া সত্ত্বেও ভয়াবহ বিমান আক্রমণ হইতে রক্ষা পাইল না এবং ব্যাপক ধ্বংসকাণ্ড বিস্তৃত হইল। স্বাধীন যুগোশ্লাভিয়া মানচিত্র থেকে মুছিয়া গেল।

(12) Hitler—Allan Bullock P.616.

একই সংগে মেটাক্‌সাস লাইন ধরিয়া গ্রীসও আক্রান্ত হইল। তখন মিশর হইতে একটি বৃটিশ অভিযাত্রী বাহিনী জেনারেল স্যার হেনরি মেটল্যান্ড উইলসনের অধীনে গ্রীসে প্রেরিত হইল। গ্রীসের সহিত চুক্তি অনুসারেই এই সাম্রাজ্য বাহিনী সেখানে প্রেরিত হইল। কিন্তু জার্মানীর রণক্রিয়ার মুখে বেশীক্ষণ টিকিতে পারিল না। ৪টি পর্যায়ে এই যুদ্ধ শেষ হইল, যথা— (১) পূর্ব ম্যাসিডোনিয়ায় আত্মরক্ষা (২) মনাস্টির গিরিবর্ত্ম ও লেসালিয়ান গিরিসঙ্কট দিয়া জার্মানীর অগ্রগতি (৩) এপিরাসে গ্রীক সৈন্যদলের বেষ্টন এবং (৪) বৃটিশ সাম্রাজ্য বাহিনীর পশ্চাদপসরণ। মাত্র ৭৪ হাজার সাম্রাজ্য সৈন্য সেখানে প্রেরিত হইয়াছিল, যার ফলে গ্রীস রক্ষা করাও সম্ভব হইল না, আবার উত্তর আফ্রিকায়ও এর জন্য বৃটেনের অবস্থা কাহিল হইল।

৬ই এপ্রিল হইতে ৩০শে এপ্রিল, মাত্র ৩ সপ্তাহের যুদ্ধে যুগোশ্লাভিয়া ও গ্রীসের পতন হইল। জার্মানী এই সংগ্রামে ২৪ হইতে ৩০ ডিভিসন সৈন্য নিয়োগ করিয়াছিল এবং পার্বত্য যুদ্ধের উপযোগী হাল্কা ট্যাঙ্ক ও বিমান নিয়োগ করিয়াছিল। পর্বত ও গিরিসঙ্কট জার্মানীর শ্রেষ্ঠ ও সাহসিক রণকৌশলকে বাধা দিয়া রাখিতে পারিল না। পোল্যান্ড বা ফ্রান্সের যুদ্ধের মতই যান্ত্রিক সৈন্যেরা পদাতিকের সংগে সহযোগিতা করিয়া বিদ্যুৎগতি জয়লাভ করিল। এই বলকান সংগ্রামে জার্মানীর মাত্র ৫৫০০ সৈন্য হতাহত হইয়াছিল (হিটলারের মতানুসারে) কিন্তু একমাত্র গ্রীসের যুদ্ধেই সাম্রাজ্য বাহিনীর ৩০ হাজার সৈন্য নষ্ট হইল। বাকি ৪৪ হাজার সৈন্য ক্রীট ও মিশরে অপসারিত করা হইল। কিন্তু এই অপসারণ কার্যে বৃটেনকে বিষম বেগ পাইতে হইয়াছিল। জার্মান বোমারুর আক্রমণে সমুদ্রপথে পলায়মান সাম্রাজ্য বাহিনীর প্রাণ লইয়া টানাটানি পড়িয়াছিল।

বিমান সৈন্যের ক্রীট দখল

কিন্তু সর্বাপেক্ষা অভিনব এবং ভয়াবহ যুদ্ধ হইল ক্রীটদ্বীপ, যাহা তখনকার দিন পর্যন্ত ইতিহাসে অতুলনীয় ছিল। গ্রীস হইতে ১৮০ মাইল দূরবর্তী সমুদ্রবেষ্টিত ক্রীটদ্বীপ জার্মান বিমান সৈন্যেরা এক সাংঘাতিক সংগ্রামের দ্বারা মাত্র ১০ দিনের মধ্যে জয় করিয়া লইল—২০শে মে হইতে ৩০শে মে, ১৯৪১। সমগ্র পৃথিবী যেন 'হাঁ করিয়া' এই অদ্ভুত বিমানযুদ্ধ লক্ষ্য করিল এবং জার্মান প্যারাস্যুট সৈন্যেরা আশ্চর্য দক্ষতা ও অপরিসীম দুঃসাহসিকতার সংগে এই দ্বীপ দখল করিল। সামরিক ইতিহাসে এই প্রথম দেখা গেল যে, বিমান সৈন্যেরা ভারী অস্ত্রের সাহায্য ছাড়াও স্থল ও জলপথের শ্রেষ্ঠতর বাহিনীকে পরাভূত করিতে পারে। বৃটিশ নৌবহর ক্ষুদ্রকগুলি নাৎসী কনভয়কে নষ্ট করিল বটে, কিন্তু জার্মান বোমারু ও টর্পেডো-বিমান বৃটিশ জাহাজগুলিকে এমন ঘায়েল করিল যে, নৌবহর ক্রীট এলাকা হইতে প্রস্থান করিতে বাধ্য হইল। ক্রীটে সাড়ে ৩ হাজার প্যারাস্যুট অবতরণ করিল এবং ইহাদের অধিকাংশই নিহত হইল। তথাপি দলে দলে গ্লাইডার ও সৈন্যবাহী বিমানযোগে হাজার হাজার সৈন্য অবতরণ করিল। জেনারেল ফ্রেবার্গের অধীন বৃটিশ বাহিনী তাহা রোধ করিতে পারিল না। ৩৫০ মাইল দূরবর্তী আফ্রিকার ঘাঁটি হইতে বৃটিশ বিমান কোন সাহায্য দিতে পারিল না। ৩৫ হাজার বিমানবাহী সৈন্য ক্রীট দ্বীপ দখল করিয়া লইল এবং বৃটিশ সাম্রাজ্য বাহিনীর অর্ধেক বা ২৭ হাজার সৈন্য প্রাণ পাইল। আর জার্মানীর হতাহত হইল ১৭ হাজার। কিন্তু ভূমধ্যসাগরের গুরুত্ব বিবেচনায় তাদের জয়ের মূল্য অপরিসীম ছিল।

মিঃ চার্চিল সেই সময় কমন্স সভায় ক্রীট দ্বীপের অদ্ভুত মারাত্মক সংগ্রাম সম্পর্কে বলিয়াছিলেন,

> 'A strange and grim battle is being fought one in which our side has no air support because they have no aerodromes— not because they have no aeroplanes —while the other side has very little or no artillery or tanks and neither side has any means of retreat.
> It is a desperate grim battle and I certainly will send wishes and encouragement to the men who are fighting what is undoubtedly the most important battle which will affect the whole course of the campaign in the Mediterranean".

অর্থাৎ এক অদ্ভুত এবং নৃশংস যুদ্ধ চলিতেছে। আমাদের বিমান আছে, কিন্তু বিমানঘাঁটি নাই, ফলে বিমানের কোন সাহায্য আমরা পাইতেছি না, আবার শত্রুপক্ষেরও কামান, ট্যাঙ্ক ও গোলাগুলী নাই —এবং কোন পক্ষেরই পিছনে হটিবার কোন জায়গা নাই। নৃশংস ও দুর্ধর্ষ এই যুদ্ধ—এই যুদ্ধ যাহারা চালাইতেছে, সেই সমস্ত সৈন্যদিগকে নিশ্চয়ই আমি আশা ও উৎসাহের বাণী পাঠাইব। এই যুদ্ধ সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ; কারণ, ইহা সমগ্র ভূমধ্যসাগরীয় সংগ্রামের গতি নির্ণয় করিবে।'

ক্রীট দ্বীপ দখলের দ্বারা সমগ্র বলকান অঞ্চল জার্মানীর মুঠার তলায় আসিয়া গেল এবং পূর্ব ভূমধ্যসাগরে অক্ষশক্তিবর্গের প্রভাব বিস্তৃত হইল। রাশিয়া আক্রমণের পূর্বে ইহাই ছিল জার্মানীর শেষ ইউরোপীয় অভিযান এবং বৃটেনকে আর একবার ইউরোপীয় ভূমিভাগ হইতে বিতাড়ন। হিটলারের জয়ধ্বনিতে তখন পৃথিবী মুখরিত হইল এবং সেই সংগে আবার শুরু হইল উত্তর আফ্রিকার মরুভূমিতে রোমেলের রণচাতুর্যের বিস্ময়।

(ক্রমশঃ)

আবহমান কাল

অসীম রায়

তৃতীয় পর্ব

মাস ছয়েক পরে গরমের সন্ধ্যা। বাগানের মাঝখানে লাল টিনের চালওয়ালা দোতলা লাল বাংলোর বারান্দায় ইলেকট্রিক আলো। সেকালের জলপাইগুড়ি শহরটা কেটফাট নির্জন, ছাড়া-ছাড়া। গেটের পাশেই সেন্টিপেডের মাথায় ঝুলন্ত চাঁপা গাছটা থেকে মৃদু গন্ধ আসে। টেবিলের ওপাশে মুগ্ধ দৃষ্টি মেলে চেয়ে থাকা যুবকটিকে বুড়ী প্রশ্ন করে, 'স্যর, এটার মানে কি?'

মানে, মানে একটা কবিতা...একটা একটা...গান, রবীন্দ্রনাথের।

যুবকটি তোতলায়। বুড়ী ভুরু কুঁচকায়। গত কয়েক মাসে অনেকটা বেড়ে উঠেছে সে। গোলাপী ফুলতোলা খাটো স্কার্টের ওপর সাদা অর্গান্ডির ব্লাউসে ক্লাস নাইনের মেয়েটিকে লাগে অপরূপ যুবকটির কাছে। ওপরের দিকে টেনে তোলা চুলের ওপর আলতোভাবে হাত বুলিয়ে ঠোঁটটা দুবার চেটে নেয় বুড়ী। অস্পষ্ট হাসির রেখা তার ঠোঁটের দু পাশে ফুটেই মিলিয়ে যায়। আবার ভুরু কুঁচকিয়ে বলে, 'তা অঙ্কের খাতায় কেন?' বুড়ী আলোর নীচে খাতাটা মেলে দেয়। ছোকরাটির হাতের লেখা নিঃসন্দেহে ভাল। খুব যত্নে চাইনিজ ইংক দিয়ে অঙ্কের খাতার শেষে লেখা :

আমি শ্রাবণ আকাশে ঐ
দিয়েছিনু জল ছলছল মেঘে মেঘে...

তারপর সশব্দে হেসে ফেলে বুড়ী। তারপর হাসি চাপবার চেষ্টা করে বলে, 'এটা কি মাস স্যর?'

মে মাস', ছোকরাটির ফর্সা কান লালচে দেখায়।

'শ্রাবণ মাস আসতে স্যর আরও দু মাস।'

পরদিন বিকেলে মমতা আসে। এক্সিকিউটিভ ইঞ্জিনীয়ারের মেয়ে মমতা বুড়ীর চেয়ে আরও দু বছরের বড়। বেশ ঝলমলে দামালো ফর্সা চেহারা মমতার। সব সময়েই হাসছে। আর হাসলে গালে টোল পড়ে। বুড়ীর সে সহপাঠী কিন্তু জগত সংসার সম্পর্কে অনেক বেশী খবর রাখে। বুড়ী তখন দোল খাচ্ছে বাগানের কোণে ঢ্যাঙা একলা আমগাছটার ডালে ঝোলানো দোলনায়। মমতা বেশ কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকে আর পায়ের শব্দ ঝাঁকাতে ঝাঁকাতে ক্রমাগত বুড়ী ওপরে উঠতে থাকে। শূন্য থেকে দূরে করলা নদীর ওপরে ব্রিজটার মাথা চাঁদের চোখে পড়েই মিলায়।

'বু...ড়ী' গানের সুর করে মমতা ডাকে।

বুড়ী কাত হয়ে ওপর থেকে তাকায়। মমতা মেয়ে বলে স্বর্ণসুন্দরী এ মেয়েকে একটু নেকনজরে দেখতেন। তবে বছর-খানেক হল এই শ্যামলা মেয়ের মুখশ্রী যে যথেষ্ট সুন্দর হয়ে উঠছে সেবিষয়ে তারও চোখ খুলেছে। দোলনা থেকে প্রায় ঝাঁপিয়ে নেমেই তার বন্ধুকে জড়িয়ে ধরে বুড়ী।

'এনেছিস, আমার জন্যে এনেছিস বইটা?' তারপর উত্তরের অপেক্ষা না রেখেই নীল শাড়ির আঁচলে লুকোনো বইটা টেনে নেয়। মলাটের ওপর চোখ রাখতেই তার উদ্ভাসিত মুখ-চোখ স্নিগ্ধতা নামে। বইটার নাম 'প্রথম প্রেম', লেখক অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত।

দিন দুই আগে বইটার গল্প করেছে মমতা। আলগোছে কোলের ওপর বইখানা রেখে বুড়ী মমতার কাঁধে হাত রেখে দুলতে থাকে। বরফের মতো কুচি কুচি সাদা ফুলে ভর্তি কৃষ্ণগাছটার দিকে চেয়ে আস্তে পা মাটিতে ঠেকিয়ে থামে। 'আচ্ছা, পানুদা অমন করে কেন বলত?'

'পানুদা? তাই নাকি? ওকে তো একদম ভিজে বেড়াল ভাবতাম!' মমতার বিশেষ কৌতূহলেই বুড়ী একটু অস্বস্তি বোধ করে।

'না না, সেরকম কিছু না, সেরকম কিছু না।'

'ঠিক আছে। তুমি চেপে যাচ্ছো। আমিও কিছু বলব না তোমাকে।'

বুড়ী ঘাড় নাড়ায়, 'সত্যি বলছি সেরকম কিছু নয়।'

'কি রকম কিছু?' মমতার চোখ জ্বলে কৌতূহলে।

'এই যেমন দিদির বেলায় হয়েছিল,' বুড়ী বললে অন্যমনস্কভাবে।

'গৌরীদির বেলায়? দেখেছো আমাকে তুমি কিছুই বল না আর আমি সব কথা আদ্যোপান্ত তোমাকে বলি। বেশ, ঠিক আছে।' মমতা দোলনার তক্তা থেকে তড়াক করে লাফিয়ে ওঠে।

'বোস বোস।' হাত ধরে টেনে বসায় বুড়ী মমতাকে। তারপর অসহিষ্ণু গলায় বললে, 'সেরকম কিছু না, একটা মাঝবয়সী লোক, হীরালালবাবু পড়াতে পড়াতে দিদির হাত চেপে ধরেছিল একবার। দিদি মাকে বলে দিলো। সে এক বিচ্ছিরি ব্যাপার। সেরকম কিছু না। পানুদা খুব ভাল লোক।'

বুড়ীর শেষ কথায় মমতার মুখে চোখে কৌতুক ঝিলিক মারে। 'পানুদা খুব ভাল লোক না-রে? ঐরকমই মনে হয় প্রথম প্রথম।'

বুড়ী জবাব দেয় না। মমতা তার চেয়ে জগৎসংসার সম্পর্কে হয়ত অনেক কিছু জানে কিন্তু পানুদার ব্যাপারেও জ্ঞানদান বুড়ীর পছন্দ হয় না। পানুদাকে সে অনেক ভাল করে জানে। তিনমাস আগে জলপাই-গুড়িতে ভবনাথের বদলি হবার দিন সাতেক পর থেকেই স্কুলের ভাল ছাত্র ইন্টার-মিডিয়েট পাশ সুদর্শন ডিস্ট্রিক্ট বোর্ডের কেরাণী পানু মিত্র বুড়ীর গৃহশিক্ষক। তিন ভাই বোনে ঝাঁকড়ে পড়লে পড়াশোনার অসুবিধে হতে পারে বলেই এ ব্যবস্থা। আর একটি গুণে সেনপাড়ার ক্ষ্যাপা দা দুই ভাইকে পড়ায় একসঙ্গে নীচের বারান্দায়। ক্ষ্যাপা-দা স্থানীয় স্কুলের নীচু ক্লাসে অঙ্ক এবং [illegible] মাস্টার।

দুটি শুধু আমার পাশাপাশি বসে দোল খায়। দুটো কোকিল একটা গাছে আলতোভাবে নাড়াচাড়া করে। দুটো শালিখ পাখার ঝাপটা [illegible] করতে করতে [illegible] পড়েই উড়ে পালায়। গেট খোলার শব্দ

আসে। ভবনাথ তাঁর বহুদিনের ব্যবহৃত সাইকেলখানা ঠেলতে ঠেলতে বাগানে ঢোকেন। তাঁর সাম্প্রতিক পদোন্নতিতে বিশেষ কিছু পরিবর্তন লক্ষ করা যায় না। সাদা প্যান্টের ওপর কাঁধকাটা ঘিয়ে তসরের কোট। বুড়ীর মনে পড়ল ঠিক এইভাবেই ভবনাথ কোর্ট থেকে ফিরতেন রাণাঘাটে, মুন্সীগঞ্জে।

'কথা বলছিস না যে! পানু-দার ব্যাপারে আমি মোটেই জেলাস নই', মমতা বললে।

বুড়ী অবাক হয়ে তাকায়। মমতা বুড়ীর কানের কাছে মুখ রেখে বললে, 'ছেলেরা মেয়েদের কাছে কি চায় জানিস?'

'কি আবার। আমি যা তোর কাছ থেকে চাই।'

'দূর, তুই কিছু জানিস না, একেবারে ছেলেমানুষ।

'আমি জানতে চাই না', বুড়ী মাথা ঝাঁকিয়ে বললে।

মমতা গুন গুন করে সুর ভাঁজে। তারপর খুব মিহি চাপা চাপা কাঁপা কাঁপা গলায় গায়:

দিনের শেষে ঘুমের দেশে ঘোমটা পরা
ঐ ছায়া
ভোলালরে ভোলাল মোর প্রাণ,
ওপারেতে সোনার কূলে আঁধার মূলে
কোন মায়া
গেয়ে গেল কাজ-ভোলানো গান।

গান থামিয়েই বললে, 'তুই দেখিস নি?'

'কী?'

'সে কি? মুক্তি! আমরা কাল দেখেছি! গ্র্যান্ড! দেখে আয় দেখে আয়! ওঃ কি মারভেলাস! প্রমথেশ বড়ুয়ার কি অ্যাকটিং মাইরি!'

বুড়ী সেই উচ্ছ্বসিত মুখখানা মুগ্ধ হয়ে দেখে। তার এই দামালো বন্ধুটির প্রতি আকর্ষণ আরও বাড়ে।

'আমরা শনিবার যাব', বুড়ী আস্তে আস্তে বলে।

'এবার নাম, আমি একটু দুলি।'

মমতার পায়ের দাপে দোলনা কেঁপে কেঁপে অনেক ওপরে উঠে। তার থোপা থোপা চুল হাওয়ায় ওঠে নামে। লাল মুশলো বেরোন ঝকঝকে দাঁতের হাসি ভরা মুখে এক-একবার বুড়ীর দিকে তাকায়। আর এক এক ঝলক মিষ্টি হাওয়ার মতো মমতার সান্নিধ্য তাকে স্পর্শ করে। সে যেরকমভাবে মমতাকে কাছে পেতে চায় পানুদাকেও চায় তেমনিভাবে কাছে পেতে। ঠিক এমনিভাবে বিকেলের আলোয় দোল খেতে খেতে বা সিনেমার গল্প করে। ছেলেরা মেয়েদের কাছে আবার কি চায়?

কিন্তু দুদিন পর 'মুক্তি' ছবিটা বুড়ীর মনে যেরকম আলোড়ন আনে সেকথা অনেকদিন সে ভুলতে পারবে না। পুরুষ বন্ধুর যে চিত্রকল্প জন্মেছিল পানু-দার সান্নিধ্যে 'মুক্তি' ছবির নায়ক প্রমথেশ বড়ুয়া তাকে এক মুহূর্তে ভেঙে দিল। ঠিক সে গুছিয়ে ভাবতে পারছিল না ব্যাপারটা। কিন্তু ছেলেরা চাইবে, জোর করবে, মোটা গলায় কথা বলবে, মেয়েদের দিকে মুগ্ধ দৃষ্টিতে তাকাবে না, তাকাবে আদায়ের ভঙ্গীতে, দাবীর ভঙ্গীতে। আর মেয়েরা সেই আদায়ের ভঙ্গীই স্বাভাবিকভাবে গ্রহণ করবে, বরং তা না থাকলেই সে হবে অতৃপ্ত। এইরকম কতগুলো আবছা ধারণা অস্পষ্টভাবে বুড়ীর মাথায় খেলতে থাকে। এক কথায় পানুদার যে ছবিটা তার মনের মধ্যে ফুটে উঠেছিল রূপোলীপর্দার নায়ক সে স্থান অধিকার করে নিলে। শয়নে স্বপনে এখন প্রমথেশ বড়ুয়া বুড়ীর সঙ্গী।

'আপনি মুক্তি দেখেছেন স্যর?'

পরদিন বুড়ীর প্রশ্নে পানু চমকায়। ভুরু কুঁচকিয়ে বলে, 'না দেখি নি, দেখব না।'

'দেখবেন না, কেন?' বুড়ীর চোখেমুখে কৌতুক খেলা করে।

'ওসব তুমি বুঝবে না। সিনেমা দেখা ভাল না।'

বুড়ী তার গৃহশিক্ষকের দিকে স্থির দৃষ্টিতে চেয়ে বললে, 'আমার খুব ভাল লাগে। আপনারও ভাল লাগবে।'

পানু ব্যাপারটা বুঝতে পারে না। মেয়েটিকে তার বরাবরই ভাল লাগে। তার চেহারা ছটফটে মেজাজ তাকে আকর্ষণ করে। মাঝে মাঝে রবীন্দ্রনাথের কবিতা দু ছত্র জ্যামিতির খাতায় যে লেখে নি তা নয়। কিন্তু তাই বলে সিনেমা নিয়ে তার ছাত্রী তার সঙ্গে খোসগল্প করবে এতে তার আত্মসম্মানে লাগে। তারপর সে নিজেই মুগ্ধ দৃষ্টি মেলে তার ছাত্রীকে দেখতে অভ্যস্ত কিন্তু তার ছাত্রীও যে তাকে মুগ্ধ চোখে দেখছে, সে যখন মাথা নীচু করে অঙ্ক দেখছে তখন তার খাতার ওপর না পড়ে এক জোড়া চোখ তার মুখের দিকে চেয়ে আছে এই নতুন পরিস্থিতিতে সে বিচলিত বোধ করে। মাস গেলে পনেরোটা টাকা আসত অস্বচ্ছল সংসারে সে পথ বন্ধ হয়ে যাবে বলে ভয় হয়।

'আপনার অফিস কখন ছুটি হয়?'

'কেন? পাঁচটা। কেন?'

'পাঁচটা হলে হবে না। পাঁচটা হলে দেরী হয়ে যাবে। চারটে হয় না?'

সেই কৌতূহলী উৎসুক মুখখানার দিকে চেয়ে পানুর অসোয়াস্তি হয়, আবার প্রবল আকর্ষণ বোধ করে।

'কেন, কোথাও যাবে?'

'চলুন না, সেই একবার মোটে নদীর ধারে গিয়েছি। কাল যাবেন?'

'মাসীমাকে বলে নিও। আমি চারটেতে আসব একটু সকাল সকাল ছুটি করে।'

'মা-কে? কেন?' বুড়ীর মুখে বিরক্তি। একটু হাসেও। গলায় ঠাট্টা স্পষ্ট। 'কেন, ভয় করেছে বুঝি?'

আবার কান লাল হয় পানু মাস্টারের। এরকম ব্যাপার গল্পেটল্পে পড়েছে, বাঙলা কোর্ট কেসের রিপোর্টের লাইনটা চোখের সামনে ভাসতে থাকে, 'তাহাকে ফুসলাইবার অভিযোগে', আস্তে আস্তে বললে, 'না ভয় কেন, মাসীমা ভাববেন তাই বলছি।'

'মা-কে বলব মমতার বাড়ি যাচ্ছি।'

'আচ্ছা।'

পড়ার শেষে উঠবার মুখে বুড়ী বললে, 'আপনি রাস্তার মোড়ে থাকবেন। ওখান থেকে আমি ধরে নেব।'

পরদিন দুপুর চারটেতে তার একমাত্র সিল্কের পাঞ্জাবি চড়িয়ে সিগারেট ফুঁকছিল পানু নির্জন রাস্তার মোড়ে মেহগিনী গাছের নীচে। কিছুক্ষণ পরই বুড়ীকে আসতে দেখা যায়। খাটো ধূসর স্কার্ট আর সাদা ব্লাউসের সঙ্গে সাদা হিলতোলা জুতোয় অনেকটা লম্বা দেখায় তাকে। মাথায় নীল রিবন প্রথমেই চোখে পড়ে। নির্জন পিচঢালা রাস্তা ধরে গাছের তলা দিয়ে দিয়ে তারা এগোতে থাকে। অদূরে ইয়োরোপীয়ান ক্লাবে টেনিস মাঠে কতগুলো লালমুখ দেখা যায়।

'আগে আমরা যেখানে থাকতাম সেখানে কি বিশাল নদী।' বুড়ী মাথা ঝাঁকিয়ে বলে।

পানু সামনেই বিকেলের রোদে পাণ্ডুর বিস্তৃত বালির দিকে আঙুলে দেখিয়ে বললে, 'তিস্তাও বিশাল।'

'ও তো খালি বালি। আর এই টুকুন জল। পদ্মা দিয়ে যখন স্টিমারে যেতাম তখন যে কিরকম মনে হত। আপনার দেশ কোথায় পানু-দা?'

'আমার? মেটেলি।'

'মেটেলি? কি অদ্ভুত নাম!'

'সেখানে নদী নেই, খালি পাহাড় আর আশেপাশে চায়ের বাগান।'

'চায়ের বাগান?'

'তোমরা যদি ডুয়ার্সে যাও কিংবা দার্জিলিং-এ, অনেক চায়ের বাগান দেখবে।' তারপর কিছুক্ষণ চুপ করে বললে, 'আমার মেটেলিই সবচেয়ে ভাল লাগে। বাবা ছিলেন চা বাগানের ডাক্তার।'

নার্ভাস ভাবখানা পানুর কেটে যায়। চা বাগানের গল্প করে, একবার চিতা এসেছিল একেবারে তাদের কোয়ার্টারের কাছে। চারপাশ থেকে বেড়া দিয়ে সড়কি দিয়ে মারা হল বাঘ। পানুর সেই নার্ভাস ভাবখানা একেবারে কেটে যায় ছেলেবেলার গল্প বলতে বলতে, অনেক স্বাভাবিক দেখায় তার ছুঁচলো ফর্সা মুখখানা। কিন্তু বুড়ী ভেতরে ভেতরে অসোয়াস্তি বোধ করে। তার এ ধরনের আলাপ যে ভাল লাগে না, তা নয়, কিন্তু এ ধরনের আলাপ ছাড়াও সে আরেক ধরনের

কথাবার্তা শুনতে চায়। অন্তত কয়েক মাস হল এইরকম একটা স্বপ্নের কথাই সে ভেবে এসেছে আর এই পড়ন্ত রোদে বালির চড়ায় বসে বসে সেই স্বপ্নটার মাঝখানে সে তলিয়ে যেতে থাকে। এক ঝাঁক পানকৌড়ি মাথার ওপর দিয়ে উড়ে যায়। 'দেখুন দেখুন।' বলে বুড়ী তার ডান হাতখানা ওপরের দিকে তুলে পানুর কোলে আলগোছে রাখে। ক্যাঁচ ক্যাঁচ করে কতগুলো গরুর গাড়ি আসে পাশের গ্রাম থেকে।

সন্ধ্যে নামছে কিন্তু পানুর খেয়াল নেই। তার সঙ্গিনীর হাত ধরে বসে থাকে। তার আর ভয় নেই, অসোয়াস্তি নেই, এক নবীন বন্ধুত্বের আত্মবিশ্বাসে তাকে সমাহিত দেখায়। একটু দূরে এক বেঁটে যুগল খেজুর গাছের গোড়া থেকে বোধহয় একটা ছাগল কাশে।

'পানুদা, তুমি একটা বোকা!' বুড়ী হঠাৎ বললে।

'বোকা! কেন?'

বলেই বুঝতে পারে পানু। আর সেই অস্পষ্ট অসোয়াস্তি তার চিন্তাশক্তি আবৃত করে। বুড়ী তার দিকে মাথা হেলিয়ে এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে। মুখে চাপা কৌতুক। সেদিকে চেয়ে পানু গাঢ় গলায় বললে, 'গায়ত্রী!' তারপর তার ছোট মাথাটা নিজের কাছে টেনে এনে গভীর চুম্বন করে।

ঠিক এই সময় অনতিদূরে খেজুর গাছের গোড়া থেকে ছাগলটার কাশির মাত্রা বেড়ে যায়। তারপর খিক খিক করে হাসির আওয়াজ ওঠে। সঙ্গে সঙ্গে আলিঙ্গনাবদ্ধ বুড়ী পানুর খুব কাছেই মাটির ঢেলা পড়ে। তারা চমকে দাঁড়িয়ে উঠতেই স্পষ্ট চোঙার গলা পাওয়া যায়, 'কি মশা! বাবা রে!' আর সঙ্গে সঙ্গে অস্পষ্ট অন্ধকারে টুটুল চোঙা ছিটকে বেরিয়ে যায়। টুটুলের হাসি জল-তরঙ্গের মতো বাজতে থাকে।

(২)

সম্প্রতি চোঙার জন্যে ক্রিকেট ব্যাট আসার পর থেকে খুব জমিয়ে ক্যাম্বিস বলে খেলা চলছে। তখনও তিস্তার বাঁধ হয়নি এবং যেখানে সেখানে মাঠের মধ্যে পাকা বাড়ির করুণ বিসদৃশ সমারোহ দৃষ্টিকে পীড়া দেয় না। দেশ ভাগের চাপও উত্তর-বঙ্গে আছড়ে পড়ে নি। শহরটা তখন নির্জন, ছিমছাম। তাই ছেলেদের নড়বার চড়বার জায়গা প্রচুর। বিকেল গড়িয়ে এলে ভোম্বল, ভূপেন দস্তিদার, দেবী, জয়ন্ত, ঢেঁকী বা বনবিহারী সাহা চোঙা টুটুলের জমজমাট ক্রিকেট টিমকে প্রায়ই ক্রীড়ামত্ত দেখা যায় আম-বাগানের ধারে মাঠে। ঢেঁকী তাদের মধ্যে বয়সে বড়। দুর্দান্ত সাইকেল চালায়, মারাত্মক বল করে। টুটুলের সহপাঠী ভূপেন দস্তিদারের গায়ের জোর সবচেয়ে বেশী। খুব হাঁকড়িয়ে ব্যাট করতে যায় এবং প্রায়ই আউট হয়। বল সবচেয়ে ভাল লোফে চোঙা। এমন অপ্রত্যাশিতভাবে সে বল লোফে যেখানে সেখানে যে সে [illegible]। সবচেয়ে ভাল ব্যাট ভোম্বল। তাকে আউট করতে বোলারের হাত টন-টন করে। আর ভাল ব্যাট করে টুটুল। টুটুলের এই আকস্মিক পারদর্শিতা চোঙার ঈর্ষার কারণ ঘটায়। টুটুলকে সে খেলাধুলোর ব্যাপারে বরাবরই এলেবেলে ভেবে এসেছে। কিন্তু তার ছোট-ছোট হাত-পা নিয়ে সে অবলীলাক্রমে ব্যাট ঘুরিয়ে বেশ তাক লাগিয়ে দেয় সবাইকে।

ভূপেন-কে যেন তার পদবী-ছাড়া ভাবা যায় না। বয়সে টুটুলের চেয়ে একটু বড় হবে কিন্তু হাব-ভাবে সে বিশেষ ভাব-গম্ভীর। টুটুলকে সে তিনখানা নাই-জিরিয়ার স্ট্যাম্প দিয়েছে, গিনির দুটো দেবে প্রতিশ্রুতি দিয়েছে। কিন্তু টুটুলের পছন্দ নয় ভূপেন-কে। তার এই ভাবগম্ভীর ভক্তের মেজাজটা তার অপছন্দ। তার থেকে সে চোঙার সহপাঠী ভোম্বলকে ভালবাসে। ভোম্বলের চোখ দুটো চমৎকার, ভুরু নাচিয়ে কথা বলে। তার দুটো ফাউন্টেন পেন আছে। তার ওপর দু চাকার সাইকেল। টুটুল আর চোঙার সাইকেলও আয়ত্ত হয়েছে। তবে টুটুলের হাফ প্যাডেল।

ভোম্বলের সঙ্গে চোঙারই সবচেয়ে পটে। কাঠালগুড়ি টি এস্টেটের পাশা-পাশি চারখানা চায়ের বাগানের মালিক অমিয় ঘোষ বেশ সম্পন্ন লোক, বোধহয় ডিস্টিক্ট বোর্ডের ভাইস-চেয়ারম্যানও ছিলেন। তাঁর বড় ছেলে সুধীর সম্প্রতি বি-এ পাশ করেছে। দ্বিতীয় ছেলে মনা একটু পাগলাটে। তৃতীয় সন্তান ভোম্বল তার সখের আর অন্ত নেই। ভোম্বলের সঙ্গে চোঙার কতগুলো বিশেষ ধরনের কথা জমে ওঠে যেগুলো ঠিক ধরতে পারে না টুটুল, আর আন্দাজে কিছুটা ধরতে পারলেও তা নিয়ে এত ফুসফুস গুজগুজ করবার কি কারণ আছে বোঝে না। আর এ সময় টুটুল কাছে এলেই তাদের আলাপ হঠাৎ বন্ধ। ভোম্বল অমনি চোখ নাচিয়ে বলে, 'সাইকেলে চড়বি না টুটুল?' টুটুল অপ্রসন্নভাবে সরে যায়। একদিন সে আড়িও পেতেছিল। ভোম্বল ফিসফিস করে বলছিল। অর্ধেক কথা শোনা যায়, অর্ধেক শোনা যায় না। এক রাজকুমারীর মনে সুখ নেই। সবাই সুখ দিতে আসে কেউ পারে না।

সবাইয়েরই গর্দান যায়। তারপর নায়ক এলেন। সে এমন সুখ দিলে...এবং ভোম্বল অদ্ভুত কতগুলো অংগভংগী করতে থাকে আর ঢোঙা হেসে গড়িয়ে পড়ে। চোখ দিয়ে ঢোঙার জল বেরিয়ে পড়েছে হাসতে-হাসতে। সেইভাবে জিজ্ঞেস করে, 'তারপর?' 'তারপর আর কি? তারপর তারা মনের সুখে থাকতে লাগল আর এই রকম করতে লাগল।' ভোম্বল হাসতে-হাসতে চোখের জল বের করে উত্তর দেয়। সংগে-সংগে দরজার পেছনে টুটুলের দিকে নজর পড়ে তার। 'ইস, আবার এলেবেলেটা এসেছে।' টুটুল দৌড়ে পালিয়ে গেল। এ ঘটনার পর প্রায় সাত দিন সে ভোম্বলের সংগে কথা বলে নি।

এদিক থেকে ভোম্বলের ছোড়দা মনার সংগে তার বনে ভাল। অবশ্য বলতে গেলে মনা-ই তার প্রতি আকৃষ্ট। অমিয়বাবুর বড় ছেলে বেশ দাঁড়িয়েছে। ইতিমধ্যেই একটা টি এস্টেটের ম্যানেজার। ভবনাথ-কে সপরিবারে তাদের সদ্য-কেনা চকোলেট রংয়ের ভি-এইট ফোর্ডে চাপিয়ে ঘুরিয়ে নিয়ে এসেছে, সবাই মিলে ডুয়ার্সে যাবার প্রতিশ্রুতিও আদায় করেছে স্বর্ণসুন্দরীর কাছ থেকে। ছোট ছেলে ভোম্বলও বেশ চালাক-চতুর, তার সৌখিন মেজাজ তার যথেষ্ট সচ্ছল বাপের পছন্দ। মনা এর ব্যতিক্রম। সে কলকাতার স্বামী প্রণবানন্দ অথবা অন্য কোন মহারাজের শিষ্য। ফর্সা, বেঁটে, রোগা, তোতলা, দুই স্বাস্থ্যবান ভাই থেকে একেবারে আলাদা। মনা এসে বাগানের এক কোণে বাতাবি লেবু গাছের নীচ থেকে তার সাইকেলের বেল দেবে। বাড়ীর ভেতরে সে যাবে না। কারণ বুড়ী কিম্বা অন্যান্য কোন নারীর সংগ তার অপছন্দ। টুটুল দৌড়তে দৌড়তে বেরিয়ে এসে বলে, 'মনা-দা চকোলেট এনেছো?'

মনা বুক পকেট থেকে চকোলেট বার করে। টুটুল চট করে ছবিগুলো সরিয়েই আনন্দে চিৎকার করে ওঠে, 'কি মজা, গ্রেটা গার্বো।' মোড়কের ভেতর থেকে নীল জামা আর মুক্তোর হার-পরা গার্বোর ছবি। মনা সেদিকে চেয়ে অপ্রসন্নভাবে বললে, 'ওটা ফেলে দে। ওটার জন্যে তো আমি চকোলেট আনি নি। তুই খাবি বলে এনেছি।'

'বাঃ আমি যে জমাই। আমি জমাই, দাদা জমায়।'

'আচ্ছা চল, তোর সংগে কথা আছে।'

মনার নতুন সাইকেলের রডে চড়ে আরাম আছে। ভবনাথের সাইকেলটা অনেক পুরনো। আর ঢোঙা তাকে রডে নিয়ে চালালে গাড়াগর্তে পড়লেই পাছা ব্যথা করে। নদীর দিকে নির্জন রাস্তা ধরে চলতে-চলতে মনা বললে, 'বাঙালীর কি অভাব জানিস? আত্মশক্তি। বুঝেছিস?'

টুটুলের জিভ তখন চকোলেটের সরসতায় মন্থর। 'হ্যাঁ মনাদা!' তাড়াতাড়ি মাথা ঝাঁকিয়ে উত্তর দেয়।

'স্বামীজী কি বলে জানিস? আত্মশক্তিতে উদ্বুদ্ধ হতে বেশী লোকের দরকার নেই। মাত্র বারোজন। এই বারোজনের ওপরেই বাংলাদেশের ভবিষ্যৎ নির্ভর করছে।'

টুটুল লক্ষ করছিল নতুন সাইকেলে বেগ বাড়লেই কেমন একটা সাঁ-সাঁ শব্দ বেরোয়। বাবার সাইকেলে সে রকম হয় না। বোধহয় নারকেল তেল দিলে শব্দ বেরোতে পারে।

নদীর ধারে কয়েক মাস আগে পানু আর বুড়ী যেখানে বসেছিল তার কাছেই তারা বসে।

দুজনে পাশাপাশি বসার পর মনা বললে, একটু তোতলিয়ে, 'তো-তোর দিদির কিন্তু নাম খারাপ হচ্ছে।'

'নাম খারাপ?' অবাক হয়ে চেয়ে থাকে টুটুল। একটু ভয়ও করে। তিস্তার ধারে সেই সন্ধ্যেটার ছবি মনের মধ্যে খেলে যায়।

'হ্যাঁ, পানু-টা একটা রাসকেল। ও ভিজে-ভিজে বেড়াল। আগেও ওরকম করেছে। তোর দিদির সর্বনাশ করবে বলে দিচ্ছি।'

টুটুল ঘাবড়ে যায়। জিভে চকোলেটের মিষ্টি স্বাদ, একটু দূরেই রোদ্দুরে ঝলকানো জলের হাওয়া সব কিছু বিস্বাদ লাগে। 'আমি ওসব জানি না মনা-দা। আমি কিচ্ছু জানি না।'

'তোমায় মাসীমাকে বলতে হবে। ভোম্বল আমাকে সব বলেছে।'

টুটুল কাঁদো-কাঁদো হয়ে পড়ে। 'আমি পারব না বলছি, মনদা,' প্রায় ফুঁপিয়ে ওঠে।

'পারতে হবে। তোমার দ্বারাই হবে। অ-আত্মশক্তির পরিচয় দিতে হবে। স্বামীজী অন্তর্দৃষ্টিতে সব দেখতে পান। যে বা-বারোজনের নাম-ঠিকানা দিয়েছেন বাংলাদেশের বিভিন্ন জায়গা থেকে তার মধ্যে তো-তোমার নামও আছে। স্বামীজী কখনও মিথ্যে বলবেন না। তোমার ওপরে অ-অনেক কিছু নির্ভর করছে।'

প্রায় প্রত্যেকটা বাক্যের শুরুতেই মনা তোতলায়। একবার যাত্রা শুরু করতে পারলেই গোটা রাস্তাটা নির্ঝঞ্ঝাটে পার হতে বিশেষ অসুবিধে হয় না।

'বল, বলবে?'

টুটুল যান্ত্রিকভাবে বললে, 'বলব'। আজ বিকেলে নতুন সাইকেলে বেড়ানোর আনন্দ, চকোলেটের স্বাদ তার কাছে মাটি হয়ে যায়। আমবাগানে ক্রিকেটেই গেলে পারত সে, এরকম ফ্যাসাদে পড়তে হত না, টুটুল চিন্তা করে।

'এবারে আয়, আমরা আসন করি।' মনা পা মুড়ে পিঠ খাড়া করে পড়ন্ত সূর্যের দিকে মুখ ফিরিয়ে চোখ বন্ধ করে বসে। টুটুলকেও তার পাশে বসতে আহ্বান করে। মিনিট পনেরো কেটে যায়। টুটুলের বাঁ হাঁটুর নীচটা সুলোকায়। সেদিকে হাত বাড়াতেই মনা সজোরে তোতলায় 'ন-ন-নড়িস নে।' আরো পনেরো-কুড়ি মিনিট কেটে যায়। হঠাৎ তিস্তার পারে পুলিশ লাইন থেকে বিউগল বাজে। একটানা বেজে আবার স্তব্ধ হয়ে যায়। এবার বোধহয় পিঁপড়ে কামড়াচ্ছে ঘাসের মধ্যে থেকে।

'ঠিক কপালের মাঝখানটায় কিছু মনে হচ্ছে? একটু গরম লাগছে? মানে এক রকম জ্যোতির মতো জিনিস ঠিকরে বেরোচ্ছে বলে মনে হচ্ছে?' চোখ বন্ধ করেই মনা প্রশ্ন করে।

টুটুল এবার আড়চোখে মনা-দার দিকে তাকিয়ে বেশ করে চুলকিয়ে নেয়। হাঁটু, নাকের ডগাটাও হাতের তালু দিয়ে ঘষে নেয়।

'এমন নড়িস নে। অধৈর্য হলে কি সিদ্ধিলাভ হয়?'

আরও মোটামুটি পাঁচ-সাত মিনিট কাটে। আধমরা আমগাছটা থেকে 'কু-উ-ক', 'কু-উ-ক' করে পাখী ডাকে। [illegible] উঁচু পাঁচিলে। [illegible] দূরে কয়েকবার ডাকে, তারপর শব্দ পাওয়া যায় না। এবার পায়ের [illegible] তেজটা ক্রমশই অসহ্য লাগে টুটুলের কাছে।

'এখন পাচ্ছিস? একটু গরম লাগছে ঠিক কপালের মাঝখানটায়?'

'একটু।' অস্ফুট উত্তর আসে টুটুলের।

'আমি বলেছি, তোর হবে। স্বামীজীর কথা কখনও মিথ্যে হয় না। আরও হবে। একেবারে জ্যোতি বেরোবে।.. এবারে কি রকম?'

'গরম লাগছে মনা-দা।'

'হবে, তোর হবে।' আনন্দে চোখ খোলে মনা। 'আজকে আপাতত এই পর্যন্তই থাক। আস্তে আস্তে হবে। হুড়বড়ালে চলবে না।'

বাড়ির পথে যখন তারা ফেরে তখনও সাইকেলের মিষ্টি সাঁ সাঁ শব্দ টুটুলের কানে আসে। কিন্তু সেদিকে তার নজর ছিল না। এক অস্পষ্ট আশঙ্কা তার বুকে চাপ বাঁধে।

তাদের বাড়ির পথে [illegible] রাস্তার মোড়ে সাইকেল থেকে টুটুল-কে নামিয়ে মনা আবার তোতলায়, 'আ-র আ-র একটা কথা। তো-তোর দিদিকে বলবি মমতার সঙ্গে না মিশতে। মমতা ভাল মেয়ে না। তু-তুই [illegible] বলবি না। স্বামীজী বলেছেন, স্ত্রীলোক কু হলে তার মত কু আর কিছু নাই।'

মনা সাঁ সাঁ করে সাইকেল চালিয়ে আম-বাগানের গা দিয়ে রাস্তাটা ধরে মিলিয়ে যায়। টুটুল হতভম্বের মতো সেদিকে চেয়ে থাকে। একবার ভাবলে সামনে এগোবে নাকি, কিন্তু ক্রিকেট-পর্ব

নিশ্চয়ই এতক্ষণ সমাপ্ত। টুটুল দীর্ঘশ্বাস ফেলে এগোয়। আর কয়েক পা এগিয়েই থমকে দাঁড়ায়। চেনা গলার কথা ভেসে আসে। তাদের ঠিক কম্পাউণ্ডের বাইরে মাঠের দিকটা থেকে ফিস-ফিস করে কথা আসছে, মাঝে মাঝে হাসিরও আওয়াজ। এ জায়গাটায় পৌঁছতে কতগুণে। কেয়ার ঝোপ সচরাচর তারা এদিকে যায় না। কিন্তু এক অদৃশ্য টানে টুটুল সেদিকে এগোয়। সন্ধ্যের অন্ধকার নামছে। কেয়ার ঝোপের ভেতর থেকেই স্পষ্ট দুটো মূর্তিকে দেখা যায় একটা কাঠের গুঁড়ির ওপর বসে আছে। টুটুল আর একটু এগোতে গিয়েই পিছু হটে! পানুদা বড়ীকে জাপ্টে ধরে চুমু খাচ্ছে।

চাবুক-খাওয়া ঘোড়ার মতো টুটুল দৌড় মারে। মনা-দার কথা শোনার পর যে চাপ সৃষ্টি হয়েছিল তা এতক্ষণে কাটতে থাকে এতক্ষণে তার ফাঁকা মন একটা লক্ষ্যে ধাবিত হয়। তিস্তার ধারে সে দৃশ্য কয়েক মাস আগে দেখেছিল তার মধ্যে একটা মজা ছিল, তার পর চোঙা কয়েকবার দিদিকে শাসালে সে বড় দুটো চকোলেট দিয়ে তার দু ভাইয়ের সঙ্গে সন্ধি করেছে। কিন্তু মনা-দার কথার পর তার আজ সন্ধ্যের কেয়াবনের দৃশ্য অন্যরকম লাগে, পানু-দাকে এক শত্রু শিবিরের লোক মনে হয়। দৌড় ত দৌড়তে সে গেট পার হয়। তারপর সমান তালে, চোঙার প্রশ্ন ভ্রূক্ষেপ না করেই দোতলায় উঠে আসে। স্বর্ণসুন্দরীকে সামনে দেখেই তার বুক দম যায়। 'মা মা!' হাঁফাতে হাঁফাতে বলেই চুপ করে আরও হাঁফাতে থাকে।

'কি হল? ওরকম হাঁফাচ্ছিস কেন? ক্যাপা-দা আসে নি?'

'নাঃ, পানুদা দিদিকে চুমু খাচ্ছে!'

হুড়মুড় করে কথাটা বলে সে বিমূঢ় ভাবে মায়ের দিকে তাকিয়ে থাকে। হঠাৎ তার চোখ ফেটে জল আসে। কান্নায় বোঁজা বিকৃত ভাঙা গলায় বলে "আমি কিছু জানি না মা, মনা-দা বলতে বলেছে।"

স্বর্ণসুন্দরী যখন ভুরু কুঁচকে সামনে এসে দাঁড়ান তখন হঠাৎ মা-কে জাপটে ধরে টুটুল ফোঁপাতে থাকে। বারে বারে জেরা করেও বিশেষ কিছু জানতে পারেন না স্বর্ণসুন্দরী। অথচ টুটুল সচরাচর বাজে কথা বলে না। কাজেই কথাটা মোটেই ফেলার নয়। তা ছাড়া মেয়ের উড়ু-উড়ু ভাব তিনি কিছুকাল যাবৎ লক্ষ্য করছেন। ফিটফাট থাকা তারও পছন্দ। সেদিক থেকে বড়ীর কাপড়-চোপড়ের দিকে সাম্প্রতিক অভিনিবেশ তাঁকে বিচলিত করে নি। কিন্তু মমতার বাড়ি যাচ্ছি বলে সময়-অসময়ে বাড়ির বাইরে যাওয়ার একটা অর্থ তিনি খুঁজে পান। পড়ার ঘরে টিক-টিক করা পছন্দ নয় তাঁর। কিন্তু একদিন পাশ দিয়ে যেতে তিনি একটু থমকে ছিলেন। টেবিল ল্যাম্পের ওপর দিয়ে এমন ভাসাভাসা মুগ্ধ দৃষ্টিতে পানুর দিকে চেয়ে ছিল তার মেয়ে যে মুহূর্তের জন্যে তাঁর নিজের আত্মবিশ্বাসে ঘা পড়ে। তারপর ব্যাপারটার অসম্ভাবনা এতই প্রচণ্ড যে সেদিকে আর চোখ ফেরানোর প্রয়োজন মনে করেন নি। কিন্তু যে কারণে তিনি সহসা ক্ষিপ্ত হয়ে পড়েন তা হোল ডিস্ট্রিক্ট বোর্ড কেরানীর আস্পর্ধা। কুকুরকে লাই দিলে মাথায় চড়ে কথাটা বলেই ফেলেন বিহ্বল টুটুলকে। তার পর ওপর থেকে হাঁক দিলেন, 'বুড়ী!'

ফায়ারিং স্কোয়াডের সামনে দাঁড়ানো বড়ী নিস্পৃহ গলায় নীচ থেকে জবাব দেয় 'যাই মা।'

সেবার শীতের সকালে মস্ত একখানা নতুন চকোলেট রংয়ের ফোর্ড গাড়ি নিঃশব্দে এসে থামে ডেপুটি কমিশনারের বাগানে। গাড়ির চাবি আঙুলে ঘোরাতে ঘোরাতে পাজামা পাঞ্জাবীর ওপর নীল চকোলেট জহর কোট আঁটা সুধীর ঘোষ নামে। কুচকুচে কালো এবং আশ্চর্য সুপুরুষ সুধীর। সাড়ে ছ' ফিট লম্বা হাল্কা খেলোয়াড়ি গড়ন, বুদ্ধিতে প্রখর কপাল ও চোখ, আর হাসকে ঠোঁটের দু-পাশ চমৎকার আকর্ষণীয়। বলতে গেলে, সুধীর সব সময় হাসছে কিংবা হাসবার উপক্রম করছে। আর সে হাসলে স্বর্ণসুন্দরীদের নীচতলায় তার আওয়াজ ভেসে আসে।

স্বর্ণসুন্দরী বললেন, 'বাঃ সুধীর, তুমি যে রাজার মতো হাসছো!'

'হাসব না মাসীমা? আপনি যেরকম ঘাবড়িয়ে দিয়েছিলেন! হাঃ হাঃ হাঃ!'

স্বর্ণসুন্দরী বুঝতে পারেন না সুধীরের প্রতি তাঁর বিশেষ স্নেহের সুযোগে সে অসভ্যতা করছে কি না। একবার ভুরু কুঁচকালেনও, কিন্তু সুধীর এমন প্রাণখোলা হাসিতে ঘর ভরিয়ে তোলে যে তিনিও হেসে ফেলেন। সুধীর হাসতে হাসতে বললে, 'বুড়ী? ওটা তো একরত্তি মেয়ে! আর পানুটা তো মহা ইডিয়েট! নিজের কেরীয়ার নিজে নষ্ট করল। তবে আপনি মাসীমা এমন ঘাবড়ে গিয়েছিলেন!'

'না না সুধীর। তোমরা আজকালকার ছেলেরা ব্যাপারটা মোটেই গুরুত্ব দিতে চাচ্ছো না। আমার সবচেয়ে রাগ হয়েছিল কেন জানো?'

'হ্যাঁ, সেটা বুঝতে পারছি, আপনি বলছেন স্ট্যাণ্ডার্ডের কথা, না?' সুধীর এবার গম্ভীর হয়ে বললে।

'হ্যাঁ অনেকটা...'

'আচ্ছা মাসীমা, পানু-র যদি স্ট্যাণ্ডার্ড থাকত তাহলে...'

'যদির কথা নদীতে।'

'তা অবশ্য!' সুধীর চেয়ারে বসে পা নাচায়।

'আমার বরাবরই মিনমিনে লোক ভাল লাগে না।'

'আমাকে কেমন লাগে?' সুধীরের ঠোঁটে আবার হাসির উপক্রম। আর সে হাসিতে সামান্য বিদ্রুপ নেই। স্বর্ণসুন্দরী সেদিকে চেয়ে হেসেই ফেলেন, 'তুমি নিজেই জানো।' বলেই মনে মনে ভাবলেন রংটা যদি সাফ হত তাহলে গৌরীর সঙ্গে কি চমৎকারই না মানাত! সঙ্গে সঙ্গে নিজের মনকেই বলেন, রং-এর কথা বাদ দিলে সুধীরের শত্রুও তাকে সুপুরুষ বলবে। তাছাড়া এ বয়সে দুটো নামকরা টি-এস্টেটের ম্যানেজার। সুন্দর স্বভাব। বাড়িঘরের অবস্থা যথেষ্ট স্বচ্ছল। এরকম ঘরে গৌরী গেলে তিনি খুশিই হবেন। তাছাড়া বুড়ীর হঠকারিতায় তিনি এমন ঘা খেয়েছেন যে, গৌরীর ব্যাপারে ভাবিত হয়ে পড়েছেন। গৌরী বি-এ দিল, এবার ধরেছে এম-এ পড়বে। কিন্তু তাঁর মেয়ে তো আর চাকরী করবে না, সুতরাং বিদুষী সে যথেষ্টই হয়েছে, আর হবার প্রয়োজন নেই। স্বর্ণসুন্দরীর ইচ্ছে গৌরী কলকাতার পাট চুকিয়ে এখানেই উঠে আসুক বড়দিনে। সুধীর এবং তাদের পরিবারের সঙ্গে অন্তরঙ্গ হবার পর থেকেই এ ইচ্ছা আরও বলবতী হয়েছে। এ ছাড়া আরও এক কারণে গৌরীর প্রবল অনিচ্ছা সত্ত্বেও তার হোস্টেলে বাস তুলে দিতে তিনি মনস্থ করেছেন। তা হল তাঁর বড় মেয়ের চিঠিতে তাঁর সদ্য ইউরোপ ফেরত জামাইয়ের সঙ্গে গৌরীর সম্পর্কে এক প্রচ্ছন্ন ইঙ্গিত।

'চা-বাগানে তোমার ফাঁকা লাগে না সুধীর?'

'আমার এখন খুব ভাল লাগে মাসীমা। কলকাতায় হার্ডিঞ্জ হোস্টেলের হট্টগোলের পর বাবা যখন বাগানে ঠেলে দিলেন তখন বেজায় খারাপ লেগেছিল। ভীষণ আড্ডাবাজ জানেন তো! কথা না বলতে পারলে আঁকপাঁক করতাম। মুষলধারে বৃষ্টির মধ্যে ছাতি মাথায় করে জল ঠেঙে এপাড়া ওপাড়া করতাম শুধু আড্ডা দেবার জন্যে। আর এখন ঠিক উল্টো, মাইলের পর মাইল, চায়ের ঝোপ, আর একটা দুটো পাখীর আওয়াজ।'

'এরকম নির্বান্ধব পুরী বাপু আমার ভাল লাগে না।' স্বর্ণসুন্দরী যেন তাঁর মেয়ে গৌরীর হয়ে কথা বলছেন।

'আমারও তাই মনে হত। এখন আর হয় না।'

'কেন বাবা? এক বছরেই এমন বুড়ো হয়ে গেলে?'

'ঠিক তা নয় মাসীমা। দেখলাম আমাদের জগতটা কেমন ফক্কা হয়ে গেল এই ক'বছরেই। যেসব জিনিস নিয়ে ভাবতাম সেগুলো আসলে কোন ভাবনাই ছিল না। খালি কথা আর কথা, কথার পিঠে কথা। কথার বন্যায় আমরা ভেসে যেতাম!'

'তা মানুষ কথা বলবে না? কথা না বললে প্রাণ বাঁচে?'

সুধীরের পা নাচানো বন্ধ। তার ঠোঁটের পাশে হাসির উপক্রম এখনও আছে কিন্তু চাহনি অনেক কোমল স্নিগ্ধ। বললে, 'এখন বেশ ভাল আছি। সকাল আটটায় বেরিয়ে যাই

ফ্যাক্‌টরীতে। সেখান থেকে একবার আসি বাড়িতে খেতে। বিকেলে সাইকেল করে যাই মাইল দুয়েক দূরে আমাদের লোকজনদের জন্যে ব্যারাক উঠছে তার তদারক করতে। যখন বাংলোতে ফিরি সন্ধ্যে নামছে। এই বেশ ভাল মাসীমা। জীবনটা বেশ ছকে ফেলা গেছে। আগে জীবনের কোন ছক ছিল না। এই গাড়িতে করে কাশ্মীর গেলাম, সারা রাত্তির ধরে হল্লা করলাম বন্ধুদের সঙ্গে। এখন আর ভাল লাগে না।'

'এত তাড়াতাড়ি বুড়ো হয়ে গেলে চলবে কেন?'

বুড়ো না মাসীমা, এটা ঠিক বুড়ো হওয়ার লক্ষণ না। কোন একটা কিছু নিয়ে থাকা চাই। তাতে ইন্টারেস্ট নেওয়ার থাকে বলে, এইটাই জীবন। এছাড়া যা আছে সেগুলো কথা, কি বলুন?'

'কি জানি বাপু, আমার তো মনে হয় বেঁচে যে আছি এটাই যদি না বুঝতে পারি তাহলে আর বেঁচে কি লাভ?'

সুধীর অন্যমনস্কভাবে গাড়ির চাবি আঙুলে পাক দিতে থাকে। আস্তে আস্তে বলে, 'কলেজ জীবনে বাবাকে খুব করুণা করতাম। আমরা এত মজা করছি, হুল্লোড় করছি, আর বাবা সারা জীবন পড়ে আছেন চায়ের বাগানে। আগে আসামে ছিলেন। ছেলেবেলায় আমিও আঁকপাঁক করতাম বাগানে কিছুদিন থাকলে। সময়ে সব পাল্টে যায়, না মাসীমা?'

'হ্যাঁ, মানুষ বুড়ো হয়ে যায়।'

'আমি ওরকম ভাবি না। আমার মনে হয় সময় আমাদের শেখায়। আমরা সময়ের কাছ থেকে শিখি।'

স্বর্ণসুন্দরী উসখুস করে বললেন, 'তুমি আবার কবিতা টবিতা লেখো না তো?'

সুধীর অবাক হয়ে বললে, 'কবিতা? না না, সাত জন্মে কবিতা লিখি নি। যদি বলেন গাড়ির মেকানিক হতে, পারি, টেনিস ট্রেনার হতে পারি। তবে কবিতা টবিতার মধ্যে নেই।'

'যেরকম কথা বলছো আজকে আমার তো ভয় হচ্ছে সাধু সন্ন্যাসী হয়ে যাও কিনা।'

সুধীর আবার হাসিতে ঘর ভরিয়ে তুললে। 'সাধু আমি নই মাসীমা, সাধু মনা! কলকাতায় গেলেই কোনো মঠে যায়। সাধু সঙ্গ করে। তবে মাথাটা খুব পরিষ্কার মনার। দেখবেন, ও আমার চেয়েও ভাল বাগান চালাবে।'

'যদ্দিন বয়স আছে আমোদ আহ্লাদ করে নাও। আমি খুব হৈ হৈ পছন্দ করি, আমার মেয়েও।'

'আপনার বড় মেয়ে?'

'না, কমলা বরাবরই খুব শান্ত, বিচক্ষণ। আমার মেয়ে গৌরী একেবারে হুড়ো। ওকে বকতাম ছেলেবেলায় কিন্তু মনে মনে হিংসেও করতাম। আমিও ঐরকম ছিলাম ছেলেবেলায়। তুমি তো গৌরীকে দেখোনি। ও আসছে বড়দিনে। আমি লিখে দিয়েছি ওসব এসে টেঁসে হবে না।'

'তাহলে চলুন, বড়দিনে একটা আউটিং করা যাবে।'

'আমার জামাইও আসছে, বড় মেয়ে আসছে।'

'বেশ তো!' সুধীর আঙুলে চাবি জড়াতে জড়াতে উঠে পড়ে।

ভবনাথের জামাই, বড়মেয়ে, গৌরী বড়দিনের সুরুতেই তাদের লটবহর নিয়ে হাজির। গৌরী গত দু বছরে আরও সুন্দর হয়েছে, কিন্তু একটু বিষম, তার কলেজে হস্টেলের বন্ধুবান্ধব নিয়ে হৈ হল্লার জীবনে ছেদ পড়ায় গম্ভীরও! তার অনেকদিনের লাল ট্রাঙ্ক গাড়ি থেকে নামাতেই চেঁচা চেঁচায়, দিদি, আমাদের সঙ্গে থাকবে রে, আর যাবে না।'

বড়মেয়ে কমলা অনেকটা লম্বা, আর কালো। চেহারায় গৌরীর ঠিক বিপরীত। ছটফটানি নেই, হাসিও ম্লান। আস্তে আস্তে ঘাড় তুলে বড়বড় চোখে তাকায়। মুখের রেখা কোমল, খুব স্পর্শকাতর। নবুর বিয়েতে কদিনের জন্যে মাত্র দেখা হয়েছিল। স্বর্ণসুন্দরী বড় মেয়েকে বুকে জড়িয়ে ধরে সশব্দে চুম্বন করেন।

জামাই মদন ঘোষের এখন বয়স চল্লিশ। কালো, বেঁটে। রোগা, কিন্তু প্রচণ্ড এনার্জির আকর। সাত বছর জার্মানীতে, বিয়ের আগে চার বছর, পরে তিন বছর। বি-ই কলেজ থেকে পাশ করে কিছুদিন চুন সুরকির দোকান দিয়েছেন, ট্যাক্সি চালিয়েছেন, কানা ঘোষা শোনা যায় জার্মানীতে ভারতীয় বিপ্লবীদের সঙ্গে যোগাযোগ ছিল। তবে এখন সে অধ্যায় কেটে গেছে। এখন মদন ফিলিপ্স কোম্পানীর ইঞ্জিনীয়ার।

মদন গাড়ি থেকে লাফিয়ে নেমেই হাঁক দেয়, 'সাবধানে নামাবে, কাঁচের জিনিস আছে।' স্বর্ণসুন্দরীর অনেক দিনের সাধ মদন পূর্ণ করেছে। দামী বিলিতি ডিনারের সেট এনেছে সঙ্গে।

খামচে খামচে পা ছুঁয়ে প্রণাম করে শ্বশুরকে বললে, 'বললাম, গাড়িতে আসব। কোন অসুবিধে নেই। আপনার মেয়ে রাজী হল না। আমার সম্পর্কে একেবারে কন্‌ফিডেন্স নেই।'

ভবনাথ মৃদু হাসেন। জামাইয়ের গাড়ি হয়েছে অথচ তাঁর এখনও হয়নি। তাঁর বড় ছেলের সাম্প্রতিক অকৃতকার্যতার কথাও স্মরণে আসে। প্রতাপকে এতগুলো টাকা দিয়ে মাসে মাসে পুষতে না হলে ইতিমধ্যে তাঁর গাড়ি হয়ে যেত। কয়েকটা ইংরেজ প্লান্টারের কাছ থেকে অফারও এসেছে।

স্বর্ণসুন্দরী আবার আনন্দে হৈ হৈ করেন। নাতনি বুলু যে এতক্ষণ আড়ষ্ট হয়ে গৌরীর পেছনে দাঁড়িয়েছিল তাকে কোলে টেনে নিয়ে হাঁক ছাড়েন, 'গোপীনাথ, গোপীনাথ, কৌচ আনাও।'

সন্ধ্যের পর দোতলার বারান্দায় পারিবারিক মজলিশ বসে। এ মজলিশের চেয়ারম্যান স্বর্ণসুন্দরী। ভবনাথ দূরে ক্যাম্পচেয়ারে বসে থাকেন। কিছুদিন যাবৎ তিনি একটু বেশী নীরব। প্রতাপের আই সি এস পরীক্ষায় অকৃতকার্যতা এবং প্রায় বছর খানেক বছর দেড়েক টালবাহানা করে শেষ পর্যন্ত চার্টার্ড একাউন্টেন্সি পড়ার অনির্দিষ্ট তীর্থযাত্রা তাঁকে ভাবিয়ে তুলেছে। জোরাল আলোয় দেয়ালের গায়ে ফুলন্ত বোগেনভিলিয়া ঝলমল করে। সেদিকে চেয়ে চেয়ে তিনি টের পান যে তাঁর ভাগ্যাকাশের সূর্য এবার হেলেছে পশ্চিমদিকে। যদি প্রতাপটা দাঁড়াত তাহলে আরও কিছুদিন বোধহয় খাড়া হয়ে থাকতেন।

'জুরিখ থেকে টমাস মান এসেছিল আমাদের ক্লাবে' মদন কথার তুবড়ি ফোটায়। একবার গৌরী আর একবার স্বর্ণসুন্দরীর দিকে চেয়ে বলে 'আমাদের দেশের হেঁজি পেঁজি সাহিত্যিক না। নোবেল প্রাইজ পেয়েছে, গয়টের ওপরে বললে। সে এক অন্য রকম দেশ মা, সব মানুষ কাজ করছে, সব মানুষ চিন্তা করছে, আমাদের দেশের মতো ঘুমিয়ে নেই।'

গোপীনাথ আরও এক কাপ সুগন্ধ দার্জিলিং চা নিয়ে আসে। 'ডাঙ্কে ডাঙ্কে।' উৎসাহের সঙ্গে পুরনো অভ্যাসে চেঁচিয়ে ওঠে মদন। তারপর শাশুড়ী ঠাকরুণের বিহ্বল দৃষ্টির দিকে চেয়ে ব্যাখ্যা করে। জার্মানে ধন্যবাদ দিলাম। গৌরীর দিকে চেয়ে বললে, তোমাদের কি ছাত্রা ইংরেজী সাহিত্য পড়ায়? তাতে কোন কথায় জোর আছে?' মদন নির্ভুল উচ্চারণে হাইনে আবৃত্তি করে। তাকে অন্যরকম দেখায়। ভবনাথও চমকিয়ে সেদিকে চোখ মেলেন। তাঁর চাকরি ও পারিবারিক জীবনে এই ধূমকেতুটির আবির্ভাব মন্দ লাগে না। খানিকক্ষণ পরে অবশ্য তাঁকে উঠতে হয়। বায় লিখতে বসেন বৈঠকখানায়।

স্বর্ণসুন্দরী কিছুই বোঝেন না। কিন্তু এই জুরিখ, বার্লিন, হামবুর্গের গল্প, সম্পূর্ণ আলাদা জগত এক অপরিচিত গন্ধ রস বয়ে নিয়ে আসে। গৌরী ভক্তের মতো চেয়ে থাকে মুগ্ধদৃষ্টিতে জামাইবাবুর দিকে। খালি কমলা প্রবল বিষাদের প্রতিমূর্তির মতো বসে থাকে। স্বর্ণসুন্দরী দুতিনবার খোঁচা দিলেও তার কোন পরিবর্তন হয় না। 'আমার মাথা ধরেছে' শেষে বললে।

'আপনার মেয়ের কথা আর বলবেন না। ও যে কি চায়, বুঝি না। খালি সংসার করো, খাও দাও, ব্যস। আর কোন চিন্তা নেই, কোন আইডিয়া নেই।' মদনের শেষ কথায় প্রতিবাদের একটা কাঁপুনি হঠাৎ কমলাকে নাড়া দিয়েই থেমে যায়।

স্বর্ণসুন্দরী মেয়েকে বলেন, 'কিরে কিছু বলছিস না যে!'

'বলছি মাথা ধরেছে!'

(ক্রমশঃ)

লটারির লট্

পশুপতি ভট্টাচার্য

লট্ হলো একটি ইংরেজী শব্দ, যার মানে ভাগ্য, বরাত। তার থেকে হয়েছে লটারি, অর্থাৎ ভাগ্যের খেলা। আজকাল এই ভাগ্যের খেলার খুবই চল হয়েছে। প্রায় প্রত্যেকটি রাজ্যেই লটারির আয়োজন, তার জন্য প্রচুর বিজ্ঞাপন। অনেকেই ভাগ্য পরীক্ষা করছে।

ভাগ্যে থাকলে এক একজন এই লটারিতে জেতে, হঠাৎ একসঙ্গে অনেক-গুলো টাকা পেয়ে যায়। ভাগ্য তো বটেই, কিন্তু তা সুভাগ্য না কুভাগ্য তা কে বলতে পারে? যারা পায় তাদের পরবর্তী জীবনের কথা কজন জানে? সে টাকার কিভাবে কি গতি হয়?

আমি একজনের কথা জানি যে একবার লটারিতে জিতেছিল।

আমাদেরই জানাশোনার মধ্যে। তার ভালো নামটা ছিল দুর্গাগতি বা অমনি একটা কিছু, ঠিক মনে নেই, কিন্তু ডাক নাম ছিল প্যাংলা। সেটাই সবাই জানতো।

প্যাংলা বেশ ভালো বংশেরই ছেলে। কিন্তু হলে কি হবে, সে লেখাপড়া বিশেষ করেনি। তার দাদারা এম-এ, বি-এল, ইঞ্জিনিয়ার ইত্যাদি, কিন্তু সে ম্যাট্রিকও পাস করেনি। পাড়ায় পাড়ায় ঘুরে আড্ডা দিয়ে বেড়ানো, খেলার মাঠে গিয়ে খেলা দেখা, ক্রিকেট ফুটবল ম্যাচ দেখে এসে তাই নিয়ে সোচ্চারে আলোচনা এবং সমালোচনা করা, পাড়ায় থিয়েটারের দল গড়ে উঠলে সেখানে গিয়ে মোড়লি করা, দলে দলে দাঙ্গা বাধলে সোৎসাহে তাতে যোগ দেওয়া, আর হরদম বান্ডিল বান্ডিল বিড়ি ফোঁকা, এই ছিল তার কাজ। এত পয়সা কোথায় পেতো? তা একরকম করে জুটিয়ে নিতো, বাবার কাছ থেকে, মায়ের কাছ থেকে, দাদাদের কাছ থেকে। সকলেই জানতো যে ওর আর কিছু হবে না, এমনি করেই দাদাদের সংসারের গলগ্রহ হয়ে থাকবে। তাই বয়স হলেও কেউ ওর বিয়ে দেয়নি, যদিও বয়স চল্লিশ পার হয়ে গেছে। তখনকার দিনে ও বয়স পর্যন্ত অবিবাহিত খুব অল্প জনই থাকতো কুলীন ব্রাহ্মণের ঘরে। এখনকার দিনের কথা নয়, বিশ বছর আগের কথা বলছি। তখনও কুলীনত্ব কিছু ছিল।

কিন্তু অমন নিষ্কর্মা ভ্যাগাবন্ড ধরনের [illegible] এবং [illegible] দরদী। পরোপকারী বললেই যথেষ্ট বলা হয় না। কারো দুঃখকষ্টের কথা বা বিপদের কথা শুনে অন্য পাঁচজনের মতো তুষ্ণীভাব নিয়ে নীরব নিষ্ক্রিয় হয়ে থাকতে পারত না, তার নিবারণকল্পে যথাসাধ্য যাহোক একটা কিছু করত। তবে ওর আর সাধ্যের সীমা কতটুকু! তথাপি চেষ্টা করতে ছাড়ত না, ক্ষমতাবান লোকদের গিয়ে ধরত। অপমান-বোধ তার ছিল না।

আর ছিল তার মাতৃভক্তি। সে এমন নিরেট নির্বোধ ভক্তি যাকে আমরা বলি অন্ধভক্তি। অর্থাৎ মা-ই যেন তার জীবনের একমাত্র সহায়। মা যখন রয়েছেন তখন আর কোনো ভাবনা নেই। কিন্তু সে ভক্তির কোনো বাহ্য প্রকাশ ছিল না। মায়ের উপর উৎপীড়ন এবং আবদারের অন্ত ছিল না। খুঁটিনাটি সব কিছুতেই মাকে চাই। ওমা, এদিকে এসো, পিঠটা চুলকে দাও, ঘুম আসছে না মাথায় হাত বুলিয়ে দাও, ইত্যাদি। আর মায়েরও তাতে বিরক্তি ছিল না, তিনিও ওকে একটু বেশিরকম স্নেহ করতেন। মায়েরা কৃতী সন্তানদের চেয়ে প্রায়ই অকৃতী সন্তানদের একটু বেশি স্নেহ করে থাকেন, তাদের অন্যায় আবদারগুলো সহ্য করেন। এটা প্রায়ই দেখি।

এমন ধরনের মানুষদের সাধারণত টাকার লোভ থাকে না। তবে সে লটারির টিকিট কিনতেই বা গেল কেন? তাও সে কিনেছিল দায়ে পড়ে, একজনের নেহাৎ পীড়াপীড়িতে।

তারও একটু ইতিহাস আছে। পাড়ার হাঁদু মাস্টার রেঞ্জার্স লটারির টিকিটের একটা বই আনিয়েছিল, কিন্তু সেই টিকিট বিক্রি করতে তাকে যথেষ্ট বেগ পেতে হচ্ছিল। লোকে সহজে কিনতে চায় না, বলে যে টাকাটা অনর্থক জলে ফেলা হবে। তাই সে এসে ধরেছিল প্যাংলাকে, একখানা টিকিট তাকে নিতেই হবে। যখন কিছুতেই ছাড়ে না, তখন সে বললে, দাঁড়াও দেখি।

বাড়ির ভিতর গিয়ে সে মাকে বললে, লোকটা কিছুতে ছাড়বে না, কি করি বলো তো মা? মা শুনে বললেন, একটা মাত্র টাকা তো, এই আমার আঁচলে বাঁধা আছে নিয়ে যা।

এমনি করে হলো তার লটারির টিকিট কেনা।

সেই টিকিট থেকে সে পেলে পঁচিশ হাজার টাকা। ফার্স্ট প্রাইজ নয়, সেকেন্ড কিংবা থার্ড প্রাইজ। তা হলেও পঁচিশ হাজার টাকা ওর পক্ষে কম কথা নয়।

পাড়ায় পাড়ায় এ কথা রটে গেল, আত্মীয়স্বজন যে যেখানে ছিল সবাই জানলে, এমন কি নিজেদের দেশে অর্থাৎ ওদের দেশের পল্লীগ্রামেও এ কথা অবিদিত রইল না।

প্যাংলা তখন প্যাংলোবাবু হয়ে গেছে, 'তুমি' থেকে 'আপনি' সম্বোধন চলছে।

কিন্তু এ টাকা নিয়ে অতঃপর সে কি করবে? পাঁচজনে পাঁচরকম মতলব দিতে লাগল। দাদারা বললে, টাকাটা ব্যাংকে ফিক্সড্ ডিপজিটে রেখে দে, ওর থেকে যা সুদ আসবে তাই কেবল নিবি, টাকাটা জমা থাকবে। কিন্তু অনেকেই এটা পছন্দ করলে না, বললে একটা কিছু ব্যবসাতে লাগান স্যার, টাকায় টাকা বাড়ে, অমন করে ফেলে রেখে লাভ কি। একটা ইটখোলা করুন, আজকাল ইটের ব্যবসাতে অনেক পয়সা। কেউ বললে, তা নয়, একটা হোটেল খুলুন। কেউ বললে, ঐ টাকাতে কলকাতায় একটা বাড়ি কিনে ফেলুন। কেউ বললে, মোটর-গাড়ি কিনে ট্যাক্সি করুন, প্রত্যহ নগদ টাকা ইনকাম হতে থাকবে। কেউ বললে, মোটর-বাস কিনে ফেলুন, ওতে প্রচুর লাভ। এমনি আরো কত কি।

ওর মা বললেন, ও সব কিছু শুনিস না, তুই একটা কাজ কর। টাকাটা তোর মামার হাতে দিয়ে দে। মামা তেজারতির কারবার করে, ঐ টাকা তেজারতিতে খাটাবে। তারও লাভ হবে, তোরও লাভ হবে। আর যখন যা দরকার হবে, মামার কাছে চাইলেই পাবি।

অতএব প্যাংলা তাই করলে। টাকাটা মামার কাছে জমা করে দিলে।

কিছুকাল পর্যন্ত প্যাংলার বেশ ফুর্তিতেই কাটল। শৌখিন কাঁধে-বোতাম আদ্দির চুড়িদার পাঞ্জাবী পরে, পায়ে চকচকে পাম্পশু, হাতে গোল্ডফ্লেকের সিগারেট টিন, সোনালি রিস্টব্যান্ড দেওয়া দামী হাতঘড়ি। বলা বাহুল্য, সঙ্গীসাথীর সংখ্যা অনেক বেড়ে গেল, অনেক স্তাবক ও কুসঙ্গী জুটে গেল।

এর ফলে যা হয়ে থাকে তাই প্যাংলার বেলাতেও ঘটল। আর সে তখন একেবারে

দিলদরিয়া। বরাবরই সে ছিল পরোপকারী, সকলেই সে কথা জানতো, তাই অনেকেই তার সুযোগ নিতে লাগল। কারো বা কন্যাদায়, কারো মাতৃদায়, কারো পিতৃদায়, কারো স্ত্রী ভুগছে টি, বি,তে অথচ চিকিৎসা হচ্ছে না, কোনো ছাত্র পরীক্ষা দেবে কিন্তু ফী জমা দেবার টাকা নেই, ইত্যাদি কত রকমের অভাবের বিবরণ নিয়ে এসে ওর কাছে কান্নাকাটি করে। বিশেষত ওদের গ্রামের লোকেরা, তারা এসে ওর হাতে পায়ে ধরে। ও তার খোঁজ নিয়েও দেখে না যে কথাটা বাস্তবিক সত্য কিনা। ও তখনই মামার কাছে একটা চিরকুট লিখে দেয়, মামার কাছে গিয়ে চিরকুট দিলেই তিনি টাকা দিয়ে দেন,—দশ, বিশ, পঁচিশ, পঞ্চাশ, একশো, দুশো, যখন যেমন লেখা থাকে।

এতো গেল দান খয়রাতি। তা ছাড়া নিজের হাতখরচের জন্যেও যথেষ্ট টাকা চাই, সে ইচ্ছামতো মামার কাছ থেকে চেয়ে আনে। মামা অবশ্য তার হিসেব রাখেন, কিন্তু ওর কোনো হিসেবপত্র নেই। যখন যেমন দরকার নিয়ে আসে। তখন সঙ্গদোষে সে জুয়া খেলা, রেস খেলা প্রভৃতি শুরু করেছে।

সঙ্গদোষে আর একটি মারাত্মক অভ্যাস তার ঘটল। মদ্যপান। সে দেখলে যে এতে মন প্রফুল্ল হয়, খিদেও বাড়ে, ঘুমও ভালো হয়, অতএব এতে দোষ কি আছে। অর্থ যখন হাতে আছে তখন প্রত্যহই চলতে পারে। এই করতে করতে ওটা অভ্যাস হয়ে গেল।

বাড়ির লোকেরা এটা জানতে পারলে। তারা চেষ্টা করেও এর কোনো প্রতিকার করতে পারলে না। মায়ের তিরস্কারেও কোনো কাজ হলো না। এ জিনিস একবার অভ্যাসে দাঁড়ালে ছাড়ানো খুব কঠিন। সে লুকিয়ে চুরিয়ে খেতে লাগল। কেউ আটকাতে পারলে না।

ওর দাদারা তখন ওর স্বভাব চরিত্র নষ্ট হবার আশংকা করতে লাগল। অসৎসঙ্গে কোথায় কখন গিয়ে পড়বে, আর ওর মতো দিলদরিয়া কাপ্তেন মানুষ অনায়াসে কোনো একটা ফাঁদে পড়ে যাবে। সবাই মিলে পরামর্শ করে স্থির হলো, তাড়াতাড়ি ওর বিয়ে দেওয়া যাক।

ওর বড়োদাদাই উদ্যোগী হয়ে বিয়েটা ঘটিয়ে দিলে তার অবিবাহিতা বয়স্থা শালীর সঙ্গে। দরিদ্র ব্রাহ্মণের কন্যা, অর্থাভাবে তাকে পাত্রস্থ করতে পারেননি। তিনি নিজেই এসে প্যাংলার হাত চেপে ধরলেন, তাকে সম্মত করালেন। মেয়েটি সুন্দরী নয়, কিন্তু সুদক্ষা, বুদ্ধিমতী, সুশিক্ষিতা।

বৌটি এসেই প্যাংলাকে বশ করে ফেললে। তা অবশ্য সব জায়গাতেই হয়ে থাকে, কিন্তু সে বুদ্ধিপূর্বক লেগে থেকে ক্রমশ ওর অনেক কুঅভ্যাস ও খামখেয়ালি ছাড়িয়ে দিলে। জুয়া খেলা, রেস খেলা প্রভৃতি বন্ধ হয়ে গেল। অনর্থক অর্থের অপব্যয় করা অনেক কমে গেল। ধূমপানের মাত্রা হ্রাস পেলো। মদ্যপানও অনেক কমে গেল, কিন্তু এটি একেবারে ছাড়ানো গেল না। তা হলেও তখন স্ত্রীর সদাসতর্ক তত্ত্বাবধানের মধ্যে থেকে প্যাংলা তখন বেশ সংযত জীবনযাপন করতে লাগল, আর বেগতিক দেখে লুব্ধ বন্ধুবান্ধবের দল তাকে পরিত্যাগ করলে।

দু তিনটে বছর এইভাবে কেটেছিল। তার পরে এমন সব ঘটনা ঘটতে লাগল যাতে নিতান্ত অপ্রত্যাশিত ও অনিবার্যভাবে জলের মতো অর্থব্যয় করতে হলো।

ওর বাবার ক্যানসার রোগ হলো। গলায় ক্যানসার, তীব্র যন্ত্রণাদায়ক। তাঁর চিকিৎসার জন্য প্রচুর টাকা খরচ করতে হলো। দাদারা কিছু কিছু দিয়েছিল বটে, কিন্তু প্যাংলাকেই দিতে হলো অধিকাংশ, কারণ টাকা তার মজুত রয়েছে যখন, তখন অন্যেরাই বা দেবে কেন। চিকিৎসা অনেক-দিন ধরে চলল, বিস্তর অর্থব্যয় হয়ে গেল, তারপর তিনি মারা গেলেন।

বাবা যতদিন ছিলেন ততদিন ওদের ছিল যৌথ পরিবার। তিনি মারা যাবার পরে ভাই ভাই পৃথক হলো। বসতবাড়িটা ছিল একতলা, সেটাকে তিন ভাগ করা হলো। ভিতরে উঠোন, দুপাশে তিনখানা করে ছ'খানা ঘর, সামনের দিকে তিনখানা। বড়ো দাদারা দু'পাশের ঘরগুলো নিলে উঠোন সমেত, প্যাংলা পেলে সামনের তিন-খানা, ভিতরের দিকে দুটো, বাইরের দিকে বৈঠকখানার মতো একটা।

প্যাংলার স্ত্রী বললে, তা ভালোই হয়েছে, ঐ বৈঠকখানা ঘরটাকে আড্ডাখানা না রেখে ওটাকে ভেঙেচুরে একটা দোকানঘর বানিয়ে নাও, আর ঐখানে তুমি একটা মনিহারি দোকান করো। তাতে তোমার একটা কাজও হবে আর পয়সাও কিছু আসবে।

সুতরাং আবার একচোট অর্থব্যয়। ঘরগুলো ভেঙেচুরে নতুন করে নেওয়া, দোকানঘর সুবিধামত গড়ে নেওয়া, ইত্যাদি। তার পর মনিহারির দোকানে সাজিয়ে রাখার মতো জিনিসপত্র কেনা, কাচের বাক্স আলমারি প্রভৃতি অর্ডার দিয়ে করানো, আলো পাখার ব্যবস্থা, অবশেষে সাহায্যের জন্য পাড়ার এক ছোকরাকে মাইনে করে রাখা। বিস্তর খরচ।

এর উপরে আবার এক দমকা খরচ এসে গেল। বাড়িটা ছিল এক পুরোনো গলির মধ্যে। ইমপ্রুভমেণ্ট ট্রাস্ট সেটিকে চওড়া করে বড়ো রাস্তা বানালে। ওর বাড়ির দিকটা তার মধ্যে যদিও পড়ল না, কিন্তু বড়ো রাস্তা হওয়াতে জমির দর বাড়ল, সুতরাং অনেকগুলো টাকা বেটারমেণ্টের জন্য খেসারত দিতে হলো।

এর পরে যখন মনিহারির দোকানের জন্য আরো কিছু মাল কিনতে মামার কাছে টাকা চাইলে, তখন মামা বললে, আর আমার কাছে একটি পয়সাও নেই। সুদ সমেত সবই তুমি নিয়েছ। আমার কাছে ভাউচার আছে, দেখাতে পারি।

প্যাংলা তাই শুনে হতভম্ব হয়ে গেল। এতগুলো টাকা, সব যে কোথা দিয়ে উড়ে গেল! এখন কিছুই আর নেই! কেবল ঐ দোকানটি সম্বল।

ওতো ঘরে গিয়ে বসে পড়ল। স্ত্রী বললে, কোনো ভাবনা নেই। আমি এখানকার মেয়ে স্কুলে একটা মাস্টারী জুটিয়ে নিচ্ছি। আর তোমার তো দোকানই রইল।

তখন থেকে এইভাবে ওদের সংসার চলে। ওদের একটি ছেলে একটি মেয়ে। স্ত্রী মেয়ে স্কুলের শিক্ষয়িত্রী। আর প্যাংলা মনিহারি দোকানদার।

ফতুয়া গায়ে দিয়ে দোকানে বসে বিড়ি ফোঁকে। অন্য সকল রকমের বাবুগিরি ঘুচে গেছে, তবে মদ্যপান একেবারে যায়নি, সুবিধা সুযোগ হলে ওটি চলে পরের পয়সাতে।

আগেকার কালের বন্ধু বিপিন নাম ওকে ত্যাগ করেনি। মাঝে মাঝে এসে ওকে ডেকে নিয়ে যায়, মদ্যপানের সাথীরূপে। তার এখন অবস্থা ভাল। লোহার ব্যবসাতে পয়সা করেছে।

সে ওকে দুঃখ করে বলে—দেখলি তো কী হলো! আমি তখন বলেছিলাম আমার ব্যবসাতে পার্টনার হয়ে যা, তখন আমার কথা যদি শুনতিস! আজ তাহলে এই অবস্থা হয়!

প্যাংলা বলে—ওরে ভাই, লটারিতে কারো কখনো লট্ পাল্টায় না। যার যেমন কর্মভোগ তাকে তা ভুগতেই হবে। আমার স্ত্রী বলে, ধনী থেকে গরিব হওয়া, এটাও একটা শিক্ষা। আর আমার মা কি বলেছেন জানিস? তিনি বলেছেন—এর জন্যে তুই দুঃখু করিস না। বানের জল যেমন এসে ঢুকেছিল তেমনি আবার বেরিয়ে গেল। কিন্তু তুই আমার যে ছেলে সেই ছেলেই রইলি। আমার আশীর্বাদে তোর ভাত-কাপড়ের অভাব হবে না। মায়ের সেই আশীর্বাদের জোরেই তুই দেখিস্ আমি ঠিক কেটে বেরিয়ে যাবো।

চোখ

বিভূতিভূষণ গুপ্ত

দুটি চোখ। দুটি চোখই বিমানকে সর্বপ্রথম আকর্ষণ করেছিল। উপমা দিয়ে ঠিক ব্যাখ্যা করা সম্ভব নয়। কি ছিল ঐ দুটি সুন্দর চোখে তিনি নিজেও তা বিচার করে দেখবার চেষ্টা করেন নি সেদিনে। চোখাচোখি হতেই থমকে দাঁড়িয়েছিলেন বিমান। তারপর পায় পায় এগিয়ে গিয়ে মুখোমুখি দাঁড়িয়ে মিষ্টি হেসে প্রশ্ন করলেন, তুমি এ পাড়ার ছেলে নিশ্চয়? আমাকে চেন?

লাজুক হেসে বিনীতভাবে জবাব দিল ছেলেটি, চিনি বইকি। আপন নতুন বাড়ী করে গত মাসে এসেছেন।

বিমান আপিস যাচ্ছিলেন। বেশি সময় তাঁর হাতে ছিল না। যদিও আরও কিছুটা সময় দিতে পারলে তিনি খুশি হতেন।

বললেন, সময় করে একদিন যেও। তোমাকে সঙ্গে নিয়ে পাড়ার সকলের সঙ্গে পরিচিত হয়ে আসব। সন্ধ্যাবেলা তোমার সময় হবে? .

ওর দৃষ্টি যেন একটু বদলে গেল। সেই সঙ্গে মুখের হাসিও। ম্লান গলায় বলল, সময়......যখন বলবেন তখনই হবে। অফুরন্ত সময় আমার কাটতেই চায় না।

সামান্য দুটি কথার মধ্যে হয়তো অনেক কথাই লুকিয়ে আছে। সুতরাং তখনকার মত বিমানকে চলে যেতে হলো।

সেই দিনই সন্ধ্যাবেলা ছেলেটিকে বিমানের বাড়িতে দেখা গেল। হাসিমুখেই দাঁড়িয়ে আছে। মুখের সঙ্গে চোখ দুটিও হাসছিল।

বিমান সস্নেহে আহবান জানালেন, এসো।

প্রবেশ করতে গিয়ে মুহূর্তের জন্য থমকে দাঁড়াল ছেলেটি। দৃষ্টি ক্ষণকালের জন্য ঘরের মোজায়েকের প্রতি আটকে গিয়েই আবার সহজ হয়ে উঠল। পায়ের ধুলোমাখা অপরিচ্ছন্ন স্যান্ডেল জোড়া বাইরে রেখে ঘরে প্রবেশ করল।

বিমান বললেন, বসো। ঐ দেখো তোমার নামটাই এখনও জানা হলো না।

জবাব সঙ্গে সঙ্গে পাওয়া গেল, নীলাদ্রি রায়।

কি পড়ছো......

মৃদু হেসে নীলাদ্রি জবাব দেয়, চুকে গেছে। গত বছর এম-এ পাশ করেছি। এখনও বেকার।

বিমান লক্ষ্য করলেন ওর হাসির পরিবর্তন—লক্ষ্য করলেন ওর দৃষ্টিতে একটা চাপা হতাশার ভাব। কিন্তু তা মুহূর্তের জন্য। পরক্ষণেই চোখ দুটি আবার উজ্জ্বল হয়ে উঠল।

তিনি ইচ্ছে করেই পড়াশুনার প্রসঙ্গটা চেপে গেলেন। বললেন, তোমার বাবা কি করেন নীলাদ্রি?

আবার নিভে গেল ওর দৃষ্টির উজ্জ্বলতা। অসহায় কন্ঠে বলল, নেই। গত বছর মারা গেছেন। মাথা গোঁজার মত দুখানি ঘর আর আমার লেখাপড়ার খরচ চালাতে গিয়ে বাবা আমাদের নিঃস্ব করে রেখে গেছেন।

বিমান বললেন, নিঃস্ব বলছো কেন নীলাদ্রি? তিনি তো তোমাকে পথ চলার পাথের দিয়ে গেছেন......

সহসা ওর চোখ দুটি জ্বলে উঠল। চেষ্টা করে নিজেকে সংযত করে চিবিয়ে চিবিয়ে বলল, পাথের......কিন্তু পাথেয় থাকলেই কি পথ পাওয়া যায়। এক বছর ধরে ত' কম খোঁজা হয়নি। যে পথেই এগোতে গেছি সেখানেই প্রতিবন্ধকতার উঁচু দেয়াল পথ আগলে দাঁড়িয়েছে। চেষ্টার ত্রুটি করিনি, কিন্তু ডিঙোতে গিয়ে বারে বারেই আছাড় খেয়ে পড়েছি। তাই বলে......

বিমান নীলাদ্রিকে থামিয়ে দিয়ে কিছু বলতে উদ্যত হতেই সে বারকয়েক মাথা নেড়ে বিনম্র কন্ঠে বলল, আমি জানি আপনি কি বলবেন। কিন্তু দয়া করে আর উপদেশ দেবেন না। শুনতে ভাল লাগে না। তাছাড়া বুঝবার মত কিছু জ্ঞানও আমার আছে, বয়েসও হয়েছে। পা ভেঙে অচল হয়ে না পড়া পর্যন্ত থামলে যে আমার চলবে না তা আমি বুঝি। একথা আর কাউকে বলতে হবে কেন।

হঠাৎ কথার মুখে রাশ টেনে ধরল নীলাদ্রি। তারপর একটু হাসবার চেষ্টা করে বলল, আমার কথায় আপনি যেন রাগ করবেন না। আপনাকে অসম্মান দেখাবার জন্য একটি কথাও আমি বলিনি।

বিমান কোন জবাব না দিয়ে ওর চোখের পানে চেয়ে থাকেন। দেখছিলেন একই চোখের বিভিন্ন রূপ। আর বুঝবার চেষ্টা করছিলেন এই বিক্ষোভের আসল কারণটা।

নীলাদ্রি পুনরায় বলে, আমি বোধহয় একটু উত্তেজিত হয়ে পড়েছিলাম, কিন্তু আমার কথা থাক, আপনাকে নিয়ে কবে বেরুতে হবে তাই বলুন।

বিমান বললেন, কাল রবিবার—সকালের দিকে তোমার সময় হবে?

নীলাদ্রি জবাব না দিয়ে একটুখানি হাসল।

ঐ হাসির মধ্যেই বিমান তাঁর প্রশ্নের জবাব পেলেন। বললেন, তাহলে একটু সকাল সকালই এসো। দুজনে একসঙ্গে বসে একটু চা খেয়ে বেরিয়ে পড়া যাবে। কি বলো?

তাই আসব। বলেই নীলাদ্রি উঠে দাঁড়াল। কিন্তু তখনই যাওয়া হলো না।

বিমানের স্ত্রী রমলা দেখা দিয়েছেন। সঙ্গে এনেছেন কিছু আহার্য এবং চা।

বিমান বললেন, একটু বসেই যাও নীলাদ্রি। নাহলে উনি দুঃখ পাবেন।

নীলাদ্রি একটু লজ্জিত হয়ে বলল, আমার জন্যে আবার—

বাধা দিয়ে রমলা বললেন, তোমার জন্যে আলাদা করে কিছু করা হয়নি বাবা। যা ঘরে ছিল তাই এনেছি।

খাবার ইচ্ছে নীলাদ্রির ছিল না। তবুও তাকে বসতে হলো—খেতেও হলো।

পরদিন নীলাদ্রি যথাসময় এসে উপস্থিত হলো। বিমানকে সংগে নিয়ে কাছেপিঠের প্রায় প্রত্যেকটি বাড়িতে গিয়ে প্রথম পরিচয়ের কাজটি সমাপ্ত করে সে চলে গেল। এরপরে কি জানি কেন প্রায় প্রতিদিনই বিমান আশা করছিলেন নীলাদ্রির উপস্থিতি। কিন্তু সে আসেনি। তাই বলে রাস্তাঘাটে যে একেবারে দেখা হয়নি তা নয়। চোখাচোখি হতে দূরে থেকেই হাসিমুখে চলে গেছে। কাছে এসে অন্তরঙ্গ হবার কোন চেষ্টাই তার মধ্যে দেখা যায় নি। বরং একটু যেন এড়িয়ে চলতে চায় বলেই বিমানের ধারণা হয়েছে। মনে মনে ক্ষুব্ধ হয়েছেন। বয়েসের ব্যবধান হয়তো বা চিন্তারও, তাঁর সম্মানবোধকে আঘাত করেছে।

প্রথম দর্শনে বিমানের মত তাঁর স্ত্রীকেও নীলাদ্রি আকৃষ্ট করেছে। খানিকটা শুনে তারপর চোখে দেখে। একথা বহুবার রমলাকে বলতে শোনা গেছে। এমনকি মাঝে মাঝে ডেকে আনবার কথাও স্বামীকে বলেছেন।

বিমানও যে মাঝে মাঝে একই পথে চিন্তা করেননি তা নয়, কিন্তু স্ত্রীর মুখে তাঁর মনের কথা প্রতিধ্বনিত হতে আবার নতন করে তাঁর আত্মসম্মানে আঘাত লাগল।

বললেন, কি এমন সম্মানিত ব্যক্তি যে নেমন্তন্ন করে তাকে বাড়ি ডেকে আনতে হবে!

স্বামীর এই অকারণ উষ্মায় রমলা খানিকটা বিস্মিত হলেন। তাঁর এই বিরাগের হেতু আবিষ্কার করতে না পেরে বললেন, এ আবার কেমন কথা তোমার। ঐ এক রত্তি ছেলে তোমার রাগের পাত্র নাকি?

অভিযোগটা সত্যি। মনে মনে স্বীকার করেন বিমান, কিন্তু প্রকাশ্যে কিছু না বলে চুপ করে থাকেন।

রমলা কিন্তু থামতে পারেন না। বলতে থাকেন, তোমার তো কথাবার্তার কোন ছিরী ছাঁদিই নেই। কি বলতে কখন কি বলেছো তাই হয়তো—

বাধা দিলেন বিমান। স্ত্রীকে স্পষ্ট করে জানিয়ে দিলেন যে তাঁর অনুমান সত্য নয়।

এরপরে বহুদিন স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে এই ছেলেটিকে নিয়ে আর কোন আলোচনা হয়নি। আলোচনা করবার মত খুব বেশী আগ্রহ কারুর মধ্যে আছে বলেও মনে হয় না। দৃষ্টির আড়ালে সরে গিয়ে সম্ভবত অনেকটা মনের আড়ালে সরে গিয়েছে।

রাস্তাঘাটে হঠাৎ দেখা হয়ে গেলে এর বিপরীত চিন্তাই কিন্তু বিমানের মনে উদয় হয়। অদ্ভুত লাগে, মনের এই বিচিত্র গতি-প্রকৃতি অনুভব করে। অথচ এই ছেলেটির সংগে তার কোন রক্তের সম্বন্ধ নেই, তবুও দেখা হলেই একটা অদ্ভুত আকর্ষণ অনুভব করেন। হয়তো এই বিশেষ আকর্ষণই তাকে বারে বারে কাছে ডাকার পথে প্রধান অন্তরায়। কিন্তু নীলাদ্রি নিজে থেকে এগিয়ে এলে বিমান খুশি হন—পিছিয়ে গেলে দুঃখ পান।

এমনি যখন তার মনের অবস্থা ঠিক সেই সময়ই এক প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে দূরকে নিকটে টেনে নিয়ে এল। স্বেচ্ছায় এগিয়ে এল নীলাদ্রি—এল আরও বহু চেনা অচেনা, যুবকের দল। একই উদ্দেশ্যে একই পথ ধরে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে তারা রুখে দাঁড়িয়েছে বিপর্যয়ের মুখোমুখি।

শহরের উপান্তে নিজের পাকা বাড়িতে বসেও বিমানকে ভাবতে হচ্ছে এর পরে কি হবে। আশ্চর্য এক পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে দিন কয়েক একটানা বৃষ্টির ফলে। পা রাখার শক্ত মাটি জলের তলায়। বাড়িগুলি সব জলের উপর যেন ভাসছে। শুধু জল আর জল। কোথাও এক কোমর, কোথাও এক গলা। অথচ পৌরপ্রতিষ্ঠানকে উচ্চ হারে কর দিতে হয় প্রত্যেকটি মানুষকে। যাদের এগিয়ে আসার কথা তারা হয়তো প্রতিকারের বড় বড় প্ল্যান করছেন আর ভাল ভাল কথার মালা গেঁথে চলেছেন। আর ছেলের দল নিজেদের জীবন বিপন্ন করে স্নানাহার ভুলে দলে দলে ছেলে, মেয়ে, বুড়োকে নৌকায়, ভেলায় তুলে এনে নিরাপদ আশ্রয়ে পৌঁছে দিচ্ছে।

চেয়ে চেয়ে দেখছেন বিমান। এরই মধ্যে কোন সাহায্যের দরকার আছে কিনা জেনে গেছে নীলাদ্রি। যতটা দূরে সরে গিয়েছিল তার চেয়ে অনেক বেশী কাছে এগিয়ে এসেছে। বাড়ি বাড়ি হাঁক দিয়ে যাচ্ছে—কার কি প্রয়োজন জেনে নিচ্ছে। পানীয় জল থেকে বাজার হাট পর্যন্ত সবই ব্যবস্থা করছে। সাবধান করে দিয়েছে। বিষাক্ত সাপ

বাড়িতে আশ্রয় নিতে পারে বলে কিছু কারবলিক অ্যাসিড দিয়ে গেছে প্রতিষেধক হিসেবে ব্যবহার করবার জন্য। ভাল লাগছে বিমানের—মানুষের প্রতি মানুষের ভালবাসার স্বতঃস্ফূর্ত প্রকাশ দেখে।

জল আরও বেড়েছে। আর ইঞ্চিখানেক বাড়লে ঘরের মধ্যে জল এসে যাবে। সকালবেলা ঘুম থেকে উঠেই চমকে উঠেছেন বিমান। স্ত্রীকে ডেকে বললেন, আর বোধহয় থাকা যাবে না রমলা। আশেপাশের অনেকেই ইতিমধ্যে চলে গিয়েছে।

রমলা চলে যেতে রাজি নন। বললেন, সিঁড়ির ঘরে থাকব।

বিমান স্ত্রীর মুখের পানে নিষ্পলক দৃষ্টিতে চেয়ে থাকেন। তিনি কি ভেবে এ কথা বলছেন ঠিক বুঝে উঠতে পারেন না। বলেন, এটা আবার কোন ধরনের কথা বলছো রমলা?

রমলা জবাব দিলেন, তুমি হয়তো এই মুহূর্তের কথা ভাবছো, আমি ভাবছি ভবিষ্যতের কথা। ফিরে এসে হয়তো—

বক্তব্যটা শেষ হলো না নীলাদ্রির আহ্বানে। ও বলেছিল, জল নাকি আরও অনেক বাড়বে। এখানে থাকা আর নিরাপদ নয়। কোথাকার কোন লকগেট বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। ফলে এদিকের অবস্থা আরও শোচনীয় হবার আশঙ্কা আছে।

তবুও রমলা অন্যত্র চলে যেতে আপত্তি জানালেন। আপত্তির কারণ শুনে নীলাদ্রি গর্জে উঠলো। বলল, মানুষের এতবড় বিপদের সুযোগ যদি কেউ নিতে আসে মাসীমা—তবে সে জ্যান্ত ফিরে যাবে না। আমরা আছি কিসের জন্য।

বিমান একটি কথাও বললেন না। তিনি শুধু দেখছিলেন আর শুনছিলেন।

নীলাদ্রি বলল, সব গুছিয়ে নিয়ে প্রস্তুত হয়ে থাকবেন আমরা একঘন্টার মধ্যে বোট নিয়ে আসব।

নীলাদ্রি চলে গেল।

বিমানের নিঃশব্দ মুখের পানে খানিক চেয়ে থেকে একটি নিঃশ্বাস ফেলে রমলা বলেন, সেইতো কারুর গলগ্রহ হ'য়ে থাকতে হবে।

বিমান শান্ত হেসে বললেন, তুমি বিপদে পড়ে যাচ্ছ রমলা—অভাবের জন্য নয়। এ দুটোর জাত আলাদা। এ সময় চুলচেরা হিসেব কষতে বসো না। তাতে শুধু দুঃখই বাড়বে।

জবাব না দিয়ে নীরবে চলে গেলেন রমলা এবং আধঘন্টার মধ্যেই মোটামুটি গুছিয়ে নিলেন।

নীলাদ্রিও ঠিক সময় এসে উপস্থিত হ'লো।

যাবার আগে চাবিটা নীলাদ্রির হাতে তুলে দিতে উদ্যত হ'তেই সে বাধা দিয়ে বলল, এত বড় দায়িত্ব আমার মাথায় চাপাবেন না মাসীমা। আমাকে বহু জায়গায় ছুটোছুটি ক'রতে হবে। কোথায় ফেলে দেব তার পর...না চাবি আপনি সঙ্গেই নিয়ে যান।

বাসোপযোগী অবস্থা ফিরে আসতে তিন সপ্তাহ লাগল। বিমান ফিরে এলেন আরও দিনকয়েক পরে। কিন্তু চলে যাওয়া এবং ফিরে আসার মাঝের এই সামান্য কটা দিনের ব্যবধানে কোথায় যেন প্রকান্ড ওলট পালট ঘটে গেছে। বাড়িতে পা দিয়েই বিমান অনুভব করলেন। সর্বত্রই একটা অস্বস্তিকর থম থমে ভাব—একটা ভীতি আর সংশয়ের ছাপ। বিমানের খুবই আশ্চর্য লাগছে। কি যে ঘটেছে তার অনুপস্থিতিকালে এ-কথা কাউকে ডেকে জিজ্ঞেস করতেও ইতস্ততঃ করছেন তিনি। এগিয়ে এসে কেউ মুখ খুলছেন না ব'লেই তার এই দ্বিধা। বিমান মনে-প্রাণে যাকে চাইছেন সেই নীলাদ্রির দেখা নেই। মন যখন সংশয় আর জানবার আগ্রহ নিয়ে দোলা খাচ্ছে এমনি দিনে নিতান্ত আকস্মিকভাবে নীলাদ্রির সঙ্গে অফিস পাড়ায় দেখা হ'য়ে গেল। সেদিনে কিন্তু এক মুহূর্তের জন্য দ্বিধা করলেন না বিমান। এগিয়ে গিয়ে ওর কাঁধের উপর একখানি হাত রেখে সাগ্রহে প্রশ্ন করলেন, তোমাকে আর দেখি না কেন নীলাদ্রি?

জবাব না দিয়ে পাল্টা প্রশ্ন করল নীলাদ্রি, কেন আপনি কিছু শোনেননি?

না...

তাহ'লে আপনাকে বোধ হয় কেউ বিশ্বাস ক'রতে পারছে না।

আমার অপরাধ?

ম্লান হেসে নীলাদ্রি বলল, তা জানি না। মনে হ'লো তাই বললাম।

এটা একটা কথাই নয় নীলাদ্রি।

তাহ'লে বোধ হয় আমাকে স্নেহ করেন বলে।

কাউকে স্নেহ করা কি অন্যায় নীলাদ্রি?

ন্যায় অন্যায়ের হিসেব ক'রে আর কে আজকাল চলে। জানেন না বোধ হয় ও পাড়ায় আমরা এখন নেই?

সন্দেহ হ'য়েছিল। কিন্তু কেন?

থাকতে পারলাম না। থাকা সম্ভব হ'লো না। রাজনৈতিক ভাগবাটোয়ারায় আমি এখন অনাবশ্যক—অবাঞ্ছনীয় ব্যক্তি।

হঠাৎ যেন হোঁচট খেল নীলাদ্রি। ওর চোখে চোখ রেখে অপলক চেয়ে আছেন বিমান। এই কি সেই নীলাদ্রি! কোথায় ওর সুন্দর দুটি চোখের স্নিগ্ধ ব্যঞ্জনাভরা চাহনি! তার পরিবর্তে ফুটে উঠেছে নিষ্ঠুর একটি ভাব। বিমান কিছু ব'লতে উদ্যত হ'তে কয়েক পা পিছিয়ে গিয়ে আবার তাঁর একান্তে এসে দাঁড়াল, খসখসে গলায় বলল, ভবিষ্যতে আমার নামটাও এড়িয়ে চলবেন। নইলে অকারণে ভুল বোঝাবুঝি হবে। অসুবিধার মধ্যে পড়বেন। এমন কি বাড়ি ছেড়ে চলে যেতেও হতে পারে।

নীলাদ্রি...বিমানের কণ্ঠস্বরে এক রাশ বিস্ময়।

নীলাদ্রি ততক্ষণে ভিড়ের মধ্যে অদৃশ্য হ'য়ে গেছে।

নীলাদ্রি চলে গেলেও বিমান অনেকক্ষণ হতবুদ্ধির মত দাঁড়িয়ে থেকে, তার পর আপন গন্তব্য পথে পা বাড়ালেন। কিন্তু তাঁর চিন্তার মধ্যে থেকে থেকে একটি কথাই পাক খেতে লাগল। রাজনৈতিক ভাগবাটোয়ারায় অবাঞ্ছিত ব্যক্তি...প্রত্যেকটি মানুষের মত এবং পথ এক হওয়া সম্ভব নয়। তাই বলে একে অপরের কাছে অবাঞ্ছনীয় হবে কেন একথা পুরাতন পন্থী বিমান কিছুতেই বুঝে উঠতে পারছেন না।

কিন্তু বুঝবার যে তাঁর আরও ঢের বাকী ছিল এ কথা কি সেই মুহূর্তে বিমান একবারও কল্পনা ক'রতে পেরেছিলেন!... তাই পরবর্তীকালে প্রতিদিনি সংবাদপত্রে খুনের খতিয়ান দেখে দেখে বিমানের সুস্থ চিন্তা ভাবনাগুলি কেমন যেন অসার হ'য়ে পড়েছে। নীলাদ্রি কি এই কথাই ভাগবাটোয়ারার মধ্যে অনুভ রেখেছিল? পরিণামের কথা ভাবতে গিয়ে হতবুদ্ধি হ'য়ে গেছেন বিমান। শুভাশুভের কথা চিন্তা করে আতঙ্কিত বোধ ক'রছেন। অথচ হাওয়া যেভাবে এলোমেলো বইতে সুরু করেছে তাতে প্রাণ খুলে একটা ভাল কথা বলবারও উপায় নেই। অবিশ্বাস আর সন্দেহের কালো ছায়া চতুর্দিক থেকে চেপে ধরেছে। স্বাভাবিক জীবন যাত্রায় তার রূপ, রস, সৌন্দর্য লোপ পেতে বসেছে। অবাঞ্ছিত ব'লে বেঁচে থাকার অধিকার হারান ছাড়া আর কিছুই নয়, এই কথাটাই যেন এক নিষ্ঠুর সত্য বলে পদে পদে প্রমাণিত হ'চ্ছে। কেন হ'চ্ছে এটা বিমানের বুদ্ধির সীমার মধ্যে ধরা দিচ্ছে না। কেমন যেন জড়ভরত হ'য়ে পড়ছেন দিনকে দিন। ইদানীং মন আর প্রাণ খুলে স্ত্রীর সঙ্গেও কথা বলতে পারেন না। সেখান থেকেও আসে বাধা।

রমলা বলেন, চুপ করো। ইট কাঠের মধ্যেও ভূত ঢুকেছে।

চমকে ওঠেন স্ত্রীর এই অতিসাবধানতায়। এমনি করে কি মানুষ বাঁচতে পারে? এরই নাম কি জীবন?

প্রতিবাদ করেন বিমান, তা বলে অন্যায়কে অন্যায় বলতে পারবো না। তাকে—

বিমানের কথায় আবার বাধা দিলেন রমলা। রুদ্ধ কণ্ঠে বললেন, পর্বত প্রমাণ অন্যায় আর অবিচারের মধ্যে যার জন্ম তাকে নীতিকথা শোনালে বিশ্বাস করবে কেন। ওখানে যুক্তি আলাদা, নীতিবোধ আলাদা... কার্যক্রম আলাদা।

আবার চমকে উঠলেন বিমান। স্ত্রীর চোখে চোখ পড়তেই এই চমক। ওখানেও

কি বিভ্রান্তি বাসা বেঁধেছে? ওখানেও কি আমি আর আমার জন্য এই আকুলতা আর সাবধানতা? কিন্তু এই চোরাবালির উপর দাঁড়িয়ে থাকার এই সতর্ক সাবধানতার পরমায়ু কতদিন?

অস্থিরভাবে পায়চারী করতে থাকেন বিমান। এ কেমন হাওয়া চতুর্দিকে বইতে শুরু করল। ঘরে-বাইরে কোথাও যে প্রাণ-ভরে একটু নিঃশ্বাস নিতে পারছেন না।

তবুও বেঁচে আছেন বিমান, বেঁচে আছেন তাঁর স্ত্রী, বেঁচে আছেন তাঁদেরই মত আরও অনেকে। অনেক ক্ষয়-ক্ষতি আর বিবেকবোধ বর্জন করে হাঁটি-হাঁটি পা-পা করে এগিয়ে চলেছেন অদ্ভুত এক জীবন যন্ত্রণার পিচ্ছিল রক্তাক্ত পথ বেয়ে। আছাড় খেতে ভয়...ডিঙিয়ে যেতে আতঙ্ক...প্রতি-রোধ করতে কাপুরুষোচিত দ্বিধা।...

স্ত্রীর আহ্বানে বিমানের চিন্তার সূত্র ছিঁড়ে গেল।

রমলা বলছিলেন, এই অন্ধকার ঘরে চুপচাপ বসে আছো? কে একটি ছেলে যে তোমাকে ডাকছে। ওকে বরং ভিতরেই ডাকি। বাইরে গিয়ে কাজ নেই। কি বলো?

তাই ডাক—

চোরের মত সাবধানে ঘরে প্রবেশ করেই ছেলেটি কঁকিয়ে উঠল, নীলাদ্রিদাকে ওরা গুলী করে মেরে ফেলেছে...

আর্তকণ্ঠে চিৎকার করে উঠলেন বিমান, কি বললে! নীলাদ্রিকে খুন করেছে? কারা...কারা খুন করেছে তাকে...

চিৎকারে ভয় পেয়ে এদিক-ওদিক সন্ত্রস্ত দৃষ্টিতে তাকাতে লাগল ছেলেটি। তারপর ফিস-ফিস করে বলল, ওরা...মানে আমি তা জানব কেমন করে...নীলুদা তার মার জন্য একটা ওষুধ নিতে এসেছিল... চুপি চুপি এসেছিল...সেখানেই বলেই সে ঝড়ের বেগে ঘর ছেড়ে চলে গেল।

প্রায় সঙ্গে-সঙ্গেই উঠে দাঁড়ালেন বিমান। দেহ টলছে। মাথার ভিতরটা ঝিম-ঝিম করছে। চোখের সম্মুখে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে নীলাদ্রির শান্ত স্নিগ্ধ উজ্জ্বল দুটি চোখ। যে চোখের দৃষ্টির মধ্যে একদিন তিনি দেখেছিলেন সুস্থ সুন্দর ভবিষ্যৎ আশা-আকাঙ্ক্ষার নীরব প্রকাশ, দেখেছিলেন মানুষের প্রতি মানুষের সহজাত ভালবাসার সুগভীর ব্যঞ্জনা, তারপর...হ্যাঁ আর একদিন ঐ চোখেই দেখেছিলেন নৈরাশ্যবাদের করুণ ছবি। সে ছবিও মুছে গিয়েছিল সময়, পরিবেশ আর অবস্থার বিপরীত হাওয়া লেগে। বিমান লক্ষ্য করেছিলেন তাঁর সমস্ত ইন্দ্রিয়কে সজাগ রেখে। আর আতঙ্কিত হয়ে উঠেছিলেন সে চোখে হিংসার বিদ্যুৎ চমক দেখে। এ রূপান্তর কেন ঘটল...কে ঘটাল...

রমলার স্পর্শে আত্মস্থ হলেন বিমান। তিনি বলছিলেন, এখনও চুপ করে দাঁড়িয়ে আছ তুমি! যাবে না?

কেমন এক অসহায় ভঙ্গিতে চোখ তুলে তাকালেন বিমান। ভিজে গলায় বললেন যেতে হবে বইকি, কিন্তু তুমি...তুমিও যাবে নাকি?

দৃঢ় কণ্ঠের জবাব পাওয়া গেল, হ্যাঁ।

খবরটা মিথ্যে নয়। নীলাদ্রি নেই। তার রক্তাপ্লুত প্রাণহীন দেহটা পড়ে আছে। চোখ দুটি খোলা। শান্ত স্নিগ্ধ দুটি চোখ পলকহীন চেয়ে আছে। এই দুটি সুন্দর চোখই একদিন তাকে আকর্ষণ করেছিল। আকর্ষণ করেছিল তার ভবিষ্যৎ গড়ে তুলবার আশা ভরা স্বপ্নালু দৃষ্টি দিয়ে, সেবা-পরায়নতার গভীরতা দিয়ে। তার পরের দিনগুলির কথা ভাবতে গিয়েই তিনি চঞ্চল হয়ে ওঠেন, বিচলিত হয়ে পড়েন। নিজেকে নিজে বারে-বারে প্রশ্ন করেন, কেন...কার অভিশাপে দেশের ভবিষ্যৎ বুনিয়াদ এমন বিভৎসভাবে ধসে পড়ল। কাদের স্বার্থ-পরতা, দুরপনেয় লোভ আর অবিবেচক নিষ্ঠুর কর্মধারা এই মহামূল্য জীবনগুলি নিয়ে জুয়া খেলায় মত্ত হয়ে দেশের সমাজকে পঙ্ককুণ্ডে ঠেলে দিচ্ছে।...মৃত্যু এই ছেলেটির চোখে যে অনিন্দ্যসুন্দর দৃষ্টিকে ফিরিয়ে দিয়ে গেল জীবদ্দশায় তা ফিরে পাওয়া কি এমনই অসম্ভব ছিল?...

স্বামীর হাত ধরে মৃদু আকর্ষণ করে কান্না ভেজা গলায় রমলা বললেন, আমি যে আর দেখতে পারছি না। চলো—

কোথায়...

বাড়ি...

বাড়ি...একটি দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করে ভগ্ন কণ্ঠে বিমান বললেন, তাই চলো।

অঙ্গনা

যে অভিযোগের অন্ত নেই

ট্রেনে সেদিন অসম্ভব ভিড়। লোক গাদাগাদি। আমি এবং আর দু'একজন কাছাকাছি কোন এক জায়গাতেই যাব। বাসে যেতে আসতে এমনিতেই সময় অনেকটা লেগে যায়। তাই হঠাৎ স্থির করে ফেললাম যে ট্রেনেই যাব। সময়ও বেশ কিছুটা বাঁচবে আর রেলভ্রমণও হয়ে যাবে। আর ইদানীং তো খুব কোথাও একটা যাওয়া হয়ে ওঠে না। অনেকখানি পুলকিত হয়ে সহকর্মীদের নিয়ে স্টেশনে ঢুকে ট্রেনের অবস্থা দেখে তো চক্ষু চড়কগাছ। তখনই ট্রেনটা এসে দাঁড়ালো। প্যাসেঞ্জার নামছে আর সেইসঙ্গে পাল্লা দিয়ে লোক উঠছে। অবস্থা দেখে মনে হলো ট্রেনে ওঠা যাবে না এবং বাধ্য হয়েই বাসের শরণ নিতে হবে। ঠেলাঠেলি, ধাক্কাধাক্কি আর রাস্তার ঝাঁকুনি আমাদের অদৃষ্টের লিখন। এসব কিছুতেই এড়ানো যাবে না। এমনি সাত পাঁচ ভাবনা সকলের মনেই উঁকি মারছে। এদিকে টিকিট কাটা হয়ে গেছে। প্রাণে ধরে সেই মায়াও ছাড়তে পারছি না। অনেকটা বাধ্য হয়েই একটু জায়গার চেষ্টা করে ওঠার জন্য সবাই এগিয়ে গেলাম। কিন্তু কোথাও জায়গা নেই। এমন কি লেডিস কামরা তাও একদম ভর্তি। একটাই মাত্র কামরা মেয়েদের জন্য সংরক্ষিত। কিন্তু মহিলা যাত্রীর সংখ্যা তো আর নেহাত কম নয়। যাত্রীদের স্বাচ্ছন্দ্যবিধানের কথা সবাই বলেন। মাঝে মধ্যেই খবরের কাগজে এ সম্পর্কে নানা কথার প্রচার দেখতে পাই। অথচ বাস্তবে যাত্রীদের যে কি দুর্ভোগ পোয়াতে হয় সে অভিজ্ঞতা আমাদের সকলের। আর মহিলাদের কথাই নেই। ট্রেন বাস আর ট্রামে প্রায়ই তাঁদের শুনতে হয়, জায়গা নেই। রাস্তায় বেরিয়েই যেন তাঁরা মস্ত ভুল করেছেন। অথচ পুরুষ সহযাত্রীরা ভুলে যান যে, পেটের তাগিদেই এই মহিলারাও রাস্তায় বেরিয়েছেন এবং সেজন্যই তাঁদের ট্রেন-বাসে একটু জায়গা করে নেওয়া দরকার। আর সকলের মতো রেল কর্তৃপক্ষও এ ব্যাপারে সমান উদাসীন। ওরা মহিলাদের জন্য একটি কামরা দিয়েই দায় সেরেছেন। এদিকে নিত্য মহিলাযাত্রীর সংখ্যা বাড়ছে। কিন্তু সেই মান্ধাতার আমলের নিয়মের কোন পরিবর্তন আজো হলো না। ট্রাম-বাসেরও একই অবস্থা। মাঝে দু একটা লেডিজ স্পেশাল বাস-ট্রাম ছাড়া হয় বটে কিন্তু সে আর কতটুকু। প্রয়োজনের তুলনায় কিছুই নয়। আর এই ট্রাম বা বাস সব জায়গা থেকে ছাড়ে না। অগত্যা সকলের গতি মেনে নিয়ে ঠেলাধাক্কা সহ্য করেই যাতায়াত সারতে হয়। কত মেয়েকে তো ঘন্টার পর ঘন্টা বাস-ট্রামের জন্য অপেক্ষা করতে হয়। দুশ্চিন্- থানা বাস ছাড়ার পরও উঠতে না পেরে যখন তাঁরা মরিয়া হয়ে ওঠেন তখন হয়তো বাসের ভেতর থেকে পুরুষ কন্ঠ ভেসে আসে, এভাবে যেতে পারবেন না পরের বাসে চেষ্টা করুন। যেন পরের বাস শুধু মহিলা যাত্রীই বহন করবে অথবা সেটা খুব ফাঁকা হবে। এদিকে ঘড়ির কাঁটা এগিয়ে চলেছে। বাদুড়ঝোলা বাসেই একটু জায়গা করে নেওয়া ছাড়া কোন উপায় থাকে না।

ভাবতে ভাবতে অনেকটা এগিয়ে গেছি। প্রায় সারা ট্রেনটা চষে ফেললাম। কিন্তু জায়গা কোথাও পাওয়া গেল না। আমাদের একজন এভাবে যাওয়ায় আপত্তি তুললো। আমি তাঁকে বোঝালুম যে, এভাবে যাওয়া ছাড়া কোন উপায় নেই। রোজই তো আমরা এই ঝক্কি পোয়াই। সুতরাং পেছিয়ে গেলে চলবে না। এই ট্রেনেই উঠতে হবে। জেদটা এবার সকলের মনে সমান হলো। এদিকে ট্রেন ছাড়ার সময়ও ঘনিয়ে আসছে। আমরাও পিছতে পিছতে সেই লেডিজ কামরার সামনে দাঁড়িয়েছি। আর এক মুহূর্ত দেরি না করে হাত বাড়িয়ে সবাই হাতল ধরে ফেললাম। তারপর ঠেলাঠেলি করতে করতে কোন একসময় পুরো ভেতরে ঢুকে এলাম। এবার অনেকটা নিশ্চিন্ত হয়ে সবাই দাঁড়ালাম। যদিও ঘামে তখন সারা শরীর ভিজে জবজবে। তবু উঠতে পারার আনন্দে সে কষ্টকে আমরা কেউ আমলই দিলাম না। একটু পরে ট্রেন চলতে শুরু করলেই এই কষ্ট থাকবে না এই একটা অনিশ্চিত ভাবনায় সবাই সান্তনা পেলাম। আমাদের আশা পূরণ করে ট্রেন দুলকি চালে চলতে শুরু করলো। কিঞ্চিৎ হাওয়াও লাগলো। মন এবার অনেকটা হালকা হয়ে গেল।

হঠাৎ এক কোণে চোখ আটকে গেল। একটি মেয়ে চুপচাপ দাঁড়িয়ে আছে। তার মুখে কোন হাসি নেই। যাত্রীদের রঙ্গ-রসিকতায় সে শরিক নয়। কারুর কথায়ও সে হাসছে না। অথচ বয়স তো এমন কিছু নয়। এই কামরার অনেকের চেয়েই সে কমবয়েসী। সবাই যখন হাসিতে যোগ দিয়েছে সে তখন সম্মানের ভয়ে চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকবে এরকম তো দেখে মনে হচ্ছে না।

একটু পরে একটা সুন্দর মিষ্টি গন্ধ নাকে ভেসে এলো। এতক্ষণের প্রাণান্তকর পরিচ্ছেদ থেকে এবার রিলিফ পাওয়া গেল। সেই মিষ্টি গন্ধ ধীরে ধীরে গোটা কামরা ভরিয়ে তুললো। এবার সকলের হুঁশ হলো। সকলের নজর অনুসরণ করে সেই মেয়েটির উপর চোখ আটকে গেল। তার হাতে একটা ধূপকাঠি জ্বলছে। সেই গন্ধেই কামরা আমোদিত। আমরা ছাড়া তাকে সবাই চেনে। দু-একজন হাত বাড়িয়ে ওর কাছ থেকে ধূপকাঠি কিনলো। সে নিঃশব্দে ধূপকাঠি দিয়ে গেল। কারো সঙ্গে কোন কথা বললো না। এমন কি আমরা যে ওর অপরিচিত —আমাদের না। ব্যাপার-স্যাপার দেখে কিরকম মনে খটকা লাগলো। একথা সেকথা ভাবতে ভাবতে বারবার আমার নজর ওর দিকেই আটকে যাচ্ছে। মেয়েটিও সেটা লক্ষ্য করছে। কয়েকবার চোখাচোখি হতে সে মুখ ঘুরিয়ে নিয়েছে। কিন্তু আমার ক্রমাগত তাকানো দেখে এবার চোখ মেলে আমার দিকে তাকিয়ে রইলো। সেই সুযোগে মেয়েটিকে পুরোপুরি দেখবার সুযোগ পেলাম।

কঠিন মূর্তি। মুখমন্ডল যেন পাথরে খোদাই। এমন বয়স নয় তবু মুখে দু একটা ভাঁজ পড়েছে। লাবণ্যের কোন রেশ কোথাও নেই। দৃঢ় সংগ্রামের শপথ ওর মধ্যে স্থির হয়ে আছে। কাঁধে একটা ব্যাগ। সেই ব্যাগেই ওর ব্যবসার সরঞ্জাম। এমনিভাবে ট্রেনেই সে নিয়মিত ধূপকাঠি বিক্রি করে। যাত্রীদের চেনাশোনা থেকেই সে কথা বুঝতে পারা গিয়েছিল। কিন্তু বেছে বেছে লেডিস কামরা কেন? এই একটা প্রশ্ন ঘুরেফিরে মনটাকে ভীষণ আন্দোলিত করতে লাগলো। আমি নিয়মিত ট্রেনের যাত্রী না হওয়ায় এর সদুত্তর পাচ্ছিলাম না। বারবার সে কথাটাই মনে ভেসে উঠছিল, এখানে আর সে এমন কি পায়? অথচ এটাই তো এর জীবিকা মনে হচ্ছে। এমনি ভাবতে ভাবতে দু একটা স্টেশন ছেড়ে এসেছি। কেউ কেউ নেমে গেছেন। উঠেছেন দু-একজন। কামরাটা একটু হালকা হয়েছে। আর একটু ফাঁকা হলেই আমি ওর পাশ ঘেঁষে দাঁড়াব এমনি একটা চিন্তা সবেমাত্র মনে এসেছে হঠাৎ দেখি সে সকলকে পাশ কাটিয়ে একেবারে আমার মুখোমুখি দাঁড়াল।

দাঁড়ানোর সঙ্গে সঙ্গে এক মুহূর্ত দেরি না করে জিগ্যেস করে বসলো, আপনি আমার দিকে ওরকমভাবে তাকাচ্ছিলেন কেন? খুব করুণা হচ্ছিল বুঝি? থাক দয়া করে কেউ করুণা করবেন না।

এরকম আকস্মিক আক্রমণে হকচকিয়ে গেলাম। একসঙ্গে এতগুলো প্রশ্নের উত্তর দেওয়া খুবই কঠিন ব্যাপার। আর এজন্য প্রস্তুতও ছিলাম না। কি বলবো ভাবছি। মেয়েটির দিকে তাকাতেই দেখলাম সে আমার দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে আছে। মনে মনে তখন ভীষণ অস্বস্তি অনুভব করছি।

ফটো : গৌর দত্ত

মেয়েটির সম্বন্ধে এমনি কৌতূহল প্রকাশ করতে গিয়ে তো বেশ ঝামেলায় পড়লাম। এটা যেন একটা মস্ত অপরাধ হয়ে গেছে। এখন জবাবদিহি করে তবে রেহাই পেতে হবে। এরকম পরিস্থিতির মুখোমুখি আমি এই প্রথম।

হঠাৎ মেয়েটি মুখ খুললো, যার বাবা নিজের মেয়েকে দেখে না তার জন্য দরদ দেখিয়ে তো আর সেই দগদগে ঘা-টা চাপা দেওয়া যাবে না। কথাগুলি ভীষণ কাটা কাটা। সেজন্যেই আরো কৌতূহল বাড়লো। দরদ ভরা চাউনি আমার ছিল না। কৌতূহল অনেকটাই ছিল। কিন্তু মেয়েটি আমার মধ্যে দরদের সন্ধান পেয়ে ছুটে এসেছে সতর্ক করে দিতে যে সে গোড়াতেই ও সম্পদে বঞ্চিত তাই তাকে দরদ দেখিয়ে আর ভোলানো যাবে না—সে কথাটাই সে জানিয়ে দিল।

ট্রেন এবার একটা স্টেশনে দাঁড়িয়েছে। অনেক যাত্রী নেমে গেল। একটু বসার জায়গা হলো। মেয়েটিও আমার পাশে বসে পড়লো। মেয়েটি আর একবার আমার দিকে তাকালো। তারপর বললো, কথাটা কেন বললাম জানেন—বাবার কাছ থেকে যে [illegible] পাওয়া উচিত ছিল সেটাই পুরো-

পুরি পাইনি তো। আপনার স্নেহ মমতা নিয়ে আমি কি করবো। একটু বড়ো হয়ে শুনেছি যে আমার জন্মের সময়ই মা মারা যায়। তারপর আত্মীয়স্বজন নয় একমাত্র বাবার স্নেহেই আমি মানুষ। ছ সাত বছর বয়সে আমি বাবার কাছ থেকেও বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়লাম। না, কোন দুর্যোগে নয়। বাবাই আমাকে সরিয়ে দিলেন নিজের কাজ-কর্মের সুবিধার জন্য। আমাকে ভর্তি করে দিলেন এক বোর্ডিংয়ে। পরে বুঝেছি বাবার কাছ থেকে এই বিচ্ছিন্ন হওয়াটাই আমার জীবনের সবচেয়ে বড়ো দুর্যোগ। ভর্তি হয়ে এক নতুন স্নেহমমতার জগতে এসে পড়লাম। দিদিমণিরা সবাই আমাকে খুব ভালবাসতেন। যত্ন করে পড়া শেখাতেন। বাবা আসতো মাঝে মাঝে। হাতে টফির বাক্স। নানারকম খেলনা নিয়ে আসা বাবার একটা নিয়মিত অভ্যেস ছিল। কখনো খালি হাতে আসতো না। সপ্তাহে একদিন তো বটেই কোন কোন সময়ে দুদিনও হতো। এমনি ছিল বাবার যাতায়াত।

আমার বাবা খুব বড়লোক ছিল না। কিন্তু আমার জন্য কোন জিনিসের অভাব রাখেনি বাবা। এসে বাবা আমাকে খুব [illegible]

এক একদিন আমাকে বেড়াতে নিয়ে যেত। চিড়িয়াখানা, যাদুঘর কত জায়গা যে বাবার সঙ্গে ঘুরেছি তার ঠিক নেই। বিশেষ বড়দিনের ছুটিতে কথা ছিল না। সেটাই তো বেড়ানোর মরশুম। বাবা আগে থেকে বলে যেতো আবার কবে আসবে। আমি সেজেগুজে রেডি থাকতাম। বাবা এলেই বেরিয়ে পড়তাম।

এমনিভাবে দিনগুলি কাটছিল মন্দ নয়। বছরের পর বছর পাশ করে ক্লাশের সিঁড়ি ডিঙোচ্ছিলাম। পাশ করার পর বাবার সে কি আনন্দ। মনের মতো জামাকাপড় কিনে দিতো। মাঝে মাঝে আবদার ধরতাম বাড়ি যাবার। বাড়ির কথা উঠলেই বাবা এড়িয়ে যেতো।

কিছুদিন থেকেই বাবাকে কিরকম অন্য-মনস্ক দেখছিলাম। কোন কথার ভাল উত্তর দিতো না। অধিকাংশ সময় চুপচাপ থাকতো। এদিকে আমাকে দেখতে আসাও কমিয়ে দিয়েছিল। এরপর বাবার আসা প্রায় বন্ধ হয়ে গেল। আমি রোজ পথের দিকে তাকিয়ে থাকি এই বুঝি বাবা আসে। কিন্তু আমার পথের দিকে তাকিয়ে থাকাই সার হয়। বাবা আর আসে না। এমনি সময়ে একদিন বড়দিমণি আমাকে ডেকে বললেন যে, এখানে আর আমার থাকা সম্ভব নয় কারণ বাবা এখন আর আমার কোন খরচ দেয় না। আমি বড়দিমণিকে বললাম বাবাকে চিঠি দিতে। এর উত্তরে তিনি আমায় জানালেন যে বাবাকে একাধিক চিঠি লিখেও কোন ফল হয় নি। সব চিঠি ফেরত এসেছে। একথা শুনে আমার মাথায় আকাশ ভেঙ্গে পড়ার উপক্রম। তখন আমি ক্লাশ এইটে পড়ি। তখন স্বপ্ন দেখি স্কুল ছাড়িয়ে কলেজ আর কলেজ ছাড়িয়ে বিশ্ববিদ্যালয়। তারপর সুপ্রতিষ্ঠিত জীবন। বড়দিমণির একথায় সব স্বপ্ন যেন নিমেষে খানখান হয়ে গেল। আর এক মুহূর্ত দেরি না করে বাড়ি গিয়ে হাজির হলাম। না, সেখানে কেউ নেই। পাশের ভাড়াটে জানালো যে, আমার বাবা বিয়ে করেছেন এবং এ বাড়ি ছেড়ে গেছেন। নতুন ঠিকানা তার জানা নেই।

বাবার সম্বন্ধে সব ভাবনা মুহূর্তে খানখান হয়ে গেল। তারপর অনেক ঘুরে ঘুরে নিজের চেষ্টায় আজ এই পর্যন্ত পৌঁচেছি। কারো করুণার পথ চেয়ে থাকি না। যে করুণা করে তাকে আমি ঘৃণা করি।

ট্রেন এসে স্টেশনে থামতেই মেয়েটি নেমে গেল। পাশের প্ল্যাটফর্মে দাঁড়ানো আর একটি ট্রেনে উঠলো এবং সেই দৌড়ে [illegible]

জলসা

রবিতীর্থের রজত-জয়ন্তী উৎসব

পুজোর ঠিক আগেই রবিতীর্থের রজত-জয়ন্তী উৎসব উপলক্ষে চারদিনব্যাপী রবীন্দ্রসঙ্গীতের ও নৃত্যনাট্যের উৎসব কলা-রসিকদের আনন্দের কারণ হয়েছে। প্রথম দিনের অনুষ্ঠান (সুচিত্রা মিত্রের একক সঙ্গীতের আসর)—পূর্বেই আলোচিত হয়েছে।

দুদিন "তাসের দেশ" নৃত্যানুষ্ঠানের একদিন সুরসাগর হিমাংশু সঙ্গীত সম্মেলনের উদ্দেশ্যে অর্পিত হয়। এ ছাড়া ছিল—বাল্মিকী-প্রতিভা ও শাপমোচন। কবিগুরুর অন্তহীন সৃষ্টির বিভিন্ন অধ্যায়কে নতুন করে উপলব্ধি করা এবং করানোর কাজ সুষ্ঠুভাবেই সম্পন্ন করেছেন শিল্পীবৃন্দ। নৃত্যনাট্যপরিকল্পনা ও সঙ্গীতপরিচালনার দ্বিবিধ দায়িত্বের সুষ্ঠু সম্পাদনাই প্রমাণ করেছে প্রতিষ্ঠানের পরিচালিকা শ্রীমতী সুচিত্রা মিত্র শুধুমাত্র শীর্ষস্থানীয়া গায়িকাই নন—অসাধারণ শক্তিসম্পন্না সংগঠিকাও বটে। সঙ্গীত-পরিচালনায় তাঁর সহযোগী ছিলেন দ্বিজেন চৌধুরী। নৃত্যপরিচালক রামগোপাল ভট্টাচার্য। নৃত্যরচনার আঙ্গিক কুশলতা ব্যঞ্জনাবাহী দেহভঙ্গী ও মুদ্রার রূপান্তরে তাঁর শিল্পকুশলতার পরিচয় রেখেছেন।

আবহসঙ্গীত পরিকল্পনা ও পরি-চালনায় দীনেশচন্দ্রের সুরসৃষ্টি সংলাপ ও গানের ফাঁক ভরিয়ে দিয়েছে অবর্ণনীয় মধুরতায়। তাঁকে সহায়তা দিয়েছিলেন রমেশচন্দ্র (দিলরুবা), চাঁদু বন্দ্যোপাধ্যায় (তারসানাই)। অমরচন্দ্র (বাঁশী), জলতরঙ্গ (গোপেশ্বর দত্ত), বৃন্দাবন দে (চেলো)। সঙ্গতে ছিলেন বিপ্লব মন্ডল, জয়দেব গড়াই, কেশব মুখোপাধ্যায়, সুনীল বসু ও রবীন গঙ্গোপাধ্যায়। একক বীণা ও সেতার-বাদনে—মায়া মিত্র ও দীনেশচন্দ্র। সুরেন চক্রবর্তীর মঞ্চসজ্জা ও সজ্জা পরি-কল্পনা—ননী দাসগুপ্তর রূপসজ্জা সমগ্র অনুষ্ঠানটিকে অনন্য করে তুলতে যথেষ্ট সহায়তা দিয়েছে। সমস্ত বিষয়বস্তুর ভাব থেকে ভাবান্তর গমনের গতির ছবিটি সুন্দরভাবে ফুটিয়ে তুলেছে কনিষ্ক সেনের আলোকসম্পাত।

"তাসের দেশ"এ প্রযোজনায় রবি-তীর্থের পূর্বখ্যাতি ম্লান হয়নি বরং পরি-মার্জনা ও পরিশীলনার গুণে আরো গভীর আরো সরস ও চিত্তগ্রাহী হয়ে উঠেছিল। নৃত্যে (রাজপুত্রের ভূমিকায়) শিবশঙ্কর, (সদাগরপুত্ররূপী) শম্ভু ভট্টাচার্য, (পত্র-লেখা) শান্তা বসুরায়, (রাণী) সুস্মিতা রায়চৌধুরী, (ছক্কা) ভানু দে, (গোলাম) রামগোপাল ভট্টাচার্য, (টেক্কানী) চন্দনা বসু, ইন্দ্রা সেন, (সদাগরপুত্র) শম্ভু ভট্টাচার্য, রাজা সন্তু মুখোপাধ্যায়, (রুইতন) শান্তি

আমেরিকান ইউনিভার্সিটি সেন্টার আয়োজিত প্রাচ্য-প্রতীচ্য সঙ্গীতের ঘরোয়া বৈঠক-এ পিয়ানোবাদক জন কুপার, 'চেলো'তে আইনার হোম, বেহালায় এল, বৈদ্যনাথন, তবলায় মহাপুরুষ মিশ্র এবং তানপুরায় তপতী ভট্টাচার্য।

বসু, (পঞ্জা) পিনাকী রায়, (হরতনী) জয়শ্রী লাহিড়ী ও (ইস্কাবনী) শান্তা বসু-রায়, বিশেষ উল্লেখের দাবী রাখেন জয়শ্রী লাহিড়ী, রামগোপাল ভট্টাচার্য, শিবশঙ্কর ও শান্তি বসু।

সঙ্গীতাংশের সুসংবদ্ধ সম্মিলন, শ্রীমতী মিত্রের অনুপম কণ্ঠের গান (বিজয়-মালা এনো) সংলাপ ও ভাষ্যে প্রদীপ ঘোষ, কল্যাণ রায়, প্রণব দাসগুপ্ত এবং সুচিত্রা মিত্র বক্তব্যের সুর ও নাটকীয়তার মেল-বন্ধনে—রসভোগ্যতার দিক দিয়ে অনুষ্ঠান-টিকে করে তুলেছিল অবিস্মরণীয়। 'শাপমোচন'-এর নৃত্যের ছন্দকে মুক্ত-ধারার মতই ঝরিয়ে গেছেন শ্রীমতী মিত্র। দুই-নৃত্যনাট্যের সঙ্গে সমান্তরাল রেখার মানে এগিয়ে চলেছিল বাল্মিকী-প্রতিভা গীতি-নাট্য। সরস্বতীর আবির্ভাব মুহূর্তের ভাস্কর্য-সৌন্দর্যবাহী ভঙ্গীর গতিতে রূপান্তর (সুস্মিতা রায়চৌধুরী)—মুগ্ধ করে দেবার মত।

সব মিলিয়ে রবিতীর্থের রজত-জয়ন্তী উৎসবটি সত্যিই মনে রাখার মতো স্মরণীয় শারদ অনুষ্ঠান।

নটরাজ প্রযোজিত অবনীন্দ্র-জয়ন্তী উৎসব—"আমার জীবনের প্রান্তভাগে যখন মনে করি সমস্ত দেশের হয়ে কাকে বিশেষ সম্মান দেওয়া যেতে পারে তখন সর্বাগ্রে মনে পড়ে অবনীন্দ্রনাথের নাম। তিনি দেশকে উদ্ধার করেছেন আত্মনিন্দা থেকে, আত্মগ্লানি থেকে তাকে নিষ্কৃতিদান করে তার সম্মানের পদবী উদ্ধার করেছেন।... তাই আজ আমি তাকে বাংলাদেশে সর-স্বতীর বরপুত্রের আসনে সর্বাগ্রে আহ্বান করি।"—অবনীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে এই ছিল রবীন্দ্রনাথের সশ্রদ্ধ স্নেহোক্তি।

পুজোর আগে একাডেমী অফ ফাইন আর্টসে অবনীন্দ্র শতবার্ষিকীকে তাঁর শিল্পকৃতির প্রতি সম্মান প্রদর্শন করে নট-রাজ সংস্থা সুধীবৃন্দের অভিনন্দন অর্জন করেছেন।

সুররচনা, অনুষ্ঠানপরিচালনা—আবৃত্তি-কারের ত্রিবিধ দায়িত্ব যোগ্যতার সঙ্গে সম্পন্ন করেন বিশ্বজিৎ রায়। অবনীন্দ্রনাথের ব্যক্তিত্ব ও মানসধারার প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শিতই হয়েছে জয়ন্তী উৎসবের প্রতিটি অনুষ্ঠানে। উদ্বোধন-অনুষ্ঠানের প্রারম্ভে ও শেষের সমবেত সঙ্গীত দুটি—"তোমার সুরের ধারা" ও "লহ লহ তুলে লহ"—অবনীন্দ্র-নাথের প্রিয় রবীন্দ্রসঙ্গীত।

অবনীন্দ্রনাথের কথা ও সুরে "নীল আকাশের রঙিন পাখী" শুনতে পাওয়া যায় না বলেই আরো আদরনীয়।

অবনীন্দ্রনাথ রচিত কবিতা "কুঁকড়ো" পাঠ করে শোনালেন বিশ্বজিৎ রায় ও প্রদীপ্ত ঠাকুর। বিশ্বজিৎ রায় রচিত সুরে অবনীন্দ্রনাথের "অতল জলের তলে তলে" দ্বৈতনৃত্যে প্রদর্শিত হয় এবং সমবেত ও একক গান ছিল শান্তিদেব ঘোষের সুরে অবনীন্দ্রনাথের গান "দিনে রাতে মিলিয়ে দেবার গান।" প্রতিটি অনুষ্ঠানই পরিচ্ছন্ন সুন্দর। দ্বৈত নৃত্যে ছিলেন বাঁশরী চক্রবর্তী ও কাজরী চক্রবর্তী। সমবেতনৃত্যে সুদক্ষিণা দত্ত, জয়ন্তী গুপ্ত, সৌগতা রায় ও বিপাশা বন্দ্যোপাধ্যায়

পরিশেষে "লম্বকর্ণ পালা" অবনীন্দ্র-নাথের রসসিক্ত নাটকটি সার্থকতার সঙ্গে মঞ্চস্থ হয়। অংশগ্রহণে ছিলেন আভাস সেন, মধুমালা চক্রবর্তী, জয়ন্তী গুপ্ত, জনজিত রায়, প্রশান্ত বন্দ্যোপাধ্যায়, চন্দ্রোদয় ঘোষ, অশোক দত্ত, সুস্থির রায়-চৌধুরী, তপন মল্লিক, অমিত বসু, অজয় সাউ, প্রিয়ব্রত রায়, দ্বিজেন্দ্রনাথ গঙ্গো-

পাধ্যায়, গৌতম বাগচী, সৌমেন্দু ঘোষ ও তমোজিৎ রায়।

সুররচনায় ছিলেন শান্তিদেব ঘোষ, অমিতেন্দ্রনাথ ঠাকুর, রণজিৎ রায়, শুভময় ঘোষ ও বিশ্বজিৎ রায়।

যন্ত্রসঙ্গীতে প্রসূন চৌধুরী, রবি বিশ্বাস, কেদার নন্দী, বিশ্বজিৎ রায়। দৃশ্যসজ্জায়—জয়শ্রী রায়। স্মারক—শ্রীমতী গুহরায় ও সন্তোষ বন্দ্যোপাধ্যায়। স্বাগত-কারিণী—শর্বরী সেন, চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য ও সুপর্ণা বসু।

"সৌরভ" প্রযোজিত রামায়ণ নৃত্যনাট্য —"সৌরভ"-এর প্রাণস্বরূপা নমিতা চট্টোপাধ্যায়ের সংগঠন কুশলতার পরিচয় অল্পদিনেই এই প্রতিষ্ঠানের অভাবনীয় বিস্তার। আমরা আরো খুশী হব যদি আজকের নৃত্যনাট্য রামায়ণে রামের চেয়ে হনুমান বড় হয়ে না ওঠেন" রবীন্দ্রসদনে মঞ্চস্থ সৌরভ-এর বার্ষিক উৎসবের উদ্বোধনী সভায় বলেছিলেন সৌরভের অন্যতম পৃষ্ঠপোষক যুগান্তর সম্পাদক শ্রীসুকমলকান্তি ঘোষ।

সৌরভের সভাপতি শ্রীঅদ্রিজা মুখোপাধ্যায় তাঁর ভাষণে ধন্যবাদজ্ঞাপন করেন সকল পৃষ্ঠপোষকবৃন্দকে যাঁদের সাহায্য ছাড়া এ প্রতিষ্ঠানের এমন অকল্পিত প্রসার ও উন্নতি কল্পনাই থেকে যেত।

প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকে বাংলাদেশের শরণার্থীদের জন্য লায়নস ক্লাবের প্রেসিডেন্টের হাতে ১০০০্ টাকার একটি চেক প্রদান করেন শ্রীমুখোপাধ্যায়।

এর পরই মঞ্চস্থ হোলো রামায়ণ নৃত্যনাট্য। সম্পূর্ণ রামায়ণের নৃত্যরূপ মেলে ধরার প্রচেষ্টা এর আগে দেখেছি বলে মনে পড়ে না। তাই এই অভিনব প্রচেষ্টার পরিপ্রেক্ষিতে শ্রীমতী নমিতা চট্টোপাধ্যায়ের উদাম অকুণ্ঠ অভিনন্দনের দাবী রাখে। নৃত্যরচনা, সংলাপ-রচনা ও নাট্যরূপদান ও পরিচালনার এতগুলি দায়িত্ব বহন করা সহজ নয়। কিন্তু অসাধারণ নিষ্ঠা ও অধ্যবসায়ের বলে শ্রীমতী চট্টোপাধ্যায় এ ভার সম্পাদনের কৃতিত্ব সানন্দেই বহন করেছেন।

শিল্পবিচারে অবশ্য এ প্রযোজনা ত্রুটীহীন নয়। তবে অভিনয় এবং নৃত্যে যাঁরা অংশগ্রহণ করেছেন তারা সবাই শিক্ষার্থী। শিল্পীর পূর্ণাঙ্গতা এঁদের কাছে আশা করা যায় না। তবু শিশুশিল্পীদের ফুল হয়ে ফুটে ওঠার দৃশ্যটি মনকে জুড়িয়ে দিয়েছে প্রকাশভঙ্গীর স্বতঃস্ফূর্ততায়। চরিত্রগুলির অতি-নাটকীয়তা আর একটু সংযত হলে ভালো হত। বিশেষ করে মন্দোদরীর বিলাপদৃশ্য। যদিও এই দৃশ্যটিই দর্শকবৃন্দের হাততালি পেয়েছে প্রচুর। খুব সম্ভব বিভিন্নশ্রেণীর দর্শকের রুচির কথা ভেবেই নমিতা দেবী মোটা আঁচড়ের আন্ডারলাইন দিয়ে অভিব্যক্তি আবেগগুলিকে দেখাতে চেয়েছেন।

আর একটি কথা স্মরণ রাখা দরকার। বাঙালিনী হয়ে হিন্দী নাট্যরূপ ও সংলাপ রচনাদ্বারা অবাঙালী (বিশেষ হিন্দী যাঁদের মাতৃভাষা) দর্শককে খুশী করা সহজ নয়। এই কঠিন কাজ স্বচ্ছন্দে সম্পন্ন করার কৃতিত্ব তাঁর অবশ্যপ্রাপ্য। তবে নেপথ্য থেকে চড়াসুরে সংলাপ পাঠ সংলাপের সৌন্দর্যকে ক্ষুণ্ণ করেছে।

রবিরেখার ঋতুবন্দনা — গত ৬ই সেপ্টেম্বর থিয়েটার সেন্টার প্রেক্ষাগৃহে রবিরেখা নিবেদিত ঋতুবন্দনা এক উপভোগ্য আলেখ্য। প্রতি ঋতুর ওপর কবিগুরুর দুটি করে গান নিয়ে এই গীতি-অনুষ্ঠানের সুষ্ঠু পরিচালনা করেন রেখা দাসগুপ্ত। আবেগস্পন্দিত কণ্ঠে সংলাপ-পাঠ করেন শ্রীমন্ত মুখোপাধ্যায়। সঙ্গীতাংশে উদ্বোধন সঙ্গীত গেয়ে শোনান বেবী দাস, রবীন্দ্রসঙ্গীত গেয়ে শোনান শ্রীভবানী মুখোপাধ্যায়। ইলেকট্রিক গীটারে রবীন্দ্রসঙ্গীতের সুর বাজান অসীমকৃষ্ণ দেব। ঋতুবন্দনা গীতি-আলেখ্যে অংশগ্রহণ করেন : রেখা দাসগুপ্ত, শুভা পালিত, গোপা দত্ত, মালা মিত্র, খুশী দাসগুপ্ত ও ডলি দাসগুপ্ত। যন্ত্রসঙ্গীতে সহায়তা করেন অমিয় ভট্টাচার্য (সেতার), নন্দলাল মুখোপাধ্যায় (বাঁশী), ভাস্কর মুখোপাধ্যায় (বেহালা), লক্ষ্মণ ভাণ্ডারী (তবলা)।

নৃত্যের তালে-তালের উৎসব—দক্ষিণ কলিকাতার সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান "নৃত্যের তালে তালে"-র ৬ষ্ঠ বার্ষিকী উৎসব উপলক্ষ্যে তিনদিনব্যাপী অনুষ্ঠানসূচীর অন্তর্ভুক্ত ছিল "অবনীন্দ্রনাথের শকুন্তলা" সমর চট্টোপাধ্যায়ের "সাত ভাই চম্পা", অমিয়জীবন মুখোপাধ্যায়ের "গঙ্গা-ভারতী", আনন্দ মুখোপাধ্যায়ের "সূর্যের অতিথি" এবং উচ্চাঙ্গ নৃত্য। পরিচালিকা —নৃত্যশ্রী মীরা দাসগুপ্তা। "শকুন্তলা" নৃত্যনাট্যের সঙ্গীত যন্ত্রসঙ্গীতভিত্তিক এবং এক নতুন রূপধারাবাহী। সংগীত-পরিচালনায় ছিলেন নীরদবরণ। ডলি ভট্টাচার্য (শকুন্তলা), সঙ্গীতা বন্দ্যোপাধ্যায় (দুষ্মন্ত) এবং পূরবী শীল ও চম্পা মুখোপাধ্যায় (অনসূয়া ও প্রিয়ংবদা) প্রশংসাযোগ্য অভিনয় করেছেন। "সাত ভাই চম্পা"র সঙ্গীতপরিচালনায় ছিলেন প্রীতি দাসগুপ্তা। শিশুশিল্পীদের অভিনয় খুব উপভোগ্য হয়েছে। "গঙ্গাভারতী" ও "সূর্যের অতিথি"র সঙ্গীতপরিচালনায় ছিলেন রতু মুখোপাধ্যায় এবং বলাই বাহুল্য সঙ্গীতই ছিল এই নাট্যদ্বয়ের প্রধান আকর্ষণ।

অভিনয়ে ছিলেন শ্যামা লাহিড়ী, চম্পা মুখোপাধ্যায়, সম্পা দাসগুপ্তা তুহিনা চক্রবর্তী, বাপ্পা দাসগুপ্তা এবং মিতা চৌধুরী। সঙ্গীতে সর্বশ্রী পূর্ণেন্দু রায়, কৃষ্ণা চট্টোপাধ্যায়, আলপনা সেন, নবনীতা সরকার, বাসন্তী বসু, প্রণব ঘোষ ও সংস্থার ছাত্রীবৃন্দ।

গ্রন্থনায় দেবদুলাল বন্দ্যোপাধ্যায়। তৃতীয় দিনে উচ্চাঙ্গনৃত্যের আসরে পরিবেশিত হয় কথাকলি, মণিপুরী, ভারত-নাট্যম ও সমবেত কথকনৃত্য।

এই পরিচ্ছন্ন উৎসব-সূচীর জন্য বিশেষভাবে ধন্যবাদার্হ ব্যবস্থাপক অমিয়ের বসু ও সনৎকুমার দাসগুপ্ত।

ঘোষপুর পার্কের 'গীতি-অঞ্জলি' সংগীত শিক্ষায়তনের তৃতীয় বার্ষিক উৎসব উপলক্ষ্যে গত ১১ই সেপ্টেম্বর বিড়লা একাডেমীতে একটি মনোরম নৃত্য ও সংগীতানুষ্ঠান পরিবেশিত হয়। এতে শিশু ও কিশোরদের অংশ ও ছাত্রছাত্রীদের গীটারবাদন দর্শকদের ভূয়সী প্রশংসা অর্জন করে। বিনয়ভূষণ দাশগুপ্ত সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। অনুষ্ঠান শেষে শ্রীধ্যানেশ খাঁ দেশ-মল্লার রাগে তাঁর অপূর্ব সরোদ বাদনে সকলকে মুগ্ধ করেন। সঙ্গে তবলা সঙ্গত করেন স্বপন চৌধুরী।

রবীন্দ্রসদনে 'সরগম'-এর আনন্দমেলা

গত ২২শে আগষ্ট রবিবার সকালে সরগম সঙ্গীতায়নের বার্ষিক উৎসবে যাঁরাই উপস্থিত হয়েছিলেন, সবারই মনে সব কিছু ছাপিয়ে বারবার উঁকি দেবে কয়েকটি কচি কচি মুখ। নাচে গানে অভিনয়ে সেদিনকার আসর মাতিয়ে রেখেছিল ওরাই। মনে হচ্ছিল যেন সারা রঙ্গমঞ্চ জুড়ে একদল দেবশিশু আনন্দের হাট বসিয়েছে। নিজেদের আনন্দমেলায় যার যার পশরা নিয়েই যেন ওরা মশগুল। এমনি সহজ সাবলীল ওদের গতিভঙ্গিমা। এমনি অনায়াস ওদের পদচারণা—কথা থেকে গানে, গান থেকে নাচে। যে নাটিকাটিকে ঘিরে সেইসব ক্ষুদে শিল্পীদের আনন্দ আসর, সেই 'পাপাড়' নাটিকাটি রচনা ও পরিচালনা করেছিলেন 'সরগম'-এর পরিচালিকা সীমা দাস। শ্রীমতী দাসকে ধন্যবাদ সেদিনকার সেই অমৃতধারায় অবগাহনের দুর্লভ সময়টুকুর জন্য। অন্যান্য যেসব সঙ্গীতানুষ্ঠান ঐদিনের উৎসবের অন্তর্ভুক্ত ছিল তার মধ্যে 'সরগম'-এর ছাত্রছাত্রীদের সমবেত গীটার বাদন বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এছাড়াও সমবেত রবীন্দ্রসঙ্গীত এবং শিশু-শিল্পীদের কথক নাচ উপস্থিত দর্শকদের কাছে উপভোগ্য হয়েছিল।

রবিচ্ছায়ার 'শাপমোচন' : রবিচ্ছায়ার শিল্পীরা কয়েক দিন আগে রবীন্দ্রনাথের 'শাপমোচন' নৃত্যনাট্যটি সাফল্যের সঙ্গে পরিবেশন করেন রবীন্দ্র সদনে। নৃত্যের ভঙ্গিমায় আর সুরের লহরীতে অনুষ্ঠানটি সত্যি উপভোগ্য হয়ে উঠেছিল। শিল্পীদের মধ্যে ছিলেন সাধন গুহ, পলি গুহ, শিখা সেন, ইন্দ্রানী মুখোপাধ্যায়, শ্রাবণী ঘোষ, দেবযানী ঘোষ, কবিতা ঘোষ, রত্না ঘোষ, ভারতী নন্দী, সীমা চৌধুরী, পলি চট্টোপাধ্যায়, সাগর সেন, প্রতিমা মুখোপাধ্যায়, প্রতিমা চক্রবর্তী, শম্ভু ভট্টাচার্য, আলো ঘোষ, রাখী রানা, তপতী বন্দ্যোপাধ্যায়, শুক্লা বন্দ্যোপাধ্যায়, অনশ্রী চক্রবর্তী, রত্না চক্রবর্তী, দীপিকা চক্রবর্তী, রঞ্জনা গাঙ্গুলী এবং আরো অনেকে। সঙ্গীত-পরিচালনা আর নৃত্য-পরিচালনায় ছিলেন প্রতিমা মুখোপাধ্যায় ও অমিত চট্টোপাধ্যায়।

—চিত্রাঙ্গদা

সমকালীন ইয়োরোপীয় ছবির কথা

অশোক মজুমদার

ফ্রান্স :

ফরাসী ছবির জগতের আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন পরিচালক ফ্রাঁসোয়া ত্রুফোর সাম্প্রতিক ছবি 'দি স্যাভেজ বয়' এবারের বার্লিন চলচ্চিত্রোৎসবে প্রদর্শিত হয়েছে। তাঁর 'ফোর হান্ড্রেড ব্লোজ'-এর মতো এ ছবিটিও এক জড়বুদ্ধিসম্পন্ন কিশোরকে কেন্দ্র করে গঠিত। কিশোরটি একদা একটি মেয়ে-নেকড়ে বাঘ দ্বারা লালিত-পালিত হয়েছে; নেকড়েটির স্তন দুগ্ধ পান করেই সে বড়ো হয়ে উঠেছে। নেকড়েদের মধ্যে থেকে সে চতুষ্পদ জন্তুদের মতোই চলা-ফেরা করতো—পায়ের সঙ্গে হাত দুখানিকেও সামনের পা হিসেবে ব্যবহার করতো। পরিচালক ত্রুফো দেখিয়েছেন, কেমন করে সেবা শুশ্রূষার দ্বারা এই জড়-বুদ্ধি কিশোরটির মনুষ্যত্বকে পুনরুজ্জীবিত করা হল। ছবির আঙ্গিক তথা ট্রিটমেন্ট ছবির কাহিনীর মতোই সহজ ও সরল। ট্রিক ও জাম্পকাট ছবির মধ্যে বিশেষ কোথাও নেই। বলা চলে, ছবিটি 'পথের পাঁচালীর' মতোই মানবিক আবেদনসমৃদ্ধ। ত্রুফোর অপর সমকালীন ছবি 'দি মিসিসিপি মার্মেড' হচ্ছে একটি রহস্য বা সাসপেন্সধর্মী ছবি, যদিও রহস্য ও রোমাঞ্চের পাশাপাশি রয়েছে দারুণ রোমান্স ও প্রণয়মূলক দৃশ্যাবলী। এই ছবিতে নব পরিণীত স্বামী-স্ত্রীর মন দেওয়া-নেওয়ার দৃশ্যাবলী ওঁর পূর্বেকার ছবি 'দি সিল্কেন স্কিন'-এর কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। যৌনতা আছে, কিন্তু নগ্নতা নেই। একজন যুবক তার স্ত্রীকে মন-প্রাণ দিয়ে ভালোবাসত, কিন্তু সেই যুবকের ভগ্নী ও তার ব্যবসায়ী স্বামীর প্ররোচনায় ওদের মধ্যে ভুল বোঝা-বুঝি হল। এরই মধ্যে ওদের একজন অতর্কিতে এক প্রাইভেট ডিটেকটিভকে গুলী করে বসল। ফলে রহস্য হল ঘনীভূত, মনে হবে, যেন হিচককের 'ভার্টিগো' জাতীয় ছবি দেখছেন। চলচ্চিত্র সম্পর্কে উনি 'কাহিয়ার দ্যু সিনেমা'তে লিখেছিলেন, 'কাগজ যেমন দুষ্প্রাপ্য, তেমনই সেলুল-য়েডও, অথচ কাগজের বুকে কলমের সাহায্যে যেমন নিজের ইচ্ছানুযায়ী যা খুশী লেখা যায়, সেলুলয়েডের বুকে তেমনই খুশীমত ছবি তোলা সম্ভব।' ওঁর মতে চলচ্চিত্র তখনই আর্টের পর্যায়ে উন্নীত হয়, যখন কাহিনী, চিত্রনাট্য, আলোকচিত্র এবং অভিনয়—সব কিছুই সম্পূর্ণরূপে পরিচালকের উপর নির্ভরশীল; কারণ চলচ্চিত্র শিল্পের তিনিই হচ্ছেন সর্বময় কর্তা।

জাঁ লুক গোদার্দ-এর প্রথম ইংরাজী ছবি 'ল্যা অ্যালফাভিল' আজও এদেশে মুক্তি পায়নি। পূর্বেকার 'ল্যা পিড পিয়েরো' বা 'পিয়েরো দ্য ফুল'-এর মতো একটি সম-সাময়িক ফরাসী কাহিনীকে অবলম্বন করে ওঁর সাম্প্রতিক ছবি 'সিমপ্যাথি ফর দি ডেভিল' নির্মিত হয়েছে। যাঁরা গোদার্দ-এর 'নব তরঙ্গ' ছবির সঙ্গে পরিচিত, তাঁরাই জানেন, কোনো সহজ সরল গল্পকে ওঁর ছবির মধ্যে খুঁজে পাওয়া যায় না। তাঁর এ ছবিটি আরও রূপকধর্মী। কারণ, ছবিটির বেশ কিছু জায়গা জুড়ে রয়েছে বিদ্রোহের দৃশ্যাবলী। বিদ্রোহের বিপ্লবাত্মক সঙ্গীতের সঙ্গে যে-সব দৃশ্য দেখা যাবে, তাতে মনে হবে এটি যেন কোনো পূর্ব ইয়োরোপীয় দেশের ছবি। গোদার্দ-এর ছবিতে এ এক নতুন অভিজ্ঞতা। চিত্র-সমালোচকদের মতে মার্কসবাদ, লেনিন-বাদের সঙ্গে বিপ্লবাত্মক ধ্বনি, বিদ্রোহ বোমা ও গুলি এবং হত্যার মধ্যে দিয়েই ছবির মূল বক্তব্য এগিয়ে চলেছে। মনে প্রশ্ন জাগবে, তবে কি পরিচালক জাঁ লুক গোদার্দ 'ভিয়েতনামের যুদ্ধ' পরিবেশন করছেন। কিন্তু না, আসলে তিনি দর্শকদের কাছে ছবির বক্তব্যকে পরিস্ফুট করবার জন্যে ছবির পরিভাষাকে বিভিন্ন প্রতীকধর্মী (সিম্বলিক) শটের সাহায্যে বর্ণনাত্মক করে তুলেছেন। অবশ্য সেই সঙ্গে তিনি শিল্পী-দের সংলাপের মাধ্যমেও বর্তমান ক্ষয়িষ্ণু সমাজজীবনের পক্ষে অপরিহার্য রাজনৈতিক বক্তব্যগুলিকে দর্শকের সামনে তুলে ধরেছেন। রাজনৈতিক মতবাদকে বাদ দিয়ে যদি ছবিটিকে দেখা যায়, তাহলে ছবির কলা-কৌশল, সম্পাদনা, চিত্রনাট্য রচনা, পরি-চালনা, সঙ্গীত পরিচালনা এবং আলোক-চিত্র গ্রহণের কাজ দেখে সকলেই মুগ্ধ হবেন। গোদার্দের সাম্প্রতিক ছবিগুলির মধ্যে এইটিই নিঃসংশয়ে শ্রেষ্ঠ। সব সংগ্রামেরই শেষ আছে, বর্তমানের রাজনৈতিক আন্দোলনও একদিন শেষ হবে, কিন্তু সংগ্রাম এবং আন্দোলনকে পটভূমিকা করে নির্মিত এই ছবিখানির মাধ্যমে গোদার্দ যে নব চেতনার সৃষ্টি করেছেন, তা স্মরণীয় হয়ে থাকবে।

'ম্যান অ্যাণ্ড ওম্যান' ছবির পরিচালক ক্লদ লেলুচ-এর সাম্প্রতিক ছবির নাম হচ্ছে 'লাভ ইজ ফানী থিং।' ছবিটির নায়িকা এক দুঃস্বপ্নকে মন থেকে ঝেড়ে ফেলতে না পেরে বিহ্বল দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকেন দরজার দিকে ভবিষ্যতের আশায় কোনো সুন্দর মুখের কথা ভেবে। ফরাসী ছবির ভবিষ্যৎ পরিচালকেরা ছবিখানি থেকে অনেক কিছুই শিখতে পারবেন, এই কথা মনে রেখে পরিচালক ছবিটিকে তাঁর 'ম্যান অ্যাণ্ড ওম্যান'-এর মতো সহজ সরল প্রেম ও প্রণয় কাহিনীমূলক না করে করেছেন মনস্তত্ত্ব-মূলক ও রূপকধর্মী। ম্যাক বোডার্ড 'বেঞ্জামিন' (১৯৬৯) ছবিটিকে ব্রিটিশ 'টম জোন্স'-এর ফরাসী সংস্করণ বলা চলে অনায়াসেই, কারণ দুটি ছবিতেই নগ্নতা ও যৌনতা বিদ্যমান সমভাবেই। তবে রঙের ব্যবহার এবং অন্যান্য কলাকৌশল ছবিটিতে যথার্থ উচ্চাঙ্গের। যেমন জ্যাক কার্ডিফ পরিচালিত এবং কলিকাতায় মুক্তিপ্রাপ্ত ছবি 'দি গার্ল অ্যাণ্ড দি মোটর সাইকেল'-এ নগ্নতা ও যৌনাবেদনমূলক দৃশ্যগুলিতে রঙের পরিবর্তন ঘটানো হয়েছে ভাবের পরিবর্তন সূচিত করবার জন্যে—এ ব্যাপারটা আমাদের কাছে, একেবারেই নতুন। প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যেতে পারে যে, দিল্লীতে অনুষ্ঠিত চতুর্থ আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্রোৎসবে 'বেঞ্জামিন' ছবিটি দেখানো হয়েছিল।

ইতালী :

ইতালীয় ছবির জগতে 'নব্য বাস্তবতা'র (নিও রিয়ালিজম-এর) শুরু থেকেই প্রখ্যাত প্রবীণ পরিচালক ভিত্তোরিও দ্য সিকা বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে বিভিন্ন পর্যায়ের ছবি করেছেন। অবশ্য ওঁর 'বাইসিকল থীফ' থেকে 'ম্যারেজ ইতালীয়ান স্টাইল' পর্যন্ত ছবিগুলির মধ্যে বহু ক্রম-পরিবর্তন লক্ষ্য করা গেছে। তিনটি ছোট ছোট কাহিনী নিয়ে রচিত 'ইয়েস্টারডে, টুডে অ্যাণ্ড টুমরো' ছবিটির পরে একটি ভিন্ন-ধর্মী উচ্চাঙ্গের প্রেমকাহিনীকে অবলম্বন করে তিনি গড়ে তুলেছেন 'সান ফ্লাওয়ার' ছবিটি ইতালী ও রাশিয়ার সহযোগিতায়। আমরা দেখেছি, রাশিয়ার সুন্দর প্রাকৃতিক পরিবেশে বিস্তীর্ণ অঞ্চল জুড়ে সূর্যমুখী ফুলের শোভা। যুদ্ধের পরিস্থিতিতে স্বামী স্ত্রীর মধ্যে বহুদিন ছাড়াছাড়ি হবার পরে 'আমার স্বামী কখনও মারা যেতে পারে না', এই বিশ্বাসের বশবর্তী হয়ে স্ত্রী ছুটল রাশিয়াতে স্বামীর খোঁজে। কিন্তু নিয়তির এমনই পরিহাস, যখন সে সত্যিই স্বামীর সন্ধান পেল তখন সঙ্গে সঙ্গে সে দেখল তার স্বামী একটি সুন্দরী রুশ তরুণীর সঙ্গে নতুন করে ঘর বেঁধেছে। অভাবে, দুঃখে স্ত্রী সটান ফিরে এল ইতালীতে নিজের বাড়ীতে। স্বামী কাঁদতে কাঁদতে পায়ে ছুটে এল স্ত্রীর কাছে মার্জনা ভিক্ষা করতে এবং তাকে বোঝাতে কি পরি-স্থিতিতে [illegible] ঐ মেয়েটিকে বিয়ে করে [illegible]। কিন্তু অভিমানিনী নারী আহত মন নিয়ে

শত্রুমেতে থাকে, তার কাছে ক্ষমা পাবার আশা কোথায়? স্ত্রীর ভূমিকাতে সোফিয়া লোরেন যে আশ্চর্য নাটনৈপুণ্যের পরিচয় দিয়েছেন, তার তুলনা নেই। স্বামী ও রুগ্ন স্ত্রীর ভূমিকায় মার্চেলো মাস্তোয়ানী ও লুডমিলাকে দেখা গেছে। এরপরে দ্য সিকা মাস্তোয়ানী ও ফে ডানাওয়েকে নায়ক-নায়িকা রূপে নিয়ে 'লাভার্স ট্রাজিডি' নামে এক প্রেমধর্মী ছবি তৈরী করেছেন।

'লা দোলচে ভিতা'-খ্যাত ইতালীর অপর পরিচালক ফ্রেডেরিকা ফেলিনির সাম্প্রতিক ছবির নাম হচ্ছে 'স্যাটারিকন!' ছবির কাহিনী পৌরাণিক, মনে হয় যেন রোমের সম্রাট নীরোর সমসাময়িক ঘটনা। কিন্তু পরিচালকের মতো এটিকে পৌরাণিক না বলে বিজ্ঞানভিত্তিক রূপক ছবি বলা শ্রেয়। ছবির নায়ক হচ্ছে সমকামী এবং তার কাণ্ড-কারখানা নাকি ছবিটিকে করে তুলেছে অশ্লীল। অবশ্য পরিচালক বলেছেন ছবিটির সব কিছুই কাল্পনিক। ছবির একটি নাটকীয় দৃশ্যে জনৈক নারী তাঁর অমূল্য ধন-সম্পদ তাঁর বন্ধুদের মধ্যে দান করতে করতে তাদের যৌনাবেদনের দ্বারা উত্তেজিত করছেন ক্ষণে-ক্ষণে। পরিচালক ফেলিনি নীরোর পতনের দৃশ্যেই যৌন বিষয়ের অবতারণা করেছেন এবং প্রাচীন রোমের দৃশ্যসজ্জার ভিতর দিয়ে বিংশ শতাব্দীর তরুণ-তরুণী-দের যৌনবিকার এবং উচ্ছৃঙ্খলতার পরিচয় দিয়েছেন। প্রাচীনকালের মতো আজও রোমে যুব সম্প্রদায় নিজেদের মধ্যে বিশৃঙ্খলা, হানাহানি, হিংস্রতা ও যৌনপরায়ণতার মধ্যে দিয়ে ধ্বংসের দিকে অগ্রসর হচ্ছে। তাই ফেলিনি বলছেন, এখনও সময় আছে: হয়তো বা এরই মধ্যে নতুন খৃস্টের আগমন সম্ভব হবে এবং সব কিছুরই পরিবর্তনের পরে নতুন কিছু সৃষ্টি হবে। প্রখ্যাত ইতালীয় পরিচালক আন্তোনিয়নি ব্রিটেনে 'ব্লো-আপ' তৈরী করার পরে আমেরিকার আধুনিক সমাজের ব্লো-আপ রূপে জেবর স্কী পয়েন্ট' ছবিটি পরিচালনা করেছেন। ওখানকার তরুণ-তরুণীদের উচ্ছৃঙ্খলতার পরিচয় দিতে গিয়ে তিনি ছবিটির বক্তব্যের চেয়ে বড়ো করে দেখিয়েছেন যৌনতাকে। আশা করা যাচ্ছে, যৌনতা ও নগ্নতার দৃশ্যগুলিকে বাদ দিয়ে আন্তোনিয়নি ও ফেলিনির ছবি দুখানি ভারতে মুক্তি লাভ করবে।

ইতালীর তরুণ পরিচালকদের মধ্যে প্যাসোলিনী **'ইডিপাস দি রেক্স'** ছবিটি শেষ করে 'বোসিল' নামে নতুন ছবির কাজ নিয়ে ব্যস্ত আছেন। অপর বিশিষ্ট তরুণ পরি-চালক বেত্রলুচির 'দি **কনফর্মিস্ট**' ছবিটি যে বার্লিন চলচ্চিত্রোৎসবে আলোড়নের সৃষ্টি করেছিল এ,কথা নিশ্চয়ই পাঠকদের মনে আছে। মোরাভিয়ার কাহিনীকেন্দ্রিক ছবিতে ফ্যাসী বিরোধিতার ঘনঘটা যেমন আছে, আবার তেমনই আছে স্বদেশপ্রেম, বিদ্রোহ, গুপ্তচরবৃত্তি, হত্যা, সমকামিতা ও যৌনতা। ১৯৪৩ সালের ৩মে যখন ফ্যাসি-বিরোধী সরকারের পতন হোলো, তখন ছবির নায়ক জানতে পারল, তার একমাত্র সুহৃদ তার নিজেরই বন্দুকের গুলিতে নিহত হয়েছে। কে ওকে হত্যা করেছে এবং কোন পরি-প্রেক্ষিতে তার উত্তর রয়েছে ছবিতে। কাহিনী বিন্যাস, পরিচালনা, অভিনয় এবং ছবির কলাকৌশলের বিভিন্ন বিভাগ—সব দিকেই তরুণ পরিচালকের সুতীক্ষ্ন দৃষ্টির পরিচয় পাওয়া যায় ছবিটিতে। শিল্পীরাও চিত্রনাট্যের দাবী মিটিয়ে বাস্তবসম্মত অভি-নয় করে পরিচালকের সঙ্গে সহযোগিতা করেছেন। ইতালীর অন্যতম তরুণ পরি-চালক ভারসিনির ছবি 'ব্লো হট, ব্লো কোল্ড' যে আমাদের দেশে তুমুল সাড়া জাগিয়ে-ছিল, এ-কথা আশা করি সকলেরই মনে আছে।

সুইডেন :

সুইডেনের ছবি বলতেই প্রথমে ইংগমার বেয়ারম্যান-এর নাম মনে আসে। উনি যে ট্রিলজিটি তৈরী করেছেন, তার মধ্যে মাত্র **উইন্টার লাইটটিই** এদেশে চলচ্চিত্র উৎসব মারফৎ প্রদর্শিত হয়েছে, বাকী দুটি দি **সাইলেন্স** এবং **থ্রু দি গ্লাস ডার্কলি** এদেশে এখনও আসেনি। এমন কি তার সাম্প্রতিক ছবি **প্যাসোনা** সম্বন্ধেও ঐ একই কথা। তবে আশার কথা, উনি বর্তমানে দি টাচ নামে একখানি ইংরেজী ছবির পরিচালনায় আত্মনিয়োগ করেছেন। এই ছবিতে ও'র কোনো সুইডিস তারকা থাকছে না, তার পরিবর্তে উনি এলিয়ট গ্লোভ নামে এক তরুণ মার্কিণ শিল্পীকে দিয়ে ছবির একটি প্রধান ভূমিকায় কাজ করাচ্ছেন। এই ছবিটি হবে ও'র আগেকার সকল ছবি থেকে সম্পূর্ণ পৃথক ধরনের। বাস্তব দৃষ্টি-ভঙ্গীর এক অপূর্ব পরীক্ষানিরীক্ষামূলক হবে ছবিটি। ও'র ধারণা, এই ছবি সুই-ডেনের খ্যাতি বর্ধিত করবে।

যৌনাবেদন ও নগ্নতার জন্যে সুই-ডেনের ছবিগুলির খ্যাতি পৃথিবীব্যাপী। বিশেষ করে ম্যয় জিটারলিঙ্ক-এর **নাইট গেম লাভিং কাপ্‌লস্**, **ডক্টর গ্লাস** ও **দি গার্লস** ছবিগুলির নাম এই প্রসঙ্গে প্রায়ই উল্লেখিত হয়। এদের পরেই মনে আসে ভিগোট সোম্যান পরিচালিত যৌনতা বা নগ্নতার ছবি—'**আই অ্যাম কিউরিয়াস ইয়েলো** '(৬৭), '**আই অ্যাম কিউরিয়াস ব্লু** (৬৮) এবং **ইউ আর লায়িং**-এর কথা। সুইডেনে কেবল যৌনাবেদনমূলক ছবি তৈরী হয়, এ কথা মনে করলে ভুল হবে। ওখানে রয় অ্যান্ডারসন পরিচালিত '**এ সুই-ডিস লাভ স্টোরী**' এবং জন বার্গেন স্টুলার পরিচালিত '**দি বাল্টিক ট্র্যাজেডি**'র মতো ক্লাসিক উচ্চমানের ছবিও তৈরী হয়ে থাকে। প্রথম ছবিতে কিশোরকিশোরীর প্রণয়কে কেন্দ্র করে সুইডেনের সমাজ ব্যবস্থায় প্রাচীনপন্থী রক্ষণশীল অভিভাবকদের চিন্তাধারার সঙ্গে আজকের তরুণদের চিন্তাধারার যে বিরাট ব্যবধান রয়েছে, তারই একটি বাস্তব নিদর্শন তুলে ধরেছেন পরিচালক। দ্বিতীয় ছবিটি হচ্ছে যুদ্ধ-

কেন্দ্রিক। দুর্দশার হাত থেকে রক্ষা পাবার জন্যে প্রায় তিন হাজার জার্মাণ সৈন্য সুইডেনে আশ্রয় নিতে বাধ্য হয়েছিল। কিন্তু কিছুদিন বাদে সুইডেন সরকার তাদের ঐ রাজ্য ত্যাগ করবার আদেশ দিলে তারা হতাশায় ভেঙ্গে পড়ে এবং অনশন ধর্মঘট করে তাদের মধ্যে অনেকেই মৃত্যুবরণ করে। মৃতপ্রায় সৈনিকদের মর্মবেদনা ও রাজনৈতিক নিরপেক্ষতাই এই সুইডিস ছবিটির মূল আবেদন। বো ওয়াইডারবার্গ তাঁর 'র‍্যাভেন্স এন্ড' ছবিটির জন্যে সুইডিস চলচ্চিত্রে একটি বিশেষ স্থান অধিকার করেছেন। তাঁর সাম্প্রতিক ছবি অ্যাডালেন ৩১ (দি অ্যাডালেন রায়টস্) ১৯৩১ সালে সুইডেনের উত্তরাঞ্চলে একটি কারখানায় যে গণ-সত্যাগ্রহ হয়েছিল, তাকেই কেন্দ্র করে গঠিত। সত্যাগ্রহীদের সংগে মিলিটারী সৈন্যদের যে সংঘর্ষ হয়, তারই করুণ আলেখ্য আছে ছবিটিতে।

পশ্চিম জার্মানী :

১৯৭০-এ অনুষ্ঠিত বার্লিন চলচ্চিত্রোৎসবে সবচেয়ে বিতর্কমূলক ছবি ছিল পশ্চিম জার্মাণীর 'ও কে'। ছবির কাহিনীতে ছিল, ভিয়েতনাম যুদ্ধের পটভূমিকায় কয়েকজন মার্কিণ সৈন্য একটি ভিয়েতনামী তরুণীকে ধর্ষণ করবার পরে তাকে নৃশংসভাবে হত্যা করে। ছবির পরিচালক তরুণ এবং শিল্পীরাও নবাগত। কিন্তু ছবির মানবিক আবেদনকে অগ্রাহ্য করে আমেরিকান জুরী-সদস্যরা ছবিটি সম্বন্ধে ঘোরতর আপত্তি তোলায় চলচ্চিত্র উৎসবটাই ভণ্ডুল হয়ে যায়। রাইনার ফার্সবিন্ডার পরিচালিত 'হোয়াই ডাজ হের্মুক রাণ?' ছবিটি সামাজিক কাহিনী অবলম্বনে রচিত. কিন্তু ছবির শেষাংশে দেখা যায়, নায়ক তার স্ত্রী, পুত্র ও প্রতিবেশীকে হত্যা করবার পরে নিজে আত্মহত্যা করে জীবনের একঘেয়েমি থেকে মুক্তি পেলেন। পরিচালক কৃতিত্বের সংগে দর্শকের চোখের সামনে তুলে ধরেছেন বর্তমানের সমাজব্যাধিকে, কেমন করে পশ্চিমী সমাজ থেকে প্রেম, প্রীতি, মানবিক অনুভূতি ক্রমে লুপ্ত হয়ে যাচ্ছে এবং তার পরিবর্তে আসছে কৃত্রিম স্বাচ্ছন্দ্যবোধ, কৃত্রিমতাই মানুষকে ঠেলে দিচ্ছে একের থেকে অন্যকে দূরে, সৃষ্টি করছে শূন্যতা, হাহাকার। পরিচালক বলছেন, যান্ত্রিক সভ্যতাই এই কৃত্রিমতার জনক।

পশ্চিম জার্মাণীর সমকালীন ছবিগুলির মধ্যে কলকাতায় প্রদর্শিত দু-একখানি ছবি সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করা যাক। 'সাইনস অব লাইফ' ছবিটিতে দেখানো হয়েছে যুদ্ধে আহত কয়েকজন জার্মাণ সৈন্য দিনের পর দিন কিভাবে একটি নির্জন দ্বীপের অধিবাসীদের শত্রুদের হাত থেকে রক্ষা করবার জন্যে সর্বশক্তি ব্যয় করেছে। ওদের মধ্যে একজন তরুণ সৈন্য সব কিছু হারিয়ে পাগল হয়ে যে দুর্গের মধ্যে গোপনে গোলাবারুদ রক্ষিত ছিল, তাকেই আক্রমণ করে বসে। ছবির মানবিক আবেদন, আলোকচিত্র গ্রহণ, অভিনয় ও পরিচালনা—সবই অনবদ্য। সিলভার বিয়ার পুরস্কারপ্রাপ্ত এই ছবির পরিচালক হচ্ছেন ওয়ার্ণার হেরুগগ্। 'ইয়েস্টার ডে গার্ল' খ্যাত পরিচালক আলেকজান্ডার ক্লগের 'দি আর্টিস্ট আন্ডার দি বিগ টপ' ছবিটি ভেনিসে শ্রেষ্ঠ পুরস্কার লাভ করেছিল। একজন তরুণীর খ্যাতনামা শিল্পী হবার স্বপ্নকে কেন্দ্র করে ছবিটি গড়ে উঠেছে। ছবির টেকনিক্যাল দিক, সম্পাদনা ও পরিচালনা—সবই উচ্চাঙ্গের। প্রয়োজন অনুসারে কোথাও সাদাকালো, আবার কোথাও রংগীন আলোকচিত্রের ব্যবহার পরিচালকের স্বতন্ত্র দৃষ্টিভঙ্গীর পরিচয় বহন করে।

চেকোশ্লোভাকিয়া :

ক্যারেল কাচিনা পরিচালিত 'দি কানি ওল্ডম্যান' ছবিটি ভারতের চতুর্থ আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্রোৎসবে প্রদর্শিত হয়েছে। যার অকেজো হৃদয়ের বদলে নতুন হৃদয় অস্ত্রোপচার করে বসিয়ে দেওয়া হয়েছে, এমন এক হাসপাতালের বৃদ্ধ রোগীর নিজের হারিয়ে যাওয়া মেয়ের খোঁজে ব্যগ্র হওয়া এবং শেষ পর্যন্ত সদ্য আত্মহত্যাকারিণী মেয়েকে দেখে শোকে প্রাণত্যাগ করার ঘটনাকে অবলম্বন করে এই বিস্ময়কর মানবিক আবেদনসমৃদ্ধ ছবিটি গড়ে উঠেছে। ইভালড স্করম পরিচালিত 'দি এন্ড অব দি প্রিস্ট' ছবিতে এক ভণ্ড ধর্মযাজকের কাহিনী বর্ণিত হয়েছে। তাকে পাপ থেকে উদ্ধার করবার চেষ্টা করেও তার পতন রোধ করা গেল না। ছবিটি নবতরঙ্গ-এর নয় এবং কমেডিই হচ্ছে এর প্রধান বৈশিষ্ট্য। পোলিশ পরিচালক স্কোলিমোস্কি ডায়ালগ ২০-২০ ও ৭০-৭০ নামে একটি সুন্দর চেক ছবি পরিচালনা করেছেন।

যুগোস্লাভিয়া :

'আর্লি ওয়াকস' ছবিটির পরিচালক হচ্ছেন জিহিকক্। ছবির কাহিনীতে দেখানো হয়েছে তিন তরুণ ও এক তরুণী স্বদেশের জন্যে অভিযানে বেরিয়ে যখন বিপদের সম্মুখীন হল, তখন তরুণেরা তরুণীটিকে উপভোগ করে দূরে সরে গেল। দুঃখে, যন্ত্রণায় তরুণীটি নিজের দেহে পেট্রল ঢেলে চিরকালের জন্যে মুক্তিলাভ করল। রাজনীতি থেকে স্বদেশপ্রেমিকতা বড়ো, এই বক্তব্য চেক ছবি থেকে যুগোস্লাভিয়ার ছবিতে বেশী করে পরিস্ফুট দেখতে পাওয়া যায়।

পোল্যান্ড :

আঁদ্রে ওয়াইদা পরলোকগত পোলিশ চলচ্চিত্রাভিনেতা চিবুলস্কির কর্মজীবনকে কেন্দ্র করে 'এভরি থিং ফর সেল' ছবিটি করেন। তাঁর পরবর্তী ছবি 'হান্টিং ফ্লাইজ'এ তিনি ওয়ারশর বিভিন্ন যুবসংস্থার পটভূমিকায় তরুণ-তরুণীদের সামাজিক পরিবেশ, তাদের বিভিন্ন সামাজিক সমস্যা নিয়ে আলাপ-আলোচনা এবং তাদের প্রেম ও প্রণয়পর্ব উদ্ঘাটিত করে দেখিয়েছেন। এরও পরে উনি ১৯৪৫-এ দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের বিশেষ পরিস্থিতির ভিত্তিতে 'দি ল্যান্ডস্কেপ আফটার এ ব্যাটল' ছবিটির কাজ শেষ করেছেন। প্রখ্যাত পরিচালক রোমান পোলনস্কী লন্ডনে 'ম্যাকবেথ' ছবিটি নতুন করে নির্মাণ করেছেন।

অপর্ণা সেন/আলোর আঁধারে ।।
পরিচালনা : অগ্রদূত

মাধবী চক্রবর্তী/প্রেম ও অপ্রেম ।।
পরিচালনা : বিমল ভৌমিক

মমতাজী মালিয়া/সংসার ।।
পরিচালনা : সলিল সেন
ফটো : অমৃত

চলচ্চিত্র কি শুধুই প্রমোদোপকরণ?

চলচ্চিত্র প্রদর্শনীর ওপর প্রমোদকর বসান হয় নিশ্চয়ই এই কারণে যে, সরকারী মতে চলচ্চিত্র হচ্ছে একটি প্রমোদোপকরণ। কিন্তু আজকের দিনে একটি চলচ্চিত্রকে শুধুই প্রমোদোপকরণ হিসেবে গণ্য করা হয় কি? খোসলা কমিশন স্পষ্টই বলেছেন, এতকাল ভারতীয় ফিল্ম সেন্সার বোর্ড খালি নেতিবাচক কাজই করে এসেছেন। কিন্তু এখন প্রয়োজন হচ্ছে, সেন্সার বোর্ডের এমন কিছু করা যাতে, চলচ্চিত্রের শিল্পগত ও নান্দনিক গুণ বৃদ্ধি পায়। এবং এর জন্যে তাঁরা চলচ্চিত্রের বক্তব্য ও বিষয়বস্তু নির্বাচনে অধিকতর স্বাধীনতা দানের পক্ষপাতী। রাজনৈতিক ও সামাজিক সমস্যা সম্পর্কিত এবং যৌনবিষয়ক বক্তব্যপূর্ণ কাহিনী চিত্রায়ণে কোনও বাধা না রাখার সুপারিশ তাঁরা করেছেন। এবং তাঁরা আরও বলেছেন যে, অতঃপর উচ্চ নান্দনিক, শিল্পগত ও সংস্কৃতিবিষয়ক গুণসম্পন্ন ছবিকে শুধু প্রদর্শনীর ছাড়পত্র না দিয়ে বিশেষ মর্যাদার সার্টিফিকেট যেন দেওয়া হয়। এই বিশেষ সার্টিফিকেটপ্রাপ্ত ছবির জন্যে প্রযোজক প্রমোদকর থেকে অব্যাহতির আবেদন করতে পারেন।

অর্থাৎ আজ আর চলচ্চিত্র যে শুধু প্রমোদ মাধ্যমরূপে গণ্য হচ্ছে না, একথা সরকার নিযুক্ত খোসলা কমিশন স্বারা স্বীকৃত। ভারতের দৈনিক ৬২ লক্ষ চলচ্চিত্র দর্শকের মধ্যে শতকরা ঠিক কতজন চলচ্চিত্রকে আর মাত্র প্রমোদোপকরণ স্বরূপ মনে করেন না, এ-হিসাব যদিও আজ করা হয়নি, তবু একথা নিশ্বিধায় বলা চলে যে, ভারতে প্রতিষ্ঠিত ফিল্ম সোসাইটিগুলির (১৯৪০ দশকের মাঝামাঝি থেকে যার শুরু এবং ১৯৭০-এর শেষে যার সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ১১৯) কৃপায় ও বহু আন্তর্জাতিক খ্যাতি-সম্পন্ন বৈদেশিক ফিল্ম ম্যাগাজিন এবং চলচ্চিত্র সম্পর্কীয় তত্ত্ব ও তথ্যসম্বলিত বহু পুস্তকের পঠন-পাঠন এবং সর্বোপরি ভারতে অনুষ্ঠিত কয়েকটি আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবের প্রত্যক্ষ ফলস্বরূপে আজ ভারতের যুব সম্প্রদায়ের একাংশ চলচ্চিত্র স্বারা এমনভাবে প্রভাবিত যে, মাছ যেমন জল ছাড়া থাকতে পারে না, এদেরও শিল্প-ভাবনা তেমনই চলচ্চিত্রকে আশ্রয় করে গড়ে উঠেছে। স্ট্যানলে কাউফম্যান এঁদেরই নামকরণ করেছেন—ফিল্ম জেনারেশন। এরা ফিল্মকে এমন তান্নিষ্ঠভাবে গ্রহণ করেছে কেন, তার কয়েকটি কারণ তিনি উল্লেখ করেছেন :

১। বর্তমান টেকনোলজির যুগে চলচ্চিত্র-শিল্পের বিকাশ লাভ ঘটেছে টেকনোলজি থেকে। স্থাপত্যবিদ্যাকে বাদ দিলে চলচ্চিত্রই হচ্ছে একমাত্র শিল্প, যা প্রত্যক্ষভাবে ও বহুল পরিমাণে এই যুগের ফলিত বা ব্যবহারিক বিজ্ঞানকে আত্মসাৎ করেছে। জ্যামিতিক অঙ্কন-শিল্পীরা যান্ত্রিক এবং ইলেকট্রোনিক উপাদান ব্যবহার করেছেন, কবি ও চিত্রকরেরা কম্পুটারকে কাজে লাগিয়েছেন, সুরকারেরা ইলেকট্রোনিক টেপ ব্যবহার করে থাকেন। কিন্তু এগুলি হচ্ছে পছন্দের ব্যাপার—ইচ্ছা করলে তাঁরা এগুলিকে বর্জনও করতে পারেন। কিন্তু চলচ্চিত্রকারের ক্ষেত্রে তা নয়; তিনি ইচ্ছা করুন আর নাই করুন, তাঁকে জটিল ইলেকট্রোনিক ও মেকানিক্যাল যন্ত্রপাতি ব্যবহার করতেই হবে—এছাড়া তাঁর গত্যন্তর নেই। এই একমাত্র কারণেই তাঁকে তাঁর সমাজের সঙ্গে দৃঢ়ভাবে যুক্ত করে রেখেছে বর্তমানের তিনি একজন সক্রিয় সদস্য। তাঁর শিল্পের উপাদানস্বরূপ তিনি যে-সব যন্ত্রপাতি ব্যবহার করে থাকেন, তারাই তাঁকে যুগচেতনার সঙ্গে মানসিক আদান-প্রদানে সংশ্লিষ্ট রেখেছে।

২। দর্শনগ্রাহ্য বাহ্যবস্তু তার প্রতিটি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সমেত আবার শিল্পকলার বা আর্টের উপাদান হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে। জার্মান লেখক রোল্ফ হোকুথ বলেছেন, "ইঙ্গমার বেরিম্যানের 'দি সাইলেন্স' ছবিটি দেখে যখন আমি হামবুর্গের

ছবিঘর থেকে বেরিয়ে এলুম, তখন আমার মনে একমাত্র এই প্রশ্নটিই উদিত হল যে, আজকের ঔপন্যাসিকের জন্যে তাহলে বাকী রইল কি? নেয়ারম্যান তার ক্যামেরার একটি শট-এর সাহায্যে কি কাণ্ডটাই না করেছে?—রাস্তা ধরে এগিয়ে গিয়ে একটি বারান্দার ওপর দিয়ে চলে একটি নারীর বগলে এসে পৌঁছেছে! একটিও কথা ব্যবহার না করে সে কত কথাই না বলল!"

সত্যিই চলচ্চিত্র উপন্যাসকারের কাছ থেকে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বাস্তবতা সৃষ্টির প্রাথমিক কাজটি কেড়ে নিয়েছে। শুধু তাই নয়, সে একে উচ্চস্তরের বস্তুতে পরিণত করেছে; দরজার হাতল, সকালের চায়ের টেবিল, ঘরের আসবাবপত্রকে সে সময়-সময় কবিতার রূপ দেয়। যে-সব ছোট-ছোট জিনিস দিয়ে আপনার-আমার জগৎ তৈরী, চলচ্চিত্রকার তাকেই ইঙ্গিতময় করে তোলে, কল্পনার রঙীন লোক তৈরী করবার জন্যে।

৩। আমাদের যুগের বহু প্রয়োজনীয় সমস্যা সমাধানের যোগ্যতা চলচ্চিত্রের আকারের মধ্যেই নিহিত রয়েছে। মানুষের মনের ভিতরকার বিরাগ, সন্দেহ বা বিকর্ষণকে নানাভাবে রূপায়িত করে চলচ্চিত্র। মনস্তত্ত্ব বিষয়ে এমন অনেক জিনিস আছে, যা রঙ্গমঞ্চের চেয়ে চলচ্চিত্রে ঢের সহজে দেখান যায়।

৪। চলচ্চিত্র হচ্ছে একমাত্র শিল্পকলা, যা প্রথমে যেভাবে তৈরী হয়েছে, ঠিক সেই অবস্থাতেই সারা জগতে এক সঙ্গে ছড়িয়ে দেওয়া যায়। কোন একটি বিশেষ ভাষার সংলাপ থাকা সত্ত্বেও অন্য ভাষায় লিখিত সাব-টাইটেলের সাহায্যে সেই ভাষাভাষী দর্শকরাও ছবিটিকে উপভোগ করতে পারে। ছবিটির পাত্রপাত্রীদের সঙ্গে তাদের বেশ একটি আবেগময় সম্পর্ক গড়ে ওঠে। চলচ্চিত্রের এই দেশ-কাল-পাত্রের সীমালঙ্ঘনকারী ব্যাপ্তি আমাদের সকলকে সমভাবে ভাবিত একটি বৃহৎ পরিবারের মানুষে পরিণত করেছে।

৫। ঘটনাচক্রে চলচ্চিত্র সর্বকনিষ্ঠ শিল্প হওয়ায় এর আছে একটি যৌবনের দীপ্তি। এবং বয়স অল্প বলে এর মধ্যে রয়েছে প্রচুর সম্ভাবনা। উপন্যাস এবং কবিতা সজীবতা সত্ত্বেও এদের গড়ে উঠেছে বড় রকম ঐতিহ্য। এই ঐতিহ্য সম্পর্কে সচেতনভাবেই ওরা ভবিষ্যতের পানে এগিয়ে চলেছে। চিত্রাঙ্কন ও ভাস্কর্যশিল্প এত পুরাতন যে, যুগে-যুগে এরা নব-নব ধারা প্রবর্তন করতে বাধ্য।

কিন্তু এদের তুলনায় চলচ্চিত্রকে শিশু বললেও চলে; এর জীবন সবে শুরু হয়েছে। অথচ এরই মধ্যে কতই না অঘটন ঘটে গেছে। ভাবতে অবাক লাগে যে, এডিসনের ক্যামেরার যুগ থেকে ৫০-বছরের মধ্যে অরসন ওয়েলস-

পীযূষ বসু পরিচালিত জীবন জিজ্ঞাসায় সুপ্রিয়া দেবী

এর 'সিটিজেন কেন' জন্মলাভ করেছে। দিকচক্রবাল এখনও সুদূরপ্রসারী হয় নি। কাজেই আজকের যুগের যারা তরুণ, তারা এর সঙ্গে একাত্মবোধ করে—এর সঙ্গে তাদের তারল্যের সম্পর্ক রয়েছে—চলচ্চিত্র তাদেরই সম্পত্তি।

চিত্রসমালোচনা

বাংলাদেশের চলমান মুক্তিসংগ্রামের ছবি

তরুণ অধ্যাপক তাহের-এর বিশ্বাস ছিল, ব্যাপক গণভোটে নির্বাচিত প্রতিনিধিদের হাতে প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান ক্ষমতা হস্তান্তর করবেন। কিন্তু রাজনীতির সঙ্গে সক্রিয়ভাবে জড়িত জাহানারা জানতো, পৃথিবীর কোনো দেশেই জঙ্গীশাসক শ্রেণী সহজে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠায় রাজী হয় না।

—বাংলাদেশে তখন ঘনিয়ে আসছে দুর্যোগ। প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া শেখ মুজিবর রহমানের সঙ্গে আলোচনার অজুহাতে বাংলাদেশের ওপর হামলার জন্যে প্রস্তুত হচ্ছিলেন। এবং ১৯৭১-এর ২৫ মার্চ রাতে ঢাকার নিরস্ত্র জনতার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল ইয়াহিয়ার হিংস্র ফৌজ। শুরু হয়ে গেল জঙ্গীশাহী বর্বরতা, যা আজও থামেনি, সমান বেগে চলেছে বাংলাদেশের মানুষগুলোকে শায়েস্তা করবার জন্যে। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে গর্জে উঠল বাংলাদেশের সাত কোটি মানুষ—প্রতিরোধ আন্দোলন গড়ে উঠল দিকে দিকে। বাংলাদেশ জঙ্গীশাহীর বশ্যতা স্বীকার করবে না।

তরুণ অধ্যাপক তাহেরের নির্যাতিতা মা যখন তারই হাতে মাথা রেখে শেষ নিঃশ্বাস ফেললেন, তখন এবং মাত্র তখনই সে তার দেশমাতৃকার সন্তানে পরিণত হতে পারল—সে নিজেকে উৎসর্গ করল মুক্তিযুদ্ধে। উল্কাবেগে জাহানারা মুক্তিযুদ্ধ সংগঠনের দায়িত্ব নিয়ে ছুটে বেড়াতে বেড়াতে তাহেরের সম্মুখীন হল—দুজনে পরস্পরকে নতুন করে উপলব্ধি করল। কিন্তু যেদিন জঙ্গীবাহিনীর সঙ্গে সংঘর্ষে তাহের নিহত হল, সেদিন জাহানারার শোক করবার সময় নেই। সে তাহেরের মৃতদেহকে প্রীতির স্পর্শ দিয়ে সযত্নে সরিয়ে রেখে মুক্তিযোদ্ধাদের সঙ্গে এগিয়ে যায় তার সংকল্প অটুট রেখে।

বেশ কিছুটা সংবাদচিত্রের মিশ্রণ ঘটিত নারায়ণ দিনে ল্যাবরেটরির নিজেদের

ধীরেন দাশগুপ্ত প্রযোজিত এবং উমাপ্রসাদ মৈত্র পরিচালিত "জয় বাংলা" ছবিটির সংক্ষিপ্ত কাহিনী ওপরে লিপিবদ্ধ হল।

ইয়াহিয়ার জঙ্গীশাসনের বিরুদ্ধে বাংলাদেশের জনসাধারণের মুক্তিসংগ্রামের যৌক্তিকতা, যাথার্থ ও সর্বময়ত্ব ছবিটির অঙ্গে অঙ্গে প্রতিফলিত এবং এদিক দিয়েই ছবিটির সার্থকতা। ছবিটিকে যতদূর সম্ভব উত্তেজক ও বাস্তবধর্মী করবার চেষ্টা করা হয়েছে, যদিও পরিমিত সামর্থ্য এই চেষ্টার পথে বাধাস্বরূপ দাঁড়িয়েছে পদে পদে। তবু যখন দেখি, কর্মকর্তারা এই ছবিটিতে অবতীর্ণ হবার জন্যে সুচিত্রা মিত্র, দেবদুলাল বন্দ্যোপাধ্যায়, তরুণ সান্যাল প্রভৃতিকে উদ্বুদ্ধ করতে পেরেছেন, তখন তাঁদের একাগ্রতার প্রশংসা না করে পারি না। বাংলাদেশের তেজস্বিনী তরুণী জাহানার বেশে মমতা চট্টোপাধ্যায় ভূমিকাটির প্রতি সাধ্যমত সুবিচার করেছেন। খুশী হতুম, যদি তাহেরের মৃত্যুর পরে জাহানারাকে "মাইন বুকে বেঁধে ট্যাঙ্ক ধ্বংস" করার সেই ঐতিহাসিক দৃশ্যটিতে আত্মাহুতি দিতে দেখতুম।

সংবাদ-চিত্রেরই মতো ছবির অধিকাংশ ফোটোগ্রাফী। ছবির গানগুলি এবং আবহ-সঙ্গীত ছবির মর্যাদাবৃদ্ধির সহায়ক।

"জয় বাংলা" একটি যথার্থ সমসাময়িক চিত্র এবং এইদিক দিয়ে এর সার্থকতা।

ছোটি বহু

মাতৃহৃদয়ের সবটুকু ভালবাসা দিয়ে নিঃসন্তান রাধা তার ভাসুরের একমাত্র ছেলে গোপীকে আদর্শ শিশু করার সাধনায় মেতে থাকে। স্বামী ডাঃ মধু, তার বড় ভাই শ্রীরাম ও বৌদি সীতা ও গোপীকে নিয়ে গড়ে-ওঠা রাধার সুখের সংসারে ভাঙনের দমকা হাওয়া নিয়ে আসে ননদিনী পারো। নিজের ছেলে নিক্কোকে গোপীর আসনে বসাবার জন্য ষড়যন্ত্রের জাল বোনে পারো। সংসারে আসে ভাঙন। চরম ভাঙনের মুহূর্তে ষড়যন্ত্র ফাঁস হয়, অবসান হয় সব ভুল বোঝাবুঝির। গোপী আবার ফিরে আসে তার মা রাধার বুকে।

শরৎচন্দ্রের 'বিন্দুর ছেলে'র সঙ্গে ডিলাক্স প্রোডাকসনের 'ছোটি বহু'র কাহিনীগত মিল এইটুকু। এর বাইরে বইটিতে যে নাচ-গান, রঙ্গরসিকতা রয়েছে তাকে হিন্দী বইয়ের প্রায় স্বাভাবিক ধর্ম হিসেবে মেনে নিলে 'ছোটি বহু' সম্পর্কে আর কারুর কোন অভিযোগ থাকবে না।

শুধু পাত্রপাত্রীর নাম পরিবর্তনই নয়, মূল গল্পটিকে এত দীর্ঘ (১৭ রিল) একটি ছবিতে টেনে নিয়ে যাওয়ার জন্য চিত্রনাট্যকার বিশ্বামিত্র আদিলকে মূল কাহিনী বহির্ভূত অনেক কিছুরই আশ্রয় নিতে হয়েছে। তা সত্ত্বেও বইটিতে কিন্তু 'স্নেহবিহ্বল করুণ-ছলছল' মাতৃ-হৃদয়ের বাৎসল্যধারা, মায়ের প্রতি সন্তানের বল্গাহীন ভালবাসা, জ্যেষ্ঠের প্রতি কনিষ্ঠ ভাইয়ের ভক্তি, বিশ্বাস ও ভালবাসার আবেগসিঞ্চনে দর্শকরা ক্ষণে-ক্ষণেই অভিভূত হয়ে পড়বেন। আর এর জন্য পরিচালক ও শিল্পীদের সঙ্গে চিত্র-নাট্যকার শ্রীআদিল নিঃসন্দেহে সকলের প্রশংসা পাবেন।

অতিদীর্ঘ হওয়ায় মাঝে-মাঝে যে এক-ঘেয়েমি এসেছে তাকে কাটিয়েও বাঞ্ছিত আবেগকে তুলে ধরতে পারার জন্য পরিচালক কে বি তিলকের মুন্সীয়ানার প্রশংসা করতে হয়।

অভিনয়ের ক্ষেত্রে প্রতিটি শিল্পীই দক্ষতার স্বাক্ষর রেখেছেন। বিশেষ করে কেন্দ্রীয় চরিত্র রাধার ভূমিকায় শর্মিলা ঠাকুর যে অসাধারণ অভিনয় করেন তাতে তাঁর পরিণত শিল্পীমনেরই পরিচয় পাওয়া যায়। আদরিণী কন্যা, সোহাগিনী স্ত্রী, বুভুক্ষু মাতা ও অভিমানিনী বধূর বিভিন্ন রূপে শ্রীমতী ঠাকুরের দীপ্ত অভিনয় মনে রাখার মত। রাধার স্বামীর ভূমিকায় রাজেশ খান্নার করার মত কিছু ছিল না। তবে প্রাপ্ত সুযোগগুলিকে তিনি কাজে লাগিয়েছেন। নিরূপা রায়ের সীতা ব্যক্তিত্ব ও অভিনয়ের গুণে সকলের ভাল লাগবে, ভাল লাগবে শ্রীরামরূপী তরুণ বসুকেও। পারোর ভূমিকায় শশীকলা অত্যধিক মাত্রায় অভিনয় করলেও চরিত্রের কূট দিকটি তিনি ফুটিয়ে তুলতে সক্ষম হয়েছেন। প্রেমনাথ

হার মানা হার চলচ্চিত্র রূপায়ণের মহরতে উত্তমকুমার এবং সুচিত্রা সেনের সঙ্গে তারাশংকর। ফটো : সুকুমার সেন

চরিত্রে আই এস জোহরের অভিনয় রঙ্গ-কৌতুক বাড়াবাড়ি হলেও অনেকেরই ভাল লাগবে। ছবিটির দুই শিশুশিল্পী গোপী-রূপী মাঃ সুরয ও কিশোররূপী জুনিয়র মেহমুদ অপূর্ব অভিনয় করেছে। অন্যান্য ভূমিকার শিল্পীরা পরিচালকের প্রয়োজন মিটিয়েছেন।

কল্যাণজী আনন্দজী সুরকৃত এই ছবিটিতে গান রয়েছে ৬টি। দুটি বাদে বাকীগুলির কোন প্রয়োজন এছবিতে ছিল বলে মনে হয় না। তবে আলাদাভাবে সুর ও গায়ন পদ্ধতির জন্য প্রতিটি গানই সুখ-শ্রাব্য। রাধা ও মধুর বিবাহ উপলক্ষ্যে মধুমতী ও জয়শ্রীর আদিরসাত্মক নাচগান যে বক্স অফিসের দিকে লক্ষ্য রেখেই পরি-বেশিত হয়েছে তাতে কোন সন্দেহ নেই।

ইস্টম্যান কালারে তোলা ছবিটির অন্যান্য বিভাগের কাজের মান উন্নত ও সুন্দর।

এ সপ্তাহে

জীবন জিজ্ঞাসা

আবেগমথিত প্রেম ও ভালবাসার ছবি বি. এম. ডি মুভীর 'জীবন জিজ্ঞাসা' এই সপ্তাহে (১৫ই অক্টোবর) উত্তরা, পূরবী ও উজ্জলা ইত্যাদি চিত্রগৃহে মুক্তি পাচ্ছে। উত্তম ও সুপ্রিয়া অভিনীত এই ছবির অন্যান্য ভূমিকায় আছেন মণ্টু ব্যানার্জী, সুনন্দা দাসগুপ্ত, চন্দ্রাবতী, সুলতা চৌধুরী, শমিতা বিশ্বাস, রাজলক্ষ্মী, অসীম চক্রবর্তী, তরুণকুমার, রুদ্ররাজ চক্র-বর্তী, কুমার রায়, কামু, শান্ত দত্ত প্রভৃতি। পীযূষ বসু পরিচালিত ছবিটির সুরকার শ্যামল মিত্র। 'জীবন জিজ্ঞাসা' ছবিটির পরিবেশক শ্রীবিষ্ণু পিকচার্স প্রাইভেট লিমিটেড।

ত্রিনয়নী মা

রূপঋষি চিত্রমের 'ত্রিনয়নী মা' এ সপ্তাহে মুক্তি পাচ্ছে সুশ্রী, রূপম, কালিকা ও অন্যান্য চিত্রগৃহে। ছবিটির কাহিনী ও চিত্রনাট্য বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্রের, পরিচালনা পূর্ণেন্দু রায়চৌধুরীর। অনিল বাগচী সঙ্গীত পরিচালিত ছবিটির কণ্ঠ-শিল্পীরা হলেন মান্না, সন্ধ্যা, ধনঞ্জয়, মানবেন্দ্র ও অলক বাগচী। এ্যালায়েন্স ফিল্ম ডিস্ট্রিবিউটার্স পরিবেশিত ছবিটির বিভিন্ন ভূমিকায় আছেন কমল মিত্র, অসিতবরণ, অজিত ব্যানার্জী, পদ্মা দেবী, শমিতা বিশ্বাস, মধুমিতা প্রভৃতি।

পরওয়ানা

এন. সি. সিপ্পী নিবেদিত একটি প্রণয়মধুর চিত্র—"পরওয়ানা"— এ সপ্তাহের মুক্তিপ্রাপ্ত একটি মাত্র হিন্দি চিত্র। চিত্রটি পরিচালনা করেছেন জ্যোতি স্বরূপ, সঙ্গীত পরিচালনায় মদনমোহন। বিভিন্ন চরিত্রে আছেন নবীন নিশ্চল, যোগীতা বালী, অমিতাভ বচ্চন, হেলেন, লক্ষ্মীছায়া, ওমপ্রকাশ প্রভৃতি। লাইটহাউস, জনতা, কৃষ্ণা, জেম, নবীনা, ছায়া প্রভৃতি প্রেক্ষাগৃহে প্রদর্শিত হবে।

স্টুডিও সংবাদ

শুভক্ষণ-এর শুভ মহরৎ

গান রেকর্ডিং-এর মাধ্যমে রূপবাণীর প্রথম নিবেদন শুভক্ষণ ছবির শুভ মহরৎ হল ইন্ডিয়া ফিল্ম ল্যাবরেটরীতে গেল রবিবার ১৯ সেপ্টেম্বর সকালে। তপেন্দ্র প্রসাদ পরিচালিত ছবিটিতে সুরযোজনা করবেন নিখিল চট্টোপাধ্যায়।

জীবনটাই নাটক-এর শুভ মহরৎ

২৩ সেপ্টেম্বর, বৃহস্পতিবার বেলা দুটোয় ইন্দ্রপুরী স্টুডিওতে গৌতম চিত্রম-এর প্রথম নিবেদন 'জীবনটাই নাটক' ছবির শুভ মহরৎ অনুষ্ঠিত হল। ছবির কাহিনী-কার, পরিচালক, সঙ্গীত-পরিচালক, গীতিকার, চিত্রশিল্পী, শিল্প নির্দেশক ও সম্পাদক হচ্ছেন যথাক্রমে ফণি চক্রবর্তী, অভিযাত্রী, অধীর বাগচী, গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার, বিজয় দে, সঞ্জিত সেনগুপ্ত এবং অজিত দাস। বিভিন্ন ভূমিকায় দেখা যাবে সমিত ভঞ্জ, চিন্ময় রায়, আরতি ভট্টাচার্য প্রভৃতি শিল্পীকে।

অসমীয়া ছবি "মরীচিকার" সঙ্গীত গ্রহণ : অসম আজকের চলচ্চিত্র জগতের একটি নাম। আগের ঘুমিয়ে থাকা অসম আজ জাগ্রত, তার চলচ্চিত্র শিশুকাল থেকে যৌবনে পদার্পণ করেছে। তা সম্ভব হয়েছে কয়েকজন নামকরা পরিচালকের অক্লান্ত পরিশ্রমের দ্বারা। তার ভিতরে অমূল্য মান্নাও একজন। বঙ্গদেশের এই চলচ্চিত্র নির্মাণের দুর্দিনে, যেখানে স্টুডিও, ল্যাবরেটারী সব কাজের অভাবে বন্ধ হতে চলেছে, সে সময় বেশ কয়েকটি অসমীয়া ছবি বঙ্গদেশের স্টুডিওপাড়াকে কর্মব্যস্ত করে রেখেছে। গত ১৫ সেপ্টেম্বর টেকনি-সিয়ানস স্টুডিওতে গোয়ালপাড়া (আসাম) প্রমথেশ বড়ুয়া চিত্রম প্রযোজিত অমূল্য মান্না পরিচালিত অসমীয়া ছবি 'মরীচিকার'

চারটি গান রেকর্ড করা হয়। আসামের সঙ্গীত পরিচালক জুটি জিতু-তপনের সুরে আরতী মুখার্জি, বনশ্রী সেনগুপ্ত ও নির্মলেন্দু চৌধুরীর কণ্ঠে সঙ্গীত গ্রহণ করা হয়। সঙ্গীত গ্রহণ অনুষ্ঠানের আগে প্রমথেশ বড়ুয়ার প্রতিকৃতিতে মাল্যদান করে প্রমথেশ বড়ুয়ার পত্নী শ্রীমতী যমুনা বড়ুয়া শুভকর্মের উদ্বোধন করেন। উক্ত অনুষ্ঠানে বঙ্গদেশের বহু খ্যাতনামা সাংবাদিক, শিল্পী, সাহিত্যিক উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠানের তরফ থেকে বিশেষ-ভাবে নিমন্ত্রিত হয়ে উপস্থিত সবাই প্রমথেশ বড়ুয়া চিত্রমের উৎসাহজনক কাজের প্রশংসা করেন। ১১ অকটোবর থেকে এক নাগাড়ে শুটিং করে এই বছরের ভিতরে ছবিটি মুক্তি দেয়ার উপযোগী করে তুলবেন বলে প্রযোজক সংস্থা দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। ছবিটিতে অভিনয় করছেন আসামের স্বনামধন্য শিল্পীদের ভিতরে তঙ্কুধর ইউচুঙ্গ, নিবান গোস্বামী, কমল চৌধুরী, পুণ্য দাস, রুক্মা দাস, পুষ্প দেবী ও অনেকে। ছবির কাহিনীকার শ্রীনৃপেন বড়ুয়া, চিত্রনাট্য ও পরিচালনা অমূল্য মান্না, ক্যামেরা বিভূতি চক্রবর্তী (বম্বে), সহযোগী পরিচালনায় শ্রীনির্মলসর্বজ্ঞ। ছবিটির দৃশ্য সম্পূর্ণ আসামের পটভূমিতে গৃহীত হবে।

মঞ্চাভিনয়

কানাড়ী নাটকের বঙ্গানুবাদের মঞ্চরূপ

মহীশূরের গিরীশ কার্ণাড একজন আধুনিক নামকরা নাট্যকার। তাঁরই রচিত 'তুঘলক' নাটকটিকে বাংলাভাষায় রূপান্তরিত ক'রেছেন শেখর চট্টোপাধ্যায় এবং শ্রীচট্টোপাধ্যায়েরই পরিচালনায় এটি অভিনীত হয়েছে থিয়েটার ইউনিট দ্বারা রবীন্দ্র সদনে।

মোহাম্মদ বীণ তুঘলক দাসবংশের দ্বিতীয় বাদশা। তাঁর চরিত্র হচ্ছে অদ্ভুত: বিদ্বান, বুদ্ধিমান, বীর যোদ্ধা, স্বৈরাচারী, নিরীশ্বরবাদী। দিল্লীর প্রভাবশালী গোষ্ঠী থেকে দূরে থাকবার জন্যে তিনি তাঁর রাজধানীকে আটশো মাইল দক্ষিণে দৌলতাবাদে সরিয়ে নিয়ে গিয়েছিলেন; সঙ্গে সঙ্গে আদেশ দিয়েছিলেন দিল্লীর সমস্ত প্রজাকে যেতে হবে দৌলতাবাদে। আর করেছিলেন তাম্র মুদ্রার প্রচলন। কূটবুদ্ধির বলে তাঁর চেহারার সঙ্গে সাদৃশ্যবিশিষ্ট ধার্মিক নেতা

নিউ প্রভাস অপেরা প্রযোজিত রক্তাক্ত রাশিয়া-র একটি অসাধারণ নাট্যমুহূর্তে ননী ভট্টাচার্য (রাসপুটিন) ও অরুণ গোস্বামী (জারিনা)।

শেখ ইমানুদ্দীনকে তাঁরই হয়ে শান্তির দূত হিসেবে পাঠিয়ে তার হত্যার কারণ হয়েছিলেন। কূটবুদ্ধির বলেই তিনি তাঁর বিরুদ্ধে চক্রান্তকারীদের শায়েস্তা রেখেছিলেন। রৌপ্য দীনারকে তিনি তাম্র দীনারের তুল্যমূল্য করেছিলেন কিনা, সেকথা ঐতিহাসিকই বলতে পারেন তবে তাঁর সিদ্ধান্তের ফলে নকল তাম্র মুদ্রায় বাজার ছেয়ে গিয়েছিল। এমন অরাজকতা দেখা গিয়েছিল যে তুঘলক অসহায় বোধ করেছিলেন।

গিরিশ কার্ণাডের 'তুঘলক' নাটকটির মধ্যে নাকি সমকালীনতা আছে—থিয়েটার ইউনিটের সভাপতি মৃণাল সেন অন্তত সেই কথা বলেছেন। ১৩২৭ সালে রাজ আজ্ঞায় দিল্লীর প্রজাপুঞ্জ দলে দলে আটশো মাইল দক্ষিণে নতুন স্থাপিত রাজধানী দৌলতাবাদে গিয়েছিল অশেষ কষ্ট স্বীকার করে এবং সঙ্গে ১৯৪৭-এ ভারত-বিভাগের ফলে লক্ষ লক্ষ লোককে চিরকালের জন্যে যে জন্মভূমি ত্যাগ করে আসতে হয়েছিল, তার চরিত্রগত বা ভাবগত মিল কোথায়? তুঘলকের আমলে প্রজাপুঞ্জের কষ্টের সীমা ছিল না; হাল আমলেও তাই।—এই কি 'তুঘলক' নাটকের সমকালীনত্বের পরিচয়?

কোন বিশেষ গুণে গিরিশ কার্ণাডের রচনাটিকে বাংলায় পরিবর্তিত করে (আশা করব, মূল কানাড়ি ভাষায় অনুবাদকারকের প্রচুর দখল আছে) মঞ্চস্থ করা হল, তা অনুধাবন করতে পারলুম না। ভদ্রলোক কতকগুলি নাটকীয় মুহূর্ত সৃষ্টি করেছেন মাত্র—এর বেশী কিছু নয়। বর্তমানে আমাদের মধ্যে যে গ্রীক, আমেরিকান এবং ইয়োরোপীয় নাটককে অনুবাদ করবার প্রবণতা দেখা যাচ্ছে, তাই আরও বিস্তৃত হয়ে ভারতের অন্য ভাষায় রচিত নাটক পর্যন্ত এগিয়েছে, দেখা যাচ্ছে। নিজেদের প্রতি হীনমন্যতার পরিচয় ছাড়া একে কি বলব? আমাদের এমনই অবস্থা যে, আমরা ভিন রাজ্যবাসীকে আয়ার সাহেব, রাও সাহেব, যোশী সাহেব, মেহতা সাহেব বলে সম্বোধন করে ধন্য হই। বাংলার বাইরে যা কিছু লেখা হচ্ছে, সবই মহান, সবই উপাদেয়, এই চিন্তাও আমাদের পেয়ে বসেছে। শ্রীকার্ণাড বলেছেন: ভারতীয় রঙ্গমঞ্চের পৌরাণিক এবং ঐতিহাসিক ঐতিহ্য আছে বটে কিন্তু শব্দের মতো সম্পন্ন কোনো জিনিসই এ থেকে জন্মায়নি। ভদ্রলোক বাংলা রঙ্গমঞ্চ সম্বন্ধে কতটুকু জানেন, তা জানতে ইচ্ছে করছে এবং জিজ্ঞেস করব কখানা বাংলা নাটক তিনি পড়েছেন বা দেখেছেন। ভারতীয় রঙ্গমঞ্চ সম্পর্কে কথা কইতে গেলে এগুলো জানা দরকার।—অত্যন্ত দুঃখের বিষয় যে শেখর চট্টোপাধ্যায়ের মতো শিক্ষিত ও শক্তিমান অভিনেতা সহসা গিরিশ কার্ণাড সম্বন্ধে একখানি 'গদ-গদ' হয়ে উঠেছেন।

স্বীকার করি তুঘলক চরিত্রের বৈচিত্র্যের মধ্যে প্রচুর নাটকীয় উপাদান রয়েছে এবং তাকে কেন্দ্র করে তার সমসাময়িক ইতিহাসকে চাতুর্যের সঙ্গে সাজাতে পারলে একটি সুন্দর রসোত্তীর্ণ নাটক রচনা সম্ভব। কিন্তু বাংলা 'তুঘলক' যদি গিরিশ কার্ণাডের রচনার মূলের প্রতিচ্ছবি হয়ে থাকে তাহলে দুঃখের সঙ্গেই বলব, গিরিশ কার্ণাড তা পারেননি। তুঘলকের খামখেয়ালীপনা প্রজাপুঞ্জের দুঃখের কারণ হয়ে উঠেছে বটে, কিন্তু তুঘলককে রক্ত মাংসের শরীর বিশিষ্ট মানুষ করে তুলতে পারেনি।

এবং সেই কারণেই 'তুঘলক'-এর অভিনয় নাটকের অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে আমাদের টেনে নিয়ে যেতে অসমর্থ হয়েছে। এ যেন অনেকগুলি খণ্ড খণ্ড চিত্র দেখলুম—চিত্রগুলি পরস্পরের সঙ্গে যুক্ত হয়ে কোনো চূড়ান্ত লক্ষ্যপথে অগ্রসর হয়নি। কোথায় সেই চারিত্রিক অন্তর্দ্বন্দ্বের মুহূর্ত কিংবা কোথায় সেই বাহ্য পরিস্থিতির সঙ্গে বুদ্ধি ও শক্তির সংঘর্ষ, যা দেখে মন নিস্পন্দ বিস্ময়ে তাকিয়ে থাকবে?

শেখর চট্টোপাধ্যায়ের নাট্য-নৈপুণ্যের কথা আমাদের অজানা নয়। এই সেদিন তিনি 'বেগম মেরী বিশ্বাস নাটকে' ক্লাইভের ভূমিকায় তার একটি স্মরণীয় পরিচয় দিয়েছেন। 'তুঘলক'-এর চরিত্রে তিনি যথেষ্টই সু-অভিনয় করেছেন; কিন্তু কোনো একটি স্মরণীয় মুহূর্তের তুঙ্গে তা উঠতে পেরেছে কি? সে সুযোগ তাঁকে নাট্যকার দেননি। বরং বলব, দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে খোপা আজিজের চরিত্রটি, প্রথমে ছিল

মুসলমান ধোবা: পরে হল হিন্দু ব্রাহ্মণ, তারও পরে পেল রাজকর্মচারীর পদ; পকেটমার বন্ধুর সংগে যখন জাল তাম্রমুদ্রা তৈরী করতে ব্যস্ত, সামনে পেল পবিত্র খালিফ ঘিয়াসুদ্দীন আবাসীদকে। তাকে হত্যা করে নিজে ধার্মিক ঘিয়াসুদ্দীন সেজে বসে সুলতানকে নাকাল করে দিল। একে বলি নাটকীয় চরিত্র। অভিনয়ও করেছেন উত্তীয় দেব সাধ্যের অতিরিক্ত ভালো। পকেটমার আজম-এর চরিত্রটিতে অলোক রায়চৌধুরীর অভিনয় হয়েছে জীবন্ত। ঘিয়াসুদ্দীন আবাসীদ-এর চরিত্রটিকে লঘু-ভাবে চিত্রিত করেছেন শঙ্কর মুখোপাধ্যায়। জানি না, চরিত্রটিকে অতখানি লঘু করা উচিত হয়েছে কিনা। অপরাপর ভূমিকায় সমর বন্দ্যোপাধ্যায় (রতন সিং), নবেন্দু গুপ্ত (নাজির), সুজিত সরকার (বারাণসী), অরুণ ঘোষ (ইমানুদ্দীন), সাধনা রায়-চৌধুরী (বিমাতা) প্রভৃতি সুযোগমত সু-অভিনয় করেছেন।

দৃশ্যসজ্জা প্রতীকধর্মী। দিল্লী থেকে দৌলতাবাদে যাবার দৃশ্যটি স্মরণীয়ভাবে বৈচিত্র্যপূর্ণ। আলো, শব্দ ও সংগীতযোজনা নাটকটিকে অতিরিক্ত গতি দিয়েছে।

অংগারের বিজয়া—পূর্বে রেলওয়ে কর্মীদের শিল্প সংস্থা অংগার কৃষ্টি সংসদের সভ্যরা স্টার মঞ্চে শরৎচন্দ্রের 'বিজয়া' মঞ্চস্থ করেন। প্রারম্ভিক অনুষ্ঠান উদ্বোধন করেন উক্ত রেলওয়ের জেনারেল ম্যানেজার শ্রী জি পি ওয়ারিয়র, পৌরোহিত্য করেন এডমিনিস্ট্রেটিভ অফিসার (এম টি পি), শ্রী জে এন রায় এবং প্রধান অতিথি রূপে উপস্থিত থাকেন প্রবীণ নাট্যকার শ্রীমন্মথ রায়। সম্পাদক শ্রীঅজয় চৌধুরী সমাগত সকলকে স্বাগত জানান।

পরিচালক বিনয় লাহিড়ী নাটকটি সুন্দরভাবে সম্পাদনা ও 'দত্তা' উপন্যাস অবলম্বনে দু' একটি চরিত্র ও দৃশ্য সংযোজনা করে বিশেষ কৃতিত্ব দেখিয়েছেন। সামগ্রিক অভিনয় বিগত দিনে পেশাদার মঞ্চে অভিনীত এই নাটকের অভিনয়ের কথা তো স্মরণ করিয়ে দিয়েছিল। রাস-বিহারীর দুরূহ চরিত্রে শ্রীলাহিড়ীর অভিনয় হয়েছিল অনবদ্য। বিজয়া চরিত্রে সংগীতা করের অভিনয়ও প্রাণবন্ত। অন্যান্য চরিত্রে যাঁরা অভিনয় করেছেন তাঁদের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখ করা যায় মানিক সরকার (বিলাস), সলিল ঘোষ (নরেন), দাশরথি সরকার (পূর্ণ), ফকিরদাস কুমার (নীল-মাধব), চিরঞ্জীব মুখার্জি (দয়াল) ও মন্দিরা রায়ের (নলিনী) নাম। সুশীল দাশের আলোকসম্পাত ও মুরারি ভক্ত সম্প্রদায়ের আবহসংগীত প্রশংসনীয়।

শতাব্দীর 'সাগিনা মাহাতো': চলচ্চিত্রে সফল একটি গল্পের নাট্যরূপ পরিবেশন করার ব্যাপারে একটা ঝুঁকি নিশ্চয়ই আছে। যদি ভালো না হয়, ছবি দেখে লোকের মনে যে ইমপ্রেশন জেগেছে, নাটক দেখে সেই ইমপ্রেশন যদি না সৃষ্টি হয়—এই সব বিক্ষিপ্ত চিন্তা স্বভাবতই প্রযোজনার প্রস্তুতিপর্বে মনে ভীড় করে আসে। কিন্তু নাট্যপ্রযোজনায় হয়তো দেখা যায় চলচ্চিত্রের দেখা একই দর্শক নাটক দেখেও বেশ পরিতৃপ্ত মন নিয়েই চলে যায়। হয়তো ঠিক এই ধরনের ব্যাপারই ঘটেছে 'শতাব্দী' প্রযোজিত 'সাগিনা মাহাতো' নাটকের প্রযোজনায়। গৌরকিশোর ঘোষের এই গল্পটি সিনেমায় নানা কারণে অসাধারণ জনপ্রিয়তা পেয়েছিল। আর এই জনপ্রিয় গল্পটিকেই 'শতাব্দীর' শিল্পীরা সীমাহীন নিষ্ঠার সংগে মঞ্চের আলোয় পরিবেশন করে প্রমাণ করেছেন সিনেমায় পরিবেশিত একটি গল্পকেও আরো বিশুদ্ধ শৈল্পিক উপায়ে নাট্যাভিনয়ের মধ্য দিয়ে নতুন আলোয় মূর্ত করে তোলা যায়। একটা কথা খুব সত্যি যে 'শতাব্দী' প্রযোজিত 'সাগিনা মাহাতো'র দর্শক গল্পের প্রাণস্পন্দনে গল্পকারের সংগে সংগেই একই পদক্ষেপে এগিয়ে গিয়েছেন।

শ্রীবাদল সরকার গল্পটির নাট্যরূপ দিয়েছেন, তাঁর নাট্যরূপও হয়েছে চমৎকার। নির্দেশনার দায়িত্বও ছিল তাঁর; মঞ্চ পরিকল্পনায় তিনি যথেষ্ট মুন্সিয়ানার পরিচয় রাখতে পেরেছেন। কয়েকটি কালো রঙ করা বাক্স ব্যবহার করে কোম্পানীর অফিস, পার্টি অফিস, মজদুর ইউনিয়ন, সাগিনার ঘর সব বোঝানো হয়েছে। মঞ্চসজ্জায় এতটুকু বাহুল্য কোথাও নেই।

সঙ্ঘবদ্ধ অভিনয়ে শতাব্দীর শিল্পীরা এবারেই বোধ করি সবচেয়ে বেশী কৃতিত্বের দাবী করতে পারেন। প্রায় প্রতিটি চরিত্রের শিল্পীই সরস অভিনয় করতে পেরেছেন। 'সাগিনা'র ভূমিকায় রজতকুমার নিজেকে বেশ দৃঢ়তায় প্রতিষ্ঠিত করেছেন, তাঁকে মানিয়েও ছিল সুন্দর। 'গোরাবেশী পঙ্কজ মুন্সীর স্পষ্ট সংলাপ উচ্চারণ সামগ্রিক প্রয়োজনায় একটি বৈশিষ্ট্য আরোপ করে।

এন, সি, সিপ্পির পরোয়ানা চিত্রে যোগীতাবলী

ভারতী সরকারের 'ললিতা' হয়ত আরও একটু প্রাণচঞ্চল হতে পারত।

অন্যান্য ভূমিকায় ছিলেন বাদল সরকার, মুরারী চক্রবর্তী, মেঘনাদ দে, দেবেন গাঙ্গুলী, রেবা রবসন, রঞ্জিত কর্মকার, সুবোধ দাশ, দিলীপ দত্ত, আদিত্য মিত্র, দিলীপ ভট্টাচার্য, সমর ভৌমিক, অপূর্ব বসু, বৃজত সরকার, কালীপদ মুখার্জি, তপন চ্যাটার্জি, কালীপদ চ্যাটার্জি, অভিজিৎ সরকার, চণ্ডী ব্যানার্জি। আলোকসম্পাতে ছিলেন তপন দাস।

উল্কা : নীহাররঞ্জন গুপ্তের মঞ্চসফল নাটক 'উল্কা' আবার কয়েক দিন আগে 'রঙ্গনায়' পরিবেশিত হোল। অভিনয়ের আয়োজন করেছিলেন স্টাফ রিক্রিয়েশন ক্লাব, সেন্ট্রাল মেডিক্যাল স্টোর্সের শিল্পীরা। প্রথমেই বলি, সামগ্রিক অভিনয় বোধ হয় সব সময়ে উপভোগ্য হয়ে উঠতে পারে নি। এর জন্য কয়েকজন শিল্পীর শিথিল চরিত্রাভিনয়ই দায়ী। সুফল পালের 'রাজীব ঘোষ' আমাদের প্রত্যাশা মেটায় নি, ডাঃ চিত্ত রায় 'সুহৃৎ সরকার' চরিত্রের ব্যক্তিত্ব মোটেই পরিস্ফুট করে তুলতে পারেন নি। মণি চৌধুরীকে 'সুবীর' হিসেবে ভেবে নিতে মনে দারুণ হোঁচট লাগছিল। একমাত্র 'অরুণাভ' চরিত্রের রূপকার উশীনর বিশ্বাস মোটামুটি নৈপুণ্যের সঙ্গে চরিত্রটির যন্ত্রণা আমাদের উপলব্ধির প্রহরে পৌঁছে দিতে পেরেছেন। শংকর দাশগুপ্তের 'দাদু'ও একটি প্রাণোচ্ছল চরিত্রচিত্রণ হোতে পেরেছে। গীতশ্রী দেবীর কমলাও মোটামুটি সার্থক একটি সৃষ্টি বলা যেতে পারে।

অন্য কয়েকটি ভূমিকায় ছিলেন মহুতী বোস, মিস পলিন, দেবেন্দ্রবিজয় ঘটক, অজয় গাঙ্গুলী, শিশির বিশ্বাস, বেলা রায়, জগন্নাথ চ্যাটার্জি, মুরারী জানা, অজিত চ্যাটার্জি, নীলিমা বোস, তাপস সেনগুপ্ত। নাটকটি পরিচালনা করেন শ্রীদীনেন রায়।

আর্ট থিয়েটার কাঁচরাপাড়া : গত ৩রা সেপ্টেম্বর, শুক্রবার আর্ট থিয়েটারের বিশিষ্ট শিল্পী ও নাট্য পরিচালক সুনীলকুমার মুখোপাধ্যায় পরলোকগমন করেন। এই জন্য আর্ট থিয়েটারের শিল্পীরা ক্লাব প্রাঙ্গণে গত ৫ই সেপ্টেম্বর এক শোকসভা করেন। শিল্পীর শিল্পসাধনা এবং কর্ম-প্রেরণা জনমানসে যে প্রতিফলন ছিল তাকে বিবেচনা করেই আর্ট থিয়েটার এবং অভিযাত্রী সম্প্রদায় গত ২০ সেপ্টেম্বর স্থানীয় ক্ষুদিরাম বসু মঞ্চে যৌথভাবে এক শোক সভা এবং নাট্যাভিনয়ের ব্যবস্থা করেন। বিশিষ্ট সাংবাদিকগণ এই সভায় উপস্থিত থাকেন। স্থানীয় পৌরপিতা শ্রীঅমূল্য উকিল এই সভায় সভাপতিত্ব করেন। উদ্যোক্তাদের পক্ষ থেকে ৫০১্ টাকা গুরু-দক্ষিণা হিসেবে গুরু পত্নীর হাতে অর্পণ করা হয়। শিল্পী সুনীল মুখোপাধ্যায় ছোটবেলা থেকেই নাটকের প্রতি অনুরাগী ছিলেন। তিনি নাট্যাচার্য শিশির ভাদুড়ীর সঙ্গে জীবনরঙ্গ নাটকে নায়ক চরিত্রে অভিনয় করেন। শিল্পী হিসেবে তিনি বহু বিশিষ্ট ব্যক্তির আশীর্বাদধন্য ছিলেন। ভারতীয় গণনাট্য সঙ্ঘের শিল্পী হিসেবে তিনি বহু নাটকে অংশগ্রহণ করেন। তাঁর পরিচালিত নাটকের তালিকায় আছে তুলসী লাহিড়ীর লক্ষ্মীপ্রিয়ার সংসার, দুঃখীর ইমান, ঝড়ের মিলন ও ছেঁড়া তার। ঋত্বিক ঘটকের দলিল এবং বীরু মুখোপাধ্যায়ের রাহুমুক্ত। সুনীল বাবুরই উদ্যোগে ছেঁড়া তার নাটককে যাত্রায় রূপান্তরিত করে শোভাবাজার রাজবাড়ীতে যাত্রা উৎসবে অভিনয় করা হয়। চলচ্চিত্রেও তাঁকে দেখা গেছে, সাঁঝের প্রদীপ নামক ছবিতে। মাত্র ৪৭ বৎসর বয়সে তাঁর আকস্মিক পরলোকগমনে মফঃস্বল নাট্য-মঞ্চের আন্দোলন ক্ষতিগ্রস্ত হলো।

শ্রীরামপুর প্রিমরোজ মিউজিক্যাল অ্যাসোসিয়েশন : সমিতির ৭৭ বৎসর পূর্তি উপলক্ষে ৯ দিনব্যাপী বিরাট নাট্যোৎসব শ্রীরামপুর রবীন্দ্র ভবনে গত ৪ সেপ্টেম্বর '৭১ থেকে ১২ সেপ্টেম্বর '৭১ পর্যন্ত অনুষ্ঠিত হয়। ৮ দিনব্যাপী একাঙ্ক নাটক প্রতিযোগিতা এবং নবম দিনে গত বৎসরের বিজয়ীগণকে পুরস্কৃত করা হয় ও সমিতির সভ্যগণ কর্তৃক 'মাটির কেল্লা' যাত্রাভিনয় অনুষ্ঠিত হয়। নবম দিন অর্থাৎ ১২ সেপ্টেম্বর '৭১ তারিখের পুরস্কার বিতরণী সভায় সভাপতিত্ব করেন শ্রী এন কে চক্রবর্তী (মহকুমা শাসক) এবং পুরস্কার বিতরণ করেন শ্রীমতী নন্দিতা চক্রবর্তী। বর্তমান বৎসরের একাঙ্ক নাটক প্রতিযোগিতায় বিজয়ীদের তালিকা :—১ম — লেকরঙ্গ : মহাকাব্য, ২য়—ইউনিট থিয়েটার কয়ার : ইতিহাস কাঁদে, ৩য়—অনির্বাণ : তালাচাবির বন্ধ, ৪র্থ—পুনশ্চ সাহিত্য পরিষদ : ঘরে ফেরার ডাক এবং ইউথ থিয়েটার : পুরাতন কাহিনী, ৫ম—কৃষ্ণচূড়া : কবর থেকে বলছি, এবং ৬ষ্ঠ—মহুয়া সাহিত্য পরিষদ : সভ্যতা ভয় পেও না।

রক্তকরবী অভিনয় : গত ২২শে সেপ্টেম্বর কুচবিহারের সরকারী জেনকিনস স্কুলের শিক্ষকবৃন্দ মঞ্চস্থ করে কবিগুরুর 'রক্তকরবী' স্থানীয় রাষ্ট্রীয় পরিবহন মঞ্চে। নাটকের পরিচালনা ও অভিনয় দর্শকবৃন্দের প্রশংসা অর্জন করে কিন্তু আলোকসম্পাত ও ধ্বনি প্রক্ষেপণের কাজ ছিল ত্রুটিপূর্ণ। নাটকের আবহসঙ্গীত সুপ্রযুক্ত হলেও কণ্ঠ-সঙ্গীতে আরও যত্নের অবকাশ ছিল। অভিনয়ে প্রথমেই নাম করতে হয় 'গোঁসাই' চরিত্রাভিনেতা প্রশান্ত গোস্বামীর। তাঁর অনবদ্য অভিনয়ে আশ্চর্য জীবন্ত হয়ে উঠেছিল এই চরিত্রটি। শ্রীগোস্বামী তাঁর পরিণত শিল্পবোধ নিয়ে যে অপরূপ অভিনয় করেন এই ছোট্ট চরিত্রটিতে তা সত্যই ভোলা যায় না। তার পরেই নাম করতে হয় 'চন্দ্রা'বেশী শ্রীমতী দোলন দাসের। তাঁর অভিনয়ও দর্শকমনে দোলা দেয়। মঞ্চে আবির্ভাবের পূর্বে পর্যন্ত রাজার ভূমিকায় বিনয় সেনের অভিনয় সুন্দর। কিন্তু 'নন্দিনী'বেশী শ্রীমতী ডলি ঘোষ দর্শকমনে রেখাপাত করতে পারেন নি। অধ্যাপক ও সর্দারের চরিত্রে যথাক্রমে শংকরদেব চক্রবর্তী ও দিলীপ দত্তের অভিনয় যথাযথ। অন্যান্য কয়েকটি বিশেষ চরিত্রে অংশ গ্রহণ করেন শংকরপ্রসাদ চক্রবর্তী, খগেন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য, রমেন্দ্রনারায়ণ সাহা, রামপ্রসাদ নায়েক ও নীরেন হোড়।

বীণাপাণি সঙ্গীত সমাজের পরবর্তী নাটক : বেহালার বনমালী নস্কর রোডের এই সংস্থার সভ্যেরা বাৎসরিক 'শারদ অনুষ্ঠান' উপলক্ষ্যে সুপ্রকাশ ব্যানার্জির পরিচালনায় 'সংক্রান্তি' ও 'লবণাক্ত' নাটক দুটি মঞ্চস্থ করবেন স্থানীয় প্রসূতি-সদন প্রাঙ্গণে। সভাপতিরূপে শ্রীক্ষীরোদ গঙ্গোপাধ্যায় এবং দুই দিনে প্রধান অতিথি থাকবেন দুইজন প্রবীণ চলচ্চিত্র শিল্পী। সংস্থার ৮৮তম ও ৮৯তম নাট্যরজনী দুটিতে অংশ নেবেন প্রকাশ চ্যাটার্জি, সুনীল ভট্টাচার্য, বিশ্বনাথ পাল, অতুল চক্রবর্তী, মানিক গাঙ্গুলী, প্রবোধ ব্যানার্জি, সুধীর দাস, অরবিন্দ ব্যানার্জি, প্রভাত ব্যানার্জি প্রমুখ।

লোকতীর্থের 'পঞ্চমিত্র' : দক্ষিণ কলকাতার জনপ্রিয় নাট্যগোষ্ঠী 'লোক-তীর্থে'র শিল্পীরা কয়েকদিন আগে অফুরন্ত হাসির উচ্ছলতায় ভরা নাটক, 'পঞ্চমিত্র' আর একবার পরিবেশন করলেন 'থিয়েটার সেন্ট্রারে'। সংসারে অভাব অনটন ও বেকারত্বর বাধাকে ধীরে ধীরে কিভাবে পাঁচজন ভিন্ন প্রতিভাসম্পন্ন তরুণ জয় করলো, তাই বিষণ্ণতায় আর উচ্ছলতায় এই নাটকের দর্শকের মনকে জয় করেছে।

অপূর্ব টিমওয়ার্ক, সুষ্ঠু পরিচালনা এবং প্রত্যেক অভিনেতা ও অভিনেত্রীর ব্যক্তিগত নিখুঁত চরিত্রানুযায়ী অভিনয় প্রযোজনটিকে সফল করে তুলেছে। বিভিন্ন ভূমিকায় কৃতিত্বের স্বাক্ষর রেখেছেন যথাক্রমে মনি ভট্টাচার্য, অর্দ্ধেন্দু রায়, প্রযোজনাটিকে সফল করে তুলেছে। বিভিন্ন গঙ্গোপাধ্যায়, মঞ্জুশ্রী সেনগুপ্ত, স্বপ্না মিত্র প্রভৃতি। নাট্য পরিচালনা ও সঙ্গীত পরিচালনায় ছিলেন বিমল দে ও প্রভাত-

ভূষণ। কন্ঠসংগীতেও প্রভাতভূষণ যথেষ্ট মুন্সিয়ানার পরিচয় দেন।

বন্ধু মহলের সোনার সিঁড়ি

কিছুদিন আগে বন্ধু মহলের শিল্পীরা মীরা দেবীর কাহিনী অবলম্বনে দীপংকর বন্দ্যোপাধ্যায়ের নাট্যরূপকৃত **সোনার সিঁড়ি** নাটকখানি মঞ্চস্থ করেন বিশ্বরূপায়।

অভিনয়ের ব্যাপারে নীলমণি চরিত্রাভিনেতা অজিত মুখোপাধ্যায়ের নাম সর্বাগ্রে উল্লেখযোগ্য। এরপরেই কল্পনা মুখোপাধ্যায়ের প্রীতি ও অরুণ সেনের নাট্যকার চরিত্র দুটি খুব প্রাণবন্ত হয়। অন্যান্য চরিত্রে মঞ্জুলা ভট্টাচার্য, রীতা বন্দ্যোপাধ্যায়, দীপংকর বন্দ্যোপাধ্যায়, ললিত মিত্র, প্রকাশ বসু, কালীশ লক্ষ্যণ প্রভৃতি সুঅভিনয় করেন। নাটকটি পরিচালনা করেন অরুণ সেন।

উজ্জ্বল সংঘের সূর্যমুক্তি ঃ বাংলাদেশের মুক্তিযোদ্ধাদের অসীম আত্মত্যাগ ও জঙ্গী পাকিস্থানি সেনাদের বর্বর অমানুষিক নিষ্পেষণ ও অত্যাচারের পটভূমিকায় গড়ে ওঠা একটি জ্বলন্ত বাস্তব নাটক কিছুদিন আগে পরিবেশিত হোল মিনার্ভা রঙ্গমঞ্চে। নাটকটি প্রযোজনা করলেন হালদারবাগান উজ্জ্বল সংঘের শিল্পীরা। সজল ভট্টাচার্য রচিত এই নাটকটির পরিবেশনা মোটামুটিভাবে সুন্দরই হয়েছে বলতে হবে। নাট্যকার স্বয়ং নির্দেশনার দায়িত্ব বহন করেন।

কয়েকটি বিশিষ্ট ভূমিকায় ছিলেন অজয় পোদ্দার, মনোজেন্দ্র চক্রবর্তী, শংকর মুখার্জি, সজল ভট্টাচার্য, দেবীপ্রসাদ রায় চৌধুরী। বিশ্বরঞ্জন কুণ্ডু ও গোরাচাঁদ মুখার্জি নাটকটির সঙ্গীত পরিচালনায় নৈপুণ্যের পরিচয় রাখেন।

থিয়েটার কমপ্লেকসের দুটি নাটক ঃ 'থিয়েটার কমপ্লেকসে'র শিল্পীরা সম্প্রতি রঙ্গনায় দুটি নাটক পরিবেশন করে নাট্যানুরাগীদের প্রশংসা অর্জন করেন। নাটক দুটি হোল বসন্ত ভট্টাচার্যের 'সারি সারি পাঁচিল' ও কিরণ মৈত্রের 'অন্য ছায়া'।

প্রথম নাটকে অংশগ্রহণকারী শিল্পীদের অভিনয়ে কিছুটা শৈথিল্য থাকা সত্ত্বেও সামগ্রিকভাবে এর প্রযোজনাটি হয়তো সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়নি। নাটকের শেষ মুহূর্তে আবদুলের চরিত্রাভিনেতা শ্যামল রায়চৌধুরী দর্শকদের চিত্ত জয় করতে সমর্থ হয়েছেন। এই নাটকের অন্যান্য শিল্পীরা হোলেন অনিল দাশ (শঙ্কর), আশীষ ভট্টাচার্য (নির্মল), সমর চক্রবর্তী (নকুল), অসিতবরণ দাশ (সনৎ) ও শশাঙ্কশেখর হাজরা (ইন্সপেক্টর)। নাটকটি নির্দেশনার দায়িত্ব নেন অনিল দাশ।

পরবর্তী নাটক 'অন্যছায়া'র পরিবেশনা অনেক বেশী আকর্ষণীয় হয়ে ওঠে। এর জন্য প্রথমেই প্রশংসার দাবী রাখেন পরিচালক শ্যামল রায়চৌধুরী। তাঁর শিল্পবোধের স্বচ্ছতা কয়েকটি মুহূর্তে সুন্দর ধরা পড়েছে। বর্তমান সমাজব্যবস্থায় অর্থনৈতিক বৈষম্য এবং প্রতিকূল পারিপার্শ্বিক অবস্থার চাপে পড়ে বর্তমান যুব সমাজ কিভাবে বিপথে চালিত হয়ে অজানা বিপর্যয়ের দিকে এগিয়ে চলেছে—সেদিকে লক্ষ্য রেখেই এই নাটকের বিষয়বস্তু রচিত।

নায়িকার ভূমিকায় অপর্ণা সেন। পরিচালনা ঃ অরবিন্দ মুখোপাধ্যায়। ফটো ঃ অমৃত।

অভিনয়ের ব্যাপারে প্রথমেই যাঁদের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য তাঁরা হোলেন শ্যামল রায়চৌধুরী (নিমে), দিলীপকুমার (মণ্টু), মাস্টার মিঠু (পল্টু)। এঁরা তিনজনই যেন নিজেদের চরিত্রের সঙ্গে নিবিড়ভাবে মিশে যেতে পেরেছিলেন।

অন্যান্য চরিত্রে ছিলেন সমর চক্রবর্তী (পশুপ), হরদেব সাধুখাঁ (মোহনবাবু), অজিতকৃষ্ণ দে (রামচরণ), অসিতবরণ দাশ (হরি), শ্যামল রক্ষিত (ভবনাথ), অনিল দাশ (গুপী), সুমন রক্ষিত (সূত্রধর)। আবহসঙ্গীত মোটামুটিভাবে নাটকটির অগ্রগতির সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলেছে।

চোর ঃ শ্রীছবি বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'চোর' নাটকটি কিছুদিন আগে সাফল্যের সঙ্গে পরিবেশিত হোল 'কলামন্দিরে'। অভিনয়ের আয়োজন করেন ইউনাইটেড ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়া (পার্কসার্কাস শাখা) কর্মচারী সমিতির শিল্পীরা। নাটকটির প্রযোজনায় যেমন শিল্পীদের সংঘবদ্ধ অভিনয় বৈশিষ্ট্য মূর্ত হয়ে উঠেছে, তেমনি স্পষ্ট হয়েছে পরিচালক শ্রীকুসুম নাগের আন্তরিক নিষ্ঠা আর শৈল্পিক চিন্তা।

প্রায় প্রতিটি চরিত্রই সুঅভিনীত হয়েছে। অসিত বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'রামলাল', রমেশ ভট্টাচার্যের 'ধর্মদাস', সুকুমার দাসের 'ডাঃ মুখার্জি' ও পুতুল চক্রবর্তীর 'কাজল'

সত্যি কয়েকটি বিশিষ্ট চরিত্রচিত্রণ হোতে পেরেছে। অন্যান্য কয়েকটি ভূমিকায় রূপ দেন প্রশান্ত গুহ, বিজন ভট্টাচার্য, রাধাশ্যাম বন্দ্যোপাধ্যায়, বরুণ চক্রবর্তী, বিমল ভৌমিক, ভরত ধর, রথীন্দ্রনাথ দত্ত, বঙ্কিম মাইতি, নলিনী বেরা, লিলি গাঙ্গুলী, সংগীতা কর, মৃণাল ঘোষ দস্তিদার।

শতাব্দী গোষ্ঠীর 'বাকী ইতিহাস' : শতাব্দী গোষ্ঠীর শিল্পীরা কয়েকদিন আগে ইউনিভার্সিটি ইনস্টিটিউট মঞ্চে বাদল সরকারের 'বাকী ইতিহাস' নাটকটি পরিবেশন করেন। বিভিন্ন ভূমিকায় অভিনয় করেন মাধব চট্টোপাধ্যায় (শরদিন্দু), দুলাল রায়, তৃপ্তি দাস (সীতানাথের স্ত্রী), বাদল রায় (সীতানাথ), নবগোপাল চক্রবর্তী (বিজয়), বিশ্বনাথ মুখার্জি (বাসুদেব), প্রফুল্ল রায় (নিখিল), রথীন বসু (বিধুবাবু), শিবানী ভট্টাচার্য (বাসন্তী)।

ত্রিতীর্থের ছুটির খেলা : বালুরঘাটের প্রগতিশীল নাট্যগোষ্ঠী ত্রিতীর্থের শিল্পীরা সম্প্রতি অনিতা রায়ের মিষ্টিমধুর নাটক 'ছুটির খেলা' মঞ্চস্থ করে নাট্যরসিকদের প্রচুর স্বীকৃতি পেয়েছেন। এটি রুমানিয়ান নাট্যকার মিখাইল সেবেস্তিয়ানের নাটক অবলম্বনে রচিত হয়েছে। নাটকটির মুখ্য দুটি চরিত্রে পুলক সেনগুপ্ত (রঞ্জন), করবী রায় (করুণা) অপূর্ব অভিনয় করেছেন। অন্যান্য ভূমিকায় ছিলেন পল্টু সাহা, ধীরেন ঘোষ, কানাই দত্ত, বতীন ভৌমিক, রতন ঘোষ, অর্ধেন্দু সরকার, প্রভাস সমাজদার। মঞ্চপরিকল্পনা ও নির্দেশনায় মাধব মুখার্জি স্বাতন্ত্র্যের স্বাক্ষর রাখেন।

বিবিধ সংবাদ

টি-ভি-তে শিশুনাটিকা : রাজধানী দিল্লী তথা সামগ্রিকভাবে ভারতবর্ষের শিল্পসংস্কৃতির আসরে আর একটি প্রোজ্জ্বল অধ্যায় সূচিত হোল। এই প্রথম ভারতীয় টেলিভিশনে একটি শিশুনাটিকার প্রাণোচ্ছল পরিবেশন সংস্কৃতানুরাগীদের সত্যি করলো আপ্লুত। এর পরিবেশনের দায়িত্ব নেন দিল্লীর করোলবাগের শিশুদের একটি প্রখ্যাত সংস্থা 'দেবকলামন্দির'। নাটিকাটির নাম হোল 'গগনে উদিল রবি'। ছোট ছোট কয়েকটি সবুজ মনের ছোঁয়ায় গড়ে ওঠা সে নাট্যানুষ্ঠানটির মধ্যে শুধু উচ্ছলতা ছিল না, ছিল পরিণত শৈল্পিক মনের স্বাক্ষর।

রবীন্দ্রনাথের জন্মতিথিকে কেন্দ্র করে এই নাটিকাটি লিখেছেন স্বপন-বুড়ো। সুষ্ঠু পরিবেশনের জন্য যেমন নাট্যনির্দেশক অমর দাস সবার অভিনন্দন লাভ করবেন, তেমনি অকুণ্ঠ স্বীকৃতি পাবেন সঙ্গীতনির্দেশক ব্যোমকেশ বন্দ্যোপাধ্যায়। দেবকলামন্দিরের প্রতিষ্ঠাতাও তিনি। তাঁর মর্মস্পর্শী সুরসংযোজনা অনুষ্ঠানটিকে প্রাণময় করে তোলে। নাটিকাটির বিষয়বস্তু প্রথমে হিন্দীতে ব্যাখ্যা করা হয়, যাতে অবাঙালী শ্রোতারা এর মধ্যে আন্তরিকতার জোয়ারে ডুব দিতে পারে। জাপানের শিশুনাট্য ও চলচ্চিত্র উৎসবে এ নাটকটি প্রদর্শিত হবে বলে জানা গেছে।

সাহিত্য ও সংগীত প্রতিযোগিতা : গুসকরা (বর্ধমান) 'সম্প্রদায়' সংস্থা আহূত ৪র্থ বর্ষ স্বরূপ স্মৃতি সাহিত্য ও রবীন্দ্র-সঙ্গীত প্রতিযোগিতার আয়োজন করেছেন। বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক এবং বিশিষ্ট সংগীতজ্ঞরা এই প্রতিযোগিতার বিচারক হিসেবে সহযোগিতা দিতে সম্মত হয়েছেন। এই সম্পর্কে বিস্তৃত বিবরণ 'সম্প্রদায়'-এর সাংস্কৃতিক সম্পাদকের কাছে পাওয়া যাবে।

বাংলাদেশের সাহায্যার্থে অনুষ্ঠান

বাংলাদেশের নিপীড়িত জনগণের সাহায্যার্থে সম্প্রতি ঝুমরীতিলাইয়ার (বিহার) স্থানীয় বৃন্দাবন প্রেক্ষাগৃহে দু'দিনব্যাপী এক মনোরম বিচিত্রানুষ্ঠান হয়ে গেল। এই অনুষ্ঠানে স্থানীয় শিল্পীদের পাশাপাশি কলকাতার খ্যাতনামা শিল্পীরাও অংশ গ্রহণে এগিয়ে আসেন। সঙ্গীতানুষ্ঠানে অন্যান্যদের মধ্যে ছিলেন জনপ্রিয় শিল্পী কার্তিক-বসন্ত, কৃষ্ণা দাশগুপ্ত। নৃত্যে মাধুরী, জয়শ্রী, সীমা দে, বীণা ও রত্না। অর্কেস্ট্রায় ছিলেন মথুরা দাস ও সম্প্রদায়। তবলা সংগতে অরূপ, বুলন ও মন্টু। অনুষ্ঠানের শেষার্ধে মূকাভিনয়ে অংশ নেন কলকাতার প্রতিভাবান তরুণ মূকাভিনেতা দীপক ঘোষ। শ্রীঘোষের 'জয় বাংলা' ফিচারটি এখানেও অশেষ জনপ্রিয়তা লাভ করে।

এ-ভি-এম-এর নতুন দান :

ভারতীয় চলচ্চিত্র জগতে মাদ্রাজের এ-ভি-এম বহু নতুনত্বের সূচনা করেছে। ১৯৭১-এর ৯ আগস্ট এ-ভি-এম স্টুডিও তার পঁচিশ বছরের জীবন পূর্ণ করেছে। এবং এই দিনই এ-ভি মায়াপ্পান-এর পঁয়ষট্টিতম জন্মদিবস পালিত হয়। এই উপলক্ষ্যে শ্রীমায়াপ্পান আনন্দ উৎসবের মধ্যে ঘোষণা করেন যে, তিনি তাঁর কর্মীদের জীবনে নিরাপত্তাবোধ জাগ্রত করবার জন্যে তাদের প্রত্যেকের জীবনবীমার সুযোগ দেবেন। প্রায় ৮৫০ জন কর্মীর জন্যে ২০ লক্ষ টাকার জীবনবীমা করা হয় এবং এর জন্যে প্রতি বছর ১,২৫,০০০ টাকা বাৎসরিক কিস্তি হিসেবে দেওয়া হবে। কর্মীরা যতদিন তাঁর প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত থাকবে, ততদিন শ্রীমায়াপ্পান তাদের জীবনবীমার বার্ষিক প্রিমিয়াম দিতে স্বীকৃত হন। একটি বিশেষ অনুষ্ঠানে তামিলনাড়ুর মুখ্যমন্ত্রী ডঃ এম, করুণানিধির উপস্থিতিতে রাজ্য সরকারের শ্রমমন্ত্রী শ্রীএন, ডি, নটরাজন্ কর্মীদের মধ্যে বীমাপত্রগুলি বিতরণ করেন।

পুনর্মিলন উৎসব

সম্প্রতি ইন্দিরা প্রেক্ষাগৃহে 'ভবানীপুর সুইমিং এ্যাসোসিয়েশনের পুনর্মিলন উৎসব এক মনোজ্ঞ অনুষ্ঠানের মধ্যে দিয়ে বিপুল সার্থকতার সঙ্গে অনুষ্ঠিত হল বহু বিশিষ্ট শিল্পী এবং বিদগ্ধ জনমণ্ডলীর উপস্থিতিতে। এ্যাসোসিয়েশনের পক্ষ থেকে প্রধান অতিথি শ্রীসাভাইলাল, কে শা উর্বশী পুরস্কারপ্রাপ্তা বাংলা ছায়াচিত্রের নায়িকা শ্রীমতী মাধবী চক্রবর্তীকে সংবর্ধনা জানান। সভাশেষে মিঃ পিমি অনুষ্ঠানে অংশ গ্রহণকারী শিল্পী ও দর্শকবৃন্দকে আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। সংবর্ধনা শেষে সংগীতানুষ্ঠানে অংশ গ্রহণ করেন তরুণ বন্দ্যোপাধ্যায়, বনশ্রী সেনগুপ্তা ও তরুণকুমার এবং আবৃত্তিতে দেবদুলাল বন্দ্যোপাধ্যায়। সর্বশেষে উত্তমকুমার মাধবী চক্রবর্তী অভিনীত 'থানা থেকে আসছি' চলচ্চিত্রটি প্রদর্শিত হয়। সমগ্র অনুষ্ঠানটি দর্শকগণ আনন্দের সঙ্গে উপভোগ করেন।

রক্তকরবী সবপেয়েছির আসর

সুকুমার রায়ের বিখ্যাত ছড়ার বই 'আবোল তাবোল'কে মঞ্চে বাস্তবায়িত করা এক দুরূহ প্রয়াস। কিন্তু সম্প্রতি বালিগঞ্জ শিক্ষাসদনে রক্তকরবী সবপেয়েছির আসরের ভাইবোনেরা রসোত্তীর্ণ মঞ্চাভিনয় করে সেই দুরূহ প্রয়াসকে সফল ও সার্থক ক'রে তুলেছে। 'আবোল তাবোলের' মঞ্চাভিনয় সম্ভবত এই প্রথম। ছড়াগুলির কাহিনী ও কৌতুকরসকে যথোপযুক্ত সুরে-তালে-লয়ে নৃত্য-গীত ও মূকাভিনয়ের মাধ্যমে অপূর্বভাবে মঞ্চে ফুটিয়ে তোলা হয়। সংস্থার শিশু ও কিশোর শিল্পীদের একক ও দলগত অভিনয় বাস্তবিকই প্রশংসনীয়। এই প্রয়াসকে সার্থক করেছে শ্রীপ্রণব চৌধুরীর সুরারোপ ও সঙ্গীত পরিচালনা, শ্রীমতী ঝর্ণা দত্তের নৃত্য-পরিচালনা এবং পরিমিত আবহসংগীতের নেপথ্যভূমিকা। কিন্তু আলোক-সম্পাতের ত্রুটি ঈপ্সিত পরিবেশকে বিঘ্নিত করেছে বহুবার। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন স্বপনবুড়ো এবং প্রধান অতিথি ছিলেন শ্রীঅমল মুখোপাধ্যায়।

বার্ষিক উৎসব

শিশিরকুমার ইনস্টিটিউটের অ্যাম্বুলেন্স, নার্সিং ও ক্যাডেট ডিভিসনের ৩১তম বার্ষিক উৎসব বিপুল সমারোহে উৎসাহ-উদ্দীপনার মধ্যে অনুষ্ঠিত হয়ে গেল কদিন আগে উত্তরা সিনেমা মঞ্চে। পৌরোহিত্য করেন ডিভিসনের সভাপতি শ্রীসুধীরকুমার বোস এবং প্রধান অতিথি হয়েছিলেন অ্যাডভোকেট শ্রীসুহৃদগোপাল দত্ত। রোগ প্রতিকার ও নিরাময় ও নানা সেবাকাজের মধ্যে দিয়ে ডিভিসন যেভাবে আর্ত মানুষের সেবা করে আসছেন সুদীর্ঘকাল ধরে উদ্বোধনী ভাষণে শ্রীদত্ত তার ভূয়সী প্রশংসা করেন। সভাপতি শ্রীবোস ডিভিসনের সেবাকাজের বিস্তৃত বিবরণ দেন এবং সহায়তা-সহযোগিতার জন্যে সকলকে আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। সভাশেষে 'জতুগৃহ' ছায়াচিত্রটি প্রদর্শিত হয়।

খেলাধুলা

দর্শক

বিশ্ব ক্রিকেট দল অস্ট্রেলিয়া সফরে

অস্ট্রেলিয়ার ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ড আফ্রিকান ক্রিকেট দলের ১৯৭১-৭২ সালের অস্ট্রেলিয়া সফর বাতিল করে তার জায়গায় বিশ্ব ক্রিকেট দলের অস্ট্রেলিয়া সফর মঞ্জুর করেছে। দক্ষিণ আফ্রিকান ক্রিকেট দলের অস্ট্রেলিয়া সফর বাতিল হওয়ার কারণ খেলাধুলোর আসরে দক্ষিণ আফ্রিকান সরকারের বহুনিন্দিত বর্ণ বৈষম্য নীতি। অস্ট্রেলিয়ার জনমত এই সরকারী নীতির বিরুদ্ধে ছিল। অস্ট্রেলিয়ার ক্রিকেট বোর্ড শেষ পর্যন্ত জনসাধারণের রায় মেনে নিতে বাধ্য হয়।

বিশ্ব ক্রিকেট দলের অস্ট্রেলিয়া সফরের উদ্যোক্তারা ৬টি দেশের মোট ১৬ জন খেলোয়াড় নিয়ে বিশ্ব ক্রিকেট দল তৈরী করেছেন—ভারতবর্ষের ৩ জন, ওয়েস্ট ইণ্ডিজের ৩ জন, পাকিস্তানের ৩ জন, দক্ষিণ আফ্রিকার ৪ জন, ইংল্যাণ্ডের ২ জন এবং নিউজিল্যাণ্ডের ১ জন খেলোয়াড়। দক্ষিণ আফ্রিকার ৪ জন খেলোয়াড়ের মধ্যে পোলক ভ্রাতৃদ্বয় ডিসেম্বর মাসে সফরের খেলায় যোগদান করবেন। বিশ্ব ক্রিকেট দলের সফর শুরু হবে ৫ই নভেম্বর এবং

...গারফিল্ড সোবার্স

তারা শেষ খেলায় নামবে ২৮শে জানুয়ারী। অস্ট্রেলিয়া সফরের তালিকায় আছে মোট ১৬টি খেলা—৫ দিন ব্যাপী খেলা ৫টি, ৪ দিনব্যাপী খেলা ৫টি, ৩ দিনব্যাপী খেলা ৩টি, ২ দিনব্যাপী খেলা ১টি এবং একদিনের খেলা ২টি। অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে পাঁচদিনব্যাপী যে পাঁচটি খেলা হবে তার নাম টেস্ট খেলা দেওয়া হয়নি, অন্য কিছু একটা নাম দেওয়া হবে স্থির হয়েছে। যে নামই দেওয়া হোক না কেন এই খেলাগুলি টেস্ট খেলার পদমর্যাদা লাভ করবে।

ভারতবর্ষ থেকে এই বিশ্ব ক্রিকেট দলে স্থান পেয়েছেন এই তিনজন খেলোয়াড়—ফারুক ইঞ্জিনিয়ার, বিষেণসিং বেদী এবং সুনীল গাভাস্কার।

বিশ্ব দলে নির্বাচিত খেলোয়াড়বৃন্দ

ওয়েস্ট ইণ্ডিজ : গারফিল্ড সোবার্স (অধিনায়ক), ক্লাইভ লয়েড এবং রোহন কানহাই

ভারতবর্ষ : ফারুক ইঞ্জিনিয়ার, বিষেণ সিং বেদী এবং সুনীল গাভাস্কার

পাকিস্তান : ইন্তিখাব আলম (সহ-অধিনায়ক), আসিফ মাসুদ এবং জাহির আব্বাস

ইংল্যাণ্ড : রিচার্ড হাটন এবং নরম্যান গিফোর্ড

দঃ আফ্রিকা : গ্রেমী পোলক, পিটার পোলক, হিলটন অ্যাকারম্যান এবং টনি গ্রেগ

নিউজিল্যাণ্ড : বব কুনিস

পাঁচদিনব্যাপী খেলার তালিকা

ব্রিসবেন : নভেম্বর ২৬, ২৭, ২৮, ৩০ এবং ডিসেম্বর ১।

পার্থ : ডিসেম্বর ১০, ১১, ১২, ১৪ ও ১৫

মেলবোর্ন : জানুয়ারী ১, ২, ৩, ৫ ও ৬

সিডনি : জানুয়ারী ৮, ৯, ১০, ১২ ও ১৩

এডিলেড : জানুয়ারী ২৮, ২৯, ৩১ এবং ফেব্রুয়ারী ১ ও ২

আন্তঃ বিশ্ববিদ্যালয় সন্তরণ

জয়পুরে অনুষ্ঠিত আন্তঃ বিশ্ববিদ্যালয় সন্তরণ প্রতিযোগিতায় কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ৬৬ পয়েণ্ট সংগ্রহের সূত্রে ছাত্র-বিভাগে দলগত চ্যাম্পিয়ানসীপ লাভ করেছে। এই নিয়ে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় দল ছাত্র-বিভাগে উপর্যুপরি ১১ বার দলগত চ্যাম্পিয়ান হল। এবার ছাত্র-বিভাগের ব্যক্তিগত চ্যাম্পিয়ানসীপ পেয়েছেন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়েরই ছাত্র সঞ্জীব সাহা।

চূড়ান্ত ফলাফল

ছাত্র বিভাগ

দলগত : ১ম কলকাতা (৬৬ পয়েণ্ট), ২য় বোম্বাই (১৫ পয়েণ্ট), এবং ৩য় কেরালা (১১ পয়েণ্ট)

ব্যক্তিগত : ১ম সঞ্জীব সাহা (কলকাতা) ১৭ পয়েণ্ট, ২য় রাজীব সাহা, বমেন্দ্রনারায়ণ দাস (কলকাতা) এবং শশীধর নরিন (কেরালা) ১০ পয়েণ্ট এবং ৩য় পি নাথ (কলকাতা) ৯ পয়েণ্ট

মেয়েদের ৪×৪০০ মিটার দৌড়ে বিশ্ব রেকর্ড : পশ্চিম জার্মাণীর হিলডে ফেলক, ক্রিস্টা মের্টেন, সিলভিয়া স্নেক এবং এলেন টিটেল ৪×৮০০ মিটার দৌড়ে নতুন বিশ্ব রেকর্ড (৮ : ১৬-৮ মিনিট) করার পর ঠাণ্ডা পানীয় সেবন করে।

মহিলা বিভাগ

দলগত : ১ম গুজরাট এবং পুণা (৫০ পয়েণ্ট), ৩য় পাঞ্জাব (৮ পয়েণ্ট)

ব্যক্তিগত : কুমারী দীপ্তি দীক্ষিত (গুজরাট) ২৭ পয়েণ্ট, ২য় কুমারী মেধা ক্ষোগলেকার (পুণা) ২৪ পয়েণ্ট

ডেভিস কাপ

১৯৭১ সালের ৬০তম ডেভিস কাপ আন্তর্জাতিক লন টেনিস প্রতিযোগিতার চ্যালেঞ্জ রাউন্ড অর্থাৎ ফাইনালে আমেরিকা ৩—২ খেলায় রুমানিয়াকে পরাজিত করে মোট ২৩ বার ডেভিস কাপ জয়ের গৌরব লাভ করেছে। এখানে উল্লেখ্য, বর্তমানে সর্বাধিকবার (২৩) ডেভিস কাপ জয়ের রেকর্ড আমেরিকারই। এই নিয়ে আমেরিকা ৪৭ বার ডেভিস কাপের চ্যালেঞ্জ রাউন্ডে খেলে ২৩ বার কাপ জয়ী হল। অপরদিকে রুমানিয়ার দ্বিতীয়বারের চ্যালেঞ্জ রাউন্ড খেলা। তারা ১৯৬৯ সালের চ্যালেঞ্জ রাউন্ডে আমেরিকারই কাছে ০—৫ খেলায় হার স্বীকার করেছিল।

১৯৭১ সালের চ্যালেঞ্জ রাউন্ডে নিগ্রো খেলোয়াড় আর্থার অ্যাস এবং ক্লিফ রিচে না খেলাতে আমেরিকা খুবই দুর্বল হয়ে পড়ে। অনেকেই ভেবেছিলেন এই সুযোগে রুমানিয়া কাপ জয়ী হবে। প্রথম দুটি সিঙ্গলস খেলাতেই আমেরিকা জয়ী হয়ে ২—০ খেলায় এগিয়ে যায়। ডাবলসের খেলায় রুমানিয়া জয়ী হলে খেলার ফলাফল আমেরিকার পক্ষে দাঁড়ায় ২—১। তৃতীয় সিঙ্গলস খেলায় স্ট্যান স্মিথ স্ট্রেট সেটে রুমানিয়ার টিরিককে পরাজিত করলে আমেরিকা ৩—১ খেলায় অগ্রগামী হয়ে ডেভিস কাপ জয়ী হয়।

ডেভিস কাপের চ্যালেঞ্জ রাউন্ড

১৯৪৬ সাল থেকে ১৯৭১ সাল পর্যন্ত চ্যালেঞ্জ রাউন্ড অর্থাৎ ফাইনাল খেলার সংক্ষিপ্ত ফলাফল :

বছর	বিজয়ী			বিজিত	
১৯৪৬	আমেরিকা	৫	:	অস্ট্রেলিয়া	০
১৯৪৭	আমেরিকা	৪	:	অস্ট্রেলিয়া	১
১৯৪৮	আমেরিকা	৫	:	অস্ট্রেলিয়া	০
১৯৪৯	আমেরিকা	৪	:	অস্ট্রেলিয়া	১
১৯৫০	অস্ট্রেলিয়া	৪	:	আমেরিকা	১
১৯৫১	অস্ট্রেলিয়া	৩	:	আমেরিকা	২
১৯৫২	অস্ট্রেলিয়া	৪	:	আমেরিকা	১
১৯৫৩	অস্ট্রেলিয়া	৩	:	আমেরিকা	২
১৯৫৪	আমেরিকা	৩	:	অস্ট্রেলিয়া	২
১৯৫৫	অস্ট্রেলিয়া	৫	:	আমেরিকা	০
১৯৫৬	অস্ট্রেলিয়া	৫	:	আমেরিকা	০
১৯৫৭	অস্ট্রেলিয়া	৩	:	আমেরিকা	২
১৯৫৮	আমেরিকা	৩	:	অস্ট্রেলিয়া	২
১৯৫৯	অস্ট্রেলিয়া	৩	:	আমেরিকা	২
১৯৬০	অস্ট্রেলিয়া	৪	:	ইতালী	১
১৯৬১	অস্ট্রেলিয়া	৫	:	ইতালী	০
১৯৬২	অস্ট্রেলিয়া	৫	:	মেক্সিকো	০
১৯৬৩	আমেরিকা	৩	:	অস্ট্রেলিয়া	২
১৯৬৪	অস্ট্রেলিয়া	৩	:	আমেরিকা	২
১৯৬৫	অস্ট্রেলিয়া	৪	:	স্পেন	১
১৯৬৬	অস্ট্রেলিয়া	৪	:	ভারতবর্ষ	১
১৯৬৭	অস্ট্রেলিয়া	৪	:	স্পেন	১
১৯৬৮	আমেরিকা	৪	:	অস্ট্রেলিয়া	১
১৯৬৯	আমেরিকা	৫	:	রুমানিয়া	০
১৯৭০	আমেরিকা	৫	:	পঃ জার্মানী	০
১৯৭১	আমেরিকা	৩	:	রুমানিয়া	২

নয়াদিল্লীর রাষ্ট্রপতি ভবনে পদ্মশ্রী উপাধি গ্রহণের পর বিশিষ্ট মহিলা অ্যাথলেট শ্রীমতী কমলজিৎ সান্ধুকে প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী এবং শ্রীমতী সুমতি মোরারজীর সঙ্গে দেখা যাচ্ছে।

ডেভিস কাপের চ্যালেঞ্জ রাউন্ড

(১৯০০-৭১)

দেশ	মোট খেলা	জয়	পরাজয়
আমেরিকা	৪৭	২৩	[illegible]
অস্ট্রেলিয়া	৩৭	২২	[illegible]
গ্রেটবৃটেন	১৬	৯	৭
ফ্রান্স	৯	৬	৩
ইতালী	২	০	২
স্পেন	২	০	২
রুমানিয়া	২	০	২
বেলজিয়াম	১	০	১
জাপান	১	০	১
মেক্সিকো	১	০	১
ভারতবর্ষ	১	০	১
পঃ জার্মানী	১	০	১

অমৃত পাবলিশার্স প্রাইভেট লিঃ-এর পক্ষে শ্রীসুপ্রিয় সরকার কর্তৃক পত্রিকা প্রেস, ১৪, আনন্দ চ্যাটার্জি লেন, কলিকাতা-৩ হইতে মুদ্রিত ও তৎকর্তৃক ১১।১, আনন্দ চ্যাটার্জি লেন, কলিকাতা—৩ হইতে প্রকাশিত।

১১শ বর্ষ
২য় খণ্ড

অমৃত

২৪ সংখ্যা
মূল্য
৫০ পয়সা

Friday 22nd October, 1971 শুক্রবার, ৪ঠা কার্তিক, ১৩৭৮ 50 Paise

সূচীপত্র

প্রচ্ছদ : শ্রীকুমার সান্যাল

নিয়মাবলী

বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

লেখকদের প্রতি

১। অমৃতে প্রকাশের জন্যে প্রেরিত সমস্ত রচনার নকল রেখে পাঠাবেন। মনোনীত রচনার খবর দু-মাসের মধ্যে জানান হয়। অমনোনীত রচনা কোনক্রমেই ফেরৎ পাঠান সম্ভব নয়। লেখার সঙ্গে কোন ডাকটিকিট পাঠাবেন না।

২। প্রেরিত রচনা কাগজের এক পৃষ্ঠায় স্পষ্টাক্ষরে লিখিত হওয়া আবশ্যক। অস্পষ্ট ও দুর্বোধ্য হস্তাক্ষরে লেখা প্রকাশের জন্যে গৃহীত হয় না।

৩। রচনার সংগে লেখকের নাম ও ঠিকানা না থাকলে 'অমৃতে' প্রকাশের জন্যে গৃহীত হয় না।

এজেণ্টদের প্রতি

এজেন্সীর নিয়মাবলী এবং সে সম্পর্কিত অন্যান্য জ্ঞাতব্য তথ্য 'অমৃত' কার্যালয়ে পত্র দ্বারা জ্ঞাতব্য।

গ্রাহকদের প্রতি

১। গ্রাহকের ঠিকানা পরিবর্তনের জন্যে অন্তত ১৫ দিন আগে 'অমৃত' কার্যালয়ে সংবাদ দেওয়া আবশ্যক।

২। ভি-পি'তে পত্রিকা পাঠানো হয় না। গ্রাহকের চাঁদা নিম্নলিখিত হারে মণিঅর্ডারযোগে 'অমৃত' কার্যালয়ে পাঠানো আবশ্যক।

চাঁদার হার

	কলিকাতা		মফস্বল	
বার্ষিক	টাকা	২৫.০০	টাকা	৩০.০০
ষান্মাষিক	টাকা	১২.৫০	টাকা	১৫.৫০
ত্রৈমাসিক	টাকা	৬.২৫	টাকা	৮.০০

'অমৃত' কার্যালয়

১১/১ আনন্দ চ্যাটার্জি লেন,

কলিকাতা—৩

ফোন : ৫৫-৫২৩১ (১৪ লাইন)

এক নজরে

চারটি রাষ্ট্রশিশু : পরিবার পরিকল্পনার কোন তোয়াক্কা না রেখে বিশ্বজননীর আরও চারটি রাষ্ট্রশিশু ভূমিষ্ঠ হল। স্বভাবতই নবজাতকগুলি 'কুয়াড্রুপ্লেট বেবী'র মতো অপুষ্ট ও অপরিণত। কিন্তু তাতে রাষ্ট্রসমাজের দায়দায়িত্ব বহুলাংশে বৃদ্ধি পেলেও নবজাতকগুলির মৃত্যুর কোন আশঙ্কা নেই। ভুটান, কাতার, বাহারিন ও ওমানকে নিয়ে রাষ্ট্রসঙ্ঘের সদস্য সংখ্যা দাঁড়াল ১৩১, এবং রাষ্ট্রসঙ্ঘের সদস্যরূপে তাদের মর্যাদা ও অধিকার হবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, সোভিয়েট ইউনিয়ন প্রভৃতির সমান, যদিও দায়িত্ব বহন করতে হবে ঐ সব বৃহৎ রাষ্ট্রগুলির সহস্র ভাগের এক ভাগেরও কম।

ভুটান ভারতের উত্তরে, হিমালয়ের কোলে অবস্থিত একটি ক্ষুদ্র পার্বত্য রাজ্য। আয়তন ১৮,১৪৭ বর্গমাইল ও লোকসংখ্যা প্রায় আট লক্ষ। অতি দরিদ্র দেশ; নিজস্ব কোন মুদ্রা ব্যবস্থা নেই, ভারতীয় মুদ্রাই সেদেশের মুদ্রা। খনিজ সম্পদ নেই, সেকারণে বৃহৎ শিল্পও গড়ে ওঠে নি কিছু। শ্রেষ্ঠ পণ্য উঁচু জাতের পাহাড়ী খচ্চর, এবং হস্ত ও কুটির শিল্পজাত কিছু পশম ও চামড়ার সামগ্রী। প্রায় সবটুকু বাণিজ্য ভারতের সঙ্গে এবং তা চলে বিনিময় প্রথায় (বার্টার সিসটেম)। তার প্রতিরক্ষার মূল দায়িত্ব ভারতের এবং তার পররাষ্ট্রনীতিও ভারত-নিয়ন্ত্রিত। ভারতই রাষ্ট্রসঙ্ঘে ভুটানের নাম সদস্যপদের জন্য প্রস্তাব করে।

বাহারিন পারস্য উপসাগরীয় অঞ্চলের একটি ক্ষুদ্র কিন্তু তৈলসমৃদ্ধ শেখশাহী। আয়তন মাত্র ২৩১ বর্গমাইল এবং লোকসংখ্যা ১৯৬৯ সালের হিসাবমত ২ লক্ষ ৭ হাজার। ১৮২০ সাল থেকে বৃটিশ রক্ষণাধীন রাজ্য ছিল, এই বছরেই রক্ষণমুক্ত হয়। রাজধানী মানামা, রাজ্যের প্রায় অর্ধেক লোক রাজধানীতে বাস করে। বাহরিনে একটি বৃহৎ তৈল শোধনাগার আছে এবং নানা তৈলজাত পণ্যই তার বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের প্রধান সূত্র।

ওমান পারস্য উপসাগরীয় অঞ্চলের আর একটি আরব-রাজ্য। আয়তন ৮২ হাজার বর্গমাইল কিন্তু লোকসংখ্যা মাত্র ৫ লক্ষ ৬৫ হাজার। অর্থাৎ প্রতি বর্গমাইলে মাত্র সাতজন লোকের বাস। রাজধানী মুস্কাট, একারণে রাজ্যটি আগে মুস্কাট ও ওমান নামে পরিচিত ছিল। পারস্য উপসাগরীয় আরব-রাজ্য কিন্তু তেল নেই, সেকারণে দারিদ্র্যও সীমাহীন। খেজুর, ফল, সব্জি ও মাছ তার প্রধান পণ্য। কোন রাজনৈতিক দলের স্বীকৃতি নেই, শাসন ব্যবস্থায় সুলতানই সর্বেসর্বা। ১৮৫৩ সাল থেকে এই বছর পর্যন্ত বৃটিশ রক্ষণাধীন ছিল।

কাতার পারস্য উপসাগরীয় অঞ্চলে বাহরিন ও ওমানের মধ্যবর্তী আর একটি শেখশাহী। আয়তন ৮,৫০০ বর্গমাইল ও লোকসংখ্যা মাত্র এক লক্ষ। ১৯১৬ সাল থেকে বৃটেনের রক্ষণাধীন রাজ্য ছিল এবং মরুকল্প দেশটির দারিদ্র্য ছিল সীমাহীন। কিন্তু ষাটের দশকে তৈল আবিষ্কৃত হওয়ার পর তার দারিদ্র্যের অবসান ঘটে। তখন থেকে প্রতিবেশী রাজ্যগুলিরও লোলুপ দৃষ্টি কাতারের উপর পড়ে। এখন কাতার স্বাধীন হওয়ায় দুটি-তিনটি প্রতিবেশী রাষ্ট্র নানা 'ঐতিহাসিক' নজির দেখিয়ে ঐ রাজ্যটির উপর দাবী জানাচ্ছে। এ অবস্থায় রাষ্ট্রসঙ্ঘের সদস্য হয়ে কাতার অবশ্যই কিছুটা আত্মরক্ষার সুযোগ পাবে।

রত্নদ্বীপের রহস্য : প্রশান্ত মহাসাগরের অজ্ঞাত, নিঃসঙ্গ, মাত্র পঞ্চাশ হেকটোয়ার আয়তনের অতিক্ষুদ্র ওক দ্বীপে প্রায় দুই শতাব্দী ধরে যে গুপ্তধনের সন্ধান চলেছে এবং যে সন্ধানকার্য চালাতে গিয়ে এ পর্যন্ত অন্তত ছয়জন অভিযাত্রীর মৃত্যু হয়েছে, তার রহস্যোদ্ঘাটনে আর বিলম্ব নেই বলে সর্বশেষ অভিযাত্রী দলের নেতা ফেভিড টোরিয়াস দাবী জানিয়েছেন। তিনিও তাঁর একুশজন সঙ্গী নিয়ে ঐ দ্বীপে গত সাত বছর অনুসন্ধান চালাচ্ছেন এবং তাঁদের সেকাজে এ পর্যন্ত সাড়ে সাঁয়ত্রিশ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়েছে। শ্রীটোরিয়াস অবশ্য সুনিশ্চিতভাবে কিছুই বলতে পারেন নি। তিনি বলেছেন, হয়ত উত্তর আমেরিকার রেড ইণ্ডিয়ান রাজা টার্টের রত্নভরা সমাধি লুকানো আছে সেখানে, অথবা মেক্সিকোর ইণকা সভ্যতার লুণ্ঠিত স্বর্ণসম্পদ, নয়ত কিছুই নয়। কিন্তু যাই হক না কেন, সে সম্বন্ধে শেষ কথা বলার মতো অবস্থায় তাঁরা পেঁছেছেন।

অষ্টাদশ শতাব্দীর গোড়ায় যখন ইংলণ্ড, ফ্রান্স ও স্পেন একসঙ্গে মুক্তসমুদ্রে জলদস্যুতা নিষিদ্ধ করে এবং জলদস্যুদের লুণ্ঠিত সম্পদ সমেত আত্মসমর্পণের নির্দেশ দেয় তখন অনেক জলদস্যু সে আদেশ মেনে নিয়ে নিজ-নিজ রাজ্যের প্রশাসকদের কাছে আত্মসমর্পণ করে ও লুণ্ঠিত সম্পদ জমা দেয়। কিন্তু তখনই গুজব রটে যে, জলদস্যুরা তাদের লুণ্ঠিত সম্পদের মাত্র বিশ শতাংশ জমা দিয়ে প্রশান্ত মহাসাগরের বিভিন্ন অজ্ঞাত দ্বীপে বাকী সম্পদগুলি লুকিয়ে রাখে, পরে কোন সুযোগে পুনরুদ্ধারের আশায়। তারপর ১৭৯৫ সালে একটি জাহাজের তিনজন যাত্রী উল্লিখিত দ্বীপটির পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় ওক কাঠের মাস্তুলের একাংশ ঐ দ্বীপে প্রোথিত অবস্থায় দেখতে পায়। ঐ ওক কাঠের মাস্তুল থেকেই দ্বীপটির নাম হয় ওক দ্বীপ। তিনজন যুবক অভিযাত্রী তখনই দ্বীপটিতে নেমে আসে ও অনুসন্ধান শুরু করে। তারা প্রায় ২৮ মিটার সুড়ঙ্গ খুঁড়ে কিন্তু রহস্যের কোন কিনারা করতে পারে না। দশ বছর বাদে ১৮০৫ সালে তারা নিরাশ হয়ে ফিরে আসে। তারপর ১৮৪১ সালে আর একটি অনুসন্ধান অভিযান একইভাবে ব্যর্থ হয়। অর্ধশতাব্দী পরে ১৮৯৯ সালে আবার যে অভিযান হয় তারা ৩৮ মিটার গভীরে কিছু গলিত ধাতুর টুকরো পেয়েই নিরস্ত হয়। ১৯০০ থেকে ১৯৫৫ সালের মধ্যে আরও দশটি অভিযান একইভাবে ব্যর্থ হয়, তবে তাদের অনেকেই বলে যে, ওক দ্বীপে যদি কোন গুপ্তধন থাকে তবে তা রূপকথার নায়কের মতো খ্যাত জলদস্যু, ক্যাপ্টেন কিড-এর। ১৯৬৫ সালের অভিযানে চারজনের মৃত্যু হয়, একটি সুড়ঙ্গে কার্বন মনোকসাইট গ্যাস সৃষ্ট হওয়ায়। তারপরই ১৯৬৭ সালে শুরু হয় কানাডিয়ান বিমান বহরের ক্যাপ্টেন টোরিয়াসের নেতৃত্বে নতুন অভিযান। ঐ নিরলস অতন্দ্র অভিযান এখন শেষ অধ্যায়ে পেঁছেছে। ক্যাপ্টেন টোরিয়াস বলেছেন, গুপ্তধনের সন্ধান তিনি পাবেন কিনা জানেন না, কিন্তু রহস্যময়ী ওক দ্বীপের সব রহস্যজাল তিনি ছিন্নবিচ্ছিন্ন করবেন যাতে অগ্নি-নেশায় উন্মত্ত পতঙ্গের মত আর কোন রহস্য-লুব্ধ বেপরোয়া তরুণ এখানে এসে প্রাণ না হারায়।

হৃদরোগ ও নারী : আমেরিকার পাবলিক হেলথ এসোসিয়েশনের বাৎসরিক সম্মেলনে নিউইয়র্ক বিশ্ববিদ্যালয়ের দুই হৃদরোগ বিশেষজ্ঞ এক রিপোর্টে বলেছেন, নিউইয়র্কের ৬০টি বালক-বালিকার উপর পরীক্ষা চালিয়ে তাঁরা দেখেছেন যে, বাবার হৃদরোগ থাকলে তার ছেলেদের চেয়ে মেয়েদের হৃদরোগ বেশী হয়। তাঁরা অবশ্য বলেছেন যে, এর জন্য জন্মগত কারণের চেয়ে পারিপার্শ্বিক কারণই বেশী দায়ী। পরিবারের সার্বিক প্রভাব নাকি ছেলেদের চেয়ে মেয়েদের উপরেই বেশী পড়ে।

১৪।১০।৭১ —প্রজাপতি

সম্পাদকীয়

বেহায়া ইয়াহিয়া

লেজের আগুনে সোনার লঙ্কা পুড়ে ছারখার হয়েছিল। ইয়াহিয়া খানের লেজের আগুনে তেমনি সোনার বাংলা ছারখার। কোটি কোটি মানুষ আজ চরম দুর্দশার শিকার হয়েছেন এবং নৃশংস গণহত্যার বলি হয়ে ধরাধাম ত্যাগ করেছেন। কাজ, কারবার, স্কুল, পাঠশালা সবই আজ ছত্রভঙ্গ। ৯০ লক্ষেরও অধিক শরণার্থী প্রতিবেশী রাষ্ট্র ভারতে প্রাণ নিয়ে পালিয়ে এসেছে তাদের যথাসর্বস্ব ত্যাগ করে। তাদের প্রাণাপেক্ষা প্রিয়-নেতা মুজিবর রহমন পিণ্ডির কারাগারের অন্ধকারে মৃত্যুদণ্ডের আদেশ শোনার প্রতীক্ষায় আছেন। এই অবস্থায় চেঙ্গিজ খানের সুযোগ্য বংশধর ইয়াহিয়া খান যে কিঞ্চিৎ বে-সামাল হয়ে পড়বেন এ আর বিচিত্র কি। তাঁর বেতার ভাষণে তাই বাংলাদেশ সমস্যা সমাধানের কোনো ইঙ্গিত নেই, আছে ভারতের বিরুদ্ধে বিষোদ্গার এবং সেই সঙ্গে সোজাসুজি লড়াইয়ের প্রস্তুতি। যে কারণে এই সব সহায় সম্পদহীন নর-নারী তাদের বাস্তুভিটা ত্যাগ করে চলে আসতে বাধ্য হয়েছে এই ভাষণে তার কোনও উল্লেখ নেই। ভারতবর্ষের আভ্যন্তরীণ অর্থনীতি যে, অন্য রাষ্ট্রের এতগুলি অসহায় মানুষের আগমনে বিপর্যস্ত সেকথা উহ্য রেখে, ভারত যাতে এই সব শরণার্থীর নাম করে বিদেশী রাষ্ট্রসমূহের কাছ থেকে চাল-কলা আদায় করতে পারে তার জন্যই ইয়াহিয়া সাহেবের উদার প্রতিশ্রুতি সত্ত্বেও তাদের ঘরে ফিরে যেতে দিতে বাধা দিচ্ছে; এইরকম ধারণা হয় এই বক্তৃতা শুনে। কিন্তু ইয়াহিয়া খান (একজন নামকরণ করেছেন বেহায়া খান) কি মনে করেন তাঁর এই ঘন ঘন আস্ফালন ও 'পালে বাঘ পড়িয়াছে' এই চিৎকারে কেউ বিভ্রান্ত হবে। তিনি তাঁর বেতার ভাষণে বার বার খোদাতালার দোহাই পেড়েছেন—বিপাকে পড়লে সবাই অবশ্য অমন করে থাকে সুতরাং ইয়াহিয়ার হিয়া মথিয়া যে-ধ্বনি উঠছে তা গর্জন না ক্রন্দন বোঝা দায়। উদ্ভট এবং উৎকট এই বেতার ভাষণ ইয়াহিয়ার সাম্প্রতিক মানসিকতার সুস্পষ্ট পরিচয়। জ্বর-বিকারে আক্রান্ত বিকারগ্রস্ত রোগীর মত তিনি আস্ফালন করেছেন। মুজিবর রহমনের মৃত্যুদণ্ড সম্পর্কে কোনো উল্লেখ না থাকায় অনেকে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলেছেন। কিন্তু এই ইচ্ছাকৃত এড়িয়ে যাওয়ার পিছনে সোভিয়েত ও মার্কিন অনুরোধ যে প্রভাব বিস্তার করে নি সেকথা কে বলতে পারে! এছাড়া ইয়াহিয়া হয়ত এটাও বুঝেছেন যে, পূর্ব বাংলার সমস্যা সমাধান করতে পারেন একমাত্র মুজিবর রহমন, সেই কারণে মুজিবরকে এই রাজনৈতিক তাস খেলায় তুরূপ হিসাবে ধরে রেখেছেন, উপযুক্ত ক্ষেত্র বুঝে ছাড়া হবে।

জেনারেল ইয়াহিয়ার চল্লিশ মিনিটের বেতার ভাষণে তাঁর স্বদেশবাসীর প্রতি নিবেদন ছিল যৎসামান্য—যে পূর্ববঙ্গের মানুষগুলিকে তিনি আজও তাঁর 'কানট্রিমেন' বলে দাবী করেন তাদের সম্পর্কে কোনো আশা বা আশ্বাসের বাণী নেই। ইয়াহিয়া আর কিছু জানেন আর নাই জানেন এটা ভালোই জানেন যে মিথ্যা বার বার জোরের সঙ্গে উচ্চারিত হলে তা সত্যের মর্যাদা পায়। সুতরাং তিনি মিথ্যাকে সত্য করার কৌশল আরম্ভ করেছেন। জেনারেল ইয়াহিয়া ক্ষমতা হস্তান্তর বিষয়ে অনেক গালভরা কথা বলেছেন, কিন্তু 'সর্বস্ব তোমার চাবীকাঠিটি আমার' এই একটি মাত্র নীতিতে তিনি বিশ্বাসী। ন্যাশন্যাল এসেম্বলীকে সুযোগ দেওয়া হবে সংবিধান সংস্কারে প্রস্তাব দেওয়ার জন্য, এই সংবিধান ২০শে ডিসেম্বর প্রস্তুত হবে। তবে ক্ষমতা হস্তান্তর নামক ঘটনাও সামরিক বোরখায় ঢাকা থাকবে—কারণ মার্শাল ল' উঠিয়ে নেওয়ার কথা কুত্রাপি নেই। আয়ুব খানের মৌলিক ডেমোক্রেসীর নামান্তর করা হয়েছিল 'বেসিক ফুড', ইয়াহিয়ার নতুন প্ল্যান তার ওপর আর এককাঠি ধাপ্পাবাজী। এই ধাপ্পাবাজী হয়ত ইয়াহিয়ার বিদেশী মুরুব্বীদের সন্তুষ্ট করবে কিন্তু যারা পাক দালালদের হালাল করছে সেই মুক্তিবাহিনী কি এত সহজে ইয়াহিয়ার ধাপ্পায় প্রলুব্ধ হবে? মুক্তিযুদ্ধের সৈনিকরা স্বাধীনতার জন্য জান কবুল করেছে। আজ আর এমন কোনো শক্তি নেই যা তাদের অগ্রগতি প্রতিহত করতে পারে।

সম্প্রতি ভারতে মার্কিন রাষ্ট্রদূত কেনেথ বি কিটিং একটি দুষ্প্রাপ্য জাতের দুটিভালুক-শাবক উপহার দিয়েছেন নয়া-দিল্লীর চিড়িয়াখানায়।

সায়গন : সম্প্রতি দশ পাউন্ড ওজনের একটি প্ল্যাস্টিক বোমা ফাটে ক্ষুদ্র নদীহালে একটি রেস্তোরার সামনে। কুড়িজন ভিয়েতনামী আহত হয়। চিত্রে দেখা যাচ্ছে পুলিশ ও সৈন্যদের ঘটনাস্থলে।

ওপার বাংলায় নৃশংস অত্যাচারের হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য এখনও অবিশ্রাম জনতার স্রোত এগিয়ে আসছে ভারতের বুকে।

পটভূমি

পশ্চিম বাংলার বৈষয়িক উন্নয়নের জন্যে রাইটার্স বিল্ডিংস থেকে শুরু করে রাজভবন, সিদ্ধার্থশংকর রায় থেকে নয়াদিল্লীর প্রতিটি দপ্তর, কারুরই উদ্বেগের অন্ত নেই। কিন্তু এই উন্নয়নের অন্যতম শর্ত সম্পর্কে কেউ যে তেমন মাথা ঘামাচ্ছেন তা মনে হচ্ছে না।

বেশির ভাগ কর্তা-ব্যক্তির অভিমতই হল, আইন-শৃঙ্খলার অবস্থার উন্নতি না হলে রাজ্যের উন্নয়ন সম্ভব নয়। কথাটা যে ভুল, তা বলছি না। কিন্তু প্রশ্ন হল, আইন-শৃঙ্খলার অবস্থার উন্নতি হলেই কি পশ্চিম বাংলা একেবারে তর তর করে সমৃদ্ধির পথে এগিয়ে যাবে? তা যেতে পারে না. কারণ বৈষয়িক উন্নয়নের কতকগুলো প্রাথমিক শর্ত থাকে, সেগুলো হাজির না থাকলে কোনো উন্নয়নের কাজই হতে পারে না। ইংরিজিতে তাকে বলা হয় ইনফ্রা স্ট্রাকচার। এই প্রাথমিক কাঠামোর অন্যতম অংগকে কেন্দ্র করেই এখন এই রাজ্যে রীতিমতো সংকট চলছে। বিদ্যুৎ সংকটের কথাই বলছি।

লেনিন বলতেন, সোভিয়েট আর বিদ্যুৎ—এই দুইয়ে মিলে রাশিয়ার চেহারা পাল্টে দেবে। বেশ কয়েক বছর আগে ডঃ রাধাকৃষ্ণন বলেছিলেন, লেনিনেরই কথা একটু বদল করে, পঞ্চায়েৎ আর বিদ্যুৎ—এই দুইয়ে মিলে পাল্টে দেবে ভারতের চেহারা। পঞ্চায়েতের কথা এখন থাক, কিন্তু বিদ্যুৎ এখনও দেশের অধিকাংশ এলাকাতেই পৌঁছয় নি। গোটা দেশে গ্রামের সংখ্যা সাড়ে পাঁচ লাখের মতো। তার মধ্যে বিদ্যুতের মুখ দেখেছে এক লাখের কিছু বেশি গ্রাম।

কিন্তু এই হিসেবও—অন্য যে-কোনো পরিসংখ্যানের মতো—কিছুটা বিভ্রান্তিকর। কারণ দেশের সব এলাকাতেই যে শতকরা কুড়ি ভাগ গ্রামে বিদ্যুৎ পৌঁছে গেছে তা নয়। হরিয়ানায় যেখানে প্রতিটি গ্রাম বিদ্যুতের আশীর্বাদধন্য, তামিলনাড়ুতে ও কেরলে যেখানে আলোকিত গ্রামের হার যথাক্রমে শতকরা ৮০ ভাগ ও ৭৬ ভাগ, সেখানে আসামে শতকরা আড়াই ভাগের বেশি গ্রামে বিদ্যুৎ নেই। আর পশ্চিম বাংলা? অনেক কিছুর মতো এখানেও তার স্থান ঠিক সবার নিচে সবার পিছে না-হলেও পিছনের সারিতেই. কারণ এই রাজ্যে শতকরা আট ভাগ গ্রামও এখনও বিদ্যুতের আশীর্বাদ পায় নি।

আলোকিত গ্রাম কথাটি এর আগে ব্যবহার করেছি, কিন্তু গ্রামে-গ্রামে বিদ্যুৎ পৌঁছে দেওয়ার প্রাথমিক উদ্দেশ্য ঠিক 'তমসো মা জ্যোতির্গময়' গোছের নয়। কারণ আলো জ্বালানোর চেয়ে বড় কথা চাষবাস, কৃষিভিত্তিক শিল্প ও অন্যান্য কুটিরশিল্পের প্রসারে সাহায্য করা। যত বেশি গ্রামে বিদ্যুৎ পৌঁছবে, তত বেশি কৃষিজীবী মানুষ বিদ্যুৎ-চালিত পাম্পের সাহায্যে মাটির তলার জল টেনে এনে মাটিকে উর্বরা করে তুলতে পারবেন। অন্ধ্রপ্রদেশ, হরিয়ানা, পাঞ্জাব বা তামিলনাড়ুতে যে আজ চাষবাসের এত বাড়বাড়ন্ত তার অন্যতম প্রধান কারণ কিন্তু এই বিদ্যুৎ-চালিত পাম্পের ব্যবহার। হাতের কাছে এ-সম্পর্কে যে-হিসেবটা রয়েছে সেটা বছর খানেকের পুরনো. কিন্তু তা থেকে এ-ব্যাপারে পশ্চিম বাংলা যে কতোটা পিছিয়ে রয়েছে তার হদিস পেতে কোনোই অসুবিধে হওয়ার কথা নয়। ১৯৬৯ সাল পর্যন্ত কয়েকটি প্রধান রাজ্যে বিদ্যুৎ-চালিত পাম্পের সংখ্যা এখানে পর পর সাজিয়ে দিচ্ছি : তামিলনাড়ু—৪,১০,১১৯; মহারাষ্ট্র—১,২৪,৯৬১; অন্ধ্রপ্রদেশ—১,২২,৩২১; পাঞ্জাব—৫৯,১১২; বিহার—৪১,৩৭৫; হরিয়ানা ৪৫,৩৮৫। এরপর পশ্চিমবাংলার সংখ্যাটা উল্লেখ করতে যদিও লজ্জাই হয় তবু করতেই হবে—সেই সংখ্যা হল ১,১৯৭। শীগগির কি অবস্থার উন্নতি হবে? তেমন আশাও দেখা যায় না. কারণ চতুর্থ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার শেষে অর্থাৎ ১৯৭৪ সালেও এই রাজ্যে ৩৬০৭টির বেশি পাম্প চালু হবে না. আর সেখানে তামিলনাড়ুতে ঐ সংখ্যা তখন সাড়ে পাঁচ লাখ ছাড়িয়ে যাবে। পশ্চিম বাংলা যে চাষবাসের ক্ষেত্রে বিশেষ পিছিয়ে রয়েছে, এর পরেও কি তাতে আশ্চর্য হওয়া সাজে? চাষীর চোখের জলে তো আর ধানের ফলন বাড়ে না।

যদি জানতে চান কেন এমন অবস্থা হচ্ছে তার উত্তর অবশ্য তৈরিই আছে। রাজ্য বিদ্যুৎ পর্ষদ, অর্থাৎ যাঁদের হাতে কিনা গ্রামে বিদ্যুৎ সরবরাহের ভার, তাঁরা বলবেন, কী করব বলুন, আমরা তো সব স্কিম তৈরি করে বসে আছি, কিন্তু দিল্লী টাকা দিচ্ছে না। আবার, "কেন রে গরু, দুধ দিস না" ছড়ার মতো যদি দিল্লীকে জিজ্ঞেস করা যায় যে, কেন পশ্চিম বাংলা টাকা পাচ্ছে না. তবে শুনতে পাবেন, স্কিম পেশ না করলে টাকা দেওয়া হবে কী করে? এই সেদিন লোকসভায় একজন সদস্য দেশের পূর্বাঞ্চলকে "অন্ধকারতম এলাকা" বলে অভিহিত করলেন। তখন কেন্দ্রীয় বিদ্যুৎ দপ্তরের মন্ত্রী ডঃ কে এল রাও বলে দিলেন যে, এ-জন্যে পূর্বাঞ্চলের রাজ্যগুলিই দায়ী, কারণ তাগাদা দেওয়ার পরও তাদের কাছ থেকে স্কিম আদায় করা যাচ্ছে না। ঐ দিনই অবশ্য ডঃ রাও জানিয়ে দেন যে, পশ্চিমবাংলার গ্রামে বিদ্যুতের প্রসারের জন্যে কুড়ি কোটি টাকা মঞ্জুর করা হয়েছে।

পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য বিদ্যুৎ পর্ষদের কর্তাদের মুখে শোনা যাবে একেবারে উল্টো কথা। ২৪ পরগণা, বাঁকুড়া, বীরভূম, হুগলি ও মেদিনীপুর জেলার জন্যে তাঁরা যে ১৪টি স্কিম তৈরি করেছেন তার অর্ধেকের বেশি মঞ্জুর হয় নি। এইসব স্কিম পুরোপুরি কার্যকর হলে ঐ সব জেলার হাজার দেড়েক গ্রাম বিদ্যুতের মুখ দেখবে। এ-ছাড়া পর্ষদের পক্ষ থেকে আরো সাতটি স্কিম পেশ করা হয়েছে ২৪ পরগণা (সুন্দরবন এলাকা), নদীয়া, বর্ধমান, পশ্চিম দিনাজপুর, পুরুলিয়া জেলার জন্যে। এই সব স্কিম অনুযায়ী আরো ষোল শ' মৌজায় বিদ্যুৎ পৌঁছবে।

এই সব স্কিম মঞ্জুর হতে দেরি হওয়ার কারণ কী? কেই বা ঠিক কথা বলছেন—কেন্দ্রীয় সরকার, না রাজ্য বিদ্যুৎ পর্ষদ? পল্লী বৈদ্যুতীকরণ স্কিম মঞ্জুর করার দায়িত্ব রুরাল ইলেকট্রিফিকেশন কর্পোরেশন নামে কেন্দ্রীয় সরকারের একটি সংস্থার। তাঁদের কাছে গিয়ে যে জানা গেল স্কিম আটকে থাকছে তার কারণ, তাঁরা মঞ্জুরীর ছাপ দেওয়ার আগে বিবেচনা করে দেখেন কোন্ স্কিম লাভজনক হবে। এই নিয়ে রাজ্য বিদ্যুৎ পর্ষদের সঙ্গে ঐ কর্পোরেশনের বিবাদ চলে। পর্ষদ বলেন এই ধরনের কাজে আশু লাভালাভের কথা বিবেচনা করার চেয়ে ভবিষ্যতের কথা ভেবে লগ্নী করা উচিত। অন্যান্য কারণের সঙ্গে এই কারণেও অনেক স্কিম আটকে গেছে।

তবে স্কিম পেশ করলেই বা তা মঞ্জুর হলেই যে পশ্চিমবাংলায় পল্লী বৈদ্যুতীকরণের কাজ সুষ্ঠুভাবে চলবে তা নয়। এখানে একটা মস্ত বড় প্রতিবন্ধক তার ও অন্যান্য বৈদ্যুতিক সাজ-সরঞ্জাম চুরি। রাজ্য বিদ্যুৎ পর্ষদ হিসেব দিয়েছেন যে, একটা নির্দিষ্ট মাসে এক ২৪ পরগণা জেলাতেই যে পরিমাণ তামার তার চুরি গেছে তার দাম লাখ খানেক টাকা। এই প্রসংগে ক্যালকাটা ইলেকট্রিক সাপ্লাই কর্পোরেশনের দেওয়া একটা হিসেবও উল্লেখ করা যায়। কর্পোরেশনের আওতায় একটি বিশেষ জেলাতেই এই বছর জানুয়ারি মাসে যে-পরিমাণ বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম চুরি গেছে তার দাম পৌনে দু' লাখ টাকার মতো। ১৯৬৯ সালের মার্চ থেকে ১৯৭০ সালের ফেব্রুয়ারির মধ্যে চুরির সংখ্যাও বেড়ে যায় ৬০০ গুণের মতো। এই অবস্থা চলতে থাকলে শত সদিচ্ছা থাকা সত্ত্বেও বৈদ্যুতীকরণের কাজ এগোতে পারবে না।

• • •

বৈদ্যুতীকরণের কাজ এগোচ্ছে না বলে

গ্রামাঞ্চলে প্রার্থিত উন্নয়ন ঘটতে পারছে না, আর শহর এলাকায় বিদ্যুতের সংকটের ফলে চালু কল-কারখানাই বন্ধ হওয়ার উপক্রম। বিভিন্ন এলাকায় লোড শেডিং তো প্রায় নিত্যকার ব্যাপার, ট্রাম-ট্রেনও আটকে পড়ছে, সেই সঙ্গে অচল হচ্ছে কল-কারখানার চাকা। বিদ্যুৎ সরবরাহ ঠিক মতো না-হওয়ায় পশ্চিমবাংলার বিভিন্ন পাটকলে এই বছরের জানুয়ারি থেকে জুন মাসের মধ্যে উৎপাদন ন' হাজার টন কমে যায়। এর দরুণ ক্ষতি হয় প্রায় পৌনে তিন কোটি টাকা, তার মধ্যে অর্ধেকেরও বেশি আবার বিদেশী মুদ্রায়, কারণ ঐ ন' হাজার টনের অনেকটাই বিদেশে রপ্তানি হতো। ঐ সময়ের মধ্যে বেঙ্গল চেম্বার অফ কমার্সের অন্তর্ভুক্ত বারোটি কারখানায় যে উৎপাদনের ক্ষতি হয়েছে তার পরিমাণ টাকার অঙ্কে প্রায় পৌনে এক কোটি এবং লে-অফ হওয়ায় কর্মীরা খুইয়েছেন সাড়ে চার লাখ টাকা মজুরি। একটি কাগজের কলের ক্ষেত্রে দেখা গেছে যে, ১৯৬৯ সালের সেপ্টেম্বর থেকে এই বছর মার্চ পর্যন্ত বিদ্যুৎ সরবরাহ ঠিক মতো না পাওয়ায় প্রায় ৩৮০ ঘণ্টা কাজ বন্ধ থেকেছে। আর বিদ্যুৎ সরবরাহ বন্ধ থাকলে শুধু যে উৎপাদন বন্ধ থাকে তাই নয়, এইভাবে হঠাৎ বৈদ্যুতিক গোলযোগের ফলে দামী যন্ত্রপাতিরও খুব ক্ষতি হয়।

কোথাও কোথাও হঠাৎ এইভাবে বিদ্যুৎ সরবরাহ বন্ধ করে দিতে হচ্ছে কেন? হচ্ছে তার কারণ চাহিদার তুলনায় বিদ্যুৎ কম তৈরি হচ্ছে। নিম্ন বঙ্গেই বিদ্যুতের চাহিদা বেশি, কারণ সেখানে কল-কারখানাও বেশি। এই এলাকায় (অর্থাৎ উত্তরবঙ্গ বাদে পশ্চিমবাংলার বাকি এলাকায়) বছরে মোট ৯৫০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ দরকার। কিন্তু পাওয়া যাচ্ছে ৯১৯ মেগাওয়াটের মতো। আর উত্তরবঙ্গের অবস্থা তো আরো কাহিল। ঐ এলাকায় বছরে অন্তত ২৭ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ দরকার বলে সাম্প্রতিক সমীক্ষায় জানা গেছে। উত্তরবঙ্গে প্রধান ভরসা জলঢাকা বিদ্যুৎ প্রকল্প। সেখানেই ২১ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ তৈরি হওয়ার কথা। কিন্তু জলঢাকায় গোলযোগ লেগেই থাকে—হয় যান্ত্রিক গোলযোগ, নয় শ্রমিক অশান্তি। তাই উত্তরবঙ্গের কপালে এখন জুটছে মাত্র সাত মেগাওয়াট। আর এই বিদ্যুতের অভাবই উত্তরবঙ্গে অনগ্রসরতারও কারণ। রাজ্য বিদ্যুৎ পর্ষদ একটা ২০০ মেগাওয়াটের বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র উত্তরবঙ্গে স্থাপনের জন্যে প্রস্তাব করেছিলেন। কেন্দ্রীয় সরকার বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র স্থাপনের প্রস্তাবটি মেনে নিয়েছেন, কিন্তু সেই সঙ্গে স্থির করেছেন কেন্দ্রটি স্থাপিত হবে বিহারে, উত্তরবঙ্গে নয়। উত্তরবঙ্গের বরাতটা নিতান্তই খারাপ।

• •

বিদ্যুতের অভাবে চালু শিল্পগুলিই যদি এই দশা হয় তবে নতুন কল-কারখানা চালু হবে কী করে? পশ্চিমবাংলার শিল্পোপা-

ফিলিপিন প্রেসিডেন্টের স্ত্রী শ্রীমতী ইমেলদা আর মার্কোস কয়েকদিনের জন্য ভারত সফরে এসে তিনি রাষ্ট্রপতি ভবনে গিয়ে রাষ্ট্রপতি শ্রী ভি ভি গিরির সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন।

য়য়নের জন্যে অনেক ঘটা করে যে ১৬ দফা কর্মসূচী তৈরি করা হয়েছে তারই বা কী হবে? তবু তো ভাগ্য ভালো বলতে হবে যে, ১৯৬৭ সালের পর থেকে এই রাজ্যে তেমন শিল্প প্রসার ঘটে নি। তা যদি ঘটতো তবে সরকার বিদ্যুতের চাহিদা মেটাতেন কোথা থেকে, অবশ্য চাহিদা মেটাবার দরকারই বোধ হয় হত না, কারণ বিদ্যুতের অভাবেই নতুন কল-কারখানা চালু হতে পারত না। তাই গোড়াতেই বলেছিলাম, যদি আইন-শৃংখলার অবস্থা পশ্চিমবাংলায় স্বাভাবিক হত তবুও বৈষয়িক উন্নয়নের কাজ আটকে যেত। শিল্পপতিরা তো একেই অভিযোগ করেন যে, অন্যান্য রাজ্যের তুলনায় পশ্চিমবাংলায় চড়া দামে বিদ্যুৎ কিনতে হয়। আবার সেই বিদ্যুৎও প্রয়োজন মতো পাওয়া যায় না।

তবে কি পশ্চিমবাংলায় চাহিদা অনুযায়ী বিদ্যুৎ উৎপাদনের ব্যবস্থা করা হয়নি? হয়েছে বৈকি। এখনই তো এই এই রাজ্যে বছরে ১২০০ মেগাওয়াটের বেশি বিদ্যুৎ তৈরির ব্যবস্থা রয়েছে। কিন্তু যাদের ওপর বিদ্যুৎ যোগাবার ভার, সেই ক্যালকাটা ইলেকট্রিক সাপ্লাই কর্পোরেশন দামোদর ভ্যালি কর্পোরেশন, দুর্গাপুর প্রোজেক্টস, রাজ্য বিদ্যুৎ পর্ষদ কেউই নিজেদের পূর্ণ ক্ষমতা অনুযায়ী বিদ্যুৎ যোগাতে পারছেন না। কোথাও ঠিক মতো রক্ষণাবেক্ষণের অভাবে যন্ত্রপাতি বিগড়োচ্ছে, কোথাও বন্যায় জল ঢুকে যন্ত্রপাতি নষ্ট করে দিচ্ছে, আবার কোথাও স্রেফ শ্রমিক অশান্তির জন্যেই পুরো বিদ্যুৎ তৈরি হতে পারছে না। কর্তৃপক্ষও ঠিক মতো কাজ চালাতে পারছেন না। রাজ্য বিদ্যুৎ পর্ষদের সাধারণ কর্মীদের মধ্যে অসন্তোষ তো রয়েছেই, তার ওপর ইঞ্জিনিয়ারদের সঙ্গে বিরোধও তুচ্ছ কারণে বেশ কিছুদিন ধরে জীইয়ে রাখা হয়েছে।

কথা আছে চতুর্থ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার শেষে এই রাজ্যে মোট ১৪৫০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ তৈরি করা হবে। কিন্তু বিভিন্ন প্রকল্পের কাজ যে-হারে এগোচ্ছে তাতে এই লক্ষ্য পূর্ণ হওয়ার আশা কম। চতুর্থ পরিকল্পনার প্রধান প্রকল্প হল রাজ্য বিদ্যুৎ পর্ষদের সাঁওতালদি প্রকল্প। কিন্তু এই তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্রের কাজ এগোচ্ছে অত্যন্ত ধীর গতিতে। কর্তৃপক্ষ বলছেন তাঁদের হাতে টাকা নেই। কিন্তু টাকার অভাবই একমাত্র কারণ নয়। বড় অফিসারদের মধ্যে অন্তর্বিরোধও এর জন্যে কম দায়ী নয়।

ইংরেজদের কাছ থেকে আমরা অন্তত একটা জিনিস খুব ভালোভাবে শিখে নিয়েছি—কোনো ঝামেলায় পড়লে একটা কমিশন বা কমিটি বসিয়ে দাও। পশ্চিমবাংলার বিদ্যুৎ সংকট নিরসনের জন্যেও রাজ্যপাল শ্রী এ এল ডায়াস একটি কমিটি নিয়োগের সিদ্ধান্ত করেছেন বলে শোনা যাচ্ছে। কিন্তু তার আগে কি রাজ্যপালের আর কিছুই করার নেই? বর্তমান বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্রগুলিতে বিদ্যুৎ উৎপাদনের পথে যে-সব বাধা রয়েছে তা শক্ত হাতে দূর করতে কি সচেষ্ট হওয়া যায় না? যে-সব প্রকল্পের কাজ ধীর গতিতে এগোচ্ছে সেগুলির কাজ ত্বরান্বিত করতেই বা সচেষ্ট হওয়া যাবে না কেন?

১৬।১০।৭১ —দেবদত্ত

অতুলপ্রসাদ সেন গীতিকার ও সুরকার

নারায়ণ চৌধুরী

কবি অতুলপ্রসাদ সেনের জন্ম ১৮৭১ সালের ২০শে অকটোবর আর মৃত্যু ১৯৩৪ সালের ২৬শে আগস্ট। কিঞ্চিদূনে তেষট্টি বছরের জীবন। এই ৬৩ বছরের জীবনকে যদি একটি মাত্র পরিচয়ে বিধৃত করতে হয় তো সে পরিচয় হলো—অতুলপ্রসাদের জীবন ছিল সুরময়। তিনি কবি ঠিকই কিন্তু গানের কবি। বস্তুতঃ গানের উদ্দেশ্যে ভিন্ন নিছক বাণীর সৌন্দর্য ফুটিয়ে তোলার জন্যে ছন্দ মিলিয়ে তিনি জীবনে কিছু লিখেছিলেন কিনা সন্দেহ। লিখলেও তার কোনো নিদর্শন নেই বাংলা সাহিত্যে। এই এক কবি, যিনি শুধু গান লিখে আর গানে সুর দিয়ে বাংলা কাব্য ও সংগীত জগতে অবিস্মরণীয় প্রসিদ্ধি অর্জন করে গেছেন। বাংলা সাহিত্যে তাঁর নিকটতম প্রতিতুলনা কান্তকবি রজনীকান্ত সেন। রজনীকান্তও গান ভিন্ন অন্য বড়ো একটা কিছু লেখেন নি এবং তাঁরও খ্যাতির প্রধান উৎস হলো সংগীত। কিন্তু দেখা যায়, এমন যে সুরতন্ময় রজনীকান্ত, তিনিও সংগীতজীবনের অবসরে 'অমৃত' নামক একখানি ছোট্ট কাব্যগ্রন্থ রচনা করেছিলেন যাতে ছোট ছোট উপদেশাত্মক কবিতা সংকলিত আছে, অনেকটা রবীন্দ্রনাথের 'কণিকা'র ধরনের কবিতা—খুবই সংক্ষিপ্ত আয়তনে গভীর তাৎপর্যের নিটোল রচনা। কিন্তু অতুলপ্রসাদ সেরকম কিছুও লেখেন নি। তাঁর পরিচয় কেবলমাত্র তাঁর গানে ও সুরে। তিনি বৈষয়িক জীবনে লক্ষ্ণৌয়ের একজন কৃতী ব্যারিস্টার ছিলেন, সমাজজীবনে ছিলেন উত্তর প্রদেশের এক বিশেষ প্রভাবপ্রতিপত্তিশালী পুরুষ—তিনি কিছুকাল লক্ষ্ণৌ বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যের পদও অলংকৃত করেছিলেন—কিন্তু আমাদের বর্তমান আলোচনার অনুষঙ্গে এসব তথ্যের সার্থকতা সীমিত বা আদৌ কোনো মূল্য নেই। সাহিত্যবাপদেশে লক্ষণীয় এবং জরুরি মাত্র এই তথ্য যে, অতুলপ্রসাদ ছিলেন মুখ্যতঃ—না, মুখ্যতঃ বলাও ঠিক হলো না, বলা উচিত সর্বতঃ—একজন গীতিকার ও সুরকার। এ ভিন্ন তাঁর আর কোনো পরিচয়ই সাহিত্যক্ষেত্রে গ্রাহ্য হবে বলে মনে হয় না। কিছু-কম আড়াই শো পৃষ্ঠার একখানি বইয়ে (গীতিগুঞ্জ) তাঁর সমগ্র গানের সংগ্রহ ধরা আছে, আর এযাবৎ প্রকাশিত পাঁচ খণ্ড স্বরলিপি পুস্তকে (কাকলি) সন্নিবিষ্ট আছে তাদের একাংশের স্বরলিপি। দুটি বইয়েরই প্রকাশক সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজ, কলিকাতা।

এত স্বল্পায়তন সৃজনী ফসলের নজিরে এত অধিক প্রতিষ্ঠা বাংলা সাহিত্যের আর কোনো বাণী বা সুর সাধকের ভাগ্যে ঘটেছে কিনা সন্দেহ। তাতেই বুঝতে হবে অতুলপ্রসাদের গানে এমন কিছু বৈশিষ্ট্য আছে যা তাঁর রচনাকে দিয়েছে এক অনন্য মহিমা—কি কথার সৌন্দর্যের দিক দিয়ে, কি সুরের জাদুতে। কী সেই বৈশিষ্ট্য, তার সন্ধান করাই হবে আমাদের আজকের আলোচনার লক্ষ্য।

(২)

—গীতিগুঞ্জে অতুলপ্রসাদের গানের কয়েকটি শ্রেণীকরণ করা হয়েছে, শ্রেণী কটির নাম দেওয়া হয়েছে যথাক্রমে—দেবতা, প্রকৃতি, স্বদেশ, মানব ও বিবিধ। অর্থাৎ ভগবদ্বিষয়ক গান, প্রকৃতিবিষয়ক গান, দেশাত্মবোধক গান, মানবসম্বন্ধীয় গান ও সর্বশেষে পাঁচমেশালি বিষয়ের গান। এ ভিন্ন একটি 'পরিশিষ্ট' অংশ আছে, যার ভিতর পূর্বে অপ্রকাশিত কিছু সংখ্যক গান স্থান পেয়েছে। মানববিষয়ক গানগুলি আসলে প্রেমের গান—কোনো বিশেষ মানবীকে কল্পনা করে লেখা না হলেও সাধারণভাবে প্রেমের আকৃতিই এই গানগুলিতে সব ছাড়িয়ে বড়ো হয়ে উঠেছে।

অতুলপ্রসাদের গানের ভাণ্ডার সামগ্রিকভাবে পর্যালোচনা করার পর তাঁর ভগবদ্বিষয়ক গানগুলিকেই শ্রেষ্ঠ মূল্য

অতুলপ্রসাদ সেন

দিতে হয়। ভক্তির প্রগাঢ়তায়, আত্মসমর্পণের ব্যাকুলতায়, বিনম্র দীনতার চেতনায় ও বিষাদের মাধুর্যে গানগুলির তুলনা আছে কিনা সন্দেহ। ভক্তি-সংগীতের ক্ষেত্রে আধুনিক বাংলা কাব্যে তিনটি নাম সবচেয়ে বেশী উজ্জ্বল—রবীন্দ্রনাথ, রজনীকান্ত ও অতুলপ্রসাদ। এই তিনেরই নিজ নিজ বৈশিষ্ট্য আছে। অতুলপ্রসাদের বৈশিষ্ট্য এখানে যে, তাঁর ভক্তির গান আগাগোড়া বিষাদে মণ্ডিত। এমন একটা কারুণ্য তাঁর গানগুলিকে ছেয়ে আছে যে, মনে হয় ভগবানকে তাঁর একান্ত করে চাওয়ার ব্যাকুলতা, তাঁতে আপনাকে বিলীন করে দেওয়ার আকুতি, তাঁকেই জীবনের চরম সত্য ও পরম ধন মেনে নিয়ে আর সব কিছুকে তাঁর অনুগত ও অধীন করবার আগ্রহ—এ সবকিছুরই মূলে আছে এক সর্ববিপ্লবী বিষাদ। তাঁরই গানের কথা : 'এত হাসি আছে জগতে তোমার বঞ্চিলে শুধু মোরে। বলিহারি বিধি, বলিহারি যাই তোরে।' এই হলো অতুলপ্রসাদের অধিকাংশ গানের ধুয়া।

কেন এই বিষাদ? এই প্রশ্নের জন্য আমাদের অতুলপ্রসাদের জীবনের মধ্যে সংকেত খুঁজতে হবে। বহিরঙ্গ দিক থেকে দেখতে গেলে অতুলপ্রসাদের জীবন ছিল স্বচ্ছলতা ও স্বাচ্ছন্দ্যে ভরা, সামাজিক সাফল্যের প্রসাদমণ্ডিত, যশ ও প্রতিপত্তিতে ভরপুর। তিনি ছিলেন লক্ষ্ণৌয়ের এক অন্যতম প্রধান সম্মানিত নাগরিক। সাহিত্যের প্রতিষ্ঠাও তাঁর ব্যক্তিত্বকে দিয়েছিল আরেকটি আয়তন। কিন্তু অন্তর্জীবনে অতুলপ্রসাদ সুখী ছিলেন না। তাঁর দাম্পত্যজীবন ছিল দুঃখময়। এই পারিবারিক ট্র্যাজিডি অনুক্ষণ তাঁর চিত্তকে ব্যথাদীর্ণ করে রেখেছিল। বস্তুতঃ থেকে থেকেই তাঁর ওই ব্যথার ক্ষত স্থানটি থেকে রক্তমোক্ষণ হতো—রক্তক্ষয় যতো নিবারণ করতে যেতেন ততই ক্ষতস্থানটিতে হাত পড়ে তাঁর অন্তরাত্মা যন্ত্রণায় কঁকিয়ে উঠত। বলা যেতে পারে এই মানসিক যন্ত্রণাই তাঁর জীবনকে এক সর্বাতিশায়ী বিষাদে ছেয়ে দিয়েছিল, আর ওই সর্বচেতনা-আচ্ছাদনকারী বিষাদ থেকেই নিঃসৃত হয়েছে তাঁর তাবৎ ভগবদ্ভক্তির গান। অতুলপ্রসাদের প্রায় প্রতিটি ভক্তি-সংগীতকুসুমের উপর দুঃখের রক্তিম ছিটে লেগে রয়েছে তার যে সৌরভ সুরভিত নির্গত হচ্ছে তা বিষাদে অনুলিপ্ত। 'নয়নে নাহি ভাতি/মনে হয় চিরবাতি/মনে হয় তুমি আমার চিরসাথী:/একবার জনালিয়ে বাতি কাটিয়ে রাতি,/ মরম ভরে দেখা দে গো।' কিংবা, 'এ জীবন-জমিন বড়ই ঊষর/সরস বরষ বরাবে তবু ধুলোয় ধূসর/তাই নিরাশ হৃদয় বসে আঁখি গ্লানের মলিন বাটে।'—এই হলো অতুলপ্রসাদের ভগবদ্বিষয়ক গানের মূল সুর। বিষাদ ও হতাশাকে ভক্তির আবেগে রূপান্তরিত করতে এমন বোধ হয় আর কোনো কবিই পারেন নি।

অতুলপ্রসাদের গানের কিছু আঙ্গিকগত ত্রুটিপূর্ণ আছে। যেমন, তাঁর ছন্দ নিখুঁত নয়, মিলও সব সময় উত্তম মিলের নিয়ম মেনে চলে নি, তার উপর উচ্চারণগুলি অসমান, ভাঙ্গা-ভাঙ্গা। এইসব অপূর্ণতা সত্ত্বেও তাঁর গানের ভাব অতি চমৎকার। অনুভবের গাঢ়তায় তাঁর রচনাশৈলীর ত্রুটি ঢাকা পড়ে গেছে। ত্রুটিগুলি যে সর্বক্ষেত্রেই অচেতনতা সঞ্জাত এমন মনে করবার হেতু নেই। মনে রাখতে হবে যে, সুরের প্রয়োজন মনে রেখেই অতুলপ্রসাদ এই গানগুলি বেঁধেছিলেন। সুরকারের ভূমিকা যাঁদের জানা আছে তাঁদের নিশ্চয় বলে দিতে হবে না যে, অনেক সময় সুরযোজনার দাবি পূরণ করবার জন্যেই গানের শব্দবিশেষকে হ্রস্ব বা দীর্ঘ করতে হয়; অন্ত্যমিলে পুরোপুরি মিলবিশুদ্ধি রক্ষা করা সম্ভব হয় না। গানে মূল ছন্দের ব্যত্যয় ঘটিয়ে কোনো শব্দ হ্রস্ব বা দীর্ঘায়িত হলেও ক্ষতি নেই : হ্রস্ব হলে সুর দিয়ে হ্রস্বতার ফাঁক ভরিয়ে দেওয়া যায়; দীর্ঘ হলে সুর দ্রুত উচ্চারণ করে দীর্ঘ শব্দের বিলম্বিত সুরকে খর্বীকৃত করা যায়। সুরকারদের সুর সংযোজনের এটা একটা চিরাভ্যস্ত কৌশল। কাজী নজরুল ইসলামের গানে এর প্রমাণ ভূরি ভূরি ছড়িয়ে আছে, অতুলপ্রসাদের তো কথাই নেই। তবে সুরযোজনার সুবিধা-অসুবিধার প্রশ্নটিকে যদি আমরা হিসাব থেকে বাদ দিই তা হলে এ কথা না মেনে উপায় থাকে না যে, অতুলপ্রসাদ গানের কাব্যশৈলীর গঠনসৌকর্য বিষয়ে ততোটা প্রযত্নশীল ছিলেন না যতোদূর প্রযত্নশীল হলে গানগুলিকে সুর-নিরপেক্ষ রচনা হিসেবেই আস্বাদন করা চলে, অর্থাৎ কবিতা হিসাবে মান্য করা যায়। এইখানে রবীন্দ্র-সঙ্গীতের সংগে অতুল-গীতির পার্থক্য। রবীন্দ্র-সঙ্গীতের গড়ন এত আঁটোসাঁটো, সংহত আর ছন্দ-নিপুণ যে, সুরের অনুষঙ্গ বাদ দিয়েই তাদের উপভোগ করা চলে পাঠ্য কবিতা রূপে। অতুল-গীতিতে বোধকরি তেমন নয়। সুরের পৃষ্ঠভূমি না হলে যেন তাদের সম্পূর্ণ রূপটি খোলে না। তাঁর গানের কথা এমনিতে কেমন ন্যাড়া-ন্যাড়া, অনলংকৃত, কিন্তু যেই তাতে কণ্ঠস্বর আরোপ করে গাওয়া হলো, অমনি তার অন্য চেহারা। সুর কথার আটপৌরে রূপকে ঢাকতে বদলে দেয়। গানের ধর্মই বুঝি এই। কথায় সুর যোজিত হলে আর সে-সুর কণ্ঠে উদ্গীত হলে কথাকে আর কথা বলে চেনা যায় না, তাতে অননুভূতপূর্ব ব্যঞ্জনার সঞ্চার হয়। মনে হয় একটা নতুন সৃষ্টির সম্মুখীন হলাম। অতুলপ্রসাদের গান সম্পর্কে এ কথা বিশেষ ভাবেই খাটে।

কিন্তু অতুল-গীতির বহিরঙ্গ চেহারা যা-ই হোক, তাদের ভাব গভীর। অনুভবের প্রগাঢ়তা গানগুলির ছত্রে ছত্রে অভিব্যক্ত। পূর্বেই বলেছি, অতুলপ্রসাদের ব্যক্তিগত জীবন বিষন্নতায় ভরা ছিল—জাগতিক বিচারে তাঁর অতিশয় রৌদ্রোজ্জ্বল দিনগুলিও ধূসর গোধূলির ম্লানিমায় ছিল আচ্ছন্ন। তবে সেই দুঃখের ব্যর্থতা একেবারে ব্যর্থ যায় নি। দুঃখ-আঘাত তাঁর ব্যক্তিগত জীবনকে ক্ষতবিক্ষত করেছে সন্দেহ নেই, কিন্তু সেইটেই আবার তাঁর ভক্তির আর্তিকে দিয়েছে পূর্ণতা, অনুভবকে দিয়েছে অতলনিবেশী গভীরতা। ব্যক্তিজীবনের ক্ষতি গানে সমূহ লাভ হয়ে ফুটে উঠেছে। জীবনে পান করেছেন বিষ, তাই অপরিমেয় সুধামৃতে রূপান্তরিত হয়ে গানের জগৎকে দিয়েছে অতিরিক্ত করে। ব্যক্তিক ক্ষয়ক্ষতির বেদনা আপন মনে চেপে রেখে দু হাতে তিনি শুধু সুধাই বিলিয়েছেন আঁজলা আঁজলা ভরে—সুরসুধা। অতুলপ্রসাদের গানের সুর ও ভাব পরম আস্বাদনের বস্তু।

উদ্ধৃতির সাহায্যে কবির কাব্যবৈশিষ্ট্য বোঝানোর চেষ্টা একটা মামুলি প্রথা। তাতে যে শুধু প্রবন্ধের কলেবর অকারণ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় তা-ই নয়, অনেক সময় ওই উদ্ধৃতির কারণেই বিশ্লেষণ গৌণ হয়ে কাব্য পাঠটাই প্রধান হয়ে ওঠে। আলোচকের বক্তব্য চাপা পড়ে গিয়ে আলোচিতের রচনাংশই সব জায়গা জুড়ে বসে। আলোচনা-প্রবন্ধের সেটা ধর্ম হওয়া উচিত নয়। কিন্তু মুশকিল হয় গানের বেলায়। গানের বৈশিষ্ট্য, বিশ্লেষণে কতো আর পরিস্ফুট করা যায়, যদি-না মূল গানেরই কিছু-কিছু অংশ বিশ্লেষণের অঙ্গ ও সহায়ক রূপে পাঠকের সামনে ধরে দেওয়া যায়? কবিতার বেলায় যেমন-তেমন, গান এমনই একটা বিশিষ্ট রচনা যাকে শত চেষ্টা করলেও বুঝি বিশ্লেষণের বেড়ের মধ্যে সম্পূর্ণ আঁটানো যায় না, বিশ্লেষণের ফাঁক গলে তার তাৎপর্য ও স্বাদ কিছু পরিমাণে বেরিয়ে যাবেই। সেই হেতু এইখানে অতুলপ্রসাদের গান থেকে কিছু-কিছু উদ্ধৃতি আমাকে দিতে হবে—শুধু ভগবদ্ভক্তির গানই নয়, সব রকমের গানই হবে উল্লেখযোগ্য। 'পুডিংয়ের স্বাদ পেতে হলে পুডিং চাখতে হয়'—এই ইংরেজী প্রবচনের মর্ম এই স্থলে আলোচনায় সঞ্চালিনী প্রেরণা হোক।

(৩)

কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ অতুলপ্রসাদের সমগ্র জীবনের সাধনাকে বলেছেন, বেদনা-ভরা সাধনা। এই মন্তব্য যে কী মর্মান্তিক ভাবে সত্য অতুলপ্রসাদের ভগবদ্বিষয়ক গানগুলির দিকে এক-নজর তাকালেই সে কথা বোঝা যাবে।

ক্ষমিয়ো হে শিব, আর না কাঁদিব—
দুঃখ-বিপদে ব্যর্থ জীবন যায়।

— — — — — — — — — — — — — — — —

আকাশ বলে মোরে, আমি কাঁদি বলে
হাসে বসুন্ধরা ফুল্ল বিভবে;
তোমারও নয়ন-বারি বিফল না হবে,
দুঃখ জীবনে তব ফুটিবে ফুল অনুপম।
কিংবা,—

কুসুম লয়ে গন্ধ বরণ
নিতি নিতি বাঁশি করিছে বরণ,
এ-কণ্টক বনে কি তাঁর চরণ,
কোন্ ফুলে বলো সে পদ ঢাকি?

নিশার আঁধারে ডাকিব তোমারে
যখন গাবে না পাখি,
কণ্টক দিব চরণে যবে
কুসুম মুদিবে আঁখি।

ব্যথাদীর্ণ চিত্তের হাহাকার প্রার্থনার আকারে এই গান দুটিতে মূর্ত হয়ে উঠেছে। শূন্যতা দিয়েই যেন কবি তাঁর প্রার্থনার উপচার পূর্ণ করতে চান। অনুরূপ আর একটি ভাবের গান—

দুঃখেরে আমি ডরিব না আর
কণ্টক হোক কণ্ঠের হার;
জানি তুমি মোরে করিবে অমল
যতই অনলে দাহিবে!

দুঃখের আগুনে পুড়ে পুড়েই যেন কবি শুদ্ধ হতে চান। এই লাইন কটিতে রবীন্দ্রনাথের প্রসিদ্ধ কবিতাংশ 'দুঃখের বেশে এসেছ বলিয়া তোমারে নাহি ডরিব হে' ইত্যাদির যেন একটা অস্পষ্ট ছায়াপাত ঘটেছে। ঋণ গ্রহণ যদি ইচ্ছাকৃতও হয় তবু বলতে হবে অতুলপ্রসাদ প্রভাবটিকে সম্পূর্ণ আত্মসাৎ করে নিয়েছেন নিজস্ব কায়দায়, স্বকীয় অনুভবের জারক-রসে জারিত করে। লাইন কটির বহুল-উদ্ধৃতিই তাদের আপন অন্তর্নিহিত শক্তির প্রমাণ।

রবীন্দ্রনাথের মতো অতুলপ্রসাদও গানের উপমায় অনেক গান বেঁধেছেন। দুজনেরই অন্তর ছিল সহজাতভাবে সুরময়, তাই স্বতঃই সংগীতের রূপকল্প তাঁদের কল্পনায় ভেসে উঠেছে তাঁদের কবিতায় এবং/অথবা গানের বাক্-প্রতিমা নির্মাণে। একটি দৃষ্টান্ত :

যখন তুমি গাওয়াও গান তখন আমি গাই।
গানটি যখন হয় সমাপন তোমার পানে চাই।
আরও কি মোর গাইতে হবে?
নয়নজলে নাইতে হবে?
আরও কি মোর চাইতে হবে—
দিলে না যা তাই।

এখানেও সেই একই বিষাদের সুর। একই ক্রন্দনগাথা। ফলতঃ অতুলপ্রসাদের ভক্তি-ভাবের গানগুলিকে যদি একটি মাত্র মৌলিক লক্ষণে চরিত্রায়িত করতে হয় তো বিষাদকেই সেই মূল আলম্বনের মর্যাদা দিতে হয়। অতুলপ্রসাদ বেদনার কবি, বিষাদের কবি—এই তাঁর কৌলিক শিল্পী-পরিচয়।

কবির প্রকৃতি-প্রেমও কিছু অগভীর নয়। ভক্তির মতো প্রকৃতি-প্রেমেও বেদনার ছোঁয়া লেগেছে। যেমন,—

মেঘেরা দল বেঁধে যায় কোন্ দেশে
ও আকাশ বল আমারে।
কেউ-বা রঙিন ওড়না গায়ে,
কেউ সাদা কেউ নীল বেশে
আকাশ, বল রে আমার বল্,
আমার আঁখি জল
তাদের মতো জীবনখানি করবে কি শ্যামল
—আমায় বল রে।
আমি তাদের মতো আমার বঁধুর সনে
মধুর খেলা
খেলব কি দিনের শেষে?—
ও আকাশ, বল্ আমারে।

বর্ষার একখানি সুন্দর চিত্র নীচের গানটিতে সুঅঙ্কিত। মিল-প্রকরণে অতুল-প্রসাদের দক্ষতা উচ্চ পর্যায়ের নয়, কিন্তু এই গানটিতে নিয়মের ব্যতিক্রম ঘটেছে। মিলের বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করবার মতো।

ঝরিছে ঝর-ঝর　　　গরজে গর গর
ধ্বনিছে সর সর　　　শ্রাবণ মাঃ।
তটিনী তর তর　　　সরসী ভর ভর
ধরণী থর থর　　　সিকত গা।
বিরহী ধর ধর,　　　মানিনী সর সর,
চাহিছে থর থর　　　সুলোচনা।

এবার অতুলপ্রসাদের দেশাত্মবোধক গান সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করা যাক। এই ক্ষেত্রে তাঁর কৃতিত্ব অসাধারণ। সহজ মধুর বাণীতে ও ভাবে স্বদেশের প্রতিমাকে এমন নয়নাভিমোহন ভাবে আর কেউ উপ-স্থিত করতে পেরেছেন কিনা জানি না। স্বদেশভাবাত্মক কোরাস গানে দ্বিজেন্দ্রলাল আজও অপ্রতিদ্বন্দ্বী। মনে হয় অতুল-প্রসাদের স্থান ঠিক তাঁর পরেই। আর যে দুজন কবি এই বিশেষ সংগীত রচনার ক্ষেত্রে অপ্রতিবাদ্য কৃতিত্বের স্বাক্ষর রেখেছেন তাঁরা হলেন রবীন্দ্রনাথ ও কাজী নজরুল। কিন্তু দ্বিজেন্দ্রলাল ও অতুলপ্রসাদের মতো রবীন্দ্রনাথ ও নজরুল তাঁদের সৃষ্টিশীল প্রতিভার সবটুকু ঝোঁক এই ক্ষেত্রে প্রয়োগ করেন নি বলেই মনে হয়। সত্য বটে রবীন্দ্রনাথ আমাদের জাতীয় সংগীতের স্রষ্টা এবং 'জনগণমন অধিনায়ক' গানটি ছাড়াও তিনি আমাদের 'আমার সোনার বাংলা,' 'অয়ি ভুবনমোহিনী,' 'দেশ দেশ নন্দিত তব মন্দ্রিত তব ভেরী,' 'বাংলার মাটি বাংলার জল;' 'আমাদের যাত্রা হলো সুরু, ওগো কর্ণধার,' 'সংকোচের বিহ্বলতা নিজেরে অপমান,' 'থরবায়ু বয় বেগে ইত্যাদি অনিন্দ্য সব কোরাস উপহার দিয়েছেন; এবং নজরুলের 'দুর্গম গিরি কান্তার মরু দুস্তর পারাবার হে' গানটি একাই একশো গানের হিম্মৎ রাখে; তাহলেও সব জড়িয়ে বলতে গেলে বলতে হয় স্বদেশের ভাবসত্তা দ্বিজেন্দ্রলাল ও অতুলপ্রসাদের যৌথ গানে যে অনবদ্য বাণী-রূপ লাভ করেছে, এমন বোধকরি শেষোক্ত দুজনার গানে করে নি। অতুলপ্রসাদের 'বলো বলো বলো সবে শত-বীণা-বেণু-রবে,/ভারত আবার জগৎ-সভায় শ্রেষ্ঠ আসন লবে/'উঠগো ভারত লক্ষ্মী, উঠ আদি-জগত-জন-পূজ্যা,' 'হও ধরমেতে ধীর, হও করমেতে বীর,/হও উন্নতশির—নাহি ভয়'/ 'ভারত-ভানু কোথা লুকালে?/পুনঃ উদিবে কবে পূরব-কাশে?' —এসব গানের কোনো তুলনা হয় না। বিশেষ, 'মোদের গরব মোদের আশা,/আ মরি বাংলা ভাষা,/তোমার কোলে তোমার বোলে/কতই শান্তি ভালোবাসা।' এ গানটি তো লাখ গানের এক গান। এমন অপূর্ব সুন্দর কোরাস বাংলা ভাষায় আর একটিও আছে কিনা সন্দেহ।

দ্বিজেন্দ্রলাল আর অতুলপ্রসাদের কোরাস গানে নানা দিক দিয়ে পার্থক্য। দ্বিজেন্দ্রলালে প্রকাশ পেয়েছে ওজঃ গুণ, দার্ঢ্য, শৌর্য-বীর্যের সংস্কার; অতুলপ্রসাদে স্বদেশমাতৃকার কোমল-কান্ত সস্মিত মধুর রূপ। সুরেও আসমান-জমিন ফারাক। দ্বিজেন্দ্রলালের কোরাস গানের বাঁধুনি মাঝে মাঝে স্বরের প্রস্বন (ঝোঁক) সমন্বিত উচ্চাবচ Staccato রীতির সুরের উচ্চা-রণ; অতুলপ্রসাদের কোরাস গান মীড়-প্রধান গড়িয়ে-চলা সুরের রীতিতে তৈরি। দুইয়ের ভাববস্তুর পার্থক্যের জন্যই সুরের এই পার্থক্য হয়েছে। ওজঃ গুণ সমৃদ্ধ গান গমক প্রধান হতে বাধ্য; তেমনি মধুর কমনীয় ভাবের পদ গড়ানে সুরেই বেশী স্ফূর্তি পায়। সুরের রাজ্যে Staccato এবং glissando দুটি সম্পূর্ণ বিপ-রীত ভাবের দ্যোতক।

অতুলপ্রসাদের প্রেমের গানগুলিও চমৎ-কার। যেগুলিকে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ তাঁদের ব্রাহ্ম সংস্কারের জন্য মানব নামের অন্তর্গত করে নাম-শুচিতা অক্ষুণ্ণ রাখবার প্রয়াস

পেয়েছেন। যেন প্রেমের গান বললে গান-গুলির জাতি নষ্ট হতো। যাই হোক, এই বর্গের কতকগুলি গান অনবদ্য। সেগুলি সুপ্রচারিতও বটে। যেমন, 'চাঁদিনী রাতে কে গো আসিলে?'/ 'উজল নয়নে কে গো হাসিলে?'' 'কে আবার বাজায় বাঁশি এ-ভাঙা কুঞ্জবনে।' 'একা মোর গানের তরী ভাসিয়েছিলাম নয়ন-জলে;' 'ওগো আমার নবীন শাখী,/ছিলে তুমি কোন্ বিমানে?', 'ধীরে, ধরো ধরো মালা, পরো গলে;' 'তুমি মধুর অঙ্গে নাচো গো রঙ্গে, নূপুরভঙ্গে হৃদয়ে—/ঝিনিকি ঝিনিকি ঝিনিকি;' 'কত গান তো হলো গাওয়া,/আর মিছে কেন গাওয়া?' প্রভৃতি। সর্বশেষ গানটি দ্ব্যর্থ-ব্যঞ্জক। এটি প্রেমের গানও হতে পারে, আবার ভগবদ্ভাবের গান রূপেও পরি-গণিত হতে পারে। অনেকটা বৈষ্ণব গীতির মতো—ভাবগ্রাহিতার প্রকৃতির উপর নির্ভর করে গানের শ্রেণী-স্বরূপত্ব। গ্রামোফোন রেকর্ডে শ্রীমতী সাহানা দেবীর কণ্ঠে গানটি অনেকেই শুনে থাকবেন।

বিবিধ ভাবের গানও অনেক আছে। তার একাংশ নীতিমূলক, একাংশ মানবপ্রীতিমূলক, অপর একাংশ মিশ্র অনু-ভূতিসূচক। নীতিমূলক গানের নমুনা ঃ

নিচুর কাছে হতে নিচু
শিখলি না রে মন।
সুখী জনের করিস পূজা,
দুখীর অযতন—মূঢ় মন।
লাগে নি যার পায়ে ধূলি,
কি নিবি তার চরণ-ধূলি?
নয় রে সোনায়, বনের কাঠেই
হয় রে চন্দন—মূঢ় মন!

কিংবা—

আপনার হিত ভেবে ভেবে
দিন কাটালি, মূঢ়মতি।
....
বসে আপন বদ্ধ ঘরে
কাঁদিলি কত নিজের তরে'
দু ফোঁটা জল দে রে পরে
যারা দীন দুঃখী অতি।

অথবা, এইসব গানের চরণ ঃ 'আপন কাজে অচল হলে চলবে না রে চলবে না।/অলস স্তুতি-গানে তাঁর আসন টলবে না রে টলবে না।'; 'সবারে বাস্ রে ভালো,/নইলে মনের কালো ঘুচবে না রে।' 'থাকিসনে বসে তোরা সুদিন আসবে বলে;/কারো দিন ধন্য হবে, কারো যায় বিফলে।' ইত্যাদি।

মানবপ্রীতিমূলক গানের সর্বোৎকৃষ্ট নিদর্শন ঃ

যারা তোরে বাসলো ভালো,
যারা দিল প্রাণে ব্যথা
যাবার আগে বন্ধু জেনে
সবার পায়ে নোয়াও মাথা।

যাদেরই তুই পর ভাবিলি,
যাদের চোখে জল আনিলি,
... ক্ষমা চেয়ে সবার পায়ে

জানা রে আজ প্রাণের কথা। ইত্যাদি

মিশ্র অনুভূতির গানের নমুনা ঃ 'মনোপথে এল বনহরিণী;/একি মনো-হারিণী?/তার সজল কাজল আঁখি/কেন তাহা নাহি জানি।' 'বঁধুয়া, নিদ নাহি আঁখিপাতে।/আমিও একাকী, তুমিও একাকী/আজি এ বাদল-রাতে।'; 'যদি তোর হৃদ-যমুনা হল রে উছল রে ভোলা,/তবে তুই এ কূলে ও কূলে ভাসিয়ে দিয়ে চল, রে ভোলা।' 'পাগলা, মনটারে তুই বাঁধ/কেন রে তুই যেথা সেথা পরিস প্রাণে ফাঁদ?' প্রভৃতি।

অতুলপ্রসাদের যেসব গানের নমুনা এখানে উৎকলিত হলো তার শ্রেণীচরিত্রের মধ্যেই বলা যেতে পারে তাঁর গানের ভান্ডার নিঃশেষিত। সেই নিরিখে বিচার করে বলতে হয়, রবীন্দ্রনাথের সর্বব্যাপী ও মানব-অনুভূতির সর্বপ্রান্ত - স্পর্শকারী বাণীর ঐশ্বর্যের পাশে অতুল-গীতি নিতান্ত নিষ্প্রভ। এত অল্প পুঁজি আর চৈতন্যের এত সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও তা হলে অতুলপ্রসাদ কেমন করে জনমনে এমন অপ্রতিরোধ্য প্রভাব বিস্তার করতে সম্ভব হলেন? যিনি সর্বসাকুল্যে গোটা জীবনে মাত্র দুশো গান রচনা করেছিলেন (সেই স্থলে রবীন্দ্রনাথ রচনা করেছিলেন সোয়া দু' হাজার আর নজরুল আনুমানিক তিন হাজারেরও বেশী), সাহিত্যের পরিপ্রেক্ষিতে যাঁর বৈদগ্ধের ও মননশীলতার অন্যবিধ প্রমাণ বলতে গেলে আর কিছুই নেই, ব্যবহারজীবী ও সামাজিক মানুষ হিসাবে পসার প্রতিপত্তির তুলনায় যাঁর কৌতূহল ও জিজ্ঞাসার ব্যাপ্তি খুবই সীমিত বলা চলে; সেই মানুষ কেমন করে তবে বাঙালীর মনপ্রাণ পূরণ করলেন? এই আপাত-রহস্যের সদুত্তর পেতে হলে অতুল-সৃষ্ট সুরের জগতে প্রবেশ করতে হবে। আমরা এতক্ষণ অতুলপ্রসাদের গানের বাণীর দিক নিয়ে আলোচনা করেছি, তাঁর সুর-বৈশিষ্ট্য নিয়ে প্রায় কিছুই বলি নি, একমাত্র কোরাস গানের আলোচনার সূত্রে সামান্য সুরপ্রসঙ্গ ছাড়া। এইবারে সেই আলোচনার অবকাশ হচ্ছে এবং এ থেকে দেখা যাবে যে, অতুলপ্রসাদের গানের সুরের জাদুই বিশেষভাবে তাঁর লোক-প্রিয়তার কারণ। বাণী নয়, সুরই তাঁর গানের আকর্ষণের প্রধানতর উৎস। সুরের দিক দিয়ে অতুলপ্রসাদ বাংলা গানে এমন কিছু অভিনব বৈশিষ্ট্যের অবতারণা করে-ছিলেন যার জন্য তাঁর গান আজও জন-চিত্তহারী হয়ে আছে এবং ভবিষ্যতেও থাকবে। সেই বৈশিষ্ট্যের নির্দেশ এবং মূল্যায়ন করাই হবে আলোচনার পরবর্তী অংশের উদ্দেশ্য।

(৪)

অতুলপ্রসাদ তাঁর গানে বলেছেন—

ওগো দুঃখসুখের সাথী,
সঙ্গী দিন রাতি,
সঙ্গীত মোর

তুমি ভবমরু প্রান্তর-মাঝে
শীতল শান্তির লোর।

এই সংগীতেই ছিল অতুলপ্রসাদের জীবন-মরুভূমিতে শান্তি ও সান্ত্বনার উৎস। দুঃখের 'কঠিন কঠোর বন্ধন,' তিনি গানের সাহায্যেই 'ছিন্ন ও মুক্ত' করতে চেয়েছিলেন। সংগীতে ছিল তাঁর সহজাত প্রবণতা। রবীন্দ্রনাথের প্রত্যক্ষ সান্নিধ্যে ও রবীন্দ্র-সংগীতের দৃষ্টান্তে তাঁর সাংগীতিক চেতনা বিশেষভাবে উদ্বুদ্ধ হয়েছিল। তার উপর, লক্ষ্ণৌ-প্রবাসের ফলে তথাকার ঠুংরী গানের সুরাদর্শ তাঁর অন্তরকে করেছিল একান্ত প্রভাবিত। লক্ষ্ণৌ শহরের সঙ্গে অতুল-প্রসাদের যোগাযোগ বিশেষ করে গানের দিক দিয়ে বিচার করলে খুবই ফলপ্রসূ হয়ে উঠেছিল বলা যায়। এই সূত্র ধরেই ক্লাসিকাল সংগীতের অনুরাগ তাঁর চিত্তে প্রবেশ করে এবং তাঁর সংগীত-জীবনকে গভীরভাবে রঞ্জিত করে।

ঠুংরী গান রাগ-সংগীতের অন্যতর শাখা। লক্ষ্ণৌতে যে বিশেষ ধরনের ঠুংরীর চর্চা হয় তার নাম 'লছা ঠুংরী'। মনে হয় লক্ষ্ণৌ নামের অপভ্রংশ থেকে 'লছা' কথাটির উদ্ভব হয়েছে। অযোধ্যার নবাব ওয়াজেদ আলি সাহ ঠুংরী গানের এক বড়ো সমজদার ছিলেন। তাঁর ও সমসাময়িক অন্যান্য সংগীতজ্ঞদের আনুকূল্যে লক্ষ্ণৌ শহর ঠুংরী গানের অনুশীলনের এক বিশেষ কেন্দ্র হয়ে ওঠে। ঠুংরী মূলতঃ প্রেম-সংগীত। রাধাকৃষ্ণ-বিষয়ক পদ, বিশে-ষতঃ ঝুলনলীলা, নৌকাবিলাস ও হোলি সংক্রান্ত পদ, সচরাচর এর কথাংশের মূল উপজীব্য। সুর রাগাভিত্তিক, তবে ধ্রুপদ বা খেয়ালের মতো এতে কেবলমাত্র একটি মাত্র রাগই আশ্রয় নয়, একাধিক রাগের মিশ্রণ ঠুংরী গানে গ্রাহ্য এবং শিল্পীরা মর্জি-মাফিক তাঁদের গানে এই সুরমিশ্রণ প্রয়োগ করে থাকেন। ধ্রুপদ খেয়ালের সঙ্গে ঠুংরীর আরেকটি পার্থক্য ঠুংরীর বাঁধুনি মোটেই ঋজু নয়, নমনীয়; উপরন্তু আবেগাত্মক। অর্থাৎ তাতে ভাব পরি-স্ফুটনের বিলক্ষণ অবকাশ আছে। 'ভাও (ভাব) বাৎলে ঠুংরী গান করা এককালে লক্ষ্ণৌয়ের শিল্পীদের লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য ছিল।

লক্ষ্ণৌয়ের এই বিশিষ্ট সাংগীতিক পরিবেশে অতুলপ্রসাদের শ্রুতি কর্ষণাপ্রাপ্ত হয়। ফলে রবীন্দ্রসংগীতের আদর্শে তাঁর প্রথম দিককার সংগীত-জীবন যথেষ্ট প্রভা-বিত হলেও (কলকাতায় থাকাকালে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে সংযোগ ছিল নিয়মিত ও গভীর), পরে দীর্ঘ দিন লক্ষ্ণৌ বাসের পরিণামে তিনি আস্তে আস্তে রবীন্দ্র-সংগীতের সুরাদর্শ থেকে অনেক দূরে সরে যান। তাঁর গানের সুরযোজনায় ঠুংরীর প্রভাব দৃষ্টিগ্রাহ্যভাবে প্রবেশ করে। ঠুংরীর সূক্ষ্ম কারুকার্য, খোঁচ, সুরমিশ্রণের লীলা অতুল-গীতির উপর ছাপ ফেলে। এটা খুবই ফলদায়ক হয়েছিল, তা নয় তো

আমরা সুরের জগতে অতুলপ্রসাদকে পেতাম না, পেতাম রবীন্দ্রনাথেরই এক 'রাবার স্ট্যাম্প' সুরকারকে। সেটা মোটেই বাঞ্ছনীয় হতো না। সুর-সংযোজনার স্বকীয়তার জন্যই অতুলপ্রসাদ অতুলপ্রসাদ, আর কারও ছায়ায়—তা তিনি যতোই বড়ো হোন—বেড়ে উঠলে তাঁকে একজন অনুকারকের অধিক মর্যাদা দেওয়া যেতো না। সুরসৃষ্টিতে অতুলপ্রসাদের দান অনন্য। প্রসিদ্ধ সংগীতসমালোচক মনীষী ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় (অতুলপ্রসাদের মতো তিনিও লক্ষ্ণৌ-প্রবাসী ছিলেন) অতুলপ্রসাদকে এক ব্যক্তিগত পত্রে যথার্থই লিখেছিলেন : 'অতুলদা, আপনি বাংলা ভাষায় ঠুংরী এনেছেন। হিন্দুস্থানী সংগীতের সঙ্গে আপনি যোগসূত্র বজায় রেখেছেন. এই যোগসূত্রের সাহায্যে বাউল, কীর্তন, ভাটিয়ালীর মালা গাঁথা আপনার মৌলিকত্ব।...আপনার গানে খুব বেশী মুসলমানী চালের আমেজ আছে।' ধূর্জটি-কথিত এই মুসলমানী চালের আমেজই অতুল-গীতিকে রবীন্দ্র-সংগীতের গঠন থেকে সম্পূর্ণ আলাদা করে দিয়েছে। রবীন্দ্রসংগীতে মুসলমানী আমেজ প্রায় নেই বললেই চলে বরং সেই তুলনায় বিষ্ণুপুরী হিন্দু ধ্রুপদ-সংগীতের প্রভাব অনেক বেশী প্রবল।

উপরের পরিপ্রেক্ষিতটি মনে রেখে এবারে অতুল-গীতির সুর-বৈশিষ্ট্যের বিশ্লেষণে প্রবৃত্ত হওয়া যাক।

দেখা যায় অতুলপ্রসাদ তাঁর গানের সুরে ছোট-ছোট ঠুংরীর খোঁচ প্রয়োগ করে সুরকে লীলায়িত করেছেন। সত্য বটে তাঁর অনেক গানের গঠনে বাংলার বাউল, কীর্তন, ভাটিয়ালির সুরের উপাদান রয়েছে কিন্তু সেসব উপাদানকে তিনি অমিশ্র থাকতে দেন নি, তার সঙ্গে সচেতনভাবে গজল আর ঠুংরীর আমেজ মিশিয়ে তাদের যৌগিক সুরে পরিণত করেছেন। ঠুংরীর ঢংয়ের সূক্ষ্ম কারুকার্য তাঁর গানের সুরে এনেছে একটা লীলায়িত গতি, একটা মধুর পেলবতা। এ কথার প্রমাণ : 'ওগো আমার নবীন শাখী ছিলে তুমি কোন্ বিমানে' (মিশ্র পিলু), 'যাব না, যাব না, যাব না ঘরে' (নট-মল্লার), 'ডাকে কোয়েলা বারেবারে' (গৌড়-মল্লার), 'শ্রাবণ-ঝুলাতে বাদল-রাতে তোরা আয় গো, কে ঝুলিবি আয়' (পিলু), 'তুমি মধুর অঙ্গে নাচো গো রঙ্গে, নূপুরভঙ্গে হৃদয়ে'—(গুজরাটী খাম্বাজ), 'কে আবার বাজায় বাঁশি এ ভাঙা কুঞ্জবনে!' (পিলু-বারোয়াঁ), 'চাঁদিনী রাতে কে গো আসিলে' (মিশ্র-দেশ-পিলু), 'মোরা নাচি ফুলে ফুলে দুলে দুলে (নটমল্লার), 'কত গান তো হল গাওয়া' (গজল) প্রভৃতি। ঠিক কোথায় এসব গানে ঠুংরীর খোঁচ লেগেছে, গানগুলি শ্রুতিগ্রাহ্য না হওয়া পর্যন্ত তা বোঝাবার উপায় নেই। মুদ্রিত অক্ষরের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণে সুরের হদিস দেওয়া যায় না।

কয়েকটি রাগ-রাগিনীর প্রতি অতুল-প্রসাদের বিশেষ পক্ষপাত ছিল। যেমন,

অতুলপ্রসাদের স্বহস্তলিখিত একটি গানের প্রতিলিপি

[illegible]

বেহাগ, কালেংড়া, মল্লার অঙ্গের বিভিন্ন রাগ, খাম্বাজ, পিলু, বারোয়াঁ, দেশ, ভৈরবী ইত্যাদি। এর ভিতর মল্লার, খাম্বাজ, পিলু-বারোয়াঁ, দেশ প্রভৃতি রাগাশ্রিত গানের কয়েকটি দৃষ্টান্ত উপরে তুলে ধরেছি। বেহাগের নমুনা : 'আমি তোমায় ধরব না হাতে', 'আজ এ নিশি, সখী, সহিতে নারি,' 'দোলে যামিনী-কোলে,' 'একা মোর গানের তরী ভাসিয়েছিলাম নয়ন-জলে.' 'নিদ নাহি আঁখিপাতে,' 'আমি অলকে পরিতে পড়ে গেল মালা,' ইত্যাদি কালেংড়ার নমুনা : 'তোর কাছে আসব মাগো, 'কে তুমি বসি নদী-কূলে একেলা,' 'আমার মনের মন্দিরে এসো গো নবীন বালিকা,' 'বঁধু, ধরো ধরো মালা, পরো গলে', 'আয় আয়, আমার সাথে ভাসবি কে আয়, ইত্যাদি। ভৈরবী সুরের নমুনা : 'প্রভু মন নাহি মানে', 'পাগলা মন-টারে তুই বাঁধ,' 'সবারে বাসরে ভালো,' 'সে ডাকে আমারে', 'তাহারে ভুলিব বলো কেমনে', 'ওগো সুখ নাহি চাই' 'মা তোর শীতল কোলে তুলে নে আমায়' ইত্যাদি। এছাড়া বাউল আর বাউল-কীর্তন মিশ্রসুরে গান বেঁধেছিলেন অজস্র। মিশ্র বাউল-কীর্তন গানের কয়েকটি সুবিদিত নমুনা : 'যদি তোর হৃদ-যমুনা,' 'আর কতকাল থাকব বসে দুয়ার খুলে', 'আমার চোখ বেঁধে ভবের খেলায়' ইত্যাদি।

অতুলপ্রসাদ যদিও রাগসংগীত, বিশেষ করে ঠুংরী গানের আদর্শে, তাঁর অনেক গান বেঁধেছিলেন, তা হলেও তাঁর গানের গঠন কিন্তু জটিল নয়, মোটামুটি সরল ও অনলংকৃত। বাংলা গানের বিশেষ প্রকৃতি স্মরণ করেই বোধ হয় তাঁকে এই সারল্য ও সহজতার দিকে ঝুঁকতে হয়েছিল। তাঁর গান রাগাশ্রিত হলেও রাগসংগীতসুলভ সুরবিস্তার (melodic improvisation) তাতে নেই। এই দিক দিয়ে রবীন্দ্র-সংগীতের সঙ্গে তাঁর গানের মিল আছে। সুরবিস্তার থাকলে বোধহয় তাঁর গান আরও আকর্ষণীয় হতো।

কিছু-কিছু খেয়ালভঙ্গিম গানও তিনি রচনা করেছিলেন। যেমন, জৌনপুরী রাগে বাঁধা 'তব চরণতলে সদা রাখিয়ো মোরে,' পঞ্চম রাগে বাঁধা 'গায় পঞ্চম রাগ মুকুগণ,

মুগ্ধ ভুবন', বসন্ত রাগাশ্রিত 'নব রূপ হেরি, আজি বিশ্ব বিমোহিত, ইত্যাদি। তবে এসব গানেও তিনি হুবহু খেয়ালের চাল অনুসরণ করেন নি, প্রয়োজনবোধে স্বকীয় বৈশিষ্ট্যও যোজনা করেছেন। প্রথম গানটির কথাই ধরা যাক। জৌনপুরী রাগে কোমল নিখাদের প্রয়োগ হয়, শুদ্ধ নিখাদ তাতে বর্জিত। কিন্তু সুরের মনোহারিত্ব সৃষ্টির জন্য তিনি এই গানটিতে শাস্ত্রসম্মত জৌনপুরীর নিয়মের ব্যত্যয় ঘটিয়ে ইচ্ছাপূর্বক গানের দ্বিতীয়, ষষ্ঠ, সপ্তম লাইনে শুদ্ধ নিখাদের প্রয়োগ করেছেন। তাতে বিধিভঙ্গ হয়তো হয়েছে, কিন্তু সুর সেইসব জায়গায় অপূর্ব লাবণ্যময় হয়ে উঠেছে। শাস্ত্রানুগতোর চেয়ে শিল্পীর সৃজনী আকৃতির দাম অনেক বেশী, এ দৃষ্টান্তে তারই শুধু প্রমাণ হয়।

পরিশেষে বক্তব্য, এটা অতুলপ্রসাদের জন্ম-শতবার্ষিকীর বৎসর। এই বৎসরে অতুলপ্রসাদের কবি-ব্যক্তিত্ব আমাদের বিশেষ শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণীয়। সেই সঙ্গে তাঁর গানের যতো সম্প্রচার হয় ততোই মঙ্গল। গানই ছিল অতুলপ্রসাদের প্রাণ, তাঁর শ্রেষ্ঠ পরিচয়। সেই কথাই বিশেষভাবে স্মরণ করেছেন কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ তাঁর অতুলপ্রয়াণের পরে লিখিত শ্রদ্ধাঞ্জলি-কবিতায়। কবিতার দুটি চরণ বারংবার আবৃত্তিযোগ্য :

মৈত্রী তব সমুজ্জ্বল ছিল গানে গানে
অমরাবতীর সেই সুধা-ঝরা দানে।

হিটলারের প্রণয়িনী ইভা ব্রাউন

বিশ্বনাথ মুখোপাধ্যায়

লাস্যময়ী ইভা

বিশ্বত্রাস নাৎসী নায়ক এডলফ হিটলারের করাল জীবন ছিলো জটিল, গম্ভীর ও কঠোর। তাই তাঁর জীবনকালে তোলা অসংখ্য ফিল্ম ও ফটোগ্রাফে তাঁর হাস্যকোমল কিম্বা প্রসন্নতায় পরিতৃপ্ত অবয়ব খুবই বিরল। যেখানে তার ব্যতিক্রম সেখানে তাঁর পাশে আছেন সবল সুঠাম, চম্পকবর্ণা কেশ, দীর্ঘাঙ্গী এক নারী,—ইভা ব্রাউন। প্রায় বারো বছর কাল জার্মাণীর দুরন্ত সর্বাধিনায়ক ফুয়েরের সঙ্গে ঐ নারীর সম্পর্ক বহুকাল পর্যন্ত ছিল স্বল্পজ্ঞাত ও রহস্যাবৃত। সম্প্রতি পূর্ব জার্মাণীর কমিউনিস্ট কর্তৃপক্ষ সে সম্পর্কে বহু তথ্য এবং ইভা ব্রাউনের প্রচুর আলোকচিত্র সর্বসাধারণের কাছে সহজলভ্য করে দিয়েছেন।

১৯২২ সাল থেকে হিটলারের প্রধান ফটোগ্রাফার ছিলেন হের্নরিখ হফম্যান। তাঁরই স্টুডিওতে হিটলারের সঙ্গে যখন ইভার প্রথম সাক্ষাৎকার হয় তখন তাঁর বয়স মাত্র সতেরো। হিটলার ছিলেন তাঁর চেয়ে ২৩ বছরের বড়। ঐ সাক্ষাৎকারের কয়েক সপ্তাহ আগে একটি কনভেন্ট স্কুল উত্তীর্ণ হয়ে ইভা হফম্যানের দপ্তর-সহকারিণী হিসেবে যোগ দেন। কাজ ছিল চিঠিপত্র টাইপ করা ও ফাইল প্রভৃতির হিসেব রাখা। সাক্ষাৎক্ষণে ইভা একটি মইয়ের ওপর দাঁড়িয়ে ফাইল পাড়ছিলেন। ইতিমধ্যে হফম্যান-সমভিব্যাহারে হিটলার স্টুডিওতে প্রবেশ করলেন। পরে ইভা তাঁর বোন এলসিকে একটি চিঠিতে লেখেন, 'ভদ্রলোকটি বয়স্ক। অদ্ভুত গোঁফ এবং হাতে একটা বড় ফেল্ট হ্যাট।'

হিটলার তখনকার বিপদজনক রাজনৈতিক পরিস্থিতির জন্যে ছদ্মনাম ব্যবহার করতেন। তাই হফম্যান তাঁকে ইভার সঙ্গে হের উলফ নামে পরিচয় করিয়ে দিলেন। খানিক পরে তিনি ইভাকে সসেজ ও বিয়ার আনতে পাঠালেন এবং সেই সুযোগে হিটলারকে ইভার পরিচয় দিলেন।

ইভা ফিরে এলে হিটলার তাঁর সঙ্গে সঙ্গীত ও নাটক সম্পর্কে নানা আলোচনা করলেন এবং বারবার ইভার প্রশংসা করতে লাগলেন। ইভা বেশ বুঝতে পারলেন সেই 'বয়স্ক ভদ্রলোক' চোখ দিয়ে তাঁর সুডোল পা দুটিকে খুবই তারিফ করছেন। এলসিকে তিনি পরে বলেন, 'আমার মনে পড়ে আমি আমার স্কার্টটাকে খাটো করেছিলাম এবং সেলাইটা সোজা হয়েছে কিনা, তাই নিয়ে চিন্তিত ছিলাম।' সে যাই হোক আলোচ্য ভদ্রলোকটির তাতে বিশেষ কোন আপত্তি ছিল না। তিনি তাঁর কালো রঙের বিশাল মারসেডিজে ইভাকে বাড়ী পৌঁছে দেবার প্রস্তাব করলেন। ইভা তাতে রাজি হলেন না। তখনো তিনি তাঁর নিজের পরিবারের মধ্যেই বাস করেন। সে অবস্থায় সদ্য পরিচিত এক ভদ্রলোকের মারসেডিজে চেপে বাড়ী যাওয়াটা শোভন হতো না। তাছাড়া ব্রীড়া নারী মাত্রকেই তো আরো লোভনীয়া করে তোলে।

কিছুদিন পরে হফম্যান ইভাকে বলেন, হের উলফ কে তাও কি তুমি বুঝতে পারো নি?—তিনি হচ্ছেন এডলফ হিটলার। আমাদের এডলফ হিটলার। অনন্য এডলফ হিটলার। সেদিন থেকে ইভা তাঁর জীবনের বাকি ষোল বছর হিটলার ছাড়া অন্য পুরুষের কথা মনে স্থান দেননি। হিটলারের ব্যক্তিজীবনকে ঘিরে যে-সব নারীরা বিরাজ করতেন তাঁরা লিখে কিম্বা বলে গেছেন যে হিটলারকে আয়ত্ত করতে, তাঁর কাছে নিজেকে অপরিহার্য করে তুলতে বদ্ধপরিকর হন। ইভার দিনপঞ্জীর স্মরণলিপিতেও সে কথার যথেষ্ট পরিচয়। তবু তাঁর জীবনের শেষ পরিণতিতে প্রমাণিত হয় যে হিটলারের প্রতি তাঁর আনুগত্য ও ভালোবাসাও ছিল নিঃসীম।

হিটলারের জন্যে নিজেকে সুস্থ ও সতেজ রাখবার জন্যে নিয়মিত ব্যায়াম করতেন। হিটলারের কল্পনায় আদর্শ সুন্দরী জার্মান নারীরা ছিলেন পীনপয়োধরা। সেদিক থেকে ইভার বক্ষসম্ভার ছিল লঘুভার। তাই তিনি কাঁচুলির মধ্যে রুমাল প্রভৃতি উন্নায়ক হিসাবে ব্যবহার করতেন। সবদিক থেকেই ইভা ছিলেন সাধারণ মেয়ে। তাঁর প্রিয় লেখিকা ছিলেন পার্ল বাক এবং প্রিয়তম সিনেমা নট ক্লার্ক গেবল। অথচ সেই মেয়েই ক্রমশ হিটলারের একতরফা, অনর্গল, একঘেয়ে কিন্তু মারাত্মক সম্ভাবনাময় রাজনৈতিক আলাপ-প্রলাপে অভ্যস্ত হয়ে উঠলেন। শুধু তাই নয়, তাঁর সেই বিকট, বেয়াড়া প্রেমিক যিনি একটি চাবুক না নিয়ে কোথাও বেরুতেন না, তাঁর দ্রুত বর্ধিষ্ণু ক্ষমতায় ক্রমশ সম্মোহিত হয়ে পড়তে লাগলেন।

প্রথমদিকে ইভার সঙ্গে হিটলারের প্রণয় ছিল বয় স্কাউটের মত। তিনি তাঁকে 'আমার খুদে বাজপরী' বলে ডাকতেন। নানান ধরনের মিষ্টি ও নাৎসীদের খাঁকি সার্ট পরিহিত নিজের ছবি উপহার দিতেন। অবশ্য তাই বলে ইভা সম্পর্কে তাঁর কুল হিসেব করতে তিনি কসুর করেননি। তলায়-তলায় তিনি বিশদভাবে খোঁজ নিতে লাগলেন যে ইভা নিষ্কলুষ আর্যবংশসম্ভূতা কি না। নাৎসীদলের বংশগতি সম্পর্কে বিশেষজ্ঞ মার্টিন বরম্যান খুঁজে পেতে আবিষ্কার করলেন যে ইভার জন্ম নিভেজাল জার্মান

বংশেই বটে। কোনকালেই সেই বংশধারায় ইহুদী সংশ্রব ঘটেনি। সপ্তদশ শতাব্দীতে তাঁর এক পূর্ব পুরুষ ব্যাভেরীয়ার নগর কাউন্সিলার ছিলেন। শুধু মুশকিল হলো, ইভার বোন এলাস ব্রাউন এক ইহুদী ডাক্তারের সার্জারীতে রিসেপসোনিসটের কাজ করেন। তিনি ইভার ক্রমদৃঢ়ীভূত নাৎসী মতবাদ ও ইহুদী বৈরিতার বিরোধী এবং স্পষ্টভাবে তা ব্যক্ত করতে তিনি কুণ্ঠিত নন। তৎপরবর্তীকালে জার্মাণীর হিংস্র সাম্প্রদায়িকতার উন্মত্ত প্লাবনের মধ্যেও এলাস তার মত পরিবর্তন করেননি। তৎ-সত্ত্বেও ইভা তাঁর ভয়াল মৃত্যুর পূর্বে এলাসকে তাঁর মিউনিখের বাড়ীটি দিয়ে যান। বাড়ীটি হিটলার ইভাকে দান করেন।

ইভার বাবা ফ্রিৎজ ব্রাউন ছিলেন রাইন-ল্যান্ডের ক্যাথলিক। মা এক জার্মাণীর স্কি চাম্পিয়ান। বহুদিন পর্যন্ত তাঁরা ইভার হিটলারের সঙ্গে সম্পর্কের বিরোধী ছিলেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তারা সে সম্পর্ক মেনে নেন এবং নাৎসী দলে যোগ দেন। ফ্রিৎজ ব্রাউন একটি কর্মহীন কিন্তু মোটা মাইনের কাজ পান। তাঁদের গ্রেটল নামে আরেকটি মেয়ে ছিল।

ইভার সঙ্গে হিটলারের প্রথম রতিক্রিয়া ঘটে পরিচয়ের তিন বছর পরে হিটলারের মিউনিখ ফ্ল্যাটে লাল ভেলভেট মোড়া একটি বৃহদায়তন সোফার ওপরে। অনেক বছর পরে সেই সোফাটির ওপর হিটলারের সঙ্গে জগৎ বিখ্যাত রাষ্ট্রনেতারা—বৃটিশ প্রধানমন্ত্রী চেম্বারলিন, ইতালীর একনায়ক মুসোলিনী প্রভৃতির ছবি দেখিয়ে ইভা পরিহাস করে বলতেন 'ঐ সোফাটার ওপর কী যে হয়েছিল তা ভাগ্যি ও'রা জানেন না।'

নিঃসংগ প্রতীক্ষা

হিটলারের প্রতি প্রেমাসক্তিই ইভার জীবনে প্রথম ও শেষ। কিন্তু ইভা কোন-ক্রমেই হিটলারের জীবনে প্রথম নারী নন। হয়তো শেষও নন। ইতিপূর্বে হিটলার জেয়েলি রাউবাল তাঁর ভাগ্নীর সঙ্গে গভীরভাবে প্রেমাসক্ত হন। শোনা যায়, থিয়েটারে নিয়ে যাবার জন্যে হিটলারকে লেখা ইভার একটি চিঠি হঠাৎ দেখে ফেলে ক্ষোভ ও অসূয়ায় তিনি আত্মহত্যা করেন। অবশ্য উইলিয়ম শিরের তাঁর প্রখ্যাত 'রাইজ এন্ড ফল অব দি থার্ড রাইখ' বইটিতে বলেছেন যে, ইভার সঙ্গে হিটলারের আলাপ হয় জেয়েলির মৃত্যুর দু-এক বছর পরে।

এরপর ১৯৩২ সালের নভেম্বরে শোনা যায় হিটলারকে অন্য মেয়েদের সংগে মিশতে দেখে ইভাও আত্মহত্যার চেষ্টা করেন। তিনি বাবার পিস্তলবার নিয়ে নিজের গলায় গুলি করেন। কিন্তু আঘাত তেমন গুরুতর হয়নি। বিদ্ধ বুলেটটি সহজেই বের ক'রে ফেলা সম্ভব হয়। কেউ কেউ মনে করেন যে হিটলারের অবহেলায় উত্তেজ হয়েই তিনি ঐ আত্মঘাতের প্রয়াস করেন। যাইহোক, হিটলার ঐ ঘটনায় সচেতন হয়ে ওঠেন। তিনি তাঁর সহচরদের বলেন 'এরপর থেকে আমাকে ইভার প্রতি আরো মনোযোগ দিতে হবে।' তিনি হাসপাতালেও ইভার সঙ্গে গোলাপের তোড়া নিয়ে দেখা করেন।

যদিও হিটলার সর্বদাই বলতেন যে 'একমাত্র নাৎসীদলের সঙ্গেই আমার বিবাহ হয়েছে,' তবু এরপর থেকে ইভার প্রতি আরো মনোযোগ দিতে থাকেন। এরপর ১৯৩৫ সালের মে মাসে ইভার ফের মনে হয় যে হিটলারকে আরেকবার নাড়া দেওয়া দরকার। তাই একদিন দেখা গেল যে তিনি ঘুমের ওষুধ খেয়ে হতচৈতন্য হয়ে পড়ে আছেন। হিটলার এবার সত্যিই নাড়া খেলেন। ইভা সেরে উঠলে তিনি মিউনিখে তাঁর নিজের বাড়ীর অদূরে, শহরের উপান্তে একটি ভিলা কিনে দিলেন। ইভা সেখানে তাঁর বোন গ্রেটলের সঙ্গে বাস করতে লাগলেন। হিটলার নাৎসী পার্টিকে দিয়ে ইভার জন্যে একটি মূল্যবান মার্সিডেজ বেনজ কিনিয়ে দিলেন। তাঁর জন্যে সোফারও

ইভার সখের কুকুর

নিযুক্ত হলো। অধিকন্তু তিনি পেলেন ফোকসওয়াগেন গাড়ী।

ক্রমশ ইভা হিটলারের বিজয়াভিযান-গুলির সংগী হতে লাগলেন। অস্ট্রিয়া বিজয়ের পর তিনি ভিয়েনায় হিটলারের সংগে একই হোটেলে ছিলেন। অবশ্য তাঁর সংগে তাঁর মা এবং একজন বয়স্কা মেট্রনও ছিলেন। অথচ নাৎসী প্রচার বিভাগের বিস্ময়কর কেরামতিতে বহির্বিশ্ব প্রায় ষোল বছর হিটলার ও ইভার সম্পর্ক সম্বন্ধে খুব সামান্যই জানতে পেরেছিল। ব্যতিক্রম হয় শুধু একবার। ১৯৩৭ সালে একটি চেক সাপ্তাহিক হিটলারের আলপাইন বিশ্রাম নিকেতন বার্চটেসগাডেনে তোলা ইভার একটি ছবি প্রকাশিত করে তার বর্ণনায় লেখে, 'হিটলারের মাদাম পমপেডু।' সেই ছবি দেখে ইভার বাবা ও হিটলার ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠেন। হিটলার হেনরিখ হফম্যানকে ইভার সব ছবি নষ্ট করে ফেলতে হুকুম দিলেন। সে হুকুম অবশ্য কোনদিনই তামিল হয়নি। তাছাড়া ইভা নিজেও ছিলেন ফটোগ্রাফলব্ধা। তাই তিনি যা কিছু দেখা, মানুষ কিম্বা প্রকৃতির অসংখ্য ছবি তুলতেন। তাঁর নিজের বন্ধুরাও তুলতেন তাঁর ছবি। মৃত্যুর পর তিনি কুড়িটি ছবির এলবাম রেখে যান। যুদ্ধ শেষে তার বেশির ভাগই আমেরিকান ইনটেলি-জেনস কর্তৃপক্ষের হস্তগত হয়।

ইভার আর্থিক সংগতিরও দ্রুত উন্নতি হতে থাকে। প্রথমে তাঁকে দেওয়া হয় বছরে ২৫০ পাউন্ড (বর্তমান মুদ্রামূল্যে ৫ হাজার মত) একটি আমৃত্যু ভাতা। পরে ১৯৩৮ সালে ২রা মে হিটলার তাঁর স্বহস্তে লিখিত উইলে নাৎসী পার্টিকে নির্দেশ দেন তারা যেন ইভাকে আমৃত্যু বছরে ৬০০ পাউন্ড করে দেয়। যদিও ইভাকে কোন অবস্থাতেই হিটলারের সঙ্গে প্রকাশ্যে একত্র বের হতে দেওয়া হতো না তবু এতদিনে ইভা তাঁর বর্ধিষ্ণু ক্ষমতা ও প্রভাব অনুভব করতে লাগলেন। হিটলারের ব্যক্তিগত জীবনে ব্রাউন পরিবারের প্রতিপত্তি ক্রমশই বেড়ে চললো। খুব ঘনিষ্ঠ পার্টিতেও তাঁদের উপস্থিতি নিশ্চিতপ্রায় হয়ে উঠলো। হিটলারের আলপাইন নিভৃত বাসেও তাঁরা আমন্ত্রিত হতেন। রাশিয়া আক্রমণের সময় বার্লিনে অতি নির্বাচিতদের পার্টিতেও তাঁদের ফটোগ্রাফ দেখা যায়। এই আতিশয্যে ফিল্ড মার্শাল গোয়েরিং একবার বিরক্ত হয়ে বলেন যে, 'হিটলার ব্রাউনসার্টদের (নাৎসীদের) দ্বারা পরি-বেষ্টিত হয়ে থাকার পরিবর্তে ব্রাউনদের দ্বারা অবরুদ্ধ হয়ে আছেন।' অবশ্য তাই বলে ইভাকে প্রকাশ্যে হিটলারের সঙ্গে তাঁর সম্পর্কের কোন পরিচয় দেবার সুযোগ দেওয়া হতো না। বিশিষ্ট কোন অতিথি এলে তাঁকে আত্মগোপন করতে হতো। ইভার তোলা কয়েকটি ছবিতে দেখা যায় যে মুসোলিনীর লীলারঙ্গী জামাতা কাউন্ট সিয়ানো হিটলারের সঙ্গে দেখা করতে এলে হিটলার ক্রুদ্ধভাবে ঝটিকা বাহিনীর শান্ত্রী-দের ইভার ঘরের জানালাগুলি বন্ধ করে দেবার হুকুম দিচ্ছেন। হিটলার মনে করতেন যে কাউন্টটি একটু বেশি মাত্রায় ইভার প্রশংসা করেন।

সামাজিকজীবন থেকে নির্বাসিতা হলেও ব্যক্তিজীবনে ইভার প্রতি হিটলারের ঔদার্যের প্রসার ছিল অনেকখানি। ইভা তাঁকে 'আমার ফুয়রার' বলে ডাকতে শুরু করেন। এমন কি ইভা পরিহাস করে বলে গেছেন যে শয্যায় সঙ্গিনী হয়েও তিনি তাই বলেই সম্বোধন ও আদর করতেন। যে সময় জার্মাণীর বিপুল অস্ত্র সজ্জার জন্যে নাৎসীরা বৈদেশিক মুদ্রা সম্পর্কে রীতিমত কাড়াকাড়ি সুরু করেছে, জার্মান নারীরা রুটির চেয়ে গুলিকে অগ্রাধিকার দিচ্ছে সেই সময় ইভা ইতালী, প্যারিস ভিয়েনায় সাজসজ্জা কিনতেন। বছরে কয়েকবার বিদেশ ভ্রমণে যেতেন। তাঁর শেষের দিকের একটি ছবি ১৯৪২ সালের গ্রীষ্মে সেন্ট মার্ক স্কয়ারে তোলা। সেখানে তিনি সহজ ও স্বচ্ছন্দ ভঙ্গীতে পারাবতদের খেতে দিচ্ছেন।

তবু কি ইভা সুখী ছিলেন? —যুদ্ধ যতই জয়ংকর হয়ে উঠতে লাগলো ততই হিটলারের সঙ্গে তাঁর সংযোগ ও সাক্ষাৎকার

ক্রমে আসতে লাগলো। হিটলারের সোফার এরিখ কেম্‌পকা বলেছেন, 'তিনি ছিলেন জার্মাণীর সবচেয়ে অসুখী নারী। তাঁর জীবনের বেশিরভাগটাই হিটলারের জন্যে অপেক্ষা করেই কেটে গেছে।'

যুদ্ধশেষে নুরেনবার্গের বিচারের সময় ফিল্ড মার্শাল কেইটেল বলে গেছেন, 'তিনি ছিলেন তন্বী, সৌষ্ঠবদর্শনা। তাঁর পা দুটি চমৎকার—যা দেখামাত্রই চোখে পড়তো। মাথার চুল গাঢ় চাঁপার রঙ। স্বল্পভাষী, লাজুক এবং অতিশয় ভালো মানুষ। তিনি সর্বদাই অন্তরালে থাকতেন। তাই তাঁকে খুবই কম দেখা যেত।'

'লাস্ট ডেজ অব হিটলারের' লেখক ট্রেভর রুপার্ট বলেছেন, 'ইতিহাসের সব লেখককে এবং পাঠককে ইভা ব্রাউন হতাশ করবেন।' —হয়তো সত্যিই তা করতেন যদি না হিটলারের শেষ কটি দিনে তিনি নাটকীয়ভাবে আবির্ভূতা হতেন।

শেষের কটি ভয়ঙ্কর দিন

ক্রমে যুদ্ধের মোড় ঘুরে গেল। জার্মাণীর ভয়ঙ্কর পরাজয়ের দিন এগিয়ে আসতে লাগলো। জার্মাণীকে সেই প্রলয়ঙ্কর বিপর্যয় থেকে বাঁচাবার জন্যে তার একদল সেনাপতি ১৯৪৪ সালের ২০শে জুলাই হিটলারকে হত্যার ষড়যন্ত্র করেন। সেই ষড়যন্ত্রীদের মধ্যে ছিল স্টর্মস্টুপার্স সেনাপতি ফেজেলেইন। তিনি ছিলেন ইভার ভগ্নী গ্রেটলের স্বামী। জুলাই ষড়যন্ত্রীদের

মধ্যে যাঁরা ছিলেন তাঁদের কেউ কেউ ছিলেন বীতমোহ নাৎসী, কেউ প্রকৃত দেশ প্রেমিক হিটলারের সর্বনাশা নীতি থেকে দেশকে ত্রাণ করবার জন্যে এক মরীয়া চেষ্টায় ব্রতী, কেউ বা সর্বনাশ সমুৎপন্ন দেখে হিটলারের শত্রুদলে ভিড়ে পড়া সুবিধাবাদী। ইতি-পূর্বে নিরস্ত্র ধুগেশলাভদের ওপর স্টর্ম-স্ট্রপার্স জেনারেল ফেজেলেইন যে দানবীয় নৃশংসতার পরিচয় দিয়েছিলেন তার বিচারে ঐতিহাসিকেরা তাঁকে সর্বশেষ দলেই ফেলেছেন। সে যাই হোক, ষড়যন্ত্রীদের বোমা যথাস্থানে এবং যথাসময়ে বিদীর্ণ হওয়া সত্ত্বেও হিটলার আহত হলেন কিন্তু প্রাণে বেঁচে গেলেন। ষড়যন্ত্রীদের গুলি করে মারা হলো। জেনারেল ফেজেলেইনও বাদ পড়লেন না। ইভা তাঁর ভগ্নীপতিকে বাঁচাবার জন্যে কোন চেষ্টাই করলেন না। বরং প্রাক্তন মহিলা টেস্ট পাইলট হান্না রেইটসচ্কে তিনি ফুঁপিয়ে কাঁদতে কাঁদতে বলেন, 'বেচারা এডল্‌ফ। সবাই তাকে ছেড়ে যাচ্ছে। সবাই তাকে বিশ্বাসঘাতকতা করছে। জার্মাণীর তাকে হারানোর চেয়ে অন্য দশ হাজারের মৃত্যু ভালো।'

ঘটনার পর হিটলার তাঁর রক্তমাখা পোষাকটি ইভাকে পাঠিয়ে দেন। আবেগ উদ্বেলিতা ইভা হিটলারকে লেখেন, 'তুমি বিপদে পড়েছো জানলে আমি ভয়ে মরি। যত শীঘ্র পারো আমার কাছে ফিরে এসো। আমি তোমাকে সর্বদাই বলেছি যে তোমার কিছু হলে আমি আর বাঁচবো না। আমাদের প্রথম পরিচয়ের দিন থেকেই আমি প্রতিজ্ঞা করেছি যে সর্বত্র মৃত্যুর পরেও পর্যন্ত আমি তোমার অনুগামী হবো। শুধু তোমার জন্যেই আমি বেঁচে আছি।' ইভা শেষ পর্যন্ত তাঁর প্রতিজ্ঞায় অটুট ছিলেন।

১৯৪৫ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে ইভা তাঁর তেত্রিশতম জন্মদিনে মিউনিখ গেলেন। সোভিয়েটের লাল সেনাবাহিনী তখন দুর্বার গতিতে বার্লিনের দিকে এগিয়ে আসছে। মিউনিখ থেকে ইভা স্বল্প দিনের মধ্যেই ফিরে গেলেন। ব্যাভেরিয়ার কাছে মটর-পথে তাঁর গাড়ীটি মিত্রশক্তির বিমান থেকে বর্ষিত গুলিতে জখম হলো। তিনি অল্পের জন্যে বেঁচে গেলেন। ঐ বছরের ১৫ই এপ্রিল ইভা বার্লিনে হিটলারের কাছে ফিরে গেলেন। বার্লিনে তখন অহোরাত্র বোমা বর্ষিত হচ্ছে। হিটলার তখন তাঁর শেষ আশ্রয় চ্যান্সারীর নীচে এক পাতাল পুরীতে বাস করছেন। ২০শে এপ্রিল হিটলারের শেষ জন্মদিন উদযাপনে ইভা হিটলারকে একটি রত্নখচিত ফ্রেমে নিজের ফটোগ্রাফ উপহার দিলেন। কয়েক মাস আগে সেটি এক মণিকারের কাছে বিশেষ-ভাবে বায়না দিয়ে তৈরী করানো হয়েছিল। সেই সময় জনৈকা বান্ধবীকে ইভা একটি চিঠিতে লেখেন যে সেই ঘনায়মান মহা-বিপর্যয়ের মধ্যেও ফুরার অবিশ্বাস্যভাবে আশাবাদী।

কিন্তু দিন সাতেকের মধ্যেই আশা করবার আর কিছুই রইলো না। বার্লিনের পূর্বদিক থেকে জার্মাণদের মরীয়া প্রতি-রোধ চূর্ণ-বিচূর্ণ করে রাশিয়ানরা সংহার মূর্তিতে দুর্বারগতিতে এগিয়ে আসতে লাগলো। ফুরারের ভূগর্ভ আশ্রয়ের ওপর গোলা-গুলি ও বোমা পড়তে লাগলো। এতদিন পর্যন্ত হিটলার বলে এসেছিলেন যে বিয়ে তাঁর নাৎসী পার্টি ও দেশকে পরিচালনার পথে অন্তরায় সৃষ্টি করবে। আজ যখন পরিচালনার আর কিছুই অবশিষ্ট রইলো না তখন তিনি বিয়ে করার সিদ্ধান্ত করলেন। তিনি জার্মাণীকে হারালেন কিন্তু ইভা তাঁকে সম্পূর্ণভাবে পেলেন। মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে বিবর্ণ, উদ্‌ভ্রান্ত, দেহমনে বিধ্বস্ত হিটলার ঘোষণা করলেন, 'যে নারী দীর্ঘকাল বিশ্বস্ত বন্ধুত্বের পর স্বেচ্ছায় এই বিধ্বস্ত নগরীতে এসে আমার ভাগ্য সহচরী হয়েছেন তাঁকে আমি বিয়ে করার সিদ্ধান্ত করেছি। তাঁর নিজের ইচ্ছায়, আমার স্ত্রী হিসাবে তিনি আমার সংগে সহমরণে যাবেন। আমরা দুজনেই চাই আমাদের মৃত্যুর পর আমাদের এখানে দাহ করা হয়।'

ঐ ঘোষণার পর ২৮ এপ্রিল রাত্রি ১টা থেকে ৩টার মধ্যে (প্রকৃতপক্ষে ২৯শে) তাঁদের সেই বিয়ে সম্পন্ন হয়। প্রচারমন্ত্রী ডঃ গোয়েবলস গিয়ে ওয়ালটার ওয়াগনার নামে এক নগর-কাউন্সিলারকে সংগ্রহ করে আনলেন। কয়েক মহল্লা দূরে তিনি বার্লিন প্রতিরক্ষার শেষ লড়াই লড়ছিলেন। সেখান থেকে ঐ তাজ্জব কর্তব্য সম্পাদনে আচম্বিতে আহূত হয়ে তিনি প্রায় বিস্ময়-উদ্‌ভ্রান্ত হয়ে গেলেন। পাতালপুরীর ছোট সম্মেলন কক্ষটিতে বিবাহ অনুষ্ঠিত হয়। ফুরারের জনৈকা সেক্রেটারী বর্ণিত সেই মরণ-বিবাহের প্রায় সব দলিল পাওয়া গেছে। তাতে জানা যায় যে, হিটলারের আদেশে যে যুদ্ধ পরিস্থিতির বিবেচনায় বিবাহ বিজ্ঞপ্তি ইত্যাদির প্রচার মুখে মুখে করা হোক এবং যেসব কাজে বিলম্ব ঘটতে পারে তা সংক্ষেপে সারা হোক। বর ও কনে উভয়েই দাবী করলেন যে তাঁরা 'সম্পূর্ণ-ভাবে আর্য বংশসম্ভূত এবং বিয়ে নাকচ হবে মতো তাঁদের কোন বংশগত রোগ নেই।' যদিও মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়িয়েও হিটলার যথাযথভাবে রীতি পালনের ওপর জোর দেন তবু ... নাম ও তাঁদের বিয়ের তারিখটির স্থান হিটলার ফাঁক রেখে দেন। কনে নাম সই করতে গিয়ে প্রথমে লিখতে গেলেন ইভা ব্রাউন। কিন্তু মাঝখানে থেমে গিয়ে 'ব'টি কেটে দিয়ে লিখলেন, ইভা হিটলার, জন্মগত পূর্বা ব্রাউন। গোয়েবলস ও নাৎসী পার্টির তদানীন্তন দ্বিতীয় প্রধান মার্টিন বরম্যান সাক্ষী হলেন।

সেই সংক্ষিপ্ত বিবাহ অনুষ্ঠানের পর ফুরারের নিজের ঘরে একটি যমপুরীর ভোজ অনুষ্ঠিত হলো। স্যাম্পেন বিতরণ করা হলো। পাতালপুরীর প্রায় সবাই, হিটলারের সেক্রেটারী, তাঁর নিরামিষ রাঁধুনী উপস্থিত দুজন সেনাপতি হান্স ক্রেবস ও উইলহেম বার্গডর্ফ, মার্টিন বরম্যান এবং ডাঃ ও মিসেস গোয়েবলস। খানিক-ক্ষণের জন্যে সবাই ভয়াল বর্তমান থেকে গর্ব ও গৌরবের অতীতে ফিরে গেলেন। ঠিক আগের মতই ফুরার অনর্গল বক্তা ও অন্যরা বিহ্বল শ্রোতা হয়ে উঠলেন। হিটলার তাঁর নাটকীয় জীবনের অনেক অবিস্মরণীয় ঘটনাকে বাঙ্‌মূর্ত করে তুললেন। গোয়েবল-সের বিবাহে তিনি ছিলেন 'বেস্টম্যান' সকৌতুকে সেই আনন্দোচ্ছ্বসিত দিনটির কথা সবাইকে শোনালেন। তারপরই গম্ভীরভাবে বললেন যে আজ সবই শেষ হয়ে গেছে। ন্যাশন্যাল সোশ্যালিজমের মৃত্যু ঘটেছে। তাঁর পুরোনো বন্ধু ও সহ-কর্মীরা তাঁকে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে। তাই মৃত্যুর মধ্যে তাঁর মুক্তি। বিবাহবাসরে বিষণ্ণতার ঢল নামলো। অতিথিরা সাশ্রু-নয়নে একে একে কক্ষান্তরে চলে যেতে লাগলেন। ফুরারও একসময় নীরবে পাশের ঘরে চলে গেলেন। খানিক পরে তাঁর এক-জন সেক্রেটারী ফ্রাউ গাট্রুড জুঙকে ডেকে পাঠালেন। তিনি এলে তাঁকে তাঁর শেষ উইল বিবৃত করতে লাগলেন।

শেষের দুদিন ভয়ংকর

পরের দিন ২৯শে এপ্রিল বিকালে আতঙ্ক-স্তব্ধ পরিবেশে খবর পৌঁছোলো হিটলারের সহ-জালিম ও যুদ্ধ সহযোগী বেনিতো মুসোলিনি ও তাঁর রক্ষিতা ক্লারা পেটাসি নিহত হয়েছেন।

২৭শে এপ্রিল তাঁরা যখন কমো থেকে সুইজারল্যাণ্ডে পলায়নের চেষ্টা করছিলেন তখন ইতালীর পার্টিজান বাহিনীর লোকেরা তাঁদের ধরে ফেলেন। পরের দিন শনিবার তাঁদের হত্যা করা হয়। সেইদিন রাত্রেই একটি ট্রাক বোঝাই করে তাঁদের মৃতদেহ দুটি নিয়ে এসে মিলানের পিয়েৎজা বা চৌ-চত্বরে ফেলে রাখা হয়। পরের দিন তাঁদের মৃতদেহ দুটিকে পায়ে দড়ি বেঁধে ল্যাম্প পোস্ট থেকে ঝুলিয়ে দেওয়া হয়। কিন্তু কারা এসে দড়ি দুটি কেটে দিয়ে যায় এবং মৃতদেহদুটি পথের পাশে পড়ে থাকে। প্রতিহিংসোমত্ত ইতা-লীয়ানরা এসে সারাটা রবিবার থুথু ফেলে যায়। সোমবার ইতালীর প্রায় দশযুগব্যাপী সর্বময়শাসক ইল ডুচেকে তাঁর উপপত্নী সমেত নিঃসম্বলদের কবরখানায় কবর দেওয়া হলো।

ডুচের শেষ লাঞ্ছনার খবরখানি ফুরারকে

জানানো হয়েছিল তা ঠিক জানা নেই। তবে তা যতখানিই হোক, তাতে তাঁর আত্মহত্যার শেষ সিদ্ধান্ত দৃঢ়তরই হয়। শেষ উইলে তিনি ইতিপূর্বেই বলেছেন যে, তিনি কিম্বা তাঁর বধূকে জীবিত কিম্বা মৃত অবস্থায় 'উন্মত্ত জনতার কাছে ইহুদীদের দ্বারা দর্শনীয় হিসাবে উত্থাপনের সুযোগ' তিনি দেবেন না। সুতরাং মুসোলিনীর মৃত্যুসংবাদ পাবার কিছুক্ষণের মধ্যেই হিটলার তাঁর নিজের মরণের উদ্যোগে ব্যস্ত হয়ে উঠলেন। তাঁর প্রিয় আলসেশিয়ান কুকুরটিকে বিষ খাইয়ে মেরে ফেললেন। পাতালপুরীর অপর দুটি কুকুরকে গুলী করে মারার নির্দেশ দিলেন। তাঁর শেষ দুই মহিলা সেক্রেটারীকে ডেকে তিনি প্রত্যেককে একটি করে বিষের বড়ি দিয়ে বললেন যে, রুশ বর্বরেরা যখন পাতালপুরীতে ঢুকে পড়বে তখন ইচ্ছে করলে তারা ও দুটি ব্যবহার করতে পারে। সেই সঙ্গে তাঁদের ওর চেয়ে ভালো কোন বিদায়-পুরস্কার দিতে পারলেন না বলে ফুরার দুঃখ প্রকাশ করলেন এবং তাঁদের দীর্ঘ অনুগত কাজের জন্যে ধন্যবাদ দিলেন।

হিটলারের জীবনের শেষ সন্ধ্যা ঘনিয়ে এলো। সেক্রেটারী গার্ট্রুড জুঙকে তিনি তাঁর অবশিষ্ট কাগজপত্র পুড়িয়ে ফেলার নির্দেশ দিলেন। নির্দেশ পাঠালেন কেউ যেন পরবর্তী নির্দেশ না পাওয়া পর্যন্ত ঘুমোতে না যায়। অন্যরা ভাবলো এবার তিনি শেষ বিদায় নেবেন। কিন্তু ৩০শে এপ্রিল রাত্রি ২-৩০মিঃ আগে কোন কিছুই ঘটলো না। ঐ সময় ফুরার তাঁর অন্দর-মহল থেকে বেরিয়ে সাধারণ ভোজনাগারে গেলেন। সেখানে প্রায় জনাকুড়ি লোক, যাঁদের বেশিরভাগই ছিলেন ফুরারের পার্শ্ব-চর ও পরিচর, জড় হলেন। ফুরার তাঁদের প্রত্যেকের সঙ্গে করমর্দন করলেন এবং মৃদু অস্পষ্টস্বরে কিছু বললেন। কয়েক দিন থেকেই ফুরারের একদা তীব্র জ্বলন্ত চোখ স্বচ্ছ ও বাষ্পাবৃত হয়ে থাকতো। এখন সেই বাষ্প গাঢ়তর হয়ে উঠেছিল। গার্ট্রুড বলে গেছেন, যে চোখ দুটি যেন বহু-দূরে, পাতালপুরীর প্রাচীরের ওপারে তাকিয়েছিল। এরপর হিটলার ফের তাঁর অন্দরমহলে চলে গেলেন।

তারপরই ঘটলো এক তাজ্জব কাণ্ড। পাতালপুরীতে যে শঙ্কা ও চাপা উত্তেজনা জমাট বাঁধছিলো তা সহ্যের সীমা অতিক্রম করে আচম্বিতে ফেটে পড়লো। পাতাল-পুরীর পরিচরদের একদল গিয়ে ভোজনা-লয়ে নৃত্য শুরু করেছিল।—তার কিছু-ক্ষণের মধ্যেই রুশ সৈন্যরা এসে হানা দেবে। হয়তো তাদের সবাইকেই গুলী করে মারবে। আজ সেই ভয়ংকর পরিণতির প্রাক্কালে অকস্মাৎ তাঁদের জীবনের ওপর থেকে হিটলারের দীর্ঘ কঠোর শাসনের বজ্রমুঠি শিথিল হয়ে গেছে। এখন তাঁরা যা খুশি তাই করতে পারেন। অনেকেই যদিও পালিয়ে গিয়ে প্রাণ বাঁচানোর ফিকির খুঁজতে লাগলো, তবু সে সবের আগে ইতিহাসের এক দুঃসহ নাটকের মুখ্য ও গৌণ পাত্র-পাত্রীরা একবার বাঁধনহারা উল্লাসে উদ্দাম হয়ে উঠলেন। একসময় হট্টগোল এতই বেড়ে উঠলো যে ফুরারের মহল থেকে তা কমানোর আদেশ এলো। তবু সারারাত্রি ধরে নাচ চললো।

পরের খবর আরো ভয়ংকর। রাশিয়ানরা চ্যানসারীর মাত্র কয়েক মহল্লা দূরে এসে পড়েছে। বার্লিনের পতন আসন্ন। সুতরাং হিটলারের সংকল্প কার্যে পরিণত করবার লগ্ন সমাগত। সেদিন একটু বেশি বেলায় হিটলার তাঁর দুজন সেক্রেটারী ও নিরামিষ রাঁধুনীকে নিয়ে আহারে বসলেন। ইভার ক্ষিধে ছিল না, তাই তিনি আর আসেন নি। সেইটাই ফুরারের জীবনে সেই শেষ আহার নীরব, বিষণ্ণ, নিস্পৃহ। আড়াইটে নাগাদ তাঁরা যখন আহার শেষ করছিলেন তখন হিটলারের ব্যক্তিগত সোফার এবং চ্যানসারীর গ্যারেজের ভারপ্রাপ্ত কর্মচারী এরিখ কেমপকা চ্যানসারীর বাগানে তৎক্ষণাৎ ২০০ লিটার পেট্রল পাঠানোর নির্দেশ পেলেন। সেই বেয়াড়া পরিস্থিতিতে অত-খানি পেট্রল জোগাড় করতে কেমপকা রীতিমত বেগ পেলেন। তবু তিনি অনতি-বিলম্বে ১৮০ লিটার পেট্রল চ্যানসারীর বাগানে পাতালপুরী থেকে জরুরী প্রয়োজনে বেরুনোর নির্দিষ্ট দরজার কাছে পাঠিয়ে দিলেন। ফুরারের চিতার আয়োজন সম্পূর্ণ হলো।

হিটলার ইভাকে ডেকে পাঠালেন। তিনি এলে শেষবারের মত তাঁর কর্মচারী, পার্শ্ব-চর ও পরিচরদের কাছ থেকে বিদায় নিতে গেলেন। উপস্থিতদের মধ্যে ছিলেন ড্রঃ গোয়েবলস্, জেনারেল হানস ক্রেবস্, জেনা-রেল উইলহেম বার্গডর্ফ, সেক্রেটারীরা ও রাঁধুনী। শ্রীমতী গোয়েবলসকে দেখা গেল না। সেই সুন্দরী ও ব্যক্তিত্বশালিনী মহিলা ইভার মত তাঁর স্বামীর সঙ্গে সহমরণে যেতে কৃতসংকল্প। কিন্তু সেই সঙ্গে যে তাঁর ছটি অপাপবিদ্ধ বালক ও শিশু সন্তানকেও হত্যা করা হবে,—এই চিন্তায় তিনি উদ্‌ভ্রান্তা। আসন্ন পরিণতি সম্পর্কে সম্পূর্ণ অজ্ঞ অবুঝ ও অবোধ সেই সন্তানেরা পাতালপুরীর সংক্ষিপ্ত ও অব-রুদ্ধ অংগনে খেলা করছিল তাদের দিকে তাকিয়ে তাঁর হৃদয়ে কান্নার সমুদ্র উথলে ওঠে। তাই তিনি তাঁর ছোট্ট ঘরটিতে একাকী শুয়ে নিজেকে সামলাচ্ছিলেন। মাত্র তিনদিন আগে এমনি আরেকটি বেদনা-উদ্বেলিত সন্ধ্যায় হান্না রেইটস্‌কে বলেন, 'শেষ সময় যখন ঘনিয়ে আসবে তখন যদি আমি দুর্বল হয়ে পড়ি তবে আমায় তুমি সাহায্য কোরো। তারা ফুরারের, তারা থার্ড রাইখের। তারাই যদি না থাকে তবে ওদেরও আর স্থান নেই। আমার সব-চেয়ে বড় ভয় শেষ মুহূর্তে আমি হয়তো অতি দুর্বল হয়ে পড়বো।'

হিটলার ও ইভার সেসব সমস্যা ছিল না। তাঁদের করণীয় শুধু নিজেদের জীবন নাশ। সবার কাছে বিদায় নিয়ে তাঁরা নিজে-দের ঘরে চলে গেলেন। বাইরে বারান্দায় ডাঃ গোয়েবলস্, মার্টিন বরম্যান ও কয়েকজন অপেক্ষা করতে লাগলেন। কিছুক্ষণের মধ্যেই একটি রিভলবারের গুলির শব্দ হলো। তাঁরা আরেকটি গুলির শব্দের জন্যে অপেক্ষা করতে লাগলেন। কিন্তু সে শব্দ এলো না। তাই আরো খানিকটা সময় দিয়ে তাঁরা ঘরে ঢুকলেন। দেখলেন সোফার ওপর ফুরারের রক্তাক্ত মৃতদেহ পড়ে আছে। তাঁর পাশেই ইভার প্রাণহীন দেহ। তাঁর হাতের কাছে টোটাভরা রিভলবারটি অব্যবহৃত। হিটলার নিজের মুখে গুলি করে আত্মহত্যা করেছেন এবং ইভা করেছেন বিষপান করে।

রাশিয়ানরা অবশ্য বলেন যে, হিটলারের ঐ গুলী করে 'বীরের' মত আত্মহত্যার কাহিনীটা মিথ্যা। তিনিও বিষ খান। সে যাই হোক এর পরবর্তী কাহিনী সংক্ষিপ্ত। পাতালপুরীর অনুচরেরা দুটি মৃতদেহ বাইরে নিয়ে গিয়ে পেট্রলের আগুনে জ্বালিয়ে দেয়। রাশিয়ানরা দাবী করেন যে, পরে তাঁরা চ্যানসারীর উদ্যান থেকে দগ্ধ দেহটি উদ্ধার করেন।

১৯৫৭ সালে মৃত্যুস্থান থেকে ৩৫০ মাইল দূরে বেরচেটস্‌গাডেনে ইভার বাবাকে সরকারীভাবে তাঁর কন্যার মৃত্যু-সার্টিফিকেট দেওয়া হয়। তাতে মৃত্যু সময় দেওয়া হয়, ৩০শে এপ্রিল, ১৯৪৫ সাল বিকাল ৩-২৮ মিঃ।

ব্রাউন পরিবারে অনেকেই এখনো (আগস্ট, ১৯৭০) বেঁচে আছেন। ইভার মার বয়স এখন ৮৬ বছর, থাকেন ব্যাভেরিয়ায়। বোন গ্রেটল যুদ্ধের পর ফের বিয়ে করেন। এলসির বয়স হওয়া সত্ত্বেও সুন্দরী। তিনি বিধবা। দুই বোনই থাকেন মিউনিখে। তাঁরা বলেন, 'ইভা ব্রাউনের বোন হওয়ার জন্যে সমস্যায় উদ্‌ব্যস্ত হওয়া ছাড়া অন্য কোন লাভই হয়নি।'

প্রবন্ধে উল্লেখিত বইগুলি ছাড়াও লেখক অবজারভার পত্রিকার নিকট তথ্য ও ছবি-গুলির জন্যে ঋণী।

সাহিত্য ও সংস্কৃতি

এলিজাবেথ ব্যারেট ব্রাউনিং

আজ থেকে একশো বছরেরও আগে লন্ডন শহরের অভিজাত বই পাড়ায় এক নতুন কবির কাব্যগ্রন্থ প্রচুর সাজিয়ে রাখা হত—পর-পর কুড়িটা সংস্করণ হয়েছিল এই কাব্যগ্রন্থের। সেই গ্রন্থের নাম 'অরোরা লে' আর লেখিকার নাম এলিজাবেথ ব্যারেট, যাঁর নামের সঙ্গে পরে স্বামীর পদবী যুক্ত হয়ে এলিজাবেথ ব্যারেট-ব্রাউনিং নামে খ্যাতিলাভ করেছিল।

ভিকটোরিয় যুগের এক চাঞ্চল্যকর রোমান্স ব্যারেট-দম্পতির প্রেম। এলিজাবেথ ছিলেন চিররুগ্ন, তাঁর অকর্মণ্য দেহ নিয়ে কোনমতে বেঁচে ছিলেন এমন সময়ে জীবনে আবির্ভূত হলেন রবার্ট ব্রাউনিং। এলিজাবেথকে স্নেহ করতেন মিস রাসেল মিটফোর্ড নামক জনৈক লেখিকা, 'আওয়ার ভিলেজ' নামক একটি গ্রন্থ রচনা করে তাঁর প্রচন্ড খ্যাতি হয়, এলিজাবেথের সঙ্গে ঘটনাচক্রে পরিচয় হওয়ায় এলিজাবেথের জীবনের ধারা পরিবর্তিত হয়। এই মিস মিটফোর্ডকে এলিজাবেথ একটি চিঠিতে লিখেছিলেন—

'কবিতা ও কাব্য অনুসঙ্গ আমার জীবনের একমাত্র সুখ আর স্বস্তি, জানি না মানুষ এ ছাড়া আর কি নিয়ে বাঁচে। আমার কাছে বাকীটুকু শিকড়মাত্র, অন্ধকার আর মাটিই তার আশ্রয়।'

এলিজাবেথ বয়সে এই মিস মিট-ফোর্ডের কন্যাসমা—আত্মপরিচয়সূত্রে মিস মিটফোর্ড বলেছেন—'গুড হিউমার্ড ওল্ড মেড'।

তিনি ব্রাউনিংকে দেখতে পারতেন না, ব্রাউনিং-এর কবিতা তাঁর কাছে,

"One heap of obscurity, confusion and weakness'.

তাই এই ব্রাউনিং-এর সঙ্গে যখন এলিজাবেথ একদিন গৃহত্যাগ করলেন তখন এলিজাবেথের পিতৃদেব ওয়ামপোল স্ট্রীটের মিঃ ব্যারেট যেমন রেগে আগুন হয়েছিলেন, মিস মিটফোর্ডও বিশেষ দুঃখিত হয়েছিলেন।

প্রথম দর্শনে এলিজাবেথ প্রসঙ্গে তিনি বলেছিলেন—'কি চমৎকার ছোট্ট মেয়েটি—কি মিষ্টি, কি নম্র, কি সুন্দর। ওর দিকে সেই চোখ নিয়ে তাকাতে হয় যেন একটি ফুলের দিকে তাকিয়ে আছি।'

এলিজাবেথ মিস মিটফোর্ডকে যে সব চিঠিপত্র লিখেছিলেন তা 'দি লেটারস অব এলিজাবেথ ব্যারেট টু মিস মিটফোর্ড" নামক গ্রন্থে সংকলিত হয়েছে।

এই লেখিকা আজ প্রায় বিস্মৃত।

ভিকটোরীয় যুগে মানুষরা মিসেস ব্রাউনিংকে শক্তিশালিনী লেখিকা মনে করতেন এবং সমকালীন কবিতার ক্ষেত্রে তিনি মর্যাদার আসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন। রাসকিন সেদিন বলেছিলেন—

"Aurora Leigh" is the greatest poem in the English Language".

ল্যানডর বলেছিলেন — মিলটনের পর এমন চকমপ্রদ কবি আর আবির্ভূত হয় নি। উইলিয়াম মরিস বলতেন—এ মেয়েটি আমার ভক্তশিষ্যা। টেনিসন সহজে কারো প্রশংসা করতেন না, তিনিও বলেছিলেন এই মেয়েটির মধ্যে প্রতিভার বীজ আছে। তিরিশের দশক পর্যন্ত এই কলকাতা শহরের ছাত্র ও পন্ডিত মহলেও ব্রাউনিং-দম্পতির কবিতা বিশেষভাবে আলোচিত হত। এমন কি ইংরাজী ভাষার যে সব অধ্যাপক ভাল ব্রাউনিং পড়াতে পারতেন তাঁদের নাম মুখে-মুখে ফিরত।

তারপর সবই মুছে গেল। এই কালে মিসেস বি একটি নাম মাত্র হয়ে দাঁড়াল এবং সেই নামও যথাযোগ্য শ্রদ্ধায় স্মরণ করা হয় না। প্রশ্ন হতে পারে এর কারণ কি?

মিস এলথিয়া হেটার তাঁর সম্প্রতি প্রকাশিত গ্রন্থ 'মিসেস ব্রাউনিং'-এ এই বিষয়ে এক পান্ডিত্যপূর্ণ ব্যাখ্যা দান করে-ছেন। তাঁর রচনায় বৈদগ্ধ্যের সঙ্গে মিশেছে সহানুভূতি ও শ্রদ্ধা এবং তাঁর মতামত অসম্পূর্ণ নয়। মিস এলথিয়া একজন সুদক্ষ সমালোচক এবং সাহিত্য বিষয়ে গভীর জ্ঞানের পরিচয় তাঁর রচনায় পাওয়া যায়। এই সমালোচনা পাঠ করলে সমালোচক এবং সমালোচিত উভয়ের সম্বন্ধে পাঠক মনে ভক্তি জাগে। এই গ্রন্থ পাঠ করলে মিসেস ব্রাউনিংকে শুধু শাদা লেশ সজ্জিত জামা পরিহিতা স্প্যানিয়েল কুকুর ভক্ত একজন ইংরাজী মহিলা মনে হবে না। একটি রক্তমাংসের মানুষ ও মহৎ কবির মূর্তি প্রকাশ পেয়েছে মিস এলথিয়ার এই গ্রন্থে। রেকস ওয়ারনার একদা মিসেস ব্রাউনিং সম্পর্কে বলেছিলেন—

'Shallow and Coy"

এই গ্রন্থটি পাঠ করলে মনে হয় ওয়ারনার ব্যক্তিগত বিদ্বেষে এই মহিলা কবি সম্পর্কে এই অভিমত প্রকাশ করেছিলেন।

মিস হেটার স্বীকার করেছেন—

'Mrs. Browning's poetry will never again be loved by a great many"

আধুনিক রুচির কাছে মিসেস ব্রাউনিংকে অতিশয় ভাবাবেগপ্রবণ এবং জোলো মনে হবে। কিন্তু এই সব ছাপিয়ে আরো কিছু আছে, মিসেস ব্রাউনিংয়ের কবিতা নিছক জোলো এবং ভাবপ্রবণ হলেও তার মধ্যে আছে—

"there was a consciousness spre-ading further than human life and human time a range of sym-pathy from chaffinch to the cherubin".

এই মন্তব্যের পর আবার মিসেস ব্রাউনিং পড়া যায়—এই কবিতা পাঠ করলে

স্নায়ু-শিরায় স্পন্দন না জাগতে পারে—মনে শ্রদ্ধা এবং ভক্তির উদ্রেক হবে।

মিস হেটার রচিত এই আলোচনা গ্রন্থের বৈশিষ্ট্য এই যে, তিনি মিসেস ব্রাউনিংয়ের ধারাবাহিক অসাফল্যের কথা অকপটে বলেছেন। তিনি বলেছেন, মিসেস ব্রাউনিংয়ের বাগ্মিতা অনেক ক্ষেত্রে ক্লান্তিকর এবং মাঝে-মাঝে তিনি এমন সব কবিতা রচনা করেছেন যা নিরর্থক। তাঁর রাজনৈতিক কবিতাগুলি হিস্টিরিয়াগ্রস্ত, এবং তার মধ্যে বিচারশক্তির অভাব আছে। মিস হেটার উল্লেখ করেছেন মিসেস ব্রাউনিং দ্বিতীয় শ্রেণীর নভেল পড়তে ভালবাসতেন, এক রকম এটাই তাঁর নেশা ছিল বলা যায়। তৃতীয় নেপোলিয়ানের প্রতি ছিল তাঁর অসাধারণ শ্রদ্ধা আর এ ছাড়া তিনি আবার আধ্যাত্মিক প্রেতচক্রে বসতে ভালবাসতেন। মাঝে-মাঝে এমন সব মুহূর্ত এসেছে যখন মিসেস ব্রাউনিং নিছক বোকার মত কাজ করেছেন। কিন্তু এসবের সঙ্গে তুলনা করা যাক সেই সব মুহূর্ত যখন—

> "her apocalyptic imagination comes brusting out in wild but hence forward characteristic imagery of glaring white light and sudden glitter of wings and sweeping winds and the throbbing pulse which beats urgently through all her poetry, as her heartbeats must have thundered in the ear pressed into her pillow on sleepless night?".

মিস হেটার এক বন্দী বিহঙ্গের ভাবমূর্তি এমন অসামান্য দক্ষতার সঙ্গে এঁকেছেন যে মিসেস ব্রাউনিংয়ের সব ত্রুটি, তাঁর ভাবাবেগ, তাঁর একগুঁয়ে মনোবৃত্তি, মানসিক দুর্বলতা সব কিছু বিস্মৃত হতে হয়। সুগভীর বেদনা এই মহিলা কবি নীরবে সহ্য করেছেন, তাঁর ভাবপ্রবণতার উজ্জ্বলময় দিকটির কথা মনে রেখে সব ভুলতে হয়। মিস হেটার স্বীকার করেছেন তাঁর নায়িকা ঐতিহাসিক গতিভঙ্গী বিষয়ে কখনও কিছুই বুঝতে পারেন নি—এ ছাড়া রাজনীতিক বা ঐতিহাসিকের শক্তিমত্তাও তাঁর মধ্যে ছিল না, মিস হেটার এই সঙ্গে আরও বলেছেন—

> "She suffered from a certain vanity about her masculine interests—'

তাঁর ধারণা ছিল তৃতীয় নেপোলিয়নের 'ক্যু দ্য তা' তিনি বুঝেছেন। তিনি নেপোলিয়নকে যেমনটি বুঝেছেন বৃটিশ রাজনীতিকরা সে দিক থেকে সম্যক বিচার করতে পারেন নি। লণ্ডনের সংবাদপত্রকেও তিনি অজ্ঞ মনে করতেন। জানলা দিয়ে একটি 'র‍্যালটে'র দৃশ্য দেখে লিখেছিলেন—

> With a universal Shout
> They took the old regalia out'.

যে ধরনের নরহত্যা এবং রাজনৈতিক হত্যা হয়েছে তা মিসেস ব্যারেট-ব্রাউনিং উপেক্ষা করেছেন। আধুনিক জগৎ এই সব কারণে মিসেস ব্রাউনিংকে 'হিস্টিরিয়াগ্রস্ত' এক বিকৃত মানসের কবি মনে করেন। মিস হেটার লিখেছেন—

> "Mrs. Browings poetry is often wilful and sometimes very Silly, at times inelegant, at times grotesquely violent, but she had strong powers of heart and mind"

এই গ্রন্থ পাঠ করে লেখিকার এই বক্তব্য পাঠকের মনে জেগে থাকবে।

যে কবির খ্যাতি এবং প্রভাব নিঃশেষিত সেই কবি বিষয়ে এমন একটি পরিচ্ছন্ন, উচ্ছ্বাসবর্জিত গ্রন্থ রচনা নিঃসন্দেহে কৃতিত্বের পরিচায়ক। মিস হেটার এমন একটি সাহসিক গ্রন্থ রচনার জন্য অভিনন্দনযোগ্য।

—অভয়ঙ্কর

Mrs: BROWNING. BY ALETHEA HAYTER: Published by FABER & FABER: Price 30 Shillings only

সাহিত্যের খবর

বিশ্ব রামায়ণ উৎসব

ইন্দোনেশিয়া ও 'ইউনেস্কো'র যুক্ত উদ্যোগে গত সেপ্টেম্বর মাসে পূর্ব জাভায় বিশ্ব-রামায়ণ উৎসব এবং আলোচনা চক্রের অনুষ্ঠান হয়। এশিয়া মহাদেশের যে-সকল দেশে রামায়ণের ঐতিহ্য এখনও নানাভাবে সমাজ ও সাংস্কৃতিক জীবনে সক্রিয় আছে সেই সকল দেশ, যেমন, ভারত, সিংহল, নেপাল, ব্রহ্মদেশ, মালয়েশিয়া, থাইল্যান্ড, কম্বোডিয়া, ভিয়েৎনাম লাওস, ফিলিপাইনস সিংগাপুর, ইন্দোনেশিয়া এতে যোগদান করবার জন্য আমন্ত্রণ লাভ করে।

পূর্ব জাভার অন্তর্গত পান্ডান সহরে এশিয়ার বৃহত্তম উন্মুক্ত রঙ্গমঞ্চে ৩১শে আগস্ট ইন্দোনেশিয়ার রাষ্ট্রপতি সুহর্তো আনুষ্ঠানিকভাবে এই উৎসবের উদ্বোধন করেন। তারপর ১১ই সেপ্টেম্বর পর্যন্ত একাদিক্রমে প্রতি রাত্রে পান্ডানে দুটি দেশের রামায়ণ বিষয়ক নৃত্যনাট্যের অনুষ্ঠান হয়। তারপর থেকে ১৯শে সেপ্টেম্বর পর্যন্ত প্রথমতঃ পূর্ব জাভার প্রধান সহর যোগজাকার্তা তারপর বালিদ্বীপের প্রধান সহর দেন পাসার এবং শেষ পর্যন্ত ইন্দোনেশিয়ার রাজধানী সহর জাকার্তায় বিভিন্ন দেশ থেকে আগত নৃত্য সম্প্রদায়ের এবং ইন্দোনেশিয়ার বিভিন্ন অঞ্চলের শিল্পীদিগের নৃত্যের অনুষ্ঠান হয়। ভারতবর্ষ থেকে দুটি সম্প্রদায় তাতে যোগদান করেছিল—কেরলের কথাকলি এবং গোয়ালিয়রের লিটল ব্যালে। জাভা এবং বালিদ্বীপের বিভিন্ন সম্প্রদায় রামায়ণ নৃত্যে চরম উৎকর্ষ প্রদর্শন করে।

পান্ডানের নিকটবর্তী ত্রেতাস শৈলনগরের মনোরম পরিবেশে রামায়ণ বিষয়ক আন্তর্জাতিক আলোচনা চক্রের চার দিনব্যাপী অধিবেশন সম্পন্ন হয়। প্রত্যেক দেশ থেকে তাতে যোগদান করবার জন্য দুজন করে প্রতিনিধি প্রেরিত হয়েছিল, কেবল ভারতবর্ষ থেকে চারজন প্রতিনিধি তাতে যোগদান করেছিলেন, এঁরা কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের প্রধান ডকটর শ্রীআশুতোষ ভট্টাচার্য, দিল্লীর প্রত্নতত্ত্ববিদ্ ডকটর লোকেশচন্দ্র, মাদ্রাজ কলাক্ষেত্রের প্রতিষ্ঠাত্রী শ্রীমতী রুক্মিণীদেবী অরুন্ডালে এবং তামিলনাড়ুর অধ্যাপক ডকটর শ্রীনিবাস রাঘবন। বিভিন্ন দেশ থেকে আগত আলোচনায় অংশ গ্রহণকারীদের মধ্যে ভারতের প্রতিনিধি ডকটর শ্রীআশুতোষ ভট্টাচার্য সর্বশ্রেষ্ঠ বিবেচিত হওয়ায় তিনি পুরস্কার লাভ করেন। ডকটর ভট্টাচার্য আলোকচিত্র সহযোগে বালিদ্বীপের কয়েকটি নৃত্যের সঙ্গে পশ্চিম বাংলার পুরুলিয়া অঞ্চলের ছৌনৃত্যের কোন কোন বিষয়ে সাদৃশ্যের

দিকে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। উৎসবে প্রতিদিন প্রায় পঞ্চাশ হাজার দর্শক এবং আলোচনা চক্রে অংশগ্রহণকারী ধাতীতও পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের সহস্রাধিক অনুরাগী-শ্রোতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

আন্তর্জাতিক, রামায়ণ উৎসব এই প্রথম অনুষ্ঠিত হলো। দ্বিতীয় উৎসব দু-বছর পর ভারতবর্ষে অনুষ্ঠিত হতে পারে বলে জানা গেছে।

সৌমেন্দ্রনাথ সম্বর্ধনা

প্রখ্যাত সাহিত্যকার এবং রাজনৈতিক নেতা শ্রীসৌমেন্দ্রনাথ ঠাকুর সপ্ততিবর্ষে পদার্পণ করলেন। এই উপলক্ষে তাঁর অনুরাগী-গুণমুগ্ধ বন্ধুগণ কর্তৃক এলগিন রোডস্থ বাসভবনে এক বিশেষ সম্বর্ধনা সভা আয়োজিত হয়। সভায় শ্রীযুক্ত সৌমেন্দ্রনাথ ঠাকুরের জীবন ও সাহিত্য সাধনা সম্পর্কে আলোচনা হয়।

সুরেন্দ্রনাথ নিয়োগীর সম্বর্ধনা

'সংহতি' সম্পাদক সুরেন্দ্রনাথ নিয়োগীর সপ্ততিবর্ষ পূর্তি উপলক্ষে বিবেকানন্দ রোডে বনফুলের সভাপতিত্বে এক বিশেষ সম্বর্ধনা সভার আয়োজন করেন বিভিন্ন সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান। বাংলার বহু খ্যাতনামা সাহিত্যিক এই সভায় উপস্থিত হয়ে শ্রীযুক্ত নিয়োগীকে তাঁর নিরলস সাহিত্য সাধনার জন্য প্রশস্তি ও অভিনন্দন জ্ঞাপন করেন।

নতুন বই : শারদ সংকলন

অশ্রু-নদী। সমীরণ দাশগুপ্ত। স্বপক্ষ প্রকাশন, বরদা ব্রীজ, নৈহাটি, ২৪ পরগণা। দাম আড়াই টাকা।

'অশ্রুনদী' গ্রন্থটি একটি গল্প সংকলন। মোট সাতটি ছোটগল্প গ্রন্থটির প্রধান অবলম্বন। লেখক বয়সে তরুণ। পূর্ববঙ্গে জন্মগ্রহণ করলেও লালিত হয়েছেন পশ্চিমবঙ্গে। কিন্তু তরুণ লেখক মনে পূর্ববঙ্গের স্মৃতি সুদূর রোমান্টিক অভীপ্সায় মিশ্রিত আছে। লেখকের যে স্বদেশ তা যুক্ত বাংলাদেশ। এই ব্যাপক স্বদেশ ভাবনা তাঁর আলোচ্য গ্রন্থের ছোটগল্পগুলির সঙ্গে ওতপ্রোত। লেখকের স্বদেশপ্রবণতা গোপন আবেগে দীপ্ত হলেও স্বদেশকে প্রতীকের তাৎপর্যে উপস্থাপিত করার কারণে সংযত ও শিল্পরসসমৃদ্ধ। নামগন্ধ ও 'পদ্মা ও গোপাল', 'আত্মপরিচয়', 'আমার লীলা', 'পুতুল' ইত্যাদি গল্প পড়লে বোঝা যায় লেখক-চেতনা স্বদেশ থেকে বিচ্ছিন্নতার কারণে পীড়িত। এই বেদনা তাঁর গল্পে একদিকে জীবনযন্ত্রণা ও অন্যদিকে কাব্যিক সুষমা দান করেছে। এখানেই তরুণ গল্পকার সমীরণ দাশগুপ্তের শিল্পকৃতিত্ব।

গল্পস্পন্দন—সম্পাদক : মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়' ১০।৭ ডি, গণেশ ব্যানার্জী লেন, কলিকাতা-৩১। দাম—এক টাকা।

শারদীয়া গল্পস্পন্দন আকর্ষণীয় রচনা-সম্ভারে সমৃদ্ধ। প্রতিটি রচনাই পাঠক-পাঠিকাকে খুশী করবে। লিখেছেন বিষ্ণু দে, দক্ষিণারঞ্জন বসু, সুনীল নন্দী, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, শম্ভু মিত্র, কমল ভট্টাচার্য, শান্তিপ্রিয় বন্দ্যোপাধ্যায়, সুহৃদগোপাল দত্ত, কায়সুল হক, আবু আহমেদ কামসার, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, মায়া বসু, শংকর সরস্বতী, তরুণ ঘোষ, শ্যামল বসু ও পিনাকী বিশ্বাস। পরিচ্ছন্ন মুদ্রণ ও শোভন-সুন্দর প্রচ্ছদ প্রশংসা করবার মতো। প্রচ্ছদ এঁকেছেন বরুণ ঘোষ।

রোশনাই—সম্পাদক : শিপ্রা আদিত্য। ৮, ডক্টর আশুতোষ শাস্ত্রী রোড, কলকাতা : ১০। দু' টাকা।

অ্যাডভেঞ্চার, খেলাধুলা, সংস্কৃতি এবং সংগ্রামকে কেন্দ্র করে কিশোর ও তরুণদের একমাত্র জীবনধর্মী বাংলা মাসিক পত্রিকাটি সত্যিই অভিনব এবং অভিনন্দনীয় এই কারণে যে, এ পত্রিকার উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য হল আজকের বিক্ষুব্ধ তরুণ চেতনার বিধ্বংসী পথ অতিক্রমণকে সৃষ্টিশীল পথে প্রবাহিত করা। যুব-মানসের দিকে লক্ষ্য রেখেই নানান ধরনের রচনা—খেলাধুলা থেকে শুরু করে পরীক্ষা-প্রহসন অবধি—সন্নিবেশ করা হয়েছে। আন্তরিক প্রাণযত্নের স্পর্শে সাময়িকীর শুধু বহিরঙ্গে নয় অন্তরঙ্গেও। সুস্থ চিন্তা ও জীবন-জিজ্ঞাসা পত্রিকাটির সর্ব অবয়বে। সুখ্যাত শিল্পী দেবব্রত মুখোপাধ্যায়ের প্রচ্ছদ ও অলংকরণ এবং অবনীন্দ্রনাথের ভিত্তি চিত্র : কচ ও দেবযানী পত্রিকাটিকে একটা আলাদা মর্যাদা এনে দিয়েছে। এ সংখ্যার বিশেষভাবে উল্লেখ্য রচনা হল : মিহির সেনের 'আকাশ-কুসুম' দিলীপ বসুর 'মহাকাশ', বিপ্লব-জিজ্ঞাসা (লেখকের নাম নেই), দীপেন্দু চক্রবর্তীর 'সমালোচনা হইতে সাবধান' অমিতাভ দাশগুপ্তের কবিতা : মধুসূদন দাদা-কে এবং অবনীন্দ্রনাথের চিঠি।

হোমশিখা—সম্পাদক : কালীপ্রসাদ বসু। কৃষ্ণনগর। এক টাকা।

১৯শ বর্ষের শারদ সংখ্যাটি নিবেদিত হয়েছে 'বাংলাদেশ সংখ্যা' রূপে। বাংলাদেশ-এর মুক্তি-আন্দোলনের প্রস্তুতিপর্ব থেকে শুরু সাম্প্রতিককালের মুক্তিযুদ্ধের আনুপূর্বিক বিবরণ তৎসম্পর্কীয় নানান সমস্যার ইত্যাদি নিয়ে রচিত হয়েছে সমস্ত লেখাগুলি। কবিতাও। এই মুক্তিযজ্ঞের সঙ্গে যাঁরা যুক্ত তাঁরাও লিখেছেন। ফলে এই বিশেষ সংখ্যাটি বাংলা প্রেমীদের কাছে বিশেষভাবে সমাদৃত হবে।

নবাংকুর—সম্পাদক : ধনঞ্জয় দাশ, বিকাশ-চন্দ্র দাস।

তৃতীয় বর্ষের শারদ সংকলনটি মুদ্রণ-পরিচ্ছন্নতায় ও জীবনধর্মী বিদগ্ধতায় রচনায় বিশিষ্ট হয়ে উঠেছে। দক্ষিণারঞ্জন বসুর 'বিজ্ঞানের জয়যাত্রায় সংস্কৃতি' এবং ধনঞ্জয় দাশের 'পূর্ববাংলার সাহিত্য-আন্দোলনের প্রথম যুগ' নিবন্ধ দুটি একাধিক কারণে সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। সভ্যতা এবং সংস্কৃতি ও বিজ্ঞানের যোগসূত্রটি যুক্তির আলোয় পরিপূর্ণভাবে মেলে ধরেছেন লেখক এই স্বল্প পরিসরে। আজকের 'বাংলাদেশপ্রেমীরা', পাবেন শ্রীদাশের নিবন্ধের মধ্যে পুরোনো দিনের অজানা কাহিনী। কবিতা লিখেছেন : গৌরাঙ্গ ভৌমিক, সত্য গুহ, তুলসী মুখোপাধ্যায়, নচিকেতা ভরদ্বাজ, পরমানন্দ সরস্বতী প্রমুখ। ভ্রমণ-কাহিনী প্রবন্ধ এবং দুটি গল্পও আছে। ছিমছাম পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন পত্রিকার সর্বাঙ্গে তারুণ্যের দীপ্তি পাঠককে আকর্ষণ করবেই।

ত্রিবৃত্ত—সম্পাদক : রণজিৎ দেব। ১, ত্রিবৃত্ত সরণি, কুচবিহার। একটাকা।

কুচবিহার থেকে প্রকাশিত 'ত্রিবৃত্ত' শারদ সংকলন 'বাংলা ও বাংলাদেশ' সংখ্যা হিসেবে প্রকাশিত হয়েছে। 'বাংলাদেশের কবিতা' লিখেছেন ওপার বাংলার খ্যাতনামা কবিরা এবং বাংলার কবিতায় আছেন এপার বাংলার কবিরা। এছাড়া গল্প প্রবন্ধও আছে একাধিক। লেখক তালিকায় বিশিষ্টরা হলেন : আলাউদ্দিন আল আজাদ, আসাদ চৌধুরী, আবুল হাসান, নির্মলেন্দু গুণ, রামেন্দ্র দেশমুখ্য, শিবশম্ভু পাল, গৌরাঙ্গ ভৌমিক, সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ প্রমুখ।

এবং নৈকট্য—সম্পাদক : অচিন্ত্যকুমার সাঁতরা। ৭০, বসাক বাগান (পাঠ-পুকুর), কলকাতা—৪৮। দাম—তিরিশ পয়সা।

উল্লেখযোগ্য দুটো কবিতা লিখেছেন তরুণ সান্যাল ও গৌরাঙ্গ ভৌমিক। গল্প লিখেছেন সমরেশ বন্দ্যোপাধ্যায়, বলরাম বসাক, সুব্রত মুখোপাধ্যায় ও অচিন্ত্যকুমার সাঁতরা। দেবকুমার গঙ্গোপাধ্যায়ের আলোচনাটি আকর্ষণীয়।

দুর্গাপুর বাণী—সম্পাদক : কালিদাস বন্দ্যোপাধ্যায়। বেনাচিতি, দুর্গাপুর—৪। দু' টাকা।

গল্প-কবিতা এবং প্রবন্ধ নিয়েই 'দুর্গাপুর বাণী'র শারদ সংকলন। এ সংখ্যার বিশিষ্ট লেখকরা হলেন : গজেন্দ্র-কুমার মিত্র, সুমথনাথ ঘোষ, গৌরীকেদার ভট্টাচার্য, গৌরাঙ্গ ভৌমিক, নচিকেতা ভরদ্বাজ, তুলসী মুখোপাধ্যায়, সত্য গুহ প্রমুখ। শম্ভু মিত্রের 'পালাকার মতিলাল রায়ের সাহিত্যকীর্তি' উল্লেখ্য রচনা।

শব্দ সাহিত্য—সম্পাদক : রণজিৎ দাশগুপ্ত ও দিলীপকুমার চক্রবর্তী। অ্যাপোলো প্রিন্টার্স এন্ড পাবলিশার্স। ২১।১, জায়াত খাঁ লেন, কলকাতা—৯। দাম : এক টাকা।

অদ্ভুত ধরণের কাগজ। পৃষ্ঠাসংখ্যা দেওয়া হয়েছে হরফের সাহায্যে। যেমন

ক-পৃষ্ঠায় লিখেছেন মণীন্দ্র রায়, খ-পৃষ্ঠায় সুনীল নন্দী, গ-পৃষ্ঠায় সৌরাঙ্গ ভৌমিক। এ সংখ্যায় গল্প-কবিতা-প্রবন্ধ লিখেছেন বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, তুলসী মুখোপাধ্যায়, সত্য গুহ, রঞ্জিত রায়চৌধুরী, দিলীপ-কুমার চক্রবর্তী, অপূর্ব মুখোপাধ্যায়, সনৎ বন্দ্যোপাধ্যায়, তরুণ সান্যাল এবং আরো অনেকে।

বলয়—সম্পাদক : সারাফত হোসেন। বাহিরা, হাওড়া। পঁচাত্তর পয়সা।

গল্প-প্রবন্ধ-কবিতা অনুবাদের রচনা ইত্যাদি নিয়েই বলয়ের শারদ সংকলন। বিশিষ্ট লেখকরা হলেন—অন্নদাশঙ্কর রায়, সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ, বদরুদ্দিন ওমর প্রমুখ। 'পিছনে ফিরে তাকানো', 'বাঙালীর সংস্কৃতি সংকট' ও শ্রেণীচেতনার পারম্পর্য নিরিখে সুকান্ত এবং রবীন্দ্র-নজরুল প্রবন্ধগুলি তথ্যসমৃদ্ধ ও সুলিখিত। ভাবনার খোরাক যোগায়।

নির্মোক—সম্পাদক : কৃষ্ণপদ সমাজদার। ২৬এফ, রাখাল ঘোষ লেন, কলকাতা—১০। দাম : এক টাকা পঞ্চাশ পয়সা।

গতানুগতিক সাহিত্যের কাগজ। লিখেছেন কিরণশংকর সেনগুপ্ত, শংকরানন্দ মুখোপাধ্যায়, অমিতাভ দাস, বিজয়কুমার দত্ত অজয় বসু এবং আরো অনেকে। কারবেজনের লেখা 'মধুসূদন' শীর্ষক রচনাটি ভালো।

বেলাভূমি—সম্পাদকমণ্ডলী কর্তৃক সম্পাদিত। ২৯ মল্লিকপাড়া লেন, শ্রীরামপুর, হুগলী। পঞ্চাশ পয়সা।

মূলত কবিতার কাগজ। গল্পও আছে দুটি। লিখেছেন আনন্দ বাগচী, শংকর চট্টোপাধ্যায়, পবিত্র মুখোপাধ্যায়, বিবেকানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায়, দেবদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, সোমনাথ মুখোপাধ্যায় এবং আরো কয়েকজন। সম্পাদনায় রুচি পরিচ্ছন্ন।

মাঝি—সম্পাদক প্রশান্ত রায়। ২৮ বিডন স্ট্রীট, কলকাতা ৬। দাম পঁচিশ পয়সা।

চেহারা ভালো। টকটকে লাল রঙের প্রচ্ছদ। উল্লেখযোগ্য লেখকদের মধ্যে আছেন গৌরাঙ্গ ভৌমিক, অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়, চন্দন সেন, প্রশান্ত রায় ও বাসুদেব পাল।

পদাবলী—সম্পাদক : স্বপন চক্রবর্তী। ৬৮, দুর্গাচরণ মিত্র স্ট্রীট, কলকাতা—৬। দাম—এক টাকা।

সূচীপত্রহীন এই কাগজটি প্রথমেই দৃষ্টি আকর্ষণ করে পরিচ্ছন্নতার জন্য। লেখকসূচীতে আছেন মিহির আচার্য, শংকর চট্টোপাধ্যায়, আবদুল জব্বার, মণিভূষণ আচার্য, দিলীপ সেনগুপ্ত, বলরাম বসাক প্রমুখ। শিশির সেনের লেখা 'তারাশংকর : মন ও শিল্প' শীর্ষক প্রবন্ধটি উল্লেখযোগ্য।

কবিকণ্ঠ—সম্পাদক : অসীমকৃষ্ণ দত্ত। ১০১, ইব্রাহিমপুর রোড কলকাতা—৩২। দাম—দু' টাকা।

কবিতা লিখেছেন, কিরণশংকর সেনগুপ্ত, বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, ফণিভূষণ আচার্য, তুলসী মুখোপাধ্যায়, সরোজলাল বন্দ্যোপাধ্যায়, অলোকরঞ্জন দত্ত, রথীন ভৌমিক এবং আরো অনেকে। বিদেশী কবিতার অনুবাদগুলি এ সংখ্যার মর্যাদা বাড়িয়েছে।

সীমান্তিক—সম্পাদক : বিবেকানন্দ সেনগুপ্ত ও দেবাশিস ঘোষ। উত্তর বঙ্গ প্রেস, টেম্পল স্ট্রীট, জলপাইগুড়ি। এক টাকা।

নবীন-প্রবীণ লেখকদের লেখায় সমৃদ্ধ। লিখেছেন রবীন সুর, শুদ্ধসত্ত্ব বসু, দুর্গাদাস ভট্ট, দিলীপ সেনগুপ্ত, সৈয়দ কওসর জামাল, অতীন্দ্রিয় পাঠক, প্রভাত দাস এবং আরো অনেকে।

সংবেদন—সম্পাদক : দিলীপ মুখোপাধ্যায়, কৃষ্ণপদ চৌধুরী। ৬৪৯/১, অশোকনগর, ২৪ পরগণা। ষাট পয়সা।

গতানুগতিক সাময়িক পত্রিকা—গল্প, প্রবন্ধ এবং কিছু কবিতা নিয়েই শারদ সংকলন। গল্পের সংখ্যা বেশি। সন্তোষকুমার মজুমদারের প্রবন্ধটি উল্লেখ করবার মতো।

বিশ্ববার্তা—সম্পাদক : কালীপদ চক্রবর্তী। ৪৪/৮, গরচা রোড, কলকাতা—১৯। দু' টাকা।

চব্বিশ বছরের শারদ সংখ্যায় সাময়িক পত্রিকাটির পূর্বসুনাম অক্ষুণ্ন আছে। প্রবন্ধ, গল্প, রম্য রচনার বিশিষ্ট লেখকরা হলেন : শ্রীজীব ন্যায়তীর্থ, ডক্টর রমা চৌধুরী, সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, প্রমথনাথ বিশী, পরিমল গোস্বামী, নন্দগোপাল সেনগুপ্ত, মনোজ বসু, নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, ফণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, আশা দেবী প্রমুখ। কান্তি ঘোষ, রবীন রায়, প্রশান্ত দে, বিরাজন দাস প্রমুখের রচনাগুলি এবং বাংলাদেশের পটভূমিকায় অধ্যাপক তারাপদ রাহার 'রাবেয়া' গল্পটিও উল্লেখের দাবি রাখে।

সহযাত্রী—সম্পাদনা : নিখিলেন্দ্র ভট্টাচার্য। কালীঘাট কলকাতা।

সর্বজনীন শারদ-উৎসবের পত্রিকা সুপরিচিত লেখকদের বিবিধ রসের রচনায় শারদীয় সংখ্যার চেহারা পেয়েছে। লিখেছেন—নরেন্দ্র মিত্র, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, শিবরাম চক্রবর্তী, গৌরাঙ্গপ্রসাদ বসু, জ্যোতির্ময় নন্দী, শংকর চট্টোপাধ্যায়, আশুতোষ মুখোপাধ্যায়, তারাপদ ব্রহ্মচারী প্রমুখ। ডিটেকটিভ বালাকী চট্টোপাধ্যায় (বসু) ও সন্দিপ্ত বসুর লেখা দুটি সিনেমা-দর্শকদের খুশী করবে।

সংস্কৃতি পরিক্রমা—সম্পাদক : অমলা চক্রবর্তী। ৩, নন্দী স্ট্রীট। কলকাতা ২৯। দাম দু'টাকা।

বর্তমান শারদ সংকলনে প্রবন্ধ, গল্প, কবিতা নাটক লিখেছেন ভবতোষ দত্ত সোমেন্দ্রনাথ বসু, সজল বসু, সুব্রত নিয়োগী, আলোক সরকার, পবিত্র মুখোপাধ্যায়, শুদ্ধসত্ত্ব বসু, রক্তেশ্বর হাজরা, কুন্তল মজুমদার, মিহির আচার্য, সমীরণ দাশগুপ্ত, সুব্রত রাহা এবং আরো কয়েকজন।

জন্মভূমি (সাপ্তাহিক) সম্পাদক : মোস্তাফা আলাম্মা। রবীন্দ্র এভিনিউ, মুজিবনগর, বাংলাদেশ।

বাংলাদেশের সংগ্রামী জনগণের মুখপত্র সাপ্তাহিক জন্মভূমির এটি ষষ্ঠ সংখ্যা। বাংলাদেশের জনযুদ্ধের গতিপ্রকৃতি এবং সংবাদ এর মুখ্য উপজীব্য। এই সঙ্গে বাংলাদেশ-এর স্বাধীনতা আন্দোলন সম্পর্কে বিশ্ব অভিমতও এতে স্থান পেয়েছে। ইয়াহিয়ার খুনে সরকার বাংলাদেশের হত্যার তাণ্ডবে শুধু মাতে নি, জাতীয়তাবাদী পত্রিকাগুলিরও কণ্ঠরোধ করেছিল। 'জন্মভূমি'র প্রেস এবং অফিস ধ্বংস করে ফেলেছিল। কিন্তু ওরা জানে না—মৃত্যুর মধ্যে দিয়েই নবজীবনের সূচনা। 'জন্মভূমি'ই তার জাগ্রত প্রমাণ।

লিপিকা — সম্পাদকমণ্ডলী। ধনেখালী, হাটতলা, হুগলী।

গ্রামবাংলা থেকে প্রকাশিত সাহিত্য পত্রিকার শারদ সংখ্যায় নানান স্বাদের লেখা স্থান পেয়েছে। লিখেছেন নবীন এবং প্রবীণ লেখকরা — বিশেষভাবে উল্লেখ্য হলেন : মণীন্দ্র রায়, নন্দগোপাল সেনগুপ্ত, নচিকেতা ভরদ্বাজ, সম্রাট সেন, গৌরকিশোর ঘোষ। 'লিপিমিতায় [ছোটদের বিভাগে] লিখেছেন : তারাশংকর বন্দ্যোপাধ্যায়, দক্ষিণারঞ্জন বসু এবং আরো অনেকে। অজিতকুমার ঘোষের জীবন সমীক্ষায় 'গৃহদাহ' উল্লেখের দাবী রাখে।

বিস্ময়—সম্পাদক : সুজিত ধর, রণেন ঘোষ। ১৩৬ রাজা রামমোহন সরণী, কলকাতা—৯। এক টাকা।

বিজ্ঞানকে সাহিত্যের হাতিয়ার করে গল্প-কাহিনী গড়ে তোলা বিশেষজ্ঞের কাজ। সবাই নন—কেউ কেউ সুষ্ঠুভাবে এই কঠিন কর্মটি করতে পারেন। সায়েন্স ফিকশনকে উপজীব্য করে যালে এদেশে কিছু সাময়িকপত্র প্রকাশিত হচ্ছে—'বিস্ময়' এই দিক থেকে বিশিষ্ট। এই সংখ্যায় লিখেছেন : সত্যজিৎ রায়, প্রেমেন্দ্র মিত্র, সমরজিৎ কর, রণেন ঘোষ, অমিতানন্দ দাশ,

অভিজিৎ দত্ত, বিশু দাশ ও অঞ্জলি বসু। গল্প, কাহিনী, উপন্যাস এবং বিজ্ঞান-বিষয়ক সংবাদের সুষ্ঠু সমাবেশের জন্যে 'বিস্ময়' পাঠক সম্বর্ধনা অবশ্যই লাভ করবে।

কৃশানু—সম্পাদক : দীনেশচন্দ্র সিংহ। ৯৪ বিবেকানন্দ রোড, কলকাতা—৬। এক টাকা।

ত্রৈমাসিক সাহিত্য পত্রিকাটির শারদ সংখ্যা বিশেষ উদ্দেশ্যের দিকে দৃষ্টি রেখে (পাঠক মন ছোট-গল্পমুখীন করার অবশ্য কর্তব্যবোধ) নানান রস, রুচি ও দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে লেখা চোদ্দটি ছোটগল্প নিয়ে প্রকাশিত হয়েছে। লেখাগুলি নতুন ধরনের। লিখেছেন : হরপ্রসাদ ভৌমিক, মদন দাশ, অসীম চক্রবর্তী, রত্নেশ্বর বর্মণ, দিলীপ সেনগুপ্ত, প্রবীর সাহা, পিনাকী-রঞ্জন গুহ, নির্মল চট্টোপাধ্যায়, সুহাস চট্টোপাধ্যায়, উৎপলকুমার চক্রবর্তী, সমরেশ চক্রবর্তী মজুমদার, প্রভাসকান্তি ভদ্র ও দীনেশচন্দ্র সিংহ। এবারের শারদ-সাহিত্যে অনুপস্থিত ছোটগল্পের আশ্চর্য রূপকার নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের 'মুনিয়া' গল্পটি পুনর্মুদ্রিত হয়েছে এই বিশেষ সংখ্যায়।

সাহিত্যচিন্তা সম্পাদক : কিরণশঙ্কর সেনগুপ্ত। ৩১১ গাঙ্গুলীবাগান, কলকাতা—৪৭। দেড় টাকা।

কবিতা ও কবিতাবিষয়ক বিদগ্ধ আলোচনায় 'সাহিত্যচিন্তা'র বিশেষ সংখ্যাটি বিশিষ্ট হয়ে উঠেছে। বিশিষ্ট লেখকরা হলেন : বিনয় ঘোষ, বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, কিরণশঙ্কর সেনগুপ্ত, চিত্তরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়, বিষ্ণু দে, অরুণ মিত্র, মঙ্গলাচরণ চট্টোপাধ্যায়, নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী, রাম বসু, আলোক সরকার, শঙ্খ ঘোষ, সুভাষ মুখোপাধ্যায়, গোপাল ভৌমিক, কৃষ্ণ ধর, জগন্নাথ চক্রবর্তী, সিদ্ধেশ্বর সেন, মলয়-শঙ্কর দাশগুপ্ত প্রমুখ। বর্মী, নেপালী, তিব্বতী পাকিস্তানী ও সিংহলী কবিতার অনুবাদ করেছেন সুজাতা প্রিয়ম্বদা।

বিস্ময়—সম্পাদক : নরেশ মালাকার। ৬৪বি, গৌরীবাড়ী লেন, কলকাতা-৪। পঞ্চাশ পয়সা।

ত্রৈমাসিক সাহিত্য পত্রিকা : 'বিস্ময়' তরুণদের সাহিত্য ভাবনায় প্রোজ্জ্বল। আয়তনে শীর্ণ হলেও বিষয় সম্পর্কে রীতিমতো প্রশংসিত হবার মতো। লিখেছেন মণীন্দ্র রায়, শক্তি চট্টোপাধ্যায়, কৃষ্ণ ধর, অমিতাভ দাশগুপ্ত প্রমুখ বিশিষ্টরা। গল্প লিখেছেন : বাসু চৌধুরী, দিলীপ সেনগুপ্ত ও কৌশিক। সত্যরঞ্জন বিশ্বাসের 'কবিতার আপনজন'ও উল্লেখ করার মতো।

স্বরান্তর—অমল রায়চৌধুরী। ২, সূর্য সেন স্ট্রীট, কলকাতা-১২। তিন টাকা।

অনেকদিন বন্ধ থাকার পর স্বরান্তর আবার বেরুচ্ছে নিয়মিত। মূলত তরুণ গল্পকারদের লেখায় সমৃদ্ধ। লেখকদের মধ্যে আছেন বরেন গঙ্গোপাধ্যায়, যশোদাজীবন ভট্টাচার্য, শঙ্কর চট্টোপাধ্যায়, সত্যেন্দ্র আচার্য, প্রফুল্ল সেন, সুভাষ সিংহ, অমরজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায়, সমরেশ মজুমদার, রমানাথ রায়, রথীন্দ্র গুহ, অভ্র রায়, রঞ্জিত রায়চৌধুরী, কল্যাণ সেন, কুমার মিত্র ও অশোককুমার সেনগুপ্ত। রম্যরচনার পাঠকেরা পত্রিকাটি পেয়ে সুখী না হলেও সিরিয়াস পাঠকেরা উল্লসিত হবেন পরীক্ষা নিরীক্ষামূলক অনেকগুলি ছোটগল্প উপহার পেয়ে।

গণবার্তা—সম্পাদক : সুখময় চক্রবর্তী। ৩০, রিপন স্ট্রীট, কলকাতা-১৬। দু টাকা।

কবিতা ও প্রবন্ধ নিয়েই গণবার্তার শারদ সংকলন। রাজনৈতিক প্রখর আলোয় বিশ্বের বিবিধ সমস্যার মূল্যবিচার করা হয়েছে। বাংলাদেশের মুক্তিসংগ্রামও বাদ যায় নি। এই সমস্ত চিত্তাকর্ষী প্রবন্ধগুলির মধ্যে দিয়েই এই শারদ সংকলনটির বৈশিষ্ট্য সোচ্চার হয়ে উঠেছে। এই দিক দিয়ে বিশেষ ভাবে উল্লেখ্য হলেন : মাখন পাল, অরুণা চৌধুরী, সঞ্জীবকুমার সরকার, অবিনাশ দাশগুপ্ত, সৌরীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য প্রমুখ। কবিতা লিখেছেন কিরণশঙ্কর দাশগুপ্ত, বীরেন্দ্রকুমার গুপ্ত, বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, মানস রায়চৌধুরী প্রমুখ।

সচন্দন—সম্পাদক : অনুপম মিত্র, মহাদেব সিংহ। ১৩৩, নলিনী বসু রোড, কাঁচরাপাড়া, ২৪ পরগণা। এক টাকা।

জীবনের নানান চাহিদার দিকে চোখ রেখেই বেশ গুছিয়ে বিবিধ বিষয়ের ওপর লেখা রচনাগুলি সচন্দন-এ মুদ্রিত হয়েছে। আয়োজন অবশ্যই প্রশংসনীয়। সুখ্যাত লেখকদের মধ্যে আছেন : তারাশঙ্কর, প্রেমেন্দ্র মিত্র, বুদ্ধদেব বসু, দীনেশ দাস, শক্তি চট্টোপাধ্যায়, গৌরাঙ্গ ভৌমিক, সমরেশ বসু, সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ, কুমারেশ ঘোষ, আশুতোষ মুখোপাধ্যায় প্রমুখ।

বিশ্বচিন্তা-ভারতী—সম্পাদক : নন্দদুলাল চক্রবর্তী। ৭১।এ, নেতাজী সুভাষ রোড, (রুম নম্বর : ডি-২৭) কলকাতা-১। দেড় টাকা।

ত্রৈমাসিক সাহিত্য পত্রিকার শারদ সংখ্যাটি রচনা-সন্নিবেশগুণে আকর্ষণীয় হয়েছে। রুচি ও রসের দিক দিয়ে পরিচ্ছন্ন। বিষয় বৈদগ্ধেই প্রবন্ধগুলি সাহিত্য পাঠকদের আকর্ষণ করবে—এই দিক দিয়ে বিশেষভাবে উল্লেখ্য হলেন : ডঃ সুশীল রায়, শ্রীতারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, ডঃ সুধীর নন্দী, প্রণতি সরকার প্রমুখ। মহামহোপাধ্যায় গোপীনাথ কবিরাজ-এর প্রতিকৃতি এবং আলোচনাটিও এই সংখ্যার অন্যতম আকর্ষণ।

প্রাশ্নিক—সম্পাদক : স্নেহাশিস বকুল, বরেন ভট্টাচার্য। ৫০, পটল ডাঙ্গা, স্ট্রীট, কলকাতা-৯। আশি পয়সা।

পরিচ্ছন্ন ছিমছাম সাহিত্য পত্রিকা। তরুণদের গল্প-কবিতা সংকলন। গল্প লিখেছেন : সমর ভট্টাচার্য, শচীন বিশ্বাস, বরেন ভট্টাচার্য, বঙ্কিম মাহাতো, স্নেহাশিস বকুল। দীপেন্দু চক্রবর্তীর 'চাটিল্ট সাহিত্য' নিবন্ধটি তথ্যসমৃদ্ধ ও চিত্তাকর্ষী।

জাগরণী—সম্পাদক : দেবকুমার বসু, বুদ্ধদেব দে। ১৯, গোয়াবাগান স্ট্রীট, কলকাতা-৬। ষাট পয়সা।

আকারে ও আয়তনে ছোট হলেও তরুণদের এই মুখপত্রটি বিবিধ রসের রচনা সন্নিবেশের দরুণ বিশিষ্ট হয়ে উঠেছে। সুপরিচিত লেখকদের মধ্যে আছেন : মণীন্দ্র রায়, দক্ষিণারঞ্জন বসু, অবারেশ শর্মাচার্য, বিধায়ক ভট্টাচার্য, দেবনারায়ণ গুপ্ত, রবি বসু প্রমুখ। একটি উপন্যাস লিখেছেন অমিয়কুমার মুখোপাধ্যায়।

অতিথি—সম্পাদক : অসিতকৃষ্ণ দে। ১।এইচ।৪, প্রাণকৃষ্ণ মুখার্জি রোড, কলকাতা-২। এক টাকা।

কবিতা, গল্প, প্রবন্ধ, সিনেমা, খেলাধুলো প্রভৃতি বিষয়ে রচনা নিয়ে শারদ সংকলন। বিশেষভাবে উল্লেখ্য হলেন : কবিশেখর কালিদাস রায়, ডাঃ কালীকিংকর সেনগুপ্ত, বিমল কর, মুকুল দত্ত প্রমুখ। গৌর শলীর 'মাগ্গিলের চিঠি', আলি ও আচার্যের কার্টুন উল্লেখের দাবী রাখে।

আলো—সম্পাদিকা : আঞ্জুমে আরা জামান। ২০, রিপন লেন, কলকাতা-১৬। দু টাকা।

প্রথম বর্ষের এই শারদ সংখ্যায় সম্পাদিকা কৃতিত্বের স্বাক্ষর রেখেছেন খ্যাতনামা কথাকারদের গল্প-কবিতা-নাটিকা-উপন্যাস ইত্যাদি রচনাসম্ভারের সমাবেশ ঘটিয়ে। লিখেছেন : প্রফুল্ল রায়, সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ, অন্নদাশঙ্কর রায়, সন্তোষকুমার ঘোষ, নিরঞ্জন চক্রবর্তী, নরেন্দ্রনাথ মিত্র, জ্যোতির্ময় বসুরায়, অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়, মণীন্দ্র রায়, গৌরাঙ্গ ভৌমিক, শক্তি চট্টোপাধ্যায়, গৌরকিশোর ঘোষ প্রমুখ। 'নবীনের চোখে প্রবীণ' ফিচারটি উল্লেখ করবার মতো—এ ফিচারে লিখেছেন অর্চনা মিত্র প্রমুখ।

তরুণতীর্থ—সম্পাদনা : তরুণ সাথী। তরুণতীর্থ কেন্দ্রীয় দপ্তর, ৩৫, রিপন স্ট্রীট, কলকাতা-১৬। দেড় টাকা।

কিশোর-কিশোরীদের জন্যে এই শারদ সংকলনটি গল্প-প্রবন্ধ-ছড়া- নাটিকা-কবিতা ইত্যাদিতে ঠাসা। ছোটদের লেখা আছে অনেকগুলো — সাহিত্যের খ্যাতনামারাও লিখেছেন তরুণ ও কিশোরদের জন্যে—এঁদের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখ্য হলেন : অমিতাকুমারী বসু, অরুন্ধতী রায়চৌধুরী, রাণা বসু, নারায়ণ চৌধুরী, দক্ষিণারঞ্জন বসু, পরেশ সাহা প্রমুখ। সংকলনটি কিশোরদের খুশী করার সঙ্গে সঙ্গে দাম নাগালের মধ্যে থাকায় কিশোর পাঠকদের অভিভাবকদের খুশী করবে।

আমরা—সম্পাদক : জে ভট্টাচার্য। মৈত্রেয় সাহিত্য, রসুলপুর, বর্ধমান। দেড় টাকা।

গল্প, স্মৃতিচিত্রণ, প্রবন্ধ, রম্যরচনার সংকলন এই শারদ-সংখ্যাটি। প্রবন্ধগুলির বিষয়বস্তুর গুণে পাঠকদৃষ্টি সবচেয়ে আগে আকর্ষণ করে—এর মধ্যে যুগমানসের প্রতিফলন লক্ষণীয়। এন রঙ্গস্বামীর 'কেন এ সন্ত্রাস?' অ্যালবার্ট আইনস্টাইনের 'কেন সমাজতন্ত্র?' ও অনিরুদ্ধর 'বাংলার মুখ আমি দেখিয়াছি' প্রভৃতি প্রবন্ধগুলি বিশেষ ভাবে উল্লেখ করবার মতো।

সহজিয়া—সম্পাদক : দিব্যেন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় ও শংকর দাশগুপ্ত। ৪১৮এ, যোধপুর পার্ক। কলকাতা-৩১। দাম এক টাকা।

ছোট গল্পের ত্রৈমাসিক সহজিয়ার এই বিশেষ সংখ্যায় গল্প লিখেছেন : শংকর দাশগুপ্ত, দিব্যেন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়, দিলীপ কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, উদয়ন ভট্টাচার্য, উৎপলকুমার দত্ত, অনিল সেন, সত্যানন্দ গুহ, দীপঙ্কর দাস, পুলক চট্টোপাধ্যায় আশিস সেনগুপ্ত, জীবন সরকার এবং দিলীপ সেনগুপ্ত।

ভাণ্ডার—সম্পাদক : গোপাল হালদার। ২৩-এ, নেতাজী সুভাষ রোড (আট তলা)। কলকাতা-১। দাম দু'টাকা।

মাসিক ভাণ্ডারের শারদ সংখ্যায় লিখেছেন অমিতাভ চৌধুরী, মণীন্দ্র রায়, নীরেন্দ্র চক্রবর্তী, শক্তি চট্টোপাধ্যায়, অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়, শংকর চট্টোপাধ্যায়, সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ, আশা চৌধুরী, প্রতিমা সেনগুপ্ত, গৌরাংগ ভৌমিক, মনোজ বসু, সন্তোষকুমার ঘোষ, অমিতাভ দাশগুপ্ত, কবিতা সিংহ, শান্তিকুমার ঘোষ, সাবিত্রী সেনগুপ্ত, বাণী রায়, জ্যোতির্ময় বসুরায়, লক্ষ্মণনাথ রায়, তপন ঘোষ, অমিয় মজুমদার, সুবন্ধু ভট্টাচার্য, নিরঞ্জন হালদার এবং আরো অনেকে।

ঊষা—সম্পাদিকা : বাণী চট্টোপাধ্যায়। ৩৩বি, আমহার্স্ট স্ট্রীট, কলকাতা-৯। দু' টাকা।

ঊষা মাসিক সাহিত্যপত্রের ষড়বিংশতি বর্ষের শরৎ সংখ্যায় প্রবন্ধ, কবিতা, রম্য-রচনা, ভ্রমণকাহিনী, নাটক, গল্প ইত্যাদি লিখেছেন পরিচিত ও প্রতিশ্রুতিবান লেখক-লেখিকা। এঁদের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখ্য হচ্ছেন : শান্তশীল দাশ, দুর্গাদাস সরকার, অমিয়কুমার হাটি, হরপ্রসাদ মিত্র প্রমুখ। বাংলাদেশ-এর মুক্তিসংগ্রামের ওপর লেখা বাণী চট্টোপাধ্যায়ের উপন্যাস : 'পূর্বদ্বার' এবং সুধীর গুপ্ত কৃত গুরুমুখী ধর্ম-কাব্যের মূলানুগ বঙ্গানুবাদ : 'সুখমনী' এ-সংখ্যার বিশেষ আকর্ষণ বলে বিবেচিত হবে। বিশেষ করে মূল পাঞ্জাবী ভাষা থেকে বঙ্গানুবাদের দুরূহ কর্মটি সুচারু-ভাবে করতে পারার দরুন শ্রীগুপ্ত সাহিত্য-পাঠকদের সাধুবাদ অবশ্যই পাবেন।

এক সাথে—সম্পাদিকা : কনক মুখোপাধ্যায়। ২, সূর্য সেন স্ট্রীট। কলকাতা-১৬। দু টাকা।

এ-পত্রিকাটি বুদ্ধিজীবী রাজনীতি-সচেতন মহিলাদের মুখপত্র। সাহিত্য-ভাবনার সঙ্গে সমাজ-ভাবনার প্রতিফলনও প্রতিটি রচনার মধ্যে সার্থকভাবে ঘটেছে। প্রবন্ধ লিখেছেন : মাধুরী দাশগুপ্ত, পঙ্কজ আচার্য, মঞ্জরী গুপ্ত, বীথিকা সেন প্রমুখ। শলোকভের একটি গল্প অনুবাদ করেছেন : সুপ্রিয়া আচার্য—তাছাড়া গল্প-লেখিকাদের দুটি নাম বিশেষভাবে উল্লেখ্য—[illegible] মুখোপাধ্যায়, ছবি বসু। কবিতা আছে অনেকগুলি, এর মধ্যে বিশেষভাবে

পাঠক-দৃষ্টি আকর্ষণ করবে দুটি বিদেশী কবিতা—অনুবাদ করেছেন স্বাগতা সেন ও প্রণতি ঘোষ।

প্রাপ্তিস্বীকার

প্রতীক—সম্পাদক : প্রফুল্ল চৌধুরী। বারুইপাড়া, সিউড়ী, বীরভূম।

সবুজ সংকেত—সম্পাদক : আলোক ভাদুড়ী, শ্যামল আচার্য। আদ্রা

রবিবাসরাং—সম্পাদক : কালাচাঁদ রায়। ৩১, রাজা রোড, কৃষ্ণনগর, নদীয়া। এক টাকা।

ধারাপ্রগতি—সম্পাদক : সেখ আমানুল্লা। চিংড়ীপোতা, পশ্চিম রামেশ্বরপুর, ২৪ পরগণা। চল্লিশ পয়সা।

তারুণ্য—সম্পাদকমণ্ডলী। কল্যাণ স্মৃতি সংঘ, বর্ধমান।

খেয়া—সম্পাদক : শ্যামলেন্দু দত্ত, তরুণ-কুমার বিশ্বাস। এম-এস, ১।২ ইউনিট 'জে', খড়গপুর-৪, মেদিনীপুর।

শ্রাবণী—সম্পাদক : মদনমোহন চক্রবর্তী। জগুপীপাড়া, হুগলী। পঞ্চাশ পয়সা।

বুলবুল—সম্পাদক : এস এম সিরাজুল ইসলাম। ২, ওয়ালি উল্লা লেন, কলকাতা-১৬। তিরিশ পয়সা।

জবাব—সম্পাদক : এ এফ কামরুদ্দীন আমেদ। বাঁদপুর, আঁকুরি, হুগলী। কুড়ি পয়সা।

কুল—সম্পাদক : বিমল দেব। খোয়াই, আগরতলা, ত্রিপুরা। চল্লিশ পয়সা।

আজিকাল—সম্পাদক : নির্মল বিশ্বাস, সুভাষ দেবরায়। রসুলবাজার, বর্ধমান। পঞ্চাশ পয়সা।

সবুজ কালি (ছোটদের সাময়িকী)—সম্পাদক : কুশল হোমরায়। কে কে রায় লেন, নাড়িহা, পুরুলিয়া। এক টাকা।

রেবেকা—সম্পাদক : রতিপতি ভট্টাচার্য। ৪৪।৭, বি টি রোড, কলকাতা-৫০। পঁয়তাল্লিশ পয়সা।

জোনাকি মন—সম্পাদক : সুন্দরগোপাল সাহিত্যরত্ন। পড়াশোনা, হরগৌরীতলা, বোলপুর, বীরভূম। সত্তর পয়সা।

বিনিদ্র—সম্পাদনায় : কমলেশ সাহা রায়, বেণু সরকার, ছানু সাহা। লেবুবাগান, আলিপুরদুয়ার কোর্ট, জলপাইগুড়ি। পঁচিশ পয়সা।

সমাধান—সম্পাদিকা : অপর্ণা রায়। ইমাম-বাজার, হুগলী। এক টাকা।

সাগ্নিক—সম্পাদক : অনিলকুমার ভট্টাচার্য। ঋষি বঙ্কিম রোড, চাকদহ, নদীয়া। তিরিশ পয়সা।

পথ চলে না

বার্ণিক রায়

রাত্রিদিন পথ চলতে গিয়ে গর্তে পা আটকে যায়
হাড় ভাঙে
ট্র্যামের বিস্তীর্ণ তার মাথার ওপরে ছিঁড়ে যায়,
টুকরো পাথর কুচি পড়ে আছে ভাঙা লাইনের সঙ্গে
লাল লণ্ঠনের আলো চারিদিক জুড়ে
থমকে দাঁড়িয়ে আছে বিন্দুর মতন,
ধুলো ওড়ে;
অকস্মাৎ বৃষ্টি আসে, জমে ওঠে কাদার পাহাড়, গাড়ির পতন;
বিদ্যুতের চিৎকারে বাড়িগুলি ধ্বসে বুড়িয়ে গেছে
ঝাপসা পথ, সামনে যায় না কিছু দেখা—
গোড়ালিতে শুধু লাল লণ্ঠন থমকে আছে।

কোথায় হারায় পথ, শূন্য অন্ধকারে একা......

তুমি

মৃণাল বসু চৌধুরী

পায়ের ধুলোয় মেশে রঙ
চৌকাঠ পেরোলে মাটি
মাটির তলায় ভাঙা কাঠের পুতুলে নয়
অনভিজ্ঞ পাখির পালকে কাঁপে ভয়

তবুও থামেনি কোন উৎসব
থামেনি ভয়ার্ত হাতি
মৃদু বাজনার তালে
প্রথামত নেচেছে

শুধু
জ্বলন্ত ট্রাপিজে তুমি
কয়েক মুহূর্ত যেন কেঁপেছিলে
শরীরের ভেতরে কোথাও
লুকনো কৌটোয় জমা রঙ নিয়ে
দুহাতে ছড়িয়েছিলে
আশ্চর্য শরীর থেকে
সটান ধুলোয়

সাম্প্রতিক আমার মা

আল মুজাহিদী

আমার মায়ের শবদেহের ওপর
অসংখ্য শিশুর কান্না উবুড় হোয়ে পড়ে আছে
আমার মায়ের শবদেহের ওপর
হায়েনার ঔরসজাত একটি প্রচন্ড আদিম-মধ্যযুগ দাঁড়িয়ে আছে
আমি যখন কফিনের জানালার কবাট খুলে
অবিচ্ছেদ্য দগদগে বিবেক নিয়ে দাঁড়াই
আমি দেখি আমার মা, আমার মাকে
আমার হৃৎপিন্ডের জ্যোতির্ময় গুহা থেকে, উঁকি
মারে অসংখ্য মারমুখী মৃত্যুহীন
রাজহংস শরগুলি।

দ্যাখো, বিধ্বংসী যুদ্ধের হিসেবহীন ক্ষতগুলি কেবল আমার,
আমার
মায়ের শবদেহের ওপর উবুড় হোয়ে পড়ে আছে।

উপন্যাস

সুবনশিরি

অমরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

।। চার ।।

অনাগতের অভ্যর্থনার যত কিছু আয়োজন সব রইল পড়ে। শুরু হল তিনটি প্রাণীর অনির্দেশ যাত্রা। শিলিগুড়ি নেমে প্রথম যে ট্রেনখানা পাওয়া গেল তাতেই উঠে বসল। পৌঁছল লালমণিরহাট। আর একটায় উঠে বসল—যাবে ডিব্রুগড়। কিছু সময়ের জন্য তারা নিশ্চিন্ত হল। নিশ্চিন্ত হয়ে চিন্তা করতে লাগল। কূল নেই, কিনারা নেই, শুধু চিন্তা। বিলি কি ভাবে বুঝে ওঠে না—তবুও ভাবে। ভাবার সামর্থ নেই, তবু ভাবে।

রাবণ ভাবে বিলির কথা—কি করে তাকে ফিরিয়ে দেবে তার স্বাচ্ছন্দ্য। লছমী ভাবে ওদের দুজনের কথা—বিলির আসন্ন বিপদের কথা। আনন্দের অনুবর্তনে সে নিরানন্দ আসবে, তার কথা ভাবে।—একটু ঠাঁই, মোটা কাপড়, মোটা ভাত। ক্ষুদ্র বুদ্ধি দিয়ে সে দু-চার কথা বলে, ভরসা দেয়।—দু জোড়া অসহায় চোখ স্থির হয়ে থাকে লছমীর মুখের ওপর। সে যেন সত্যই লক্ষ্মী! এইটুকুই তারা বলতে পারে, তাও মনে-মনে।

সারাটা রাত নিবিড় অন্ধকার ভেদ করে ইঞ্জিনটা ছুটলো বগিগুলো টেনে। বাইরের অন্ধকার কখনো মনের মধ্যে জমাট বাঁধলো, কখনো বা মনের অন্ধকার ভেঙে চুরমার হয়ে ছুটলো বাইরে—অন্ধকারের কূল-কিনারা খুঁজতে। এমনি ভাবে হেলতে-দুলতে, চমকে-থমকে-ঝিমতো-ঝিমোতে চলল সারাটা রাত। রাত্রি যেন হঠাৎ প্রভাত হল। ভোরের আলোয় চোখের সামনে ভেসে উঠল এক পাশে বালসূর্যের অপরূপ রূপ, আর এক পাশে প্রান্তরের প্রান্তে দিগন্তব্যাপী ছুটাম পর্বতমালা,—তারই শিখরে শিখরে অরুণ-আলোর ছটা। দক্ষিণে ব্রহ্মপুত্রের পরপারে খাসিয়া পাহাড়—যেন উন্মত্ত মহা-সমুদ্রের তরঙ্গ স্থির হয়ে আছে। দিনের আলোর নির্ঝরে ধুয়ে গেল তিনটি প্রাণীর মনের যত উদ্‌বেগ! থমকে গেল তাদের যত ভাবনা-চিন্তা, ব্যথা-বেদনা। পৌঁছলো আমিনগাঁও। জাহাজে ব্রহ্মপুত্র পার হয়ে পাণ্ডু। আবার সবাই উঠে বসল রেল-গাড়ীতে।

এ পথ বিলির কত চেনা। কতবার সে জনসনের সঙ্গে গেছে শিলং শৈলাবাসে, গেছে আপার আসামে—ডিগবয় অয়েল-দেখতে—কাজিরঙ্গা, কোহিমা, মণিপুর দেখতে পথ চলতে-চলতে জনসন কত কথা বলেছে, দু পাশের কত কিছু তাকে বুঝিয়ে দিতে। সেসব মনে পড়ল তার।

প্রথমেই ভরলী, পরে দিগারু, কিলিং কপিল, তারপর ধনশিরি, দিখো, দিশাং—এমনই কত উপনদী। সবই ডান পাশের এক-একটা পাহাড় থেকে নেমে এসে দু পাশের প্রান্তর সুধাসিক্ত করে মিলেছে ব্রহ্মপুত্রে। শীতের শান্তশিষ্ট শীর্ণ নদী বর্ষায় হয়ে ওঠে ভয়ঙ্কর—তখন তার উন্মত্ত জলরাশি দু পাশের খেত-খামার, ঘরবাড়ী ভাসিয়ে উপড়ে দিয়ে যায়। ভয়ার্ত জীব-জন্তুর নীরব আবেদন, মানুষের হাহাকার ঠেকিয়ে রাখতে পারে না তাদের। দু কূলে মানুষের কত উপনিবেশ কতবার বসেছে, কতবার ভেঙেছে।

ঐসব পাহাড়ের পিঠে, খেত-খামার ও নদীর বুকে কত রাজার কীর্তি-কথা জুড়ে আছে যুগ-যুগান্তর ধরে। ইতিহাস ও দর্শন অনুরাগী ছিল জনসন। এক-একটা দেশের ঐতিহ্য আকৃষ্ট করেছে তার মন। সে সঙ্গে করে নিয়ে গেছে বিলিকে।

প্রথমবার এ অঞ্চলে এসে জনসন একটা কবিতা রচনা করে। বিলির মনে পড়ল সেটা—

'কামরূপের স্মৃতি'

এসেছিনু এক দেশ,
স্মৃতি ভরা নিয়ে রেশ,
পূর্ণ করে নেব ছিল আশা
শুনেছিনু কত কথা,
হারি তাতে নাহি ব্যথা,
কামরূপে বেঁধে নেব বাসা।

ইত্যাদি

গাড়ীটা ছাড়ল—চলন্ত থাকল নীলা-চল পাহাড়টা বাঁপাশে রেখে। প্রথম যেদিন বিলি এ পথ দিয়ে গেছে, সেদিন জনসন তাকে ঐ পাহাড়টা দেখিয়ে বলেছে—জান ওখানে কি আছে? কামাখ্যা মন্দির।

কবে যেন সে বিলিকে বলেছিল দক্ষ-যজ্ঞের গল্পটা। সেটা মনে করিয়ে দিয়ে বলে—সেই কামাখ্যা দেবী ঐ পাহাড়ের মাথায়। ভাষাতত্ত্বজ্ঞের মতে কামাখ্যা শব্দটা এসেছে খাসিয়াদের কা-মেইখা (ঠান দিদি) শব্দ থেকে। কিন্তু পুরাণ বলে অন্য কথা।

বিলির মনে পড়ল নতুন করে কৌতূহলটা এল এমন প্রখ্যাত স্থানটার কাছে এসে। সে বললে—খাসিয়াদের উপাস্য, তাতে আবার পুরাণ এল কি করে?

জনসন বলে—হুঁ-হুঁ, প্রাচীন কথায় অমন কত মজা—এখানে কেন অনেক দেশেই তা পাবে। অবশ্য দেবতা যদি পুরানো হয়। নরকাসুরের নাম শুনেছ? শোন নি? তোমাদের দেশের কথা? শোন তবে। বিষ্ণুর ঔরসে পৃথিবীর গর্ভে তার জন্ম—তাঁকে লালন-পালন করেছিলেন মিথিলাপতি, জনক। বড় হয়ে এখানে এসে ঐ মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন এখানে রাজত্বও করেন। শেষ পর্যন্ত তিনি বিষ্ণুর হাতে নিহত হন। তাঁরই বংশধর ভগদত্ত কৌরবদের হয়ে কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে যোগ দেন।

বিলি তখন সব কথা ছেড়ে ধরে রইল একটি জানতে চাইল—পৃথিবীর গর্ভে আবার সন্তান জন্মায় কি করে?

তার জবাবে জনসন হাসে—সোজা কথা, ভেবে দেখ না, আমাদের সকলের জন্মই তো পৃথিবীর গর্ভে। আসল কথা কি জান? সে রসবোধ আমরা হারিয়েছি, তাই পুরাণের কথাগুলোর তাৎপর্য গ্রহণ করতে পারি না বর্তমান যুগের বিক্ষিপ্ত মন দিয়ে। যত উল্টো-পাল্টা অর্থ করে নিজেদের মতো জাহির করি। আচ্ছা সেকথা পরে বলব। এখন দেখ পুলটার নীচে বয়ে চলেছে ভরলী নদী—ঐ দেখ নদীটা মিলেছে ব্রহ্মপুত্র নদে। ওখানে একদিন নৌযুদ্ধ হয়।

—কবে গো?

—সপ্তদশ শতাব্দীর শেষে।

বিলি জিজ্ঞেস করে কার সঙ্গে কার?

—অহোম রাজা চক্রধ্বজ-এর সঙ্গে মোগল বাদসাই আওরংজেবের।

বিলির আগ্রহ উজান বেয়ে উঠল। সিধে হয়ে বসল, বললে—আওরংজেব এখানে যুদ্ধ করতে এসেছিল?

—তা কেন? রাজার যুদ্ধ করে সেনাপতি গো। মনে পড়েছে? একপক্ষে ছিল রাজপুতবীর রাজসিংহ, এপক্ষে ছিল লাচিত বুরফুকন।

—কে জিতল?

—জিতল আহোম রাজা।

—কেন যুদ্ধ হল?

—এর অনেক আগে, চুতামলাই যখন আসামের রাজা তখন মীরজুমলা এসে, শিবসাগরের কাছে—গরগাঁও পর্যন্ত অধিকার করে নেয়। তখন দু পক্ষের এক সন্ধি হয়।

—সন্ধি কি হল?

—সন্ধি হয় মীরজুমলা ওদিকটা ছেড়ে দিয়ে আসবে গোহাটিতে—রাজা তার বদলে বাদসাকে দেবে হাতী, তিন লাখ টাকা আর একটি মেয়ে।

বিলির সারা দেহ কেঁপে উঠল। সে বললে—মেয়ে! মেয়ে কি গো?

—আহা! যেন নতুন শুনলে—পড় নি? বাদসাদের ঘরে কত রাজার মেয়ে গেছে।

—হাঁ-হাঁ, তারপর, মেয়ে দিলে?

—ওটাই তো আগে দিতে পারল।

—পরে দিল কোন্‌টা?

—দিল হাতী, টাকা—টাকাও তো দিলই না শেষ পর্যন্ত।

—কেন চুক্তি হল যে—

—চুক্তি হল, কিন্তু অত টাকা তো ছিল না, তাই ঠিক হয় কিস্তি করে দেবে।

—তবে কেন লড়াই লাগল?

—চুতামলাই একটু ঢিলে গোছের। তার নাতি খুব রোখাচোখা। চুতামলাই মারা যাবার পর চুপংমুঙ্গ বাপ-খুড়োদের টপকে রাজা হয়ে বসল। সে আর ওসব চুক্তি মানল না—লাগল যুদ্ধ। শেষ পর্যন্ত মোগলদের হারিয়ে, ভাগিয়ে দিলে।

—বাঃ! এখানেও তাহলে ওসব হয়েছে এখানকার অতশত জানি না। ইসকুলে মোটামুটি ভারতবর্ষের ইতিহাস শেষ করে আমরা শুরু করেছি ইওরোপের ইতিহাস।

—হয়েছে বৈকি। এর শ-চারেক বছর আগে তুর্কি ফৌজগুলোকে তো চুবিয়ে মারলে বরনদীর জলে।

—ওমা, কি বীভৎস! কেন অমন করল?

—বক্তিয়ার একটু চালাকি খেলেছিল বোধ হয়। বলেছিল, তিব্বত যাচ্ছি। কিন্তু এখানকার রাজা কামরূত রায় ফন্দিটা বুঝে বাধা দিল।

—তারপর?

—ওরা পালাতে লাগল।

—তুর্কিরা পালাল?

—পিছনে রাজার ফৌজ, সামনে গাঁয়ের লোক...

—গাঁয়ের লোকও? তখন কি হল?

—পালাতে গিয়ে দেখে, যে নদীটা পার হয়ে এসেছিল তার সাঁকোটা ভাঙ্গা—

—ভাঙ্গা! কারা এ-কাজ করল?

—গাঁয়ের লোকই, পালাতে দেবে না—

—তারপর?

—মরিয়া হয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ল সব নদীতে, তাতেই কাজ খতম।

—এই তো খালের মত নদী এতে আর মরে কি করে?

—পাহাড় থেকে নেমে আসছে তো এসব নদী—বর্ষাকাল, তখন ভয়ানক স্রোত বে।

—ও, বক্তিয়ারের কি হল?

—কোন মতে পার হল, কিন্তু দশ হাজার ফৌজের হাজারও ফিরতে পারে নি। যদি বা কোন মতে পার হয়, ভাঙ্গায় লোক আছে কুকুর ঠেঙ্গানি দিতে।

—তাহলে এখানেও মোগল-পাঠান ঘুরে গেছে?

—গেছে বৈকি, আরো কত লেছে।

—আবার কারা এল?

—শুধু আসে নি, তারা থেকে গেছে। এ-দেশের নদীনদ, জনপদের নামেই তো তার প্রমাণ। মানুষের মুখের দিকে চাইলেই তো মনে পড়ে কত বিভিন্ন নরগোষ্ঠীর অন্তঃপ্রবাহের কথা—স্মরণাতীত দিন থেকে শুরু করে অদূরাতীত দিন পর্যন্ত।

—বল না, তারা কারা?

বিলির কথা জনসন্ হাসতে হাসতে বলছে—সেসব নীরস কথা, তোমার শুনতে ভাল লাগবে কি?

আগ্রহ দেখিয়ে বিলি বলেছে—কেন? এই তো, শুনছি না আমি?—আবার আব্দার-অভিমান করে মুখ ফিরিয়ে বলেছে—যাও, তুমি কিছু বলতে চাও না। আমায়। তবে সারাটা রাস্তা কি করব? থাক, আর কোন কথা বলব না।

—আচ্ছা-আচ্ছা, রাগ করো না। নীরস কথাটা বাদ দিয়ে বলছি।

—বলার আগেই তুমি ধরে নিলে আমার ভাল লাগবে না। চাই না শুনতে—

জনসন্ বিজ্ঞের মতো হেসে বলেছে—আমি জানি না— কোন কথাটা তোমার ভাল লাগবে, বা না লাগবে?

রাগ করে বিলি বলেছে—তবে বলো না।

—বেশ বেশ বলছি শোন—মঙ্গোলীয়রা এদেশে আসার অনেক আগেও দলে দলে মানুষ এসেছে, তিব্বতের ওপর দিয়ে নেগ্রিটো, আলপো-দিনারিক, আর পশ্চিম দিক দিয়ে এসেছে ভারতের আদিম নরগোষ্ঠী—অস্ট্রেলয়েড।

—রক্ষে কর, তোমার ওসব দাঁতভাঙ্গা নাম শুনে আমার কানে তালা ধরে যাবে।

—কেমন! বলেছিলাম না?

—আহা, আমি জানি এতক্ষণ যেমন বলছিলে তেমনই বলবে।

—আমি তো বলছিলাম যারা এদেশে এসেছে তাদের কথা।

—আর কেউ বুঝি তোমার চোখে পড়ে নি? শুধু আমায় জব্দ করবার জন্য—

—তাই তো ওগুলো বাদ দিয়ে বলতে চেয়েছিলাম।

—তবে তাই বললে না কেন?

জনসন্ খানিকটা হেসে নিল মন খুলে। তারপর গম্ভীর হল। বলল—শোন তবে, কি করে এক-এক যুগে এক-একটা নাম হয় এই অংশটার। আজ থেকে পাকা পৌনে পাঁচ হাজার বছর আগে চাওবংশ শাসিত বর্তমান চীন দেশের এক অংশের নাম ছিল —থিস্। চীনাভাষায় যার অর্থ স্বর্গরাজ্য। অনেক রাজা এমন নিজের দেশের নাম দিয়েছে স্বর্গরাজ্য, স্বর্গদ্বার ইত্যাদি। ওসব রাজার মহিমা প্রচারের সম্যক্ প্রথা। সে যাই হোক, পরে একদিন সেই নামের সঙ্গে শাসক বংশের নাম জুড়ে হল—চাওথিস্। কালক্রমে চাওথিস্ উচ্চারিত হল চুথিস। আরো পরে তা হল যুথিস। সে দেশের মানুষও যুথিস নামে পরিচিত ছিল তখন।

—বলছিলে এদেশের কথা, তা নয়—চুথিস্, যুথিস্!

—তারাই তো এল এখানে। এখন তাদেরই কথা বলছি। আর এক সময় বলব যারা এখান থেকে গেছে ওদিকে—পর্বত পথে ও সমুদ্র পথে। ওদিকে কত দেশ পাবে সে-সবের নামে, ভাষায় ও সমাজবিন্যাসে তার স্পষ্ট প্রমাণ আছে, ধর্মের কথা তো জানই। কটা কথা বলে রাখি এখানে—মঙ্গোলজাত বলতেই যেন বর্তমান চীনা জাত বা চীনভাষায় যারা কথা বলে তাদের ধরে নিও না। ওদেরও অনেক হেরফের আছে, ওরাও পৃথিবীর বহু ভাগে ছড়ানো। এবং চীনারাও সৃষ্টি হয়েছে বহু রক্তের সংমিশ্রণে।

—ওঃ! তাই নাকি? বলে যাও, বেশ লাগছে।

—বলবার তো কত কথা গজগজ করে মাথায়। তাই একটার উপক্রমণিকায় এসে যায় আর একটা। সবাই জানে, ভারতবর্ষ যখন শিক্ষা ও সংস্কৃতির শীর্ষে পাশ্চাত্যদেশ তখনো অসভ্য বর্বর। সেই ভিত্তিভূমিতে সেখানে আসে বিদেশী ধর্ম ও আচার। তাই এককালে আমাদের দৌড় ছিল আরব দেশ পর্যন্ত, যত শাস্ত্র ও জ্ঞানের আদি-নিষ্পত্তিও সেখানে। পরে তার সঙ্গে জুড়ল রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক প্রভাব প্রসারণের একান্ত সুযোগ ও চাহিদা। তখন শাসকদের সঙ্গে পাদরীগুলোও কম করে নি। সেসব উপাদানে যে ইতিহাস লেখা হল তাতে ভারতবাসীদের প্রায় ভুলিয়ে দিয়েছিল অতীতের ঐতিহ্য।

যে সভ্যতা যেমন উপাদানে তৈরি হয় তেমন তার কার্যবিধি, তেমন তার পরমায়ু। গড়ে ওঠে, ভেঙ্গে যায়, ইতিহাসের পাতায় ধিকধিকিয়ে চলে। যেমন দু-হাজার বছর আগে রোম সভ্যতা বিলুপ্ত হয়েও আরো কিছুদিন চলে তার জের টেনে। গ্রীস ও রোমের স্তূপগুলো যদি খাড়া হয়ে না থাকত, তার ইট ক-খানা যদি সরিয়ে দেওয়া হত তবে নিশ্চিহ্ন হত তার স্থাপত্য শিল্পের নিদর্শন। ঐগুলো সাক্ষী দেয় মানুষের, শিল্পকলা পারদর্শী হাত ও হৃদয়ের কীর্তি। ঐ সবের আরো গভীরে গেলে শোনা যাবে লক্ষ লক্ষ নরনারী, শিশু ও বৃদ্ধের হৃদয় বিদারক ক্রন্দনের রোল। ওগুলো না থাকলে এই দুটোর কোনটাই থাকত না—চোখের সামনে সুন্দরের রূপ, বাজত না কানের পাশে কান্নার রোল।

আরো কত গেল, কত এল সভ্যতার নাম ধরে। যুদ্ধ কি জেনেছে, শান্তি কি

এসেছে! এক নিষ্পেষণবিধির ধ্বংসে স্তূপে গড়ে উঠেছে আর একটা। সে সবের বাহ্যিক প্রকাশ বিলুপ্ত হলেও থাকে মন। উদ্ভিদ রেখে যায় বীজ। মানুষ যায়, কিন্তু থাকে তার মতবাদ, তার শান্তি দেবের বা দানবের যাই হোক। এক বুদ্ধিজীবীর ব্যক্তিত্ব বজায় রাখতে আর এক বুদ্ধিজীবীকে শেষ করা হয়, কিন্তু ভারান্তরে সেই বুদ্ধিটা কাজে লাগানো হয়। যে ছুরিটা হত্যা করে সেটা হাতেই থাকে। এক হাত থেকে যায় আর এক হাতে। পশ্চিমে উদ্ভূত যত মতবাদ সে সবের মূলে পাই স্বার্থ, ওটা ধ্বংসাত্মক, তাই তার পন্থা হল হত্যা বা ধ্বংস।

ভারত বুঝল প্রকৃত জ্ঞান মনের উৎকর্ষ সাধনে। মন দিয়ে মনের হত্যা, মনের জয়। তার মতবাদে সকল মত আশ্রয় পেতে পারে, অথবা সকলকে গ্রহণ করতে পারে। পশ্চিম তাতে শেষ হয়ে যায়। সেখানকার মানুষের বুকে তা ছুরির মতো বিঁধল। এখানকার অতীতের আলো তাকে কশাঘাত করল। অভ্যাস বশে সেও রুখে দাঁড়ালো।

অতীত মানুষের বড় প্রিয় বস্তু। তার খোঁজে সাদা আমেরিকানরা আসে ব্রিটেনে, ফ্রান্সে-হল্যান্ডেরা যায় চীন-জাপানে, তামাটেরা যায় ভারতে, কালোরা যায় আফ্রিকায়, ইহুদীরা যায় প্যালেস্টাইনে। সেই অতীত ভুলিয়ে দিতে পারলে মানুষকে যেমন ছন্নছাড়া করা যায় তেমনটি আর কোন কিছুতে হয় না।

বিলি জানে জনসনের সেসব কথা, তাই তখন তন্ময় হয়ে সব শুনেছে। জনসন একটা নিঃশ্বাস টেনে আবার শুরু করেছে—এতবড় দেশকে কি অমন শেষ করা যায়! সময়মত কয়েকজন জন্মায়, যেমন বঙ্কিম, রামমোহন, বিবেকানন্দ, তাতে ভারতবর্ষ পুনর্জীবন লাভ করেছে। আমার লেখাটা শেষ হলে টাইপিং চেক করবার সময় তোমার সাহায্য চাই তো, তখন সব জানতে পারবে। এখন তো এক-একটা অংশ লিখে পাঠাই আমেরিকা, ফ্রান্স, জার্মানী, রাশিয়া, চায়না, জাপান—তারপর সব যায় লন্ডনে আমার বন্ধুর কাছে। এক এক বিশেষজ্ঞ এক-একটা দিক বিচার করে দেখেন। সেকথা এখন থাক, বলছিলাম আসামের কথা, সেটা শেষ করি আগে। অতীতের কোন এক অজানা দিনে ভ্রাম্যমাণ সেই যুথিস সওদাগরের দল চীনের, অর্থাৎ আজ যাকে চীন বলে জানো, তার দক্ষিণ-পশ্চিম গিরিবর্ত্ম অতিক্রম করে এক পার্বত্য প্রবাহ ধরে এগিয়ে চলল। সংকীর্ণ পাহাড়ে ঝরনা ক্রমেই প্রশস্ত হতে প্রশস্ততর হয়ে চলেছে এক বিস্তীর্ণ উপত্যকার মধ্য দিয়ে। তারা সেই নদীর নাম রাখল—লাও-তু। যে শব্দের ভাষান্তর হল, প্রশস্ত নদী। আজও ব্রহ্মপুত্রের উপরাংশকে লুইত বা লোহিত বলা হয়। যে শব্দ আর্যিকরণের ফলে হল লোহিত্য নদী। এই নদীর তীরে তারা বসতি স্থাপন করল।

—থেকে গেল? তারা যে সওদাগর।

—অমন কত সওদাগর কত দেশে থেকে গেছে।

আবার কত যাযাবর সওদাগর হয়ে গেছে। বাসস্থানকে ওদের ভাষায় বলা হত—উর বা কুর অথবা পুর। এখানে আমার মতদ্বৈধ আছে। ইতিহাস যাই বলুক, প্রথম দুটো শব্দের সঙ্গে দ্রাবিড় শব্দেরও মিল পাই, আর পুর তো বহু পুরানো কথা—যেমন হস্তিনাপুর। কারা কোনদিকে আগে বা পরে গেছে, সেটা যাচাই করে দেখতে হবে। যাই হোক, এখন ধরে নিই যুথিস্-এর সঙ্গে পুর যোগ করে কথাটা দাঁড়াল যুথিসপুর। তাদের বাসস্থানের পূর্ববর্তী দেশকে বোঝাবার জন্য সেই নামের আগে আর একটা শব্দ জুড়ে গেল। পাগার, অর্থাৎ আগে বা সামনে। পাগার-যুথিস-পুর, অর্থাৎ যুথিসপুরের সামনে। এই শব্দই সংস্কৃত ভাষার ছাঁচে পেষাই হয়ে আজ হয়েছে—প্রাগজ্যোতিষপুর। যার পিছনে লুকানো আছে পুরাণেতিহাস পূর্ব যুগের মঙ্গোল জাতীয় জনগণের স্থিতিবিন্যাসের কাহিনী। আর্যপূর্ব যুগে বিভিন্ন নরগোষ্ঠীর, বিভিন্ন নরগোষ্ঠীর বর্ণসংকরের দেশ এটা। হিমালয়, উপ-হিমালয়ের পর্বতমালার বক্ষসুধা প্রবাহিত নির্ঝরিণীর কূলে মঙ্গোল জাতীয় জনগণের বর্ণবৈচিত্র্য রক্ষণের দেশ। রমন্যাসপূর্ণ কত আর্য-অনার্য যাযাবর অধ্যুষিত ধর্মবিন্যাসের তীর্থ, শাক্ত-বৈষ্ণবের মিলন তীর্থ।

জনসন যেন কথা সরিৎ সাগর। সব খবরই তার নখদর্পণে। একটার সূত্র ধরে চলে গেছে আর একটায়। বলেছে, অসমীয়দের পৌরাণিক কৌলিন্যের মত-বিরোধী দাবীর কথা—ব্রহ্মপুত্রের এপারে প্রাগজ্যোতিষপুরে নরকাসুর, ওপারে শোণিতপুরে রাজত্ব করেছেন হিরণ্যকশিপু বংশোদ্ভব বাণরাজা। শ্রীকৃষ্ণের পৌত্র অনিরুদ্ধ বাণরাজার কন্যা ঊষার প্রেমাসক্ত হয়ে এখানে এসে বন্দী হল—তখন বেচারা শ্রীকৃষ্ণকে ছুটে আসতে হয় নাতিকে উদ্ধার করে নিয়ে যেতে। তাই নিয়ে বেঁধে গেল দেবাসুরের যুদ্ধ।

এমন কতসব বিচারাত্মক কাহিনীও সে শুনেছে। এই দুঃখের দিনে সেই সুখের কথাগুলোর সঙ্গে বিলির মন ভেসে চললো। জনসন বলে চলেছে—প্রাচীনতম কাল থেকে অধুনাতন পর্যন্ত বিভিন্ন বিচিত্র রক্ত ও সংস্কৃতির ধারা প্রবাহিত হয়ে চলেছে ভারতের পূর্ব প্রান্তে এই লোহিত্যের এবং লোহিত্যের উপনদীর স্নেহজলধারা বিধৌত উপত্যকার উপকূলে। যার কার্য-কারণের ঐতিহাসিক তথ্য বিলীন হয়ে গেলেও তার দেহ গঠন ও ভাষা সৃষ্টির বিচিত্র বৈশিষ্ট্য, সভ্যতার দৈনন্দিন অনুসৃতি, পুরাণ স্মৃতি ও সংস্কৃতির অনবদ্য ধারার স্তরে স্তরে অন্তঃসলিলা ফল্গুর মতো প্রবাহিত এদেশের বিভিন্ন জনগণের সমাজবিন্যাসে। সেদিক দিয়ে ভারতবর্ষ যেমন একটি ক্ষুদ্রায়তন পৃথিবী, আসামও তেমনি ক্ষুদ্র ভারতবর্ষ। গৌড়-বঙ্গের পাল-শাসক, গুপ্ত-শাসকের দুর্বার শাসনবিধি প্রসারিত হল নীলাচলের (কামাখ্যা পাহাড়) নীল বনানীর মাথায়, আবার তা নেমে এল; পাঠান গেল, মোগল গেল দেশটাকে বিধ্বস্ত করে, এদেশে বিধ্বস্ত হয়ে, পাঠান-মোগল তেজ প্রবাহিত হল জনগণের ধমনীতে—কামরূপের রূপ বদল হল না। শত শত বৎসরব্যাপী চলল দুর্ধর্ষ আহোম জাতির ধ্বংসলীলা—

তারাও মিলে গেল, বিলীন হয়ে গেল তাদের নাম এদেশের নামের সংগে। তবুও অসম, অ-সম থেকে গেল। ব্রহ্মের মান শাসকের হাত থেকে আসামকে রক্ষা করতে ১৮২৬ খৃষ্টাব্দে ইংরেজও এল, অ-সমকে সমান করা গেল না।

দু'পাশে চোখ বুলিয়ে জনজন্ নেমে এল বর্তমান সমস্যার একটা অংশে। কথার ধারাটা বদল হল। সে বললে—দেখছ তো, চারপাশে কত পাহাড়ী, কত গরীব এরা। কিন্তু কিছুতেই কাজ করতে যাবে না কোথাও। যত কষ্টই হোক না, এখানেই থাকবে। আর কষ্টই বা কি! চাহিদা অতি সামান্য। খাবার না থাকলে চলে যাবে জংগলে, তুলে আনবে একটা মাটিআলু, তাতেই দিন সাতেক চলে যাবে। শুয়োরটা, হরিণটাও শিকার করে আনে সময় সময়। নেশার জন্য পথের ধারে আছে অন্ততঃ ভাঙ। ইংরেজরা এখানেই প্রথম চা-বাগান পত্তন করে, লক্ষ লক্ষ লোক বাগানে কাজ করে। কিন্তু সব কুলি আনা হয়েছে বাংলার পশ্চিমাংশ, বিহার উড়িষ্যা, নাগপুর আর মাদ্রাজ থেকে। তাদের সংগে কথা বলতে ছত্রিশ গণ্ডা বুলি শিখতে হয়। আমাদের দার্জিলিং-এ অত ঝামেলা নেই। এখানকার পাহাড়ীরা ডেরা ছাড়বে না, আর সমতল-বাসীদের মান যায় চা-বাগানে কাজ করতে—কুলি লাইনে থাকলে তো জাতই যাবে।

হাসতে হাসতে বিলি টিপ্পনি কেটেছে—ব্যানার্জির বুঝি এই ব্যথা?

—কি বললে? বুঝলাম না। বলে, জন্‌সন্ হাঁ-করে তাকিয়ে থেকেছে বিলির চোখের পানে।

বঙ্কিমচন্দ্রের গল্পটা শুনে জন্‌সন্ একটা হাসির লহরা তুলল। বিলির রসিকতাটার তারিফ করল। শেষে গম্ভীর হয়ে বললে—কিন্তু দেখ, নেপালীরা ঠিক উল্টো। জানতো আমাদের কুলিরা প্রায় সবই নেপালী। তাছাড়া কতদিকে ছড়িয়ে গেছে তারা। এখানকার গাঁয়েও, গাঁয়ে কেন পাহাড়েও নেপালীরা বসে গেছে। খাসিয়া পাহাড়ের যেখানে সেখানে পাবে ওদের।

কথায় কথায় কখন কামরূপ জেলা পার হয়েছে, তারপর নওগাঁ জেলা। একটা সেতুর ওপর ট্রেনখানা আসতে জন্‌সন্ চারপাশে চোখ ফিরিয়ে দেখে নিল, বললে—এটা কাপিল নদ, বৌদ্ধযুগে এই নদীর পাড়েই তন্ত্র সাধনার এক কেন্দ্র গড়ে ওঠে।

জন্‌সনের গভীর তত্ত্বকথায় বিলিও গম্ভীর তন্ময় ছিল। কিন্তু তার যতিভঙ্গ হয় হাল্কা কথায় অবতারণার সংগে। যেখান থেকে নামিয়ে আনা হয়েছে সেখানে হঠাৎ উঠতে চায় না বিলির মেয়েলী মন। সে ধমক দিয়ে বলে—ঢের হয়েছে তোমার তন্ত্রমন্ত্র! এখন একটু হাল্কা কথা বল, নয়তো তোমার 'বিষয়-কর্মে'র কথা বল ব্যানার্জির মতো।

—আচ্ছা আচ্ছা, তাই বলছি। বলে, জন্‌সন্ পিছনে পাহাড়ের দিকে ইঙ্গিত করে বললে—ওই দিকের পাহাড়টায় একবার বেড়াতে গিয়েছিলাম—রাগ করো না—তখন কিন্তু তোমাকে পাইনি। এক ভদ্রমহিলার সঙ্গে আলাপ হয়, তিনি সুন্দর আমাদে গল্প বলতে পারেন। তিনি বললেন—একবার পাহাড়ে লোক গণনা শুরু হয়েছে। কাজকর্ম কেমন এগুচ্ছে তা দেখবার জন্য ডেপুটি কমিশনার একদিন বের হলেন বাবুদের সংগে। যে বাড়ীতেই যান, শোনেন একঘেঁয়ে কথা।

বিলি জানতে চাইল তা—কি কথা।

জন্‌সন্ জবাব দিল—এম্ তিপ্।

বিলি জিজ্ঞাসা করল—তার মানে?

জন্‌সন্ বললে—জানি না।

বিলি খেপে উঠল, বললে—জান না তো কি বলতে এলে?

জন্‌সন্ হেসে বলল—আমি জানি না নয়, কথাটার মানে, "জানি না।"

বিলি হাঁ করে বললে—তাতে কি হল?

—বাবুরা জিজ্ঞাসা করে, ওমুকের বাপের নাম কি?—তার জবাবে শোনে—এম্ তিপ্। ডেপুটি কমিশনার জানতে চাইলেন—ব্যাটা এম্ তিপ্-এর কতগুলো ছেলেমেয়ে? সবাই পাহাড় ভর্তিই তো শুনছি—এম্ তিপ্। বাবুরা হাসি সামলে, সাহেবকে বুঝিয়ে দেয় কথাটার অর্থ।

অন্তরের হাসিটা গম্ভীর মুখে চেপে ধরে বিলি বললে—অসভ্য কোথাকার!

তার উপর আর একটা চাপিয়ে জন্‌সন্ হাসতে হাসতে বললে—উত্তর প্রদেশের লোকবিশেষেও অমন কথার চলন আছে। সেখানে বাপের নাম জিজ্ঞাসা করলে জবাব দেয়—রাম জানে।

এবার বিলি কথাটার অর্থ নগদ হৃদয়ংগম করল। সে আর না হেসে পারল না।

অমন কথায় আজ হাসছ বটে, কিন্তু মহাভারতে কত মহান চরিত্র পাবে যারা "এম্ তিপ্" অথবা "রাম জানের" সন্তান।

সে সব তো অতি পুরানো কথা। জন্‌সন্ দেখে যায় নি—অমন অভিশপ্ত জন্ম নিয়ে বর্তমানেও মানুষ কত ওপরে উঠতে পারে! জার্মানীর চ্যান্সেলার বিলি ব্রান্ডৎ তার জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত। তার নিজ মুখ নিসৃত কথায় বুঝেছি, সমাজ, বিপক্ষ দল তাকে যত দাবিয়ে রাখতে চেয়েছে তত বলীয়ান হয়ে সে পথ চলেছে।

পরমুহূর্তে ওদের গাড়ীটা এসে দাঁড়াল এক স্টেশনে। বিলির বুকের ভিতরটা দুমড়ে-মুচড়ে, জেলো-ছিঁড়ে যেতে চাইল।

(ক্রমশঃ)

বঙ্কিমচন্দ্রের ললিতা ও মানস

আদিত্য ওহদেদার

বঙ্কিমচন্দ্রের সাহিত্যকীর্তি সম্পর্কে আমাদের সমালোচকগণ ক্ষীণদৃষ্টির পরিচয় দিয়েছেন। তাই দেখি খৃঃ ১৮৬৫ সনে প্রকাশিত 'দুর্গেশনন্দিনী' দিয়ে বঙ্কিমের সাহিত্য প্রতিভার যে রূপ উদ্ঘাটিত হল এবং পরবর্তীকালে ক্রমবিকশিত হল, তা নিয়েই বঙ্কিম সাহিত্য-সমালোচনা নিজেকে সীমিত রেখেছে। দুর্গেশনন্দিনীর পূর্বে বঙ্কিমের যে সাহিত্য চর্চা, সেদিকে আমাদের সমালোচনা কোন দৃষ্টি দেয় নি বললেই চলে।

অতি অল্প বয়সেই বঙ্কিমচন্দ্র সাহিত্য-চর্চা শুরু করেন। এবং দুর্গেশনন্দিনীর পূর্বে তাঁর যে সাহিত্যচর্চা তাকে দুটি পর্যায়ে ভাগ করা যায়। প্রথম পর্যায় হল পাঠ্যাবস্থাতে ঈশ্বর গুপ্তের সংবাদ-প্রভাকর ও সংবাদ-সাধুরঞ্জনে যে-সব গদ্য ও পদ্য প্রকাশিত হয়। এই পর্যায়ের কাল হল ১৮৫৩ থেকে ১৮৫৬। এর পর বেশ কিছু কাল—প্রায় বছর আট বঙ্কিমচন্দ্রের সাহিত্য-চর্চা বাংলা ভাষার বদলে ইংরেজী ভাষায় চলতে থাকে। এইটি হল দ্বিতীয় পর্যায়ের সাহিত্যচর্চা। এর পরিচয় জড়িয়ে আছে 'রাজমোহনস ওয়াইফ' নামক ইংরেজী উপন্যাস তথা কয়েকটি প্রবন্ধে।

ইংরেজীতে সাহিত্যচর্চার দ্বিতীয় পর্ব না হয় ছেড়ে দিলাম কিন্তু বাংলা ভাষায় সাহিত্যচর্চার প্রথম পর্বটির প্রতি উদাসীন হব কেন? মনে হয় নিতান্ত বাল্যরচনা হিসেবে দেখে এই পর্বকে অবহেলা করা হয়েছে। যে ঔৎসুক্যে মহৎ সাহিত্য-প্রতিভার বাল্যরচনার প্রতিও রসিক সমালোচকদের দৃষ্টি পড়ে, এবং সেই বাল্যরচনার সম্যক বিচার-বিশ্লেষণ করা হয়, বঙ্কিমের ক্ষেত্রে সেই জাতীয় ঔৎসুক্য আজও জাগ্রত হয় নি।

অথচ বঙ্কিমের ঔপন্যাসিক প্রতিভা বুঝতে গেলে তাঁর বাল্যকালের কবিতা পাঠ করা প্রয়োজন। তাতে জানা যায়, জীবনের প্রতি ভাবুক বঙ্কিমের যে মানস-দশা বা মনোভাব তাঁর উপন্যাসগুলিতে দেখা যায় কত অল্প বয়স থেকে তাঁর মধ্যে তা দানা বেঁধেছিল। এই বাল্যরচনার পর্বের প্রতি ইঙ্গিত করে মোহিতলাল মজুমদার তাঁর 'বঙ্কিমচন্দ্র' গ্রন্থে বলেছেন, 'অল্প বয়সের রচিত কবিতাগুলিতে যে একটা কল্পনা বা রসপ্রেরণার উন্মেষ দেখা যায় তাহা যৌন আকর্ষণমূলক। তাহাতে অকালপক্বতার লক্ষণ আছে। সেই সকল কবিতার কৃত্রিম অলংকার-বাহুল্যের মধ্যেও বালক-কবির যে একটি বিশিষ্ট প্রকৃতির পরিচয় পাওয়া যায় তাহা সেকালের কেহ লক্ষ্য করে নাই। উত্তরকালে নব্য কাব্যশিল্পের শ্রেষ্ঠ শিল্পী জীবনের যে দিকটিকে তাঁর কবি-কল্পনার মুখ্য উপজীবনরূপে আশ্রয় করিয়াছিলেন, এই কবিতাগুলির মধ্যে তাহার সুস্পষ্ট অঙ্কুর রহিয়াছে। নায়িকারূপিণী নারীর প্রতি এই যে আসক্তি, ইহাই তাঁহার জীবন-দর্শনের মূলে সূত্ররূপে উপন্যাসগুলিতে সৃষ্টি-কল্পনায় অনুস্যূত হইয়া আছে।'

মোহিতলাল এখানে বঙ্কিমের সেই সব বাল্যরচনাকে নির্দেশ করেছেন যেগুলি সংবাদ - প্রভাকর ও সংবাদ - সাধুরঞ্জনে প্রকাশিত হয়। এগুলি রচিত হয় বঙ্কিমের বয়স যখন তেরো-চোদ্দ। তাঁর বয়স যখন পনেরো তখন তিনি 'ললিতা' এবং 'মানস' নামে দুখানি কাব্য রচনা করেন, এবং তিন বছর পরে, অর্থাৎ তাঁর আঠারো বছর বয়সে, ১৮৫৬ খৃস্টাব্দে ও দুটি কাব্যকে একত্রে নিজের খরচায় পুস্তকাকারে ছাপিয়ে বার করেন। আমাদের আলোচনা এই ললিতা ও মানস নিয়ে।

এই কাব্যপুস্তকের 'বিজ্ঞাপন'-এ অর্থাৎ ভূমিকায় বালক কবি (কিম্বা বলা যেতে পারে কিশোর কবি) নিবেদন করেন, 'সুকাব্যালোচক মাত্রেরই অত্র কবিতাদ্বয় পাঠে প্রতীতি জন্মিবেক যে ইহা বঙ্গীয় কাব্য রচনারীতি পরিবর্তনের এক পরীক্ষা বলিলে বলা যায়। তাহাতে গ্রন্থকার কত দূর উত্তীর্ণ হইয়াছেন তাহা পাঠক মহাশয়েরা বিবেচনা করিবেন।'

'তিন বৎসর পূর্বে এই রচনাকালে গ্রন্থকার জানিতে পারেন নাই যে, তিনি নূতন পদ্ধতির পরীক্ষা পদবীরূঢ় হইয়াছেন।'

দেখা যাচ্ছে তরুণ বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর কাব্যপুস্তক যখন ছাপান তখনি তিনি বুঝতে পেরেছিলেন যে, তিনি ললিতা ও মানস-এ একটা নতুন কিছু করেছেন। তিনি কিঞ্চিৎ কৃতিত্বের দাবী করেছেন। এ দাবী কি তরুণ মনের প্রগলভ আত্মশ্লাঘা মাত্র? না, এর পেছনে কোন যাথার্থ আছে? আশ্চর্য, বঙ্কিমের এই উক্তিকে যাচাই করে দেখি নি আমরা। গদ্যশিল্পী বঙ্কিমচন্দ্র আমাদের দৃষ্টি আচ্ছন্ন করায়, কবিযশঃ-প্রার্থী বঙ্কিমের রচনার প্রতি উদাসীন থেকেছি—নিতান্ত বাল্যরচনা বলে অবহেলাই করেছি। ললিতা ও মানসের ক্ষেত্রেও এর ব্যতিক্রম হয় নি।

ললিতা ও মানস অপরিণত বয়সের রচনা বটে, কিন্তু মোটেই অসার্থক রচনা নয়। বাংলা কাব্যসাহিত্যের ইতিহাসে এর বিশেষ গুরুত্ব আছে। এই গুরুত্ব আমরা

উপলব্ধি করতে পারি নি, যার ফলে আধুনিক বাংলা কাব্যের ইতিহাস ত্রুটিপূর্ণ।

॥ ২ ॥

পণ্ডিতী গবেষণার ফতোয়া হল, ১৮৫৮ খৃস্টাব্দ থেকে আধুনিক কবিতার শুরু। সেই বছর প্রকাশিত হয় রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'পদ্মিনী উপাখ্যান' কাব্য। এইটিই নাকি আধুনিক বাংলা সাহিত্যের প্রথম কাব্য। (সুকুমার সেন)। এই কাব্যের আধুনিকতার লক্ষণ হিসেবে বলা হয়েছে যে, পূর্বতন কাব্যরীতিতে প্রকৃতির প্রকাশ ছিল শুধু এবং গতানুগতিক উপমা-রূপক-উৎপ্রেক্ষার বাঁধা খাতে বর্ণনার ধারায়। কবিচিন্তা-অনিরপেক্ষ প্রকৃতি-বর্ণনা এই প্রথম পাওয়া গেল। দৃষ্টান্ত হিসেবে দেওয়া হয়েছে পদ্মিনী উপাখ্যান থেকে প্রথম সর্গের কয়েকটি পংক্তি।

আহা এইরূপ শোভা অতি অপরূপ
উথলায় ভাবুক জনের ভাব কূপ!
সরসী সরিৎ সিন্ধু শেখর সুকর।
গহন গহ্বর বন নির্ঝর নিকর॥
দিনকর নিশাকর নক্ষত্রমণ্ডল।
মেঘমাঝে তড়িতের চমক উজ্জ্বল।

এই প্রকৃতি-বর্ণনার পাশে 'ললিতা'র প্রথম সর্গ থেকে কিছু অংশ তুলে ধরছি—

মহারণ্যে অন্ধকার, গভীর নিশায়
নির্মল আকাশ নীলে, শশী ভেসে যায়॥
নীচে তার অন্ধকারে, আছে ক্ষুদ্র নদী।
অন্ধকার, মহাস্তব্ধ, বহে নিরবধি॥
আঁধারে অস্পষ্ট দেখি, যেন বা স্বপন।
কল্লিকান্তবকময় ক্ষুদ্র তরুগণ॥
কি কারণে দুঃখোদয় কিসের স্মরণে,
কিছুই বুঝি না তবু, উচাটন মনে॥
ফুলিয়ে উঠেছে ধ্বনি, স্থির শূন্য কেটে।
ইচ্ছা করে গগনেতে উঠে যাই ফেটে॥
ছেঁড়ে হৃদয়ের ডোর গভীর যাতনে।
ইচ্ছা করে গলি গিয়ে মিশি গান সনে॥

এই প্রকৃতি-বর্ণনা রঙ্গলালের বর্ণনা থেকে কিছুমাত্র ভিন্ন প্রকৃতির কি? কবিচিন্তা-অনিরপেক্ষ প্রকৃতি বর্ণনাও তো এখানে আরো অধিক স্পষ্ট। অথচ ললিতা ও মানস প্রকাশিত হয় পদ্মিনী উপাখ্যানের দু বছর আগে। সুতরাং রঙ্গলালকে যে গৌরব দেওয়া হয়েছে, অথবা দেওয়া হয়ে থাকে, তা বঙ্কিমচন্দ্রেরই প্রাপ্য।

আসলে, আমি ইতিপূর্বে যা বলেছি, আমাদের সমালোচকরা ললিতা ও মানসকে ভাল করে পড়েন নি, এবং কাব্যগ্রন্থটির সম্পর্কে নিবিষ্টভাবে চিন্তা করেন নি। তা করলে তাঁদের বুঝতে মোটেই কষ্ট হত না যে, ললিতা ও মানসে আছে আধুনিক বাংলা কবিতার প্রথম এবং বলিষ্ঠ পদক্ষেপ। শুধু তাই নয়, যে ধরনের রোমান্টিক কবি-কল্পনা রঙ্গলাল-মধুসূদন-হেম-নবীন যুগের পরবর্তীকালে প্রথমে বিহারীলাল এবং তারপর রবীন্দ্রনাথে বিকশিত হয়ে ওঠে, তারই প্রথম-ফোটা-কলি হল ললিতা ও মানস।

কথাটি বিশদ করছি।

এই কাব্য দুটিতে যে কবিকল্পনার পরিচয় পাই তা হল আধুনিক রোমান্টিক ভাবুকতা—ইতিপূর্বে বাংলা কবিতায় (পদাবলীকে ধরছি না) যার চিহ্ন ফুটে ওঠে নি। আধুনিক রোমান্টিকতা বলতে কি বোঝায় তা সাহিত্যের পাঠকমাত্রই অবগত আছেন। তবু সেই বহুকথিত সূত্রগুলির উল্লেখ করা যেতে পারে। মর্তপ্রেম, প্রকৃতিপ্রেম, বিস্ময়বোধ এবং তারই সঙ্গে একটা অজানা বিষাদবোধ — আধুনিক রোমান্টিকতার এই হল ভাব-উপাদান। কবি-কল্পনার এই চরিত্র ইংরেজী সাহিত্যে উনিশ শতকের শুরুতেই দেখা দেয়, ওয়ার্ডস-ওয়ার্থ ও কোলরিজের মাধ্যমে। বাংলা সাহিত্যে বঙ্কিমচন্দ্র এই কবিকল্পনার প্রথম এবং সার্থক উদ্গাতা। ললিতা ও মানসে সেই কবিকল্পনার সূত্রপাত।

॥ ৩ ॥

ললিতা একটি আখ্যায়িকা কাব্য। কিন্তু এই আখ্যায়িকা বাংলা কাব্যের ঐতিহ্য থেকে বিচ্যুত। ইতিপূর্বে বাংলা আখ্যায়িকা কাব্যের বিষয়বস্তু ছিল দেব-দেবীর কাহিনী, কিংবা বিদ্যা ও সুন্দরের ব্যাপার। ললিতার আখ্যানবস্তুর আধুনিকতা লক্ষণীয়। ললিতা হল এক রাজার মেয়ে যার বিরুদ্ধে আছে তার বিমাতার শত্রুতা। তার পিতা তাকে এক 'দুর্জনে'র সঙ্গে বিয়ে দিতে ইচ্ছুক। কিন্তু ললিতার হৃদয় বাঁধা পড়েছে মন্মথ নামে এক যুবকের সাথে। এই সংবাদ জানতে পেরে ললিতার পিতা ললিতাকে গৃহত্যাগের আজ্ঞা দেন। ললিতা ও মন্মথ নদীপথে একটা নৌকো পালিয়ে যায়। পথে দস্যুগণ ললিতাকে লুণ্ঠন করে; তার গহনাপাতি কেড়ে নিয়ে তাকে ছেড়ে দেয়। সেই নদী-তীরের চারিদিকে অরণ্য। সেইখানে এক সময় মন্মথের সঙ্গে তার মিলন হল। দুজনে একসঙ্গে একটা বনের দিকে অগ্রসর হতেই তারা শুনতে পেল, সেই বনের মধ্যে একটা সুমধুর সঙ্গীতধ্বনি। কিন্তু বনের মধ্যে প্রবেশ করতেই সেই ধ্বনি থেমে যায়। পর-পর কয়েকটি রাত্রি বনের বিভিন্ন স্থানে ঐ রকম সঙ্গীতধ্বনি তাদের বিমোহিত রাখে। তারপর এক রাত্রে চারিদিক কাঁপিয়ে এক দুরন্ত ঝড়ের তাণ্ডবে তারা যেন কোথায় হারিয়ে গেল। ঝড়ের শেষে আকাশবাণী শোনা গেল, 'রে নরযুগল, দেবের নিকুঞ্জে এসে পাও কর্মফল।' নিশাশেষে প্রেমিক যুগলের মৃতদেহ নদীর তটে পড়ে আছে দেখা গেল।

এই মৃত্যুতে প্রেম জয়ী হয়েছে—তার ছবি অমলিন হয়ে থাকার সুযোগ পেয়েছে—কবির কাছে তাই এ মৃত্যু মধুর ঠেকেছে।—

এক বৃন্তে দুটি ফুল মুখে মুখ দিয়ে
সে হৃদি কুসুমাসনে পড়েছে ঢিঁড়িয়ে॥
তেমনি এক সঙ্গে এরা থেকে চিরকাল।
মরিল অধরাধরে কি সুখ কপাল॥
যার লাগি ছিল বেঁচে পারিত বাঁচিতে।
তারি সনে মরে গেল তাহারি হৃদিতে॥
সুখের কপাল! কত সংসার যাতনা।
বিকার বিয়োগ শোক সহিতে হল না॥

ছোট্ট সরল কাহিনী, হয়ত বা তুচ্ছই বলা চলে। কিন্তু কাহিনীর প্রকৃতি যে রোমান্টিক তাতে কোন দ্বিমত থাকার অবকাশ নেই। নরনারীর স্বেচ্ছাচালিত প্রেমের জয়গান, অর্থাৎ প্রেমের স্বাধীনতার মধ্যে মাধুর্য নিরীক্ষণ, প্রকৃতির মধ্যে মানব-জীবনের লীলা অবলোকন করা, প্রাকৃতের সঙ্গে অতি-প্রাকৃতের যোগসাধন করা—এ সবই খাঁটি রোমান্টিক কল্পনার বৈশিষ্ট্য। এবং এই ধরনের আখ্যায়িকা বাংলা কবিতায় ললিতার মধ্যেই প্রথম দেখা দিল। এই রোমান্টিক কাহিনীর স্বগোত্রীয় হল অক্ষয় চৌধুরীর 'উদাসিনী', রবীন্দ্রনাথের 'বন-ফুল' কিংবা তাঁর শৈশবসঙ্গীত গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত গাথাগুলি। উদাসিনীকে বলা হয় বাংলা সাহিত্যের প্রথম নব্যরোমান্টিক কাব্য। কিন্তু এর পেছনেও সেই প্রমাদ। ললিতা কাব্যটিকে অবহেলা করা হয়েছে বলেই, উদাসিনী সম্পর্কে এমন গৌরবজনক সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। আসলে উদাসিনীর স্থান দ্বিতীয়। ললিতাই প্রথম।

এবার 'মানস' প্রসঙ্গ। ললিতা কাব্যের সঙ্গে মানস প্রকাশিত হয়েছে বটে, কিন্তু তাই বলে মানস আখ্যায়িকা কাব্য নয়। অথচ বাংলা আখ্যায়িকা কাব্যের গবেষণা গ্রন্থে এমন প্রমাদই ঘটেছে দেখতে পাই। কাব্যশাস্ত্রের কোন সূত্রে মানসকে আখ্যায়িকা কাব্য বলা যায় জানি না। একে আখ্যান, কিংবা আখ্যায়িকা বা কাহিনী বলতে

কিছুই নেই। এটি আসলে মনের একটি আবেগ-উচ্ছ্বাস—রোমান্টিক ভাবুকতা যার উৎস। আধুনিক গীতিকবিতার একটি সাধারণ লক্ষণ হল কবির মর্ত-প্রেমজনিত আত্মপ্রকাশ, যাকে আমরা সাধারণত বলে থাকি কবিমনের আত্মগত প্রকাশ। এই পৃথিবীর রূপ-রস-বর্ণ-গন্ধময় যে আবেদন তাতে কবিচিত্ত সম্পূর্ণ সংবেদনশীল হয়ে অভিভূত হয়ে পড়েন—একান্তভাবে পাবার জন্যেই একটা অভাববোধ, একটা ব্যাকুলতা বা আকুলতা জাগে এবং কবি তাঁর হৃদয়ের সেই ভাবকে কাব্যরসে মণ্ডিত করে প্রকাশ করেন। মানস কবিতায় বঙ্কিমচন্দ্র তাই করতে সচেষ্ট হয়েছেন। কবিতার প্রথম কয়েক ছত্র উদ্ধৃত করছি—

হা ধরণি ধর কি রে হৃদয় মণ্ডলে,
ধর কি কোথাও মম মনোমত স্থলে?
কি আছে সংসারে আর বাঁধিবারে মোরে।
যে কালে কেটেছে কাল ভরসার জোরে।।
মনে করি কাঁদিব না রব অহঙ্কারে।
আপনি নয়ন তবু ঝরে ধারে ধারে।।
গোপনে কাঁদিবে প্রাণ সকালি আঁধার।
জীবন একই স্রোতে চলিবে আমার।।
আঁধার নিকুঞ্জে যেন নীরবেতে নদী।
একাকী কুসুম তার চলে নিরবধি।।
কারে নাহি বাসি ভাল, কেহ নাহি বাসে।
হৃদে চাপা প্রেমাগুন, হৃদয় বিনাশে।।
সংসার বিজন বন, অন্তরে আঁধার।
দেখিতে অপ্রেমী মুখ, না পারি রে আর।।

এ বিষাদ, এ আকুতি সংসার-বৈরাগ্যের নয়। কবি কি চান? তিনি চান—

বিজন বিপিনময় দ্বীপে এক থাকি।
ভাবিয়া মনের দুঃখ ভ্রমিব একাকী।।
দেখিব দ্বীপের শোভা মোহিত নয়নে।
বিপিন বারিধি নীল বিশাল গগনে।...
মোহে মন মজাইবে প্রকৃতি মোহিনী।
জীবন যাইবে যেন স্বপনে যামিনী।।

এই প্রকৃতি-প্রেম কবির হৃদয়ে অত্যন্ত গভীর বলেই তাতে একটা অজানা বিষাদ মিশে আছে।

কালো জলে ঢাকা দিলে প্রদোষ আঁধার—
অনিবার তর তর বিশাল বিস্তার—
সেই দুঃখস্বরে হৃদি, শিহরি চঞ্চল,
কাঁদিবে, না জানি কেন আঁখিময় জল!
মনে হয় যেন কোন সুখের সঙ্গীত।
নাচাইয়ে হৃদি ডোরে জাগে অচম্বিত।।
আপনি ভাসিবে আঁখি দর দর ধারে।
অনন্ত সর্নাবর চেয়ে পয়োধির পারে।।

এই হল রোমান্টিক ভাবুকতার ভুয়া-স্বপ্ন, অসীমের আকুতি — বিদেশী সমালোচক যাকে বলেছেন romantic agony. প্রকৃতির সৌন্দর্য নিয়ে এমন ভাবুকতা, এমন কবিকল্পনার আস্বাদ বাংলা কাব্যে ইতিপূর্বে দেখা দেয় নি। 'যাহা চাই তাহা পাই না' —এই বিষাদ-অনুভবের মূর্ছনা অনুরণিত হয়েছে উপরে উদ্ধৃত অংশে।

অবশ্য ললিতা ও মানস-এর প্রকাশপদ্ধতি কোন বিশেষত্ব দাবী করতে পারে না। এর রচনাশৈলী সে-যুগের বাঁধা পথেই চালিত। আসলে এই কাব্যগ্রন্থে তরুণ বঙ্কিম ভাবুকতায় যে নতুনত্ব দেখিয়েছেন, রচনারীতিতে তেমন উল্লেখযোগ্য কিছু দেখাতে পারেন নি। 'ফর্ম' ও 'কনটেন্ট'-এর একটা বিরোধ এতে আছে।

॥ ৪ ॥

ললিতা ও মানস যখন প্রকাশিত হয় তখনই তার প্রতি রসিকজনের দৃষ্টি পড়া উচিত ছিল। কিন্তু দুঃখের বিষয় তা হয় নি। উত্তরকালে বঙ্কিমচন্দ্র নিজেই বলেছেন —এ গ্রন্থ বিক্রী হয় নি, এর প্রায় সবগুলি কপি লেখকের ঘরে পোকায় কেটেছে।

এই কাব্যগ্রন্থ কেন সমকালে রসিকজনের দৃষ্টি আকর্ষণ করে নি? কারণ হিসেবে বলব, সমকাল থেকে বঙ্কিম অনেক দূর এগিয়ে ছিলেন। ঈশ্বর গুপ্ত প্রভাবিত রসশিক্ষা ও কাব্যরুচি ললিতা ও মানসের জন্যে কিছুমাত্র প্রস্তুত ছিল না। এবং এর পর বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর কাব্যরচনাচর্চা অনুশীলন দ্বারা একটানা রাখেন নি। কলম থামিয়ে দেন। ইতিমধ্যে সিপাই বিদ্রোহ এল, ভারতের ওপর দিয়ে একটা ঝড় বয়ে গেল। বাঙালীর মানসলোকেও ঢেউ তুলল। স্বদেশ-চিন্তা, স্বাধীনতা-ভাবনার বীজ উপ্ত হ'ল। এই মানসিক আবহাওয়ায় রঙ্গলালের পদ্মিনী উপাখ্যান সময়োপযোগী হয়ে দেখা দিল। এতে সর্বজনগ্রাহ্য সুবর্ণিত একটি কাহিনী আছে, আছে স্বদেশপ্রেমের ভাবোচ্ছ্বাস যা সহজেই হৃদয়ের তারে ঝঙ্কার তোলে। এর ফলে এই জাতীয় কাব্যের পক্ষে জনচিত্তজয়ী হওয়া অনায়াসেই সম্ভব হয়। পদ্মিনী উপাখ্যানের বেলাতেও তার অন্যথা হয় নি।

অবশ্য ললিতা ও মানসে যে কবি-কল্পনা তা যদি আরো বিস্তারিতভাবে এবং উপযুক্তভাবে প্রযুক্ত হত তাহলে রসিক-সমাজে তার আবির্ভাব কিভাবে গৃহীত হত বলা যায় না। অন্তত সমজদার পাঠক নিস্পৃহ থাকতে পারতেন না। কারণ, ললিতা ও মানসের অঙ্কুরই পূর্ণ-বিকশিত হয়েছে কপালকুণ্ডলায়। ললিতায় লৌকিক-অলৌকিকের দ্বন্দ্বে গঠিত যে কাহিনী-বীজ এবং মানসে গভীর প্রকৃতি-প্রেমের যে লিরিক-উৎসার — এই দুইয়ের সমন্বয়ে, কল্পনায় বলিষ্ঠতায় এবং বিস্তারে, তথা রচনাশৈলীর উন্নততর প্রয়োগে, তাই এক অপরূপ শিল্পমহিমাময় মহীরুহের রূপ নিয়েছে কপালকুণ্ডলায়। সুতরাং বঙ্কিমচন্দ্রের শিল্পমানসের যে বৈশিষ্ট্য তার মুকুল আছে ললিতা ও মানস কাব্যগ্রন্থে। ঐতিহাসিক দৃষ্টিতে নিরীক্ষণ করলে বলতে হয়, আধুনিক বাংলা সাহিত্যের পেছনে যে নব্য-রোমান্টিক শিল্প-ভাবনা সক্রিয় হয়েছে তার সূত্রপাত দেখা গেছে ১৮৫৬ সালে—ললিতা ও মানসে। ললিতা হল আধুনিক কাহিনী-কাব্যের প্রথম নিদর্শন, আর মানস হল আধুনিক গীতিকবিতার প্রথম কলি। মানসের শিল্প-ভাবনা বিহারীলাল ও রবীন্দ্রনাথের সমগোত্রীয় বললে অত্যুক্তি দোষ ঘটে না।

উপন্যাস

গজেন্দ্রকুমার মিত্র

।। উপক্রমণিকা ।।

নিভার চিঠি পেয়ে মনটা খারাপ হয়ে গেল। অথচ মন খারাপ হবার কথা নয়। খুশী না হোক, নিশ্চিন্ত হবার কথা। আর, যার সম্বন্ধে উদ্বেগ আছে তার সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত হওয়া মানেই তো খুশী হওয়া। তবু, কে জানে কেন মনটা অনেক-ক্ষণ ধরেই কেমন ভার ভার হয়ে রইল, কোথায় যেন একটা বেদনাবোধ খচখচ করতে লাগল—অকারণেই। হেমন্ত মার মৃত্যুতে শোক করার কোন কারণ নেই, শোক করবার মতোও কেউ বেঁচে নেই আর—আমি তো পরস্যাপি পর—তত্রাচ, কেন জানি না চিঠিখানা পাবার পর থেকে কী একটা বিষণ্ণতা পেয়ে বসল আমাকে।

আর সেটা, কদিন ধরে, অসংখ্য কাজের মধ্যে সহস্র কথাবার্তার ফাঁকে ফাঁকে, বারবারই অনুভব করতে লাগলুম। খুব ছোট্ট মাছের কাঁটা গলায় বিঁধে থাকলে যেমন একটু বেদনা বোধ হয়—তেমনিই। তাতে কাজ আটকায় না, তার জন্যে ব্যস্ত হতে হয় না, তবু একটু খচখচানি, একটু অস্বস্তি বোধ হতেই থাকে।

হঠাৎই মনে পড়ে গিয়েছিল কথাটা। অনেকদিন কোন খবর পাইনি। মানে নিইনি। হেমন্ত মা কেমন আছেন কে জানে এখনও কি বেঁচে আছেন? এতদিনও? বেঁচে থাকা মানে আরও দুর্গতি কিন্তু দুঁদের যা কপাল—অত সহজে কি মরবে?

নিভাদের কাছে ছিলেন এটা জানি। অন্তত শেষ যা খবর পেয়েছি। নিভাদের ঠিকানা একবার দিয়েও ছিলেন আমাকে—সেই শেষ চিঠি তাঁর—অবশ্যই সেটা যত্ন করে রাখিনি। আছে কোথাও, তবে কোথায় তা মনে পড়ল না অনেক ভেবেও। নিতান্ত আন্দাজে আন্দাজেই একটা চিঠি দিয়ে-ছিলুম। দৈবক্রমে সেটা ওদের কাছে পৌঁচেছে। তারই জবাবে খবরটা দিয়েছে নিভা।

হেমন্ত মা মারা গেছেন গত ডিসেম্বরে, ১৯৬৬র ডিসেম্বর। বুড়ো শরীর, এবারের শীতের ধাক্কাটা আর সামলাতে পারলেন না। মাত্র তিন চারদিনের জ্বরেই শেষ হয়ে গেল। মরবার আগে নাকি আমার কথা অনেকবার বলেছিলেন। তবে ওরা, সত্যি সত্যিই যে এত টপ্ করে মারা যাবেন উনি—বুঝতে পারেনি, তাই কোন খবর দেবার চেষ্টা করেনি। দিলেও অবশ্য লাভ হত না। অকারণে ব্যস্ত হওয়া ও ব্যস্ত করা সার হত। তার পরও নানা কারণে বিব্রত ছিল বলে মৃত্যু সংবাদটাও দিতে পারেনি। আমি যেন কিছু মনে না করি। ইত্যাদি—

মনে করার কিছু নেই। নিভা ওঁর ভাইঝি—কিন্তু সে বহু দূরসম্পর্কে। নিভার বাবা হেমন্ত মার পিসতুতো ভাই হতেন, তাও আপন নয়। সে তুলনায় ওরা যা করেছে—ঢের করেছে। এতখানি ঝাক্কি নিকট-আত্মীয়রাও নেয় না। শেষের দিকে অথর্ব নয়, একেবারে অশক্তই হয়ে পড়েছিলেন। ঘরের বাইরে যেতে পারতেন না, প্রাকৃতিক কৃত্যও ঘরের মধ্যে নর্দমার ধারে সারতে হত। নিভার অবস্থাও এমন ভাল নয় যে একটা আলাদা ঝি-চাকর রেখে দেবে ওঁর জন্যে। যা কিছু করতে হয়েছে নিজেদেরই।

সাধারণ গৃহস্থ ঘরে বিয়ে হয়েছিল নিভার। কুষ্ঠিয়ার কাছে এক গ্রামে। চাষী-গৃহস্থ ঘর—টাকা-পয়সা বিশেষ ছিল না, তাই স্বাধীনতার পরও বছর-দুই সেখানেই ছিলেন ওর স্বামী-শাশুড়ি। কে তাঁদের বুঝিয়েছিল যে নদীয়ার ঐ অংশটুকু এধারের সঙ্গে জুড়ে দেবে। ফলে যখন চলে আসতে হল তখন কিছুই প্রায় নিয়ে আসতে পারলেন না। ব্রাহ্মণের ঘর—গুরু-বংশ, শাসনকোন্নই ছিল নাকি দু সিন্দুক বোঝাই। তবু, শেষ মুহূর্তে এই জমি বদলের ব্যবস্থাটা হয়ে গিয়েছিল তাই রক্ষে। যা ফেলে এসেছেন তার তুলনায় অনেক কম, গ্রাসাচ্ছাদনটা চলে যাচ্ছে এই পর্যন্ত।

তাও—এ বাজারে কষ্টই হত—যদি না নিভার স্বামী এখানে এসে একটা মাস্টারী জুটিয়ে নিতে পারতেন। স্থানীয় গ্রামের ইস্কুলে নিচের দিকে মাস্টারী—তবু তাতেই কিছুটা সামলে নিতে পেরেছিল ওরা। এখন অবশ্য নিভার সব ছেলেই চাকরি-বাকরি করছে, তেমনি প্রত্যেকেরই বিয়ে হয়ে গেছে—ছেলেপুলেও। অর্থাৎ নিজস্ব সংসার এক একটি।

সে হিসেবে, ওদের অবস্থার তুলনায় যা করেছে যথেষ্টই বলতে হবে।

তা নয়, আমি ভাবছি হেমন্ত মায়ের কথা।

সেই মানুষ! কী প্রতাপই না ছিল!

ওঁকে দেখলে ভাবাও যেত না যে, কোনদিন বাংলাদেশের এক অখ্যাত পল্লী-গ্রামে সাধারণ গৃহস্থবাড়িতে অসহায় পরের গলগ্রহ হয়ে পড়ে থেকে সবার অগোচরে একদিন এমনভাবে নিঃশব্দে বিদায় নেবেন। মনে হত উনি যেদিন মরবেন সেদিন একটা ইন্দ্রপাত হবে। জীবনেও যে তেজ ছিল, মৃত্যুতেও সেই তেজেরই আর একটা বিকাশ দেখতে পাবে সকলে। দাপট যেমন ছিল, তেমনি শক্তিও। সত্তুরই বছর বয়সেও জোয়ান হিন্দুস্থানী মুটেকে একটা চড় মারলে সে ঘুরে পড়ে যেত। ঐ লোক যে এমন অসহায় পঙ্গু হয়ে পড়বেন কোনদিন তা ওঁকে দেখলে ধারণাও করা যেত না। যেমন শক্তি তেমনি মনের বল। কখনও কারও এতটুকু সাহায্য নিতেন না। কারও কাজ পছন্দও হত না। শুধু স্বাবলম্বী নয়, শৌখিনও ছিলেন খুব। জামা কাপড় বিছানা মাদুর ধপধপ করত, ঘরের আসবাব-পত্র পরিষ্কার ঝকঝক করত। নিজে হাতে

ঝাড়ামোছা করতেন প্রত্যহ, এতটুকু ধুলো কি ঝুল কোথাও জমবার অবসর পেত না। বিছানায় চাদর টান করে গোঁজা না থাকলে শুতেন না।

সেই মানুষের এই হাল!

তীর্থে মৃত্যুর খুব শখ ছিল মহিলার। তীর্থে ছিলেনও বহুদিন। অনেক ঘুরে দেখে শেষে কাশীতে এসে বাসা বেঁধেছিলেন। ১৯৩০ থেকে ১৯৬০—ত্রিশ একত্রিশ বছর কাশীবাস করেছেন। খুব ইচ্ছা ছিল মণিকর্ণিকা পাবেন। তবে বলতেনও, 'হবে কি? আমার যা কপাল! মরার মতো মরাটাও ভাগ্যের কথা। জপ-তপ করো কি, মরতে জানলে হয়।' উচ্চারণ করতেন জপো তপো।

সেই হেমন্ত মাকেই গিয়ে থাকতে হল—থাকতে হল কেন মরতেও হল—একেবারে অগঙ্গার দেশে, তীর্থ তো নয়ই, কাছাকাছি একটা মন্দিরও আছে কিনা সন্দেহ। নিভাদের বাড়ি একবার গেছিও আমি—ও'রই পাঠানো কিছু জিনিস পেশছে দিতে। শীতের ফসল বোধহয় বেগুন পেয়ারা ইত্যাদি—মধ্যমগ্রাম স্টেশনে নেমে অনেকটা যেতে হয়, নিতান্তই পল্লীগ্রাম। আমি যখন গেছি তখনও বিজলীবাতি জ্বলেনি ওদের বাড়ি, হয়ত এতদিনে জ্বলে থাকবে। পুরনো মুসলমান জোৎদারের বাড়ি, এরা সামান্য সারিয়ে নিয়েছে এই মাত্র। মোটা মোটা মাটির গাঁথুনি দেওয়াল—কেমন স্যাঁৎসেঁতে ভাব—যেটা হেমন্ত মা মোটে দেখতে পারতেন না।

অথচ উপায়ই বা কি? ভাগ্যের দিক দিয়ে যত যা হোক—স্বাস্থ্যের দিক থেকে ভগবান ও'কে অনেক দিয়েছিলেন। কিন্তু অফুরন্ত কিছু নয়। শারীরিক শক্তির সীমা আছে, ভীমকেও একদিন অনড় হয়ে পড়ে যেতে হয়েছিল। গাণ্ডীবী ধনুক তুলতে পারেন নি। একশ বছরেও উনি যদি না মরেন, শরীর আর কি করতে পারে? কত সহযোগিতা করবে সে? তার দোষ দেওয়া যায় না বিশেষ। দোষ ও'র পরমায়ুরই। নিজেই বলতেন হেমন্ত মা, 'আকন্দর ডাল মুড়ি দিয়ে বসে আছি বাবা, আমার মৃত্যু নেই। বিধাতাপুরুষ ওটার কথা লিখতে ভুলে গেছেন। মনে হয় মহাপ্রলয়ের দিন মার্কণ্ডর সঙ্গে আমিও জলে ভাসব।'

এখনও তাঁর সেই মুখ আমার চোখের সামনে ভাসছে, দন্তহীন মুখের দৃঢ়সম্বদ্ধ ওষ্ঠাধরে একরকমের তিক্ত হাসির ভঙ্গী, চোখের দৃষ্টিতে যেন বিশ্বসংসারের ওপর একটা অবিশ্বাস আর বিদ্রূপ। মুখে যতই যা বলুন, তিনি যে কোনদিন অশক্ত হয়ে পড়বেন তা বোধহয় তিনিও ভাবেন নি। মৃত্যু তো হবেই, একদিন পূর্ণচ্ছেদ টানতেই হবে জীবনে, কিন্তু সে হঠাৎ আসবে—তাই ভেবে রেখেছিলেন।

আশ্চর্য মানুষ ছিলেন—সব দিক দিয়েই। প্রচণ্ড ক্রোধ ছিল তাঁর, রাগলে জ্ঞান থাকত না, কাউকে পরোয়া করতেন না। মুখ এবং হাত দুইই চলত—ক্ষেত্রবিশেষে। পাও। তবে ইদানীং নাকি দিনকাল খারাপ হয়ে পড়েছে বলে পা সম্বরণ করেছিলেন, লাথিটাথি মারতেন না কাউকে। সে রকম ঘটনা আমি অন্তত দেখিনি। আগে নাকি—মানে এই দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের আগে— তেমন তেমন ত্যাঁদড় রিক্সাওলা কি ডুলিওলাকে তাঁর লাথিও খেতে হয়েছে। তখন অবশ্য তারা কিছু বলতে সাহস করত না, চেনাশোনা লোকরা তো নয়ই। যারা একটু জানত তারা ও'কে শ্রদ্ধাও করত খুব। কারণ শাসনও যেমন ছিল তেমনি স্নেহও। স্নেহ বললে হয়ত ভুল হবে—করুণা। কারও অসুখ করেছে কিম্বা কেউ বিপদে পড়েছে শুনলে সে পক্ষ থেকে অনুরোধ-আমন্ত্রণের অপেক্ষা করতেন না—কী জাত কিম্বা কোন্ দরের লোক তাও বিচার করতেন না। অর্থ দিয়ে সামর্থ্য দিয়ে সেবা করতেন, বুক দিয়ে গিয়ে পড়তেন।

তবে, আতুর বা বিপন্ন লোকেরও বেচাল দেখলে মুখ ছোটাতে কসুর করতেন না। তাঁকে দেখলে মনে হত—একমাত্র আগ্নেয়গিরির সঙ্গেই তুলনা দেওয়া যায়। কখন অগ্ন্যুৎপাত শুরু হবে, কেঁপে উঠবে তারপর পাশের মাটি—তা কেউ বলতে পারে না।...

সেই লোক অসহায় পঙ্গু হয়ে পড়ে রইলেন—কোথায় এক প্রায়-পরপরিবারের করুণা ও বিবেচনার ওপর নির্ভর করে! প্রথম যখন নিভাদের বাড়ি আসেন তখন অশক্ত হয়ে পড়লেও একেবারে অনড় হননি—বসে বসে ওদের সংসারে আড়াইসের ডালের বড়ি দিয়েছেন একহাতে বেটে ফেনিয়ে—এক এক বেলায়। উনিই লিখেছিলেন আমাকে, বোধকরি তার মধ্যে একটু আত্মপ্রসাদ কিম্বা আশ্বাস ছিল যে, একেবারে পরনির্ভরশীল হননি তিনি। তবে সে বেশীদিন নয়। অতকাল পশ্চিমে বাস করে এসে এখানের এই ভিজে নোনা মাটি তাঁর সহ্য হয়নি, বছরখানেক পরেই শয্যাশায়ী হয়ে পড়েছিলেন।

কে জানে—তখনও তাঁর ক্ষুরধার রসনা তেমনি অগ্ন্যুদ্গীরণ করে গেছে কিনা। মনে হয়, না। ক্রোধও তাঁর যেমন ছিল প্রচণ্ড, বুদ্ধি আর বিবেচনাও ছিল সেই মাপে। পরের দয়ার ওপর নির্ভর করে থাকতে হলে কিছুটা অবহেলা সহ্য করতেই হয়—এই সাধারণ জ্ঞানটুকু তাঁর ছিল নিশ্চয়ই। তবু ভীমরতি বলেও তো একটা কথা আছে। হয়ত সেই হেমন্ত মাই অপরের কত মুখনাড়া তিরস্কার খেয়ে গেছেন মরার আগে, যেমন অপরকে করেছেন এককালে। নিভা খুবই বিবেচক—তবু মানুষের মন আর মেজাজ সব সময়েই হিসেব করে চলবে তা সম্ভব নয়। সহ্যশক্তির সীমা আছে, সেবা করারও। রুগ্ন পঙ্গু লোক প্রায়ই স্বার্থপর অবিবেচক হয়ে পড়ে, তখন ধৈর্য ধরে তার সঙ্গে মিষ্ট ব্যবহার করা কঠিন বৈকি!

খুবই কৌতূহল হয় জানতে—শেষটা কিভাবে কাটল হেমন্ত মার। হয়ত কোনদিন নিভাদের সঙ্গে দেখা হলে জানা যাবে। তবে কতটা—সে বিষয়েও সন্দেহ আছে। মানুষ যে সব সময় নিজেদের দোষ, ক্ষুদ্রতা তুচ্ছতা ইচ্ছে করে হিসেব করে ঢেকে কথা বলে তাও নয়, অধিকাংশ সময়ই নিজেদের মানসিক দৈন্যের প্রকাশ সম্বন্ধে নিজেরা সচেতন থাকে না। অথবা, থাকলেও ভুলে যায় খুব শীগগির।

আর, নিভার সঙ্গেই কি কোনদিন দেখা হবে? আমার পক্ষে শুধু এই কৌতূহল নিবারণ করতে অতদূর যাওয়া সম্ভব নয়। সে-ই বা আসবে কেন? তারও ঢের বয়স হয়েছে।

॥ ২ ॥

এতদিন পরে হঠাৎ হেমন্তমার কথাটা মনে পড়ার কারণ ছিল।

ও'র সঙ্গে আমার পরিচয়ের সূত্রটা বড় বিচিত্র।

কাশীতে মানসরোবরের গলির যে বাড়িতে আমার ঠাকুমা থাকতেন, সেই বাড়িরই একটা অংশে থাকতেন হেমন্ত মা। ওখানকার ছেলে বুড়ো সবাই—সম্পর্ক-নির্বিশেষে ও'কে হেমন্ত মা বলত—সেই হিসেবেই আমিও তাই বলতুম। নইলে আমরা কায়স্থ উনি ব্রাহ্মণের মেয়ে।

অভয়াচরণ তর্কচূড়ামণির বাড়িটা যাঁরা দেখেছেন তাঁরা জানেন—ঠিক গঙ্গার ওপর না হলেও ও'র দোতলা তেতলার বারান্দা থেকে গঙ্গা দেখা যেত। তেতলা থেকে তো কথাই নেই, ওদিকে রামনগরের রাজবাড়ি থেকে এদিকে হার্ডিঞ্জ ব্রীজ পর্যন্ত (এখন বোধহয় মালবা সেতু নাম হয়েছে)। তর্কচূড়ামণির বাড়িটা দুভাগ করা ছিল, একদিকের দোতলা তেতলা নিয়ে উনি নিজে থাকতেন, আর একদিকের দোতলায় থাকতেন আমার ঠাকুমা, তেতলায় হেমন্ত-মা। নিচের তলায় প্রায় অব্যবহার্য ঘর-

[illegible] ভাড়া নিতেন না তর্কচূড়ামণিমশাই, কয়েকটি দরিদ্র বিধবা এমনিই বাস করত।

ঠাকুমা আর হেমন্ত মার মধ্যে খুব প্রীতির সম্পর্ক ছিল না—বলা বাহুল্য। [illegible] এই জন্যে নয়, এমনিই দুটি মেয়ে-ছেলের হৃদ্যতা হওয়া কঠিন; মেয়েদের মধ্যেতে—অল্পবয়সেও—পুরুষের মতো বন্ধুত্ব বিশেষ হয় না, ওদের বন্ধুত্ব ওষ্ঠে ও ভঙ্গীতেই সীমাবদ্ধ থাকে। বৃদ্ধাদের তো কথাই নেই, তারা মৌখিক সৌহার্দ্যের অন্তরালে আড়ালে সরস আলোচনা করার মতো শুধু পরস্পরের দোষ খুঁজতে ব্যস্ত থাকে। তার ওপর হেমন্ত মার মতো মেজাজী মানুষ—নিতান্ত বিপন্ন হয়ে না পড়লে তাঁকে সহ্য করা যে-কোন মেয়েছেলের পক্ষেই দুঃসাধ্য।

বলতে নেই, আমার পিতামহীরও স্বভাব খুব কোমল ছিল না। বয়সে মানুষ এমনিই খিটখিটে অসহিষ্ণু হয়ে পড়ে, তার ওপর তাঁর আরও কিছু দোষ ছিল। কোন্ সুদূর অতীতে তিনি জমিদারের স্ত্রী ও ক্ষুদে জমিদারদের মা ছিলেন, পরেও তাঁর এক ছেলে তখনকার দিনেই আড়াই হাজার টাকা মাইনের চাকরি করতেন, একথা তিনি ভুলতে পারতেন না কিছুতেই; তার চেয়েও বড় কথা—অপরকে ভুলতে দিতেন না। কোন অচেনা লোকের সঙ্গে আলাপ হলেই, এমন কি চেনা লোকের সঙ্গেও বিবিধ প্রসঙ্গের ফাঁকে—এই কথাগুলি শুনিয়ে দিতেন। তাঁর জ্যেঠামশাই জজ ছিলেন, বাপের বাড়িতে পোষা হাতী ছিল, শ্বশুর-বাড়ির সামনে দিয়ে কোন প্রজার জুতো পায়ে বা ছাতা মাথায় চলবার হুকুম ছিল না; তাঁর সেজছেলেকে সাহেব-সুবোরাও এককালে 'স্যার' বলে এসে সেলাম করত, দাঁড়িয়ে কথা বলত—তিনি না বললে কেউ চেয়ারে বসতে সাহস করত না—ইত্যাদি, ইত্যাদি, বার বারই শুনতে হত সবাইকে।

এই 'বড়াই' বা 'জাঁক করা' নিয়ে অনেকেই হাসাহাসি করত, ঠাট্টাবিদ্রূপ করত—তবে সে আড়ালে। হেমন্তমা ওসব শৌখীন ভদ্রতার ধার ধারতেন না। তাঁর সামনে এ প্রসঙ্গ উঠলে উপক্রমণিকাতেই যাকে বলে 'ছিরি ফাঁদা' তিনি গায়ে জল ঢেলে দিতেন, 'রাখ দিকি বাপু! অমনি ও'র বড়াই শুরু হয়ে গেল।...আরে মর, মাগী, এতটা বয়স হয়ে গেল—চার কুড়ি পেরিয়ে গেছে কবে, নিজেই তো বলিস—গঙ্গাপানে পা করে বসে আছিস, কী কথার কি অর্থ হয় বুঝিস না?...এখানে তো এই ষোল টাকা ভাড়ায় বাস করছিস, না আত্মীয় না স্বজন, সাত জন্মে কেউ খোঁজ নিতে আসে না, একটা রাঁধুনী বামুনি রেখেও খাবার সামর্থ্য নেই, এক ঠিকে ঝি ভরসা, এ অবস্থায় অত বড়মানুষির জাঁক করলে লোকে টিটকিরি করবে না? আড়ালে গায়ে থুথু দেবে যে!...এত যদি বড়ের মানুষ তো এভাবে পড়ে আছিস কেন—লোকে বলবে না? লক্ষপতি জমিদার সব যার ছেলে—সে তো একরাশ আশ্রিত প্রতিপাল্য নিয়ে থাকবে!'

'তারা যদি বেঁচে থাকত তাহলে কি আর এভাবে পড়ে থাকতুম! তেমন ছেলে ছিল না আমার। মাতৃভক্ত মাতৃঅন্ত প্রাণ। কী বলব পোড়াকপাল—সব খেয়ে বসে আছি তাই, একটা ছেলেতে ঠেকেছে শিবরাত্তিরের সলতে, সেও তো আধমরা। চিরদিন দেশে রইল জমিজায়গা নিয়ে, কখনও যে আধ-বুড়ো তাদের জন্যে চাকরি নিতে হবে তা তো আর ভাবে নি, সেখানে অনাহারী ম্যাজেস্টার ছিল এই পাকিস্তানের আমলেও—এখন একবস্ত্রে চলে আসতে হয়েছে নাতোয়ান হয়ে—কোনমতে মাথা গুঁজে পড়ে আছে! তার কি ক্ষ্যামতা বলো গাড়িভাড়া দিয়ে আমাকে দেখতে আসবে হুট হুট করে?'

মুখ গোঁজ করে উত্তর দেন আমার ঠাকুমা।

'ব্যস ব্যস। হয়েছে। বুঝেছি। এখন কিছু নেই যখন চুপ করে থাকাই বুদ্ধিমানের কাজ। এখনকার যা অবস্থা সেইভাবে চলো। কবে ঘি খেয়েছি—এই দ্যাখো এখনও হাতে গন্ধ, ওটা ভারী লজ্জার কথা। তুমি তো শুনতে পাও না, আমি শুনি—কত টিটকিরি দেয় লোকে কী দরকার গাল বাড়িয়ে চড় খেতে যাওয়ার।'

আর একটু থেমে হয়ত মর্মান্তিক উপসংহার টানতেন, 'কী ঘোষের মেয়ে তুমি মাঝে মাঝে সন্দ হয়। আশি বছর পেরিয়ে গেল এখনও আক্কেল হল না!'

এর পর আমার ঠাকুমা কি চোখে দেখবেন ও'কে—তা সহজেই অনুমেয়।

তবে, একেবারে ছেঁটে ফেলে দিতেও পারতেন না। কারণ ও'র ছিল বাতের শরীর, মধ্যে মধ্যে বাত-জ্বরে শয্যাশায়ী হয়ে পড়তেন। তখন দেখবার লোক ঐ হেমন্ত মাই। যদিচ তিনি ঠাকুমার চেয়ে বেশ খানিকটা বয়সে বড় ছিলেন—তবু তাঁকে কোনদিন কারুর দেখতে হয় নি। হেমন্ত মা বকাঝকা করতেন যথেষ্টই, ঐ জন্যেই একশোবার বলি অত মর্দানি দেখিয়ে নিত্যি গঙ্গায় চান করতে যেতে হবে না। সয় না তো বাহাদুরী দেখাতে যাস কেন? এই ঠান্ডায় নিত্যি চান করতে যাওয়া—হিম লাগিয়ে!' কিন্তু করতেনও ঢের, যাকে বলে গুয়েমুতে করা'—তাই।

তা ছাড়া, এ বিদ্যাটা উনি জানতেনও ভাল। রোগী শুয়ে থাকতেই বিছানা পাল্টানো, রোগীকে স্পঞ্জ করা, ঘর পরিষ্কার রাখা— এসব কাজে তাঁর তুলনা ছিল না। ঠাকুমা অপর কারুর হাতে ভাত খেতেন না—প্রসাদ ছাড়া। হেমন্ত মাও তা খেতে বলতেন না। ভাত খাবার হলে, পথ্য করার দিন, তর্কচূড়ামণির গৃহদেবতার প্রসাদ আসত। গৃহিণী নিজে দিয়ে যেতেন। কিন্তু অন্যদিন সাবু বার্লি ফলের রস দুধ—যা খাওয়ার হেমন্ত মাই করে দিতেন যতদূর সম্ভব শুদ্ধাচারে। এমন সেবা আর কেউ করবে না, ঠাকুমার নাতনী বা বৌমারা তো নয়ই। তাছাড়া তাদের চিঠি লিখে খবর দিলে আসাতেই তো ও'র অবস্থা কাহিল হয়ে পড়বে। ঠাকুমা হঠাৎ-হঠাৎই একেবারে শয্যাশায়ী হয়ে পড়তেন, পড়ে পড়ে যন্ত্রণায় চিৎকার করতে থাকতেন। শুধু সেবা নয়—মালিশ পুলটিশ, কোনটায় কী উপকার হয়—তাও হেমন্ত মা জানতেন, বেগতিক দেখলে কবিরাজ বা হোমিওপ্যাথ ডাক্তার ডাকতেন—একেবারে নিকট আত্মীয়ের মতোই ব্যবহার করতেন, অথচ সেক্ষেত্রে ঠাকুমার তরফ থেকে নির্দেশ বা অনুরোধের অপেক্ষা করতেন না।

সুতরাং এ অবস্থায়, কাটান ছিঁড়েন করা যাকে বলে, তা করা চলত না। তবে ঠাকুমা আড়ালে যথেষ্টই বিষ উদ্গার করতেন। 'কাস্তেন মেয়েমানুষ' 'মদ্দা মেয়ে-মানুষ' 'মেয়ে বর্গী'—এই ছিল তাঁর কাছে হেমন্ত মার অভিধা। আমি একটু বেশী ওপরে বেতুম বলে আমার ওপরও চটা ছিলেন, 'কেন যাস ওপরে—অত যখন তখন? ওর ঐ বগবগানি বচনামৃত না শুনলে বুঝি ভাত হজম হয় না? আর ওর ঘরে যাসই বা কেন? এখানে খেতে পাও না? রজপুজ ঘাঁটা হাত ওর, নিজেই তো বলে, এ তো আর শোনা কথা নয়! বামুনের মেয়ে ঐ পজ্জন্ত, ওর কি জাতজন্ম আছে? তাছাড়া ওর স্বভাব-চরিত্তিরও কখনও ভাল ছিল না—।'

এইখানেই থামিয়ে দিতে হত। কখনও ঠাট্টা তামাশা করে, কখনও বা মনে করিয়ে দিয়ে যে, আমরা পথেঘাটে ট্রেনে হোটেলে রেস্তোরাঁয় খাই, খৃীষ্টান মুসলমান কিছুই বাকী নেই আমাদের—আমাদের কাছে জাতের কথা হাস্যকর। আর স্বভাবচরিত্র? সে হিসেব রেখে যদি কারও হাতে খেতে হয়—তাহলে তো নিজের হাতে ছাড়া খাওয়াই চলে না, কার ভেতর কি আছে কে জানে। কে কার মনের মধ্যে ঢুকছে! তারপর হয়ত চোখ টিপে বলি, 'তুমিই বয়সকালে কোথাও কিছু করেছ কিনা কি করে জানছি?'

এই শেষের খোঁচাতেই যথেষ্ট ফল হবে জানা ছিল। হতও। উনি অকথ্য কুকথ্য গালিগালাজ শুরু করতেন। 'আ মর ছোঁড়া, ড্যাকরা, ভারত ছাড়া, যত বড় মুখ নয় ততবড় কথা! আমি না তোর বাপের মা হই! এই তোমাদের শিক্ষা হয়েছে। এর নাম লেখাপড়া শেখা! গাধা তৈরী করেছে তোর বাপ একগাদা পয়সা খরচ করে!...... আমাদের স্বভাব-চরিত্তির! চন্দসূর্যি আমাদের মুখ দেখতে পেত না সেকালে—তা জানিস! পাশের জাতের বাড়ি নেমন্তন্ন খেতে হলেও পাল্কী করে যেতে হত, পালকী একেবারে অন্দরমহলে গিয়ে থামত। তাও শাশুড়ি পিসশাশুড়ি ছাড়া কোথাও নেমন্তন্ন যাবার হুকুম ছিল না। বিধবা পিসশাশুড়ি সঙ্গে থাকত যমদূতের মতো, দারোগার বাড়া। এক চাউনি দিলেই পেটের মধ্যে হাত-পা সেঁধিয়ে যেত, আত্মাপুরুষ খাঁচা ছাড়া হবার জো হত। ...জাতের বাড়ি ছাড়া কোথাও পাত পেড়ে খাওয়ার হুকুম ছিল না, গিয়ে নৌকোতা করে চলে আসতে হত। পিসশাশুড়ি জাতের বাড়িও খেতেন না, বিধবা মানুষ কড়েরাঁড়ি—

ফটো : রামকিঙ্কর সিংহ

জলস্পর্শ করতেন না কোথাও। শুধু আমাদের পাহারা দেবার জন্যেই যাওয়া। ...কোথায় কি বলতে হবে, কি করতে হবে—কপা এগুবো কপা পেছবো, কোথায় বসব—সেসব তাঁর হুকুম চাই—'

অর্থাৎ ট্রেন অন্য লাইনে চলে যেত নিরাপদে। শুরু হয়ে যেত তাঁর নিজের বৃত্তে আবর্তন। হেমন্ত মা তখনকার মতো অব্যাহতি পেতেন।...

আমি সত্যিই যখন তখন ওপরে যেতুম। হেমন্ত মার কাছে। আমার আকর্ষণ ছিল দুটো। প্রথমত ওঁর তেতলার বারান্দা ও দ্বিতীয়ত উনি নিজে। এই শেষের আকর্ষণটা হয়েছে ধীরে ধীরে, একটু একটু করে পরিচয় ঘনিষ্ঠ হতে। ওঁর বিচিত্র স্বভাবে, বিচিত্র কথাবার্তায়। আমি যত ঐ বয়সের মহিলা দেখেছি (ঐ বয়স অবশ্য কারুরই নয়, বলা উচিত যত বৃদ্ধা দেখেছি) উনি একেবারেই তাদের থেকে পৃথক।

ঠাকুমা বলতেন 'হুতশুনে মেয়েমানুষ', কথাটা খুব মিথ্যে নয়। হুতাশনই বটে। দেখলে মনে হত বিরাট বহ্নিসম্ভাবনা বুকে নিয়ে একটা চলন্ত আগ্নেয়গিরি ঘুরে বেড়াচ্ছে। ওঁর চালেচলনে কথায়বার্তায় সর্বদাই একটা জ্বালা বিচ্ছুরিত হত। তবু, সেটাই সব নয়। এই মানুষেরই এত মধুর এত কোমল রূপ দেখেছি—যা প্রায় অবিশ্বাস্য। উপর্যুপরি আঘাত পেয়েও, মানুষের অসংখ্য হৃদয়হীনতা বিশ্বাসঘাতকতা স্বার্থপরতা দেখার পরও সে কোমলতা আর সরসতা একেবারে নষ্ট হয়নি। স্নেহপিপাসু অন্তর তাঁর শুধু স্নেহ পেতেই চায়নি, দিতেও চেয়েছে—জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত।

কিন্তু সেটা দীর্ঘ পরিচয়ের পরের কথা।

প্রথম ও প্রধান আকর্ষণ ছিল ঐ বারান্দাটাই। সেটাও আমার ঠাকুমার একটা—ইংরেজীতে যাকে বলে 'সোর পয়েন্ট'—ক্ষতস্থান ছিল। উনি আগে এসেছেন এ বাড়িতে, তখন তিনতলাটা দিতে চান নি বাড়িওয়ালা। তিনি অন্য কিসব কারণ দেখিয়েছিলেন, তাঁর বৃদ্ধা মা কিন্তু রেখেঢেকে বলেন নি, আসল কারণটাই খুলে বলেছিলেন। 'কে জানে এরপর কে ভাড়াটে আসবে বাছা, তারা যদি বামুন হয়, তুমি যতই হোক কায়স্থ তো। তুমি তাদের মাথার ওপর চলবে ফিরবে—সে তো আমাদেরই পাপ হবে।' হেমন্ত মা যখন এলেন তখনও একবার কথাটা তুলেছিলেন ঠাকুমা কিন্তু তখনও তর্কচূড়ামণিমশাই নানা অছিলায় প্রসঙ্গটা এড়িয়ে গিয়েছিলেন, বেশী জোড়ার কথাও তুলেছিলেন; আসলে, আমার ঠাকুমা বুঝেছিলেন, ব্রাহ্মণ বলেই ওপরটা পেয়ে গেলেন হেমন্ত মা এককথায়। সেই জন্যে ওপরে যদি বা উঠতেন ঠাকুমা, ও বারান্দায় কখনও পা দিতেন না।

আমার অত অভিমান বোধ ছিল না। তাছাড়া নিচেরতলার আকর্ষণও ছিল কম। নিতান্ত কর্তব্যের খাতিরেই বছরে দুবার একবার আসতুম। অবশ্য শুধু কর্তব্য বললে সত্যের অপলাপ করা হবে, কাশীর প্রতি আকর্ষণটা ও কর্তব্যনিষ্ঠ হবার একটা প্রধান কারণ ছিল। নইলে বাইরে বাইরে মানুষ হয়েছি আমরা—ঠাকুমার স্নেহ এত পাইনি যে সেই টানে ছুটে আসব। ওঁর সঙ্গে গল্প করা মানেই সেই পুরাতন জাঁকের পুনরাবৃত্তি—সে আর কত শোনা যায়। তাছাড়া এখান থেকে গঙ্গার দৃশ্যও সীমাবদ্ধ।

সেই জন্যে, একটু ফাঁক পেলেই একখানা বই হাতে ওপরে চলে যেতুম। সকালের কিছুটা খুবই নিরিবিলি থাকত, হেমন্ত মা তাঁর পুজোর যোগাড় পুজো, রান্না প্রভৃতি নিয়ে ব্যস্ত থাকতেন। অত গল্প করার সময় পেতেন না। সেটা আমার পক্ষে শাপে বর হ'ত। বিশেষ শীতের দিনে মিষ্টি রোদে পিঠ দিয়ে বসে বই পড়া আর কখনও কখনও ভেতরে একটা আঙুল দিয়ে বই বন্ধ করে চোখ গঙ্গার দিকে চেয়ে বসে থাকা বেশ লাগত।...নৌকোগুলো পারাপার করছে, কেউ বা মাল বোঝাই কেউ বা মানুষ নিয়ে; কিম্বা কেদার থেকে মণিকর্ণিকা পঞ্চতীর্থ করে বেড়াচ্ছে বা শুধুই ঘাটের শোভা দেখাচ্ছে; কখনও কখনও সাহেব-মেমের দল বড় বজরার ছাদে বসে দূরবীন নিয়ে আমাদের দেখছে কি ফটো তুলছে; মধ্যে মধ্যে দু'একটা শুষুক ডিগবাজী খেয়ে মিলিয়ে যাচ্ছে মাঝগঙ্গায়, প্রসাদী গাঁদার মালা বা গঙ্গাকে নিবেদিত ফুলবেলপাতার গুচ্ছ জলে ভেসে যাচ্ছে অথবা যেতে পারছে না, নৌকো যাতায়াতে যে মৃদু তরঙ্গের সৃষ্টি হচ্ছে তারই আঘাতে-প্রত্যাঘাতে এক জায়গাতেই স্থির হয়ে থেকে নাচছে শুধু; মাল্লারা নিচের ঘাটে আপসে ঝগড়া করছে; কোন বিধবা হয়ত ভোরে আসতে পারেন নি তখন স্নান সেরে কমণ্ডলুতে জল ভরে নিয়ে উঠে আসছেন; গুম গুম করে ট্রেন উঠছে মালব্যসেতুর ওপর—এমনি সব বহু পরিচিত ও অতি প্রিয় দৃশ্য বসে বসে দেখতুম।

॥ ৩ ॥

হেমন্ত মার সঙ্গে শেষ দেখা হয়—ঠাকুমার মৃত্যুর বছর সেটা—১৯৫৭ সাল। না, বোধহয় ভুল হচ্ছে, তারও পরে একবার দেখা হয়েছিল, '৫৯ কি '৬০ সালে—ঠিক মনে পড়ছে না। তবে সে কিছু না। মিনিট কতকের জন্যে। অন্যত্র উঠেছিলুম, কাজের ফাঁকে একবার এটা দেখা করে গিয়েছিলুম। ঠাকুমার মৃত্যুর পর প্রাপ্য করতে খুড়তুতো দাদা—অর্থাৎ কাকার ছেলেরা। এসেছিলেন আমার কাকা ও ... জন দুই

আমি তখন আসতে পারিনি। শ্রাদ্ধ-শান্তি সারার পর ও'র এস্টেট্ পত্র কি হবে—অর্থাৎ তাঁর যা কিছু অবশিষ্ট অস্থাবর সম্পত্তি। নিতান্তই ঘরকন্নার তুচ্ছ তুচ্ছ সব জিনিস—কিছু স্থির করতে না পেরে তাঁরা একটা ঘরে বসে সব পুরে চাবি দিয়ে চাবিটা তর্কচূড়ামণির ছেলের কাছে রেখে চলে গিয়েছিলেন। ভাগ্যে পণ্ডিতমশাই তার আগেই কাশীপ্রাপ্ত হয়েছিলেন, তাঁর গর্ভধারিণীও, নইলে অত সহজে ঘর জোড়া করে রেখে চাবিটা আবার ও'দের কাছেই গচ্ছিয়ে আসা যেত না। যাই হোক—তার পর বহু বাদবিতণ্ডা ও চিঠি লেখালেখির পর আমার ওপরই ভার পড়েছিল সেগুলোর সম্পত্তি করার। বাড়িওয়ালারা ব্যস্ত হচ্ছেন, সুতরাং আমি যেন যেমন করেই হোক একটু সময় করে গিয়ে একটা সুব্যবস্থা করে আসি।

ব্যবস্থার একটা সর্বসম্মত নির্দেশও ছিল। কমদামী বাসন কোসন আমার বিবেচনামতো আমি যেন দান করে দিই—পুরনো দাসী বা ঐরকম কাউকে। আর পুজো করার যেসব রুপোর বাসন কোসন আছে, বা অন্য কোন নতুন বাসন যদি থাকে, ও'র গুরুবাড়ি পাঠাতে হবে। সেটা অবশ্য এই কাশীতেই। এছাড়া বিক্রীর মতো যদি কিছু থাকে—ওর ভেতর আমার কোন জিনিস রাখতে ইচ্ছে হলে যেন রাখি, সঙ্কোচ না করি—সব বিক্রী করে টাকাটা যেন আমার কাকাকে দিয়ে দিই। কাকাই ও'র একমাত্র অবশিষ্ট সন্তান, তাঁর অবস্থাও ভাল না। ঠাকুমার সঙ্গে কিছু গহনা এবং নগদ টাকাও ছিল—দুঃসময়ের সম্বল, কত ছিল কাউকে কদাচ জানতে দিতেন না তিনি, সেগুলো ও'রা আগেই নিয়েছিলেন। সেই টাকাতেই শ্রাদ্ধশান্তি হয়েছে, যা যৎসামান্য বাকি ছিল—সকলে সেটাও কাকাকেই দিয়েছেন।

কাশীতে পৌঁছে সোজা হেমন্ত মার কাছেই উঠেছিলুম। কে জানে কেন, কোন সঙ্কোচ বোধ হয় নি। মনে প্রশ্নও ওঠে নি যে কোথায় উঠব। যেন হেমন্ত মার কাছে গিয়ে উঠব এইটেই স্বাভাবিক। হেমন্ত মাও খুব সহজভাবেই স্বাগত সম্ভাষণ জানিয়েছিলেন। গাড়ির কাপড়চোপড় ছেড়ে ফেলতে বলে, চা খাব না শরবৎ খাব জিজ্ঞাসা করে একেবারে ভাত চাপিয়ে দিলেন। তিনি জানতেনই আমি ওখানে উঠব--তাঁর আচরণে অন্তত তাই মনে হল।

খাওয়াদাওয়ার পর তাঁর ছোট্ট পেতলের হামানদিস্তেতে পান ছেঁচে মুখে ফেলে একটি গোপন সংবাদ দিলেন।

ওরা যা জানত, যা পেয়েছিল তাছাড়াও ঠাকুমার একটি ভারী গার্ডচেন হার ছিল, অন্তত সাত ভরি ওজন হবে। তিনি নাকি আমার জন্যেই এটা হেমন্ত মার কাছে রেখে গেছেন। বলে গেছেন, 'ও ছাড়া তো সাতজন্মে কেউ আসত না আমার খোঁজ নিতে, ওকে একটা কিছু দিয়ে যাব আমার ইচ্ছে। এমনি তোরঙ্গয় থাকলে মরার সময় যারা থাকবে—যে যা পাবে নিয়ে নেবে।... তুমি এটা তোমার কাছে রেখে দাও দিদি, তার হাতে দিও। যেন এটা ভেঙ্গে বৌকে একটা কিছু গড়িয়ে দেয়।'

খবরটি দিয়ে একটু মুচকি হাসলেন হেমন্ত মা। তারপর একরকমের বিচিত্র দৃষ্টিতে আমার দিকে চেয়ে বললেন, 'এটা তোর খুব নেবার ইচ্ছে?'

আমি তো অবাক। বললুম, 'ইচ্ছে কি অনিচ্ছে ভেবে দেখার সময় পেলুম কৈ বলুন। এই তো খবরটা শুনলুম সবে।... তবে আমার ঠিক এভাবে কোন জিনিস নিতে ইচ্ছে করে না। সবাইকে লুকিয়ে—আলাদা।...কাকা কি অন্য খুড়তুতো ভাইরা যদি জানতে পারে তো কি মনে করবে? যা পেয়েছি তার চেয়ে অনেক বেশী কল্পনা করে মনে কষ্ট পাবে।'

'তা ঠিক।...শোন, তাহলে বলি, এ আর তোর নিয়ে কাজ নেই। আমি বাক্যদত্ত, দিতে বাধ্য, তাই দিলুম। তোর ঠাকুমার খুব শখ ছিল, কাশীতে এতদিন বাস করে গেল—পাঁচজনকে দিতে দেখেছে তো—একটা অধ্যাপক বিদেয় দেয়। এককালে কাশীতে খুব চল ছিল, এখন তেমন অধ্যাপকই বা কোথায়, এককালে মহামহোপাধ্যায়ের গুষ্টি ছিল এখানে—আর দেনেওলাই বা কোথায়। সে যাক গে, ও যদ্দিন এসেছে অনায়াসে দিতে পারত, তখন এত খবরও ছিল না, আমিও এসে দেখেছি, তেমন তেমন গরীব লোক নতুন মাটির সরাতে দুটো সন্দেশ, পৈতে, সুপুরি আর দুআনি কি সিকি দিয়ে পণ্ডিত বিদেয় দিয়েছে, তাবড় তাবড় পণ্ডিতরা হাসিমুখে নিয়ে গেছেন। এটা তো পাওনার হিসেবে ধরতেন না পণ্ডিতরা, সম্মান একটা—নেওয়া তাঁদের কর্তব্য এই মনে করতেন।...তা প্রাণ ধরে এসব সঞ্চয় হাতছাড়া করতে পারে নি তো, মুখে খাবার ভয়ে নাতিদেরও বলতে পারে নি—হাতের টাকা খোয়াতে পারে নি, বলে—কদিন এখনও বাঁচব তার ঠিক কি, এই তো মাত্তর সম্বল। নাতিরা কিছু কিছু দিচ্ছে সত্যি কথা, যা দিনকাল পড়েছে, যদি না দেয়, না দিতে পারে? শেষে কি সত্যিই অন্নপূর্ণার গলিতে কাপড় বিছিয়ে বসব?... অবিশ্যি কেউ কিছু না দিলে এতেই বা কদিন যেত, আমার মতো পেরমাই হলে?... সে যাক গে, তোর যদি এতে তেমন লোভ না থাকে তো হারছড়াটা বেচে একটা অধ্যাপক বিদেয় দিয়ে যা এই বাড়িতে: তার আত্মার তৃপ্তি হোক। নইলে, হয়ত ঐ জন্যেই আবার জন্ম নিতে হবে।'

'তদ্দিনে এসব পণ্ডিত বিদেয়ের পাট উঠে যাবে, ভয় নেই।' আমি হেসে বলি, 'তা নয়। আমি অনায়াসে এর ক্লেম ছেড়ে দিতে রাজী আছি, কিন্তু এতে কি কুলোবে?'

'খুব কুলোবে। অতও লাগবে না। হারছড়াটা বেচলে নিদেন হাজার টাকা উঠবে। একশ আটটি পণ্ডিতকে বিদেয় দে, বড় পেতলের সরা কি কাঁসার রেকাবীতে চারটে মিষ্টি, পাঁচসিকে করে দক্ষিণে, পৈতে, আর একটা কোন ফল—নিষ্ফলা দান দিতে নেই—কত আর পড়বে? বরং ঐ সঙ্গে দ্বাদশটি ব্রাহ্মণ খাইয়ে, পণ্ডিত বিদেয়ের পর খাওয়াতে হয় অনেকে বলে, যা থাকবে কাঙ্গাল দুঃখী খাইয়ে দিয়ে যা। ওর বুকের ধন বুক দিয়ে আগলানো সোনা, ওর আর কিছু নিয়ে কাজ নেই।'

সেই কারণেই বেশ কটা দিন থেকে যেতে হল সে যাত্রায়। ও'র কাছেই রইলুম। কিছু খরচ দেবার প্রস্তাব করতে কান মলে দিয়েছিলেন (বুড়ির হাতে তখনও যথেষ্ট জোর), তাই সে কথা আর তুলি নি। সুখেই ছিলুম, সুখে এবং নিঃসঙ্কোচে। ফেরার সময়, বলতে গেলে ওবাড়ির সম্পর্ক চুকিয়ে আসতে বরং একটা বেদনাবোধই হতে লাগল—এই নিঃসঙ্গ অনাত্মীয় বৃদ্ধার জন্যে।

আসবার আগের দিন হঠাৎ এক কাণ্ড করে বসলেন হেমন্ত মা।

ও'র যে আবার এসবও আসত, একটু লেখার অভ্যাসও ছিল তা কোনদিন জানতুম না, কল্পনাও করিনি। খান চারেক বাঁধানো খাতা আমার সামনে ফেলে দিয়ে বললেন, 'তোর সঙ্গে তো অনেক প্রকাশকের খাতির আছে, সে না ছাপিয়ে, পারিস তো!'

আমি অবাক হয়ে চেয়ে আছি দেখে হেসে বললেন, 'কী ভাবছিস? বুড়ি বুড়ি পদ্য আছে এতে? ভয় নেই, পদ্যটদ্য নয়। আত্মজীবনী। পদ্য হলে ছাপাবার কথা বলতুম না। অনেকদিন ধরে লিখেছি একটু একটু করে। প্রথম পাতাটা দুতিনবার করে লিখেছি। নিতান্ত মন্দ হয় নি, ফেলে দেবার মতো নয়। পড়ে দেখিস। তোর যা তাড়াতাড়ি পড়া—কতক্ষণই বা লাগবে?'

তারপর একটু থেমে কেমন একরকমের চোখ মটকে বললেন, ভাবছিস ওর আবার জীবন তার আবার আত্মজীবনী। কার এত গরজ আছে ছাপালে পড়বে? ...তাই না? ওরে, লেখার মতো না হলে লিখতুম না। ছাপাতেই বা বলব কেন তাহলে, আমি কি পাগল না ছন্ন! লিখেও তো এতকাল ফেলে রেখেছি। ভেবে দেখেছি, ছাপালে নবেলের

মতোই লাগবে।...তোরা কী ছাই পাঁশ নবেল লিখিস—ভগবান যা লেখেন তা তোরা ভাবতেও পারবি না। নবেলের মতো যদি না লাগে তো জলে ফেলে দিস। দেখিস, অমন তোফা তোফা নবেলকে হার মানিয়ে দেবে।'...

মুখের ওপর 'না' বলতে পারি নি। বয়সুই পেঁীছয়ে গেছে, বৃদ্ধার, এখনও সাহিত্যিক যশের আশা রাখেন—নতুন কীর্তির কথা চিন্তা করছেন।...হাসি পেলেও সামনে হাসতে পারিনি। ওঁকে শুধু ভক্তি নয়, এতদিনে বোধহয় একটু ভালও বেসে ফেলেছিলুম। ওঁকে কোন রকম আঘাত দেওয়া সম্ভব নয়।

সুতরাং— খাতাগুলো পড়ে দেখব বলে নিয়েই আসতে হয়েছিল। এখানে এনেও ফেলে দিতে পারিনি। যা মানুষ, কোনদিন [illegible] চেয়ে বসবেন হয়ত, না পেলে অনর্থ করবেন। অবশ্য আত্মজীবনী—পড়ে শুধু শুধু সময় নষ্ট করা। সকলেই মনে করে তার জীবনের মতো এমন জীবন আর কারও নয়। উপন্যাস লেখবার মতো। লেখক মাত্রেই জানেন, কত লোকের কাছ থেকে কত প্রস্তাব আসে—তাদের জীবন বা জীবনের ঘটনা নিয়ে উপন্যাস লেখার জন্যে। সকলেই বলে— 'এ গল্প লিখলে আপনার অন্য লেখাকে হার মানিয়ে দেবে। ম্লান হয়ে যাবে অন্য সব বই।' এও মিস্টার তা-ই। তার বেশী আর কি আশা করা যায়?......

খাতাগুলো বাড়ি ফিরে এসে সুটকেস থেকে বার করে একটা তাকে ফেলে রেখে-ছিলুম—কিছু স্বল্প-ব্যবহার্য বই-খাতার সঙ্গে। যা হামেশা হরবখৎ দরকার হয় না, অথচ কোন সুদূর ভবিষ্যতে দরকার হতে পারে এই আশঙ্কায় ফেলে দেওয়াও যায় না—এমন কাছু না কিছু পুস্তক জাতীয় জিনিস [illegible] বাড়িতেই থাকে। তারমধ্যে বাল্যকালে [illegible]ড়া দু-একখানা স্কুলপাঠ্য বইও খুঁজে [প]াওয়া যাবে হয়ত।

এমনি একটা জায়গাতেই পড়েছিল [খা]তাগুলো। হঠাৎ সেদিন পুজোর আগে [সাং]সারিক ঝাড়া মোছা করতে গিয়ে দেখি সেখানে উই লেগেছে। গত বছর এমনি [সম]য় একবার সাফ করে গুছিয়ে রেখেছি, [তখ]ন দেখা হয়নি অবশ্য। তবে এ উই লাগা [বেশ]ীদিনের নয়। এই কীটগুলির কর্ম [illegible] যাঁরা লক্ষ্য করেছেন তাঁরাই জানেন [illegible] একদিনে এদের [illegible] কাজ [illegible] [illegible] যায় এরা, [illegible] অধিগত [illegible]। এক [illegible] নষ্ট করতে এদের [illegible]ই যথেষ্ট।

সৌভাগ্যক্রমে [illegible] পারেনি [illegible]। [illegible] দিন [illegible] [illegible] [illegible]। [illegible] আর [illegible] [illegible] [illegible]। [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] না, [illegible]। [illegible] [illegible] —[illegible] [illegible]নি। এক নম্বর খাতাটা তো ঠিকই আছে প্রায়। পরেরগুলোই কিছু জখম করেছে। অনেকগুলো গর্ত হয়েছে মাঝখানে মাঝখানে, প্রথম থেকে শেষ পৃষ্ঠা, এ খাতা থেকে ও খাতা সোজা চলে গেছে। কোথাও আবার অজ্ঞাত কারণেই মাঝামাঝি গর্তটা বিস্তৃততর হয়েছে। ফলে বহু লেখাই আর পড়া যায় না।

খাতাগুলো দেখেই মনে পড়েছিল হেমন্ত মার কথা। একটু ভয়ও হয়েছিল। আরও কতকটা সেই জন্যেই নিভাকে চিঠি লিখেছিলুম।

কিন্তু ইতিমধ্যে, নিভার জবাব আসার আগেই আর একটা ঘটনা ঘটে গেল। তাক পরিষ্কার করে ডি ডি টি পাউডার ছড়িয়ে দুদিন খালি ফেলে রেখেছিলুম। তারপর আবার উইভুক্তাবশিষ্ট বইখাতাগুলো গুছিয়ে রাখতে গিয়ে—অলস কৌতূহলে একবার উলটে দেখেছিলুম খাতাগুলো। গুলো বলতে প্রথম খাতাটাই। দেখে কিন্তু চমকে উঠেছিলুম। ভাল করে পড়েছিলুম আবার। তারপর অন্যগুলোও, অবশ্য যতটা পড়া যায়।

'না, রচনার জন্যে নয়। ভাষার জন্যে তো নয়ই—টানটা কাহিনীরই। ঠিকই বলে-ছিলেন মহিলা, বিধাতার লেখা গল্পের কাছে মানুষের লেখা গল্প কিছু না। মানুষ লেখকের সাধ্য নেই বিধাতার কল্পনার ধারে কাছে পেঁছয়। আর গল্প-উপন্যাসের মুখ্য বস্তুই তো কাহিনী। সে সব আধুনিক লেখকরা—সব দেশেই—গল্প-উপন্যাস লিখতে বসে কাহিনীকে পরিহার করে চলেন। তাঁরা কাহিনী বানাতে পারেন না বলেই করেন। সেটা তাঁদের অক্ষমতা। অক্ষমতাকে ইচ্ছাকৃত বাহাদুরী বলে জাহির করাই হল বর্তমান কালের প্রচার-কৌশল। কী রাজনীতি কী সাহিত্য-শিল্প সর্বত্রই এই গোয়েবলস নীতির জয় জয়কার।

নিভার চিঠিতে হেমন্তমার মৃত্যু সংবাদ পাবার পর প্রথমে ভেবেছিলুম খাতাগুলো গঙ্গায় দেব। কিন্তু তা পারিনি।

এমনিই তো একটু অনুতাপ বোধ হচ্ছিল। ভদ্রমহিলা যখন অত জোর দিয়ে বলেছিলেন, 'পড়ে দেখিস, একেবারে মন্দ হয় নি।' নিশ্চয়ই তখন আশা করেছিলেন, যে, আমি পড়ে একটু প্রশংসা করব। অত বড় মানুষটা মুখ ফুটে ঠিক বলতে পারেন নি। 'তোর মতামত জানাস'—স্বভাবতই সংকোচে বেধেছিল। এতদিন কেটে গেছে তারপর, আট-ন বছর। আমার দিক থেকে ও প্রসঙ্গের উল্লেখ মাত্রও হয়নি। অবশ্যই ক্ষুণ্ণ হয়েছেন মনে মনে। পছন্দ হয়নি সে একটা আঘাত। লেখক বিশেষ নতুন লেখকের পক্ষে সেটাও বড় কম নয়। কিন্তু এত কষ্টের এত যত্নের জিনিস আমি উলটেও দেখিনি। অবহেলায় উপেক্ষায়, হয়ত বা কৌতুক মিশ্রিত অনুকম্পায় এক-পাশে ফেলে রেখেছি কি ফেলেই দিয়েছি—মনে করে থাকলে আরও বেশী আঘাত পেয়েছেন। হয়ত হাসাহাসি করেছি তাঁর এই প্রচেষ্টা নিয়ে। নিজেদের মধ্যে ঠাট্টাতামাশা করেছি— এ মনে করাও বিচিত্র নয়। মানব চরিত্রে তাঁর যা অসাধারণ জ্ঞান—এইটেই আগে মনে হওয়া স্বাভাবিক—ফলে খুবই কষ্ট পেয়েছেন নিশ্চয়।

আচ্ছা, এটাই ছাপিয়ে দিলে কি হয়? তবু কিছুটা প্রায়শ্চিত্ত হতে পারে আমার এই অবহেলা-অপরাধের।

যদি স্বর্গ থেকে এ মর্তের সংবাদ পাওয়া সম্ভব হয়—তিনি তৃপ্ত হবেন। আমার মঙ্গল কামনা করবেন।......

এই ভেবেই আবার খাতাগুলো নিয়ে বসেছি। প্রথম খাতাটা ঠিকই আছে, একটু-আধটু বানান ভুল, দু-একটা শব্দের অপ-প্রয়োগ, দু-এক জায়গায় গুরু চণ্ডালী দোষ—সেগুলো শুধরে দিলেই চলবে। অন্য খাতাগুলোতে অত অল্পে কিছু করা যাবে না। অধিকাংশ জায়গাতেই কয়েক পৃষ্ঠা করে একেবারে নষ্ট হয়ে গেছে। সেখানে কল্পনার সাহায্য নেওয়া ছাড়া নতুন করে লিখতে হবে। ঐতিহাসিকরা যেমন করে শিলালিপির নষ্টাংশের পাঠোদ্ধার করেন। সম্ভাব্য শব্দ বসিয়ে—ইংরেজীতে যাকে re-construct করা বলে—পুনর্সম্বন্ধ করা—তাই করতে হবে।

করব তাই? দোষ কি?

মন স্থির করার পর আর দেরি করিনি। কাগজ-কলম নিয়ে বসে গেছি।

তবে লিখতেই যখন হচ্ছে নতুন করে তখন আর লেখিকার ভাষা দিই কেন, তাঁর জবানীই বা ব্যবহার করার প্রয়োজন কি?—এই কথাটাই মনে এসেছে। প্রয়োজন তো নেই-ই বরং অসুবিধা আছে। কল্পনায় যে অংশটুকু ভরাট করা চলে, আত্মকাহিনীর ভঙ্গীতে লিখলে হাত-পা বাঁধা হয়ে থাকতে হবে। অনেক কৈফিয়ৎ, অনেক জবাবদিহির মধ্যে পড়তে হবে। তার চেয়ে সোজাসুজি উপন্যাসের ভঙ্গীতে লিখে যাওয়াই ভাল। আমি যখন স্বীকারই করছি এর অন্তত দ আনা অংশ কল্পনা—তখন আর আপত্তি কি?

তবে—প্রথম খাতাটা যখন প্রায় ঠিকই আছে, সেটা এমনিই ছেপে দিচ্ছি। ভদ্রমহিলা কষ্ট করে লিখেছিলেন, বারবার সংশোধন পরিবর্তন করেছেন। তাঁর ভাষা তাঁর জবানীতে পাঠকরা পড়লে তাঁর আত্মা তৃপ্তি পাবে। আমাকে কিছুটা অদলবদল করতে হয়েছে, বর্তমান পাঠকদের বোধগম্য করতে—তবু বেশীটা তাঁরই।

একই বইতে দুরকম ভাষা হবে? তা হোক না। বর্তমানে কোন কোন বহুল প্রচারিত বাংলা দৈনিকপত্রেও তো একই সঙ্গে দুরকম ভাষা চলছে। তাতে যদি কোন দোষ না হয়, যদি পাঠকদের বুঝতে পড়তে অসুবিধা না হয় তো বইতেই বা হবে কেন?

নতুন করে লেখার জন্যে, বিশেষ—কল্পনার আশ্রয় নিতে হচ্ছে বলে, নিশ্চয় কোথাও কোথাও সত্যের অপলাপ ঘটছে। তা হোক, আমি জানি—হেমন্তমার যে চরিত্রের ঔদার্য এবং দৃষ্টিভঙ্গীর প্রসারতা ছিল, তিনি এতে ক্ষুণ্ণ হবেন না। বেঁচে থাকলেও হতেন না। (ক্রমশঃ)

খেলোভোল্ট মাছের পৃথক পৃথক ডেরা

বিজ্ঞানের কথা

মাছের গতিবিধি থেকে মহাদেশের ভেসে বেড়ানোর হদিশ

বিজ্ঞানের কথার পাঠকরা জানেন, পৃথিবীর উপরিতলের মহাদেশগুলো রয়েছে ভাসমান অবস্থায়। বরফ যেমন সমুদ্রে ভাসে তেমনি মহাদেশগুলো ভাসছে ম্যাগমা সমুদ্রের ওপরে। পৃথিবীর বাইরের দিকের খোলসটিকে বলা হয় ভূত্বক বা ক্রাস্ট। তার নিচের স্তরে ম্যাগমা। ভাসমান অবস্থায় রয়েছে বলেই মহাদেশগুলো এক জায়গায় স্থির নয়, নড়াচড়া করে থাকে। তবে এতই সামান্য মাত্রায় যে চোখে পড়ে না। সারা বছরে চার সেন্টিমিটারের বেশি নয়। কিন্তু এই সমান্য মাত্রার নড়াচড়াও যদি কোটি কোটি বছর ধরে চলে তাহলে নড়াচড়ার মাত্রাটি আর সামান্য থাকার কথা নয়। এ-কারণে মহাদেশগুলোকে এখন আমরা যেখানে যেটিকে দেখছি সেখানেই সেটি বরাবরের মতো আছে, এমন ধরে নেওয়াটা ভুল হবে। এমনকি ঠিক এখনকার আকারেই যে বরাবর থেকেছে তাও নয়। ভাঙচুর হয়েছে বেশ বড়ো রকমেরই। লক্ষণ দেখে মনে হয়, একালের এই মহাদেশগুলো এককালের অখণ্ড একটি মহাদেশের টুকরো টুকরো অংশ মাত্র। অর্থাৎ মহাদেশগুলোর উপকূল-রেখার গড়নই এমন যে একটির সংগে অপরটি জুড়ে দেওয়া চলে। বেমালুম জুড়ে যাচ্ছে তা নয়, অনেকটাই। কোথাও আবার বিসদৃশ রকমের ফাঁক, মনে হয় দুয়ের মাঝখানে বড়ো রকমের একটা টুকরো একেবারে বেপাত্তা। এ-সমস্ত কারণে মহাদেশগুলোর ভেসে-বেড়ানো এবং টুকরো টাকরা হয়ে যাওয়ার ব্যাপারটি বিজ্ঞানীদের কাছে একটি বড়ো গবেষণার বিষয় হয়ে উঠেছে। সম্ভাব্য সমস্ত রকমের উপায়ের সাহায্য নিয়ে তাঁরা এ বিষয়ে খবর সংগ্রহ করছেন। কাজটি সহজ নয়। পৃথিবীর বয়স মোটামুটি ৫০০ কোটি বছর। প্রথম দু-শো কোটি বছর কেটেছে ভূত্বকটি তৈরি হতে। তারপরেও পৃথক পৃথক ভাবে মহাদেশ ও সমুদ্র তৈরি হতে আরো বেশ কিছুটা সময়। মোটামুটি ধরে নেওয়া চলে পৃথিবীর অস্তিত্বকালের শেষার্ধে ভূত্বকের চেহারায় মহাদেশ ও সমুদ্রকে চিনে যাওয়া যাচ্ছে। কিন্তু এই চেহারাটিও স্থায়ী নয়। অনবরত বদলেছে। মহাদেশ ও সমুদ্রের পারস্পরিক অবস্থান যেভাবে বদলেছে তাকে এককথায় বলা চলে বিপুল। বিজ্ঞানীদের চেষ্টা, অতীতে কী ঘটেছিল তার খবরগুলো নানা নিদর্শন থেকে সংগ্রহ করে পুরো একটি চেহারা দাঁড় করানো। এজন্যে তাঁরা বিশেষ করে নির্ভর করেছেন শিলার গড়ন ও প্রকৃতি এবং শিলার মধ্যে থেকে পাওয়া জীবাশ্মের ওপরে। এই শেষোক্ত ক্ষেত্রেই বিজ্ঞানীদের হাতে সমুদ্রের মাছও সংবাদের উৎস। এ-বিষয়ে একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে ব্রিটিশ বিজ্ঞান সংবাদ 'স্পেকট্রাম'-এ (১৯৭০ সালের ৭৯নং)। এই প্রবন্ধের বক্তব্য সংক্ষেপে উপস্থিত করতে চাই। সঙ্গের ছবিও 'স্পেকট্রাম' থেকে নেওয়া।

মহীসঞ্চরণ

মহাদেশের ভেসে বেড়ানোকে ইংরেজিতে বলা হয় 'কণ্টিনেন্টাল ড্রিফ্ট', বাংলা বৈজ্ঞানিক পরিভাষায় 'মহীসঞ্চরণ'। এই সঞ্চরণের ফলে মহাদেশের আস্তরটি যেদিকে ভেসে চলেছে সে-দিকের প্রান্তে চাপ সৃষ্টি হয়, ভূত্বকের পলল-স্তরকে ধনুকের মতো বাঁকিয়ে তোলে, ভূত্বকে ভাঁজ পড়ার মতো অবস্থা সৃষ্টি হয়। এই ভাঁজ পড়ার ফলেই পর্বতমালার সৃষ্টি। কিন্তু কোনো পর্বতই চিরকাল থাকবার নয়, অতি ধীরে ধীরে হলেও পর্বতের ক্ষয় হতে থাকে এবং এক সময়ে হিমালয়ের মতো পর্বতও সমতল হয়ে যায়। আবার মহাদেশের টুকরোগুলো আলাদা আলাদা হয়ে যাবার সময়ে মহা-সমুদ্রের তলদেশে গভীর ফাটল ও খাদ সৃষ্টি করে থাকে। এই ঘটনাগুলোর মূলে শক্তির যোগান আসে সম্ভবত পৃথিবীর আভ্যন্তরীণ তেজস্ক্রিয়তা থেকে কিংবা

পরিবহমান বিদ্যুৎ-তরঙ্গ থেকে। ফলে পৃথিবীর উপরিতলের কোনো অংশ ঠেলে ওপরে ওঠে, কোনো কোনো অংশ নিচে নেমে যায়। তার চিহ্ন চোখে পড়ে উপত্যকায়, মাঝ-সমুদ্রের গিরিশ্রেণীতে, সক্রিয় আগ্নেয়গিরিতে এবং ভূত্বকের দুর্বল এলাকা বরাবর সৃষ্ট ভূমিকম্পের বলয়ে। যে এলাকায় এই প্রকাণ্ড ভাঙাগড়ার ব্যাপারগুলো লক্ষ লক্ষ বছর ধরে চলবার পরে একটি চক্র সম্পূর্ণ করে তাকে বলা হয় গিরিজনি।

এমনি একটি এলাকার নাম অ্যাপেলাশীয়কালেডোনীয় গিরিজনি। পৃথিবীর বয়সের কালক্রমে যে-সময়টিকে বলা হয় অর্ডোভিসীয় (আজ থেকে ৫০ কোটি বছর আগে) এবং যে-সময়টিকে বলা হয় ডেভোনীয় (আজ থেকে ৩৫ কোটি বছর আগে)—এই দুই সময়ের মধ্যে চক্রটি এখানে সম্পূর্ণ হয়েছিল। আর ঠিক এই সময়েই আমাদের পূর্বপুরুষ প্রথম মেরুদণ্ডী প্রাণীর উদ্ভব। সে-সময়ে যদি কোনো একটি উপগ্রহ থেকে উত্তর গোলার্ধের দিকে আমরা তাকিয়ে দেখতে পারতাম তাহলে বর্তমানের সঙ্গে কিছুটা সাদৃশ্য চোখে পড়তে পারত। এখন যেমন ইউরোপ ও আমেরিকাকে বিচ্ছিন্ন করে রেখেছে আটলাণ্টিক মহাসাগর, তখনো তেমনি চোখে পড়ত দুটি মহাদেশের মাঝখানে বৃহৎ একটি সমুদ্র। অর্ডোভিসীয় কালের সেই সমুদ্রটি কিন্তু ক্রমেই ছোট হচ্ছিল, কেননা মহাদেশ দুটি ক্রমেই কাছে এগিয়ে আসছিল। ফলে সমুদ্রের তলদেশও সংকুচিত হচ্ছিল। এই খবরগুলো পাওয়া গিয়েছে স্কটল্যাণ্ড, ওয়েলস ও পূর্ব আমেরিকার শিলাখণ্ড থেকে। কিন্তু এই খবরগুলোই—কী ঘটেছিল, কখন ঘটেছিল, উপকূল-রেখার অবস্থান ও তদনুবর্তী মহাদেশের গড়ন—আরও বিস্তৃতভাবে পাওয়া যেতে পারে সে-সময়কার মেরুদণ্ডী প্রাণীদের ফসিল থেকে। এই মেরুদণ্ডী প্রাণীরা হচ্ছে একধরনের চোয়ালবিহীন মাছ।

সমুদ্রের কোন এলাকায় কোন প্রাণী থাকে তা যেমন নির্ভর করে সেই প্রাণীর শারীরিক ও স্বভাবের ওপরে, তেমনি আরো নির্ভর করে উত্তাপ, তরঙ্গের বিন্যাস ও ভৌগোলিক বাধার ওপরে। যে-সব প্রাণী উপকূলের কাছাকাছি এলাকায় থাকে কিংবা কন্‌টিনেন্‌টাল শেলফ বা মহী-সোপানের জলে, তারা নিশ্চয়ই মহাদেশের আকার সম্পর্কে একটা ধারণা দিতে পারে।

এ ক্ষেত্রে দেখার বিষয়—এই প্রাণী-গুলোকে, আরও সঠিকভাবে বলতে হলে তাদের ফসিলগুলোকে ঠিক কি-ভাবে পাওয়া যাচ্ছে। এ থেকে প্রাণিকুলের নির্দিষ্ট ডেরাগুলোকে চিহ্নিত করা যেতে পারে। 'নির্দিষ্ট' এই অর্থে যে কিছু কিছু বাধা থাকার দরুন এক ডেরার সঙ্গে অপর ডেরার যোগাযোগ সামান্যই। প্রাণীগুলো যদি প্লাংকটন-জাতীয় হয়, অর্থাৎ সমুদ্রের জলে ভেসে ভেসে বেড়ায় তাহলেও কিন্তু গোটা বিশ্বে ছড়িয়ে পড়তে পারে না, উত্তাপের বিভিন্নতা এ ক্ষেত্রে বাধা হয়ে দাঁড়ায়। আবার সমুদ্রের তলদেশে যে-সব প্রাণীর ডেরা সেখানে বাধা হয়ে দাঁড়ায় জলের গভীরতা বা অ-গভীরতা, বা এমনকি জমিও।

সে-সময়ের প্রথম মেরুদণ্ডী প্রাণী হিসেবে যে চোয়ালবিহীন মাছের কথা ওপরে বলা হয়েছে তাদের ডেরাগুলোর অবস্থান বিচার করলে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে পড়ার পক্ষে বাধাগুলো সম্পর্কে ধারণা হতে পারে।

চোয়ালবিহীন এই মাছগুলোকে বলা হয় 'থেলোডোন্ট', লম্বায় প্রায় ২০ সেন্টি-মিটার। এই মাছের সারা গা আঁশে ঢাকা, স্তন্যপায়ীদের দাঁতের সঙ্গে যা তুলনীয়। ওপরের নিচের ও পিছনের পাখনা দেখে বোঝা যায় যে এরা ভালোই সাঁতার দিতে পারত। গোটা মাছটিকে ফসিল হিসেবে পাওয়া খুবই শক্ত, কিন্তু এই মাছের নিদর্শন হিসেবে বিভিন্ন এলাকার সিলিউরীয় ও ডেভোনীয় শিলাস্তর থেকে (৪২ থেকে ৩৯ কোটি বছর আগে) প্রচুর পরিমাণ আঁশ পাওয়া গিয়েছে। এদের উদ্ভব অর্ডোভিসীয় কালে এবং তারপর থেকেই দুই মহাদেশের উপকূল বরাবর ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়তে শুরু করেছিল। কিন্তু সিলিউরীয় স্তর থেকে পাওয়া আঁশ থেকে বোঝা যায়, এক্ষেত্রে সমুদ্রই হয়ে উঠেছিল বাধা এবং তার ফলে তিনটি পৃথক ডেরার সৃষ্টি।

এই সঙ্গে যে মানচিত্রটি দেওয়া হল তাতে অন্য অনেক বিষয়ের সঙ্গে থেলো-ডোণ্ট মাছের এই তিনটি পৃথক ডেরাও দেখানো হয়েছে (ইংরেজী 'এল' 'টি' ও 'এস' অক্ষরে চিহ্নিত)।

এই ডেরাগুলোর বিন্যাস থেকে এবং কোন ডেরায় কী ধরনের মাছের সমাবেশ ঘটেছে তা থেকে বিজ্ঞানীরা মহাসিন্ধুর সম্পর্কে অনেক খবরই জানতে পারেন।

কুমেরু অঞ্চল : মহাকাশ থেকে দেখা

উপরোক্ত বিষয়ে সোভিয়েত বিজ্ঞানী এম রাভিচের লেখা একটি প্রবন্ধ আমাদের হাতে এসেছে এবং এই প্রসঙ্গে উপস্থিত করা যেতে পারে। এম রাভিচ হচ্ছেন কুমেরু অঞ্চলের ভূবিদ্যা সংক্রান্ত গবেষণা ইনস্টিটিউটের সহকারী পরিচালক। প্রবন্ধের কিছুটা অংশ নিচে তুলে দিচ্ছি। সম্পূর্ণ প্রবন্ধটি বাংলায় প্রচারিত সোভিয়েত সংবাদ বুলেটিনের ষষ্ঠ বর্ষ ৪৭ সংখ্যায় প্রকাশিত।

অনেক বৈজ্ঞানিকের ধারণা যে কুমেরু অঞ্চল ছিল অবিচ্ছিন্ন বিশাল মহাদেশ গণ্ডোয়ানার মূল অংশ। আধুনিক দক্ষিণ আমেরিকা, আফ্রিকা ও অস্ট্রেলিয়ার উপ-কূলরেখায় অদ্ভুত সাদৃশ্য লক্ষ্য করেই বিশেষ করে ভৌগোলিক ভূতত্ত্ববিদেরা এই সিদ্ধান্তে এসেছিলেন। মানচিত্রের এই অঞ্চলগুলিকে যদি মানচিত্রের উপর স্থানান্তরিত করা যায় তাহলে দেখা যাবে যে, এই শক্ত জমির এলাকাগুলি কুমেরুর উপকূলরেখার সঙ্গে খাপে-খাপে মিলে যাচ্ছে। প্রায় ২০ কোটি বছর আগে গণ্ডোয়ানা বিভক্ত হয়ে বিভিন্ন দিকে ছড়িয়ে পড়ে। সেই ভেসে বেড়ানোর গতিবেগ তখন ছিল বছরে ৪ সেন্টিমিটার।

সম্ভবত উত্তর আমেরিকা, ইউরোপ ও এশিয়াকে নিয়ে একদিন আর একটি বিশাল মহাদেশ গঠিত ছিল যার নাম লাউরাশিয়া। তাই ছিল কি? এখনও কি বিজ্ঞানীরা বিশ্বাস করেন যে, মহাদেশগুলি ভেসে বেড়াচ্ছে?

ভৌগোলিক ও ভূতত্ত্ববিদদের হাতে যে সমস্ত উপায় ও পদ্ধতি রয়েছে তা দিয়ে এই তথ্যকে সুনির্দিষ্টভাবে প্রমাণ করা কঠিন। এর সঠিক উত্তর দিতে পারে একমাত্র 'মহাকাশ-ভূবিদ্যা'। দীর্ঘস্থায়ী মহাকাশ স্টেশন এবং স্পুৎনিক থেকে এই গ্রহের পর্যালোচনার মধ্য দিয়েই একমাত্র এর সঠিক উত্তর পাওয়া যাবে। বহু বছরের তাদের পর্যবেক্ষণ মহাদেশগুলির অব-স্থানের নির্ভুল পরিমাপ করতে, তাদের বর্তমান ও প্রাচীন উপকূলরেখা নির্ধারণ করতে এবং মহাদেশগুলির বিচরণের গতি-বেগ নির্ধারণ করতে সাহায্য করতে পারে।

এর দ্বারা কেবল যে এই গ্রহের ভৌগোলিক অতীতকেই জানা যাবে তা নয়, এর খনিজ পদার্থের মজুদ পরিমাণের একটা পূর্বাভাসও তৈরী করা যাবে।

খোলোডোন্ট মাছ

মহাকাশ স্টেশন থেকে 'ল্যাসের' পর্যবেক্ষণ যদি প্রমাণ করে গণ্ডোয়ানার অস্তিত্ব, তাহলে দক্ষিণ আফ্রিকার যে অঞ্চলে হীরক পাওয়া যায় সেই অঞ্চলের সঙ্গে কুমেরু অঞ্চলের সাদৃশ্য সম্পর্কে ভূতত্ত্ববিদেরা অনেকখানি নিশ্চিতভাবে কথা বলতে পারবেন।

স্বভাবতই যদি বলি যে, 'মহাকাশ ভূতত্ত্ব' বলে দিতে পারে ঠিক কোন জায়গায় খনি গড়ে তুলতে হবে, কোথায় ঠিক খুঁড়তে হবে তাহলে ব্যাপারটাকে একটু বেশী সহজ করে বলা হয়। ভূতাত্ত্বিকের দলকে তন্ন-তন্ন করে অনুসন্ধানের কাজ করতেই হবে। কিন্তু তবুও অনুসন্ধানের সংগঠনের কাজের খরচ কমবে বিপুলভাবে একথা বলা যায়। এবং মহাকাশকর্মীদের নির্দেশিত স্থানে অনুসন্ধানের কাজ চালালে নিঃসন্দেহে ফল পাওয়া যাবেই একথা বলা যায়।

আলোকচিত্র গ্রহণে 'ল্যাসে'র পরীক্ষার দ্বারা আরও একটি ব্যাপার সম্পর্কে নিশ্চিত সিদ্ধান্তে আসা যাবে। পৃথিবীর মানচিত্রের দিকে তাকালে দেখা যাবে যে, সমস্ত অঞ্চল খনিজ সম্পদে সমৃদ্ধ যেগুলি সব দৈর্ঘ্য বরাবর অবস্থিত। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় যেমন : উরাল পর্বতশ্রেণী, ইয়েনিসেইস্ক ও ভেরখোয়ানস্ক পর্বতমালা। একই ব্যাপার লক্ষ্য করা যাবে দক্ষিণ গোলার্ধেও। এর অর্থ হচ্ছে এই যে, মেরু অঞ্চলে তাহলে খনিজ আকরের স্তরের ঘন সন্নিবেশ ঘটবে। এই ধারণা ঠিক কিনা সে সম্পর্কে সুনিশ্চিত হতে পারলে তা যে কতখানি গুরুত্বপূর্ণ হবে তা বলাই বাহুল্য।

মহাকাশ থেকে মেরু অঞ্চলের গবেষণা অন্যদিক থেকেই বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। কুমেরু অঞ্চলের আলোকচিত্র এমন সব অঞ্চলের চিত্র গ্রহণ করতে পারে যাতে গবেষকের সাহায্য হয় প্রচুর এবং সেসব অঞ্চলে মেরু অভিযাত্রীদের পক্ষে পৌঁছান দুঃসাধ্য। তা ছাড়াও মহাকাশ থেকে তোলা আলোকচিত্রের প্রত্যেকটি বিমান থেকে তোলা ছবির যে শতগুণে ভাল হবেই। মহাকাশ স্টেশন থেকে এক লক্ষ বর্গকিলোমিটার অঞ্চলের আলোকচিত্র গ্রহণ করা যায়।

আর একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হল মহাকাশ থেকে পর্যবেক্ষণের ফলে বরফাবৃত মহাদেশে শিলার অবস্থান নির্ণয় করা যায় এবং কম বরফাবৃত এলাকাগুলি নির্ধারণ সম্ভব হয়। মহাকাশভূতত্ত্ব বিজ্ঞানী ও মেরু অভিযাত্রীদের দ্রুত কুমেরু অঞ্চলের রহস্য উদ্ঘাটনে সাহায্য করবে।

ছড়ো আংলা থেকে

রামছাগল দাড়ি নেড়ে শিং বেঁকিয়ে কটমট করে তাদের দিকে তাকাচ্ছে দেখে সুবচনীর খোঁড়া হাঁস হেলতে-দুলতে এগিয়ে এসে বললে — 'ছাত্রগণ, তোমাদের মাস্টার যা বললেন, ঠিক, চোখে না দেখলে কোন জিনিসে বিশ্বাস করা শক্ত। কিন্তু এই পাহাড় পর্বত কুয়াশায় যখন দেখা যায় না, তখন কি বলতে হবে কুয়াশার মধ্যে কিছু নেই? না বলতে হবে, সূর্য চন্দ্র আকাশ ছেড়ে পালিয়েছেন। ঠিক জিনিস সব সময়ে চোখে পড়ে না, সেই জন্যে এই দুই চোখের উপরে নির্ভর করে থাকি বলে আমরা কোনোদিন মানুষের সমান হতে পারব না। মানুষের মধ্যে যাঁরা ঋষি, যাঁরা কবি, তাঁরা শুধু দুই চোখে দেখলেন না, তাঁরা ধ্যানের চোখে যা দেখতে পেয়েছেন সেইগুলো ধ্যান করে কেতাবে লিখেছেন, তা পড়লে তোমরা জানতে পারবে — এই হিমালয় প্রথমে সমুদ্রের তলায় ছিল। হঠাৎ এক সময় পৃথিবীর মধ্যেকার তেজ মহাবেগে জল ঠেলে আকাশের দিকে ছুটে বার হল আর তাতেই হল সব পর্বত! যে সময় পাহাড় হয়েছিল সে সময় কেউ দেখে নি কেমন করে কি হল, কিন্তু মানুষ ধ্যান করে অনুসন্ধান করে এই পাহাড়ের জন্ম যেন চোখে দেখে কেতাব লিখেছে।'

'মাস্টারমহাশয়ের কথায় কি কেতাবগুলো অবিশ্বাস করবে!' বলে খোঁড়া একটি সমুদ্রের শাঁখ পাহাড়ের উপর থেকে তুলে নিয়ে রামছাগলকে দেখিয়ে বললে— 'হিমালয় তো এককালে সমুদ্রের গর্ভে ছিল, এই শাঁখই তার প্রমাণ!'

বেতার-বিজ্ঞানী অরুণ বন্দ্যোপাধ্যায়

আকাশবাণীর মগরাস্থ উচ্চশক্তি ট্রান্সমিটারের ভারপ্রাপ্ত ডেপুটি চীফ ইঞ্জিনীয়ার বিশিষ্ট বেতার-বিজ্ঞানী শ্রীঅরুণকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায় গত ১৯ সেপ্টেম্বর আকস্মিক হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে পরলোকগমন করেছেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল মাত্র পঞ্চান্ন বছর।

অরুণকৃষ্ণ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন কৃতী ছাত্র ছিলেন। ১৯৩৮ সালে তিনি এম-এস-সি পরীক্ষায় বিশুদ্ধ পদার্থবিদ্যায় শীর্ষস্থান অধিকার করেন এবং বেতার-বিজ্ঞান বিষয়ে বিশেষ কৃতিত্ব প্রদর্শন করেন। এর পর প্রায় দু বছর কাল তিনি (পরলোকগত) জাতীয় অধ্যাপক ডঃ শিশিরকুমার মিত্রের অধীনে উচ্চ আয়নমণ্ডল ও বেতার সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ গবেষণা করেন। ১৯৩৯-৪০ সালে তিনি আকাশবাণীতে যোগদান করেন এবং ক্রমোন্নতি লাভ করে ডেপুটি চীফ ইঞ্জিনীয়ার পদে উন্নীত হন। সোভিয়েত রাশিয়ার সহযোগিতায় হুগলী জেলায় মগরায় আকাশবাণীর সর্বাপেক্ষা উচ্চশক্তিসম্পন্ন (এক হাজার মেগাওয়াট) ট্রান্সমিটারটি তাঁরই তত্ত্বাবধানে নির্মিত হয় এবং জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত তিনি এই বেতার কেন্দ্রের ভারপ্রাপ্ত ছিলেন। তিনি বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদের সদস্য এবং বাংলা ভাষায় বিজ্ঞান বিষয়ে একজন সুলেখক ছিলেন। তাঁর অকাল মৃত্যুতে বাংলা তথা ভারতের একজন বিশিষ্ট বেতার-বিজ্ঞানীর তিরোধান ঘটলো।

—অয়স্কান্ত

ডক্টর পল হার্স্ট

বীরেন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়

সকাল তখন আটটা হবে। চৌরঙ্গীর এক বিরাট অট্টালিকার গেটের ধারে, ধীরে ধীরে নিঃশব্দে একটা স্টেশন-ওয়াগন এগিয়ে এল। মোটর চালক টুপিটা একটু খুলে মাথায় সেটা আবার গুছিয়ে বসিয়ে নিলে। উপরদিকে তাকালো একবার, বৈদ্যুতিক হর্ণ টিপলো, তারপর গেটের দিকে আনমনে চেয়ে রইলো, যাত্রী আসার প্রতীক্ষায়।

প্রায় সেই সঙ্গেই চোদ্দ নম্বর ফ্ল্যাট থেকে [illegible] বেগে বেরিয়ে এলেন মিস এঞ্জেলা গ্রে। তার হাই হিল জুতোর শব্দ সারা অলিন্দে ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হয়ে স্বয়ংক্রিয় লিফটের দুয়ারে থামলো। মিস গ্রে নীচে নেমে এলেন। গাড়ীতে উঠতে যাবেন, এমন সময় বাধা।

ডাকপিওন এসে হাজির। মিস গ্রের [illegible] একখানা চিঠি। [illegible] দিয়ে তিনি [illegible] ভ্যানিটি ব্যাগের মধ্যে রাখলেন। উদ্দেশ্য পরে পড়বেন—সময় নেই এখন। অফিসের দেরী হয়ে যাবে। পত্র-প্রেরকের নাম—জন সান্ডারস, ১৪, ফ্যান্সি লেন, কলকাতা—১

প্রথম শীতের কুয়াশাচ্ছন্ন প্রভাতের অস্পষ্ট ম্লানিমা কাটিয়ে ঝলমলে রৌদ্রালোকের ঝরণা ধারা তখন গড়িয়ে নেমে এসেছে তার সোনালী রেশমী অলকের গুচ্ছে গুচ্ছে—নেমে এসেছে তার নীলাভ আঁখিতারায়, শুভ্রহংসী গ্রীবার এক পাশে, তার অধীর সুদৃপ্ত যৌবনের একাধার বেয়ে তা যেন লুটিয়ে পড়ছে সে মর্তের সুন্দরীকে পরম অভিবাদনে। ক্লান্ত বাতাসে তার সযত্নে রক্ষিত কেশদাম যেন চঞ্চল হয়ে উঠল; কয়েক গুচ্ছ তার শ্বেতশুভ্র কপোলে এঁকে বেঁকে জড়িয়ে রইল। কিন্তু তার ভ্রূক্ষেপ নেই সেদিকে। চিন্তাও নেই। গাড়ী তখন সশব্দে ছুটে চলেছে ময়দান পেরিয়ে অফিসের দিকে।

তিনি যে নিঃসংশয়ে অপরূপ সুন্দরী এবং তার সৌন্দর্যের মাধুরিমা যে সচরাচর চোখে পড়ে না—সে কথা তার অতিবড় শত্রুও স্বীকার করবে। সেই জন্যেই বোধহয় মনের কোন গোপন গহ্বরে তার ছিল এক গর্ব, এক অহঙ্কার যা দুষ্প্রাপ্য অলঙ্কারের মতই তিনি লুকিয়ে রেখেছিলেন সৌন্দর্যের আবরণে। বিংশতিবর্ষীয়া প্রাণোচ্ছলা যুবতী অনন্যসাধারণ রূপসী। তিনি দেখেছেন, জানেন, শুনেছেন সবার কাছে তার রূপের কথা। জেনে, শুনে, দেখেও যদি তিনি ঈষৎ অহঙ্কারগ্রস্ত হয়ে যান, তবে দোষ কোথায়? এতো তার স্বধর্মকে দোষ দেওয়া? এতো প্রকৃতির বিরুদ্ধে অভিযান? গুণও ছিল অনন্ত। তিনি ছিলেন অদ্ভুত সাঙ্কেতিক লিখনবিৎ ইংরেজীতে যাকে বলে স্টেনোগ্রাফার, তাঁর বেগে তিনি লিখে যেতেন দ্রুতোলখন এবং হাতের বেগে যা লিখেছেন তা আপন হরফে মুদ্রাক্ষরে যা ছাপাতেন তা সম্পূর্ণ নির্ভুল,

প্রতিহীন, বিচ্যুতিহীন। কোনদিন তার ওপরওয়ালার দ্বিতীয়বার কিছু দেখতে হয়নি। চোখ বুজেই সই করে দিয়েছেন। তাই তিনি অতি অল্পবয়সেই বিদেশী বাণিজ্য প্রতিষ্ঠানের ইংরেজ সর্বাধ্যক্ষের নজরে পড়লেন এবং যথাসময়ে তার প্রথম সহায়কের পদে উন্নীত হলেন, যার মাসিক বেতন ভাতাসমেত মিলে প্রায় দেড় হাজার টাকার ওপরে।

সারাদিন কাজের চাপে তার কোন কিছুই মনে পড়েনি। সম্পূর্ণ ভুলে গেছেন রেজিস্টারী চিঠির অস্তিত্ব, যা দ্বিধাহীনভাবে তার ভ্যানিটি ব্যাগের অন্ধকারে নরকগুলজার করছিল। অফিস থেকে ফেরার পথে হঠাৎ নজরে পড়ল সেই চিঠি। ঠিক করলেন, বাড়ীতে ফিরে বিশ্রাম নিয়ে সেই চিঠি পড়বেন।

তখন সন্ধ্যার সমাধির প্রায় শেষ ক্ষণকাল উপস্থিত। পরিচারিকা অনুরেখা তখন তার রাতের আহার প্রস্তুতে ব্যস্ত। মনে পড়ল তার চিঠির কথা। ব্যাগ খুললেন, চিঠি খুললেন। কিন্তু একি চিঠি?

প্রথমে সাদা খাম। সেটি খুললেন। ভিতরে শীলমোহর করা খাম। খামের পাশেই একটি চিঠি। পিন দিয়ে আটকানো। তাকেই উদ্দেশ্য করে সে চিঠি লেখা হয়েছে। প্রথমেই সেই চিঠি পড়লেন। অদ্ভুত রকমের চিঠি। পড়তে পড়তেই ভয়ে আতঙ্কে তার সর্বাঙ্গ কাঁপতে লাগল, গলা শুকিয়ে গেল, চোখ, মুখ বিবর্ণ হয়ে গেল, দৃষ্টি বিস্ফারিত হয়ে উঠলো, নিঃশ্বাস প্রশ্বাস যেন বন্ধ হয়ে গেল—এ চিঠিতে যেন নিহিত হয়ে আছে মৃত্যুদণ্ডের ভয়ঙ্কর আদেশ, জহ্লাদের শেষ মুহূর্তের জন্য উদ্যত শানিত খড়্গের নিষ্করুণ প্রস্তুতি—সর্বনাশার ডাক।

চিঠিটা হাতে লেখা, অথচ যেন হাতে লেখা নয়। এ চিঠিতে লেখকের হাতের লেখা যেন গোপন করবার আপ্রাণ চেষ্টা হয়েছে—টাইপের লেখার অনুকরণে। এটা যেন সোজাসুজি কাগজের ওপর বা চিঠির প্যাডের ওপর পেন্সিল বা কলমে লেখা নয়। চিঠির ওপরে কার্বন কাগজের মসীময় চিহ্ন। অর্থাৎ আসল লেখাটা ছিল ইংরেজী বড় অক্ষরে টাইপ করা। লেখক নিজের হস্তলিপি গোপন করেছেন সেই টাইপসুদ্ধ বা মুদ্রাক্ষরের তলায় কার্বন কাগজ রেখে এবং তার তলায় চিঠির কাগজ রেখে। তারপর ধীরে ধীরে টাইপ অক্ষরের ওপর দাগা বুলিয়ে গেছেন। এর উদ্দেশ্য দুই। প্রথমত নিজের হাতের লেখা ধরা পড়বে না। দ্বিতীয়ত যে টাইপরাইটিং যন্ত্রে তিনি চিঠিটা ছাপিয়েছিলেন, সাদা বুলানোর ফলে, মুদ্রিমের ব্যবহারের ফলে যে সব অদ্ভুত ভাঙাচোরা, অস্পষ্টতা, অভিন্নতা এবং একজনের চিহ্ন টাইপ মেসিনের যন্ত্রে দেখা যায়, তাও দেখা যাবে না। কাজেই কোন টাইপ মেসিন থেকে টাইপ করা হয়েছে তাও বোঝা যাবে না।

এসব কিন্তু মিস গ্রে দেখেননি, বোঝেননি, তাঁর চিন্তাশক্তি তখন সম্পূর্ণ বিলুপ্ত, সম্পূর্ণ বিধ্বস্ত হয়েছে। সেটা কিন্তু লক্ষ্য করেছে যে গোয়েন্দার দুটো চোখ যার ধ্যান-ধারণায় গোচরীভূত হয়েছে এক বিরাট ব্ল্যাকমেলের জটাজাল, যেটা মিস গ্রেকে জড়িয়ে ধরেছে।

চিঠিটা ইংরেজীতে লেখা। তাতে কি লেখা ছিল এখন তা জানাবার দরকার। বাংলায় তর্জমা করলে সে অনেকটা এরকম দাঁড়ায় :—

"প্রিয়তমা গ্রে,

যখন আমার চিঠি পাবে, তখন হয়ত বুঝতে পারবে আমি কে? হয়তো বা বুঝতেও পারবে না। যা হোক, বুঝতে পারো আর না পারো তাতে আমার কিছু আসে যায় না। আমার প্রয়োজন এখন পঞ্চাশ হাজার টাকা।

তুমি যে চিরকালের ব্যভিচারিণী সে কথা আমি একলা না জানলেও, বিশ্বের অনেকে জানে। একটা রাত্রির খেলা তুমি যা খেলেছিলে, সে কথা আমি আজও ভুলিনি। তুমি হয়ত ভুলে গেছ। আজ তোমায় সে দাম দিতেই হবে। বার বার যা হরণ করেছ, ঘুরে ফিরে তাকে ফিরাতে হবে।

আমি তোমার কাছে একটা প্রস্তাব করছি। এ প্রস্তাব অতি সহজ, সাধারণ। এ প্রস্তাব করতে পারে তারাই যাদের তুমি পদদলিত করেছ। আমার প্রয়োজন পঞ্চাশ হাজার টাকা—আর সে টাকা তোমায় দিতেই হবে।

আর শোনো। যদি তুমি সে টাকা আমায় না দিতে চাও তবে তোমায় জানিয়ে দিচ্ছি আমার সামনে একটি পথ খোলা রয়েছে। অনিচ্ছা সত্ত্বেও, বাধ্য হয়ে সেই পথই আমায় নিতে হবে।

শীলমোহরাঙ্কিত খামটি খুলে দেখ। দেখলেই বুঝতে পারবে আমি কি জানাতে চাই, কি করতে চাই, কি নিতে চাই?"

শোনো! প্রথমেই আমার কাজ হবে তোমার অফিসের মালিকদের কাছে, ডিরেকটরদের কাছে, তোমার প্রভুর কাছে জনে জনে এই দলিল ও প্রামাণ্য পত্র পাঠিয়ে দেওয়া, তোমার এমন কেউ আত্মীয়, অনাত্মীয়, পরিচিত বন্ধু-বান্ধব নেই যাদের কাছে এই দলিল না পাঠাব।

তারপর তাদের কাছে চিঠি দেবো একটার পর একটা, সেটা শুধু তোমার চরিত্রহীনতার কলুষগান গেয়ে। আর এই চলবে, চলতে থাকবে যতক্ষণ না পর্যন্ত তোমাকে তারা ডাইনী বিচারে দেশছাড়া হতে বাধ্য করে।

আর শোনো! যদি তুমি আমার প্রস্তাবে রাজী হও তবে [illegible] রবিবাসরীয় যে কোন বিখ্যাত ইংরেজী দৈনিক পত্রিকার ব্যক্তিগত স্তম্ভে নীচেকার এই বিজ্ঞাপন দিও :—

"প্রিয়তম,
তোমার চিঠি পেয়েছি। রাজী আছি। কবে দেখা হবে জানিও।"

তুমি যখন এই বিজ্ঞাপন দিয়ে দেবে এবং যখন আমি পড়ব, তখনই স্থির করব ভবিষ্যৎ কার্যসূচী। তারপর তোমায় জানাব কোথায়, কবে, কিভাবে পঞ্চাশ হাজার টাকা রাখতে হবে।

তবে একটা ভুলে যেও না যে যদি পুলিশের আশ্রয় নাও, তবে, তোমাকে হত্যা করা হবে গুলি করে যেমনভাবে তোমার সেজদিদিকে হত্যা করা হয়েছিল।

ইতি
"তোমার চিরকালের"—

মিস গ্রে আর দাঁড়াতে পারলেন না। তাঁর সর্বাঙ্গ তখন কাঁপছে, আর তার সঙ্গে কাঁপছে তার দুই কম্পিত অঙ্গুলিধৃত ভীতি-পত্র। তার স্বেতাভিস্নগ্ধ কপোলে তখন বিন্দু বিন্দু স্বেদে পূর্ণ হয়ে গিয়েছে। তার রক্ত অধর নীলাভ বিবর্ণ হয়ে গিয়েছে। শয্যাপ্রান্তে অসহায়ের মত বসে পড়লেন, যেন গুপ্তঘাতকের কাছে স্বেচ্ছায় আত্মসমর্পণ করলেন দ্বিখণ্ডিত হবার জন্যে।

তখনও শয্যার ওপরে শীলমোহর করা হলুদ খাম জ্বলজ্বল করছে। সে খাম খুলতে তার ভয় করল, কি জানি কোন ভয়াল বিভীষিকা না জানি তার জন্যে অপেক্ষা করছে। চোখের সামনে যেন দেখতে পাচ্ছেন এক প্রাগৈতিহাসিক যুগের ভয়াল, বিলুপ্ত জীব, অনাবিষ্কৃত, এক অতিকায় জন্তু, যা পুনরায় দেহ ধারণ করে অনুসরণ করতে করতে তার দিকে এগিয়ে আসছে ধীরে ধীরে সম্পূর্ণ গ্রাস করতে।

কতক্ষণ সেভাবে বসেছিলেন জানিনে। তারপর কিছু বল সংগ্রহ করে খামটি খুললেন। কিন্তু দেখলেন কি? দেখলেন যা তার ভাবনাতীত, স্বপ্নাতীত, জ্ঞানগোচর বহির্ভূত, যা পাশবিক চিন্তাধারার জঘন্য, উলঙ্গ, বিকৃত প্রকাশ। সেটি একটি আলোকচিত্র, একটি ফোটোগ্রাফ। সে ফোটোগ্রাফে তাকে দেখানো হয়েছে সম্পূর্ণ নগ্নাবস্থায় শয্যায় শায়িতা এবং এক পরপুরুষ তার সঙ্গে যৌনক্রিয়ায় ব্যাপৃত রতিসুখে মত্ত। পুরুষটির মুখ অন্যদিকে ফেরানো, সে কে বোঝা যায় না। তবে মিস গ্রের মুখ সম্পূর্ণ চেনা যায়। শুধু তার কণ্ঠদেশের উপর দিয়ে এক কৃষ্ণবর্ণের রুমাল যেন আলগোছে বাঁধা রয়েছে।

প্রথমে তার দৃষ্টিকে যেন বিশ্বাস করতে পারলেন না। বার বার চোখ মুছলেন। কিন্তু সে একই ছবি—একই পাটি [illegible]। [illegible] ছবির স্ত্রী- [illegible] তার মাথার প্রতিমূর্তি। সেখানে তো কোন ভুল নেই?

এ কে করে সম্ভব হোল? তার চোখের সামনে মনে হোল সব কিছু ঘুরছে জোরে, বিদ্যুৎবেগে ঘুরতে ঘুরতে উল্কার মত ধাক্কা খাচ্ছে, আবার যাচ্ছে ছিটকে, আবার ঘুরছে। তার বুক চিরে, কণ্ঠ চিরে এক মর্মভেদী আর্তনাদ বেরিয়ে এলো—তারপরই তার জ্ঞানহীন, নিশ্চল, নিঃসাড় দেহ পাষাণ ভূতলে পড়ে রইল। জুবেদা ছুটে এল। সে দেখলো না, বুঝলে না, জানলে না কি ঘটে গেছে।

যখন তার জ্ঞান ফিরে এলো তিনি দেখলেন জুবেদা তার মুখের দিকে ভয়-বিহ্বল দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে। তার মুখমণ্ডল দিয়ে জল গাড়িয়ে পড়ছে, তার সঙ্গে যোগ দিয়েছে তার দুই গণ্ড বেয়ে নীরব অশ্রুধারা—তার মাথার বালিশ, শয্যাচ্ছাদন সম্পূর্ণ সিক্ত। জুবেদা প্রশ্ন করল এক নিঃশ্বাসে, কি হয়েছিল? কেমন করে হোল? আপনি সুস্থ বোধ করছেন তো?

মিস গ্রে তার ক্লান্ত ওষ্ঠে হাসি টেনে নিয়ে আসবার নিষ্ফল প্রয়াস করলেন। তারপর ধীরে ধীরে বললেন, কিছু হয়নি! হঠাৎ কি রকম ভয় পেয়েছিলাম। সে রাত্রে তার খাওয়া হোল না, ঘুম হোল না, শুধু ভাবনা।

সারারাত অন্ধকারে কড়ি কাঠের দিকে চেয়ে চেয়েই কেটে গেল। চোখ, মন, চিন্তা, কল্পনা সবই যেন বিভ্রান্ত। দৃষ্টি আকৃষ্ট হচ্ছে অবিশ্রান্তভাবে একটির থেকে অন্যটিতে। কে করতে পারে এ জঘন্য কাজ? হাজার চিন্তা করেও তার হদিশ করতে পারলেন না। তিনি তো কোনদিন এমন কোন অন্যায় করেননি। যার জন্যে তাকে এ কষ্ট ভোগ করতে হবে? ভোর হয়ে এল। না। আর অপেক্ষা নয়। শয্যার ধারে টেলিফোনের দিকে হাত বাড়ালেন। বড়দিদিকে টেলিফোনে বললেন—দিদি তুমি এখনই চলে এসো। ভীষণ বিপদে পড়েছি।

তারপর দিন, কোলকাতা ভেসে গেল অকাল অবিশ্রান্ত, বিরামহীন বৃষ্টিপাতে। সেই সন্ধ্যার প্রাক্কালে হঠাৎ এই পথিকের ডাক পড়ল মুস্কিল-আসানের জন্যে। ডাকছেন গোয়েন্দা বিভাগের কর্ণধার। এখনি যেতে হবে। গিয়ে দেখি শ্রীমতী বসে আছেন কতিপয় আত্মীয়ের সঙ্গে। টেবিল লাইটের আলো-অন্ধকারে তাকে দেখাচ্ছিল ক্লান্ত রিক্ত সর্বস্বান্ত। কর্ণধার আমার সঙ্গে মিস গ্রের পরিচয় করিয়ে দিলেন, তার সমস্যা নিয়ে আলোচনা করলেন এবং আমাকে তদন্তের ভার দিলেন। তদন্ত সুরু হয়ে গেল সেই রাত্রেই।

মিস গ্রের বক্তব্য লিপিবদ্ধ করার আগেই আমার এক সহকারীকে পাঠিয়ে দিলাম ১৪নং ফ্যান্সি লেনে, পত্রপ্রেরক জন স্যান্ডারস-এর সন্ধানে। মিস গ্রে স্বীকার করলেন তার সেজদিদিকে গুলি করে মারা হয় এবং তার স্বামীই তাকে হত্যা করেন। তিনি আরও জানান কোনদিন তার প্রেমে পড়বার সৌভাগ্য বা দুর্ভাগ্য হয়নি, কাজেই মন দেওয়া-নেওয়ার কোন ঘটনাই তার জীবনে ঘটেনি। তার মনে পড়ে না জীবনে তিনি কারোর সঙ্গে অসদ্ব্যবহার করেছেন বলে, কারোর সঙ্গে তার বিবাদ বিসম্বাদ নেই—তার ওপর কারো ঈর্ষা আছে কিনা তাও তিনি জানেন না। তার বন্ধু বান্ধবের সংখ্যা অত্যন্ত কম—এবং যারা আছেন তাদের সঙ্গে তার শুধু সখ্যতার সম্পর্ক। গত চব্বিশ ঘন্টায় তিনি তার মনের গহন অন্তঃপুরে একাকিনী শুধু ঘুরে ঘুরে বেড়িয়েছেন, হাতড়ে হাতড়ে বেরিয়েছেন এমন এক লোকের সন্ধানে যার দ্বারা এ জঘন্য কাজ হওয়া সম্ভব—কিন্তু কাউকেই তিনি পাননি।

এই প্রসঙ্গে তার পারিবারিক ইতিহাস নেবার প্রয়োজন হোল। যা জানা গেল তদন্তে তা অনেকটা এইরকম দাঁড়ায়।

মিস এঞ্জেলা গ্রে, তার পিতা জরজ হ্যারি গ্রে ও মাতা মিসেস আইলিন গ্রের কনিষ্ঠা কন্যা। তার পিতা ছিলেন ভারতীয় বন-বিভাগের এক উচ্চ রাজ-কর্মচারী। পিতা ছিলেন জাতিতে ইংরেজ আর ধর্মে রোমান ক্যাথলিক। দার্জিলিংয়ে শুকনা জঙ্গলে যখন কাজে ব্যাপৃত তিনি ও তার স্ত্রী মারাত্মক কালাজ্বরে আক্রান্ত হন এবং মাত্র পনের দিনের ব্যবধানে দুজনেই পৃথিবীর মায়া কাটিয়ে পাড়ি দিলেন মৃত্যু মহাসাগরে। এঞ্জেলার বয়স তখন মাত্র আট বছর। মিস্টার ও মিসেস গ্রের কোন পুত্র সন্তান ছিল না। তার সন্তান-সন্ততির মধ্যে চার-জনই কন্যা।

বড় মেয়ে ইথেল গ্রে, যখন কোলকাতা টেলিফোনে চাকরী করছিলেন, সেই সময় কোন ভোজ-সভায় কোলকাতার এক বিখ্যাত পুস্তক প্রকাশক সংস্থার এক উচ্চ কর্মচারী মিস্টার আর্থার লং-এর সঙ্গে পরিচয় হয় এবং পরে তার সঙ্গে পরিণয় সূত্রে আবদ্ধ হন। তাদের দুই পুত্র সন্তান।

মেজ মেয়ে এলিজাবেথ, ডাক নাম লিজা। তার বয়স যখন মাত্র আঠারো তখন তিনি ডক্টর পল হার্ষ্ট নামে এক ত্রিশ বছর বয়স্ক পদার্থ বিজ্ঞানীর সান্নিধ্যে আসেন। ঠিক কবে, কখন বা কিভাবে তাদের প্রথম পরিচয় হয় তা জানা নেই—তবে এটা ঠিক যে প্রথম দর্শনেই উন্মোধন হয় প্রেমের এবং তার শেষ পরিণতি হয় দুজনকার বিবাহ বন্ধনে। তাদের দুজনার বয়সের পার্থক্য প্রেমের কাছে মাথা নিচু করে। ডক্টর হার্ষ্ট তখন কোলকাতার এক বিরাট বৈদেশিক ফার্মের ডিরেক্টর। বিশিষ্ট পদার্থ বিজ্ঞান-বিদ এবং বিশারদ বলে তাঁর নাম তখন সর্বত্র ছড়িয়ে পড়েছে।

বার বছর গড়িয়ে গেল সুখ শান্তিতে। ডক্টর হার্ষ্ট ও লিজার চারটি সন্তানসন্ততি

হোল। কিন্তু এ শান্তি বেশীদিন রইল না। ডকটর হার্স্ট কর্মোপলক্ষে দার্জিলিং সফরে চলে গেলেন, সংগে রইলেন লিজা। সেই সফরই হোল কাল, তাদের সব শান্তির সমাধি। দার্জিলিং-এর ঘুম শহরে অবস্থান কালে লিজা মারাত্মক যক্ষ্মা রোগে আক্রান্ত হলেন। কোলকাতায় চিকিৎসার জন্যে তাকে নিয়ে আসা হোল। ডাক্তার পরীক্ষা করে অভিমত দিলেন এ রাজযক্ষ্মা। দক্ষিণ কি উত্তর ভারতে কোন যক্ষ্মা নিরাময় সংস্থায় তাকে নিয়ে যেতে হবে দীর্ঘ চিকিৎসার জন্যে। যাত্রার যখন সব প্রস্তুতি সম্পূর্ণ, তখন লিজা সবাকার ভাবনা-চিন্তা, জ্বালা যন্ত্রণা শেষ করে দিয়ে স্বর্গে পাড়ি দিলেন। ডকটর হার্স্ট তার সন্তান-সন্ততি নিয়ে বাড়ী বদল করলেন পার্ক স্ট্রীট অঞ্চলে এবং সেখানেই তার নিঃসংগ ভারাক্রান্ত জীবন অতিবাহিত করতে লাগলেন।

সেজ মেয়ে ডরিস গ্রে, ডাক নাম ডলার। যদি দুঃখের জীবন বোনেদের মধ্যে কাউকেও ভোগ করতে হয়ে থাকে, তবে তাকেই হয়েছে। বিধির বিধানে, ভাগাচক্রে, কিভাবে জানি না তিনি সংস্পর্শে এলেন জ্যাক স্টেনার নামে এক অ্যাংলো-ইন্ডিয়ান যুবকের। তিনি তখনকার দিনে পুলিশ সারজেন্টের কাজ করতেন। তখনও ভারত বিভক্ত হয়নি। ডরিস তার বড়দি ইথেলের বাধা সত্ত্বেও স্টেনারকে বিবাহ করলেন। ভারত বিভাগের পর স্টেনার পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত হতে চাইলেন। কিন্তু ডরিস চাইলেন ভারতে অবস্থান করতে। এই গোলযোগের হোল প্রথম প্রতিষ্ঠা।

স্টেনার চলে গেলেন ঢাকায় এবং প্রায় জোর করেই ডরিসকে নিয়ে গেলেন। সুরু হল দাম্পত্য কলহ, সুরু হোল সংসারে ঝড়, ঝঞ্ঝাপাত। প্রতিদিনই প্রায় দাম্পত্য কলহের শোচনীয় পরিণতি দেখা দেয় রক্তক্ষয়ী সংগ্রামে। ডরিস আর পারলেন না। তিনি এক সন্ধ্যায় চুপিসারে গৃহত্যাগ করে চলে এলেন কোলকাতায় তার চির পুরাতন ঘরে। সঙ্গে নিয়ে এলেন একমাত্র মেয়েকে। চাকুরী জুটিয়ে নিলেন এবং সেখানেই সংগীহীন জীবনযাপন করতে লাগলেন।

স্টেনার খবর পেলেন। তিন মাস পর ছুটি নিয়ে তিনি কলকাতায় চলে এলেন, সংগে নিয়ে এলেন তার সরকারী টোটাভরা রিভলবার। ডরিসের সংগে দেখা করলেন, অনুরোধ করলেন ফিরে যেতে। কিন্তু ডরিস নিরুত্তর। তিনি সে অনুরোধে কান দিলেন না। শুধু একটি মাত্র কথা— আমাকে মেরে ফেললেও কলকাতা ছেড়ে যাব না। আমি জানি আমার কবরের মাটি কলকাতাতেই কেনা আছে।

স্টেনার তার না যাবার প্রস্তাবে অন্য ইংগিত আবিষ্কার করলেন। তিনি আবিষ্কার করলেন কলকাতা পরিত্যাগ না করার পিছনে আছে অন্য আকর্ষণ। ঈর্ষায় ফেটে পড়লেন তিনি। বাগ-বিতণ্ডা চরমে উঠল। টেবিল ভাঙল, চেয়ার ভাঙল, কাঁচের ফুলদানী ভেঙে চুরমার হয়ে গেল, চায়ের পেয়ালা খণ্ড খণ্ড হয়ে গেল। তখন দুজনেরই কপাল দিয়ে রক্তক্ষরণ হচ্ছে। স্টেনার আর থাকতে পারলেন না তিনি গুলিভরা রিভলবার ক্ষিপ্রহস্তে টেনে বার করলেন— তারপর ডরিসের বুকের দিকে লক্ষ্য করে রিভলবারের ঘোড়া টিপলেন। প্রচণ্ড শব্দ। তারপর সব চুপ। ডরিসের মৃতদেহ পড়ে রইলো ভূতলে।

সত্যিই কি হত্যা করলাম, স্টেনার হয়তো ভেবেছিলেন! হত্যা করলাম কি স্ত্রীকে? যাকে দিয়েছিলাম এত ভালবাসা। আমি কি দূরে থাকবো? না—তা হয় না—তিনি রিভলবার তুলে রিভলবারের নল নিজের বুকে ঠেকিয়ে ঘোড়া টিপলেন। আবার এক বিরাট শব্দ। পার্ক স্ট্রীট পুলিশ যখন এল তখন সব দ্বন্দ্বের অবসান, সব সংঘর্ষের শেষ যবনিকা পতন। এই মৃত্যুর কথাই মিস গ্রেকে লেখা চিঠির এক অংশ।

কনিষ্ঠা কন্যা মিস এঞ্জেলা গ্রে। আগেই বলেছি পিতা-মাতার মৃত্যুর সময় তার বয়স ছিল মাত্র আট বছর। তার বড়দিদি ইথেল এবং তার স্বামী মিস্টার আর্থার লং এঞ্জেলাকে মানুষ করতে লাগলেন। স্কুল থেকে একের পর এক এঞ্জেলার উদ্দেশ্যে প্রশংসাপত্র আসতে লাগল। তাদের গর্ব যেন ধরে না। এঞ্জেলা মানুষ হোল, চাকরী পেল, তারপর অফিসের দেওয়া চৌরঙ্গীর এক প্রাসাদোপম ফ্ল্যাটে একলা থাকতে লাগল শুধু এক পরিচারিকাকে নিয়ে। এঞ্জেলার সবাই আছে, কিন্তু তবু যেন কেউ নেই, তবু যেন নিরাশ্রয়। এখন তার ভার নেবার উপযুক্ত লোক কোথায়? তাই সেদিন তার ঘোরতর বিপদের প্রথম উষার সংগে সংগেই বড়দিকে মনে পড়ল—যে দিদি তাকে মার মত লালন-পালন করেছেন—তার শরণাপন্ন হওয়া ছাড়া গতি কি?

রাত্রি তখন গভীর হয়ে উঠেছে। ইতিমধ্যে আমার সহকারী জানিয়ে দিলেন যে, পত্রপ্রেরকের নামধাম মিথ্যা। ওই নামে কোন লোক সেখানে কোনদিন থাকেনি।

মিস গ্রে ভীত হলেন। ইথেল আর মিস্টার লংকে অনুরোধ করলেম যখন আমি মিস গ্রে'র আবাসে যাব আগামী কাল নটার সময়, তারা যেন দয়া করে উপস্থিত থাকেন।

প্রশ্ন করতে পারেন কেন এ অনুরোধ করলাম। কারণও যথেষ্ট ছিল। আমি পথচারী গোয়েন্দা, ঘুরে ঘুরে চোখ খুলে বেড়ানই আমার কাজ। আজ আমার তদন্তের কেন্দ্র অনন্যসাধারণ রূপবতী যুবতী অবিবাহিতা। আমার একাকী তদন্তের ফলে পরে যদি নানা প্রশ্ন ওঠে এই ভয়ে।

তার পরদিন যথাসময়ে মিস গ্রে'র আবাসে হাজির, সেখানে দেখি বড়দি ইথেল লং এবং তাঁর স্বামী ছাড়াও আর একজন আত্মীয় উপস্থিত যাকে আমি চিনি না। মিস গ্রে পরিচয় করিয়ে দিলেন, ইনি আমার ভগ্নিপতি ডকটর পল হার্স্ট। এর কথাই আপনাকে আগে বলেছিলাম।

এই প্রথম ডকটর পল হার্স্টের সংগে আমার দেখা। চোখে পুরু রিমলেস চশমা। মাথার চুল আলুথালু, কাঁচাপাকা—বয়স প্রৌঢ়ত্বের শেষার্ধে। দেখলাম তাকে যেন উদ্‌ভ্রান্ত, উদ্বিগ্ন, উল্লিখিত অব্যক্ত যাতনায় যেন অস্থির।

মিস গ্রের দুঃখে যেন ভেঙে পড়লেন। প্রশ্ন করলেন—"বলতে পারেন কার এমন পাষাণ হৃদয় আছে যে আমার এঞ্জেলাকে দুঃখ দিতে পারে?" এঞ্জেলার চোখে জল এল।

দেখেছেন? দেখেছেন সে চিঠি? দেখেছেন সে ছবি? পারবেন কি হদিশ করতে? আমি ব্যর্থ হয়েছি। এঞ্জেলার একটা ব্যবস্থা দয়া করে করুন। ওকে দেখবার যে কেউ নেই! কথায় তার গভীর সমবেদনা। দেখলাম, এঞ্জেলার দু চোখ বেয়ে হীরকের মত অশ্রুধারা নিঃসাড়ে গড়িয়ে পড়ছে।

তদন্তের উদ্দেশ্য ছিল মিস গ্রেকে আরও গভীরভাবে প্রশ্ন করা, একান্তে সপরিবারের মধ্যে নয়, বৈঠকখানায় নয়। অনেকক্ষণ অপেক্ষা করার পর আমাকে বাধ্য হয়ে বলতে হল আমি শ্রীমতীকে একলাই চাই, তাকে প্রশ্ন করার জন্য। ডকটর হার্স্ট বিদায় নিলেন। শুরু হোল আমার তদন্ত।

ঘরের চারিধারে ঘুরে ঘুরে ছবি দেখতে লাগলেম—প্রতিবারেই প্রশ্ন কার এ কার ছবি? ও কার ছবি? প্রতিবারেই মিস গ্রে ব্যক্তিবিশেষের ছবির সংগে পরিচয় করিয়ে দেন। দেখলাম ড্রেসিং টেবিলের উপর সুন্দর ফ্রেমে বাঁধানো এক যুবতীর ছবি। আকৃতিতে ইথেলের সংগে অনেক সাদৃশ্য পাওয়া যায়। তবে এ'র চুল বাঁধার কায়দা অভিনব। কবরীকে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে উপরদিকে তুলে দেওয়া হয়েছে সুন্দর ভঙ্গিমায়; যেন মাথার উপর মালার বাহার। চোখের দৃষ্টি যেন প্রকাশব্যঞ্জক নয়! কোথায় যেন বিশেষ অভাব!

প্রশ্ন করলাম,—এ কার ছবি? উত্তর—আমার মেজদি লিজা।

প্রশ্ন করলাম, আপনার ছবির অ্যালবাম নেই? উত্তর দিলেন, একটা নয় চার চারটে আছে। আপনি দেখবেন?

মিস গ্রে তখন আমার কাছে অনেক সহজ হয়ে গেছেন। তিনি ক্ষিপ্রগতিতে পাশের ঘরে এবং টেবিলের উপরে সজ্জিত রাখা চারটি ছবির অ্যালবাম আমার কাছে নিয়ে সোফার এক অংশে রাখলেন। তারপর নিদিকে উদ্দেশ্য করে বললেন—দিদি আমি কফি করে নিয়ে আসছি তুমি এঁদের দেখো।

একটার পর একটা ছবি দেখছি। প্রায় শ'খানেকের ওপর ছবি! কোনটা বড় কোনটা ছোট বিভিন্ন ভঙ্গিমায়। লম্ব

৮৫০

করলাম শ্রীমতী ফটোজেনিক, যেভাবেই তার ছবি তোলা যায় সেভাবেই তার অদ্ভুত ছবি ওঠে।

কিন্তু আমার শুধু ছবি দেখা উদ্দেশ্য নয়; আমার উদ্দেশ্য যে ছবি মিস গ্রে ভাঁতি পত্রের সঙ্গে পেয়েছেন সেই ছবির মুখের সঙ্গে মিস গ্রের অন্য কোন ছবির সাদৃশ্য আছে কিনা? দেড়ঘণ্টাকাল কেটে গেল, কফি এলো—শেষ হয়ে গেলো—তখনও আমার দেখার শেষ হয় নি।

হঠাৎ নজরে পড়ল একটি ছোট ছবি। শ্রীমতী একটি দড়ির দোলায় (হ্যামকে) শুয়ে রয়েছেন, ঘাড় একধারে ঈষৎ কাত করে। মিলিয়ে দেখলাম যে এই ছবির মুখের সঙ্গে যে ছবি মিস গ্রে পেয়েছেন তার সঙ্গে বহুলাংশে মেলে।

প্রশ্ন করলাম, এ ছবি কোথায়, কবে এবং কে তুলেছিলেন?

উত্তর এলো,—বছর তিনেক আগে আমরা সবাই বোটানিক্যাল গার্ডেনে গিয়েছিলাম চড়ুইভাতি করতে—সেখানে যখন হ্যামকে শুয়ে আছি তখন আমার ভগ্নিপতি ডকটর হার্স্ট এ ছবি তোলেন।

প্রশ্ন করলাম, আমি কি এই ছবিটি নিতে পারি পরীক্ষার জন্যে? মিস গ্রে একটু আশ্চর্য হলেন বটে, কিন্তু বাধা দিলেন না। ছবিটি যত্নসহকারে ব্যাগের মধ্যে রাখলাম।

অ্যালবামের পাতা উল্টোতে উল্টোতে হঠাৎ একটি গ্রুপ ফটোগ্রাফ নজরে এলো। সে ছবিতে ইথেলকে চিনতে পারলাম, ডরিস ও এঞ্জেলাকে চিনতে পারলাম কিন্তু তাঁদের সঙ্গে আর এক নারীমূর্তিকে চিনতে পারলাম না।

প্রশ্ন করলাম, ইনি কে? ইথেল কাছেই বসেছিলেন, তিনি উত্তর দিলেন, ইনি আমার মেজ বোন লিজা।

কিন্তু তা কি করে হয়? এ ছবিতে দেখছি লিজার ডান চক্ষু সুস্পষ্টভাবে টেরা। তিনি কোনদিকে তাকিয়ে রয়েছেন তাও সঠিক বোঝা যায় না। তা ছাড়া তার কেশ ববছাঁটে ছাঁটা, নেমে এসেছে ঘাড় পর্যন্ত।

প্রশ্ন করলাম, কিছু মনে করবেন না লিজা কি টেরা ছিলেন?

ইথেল উত্তর দিলেন অকপটে, হ্যাঁ লিজার ডান চোখে ছিল বক্রদৃষ্টি। আমার দিদিমার ডান চোখ টেরা ছিল। আমাদের নাতনিদের মধ্যে একমাত্র লিজাই এই বিকৃতির উত্তরাধিকারিণী হয়েছিলো।

আমার প্রশ্ন তখন সংক্ষিপ্ত। প্রশ্ন করলাম, মিস গ্রে! তবে কি বলতে চান আপনার ড্রেসিং টেবিলের উপরে লিজার যে ছবি রয়েছে সেটা সত্যিকারের লিজার আকৃতি নয়? শুধু তার ছায়া মাত্র? দেখুন ছবিটার দিকে। লিজার ডান চোখ যে টেরা ছিল তার তো কোন চিহ্ন নেই। দুই ছবির মধ্যে লক্ষ্য করুন কেশবিন্যাসের পার্থক্য। আমার প্রশ্ন দুটির মধ্যে লিজার কোন ছবিটা সত্যকারের এবং স্বাভাবিক? আর একটি প্রশ্ন, আপনাদের এই গ্রুপ ছবিটিও কি ডকটর হার্স্ট তুলেছিলেন?

মিস গ্রে কেন একটু আশ্চর্য হলেন। তাঁর মনে প্রশ্ন জাগলো আমি তার মৃতা দিদির চেহারা ও ছবি নিয়ে কেন এত ব্যস্ত? মনে হওয়া স্বাভাবিক। মিস গ্রে তো গোয়েন্দা নন!

মিস গ্রে ধীরে ধীরে উত্তর দিলেন, আগেই বলেছি ড্রেসিং টেবিলের ওপর লিজার ছবিটি আমার ভগ্নিপতি ডকটর পল হার্স্ট আমাকে দিয়েছিলেন লিজার মৃত্যুর তিন বছর পরে। তিনি তুলির সাহায্যে লিজার সত্যকারের কেশবিন্যাসের পরিবর্তন করেন, তার ডান চোখের বক্রদৃষ্টি সোজা করে দেন আঁখি তারার উপর রঙ ফলিয়ে। আর এই গ্রুপটিও লিজার মৃত্যুর অনেক আগে ডকটর হার্স্টই তুলেছিলেন। কিন্তু এখানে তার স্বাভাবিক আকৃতির কোন পরিবর্তন করেন নি।

—তবে কি বলতে চান ডকটর হার্স্ট শুধু ভালো ফোটোগ্রাফার নয়, তিনি এক বিশিষ্ট চিত্রকর? প্রশ্ন করলাম।

উত্তর দিলেন, ঠিক তাই। তার বরাবর ফোটোগ্রাফীর ওপর ঝোঁক। তিনি পেশাদার নন, তার নিজের এক সৌখীন আলোকচিত্রের স্টুডিও রয়েছে।

প্রশ্ন করলাম, কোথায়?

উত্তর, বেণ্টিঙ্ক স্ট্রীটে। বোধহয় ১৬ নম্বর।

প্রশ্ন করলাম আপনি তো এ কথা আগে জানান নি?

উত্তর এলো, আপনি তো প্রশ্ন করেন নি?

বেলা তখন দ্বিপ্রহর। সেদিনকার মত বিদায় নিলাম। কিন্তু যাবার আগে চার বোনের গ্রুপ ছবি এবং ড্রেসিং টেবিলের ওপর থেকে লিজার ছবি নিতে ভুলে গেলাম না। আশ্বাস দিলাম যে মুহূর্তে আমার কাজ শেষ হবে সেই মুহূর্তেই আমি এ সব ছবি ফিরিয়ে দোব। লিফটের দরজা যখন বন্ধ করছি, ইথেল প্রশ্ন করলেন আবার কবে দেখা হবে? উত্তর দিলাম, "টেলিফোনে আমি জানাব।"

আমার কাজ তখন লেবরেটরিতে, স্টুডিওতে। এখানেই যদি কিনারা হয়ে যায়, তবে যেতে হবে না অন্য পথে। অর্থাৎ চিঠিতে যে নির্দেশ আছে, সেই নির্দেশানুযায়ী রবিবাসরীয় দৈনিক পত্রিকাতে বিজ্ঞাপন দেওয়া এবং তারপর ফাঁদ পেতে ধরা সেটা অনেকদূরের পথ। সে পথে সফল হব কিনা তাও জানা নেই। কিন্তু স্টুডিওতেই সাফল্য মিলল। মিস গ্রের ছোট ছবি যেটা শিবপুরে বোটানিক্যাল বাগানে তোলা হয় সেই ছবিটির মুখটি একই ভাবে রেখে, যন্ত্রের সাহায্যে ধীরে ধীরে বর্ধিত করা হোল এবং সেই পরিবর্ধিত চিত্র অবলীল ছবিতে মিস গ্রের মুখের সঙ্গে নির্ভুলভাবে মিলে গেল।

মনে পড়ে সেদিন ছিল শনিবার। ভোরের আলো ফোটার সঙ্গে সঙ্গে ডকটর হার্স্টের স্টুডিওর ওপর গোয়েন্দারা কড়া নজর রেখেছিল। সেদিন মাঠে ঘোড়দৌড়ের বিরাট পর্ব। হঠাৎ সাড়ে এগারটার সময় ডকটর হার্স্ট হন্তদন্ত হয়ে স্টুডিওতে ঢুকছেন। ঠিক পনের কি কুড়ি মিনিটের মধ্যে তিনি বেরিয়ে এলেন এবং গাড়ী হাঁকিয়ে চলে গেলেন। সেই ঘরের পরিচারককে কি যেন নির্দেশ দিয়ে গেলেন।

তিনি চলে যাবার অল্পক্ষণ পরেই পরিচারকের কাছে তদন্তকারী গোয়েন্দা সোজাসুজি গিয়ে হাজির। নিজের পরিচয় দিলেন ডকটর হার্স্ট-এর বিশিষ্ট বন্ধু বলে এবং তাঁকে জানালেন যে ডকটর হার্স্টের সঙ্গে কথা হয়েছিল যে তিনি সাড়ে এগারটার সময় আসবেন, কিন্তু পথে আটকে যাওয়ায় দেরী হয়ে গেল। বিশেষ জরুরী কাজ ছিল। ডকটর হার্স্ট কি কোন নির্দেশ দিয়ে গেছেন?

উড়িয়্যাবাসী পরিচারক সরল মনে সবই বিশ্বাস করল, তারপর অকপটে বলল, হ্যাঁ হ্যাঁ ঠিকই আপনি বলেছেন সাহেব ঠিক সাড়ে এগারটার সময় আসেন। আপনারই জন্য বোধহয় দশ পনের মিনিট অপেক্ষা করেছিলেন। সেই সময় সাহেব ডার্করুম থেকে কিছু ছবি আর নেগেটিভ সরিয়ে একটা ব্যাগে পুরে লোহার আলমারীতে রাখলেন। চাবি বন্ধ করে যাবার সময় বললেন যে তিনি রেস থেকে পাঁচটার সময় ফিরবেন। সেই সময় আমি যেন উপস্থিত থাকি। অনেক বাজে জিনিসে ঘর ভরেছে, তিনি সেগুলো পুড়িয়ে দেবেন।

পাঁচটা বাজতে চার মিনিট বাকী। ডকটর হার্স্টের গাড়ী স্টুডিওর দরজায় থামলো। তার প্রবেশ করার সঙ্গে সঙ্গেই নাটকীয়ভাবে গোয়েন্দা পুলিশ সাক্ষীসাবুদ ও তল্লাসী পরোয়ানা নিয়ে স্টুডিওতে প্রবেশ করল।

ডকটর হার্স্ট প্রথমেই স্তম্ভিত, হতবাক্। আমাকে দেখে প্রথমেই প্রশ্ন করলেন, মিস গ্রের বাড়ীতে আপনাকে গতকাল সকালে দেখেছি না? আমাকেই শেষে সন্দেহ করলেন?

উত্তর দিলাম, আজ্ঞে হ্যাঁ। আর তার যথেষ্ট কারণ রয়েছে। আপনি নিশ্চয়ই বুঝতে পেরেছেন আমরা জিনিসের সন্ধানে এসেছি। আশা করি ভদ্রভাবে সে সব জিনিসপত্র আমাকে দিয়ে দেবেন। দেরী করবেন না। তার কারণ আমাদের যেতে হবে আপনার বাড়ীতে তল্লাসী করবার জন্যে। আপনি যদি আমাদের সাহায্য করেন তবে এইটুকুই আশ্বাস দিতে পারি যে আপনার

যাতে কোনরকম বে-ইজ্জত না হয় সে দিকে আমি দৃষ্টি রাখব। ডকটর হার্স্ট তখন থরথর করে কাঁপছেন। কপাল দিয়ে বিন্দু বিন্দু ঘাম ঝরে পড়ছে।

প্রশ্ন করলাম, কাঁপছেন কেন? আমরা তো আপনার অন্য কিছু নিতে আসিনি? নিতে এসেছি যে ব্যাগে জিনিসগুলো আপনি পুড়িয়ে দেবার মনস্থ করেছেন। সেগুলোই দিন, বিশেষ করে যেগুলো ব্যাগে ভরে লোহার আলমারীতে রেখেছেন আজ সকালে সাড়ে এগারটায়। সেগুলোই না হয় দিন।

ডকটর হার্স্টের বিস্ময়ের সীমা নেই। ধীরে ধীরে দেরাজের চাবি খুললেন। ব্যাগের মধ্যে পাওয়া গেল আসল ফোটো-গ্রাফ, সেই অশ্লীল ফোটোগ্রাফ যার থেকে স্ত্রীলোকের মুখটি তুলে নিয়ে সে জায়গায় মিস গ্রের মুখখানি কেটে বসান হয়েছে। তারপর কাটার দাগটা ঢাকবার জন্যে নিখুঁত ভাবে তুলি আর রঙ এর সাহায্যে একটি কালো রেশমী রুমাল এঁকে দেওয়া হয়েছে। তারপর সেই ছবি থেকে তিনি একটি নেগেটিভ তুলেছেন, আবার সেটাকে প্রিণ্ট করেছেন। পুনরায় অসম্পূর্ণতা ঢাকবার জন্যে রিটাচিং বা পুনরাঙ্কনের সাহায্য নিয়েছেন, আবার সেটাকে ফোটো-গ্রাফ করেছেন। যখন শেষ হয়ে গেছে তখন সাধারণের চোখে ধরবার উপায় নেই যে সেটা একটা নকল, একত্রিত করা সম্মিলিত করা আলোকচিত্র। একই ছবির চার পাঁচটি কন্ট্যাকট পজিটিভ ও নেগেটিভ পাওয়া গেল। অঙ্কন পেনসিল যা ব্যবহার করা হয়েছে জাল ছবি তৈরী করতে তাও পাওয়া গেল। যখন কর্মশেষ, তখন ডকটর হার্স্ট আমার দুটি হাত চেপে ধরে অস্ফুট-স্বরে বললেন—"আমায় বে-ইজ্জৎ করবেন না। আমার বাড়ীতে কিছুই পাবেন না।"

কিন্তু গোয়েন্দা পুলিশকে তো কর্তব্য পালন করতেই হবে। তার বাড়ীতে হোল এক অপূর্ব আবিষ্কার এবং সেটা এমন স্থান থেকে আবিষ্কার হোল যা ডকটর হার্স্ট স্বপ্নেও ভাবতে পারেননি। সেটা মিস গ্রেকে কপি করে লেখার আসল চিঠি যার ইংরেজী বড় অক্ষরে দাগা বুলিয়েছিলেন ডকটর হার্স্ট। এটা পাওয়া গেল ডকটর হার্স্টের এক মোজার ভেতরে।

তদন্তে জানা গেল, যখন ডকটর হার্স্টের আসল চিঠির ওপরে দাগা বুলানো শেষ হয়েছে ঠিক সেই সময়ে তার বাড়ীতে এক অতিথি হঠাৎ এসে হাজির। তাড়া-তাড়িতে আসল কাগজ লুকোবার প্রয়াসে তিনি তার পার্শ্বস্থিত মোজার মধ্যে সেটাকে লুকিয়ে রেখেছিলেন। তারপর আর তার মনে নেই। চিঠির কপি ও ছবি এঞ্জেলাকে পাঠালেন কিন্তু আসল চিঠিটা মোজার মধ্যেই আত্মগোপন করেছিল।

ডকটর হার্স্টকে গ্রেপ্তার করা হোল। তিনি তার সম্পূর্ণ অপরাধ স্বীকার করলেন। লালবাজার কেন্দ্রের পথে তিনি দেখিয়ে দিলেন সেই দোকান যেখান থেকে জাপানী অশ্লীল ছবি সংগ্রহ করেছিলেন। দোকান তল্লাসী করে দুই ডজন একই অশ্লীল ছবির সন্ধান পাওয়া গেল। দোকানীকে গ্রেপ্তার করা হোল।

সেই রাত্রেই কালহরণ না করেই, মিস্টার এবং মিসেস লংকে সঙ্গে নিয়ে মিস গ্রের ফ্ল্যাটে গিয়ে হাজির হলাম। সুরু হোল আবার প্রশ্ন। যার উপরে বুঝতে পারব অপরাধের কারণ, অপরাধীর মনোবৃত্তি, তার চিন্তাধারা। আমার প্রশ্ন ছিল একটি। ডকটর হার্স্ট অতীতে কোনদিন মিস গ্রের কাছে প্রেম নিবেদন করেছিলেন কিনা, যদি করে থাকেন কবে এবং কি ভাবে? অথবা মিস গ্রের পাণিগ্রহণ করতে চেয়েছিলেন কিনা?

আমার এই প্রশ্নে মিস গ্রে প্রথমে একটু উত্তেজিত হয়ে উঠলেন। তার মনে হোল আমি অনধিকার চর্চা করছি। তার ব্যক্তিগত জীবনের গোপনতায় প্রবেশ করার হীন চেষ্টা আমি করছি—যেটা আমার কখন করা উচিত নয়।

কিন্তু যখন তিনি শুনলেন আমি অপরাধীকে গ্রেপ্তার করেছি এবং সেই অপরাধী হার্স্ট স্বয়ং এবং তারই স্বীকারোক্তির ফলে আমি তার কাছে শেষ বারের মত হাজির হয়েছি শুধু জানতে আসামীর স্বীকারোক্তি ঠিক কিনা, শুধু যাচাই করতে এসেছি সত্যাসত্য, তখন মিস গ্রে কান্নায় ভেঙ্গে পড়লেন। সে এক করুণ দৃশ্যের অবতারণা হোল তার কারণ মিস গ্রে স্বপ্নেও চিন্তা করতে পারেননি যে ডকটর হার্স্টের দ্বারা এ জঘন্য কাজ সম্ভব হতে পারে বলে। তিনি যা বললেন, তার সারাংশ এই রকম দাঁড়ায়।

মেজদি লিজা আমার থেকে বয়সে অনেক বড় ছিলেন। তার স্বামী ডকটর হার্স্ট মেজদিদির থেকে এগার-বার বছরের বড়। আশৈশব আমি ডক্টর হার্স্টকে পিতার মত শ্রদ্ধা করে এসেছি। অন্য কোনভাবে তাকে দেখিনি। কিন্তু লিজার মৃত্যুর পর তিনি যেন আমাকে অন্যভাবে দেখতে শুরু করলেন। একদিন বছর চারেক আগে তিনি সিনেমা দেখতে দেখতে হঠাৎ আমাকে প্রেম নিবেদন করলেন। আমাকে প্রস্তাব করলেন তাকে বিবাহ করার জন্যে। আমি কিন্তু তাকে কোনদিন স্বামী বা বন্ধু বলে ভাবতেই পারিনি। যাকে পিতার আসন দিয়েছি তাকে স্বামীর আসন কি করে দেবো? তিনি অনেক চেষ্টা করলেন আমায় রাজী করাতে কিন্তু প্রতিবারেই তার প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেছি। এ ঘটনা আজ চার বছর আগেই শেষ হয়ে গেছে। গত দুই-তিন বছরে তার আসা আমার আবাসে অনেক কমে গেছে। এবং সম্প্রতিকালের মধ্যে লক্ষ্য করছি তিনি পুনরায় পূর্বেকার ব্যবহার সুরু করলেন। তার কথায়, বার্তায়, ব্যবহারে, আচরণে কোনদিনের জন্য প্রকাশ পায়নি যে কোনদিন কোনো এক অবিস্মরণীয় সন্ধ্যায় এক অসতর্ক মুহূর্তে তিনি অস্থির উদ্বেল হৃদয়ে আমাকে প্রেম নিবেদন করেছিলেন। তার ব্যবহার ছিল সম্পূর্ণ স্বাভাবিক, তিন বছর আগে বোটানিক্যাল গার্ডেনে যখন আমরা চড়ুই-ভাতি করতে যাই তখন ডকটর হার্স্টের অনুরোধেই আমি হ্যামকে শুয়েছিলাম। কল্পনাও করতে পারিনি তখন, তিনি আমার ছবির এ নৃশংস ব্যবহার করবেন—আর তা তিন বছর পরে।

উত্তর দিলাম,—তিনি অকপটে স্বীকার করেছেন তার অপরাধ। সেদিক থেকে তার কোন ত্রুটি নেই। স্বীকার করেছেন, তার স্ত্রীর মৃত্যুর পর কিভাবে নিঃসংগ জীবনযাপন করছিলেন। তার চার চারটি সন্তান-সন্ততি দেখবে কে? এই হিসাবে তার ক্ষীণ আশা হয়েছিল আপনাকে যদি স্ত্রীরূপে লাভ করতে পারেন তবে তার কোনই সমস্যা থাকবে না। এটা স্বার্থপরতা নিশ্চয়ই। কিন্তু এই ছিল তার চিন্তাধারা। আপনার প্রেমভিক্ষা চাইলেন, কিন্তু প্রত্যা-খ্যাত হলেন। বার বারই প্রস্তাব করলেন, বারবারই প্রত্যাখ্যাত হলেন। তারপর তিনি যেন মরীয়া হয়ে উঠলেন, রোষে গর্জাতে লাগলেন ভিতরে ভিতরে, আর সেই বহ্নিতে ছাই হয়ে গেল তার সুকুমার মনোবৃত্তি, সুনাম আর আভিজাত্য। শুধু এই নয়। দগ্ধ হোল এক স্নিগ্ধ পরিবেশ যা চিরকাল যুগ যুগ ধরে মানব হৃদয় আকাঙ্খা করে এসেছে—সেটা শান্তি। শান্তির চির সমাধি হোল, হতেই ক্রোধে, রিপুতে তিনি পুড়তে লাগলেন।

গত তিন বছর ধরে তিনি নানাভাবে মতলব এঁটেছেন, নানা পরিকল্পনা করেছেন, কিভাবে তার প্রেমের প্রত্যাখ্যানের প্রতিশোধ নেওয়া যায়। শেষে এ ছবির পথ, এ ভীতি প্রদর্শনের পথ, এ মাত্রাহীন ব্ল্যাকমেলের পথ তিনি গ্রহণ করলেন। তিনি পেশাদারী অপরাধী নন, তাই তার কাজে কর্মে অনেক ত্রুটি রয়ে গেল। তিনি যদি আপনাকে চিঠি পাঠিয়েই সমস্ত ফোটো-গ্রাফের আর চিঠির দলিল পুড়িয়ে ছাই করে দিতেন, যেটা তিনি অনেক পরে মনস্থ করেছিলেন, তাহলে হয়ত তিনি ধরা পড়তেন না। যখন তিনি চেষ্টা করলেন তখন অনেক দেরী হয়ে গেছে। গোয়েন্দা সেখানে উপস্থিত। আর তাছাড়া তার অর্থের প্রয়োজন নেই। অর্থ চাওয়া হয়েছে ভীতি প্রদর্শনের জন্যে। তিনি ভেবেছিলেন যখন আপনি সম্পূর্ণ বিহ্বল সম্পূর্ণ বেপথ, সম্পূর্ণ নিরাশ্রয় মনে করবেন, তিনি তখন আপনার সাহায্যে এগিয়ে আসবেন এক সৎ স্যামারিটানের মত এবং

তার সাহায্যের মূল্য হিসাবে আপনাকে লাভ করবেন স্ত্রী হিসাবে।

আর এটা ঠিক, এত বিদ্বান হয়েও তিনি মূর্খের মত কাজ করেছেন। তার মত উচ্চাঙ্গের ফোটোগ্রাফারের কাছে এ ধরনের কাজ আশা করা যায় না। যে ছবিটা, অর্থাৎ বোটানিক্যাল গার্ডেনে হ্যামকের ওপর আপনার শায়িত অবস্থায় ছবি, যেটা তিনি বেছে নিলেন তার দুষ্কর্মের জন্য, সেটা যে বহিঃদৃশ্যের আলোকচিত্র বা আউটডোর ফোটোগ্রাফি এটা সম্পূর্ণ ভুলে গেলেন। সেই ফোটোর মুখ কেটে তিনি বসালেন অশ্লীল ছবির আর একটি মুখের পরিবর্তে, যে ছবি তোলা হয়েছে ঘরের মধ্যে, স্টুডিয়োর আলোকে, নানা আলোক সম্পাতে। ফলে কি হোল, আসল আর নকল ছবির মধ্যে আলোছায়ার স্বাভাবিক পরিবেশন পরিবর্তন হোল, আপনার চিত্র যখন তোলা হয়, তখন ক্যামেরাম্যানের পিছনে পড়ন্ত সূর্য, রৌদ্রালোক পড়ছে আপনার মুখের এক ধারে, অন্যদিকে গভীর ছায়ায় ঘেরা। এই দেখুন, এ জাপানী অশ্লীল ছবি যেটা আমরা উদ্ধার করেছি অনেক একই ছবির সংগে কোন দোকান থেকে, যে দোকান থেকে ডকটর হার্স্ট একটি কপি কিনেছিলেন আপনার বিরুদ্ধে ব্যবহারের জন্যে; লক্ষ্য করুন মুখের কোথায় একধারে ছায়া? দুধারে স্টুডিও লাইট ও আলোক সম্প্রপাতে জাপানী স্ত্রীলোকের মুখ জ্বলজ্বলে করে তুলেছে। কোথাও গভীর ছায়াপাত নেই।

আর একটা জিনিস লক্ষ্য করুন, আপনার আসল ছবিটা, যেটা ডকটর হার্স্ট ব্যবহার করেছেন তার মাথায় ও কপালের উপর দুটি গাছের পাতার ছায়ায় প্রতিচ্ছবি পড়ছে। অর্থাৎ ছবি নেবার সময় ক্যামেরার চোখ এবং আপনার মাথা ও কপালের মাঝে একটা গাছের ডাল ঝুঁকে পড়েছিল এবং তারই দুটো পাতার ছায়া পড়েছে আপনার মাথায় ও কপালে। অশ্লীল ছবির মধ্যে এটা আসবে কি করে? আপনিই বলুন। নিশ্চয়ই আপনার দাঁড়ের দোলা বা হ্যামকে বিভিন্ন দুটো গাছের ডাল বাঁধা ছিল। তাই নয় কি? কাজেই দেখুন আলোকের দৃষ্টিকোন আসল ছবিতে আর নকল ছবিতে সম্পূর্ণ পৃথক।

তারপর দেখুন আপনার মুখমণ্ডলের যে অংশ তিনি কেটেছেন এবং অন্য জায়গায় আর এক মুখের অংশের ওপর সংযোজিত করেছেন তার ধারগুলো দেখুন যেন ক্ষুরধারে কাটা। আসল যদি ছবি হোতো তবে এরকম থাকতো না। তার ধারগুলো থাকতো গোল ধরনের যেহেতু মানুষের মুখ বৃত্ত আকৃতি যে থ্রি ডাইমেনসণ্ড বা ত্রি-পরিসরের। হক্যার তুলি বা রং চড়িয়ে সেই ক্ষুরধার ধারগুলো চাপা দেবার চেষ্টা করলেও আলোকচিত্র বর্ধিত করার সংগে সংগেই তা ধরা পড়বেই।

চতুর্থতঃ যে ধড়ের সংগে আপনার মুখ লাগানো হয়েছে তার আয়তনের সংগে আপনার মুখ ঠিক লাগে না। আপনার মুখের আয়তন অশ্লীল ছবির মুখের অপেক্ষা বেশ ছোট। ভুল জ্যামিতিক কোণে আপনার ছবির গলাটা কাটার ফলে অশ্লীল ছবির ধরের সংগে ঠিক লাগানো গেল না, কিয়দংশ বাদ পড়ে গেল। ডকটর হার্স্ট এই ভুলকে ঢাকবার চেষ্টায় গলার কাটার উপর সুন্দরভাবে এক কালো রুমাল এঁকে দিলেন। কিন্তু তার লাভ তাতে কিছু হোল না। আসল যে ছবি যার উপরে তিনি এঁকেছিলেন সেটাকেও ধরেছি। বৃহদাকারে বর্ধিত বা অতিরঞ্জিত করার ফলে এবং দূরস্থ বেগুনী রশ্মি বা আলট্রা-ভাওলেট রে-র তলায় পরীক্ষার পর সব ত্রুটিই ধরতে পেরেছি।

আর একটা মারাত্মক ভুল করেছেন ডকটর হার্স্ট। সেটা যে জাপানী ছবির ওপর আপনার মুখটা কেটে বসালেন তখন একবারও দেখলেন না যে দুটো ছবির মাঝে টোনাল গ্রেডেসন-এর পার্থক্য রয়েছে যেটা নির্ভর করে ফোটোগ্রাফী ছাপার কাগজের পার্থক্যের উপর এবং দুটো প্রিন্টের বয়সের পার্থক্যের উপর।

ডকটর হার্স্টকে প্রশ্ন করেছিলেম এসব বিষয়ে অনেকক্ষণ চুপ করে থেকে শেষে ধীরে ধীরে তিনি বললেন—ছবিটি তৈরী করেছিলাম মিস গ্রের উদ্দেশ্যে, তাকেই বশ্যমান করবার উদ্দেশ্যে—আপনার জন্যে তো নয়? তারপর আর অন্য কোন কথা বলেননি। যাই হোক অনেক রাত হয়ে গেল। একটু কফি খাওয়াবেন কি? প্রশ্ন করলাম এঞ্জেলাকে।

প্রশ্ন করবার উদ্দেশ্যও ছিল। দেখি মিস গ্রে অশ্রুধারায় ভেসে চলেছেন। ছেলে-মানুষের মতো ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছেন। তাকে অন্যমনস্ক করবার জন্যেই আমার এ অনুদার আব্দার। মিস গ্রে উঠে গেলেন চোখ মুছতে মুছতে—মনে হোল শীঘ্রই স্বাভাবিক হয়ে উঠবেন।

মিস গ্রে চলে যাবার পরই মিঃ আর্থার লং আর ইথেলকে জানালাম যেন তারা দয়া করে মিস থেকে নিয়ে লালবাজার আমার অফিসে দশটার সময় আগামীকাল আসেন। আমি অপেক্ষা করে থাকব। সারাদিনের ক্লান্ত দেহটাকে কোন মতে উঠালাম। ইথেল প্রশ্ন করল—কিন্তু কফি? উত্তর দিলাম—কফি হবে যখন মুস্কিল আসান হবে।' সেই রাত্রে ইথেল আর মিঃ লং এঞ্জেলার ফ্ল্যাটেই থেকে যান। তার কারণ এঞ্জেলার শক্তি সম্পূর্ণ বিলুপ্ত।

পরদিন দশটায় সময় আমার অফিসে এঞ্জেলা, ইথেল ও মিঃ লং এসে হাজির। তার অনেক আগেই ডকটর হার্স্টকে আনিয়েছি। তার চোখে কান্না নেই, শোক নেই, শুধু আছে অনুতাপের চিরবহ্নি, যা নিজেকেই ছাই করে ফেলেছে।

আমার ঘরে প্রবেশ করেই প্রথমে আঘাত পেলেন ইথেল। ডকটর হার্স্টকে ঐ অবস্থায় দেখে তিনি আত্মসম্বরণ করতে পারলেন না। অচৈতন্য হয়ে পড়লেন। দ্বিতীয় হলেন এঞ্জেলা, তিনি যে কত গভীরভাবে আহত হয়েছিলেন তার সেদিনের আচরণে বুঝতে পারলাম। হার্স্ট এর পুরু রিমলেস চশমার তলায় অজস্রধারে অশ্রুপাত সুরু হয়েছে। হঠাৎ মিস গ্রে সভায় নিবেদন করলেন, ওকে কি মুক্তি দেওয়া যায় না কোনমতে? আমি জানি ইনি এ কাজ আর করবেন না।

ফরিয়াদীর গভীর আপত্তি মামলা চালাতে এবং ফরিয়াদীর সনির্বন্ধ অনুরোধে মামলা তুলে নেওয়া হোল। ডকটর হার্স্ট মুক্তি পেলেন সে যাত্রায়। কিন্তু তারপর? তারপর আর কাজ করতে পারলেন না। অহর্নিশ অনুতাপানলে দগ্ধ হতে লাগলেন।

অনেকদিন পরে হাওড়া স্টেশনে গিয়েছি, হঠাৎ দেখা ডকটর পল হার্স্টের সংগে। আমাকে দেখে কেন যেন চমকে উঠলেন। শুধালেন, আপনি কি এখনও আমাকে অনুসরণ করছেন?

হেসে বললাম, না। আপনাকে আজ আমার কোনই প্রয়োজন নেই। সব প্রয়োজন ফুরিয়ে গেছে।

উত্তরে বললেন, চাকরী ছেড়ে দিয়েছি। পারলাম না আর। যাবো প্রথমে বম্বে, তারপর দক্ষিণ আফ্রিকায় সন্তান-সন্ততি নিয়ে। সেই শেষবারকার মত তার সংগে দেখা। মিস গ্রে, ইথেল বা মিঃ লং-এর সংগে বহু দিন দেখা হয়নি।

মনে পড়ে এ ঘটনার বহুকাল পরে ১৯৫৯ খৃঃ লণ্ডনের পিকাডিলী সারকাস অতিক্রম করে, কক্সেলিয়ার স্ট্রীট পার হয়ে লেস্টার স্কোয়ারে ঘুরে বেড়াচ্ছি। ধার দিয়ে এগিয়ে চলেছি চেরিং ক্রশ স্টেশনের দিকে। অসংখ্য বাতি, অসংখ্য আলোর মেলা, যেন চোখ ঝলসে যায়। এমন সময় হঠাৎ কে যেন আমার হাতে টোকা দিল। মুখ ফেরাতেই দেখি

মিস গ্রে! অভিবাদন করার আগেই তিনি আমার হাত ধরে টেনে নিয়ে গেলেন তার স্বামীর সঙ্গে পরিচয় করাতে। স্বামী সুশ্রী, ইংরেজ যুবক, বোধহয় এঞ্জেলারই সমবয়সী, নাম উইলিয়াম জ্যাকসন হার্ডি। লণ্ডনে গ্যাস কোম্পানীর এক উচ্চ কর্মচারী। আমার খুব ভাল লাগলো।

এঞ্জেলা প্রশ্ন করলেন, আপনি এখানে কেন? কবে এসেছেন? কি কাজ?

উত্তর দিলাম, উচ্চ শিক্ষার্থে।

প্রশ্ন করলেন, আপনারও শিক্ষার দরকার?

উত্তর দিলাম, শিক্ষার কি শেষ আছে?

এঞ্জেলা বললেন, আমার কিন্তু আপনার ওপরে একটা গভীর অভিযোগ আছে।

উত্তর দিলাম, বলুন কি?

—আপনি কফি তৈরী করতে বলে, না খেয়ে আমার বাড়ী থেকে চলে গেলেন।

—আপনি তো জানেন তার কি কারণ?

—চলুন আমরা কফি খেয়ে আসি—এঞ্জেলা বললেন। জ্যাকসন বাধা দিলেন, বললেন, এই দ্যাখো! এতদিন পরে দেখার পরও কফি? চলো ওঁকে ধরে আমরা পাব-এ নিয়ে যাই।

আমি কিন্তু তখন সম্পূর্ণ আত্মসমর্পণ করেছি।

প্রেরণা ও পরিণাম

মৈত্রেয়ী দেবী

ছাব্বিশে মার্চ সকালে খবরের কাগজ খোলবার আগেই টেলিফোন পেলাম একজন সহকর্মীর কাছ থেকে উদ্বেগব্যাকুল কণ্ঠে তিনি প্রশ্ন করলেন—"ওদের এরকমভাবে গুঁড়িয়ে মেরে ফেলবে আমরা কিছু করব না? এখুনি প্রধানমন্ত্রীকে টেলিগ্রাম করা হোক বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেবার"—সেদিনের সেই ব্যাকুলতা মনে পড়লে আজ আশ্চর্য লাগে। কেমন করে ধীরে ধীরে একটি প্রেরণার মৃত্যু হচ্ছে। বস্তুতঃ সেদিন বাংলাদেশের এই আন্দোলন, অর্থাৎ তার সংস্কৃতির স্বাধীনতা, চিন্তার স্বাধীনতা ও যুক্তিবাদের প্রতিষ্ঠার আন্দোলন এই পশ্চিমবঙ্গে আমাদের কাছে হয়েছিল একটি প্রেরণা।

গত আট বছর ধরে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি পরিষদ পূর্ববঙ্গের লেখক ও চিন্তাবিদদের জীবনে নব-জাগরণের মধ্যে এই উপমহাদেশে সাম্প্রদায়িকতার অবসান ঘটবে মনে করে তাদের লেখা নিয়মিতভাবে প্রচারের দায়িত্ব নিয়েছিলাম। কিন্তু সে প্রচার খুব ব্যাপকতা লাভ করে নি। যদিও শিক্ষিত সমাজে কিছু কিছু মানুষ পূর্ব-বাংলার ভাষা আন্দোলন ও বঙ্গ সংস্কৃতির প্রতি অনুরাগের খবর পেয়ে থাকেন, কিন্তু তার ব্যাপকতা ও গভীরতা সম্বন্ধে অধিকাংশ মানুষই ওয়াকিবহাল ছিলেন না। অনেকেরই ধারণা ছিল যে, মুষ্টিমেয় কয়েকজন মুসলমান লেখক ও ছাত্রই সাম্প্রদায়িকতার উর্ধ্বে উঠেছেন—এর কোন দূরপ্রসারী মূল নেই।

তাই ইলেকসনের অভূতপূর্ব ফলাফল ও তার পরে ইয়াহিয়া বাহিনীর নৃশংস আক্রমণের ফলে বাংলাদেশ আন্দোলনের প্রকৃত রূপ দেখতে পেয়ে এদেশের মানুষ আবেগে বিহ্বল হয়ে পড়েছিল। দীর্ঘ বিশ বৎসর ধরে দফায় দফায় শরণার্থী প্রবাহ এদেশের সাম্প্রদায়িক মানসিকতাকে ক্রমাগত খুঁচিয়ে দগদগে করে রাখছিল। জনপ্রিয়তা-সন্ধানী এদেশের বহু পত্র-পত্রিকা তাতে ইন্ধন যোগাত—অর্থাৎ যে তিক্ততা নিয়ে দেশ ভাগ হয়েছিল, তা দিনে দিনে বেড়েছে বই কমেনি। অপরপক্ষে পূর্ববঙ্গে পাকিস্তান আন্দোলন সফল হওয়া মাত্রই সেখানকার শিক্ষিত-মন অনুভব করতে সুরু করল মাতৃ ক্রোড়চ্যুত হবার বেদনা এবং দেশ ভাগ করে যে স্বাধীনতা পাওয়া গেল সে যেন 'নাকের বদলে নরুন পাওয়া'। তাই পূর্ব পাকিস্তানবাসী বাঙালী মুসলমানের অন্তরে যে বেদনা ক্রমে তাকে বাংলার তথা ভারতীয় ঐতিহ্যের প্রতি আগ্রহশীল করে তুলল প্রকৃতপক্ষে তা ধরে ফেরার আকাঙ্ক্ষা। পূর্ব পাকিস্থানী অবাঙালী মুসলমানেরা এর সরিক হতে পারল না, কারণ তারা ক্রমাগত বিশ বছর পূর্বের তিক্ততাকেই লালন করতে লাগল। বস্তুত ভারতীয় বহু হিন্দু-মুসলমানও তাদের সঙ্গে সমভাবাপন্ন। এদেশের সরকারী নথিপত্রে Secularism এর বর্ণনা থাকলেও, জনসাধারণের এক বিরাট অংশের কাছে তার অর্থ স্পষ্ট হয়নি—একথা অপ্রিয় হলেও সত্য।

এমন সময় ২৫শে মার্চের রাত্রে অসতর্ক আক্রমণে হিন্দু-মুসলমানের রক্ত মিশল বাংলাদেশে। যা ছিল বই-এর কথা মুখের কথা তা মৃত্যু-পূর্ব সজীব মূর্তি সত্য হ'ল আমাদের কাছে। বাংলাদেশের আন্দোলন তাই হল একটি মহৎ প্রেরণা। স্বকর্ণে শুনলাম স্বচক্ষে দেখলাম যাঁরা এতোদিন আমাদের হিন্দু-মুসলমানের সম্প্রীতি প্রচেষ্টাকে বিদ্রূপ করতেন, যাঁরা স্বচ্ছন্দে বলতেন—'ও জাতকে বিশ্বাস নেই'—সেটা যে তাঁদের একটা মুখের কথা মাত্র, অন্তরের কথা নয়, তা তার প্রমাণ। বাঙালীর দুঃখে বাঙালীর প্রাণে সাড়া লাগল। মানুষের দুঃখে মানুষের প্রাণ গলল—মানুষের প্রতি অন্যায়ের বিরুদ্ধে এদেশের মানুষ ও দেশের মানুষের সঙ্গে এক সঙ্গে রুখে দাঁড়াল। প্রথম দিকে এদেশে যাঁরা এলেন তাঁরা বেশীরভাগই শিক্ষিত মুসলমান। তাঁরা পশ্চিম বাংলার মানুষের কাছে সমাদর ও সম্মান পেলেন অপরিমিত। সাম্প্রদায়িকতার দূষিত আবহাওয়া যেন সমুদ্রের বাতাসে নির্মল হয়ে গেল। সীমান্তে সীমান্তে মানুষের পায়ে পায়ে সে মিলনের ধ্বনি শোনা গেল। দেখলাম যে যা পারে—ভারে ভারে জিনিষপত্র নিয়ে সীমান্তের স্থানে স্থানে ছুটেছে—ওপারের যুদ্ধরত মানুষের কাছে পৌঁছে দিতে। সে সময়ে বিশ্বাস ছিল এ যুদ্ধের অবসান ঘটবে দু'চার দিনে, ভারত সরকার দৃঢ় পদে এগিয়ে আসবেন, চণ্ডমূর্তি পাকিস্থানী চমূরে উপযুক্ত শাস্তিবিধানে এবং অল্প সময়ের মধ্যেই বাংলাদেশ তার বহুবাঞ্ছিত স্বাধীনতা পাবে। কিন্তু যতই সময় যায় এদেশের মানুষ হতাশ হয়ে পড়ে, সরকারের সাবধানী পদক্ষেপ বুঝতে পারে না, তার উৎসাহ স্বাভাবিক নিয়মে তেল ফুরান সলতের মত নিভে আসতে চায়।

ইতিমধ্যে সুরু হ'ল হিন্দুদের সুপরিকল্পিত বিতাড়ন। হাজারে হাজারে লক্ষে লক্ষে লোক প্রবেশ করতে লাগল বিভিন্ন সীমান্ত দিয়ে। বনগাঁ থেকে ২১ মাইল দূরে এমনি একটি সীমান্ত—বয়ড়া। সেখান থেকে একদিনে এক লক্ষ লোক প্রবেশ করতে দেখেছি—২১ মাইল জুড়ে পদযাত্রা এগিয়ে চলেছে মাথায় মাথায় লেগে ঊর্ধ্বশ্বাস দ্রুতগতি। ছেলেমেয়ে পর্যন্ত ছিটকে পড়েছে, কে কোথায় গেছে ঠিক নেই। একটি রোরুদ্যমান যুবতী দেখেছিলাম—শুনলাম সে ক্ষেতে কাজ করছিল, এমন সময় সুরু হয়েছে গুলীবর্ষণ। দলের সঙ্গে দিগ্বিদিগ্ জ্ঞানশূন্য হয়ে ছুটে এসেছে—ঘরে ফেলে এসেছে ঘুমন্ত শিশু। দেখেছি একটি প্রৌঢ় চাষীকে—একটি পা সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন অবস্থায়, রক্তাপ্লুত শরীরে দু'দিন ধরে গড়িয়ে এসেছে। কিন্তু তখনো তার মনোবল অক্ষুণ্ণ।

এই রকম মর্মান্তিক পরিস্থিতির মধ্যে দুর্দশাগ্রস্ত নরনারীর জন্য ভারত সরকার সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিলেন। সাহায্য করতে এগিয়ে এলো দেশ-বিদেশের নানা দুর্গত-ত্রাণ প্রতিষ্ঠান। পথশ্রান্তি, অনাহার, কলেরার আক্রমণ ও অব্যবস্থার মধ্যে বহু মানুষ মারা গেল, কিন্তু যারা বেঁচে রইল এই দুর্গতি যেন তাদের জীবনতৃষ্ণাকে আরো বাড়িয়ে তুলল।

বর্তমানে শরণার্থী শিবিরগুলিতে মোটামুটি ভাল বন্দোবস্ত হয়েছে। বৃষ্টি ও বন্যার আক্রমণ বাদ দিলে, প্রায় এক কোটি মানুষের জন্য যা ব্যবস্থা হয়েছে, তাকে ইতিহাসে অতুলনীয় বললেও অন্যায় হয় না। প্রত্যেকে নিশ্চিন্ত আশ্রয় ও দুবেলা পেট ভরে খাবার পাচ্ছে। অন্যান্য নানাবিধ প্রয়োজনীয় দ্রব্য, যেমন লণ্ঠন, বাসন, কাপড় জামা সরবরাহ করা হচ্ছে। চিকিৎসার ব্যবস্থা যা হচ্ছে তা সাধারণ কোন গ্রামবাসীর ভাগ্যে জোটে না। নানা দাতব্য

প্রতিষ্ঠানও নানাবিধ জিনিষ দিচ্ছেন। বস্তুতঃ এক কোটি ছিন্নমূল মানুষকে বাঁচিয়ে রাখার চেষ্টা চলেছে অবিশ্রান্ত। কিন্তু গাছ ঐ অবস্থায় বাঁচতে পারে না—মানুষও না। মানুষের শরীর হয়ত বাঁচে—মনের ঘটে অপমৃত্যু। বার বার শরণার্থীর ত্রাণকার্যের দ্বারা এইভাবে বহু মানুষকে মানসিক মৃত্যুর পথে এগিয়ে দেওয়া হয়েছে। এবারে কিন্তু প্রথম থেকেই ভারত সরকার বলে আসছেন—শরণার্থীরা বিদেশী, তাদের দেশ ফেরবার উপযুক্ত হলে ('স্বাধীন হলে' কথাটা ব্যবহার করেন নি) স্বদেশে ফিরে যাবেন। অন্যান্য বারের শরণার্থীদের সঙ্গে পার্থক্য এই যে, এবার হিন্দুরাও বলছেন—দেশ স্বাধীন হলে ফিরে যাব। বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গের শরণার্থী শিবির-গুলিতে হিন্দুদের সংখ্যাই বেশী। এ নিয়ে এদেশে নানা জনে উদ্বিগ্ন। কেউ বা সেই পুরাতন চিন্তার অজীর্ণ রোগে আক্রান্ত। কিন্তু বিভিন্ন শিবিরে এই পুরো পাঁচ মাস ক্রমাগত কাজ করার ফলে—বিশেষতঃ একটি পূর্ণাঙ্গ সমীক্ষার দ্বারা এ বিষয়ে আমরা নিশ্চিত যে এবারে হিন্দুরা, বিশেষভাবে একশ্রেণী মুসলমানের দ্বারা উপদ্রুত হলেও, সেটা যে পাকিস্থানী চক্রান্ত এবং পূর্ব পাকিস্থান ও বাংলাদেশ যে দুটি স্বতন্ত্র সত্তা সেটা বুঝতে পেরেছেন এবং দেশে ফিরে যাবার কথা ভাবছেন যা ইতি-পূর্বে কোন শরণার্থী ভাবেন নি। "বাংলাদেশ তাই একটি সত্য"। কিন্তু সত্যের প্রতিষ্ঠার জন্য বহু মানুষের অনলস কর্মের প্রয়োজন আছে। কয়েকজন মুক্তিযোদ্ধা গেরিলা যুদ্ধ করে সেই সত্য বাঁচিয়ে রাখতে পারে না। এদেশে যে সব বাঙালী চলে এসেছেন—কি হিন্দু কি মুসলমান—তাদের অন্তরে সেই সত্যকে জাগ্রত রাখবার উপায় কি? যাঁরা ঘনিষ্ঠভাবে এ কাজে যুক্ত আছেন তাঁরা জানেন মুক্তিযুদ্ধের এই দিকটি কত অবহেলিত। হিন্দুরা যাঁরা এতদিন পাকিস্থানে মর্যাদা পাননি তাঁরা এই সবে বাংলাদেশে যেন হারান মাতৃভূমিকে ফিরে পাচ্ছিলেন, কিন্তু ভারতের বৃহত্তর ক্রোড়ে আশ্রয় পেয়ে তাঁদের একটা নিরুদ্বেগ স্বাচ্ছন্দ্য এসে পড়া অসম্ভব ত নয়ই বরং স্বাভাবিক। তাছাড়া কর্মহীন জীবনে কোন প্রেরণা রক্ষা করা অসম্ভব। এই এক কোটি মানুষের মধ্যে সুস্থ-সবল স্ত্রীপুরুষ কেবল অন্ন চিন্তায় দিন কাটাচ্ছে, ভুয়া কার্ড হচ্ছে এবং প্রত্যেক ক্যাম্পের নিকটে চাল-ডাল বিক্রী হচ্ছে। অর্থের প্রয়োজনীয়তা এত বেশী যে আত্মীয়স্বজনের মৃতদেহ কেউ সনাক্ত করে না পাছে রেশান কার্ড কাটা যায়। এই অবস্থাটা খুব স্বাভাবিক। পূর্বে যে সব শরণার্থী এসেছিলেন, সরকার তাদের বিভিন্ন খাতে টাকা দিতেন—যেমন মেয়ের বিয়ের জন্য ২০০ টাকা করে দেওয়া হত। শুনেছি একটি মেয়ের বহুবার করে বিয়ে দেখান হয়েছে। উপকার করতে গিয়ে এই ধরনের সামাজিক ব্যাধি সৃষ্টি করার দৃষ্টান্ত সরকার এবং রাজনৈতিক দল উভয়ই দেখিয়েছেন। কিন্তু এবার ব্যাপারটা অন্য-রকম। এবার ওরকম হলে যা অনিবার্যভাবে ঘটছে ও ঘটবে তা হচ্ছে একটি মহৎ প্রেরণার মৃত্যু। শুনছি দেশ-বিদেশে ভারতের প্রশংসা হচ্ছে এভাবে এক কোটি মানুষের দায়িত্ব নেওয়াতে। কাজটা প্রশংসনীয় হলেও এর পরিণতি ভয়ানক। আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতায় আমি দেখছি—ইতিমধ্যেই একটা নিশ্চিন্ত নির্লিপ্ততা সৃষ্টি হয়েছে। যেন, "এমনি করেই যা যদি দিন, যাক না।" ইতিমধ্যেই কেউ কে Citizenship পাবার জন্য দরখা সুরু করেছেন। এরই প্রমাণ ক্যাম্পে ক্যাম্পে পূজার আয়োজন। মুক্তিযোদ্ধার রক্তনদী পাশে দাঁড়িয়ে, কি করে সেই দেশবাস পূজার সমারোহ করলো তা বুঝতে পা না। প্রশ্ন জাগে "বাংলাদেশ" যদি এই এ কোটি লোকের জীবনে, চিন্তায়, ক জীবন্ত হয়ে না ওঠে তা হলে যে সাড়ে ছ কোটি মানুষ উৎপীড়ন সহ্য করে দেশে ভিতর যুদ্ধ করে চলেছে তাদের সঙ্গে

বাগদা স্কুল / সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি পরিষদ ক্যাম্পে স্কুল চলছে

এরা মিলবে কি করে? এই মেলাবার দায়িত্ব কার? বাংলাদেশের যে সব নেতৃবৃন্দ এপারে রয়েছেন, যে সব বুদ্ধিজীবী বা শিক্ষিত সম্প্রদায় বিশেষভাবে এই দায়িত্ব বহন করার উপযুক্ত তাঁরা যথোচিতভাবে এগিয়ে এসেছেন একথা বলতে পারি না। ভারতে আশ্রিত বাংলাদেশবাসীর শরীররক্ষার দায়িত্ব ভারত নিলেও, তাঁদের মন ও চিন্তাকে জাগ্রত, উদাত্ত ও দেশাভিমুখী রাখবার দায়িত্ব বর্তেছে বাংলাদেশের শিক্ষিত মানুষের উপর। ক্যাম্পে ক্যাম্পে যে ক্লিন্ন পরিবেশ শরণার্থীরা নিজেরাই সৃষ্টি করে—নিজেরাই দুর্গত হচ্ছেন, তাঁদের সেই অবস্থা থেকে রক্ষা করবে কে?—কেইবা শরণার্থী জীবনের বহুবিধ গ্লানির আক্রমণ রোধ করবে—যাতে তাঁরা একদিন স্বাধীন বাংলার উপযুক্ত নাগরিক হয়ে ফিরে যেতে পারে? এইত সুযোগ ছিল যখন এক এক জায়গায় যূথবদ্ধভাবে অনেক মানুষকে পাওয়া গেল। "Communitylife" গড়ে তোলবার উপযুক্ত ক্ষেত্র এখনই তৈরী আছে। স্বাধীনতার প্রস্তুতি কেবল অস্ত্রেই নেই—সমাজের সর্বস্তরে বহুবিধ কর্মের মধ্যে সদা সচেষ্ট না থাকলে তা বিফল হয়। স্বাধীনতার প্রাক্কালে ভারতেও বহু নেতা তা বিস্মৃত হয়েছিলেন এবং তারই ফলে আজ আমরা ভুগছি।

শিবির ছাড়াও যেসব শরণার্থী শিল্পী-সাহিত্যিক স্বদেশে স্বাধীনতা আন্দোলনে নিঃসংশয় নিষ্কলুষতার সঙ্গে এগিয়ে-ছিলেন তাঁরা আজ এই দেশে বণিকবৃত্তি-পরায়ণ সাহিত্যশিল্পের ছোঁয়াচে কতটা শুদ্ধ থাকতে পারবেন সে বিষয়ে সন্দিহান হবার কারণ রয়েছে। বাংলাদেশের নব-উদ্ভূত দেশপ্রেম কেন আমাদের দেশেও একটি মহৎ প্রেরণা হতে পারত তার একটি বাস্তব দৃষ্টান্ত আমার মনে পড়ছে। মে মাসের শেষের দিকে যখন সব শিল্পী-সাহিত্যিকরা দলে দলে চলে আসছেন বনগাঁর একটি শিবিরে আমার সঙ্গে ঘুরেছিলেন বাংলাদেশের একটি প্রসিদ্ধ গায়ক। তিনি কথা প্রসঙ্গে বিস্ময় ও বেদনার সঙ্গে আমাকে বললেন—"আপনাদের দেশে দেখছি রবীন্দ্রসংগীত গান করে লোকে মোটা মোটা টাকা পায়। রবীন্দ্রসংগীত গান করে টাকা রোজগার আমরা চিন্তাও করতে পারি না। রবীন্দ্রসংগীত আমাদের সংকল্পে স্থির রাখে, মর্মবোধ জন্মায়—তাকে নিয়ে ব্যবসার করবার কথা আমরা ভাবতেও পারি না। রবীন্দ্রসংগীত গাইবার জন্য কেউ টাকা দিতে চাইলে আমরা অপমান বোধ করি।" পশ্চিমবঙ্গে এই মনোভাব ক'দিন টিঁকিয়ে রাখা সম্ভব হবে? যে দেশে সাহিত্য সুলভ পণ্যে পরিণত রবীন্দ্রসংগীত যেখানে ব্যবসায়ের মূলধন, রবীন্দ্র জন্মোৎসব তথৈবচ? এর উপরে আছে দেশ বিদেশের হিতকারী গোষ্ঠী যারা নানা উদ্দেশ্যে দু' হাতে টাকা ছড়িয়ে সংস্কৃতি বাঁচাতে এসেছে। মানুষের দুর্দশার মুহূর্তে প্রলোভনের জাল বিস্তার করে এরা একটি মহৎ প্রেরণার মৃত্যু ঘটাবে। যাঁরা আজ ভারতে শরণার্থী তাঁদের মধ্যে দুটি জাত সৃষ্টি হচ্ছে—এক জায়গায় পড়ে আছে চরম নৈতিক ও কায়িক দুর্গতিতে বহু মানুষ শিবিরে শিবিরে, আর যারা ৫০০।৬০০ টাকা বাড়ী ভাড়া দিতে সমর্থ। ফলে দুই স্তরেই বিপদ ঘটবে। যারা বাংলাদেশের মধ্যে গিয়ে প্রাণ দিয়ে লড়ছে তাদের সঙ্গে সংযোগের সেতু সীমান্তে নানা বিধ কর্ম পরিকল্পনার মাধ্যমেই তৈরী হতে পারে। ভারতের স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় যে প্রেরণা জেগেছিল, পরে সেই প্রেরণার অন্ত্যেষ্টি আমরা দেখেছি। যে গান্ধী খৃস্টের মত মৃত্যু বরণ করলেন তাঁরই নামে গান্ধী টুপি পরে চলল নানান দুষ্কর্ম।

এক অত্যাচারী প্রবঞ্চকের হাত থেকে অন্য প্রবঞ্চকের হাতে পড়ায় মুক্তি নেই, এবং শিকলগড়ার কারখানা আমাদের প্রত্যেকের মধ্যেই রয়েছে।

আজ শিবিরে শিবিরে অকর্মন্য অলস নিরর্থক জীবনে যাঁরা কয়েক মাস ধরে নীচের দিকে নামছেন তাঁদের খুব পাশে গিয়ে দাঁড়ানোও এই বিপদ থেকে রক্ষা করাই সংস্কৃতিকে বাঁচানো। বিশ্ববিদ্যালয়ে বা প্রেক্ষাগৃহে এখন তা হবার নয়। যুদ্ধের এটা একটি প্রয়োজনীয় অঙ্গ।

বাংলাদেশে যুদ্ধ জয় হবেই। কিন্তু যাঁরা দেশত্যাগ করতে বাধ্য হয়েছিলেন তাঁরাও যেন বিজয়ীর শোভাযাত্রায় যোগ দিতে পারেন, সে বিষয়ে হিতৈষী সকলেই যেন সচেষ্ট থাকেন।

অবহমান কাল

অসীম রায়

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

বিরাট রুই মাছের মুড়োর ঘণ্ট তদারক করতে স্বর্ণসুন্দরী উঠে যান রান্নাঘরের দিকে। জামাইয়ের জন্যে আউটহাউসে মুর্গী রান্নারও ব্যবস্থা হয়েছে। মায়ের সংগে সংগে বড়মেয়ে উঠে পড়ে। গৌরী আস্তে আস্তে বললে, 'আপনি দিদিকে অমনভাবে......

সত্যি কথা বলার সৎসাহস আমার আছে গৌরী। তা ছাড়া কেন বলব না। আমার সংগে আমার স্ত্রীর মানসিক কোন যোগাযোগ নেই। কিচ্ছু না।'

গৌরীর সুন্দর মুখখানায় আতংকের ছায়া পড়ে। সে বুঝতে পারে এবার কথার মোড় কোনদিকে নেবে। এবং সেদিকেই নেয়। মদন বললে, 'এই যেমন ধরো তুমি। তোমাকে যে আমি ভালবাসি তার জন্যে তোমাকে তো সাতপাক দিতে হয়নি। 'আমাকেও টোপর পরতে হয়নি।'

'আস্তে, মদন-দা আস্তে!'

'আস্তে কেন? এ ব্যাপারে হেস্তনেস্ত হয়ে যাওয়া ভাল। আমি ওসব মেয়েলি ন্যাকামী পছন্দ করি না। তুমি আমাকে সোজাসুজি বল, তুমি ভালবাসো কি না, বল। তুমি যা বলবে আমি মেনে নেব।'

কিছু বলবার জন্যে গৌরীর পাতলা ঠোঁট দুটো কেঁপে উঠল। কিন্তু তার মুখ থেকে কিছু ফুটবার আগেই মদন বললে, 'তোমাকে কিছু বলতে হবে না। আমি জানি। আমি জানি তুমি আমাকে ভালবাসো। তোমার ভয় হচ্ছে তোমার দিদির সংসার ভেঙ্গে যাবে, বেনুর ভবিষ্যৎ নষ্ট হবে। এইসব ভাবছো। এইগুলো তো বাইরের কথা। এগুলোর সামনে আমরা দাঁড়াব কিন্তু অন্যভাবে। তুমি তো আমাকে ভালবাসো, এ ব্যাপারে তুমি নিজে আরও শক্ত হও। শুধু খুকী হয়ে থেকো না। আমাদের দেশের বেশীর ভাগ স্ত্রীলোক মানেই খুকী অথবা বুড়ী। তুমি এই দুটো টাইপ থেকে আলাদা হও।'

গৌরী এই কথার ঝড়ের সামনে স্তব্ধ হয়ে বসে থাকে। সে বুঝতে পারে না এটা ভালবাসা কি অন্য কিছু। কিন্তু যখনই নির্জনে মদন তাকে নিয়ে বসে এবং এইরকম কথা বলে তখনই তার বুক কাঁপে, ভয়ে উদ্বেগে অথচ এক অভূতপূর্ব আকর্ষণে। আর সবচেয়ে বড় কথা, মদন তা জানে। মদন জানে যে গৌরীকে ডাক দিলেই তার কাছে চলে আসবে। এই অসহনীয় আকর্ষণের অদৃশ্য দড়িটা বারে বারেই ছিঁড়তে চেয়েছে গৌরী গত কয়েকমাস ধরে, কিন্তু বারে বারেই জড়িয়ে পড়েছে। গৌরী মাথা নীচু করে থাকে। তার বুক তোলপাড় করে। হাতের মুঠো শক্ত করে বলে 'আমি বাবা-মা-র বিরুদ্ধে কিছু করতে পারব না।'

'কাওয়ার্ড, ইউ আর এ কাওয়ার্ড!' মদন চাপা গর্জন করে। সেই খুকী, সেই এম-এ পড়া খুকী। আচ্ছা, আমাদের দেশটা কি চিরকাল এরকম থাকবে?'

'আমাদের দেশের ছেলেমেয়েরা সব সময় বড় বড় কথা বলবে। অথচ কাজের বেলায় অষ্টরম্ভা। নিজের মনের কাছে কি জবাবদিহি দেবে গৌরী? না, তার কোন প্রয়োজন মনে কর না? একে কি বলে জানো? ম্যাসোচিজম্। নিজের পিঠ কুঁড়ে একরকম আনন্দ আছে না, সেই রকম। আচ্ছা, দেখো, আমি কি রকম পারিবারিক যূপকাষ্ঠে বলি! স্ক্যাণ্ডালাস্!'

গৌরী পাথরের মতো বসে থাকে। স্বর্ণসুন্দরীর পায়ের শব্দ পাওয়া যায়। চিকেন কাটলেট-টা ঠিক তোমার মনের মতো হবে না, বলে দিচ্ছি।' আসতে আসতেই বললেন।

'বেশী পুর দিয়ে দিয়েছে বোধ হয়। সেরেছে।' মদন জবাব দেয়।

পরদিন সকালে ছেলেদের শোবার ঘর থেকে একটা আওয়াজ খুব ঘন ঘন উঠতে থাকে। 'আজকে কী? চার্মর্চি!' বারে বারে লাইনটা উঁচু নীচু খাদে উঠতে থাকে। 'কান একেবারে ঝালাপালা করে দিলি।' বুড়ী চেঁচিয়ে ধমক দেয়।

বাইরে দুটো গাড়ি এসে লেগেছে। সামনে সুধীরের চকোলেট রংয়ের বিরাট ফোর্ড গাড়ি। পেছনে আর একখানা বাদামি শেভ্রলে।

সুধীরদা, আপনি একশো মাইল তুলতে পারবেন?' চোংগা জিজ্ঞেস করে।

সুধীর ভবনাথের সংগে লনে বেড়াচ্ছিল শীতের রোদ্দুরে। টুটুল কাছে এসে আস্তে আস্তে বললে, 'আমি কিন্তু আপনার পাশে বসব।'

চোংগা বললে, 'আমিও।'

'তোমার কি মনে হয় চায়ের শেয়ারের দাম উঠবে? বাজারের যা অবস্থা তাতে তো কেনার কথা ভাবতেই ভয় করে, ভবনাথ বললেন।

'আমি বলছি মেসোমশাই আর দুতিন বছরের মধ্যেই চড় চড় করে দাম উঠবে। আমরা কিনছি, আপনাকেও বলছি। কয়েকটা বাগানের নাম করে দিচ্ছি সেই সেই কোম্পানির কিনবেন।'

'প্রতাপটার জন্যেই সব চলে যাচ্ছে।'

'কেস, করে কিনুন।'

'আমার গরম জল হয়েছে?' গৌরীনাথ? ওপরতলা থেকে মদনের হাঁক আসে। কিছুক্ষণ পরেই একটা একটা করে মাল গাড়িতে তোলা হয়। খাবারের ঝুড়ি, চায়ের সরঞ্জাম, সুটকেশ, ট্রাঙ্ক, ছোট বেডিং।

'মাসীমা কি বিদেশ যাচ্ছেন নাকি?'

স্বর্ণসুন্দরী বারান্দায় আসতেই সুধীর বললে।

'বড় বেডিংটা তো নিলাম না।'

'বেডিং নেবার কোন দরকার নেই। বলেই তো দিলাম মাসীমা। বাগানে সব পাবেন।'

বুড়ী এসে মায়ের পাশে দাঁড়াল। পানুদা পর্বের পরে বুড়ী কিছু বিশেষ

পার্ল্টারনি। ঘাড় কাত করে দাঁড়াবার দৃপ্ত ভঙ্গী সে আয়ত্ত করেছে, তার অন্যান্য দুবোন থেকে তা আলাদা। কলার তোলা কমলালেবু রংয়ের সোয়েটার আর খাটো নীল স্কার্টের সঙ্গে সাদা হাই হিল তোলা জুতোয় সে একটু করো কমলা-নীল-সাদা পাথরের দীপ্তিতে ঝলকায়। সুধীরের দিকে স্থির দৃষ্টিতে এমন ভাবে তাকায় যেন তা শত্রুপক্ষ পর্যবেক্ষণ। পানুদা যে হাওয়ায় কর্পূর হল তার কারণ সুধীরদা। সুধীরদা কোন ট্যাঁফো করবার অবকাশ দেয়নি, ভাল ভাবে বিদায় নিতে পারেনি পানুদা, (গলার কাছে একটা ব্যথা নড়েচড়ে ওঠে বুড়ীর)। পানু-দাকে লোকটা গিলে ফেলেছে। তারপর সে আরও টের পায় লোকটার ঘন ঘন আগমন, তার মায়ের উৎসাহ এ সমস্ত ব্যাপারের পেছনে দিদি আছে। এই গোপন কথাটা হাবেভাবে প্রকাশ পেয়েছে, বুড়ীর কাছে ঢাকা পড়েনি। বুড়ী আরও একবার চকোলেট রংয়ের ফোর্ড গাড়ীখানার পাশে লম্বা পাজামা-পাঞ্জাবীপরা লোকটার দিকে চেয়ে ঠোঁট চাটে। বলাই একবার বলেছিল না তাঁর মাকে যে মা আঁচে বাঘ ধরে, বুড়ীও তা পারে। মৃদু হাসির রেখা তার মুখের কোণে জেগে মিলিয়ে গেল। সোজা পায়ে নেমে এসে সুধীরের চোখের দিকে স্থির দৃষ্টিতে চেয়ে বলে, 'আমি আপনার গাড়িতে যাব।'

সুধীর অবাক হয়ে মেয়েটিকে লক্ষ্য করে, ঠিক এলেবেলে নয়। এক মুহূর্তে মনে আসে পানুর আত্মপক্ষ সমর্থনে মরীয়া যুক্তি। 'আমি প্রথমে কিছু করিনি, সুধীরদা। ঐ আমাকে...।'

'বেশ তো, অনেক জায়গা আছে।'

এবার গৌরী কমলার পেছনে পেছনে আসে। লাল জংলা সিল্কে ঝলমল করে। মাথায় সাদা বুটিদার নীল সিল্কের স্কার্ফ, চোখে গগলস্। তার ফর্সা খেলোয়াড়ি হাতে ব্যাগটা ঝোলাতে ঝোলাতে যখন শীতের রোদ্দুরে ঢালা সিঁড়ি দিয়ে নামে তখন সুধীর সেদিকে চেয়ে চোখ ফেরাতে পারে না। প্রবল আকর্ষণে আকৃষ্ট সুধীর একটু যে না ঘাবড়ায় তা নয়। চা বাগানের বাংলোর বারান্দায় বসে বসে দূরে নীল পাহাড়ের গা থেকে গড়িয়ে-নামা চায়ের ঝোপের সারির ওপর সাদাটে শুকনো এক-হারা গাছগুলোর দিকে চেয়ে চেয়ে বিকেলের পর বিকেল কাটানো কি তার পক্ষে সম্ভব হবে?

পেছনে কমলা একেবারে বৈপরীত্যের ছবি। ভীষণ আত্মসচেতন, কাঁচুমাচু। সে যে আজ একটু সেজেছে, মানে নীল জর্জেট পরেছে, একটু হাল্কা করে লিপস্টিকও লেপেছে ঠোঁটে তা যেন অাকাশ মানুষের দ্রষ্টব্য। তার স্বাভাবিক শান্ত বিষাদ-ভরা চেহারাখানা লাজুক হাসিতে ঢেকে তাড়াতাড়ি নামতে গিয়ে জুতোতে ঠোকর খায়। প্রায় পড়েছিল আর কি! গৌরী হাত বাড়িয়ে ধরে ফেলে।

'কি যে করো! সবটাতে তাড়াহুড়ো। মেয়েকে স্কুলে পাঠাচ্ছো না কি!'

গলা উঁচু সাদা পুরোহাতা বিলিতি পুলওভার পরা বেঁটে লোকটা দরজা থেকে বেরিয়েই চড়ুই পাখীর মতো তড়াক তড়াক করে লাফিয়ে লাফিয়ে এগোয়। 'খবোস-টা এনেছো গৌরী, তুমি আমাদের সঙ্গে এসো। আমার রাগ-টা খুলে দিয়েছেন তো মা? বুড়ী, বুড়ী, মাই ডার্লিং।'

কৌতূহলী সুধীর এই আদা তামাটে চড়ুই পাখীটার দিকে চেয়ে মজা পায়। বলে, 'আপনি স্যার আমার গাড়িতে আসুন।'

'চলুন, চলুন। আমরা একবার ব্ল্যাক ফরেস্টে গিয়েছিলাম ক্লাউ কুরেগারের সঙ্গে। বাব্বাঃ সে কি পার্টি! সারারাত ধরে হোটেলে নাচগান। ওরা যেমন কাজও করতে পারে, ফুর্তিও করতে পারে।'

সব মাল দুটো গাড়িতে তোলা হলে গোপীনাথ হাজির হয়। ধোকড় পুরনো মেটে আলেস্টার (বোধহয় কমলার ছিল) তার বেঁটে শরীরটা এমনভাবে ঢেকেছে যে তার খাটো ধুতি মালুম হয় না। পায়ে বাবুর পুরনো বুটজুতো, হাতে টিফিন কেরিয়ার। স্বর্ণসুন্দরী হাঁকলেন, 'মদন, তুমি আমার পাশে এসে বসো, তোমার জার্মানীর গল্প শনতে শুনতে যাব।'

মদন উৎসাহিত হয়ে শাশুড়ীর পাশে বসে। স্বর্ণসুন্দরী চোখের ইসারায় গৌরীকে সামনের গাড়িতে উঠতে বললেন। দুটী শাশুড়ি এবং সামনের সীটে শ্বশুর মশাই থাকাতে মদন কেমন থমথমে মেরে যায়। বুড়োর দলে ভিড়ে তারও বয়স বেড়ে গেছে আর ভারতবর্ষে তারুণ্যের কোন দাম নেই এই ধরণের আলটপকা চিন্তায় বিষণ্ণ বোধ করে।

সামনের তিস্তার ধু ধু বালি। বিচালি বিছানো পথে নীচু গীয়ারে কোঁ কোঁ করে গাড়ি দুটো তিনশো মাইল পার হবার পর ঝকঝকে নীলচে পাহাড়ী জলে পাটাতন-ফেলা দুখানা বজরা। গাড়ি দুটো যখন তাতে তোলা হয় তখন অনেক দূরে ছেড়ে আসা ওপারে একটা নির্জন খেজুর গাছের দিকে চেয়ে চোখে বুড়ীর সমস্ত মনটা টলমল করে ওঠে। তারা তখন নৌকোর পাটাতনে দাঁড়িয়ে। চোঙা বুড়ীকে কিছুক্ষণ লক্ষ্য করছিল। কাছে ঘেসে বললে, 'তুই কি ভাবছিস বুড়ী বলে দেব?' তারপর বুড়ীর জবাবের অপেক্ষা না রেখেই আঙুল দেখিয়ে বলে, 'ঐ খেজুর গাছটা, না রে?'

'ভাগ!' বুড়ী আবার তার সীটে গিয়ে বসে।

তিস্তার ওপারে পড়েই গাড়ি হু হু করে ছোটে। চমৎকার ডুয়ার্সের রাস্তা শীতের রোদ্দুরে ঝকঝকে ফাঁকা। এক-আধটা লরী যায় কয়লা নিয়ে চা বাগানের দিকে, উল্টো দিক থেকে কখনও কখনও ছুটন্ত প্রাইভেট গাড়িতে লাল মুখ। দু-তিন ঘণ্টার পর জঙ্গল শুরু হয়। ঘন সবুজ মোটাগুঁড়ি দীর্ঘ শালের সমারোহের মধ্যে দিয়ে গাড়ি ছুটতে থাকে। উৎসাহে চোঙা চীৎকার করে, 'আরও জোরে, সুধীর-দা, আরও জোরে।' উৎসাহে গৌরীও সামনের দিকে ঝুঁকে পড়ে। স্পীডোমিটারের কাঁটা লাফিয়ে লাফিয়ে ওপরে ওঠে। বাইরে মাইলবাট বনজঙ্গল কাল-ভার্ট টেলিগ্রাফের তার শুধু সাদা লাগে। সেভেন্টি, সেভেন্টি, সেভেন্টি-ফাইভ এইট-টি। এইট-টি হয়েছিল সুধীরদা?' সুধীরের জন্যে আশী মাইল স্পর্শ করেই নামতেই থাকে কাঁটা। সামনে কালভার্ট, নদী, খাট, গেহে পঞ্চাশে ছোটে। উৎসাহে-উদ্দীপনায় বুড়ী গৌরী টুটুল সবাই সোরগোল তোলে। আশী মাইল গতিতে তারা ছুটেছিল এই কৃতিত্বের শরিক তারা সবাই এ রকম মনোভাব তাদের চীৎকারে হাসিতে কথাবার্তায় প্রকট। বুড়ী তো প্রায় সুধীর-দার প্রেমে পড়ো পড়ো। স্টিয়ারিং হুইলের পেছনে এক সমাহিত যৌবনের প্রতিমূর্তির মতো সুধীরদা, তার পাশে পানু-দাকে অনেক ফিকে লাগে। পানু-দাকে কখনও ভাবাই যায় না এই রকম ভূমিকায়, পানু-দা যেমন সব সময় মুগ্ধ দৃষ্টিতে তার দিকে তাকিয়ে আছে। বিশেষ করে এই শাল পাইনের সমারোহে। এই শীতের উজ্জ্বল সকালে পানু-দাকে আবার ফিরে পেলে কেমন হত? এ রকম চিন্তা কাঁটার মতো বুড়ীকে বেঁধে, কিন্তু বুড়ী টের পায় সে ব্যথা অনেক ভোঁতা হয়ে এসেছে কয়েক মাসে। আর বোধহয় কয়েক মাস গেলে সেটা কেবল বাল্যকালের ঘটনা হয়ে থাকবে এ রকম আন্দাজ করতে পারে।

গৌরীও মাঝে মাঝে চোখ ফেরায় সুধীরের দিকে। সে যে খুব একটা আকর্ষণ বোধ করে তা নয়। বলতে কি, মদনের প্রতি তার আকর্ষণ এখনও অটুট কিন্তু সে আকর্ষণের ফলাফল ভাবতে তার মাথা ঘোরে। গত দু তিন বছরে ব্যাপারটা খুব পেকে উঠেছে। বিশেষ করে জার্মানী থেকে প্রত্যাবর্তনের পরই মদন তার এই শালীর মধ্যে ইউরোপীয় নারীর মানসিকতা ক্রমশঃ আবিষ্কার করতে থাকে। কিন্তু গৌরী বুঝতে পারে এটা শুধু মদনের তাত্ত্বিক আকর্ষণ নয় (যা সে প্রায়ই বোঝাতে চায়)। সে যদি তার দিদির মতো দেখতে সাদামাটা হত তাহলে কি মদন তার মধ্যে কোন নতুন মানসিকতা খুঁজে পেত? এ প্রশ্ন গৌরী নিজেকে মাঝে মাঝে করে। কিন্তু মদন এখন এমন খেপেছে যে বোধহয় আর বেশীদিন ব্যাপারটাকে গড়াতে দেওয়া যাবে না। তাছাড়া নিজের ভবিষ্যৎ একেবারে ভুললে কেমন করে চলে? যদিও ভবিষ্যৎহীন প্রেমের আবর্তে পাক খেতে খেতে গৌরীর এতদিন মনে হয়নি সে কথা। সবচেয়ে তার অবাক লাগে তার দিদির কথা ভেবে। দিদি তার মা-কে বলেছে সব কথা, এটা স্বর্ণসুন্দরী তাকে আঁচ দিয়েছে। কিন্তু দিদি কেন তাকে ভয় করে? কেন ব্যাপারটা এস্পার-ওস্পার করে ফেলে নি এতদিন? এজন্যে দিদির প্রতি করুণা জাগে। কেমন এক ভারী অব্যক্ত বেদনার রূপ হয়ে দিদি ঘুরে ফিরে বেড়ায়, কিন্তু তাকে কিছু বলবার সাহস সঞ্চয় করতে পারে না, শেষে মা-কে সেকাইত করে একটা সীন করেছে। এখন সমস্ত ব্যাপারটা থেকে গৌরী পালিয়ে যেতে চায়

আর তা যদি সম্ভব হয়, সুধীরের হাত ধরে তাহলে তাই করবে।

দুপুর গড়িয়ে এলে তারা লাটাগুড়ি জঙ্গলে এল। বড় রাস্তা ছেড়ে সুধীর যখন গাড়ি নিয়ে ছোট রাস্তা ধরে জঙ্গলের ভেতরে এসে পড়ে তখন চারপাশের নৈঃশব্দ্য অন্ধকার এবং ঠাণ্ডা গাড়ির ভেতর কথাবার্তা চীৎকার থামিয়ে দেয়। পাক খেয়ে খেয়ে গাড়ি এগোতে থাকে, তারপর খোলা এক জায়গায় এসে থেমে যায়। স্বর্ণসুন্দরী নেমেই হাঁক দেন, 'গোপীনাথ, স্টোভ ধরাও।'

সুধীর ও স্বর্ণসুন্দরীর মানা সত্ত্বেও ছেলেরা এদিক ওদিক ছড়িয়ে পড়ে। ভবনাথ মোড়ার ওপর বসেছেন। তাঁর প্রায় গায়েই আঁকড়-মোড়া বিশাল শালের গুঁড়ি। এ অঞ্চলের গাছগুলোর গুঁড়ি দুটো লোকের হাতের বেড় থেকেও বড়। সেই ঋজু, পঞ্চাশ ষাট বছরের অটুট শান্তির ছবির দিকে চেয়ে চেয়ে ভবনাথ আনমনা হয়ে পড়েন। বস্তুত তিনি তাঁর শক্তির শিখরে। গত দু' বছরে স্বাস্থ্যটা অনেকখানি ভেঙেছে। এখন আর টি-এ বিলের জন্যে তাকিয়ে থাকতে হয় না। চাকরী জীবনেও লক্ষ্যে পৌঁছে গেছেন। পাবনা বাড়ির অংশের খাঁই খাঁই এখন শান্ত। ভাইপো ভাগ্নেরা গড়িয়ে গড়িয়ে একটা জায়গায় এসে দাঁড়িয়েছে, আর ও ব্যাপারে তাঁর আকর্ষণও ঢিলে। কাজেই সাংসারিক ঝামেলা থেকে তিনি মুক্ত। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে তিনি নিজেকে দেখতে পান যেন [illegible]

প্রতাপশালী। তিনি চলে পড়ছেন তাঁর সমস্ত বৈভব সত্ত্বেও যেমনভাবে তাঁর প্রতাপশালী বাবা অস্তে গেলেন। ভবনাথ এই বিষণ্ণ চিন্তা থেকে নিজেকে জোর করে ছাড়াবার চেষ্টা করেন। একটা কাঠবেড়ালী অর্কিড মোড়া গুঁড়িটার গা বেয়ে নেমে ঠিক তাঁর মোড়ার সামনে দুপা তুলে তাঁকে কিছুক্ষণ লক্ষ্য করে জঙ্গলের পথ ধরে মিলিয়ে যায়।

গৌরীর দিকে চেয়ে ভবনাথ বললেন, 'বাজনা নিয়ে এসেছিস ?'

গোপাল মাস্টারের কাছে শেখা বিদ্যেটা গৌরী এখনও ছেড়ে দেয়নি। গাড়ি থেকে বেহালার বাক্স বেরোয়। তারপর গোপাল-মাস্টার যেভাবে শিখিয়েছিল তেমনি চিবুকে যন্ত্র লাগিয়ে গৌরী রবীন্দ্রসঙ্গীত বাজায়, 'হে ক্ষণিকের অতিথি, এলে প্রভাতে কারে চাহিয়া/ঝরা শেফালির পথ বাহিয়া।'

মন্দ লাগে না, পিংসিকাটো দিয়ে বেহালায় রবীন্দ্রসংগীত ভবনাথের পিপাসিত কানে আরাম দেয়। তিনি তাঁর চারপাশে এই রকম সামান্য আরাম চেয়ে এসেছেন সারা জীবন, তার বেশী কিছু চান না। তাঁর বাপের আদর্শবাদ, পৌরুষের পরীক্ষা তাঁর পছন্দ নয়। এমনকি পারিবারিক খ্যাঁচগুলোও তিনি ভুলে থাকতে চান। তাঁর জামাইয়ের ব্যাপারটা নিয়ে স্ত্রী কয়েকদিন তাঁকে খুঁচিয়েছেন, সোজাসুজি মদনকে ধমকে দিতে বলেছেন কিন্তু তিনি বিশেষ গা করছেন না। বয়স্ক লোক নিজেরা বুঝতে পারবে। মদন যদি নাও পারে, গৌরী পারবে। গৌরীর হাতে ছড়ের ওঠা-নামা দেখতে দেখতে মনে হয়, সে নিশ্চয় এ ব্যাপারটা থেকে বেরিয়ে আসতে পারবে। আর গৌরীও বাজাতে বাজাতে এক আধবার তার বাপের দিকে চোখ তোলে। এবং চোখ তুলে বুঝতে পারে। এতদিন মনের মধ্যে যে ইচ্ছেটা নড়ে-চড়ে বেড়াচ্ছিল, সেটা যেন বেহালা বাজাতে বাজাতে তার আঙুলের মধ্যে দিয়ে এসে এক জায়গায় জমা হয়। আর ব্যাপারটাকে গড়াতে দেওয়া যাবে না—না! হঠাৎ বাজনা বন্ধ হয়ে যায়।

'আর বাজাবি না ?'

'নাঃ।'

খিদের মাত্রা এমন বেড়ে গিয়েছিল যে, কড়াইশুঁটির ঘুগনি আর ডিম ভাজা কম পড়ে গেল। স্বর্ণসুন্দরী বেশী করে মুড়ি দিয়ে মেখে ম্যানেজ দিলেন। বুড়ী চেঁচিয়ে উঠল, চোঙা তার আধখানা ডিম খেয়ে ফেলেছে। তারপর সুধীরদা কি ভাববে এসব কথা না ভেবেই খপ করে এক মুঠো ঘুগনি চোঙার ডিশ থেকে তুলে নিলে। মারামারি বেধে যেত, তবে স্বর্ণসুন্দরী এক হাতা ঘুগনি দিয়ে চোঙাকে শান্ত করলেন। চোঙা বললে, সে ভালুক দেখেছে। 'কালো, রোঁয়া, রোঁয়া।'

'ওটা কুকুর চোঙা, এঁটো খাবার জন্যে এসেছে', সুধীর বললে।

'আপনি সেটা দেখেননি। নির্ঘাত ভালুকের বাচ্চা!'

চা খাবার পর যখন আবার সাজসরঞ্জাম তুলবার পালা তখন ছেলেমেয়েরা এদিক-ওদিকে ছিটিয়ে পড়ে। সবচেয়ে এগিয়ে যায় টুটুল। একটা বাঁক নিতেই সে সকলের থেকে আলাদা অদ্ভুত জগতে এসে পড়ে। একটানা ঝিঁঝি ডাকছে। দিনের বেলাতেও রোদ এসে পড়েনি। একদিকে কতগুলো পাইন, গা ভর্তি ঝুলন্ত মসের দাড়ি নিয়ে চুপচাপ। ঠাণ্ডা ভেজা এক খয়েরি সবজে অন্ধকারে একলা একলা দাঁড়িয়ে তার গা শির শির করে। এখানে যেন কোনদিন কোন মানুষের পা পড়েনি, এইরকম আবিষ্কারের শিহরণে টুটুল স্তব্ধ হয়ে থাকে। তারপর হঠাৎ চমকে ওঠে। খুব কাছেই গলার আওয়াজ। দিদির গলা, মেজদির আর কার? আর সেই জামাইবাবু, যার জন্যে বাড়িতে রান্নাবান্না সোরগোল। গলার আওয়াজ এদিকে আসতে আসতে থেমে যায়।

'ছাড়ো, আর না! সবাই দেখবে।' আড়ষ্ট বাধা ও আনন্দে অবসন্ন গৌরীর গলায় টুটুল আবার চমকে ওঠে। এক অদৃশ্য আকর্ষণে একপা একপা করে এগিয়ে সে অবাক হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। জামাইবাবু মেজদিকে কিরকমভাবে যেন থামচাচ্ছে, আর মদনের আলিঙ্গনে আঁকপাঁক করছে গৌরী, যেন সে ছুটে পালিয়ে যাবে, অথচ পারছে না। টুটুলের সঙ্গে সঙ্গে কয়েক মাস আগে আর একটা দৃশ্যের কথা মনে পড়ে গেল। বুড়ী আর পানুদার আলিঙ্গনে আবদ্ধ মূর্তি দুটো পরিষ্কার ভেসে ওঠে তার মনে। একবার ভাবলে এখান থেকে পালিয়ে যায়। কিন্তু ঐ একই রাস্তা দিয়ে ফিরতে হবে, সামনে আরও ভিজে অন্ধকার, আরও ঝিঁঝির শব্দ।

'এবারে কিন্তু সত্যি কথা বলতে হবে গৌরী। আর কচি খুকিমো কোর না। ফর হেভেন্স সেক। আমরা এখনও দুজনে নতুন সংসার গড়তে পারি।'

গৌরী হঠাৎ হাতের মুঠি শক্ত করে লাফিয়ে ওঠে।

মদনের গলা বিকৃত শোনায়, 'বুঝতে পেরেছি, এখন ঐ মাকড়াটার দিকে তোমার নজর পড়েছে। হি উইল বি এ ভাল কম্পানি, আই টেল ইউ। তোমার মা-ও তোমাকে ভিড়াবার চেষ্টা করছে। সাবধান, আমি বলে দিচ্ছি, আমি তোমাকে কিছুতেই ছাড়ব না।'

গৌরী শেষ কথা শুনবার আগেই এগিয়ে যেতে থাকে, আর পেছনে পেছনে ফুঁসতে ফুঁসতে চলে মদন।

এতক্ষণ এই নির্জনতায় যে অপরিচিত আনন্দের স্বাদে মুগ্ধ লাগছিল টুটুলের, তা কোথায় পালিয়ে যায়। বড় হওয়া মানেই কি এইরকম হওয়া? এইরকম চিন্তা মাথায় নিয়ে আরও সকলের সংগে টুটুল গাড়িতে ওঠে।

লাল আর সাদা বোগেনভিলিয়ায় মোড়া ঝকঝকে সাদা দোতলা কাঠের বাড়িটার সামনে বাগানে সারি সারি তক্তায় বসানো টবে রকমারি ফার্ন, কেয়ারিতে গোলাপ হাওয়ায় দোল খায়। কাঠের সিঁড়ির মুখে বিরাট পিতলের গামলায় বসানো দেয়ালে-তোলা গাছটা থেকে সাদা একটা গোলাপ টপ করে তুলে নিয়ে গৌরী চুলে গোঁজে। বাথরুমে কলে গরম জল। মুখ হাত ধুয়ে আলোয় ঝলমল বারান্দাতে ছেলেরা সোর-গোল তোলে। কাঠের সিঁড়িতে ছোটাছুটিতে এত আওয়াজ ওঠে যে ভবনাথ পর্যন্ত হাঁক দেন। প্রচুর খিদে এবং প্রচুর ভাল খাওয়ার সমাবেশ। নিরামিষ, আমিষ, মিষ্টি, কোন কিছুর বাদ নেই। এমন ভাল খেয়ে দেয়ে লেপের মধ্যে সিঁধিয়ে সকালে ঝকঝকে রোদ্দুরে বারান্দা থেকে সামনে দিগন্তবিস্তৃত চা-ঝোপের ঘন সবুজ গালিচার দিকে চেয়ে চেয়ে গৌরীর চোখ ফেরাতে ইচ্ছে হয় না।

নীচ থেকে বুড়ী চীৎকার করে ডাকে, 'দিদি, আমরা ফ্যাক্টরি দেখতে যাচ্ছি সুধীর-দার সংগে। তাড়াতাড়ি নেমে এসো।'

গৌরী দেখলে সবাই প্রস্তুত কেবল স্বর্ণময়ী, দিদি ও মদন ছাড়া। টুটুলের সঙ্গে দিদির মেয়েটা তাদের মাথা-সমান কসমস ঝাড়ের এদিক-ওদিক লুকোচুরি খেলচে। সুধীর একটা গলাঢাকা হাল্কা হলুদ উঁচুগলা পুলওভার কালো পেন্টুলুন এবং হাতে ছোট ছড়ি নিয়ে সামনে আস্তে আস্তে এগোচ্ছে। সঙ্গে ভবনাথ। খাকি হাফপ্যান্ট, গরম কোট, পুরো মোজা, বয়সটা আরও কমে গেছে তাঁর। স্বাভাবিক চামড়ার লালিতো আর গত রাত্রির পরিপূর্ণ বিশ্রামে সেই রাণাঘাটের এস-ডি-ওর মতো লাগে। তাঁর হাতেও ছড়ি। ছড়ি তুলে গৌরীকে আহবান করলেন।

'আমি আর এখন যাব না। বেশ লাগছে।' গৌরী বললে।

তারপর বেতের চেয়ারে গা এলিয়ে রোদ্দুরে টুলের ওপর পা তুলে সে ব্যাগ থেকে টমাস হার্ডির উপন্যাস বার করে পড়তে শুরু করে। মাঝে মাঝে চায়ের গালিচা যেখানে পাহাড়ের গায়ে ধাপে ধাপে উঠে গিয়েছে সেদিকে, আর মাঝে মাঝে চায়ের ঝোপের ওপর সারি সারি সাদাটে হাড়গিলে গাছগুলোর তীক্ষ্ণ শোভা দেখতে দেখতে সে ডুবে যায় গত শতাব্দীর মেষ-চরনো ওয়েলসের অখ্যাত গ্রাম্য জগতে যেখানে মাটির সোঁদা গন্ধের সংগে সংগে ভদ্রলোকের ঘরের প্রেম এক অদ্ভুত অবাস্তব সমন্বয়ে তাকে আকর্ষণ করে। কতক্ষণ সে এই স্বপ্নের জগতে ঘুরে বেড়াচ্ছিল খেয়াল নেই, নীচতলা থেকে স্বর্ণসুন্দরীর শাসনে গমগমে গলায় হঠাৎ ধড়মড়িয়ে ওঠে। স্বর্ণ-সুন্দরী আবার হাঁকেন, 'গৌরী, একবার নীচে শুনে যাওতো।' সাধারণত স্বর্ণ-সুন্দরীর আত্মপ্রত্যয় এত বেশী, যে ছেলে-মেয়েদের নীচুগলায় ডাক দিতে তিনি অভ্যস্ত। তাঁর ডাকে একথা স্পষ্ট যে এ ডাক যতই নীচু খাদে হোক তা উপেক্ষার নয়। খুব চেঁচামেচির মধ্যে যে অসহায়তা স্বর্ণ-সুন্দরীর হাবভাবে তা মোটেই নেই। কিন্তু মায়ের এই অস্বাভাবিক চড়া গলায় গৌরীর বুক কেঁপে উঠল। তাহলে মদন...ব্যাপারটা!'

—এরকম চিন্তায় ধপ্ দুড়্দুড়্ করে নেমে তার এতক্ষণের স্বপ্ন অকস্মাৎ অবলুপ্ত করে পা ঠেনে ঠেনে গৌরী নেমে আসে নীচে।

নীচে চায়ের টেবিলে স্বর্ণসুন্দরী অপেক্ষা করছিলেন এই মুহূর্তটির জন্যে। মোটামুটি তিনি যেভাবে ছক কষছিলেন আগে থেকে ঠিক পর পর গত কয়েক মিনিটে তাই ঘটে গিয়েছে। টেবিলের নীচে ভাঙা চায়ের পেয়ালা, ডিশ। বেয়ারা সরাতে এলে তিনি তাকে ঘরে আসতে নিষেধ করলেন। আর সামনে কমলা ম্লান বিপদের প্রতিমূর্তির মতো। কখনও ঘাড় হেঁট করে, কখনও চোখ দুটো স্বামীর চোখের দিকে স্থিরভাবে রেখে, পরমুহূর্তেই নামিয়ে, ভয়ে ভয়ে মায়ের দিকে তাকিয়ে শেষপর্যন্ত এক অতিবিসদৃশ অস্বোয়াস্তির চেহারা হয়ে লেবড়ে থাকে চেয়ারে।

মদনকে দেখায় অপেক্ষাকৃত শান্ত কিন্তু ধূমায়িত গিরি। সামনে একটা চায়ের কাপ উল্টে আছে। কিন্তু মদনের দৃষ্টি সেদিকে নেই। ঝিম মেরে বসে আছে তার ড্রেসিং-গাউনের মাঝখানে তার ছোট পাখীর মতো মাথাখানা যতদূর সম্ভব সেঁধিয়ে।

স্বর্ণসুন্দরীই কথাটা তুলেছিলেন। ভবনাথ সুধীর ছেলেমেয়েদের নিয়ে বাগানে যেতেই বললেন, মদন, তুমি যেও না। তোমার সঙ্গে কথা আছে।'

তারপর বিবর্ণ বড়মেয়েকে একবার প্রবল অবজ্ঞায় আপাদমস্তক দেখে বললেন 'তুমি এসব কি করছো মদন? তোমার কি মাথা-টাথা খারাপ হয়েছে?

'আমি ঠিক বুঝতে পারছি না, আমাকে বলছেন?' খুব মিহি সাবধানী গলায় মদন জবাব দেয়।

'তোমাকে না কাকে বলব? গৌরীকে ছেলে-মানুষ পেয়ে তুমি যা-তা করছো। তোমার লজ্জা করে না? ছিঃ!'

প্রবল অবজ্ঞায় এবং এক অন্তর্নিহিত শঙ্কিতয় টলমল করেন স্বর্ণসুন্দরী। তাঁর ফর্সা মুখ রাঙা হয়ে ওঠে, কপালের ওপর চুলের গুছি এসে পড়ে। পাতলা ঠোঁট দুটো চেপে এমনভাবে মদনের দিকে চেয়ে থাকেন যে উত্তর দিতে গিয়েও উত্তর গলায় আটকে যায় মদনের। হঠাৎ বিকট চীৎকার করে মদন, 'আমি গৌরীকে ভালবাসি। গৌরী আমাকে ভালবাসে। ওকে ডাকুন। ও সবাইয়ের সামনে বলবে।'

'চুপ করো, চুপ করো। ওসব ভালবাসার ঢং আর এবয়সে সাজে না!'

'আমার বয়স . '

'তাছাড়া গৌরী আমাকে সব বলেছে। তুমি আমার বড়মেয়ের সঙ্গে জোচ্চুরি করেছো, আমার সঙ্গে করেছো, এখন গৌরীর সঙ্গে করতে চলেছো!'

'বেশ করেছি, বেশ করেছি,' জন্তুর মতো আওয়াজ করে সামনের বড় ডিশটা ঠেলে দেয় মদন, আর সঙ্গে সঙ্গে একটা পেয়ালা ডিশ ঝন্ ঝন্ করে মেঝেতে ভাঙে। মুহূর্তের জন্যে স্তব্ধ হয়ে যায় মদন।

'চমৎকার। আমার উপযুক্ত জামাই বটে। সাত হাজার টাকা যৌতুক দেওয়া জামাই। তুমি এখন কি করবে মদন? কমলার সঙ্গে থাকতে পারলে না, গৌরী তোমার মুখে—'। প্রবল অবজ্ঞায় প্রবল অসভ্য কথা বলে ফেলেন স্বর্ণসুন্দরী। মদনও স্তম্ভিত হয়ে যায়। তারপর নিজেকে সামলিয়ে বলে, 'গৌরীকে ডাকুন। ও নিজের মুখেই বলবে।'

'তোমাকে বলতে হবে না। অ্যাদ্দিন ভাবতাম, তোমার মধ্যে পদার্থ আছে। তুমি যে তলে তলে মেয়েটাকে ফুসলাচ্ছো তা যদি জানতাম আমার বাড়ির ত্রিসীমানায় তোমাকে ভিড়তে দিতাম না।'

মদন লাফিয়ে দাঁড়িয়ে ওঠে। 'আমি এখনই চলে যাচ্ছি।'

'দাঁড়াও। গৌরীকে ডাকি।'

কাঠের সিঁড়ির হাতলে হাত ঘষতে ঘষতে গৌরী নামে। সে তখন আশ্চর্য রূপান্তরিত। মদনকে নিয়ে যে বিরাট টানাপোড়েন চলেছে তার জীবনে তা থেকে সে যেন সরে এসেছে। জীবনের এক পর্ব উত্তীর্ণ হয়ে দাঁড়িয়েছে গৌরী। বর্তমান এখন স্মৃতিতে পর্যবসিত। তাই খাওয়ার টেবিলের সামনে গিয়ে সে অবলীলাক্রমে বলতে পারল, 'মা ডাকছো?'

আর তার দিকে চেয়ে স্বর্ণসুন্দরীও চোখ কুঁচকান। একবার একটু ইতস্ততঃ করে বললেন, 'তুমি, তুমি মদনকে ভালবাসো?'

গৌরীর পাতলা লাল ঠোঁটে হাসি খেলে। 'বাঃ ভালবাসব না কেন?'

কিরকম প্রহেলিকার মতো তার এ আত্মজিজ্ঞাসা শোনায় তার মায়ের কাছে। মদনও তার সরু গলাটা সামনের দিকে বাড়িয়ে দেয়। অত্যন্ত অসংলগ্নভাবে স্বর্ণসুন্দরী চেঁচিয়ে ওঠেন, 'ছেলে খেলা কোর না গৌরী। আমি তোমাকে যা বলছি তার ঠিক জবাব দাও। মদনকে তুমি সত্যিই ভালবাসো?'

গৌরী এমনভাবে মায়ের দিকে তাকায় যে স্বর্ণসুন্দরী চোখ ফিরিয়ে নেন। এযেন ঠিক সে নয় যাকে কোলে পিঠে করে মানুষ করা গেছে, যাকে বুঝে দেওয়া যায় সবরকম, যার কষ্টে প্রাণ পাত করা যায় আর যার আনন্দ মনে হয় নিজেরই কীর্তি। গৌরীর চাহনিতে সেই একাত্মতা অনুপস্থিত। আর প্রত্যেক সন্তানের কাছেই প্রত্যেক জনক জননীর হেরে যাওয়ার সেই পুরনো নাটক নিজের প্রবল প্রতাপান্বিত জীবনে আবার ঘটতে দেখে স্বর্ণসুন্দরী প্রচণ্ড অস্থিরতা বোধ করেন। গৌরী মায়ের দিকে প্রচ্ছন্ন ব্যঙ্গের দৃষ্টিতে তাকায়। তাকে এই চায়ের টেবিলে কাঠগড়ায় দাঁড় করিয়ে তার মা যে অপার ক্ষমাশীল বিচারপতির অভিনয় করবার জন্যে প্রস্তুত হয়ে আছে সে কথা মনে করে তার ব্যঙ্গ আর প্রচ্ছন্ন থাকে না। সঙ্গে সঙ্গে মদনের দিকে চোখ ফেরায় গৌরী। খুব ছোট্ট পুঁচকে লাগে মদনকে আসামীর ভূমিকায়। গৌরী হঠাৎ হাই তোলে। দিদির দিকে এক নজর চেয়ে তাড়াতাড়ি বলে, 'মদন-দা খুব পণ্ডিত লোক, অনেক ব্যাপার জানে। কিন্তু কেমন যেন!' গৌরী হেসে ফেলে।

'বিচ্!' মদন দাঁতের ফাঁক দিয়ে বললে।

'শুনলে তো, শুনলে?' স্বর্ণসুন্দরীর গলায় চাপা উল্লাস। তাঁর স্বাভাবিক আত্মবিশ্বাস যেন ফিরে আসে।

আর গৌরী আস্তে আস্তে মায়ের পাশে চেয়ার টেনে বসে। কমলাও আতঙ্কে তার বোনের দিকে তাকায়। তাহলে স্বচক্ষে সে যা দেখেছে তা কি তার মতিভ্রম?

'আর চা আছে?' আলগোছে কথাটা বলেই এক কাপ চা ছেঁকে নেয়। চায়ে চুমুক দিয়ে মদনের দিকে চেয়ে থাকে। আর সে রক্তে রক্তে বুঝতে পারে সময়ের কি প্রবল প্রতাপ। সময় একদিন তার শরীর এবং মদনের শরীর একত্রে বেঁধেছিল, তারপর সময়ের চাপেই সে বাঁধন আলগা হয়ে গেছে। এখন সে মুক্ত। আর সেই নতুন মুক্তির প্রবল আনন্দে গৌরী ভেতরে ভেতরে ঝলমল করতে থাকে।

হঠাৎ কর্কশভাবে চেঁচিয়ে ওঠে মদন, 'আমি জানি গৌরী, তোমার ঐ ঢ্যাঙা-টার দিকে নজর পড়েছে!'

'মদন! আমার বাড়িতে এ ধরনের কথা আমি সহ্য করব না।'

'বেশ! ঠিক আছে। বুলু, বুলু!' মদন তড়াক করে লাফিয়ে উঠে মেয়ের নাম ধরে চেঁচাতে থাকে।

'বুলু তো বেড়াতে গেছে টুটুলদের সঙ্গে', নির্লিপ্ত গলায় গৌরী বললে।

'বেশ, আমি একলাই যাচ্ছি।'

'আমিও যাব।' কমলাও দাঁড়িয়ে ওঠে।

মেয়ে জামাই বেরিয়ে গেলে স্বর্ণসুন্দরী চুপ করে বসে থাকেন গৌরীর সামনে। নিজের কাছে নিজের বয়সটা আরও বেশী লাগে। গৌরী চুপচাপ চা খায়।

'চা ঠাণ্ডা না?' একটা কিছু কথা বলবার জন্যেই কথাটা বলেন স্বর্ণসুন্দরী।

এবার গৌরীর হাসির রেখায় যেন মমতারও ছাপ আছে। কাপটা নিঃশেষ করে বলে, 'ঠাণ্ডা চা খেলে মা রং ফর্সা হয়।'

পাতা ছাঁটার কাজ চলেছে। সবুজ সতেজ চা ঝোপের মখমল এক এক জায়গায় বেঁটে হাড়গিলে ধোঁয়াটে চেটাল খোঁটার সারি। এরকম মুড়িয়ে নেড়া করে দেওয়া কাজ মুড়ীর অপছন্দ। বলে, 'এতোগুলো চায়ের পাতা কেন মিছিমিছি নষ্ট করছো সুধীরদা।'

চা ঝোপ দুটোর প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে সুধীরের মন্তব্য তার মনঃপূত হয় না। হাঁটতে হাঁটতে তারা এক জায়গায় এসে থমকে দাঁড়ায়। পায়ে চলার রাস্তা জুড়েই নেপালী ছেলেমেয়েগুলো গোল হয়ে বসে জিরোচ্ছে, চায়ের সঙ্গে খাচ্ছে ভুট্টার খই। চোঙা পাশে দাঁড়াতে একটি তরুণ দুহাত জড়ো করে এক মুঠো খই দেয়। এরপর খানিক চড়াই উৎরাই। ডুয়ার্সের বাগান হলেও এ বাগানের একটা দিকে শ্যামল পাহাড়, জ্বালানির জন্যে গাছপালার ওপর আক্রমণ এখনও শুরু হয়নি। সেই ওঠা-নামা রাস্তায় অভ্যস্ত হাল্কা পায়ে সুধীর এগিয়ে চলে আর মাঝে মাঝে ভবনাথের দিকে চেয়ে বলে, 'কাকাবাবু, অসুবিধে হচ্ছে না তো। ঐ যে আমাদের ফ্যাক্টরী দেখা যাচ্ছে।' সবুজের মাঝখানে নতুন করো-গেটের টিনের গাঢ় নীল রূপোলী রোদ্দুরে ঝলকায়। চোঙা আর টুটুল মুগ্ধ দৃষ্টিতে সুধীরদাকে দেখতে থাকে। সাবালকত্বের এই গতিময় শক্তিমান চেহারা তাদের অভিভূত করে। কবে আমরা সুধীরদার মতো বড় হব এ চিন্তা চোঙা আর টুটুলের মনে এক অস্বাভাবিক তীক্ষ্ণতা অর্জন করে। বেশ কয়েক বছর ধরে টুটুলের মনে যে স্বপ্নের জগত ছায়া ফেলেছিল, এমনকি ল্যাটাগুড়ি জঙ্গলেও যা আবার ঘন হয়ে এসেছিল তা পালিয়ে যায়। ফ্যাক্টরীতে চায়ের পাতা শুকোনোর কলের পাশে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে শুধু সে কলকব্জাই দেখে না। এই বাগানের চায়ের পাতা ছাঁটাই, কলকব্জা চালানোর পেছনে একটা লোক দাঁড়িয়ে আছে। গলা তোলা হলুদ পুলওভার পরা লম্বা লোকটা যে এই সব চালাচ্ছে সে এক কর্মজগতের নতুন নায়ক। চোঙাকে বলতে পারে না কিন্তু বুড়ীর গা ঘেঁষে ফিসফিস করে বলে, 'আমরা কবে এমন বড় হব দিদি?'

ভবনাথেরও ভাল লাগছিল। বড় মেয়ের বিয়েতে বরপক্ষের সাত হাজার টাকার বায়নার মতো এ ক্ষেত্রে নিশ্চয় কোন বায়না আসবে না। বড় মেয়ের বিয়েতে চোদ্দ হাজার খরচ হয়েছিল। গৌরীর বিয়ে নিশ্চয় আরও কমে সারা যাবে। তবে হাজার দশেকের কমে বোধহয় নামানো যাবে না। তাঁর সবচেয়ে প্রিয়কন্যাকে নিশ্চয় সবরকম দিতে থুতে চাইবেন স্বর্ণসুন্দরী।

'সামনের বছর ঐ টিলাটার ওপর আরও কয়েকটা কুলি কোয়ার্টার বানাচ্ছি,' সুধীর তার সাদাপশমে ঢাকা ডান হাতখানা দিগন্তের একদিকে বাড়িয়ে দেয়।

'ঐ যে দেখছেন, ঐ বাগানটা—সানি-ভিউ ওটা গত বছর কিনেছি।'

এই বিস্তীর্ণ আকাশের নীচে সমস্ত জগতটাই সুধীর-দার রাজত্ব—একথা একই সঙ্গে চোঙা আর টুটুলের মনে খেলে যায়। আর দিদির সঙ্গে বিয়েটা ঘটে গেলে তাদের এসব জায়গায় হামেশা যাতায়াতের সূত্রপাত হবে এ সম্ভাবনায় দুজনেই পুলকিত। ঢ্যাঙা ফর্সা রোগাটে তার বাপ মায়ের সম্পূর্ণ অমিল চেহারা বুড়ো হাততালি দিয়ে চেঁচিয়ে ওঠে, 'আমিও তোমাদের সঙ্গে আসব টুটুলদা।'

পরিতৃপ্ত ক্লান্তিতে সারা গা ভারী করে তারা ফিরতেই স্বর্ণসুন্দরী ভবনাথ ও পরে সুধীরকে খাটো গলায় কি সব বললেন। তারপর বুলুর ডাক পড়ে ওপর থেকে। আর কিছুক্ষণ পরেই বুলু 'আমি যাব না কিছুতেই যাব না' বলে কাঁদতে কাঁদতে নেমে আসে।

স্বর্ণসুন্দরী দোতলায় গিয়ে দেখেন বিদেশী শহরের লেবেল আঁটা নীল সুট-কেসখানা মদন গুছোচ্ছে। সেদিকে এক নজর চেয়ে বললেন, 'আমরা খেয়ে দেয়ে সবাই বেরোচ্ছি। এখান থেকে চামচির কমলা বাগান তারপর বাড়ি। কাল কলকাতা গেলেই চলবে।'

'আমি হেঁটে ফিরব,' মদনের গলায় আত্মপ্রত্যয়ের অভাব স্পষ্ট।

'জঙ্গলে অনেক বাঘ আছে।' স্বর্ণ-সুন্দরী মদনের দিকে না চেয়ে বললেন।

পাহাড়ের গা বেয়ে বেয়ে পাক খেয়ে অনেকটা ওপরে উঠে আসতে হয়। সামনে খাদ, উল্টো দিকে জঙ্গলে ঢাকা পাহাড়ের চূড়োর গায়ে মেঘ। গাড়ি থেকে নেমে হঠাৎ ডান দিকে চোখ পড়ে কমলার বাগানের দিকে। বেঁটে গাছগুলে ঝুম ঝুম করছে ফলে। কিছুক্ষণের মধ্যেই কিশোর-কণ্ঠের চেঁচামেচি ওঠে, ছুটোছুটি লেগে যায়। চোঙা আর টুটুল ক্রিকেট বলের মতো কমলাগুলো ব্যবহার করে, গোপীনাথ এক লুঙ্গি ভর্তি করে কমলা জোগাড় করে। তাছাড়া রকমারি থলেতে লেবু গাড়িতে ওঠে। ফেরার পথে ডুয়ার্সের ফাঁকা ম্লান, চাঁদঢাকা রাস্তায় আবার তীব্র গতিতে গাড়ি দৌড়য়। অনেকক্ষণ 'আজকে কী? চার্মটি' স্লোগানের মতো চেঁচিয়ে টুটুল আর চোঙার গলা ভাঙ্গা। ভবনাথের অনুরোধে গৌরী গান ধরে,

'গ্রাম ছাড়া ঐ রাঙা মাটির পথ
আমার মন ভুলায় রে।'

যখন প্রায় মাঝ রাত্তিরে গেট পেরিয়ে গাড়ি বাড়ির সামনে এসে লাগল তখন শ্রান্তিতে ঘুমে সবাই টলমল। খুব বোঝা যাচ্ছিল না তাদের মধ্যে সেদিন সকালেই কোন বিভেদ বিরোধের নাটক অভিনীত হয়েছে। টুটুল যখন খাটে গিয়ে শোয় তখনও তার ঠোঁটের ফাঁক দিয়ে অস্পষ্ট হাসি খেলে। প্রায় ঘুমের মধ্যেই বিড়বিড় করে, 'আজকে কী? চার্মটি।'

কালের কৌটিল্য ভবনাথকে স্পর্শ করেনি। মোটামুটি এক দৃঢ় নির্দিষ্ট সরল খাতে যৌবন জরা বার্ধক্য শৈশব কৈশোরের ধারা প্রবাহিত। এই আবহমানতায় কেউ যদি ডুবে থাকে তাহলে ভবনাথের মতে কপাল চাপড়াবার কারণ নেই কিংবা পরি-বর্তনের জন্যে আঁকপাঁক করার কারণ ঘটে না। এই সরল নির্দিষ্টখাতে তার বংশধর প্রতাপের জীবন কেন বয়ে চলে না এ প্রশ্ন তাঁকে বিস্মিত ও আহত করে। উত্থান পতন সবই কালের লীলা একথাটা কোন গুরুজীর শিষ্য না হয়েও কি বোঝা যায় না?

আর কালের এই আবহমানতায় জীবনের এক নির্দিষ্ট ছক তাঁর মতে অপরিহার্য। এই ছকে যেমন উদ্দীপনার স্থান নেই তেমনি প্রয়োজন নেই উদ্ভ্রান্তির, কেবল মৃদু হাসি, অনুত্তেজ কণ্ঠ এবং এক কথোক্ত কৌতূহল নিয়ে এই উত্তপ্ত কোলা-হলপূর্ণ জীবনের সামনে দাঁড়ানো ছাড়া মানুষের আর কি করণীয়? আর যেমন কোন কোন কবির কবিতা খোলে নির্দিষ্ট এক ছকের বন্ধনে তেমনি ভবনাথ তাঁর জীবনে এই নির্দিষ্টতায় মুক্তির স্বাদ পান। তাঁদের ছেলেমেয়েদের সময়ের চেহারা কি হবে তিনি জানেন না, তবে এটুকু আঁচ করেন তা হয়ত ভিন্ন শুধু নয় বিপদসংকুল হতে পারে। হয়ত প্রতাপ কালের কৌটি-ল্যের প্রথম শহীদ। তাঁর অন্যান্য ছেলেদের কাছেও হয়ত তাঁর এই অত্যন্ত অনুত্তেজিত জীবন নাট্য হবে বিদ্রূপের বস্তু। কিন্তু তিনি এইটুকু বুঝেছেন মানুষকে বাঁচতে গেলে কালের আবহমানতায় আস্থা রাখতে হবে। অনবচ্ছেদ ভেঙে দেওয়ার জন্যে আঁকপাঁক করলে চলবে না।

তাই পরিবর্তনের বজ্রাহত দৃষ্টি ভারত-বর্ষের আকাশে আকাশে মাঝে মাঝে উঁকি ঝুঁকি মারলেও সেদিকে নিমেষক্ষণ চেয়ে ফেরাননি ভবনাথ। যারা আসছে কিংবা আসবার চেষ্টা করছে চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠনের মারফত হোক গোলটেবিল বৈঠকের মারফতেই হোক তাদের তিনি জানেন না, চেনেন না, আগামীকে নিয়ে কোন ছক বাঁধা যায় না। কিন্তু অতীত বর্তমান নিয়ে বাঁধা যায় যেমন যন্ত্র ইংরেজের বেঁধে আইনে, তার রাজ্যশাসন প্রণালীতে।

কলকাতার বাড়ি সম্প্রতি আরও সাজিয়েছেন গুছিয়েছেন। এখন বেশ সম্ভ্রান্ত বাঙালী বাড়ির ছাপ এসেছে সেই চেহারায়। এক একবার ভাবেন এই সব কিছু ঢেলে দিয়ে বাড়ি বানানোর কি খুব বিশেষ অর্থ আছে? কিন্তু এ ক্ষেত্রেও ভবনাথ মনে করেন কালের ইঙ্গিতেই তিনি পরি-চালিত যেমন পরিচালিত হয়ে তাঁর বাবা নিজেকে ঢেলেছিলেন পাবনা বাড়ির পেছনে। এক একবার তাঁর কনিষ্ঠ পুত্র কন্যাদের সঙ্গে তাঁর বয়সের ফারাকের কথা মনে আসে। ছেলে দুটো বড় হয়ে থাকলে অবসর গ্রহণের আগেই সাহেব সুবোদের ধরে করে একটা কিছু করে দিতে পারতেন। এখন প্রতাপের খবর মানেই বিপর্যয়ের খবর। দেশে ফিরে এলেও খানিকটা নিশ্চিন্ত হতে পারতেন। তবে এ সব চিন্তাতে তিনি মুষড়ে পড়েন না বা উত্তেজনা বোধ করেন না। অবসর গ্রহণের পরও চাকরী করবেন নেটিভ স্টেটে অনেকেই তো কাজ পাচ্ছে ভবনাথ তাঁর চওড়া কব্জি ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখেন।

(আগামী সংখ্যায় শেষ হবে

অঙ্গনা

বিদেশের মোহে

প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী সম্প্রতি সিমলায় এক মহিলাসভায় বিদেশী জিনিসের প্রতি আমাদের অহেতুক মোহ সম্পর্কে তীব্র ব্যঙ্গ করেছেন। দৃষ্টান্ত-ক্রমে নিজস্ব অভিজ্ঞতার পুঁজি থেকে একটি উদাহরণ তিনি উপস্থিত মহিলাদের কাছে রেখেছেন। বিদেশে গিয়ে জনৈক মহিলা শাড়ির সৌন্দর্য এবং বৈচিত্র্যে মুগ্ধ হয়ে অনেকগুলি শাড়ি কেনেন। কিন্তু দেশে ফিরে তিনি আবিষ্কার করেন যে, বিদেশী সামগ্রী হিসেবে কেনা এবং বিদেশের স্মারক হিসেবে বন্ধুবান্ধবদের উপহার প্রদত্ত এই শাড়ি আসলে এদেশীয় এবং লুধিয়ানায় তৈরি। তখন তো তাঁর আকাশ থেকে পড়ার অবস্থা। এরপর তাঁর চৈতন্যোদয় হলো কিনা প্রধানমন্ত্রী তা আর বিশদ ব্যাখ্যা করেন নি।

এ প্রসঙ্গে বেশ কিছুদিন আগে খবরের কাগজের পাতায় প্রকাশিত একটি সংবাদ মনে পড়ছে। কোন এক চিত্রাভিনেত্রী বিদেশ সফর শেষে বোম্বাই পৌঁছান। কিন্তু বাদ সাধলেন শুল্ক বিভাগের কর্মীরা। তাঁর সঙ্গে জিনিসপত্রের বহর দেখে (বলা-বাহুল্য, সবই বিদেশী) তাঁকে আর তাড়-ঘাড় ছাড়া গেল না। এতো জিনিসপত্র তিনি নিয়ে আসায় সবাই যখন বিস্ময় প্রকাশ করছেন তখন একটিমাত্র কথায় তিনি সব সন্দেহের নিরসন করলেন, ম্যায় জেনানা হুঁ। একে মহিলা তায় চিত্রাভিনেত্রী। সুতরাং অজস্র বিদেশী জিনিস আনতে তাঁর আটকানোর কোন প্রশ্নই ওঠে না। কিন্তু প্রশ্ন হলো যে, বিদেশে সওদা করার মতো ফরেন এক্সচেঞ্জ তিনি পেলেন কোথায়? এই একই প্রশ্ন সেই প্রথমোক্ত ভদ্রমহিলা সম্পর্কে।

দেশ স্বাধীন হবার পর প্রায় পঁচিশ বছর হতে চললো। কিন্তু বিদেশের প্রতি মোহ আমাদের একটুও শিথিল হয় নি। বরং দিনে দিনে তা বাড়ছে। এক সময় ইংলিশ মিডিয়ম স্কুল বা কনভেন্টে ছেলে-মেয়ে পাঠানোর ব্যাপারে আমরা খুবই দ্বিধাগ্রস্ত ছিলাম। তখন স্বদেশীয়ানার জোয়ার। সেই জোয়ারে সবাই ভাসছে। বিদেশী পণ্য বর্জনে শুধু নিজের ঘৃণা-প্রকাশ সীমাবদ্ধ রাখছে না। বিদেশী ভাষার একান্ত স্তাবকদের কাছ থেকেও ছেলে-মেয়েদের দূরে রাখতে চাইতেন।

কিন্তু দেশ স্বাধীন হওয়ার পর এই চিত্রটা রাতারাতি বদলে গেল। ইংলিশ মিডিয়ম স্কুল এবং কনভেন্টে পড়ার জন্য আমাদের মধ্যে হুড়োহুড়ি পড়ে গেল। এর ফলে দেখা গেল যে, ওসব স্কুলে সীট পাওয়াই দায়। সীট পেতে হলে অনেক সাধ্য-সাধনা করতে হয়। আমার এক ঘনিষ্ঠ বন্ধু যে কিনা মনেপ্রাণে স্বদেশী তিনি একদিন আমাকে ধরে বসলেন ওর মেয়ের জন্য কনভেন্টে একটা সীট জোগাড় করে দিতে। আমি বারকয়েক ভাল করে ওর মুখের দিকে তাকালাম। আমার কি রকম মনে হচ্ছিল কনভেন্টে ছেলেমেয়েদের পড়ানোর ব্যাপারে বাপ-মাদের হাস্যকর প্রতিযোগিতাকে ও হয়তো ঠাট্টা করছে। আমার মনের ভাব বুঝতে পেরে বন্ধু জানিয়ে দিল যে, সে এ ব্যাপারে সিরিয়াস। আমার মুখে আর রা নেই। খানিকক্ষণ আমতা আমতা করে বললাম, এমনি স্কুলেই তো এতদিন আমরা পড়াশুনা করেছি তাতে খারাপ কিছু হয় নি। তোমার মেয়ের বেলা হঠাৎ আবার কনভেন্টের প্রয়োজন হলো কেন?

এর উত্তরে বন্ধু জানালো যে, দিন-কালের চেহারা অনেক বদলে গেছে। এখন একটু স্মার্টলি চলতে না পারলে এবং ইংরেজিটা ভাল রপ্ত করতে না পারলে আর চলছে না। প্রসংগক্রমে সে নিজের একটি করুণ অভিজ্ঞতা বর্ণনা করলো। ওদের এক আত্মীয়ের প্রচুর পয়সা। বাড়ির ছেলেমেয়েরা কিন্তু সে অনুপাতে কেউ পড়াশুনা করে উঠতে পারে নি। তবে সবাই স্কুলের চৌকাঠ পেরিয়েছে। রেজাল্ট যাই হোক না কেন পয়সার সঙ্গে সঙ্গে মুরুব্বির জোরও ওদের নেহাৎ কম নয়। ছেলেমেয়েদের কলেজে ভর্তি করার জন্য শুরু হলো তাম্বির তদা-রক। বলাবাহুল্য যে, খুব বাজে রেজাল্টে ডাকসাইটে কলেজে ভর্তির জন্য এই তাম্বির তদারক। অনেক চেষ্টা হলো। কিন্তু রেজাল্ট এতো খারাপ যে কিছুই করা গেল না। বন্ধুর আত্মীয় এতে খুবই অসন্তুষ্ট। তাঁদের অসন্তোষ গিয়ে পড়লো সারা দেশের উপর। এর বিহিত করতে তাঁরা ছেলে-মেয়েকে পাঠিয়ে দিলেন বিদেশে। তখনও অবশ্য বিদেশ যাওয়ার ব্যাপারে এত কড়া-কড়ি হয় নি। হঠাৎ ছেলেমেয়েকে এভাবে বিদেশে পাঠানোয় আমার বন্ধু কিঞ্চিৎ বিস্ময় প্রকাশ করেছিল। এর জবাবে ওরা নাকি জানিয়েছিল যে, যতই দেশ স্বাধীন হোক না কেন বিদেশী ডিগ্রীর মর্যাদা এখনও অনেক বেশী।

এরপর বন্ধু দুঃখ করলো যে, এই তো মনোভাব। তাই এসব দেখেশুনে সেও খুব ক্ষেপে উঠেছে যে মেয়েকে কনভেন্টে ভর্তি করাতে হবে। আমি আর কথা বাড়ালাম না। শুধু বললাম যে, কনভেন্টে ভর্তি করানোর ব্যাপারে তাহলে আমার শরণাপন্ন হয়ে লাভ নেই। কারণ, যেখানে হাতি-ঘোড়া তল পাচ্ছে না সেখানে আমি তো কোন্ ছার। এই বলেই সেদিন উঠে পড়লাম। কিন্তু পরে খবর নিয়ে জেনেছি যে, বন্ধুর পক্ষে তার মেয়েকে কনভেন্টে ভর্তি করা হয়ে ওঠেনি তবে মেয়েকে বিদেশে পাঠানোর ব্যাপারে সে ধনুর্ভঙ্গ পণ করে বসে আছে।

শুধু আমার বন্ধুর অবস্থা নয়। অন্তত শহরের বেশির ভাগই বিদেশী অনু-গ্রহের দিকে কাতর নয়নে তাকিয়ে আছে। একটু ফাঁকফোকর পেলেই বেরিয়ে পড়তে চায়। এই ব্যাধি গ্রাস করছে সুদূরে মফঃ-স্বলকেও। একদিন বাসে যাচ্ছি এক মফঃস্বল শহরে। বাসে গোটাকয়েক ছাত্র। দেখেশুনে মনে হলো কলেজের পড়ুয়া। বেশি ভিড় নেই, বাস মোটামুটি ফাঁকা সবাই সবাইকে দেখতে পাচ্ছে। এমন সময় দুজন লোক উঠলেন এবং উঠেই নিজেদের মধ্যে আলাপ-আলোচনা করতে লাগলেন। সবই ইংরেজিতে। আমি জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়েছিলাম। মফঃস্বল বেড়ানোর সুযোগ পেলে চোখ জুড়িয়ে নেওয়া প্রায় আমার অভ্যাসের অঙ্গ দাঁড়িয়ে গেছে। শহরে বাস করে চোখ একদম পচে গেছে। এখানে এলে একটু ফ্রেশ হয়। বেশ কিছুক্ষণ পর বাসের ভেতরে একবার চোখ বোলালুম। সেই দুজন তখনও সমানে কথাবার্তা চালিয়ে যাচ্ছেন এবং যথারীতি ইংরাজিতে। কলেজের পড়ুয়াদের দিকে চোখ পড়তেই আমি তো অবাক। ওরা সবাই হাঁ করে ওদের দুজনের দিকে তাকিয়ে আছে। ওদের চোখের পলক পড়ে না। দেখে মনে হলো যে, এরকম ইংরেজিতে কথা বলতে ওরা এর আগে কখনো শোনে নি। একটু পরে ভদ্র-লোক দুজন নেমে যেতে ওরা এগিয়ে নিজেদের মধ্যে বলাবলি করতে লাগলো। অথচ দু-একটা কথা যা আমার কানে এসেছে তাতেই বোঝা গেছে যে, ইংরেজি ভাষায় এতোখানি অনধিকার নিয়ে বাসে এই ভাষার ব্যবহার চমক সৃষ্টি ছাড়া আর কিছুই নয়। এবং সে উদ্দেশ্য ওঁদের যে সফল হয়েছে ছাত্রদের সঙ্গে আলোচনায় সে কথা বুঝতে আর বাকি রইলো না।

কোন ভাষা শেখা আর সে ভাষায় কথা বলা নিশ্চয়ই অপরাধ নয়। কিন্তু ইংরেজির মোহ আমাদের দিনকে দিন ভীষণভাবে গ্রাস করে বসছে। এককালে শোনা যেত যে, ইংরেজি শেখার দুরন্ত তাগিদে কেউ কেউ ছড়া বানিয়ে মুখস্ত করতো। ঘুমের ঘোরেও তারা মাঝে মাঝে চেঁচিয়ে উঠতো। সে দিনতো এখন অতীতের পৃষ্ঠা। তবু ইংরেজি শেখা, ইংরেজি স্কুলে পড়া এবং বিদেশের মোহ আমাদের ক্রমেই বেড়ে চলেছে। এটা কোন সুস্থ স্বাস্থ্য বা নব-তরঙ্গের ব্যাপার নয়। দাস মনোবৃত্তি আমা-দের অনেকের মধ্যেই বেশ জেঁকে বসেছে। তাই একই সঙ্গে যেমন ইংরেজির বিরুদ্ধে আমাদের জেহাদ ঘোষণা চলছে তেমনি চলছে ইংরেজিয়ানাকে আঁকড়ে থাকার প্রাণ-পণ প্রয়াস। মনে এবং মুখে ভীষণ বৈপরীত্য।

একবার বিদেশ ঘুরে আসতে পারলে জীবন সার্থক হয় এরকম একটা ধারণা আমাদের অনেকের। এ পর্যন্ত অনেকের সংস্পর্শে এসেছি। বিদেশ সম্পর্কে প্রায় অনেকেরই একটা অদ্ভুত দুর্বলতা। স্বাধীনতার আগে বিদেশকে আমরা যেন

এড়িয়ে চলার চেষ্টা করেছি। এখন আর তার প্রয়োজন নেই। কিন্তু বিদেশে যাওয়ার ছাড়পত্র সহসা মেলে না। এজন্য ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করতে হয়। এজন্য কেউ পেছপা নয়। তবে কয়েকজনকে আবার বলতে শুনেছি, বিদেশে গিয়ে কি করবো? এর উত্তরে আর একজন বলেছে, সে কিরে তুই বিদেশে যেতে চাস না, আমি তো গেলে বেঁচে যাই।

এমনি মোহ জীবনের নানা ক্ষেত্রে অনেককে গ্রাস করেছে। ইদানীং আমাদের দেশে অনেক হ্যান্ডিক্রাফট সেন্টার গড়ে উঠেছে। এর পেছনে সরকারী উদ্যোগ যেমন আছে তেমনি বেসরকারী উদ্যোগও খুব কম নেই। এসব হ্যান্ডিক্রাফট সেন্টারের মাধ্যমে আমাদের লুপ্তপ্রায় কুটিরশিল্প-সহ নানা শিল্পের চর্চা হয়। এর আর একটি উদ্দেশ্য হলো, কোন কোন জিনিস বিদেশে রপ্তানী করা। কিন্তু এমন হ্যান্ডিক্রাফট সেন্টার প্রচুর আছে যাদের কোন জিনিস কখনো বাইরে যাবার সম্ভাবনা নেই। দেশে তাদের জিনিস বেশ ভালই চলছে। এটাই তাদের একমাত্র সন্তোষ। তাদের আরো বড়ো আনন্দের কারণ যে, এতে কিছু মহিলার অন্নসংস্থান হচ্ছে এবং কারো কারো সংসার স্বচ্ছল হচ্ছে।

কয়েকটি প্রতিষ্ঠানে দেখেছি বিদেশে তারা নিয়মিত মাল পাঠায়। সরকারী একটি সংস্থা রাশ পাঠিয়ে বেশ ভালো বৈদেশিক মুদ্রা সংগ্রহ করে। আবার একাধিক বে-সরকারী প্রতিষ্ঠানও এভাবে বিদেশী মুদ্রা সংগ্রহে সরকারকে সাহায্য করে চলেছে। সরকারী প্রতিষ্ঠানের কথা ছেড়ে দিলাম। সেখানে একক কৃতিত্বের অধিকারী কেউ নয়। কিন্তু বেসরকারী প্রতিষ্ঠানে সব কৃতিত্বের অংশীদার তার পরিচালক। আর কারো সঙ্গে কৃতিত্ব ভাগে তিনি রাজি নন। অবশ্য কর্মীদের সামনে তাদের প্রশংসা করার মতো যথেষ্ট বুদ্ধিমান তাঁরা। বিদেশে প্রশংসা-প্রাপ্ত নানা জিনিস তাঁরা আমাকে দেখিয়েছেন। এবং কিরকম নৈপুণ্য খাটিয়ে এই জিনিসগুলি বাইরে পাঠিয়েছিলেন সেকথা সবিস্তারে বলতে বলতে তাঁদের অধিকাংশেরই মুখ উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। পরিশেষে একটা কথা যোগ করে দিতে ভোলেন না যে, তাঁদের প্রচেষ্টা ছাড়া এই শিল্প এরকমভাবে বিশ্বের কাছে তুলে ধরা আর কারো পক্ষে সম্ভব হতো না। সরকার এখন একথা বুঝতে পেরেছে। তাই মালের জন্য আর কোন কষ্ট নেই। তৈরি হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সবটাই সরকার নিয়ে নেয়। কথা বলতে বলতে বিদেশ থেকে পাঠানো দু-একটা চিঠি চোখের সামনে মেলে ধরেন। সে চিঠি ভর্তি কতসব সপ্রশংস উক্তি। চিঠির লেখক এই বস্তুটি আরো সংগ্রহ করার আকাঙ্ক্ষা জানিয়েছেন। এ পর্যন্ত বলে ও'রা একটু জিরিয়ে নেন। একটু দম নিয়ে আবার শুরু করেন। এবার আসেন নিজেদের নক্সা পরি-কল্পনার স্তরে। নানাভাবে করেন ব্যাখ্যাও। এতে দেশ এবং দশের কতোখানি উপকার হবে সেকথা বলেন বারবার। তারপর সরকারকে একটু দোষারোপ। কাজটাকে তাড়াতাড়ি হাত দেওয়া দরকার। কিন্তু সরকারের জন্য হয়ে উঠছে না। তবে আর বেশি দিন নয়।

এই পর্যন্ত বলে একবার পরিপূর্ণ নয়নে তাকান শ্রোতার দিকে। তারপর এক সময় ঠোটের কোণে হাসি ছড়িয়ে, তাঁদেরই কাউকে প্রকাশ করতে দেখেছি, সুপ্ত বাসনাকে—বিদেশে ঘুরে আসার বাসনা। আর হেসেছি মনে মনে। বোধ করেছি বেদনাও। প্রশ্ন জেগেছে বারবার, বিদেশ নামক বাড়ি হোবার বাসনা এত তীব্র কেন? প্রধানমন্ত্রীর সাবধানবাণীতে পুরনো অভিজ্ঞতাই ঝিলিক মারলো মনের কোণে!

—প্রমীলা

শিল্পী : রাজুল ধারিওয়াল

প্রদর্শনী

শ্রীমতী রাজুল ধারিওয়াল শান্তি-নিকেতন ও বরোদায় শিল্পশিক্ষা লাভ করেছেন। ৯ থেকে ১৬ অক্টোবর অ্যাকাডেমি অব ফাইন আর্টসে তাঁর ভাস্কর্যের বাইশটি নিদর্শনের একটি প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হল।

শ্রীমতী ধারিওয়াল কাঠ, কংক্রিট, ধাতু ও প্লাস্টার অব প্যারিসে কাজ করেছেন। স্টাইলের বৈচিত্র্যও তাঁর কাজে প্রচুর। ফর্ম নিয়ে নানারকম পরীক্ষানিরীক্ষার নিদর্শন তাঁর প্রদর্শনীতে দেখা গেল। ফিগারেটিভ ও নন-ফিগারেটিভ এই উভয় রীতিতেই তাঁর দক্ষতার অনেকগুলি নমুনা পাওয়া যায়। বর্তমান প্রদর্শনীর কাজগুলির মধ্যে কাঠের কাজেই তাঁর দক্ষতার পরিচয় বেশী। 'ড্রে ড্রীমার' মূর্তির শায়িত ভঙ্গীর বিভিন্ন ফর্মের একটির সঙ্গে আরেকটির মিলন, 'হার্মনি ইন ইন্টিগ্র্যালস' মূর্তির আদিম বলিষ্ঠতা ও সরলীকৃত ফর্মের পারস্পরিক সুসম্বন্ধ সংযোজন বা ধাতুনির্মিত যন্ত্রাংশ নিয়ে তৈরী দুটি ফিগারের রৈখিক গতি-ময়তায় (১৮, ১৯) শিল্পীর সজীব মনের পরিচয় পাওয়া যায়। ফ্ল্যাট রিলিফ কাজের মধ্যে 'চিত্রাঙ্গদা', 'ওয়ারিয়র' ও নিসর্গদৃশ্য ছোঁয়া কাজ 'রিফ্লেকশন'এ তাঁর দৃষ্টিভঙ্গীর অন্য এক ধরনের বৈশিষ্ট্য দেখা যায়। কতকগুলি কাজ ছোট হলেও মনুমেন্ট্যালিটির ভাব তাতে সঞ্চারিত হয়েছে।

•

জার্মান ডেমোক্র্যাটিক রিপাব্লিকের ২২শতম প্রতিষ্ঠা দিবস উপলক্ষ্যে কলকাতায় তথ্যকেন্দ্রে একটি ফটোগ্রাফ প্রদর্শনীর উদ্বোধন হয়। ৬ থেকে ১৫ অক্টোবর অবধি অনুষ্ঠিত এই প্রদর্শনীর উদ্বোধন করেন শ্রীতুষারকান্তি ঘোষ। প্রদর্শনীতে রঙীন ও একরঙা ফটোগ্রাফের মাধ্যমে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের অবসান থেকে বর্তমান কাল অবধি ঐ রাষ্ট্রের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, শিক্ষা, কারুশিল্প, সমাজকল্যাণ ইত্যাদি বিভিন্ন বিভাগে যেসব উন্নতি হয়েছে তার নানা নিদর্শন উপস্থিত করা হয়।

•

ফ্লোরাল আর্ট স্কুল অব ইন্ডিয়ার উদ্যোগে পার্ক স্ট্রীট ও লাউডন স্ট্রীটের মোড়ে জাপানী পুষ্পসজ্জায় একটি প্রদর্শনী ৯ থেকে ১৬ অকটোবর অনুষ্ঠিত হয়ে গেল। প্রদর্শনীতে ত্রিশখানির অধিক পুষ্প সজ্জার নমুনা উপস্থিত করা হয়েছিল। স্থানীয় মালমশলা ফুলপাতা ইত্যাদির সাহায্যে এই পুষ্পসজ্জাগুলি তৈরী করা হয়। কয়েকটি ছোট মাপের পুষ্পসজ্জা উল্লেখযোগ্য হয়েছিল। তবে প্রদর্শনীর শিল্পবস্তুগুলি সাজানোর জন্যে যতখানি জায়গা দরকার তার অভাব থাকায় একটু অসুবিধা হয়।

—চিত্ররসিক

সময়ের সিঁড়ি

দুর্গাদাস ভট্ট

সবের মধ্যেই একটি মাত্র রেশ, একই বাজনা, বিবাহ উৎসবের জাঁক-জমক, সানাই, রেকর্ডের গান, উলু শঙ্খধ্বনির মাঝখান থেকে প্রায় সকলের মনেই একটি কথাই ফিরছিল। ছোট বোন মৃণার সবই হল কিন্তু মাঝের বোন রত্না যেন সব কিছু থেকেই বাদ পড়ে গেছে। অথচ রত্নের মতোই মূল্যবান ছিল রত্না। গায়ের রং মুখশ্রী ইস্কুল-কলেজের রেজাল্ট—সর্বোপরি তার শান্ত দরদী মন সকলকেই মুগ্ধ করেছে, তৃপ্ত করেছে এতদিন।

কিন্তু কি করে যে কি হয়ে গিয়েছিল সেটা এই হৃদয়পুরের মুখার্জী বাড়ির কাছে একটা বিস্ময়। পুরুষেরা চমকিয়ে উঠেছিল। গিন্নীরা চমকে উঠলেও নিজেদের মন দিয়ে রত্নার মনকে বুঝতে চেষ্টা করেছিলেন। বড় গিন্নী সুপ্রভা শুধু বলেছিলেন—বুঝই তো বুঝলাম, মেয়েটা কি নিজেকে বুঝত না। বিয়ের বাজারে সে যে কতবড় সুপাত্রী ছিল, এটা সে কি বোঝেনি?

রত্নার বড় জামাইবাবু শুভময় শুধু বলেছিল—এ আর এমন কি? অমন তো আকছারই হচ্ছে; যদিও আমার না আধুনিক না প্রাচীন শ্বশুর বাড়ির কাছে এটা একটা ভয়ানক ব্যাপার বটে, তবু ওই দরদের কথা বলছিলেন? যারা সত্যিই দরদী তারা শুধু নিজের সুখের কথাই ভাবে না। অন্যকে সুখী করাটাও তাদের কাছে খুবই বড় কথা।

—থাক আর বক্তৃতা দিয়ে কাজ নেই।

শুভময়কে থামিয়ে দিয়েছিল তার স্ত্রী মণিকা। শুভময়ও তাই কথা বাড়ায়নি। মণিকার বক্তব্য যতই স্থূল হোক না কেন, সেখানে সত্যের সমর্থন ছিল। যে মেয়ে একদিন ইলেকট্রিক ফেল করলে সারাদিন ছটফট করে ঘুরত। রেফ্রিজেরেটরের ঠাণ্ডা জল না পেলে যার মেজাজ আসত না। নতুন শাড়ি পুরোনো হয়ে যেতে যার মাত্র দু-চারটি দিন লাগত—কি করবে সে এখন? তার এত প্রয়োজনের চাহিদা কি শুধু মাত্র ভালবাসা দিয়ে মিটবে? এ প্রশ্নটি শুভ-ময়েরও বরাবরই সঙ্গ ছাড়েনি। মৃণার বিয়ের এই আয়োজন, এত চমকপ্রদ শাড়ি গয়না টয়লেটের বিচিত্র সমাবেশে আর সকলের মতোই তারও মনে রত্নার মুখ-খানিই জেগেছে। যে প্রচণ্ড তেজ এবং অভিমানে সে যখন এই মুখার্জী বাড়ি ছেড়ে চলে গিয়েছিল সেই সব ঘটনার কথা অনেকের কাছেই বহুবার শুনেছে শুভময়—কিন্তু তখন যা হবার হয়ে গিয়েছে কিছুই করার ছিল না তারপর।

ভাঁড়ারঘরে থরে থরে রসগোল্লা পানতুয়া সাজানো। বড় কাঠের পাত্রে মিহিদানা চুড়ো করে রাখা আছে। উঠোনের একটা পাশে টেম্পোরারী শেডের মধ্যে উনুন জ্বলছে। একধারে স্তূপাকার করা টুকরো মাছ। কলকাতায় এখন এক কিলো বরফ দেওয়া মাছের দাম কম করে দশ টাকা। দই মিষ্টি সব কিছুই এখন আগুনের দামে বিকোচ্ছে। তবু শুভময়ের শ্বশুরমশাই তাঁর ছোট মেয়ের বিয়েতে আয়োজনের কোন ত্রুটি করেননি। দেখতে দেখতে দুপুর ফিরছে বিকেলের দিকে। আত্মীয় বান্ধবে গমগম করছে চারিদিক। গিন্নীবান্নিরা এক-তলার বারান্দায় বসে তরকারী কুটছেন। লাউ-কুমড়ো পটল আলু...সত্যি কত লোক নিমন্ত্রিত হয়েছে আজকের এই আনন্দ নিমন্ত্রণের দিনে? শুভময়ের শ্বশুর মান প্রহ্লাদ মুখুজ্জেমশাই এভাবে খরচ করছেন কেন?

কথাটা বোধহয় বুঝেই ফেলল মণিকা। কিম্বা মনে এই ধরনের একটা বিশ্লেষণই উঁকি-ঝুঁকি দিচ্ছিল।—ব্যাপারটা কি জান? রত্নার কাছ থেকে বড় আঘাত পেয়েছিলেন তো বাবা। কিন্তু তুমি তো জান ওই ছিল আমাদের বোনেদের মধ্যে সেরা। আমাদের গর্বের বোন তো বটেই। পাড়ার লোকেও ভাল মেয়ের দৃষ্টান্ত হিসেবে রত্নার কথাই বলতেন।

তা বলে আবার নতুন করে পুরোনো বিশ্লেষণগুলিকে খাঁজিয়ে নিতে চেষ্টা করে শুভময়। কখনো মনে হয়েছে এটা যৌবনের ধারা। নিজের করে সবকিছু যেখানে এগিয়ে এসেছেন। প্রাপ্ত বয়সকে যথার্থ মর্যাদা দিয়েছেন। মণিকা বলেছে, কিসের প্রাপ্ত বয়স?' নিজের ভাল-মন্দ বোঝা কি অত সহজ ব্যাপার? শুভময় শান্ত হেসে একমুখ সিগারেটের ধোঁয়া ছেড়েছে। কে কার ভাল-মন্দ বোঝে। এই যে তাদের বিয়ে হয়েছে! নানা রকমের জোড়াতালি দিয়ে সাংসারিক

গান্তি বজায় রেখেছে, এর ভিতর ভাল-মন্দ বিচারের স্থান কতটুকু? মানুষে তার দোষ-গুণের বেশ কিছু তার জন্মসূত্রেই পায়। তারপর আসে পরিবেশ শিক্ষা। এমনি করেই তো এক-একটি ব্যক্তিত্বের জন্ম। সত্যি বিয়ের আগে তেমন করে মণিকাকে চেনেনি মণিকাও তাই। কিন্তু প্রয়োজন হচ্ছে এমন একটা বস্তু যে নিজেই মানুষকে পথ চিনিয়ে নিয়ে যায়। অনেক সময় সব কিছু জেনে বুঝেও কিছু করার থাকে না। তখন সাহসের সঙ্গে পরিস্থিতির মোকাবিলা করা ছাড়া উপায় থাকে না।

—কি করে তুমি জানলে ওদের ভাল হবে না, ওরা সুখী হবে না। আমরা কি জ্যোতিষী?

—বলছ কি তুমি মা-বাবাকে এত দুঃখ দিয়ে যে চলে যেতে পারল, তার কখনো ভাল হয়?

—এটা তুমি তোমার বদ্ধমূল ধারণার কথা বলছ। কিন্তু ঘটনা কখনো বাঁধা ছকে চলে না। কি থেকে কি হয় এ সম্পর্কে শেষ কথাটা দুনিয়ায় কোন মানুষের পক্ষে জোর করে বলা সম্ভব নয়।

—কার পক্ষে সম্ভব নয় তা নিয়ে মাথা ব্যথা নেই আমার। মোট কথা যে শুধু নিজেরটুকুই বুঝল, আর কারুর কথা চিন্তা করল না, তাকে আমি কিছুতেই ভাল মেয়ে বলতে পারি না।

—কারণ বিয়ের অনুষ্ঠানটা সকলের হলেও বিয়ে ব্যাপারটা যে নিতান্তই ব্যক্তি-গত সেটা তো বোঝ। এই যে আমাকে বিয়ের সময় অনেকেই তো ভরসা দিয়ে-ছিলেন, আমরা তো আছি ভয় কি, তুই নেমে পড়! কিন্তু এখন দেখছ তো, 'একটা চাকরীতে কুলোচ্ছে না! পার্ট টাইমও করতে হচ্ছে। তার ওপর আছে তোমার নানা রকমের আক্ষেপ...

—আমার আক্ষেপ তুমি আমাকে বুঝতে চাও না তাই...

প্রসঙ্গটা অন্যদিকে মোড় নেওয়ার আগেই ঠিক করে মণিকার ছোট বোনের জন্যে যে ভাল পাত্রটির সন্ধান সেদিন বিকেলেই মিলেছিল, সেটার কথাটা তুলতেই পরিবেশটা একেবারে পাল্টে গিয়েছিল।

সময় মত সন্ধ্যাকাল এসে গেল। সারা দুপুর থেকে মেঘ ঘনিয়ে ছিল আকাশে। বর্ষাকাল। কাজেই ভয় ছিল। কখন বুঝি ধারা বর্ষণ শুরু হয়। কিন্তু তা হল না। মেঘও ছিল এলোমেলো বাতাসও ছিল। সন্ধ্যার আগেই আকাশ পরিষ্কার। এক আকাশ তারার নীচে মুখার্জি বাড়ি এখন আসন্ন লগ্নের প্রতীক্ষা করছে। মাইকে সানাই বাজছে, মেয়েরা খোঁপায় বেলফুলের মালা জড়িয়ে দোতলার ব্যালকনিতে দাঁড়িয়ে। অনেকের হাতেই শাঁখ। বরের গাড়ি আসতে দেখলেই সবগুলিই সমস্বরে বেজে উঠবে। মার্কারী ল্যাম্পের আলোয় দোতলায় জড়িয়ে ওঠা রজনীগন্ধা ফুলের কার্ডটিকে স্নিগ্ধ এবং মনোরম দেখাচ্ছে। এ বাড়ির বড়কর্তা মেজ-কর্তা থেকে শুরু করে চাকর-বাকরেরা এধার-ওধার ছোটাছুটি করছে। এমন সময় বাঞ্ছিত মোটর হর্ণটি শোনা গেল। বিরাট একখানা স্টুডিবেকারে চড়ে বর এসে নামলেন। দোতলার একটি জানলা খুলে শুভময় আর মণিকাও দেখতে পেল পাত্রকে। হ্যাঁ সুপুরুষ বটে। দীর্ঘ ললাট উন্নত নাসা, শক্ত সবল চেহারা। এর ওপর গায়ের রঙ গরদের পাঞ্জাবী ফুলের মালা আজকের জন্যে একটা বিশেষ লালিত্য এনে দিয়েছে।

মণিকা প্রায় ছেলেমানুষের মতোই ঘরের মধ্যে একটা ঘুরপাক দিয়ে এসে শুভময়ের কানের কাছে বলল—ইস কি সুন্দর, রত্নার সাথে কি রকম মানাবে বলতো।

ঠিক তখনই অদূরেই একটি নিঃশ্বাসের শব্দ পাওয়া গেল। কখন নিঃসাড়ে শুভ-ময়ের শাশুড়ী কল্যাণী এসে দাঁড়িয়ে-ছিলেন। চকিতেই শুভময় এবং মণিকা দুজনেই তাঁর চোখ দুটি দেখে ফেলেছে। না আর লুকোবার অবকাশ নেই। এক-জোড়া নিটোল অশ্রু-বিন্দু টলমল করে উঠেছে কল্যাণীর চোখে। মণিকা জীবনে খুব কমই তার মাকে কাঁদতে দেখেছে। রীতিমতো চেষ্টা করে সেই দুর্লভ ঘটনা তাকে স্মরণে আনতে হয়। যে জন্যে মেয়ে মহলে তাঁর কিছু দুর্নামও আছে। আবেগ, উচ্ছ্বাস নাকি মেয়েদের চরিত্রগত ব্যাপার। এ থেকে বিচ্যুতিকে সহানুভূতি অথবা মনের অভাব বলেই গণ্য করা হয়। কিন্তু কল্যাণী জানেন তাঁর সবই ছিল শুধু সংসারের এই ভয়ানক চাপ তাঁর নরম দিকগুলোকে দুমড়ে মুচড়ে দিয়েছে। প্রকৃত পক্ষে তাঁর জড় অস্তিত্বটুকু ছাড়া বাকী সবটাই মরে গেছে কোনো একসময়। শুধু তাঁর ছোট মেয়ের বিয়ের ঠিক হওয়া আর তারপর থেকেই বাড়িতে যে নতুন হাওয়া বইছিল সেই হাওয়াতেই নিজেকে কিছুটা আপ্লুত মনে হচ্ছিল। বার বারই রত্নার কথা মনে পড়ছিল। তা ছোট্টটি থেকে বড় হওয়া আমোদ আবদারের পাশাপাশি সহানুভূতি শালীনতা মিশে কোথায় যেন নিয়ে গিয়েছিল কল্যাণীকে। কিন্তু তিনি আচরণে অটুট। যেখানে যা করার, যাকে যা বলার সবই তিনি নিয়ম-মাফিকই করে যাচ্ছেন। শুধু রত্নার বর দেখে তাঁর চোখের বাঁধন টিঁকল না। এবং ধরা পড়ে গেলেন।

সঙ্গে সঙ্গেই ওঘর থেকে চলে যেতে চাইছিলেন কল্যাণী। কিন্তু মণিকা ওঁর সঙ্গ ছাড়ল না। শুভময়ও ভাবল ওদের কথা-বার্তার মধ্যে অংশ গ্রহণ করে। কিন্তু তার সময় হ'ল না। নিচে অতিথি আপ্যায়ন বরযাত্রীদের চা জলখাবার বিতরণের বেশ কিছু দায়িত্ব তার ওপর ন্যস্ত ছিল। দ্রুত পায়ে নিচে নেমে এল শুভময়। উঠোনের ওপরই সেজকর্তাকে দেখতে পেল। তিনিও শুভময়কেই খুঁজছিলেন। তারপর সহাস্য আপ্যায়ন। চা জলখাবারের তদারকী। বরাসনে বসা নতুন জামাইকে সাহস দেওয়া। বরযাত্রীদের ঠাট্টা-মস্করায় অংশ গ্রহণ করা ইত্যাদিতে আরো দেড় ঘন্টা কেটে গেল। বিয়ের কাজ সুরু হ'ল একদিকে। রত্নাকে পিঁড়িতে চাড়িয়ে সাতপাক দেওয়ানোর পর সম্প্রদানের আসরে পৌঁছে দিয়ে যখন একটা নির্মল জায়গায় দাঁড়িয়ে সবে মাত্র একটা সিগারেট ধরিয়েছে হঠাৎ ছুটতে ছুটতে শুভময়েরই বড় ছেলে শমিত এসে বলল—দিদিমা তোমাকে খুঁজছেন। ভীষণ দরকার।

ভিতর বাড়িতে এসে রোয়াক পার হয়ে সিঁড়ি দিয়ে দোতলায় এল শুভময়। ও বুঝল পুব দিকের শয়ন কক্ষেই শুয়ে আছেন কল্যাণী। কিন্তু কোথায় তিনি? ঘরে মণিকা ছাড়া দ্বিতীয় কেউ নেই। খোলা জানলার সামনে দাঁড়িয়ে আছে মণিকা। যে জানলা দিয়ে অন্ধকার বাগান দেখা যাচ্ছে। পানা নিবিড় পুকুরটার ওপর ঝুঁকে পড়া নিমগাছটির চারধারে জোনাকীরা বৃত্তের আকারে পাক দিচ্ছে।

—কি ব্যাপার?

—এই যে তুমি এসেছ।

—আসব না কেন? কিন্তু তুমি এখানে কি করছ বল ত? বিয়ের ওখানে যাও। এখুনি সম্প্রদান হবে।

—আমার আজ কিছুই ভাল লাগছে না।

—সেকি! আজকের এই শুভদিনে কি কখনো মন খারাপ করতে হয়!

—কি করব বলো। আজ আমি নিজের ওপরেই বিশ্বাস রাখতে পারছি না। যে মাকে এতকাল আমরা একজন শক্ত মানুষ বলে জানতাম। রত্না চলে যাওয়ার বেদনাটা যিনি সবচেয়ে সহজভাবে মেনে নিয়েছেন বলে জানতাম, আজ দেখছি সবই উল্টো। নিজের মাকেই চিনতে পারিনি আমি।

—এসব কথা তো পরেও বলা চলত। এত কাজ আজ।

—থাক আর কাজ দেখাতে হবে না; নিজেকে তুমি কি মনে করো শুনি, তোমার অভাবে বিয়ে আটকাবে না।

—তা না হয় আটকাবে না, কিন্তু আমারো তো একটা কর্তব্য আছে, সাধ আছে।

—থাক তোমার কর্তব্য, থাক তোমার সাধ। আপাতত অনেক বড় কর্তব্য তোমার জন্যে রয়েছে, তুমি একবার হ্যাঁ বলো, অমত কোরো না।

—ব্যাপারটা কি তাই জানলাম না, কথা দিই কি করে।

শুভময়ের হাত ধরে খাটের ওপর বসিয়ে দেয় মণিকা, স্থির দৃষ্টিতে শুভময়ের মুখের ওপর তাকায়। তারপর কেমন একটু থমকে যায়। কিছুটা আমতা আমতা করার ভঙ্গীতে কিছু একটা পেশ করার চেষ্টা করে।

—দেখ তুমি তো ঠিক আমার মতো নও, তুমি পুরুষ মানুষ, তার ওপর কি যেন বলে—সমাজ সচেতন।

—থাক আর ভূমিকার কাজ নেই, যা বলার বলে ফেল। —

—মা আজ সন্ধ্যে থেকেই কাঁদছিলেন। বলছিলেন বাড়িতে এত খাবার অথচ রত্নার মেয়ে দুটো এত কাছে রয়েছে......।

—তাহলে চলো, আমরা দুজনে গিয়ে ওদের কিছু দিয়ে আসি।

—তুমি যাবে?

—না গেলে নয় তাই যাব। বিশেষ করে শাশুড়ী ঠাকরুণ যখন কাঁদছেন। নিতান্ত বাধ্য হয়েই যাব।

—হ্যাঁ বাধ্য হয়েই চলো। মায়ের মন বড় কঠিন জিনিস। বুঝলে। সেখানে কোনো তর্ক চলে না।

—ঠিক আছে।

প্রথমে খানিকটা অন্ধকার গলি পথ। সর্টকাট করে বড় রাস্তায় আসতে গেলে এইটাই উপায়। বড় রাস্তায় এসে দেখল ইতিমধ্যেই লোক চলাচল কমে এসেছে। সম্প্রতি দু-দুটো খুন হয়েছে এই শহরে। রাস্তার লাইট পোস্টে মাঝে মাঝে ইলেকট্রিক বালব জ্বলছে। মাঝেরগুলো চুরি হয়ে গেছে। কিছুটা হাঁটার পর পঞ্চাননতলার কাছে ওরা এসে পড়ল। এবার ডান দিকে মোড় ফিরতে হবে। এদিককার বসতি তত ঘন নয়। উঁচু ডাংগার ওপর হাল ফ্যাসানের বেশ কয়েকটি নতুন বাড়ি উঠেছে। পর্দা ফেলা জানলা। দুটি বাড়িতে রেডিও বাজছে। সামনের বারান্দায় বেতের চেয়ার পেতে গল্প করছে কেউ কেউ।

—এই আমরা এসে গেছি।

এসে যে তারা পড়েছে একথাটা শুভময়ও জানত। কেউ তাকে স্পষ্ট করে বলে দেয়নি। কিন্তু নানা কথা নানা সংবাদকে একত্র করে মনে মনে একটা ছবি তৈরী করেছিল শুভময়। রাস্তার পাশের বাঁধানো ড্রেনের ওপর ক্যালভার্টের মতো। সেটা পার হয়ে এখানে আসতে হয়। ছোট্ট একটু মাঠ। বাঁ ধারে কলাঝোপ। মাঠটার শেষাশেষি চার কামরার একটি একতলা বাড়ি। বাইরের বারান্দায় উঠে জানলা দিয়ে তাকালে ওদের শয়ন কক্ষের ভিতরের দৃশ্য চোখে আসে।

বারান্দায় ওঠার মুহূর্তে মণিকাকে কেমন যেন ক্লান্ত দেখাচ্ছিল। ও একটু মোটাসোটা বটে তবে রাস্তা চলায় সাধারণত ওর কোন ক্লান্তি নেই। খাবারের পাত্র দুটো শুভময়েরই হাতে। সে ভারটুকুও বইতে হয়নি মণিকাকে। কিন্তু স্ট্রীট লাইটের আলো আর ঘরের মধ্যে জ্বলা আবছা আলোয় মণিকার মুখকে বিবর্ণ এবং রক্ত-হীন দেখাচ্ছে। কিরকম একটা ঝোঁকের মাথায় এসে পড়েছে সে, এখন অজস্র সংকোচ পায়ে পায়ে জড়াচ্ছে।

কিন্তু কিছু করার ছিল না। উভয়েই উঁকি দিল জানলা দিয়ে। চোদ্দ ফুট বাই বার ফুট গোছের মোটামুটি বড়ই ঘরখানা। জানলার অল্প দূরেই একখানা খাট লম্বালম্বি রাখা আছে। আর একপাশে ছোট টিপয়ের ওপর জলের গ্লাস ও ওষুধের শিশি। একজন অসুস্থ ভদ্রলোক শুয়ে আছেন খাটের ওপর। এমনভাবে শুয়ে আছেন যে শুধু মাত্র মাথার চুলগুলি ও শরীরের একটা অংশ এখান থেকে দেখা যায়। দুটি ফ্রক পরা মেয়ে তাঁর বুকের দুধারে ঘনিষ্ঠ হয়ে বসে আছে। একজন মাঝে মাঝে তার চুলের মধ্যে আঙুল ডুবিয়ে বিলি কেটে দিচ্ছে, অপরজন চাপা স্বরে গান গাইছে। এ জীবন পুণ্য করো দহন দানে।

গান শেষ হল। আট বছরের বালিকার মিষ্টি গলা এই স্তব্ধ নিরালায় যেন একটা ভিন্ন জগতের সৃষ্টি করেছে। ঝিঁঝিঁ ডাকছে দূরে। ঘরের আলোর বেশীর ভাগটাই শেড দিয়ে ঢাকা তাই ভিতরটাকে ঘুমন্ত ঘুমন্ত মনে হচ্ছে। ওদের পিতা হাত বাড়ালেন—মিঠু তুই আমার আরো কাছে আয়। কাছে এল মিঠু বুকের কাছে এসে পিতার হৃদয়ের ওপর গাল মুখ রাখল।...তোর এত ভাল গলা মিঠু, কিন্তু আমি তোদের অক্ষম বাবা। কিছুই করতে পারি না...।

—আবার তুমি দুঃখ করছ। মাথার কাছে বসা অপেক্ষাকৃত বড় মেয়েটি ছোট করে একটা ধমক দেয়।—কেন তুমি দুঃখ করছ বাবা। তুমি তো ভাল হয়ে উঠবেই। মা কি বলছিল জানো না?

—কি বলছিল তোর মা?

—মা বলছিলেন—সব কিছুই হাত পেতে নিতে নেই, তোদের বাবা ভাবতেন তাঁকেই যেন সব কিছু দিতে হয়, আর আমাদের হাত পেতে নেওয়া ছাড়া যেন আর কিছু করার নেই। আমরা যেন কিছু দিতে জানি না, করতে জানি না।

—কিন্তু তোদের মার ফিরতে আজ এত দেরী হচ্ছে কে?

—কই বেশী দেরী তো হয়নি, মোটে তো নটা, ইস্কুলের পর দুটো টিউশনী, তারপর আবার বাজার ঘুরে আসবেন?

—কেন?

ওমা তাও বুঝি জান না, মা আজ ইলিশ মাছ কিনে আনবেন। এদিকে আমি বাটনা বেটে রেখেছি, ওই যাঃ উনুনটা কামাই যাচ্ছে, ভাত চড়িয়ে দিয়ে আসি।

বড়টি লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়ানো মাত্রই শুভময় ও মণিকা জানলার কাছ থেকে সরে আসে। শুভময় স্পষ্ট দেখে অঝোরে কাঁদছে মণিকা। এ অশ্রু তৃপ্তির না আক্ষেপের এই মুহূর্তে সেটা বিশ্লেষণ করে দেখার সময় নেই।

—তাহলে খাবারগুলোর কি হবে?

মণিকা প্রথমটায় উত্তর দিতে পারে না, তারপর ঘুম ভেঙে জেগে ওঠার মতো বলে—আমার কিন্তু দিতে ইচ্ছে করছে না। কিন্তু মা যে আবার কাঁদবেন।

—সেখানে মিথ্যে কথা বলতে হবে। রাস্তায় কাউকে দিয়ে দিলেই হবে এগুলো। এদের সম্বন্ধে আমরা যাই ভাবি না কেন, এদের আমরা অপমান করতে পারি না মণিকা।

পাঁচিশ চূড়া মন্দির

মহীতোষ বিশ্বাস

বাংলাদেশে এক সময় যে দেব মন্দির, দেউল প্রভৃতি প্রতিষ্ঠা হয়েছিল তা আজ অনেক স্থানে ধ্বংসের মুখে। সরকার থেকে এই সব মন্দিরগুলি রক্ষার ব্যবস্থা করা হচ্ছে বটে, কিন্তু যা নষ্ট হয়ে গিয়েছে তা আর ফিরে পাওয়া যাবে না। এক সময় জমিদার, রাজা-মহারাজার পৃষ্ঠপোষকতায় এই সব দেব-দেউল, মন্দির নির্মাণ হয়েছিল। আজ কালের পরিবর্তনে, অবস্থার পরিবর্তনে সেই সব দেব মন্দির, দেউলের সংস্কার করা সম্ভব হচ্ছে না। আরও একটা কথা বিশেষভাবে বলা যায় তা হচ্ছে ঐসব মন্দিরে যে অপূর্ব শিল্প নিদর্শন রয়েছে তার সংস্কার করার মত উপযুক্ত শিল্পীও নেই। অনেক স্থানে দেখা গেছে প্রাচীন শিল্পধারার সঙ্গে বর্তমান কালের শিল্পীর কাজের অনেক তফাৎ, কোন মিল নেই। সুতরাং আজও যে সকল প্রাচীন মন্দিরে বাংলার নিজস্ব সম্পদ, অপূর্ব সৌন্দর্য-মণ্ডিত শিল্পকলা রয়েছে, সেগুলি সযত্নে রক্ষা করা আমাদের অবশ্য কর্তব্য।

বর্ধমান জেলায় বহু স্থানে প্রাচীন মন্দির আছে। বিশেষ করে কালনার মন্দিরগুলির মধ্যে পঁচিশ চূড়া মন্দিরের কথা উল্লেখযোগ্য। এখানে ছোট-বড় তিনটি মন্দিরের গঠন সৌন্দর্য যেমন অপূর্ব তেমনি এর পঁচিশটি করে চূড়া, যা বাংলার আর কোন স্থানে দেখা যায় না।

পাঁচ চূড়া, নয় চূড়া, তের চূড়ার মন্দির অনেক স্থানে দেখা যায় কিন্তু পঁচিশ চূড়া মন্দির বড়-একটা নেই। এই তিনটি মন্দিরই বর্ধমান রাজবংশের পূর্বপুরুষের কীর্তি। প্রায় তিনশত বৎসর পূর্বে ভাগীরথীর তীরে এই মন্দির প্রতিষ্ঠা হয়। বর্তমানে তিনটি মন্দিরেই বিগ্রহ আছেন। একটিতে 'লালজী' (রাধাকৃষ্ণ) একটিতে শ্যামসুন্দর ও একটিতে শ্রীশ্রীগোপালজী। ধর্মপ্রাণ মানুষ আজও এই মন্দিরে পূজা দিতে আসেন। দোল, ঝুলন, রাস প্রভৃতি বিশেষ উৎসবে ভক্ত মানুষের সমাগম আজও হয়।

দেব দর্শনে যাঁরা আসেন তাঁরা যে সকলেই মন্দিরের অপূর্ব গঠন সৌন্দর্য এবং তার শিল্পকাজ দেখে মুগ্ধ হন তা নয়, কখন-কখনও দু-পাঁচজন রসিক মানুষ এই মন্দির দর্শনে বিশেষ করে শিল্পকাজগুলি দেখতে আসেন। বাংলার যে অপূর্ব পোড়া মাটির শিল্পকাজ তা এই মন্দিরগুলিতে এখনও রয়েছে। ছোট-বড় মূর্তিগুলির মধ্যে চারুশিল্পের সুন্দর নিদর্শন আজও বর্তমান। গ্রামের মানুষ এক সময় শিল্প-

সাধনায় কিভাবে আত্মনিয়োগ করেছিল এবং সেই সাধনায় সিদ্ধিলাভ করেছিল তা এই মন্দিরের অলঙ্করণ ও মূর্তিগুলি দেখলে বোঝা যায়। যদিও এই শিল্প-কাজের মধ্যে 'ছাঁচের' ব্যবহার হয়েছে এবং সেজন্য একই রকমের মূর্তি দু-তিন জায়গায় স্থান পেয়েছে। তবুও একথা অবশ্য বলা যায় যে, মূল রচনাটি যখন শিল্পী রচনা করেছেন তখন সেই শিল্পীর চিন্তা এবং গঠন-দক্ষতার প্রশংসা অবশ্যই করতে হয়। মূর্তিগুলির মধ্যে রামায়ণ, মহাভারতের কাহিনী যেমন আছে তেমনি সমাজজীবনের বহু ঘটনাও আছে। মূর্তি রচনার মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখ করা যায় মূর্তির গঠন পদ্ধতি এবং ছন্দ। যে কোন বিষয়বস্তুর মধ্যে অপূর্ব ছন্দ ও অলঙ্করণ শিল্পীর দৃষ্টিতে ধরা দিয়েছে। জীব-জন্তু, বৃক্ষ-লতা, ফুল সকল কাজের মধ্যে শিল্পনৈপুণ্যের পরিচয় পাওয়া যায়। এই মন্দিরে শিকারের এবং যে নারী মূর্তি আছে তা পোড়া মাটির কাজের শ্রেষ্ঠ নিদর্শন। অলঙ্করণের কাজের মধ্যে লতা ও ফুলের কাজগুলি অতিসুন্দর। এই সব অপূর্ব শিল্প অনেক স্থানে নোনা লেগে নষ্ট হয়ে গিয়েছে। তবুও আজও যা বর্তমান আছে তা শিল্পরসিকদের আনন্দদান করে।

এই মন্দিরের গঠনপদ্ধতিও বিশেষ ধরনের। সাধারণ শিবমন্দির বা কালীমন্দির যেভাবে নির্মাণ হয়েছে সেভাবে এই মন্দির নির্মাণ হয়নি। বিশেষ করে এতগুলি চূড়ার জন্য এর গঠনপদ্ধতি ভিন্ন ধরনের। মন্দির ভিতটির নীচে থেকে পাঁচটি ভাগে বিভক্ত। নীচে সাধারণভাবে থামের উপরে খিলান ও ছাদ। তারপর চারটি স্তর উঠেছে। উপরে পর পর এইসব স্তরে চূড়াগুলি সুন্দরভাবে সাজান আছে। প্রথম স্তরে মন্দিরের চার-কোণে তিনটি করে বারোটি, পরের স্তরে দুটি করে আটটি, তার উপরের চারটি এবং সর্বোচ্চ স্তরে একটি চূড়া আছে। প্রত্যেক চূড়ার গঠনপদ্ধতিও সুন্দর। মন্দিরে থামের কাজ অতি নিখুঁত এবং সুন্দর। এত সূক্ষ্ম মাটির কাজ বড় একটা দেখা যায় না। দীর্ঘ-কালের জরাজীর্ণ নোনাধরা মাটির কাজের নিদর্শন আজও শিল্পী এবং রসিকজনকে মুগ্ধ করে। এই মন্দিরের খিলানগুলিও দেখবার মত। কারুকার্যখচিত এমন ছন্দময় শিল্পকাজ বড় একটা চোখে পড়ে না। এক সময় মানুষের মনে যে প্রেরণায়, সাধনায় এমন সৌন্দর্যপূর্ণ শিল্পকাজ হয়েছিল তা চিন্তা করলে বিস্মিত হতে হয়। বাংলার এইসব মন্দির এবং পোড়ামাটির কাজ প্রত্যেক শিল্পীকে প্রেরণা দেবে।

প্রণাম / পোড়ামাটির কাজ

কয়েক বছর পূর্বে আমি হুগলী জেলার আঁটপুর মন্দির সম্বন্ধে 'অমৃত' পত্রিকায় লিখেছিলাম। পরে দেখা গেল পশ্চিমবঙ্গ

এইভাবে পঁচিশটি চূড়া সাজান আছে

সরকার এই মন্দিরটি সম্বন্ধে বিশেষ যত্ন নিয়েছেন এবং এই স্থানটি ভ্রমণকারীদের বিশেষ দর্শনীয় বলে গণ্য করেছেন। কালনার এই মন্দিরগুলির দিকেও সরকার দৃষ্টি দিয়েছেন কিন্তু এখনও এখানে তেমন দর্শক আসেন না। বিশেষভাবে মন্দিরের শিল্পকাজ-গুলির দিকে দৃষ্টি দেওয়া একান্ত প্রয়োজন। কারণ নোনা ধরে ক্রমশঃ কাজগুলি নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। আমি বাংলার নবীন শিল্পীদের এ বিষয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। আমরা বিদেশে শিল্পকলা দেখতে যাই, বহু পয়সাও খরচ হয়। শিক্ষার জন্যও যাই তাতেও বহু অর্থের প্রয়োজন হয়। কিন্তু আমার দেশের মধ্যে যে অপূর্ব শিল্পসম্পদ রয়েছে সেগুলির দিকে বিশেষ দৃষ্টি দিই না। সকল দেশের শিল্পকাজ দেখা দোষের নয় কিন্তু আগে আপন সম্পদকেও চিনতে হয়। বাংলার এই সকল মন্দিরে যে শিল্প-নিদর্শন রয়েছে তা শুধু প্রাচীন শিল্প-শিল্পধারার শিক্ষা গ্রহণ করতে পারি। বিশেষভাবে যাঁরা ভারতীয় শিল্পধারায় চিত্রাংকন শিক্ষা করছেন তাদের পক্ষে এই শিল্পধারা থেকে বিশেষ শিক্ষালাভ হবে। স্বামী বিবেকানন্দ বলেছেন বর্তমানকে জানতে হলে অতীতকে জানতে হবে। শিল্প-কলা সাধনার ক্ষেত্রেও একথা অবশ্য বলা যায়। ভারতীয় হিসাবে উপযুক্ত নাগরিক হিসাবে আমাদের মনে জাতীয়তাবোধ ও ভাবধারা থাকবে তা কে অস্বীকার করবে। শিল্পকাজের মধ্যেও শিল্পীদের সেই চিন্তা-ধারা থাকবে এবং স্বাতন্ত্র্য থাকবে তা অবশ্য বলা যায়। বাংলাদেশের এইসব মন্দিরের পোড়ামাটির কাজের মধ্যে একটা পদ্ধতি ও ভাবধারা আছে যা বাংলার শিল্পী ছাড়া আর কারও কাজে প্রকাশ পায়নি।

হাওড়া থেকে অম্বিকা কালনা মাত্র ৫১ মাইল পথ। ট্রেনে আসা যায়। আবার ব্যাণ্ডেল থেকে বাসেও আসা যায়। এখানে এই পঁচিশচূড়া মন্দির ছাড়া আরও কয়েকটি মন্দির এবং একটি 'দেউল' আছে। সেগুলির মধ্যেও অপূর্ব শিল্পকাজ আছে। বিশেষ করে অনন্ত বাসুদেবের মন্দিরের কথা বলা যায়। এই মন্দিরের গঠনপদ্ধতি শিব-মন্দিরের মত। কিন্তু এই বৃহৎ মন্দিরের গঠন এবং পোড়ামাটির কাজ অতি সুন্দর। বহু মূর্তি ভেংগে গিয়েছে এবং বর্তমানে সংস্কার করায় সিমেন্টের কাজের জন্য অনেক মূর্তি ঢেকে গিয়েছে। ১৬৭৬ শকাব্দে এই মন্দির প্রতিষ্ঠা করা হয়। এই মন্দিরে পাথরে তৈয়ারী অনন্ত বাসুদেবের মূর্তি খুবই প্রাচীন। এখানকার সিদ্ধেশ্বরী মন্দির খুবই পুরোন। বাংলার দোচালা ঘরের মত এর গঠন। প্রাচীন মন্দিরের অপূর্ব নিদর্শন।

অম্বিকা কালনা প্রাচীন স্থান। এক সময় শ্রীশ্রীমহাপ্রভু এখানে এসে অবস্থান করেছিলেন। এই স্থানটি আজও বর্তমান।

যাঁরা প্রাচীন শিল্পকাজ দেখতে ভাল-বাসেন এবং অনুশীলনের জন্য যাঁরা দেশ-বিদেশে ভ্রমণ করেন তাঁদের এই প্রাচীন এবং ইতিহাসপ্রসিদ্ধ স্থানটি দর্শনের জন্য অনুরোধ জানাই। বিশেষ করে যাঁরা শিল্প-রসিক তাঁদের এই পঁচিশ-চূড়া মন্দির দর্শনে বিশেষ আনন্দলাভ হবে তা অবশ্যই বলা যায়।

চিত্র-সমালোচনা

জীবন জিজ্ঞাসা

ভালবাসার অর্থই ত্যাগ। দু'হাত ভরে সে শুধু দিতে জানে, প্রতিদানে চায় না কিছুই। ভালবাসার আপনজন যদি করে চরম সর্বনাশ—করে প্রবঞ্চনা—বিশ্বাসঘাতকতা তবু তার যাতে ক্ষতি হয় এমন কোন কাজই করতে দেয় না সে। বি এন ডি মুভিজের 'জীবন জিজ্ঞাসা' ছবিতে নৈতিক অধঃপতন, শঠতা, হত্যা ইত্যাদির কথা আছে সত্য। কিন্তু সবার ওপরে আছে সর্বজয়ী ভালবাসার এক সুমহান জয়গাথার কথা। আর ঠিক ওই কারণেই, প্রযোজনার দিক থেকে একটি সাধারণ কমার্শিয়াল ছবি হলেও এটি সকলেরই ভাল লাগবে। পরিচালক পীযূষ বসুর কৃতিত্বও ওইখানেই।

ছবিটির সংলাপ ও চিত্রনাট্য শ্রীবসুরই। গল্পের দিক থেকে একটা সাধারণ গল্প হলেও কাহিনী বিন্যাসের মুন্সীয়ানায় সারা ছবিতে তিনি একটা নাটকীয় কৌতূহল সৃষ্টিতে সক্ষম হয়েছেন। কিছুটা জোর করে হলেও পতিতাবৃত্তির মত সামাজিক সমস্যার কারণ সম্পর্কে প্রশ্ন এ ছবিতে আছে, আছে বেশ কিছু তীক্ষ্ণ সংলাপ। সবশেষে বলিষ্ঠ অভিনয়সমৃদ্ধ এ ছবির প্রায় সর্বত্রই তিনি ভালো লাগার উপকরণ ছড়িয়ে রেখেছেন।

এবার কাহিনীর কথায় আসা যাক। বিখ্যাত ধনী ব্যবসায়ী বংশীলালকে হত্যা ও তার অর্থ অপহরণের অভিযোগে পুলিশ শেফালী নামে একটি পতিতাকে গ্রেপ্তার করলো। আদালতে শুরু হলো বিচার। সদ্য বিলেত প্রত্যাগত ইন্দ্রনীল চৌধুরী সরকারের সিনিয়র স্ট্যান্ডিং কাউন্সিল হিসেবে আরম্ভ করেন সওয়াল। অবগুণ্ঠিতা শেফালী জানায়, সে নির্দোষ, সে খুন করেনি। ঘোমটা খুলে ইন্দ্রর দিকে তাকিয়েই চমকে ওঠে শেফালী। সঙ্গে সঙ্গে বলে, আমিই খুন করেছি, আমাকে ফাঁসী দিন। সেদিনের মত বিচার স্থগিত থাকে। ইন্দ্র ভাবতে বসে। ও মুখ যেন বড় পরিচিত। দেওয়ান কাকা আর শিবুদাকে পাঠায় জেলে মেয়েটিকে দেখতে। তারা এসে জানায় এ সেই রাধা।

রাধা। মন্দিরের মধ্যে ছোট্ট মেয়ে রাধাকে কুড়িয়ে পেয়ে ইন্দ্রর পিসীমা নয়াগড়ের নিঃসন্তান রাণীমা তাকে নিজের মেয়ের মত মানুষ করতে থাকে। রাধা বড় হয়। ব্যারিস্টারি পড়তে যাওয়ার আগে ইন্দ্র নয়াগড়ে এসে রাধার রূপযৌবন দেখে নিজেকে যেন আর সামলাতে পারে না। এক ঝড়জলের রাতে মিথ্যে প্রেমের অভিনয়ে সে রাধার চরম সর্বনাশ করে বলে, আজ থেকে সে তার সব ভার নিল। ধীর, স্থির, ভীরু রাধা তা বিশ্বাস করল। পরদিনই ইন্দ্র কলকাতা চলে গেল এবং বিলেত যাওয়ার আগে সব কথা জানিয়ে দেখা করার কথা দিলেও সে নয়াগড়ে না এসে সোজা বিলেত চলে যায়।

ওদিকে রাধা অন্তঃসত্ত্বা হয়। রাণীমা জানতে চান কে তার ঐ অবস্থা করেছে। রাধা নীরব। যাকে সে ভালবাসে তার সম্মান নষ্ট করবে সে কেমন করে। কিন্তু রাণীমা তাকে তাড়িয়ে দেন। রাধা আশ্রয় পায় রাণীমার পুরনো চাকর শিবুদার গ্রামের বাড়ীতে। সেখানে রাধার একটি ছেলে হয়। শিবুদার বৌ কিন্তু রাধার প্রতি প্রসন্ন ছিল না। একদিন তার ছোট ভাই এসে রাধাকে দেখে মুগ্ধ হয়ে রাত্রে তার ঘরে গিয়ে অত্যাচার করতে যায়। রাধা বাধা দেয়। চীৎকারে শিবুদার বৌ আসে। লম্পট ভাইয়ের কথা বিশ্বাস করে সেই রাত্রেই রাধাকে ঘর ছাড়া করে। রাধা ট্রেনে করে চলেছে—কোলে তার মরা ছেলে।

চিঠি। পরিচালনা : নবেন্দু চ্যাটার্জি। সন্ধ্যা রায় এবং শমিত ভঞ্জ। ফটো : অমৃত

অর্চনা । মাধবী মুখোপাধ্যায়, গীতা দে ও শৈলেন মুখোপাধ্যায়। পরিচালনা : পীযূষ গঙ্গোপাধ্যায় —ফটো : অমৃত

সেই কামরাতেই ছিল এক বাড়ীওয়ালী মাসী। সহানুভূতির সঙ্গে মিষ্টি কথায় ভুলিয়ে মাসী রাধাকে নিয়ে আসে নিজের পতিতালয়ে। তারপর অত্যাচারে জর্জরিতা রাধা নিজের ইচ্ছার বিরুদ্ধেই পতিতা হতে বাধ্য হয়। নাম হয় তার শেফালী।

পতিতা হয়েও শেফালী সবার চেয়ে ভিন্ন। সে খালি মদ খায়। মদ খেয়ে সে যেন নিজেকে মেরে ফেলতে চায়। পুরুষ গায়ে হাত দিলেই সে রেগে ওঠে। তবু পুরুষ আসে—আসে ব্যবসায়ী বংশীলাল। শেফালীকে তার ভাল লাগে। একদিন মাসীকে টাকা দিয়ে শেফালীকে সে তার হোটেলে পাঠিয়ে দিতে বলে। অত্যাচারের ভয়ে, ইচ্ছার বিরুদ্ধে শেফালী বংশীলালের হোটেলে যায়। সেই রাত্রেই বংশীলাল খুন হলো, তার টাকাও খোয়া গেল। পুলিশ গ্রেপ্তার করলো শেফালীকে। শুরু হলো মামলা।

শেষ পর্যন্ত প্রকৃত খুনী কিভাবে ধরা পড়লো—রাধারই বা কী হলো তাই দেখিয়ে শেষ হয়েছে ছবি।

শিল্পীদের অভিনয় এ ছবির এক সম্পদ। বিশেষ করে নায়িকা রাধার ভূমিকায় সুপ্রিয়া দেবীর অভিনয়। রাধা এবং শেফালী দুটি চরিত্রকেই তিনি অসীম মমত্ব দিয়ে গড়ে তুলেছেন। বিশেষ করে শেফালীর রূপসজ্জায় তাঁর অভিনয় ভোলা যায় না। বাচনভঙ্গি, দৃষ্টিপাত ও অন্যান্য আঙ্গিকে চরিত্রটিকে তিনি জীবন্ত করে তুলেছেন। বংশীলালরূপী অসীম চক্রবর্তীও অত্যন্ত সহজ, সাবলীল, সুন্দর অভিনয় করেছেন। চলচ্চিত্রে প্রায় নবীন এ শিল্পীর ভবিষ্যত সম্ভাবনাময়। ইন্দ্রর চরিত্রে উত্তম-কুমারের যেটুকু করার ছিল তিনি তারই সদ্ব্যবহার করেছেন। অন্যান্য কয়েকটি চরিত্রে সুঅভিনয় করেন চন্দ্রাবতী, সুনন্দা দাশগুপ্ত, কুমার রায়, মণ্টু ব্যানার্জি।

শ্যামল মিত্র সঙ্গীত-পরিচালিত এ ছবির গান দুটি গেয়েছেন প্রতিমা ব্যানার্জি ও শ্রীমিত্র স্বয়ং। গান দুটি মোটামুটি। ছবিতে এর প্রয়োজন খুব বেশী ছিল বলে মনে হলো না। ছবিটির আবহসঙ্গীতও বেশ চড়া সুরে বাঁধা।

ছবিটির চিত্রগ্রহণ (দিলীপরঞ্জন মুখোপাধ্যায়) অপূর্ব। বিশেষ করে আদালতে ঘোমটা খোলার পর সুপ্রিয়া দেবীর যে প্রায় স্থির ক্লোজআপ ভঙ্গিমাটি নেওয়া হয়েছে তা অনেকদিন মনে রাখার মত। অন্যান্য বিভাগীয় কাজ সুন্দর। সম্পাদনার ক্ষেত্রে সম্পাদক আরো কিছুটা নির্মম হতে পারতেন।

সেলুলয়েডে কবিতা

না, আর গতানুগতিকতা নয়। প্রথার কাছে আত্মসমর্পণ নয়। পুরাতনকে অস্বীকার নয়, আবার তার বাঁধা ছকে চলাফেরাও নয়। এ যেন এক নতুন চিন্তা—নতুন সাহসিক ভাবনা। তাই দেখে ভাল লাগে—ভয়, হ্যাঁ তাও বোধহয় হয়। বিস্ময় আছে, আছে চমক তবু আবার পুরোপুরি একাত্মও হওয়া সম্ভব নয়। সব মিলিয়ে এ এক অপরিচিত—আনন্দমধুর অথচ শঙ্কামিশ্রিত আশ্চর্য অনুভূতি।

ধরুন, মৃণাল সেনের 'ভুবন সোম'-এর কথা। ছবিটির প্রতিটি দৃশ্যই যেন এক গতিশীল ছন্দবদ্ধ কবিতা। সে কবিতা পাঠের যে আনন্দ তা আজও অম্লান। তারপর ওধরনের প্রচেষ্টার অনুপস্থিতি বেদনাদায়ক। কিন্তু দেখা গেল, না, সম্পূর্ণ অনুপস্থিত নয়। এক নবীন পরিচালক মণি কাউল নাট্যকার মোহন রাকেশের একটি গল্প নিয়ে 'উসকি রোটি' নামে যে ছবিটি তুলেছেন, তাতেও তো সেই সুর—সেই ছন্দ। কোথাও বেশী বাঙ্ময়—বুঝি পরিণতও; আবার এর মন্থরতা—কাব্য হয়েও যা এক দমবন্ধকর অস্বস্তির সৃষ্টি করে—কোথাও বা বিভ্রান্তিও আনে। তবু পরিচালক শ্রীকাউলের এই যে দুঃসাহস; পরীক্ষা করার মত মেজাজ, এক কাব্যিক শিল্পবোধ, তাকে ভাল না বেসে তো উপায় নেই। তা সুন্দর—তাই মনোমুগ্ধকর।

কাহিনী সামান্য। তবু নতুনত্ব আছে। অনেকটা যেন উচ্চাঙ্গসঙ্গীতের মত সে ডানা মেলে এগিয়েছে। কোথাও কিছু নির্বাক-শব্দহীন মুহূর্ত—আবার কোথাও একটি দুটি ছোট সংলাপ। তবু ওরি মধ্য দিয়ে ঝরে পড়েছে যে মানবিক আবেদন, তার কাছে নত না হয়ে তো পারা যায় না।

ওই যে মেয়েটি বালো যার নাম—সে তার শান্ত মনটিকে সামলে রয়েছে, স্বামী বাস-ড্রাইভার সুচা সিং-এর সব উপেক্ষা সয়েও রোজ রুটি নিয়ে আসে—অপেক্ষা করে যেন শবরীর অন্তহীন প্রতীক্ষায়। কোনদিন বাস আসে, কোনদিন আসে না, কোনদিন বা সুচা সিং বলে, না আজ আর রুটি নয়। তবু রোজ ... প্রতিদিনই

প্রেম ও অপ্রেম : তরুণকুমার ও মাধবী চক্রবর্তী। পরিচালনা : বিমল ভৌমিক

অপেক্ষা করে। অপেক্ষা করে সপ্তাহের সেই দিনটির জন্য যেদিন সুচা সিং ঘরে থাকে। যদিও তাতে কোন উত্তাপ নেই সুচা সিং-এর এতটুকু ভালবাসার ছোঁয়া। তবু বালো অপেক্ষা করেই চলে।

সংলাপ সংক্ষিপ্ত। কিন্তু ক্যামেরা যেন কথা বলেছে। দীর্ঘক্ষণ তা হয়ত স্থির থেকেছে তবু কী আশ্চর্য এক ব্যঞ্জনা। সব কিছুই নির্লিপ্ত শান্তভাবের মধ্য দিয়ে তা ধরেছে। কী ধর্ষণের দৃশ্য, কী বিবাহ বা মৃত্যুর দৃশ্য—সব জায়গাতেই কবিতা আর গানের সেই আশ্চর্য অনুভূতি। এছাড়া ক্যামেরাকে এক বিশেষ উচ্চতায় সারাক্ষণ ধরে রেখেও যে বিশেষ 'মুড' সৃষ্টি করা হয়েছে তাও তো ছবিটির এক সম্পদ।

আলাদাভাবে আবহসঙ্গীত নেই। শুধু সন্তুরের একক সুর, কখনও বাদের আওয়াজ, কখনও কাক বা পাখির কাকলী—সব মিলিয়ে এক সুন্দর ঐকতান।

সম্পাদনার গুণে ছবিটি মন্থর হয়েও কাব্যিক হয়ে উঠেছে। আর অভিনয় সে সম্বন্ধে নতুন কিছু বলার নেই। পরিচালকের নির্দেশেই অভিনেতারা সব কিছু করেছেন। তবু বালোরূপী সবিতা বাজাজের চোখ—তার নীরব ভাষা অনেক কিছু না বলেও বলে গেছে অনেক কথা। ও চোখ ভোলা যায় না—এ ছবিও বুঝি তাই।

মঞ্চাভিনয়

লিপটন ড্রামাটিক ক্লাব প্রযোজিত 'শ্রীকান্ত' : শরৎচন্দ্রের 'শ্রীকান্তে'র সঙ্গে বঙ্গজীদের যে একটি নিবিড় প্রাণময়তার যোগসূত্র আছে তারই একটি প্রোজ্জ্বল রূপ সেদিন ধরা পড়লো এই উপন্যাসের একটি সফল নাট্যরূপায়ণে। স্টার রঙ্গমঞ্চে নাট্যাভিনয়ের আয়োজন করেন লিপটন ড্রামাটিক ক্লাবের শিল্পীরা। শরৎচন্দ্রের গভীরতম জীবনচেতনার দীপ্তিতে দ্যুতিময় এই উপন্যাসটিকে মঞ্চের আলো আঁধারে পরিবেশন করে শিল্পীরাও সচেতন জীবনবোধ আর শিল্পবোধের আন্তরিক পরিচয় রাখতে পেরেছেন।

'শ্রীকান্ত' উপন্যাসটির প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড অবলম্বন করে সার্থকভাবে নাট্যরূপ দিয়েছেন শ্রীদেবনারায়ণ গুপ্ত। নাট্যরূপায়ণে উপন্যাসের মতো সব চরিত্রগুলোই সজীব হয়ে উঠতে পেরেছে, আর প্রতিটি মুহূর্তেই হয়ে উঠেছে মানবিক গুণে সপ্রতিভ। নাটকের প্রথম পর্বে শ্রীকান্ত, ইন্দ্রনাথ আর অন্নদাদিদির যন্ত্রণাদগ্ধ জীবনের একটি অধ্যায় নিয়ে ঘটনা সংঘাতে মুখর হয়ে উঠেছে। দ্বিতীয় পর্বে বর্ণিত হয়েছে শ্রীকান্ত ও রাজলক্ষ্মীর অতল হৃদয়ের যন্ত্রণাছোঁয়া চাওয়া পাওয়ার কাহিনী। শ্রীকান্ত, রোহিণী আর অভয়াকে ঘিরে আর একটি ঘটনার আবর্ত সৃষ্টি হয়েছে নাটকের তৃতীয় পর্বে। পরিশেষে শ্রীকান্তের অসুস্থতার খবর পেয়ে সমস্ত সামাজিক বিধিনিষেধ ছিঁড়ে ফেলে রাজলক্ষ্মী ছুটে এসেছে শ্রীকান্তের গ্রামে। আর কুসংস্কারাচ্ছন্ন গ্রামবাসীদের রূঢ় সমালোচনা বন্ধ করে দিলো শ্রীকান্ত রাজলক্ষ্মীকে নিজের স্ত্রীর মর্যাদা দিয়ে। আর রাজলক্ষ্মীও নতুন পথের নিশানা পেলো—পেলো স্নেহ প্রীতি আর ভালোবাসায় উদ্বেল-করা একটি ছোট্ট সংসারের স্বপ্নকে সফল করে তোলার দিগন্তকে।

স্বভাবতই উল্লেখ্য এই দীর্ঘ কাহিনীকে নাটকে রূপদান করতে ঘটেছিল বহু চরিত্রের সমাবেশ। নির্দেশক শ্রীদীনেন রায়ের শৈল্পিক উপস্থাপনার ছোঁয়ায় নাটকের বক্তব্য ও স্বকীয় গতি প্রায় প্রতিটি মুহূর্তে অক্ষুণ্ণই থাকে। বিশিষ্ট ভূমিকায় যাঁরা অভিনয় করেন তাঁরা প্রায় সবাই তাঁদের বিভিন্ন চরিত্রের অতলে ডুবে যেতে পেরেছিলেন এবং সেই সূত্রেই সামগ্রিকভাবে নাট্যপ্রযোজনাটি শৈথিল্যমুক্ত হয়।

বিভিন্ন অনুভূতির প্রহর থেকে যে শ্রীকান্ত জীবন ও চলমান বিচিত্র চরিত্রগুলোকে দেখেছে তার রূপদানে কৌস্তুভ চট্টোপাধ্যায় সুগভীর নিষ্ঠার পরিচয় রাখতে পেরেছেন। শ্রীকান্তের উপলব্ধির প্রশান্ত মুহূর্তগুলো তাঁর অভিব্যক্তিতে মোটামুটি পরিস্ফুট হয়ে উঠতে পেরেছে। দীপিকা দাসের হৃদয়গ্রাহী অভিনয় 'রাজলক্ষ্মী'কে এক আশ্চর্য মাধুর্য দিয়েছে। পিয়ারী বাঈজীরূপে তাঁর সংগীত পরিবেশনায় চিহ্নিত হয়েছে প্রকৃত সুর-মূর্ছনা। গীতা দে'ও 'অন্নদাদিদি'র নিঃসীম যন্ত্রণাকে মূর্ত করে তুলেছেন মঞ্চের আলোয়। দীপঙ্কর চৌধুরী (ছোট শ্রীকান্ত), পঙ্কজ ভট্টাচার্য (ইন্দ্রনাথ), অশোক রায়চৌধুরী (রোহিনী), শক্তি ব্যানার্জি (নতুনদা), অমিতাভ ঘোষ (অভয়ার স্বামী), চণ্ডীচরণ পাইন (ছিনাথ বহুরূপী), ঝুমা মুখার্জি (অভয়া) তাঁদের স্বকীয় চরিত্রচিত্রণে সাবলীল অভিনয়-নৈপুণ্যকে তুলে ধরতে পেরেছেন। অন্য কয়েকটি ভূমিকায় ছিলেন জেরাল্ড গোমেশ, অমরেন্দ্র মিত্র, সুনীল বসু, অজয় গাঙ্গুলী, দিবাকর চক্রবর্তী, শঙ্করলাল ঘোষাল, মৃণ্ময় রায়চৌধুরী, প্রদীপ দে, গিরীন ব্যানার্জি, অপূর্ব বোস ও মেনকা দাস।

ইউনিয়ন কারবাইডের 'পথদেবতা' : যান্ত্রিক জীবন-জিজ্ঞাসার সহস্ররকম জটিলতায় ভরা শহর থেকে অনেক দূরে

যে শান্ত নদীনিবিড় গ্রাম, তারও প্রশান্তি বিঘ্নিত হয় নানা ধরনের কুটিলতার কশাঘাতে। মতান্তরবোধের আবর্ত থেকে সেখানেও শুরু হয় অস্বাভাবিক অনেক সংঘাত, প্রাচীনের সঙ্গে অকারণে বিরোধ বাধে নবীনের। অর্থলোভীর লালসার সীমাহীনতাও সেখানে নিদারুণভাবে অসহ্য হয়ে ওঠে। সাধারণ মানুষের যাত্রা হয় বিপর্যস্ত, তবু তারা বিরাট শক্তির বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে চেষ্টা করে। তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের অমর সৃষ্টি 'গণদেবতা' উপন্যাসের প্রতিটি পাতায় এই জীবন-গুলোকেই তুলে ধরা হয়েছে। পঞ্চগ্রামের সাধারণ মানুষের মধ্যে আশঙ্কা দেখা দিলেও, লেখকের তীব্রতর বিশ্বাস মানুষের মুক্তি একদিন আসবেই, পঞ্চগ্রামের মানুষ মরবে না—তার সার্বজনীন অধিকার ছিনিয়ে নেবার অধিকার কারো নেই। শত শত অবক্ষয়ের মাঝেও আশার আলোর সংকেত এনেছে সূর্য। এই সূর্যালোককেই বুকে নিয়ে পঞ্চগ্রামের গণদেবতা এগিয়ে চলেছে সত্য, আনন্দ আর চিরন্তন জীবনের পথে।

জ্ঞানপীঠ পুরস্কারজয়ী তারাশঙ্করের এই অসাধারণ উপন্যাসটিকে আশ্চর্যসুন্দর-ভাবে মঞ্চের আলোয় সেদিন তুলে ধরলেন ইউনিয়ন কারবাইড রিক্রিয়েশন ক্লাবের শিল্পীরা। এই বলিষ্ঠ উপন্যাসটির সার্থক নাট্যরূপ দিয়েছেন শ্রীরতনকুমার ঘোষ; তাঁর এই প্রয়াস সর্বতোভাবে অভিনন্দনযোগ্য। নাট্যনির্দেশনার দায়িত্বও তিনি নিজে নিয়েছিলেন। প্রয়োগ-পরিকল্পনার শৈল্পিক মুন্সিয়ানা আর শিল্পীদের সংঘবদ্ধ অভিনয়ের সাবলীলতার সেতুবন্ধনে 'গণদেবতা' প্রযোজনাটি এক নতুনতর বৈশিষ্ট্য পেয়েছে।

প্রতিটি চরিত্রই হয়েছে সুঅভিনীত। বিভিন্ন ভূমিকায় যাঁরা ছিলেন তাঁরা হোলেন নির্মল বসু (হরিশ), শ্যামানন্দ গুপ্ত (ভবেশ), নির্মল চ্যাটার্জি (সতীশ), অমর ভট্টাচার্য (হরেন), শৈলেশ বসু মজুমদার (শ্রীহরি চৌধুরী), রাধাগোবিন্দ বসাক (ছিরু পাল), প্রবীর মজুমদার (দেবু ঘোষ), যতিনাথ চ্যাটার্জি (অনি কামার), মমতা চ্যাটার্জি (দুর্গা), উৎপল পাঠক (গাঙ্গুলী), ভবেন দাশগুপ্ত (ভূপাল), গীতা কর্মকার (পদ্ম), রঞ্জিত গোস্বামী (জগন ডাক্তার), চণ্ডীচরণ মান্না (তিনকড়ি), কৃষ্ণপদ দাস (দারোগা), মীরা বোস (বিল্টু), তপন ব্যানার্জি (যতীন), বিশ্বনাথ বিশ্বাস (নায়েব), পিনাকী চক্রবর্তী (বিশ্বনাথ)। আলোকসম্পাতে দক্ষতার স্বাক্ষর রাখেন স্বরূপ মুখার্জি।

ইউনিয়ন স্পোর্টিং ক্লাবের 'প্রতিচ্ছবি': ইউনিয়ন স্পোর্টিং ক্লাবের শিল্পীরা কয়েক-দিন আগে ক্লাবের তৃতীয় বার্ষিক সাংস্কৃতিক উৎসব উপলক্ষ্যে নীলোৎপল দের 'প্রতিচ্ছবি' নাটকটি পরিবেশন করেন ইউনিভার্সিটি ইনস্টিটিউট মঞ্চে। নাটকটি সার্থকভাবে পরিচালনা করেন শ্রীবিশু চট্টোপাধ্যায়। স্বচ্ছন্দ অভিনয়গুণে যাঁরা দর্শকমনে রেখাপাত করতে পেরেছেন তাঁরা হোলেন জয়ন্ত চৌধুরী (সোমনাথ), শিবনাথ মিত্র (প্রতাপ রায়), অশোক ঘোষ (মোহন), সৌমেন মল্লিক (জয়), মলয় তালুকদার (শৈলেন), কাজল বন্দ্যোপাধ্যায় (রজনী)।

অন্যান্য চরিত্রে ছিলেন সমর দে, সতীশ-চরণ বসু, সরোজ বসু, স্বপন বসু, তাপস দাশগুপ্ত, অসিত রায়, সুধাংশু রায়, স্বপন দাস, পাঁচুগোপাল সিংহরায়, নমিতা গঙ্গোপাধ্যায়। শ্রীকাশীনাথ পালের আলোকসম্পাত সমগ্র নাটকটিতে অতিরিক্ত গতিবেগ দিয়েছে।

আটাত্তর দিন পরে ছবির নায়িকা/জয়া ভাদুড়ি ফটো : অমৃত

কল্পনা । সাধনা । পরিচালনা : নরেন্দ্র পুরী।
—ফটো : অমৃত

অপর্ণা সেন এবং সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়।

বিবিধ সংবাদ

রবীন্দ্র-নজরুল সঙ্গীতানুষ্ঠান

গৌতম মুখার্জি প্রযোজিত ও সম্ভাবনা নিবেদিত রবীন্দ্র-নজরুল সঙ্গীতানুষ্ঠান আগামী ২০শে অকটোবর সন্ধ্যা ৬টায় একাডেমী অব ফাইন আর্টস মঞ্চে অনুষ্ঠিত হবে। শিল্পী : হেমন্ত মুখোপাধ্যায় ও মানবেন্দ্র মুখোপাধ্যায়, সঙ্গতে : রাধাকান্ত নন্দী।

ইস্ট বাকল্যান্ড রোড : সম্প্রতি 'ইস্ট বাকল্যান্ড রোড', নাটকটি কিন্নরপায় অভিনীত হয়। ঊনবিংশ শতাব্দীর গোড়ায় বাংলাদেশের কোন এক জায়গায় ইংল্যান্ড থেকে বাকল্যান্ড সাহেব এসেছিলেন। ডাক্তার মানুষ, নিজের ভাগ্য ফেরাতেই এসেছিলেন এই বাংলায়। দুর্ভাগ্য তাঁর যে এই বাংলারই এক আদিবাসী মেয়েকে ভালবাসতে গিয়ে অবশেষে তিনি নিহত হয়েছিলেন।

'ইস্ট বাকল্যান্ড রোড' নাটককে কেন্দ্র করে যাঁরা অভিনয় করেছিলেন, তাঁদের মধ্যে জর্জিনা মোন্ড অনবদ্য অভিনয় করেছেন।

এছাড়া আরো যাঁরা অভিনয় করেন, তাঁদের মধ্যে ছিলেন শঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, মালা দাশ, ডি কে চৌধুরী, সন্ধ্যা পাল,

স্ত্রী পরিত্যাগ : সমিত দত্ত ও শ্রীমতী আরতি ভট্টাচার্য। —ফটো : অমৃত

প্রিয়গোপাল সরকার ও ইরা মিত্র। নাটকটি পরিচালনা করেন তপেন গঙ্গোপাধ্যায়।

নজরুল সংগীতানুষ্ঠান : গত শনিবার ১৯ সেপ্টেম্বর শ্রীমতী হাসি অধিকারীর আহ্বানে শ্রীমতী বাসন্তী দেবীর ডায়মণ্ড-হারবার রোডস্থ ভবনে নজরুল সংগীতানুষ্ঠানের একটি আয়োজন হয়েছিল। অনুষ্ঠানের প্রধান শিল্পী ছিলেন গীতি-চারণ সত্যেশ্বর মুখোপাধ্যায়। প্রারম্ভে কুমারী খেবী অধিকারীর উদ্বোধন সংগীতের পর সত্যেশ্বর মুখোপাধ্যায় একক উদাত্তকন্ঠে কাজী নজরুলের গজল, রাগপ্রধান, ভাটিয়ালী, ঝুমুর, হাসির গান, শ্যামাসংগীত, দেশাত্মবোধক, কীর্তন প্রভৃতি বিভিন্ন পর্যায়ের অনেকগুলি গান দীর্ঘসময় ধরে পরিবেশন করে উপস্থিত শ্রোতৃবৃন্দের অকুণ্ঠ তৃপ্তিদান করেন। তাঁর সঙ্গে সঙ্গতে অংশগ্রহণ করেন গুরুসদয় মুখোপাধ্যায়। সত্যেশ্বর মুখোপাধ্যায় প্রকৃত নজরুল ঘরাণার শিল্পী। শিল্পী পরিচিতি প্রসঙ্গে সে ঘরাণার কথা উল্লেখ করেন রণজিৎ চক্রবর্তী। বর্তমানে নজরুল সংগীতের ব্যাপক সুরবিচ্যুতি সম্বন্ধেও তিনি সকলকে অবহিত করেন। প্রভাতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, বিশ্বনাথ মুখোপাধ্যায়, ডাঃ সুধীরকুমার অধিকারী ও স্বপ্না চট্টোপাধ্যায়ের ঐকান্তিক চেষ্টায় অনুষ্ঠানটি সাফল্যমণ্ডিত হয়েছিল। স্থানীয় বিশিষ্ট ব্যক্তিরা অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন।

দক্ষিণ ভারতে মূকাভিনয়

প্রখ্যাত মূকাভিনেতা যোগেশ দত্ত সম্প্রতি দক্ষিণ ভারতের ওয়ালটেয়ার, বাংগালোর, মহীশূরে ও মাদ্রাজে তাঁর একক মূকাভিনয় পরিবেশন করেন। শ্রীদত্তের এই সফর ভারতীয় মূকাভিনয়কে আরও জনপ্রিয় করে তোলে। এক সাংবাদিক সম্মেলনে শ্রীদত্ত বলেন যে, দক্ষিণ ভারতের কথাকলি ও ভারতনাট্যমই এই মূকাভিনয়ের আদি উৎস। শ্রীদত্ত এবার সফরে প্রভূত প্রশংসা অর্জন করেন। একটি সংবাদপত্র শ্রীদত্তকে 'সাইলেণ্ট পোয়েট অফ ইণ্ডিয়া' নামে অভিহিত করেছেন।

সারারাত্রিব্যাপী বিচিত্রানুষ্ঠান : সম্প্রতি ওয়েস্ট বেঙ্গল স্টেট ইলেকট্রিসিটি সাপ্লায়ের (ফলতা শাখা) কর্মীরা সারারাত্রিব্যাপী এক বিচিত্রানুষ্ঠানের আয়োজন করেছিলেন। শিল্পীদের মধ্যে ছিলেন— সর্বশ্রী নির্মল পাল, কার্তিককুমার ও মদনকুমার, জয়ন্ত মুখোপাধ্যায়, প্রেমেন পাল, হৃষীকেশ বর (বাউল), বাণী চট্টোপাধ্যায়, রমিলা মুখোপাধ্যায়, সোনালী রায়, মাধুরী সেনগুপ্ত, মঞ্জু সেনগুপ্ত, প্রশান্ত মুখোপাধ্যায় ও সম্প্রদায় (যন্ত্রসংগীত), গৌতম মজুমদার। তাছাড়া স্থানীয় শিল্পীরাও ছিলেন। যন্ত্রসংগীতে প্রশান্ত মুখোপাধ্যায়ের নাম উল্লেখযোগ্য। শিশু চিত্রশিল্পী সোনালী রায়ও দর্শকদের আনন্দদান করেন।

অনির্বাণ সংসদের বিচিত্রানুষ্ঠান

সম্প্রতি দক্ষিণ কলিকাতার মহারাষ্ট্র নিবাস হলে 'অনির্বাণ সংসদের' পরিচালনায় একটি মনোজ্ঞ বিচিত্রানুষ্ঠানের আসর বসে। অংশগ্রহণকারী শিল্পীদের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখ্য হলেন : অখিলবন্ধু ঘোষ, প্রতিমা বন্দ্যোপাধ্যায়, আশীষ মুখোপাধ্যায়, নির্মু ভৌমিক, দেবল রায় প্রমুখ। ব্যবস্থাপনায় ছিলেন অভিজিৎ বিশ্বাস।

কিশোর কল্যাণ পরিষদ

ক'দিন আগে পাথুরিয়াঘাটার মন্মথ মল্লিক স্মৃতিমন্দিরে কিশোর কল্যাণ পরিষদের একবিংশ প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী, সন্ধ্যা-বর্তন উৎসব ও অবনীন্দ্র জন্মশতবার্ষিকী অনুষ্ঠানে সভানেত্রীত্ব করেন প্রখ্যাত সাহিত্যিকা শ্রীমতী আশাপূর্ণা দেবী এবং প্রধান অতিথির আসন গ্রহণ করেন সরকারী চারু ও কলা মহাবিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ শ্রীচিন্তামণি কর। অনুষ্ঠানে পরিষদ আয়োজিত বার্ষিক প্রতিযোগিতায় বিভিন্ন বিষয়ে প্রথম স্থানাধিকারী ছেলেমেয়েরা আবৃত্তি, সংগীত ও নৃত্য পরিবেশন করে। প্রতিযোগিতার বিভিন্ন বিষয়ে স্থানাধিকারীরা এই অনুষ্ঠানে পুরস্কার লাভ করে।

চারটি বিষয়ে প্রথম স্থান অধিকার করায় কুমারী হিমিকা দাশগুপ্ত 'শ্রেষ্ঠ প্রতিযোগীর' বিশেষ পুরস্কার 'গোবিন্দ-গৌরী' স্মৃতিপদক লাভ করেন।

চারণ দল-এর নাটক

আগামী ২৬ অকটোবর, মঙ্গলবার, সন্ধ্যা ৭টায় চারণদল প্রযোজিত 'কমরেড' ও 'হিমালয়ের থেকেও ভারী' নাটক দুটি মুক্ত অঙ্গনে রঙ্গালয়ে মঞ্চস্থ হবে।

গৌরচন্দ্রঘাট ...(চাতরা, শ্রীরামপুর) শ্যামাপূজা কমিটির বিচিত্রানুষ্ঠান : আগামী ২৩ অকটোবর গৌরচন্দ্রঘাট শ্যামাপূজা কমিটি এক বিচিত্রানুষ্ঠানের আয়োজন করেছেন। অংশগ্রহণ করবেন সর্বশ্রী সুদাম বন্দ্যোপাধ্যায়, ললিতা ধরচৌধুরী, কল্যাণ মুখোপাধ্যায়, অঞ্জনা বাবলু, হৈমন্তী শুক্লা, রীণা সরকার, মণ্টু ভট্টাচার্য (হরবোলা), শিবনাথ দাস, দিলু চট্টোপাধ্যায় (বাঙলাগীতি), বেণু সেনগুপ্ত (হাস্যকৌতুক), সোনালী রায় (নৃত্য), মৃত্যুঞ্জয় দাস ও সহশিল্পীবৃন্দ (যন্ত্রসংগীত)।

অভিনেতাদের জন্য ট্রেনিং সেণ্টার দরকার —অপর্ণা সেন

পত্রান্তরে বাঙলা চলচ্চিত্রের অন্যতম নায়িকা অপর্ণা সেন লিখেছেন : "অভিনেতাদের জন্য ট্রেনিং সেণ্টার দরকার। দিল্লীতে স্কুল রয়েছে, পুণাতে রয়েছে—সেগুলো কতটা কার্যকরী হয়েছে, সেটা আমার বক্তব্য নয়—মোদ্দা কথা রয়েছে তো? কিছু কাজ তো হচ্ছে!......অথচ দেখুন কলকাতায় (যেখানে অভিনয়ের মান সম্পর্কে সকলে এত সচেতন) সে রকম কোনো প্রতিষ্ঠান নেই।"

ফিল্ম অ্যান্ড টেলিভিশন ইনস্টিটিউট অব ইণ্ডিয়াতে যে চলচ্চিত্রাভিনয় বা ফিল্ম অ্যাকটিং শেখানো হয়ে থাকে, সে-কথা চলচ্চিত্র জগৎ সম্পর্কে যাঁরা কিছুটা খোঁজ-খবর রাখেন, তাঁদের না জানবার কথা নয়। ওখানকার কিছু কিছু ছাত্রছাত্রী—জয়া ভাদুড়ী, রেহানা সুলতান, নবীন নিশ্চল, অনিল ধাওয়ান, শত্রুঘ্ন সিংহ প্রভৃতি—এরই মধ্যে ব্যবসায়িক চিত্রজগতে নিজেদের স্থান করে নিয়েছেন বা নিচ্ছেন। কিন্তু দিল্লীর কোনো স্কুলে চলচ্চিত্রের জন্যে অভিনয় শিক্ষা দেওয়া হয়ে থাকে বলে শুনিনি। দিল্লী স্কুল অব ড্রামা, যার পরিচালক হচ্ছেন অলকাজি (নামটা ঠিক ঠিক বললুম কিনা জানি না)—মঞ্চাভিনয়ের জন্যে অভিনয় শিক্ষা দিয়ে থাকেন; কিন্তু চিত্রাভিনয়ের? স্টেজ অ্যাক্টিং এবং ফিল্ম অ্যাকটিংয়ের ভিতর যে প্রচুর তফাৎ, সে-কথা অপর্ণা সেন নিশ্চয়ই জানেন; কারণ তাঁকে উৎপল দত্ত পরিচালিত 'লিটল থিয়েটার গ্রুপ'-এ বেশ কয়েকবার অভিনয় করতে দেখা গেছে।

তবু যদি শ্রীমতী সেন দিল্লী স্কুলকে অভিনয় শিক্ষার কেন্দ্র হিসেবে আমোল দেন, তাহলে তিনি 'কলকাতায় সে রকম কোনো প্রতিষ্ঠান নেই', এ-কথা এক নিশ্বাসে বলতে পারেন না। বরং বলা যেতে পারে, কলকাতায় অভিনয়-শিক্ষার এবং ঐ সঙ্গে নাটক বিষয়ে সর্বাঙ্গীন শিক্ষার যে-বিরাট প্রতিষ্ঠান রয়েছে, তার জোড়া শুধু ভারতে কেন, সমগ্র এশিয়াতে নেই। আমরা রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের কথা বলছি। এখানে নাটক সম্পর্কে দুটি পাঠ্যক্রম বা কোর্স—ডিপ্লোমা ও স্নাতকোত্তর বা এম-এ চালু রয়েছে। প্রথমটি স্কুল ফাইন্যাল উত্তীর্ণদের জন্যে ও তিন বৎসরব্যাপী; দ্বিতীয় স্নাতক বা বি-এ (বি-এসসি) পরীক্ষোত্তীর্ণদের জন্যে ও দুই বৎসরব্যাপী। ছাত্রছাত্রীরা কোন্ বিশেষ দিকে ব্যুৎপত্তিলাভ করতে চান,—কেউ অভিনয় বিষয়ে, কেউ নাটক রচনার ক্ষেত্রে আবার কেউ বা মঞ্চ আঙ্গিক বা নাট্যপ্রয়োগ বিষয়ে—, সেইদিকে লক্ষ্য রেখে প্রতিটি পাঠ্যক্রম বা কোর্সকে তিনটি ধারায় বা গ্রুপে ভাগ করা হয়েছে। অবশ্য রবীন্দ্রভারতীর নাট্য বিভাগের প্রতিটি ছাত্রছাত্রীকেই অল্পবিস্তর মঞ্চাভিনয়ে যোগ দিতেই হয়।

নাট্য বিষয়ক পাঠ্যক্রমটি প্রথম রচনা করেন নটসূর্য অহীন্দ্র চৌধুরী। তখন প্রতিষ্ঠানটির নাম ছিল রবীন্দ্রভারতী সঙ্গীত-নৃত্য-নাটক আকাদেমী। পরে যখন রবীন্দ্রভারতী একটি পুরোপুরি বিশ্ববিদ্যালয়ের রূপ ধারণ করে, তখন শ্রীচৌধুরীই নাটক বিভাগের ডীন হন। উনি অবসর গ্রহণ করবার পরে এই বিভাগটি ডঃ সাধনকুমার ভট্টাচার্যের অধ্যক্ষতায় পরিচালিত হয়। নাট্যবিষয়ে অসাধারণ পণ্ডিত ডঃ ভট্টাচার্যই নাটক রচনার সঙ্গে চিত্রনাট্য ও বেতারনাট্য রচনার বিষয়টি পঠন-পাঠনের ব্যবস্থা করেন ১৯৬৬ সাল থেকে এবং পরে চলচ্চিত্রের সকল বিভাগে শিক্ষা দেবার কথা চিন্তা করে একটি চলচ্চিত্র সম্পর্কীয় পাঠ্যক্রম রচনা করে সেটিকে রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্যপরিচালন সমিতি বা অ্যাকাডেমিক কাউন্সিল দ্বারা মঞ্জুরও করিয়ে নেন। এই পাঠ্যক্রমে চলচ্চিত্র পরিচালনা, চিত্রনাট্য লিখন, চলচ্চিত্রাভিনয়, আলোকচিত্রগ্রহণ, শব্দানুলেখন, সম্পাদনা, রসায়নাগারের কাজ, শিল্পনির্দেশনা প্রভৃতি বহু বিষয় অন্তর্ভুক্ত ছিল। তাঁর ইচ্ছা ছিল, একটি রীতিমত আদর্শ সাউণ্ড স্টেজ, ফিল্ম ল্যাবোরেটরী, এডিটিং এবং আর্ট ডিপার্টমেণ্ট তৈরী করিয়ে ক্যামেরা, সাউণ্ড মেশিন, ডেভলপিং ও প্রিণ্টিং মেশিন, মুভীওলা প্রভৃতির সাহায্যে আমাদের ছেলেমেয়েদের চলচ্চিত্র বিষয়ে তত্ত্ব ও ব্যবহারিক—থিয়োরিটিক্যাল ও প্রাকটিক্যাল শিক্ষায় শিক্ষিত করে তোলা। টেলিভিশান সম্পর্কেও তিনি চিন্তা করেছিলেন। তিনি বলতেন, আমাদের বাঙালী ছেলেমেয়েদের পক্ষে চালচিঁড়ে বেঁধে সুদূর পুণায় গিয়ে চলচ্চিত্রবিষয়ক শিক্ষালাভ করা সম্ভব নয়; মধ্যবিত্ত বাঙালীর সে রকম পয়সা ও সুযোগ কোথায়? অথচ এখানে যদি এই শিক্ষা দেবার ব্যবস্থা করা যায়, তাহলে বহু ছেলেমেয়ে দিনের বেলায় উপার্জন করতে করতেও সান্ধ্য বিভাগে এই বিশেষ বিষয়ে শিক্ষা গ্রহণ করতে পারে। যাদের উপার্জনের প্রয়োজন নেই, তাদের জন্যে দিবা বিভাগ তো খোলা থাকবেই।

ডঃ ভট্টাচার্য জানতেন, তাঁর এই স্বপ্নকে সফল করতে হলে বহু অর্থের প্রয়োজন হবে। তাই তিনি চলচ্চিত্র বিভাগটি খোলবার জন্যে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের কাছে এককালীন অর্থসাহায্য প্রার্থনা করেছিলেন এবং এও ভেবেছিলেন, তিনি চলচ্চিত্র ব্যবসায়ের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের কাছে এ-ব্যাপারে সাহায্য পাবার জন্যে ভিক্ষার ঝুলি নিয়ে উপস্থিত হবেন। কিন্তু আমাদের দুর্ভাগ্য যে, তিনি অত্যন্ত অকালে ইহলোক ত্যাগ করায় তাঁর এই পরিকল্পনা—যা রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের অ্যাকাডেমিক কাউন্সিল দ্বারা অনুমোদিত হয়ে রয়েছে—আজও বাস্তবে পরিণত হয়নি। অথচ আমরা অনুমান করতে পারি, রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয় যদি উদ্যোগী হয়ে নাটক বিভাগের অন্তর্গত এই চলচ্চিত্র বিষয়ক গ্রুপটিকে চালু করতে পারেন, তাহলে তাকে স্বাগত জানাবার জন্যে লোকের অভাব হবে না এবং বিভাগটি বহু তরুণ-তরুণীর আশাআকাঙ্ক্ষা পূরণে একটি বড়ো সহায়করূপে চিহ্নিত হবে। কে বলতে পারে, এই উপবিভাগটি চলচ্চিত্র বিষয়ে আমাদের দেশে নতুন গবেষণার ক্ষেত্রকে উন্মুক্ত ও প্রসারিত করবে না!

আমাদের পশ্চিমবঙ্গে চলচ্চিত্রাভিনয়ে ট্রেনিং সেণ্টার খোলার জন্যে অপর্ণা সেন যে দাবি জানিয়েছেন তা যদি রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ডঃ রমা চৌধুরীকে ডঃ সাধন ভট্টাচার্য পরিকল্পিত চলচ্চিত্র উপ-বিভাগটি খোলবার জন্যে তৎপর হতে উদ্বুদ্ধ করেন, তাহলে আমাদের অকুণ্ঠ ধন্যবাদ পাবেন শ্রীমতী সেন।

—আন্দীকর

মস্কোর ডায়নামো স্টেডিয়ামে ভারত বনাম সোভিয়েট ইউনিয়নের ফুটবল খেলার প্রারম্ভে দুই দলের অধিনায়কদ্বয়ের করমর্দন। খেলায় ভারত ০—৫ গোলে পরাজিত হয়।

খেলাধুলা

দর্শক

জাতীয় স্কুল ক্রীড়ানুষ্ঠান

গুজরাটের গান্ধীনগরে আয়োজিত ১৭তম শীতকালীন স্কুল ক্রীড়ানুষ্ঠানের চূড়ান্ত পদক জয়ের তালিকায় মহারাষ্ট্র প্রথম, রাজস্থান দ্বিতীয় এবং পশ্চিমবাংলা তৃতীয় স্থান লাভ করেছে। সন্তরণ প্রতিযোগিতার আসর বসেছিল আমেদাবাদে। এই সন্তরণ প্রতিযোগিতার বালক বিভাগে পশ্চিমবাংলা ৭টি স্বর্ণ, ৩টি রৌপ্য এবং ৩টি ব্রোঞ্জ পদক জয়ের সূত্রে দলগত চ্যাম্পিয়ানশিপ লাভ করে। পশ্চিমবাংলার সুধীর দাস বালক বিভাগের ২০০ মিটার, ৪০০ মিটার এবং ৮০০ মিটার ফ্রিস্টাইল সাঁতারে স্বর্ণপদক জয় করে অসাধারণ কৃতিত্বের পরিচয় দেয়। ৪০০ মিটার ফ্রিস্টাইল সাঁতারে তার নতুন রেকর্ড (৫ মিঃ ০৩.৫ সেঃ) বিশেষ উল্লেখযোগ্য। তাছাড়া ৪×১০০ মিটার মেডলে এবং ৪×১০০ মিটার ফ্রিস্টাইল রীলে সাঁতারে স্বর্ণপদক বিজয়ী পশ্চিমবাংলা দলে সুধীর দাসের ভূমিকা যথেষ্ট ছিল।

ফুটবল খেলায় গত বছরের চ্যাম্পিয়ান পশ্চিমবাংলা দল স্বদেশের মর্যাদা রাখতে পারেনি। ফাইনালে রাজস্থান ৮—৭ গোলে পশ্চিমবাংলাকে পরাজিত করে স্বর্ণপদক জয়ী হয়। নির্ধারিত সময় পর্যন্ত ফাইনাল খেলাটি ১—১ গোলে ড্র ছিল। শেষপর্যন্ত পেনাল্টি কিকের সাহায্য নিয়ে জয়-পরাজয়ের মীমাংসা করতে হয়।

আলোচ্য বছরের প্রতিযোগিতায় ১৮টি রাজ্যের স্কুল ছাত্র-ছাত্রীরা অংশগ্রহণ করেছিল। পদক পেয়েছিল দশটি রাজ্য।

পদক জয়ের তালিকা

	স্বর্ণ	রৌপ্য	ব্রোঞ্জ
মহারাষ্ট্র	৩	২	১
রাজস্থান	৩	০	১
পঃ বাংলা	১	১	২
পাঞ্জাব	১	০	২
আসাম	১	০	১
মধ্যপ্রদেশ	১	০	০
ত্রিপুরা	০	২	০
গুজরাট	০	১	২
দিল্লী	০	১	০
হরিয়ানা	০	১	০

সন্তরণ প্রতিযোগিতা
বালক বিভাগ

	স্বর্ণ	রৌপ্য	ব্রোঞ্জ
পঃ বাংলা	৭	৩	৩
মহারাষ্ট্র	১	২	৩
ত্রিপুরা	০	৪	১
পাঞ্জাব	১	০	০
দিল্লী	০	০	২

বালিকা বিভাগ

	স্বর্ণ	রৌপ্য	ব্রোঞ্জ
মহারাষ্ট্র	৪	২	১
গুজরাট	০	১	২
ত্রিপুরা	১	১	১
পঃ বাংলা	০	১	১

দলগত চূড়ান্ত ফলাফল

ফুটবল : স্বর্ণ—রাজস্থান, রৌপ্য—পশ্চিমবাংলা, ব্রোঞ্জ—আসাম।

বাস্কেটবল : বালক বিভাগ : স্বর্ণ—রাজস্থান, রৌপ্য—হরিয়ানা, ব্রোঞ্জ—পাঞ্জাব।

বালিকা বিভাগ : স্বর্ণ—মহারাষ্ট্র, রৌপ্য—দিল্লী, ব্রোঞ্জ—রাজস্থান।

ভারোত্তোলন : স্বর্ণ—পাঞ্জাব ও রাজস্থান, ব্রোঞ্জ—পশ্চিমবাংলা।

বিশ্ব হকি প্রতিযোগিতা (বার্সিলোনা) : ভারত বনাম আর্জেন্টিনার খেলার একটি দৃশ্য। খেলায় ভারত ১—০ গোলে জয়ী হয়।

টেবল টেনিস :

বালক বিভাগ : স্বর্ণ—আসাম, রৌপ্য—মহারাষ্ট্র, ব্রোঞ্জ—পশ্চিম বাংলা।

বালিকা বিভাগ : স্বর্ণ—মহারাষ্ট্র, রৌপ্য—গুজরাট, ব্রোঞ্জ—পাঞ্জাব।

খো-খো (বালিকা) : স্বর্ণ—মধ্যপ্রদেশ, রৌপ্য—মহারাষ্ট্র, ব্রোঞ্জ—গুজরাট।

সাঁতার :

বালক বিভাগ : স্বর্ণ—পশ্চিমবাংলা (৫৮ পয়েণ্ট), রৌপ্য—ত্রিপুরা (১৯ পয়েণ্ট), ব্রোঞ্জ—মহারাষ্ট্র।

বালিকা বিভাগ : স্বর্ণ—মহারাষ্ট্র (৪২ পয়েণ্ট), রৌপ্য—ত্রিপুরা, ব্রোঞ্জ—গুজরাট।

পশ্চিমবাংলার পদক জয়

স্বর্ণ (১) : সাঁতার (বালক বিভাগ)।

রৌপ্য (১) : ফুটবল।

ব্রোঞ্জ (২): টেবল টেনিস (বালক বিভাগ) এবং কবাডি।

রাশিয়া সফরে ভারতীয় ফুটবল দল

ভারতীয় ফুটবল দল রাশিয়া সফরের পাঁচটি খেলাতেই পরাজিত হয়ে স্বদেশে ফিরেছে—১ম খেলায় ০—৫ গোলে, ২য় খেলায় ০—২ গোলে, ৩য় খেলায় ০—৫ গোলে, ৪র্থ খেলায় ০-২ গোলে এবং ৫ম খেলায় ০—৪ গোলে। ভারতীয় ফুটবল দলের এই শুভেচ্ছা সফরে টেস্ট পর্যায়ে কোন খেলা হয়নি।

বিশ্ব হকি প্রতিযোগিতা

স্পেনের বার্সিলোনায় প্রথম বিশ্ব হকি প্রতিযোগিতার লীগ পর্যায়ের খেলা প্রায় শেষ হতে চলেছে। ভারতবর্ষ 'এ' গ্রুপের ৩টি খেলায় ৬ পয়েণ্ট সংগ্রহের সূত্রে সেমি-ফাইনালে খেলবার যোগ্যতা সর্বপ্রথম লাভ করেছে। ভারতবর্ষ ১—০ গোলে ফ্রান্সকে, ১—০ গোলে আর্জেণ্টিনাকে এবং ২—০ গোলে কেনিয়াকে পরাজিত করে ৬ পয়েণ্ট লাভ করে। 'বি' গ্রুপের লীগ খেলার তালিকায় পাকিস্থান বর্তমানে শীর্ষস্থানে আছে—৩টে খেলায় ৫ পয়েণ্ট। পাকিস্থান ৫—২ গোলে অস্ট্রেলিয়া, ১—০ গোলে জাপানকে পরাজিত করে পরবর্তী খেলায় নেদারল্যাণ্ডস দলের সঙ্গে কোনক্রমে ৩—৩ গোলে খেলা ড্র করে। ভারতবর্ষ এবং পাকিস্থান আগের মত গণ্ডায় গণ্ডায় গোল দিয়ে খেলায় জিততে পারছে না। অস্ট্রেলিয়াও বিশেষ সুবিধা করতে পারেনি—প্রথম খেলায় পাকিস্থানের কাছে ২—৫ গোলে হার এবং জাপানের সঙ্গে ১—১ গোলে খেলা ড্র।

এখানে উল্লেখ্য, ১৯৬৮ সালের অলিম্পিক হকি প্রতিযোগিতায় পাকিস্থান স্বর্ণপদক, অস্ট্রেলিয়া রৌপ্যপদক এবং ভারতবর্ষ ব্রোঞ্জপদক জয়ী হয়েছিল।

অমৃত পাবলিশার্স প্রাইভেট লিঃ-এর পক্ষে শ্রীসুপ্রিয় সরকার কর্তৃক পত্রিকা প্রেস, ১৪, আনন্দ চ্যাটার্জি লেন, কলিকাতা-৩ হইতে মুদ্রিত ও তৎকর্তৃক ১১।১, আনন্দ চ্যাটার্জি লেন, কলিকাতা—৩ হইতে প্রকাশিত।

নিয়মাবলী

বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

লেখকদের প্রতি

১। অমৃতে প্রকাশের জন্যে প্রেরিত সমস্ত রচনার নকল রেখে পাঠাবেন। মনোনীত রচনার খবর দু-মাসের মধ্যে জানান হয়। অমনোনীত রচনা কোনক্রমেই ফেরৎ পাঠান সম্ভব নয়। লেখার সঙ্গে কোন ডাকটিকিট পাঠাবেন না।

২। প্রেরিত রচনা কাগজের এক পৃষ্ঠায় স্পষ্টাক্ষরে লিখিত হওয়া আবশ্যক। অস্পষ্ট ও দুর্বোধ্য হস্তাক্ষরে লেখা প্রকাশের জন্যে গৃহীত হয় না।

৩। রচনার সঙ্গে লেখকের নাম ও ঠিকানা না থাকলে 'অমৃতে' প্রকাশের জন্যে গৃহীত হয় না।

এজেন্টদের প্রতি

এজেন্সীর নিয়মাবলী এবং সে সম্পর্কিত অন্যান্য জ্ঞাতব্য তথ্য 'অমৃত' কার্যালয়ে পত্র দ্বারা জ্ঞাতব্য।

গ্রাহকদের প্রতি

১। গ্রাহকের ঠিকানা পরিবর্তনের জন্যে অন্তত ১৫ দিন আগে 'অমৃত' কার্যালয়ে সংবাদ দেওয়া আবশ্যক।

২। ভি-পি-তে পত্রিকা পাঠানো হয় না। গ্রাহকের চাঁদা নিম্নলিখিত হারে মণিঅর্ডারযোগে 'অমৃত' কার্যালয়ে পাঠানো আবশ্যক।

চাঁদার হার

	কলিকাতা		মফঃস্বল	
বার্ষিক	টাকা	২৫.০০	টাকা	৩০.০০
ষান্মাসিক	টাকা	১২.৫০	টাকা	১৫.৫০
ত্রৈমাসিক	টাকা	৬.২৫	টাকা	৮.০০

'অমৃত' কার্যালয়

১১/১ আনন্দ চ্যাটার্জি লেন,

কলিকাতা—৩

ফোন : ৫৫-৫২৩১ (১৪ লাইন)

১১শ বর্ষ
২য় খণ্ড

অমৃত

২৫ সংখ্যা
মূল্য
৫০ পয়সা

Friday 29th October, 1971 শুক্রবার, ১১ই কার্তিক, ১৩৭৮ 50 Paise

সূচীপত্র

প্রচ্ছদ : শ্রীসুনীল সাহা

এক নজরে

যে দেশে সবাই রাজা : ধনকুবের মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সকল মানুষের মাথাপিছু গড় আয় বছরে চার হাজার ডলার, কিন্তু এমন রাজ্য আছে যেখানে মাথাপিছু গড় আয় বছরে পাঁচ হাজার ডলার। অর্থাৎ পাঁচজনের একটি পরিবারের বাৎসরিক আয় পঁচিশ হাজার ডলার, যার মানে হল এক লক্ষ সাড়ে সাতাশি হাজার টাকা। কিন্তু তার চেয়েও বড় কথা, সেই আয়ের জন্য ঐ রাজ্যের কোন অধিবাসীকে আয়কর দিতে হয় না। শুধু তাই নয়, সেখানকার প্রাথমিক স্তর থেকে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যন্ত সকল শিক্ষা অবৈতনিক, আর ভাল ছেলেদের রাজ্যের খরচেই বিদেশে উচ্চ শিক্ষার জন্য পাঠানো হয়। স্কুল-কলেজের বই-খাতাপত্র বা শিক্ষার অন্যান্য সরঞ্জাম রাজ্য থেকে ত সরবরাহ করা হয়ই, তার ওপর সব বিদ্যায়তনে আছে মধ্যাহ্নভোজ ও টিফিনের ব্যবস্থা, আর সেই সঙ্গে দেওয়া হয় হাত খরচ। এরও একটা বাঁধা হিসাব আছে: প্রাথমিক স্কুলের ছেলেরা হাত খরচ পায় মাসে নয় ডলার, মাধ্যমিক স্কুলে একুশ ডলার, স্নাতকোত্তর পর্যায়ের ছাত্রছাত্রীদের জন্য বই-খাতাপত্র, শিক্ষার অন্যান্য প্রয়োজনীয় সরঞ্জাম, টিউশন প্রভৃতি বাবদ মাথাপিছু ব্যয় করা হয় বছরে ৩৮ হাজার ডলার! বলাই বাহুল্য, দেশের চিকিৎসা ব্যবস্থাও সম্পূর্ণরূপে রাষ্ট্রীয় দায়িত্ব। ডাক্তারের ফী, ওষুধপত্রের খরচ রাষ্ট্র ত দেয়ই, তার ওপর কাউকে যদি ঠিকমত চিকিৎসার প্রয়োজনে বিদেশে পাঠানোর প্রয়োজন হয় তার ব্যয়ভার ও রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব রাষ্ট্রই গ্রহণ করে। সুতরাং পরিবারপিছু যে বছরে আয়করমুক্ত লাখ দুয়েক টাকা আয় হয় তা ব্যয় করাও রীতিমত সমস্যা তাদের পক্ষে।

রূপকথার রাজ্যের মত এই সব-পেয়েছির-দেশটি হল পারস্য উপসাগরের উপকূলে অবস্থিত মরুকল্প আরব উপ-দ্বীপের একটি ক্ষুদ্র অংশ। নাম কুয়েট। আয়তন পাঁচ হাজার বর্গমাইল ও লোকসংখ্যা সাড়ে সাত লক্ষ। দু দশক আগেও সে রাজ্যের আরব বেদুইনরা ছিল নিঃস্ব যাযাবর, মরুর বুকে মেষ-চারণ আর নিরুদ্দেশ বিহারেই জীবন অতিবাহিত তাদের। কিন্তু হঠাৎ মরুর দগ্ধ বুক চিরে ফিন্‌কি দিয়ে বেরিয়ে এল তৈল স্রোত, আর তাতেই প্রায় চক্ষের পলকে ভাগ্য ফিরে গেল সমগ্র কুয়েটের। হঠাৎ লটারীর টাকা পেয়ে নিঃসহায় নিঃসম্বল ভবঘুরের ভাগ্য ফিরে যাওয়ার মতো। ১৯৭১ সালে কুয়েট সরকার শুধু তেল বেচে পেয়েছে ১৩০ কোটি ডলার, ১৯৭৫ সাল নাগাদ ঐ অঙ্ক বৃদ্ধি পেয়ে হবে ২০০ কোটি ডলার, অর্থাৎ দেড় হাজার কোটি টাকা। আর সে টাকার মালিক ঐ রাজ্যের মাত্র সাড়ে সাত লক্ষ লোক। তৈল উৎপাদনে কুয়েট এখন পৃথিবীর সপ্তম দেশ, আর তৈল রপ্তানীতে পঞ্চম। সারা পৃথিবীর তৈল সম্পদের প্রায় সাড়ে ষোল শতাংশ কুয়েটে আছে বলে বিশেষজ্ঞদের অনুমান। এহেন দেশের শিক্ষা, স্বাস্থ্য থেকে শুরু করে জনকল্যাণের সকল দায়িত্ব যে রাষ্ট্র স্বহস্তে গ্রহণ করবে তাতে আশ্চর্যের কি আছে? আমাদের অতিগুরুত্বপূর্ণ শহরেও যখন একটা টেলিফোনের জন্য এক যুগ অপেক্ষা করতে হয়, কুয়েট সরকার তখন নিজ ব্যয়ে প্রতি গৃহে টেলিফোন পৌঁছে দিচ্ছে এবং তার জন্য গ্রাহকদের কোন মাশুল দিতে হয় না। এছাড়া গৃহ নির্মাণের জন্য বা দেশে-বিদেশে বাণিজ্যের জন্য সব কুয়েটবাসী রাষ্ট্রের কাছ থেকে পায় বিনা সুদে যথেচ্ছ পরিমাণ ঋণ এবং তা পরিশোধের জন্য রাষ্ট্রের দিক থেকে তাগাদা অতিসামান্যই আসে। প্রকৃতির রুদ্ররোষ, যা কুয়েটবাসীদের এখন একমাত্র অস্বস্তির কারণ, তাকেও তারা প্রায় সম্পূর্ণ পরাস্ত করেছে প্রতিটি গৃহ, এমন কি কল-কারখানা-গুলিকেও বায়ু-অনুকূলিত করে। আর জুলাই-আগস্ট মাসে যখন গ্রীষ্মের খরতাপ অসহনীয় হয় তখন প্রায় শতকরা ষাটজন কুয়েটবাসী চলে যায় ভূমধ্যসাগরের উপকূলবর্তী দেশগুলির শান্তশীতল পল্লী আবাসগুলিতে।

জরাজয়ের সাধনা : শুক্রাচার্যের শাপে জরাগ্রস্ত যযাতি শেষ পর্যন্ত পুত্র পুরুর দেহে জরা সংক্রামিত করে যৌবন ফিরে পেয়েছিলেন। পুরাণ-কালের এই ঘটনার পুনরাবৃত্তি আজকের পৃথিবীতে হওয়ার কোনই সম্ভাবনা নেই। কারণ জরা সংক্রমণের সে মন্ত্রও কারও জানা নেই, এবং জানলেও তা প্রয়োগের উপযোগী অনুগত পুত্র কোন বৃদ্ধ পিতার পাওয়া সম্ভব নয়। কিন্তু জরা সেদিনের মতো আজও মনুষ্যজীবনের অনিবার্য পরিণতি। মানুষের চক্ষু কর্ণ অকেজো করে দিয়ে কর্মশক্তিহীন, চলচ্ছক্তি-হীন করে দেয় জরা, তবু মানুষকে বেঁচে থাকতে হয়। তাই এই জরার অভিশাপ থেকে মুক্তির চিন্তা শুধু ভগবান বুদ্ধকেই বিচলিত করে নি, যুগে যুগে চিকিৎসক ও শারীরবিজ্ঞানীরা একে এক চ্যালেঞ্জরূপে গ্রহণ করেছেন এবং তাঁদের জরাজয়ের সাধনা যে ব্যর্থ হয় নি তা আজকের মানুষের দিকে তাকালেই বুঝতে পারা যায়। পঞ্চাশোর্ধ্বে বানপ্রস্থ বা বনবাসের ত কোন প্রশ্নই ওঠে না, ষাট বা তারও পরে অবসরগ্রহণের পর পূর্ণ কর্মশক্তি নিয়ে মানুষ ভাবে, এর পর কি করা যাবে।

সম্প্রতি জুরিখে যে জীবতত্ত্ববিদ ও সমাজবিজ্ঞানীদের আন্তর্জাতিক সম্মেলন হয়ে গেল তাতে সমবেত দুই শতাধিক বিশেষজ্ঞ এই দৃঢ় প্রত্যয় প্রকাশ করেন যে, শুধু শতায়ু হওয়াই নয়, পূর্ণ কর্মশক্তি এবং জীবনের সব সাধ-আহ্লাদ নিয়ে শতবর্ষ বেঁচে থাকা আগামী দশ-পনেরো বছরের মধ্যে অতিস্বাভাবিক ঘটনা হয়ে দাঁড়াবে। এমন কি ১৯৭৫ সালের মধ্যে তাঁরা সুনিশ্চিতভাবে এমন জরা-প্রতিরোধক ওষুধ আবিষ্কার করতে পারবেন যাতে পঁচাত্তর বছরের মানুষ প্রায় যৌবনকালের কর্মশক্তি ফিরে পাবে।

কিন্তু সমাজবিজ্ঞানীরা ঐ বিশ্ব সম্মেলনেই প্রশ্ন তোলেন, বিজ্ঞানের এই জরাজয়ের সাধনা সফল হলে বিশ্বের কতটুকু কল্যাণ হবে? কর্মক্ষম যুবকরাই যখন কর্মহীন থাকতে বাধ্য হয়ে সমাজের বোঝা হয়ে দাঁড়াচ্ছে, তখন কর্মক্ষম বৃদ্ধরা কোন কাজে লাগবে?

লাগোসের দৃষ্টান্ত : পশ্চিম আফ্রিকার বৃহৎ রাষ্ট্র নাইজেরিয়ায় সম্প্রতি সড়ক ডাকাতি অত্যধিক বৃদ্ধি পাওয়ায় গত বছর আগস্ট মাসে নাইজেরিয়া সরকার আগ্নেয়াস্ত্রসহ সড়ক ডাকাতি মৃত্যুদণ্ডযোগ্য অপরাধ বলে ঘোষণা করেন। তাছাড়া সাইকেল চুরি, চলন্ত বাসে পকেটমার ইত্যাদি এত বৃদ্ধি পায় যে, অপরাধী ধরা পড়লে তাকে পিটিয়ে আধমরা করে তবে পুলিশে জমা দেওয়া সেখানে প্রায় অলিখিত আইন হয়ে গেছে। গত মাসে আগ্নেয়াস্ত্রসহ সড়ক ডাকাতির অভিযোগে নাইজেরিয়ার রাজধানী লাগোসে আট ব্যক্তিকে সারিবদ্ধভাবে দাঁড় করিয়ে প্রকাশ্যে গুলী করে হত্যা করা হয়। লাগোসের বারবীচ স্যাণ্ডস স্টেডিয়ামে যখন অপরাধীদের হত্যা করা হচ্ছিল তখন ত্রিশ হাজার লোক তা প্রত্যক্ষ করে। তারপর টেলিভিশনে সে-দৃশ্য দেখে আঁতকে ওঠে সভ্য পশ্চিম। লাগোসের সংবাদপত্রগুলিতেও শাস্তিবিধানের ঐ ব্যবস্থাকে জঘন্য বর্বরতা বলে নিন্দা করা হয়। কিন্তু লাগোসের স্টেট পুলিশ কমিশনার জোসেফ এডোলা দাবী জানিয়েছেন, ঐ ঘটনার পর সড়ক ডাকাতি বা ঐ ধরনের বড় অপরাধ নাইজেরিয়ায় প্রায় নব্বুই শতাংশ কমে গেছে।

২১।১০।৭১ —প্রত্যক্ষদর্শী

সম্পাদকীয়

।। মার্কিন মতিগতি ।।

মার্কিন মুল্লুক এক আশ্চর্য দেশ। সেখানকার সংবাদপত্রাদিতে প্রকাশিত ছবি ও সংবাদ পাঠ করলে মনে হবে বাংলাদেশের দুর্দশাগ্রস্ত অসহায় মানুষগুলির জন্য সেখানে দরদের আর অন্ত নেই। আমেরিকার সাধারণ মানুষের একটি সামান্য ভগ্নাংশ হয়ত এতদ্বারা প্রভাবিত হতে পারে কিন্তু রাজ্যের পরিচালনভার যাঁদের হাতে সেই শাসকচক্রের মতিগতি একেবারে ভিন্ন। এই মেজাজ তাঁরা চেপে রাখতে পারছেন না। কেনেডি সাহেবের অন্তরঙ্গ মহল একটি সংবাদ সংগ্রহ করে ফাঁস করেছেন যে জেনারেল এ্যাকাউন্টিং অফিসের গোপন নথিপত্র দৃষ্টে জানা যায় যে, সোভিয়েত ইউনিয়ন এবং পূর্ব য়ুরোপের অন্যান্য অঞ্চল থেকে কেনা প্রচুর গোলাবারুদ পাকিস্তানে পাঠানোর ঢালাও হুকুম দিয়েছেন মার্কিন সরকার। যেসব অস্ত্রাদির লাইসেন্স দেওয়া হয়েছে তার মধ্যে আছে 'সাবস্টানসিয়াল এমাউন্ট'-এর সোভিয়েত অস্ত্র এবং ২৯৭.৭ মিঃ মিঃ চেক্ মসার শ্রেণীর রাইফেল। তবে বলা হয়েছে, এসবই ২৫শে মার্চ তারিখের পূর্বে করা হয়েছে। এই প্রসঙ্গে ওয়াকিবহাল সূত্রে বলা হয়েছে, যেটুকু খবর প্রকাশিত হয়েছে তা দুধের উপরকার সরটুকুর মত অতি অল্পই—এখনও এমন প্রচুর মালপত্র পাঠানোর খবর আছে যার তথ্য উপস্থিত অনাবিষ্কৃত। এদিকে মার্কিন শাসকচক্র বলছেন ভারতীয়দের উৎকট ভাবাবেগ পূর্ব পাকিস্তানের সমস্যাকে জীইয়ে রাখছে, ভারতবর্ষের মানুষগুলো প্রতিদ্বন্দ্বিতার নেশায় এমন আচ্ছন্ন যে, আর সব ব্যাপারে তারা 'সর্ট-সাইটেড'। সম্প্রতি 'ন্যুইয়র্ক টাইমসে' প্রকাশিত এক সংবাদে ম্যাক্স ফ্রাংকনেল বলেছেন—

"The Indians are almost always spoken of in tones of deep annoyance as not very lovable people."

কোনোরকম কান্ডজ্ঞান নেই ভারতীয়দের, সুতরাং তাদের জন্য মানবিক করুণার খাতিরে যতটুকু করণীয় তাই করা যাবে, তার বেশী নয়। পাকিস্তানে মার্কিন অস্ত্রশস্ত্রের যথেচ্ছ চালান যাওয়ার ব্যাপারে ভারত আপত্তি করায় এই মার্কিন কর্তারা তেলে-বেগুনে জ্বলে উঠেছেন। এমনকি অর্থমন্ত্রী চৌহান যখন ওয়াশিংটনে গিছলেন তখন শাসকগোষ্ঠীর সমর্থক জনৈক সংবাদদাতা তাঁর সঙ্গে অপমানসূচক ভঙ্গীতে কথা বলেছিল। একজন বিশিষ্ট সংবাদদাতা ওয়াশিংটন থেকে জানিয়েছেন ব্যক্তিগতভাবে মিঃ নিকসন অতিশয় আত্মাভিমানী ব্যক্তি, তাঁর কর্তৃত্ব নিয়ে কেউ যদি কোনো প্রশ্ন ওঠায়, তাহলে তিনি চটে যান এবং তাঁর জেদ বেড়ে যায়। বিশেষ করে কোনো গোপন ব্যাপার ফাঁস হলে তাঁর আর জ্ঞান থাকে না। এই কারণে অনেক উচ্চপদস্থ কর্মীদের ইতিমধ্যে নিকসনী আমলে গলাধাক্কা খেতে হয়েছে। অক্টোবর মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহে মিঃ কেনেডির রিফিউজি সংক্রান্ত সাব-কমিটি ইউ, এস, ডিফেন্স কর্তৃক পাকিস্তানের সঙ্গে সম্পাদিত দুটি কন্ট্রাক্ট ফাঁস করে দিয়েছেন। এই চুক্তিতে দেখা যায় ২৫শে মার্চ তারিখের অনেক পরেও মার্কিন মহল পাকিস্তানকে মারাত্মক অস্ত্রশস্ত্র দানের জন্য অঙ্গীকারবদ্ধ হয়েছেন। অথচ প্রকাশ্যে এসব মালপত্র দান নিষিদ্ধ করা হয়েছে। ইসলামাবাদের সঙ্গে মার্কিন গাঁটছড়া দৃঢ়বদ্ধ। এর পিছনে ব্যক্তিগত কৃতজ্ঞতার ব্যাপার থাকা সম্ভব। অনুমান করা যাচ্ছে বিভিন্ন সূত্রে ইসলামাবাদকে মালপত্র পাঠানো হচ্ছে, ভিয়েতনামে যেসব অস্ত্রশস্ত্র মজুদ আছে, সেগুলিকে ইয়াহিয়ার আবদারমাফিক যে-কোনও স্থানে পৌঁছে দেওয়াও মার্কিন সরকারের পক্ষে অসম্ভব নয়। তাছাড়া গাইবাছুরে ভাব থাকলে যে-কোনো উপায়ে দুগ্ধ দান করা কঠিন নয়। ইসলামাবাদকে দৃঢ় করতে এবং শক্তিতে প্রতিষ্ঠিত করতে যে ওয়াশিংটন দৃঢ়সংকল্প এটা বুঝতে বিশেষ জ্ঞানের অধিকারী হওয়ার প্রয়োজন হয় না। যুক্তরাষ্ট্র নিজে যা পারছেন করছেন, তাছাড়া তাঁদের বশংবদ রাষ্ট্রদের অনুরোধ করছেন তোমরা পাকিস্তানকে অর্থনৈতিক সাহায্য করো। ভারতকে ঠান্ডা করতে হলে পাকিস্তানকে চাঙ্গা রাখা দরকার এটা মার্কিন-কর্তারা ভালোই বোঝেন। খুব কৌশলে মার্কিন সূত্র থেকে প্রচার চালানো হচ্ছে ভারতবর্ষ এমন একটা দেশ যার ওপর ভরসা রাখা যায় না। মিত্ররাষ্ট্র হিসাবে মোটেই নির্ভরযোগ্য নয়। আর যেটুকু প্রেম এখনও অবশিষ্ট ছিল ভারত সম্পর্কে, তা সোভিয়েত-ভারত চুক্তির পর একেবারে নিঃশেষিত। সুতরাং এই উপমহাদেশে পাকিস্তানের মত মিত্র আর কোথায়। ভালোবাসাটা মিলিটারী ডিক্টেটরদের সঙ্গে ভালো জমে, কারণ গণতান্ত্রিক সরকারকে একটু ভেবেচিন্তে কাজ করতে হয়, কাজেই তারা পুতুলনাচের পুতুল হয়ে বৃহৎশক্তির নির্দেশে নাচতে পারে না। এই পরিস্থিতিতে আমাদের প্রধানমন্ত্রীর মার্কিন সফর কতখানি সার্থক হবে এ বিষয়ে সংশয় জেগেছে। কারণ পূর্ব বাংলার ঘটনা দুঃখকর হলেও তা নিয়ে মাথা ঘামানোর দায় নেই যুক্তরাষ্ট্রের। তাঁরা প্রচার করছেন লিন্কনকেও কি জাতীয় অখণ্ডত্ব রক্ষায় যুদ্ধ করতে হয়নি?

এই দিক থেকে বাংলাদেশের ঘটনার জন্য ইয়াহিয়ার মত মার্কিন সরকারকেও দায়ী বলা যায়। বাইরে শান্তিকামীর তিলক কেটে জপমালা হাতে নিয়ে ভিতরে ভিতরে অস্ত্র সরবরাহ করে মদৎ দিয়ে এই উপমহাদেশে যুদ্ধের আবহাওয়া সরগরম করে রাখার এই দায়িত্ব কার? খোঁটার জোরে জীববিশেষ লড়াই করে—গণহত্যাকারী ইয়াহিয়ার রণনৃত্যের পিছনেও সেই খোঁটার জোর। মার্কিন সরকারের পাকিস্তান তোষণনীতি আজ এই প্রায়-যুদ্ধের মত বিষাক্ত আবহাওয়ার জন্য দায়ী একথা বলা কি ভুল হবে?

পটভূমি

অনেকে ভাবতে পারেন, এ-সব আবার কেমন কথা ? ভারতে বিভিন্ন 'জাতির' বাস, আবার তাদের 'আত্মনিয়ন্ত্রণের' অধিকার নিয়ে আন্দোলন ? মার্কসবাদী কম্যুনিস্ট পার্টির নেতা প্রমোদ দাশগুপ্ত হঠাৎ এ-সব প্রসঙ্গ তুলতেই বা গেলেন কেন ? তামিলনাড়ুতে আসন্ন পার্টি কংগ্রেসের জন্যে আলোচনার জন্যে অন্য বিষয় কি পাওয়া গেল না ?

প্রমোদবাবুর মুখে ভারতে বিভিন্ন 'জাতি', 'আত্মনিয়ন্ত্রণ অধিকার', এই সব কথা শুনে অবাক হওয়ার অবশ্য তেমন বোধহয় কিছু নেই। কারণ প্রমোদবাবুর মুখে কথাগুলো হয়ত নতুন, কিন্তু এদেশে কম্যুনিস্ট আন্দোলনের ইতিহাসে মোটেই তা নয়। বরং যেন একটু বেশিই পুরানো। সে একেবারে সেই চাল্লিশের দশকের গোড়ার দিকের কথা। তখনকার কম্যুনিস্ট পার্টি তো একটা প্রস্তাবই গ্রহণ করেছিল ভারতবর্ষের জনগণের 'বহুজাতিক' বৈশিষ্ট্য নিয়ে।

১৯৪২ সালের সেপ্টেম্বরে গৃহীত ঐ প্রস্তাবে (তারিখটার তাৎপর্য কিন্তু কম নয়, ঐ সময় শুরু হয়ে গেছে দেশব্যাপী 'ভারত-ছাড়ো' আন্দোলন) বলা হয়েছিল যে, ভারতীয় জনগণের যে-কোনো অংশকেই একটি বিশিষ্ট জাতি হিসেবে স্বীকার করতে হবে, যদি ঐ অংশের থাকে একটি নির্দিষ্ট বসবাসের এলাকা, সাধারণ ঐতিহাসিক ঐতিহ্য, সাধারণ ভাষা, সংস্কৃতি, মানসিক গড়ন এবং সাধারণ অর্থনৈতিক জীবন। তবে শুধু ঐসব অংশকে বিভিন্ন জাতি হিসেবে স্বীকার করে নিলেই চলবে না, ঐসব জাতির ভারতীয় ইউনিয়নের অথবা ফেডারেশনের মধ্যে স্বয়ংশাসিত রাজ্য হিসেবে থাকবার অধিকার দিতে হবে। এবং ঐসব রাজ্যের ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্র থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়ার অধিকারও (রাইট টু সিসিড) থাকবে। অর্থাৎ কম্যুনিস্ট পার্টির স্বপ্নের স্বাধীন ভারত হবে 'পাঠান, পশ্চিম পাঞ্জাবী (প্রধানতঃ মুসলমান), শিখ, সিন্ধি, হিন্দুস্থানী, রাজস্থানী, গুজরাটী, বাঙালী, অসমীয়া, বিহারী, ওড়িয়া, অন্ধ্র, তামিল, কর্ণাটকী, মহারাষ্ট্রীয়, কেরালা প্রভৃতি জাতির স্বয়ংশাসিত রাজ্যের যুক্তরাষ্ট্র।'

তখন যে ভারতের বিভিন্ন জাতি ও তাদের আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার প্রস্তাবটা কম্যুনিস্ট পার্টির মনোযোগ আকর্ষণ করেছিল তার আশু উপলক্ষ ছিল মুসলমানদের জন্যে পৃথক একটা রাষ্ট্র, অর্থাৎ পাকিস্তান গঠনের দাবি। ঐ সময় যে পাকিস্তানের দাবির প্রতি পার্টি যে সমর্থন জানিয়েছিল তা সকলেই জানেন। আর ঐ সমর্থনের মূলে ছিল এই বিশ্বাস যে, মুসলমানরাও একটা পৃথক জাতি। পার্টির মুখপত্র পিপলস্ ওয়ারে সম্পাদকীয় মন্তব্যে বলা হয়েছিল যে, মুসলমানরা যেখানেই একটি বিশেষ এলাকার মধ্যে একত্রে থাকে সেখানেই তারা একটি পৃথক জাতি হয়ে ওঠে এবং ভারতের অন্যান্য জাতি, যথা অন্ধ্র, কর্ণাটকী, মারাঠী বা বাঙালীর মতো তাদেরও স্বয়ংশাসিত রাজ্য গঠনের অধিকার আছে। স্বভাবতঃই মুসলমানদের স্বয়ংশাসিত রাজ্যেরও ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্র থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়ার অধিকার থাকবে।

ঐ বিচ্ছিন্ন হওয়ার অধিকার সম্পর্কে পিপলস্ ওয়ার অন্য এক সম্পাদকীয় প্রবন্ধে বলে যে, বিচ্ছিন্ন হওয়ার অধিকার, অর্থাৎ স্বাধীন রাষ্ট্র গঠনের অধিকার না দিলে সংখ্যাগরিষ্ঠদের সম্বন্ধে সংখ্যালঘিষ্ঠের ভয় ঘুচবে না। বিচ্ছিন্ন হওয়ার অধিকারের দাবিকে জিন্নার একটা খামখেয়াল এবং বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের স্বার্থে ভারতকে খন্ড খন্ড করার জন্যে কম্যুনিস্টদের চক্রান্ত হিসেবে দেখার অর্থ মুসলমানদের এবং অন্ধ্র, কর্ণাটকী, মহারাষ্ট্রীয় প্রভৃতি অন্যান্য জাতিরও নতুন জাগরণকে অস্বীকার করা।

প্রমোদবাবু সম্ভবতঃ আর মুসলমানদের একটি পৃথক জাতি হিসেবে গণ্য করেন না, কারণ তিনি বলেছেন ধর্মের ভিত্তিতে রাষ্ট্রগঠন যে এখন অবাস্তব, তার জ্বলন্ত উদাহরণ পূর্ববঙ্গের ঘটনাবলী। পার্টি কংগ্রেসে যখন এই বিষয়ে আলোচনা হবে, তখন সি পি এম নেতা বি টি রণদিভে কী বলেন সেটা অবশ্য লক্ষ্য করার মতো হবে, কারণ ১৯৪২ সালে তিনি মুসলমানদের একটি পৃথক জাতি হিসেবেই চিহ্নিত করেছিলেন।

●

ভারতের বিভিন্ন জাতি ও তাদের অধিকার নিয়ে প্রমোদবাবু যে আন্দোলন করবেন বলছেন তার কারণ দুটো। প্রথম, [illegible] চলছে, সি পি এম সেগুলোকে 'ঠিক পথে' নিয়ে যেতে চায়। ঠিক পথ বলতে অবশ্য কী বোঝায় তা স্পষ্ট করে তিনি কিছু বলেননি। দ্বিতীয় কারণ, বিভিন্ন রাজ্যের (অর্থাৎ কিনা বিভিন্ন জাতির) প্রতি কেন্দ্রীয় সরকারের বৈষম্যমূলক আচরণ। বৈষম্যের উদাহরণও তিনি দিয়েছেন। সারা দেশের লোক ইস্পাত ও কয়লা কিনতে পায় সমান দরে, কিন্তু তুলোর দর বিভিন্ন এলাকায় বিভিন্ন। এর ফলে পশ্চিমবাংলার মধ্যে ও কাছাকাছি এলাকায় ইস্পাত তৈরি হলেও দামের দিক দিয়ে পশ্চিমবাংলার কোনো সুবিধে হয়নি। আবার যেহেতু তুলোর দাম সর্বত্র এক নয়, তাই পশ্চিমবাংলাকে তুলোর জন্যে চড়া দর দিতে হয়, কারণ এই রাজ্যে তুলো আসে দূর-দূরান্ত থেকে।

অর্থাৎ সি পি এম যে আন্দোলন করবে তার কারণ মূলতঃ অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে বৈষম্য। এবং তলিয়ে দেখলে দেখা যাবে, এই ধরনের বৈষম্যটা প্রাদেশিকতারই প্রকাশ, এর মধ্যে বুর্জোয়া-প্রোলেতারিয়েত বা শোষক-শোষিতের ব্যাপার নেই। কারণ, উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, তুলোর দামের প্রশ্নে পশ্চিমবাংলার যদি ক্ষতি হয়ে থাকে তবে গোটা পশ্চিমবাংলারই হয়েছে। শুধুই গরীব লোকের হয়নি, ব্যবসায়ীশ্রেণীরও হয়েছে। তুলোর জন্যে চড়া দাম দিতে হয় বলে এই রাজ্যের কাপড়ের কলের মালিকেরা মহারাষ্ট্র, গুজরাট বা তামিলনাড়ুর কাপড়ের কলের মালিকদের সঙ্গে এঁটে উঠতে পারছেন না। অনেক কাপড়ের কল যে বন্ধ হয়ে যাচ্ছে এটা তার একটা বড় কারণ। তাতে শ্রমিকরা যেমন কর্মচ্যুত হচ্ছেন, তেমনই মালিকদেরও ক্ষতি হচ্ছে। যদি সি পি এম-এর আন্দোলনের ফলে তুলোর দামের প্রশ্নের একটা মীমাংসা হয়, তবে কাপড়ের কলের মালিকেরাও লাভবান হবেন, শ্রমিকেরা তো হবেনই।

আবার এই ধরনের বৈষম্যকে গরীব রাজ্যগুলির বিরুদ্ধে ধনী রাজ্যগুলির অভিযান বা শোষণের উদাহরণও ঠিক বলা যায় না। বৈষম্যের একটা বড় রকমের উদাহরণ অবশ্যই পশ্চিমবাংলা। তবে স্বাধীনতার পরে পশ্চিমবাংলার প্রতি যখন বৈষম্য প্রদর্শন শুরু হল, তখন কিন্তু তাকে কখনোই গরীব রাজ্য বলা চলত না। বরং শিল্প-সমৃদ্ধি বা মাথাপিছু আয়ের দিক দিয়ে এই রাজ্যের স্থান ছিল শীর্ষে। তবু যে পশ্চিমবাংলা ক্রমশঃ অবহেলিত হতে লাগল তার কারণ অন্যান্য অনেক রাজ্যের প্রতিনিধিরা জাতীয় জীবনে পশ্চিমবাংলা ও বাঙালীর গুরুত্ব কমাতে উঠে পড়ে লেগে গেলেন। পশ্চিমবাংলার বদলে অন্যান্য রাজ্যে কল-কারখানা ছড়িয়ে দেওয়া হতে লাগল, উদ্বাস্তু সমস্যা সমাধানে চরম ব্যর্থতা দেখানো হল, কলকাতার সমস্যা সমাধানের কোনো চেষ্টাই করা হল না। পশ্চিমবাংলায় সামান্যতম গন্ডগোল [illegible]

দেশে বিদেশে

নয়া ইয়াহিয়াখানী সংবিধানের মেওয়া ফলাবার জন্য পাকিস্থানের মানুষকে আরও কিছুটা সবুর করতে হবে, এই ছিল গত ১২ অকটোবর তারিখে পাকিস্থানের মিলিটারি প্রেসিডেন্টের বেতার ভাষণের মূল কথা। গত জুন মাসে তিনি ওয়াদা করেছিলেন, চার মাসের মধ্যে তিনি পাকিস্থানের নতুন সংবিধান সে দেশের মানুষের সামনে হাজির করবেন। এখন তিনি বলছেন, না, আরও মাস দুয়েক সময় দিতে হবে, ২০ ডিসেম্বরের মধ্যে জরুর তিনি তাঁর আস্তিনের তলা থেকে সংবিধান বের করে দেবেন। বাস, তারপরই নির্বাচিত অসামরিক সরকারের হাতে ক্ষমতা অর্পণের রাস্তা পরিষ্কার হয়ে যাবে।

কিন্তু পাকিস্থানের সংবিধান নামক সেই সুদুর্লভ বস্তুটি এখনও বিশ বাঁও জলের তলায়। গত সিকি শতাব্দীতে পাকিস্থানের সামরিক অসামরিক কোন শাসকই সেই গভীর জলের তলা থেকে বস্তুটিকে উদ্ধার করে আনতে পারেন নি, আগা মহম্মদ ইয়াহিয়া খাঁ সাহেবই যে তা পারবেন এমন ভরসা কম।

ইতিমধ্যে খাঁ সাহেব সহজ রাস্তাটাই ধরেছেন। তিনি ভারতের বিরুদ্ধে যুদ্ধের জিগির তুলেছেন। বাংলাদেশে মুক্তিবাহিনীর হাতে তাঁর ফৌজ যে প্রচন্ড মার খাচ্ছে সে কথাটা চাপা দেওয়ার জন্য, অসামরিক সরকারের হাতে কর্তৃত্ব ফিরিয়ে দেবেন বলে দেশের মানুষকে তিনি যে ক্রমাগত ভাঁওতা দিয়ে চলেছেন সে কথাটা ভুলিয়ে রাখার জন্য তিনি ভারতের বিরুদ্ধে উত্তেজনা বাড়িয়ে তুলতে উঠে পড়ে লেগেছেন। ১২ অকটোবরের বেতার ভাষণে তিনি ভারতের বিরুদ্ধে দোষারোপ করে বলেছেন যে, ভারত নাকি পূর্ববঙ্গের সীমান্তের কাছে সৈন্য সমাবেশ করেছে এবং সেখানে সামরিক বিমানঘাঁটি বসিয়েছে। পশ্চিমেও নাকি ভারতীয় বাহিনীকে পাকিস্থানের সীমান্তের কাছে নিয়ে আসা হয়েছে। নিজের ব্যর্থতা ঢাকা দেওয়ার জন্য ও দেশের মানুষের দৃষ্টি সরিয়ে নেওয়ার জন্য তিনি সকলকে শুনিয়ে বলেছেন, ঐ দেখ হিন্দুস্থান আমাদের উপর হামলা করার জন্য তৈরি হয়েছে।

পাকিস্থান তার নিজের সমস্যাকে লক্ষ লক্ষ আশ্রয়প্রার্থীর আকারে ভারতের ঘাড়ে চালান করেছে। এখনও পূর্ববঙ্গ থেকে আশ্রয়প্রার্থীদের সীমান্ত অতিক্রম করে আসার বিরাম নেই। ভারতে ইতিমধ্যে পূর্ববঙ্গের আশ্রয়প্রার্থীদের সংখ্যা ৯৩ লক্ষ ছাড়িয়ে গেছে। ভারত বারবার বলা সত্ত্বেও ইসলামাবাদের সরকার এই আশ্রয়-প্রার্থীদের ফিরে যাওয়ার অনুকূল পরিবেশ তৈরি করছে না। অথচ, উল্টো দিক থেকে ইয়াহিয়া খাঁ সাহেব ভারতের বিরুদ্ধেই দোষারোপ করলেন। স্বভাবতই ভারতবর্ষ তাঁর এই কথাগুলিকে একটা প্ররোচনা হিসাবে গ্রহণ করেছে।

বাঙলা দেশের অসহায় নরনারী

মোট ফল হয়েছে এই যে, ইয়াহিয়া খাঁর ঐ বক্তৃতার পর থেকেই ভারত-পাকিস্থান সীমান্তে উত্তেজনা খুব বেড়েছে। ভারত সরকার পুরোদমে প্রতিরক্ষার প্রস্তুতি করছেন। আমাদের সামরিক বাহিনীকে তৈরি রাখা হয়েছে। বিশেষ করে সীমান্ত-বর্তী জেলাগুলিতে অসামরিক প্রতিরক্ষার প্রস্তুতি চলছে।

প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী নয়াদিল্লীতে সাংবাদিক সম্মেলনে বলেছেন যে, ভারত-পাকিস্থান সীমান্ত পরিস্থিতি গুরুতর। সঙ্গে সঙ্গে তিনি একথাও জানিয়েছেন যে, যুদ্ধ এড়াবার জন্য সম্ভাব্য সব চেষ্টা চালিয়ে যেতে ভারত কৃতসংকল্প। শ্রীমতী গান্ধী পরিস্কার করে একথাও জানিয়ে দিয়েছেন যে, ভারতবর্ষ যদিও পাকিস্থানের সঙ্গে পারস্পরিক স্বার্থ-সংশ্লিষ্ট বিষয়গুলি নিয়ে কথা বলতে ইচ্ছুক তাহলেও তিনি বাংলাদেশ নিয়ে কখনই প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খাঁর সঙ্গে কথা বলবেন না; কেননা, বাংলাদেশ সমস্যাটা হচ্ছে পশ্চিম পাকিস্থানের সামরিক শাসক ও বাংলাদেশের জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের ভিতরকার ব্যাপার। ভারতের সঙ্গে সংলাপ আরম্ভ করার জন্য এবং সীমান্ত থেকে উভয়পক্ষের সৈন্য অপসারণের জন্য পাকিস্থানের প্রেসিডেন্ট যে প্রস্তাব দিয়েছেন সে সম্পর্কে প্রশ্ন করা হলে শ্রীমতী গান্ধী সরাসরি জবাব দেন, "মুক্তিবাহিনী ভারতের সঙ্গে

ব্রাসেলস: বিমান বন্দরে শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী জনতার অভিনন্দন গ্রহণ করছেন।

ওপার বাঙলা থেকে এপারে আসছেন নৌকা করে

হ্যাণ্ডওভার করা যায় না।" তিনি বলেন, পাকিস্থানের সামরিক শাসকদের প্রথম করণীয় কাজ হল বাংলাদেশে সমস্ত অত্যাচার বন্ধ করা এবং জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের পক্ষে গ্রহণযোগ্য পরিবেশ সৃষ্টি করা। শ্রীমতী গান্ধী একথাও জানিয়ে রাখেন যে, বাংলাদেশে একটি পুতুল সরকার প্রতিষ্ঠা করে পাকিস্থানের জঙ্গীশাহী যে সেটাকে সমস্যার সমাধান বলে চালিয়ে দেবে সেটা হবে না। যে সমাধানই হোক না [illegible] সেটা বাংলাদেশের জনগণের পক্ষে সন্তোষজনক হওয়া চাই।

এদিকে, ভারত সরকার যে কোন জরুরী অবস্থার মোকাবেলা করার জন্য [illegible] পরিকল্পনা উপযোগী [illegible]

রাষ্ট্রমন্ত্রী বিদ্যাচরণ শুক্ল বলেছেন, ভারতীয় বাহিনী এখন এতটা প্রস্তুত হয়ে রয়েছেন যে, খবর পাওয়ার পর ঝাঁপিয়ে পড়তে তাঁদের দুই মিনিটের বেশী সময় লাগবে না।

জলন্ধরে এক জনসভায় প্রতিরক্ষামন্ত্রী জগজীবন রাম পাকিস্থানকে এই বলে হুঁশিয়ার করে দিয়েছেন যে, লড়াই যদি বাধে তাহলে ভারত পাকিস্থানের মাটিতেই সেই লড়াই চালাবে এবং যুদ্ধ করে সে পাকিস্থানের যেটুকু অংশ সে দখল করবে সেটা সে আর ছেড়ে দেবে না। তিনি বলেছেন, "আমরা লাহোর ও শিয়ালকোট ইসতক চলে যাব এবং পরিণাম যাই হোক না কেন সেখান থেকে আর ফিরে আসব না।"

সীমান্তের কোন কোন অঞ্চল থেকে সীমান্তরক্ষী বাহিনী সরিয়ে এনে ঐসব অঞ্চল রক্ষার ভার ভারতীয় সৈন্যবাহিনীকে দেওয়া হয়েছে। রিজার্ভ বাহিনীকেও তলব করা হয়েছে।

এই পরিস্থিতির মধ্যে প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী গান্ধী পূর্ব পরিকল্পনা অনুযায়ী বিদেশ সফরে যেতে পারবেন কিনা সেবিষয়ে সাময়িকভাবে কতকটা সংশয় দেখা দিয়েছিল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তিনি তাঁর এই তিন সপ্তাহব্যাপী বিদেশসফরে বেরিয়ে গেছেন। যাত্রার আগে জাতির উদ্দেশে এক বেতার ভাষণ দিয়ে তিনি বলেছেন যে, দেশের সামনে যে বিপদ রয়েছে সেবিষয়ে অবহিত হয়েও তিনি অনেক ভেবে-চিন্তে বিদেশে যাওয়ার সিদ্ধান্ত বহাল রাখলেন। তবে তিনি যতদূরেই যান না কেন তাঁর মন দেশের মানুষের কাছেই পড়ে থাকবে। কেননা এইরকম একটা সময়ে হালকা মনে দেশ ছেড়ে যাওয়া চলে না।

কোনও কোনও পর্যবেক্ষকের ধারণা শ্রীমতী গান্ধী যে এই সময়ে অনায়াসে দেশ ছেড়ে যেতে পারলেন সেটা একটা সুলক্ষণ হতে পারে। পরিস্থিতির নিখুঁত পর্যালোচনা না করে তিনি বিদেশে যান নি। তিনি বিমানে ওঠার আগের দিন পর্যন্ত কয়েকদিন ধরে প্রতিদিন তাঁর ক্যাবিনেট সহকর্মীদের সঙ্গে তিনি আলোচনা করেছেন। বিভিন্ন দলের নেতাদের সঙ্গেও তাঁর আলোচনা হয়েছে। এই সময়ে প্রধানমন্ত্রীর দেশের বাইরে যাওয়া উচিত কিনা সেবিষয়েও নিশ্চয়ই আলোচনা হয়েছে। যাদের সঙ্গে তিনি পরামর্শ করেছিলেন তাঁরা তাঁকে কি বলেছেন তা জানা যাবে না। তবে, অনুমান করা যায় যে এই পরামর্শদাতারা অন্ততঃ এখনই পাকিস্থানের দিক থেকে আক্রমণের আশংকার কথা প্রধানমন্ত্রীকে বলেন নি। এটা খুবই সম্ভব যে, ১২ অক্টোবরের বেতার ভাষণে ভারতের প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করে ইয়াহিয়া খাঁ সাহেব এখন একটু থমকে দাঁড়িয়েছেন। তিনি হয়তো বুঝতে পেরেছেন যে হঠকারিতার পরিণাম ভাল হবে না।

যাই হোক না কেন, ভারতবর্ষ এখন আর নিশ্চিন্ত হয়ে বসে থাকতে পারবে না। পাকিস্থানের শাসকরা কখন কি করে বসেন সেদিকে তাকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখতে হবে। তেমন পরিস্থিতি দেখা দিলে প্রধানমন্ত্রীকে তাঁর বিদেশ সফর বন্ধ রেখে ফিরে আসতে হতে পারে, এটাও কোন অসম্ভব কল্পনা নয়।

[illegible] —[illegible]

অসময়

চণ্ডী মণ্ডল

মলয়

বাসে আজকাল অসম্ভব ভিড় বেড়েছে। বলতে নেই—ভালই হয়েছে। ভাল যে সত্যিই হয়েছে উজ্জ্বল-এর অন্ততঃ অরুচি নেই ভাবতে। গায়ের চামড়া তার একটু বেশীই পুরু, যত ভিড়ই হোক হেলায় ভেতরে চলে যায়। তারপর দেখেশুনে একটা শরীরে লেপটে যাওয়া। চারপাশের লোকেরা ঘাস খায় না, বুঝতে পারে, তবে মুখ ফুটে কেউ ত আর কিছু বলে না। নিজেও যেন বোঝে না কী করে, মুখের ভাবখানা এমন করে রাখে। গোটা শরীর দিয়ে নধর একটা দেহ চুষতে থাকে মজাসে, দিব্যি বিনা পয়সায়। একেবারে বিনি পয়সায় ভোজ নয় ঠিক, অন্ততঃ আজ—মাসের পয়লায়। পকেটে যা আছে একশ টাকার দশ টাকার তাজা নোট মিলিয়ে নম্বর কিছু বেশীই হবে। তা হবে বৈকি একটু রিস্ক নিতে। পোকামাকড় থাকবে না এমন গ্যারান্টি নেই তাই বলে ফুল দুষ্প্রাপ্য পেয়ে গন্ধ না শুঁকে ছাড়ে কেউ! অন্য কারো কথা তার জানা নেই তবে নিজের বেলায় এটা ঠিক জানে যে সুযোগ হাতছাড়া করাটা ঠিক নয়। ঠিক ত নয়ই বিশেষ সুযোগটা যদি হয় আবার—না—সত্যি, কী করবে, ভিড় বাসে উঠবে? অনেকগুলো টাকা! গায়ের রক্ত জল করে রোজগার করা টাকা অবশ্য নয়। ভাল চাকরী—ভাল মাইনের চাকরী লোকে কেমন করে পায়—অন্য লোক কেমন করে পায় সে অন্যের ব্যাপার, উজ্জ্বল চাকরীটা পেয়েছে—চাকরীটা তাকে দিয়েছে একজন। [illegible]

বড় ফার্মের ডিরেকটার। একরকম যেচেই চাকরীটা উজ্জ্বলকে দিয়েছেন তিনি। প্রথম মাসের মাইনের অর্ধেকটা টাকা তাঁকে দিতে হয়েছিল মদ খেতে; বাকী অর্ধেক টাকায় বন্ধুবান্ধব মিলে উজ্জ্বল মদ খেয়েছিল। মাইনের অর্ধেক টাকায় ফি-মাসে উজ্জ্বল বন্ধুদের নিয়ে মদ খায়, বাকী টাকায় সারাদিন হাতখরচ চালায়; তারপর আজ বাবার কাল মা-র টাকা নিয়ে মাস চালায়। মাইনের টাকাটা পিকপকেট হলে মাসিক ফূর্তি তেমন জমবে না, তাই ভাবতে হচ্ছে বাসে চড়ার মজা আজ হাতছাড়া করবে কিনা। মজার মন্দিরে আজ যাবে নিরামিষ ট্যাক্সি চেপে?

উজ্জ্বল না!

বুকের ওপর জোর চাপ পড়ল। রক্তের চাপ হু-হু করে বাড়তে লাগল। পৌনে ছফুট পুরুষ্টু মেয়ে একটি দুহাত দূরে।

চিনতে পারলে না?

শীলা না!

নাঃ! নামটাই শুধু দেখছি মনে আছে।

না—চেহারাটাও—। মনে রাখার মত—।

সত্যি নাকি!

যে দেখবে সে-ই বলবে এর চেয়ে সত্যি আর নেই।

সুখের কথা—।

তাই? তারপর—কতদিন পরে—। কী খবর? কোথা[illegible]দিকে? চাকরী করা [illegible]

কে বলল চাকরী করছি!

তাহলে?

চাকরী না করলে আসতে নেই এদিকে?

তা নয়, মানে—চাকরী করছ না কী করছ তবে?

কী আবার করব—কিছুই না!

ও—আচ্ছা। কতদিন—অনেকদিন পরে দেখা হল, ভাবাই যায় না। [illegible] আছ এখন?

কেন, বাড়িতেই!

বাড়ি বলতে?

বাপের বাড়ি।

তাই? আচ্ছা—।

তুমি? তোমার খবর কী [illegible] করছ কোথায়?

একটা ফার্মে আছি—।

খুব ভাল আছ—।

দেখে মনে হচ্ছে?

দেখে ত অনেক কিছু মনে হচ্ছে!

কী রকম কী রকম?

খুব শুনতে ইচ্ছে করছে? শোনাব শোনাব অনেক শোনাব, আগে একটা জোগাড়টোগাড় করে দাও দেখি; তোমার ত অনেক সোরস্—তোমাকে দেখলেই মনে হয়। তবে তুমি কি দেখবে! আমাদের কথা কি তোমার মনে থাকবে! কী করে থাকবে মনে! যাক্! যত আজেবাজে কথা! তারপর বল—কিছু যে বলছ না! কতদিন পরে তোমাকে দেখলাম উজ্জ্বল! ইস্[illegible]

তোমার মনে আছে—পড়ে মনে? কিছুই মনে নেই তোমার—কেমন করে থাকবে! অনেকের সঙ্গেই দেখা হয়, জানতে চাইলে তোমার কথা কেউই কিছু বলতে পারে না। পারবে কেমন করে—রাখনি ত সম্পর্ক কারো সঙ্গে! কেন, প্রশ্ন করে বিব্রত করব না,—তবু জানতে ইচ্ছে করে খুব, কোথায় ছিলে এতকাল? বাইরে কোথাও—ইউ কে, আমেরিকা—কোথায়?

মুখে রুমাল ঘষতে ঘষতে উজ্জ্বল হাসে। মনের সাধ মিটিয়ে নিচ্ছ আচ্ছা করে ব্যঙ্গ করে!

কক্ষনো নয়! আমেরিকা ত তোমাদের জন্যেই। নয়?

না, আমার মত ছেলের জন্যে কক্ষনো নয়।

কিছু খারাপ ছেলে নাকি তুমি—না তোমাদের টাকার অভাব আছে কিছু! ভেবেছ জানি না, সব জানি মশায়—নাড়ীর খবর রাখি। তোমার বাবা এ-ক্লাস একটা ব্যাঙ্কের একটা বড় ব্রাঞ্চের ম্যানেজার; তোমার মা কী একটা আমেরিকান কনসার্নে রিসেপসনে—।

হাঁড়ির খবর রাখ দেখি!

গরীবের পাতের খবর কেউ কিন্তু রাখে না!

কেন কেন—তুমি কি সত্যিই কিছু—একেবারে কিছুই করছ না?

তবে কি রসিকতা করছি?

না— সিরিয়াসলি নীলা—। আমার ডিপার্টমেন্টে ঠিক এই মুহূর্তে কোন ভ্যেকান্সি নেই—। তবে চেষ্টা করলে ভ্যেকান্সি যে একটা ক্রিয়েট করা যায় না এমন নয়। আচ্ছা, সর্টহ্যান্ডটা শেখা আছে তোমার—যদি না থাকে খুব তাড়াতাড়ি, এই ধর মাস পাঁচ সাত-এর মধ্যে—নো—নোঃ ইট ইজ অ্যাবসার্ড,—বাট ইট ইজ এসেন্সিয়াল; ভাল চাকরী করতে চায় যারা এমন মেয়েদের পক্ষে এটা একেবারে অপরিহার্য। তুমি কিছু মাইন্ড করছ না ত নীলা?

বারে! তুমি চাকরী দিচ্ছ—ইন্টারভ্যু নেবে না, মনে কিছু করলে আমাকে দিয়ে কি তোমার কাজ হবে!

উজ্জ্বল নীলার লঘুতা গায়ে মাখল না। গাম্ভীর্য অটুট রেখেই বলল, আমাকে দিয়ে তোমার কাজ কিছু হবে কিনা—আপত্তি না থাকলে তোমার ঠিকানাটা আমাকে দিতে পার।

আপত্তি? আশ্চর্য! এ তুমি কী বলছ উজ্জ্বল? নিবিড় স্বরে বলে চলল নীলা, এখানেই দোব ঠিকানা—এই ভিড়ের মাঝখানে রাস্তায় দাঁড়িয়ে? তোমার তাড়া আছে কোথাও যাওয়ার? বিয়ে নিশ্চয়ই করোনি—তবু, কোন স্যুইট এ্যাপয়েন্টমেন্ট, ইফ এনি?

বলতে পার কোথায় যেতে চাও। বল, কোথায় যাবে—যাই না যাই, তোমার কোন এনগেজমেন্ট—আই মিন্—।

ন্যাথিং! নীলা উজ্জ্বলের চোখের তারার দিকে চেয়ে হাসে। কতদিন পরে দেখা, আবার কবে দেখা হবে—।

একবার দেখা যখন হয়েছে এবার মাঝে মাঝে দেখা হবে আশা করা যায়! কথাটা বলেই নিজেকে নির্বোধ ভাবল উজ্জ্বল।

নীলার গলা উথলে উঠল অমনি, হ্যাঁ নিশ্চয়, নিজের স্বার্থে এখন থেকে প্রায়ই তোমাকে বিরক্ত করব।

উজ্জ্বল আবার উদ্বুদ্ধ হয়। বেঁচে যাব! সত্যিই বেঁচে যাব তাহলে।

বাঁচাবার কেউ ছিল না—নেই কেউ, কথাটা বিশ্বাস করতে বলছ—উজ্জ্বল? হাসির ছলনার মত সেই হাসি খেলতে থাকে নীলার ঠোঁটে।

তোমরা এই সরল সত্যটা কিছুতেই বিশ্বাস কর না কেন নীলা? আমাকে দেখে কী মনে হয়, কী, কী মনে হয় তোমার নীলা, কী বল?

মনে যা হয় সত্যি বলব?

বলবে বইকি! উজ্জ্বল নীলার চোখের ওপর হাসে; বল কোথায় যাবে যেখানে তোমার সব কথা বলতে পারবে স্বচ্ছন্দে?

বল? নীলা উজ্জ্বলের স্রোতে ভাসিয়ে দেয় নিজেকে। কালো চশমাটা পরে নিল।

ব্যাগটা টেবিলের ওপর নামিয়ে রেখে সোফাতে পিঠ এলিয়ে দিল ধীরে ধীরে। ডান হাতে সানগ্লাসটা চোখ থেকে নামাল। বাঁ হাতে শাড়ির চওড়া পাড়খানা বাঁ বুকের শিখরে তুলে দিতে দিতে সংগীতের মত স্বরে বলল নীলা, এখানে যে নিয়ে আসা হল, এত দামী জায়গায়—অনেক বুঝি পয়সা হয়েছে?

উজ্জ্বল সিগারেট জেলেছিল, এক ঝলক ধোঁয়া উগরে দিল, নাঃ, অনেক আর কোথায়!

সত্যি, কত পাচ্ছ? জিগ্যেস করছি বলে কিছু মনে করছ না ত?

নাঃ। থাউজেন্ডের মত—এমন কী আর। বল সত্যি কী না? আজকাল রামশ্যাম এরকম পায়—।

সত্যি, তোমার আরো বেশী পাওয়া উচিত। নীলার গলায় নিবিড় আন্তরিকতা।

কেবিনের দরজায় টোকা পড়ল। জল নিয়ে চুকল টুপি মাথায় বেয়ারা।

বল? উজ্জ্বল নীলার মুখের দিকে তাকাল।

আমি শুধু চা।

তা কি হয়? এখানকার মুর্গীর প্রেপারেসান অপূর্ব। বেয়ারা—।

বেয়ারা অর্ডার পেয়ে চলে গেল।

নীলা আবদারের মত করে প্রতিবাদ

[illegible]

বেশ ত, একটু মুখে দিও।

যদি না দিই? নীলার গলায় কিশোরীর সুর।

তা আর কেমন করে হয়? উজ্জ্বল টাই-এর নট আলগা করতে করতে বলল। বল, তোমার আর সব খবর?

আমার আবার কত খবর থাকতে পারে! মাথা নিচু করে কাঁচে জলের দাগ আঁকতে আঁকতে অন্যমনস্কের মত উত্তর দিল নীলা।

তবু কিছু বল। কিছু খবর ত থাকেই।

নীলা মুখ তুলে তাকাল। কিছু বলতে গেলেই ত নিজের কথা বলতে হয়।

তাই-ত শুনতে চাই।

ভাল লাগবে তোমার?

খারাপ লাগবে—আমার সম্বন্ধে এরকম ধারণা হওয়ার কারণ?

না— অন্যের দুঃখের কথা শুনতে কার আর ভাল লাগে!

তবু শুনিই না তোমার সেই দুঃখটা কী—কিসের দুঃখ তোমার এত?

দুঃখ? না, দুঃখ কিছু ত নেই।

তাহলে শোনাও তোমার সুখের কথা।

সেই একঘেয়ে কথা, আমাদের মত মেয়েদের সে-ই চিরদিনের পুরোনো কথা। তুমি শুনবে সত্যি?

সত্যি। তুমি বল। মমতা উপচে পড়ে উজ্জ্বলের স্বরে।

নীরবে টেবিলের ওপর হাতদুটো তুলে দেয় নীলা; আঙুলগুলো সোচ্চারে বলে, নীলার বয়েস হয়েছে।

সরু কাঁকন একগাছা একহাতে। অন্য হাতে ঘড়ি। ব্যান্ডের রঙ চেনা যায় না। শরীরের ভঙ্গিতে ব্যর্থতা আর বিষাদ ঘনিয়ে উঠেছে। কপালের ফর্সা চামড়া ভেঙে-চুরে ভাঁজে ভাঁজে ভরে উঠেছে হঠাৎ। নিটোল সারা মুখে ঘামের বিন্দু ফুটে উঠেছে ব্রণের মত। চোখ নামিয়ে নিল উজ্জ্বল। দামী আংটিটা আঙুলের মধ্যে ঘোরাতে লাগল। এ্যাসট্রেতে উচ্ছিষ্ট সিগারেট পুড়ছে। শাড়ির আঁচল দিয়ে নীলা গলার ঘাম মুছল।

কী—?

উঁ—। উজ্জ্বল মুখ তুলল, বল।

কী গুমোট গরম না?

হ্যাঁ।—আচ্ছা নীলা, বাড়ীতে তোমার কে কে আছেন?

বাবা মারা গেছেন বছর দেড়েক হল।

কী হয়েছিল?

অসুখবিসুখ কিছু তেমন নয়, বয়েস হয়েছিল।

তোমার কোন দাদা—।

না, আমিই বড় ভাইবোনদের মধ্যে।

ও, আচ্ছা!

নীলা হাসল, কী হল?

না—। তোমার মা?

[illegible] আছেন। হাসপাতালে দেওয়া

মারা যাবার পর থেকে—। গত তিন চার মাস একনাগাড়ে বিছানায় পড়ে আছেন।

অসুখটা কী?

কী জানি! আমার যতটুকু সাধ্য ডাক্তার দেখিয়েছি আমি।

তোমার ভাইবোনেরা কি খুব ছোট? ক' ভাইবোন তোমরা?

দু' ভাই দু' বোন। ভাই দুজন ছোটই। আমার ইমিডিয়েট পরে বোন।

কী করে বোন, পড়ে?

বি-এটা পাস করার পর আর পড়ে নি। দু' বছর ধরে চাকরীর চেষ্টা করে যাচ্ছে।

আচ্ছা নীলা, তুমি তো একটা স্কুলে-টুলে—। স্কুলের মাইনেটাইনে শুনি আজ-কাল ভালই। উজ্জ্বল সিগারেট ধরায়। চেষ্টা করলে কি—।

নীলা গম্ভীরভাবে তাকায় উজ্জ্বলের চোখের দিকে। কলকাতায় অনেক চেষ্টা করেছি। অনেক দূরে গ্রামে কোথাও যাওয়া আমার পক্ষে সম্ভব নয়। ভাই দুজন স্কুলের নিচু ক্লাসে পড়ে, মার ঐ অবস্থা,—বোন, বুঝতেই পারছ।

অনেক দায়িত্ব তোমার ওপর, তোমার একার ওপর,—বুঝি। কিন্তু—।

নীলা মাথা নীচু করে টেবিলে জলের দাগ কাটে।

অনেকক্ষণ উজ্জ্বল শুধু দেখে নীলাকে। তারপর বলে, একটা কথা বলব?

নীলা ধীরে ধীরে মুখ তুলে তাকায়।

কিছু যদি মনে না কর—একটা কথা বলব?

নীলা কোন উত্তর করল না, তেমনি তাকিয়ে রইল উজ্জ্বল-এর মুখের দিকে।

কথাটা তুমি কেমন ভাবে নেবে জানি না—। উজ্জ্বল সংকোচের ভাব করে, নীলার আগ্রহ আশা করে। শেষে ধৈর্য রাখতে পারে না, না—মানে, আচ্ছা নীলা, কোন অভিজাত দোকানে বা যদি কোন হোটেলে রিসেপসনে—।

নেবে কেন আমাকে?

মাইনেপত্তর যতদূরে জানি ভালই দেয় ওরা।

খারাপ মাইনে দিলেও কোন আপত্তি নেই, কিন্তু আমাকে ওরা নেবে কেন?

কেন, ওরা যা চায়—স্মার্টনেস,—তোমার যথেষ্ট আছে। আর সত্যি কথা বলতে কী—

কী? থামলে কেন, বল, বলেই ফেল না—।

না— মানে, হ্যাঁ, ইয়ে—তোমার—।

ফিগার! নীলা শব্দ করে হেসে উঠল।

সার্টেনলি; হাসির কথা নয় নীলা। অনেকের চেয়ে তোমার—।

ফিগার অনেক ভাল! এক হাতে বুকের শাড়ি চেপে আর এক হাতে মুখ ঢেকে হাসিতে ভেঙ্গে পড়ল নীলা। তারপর হঠাৎ হাসি থামিয়ে বলে উঠল, কিন্তু নীলার ঠোঁট দুটো ভিজে গেছে। ফর্সা মুখটা হয়ে উঠেছে রক্তাভ।

উজ্জ্বল ঠোঁট থেকে সিগারেট নামিয়ে বলল, লুক! ইউ মিন—আমি বুঝতে পেরেছি নীলা তুমি কী বলতে চাইছ। আমি বলতে চাই নীলা ঐ দায়িত্বটা তুমি আমাকে দাও, অবশ্য যদি আমাকে তুমি বিশ্বাস কর—।

কী—কী, বলছ কী তুমি উজ্জ্বল! গভীর ব্যথিত চোখে উজ্জ্বলের চোখের দিকে তাকাল নীলা। তেমনি রইল কিছুক্ষণ। তার-পর টেবিলের ওপর কনুই দুটো রেখে দু-হাতের অঞ্জলিতে মুখখানা ভাসিয়ে দিয়ে আবেগ-ধরা গলায় বলে চলল, তুমি যদি আমার একটা ব্যবস্থা সত্যিই করতে পার—। যে কোন চাকরী—যেমন তেমন কাজ একটা। সারাজীবন আমি—আমি তোমার—তোমার—কী বলব? জান উজ্জ্বল, বাইরে থেকে সকলে ভাবে আমার মত মেয়েরা ইচ্ছে করলেই যে কোন চাকরী যখন খুসী পেতে পারে। ইচ্ছে করে, সত্যি, ইচ্ছে হয় এক-এক সময় লোকের এই ভুলটা ভেঙে দিই—দিই ভেঙে। বলি, শুনুন, শুনুন সকলে, দেখুন আমাকে—আমাকে দেখে সত্যের আসল চেহারাটা দেখতে শিখুন! উজ্জ্বল, জান, খুব খারাপ লাগে যখন, যখন দেখি আমার তো আর কোন পথ নেই—কী ইচ্ছা হয় জান,—থাক্, নাইবা আর শুনলে তুমি! কী লাভ! তারচেয়ে তুমিই বল, তোমার কথা—সেই ভাল, উজ্জ্বল। নীলা টেবিলের ওপর একটা হাত বিছিয়ে দিল। হাতের ওপর চিবুক রেখে মুখটা রাখল উজ্জ্বলের মুখের দিকে।

নীলা, তোমার ইচ্ছাগুলো আমাকে বলতে পার স্বচ্ছন্দে।

পাগল! না শোন উজ্জ্বল, তুমি কিছু ভেব না,—আমার জন্যে কিছু করতে হবে না তোমাকে। আমার ভাবনা, আমার দায়িত্ব সমস্ত আমার নিজের। নীলা সোফাতে শরীর এলিয়ে দিল ধীরে ধীরে। উজ্জ্বল তাকে দেখছে। তার চোখ-দুটোর দিকে তাকিয়ে ঠোঁটে হাসি ভরিয়ে শাড়ি দিয়ে বুক ঢাকতে ঢাকতে বলল নীলা, কিছু বলছ না যে?

তুমিই তো বলবে। বল—। উজ্জ্বল আর একটা সিগারেট ধরাল।

আচ্ছা উজ্জ্বল, কতগুলো সিগারেট খাও তুমি দিনে?

উজ্জ্বল হেসে উত্তর দিল, তা দিন রাতে দশ প্যাকেটের মত সিগারেট আমার লাগে—লাগে!

মাসে তিনশ টাকা লাগে বল?

মিনিমাম!

একজন কেরানী বা স্কুল-কলেজের মাস্টারের মাইনে!

ওরা আজকাল কত পায় ঠিক জানি না, তবে নিজের সম্বন্ধে এইটুকু আমি জানি, বাজারের সব সেরা জিনিস ছাড়া আমার পোষায় না! খাই বা খাই, নিবিড় উজ্জ্বল, তোমার দেরী হয়ে যাচ্ছে না, নীলা?

উঁহু! নীলা মাথা দোলায়। শরীর দোলে নীলার।

তুমি হয়ত ভাবছ কেন আরো কিছুক্ষণ তোমাকে থাকতে বলছি, উজ্জ্বল যেন অন্য মানুষ, বলে, একটা কথা নীলা,—ভাল লাগে না, আজকাল আর ভাল লাগে না!

এ কী বলছ উজ্জ্বল?

হ্যাঁ নীলা, তোমাকে ঠিক বলতে পারব না—। তোমাকে বলতে অবশ্য আমার বাধা নেই—।

অমন কথা বলো না। বেশ তো আছ—দিব্যি!

হ্যাঁ, অন্ততঃ তাই-ই মনে হয় দেখে। কিন্তু নিজে তো জানি, ঠিক বেশ নেই নীলা।

বাজে কথা। বানানো কথা। এই দুঃখ-বোধ আজকের ছেলেদের এটা একটা রোগ। তোমাদের মত সুখীদের একটা বিলাস এটা। কী, সত্যি বলিনি?

ভাবছি ছেলেদের এই গোপন খবর তুমি জানলে কেমন করে!

ভেবোনা অনেক কষ্ট করে জানতে হয়। রাস্তাঘাটে সর্বত্র সারাক্ষণ দেখছি। চোখ চেয়ে চললেই—।

তোমার চোখ দুটো ভারী সুন্দর কিন্তু।

বন্দনা করছ, না ব্যঙ্গ?

না সত্যি নীলা, সত্যি বলছি।

আচ্ছা উজ্জ্বল, এই যে কিছুক্ষণ আগে বলছিলে না আমার ফীগারটা সুন্দর, সত্যি?

এর চেয়ে সত্যি আর কিছু নেই।

না না—সিরিয়াসলি, বল না, সত্যি?

সিরিয়াসলি! অনেকের চেয়ে অনেক বেশী অ্যাট্রাকটিভ তুমি। তোমার একসট্রা গ্ল্যামার আছে!

তোমার চোখের দোষ আছে!

এটা যে কারো চোখে পড়বেই নীলা! চোখে তুমি না পড়ে পার না।

ফিল্মে চান্স পাচ্ছ না কেন তাহলে?

এক মুহূর্ত ভেবে উজ্জ্বল উত্তর দিল, হয়ত ঠিকমত চেষ্টা করা হয়নি!

সেই চেষ্টাই যদি করতে হল তবে আর এমন কী অসাধারণ চেহারা আমার!

ঠিক কথা! উজ্জ্বল গম্ভীর হল; মুখটা নীলার দিকে অনেকটা এগিয়ে নিয়ে গিয়ে চাপা গলায় বলল, তুমি সিনেমায় নামতে চাও, নীলা?

মাথাটা পিছিয়ে নিয়ে নীলা উত্তর দিল, টাকা যদি পাই ঠিকমত, সত্যি কথা বলতে কি আপত্তি নেই! মুখটা কিছুটা এগিয়ে এনে বলল, উজ্জ্বল, ও লাইনে তোমার চেনাজানা থাকলে আমার জন্যে যদি—।

তাড়াতাড়ি সিগারেট ধরাল উজ্জ্বল। পিঠ টান করে বসল। তোমাকে [illegible]

মিথ্যে বলব না, দ্ব'চারজন দিয়েছিল। তবে তাদের ওপর ঠিক ডিপেণ্ড করতে পারি নি। তুমিই বল, অপরিচিত একজন লোককে হুট করে—।

তা ঠিক। কিন্তু কী জান—অপরিচিত-দের তুমি এড়াতে পার না কিছুতেই। অপরিচিতদের পরিচিত হওয়ার একটা সুযোগ ত চাই—সেই সুযোগ থেকে তুমি তাদের বঞ্চিত করতে পার না! রিস্ক তোমাকে একটু নিতেই হয় নীলা!

তবু তুমি কি মনে কর না উজ্জ্বল, আগে থেকে একটু চেনা পরিচয় থাকলে—।

তুমি যে ভয় করছ নীলা, সেই ভয় আজকাল অনেকটা কম মনে হয়। যতদিন যাচ্ছে ও লাইনের গ্ল্যামার ততোই বেড়ে চলেছে।

কিন্তু ব্যবসা ত—।

ব্যবসা?—ইয়েস! আর সেই জন্যেই ত ভয়টা অনেক কম! টাকা পয়সা লেনদেনের ব্যাপার যখন তখন যতটুকু না দিলে নয়,—তার বেশী—আমার তো মনে হয় না।

বেশ তো, তোমাকে বলা রইল। দেখ—। নীলা শরীর এলিয়ে দিয়ে শিথিল হয়ে গেল।

আমাকে তো রিল্যায় করতে হয় তাহলে—?

আমি কি বলেছি তোমাকে রিল্যায় করি না? তোমাকে রিল্যায় করব না তবে কি রাস্তার একটা লোককে করব নাকি!

আমিও তো আফটার অল রাস্তারই লোক! অন্ততঃ রাস্তায় দেখা হল হঠাৎ।

নীলা শরীর কাঁপিয়ে শব্দ করে হেসে উঠল। বেশ বলেছ! তুমি রাস্তার লোক আর রাস্তার লোকগুলো হল ঘরের লোক। চমৎকার কথা! হা-হা-হা-হা-হা......।

উজ্জ্বল গম্ভীর থাকার চেষ্টা করল। না, মানে—একটু ঘুরতে হতে পারে কিন্তু।

বল না, রোজ ক'ঘণ্টা করে ঘুরতে হবে তোমার সঙ্গে? নীলা সোজা হয়ে বসে বুকটা দেখে নিল একবার। বল তো আজই—আজ থেকেই শুরু করি; আমি তৈরী—।

না—মানে, প্রয়োজনেই ঘুরতে হবে। ঘুরতেই পারছ?

না পারার কী আছে! এ ত জলের মত পরিষ্কার! স্বার্থটা যে আমারই সে কী জানি না!

না—মানে, তুমি হয়ত ঠিক জান না নীলা,—বাজারে যে কী সাংঘাতিক কম্পিটিশন—।

তুমি আমাকে বাজার শেখাবে উজ্জ্বল! বাজারের খবর কিছু কিছু আমি রাখি। যা ভাবছ আমাকে, উঁহু! অতোটা আমি নয়। বানিয়ে বলছি না উজ্জ্বল! শিথিল ভঙ্গিতে নীলা টেবিলের ওপর ঝুঁকে পড়ে রইল। উজ্জ্বলের চোখদুটো দুটো মাছির মত নীলার অদ্ভুত পুষ্ট ঠোঁটদুটোতে এসে বসল; তারপর নিটোল চিবুক বেয়ে মসৃণ গলা বেয়ে বেয়ে বুকে এসে পড়ে; বুকের চাতালে চরতে চরতে দেখে ব্লাউজের মুখটা বেশ হাঁ, ভেতরে গলে পড়ে অমনি। স্তন দুটি ধীরে ধীরে দুরন্ত গুটিয়ে গুটিয়ে এক জায়গায় সরু সুতোর ব্যবধানে জমাট বেঁধে গেছে;—সেই রমণীয় সঙ্গম থেকে লাবণ্য ঠিকরে বেরুচ্ছে। ফোঁটা কয়েক ঘাম টলটল করছে।

বাঁ গালটা চুলকোতে গিয়ে নীলা মুখ তুলেছে—চোখাচোখি হয়ে গেল; ত্রস্তে চোখ ফিরিয়ে নিয়ে সিগারেটে মন দিয়ে এতক্ষণ অন্যমনস্ক ছিল, এরকম ভাব করল উজ্জ্বল। একটু হেসে টেবিলের ওপর একটা হাত পেতে মুখটা ধীরে ধীরে হাতের ওপর নামিয়ে দিল নীলা; একটা হাত বাড়িয়ে দিল।

চওড়া কাঁধের অনেকটা নিচে ব্লাউজের ব্যাক; ঘাম-চকচকে জমাট পিঠ, ভারী [illegible] —আলো তালে

উঠছে নামছে, উঠছে নামছে। উজ্জ্বলের চোখদুটো দুটো ঠোঁট! ঠোঁটে সিগারেট পুড়ছে, হৃদ্‌পিণ্ড জ্বলছে। অঙ্গপ্রত্যঙ্গ সব কাঁপছে থরথর থরথর।

অনেকক্ষণ পরে নীলা মুখ তুলল। মুখে ক্লান্তির ছোপ, ঢুলুঢুলু চোখ। সোফায় পিঠ মেলে দিয়ে ব্যাগটা কোলে টেনে নেয়। রুমাল বের করে ঠোঁট, গলা, বুকের যতটা সম্ভব, ঘাড়, পিঠ মোছে। তারপর শিথিল হাতে জলের গ্লাসটা তুলে নিয়ে ঢকঢক করে অনেকটা জল খেয়ে নেয়। ভিজে ঠোঁট মুছে রুমালটা ব্যাগে রাখে, ব্যাগটা আবার টেবিলে যেখানে ছিল, রাখে। বুকের, পিঠের শাড়ি যেখানে যেমন থাকার ঠিকঠাক রাখতে রাখতে উজ্জ্বলের মুখের দিকে তাকায়, উজ্জ্বলের বাদামী ঠোঁটে সিগারেট পুড়ছে তখনও। মুখটা জ্বলছে।

টেবিলের এক পাশে প্লেটে প্লেটে উচ্ছিষ্ট খাবার, হাড়গোড় ইতস্ততঃ ছড়ানো। অর্ধভুক্ত উচ্ছিষ্ট মাংসের গন্ধ কেবিনে জমাট বেঁধে আছে। কোথা থেকে কয়েকটা অদ্ভুত আকৃতির মাছি এসে উড়ছে ভনভন করে। দু'একটা উড়ে উড়ে গায়ে বসে বসে— গা গুলিয়ে ওঠে নীলার; ভেতরটা ওয়াক্ ওয়াক্ করে।

তোমার কাছে কিছু টাকা হবে উজ্জ্বল?

কত?

নীলা দাঁত দিয়ে ঠোঁট কামড়াল। এ—ই —শ'খানেক?

আজ বোধ হয় হবে না,—পঞ্চাশ টঞ্চাশ হলে—?

আচ্ছা।

উজ্জ্বল উঠে দাঁড়িয়ে প্যান্টের পকেট থেকে মানিব্যাগ বের করতে যাবে, নীলা বাধা দিল,—এখনই কী দরকার! বোস। বসবে না কিছুক্ষণ?

দোকানে আর কতক্ষণ বসা যায়?

বললেই পারতে কোথায় যাবে? শুধু শুধু কষ্ট পেলে—।

না, খিদেও পেয়েছিল।

কাপড় ঠিকঠাক করতে করতে উঠে দাঁড়াল নীলা। কোথায় যাবে?

তুমি বল?

উঁহু।—শেষে ভাল লাগবে না।

লাগবে, কথা দিচ্ছি।

সত্যি বলছ?

রীয়েলি!

আমার ওপর ভার দাও যদি—আমি মাঠ প্রেফার করি।

মাঠেই তবে যাওয়া যাক।

না উজ্জ্বল, তুমি যদি অন্য কোথাও ভেবে থাক—বল,—বলই না?

না মাঠেই ভাল।

রাস্তা পেরোলেই মাঠ। রাস্তায় নেমেছে, ছুটন্ত একটা ট্যাক্সি সজোরে ব্রেক কষল প্রায় সামনে—কী হাত দুই তিন এগিয়ে—রীতিমত চমকে দিয়ে। —'আরে নীলা দেবী! কোথায়?' কে না কে—কাকে না কাকে ডাকছে, কার না কার নাম নীলা! উজ্জ্বলের দিকে ফিরে নির্বিকার কণ্ঠে নীলা ব'লে উঠল, দাঁড়িয়ে পড়লে যে!—এস। নিমেষে রাস্তা পেরিয়ে গেল নীলা। উজ্জ্বলও রাস্তা পেরিয়ে এল। বলল, ভদ্রলোক বোধ হয় তোমার সঙ্গে কী কথা বলতে চান নীলা। পিছন ফিরে আবার দেখল উজ্জ্বল। তাদের দিকে মুখ করে দাঁড়িয়ে আছে লোকটি; হাসছে। এক হাতে কালো চশমাটা, এক হাতে সিগারেট জ্বলছে।

কোন ভদ্রলোকের কথা বলছ,—কী ব্যাপার বলত? নীলার বিস্ময়ের সীমা নেই।

পিছনে চেয়ে দেখ—দাঁড়িয়ে আছেন।

নীলা দেখল না। বলল, কে না কে! কত লোক তো দাঁড়িয়ে আছে—দেখার কী আছে!

ভদ্রলোক কিন্তু তোমাকে দেখেই দাঁড়ালেন।

আমাকে দেখে? কেমন করে বুঝলে? দারুণ বুদ্ধি তো তোমার!

বারে! তোমার নাম ধরে ডাকল—

কার নাম ধরে ডাকল, আর—!

মানে?

আমি তো কোন ভদ্রলোককে দেখলাম না!

কী রকম? ট্যাক্সিটা তোমার সামনে এসে দাঁড়াল। ভেতর থেকে একজন লোক—চোখে কালো চশমা, বেশ জোরেই তোমাকে ডাকল। তুমি দাঁড়ালে না দেখে লোকটা প্রায় লাফিয়ে নেমে পড়ল ট্যাক্সি থেকে। আমি সঙ্গে না থাকলে হয়ত তোমার পিছন পিছন ছুটে আসত—।

তোমার কল্পনাশক্তি দারুণ উজ্জ্বল!

কল্পনা মানে?

নয়? কাকে না কাকে দেখেছ—কী রকম জুড়ে দিলে আমার সঙ্গে! রীয়েলি—ইন্টারেস্টিং!

ইন্টারেস্টিং—রীয়েলি! একজন লোক স্পষ্ট তোমার নাম ধরে ডাকল, তোমাকে কী জিজ্ঞাসা করল আর তুমি—

তুমি কি আমাকে চ্যালেঞ্জ করছ, উজ্জ্বল?

নীলা হঠাৎ ঘুরে দাঁড়াল। একেবারে অন্য মূর্তি! আমাকে যে ডাকছে তাকে আমি চিনব না এরকম ভাবছ কেন?

আমি ত কিছুতেই ভেবে পাচ্ছি না একজন লোককে এত করে না চেনার ভান করছ কেন? লাভ কী হচ্ছে তোমার?

আর এতে লজ্জারই বা কী আছে—তুমি কি—।

কী? বল, বল আমি কী? ছি-ছি! ছিঃ, উজ্জ্বল! কোথায় নেমেছ! এত নীচ তুমি উজ্জ্বল?

তুমি? তুমি বুঝি খুব সতী—নীলা?

ছোটলোক কোথাকার! এমন জানলে—।

কী—টাকা চাইবে না?

টাকা আমি ধার চেয়েছিলাম।

তাই অন্ধকার মাঠে আসতে চেয়েছিলে?

নীলার মুখ বন্ধ হল না। কোন কথাও বলল না আর। স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল কাঠের ভঙ্গিতে, মাথা নিচু করে। একটা হাত কাঁপতে জড়ানো শক্ত করে। একটা হাত কপালে ছোঁয়ানো।

যেন কিছুই হয়নি, কিছুক্ষণ আগে কিছুই ঘটেনি যেন! সিগারেট ধরিয়ে উজ্জ্বল দেখছে চারপাশ।

মাঠের রঙ বদলে গেছে। দূরে নীলাভ অন্ধকার কুয়াশার মত ঘনিয়ে উঠছে। বিকেল সন্ধ্যার দিকে এগিয়ে চলেছে পায়ে পায়ে। গাছ, গাছের নীল ছায়া ছড়িয়ে আছে ইতস্ততঃ। ঘাসের ওপর সন্ধ্যার স্নিগ্ধতা ঝরে পড়ছে। বাতাসও গেছে জুড়িয়ে। সুনীল আকাশে মেঘের কোলে কোলে শেষ লালিমা। একটুকরো রক্তিম আলো এসে লুটিয়ে পড়েছে নীলার পায়ে।

যেন উজ্জ্বল নয়, উজ্জ্বলের ভেতর থেকে অন্য একজন স্নিগ্ধ কণ্ঠে শুধোল, যাবে না নীলা?

কোথায়,—না। নিরালঙ্কার নির্মম উত্তর, যার পর আর কোন জিজ্ঞাসার অবকাশ থাকে না।

নীলা তেমনি দাঁড়িয়ে থাকে। কারো দিকে কোন কিছুর দিকে মুখ তুলে না তাকিয়ে অথচ অনেক দেখতে দেখতে।

অভিমানী কোন প্রেমিকার মত দেখায় নীলাকে।

এবং উজ্জ্বল, আহত প্রেমিকের মতই অনুশোচনার যন্ত্রণায় কাতর হতে থাকে। যন্ত্রণাকে ভাষার রূপ দিতে থাকে। কেন এমন হল নীলার? কেন নীলা এত নীচে নামল?—নীলার চাকরী দরকার, টাকা দরকার, নিশ্চয়তা সুখ, স্বাচ্ছন্দ্য দরকার,—তাই?

কিন্তু উজ্জ্বল—তার তো চাকরী আছে, স্বাচ্ছন্দ্য আছে—বাবা সমস্তই আছে,—তাহলে?

তাহলে টাকা নয়—কোন অভাব নয়; নীলা নয়, উজ্জ্বল নয়—অন্য কিছু, অন্য কেউ দায়ী, যাকে নীলা এড়াতে পারে না—যাকে উজ্জ্বল এড়াতে পারে না।

এ কোন্ সময়-এর মধ্যে এসে পড়েছে তারা! কে দায়ী তাদের জন্যে?

দূরের সেই অন্ধকারটা কখন বুকের কাছে ঘনিয়ে এসেছিল—চোখের ওপর জমাট বেঁধে গেছে।

"UTTARAYAN"

SANTINIKETAN, BENGAL.

চৈতন্য লাইব্রেরির ইতিহাস পঞ্চাশ
বৎসর পূর্ণ করিয়াছে — এই উপলক্ষ্যে ইহাদের
আন্তরিক অভিনন্দন জানাই। ইতি ২৪/১১/৩৭

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

বাংলা ১৩০০ সনের ভাদ্র মাসের শেষাশেষি, ইংরাজি ১৮৯৩ খৃঃ আগস্ট—কলকাতায় খুব চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হোল। চৈতন্য লাইব্রেরী আয়োজিত সাহিত্য সভায় তরুণ রবীন্দ্রনাথ একটি দীর্ঘ প্রবন্ধ পাঠ করবেন। নাম 'ইংরাজ ও ভারতবাসী।' ইংরেজের বিরুদ্ধে ভারতের সাধারণ মানুষের মনে বহু অসন্তোষ দানা বেঁধে উঠছিল ধীরে-ধীরে। এছাড়া ইংরাজের মোসাহেবের দলও সৃষ্টি হয়েছে তখন, যারা পদে-পদে ইংরাজের অনুকরণের চেষ্টা করে ও স্বজাতীয় ভারতবাসীর প্রতি নানাবিধ অবজ্ঞা প্রদর্শন করে ইংরাজের প্রিয়পাত্র হতে চায়।

শোনা গেল তরুণ রবীন্দ্রনাথ নাকি ইংরাজ ও তাদের মোসাহেবদের বিরুদ্ধে কলম ধরবেন এ প্রসঙ্গে। শহরের লোকের উত্তেজনা একেবারে তুঙ্গে উঠল যখন শোনা গেল যে, ঐ সভায় সভাপতিত্ব করবেন স্বয়ং বঙ্কিমচন্দ্র।

কেউ-কেউ খবরটা বিশ্বাস করলেন বটে, কিন্তু অনেকেই করলেন না। তাঁদের ধারণা এরকম একটা বিপজ্জনক রাজনৈতিক

রবীন্দ্রনাথ ও চৈতন্য লাইব্রেরী

সুজিতকুমার সেনগুপ্ত

রবীন্দ্রনাথের একটি চিঠির অংশ

পত্রোত্তর দিতে বিলম্ব হইল
সেজন্য মার্জনা করিবেন।
আগামী রবিবারে যদি আমাকে
অভ্যর্থনা করিয়া আপনাদের
ভোজ কার্য্য সম্পন্ন করেন
তবে আমার জন্য অপেক্ষা বিলম্ব
করিতে হইবে না। আমি আপনাদের
পরীক্ষক সমিতির একজন সভ্য
হইতে সম্মত আছি।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

নিয়মানুসারে অনুষ্ঠিত সভায় বঙ্কিমচন্দ্র কখনই যোগ দিতে পারেন না। কিন্তু না। সত্যি সত্যিই বঙ্কিমচন্দ্র ঐ সভায় সভাপতিত্ব করতে রাজী তবে একটি সর্ত দিয়েছেন বটে। সর্তটি হল, প্রবন্ধটি যেহেতু রাজনৈতিক সমালোচনা, সেহেতু প্রবন্ধটি সভায় পাঠ করার আগে তাঁর বাড়ীতে রবীন্দ্রনাথকে একবার পড়ে শোনাতে হবে। প্রবন্ধটিতে যদি মারাত্মক ধরনের কিছু মন্তব্য থাকে, যা পীড়িকদের পর্যায় পড়ে তবে তা থেকে উদ্ভূত দারুণ গোলযোগ এড়াবার জন্যই এ ব্যবস্থা।

গেলেন রবীন্দ্রনাথ বঙ্কিমচন্দ্রকে প্রবন্ধটি পড়ে শোনাতে। 'তাহার পরে সেদিন তিনি আমার প্রবন্ধ শ্রবণ করিয়া সমাদর-সহকারে আমার বক্তৃতার স্থলে সভাপতি হইতে স্বীকার করিলেন।'

নির্দিষ্ট দিনে সভাস্থল লোকের ভিড়ে একাকার। সভায় রবীন্দ্রনাথ তাঁর দীর্ঘ অনবদ্য প্রবন্ধ 'ইংরেজ ও ভারতবাসী' পাঠ করলেন। সেই প্রবন্ধে তিনি যা বক্তব্য রাখেন তা সে যুগের বিচারে অকল্পনীয়। 'আমাদের দুর্ভাগ্যক্রমে ইংরাজও অনেকগুলি বিষয়ে কিছু স্থূলদৃষ্টি। ভারতবর্ষীয়দের মধ্যে যে বিশেষ গুণগুলি আছে এবং যেগুলি বিশেষ সমাদরের যোগ্য তাহা তাহারা তলাইয়া গ্রহণ করিতে পারে না; অবজ্ঞাভরেই হউক বা যে কারণেই হউক, তাহারা বিদেশী আবরণ ভেদ করিতে পারে না বা চাহে না। তাহার একটা দৃষ্টান্ত দেখো—বিদেশে থাকিয়া জর্মান যেমন একাগ্রতার সহিত আমাদের সংস্কৃত শাস্ত্রের অনুশীলন করিয়াছে, স্বক্ষেত্রে উপস্থিত থাকিয়া ইংরাজ তেমন করে নাই।'

'সাহেব যদি হাসিয়া বলিয়া বসে, বাঃ বাবু, তুমি তো ইংরাজী মন্দ বল না, তাহার পর হইতে বাংলার চর্চা করা আমার পক্ষে বড়ই কঠিন হইয়া উঠে।' 'আমরা সাজিতে পারিব না। না সাজিলে কর্তারা যদি আমাদিগকে একটুখানি অধিকার বা আধটুকরা অনুগ্রহ না দেন তো নাই দিলেন।'

'যদি অরণ্যে রোদনও হয় তবু বলিতে হইবে যে, ইংরাজি ফলাইয়া কোন ফল নাই, স্বভাষায় শিক্ষার মূল ভিত্তিস্থাপন করিয়াই দেশের স্থায়ী উন্নতি। ইংরাজের কাছে আদর কুড়াইয়া কোন ফল নাই। আপনাদের মনুষ্যত্বকে সচেতন করিয়া তোলাতেই যথার্থ গৌরব।'

'আমরা ইংরাজের রেলগাড়ি কলকারখানা রাজ্যশৃঙ্খলা দেখি আর হাঁ করিয়া ভাবি, ইহারা ময়দানবের অংশ। ইহারা এক জাতই স্বতন্ত্র, ইহাদের অসাধ্য কিছুই নহে—এই বলিয়া নিশ্চিন্ত মনে রেলগাড়িতে চাড়, কলের মাল সস্তায় কিনি এবং মনে করি, ইংরাজের মুল্লুকে আমাদের আর কিছু ভয় করিবার, চিন্তা করিবার, চেষ্টা করিবার নাই—কেবল পূর্বে ডাকাতে যাহা লইত এখন তাহা পুলিস এবং উকিলে মিলিয়া অংশ করিয়া লয়।'

'আমি যদি আজ ইংরাজের মত হইয়া ইংরাজের নিকট মান কাড়িতে যাই তবে আমার যে ভ্রাতারা ইংরাজের মত সাজে নাই তাহাদিগকে আত্মীয় বলিয়া পরিচয় দিতে স্বভাবতই কিছু সংকোচবোধ হয়ই...ইহার অর্থই এই—জাতীয় সম্মান বিক্রয় করিয়া আত্মসম্মান ক্রয় করা...মনে করা যাক যে, এইরূপ কাঙাল বৃত্তি করিয়া কিছু প্রসাদ পাওয়া যায়। কিন্তু ইহাতেই কি আপনার কিম্বা স্বজাতির সম্মান রক্ষা করা হয়?'

'সম্মান বঞ্চনা করিয়া লইব না, সম্মান আকর্ষণ করিব। নিজের মধ্যে সম্মান অনুভব করিব। সেদিন যখন আসিবে তখন পৃথিবীর যে সভায় ইচ্ছা প্রবেশ করিব...যাচিয়া মান কাঁদিয়া সোহাগের কোন প্রয়োজন থাকিবে না।'

'কেবলমাত্র ভিক্ষা করিয়া কখনোই আমাদের মনের যথার্থ সন্তোষ হইবে না।'

রবীন্দ্রনাথ দেড় ঘণ্টার কিছু বেশী সময় প্রবন্ধটি একটানা পড়ে শেষ করলেন।

সর্বক্ষণ সভাপতি বঙ্কিমচন্দ্র পাথরের মত নিস্পন্দ হয়ে বসে একবার শোনা প্রবন্ধটি দ্বিতীয়বার শুনেছিলেন।

বিরাট শ্রোতৃমণ্ডলীও ছিল একেবারে নিশ্চুপ। ঐ প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ ইংরাজের বিরুদ্ধে ভারতবাসীকে আত্মশক্তি সংহত করতে ও অসহযোগের ইঙ্গিত দিলেন।

বঙ্কিমচন্দ্র তো এই প্রবন্ধের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করলেনই, সমকালীন প্রায় সমস্ত মনীষী তথা সাধারণ মানুষের মনের মধ্যে জেগে উঠল তুমুল কল্লোল। দলে দলে মানুষ রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে দেখা করতে ছুটলেন। কেউ-বা তাঁকে অভিনন্দন জানাতে যান, কেউ-বা নিন্দা, কেউ-বা আরও বিশদ ব্যাখ্যা শুনতে চান, কেউ-বা রাজনৈতিক নতুন মোড় ফেরানোর প্রচেষ্টায় তাঁর সঙ্গে নিভৃত আলাপে উৎসাহী। প্রশংসা বা গালিগালাজে পূর্ণ চিঠিও

কিছুদিন হইল আমার কথা
সমর্থন করিতে গিয়া আমার
অভিপ্রায়ের অতিরিক্ত কিছু
মত অসাবধানে ব্যক্ত করিলেন।
স্পষ্ট হইলে ~~[illegible]~~ অনুবাদের
~~[illegible]~~
প্রতিবাদের জন্য সময় হয়
যে আমাকে লেখা পাঠাতে
হইবে — তাহা না হইলে
ভাল হয়।

শ্রী[illegible]

[illegible]নাথ ঠাকুরের চিঠির অংশ

দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে রবীন্দ্রনাথের কাছে পৌঁছতে লাগল অজস্র।

সকলেরই জানা আছে তাঁর দীর্ঘজীবনে রবীন্দ্রনাথ কখনই রাজনীতি নিয়ে মাতামাতি করতে উৎসুক ছিলেন না বরং রাজনীতিকে এড়িয়ে যেতে চেয়েছেন বার বার।

এই তুমুল রাজনৈতিক আলোড়নের কেন্দ্রবিন্দু হয়ে কয়েক দিনের মধ্যে তিনি একেবারে হাঁপিয়ে উঠলেন।

১৮৯৩ খৃস্টাব্দে সেপ্টেম্বরে একটি ব্যক্তিগত চিঠিতে লিখলেন :

'চৈতন্য লাইব্রেরির সম্পাদকের অবিশ্রাম উত্তেজনায় এই অসম সাহসিক কার্যে প্রবৃত্ত হয়েছিলুম, নইলে পাব্লিকের কাছে ঘেঁষতে আমার আর বড় ইচ্ছে করে না। আমি...দুরদৃষ্টক্রমে পাব্লিকের মধ্যে নিক্ষিপ্ত হয়েছি, এখন আর আমার কোথাও শান্তি নেই।'

চৈতন্য লাইব্রেরী ও তার সম্পাদক, যাঁর 'উত্তেজনায়' রবীন্দ্রনাথ ইংরাজ ও ভারতবাসী প্রবন্ধটি লিখেছিলেন—এই দুই সম্পর্কে কয়েকটি তথ্য আমরা সংক্ষেপে এখানে আলোচনা না করলে মূল বক্তব্য পরিষ্কার হবে না। ১৮৮৯ খৃঃ ৫ ফেব্রুয়ারী বিডন স্ট্রীটে চৈতন্য লাইব্রেরী প্রতিষ্ঠিত হয়। গৌরহরি সেন, কুঞ্জবিহারী দত্ত, নিতাইচাঁদ দত্ত, হরলাল শেঠ ও রঙ্গলাল বসাক প্রভৃতির উৎসাহে ও গঙ্গানারায়ণ দত্তের আনুকূল্যে এবং রেভারেণ্ড আলেক্স টমরীর সহায়তায় পরবর্তীকালের মহীরুহতুল্য বিরাট গ্রন্থাগারটির বীজ অঙ্কুরিত হল।

উৎসাহী ব্যক্তিদের অগ্রগণ্য ছিলেন গৌরহরি সেন (১৮৬৮—১৯২৪)। তিনিই ছিলেন এ লাইব্রেরীর প্রতিষ্ঠাতা-সম্পাদক। জীবনের শেষ দিনটি পর্যন্ত গৌরহরি সেন চৈতন্য লাইব্রেরীর সম্পাদক পদে আসীন ছিলেন। তিনি ও তাঁর সঙ্গীদের পরিচয় তাঁর ভাষাতেই উদ্ধৃত করি।

'হরলালবাবু মাস্টার, রঙ্গলাল সামান্য মাহিনার কেরাণী, নিতাই হেয়ার স্কুলে পড়ে, কুঞ্জ এফ-এ ক্লাশের ছাত্র, আমি এফ-এ পরীক্ষায় ফেল হইয়া টো-টো কোম্পানীর কার্য করি।'

পাদরি টমরি অতি উদারমনা ব্যক্তি ছিলেন। উদ্যোক্তারা তাঁকে 'পাকড়াও' করার পর নিঃশর্তভাবে এই কটি তরুণকে সহায়তা করতে তিনি এগিয়ে এলেন।

লাইব্রেরী গড়ে তোলবার জন্য আরম্ভ হল অমানুষিক প্রচেষ্টা। পুস্তক আদান-প্রদানের কেন্দ্র ছাড়াই চৈতন্য লাইব্রেরী শিক্ষাক্ষেত্রে যে দুটি পদক্ষেপ রাখল তা বাংলা তথা ভারতের গ্রন্থাগার জগতে চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে।

প্রথম পদক্ষেপ হল দেশের বিভিন্ন ক্ষেত্রের বরণীয় ব্যক্তিদের এনে নিয়মিত আলোচনাসভা, বক্তৃতাসভা, সাহিত্যসভার প্রবর্তন। লাইব্রেরী প্রতিষ্ঠার পরের বৎসর থেকেই এই সভাগুলি নিয়মিত অনুষ্ঠিত হতে থাকে। সেই সভাগুলির বিষয়বস্তু, বক্তা ও সভাপতিদের নাম উল্লেখ করলেই এ যুগের পাঠকেরা সভাগুলির গুরুত্ব অনুধাবন করতে পারবেন।

প্রসঙ্গত বলে রাখা ভাল যে, এই সভাগুলির প্রত্যেকটিতেই বিপুল জনসমাগম ঘটত।

বিষয়বস্তু	বক্তা	সভাপতি
(১) সাহিত্য ও কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় [ইংরাজী]	স্যার আশুতোষ চৌধুরী	প্রধান বিচারপতি জে এফ নরিস স্যার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় বিচারপতি ও উপাচার্য
(২) আর্যামি ও সাহেবিআনা [বাংলা]	দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর	
(৩) য়ুরোপ যাত্রীর ডায়ারি [বাংলা]	রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	স্যার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়
(৪) আমেরিকার শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও তাদের আদর্শ [ইংরাজী]	জেনারেল স্যামুয়েল মেরিল	রাজা পিয়ারীমোহন মুখোপাধ্যায়
(৫) সাধনা—প্রাচ্য ও প্রতীচ্য [বাংলা]	দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর	কুঞ্জলাল বন্দ্যোপাধ্যায়
(৬) বিভিন্ন অবস্থায় বৈদ্যুতিক ক্ষরণ (Electric Discharge) [ইংরাজী]	রেভারেণ্ড ফাদার লাফো	ডক্টর মহেন্দ্রলাল সরকার
(৭) ইয়োরোপের টেকনিক্যাল এডুকেশন ও বাংলার ভবিষ্যৎ [ইংরাজী]	রেভারেণ্ড আলেক্স টমরি	স্যার হ্যারি লী, আই সি এস
(৮) জুরীর বিচার [ইংরাজী]	স্যার আলেকজাণ্ডার মিলার (ভাইসরয় কাউন্সিলের ল মেম্বার)	প্রধান বিচারপতি স্যার কোমার পেথারম
(৯) প্রতিনিধিমূলক সরকার (ইংরাজী)	স্যার আলেকজাণ্ডার মিলার	স্যার রাসবিহারী ঘোষ
(১০) ইংরাজ ও ভারতবাসী	রবীন্দ্রনাথ	বঙ্কিমচন্দ্র
(১১) বঙ্কিমচন্দ্র	রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	স্যার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়
(১২) মেয়েলীছড়া [বাংলা]	রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	স্যার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়
(১৩) নানসেনের মেরুযাত্রা (ইংরাজী)	রেভারেণ্ড আলেক্স টমরি	স্যার হারবার্ট রিসলে
(১৪) ইংলণ্ডের পাব্লিক স্কুল (ইংরাজী)	মোস্ট রেভারেণ্ড ওয়েলডন, ডি-লিট	ছোটলাট স্যার জন উডবার্ণ এম-এ [লিউটেন্যাণ্ট গভর্নর]
(১৫) অরণ্যে রোদন (বাংলা)	রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী	রমেশচন্দ্র দত্ত

বিষয়বস্তু	বক্তা	সভাপতি
(১৬) স্বদেশী সমাজ (বাংলা)	রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	রমেশচন্দ্র দত্ত
(১৭) শিল্পের ব্যবহার (ইংরাজী)	অধ্যক্ষ ই বি হ্যাভেল	প্রধান বিচারপতি স্যার ফ্রান্সিস ম্যাকলীন
(১৮) পথ ও পাথেয় (বাংলা)	রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	হীরেন্দ্রনাথ দত্ত
(১৯) হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়	রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	স্যার আশুতোষ চৌধুরী
(২০) আমেরিকার সাধারণ মানুষের পারিবারিক জীবন ও শিক্ষাপদ্ধতি (ইংরাজী)	আমেরিকান কনসাল-জেনারেল ডবলু এইচ মিচেল	ছোটলাট স্যার জন উডবা[illegible] [লিউটেনাণ্ট গভর্নর]
(২১) ভারতবর্ষের ইতিহাসের ধারা (বাংলা)	রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	স্যার আশুতোষ চৌধুরী
(২২) তন্ত্রের ভাষায় সৃষ্টির রহস্য (ইংরাজী)	বিচারপতি স্যার জন উ[illegible]	বড়লাট লর্ড কারমাইকেল
(২৩) আধুনিক চুম্বক বিজ্ঞান [ম্যাজিক লণ্ঠনসহযোগে পূর্ণাঙ্গ ব্যাখ্যা]	[illegible]ার সি ভি রমন	রেভারেণ্ড ডক্টর এস আর্কহার্ট ডি-লিট

চৈতন্য লাইব্রেরীর উদ্যোগে অনুষ্ঠিত বহু বহু গুরুত্ব-পূর্ণ সভার মধ্য থেকে কয়েকটির মাত্র নাম উল্লেখ করা গেল।

লক্ষণীয় এই যে, সাহিত্য, বিজ্ঞান, ব্যবসা-বাণিজ্য, সম-সাময়িক ঘটনা, রাজনীতি থেকে আরম্ভ করে এমন কোন বিষয় ছিল না যা এই সভাগুলিতে বিশদভাবে আলোচিত হয় নি।

বিতর্কসভাগুলিও ছিল অত্যন্ত আকর্ষণীয়। এমন কি একদিন জাঁদরেল জাঁদরেল ইংরাজ আই-সি-এস ও অতিউচ্চপদস্থ মিলিটারী অফিসারদের সঙ্গে সমান তালে লড়ে এলেন ভগিনী নিবেদিতা।

শিক্ষা ও সংস্কৃতি ক্ষেত্রে দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ হল এই লাইব্রেরী আয়োজিত প্রবন্ধ প্রতিযোগিতা। এই প্রবন্ধ প্রতিযোগিতায় যে কেউ যোগ দিতে পারতেন। বিষয়বস্তু এক-একজন মনীষী নির্বাচন করে দিতেন ও প্রবন্ধপত্রগুলির পরীক্ষা-কার্য দেখতেন তিনিই। বৎসরে পাঁচটি করে পুরস্কার (সোনার মেডেল, রূপোর মেডেল, নগদ একশো টাকা) পর্যন্ত দেওয়া হত।

সংরক্ষিত সেই প্রবন্ধগুলির বিস্তারিত বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে যে, বাংলাদেশ তো বটেই বাংলাদেশের বাইরে থেকেও বহু ব্যক্তি এই প্রবন্ধ প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণ করতেন। এক-একটি প্রতিযোগিতায় তিনশো প্রবন্ধও জমা পড়েছে। কোন কোন প্রবন্ধ ফুলস্কেপ খাতার একশত পৃষ্ঠা! সহজেই অনুমান করা যায় সে যুগে এই প্রতিযোগিতা গবেষণা দাখিল করার মর্যাদা পেয়েছিল।

এই প্রতিযোগিতারও সূত্রপাত ১৮৯০ খৃঃ।

প্রবন্ধগুলির বিষয়বস্তু ও তাদের পরীক্ষকদের নাম উল্লেখ করলে এ যুগে যে আমরা দারুণ বিস্মিত হব তাতে কোন সন্দেহ নেই। স্বীকার করতেই হবে গৌরহরি সেন ও টমরী সাহেব অকল্পনীয় অধ্যবসায় ও সংগঠন শক্তির পরিচয় রেখেছিলেন।

স্থানাভাবে কয়েকটি মাত্র প্রবন্ধের বিষয়বস্তু ও তার পরীক্ষকদের নাম উল্লেখ করা হল—

প্রবন্ধের বিষয়বস্তু	পরীক্ষক
(১) হার্বার্ট স্পেনসারের 'শিক্ষার' বাংলা অনুবাদ	(ক) দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর, (খ) চন্দ্রনাথ বসু, (গ) রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
(২) সংবাদপত্রের উপর সেন্সর ব্যবস্থা (ইংরাজী)	স্যার আশুতোষ চৌধুরী
(৩) হিন্দু সমাজের বর্তমান অবস্থা (বাংলা)	বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় [প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যায় এই প্রতিযোগিতায় প্রথম হয়েছিলেন পরবর্তী কালের যশস্বী সাংবাদিক হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ]
(৪) বিদ্যাসাগর মহাশয়ের নিকট বাঙলা সাহিত্য কতদূর ঋণী (বাংলা)	হরপ্রসাদ শাস্ত্রী
(৫) প্রফেসর ব্ল্যাকির "Self Culture" পুস্তকের বাংলা অনুবাদ	জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর
(৬) বাংলা সাহিত্যে বঙ্কিমের স্থান (বাংলা)	রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
(৭) বাংলা নাটকের ইতিহাস (বাংলা)	হরপ্রসাদ শাস্ত্রী
(৮) বিজ্ঞান চর্চার প্রয়োজনীয়তা (বাংলা)	ডক্টর মহেন্দ্রলাল সরকার
(৯) আকবরের জীবন ও সময় (ইংরাজী)	স্যার সি আর উইলসন [প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যায় এই প্রতিযোগিতায় প্রথম হয়েছিলেন মৌলভী আবদুল করিম]

প্রবন্ধের বিষয়বস্তু	পরীক্ষক
(১০) ভারতে দুর্ভিক্ষ ও তাহার প্রতিকার (বাংলা)	সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর [১৯০১ খৃস্টাব্দে অনুষ্ঠিত এই প্রতিযোগিতার ফলাফল জানিয়ে সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর চৈতন্য লাইব্রেরী সম্পাদককে যে চিঠি লিখেছিলেন, সেই মূলে চিঠিটির প্রতিলিপি দেওয়া হল]
(১১) বিশ্ববিদ্যালয়ের বর্তমান শিক্ষা ব্যবস্থা	রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী
(১২) হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের কবিতা ও বাংলা সাহিত্যে তাঁর প্রভাব (বাংলা)	কালীপ্রসন্ন ঘোষ [প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যায়, এই প্রতিযোগিতায় প্রথম হয়েছিলেন পরবর্তীকালের বাংলা সাহিত্যের খ্যাতিমান সমালোচক শশাঙ্ক-মোহন সেন]
(১৩) জাপানের জাগরণ (বাংলা)	সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর [প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যায়, এই প্রতিযোগিতায় প্রথম হয়েছিলেন পরবর্তীকালের অদ্বিতীয় ঐতিহাসিক স্যর যদুনাথ সরকার]
(১৪) সাহিত্যিক রমেশচন্দ্র দত্তের জীবন ও রচনাবলী (বাংলা)	রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী

১৮৮৯ খৃঃ থেকে আরম্ভ করে ১৯২৪ খৃঃ পর্যন্ত পুস্তক আদান-প্রদানের সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষা ও সংস্কৃতির উন্নতিকল্পে চৈতন্য লাইব্রেরীর উপরে উল্লিখিত দুটি প্রচেষ্টার গতি অব্যাহত ছিল।

দুর্ভাগ্যক্রমে ১৯২৪ খৃঃ কর্মবীর গৌরহরি সেন মহাশয়ের অকালমৃত্যু ঘটে।

তাঁর মৃত্যুর কয়েক বৎসর পূর্বেই পাদ্রী আলেক্স টমরী মহাশয় বার্ধক্যের কারণে অবসর গ্রহণ করে ভারতবর্ষ থেকে জন্মভূমি ইংলণ্ডে ফিরে গিয়েছিলেন। এই দুই মহান কর্মযোগীর অবর্তমানে ঐ দুঃসাধ্য দুটি কাজ পরবর্তী কোন কর্মকর্তাই চালিয়ে নিয়ে যেতে সক্ষম হলেন না। পরবর্তীকালে চৈতন্য লাইব্রেরী আয়তনে অনেক বেড়েছে। পুস্তকের সংগ্রহ হয়েছে যেমন বিপুল সংখ্যায়, সভ্য সংখ্যাও বেড়েছে সে অনুপাতে। কিন্তু দুঃখের সঙ্গে একথা আমাদের স্বীকার করতেই হবে, বাংলা তথা ভারতবর্ষের পাবলিক লাইব্রেরীর ক্ষেত্রে যে দুটি অভূতপূর্ব ও অকল্পনীয় ধারা চৈতন্য লাইব্রেরীর সৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গেই সংযোজিত হয়েছিল, শিক্ষা ও সংস্কৃতির সেই দুটি ধারা পরবর্তীকালে একেবারেই শুকিয়ে যায়।

আমরা পুরোন প্রসঙ্গে আবার ফিরে যাই। সেই উত্তেজনা-কর রাজনৈতিক বিতর্কের শেষে রবীন্দ্রনাথ সংগঠনমূলক কাজ ও সাহিত্যে নিজেকে সম্পূর্ণভাবে নিয়োজিত রাখলেন।

এরই ফাঁকে তাঁর বিখ্যাত প্রবন্ধ "মেয়েলী ছড়ার" মাল-মশলা সংগ্রহ ও খসড়া প্রস্তুত হতে থাকে। তাঁর ইচ্ছে প্রবন্ধটি তিনি চৈতন্য লাইব্রেরীতে পাঠ করবেন।

প্রবন্ধটি পরে তিনি চৈতন্য লাইব্রেরীর অধিবেশনে পাঠ করলেনও। কিন্তু হায়! তার আগেই বেদনার্ত হৃদয়ে তাঁকে অপর আরেকটি অধিবেশনে আসতে হল 'বঙ্কিমচন্দ্র' প্রবন্ধটি পড়বার জন্য!

১৮৯৪ খৃঃ ৮ এপ্রিল (২৬ চৈত্র ১৩০০) বহুমূত্র রোগে বঙ্কিমচন্দ্র ইহলোক ত্যাগ করলেন।

সমগ্র বাংলাদেশে শোকের ছায়া নেমে এল। সাহিত্য-সম্রাটের তিরোভাবে দেশের সাহিত্য অনুরাগী ব্যক্তিমাত্রেই শোকে পড়লেন মূহ্যমান হয়ে। চৈতন্য লাইব্রেরীর কর্তৃপক্ষস্থানীয়দের বুকে এ বেদনার শেল খুব গভীরভাবেই বিঁধলো।

দাম্ভিক, স্বাতন্ত্র্য-অভিমানী, অভিজাতশ্রেষ্ঠ সাহিত্যসম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র চৈতন্য লাইব্রেরীর শিক্ষা ও সংস্কৃতি উন্নয়ন প্রচেষ্টার সঙ্গে নিজেকে যুক্ত করে লাইব্রেরীকে ধন্য করে গেছেন। এমনকি লাইব্রেরীর প্রতিযোগিতার জন্য আসা দীর্ঘ দীর্ঘ প্রবন্ধগুলি সযত্নে পরীক্ষা করতে এসে ('হিন্দু সমাজের বর্তমান অবস্থা') তাঁর অমূল্য সময় ব্যয় করেছিলেন হাসিমুখে।

বাংলাদেশের কোন প্রতিষ্ঠান এ সৌভাগ্য দাবী করতে পারে না।

অবিলম্বে চৈতন্য লাইব্রেরী কর্তৃপক্ষ এক মহতী শোক-সভার আয়োজন করলেন। এই উপলক্ষেই রবীন্দ্রনাথ তাঁর অতুলনীয় প্রবন্ধ 'বঙ্কিমচন্দ্র' রচনা করেন। সভার দিন স্থির হল ২৮ এপ্রিল ১৮৯৪ খৃঃ (১৬ই বৈশাখ ১৩০১), বঙ্কিমচন্দ্রের তিরোধানের কুড়িদিন পরে।

চৈতন্য লাইব্রেরী কর্তৃপক্ষ ও স্বয়ং রবীন্দ্রনাথের ইচ্ছা ছিল সে যুগের যশস্বী কবি নবীনচন্দ্র সেন মহাশয় এই শোকসভার সভাপতির আসন গ্রহণ করুন।

রবীন্দ্রনাথ নবীনচন্দ্র সেনকে এ বিষয়ে অনুরোধ জানিয়ে ব্যক্তিগত চিঠিও লিখেছিলেন।

অনতিবিলম্বেই দারুণ বিভ্রাট দেখা দিল। নবীনচন্দ্র সেন পত্র পাঠ রবীন্দ্রনাথের অনুরোধ অগ্রাহ্য তো করলেনই উপরন্তু ক্রুদ্ধ হয়ে উঠলেন অত্যন্ত।

এ যুগের পাঠকের কাছে সে যুগের পটভূমির কিঞ্চিত পরিচয় দেয়া আবশ্যক। সে যুগে কোন বিশিষ্ট ভারতীয়ের মৃত্যুতে শোকসভা আয়োজনের প্রথা ছিল না বললেই চলে। কদাচিৎ কখনও কখনও হয়েছে বটে কিন্তু সমাজের গোঁড়া ব্যক্তিরা (যাঁরা দলেও ভারী—সমাজে তাঁদের প্রভাবও যথেষ্ট) মোটেও তা মেনে নিতে পারেননি বরং অত্যন্ত অপ্রসন্ন ছিলেন এ ব্যাপারে।

ক্রুদ্ধ নবীনচন্দ্র সেন রবীন্দ্রনাথের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে যে বক্তব্য উপস্থাপিত করলেন, তা হল সে যুগের গোঁড়া সমাজ-পতিদের বক্তব্যেরই প্রতিধ্বনি।

তিনি বললেন, "সভা করিয়া কিরূপে শোক করা যায়, আমি হিন্দু, তাহা বুঝি না। সভা করিয়া শোক! অশ্রু রাখিবার জন্য কত গামলার বন্দোবস্ত হইয়াছে, একজনকে........জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম।

আশুতোষ চৌধুরীর চিঠি

OLD BALLYGUNGE.

25th August 1906

আমাদের শোক বড় নিভৃত ও পবিত্র। উহা সভা করিয়া একটা তামাসার জিনিস করা আমি মহাপাতক মনে করি। অবস্থা যেরূপ দাঁড়াইতেছে, বোধহয় আর কিছুদিন পরে পিতামাতার শ্রাদ্ধ করিতে হইলেও এক সভা হইবে এবং তাহাতে সর্ব্বাদি-সম্মতিক্রমে প্রস্তাব গৃহীত হইয়া উহা সংবাদপত্রে প্রেরিত হইবে।"

বঙ্কিমচন্দ্রের শেষ জীবনে রবীন্দ্রনাথ যে তাঁর সঙ্গে তিক্ত বাদানুবাদে প্রবৃত্ত হয়েছিলেন ও স্বয়ং বঙ্কিমচন্দ্র 'রবির ছায়া' প্রবন্ধে যেভাবে রবীন্দ্রনাথের সমালোচনা করেছিলেন—তার উল্লেখ করে নবীনচন্দ্র সেন একথাও বললেন যে বঙ্কিমচন্দ্রের উদ্দেশ্যে রবীন্দ্রনাথের শোকপ্রকাশ করার আদৌ কোন অধিকার আছে বলে তিনি মনে করেন না।

উপায়ান্তর না দেখে চৈতন্য লাইব্রেরী কর্তৃপক্ষ ও রবীন্দ্রনাথ স্যর গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়কে এই সভার সভাপতি হতে আহ্বান করলেন।

হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলার ও সে যুগের বাংলা সাহিত্যের একজন প্রধান পৃষ্ঠপোষক স্যর গুরুদাসও ছিলেন একজন গোঁড়া হিন্দু। কিন্তু তিনি বিন্দুমাত্র আপত্তি না জানিয়ে সানন্দে তাঁর সম্মতি জানালেন।

নির্দিষ্ট দিনে বিপুলসংখ্যক শ্রোতার সামনে রবীন্দ্রনাথ তাঁর ভাষণ শুরু করলেন। প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণে জানা যাচ্ছে যে সেই সভায় সর্বক্ষণ একটি পরম গাম্ভীর্য ও বেদনার ছায়া বিরাজ করছিল।

রবীন্দ্রনাথ বললেন, "অধিক দিনের কথা নহে; ইতিপূর্বেই যে সভায় আমি সাধারণের সমক্ষে প্রবন্ধ (ইংরাজ ও ভারতবাসী) পাঠ করিয়াছিলাম, বঙ্কিমচন্দ্র তাহার সভাপতি থাকিয়া আমাকে পরম সম্মানিত এবং উৎসাহিত করিয়াছিলেন। তখন কে কল্পনা করিয়াছিল তাহার অনতিকাল পরে পুনশ্চ এই সাধারণ সভায় দাঁড়াইয়া তাঁহার বিয়োগে বঙ্গসাহিত্য ও বঙ্গদেশের হইয়া আমাকে শোকপ্রকাশ করিতে হইবে। কে জানিত আমার সহিত তাঁহার সেই শেষ ঐহিক সম্বন্ধ।"

'বঙ্কিমচন্দ্র' শিরোনামে দীর্ঘ প্রবন্ধটি রবীন্দ্রনাথ বেদনার্ত কণ্ঠে পাঠ করলেন এর পর।

পরলোকগত কোন সাহিত্যিকের উদ্দেশ্যে এ ধরনের শোক-সভা বাংলাদেশে ইতিপূর্বে কখনও অনুষ্ঠিত হয়নি।

১৮৬২ খৃঃ 'হিন্দু পেট্রিয়টের' হরিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের স্মৃতির উদ্দেশ্যে একটি শোকসভার আয়োজন করা হয়েছিল। সে সভায় তাঁর সাংবাদিকতা ও সমাজ হিতৈষণার কথাই উল্লেখ করেছিলেন কয়েকজন বক্তা।

পরবর্তীকালে পুণ্যশ্লোক ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ের তিরোভাবে ১৮৯১ খৃঃ ছোট বড় কয়েকটি শোকসভার আয়োজন করা হয়। কিন্তু একথা জানলে আমরা নিতান্ত আশ্চর্য হব যে ঐ সভার কোনটিতেই বিদ্যাসাগর মহাশয়ের অকল্পনীয় সাহিত্য প্রতিভার বিন্দুমাত্রও আলোচনা হয়নি।

বিদ্যাসাগর মহাশয় যে কত বড় একজন সাহিত্যিক ছিলেন সে সম্বন্ধে কোন বক্তাই উচ্চবাচ্য করলেন না। সকলেই সেই সভাগুলিতে 'দয়ার সাগর বিদ্যাসাগর' ও 'সমাজ সংস্কারক বিদ্যাসাগর' এই দুই বিষয়ের আলোচনাতেই নিজেদের সীমাবদ্ধ রাখলেন। ফলে স্বাভাবিক কারণেই সেই সভাগুলির সুর আবেগের যে কত চড়া পর্দায় বাঁধা হল তা একটি উদাহরণেই পরিষ্কার হবে।

19 Store Road
Ballygunge
1 Jan 1907

সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের চিঠির অংশ

চৈতন্য লাইব্রেরীর পুরোনো একটি হ্যান্ডবিল

চৈতন্য লাইব্রেরি।

সভাপতি :—শ্রীযুক্ত রমেশ চন্দ্র দত্ত, সি-আই-ই।

বক্তা :—শ্রীযুক্ত রবীন্দ্র নাথ ঠাকুর।

বিষয় :—"স্বদেশী সমাজ"।

স্থান :—মিনার্ভা থিয়েটার।

সময় :—শুক্রবার, ২২ শে জুলাই, সন্ধ্যা ৭টা।

তিন খানি রৌপ্য-পদক পুরস্কার।—" আমাদের দেশীয় শিল্প, শ্রমজাত দ্রব্য ও বাণিজ্যের উন্নতির উপায় " এই বিষয়ে বাঙ্গালা প্রবন্ধ রচনা করিয়া, আগামী ৩০শে নভেম্বরের পূর্বে চৈতন্য লাইব্রেরির সম্পাদক, বীডন ষ্ট্রীট, এই ঠিকানায় পাঠাইবেন।

বিদ্যাসাগর মহাশয়ের স্মৃতির উদ্দেশ্যে নিবেদিত একটি শোকসভায় তৎকালীন বহু খ্যাতনামা বাঙালী ইংরেজী ভাষায় বিদ্যাসাগর মহাশয়ের দেবতুল্য চরিত্র ও দয়ার কথা সবিস্তারে আলোচনা করছিলেন। সে যুগের খ্যাতনামা বক্তা ও শিক্ষাব্রতী অন্যাবধন্য প্রতাপচন্দ্র মজুমদার মহাশয়ের যখন বলবার পালা এল, তখন তিনি বক্তৃতামঞ্চে উঠে উচ্চৈঃস্বরে কাঁদতে কাঁদতে বললেন, বাবা মারা গেলে সন্তানরা কি বিজাতীয় ভাষায় শোক করতে পারে? আজ আমাদের পিতৃশোক উপস্থিত। এই পিতৃশোকে ইংরেজীতে ভাষণ আমি দিতে পারব না। আমি বাংলাভাষাতেই বলব।

[প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য সে যুগে শিক্ষিত বাঙালী ইংরেজী ভাষায় বক্তৃতা ও আলোচনা করতেই অভ্যস্ত ছিলেন, পছন্দও করতেন তাই।

প্রতাপচন্দ্র মজুমদার মহাশয় ইংরেজী ভাষার একজন সুনিপুণ বক্তা ছিলেন।]

মহাকবি মাইকেলের স্মৃতিসভাও নম নম করেই শেষ করা হয়েছিল।

কাজেই এই সিদ্ধান্ত করা নেহাৎ অসঙ্গত হবে না যে, বঙ্কিমচন্দ্রের স্মৃতির উদ্দেশ্যে নিবেদিত উক্ত শোকসভাটিই পরলোকগত বাংলাদেশের একজন সাহিত্যিকের যথোচিত মর্যাদায়, তাঁর সাহিত্যকৃতির মূল্যায়ন প্রসঙ্গে, ও যথার্থ সাহিত্য পরিবেশে অনুষ্ঠিত সর্বপ্রথম শোকসভা।

এই শোকসভাটি উদ্‌যাপিত হবার কদিন পরেই নবীনচন্দ্র সেন ঐ সভাটির উদ্দেশ্যে তীব্র শ্লেষাত্মক মন্তব্য প্রকাশ করলেন।

তিনি বললেন—হরি, হরি, কি শোকসভাটিই না হল। রবীন্দ্রনাথ "বিনাইয়া বিনাইয়া" দীর্ঘ শোক শেষ করে, তাঁর সুন্দর সোনার চশমা খুলে গায়ের সিল্কের চাদরে চোখ মুছে যেই বসলেন অমনি চতুর্দিক থেকে রব উঠল "রবিঠাকুর, একটা গান কর। রবিঠাকুর, একটা গান কর।"

এমনকি স্যর গুরুদাসও শ্রোতাদের ওপর নিতান্ত বিরক্ত হয়ে ধমক দিয়ে বললেন, না, আজ রবিবাবুর শরীর ভাল নেই, উনি গান গাইতে পারবেন না।

এই কি শোকসভার নমুনা?

অথচ সে সময় অনেক তরুণ সুদর্শন রবীন্দ্রনাথকে দেখতে ও তাঁর "অশ্রুসিক্ত কণ্ঠে" গান শুনতে গিয়েছিল।

বঙ্কিমচন্দ্রকে শ্রদ্ধা জানাতে গিয়েছিল না তাই।

রবীন্দ্রনাথ নবীনচন্দ্র সেনের এই অভিযোগের কোন উত্তর দিলেন না বটে, কিন্তু শোকসভা সম্বন্ধে নবীনচন্দ্র সেন তথা গোঁড়া ব্যক্তিদের মতের প্রতিবাদে ১৩০১ সনের "সাধনার" জ্যৈষ্ঠ সংখ্যায় 'শোকসভা' নামে একটি প্রবন্ধ লিখলেন।

তিনি বললেন, "যেমন আমাদের দেশে পিতৃশ্রাদ্ধ প্রকাশ্য সভায় অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে এবং প্রত্যেক পিতৃহীন ব্যক্তির পিতৃশোক ব্যক্ত করা প্রকাশ্য কর্তব্যস্বরূপে গণ্য হয়, তেমনি পাবলিকের হিতৈষী কোন মহৎ ব্যক্তির মৃত্যুতে প্রকাশ্য সভায় শোক জ্ঞাপন একটা সামাজিক কর্তব্যের মধ্যে গণ্য হওয়া উচিত।

.........পাশ্চাত্য বলেই তা বর্জনীয় হতে পারে না।"

এই তর্কাতর্কির আড়ালে কিন্তু আসল সত্য চাপা থাকেনি।

সাহিত্যসম্রাটের মহাপ্রয়াণে দেশবাসীর অন্তরের অব্যক্ত বেদনাকেই আশ্চর্য সুন্দর রূপ দিলেন রবীন্দ্রনাথ।

শুধু তাই-ই নয়। বঙ্কিমচন্দ্রের সাহিত্য প্রতিভার পূর্ণস্বরূপ, যা এতকাল অনেকের কাছেই অজ্ঞাত ছিল—রবীন্দ্রনাথই ঐ প্রবন্ধে তা প্রথম উদ্ঘাটিত করলেন।

বঙ্কিমচন্দ্রের উদ্দেশ্যে "বঙ্গসাহিত্য ও বঙ্কিমচন্দ্র" এটাই ছিল শ্রেষ্ঠ অর্ঘ্য।

সংযোজন

পত্রপরিচয়—

"চৈতন্য লাইব্রেরী কার্যাধ্যক্ষ মহাশয়কে উদ্দেশ্য করে লেখা রবীন্দ্রনাথের এ চিঠিতে তারিখের উল্লেখ নেই। তবে স্পষ্টতই চিঠিটি ১৮৯০ খৃঃ লেখা, রবীন্দ্রনাথের বয়স তখন ২৯ বৎসর।

চৈতন্য লাইব্রেরী স্থাপিত হবার পরের বছর থেকেই অর্থাৎ ১৮৯০ খৃঃ "সর্বসাধারণের জন্য উন্মুক্ত প্রবন্ধ প্রতিযোগিতা" শুরু হয়।

লাইব্রেরী কর্তৃপক্ষ তাঁকে পরীক্ষক সমিতিতে থাকবার আমন্ত্রণ জানালে সে প্রস্তাবে সম্মত হয়ে রবীন্দ্রনাথ চিঠিখানি লিখেছেন।

প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য, ১৮৯১ খৃঃ "হার্বার্ট স্পেনসারের শিক্ষার বাংলায় অনুবাদ" বিষয়টিতে দাদা দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সঙ্গে তিনিও প্রতিযোগিতার আসা প্রবন্ধগুলি পরীক্ষা করেছিলেন বটে কিন্তু কোন প্রতিযোগীকেই পুরস্কারের উপযুক্ত বলে বিবেচনা করেননি।

রবীন্দ্রনাথের কাছ থেকে সর্বপ্রথম পুরস্কার লাভের কৃতিত্ব অনেক হারানচন্দ্র রক্ষিতের।

১৮৯৪ খৃঃ "বাঙ্গলা সাহিত্যে বঙ্কিমচন্দ্রের স্থান" বিষয়ে প্রবন্ধ প্রতিযোগিতায় বিচারক রবীন্দ্রনাথ হারানবাবুকে প্রথম পুরস্কার যোগ্য ঘোষণা করে কন্দোল মল্লিক স্বর্ণ পদক প্রদান করেন।

আমাদের নয় আমাদেরই ॥

রত্নেশ্বর হাজরা

কোনো কোনো দুঃসংবাদ আমাদের নয় তবু যেন আমাদেরই
আমরা না চাইলেও
'যোজক ডুবিয়ে জল—লোনা জল—আমাদের
ঝাউবনে মধ্যরাত্রি—যেসব রাত্রির
উঠোনে দাঁড়িয়ে থাকে ঘুম, আর
শ্মশানে যাবার পথ ভুল করে ফিরে আসে শববাহকেরা।

অনেক গানের মধ্যে কোনো কোনো গান
আমাদের জন্য গাওয়া নয়, তবু তার
সুর থেমে গেলে শব্দ : বিদায় বিদায়......
রুমাল নাড়িয়ে ছাড়ে ট্রেন। সাইকেল পিওন
—পারাপার হবার সাঁকোটি ভেঙে গেছে—
এরকম এক লাইন চিঠি
হাতে হাতে বিলি করে...দুঃসংবাদ...দুঃসংবাদ...কারো
নিরুদ্দেশ হবার খবর কিংবা জাহাজডুবির এস-ও-এস...
রোজ আমাদের নয় তবু কোনোদিন যেন আমাদেরই
অচেনা রাত্রির কাছে শেষ ট্রেন হঠাৎ দাঁড়িয়ে
একজন যাত্রীকে ফেলে কুয়াশার মধ্যে চলে যায়—।

প্রেম ॥

বিজয়কুমার দত্ত

মৃত নক্ষত্রের আলো—
যেতে যেতে, অনেক দূরের
জ্যোতিষ্ক ছড়ানো, শূন্য নীল-বীথিকায়
অন্ধতা-সঞ্চারী রাত্রি, আলোকিত করে।

কবে সে হাজার লক্ষ আলোকবর্ষের
দূরত্ব ছাড়িয়ে গিয়ে গ্রহানুপুঞ্জের
অতি দ্রুত অথবা মন্থর গতি আবর্তন শেষে
হঠাৎ কি থমকে যায়, পৃথিবীর মাঠ-নদী সাগর-পাহাড়ে?
মানুষের মুখ, আর ফুল পাখী অরণ্যশীর্ষের
সমবেত প্রতিঘাত থেকে—
সহজ, সমান্তরাল, ঋজু প্রতিফলনের সহজ নিয়মে
ফিরে যায়, সেই দীর্ঘযাযাবরী আলোকপথিক
নিজের ধ্বংসের উৎস, শেষবার দেখে নেবে বলে।

প্রিয়বরেষু ॥

অশ্রু রায়

ভাল আছি, ভালোই তো আছি;
তোমার কথা মতো বোলো বছর ধরে
রকম রকম সুখের ঘরে খুব ভালো আছি।
আর তুমি?
তোমার কি বিরল কেশ, শীর্ণ দেহ, ক্ষীণ দৃষ্টি?
অথবা মেদ-বহুল বিশাল বপু সন্ত্রস্ত সদাই
রক্তচাপ ভয়ে?
সেই কিশলয় মন?
সবটাই দিয়েছ কি বেচে দারা পুত্র পরিবারে?
নাকি আজও কিছু আছে বেঁচে
শিলীভূত বুকের তলায়?
শুধু এই কথা ছাড়া, আর সব জানিও খবর,
কেননা আমার, প্রচণ্ড সুখের চাপে
মন নামে বস্তুটাই কবে মরে গেছে।

পাবলো নেরুদা

ভবানী মুখোপাধ্যায়

প্রতি বছর সাহিত্যে নোবেল প্রাইজ কোন দেশের সাহিত্যিকের অদৃষ্টে পড়বে এ নিয়ে অনেক জল্পনা কল্পনা চলে। এই বছরও অনেকরকম নাম শোনা যায়, অস্ট্রেলিয়ার তরুণ উপন্যাস লেখক থেকে ইংল্যান্ডের গ্রেহাম গ্রীন পর্যন্ত। শেষ পর্যন্ত সব রকম জল্পনার অবসান ঘটেছে। সন্ধ্যার স্টকহোম থেকে ২১শে অক্টোবর তারিখে সংবাদ পাঠিয়েছেন যে, এবছর চিলির কম্যুনিস্ট কবি পাবলো নেরুদাকে নোবেল পুরস্কার দেওয়া হবে তাঁর কবিতার জন্য। সুইডিস একাডেমী বলেছেন—'নেরুদার কবিতার মধ্যে যে অন্তর্নিহিত শক্তি বর্তমান তার মধ্যে একটি মহাদেশের ভবিষ্যৎ ও স্বপ্ন রূপায়িত হয়েছে।' আর সেই কারণেই তিনি এইবার নির্বাচিত হলেন। পাবলো নেরুদা ছদ্মনামেই সুপরিচিত। তাঁর প্রকৃত নাম নেফতালি রিকার্ডো রেইস বাসুআল্তো।

বাংলাদেশের সাহিত্যিক সমাজে পাবলো নেরুদা একটি সুপরিচিত নাম। প্রায় দুই দশক ধরে তাঁর ছোট-খাটো রচনার বঙ্গানুবাদ সাময়িক পত্রিকাগুলিতে প্রকাশিত হয়েছে। পাবলো নেরুদার বর্তমান বয়স ৬৭ বছর এবং গত মার্চ মাস থেকে তিনি প্যারিসে চিলিয়ান রাষ্ট্রদূত। সুইডিস একাডেমির স্থায়ী সেক্রেটারি ডাঃ কার্ল রাগনার গীয়েরো নেরুদা সম্পর্কে বলেছেন— "The poet of violated human dignity" —

১৯৪৫ থেকেই নেরুদা চিলিয়ান কম্যুনিস্ট পার্টির সদস্য এবং [illegible] চিলিতে একদা কম্যুনিস্ট সেনেটর ছিলেন। কিউবার ফিডেল কাস্ত্রোর তিনি সমর্থক। মার্কসবাদী সালভাডর এলেনডি এখন চিলির প্রেসিডেন্ট, তিনি নেরুদার অন্তরঙ্গ বন্ধু। এই সংবাদ পেয়ে সান্তিয়াগো থেকে প্যারিসে গিয়ে তিনি নেরুদাকে অভিনন্দন জানিয়েছেন। আর নেরুদা সংবাদ শুনে বলেছেন—আমার পক্ষে প্রাইজ লাভ এক-রকম মিরাকল।

নেরুদা মার্কিণ পররাষ্ট্রনীতির তীব্র সমালোচক। ১৯৬৮ খৃষ্টাব্দে চিলিস্থ মার্কিণ এমব্যাসাডর আমেরিকান একাডেমি অব আর্টস অ্যান্ড লেটার্সের স্নাতক চিহ্ন নেরুদাকে উপহার দিতে গেলে তিনি তা প্রত্যাখ্যান করেন। নেরুদা বলেছিলেন—ভিয়েতনাম যুদ্ধে মার্কিণ নীতির জনাই তিনি এই সম্মান প্রত্যাখ্যান করলেন।

নেরুদার প্রথম প্রকাশিত কাব্যগ্রন্থের নাম 'ক্রেপুসে ক্যালারিও' বা 'প্রত্যাসন্ন ঝটিকা'। ১৯২৩-এ এই গ্রন্থটি প্রকাশের সঙ্গে স্পেনীয় ভাষার গীতিকবি হিসাবে নেরুদার প্রতিষ্ঠা হয়।

জীবনের সূচনায় তিনি সাংবাদিকের কাজ নিয়েছিলেন, পরে সিভিল সারভিস এবং তারপরে কূটনীতিকের কাজ নিয়ে ১৯২৬-এ ব্রহ্মদেশে চিলির কনসাল হিসাবে নিযুক্ত হলেন। এই ব্রহ্মদেশেই তাঁর বৃহত্তম সাহিত্য গ্রন্থ রচনার সূচনা। 'মাটির বাসা' বা 'রেসিডেন্স অন আর্থ' নামক গ্রন্থের প্রথম অংশ ব্রহ্মদেশেই রচিত। এই গ্রন্থটির মধ্যে সাধারণ মানুষের প্রতি লেখকের মমতা সুস্পষ্ট।

স্পেনের গৃহযুদ্ধকালে যেসব সাহিত্যিক সেখানে উপস্থিত হয়েছিলেন নেরুদা তাঁদের অন্যতম। ১৯৩৭-এ তাঁর 'স্পেন ইন মাই হার্ট' গ্রন্থটি প্রকাশিত হলে বিশেষ আলোড়ন সৃষ্টি হয়। ১৯৫০-এ 'ক্যানটো জেনারেল' ইংরাজীতে 'ইউনিভার্সেল সঙ' প্রকাশিত হয়।

নেরুদার জীবনে সম্মান লাভ এই প্রথম নয়। ১৯৫৩ খৃষ্টাব্দে তিনি পেয়েছেন স্তালিন পুরস্কার এবং ১৯৬৫ খৃষ্টাব্দে অকসফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় থেকে তাঁকে ডি-লিট উপাধিতে সম্মানিত করা হয়েছে।

নেরুদার রাজনৈতিক জীবন বিস্তারিত আলোচনার দাবী রাখে। এই দুঃসাহসী কবি অন্যায়ের প্রতিবাদে সদা সতর্ক। যেখানে অত্যাচার এবং অবিচার দেখেছেন, সেখানেই তাঁর বলিষ্ঠ কন্ঠের ধিক্কার ধ্বনি উচ্চারিত হয়েছে। পাস্তেরনাকের 'ডক্টর জিভাগো' উপন্যাসটি নোবেল পুরস্কারে সম্মানিত হওয়ার পর রাশিয়ায় যেভাবে পাস্তেরনাককে বিড়ম্বনা ভোগ করতে হয় তা সুবিদিত। এই সময় নেরুদা প্রতিবাদ জানিয়েছিলেন।

১৯৫৮ খৃষ্টাব্দে পাবলো নেরুদার 'এসট্রাভেগারিও' ১৯৬২-তে তাঁর 'প্লেনোস পোভারেস' প্রকাশিত হয়। তাঁর এই দুটি কাব্য গ্রন্থ থেকে দুটি কবিতার বঙ্গানুবাদ এলেস্টেয়ার রীড়-কৃত ইংরাজী অনুবাদ থেকে করে দিলাম। এই দুটি গ্রন্থ নেরুদার নিজের কাছে প্রিয়। এই কাব্যগ্রন্থ দুটির মধ্যে নেরুদার লাতিন আমেরিকান সমালোচকদের মতে তাঁর "Atumnal manner" বা শারদীয় মনোভংগী বর্তমান।

শোকের প্রীতি (২)

হে শোক
তোমাকে আমি চাই
আর চাই তোমার কালো ডানা।
পাখির সুরে এতো মধু
এতো রোদ
উঠোনভরা হাসিমাখা এই আলোকণা
আলোয় আলোয় ভরা চারদিক
যেন মহাশূন্যে গুঞ্জমান ভ্রমর।
তবে তাই হোক
আমাকে দাও তোমার কালো ডানা,
হে ভগিনী শোক!
আমি মাঝে মাঝে চাই
নিভে যাক বৈদুর্যের জ্যোতি
ঝরে পড়ুক তির্যক বৃষ্টিধারা
ওরা যেন মাটির বুকে চাপা কান্না।
মনে মনে আকাঙ্ক্ষা আমার
সাগর-সঙ্গমে দেখি চুরমার
জাহাজের খোল।
অন্ধকারে ঢাকা বিরাট বাড়িখানা,

তেল-ভর দীপ জ্বালে আমার জননী
আলোকের জন্ম নাহি হয়
বিনা দীর্ঘশ্বাসে।

রাত্রির জন্ম হচ্ছে না।

সরে পরে দিন
চলেছে ওর নিজস্ব কবরে
আর এই বৃষ্টি ও ছায়ার অন্তরালে
জানলায় বসে থাকা।
জানলায় বসে
পুরাতন স্মৃতি মনে আসে
যার অস্তিত্ব নেই,
যা ঘটছে না এ স্মৃতি তার।
হয়ত বুকের ওপর নেমে আসত জলতায়
কালো ডানা মেলে
সব আজ বিস্মৃতির কোলে,
বাতায়নে দেখি চোখ মেলে।।

এখন কোথা সেই কালো রাত
কোথা নিরুদ্দেশ।

তোমার মৃদু রক্ত আমাকে দাও
শীতল
বৃষ্টির জল,
দাও আমাকে তোমার নিদারুণ বিস্তার
ফিরিয়ে দাও আমার হাতে সেই চাবী
ধ্বংসপ্রায় বন্ধ দরোজার চাবী।

একটি মুহূর্তের জন্য
ক্ষণস্থায়ী জীবনের জন্য
আমার আলো নিয়ে যাও
আমাকে ছাড়ো,
অনুভব করতে দাও আমার দুর্গতি,
আমার বিচ্ছিন্নতা।
গোধূলির জালে কম্পমান
আমার সত্তায় নেব
বৃষ্টির বেপথু
দুটি হাত।।

দুই

গ্রহ

জলের পাথর আছে
চাঁদের ভিতরে?
আছে নাকি সোনাভরা জল
শরতের রঙটি কেমন?
দিনগুলি বিজড়িত নাকি
মত্তকাল ভেঙে নাহি পড়ে
রমনীর চূর্ণালক সম?

পৃথিবী থেকে কতটুকু
ঝরে পড়ে চাঁদে
কাগজ, মদ, হাত, মৃতদেহ?
জলে যারা ডুবে যায়
তারা কি সব ওখানেই থাকে?

সাহিত্য সংস্কৃতি : শারদ সংকলন

চিত্রাঙ্গদা—সম্পাদক : অজিতমোহন গুপ্ত। ৭২।১, কলেজস্ট্রীট কলকাতা—১২। পাঁচ টাকা।

প্রথম দর্শনেই পাঠকদের সানুরাগ দৃষ্টি আকর্ষণ করে। রচনা-বৈচিত্র্যের বিদগ্ধতায় মুদ্রণ-শোভনতার পরিচ্ছন্নতায় ও বিন্যাসের রুচিসুন্দর কুশলতায় 'চিত্রাঙ্গদা' শারদ-সংকলনের উল্লেখযোগ্য নিদর্শন। কবিতা লিখেছেন—পরমানন্দ সরস্বতী, হীরেন্দ্র-নারায়ণ মুখোপাধ্যায়, জগদীশ ভট্টাচার্য, গোপাল ভৌমিক, শান্তশীল দাশ, হেনা হালদার প্রমুখ। গল্প লিখেছেন—প্রতিশ্রুতি-বান তরুণ লেখকরা। 'বাংলাদেশ' নিয়ে অনেকগুলো ভালো প্রবন্ধ আছে—লিখেছেন : এম হোসেন আলী, সুনীলকুমার বন্দ্যো-পাধ্যায়, হাসান মুরশিদ, গাজীউল হক, জেবুন নাহার আইভি, জলি জাহানুর, কস্তুরচাঁদ লালওয়ানী, বাদল রশীদ, যতীন দাশ প্রমুখ। নীরোদ রায়ের 'রূপান্তরিত ফটোগ্রাফ' নরেশচন্দ্র ঘোষের 'দেশবন্ধু ও নজরুল' তথ্যসমৃদ্ধ রচনা। ছায়াচিত্র বিভাগে সেবাব্রত গুপ্ত, সন্ধ্যা (রায়) মজুমদার, বিশ্বজিৎ চট্টোপাধ্যায়, শুভেন্দু চট্টোপাধ্যায় প্রমুখের লেখাগুলি চিত্ররসিকদের খুশী করবে। সুকীর্তি রায়চৌধুরীর ও বীনা মিত্রের প্রবন্ধ দুটি এবং নীরদ ভট্টাচার্যের ব্যঙ্গচিত্রও উল্লেখ্য হবার মতো।

কালি ও কলম [শারদীয়া]—সম্পাদক : শচীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়। ১৫ বঙ্কিম চাটুজ্জে স্ট্রীট, কলকাতা ১২। দাম : তিন টাকা।

রম্যরচনার পাঠকদের কাছে পত্রিকাটি পাঠযোগ্য মনে হবে না, কিন্তু সিরিয়াস পাঠকদের কাছে সংগ্রহযোগ্য একটি মূল্য-বান সংকলন বলে মনে হবে। প্রতিটি প্রবন্ধই চিন্তার খোরাক জোগায়। লেখক-দের মধ্যে আছেন সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, বিনয় ঘোষ, শঙ্খ ঘোষ, আশিস সান্যাল, অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়, সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ, দিব্যেন্দু পালিত, বরেন গঙ্গোপাধ্যায় এবং অনেকে। উল্লেখযোগ্য কয়েকটি কবিতা লিখেছেন বিষ্ণু দে, মণীন্দ্র রায়, সতীকান্ত গুহ, রত্নেশ্বর হাজরা, গণেশ বসু ও চন্দন সেন। বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের একটি বিস্মৃতপ্রায় গল্পের পুনর্মুদ্রণ ও 'মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় : আমার স্মৃতিতে' শীর্ষক গৌরচন্দ্র চক্রবর্তীর একটি রচনা এ সংখ্যার মর্যাদা বাড়িয়েছে।

উদয়ন [শারদীয়া]—সম্পাদক : মনোতোষ কর মজুমদার। বেঙ্গলী লজ (আপার ফ্লোর), সাদপুরা চক, মজঃফরপুর, বিহার।

বাংলাদেশের বাইরে থেকে পত্রিকাটি প্রকাশিত। প্রবাসী বাঙালীদের রচনায় সমৃদ্ধ। লিখেছেন সুভাষচন্দ্র সরকার পার্থপ্রতিম দাশগুপ্ত, উৎপল দাশ, অনুপ চট্টোপাধ্যায়, ধীরেন সেন, কল্যাণী মজুমদার রণজিৎ রায়, দিলীপ ঘোষ, উমা বন্দ্যো-পাধ্যায় এবং আরো অনেকে। এ সংখ্যায় সম্পাদকীয়টি সুচিন্তিত। উদ্যোক্তাদের আন্তরিকতার স্পর্শে প্রতিটি রচনাই পাঠযোগ্য।

শুকসারী—সম্পাদক : মিহির আচার্য। ১৭২।৩৫ আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু রোড, কলকাতা : ১৪। দু'টাকা।

বাংলা-সাহিত্যে ছোট গল্প নিয়ে নানান পরীক্ষা-নিরীক্ষার আন্তরিক আয়োজনে 'শুকসারী'র প্রশংসনীয় এবং বলিষ্ঠ ভূমিকা গ্রহণ, বাজার চলতি আরো পাঁচটা পাঁচ-মিশেলী সাহিত্য পত্রিকা থেকে 'শুক-সারী'কে পৃথক করেছে। শারদ-সংখ্যায় 'শুকসারী' আঠারোজন উদীয়-মান তরুণ লেখকের নানান ধরণের ধাঁচে লেখা আঠারোটি গল্প আছে। লিখে-ছেন : মিহির আচার্য, উৎপল গুহ, অজিত মুখোপাধ্যায়, চিত্ত ঘোষাল, সমরেশ দাশ-গুপ্ত, হিমাংশু রায়, সুনীল দাস, বিভূতি পট্টনায়ক, রবীন্দ্র গুহ, মানবেন্দ্র পাল, মীরা দেবী, আশিস সেনগুপ্ত সাগর চক্রবর্তী, অমিতাভ দাস, রত্নেশ্বর বর্মণ, রেবন্তকুমার

আরব জগতের সংহতি

দিলীপ মালাকার

আরব জগতে সংহতির প্রশ্ন বড় আকারে দেখা দেয় আজ থেকে পঁচিশ বছর আগে যখন ইজ্রায়েল রাষ্ট্র গড়ে উঠল মধ্য প্রাচ্যে। আরব জগতে কোনো দিন সত্যিকারের সংহতি ছিল না বলেই সেই দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্রগুলো বিশেষ করে ইঙ্গ-মার্কিণ শক্তি ইজ্রায়েলকে প্রতিষ্ঠা করতে সব রকমের ইন্ধন যোগায়।

গত বিশ বছরে আরব জগতে বহু বিপ্লব, বিদ্রোহ ও সামরিক অভ্যুত্থান ঘটেছে। এবং সব কটাই কিন্তু ইজ্রায়েলকে নিয়ে। ইজ্রায়েলের সঙ্গে যতবার যুদ্ধ হয়েছে তার আগে ও পরে বহু প্রচেষ্টা চালান হয়েছে আরব রাষ্ট্রগুলোর মধ্যে সংহতি প্রতিষ্ঠা করতে। আরব রাষ্ট্রগুলোর মধ্যে সংহতির প্রেরণা ও প্রয়োজনীয়তা বোঝেন ও সবাইকে বোঝাবার চেষ্টা করেন মিশরের রাষ্ট্রপতি স্বর্গীয় আবদাল গামাল নাশের। তাঁর প্রচেষ্টায়ই প্রথম প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল সিরিয়া-মিশর রাষ্ট্রিক সংহতি ঠিক সুয়েজ আক্রমণের পর ১৯৫৬ সালে। কিন্তু সেই রাষ্ট্রিক সংহতি ভেঙে যায় ১৯৫৮ সালে। এমনি অনেকবার আরব ফেডারেশন হয়েছে ও ভেঙেছে।

সর্বশেষ আরব ফেডারেশন সংগঠিত হল ২রা সেপ্টেম্বর '৭১-এ। এই ফেডারেশনের তিন শরিক মিশর লিবিয়া ও সিরিয়া। এই তিন রাষ্ট্রের মধ্যে দূরত্ব কয়েক হাজার মাইল। এদের মধ্যে পার্থক্যও রয়েছে যথেষ্ট। ভাষা এক বটে কিন্তু মানুষের চেহারা, আচার ব্যবহার, কথা ভাষার মধ্যেও অনেক পার্থক্য। সিরিয়া হল এশিয়া ভূখণ্ডের একটি রাষ্ট্র, লিবিয়া ও মিশর আফ্রিকার।

সিরিয়ার লোকসংখ্যা ষাট লাখ। সামরিক সরকার। রাষ্ট্রপতি হচ্ছেন জেনারেল আশাদ।

মিশর-এর লোকসংখ্যা তিন কোটি ত্রিশ লাখ। সামরিক সরকার। রাষ্ট্রপতি আনোয়ার অল সাদাত।

লিবিয়ার লোক সংখ্যা উনিশ লাখ মাত্র। সামরিক সরকার। রাষ্ট্রপতি কর্নেল কাজ্জাফি।

নবগঠিত আরব ফেডারেশনের এই তিন রাষ্ট্রে রয়েছে সোভিয়েট ইউনিয়নের প্রভাব কিন্তু এদের সরকার কম্যুনিষ্ট নয়। বরং কম্যুনিষ্ট পার্টি বিরোধী। এরা বলে, এরা হল আরব সমাজতান্ত্রিক। এদের নিজেদের প্রয়োজনে আরব সমাজতন্ত্র চালু করেছে।

আরব দুনিয়াকে দু'ভাগে ভাগ করা হয়। 'মশরেব' ও 'মঘরেব' আরব। উত্তর আফ্রিকার আরব রাষ্ট্রগুলো মঘরেব-ই আরব। মধ্য-প্রাচ্যের আরব রাষ্ট্রগুলো হল মশরেব-ই আরব।

চোদ্দটি আরব রাষ্ট্রের মধ্যে দূরত্ব তিন হাজার মাইলের মতন। প্রায় কোনো রাষ্ট্রের সঙ্গে কোনো রাষ্ট্রের মিল নেই। জর্ডনের সঙ্গে বিরোধ সিরিয়ার। খাস জর্ডনে চলছে প্যালেস্টাইনের গেরিলা বাহিনী আলফাতার সঙ্গে সঙ্ঘর্ষ। আলফাতা বাহিনীর নেতৃত্ব করে ইয়াশর আরাফাৎ। ইনি এবং এর দল মিশরের নাশের পন্থী। একটু রুশ ঘেঁষা। এই দলকে মদত জোগায় সিরিয়া। তাই সিরিয়ার সঙ্গে জর্ডনের বিরোধ। জর্ডন প্রথমে ছিল বৃটিশ ঘেঁষা। এখন সে পুরোপুরি মার্কিন পন্থী। মার্কিন সরকার এখন জর্ডনকে অস্ত্র দিচ্ছে। সেই অস্ত্র ব্যবহৃত হচ্ছে সিরিয়া ও আলফতা গেরিলা বাহিনীর বিরুদ্ধে। যদিও এদের সবার শত্রু ছিল ইজ্রায়েল কিন্তু এখন জর্ডন ইজ্রায়েলের বিরুদ্ধে না লড়ে সিরিয়া ও আলফতা বাহিনীর বিরুদ্ধে লড়ছে।

এই সব কারণে ইজ্রায়েল এত ছোট রাষ্ট্র হয়েও বেশ টিঁকে আছে। আরব রাষ্ট্রগুলো নিজেদের মধ্যে সংহতির কথা ভুলে গিয়ে বরং পরোক্ষে ইজ্রায়েলকে প্রতিষ্ঠিত হবার সব রকমের সুযোগ ঘটিয়েছে।

আরব জগতে বিভেদের অনেকগুলো কারণের মধ্যে অর্থনৈতিক কারণ অন্যতম। পেট্রল নিয়ে ক্ষমতার লড়াই বাধিয়ে রেখেছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। ইরাক ও সৌদি আরবের পেট্রল কোম্পানী পরোক্ষে চালায় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও অন্যান্য পশ্চিমী রাষ্ট্র। তারা চায় না আরব জগতে ঐক্য আসুক। যেখানে মার্কিনদের প্রভাব নেই সেখানে রয়েছে রুশ প্রভাব। অর্থাৎ আরব জগতে দুই দলের অন্তরালে চলেছে মার্কিন-রুশদের ক্ষমতার লড়াই। আর হল পেট্রল নিয়ে অর্থনৈতিক রাজনীতির খেলা।

গত জুলাই মাসে দু' দুটো সামরিক অভ্যুত্থান ঘটে গেল আরব জগতে। এবং দুটোই আফ্রিকায়। প্রথমে ঘটল মরক্কোতে।

জুলাই-এর দ্বিতীয় সপ্তাহে মরক্কোর রাজা দ্বিতীয় হাসানের প্রাণনাশের প্রচেষ্টা হয়। এই সামরিক অভ্যুত্থান ব্যর্থ হয়। শোনা যায় লিবিয়ার বামপন্থী সরকারের হাত ছিল এই ব্যাপারে। মরক্কোর রাজতন্ত্র কায়েম রইল। দক্ষিণ পন্থী সেনাপতি উফকিরকে সব ক্ষমতা দিলেন রাজা হাসান। মরক্কোর সঙ্গে প্রতিবেশী রাষ্ট্র আলজেরিয়ার সম্পর্ক কোনো দিন ভাল ছিল না। সম্পর্ক ভাল নয় মিশরের সঙ্গে। প্রতিবেশী রাষ্ট্র আলজেরিয়া সমাজতান্ত্রিক। মরক্কোয় চলছে রাজতন্ত্র। রাজতন্ত্র বিরোধীরা গত জুলাই মাসে সামরিক অভ্যুত্থান চালিয়ে ব্যর্থ হয়। মরক্কোর বামপন্থীরা এখন নির্বাসন জীবন কাটাচ্ছিলেন হয় আলজেরিয়ায় নয়তো ফ্রান্সে।

জুলাই মাসের শেষে সুদানে ঘটল এক সপ্তাহে দুবার সামরিক অভ্যুত্থান। প্রথম

সুদানের রাষ্ট্রপতি জেনারেল নুমেরি

আলফতা নেতা আরাফাত

সিরিয়ার রাষ্ট্রপতি জেনারেল আসাদ

লিবিয়ার রাষ্ট্রপতি কর্নেল কাজ্জাফি

তিন মেজর আত্তা যে সামরিক অভ্যুত্থান ঘটালেন সেটা ছিল লিবিয়া প্রণোদিত কম্যুনিস্ট পন্থী। তার তিন দিন পরে জেনারেল নুমেরি পাল্টা সামরিক অভ্যুত্থান ঘটালেন। মেজর আত্তার দল হারল। তাদের বন্দী করা হল। দক্ষিণ পন্থী সরকার প্রতিষ্ঠিত হল। বহু কম্যুনিস্টদের জেলে পাঠান হল। লিবিয়া, সিরিয়া, মিশর ও আলজেরিয়ার সঙ্গে সম্পর্ক তিক্ত হল। এইভাবে আরব সংহতি বারে বারে ভাঙছে।

এক একটি আরব রাষ্ট্রে চলছে এক এক ধরনের সরকার। কোনোটি বা রাজতন্ত্র, কোনোটি বা সাধারণতন্ত্র। কোনটি সমাজতান্ত্রিক, কোনোটি পুঁজিবাদী। তাই এদের ঐক্য সংগঠিত হচ্ছে না। আগে তিনটি আরব রাষ্ট্রের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিয়েছি। এখন দিচ্ছি বাকি কয়েকটির।

তিউনিশিয়ার লোকসংখ্যা পঞ্চাশ লাখ। সাধারণতন্ত্র। বে-সামরিক সরকার। রাষ্ট্রপতি হাবিব বুরগিবা।

মরক্কোর লোক সংখ্যা দেড় কোটি। রাজতন্ত্র। রাষ্ট্রপ্রধান রাজা দ্বিতীয় হাসান।

ইরাক-এর লোক সংখ্যা পঁচানব্বই লাখ। সাধারণতন্ত্র। সামরিক শাসন। রাষ্ট্রপতি জেনেরাল আহমদ হাসান অল-বাকর।

জর্ডন-এর লোকসংখ্যা পঁয়ত্রিশ লাখ পঞ্চাশ হাজার। রাজতন্ত্র। রাষ্ট্রপ্রধান রাজা হুসেন।

আরব রাষ্ট্র ঘেরা ইজরায়েলের অস্তিত্ব প্রায় খুঁজেই পাওয়া দুষ্কর। সিরিয়া, ইরাক ও জর্ডনের যাযাবরদের একেবারে দোরের দিকে ক্ষুদ্র অথচ দুর্ধর্ষ ইজরায়েল শান্তির অনিশ্চিত।

লেবানন-এর লোক সংখ্যা ছাব্বিশ লাখ। সাধারণতন্ত্র। বে-সামরিক সরকার। রাষ্ট্রপতি হামিদ ফাঙ্গি।

সৌদি আরবের লোক সংখ্যা সত্তর লাখ। রাজতন্ত্র। রাষ্ট্রপ্রধান কিংস ফৈজল।

ইয়েমেন-এর লোক সংখ্যা পঞ্চান্ন লাখ। সাধারণতন্ত্র। রাষ্ট্রপতি শেখ আবদুল রহমান অল ইরিয়ানি।

দক্ষিণ-ইয়েমেনের লোকসংখ্যা তের লাখ পঞ্চাশ হাজার। রাজতন্ত্র। রাষ্ট্রপ্রধান সালয়েন অল-রুবিয়া।

কুয়ায়েৎ-এর লোক সংখ্যা পাঁচ লাখ পঞ্চাশ হাজার। রাজতন্ত্র। রাষ্ট্রপ্রধান হলেন আমীর আল-সালেম আল সাবা।

সুদানের লোকসংখ্যা দেড় কোটি। সাধারণতন্ত্র। সামরিক সরকার। রাষ্ট্রপতি জেনেরাল নুমেরি।

উত্তর-আফ্রিকা ও মধ্য প্রাচ্যে আমি কয়েকবার ভ্রমণ করেছি। এরা সবাই আরব। কিন্তু প্রত্যেকটা দেশের মধ্যে কত পার্থক্য না দেখলে বোঝা মুশকিল।

প্রথমতঃ নৃতাত্ত্বিক পার্থক্য প্রচুর। সিরিয়া, ইরাক, জর্ডন, লেবাননে গেলে মনে হবে লোকগুলো ইউরোপীয়ান। তাদের চেহারা ও পোশাক ইউরোপীয়ান। আদব-কায়দায়ও।

মিশর, সুদান, আলজেরিয়ায় পাঁচ-মিশালি জাত। কেউ সাদা, কেউ ঘন কালো, কেউবা আমাদের মতন। তাদের আচার ব্যবহারেও অনেক পার্থক্য। সম্ভবত এই সব কারণেই আরব জগতে সংহতি দানা বাঁধছে না।

তাছাড়া সবচেয়ে বড় কারণ হল বিদেশী রাষ্ট্রগুলোর প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ষড়যন্ত্র। তারা চায়না আরব জগতে সংহতি আসুক। অবশ্য এর জন্যে দায়ী আরব রাষ্ট্র-গুলো। তারা নিজেদের মধ্যে বিবাদ নিয়েই ব্যস্ত। নিজেদের মধ্যে লড়াই-এর দরুণ তাদের ঐশ্বর্য ব্যয় হচ্ছে। নিজেদের দেশের উন্নতির জন্য খুব বেশী নয়। যুদ্ধ খাতেই সব ব্যয় হচ্ছে। আরব জগতে সংহতি থাকলে তাদের এই অপচয় ঘটত না। ফলে তাদের আর্থিক উন্নতি হত। সব চেয়ে বড় প্রশ্ন—ইজ্রায়েল, যে সমস্যার সমাধান আজও হয় নি।

যখনই ইজ্রায়েলের সঙ্গে সংঘর্ষ হয় তখন আরব রাষ্ট্রগুলোর মধ্যে ঐক্য দেখা যায়। কিন্তু বিপদ কেটে গেলে সংঘাত থামলে আবার যে কে সেই।

১৯৬৬ সালের নভেম্বরে সিরিয়াতে দেখলাম সর্বত্র মিলিটারীর ছড়াছড়ি। তখন সিরিয়ার সঙ্গে ইরাকের মন কষাকষি চলছিল। কাশেম যখন ইরাকের রাষ্ট্রপ্রধান ছিলেন তখন সিরিয়া ও মিশরের সঙ্গে সদ্ভাব ছিল। কাশেমের হত্যাকাণ্ড ও সামরিক অভ্যুত্থানের পর থেকে ইরাকের সঙ্গে সিরিয়া ও মিশরের সদ্ভাব নেই। তাই ১৯৬৭ সালের ইজ্রায়েল-আরব যুদ্ধে ইরাক বিশেষ কোনো গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেনি। তেমনি মরক্কোর সঙ্গে মিশরের ও আলজেরিয়ার সম্পর্ক ভাল ছিল না বলে মরক্কো সামরিক সাহায্য পাঠায়নি। আরব সংহতির ব্যর্থতার প্রসঙ্গে প্রকট হয়ে দেখা দেয়।

১৯৬৭ সালের অক্টোবর মাসে আবার যখন সিরিয়া গেলাম তখন বহু সিরিয়ানের মুখে শুনেছি আরব জগতে সংহতির অভাবেই এই বিপর্যয় ঘটেছে।

আমি আলজেরিয়া সফরকালে প্রায়ই শুনতাম, মরক্কোর সঙ্গে আলজেরিয়ার বিরোধের কথা। ওদের বিরোধ এতই গভীর যে ১৯৬৬ সালে দুই দেশের সীমান্তে সামরিক সংঘর্ষ হয়। কোনো রকমে সে যুদ্ধ এড়িয়ে যায় দুই পক্ষ। আলজেরিয়া-মরক্কোর বিরোধ বহু কালের। এবং সে বিরোধ মেটার কোনো আশা আপাততঃ নেই। এখন আবার সুদানের সঙ্গে বিরোধ চলছে মিশর ও লিবিয়ার। এই কারণেই আরব জগতে সংহতি সুদূর পরাহত।

উপন্যাস

পূর্বপুরুষ

গজেন্দ্রকুমার মিত্র

কথারম্ভ

(লেখকের কথা)

॥১॥

বাংলা ১২৭০ সনে আমার জন্ম। আমার বাবার নাম ছিল নগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। হালিশহরের কাছে কোথায় আমাদের পৈতৃক দেশ ছিল তাহা আমরা জানি না। কখনও সেখানে যাওয়ার প্রয়োজন বা আয়োজনও হয় নাই। আমরা থাকিতাম সিঁথির কাছাকাছি—রাস্তাটার নাম আর করিব না—সেইখানেই আমার জন্ম হয়। শুধু আমি কেন, আমরা সব কটি ভাই-বোনই ওখানে জন্মিয়াছি। অবশ্য সেটা আমাদের নিজস্ব বাড়িই ছিল। পিতামহের কোন্ এক শিষ্য ভূতের ভয় নিবারণ করিতে না পারিয়া বাড়িটা গুরুকে প্রণামী দেন। সেই সূত্রেই নিজস্ব। ব্রাহ্মণের হাতে আসার পর নাকি ভূতের ভয় আর ছিল না। কে জানে,—পিতামহদেব ক্ষমা করিবেন—সে ভূতের উপদ্রবে তাঁহার কোন হাত ছিল কি না।

আমার বাবা জীবিকা হিসাবে কিছুই করিতেন না। দেশে কিছু জমি-জায়গা ছিল। সেও কখনও নিজে দেখিতে গিয়াছেন বলিয়া শুনি নাই। আগে তাঁহার ভগ্নিপতি ও ভাগিনেয়রা দেখাশুনা করিতেন। পরে একটু বড় হওয়ার পর দাদাই আনাযাওয়া করিতে লাগিলেন। তবে সেকালে এত ঠকানোর রেওয়াজ হয় নাই, অত অভাব ছিল না বলিয়াই বোধহয়, রক্তবীজের ঝাড়ের মতো এত মানুষও আমদানী হয় নাই— সুতরাং উপস্বত্ব যথানিয়মেই আসিত। তাছাড়া কিছু শিষ্য সেবকও ছিল। মোটের উপর সংসার একপ্রকারে চলিয়া যাইত। বাবার কোনদিন কিছু করার প্রয়োজন হয় নাই।

বাবাকে লোকে বলিত—দেবতুল্য ঋষি-তুল্য লোক। তা চেহারাটা সেই রকমই ছিল। দীর্ঘ দাড়ি। গৌরবর্ণ, সৌম্য কান্তি। প্রশান্ত মুখভাব,—কখনও পরগোত্রে আহার করিতেন না, বাজারের খাবার তো নয়ই, ত্রিসন্ধ্যা জপ আহ্নিক করিতেন। গোটা গীতা বইটা মুখস্থ ছিল। সম্ভবত এইসব কারণেই লোকে ঐ আখ্যা দিয়াছিল।

কিন্তু—পিতৃনিন্দা মহাপাপ। নিন্দা আমি করিব না—আমার কখনও স্বীয় পিতৃদেবকে দেবতুল্য বা ঋষিতুল্য বলিয়া মনে হয় নাই। আসলে তিনি ছিলেন, আমি যতদূর দেখিয়াছি, অত্যন্ত আরামপ্রিয় অলস লোক। অর্থের প্রতি আকর্ষণ কিছু-মাত্র কম ছিল না। তবে তাহার জন্য শ্রম করিতে নারাজ ছিলেন। পরগোত্রে খাইতেন না। সেজন্য মাকে উদয়অস্ত পরিশ্রম করিতে হইত। সন্তানাদি জন্মের সময় তাঁহার এক বৌদিকে দেশ হইতে আনানো হইত, কাজ মিটিয়া গেলেই পত্রপাঠ তিনি দেশে চলিয়া যাইতেন। অন্য সময় কোন বাধা উপস্থিত হইলে—আমার জ্ঞান হওয়ার পর যা দেখিয়াছি—দাদাই ডালভাত নামাইয়া লইতেন, আমার বাবার নিষ্ঠা ও ব্রাহ্মণত্ব বজায় থাকিত—তবে সেজন্য তিনি নিজে অঙ্গুলি হেলনের পরিশ্রমও করিতেন না।

বাবার খোরাকও বেশ ছিল। আহার্যের পরিমাণও যেমন, তেমনি বৈচিত্র্যের প্রতি লোভও। সকালের জলযোগ ব্যবস্থাই ছিল ছুরিভোজের মতো। সরবৎ, আদাছোলা, মাখন মিছরী, ছানা গুড়, সময়ের সব রকম ফল—শেষে দুই-একখানা লুচি বা নিমকি সন্দেশ। মধ্যাহ্নে আবার—ভাজা পোড়া সুক্ত ডাল ডালনা মাছ মিলাইয়া আট-দশ পদ থাকা প্রয়োজন হইত। সঙ্গে পায়স, দধি বা ক্ষীর। গৃহে নারায়ণ ছিলেন। সুতরাং পায়স তো হইতই, তবে নিত্য যে জিনিস হয় তাহাতে মন ভরিত না, দধি কি ক্ষীর আর একটা উপসংহার ব্যবস্থা না হইলে চলিত না। নহিলেই দুঃখভার করিয়া আকাশের দিকে তাকাইয়া আক্ষেপ করিতেন। 'এ লক্ষ্মীছাড়া খাওয়া আর কতকাল নারায়ণ খাওয়াইবেন কে জানে, কবে তাঁহার কাছে ডাক পড়িবে!' বিকালের দিকে সিংগাড়া নিমকি কচুরি রসগোল্লা পান্তুয়া এসব চাই। বলাবাহুল্য এগুলি মাকেই শিখিয়া লইতে হইয়াছিল, বাবা নাকি উপনয়নের পর আর ময়রার দোকানের খাবার খান নাই—কিন্তু আগেকার খাওয়ার স্বাদ ও লোভ দুইই রসনায় থাকিয়া গিয়াছিল। দধি তো বটেই, নিত্য সন্দেশ রসগোল্লা পান্তুয়া ঘরে তৈয়ারী করিতেন মা। সে জন্য ঘরে দুই তিনটি গাভী রাখিতে হইয়াছিল। তাহাদের দেখিবার জন্য একজন চাকর ছিল বটে—সময়ে মাকেও গাভীর পরিচর্যা করিতে হইত।

এইখানে একটি কথা বলিয়া রাখা ভাল, এই যে বিবিধ বৈচিত্র্যপূর্ণ রসনা-তৃপ্তিকর খাদ্যের আয়োজন—এ আমাদের সকলের জন্য করা সম্ভব হইত না। ক্রমে সংসার বাড়িয়াছে, ব্যয় বাড়িয়াছে—আয় আদৌ বাড়ে নাই। বরং শিষ্য সংখ্যা কমিতে শুরু করিয়াছিল। কারণ এই কলিকাতার আশপাশে যা দুই-চারি ঘর শিষ্য বাড়ি আছে, সেখানে ছাড়া বাবা কোথাও যাইতেন না। মফস্বলে তো নয়ই, এমন কি দেশের শিষ্যরাও,—যাহারা গরজ করিয়া এখানে আসিয়া দীক্ষা লইত তাহারাই পাইত, অন্যের মিলিত না। দেশে ভিন্ন গোত্রে খাওয়ার প্রশ্ন ছিল না। কারণ ভাজ-ভাই-পোরা ছিল। নিকট দশরাত্রির জ্ঞাতি, তবুও যাইতেন না। অজুহাত—ভগবানের নাম লইয়া ব্যবসায় এ নাকি তাঁহার ভাল লাগিত না (সংসারের সুখভোগ ভাল লাগিত!)। কোন কোন শিষ্য বিরক্ত হইয়া অনুমতি গ্রহণান্তর অন্য গুরু ধরিয়াছিলেন। সে তো লোকসান বটেই। উপরন্তু মধ্যে মধ্যে শিষ্যবাড়ি ঘুরিয়া আসিলে প্রণামী দক্ষিণান্তে বেশ কিছু আদায় হয়, সকলেই জানে সে কথা—গুরুর সেইটাই প্রধান

আয়। গুরু যদি সাতজন্মেও না যান তো শিষ্যদের এত কি গরজ নিজে হইতে প্রণামী পাঠাইবে?

যাহা বলিতেছিলাম—অত রকমের খাদ্য আমাদের ভাগ্যে বিশেষ জুটিত না, কদাচিত কখনও হয়ত এক আধটা ভাল খাবার সকলের জন্য হইত—নচেৎ শুধু বাবার মতোই প্রস্তুত হইত। যাহা খাইবার খাইতেন, বাকি অন্য সময় বা অন্যদিনের জন্য তাঁহার উদ্দেশ্যেই তোলা থাকিত। তিনিও অম্লানবদনে নিজেরই—বুভুক্ষু না হোক—লোলুপ সন্তানদের সামনে বসিয়া ধীরে সুস্থে তৃপ্তিপূর্বক ভোজন করিতেন। কিছুমাত্র তাঁহার সঙ্কোচবোধ হইত না। অত্যন্ত স্বার্থপর মানুষ ছাড়া এমন কেহ পারে না।

স্বার্থপর তিনি সর্বদিক দিয়াই। স্বার্থপর ও কামুক। মাকে দিবা-রাত্র অমানুষিক পরিশ্রম করিতে হইত। কোন পুষ্টিকর খাদ্য বা ঔষধ তো দূরের কথা, দুইবেলা দুইমুঠা ভাতই সময় মতো পেটে যাইত না। স্নানাহারের কোন নিয়ম ছিল না। দ্বিপ্রহরের খাওয়াটা সারিতেই কোন কোনদিন সন্ধ্যা গড়াইয়া আসিত, ফলে রাত্রে আর আহারের রুচি থাকিত না। ঘরের দুধ—তাও বাবার সুখাদ্য দধি ক্ষীর পায়স প্রভৃতি করিয়া আমাদের এক আধ পলা দিতেই শেষ হইয়া যাইত। মায়ের অদৃষ্টে কোনদিনই জুটিত না। ফলে মায়ের শরীর একেবারে ভাঙিয়া গিয়াছিল। অম্ল অজীর্ণ আমাশয় শেষ অবধি সূতিকায় দাঁড়াইয়াছিল। অনেক দিন ভুগিয়া ইদানীং অস্থিচর্ম সার হইয়া পড়িয়াছিলেন। তবু ছুটি মেলে নাই। না সংসারের কাজে বা হাঁড়িঠেলায়—না সন্তান উৎপাদনে। পিতৃদেবের সৃষ্টি স্পৃহা—নিজের বাবা বলিয়াই কাম শব্দটা বার বার ব্যবহার করিতেছি না—কিছুমাত্র হ্রাসপ্রাপ্ত হয় নাই। মায়ের সেই অর্ধ কেন তিন-চতুর্থাংশ মৃত দেহটাকেও সম্ভোগ করিতে বাধে নাই। ফলে আমার কনিষ্ঠ ভ্রাতা যখন জন্মগ্রহণ করে তখন, আমাদের বাড়ি যে ধাত্রী কাজ করিত সে, সোজা জবাব দিয়াছিল, 'ও মড়াকে আমি প্রসব করাইতে পারিব না। আপনারা অন্য লোক দেখুন।' বস্তুত—শেষ সন্তানটি তাঁহার এ পৃথিবীর প্রথম নিঃশ্বাস গ্রহণ করারও পূর্বে তাঁহার শেষ নিঃশ্বাস বহির্গত হইয়া যায়। ফেলা—আমার কোলের ভাই (যাহাকে আমি কোনদিন চোখে দেখিতে পাই নাই, এমনই কপাল!) নাকি সভাই মৃতার গর্ভ হইতে নিঃসৃত হইয়াছিল।

সুতরাং—এই পিতাকে যদি দেবতা বা ঋষি বলিয়া ভাবিতে না পারি—পাঠক-পাঠিকাগণ ক্ষমা করিবেন। ইহার জন্য যদি কোন পাপ হয়— সে পাপের জবাবদিহি আমার সৃষ্টিকর্তার কাছে করিতে পারিব—সে জন্য প্রস্তুত আছি।......

আমরা ছয় বোন, দুই ভাই। দাদা সর্বজ্যেষ্ঠ, ফেলা সর্বকনিষ্ঠ। আমার বোনদের মধ্যে আমি দ্বিতীয়া। কার্তিক মাসে জন্ম বলিয়া আমার জ্যাঠাইমা নাম রাখিয়াছিলেন হেমন্তবালা। বাবার নামটা তত পছন্দ হয় নাই, তার অন্য নাম চিন্তা করিতে গেলে অনেক পরিশ্রমে মনটাকে অযথা ব্যস্ত করিতে হয় বলিয়াই বোধ করি—তেমন বাধাও দেন নাই।

আমরা ভাইবোন সকলেই সুশ্রী ছিলাম। আমার বাবা তো রীতিমতো সুপুরুষ ছিলেনই। মায়ের চেহারাও যা দেখিয়াছি—মনে হয় বয়সকালে সুন্দরীই ছিলেন। সেইজন্যই আমাদের মধ্যে কেহই কুরূপ বা কুরূপা হই নাই। লোকে বলিত আমাদের ছয় বোনের ভিতর আবার আমিই সর্বাপেক্ষা সুন্দরী ছিলাম। লোকে বলিত কথাটার মধ্যে কোন অযথা বিনয় নাই। দশ বছর বয়সে বিবাহ হইয়া পরের ঘরে চলিয়া যাই, তখনও পর্যন্ত রূপ সম্বন্ধে কোন সচেতনতা আসে নাই। বাড়িতে একটা ভাল আর্শিও ছিল না যে এখনকার মেয়েদের মতো দিবারাত্র নিজের প্রতিবিম্বের দিকে তাকাইয়া থাকিব। সুতরাং অপরের চোখের উপর নির্ভর করিয়া থাকা ছাড়া উপায় কি বলুন?

পরবর্তীকালে অনেককেই আমার সম্বন্ধে উল্লেখ করিয়া আক্ষেপ করিয়া ছড়া কাটাইতে শুনিয়াছি—'অতিবড় রূপসী না পায় বর।' আরও পরবর্তীকালে আমার সম্বন্ধে পুরুষের উগ্র লোলুপতা দেখিয়াও কতকটা অনুমান হইয়াছে যে আমি দেখিতে ভালই ছিলাম। সত্য কথা বলিতে কি, বড় হইয়া—এমন কি স্বাধীন হইবার পরও—এতখানি বয়সেও নিজের দিকে ভাল করিয়া তাকাইবার অবসর হয় নাই। ইচ্ছাও না।

।। ২ ।।

আমার দিদিকে বাবা গৌরীদান করিয়াছিলেন। সৌভাগ্যক্রমে কৃষ্ণনগরে যে ঘরে তাহার বিবাহ হয়—সে সজ্জনের ঘর। অবস্থা তত ভাল ছিল না—দিদিকে ঐ বয়সেই গোয়াল কাড়া ও ধানভানার কাজ শুরু করিতে হইয়াছিল—তথাপি সর্বদিক দিয়া বিচার করিলে সে সুখেই ছিল বলিতে হইবে। তাও মায়ের মতো স্বল্পায়ু

পাইয়াছিল, পঞ্চাশ বছর বয়স হওয়ারও আগে তাহাকে ইহলীলা সম্বরণ করিতে হয়—তবু মোটামুটি তাহাকে সৌভাগ্যবতীই বলিব। সতীনের ঘর করিতে হয় নাই, মরার পরও স্বামী অন্য বিবাহ করেন নাই। ছেলেমেয়েগুলিও বেশ ভাল হইয়াছে—ইহার চেয়ে স্ত্রীলোকের সৌভাগ্যের কথা আর কি আছে?

আমার পাত্র খুঁজিতে কিছু দেরি হইয়াছিল, তাই গৌরীদান করা সম্ভব হয় নাই। খোঁজার কথাটা নিতান্তই সৌজন্যসূচক। বাবার দ্বারা কোনদিন কন্যার পাত্র অন্বেষণ করা যে হইয়া উঠিবে না ইহা তো জানা কথা। তিনি নিজের সাধন-ভজন (এবং ভোজনও) লইয়া থাকিতেন, এসব তুচ্ছ পারত্রিক কর্তব্য লইয়া মাথা ঘামাইবার সময় কোথায়? পাত্রপক্ষ অনেক সময় উপযাচক হইয়া প্রস্তাব উত্থাপন করিত। অর্থাৎ উভয়পক্ষের পরিচিত কোন লোকের দ্বারা সম্বন্ধের কথা পাড়িত—তখন বাবা দয়া করিয়া কথাবার্তা কহিতেন।

তবে কথাটা তিনি ভালই কহিতে পারিতেন। ঐ সৌম্য শান্ত চেহারা। ঐ বক্ষলম্বিত দাড়ির রাশি, গম্ভীর কণ্ঠস্বর—তিনি যখন বিবাহ বিষয়ে কথা বলিতেন, মনে হইত তিনি কন্যাদান করিয়া পাত্রপক্ষকেই কৃতার্থ করিতেছেন। পাত্রপক্ষ সমীহ করিয়া কথা বলিত, বেশী দাবীদাওয়া তুলিতে ভরসা পাইত না। কিন্তু ঐ পর্যন্তই। মা যতদিন জীবিত ছিলেন, তিনিই আত্মীয়-স্বজনদের পাত্রের জন্য তাগাদা করিতেন, আমার পরের বোনের বিবাহ পর্যন্ত তিনিই যোগাযোগ করাইয়াছিলেন, তাহার বেশী আর তাঁহাকে চেষ্টা করিতে হয় নাই।

সুতরাং কেহ খোঁজ-খবর করিয়া পাত্র বাছিয়া আমাদের কোন বোনেরই বিবাহ দেয় নাই। যাহার যা বিবাহ হইয়াছে—নিজেদের ভাগ্যমোতাবেক, নিতান্তই ভবিতব্য অনুসারে। তবে ভাগ্য আমার সম্বন্ধে যতটা অপ্রসন্ন ছিলেন এমন আর কোন ভগিনীর বেলাতেই নহে, এমন বিবাহ কাহারও হয় নাই।

সে কথা থাক। বড়র কথা কিছু বলিয়াছি, বাকি আরও চার বোনের কথা লিখিতে গেলে বাজীভোর হইয়া যাইবে। অত কথা আপনারা শুনিবেনই বা কেন? এমন লিখিবার মতো কিছু কাহিনীও নয়। সাধারণ ঘরে বিবাহ হইয়া সাধারণ জীবনযাত্রা যাপন করিয়াছে। এখন আর কেহ বাঁচিয়াও নাই। ভাইবোন কেহই না। আমিই শুধু মার্কণ্ডেয়র পরমায়ু লইয়া বাঁচিয়া আছি। ভাগ্য যে আমার কেমন—এই দীর্ঘকাল বাঁচিয়া থাকাও তাহার একটা প্রমাণ। যমেরও অরুচি আমি। ভগবানও আমাকে তাঁহার রাজ্যে লইয়া যাইতে চাহেন না।...

আমার বিবাহ হয় হুগলী জেলার একটা গ্রামে। গ্রামের নামটা আর না-ই বলিলাম, নামটা নাকি তত অজানাও নয়। কলিকাতা হইতে বেশী দূরে নয়, এখন তো যাতায়াতে খুবই সুবিধা হইয়াছে, শুনিয়াছি এক ঘণ্টার মধ্যেই পৌঁছানো যায়। আমার যখন বিবাহ হইয়াছিল তখনও ওদিকে রেললাইন বসে নাই, মেন লাইনের কী একটা স্টেশনে নামিয়া পাল্কি বা গোরুর গাড়িতে যাইতে হইত। তবে সেও এমন কোন যত্নসাধ্য বা আয়াসসাধ্য ব্যাপার ছিল না। আমার শ্বশুর মহাশয় শুনিয়াছি আগে আগে—যখন সুস্থ ছিলেন—সোজা হাঁটিয়া কলিকাতায় চলিয়া আসিতেন।

তবুও না বাবা না দাদা—কেহ কোনদিন ঐ গ্রামে গিয়া খবর লন নাই—যে বাড়িতে তাঁহারা কন্যাদান করিতেছেন বা যে ছেলেকে—সে বা তাহারা কেমন। দাদাকে তত দোষ দিই না, তখন তাহার মাত্র পনেরো বছর বয়স, বাবা তো মহাস্থবির—তবু, তিনি কোন লোক মারফৎও খবর লইতে পারিতেন। আসলে তেমন কোন আবশ্যকও বোধ করেন নাই। ব্রাহ্মণ ও ভাল ব্রাহ্মণ, যে ব্যক্তি প্রস্তাব আনিয়াছিল তাহার নিকট হইতে এই তথ্যটুকু অবগত হইয়াই বাবা পরম নিশ্চিন্ত হইয়াছিলেন।

আমার শ্বশুররা চট্টোপাধ্যায়, কাশ্যপ গোত্র। কিন্তু ব্রাহ্মণ বলিতে ঐ পদবী ও একগাছা করিয়া পৈতা ছাড়া আর কোন লক্ষণ ছিল না। আমার যখন বিবাহ হয় তখনই শ্বশুরে মৃতপ্রায়—এক কোণের ঘরে পড়িয়া থাকেন—শাশুড়িই গৃহের কর্ত্রী। আমার স্বামীরা সাত ভাই, ইনি তাহাদের মধ্যে পঞ্চম। বিবাহের সময় তাঁহার বয়স ষোল কি সতেরো হইবে, রোগে ও অস্বাস্থ্যে আরও ছোট দেখাইত। ভাল করিয়া গোঁফের রেখাও দেখা দেয় নাই।

সমস্ত পরিবারটিই বসিয়া খাইত। জমি জমার উপরই যাহা কিছু ভরসা। চাষী গৃহস্থও ঠিক নয়, চাষ সব ভাগেই হইত, নিজেরা মাঠে গিয়া কৃষাণকে দিয়া চাষ করাইতে পারিতেন না, তাহাতে নাকি ব্রাহ্মণত্ব চলিয়া যাইবে, উহা ভদ্রলোকের কাজ নয়। অথচ সংসারও বিরাট। বাবা মা, এক পিসীমা, ছয় ভাই, চার বৌ, তিন ভাইয়ের মোট ছয়টি ছেলেমেয়ে। এছাড়া আউতি-যাউতি যাহাকে বলে, সে তো ছিলই। দুই ননদেরই কাছাকাছি বিবাহ হইয়াছিল। তাহারা একুনে বছরে তিন-চার মাস করিয়া থাকিয়া যাইত, মায়েদের সহিত ছেলেমেয়েরা তো বটেই, বেশিরভাগ সময় ছেলেমেয়েদের জন্মদাতারাও। সবই যোগ, বিয়োগের মধ্যে এক ভাসুর ইতিমধ্যেই গত হইয়াছিলেন, সে বিধবা জাও বেশীদিন বাঁচেন নাই।

অবশ্য বসিয়া খাওয়া ছাড়া ইঁহাদের উপায়ও ছিল না বিশেষ। প্রথমত সকলেই মূর্খ, সামান্য বাংলা লেখাপড়ার বেশী কাহারও কোন শিক্ষা অগ্রসর হয় নাই, তাও পাঠশালায় কেহ পড়িয়াছেন বলিয়া মনে হয় না। জায়েদের মধ্যে আমারই—মায়ের কল্যাণে—অক্ষর পরিচয় ছিল (সেটাও আমার অন্যতম অ-গুণ)। দ্বিতীয়ত—আমি যখনকার কথা বলিতেছি তখন—ওখানে প্রচণ্ড ম্যালেরিয়া ছিল, সকলেই প্রায় বারোমাস জ্বরে ভুগিতেন। আমার শ্বশুর মুমূর্ষুর মতো ধুঁকিতেন—কিন্তু তাঁহার অত কিছু বয়স হয় নাই, আসলে ম্যালেরিয়াতেই তাঁহাকে অমন পঙ্গু করিয়া দিয়াছিল। কেবল আমার শাশুড়িই বেশ শক্ত ছিলেন। বোধকরি সেই জন্যই তাঁহার অত প্রতাপ। বাকি সকলেই তো মাসের মধ্যে কুড়িদিন আধমরা হইয়া থাকিতেন।

আমাদের ইনিও সেই দলে। ফুলশয্যার দিনই তাঁহার তিনখানা কাঁথার উপর শেষ পর্যন্ত আমাকেও চাপিয়া শুইয়া থাকিতে হইয়াছিল—এত শীত। তাহার পূর্বে এমন কাঁপুনি কখনও দেখি নাই। ম্যালেরিয়া জ্বর নাম শোনা ছিল এই পর্যন্ত, আমাদের পরিবারে কাহারও ছিল না। সে কাঁপুনির কাণ্ড দেখিয়া রীতিমতো ভয় পাইয়া গিয়াছিলাম। ভূতে পাইল কিনা মানুষটাকে—সন্দেহ হইয়াছিল।

বাড়িসুদ্ধ সকলেই অল্পবিস্তর ভুগিত কেবল আমি ছাড়া। ভগবান আমাকে এমনই স্বাস্থ্য দিয়াছিলেন যে কোন রোগ কোনদিন আমাকে কাবু করিতে পারে নাই। আর প্রধানত সেই জন্যই প্রথম হইতেই আমি শ্বশুর বাড়ির বিষ নজরে পড়িয়া গিয়াছিলাম। আমার শাশুড়ির ভাষায় 'নিকড়ে গতর' আমার একটা প্রধান অপরাধ হইয়া দাঁড়াইয়াছিল—আমার 'ডাইনীত্বের' অন্যতম প্রমাণ। সকলে ভোগে, গ্রামসুদ্ধই—আমার কিছু হয় না কেন? ইহার মধ্যে অলৌকিক কোন কাণ্ড-কারখানা না থাকিয়াই পারে না।

আমার মনে হয় আমার পূর্ববর্তী জায়েদেরও পর্যায়ক্রমে নির্যাতন সহিতে হইয়াছে, নূতন মানুষ আসামাত্র তাঁহারা একে একে নির্যাতিতর দল হইতে, ছেলেরা যাহাকে বলে 'প্রমোশন' পাইয়া নির্যাতনকারীর দলে উঠিয়া অব্যাহতি পাইয়াছেন। এবার আমার পালা। অথচ আমি আসাতে আমার জায়েদের সুবিধা হইয়াছিল ঢের। সকলেরই কোলে ছেলে—স্বাস্থ্যও কাহারও ভাল নয়—সেই অবস্থাতেই সংসারের কাজ বজায় দিতে হইত। অতবড় সংসারে কাজ বড় কম নয়। একটা 'জল-অচল' জাতের মেয়ে ছিল, সে দুইবেলা বাসন মাজিয়া বাহিরের রকে উপুড় করিয়া দিয়া যাইত শুধু। আর একটি আরও নিচু জাতের মেয়ে ভিতর-বাহিরের মেটে উঠান নিকাইয়া ছড়াঝাঁট দিয়া গোয়াল কাড়িয়া চলিয়া যাইত। বাড়ির মধ্যে যা কিছু কাজ, ঝাঁট দেওয়া, মোছা, মাটির ঘরগুলি নিকানো, ক্ষার কাচা, রান্নাঘরের পাট—সবই আমাদের করণীয় ছিল। মাজা বাসন একবার জল দিয়া ধুইয়া ঘরে তুলিতে হইত, কদাচিত তাহাতে কোন কালি বা উচ্ছিষ্টের আভাস দেখিলে আবার সবগুলি গোবরমাটি দিয়া মাজিয়া ধুইয়া—ঝিয়ের স্পর্শদোষ ঘটার জন্য—পুকুর হইতে স্নান করিয়া আসিতে হইত।...

এছাড়া ধানের পাট ছিল বিরাট। ধান সিদ্ধ করা, শুকানো, গরুর খড় কাটা—সবই আমাদের করিতে হইত। আগে নাকি ঢেঁকিতে পাড় দেওয়ার কাজটাও ছিল, আমার এক জায়ের গর্ভপাত হওয়ার পরে সেটা বন্ধ হইয়াছে, এক কিষেণের বৌ আসিয়া সে কাজটা করিয়া দিয়া যায়। কিন্তু হাঁড়ি হাঁড়ি ধান সিদ্ধ করা ও শুকানো—সেইটাই তো একটা মস্ত পর্ব ছিল। বিশেষ বর্ষাকালে। ঐ দ্যাখ দ্যাখ—বুঝি জল আসিল, ধান জড়ো করিয়া ধামায় তোল, দাওয়ায় তুলিয়া রাখ নয়তো ঢোকা চাপা দাও (জলের বেগ বুঝিয়া), আবার আকাশ একটু পরিষ্কার হইল তো, সেগুলি পুনরায় ছড়াইয়া দাও, নহিলেই চালে 'ভাদপচা' গন্ধ ছাড়িবে।

সেও এতটুকু দেরি হওয়ার জো ছিল না। অমনি শাশুড়ি ঠাকরুণের সুমধুর বাক্য বৃষ্টি হইতে থাকিত, 'চোখ-খাকীর দল কি রোদ বেরোলেও দেখতে পায় না? বলি, ফলনা চাটুয্যের সংসারে এসেছি বলে কি চোরের দায়ে ধরা পড়েছি যে, উদয়-অস্ত এই নায়দের সংসারে সব কাজ আমাকেই করতে হবে? বলি কুঁড়েপাস্তর গেলবার বেলায় তো সব ঠিক আছে। তখন দু'হাত ছেড়ে চার হাত বেরোবে, ধানগুলো না শুকোলে সে পিণ্ডির যোগাড়টা আসবে কোথা দিয়ে? তখন তো তাহলে এই শাশুড়িমাগীর হাতটা-পাটা কেটে সেদ্ধ করে খেতে হবে। নিজেরা গিলবি—সে যোগাড়েও আলিস্যি!'

এ সামান্য একটু নমুনা দিলাম। অপেক্ষাকৃত নির্দোষ নমুনা ধরিয়া লইতে পারেন। সামান্য তিন-চারটি শব্দেই কাজ হয়, নবৌমা কি নতুন বৌমা, 'ধানগুলো মেলে দিয়ে এসো।' কিন্তু সংক্ষেপে সরল ভাষা ব্যবহার করা আমার ঠাকুরাণীর ধাতেই ছিল না। খোঁচা না দিয়া বা নিজের ভাগ্যের সম্বন্ধে একটু বিলাপ না জুড়িয়া কোন কথাই তিনি বলিতে পারিতেন না।...

যাহা বলিতেছিলাম। আমি আসার পর আমার সুস্বাস্থ্যের অজুহাতে এই সমস্ত শ্রমসাধ্য কাজগুলিই আমার উপর চাপিয়াছিল। এক একদিন দিনেরাতে এক দণ্ডও অবসর মিলিত না। তথাপি জায়েরাও আমার উপর প্রসন্ন ছিলেন না। তাঁহাদের মতো যখন-তখন কোঁ-কোঁ করিয়া কাঁথা মুড়ি দিয়া শুইয়া পড়িতাম না, অথবা গোপনে কুপথ্য করিয়া ঘন ঘন বাগানে ছুটিতাম না—এটা তাঁহাদের বড় ঈর্ষার কারণ ছিল। আমি যে 'ডাইনী' বা 'পিশাচে পাওয়া' সে বিষয়ে তাঁহারাও আমার ঠাকুরাণীর সহিত একমত ছিলেন। এবং মা মনসাকে ধুনার ধোঁয়া যোগাইতে—অর্থাৎ আমার শাশুড়ির কাছে আমার নামে লাগানি ভাঙানি করিয়া লাগাইতে তাঁহাদের উৎসাহের অবধি ছিল না। তাহাতে একটু সুবিধা এই হইত যে, তখনকার মতো, শাশুড়ির সহিত, যে লাগাইত তাহার, গলায় গলায় ভাব হইয়া যাইত। সেই সময়টার জন্য অন্তত বাক্যবাণটা আমার উপর বর্ষিত হইত না।

জায়েদের আরও একটা সুবিধা, তাহাদের সকলেরই বাপের বাড়ি ছিল, অর্থাৎ বাপের বাড়ি হইতে খোঁজখবর করিত, মধ্যে মধ্যে লইয়া যাইত। আমার ওপাট ছিল না। সব থাকিতেও নাই। একটি তো দাদা, তিনি লেখাপড়া ছাড়িয়া দিয়া সেই বয়সেই কাজকর্ম দেখিতে শুরু করিয়াছেন, নহিলে সংসার চলে না। আমার বিবাহের সময়ই তাঁহাকে প্রথম বাহির হইতে হয়—কয়েকটি শিষ্যবাড়ি ঘুরিয়া কিছু টাকা সংগ্রহ করিয়াছিলেন। আমার বাবা নাকি এসব 'উঞ্ছবৃত্তি' বা 'ভিক্ষাবৃত্তি' পছন্দ করিতেন না—কিন্তু না করিলে এতবড় সংসারটা চলিবে কিসে, ক্রিয়াকলাপ পূজাপার্বন বিবাহ উপনয়ন এসবই বা উঠিবে কিসে—সে প্রশ্ন করিলেও কোন সদুত্তর দিতে পারিতেন না। অগত্যা, মায়ের কাতর বিলাপেই আরও, ঐ বয়সেই দাদাকে সংসার বুঝিয়া লইতে হইয়াছিল।

তা ছাড়াও বিবাহিত মেয়েদের যখন তখন বাপের বাড়ি আসা বাবা ভাল চোখে দেখিতেন না। বিবাহের পর আদৌ বাপের বাড়ি আসা উচিত নয়—এই ছিল তাঁহার অভিমত। কথায় কথায় তিনি সীতা, দ্রৌপদীর উদাহরণ দিতেন। রাজপুত রাজাদের কথা বলিতেন। সীতা, দ্রৌপদী এত কষ্ট পাইয়াছেন তবু বাপের বাড়ি যাওয়ার কথা কেহ চিন্তাও করেন নাই। রামায়ণ মহাভারত পড়িয়া দ্যাখো না, কোন কন্যা বিবাহের পর পিত্রালয়ে গিয়াছে খুঁজিয়া বাহির করো দিকি! এই যে রাজপুত রাজারা—সাত আট বছরের মেয়েরা শ্বশুর ঘর করিতে আসে, একেবারে মরিয়া বাহির হয়। ইত্যাদি—

তখন বাপমায়ের, বিশেষ বাবার মুখের উপর কথা বলার রীতি ছিল না। এখন হইলে প্রশ্ন করিতাম, 'আপনি যত উদাহরণ দেন সবই তো রাজারাজড়ার ঘরের, আপনি কি আপনার মেয়েদের সেই রকম বিবাহ দিয়াছেন? তবে সে দৃষ্টান্ত দেন কেন? কচি মেয়েদের কঠোর পরিশ্রম আর অসীম জ্বালাযন্ত্রণার মধ্যে পাঠাইয়া দিয়াছেন, মধ্যে মধ্যে দুই একটা দিন একটু স্বস্তির নিশ্বাস ফেলার অবসর দেওয়া আপনার কর্তব্য।'

তা নয়। এখন বুঝি—বাবা কোন ঝঞ্ঝাট পোহাইতে রাজী ছিলেন না। তিনি তো মেয়ে আনিতে যাইবেনই না, অপরকে অর্থাৎ ছেলেকে পাঠাইয়া আনিতে হইলেও জামাইকে নিমন্ত্রণ করিয়া আসা প্রয়োজন। সে যদি সত্যই আসিয়া হাজির হয়। বড় ঝামেলা নয় কি? খরচও তো বটে, এইসব কাজে বাজে খরচ হইলে তাঁহার চর্ব্যচোষ্য জোটে কোথা হইতে?

তবু আমার দাদা পরবর্তী কালে দুই একবার গিয়াছিলেন, কিন্তু আমার শাশুড়ি পাঠান নাই। কোন না কোন অজুহাত দেখাইয়া তখনকার মতো ফিরাইয়া দিয়াছেন। এমন কি মায়ের মৃত্যুর পরও আমার যাওয়া হইয়া ওঠে নাই। আমার দাদা নিজে আসিয়া দায় জানান নাই, এক অজি-ছুতো তাঁহাকে পাঠাইয়াছিলেন, এক লোক কর্তাদিকেই যা বাম—এই অপরাধে যথেষ্ট বাঁকা কথা শুনাইয়া ফেরৎ পাঠাইয়াছিলেন। এখান হইতেও কেহ নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতে যায় নাই। এমন কি যথারীতি নিমন্ত্রণ হয় নাই—এই ছুতায় লৌকিকতা করার দায়িত্বও এড়াইয়া গিয়াছেন। কেনমতে এখানেই নিয়ম রক্ষার মতো একটা চতুর্থী করাইয়াছিলেন, সেই বোধ করি আমার চৌদ্দপুরুষের ভাগ্য।

আসলে এই ডাইনীর নিকড়ে গতরে এমনই অভ্যস্ত হইয়া গিয়াছিলেন আমার শাশুড়ি যে, একবেলাও থাকিব না মনে করিলে চোখে অন্ধকার দেখিতেন।

॥৩॥

এইবার বোধ হয় আমার পতিদেবতার কথা কিছু বলা প্রয়োজন। কিন্তু কি বলিব? পতি পরম গুরু। আশৈশব মার মুখে শুনিয়াছি, কিন্তু সেভাবে কোনদিনই মানুষটাকে দেখিতে পারি নাই। সে জন্য যদি কিছু অন্যায় হইয়া থাকে, মা সতীরাণী আমাকে মার্জনা করিবেন।

প্রথমত আমার যা স্বাস্থ্য ও বাড়ন্ত গঠন ছিল—স্বামী স্ত্রী মোটেই মানায় নাই। আমার শাশুড়ি তো আমার আসল বয়স বিশ্বাসই করিতেন না—বলিতেন, 'বাপ মিনসে নাকি মুনি ঋষি, সত্যবাদী যুধিষ্ঠির শুনতে পাই!......একের নম্বরের মিথ্যেবাদী, গঙ্গাজলে যাক্‌গে! ঐ মেয়ের বয়েস দশ বছর! কেউ একগলা গঙ্গাজলে দাঁড়িয়ে বললেও বিশ্বাস করব না। বলি আমরা কি ভাব খাই, না ঘাসে মুখ দিয়ে চলি? ধানের চেলের ভাত খাই না আমরা, আমাদের চোখ নেই? দশ বছর ওর হাঁটুর বয়েস!'......তা তাঁকে বিশেষ দোষ দেওয়াও যায় না, আমার জায়েরা সকলেই ছিলেন ক্ষয়াঘষা কেনখুরি চেহারার মানুষ, তাঁহাদের বয়স বাড়িত না। আরও তাঁহাদের দেখিয়াই বয়স সম্বন্ধে শাশুড়ির ঐ রকম ধারণা হইয়াছিল।

সুতরাং আমার স্বামীকে আমার পাশে ছোট ভাইয়ের মতো মনে হইত। আমার নিজেরই কেমন সেই ধরণের একটা অনুভূতি হইত মধ্যে মধ্যে। কোনদিন তাঁহার সহিত রাগারাগি হইলে ঝগড়া করি নাই। বয়স্কা দিদির মতোই ধমক দিয়াছি—বেশ মনে পড়ে।

আমার স্বামীর নাম ছিল হরিচরণ। নামটা দেখুন বলিয়াই ফেলিলাম। মুখে তো বলিতেছি না। লিখিতে দোষ কি? এই এক জ্বালা, মুখে কোনদিন হরিনাম করিতে পারিলাম না। হরিবোল বলাও নিষেধ। ভুলিয়া যে এক আধ সময় শব্দটা উচ্চারণ করি নাই তাহা নয়—তবে সে কদাচ কখনও।

রোগা লিকলিকে, পেটটি ডাগর, হাত পা কাঠি কাঠি—হরিদ্রাভ চোখ, ম্যালেরিয়া-নিষ্পেষিত চেহারা। তেমন চালাকও ছিলেন না, পুরুষ মানুষের একটা লক্ষণও ছিল না তাতে। অথচ ঐ বয়সেই—লেখাপড়া তো দ্বিতীয় ভাগ এবং ইংরেজী বর্ণ পরিচয় পর্যন্ত দৌড়, তাও দ্বিতীয় ভাগটাও শেষ হয় নাই [illegible] হইয়া

উঠিয়াছিলেন। তামাক খাইয়া খাইয়া দাঁত হলদে হইয়া গিয়াছিল, এখন মনে হয় গোপনে গাঁজাও খাইতেন। তখন গন্ধটা চিনিতাম না। পরে বুঝিয়াছি। তবু ঠিক যে ঘৃণা করিয়াছি কখনও এমন নয়, একটু বরং অনুকম্পার চোখেই দেখিয়াছি বরাবর।

সুতরাং—যাহাকে স্বামী বলিয়া আদৌ ধারণা হয় নাই, তাহার সহিত স্বামীস্ত্রীর অন্তরঙ্গ সম্পর্ক স্থাপিত হইবে, পরস্পরের প্রতি নির্ভরশীলতা— ইহা সম্ভব নয়। মধুর দাম্পত্য প্রেমের কাহিনী বা বিবরণ ঐ বয়সেই যে একেবারে শুনি নাই তাহা নহে। পরবর্তী কালে তো অনেক শুনিয়াছি—কিন্তু আমার জীবনে সে অভিজ্ঞতা লাভ কখনও ঘটে নাই। তাছাড়া আমার মনে হয় আমার ভাবভঙ্গী, বলিষ্ঠ গঠন ও গায়ের জোর দেখিয়া, তিনি আমাকে একটু সমীহই করিতেন। স্ত্রী বা প্রেয়সী বলিয়া কখনও ভাবিতে পারেন নাই।...অথবা, অবিরাম 'ডাইনী' ও 'পিশাচ পাওয়া' অভিধা দুটো শুনিতে শুনিতে তিনিও কিছু ভয় পাইয়া থাকিবেন—কে বলিতে পারে!......

তবে চেহারা ও স্বাস্থ্য যেমনই হোক শুধু নেশা নয়। অন্যরকমেও বেশ পাকিয়াছিলেন। আমি ছাড়াও তাঁহার স্ত্রী সংসর্গ ঘটিয়াছে। বিবাহের আগে কি না বলিতে পারিব না। বিবাহের পরে তো বটেই। কথাবার্তার ফাঁকে, কখনও বা উত্তেজনার মুখে কথাটা প্রকাশ হইয়া পড়িয়াছে, উহারই মধ্যে এক-আধদিন যেটুকু রসের সম্পর্ক স্থাপিত হইয়াছে—সে সময়ও—তুলনামূলকভাবে। অভিজ্ঞতাটা প্রধানত হইয়াছিল যে দাসী আমাদের বাহিরের কাজ করিত তাহার কন্যাকে অবলম্বন করিয়া—এটা আমার কাছে তিনি স্বীকারই করিয়াছেন। তবে ঐখানেই যে সীমাবদ্ধ ছিল না, তাহাও জানি। হয়ত অমনিই কোন বর্ণেতর জাতির মেয়ের সর্বনাশ করিয়াছেন। বামুনের ছেলে দেখিলেই যাহারা ভয়ে আড়ষ্ট হইয়া যায়, সর্বতোভাবে ব্রাহ্মণের সেবা করা যাহারা পুণ্যকর্ম মনে করে—সেখানে তাহাদের কাছেই এই শ্রেণীর ইতর ঈপ্সা চরিতার্থ করা সুবিধা। তবে ঘরে ঘরেও যে কিছু হয় নাই—এমন কথা হলপ করিয়া বলিতে পারিব না।

আমার শ্বশুরবাড়ির আবহাওয়াটাই ছিল বড় কদর্য। মানুষ অমানুষ হইতে বাধ্য।

যাহা হউক—ঘি আর আগুন, কাছাকাছি থাকিলেই নিজ নিজ ধর্ম পালন করিবে ইহাতে আর আশ্চর্যের কি আছে? সমীহ করুন আর ঘৃণা করুন—যাহাই করুন না কেন, এক শয্যায় পাশাপাশি শুইয়া শরীরের ধর্ম পালন করিবেন না, ইহা সম্ভব নহে। বিশেষ যেখানে অভিজ্ঞতা লাভ হইয়াই গিয়াছে। স্বভাবের ধর্ম অভ্যাসে পরিণত হইয়াছে।......আমার আদৌ ভাল লাগে নাই। যাহাকে স্বামী তো নয়ই—পুরুষ বলিয়া ভাবিতেই বাধে, যাহার দেহ বা সংসর্গ সম্বন্ধে কোন প্রকার আকর্ষণ নাই। তাহাকে ঘৃণার যোগ্যও মনে হয় না—অনুকম্পার পাত্র মনে করি। যে স্বামী অন্য নারীতে গমন করে জানিয়াও ঈর্ষা বোধ করি না—তাহার কাছে স্ত্রী হিসাবে আত্মসমর্পণ করিতে ভাল লাগার কথাও নয়। তবে সে সময় ছিল অন্য রকম, স্বামীর লালসা বা কামনায় বাধা দেওয়া সম্ভব—প্রতিবাদ করা বা ঘর হইতে বাহির হইয়া আসা কি অন্য শয্যায় চলিয়া যাওয়া চলে—এ তখন বড়-একটা কোন মেয়ে ভাবিতেও পারিত না। আমিও পারি নাই। ইহাই আমার ভাগ্য, আমার নিয়তি—এ সহ্য করিতেই হইবে। এই ভাবেই সহ্য করিয়াছি। কখনও বাধাও দিই নাই বা এই লইয়া কলহ—কোঁদলও করি নাই। তবে আমার তরফ হইতে কোন উৎসাহ বা ঈপ্সাও প্রকাশ পায় নাই। পুতুলের মতোই পড়িয়া থাকিয়াছি।

তবু তেরো বছর বয়স অবধি আমার গর্ভে সন্তান আসে নাই। আমি তো সে তথ্যের মধ্যে অস্বাভাবিক কিছু দেখিতে পাই নাই কিন্তু আমার শাশুড়ি বিষম বিচলিত হইয়া উঠিলেন। ইতিমধ্যেই চারিদিকে মানত শুরু হইয়া গেল, বাবা তারকনাথের দোর ধরা হইল। মাদুলিও বেশ গুটিকতক হাতে-গলায় উঠিল—এবং আমার জায়েরা পরম তৃপ্তির সহিত শুনাইতে লাগিলেন, 'দেখো না মজা, বড়জায় আর কটা মাস দেখবে, তারপরই আমাদের দেওরের আর একটি বিয়ের জন্যে ঘটক লাগানো হবে।...এত ছেলেমেয়ে বাড়িতে তবু আমার শাশুড়ির হরিচরণের ছেলের জন্যে প্রাণ বেরিয়ে গেল একেবারে!'

আমি অবশ্য গোড়ার দিকে অত ভয় পাই নাই। বরং বলিয়াছি, 'ভালই তো, বাঁচা যায় তাহলে, আমি অব্যাহতি পাই!'

'উঃ। তা আর নয়!' জায়েরা মুখে 'পিচ' করিয়া একটা শব্দ করিয়া বলিতেন 'ভাবছ তোমাকে ছেড়ে দেবে? দিচ্ছে এই আর কি! বরং আরও ভাল করে সংসারটি ঘাড়ে চাপাবে। গাধার বোঝা চাপিয়ে দেবে। বলবে বাঁজাখাঁজা মানুষ খাটবে না তো কি!...এক, বাপের বাড়ির তেমন জোর থাকত, সেকথা আলাদা।'

এই আঘাতটাই মর্মান্তিক লাগিত। সত্যই তো, আমার বাপের বাড়ির জোর কোথায়? আমার স্বামীর পুনরায় বিবাহ হইতেছে জানিলেও কেহ লইয়া যাইবে না, উঁকিই মারিবে না তো লইয়া যাওয়া—এই সংসারে এমনিই উদয় অস্ত দাসীর মতো খাটিতেছি তখন হয়ত সোজাসুজি দাসীর খাতাতেই নাম উঠিবে। এখন ঘরে শুইতে পাই, তখন হয়ত গোয়ালে শোয়ার ব্যবস্থা হইবে।

কথাটা ভাবিলেই দুই চোখ জলে ভরিয়া আসিত। সতীন হইবে স্বামীর ভাগ দিতে হইবে বলিয়া নহে— সে তো এই বয়সে এমনিই দিতে হইয়াছে—নিজের অসহায় অবস্থা ভাবিয়াই আরও। বাবা আছেন দাদা আছেন—তবু কেহ একবার খবর লইতে আসেন না। সব থাকিতেও যে অনাথা, তাহাকে সকলেই দু পায়ে দলিয়া থাকে।...

যাহা হউক, সে দুর্গতি আর পোহাইতে হইল না! আমার তো বটেই—আর একটা ভদ্রলোক ব্রাহ্মণের মেয়ে যে আসিত—তাহার কথা ভাবিয়াই শিহরিয়া উঠি; আমার তখন চৌদ্দ বছর বয়সে একটি সন্তান কোলে আসিল। পুত্র সন্তান। তারকনাথের দোরধরা বলিয়া তারকনাথই নাম রাখা হইল।

এ অবস্থায়, অনেকেই ভাবিবেন যে, এবার আমার কিছু আদর বাড়িল। অন্তত পক্ষে নির্যাতনটা কিছু কমিল। হায়, হায়। আদর যাহার হইল তাহার হইল, আমি কে? আমি একটা যন্ত্র বইতো আর কিছু নয়। ছেলে আসিয়া গিয়াছে এখন বধু মারিলেই বা ক্ষতি কি? শাশুড়ি নিত্য ছড়া কাটাইতেন, 'বেঁচে থাক আমার মোহনবাঁশী কত শত মিলবে দাসী'। বরং—ছেলেকে উপলক্ষ্য করিয়া লাঞ্ছনা আরও বাড়িয়াই গেল।...সেই সব মুহূর্তে ছেলেটাকে যেন শত্রু মনে হইত।

আর পরিশ্রম?

এখনকার মেয়েদের দেখি একটা ছেলে বা মেয়ে হইলে—হিন্দুস্থানীদের দেখাদেখি বাচ্চা বলার চল হইয়াছে—পোয়াতী যেন রাতারাতি রাজরাণী বা আরও বেশী, দেবী

বাঁনয়া যায় তাহারা নড়িয়া ঘাস খায় না.. গুরুজনরা—বিশেষ স্বামীও—তাহাদের ত্রুটি ভাঁঙ্গয়া দুটি করিতে দেয় না। তখন এ ধরণের আদিখ্যেতা ছিলও না। মাকে দেখিয়াছি আঁতুড় উঠিয়া গেলে গঙ্গাস্নান করিয়া আসিয়াই হাঁড়ি হেঁসেল তুলিয়া লইতেন। শুধু মা কেন, আশপাশে অনেক দেখিয়াছি,• দেশে কলিকাতায়—ছেলে হইয়াছে বলিয়া সংসারের কাজ অচল হইবে, কিম্বা অন্য লোক আমদানী করিতে হইবে—একথা কেহ ভাবিতেও পারিত না। তাবড় তাবড় অবস্থাপন্ন ঘরের মেয়েদেরও দেখিয়াছি, ছেলের পায়ে কাপড় বাঁধিয়া রাখিয়া সংসারের কাজ করিতেছে। ছেলে মেয়েকে একটু দুধ খাওয়াইবারই সময় পায় না। তাহাতে ছেলেমেয়েরা মরিয়া যাইত না। কাঁদিলে মরে না, বরং দেহের বৃদ্ধি হয়। আমার তো কথাই নাই. ভারী ভারী এবং কষ্টসাধ্য যাবতীয় কাজ যেমন আমার ঘাড়ে চাপিয়া ছিল—তেমনিই রহিল।

তবে. এত দুঃখের মধ্যে ঐ একটা সান্ত্বনা মিলিয়াছিল—ঐ ছেলেটা। সহস্র কষ্ট লাঞ্ছনার মধ্যেও উহার দিকে চাহিলে যেন সব ভুলিয়া যাইতাম. কিছুক্ষণের জন্য এ পৃথিবীর সহিত কোন সম্পর্ক থাকিত না।

আর তখন হইতেই হিসাব করিতাম, ছেলে কতদিনে বড় হইয়া উঠিবে, আমার দুঃখ ঘুচাইবে।

এদিকে আমার ছেলেও যেমন একটু একটু করিয়া বাড়িতে লাগিল—আমাদের ইনি তেমনি যেন দিন দিন ছোট হইয়া যাইতে লাগিলেন। কোথা হইতে যেন নানান খারাপ রোগ আসিয়া চাপিয়া ধরিল। রোগ বলি কেন—রোগ তো সারিয়া যায়, আমার ভাসুররা তো জ্বর ও পেটের গোলমাল বেশ মানাইয়া লইয়া সহজভাবে ঘুরিয়া বেড়াইতেছেন, বরং মনে হয় তাঁহারা আগের চেয়ে সুস্থই হইয়া উঠিয়াছেন—আসলে লোকটাকে দুর্ভাগ্যই আসিয়া ধরিয়াছিল।

এমনিতেই তো ক্ষীণজীবী এতটুকু মানুষ, ছেলের বাপ হইবার পরেও ভাল করিয়া দাড়ি ওঠে নাই। তাহার উপর ক্রমে তখন যেন আরও কৃশ আরও খর্বকায় হইয়া গেলেন। জ্বর তো আছেই, আনুষঙ্গিক প্লীহা-যকৃতও—ইদানীং আবার গ্রহণী আসিয়া জুটিল। নিত্য আমাশয়—লাগিয়াই আছে। কত কি টোটকা ওষুধ খাওয়ানো ঝাড়ফুঁকও করা হইল। শেষে একজন প্রবীণ কবিরাজও ডাকা হইল—কিন্তু কিছুতেই সারার কোন লক্ষণ দেখা গেল না।

বলা বাহুল্য—ইহার পুরা দায়িত্বটাই আমার ঘাড়ে আসিয়া চাপিল। ভাসুররা তবু কিছু রাখিয়া ঢাকিয়া বলিতেন, 'তখনই বলেছিলুম হরেটা ঐ ল্যাকপেকে ছেলে. ওকে ঐ রকম বুকচাপ মেয়ের সঙ্গে শুতে দিও না—তা আমাদের কথা তো শুনবে না. সবই তুমি বেশী বোঝ বেশী জানো—এখন ভাল করেই বুঝবে।'

শাশুড়ি ও জায়েরা, একজন প্রকাশ্যে, বাকীরা একটু চোখের আড়ালে বলাবলি করিতে লাগিলেন, আমি 'ডাইনী'—স্বামীর রক্ত শুষিয়া খাইতেছি। জায়েরা সকলেই এই উপলক্ষ্যে শাশুড়ির 'সো' হইয়া গেলেন, 'আপনিই তো বরাবর বলেছেন মা যে, এ মেয়ে কখনও সাধারণ মানুষ নয়। এদেশে এসেও যার ম্যালেরিয়া হয় না, তাকে কোন অন্যি দেবতা রক্ষে করেন নিশ্চয়ই!...তা সব জেনে শুনে আপনি কেন এক ঘরে এক খাটে শোওয়ার ব্যবস্থা করলেন? গুর দোষ কি, যদি সত্যিই অন্যি দেবতায় ভর করে থাকে—তার তো একটা খোরাক চাই! পিশাচে ভর করলে শুনেছি নিত্যি একপো করে রক্ত খায় সে।...দুগ্গা দুগ্গা—আমাদের ছেলেগুলোর দিকে না নজর পড়ে। ...আপনার নতুন ছেলে আসলে ডাইনী-চোষা হয়ে যাচ্ছে, তা বুঝছেন না?'

শাশুড়ি অনেকদিনই বুঝিয়াছিলেন, আমার উপর অন্যত্র শোওয়ারও আদেশ হইয়াছিল, তারক তাহার কাছে থাকিবে, আমি ভাঁড়ার ঘরে বিছানা করিয়া রাত্রে শুইব—এই রূপেই হুকুম ছিল—কিন্তু বাধ সাধিয়াছিলেন তাহার পঞ্চম পুত্রই। তিনিই চেঁচামেচি করিয়া গালি-গালাজ করিয়া এ ব্যবস্থা রদ করাইয়াছিলেন। প্রতিবাদের প্রথম কারণটা লিখিতে লজ্জা হয়—স্ত্রীসঙ্গ তাঁহার একটা অভ্যাসে দাঁড়াইয়া গিয়াছিল। দ্বিতীয় কারণটা প্রত্যক্ষ—সেবাযত্ন। পেটের অসুখে ঘন ঘন বাহিরে যাইতে হইত, আমিই প্রদীপ লইয়া সংগে যাইতাম, হাত-পা সর্বদা কনকন করিত—মধ্যে মধ্যেই উঠিয়া টিপিয়া দিতে হইত। এ সব সেবা মা কি ভাজদের দ্বারা সম্ভব নয়।

তবু বেশীদিন তিনি ঠেকাইয়া রাখিতে পারিলেন না। আসলে, সত্য কথা বলিতে কি, আমারও আর ভাল লাগিতেছিল না। কী সুখের জন্য আমি অবিরাম বাড়িশুদ্ধ লোকের বাক্য যন্ত্রণা সহিব? শুধু বাক্যও নয়, তুচ্ছ ছুতা ধরিয়া ঠাকুরাণী ইদানীং মার-ধোরও শুরু করিয়াছিলেন, উপলক্ষ্য যাহাই হউক লক্ষ্যটা কোথায় তাহা কাহারও বুঝিতে বাকী থাকিত না। তাছাড়া, একই কথা শুনিতে শুনিতে আমারও কেমন একটু ভয় ধরিয়া গিয়াছিল। মনে হইত—কথাটার মধ্যে সত্যই কিছু সত্য নাই তো? সত্যই যদি এমন হয় যে আমার নজরেই উহার এই দশা হইতেছে, দিন দিন শুকাইয়া যাইতেছেন? সুতরাং আমিই কাঁদিয়া কাটিয়া স্বামীর হাতে পায়ে ধরিয়া মত করাইলাম। আমারই পরামর্শ মতো তিনি একটা শর্ত করিলেন, বৌ যদি অন্যত্র শোয় তাহা হইলে মাকে তাঁহার কাছে শুইতে হইবে।

সেই ব্যবস্থাই [illegible] কিন্তু তারকেরও সর্বনাশ ঠেকানো গেল না।

তারকের তিন বছর বয়সের সময় তাহার পিতামহ মারা গেলেন। তিনি যে এতকাল বাঁচিয়া ছিলেন—তাহাই যেন বাড়ি সুদ্ধ লোক ভুলিয়া গিয়াছিল। ও পাশের একটা ঘরে শয্যাশায়ী হইয়া পড়িয়া পড়িয়া চিঁচিঁ করিতেন, আমার সতীলক্ষ্মী শাশুড়ি কখনও উঁকি মারিয়াও দেখিতেন কিনা সন্দেহ। যে কয়টাও আমাকেই করিতে হইত। তবু, তাঁহার মৃত্যুও যে আমার জন্যই ত্বরান্বিত হইল—এমন কথাও বলিতে বাধিল না শাশুড়ি ঠাকুরুণের 'সর্বনেশে বৌ যেদিন বাড়ি ঢুকল সেইদিন থেকেই মানুষটা শয্যাধরা হয়ে পড়ল। তখনই বোঝা উচিত ছিল আমার, কী বৌ বরণ করে ঘরে তুললুম।...ঐ ভয়ে আমার গোপালের বের কথা মুখে উচ্চারণ করছি না, আবার কি করতে কি হবে, কোন রাক্ষুসী বাড়ি ঢুকবে তা কে জানে!... নইলে গোপালের বৌ দেখবেন ওঁর খুব সাধ ছেল!"

গোপাল আমাদের ইঁহার পরের ভাই। মাসীর কাছেই থাকে— নামে লেখাপড়া করে, আসল কথা মাসীর অবস্থা ভাল, একটা ছেলে যদি পরের উপর দিয়া মানুষ হয় তো মন্দ কি।

আমার শ্বশুরের মৃত্যুর পর হইতেই উনি যেন আরও কেমন দুর্বল হইয়া পড়িলেন, কেমন একটা মনমরা ভাবও। প্রায়ই বলিতে লাগিলেন, আমি আর বাঁচব না নতুন বৌ, আমার শেষ হয়ে এসেছে। কিছুই তো পেলি না. কোন সাধই তো মিটল না বলতে গেলে, তার ওপর এই বয়সেই মাছ-ভাত খাওয়াটাও তোর দেখছি বন্ধ হয়ে গেল! তা আমি বলি কি, পেলে লুকিয়ে চুরিয়ে খেয়ে নিস, পাপ হয় আমার হবে। সে কৈফেৎ আমি দিতে পারব চিত্রগুপ্তকে!'

আমিও বুঝিলাম বেশী দিন নয়। খুব বাল্যে একবার কোন এক প্রতিবেশীর অসুখের সময় মা একটা কথা বলিয়াছিলেন, আমি কখনও ভুলি নাই। এতদিনের জীবনে কথাটার সত্যতা বার বার মিলাইয়া দেখিয়াছি, মা বলিয়াছিলেন, 'ও আর বাঁচবে না। ওর নিজেরই যখন বাঁচবার আশা গেছে, ইচ্ছে গেছে ও কোন ডাক্তারে বাঁদ্যতেই কিছু করতে পারবে না। ওরা দুশ্যোচরণ ডাক্তারকে আনাচ্ছে, আনালে কি হবে, রুগীর বাঁচবার ইচ্ছেই নেই—কে বাঁচাবে! রোগ আট আনা সারে ওষুধে. আট আনা সারে রুগীর মনের জোরে!'

কথাটা যে আমার নিজের জীবনেই এমনভাবে খাটিবে কে জানিত। সত্যই যেন লোকটার বাঁচিবার আগ্রহ, রোগের সহিত যুদ্ধ করিবার ইচ্ছাই চলিয়া গেল। ফলে আমার শ্বশুর মহাশয়ের মৃত্যুর আট মাসের মধ্যেই উনিও চলিয়া গেলেন। তারকের তখন চার বছরও পুরা হয় নাই। মাত্র আঠারো [illegible] আমি বিধবা হইলাম।

(ক্রমশঃ)

আঠার শতকের কবি অকিঞ্চন চক্রবর্তী

প্রণব রায়

কবীন্দ্র অকিঞ্চনের 'গঙ্গামঙ্গলের' প্রথম পত্র (প্রথমাংশ)। গঙ্গামঙ্গলের প্রথমাংশের রচনাকাল ১১৮১ সাল

মঙ্গলকাব্যের শেষ যুগের উজ্জ্বলতম জ্যোতিষ্ক ভারতচন্দ্রের প্রতিভায় বাঙলা মঙ্গলকাব্য ঐশ্বর্যযুগের শ্রেষ্ঠ পর্যায়ে উপনীত হইলেও তাঁহার প্রতিভা বিকাশের বহু পূর্বে অকিঞ্চন চক্রবর্তীর কয়েকটি কাব্য বাঙলা সাহিত্যের ইতিহাসে উল্লেখ-যোগ্য বলিয়া মনে করা যাইতে পারে। কবি অকিঞ্চন মেদিনীপুর জেলার অন্তর্গত ঘাটাল মহকুমার বরদা পরগণার অধিবাসী ছিলেন। লেখক যে পুঁথিগুলি সম্প্রতি কবির বর্তমান বংশধরগণের (১) গৃহ হইতে সংগ্রহ করিয়াছেন, তাহাদের মধ্যে 'চন্ডী-মঙ্গল' ও 'গঙ্গামঙ্গল' পুঁথি দুইটি মঙ্গল-কাব্যের ইতিহাসে বিশিষ্ট স্থান লাভ করিবার যোগ্য। 'চন্ডীমঙ্গল' পুঁথিটির একটি সংক্ষিপ্ত আলোচনা সন ১৩৬০ সালে 'বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা'র (৬০ বর্ষ ১ম সংখ্যায় প্রকাশিত হইয়াছিল। (২) ইহার পরও বাঙলা সাহিত্যের ইতিহাসে মঙ্গলকাব্যের আলোচনা প্রসঙ্গে অকিঞ্চনের কাব্যবিষয়ে যৎকিঞ্চিৎ আলোচনা হইলেও কবিসংক্রান্ত প্রকৃত তথ্য উদ্‌ঘাটনের তেমন প্রয়াস দেখা যায় না। অকিঞ্চনের গঙ্গা-মঙ্গল পুঁথিটির আলোচনাও আজ পর্যন্ত কোন গ্রন্থে লক্ষ্য করা যায় না। বর্তমান লেখক বহু অনুসন্ধানের পর কবিরচিত যে পুঁথিগুলি ও অন্যান্য প্রাচীন নথীপত্র সংগ্রহ করিয়াছেন তাহাদের উপর ভিত্তি করিয়া কবিসংক্রান্ত প্রকৃত তথ্য উদ্‌ঘাটনের চেষ্টা করা যাইতেছে।

বাঙলা ১১৫৯ সালে ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গল কাব রচিত হইবার পর মঙ্গল কাব্যের গৌরবময় যুগের অবসান হয় বলিয়া অনেক সমালোচক মনে করিয়া থাকেন। কারণ ইহার পর বেশ কিছুকাল কোন উল্লেখযোগ্য সাহিত্য রচিত হয় নাই। যাহাও রচিত হইয়াছে তাহাও যুগ-প্রভাবের ফলে রাজেন্দ্রবদন্ত ও ভারত-চন্দ্রের অন্ধ অনুকরণমাত্র। পলাশীর যুদ্ধের পাঁচ বৎসর পূর্বে ভারতচন্দ্রের প্রতিভার ভাস্বরদ্যুতি বঙ্গসাহিত্য কালকে আলোকিত করিবার পর বাঙলাদেশে রাজনৈতিক ও সামাজিক জটিলাবস্থা প্রকৃত সাহিত্যরচনায় আদৌ অনুকূল ছিল না—এই কথা অংশতঃ স্বীকার করিয়া লইলেও মঙ্গলকাব্যের কোন উল্লেখযোগ্য রচনা এই যুগে পাওয়া যায় না তাহা সমর্থন করা যায় না। 'অন্নদা-মঙ্গলে'র প্রায় ২৪ বৎসর পরে রচিত অকিঞ্চন চক্রবর্তীর 'গঙ্গামঙ্গল' পুঁথিখানি পাঠ করিলে ভারতচন্দ্রের প্রভাবমুক্ত এক নবীন প্রতিভাকে স্বাগত জানাইতে হয়। অকিঞ্চনের এই কাব্যে মুকুন্দরাম ও রামেশ্বরের প্রভাব যতখানি পড়িয়াছে ভারতচন্দ্রের প্রভাব ততখানি পড়ে নাই। তাহার কারণ ভারতচন্দ্রের আবির্ভাবের অনেক আগেই তাঁহার প্রতিভার বিকাশ হইয়াছিল। যদিও তাঁহার শেষ রচনা 'গঙ্গা-মঙ্গল' ভারতচন্দ্রের অনেক পরে রচিত হইয়াছে। পরবর্তী আলোচনার সাহায্যে বুঝা যাইবে কবি অকিঞ্চন সুদীর্ঘকাল ধরিয়া সাহিত্যসাধনা করিয়াছিলেন। তাঁহার কাব্য সাহিত্যিক কৌলীন্যের মর্যাদা লাভ করিয়াছিল কিনা তাহা বিচার্য বিষয়। তবে তৎকালীন কাব্যরসপিপাসু পণ্ডিত ব্রাহ্মণ-গণ যে তাঁহাকে কবি স্বীকৃতি দিয়াছিলেন তাহার প্রমাণ পুঁথিগুলির মধ্যে লক্ষ্য করা যায়।

কবি অকিঞ্চনের যে পুঁথিগুলি বর্তমানে সংগ্রহ করা হইয়াছে তাহাদের মধ্যে গঙ্গামঙ্গলটি সম্পূর্ণ। কয়েকটি পত্র ছাড়া 'চন্ডীমঙ্গল' পুঁথি একপ্রকার সম্পূর্ণই বলা যায় এবং 'শীতলামঙ্গলে'র মাত্র কয়েকটি পত্র লেখকের হস্তগত হইয়াছে। ইহা ছাড়া কবিরচিত কয়েকটি ভক্তিমূলক পদও পুঁথির সহিত পাওয়া গিয়াছে। কবির বর্তমান বংশধরের গৃহ হইতে যে সব পুরাতন কাগজপত্র সংগৃহীত হইয়াছে তাহার মধ্যে কবির স্বনামাঙ্কিত একটি ক্ষুদ্র হিসাবতালিকা, কবির জ্যেষ্ঠ ও কনিষ্ঠ পুত্রের দুইটি পত্র, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অন্যান্য হিসাবতালিকা ও ফারসীভাষায় লিখিত কয়েকটি দলিল উল্লেখযোগ্য। এইগুলিতে উল্লিখিত সন ও তারিখ হইতে কবির সময় সম্পর্কে এক সঠিক ধারণা করা যায়।

অকিঞ্চনের 'গঙ্গামঙ্গল' পুঁথিটি অত্যন্ত ক্ষুদ্র। ইহাতে সর্বসাকুল্যে মাত্র উনিশটি পত্র আছে। পুঁথিটি মোট দুইটি অংশে বিভক্ত—একটিকে পূর্বাংশ ও অপর-টিকে উত্তরাংশ আখ্যা দেওয়া যাইতে পারে। পূর্বাংশটি দশটি পত্রের ও উত্তরাংশটি নয়টি পত্রের দুই পৃষ্ঠায় লিখিত এবং প্রতি অংশের রচনাকাল পৃথক। উনিশটি পত্রের কতগুলি দোভাঁজ ফুলট কাগজে লিখিত এবং অন্যগুলি একটি পত্রের দুই পৃষ্ঠায় লিখিত। হস্তাক্ষর পরিচ্ছন্ন ও সুন্দর। সম্ভবতঃ ইহা কবির স্বহস্ত লিখিত বলিয়া অনুমান করা যাইতে পারে। ইহাতে লিপিকরের কোন নাম ও তারিখের উল্লেখ নাই।

'চন্ডীমঙ্গল' পুঁথিটি সুবৃহৎ। ইহাতে আনুপূর্বিক পত্র সংখ্যার উল্লেখ

---

১ কবির ২য় পুত্র রামচাঁদের বর্তমান বংশধর শ্রীযুক্ত তারাপদ চক্রবর্তী মহাশয় ও তাঁহার অপর তিন ভ্রাতা মেদিনীপুর জেলার ঘাটাল মহকুমার বেণ্গরাল গ্রাম নিবাসী।

২ লেখক ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য

নাই। প্রতিটি পালার সূচনায় নূতন করিয়া পত্রসংখ্যা গণনা করা হইয়াছে। পুঁথিটি বহু স্থানে হস্তান্তরিত হওয়ায় পালাগুলি ঠিকভাবে সাজানো নাই। এই পুঁথির মধ্যে প্রাচীন ও অর্বাচীন হস্তাক্ষর লক্ষ্য করা যায়। পত্রগুলির কিছু কিছু অত্যন্ত জীর্ণ ও স্থানে স্থানে অক্ষর অস্পষ্ট। কবিকঙ্কণের চন্ডীর ন্যায় ইহারও দুইটি অংশ আছে—কালকেতু ও সদাগর উপাখ্যান। কালকেতু উপাখ্যান শেষ হইবার কিছু পূর্বে কবি প্রহেলিকার সাহায্যে রচনাকাল জ্ঞাপন করিয়াছেন। সদাগর উপাখ্যানের শেষেও রচনাকালের উল্লেখ আছে। তবে এই অংশটি পূর্ব অংশ হইতে দশবৎসর পরে রচিত হয়। পুঁথি সমাপ্ত করিয়া কবি 'সমাপ্তশ্চায়ং গ্রন্থঃ' বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন।

'শীতলামঙ্গলে'র মাত্র ছয়টি পত্র পাওয়া যাইলেও ইহার একটি পুঁথি বর্ধমান সাহিত্য সভায় রক্ষিত আছে।[১] বর্তমান লেখক কর্তৃক প্রাপ্ত ঐ পত্রগুলির উভয় পৃষ্ঠায় যে লেখা আছে, তাহা হইতেও কবিসম্পর্কিত কয়েকটি তথ্য জানা যায়। প্রাপ্ত পত্রসমূহে গোকুলপালার কাহিনী আছে। গোকুলে নন্দ ঘোষের গৃহে ছদ্মবেশী শীতলার গমন, শীতলার রোষে যশোদানন্দনের বসন্ত রোগ এবং যশোদার অনুনয়ে শীতলার কৃপায় রোগমুক্তিই প্রধান কাহিনী। কাহিনীগুলি সর্বশুদ্ধ তেরটি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশে বিভক্ত।

উপর্যুক্ত এই তিনটি পুঁথি ছাড়াও কবিরচিত কয়েকটি ভক্তিমূলক পদও পাওয়া যায়। ভক্তিরসাপ্লুত এই পদগুলিতে ভক্ত কবির হৃদয়ালেখ্য চিত্রিত হইয়াছে। ইহাদের একটি দৃষ্টান্তস্বরূপ উদ্ধৃত হইল ঃ

'৭ শ্রীশ্রীহরি, মন কবে হবে রে
শ্রীরামচরণ অভিলাষী
সদা বল সীতারাম, পূর্ণ কর মনস্কাম,
আনন্দে হইবে গোলকবাসী।
যেখানে রামের কথা, সর্বতীর্থ স্থান তথা,
গয়া গঙ্গাসাগর বারাণসী।।
রাম নামে বাঁধ তরী, তরিবে দুষ্পাপ বারি,
নাম খড়্গে কাট পাপরাশি।
কবীন্দ্রাকিঞ্চন কন, সীতারাম বল মন,
কর দেহ পূর্ণিমার শশী।।'

অকিঞ্চনের শক্তি বিষয়ক একটি পদও এই প্রসঙ্গে উদ্ধৃত করা যাইতেছে ঃ

"নয়ান কোণে, বালক পানে, বারেক হের।
শুন্যাছি পুরাণে, চাহিয়া নয়ানে,
চতুর্বর্গ দিতে পার।।
তোমার বালকে, ধিক বলে লোকে,
মা হৈয়া সহ্য কর।
আমি মনে জানি, জননী ভবানী,
কেমন পরাণ তোর।।
......কবীন্দ্রের কথা, শুন গিরিজাতা,
অধম তারিতে পার।।

এইরূপ ভক্তিমূলক আরও অনেক পদ আছে। তবে প্রাপ্ত পদগুলি ছাড়া কবি আরও বহু পদ রচনা করিয়াছিলেন মনে হয়। কালের প্রকোপে বোধহয় সেগুলি নষ্ট হইয়া গিয়াছে।

পুঁথিগুলির নানাস্থানে অকিঞ্চনের যে ভণিতা আছে তাহা হইতে কবির আত্মপরিচয় ও কাব্য রচনার কাল সম্বন্ধে নিশ্চিত হওয়া যায়।

কবির পদবী ছিল চক্রবর্তী, তবে অনেক ভণিতায় পিতামহ ও পিতার নামের শেষে তিনি 'মিশ্র' পদবীর উল্লেখ করিয়াছেন। তাঁহারা কাশ্যপগোত্রীয় ব্রাহ্মণ ছিলেন। একটি ভণিতায় কবি বলিয়াছেন,—

'কবীন্দ্র করিলা কাব্য কশ্যপের বংশ'
(চন্ডীমঙ্গল ঃ ধনপতির সিংহল গমনোদ্যোগ)

উদ্ধৃত অংশে 'কবীন্দ্র' পদটি কবির উপাধি। কবির পিতামহের নাম হরিহর, পিতার নাম পুরুষোত্তম ও মাতার নাম গঙ্গা দেবী। ইহা ছাড়া কবির এক জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ছিলেন, তাঁহার নাম গোবর্ধন। কবিরা দুই ভাই ছিলেন মনে হয়। কারণ ভণিতায় কবির অপর কোন ভ্রাতার নাম পাওয়া যায় না। কবির তিন পুত্রের নাম ছিল রামদুলাল, রামচন্দ্র ও শিবানন্দ এবং এক কন্যার নাম পার্বতী ও জামাতার নাম পরমানন্দ। তবে প্রাচীন নথীপত্র ও পুঁথি ভালভাবে অনুসরণ করিয়া মনে হয় চন্ডীমঙ্গল রচনার সময় কবির জ্যেষ্ঠপুত্র মাত্র জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। কবির কয়েকটি ভণিতা নিম্নে উদ্ধৃত হইল ঃ

(১)
'শ্রীহরি মিশ্রের সুত রাধাকান্ত পদে রত
পুরুষোত্তম মিশ্র ঠাকুর
তাঁহার নন্দন কহে গঙ্গাপদ সরোরুহে
শ্রবণে পাতক যায় দূর।।'
(গঙ্গামঙ্গল ঃ উত্তরাংশ)

(২)
শ্রীমতী গঙ্গার সুত ব্রহ্মারূপে পদে রত
রামনামে সদ্য কুতূহল।
চন্ডিকা করিয়া ধ্যান দ্বিজ অকিঞ্চন গান
মনোহর নূতন মঙ্গল।।
(চন্ডীমঙ্গল ঃ সুন্দরীবেশী চন্ডীর প্রতি কালকেতুর উক্তি)

(৩)
'পুণ্যবান্ কৃতকীর্তি পুরুষোত্তম চক্রবর্তী
তাঁহার নন্দন গোবর্ধন।
তাঁহার অনুজজন চক্রবর্তী অকিঞ্চন
বিরচিলা চন্ডীসংকীর্তন।।'
(চন্ডীমঙ্গল ঃ সুন্দরীবেশী পার্বতীকে দেখিয়া কালকেতুর প্রতি ফুল্লরার উক্তি)

(৪)
শ্রীরামদুলালে রামচন্দ্রে শিবানন্দে।
কল্যাণে করিবে রক্ষা গঙ্গাপদ দ্বন্দ্বে।।
(গঙ্গামঙ্গল)

(৫) শ্রীরামদুলালে রামচন্দ্রে শিবানন্দে।
পার্বতী পরমানন্দে রক্ষ পদদ্বন্দ্বে।।

পূর্বেই উল্লিখিত হইয়াছে অকিঞ্চন তাঁহার নামের সহিত কবীন্দ্র উপাধি ব্যবহার করিতেন। প্রায় প্রতিটি ভণিতায় কবির এই উপাধির ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়। 'কবীন্দ্র' উপাধিটি তাঁহার যে অত্যন্ত প্রিয় ছিল সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। কবি নিজেই স্বীকার করিয়াছেন এই উপাধিটি তিনি ব্রাহ্মণ সমাজ হইতে লাভ করিয়াছিলেন। মনে হয় তৎকালীন বিদ্বৎ সমাজের শীর্ষস্থানীয় কাব্যরসরসিক ব্রাহ্মণগণ কাব্য প্রতিভায় মুগ্ধ হইয়া কবিকে এই উপাধিদান

১ পুঁথির নং ২৩৪ ডঃ সুকুমার সেনের 'বাঙ্‌লা সাহিত্যের ইতিহাসে'র ২য় সংস্করণ ১ম খন্ড পৃ ৮০০ দ্রষ্টব্য

কবীন্দ্র অকিঞ্চন চক্রবর্তীর চন্ডীমঙ্গলের (সদাগর উপাখ্যান) শেষ পৃষ্ঠা। এই পৃষ্ঠার শেষ থেকে ৫ম ও ৪র্থ পংক্তিতে প্রহেলিকার মাধ্যমে রচনাকাল উক্ত হয়েছে

করিয়া থাকিবেন। 'চণ্ডীমঙ্গলে'র একস্থানে কবি এই বিষয়ে বলিয়াছেন—

'শ্রীমতী গঙ্গার সুত : রাম নামে সদা পুত :
বিরচিলা চণ্ডীর কীর্তন।
শ্রবণে সুখের ধাম : কবীন্দ্র উপাধি নাম :
রাখিলেন সমূহ ব্রাহ্মণ।।'

'কবীন্দ্র' উপাধিটি শ্রবণ সুখকর। তাই কবির ইহা অত্যন্ত প্রিয় ছিল। ব্রাহ্মণগণ কর্তৃক এই উপাধিদানের কথা কবি সর্বপ্রথম স্বীকার করিয়াছেন 'চণ্ডীমঙ্গলে'র পৌরাণিক কাহিনীসমূহের 'দক্ষযজ্ঞনাশ' অংশে—

'দুর্গার মঙ্গল গান দ্বিজ অকিঞ্চন।
কবীন্দ্র উপাধি দিল সমূহ ব্রাহ্মণ।।'

শীতলামঙ্গল, গঙ্গামঙ্গল ও অন্যান্য রচনায় কবীন্দ্র উপাধির ব্যবহার দেখা যায়। মনে হয় 'চণ্ডীমঙ্গল' রচনার আগেই কবি এই উপাধি লাভ করিয়াছিলেন। হয়তো অন্য কোন কাব্য ইহার আগে কবি রচনা করিয়াছিলেন। তাহারই স্বীকৃতিস্বরূপ কবি এই উপাধি লাভ করিয়া থাকিবেন। কবি অকিঞ্চনের কতগুলি ভণিতা নিম্নে উদ্ধৃত হইল :

(১) 'চক্রপাণিচরণ চিন্তিয়া অনুক্ষণ।
বিরচিলা ব্রাহ্মণ কবীন্দ্র অকিঞ্চন।'
(গঙ্গামঙ্গল)

(২) 'চণ্ডিকার চরণ চিন্তিয়া অনুক্ষণ।
রচিলা কবীন্দ্র চক্রবর্তী অকিঞ্চন।।'
(চণ্ডীমঙ্গল)

কবি যদিও পুঁথির বিভিন্নস্থানে প্রবল-প্রতাপশালী বর্ধমানরাজ কীর্তিচন্দ্র, তিলকচন্দ্র ও তেজশ্চন্দ্রের উল্লেখ করিয়াছেন তথাপি রাজানুগ্রহস্বরূপ এই উপাধিটি তিনি নিশ্চয়ই লাভ করেন নাই। তাহা হইলে কাব্য মধ্যে নিশ্চয়ই এই কথা স্বীকার করিতেন। ব্রাহ্মণগণ কবিকে এই উপাধিদান করায় তাঁহাদের প্রতি কবির কৃতজ্ঞতার অন্ত ছিল না। কাব্যের মধ্যে তিনি বহুবার বিপ্রগণের চরণবন্দনা করিয়াছেন,—

(১) 'বিপ্রবর্গে বন্দিয়া ব্রাহ্মণ অকিঞ্চন।
সারা কৈলা সুধানিধি শৈলজাকীর্তন।।'
(চণ্ডীমঙ্গল, শেষাংশ পত্র ৬৪ পৃঃ ২)

(২) 'শৈলসুতা চরণসরোজ সুধা পানে।
বিপ্রবৃন্দ বন্দি গান বিপ্র অকিঞ্চনে।।'
(চণ্ডীমঙ্গল : কালকেতু কর্তৃক ভাঁড়ু দত্তের শাস্তি)

এইরূপ বহু ভণিতায় এবং পুঁথির বিভিন্ন স্থানে ব্রাহ্মণের উদ্দেশ্যে কবি শ্রদ্ধার্ঘ নিবেদন করিয়াছেন।

কবীন্দ্র অকিঞ্চন চক্রবর্তীর সাহিত্য সাধনা দীর্ঘকাল ব্যাপিয়া চলিয়াছিল। 'গঙ্গামঙ্গল'টি তাঁহার সর্বাপেক্ষা ক্ষুদ্র কাব্য। এই কাব্যটি কবির জীবনের প্রান্তভাগে রচিত হইয়াছিল মনে হয়। ইহার পূর্বাংশ ও উত্তরাংশটির রচনাকাল পৃথক পৃথক্। পূর্বাংশের শেষভাগে প্রহেলিকার মাধ্যমে কবি যে কাল নির্দেশ করিয়াছেন তাহাতে জানা যায় এই অংশটি বাংলা ১১৮১ সালে রচিত হইয়াছিল। কবি প্রহেলিকার সাহায্যে ইহা নির্দেশ করিয়াছেন,

'বসুতে বিরাজে বিধু বামে বাণেশ্বর।
মীনেতে মিহির মহোদধি যে বাসর।।
পুরাণপ্রসঙ্গ পূর্ণোদিনে হৈল্য সারা।
পৃথিবী প্রবেশ কৈল্য পিযুষের ধারা।।'

প্রহেলিকাটির দুইটি পংক্তির ব্যাখ্যা করিলে দাঁড়ায়—বসু=৮, বিধু=১ বসুতে বিধু বিরাজ করিলে ৮১ হয়। এই সংখ্যার বামপার্শ্বে বাণেশ্বর=১১ (বাণেশ্বরকে রুদ্র ধরিয়া ১১ ধরিলে) রাখিলে ১১৮১ সাল হয়। মীনেতে মিহির—চৈত্র মাস, মহোদধি—৭। তাহা হইলে তারিখ হইল ৭ই চৈত্র। উল্লেখ্য—উদ্ধৃত প্রহেলিকায় সনের উল্লেখ নাই, তাই এক্ষেত্রে বঙ্গাব্দই ধরিতে হইবে। ১১৮১ সাল=১৭৭৪ খৃষ্টাব্দ। এই সময়ে বর্ধমানাধিপ মহারাজ তেজশ্চন্দ্র রাজ্য লাভ করিয়াছেন। 'গঙ্গামঙ্গলে'র উত্তরাংশটির রচনাকাল ১১৮৩ সাল অর্থাৎ ১৭৭৬ খৃীষ্টাব্দ। কবি ইহা স্পষ্টভাবেই উল্লেখ করিয়াছেন,—

'সুরধনী সঙ্গীত সুধার সমা ধারা।
তারিণীর মঙ্গল তিরাশি সালে সারা।।
আষাঢ়ের একুশা অহর অবসানে।
অকিঞ্চন কবীন্দ্র ব্রাহ্মণ রস ভণে।'

এই অংশটি ১১৮৩ সালের ২১শে আষাঢ় দিবাবসানে রচিত হয়। কবি উত্তরাংশে তেজশ্চন্দ্রের উল্লেখ করিয়াছেন,—

'মহারাজা তেজশ্চন্দ্র : বর্ধমানে যেন ইন্দ্র :
পৃথিবী পালনে যুধিষ্ঠির।
প্রতাপে প্রচণ্ড রবি : সভাতে পণ্ডিত কবি :
কৌটিল্য নন্দন রণধীর।।
নিবাস তাঁহার দেশে : গঙ্গার মঙ্গল ভাষে।
কবীন্দ্র ব্রাহ্মণ সুবিদ্বান্।'

তেজশ্চন্দ্র ১৭৭০ হইতে ১৮৩২ খৃীষ্টাব্দ পর্যন্ত দীর্ঘকাল রাজত্ব করেন। তাঁহার রাজ্যকালের প্রথমভাগেই ইহা রচিত হইয়াছিল। 'গঙ্গামঙ্গলে'র পূর্বাংশটি রচিত হইবার প্রায় এক বৎসর চারি মাস পরে উত্তরাংশের রচনা শেষ হয়। 'গঙ্গামঙ্গলে' তেজশ্চন্দ্র ছাড়া কীর্তিচন্দ্র ও তিলকচন্দ্রের নামের কোন উল্লেখ নাই। অতএব ইহা নিশ্চিত যে ১৭৭৪ এ ১৭৭৬ খৃীষ্টাব্দ তেজশ্চন্দ্র রাজ্যলাভ করার কিছুকালের মধ্যেই কাব্যটি রচিত হইয়াছিল।

কবীন্দ্র অকিঞ্চনের 'চণ্ডীমঙ্গল' একটি সুবৃহৎ রচনা। পুঁথির বিভিন্নস্থানে কবি মহারাজ কীর্তিচন্দ্র, তিলকচন্দ্র ও তেজশ্চন্দ্রের উল্লেখ করিয়াছেন। 'চণ্ডীমঙ্গলে'র রচনাকাল সম্বন্ধে ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য মহাশয় বলিয়াছেন,—'মনে হয়, তিনি যখন চণ্ডীমঙ্গল কাব্য রচনা করেন, তখন মহারাজ তিলকচন্দ্রের পুত্র মহারাজ তেজশ্চন্দ্র বর্ধমানের অধিপতি ছিলেন... তবে মনে হয় খৃষ্টীয় অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগেই কাব্যখানি রচিত হয়। মহারাজ

'চন্ডীমংগলের' কালকেতু উপাখ্যানের একটি পত্র

ফটো : শ্রীদিলীপ বন্দ্যোপাধ্যায়

তিলকচন্দ্রের কথাও তিনি যেভাবে উল্লেখ করিয়াছেন, তাহাতে মনে হয় তিনি তিলকচন্দ্রের রাজ্যকালের শেষভাগ হইতে তেজশ্চন্দ্রের রাজ্যকালের প্রথম ভাগ পর্যন্ত বর্তমান ছিলেন...পুঁথিখানিতে ইহার রচনাকালজ্ঞাপক নির্দিষ্ট কোন তারিখের উল্লেখ পাওয়া যায় না। অতএব ইহা অপেক্ষা এই বিষয়ে আর কিছু নির্দিষ্ট করিয়া বলা অসম্ভব।' (বাংলা মঙ্গল-কাব্যের ইতিহাস ৫ম সং পৃ ৫৪৩—৫৪৪)

ডঃ ভট্টাচার্যের এই উক্তি সম্পূর্ণ অনুমানভিত্তিক। কারণ 'চন্ডীমঙ্গল' পুঁথি ভাল করিয়া দেখিলে ইহার রচনাকাল সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত হওয়া যায়। এই পুঁথির দুইটি স্থানে কবি কালজ্ঞাপক যে প্রহেলিকা রচনা করিয়াছেন তাহার একটি কালকেতু উপাখ্যানের শেষভাগে ও অন্যটি গ্রন্থ সমাপ্তিকালে লক্ষ্য করা যায়। চন্ডী দাড়িম্ববৃক্ষের তল হইতে সাতঘড়া ধন তুলিয়া দিবার পর কালকেতুকে তাঁহার পূজা করিতে আদেশ দিলেন। ইহার পর কবি বলিয়াছেন,—

"পালা পূর্ণ হৈলা পার্বতী-কীর্তন।
কবীন্দ্র চাহেন চন্ডিকার পদযন।।
...বামে বিধু কলাপূর্ণ বেদে বিধ
(বিধু?) রথ।
মিথুনে মিহির স্থিতি দিনে মুনিত্রয়।।
শঙ্করীর সংগীত সে শকে হৈল্য সারা।
পৃথিবী প্রবেশ কৈল্য পিযুষের ধারা।"

উদ্ধৃত প্রহেলিকার অর্থ এইরূপ দাঁড়ায় : বামে বিধু কলাপূর্ণ=বামভাগে ১৬ বেদে বিধি বা বিধু=৪১ অর্থাৎ ১৬৪১ শকাব্দ বা ১৭১৯ খৃষ্টাব্দ। শ্রদ্ধেয় ডঃ সুকুমার সেন পুঁথি দেখিয়া প্রথমতঃ ঐরূপ অর্থ করিলেও পরে শককে সাল অর্থে মনে করিয়া উক্ত প্রহেলিকার অর্থ করিয়াছেন—বামভাগে বিধু=১ কলাপূর্ণ =১৬ বেদে বিধি বা বিধু=৫ অর্থাৎ ১১৬৫ সাল বা ১৭৫৮ খৃষ্টাব্দ কালকেতু উপাখ্যানের রচনাকাল। 'মিথুনে মিহির স্থিতি দিনে মুনিত্রয়' ইহার অর্থ ৩রা আষাঢ় হয়। ডঃ সেনের এই মত গ্রহণ করিলে পুঁথিতে বর্ধমানরাজ তিলকচন্দ্রের উল্লেখ [illegible]

খৃষ্টাব্দ ১৭৪৪ হইতে খৃষ্টাব্দ ১৭৬৯ পর্যন্ত রাজত্ব করেন। কিন্তু ইহা সত্ত্বেও পুঁথিতে তেজশ্চন্দ্রের উল্লেখ সঙ্গত হয় না। কারণ তেজশ্চন্দ্র ১৭৭০ খৃঃ হইতে ১৮৩২ পর্যন্ত রাজত্ব করেন।

সদাগর উপাখ্যানের শেষে ও গ্রন্থ-সমাপ্তিকালে কবি আর একটি প্রহেলিকার মাধ্যমে উক্ত অংশের রচনাকাল নির্দেশ করিয়াছেন,

'দুর্গার মঙ্গলগান দ্বিজ অকিঞ্চন।
হরগোরী সংবাদ শুনহ সর্বজন।।
...বাণে বিধু বিরাজে বামেতে বিধুকলা।
শরৎ সুধন্যা কর্যা কন্ঠে রত্নমালা।।
শঙ্করীর সংগীত সে শকে হৈলা সারা।।
সমাপ্তশ্চায়ং গ্রন্থঃ [পত্র ৬৪ পৃঃ ২]

উক্ত প্রহেলিকার ব্যাখ্যা নিম্নরূপ : বামভাগে বিধুকলা=১৬ বাণ=৫ বিধু=১ অর্থাৎ ১৬৫১ শকাব্দ বা ১৭২৯ খৃষ্টাব্দ। অতএব কালকেতু উপাখ্যান রচিত হওয়ার দশ বৎসর পরে সদাগর উপাখ্যান রচিত হয়। ডঃ সেন এখানেও শককে সাল অর্থে ধরিয়া প্রহেলিকার ব্যাখ্যায় বলেন বামে বিধু=১ কলা ১৬ বাণে বিধু= ৫+১=৬ অর্থাৎ ১১৬৬ সাল ১৭৫৯ খৃঃ। এইরূপ অর্থ করিলে পুঁথিতে তিলক-চন্দ্রের উল্লেখ সঙ্গত হয়, কিন্তু তেজশ্চন্দ্রের উল্লেখ সংগত হয় না অবশ্য ডঃ সেনের এই যুক্তির সমর্থনে বলা যায় কবি অকিঞ্চন 'গংগামঙ্গল' কাব্যেও বঙ্গাব্দের ব্যবহার করিয়াছেন। কাজেই চন্ডীমঙ্গলের উদ্ধৃত প্রহেলিকা দুইটিতে শকের উল্লেখ থাকিলেও উহা সাল অর্থে বুঝিতে হইবে। পুঁথির সহিত যে সব পুরাতন নথীপত্র পাওয়া গিয়াছে তাহাদের মধ্যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কয়েকটি হিসাব তালিকায় বাঙলা সনের উল্লেখ আছে। কবির স্বনামাঙ্কিত ঐরূপ একটি হিসাব তালিকায় ১১৫৮ সালের উল্লেখ আছে। তালিকার প্রথমে লিখিত আছে—'৭ শ্রীশ্রীহরি সিরিবগত্যা শ্রীঅকিঞ্চন শর্মা হিঃ জিনিষতালিকা'। ঐরূপ আরও অনেক হিসাব তালিকায় বাঙলা সনের উল্লেখ পাওয়া যায়। তবে ১১৫৮ সনের হিসাব-[illegible] পাওয়া যায় [illegible]

উপর্যুক্ত আলোচনায় লক্ষ্য করা গেল শক অর্থে প্রহেলিকার অর্থ করিলে কবি অকিঞ্চন অষ্টাদশ শতকের দ্বিতীয় ও তৃতীয় দশকের মধ্যে চন্ডীমংগল সমাপ্ত করিয়াছিলেন। তাহা হইলে ১৭২৯ খৃঃ হইতে ১৭৭৪ খৃঃ পর্যন্ত 'শীতলামংগল' ব্যতীত অন্য কোন রচনা তাঁহার পাওয়া যায় না। এই দীর্ঘ সময়ের ব্যবধানে একটি মাত্র কাব্য রচনা বিস্ময়ের সৃষ্টি করে। কিন্তু ১১৬৫-৬৬ সালকে 'চন্ডী-মংগলের' রচনাকাল ধরিলে এইরূপ বিস্ময়ের অবকাশ থাকে না। কিন্তু পুঁথিতে কবি নিজেকে কীর্তিচন্দ্রের আশ্রিত বলিয়া বারবার উল্লেখ করিয়াছেন—

'জগতপ্রসংগে : মহারাজা বংশে :
নৃপতি কীর্তিচন্দ্র।
তাঁহার আশ্রিত : নূতন সংগীত :
কবীন্দ্র রচিলা ছন্দ।।'

কালকেতুর বনকাটা পালায় কবির একটি ভণিতা এইরূপ—

'মহারাজ চক্রবর্তী : কীর্তিচন্দ্র কৃতকীর্তি :
ইন্দ্রের সমান বর্ধমানে।
নিবাস তাঁহার দেশে : নূতন মঙ্গল ভাষে :
ব্রাহ্মণ কবীন্দ্র অকিঞ্চনে।।'

কীর্তিচন্দ্র তাঁহার রাজ্যসীমা পশ্চিমে মল্লভূম পর্যন্ত বিস্তৃত করিয়াছিলেন। তাঁহার প্রবল প্রতাপের কথা স্মরণ করিয়া কবি বলিয়াছেন—

'রণে মহাতেজা : কীর্তিচন্দ্র রাজা :
বর্ধমানে পুরন্দর।
বাস তস্য দেশে : গান নানা রসে :
কবীন্দ্র দ্বিজ কবিবর।।'
(সুশীলার সহিত শ্রীমন্তের বিবাহ)

সমগ্র পুঁথিখানি ভালোভাবে আলো-চনা করিলে লক্ষ্য করা যায় কবি মহারাজ কীর্তিচন্দ্রের যেভাবে প্রশংসা করিয়াছেন তদনুরূপ প্রশংসা তিলকচন্দ্র বা তেজ-শ্চন্দ্রের করেন নাই ইহার কোথায়ও কবি নিজেকে তাঁহাদের 'আশ্রিত' বলিয়া উল্লেখ করেন নাই। সেইজন্য মনে হয় কবি কীর্তি-চন্দ্রের রাজ্যকালেই চন্ডীমঙ্গল রচনা করিয়া থাকিবেন। মহারাজ তিলকচন্দ্র ও তেজ-শ্চন্দ্রের প্রশস্তিসূচক পংক্তিগুলি পুঁথিতে পরবর্তী সংযোজন মনে হয়।

ডঃ ভট্টাচার্য আরও বলিয়াছেন,—'অকিঞ্চন বৃদ্ধ বয়সেই চণ্ডীমঙ্গল কাব্য রচনা করিয়াছিলেন বলিয়া মনে হয়। কারণ ইহাতে তাঁহার তিন পুত্রেরই উল্লেখ আছে, যেমন—'শ্রীরামদুলালে রামচন্দ্রে শিবানন্দে, কল্যাণে করিবে রক্ষা গঙ্গাপদদ্বন্দ্বে।'' উদ্ধৃত এই পংক্তিটি চণ্ডীমঙ্গলে নাই, গঙ্গামঙ্গলে আছে। 'গঙ্গামঙ্গল' কবির পরিণত বয়সের রচনা, ইহা পূর্বেই আলোচিত হইয়াছে। মহারাজ কীর্তিচন্দ্রের সময় চণ্ডীমঙ্গল রচিত হইলে ইহাকে কবির পরিণত বয়সের রচনা বলা যায় না।

কবি অকিঞ্চনের যে পুঁথিগুলি বর্তমানে সংগৃহীত হইয়াছে, তাহাদের মধ্যে কোথায়ও কবি নিজের গ্রামের নাম উল্লেখ করেন নাই। চণ্ডীমঙ্গল পুঁথির এক স্থানে উল্লেখ আছে কবির পিতা পুরুষোত্তম আটঘরা গ্রামে বাস করিতেন। এই আটঘরা গ্রামটি মেদিনীপুর জেলার ঘাটাল মহকুমার বরদা পরগণার অন্তর্গত আটঘরা-শ্রীরামপুর নামে বর্তমানে পরিচিত। কবি বলিয়াছেন—

'বিপ্রকুলোৎপত্তি : আটঘরা স্থিতি :
ঠাকুর পুরুষোত্তম।
তাঁহার নন্দন: কবীন্দ্র ব্রাহ্মণ :
রচে কাব্য মনোরম।।'

অন্য এক স্থানেও কবি বলিয়াছেন—
'বসতি বরদা: বদনে সারদা:
চণ্ডিকা দেবীর আদেশে।
নূতন মঙ্গল : শ্রবণে কুশল : কবীন্দ্র
ব্রাহ্মণ ভাষে।।

'শীতলামঙ্গলে'র খণ্ডিত পুঁথির মধ্যে চারণানগরের অধিবাসী সাকলরাম চট্টোপাধ্যায়ের পুত্রের পোষ্যরূপে তাঁহার আশ্রয়ে বাসগৃহ নির্মাণ করিয়াছিলেন বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন,—

'চট্টকুলোদ্ভবদান্ত : সর্বগুণধাম শান্ত :
শ্রীযুত সাকলরাম নাম।
ইষ্টে সদা মনস্থির: যুধিষ্ঠির :
দীনজনে দয়া যেন রাম।।
চারণানগর ধাম: রূপবান্ যেন কাম:
অনিরুদ্ধ সমান নন্দন।
তস্য পোষ্য নিরন্তর: ভদ্রাশ্রয় করা ঘর:
রচিলা কবীন্দ্র অকিঞ্চন।।'

এই চারণানগরটি কোথায় তাহা জানা যায় না। বেঙ্গরালগ্রামের যেখানে কবির বর্তমান বংশধরেরা বাস করিতেছেন তাহার উল্লেখ ১১৮৪ সালের একটি ক্ষুদ্র কর্জদাদনপত্রে দেখা যায়। উহাতে 'বেঙ্গরালী' বলিয়া উল্লেখ আছে। কর্জদাদন ও হিসাবের কয়েকটি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পত্রে আটঘরা, বেঙ্গরালী, কান্তপুর, সিরিষগড়্যা ইত্যাদি গ্রামের উল্লেখ আছে। আটঘরার উল্লেখ ১১৫৮ সালের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ফর্দে দেখা যায়। অবশ্য ১১৫৭ সালের ক্ষুদ্র একটি ফর্দে বেঙ্গরালীরও উল্লেখ আছে। যাহা হউক 'শীতলামঙ্গল' রচনা করার সময় কবি যে আটঘরা নিবাসী ছিলেন না সে বিষয়ে নিশ্চিত হওয়া যায়। ১১৮৪ সালের একটি ফর্দে 'বেঙ্গরালী'র উল্লেখ থাকায় মনে হয় কবি ১১৮৩ সালে গঙ্গামঙ্গল রচনার সময় বেঙ্গরাল গ্রামেই বসবাস করিয়া থাকিবেন। কবির কনিষ্ঠ পুত্র শিবানন্দ কর্তৃক জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা রামদুলাল চক্রবর্তীকে লিখিত একটি পত্রে রামদুলালকে বেঙ্গরালগ্রাম নিবাসী বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। অতএব অনুমান করা যাইতে পারে কবি তাঁহার জীবদ্দশাতেই বেঙ্গরাল গ্রামে বসতি স্থাপন করিয়া থাকিবেন।

'চণ্ডীমঙ্গল' ও 'গঙ্গামঙ্গল' কাব্যে কবিত্ব, পাণ্ডিত্য, অলঙ্কার ও ছন্দোবৈদগ্ধের এক অপূর্ব সমন্বয় লক্ষ্য করা যায়। বরদা পরগণার প্রসিদ্ধ কবি রামেশ্বরের দেশবাসী ও সমসাময়িক কবি অকিঞ্চনের উপর রামেশ্বরের প্রভাব লক্ষ্য করা যাইলেও কাব্যে বিশুদ্ধ রস ও সৌন্দর্য সৃষ্টিতে অকিঞ্চন অসামান্য নৈপুণ্য প্রদর্শন করিয়াছেন। ভাষার মাধুর্যে ও সৌকুমার্যেও তাঁহার কাব্যকে সুষমামণ্ডিত করিয়া তুলিয়াছে। 'চণ্ডীমঙ্গলে' কমলে কামিনীর বর্ণনায় কবির এই নৈপুণ্যের পরিচয় পাই,—

'ষোল বছরের রামা: রূপে গুণে অনুপমা:
পূর্ণে শরদিন্দু বিভাননা।
অধর অরুণভাতি: কুন্দকলি দন্তপাঁতি:
হরিণী-হারিণী বিলোচনা।।
মুখে মন্দ মন্দ হাস: সৌদামিনী পায় ত্রাস
কদম্বকোরক পয়োধর।
ক্ষীণমধ্যা হরিজিতা: কিঙ্কিণী সুনিনাদিতা
দশাঙ্গুলে ধরে সুধাকর।।'

স্থানে স্থানে ভাবের পরিপোষকরূপে সার্থক ছন্দের ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়—কলিঙ্গরাজের সহিত কালকেতুর যুদ্ধের বর্ণনায় ললিতঝাঁপ ছন্দের প্রয়োগ সুন্দর হইয়াছে—

'উত্তর সমরে: ঐছন বীরবর :
যৈছন ছুটয়ে তারা।
পূরিয়া সন্ধান: বিন্ধয়ে চণ্ডবাণ :
মেঘে যেন বরিখে ধারা।।
বীণা বেণি ভেরী: ভোরঙ্গ মোহরি:
ঝাঁ ঝাঁ বাজয়ে ঝম্প।
ধামসা ধাঁ-ধাঁ: ডাকয়ে হাঁ হাঁ :
রিপুকুল শুনিয়া কম্প।।

ইহা ছাড়া ভ্রমর, করুণা, কামদ ও অন্যান্য আরও ছন্দের ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়। ভ্রমর ছন্দের উদাহরণ, যথা—

'আমা হেরি হেরি: চাইসি সুন্দরী :
না জানি কিসের হেতু।
লোচন কটাক্ষে: মারে মোর বক্ষে:
পঞ্চবাণ মীনকেতু।।
(কমলেকামিনী বর্ণন)

একাবলীরও ভূরি ভূরি প্রয়োগ দেখা যায়। পয়ার, লঘু ও দীর্ঘত্রিপদীর ব্যবহারেও অকিঞ্চন বিশেষ নৈপুণ্য দেখাইয়াছেন। অলংকারের ক্ষেত্রে অনুপ্রাস ও যমকের সার্থক ব্যবহার বহু ক্ষেত্রে কাব্যের সৌন্দর্য সৃষ্টিতে সাহায্য করিয়াছে, যথা—

'চতুর্বেদ চতুর্মুখে চতুর্মুখ গান
[গঙ্গামঙ্গল পত্র ৭ পৃ: ১]

স্থানে স্থানে শিবায়নের কবি রামেশ্বরের প্রভাব বেশ পড়িয়াছে, এমনকি ভাষার মিলও কোথাও কোথাও দেখা যায়—নিম্নোদ্ধৃত ভণিতা হইতে তাহা প্রমাণিত হইবে—

(১) 'মধুক্ষর মনোহর মহেশের গীত।
রচে রাম রাজা রামসিংহ প্রতিষ্ঠিত।।'
[শিবায়ন: রামেশ্বর]

(২) 'মনোহর মধুক্ষর মোক্ষদার গীত।
রচিলা কবীন্দ্র রমানাথের সংপ্রীত।।'
[গঙ্গামঙ্গল: অকিঞ্চন পত্র ৭ পৃ: ১]

ইহা ছাড়া মুকুন্দরাম ও ভারতচন্দ্রের প্রভাবও তাঁহার উপর স্থানে স্থানে পড়িয়াছে দেখা যায়।

কিন্তু তৎসত্ত্বেও কবীন্দ্র অকিঞ্চনের নবাবিষ্কৃত মঙ্গলকাব্যগুলি বাঙলা-সাহিত্যের ইতিহাসে স্থায়ী আসন লাভ করিবার যোগ্য। তাঁহার কাব্য-সাধনা অষ্টাদশ শতকের প্রথম পাদ হইতে শেষ পাদের প্রারম্ভ পর্যন্ত চলিয়াছিল ইহা পূর্বেই আলোচিত হইয়াছে। মুকুন্দরাম ও রামেশ্বরের অনুবর্তী হইয়াও অকিঞ্চন মঙ্গলকাব্যে এক সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ধারার সৃষ্টি করিতে পারিয়াছিলেন। যে পরিচ্ছন্ন রুচিবোধ থাকিলে শিল্পী তাঁহার রচনাকে সত্য, শিব ও সুন্দরের পথে লইয়া যাইতে পারেন কবি অকিঞ্চনের তাহা ছিল। তাঁহার কাব্যে পৌরাণিক ও লৌকিক কাহিনীগুলি পরিশুদ্ধ হইয়া কাব্যের প্রকৃত সৌন্দর্য সৃষ্টিতে সহায়তা করিয়াছে। কবি 'চণ্ডীমঙ্গল' পুঁথির শেষে তাঁহার কাব্যকে 'ভাবার্থভাজনভদ্রভবাগণভাব্য' বলিয়াছেন। অষ্টাদশ শতকের শ্রেষ্ঠ কবি ভারতচন্দ্রের কাব্যও যেখানে স্থানে স্থানে রুচিদোষদুষ্ট হইয়া উঠিয়াছে কবি অকিঞ্চন সেখানে তাঁহার কাব্যকে সর্বপ্রকারে নির্দোষ করিয়া পরিচ্ছন্ন রুচির পরিচয় দিয়াছেন।

নেপোলিয়নের গুপ্তধন

নন্দলাল ভট্টাচার্য

আবছা কুয়াশার মধ্য দিয়ে এগিয়ে আসছে একটা ছোট্ট ভেলা। হোগলা জাতীয় জিনিসে তৈরী ভেলায় বসে দ্রুত দাঁড় চালাচ্ছে এক তরুণ অফিসার। প্রচণ্ড শীতের সন্ধ্যাতেও তার কপালে ঘামের বিন্দু—মুখে চাপা উত্তেজনা। তীরে লাফিয়ে পড়ে অভিবাদন জানায় সে জেনারেলকে। তারপর সংযত অথচ কিছুটা দ্রুত লয়ে বলে চলে—মাঝখানটা ৫০ ফুট গভীর, তীরের কাছে গভীরতা ৩৫ ফুট, আর তলায় জমে রয়েছে সম্ভবত ২০ ফুট পুরু পাঁক।

প্রায় ঠিক ওইখানেই বনের পথে ভেসে আসে গাড়োয়ানের বকবকানি আর গাড়ীর চাকার ঘরঘরানি শব্দ। সবকিছুকে ছাপিয়ে আসে কিন্তু একটি তেজী ঘোড়ার জোড়-কদমের আওয়াজ। কিছুটা সন্ত্রস্ততার মধ্যে সবাই নিজেকে তৈরী করে নেয়।

দূর থেকে দেখা গেল সাদা ধবধবে তেজী ঘোড়ার পিঠে তাঁর ছোট্ট দেহটা। দ্রুত পদক্ষেপে এগিয়ে গেলেন জেনারেল। সম্ভ্রম আর সম্রাট ভরা কণ্ঠে উচ্চারিত হলো কটি শব্দ—সব কিছু ঠিক আছে সম্রাট।

আচম্বিতে ঘোড়ার লাগামে পড়লো টান। এক ঝটকায় ঘোড়ার মুখ ঘুরিয়ে [illegible] তিনি।

দাওয়ার আগে দিয়ে গেলেন এক নিরুত্তাপ নির্দেশ।

সাঁড়াশির গলায় ফ্যাসফেঁসিয়ে ওঠে জেনারেলের আদেশ। মুহূর্তে তৈরী হয়ে দাঁড়ায় সৈন্যরা। এরপরই গাড়ী বোঝাই বাক্সগুলিকে ঠেলে নামিয়ে দেয় হ্রদের জলে। কয়েকটি মাত্র বুদ্বুদ—তারপরই তলিয়ে গেল সেগুলি কালো জলের গভীরে। পালিত হলো মহামান্য সম্রাট নেপোলিয়নের আদেশ।

ফল ইন। কুইক মার্চ। আবার সেই ঘরঘরানি গলার আওয়াজ। অন্ধকারের মধ্যেই এগিয়ে চলে বিচ্ছিন্ন বাহিনী মূল বাহিনীতে যোগ দিতে। শীতের কুয়াশা তখন আরো ঘন হয়ে উঠেছে। দূরে বরফ-জমা প্রান্তরের বুকে রুক্ষ শীর্ণ গাছগুলি

লুণ্ঠিত ছিল সেটিও তাদের হাত থেকে রেহাই পেলো না। লুঠের মাল বুঝে নিয়ে গাড়ী বোঝাই করে স্বদেশের পথ ধরে।

সার্জেন্ট বুরগোগনে নামে একজন ফরাসী সৈনিকের রোজনামচা—অপরাহ্নে রওনা হলাম।...কিছুক্ষণ বাদেই দেখি তিন-চার সার গাড়ীতে ঠাসা রয়েছে প্রায় এক মাইল পথ।...লুঠের সময় আমিও আইভান দি গ্রেটের ঘন্টাঘরের একটা টুকরো ব্যাগে ভরে নি।...সেদিন শুধু ব্যক্তিগতই নয়—প্রতীক সম্পদ লুঠেও এতটুকু অনীহা দেখা যায়নি।

২৫শে অক্টোবর মালোয়ারোস্লাভেট্‌সে [illegible] পর ফরাসী বাহিনী

সৃষ্টি করেছে এক অপার্থিব মায়ার। চারিদিকে কেমন যেন একটা গা ছমছমে ভাব। একটু আগের উৎকণ্ঠ সেমলিওভস্কি হ্রদের তীরে আবার তখন নিথর নিস্তব্ধতা।

কিন্তু সত্যি সত্যিই কী সম্রাট নেপোলিয়নের মস্কো লুণ্ঠনের সম্পদ চিরতরে থেকে গেল এই সেমলিওভস্কি হ্রদের তলায়? সঠিক উত্তর আজো অজানা।

তবে সেদিন অর্থাৎ ১৮১২ সালে নেপোলিয়নের বিজয়ী বাহিনী যখন প্রবেশ করল প্রায় পরিত্যক্ত অগ্নিদগ্ধ মস্কো নগরীতে তখন কেউ স্বপ্নেও ভাবেনি এখান থেকেই শুরু হবে ফরাসী বাহিনীর পিছু হটার পালা। দুর্দান্ত ফরাসী বাহিনীর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল রাশিয়ার প্রচণ্ড শীত দস্যু। ওদিকে খাদ্য নেই—সরবরাহ বন্ধ। সেনানীরা বিভ্রান্ত—বিপর্যস্ত। অবশেষে উনিশে অক্টোবর নেপোলিয়ন পশ্চাদ অপসরণের নির্দেশ দিলেন।

প্রকৃতির কাছে মার খেয়ে ফরাসীরা যেন রাগে উন্মাদ হয়ে যায়। মস্কোর যেখানে যা-কিছু তারা পেলো তাই লুঠ করলো। এমন কি আইভান দি গ্রেটের ঘন্টাঘরের রুপোর ওপর সোনার গিল্টি করা যে

শ্রান্তি' আর হতাশায় যেন একেবারে ভেঙে পড়ে। সেনাবাহিনীর সার্জন ডঃ রোস-এর দিনলিপির পাতায় লেখা আছে সে কাহিনী। যুদ্ধক্ষেত্রে ফেলে আসা সবকিছু নষ্ট করে দেওয়া হচ্ছে। গাড়ী ভর্তি কামানের গোলাতেও আগুন দেবার নির্দেশ দিলেন জেনারেল।

১লা নভেম্বর...কসাক বাহিনীর প্রচণ্ড আক্রমণের মুখে আমরা যেন দিশেহারা হয়ে পড়েছি। পতাকাদণ্ড থেকে পতাকা নামিয়ে নিয়ে সৈনিকরা তা ব্যাগে ভরে ফেলছে, কেউ বা পতাকাটা কোমরে জড়িয়ে রাখছে।'

রুশ সেনা ও গেরিলাদের ক্রমাগত আক্রমণে ফরাসীদের শুধু খাদ্য নয়, পরিবহনে অশ্বতেও টান পড়লো। অশ্বহীন গাড়ীগুলিকে আগুন দিয়ে বা গোলার ঘায়ে তারা উড়িয়ে দেয়। বাকী গাড়ীগুলি বয়ে নিয়ে চলে আহতদের।

ক্রমেই মস্কো লুঠের মাল প্যারিসে নিয়ে যাবার আশা যেন শূন্যে মিলিয়ে যেতে থাকে। তাই ঝটিতি সিদ্ধান্ত নেওয়া হলো, অপহৃত সম্পদ আবার শত্রুর হাতে পড়ার আগেই তা লুকিয়ে ফেলতে হবে গভীর জলের নীচে। এ-কাজের জন্যই

নেপোলিয়নের গুপ্তধন সন্ধানের একটি ব্যর্থ প্রয়াস

বোধহয় বেছে নেওয়া হয় সেমলিওভস্কি হ্রদকে।

সেদিন থেকেই সেমলিওভস্কি হ্রদ গুপ্তধনের লোভ দেখিয়ে কাছে টানছে সবাইকে। জার প্রথম নিকোলাস থেকে শুরু করে বহু রাজ্যের প্রধান, বেসরকারী সংস্থা ও ব্যক্তিকে সে যেন হাতছানি দিয়ে ডাকছে। আশার মরীচিকায় বিভ্রান্ত সেইসব মানুষ গুপ্তধনের নেশায় ছুটে এলেও তাদের ভাগ্যে জুটেছে শুধুই ব্যর্থতা। কেননা তারা গুপ্তধন উদ্ধারে ছুটে এসেছিল শুধু জনশ্রুতি আর কিছু পরস্পর-বিরোধী কাহিনী সম্বল করে।

কিন্তু সম্প্রতি আধুনিক বিজ্ঞানে উন্নত রাশিয়া তার অনুশীলিত জ্ঞান আর কারিগরি কৌশল নিয়ে এগিয়ে এসেছে এর রহস্যভেদে। ফলে তাদের হাতে এসেছে বেশ কিছু তথ্য। বিভিন্ন পরীক্ষা-নীরিক্ষার পর এখন দুটি বৃত্তচিহ্নিত স্থানকে অনুসন্ধান চালাবার জন্য বেছে নেওয়া হয়েছে। উদরসায়নবিদরা (হাইড্রোকেমিস্ট) বলেছেন ওই চিহ্নিত এলাকাতেই আছে গুপ্তধন।

রহস্যভেদের সম্ভাবনা উজ্জ্বল হয়ে ওঠে ১৯৬১ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে। উদভূতত্ত্ব সমীক্ষা সংস্থা ও মস্কোর ছাত্রদের এক যুক্ত অভিযানের সময় সেমলিওভস্কি হ্রদ এবং তার আশপাশের এলাকা থেকে জলের ৫২টি নমুনা সংগ্রহ করা হয়। পরীক্ষা করে দেখা যায়, হ্রদের জলে সোনা, রুপো, তামা, টিন ও দস্তার পরিমাণ অন্যান্য এলাকার চেয়ে কয়েক ডজন গুণ বেশী।

হ্রদের উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের দুটি এলাকার ওইসব ধাতুর ঘনত্বের পরিমাণ উল্লেখ করার মত। রৌপ্য আকরিকের প্রায় সম-পরিমাণ রুপো ওই এলাকার জলে পাওয়া গেছে।

১৯৬৩ সালের উদ-রসায়ন সমীক্ষায় ওই এলাকার জলের ওপরই বেশী গুরুত্ব দেওয়া হয়। দু বছর ধরে যে সমীক্ষা চলে তাতে হ্রদের জল নেড়েচেড়ে একবারে তোলপাড় করে দেওয়া হয়। তার পরও ওই দুটি এলাকায় দামী বিরল ধাতুর পরিমাণ এত বেশী থাকায় একটি মাত্র ব্যাখ্যা দেওয়া যায় যে, ওইসব ধাতুর উৎস হ্রদের তলার দিকেই রয়েছে।

হ্রদটির আশেপাশে কোন খনির অস্তিত্ব নেই। কাজেই ওইসব ধাতু বাইরে থেকে এসেছে। আর সেটা নেপোলিয়নের মস্কো লুঠের মাল বলেই মনে হয়।

সেমলিওভস্কি হ্রদের পাঁক পরীক্ষার জন্য মস্কো অ্যাভিয়েশন ইনস্টিটিউট স্কী ক্লাব-এর স্কিন ডাইভাররা পাম্প ও সাকশন ড্রেজার দিয়ে পাঁক উদ্ধার ও জল পরিষ্কারের চেষ্টা করে যাচ্ছে। এখনও তাতে উৎসাহিত হবার মত ফল পাওয়া না গেলেও হারানো রত্নোদ্ধারের আশায় আজও সন্ধানে কাজ এগিয়ে চলেছে। দেখা যাক সেদিন ঘন-কুয়াশায় মধ্যে যে নাটকের যবনিকা পড়েছিল আধুনিক বিজ্ঞানের উজ্জ্বল আলোকচ্ছটায় তা আবার ওঠে কিনা? নেপোলিয়নের গুপ্তধন আবার প্রকাশ্যে দেখা দেয় কিনা?

উপন্যাস

সুবনশিরি

অমরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

পাঁচ

কদাচিৎ কোথাও কৌলিন্যবিহীন পাহাড়ের বুক চিরে চলেছে রেলপথ, তার বাইরে চারদিকেই ঝোপঝাড়, প্রান্তর, গ্রামের অন্তর। রেলগাড়ীর আবির্ভাবে কোথাও শিশুরা অভ্যর্থনা জানায়, বীরত্ব দেখায়। এমনই সব দৃশ্য যাতে অনেক সময় আত্মহারা হয়ে যেতে হয়, বাংলাদেশের মাঝে চোখ দুটো যদি না ছুটে যায় চক্রবালে। যেখানে দু-পাশে প্রান্তরের শেষে আকাশ ছুঁয়ে আছে দিগন্ত জুড়ে ক্ষীণ মসীরেখায় নিবদ্ধ পর্বতমালা। ডাইনে খাসিয়া, মিকির, নাগা, পাটকই,—বাঁয়ে ব্রহ্মপুত্রের পরপারে বহু দূরে একটানা ভুটান, তারপর বালিপাড়া ফ্রন্টিয়ার, ডাফলা, আবর, আরও কত পাহাড়—উত্তর থেকে গেছে আরও উত্তরে।

মাঝে মাঝে, এমন কি ব্রহ্মপুত্রের বুকেও অনেক ছোটখাট পাহাড়, তাদের নাম আলাদা কিন্তু গোত্র এক—যদিও আপাত-দৃষ্টিতে তা ধরা পড়ে না। তারা যে একই গোত্রের তা প্রমাণ করতে পাহাড়গুলো মাঝে মধ্যে এগিয়ে এসেছে রেললাইন বন্ধ করে দিতে, আবার দূরে সরে গিয়ে ইতর-জনের মনে ভ্রান্তি এনে দিয়েছে। লঙ্কা থেকে ডিপু—এই দুটি স্টেশনের মাঝে কয়েক মাইল লাইনটা গেছে মিকির পাহাড়ের মধ্যে সুড়ঙ্গ পথ দিয়ে মিকির পাহাড়ের যে অংশটা গেছে ডাইনে তারই অঙ্গাঙ্গি হল কাজিরঙ্গা ফরেস্ট—নওগাঁ ও শিবসাগর জেলার মাঝামাঝি। পৃথিবীর নানা দেশের পর্যটকের কাছে পরিচিত এই কাজিরঙ্গা গেম-স্যাংচুয়ারি। এখানে কত সব অতিকায় বন্য জীবজন্তুর সহজ সাবলীল চলাফেরা দেখতে পাওয়া যায়, তেমনিটি আফরিকার গেম্-স্যাংচুয়ারি ছাড়া আর কোথাও সম্ভব নয়। এখানকার আকবর (হাতীর নাম), বুড়োগুণ্ডো (গণ্ডারের নাম), বহু দেশের গণ্যমান্য লোকের কাছে পরিচিত।

আকবরের পিঠে বসে পর্যটকরা গেছে গভীর জঙ্গলে—ওদের এসেছে বুড়োগুণ্ডোর চলাফেরা, দেখে এসেছে আরও কত জীব-জন্তু। তারাও দেখেছে আকবরের পিঠে কত রং-বেরং-এর মানুষ—কখনো তাচ্ছিল্য করে চলে গেছে, কখনো বা অবাক হয়ে চেয়েও থেকেছে।

কাজিরঙ্গা জঙ্গলে আজ আর আকবর নেই, নেই বুড়োগুণ্ডাও। তাদের জীবন-মৃত্যুর কথায় দেশ-বিদেশের নাম-করা সংবাদপত্রের পৃষ্ঠা ভরে গেছে। ইতিহাস প্রসিদ্ধ তারা। কিন্তু সে খবরটা তারা জেনে গেল না।

এখানকার জন্তু-জানোয়ারের কত রকম-সকম দেখেছে কত লোক। বিলিও দেখেছে কত। সেই জঙ্গলের পাশ দিয়ে যাবার পথে একটা তার মনে পড়ল। সাধারণতঃ এক-এক জাতের জীবজন্তু এক-এক জায়গায় থাকে, অন্যথায় কিছু মুস্কিল ঘটে। একদিন হঠাৎ এক গণ্ডারের সঙ্গে এক হাতীর দেখা। হাতীটা দেখেছে, কিন্তু গ্রাহ্য করে নি। তারাবনের পাশে সে বিষয়কর্মে ব্যস্ত, গণ্ডার অতটা উদাসীন থাকতে পারল না। সে ধীরে ধীরে হাতীর দিকে এগিয়ে চললো। হাতীটা দু-চারবার শুঁড় দোলা দিয়েও যখন তাকে শাসন করতে পারল না, তখন গণ্ডারের দিকে মুখ ফিরিয়ে শুঁড়টা খাড়া করে দাঁড়ালো। গণ্ডারও থমকে দাঁড়িয়ে কুস্তিগিরের মতো পাঁয়তাড়া করতে লাগল। যে কোন মুহূর্তে ছুটে গিয়ে গোঁত্তা খেয়ে পড়বে হাতীর ওপর। সে-ই বা কম কিসে। দুজনের মধ্যে শ-খানেক গজ ফাঁকা মাঠ। হঠাৎ গতর নাড়া দিয়ে গণ্ডারটা গোঁ-গোঁ করে ধাওয়া করল; হাতীও প্রস্তুত, যেখানে দাঁড়িয়েছিল সেখান থেকেই শুঁড়টাকে নীচে থেকে টেনে জোরার সঙ্গে এক ভীষণ হুঙ্কার, বা ধমক দিয়ে উঠলো। কে যেন হঠাৎ গণ্ডারের মুখে লাগাম কষে ধরল—চার-পা সামনের দিকে এগিয়ে আর বিকট দেহটা আটকে আছে লাগামের টানে। হ্যাটস্ অফ—নাঃ, ভুল হয়ে গেছে! গতর ফিরিয়ে গণ্ডার ছুটে পালালো—হাতীটা মুখ ঘুরিয়ে তারাবন থেকে একগোছা তারার ডগা জোগা মুখের মধ্যে ভরে দিল। যেন কিছুই হয়নি।

দিনের বেলায় গ্রাম ও প্রান্তরের মধ্য দিয়ে হু-হু করে ছুটেছে ইন্‌জিন্ সোনালী বগিগুলো টেনে। হু-হু করে বয়ে চলেছে তাদের চিন্তা, বগিগুলোর মতোই হেলে-দুলে। হয়তো যতখানি সচল ট্রেন ততখানি অচল তাদের মন। নয়তো দুটোই চলেছে রেসের ঘোড়ার মতো, একবার এগিয়ে একবার পিছিয়ে।

বেলা বাড়ে। রৌদ্রের ঝলকে হাওয়ার কোলে করে পড়ে সোনালি বালুকণা। শুধিয়ে আসে তলার নদী। বস্তিটার সঙ্গে দুলছে সকলের দেহ, দুলছে ওদের তিনটি প্রাণীর মাথা। যতই এগিয়ে যাচ্ছে, পথ আসছে কমে, ততই জমাট বাঁধে ওদের ভাবনা। মড়মড় করে গুঁড়িয়ে পড়ে, গুঁড়ে-গুঁড়ে করে গড়িয়ে পড়ে—কালবৈশাখীর ঝড়ে ধুলার মতো উড়ে বেড়ায় আবার সব সম্ভব! আবার জমাট বাঁধে। ভাবতে ভাবতে কখনো তন্দ্রায় ঢুলে পড়ে, কখনো চমকে ওঠে। দিন মিলল সন্ধ্যায়, এল রাত্রি, আবার রাত প্রভাত হল।

ভোরের আলোয় জানলা দিয়ে মুখ বাড়াল লছমী। দূরে সবুজ প্রান্তর জুড়ে একটা দুধের প্রলেপ যেন কুয়াশা। সামনে, লাইনের পাশে সারিসারি চা-গাছ। জেগে উঠলো চোখ, নেচে উঠলো তার মন। হঠাৎ দুঃখ টপকে এল সুখ। রাবণকে সে বলল—চল যাই একটা বাগানে। তুমি কাজ করবে, আমিও সারাদিন পাতা তুলব। কোন কষ্ট হবে না আমাদের।

বোবার মতো চেয়ে রইল রাবণ। বিলিকে নিয়ে সে থাকতে যাবে সে কুলিদের সঙ্গে, কুলি বস্তিতে!

বাগানের কথা বিলি প্রায় ভুলেই ছিল। লছমীর কথায় খাঁ-খাঁ করে উঠল তার বুকের ভিতরটা। জানলা দিয়ে সে মুখ বাড়াল। চা-গাছগুলো বিলির দিকে তাকিয়ে সমবেদনা জানাল, কেঁদে উঠলো। বিলির দুগাল বেয়ে নেমে এল দুটি চোখের জলের ধারা। অপর দুটি প্রাণী নির্বাক হয়ে চেয়ে রইল।

আলমাঁগিরহাটে থেমেছিল, যা স্থির করেছিল এ পথের শেষ ডিব্রুগড়ে। কিন্তু এত যে গাড়ী বদলের ঝঞ্ঝাট তা বুঝে উঠতে পারেনি। এসব ভাল লাগছিল না। ইচ্ছা ছিল একটু নিশ্চিন্ত হয়ে বসে থাকা। সকালবেলা পেঁছিল তিনসুকিয়া জংসনে। আবার গাড়ী বদল।—আবার বিস্তীর্ণ প্রান্তর। চোখে পড়ে দিক-দিগন্তজোড়া চা-গাছ, ছাঁটাইকরা ডগার ওপর নতুন সবুজ কুঁড়ি। আকাশের কোল পর্যন্ত বিছানো একখানা সবুজ জাজিম। তার ওপর অজগরের মতো ফণা তুলে কি একটা লুকলুকিয়ে বেড়াচ্ছে? ওঃ, ইনজিনের পিছনে ট্রলি। চারপাশ খোলা ঘরের মতো গাড়ী, তাতে জালের থাক—তার ওপর সদ্য তোলা পাতা। আর একটা ইনজিন্ কতগুলো ঝাঁপ টেনে নিয়ে এসে দাঁড়িয়েছে বড় লাইনটার পাশে—সাইডিং-এ। চায়ের পেটিতে বোঝাই বগিগুলো, পাশের ডালা খোলা। মাল খালাস হয়ে চালান যাচ্ছে। আর খোলা ডাব্বায় বোঝাই হচ্ছে কয়লা।—এখানে এমন ব্যবস্থা? তাদের দার্জিলিং-এ তো দড়ির রাস্তা—নেমে গেছে শিলিগুড়ি পর্যন্ত। তার ওপর দিয়ে হনুমানের মতো ঝুলতে ঝুলতে আসা-যাওয়া করে মাল বোঝাই যত ডাব্বা।

ফুল নয়, ফল নয় শুধু সবুজের সমারোহ—তার ওপর অসংখ্য ভ্রমরের গুঞ্জরণ! —ওঃ! কুচকুচে কালো মেয়েগুলো পাতা তুলছে আর গান গাইছে :

বড় বহিন্ ধান ভানে
মারে গেছে ঘাটে,
ছোট বহিন্ পাত্ তুলে
বাপে গেলো মাঠে।

এই ক'টি কথার মধ্যে তাদের দৈনন্দিন কর্মরত জীবনের কথা শেষ।

খুশীতে দুলে উঠল লছমীর দু-চোখ। পারে তো লাফিয়ে পড়ে, ছুটে যায় ওদের মধ্যে।

গাড়ী চলেছে হেলে-দুলে। দু-পাশের কত দৃশ্যের ওপর দিয়ে চোখ বোলাতে বোলাতে কত কথাই না ভেসে উঠছে তাদের মনে। কত কথা, কত ভাবের মধ্যেই না তলিয়ে যাচ্ছে তাদের মন।

সুদীর্ঘ পথের অবসান হয়। গাড়ী এসে দাঁড়ায় ডিব্রুগড়। যাত্রীরা সব একে-একে নেমে গেল। যেন নিঃশ্বাস বন্ধ করে সেসব দেখলো তিনটি প্রাণী। তাদের যেন এখানে নামতে হবে না। একজন প্লাটফর্মের দিকে, অপরজন তার উল্টো দিকে মুখ ফিরিয়ে বসে রইল। লছমীও তাকায় একবার এর পানে আর একবার ওর পানে। সে কি করবে, কি বলবে? কথাগুলো জট পাকিয়ে যায় মনের মধ্যে, কিছুতেই সে জট খুলতে চায় না।

কামরায় এল এক বুড়ো ঝাড়ুদার। গাড়ীতে উঠে ক্ষণেকের জন্য সে থমকে দাঁড়াল তাদের দিকে চেয়ে। তারপর মুখ ফিরিয়ে ঝাড়ু দিতে লাগল একপাশ থেকে। একটা কাজ পেল তারা। তিনজোড়া নিষ্ক্রিয় চোখ সক্রিয় হল। দেখতে লাগল ঝাঁট দেওয়া। লছমী দেখে তার কাজের নৈপুণ্য। বিলির চোখ দুটো শুধু ঘোরা-ফেরা করে ঝাঁটার সঙ্গে। রাবণও দেখছে, চোখ দিয়ে নয়, মন দিয়ে—সে ভাবছে :

কাজ শেষ করে সে যাবে কোথায়? ঘরে। একখানা কুঁড়ে, নয়তো রেলের পাকা কোয়ার্টার। নোংরা হাঁস-মুরগী কুকুর। শুয়োরগুলো হয়তো ঘোঁৎ ঘোঁৎ করে বেড়াচ্ছে। আর?—তার ছেলেমেয়ে, বৌ। ছেলেমেয়েরা উলঙ্গ, নয়তো অর্ধউলঙ্গ। বৌটার গায়ে রঙিন ছিটের ব্লাউজ, তার ওপর আঁটসাট জড়ানো ময়লা শাড়ীটা। হয়তো রান্নায় ব্যস্ত সে, নয়তো অবাধ্য ছেলেমেয়েদের উৎপাতে অস্থির—তেড়ে যাচ্ছে তাদের মারতে। নয়তো দুটোর সঙ্গেই তাল রেখে চলেছে। খুন্তি চালনার সঙ্গে মুখও চলছে তার মরদের কোন ত্রুটির উপলক্ষে। ফেনের রেখা বেয়ে হাঁসটার ঠোঁটটা নর্দমা থেকে উঠে এল উপুড় করা ভাতের হাঁড়িটার গায়ে। ঠোক্কর দিয়ে উল্টে দিতে চায় হাঁড়িটা।—একটা খুন্তির ঘা! প্যাঁ-ক্ করে হাঁসটা লাফিয়ে পড়ল দাওয়া থেকে উঠোনে। মুরগীগুলো চারদিকে ছিটকে পড়ল সন্ত্রস্ত সমবেদনায় ডাকতে ডাকতে। শুয়োরগুলো সশব্দে সরে গিয়ে নিরাপদ হল। ছুটে এসে মেয়েটা কোলে তুলে নিল হাঁসটাকে, গালি দিয়ে উঠলো তার মাকে। যথাযথ প্রতিবাদ করে মা-ও খুন্তিটা ঠুকলো ভাতের হাঁড়িটার ওপর। ফেনসমেত ভাত গড়িয়ে গেল নর্দমায়। হায় হায়! আর চাল নেই, পয়সাও নেই। যেখানে অভাব সেখানে সব কিছুরই অভাব। মায়ের রাগ উঠল সপ্তমে, খুন্তিটা সে ছুঁড়ে মারল মেয়েটার দিকে। তার কোল থেকে হাঁসটা পড়ে গেল—মেয়েটা লুটিয়ে পড়ল উঠোনে। তার চোখের কোল থেকে রক্তের ফিনকি। রান্না ফেলে ছুটল মা।

কাজ শেষ করে ঝাড়ুদার বললে—জী! আপকা আদমি আভি তক্ নাহি আয়া? কাঁহা যাওগে?

রাবণের ভাবনাটা থমকে গেল। বলল—হাঁ—না, ওঃ। তোমরা ঘর্ কাঁহা?

ঝাড়ুদার দেখিয়ে দিল লাইনের পাশে কোয়ার্টারগুলো। ওরই মধ্যে একখানা তার।

রাবণ ওকে জিজ্ঞেস করে বলল—তোমার খোঁজে কোন ঘরভাড়া আছে?

ঝাড়ুদার এক পলকে দেখে নিল তিনজনের চেহারা, পোশাক-পরিচ্ছদ। লছমী ও রাবণের সাজগোজ যত পারিপাট্যই থাক না কেন, তাদের গায়ের মেঠো গন্ধ তখনও দূর হয় নি। কিন্তু বিলির?—সে রেলের ঝাড়ুদার। দিনরাত কত রকমের মানুষ সে দেখে। তার ওপর এটা চা-বাগান অঞ্চল। সে জানে সাহেবের অনুগ্রহে একটা মেয়ের মেমসাহেব হয়ে উঠতে বেশী সময় লাগে না। কিন্তু মেমসাহেব যখন পুনর্মূষিক হয়ে ঘরে ফিরে আসে তখন তার পোশাকের সঙ্গে কোন সামঞ্জস্য থাকে না দারিদ্র্য নিষ্পেষিত ঘরখানার। একদিকে থাকে বুকের মধ্যে ভোগ-বিলাসের ছাই-চাপা আগুন, সুখ-নিদ্রার স্বপ্ন জড়িমা—আর একদিকে মা-বাপ, ভাই-বোনের সহজাত আন্তরিকতাপূর্ণ ক্ষুদ্র পরিসর।

ঝাড়ুদার চোখ বুজে নাকের ডগাটা দুটো আঙুলে পিষে আপন মনেই আওড়ে নিলে—বেশী খরচ করা এখন তো ঠিক হবে না। তারপর চোখ খুলে বললে—আমাদের লাইনের কাছেই একটা বাড়ী আছে। ঘর-পিছু ভাড়া দশ টাকা, ইচ্ছা করলে দুখানাও নেওয়া যাবে, ভাড়াও কিছু কম হবে তাতে। ইক্রার (কঞ্চির মতো বস্তু) গায়ে মাটি ধরানো চুনকাম করা বেড়া, টিনের চাল, পাকা ভিটে, বিজলী বাত্তিও আছে।

স্বর্গ হাতে পেল রাবণ। অসঙ্কোচে আত্মীয়তা পাতিয়ে সে বললে—আমাদের সেখানে নিয়ে চল বাবা।

চা-বাগানে তাদের বসবাস। সেখানে একদিকে যেমন অনেক বাধানিষেধ, অপরদিকে তেমনি সাবলীল মেলামেশা। ছেলে-মেয়ের বিয়ে দিতে জাতের বাছবিচার চলবে, কিন্তু খানাপিনা একসঙ্গে একই মজলিসে চলে। তাই ঝাড়ুদারের সঙ্গে সমভাবেই কথা বলা তাদের অভ্যাস।

লছমীও উঠে দাঁড়ালো, বললে—হাঁ, বাপুজী। চল চল।

শহরে অনাত্মীয়ের মুখে এমন সম্বোধন সে শোনে নি। ওদের কথায় জমাদারের মনটা সত্যই বাপুজীর মতো হয়ে গেল।

ছয়

সেই বাড়ীতেই যাওয়া হল। সেখান থেকে দিন কয়েক পর বিলিকে যেতে হল হাসপাতালে। দুজনই প্রায় যায়-যায় কিন্তু কোনমতে রক্ষা পেয়ে গেল। বিলির কোল জুড়ে এল একটি পুত্রসন্তান। মাসখানেক হাসপাতালে থেকেও বিলি বিপদমুক্ত হতে পারল না। এই অজানা দেশে দৈবের অনুগ্রহে তারা সেই ঝাড়ুদার, তুকারামকে পায়। সেই বৃদ্ধই তাদের একমাত্র বন্ধু। হাসপাতালে তার অনেক বন্ধু। তাদের সে বলে দিয়েছে যাতে প্রসূতির সেবাযত্নের কোন ত্রুটি না হয়। রাবণ ও লছমী রোজই সেখানে যায়, বিলি ও বাচ্চাটিকে দেখে আসে, পথ্যাদি খাইয়েও আসে। তুকারামও কোনদিন যায় ওদের সঙ্গে।

কর্মক্লান্ত দিনের শেষে তুকারাম গিয়ে বসে রাবণের দাওয়াটিতে—কথা কয়, ভরসাও দেয়। রাবণ বললেই তাকে কোন চা-বাগানে, বা যেখানে হোক একটা কাজের ব্যবস্থা করে দেবে। যেতে পারলে তখনই একটা ভাল কাজ দিতে পারে, কিন্তু তা তো সম্ভব নয় এ অবস্থায়।

রুগ্নী যে অবস্থায় ফিরে এলো হাসপাতালের কর্তৃপক্ষ দায়মুক্ত হয়ে, সে অবস্থায় পৌঁছে বিলির ছুটি মেলে। রোজ

থেকে রেহাই পেয়েছে বটে, কিন্তু তখনো চলেছে ফ্যাকড়ার জের টেনে। ডাক্তার, পথ্য ঠিকমত না চললে অন্য জটিলতা দেখা দিতে পারে। রাবণ প্রাণপণ চেষ্টা করল চিকিৎসার ব্যবস্থা বজায় রাখতে, লছমী দিল সেবা।

শহর ছেড়ে বাগানে গেলে বিলির চিকিৎসা হয় না। তাই ভাল-ভাল কাজের সুযোগগুলো হাতছাড়া হল। রাবণ অনেক খাটাখাটুনির কাজে অভ্যস্ত। ঠিকা কাজে কিছু-কিছু কামাই করে আনে। তাতে কি আর এত খরচের সামাল দেওয়া যায়। তাই হাতের পয়সা প্রায় শেষ হতে চলল। কত-দিন আর এভাবে চলবে? তাই তুকারাম শহরেই একটা কাজ জুটিয়ে দিল রাবণকে। এক অফিসের দারোয়ান। তার ওপর বাড়তি খেটেও পয়সা আনত। তাতে আরো কিছু-দিন রাবণ যুঝল।

ফ্যাকড়া কমে গেছে, কিন্তু তখনো বিলি বড় দুর্বল। আরো কিছুদিন নিয়ম মতো চালাতে হবে। একমাত্র রাবণের রোজ-গারে সকলের পেট চালানো দায়। তার ওপর দামী দামী ওষুধ, ভাল ভাল পথ্য।

সব দেখেশুনে বিলি বলে—আমি তো এখন চলতে-ফিরতে পারি। কোন ইস্কুলে একটা কাজের যোগাড় ক'রে নিই না।

ইস্কুলে কাজ করবার যোগ্যতা বিলির আছে। কিন্তু রাবণ জানে, ভদ্র-সমাজের নানা প্রশ্ন, নানা বাধাবিঘ্নের কথা। বিলিও যে না বোঝে, তা নয়। কিন্তু অবস্থা বিপর্যয়ে সেসব ভুলতে, বা উপেক্ষা করতে বাধ্য হয়েছে সে। এখন তাই সে চায় রোজগার ক'রে তাকে সাহায্য করতে। সে চেষ্টা কত আশঙ্কা, কত বিড়ম্বনা ভরা। বিলি তো নিজের ঘটনা রেখে ঢেকে কথা বলবে না। তাহ'লে তো বহু আগেই তা পারত। তার সততার মর্যাদা দেবে কে? তবে শুধু হাসাহাসি। না, আর নয়। কোথা থেকে কোথায় এসে দাঁড়িয়েছে আজ বিলি। জীবনের সকল মাধুর্য সে হারিয়েছে। তাই এখন সে এড়িয়ে থাকতে চায় এখানকার সমাজ। চায় নিজের লজ্জাকে আড়াল ক'রে রাখতে, এই লোকালয়ের অন্তরালে, দূরে একান্ত নিরিবিলি জীবনযাপন করতে। তাই রাবণ সায় দিতে পারেনা তার নিরীহ সাধু প্রস্তাবে।

লছমী বলে—কোন বাগানে চল না। দিদি ঘরে থাকবে ছেলেটা নিয়ে, আমরা দুজনে কাজ করব। আমি পাতা তুলে অনেক কামাই করব। ভালই চলবে।

বিলি চুপ ক'রে থাকে, কোন মতামত দেয় না লছমীর কথায়। রাবণ বোঝে, এ মৌনতা সায় দেয় লছমীকেই। বাগানের পরিবেশেই আছে তাদের সকল প্রয়োজনের সমাবেশ।

তুকারাম যোগাড় করে দেয় কাজ। [illegible] ছেড়ে তারা যায় [illegible] কাছেই এক বাগানে।

বিলিকে নিয়ে বাধল এক নতুন ঝঞ্ঝাট। সেখানে রাবণ জানাল বিলি তার ঘরণী নয়। অতএব বাগানের কর্তৃপক্ষ রাবণের সঙ্গে তাকে এক ঘরে থাকতে দেবে না। তাদের ভয়, কোথা দিয়ে কি ঝঞ্ঝাট এসে যায়। বিলি কোন কাজ করবে না, তার জন্য তাই আলাদা ঘরও দেওয়া যায় না। ফিরে আসতে হ'ল সেখান থেকে। রইল আগের ঘরেই শহরের চাকরিটা ছেড়ে দিল, ও-দিকেও কিছু হ'লনা। মাথায় হাত দিয়ে বসল সবাই।

সব শুনে তুকারাম মহা দুশ্চিন্তায় পড়ল। যেন নিজেরই রুজি গেছে। এই অঞ্চলটার চারপাশে বড় বড় বাগান। বাগানের নানা কাজে সকলকেই আসতে হয় ডিব্রুগড়। যন্ত্রপাতি মালপত্র খরিদ তো নিত্য-নৈমিত্তিক ব্যাপার। সেখানে অনেক সাহেব কোম্পানীর শাখা। হয় তুকারাম, নয় তার কোন বন্ধু ব্যাপারী বা

[illegible] নিজের লোক [illegible] তুকারাম বিশেষ পরিচিত ও বিশ্বস্ত লোক। তার সুপারিশ ছাড়া কেউ [illegible], মেয়েরা-বাচ্চাদের কাজ পায় না [illegible]। তখন থেকেই বাগানের সাহেবদের সঙ্গে তার মেলামেশা। সবাই জানে, সাহেবরা তাকে কত ভালবাসে। সাহেবরা ওঠবস করে তুকারামের কথায়। কিন্তু আসল ঘটনাটা কি দিয়ে কি করে সে। [illegible] জানতে দেয়, যেন ব্যবহারে না জানায়।

বয়সে রাবণের ছোট বিজি। শৈশবে রাবণ তাকে নাম ধরেই ডাকত। পরে বাপের শাসনে তা বদলে যায়। নামের সঙ্গে জুড়ে গেল দিদিরাণি। এক দিন অজান্তে নামটা বাদ পড়ে যায়, থাকে শুধু দিদিমণি। তুই বা আপনি তুমির বালাই নেই এ-সমাজে। সকলে একই কথা। একটা সর্বনামই যথেষ্ট, সে নিজের বাচ্চা বা বাবু যেই হোক। তবে বড়দের সঙ্গে বেশী মেলামেশায় ওদেরও রপ্ত হয়ে থাকে। রাবণেরও তা হয়েছে। যেদিন জন্সনের কাজে নিযুক্ত হ'ল, সেদিন থেকে রাবণ এক অদ্ভুত সম্বোধন আবিষ্কার করে নিল। বিজির ডাকে সাড়া দিয়ে সে বলত—সরকার, বা জী-সরকার।

কথাটা নিয়ে জন্সনের সঙ্গে বিজির কত হাসাহাসি হয়েছে। বিজি কিন্তু তাকে একটানা নাম ধরেই ডেকে এসেছে। রাজকুমারীর শাসনেও কোনদিন দাদা ব'লে ডাকেনি রাবণকে। অজানা ভাবে কবে যেন তুই থেকে শুধু তুমিতে উঠেছে।

রাবণের জেরবার সংস্কারটা আরো জেরবার হ'য়ে পড়ল। সে অবস্থা থেকে মুক্তি পাওয়ার একটা উপায় বিজির মাথায় এল। সে বলল—শহরে আমার কোন কাজ করতে দেবে না, বাগানের কাজও হবে না আমাকে দিয়ে। বৌ না-হলে তোমাদের সঙ্গে থাকতে পারব না বাগানে, তবে আমাকে বৌ বলেই নিয়ে চল না।

রাবণ সাতকান মলা খেল, জিব কাটল। সরকার এ কি কথা? রাম রাম! ব'লে, মুখ ফিরিয়ে রইল রাবণ।

এত দুঃখের মধ্যেও দুজন হেসে গড়িয়ে পড়ল রাবণের কাণ্ড দেখে।

কয়েক মাসে রাবণ ও তুকারামের মধ্যে বেশ ঘনিষ্ঠতা জমে উঠেছে। রাবণদের সব কথাই শুনেছে তুকারাম। কথা যতই গোপন হোক, তা প্রকাশ করবার মতো কোন দরদী হাতে পেলে মনটাকে বেঁধে রাখা বড় শক্ত। তার ফল কখনো খারাপ হয়, কখনো হয় ভাল। কিন্তু এক্ষেত্রে ভালই ফল দিল। তুকারামের মনটাও গোপন ব্যথার বিষে জর্জরিত। তাই রাবণের কথা শুনতে শুনতে একদিন তুকারামের নিঃশ্বাসও ঘন হ'য়ে এল। বিন্দু মেয়ের কথা, মেয়ের মায়ের কথা ভাবতে ভাবতে তার মনে জেগে ওঠে নিজের বাল্য জীবনের ক্ষীণ স্মৃতি। হঠাৎ বুকের ভিতরটা মোচড় দিয়ে উঠল [illegible] শুধু [illegible] [illegible]

—দেখ্ রাবণ্, আদ্মিকা [illegible] সোবব আছে। হামার বিজি মাজীকা এইসা হোনেকা বাত্? ঊঁ বাচ্চা লেইকেটা কি ঊঁ রোকম ভাইসে যানেকা বাত্, নাই তুঁদের ইমন বিপদ পড়নেকা কথা? ইঁদের সংসারে তুঁর নসিবকা দশ জানাই বটি অচারিত্তা (আশ্চর্য) লাগে হামার। নাহি তো কি দুঃখ্ পড়ত, তাবি তা।

—হাঁ বুড়িয়া হামকে বাত করম কোরত। মাজী রকম নাই নাই মিলবেক্। ইরা হামার মরণে কি করিছে তার সোব বাত্ হামি ভাগে পুছারে নাই কইতে পারি। হামার যি কুছ হোইছে সেবই ইদের সোহায়। হামার কথা নাহি ভাবি। ইদের মুখ দেখা পা'লে দিলটো খুশ হোইতো। মাজী জীয়া থাকলে আজ হামদের এতনা দুঃখ নাই মিলত।

—সি কথাই তো কহিসি। ভগ্বান্ ঊঁদের সোব কাইড়ে লিসে, ইকটা দিসে, তুঁদের দিসে। নসিব! ঊঁ নসিবটা মানুকে কাঁহা সেইকে কাঁহা লেই যা'ছে শুনিবি?—হামারা ঘর সিল পাঠনা।

—পাটনা? সি তো হামার বগলে দুর আছে!

—দুর আসে? তোবে দ্বারভাঙ্গা, শহরকা নজ্দিক্ হামরা ঘর।

—দ্বারভাঙ্গা? সি তো হামার বগলে দুর নাই আছে।

—আদ্মি কহে রাঁচি, হামি কইসি দ্বারভাঙ্গা। হামে তোখনে খুব ছোটা দিলি কিনা, ওত্না নাই জানিসলি। শুন্না বাত্টা। এক্দিন দুপুরি লেইলিদের লগ লাগি বাটে খেল্ করসি। এক্জোড়া মটা-মাইকী (স্ত্রী-পুরুষ) কাঁহা সে কাঁহা যা'ছে। উঁরা হাম্দের সামনে, গাছটা নীচে বইটে গিলো। হামি যাইয়ে পুছ করলু—উঁই ঝোলা ভিত্রে কি আসে?—সাঁপ? মাইকীটা কইলো—হুঁ, লিবি তুঁ?

—হামি কহিলু, হুঁ। লেকিন্ মন্কা ভিত্রে ঠিক রাখ্লু—সাঁপ ওলাবে তো দিম ছুট।—মাইকীটা দিল মিঠাই! কোলুমে বসাই খুব পিয়ার মরম করল। উঁরা মটা-মাইকী দুজ্না ফিস্ফিসারে কিবাকিবি কহিল, চারপিনে চাহিল, দাঁড়ায়ে উঠল, হামকে লিয়ে বাট করলো (পথ চলল)। হামি বিনো কি রকম হই গেইলি, একো বাত্ নাই কহিলি।

—নাই কহিলি?

—নাই কহিলি তো।

—তারপোর?

—তারপোর কি হোইছে কোছুতে নাই বুঝিলি। এখ্নে পেরে বুঝিলি। উঁরা হামকে লিয়ে গিলো দুরি ডিপো। আড়কাঠিকা কাসে। হাম্রা লোব রেল উইঠে গাড়ী চাপলম হোই গেইলি। কেত্না উঠলি, [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] হোইলি, [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]।

—ইস রাম! রাবণ ভাবল—যাবপথে দার্জিলিং থাকতে একেবারে আসাম! এমন ভুল করে কজন তুকারাম! সে বলল—চালান হোইলি একদম আসাম। দার্জিলিং নাই গেইলি কেনে রে?

এমনই তার কথার ভাব যেন তা হলেই রাবণের সঙ্গে তুকারামের দেখা হয়ে যেত। তুকারাম একটু ধাঁধায় পড়ে গেল। সে ভুলে গেল যে দার্জিলিং যাওয়া না-যাওয়াটা তার হাতের বাইরে ছিল। তবে চিন্তে মাথা নাড়া দিয়ে সে বললে—জেড়ি ভুল হোই গেইসে। কি রোকমে হোইলো কইতে ন'রছি (পারছি না)।

যাক যা হবার হ'য়ে গেছে। রাবণ শুনতে চাইল পরের ঘটনা। ছোটবেলায় এমন অনেক কথা সে শুনেছে। সেসব মনের তলায় কোথায় চাপা পড়ে ছিল। তার এক একটা ঠেলে ঠেলে উঠতে চাইল বিস্মৃতির স্তূপ থেকে। তুকারামের কাহিনীটা সে সবের তুলনায় যেমন অসাধারণ, তেমন করুণ। তার শোনার আগ্রহ একান্ত হ'য়ে উঠলো।

সুখের কথা জানাবার মধ্যে আগ্রহ থাকে, দুঃখও থাকে। আবার দুঃখের কথা জানাবার মধ্যে আগ্রহ থাকে, সুখও থাকে। তাই রাবণকে পেয়ে তুকারামের অতীত জীবনের অনেক কথাই ঠেলে বেরিয়ে আসতে চেয়েছে। কতদিন তা বলতে এসেও বলতে পারেনি। সময়ের মধ্যেও সুযোগ চাই—তা সে ক'রে উঠতে পারেনি এতদিন। সেই বাগান থেকে রাবণরা ফিরে আসার পর সমস্যার আর একটা দিক বড় হ'য়ে দেখা দিল। তা নিয়ে আলোচনা করতে হাতের সামনে একটা সুযোগ এল। কথায় কথায় তুকারামের মনে পুরানো কথাগুলো ব্যথায় ডুকরে উঠলো। সে নিঃশ্বাস টেনে টেনে বলতে লাগলো—তারপোর রেল বাট চোলতে চোলতে মা-বাবার মুখ মন্মে উঠলো। মা-বাবার বাত্, ঘর্কা বাত্ ভাবে ভবে বোটি দুঃখ হোইলো। হামি কান্দে থাকি—উঁরা দিয়ে খাওয়া, দেখায়ে দিয়ে রেল-টিশান, কেত্না মানু-জন। উঁ সব মনমে নাই ধরল হামার। হাম্রা আঁখোকা পানি বন্দ্ নাই হোইলো। উঁরা বোলে—রেলগাড়ী কইয়ে ঘর যা'ছে। হামি চুপ্ থাকে, আবার কান্দে উঠে, ফিন্ ঘুমায়ে পড়ি।

এমন শুনতে শুনতে নিজের জীবনের কত কথা রাবণের মনের মধ্যে নড়াচড়া করতে লাগলো। মনে হ'ল সেদিন শিলিগুড়ি থেকে ঐ পথে আসামে আসার কথা। চোখের সামনে [illegible] হয়ে উঠলো তার সেদিনকার সমস্ত ভাবনা-চিন্তা। তুকারাম যখন এসেছে তখন সে শিশু। শিশুর মতোই পিছল [illegible] তার মন, পিছল ছিল তার ব্যথা। রাবণ এসেছে কত বিপদ, কতবড় দায়িত্বের বোঝা, কত ভাবনা চিন্তার বোঝা মাথায় [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] তুলে

গেল সে। তুকারামের দুঃখে দুঃখিত হয়ে তার ব্যথায় ব্যথিত হয়ে রাবণের মন নদীর মতো ভেসে চলল। যেন দুটি দুঃখের স্রোতের একটি মিলিত ধারা। তুকারাম থামতেই রাবণ সমবেদনা প্রকাশ করে বললে—বড় মজা (করুণ) তো! পিছে কি হোইলো?

রাবণ লেখাপড়া জানে কিন্তু কথা বলে নিজেদের ভাষাতেই অর্থাৎ নিজেদের ঢঙে। এমন অভ্যাস অনেক উন্নত শ্রেণীতেও বিরল নয়। তাই সেও তার অভ্যাস মতো তুকারামের অমন করুণ কাহিনী শুনে বলে বসল—বড় মজা তো!

তুকারামও তা বুঝল। সে [illegible] চলল তার প্রশ্নের।

—পিসে উ'দের দোজনাকে মা-বাপ কহিতে থাকলি। উ'দের বাচ্চা নাই সিল। উ'রা খুব মরম কোরলো খোয়াইলো পোরাইলো, ডাংগর কোরলেলো।

—উরা মরম কোরল, খোপাইল, ডাঙ্গার ভি কোরল?

—কোরালো তো। তবি ভি অসলি মা-বাপকা ভাওনা মনসে দূর নাই হোইলো। আজি ভি নই গিলো।

রাবণ পড়ে গেল আর এক ভাবনায়। তুকারামের মন থেকে এখনও তার মা-বাপের ভাবনা যায়নি? তাকে এখন কি সান্ত্বনা দেওয়া যায়? কিছুই ভেবে পায় না। তবুও তুকারামেরই কথার জের টেনে বললে—আজি ভি নাই গেইছে সি ভাওনা? তোবে একটা চিঠ্ঠি লিখি দি না।

—ঠিকনা নাই জানছিলি তো।

—লেই লে ঠিকনা।

—ঠিকনা কাঁহা পাইবি?

তুকারামের কথা শুনতে শুনতে রাবণও তুকারামের মতো হয়ে পড়েছিল, আবার তুকারামের কথাতেই তার খেয়াল ফিরে এল। সে সায় দিয়ে বললে—উতো ঠিক বাত, কাঁহা পাইবি ঠিকনা! পিছে?

—পিসে হাড়ী জাইতের ভাত খায়ে খায়ে হাড়ী হোই গেইলি।

—হাড়ী। পিছে হাড়ী হোই গেইলি?

এমনই কথার ভাঙ্গা যেন তুকারামের জাতের খবরটা রাবণ প্রথম জানলো।

—হাঁ রে বাবা। হামি ডাংগর জাত, বেরামন সিলি। হামার বাবার বহুত খেতি, গরু-ভ'ইসা সিল। উ' খেতি-কাম কোরতে সিল, আউর গো-ভ'ইসা ভি চরাইতো।

—গরু চরাইছিল? তোবে বাভন্ কাইসে রে? গোয়ালা হে ছিল।

—কোউন জানে কিয়া সিলি! লেকিন হাড়ী নাই সিলি। হামদের হাত বেরামন ভি পানি খাতে পারসিল, সি খাতিরে কহেসি বেরামন সিলি।

—হাড়ী জো নাই ছিলি, জোরুরে। গোয়ালা ভি তো ভাল জাইত আছে রে, নাই তো ছত্রী—।

দুঃখটা সহ্য হয়ে উঠলো তুকারামের মনে। সে কপালে হাত ঠেকিয়ে বললে—নসিব কা হাল। আজি হামে মেথর। উ' দুঃখ পাহার (পাসরি) যাউ কেইসে। উ' দুঃখ হামারা জীওন কা সাথ সাথ যাইয়ে। হামার নওতুন বাপ-মা যোখন বিয়া-সাদি ঠিক কোরলো, তোখন হামে কান্দে বেড়াইলি।

—কেন রে?

—ইয়ে সাদিকা সাথ হামার জীওনকা কুল যাইবে।

—কেনে যাবেক?

তুকারাম কপাল চাপড়ে বললে—আবি ঘরকা পাতা মিলবে তো কি হোবে? হামার ঘরকা মাইকীটা তো সোলি-পোলি লেইকে হামকে নাই এড়বেক। আজি দেখ বিয়া বাদকে মেথর হোইলি, মেথর সোলি-পোলিকা বাপ হোইলি। আবি ভাবে থাকি, ঘরকা পাতা মিলবেক তো এতনা সোলি-পোলি নেইকে কাঁহা যাইবে, ক্যাইসে যাইবি? হামার বাপ-মাই হামকে চিনে, উ'দের তো নাহি জানেছে।

—তু' আবি ভি ঘর লোটবা বাত ভাবছিস নাকি?

—নাহি তো কি করসি? ইশ্টা মাই বুঝছিস কেনে রে?

তাদের জাতের কথা, সমাজের প্রথা, বেশ ভালই জানা আছে রাবণের। এখানেই যদি এত, তবে আসল জায়গায় না-জানি আরো কত? তাই চেষ্টা করে ঐ আশার কুহক-পাশ থেকে তুকারামকে মুক্ত করতে। সে বললে—উ কথা ভাইবে দুঃখ কোইরে কি করবি? গাঁও-ঘর খুঁইজে পাবি তো ঢুকতে নাই পারবি। বুড়া বাপ-মাইকা দিল-কালজা ফাটকে যাবে তো তুকে ঘর উঠাতে নাই সেকবে।

—কেনে নাই সেকবেক রে?

—গাঁও মে পাঁচ-পনচাত আছে হি রে।

—হামি গাঁওমে নাহি যাবে, ঘর থাকবে।

যাবার যেনসকল ব্যবস্থাই হয়ে রয়েছে, শুধু যাওয়াটাই বাকী আছে। এমন কি, কাউকে কোন সুযোগ না দিয়ে, সে নিজেই গাঁয়ের লোকের সঙ্গে সকল সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন করে পৈতৃক ভিটেয় বসবাস করবে।

রাবণ [illegible] মহামুশকিলে। [illegible] আর একটা পথ [illegible]। [illegible]—তুই [illegible] মাই-বাপ তুকে চিনবেক [illegible] তোখন [illegible] ছোটা ছিলি।

তুকারাম হেসে উঠল—কিসো নাই চিনবেক? হামি উ'দের সাইলে যি রে—কহে দিম্ তেখন ছোটা ছিলি এখানে ডাংগর হোইসি।

নাঃ! এ পথে হবে না। রাবণ জিজ্ঞাসা করলে—তু যেখন আসেছিলি, তেখন উরা কেতনা বোড় ছিল?

—হাঁ, খুব ডাংগর সিল—নাহি বুড়া সিল। হামে সোবসে সোটা বাচ্চা, বহুত মরম পিয়ার কোরত হামকে।

শৈশবের স্মৃতি তুকারামের মুখে-চোখে হঠাৎ এনে দিল অপূর্ব খুশীর ঝলক।

রাবণ তার উপর নির্মম কষাঘাত করে হেসে উঠল—তোবে মিছা ভাবোছিস। এতনা দিন কি বাঁচে আছেরে? কোবে মইরে গিছে।

চমকে তুকারাম 'আঁ' করে উঠল। এদিকটা সে ভেবে দেখেনি এতদিন। অকস্মাৎ হলেও অবিশ্বাস্য নয় রাবণের কথাটা। তারই যখন এত বয়েস হয়েছে, তার মা-বাবার তো বেঁচে থাকার কথা নয়! তবে শুধু শুধু এতদিন সে অমন ভেবে আসছে! তার ভাবনার কথাটা এমন নির্মম বাস্তবতায় শেষ হয়ে যেতে সে যেমন নিশ্চিন্ত হল, তেমনই চিন্তিত হল। তার মা-বাবা তবে আর নেই? সে গুম হয়ে বসে রইল পিতৃ-মাতৃহীন শিশুর মতো। সদ্য শোকসন্তপ্ত হৃদয়ে আর কোন কথা বলতে পারল না।

তার কথায় তুকারামের মনটা যে এতখানি ভেঙ্গে পড়বে, রাবণ তা বুঝে উঠতে পারে নি। রাবণও অপরাধীর মতো চুপ করে বসে রইল। যেন সে নিজের হাতেই তুকারাম হেন পরম মিত্রের মা-বাবাকে হত্যা করেছে।

(ক্রমশঃ)

গগনে গগনে আপনার মনে

বৈদ্যনাথ মুখোপাধ্যায়

পারস্য দেশ। সবে বসন্ত এসেছে। গাছে গাছে সবুজের সমারোহ। গুল-বাগিচায় পাখিদের কাকলি। গোলাপ-বাগিচায় লেগেছে রঙের আগুন। ভ্রমর আর মৌমাছিদের গুঞ্জনে কানপাতা দায়। এদিকে মধু বাতাসে ছড়িয়ে পড়ছে সহর্ষ রোমাঞ্চ।

এই বসন্ত সমাগমকে স্বাগত জানাতে এলো নওরোজ উৎসব।

নওরোজ মানে নববর্ষ। সেকালের পারস্যে এর থেকে বড়ো উৎসব আর দুটি ছিল না। সারা বছর ধরে লোকে খোয়াব দেখত এই উৎসবটির জন্য। তাই এ উৎসব এলেই দরিদ্রের কুটীর থেকে আরম্ভ করে বাদশাহের দৌলতখানা পর্যন্ত সর্বত্র আনন্দের বান ডেকে যেত। উৎসবের দিন দেশ-দেশান্তর থেকে নানা ধরনের লোক আসত। নানারকমের মজাদার জিনিস ও খেলা দেখিয়ে বাদশাহকে সন্তুষ্ট করে পুরস্কার নিয়ে যেত।

রাজধানী সিরাজনগরে সেবার বসেছে নওরোজ উৎসব। নানা রঙের নতুন নতুন পোশাক পরে দলে দলে লোক এসেছে, এসেছে বাজীকর আর নানা ধরনের মজার খেলার খেলোয়াড়েরা। স্বয়ং বাদশাহ উৎসুক হয়ে দেখছেন এইসব। মাঝে মাঝে তাদের উৎসাহিত করছেন।

হঠাৎ সেখানে একজন ভারতীয় এসে হাজির। সঙ্গে একটি কাঠের ঘোড়া। সে বাদশাহকে আভূমি কুর্ণিশ করে এগিয়ে দিল কাঠের ঘোড়াটিকে। বাদশাহ ওপর ওপর চোখ বুলিয়ে গেলেন, তারপর ভারতীয়টির দিকে তাকিয়ে বললেন, 'হ্যাঁ, এটি অবিকল ঘোড়ার মতনই দেখতে, কিন্তু তাতে কি? এই নকল ঘোড়া কি দৌড়তে পারে?'

ভারতীয়টি বার কয়েক কুর্ণিশ করে বলল, 'না হুজুর এ ঘোড়া দৌড়তে পারে না, এ কেবল ওড়ে। এ পক্ষীরাজ, শাহানসা! যদি ফরমাস করেন, আর গরীবের গোস্তাকি মাপ করেন, তবে একবার এ চিড়িয়াকে উড়িয়ে দেখিয়ে দিতে পারি।'

বাদশাহের চোখে ঝিলিক দিয়ে উঠলো কৌতূহল। প্রাসাদের সামনে যেখানে বিরাট মাঠে বসেছিল নওরোজের দরবার, সেখান থেকে বেশ কিছুদূরে একটি পাহাড় দেখা যাচ্ছিল, আর তার মাথায় ছিল কয়েকটি তালগাছ, বাদশাহ্ সেদিকে তাকিয়ে বললেন, 'বেশত! ওখান থেকে কিছু পাতা ছিঁড়ে নিয়ে এসো ত!'

ব্যস! কথা ফুরোতে না ফুরোতে কাঠের ঘোড়া পক্ষীরাজ হয়ে গেল। আকাশে উড়তে উড়তে এগিয়ে চলল সেই ভারতীয় জাদুকরের আশ্চর্য চিড়িয়াটি।

আমাদের গগন পর্যটনের ইতিহাস এইভাবে আরম্ভ হলে বোধ হয় ভাল হত। কিন্তু তা হয় নি। তাই আমরা কাল্পনিক ছবি এঁকেছি এইভাবে আরব রজনীর আজগুবি রহস্যময়তা মিশিয়ে। না, ওপরের ঐ কাহিনীটি সত্যি নয়, আরব-উপকথার একটি কাহিনীর আরম্ভ।

আমাদের দেশে পুষ্পকরথ আকাশে উড়েছে ঠিক অনুরূপভাবেই। রূপকথার মতই এ আরেক জগত। কল্পনা এখানে অবাধ।

কিন্তু মজা এই, মানুষ বেশি দিন কল্পনা নিয়ে বসে থাকতে পারে না। তাকে রূপায়িত না করা পর্যন্ত তার ক্ষান্তি নেই। যেখানে বাধা, সেখানেই দুর্বার হয়ে ওঠে মানুষ। তাই কল্পনা বিলাসের সঙ্গে মানুষের অন্তহীন চেষ্টাও চলল পাশাপাশি। আর সে প্রয়াস রূপকথার থেকেও রোমাঞ্চকর। আমাদের সাহিত্যসম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র তার একটি ছবি এঁকে গেছেন। সে ছবি এইরকম :

'সামান্য মনুষ্যের চিরকাল বড় সাধ গগন পর্যটন করে। কথিত আছে, তারন্তম নগরবাসী আর্কাইতস নামক এক ব্যক্তি ৪০০ খৃষ্টাব্দে একটি কাষ্ঠের পক্ষী প্রস্তুত করিয়াছিল; তাহা কিয়ৎক্ষণ জন্য আকাশে উঠিতে পারিয়াছিল। ৬৬ খৃষ্টাব্দে, সাইমন নামক এক ব্যক্তি রোমনগরে প্রাসাদ হইতে প্রাসাদে উড়িয়া বেড়াইবার উদ্যোগ পাইয়াছিল। এবং তৎপরে কনস্তান্তিনোপল নগরে একজন মুসলমান ঐরূপ চেষ্টা করিয়াছিল। পঞ্চদশ শতাব্দীতে দান্তে নামক একজন গণিত শাস্ত্রবিৎ পক্ষ নির্মাণ করিয়া আপন অঙ্গে সমাবেশ করিয়া থ্রাসীমিন হ্রদের উপর উঠিয়া গগনমার্গে পরিভ্রমণ করিয়াছিলেন। ঐরূপ করিতে করিতে একদিন এক উচ্চ অট্টালিকার উপর পড়িয়া তাঁহার পদভঙ্গ হয়। মামসবার নিবাসী অলিবর নামক একজন ইংরেজেরও সেই দশা ঘটে। ১৬৩৮ সালে গোডেউইন নামক এক ব্যক্তি শিক্ষিত হংসদিগের সাহায্যে উড়িতে চেষ্টা করেন। ১৬৭৮ সালে বেনিয়র নামক একজন ফরাসী পক্ষ প্রস্তুতপূর্বক হস্তপদে বাঁধিয়া উড়িয়াছিল। ১৭৯০ সালে লরেন্ত দে গুজমান নামক একজন ফরাসী দারুনির্মিত বায়ুপূর্ণ পক্ষীর পৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া আকাশে উঠিয়াছিল। মার্কুইস দে বাকবিল নামক একজন আপন অট্টালিকা হইতে উড়িতে চেষ্টা করিয়া নদীগর্ভে পতিত হন। বানসার্ডেরও এই দশা ঘটিয়াছিল।'

গগনভ্রমণের যে ইতিবৃত্ত উদ্ধৃত হল তা থেকে একথাই মনে হয় যে মানুষ সেদিন ওড়ার অ্যাডভেঞ্চারেই উড়তে চেষ্টা করেছিল, ওড়ার বিজ্ঞান অধিগত ছিল না বলে পাখিকেই অনুসরণ করেছিল আদর্শ হিসাবে। কিন্তু মানুষ যেহেতু পাখি নয়, তাই তার ব্যর্থতাও ত্বরান্বিত না হয়ে পারে নি। বেশির ভাগ ক্ষেত্রে অ্যাডভেঞ্চার গিয়ে ফুরোল দুর্ঘটনায়। কখনো হাত-পা ভাঙল, আবার কখনো বা ঘটল জীবনহানি।

অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষের দিকে হঠাৎ মানুষের কাছে আকাশের দরজা খুলে গেল। আমাদের এই কলকাতায় তখন চলেছে ওয়ারেণ হেস্টিংসের আমল। কলকাতায় বের হচ্ছে প্রথম খবরের কাগজ, তৈরী হচ্ছে রেসকোর্স, ঠিক সেই সময় সুদূর ইংলণ্ডে সত্যেরোশ একাশিত ক্যাভেণ্ডিস সাহেব আবিষ্কার করলেন হাইড্রোজেন গ্যাস। ব্যস, সঙ্গে সঙ্গে সাড়া পড়ে গেল চারদিকে।

ওদিকে ফ্রান্স দেশে দুই ভাই জোসেফ আর এটিনে মঁগোল ফী সুখে-স্বচ্ছন্দেই কাল কাটাচ্ছিল। তাদের হাত দিয়েই যে প্রথম আকাশে বেলুন উড়বে, তা কে জানত! হঠাৎ একদিন তারা বেলুনে ওড়ানোর তত্ত্ব আবিষ্কার করে ফেলল। তারপর ঘোষণা করে দিল যে তারা আকাশে বেলুন ওড়াবে।

জুন মাসের পাঁচ তারিখে ঐ বহু প্রতীক্ষিত দিনটি এলো। ফ্রান্সের ছোট্ট শহর 'এনোনে' হল প্রথম বেলুন ওড়ানোর ঐতিহাসিক স্থান। দুই ভাই জোসেফ আর এটিনে তৈরী করেছিল কাপড়ের বিরাট বেলুন। ভারীও ছিল তেমনি, পাকা সাত মণ। ঐ সাত মণের ভারী বেলুন কেমন করে আকাশে পাড়ি দেয় তা দেখবার জন্য দলে দলে লোক এলো। উঃ সে লোকে লোকারণ্য! আর সেই লোকারণ্যের মাঝে পৃথিবীর প্রথম বেলুন আকাশে উড়ল। সাত মণের বেলুন ওপরে উঠল সাত হাজার ফিট।

তারপর?—তারপর আর কী! বিষয়টিকে একবার আয়ত্ত করতে পারলে তাকে বারবার দেখানো যায়। তাই মাস তিন গড়াতে না গড়াতে আবার এই বেলুন ওড়ানো অনুষ্ঠান হল। আর যেখানে সেখানে নয়, একেবারে খোদ প্যারী শহরে। এদিকে লোকের মুখে মুখে ছড়িয়ে পড়েছিল খবর, বেড়ে গিয়েছিল কৌতূহল। তাই কৌতূহলীরা দলে দলে ভিড় করল। এলো দূর-দূরান্ত থেকে।

প্যারীর 'ক্যাম্প দা মারস' ময়দানে লক্ষ লক্ষ লোকের সমাবেশে উঠল হাঁপিয়ে। এদিকে সেদিন আবার আকাশ জুড়ে মেঘ এলো। ঝমঝম করে বৃষ্টি নামল। কী বৃষ্টি! কী বৃষ্টি! কৌতূহলী জনতা কিন্তু এক পাও নড়ে না।—শেষ-বেশ, সেই ময়দান থেকে বেলুন উড়লো।—বেলুনটির নাম ছিল 'গ্লোব'। পঁয়তাল্লিশ মিনিট ধরে বেলুন উড়ল। ভাসতে ভাসতে চলল দূর থেকে দূরান্তরে! মাইল পনেরো যাবার পর বেলুনটি ফেটে গেল। গোনেস নামক ছোট্ট একটি গ্রামে নেমে পড়ল বেলুনটি।

গোনেশ গ্রামের লোকেরা অতশত জানত না। তারা তো অবাক। আকাশ থেকে ঐ রকম একটি আজব জিনিস নেমে আসতে দেখে ভয়ে আড়ষ্ট। অনেকে চেঁচামেচি আরম্ভ করে দিল। কেউ গিয়ে বেলুনের গায়ে খোঁচা মারল, কেউ লাঠি, আবার কেউ পাথর ছোঁড়ে। শেষে একজন বন্দুকও ছুঁড়ল। পাদ্রীরা এসে বলল, 'এ এক অলৌকিক জীব, সুতরাং'—

*

বেলুনের নাটক এইভাবে দেখতে দেখতে জমে উঠল। গগনে গগনে আপনার মনে আরম্ভ হয়ে গেল বেলুন নিয়ে খেলা। ঐ বেলুনে চেপেই ইউরোপীয়রা একদিন ইংলিশ চ্যানেল পার হল। আরো পরে দেশদেশান্তরে পাড়ি জমাল। এমন কি বছর দশেক ভেতর [illegible] লুনার্দি নামে এক ক্যাপ্টেন বেলুনে করে [illegible] অতলান্তিকের [illegible]। রূপকথা, রূপকথার রাজ্যে অথবা আরব্য রজনীর উপকথায় মানুষ যাকে মনে মনে দেখেছিল, এখন সে সাঁচ্চা সাঁচ্চাই প্রত্যক্ষ হয়ে উঠল। দেশ-দেশান্তরের লোক যারা এখনো এসব আজব ব্যাপার দেখেনি, [illegible] তাদের চোখে [illegible] দিয়ে উঠল কৌতূহল। এবং তাঁরা নয়ন সার্থক করবার জন্য সুযোগের অপেক্ষায় রইলেন।

আমাদের কলকাতাবাসীদের অবস্থা ঠিক দাঁড়াল অনুরূপ। তখন বাবুদের গৌরবের দিন চলেছে কলকাতায়। ওয়ারেন হেস্টিংসের যুগ কেটে গেল। হারমোনিক ট্যাভার্নে সম্ভ্রান্ত কলকাতা বিদায় অভিনন্দন জানাল তাঁকে। তারপর যুগ গড়াতে গড়াতে চলে এলো একেবারে অকল্যান্ডের রাজত্বে। ইতিমধ্যে শহর কলকাতায় অনেক পরিবর্তন হয়ে গেল। কর্নওয়ালিশের চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত ভূমি রাজস্ব নিয়ে এলো বিপ্লব। স্যার উইলিয়ম জোন্‌স মারা গেলেন। রিচার্ড বারওয়েলের খিদিরপুরের বাড়ি বিকিয়ে গেল। তেরো লক্ষ টাকা খরচ করে লাট প্রাসাদ তৈরী হল। পুরনো ফোর্ট ভেঙে সরিয়ে ফেলা হল। প্রথম কলের জাহাজ চলল বাংলাদেশের নদীপথে, রাজা রামমোহন রায় চললেন বিলেতে, আর তারপর একদিন অকল্যান্ড সাহেব এলেন বাংলাদেশে গভর্নর জেনারেল হয়ে।

সেবার আঠারোশ ছত্রিশ সাল। কলকাতার বাবুরা বুলবুলির লড়াই দেখে, পায়রা উড়িয়ে, বাঈজীদের নাচের আসরে তুড়ি দিয়ে এবং ইয়ার বকসিদের নিয়ে বাগানবাড়ির বিলাসে গা এলিয়ে দিয়েও যখন বৈচিত্র্য খুঁজে পাচ্ছে না, তখন রবার্টসন নামে এক ফরাসী ভদ্রলোক নতুন বৈচিত্র্য নিয়ে এসে দেখা দিলেন কলকাতায়। তিনিই প্রথম কলকাতায় বেলুনের রোমান্স নিয়ে এলেন।

রবার্টসন সাহেবের বিস্তৃত পরিচয় এখন খুঁজে পাওয়া কঠিন, তবে তাঁর নামে যে শহরটি উদ্বেলিত হয়ে উঠেছিল সে খবর পাওয়া যায়। ইউরোপের ভিন্ন ভিন্ন জায়গায় এর আগে তিনি ঘোলধায় উঠে-ছিলেন। সুতরাং এ লাইনে একবারে তিনি পেশাদারী ছিলেন বলেই অনুমান করা যেতে পারে। যাইহোক তিনি এসে ঘোষণা করলেন যে তিনি বেলুন নিয়ে আকাশে উড়বেন। অবশ্য এ অভিনব দৃশ্য দেখাবার জন্য দর্শকদের কাছ থেকে দাবী করলেন চাঁদা।

সঙ্গে সঙ্গে হু হু করে চাঁদা উঠে গেল। সেকালের কলকাতায় হুজুগে বাবুর কোনো অভাব ছিল না। বেড়ালের বিয়েতে যাঁরা লাখ লাখ টাকা খরচ করেন, তাঁরা কি বেলুন বাজিতে টাকা দিতে অকৃপণ হতে পারেন?

সেদিন বুধবার। চৈত্র মাসের প্রায় মাঝামাঝি। কলকাতায় ভরা বসন্ত। আমের বোলে মৌমাছিদের ভিড়। শিমুল-পলাশ পরেছে আগুনের পোশাক। গাজনের সন্ন্যাসীরা শিব সেজে ঘুরে বেড়ায় পথে পথে। এই সময় নতুন ভিড় দেখা গেল মুচিখোলাতে। ভীষণ ভিড়। কাগজঅলারা লিখল, 'মুচিখোলাতে যেরূপ জনতা হইয়াছিল আমরা বোধকরি এ প্রকার লোকের ভিড় কখনও দৃষ্ট হই নাই।' এই বিশাল জনতার একাংশ এলো গাড়ি করে, তাদের ঘোড়ার খুরে খুরে কলকাতার পথে ধুলোর ঝড় উঠল। কোনো কোনো রইস লোক এলেন পালকি করে। পালকি বেহারাদের বিচিত্র শব্দে মুখর হয়ে উঠল কলকাতার পথ। ওদিকে নদীতেও নৌকো ভাসল। মাহেশের স্নানযাত্রায় অথবা ঘোষপাড়ার মেলা দেখতে বাবুরা চিরকালই গা ভাসিয়েছেন নৌকা-বিলাসে। সুতরাং বেলুন-বিহারেও তা বাদ থাকে কেন? —আর এদিকে পদব্রজে যাঁরা গেলেন, তাঁদের কথা না তোলাই ভালো। তাঁদের সংখ্যা অজস্র।

যদিও এ উৎসব শারদোৎসব নওরোজ উৎসব নয়, কিন্তু দর্শক বাবুদের পোশাকের বাহার, আর জনতার কৌতূহল তাকে এনে দিল নওরোজের মহিমা। বাবুরা প্রত্যেকেই হয়ে গেলেন এক একজন বাদশাহ। তাঁরা বাবরীর বুরুশ ঝাড়া দিলেন, আর গোঁফে দিলেন তা।

যাইহোক, এদিকে যথাসময়ে বেলুনে উড়ল আকাশে। নির্মল নীল আকাশ। বাতাস বইছে মৃদু মৃদু। রবার্টসন সাহেবও বেলুনের সঙ্গে উঠলেন। বাবুরা রুমাল নাড়লেন, রবার্টসনও হাত নাড়লেন। তারপর বেলুনের সঙ্গে ভেসে চললেন সাহেব। বেলুন ক্রমে ক্রমে ওপরে উঠতে থাকল। ওপর থেকে আরো ওপরে। তারপর ভাসতে ভাসতে এগিয়ে চলল দক্ষিণ দিকে।

এইভাবে দেখতে দেখতে কতক্ষণ যে কেটে গেল, কারো হুঁস ছিল না। অধীর আগ্রহে রুদ্ধনিঃশ্বাসে লোকে তাকিয়ে রইল হাঁ করে।

তারপর হঠাৎ কী যেন কোথা থেকে ঘটে গেল। ভেসে চলা বেলুন নামতে আরম্ভ করল সোঁ সোঁ করে। মনে হল, যন্ত্র বুঝি বিকল হয়ে গেছে। মুহূর্তের ভেতর মেলাতে গোলমাল পড়ে গেল। কোথায় বেলুন নেমেছে দেখবার জন্য কৌতূহলীরা দৌড়াদৌড়ি আরম্ভ করে দিল।

তারপর? তারপর জোর গোলমাল পড়ে গেল। না, সাহেবের প্রসঙ্গে কোনো উদ্বেগ-আশঙ্কা ছিল না। কেননা, তিনি নেমে এসেছিলেন নির্বিঘ্নে। এখন লোকের মুখে মুখে একটি মাত্র প্রশ্নই ঘুরে বেড়াতে থাকল, এবং সে প্রশ্নটি হল, বেলুন যাবার সাহেব এমনভাবে ইতি টানলেন কেন? এ কি কোনো যান্ত্রিক গোলযোগ না সাহেবের ইচ্ছাকৃত ব্যাপার? —'ঊর্ধ্বে উঠিয়া কি কারণ বেগে পতিত হইল?'

কেউ বলল, বেলুনের চাঁদায় সাহেব খুশি নন, তাই সাহেব নেমে পড়েছেন তাড়াতাড়ি। যাঁরা একটু বেশী বুদ্ধিমান তাঁরা বললেন না না, তা কেন হবে? উত্তরের বাতাসে সাহেব যেভাবে দক্ষিণে যাচ্ছিলেন, সেইটেই ছিল ভয়ের ব্যাপার। সাহেব বোধ-হয় সামনে সমুদ্র দেখতে পেয়ে ভয়ে নেমে পড়েছেন। কোনো কোনো ঠোঁটকাটা মন্তব্য করল, 'নারে বাপু না, কলকাতার লোকেদের অনেক টাকা কিনা, সেই টাকা হাত করবার জন্য সাহেব এই কল করেছেন!'

এইভাবে সেকালের নটেরা নানারকম আলোচনা করতে করতে নিতান্ত ক্ষুণ্ণ মনেই ফিরে এলেন বাড়ি। একটু পরেই সন্ধ্যা নামল। ঘরে ঘরে জ্বলে উঠল আলো। মশালচীরা কোনো কোনো বাবুর পালকি পথ আলো করে পৌঁছে দিয়ে গেল। তারপর শেয়ালের ডাক ধীরে ধীরে নেমে এলো নিস্তব্ধতা।

কিন্তু না, গোটা রাতটাও বাবুদের নিরস্ত থাকতে হল না। পরের দিনই কাগজ অলারা সাড়ম্বরে ঘোষণা করল: '[illegible] [illegible] সকাল [illegible] ইত্যাদি রবার্টসন সাহেবের ইচ্ছা আছে পরের মাঠ [illegible] ঊর্ধ্বে গমন করিবেন। [illegible] একারে সাহেবের কিছু অধিক [illegible]।'

এর পরে কলকাতায় এই বেলুন-ওড়ানো রীতিমত নিত্য ব্যাপার হয়ে দাঁড়াল।

আরো অনেক বিদেশীরা টাকা রোজগারের ধান্দায় এই কলকাতায় পাড়ি জমালেন। যে রবার্টসন সাহেব এখানে প্রথম বেলুন ওড়ানোর দাবী করতে পারেন, তিনি বছর দুই পরে এই কলকাতাতেই দেহ রাখলেন। বেলুন ওড়ানোর জন্য সেকালে চল্লিশ হাজার টাকা খরচে তিনি যন্ত্র কিনেছিলেন তিনটি। সাহেবের মৃত্যুর পর তাঁর সব সম্পত্তি নীলামে বিক্রয় হয়ে গেল এবং ঐ যন্ত্র তিনটিও। তবে যন্ত্র তিনটি বিক্রয় হল মাত্র পঞ্চাশ টাকায়। কে বা কারা ঐ যন্ত্রগুলি কিনেছিল তা জানা যায় না। তবে সে যন্ত্র যে বেলুন-ওড়ানোতে ব্যবহৃত হয় নি তা ঐ দামের বহর দেখেই অনুমান করা যায়।

এদিকে কলকাতার আকাশ কিন্তু তাই বলে বেলুনের সম্পদ থেকে বঞ্চিত রইল না। এক সাহেব যান, আসেন আরেক সাহেব। কাইট নামে এক ইংরেজ সাহেব কলকাতার বাবু মহলে রীতিমত নাম করে ফেললেন। স্বয়ং ঈশ্বর গুপ্ত তাঁকে নিয়ে লিখলেন একটি কবিতাও। লিখলেন ঃ

এ আবার কোথা হতে আইল 'কাইট ?'
নাহি বলে, বলে চলে কলের 'কাইট'।
মর্তলোকে শব্দ করে, 'কাইট, কাইট।।'

শুধু সাহেবের কথা নয় কবিতার মূল বক্তব্য হল বেলুন। এই বেলুন কেবল আকাশেই ওড়ে নি, উড়েছিল কলকাতা-বাসীর মনেও। বুলবুলির লড়াই দেখে, রেসকোর্সে ঘোড়ার দৌড় দেখে লোকে যে আনন্দ পায় নি, এমন কি ঘুড়ি উড়িয়েও যা, সেই আনন্দ ও সেই সুখ লোকে খুঁজে পেয়েছিল বেলুন যাত্রায়। কবি ঈশ্বর গুপ্তের কবিতায় সেই উদ্বেলিত আনন্দেরই প্রকাশ—

উড়িয়াছে আকাশেতে সুচারু ফানস।
তাহাতে মানুষ বসে প্রফুল্ল মানস।।
সাবাস সাবাস তার কিছু নাই ভয়।
যত ওঠে তত মনে সুখের উদয়।।
নগরের লোক যত করে হই হই।
দেখি যত আমি তত কত সুখী হই।।
বেলুনকে নিয়ে বসল সুখের হাট।

এই সুখের হাটে সকলেই আসে। আকাশের রোমান্স দিয়ে অবকাশ ভরিয়ে নেন কলকাতার সাধারণ মানুষেরা। এদিকে দেখতে দেখতে গড়িয়ে চলল সময়। হিন্দু কলেজের থেকে বিপ্লবী ছেলেরা বেরিয়ে এলেন একে একে। এঁদের ভেতর কেউ বক্তৃতা দিলেন, কেউ কবিতা লিখলেন, আবার কেউ বা মন দিলেন সমাজ সংস্কারে। ওদিকে সিপাহী বিদ্রোহে সারা ভারত জুড়ে প্রবাহিত হল রক্তস্রোত। নীল হাঙ্গামা সোনার বাংলাকে করে দিল ক্ষতবিক্ষত। এই সব বিরাট বিরাট ঘটনা ঘটে যায়, কখনো আতঙ্কে, কখনো কান্নায় ভারী হয়ে ওঠে মন, বেলুন কিন্তু ঠিক উড়ে চলে। ময়দানে ঠিক জনসমাবেশ হয়, আর বেলুনবাজ সাহেবেরা ভেসে চলেন বেলুনে—

কেহ বলে দেখিতেছি, ওই, ওই, ওই।
কেহ বলে, ওই বটে, কেহ বলে কই।।
কেহ বলে দেখা যাবে এইখানে রই।
কেহ বলে, এতক্ষণে হোলো চাঁদ সই।।

এইভাবেই কালের নদীতে ভাসতে ভাসতে বাংলা দেশ এসে পৌঁছুল হিন্দু-মেলার আমলে। বেলুনবাজ স্পেনসার সাহেব সেদিন দাপটের সঙ্গে উড়িয়ে বেড়াচ্ছেন বেলুন। — কলকাতার বেলুন ওড়ানোর ইতিহাসে পার্সিভাল স্পেনসারের নাম চিরকাল লেখা থাকবে সোনার অক্ষরে। গড়ের মাঠে হাজার হাজার লোকের সামনে তিনি উড়িয়ে দিতেন বেলুন। তারপর নেমে আসতেন প্যারাসুটে করে।—সেকালে এই নিয়ে একটি বই পর্যন্ত লিখিত হয়েছিল। বইটির নাম, 'পার্সিভেল স্পেনসার ও গড়ের মাঠে বেলুন।' বেলুনের রোমান্স কোনো কোনো নাট্যকারকে রোমান্টিক নাটক রচনাতেও উদ্বুদ্ধ করেছিল, এবং একজন লিখে ফেললেন, 'বেলুনে বাঙালী বিবি।'

এদিকে হিন্দুমেলার কল্যাণে তখন জন্ম নিচ্ছে নবজাগ্রত জাতীয়তাবাদ। চারদিকে ন্যাশানাল চিন্তার ছড়াছড়ি। আমাদের জাতীয় পোশাক কি নেই? — এই নিয়ে চলছে পরীক্ষা-নিরীক্ষা। প্রকাশিত হল ন্যাশানাল পেপার, প্রতিষ্ঠিত হল ন্যাশানাল থিয়েটার, এবং শেষে হল ন্যাশনাল সার্কাস। নবগোপাল মিত্র ছিলেন এই ন্যাশানাল যুগের প্রবর্তক। তাই কেউ কেউ কৌতুক করে তাঁর নাম দিয়ে বসল, 'ন্যাশানাল নবগোপাল।'

যাই হোক, শেষবেশ ঐ ন্যাশানাল চিন্তা বেলুনে গিয়েও ঢুকে পড়ল। আর এ ব্যাপারে যিনি উদ্যোগী হয়ে এগিয়ে এলেন, তিনি বিখ্যাত বাঙালী অ্যাডভেঞ্চারিস্ট রামচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। পদব্রজে পৃথিবী পর্যটন করায় প্রথম কৃতিত্ব যেমন বাঙালী হিসাবে দাবী করতে পারেন উপেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী, তেমনি প্রথম বেলুন বিলাসের নায়ক হলেন রামচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

রামচন্দ্রের আর্থিক সামর্থ্য তেমন ছিল না। তাই তাঁর ঐ রোমান্সপ্রিয়তার জন্য হাত বাড়াতে হল বিখ্যাত ধনী গোপাল মুখোপাধ্যায়ের কাছে। গোপাল টাকা দিলেন। সেই টাকাতে থান থান তসর-গরদ কেনা হল। তারপর কেটে তৈরী হল বেলুন। ঐ বেলুনে গ্যাস ভরে ওড়ান হল। রামচন্দ্র সেই বেলুনে উঠে উড়ে বেড়ালেন। তবে এই ওড়ার ব্যাপারে একটু সতর্কতা অবলম্বন করা হয়েছিল। একটি সুদীর্ঘ ও শক্ত দড়ি দিয়ে বেঁধে রাখা হয়েছিল ঐ ব্যোমযানটিকে, যাতে গগনবিহার করতে করতে বেলুনটি নিঃসীম শূন্যে হারিয়ে না যায়।—যাই হোক, বাঙালীরা এইটুকু দেখেই বেজায় খুশি। চিরকাল সাহেবরাই এ সব কাণ্ড করে এসেছে, দেশীয় লোকেরা যে এ খেলায় সাহেবদের সঙ্গে টক্কর দিতে পারে তা কি কেউ ভেবেছে?—তাই রাজ্য-জয়ের গৌরব নিয়ে খুশিতে ডগমগ হয়ে নেটিবরা সেদিন ঘরে ফিরলেন।

ওদিকে নেটিবদের এই স্পর্ধা দেখে সাহেবদের চোখ টাটাল। তাঁরা গোঁফে তা দিয়ে বললেন, 'বটে!'—তাই পাল্টা জবাব দিতে তাঁরা আর দেরী করলেন না। গড়ের মাঠে তাঁরা উড়িয়ে দিলেন খোলা বেলুন। ঐ বেলুন উড়ে চলল 'গগনে গগনে আপনার মনে!' তারপর নিঃসীম শূন্যে সম্পূর্ণ হারিয়ে যাবার আগেই বেলুনবিহারী সাহেব ঝাঁপ দিলেন প্যারাসুট খুলে। ধীরে ধীরে গড়ের মাঠে নেমে এলো প্যারাসুট, আর সাহেবদের জয়োল্লাসে সারা কলকাতা ফেটে পড়ল।—নেটিবরা কিন্তু সেদিন কালো মুখ করে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সে দৃশ্য দেখল।

কোথায় সুদূর ফ্রান্স, আর কোথায় এই কালা নেটিবদের কলকাতা! বেলুনবিহারের বিজয়বৈজয়ন্তী দেখেই খুশি ছিল লোকে, কিন্তু সেটা যে এমনভাবে সাদা ও কালো নেটিবদের প্রতিযোগিতার খেলায় দাঁড়িয়ে যাবে তা কে জানত?—অ্যাডভেঞ্চারিস্ট রামচন্দ্রও জানতেন না যে এটি মর্মপীড়ার কারণ হবে।

তবে সেদিন ন্যাশনাল হাওয়া অত্যন্ত প্রবল। নিজের জীবনের থেকেও বড়ো তখন জাতীয় সম্মান। তাই উদ্দীপিত হতে রামচন্দ্রের আর দেরী হল না। তিনি ঘোষণা করে দিলেন যে, খোলা বেলুনের খেলাই তিনি দেখাবেন। তারপর প্যারাসুট খুলে নামবেন যেমন সাহেবরা নামে।

ব্যস, রামচন্দ্রের এই ঘোষণা ছড়িয়ে পড়ল দাবানলের মত। লোকের মুখে মুখে যথাসময়ে এ খবর গিয়ে পৌঁছুল সাহেব-টোলাতেও। সাহেবরাও সমান কৌতূহলী হয়ে উঠলেন নেটিবদের মতন। তারপর শহর কলকাতা এই দিনটির জন্য প্রতীক্ষায় রইল অধীর আগ্রহে।

না, এবার গড়ের মাঠে নয়। নারকেলডাঙায় যেখানে গ্যাস তৈরী হত সেখানকার ময়দান হল বেলুন ওড়ানোর জায়গা। রোজার হাজার লোক জমা হতে থাকল সেখানে। কলকাতায় প্রথম বেলুনে ওড়ানোর দিন যেমন হয়েছিল, অনেকটা সেই রকম। শুধু কালা নেটিবরা নয়, সাদা সাহেবরাও এলেন। অনেকেরই হাতে দূরবীণ। আমাদের দেশী লোক সেদিন ঐ ভিড়ের 'জনগণমন অধিনায়ক', এ কি কম গৌরবের কথা?

এবারও গোপাল মুখোপাধ্যায়ের টাকাতেই তৈরী হয়েছিল বেলুন। অনেক অনেক টাকা খরচ করেছিলেন তিনি। যথাসময়ে সেই মহামূল্যবান বেলুন আকাশে উড়ল। রামচন্দ্র ঐ বেলুনে সমাসীন। প্রথমের দিকে বেলুনটি ছিল দড়ি বাঁধা। সেই সুদীর্ঘ শক্ত দড়িতে আটকানো। কথা ছিল রামচন্দ্র ইশারা করে রুমাল নাড়লে দড়ি কেটে দেওয়া হবে। হলোও তাই। কিছুদূর বেলুনটি ভেসে চলার পর রামচন্দ্র রুমাল নাড়লেন। ব্যস, সঙ্গে সঙ্গে খটাস করে দড়ি কেটে দেওয়া হল। এর পর বেলুন ওপরে উঠতে আরম্ভ করল। কখনো হেলে-দুলে আবার কখনো বা শোঁশোঁ করে ওপরে ওঠে বেলুন। কে একজন ভিড়ের ভেতর থেকে টিপ্পনী কেটে মন্তব্য করে—

হেলে দুলে, নেচে নেচে, চলে থরে থরে।
মহাবেগে চলিয়াছে মেঘের উপরে।।

এদিকে সত্যি সত্যিই মেঘের ওপরে বেলুন ভেসে চলে। আর স্তব্ধ বিস্ময়ে রুদ্ধশ্বাসে সকলে তাকিয়ে থাকে ওপরের দিকে। মনে মনে ভাবে, এইবার বুঝি রামচন্দ্র প্যারাসুট হাতে লাফ মারবেন বেলুন থেকে। কিন্তু তা আর হয় না, আরবরজনীর গল্পের মতন রক পাখি ছোঁ মেরে নিয়ে চলে যেন রামচন্দ্রকে। ভিড়ের ভেতর বিজ্ঞান-জানা এক সাহেব ছিলেন, তিনি বলে উঠলেন, 'না রামবাবু আর নামতে পারবেন না। এখন তিনি একবারে কোল্ড ওয়েভের ভেতর চলে গেছেন। ওখানে গেলে কেউ জীবন্ত ফিরে আসে না।'

এসব কথা শুনে কালো নেটিবদের মুখ আরো কালো হয়ে উঠল। কেউ কেউ হায় হায় করে উঠল। গোপাল মুখোপাধ্যায়ের অত টাকার বেলুন তো গেলই, সঙ্গে সঙ্গে রামচন্দ্রও গেলেন?

কৌতূহলীরা চোখে দূরবীন এঁটে অধীর আগ্রহে ওদিকে তাকিয়ে আছেন।—এক সময় হঠাৎ তাঁরা দেখতে পেলেন রামবাবু লাফিয়ে পড়েছেন বেলুন থেকে। সঙ্গে সঙ্গে ঝাঁকানি খেয়ে ভারমুক্ত বেলুনটা আরো ওপরে উঠে গেল, আর রামবাবু পাক খেতে খেতে নীচে নামতে থাকলেন। শূন্যে এক একটি পাক খান, আর নেমে আসেন একবারে পঞ্চাশ-ষাট হাত এইভাবে বার কয়েক পাক খাবার পর প্যারাসুট গেল খুলে। — ত্রেতাযুগের রাবণবিজয়ী রামের মতই রামচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় যেন পুষ্পক রথ থেকে নেমে আসতে লাগলেন ধীরে ধীরে।

এদিকে সারা মাঠ জুড়ে লেগে গেল হৈ-চৈ। সকলে আনন্দে হাততালি দিয়ে, রুমাল উড়িয়ে টুপি উড়িয়ে দু হাত তুলে নাচতে থাকল। আর ঘন ঘন জয়ধ্বনি পড়ল—জয় রামবাবুকী জয়! — সাহেবরা এ দৃশ্য দেখে একে একে কেটে পড়লেন।

প্যারাসুটের সঙ্গে রামবাবু মাটিতে নামতেই, সকলে তাঁকে ঘিরে ধরল। কেউ তাঁকে হাওয়া করতে থাকল, আবার কেউ-বা ভিড় ঠেলে এগিয়ে দিল শরবৎ।

এবার একটু সুস্থ হওয়ার পর কেউ কেউ জিজ্ঞাসা করল: 'কী ব্যাপার? বেলুন থেকে লাফিয়ে পড়তে এত দেরী করলেন কেন? বুঝতে পারেন নি বুঝি, রামবাবু?'

রামবাবু জিব কেটে বললেন, 'না না, ওসব না। বুঝতে ঠিকই পেরেছিলাম। কিন্তু যতবারই লাফিয়ে পড়বার জন্যে দড়ি ধরতে যাই, মনের ভেতরটা কেমন যেন হয়ে ওঠে। হাত সরিয়ে নি।'

'তাই নাকি? তারপর?'

'তারপর আর কি! যখন দেখলুম বেলুন উঠতে উঠতে এত ওপরে উঠে গেছে যে, আর কিছুই প্রায় দেখা যায় না, তখন সাহসে ভর করে 'জয় মা' বলে লাফিয়ে পড়লুম।'

না, এর পরে আর কোনো কাহিনী নেই। গগনে গগনে খেলার একটি যুগ এখানেই শেষ হল। পরে অবশ্য আকাশের দরজা অন্যভাবে খুলে গেল। তার ইতিবৃত্ত অন্য ধরনের, সুতরাং বর্তমানে অপ্রাসঙ্গিক। তবে বহুকাল ধরে মানুষ যে আকাশে ওড়ার স্বপ্ন দেখেছিল, সেই স্বপ্নকে বেলুনই প্রথম বাস্তবে রূপায়িত করে, তাই প্লেন-জেট-রকেট-হেলিকপ্টার যতই আসুক না কেন, বেলুনের রোমান্সকে মানুষ বোধহয় কোনদিন ভুলতে পারবে না!

আর সেই সঙ্গে বাঙালীরা বোধহয় রামবাবুকেও না। আগেই বলেছি এই রামচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পর্কে বিশেষ কিছু জানা যায় না। তবে শোনা যায়, এর পরেই তিনি সঙ্কল্প নিয়েছিলেন বাঘের সঙ্গে লড়াই করবার। যে সে বাঘ নয়, একেবারে রয়েল বেঙ্গল টাইগারের সঙ্গে।

যে কথা, সেই কাজ। পাথুরেঘাটার রাজবাড়িতে কোথা থেকে তিনি একটি কেঁদো বাঘ জোগাড় করে আনলেন। তারপর দেখালেন খেলা। রামচন্দ্র ঘোষণা করলেন, 'সাহেব বেটারা আর কী খেলা দেখায় বাঘের, দু পাশে দুটো বন্দুক নিয়ে লোহার খাঁচার ভেতর। আমি খেলা দেখাব একবারে খোলা উঠোনে।'

হ্যাঁ দেখালেনও তাই। খাঁচা থেকে ছেড়ে দেওয়া হল বাঘ। চড়চাপড় ঘুষোঘুষি মেরে বাঘকে বশে আনলেন রামচন্দ্র। তারপর প্রহার দিয়ে ভরে দিলেন খাঁচায়।

যাই হোক, এই অ্যাডভেঞ্চারপ্রিয় মানুষটি একবারে হঠাৎ সন্ন্যাসী হয়ে গৃহত্যাগী হন। সোজা চলে যান হিমালয়ে। তারপর সেখানে তপস্যা করতে করতেই একদিন দেহত্যাগ করেন।

কোথায় আকাশ, আর কোথায় সন্ন্যাস! বাইরে কোথাও মিল নেই। তবে ভেতরে ভেতরে নিশ্চয় কোনো সাদৃশ্য আছে! তাই মহাশূন্যের রহস্য যে জেনেছে, সে শেষ পর্যন্ত মুক্তজীবনের দীক্ষা না নিয়ে কি পারে?—গগনে গগনে আপনার মনে' এ আরেক খেলা! বেলুনবিজয়ী রামচন্দ্র সেই খেলাই খেললেন।

জলসা

সদারং সংগীত সম্মেলন

কলামন্দিরে সর্বভারতীয় সদারং সংগীত সম্মেলনের আসর ছিল প্রাক্-পূজা সংগীতোৎসবের প্রধান আকর্ষণ। উৎসবের উদ্বোধন ভাষণে ওস্তাদ আমীর খান উচ্চাঙ্গ সংগীত প্রচার ও প্রসারের ক্ষেত্রে সদারং সংগীত সম্মেলনের অবদানের উল্লেখ করে সংঘসচিব কালিদাস সান্যালকে অভিনন্দন ও আশীর্বাদ জ্ঞাপন করেন। শিল্পী, সভ্য ও সংগীতরসিক শ্রোতাদের সকৃতজ্ঞ ধন্যবাদ জানিয়ে প্রত্যুত্তরে শ্রীসান্যাল বলেন, এঁদের সার্থক সহযোগিতা পেয়েছেন বলেই নানান বিরুদ্ধ পরিস্থিতি ও বিপত্তি উপেক্ষা করেও দীর্ঘ বারো বছর ধরে সদারং সংগীত সম্মেলনের আসর অব্যাহত আছে। শ্রীমতী গোপা চট্টোপাধ্যায়ের 'বন্দেমাতরম' গান দিয়ে উৎসবের সূচনা ঘটে।

সদারং সংগীত সম্মেলনের কণ্ঠসংগীতে প্রধান আকর্ষণ ছিলেন **ওস্তাদ আমীর খাঁ ও সংগীতালংকার সুনন্দা পট্টনায়ক।** একজনের বুদ্ধিদীপ্ত মর্যাদা-গাম্ভীর্য অপরের আবেগ-মাধুর্য ও আঙ্গিক ঐশ্বর্যের সমারোহ শ্রোতাদের আবিষ্ট করে রেখেছিল।

ওস্তাদ আমীর খাঁর গীত কৌশিককানাড়ার ধীর, শুদ্ধ বিস্তারের বেশ সারা প্রেক্ষাগৃহে ধ্যানস্তব্ধ পরিবেশ রচনা করে। এই মধ্যমপ্রধান রাগে মাজ্ঞা, মাদা, গমপ মপাজ্ঞা, মারসা-র শাস্ত্রীয় প্রয়োগে রাগের বক্রগতির ওপর যথেষ্ট আলোকপাত করা হয়েছে। সুর থেকে মধ্যমের [illegible] রাগের শ্রীমণ্ডিত অঙ্গসৌষ্ঠব রচনার সহায়ক হয়ে উঠেছিল।

উচ্চারণবিভ্রাট এবং তারসপ্তকে কণ্ঠসঞ্চালনের কিছু জড়তা যে অস্বস্তি সৃষ্টি করেছে তার যথোপযুক্ত ক্ষতিপূরণ ঘটেছে সংযত তানের শান্তশ্রী রচনায়। আর তারই মধ্যে যেন কথা বলে উঠেছে খাঁ-সাহেবের সূক্ষ্ম শিল্পচেতনার গভীরতা। তরুণ তবলিয়া গোবিন্দ বসুর তবলা সঙ্গত অভিনন্দনীয়।

সর্বশেষ অধিবেশন সমাপ্ত হোলো শ্রীমতী সুনন্দা পট্টনায়কের গান দিয়ে। সম্মেলনের ঠিক আগেই শ্রীমতী পট্টনায়কের ভ্রাতার মর্মন্তুদ মৃত্যু-সংবাদ ও সেই কারণে তাঁর উপস্থিতির অনিশ্চয়তা শিল্পীর অগণিত অনুরাগীদের অস্বাচ্ছন্দ্যের কারণ হয়েছিল। কিন্তু তাঁর গানের অনুরাগী শ্রোতাদের তরফ থেকে আসবার জন্য ব্যাকুল অনুনয় ও কালিদাস সান্যালের বিশেষ অনুরোধে ইনি ব্যক্তিগত শোক উপেক্ষা করেও সংগীতাসরে উপস্থিত হয়ে কোলকাতার সংগীতসমাজকে যে সম্মান প্রদর্শন করেছেন, তার জন্য রসিকসমাজ চিরদিন শিল্পীর কাছে কৃতজ্ঞতাবদ্ধ থাকবেন।

রাত্রিশেষের লগ্নে ভোরের আলো যখন সবেমাত্র আকাশের কোণে উঁকি দিচ্ছে, তখনই শ্রীমতী পট্টনায়ক ধরলেন রামকেলী। রাগের অন্তর্নিহিত কোমল কারুণ্য ও আত্মনিবেদনের আবেদন শিল্পীর রাগরূপ রচনায় যেন ছবির মত ফুটে উঠেছিল। অন্তরে ব্যাকুলতার বিষণ্ণ আলোর মৃদু আভায় শিল্পীর মানসলোকের ঐশ্বর্য যেন আরো বেশী বাঙ্ময়ী হয়ে উঠেছিল। এর সঙ্গে মিশেছিল গোয়ালিয়র ঘরানার সতেজ স্পষ্টতা ও [illegible] তান। শ্রোতাদের অনুরোধে [illegible] গাওয়ার পরেও বিশেষ অনুরোধে শংকরাচার্যের 'ভজ গোবিন্দম্' স্তোত্র দিয়ে শিল্পী অনুষ্ঠান সমাপ্ত করলেন।

ওস্তাদ শাহামৎ হোসেন খাঁর [illegible] কানাড়া রাগে আগ্রা ঘরানার এক বিরল নজীর পাওয়া গেল। শিল্পীর কণ্ঠের দাপট, মেজাজ, তান সবই উপভোগ্য হয়েছে। বিলম্বিতে ইনি শুধু লয়কারী নিয়ে দরবারী কানাড়া রাগরূপায়ণ। শেষের ঠুংরীটি ইনি ভালই গেয়েছেন। এঁর সঙ্গে তবলা সঙ্গতে সমান আনন্দ দিয়েছেন পণ্ডিত কিষণ মহারাজ। [illegible] খাঁর কল্যাণ ঠাটে গাওয়া হংসধ্বনি গুণী-জনের প্রশংসা পেয়েছে। কিন্তু শিল্পী-পরিচিতির সার্টিফিকেটের স্বাক্ষর তাতে কেন ফুটল না?

মীরা বন্দ্যোপাধ্যায় সমানে সম্মানেই প্রতিষ্ঠিতা। পরিবেশনা সাবলীল তান কর্তবের দক্ষতাও আনন্দদায়ক। কিন্তু সামগ্রিক গঠনের ঐক্যসুষমাটিতে কোথায় যেন একটু শৈথিল্য ছিল। কুমার মুখোপাধ্যায় গেয়েছেন নটবেহাগ, [illegible] বসু ছায়ানট।

তরুণ শিল্পীদের মধ্যে গৌতম রায়ের পূরিয়া ও খাম্বাজ ঠুংরী খুবই আশাপ্রদ।

কণ্ঠসংগীতের তুলনায় এবারের **যন্ত্রসংগীতের আসর নিষ্প্রভ।** মণিলাল নাগ ও ভি জি যোগের সেতার ও বেহালার যুগলবন্দী ছিল অন্যতম আকর্ষণ। প্রথমের পূরিয়া কল্যাণ এঁরা ভালই বাজিয়েছেন— তবে তার চেয়েও জমেছিল কিরবাণী। এঁদের সঙ্গে তবলাসঙ্গতে কিষণ মহারাজ ও জমিয়েছেনই, তরুণ শিল্পী আনন্দ [illegible] প্রতিশ্রুতির পরিচয় দিয়েছেন তাঁর বাজনায়।

সুনন্দা পট্টনায়ক

[illegible] উদীয়মান এবং [illegible] শিল্পী।

[illegible] নিঃসন্দেহে উজ্জ্বল হয়েছে।

অশোক পাঠক পিতা [illegible] পাঠকের [illegible] তৈরী হয়ে উঠেছেন।

খ্যাতিসম্পন্ন সরোদী ওস্তাদ [illegible] খাঁ সেহাগে আলাউদ্দিন ঘরানার [illegible] অভাব ছিল। তবে খাঁর সেতারবাদন সুশ্রাব্য। ধ্যানেশ খাঁর পূরিয়া ধানেশ্রী শিল্পীর যোগ্যতার স্বপক্ষে রায় দিয়েছে। একই কথা বলা যায় বুলবুল চৌধুরীর তবলা সম্পর্কে।

এছাড়া অপ্রতিরোধ্য আকর্ষণ তবলা বাজনা, বেনারসের তবলিয়া পণ্ডিত কিষণ মহারাজের। এঁর ঠেকা, রেলা, পরণ, টুকরো—শক্তির দাপট, শিল্পবোধের এক সুন্দর সমন্বয়।

—চিত্রাঙ্গদা

বঙ্কিমচন্দ্রের নামকরণ

সুনীল মুখোপাধ্যায়

সব সময় যে নাম চরিত্রের সঙ্গে সঙ্গতি রক্ষা করে চলে তা নয়, কিন্তু নামেরও যে একটা মহিমা আছে তা অস্বীকার করা যায় না। নাটক, উপন্যাস, গল্প প্রভৃতির পাত্র-পাত্রীর নাম নির্বাচনে শিল্পিরা অনেক সময় এ বিষয়ে সচেতন ও সতর্ক হন। দক্ষ শিল্পীর নির্বাচিত নামের মধ্য দিয়ে অনেক ক্ষেত্রেই চরিত্র উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে। অনেকে নামকে তেমন গুরুত্ব দেন নি, অনেকের কাছে আবার নাম নির্বাচন একটা শিল্পবিশেষ। প্রসঙ্গত আমরা যদি বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ ও শরৎচন্দ্রের উপন্যাসের বিশেষ করে প্রধান প্রধান নারী চরিত্রগুলির নাম-নির্বাচন লক্ষ্য করি তাহলে দেখব—বঙ্কিমচন্দ্রই সর্বাধিক পুরাতন হয়েও আধুনিকতায়, নিপুণতায় ও তাৎপর্যে অধিকতর সচেতন ও পরিপাটী।

বাংলা উপন্যাসের জনক বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর উপন্যাসে নায়িকা ও প্রধান প্রধান নারীচরিত্রের নামকরণে যে দক্ষতা ও কল্পনাশক্তির পরিচয় দিয়েছেন তা আমাদের মুগ্ধ করে। সেকালে বসে যে বঙ্কিমচন্দ্র (১৮৩৮-৯৪) নাম-নির্বাচনে কতখানি আধুনিক ও সুরুচিসম্পন্ন ছিলেন তা একালের পাঠকেরও বিস্ময় উৎপাদন করে। তাঁর নির্বাচিত নারীচরিত্রের নামগুলি যেন প্রায় সর্বক্ষেত্রেই ইঙ্গিতগর্ভ, চরিত্রের বৈশিষ্ট্য ও স্বরূপ উদ্ঘাটন করে। বঙ্কিমচন্দ্রের প্রথম উপন্যাস 'দুর্গেশনন্দিনী'র (১৮৬৫) আয়েসা নামটি যেমন সঙ্গীত-মধুর তেমনি প্রেমস্নিগ্ধ নাম। এ-নাম জগৎসিংহকে তো বটেই প্রত্যেক পাঠককেও মোহাবিষ্ট করে। তিলোত্তমা নামটি গুরুভার হলেও সৌন্দর্যের চিত্র ফুটিয়ে তোলে, কিন্তু আয়েষা নামটি পাঠকের অন্তরকে বিনীত-মাধুর্যে ভরিয়ে তোলে। আয়েষা তার প্রেমাস্পদকে পায় নি বটে, কিন্তু তার প্রেমমহিমা শান্তশ্রীতে ভরপুর যা ঐ নামটির সঙ্গে একাত্ম হয়ে আছে।

দ্বিতীয় উপন্যাসে কাপালিক-পালিতা ও দেবী কালিকা প্রভাবান্বিতা মেয়েটির নাম কপালকুণ্ডলা ছাড়া আর কি মানাতো? সংসার-জীবনে কপালকুণ্ডলা মৃন্ময়ী হয়েছে, অরণ্য তথা প্রকৃতির দুলালীকে আরণ্য জীবনের সঙ্গে সংযোগ হারাতে কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্র দেন নি। নামের সঙ্গে চরিত্রের সঙ্গতি তাৎপর্যপূর্ণ।

সূর্যমুখী ফুল যেমন সূর্যের মুখ-পানে চেয়ে থাকে, নগেন্দ্র-জায়া সূর্যমুখীও তেমনি একান্তভাবে নগেন্দ্রমুখী—অস্তায়-মান নগেন্দ্র-চরিত্রের সঙ্গে সঙ্গে সূর্যমুখীর প্রাণৈশ্বর্যও ঢলে পড়ছে। কুন্দনন্দিনী যেমন মিষ্টি নাম তেমনি বিষাদ ও বেদনা বিধুরা। যেন কুন্দকলি, প্রস্ফুটিত হবার আগেই ঝরে যায়।

স্বল্পাক্ষরে মধুর ও আধুনিক ভ্রমর নামটি বঙ্কিমচন্দ্র সেকালে বসেই নির্বাচন করেছিলেন এটা কম কথা নয়। দেবদেবী বা নক্ষত্রের নাম দিয়েই যেকালে নামকরণ হোত, সেকালে বঙ্কিমচন্দ্র প্রথাবদ্ধ ও প্রচলিত নাম বর্জন করে নতুন নাম সৃষ্টি করে যথেষ্ট মুন্সিয়ানা দেখিয়েছেন। বহিরঙ্গে ভ্রমর হয়ত ভোমরার মত কালো, কিন্তু অন্তরে তার প্রেমের আলো, হৃদয় তার মধু-গুঞ্জনে মুখর। রোহিনী নামটিও সুনির্বাচিত। নক্ষত্র-সদৃশ তার রূপ ও আকাঙ্ক্ষা, যাতে গোবিন্দলাল অভিভূত। তার চরিত্রটি নামের মধ্য দিয়ে সংকেত লাভ করেছে। দু'অক্ষরের হীরা নামটিও লক্ষ্য করার মত। হীরের কাঠিন্য ও দ্যুতি হীরা চরিত্রে বিদ্যমান। তার বাস্তববোধ ও বুদ্ধির দ্যুতি সহজলক্ষ্য এবং সে যে প্রয়োজনে কত কঠিন হতে পারে তা দেবেন্দ্রকর্তৃক অপমানিত হবার পর প্রতিশোধ গ্রহণের মধ্য দিয়ে তা দেখিয়ে দিয়েছে।

শৈবলিনী—এই নামটির মধ্যেই যেন একটি ব্যক্তিত্ব আভাসিত। জলজ শৈবাল কোমল ও ঘন, শৈবলিনীও কোমল ও গাঢ় প্রেমানুভূতিতে নিথর। অসাধারণ ব্যক্তিত্ব না থাকলে সেকালের সমাজ ব্যবস্থার মধ্যে কোন পরস্ত্রী প্রেমিকের জন্য ঘর ছেড়ে বেরুতে পারে না। এ চরিত্রটি অন্য কোন নামে ব্যঞ্জিত হতো বলে মনে হয় না। নামটি যেমন অভিনব তেমনি বঙ্কিমচন্দ্রের সার্থক সৃষ্টি।

দলনী বেগম—একটি প্রাণজুড়ানো নাম। মাধুর্য প্রেম, আত্মোৎসর্গ সব দিক থেকেই বঙ্কিমচন্দ্রের মানসকন্যা দলনী মাধুর্যমণ্ডিতা। নামটির মধ্যে সুরের ছোঁয়া রয়েছে।

চঞ্চলকুমারীর চঞ্চলমতিত্বের জন্যই অর্থাৎ পদাঘাতে বাদশাহের তসবীর ভাঙার কারণেই অতবড় যুদ্ধটা শুরু হয়েছিল। কিন্তু সে প্রেমে স্থির, যেন 'অচপল দামিনী'। রাজস্থানের পাহাড়ী জায়গার দীর্ঘতা ও অসমতার সঙ্গে সামঞ্জস্য রাখার জন্য বোধহয় অনুরূপ-ভাবে নির্মলকুমারী নামটি নির্বাচিত।

আনন্দমঠের কল্যাণী সার্থকনাম্নী। তিনি যথার্থই কল্যাণ বিকীর্ণ করেছেন সমগ্র উপন্যাসে। দেবীচৌধুরাণীর দেবী নামটি অবশ্যই সর্বগুণ অর্জন ও বিপুল ঐশ্বর্যের অধিকারিণী হওয়ার মধ্য দিয়ে তাৎপর্যমণ্ডিত। নয়ানবৌ, সাগরবৌ নাম দুটি নির্বাচনে বঙ্কিমের পরিশীলিত রুচি পরিস্ফুট। দিবা ও নিশি যথেষ্ট সংকেত বহন করে এবং ডাকাত সর্দারের উপযুক্ত সহচরী। এই নামগুলি বঙ্কিমচন্দ্রের চিন্তা ও শিল্পবোধকে ফুটিয়ে তোলে।

সীতারামের শ্রী সত্যই শ্রীমণ্ডিত—নামে এবং চরিত্রে। একাক্ষরে যেমন মধুর ও রুচিস্নিগ্ধ, তেমনি চরিত্রের শুভ্রঋজুতাকে ব্যঞ্জিত করে তোলে। নামটি যেমন আধুনিকতম, তেমনি বৈচিত্র্য সম্পাদন করে। এ শ্রী বিগলিত হয় না, এর যেমন কাঠিন্য আছে, তেমনি দীপ্তিও আছে।

কিন্তু রবীন্দ্রনাথের উপন্যাসের প্রধান প্রধান নারীচরিত্রগুলি, তাদের নামের ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথের কাছ থেকে অনুরূপ মনোযোগ ও নিষ্ঠা আদায় করতে পারেনি। অর্থাৎ মনে হয়, দু' একটি ক্ষেত্র ছাড়া রবীন্দ্রনাথ নামকে চিহ্ন ছাড়া আর কিছুই ভাবেন নি। 'মহুয়া' কাব্যের ভূমিকায় রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং বলেছিলেন—কাব্যের নাম হবে ব্যাখ্যামূলক নয়, ব্যঞ্জনাধর্মী। উপন্যাসের নায়ক-নায়িকার নাম নির্বাচনের ক্ষেত্রেও এটি আকাঙ্ক্ষিত, কিন্তু রবীন্দ্রনাথ এখানে সে সচেতনতার পরিচয় দেন নি। তাঁর দু' একটি নাম ছাড়া আধুনিক নাম যেমন নেই, তেমনি নামগুলি বঙ্কিমচন্দ্রের নামের মত ব্যঞ্জনাধর্মীও নয়।

চোখের বালির আশা ও বিনোদিনী চরিত্র দুটি রবীন্দ্রনাথ নিপুণ হাতে সৃষ্টি করেছেন বটে কিন্তু নাম দুটি যথেষ্ট ইঙ্গিতগর্ভ নয়, সুতরাং তার নাম সুনির্বাচিত হবার দাবী রাখে।

নৌকাডুবির কমলা বা হেমনলিনীর নাম নির্বাচনে কোন দক্ষতা ও ব্যঞ্জনার ছোঁয়া নেই—সেকালের অতি সাধারণ নাম। কমলার শান্ত, সমাহিত সৌন্দর্য বা হেমনলিনীর চরিত্রের গভীরতা বঙ্কিমচন্দ্রের মত নামে আভাসিত হয় নি।

গোরার সুচরিতা সংযত ব্যক্তিত্বের দীপ্তিতে সমুজ্জ্বল—নামটি আমাদের আকৃষ্ট করে সন্দেহ নেই। কিন্তু ললিতা খুব একটা সুনির্বাচিত নাম তা নয়। তবে মা আনন্দময়ী সার্থকনাম্নী।

চতুরঙ্গের দামিনী কিন্তু আধুনিকতায় ও ব্যঞ্জনায় নন্দিনী, ভ্রমর, শ্রী, হীরার সঙ্গে একাসনে বসতে পারে। দামিনী বিদ্যুতের মতই দীপ্তিময়ী এবং হঠাৎ আলোর ঝলকানি লাগিয়ে চিত্তকে ঝলমল করে। শচীশের প্রেমের স্পর্শে সে স্তব্ধ ও সংহত হয়েছে। ননিবালা নামটি নাম হিসাবে অন্ত্যজ শ্রেণীর।

ঘরে বাইরের বিমলা যদিও মাধুর্যে, বুদ্ধি ও গভীরতায় অসাধারণ তবুও নামটি কিন্তু অতি সাধারণ ও তাৎপর্যহীন।

যোগাযোগের কুমুদিনী আভিজাত্যে ও সংযত বলিষ্ঠতায় সার্থক চরিত্র, কিন্তু নামটি ঠিক প্রতীকধর্মী নয়। হয়ত তার অন্তরের সৌন্দর্যের কথা চিন্তা করে আমাদের চন্দ্রকিরণের কথা মনে পড়তে পারে, কিন্তু রবীন্দ্রনাথ বঙ্কিমচন্দ্রের মত অতটা সতর্ক ছিলেন বলে মনে হয় না।

শেষের কবিতার লাবণ্য কিন্তু একটি অনুপম নাম। নামটি চরিত্রের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ বলা যায়। নামটি যেমন আধুনিক তেমনি সঙ্গতিপূর্ণ। বুদ্ধির দীপ্তিতে, হৃদয়ের গভীরতায়, প্রেমানুভূতিতে লাবণ্য লাবণ্যবতী সন্দেহ নেই। কিন্তু এটা কি রবীন্দ্রনাথের সচেতন মনের প্রয়াস?

দুই বোনের ঊর্মিলা ও শর্মিলা নাম দুটি চরিত্রের কোন পরিচয় বহন করে আনে না। মায়ের জাত হিসাবে শর্মিলা ও প্রিয়ার জাত হিসাবে ঊর্মিলাকে অঙ্কন করেছেন। রবীন্দ্রনাথ তেমন সচেতন হলে নাম দুটির স্থান পরিবর্তন ঘটত।

চার অধ্যায়ের এলা একটি সুন্দর আধুনিক নাম। রহস্যময় মাধুর্যের, অনির্বচনীয় সৌন্দর্যের জ্যোতির্বলয় যেন তাকে ঘিরে আছে। যদিও নামটি যথেষ্ট পরিমাণে তাৎপর্যবহ নয়, তবু এ নামের একটা আলাদা স্বাদ-মাধুর্য রয়েছে।

রবীন্দ্রনাথ বঙ্কিমচন্দ্রের মত নামকে বড় করে দেখেন নি। তিনি অনুরূপ সতর্ক না হলেও তাঁর নির্বাচিত নামের মধ্যে একটা শুচিতা ও সম্ভ্রমবোধের পরিচয় পাওয়া যায়।

আধুনিককালে শরৎচন্দ্র-এর ক্ষেত্রেও দেখতে পাই যে, তিনি তাঁর উপন্যাসের নারীচরিত্রগুলির নামকরণে আধুনিকতা, যথাযথ মনোযোগ ও সতর্কতার পরিচয় দেন নি। সৃষ্ট চরিত্রগুলি আপন মহিমায় উজ্জ্বল হয়ে আছে বটে কিন্তু নামের মধ্য দিয়ে চরিত্র যেন দু' একটি ক্ষেত্র ছাড়া আর কোথাও ফুটে ওঠেনি। কয়েকটি ক্ষেত্রে দেখি আবার নায়ক নায়িকার একটা অন্তরঙ্গ দ্বিতীয় নাম দিয়েছে, যে-নামে শুধু তাদেরই অধিকার। তারও যে কোন সংকেতধর্মিতা আছে তা নয়, তবু সেগুলি মধুর। যেমন রমা হচ্ছে রাণী, ষোড়শী অলকা। রাজলক্ষ্মীরও দ্বিতীয় নাম রয়েছে পিয়ারী বাঈজী। অনেকে আবার মনে করেন শরৎচন্দ্র তাঁর সৃষ্ট অসৎচরিত্রাদের নামকরণে ইচ্ছাকৃতভাবে সাবিত্রী, সবিতা, পার্বতী, অভয়া, রাজলক্ষ্মী প্রভৃতি পূত নামগুলি গ্রহণ করেছেন।

পল্লীসমাজের রমা পুরানো হলেও দু অক্ষরে মিষ্টি নাম। সে রমেশকে নন্দিত করে সন্দেহ নেই। রমা লক্ষ্মী—সে রমেশের জীবনকে পূর্ণ করেছে। সেদিক থেকে নামের কিছুটা তাৎপর্য পাওয়া গেলেও যেতে পারে। দেনাপাওনার ষোড়শী, চরিত্রটির জীবনচর্যার সঙ্গে সঙ্গতি রক্ষা করে। দ্বিতীয় নাম অলকা-র মাধুর্যমণ্ডিত অন্তরঙ্গতা রয়েছে। ভাগ্যগুণে ষোড়শী শরৎচন্দ্রের কাছ থেকে এটি অর্জন করেছে বলে মনে হয়।

শ্রীকান্তের রাজলক্ষ্মী বা অন্নদাদিদি শুধু নাম মাত্র, যেমন অনাধুনিক তেমনি তাৎপর্যহীন। অভয়া নামের মধ্যে [illegible] খানিকটা সৌন্দর্য ও নির্ভীকতার পরিচয় পাওয়া যায়।

পথের দাবীর ভারতী, দেবদাসের পার্বতী পুরাতন ও সাধারণ নাম [illegible] চরিত্রকে ব্যঞ্জিত করে না। গৃহদাহের 'অচলা' নামটি কিন্তু অপেক্ষাকৃত [illegible] বলা যায়। নামটি আধুনিক ও প্রকাশ[illegible] ঐ চরিত্রটিকে এর থেকে ভাল অন্য কোন নামে বোঝা বোধহয় মুস্কিল।

চরিত্রহীন-এর কিরণময়ী, সাবিত্রী, সরোজিনী নিছক নাম। এর পেছনে শরৎচন্দ্রের কোন সচেতনতা ছিল না বলেই মনে হয়। বিরাজবৌ-এর বিরাজ, পরিণীতার ললিতা, নিষ্কৃতির শৈল, বিন্দুর ছেলের বিন্দু, বরং অপেক্ষাকৃত মধুর ও আধুনিক[illegible]

বিপ্রদাসের সতী ও বন্দনা নাম দুটি সুন্দর। বন্দনাকে আধুনিক [illegible] শেষের পরিচয়ের সবিতা [illegible] দায়িত্ববোধে মাধুর্যে সে [illegible] ইঙ্গিতগর্ভ।

সুতরাং দেখা যাচ্ছে, বঙ্কিমচন্দ্রের [illegible] এঁদের পার্থক্য রয়েছে। [illegible] বস্তুনিষ্ঠতা। বঙ্কিমের যুগ [illegible] উপন্যাসের যুগ। [illegible] থেকেই বস্তুনিষ্ঠ, [illegible] মনোবিকলধর্মী উপন্যাসের [illegible] এই বস্তুনিষ্ঠার [illegible] শরৎচন্দ্রের নামগুলিও [illegible] পড়েছে। কেননা চরিত্র-প্রধান [illegible] এখন কাহিনী ছেড়ে চরিত্রের [illegible] করেছে।

ময়না

অসিত বন্দ্যোপাধ্যায়

ঘরের ভেতরে একলা চুপচাপ বসে রইল শওকত। ময়না অনেকক্ষণ চলে গেছে কিন্তু ময়নাকে নিয়ে চিন্তার রেশটা রেখে গেছে শওকতের মাথায়। কাল গাজীপাড়া অথবা ঝুমরোর বাজারে নীলামে বিক্রী হয়ে যাবে তার আদরের ময়না পাখী—এ-কথাটা ভাবতে শওকতের বুকের ভেতরটা কিরকম যেন চিন-চিন করতে থাকে। অথচ ময়নার বাবা ওই সুদখোর নরুল মিঞা গুনে গুনে কড়করে আড়াইশো টাকা না পেলে ময়নাকে হাত-ছাড়া করবে না। ময়না তার সুন্দরী মেয়ে। কিন্তু আড়াইশো টাকা সে এখন কোথায় পাবে।

একটু আগে ঘরের সামনে দাওয়ায় চুপচাপ বসেছিল শওকত। বিকেলের মরা রোদ্দুরের আলো এসে পড়েছিল এ-ধারটায়। সামান্য একটু দূরে শাল-দেবদারু আর ঝাউ গাছের শান্ত নিবিড় ছায়ায় ঘেরা এবাদ আলির কবরটার দিকে তাকিয়েছিল শওকত। কাল বিকেলে এমনি সময় মাটির নীচে শুইয়ে এসেছে শওকত তার বাবা এবাদ আলির মৃতদেহটা চির-শান্তির নিভৃত আশ্রয়ে। একদৃষ্টে সেই-দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে শওকতের চোখদুটো ঝাপসা হয়ে আসছিল।

ঠিক এমনি সময়ে এসেছিল ময়না। ময়না যে আজ এতদিন পরে আবার এখানে আসবে এটা শওকতের ছিল কল্পনার বাইরে। বিশেষ করে ময়নার বাবা নরুল-চাচা সেদিনের সেই মিলন-দৃশ্য দেখবার পর। লোকচক্ষুর অন্তরালে সামনের ঘন জঙ্গলের ওই শিমুল গাছটার নীচে সেদিন শওকত ময়নাকে জড়িয়ে ধরে সবে তার ঠোঁটে ঠোঁটটা ছুঁইয়েছিল এমন সময় জলদগম্ভীর স্বরে পিছন থেকে চিৎকার করে উঠেছিল নরুলচাচা, শওকত—হারাম-জাদা। বিদ্যুৎস্পৃষ্টের মত ময়নাকে ছেড়ে দিয়েছিল শওকত। নরুলচাচা শওকতের সামনে এসে বলেছিল, শয়তান। ভরদুপুরে পরের মেয়েকে ঘরের বার করে তৃষ্ণা মেটাচ্ছো।

ধরা পড়ে গিয়ে শওকত নিজের মনের ইচ্ছা প্রকাশ করে বলেছিল, আমি ময়নাকে বিয়ে করবো, নরুলচাচা।

একটা ধমক দিয়ে নরুলচাচা বলেছিল, বিয়ে করবি? তোর সাহস তো কম নয়। নিজের পেটের ভাত জোটাতে পারিস না, তুই ময়নাকে কি খাওয়াবি? —ছাতু।—নরুলচাচা একটু থেমে বলে, বিয়ে করার টাকা আছে তোর? আড়াইশোটা টাকা দে ময়নাকে নিয়ে গিয়ে তোর খাঁচায় রাখ। যত খুশি পীরিত কর। আর তা যদি না পারিস এই শিমুলতলায় দাঁড়িয়ে অমনধারা কিচিরমিচির করিসনি।

নরুলচাচার কথায় সেদিন শওকতের রাগে হাড় জ্বলে গিয়েছিল। আড়াইশোটা টাকা থাকলে তখনই নরুলচাচার মুখের ওপর ছুঁড়ে দিত। সে টাকা নেই শওকতের। কিন্তু কেনই বা সে টাকা দেবে। মুসলমানের কোন শাস্ত্রে বলেছে বিয়ে করলে শওকতকে টাকা দিতে হবে? বন্ধকী সুদের কারবার মুসলমানের কোন্ ধর্মশাস্ত্রে লেখা আছে। তবে হ্যাঁ, শওকত যদি বিয়ে করার পর ময়নাকে কোনদিন পরিত্যাগ করে, তার জন্য দেন-মোহর লিখে দিতে রাজী ছিল সে। আড়াই কেন আরো বেশী অঙ্কের স্বীকৃতিনামা লিখে দিত সে। কিন্তু ময়নাকে বিয়ে করায় সেলামী সে কেন দেবে নরুলচাচাকে। আবার লোকের কাছে বড়াই করে বলে চাচা নাকি সাচ্চা মুসলমানের বাচ্চা।

সেদিনের সেই ঘটনার পর ময়না এসে-ছিল আজ এই প্রথম। দাওয়া থেকে উঠে ময়নার হাত ধরে ঘরে টেনে এনে দরজা বন্ধ করে দিয়েছিল শওকত। নরুলচাচাকে তার বড় ভয়। ভয় ময়নারও আছে। বাবার ভয়েই সে শওকতের কাছে আসতে পারেনি এতদিন। কিন্তু আজ সংবাদটা

শওকতকে না দিলেই নয়। ছোট ভাইটার অসুখ। রাস্তার টিউকল থেকে জল আনতে হবে তাকে। সুতরাং এই সুযোগ। সট-কাটে জঙ্গল পেরিয়ে ময়না সোজা চলে এসেছিল শওকতের কাছে। এলো গায়ে শুধু শাড়ীর আঁচলটা ভাল করে জড়ানো। ফেরার পথে পুকুরঘাটে গা'টাও ধুয়ে যাবে ময়না।

শওকত চোখ দিয়ে ময়নার শরীরটা চাটতে থাকে। এক মনোরম অনুভূতিতে তার সমস্ত দেহটা শির-শির করছে। সবে-মাত্র গতকাল যে তার পিতৃবিয়োগ হয়েছে এবং এখনও অশৌচ যায়নি সে-কথাটা সাময়িকভাবে ভুলে গিয়েছিল শওকত।

ময়না লজ্জা পেয়ে গায়ের কাপড়টা দিয়ে আরো একটু ভালো করে নিজেকে জড়িয়ে নিয়ে বলে, অমন করে তাকিয়ে কি দেখছিস।

—দেখছি তোকে। বলে ময়নাকে একটা হেঁচকা টানে নিজের বুকের সঙ্গে চেপে ধরে শওকত বলে, এমন করে তোকে কত-দিন পাইনি ময়না।

ঘরের ভেতর তখন অস্তগামী সূর্যের সোনার আভা এসে ছড়িয়ে পড়েছিল। ওদিকের বনজঙ্গল থেকে ভেসে আসছিল ক্লান্ত বিহঙ্গের কলকাকলি। ময়নার সমস্ত দেহটা শওকতের বুকের ওপর চুপ করে অসাড় হয়ে পড়েছিল। অনেকক্ষণ পরে শওকত ময়নার মুখের কাছে মুখ এনে বলেছিল, তুই আমায় ছেড়ে যাসনি ময়না।

এই ছেড়ে যাওয়ার কথাটা বলবার জন্যই এসেছিল ময়না। শওকতের বুকের ভেতরে মুখ লুকিয়ে ময়না বলে, তোকে ছেড়ে যেতে আমার মন চায় না শওকত। কিন্তু বাবাকে তুই আড়াইশোটা টাকা দিতে না পারলে আমাকে যে বাবা ভিন গাঁয়ে পাঠিয়ে দেবার বন্দোবস্ত করছে।

ময়নাকে ছেড়ে দিয়ে শওকত চোখ বড় বড় করে তাকিয়ে বলে, ভিন গাঁয়ে। কার কাছে—

—কার কাছে আবার। আমার বিয়ে দিয়ে দেবে। গতকাল এসেছিল গাজীপাড়া থেকে, আসছে কাল আসবে ঝুমরো থেকে। যেখানে বাবা টাকা বেশী পাবে সেইখানেই আমায় যেতে হবে।

—কিন্তু কালই আড়াইশোটা টাকা কোথায় পাবো ময়না?

উদাস চিন্তাকুল দৃষ্টিতে খোলা জানলার ফাঁক দিয়ে তাকিয়ে রইল শওকত সামনের ওই গন্ধরাজ গাছটার দিকে। বাবার কথা মনে পড়লো তার। বাবা-ই গাছটা পুঁতে গিয়েছিল বছর-দেড়েক আগে। আজ ক'দিন ধরেই গন্ধরাজ গাছটায় অনেক ফুল ফুটেছে। যেন এবাদ আলি মারা যাওয়ার আগে গাছটা ফুলসম্ভারে কৃতজ্ঞতা জানিয়ে নীরবে শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করছে।

সেদিক থেকে দৃষ্টি ফিরিয়ে এনে ময়নার মুখের দিকে তাকাল শওকত। চোখ জলে ভরে উঠেছে ময়নার। শওকতের দারিদ্র্যের কথা তো তার অজানা নয়। আড়াইশোটা টাকা সে আজই কোথায় পাবে? কে দেবে তাকে? বুকের ওপর কাপড়টা তুলে নিয়ে নিঃশব্দে বেরিয়ে গিয়েছিল ময়না।

চটকা-ভাঙা হয়ে ধড়মড় করে উঠে পড়ে শওকত। সন্ধ্যা হয়ে গেছে অনেক-ক্ষণ। ময়নার কথা ভাবতে ভাবতে কখন ঘরের ভেতর অন্ধকার নেমে এসেছে লক্ষ্য করেনি শওকত। ঘরের দরজাটা বন্ধ করে দাওয়ায় এসে দাঁড়ায় সে। বাঁশের খুঁটিটা ধরে তারা-জ্বলা উন্মুক্ত আকাশের দিকে তাকিয়ে ভাবে ময়না কি একেবারে চলে গেল। আর আসবে না কোনদিন।

অজগর সাপের মত ময়নার চিন্তাটা তাকে যেন ক্রমশঃ গ্রাস করে ফেলছে। এখনও আটচল্লিশ ঘণ্টা হয়নি তার বাবা মারা গেছে। কবরের ঠাণ্ডা মাটির নীচে চিরশান্তির আশ্রয়ে শুইয়ে দিয়ে এসেছে শওকত তার বাবা এবাদ আলির হিম-শীতল মৃতদেহটা। কিন্তু কি আশ্চর্য এই সামান্য সময়ের ব্যবধানে বাবার মৃত্যুটা যেন আস্তে আস্তে তার মনে ফিকে হয়ে আসছে। আর তার জায়গায় একটা গাঢ় চিন্তা তাকে রঙীন করে তুলছে—ময়না। না ময়নাকে আর কোন রকমেই ধরে রাখা গেল না। ময়না উড়ে যাবেই। তবু একবার শেষ চেষ্টা করে দেখবে শওকত। বাড়ীর উঠোন পেরিয়ে মেঠো রাস্তায় এসে নামলো সে। এখনই একবার নরুলচাচার কাছে যেতে হবে তাকে।

একটা ভুষো-পড়া লণ্ঠনের মিটমিটে আলোয় ঘরের সামনে রোয়াকে বসে সারা-দিনের পাওনাগণ্ডার হিসাব মিলিয়ে নিচ্ছিল নরুল মিঞা। সামনে একটা তেল-চিটে কাঠের বাক্স বসানো। নরুল মিঞার লক্ষ্মীর ঝাঁপি। শওকত এসে বসলো তারই পাশে।

হাতের কাজ বন্ধ রেখে শওকতের মুখের দিকে তাকাল নরুল মিঞা। এত-দিন পরে এই অসময়ে শওকতের আগমনের উদ্দেশ্যটা আঁচ করতে চাইলো। সবাই যে কারণে তার কাছে আসে শওকতও কি সেই কারণে তার কাছে এসেছে? টাকা?—তাছাড়া আর কি-ই বা হতে পারে।

নরুল মিঞা বললে, তা এই রেতের বেলায় শওকত তুমি যে হঠাৎ এখানে। টাকাকড়ি কিন্তু কিছু কর্জ দিতে পারবো না বাপজান।

শওকত তাড়াতাড়ি বলে, না চাচা, নগদ টাকা আমি ঠিক ধার করতে আসিনি—তবে কিনা বাবা মারা গেল। ঘরটা এখন বড় ফাঁকা। তাই বলছিলাম—

শওকত একটা ঢোক গিলে নরুল মিঞার দু'খানা হাত চেপে ধরে অনুনয় করে বলে, তুমি 'না' করো না চাচা। ময়নার সঙ্গে আমার বিয়ে দিয়ে দাও; আমি তোমার আড়াইশোটা টাকা সুদে-আসলে শোধ দিয়ে দোব। বিশ্বাস করো—আল্লার কসম।

টেনে হাতটা ছাড়িয়ে নিয়ে নরুল মিঞা রুক্ষকণ্ঠে বলে, তা এই কথা শোনাবে বলে বাপজান রেতের বেলা এতটা পথ হেঁটে এসেছ। অনেকেই তো অনেক টাকা দিতে চাইছে। মোটামুটি একটা ঠিকও করে ফেলেছি। শুধু এবাদ আলির ছেলে বলেই তোমাকে মাত্র আড়াইশো টাকা বলেছি। তা সেটাও যদি না দিতে পার—

নরুল মিঞা একটু থেমে অভিজ্ঞের মত বলে, তোমার এখন কাঁচা বয়েস, তাই মনে রঙ ধরেছে। আসলে ভালবাসা-টাসা ওসব কিছু নয়—সব ধোঁয়া, সব ধোঁকা, যাকে বলে স্রেফ বুজরুকি। ওই যে হিন্দুরা আমাদের নিয়ে একটা কথা বলে—ভালবাসা না মুসলমানের মুর্গী পোষা—একেবারে নির্ভেজাল খাঁটি কথা। ওদের শাস্ত্রে বলে স্ত্রীলোকের মন হচ্ছে জলবৎ তরলং। যখন যে পাত্রে রাখবে ঠিক সেই পাত্রেরই আকার ধারণ করবে। খুব সাঁচ্চা কথা। এই ময়নাকেই দেখ না—এই ক'দিনেই কোথায় উপে গেছে তোমার প্রতি তার ভালবাসা।

মিঞা হয়তো আরো বলে যেত কিন্তু যত গণ্ডগোল বাধালে ওই লণ্ঠনটা। কি যে হলো হঠাৎ আলোর শিখাটা দপ দপ করতে করতে নরুল মিঞার সব চেষ্টা ব্যর্থ করে এক সময় নিভে গেল। সব অন্ধকার।

দেশলাইটা হাতড়াতে থাকে নরুল মিঞা। ক্যাশ বাক্সোটা আবার খোলা রয়েছে শওকতের সামনেই। নরুল মিঞা একটু বিরক্ত হয়ে ওঠে। ঠিক সেই মুহূর্তে অন্ধকারে শওকতের উপস্থিতিটা যেন অসহ্য হয়ে ওঠে তার কাছে। বলে, এখানে ভূতের মত বসে থেকে আর লাভ কি শওকত। নরুল মিঞার একটাই কথা।

ক্যাশ বাক্সোটা নিজের কোলের কাছে আঁকড়ে ধরে থাকে নরুল মিঞা।

নিরাশ হয়ে ময়নার কথা চিন্তা করতে করতে বাড়ী ফিরছিল শওকত। এত গভীর চিন্তায় মগ্ন যে, রহমনকে বোধহয় ধাক্কাই মেরে দিত। মুখোমুখি থমকে দাঁড়িয়ে পড়লো দু'জনেই। রহমন বললে, তোকে বাড়ীতে না পেয়ে তোরই খোঁজে ঘুরছি।

—কেন, যা বলবার একবারই তো বলে দিয়েছি। গম্ভীরভাবে উত্তর দেয় শওকত।

এর আগেও ওই প্রস্তাব নিয়ে শও-কতের কাছে এসেছিল রহমন। কথাটা শোনামাত্র শওকতের মাথায় রক্ত উঠে গিয়েছিল। একটা খেটো লাঠি নিয়ে তেড়ে গিয়েছিল সে—শালা কসাই। রহমান ছুটে না পালালে বোধহয় মেরেই দিত শওকত। তখনকার মত পালালেও রহমন কিন্তু আশা ছাড়েনি। দেখলে শওকত নিরস্ত্র। সাহস পেয়ে তার কাছে এগিয়ে এসে দূরের ওই কবরখানার দিকে আঙুল দেখিয়ে বললে, শোন শওকত, ওই যে দেখছিস মিটমিট করে বাতিটা জ্বলছে ওটা ফতেমা-বিবি রোজ সাঁঝের বেলায় তার স্বামীর কবরে জেলে দিয়ে যায়। আর ওই যে আমাদের বুড়ো প্রেমিক রসুল মিঞা—যার স্ত্রীর কবরের ওপর রসুলের নিজের হাতে লাগানো যুঁই গাছটার সাদা সাদা ফুল সব সময় বিছিয়ে থাকে—

[illegible] রহমন আর শেষ করলো না। শুধু খ্যাঁক খ্যাঁক করে ধূর্ত শিয়ালের মত হেসে উঠলো। কিন্তু শওকত বোঝে রহমন কি বলতে চায়। রহমন বলে, তুই আমার বন্ধু বলেই শওকত তোকে আড়াইশো দিতে চাইছি। নয়তো কখন কাজ হাসিল করে দিতাম তুই জানতেও পারতিস না।

আসলে শওকতকে বেশ একটু ভয় করে রহমন। একবার যদি কোনরকমে কথাটা জানতে পারে শওকত, তাহলে রহমনকে আর জীবিত রাখবে না। শওকত এবার আগুন হয়ে ওঠে। চিৎকার করে বলে, শয়তান। শিয়াল-কুকুরের অধম তুই।

শওকত জোর পায়ে হাঁটতে থাকে। রহমন এবার শেষ অস্ত্র ছাড়ে। চেঁচিয়ে বলে, চলে গেলি শওকত। ময়নার মুখখানা একবার ভেবে দেখলি না। এই তোর ভালবাসা। তোর ওই আড়াইশোটা টাকার মুখ চেয়ে আছে সে এতদিন।

ময়নার কথায় থমকে দাঁড়িয়ে পড়ে শওকত। রহমনের কথাগুলো একেবারে তার অন্তস্তলে গিয়ে আঘাত করেছে। তার ভাবনায় তার মন জুড়ে রয়েছে সেই ময়নার কথা তো সে ভেবে দেখে নি। তারই মুখ চেয়ে বসে আছে তার আদরের ময়না। নয়তো তাকে যেতে হবে গাজিপুরে অথবা বমেরো যে কোন একটাতে। গতকাল তার বাবার মৃতদেহ কবরের মাটিতে সমাধিস্থ হয়েছে আর আগামীকাল চিরকালের মত

সমাধিস্থ হবে ময়নার জীবিত দেহ গাজিপুর অথবা ঝুমরোর মাটিতে। কিন্তু রহমন এত কথা জানলো কোথা থেকে। নরুল মিঞা কি তবে সব বলেছে?

শওকত পিছু ফেরে। রহমন চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকে। আর ভয় পায় না সে শওকতকে। অন্ধকারে লক্ষ্যভেদী অস্ত্র তার কাজে লেগেছে।

রহমনের কাছে এসে কোন কথা না বলে হাতটা সোজা বাড়িয়ে দেয় শওকত।

—টাকা দে।

টাকা সঙ্গে নিয়েই ঘুরছিল রহমন। শওকত একবার রাজী হলেই হাতে গুঁজে দেবে টাকা। ব্যস, খাঁচায় বন্দী হবে পাখী। গাঁট থেকে একতাড়া দশ টাকার নোট বার করে একখানা একখানা করে গুনে গুনে শওকতের হাতে দিয়ে বলে, এই নে, গুনে দেখ ঠিক আড়াকইশো আছে কিনা।

রহমন ভেবেছিল শওকত হয়তো একটু খেলবে। চাপ দিয়ে আরো বেশী কিছু আদায় করবে। রহমনও প্রস্তুত ছিল তার জন্য। কিন্তু শওকত কোন কথা না বলে টাকা হাতে নিয়েই ফিরে গেল। যেন অনেকটা পালিয়ে গেল।

বাড়ী ফিরে সামান্য যা হয় কিছু মুখে দিয়ে সেদিনের মত শুয়ে পড়লো শওকত। না দিলেও চলতো। এখন খাওয়ার কথা বলবার মত আর কেউ নেই। মাথায় শিয়রে প্রদীপের শিখাটা কাঁপতে কাঁপতে জ্বলছে। একলা ঘরে মনে মনে ময়নাকে নিয়ে খেলা করতে থাকে শওকত। তারপর এক সময় কখন ঘুমিয়ে পড়ে।

মাঝরাতে হঠাৎ ঘুমটা ভেঙে গেল শওকতের। কান খাড়া করে শুনতে থাকে। কিসের শব্দ ওটা। ঘরটা বড় অন্ধকার। প্রদীপের মিটমিটে আলোটা এতক্ষণ জ্বলতে জ্বলতে কখন নিভে গেছে। বিছানা ছেড়ে উঠে খোলা জানলার ধারে এসে দাঁড়ালো শওকত। গন্ধরাজ গাছটা থেকে ঝিরঝিরে দখিণা বাতাসে ভেসে আসছে এক সুমধুর গন্ধ। গভীর রাত। সমস্ত পৃথিবীতে এখন কবরের নিস্তব্ধতা নেমে এসেছে। মানুষ এখন গাঢ় নিদ্রায় সমাধিস্থ। শওকতের দৃষ্টি গিয়ে পড়ে দূরের ওই কবরখানায় তার বাবার সমাধির দিকে। শব্দটা যেন ওই দিক থেকেই আসছে। নীলচে জোছনার একটা নরম আস্তরণ বিছানো সমস্ত কবরখানাটায়। তারই মধ্যে শওকত চোখ বড় বড় করে তাকিয়ে দেখে তার বাবার কবরটাকে ঘিরে প্রেতমূর্তির মত অস্পষ্ট কতকগুলো মানুষ। ঝুপ ঝুপ শব্দের অর্থটা আলোর মত পরিস্কার হয়ে ওঠে তার কাছে।

জানলার কপাট দুটো বন্ধ করে নিজের বিছানায় ফিরে আসে শওকত। ঘরের অন্ধকারটা আরো গাঢ় হয়ে উঠেছে। আর এই অন্ধকারের সুযোগ নিয়ে কতকগুলো এলোমেলো চিন্তা পাথরের মত তার বুকে চেপে বসছে। একদিকে ময়নাকে পাওয়ার আশার [illegible]

মৃত্যুর বিষাদ এই দুয়ে মিলে তার হৃদয়টাকে যেন ছিন্ন-ভিন্ন করে দিচ্ছে। শ্বাসরুদ্ধ হয়ে আসছে শওকতের। ঝুপ ঝুপ শব্দটা আর কানে আসছে না তার।

বাবার কথাই ভাবতে ভাবতে একটু তন্দ্রার আমেজ এসেছিল। শওকত দেখলে বাবা তার সামনে দাঁড়িয়ে আঙুল দেখিয়ে বলছে, শওকত, তুমি স্বার্থপর—পরম স্বার্থপর—

ধড়মড় করে উঠে বসলো শওকত। গায়ের লোমগুলো তার সোজা হয়ে উঠেছে। কিন্তু ভয় পেল না শওকত। অন্ধকার—ঘুটঘুটে অন্ধকার—কিছুই দেখা যায় না। শওকতের মনে হলো ছায়ামূর্তির মত বাবা যেন তার সামনে দাঁড়িয়ে রয়েছে। প্রদীপটা জ্বালবে সে?—না, তাহলে আর বাবাকে দেখতে পাবে না সে।

ঘুম থেকে উঠতে একটু বেলা হয়ে গেল শওকতের। ঘরের বাইরে দাওয়ায় এসে তাকিয়ে দেখলে রোদ চড়-চড় করছে। ব্যাপারীরা আনাজের বাঁক নিয়ে কখন হাটে চলে গেছে। যে যার কাজে-কর্মে বেরিয়ে পড়েছে। গত রাতের ঘটনাগুলো দিনের আলোয় ভাবতে চেষ্টা করে সে। কাল কি স্বপ্ন দেখেছিল শওকত?

কিন্তু অত ভাববার এখন সময় নয়। নরুল মিঞার বাড়ী যেতে হবে তাকে এখনই। নয়তো গাজিপুরে অথবা ঝুমরোর বাজারে নরুল মিঞা যদি এই সাত-সকালেই নীলাম করে দেয় ময়নাকে। শওকত হাঁটার গতিটা একটু জোর করে দিল।

কাঠের সেই বাকসোটা সামনে নিয়ে নরুল মিঞা তখন তার ভেতরের সব কাগজপত্তর টাকা-পয়সা বাইরে স্তূপাকার করে ছড়িয়ে আতি-পাঁতি করে কি খুঁজছে। কে জানে—শওকতের কোন দরকার নেই তাতে। কোমরের রসি থেকে আড়াইশোটা টাকা বার করে নরুল মিঞার সামনে রেখে শওকত বললে, এই নাও চাচা।

এতে আড়াইশো আছে। ময়নার সঙ্গে এবার আমার বিয়েটা দিয়ে দাও।

হাতের কাজ ফেলে চোখ কটমট করে নরুল মিঞা শওকতের দিকে তাকায়। বলে, এই তো। এ টাকা তুই পেলি কোথা থেকে?

—সে খোঁজে তোমার দরকার কি চাচা। কথা দিয়েছ আড়াইশো টাকা পেলে তুমি ময়নার সঙ্গে আমার বিয়ে দিয়ে দেবে।

নরুল মিঞা শওকতের একথার কোন উত্তর না দিয়ে বলে, এ টাকা তুই চুরি করেছিস। এ আমারই টাকা।

শওকত হতভম্বের মত নরুল মিঞার মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে। কি বলছে নরুলচাচা। এ টাকা তারই টাকা। নরুল মিঞা বলে, কাল রাতে তোর এক পয়সার সম্বল ছিল না আর রাতারাতি তোর হাতে এতগুলো টাকা এসে গেল। চোর কোথাকার।

—কিন্তু বিশ্বাস করো চাচা—আল্লার কসম নয়তো আমি দোজখে যাবো—তোমার টাকা আমি চুরি করিনি।

—শয়তান। মিথ্যাবাদী। চুরি করিস নি তুই। কাল রাতে লণ্ঠনের আলোটা দপদপ করে নিভে না গেলে এই আড়াইশো টাকা আজ সকালেই তোর হাতে আসতো?—হারামজাদা, তোকে মেরে পুলিশে দোব।

নরুলের চিৎকার হারেমেও পৌঁছয়। বাইরে ছুটে আসে ময়না। হারেম থেকে সব কথা শুনেছে সে।

—বাবা!

ময়নার ডাকে মুখ ফিরে তাকায় নরুল মিঞা। ময়না বলে, ও টাকা তোমার নয়। তোমার টাকা চুরি করেছি আমি। আমায় পুলিশে দাও।

ময়না বুকের ভেতর থেকে এক তাড়া দশ টাকার নোট নরুলের হাতে দিয়ে বলে, এই নাও তোমার টাকা।

টাকাগুলো হাতে নিয়ে চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকে নরুল মিঞা। ব্যাপারটা ঠিক বুঝে উঠতে পারে না সে। সব যেন কি রকম গোলমাল পাকিয়ে যাচ্ছে। উত্তেজনায় হাঁপাচ্ছে সে। বুকটা তার ভীষণভাবে ওঠানামা করছে। তারই মেয়ে ময়না যে ওই কাঠের বাকসের চাবি খুলে টাকা নিতে পারে তা যেন ঠিক বিশ্বাস করতে পারে না নরুল মিঞা। কিন্তু শওকত এতগুলো টাকা পেল কোথা থেকে?

নরুল মিঞা বলে, কিন্তু শওকত, এ টাকা তুই অন্য কোথাও থেকে চুরি করে এনেছিস।

এতক্ষণ শওকত বেশ শান্ত ছিল কিন্তু এই মুহূর্তে কি রকম যেন দুর্বল হয়ে পড়লো সে। নরুল মিঞা তাকে যা ভাবে ভাবুক কিছু এসে যায় না। কিন্তু ময়নাও কি তাকে চোর বলে সন্দেহ করেছে? সত্য কথাটা বলে শওকত।—কারো টাকা চুরি করি নি চাচা। বাবার মৃতদেহটা রাতের অন্ধকারে কাল বিক্রী করে দিয়েছি। কবর থেকে তুলে নিয়ে গেছে তারা। ওটা তারই টাকা।

ঝর ঝর করে মুখে হাত চাপা দিয়ে কেঁদে ফেললো শওকত।

সামনে বাজ পড়লেও বোধহয় নরুল মিঞা আর ময়না এতটা চমকে উঠতো না। মরা চোখে কাঠ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে নরুল মিঞা। জীবনে অনেক অন্যায়, অনেক পাপ করেছে সে। কত অসহায় লোকের ভিটে-মাটি, জিনিষপত্র বন্ধকী রেখে টাকা ধার দিয়ে সুদ-আসল আর সময়ের ফাঁদে ফেলে আত্মসাৎ করেছে। তার জন্য কোন দুঃখ অনুশোচনা হয় নি তার কোনদিন। কিন্তু আজ প্রথম নরুল মিঞার চোখ ঝাপসা হয়ে এলো। ভাঙা গলায় বললে নরুল মিঞা, শওকতকে ঘরে নিয়ে এসো ময়না। কথা আমি রাখবো।

অযোধ্যার নবাব-বাদশা পরিবার ও ওয়াজিদ আলি শা

গৌরাঙ্গ গোপাল সেনগুপ্ত

সম্রাট আওরঙ্গজেবের (১৭০৭ খৃস্টাব্দ) মৃত্যুর পর ফাররুকসিয়ার ১৭১৩ খৃস্টাব্দে যখন সিংহাসনে বসলেন তখন তাঁর উজীর বা প্রধানমন্ত্রী হলেন সাদাত খান। ইরানের খোরাসান অঞ্চল থেকে ভারতে ব্যবসা করতে এসে তিনি ধীরে ধীরে মুঘল দরবারে প্রতিপত্তি লাভ করেন এবং পরিশেষে নিজের বুদ্ধিবলে উজিরী অর্জন করেন। উজির হিসাবে ১৭৩২ খৃস্টাব্দে অযোধ্যা প্রদেশটি তিনি 'জায়গীর' পেয়ে যান। সাদাত খান শুধু বুদ্ধিই ধরতেন না, তাঁর বাহুবলও যথেষ্ট ছিল। মুঘল শক্তির ক্রমবর্ধমান দুর্বলতার সুযোগে অল্প কিছু দিনের মধ্যেই তিনি দিল্লীর বন্ধন ছিন্ন করে নিজেই অযোধ্যাতে একটি রাজ্য গড়ে তুললেন এবং অযোধ্যাতেই স্থায়ীভাবে নবাব রূপে বাস করতে লাগলেন। ১৭৩৯ খৃস্টাব্দে সাদাত খাঁর মৃত্যুর পর তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্র সফাদার জঙ্গ অযোধ্যার নবাব হলেন, ইনি সাদাতখানের মেয়েকে বিয়ে করেন সেই হিসেবে ইনি সাদাত খানের জামাতাও ছিলেন। সফাদার জঙ্গ অযোধ্যা শহর সংলগ্ন ফৈজাবাদ শহরটি পত্তন করেন এবং এখান থেকেই রাজ্য শাসন করতে থাকেন। এই সময় লক্ষ্ণৌ শহরটি ধীরে ধীরে গড়ে উঠছিল। সফাদার জঙ্গ লক্ষ্ণৌ-এর লক্ষ্মণটিলা নামক জায়গাটিতে একটি দুর্গ নির্মাণ করেন। এই দুর্গের প্রবেশ মুখে একটি মৎস্যের প্রতীক বসান ছিল এই জন্য এই দুর্গটি লোকমুখে 'মচ্ছিভবন' আখ্যা পেয়েছিল।

সফদার জঙ্গের পর নবাব হন তাঁর পুত্র সুজাউদ্দৌলা। ১৭৫৭ খৃস্টাব্দে তথাকথিত পলাশীর যুদ্ধে জিতে ইস্টইন্ডিয়া কোম্পানীর উচ্চাশা খুবই বেড়ে গিয়েছিল, দেশের বাকী অংশে প্রভুত্ব বিস্তারের জন্য তারা আপ্রাণ কূটনীতির খেলায় মেতে উঠেছিল। ১৭৬৪ খৃস্টাব্দে বক্সারে কোম্পানীর সঙ্গে মুঘল সম্রাট শাহ আলমের যুদ্ধে সুজাউদ্দৌলা সম্রাট পক্ষ সমর্থন করেছিলেন। মুঘল সম্রাট যুদ্ধে হেরে ইংরেজের সঙ্গে সন্ধি করতে বাধ্য হয়েছিলেন। সুজাউদ্দৌলার সন্ধি করতে অস্বীকার করায় কোম্পানী লক্ষ্ণৌ ও অযোধ্যা রাজ্যভুক্ত এলাহাবাদ দখল করে নিয়েছিল। এবার ইংরাজের প্রতাপে ভয় পেয়ে সুজাউদ্দৌলা ইংরাজের সঙ্গে সন্ধি করতে বাধ্য হন। সন্ধির ফলে কারা ও এলাহাবাদ ব্যতীত 'আউধ' রাজ্যের বাকী অংশটুকু সুজাউদ্দৌলা ফিরে পেয়েছিলেন। এর পর তিনি ইংরেজের অনুগ্রহে অযোধ্যা রাজ্যের আয়তন বাড়িয়ে নিয়েছিলেন।

সুজাউদ্দৌলার মৃত্যুর পর ১৭৭৫ খৃস্টাব্দে তাঁর ছেলে আসফউদ্দৌলা আউধের সিংহাসন লাভ করেন। ইনি ফৈজাবাদ থেকে তাঁর রাজধানী লক্ষ্ণৌ-এ সরিয়ে আনেন। ৫২খানি ছোট ছোট গ্রাম একত্রিত করে তিনি একালের লক্ষ্ণৌ শহরটি গড়ে তোলেন। লক্ষ্ণৌ-এর বিরাট ইমামবরা, রুমি দরওয়াজা, রেসিডেন্সি প্রভৃতি তিনিই নির্মাণ করিয়েছিলেন। আসফউদ্দৌলা ছিলেন যেমন বিলাসী তেমনি দানশীল ও দয়ালু। তাঁর দানশীলতা সম্বন্ধে লক্ষ্ণৌ শহরে এখনও একটা প্রবাদ প্রচলিত আছে যে যাকে আল্লাও দয়া করেন না তাকে দয়া করার জন্য আছেন স্বয়ং আসফউদ্দৌলা। দুর্ভিক্ষ প্রপীড়িত প্রজাদের সাহায্য করার জন্যই বিপুল অর্থব্যয়ে তিনি লক্ষ্ণৌ-এর বিরাট ইমামবরাটি নির্মাণ করিয়েছিলেন।

১৭৯৭ খৃস্টাব্দে আসফউদ্দৌলার মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র ওয়াজিদ আলি হলেন অযোধ্যার নবাব। মাত্র চার মাস পরেই তাঁকে কিন্তু পদচ্যুত করা হল এই কারণে যে, তাঁর মাতা পরলোকগত নবাবের বৈধ স্ত্রী ছিলেন না। এবার সিংহাসনে বসলেন আসফউদ্দৌলার এক বৈমাত্রেয় ভ্রাতা সাদাত আলি খান। প্রচুর টাকা উৎকোচ নিয়ে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী সাদাত আলির দাবী সমর্থন করেছিল। সাদাত আলি কোম্পানীকে এই প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন যে, তাঁর রাজত্বে রাজ্যশাসন ব্যাপারে কোম্পানীর কর্মচারীদের নির্দেশই মেনে চলা হবে। লক্ষ্ণৌ-এর বারদুয়ারী, দিলখুসা, ফারহাত বাকস প্রভৃতি সুরম্য বৃহৎ অট্টালিকাগুলি সাদাত আলির সময়েই নির্মিত হয়েছিল। সাদাত আলিকেই অযোধ্যার শেষ নবাব বলতে পারা যায়, কারণ তাঁর উত্তরাধিকারী গাজিউদ্দীন হায়দার ১৮১৪ খৃস্টাব্দে যখন সিংহাসনে বসলেন তখন কোম্পানী তাঁকে 'বাদশা' বলেই মেনে নিলেন। ১৭৬৫ খৃস্টাব্দে মুঘল সম্রাট শাহ আলমের কাছ থেকে বাঙ্গলা, বিহার ও উড়িষ্যার দেওয়ানী লাভ করে কোম্পানী শুধু এই তিন প্রদেশেরই নয়, প্রায় সমগ্র উত্তর ভারতেরই ভাগ্য নিয়ন্তা হয়ে উঠেছিল। সাদাত আলি ছিলেন কোম্পানীর হাতের পুতুল, তাঁর ছেলে গাজীউদ্দীনও এমনি মেরুদণ্ডহীন জীব, সুতরাং এহেন গাজীউদ্দীনকে 'বাদশা' খেতাব দিতে কোম্পানীর আপত্তি হয়নি। দিল্লীশ্বরই ছিলেন দেশের প্রকৃত 'বাদশা', অযোধ্যার নবাবকে 'বাদশা' খেতাব দেওয়া দিল্লীর পক্ষে অপমানজনক হলেও দিল্লী

আসফউদ্দৌলা নির্মিত বড়া ইমামবরার সম্মুখভাগ—লক্ষ্ণৌ

রেসিডেন্সী—লক্ষ্ণৌ

থেকে এর কোন বিরোধিতা করার উপায় ছিল না। গাজীউদ্দীন লক্ষ্ণৌএ সাদা গম্বুজযুক্ত একটি সুরম্য ভবন নির্মাণ করান। এর নাম 'শা নজফ', ১৮২৭ খৃস্টাব্দে গাজীউদ্দীনের মৃত্যুর পর তাঁকে এইখানেই সমাহিত করা হয়েছিল।

গাজিউদ্দীন-এর মৃত্যুর পর বাদশা হলেন তাঁর ছেলে নাসিরুদ্দীন। বিষ প্রয়োগে এ'র মৃত্যুর পর গাজিউদ্দীনের এক ভ্রাতা মহম্মদ আলি শা ১৮৩৭ খৃস্টাব্দে 'আউধ'এর বাদশা হলেন। লক্ষ্ণৌ হোসেনাবাদের ইমামবরা ও জামি মসজিদটি ইনিই নির্মাণ করিয়েছিলেন।

মহম্মদ আলি শার মৃত্যুর পর আমজাদ আলি শা বাদশা হলেন। ১৮৪২ থেকে ১৮৪৭ খৃস্টাব্দ পর্যন্ত পাঁচ বৎসর কাল ইনি রাজত্ব করেছিলেন। লক্ষ্ণৌ-কানপুর সড়কের উপর গোমতী নদীর লোহার সেতুটি ইনিই তৈরী করান। লক্ষ্ণৌ-এর প্রসিদ্ধ আমিনাবাদ বাজারটি এ'র প্রধানমন্ত্রী আমিনুদ্দৌলা কর্তৃক স্থাপিত হয়েছিল।

আমজাদ আলির পর বাদশা হয়েছিলেন এ'র দ্বিতীয় পুত্র ওয়াজিদ আলি শা। ৮০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ওয়াজিদ আলি শা কৈসর বাগ প্রাসাদটি তাঁর নিজের বাসের জন্যে তৈরী করিয়েছিলেন। এই প্রাসাদে তিনি তাঁর ৩৬০টি উপপত্নী নিয়ে বাস করতেন, এ'দের প্রত্যেকের জন্য এক একটি আলাদা মহল ছিল। ওয়াজিদ আলির সময়ে 'আউধ' রাজ্য তার গৌরবের চরম সীমায় উপস্থিত হয়েছিল। রোহিলখণ্ড, এলাহাবাদ, কানপুর থেকে গাজীপুর পর্যন্ত এই রাজ্যের সীমানা বিস্তৃত ছিল। সাদাত আলি খাঁর সময় থেকেই ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী 'আউধ' রাজ্য থেকে প্রচুর টাকা আদায় করে নিত, এর বিনিময়ে নিজেদের শক্তি দিয়ে তারা 'আউধ' রাজ্যটিকে টিকিয়ে রেখেছিল।

বৃটিশ শক্তির সাহায্যেই গাজিউদ্দীন স্বাধীন রোহিলখণ্ড গ্রাস করেছিলেন। মারাঠা শক্তির গ্রাস থেকে আউধ রাজ্যটিকে বাঁচিয়ে রাখতেও বৃটিশ শক্তি বাদশাদের সব শক্তি দিয়ে সাহায্য করেছিল। বস্তুতঃ বাদশা এবং কোম্পানীর কর্মচারী এই দুই পক্ষই 'আউধ' রাজ্যের প্রজাদের একভাবেই শোষণ করে যাচ্ছিল। দেশের মালিক কোম্পানী না বাদশা প্রজাদের পক্ষে তা বুঝে উঠা কঠিন হয়েছিল, দুই পক্ষেরই অত্যাচারে ও শোষণে তারা অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছিল। প্রজাদের দুঃখকষ্টের কথা কোম্পানীর ডিরেক্টরদেরও কানে উঠেছিল। কোম্পানীর কর্মচারীরা যে শোষণ-লুণ্ঠনে বাদশার চেয়ে কম যান না, কোম্পানী একথা মানতে চাইলেন না—তাঁরা ঠিক করলেন বাদশাহী শাসনেই প্রজাদের এই দুরবস্থা। কোম্পানীর তরফ থেকে নূতন গভর্নর জেনারেল লর্ড ডালহৌসি বাদশা (১৮৪৮-৫৬) ওয়াজিদ আলিকে চাপ দিতে লাগলেন একটি চুক্তি সই করে রাজ্যশাসন ব্যবস্থা কোম্পানীকে ছেড়ে দিতে। এর বিনিময়ে তাঁকে, তাঁর পরিবারবর্গকে এবং উত্তরাধিকারীগণকে উপযুক্ত মাসোহারা দেওয়া হবে একথাও জানানো হয়েছিল। ওয়াজিদ আলি এই চুক্তিপত্রে সই করতে অস্বীকার করায়, লর্ড ডালহৌসি একটি ঘোষণাপত্রের বলে ১৮৫৬ খৃস্টাব্দের ১৩ই ফেব্রুয়ারী ওয়াজিদ আলিকে রাজ্যচ্যুত করে, আউধ রাজ্য কোম্পানীর অধিকারভুক্ত করে নিয়েছিলেন। ওয়াজিদ আলির পরিবর্তে কোম্পানীর তরফে লেঃ জেনারেল স্যর চার্লস আউট্রামকে আউধ রাজ্যের শাসনকর্তা বা চিফ কমিশনার নিযুক্ত করা হল। কয়েক মাস পর আউট্রামের স্থলাভিষিক্ত হলেন সিভিল সার্ভিস কর্মচারী কভারলি জ্যাকসন। লক্ষ্ণৌ-এ সিপাহী বিদ্রোহ ঘটার কয়েক মাস আগে এই পদে নিযুক্ত হয়েছিলেন স্যর হেনরী লরেন্স।

১৮৫৬ খৃস্টাব্দের মে মাসে রাজ্যচ্যুত ওয়াজিদ আলিকে কলকাতায় নির্বাসিত করা হল। ওয়াজিদ আলির সঙ্গে এলেন তাঁর প্রায় পাঁচশত কর্মচারী এবং বৈধ-অবৈধ মিলে ছয়টি স্ত্রী। কলকাতার উপকণ্ঠে খিদিরপুর সংলগ্ন মেটিয়াবুরুজে ওয়াজিদ আলির বাসস্থান নির্দিষ্ট হয়েছিল। ওয়াজিদ আলি ইংল্যাণ্ডে গিয়ে মহারাণী ভিক্টোরিয়ার সঙ্গে দেখা করে তাঁর হৃতরাজ্য ফিরে পাওয়ার জন্য আবেদন করতে ইচ্ছুক ছিলেন। স্বাস্থ্য ভাল না থাকায় ওয়াজিদ আলি তাঁর প্রতিনিধিরূপে তাঁর

ছোটা ইমামবরা—লক্ষ্ণৌ

বলত। বাঙলা দেশের প্রসিদ্ধ মিষ্টান্ন 'লেডিকেনি'র (ছানাবড়া) নামকরণ হয়েছিল এ'র স্ত্রীর অর্থাৎ লেডি ক্যানিং-এর নামে। 'লেডিকেনি' হচ্ছে লেডি ক্যানিং শব্দের প্রাকৃত বা অপভ্রংশ রূপ। এটি নিঃসন্দেহে লর্ড ক্যানিং-এর প্রতি দেশের সাধারণ মানুষের শ্রদ্ধার অভিব্যক্তি। ১৮৫৯ খৃষ্টাব্দে সরকার থেকে ওয়াজিদ আলিকে বার্ষিক ১২ লক্ষ টাকা ভাতা বা পেন্সন দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়েছিল। আজীবন তাঁকে আউধ-এর বাদশা বা 'সুলতান-ই-আলম' খেতাব ব্যবহার করার অধিকারও দেওয়া হয়েছিল। কলকাতায় আসার পর থেকে ওয়াজিদ আলির শরীর মন ভেঙে পড়েছিল। বৃটিশ কর্তৃপক্ষ যখন বুঝতে পারলেন যে, তাঁর পক্ষে আর হৃতরাজ্য পুনরুদ্ধারের জন্য কোন চেষ্টা অসম্ভব তখন তাঁরা তাঁকে কতকটা স্বাধীনভাবেই জীবন যাপন করতে দিয়েছিলেন, বিধিনিষেধের বেড়াগুলি সব শিথিল করে দেওয়া হয়েছিল। বাদশাহী বিলাসিতায় অভ্যস্ত, উদার হৃদয় ও দানে মুক্ত হস্ত ওয়াজিদ আলির পক্ষে বার্ষিক বার লক্ষ টাকায় ব্যয় সঙ্কুলান করা অসম্ভব হয়ে উঠেছিল। লক্ষ্ণৌ থেকে আসার সময় যেসব হীরামুক্তো ও সোনার অলংকার আনতে পেরেছিলেন সেগুলি বেচেই রাজ্যহারা বাদশাকে তাঁর বাদশাহীর ব্যয় নির্বাহ করতে হত। ১২ লক্ষ টাকা পেন্সন নিয়ে মেটিয়াবুরুজে গুছিয়ে বসে বাদশা সেখানেও লক্ষ্ণৌর মত দরবার খুলে বসেছিলেন। লক্ষ্ণৌ দরবারের নিভে যাওয়া বাতিগুলি কলিকাতার উপকণ্ঠে আর একবার বেশ দীপ্তি নিয়ে জ্বলে উঠেছিল।

মেটিয়াবুরুজ অঞ্চলে প্রচুর ভূমি ক্রয় করে ওয়াজিদ আলি সেখানে লক্ষ্ণৌ-এর অনুকরণে অনেকগুলি প্রাসাদ আর বাগিচা তৈরী করিয়েছিলেন। তাঁর একটি প্রাসাদে ছিল একটি ডিম্বাকৃতি দরবার কক্ষ এই কক্ষে অবিরত সঙ্গীত প্রবাহ বইত। দেশের বহু বিখ্যাত গায়ক বা গায়িকা নিয়মিত মাসোহারার বিনিময়ে অবিশ্রাম এই কক্ষে সঙ্গীত সাধনা করতেন। বাদশার পৃষ্ঠপোষকতায় নিতনূতন সঙ্গীতের উদ্ভাবন ও পরীক্ষা নিরীক্ষাও চলত। যাঁরা বিশেষ কৃতিত্বের পরিচয় দিতে পারতেন উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত-বোদ্ধা বাদশা তাদের প্রচুরভাবে পুরস্কৃত করতেন। যেসব সঙ্গীতসাধক কলকাতায় স্থায়ীভাবে বাস করতে পারতেন না, দেশের অন্যত্র থাকতেন তাঁরাও কিছুদিন পর পর ওয়াজিদ আলির দরবারে নিয়মিত হাজিরা দিয়ে যেতেন কারণ ওয়াজিদ আলি শাহের দরবারে গান করেন নি, এমন কোন গায়কের সর্বভারতে প্রতিষ্ঠালাভ তথা যথার্থ গায়ক হিসাবে স্বীকৃতির কোন আশা ছিল না। ওয়াজিদ আলি শুধু সঙ্গীত বোদ্ধা বা সুগায়ক ছিলেন না, তিনি নিজে ছিলেন একজন নিপুণ সেতার বাদক। ওয়াজিদ আলি নিজে কয়েকটি বিখ্যাত সঙ্গীত রচনা করেন, তাঁর রচিত 'বাবুল মেরা রে নৈহার ছুটি যায়' এবং 'নীর ভরণে কৈসে যাঁও' প্রভৃতি গান আজও বহু ওস্তাদের কণ্ঠে গীত ও সমাদৃত হয়ে থাকে। ওয়াজিদ আলি অনেকগুলি কাব্যগ্রন্থ লেখেন এ'র তিনটি 'দিওয়ান' ও তিনটি 'মসনভী' শ্রেণীর। উর্দু ভাষার প্রথম নাট্যকাব্যের সম্মানও ওয়াজিদ আলির প্রাপ্য। এই নাটকটির নাম 'রাধা অউর কিসন কা কিস্‌সা'। এই নাটকটি সম্প্রতি প্রকাশিত একটি নাট্য সংকলনে সন্নিবিষ্ট হয়েছে (লক্ষ্ণৌ কা শাহী স্টেজ, প্রোঃ মাসুদ হোসেন রিজভী সম্পাদিত, লক্ষ্ণৌ, ১৯৫৭)। নাজু, বাজী ও দুলহেন নামে তিনটি সঙ্গীতশাস্ত্রবিষয়ক গ্রন্থও ওয়াজিদ আলি রচনা করেন। নিজের লেখা বইগুলি মুদ্রণের জন্য ওয়াজিদ আলি মেটিয়াবুরুজে নিজস্ব একটি মুদ্রণালয় স্থাপন করেছিলেন। এই পুস্তকগুলি মুদ্রণে প্রচুর অর্থব্যয় করলেও এইগুলি অর্থমূল্যে বিক্রয়ের কোন ব্যবস্থা ছিল না। সঙ্গীতজ্ঞ ও গুণীব্যক্তিদের মধ্যে এগুলি বিনামূল্যে বিতরিত হত।

ওয়াজিদ আলি শা ১৮৮৭ খৃষ্টাব্দের ২১শে সেপ্টেম্বর ৬৪ বছর বয়সে মেটিয়াবুরুজেই দেহত্যাগ করেন। মেটিয়াবুরুজে নিজ নির্মিত ইমামবরাতেই তাঁকে সমাহিত করা হয়। ওয়াজিদ আলির মৃত্যুতে শুধু কলকাতা বা লক্ষ্ণৌতে নয়, সমগ্র উত্তর ভারতের সঙ্গীতানুরাগী বিদগ্ধ সমাজে নিবিড় শোকের ছায়া নেমে এসেছিল। রাজ্যচ্যুত হতভাগ্য ওয়াজিদ আলির স্মৃতি আজও ভারতের জ্ঞানী-গুণী ও সঙ্গীতরসিকদের কাছে অম্লান হয়ে আছে, থাকবেও।

নষ্টনীড়ের নায়ক শেক্সপীয়র

নীর চট্টোপাধ্যায়

যদি আপনি স্ট্রাটফোর্ড থেকে সবুজ তৃণভূমির ওপর দিয়ে স্ন্যাটারি পর্যন্ত পদচারণা করে যান, তাহলে অবশ্যই আপনার মনে এই কথাটি জাগবে যে এই পথ দিয়েই কয়েকশত বৎসর পূর্বে একজন উদ্ভট ধরনের গ্রাম্য যুবক তাঁর প্রণয়িনী অ্যান হেয়াটেলির সঙ্গে অভিসার করতে নির্দিষ্ট একটি স্থানে মিলিত হবার জন্য চঞ্চল চরণে একদা হেঁটে হেঁটে গিয়েছে।

তখন বুঝি উইলিয়াম শেকসপীয়রের কল্পনায়ও ছিল না যে পরবর্তী যুগে তাঁর নাম শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে অবিশ্বাস্য রকম শ্রদ্ধায়, অতুলনীয় যশোমণ্ডিত হয়ে দিকবিদিকে উচ্চারিত হতে থাকবে। আর এও বোধকরি তিনি ভাবতে পারেননি যে সরল গ্রাম্য কবিতার মত তাঁর জীবনের প্রণয় ঘটনাটি অতীব দুঃখের এক পরিণতি লাভ করবে। আর সেজন্য, তাঁকে বছরের পর বছর খেদ করে, পরিতাপ করে ফিরতে হবে, এটাও ছিল তাঁর কল্পনার বাইরে।

অবশ্য শেকসপীয়রের জীবনের করুণতম ট্রাজেডি যে ছিল তাঁর বিবাহ বিবাহিত জীবনটি এ বিষয়ে বিন্দুমাত্র সন্দেহের অবকাশ নেই।

একথা সত্য যে যদিও তিনি অ্যান হেয়াটেলিকে ভালবাসতেন খুবই, তবু বলতে দ্বিধা নেই যে জ্যোৎস্নাপুলোক

মজা এই, জীবিত থাকাকালীন মানুষটির প্রতি আদৌ কেউ নজর দেয়নি। গ্রাহ্য করেনি মোটে। তারপর, এক সময় তাঁর মৃত্যু হল। এবং মৃত্যুর পর পাক্কা একশ' বছর কেটে গেল। তখনও পর্যন্ত কিন্তু প্রকৃতপক্ষে অজ্ঞাত, অখ্যাত অবজ্ঞাত একজন হয়েই তিনি রইলেন। অবশ্য এরপর থেকেই হয় পরিচিতি তথা অসামান্য খ্যাতির শুরু। যার শেষ আজও হয়নি। অর্থাৎ সেই সময় থেকে অদ্যাপি লক্ষ কোটি কথা লিখিত হয়েছে এই অদ্ভুত প্রতিভাধর মানুষটি সম্বন্ধে।

পালকের কলম দিয়ে আক্কেল-দাঁত তীক্ষ্ণ করা এমন আর দ্বিতীয় কোন লেখক আজও এই মর দুনিয়ায় জন্মালো না যাঁর বিষয়ে এতরকম, এত অজস্র মন্তব্য, এত অসংখ্য বাক্যব্যয়, সমালোচনা বা টীকাটিপ্পনীর উদ্ভব হয়েছে।

আজ লক্ষ লক্ষ মানুষ তাঁর জন্মস্থানে যায় তীর্থযাত্রার সুপবিত্র মনোভাব নিয়ে।

রাত্রির গভীরে অপর একটি তরুণীর সংগেও তিনি সবিশেষ ঘনিষ্ঠভাবে মেলামেশা চালিয়ে গিয়েছিলেন বেশ কিছুকাল। সে তরুণীর নাম : অ্যানি হ্যাথাওয়ে।

এই দ্বিমুখী প্রণয়েই বিপত্তির শুরু। এখানেই গোলমালের গোড়াপত্তন বলা যেতে পারে। অ্যানি হ্যাথাওয়ের কর্ণে যে-ই প্রবিষ্ট হল যে তার প্রেমিকপ্রবর অন্য একটি কন্যাকে বিয়ে করবার জন্যে লাইসেন্স নিয়েছে, প্রথমটা সে নিদারুণভাবে স্তম্ভিত হয়ে গেল, পরে ভয়ে আতঙ্কে ক্রোধে হয়ে উঠল উন্মাদিনীপ্রায়। ঘটনার এই সর্বনাশা আকস্মিকতায় দিশেহারা হয়ে সে ছুটে গেল পাশের এক বাড়িতে।

লজ্জায় ক্ষোভে ডুকরে কেঁদে উঠে পরশীদের কাছে প্রকাশ করে বললে, কেন শেকসপীয়ার নামক যুবকটি তাকে বিয়ে করতে অবশ্যই বাধ্য। নতুবা তার সর্বনাশ। সেই বাড়ির কর্তাব্যক্তিটি ছিল অতীব সাদা সরল সৎপ্রকৃতির মানুষ এবং নৈতিক চরিত্রাদি ব্যাপারে ছিল বিষম গোঁড়া ধরনের। সে এই ঘটনা শুনে উক্ত কুমারী কন্যাটির প্রতি দয়াপরবশ আর শেকসপীয়ার ছোঁড়ার প্রতি চরম ক্ষুব্ধ হয়ে পরদিনই মেয়েটিকে নিয়ে দুজনে গিয়ে টাউন হল-এ উপস্থিত হল। এবং অচিরাৎ শেকসপীয়ার ও অ্যানি হ্যাথাওয়ের বরাবরে বিবাহের জন্য একটি বিধিমত বন্ড সেখানে টাঙিয়ে দিয়ে এল।

এই পাত্রীটি ছিল শেকসপীয়ারের চেয়ে পুরো আট বছরের বড়। ঘটনার বিবরণে প্রকাশ বিয়ের পরদিন থেকেই নাকি তাদের দাম্পত্য জীবন হয়ে উঠেছিল একটি যৎপরনাস্তি হাস্যকর ট্র্যাজেডিবিশেষ।

এই কারণেই বোধকরি শেকসপীয়ার তাঁর নাটকাদিতে পুরুষদের নিজের চেয়ে বয়সে বড় কোন স্ত্রীলোককে বিবাহ করার বিরুদ্ধে পুনঃ পুনঃ হুঁশিয়ারী করে দিয়েছেন।

প্রকৃতপক্ষে তিনি তাঁর দুর্জাগা স্ত্রী অ্যানি হ্যাথাওয়ের সংগে যে কটা দিন বা যে ক'টা রাত্রি বসবাস করেছেন, তা বুঝি হাতে গোনা যায়। তাঁর বিবাহিত জীবনের পনের আনা সময়ই কেটেছে প্রবাসে, লন্ডনে। সম্ভবত তিনি বছরে একবারের বেশী নিজ পরিবারের কাছে কখনোই যেতেন না। কথিত আছে তাঁর জীবন দুর্বিসহ করে তুলেছিল তাঁর স্ত্রী।

ছোট ছোট মনোরম কটেজ, হলিহকস-এর বাগান, নয়নাভিরাম আঁকাবাঁকা পথ সমন্বিত আজকের স্ট্র্যাটফোর্ড-অন-অ্যাভন ইংলন্ডের মধ্যে একটি সুন্দর ছোট্ট শহর। কিন্তু শেকসপীয়ার যখন জীবিত ছিলেন এবং তিনি যখন সেখানে বসবাস করতেন তখন কেমন ছিল জায়গাটা? তখন ছিল অতি নোংরা, দারিদ্র্যপ্রপীড়িত, এবং নানাবিধ রোগাদি অধ্যুষিত এক জঘন্য পল্লীবিশেষ। জলনিকাশের কোন পয়ঃপ্রণালী ছিল না। পথে পথে নোংরা শূয়রের পাল অহোরাত্র আবর্জনা খেতে খেতে চরে বেড়াতো। শেকসপীয়ারের বাবা ছিলেন ঐ নগরেরই জনৈক কর্মচারী। আস্তাবলের আবর্জনা বাড়ির সামনে স্তূপীকৃত করে রাখবার অভিযোগে একদা তাঁর জরিমানা হয়েছিল। অত্যন্ত দুঃসময় ছিল সে সময় স্ট্র্যাটফোর্ড শহরের। ওখানকার লোকসংখ্যার আধাআধি মানুষ সাধারণের দান খয়রাতির উপর নির্ভর করে জীবনধারণ করত। অধিকাংশ মানুষই ছিল নিরক্ষর। শেকসপীয়ারের না বাবা, না মা, না বোন, না মেয়ে, না নাতনী কেউই লেখাপড়ার ধার ধারত না। পরিপূর্ণ নিরক্ষর সবাই।

যে মানুষ ভবিষ্যতে ইংরেজী সাহিত্যের পরম গৌরব ও চরম শক্তিরূপে অভিহিত হবার জন্য আবির্ভূত হয়েছিল, নিয়তির এমনই পরিহাস যে তাঁকে কিনা মাত্র তের বছর বয়সেই স্কুলের পাট চুকিয়ে জীবিকার ধান্ধায় কাজে লাগতে বাধ্য হতে হয়। বাবা ছিলেন চাষী এবং দস্তানা প্রস্তুতকারক। শেক্সপীয়ার নিজে দুধ দুইতেন, ভেড়ার লোম ছাঁটতেন, মাখন তৈরী করতেন এবং কাঁচা চামড়া ট্যান করতে সাহায্য করতেন।

অথচ শেকসপীয়ার যখন মারা যান তখন তিনি তাঁর যুগের নিরিখ অনুসারে যাকে বলে যথার্থ ধনী ব্যক্তি ছিলেন। লন্ডনে যাবার বছর পাঁচেকের মধ্যেই অভিনেতা হিসেবে তিনি বেশ ভাল রোজগার শুরু করেন। অনতিকালমধ্যে তিনি দু দুটি রঙ্গালয়ের শেয়ার ক্রয় করেন, সম্পত্তি বেচা-কেনার দালালী করেন এবং কথিত আছে অত্যন্ত চড়া সুদে টাকা ধার দিয়ে তেজারতিতে নামেন। সে সময় তাঁর উপার্জন সাংসারিক তিনশ' পাউন্ডে পৌঁছায়। আজকের তুলনায় সে যুগে অর্থের ক্রয়-ক্ষমতা ছিল কমসে কম বারোগুণ বেশি। সুতরাং শেকসপীয়ারের যখন পঁয়তাল্লিশ বছর বয়েস তখন তার উপার্জনের পরিমাণ আজকের হিসেবে আমাদের প্রায় লাখ টাকার মত ছিল বছরে।

তাহলে, স্বীয় পত্নীর জন্য তাঁর উইলে কত অর্থ রেখে গিয়েছিলেন বলে আপনার ধারণা হয়? একটি পাইপয়সাও নয়। বিশ্বাস করুন আর নাই করুন। একটি পুরনো শোবার খাট ছাড়া তিনি স্ত্রীর জন্যে স্থাবর-অস্থাবর কোন কিছুই রেখে যান নি। এই 'পরম দান'টিও বোধকরি তিনি উইল শেষ হবার পরে দ্বিতীয়বার চিন্তা করে স্থির করেছিলেন। কেননা এই দানের কথাটি লিখিত উইলের লাইনের ফাঁকে পুনঃসংযোজিত হয়।

পুস্তকাকারে নাটকগুলি প্রকাশের সাত বছর পূর্বেই শেকসপীয়ারের মৃত্যু হয়। আজ যদি কেউ সেগুলোর প্রথম সংস্করণের যে কোন একটি কপি। কিনতে চান তো তাঁকে ব্যয় করতে হবে মোটামুটি বারো লক্ষ টাকার মত। অথচ হ্যামলেট, ম্যাকবেথ, মিডসামার নাইটস ড্রিম প্রভৃতি নাটকগুলোর জন্য রচয়িতা আজকের নিরিখে হাজার তিনেক টাকাও কখনো পান নি।

শেক্‌সপীয়ার বিষয়ে বিশারদ এবং তাঁর সম্পর্কে বেশ কয়খানি গ্রন্থপ্রণেতা ডঃ এস এ ট্যানেনবাউমকে একদা প্রশ্ন করা হয়েছিল যে এমন কোন প্রমাণ তাঁর কাছে আছে কি যার দ্বারা মনে হয় যে স্ট্র্যাটফোর্ড-অন-অ্যাভনের উইলিয়াম শেক্‌সপীয়ারই শেক্‌সপীয়ার নামাঙ্কিত নাটকগুলির প্রকৃত লেখক। হ্যাঁ আছে, তিনি জবাব দেন, যে এ বিষয়ে তিনি নাকি নিশ্চিত।

এতদসত্ত্বেও অনেক লোকের ধারণা যে, শেকসপীয়ার বলে কেউ কোনকালে ছিল না। এবং তাঁরা খান-দশবারো গ্রন্থে একথাও প্রমাণ করবার চেষ্টা করেছেন যে, শেকসপীয়ার নামধেয় নাটকাবলীর প্রকৃত লেখক : এক হয় স্যার ফ্রান্সিস বেকন, নয়ত, আর্ল অব অক্সফোর্ড।

সেকথা থাক। শেক্‌সপীয়ারের সমাধি-স্তম্ভে নিম্নোক্ত বিচিত্র নিয়তির বাণীটি উৎকীর্ণ করা রয়েছে :

> Good friend for Jesus sake for beare,
> To digg the dust enclosed here,
> Bleste be ye man yt spare thes stones
> And curst b: he yt moves my bones.

স্থানীয় ক্ষুদ্র গীর্জার ধর্মোপদেশদান মঞ্চের সম্মুখে তাঁকে কবর দেওয়া হয়েছিল। তাঁকে ঐ সম্মানিত স্থান দেওয়া হয়েছিল কেন? তাঁর অতুলনীয় প্রতিভার সম্মানে কি? যে অমর প্রতিভাকে তিনশ বছর ধরে সারা বিশ্বের মানুষ পরম শ্রদ্ধা দেখিয়ে আসছে সেই প্রতিভাই কি কারণ? না। দুঃখের সংগে বলতে হয়, মোটেই তা নয়। যে কবি-নাট্যকার ভবিষ্যৎ ইংরেজী সাহিত্যের শুকতারা হিসেবে চিহ্নিত হবার জন্য নির্দিষ্ট হয়ে জন্মেছিলেন তাঁকে গীর্জার অভ্যন্তরে কবর দেওয়া হয়েছিল তার কারণ শুনলে হাস্যোদ্রেক হয়। যেহেতু তিনি তাঁর নিজ শহরের মানুষজনকে অর্থ-ধার দিতেন, তাই তাঁকে দেওয়া হয়েছিল ঐটুকু ধর্মীয় সম্মান।

প্রখ্যাত 'সাইলক' চরিত্রস্রষ্টা মানুষটি যদি স্বীয় শহরের লোকেদের সুদে টাকা ধার না দিতেন তাহলে বোধকরি তাঁর প্রাণহীন দেহের হাড়গোড় অচিহ্নিত কোন কবরের মধ্যে নিক্ষিপ্ত হয়ে যেত, এ বিষয়ে বুঝি সন্দেহের কোন অবকাশ নেই।

অঙ্গনা

সম্মানিত স্থানে

বিবাহ সম্পর্কে তরুণীদের মনোভাব জানতে চেয়ে লণ্ডনের 'ডেইলি মিরর' পত্রিকা একটি সমীক্ষা চালায়। পনেরো থেকে উনিশ বছরের মেয়েরা ছিল এই সমীক্ষার অন্তর্ভুক্ত। এঁদের সংখ্যা হবে প্রায় দু হাজার। বলা বাহুল্য, এই মেয়েদের সবাই অবিবাহিত এবং সমীক্ষার উদ্দেশ্য হলো এ যুগের মানসিকতাকে তুলে ধরা। প্রথমেই এঁদের যে প্রশ্নটি করা হয় তা হলো যে, তোমার চেনা-জানা বিবাহিতদের মধ্যে কার প্রভুত্ব বেশী? সঙ্গে সঙ্গে আর একটি প্রশ্ন জুড়ে দেওয়া হয়ঃ তোমার বিবাহিত জীবনে তুমি কি রকম আশা কর?

প্রায় অর্ধেকের কাছাকাছি মেয়ে প্রথম প্রশ্নের উত্তরে জানায় যে, তাদের চেনা-জানা এবং বিবাহিতা বান্ধবীদের মধ্যে স্বামীর প্রভুত্বই বেশী খাটে। শতকরা চাল্লশ জন কিন্তু নিজেদের গণ্ডীর মধ্যে স্বামীর প্রভুত্বের সন্ধান পায় নি। তাদের নজরে দুজনেই সমান ঠেকেছে। আর বাদবাকীরা নিজেদের পরিচয়ের অভিজ্ঞতায় স্বামীর প্রভুত্ব তো দূরের কথা স্বামী-স্ত্রীর সমানাধিকারও মেনে নিতে চান নি। তারা বরং স্ত্রীকেই একচ্ছত্র কর্ত্রী হিসেবে মেনে নিতে দেখেছেন।

দ্বিতীয় প্রশ্নটির পুরুষ নিঃসন্দেহে বেশী। কিন্তু এই প্রশ্নেও সব মেয়ে সহমত হতে পারে নি। শতকরা বাহান্ন জন মেয়ে স্বামী-স্ত্রীর সমানাধিকার দাবী করেছে। শতকরা তিরিশ জন স্বামীর প্রভুত্ব মেনে নেওয়ার চিরাচরিত পন্থায় আস্থা জ্ঞাপন করেছে। বাদবাকীরা বিবাহিত জীবনে নিজেদের একচ্ছত্র অধিকার সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ।

এরই পাশাপাশি আর একটা চিত্রও ফুটে উঠেছে। স্বামী-স্ত্রীর সমানাধিকার ছাড়া চেয়েছে তারা চাকরী ক্ষেত্রেও সমান বেতন দাবী করেছে। তাদের মতে নারী এবং পুরুষ উভয়েই সমান ক্ষমতাসম্পন্ন। বুদ্ধির দিক থেকেও খুব একটা ইতর বিশেষ হয় না। কেউ কেউ আবার আরো একটু এগিয়ে জানিয়েছে যে, স্বামীরা ছেলেপুলে নিয়ে ঘর সামলাক। সংসার চালানোর দায়িত্ব তারাই নেবে।

বছর পঞ্চাশেক আগে বৃটেনে একথা কথা কেউ ভাবতেও পারে নি। এ জিনিস সেদিন ছিল প্রায় অসম্ভব। কিন্তু বর্তমান যুগে হচ্ছে সেই 'অসম্ভব' কথাটি বর্জিত। তাই দিনে দিনে সব অসম্ভবই সম্ভব হয়ে উঠেছে। সেজন্যই আরও একটি ঘটনা এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন। বৃটেনের নারীদের ভোটাধিকার প্রাপ্তির সুবর্ণ-জয়ন্তী উৎসব অনুষ্ঠিত হয় ১৯৬৮ সালে। সেই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন সমানাধিকার আন্দোলনের নেত্রীরা। সেই সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন বহু শিক্ষিত এবং কর্মজীবনে সফল মহিলা। এঁদের মধ্যে কেউ-বা কৃতিত্ব দেখিয়েছেন রাজনীতিতে, আবার কেউ-বা সরকারী কাজকর্মে, গবেষণায়, আইন ব্যবসায় যে সব ক্ষেত্রে এক সময় তাঁদের প্রবেশাধিকার ছিল না মেয়ে হয়ে জন্মানোর অপরাধে।

একালের এবং প্রায় ঐতিহাসিক কালের এই বিশিষ্ট মহিলাদের মধ্যে মিনি স্কার্ট পরা দুজন মেয়েও ছিলেন। তাঁদের আমন্ত্রণ করা হয়েছিল এজন্য যে, তাঁরা অকসফোর্ড এবং কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র ইউনিয়নের প্রথম মহিলা প্রেসিডেন্ট। এখান থেকে একথাই স্পষ্ট হচ্ছে যে, পুরুষ-দের যেসব ঘাঁটি এখনো তাঁদের কাছে বন্ধ হয়ে আছে সেসব ঘাঁটির ওপর সমানে আক্রমণ চালিয়ে তারা পুরুষের একচেটিয়া অধিকার খর্ব করে নিচ্ছেন। সুতরাং একথা অনুমান করতে কষ্ট হয় না যে, এই দুই তরুণী হয়তো তাঁদেরই পূর্বসূরিনী যাঁদের মধ্য থেকে একদিন আসবেন বৃটেনের প্রথম মহিলা প্রধানমন্ত্রী। হয়তো খুব বেশী দেরী এ ব্যাপারে হবে না। বৃটেনের মেয়েরা আজ ছেলেদের মতই শিক্ষার সুযোগ পেয়েছেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের পড়ুয়াদের মধ্যে এক-চতুর্থাংশ হল মেয়ে। এঁদের মধ্যে অনেকেই আবার এমন সব বিষয়ে পড়াশোনা করছেন যা ঠিক মেয়েদের নিজস্ব বিষয় নয়। ডাক্তারী, দন্তচিকিৎসা বিদ্যা, আইন ও ইঞ্জিনীয়ারিং কমপ্যুটর পদ্ধতি এবং নিউ-ক্লিয়ার ফিজিক্স-এ মেয়ে পড়ুয়ার সংখ্যা ক্রমেই বাড়ছে। এসব পেশার প্রায় সব কটিতেই তাঁরা পুরুষ সহকর্মীদের সঙ্গে সমান মর্যাদায় কাজ করতে পারছেন।

কাজকর্মের সুযোগ বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে মেয়েদের জীবনেও নানা ধরনের পরিবর্তন লক্ষ্য করা যেতে পারছে। পারিবারিক জীবনে যার প্রভাব অবশ্যম্ভাবী হয়ে উঠলো। আজ কেউ লক্ষ্যই করবেন না বা কোন রকম সমালোচনা করবেন না যদি কোন মেয়েকে পুরুষের মত নতুন উপ-নগরীর পরিকল্পনা নিয়ে ব্যস্ত থাকতে দেখা যায় বা তাঁকে দেখা যায় বিমান চালিয়ে দেশ-দেশান্তরে উড়ে যেতে। আবার কোন পুরুষকে যদি রান্নাঘরে ব্যস্ত থাকতে দেখা যায় অথবা ছেলে-মেয়েদের শিক্ষার ব্যবস্থা নিয়ে মাথা ঘামাতে দেখা যায় তাহলেও কেউ একটি কথা বলবেন না। কারণ, এসবের মূলে রয়েছে দু পক্ষের বাইরের জীবনের সঙ্গে নিবিড় যোগ।

প্রায় ৯০ লক্ষ মেয়ে আজ বৃটেনে চাকরী করছেন। তাঁরা ছড়িয়ে আছেন স্কুলে, হাস-পাতালে, গবেষণাগারে, কারখানা, দোকানপাটে এবং সরকারী নানা দপ্তরে। এঁদের অর্ধেকই বিবাহিতা। তাছাড়া একটা কথা এখানে উল্লেখ করা দরকার যে, পশ্চিমী দেশে এ যুগের ঝোঁকই হচ্ছে একটু তাড়া-তাড়ি বিয়ে করা। সাঁচা কথা বলতে কি, কোন কোন শিল্পের কাজই হয়ত বন্ধ হয়ে যাবে যদি মেয়েরা সেখানে কাজ করতে রাজী না হয়।

ঘরে-বাইরের জীবনের মধ্যে সমতা আসা সম্ভব হয়েছে বলেই বিবাহ এবং মাতৃত্ব তাঁদের কর্মজীবনে ছেদ আনছে না। তা কেবল সাময়িক বিরতির কারণ হচ্ছে। কিন্তু তা সত্ত্বেও মেয়ে কর্মীর অভাব আজকাল অনেক দিকেই রয়ে গিয়েছে। এমন কি সমাজকল্যাণমূলক কাজকর্মের বিভিন্ন ক্ষেত্রেও এই অভাব অনুভূত হচ্ছে।

কর্মজগতে এভাবে মেয়েদের প্রবেশের ফলে জনজীবনেও তাঁদের ভূমিকা ব্যাপকতা লাভ করছে। তাঁরা স্থানীয় শাসনব্যবস্থায় ম্যাজিস্ট্রেট হিসেবে, স্কুলে এবং হাস-পাতালে পরিচালন সংক্রান্ত কাজকর্মে আরো বেশী করে অংশ গ্রহণের সুযোগ পেয়েছেন। তিনটি প্রধান রাজনৈতিক দলই তাঁদের গুরুত্ব মেনে চলছে। তার কারণ হল নির্বাচকমণ্ডলীর অর্ধেকই আজ তাঁদের নিয়ে গঠিত এবং তাঁরা বিশেষভাবে দৃষ্টি দিয়ে থাকেন গৃহ নির্মাণ, শিক্ষা, শিশু পরিচর্যা আর সেই সঙ্গে বৃদ্ধ ও বঞ্চিতদের সুখ-সুবিধার ওপর।

মেয়ের ও পুরুষের জগতের মধ্যে যে পার্থক্য রয়ে গিয়েছে তা নিয়ে কোন কোন

মেয়ে এখনো প্রশ্ন তুলে থাকেন। তাঁদের কথা হল, সমান অধিকারই সামাজিক ন্যায়-বিচারের মূল কথা। সমগ্র নারী সমাজের স্বার্থেই এই সমান অধিকার তাঁরা দাবী করে চলেছেন। একথা সত্যি যে, রাজনৈতিক সমতার অর্থ সর্বক্ষেত্রে অর্থনৈতিক সমতা নয়। কোন কোন পুরুষের তুলনায় চাকরীতে কম বেতন পাওয়ার জন্য এবং আয়ের একটা বিশেষ স্তরে তাঁদের স্বামীরা স্ত্রীর আয়ের দ্বিগুণ বেশী আয়কর দিতে বাধ্য হওয়ার জন্য বেশ একটু অসন্তুষ্টি প্রকাশ করে থাকেন।

আগের তুলনায় এখন মেয়েরা সাম্যের পথে অনেকখানি এগিয়ে আসতে পেরেছেন সন্দেহ নেই। মেয়েরা নিজেরাই এখন নিজেদের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট খুলেছেন আর তার হিসাব রাখছেন। তাঁরাই টাকা ধার নিচ্ছেন, বন্ধক দিচ্ছেন অথবা ভাড়া-ক্রয়ের চুক্তিতে সই করছেন। বিয়ের পর নিজের সম্পত্তির উপর তাঁরা অধিকার রক্ষা করছেন। সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য হল যে, সন্তানের উপরও তাঁদের দাবী এখন সর্বাগ্রে বিবেচ্য। এদিক থেকে আজকের দিনের একটা বড় সমস্যার সমাধান হয়ে গেছে। আবার যে সংসারে স্ত্রী পরিবার চালানোর দায়িত্ব বহন করেন সেখানে স্বামীর কাছ থেকে পাওয়া সংসার খরচ উদ্বৃত্ত হলে অর্ধেক পাবেন স্ত্রী।

এসব সত্ত্বেও অস্বীকার করে লাভ নেই, যে, কখনো কখনো সংস্কারবশত কিম্বা প্রচলিত প্রথার দরুণ মেয়েদের উপর বেশ কিছুটা অবিচার হয়ে যায়। অনেক কর্তৃপক্ষ একটু বেশী রকম কৃতিত্ব দেখাতে না পারলে কোন মেয়েকে পুরুষের সমান স্তরে ফেলে দেখতে রাজি হন না। এ ব্যাপারে মেয়েদের নিজেদেরও কিছুটা দোষ যে নেই তা নয়। তাঁরা অনেক সময় পুরুষের উপর অতিরিক্ত নির্ভর করেন। তাঁরা এই অন্তর্নিহিত ব্যাপকতার মধ্যেও নির্ভর করে থাকতেই বেশী পছন্দ করেন। এই দোষ নিজেদের প্রচেষ্টায় শুধরে নিতে হবে। নিজেদের প্রকাশ করার চেষ্টায় তাঁদের উদ্বুদ্ধ করতে হবে। সুখের কথা যে, ব্রিটেনের মেয়েরা এ ব্যাপারে ক্রমেই সচেতন হচ্ছে। তাছাড়া এই বিজ্ঞানের যুগে কাজের মানুষের চাহিদা ক্রমেই বাড়বে। এই অবস্থায় সমাজের অর্ধেক অংশকে অবহেলিত রাখার অর্থ সমাজের বিপুল ক্ষতি। এ সম্বন্ধে সচেতনতা যত বাড়বে দেশে দেশে নারী-সমাজ তত এগিয়ে যাবে। এমনিভাবে আধুনিক সমাজে মেয়েদের সম্মানিত স্থানেরও প্রসার ঘটবে।

—প্রমীলা

যুগে যুগে বেশ বিন্যাসে নারী

• বেলা দে •

সৃষ্টির অনাদিকাল থেকে মানুষ সৌন্দর্যের পূজারী—যে যুগে সে গৃহনির্মাণ করতে শেখেনি, বন্য পশুর সঙ্গে নিয়ত যুদ্ধ করে জীবনধারণ করতো সেই আদিম প্রস্তরযুগেও তার সৌন্দর্যপিপাসা ছিল আর তার রুচি অনুরূপ নিজেকে সুন্দর করে তুলতে চাইত। বিচিত্র ভূষণে অঙ্গ অলঙ্কৃত করতো, পত্রপুষ্পে দেহকে ভূষিত করতো। প্রসাধন ও অঙ্গরাগে সেকালের মেয়েরা আজকের দিনের মতই ছিলেন। কাজেই কি প্রাচীনকালে কি একালে ভারতবর্ষের মেয়েরা বেশ-বিন্যাসে ও প্রসাধনের ব্যবহারে সারা বিশ্বে অগ্রণীর ভূমিকা দাবী করতে পারেন।

প্রথমে ধরা যাক অলঙ্কারের কথা—বস্তুতঃ অলঙ্কারের ইতিহাস মানুষের ইতিহাসের সমসাময়িক বলা চলে। সেই থেকে আজো পর্যন্ত অলংকারের কত রূপান্তর চলছে। প্রথম যুগের মানুষ বাস করতো বনে-জঙ্গলে। বন্য পশু ছিল তাদের খাদ্য, তবুও সেই জন্তু-জানোয়ারের হাড় দিয়ে লোম ও চামড়া দিয়ে সে অলঙ্কার তৈরী করে পরতো। এমনি করে অলঙ্কারের সূত্র হলো। বাংলা দেশের অলঙ্কার শিল্পের বিচিত্র ইতিহাস আলোচনা করলে দেখা যায় পুরুষ আর মেয়ে-লক্ষ্মীর আভরণশ্রীর উপকরণ আয়োজনে একটা বিশিষ্ট ধারা অনুসরণ করে এসেছে—বিভিন্ন যুগে তার বৈচিত্র্যের সমাবেশের মধ্যেও একটি মূল ভাবধারা বিভিন্ন পরিকল্পনায় রূপায়িত হয়ে এসেছে। আধুনিক অলঙ্কার শিল্পে তাই দেখা যায় প্রাচীনের পুনরাবৃত্তি কিছু পরিবর্তিত ও পরিমার্জিত সংস্করণে।

দ্বিতীয়তঃ শাড়ী পরার কথা—বিশাল ভারতের এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্যন্ত শাড়ীর প্রচলন। ভারতে অবশ্য বহুকাল থেকে শাড়ী পরার রীতি চলে আসছে। বৈদিক যুগের আর্য-ললনা থেকে পূর্ব ভারতে উপজাতি এলাকার নাগা-সুন্দরীরা প্রত্যেকেই অতীতের অতীত যুগ থেকে শাড়ী ব্যবহার করেছেন। অনেকে অনুমান করেন দ্রাবিড় যুগ থেকে ভারতে শাড়ীর প্রচলন হয়েছে। বাঙলাদেশের ইতিহাস আলোচনা করলে বাঙলার মেয়েদের সাংস্কৃতিক পরিচ্ছদ বা বেশভূষা করার রীতিটা ছিল পুরুষদের মতই। শাড়ী কখনই নাভিদেশের উপরে উঠতো না। বক্ষ-আবরণের জন্য ছিল ওড়না, চোলি অথবা স্তনপট্ট। এছাড়া ঢিলে-ঢালা করে দু-তিন ফেরতা করে মালকোঁচা মেরে শাড়ী পরতেন। ভাস্করেরা কবিরা নারীদেহের বিভিন্ন অঙ্গের যে বর্ণনা করেছেন তার প্রমাণ পাওয়া যায় মাটী, পাথর ও ধাতুতে গড়া প্রাচীনকালের যে সব নারীমূর্তি পাওয়া গেছে তাই থেকে। পাহাড়পুরে যে সমস্ত পাথরে খোদাই করা সাধারণ নরনারীর জীবনযাত্রার চিত্র পাওয়া গেছে তাতেও মেয়েদের পোষাক পরিচ্ছদ ঠিক এই রকমই।

এরপর মেয়েদের অঙ্গরাগের কথা—সুন্দরীর সৌন্দর্যবিলাস দেশ ও কালভেদে বিভিন্ন হলেও এর চিরন্তনতা অনস্বীকার্য। রাসভ-দুগ্ধ স্নাতা ক্লিওপেট্রার কাহিনী এবং কাব্যলোকের অন্তরালবর্তিনী লোধ্র-ফুলের শুভ্ররেণু মাখা সুন্দরীর মুখখানি আজো আধুনিকাদের রূপচর্চা ও অঙ্গরাগে সঙ্গতভাবেই প্রেরণা দেয়। প্রসাধন ও অঙ্গরাগে সেকালের মেয়েদের অনুরাগ ছিল আজ-

অলংকার মতই। অথা যে কতরকম ফ্যাসান করে দেহকে সাজাতেন কবির বর্ণনা থেকে তার কিছু আভাস পাওয়া যায়। মুখে পাউডার জাতীয় সুগন্ধি চূর্ণ, এছাড়া চন্দন ও কুমকুমের সাহায্যে ললাট ও বক্ষো-দেশে অঙ্গরাগ রচনা তখনকার বিলাসের পরিচয় দেয়।

সৌন্দর্য-সচেতন নারীর চিরন্তন আকাংখাকে রূপভাস্বর করেছে। হরপ্পার ধ্বংসস্তূপের অনেক কিছুর সঙ্গে একটি প্রসাধন সামগ্রীর বাক্স পাওয়া গেছে। এ থেকে সেকালের মেয়েদের প্রসাধনের অনেক নিদর্শনের কথা জানা গছে। যেমন, মহেঞ্জোদাড়ো ও হরপ্পার প্রত্নতাত্ত্বিক খননের ফলে অঞ্জন, অঞ্জনশলাকা, লিপস্টিক বা অধররঞ্জনবর্তী, মুখ বা কপোল রক্তিমাভা, ব্রোঞ্জের মুকুর, হাতীর দাঁতের চিরুণী ও প্রসাধনপট্ট ইত্যাদি উপকরণ।

বৈদিক সাহিত্য, ও পৌরাণিক যুগে রামায়ণ মহাভারতে অঙ্গরাগ ব্যবহারের বর্ণনা আছে।

ভারতীয় নারীর কাছে মাথার সুদীর্ঘ কেশ অতি লোভনীয়। অথ এই আজানু-লম্বিত ঘন কালো কেশ যেমন নারীর সৌন্দর্যের প্রধান পরিচায়ক, তার পরিচর্যা ও তা দিয়ে বিভিন্ন রকমের কবরী রচনা পদ্ধতি সকল যুগের নারী-জগতে অতি আদরে সম্মানের স্থান লাভ করে এসেছে। বাংলা-সাহিত্যের গল্পগুলির মধ্যেও অনেক

একাল

জায়গায় নারীর কেশ-বর্ণনায় চিত্র দেখেছি। কাঞ্চনমালার গল্পে রাজকুমার বণিকনী কন্যা কাঞ্চনমালার রূপ দেখে মুগ্ধ হয়েছিলেন। কবি সে রূপের বর্ণনা প্রসঙ্গে লিখছেন—'কাঞ্চনের মাথার চুল পৃষ্ঠদেশ হইতে নিবিড় মেঘের লহরীর মতো নিম্নে লুটাইয়া পড়িয়াছে।' আর রাজকুমার সেই রূপে মুগ্ধ হয়ে বলছেন—

'আমি যে পাগল হৈছি
দেখি মাথার চুল।'

আবার ময়নামতীর গানে দেখি রানী অদুনা চুল বাঁধতে বসেছেন। একবার বিনুনী (বেণী) বাঁধবার এমনি কৌশল দেখালেন, যে তাতে পূজারী ব্রাহ্মণের ছবি ফুটে উঠলো, কিন্তু সে চুল বাঁধা তাঁর পছন্দ হল না। আবার চুল বাঁধতে বসলেন, তাতে ক্রীড়াশীল শিশুদের মূর্তি দেখা গেল, আর একবার চুলের সজ্জায় ফোটা ফুল তৈরী করলেন। এইভাবে চিত্রকরের ছবির মতো নানা ধরনের চুল বাঁধতে লাগলেন। চুল বাঁধা ও নানা ছাঁদে কবরী বাঁধার মধ্যে যে সত্যিই একটি শিল্পীমনের পরিচয় পাওয়া যায়, এ বিষয়ে সন্দেহ নেই। কত রকমের খোঁপার নাম—গঙ্গা-যমুনা, পানখোঁপা, চাটাই খোঁপা, জলতরঙ্গ, চালতা ফুল, প্রজাপতি, অজন্তার ছাদ ইত্যাদি

খোঁপা কি সেকালে কি একালে বেশ জনপ্রিয় সঙ্গেই মেয়েরা বাঁধেন।

আধুনিক কালে হয়তো সাময়িকভাবে বেশ বিন্যাসের মধ্যে কিছুটা পাশ্চাত্য অনুকরণ স্থান লাভ করেছে তার জন্য নানা ধরনের সমালোচনাও শুনতে হয় কিন্তু কালের সঙ্গে যাঁরা সমান তালে পা বাড়িয়ে চলেছেন তাদের তো কিছুটা পাল্লা দিতেই হবে। এটা গতির যুগ কাজেই পিছনে কি ছিল আজকের মেয়েরা তা ভাবতে রাজী নন। তবে সাময়িক মোহের যুগটা কাটিয়ে ওঠা খুব কঠিন হবে না। তাই মাঝে মাঝে চোখে পড়ে বেশবিন্যাসের বা ফ্যাসানের প্রতিযোগিতায় সেকালের নানা ধরনের অলংকার ব্যবহার করা হচ্ছে এবং পুরোনো দিনের নামকরা শাড়ীও দেখানো হয়ে থাকে। এই থেকে অনুমান করা যেতে পারে সেকালের অনেক কিছুই একালে ফিরে আসছে, তবে প্রাচীনার পুনরাবৃত্তির কিছু অদল-বদল হয়ে।

রবীন্দ্রনাথ তাঁর ফাল্গুনী নাটকে মানুষের চিরায়মানতা সম্পর্কে যে ভাবটি ব্যক্ত করেছিলেন এই প্রসঙ্গে তার উল্লেখ করছি—

'বিদায় নিয়ে গিয়েছিলেম
বারে বারে।
ভেবেছিলেম ফিরব না রে
এই তো আবার নবীন বেশে
এলেম তোমার হৃদয় দ্বারে।'

একাল

সেকাল

সুচিত্রা সেন/তারাশঙ্কর রচিত ফরিয়াদ চিত্রের নায়িকা। পরিচালনা : বিজয় বসু

[illegible] (৭১) পরিচালনা : অজিত লাহিড়ী। ছবির নায়ক সমিত ভঞ্জ।

প্রেক্ষাগৃহ

রাজ্যপাল সকাশে পশ্চিমবঙ্গের চলচ্চিত্র-শিল্পের প্রযোজনা বিভাগের প্রতিনিধিবৃন্দ

সম্প্রতি ইস্ট ইণ্ডিয়া মোশান পিকচার অ্যাসোসিয়েশনের প্রযোজক শাখার প্রতিনিধিবৃন্দ পশ্চিমবঙ্গের নির্বাপোন্মুখ চলচ্চিত্র প্রযোজনাশিল্পের পুনরুজ্জীবনে সক্রিয় সাহায্য কামনা করে পশ্চিমবঙ্গের বর্তমান রাজ্যপাল শ্রীএ. এল. ডায়াসের সঙ্গে একটি এক ঘণ্টাব্যাপী সাক্ষাৎকারে মিলিত হয়েছিলেন। প্রকাশ, রাজ্যপাল শ্রীডায়াস অত্যন্ত সহানুভূতির সঙ্গে প্রতিনিধিবৃন্দের বক্তব্য শ্রবণ করেন এবং ঐতিহ্যপূর্ণ বাঙলা চলচ্চিত্রশিল্পের রক্ষার জন্যে কতদূর কি করা যেতে পারে, সে-বিষয়ে গভীরভাবে অনুধাবন করা এবং এই শিল্পের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন সরকারী বিভাগের সঙ্গে আলোচনা করে একটি সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়ার জন্যে তিন সপ্তাহকাল সময় চেয়েছেন। প্রতিনিধিবৃন্দ রাজ্যপাল সকাশে নিম্নলিখিত ছদফা দাবি পেশ করেছেন : (১) ২য় যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রিসভার সুপারিশ মতো সেন্সার-তারিখের ক্রম অনুযায়ী বাঙলা ছবির মুক্তির ব্যবস্থা; (২) আর্থিক সঙ্কট থেকে অব্যাহতি লাভের জন্যে পশ্চিমবঙ্গের ফিল্ম-স্টুডিও এবং ল্যাবরেটরীগুলিকে এককালীন অর্থ সাহায্য; (৩) ১৯৬২-৬৭ ও ৭০ সালের চলচ্চিত্র বিষয়ক অনুসন্ধান সমিতির সুপারিশ অনুযায়ী অবিলম্বে একটি চলচ্চিত্র উন্নয়ন সংস্থার প্রতিষ্ঠা; (৪) যে-চিত্রগৃহগুলি সাধারণত বাঙলা ছবি দেখিয়ে থাকে, সেগুলি ছাড়া পশ্চিমবঙ্গের প্রতিটি চিত্রগৃহের ২০ শতাংশ প্রদর্শনী-সময় বাঙলা ছবির জন্যে বরাদ্দ করা; (৫) বাঙলা ছবির প্রযোজকদের কিছুটা সঙ্কটমুক্তির জন্যে প্রমোদকরের ৫০ শতাংশ ফেরত দেওয়া এবং (৬) একটি পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য ফিল্ম ফিনান্স কর্পোরেশন স্থাপন।

উপরোক্ত ছয় দফা দাবির ভিত্তিতে একটি কার্যকরী সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়ার পক্ষে তিন সপ্তাহকাল সময় অত্যন্ত সামান্য। রাজ্যপাল শ্রীডায়াস এই অল্প সময়ের মধ্যে যদি সত্যই এই মৃতকল্প শিল্পটির প্রাণদানে কিছুটাও সাহায্যের ব্যবস্থা করতে পারেন, তাহলে তিনি যে শুধুই এই শিল্পের সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে জড়িত অন্তত দু'হাজার কর্মীকে অনশনের হাত থেকে রক্ষা করবেন, তাই নয়, বাঙলার সংস্কৃতির সর্বশ্রেষ্ঠ ধারক, স্বদেশে-বিদেশে বহু অভিনন্দিত এই শিল্পটির ত্রাণকর্তা-রূপে সকল সুধীজনের প্রশংসাভাজন হবেন।

এই প্রসঙ্গে মহারাষ্ট্র, মহীশূর, তামিলনাড়ু, রাজস্থান, ওড়িশা, আসাম প্রভৃতি অন্যান্য রাজ্যসরকার নিজ নিজ রাজ্যের ভাষায় প্রস্তুত চলচ্চিত্রগুলির প্রযোজকদের উৎসাহদানের জন্যে পুরস্কার প্রদানের ব্যবস্থা ছাড়াও কতরকমে আর্থিক সাহায্য করেন, সে-সম্পর্কে একটি বিস্তারিত তথ্য আমাদের রাজ্যপালের অবগতির জন্যে পেশ করা হয়েছে বলে আমাদের বিশ্বাস। এখানে বলা প্রয়োজন যে, একদা শিল্প, সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষকতা করে এসেছেন ভারতের জমিদার ও রাজন্যবর্গ। কিন্তু গণতন্ত্রী ভারত ইউনিয়ন যখন এই পদমর্যাদাগুলির বিলুপ্তি সাধন করেছে, তখন নিশ্চয়ই এই পৃষ্ঠপোষকতার দায়িত্ব এসেছে কেন্দ্রীয় ও রাজ্যসরকারগুলির ওপর। সর্বভারতীয় ভিত্তিতে কেন্দ্রীয় সরকার চলচ্চিত্রশিল্পের উন্নতি, সহায়তা ও পৃষ্ঠপোষকতাকল্পে বাৎসরিক পুরস্কার প্রদানের ব্যবস্থা (এর মধ্যে আর্থিক পুরস্কারের কথা বিশেষভাবে উল্লেখ্য), ফিল্ম ইনস্টিটিউট স্থাপন, ফিল্ম ফিনান্স কর্পোরেশনের প্রতিষ্ঠা প্রভৃতি বহুবিধ কর্মপন্থা গ্রহণ করেছেন এবং একটি কেন্দ্রীয় ফিল্ম-বোর্ড গঠনের কার্যে অগ্রসর হচ্ছেন। কিন্তু একটি বিশেষ আঞ্চলিক ভাষায় নির্মিত চলচ্চিত্র-শিল্পের বিষয়টি হল রাজ্যসরকারের একান্ত নিজস্ব অনুধাবন ও চিন্তার সামগ্রী এবং এই জন্যই বিভিন্ন রাজ্য-সরকারকে তাঁদের আঞ্চলিক ভাষায় নির্মিত চলচ্চিত্রশিল্পের রক্ষা ও উন্নতিকল্পে নানারকম বিধিব্যবস্থা গ্রহণে উদ্বুদ্ধ করেছে। দুঃখের বিষয়, আমাদের পশ্চিম-বঙ্গ ভারতের স্বাধীনতাপ্রাপ্তির প্রায়

কেয়ার/পরিচালনা : অসীম ব্যানার্জি।
পাপিয়া মুখার্জি।

সঙ্গে সঙ্গেই একটি সমস্যাকণ্টকিত রাজ্যে পরিণত হয়েছে। এবং এই স্বাধীনতাপ্রাপ্তির ফলেই পূর্বতন বাঙলাদেশের দুই-তৃতীয়াংশ ভারত ইউনিয়নের বাইরে চলে যাওয়ায় ও নবসৃষ্ট পাকিস্তানের সঙ্গে ভারতের সম্পর্ক গোড়া থেকেই তিক্ত হওয়ায় বাঙলা চলচ্চিত্রশিল্পের স্বাভাবিক বাজার এক-তৃতীয়াংশে সঙ্কুচিত হয়ে পড়ে। এর পরে ভাষার ভিত্তিতে রাজ্যগুলিকে যখন পুনর্গঠিত করা হয়, তখন প্রায় প্রতিটি রাজ্যই রাজ্যবহির্ভূত ভাষার প্রতি সহসা বিরূপ হয়ে পড়ে এবং তারই দরুণ বাঙলা ছবিগুলি বিহার, ওড়িশা, আসাম প্রভৃতি প্রতিবেশী রাজ্যে তাদের বহুদিনের প্রতিষ্ঠিত বাজারটি সম্পূর্ণে হারিয়ে বসে। কিন্তু এরও পরে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের অভ্যন্তরেই অত্যন্ত সন্তর্পণে, সুপরিকল্পিত উপায়ে হিন্দী ছবির বাজারের যে-প্রসার ঘটানো হয়েছে, বাঙলা চলচ্চিত্র-শিল্পের মূলোচ্ছেদে তারই দায়িত্ব সবচেয়ে বেশী। আজ প্রধানত বাঙালী অধ্যুষিত পশ্চিমবঙ্গের প্রায় ৩৭০টি চিত্রগৃহের মধ্যে মাত্র ৭০টিতে বাঙলা ছবি দেখানো হয়ে থাকে কেন, এ-প্রশ্নের যথার্থ উত্তর কে দেবে? কলকাতা শহরের শ্যামবাজার অঞ্চলে স্থাপিত দর্পণা ও মিত্রা চিত্রগৃহ আজ কেন হিন্দী ছবি দেখিয়ে থাকে এবং এর সম্বন্ধে প্রতিবাদ ওঠে না কেন? বাঁকুড়া শহরে দুটি চিত্রগৃহের মধ্যে একটিতে নিয়মিতভাবে হিন্দী ছবি দেখানো হয়। উত্তরপাড়ার গৌরী টকীজ, কৃষ্ণনগরের বনফুল, মালদহের রূপকথা, মেদিনীপুরের অরোরা সিনেমা, জলপাইগুড়ির রূপশ্রী, কোন্নগরের চলচ্চিত্রম্ প্রভৃতি বহু চিত্র-গৃহের নাম করা যায়, যেগুলি সম্পূর্ণভাবে বাঙালী প্রধান অঞ্চলে থেকেও প্রায় নিয়মিতভাবেই হিন্দী ছবি দেখিয়ে থাকে। এবং সবচেয়ে মজার কথা, পশ্চিমবঙ্গে হিন্দী ছবির এই ব্যাপক প্রসার স্বাধীনোত্তর যুগেই ঘটেছে। বলতে বাধ্য হচ্ছি, এব্যাপারে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যসরকার আদৌ দৃষ্টিপাত

করা প্রয়োজন অনুভব করেন নি। অথচ সরকার যদি সতর্কতামূলক ব্যবস্থা অবলম্বন করতেন, তাহলে আজ বাঙলা ছবিকে 'নিজ বাসভূমে পরবাসী'র ভূমিকা গ্রহণ করতে হ'ত না। আজ হিন্দী ছবি কি শহর, কি মফঃস্বল—আপামর বাঙালী জনসাধারণকে এমনভাবে প্রভাবিত করেছে যে, কথা ফোটে নি, এমন বাচ্চা-বাচ্চা ছেলেমেয়ে বাপমায়ের সামনেই নেচে নেচে যখন গাইছে 'চল চল মেরে সাথী, ও মেরে সাথী', তখন তাঁরা সোল্লাসে তাদের তারিফ করছেন।

পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের চলচ্চিত্র প্রযোজনা শিল্পকে বাঁচাতে হলে, তাকে স্বাধিকারে প্রতিষ্ঠিত করতে হলে এই অসহনীয় অবস্থার পরিবর্তন ঘটাতে হবে এবং তার জন্যে প্রয়োজন, পশ্চিমবঙ্গের চলচ্চিত্র-প্রযোজক, স্টুডিও এবং ল্যাবরেটারী সংস্থাগুলির একযোগে একটি সার্বভৌম সমিতি গঠন করে রাজ্যসরকারের কাছ থেকে এই শিল্পটি সম্পর্কে সকল রকম রক্ষাকবচ আদায় করা। বহু স্বার্থসংশ্লিষ্ট মহল থেকেই প্রতিবাদের ঝড় উঠবে, প্রতিরোধ আন্দোলনও গড়ে উঠতে পারে, কিন্তু তাতে পিছু হটলে চলবে না। আত্মরক্ষার অধিকার সর্ববাদিসম্মত। বাইরের প্রতিকূল পরিস্থিতি যখন আমাদের শিল্পকে বাঁচা-মরার পর্যায়ে ঠেলে এনেছে, তখন সেই পরিস্থিতির বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াবার আইনসম্মত অধিকার আমাদের আছে এবং তা কোনোক্রমেই জাতীয়তার পরিপন্থী বলে গণ্য হতে পারে না।

এরই সঙ্গে প্রযোজনাশিল্পকে স্ব-ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত করবার জন্যে অবশ্য কিছু কাজ করতে হবে। প্রথমেই সকল প্রযোজক এক হয়ে এক টেবিলের চারপাশে বসে একটি বার্ষিক পরিকল্পনা গ্রহণ করুন। আসছে বছরে ক'খানি ছবি করা হবে, কে কোন্ ছবি করবেন, কোন্ ছবিতে কি পরিমাণ খরচ হওয়া উচিত, কোন্ কোন্ শিল্পীকে নিযুক্ত করা হবে,—এই সব ব্যাপারেই সকলে একটি সর্বসম্মত সিদ্ধান্তে আসুন। সাউথ ইণ্ডিয়া ফিল্ম চেম্বার অব কমার্স-এর মতো আপনাদেরও প্রতিষ্ঠান হোক ইস্ট ইণ্ডিয়া ফিল্ম চেম্বার অব কমার্স'। আপনারা আগে থাকতে জানিয়ে দিন সরকারকে আসছে বছরের সামগ্রিক চলচ্চিত্র প্রযোজনায় সর্বসাকুল্যে এত ব্যয় হবে; এর মধ্যে আপনারা দেবেন এত টাকা এবং বাকিটা ঋণ দিন সরকার অল্প সুদে। তাঁরা তাঁদের অর্থকে নিরাপদভাবে লগ্নী করবার জন্যে সম্ভবমত সতর্কতা অবলম্বন করুন, ক্ষতি নেই; কিন্তু সরকারকে বলুন, দুর্নীতিগুলাদের হাত থেকে আমাদের রক্ষা করুন। তেমন সরকারের কাছে আপনাদের অন্য অনুরোধ হোক, সিনেমাগৃহের মালিকদের শোষণ থেকেও আপনাদের রক্ষা করুন। যেন অত্যন্ত জনপ্রিয় ছবি তৈরী করেও মুক্তি-চিত্রগৃহের থেকে আপনার অংশ যখন দু'লাখ, তখন তাঁদের অংশে গিয়ে না পড়ে চার লাখ টাকা।

জনপ্রিয় শিল্পী, পরিচালক, সঙ্গীত-পরিচালকদেরও আপনাদের অবস্থা সম্বন্ধে অবহিত করুন। আঞ্চলিক বাঙলা ভাষায় তৈরী ছবি আজ যখন আর্থিক সাফল্যের মুখ কিছুতেই দেখতে পাচ্ছে না, তখন প্রযোজনাশিল্পের সঙ্গে যুক্ত প্রতিটি লোকই যাতে বেঁচে থাকতে পারে এবং সমগ্র শিল্পটি বেঁচে থাকে, তারই জন্যে তাঁরা দয়া করে পারিশ্রমিকের চাহিদাকে একটা ন্যায়সম্মত পরিমাণের মধ্যে নিয়ে আসুন। যদি উপযুক্ত বিবেচনা করেন, সরকার প্রতিষ্ঠিত ফিল্ম ডেভেলপমেন্ট বোর্ডকে একটি পক্ষ করে তাঁদের কিছুটা নগদ দিয়ে লাভের অংশীদার করে নিতেও পারেন।

আমাদের এই একান্ত আপন চলচ্চিত্র-শিল্পটির জন্যে বলবার ও করবার অনেক জিনিসই আছে। তিন হপ্তা পরে রাজ্যপাল শ্রীএ. এল. ডায়াস আপনাদের জন্যে কি মুশকিলআসানের ব্যবস্থা করেন, তারই ওপর আপনাদের ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা নির্ভর করছে।

চিত্র-সমালোচনা

ত্রিনয়নী মা

বর্তমানে পৌরাণিক ধর্মমূলক ছবি প্রায় তোলা হয় না বললেই চলে। সেদিক থেকে রূপশ্রী চিত্রমের 'ত্রিনয়নী মা' চিত্রটি নিঃসন্দেহে প্রশংসাযোগ্য। শ্রীশ্রীচণ্ডীর কাহিনী অবলম্বনে গৃহীত এই চিত্রটিতে বয়ে গেছে এক অনাবিল ভক্তিরসের ধারা। নচেৎ শুধু পরিসজ্জায় এই ছবিটির অভিনয়, সিক্ষণীয় অলঙ্করণের কাজ খুব একটা উচ্চমানের নয়। তবে ধর্মপ্রাণ দর্শকদের কাছে এ ছবির আবেদন অবহেলার যোগ্য নয়।

আগেই বলেছি শ্রীশ্রীচণ্ডীর কাহিনী নিয়ে গড়ে উঠেছে ছবিটির আখ্যানভাগ। রাজা সুরথ ও বৈশ্য সমাধি স্বজনদের চক্রান্তে ও ব্যবহারে ক্ষুব্ধ হয়ে সর্বকিছু

ত্যাগ করে এসে আশ্রয় নেন মেধস মুনির আশ্রমে। স্বজনদের দ্বারা বিতাড়িত হয়েও তাঁরা কিন্তু ভুলতে পারেন না তাঁদের আত্মীয়স্বজনদের। এর কারণ জিজ্ঞাসা করেন তাঁরা মেধস মুনিকে। তিনি বলেন, এসবই মহামায়ার লীলা। তাঁরা জিজ্ঞাসা করেন, কে এই মহামায়া? এরই উত্তরে মেধস মুনি মহামায়া ত্রিনয়নী মা'র বিভিন্ন লীলা-বর্ণনা করেন। আর সেই লীলা বর্ণনা প্রসংগেই মধুকৈটভ বধ, মহিষাসুর বধ ও শুম্ভ নিশুম্ভ, রক্তবীজ, চণ্ডমুণ্ড বধের ঘটনা দেখান হয়। সবশেষে দেখান হয় ওই মহামায়ারই আরাধনা করে রাজা সুরথ ও বৈশ্য সমাধি কিভাবে তাঁদের হৃত সম্পদ ফিরে পেলেন তার কথা।

কোনরকম বাহ্যিক আড়ম্বরের আশ্রয় না নিয়ে পরিচালক পূর্ণেন্দু রায়চৌধুরী সহজ সরলভাবে ছবিটিকে চিত্রায়িত করেছেন এবং শুধু ভক্তিভাবটিকেই জাগিয়ে রাখতে তিনি সক্ষম হয়েছেন।

ছবিটির কাহিনী, চিত্রনাট্য ও সংলাপ বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্রের। শ্রীভদ্র ছবিটিতে সব সময় আকাঙ্ক্ষিত সংঘাত সৃষ্টি করতে পারেন নি। এ ছাড়া তাঁর চণ্ডী পাঠ ছবিটির পরিবেশসৃষ্টিতে সহায়ক হলেও মাঝে মাঝে উচ্চারণের অশুদ্ধতাও কানে লাগে।

অভিনয়ে কোন শিল্পীরই প্রায় করার মত কিছু ছিল না। ওরি মধ্যে ছবির বিভিন্ন চরিত্রের চাহিদা মিটিয়েছেন অসিতবরণ, অজিত বন্দ্যোপাধ্যায়, কমল মিত্র, দ্বিজু ভাওয়াল, গুরুদাস, পদ্মা দেবী, নবাগতা মধুমিতা প্রভৃতি।

ছবিটির গানগুলি এক উল্লেখ্য সম্পদ। অনিল বাগচী সুরারোপিত ছবিটির বিভিন্ন গানে কণ্ঠ দিয়েছেন মানবেন্দ্র মুখোপাধ্যায়, ধনঞ্জয় ভট্টাচার্য, মান্না দে, অলক বাগচী, সন্ধ্যা মুখার্জি।

চিত্রগ্রহণে ছিলেন রামানন্দ সেনগুপ্ত। কয়েকটি ট্রিকশট্ গ্রহণে তিনি দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন। ছবির অন্যান্য বিভাগের কাজ মোটামুটি।

ছদ্মবেশী / উত্তমকুমার। পরিচালনা ঃ অগ্রদূত। ফটো ঃ অমৃত

স্টুডিও থেকে

ফরিয়াদ ঃ

শুক্রবার ৫ই নভেম্বর অমর কথাশিল্পী তারাশঙ্কর রচিত পর্ণা পিকচার্সের 'ফরিয়াদ' বিজয় বসুর পরিচালনায় চিত্র-রূপায়িত হয়ে মিনার বিজলী ছবিঘর চিত্র-গৃহে মুক্তিলাভ করছে।

'ফরিয়াদ' আধুনিক কালের ধোঁয়াটে জীবন-যন্ত্রণার কাহিনী নয়, চিরন্তন হৃদয়াবেগের কাহিনী। এ এক নির্যাতিতার কাহিনী, যার বাপ জুয়াড়ী, স্বামী অক্ষম ক্লীব আর ছেলে সমাজবিরোধী মস্তান। এদের নিয়েই গড়ে উঠছে সমাজ-জীবনের এক খণ্ডচিত্র যা নির্মম ও প্রাণঘাতী।

একটি অসহায় সাধারণ ঘরের মেয়ে অবস্থারে-পাকিস্তা রক্সাবাঈরূপে রূপান্তর—এই ছবির পটভূমি। স্বনামধন্যা সুচিত্রা সেন এই চরিত্রের রূপ দিয়েছেন। অন্যান্য চরিত্রে আছেন বিকাশ রায়, উৎপল দত্ত, পার্থ মুখার্জি, চন্দ্রাবতী, আনন্দ ও সোম মুখার্জি।

নচিকেতা ঘোষ এই ছবির সুর-সংযোজনা করেছেন।

সংসার

নর্মদা চিত্র প্রযোজিত ও পরিবেশিত সলিল সেন পরিচালিত 'সংসার' ইন্দিরা, প্রাচী, মিত্রা ও অন্যত্র পরবর্তী ছবি হিসাবে মুক্তির প্রতীক্ষায় আছে। কাহিনী ও চিত্রনাট্য পরিচালক সলিল সেনের। ভূমিকায় আছেন—সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায়, সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়, সন্ধ্যারানী, বসন্ত চৌধুরী, নির্মলকুমার, শেখর চট্টোপাধ্যায়, অজয় গাঙ্গুলী, মৃণাল মুখোপাধ্যায়, জহর রায়, হরিধন, অমরনাথ মুখোপাধ্যায়,

শ্রাবণ সন্ধ্যায় / সুমিত্রা মুখোপাধ্যায়। পরিচালনা : প্রান্তিক।   ফটো : অমৃত।

বৌয়ের চিত্রগ্রহণ নভেম্বরের প্রথম সপ্তাহ থেকেই আবার শুরু হচ্ছে উত্তমকুমারকে নিয়ে। বেশ কয়েক মাস উত্তমকুমারের অনুপস্থিতির জন্য চিত্রগ্রহণ বন্ধ ছিল। লম্বা একটানা সুটিং করে ছবির কাজ নভেম্বরেই শেষ করবেন বলে স্থির করেছেন পরিচালক মানু সেন। সুর দিচ্ছেন—কালিপদ সেন। নেপথ্য কণ্ঠে আছেন—সন্ধ্যা মুখার্জি, ধনঞ্জয় ভট্টাচার্য, শ্যামল মিত্র ও অনুপ ঘোষাল। চিত্রনাট্য : সলিল সেন। চরিত্র চিত্রণে আছেন উত্তম-কুমার, মাধবী চক্রবর্তী, সুব্রতা চ্যাটার্জি, মিন্টু চক্রবর্তী, সুব্রতা চট্টোপাধ্যায়, শমিতা বিশ্বাস, মাঃ অরিন্দম প্রমুখ। সঙ্গীত পরিচালক হেমন্ত মুখোপাধ্যায়। নেপথ্য-কণ্ঠে আছেন : আরতি মুখো-পাধ্যায় ও হেমন্ত মুখোপাধ্যায়।

বাদল পিকচার্সের আগামী ছবি :

দীপ জেলে যাই, জীবনতৃষ্ণা, ভাঙা-গড়া, জীবনকাহিনী প্রভৃতির প্রযোজক শ্রীরাখালচন্দ্র সাহা দীর্ঘকাল পর আবার ছবির প্রযোজনায় এগিয়ে এলেন। বাদল পিকচার্সের হয়ে এবার তিনি যে ছবিটির প্রযোজনা করছেন তার নাম 'আলোয় ফেরা'। পরিচালনা করছেন অজিত গাঙ্গুলী। কাহিনী ও চিত্রনাট্য রচনা করেছেন শ্রীগাঙ্গুলী স্বয়ং। গান রেকর্ডিং-এর কাজ শেষ হয়ে গেলেই নভেম্বরের মাঝা-মাঝি থেকে ছবির কাজ জোরকদমে চলবে।

মুক্তিপথে অপর্ণা :

সরকার প্রোডাকসন্স প্রাঃ লিঃ-এর ছবি 'অপর্ণা'র চিত্রগ্রহণ কাজ শেষ করে মুক্তির দিন গুনছে। কাহিনী রচনা করেছেন জরাসন্ধ। চিত্রনাট্য ও পরিচালনা সলিল সেনের। সুর দিয়েছেন রবীন চট্টোপাধ্যায়। নেপথ্য-কণ্ঠে আছেন : আরতি মুখো-পাধ্যায়, বনশ্রী সেনগুপ্ত ও শিপ্রা বসু। বিশিষ্ট ভূমিকায় অংশগ্রহণ করছেন : সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়, তনুজা, শুভেন্দু চট্টোপাধ্যায়, অরুণ মুখোপাধ্যায়, গঙ্গাপদ বসু, গীতা নাগ, গীতা দে, অমরনাথ, কল্যাণ চট্টোপাধ্যায়, বীরেন চট্টোপাধ্যায়, রেবা দেবী, অজন্তা চৌধুরী, অপর্ণা দেবী, জহর রায়, বঙ্কিম ঘোষ, বিজন ভট্টাচার্য, মাঃ অরিন্দম ও তরুণকুমার প্রমুখ। চিত্র-গ্রহণে : কৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়। সম্পাদনায় : সুবোধ রায়। পরিবেশনায় : শ্রীরঞ্জিৎ পিকচার্স প্রাঃ লিঃ।

বিরাজ বৌ-এর চিত্রগ্রহণ শুরু :

সুনীল রায় প্রযোজিত কে সি দাস প্রোডাকসন্সের ছবি শরৎচন্দ্রের 'বিরাজ

অনুপকুমার, দিলীপ রায়, নীলিমা দাস, বিকাশ রায়, শিবানী বসু, শর্মিলা, কমল মিত্র, তরুণকুমার, জীবেন বসু, জহর রায়, বেচু সিংহ, ধীরাজ দাস, নৃপতি চ্যাটার্জি, গোর শী, বীরেন চ্যাটার্জি, আনন্দ মুখার্জি ও রাজলক্ষ্মী (ছোট) প্রমুখ।

মঞ্চাভিনয়

ভারতী অপেরার 'বাঘা যতীন' : বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের শৃংখল থেকে ভারতবর্ষকে মুক্ত করতে যে সব বীর বিপ্লবীরা জীবন দিয়ে গিয়েছেন, তাঁদের সংঘাতমুখর প্রদীপ্ত জীবনকাহিনী আজ পালাগানের আসরেও প্রোজ্জ্বল করে তোলা হোচ্ছে। এ প্রয়াসে যাঁদের আন্তরিক নিষ্ঠা ও শৈল্পিক স্বাতন্ত্র্য নাট্যানুরাগীদের আকৃষ্ট করেছে, তাদের মধ্যে 'ভারতী অপেরা'র নাম নিঃসন্দেহে প্রথম সারিতেই উল্লেখযোগ্য। গত বছর এই অপেরার বলিষ্ঠ প্রযোজনা 'মৃত্যুঞ্জয়ী সূর্য সেন' যেমন দেশাত্মবোধের গভীরতর ছন্দে আমাদের উদ্দীপিত করেছে, তেমনি দুর্ধর্ষ অভিনয় আমাদের করেছে বিস্মিত। এবারে তাঁদের আর একটি বৈপ্লবিক অবদান হোল 'বাঘা যতীন'। এ পালা বোধ হয় 'ভারতী অপেরা'র পরিচিতিকে আরো বিস্তৃততর করে দিল।

নিজের ও পরিবারের সুখস্বাচ্ছন্দ্য বিসর্জন দিয়ে যে অটল মন ও দৃঢ়তর প্রতিজ্ঞা নিয়ে বাঘা যতীন দেশমাতৃকার পরাধীনতার শৃংখল মোচন করবার দুর্বার সংগ্রামে জীবনপণ করেছিলেন, তারই জীবন্ত প্রেক্ষাপটে রচিত হয়েছে 'বাঘা যতীন' পালাটি। শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত পালাটি দর্শককে আপ্লুত করে রাখে। এর জন্য প্রথমেই প্রশংসার দাবী রাখেন নির্দেশক জ্ঞানেশ মুখোপাধ্যায়। পালার প্রতিটি মুহূর্তে তাঁর অসাধারণ নিষ্ঠা ও গভীরতর চিন্তার ছোঁয়া আছে। বিশেষ করে 'টেগার্ট' ও 'বাঘা যতীন' দুটি চরিত্রে শিল্পী নির্বাচনে দুরন্ত বলিষ্ঠতার পরিচয় রেখেছেন। সুজিত পাঠক করেছেন 'টেগার্টে'র ভূমিকায় অভিনয়, আর জহর রায় সেজেছেন 'বাঘা যতীন'। যাত্রারসিকদের চিরাচরিত ধারণায় এই চরিত্রাভিনয় একটা বিরাট ছাপ রেখে যায়। দুই শিল্পীই বিরাট ব্যতিক্রম। অথচ দুই শিল্পীই দাপটের সঙ্গে অভিনয় করে প্রমাণ করেছেন যে, তাঁরা যে কোন চরিত্রের অতলে নিজেদের একান্তভাবে মিশিয়ে দিতে পারেন।

অন্যান্য চরিত্রে সার্থক রূপদান করেছেন হিরণকুমার, অমর ভট্টাচার্য, শচী মণ্ডল, দেবকুমার, হীরালাল, সব্যসাচী মুখার্জি, মণু ঘোষ, বলাই হালদার, হীর চ্যাটার্জি, বন্দনা দেবী, অঞ্জনা ব্যানার্জি ও বেলারাণী। পালাটির মেজাজ অনুযায়ী সুরসৃষ্টি করেছেন অনিল বাগচী।

'একটি দলে'র 'কবে বসন্ত আসবে' : 'একটি দল' নাট্যগোষ্ঠীর প্রথম প্রয়াস সম্প্রতি মঞ্চস্থ হোল বালিগঞ্জ শিক্ষাসদনে স্বপন সেনগুপ্তের 'কবে বসন্ত আসবে' নাটকটির সফল পরিবেশনায়। সমস্যাবহুল গোষ্ঠীজীবনের সুখদুঃখকে শিল্পীরা সুন্দরভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন তাঁদের সাবলীল অভিনয়ে। এঁদের মধ্যে শ্রীনাথের স্ত্রী চরিত্রটি স্বপ্না মিত্রের প্রাণবন্ত অভিব্যক্তিতে মূর্ত হয়ে ওঠে। এ ছাড়া ইউনিয়ন নেতা 'বংশী'র চরিত্রে সমীর ঘোষ, দালালরূপী অপূর্ব চ্যাটার্জি এবং প্রাক্তন স্কুল শিক্ষক অধুনা ফ্যাক্টরীর টাইমবাবু, 'শ্রীনাথে'র চরিত্রে দিলীপ কুণ্ডু এবং 'গজা'র ভূমিকায় অরবিন্দ চ্যাটার্জি সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। তবে সামগ্রিক অভিনয়ের গতিছন্দে মাঝে মাঝে শৈথিল্য দেখা গিয়েছে।। নাটকটি নির্দেশনার দায়িত্ব বহন করেন শ্রীমতী স্বপ্না মিত্র।

সংক্রান্তি : কয়েকদিন আগে বীরু মুখোপাধ্যায়ের মঞ্চসফল নাটক 'সংক্রান্তি' 'প্যারে' বেশ সাফল্যের সঙ্গেই পরিবেশিত হোল। অভিনয়ের আয়োজন করেন কোমলাইট (ইণ্ডিয়া) প্রাইভেট লিঃ

বসন্তবিলাপ চিত্রের মহরতে সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়, অসীম দত্ত, সোনালী গুপ্ত, সুমিত্রা মুখোপাধ্যায় ও কাজল গুপ্ত। পরিচালক : দীনেন গুপ্ত। ফটো : অমৃত

রিক্রিয়েশন ক্লাবের শিল্পীরা। হরিদাস সান্যালের পরিচালনায় এই সংঘাতসমৃদ্ধ নাটকটি মঞ্চের আলোয় নতুনতর ব্যঞ্জনায় মূর্ত হয়ে ওঠে। শিল্পীদের মধ্যে বিশেষ করে লক্ষ্মণ সোম (রতন), মনোতোষ চক্রবর্তী (নায়েব), গীতা দে (নিস্তারিণী) বিশেষ নৈপুণ্যের পরিচয় রাখেন।

অন্যান্য কয়েকটি বিশিষ্ট ভূমিকায় ছিলেন অমিতাভ রায়, দীপক জোয়ারদার, শংকর ব্যানার্জি, কমল ভট্টাচার্য, শংকর ভট্টাচার্য, রথীন সুর, অজয় ভট্টাচার্য, সমীর চক্রবর্তী, যূথিকা ভট্টাচার্য, পুতুল চক্রবর্তী।

কোচবিহারে 'রক্তকরবী' : কোচবিহারের সরকারী জেনকিনস্ স্কুলের শিক্ষকরা সম্প্রতি স্থানীয় রাষ্ট্রীয় পরিবহন মঞ্চে পরিবেশন করলেন রবীন্দ্রনাথের 'রক্তকরবী'। নাটকটিকে রসোত্তীর্ণ করতে যাঁদের চরিত্র-চিত্রনে বৈশিষ্ট্যের নজীর মেলে ধরেছিল তাঁরা হোলেন শংকরপ্রসাদ চক্রবর্তী, নীরেন হোড়, রামপ্রসাদ নায়েক, প্রশান্ত গোস্বামী, খগেন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য, বমেন্দ্রনারায়ণ সাহা, ডলি ঘোষ ও দোলন দাস।

'আত্রিকে'র দুটি একাঙ্ক : 'আত্রিক' সম্প্রদায়ের শিল্পীরা সম্প্রতি মুক্তঅঙ্গনে দুটি একাঙ্ক নাটক সাফল্যের সঙ্গে পরিবেশন করলেন। নাটক দুটি হোল সৌরীন্দ্র ভট্টাচার্যের 'ঠিক বৃষ্টির আগে' ও রবীন্দ্র ভট্টাচার্যের 'অমর শহীদ গদাই'। প্রশান্ত চট্টোপাধ্যায় ও নিখিল ভট্টাচার্যের নির্দেশনায় সামগ্রিক প্রযোজনাটি নাট্যানুরাগীদের তৃপ্তি দিতে পেরেছে।

নাটক দুটির বিভিন্ন ভূমিকায় ছিলেন সুনীল বোস, অসীম ব্রহ্ম, আশীষ বোস, দেবপ্রসাদ চৌধুরী, দিলীপ চট্টোপাধ্যায়, শিবপ্রসাদ দত্ত, সাধন গুপ্ত, তারাশঙ্কর দাস, সৌরীন্দ্র ভট্টাচার্য, স্বপন ভট্টাচার্য, হরিমোহন ঘোষ, হরিপ্রসাদ বিশ্বাস, দেবতোষ ঘোষ, প্রদীপ ঘটক, রুদ্দীপ ভট্টাচার্য, যূথিকা বসু, সুষমা চক্রবর্তী।

'শৈলুষে'র দুটি একাঙ্ক : আসানসোলের প্রগতিশীল নাট্যগোষ্ঠী 'শৈলুষে'র শিল্পীরা সম্প্রতি দুটি ভিন্নস্বাদের একাঙ্ক পরিবেশন করে স্থানীয় নাট্যানুরাগীদের যথেষ্ট স্বীকৃতি অর্জন করেছেন। ডুরান্ড ইনস্টিটিউট মঞ্চে অভিনীত দুটি নাটকের নাম হোল পার্থপ্রতিম চৌধুরীর 'ঈগলের চোখ' ও কল্লোল মজুমদারের 'সংবর্ত'। তিলক রায়চৌধুরীর নিপুণ নির্দেশনায় সামগ্রিক নাট্যপ্রযোজনাটি শিল্পসুষমায় প্রাণবন্ত হয়ে ওঠে।

নাটক দুটির বিভিন্ন ভূমিকায় ছিলেন কুমুদ বক্সী, কালীকুমার মুখোপাধ্যায়, সুগীত চৌধুরী, তিলক রায়চৌধুরী, মণি রায়, সাতকড়ি কুণ্ডু, আশীষ দাশগুপ্ত, দিলীপ বন্দ্যোপাধ্যায়, সুনীল পাল, কাজল [illegible] বন্দ্যোপাধ্যায়, গীতা ঘোষ। মঞ্চপরিকল্পনায় কুমুদ বক্সী ও মিহির বসুর চিন্তার গভীরতা ধরা পড়েছে। আলোকসম্পাতে ছিলেন সাক্ষী বন্দ্যোপাধ্যায়, মনু চট্টোপাধ্যায়।

একাডেমী অফ ফাইন আর্টসে নৃত্যম্ আয়োজিত রূপকথা নৃত্যনাট্যে শ্রীমতী পূর্ণিমা চট্টোপাধ্যায়

পাটনায় পূর্ণাঙ্গ বাংলা নাটক অভিনয় প্রতিযোগিতা : পাটনা শিল্পী সমিতির চতুর্থ বার্ষিক পূর্ণাঙ্গ বাংলা নাটকের অভিনয় প্রতিযোগিতা আগামী ১৭ই থেকে ৩০শে ডিসেম্বর পর্যন্ত অনুষ্ঠিত হবে। আবেদন করার শেষ তারিখ ১০ই নভেম্বর। যোগাযোগের ঠিকানা : সম্পাদক, শিল্পী সমিতি, ইয়ারপুর হাউস, ইয়ারপুর, পাটনা-১।

লখনউয়ে বাংলা নাট্যাভিনয় প্রতিযোগিতা : লখনউ বেঙ্গলী ক্লাব ও যুবক সমিতির নবম বার্ষিক সর্বভারতীয় বাংলা নাট্যাভিনয় প্রতিযোগিতা আগামী ১১ই ডিসেম্বর থেকে শুরু হবে। আবেদনপত্র পাঠাবার শেষ তারিখ ১১ই নভেম্বর। যোগাযোগের ঠিকানা : ১০, শিবাজী মার্গ, লখনউ-১ অথবা ৯০।৩ গ্রে স্ট্রীট, কলকাতা-৫

পাঞ্চজন্য-এর 'বখাটে'

বর্তমান ভয়াবহ বেকার জীবন ও তার [illegible] যে তরুণ সমাজ জড়িয়ে আছে, লেখাপড়ার মূল্য তাদের কাছে অর্থহীন— এরকম কয়েকজন তরুণের কাহিনী 'বখাটে'। সম্প্রতি 'পাঞ্চজন্য'-এর সভ্যরা রঙ্গনা মঞ্চে এই নাটকটি মঞ্চস্থ করলেন। রচনা এস রনেন্দ্রনাথ ও পরিচালনা করেন শ্রীমন্টু গুপ্ত। বিভিন্ন ভূমিকায় ছিলেন সমীর দাস, পরিতোষ বিশ্বাস, অপূর্ব ভট্টাচার্য, সুরজিৎ ভট্টাচার্য, অঞ্জন বসু, অসীম ভট্টাচার্য, বরুণ রায়, সুকান্ত ভট্টাচার্য, অজয় বসু, এস রনেন্দ্রনাথ,

সমীর ভট্টাচার্য, এস আনাম, মন্টু গুপ্ত, শঙ্কর ঘোষ অগ্নিহোত্রী, বন্দনা বিশ্বাস ও সন্ধ্যা শর্মা প্রমুখ। সঙ্গীত-পরিচালনা দুলাল লাহিড়ীর। মঞ্চ ও আলোক-সম্পাতের ভার ছিল হীরক মুখার্জির ওপর।

'শেষ থেকে শুরু'

গেল ১৫ই অকটোবর '৭১ উদ্যোগীর পরিচালনায় সত্য বন্দ্যোপাধ্যায়ের "শেষ থেকে শুরু" নাটকটি বিজয় ঘোষের পরিচালনায় ভবানীপুরে থিয়েটার সেন্টার হলে প্রশংসার সঙ্গে অভিনীত হয়ে গেলো। বিভিন্ন চরিত্রে রূপদান করেন : অমলেন্দু দে, সঞ্জয় ঘোষ, চয়ন দাস, দুলাল মণ্ডল, সুকুমার মুখোপাধ্যায়, স্বপ্না ভট্টাচার্য ও আরও অনেকে।

'বাঁশের কেল্লা' যাত্রাভিনয়

গিরিশ নাট্য সংসদ কোলকাতার একটি বিশিষ্ট নাট্যসংস্থা। এ'রা যাত্রাভিনয়কেই মাধ্যম হিসেবে বেছে নিয়েছেন ও ইতিমধ্যেই দশটি নাটক কলকাতা ও মফস্বলের বহু বিশিষ্ট আসরে শতাধিক রাত্রি অভিনয় করে দর্শকদের স্বতঃস্ফূর্ত প্রশংসায় ধন্য হয়েছেন। সম্প্রতি পর পর কয়েক রাত্রি 'বাঁশের কেল্লা' নাটকটি সাফল্যের সঙ্গে অভিনয় করেছেন। গেল ৫ই অকটোবর খিদিরপুরের ২৫ পল্লী সার্বজনীন দুর্গোৎসবের আসরে 'বাঁশের কেল্লা' বিশেষ দক্ষতার সঙ্গে পুনরাভিনীত হল। বাঙালী বীর তিতুমীর বৃটিশ শক্তির সঙ্গে সংগ্রাম করে কিভাবে গৌরবের সঙ্গে মরণ বরণ করলেন তারই কাহিনী এ নাটকে আছে। প্রত্যেকটি চরিত্র সুঅভিনীত। শুরু থেকে শেষ সুঅভিনয়ের ধারাটি বজায় ছিল। দক্ষতার গুণে সৌখীন দলের অভিনয় কত সুন্দর হতে পারে তার দীপ্ত স্বাক্ষর রয়েছে এই যাত্রাভিনয়ে। দলগত সংহতি মনে রাখার মত। ধীরেন চক্রবর্তী, সমীর ব্যানার্জি, কার্তিক বাগচি, পুরেন পাল, কেষ্ট সিংহ, প্রদীপ ব্যানার্জি, সুরেশ ঘোষ, গৌরচন্দ্র পাল, তারাপ্রসাদ ভট্টাচার্য নিখিল দাস, গৌর অধিকারী, নিমাই দে, শশাঙ্ক চ্যাটার্জি, কুমারী ইতু, সুলেখা ব্যানার্জি, রুণু ঘোষ, শান্তা সরকার, অমিতা দেবী, বিজলী রায়চৌধুরী প্রমুখ সংসদ শিল্পীরা চরিত্রাভিনয়ে শ্রেষ্ঠত্বের পরিচয় দেন।

বিবিধ সংবাদ

জাতীয় অপরাধ দমন সপ্তাহ—প্রতি তিন বছর অন্তর কোলকাতা এবং ওয়েস্ট বেঙ্গল পুলিশ বাহিনী যে 'জাতীয় অপরাধ দমন সপ্তাহ পালন' করেন, এইবারেও তাদের দেখা গেল কলিকাতা 'রঞ্জি ইনডোর স্টেডিয়ামে' নানাবিধ প্রদর্শনী ও আনন্দ অনুষ্ঠানের মাধ্যমে গত ১০ অকটোবর থেকে ১৭ অকটোবর পর্যন্ত 'জাতীয় অপরাধ দমন সপ্তাহ' পালন করতে।

দর্শকদের আনন্দদানের জন্য কুকুর প্রদর্শনী, ছায়াচিত্র প্রদর্শনী ও অন্যান্য প্রদর্শনীর মতন যে সকল আনন্দ অনুষ্ঠানের আয়োজন প্রতিদিন করা হয় তার মধ্যে গত ১৪ অকটোবরের 'ঝড় উঠেছে' নাটকটি বিশেষভাবে দর্শকদের মনে রেখাপাত করে। নাটকটি রচনায় এবং পরিচালনায় ছিলেন সুবঙ্কিম চট্টোপাধ্যায়। আবহনির্দেশনায় ছিলেন 'হরবোলা' অজয় গঙ্গোপাধ্যায়। মাইক মাঝে মাঝে প্রথম ও দ্বিতীয় দৃশ্যে বন্ধ হয়ে যাওয়ায় অজয় গঙ্গোপাধ্যায়ের 'হরবোলার ডাক' নাটকের পরিবেশ রচনার কাজে তেমন সহায়তা না করতে পারলেও তৃতীয় দৃশ্যে 'হরবোলা গঙ্গোপাধ্যায়' মুখে নানাবিধ ডাক ও শব্দের মাধ্যমে দৃশ্যের অবতারণা করে দূরদর্শিতার পরিচয় দেন। আলোকসম্পাত মোটেই আশানুরূপ হয়নি। নাটকের বিভিন্ন চরিত্রে ছিলেন, সুবঙ্কিম চট্টোপাধ্যায়, সুভাষ আচার্য, বিপিনবিহারী চট্টোপাধ্যায়, পূর্ণেন্দু চট্টোপাধ্যায়, কালিদাস ভট্টাচার্য, সৌমেন মুখোপাধ্যায়, বিধান রায়, মোহিত বন্দ্যোপাধ্যায়, সমীর চক্রবর্তী, কাশীনাথ রায় ও শ্রীমতী গীতা দে।

মনোজ্ঞ অনুষ্ঠান

চন্দননগর ট্যাবুলেশন অফিস রিক্রিয়েশন কমিটির আয়োজনে চন্দননগর নিত্যগোপাল স্মৃতিমন্দিরে মনোজ্ঞ পরিবেশের মধ্যে এক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান হয়ে গেল ক'দিন আগে। এই অনুষ্ঠানে বিশেষ করে একক রবীন্দ্র-নজরুলগীতি অনুষ্ঠানে শিল্পী জ্যোৎস্না ধর উপস্থিত শ্রোতৃমণ্ডলীর অকুণ্ঠ প্রশংসা অর্জন করে। অন্যান্য শিল্পীদের মধ্যে যন্ত্রসঙ্গীতে সুব্রত পাল, হাস্যকৌতুকে সুশীল সেনগুপ্ত ও আধুনিক সঙ্গীতানুষ্ঠানে সমর ঘোষ, দুর্গা ঘোষ ও তবলা সংগতে অজিত সেনের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। অনুষ্ঠানের শেষে শ্রীশৈলেশ চক্রবর্তীর পরিচালনায় 'তৃণিব রূপের পারে' নাটকটি অনুষ্ঠিত হয়। দলগত সুঅভিনয়ের গুণে নাটকটি মঞ্চসফলতা লাভ করে। সুজয় ঘোষালের সঙ্গীত নাটকের সাফল্যে অনেকখানি সহায়তা দিয়েছিল।

অতুলপ্রসাদ জন্মশতবার্ষিকী

গত ২০শে অকটোবর রবীন্দ্রসদন কর্তৃপক্ষ অতুলপ্রসাদ জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষ্যে মনোজ্ঞ সান্ধ্য উৎসবের আয়োজন করে কবি সুরকার গীতিকার অতুলপ্রসাদের প্রতি সম্মান প্রদর্শন সুষ্ঠুভাবেই করেছেন।

বাংলা গানের ধারায় কবি অতুলপ্রসাদের আসন চিরকালের জন্যে পাকা। এ-ছাড়া সহজ, সরল প্রকাশভঙ্গীর গুণে তিনি জনগণের অন্তরের মানুষ।

সম্পাদিকা তপতী রায় আয়োজিত অনুষ্ঠানের শুরু থেকে শেষ একটি রুচিসুন্দর স্নিগ্ধতায় ছিল ভরা। শিল্পমণ্ডিত মঞ্চসজ্জা, আম্রপল্লব-ঘট প্রবেশদ্বারে ঘট ও আলপনা প্রাচ্যের মঙ্গলাচরণ, প্রতিটি শিল্পীকে গোলাপকুঁড়ি দিয়ে অভ্যর্থনা সংগঠিকা ও শিল্পীর পারস্পরিক প্রীতি-বিনিময় সব মিলিয়ে স্নিগ্ধ উজ্জ্বল বাতাবরণ মনকে স্পর্শ করছিল বারবার। উদ্বোধক শ্রীসৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে অতুলপ্রসাদের মধুর অন্তরঙ্গতার উল্লেখ করে কবি অতুলপ্রসাদের সঙ্গীত রচনা ও সুরসৃষ্টির বিভিন্ন ধারার আলোচনা প্রসঙ্গে বলেন প্রথম যুগে ছিল রাবীন্দ্রিক প্রভাব, দ্বিতীয় যুগে দিলীপকুমার রায় ও ধূর্জটিপ্রসাদের সংস্পর্শের ফলশ্রুতি টপ্‌খেয়াল ও ঠুংরীর প্রভাব এবং একেবারে শেষের দিকে ধ্রুপদী ভাবের ছায়া অতুলপ্রসাদের গানে পরিদৃশ্যমান।

সঙ্গীতানুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেন সর্বশ্রী সুচিত্রা মিত্র, অলকা দে, দিলীপকুমার রায়, শিখা বসু, মানসী দাসগুপ্ত, মীরা দাসগুপ্ত, শর্বাণী সেন, সন্তোষ সেনগুপ্ত ও সুশীল চট্টোপাধ্যায়। বিশেষ উপভোগ্য হয়েছিল সুচিত্রা মিত্রের 'একা মোর গানের মাথানো 'আমি বাঁধিনু তোমার কূলে' মাথানো 'আমি বাঁধিনু তোমার কূলে' সুশীল চট্টোপাধ্যায় ও দিলীপকুমার রায়ের গান। তরুণেতর শিল্পীদের মধ্যে শিখা বসু ও শর্বাণী সেন প্রতিশ্রুতিদীপ্ত।

বিশ্ব হকি প্রতিযোগিতা : ভারত বনাম পাকিস্তানের সেমি-ফাইনাল খেলার একটি দৃশ্য। আবদুল রসিদ পাকিস্তানের পক্ষে প্রথম গোল দিচ্ছেন। এই খেলায় পাকিস্তান ২—১ গোলে জয়ী হয়।

খেলাধূলা

দর্শক

বিশ্ব হকি প্রতিযোগিতা

স্পেনের বার্সিলোনায় প্রথম বিশ্ব হকি প্রতিযোগিতার ফাইনালে ১৯৬৮ সালের অলিম্পিক হকি এবং ১৯৭০ সালের এশিয়ান হকি চ্যাম্পিয়ান পাকিস্তান ১—০ গোলে স্পেনকে হারিয়ে তাদেরই উপহার দেওয়া বিজয়ী দলের পুরস্কার সোনার কাপটি স্বদেশে নিয়ে গেল। এখানে উল্লেখ্য, প্রাথমিক লীগ পর্যায়ের খেলায় পাকিস্তান ২—৩ গোলে এই স্পেনের কাছেই হেরেছিল। ভারতবর্ষ ১—০ গোলে কেনিয়াকে পরাজিত করে প্রতিযোগিতায় তৃতীয় স্থান পেয়েছে।

লীগ পর্যায়ের খেলায় 'এ' গ্রুপ থেকে ভারতবর্ষ ও কেনিয়া এবং 'বি' গ্রুপ থেকে স্পেন ও পাকিস্তান সেমিফাইনালে খেলবার যোগ্যতা লাভ করেছিল। লীগ পর্যায়ের খেলায় একমাত্র ভারতবর্ষই অপরাজিত অবস্থায় চারটে খেলাতেই জিতেছিল। তথ্যের ভিত্তিতে বলা যায় পাকিস্তান স্রেফ বরাত জোরেই সেমি-ফাইনালে উঠেছিল। লীগ পর্যায়ে প্রত্যেক দেশকে চারটে করে ম্যাচ খেলতে হয়েছিল। চতুর্থ দিনের খেলার শেষে 'বি' গ্রুপের লীগ তালিকা এই রকম দাঁড়ায় : স্পেনের ৩টে খেলায় ৫ পয়েন্ট, পাকিস্তানের ৪টে খেলায় ৫ পয়েন্ট, নেদারল্যাণ্ডসের ৩টে খেলায় ৪ পয়েন্ট, অস্ট্রেলিয়ার ৩টে খেলায় ১ পয়েন্ট এবং জাপানের ৩টে খেলায় ১ পয়েন্ট। এই অবস্থায় পাকিস্তানের থেকে নেদারল্যাণ্ডসেরই সেমি-ফাইনালে খেলবার সম্ভাবনা সব থেকে বেশী ছিল ; কারণ পাকিস্তানের আর কোন খেলা বাকি ছিল না ; অপরদিকে নেদারল্যাণ্ডসের শেষ ৪র্থ খেলায় প্রতিদ্বন্দ্বী ছিল তালিকার সর্ব-নিম্নস্থানাধিকারী জাপান, যার তখন তিনটে খেলায় মাত্র এক পয়েন্ট উঠেছে। সুতরাং জাপান শক্তিশালী নেদারল্যাণ্ডসকে হারাবে এমন উদ্ভট কল্পনা কেউ মনে স্থানই দেন নি। অনেকেরই দৃঢ় ধারণা হয়েছিল জাপানের যেখানে সেমি-ফাইনালে ওঠার কোন সম্ভাবনাই নেই সেখানে শক্তিশালী নেদারল্যাণ্ডসের বিপক্ষে জাপানের জয়লাভের মনোবল থাকবে না। জাপানের বিপক্ষে ৭০ মিনিট চেপে খেলে এবং ৭টা পেনাল্টি কর্ণার পেয়েও নেদারল্যাণ্ডস একটা গোলও দিতে পারেনি। আর জাপান মাত্র দুটো পেনাল্টি কর্ণার পেয়ে দ্বিতীয় পেনাল্টি কর্ণার থেকে জয়সূচক গোলটি করে নেদারল্যাণ্ডসের বাড়া ভাতে ছাই ফেলে দেয়। জাপানের এই জয়লাভের ফলেই শেষ পর্যন্ত পাকিস্তানের সেমি-ফাইনালে যাওয়া সম্ভব হল। সুতরাং পাকিস্তানের আজকের এই বিশ্ব হকি কাপ জয়ের পিছনে জাপানের অবদান কম নয়। জাপান যদি শক্তিশালী নেদারল্যাণ্ডসের বিপক্ষে পরাজয়ের মনোভাব নিয়ে খেলতো তাহলে পাকিস্তানের সেমি-ফাইনালে ওঠাই হত না। তবে পাকিস্তান যোগ্য দল হিসাবেই সেমি-ফাইনালে ভারতবর্ষকে ২-১ গোলে এবং ফাইনালে স্পেনকে ১-০ গোলে হারিয়েছে। ভারতবর্ষ সেমি-ফাইনালের প্রথমার্ধের খেলায় ১-০ গোলে অগ্রগামী থেকে ভুল খেলার ফলে শেষ রক্ষা করতে পারেনি।

লীগ পর্যায়ের খেলা

যে চারটি দেশ সেমি-ফাইনালে খেলবার যোগ্যতা লাভ করেছিল, তাদের লীগ পর্যায়ের খেলার সংক্ষিপ্ত ফলাফল নীচে দেওয়া হল।

গ্রুপ 'এ'

ভারতবর্ষ : ফ্রান্সকে ১—০ গোলে, আর্জেন্টিনাকে ১—০ গোলে, কেনিয়াকে ২—০ গোলে এবং পশ্চিম জার্মানীকে ১—০ গোলে পরাজিত করে অপরাজিত অবস্থায় 'এ' গ্রুপের লীগ চ্যাম্পিয়ান হয়।

কেনিয়া : পশ্চিম জার্মানীকে ৩—০ এবং আর্জেন্টিনাকে ২—০ গোলে পরাজিত করে। ফ্রান্সের কাছে ০—১ এবং ভারতবর্ষের কাছে ০—২ গোলে পরাজিত হয়।

'এ' গ্রুপের লীগ তালিকায় কেনিয়া এবং পশ্চিম জার্মানী যুগ্মভাবে দ্বিতীয় স্থান পেয়েছিল—উভয়েরই পয়েন্ট সংখ্যা সমান দাঁড়ায়। ফলে এদের মধ্যে কে সেমি-ফাইনালে উঠবে তা নির্ধারণের জন্যে যে

বিশ্ব হকি প্রতিযোগিতা ঃ তৃতীয় স্থাননির্ধারণের জন্য ভারত বনাম কেনিয়ার খেলা ভারত ১—০ গোলে জয়ী হয়।

খেলা হয়, তাতে কেনিয়া ২—১ গোলে পশ্চিম জার্মানীকে পরাজিত করে।

গ্রুপ 'বি'

স্পেন ঃ জাপানকে ২—০ এবং পাকিস্তানকে ৩—২ গোলে পরাজিত করে। নেদারল্যান্ডসের বিপক্ষে ০—০ গোলে খেলা ড্র এবং অস্ট্রেলিয়ার কাছে ০—১ গোলে পরাজয়।

পাকিস্তান ঃ অস্ট্রেলিয়াকে ৫—২ এবং জাপানকে ১—০ গোলে পরাজিত করে। নেদারল্যান্ডসের বিপক্ষে ৩—৩ গোলে খেলা ড্র এবং স্পেনের কাছে ২—৩ গোলে পরাজয়।

চূড়ান্ত লীগ তালিকা

গ্রুপ 'এ'

দেশ	খেলা	জয়	ড্র	হার	স্বঃ	বিঃ	পঃ
ভারতবর্ষ	৪	৪	০	০	৫	০	৮
পঃ জার্মানী	৪	২	০	২	৯	৫	৪
কেনিয়া	৪	২	০	২	৫	৩	৪
ফ্রান্স	৪	২	০	২	২	৫	৪
আর্জেণ্টিনা	৪	০	০	৪	১	৯	০

গ্রুপ 'বি'

দেশ	খেলা	জয়	ড্র	হার	স্বঃ	বিঃ	পঃ
স্পেন	৪	২	১	১	৫	৩	৫
পাকিস্তান	৪	২	১	১	১১	৮	৫
নেদারল্যান্ডস	৪	১	২	১	৪	৪	৪
অস্ট্রেলিয়া	৪	১	১	২	৪	৭	৩
জাপান	৪	১	১	২	২	৪	৩

সেমি-ফাইনাল

পাকিস্তান ২ ঃ ভারতবর্ষ ১

স্পেন ১ ঃ কেনিয়া ০

ফাইনাল

পাকিস্তান ১ ঃ স্পেন ০

আন্তঃ বিশ্ববিদ্যালয় ফুটবল প্রতিযোগিতা

১৯৭১ সালের আন্তঃ বিশ্ববিদ্যালয় ফুটবল প্রতিযোগিতায় কালিকট বিশ্ববিদ্যালয় ৫ পয়েন্ট সংগ্রহের সূত্রে স্যার আশুতোষ মুখার্জি শীল্ড জয়ী হয়েছে। রানার্স আপ হয়েছে পূর্বাঞ্চলের লীগ চ্যাম্পিয়ান গৌহাটী বিশ্ববিদ্যালয় (৩টি খেলায় ৩ পয়েন্ট)। এখানে উল্লেখ্য, কালিকট বিশ্ববিদ্যালয় দলের পক্ষে স্যার আশুতোষ মুখার্জি শীল্ড জয় এই প্রথম।

কালিকটে আয়োজিত চূড়ান্ত লীগ পর্যায়ের খেলায় অংশগ্রহণ করেছিল এই চারটি বিশ্ববিদ্যালয় দল—কালিকট (সাউথ জোন চ্যাম্পিয়ান), গৌহাটি (ইস্ট জোন চ্যাম্পিয়ান), পাঞ্জাব (নর্থ জোন চ্যাম্পিয়ান) এবং বিক্রম (ওয়েস্ট জোন চ্যাম্পিয়ান)। গত দু' বছরের স্যার আশুতোষ মুখার্জি শীল্ড বিজয়ী পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিযোগিতা বর্জন করে। কালিকটের বিপক্ষে দ্বিতীয়ার্ধের খেলার দশ মিনিটের মাথায় রেফারীর সিদ্ধান্তের প্রতিবাদে তারা মাঠ ত্যাগ করে। এই সময় কালিকট ১-০ গোলে এগিয়েছিল।

এখানে উল্লেখ্য, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্পোর্টস বোর্ডের গাফিলতিতে নির্দিষ্ট সময়ে প্রবেশপত্র পাঠানো হয়নি। ফলে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় এ বছরের প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করতে পারেনি। আন্তঃ বিশ্ববিদ্যালয় ফুটবল প্রতিযোগিতার ইতিহাসে সর্বাধিকবার (মোট ১১ বার) স্যার আশুতোষ মুখার্জি শীল্ড জয়ের রেকর্ড কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় দলের। তারা শেষ এই শীল্ড জয়ী হয়েছে ১৯৬৭ সালে।

ফুটবল খেলার হালচাল

কলকাতার মাঠে অসমাপ্ত প্রথম বিভাগের ফুটবল লীগ এবং আই এফ এ শীল্ড খেলা নিয়ে রীতিমত রং তামাসা চলছে। আই এফ এ কর্তৃক নির্দিষ্ট খেলার তালিকা অনুযায়ী খেলা হচ্ছে না—কখনও একপক্ষ গরহাজির কখনও দু' দলই। ব্যাপারটা রং তামাসা ছাড়া আর কি হতে পারে।

চিঠিপত্র

২২শে শ্রাবণের ডায়েরী

গত ২০শে শ্রাবণ (১৩৭৮) 'অমৃতে' প্রবোধকুমার সান্যালের '২২শে শ্রাবণের ডায়েরী' পড়ে স্তম্ভিত ও বিস্ময়ে হতবাক হয়েছি। এমন কলঙ্কজনক ও মর্মান্তিক ঘটনা শুধু মনে হয় আমাদের দেশেই সম্ভব-পর। লেখকের বক্তব্য পড়ে এই ধারণাই দৃঢ় হয় যে, কবিগুরুর মহাযাত্রার সময়েও শ্মশানে তাঁর অগণিত ভক্ত, বন্ধু ও আত্মীয়-স্বজন ও বিশ্বভারতীর কর্মিবৃন্দ সকলেই নিজেদের গভীর দায়িত্ব সম্পূর্ণ উপেক্ষা ও অবহেলা করেছেন। এমন লজ্জাজনক ব্যাপারে আমাদের মাথা আজও হেঁট হয়ে আছে ও সমগ্র দেশের কাছে আমরা আজও অপরাধী হয়ে আছি। আমরা যারা বাংলার বাইরে থাকি পত্র-পত্রিকাদি থেকে শুধুমাত্র এইটুকু সংবাদ পেয়েছিলাম যে, কবিপুত্র রথীন্দ্রনাথ পিতৃশোকে নিতান্ত অভিভূত হয়ে তাঁর শেষ কর্তব্য সম্পাদন করতে পারেন নি। সেজন্য শ্রীসুধীরেন্দ্রনাথ ঠাকুরের উপর এ দায়িত্ব অর্পণ করা হয়। তবে পরিতাপের বিষয় যে, শ্রীপ্রবোধকুমার সান্যাল গত ৩০ বছর এ ব্যাপারে সম্পূর্ণ নীরব থেকে এত দিন পর তাঁর 'ডায়েরী' দেশের কাছে প্রকাশ করেছেন। যাঁদের সম্বন্ধে এ ব্যাপারে আমাদের প্রধান অভি-যোগ তাঁরা প্রায় সকলেই পৃথিবী থেকে বিদায় নিয়েছেন। মনে হয় এ সম্বন্ধে আরো আলোচনার প্রয়োজন।

মালতী সেন
মডেল টাউন, জলন্ধর

পুকুর চুরি

একটি নিবন্ধ সহসা চোখে পড়াতে কিঞ্চিৎ সন্দেহ হোল। অমৃতে প্রকাশিত নিবন্ধটির নাম—সাহিত্যে নতুন চিন্তা লেখক—শ্রীঅনন্য সেন। লেখাটি ১৯৭১ সালের ১৫ জানুয়ারীর শুক্রবারের সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছে।

সাহিত্যে যে পরিবর্তন আসছে আঙ্গিকে, অলংকরণে, বিষয়বস্তুতে বুশ সাহিত্যের অধুনা গতিপ্রকৃতির নিরিখে তা তুলে ধরা হয়েছে। এতে আমাদের আপত্তি থাকার কথা নয়। কিন্তু লেখক নিবন্ধ রচনায় (?) যে চরম অসাধুতার আশ্রয় নিয়েছেন তাতে আপত্তি বা পাঠক-বর্গের দৃষ্টি আকর্ষণ না করে পারছি না।

লেখক নামকরণ বদল করে, সংগৃহীত কয়েকটি নিবন্ধ হতে গ্রহণ-বর্জন করে একটি নিবন্ধের রূপ দেবার অপচেষ্টা করে-ছেন। আসলে সোভিয়েত রাশিয়ার কল-কাতাস্থিত কনসুলেট হতে পাঠান সাহিত্য-বিষয়ক তিনটি নিবন্ধের এটি হোল বিকৃত রূপ।

সোভিয়েত কনসুলেট হতে পাঠান (প্রথম বর্ষ : সংখ্যা ৩১/আগষ্ট ১৭-১৯৭০) 'শিল্পী, জীবন, সমাজতন্ত্র' ও 'কাব্য ও কাব্যেতর রচনা' (প্রথম বর্ষ : সংখ্যা ২৪/জুলাই ২৭, ১৯৭০) নিবন্ধ দুটির মাত্র কয়েকটি স্তবক বাদ দিয়ে হুবহু নকল করেছেন। এ ছাড়া উক্ত কনসুলেট হতে পাঠান ১৯৭০ সালের ৩০ নভেম্বরের এভগেনি দুভোলোনিকভ-এর বিশেষ নিবন্ধ 'সোভিয়েতের লেখক ও সোভিয়েত লেখক ইউনিয়ন' হতে দুটি স্তবক উদ্ধৃতিচিহ্ন না দিয়ে নিজের রচনার মধ্যে চালিয়ে দিয়েছেন। সমগ্র নিবন্ধে লেখকের (?) প্রথম লাইন ছাড়া আর দ্বিতীয় লাইনটি তার নিজের লেখা নয়। এ ধরনের পুকুরচুরি সম্পর্কে সতর্ক হওয়া সম্পাদকের পক্ষে যদিও সাধ্যাতীত তবুও রচনাটি সম্পর্কে সম্পাদককে অবগত করছি।

—সাজেদুল হক
কলকাতা—১৬

সংগীত সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ

বাংলা ভাষায় প্রকাশিত মুষ্টিমেয় সাপ্তাহিক পত্রিকাগুলির মধ্যে নিশ্চয়ই আপনার সম্পাদিত 'অমৃত' বৈশিষ্ট্যের দাবী রাখে। এবারেও যথারীতি অমৃতের বিশেষ সংখ্যা যা পুজোর সংখ্যা হিসাবে পরিচিত, প্রকাশিত হয়েছে। প্রতিবারের মত এবারেও আপনার সম্পাদিত এই সংখ্যাটি আকর্ষণীয় সন্দেহ নেই, তবু একটি প্রবন্ধ যা 'বিশেষ রচনা' 'আকর্ষণীয় প্রবন্ধ' হিসাবে বার বার বিজ্ঞাপিত হয়েছিল সেই 'সংগীত সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ' প্রবন্ধটি সম্বন্ধে আমার কিছু নিবেদন আছে।

আজ থেকে ৫২ বছর আগে ১৩২৪ সালের ভাদ্র মাসের 'সবুজপত্রে' ঐ প্রবন্ধটি প্রথম প্রকাশিত হয়। প্রবন্ধটি ঐ সময় পরিবর্ধিত ও পরিমার্জিত আকারেও ছিল। এর পরে পশ্চিমবঙ্গ সরকার কর্তৃক প্রকাশিত 'রবীন্দ্ররচনাবলীর' চতুর্দশ খণ্ডে (জন্মশতবার্ষিক সংস্করণ) ঐ প্রবন্ধটি স্থান পায়। 'সংগীতের মুক্তি' শীর্ষক নামে (পৃষ্ঠা ৮৯২) ঐ প্রবন্ধটি তখন প্রকাশিত হয়েছিল।

অমৃতের পুজো সংখ্যায় প্রকাশিত 'সংগীত সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ' শীর্ষক প্রবন্ধটি যে পুনর্মুদ্রিত একটি রচনা সে সম্পর্কে কিন্তু কোন সময় কোথাও বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হয় নি। এমন কি প্রবন্ধটির শেষেও সাধারণ-রীতি অনুযায়ী এ সম্পর্কে কিছু [illegible] হয় নি। ফলে সাধারণ পাঠকের পক্ষে বিভ্রান্তির প্রচুর অবকাশ রয়ে গেছে। যাই হোক এ সম্বন্ধে আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। *

সুবীর রায়চৌধুরী
বারুইপুর

* রবীন্দ্রনাথের সংগীতসম্বন্ধীয় রচনার দুষ্প্রাপ্য পাণ্ডুলিপিটি সম্প্রতি আবিষ্কৃত হয়েছে। রবীন্দ্রনাথের স্বহস্ত লিখিত উক্ত পাণ্ডুলিপির প্রতিলিপি প্রকাশের উপরেই আমরা জোর দিয়েছি এবং একথা নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, এটি একটি আকর্ষণীয় বিষয়। রচনাটি কোন সময় অপ্রকাশিত হিসাবে বিজ্ঞাপিত হয় নি; তবে রচনাটির পূর্ব-ইতিহাস সম্পর্কিত মন্তব্যটুকু রচনার শেষে উল্লেখ করা উচিত ছিল—এই ত্রুটির জন্য আমরা দুঃখিত।

—অঃ সঃ

শিল্পী অবনীন্দ্রনাথ

ভূদেব চৌধুরী লিখিত 'শিল্পী অবনীন্দ্রনাথ' নিবন্ধটির ১০০ পৃঃ শেষ প্যারায় (দ্বিতীয় কলম) '১৮৫৮ খৃঃ হিমালয় থেকে মহর্ষি যেদিন কলকাতায় ফিরে আসেন ঐ বছরেই মহর্ষির কনিষ্ঠ ভ্রাতা নগেন্দ্রনাথ অবিবাহিত থেকে লোকান্তরিত হন।' এই তথ্যটি ভুল। নগেন্দ্র-নাথ বিবাহিত ছিলেন তবে তিনি ছিলেন অপুত্রক। '৫৮ সালের পূর্বে দেবেন্দ্রনাথ তাঁর দুই অনুজের সঙ্গে একত্রে ব্রাহ্মধর্মে দীক্ষা নিয়েছিলেন। বাড়ীতে পৌত্তলিক পুজো ও ধর্মানুষ্ঠান বজায় ছিল ১৮৫৮ সাল পর্যন্ত, কেবল গিরীন্দ্র-পত্নী বিধবা যোগমায়া দেবী ৫নং গৃহে উঠে আসার সময় নীলমণি ঠাকুরের কুলদেবতা লক্ষ্মী-নারায়ণকে নিয়ে আসেন।

পিতৃপুরুষের সেই কুলদেবতা অদ্যাবধি আমার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা অলোকেন্দ্রনাথের গৃহে ত্রিসন্ধ্যা যথারীতি সেবা পুজো ও ভোগ পেয়ে আসছেন।

তরুণেন্দ্রনাথ ঠাকুর
পীতাম্বর ভট্টাচার্য লেন,
কলকাতা—৯।

কাশ্মীর, শ্যামাপ্রসাদ, আবদুল্লা প্রসঙ্গে

'কাশ্মীর, শ্যামাপ্রসাদ, আবদুল্লা' সম্পর্কে যুক্তরাজ্য এসেক্সের শ্রীহিরন্ময় ভট্টাচার্যকে তাঁর চিঠির জন্য ধন্যবাদ। তিনি

যেটাকে 'ভুল' বলেছেন, বুঝতে পারছি, ওটা বাক্য-বিন্যাসের 'ভুলে' তথ্যগত ভুল মনে হতে পারে। প্রকৃত কথাটা হচ্ছে, কাশ্মীর মঞ্চে এ'রা বা তৎকালীন নায়কেরা সবাই অনুপস্থিত; কাশ্মীর রাষ্ট্রপুঞ্জে, শেখ আবদুল্লা বহিষ্কৃত। মৃতের মধ্যে শ্যামাপ্রসাদ, নেহরু, কৈলাসনাথ; এবং অনুপস্থিতির তালিকায় মৃত ও অ-মৃত থাকায় পাঠক যে ভুল বুঝতে পারেন তার প্রমাণ হিরন্ময়বাবু। বাক্য-বিন্যাসের এ ভুল আমি স্বীকার করছি। লর্ড মাউন্টব্যাটেন (লেডী নন) জীবিত তা কিন্তু আমার অজানা ছিল না। নেহরু সম্পর্কে তিনি এক বক্তৃতামালাও দিয়েছিলেন; তা আমি অন্যত্র উদ্ধৃত করেছি।

সত্যোদ্ঘাটন শুধু নির্মম নয়, শাসকপক্ষ স্বার্থসংশ্লিষ্ট থাকলে তা অসম্ভব। অমৃত-বাজার পত্রিকার পুরানো ফাইল থেকে সংকলিত বহু উপকরণের একাংশ মাত্র দিয়েছি। হিরন্ময়বাবু কাশ্মীর-আবদুল্লা-নেহরু সম্পর্কে আরও চমকপ্রদ খবর পাবেন লিওনার্ড মসলের দি লাস্ট ডেজ অব দি ব্রিটিশ রাজ, বলরাজ মাধোকের ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি, লেঃ জেনাঃ বি এস কলের দি আনটোল্ড স্টোরীতে এবং সমসাময়িক পত্র-পত্রিকায়; যা দুরধিগম্য তা হচ্ছে সরকারী মহাফেজখানা—ভারতের এবং কাশ্মীরের। হ্যাঁ, ক্যাম্বেল-জনসনের মিশন উইথ মাউন্টব্যাটেনেও অনেক খবর পাবেন। শ্যামাপ্রসাদ কাশ্মীরে বন্দীদশায় কলহনের রাজতরঙ্গিনী পড়তেন। অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ; 'নয়া রাজতরঙ্গিনী'তেও শ্যামাপ্রসাদের একটা শোচনীয় ভূমিকা থেকে গেছে।

পুলকেশ দেসরকার

বৈজিকতত্ত্ব প্রসঙ্গে

অমৃত পত্রিকার ২৮শে আশ্বিন, ১৩৭৮ তারিখে প্রকাশিত সংখ্যায় ৭৩৮-৭৪০ পৃষ্ঠায় অমৃতসূদন ভট্টাচার্য সংকলিত সঞ্জীবচন্দ্রের 'বৈজিকতত্ত্ব প্রবন্ধটি পড়লাম। এই প্রবন্ধে উল্লিখিত হয়েছে—'স্বগোত্রে বিবাহ করা আমাদের নিষেধ আছে সত্য, কিন্তু তাহা পিতৃগোত্র সম্বন্ধে; মাতৃগোত্র সম্বন্ধে বিশেষ নিষেধ নাই।' (৭৪০ পৃষ্ঠায়)

এই সম্পর্কে বিশ্ববরেণ্য ভারতীয় দার্শনিক ডকটর সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণন তাঁর Religion And Society গ্রন্থে লিখেছেন:

> 'Sanskara Kaustubha says that the great Manu, Parasara, Angirasa, and Yama permit marriages among descendents of the third degree on both mother's side and the father's side':

এই প্রসঙ্গে উক্ত গ্রন্থের ১৭২ পৃষ্ঠার পাদটীকা দ্রষ্টব্য:

> 'তৃতীয়ম্ মাতৃতঃ কন্যাম্ তৃতীয়ম্
> পিতৃতস্ তথা
> বিবাহেৎ মনুঃ প্রাহ পরাশরয়োঽঙ্গীরায়মঃ।
> —সংস্কার কৌস্তুভ।।

ভারতের ইতিহাসে ঐ বিধানের ব্যতিক্রম অনেক ক্ষেত্রে ঘটেছে একথা সত্য, কিন্তু সে যুগের শাস্ত্রকারদের দৃষ্টিতেও এই সাবধানতার প্রয়োজনীয়তা ধরা পড়েছিল। সুতরাং মাতৃগোত্র সম্বন্ধে নিষেধের বিধান দেওয়ার কৃতিত্ব অধুনা যুগের বিজ্ঞানীদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ করলে সত্যের অপলাপ হবে।

সংস্কার কৌস্তুভের মূল শ্লোকটি পাঠকদের ভারতীয় শাস্ত্রকারদের দূরদৃষ্টির যথার্থ মূল্যায়ন করতে সাহায্য করবে—এই আশায় বিষয়টি পাঠকদের জ্ঞাতার্থে পাঠালাম।

সুহৃদগোপাল দত্ত
কলকাতা—৩

জলসায় পরিবেশিত সংবাদ প্রসঙ্গে

৭ই আশ্বিনের অমৃতে জলসা বিভাগে ৬২৮ পৃষ্ঠায় তৃতীয় কলমে বেগম আখতারের দুখানি গানের 'কথা ও সুর রবি গুহর' এই ভুল মুদ্রণ সংশোধন করলে বাধিত হব। আমার নাম রবি গুহমজুমদার থেকে 'মজুমদার' বর্জন করবার কোনো বিশেষ কারণ ছিল কি?

রবি গুহমজুমদার

(২)

'ভারতী রেকর্ড কোম্পানীর পুজোর গান' শিরোনামায় আপনাদের সংবাদ পরিবেশনায় যে সমস্ত ভুল তথ্য দিয়েছেন তার প্রতি আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। খ্যাতনামা এবং বহুল প্রচারিত গানের দুজন শিল্পী 'বিজন শেঠ' এবং 'মানসকুমারের' নাম আপনার তালিকায় কেন অন্তর্ভুক্ত হল না সে প্রশ্নে না গিয়ে আপনাদের ভুল সংশোধন করে নেবার জন্য অনুরোধ করি। শিল্পী বিজন শেঠ স্বরচিত বাণী এবং সুরে ও জগন্নাথ ধরের সুরে দুটি গান রেকর্ড করেছেন এবং শিল্পী মানসকুমার শ্রীলক্ষ্মীকান্ত রায় এবং শ্রীহিমাংশু বিশ্বাসের সুরে গেয়েছেন দুটি গান, যেগুলো ভারতী কোম্পানীর গানগুলির মধ্যে শ্রেষ্ঠত্বের দাবী রাখে। সুভাষ পালের গীটারের রেকর্ড প্রসঙ্গও অনুল্লেখ্য রয়ে গেছে।

ইরা সিনহা
স্বপ্না মুখার্জী
শিপ্রা গাঙ্গুলী
দিলীপ চ্যাটার্জী
বনহুগলী হাসপাতাল
বনহুগলী, কলিকাতা—৩৫

জলসায় পরিবেশিত সংবাদ প্রসঙ্গে

চিঠির উত্তরে

৭ই আশ্বিনের অমৃতের জলসা বিভাগে (৬২৮ পৃষ্ঠায়) রবি গুহমজুমদারের জায়গায় রবি গুহ মুদ্রিত হওয়ার জন্য আমরা দুঃখিত। ত্রুটি প্রদর্শনের জন্য পত্রলেখক শ্রীগুহমজুমদার ধন্যবাদার্হ।

(২)

"ভারতী রেকর্ড কোম্পানী"র যে কখানি রেকর্ড সমালোচনার জন্য আমাদের হাতে এসেছিল ঠিক সেই কখানি রেকর্ড নিয়েই আলোচনা করা হয়েছে।

—চিত্রাঙ্গদা

একটি সংশোধন

আপনাদের ৩রা ভাদ্রের 'অমৃতে' শ্রীমণি দাসের 'বয় চিরকাল বয়ই রয়' রচনাটি সম্পর্কে জানাইতেছি যে, কবিতার লাইনটি 'বয় চিরকাল বয়ই থাকে' হবে এবং লেখক বুদ্ধদেব বসু নন, রামেন্দু দত্ত। শেষের শব্দটি পরিবর্তিত করা সংগত হয়েছে কি? এই সংশোধনটি আপনাদের বহুল প্রচারিত পত্রিকায় প্রকাশিত হলে বাধিত হব।

কল্যাণ দত্ত
আগরতলা, ত্রিপুরা

অমৃত পাবলিশার্স প্রাইভেট লিঃ-এর পক্ষে শ্রীসুপ্রিয় সরকার কর্তৃক পত্রিকা প্রেস, ১৪, আনন্দ চ্যাটার্জি লেন, কলিকাতা-৩ হইতে মুদ্রিত ও তৎকর্তৃক ১১।১, আনন্দ চ্যাটার্জি লেন, কলিকাতা—৩ হইতে প্রকাশিত।

১১শ বর্ষ
২য় খণ্ড

অমৃত

২৬ সংখ্যা
মূল্য
৫০ পয়সা

Friday 5th November, 1971. শুক্রবার, ১৮ই কার্তিক, ১৩৭৮ 50 Paise

সূচীপত্র

প্রচ্ছদ : শ্রীপ্রদীপ দাশ

নিয়মাবলী

বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

লেখকদের প্রতি

১। অমৃতে প্রকাশের জন্যে প্রেরিত সমস্ত রচনার নকল রেখে পাঠাবেন। মনোনীত রচনার খবর দু-মাসের মধ্যে জানান হয়। অমনোনীত রচনা কোনক্রমেই ফেরৎ পাঠান সম্ভব নয়। লেখার সঙ্গে কোন ডাকটিকিট পাঠাবেন না।

২। প্রেরিত রচনা কাগজের এক পৃষ্ঠায় স্পষ্টাক্ষরে লিখিত হওয়া আবশ্যক। অস্পষ্ট ও দুর্বোধ্য হস্তাক্ষরে লেখা প্রকাশের জন্যে গৃহীত হয় না।

৩। রচনার সঙ্গে লেখকের নাম ও ঠিকানা না থাকলে 'অমৃতে' প্রকাশের জন্যে গৃহীত হয় না।

এজেন্টদের প্রতি

এজেন্সীর নিয়মাবলী এবং সে সম্পর্কিত অন্যান্য জ্ঞাতব্য তথ্য 'অমৃত' কার্যালয়ে পত্র দ্বারা জ্ঞাতব্য।

গ্রাহকদের প্রতি

১। গ্রাহকের ঠিকানা পরিবর্তনের জন্যে অন্তত ১৫ দিন আগে 'অমৃত' কার্যালয়ে সংবাদ দেওয়া আবশ্যক।

২। ভি-পি'তে পত্রিকা পাঠানো হয় না। গ্রাহকের চাঁদা নিম্নলিখিত হারে মণিঅর্ডারযোগে 'অমৃত' কার্যালয়ে পাঠানো আবশ্যক।

চাঁদার হার

	কলিকাতা	মফঃস্বল
বার্ষিক	টাকা ২৫·০০	টাকা ৩০·০০
ষাণ্মাসিক	টাকা ১২·৫০	টাকা ১৫·৫০
ত্রৈমাসিক	টাকা ৬·২৫	টাকা ৮·০০

'অমৃত' কার্যালয়

১১/১ আনন্দ চ্যাটার্জি লেন,

কলিকাতা—৩

ফোন : ৫৫-৫২৩১ (১৪ লাইন)

এক নজরে

শিক্ষায় নারী প্রগতি :

বিগত দশকের লোকগণনার বিভিন্ন বিষয়সম্পর্কিত যেসব রিপোর্ট সম্প্রতি প্রকাশ পাচ্ছে তাতে দেখা যাচ্ছে যে, '৬১ সাল থেকে গত দশ বছরে পশ্চিমবঙ্গে নারীশিক্ষার ব্যাপারে, পুরুষের তুলনায়, বিশেষ উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি ঘটেছে। পশ্চিমবঙ্গে এক দশকের ব্যবধানে লোকবৃদ্ধি ঘটেছে ৩ কোটি ৪৯ লক্ষ থেকে ৪ কোটি ৪৪ লক্ষ, অর্থাৎ ২৭ দশমিক ২৪ শতাংশ। এবার শিক্ষিতের সংজ্ঞাও পূর্বের তুলনায় কিছুটা সংকীর্ণ করা হয়েছে। আগে নাম সইয় বিদ্যাই শিক্ষার ন্যূনতম শর্ত ছিল. কিন্তু এবারের লোকগণনায় শিক্ষার সংজ্ঞা নির্দিষ্ট হয় যে কোন ভাষায় একটি চিঠি লেখার ও পড়ার সামর্থ্য। তবু '৬১-'৭১ দশকে এই রাজ্যে শিক্ষিত নারীর সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে, পূর্বের দশকের তুলনায় ৩০ দশমিক ১৯ শতাংশ, যে জায়গায় শিক্ষিত পুরুষের সংখ্যা বেড়েছে মাত্র ৬ দশমিক ৮৯ শতাংশ। এক দশকের ব্যবধানে একটি রাজ্যের প্রায় এক-তৃতীয়াংশ নারীর চিঠি লেখার ও পড়ার বিদ্যার্জন একটি অনগ্রসর দেশের পক্ষে খুব সামান্য কথা নয়।

নারী শিক্ষার ব্যাপারে সর্বাধিক অগ্রগতি ঘটেছে চব্বিশ পরগণা, বর্ধমান ও দার্জিলিং জেলায়—এই তিন জেলায় নারী শিক্ষিতের সংখ্যা ২০ শতাংশেরও বেশি বৃদ্ধি পেয়েছে। মেদিনীপুর জেলা অল্পের জন্য ২০ শতাংশ অগ্রগতির লক্ষ্য স্পর্শ করতে পারে নি। বাঁকুড়ার মতো অনগ্রসর জেলাতেও নারী শিক্ষা বৃদ্ধি পেয়েছে ১৩ দশমিক ৮৭ শতাংশ। পশ্চিম দিনাজপুর, মুর্শিদাবাদ, জলপাইগুড়ি ও বীরভূম জেলায় অগ্রগতির হার ১১ থেকে ১৬ শতাংশের মধ্যে। পুরুলিয়ায় ৮ দশমিক ১৮ শতাংশ। এবার পশ্চিমবঙ্গের একমাত্র কোচবিহার জেলায় শিক্ষিতের হার পূর্বের দশকের তুলনায় হ্রাস পেয়েছে, কিন্তু সেখানেও নারী শিক্ষা বৃদ্ধি পেয়েছে ২ শতাংশ।

কিন্তু সবচেয়ে অবাক করেছে কলকাতা। এখানে এক দশকের ব্যবধানে শিক্ষিতের সার্বিক হার বৃদ্ধি পেয়েছে মাত্র ১ দশমিক ৮ শতাংশ। শিক্ষিত পুরুষের সংখ্যা বেড়েছে এক শতাংশেরও কম। তবু নারী মুখরক্ষা করেছে শিক্ষিতের হার চার শতাংশ বৃদ্ধি করে। বিভিন্ন প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় ছেলেদের তুলনায় মেয়েদের প্রাধান্য আজ সুপ্রতিষ্ঠিত। কিন্তু নাম সইয় বিদ্যেটুকু অর্জনেও পুরুষের ক্রমবর্ধিষ্ণু অনীহা অবশ্যই ভাববার বিষয়।

মড়ার বেশী দাম : মরা হাতির লাখ টাকা দাম যে বলা হয় সেটা তার অতি মূল্যবান দাঁতদুটির কথা ভেবে। কিন্তু মানুষের ক্ষেত্রেও যে কোনদিন জিন্দার চেয়ে মড়ার দাম বেশি হবে এটা বোধহয় অতি বড় ভবিষ্যৎ দ্রষ্টাও কোনদিন চিন্তা করতে পারেনি। এক সাম্প্রতিক সংবাদে প্রকাশ, রানাঘাটের অদূরে তিন ব্যক্তি এক পুরুষ ও একটি নারীকে খুন করে তাদের খুলি ও কঙ্কাল মেডিক্যাল ছাত্রদের কাছে বিক্রয়ের উদ্দেশ্যে। ধৃত ব্যক্তিদের মধ্যে একজন কলকাতার একটি হাসপাতালে আগে ডোম হিসাবে কাজ করত এবং সে সময় সে যাদবপুর অঞ্চলে আর এক ব্যক্তিকে খুন করে তার কঙ্কালটি ১০৫ টাকা দামে বিক্রি করে। সংবাদে প্রকাশ, উল্লেখিত দুই নিহত নরনারীকে হত্যাকারীরা চাকরির লোভ দেখিয়ে শিয়ালদা স্টেশন থেকে নিয়ে যায়।

এই হতভাগ্য দেশে মানুষের কোন দাম না থাকলেও মানুষের কঙ্কালের এখন জোর চাহিদা। তাই ঘাতকরা শিকারের সন্ধানে যত্রতত্র ঘুরে বেড়াচ্ছে।

অপরাধ ও শাস্তি : কেরল রাজ্যের এই সংবাদটিও কম বীভৎস নয়। কুইলনের জেলা ও দায়রা জজ এক গৃহশিক্ষককে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করেছেন দুটি কলেজের ছাত্রীকে হত্যার অপরাধে। অভিযোগ, উক্ত গৃহশিক্ষক ছাত্রী দুটির গৃহশিক্ষকতা কালে তাদের সঙ্গে অবৈধপ্রণয়ে লিপ্ত হয় যার ফলে একটি ছাত্রী অচিরে অন্তঃসত্ত্বা হয়ে পড়ে। কিন্তু গর্ভপাতের চেষ্টা ব্যর্থ হলে গৃহশিক্ষকটি ঐ ছাত্রীটিকে বিষ দিয়ে হত্যা করে এবং কথা জানাজানি হওয়ার ভয়ে অপর ছাত্রীটিকেও একইভাবে হত্যা করে। বিচারপতি তাঁর রায়ে বলেছেন, শুধু নিজের মান রক্ষা করতে যে ব্যক্তি ঠান্ডা মাথায় দুটি অসহায় বালিকাকে হত্যা করতে পারে তার শাস্তি শুধু কঠোর নয়, এমন নিবর্তনমূলক (ডেটারেন্ট) হওয়া দরকার যাতে ভবিষ্যতে একই ধরনের অপরাধ কেউ করতে সাহস না পায়।

অপরাধ কঠিন এবং তার শাস্তিও নিঃসন্দেহে কঠোর হওয়া দরকার। কিন্তু প্রাণদণ্ডের বিরোধী যাঁরা, তাঁরা প্রশ্ন তুলবেন, দুটি জীবনের শোচনীয় অপচয় কি আর একটি জীবনের বিনিময়ে পূরণ হবে? না, এই অবাধ মেলামেশার যুগে এ ধরনের ঘটনা এরপর আর ঘটবে না? আর চরম অসম্মান ও অমর্যাদার আশংকায় মানুষ যা করে তা অগ্রপশ্চাত বিবেচনা না করে বেপরোয়া হয়েই করে, তাকে কোনমতেই ঠান্ডা মাথায় অপরাধ বলে অভিহিত করা যায় না। তার চেয়ে যদি ঐ অপরাধীকে বিশ বছর বন্দী করে রাখা হত, আর অনুশোচনার আগুনে নিয়ত দগ্ধ হত তার শিক্ষিত মন তাহলে হয়ত তাপদগ্ধ খাঁটি সোনার মতোই একটি খাঁটি মানুষকে বিশ বছর বাদে এই সমাজ ফিরে পেতো। কারাগারে বন্দী অবস্থায় এমন কোন সাহিত্য হয়ত সে সৃষ্টি করত, যা মৃত্যুঘরে দশ বছর বন্দী থাকা মার্কিন অপরাধী সিরিল চেসম্যানের সাহিত্যসৃষ্টির মতোই অবিনশ্বর হয়ে থাকত। উল্লেখিত অপরাধীর গলায় ফাঁসির দড়ি টেনে দিলে সেসব সম্ভাবনাই সুনিশ্চিতভাবে লোপ পাবে, অথচ ঐ মৃত্যুর ফলে একই ধরনের অপরাধ আর কেউ করবে না, এমন সুনিশ্চিত প্রতিশ্রুতি নিশ্চয়ই কেউ দিতে পারবেন না।

মারাত্মক বিজ্ঞাপন :

খবরটি হল্যান্ডের। এক প্রেমিক তার প্রণয়িনী অন্তঃসত্ত্বা হওয়ার পর গা ঢাকা দেয়। প্রণয়িনীটি তখন তার শোধ নেয় এক অভিনব উপায়ে। সন্তান প্রসূত হওয়ার পর কাগজে বিজ্ঞাপন দিয়ে সে জানায় : মার্তজে উয়েরহান্ড জানাচ্ছে যে তার গর্ভজাত জন ডেকারের কন্যা ও ফ্রেড এবং উইলনি ডেকারের পৌত্রী ভালই আছে, যদিও তাঁদের কন্যা বা পৌত্রীর জন্য উল্লেখিত তিন ব্যক্তির কোন মাথাব্যথা নেই।

বিজ্ঞাপন পড়ে অগ্নিশর্মা ফ্রেড ডেকার তখনই ছেলেকে ডেকে বলেন : তোর জন্যে সমাজে মুখ দেখাতে পারব না, এখনই তুই যা হয় একটা কর, না হয় বেরিয়ে যা বাড়ি থেকে।

অনুতপ্ত পুত্র তখনই মার্তজের কাছে ছুটে যায়। কিন্তু মার্তজে তাকে ফিরিয়ে দেয় কয়েকদিন দেরি হয়ে গেছে বলে।

২৮।১০।৭১ —প্রত্যক্ষদর্শী

সম্পাদকীয়

ভ্রম সংশোধন

অবশেষে ২৬শে অকটোবর তারিখে লোকতন্ত্রী চীন রাষ্ট্রসঙ্ঘে সদস্য হিসাবে গৃহীত হল। নকল-চীন বা তাইওয়ানকে বিদায় নিতে হল। বিভিন্ন রাষ্ট্রের যেসব প্রতিনিধি চীনের এই ন্যায্য দাবী সমর্থন করেছেন, তাঁরা নৃত্য করেছেন, টেবিল বাজিয়েছেন, গান গেয়েছেন। এই আনন্দ সংবাদ অভিনন্দনে এই ছিল তাঁদের স্বতঃস্ফূর্ত অভিব্যক্তি। সংবাদে প্রকাশ যে, হোয়াইট হাউস ইউ-এন জেনারেল এসেম্বলীতে আলবেনিয়ার প্রস্তাব গৃহীত হওয়ার পর যে আনন্দ-হুল্লোড় দেখা গেছে তা এক "Shocking Spectacle" বলেছে। প্রেস সেক্রেটারি মিঃ রোনাল্ড জাইগলার টেলিভিশনে প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার সময় বলেছেন, 'এ হল যুক্তরাষ্ট্রের নীতির প্রতি ব্যক্তিগত বিদ্বেষ প্রকাশ'—আলবেনিয়ার প্রস্তাব দুই-তৃতীয়াংশেরও অধিক ভোট পাবে এ ছিল যুক্তরাষ্ট্রের পক্ষে ধারণাতীত। তাই তাঁরা ক্ষোভে, দুঃখে, অপমানে জর্জরিত হয়ে ভাবছেন : (১) যুক্তরাষ্ট্র রাষ্ট্রপুঞ্জের সদস্যপদ ত্যাগ করবে, (২) রাষ্ট্রপুঞ্জকে প্রায় অর্ধেক মূলধন দান করেছে যুক্তরাষ্ট্র, এখন উপযুক্ত ব্যবস্থা হিসাবে রাষ্ট্রপুঞ্জকে সবরকম সাহায্যদান বন্ধ করা হোক এবং যুক্তরাষ্ট্রের মাটি থেকে রাষ্ট্রপুঞ্জকে উৎখাত করা হোক — (কংগ্রেসম্যান রোনালড সাইকসের উক্তি)। জন রারিক নামক আরেকজন ডেমোক্র্যাট কংগ্রেসম্যান বলেছেন, এটা অতি দুঃখের বিষয় সদস্যরা ভোট দিয়ে রাষ্ট্রপুঞ্জের সদর দফতর যে বিল্ডিং-এ স্থানান্তর করার ব্যবস্থা করেন নি। এছাড়া কেউ কেউ অর্থসাহায্য হ্রাস করার পরামর্শ দিয়েছেন। মোট কথা যুক্তরাষ্ট্র প্রচন্ডভাবে অপমানিত বোধ করছেন। এই অপমান তাঁদের প্রাপ্য ছিল। আর্থিক সমৃদ্ধি বর্তমান যুক্তরাষ্ট্রের শাসকগোষ্ঠীকে অহমিকায় আচ্ছন্ন করেছে, তাঁদের ধারণা ছিল টাকায় সব হয়, মুক্তহস্তে সর্বত্র টাকা ছড়ালেই বিশ্বের বিবেককে ট্যাঁকে গুঁজে রাখা যাবে। কার্যক্ষেত্রে দেখা গেল তাঁদের সব কৌশলই বিফল হল। আশাহতের অভিমান বড়ই তীব্র হয়, যুক্তরাষ্ট্রও আজ অভিমানে ফেটে পড়ছে। নিষ্ফল আক্রোশে তাই যাঁর যা মনে আসছে বলছেন।

লোকতন্ত্রী চীনের রাষ্ট্রপুঞ্জে এই ঐতিহাসিক প্রবেশ এক স্মরণীয় ঘটনা। তেইশ বছর ধরে যে অন্যায়কে সকলে মেনে নিয়ে চোখ বুজিয়ে ছিলেন আজ সেই ত্রুটির সংস্কার হল, এক বিরাট ভ্রম-সংশোধন করা হল। বিলম্বে হলেও এই ব্যবস্থা অতিশয় ন্যায়সঙ্গত এবং উপযুক্ত হয়েছে একথা শুভবুদ্ধিসম্পন্ন সকল শ্রেণীর মানুষই স্বীকার করবেন। চীনকে গ্রহণ করার ফলে রাষ্ট্রপুঞ্জ এতদিনে যথেষ্ট শক্তিশালী হলেন এবং রাষ্ট্রপুঞ্জের গুরুত্ব বৃদ্ধি পেল। এতকাল রাষ্ট্রপুঞ্জে লোকতন্ত্রী চীনের সাতশ মিলিয়ন মানুষের প্রতিনিধিত্ব না থাকায় রাষ্ট্রপুঞ্জের অঙ্গহানি ঘটেছিল। চীন দেশের সঙ্গে মিতালী পাকা করার জন্য নিকসনী শাসকচক্র এত আগ্রহশীল হওয়া সত্ত্বেও তাইওয়ানকে আঁকড়ে ধরে রাখার এই হাস্যকর প্রচেষ্টা খানিকটা হেঁয়ালির মত ঠেকে। যদিও বলা হয়েছে তাইওয়ানকে বহিষ্কৃত করা হল, তথাপি বলা যায় এর নাম বহিষ্কার নয়, ভূয়া দাবীদারকে সরিয়ে দিয়ে তার আসনে ন্যায়সঙ্গত অধিকারীকে বসানোর সিদ্ধান্ত যা নাকি একমাত্র স্বাভাবিক ব্যবস্থা। আমেরিকার অন্তরঙ্গ গোষ্ঠীর মধ্যে অনেকগুলি রাষ্ট্র এই বিভ্রান্তিকর অবস্থার কৌতুককর দিকটি উপলব্ধি করেই আলবেনিয়ার প্রস্তাবটি সমর্থন করেছেন, এই একটি দিক বিবেচনা করলে যুক্তরাষ্ট্র স্বস্তিলাভ করতে পারেন। এদিকে রাষ্ট্রসঙ্ঘে লোকতন্ত্রী চীনের প্রতিষ্ঠার ফলে বিশ্বশান্তির সম্ভাবনা উজ্জ্বল হল। আসল-চীন অপর কোনও শক্তিশালী রাষ্ট্রের হাতের পুতুল হয়ে তাঁদের খেয়াল-খুশি মতো নড়া-চড়া করবে না। রাষ্ট্রপুঞ্জে লোকতন্ত্রী চীন তাঁর বিশ্বাস এবং ধারণা অনুযায়ী ভূমিকা পালনে ব্রতী হবে। এবং তার এই মহান ভূমিকা আগামী দিনের পৃথিবীর পক্ষে কল্যাণকর হবে এই বিশ্বাস অসঙ্গত নয়।

আলবেনিয়ার এই প্রস্তাব গৃহীত হওয়ার ফলে দুই-চীন নীতি অবশ্য সমাধিস্থ হল, কিন্তু তাইওয়ান নিয়ে মার্কিনী মাথাব্যথা হ্রাস পাবে কি? এই পটভূমিতে আগামী জানুয়ারীতে মার্কিন-চীন পিংপং খেলাটা কি রূপ নেবে সে বিষয়ে জল্পনার অন্ত নেই। নিকসন-চৌ আঁতাত কোন পথে চলবে বলা কঠিন। আমেরিকার সঙ্গে তাইওয়ানের যে সামরিক-চুক্তি আছে বা ফরমোজায় যে বিরাট মার্কিন নৌ-বহর আছে তার ভবিষ্যৎ কি,—এসব প্রশ্ন নিশ্চয়ই অচিরে মীমাংসিত হবে। মোট কথা অতঃপর যে খেলা শুরু হবে তা শুধু চিত্তাকর্ষক হবে না, সেই সঙ্গে একটু লোমহর্ষকও হতে পারে।

আমাদের প্রধানমন্ত্রী ভিয়েনা থেকে চৌ-এন-লাইকে অভিনন্দন জ্ঞাপন করেছেন। কয়েক ঘন্টা পরে ভোজসভায় চীনা রাষ্ট্রদূতও শ্রীমতী গান্ধীর প্রতি শিষ্টাচার প্রদর্শন করেছেন। তবে এসব নিছক রাজনৈতিক সৌজন্য বিনিময়ের ব্যাপার। কোনো বৃহত্তর সম্ভাবনার দ্বারা ভারত-চীন সম্পর্কের উন্নতি হবে কিনা তা এখনই ভবিষ্যৎবাণী করা কঠিন। তবে তেইশ বছরের এক দুঃখকর রাজনৈতিক ত্রুটি সংশোধিত হওয়ায় আন্তর্জাতিক আবহাওয়া যে অনেকখানি মেঘমুক্ত হয়েছে একথা নিঃসন্দেহে বলা যায়।

পটভূমি

অফিস-বাড়ি, ট্রাম-বাস, দোকান-বাজার সর্বত্রই শুনতে পাবেন একই হাহাকার : বাজার আগুন, সংসার চালাই কী করে! মাছ-তেল-ডাল তো বটেই, কাঁচা আনাজে পর্যন্ত হাত দিতে গেলে হাতে ওষুধ লাগাতে হচ্ছে! আগে শোনা যেত চালের দাম ঠিক থাকলে নাকি অন্যান্য জিনিসের দামও বাড়তে পারে না। শ্রাবণ-ভাদ্র-আশ্বিনে বরাবরই বাজার একটু চড়া থাকে। কিন্তু এবার চালের দাম যখন প্রায় একই রকম তখনও অন্যান্য সব জিনিসের দাম সাধারণ মানুষের নাগালের বাইরে। আর সেই নাগাল-ছাড়ানো দর দেখে মনে হচ্ছে অন্যান্য বছরের চড়া দামও যেন বেশ সস্তাই ছিল।

আর এই যে এমন একটা সমস্যা সে সম্পর্কে কিন্তু আমাদের পশ্চিমবাংলা সরকার ধ্যানমগ্ন ঋষির মতোই নির্বিকার। মনে পড়ছে, গত বছরের রাষ্ট্রপতির শাসনের সময় রাজ্যপালের মুখ্য উপদেষ্টার মুখ থেকে চড়া দাম সম্পর্কে ব্যবসায়ীদের উদ্দেশ্যে এক-আধবার একটু কড়া কথা শোনা গিয়েছিল। কিন্তু এবার কোনো উচ্চবাচ্যই নেই। অবশ্যই আমলাকুল অনেক বড় বড় কাজে ব্যস্ত আছেন—খুনোখুনি সামলাতে হচ্ছে, রাজ্যের শিল্পোন্নয়নের ছক তৈরি করতে হচ্ছে, সরকারী কর্মচারীদের মধ্যে কর্তব্যবোধ ফিরিয়ে আনতে হচ্ছে। এই সব গুরুদায়িত্বের মধ্যে রাজ্যের মানুষ দুবেলা খেতে পারছে কিনা, এমন একটা নিতান্ত সামান্য বিষয়ে নিশ্চয়ই বিশেষ মনোযোগ দেওয়া যায় না, বিশেষতঃ আবার একটা লড়াই যখন নাকি বাধতে চলেছে।

আমলাতান্ত্রিক ঔদাসীন্য বুঝতে পারি, অবাক লাগে রাজনৈতিক মহলের নির্লিপ্ততায়—বিশেষতঃ বামপন্থীদের। সেই নির্লিপ্ততা আরো বেশি আশ্চর্য মনে হয় যখন ১৯৬৫-৬৬ সালের কথা মনে পড়ে। সেই সময় খাদ্যদ্রব্যের চড়া দামের বিরুদ্ধে যখন সারা পশ্চিম বাংলা গর্জে উঠেছিল তখন সেই বিক্ষোভকে নেতৃত্ব দিয়েছিল কয়েকটি বামপন্থী দলই। বাজারে-দোকানে প্রতিরোধ ও ধর্নার দৃশ্যগুলি নিশ্চয়ই অনেকেই এখনও মনে করতে পারেন। আজ দাম চড়েছে অনেক গুণ বেশি, তবু কিন্তু কোনো বামপন্থী দল এই প্রশ্ন নিয়ে আন্দোলনের জন্যে রাস্তায় নামতে পারলেন না। সংযুক্ত বামপন্থী আন্দোলনের কর্মসূচী নিয়ে প্রায়ই মতবিরোধ হয় কিন্তু অন্ততঃ এই একটি প্রশ্নে মতপার্থক্যের কোনো সুযোগ ছিল না। খুনোখুনির বিরুদ্ধে আন্দোলনে মতবিরোধ দেখা দেয় তার কারণ, কে দোষী সেই প্রশ্ন এসে পড়ে। সরকারী কর্মচারী বরখাস্ত করার বিরুদ্ধে মিলিত সংগ্রামেও আসে দলীয় রাজনীতির প্রশ্ন। কিন্তু চড়া দামের বিরুদ্ধে আন্দোলনে সে-সুযোগ কোথায়? তবু বামপন্থীরা কিছু করলেন না। করবেন বলেও মনে হয় না। এই রাজ্যে বামপন্থী আন্দোলন এখন কতোটা দ্বিধাগ্রস্ত, বিভ্রান্ত ও বিভক্ত তার সবচেয়ে বড় উদাহরণ বোধ হয় এটাই।

আমি বলছি না যে, আন্দোলন শুরু হলেই জিনিসপত্রের দাম হু হু করে নেমে যেত। হয়ত যেত না। সেকথা যদি বলেন, তবে আন্দোলন করে বরখাস্ত সরকারী [illegible] পুনর্বহাল করা যায় নি। তবু সেই আন্দোলন হল কেন বা চলছে কেন? জনসাধারণের আশু উপকারের কথাটা এখন না-হয় ছেড়েই দেওয়া গেল, কিন্তু চড়া দামের বিরুদ্ধে আন্দোলনে নামলে বামপন্থী অন্ততঃ একটা কমন প্ল্যাটফর্ম তো পেতেন। তার ফলে যেমন ভবিষ্যতে ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনের পথ প্রশস্ত হত, তেমনই জনসাধারণও বুঝত যে বামপন্থীরা তাদের এই সংকটে যথাসাধ্য করছেন। যে নির্বাচনের জন্যে সকলেই এখন উদগ্রীব সেই নির্বাচনের সময় এর ফলে কি কিছুটা সুবিধে হত না?

●

তবে প্রকৃতির মতো রাজনীতিতেও কোনো ফাঁক অপূর্ণ থাকতে পারে না। তাই ছাত্র পরিষদ, যুব কংগ্রেসকে এখন দেখা যাচ্ছে চড়া দামের বিরুদ্ধে আন্দোলনে অগ্রণী ভূমিকা নিতে। কংগ্রেসের ইতিহাসে এই ধরনের আন্দোলন একেবারেই নতুন।

কংগ্রেসের যুব-ছাত্র শাখার এই কর্মসূচী অভিনন্দনযোগ্য ঠিকই, কিন্তু এক্ষেত্রে তাদের কতকগুলো স্বাভাবিক অসুবিধে আছে যেগুলো কাটিয়ে ওঠা সহজ নয়। প্রধান অসুবিধেটা এই যে, কংগ্রেসই দেশে ক্ষমতার আসনে অধিষ্ঠিত। তাই ছাত্র পরিষদ বা যুব কংগ্রেসকে এই অভিযোগের সম্মুখীন হতেই হবে যে, পশ্চিম বাংলায় তো বটেই, গোটা দেশেই যে দাম দারুণ চড়ছে তার জন্যে তাদের দলের দায়িত্ব তো আর কম নয়। কেন্দ্রীয় সরকার তার জন্যে কী করছেন? গত বছরই দেশে আগস্ট সেপ্টেম্বর-অক্টোবরে যে-হারে দর চড়েছিল তাতেই দারুণ আশংকা দেখা দিয়েছিল। আর এ-বছর সেই রেকর্ডও ছাড়িয়ে গেছে। সরকারী হিসাব থেকে দেখা যাবে যে, গত দু-বছরে জিনিসপত্রের দাম বেড়েছে শতকরা [illegible] তারও বেশি। এই হিসেবটাকে অনেকেরই খুব কম বলে মনে হবে কারণ বাজারে-দোকানে [illegible] দাম

বেড়েছে আরো বেশি। সরকারী হিসেবের সংগে আমাদের হিসেবের পার্থক্যের কারণ সরকার হিসেবটা তৈরি করেন গোটা দেশের পাইকারি দরের গড়পড়তা ভিত্তিতে। আর আমরা যখন দোকান-বাজারে কোনো জিনিস কিনতে যাই তখন কিনি খুচরো দরে। খুচরো দর এমনিতেই পাইকারি দরের চেয়ে চড়া, তার ওপর মাঝখানে থাকে নানা মুনাফাশিকারী ফড়িয়ার দল। কোনো জিনিস ঠিকমতো পাওয়া যাচ্ছে না দেখলেই তারা কলকাঠি নেড়ে সে-সবের দাম আগে চড়িয়ে দিতে চেষ্টার কোনো কসুর করে না।

এই বছর গোড়ার দিকে জিনিসপত্রের দাম অনেকটা স্থির হতে সুরু করে। কিন্তু তারপরেই আসে মে মাসে কেন্দ্রীয় সরকারের বাজেট। ঐ বাজেটে যে শুধু রেকর্ড পরিমাণ করের বোঝা চাপানোই হয় তাই নয়, বিরাট একটা অংক ঘাটতিও থেকে যায়। বাজেট পেশের পর দিল্লীর অর্থ দপ্তরের কর্তারা বড়মুখ করে বলেন যে, এই বাজেটের ফলে দাম চড়বে না। আমরাও মনেপ্রাণে প্রার্থনা করছিলুম যে তাঁদের মুখে ফুল-চন্দন পড়ুক, কিন্তু আমাদের ব্যবসায়ীরা তখন অন্য অংক কষছিলেন। যে সব জিনিসের ওপর কর চেপেছে তাদের দাম তো চড়লোই এমনকি যে সব জিনিসের ওপর কোনো নতুন কর বসেনি তাদেরও দাম বেড়ে গেল। ইংরাজিতে একে বলে নাকি 'সিমপ্যাথেটিক রাইজ'। কিন্তু সেই সিমপ্যাথিটা যে খরিদ্দারদের প্রতি নয়, তা বলাই বাহুল্য।

আমাদের দেশে এমনিতেই প্রায় সব কিছুরই ঘাটতি। চাহিদার তুলনায় যোগান যতক্ষণ কম থাকবে অথচ কিছু লোকের হাতে যথেষ্ট পয়সা থাকবে ততক্ষণ কিছুটা দাম বৃদ্ধি থামানো যাবে না। কিন্তু আমাদের এ এমনই এক বিচিত্র দেশ যে এখানে অর্থনীতির অনেক সামান্য নিয়মও খাটে না। তাই দেখা যায়, যোগান বৃদ্ধি পেলেও দাম আর কিছুতেই কমে না। কারণ এদেশে বণ্টন ব্যবস্থা যাদের হাতে তাদের মধ্যে একশ্রেণীর অসাধু ব্যবসায়ী অর্থনীতির সব নিয়ম বানচাল করে দেয়। আরো যেটা পরিতাপের বিষয়, অনেক সময় সরকারী নীতি দাম বৃদ্ধিতেই সাহায্য করে। যেমন ধরা যাক, চিনির কথা। গত কয়েক বছরে অঢেল চিনি উৎপন্ন হয়েছে, গুদামে আর ধরছে না। অথচ চিনির দাম বিনিয়ন্ত্রণের পরেও কমছে না কেন? কমছে না তার কারণ চিনি ব্যবসায়ীরা যাতে চিনি বেশি দিন গুদামে ধরে রাখতে পারে সেই জন্যে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক তাদের টাকা ধার দেওয়ার ব্যবস্থা করেছে।

এর ওপর আবার আছে ঘাটতি বাজেটের ধাক্কা। এবছরের ঘাটতির পরিমাণ অতীতের সব রেকর্ডকে ছাড়িয়ে যাবে। সেই ঘাটতি প্রধানতঃ পূরণ করা হবে কাগজে নোট ছাপিয়ে। আর যতো বেশি কাগজে নোট বাজারে আসবে ততোই কমবে টাকার দাম, ফলে চড়বে জিনিসপত্রের দাম।

এই সব সংকট সমাধানের দায়িত্ব যেহেতু কেন্দ্রের কংগ্রেসী সরকারের, তাই ছাত্র-পরিষদ বা যুব কংগ্রেসের খানিকটা অসুবিধে হবে বৈকি?

•

পশ্চিম বাংলায় যে-সব জিনিসের চড়া দাম সবাইকে সবচেয়ে বেশি অবাক করেছে তা হল কাঁচা আনাজ। মাছের চড়া দামে আমরা এখন আর তেমন অবাক হই না। আর মাছের কিলো দশ টাকা বা বারো টাকা যাই হোক না কেন, তা সাধারণের নাগালের বাইরে। কিন্তু কাঁচা বাজারের দাম এত আক্রা কেন?

এখানেও সেই চাহিদা আর যোগানের মধ্যে বিরাট ফারাক। তার ওপর এই বছরে

আবার একদিকে যেমন যোগান কমেছে, তেমনই বেড়েছে চাহিদা। যোগান কমার কারণ জলস্রোত, আর চাহিদা বৃদ্ধির কারণ জনস্রোত। বন্যার ফলে ব্যাপক এলাকায় চাষের ক্ষতি হওয়ায় উৎপাদন কমেছে। আর শরণার্থী আগমনের ফলে গত ক'মাসে পশ্চিমবাংলার জনসংখ্যা ৭০ লক্ষ বেড়ে গেছে। তার মধ্যে প্রায় অর্ধেক রয়েছেন সরকারী শিবিরে, আর বাকি আত্মীয়-স্বজনের কাছে অথবা নিছকই পথে বা গাছতলায়। শিবিরে যাঁরা আছেন তাঁরা সরকারী ড্রাই ডোল হিসেবে চাল-ডাল-আলু-পেঁয়াজ পাচ্ছেন। অন্যান্য আনাজ তাঁরা কেনবার বিশেষ সুযোগ পাচ্ছেন না। কিন্তু যাঁরা শিবিরের বাইরে রয়েছেন তাঁদের জন্যে তো বাড়তি জিনিস লাগছেই, ফলে সীমিত সঙ্গতির ওপর চাপ পড়ছে, দামও বাড়ছে। এর ওপর ধরুন এখন যদি পাকিস্তানের সঙ্গে লড়াই বাধে তবে আরো দাম চড়বে, কারণ প্রথমতঃ প্রতিরক্ষাবাহিনীকে খাদ্যদ্রব্য যোগাতে হবে এবং দ্বিতীয়তঃ লড়াই বেধেছে বলেই একদল লোক বাড়তি মুনাফা লুটতে চাইবে। বাংলাদেশের শরণার্থী সমস্যা পশ্চিমবাংলাকে কতোটা বিপর্যস্ত করছে, এটা তারই একটা উদাহরণ।

শুধু চাহিদা ও যোগানের ফারাকের ফলেই যে দাম বাড়ে না, সে-কথা আগেই বলেছি। অভাবকে কাজে লাগিয়ে যারা মুনাফা লোটে তাদের সম্পর্কে সরকারী কঠোরতার প্রশ্ন সেই কারণেই ওঠে। কিন্তু রাজ্য সরকারের নির্লিপ্ততা এক্ষেত্রে বিস্ময়কর বললে সামান্যই বলা হয়।

তবু একটু ঠাণ্ডা মাথায় ভাবলে দেখা যাবে, এখানেও রাজ্য সরকারের হাত-পা অনেকটা বাঁধা। সেই অসহায় অবস্থার কারণ, প্রায় প্রতিটি প্রধান খাদ্যদ্রব্যের ব্যাপারেই আমরা পরমুখাপেক্ষী। চালের ঘাটতি কেন্দ্রীয় সাহায্যের দৌলতে অনেকটা ভরে যায় এবং রেশন ব্যবস্থা চালু আছে বলে তবু চালের দামটা আয়ত্তের বাইরে চলে যায়নি। সেই সঙ্গে অবশ্য চালের উৎপাদনও অল্প বাড়ছে। কিন্তু বাঙালীর খাদ্যের অন্যান্য প্রধান উপকরণ যথা ডাল, সরষের তেল বা আলু সম্বন্ধে তো সেকথা খাটে না, কারণ এই সব জিনিস অন্য রাজ্য থেকে এলেই তবে বাঙালীরা তা খেতে পাবে অথচ এই সব জিনিস আসবে বেসরকারী ব্যবসায়ীদের মারফৎ। ডাল, তেল বা আলুর যে-পরিমাণ চাহিদা পশ্চিম বাংলায় রয়েছে, তার অর্ধেকটা মেটাবার মতো ক্ষমতাও এই রাজ্যের নেই। যেসব ধরুন, সরষের তেল। টিনে ভর্তি তেল আমদানি তো ক্রমশঃ বেড়েই চলেছে। তার ওপর যদি উত্তরপ্রদেশ থেকে ঠিকমতো সরষের বীজ না আসে তবে এই রাজ্যে যে ক'টি কলে তেল তৈরি হয় তাও প্রায় বন্ধ হয়ে যাবে। এখন উত্তরপ্রদেশে যদি হঠাৎ সরষের দাম বেড়ে যায় (অথবা ব্যবসায়ীরা কারসাজি করে দাম বাড়ান) তবে আমাদের রাজ্য সরকার কতোটা কী করতে পারেন? ডাল বা আলু সম্বন্ধেও ঐ একই কথা।

অবশ্য এ-কথার অর্থ এই নয় যে, দাম চড়ছে বলে সরকারের কিছুই করার নেই। অন্ততঃ অসাধু ব্যবসায়ীদের শায়েস্তা করার উদ্যোগ তাঁরা নিতে পারেন। মনে পড়ছে, দুই যুক্তফ্রণ্ট সরকারের কর্মসূচীতেই দাম বৃদ্ধি রোধ করার ওপর যথেষ্ট গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছিল। দ্বিতীয় যুক্তফ্রণ্টের ৩২-দফার মধ্যে একটি দফায় বলা হয়েছিল, মূল্য নিয়ন্ত্রণের জন্যে একটি প্রাইস কমিশন গঠন করা হবে। ফ্রণ্ট সরকারের অন্যান্য অনেক প্রতিশ্রুতির মতো এটিও অবশ্য অপূর্ণই থেকে গেছে। কিন্তু আমাদের রাজ্যপাল শ্রীডায়াস, যিনি জায়গা বিশেষে কঠোর হতে জানেন, তিনি কি এ ব্যাপারে কোনো উদ্যোগই গ্রহণ করতে পারেন না? অবশ্য তিনি যে সেই উদ্যোগ গ্রহণে বাধ্য হবেন, এমন অবস্থা সৃষ্টিই তো হয়নি, কারণ সংগ্রামী বামপন্থী দলগুলি এ ব্যাপারে একেবারে 'স্পিকটি নট'।

২৯-১০-৭১ —[illegible]

দেশ বিদেশ

হীথরো বিমানবন্দরে ব্রিটিশ পররাষ্ট্র সচিব স্যর আলেক ডাগলাস হিউম ভারতীয় প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীকে স্বাগত জানান। —ইউ পি আই রেডিও ফটো

তানজানিয়ার প্রতিনিধিরা আনন্দে লাফিয়ে উঠলেন। ভারতীয়, পাকিস্তানী, সিরিয়ান, কিউবান ও আলবেনিয়ান প্রতিনিধিরাও হাসতে হাসতে শূন্যে হাত ছুঁড়তে থাকলেন। আর সেই সময়ে নিজের আসনে নতমুখে বসে থাকলেন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিনিধি জর্জ বুশ। আলবেনিয়ার পররাষ্ট্রবিভাগের উপমন্ত্রী ফরাসী ভাষায় বলতে আরম্ভ করলেন, 'এটা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পক্ষে একটা বিরাট পরাজয়।' ফরাসী বক্তৃতার ইংরেজী অনুবাদ শোনার জন্য কানে যে ইয়ার-ফোনটি লাগান ছিল সেটি মিঃ বুশ বিরক্তিভরে খুলে ফেলে ডেস্কের উপর রাখলেন।

রাষ্ট্রসংঘের সাধারণ পরিষদে তাই-ওয়ানের আসনগুলি তখন শূন্য। পরিষদের অধিবেশনে সেই ঐতিহাসিক ভোট গ্রহণের আগেই তাইওয়ানের প্রতিনিধিরা অধিবেশন-কক্ষ থেকে বেরিয়ে গেছেন।

রাষ্ট্রসংঘে চীনের আসনটি নিয়ে গত কুড়ি বছর ধরে যে-বিতর্ক চলছিল, গত ২৬ অক্টোবর মধ্যরাত্রে সেই বিতর্কের উপর এইভাবেই যবনিকাপাত হল।

রাষ্ট্রসংঘে চীনের আসনটি যে শেষ-পর্যন্ত মাও সে-তুং-এর 'পিপল্‌স্ রিপাবলিক অব চায়না'র ভাগেই যাবে, সে বিষয়ে ইদানীং আর সন্দেহের অবকাশ ছিল না। লাল চীনকে রাষ্ট্রসংঘে স্থান দেওয়ার পক্ষপাতী রাষ্ট্রের সংখ্যা গত কয়েক বছর ধরে ক্রমেই বাড়ছিল এবং রাষ্ট্রসংঘের মোট সদস্য-সংখ্যা যতই বৃদ্ধি পাচ্ছিল, ততই রাষ্ট্রসংঘের ভোট লাল চীনের অনুকূলে যাচ্ছিল। কিন্তু সেই শেষ ও অনিবার্য পরিণাম যে এত তাড়াতাড়ি আসবে, কম্যুনিস্ট চীনের অনুকূলে ভোটের ব্যবধান যে এত বেশী হবে এবং তাইওয়ানকে যে এমন নির্দ্বিধায় বিশ্বসভা থেকে বিতাড়িত করা হবে, সেটা কারও প্রত্যাশার মধ্যে ছিল না।

এই দীর্ঘ-আলোচিত ঐতিহাসিক বিতর্কের শেষে যখন ভোট নেওয়া হল, তখন দেখা গেল, আলবেনিয়ার প্রস্তাবের পক্ষে ৭৬টি আর বিপক্ষে ৩৫টি ভোট পড়েছে, ১৭টি সদস্য-রাষ্ট্র কোন পক্ষেই ভোট দেয়নি। অর্থাৎ, দুই-তৃতীয়াংশের বেশী সদস্যের মত ঐ প্রস্তাবের স্বপক্ষে গেছে। প্রস্তাবটির বয়ান হচ্ছে:—

'রাষ্ট্রসংঘের সনদে নির্দিষ্ট নীতিগুলি স্মরণ করে, গণপ্রজাতন্ত্রী চীনের বৈধ অধিকার পুনঃপ্রতিষ্ঠা করা যে রাষ্ট্রসংঘের সনদের সর্ত পূরণের দিক থেকে ও এই সনদে নির্দিষ্ট উদ্দেশ্য চরিতার্থ করার দিক থেকে অবশ্য প্রয়োজন সে-কথা বিবেচনা করে,

'গণপ্রজাতন্ত্রী চীনের সরকারই যে রাষ্ট্রসংঘে চীনের একমাত্র বৈধ প্রতিনিধি এবং গণপ্রজাতন্ত্রী চীনই যে নিরাপত্তা পরিষদের পাঁচটি স্থায়ী সদস্য-রাষ্ট্রের অন্যতম, এ-কথা স্বীকার করে,

সাধারণ পরিষদ গণপ্রজাতন্ত্রী চীনকে

সোভিয়েট এয়ার চীফ মার্শাল পি এস কুতাখভ শনিবার দিল্লীতে পৌঁছুলে ভারতীয় বিমান বাহিনীর অধিকর্তা এয়ার চীফ মার্শাল পি সি লাল (ডানে) তাঁকে সম্বর্ধনা জানান।

তার সকল অধিকার ফিরিয়ে দেওয়ার, তার সরকারকে রাষ্ট্রসংঘে চীনের একমাত্র বৈধ প্রতিনিধি হিসাবে স্বীকার করার এবং চিয়াং-কাই-শেকের প্রতিনিধিরা রাষ্ট্রসংঘে ও তার অনুমোদিত সকল সংস্থায় অবৈধ-ভাবে যে স্থান অধিকার করে আছেন, সেখান থেকে তাঁদের অবিলম্বে বিতাড়িত করার সিদ্ধান্ত করছে।'

এই প্রস্তাব মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পক্ষে একটি বিরাট পরাজয়। যুক্তরাষ্ট্র যে লাল চীনকে রাষ্ট্রসংঘে স্থান দেওয়ার বিরোধী ছিল তা নয়। লাল চীনকে রাষ্ট্রসংঘে প্রবেশ করতে না দেওয়ার চেষ্টা বৃথা জেনে সে সম্প্রতি সেই চেষ্টা ত্যাগ করেছিল। বিশেষ করে, চীনের সংগে ঘনিষ্ঠতা স্থাপনের যে নূতন নীতি প্রেসিডেন্ট নিক্সন গ্রহণ করেছেন, তার পরিপ্রেক্ষিতে এভাবে চীনের সরাসরি বিরোধিতা করা এখন আর ওয়াশিংটনের পক্ষে সম্ভব ছিল না। কিন্তু তার মুশকিল এই যে, চিয়াং-কাইশেকের চীনকেও সে ফেলতে পারে না। এতকাল ধরে আমেরিকা শুধু যে চিয়াং-কাইশেকের চীনকে সাহায্য দিয়ে এসেছে ও তাকে রক্ষা করার দায়িত্ব নিয়ে এসেছে তাই নয়, এই দ্বীপভূমির শাসকদের চীনের মূল ভূখণ্ডেরও প্রতিনিধি হিসাবে স্বীকৃতি দিয়ে এসেছেন। শ্যাম ও কুল—দুই-ই একসংগে রাখার চেষ্টা করতে গিয়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত রাষ্ট্রসংঘে তাইওয়ানের আসনটি বজায় রেখে চীনকে নিয়ে আসার জন্য লড়াই চালিয়ে গেছে।

কিন্তু লাল চীন আগে থেকেই জানিয়ে রেখেছিল যে, দুই চীনের তত্ত্ব সে মানতে রাজী নয়, রাষ্ট্রসংঘের আসন সে কিছুতেই চিয়াং-কাইশেকের প্রতিনিধিদের সংগে ভাগ করে নেবে না। তবু, মার্কিন প্রতিনিধি মিঃ জর্জ বুশের আশা ছিল, 'আমরাই জিতব এবং ভোটের ব্যবধান খুবই সংকীর্ণ হবে।'

ভোটের ফলাফল যখন জানা গেল, তখন হতাশ মিঃ বুশ বললেন, 'রাষ্ট্রসংঘ আজ একটি অত্যন্ত বিপজ্জনক সেতু অতিক্রম করল।'

লক্ষ্য করার বিষয় যে, এবার সাধারণ পরিষদে ছয়দিন ধরে এই বিষয়ে যে-বিতর্ক হয়েছে, তাতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে আগা-গোড়াই হার স্বীকার করতে হয়েছে। প্রথমে চেষ্টা করল তাইওয়ানের বিতাড়নের প্রশ্নটিকে 'গুরুত্বপূর্ণ' বলে চিহ্নিত করে রাষ্ট্রসংঘের নিয়ম অনুযায়ী এই বিষয়ে দুই-তৃতীয়াংশের ভোটের শর্ত আরোপ করতে। রাষ্ট্রসংঘের সদস্যরা ৫৯—৫৫ ভোটে এই চেষ্টা ব্যর্থ করে দেন। আল-বেনিয়ার প্রস্তাবটি অগ্রাধিকার অধিকের বেশী সংখ্যাগরিষ্ঠতায় পাস হয়ে যাবেই, এ-কথা বুঝবার পর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সৌদী আরবের মারফৎ একটি প্রস্তাব তুলে এই বিষয়ে বিবেচনা স্থগিত রাখার চেষ্টা করল। কিন্তু সেই চেষ্টাও শোচনীয়ভাবে ব্যর্থ হয়ে গেল। ওদিকে চীনের পক্ষে পাল্লা ভারী হতে দেখেই একটির পর একটি রাষ্ট্র সেই ভারী পাল্লার দিকে ঝুঁকে পড়তে থাকে। তার ফল হল এই যে, বৃটেন, ইতালী, বেলজিয়াম, নেদারল্যান্ড, হল্যান্ড প্রভৃতি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সংগে চুক্তি অথবা অন্য ঘনিষ্ঠতার সূত্রে আবদ্ধ দেশগুলিও আমেরিকার বিরুদ্ধে ভোট দিল।

রাষ্ট্রসংঘে যখন এই ঐতিহাসিক ভোট গ্রহণ করা হয়, তখন প্রেসিডেন্ট নিক্সনের দূত হেনরি কিসিংগার তাঁর পিকিং সফরের শেষে দেশে ফিরে আসার জন্য তৈরি হচ্ছিলেন। সাংবাদিকদের অনুমান যে, হয় পিকিং বিমানবন্দরে যাওয়ার পথেই অথবা মার্কিন প্রেসিডেন্টের বিশেষ বোয়িং বিমানে ওঠার পর তিনি পাকা খবরটা পেয়ে যান। এটা একটা বিচিত্র পরিহাস যে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র যখন পিকিং-এর সংগে ঘনিষ্ঠতর সম্পর্ক স্থাপনে উদ্যোগী হয়েছে, তখনই চীন তাকে এতবড় একটা কূটনৈতিক পরাজয় মেনে নিতে বাধ্য করল।

২৯।১০।৭১ —পুণ্ডরীক

কলকারখানা ও রান্নাধর্মঘট পশ্চিমবাংলা

শঙ্কর সেনগুপ্ত

ধর্মঘট বা বন্ধ আমাদের গা সওয়া হয়ে গেছে। অহরহ বন্ধ, ঘেরাও, অনশন, ধর্মঘটাদি দেখে দেখে আমরা এত অভ্যস্ত হয়ে গেছি যে ওগুলো আর আমাদের তেমন উত্তেজিত করে না, উদ্দীপিত করে না। তাই পশ্চিমবঙ্গবাসীকে স্মরণ করিয়ে দেবার প্রয়োজন দেখা দিয়েছে অনুষ্ঠিতব্য কলকারখানা ও রান্না ধর্মঘটের কথা। হয়ত পশ্চিমবঙ্গবাসীর কাছে এর দরকার ছিল না, কিন্তু তবুও বর্তমান পরিস্থিতিতে এই বাহুল্যের শিকার হতে হল। হাঁ, আগামী (৩১শে ভাদ্র) শুক্রবার ভাদ্র সংক্রান্তির কথা বলছি। ওই দিনে পশ্চিমবঙ্গের সর্বত্র রন্ধন ধর্মঘট প্রতিপালিত হবে। অন্যান্য ধর্মঘটের চেয়ে এ ধর্মঘটের তীব্রতা বেশী। অন্য ধর্মঘটে সাধারণতঃ আমরা পুরুষেরা প্রধান ভূমিকা নিয়ে থাকি। কিন্তু এইদিনের ধর্মঘটের নেতৃত্ব সম্পূর্ণ মেয়েদের হাতে। এদিনে তাঁরা কোন কাজই করবেন না। এমন কি রান্না পর্যন্ত না।

অন্য কোন ধর্মঘটেই আমরা আমাদের নারীসমাজকে সম্পূর্ণ বিশ্রাম বা ছুটি দিতে পারি না। দেই না। রন্ধনশালার কাজ থেকে ছুটি নিতে পারেন না তাঁরা। ও কাজে কর্মবিরতি বা কলম ধর্মঘট অথবা ইচ্ছামাফিক কাজের ঝক্কি তাঁরাও নেন না, আমরা নিতে দেই না। কিন্তু আগামী ৩১শে ভাদ্র কলকারখানা বন্ধের সঙ্গে সঙ্গে হবে রন্ধন ধর্মঘট। এদিনে উনুন জ্বলবে না, গরম গরম ভাত বা কোন গরম গরম খাবার পাওয়া যাবে না পশ্চিমবঙ্গবাসী কোন গৃহস্থের ঘরে। পূর্বদিনের রান্না বাসি খাবার, পান্তা বা জলভাত খেয়ে কাটাতে হবে ওই দিনটিতে। শুক্রবার। শুক্রবারকে মুসলমান সমাজ বলেন জুম্মাবার। এদিনটি তাঁদের কাছে বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। হিন্দুদের যেমন বৃহস্পতি বা লক্ষ্মীবার। জুম্মাবারে ওদের নামাজ বা প্রার্থনা অবশ্য করণীয়। এই নামাজ করতে ব্যস্ত থাকার দরুণ বা অন্য কর্মে লিপ্ত থেকে তাঁদের কোন কেউ যদি এ ধর্মঘটে অংশগ্রহণ না করেন তাহলে আমাদের আপত্তি নেই। হিন্দুসমাজের কেউও যদি এ ধর্মঘটের বিরোধিতা করে অন্য পথে যেতে চান স্বচ্ছন্দে তিনি তা করতে পারেন নিজ দায়িত্বে। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গবাসী কোন গৃহস্থের ঘরে কিছুতেই রান্না হবে না। হবে না কলকারখানা বা যন্ত্রদানবের কোন কাজ। বন্ধ থাকবে সব। কোন কর্ম নয়, শুধু অবসর, শুধু বিশ্রাম এ দিনটিতে।

নিষ্কর্মা ওইদিনে মনের আনন্দে যার খুশী সে ঘুড়ি খেলবে, যার খুশী সে নৌকা বাইচে অংশগ্রহণ করবে, যার খুশী সে মাইক বাজাবে, রেকর্ড প্লেয়ারের আওয়াজ ছড়িয়ে পাড়াপড়শীদের কানে তালা ধরিয়ে দিবে, যার খুশী সে বিশ্বকর্মা পুজোয় মাতবে বা মনসা পুজো সমাপন ও মনসার ভাসানে অংশ নিবে, যার খুশী সে ধর্মরাজ পুজো ও মেলায় নিজেকে মিলিয়ে দিবে অথবা যার খুশী সে নিজের খেয়াল মত নাচ বা আনন্দানুষ্ঠানে মাতবে, ভাদু বা তজ্জাতীয় গান গেয়ে মনটাকে হাল্কা করবে—এর কোন কিছুতেই আমরা বাধা দেবো না। এসবের কোন কিছু অনুষ্ঠিত হলে বা না হলে আমাদের কিছুই আসে যায় না। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গবাসী গৃহস্থের ঘরে এদিনে আগুন জ্বলতে দেখলে আমরা তা নিভিয়ে দেবো। রন্ধন ধর্মঘট ভাঙতে যেসব দালাল পশ্চিমবঙ্গের গৃহস্থ ঘরে ঢুকতে চেষ্টা করবেন তাঁদের সমুচিত শিক্ষা দেওয়া হবে, দালালীর ফল তাঁরা হাতে হাতে টের পাবেন। আমরা আশাকরি অন্যান্য বৎসরের মত এবৎসরও এ ধর্মঘট স্বতঃস্ফূর্তভাবে ও নির্বিঘ্নে সুসম্পন্ন হয়ে যাবে। পিতা-পিতামহ-প্রপিতামহদের কাছ থেকে পাওয়া, আহরণ করা বা অর্জিত আমাদের এ অধিকারে কেউ হস্তক্ষেপ করলে তার বিরুদ্ধে লড়াই করে, তাকে আঘাতের পর আঘাত দিয়ে বুঝিয়ে দিতে হবে যে অনধিকার চর্চারও একটা সীমা আছে। আর সে সীমা অতিক্রম বা লঙ্ঘন করার প্রতিফলও তাকে পেতে হবে। এ প্রতিফল হবে আমাদের সঙ্ঘশক্তি, আমাদের সততা ও ঐতিহ্যের প্রতি নিষ্ঠা নিয়ে ধর্মঘটকে সাফল্যমণ্ডিত করা। আমাদের বিরোধীরা, আমাদের অবাধ্যরা, আমাদের সাফল্যে লজ্জিত না হয়ে পারবে না। মনে রাখতে হবে যে আমাদের ঐতিহ্যের, আমাদের বিশ্বাসের, আমাদের আচার আচরণের, আমাদের সাহিত্য সংস্কৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে গিয়েই এ ধর্মঘট বা অরন্ধন। আমাদের এ আহ্বানে সকলেই সাড়া দিবেন এ আশা আমরা করি না। অগণিত জনগণের, নানা শ্রেণীর লোকেদের মধ্যে মতপার্থক্য তো থাকবেই। কিন্তু ঐতিহ্যে বিশ্বাসী পশ্চিমবঙ্গের অধিবাসী ও গায়েভূঁয়ের মানুষ আমাদের এ আহ্বান প্রত্যাখ্যান না করে বরাবরের মত এবারও যে আমাদের পাশেই এসে দাঁড়াবেন তাতে আমাদের বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই। আর হাঁ, এ অনুষ্ঠানে মেয়েদের নির্দ্বিধায় একাধিপত্য আমরা তা স্বীকার করে নিয়েছি। আমরা বাংলার নারীসমাজের এদিনের সর্ববিধ আচরণকে মেনে নেব, শ্রদ্ধা জানাব।

বলাবাহুল্য, বিশেষ বিশেষ দিনের রন্ধন বর্জন প্রথাকে আমরা রন্ধন ধর্মঘট বলে স্বীকৃতি দিয়েছি। এইদিনে আনুষ্ঠানিক রান্না বন্ধ। ভাদ্র সংক্রান্তি বা আমাদের আহ্বায়িত সতেরই সেপ্টেম্বরের রান্না বন্ধের দিনে উনুনের ভিতর সিজ বা মনসা গাছের ডাল রেখে মনসা পুজো করা হয়। অনেকে এ অনুষ্ঠানকে রান্নাপুজো বলেন। উনুন জ্বালান অনুচিত সেদিন। মনসার সন্তান সাপেরা নাকি সেদিন উনুনে লুকিয়ে থাকে। উনুনে আগুন দিলে এইসব সাপেদের কোন অনিষ্ট হতে পারে বিবেচনায় উনুনে জ্বালান বন্ধ। সাপের কোন অনিষ্ট করলে বংশ রক্ষা করা অসম্ভব হয়ে পড়ে। এই প্রসঙ্গে স্মরণীয় যে সাপ প্রজনন শক্তির প্রতীক। মূলত কৌম সমাজের প্রজনন শক্তির পুজোর পথ ধরেই মনসাপুজোর উদ্ভব। মনসাদেবীর মূর্তির বা চিত্রের সঙ্গে একাধিক সর্পের ক্রোড়াসীন একটি মানব শিশুর একটি ফলের এবং মনসার ঘটের প্রতিকৃতি সবই প্রজনন শক্তির প্রতীক। এই সাপেদের কোন আঘাত থেকে বাঁচাবার অন্যতম একটি কারণ আজকের ধর্মঘট। অরন্ধন।

অরন্ধন লোকায়ত অনুষ্ঠান। ব্যক্তির আকাঙ্ক্ষা এখানে শালপ্রাংশু হবার অবকাশ পায় নি। যৌথ স্পৃহা ও একাগ্রত কর্মকাণ্ডই অরন্ধন অনুষ্ঠানের সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ কারণ। সমষ্টি প্রবণতা থেকেই এ উৎসবের বিকাশ ও বিবর্ধন। এ অনুষ্ঠান সমগ্র সমাজের। কৃষি ও গ্রাম নির্ভর সমস্ত সমাজ এখানে সচল। এ উৎসব গোষ্ঠীবদ্ধ ঐন্দ্রজালিক অনুষ্ঠানের একটি। ইন্দ্রজালে বৈজ্ঞানিক সচেতনার অভাব থাকলেও অত্যাচার জর্জর মানুষের হা হুতাশ বা আর্তনাদের প্রকাশ নেই। বাস্তবকে বশ করার জন্য মানুষ সেখানে বিরূপ প্রকৃতির বিরুদ্ধে সতত সংগ্রামশীল। কালে ইন্দ্রজাল ধর্মের অবয়বে রূপান্তরিত হয়।

সন্তান প্রজননের ক্ষেত্রে যেমন পুরুষ নারীর সহযোগী, অরন্ধন অনুষ্ঠানেও তেমনি পুরুষ নারীর সহযোগীমাত্র। নারী সন্তান ধারণে সক্ষম অতএব সে উর্বরতার প্রতীক। নারীর প্রজনন ক্ষমতা প্রকৃতির ক্ষেত্রে জনন-ক্ষমতা সঞ্চারিত করবে এ ধারণার বশবর্তী হয়েই বহু প্রাচীন জাতি নানাপ্রকার মৈথুন ক্রীড়ায় লিপ্ত হতো ফল কামনার উদ্দেশ্যে। জমির উর্বরতা বৃদ্ধির কামনায় অনুষ্ঠিত নানাবিধ জাদুর

অনুষ্ঠান নারীর এক্তিয়ারে। জমির উর্বরতা কামনা কিংবা কৃষি উৎসব অনুষ্ঠানের উদ্দেশ্য মানুষের বংশবৃদ্ধি। মনসার ব্রত-কথাতেও বংশবৃদ্ধির ও জাদুর প্রভাব স্পষ্ট। তাই প্রথম ব্রতচারিণী অর্থাৎ যাঁকে দিয়ে মনসাব্রতের প্রচার করা হয়েছে তাঁকে পোয়াতী বা প্রেগন্যান্ট অবস্থায় পিক্ আপ করা হয়েছে। সদাগরবাড়ীর ছোটবউ, যিনি পোয়াতী, যার 'মাছের অম্বল দিয়ে পান্তাভাত' খাবার ইচ্ছা হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে স্নান করতে গিয়ে পুকুরে কতগুলো মাছ খেলা করছে দেখতে পেলেন। যেমনি দেখা অমনি নিজের গামছা ছাঁকা দিয়ে সে মাছগুলো ধরে ফেললেন। বাড়ী ফিরে মাছগুলো একটা বড় মাটির জালার ভেতর জিইয়ে রাখলেন। পরদিন মাছ কুটবার জন্য যেই জালার সরা খুললেন অমনি দেখতে পেলেন মাছগুলো সাপ হয়ে ভাসছে। ছোট-বউ অবাক। তবুও তিনি সাপগুলোকে অবহেলা না করে দুধকলা দিয়ে পুষতে লাগলেন। সাপেরা ছোট বউয়ের আপ্যায়নে খুশী হয়ে মা মনসাকে বললেন ছোট-বউকে তাদের কাছে নিয়ে আসতে। মনসা-দেবী ছেলেদের আগ্রহে ছোটবউর মাসীর ছদ্মবেশে সদাগরবাড়ীতে এসে উপস্থিত হলেন। সদাগরগিন্নী বললেন, 'কে গা বাছা তুমি, কি তোমার অভিপ্রায়?' মাসীর রূপধরা, শাঁখা, সিঁদুর-চুপড়ী, নোয়া নথাদি-পরা, মনসাদেবী বললেন, বেয়ানঠাকুরুণ, আমাকে চিনবেন না আমি আপনার ছোট-বউর মাসী। গিন্নী বললেন—'তা মাসী হয়েছ বেশ কথা, কিন্তু হঠাৎ আজ এখানে?' মনসা বললেন—'এমনি আর কি কখনো বোনঝিকে একটু যত্নআত্তি করতে পারি নি। তাই এসেছি আপনার ছোট বউমাকে কিছুদিনের জন্য আমার কাছে নিয়ে রাখতে। এখন যদি অনুমতি করেন তবেই সেটি সম্ভব হয়। গিন্নী রাসভারী ভঙ্গিতে বললেন—'কোনদিন তো জানতুম না ছোট-বউয়ের আপনার কেউ আছে। তা তুমি যখন এতদিন পরে এসেছ, তখন নিয়ে যাও—অনুমতি দিচ্ছি'। অনুমতি পেয়ে মাসী বোনঝিকে রথে চড়ালেন। রথে উঠেই বললেন—'দেখো মা তুমি চোখ বোজ। যখন খুলতে বলব তখন খুলো।' ছোটবউ আদেশ পালন করে বসে রইলেন। হঠাৎ মনসা চোখ খুলতে বললেন ছোটবউকে। চোখ খুলতেই বিস্ময়ে হতবাক। মস্তবড় বাড়ী আর তেমনি সব আসবাব। পাশে সেই অষ্টনাগ খেলা করছে যাদের ছোটবউ দুধকলা দিয়ে পুষছিলেন, মৎস্য ভ্রমে ধরেছিলেন। তারপর অনেক কথা। হঠাৎ সাপেরা তার উপর রেগে গেল, কামড়াবার জন্য ধাওয়া করল। মনসাদেবীর পরামর্শে তিনি রক্ষা পেলেন। তখন মনসাদেবী চুপিচুপি ছোটবউকে বললেন 'কি জানিস, আমি তোর মাসী নই, আমি মনসা। ফণী মনসাগাছে থাকি। তুই আমার পুজো পৃথিবীতে প্রচার করবি। সারা শ্রাবণ মাস ধরে আমার মঙ্গল কাহিনী গাইবি, ব্রতকথা শুনবি, নাগপঞ্চমী দশহরা, ভাদ্র সংক্রান্তিতে সিজ বা ফণী-মনসা গাছ এনে উনুনে আমার প্রতীক হিসাবে রেখে পুজো করবি। এদিনে রান্না করবি না। উনুন জ্বালাবি না। শুদ্ধাচারে রান্নাপুজো করে আমাকে পান্তাভাত সাধ দিবি। তাহলে আর কখ্খনো সাপের ভয় থাকে না। বন্ধ্যা হতে হবে না। এ ব্রত যে করবে ধনে জনে পূর্ণ হয়ে সে পরম সুখে দিনাতিপাত করবে।' ছোটবউ আনুপূর্বিক সকল ঘটনা সবিস্তারে সকলের কাছে বললেন, সব কথা শুনে তার সুখ্যাতি করলেন সকলে। মনসাপুজো সুরু করে দিলেন রান্না ধর্মঘট ও আনুষঙ্গিক কৃত্যাদির মাধ্যমে। যথাসময়ে ছোট বউ সুন্দর ছেলে প্রসব করলেন। আরও ছেলে। ধনে জনে সমৃদ্ধ ও শ্রীবৃদ্ধিশালিনী হয়ে উঠলেন তিনি মনসাদেবীর বরে। ক্রমে সারা দেশব্যাপী মনসার পুজো ও ব্রত অনুষ্ঠিত হয়ে চলে আসছে। অনুষ্ঠিত হয়ে আসছে রন্ধন ধর্মঘট বা অরন্ধন।

জনজীবনে সুখ শান্তি সমৃদ্ধি শ্রীবৃদ্ধি স্থাপন ছাড়া এ ধর্মঘটের অন্য কোন উদ্দেশ্য নেই। ধনজন বৃদ্ধি, বিপদ-আপদ থেকে মুক্তি, অন্যায় ও পাপের বিরুদ্ধে ধিক্কার জানাবার উদ্দেশ্যেই রন্ধন ধর্মঘট। এধরণের আরেকটি ধর্মঘট অনুষ্ঠিত হয় বর্ষা ঋতুতে অম্বুবাচী উপলক্ষ্যে। প্রধানতঃ বঙ্গীয় বিধবা নারীগণ এই পার্বণটি তিন বা সাতদিন ধরে প্রতিপালন করেন। লাগাতার এ ধর্মঘটে তিন কি সাতদিন রান্না বন্ধ। মাটি খোঁড়া বন্ধ। এমন সব কাজ বন্ধ যাতে পৃথিবীর, মাতা বসুন্ধরার অঙ্গে আঘাত লাগে। প্রচলিত বিশ্বাস এ কদিন মাতা বসুধার ঋতু পর্ব এবং যতদিন তিনি ঋতুমতী থাকেন ততদিন তাঁর অঙ্গে কোন আঘাত লাগে এমন কোন কাজ করা যাবে না। দরিদ্র চাষী, ক্ষেতমজুর, দিনমজুরাদি সকলেই তাঁদের কাজ বন্ধ রাখেন এ সময়। বন্ধের আমেজ বিশ্রাম বা ফোর্সড্ রেস্ট উপভোগ করেন এরা সকলে নববর্ষের সূচনায় অন্ততঃ তিনদিন। লাগাতার এ বিশ্রামের দিনগুলিকে লোক-সমাজ নানারূপে ধর্মানুষ্ঠান করে তৃপ্তি পান। বাংলাদেশে অম্বুবাচীর সময় সুরু হয় ৭ই আষাঢ় থেকে, চলে তিন কি সাতদিন পর্যন্ত। উড়িষ্যায় এ পার্বণের তারিখ আরও আগে। জ্যৈষ্ঠ সংক্রান্তি থেকে তিনদিন। উড়িষ্যাবাসী এ অনুষ্ঠানকে বলেন রজউৎসব। এ উৎসব উড়িষ্যার প্রতিটি ঘরে দারুণ উত্তেজনার সৃষ্টি করে এ সময়ে সব কাজ বন্ধ, এমন কি কল-কারখানা, অফিস আদালত পর্যন্ত। আসামের অম্বুবাচী উৎসব আর বাংলার উৎসব প্রায় একই সময়ে অনুষ্ঠিত হয়। অম্বুবাচী উপলক্ষ্যে আসামের কামাখ্যার মেলার খুব নামডাক। নদীয়া জেলার মাটিয়ারী গ্রামের অম্বুবাচী মেলারও প্রচুর জনপ্রিয়তা। পশ্চিমবঙ্গের নানাস্থানে এ সময়ে মেলা অনুষ্ঠিত হয়। নানাবিধ ফলমূলের প্রদর্শনীর বাহার হয় অম্বুবাচী মেলায়। ছুটির আমেজ ও মেলায় আনন্দে সকলের উল্লাস। সকলের বিশ্রাম। ধনী দরিদ্র, মালিক শ্রমিক, চাষী-কৃষক, শিক্ষক ছাত্র, সকলের ছুটি, সকলের বিশ্রাম এ সময় উড়িষ্যায়। বাংলা বা আসামের অধিবাসী-বৃন্দ এত বিশ্রাম নিতে পারেন না এ সময়। অবশ্য বিধি যদি বাম হন, অর্থাৎ এক নাগাড়ে বরুণদেব যদি কৃপাবারি বর্ষণ করে চলেন তবে 'রেইনি ডে' যে এক আধদিন উপভোগ করা যায় না, এমন নয়। স্মরণীয় অম্বুবাচী মূলত বিধবা সম্প্রদায়ের অনুষ্ঠান হলেও অনেক আচারনিষ্ঠ ব্রাহ্মণ বিধবাদের মত অম্বুবাচী পালন করেন। রুটি, লুচি, খই, চিড়া, ফলমূল, কাঁচা দুধ প্রভৃতি খান তিনদিন। কোনপ্রকার অগ্নিপক্ক জিনিস খাওয়া বারণ।

জ্যৈষ্ঠ মাসের শুক্লাষষ্ঠী, মাঘ মাসের শীতল ষষ্ঠী প্রভৃতি নানা দিনে নানা কারণে রান্না বন্ধ হয়ে থাকে। বাড়ীর ছোট বউ রান্না চুরি করে খেয়ে বিড়ালের নামে দোষ দিতেন। বলতেন, বিড়াল খেয়ে গেছে। এই অপরাধে ও বিড়ালের ক্রোধে একে একে তিনি হারালেন সাতটি ছেলে আর একটি মেয়ে। আটকুড়ি এ বউর মুখ কেউ দেখতে চান না। সকলে বলেন দূর ছাই, দূর ছাই, বলেন, 'বউয়ের কি মূর্তি, যেন শেওড়া-গাছের চক্রবর্তী' বা ওর 'শুনলে কথার ছন্দ, হাঁড়ি ভেঙে মাছ পালায়, ঝোল রইল বন্ধ'। বলেন—পরিহর বিনা কাঁড়িতে হাট, পরিহর বিনা লাড়িতে বাট। পরিহর নদীর তীরে গাছা, পরিহর মায়ের বিহনে বাছা। পরিহর গুয়া রুণাঝুনা, পরিহর ঠাকরুণ কুবচনা। পরিহর নারী যার দুই সাঁই, পরিহর যার দুই গোঁসাই। পরিহর যত্নে ঋণের শেষ, পরিহর রত্নে লাসের বেশ। পরিহর বিনা ঢাকান বারি, পরিহর লাজবিহনে বহুড়ী। পরিহর পাঁচদিন ভুঞ্জন সুখ (অষ্টমী, চতুর্দশী, অমাবস্যা, পূর্ণিমা ও সংক্রান্তি)। পরিহর চিরদিন দুর্জন মুখ। পরিহর নিত্য রতি-পিয়াস, পরিহর ধনী কুটুম্ব পাশ। পরিহর শূন্য নগরের কূপ, পরিহর ব্যঞ্জন বাসি সূপ। পরিহর দুই গ্রামে বাস, পরিহর পর যুবতীর আশ। পরিহর বাটে ক্ষেতের আল, পরিহর গভীর বয়সের কাল। পরিহর নিত্য জিরার ঝোল, পরিহর দুষ্টানারীর কোল। পরিহর পোখরী পিচ্ছল ঘাট, পরিহর যত্নে ভাঙা হাট। পরিহর সুশ্রী বাজা বউ, পরিহর আঁটকুড়ো মাগীর ছো। ছোট বউ এসব শোনে আর কাঁদে। দেবতার কাছে মৃত্যুর প্রার্থনা জানায়। এত দুঃখ কষ্ট যন্ত্রণাদি দেখে মা ষষ্ঠীর দয়ার উদ্রেক হয়। তিনি ছদ্মবেশে ছোট বউর কাছে এসে শুক্লাষষ্ঠীর দিনে ষষ্ঠীব্রত পালন করতে বললেন। বললেন, 'ও অভাগীর বেটি, তুই সব খাবার চুরি করে খেয়ে বেড়ালের নামে দোষ দিতিস কেন? সেই জন্যই তো আমার বেড়াল তোর ছেলেমেয়েদের এনে আমাকে দিয়েছে'। ছোট বউ কাঁদতে কাঁদতে বললেন—'মা আমি বড় পাপিষ্ঠা, সংসারে সকলেই আমার ঘেন্না করে, আমাকে দেখে ছড়া কাটে। তাই আমি বনে এসেছি মরতে। এ জীবনে আর আমার সাধ নেই'। মা ষষ্ঠী বললেন, 'মরবি

কেন, যা ঐ ওখানে গিয়ে দেখ একটা বিড়াল মরে পচা গলা অবস্থায় পড়ে আছে। এক হাঁড়ি দই এনে ঐ বেড়ালটার গায়ে ঢেলে দে গে যা। তারপরে জিহ্বে করে ঐ দই আবার হাঁড়িতে তুলে আমার কাছে নিয়ে আয়, তা হলে তোর ছেলেমেয়েদের সব পাবি।' ছোট বউ তাই করলেন। তখন মা ষষ্ঠী ছেলেদের আর মেয়েকে এনে দিয়ে বললেন, 'এদের কপালে দই-এর ফোঁটা দে। আর কখনো চুরি করে খেয়ে বেড়ালের নামে দোষ দিস নি। বেড়ালকে কখনো লাথি মারবি নি। ছেলেদের কখনো বাঁ হাতে মারবি নি, মর বলে গাল দিবি নি'। তাছাড়া জ্যৈষ্ঠ মাসের শুক্লষষ্ঠীতে পিটুলির কাল বেড়াল গড়ে, পিটুলির কঙ্কন গড়ে, ফল-মূলের বাটা সাজিয়ে, ছ'টা পান, ছ'টা সুপুরি ছ'টা কলা, আর বাঁশপাতায় হলুদের নেকড়া জড়িয়ে দু'গাছা সুতো পাকিয়ে তাতে বাঁধবি। এই সুতোকে বলে ষাট সুতো। তারপর তেল হলুদ দিয়ে অরণ্য-ষষ্ঠীর পুজো দিবি। পুজোর পর সেই সুতো প্রত্যেকের কপালে ছুঁইয়ে ডান হাতে বেঁধে দিবি। তারপর ষষ্ঠীব্রতের কথা শুনে ফলমূল কিংবা ফলার খাবি। খবরদার, ভাত খাবিনি যেন। রান্না করবি না যেন। এদিনে রান্না বন্ধ। অরন্ধন। এ নিয়ম মেনে চললে পোয়াতিদের ছেলেপুলে মরে না। বুঝলি'। অরণ্যষষ্ঠী পুজোর আগে ব্রতিনীরা একখানা তালপাতার পাখা ও ভোজ্য এবং নৈবেদ্যের দ্রব্যাদি সহ বনে যান পুজো দিতে। যেখানে বন বা অরণ্য নেই সেখানে গৃহমধ্যে অরণ্য কল্পনা করে অরণ্য-ষষ্ঠীর পুজো অনুষ্ঠিত হয়। শিলাখণ্ডে ষষ্ঠীদেবীর অধিষ্ঠান বলে ধরে নেওয়া হয়। শিলাখণ্ডের অভাবে মশলা পেশনী নোড়া দিয়েও কাজ চালান যেতে পারে। ব্রতের সঙ্কল্প বাড়ীর মেয়েদের নামে হয়। এখানেও মেয়েদের একাধিপত্য। যতজন ব্রত উদযাপন করবেন ততটি তালপাতার পাখা, পাকা আম, দূর্বাগুচ্ছ (ছয় কুড়ি ছয় গাছ) আবশ্যক। ওগুলো নিয়ে ব্রতিনী স্নান করবেন কোন এক জলাশয়ে। বুক জলে দাঁড়িয়ে পাখা ও আম বাঁ হাতে রেখে দূর্বাগুচ্ছ দিয়ে ছয় কুড়িবার চোখে জলের ছিটা দিবেন। স্নানান্তে ও কথা শোনার পর পূর্ব সংগৃহীত অতিরিক্ত দূর্বা এক এক গাছি করে পূর্বোক্ত নোড়ার উপর দিয়ে বলবেন—'অগ্রহায়ণে মূলো ষষ্ঠী ষাট ষাট ষাট (দূর্বাদান)। পৌষে ন্যোটন ষষ্ঠী ষাট ষাট ষাট। মাঘে শীতল ষষ্ঠী, ষাট ষাট ষাট। ফাল্গুনে গুণোষষ্ঠী ষাট ষাট ষাট। চৈত্রে অশোক ষষ্ঠী ষাট ষাট ষাট। বৈশাখে দহ ষষ্ঠী ষাট ষাট ষাট। জ্যৈষ্ঠে অরণ্য ষষ্ঠী ষাট ষাট ষাট। অরণ্যে গেলেও ঝি পুত ফিরে আসে (দূর্বাদান)। আষাঢ়ে চাপড়া ষষ্ঠী ষাট ষাট ষাট। শ্রাবণে লুণ্ঠন ষষ্ঠী ষাট ষাট ষাট। আশ্বিনে বোধন ষষ্ঠী ষাট ষাট ষাট। কার্তিকে শ্মশান ষষ্ঠী, শ্মশানে গেলেও ঝি পুত ফিরে আসে ষাট ষাট ষাট (দূর্বাদান) প্রভৃতি। কালে এই ব্রতের সঙ্গে জামাইষষ্ঠী অনুষ্ঠান যুক্ত হয়ে যায়। ধর্মানুষ্ঠানের সঙ্গে এর কোন যোগ নেই। জামাইকেও ষাট দেওয়া হয়। এই ব্রত করে কি হয়? 'হয়ে পুত্র মরবে না। চোখের জল পড়বে না'।

অরণ্য ষষ্ঠী বা শুক্ল ষষ্ঠী ব্রতের মত শীতল ষষ্ঠীর দিনেও অরন্ধনের, বা রন্ধন ধর্মঘটের বিধান। কিন্তু কোন এক দালালের প্ররোচনায় বাড়ীর গিন্নি এ ধর্মঘট ভাঙলেন। হঠাৎ বললেন, 'আজ কিন্তু ঠাণ্ডা জলে চান করতে পারবো না। আমাকে এক হাঁড়ি গরম জল করে দাও, ভাতও রেঁধে দাও, এক হাঁড়ি গরম জলে চান করে গরম গরম ভাত খেয়ে দেখি শীতটা মরে কিনা'। নাতবউয়েরা তো অবাক। তারা একে অন্যের মুখের দিকে চাইতে লাগল, ইশারায় কথা কয়ে চলল। সকলেই ভাবল বুড়ীকে ভীমরতিতে ধরেছে। নইলে আজ শীতল ষষ্ঠীর দিন। উনুন জ্বালাতে নেই। আজ বুড়ী কিনা তাই করতে বলছেন। বুড়ীর আদেশে নাতবউয়েরা তাকে গরম জল ও গরম গরম ভাত দিল। খেয়ে দেয়ে বুড়ী ঘুমিয়ে পড়লেন. পরদিন সকালে ঘুম থেকে উঠে বুড়ী কি না দেখেন বাড়ীর কুকুর বিড়ালসহ পুত্র-পুত্রবউ, নাতি, নাত-বউ সব মরে পড়ে আছে যে যার জায়গায়। বুড়ী কেঁদে পাড়া মাথায় করলেন। অবশেষে ষষ্ঠীদেবী এক বৃদ্ধার বেশে এসে বললেন—'ভাল করে গরম জলে চান আর গরম গরম ভাত খাও—দেখলে তো মজা।' বুড়ী ষষ্ঠীদেবীর পা জড়িয়ে ধরে বললেন—আমাকে বাঁচাও মা, কথা দিচ্ছি আর কোনদিন এ কাজ করবো না। ষষ্ঠীদেবী তখন বললেন—'যা, তোর নাত-বউয়েরা যে শীতল ষষ্ঠী পেতেছে সেই ষষ্ঠীর গায়ে যে দই হলুদ আছে তা এনে সকলের আগে কুকুরের কপালে ফোঁটা দিবি। তারপর আর সবাইর কপালে, তারপর ঐ হলুদ ছোপান সুতো ছেলে নাতি ছেলের বউ নাতবউদের হাতে তাগা করে বেঁধে দিবি। তা হলেই সব আবার বেঁচে উঠবে। আর হাঁ, আর কখনও শীতল ষষ্ঠীর দিন উনুন জ্বালাবি না। গরম ভাত খেতে চাবি না। এদিনে অরন্ধন পালন করবি।' মা ষষ্ঠীর পরামর্শানুযায়ী কাজ করে বুড়ী সকলকে ফিরে পেলেন। সেই থেকে দালালদের কুহকে ভুলে ধর্মঘট ভাঙার কোন কাজে নিজেকে না লাগাবার শপথ নিলেন। অন্যেরাও বুড়ীর থেকে শিক্ষা গ্রহণ করলেন।

আশ্বিন সংক্রান্তির দিনের যে গাড়শী ব্রত উদযাপিত হয় তাও হয় রন্ধন ধর্মঘটের মাধ্যমেই। 'আশ্বিনে রাঁধিয়া কার্তিকে খায়, যে বর মাগে সেই বর পায়'—এই ছড়া বলে ব্রত আরম্ভ। 'গাড়শী' বোধহয় গার্হস্থ্য শব্দের অপভ্রংশ। রাত্রির চতুর্থ প্রহরে কাক ডাকার পূর্বে গাত্রোত্থান করে বালকবালিকা সধবা বিধবা সকলে অন্তঃপুরের প্রাঙ্গণে জ্বলন্ত প্রদীপ হস্তে সমবেত হন। পুষ্করিণী থেকে এক ঘটি জল এনে কিছু

বাটা মশলা যথা সরিষা, মেথী, হলুদ, **কুলগাছের** নতুন পাতাসহ এক জায়গায় **স্থাপন করবে।** প্রদীপের শিখার উপর **দু' একটি** কাঁচা তেঁতুল পোড়ান হবে, **তারপরে উলুধ্বনি** সহকারে ঘট স্থাপনা **হবে। ঐ জায়গায়** ব্রতকথা অনুষ্ঠিত হবে। **এদিনে ব্রতিনীদের** কোন কাজ নেই। রান্না **নেই। বাসি** খাবার খেতে হবে। কার্তিক **সংক্রান্তির** দিনে রান্না না করে খই চিড়া **দই ইত্যাদি** খাওয়ার প্রথা। গঙ্গাপুজোর দিনেও পশ্চিমবঙ্গে অরন্ধন প্রতিপালিত হয়। শ্রাবণ সংক্রান্তির অরন্ধন অঞ্চল ভেদে নানা নামে অভিহিত। যেমন হাওড়ায় 'ঢেলাফেলা', বাঁকুড়ায় 'খই ধরা', বর্ধমানে 'খইদই', নদীয়ায় 'পাতালফোঁড়' প্রভৃতি। প্রত্যেক সংক্রান্তিতেই স্নান, দান, ব্রত, উপবাস প্রভৃতির বিশেষ বিশেষ বিধান আছে। জল সংক্রান্তি, দান সংক্রান্তি, অম্ল সংক্রান্তি, ফল সংক্রান্তি, ধর্মঘট আইয়ো সংক্রান্তি প্রভৃতির সঙ্গেও অরন্ধন বা রান্না বন্ধের যোগ আছে। ধর্মঘট আইয়ো ব্রতে একমাস প্রতিদিন একটি জলপূর্ণ কলসী দানের বিধান আছে। অরন্ধনে থেকে শুদ্ধাচারে কলসী দান করলে তাতে সুফল পাওয়া যায়। ব্রত শেষে বলা হয়—'পরের মন্দে ভাল যে করে, তাতে পুতে সে বাড়ে। পরের ভালোয় মন্দ যে করে, ভস্ম হয়ে সে মরে।'

অরন্ধন লোকায়ত ধর্মানুষ্ঠান। স্বর্গ-লাভ এখানে কাম্য নয়। বিশ্বাস ও মন্ত্র-

ক্ষেত্রের সাফল্য বৃহত্তর ক্ষেত্রে বিস্তার লাভ করে। জাদু সৃষ্টি করে। তাই লোকায়ত ধর্মে আছে ইন্দ্রজালের প্রবণতা। এই ইন্দ্রজাল কালক্রমে ধর্মের অবয়বে রূপান্তরিত হয়। ধর্ম ইন্দ্রজালকে ধীরে ধীরে নিস্তেজ করে এগিয়ে যায়। তাই যেখানে ইন্দ্রজালের ব্যর্থতা সেখানে ধর্মের সূত্রপাত। ইন্দ্রজালের দৃঢ়ভিৎ বিশ্বাস, প্রাকৃতিক নিয়ম অলংঘনীয়। আর ধর্মের ধারণা, প্রাকৃতিক নিয়মের অধিদেবতাকে পরিতুষ্ট করে নিয়মের সীমা লঙ্ঘন করে চলা। সমাজ থেকে রাতারাতি এ বিশ্বাসের বিলুপ্তি অসম্ভব। বিশেষত আমাদের সমাজে যেখানে বিজ্ঞান বুদ্ধি অনায়ত্ত। দৈনন্দিন জীবন আমাদের প্রতিদিনের অশন-বসন, চলন-বলন, আমোদ-উৎসব, খেলাধুলো, মনন, কল্পনা, অভ্যাস ও সংস্কারকে ব্যক্ত করে শীলাচরণ এবং ব্যবহারিক জীবনচর্যার মাধ্যমে। আজও তাই সেইসব প্রাচীন আচার-আচরণ-আদর্শ অনুষ্ঠান আমাদের মধ্যে সক্রিয় যা আমাদের পিতামহ প্রপিতামহদের আমলেও ছিল। মাতার যে কামনা—শুভ্র নিষ্কলঙ্ক সুদর্শন সন্তানের জননী হওয়া তা সেকালেও ছিল, আজও আছে এবং ভবিষ্যতেও থাকবে। এই কামনা থেকেই এ বিশ্বাস চলে আসছে যে শুক্লপক্ষের গোড়ার দিকে নবোদিত চন্দ্রের পূর্ণ-গোলক রেখা প্রত্যক্ষ করলে প্রসূতি চাঁদের মত স্নিগ্ধ সুন্দর সন্তান প্রসব করবেন, অনুরূপ ভাবে আরাধ্য দেবতা বা পুরুষের ছবি দেখলে তাঁর মত সন্তানেরই জন্ম হবে। তীর্থ-স্নান, উপবাস, দান ও অরন্ধনাদি প্রাচীনকাল থেকে আজ পর্যন্ত প্রায় সমান উৎসাহ ও বিশ্বাস নিয়ে অনুষ্ঠিত হয়ে চলেছে।

বাঙলার লোকজীবনের সঙ্গে যাঁরা পরিচিত তাঁরাই জানেন যে মাঠে হল চালনার প্রথম দিন থেকে অনাবাদ বীজ ছড়ান, ধান-বোনা, ফসলকাটা, ফসল তোলা থেকে গো-মহিষাদির পুজো চলে আসছে। আমাদের জীবনবৃত্তের প্রত্যেকটি পর্যায়ে প্রত্যেকটি কর্মই আচার অনুষ্ঠানের মারফৎ সম্পন্ন হয়ে আসছে যুগ যুগ ধরে। বলাবাহুল্য যে শুধু কৃষিজীবনকে আশ্রয় করেই নয় শিল্পজীবনেও বিশেষ বিশেষ দিনে কামারের হাঁপড়, কুমোরের চাকা, তাঁতীর তাঁত, চাষীর লাঙল, ছুতোর রাজমিস্ত্রীর কারুযন্ত্র, কল-কারখানার যাবতীয় যন্ত্রপাতিকে আশ্রয় করে এক এক ধরণের ধর্মানুষ্ঠান চলে আসছে। এরই কিছুটা আবরীকৃত রূপ আমরা ভাদ্র সংক্রান্তির বিশ্বকর্মা পুজোর মধ্যে প্রত্যক্ষ করি। বিশ্বকর্মা বিশিষ্ট শিল্পী ও স্থপতি। দেবতাদের পংক্তিতে পাংক্তেয় হলেও তিনি দেবতাদের বেতনভুক কর্মচারী। আর্যদের মহলে তাঁর আভিজাত্য অত্যন্ত ক্ষীণ। শুধুমাত্র কাব্যোপলক্ষ্যেই তাঁকে স্মরণ করা হতো— 'বিশ্বকর্মা' মনি হাড়ি হুংকার ছাড়িল। খাড়া আনা মনি ডাকাইতে লাগিল। ডাকমাথা তিনজন দরশন দিল। তিনজনে আসি হাড়িকে প্রণাম। কান ডাকন গুরু আমার গুরু কি কারণ। হাড়ি বলে হাতে জাদু করে প্রাণে চাও। বাজার ছেইন্যা নিদ্রা পাইল বুকেশ্বর তলে। মারুথি (গ্রাম্যপথ) বান্দি নইল আমি ডারাইপুর শহরে। ইত্যাদি। বিশ্বকর্মাকে দেবশিল্পী হিসাবে মানতে হয়েছিল, কারণ আর্যেরা উল্লেখযোগ্য কোন শিল্পচেতনা নিয়ে আসেন নি। এলে একদিকে ময়দানব, অন্যদিকে বিশ্বকর্মার এত নামডাক কিছুতেই হত না। এই নামডাক সবই কার্যকারণ সম্পর্কের উপর দাঁড়িয়ে। বিশ্বকর্মা অবশ্য দেবশিল্পীর আসন পেলেও আর্যকন্যার পাণিগ্রহণে সক্ষম হন নি। অনার্যদের প্রভাবপুষ্ট আর্যেরা তাঁদের শিল্পচেতনাকে নতুন দিকে মোড় ঘুরিয়েছিলেন আর্য-অনার্যের সংঘর্ষের দেবদানবের লড়াইয়ের পথ ধরে,, বিশ্বকর্মা দেবশিল্পী হলেন, দেবভক্ত মানুষের দেবতায় পর্যবসিত হলেন, কিন্তু তবুও তাঁর মূর্তি সৃষ্টি হলো না। ভাদ্রসংক্রান্তির অরন্ধনের এই দিনটিতে সম্প্রতি যে বিশ্বকর্মা মূর্তি পূজিত হচ্ছে তার বয়স পঞ্চাশ বৎসরের বেশী হবে না। গজবাহন, দেবসেনাপতি কার্তিকের মত সুন্দর সুঠাম দেহের অধীশ্বর বিশ্বকর্মার এ মূর্তি কুমারটুলীর মৃৎশিল্পীদের, যাঁরা নিজেদেরকে বিশ্বকর্মার বংশধর বলে মনে করেন, তাঁদের দান। মধ্যযুগের সাহিত্যের ভল্লুকবাহন বিশ্বকর্মা কি ভাবে গজবাহনে রূপান্তরিত হলেন অথবা অসুন্দর এই দেবতাটি কি ভাবে কার্তিকের মত সৌন্দর্য পেলেন তা গবেষণার বিষয়।

এ প্রসঙ্গে স্মরণীয় যে ধনতান্ত্রিক সভ্যতার আক্রমণে আমাদের প্রাচীন জীবনের 'মোড়' বা প্যাটার্ন গেল পাল্টে। অথচ এর জায়গায় বলশালী ধনতান্ত্রিক সভ্যতারও উদয় হল না। জন্ম নিল কিম্ভূতকিমাকার পদার্থ। গ্রাম ফাঁকা হয়ে চলল। ব্রিটিশ যুগে অর্থনৈতিক দিক থেকেও গ্রামীণ শ্রেণী বিন্যাস অন্যদিকে মোড় নিল। মুসলীম আমলে সরকারী তহবিলের একমাত্র সম্বল ছিল ভূমিরাজস্ব। অন্য রাজস্ব থাকলেও তাদের উল্লেখযোগ্য কোন ভূমিকা ছিল না। কাজেই ঐ সময় কৃষক সম্প্রদায়ের উপর যতই অত্যাচার অবিচার অনুষ্ঠিত হতে থাকুক না কেন, স্বর্ণডিম্বপ্রসবিনী হংসটিকে বাঁচিয়ে রাখার চেষ্টা চলতো। এর পরিচয় পাওয়া যায় 'তকশীম' বা চাষী কর্তৃক উৎপন্ন ফসলের উপর রাজস্ব নির্ধারণ এবং 'হস্তবুদ' বা মোটামুটি আন্দাজী অঙ্কের উপর রাজস্ব নির্ধারণ ব্যবস্থায়। ইংরেজ মুসলমানদের 'হস্তবুদ' ব্যবস্থা তো মানলেনই তার উপর চাপালেন চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত। বিভিন্ন প্রজাস্বত্ব আইন এমনভাবে জুড়ে দিলেন যে গ্রামাঞ্চলের চেহারা গেল বদলে। পূর্বে জমির শোষণকারীদের সংখ্যা বেশী ছিল না। ক্রমে বহু শোষক এসে গেল। চাকড়া খাজনা ইত্যাদি দেবার পরেও যদি চাষী কোথাও লাভবান হতেন তবে সেটুকুও কেড়ে নেবার ব্যবস্থা হল ১৮৫৯ সনের 'রেন্ট এ্যাক্ট'। ফলে গ্রামে নতুন শ্রেণী গড়ে উঠলো। গ্রাম ও শহরের লোকেদের মধ্যে আচার আচরণের তফাৎ দেখা দিল। সংক্রান্তি, স্নান, উপবাস অরন্ধনাদির 'প্যাটার্ণ' শহরে এক, গ্রামে আরেক। শহরের বিশ্বকর্মা এখন মূর্তির মাধ্যমে পূজিত, গ্রামের অনেক জায়গায় এখনও এ মূর্তি যায় নি। সেখানে দা, কুড়াল খুন্তী, যন্ত্রসমূহকেই বিশ্বকর্মার প্রতীক হিসাবে পুজো করে থাকেন। ক্রমে ধর্মানুষ্ঠানের সঙ্গে আনন্দানুষ্ঠান যুক্ত হয়ে এক একটি দিন এক এক প্রকার উৎসবের সৃষ্টি করেছে। সে উৎসবের কোথাও আছে ভূরিভোজ, কোথাও আছে অরন্ধন বা বাসি শীতল খাবার খাওয়া, স্বভাবতই তা স্বল্পভোজের আওতায় আসে। কিন্তু কোন ক্রিয়াকর্মই আনন্দের অভাব বা অসদ্ভাব নেই।

আনন্দের স্বভাবই হচ্ছে ক্রীড়া। আনন্দ স্বতঃই নিজেকে বিচিত্র প্রকাশের মধ্যে মুক্তিদান করতে থাকে। আনন্দের কর্মের মধ্যেই আমরা মুক্ত। আনন্দের নিষ্ক্রিয়তাই তার বন্ধন। কর্মই তার মুক্তি। কর্মের মুক্তি আনন্দের মধ্যে। আনন্দের লক্ষ্য কর্মের দিকে। কর্মের মধ্যে এই আনন্দের অভাব ঘটলে দেখা দেয় অশান্তি; বিঘ্ন সৃষ্টি হয় কর্মে। এই বিঘ্ন থেকে মুক্তির জন্য, অশান্তি থেকে শান্তির জন্য প্রায়শই আহ্বান দেওয়া হয় ধর্মঘটের। ডাক দেওয়া হয় বন্ধের পরম শান্তি ও নির্বিঘ্নে কাজ করে আনন্দ পাবার জন্যই ধর্মঘট। কাজের আনন্দ বা আনন্দের সঙ্গে কাজ করতে অর্থনৈতিক স্বাধীনতার প্রয়োজন যে কত তা বলার দাবী রাখে না।

১৯০৫ সনের আশ্বিন সংক্রান্তি (১৬ই অক্টোবর — ৩০শে আশ্বিন) ব্রিটিশ সরকার যখন বঙ্গভঙ্গের দিন ঘোষণা করলেন তখন সারা বাংলার গায়েভূঁয়ে এ দিনটিকে ক্ষোভ ও দুঃখের প্রতীক করে তোলার আয়োজন করা হয়। রবীন্দ্রনাথ বঙ্গ মিলনের চিহ্নস্বরূপ 'রাখীবন্ধন' ও রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী 'অরন্ধন' পালন করতে প্রস্তাব রাখলেন। রাজনৈতিক সমাজ এ প্রস্তাব সাদরে গ্রহণ করলেন। শোকচিহ্নস্বরূপ আশ্বিন সংক্রান্তি বা ৩০শে আশ্বিন প্রতিপালিত হল অরন্ধন দিবসরূপে। এই অরন্ধনের সংগে ইতিপূর্বে বর্ণিত ধর্মাশ্রিত অরন্ধনের কোন যোগ ছিল না। এই অরন্ধন ছিল সম্পূর্ণ রাজনৈতিক কারণে। তাই বলা হয়েছিল শিশু ও রোগী ব্যতীত এ দিনে কেউই অন্নজল গ্রহণ করবেন না, সকলেই খালি পায়ে থাকবেন। কোন বাঙালীর ঘরে উনুন ধরবে না। সব বন্ধ। সব ধর্মঘট। এইভাবেই ধর্মাচরণের অংগ অরন্ধন, উপবাস প্রভৃতি কালক্রমে ট্রাডিশন থেকে রাজনৈতিক লড়াই-এর হাতিয়ারে পরিণত হয়েছে। ধর্মীয় উপবাস থেকে এসেছে অনশন। একই সরণি বেয়ে সকলের আনাগোনা, যে সরণী বেয়ে গ্রাম শহরের মধ্য পার্থক্য সৃষ্টি হয়েছে, যে সরণি বেয়ে বিশ্বকর্মার মূর্তি রূপান্তরিত হয়েছে, সেই সরণি বেয়েই ধর্মীয় বন্ধ, উপবাসাদি পরিবর্তিত সমাজ ব্যবস্থা ও বদলের মধ্য দিয়ে স্ট্রাইক, ধর্ণা, ঘেরাও অনশনাদিতে পর্যবেশিত হয়েছে।

লড়াইকে সফল করতে, ন্যায্য দাবী প্রতিষ্ঠিত করতে ট্রাডিশনাল উপাসনা, আচার-আচরণ, উপবাস ও অরন্ধনের রাজনৈতিক রূপ ধর্মঘট, বন্ধ, অনশনাদি যে কত কার্যকর তা ভুক্তভোগী মাত্রেরই জানা। বলাবাহুল্য এই দুই লড়াই-এর পদ্ধতিতে অনেক তফাৎ। কিন্তু একথা স্বীকার করতেই হবে যে উভয়েরই উদ্দেশ্য প্রায় এক। এবং সে উদ্দেশ্য সিদ্ধির সংগ্রামে এই সব হাতিয়ার অহরহই ব্যবহৃত হয়ে আসছে। রাজনৈতিক ধর্মঘটে শ্রমিক মালিকের কাছে, সরকারী কর্মচারী সরকারের কাছে নানাবিধ দাবী পেশ করেন, লড়াই করে তা আদায় করেন। আর ধর্মানুষ্ঠানকারীরা উপবাস করেন আত্মশুদ্ধির জন্য, অরন্ধন পালন করেন শাস্ত্রীয় বিধান বা লোকাচারের জন্য তাঁরাও তাদের দাবী পেশ করে মহামহিম পরমেশ্বরের কাছে। কিছু একটা পাওয়ার চিন্তা উভয়ের মধ্যেই প্রকট। কাজে কাজেই বলা যেতে পারে যে উভয়েরই উদ্দেশ্য এক; অর্থাৎ হয় আমাতে সমর্পণ নয় সমূলে বিনাশ। দেবদেবীদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে কোন কাজ করলে অথবা দেবদেবী চরণে সম্পূর্ণ আত্মসমর্পণ ব্যতীত ব্যক্তিদের যে কি হাল হয় তা আমরা পূর্বে উল্লিখিত কিছু চুম্বক ব্রতকথার মধ্যে দেখেছি। আর প্রতিনিয়ত দেখছি মালিকে সমর্পিত না হলে কর্তার ইচ্ছানুযায়ী কর্ম না করলে শ্রমিক কর্মচারীদের ও কনিষ্ঠদের যে কি দশা হয়।

আদায় করে নেওয়ার রাজনৈতিক আন্দোলনে ইচ্ছায় হউক কি অনিচ্ছায় হউক আমরা শামিল হয়ে চলেছি। এ লড়াইর সৈনিকেরা ভুলতে পারেন না ধর্মানুষ্ঠানের ধর্মঘট উপবাসাদির পথকে সম্পূর্ণ প্রত্যাহার করতে। এই কারণেই পশ্চিমবংগের সংগ্রামী জনগণকে স্মরণ করিয়ে দেবার দরকার আছে আগামী ১৭ই সেপ্টেম্বরের কথা। ভাদ্র সংক্রান্তির অরন্ধনের কথা। বিশ্বকর্মা পুজোর এই নিষ্কর্মা দিনটিতে কল-কারখানা বন্ধ ও ধর্মঘটের কথা। কারণ, সম্প্রতি আমরা এক দারুণ আতংক ও অস্থিরতার মধ্য দিয়ে চলেছি। এ অস্থিরতা আমাদের অনেক কথা ভোলাতে বসেছে। কিন্তু এ ভাদ্র সংক্রান্তির কল-কারখানা বন্ধ ও রন্ধন ধর্মঘটকে কিছুতেই ভোলা যাবে না। কিছুতেই যাবে না এ দিনের স্ত্রী-পুরুষ শ্রমিক-মালিক শিক্ষক-ছাত্র, ধনী-দরিদ্র সকলের একত্রিত বিশ্রামের কথা। বরাবর যারা এ ধর্মঘটে অংশগ্রহণ করে আসছেন আমাদের দৃঢ়বিশ্বাস তাঁরা এবারের ধর্মঘটের পূর্বে উৎসাহ ও উত্তেজনা নিয়ে যোগদান করবেন। এ ধর্মঘটকে সাফল্যমণ্ডিত করে তুলবেন। এই প্রসংগেই স্পষ্ট করে বলা দরকার কাউকে জোর করে এ ধর্মঘটে যোগদান করার জন্য বাধ্য কোনদিনই করান হয়নি, আজও হবে না। সেই সংগে সঙ্গে এও জানিয়ে দেওয়া দরকার যে, যারা এ ধর্মঘটে যোগদান করবেন তাদের কোন প্রকার ক্ষতি কোন তরফ থেকে কেউ করতে চাইলে তবে তাঁকে যথোপযুক্ত শাস্তি দেওয়ার ব্যবস্থা হবে, ধর্মঘট ভাঙ্গার বা দালালী করার দায়ে কেউ পড়লে তিনি যতবড় প্রভাবশালী লোকই হোন না কেন, জনগণের দরবারে দাঁড়িয়ে জনগণের ইচ্ছানুযায়ী তাঁকে শাস্তিভোগ করতে হবে।

ক্লান্ত সন্ধ্যায় সিঁড়ি ভেঙে ওপরে উঠতে উঠতে আবার মনে হল সীতার : একটা দিন অপেক্ষায় অপেক্ষায় খরচ হয়ে গেল! না নিখিলেশ বাড়িতেও কোনো খবর রেখে যায়নি। আশ্চর্য, কোথায় গেল, কী হল ওর? ওর কথামতো শ্যামবাজার কফি-হাউসের সামনে ঠিক ছটা থেকে দাঁড়িয়ে-ছিল ও: বাড়িতে মার কিছু ফরমায়েশ ছিল, টুকিটাকি মার্কেটিং, একবার গড়পারে পিসিমনির বাড়িতে খোঁজ নিয়ে আসা! মার কোনো আদেশই পালন করতে পারা যায়নি। কারণ প্রায় হপ্তা দুয়েক পরে নিখিলেশের হঠাৎ এই জরুরি তলব। কী বিশেষ প্রয়োজন আছে। আহ্ প্রয়োজন। এখন স্বাভাবিক কারণে রাগ হল সীতার। যেন ও নিখিলেশের প্রয়োজনের চাকরি করে। এবং ওর কথামতো নাকে দড়ি বেঁধা সুশীল জন্তুর মতো ওকে ধাবিত হতে হবে। সীতা অকারণ জীবনকে জটিল করতে চায় না, ধার-করা উত্তেজনার গুহায় বাস করতে চায় না বলেই নিখিলের আহ্বানে সাড়া দিতে তৈরি ছিল। বস্তুত সেই কারণেই সে গিয়েছিল। নতুন কোনো কৌতূহল কিংবা আকাংখা পোষণ করেনি। নিখিলেশের দৌড় জানতে তার বাকি নেই। আসলে ও নাটক করতে ভালোবাসে। যেন ও ইচ্ছে করলে বাড়িতে আসতে পারত না! বাড়িতে ও কতবার এসেছে, মাকে মাসিমা মাসিমা বলে কত আদিখ্যেতা। হঠাৎ ডুব মেরে আবার ভেসে উঠে ওর প্রয়োজনগুলো যে কী চেহারা নিলো কে জানে। বেশ তো, এলো না কেন। সীতা তো একটা ছেলে-খেলা ভেবেই গিয়েছিল, একটা সন্ধ্যার মতো অপব্যয় জেনেও। নিখিলেশবাবুর দেখা নেই। প্রায় পৌনে সাতটা পর্যন্ত অপেক্ষা করেছে সীতা। ওর ভদ্রতায় কেউ প্রশ্ন তুলতে পারবে না। নিখিলেশবাবু এলেন না! আর সীতাকে একটা বাজে ম্যাটিনি শো দেখে ফিরে-আসা ভোঁতা ক্লান্ত মনোভাব নিয়ে চলে আসতে হল। আচ্ছা, সীতা কেবল নিজের দিকটাই ভাবছে। ধরো নিখিলেশের যদি কিছু হয়েই থাকে, আকস্মিক কোনো বিপদ, দুর্ঘটনা! এমন কী হওয়া সম্ভব নয়? সীতা যেন রাগে অন্ধ হয়ে যুক্তিটা অবিশ্বাস করল। ইচ্ছে করলেই এ জাতীয় আকস্মিক বিপদ হাজারটা বানানো যায়। এবং তাতে নাটকীয়তা অত্যধিক ঘন হয়ে ওঠে। সকালে একটা দেখা-করার নির্ঘণ্ট রচিত করে সেদিন সন্ধ্যার মধ্যেই তা বাতিল হওয়ার কারণগুলি যথেষ্ট বিশ্বাসযোগ্য নয়।

নিখিলেশ ইচ্ছা করেই আসেনি। কিংবা, কিংবা ও ধারেকাছে গা ঢাকা দিয়ে তার বিপন্ন অবস্থা দেখে কৌতুক করেছে। কে জানে, ও হয়তো ভেবে রেখেছিল সীতা আসবে না। সীতা ভ্রূ কুঁচকালো; আহ্, কেন ওর এমন ভাবনা হল। সীতা কী

কলকাতা, কলকাতা

মিহির আচার্য

আজো ওর কাছে কিছু আশা করে! মরণ আর কী। নিখিলেশবাবু তুমি তাহলে মেয়েদের চেনো না। কিছু আশা করলে সীতা নিশ্চয় এমনভাবে দেখা করতে আসত না। পোস্ট গ্রাজুয়েটের দিনগুলি আর নেই। সীতা উনিশ বছরটাকে ত্যাগ করে এসেছে। সীতার না-আওয়ার অর্থ হত ও কখনো নিখিলেশকে মনে রেখেছে। নিখিলেশ আত্মম্ভরিতার স্বপ্ন দেখে সুখী হতে পারত। এইতো সীতা অসংকোচে হাজির হল। নিখিলেশ সম্মুখীন হতে পারল না কেন। তার কারণ, সীতা ঠোঁট কুঞ্চিত করল, দুর্বল, দুর্বল একেবারে। হোপলেস। সীতা সীতা সীতার উপস্থিতি নিখিলেশকে কাপুরুষ করে দিয়েছে। সে বুঝতে পেরেছিল একঘেয়ে খেলা আর চলবে না। হ্যাঁ নিশ্চয় ওর সঙ্গে চা বা কফি খেতে সীতা তিলমাত্র আপত্তি করত না, কী পার্কের নির্জন পথে হাঁটতেও। কিন্তু, তারপর? কফির পেয়ালা শেষ হত, হাঁটায় ক্লান্তি আসত। তারপর ওই নির্জন পার্ক দেয়ালগুলো বরফের মতো শীতল হয়ে আসত, তখন...? ওর প্রয়োজনের ব্যাপারটাকে কী স্মরণ করে দিত সীতা? বড় ভুলো মন নিখিলেশবাবুর। নিখিলেশ অত ঘন ঘন সিগারেট খাচ্ছে কেন। ওর চোখ জোড়া আঁতিপাঁতি কী খুঁজছে। আহা, নিখিলেশবাবু তোমাকে দেখে আমার ভীষণ কষ্ট হচ্ছে। হাসতে গিয়ে সীতার চোখ ছলছল করে উঠল। চোখ দেখাতে হবে। পাওয়ার বাড়ল কিনা কে জানে। নিখিলেশ জানি হেঁটে হেঁটে বাস কাবার করে দিলেও তোমার কথাগুলো আর সরব হবে না। কারণ কথা তো আর মুখস্ত শব্দপিণ্ড নয় যে, রোজ রোজ একইভাবে প্রয়োগ করে যাবে। কথাগুলোর অর্থ আছে, ব্যঞ্জনা আছে। তা না হলেতো সঙ্গে টেপ-রেকর্ডার নিয়ে বেরোলেই পারতে। এখন কী তোমার মুখস্ত কথাগুলোকে রোমন্থন করতে অনিচ্ছা হচ্ছে! নাকি সীতাকে ভয় করছে নিখিলেশ! কেন? ডাকামাত্রই যে মেয়ে হুজুরে হাজির, তাকে আর ভয় কী। তুমি ইচ্ছে করলে বিনা বাধায় সীতাকে ট্যাক্সি করে তোমার সেই উদার বন্ধুর ব্যাচেলারস ফ্ল্যাটে নিয়ে যেতে পারো। যেমন নিয়ে গিয়েছিলে একদিন? তখন বয়েসটা উনিশ ছিল, তাই না?

কী বলছ ওসব কথা কেন? না, হঠাৎ মনে পড়ে গেল, তাই বলছি। মানে, তুমি যে-যে কাজগুলো পারো আর কী। নিখিলেশ তুমি অবশ্যই স্বীকার করবে সেদিন তোমার অনেক কাজেরই আমি নিঃশব্দ সঙ্গী ছিলাম। তুমি নিশ্চয় আমার সাহসের প্রশ্ন তুলবে না। দ্যাখো আজো আমি তোমাকে অফার দিচ্ছি তোমার সুবিধেমতো যে কোনো নিরিবিলি অ্যাপার্টমেন্টে আমাকে নিয়ে যেতে পারো, আমি বাধা দেবো না। হি হি হি। দেখলে তো আজ তোমার নিজের শক্তির পরেই বিশ্বাস নেই। তুমি জানো সীতার বয়েস আজ পঁচিশ। পঁচিশ বছর বয়েসের মেয়েকে নরম শয্যায় দীর্ঘকাল আটকে রাখা যায় না। যায় কি? তুমিই বলো নিখিলেশবাবু? তাহলে আর তুমি সীতাকে নিয়ে কী করবে? উনিশ বছরের শরীরের লোভকে নিয়ে তো আর পঁচিশ বছরে জ্যাবলামি করা যায় না! স্বভাবতই তুমি অমন পরিবেশে আমাকে নিয়ে যেতে ভয় পাবে। তোমার বাকচাতুরি এবং শারীরিকতা—দুটো বিষয়ই আমার কাছে বস্তাপচা। ইতিমধ্যে ডি-ভি-সির বাড়তি জল-ছাড়ার ফলে বছর-বছরই দামোদরে বন্যা হয়ে চলেছে। আমরা এমন একটা বাঙলাদেশে বাস করছি যেটা দুঃস্বপ্নের মতো ভয়ংকর। এই দুঃসময়ে তোমার কথাশিল্প এবং সমস্ত দৈহিক বিজ্ঞাপন অবান্তর হাস্যকর। আমরা আগুনের বেড়ার মধ্যে বাস করছি, প্রতিদিন এই বেড়ার মধ্যে থেকে কাজ করে যেতে হচ্ছে। কোনো দিন কলেজে যেতে পারছি, কোনো দিন মাঝপথে ফিরে আসতে হচ্ছে। বন্ধ, হত্যা, ঘেরাওয়ের সঙ্গে তাল রেখে কলেজে পড়াচ্ছি। জানিনে এই সকল প্রশ্ন তোমাকে বিদ্ধ করে কিনা! তাই হঠাৎ তোমার এই খাপছাড়া আমন্ত্রণে অবাক হয়েও গরহাজির হতে পারিনি। কিন্তু নিখিলেশবাবু এল না।

ঘরে পা দিতেই মা বলল : 'কী রে? এত শিগ্‌গির ফিরলি?'

সীতা মেজাজ করে বলল : 'কৈফিয়ত দিতে হবে?'

'শোনো মেয়ের কথা! বলছি যে ফিরতে দেরি হবে!'

সীতা গম্ভীর হয়ে বলল : 'অ বলেছিলাম বুঝি?'

'আহা!'

'মা একটু চা করবে? ভীষণ মাথা ধরেছে।'

সীতা শয্যায় কাত হয়ে পড়ল।

চোখের সামনে শাদা দেয়াল আর যামিনী রায়ের সুন্দর ল্যান্ডস্কেপটি টাটা কম্পানির দৌলতে ক্যালেন্ডার হয়ে ঝুলছে। নিখিলেশ তাহলে কথা রাখল না। ভীষণ অন্যায়। এমনভাবে সীতাকে রাস্তায় দাঁড় করিয়ে-রাখা। আহা, এত তাড়াতাড়ি বাড়ি না ফিরলে ভালো হত। বাড়িতে পা দিয়ে মনে হল বাড়িতে এখন ওর কোনো কাজ নেই। মা এখন পায়ে পায়ে জড়িয়ে থাকবে, আজকাল মা এমন ঘনিষ্ঠ মুহূর্ত খুব কম পায়। মা ভাবে সীতা এখনো ছোটো আছে। মা একটা বিরক্তিকর অস্তিত্ব, উচ্চারণ করেই হাসল সীতা। নিখিলেশের কী হল! দিনকাল যেমন। বাড়িতে সাত-তাড়াতাড়ি না ফিরে সুতপার ওখানে জমিয়ে আড্ডা দেয়া যেত। কলেজে কলিগদের মধ্যে সুতপার সঙ্গে যা দু-একটা কথা বলা যায়। বাঙলাদেশের উদ্বাস্তুদের সাহায্যে একদিনের মাইনে দেয়ার ব্যাপারে কী-অসভ্য হইচই করে উঠল বিদুষী অধ্যাপকরা। অথচ দৈবাৎ কলেজে দুঃস্থ মেয়েরা ভ্যানিটি ব্যাগ বেচতে এলে শাড়ির রঙ মিলিয়ে ব্যাগ কেনবার ধুম পড়ে যায়। তখন টাকা বেরোয়! সুতপাই সেদিন তার পক্ষ নিয়ে টিচারস-রুমে ঝগড়া করেছিল। উচিতবক্তা মেয়েটা। আমরা ক্রমশ ছোটো হয়ে যাচ্ছি, কলেজের সঙ্গীরা অসহ্য। নাভিমূলের বাইরে চোখ মেলে জগতটাকে দেখতে ভুলে যাচ্ছি। কেবল মাইনে বাড়াও, ডি-এ বাড়াও। চারদিকের অমানবিক এই অভাব, দুঃখ-যন্ত্রণা, উদ্বাস্তু...। যামিনী রায় এত সুন্দর ল্যান্ডস্কেপ আঁকেন কালিঘাটের পট ঝুঁকলেন কেন। নিখিলেশ মনে করলে বাড়িতেও আসতে পারে। তাড়াতাড়ি বাড়ি-ফেরার যেন জরুরি কারণ খুঁজে পেল সীতা। আচ্ছা? সীতা নিজের মনে হাসল : দেরি করেও যদি নিখিলেশ শ্যামবাজারে পৌঁছয়, তাকে দেখতে না পেয়ে পরবর্তী কাজ হবে ওর সীতার বাড়িতে আসা। সুতপার বাড়িতে আড্ডা দিলে নিখিলেশ যোগাযোগের সূত্র হারাত। বিছানায় শরীরটাকে নিভার ছড়িয়ে দিল সীতা। মা একটা জ্বালা, আবার হাসল সীতা।

'মা—'

'হ্যাঁ এইযে। শুধু চা খাবি?'

সীতা মার দিকে তাকাল।

'কী দেখছিস অমনি করে?' মা হাসল।

'সার্থক জনম মাগো জন্মেছি...' মার গলা জড়িয়ে আদুরেপনা করল সীতা।

'তোদের আজকাল স্বদেশী গানের ফ্যাশান হয়েছে...' মা হাসল।

'আজ বাঙলাদেশের দুঃস্থ হতে...'

'আ, ছাড় ছাড়।' মা বলল : 'আজ তোর সঙ্গে একটা দরকারি কথা...'

'জানি। ছোটোমামার সেই বন্ধুর কোথায় মুনসেফের পোস্টিং পেয়েছে?'

'ছেলেটি ভালো। শিক্ষায়-দীক্ষায় বংশ-গৌরবে...'

'মা, এ সমাজে যে যত শিক্ষিত সে তত মূর্খ...'

'বাজে কথা রাখ। কেন? তোর সুবিমলকে পছন্দ নয়?'

'আ, মা!'

'তোকে কথা দিতেই হবে।'

'কথা! মা তুমি শেক্সপীয়র পড়েছ?'

'না। তুই কৃত্তিবাসী রামায়ণ পড়েছিস?'

'আহ্‌ পুত্তর মাদার...'

'আমি ইংরিজি বুঝিনে বলে ইয়ার্কি করিসনে।'

'মা তোমার কোনো উচ্চাকাঙ্খা নেই?'

'জ্বালাসনে। মেয়েদের ভালো বিয়ে হওয়া ছাড়া আর কী আকাঙ্খা আছে? নাকি তুই বিবেকানন্দ হবি ঠিক করেছিস? এসব দেখবার জন্যে কী আমি বেঁচে আছি।'

'মা আমাদের প্রধানমন্ত্রীর নাম করো তো?'

'কেন? ইন্দিরা গান্ধী।'

'তবে?'

মা বলল : 'তুই ইন্দিরা গান্ধী হবি?'

'বিয়ে করা ছাড়াও মেয়েদের উচ্চাকাঙ্খা থাকে।'

'তোর সঙ্গে কথায় পারব না বাপু। তাহলে ওদের কী জানাব বল? অমন ছেলে কী পড়ে থাকবে?'

'মা আজ কাগজে নটা খুন।'

মা চুপ।

'আমি যে দেখিনু তরুণ বালক উন্মাদ হয়ে ছুটে। কী যন্ত্রণায় মরেছে পাথরে

নিষ্ফল মাথা কুটে। মা—' নিখিলেশের কী এখনো আসার সময় হল না। তাহলে আর বাড়ি-ফেরার কী মানে হল। 'মা রাগ করো না। এখন এ জাতীয় বিষয় নিয়ে তোমার আমার মধ্যে রাগ করার কোনো অর্থ নেই। তুমি নিশ্চয় জানো আমি মুনসেফের বউ হলে তোমার কিছু দশটা হাত গজাবে না।'

মা রাগ করে চায়ের বাটি নিয়ে উঠে গেল।

বাইরের জামাকাপড় ছেড়ে ফেললেই হয়। সাড়ে আটটা। এই রাতে আর যেই আসুক নিখিলেশ আসবে না। উত্তর-কলকাতার হাবভাব ওর কোনো কালেই তেমন বরদাস্ত হয় না। ও তো আবার দক্ষিণ শহরতলির ছেলে। তার মানে লেক, গড়িয়াহাট, দখিন বাতাস। তবু যদি সীতা না জানত। আজ উত্তর-দক্ষিণ-মধ্য কোথায় তুমি যাবে? তরুণ বয়েসের প্রেমের উদার ময়দান পর্যন্ত জবলে খাক হয়ে গেছে। সেদিন গলাকাটা বয়স্ক অজ্ঞাতপরিচয় মানুষের লাশ পাওয়া গেছে ময়দানে।

আরে, কে কড়া নাড়ছে না? সীতার চিন্তার আলস্যগুলো যেন গা ঝাড়া দিয়ে উঠল। দোতলার বারান্দা থেকে উঁকি মেরে মানুষটাকে দেখেই আপাদমস্তক বিরক্তিতে ভরে উঠল সীতার।

মা দরজা খুলে দিয়েছে।

'সীতামা আছে?'

'পণ্ডিতমশায়। আসুন।'

একদা ইস্কুলে পড়িয়েছেন বলেই কী জনাদনবাবুর ছাত্রীর ওপর অহেতুক জুলুম করবার অধিকার জন্মে গেছে। কালকেই বলে দিয়েছে মৃদুলার চাকরি হবে না। ইন্টারভিউয়ে একসপার্টদের ওর ওপর খুব খারাপ ধারণা হয়েছে। সাম্প্রতিক বাংলা ছোটো গল্পের গতিপ্রকৃতি সম্পর্কে ও একটা জবাবও দিতে পারেনি। অথচ ও বাংলার অধ্যাপনা করবে! পণ্ডিতমশায়ের অভিমত কলেজে পড়াতে সাম্প্রতিক হালচাল না জানলেও চলে। বেশ তো। গভর্নিং বডির কাছে যান তাহলে। টিচারস কাউন্সিল কী করতে পারে এ ব্যাপারে।

সীতা নত হয়ে পণ্ডিতমশায়ের পায়ের ধুলো নিল।

'আপনি আবার এলেন কেন। বলেছি তো কোনো ডেভেলপমেন্ট হলে আপনাকে জানিয়ে আসব।'

'এদিক দিয়ে যাচ্ছিলাম, ভাবলাম ...'

'চা খাবেন?'

'না এই সময়ে আর ...'

'আপনি অত ব্যস্ত হচ্ছেন কেন? মৃদুলা তো একটা ইস্কুলে আছে।'

'না, কী জানো, তুমি আমার নিজের মেয়ের মতো, তাই বলছি। ওর কলেজের কাজটা হলে ওর জন্যে একটা ভালো সম্বন্ধ অপেক্ষা করে আছে। ছেলেটি অ্যাকাউণ্টেন্ট জেনারেল অাপিসের ইউ-ডি। সম্বন্ধের সময় মৃদুলার কলেজের চাকরি হওয়ার সম্ভাবনার কথাটাও বলা হয়েছিল ওদের। জানো তো আজকালকার ছেলেদের চাকরি-করা মেয়েদের পছন্দ।'

কঠিন একটি মন্তব্য করতে গিয়েও নিজেকে সামলে নিল সীতা। হেসে বলল : 'ইন্টারভিউ তো আরো কয়েকজন দিয়েছে পণ্ডিতমশায়। একজন আবার আমাদের কলেজেরই ছাত্রী।'

'হ্যাঁ সেইজন্যে তো আমার বারবার আসা। শুনেছি প্রিন্সিপাল তোমাকে খুব স্নেহ করেন। ধরাকরা না হলে কী আজকাল চাকরি হয়।'

'বলেছি তো আমার দিক থেকে চেষ্টার কোনো ত্রুটি হবে না।' নিখিলেশ আর এল না।

'তাহলে আজ আসি।'

'আচ্ছা।'

সীতা নিঃশব্দে খোলা ছাদে উঠে এল।

আজকাল রাস্তার বাতিগুলোরও যেন জোর কমে গেছে। আকাশের ছিটনো তারাগুলোও শহরকে আলোকিত করতে পারে না। এই শহর তার পঁচিশ বছরের অস্তিত্বে কেমন ভেঙেচুরে বনেদী বাড়ির অব্যবহৃত ঝাড়লণ্ঠনের মতো পড়ে রয়েছে। আজো কী বাইরে থেকে লোক কলকাতা দেখতে আসে! আচ্ছা সত্যি কোন্ অংশকে কলকাতা বলে? জোড়াসাঁকো, বড়বাজার, ডালহৌসী, চৌরঙ্গি, কালিঘাট, বালিগঞ্জ, কাশীপুর-বরানগর? আহা. কোনটা কলকাতা? ধেৎ।

'এই সীতাদি—'

কে?

'আমি—'

'রমা না? কবে এলে শ্বশুরবাড়ি থেকে?'

'পরশু।'

'কেমন ভালো তো? কদ্দিন মেয়াদ? কর্তাকে বেঁধে এনেছ?'

'কোয়ার্টার খালি করে কী আসার উপায় আছে? এক বেলা না থাকলেই সব চুরি হয়ে যায়।'

'তাহলে তো মুশকিল। ওদিকে মানুষটি হয়তো হাত পুড়িয়ে রান্না করছে, অ্যাঁ?'

'হ্যাঁ। কালকেই চলে যেতে হচ্ছে।'

'তারপর? নতুন খবরটবর কিছু আছে?'

'না। নষ্ট হয়ে গেছে।'

'আহা।'

'তোমাকে অনেক দিন পর দেখছি। তুমি আগের চেয়ে সুন্দর হয়েছ।'

'যা।'

'পরের বার এলে তোমাদের বাড়িতে যাব। মাসিমা ভালো আছেন?'

'ভালো থাকা কী সহজ কথা? চলে যাচ্ছে।'

'হ্যাঁ চলে যায়। আজ আসি মা ডাকছে।'

সীতা ঘাড় নাড়াল।

রমার স্মৃতিটা এখন মিষ্টি লাগছে। এই সেদিন পর্যন্ত কী দস্যি মেয়ে ছিল। বছর তিনেক বিয়ে হয়েছে। ওর বিয়েতে বোধহয় ওমরখৈয়াম উপহার দিয়েছিল সীতা। মা দিয়েছিলেন শাড়ি। ছাদে হাওয়া দিয়েছে। সিঁড়ির এখানে ছায়া-ছায়া অন্ধকার। চুপচাপ বসেছিল নিখিলেশ। ও যেন বহুক্ষণ থেকে উশখুশ করছিল। ঘরের আলোতে ওর মুখ থমথমে গম্ভীর দেখাচ্ছিল। প্রশ্ন করে উত্তর পায়নি সীতা। তারপর নিঃশব্দে ছাদে উঠে এসেছিল নিখিলেশ। পরে সীতাও এসেছিল। ছাদের কার্নিশে সীতা হেলান দিয়ে ছুটন্ত গাড়ি লক্ষ্য করছিল। তারপর ধপ করে এসে বসেছিল নিখিলেশের পাশে। নিখিলেশ কী অসুস্থ ছিল সেদিন? আকাশে মেঘগুলো দ্রুত অপসৃত হচ্ছিল। হাওয়া কাঁপছিল। এবং তারপর সীতা এক পলকে দেখল সারা নক্ষত্র-ছিটনো আকাশটা তার মুখের ওপরে ভেঙে পড়েছে, আর চাঁদটা তরুণ পুরুষ মুখাকৃতি হয়ে তার বিস্ফারিত ঠোঁটে প্রণয়-সম্ভাষণ ঢেলে দিচ্ছে। আঁচলে ঠোঁট মুছে অনেকক্ষণ ঘাড় হেঁট করে বসেছিল সীতা। অস্ফুটে শুধু বলেছিল : 'এই সুযোগটুকুর জন্যে তুমি এমন মন খারাপ করো যে আমার খারাপ লাগে।' নিখিলেশ কোনো উত্তর করেছিল কী? মনে পড়ে না। কিশোরের মতো ভীরু লজ্জায় নরম ওর একমাথা-চুল মুখটা দেখে নিশ্বাস ফেলেছিল সীতা। বস্তুত প্রথম থেকেই ওর সঙ্গে সম্পর্কটা একটা উদ্বেগের কাঁটায় থরতর লাগত। নিখিলেশের সমূহ ইচ্ছাটা একটু সুযোগের সন্ধানে অসুস্থ হয়ে উঠেছিল। ও ভিড় ভালোবাসতো না, বন্ধুবান্ধবের সাহচর্যও নয়। ও কী তাহলে পরোমাত্রায় অসামাজিক ছিল! নাঃ নিখিলেশের স্মৃতির একটি নির্দিষ্ট চরিত্র সীতার দর্পণে ধরা নেই। সীতাকে বাদ দিয়ে ওর বাইরের জীবনটার কী কোনো আদর্শ ছিল? কোনো দিন নিখিলেশ তার কোনো সমস্যা নিয়ে সীতার কাছে আসেনি। সীতা তো ওর জীবনের পুরো অংশ নয়, খণ্ড মাত্র, সেই সম্পূর্ণাঙ্গ মানুষটাকে কোনো দিনও বুঝতে পারল না। ও। নাকি ও ওর প্রয়োজনের হিসেবের বাইরে কোনো দিন সীতাকে গণ্য করেনি! কিংবা ও হয়তো ভেবেছিল মেয়েদের শস্তা শরীর-চেতনার উর্ধ্বে আর কোনো জীবন নেই।

'সীতা খাবি আয়।'

মা ডাকছে। এবার নীচে নেমে যেতে হবে। কত রাত হল? তাই আজ দশ-এগারো বছর পরেও দুজনের সম্পর্কটার কোনো উন্নতি হল না। যেমন ছিল তেমন এক জায়গায় দাঁড়িয়ে রইল। নিখিলেশ তার স্বভাবের বাইরে এক চুলও নড়েনি! তাই একদা যেমন ঘনঘন দেখা করেছে, তেমনি এক সময় ডুবও মেরেছে। ডুব দেয়া অবস্থায় প্রথম দিকে খারাপ লাগলে সীতাই খোঁজ নিয়েছে। এবং যখন জেনেছে ওর এই অদৃশ্য হওয়ার ব্যাপারটা নিছক অর্থহীন খেয়াল, তারপর আর খবর নিতে চেষ্টা করেনি। সীতা বেশ বুঝেছে ওর আসা না আসার ব্যাপারটা ওর নিজস্ব। সেখানে সীতারও কোনো জোর খাটবে না।

নিখিলেশের এই সৃষ্টিছাড়া মেজাজটা সীতার রপ্ত হয়ে গেছে। ও একেবারে অদৃশ্য হয়ে গেলে একটা কথা ছিল। ও যে যে-কোনো সময়ে এসে ডাক দেবে এই সম্ভাবনাটাই সীতাকে স্বাধীন হতে দেয় না। নিখিলেশ এই রকমই, সীতার জীবন-ধারার সঙ্গে ও এইভাবেই জড়িয়ে রয়েছে।

মা আবার ডাকছে। সীতা নিশ্বাস ফেলে নীচে নেমে এল।

শেষ রাতে পুলিশের কালো ভ্যান দরজায় এসে দাঁড়াল।

কড়া নাড়ার নিষ্ঠুর আওয়াজ।

মায়ের ডাকে ঘুম ভেঙে গেল সীতার।

'আপনিই সীতা মিত্র? আপনাকে এখুনি একবার যেতে হবে।'

'কেন?'

'একটা আইডেন্টিফিকেশনের জন্যে।'

'আমি! আচ্ছা আসছি।'

পুলিশ স্টেশনের বারান্দার কোণে চাদরে আবৃত ডেড বডি।

মিলিটারি কর্ডন ভেঙে লোকটি শ্যামবাজারের দিকে ছুটে আসছিল। বাগবাজার স্ট্রীটে সেনট্রি ওকে চ্যালেঞ্জ করে। শোনেনি। কর্তব্যরক্ষায়, বুঝতেই পারছেন...' কনেস্টবল মুখের আবরণ সরিয়ে দিতে চিৎকার করতে গিয়ে পাথরের মতো কঠিন হয়ে দাঁড়াল সীতা।

'ওর পকেটে একটা চিরকুটে আপনার নাম-ঠিকানা পাওয়া গেছে। দেখুন তো আপনি চিনতে পারেন কিনা ...'

সীতা মূক।

'দেখুন ভালো করে ...'

সীতা বলল : 'না।'

ক্রীতদাস

মণীন্দ্র রায়

যেদিন ঘরোয়া ময়নার মতো হাতে এসে বসেছিলে আমার,
আর গালের পাশে ছুঁইয়েছিল তোমার সোনালিহলুদ ঠোঁট,
কে জানত, তোমার ভাঁজকরা পাখার নিচে রয়ে গেছে কালবৈশাখীর আকাশ,
আর তোমার বুকের মধ্যে শত শত জটিল অরণ্যের লুপ্ত করতালি!

তোমাকে আপন করে পেতে
কোনারকের কর্কশ পাথর থেকে গড়ে তুলেছি সুরসুন্দরী—
দিনের অনাহার আর রাত্রির অনিদ্রায়
রাঙা ডালিমের মতো বুকে তোমার ঢেলে দিয়েছি স্বপ্ন,
আর অনুচ্চারিত হাসির আলো-আঁধারিতে
রহস্যময় করে তুলেছি তোমার কিশোরী মেয়ের মতো ঐ মুখ:
তবু ললিত সেই শরীরের আরতি ভেঙে ছিটকে বেরিয়ে এলে মাটিতে,
আর একের পর এক সেনাপতির প্রসারিত করতলকে উপেক্ষার হাসিতে আহত করে
ক্লিয়োপেট্রার সিংহাসনে উঠে বসলে তুমি তরঙ্গিত কামনার সম্রাজ্ঞী,
আর সোনার শিকলে বাঁধা পোষা চিতাবাঘের মতো
পায়ের পাশে ফেলে রাখলে যেন আমাকেই।

হা আমার স্বপ্ন, আমার অভিযান, আমার রচনা!
আমার বিলীয়মান মমতা জেগে উঠেছিল যেদিন
তোমার তন্বী শরীরের উদ্ধত রজনীগন্ধার আহ্বানে,
আর পৃথিবীর সমস্ত কবির কবিতা থেকে অশ্রু কুড়িয়ে এনে
ঢেলে দিয়েছিলাম যেদিন তোমার হৃদয়ে,
আর যেদিন শিশুর বিস্ময়ে বিস্ফারিত তোমার ঐ তাজা চোখের সমুদ্রে
অজানা মহাদেশের উপকূলের খোঁজে ভাসিয়েছিলাম আমার কলম্বাসের জাহাজ,
আর প্রজাপতির পাখার মতো কেঁপে উঠেছিলে তুমি
আমার তপ্ত নিশ্বাসের হিংস্র করুণ ব্যাকুলতায়,
কে জানত, মাথার ওপর বাইসনের শিঙ-পরা
আমার সেই আদিম ঔদ্ধত্যের সরলতাকে
একটি কটাক্ষে হাঁটুর কাছে ফেলে বেড়ে উঠবে তুমি
প্রাচীন গির্জার মতো মহীয়ান এই দূরত্বের নির্জনতায়।

আমি তাই চেয়ে রয়েছি তোমার ঐ পা-রাখার মাটির দিকে একাগ্র।
পুরনো চিঠির মতো সেই সব বিরল মুহূর্ত,
উনুনের আগুনের আভায় উদ্ভাসিত তোমার সেই সেবাপরায়ণ মুখ,
নৌকোর ওপর সন্ধ্যায় সেই ফুলের মালার শিহরণ,
বুকের কাছে ঘন হয়ে আসা সমর্পিত দেহের অস্পষ্ট সৌরভ,
আরব্য রজনীর উড়ন্ত গালিচায় শূন্যে শূন্যে সেই আমাদের ভ্রমণ,
কিছুই আর ভোলায় না আমাকে, [illegible] না;
কেননা আমি জানি, ঐখানে ঐ মাটির ওপর পা রেখেই
তোমার মাথার ওপর পরে নেবে তুমি হিমালয়ের মতো মুকুট,
আর গায়ে জড়াবে সমুদ্রের মতো শাড়ি,
আর আমাকে পাঠাবে তুমি মহাকাশ থেকে মহাকাশে
কালপুরুষের তলোয়ার থেকে নক্ষত্র ছিনিয়ে এনে
পরিয়ে দেবার জন্যে তোমার ঐ গলায়;
আর আমি, তোমার ক্রীতদাস, নির্বাচিত বীজের মতো
সেই হবে আমার উদ্ধার, সেই আমার আনন্দ!

তারাশঙ্করের পরিশ্রম ও যন্ত্রণাবোধ

হরপ্রসাদ মিত্র

—'রূপকের ব্যবহার, সাংকেতিকতা, বস্তুবর্ণনা, সমস্যার প্রতি পক্ষপাত, মনস্তত্ত্বের বিশ্লেষণ ইত্যাদি নানাদিকের প্রতি গল্প-উপন্যাসের সমালোচকরা সজাগ; দেশের রাজনৈতিক, সামাজিক অথবা ধর্মবিশ্বাসের পরিবর্তনধারা বা বিশেষ বিশেষ স্তর বর্ণনাও কোনো কোনো উপন্যাসের উপজীব্য হয়েছে; কিন্তু আসল কথাটা হল—জীবনের গভীর দুর্জ্ঞেয় রহস্যের বিষয়ে সচেতন থাকে লেখকের মন। কৌশলের চেয়ে বোধ বড়ো।'

তারাশঙ্করের মুখে এই কথা শুনে আমি তাঁকে বলেছিলুম — জীবন-রহস্যের উদ্‌ঘাটন ব্যাপারটা এক্ষেত্রে এতোই প্রত্যাশিত এবং পরিচিত যে, ওটা শুধু গল্প-উপন্যাসে কেন, মানুষের যাবতীয় শিল্প-প্রয়াসের মধ্যে নিহিত বলে মেনে নিয়ে অন্যান্য প্রসঙ্গের আলোচনায় এগিয়ে যাওয়াই সংগত। জীবনবোধ উপন্যাসেও চাই, কবিতাতেও চাই, গল্পেও চাই।

তিনি বলেছিলেন—আমি জীবনের গভীর রহস্যবোধের তাড়নাতেই আমার গল্প-উপন্যাস লিখেছি।

প্রশ্ন করেছিলুম—আপনার গল্প-উপন্যাসের শিল্পসুষমা কি সেই একই তাড়নায় স্বতঃস্ফূর্তভাবে দেখা দিয়েছে? বোধ হয়, তা ঘটেনি,—কাহিনীর ধারা বদলে গেছে কোনো কোনো ক্ষেত্রে,—সংক্ষিপ্ত রচনা বিস্তীর্ণ হয়েছে,—'মন্বন্তর' সম্বন্ধে আপনি নিজেই ১৯৪৪ সালের ভূমিকায় লিখেছিলেন যে, আনন্দবাজার পত্রিকায় সে-লেখা যখন প্রথম ছাপা হয়, তখন স্থান সংকুলানের জন্যে সংক্ষেপে লেখেন; পরে উপন্যাসের লম্বিত তালে সুর বাঁধবার চেষ্টা করেন। অর্থাৎ আপনার অনেক রচনা থেকেই একথা কি প্রমাণিত হয়না যে আপনি বিস্তার পছন্দ করেন? এবং বার-বার বদ্‌লাতে চান পূর্বরচনা?

এই প্রশ্ন শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে তিনি বলেন—এ-কথার জবাব তো আমার ব্যক্তিগত আলাদা কোনো মন্তব্যে পাবে না,—আমার লেখাই আমার উত্তর। আমি খুঁটিয়ে দেখি এবং গুছিয়ে পরিবেশন করবার চেষ্টা করি—তাতে অনেক বদল ঘটে বৈকি।

আমি বলেছিলুম —আপনার নিজের কিংবা বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের গল্পে আমরা পাঠকরা দেখি বিস্তারের রুচি,—অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তাই; অন্য পক্ষে বনফুল অনেক গল্প লিখেছেন যেগুলির আয়তন সংকীর্ণ, যেমন তাঁর 'সংক্ষেপে উপন্যাস' কিংবা জ্যামিতিক গল্প 'ক খ গ'—যেসব ক্ষেত্রে গভীর জীবনবোধের উল্লেখ অবান্তর,—সে সব প্রধানত ব্যঙ্গ-পরিহাসের ছটা বা শিল্পকৌশলের খেলা। জীবনবোধ ব্যক্ত হয়েছে তাঁর অন্যান্য অনেক রচনায় — ছোটো-বড়ো দু-রকম লেখাতেই।

এই উক্তির পরেও তিনি সেই একই কথা বলেন—'আমার জীবনবোধই আমার গল্পের প্রধান প্রেরণা।'

একদিকে শাশ্বত সত্য অন্যদিকে জীবনের বিচিত্র সংবাদ —জীবনবোধের প্রসঙ্গটি কেউ কেউ এই দু'ভাগে ভাগ করে দেখতে ভালবাসেন। প্রায় পঁচিশ বছর আগে কুচবিহার সাহিত্য সম্মিলনের সভাপতির অভিভাষণে বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় এ-কথার পুনরাবৃত্তি করেছিলেন। আমি সে-কথাও একদিন তারাশঙ্করবাবুকে জিগ্যেস করেছিলুম। বিভূতিভূষণের কথা ছিল এই—'এ আমরা যেন আদৌ ভুলিনে যে কোন রচনায় আধুনিক যুগের সমস্যা আছে কি না, রাজনীতির ক্ষেত্রে লেখকের দৃষ্টি স্বচ্ছ না ঘোলাটে, দুর্ভিক্ষের কথা ঠিক করে বলা হল কি না—এসব দেখে সাহিত্য বিচার হয় না। আজকাল নানা কারণে আমাদের দৃষ্টি ঝাপসা হয়ে এসেছে, মন হয়ে এসেছে নিস্তেজ। সমালোচনার আদর্শ অন্য রকম হয়ে দাঁড়াচ্ছে। জীবনের শাশ্বত ধ্রুব সত্যকে আমরা এখন অস্বীকার করে চলেছি।'

মোহিতলাল তারাশঙ্করকে এক সময়ে বলেছিলেন—'ধর্ম নইলে মানুষ বাঁচে না, প্রতিটি মানুষেরই একটা একটা ধর্ম আছে, কিন্তু যারা ধর্মপ্রচারক হয় তারা নিজেরাই হয় ধর্ম থেকে ভ্রষ্ট; ধর্মকে প্রতিষ্ঠা দিতে হয়—নিজের অন্তরে দাও।...রাজনীতি হোলো সাময়িক—কালে কালে পাল্টায় কিন্তু সাহিত্য-ধর্ম শাশ্বত।'

এই শেষ কথাগুলি তারাশঙ্কর তাঁর "আমার সাহিত্য-জীবন" বইখানিতে লিখে গেছেন। এই দুটি প্রসঙ্গ—বিভূতিভূষণের এবং মোহিতলালের মন্তব্য সূত্রেই আমি তাঁকে জিগ্যেস করেছিলুম—যাকে 'শাশ্বত' বলি সে তো রসবোধ ছাড়া আর কিছুই নয়; আপনি কি মনে করেন?

—নিশ্চয়, রসবোধই। রস যেসব বিষয় অবলম্বন করে দানা বাঁধে, সেই বিষয় সম্ভারের মধ্যে রাজনীতিও আছে, দুর্ভিক্ষও আছে ভাই। সবই দেখতে হবে,—দেখাই স্বভাব।

বেশ গুছিয়ে বলেছিলেন তিনি। তাঁর সেই সহাস অসংশয় ভঙ্গিটি মনে আছে, আমার, এই উক্তির স্থানটুকু মনে আছে, সন-তারিখের কথা নির্দিষ্টভাবে মনে পড়ে না। কোনো একটি সাহিত্য-সভায় যাচ্ছিলুম তাঁর সঙ্গে একই মোটরকারে। বিকেলের রোদ পড়েছিল তাঁর মুখে,—জামগাটা বালিখালের অভিমুখে গ্রান্ডট্রাঙ্ক

ব্রোডের সেই অংশ যেখান থেকে ডাইনে বিবেকানন্দ ব্রিজ চোখে পড়ে।

সবই দেখতে হবে,—এই কথাটা তিনি দ্বিতীয়বার বেশ জোর দিয়ে বললেন।

আমি চুপ হয়ে গিয়েছিলুম তারপর। কারণ তাঁর এই উক্তির প্রতিবাদ সম্ভব এবং সম্ভব নয়ও বটে,—এই রকম একটা ধারণা আমার তখনো ছিল, এখনো আছে।

জীবনবোধ যে রসবোধ, এ-বিষয়ে বিতর্ক অবান্তর—রসের ক্ষেত্রে রসই শেষ কথা। কিন্তু উপকরণের বাছাই—ব্যাপারটাকে অবান্তর বলতে আমার বাধতে বাধে। অন্নদাশংকরের 'বিন্দু'র কোনো কোনো উক্তিতে আমার মন তখন অস্থির হয়েছিল। বিন্দু বলে গেছে—'প্রেমের মতো আর্টের সবটাই দেওয়া' দু-হাত খালি করে বিলানো'। 'তারাশংকরের মুখে 'সবই দেখতে হবে—দেখাই স্বভাব' শুনে আমার সেই কথা মনে এসেছিল। এবং অতঃপর শাশ্বত সত্যের বিষয়ে বিভূতিভূষণ, মোহিতলাল, অন্নদাশংকর তারাশংকর ইত্যাদি লেখকদের ধারণা কী রকম এবং এঁদের রচনায় সে ধারণার প্রয়োগই বা কী রকম, এই প্রসঙ্গটি কোনো সময়ে খুঁটিয়ে দেখতে হবে,—এই শুভ সংকল্প একদা আমার মনে জেগেছিল। অনেক সংকল্পের মতো এ সংকল্পও স্থগিত থাকতে থাকতে কোনো এক সময়ে অদৃশ্য হয়ে গেছে।

সে যাই হোক, গল্প-উপন্যাসের শিল্পাদর্শের ব্যাপারে তাঁর সজ্ঞান প্রয়াস সম্বন্ধে তাঁর নিজের মুখ থেকে কিছু শুনতে চেয়েছিলুম আমি। তাঁর সঙ্গে কথা বলবার সময়ে সর্বদা সতর্ক থাকতে হোতো, কারণ সকলেই জানেন, মনে মনে তিনি কী রকম স্পর্শকাতর ছিলেন। আমি খুবই সাবধানে কথাটা তোলবার জন্যে প্রস্তুত হয়েছিলুম। তাঁর উপন্যাসে বক্তৃতা বেশি, কথায় আড়ম্বর বেশি,—এসব তাঁকে বলতে দ্বিধা হোতো,—তাঁর নিজের ব্যাখ্যা শোনাও দরকার।

অতঃপর একদিন বলে ফেললুম—আপনার 'আগুন'—উপন্যাসের চন্দ্রনাথকে আপনার জীবনবোধের রূপক বলছিলেন একজন। চন্দ্রনাথ ছেলেবেলায় গৃহত্যাগী, কৈশোরে পথিক যাযাবর, পরবর্তী জীবনে কতো অজস্র বড়ো বড়ো বিষয়কর্মে নিযুক্ত, তবু কী রকমের যেন উদাসীন। বিচিত্র আকাঙ্ক্ষার প্রতিমূর্তি সে। তার কিছুতেই যেন পরিতৃপ্তি ঘটে না। আপনার 'কবি' উপন্যাসের নিতাইচরণের সঙ্গে 'ঠাকুরঝি' আর 'বসন' যেমন,—আপনার 'আগুন'-এর চন্দ্রনাথের সঙ্গে 'মীরা'—আর হীরুর সঙ্গে 'চিত্রাঙ্গদা'ও তেমনি। এরা সব আশ্চর্য মানুষ। আপনার 'আগুন' তো ১৯৩৭ সালের বই, কিন্তু অতো আগেকার লেখাতেও সাহিত্যিক হিসেবে আপনার নিজের একরকম কর্তব্যবোধের কথা আপনি যেন চন্দ্রনাথের মুখে চকিতে প্রকাশ করেছিলেন।

তিনি বললেন—তুমি বোধ হয় নরেশের কথা বলছো?—চন্দ্রনাথের নয়।

—না, চন্দ্রনাথের কথাই,—বইয়ের শেষ দিকে নরেশকে চন্দ্রনাথ বলেছিল—'যার জন্যে পরিশ্রম করলাম না, তার জন্যে আবার পাওনা কি? 'গ্রোথ অব দি সয়েল (Growth of the Soil) -এর কল্পনা আমার জীবনে স্বপ্ন।'

শুনে হাসলেন তারাশংকর।

আমি বললুম—আপনার 'তারিণী মাঝি', 'জলসাঘর' 'অগ্রদানী' ইত্যাদি আশ্চর্য সব গল্প যখন পড়ি, তখন শিল্পকর্মের দিকটা আলাদা করে কিছু মনে হয় না,—শিল্প-সৌকর্য আর জীবনবোধ ওসব রচনায় পরস্পর মিলেমিশে এক হয়ে গেছে বলে বোধ হয়; কিন্তু আপনার উপন্যাসের ক্ষেত্রে পরিশ্রমটা বেশ বোঝা যায়। 'হাঁসুলি বাঁকের উপকথা'র মধ্যেও সেটা বোঝা যায়। হাঁসুলি বাঁকের পুরো প্রকৃতি, পুরো সমাজ আপনার উপন্যাসে ধরা দিয়েছে, আর বনোয়ারি এবং করালীর মধ্য দিয়ে সময়ের বহতা স্রোতের কলস্বর ধরে রাখবার শিল্পকলায় আপনার দক্ষতা দেখে উপন্যাসের শিল্পাদর্শ সম্বন্ধে আপনার নিজস্ব বিশেষ কোনো চিন্তা আছে কি না, সেকথা জানতে ইচ্ছে করে।

প্রসন্ন হাসি ফুটলো তাঁর মুখে। বললেন—সেভাবে আলাদা করে কিছু বলবার নেই আমার। তবে জীবনের অনেকটা ক্ষেত্র আমার নজরে এসেছিল।

—'আগুন' বা 'কবি'-র বেলায় সেরকম নয় নিশ্চয়?

—না, সেরকম নয়।

—কিন্তু 'আরোগ্য নিকেতনে' বিস্তারের চেয়ে গভীরতাই বেশি পাই।

—সে বইয়ে সময়ের একটানা ধারা-বাহিকতা মেনে চলিনি, অনেক সব বোধের মুহূর্ত দেখা দিয়েছিল। কিন্তু বিস্তার আর গভীরতা,—জীবন-মহাকাব্যের পরি-মিতিতে দুটো শব্দই একই অর্থের বাচক নয় কি?

সেদিন তিনি এই কথার পরে আচম্বিতে সে-সূত্র ছেড়ে ফেলে দিতে চেয়েছিলেন বোধ হয়। বলেছিলেন—বিশ্লেষণ করে ওসব বলা যায় না,—বোধের কাজ এসব, প্রধানত বোধেরই কাজ।

কিন্তু খবর-কাগজের খবর কেটে কেটেও আপনি তো আপনার উপন্যাসে ব্যবহার করেছেন?—'মন্বন্তর'-এর কথা বিশেষভাবে মনে পড়ছে।

তিনি বললেন—সে কাজ তো করতেই হয়, আগেও করেছি, এখনো করি, বোধ হয় ভবিষ্যতেও করতে হবে। ধরো—আমাকে ঐতিহাসিক উপন্যাস লিখতে হচ্ছে কোনো সময়ে, তখন আমাকে ইতিহাস,—তা সে বৃহৎ দেশেরই হোক, আর বিশেষ কোনো অঞ্চলেরই হোক,—সে-ইতিহাসের গতি তো বুঝে নিতেই হবে; সেজন্যে পড়তে হয়, ভাবতে হয়, বুঝতে হয়,—কিন্তু মনের এইসব আলাদা আলাদা ক্রিয়া থেকে এবং এসবের বাইরে অবস্থিত গভীর কোনো কোনো উৎস থেকে জীবনের বোধ গড়ে ওঠে—এই বোধের কতকগুলো অবলম্বনসূত্র খুঁজে পাওয়া যায় স্মৃতিতে, যেমন স্বর্ণ ডাইনীকে মনে আছে, রক্ত-জ্যাঠাকে মনে আছে, 'ধাত্রীদেবতা'র শিবুর অনুচর শম্ভু বাউরীকে মনে আছে।

অতঃপর স্বভাবতই 'রাধা'র কথা উঠে-ছিল। 'গন্না বেগম'-এর কথাও উঠতে পারতো। কিন্তু প্রসঙ্গ অন্যদিকে ঘুরে যাচ্ছে দেখে আমি তাঁকে 'যোগভ্রষ্ট' বই-খানির ভূমিকার কয়েকটি কথা মনে করাতে চেয়েছিলুম। ১৩৬৬ সালে পূজা-সংখ্যা 'উল্টোরথে' যখন প্রথম ছাপা হয়, তখন সে-কাহিনীর নাম ছিল 'যবনিকা', পরে নাম বদলে 'যোগভ্রষ্ট' রাখা হয়। ভূমিকার প্রথম দিকেই তিনি লেখেন—'এই আখ্যানটি সচরাচর এই যুগে যে অর্থে উপন্যাসকে উপন্যাস বলে থাকি—তা ঠিক নয়। অর্থাৎ ঠিক অতিসাধারণ সমাজ-জীবনের দৈনন্দিন সমস্যায় পীড়িত, সুখে-দুঃখে বর্তমান যুগবোধে জর্জরিত সমাজচিত্র নয়।'

—'যোগভ্রষ্ট' আপনার এক ধরনের উপন্যাস, 'পঞ্চগ্রাম', 'মন্বন্তর' প্রভৃতি অন্য ধরনের—একথা বলা কি ঠিক হবে?

—'আরোগ্য নিকেতন'ও 'যোগভ্রষ্টে'র দলে যাবে তাহলে।

—নিশ্চয়, কারণ দুটিতেই প্রধানত শাশ্বত সত্যের দিকেই আপনার লক্ষ্য ছিল? কিন্তু 'মন্বন্তর'-এর বস্তুবর্ণনার ঝোঁকের কথাই ধরি, আর 'যোগভ্রষ্ট' উপন্যাসে পাত্র-পাত্রী কাল্পনিক,—শুধু সুদর্শন ভেটিনারু আর সন্ন্যাসী বাদে,—আপনার এই উক্তিই মনে রাখি,—দুই ক্ষেত্রেই আপনি অসাধারণ পরিশ্রমী লেখক,—এই কথাই আমাদের মনে হয়।

তারাশংকর সোজা হয়ে বসে বলেছিলেন —আমার লেখায় শিল্পাদর্শ পরিচ্ছন্ন কি অপরিচ্ছন্ন হয়েছে, সে-কথা তোমরা বলবে, —পরে আরো অনেকে বলবে হয়তো, কিন্তু আমার জীবনে সত্যিকার যন্ত্রণাবোধ ঘটেছে, 'আরোগ্য উপন্যাসে', 'যোগভ্রষ্ট'-তে আমি আমার আপন কালের বিশেষ যন্ত্রণার রূপ দেবার চেষ্টা করেছি।

সেদিন বাড়ি ফিরে মিলিয়ে দেখে-ছিলুম—'যোগভ্রষ্টে'র ভূমিকার শেষ লাইনে তিনি লিখেছিলেন—'এ আমার কৌশল-সর্বস্ব রচনা নয়, এ আমার অন্তরের যন্ত্রণার সংগীত।'

সাহিত্য ও সংস্কৃতি

॥ রসসাগর ওড্‌হাউস ॥

আজ থেকে একাত্তর বছর আগে যদি কেউ লন্ডনস্থ হংকং অ্যান্ড সাংহাই ব্যাঙ্কে উপস্থিত হতেন তাহলে দেখতেন একটি আঠারো-উনিশ বছরের কিশোর অন্যমনস্ক-ভাবে ব্যাঙ্কের মোটা লেজার বইয়ের পাতা উল্টাচ্ছেন। কি কাজ যে করছেন সে বিষয়ে তাঁর ধারণা যে একেবারেই নেই এ তাঁর মুখ দেখে বোঝা যায়। এই কেরানীটি যে কালে এই শতাব্দীর শ্রেষ্ঠতম রসরচনাকার হয়ে উঠবেন এ ধারণা সেদিন কেউই করতে পারেন নি। ছেলেটির নাম পেলহাম গ্রেন-ভীল ওড্‌হাউস। সবাই ভাবত এর দ্বারা ব্যাঙ্কের কাজকর্ম চলা দায়।

স্টেফেন লেককের মতো পি জি ওড-হাউসের ব্যাঙ্কের কেরানী জীবন ক্ষণ-স্থায়ী। অতি অল্পবয়স থেকেই ওডহাউসের বাসনা লেখক হওয়া—বাপ-মার বাসনা ছিল অন্যরকম তাই ওডহাউসকে তাঁরা অনেক চেষ্টাচরিত্র করে ব্যাঙ্কের চাকরীটা জোগাড় করে দেন। এই চাকরীতে কিশোর ওডহাউস প্রতিভার পরিচয় দিতে পারেন নি। কেবল বেতনটুকু হাতে পাওয়ার আগ্রহ। একদিন একটা নতুন লেজার খুলতে দেওয়া হল। পেলহামের বাসনা হল এই লেজারের প্রথম পৃষ্ঠাটিতে আনুষ্ঠানিকভাবে লেজার খোলা বিষয়ে বিস্তারিত বিবরণ লিখতে। তারপর বেশ খানিকটা লিখে ফেলার পর পরম স্বস্তিতে নিজের চেয়ারে বসে রইলেন। অনেকটা 'পিকউইক পেপারস' রচনাতে ডিকেন্সের মতো ভাবভঙ্গী। কিন্তু এই আত্মতুষ্টির ভাব ক্ষণস্থায়ী, কারণ তাঁর অপরাধ যে কত গুরুতর তা তিনি অচিরেই বুঝলেন, তখন এই প্রথম পৃষ্ঠাটি ছিঁড়ে ফেলাই শ্রেয় মনে করলেন।

ব্যাংক কর্তৃপক্ষ এই ব্যাপারে একটা অনুসন্ধান কমিটি বসালেন, তাঁদের কাছে পেলহাম অকপটে নিজের অপরাধ স্বীকার করলেন। তখন ব্যাংক কর্তৃপক্ষ স্থির করলেন যে ওডহাউসমুক্ত হওয়াই শ্রেয়।

চাকুরী থেকে ছাড়া পেয়ে কিছুকাল ঘোরাঘুরি করার পর তরুণ ওডহাউস 'দি গ্লোব' নামক একটি সান্ধ্য দৈনিকের স্তম্ভ লেখকের একটা কাজ পেলেন।

ওডহাউস ইংলণ্ডে জন্মগ্রহণ করলেও হংকং-এ অনেককাল কাটিয়েছেন, কর্মসূত্রে ওডহাউসের বাবা সেখানে থাকতেন। ব্যাঙ্কে চাকরী পাওয়ার পর তিনি দিবাভাগে লেজার নিয়ে বসে থাকলেও, দীর্ঘ রাত জেগে হালকা ছড়া ও সরস রচনাদি লিখতেন। 'গ্লোব' পত্রিকার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট হওয়ার পর ওডহাউস প্রথমে 'পাঞ্চ' ও পরে 'স্ট্রান্ড ম্যাগাজিনে'ও লেখার সুযোগ পেলেন। ধীরে ধীরে কিছু পয়সাও জমাতে পারলেন। ১৯০২ খৃষ্টাব্দে তাঁর প্রথম গ্রন্থ 'দি পটহানটার্স' প্রকাশিত হল। ইতিমধ্যে আমেরিকায় গিয়ে জেমস কারণের সহযোগে কয়েকটি নাটিকা রচনা করে ওডহাউস সাফল্য লাভ করলেন।

১৯০৪-এ আমেরিকা থেকে ফিরে এলেন ওডহাউস। তখন তিনি সুপ্রতিষ্ঠ। পাঁচ বছর পরে আবার আমেরিকায় গেলেন। 'কলিয়ার্স' এবং 'কসমোপলিটান' নামক সাময়িক পত্রিকায় দুটি গল্প দিয়ে পাঁচশ' ডলার পারিশ্রমিক পেলেন ওডহাউস। লেখকের মনে হল হামিনস্ত, হামিনস্ত, হামিনস্ত—স্বর্গ যদি কোথাও থাকে তা এই-খানে। যুক্তরাষ্ট্রের স্থায়ী বাসিন্দা হয়ে যাবেন স্থির করলেন।

কিন্তু এই ভাগ্য দীর্ঘস্থায়ী হল না, ছোট-খাটো পত্রিকায় লিখে পঞ্চাশ ডলারের মত পেতেন, তার দ্বারা কোনোমতে কায়ক্লেশে চালানো যায়। এই সময় 'ভ্যানিটি ফেয়ার' নামে একটি পত্রিকা প্রকাশ শুরু হল। ওডহাউস এই পত্রিকার নাট্য-সমালোচক হিসাবে যোগ দিলেন।

মার্কিন সাময়িক পত্রিকাটিতে লেখার সময় ওডহাউসের একটা অসুবিধা ছিল। মার্কিন সমাজ বিষয়ে তাঁর অভিজ্ঞতা এবং জ্ঞান যথেষ্ট ছিল না। কিন্তু ইংরেজ পরি-বারের কানট্রি-হাউসের জীবন সম্পর্কে ওডহাউসের জ্ঞান ছিল যথেষ্ট। সেইসব খানদানী পরিবারের আর্ল, তাদের বাটলার (যে কখনও হাসে না), তাদের সংসারের তরুণ-তরুণী ইত্যাদি হল তাঁর কাহিনীর উপ-জীব্য। মার্কিন সমাজ এইসব গল্প একেবারে লুফে নিল। তারা আরো চায়, ওড্‌হাউসের গল্প নিয়ে কাড়াকাড়ি পড়ে গেল। ক্রমে গ্রন্থ-পিছু ওডহাউস ৪০,০০০ ডলার পেতে লাগলেন। আজ তাঁর বয়স নব্বুই—জীবনের প্রতিটি বছরের হিসাবে নব্বুইখানি গ্রন্থ লিখেছেন ওডহাউস। বছর পিছু গড়ে একখানি বই। এইসব গ্রন্থের মধ্যে আছে ছোটদের বই, উপন্যাস, ছোটদের উপন্যাস, বড়দের ছোট গল্প, আর অজস্র প্রবন্ধাবলী।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় ফ্রান্সের লে ত্যুকে নামক একটি অঞ্চলে 'জয় ইন দি মর্নিং' নামে উপন্যাস লিখছিলেন ওডহাউস। যুদ্ধের গতিপ্রকৃতি সম্পর্কে সম্ভবতঃ যথেষ্ট অবহিত ছিলেন না। নাৎসীরা ওড-হাউসকে ধরে ফেলল পালাবার আগে। বন্দী-শিবিরে থাকার সময় নাৎসীরা ওডহাউসকে দিয়ে কিছু বেতার ভাষণ দেওয়ার ব্যবস্থা করল। একটি ভাষণে ওডহাউস বললেন—

> "If Britain wing this war or not ...."

এই উক্তিটি আপত্তিকর বিবেচিত হল। ওডহাউসের দেশপ্রাণতা বিষয়ে সংশয় জাগল। সমস্ত পাবলিক লাইব্রেরী থেকে তাঁর গ্রন্থাবলী সরিয়ে নেওয়া হল। এমনকি যুদ্ধোন্মাদনা অবসানের অনেককাল পরেও ওডহাউসকে কলঙ্কমুক্ত করা হয়নি। ম্যাল-কম মগারিজ আর জর্জ ওরওয়েল দুটি প্রবন্ধে লিখলেন ওডহাউসের প্রশস্তি, নিন্দা করলেন তীব্র ভাষায় ওডহাউসের দেশপ্রাণতায় সংশয়াচ্ছন্ন মানুষদের। এই দুটি প্রবন্ধ ওডহাউসকে আবার নিয়ে এলো পাদ-প্রদীপের সামনে — ওডহাউসের সাহিত্যিক পুনর্বাসন ঘটলো আংশিকভাবে। কিন্তু এর পর তিনি ইংলণ্ডে আর বাস করেন নি। আজ তিনি সস্ত্রীক লঙ আইল্যান্ডের রেম-সেনবার্গ নামক একটি গ্রামে বাস করছেন। জেমস অ্যাগেট একটি প্রবন্ধে বলেছেন—

> 'Like O Henry, the wirter apparently divides the world into two classes — those who can read his books, and those who can read no others".

ওডহাউসের বেতার-ভাষণগুলি ১৯৫৪ খৃষ্টাব্দে 'এনকাউন্টার' নামক পত্রিকায় প্রকাশিত হলে দেখা গেল যে, সেইসব ভাষণের মধ্যে এতটুকু প্রচার বা অভি-সন্ধিমূলক বাক্য নেই যা শত্রুর সহায়ক। প্রকৃতপক্ষে সেসব ভাষণ কারাজীবনের চমকপ্রদ কাহিনী। জার্মানদের রসবোধ আছে স্বীকার করতে হবে, নইলে একজন বন্দীকে এই সব কথা বলতে দিয়েছেন কি করে।

ওডহাউসের সাহিত্যিক জীবনের উত্থান-পতনের ইতিহাস বিস্ময়কর। 'গ্লোব' পত্রিকার লেখক ধীরে ধীরে 'প্যাঞ্চ' এবং 'স্ট্রান্ড ম্যাগাজিনে' লিখে প্রতিষ্ঠা অর্জন করেছেন। কিন্তু ১৯১৬ খৃষ্টাব্দে 'দি স্যাটারডে ইভনিং পোস্টে' ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হল ওডহাউসের 'সামথিং ফ্রেস'। এই কাহিনীতে 'লর্ড এমসওয়ার্থ' তাঁর শূকর পালন, ব্ল্যানডিংস ক্যাসেল, ব্ল্যানডিংস এবং তাঁর সেক্রেটারী ব্যাকস্টার প্রভৃতি চরিত্রাবলী আবির্ভূত হল। আর এই কাল থেকে যে সাফল্য ও খ্যাতি তিনি অর্জন করেছেন তা বিরতিবিহীন। অকসফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় একদা মার্ক টোয়েনকে ডক্টর অব লিটারে-চার উপাধি দান করেছিল আর দ্বিতীয় রসরচনাকার ওডহাউস এই সম্মানের অধিকারী।

অপ্রচলিত খানদানী পরিবারের কাহিনী এবং সেই সঙ্গে এক স্বপ্নের জগৎ রচনায় ওডহাউস অদ্বিতীয়। এমনকি ধনী-সন্তানের সখের সোস্যালিস্ট হওয়ার এক চমকপ্রদ কাহিনীও লিখেছেন ওডহাউস।

ওডহাউসের রচনাসংগ্রহ 'উইক এনড্ ওডহাউসে'-র ভূমিকা লিখেছিলেন হিলেয়ার বেলোক। অনেক কথার মধ্যে তিনি বলেছিলেন—

"Writing is a craft, like any other: playing the violin, skating, batting at cricket, billiards, wood-carving—anything you like, and mastership in any craft is attainment of the end to which the craft is devoted. A craftsman is excellent in his craft according to his degree of attainment towards its end, and his use of the means towards the end. Now the end of writing is the production in the reader's mind of a certain image and a certain emotion. And the means towards that end are the use of words in any particular language; and the complete use of that medium is the choosing of the right words and the putting of them into the right order. It is this that which Mr. Wodehouse does better, in the English language, than any one else alive".

আজ থেকে প্রায় ত্রিশ বছর আগে হিলেয়ার বেলোক উপরোক্ত কথাগুলি লিখেছিলেন এবং সেদিন এই প্রবন্ধের শেষে লিখেছিলেন—

'আজ থেকে পঞ্চাশ বছর পরে যদি জীভস্ বা তাঁর মহৎ সহযাত্রীদল—বিশেষতঃ জীভস্ যদি স্তিমিত হয়ে আসে, তাহলে এতাবৎ যা আমরা ইংলণ্ড বলে জেনে এসেছি তারও অস্তিত্ব থাকবে না।'

ইংলণ্ড আজো বর্তমান। ওডহাউস শারীরিক দিক থেকে ইংলণ্ডে অনুপস্থিত। তিনি স্বেচ্ছা নির্বাসন গ্রহণ করে যুক্তরাষ্ট্রে বসবাস করছেন। যুদ্ধের সময় অধিকৃত প্যারিস থেকে নাৎসী বন্দীর কারাজীবন বিষয়ে হাল্কা ধরনে যে বেতার-ভাষণ দান করেছিলেন, তার জন্য ইংলণ্ড তাঁকে ক্ষমা করেনি। ওডহাউসের গুণমুগ্ধরা মনে করেন যে, তাঁর ওপর অতিরিক্ত কঠোর মনোভঙ্গী প্রকাশ করা হয়েছে—তাঁকে উপেক্ষা করা হয়েছে। ওডহাউসের নব্বতিতম জন্মদিবস ইংলণ্ডে পাশ কাটিয়ে যাওয়া হয়েছে। যুদ্ধের সময় মন্ত্রীদের মধ্যে ডাফ কুপার তাঁর তীব্র সমালোচনা করেন এবং ডেলী মিরর পত্রিকার স্তম্ভলেখক 'ক্যাসানড্রা' দিনের পর দিন ওডহাউসকে বিশ্বাসঘাতক বলে অভিহিত করেছেন। কিন্তু পরে যাঁরা ওডহাউসের সম্মান রক্ষার জন্য প্রয়াসী হয়েছিলেন, তাঁদের মধ্যে সেনাবাহিনীর অনেক সুযোগ্য সেনানীও ছিলেন। কর্তৃপক্ষ কিন্তু এই মহান সাহিত্য-স্রষ্টার ওপর উপেক্ষা প্রদর্শন করাই শ্রেয় মনে করেছেন।

অনুরাগ কিংবা বিরাগ যে-কোনো বস্তুর আধিক্য ঘটুক ওডহাউসের 'ড্রোনস ক্লাব স্টোরিজ', 'মিঃ মুলনার স্টোরিজ', 'জীভ্স স্টোরিজ', 'লর্ড এমসওয়ার্থ স্টোরিজ', 'আর্কারিজ স্টোরিজ', 'রাইট হো জীভ্স', 'থ্যাংক ইউ জীভ্স', 'লাফিং গ্যাস' প্রভৃতি কাহিনীগুলি পাঠকের মনে গাঁথা হয়ে আছে। অনেক আনন্দ দিনের সুখস্মৃতির মত অবিস্মরণীয় রসসাগর ওডহাউস।

—[illegible]

নতুন বই

তারাশঙ্কর স্মৃতিকথা—সুজিতকুমার নাগ। সংকলিত গ্রন্থবিতান : ৯।৪ টেমার লেন, কলিকাতা-৪। চার টাকা।

আজকের বাংলা সাহিত্যে সবচেয়ে বরণীয়, স্মরণীয় এবং শ্রদ্ধেয় নাম তারাশঙ্কর। সাহিত্যের অবিস্মরণীয় কথাকার তিনি। সাহিত্যের নবরূপকার হিসেবে বিশ্বের বিদগ্ধজনের বরমাল্য বঙ্গবাণীর চরণপদ্মে অর্পণ করে তিনি শুধু নিজে ধন্য হননি, দেশ ও সাহিত্যকে ধন্য করেছেন।

'তারাশঙ্কর স্মৃতিকথা' গ্রন্থটি সাহিত্যিক এবং মানুষ তারাশঙ্কর সম্পর্কে এ দেশের সকল শ্রেণীর কথা-শিল্পীদের শ্রদ্ধানত স্মৃতিচারণ। এদেশের কবি ও কথাশিল্পীদের দৃষ্টির দর্পণে প্রতিবিম্বিত তারাশঙ্করের সঠিক পরিচিতি পাওয়া যাবে এই গ্রন্থটিতে। বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় ইতিপূর্বে প্রকাশিত ছড়ানো-ছিটানো স্মৃতিবিজড়িত লেখাগুলি নিয়েই এই গ্রন্থের প্রকাশ। সংকলক সুজিতকুমার নাগ এ বিষয়ে কৃতিত্বের পরিচয় রেখেছেন।

গঙ্গোত্রী—(গঙ্গোত্রী অভিযাত্রীদের মুখপত্র) সম্পাদক : বীরেন সরকার। ১২।১বি নয়ানচাঁদ দত্ত ষ্ট্রীট, কলকাতা : ৬। দামের উল্লেখ নেই।

পর্বত অভিযানে শিখরে থেকে শিখরে পরিক্রমণে এবং দুর্গম শিখরগুলি জয় করবার দুরন্ত আগ্রহ আজকে বাঙালী তরুণ সমাজের মধ্যে দেখা দিয়েছে, তা আশা এবং আনন্দের কথা। এই রোমাঞ্চকর দুঃসাহসিক অভিযানে শুধু ছেলেরা নয়—মেয়েরাও উল্লেখযোগ্য বলিষ্ঠ ভূমিকা গ্রহণ করছেন।

শুধু অজেয়কে জয় এবং নতুন শিখর আবিষ্কার করে সেখানে পদচিহ্ন রেখে আসাই পর্বতাভিযানের লক্ষ্য নয়, আজকের মানুষ আরো এক ধাপ এগিয়ে গেছে বৈজ্ঞানিক নানাবিধ তথ্যানুসন্ধানে।

এই নতুন দৃষ্টিভঙ্গির উন্মোচন ঘটেছে ১৯৬৬ সালে। চারজন তরুণের প্রাণ-সাধনায় প্রতিষ্ঠিত হয়েছে পর্বতাভিযান সংস্থা। ধীরে ধীরে ধাপে ধাপে সে-প্রতিষ্ঠান আরো বলিষ্ঠ হয়ে উঠেছে পর্বতপ্রেমী অভিযাত্রীদের সার্থক সহযোগিতায়। গঙ্গোত্রী সেই অভিযাত্রীদের মুখপত্র—ইংরেজি ভাষায় প্রকাশিত। এই গ্রন্থে বৃটিশ আমল থেকে শুরু করে ১৯৬৯ সেপ্টেম্বর-অক্টোবরে গঙ্গোত্রী অভিযাত্রীদের দ্বারা বিজিত চতুরঙ্গী শিখর বিজয় এবং বৈজ্ঞানিক তথ্যানুসন্ধানের আনুপূর্বিক কাহিনী লিপিবদ্ধ হয়েছে। অভিযান সম্পর্কীয় নানান বিষয়ে লিখেছেন : বীরেন সরকার, অসিত বসু, অমূল্য সেন, ডাঃ স্বপন রায়চৌধুরী, বরেন্দ্র মুখোপাধ্যায়, করুণাময় দাশ, ডাঃ ধ্রুবজ্যোতি মুখোপাধ্যায়, ডাঃ যূথিকা কোলে, ডাঃ সুশীলরঞ্জন মিত্র, ডাঃ অমিতাভ সেন প্রমুখ। গঙ্গোত্রীর শিখর-তালিকা এবং অভিযান সম্পর্কীয় আর্টপ্লেটগুলি এ-গ্রন্থখানিকে অধিকতরো আকর্ষণীয় করে তুলেছে।

পর্বতপ্রেমীদের কাছে এ-গ্রন্থের প্রয়োজনীয়তা অপরিসীম।

সঙ্গীতাঞ্জলি (৩য় খণ্ড)—স্বরলিপি : নিতাই ঘটক। প্রকাশক : সুরজিৎচন্দ্র দাস। জেনারেল প্রিন্টার্স এণ্ড পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড। ১১৯, ধর্মতলা স্ট্রীট। কলকাতা : ১৩।

নজরুল-সঙ্গীতের স্বরলিপি-গ্রন্থ সঙ্গীতাঞ্জলি (৩য় খণ্ড) সঙ্গীতশিল্পী ও শিক্ষার্থী উভয়েরই আদরণীয় হবে নিশ্চয়ই। কারণ, কবির একত্রিশটি বিভিন্ন ভাব ও স্বাদের গানের সুবিস্তৃত স্বরলিপি নজরুলের সঙ্গীতধারার গতি ও প্রকৃতি অনুধাবনের সহায়ক। এ ছাড়া 'সঙ্গীতাঞ্জলি'র বিশেষ আকর্ষণ হোলো বিদ্রোহী কবির কারাগারে বসে লেখা 'রক্তাম্বর ধারিণী মা'-এর পরিবর্তে 'রক্তনিশি জোরে' গানটি। ভৈরব রাগাশ্রিত 'জয় বিগলিত করুণা', ভৈরবী সুরে আড়খেমটা 'জাগো কঙ্কালি'—এই রকম অনেক নতুন গান সত্যিই শেখবার মতই।

সংকলন ও পত্র-পত্রিকা

গবেষণা (তৃতীয় খণ্ড : ১৯৭১) সম্পাদক : আশিস সিংহ। ২৭, জাস্টিস মন্মথ মখার্জি রো, কলকাতা-৯। দেড় টাকা।

গবেষণা বিজ্ঞানের সকল শাখার টেকনিক্যাল ত্রৈমাসিক পত্রিকা। এদেশের বিজ্ঞান প্রচেষ্টার এবং যাবতীয় গবেষণা-কর্মের মুখপত্র হিসেবে বিজ্ঞানের বিবিধ শাখার প্রসারে ও প্রচারে নিবেদিত। বিজ্ঞান সম্পর্কীয় যাবতীয় তথ্য, তত্ত্ব এবং গবেষণা-কর্মের বিস্তৃত বিবরণ বিজ্ঞান-জিজ্ঞাসু জনসাধারণের কাছে পৌঁছে দেবার আন্তরিক প্রচেষ্টার ছাপ এই সাময়িক পত্রিকার সর্ব অবয়বে। আলোচ্য সংখ্যায় : 'সাময়িক পত্রে বিজ্ঞান', 'সংবাদ ও ভাষা', 'নিবন্ধ গবেষণা-পত্র', 'আলোচনা', 'সাময়িক সংবাদ', ' সূচ-

যোগী পত্রিকায় বিজ্ঞান প্রবন্ধ' ও 'ব্যবহৃত পরিভাষা' শিরোনামের মাধ্যমে বিজ্ঞান-জগতে পরিক্রমণ করা হয়েছে। বিজ্ঞানী, গবেষক এবং বিজ্ঞান-পিপাসুদের কাছে এই সাময়িকপত্রের প্রয়োজনীয়তা অপরিহার্য। সম্পাদকীয়টি বিশেষ মূল্যবান।

নবায়ণ (অক্টোবর '৭১)—সম্পাদক: সুবোধ-বিকাশ দত্ত। ৬৫এ, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলকাতা-৯। তিরিশ পয়সা।

খৃষ্টধর্মাবলম্বী সাহিত্য অনুরাগীদের মুখপত্র। ধর্মের নানান প্রসঙ্গের সঙ্গে সাহিত্যগুণান্বিত গল্প, কবিতা, প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়ে থাকে। ছোটদের জন্যে পৃথক বিভাগ আছে। তারাপদ পাল, মাখন সরকার, হীরেন ধর এবং আরো কয়েকজনের লেখা আছে। প্রচ্ছদে একটি দুষ্প্রাপ্য দামী আলোকচিত্র দীনবন্ধুর শেষ শয্যাপাশে মহাত্মা গান্ধী ও ডঃ বিধানচন্দ্র রায়। এই সংখ্যাটিকে বিশিষ্টতা দান করেছে।

শারদ সংকলন

রূপসী বাংলা—দেবাশীষ গৌতম। ৫বি, মুখার্জিপাড়া লেন, কলকাতা-২৬। এক টাকা।

চেহারাটা সাধারণ মানের এমন কিছু আহামরি নয়, কিন্তু বক্তব্য এবং দৃষ্টিভংগী স্বতন্ত্র ধাঁচের। কবিতা আছে অনেকগুলি, কিছু গল্পও। 'বাংলাদেশ'-এর পটভূমিতে লেখা সুভাষ সমজ্দারের গল্পটি মনোরম। ভবানী মুখোপাধ্যায় অনুবাদক হিসেবে সুখ্যাত। তাঁর অরিজিন্যাল গল্প বড় একটা এর আগে দেখিনি—শুধু অনুবাদে নয়, স্বরচনাতেও ভবানীবাবু নিপুণ শিল্পী—'খেলাঘর' গল্পটি তার প্রমাণ। ছোটগল্প সম্পর্কে অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তের প্রবন্ধটি সকল শ্রেণীর গল্প-লিখিয়েদের দিক-দর্শনের কাজ করবে।

যষ্টিমধু—সম্পাদক : কুমারেশ ঘোষ। ২৮।৩/আর রামকৃষ্ণ সমাধি রোড, কলকাতা-৫৪। তিন টাকা।

বিরস বাংলার সরস পত্রিকা হিসেবে যষ্টিমধু সুদীর্ঘকাল ধরে সাহিত্য-পাঠকদের মানসিক ভোজে যুগপৎ যষ্টি এবং মধু পরিবেশন করে আসছে। ব্যঙ্গ-বিদ্রূপে তির্যক দৃষ্টিপাতে, ব্যঙ্গচিত্রে এবং হাস্য-রসে বক্তব্যকে সরস হাস্য এবং চিত্তাকর্ষী হয়ে উঠেছে যষ্টিমধুর শারদ-সংকলন : 'একেলে হাসির গল্প' সংখ্যাটি। 'টেলপিস' হিসেবে পাদপূরণের জন্যে ব্যবহৃত সাহিত্য ও সাহিত্যিক সম্পর্কীয় টুকরো হাসির ঘটনাগুলিও উল্লেখ্য। লিখেছেন নামী এবং স্বল্পনামী বহুজন—বিশেষভাবে উল্লেখ্য হলেন : বনফুল, আশাপূর্ণা দেবী, বিরূপাক্ষ মন্মথ রায়, পরিমল গোস্বামী, নন্দগোপাল সেনগুপ্ত, প্রবুদ্ধ, অখিল নিয়োগী, কৃষ্ণধন দে সন্তোষকুমার দে, গোরাচাঁদ নন্দী, অজিতকৃষ্ণ বসু প্রমুখ এবং পরিশিষ্টে একগুচ্ছ গল্প 'হাসাকর গল্প', উপহার দিয়েছেন সম্পাদক কুমারেশ ঘোষ স্বয়ং। একেলে হাসির গল্প কার্টুনে রূপ দিয়েছেন : চণ্ডী, সুফি, শতদল ও ওমিও।

সত্তর দশক—সম্পাদক : জিতেশ গঙ্গোপাধ্যায় এবং বিজন সেন। ৭৮।২ বীরেন রায় রোড, ওয়েস্ট। কলকাতা—৬১। দাম একটাকা।

পরীক্ষা-নিরীক্ষামূলক জীবনধর্মী প্রবন্ধ, গল্প, কবিতা ও নানাবিধ রচনার সংকলনে পত্রিকাটির বৈশিষ্ট্য সুস্পষ্ট। পত্রিকা প্রকাশের উদ্দেশ্য সম্পর্কে বলা হয়েছে "এই দশকে ঢালাও ব্যবসা চলেছে মুখোসের। যে মুখোসখানা যত সুন্দরভাবে মানানসই হচ্ছে সেই মুখোসই বেশিদিন টিকছে। কিন্তু আমাদের মনের যে ব্যথা, তা মুখ খুঁজে বেড়াচ্ছে। একখানা সুন্দর মুখ—নিষ্পাপ কোমলতায় ভরা মুখ—সংগ্রামী দীপ্ত মুখ—আত্মবিশ্বাসে ভরা মুখ।" তার স্বাক্ষর এরা রেখেছেন প্রথম সংখ্যাতেই। গল্প লিখেছেন প্রলয় সুর, কার্তিক রায়, কল্যাণ সেন, যোগব্রত চক্রবর্তী জিতেশ গঙ্গোপাধ্যায়, অসিত ঘোষ, এবং দিলীপ বন্দ্যোপাধ্যায়। প্রবন্ধ লিখেছেন এবং নানা বিষয়ে আলোচনা করেছেন নির্মাল্য [illegible], রণজিৎ দত্ত অমরেন্দ্র চক্রবর্তী বিজন সেন, সঞ্জয়কুমার বসু, [illegible] মুখোপাধ্যায় এবং সোমেন ঘোষ. শক্তি চট্টোপাধ্যায়, আনন্দ বাগচী, রত্নেশ্বর হাজরা, [illegible] চৌধুরী শামসের আনোয়ার, শিশির ভট্টাচার্য নীতিশ মুখোপাধ্যায়, মৃণাল বসু-চৌধুরী [illegible] রায় এবং আরো কয়েকজন কবিতা লিখেছেন। জোহান আগাস্ট স্ট্রিণ্ডবার্গের 'দ্য স্ট্রংগার' অনুসরণে একটি নাটক লিখেছেন সম্পাদক [illegible]। [illegible] একটি নাটক লিখেছেন [illegible]। [illegible] রায়চৌধুরীর সম্পাদনাটি বেশ আকর্ষণীয়।

পদক্ষেপ— সম্পাদক : গোপাল নাগ। ১, সতীশ নন্দী রোড কাঁচরাপাড়া, ২৪ পরগণা। আশি পয়সা।

কবিতা, গল্প, প্রবন্ধ রম্যরচনা, সাক্ষাৎকার, নাটিকা ইত্যাদি বিবিধ বিভাগে লিখেছেন উদীয়মান তরুণ লেখকরা। বিশেষভাবে উল্লেখ্য হলেন : বংশীদাজীবন ভট্টাচার্য তারাপদ রায় মলয়শংকর দাশগুপ্ত জিয়াদ আলী, বিনায়ক বিশি, অরুণকুমার হালদার গোপালচন্দ্র দাস, প্রদীপ্তকুমার চক্রবর্তী, 'হিন্দী সাহিত্য ঃ ছোটগল্প' প্রবন্ধটি সবিশেষ উল্লেখযোগ্য।

সমন্বয়— সম্পাদক : সুমনকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়। ঐকতান সাহিত্য সংস্থা, সুখচর, ২৪ পরগণা (নর্থ)। দুটাকা।

সুখচর (২৪ পরগণা)-র ঐকতান সাহিত্য সংস্থার সাময়িক সাহিত্যে প্রথম পদক্ষেপ 'সমন্বয়' শারদ সাময়িকী। বিষয়-বৈচিত্র্য এবং লেখকতালিকা পাঠকদৃষ্টি আকর্ষণ করে। রচনা-বৈশিষ্ট্যে বিশেষভাবে উল্লেখ্য হলেন : বীরূপাক্ষ, সমরেশ বসু, শিবরাম চক্রবর্তী, মাল্য বসু, বোম্বানা বিশ্বনাথন, আশা দেবী, অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায়, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, শান্তশীল দাশ, ডঃ পূর্ণচন্দ্র দাসচৌধুরী, অজয় হোম, অহীন্দ্র চৌধুরী, রজত নন্দী (গীটার-স্বরলিপি), প্রেমেন্দ্র মিত্র, চিরঞ্জীব, সনৎ শেঠ, কার্টুনে পি জি ও রবীন মণ্ডল প্রমুখ।

উত্তর দিগন্ত—সম্পাদক : সন্তোষকুমার চক্রবর্তী। মালদহ কালচারাল ইউনিট, মালদহ। এক টাকা।

ত্রৈমাসিক সাহিত্য পত্রিকাটির শারদ-সংখ্যায় নবীন ও প্রবীণ লেখকদের রচনা স্থান পেয়েছে। কবিতা লিখেছেন—মনীশ ঘটক, বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, তুলসী মুখোপাধ্যায়, হেনা হালদার, শিবরাম চক্রবর্তী, অমিতাভ দাশগুপ্ত, এবং আরো অনেকে। গল্প আছে অনেকগুলি—বিশেষ ভাবে উল্লেখ্য হলেন : আশাপূর্ণা দেবী, সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ, দুর্গাদাস ভট্ট অপর্ণা সান্যাল প্রমুখ। প্রবন্ধগুলিতে নতুন চিন্তার খোরাক আছে—এদিক দিয়ে বিশেষভাবে উল্লেখ্য হলেন : নলিনীকিশোর গুহ, গুণময় মান্না, এবং প্রণবকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়।

নূপুর— সম্পাদক : সুধীর ভৌমিক। নূপুর সাহিত্য সংস্থা, কৃষ্ণনগর। পঁচাত্তর পয়সা।

দ্বিতীয় বর্ষের প্রথম সংখ্যাটি শারদ-সংকলন হিসেবে প্রকাশিত হয়েছে। গল্প কবিতা, প্রবন্ধ ইত্যাদি অধিকাংশেরই পটভূমি 'বাংলাদেশ' ও বঙ্গবন্ধু মুজিবর। রচনাগুলি সাধারণ মানের। এর মধ্যে অধীর দাশশর্মার 'রূপা নীরব কেন' ও নিখিল বিশ্বাসের 'মৃত্যু থেকে ফেরা' রচনাদুটি বিশিষ্ট।

প্রাপ্তি স্বীকার

তরঙ্গ—সম্পাদক : স্বপন মজুমদার। তুলসীপাড়া, রায়গঞ্জ, পশ্চিম দিনাজপুর। ১-২৫ পয়সা।

অভিযান—সম্পাদক : তপনকিরণ সাহা, জয়নারায়ণ সাহা। রায়গঞ্জ, পশ্চিম দিনাজপুর। এক টাকা।

প্রবাহ—সম্পাদক : পরেশচন্দ্র সরদার। আমতলা, কন্যানগর, ২৪-পরগণা। পঞ্চাশ পয়সা।

অন্বয়—সম্পাদক : ফণী পাল। জে কে সান্যাল রোড, মালদহ। এক টাকা।

নবরাগ—সম্পাদক : মেঘনাথ দাস। ২।২ নরেন্দ্রনাথ মুখার্জি রোড, উত্তরপাড়া, হুগলী। পঁচিশ পয়সা।

অনির্বাণ—সম্পাদক : রামপ্রসাদ ভট্টাচার্য। ৫৪।১।১২।১ এল রোড, বেলগাছিয়া, হাওড়া—৫। পঁচিশ পয়সা।

মুখপত্র—সম্পাদক : অমরনাথ দাস। ৮।৩৪ লালবিহারী বসু লেন, হাওড়া৬।

পার্শ্বপার্শ্বিক (কার্তিক '৭৮)— সম্পাদক : প্রীতিকুমার ঘোষ। ৫।এ, অক্ষয় বোস লেন, কলকাতা-৪। ৪৫ পয়সা।

শাশ্বত ভারত (শারদসংকলন '৭৮।) সম্পাদক : মুরলীধর সরকার। মহা-সত্তা আশ্রম, পাঠকপাড়া, বাঁকুড়া। তিরিশ পয়সা।

পূর্বপুরুষ

গজেন্দ্রকুমার মিত্র

॥ ২ ॥

এই মর্মান্তিক সংবাদ পাইয়া বাবা না হোক, দাদা আসিয়াছিলেন। না আসিলেই ভাল করিতেন। আমার তো কোন সুবিধা হইলই না, মাঝখান হইতে তাঁহার অপমানের শেষ রহিল না।

দাদা অনুকে লইয়া যাইবার কথা বলিতে পারিলেন না। বাধা অনেক। তিনিও বিবাহ করিয়াছেন, নইলে বাবার রান্না দাদাকেই করিতে হয়। বহুকে অবিরাম সেবা ও কাজকর্ম করা, খাওয়া আসা করিতে হইতেছে তাহার সময় কোথা? একটা ছোটবোন এখনও অনূঢ়া আছে বটে, তবে তাহাকে ঐ খানিকটা জুড়িয়া দিলে আর বোধহয় বিবাহ দেওয়া যাইবে না। সে এমনিতেই যথেষ্ট রোগা—অমন পুরো শরীর খারাপে তাহার জন্ম। সাধারণ রান্না কি ঘরের কাজ কিছু হয় না কিন্তু আমাদের সংসারে দুটোর কোনটাই সাধারণ নয়। বাবার আহারের পরিপাট্য কিছুমাত্র কমে নাই, পান হইতে চুন খসিলেই আজকাল থালা ছাড়িয়া রাগ করিয়া উঠিয়া যান। সুতরাং দাদাকে বিবাহ করিয়া বাবার নিকট হইতে দীক্ষা লওয়াইয়া বৌকে জলচল করিয়া লইতে হইয়াছে।

মোট কথা খরচ কমে নাই, উপরন্তু পর পর বোনদের বিবাহ দিয়া দাদা কিছু ঋণগ্রস্তও হইয়াছেন। অথচ আয় কমিয়াই যাইতেছে দিন দিন। শিষ্য সেবকদের কাছে আদায় অনেক কমিয়াছে। বাবা গেলে যে কাজ হয় দাদা গেলে তাহা হওয়া সম্ভব নয়। বিশেষ বাবা বর্তমানে।

অবস্থা সব খুলিয়া বলিয়া, চিরদিনের জন্য যে আমার ভার লওয়া সম্ভব নয় সেইটাই আভাসে বুঝাইয়া দিয়া দাদা প্রস্তাব করিলেন, 'তা কাজকর্ম চুকে গেলে—মাস-খানেক না হয় ওখানে—? সেই কথাই জোর [illegible]'

আমি সবেগে মাথা নাড়িলাম। বয়স আমার যাহাই হউক, এই গত প্রায় আট বছর অবিরাম প্রতিকূল ভাগ্যের সহিত যুঝিয়া অভিজ্ঞতা অনেক হইয়াছে। সংসারটাকে ঢের বেশী চিনতে শিখিয়াছি। আমি বলিলাম, 'না দাদা, এক মাস কেন দশদিনের জন্যে নিয়ে গেলেও এরা আর আনবে না। তুমি সঙ্গে করে এনে পৌঁছে দিলেও ঢুকতে পাবব কিনা সন্দেহ। যদি চিরকালের মতো বিধবা বোন-ভাগ্নের ভার নিতে পারো তো নিয়ে চলো। আমি তোমার সংসারে ঝিয়ের মতো খাটতে রাজী আছি। কিন্তু একমাস দুমাসের জন্যে যাব না।'

দাদার মুখ আরও শুকাইয়া উঠিল। তবু মুখে জোর আনিয়া বলিলেন, 'ঢুকতে দেবে না মানে? এখন তো খোকার অংশ জন্মে গেছে, ও তো মালিক একজন। ওকে তাড়ায় কে?'

আমি শান্তভাবে শুধু একটি প্রশ্ন করিলাম, 'তুমি মামলা করতে পারবে আমার হয়ে যদি তাড়িয়েই দেয়?...পারবে না। ও থাক দাদা। আমার ভাগ্যে যা আছে তাই হবে। দুটো দিনের জন্যে গিয়েই বা লাভ কি?'

তারপর—তখনও একটু ক্ষীণ আশা বুঝি টিকিয়া ছিল—অর্ধস্বগতোক্তি করিলাম, 'ছেলেটাকে মানুষ করতে পারব না, সে তো বুঝছিই, তবু পৈতৃক বিষয়টা থেকে বঞ্চিত করি কেন?'

দাদা মাথা হেঁট করিলেন। একটু চুপ করিয়া থাকিয়া বলিলেন, 'সবই বুঝি। এই বয়স তোর, একটা ছেলে। কিন্তু আমিই যে নিয়ে গিয়ে মানুষ করতে পারব তাও তো বলতে পারছি না।...এখন থাক, আর একটু বড় হোক। তোকে ছেড়ে থাকবার মতো হলে বরং ওখানে নিয়ে যাব। ইস্কুলে ভর্তি করে একটু ইংরিজী লেখাবার চেষ্টা করব।'

'যতদিন বাঁচে তবে তো!' ম্লান হাসিয়া জবাব দিলাম, 'মরের মতো স্বাস্থ্য না পেলে এখানে বাঁচাই মুশকিল। আমাশা আর জ্বর—এ বাড়ির বাস্তু দেবতা!'

'ছি ছি! ওসব কথা বলিস নি!' দাদা তাড়া দিয়া উঠিলেন।

আমার কাছে অব্যাহতি পাইলেও দাদা শাশুড়ির কাছে নিষ্কৃতি পাইলেন না। ইঁহারা সকলেই আশা করিয়াছিলেন যে, দাদা এবার আমাকে লইয়া যাইবার প্রস্তাব করিবেন। সেরূপ কোন উচ্চবাচ্য না হওয়াতে তিনি মুখ ছুটাইলেন। দেওয়ালের দিকে মুখ করিয়া দাদা যাহাতে পরিষ্কার শুনিতে পান সেই ভাবে বলিলেন, 'একটা ডাইনীকে পাঠিয়ে দিয়ে তো আমার জলজ্যান্ত জোয়ান ছেলেটাকে শেষ করলে, আমার সর্বনাশ করে ছাড়লে, আরও কি মতলব আছে ওদের সেইটে খুলে বলুক, শুনি। ধড়ফড়িয়ে মরে গেল বাছা, আমার—ঐ ডাইনী আঁজলা আঁজলা রক্ত চুষে খেলে চোখের সামনে। আরও কটাকে খাবে বলে রেখে যাচ্ছে ওরা? কী করলে ওদের মনস্কামনা পূর্ণ হয়?... শ্বশুর গেল, সোয়ামী গেল এবার আমার খেতে বাকী। তা আমাকে খায় খাক—দুধের বাছা ভাসুর-পো গুলোর দিকে না নজর দেয়—কিম্বা কচি দেওরগুলোর দিকে।... কী করলে এই অলক্ষুণে ডাইনীর হাত থেকে অব্যাহতি পাব সেইটে যদি কেউ বলে দিতে পারত!...ও হো হো, বাবা আমার রে, হরি রে আমার কী কুক্ষণেই তোর বে দিতে গিছলুম রে বাপ! কী কুক্ষণেই হারামজাদী শেকিতে এসে বের কথা তুলেছিল ওখানে!'

দাদা নীরবে দাঁড়াইয়া সব শুনিলেন। তবে তাহাতেও নিস্তার লাভ হইল না। তিনি ধামাভর্তি করিয়া ফল বাতাসা ও কাপড়-চোপড় আনিয়াছিলেন। হুকুম হইল, 'মেজবৌমা, ওর বোন-ভাগ্নের জন্যে যা লাগে রেখে ওসব ফিরিয়ে নিয়ে যেতে বলো। অনেক দিয়েছে, ওদের ঘরের মেয়ে

এনে সপুরী একগাড়ে যেতে বসেছি—আর কিছু দিতে হবে না। যদি পারে তো যেখানকার জিনিস সেখানে ফিরিয়ে নিয়ে যাক।... ওর বাপ মিনসে শুনেছি এক পোর বেলা ধরে বসে বসে জপ আহ্নিক করে। সেই সময়টায় বুঝি বসে বসে গুণতুক করে—যাতে মেয়েদের শ্বশুরবাড়ি সব শ্মশান হয়ে গিয়ে সম্পত্তিগুলো ওদের ঘরে গিয়ে ওঠে!'

আরও বহুক্ষণ ধরিয়া এমনি সুধাবর্ষণ চলিল। দাদা মাথা হেঁট করিয়া দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া এক সময় বাহির হইয়া গেলেন। তাঁহার পিছনে পিছনে তাঁহার দেখিতে কোন অসুবিধা না হয় এই ভাবেই—তাঁহার আনা জিনিসগুলি বাহিরে ফেলিয়া দেওয়া হইল। নিজের মায়ের পেটের ভাই, অতটা পথ আসিয়া সেই ভরা দুপুরে অভুক্ত ফিরিয়া গেল, কিছুই করিতে পারিলাম না। কেহ একটু বসিতেও বলিল না, জলখাবার তো দূরের কথা, এক ঘটি সরবৎও দিল না। তখনকার দিনে অশৌচের বাড়ি অপরের খাওয়া নিষিদ্ধ ছিল, সেরূপ ক্ষেত্রে সকলেই আশপাশের ব্রাহ্মণবাড়িতে ব্যবস্থা করে, পরস্পরের প্রয়োজনে লাগে বলিয়া, সকলে সাগ্রহেই সে ভার লয়, অনেক সময় উপযাচক হইয়াও। তাছাড়া ফল এবং দুধে দোষ নাই।

কিন্তু সে কথা কেহ উত্থাপনও করিল না। আমার ভাসুরেরাও কেহ কোন কথা কহিলেন না। বরং দাদা মেজভাসুরকে প্রণাম করিতে গেলে তিনি খিঁচাইয়া উঠিলেন, 'অশৌচ অবস্থায় পেন্নাম করতে আছে? কেমন বামুনের ঘরের গরু তুমি?'

দাদা চোখ মুছিতে মুছিতে চলিয়া গেলেন, আমিও দাঁড়াইয়া চোখ মুছিতে লাগিলাম। আর কি করিব?

শ্রাদ্ধশান্তি চুকিয়া গেলে শাশুড়ি সোজাসুজি বলিলেন, 'তা বলি, এখন কি করবে? সে ছোঁড়া এসে তো চুপি চুপি পালিয়ে গেল, নে যাবার কথা মুখে একবার উচ্চারণও করলে না।...বে হয়ে এস্তক দেখলুম না যে স্বেচ্ছাসুখে কোনদিন বাপভাই নে যেতে চাইলে! এমনিই জিনিস তুমি! ঐ বয়েসেই বাপের ভেয়ের হাড় এমন ভাজাভাজা করে খেয়েছেলে যে তারা একদম ঘাড়াতে চায় না। কোনমতে ঘাড় থেকে নাবিয়ে দে নিশ্চিন্তি!...সে যাকগে, তাদের মড়া তারা ফেলে কি তুলে রাখে তারা বুঝবে, আমরা এই সাংঘাতিক চীজ বুকে করে বসে থাকব না আর। যার সঙ্গে সম্পর্ক সে গেছে—এখন আস্তে আস্তে ভালয় ভালয় সরে পড়ো—যেখানে পারো। বাপ মিনসেকে চিঠি দাও, নয়ত ভাইকে লেখো—এসে নে যাক!'

এই প্রশ্ন যে উঠিবে আমি জানিতাম। ইহার জন্য প্রস্তুত হইয়াই ছিলাম। দশ বছরের বালিকা আসিয়াছিলাম, সেই যে ভয়ে ভয়ে থাকিতাম—ভয়টাই অভ্যাস হইয়া গিয়াছিল। শত অত্যাচারেও তাই [illegible] তেমন জোরের সহিত প্রতিবাদ করিতে পারি নাই, বিবাদ করি নাই। কিন্তু এই কদিনে মনের সঙ্গে একটা বোঝাপড়া করিয়া লইয়াছি। শোকে বিহ্বল হইয়া পড়ি নাই সে-ই রক্ষা। স্বামীর সহিত এমন প্রেমের সম্পর্ক ছিল না যে তেমন শোক হইবে। স্বামীর আসক্তি ছিল আমার দেহটার প্রতি, ইদানীং সেবাযত্নেও লোভ জন্মিয়াছিল—কিন্তু আমার আসক্তির কোন কারণ ছিল না। তবে আট বছর ঘর করিলে জড়পদার্থের প্রতিও একটা মায়া পড়ে—এতো মন্ত্রপড়া বিবাহিত স্বামী, সন্তানের পিতা। তাছাড়াও ইদানীং মানুষটার প্রতি কিছু মমতাও দেখা দিয়াছিল মনে কোথায়, বড় অসহায় বোধ হইত; আপনারা মাপ করিবেন, স্বামীর মতো নহে—রুগ্ন আবুদেরে ছোট ভাইয়ের সম্বন্ধে যেমন মমতা বোধ হয়—তেমনিই হইত।

যাহা হউক—শোকে ভাঙ্গিয়া পড়ি নাই, তবে বড়ই একা নিঃসহায় বোধ করিতেছিলাম। ঐ এতটুকু মানুষটার হাড় কখানা যতদিন ছিল, তবু যেন একটা ভরসা একটা জোর ছিল। মৃত্যুর পর বড় ভয় ভয় করিতে লাগিল, মনে হইল বিপুল শত্রুপুরীতে আমি একা পড়িয়া গেলাম, এই দুধের ছেলেটাকে ইহাদের রোষ ও বিষ হইতে কে রক্ষা করিবে?

তবে ছেলেটার কথা চিন্তা করিয়াই শেষ পর্যন্ত মনকে বাঁধিলাম। ইহার জন্যই কঠিন হইতে হইবে, মাথা উঁচু করিয়া থাকিতে হইবে, প্রয়োজনে লড়াই করিতে হইবে। বাপের বাড়িতে একটা বিড়ালী ছিল। এমনি খুব নিরীহ পোষমানা, ছোটবোনেরা তাহার ল্যাজ ধরিয়া টানাটানি করিত—মুখের মধ্যে হাত পুরিয়া জিভ্ টানিবার চেষ্টা করিত—তবু সে কিছু বলিত না, খুব বিরক্ত করিলে বড় জোর একবার ফ্যাঁশ করিয়া শব্দ করিত—ভয় দেখাইত। কিন্তু সেই পুষিরই বাচ্চা হইলে তাহার মূর্তি পাল্টাইয়া যাইত, তখন এমন কি কাছে গেলেও গর্জন করিয়া উঠিত, ক্রোধে গায়ের লোম খাড়া হইত। আমার পরের এক বোন বসন্ত একদিন—কী বাচ্চা হইয়াছে, কটা ছেলে কটা মেয়ে দেখিতে—যেমন বাচ্চাগুলিকে তুলিতে গিয়াছে, বিড়ালীটা তাহাকে আঁচড়াইয়া কামড়াইয়া রক্তারক্তি বাধাইয়া দিল। মা আমাদেরই বকাবকি করিলেন। বলিলেন, জীব মাত্রেরই ইহা স্বধর্ম। যত অসহায় নিরীহ প্রাণীই হউক সন্তানের অনিষ্ট আশংকা করিলেই মায়েরা বাঘিনীতে পরিণত হয়। ইহাই ভগবানের নিয়ম, নাহলে সৃষ্টি থাকিত না।

সেই কথাটাই মনে পড়িল।

আমিও অনেক দেখিয়াছি। এখানেও, সামনের আমগাছটাতে কাকের বাসা ছিল। গাছের নিচে দিয়া যাতায়াতের সময় প্রায়ই অকর্ম করিয়া দিত, আবার পুকুরে গিয়া নাহিয়া আসিতে হইত। যেহেতু কাকে ময়লা খায় সেহেতু তাহার ময়লা গায়ে পড়া নাকি বড় দোষের। অথচ অন্য কোন জিনিসে পড়িলে দোষের হয় না। সে যাক—আমি একদিন অসময়ে এমনি বিরক্ত করায় রাগ করিয়া একটা ঢিল ছুঁড়িয়াছিলাম। তখন সেটা বোধহয় ডিমে 'তা' দেবার সময়, কাকিনীটা উড়িতে পারিল না। কিন্তু কাকটা আমাকে ঠোকর মারিয়া অস্থির করিয়া তুলিল। তাহার পর আমগাছের কাছে গেলেই উভয়ে তাড়িয়া আসিত; একবার আমার গালে ঠোকর মারিয়া রক্ত বাহির করিয়া দিয়াছিল। তাহাতে আবার তারকের গুষ্ঠি কত রসিকতা করিয়াছিলেন। (আমাদের আমলে স্বামীকে 'অমুকের বাবা' বলিয়া উল্লেখ করার নিয়ম ছিল না; এমন কি ছেলেমেয়েদেরও বলা চলিত না যে, 'তোর বাবাকে ডেকে দে'। 'তোর গুষ্টিকে ডেকে দে' এইভাবে বলিতে হইত।)

এইভাবেই—এইসব কথা স্মরণ করিয়াই—শেষ কদিনে বুক বাঁধিয়াছিলাম, নিজেকে শক্ত করিয়া লইয়াছিলাম। এটা বুঝিয়াছিলাম যে, নরম হইলে আর চলিবে না। 'অতি ছোট হয়ো না ছাগলে মাড়াবে'—কথাটা খাঁটি সত্য। আমি সোজা শাশুড়ির চোখের দিকে তাকাইয়াই উত্তর দিলাম, 'কেন, তারা নিয়ে যাবে কিসের জন্যে? আমিই বা যাব কেন? দাদা তো বলেছিল, আমিই বলে দিয়েছি এখন সুবিধে হবে না।'

এই প্রথম দেখিলাম আমার শাশুড়ি কেমন যেন থতমত খাইয়া গেলেন।

আর যাহাই হউক—এ জবাবের জন্য বোধ করি তিনি প্রস্তুত ছিলেন না। বেশ কিছুক্ষণ অবাক হইয়া তাকাইয়া থাকিয়া বলিলেন, 'তার মানে?...এ অবস্থায় বাপের বাড়িই তো যায় লোকে!...তা সে যা ভাল বুঝবে তাই করবে, বাপের বাড়ি না যেতে চাও অন্য পথ দ্যাখো। মোদ্দা এখানে থাকার সুবিধে হবে না। পরিষ্কার বলে দিচ্ছি। ছেলেপুলে নাতি নাতনী নিয়ে ঘর করি, তোমার মতো জ্যান্ত রাক্ষুসীকে ঘরে পুষতে পারব না!'

'আমারও এখন অন্য জায়গায় যাওয়ার সুবিধে হবে না, আমিও পরিষ্কার বলে দিচ্ছি।' বেশ সহজভাবেই জবাব দিলাম।

বিস্ময়ে ক্রোধে আমার শাশুড়ি যেন তোৎলা হইয়া গেলেন।

'ত্-তার মানে? এ কি গায়ের জোর নাকি?'

'নিশ্চয়ই। নিজের বাড়িতে থাকব—সেখানে জোর করে থাকব না তো কোথায় থাকব বলুন!'

'নিজের বাড়ি। তোর সেই চোদ্দগুষ্টির বাড়ি তোর মার চোদ্দভাতারের বাড়ি।' আমার কণ্ঠ যত শান্ত সংযত থাকে তাহার কণ্ঠ ততই উত্তেজিত হয়, 'আমি বেঁচে থাকতে তোর কিসের বাড়ি লা হারামজাদী ডাইনী?'

'আপনার কিসের অধিকার। আপনি বাঁচুন মরুন যা খুশি করুন। শ্বশুরের বিষয়, তাঁরও পৈতৃক। স্বকৃত কিছু নয়। আমি ওঁর মুখে সব শুনেছি। কেন মিথ্যে

মাথা গরম করছেন! ছেলে সাবালক হোক, তার অংশ বুঝে নিক, তারপর—সে রাখতে চায় রাখবে—তাড়াতে চায় তাড়াবে। সে তার সংগে বোঝাপড়া। আমাকে বেরিয়ে যাও বলবার অধিকার আপনার নেই। বরং আমার নাবালক ছেলের হয়ে আপনাকে যাও বলার অধিকার আমার আছে। সে মালিক একজন, আপনি নন।'

তাহার পর যে কান্ড হইল সে অবর্ণনীয়। ঠাকুরাণী কাঁদিয়া কাটিয়া চুল ছিঁড়িয়া মাথা কুটিয়া পাগলের মতো ব্যাপার বাধাইয়া তুলিলেন। সে চিৎকারে আমার জায়েরা ভাশুরেরা সব ছুটিয়া আসিলেন। শাশুড়ির নালিশ শোনার কোন প্রয়োজন ছিল না, কারণ আমরা কেহই চুপিচুপি কথা বলি নাই; শাশুড়ি তো নয়ই—কিন্তু কে জানে কেন, সম্ভবত গর্তের ব্যাঙকে কোঁক্ করিতে দেখিয়া—(সেই যে চলতি কথা আছে না, গর্তের ব্যাঙকেও অনবরত খোঁচা মারিলে সে এক সময়ে কোঁক করিয়া প্রতিবাদ করে) তাঁহারাও একটু যেন অবাক হইয়া গিয়াছিলেন, অথবা একটু ভয়ই পাইয়াছিলেন। তাঁহারা উভয় পক্ষকেই কিছু তিরস্কার করিলেন, বিশেষ আমার মেজভাশুর শিবুচরণ তো আমার দিক টানিয়াই বেশী বলিলেন; সেজভাশুর শিবচরণ মাকে টানিয়া ভিতরে লইয়া গিয়া মাথায় জল থাবড়াইয়া সুস্থ করার চেষ্টা করিতে লাগিলেন।

এই প্রথম, আমি রণাঙ্গণে অবতীর্ণ হইলাম।

ইহার পর কটা দিন একেবারে চুপচাপ কাটিল।

এত চুপচাপ যে আমি মনে মনে বেশ একটু ভয় পাইয়া গেলাম।

যেমন কাজকর্ম করিতাম, আমিও তেমনি সহজভাবেই করিয়া যাইতে লাগিলাম, অন্য জায়েরাও স্বভাবিকভাবেই কথাবার্তা বলিতে লাগিলেন। শুধু আমার শাশুড়ি হুকুম দিলেন যে আমার আনা জল না কেহ খায়, আমার রান্নাও না। সে আমার শাপে বর হইল। অতদূরে হইতে ঘড়া-ঘড়া খাওয়া ও রান্নার জল বহিতে হইত—কারণ সব পুকুরের জল খাওয়া যায় না। বোসেদের প্রতিষ্ঠাকরা পুকুর খুব গভীর ও বিস্তৃত, বারোমাস পরিষ্কার জল থাকিত, তাহারা এ পুকুরে কাহাকেও বাসন মাজিতে বা ক্ষার কাচিতে দিত না—এমন কি নিজেরাও অন্য একটা ডোবামতো পুকুরে সে কাজ করিত। সেই কারণেই ঐ বোসেদের বড় পুকুর হইতে রান্না খাওয়ার জল বহিতে হইত—সে দায় হইতে বাঁচিয়া গেলাম।

বলা বাহুল্য, আমার জায়েরা এ ব্যবস্থায় বড় সন্তুষ্ট হইলেন না, বরং শাশুড়িকে বুঝাইতে চেষ্টা করিলেন, জল নারায়ণ, জলে কেহ নজর দিতে পারে না। কিন্তু আমার শাশুড়ির হুকুম রদ হইল না, তিনি বলিলেন, 'ছেলেপুলে নিয়ে ঘর করো বাছা, তোমাদের সাহস থাকে খাওয়াও—তবে আমি ঐ পিচেশে পাওয়া মেয়েছেলের হাতে ভাত জল খাব না। তোমরা আনতে না পারো, আমিই বয়ে আনব'খন আমার মতো জল।'

ইহার পর আর কে সাহস করিয়া আমাকে জল আনিতে বলিবে?

তবে আমার বিশ্বাস, ইহাতে ঠাকুরাণী এক ঢিলে দুই পাখী মারিলেন, বরং ঐ পাখীটাই বেশী মার খাইল। আমাকে একঘরে করিয়া রাখা হইল বটে—জায়েরাও এতদিন বেশ আরামে ছিলেন, এখন জল বহিতে বহিতে তাঁহাদের মাজায় ব্যথা ধরিয়া গেল। আমার শাশুড়ি আমার হাতে খাইবেন না, তাহার প্রয়োজনও ছিল না। কারণ রান্নাটা তিনিই বেশী করিতেন—তিনি আর মেজ জা। মেজ-জাই চক্ষুলজ্জায় পড়িয়া এক কাঁসি নিরামিষ ভাত ধরিয়া দিতেন। আমি সব দিক দিয়াই বাঁচিয়া গেলাম।

তবু—এই এতটা শান্ত ভাব আমার ভাল লাগিল না।

বেশ বুঝিলাম এই নিস্তব্ধতা ঝড়ের পূর্বাভাস। এত সহজে ইঁহারা হাল ছাড়িবেন না. আর একটা আক্রমণ শীঘ্রই আসিবে। সেরূপ কোন আশ্বাস না পাইলে আমার শাশুড়ি এমন নিষ্ক্রিয় হইয়া থাকিতেন না। আর, এবার যে আক্রমণ হইবে, তাহা আটঘাট বাঁধিয়া, সব দিক ভাবিয়া-চিন্তিয়া—একটা মোক্ষম মার দিবার চেষ্টা হইবে। বিশেষ আমার মেজভাশুর সাংঘাতিক লোক. আমার স্বামীই সে কথা বলিতেন। বলিতেন, 'ওর মাথায় একটা পেরেক পুঁতে দিলে ইস্কুরূপ হয়ে বেরিয়ে আসবে।'

সুতরাং তিনি মায়ের মতো বৃথা চেঁচামেচি গালিগালাজ করিবেন না, অন্য পথ ধরিবেন। সেইটা কি, আক্রমণটা কোন দিক হইতে আসিবে বুঝিতে না পারিয়া অস্বস্তি বোধ করিতে লাগিলাম।...

অবশ্য বেশীদিন অপেক্ষা করিতে হইল না।

প্রথম ঘটনার দিন দশেক পরেই একদিন বিষ্ণুচরণবাবু আমার মেজজায়ের মারফৎ একটা কি কাগজ পাঠাইয়া বলিলেন, 'এইটে নতুন বৌমাকে সই করে দিতে বলো তো।'

জাকে আর বলিতে হইল না, কারণ আমি সামনেই, দাওয়ার এক পাশে বসিয়া মুগ কড়াই বাছিতেছিলাম, আমি সবই শুনিতে পাইতেছি। ভাদ্রবৌয়ের সহিত সোজাসুজি কথা বলিতে নাই বলিয়াই এই 'ভট্টাচার্যের পত্র-আড়াল' ব্যবস্থা।

ভাশুর খুবই তাচ্ছিল্যভরে কথাটা বলিলেন, যেন ব্যাপারটা কিছুই নয়। কিন্তু আমি, দেখিলাম কাগজখানা সাধারণ কাগজের মতো নয়—উপরে বড় করিয়া টিকিট বা স্ট্যাম্প ছাপা—যেমন দলিল দস্তাবেজে দেখা যায়। বাপের বাড়িতে দলিল আমি অনেক দেখিয়াছি, সিন্দুকে নানা ধরনের দলিল-পত্র থাকিত, বহুবারই মা এটা-ওটা বাহির করিতে সিন্দুক খুলিয়াছেন, সেই অবসরে খুলিয়া খুলিয়া দেখিয়াছি। মাকে প্রশ্ন করিতে তিনিই বলিয়াছেন, 'রেখে দে, রেখে দে। ওসব দলিল। এ বাড়ির আছে, দেশের বাড়ি জমি জায়গার অনেক দলিল আছে।...আমাদের কাছে নবাবের বন্দোবস্তের ফার্মান পর্যন্ত আছে।...যেমন ছিল সাজিয়ে রেখে দে, নইলে দরকারের সময় খুঁজে পাওয়া যাবে না।'

সুতরাং এ কাগজ আমি চিনি। কিন্তু ইহাতে কিছুই লেখা নাই, সবটাই সাদা। শুধু তলার দিকে ও পাশে কানের কাছে কালি দিয়া সূক্ষ্ম দুটি চিকে-কাটা দাগ দেওয়া আছে, ভাশুর দেখাইয়া দিলেন, ঐ দুই জায়গাতেই সই করিতে হইবে।

নির্দেশটা এতই আকস্মিক, এতই অপ্রত্যাশিত যে কিছুক্ষণের জন্য যেন বিমূঢ় হইয়া গেলাম। অনেক কিছু ভাবিলেও ঠিক এ ধরনের সোজাসুজি আক্রমণ আশঙ্কা করি নাই—তাই ব্যাপারটা বুঝিতে ও ইতিকর্তব্য স্থির করিতে কিছু সময় লাগিল।

ভাশুর সিয়াইয়ের দোয়াত ও কলম আগাইয়াই দিয়াছিলেন, আমাকে নিশ্চল-ভাবে বসিয়া থাকিতে দেখিয়া একটু যেন অসহিষ্ণুভাবেই বলিলেন, 'কী হল? বৌমা সই করতে জানেন না?...তুমি তো বলে-ছিলে উনি লেখাপড়া জানেন!'

অর্থাৎ আর অপেক্ষা করা চলিবে না। যা বলিতে হইবে, জবাব দিতে হইবে—এখনই।

আমিও নিজেকে তৈয়ারী করিয়া লইলাম। মুখের উপর ঘোমটাটা আর একটু টানিয়া দিয়া বলিলাম, 'এটা কিসের কাগজ দিদি? এতে তো কিছু লেখা নেই—?'

ভাশুরও আমার জায়ের মুখে প্রশ্নটার পুনরাবৃত্তির অপেক্ষা করিলেন না; বলিলেন, 'লেখাটা হয়ে ওঠেনি, পুর্ণ মুহুরীকে ডেকে পাঠিয়েছি—এসে লিখিয়ে দেবে। সইটা বউমার করা থাক—সেই মতো হিসেব করে লিখে দেবে'খন—যাতে ঠিক সইটার আগে এসে লেখা শেষ হয়।'

আমি মাটির দিকে চোখ নামাইয়া বলিলাম, 'কিন্তু এটা কিসের জন্যে তা জানতে পারব না? আমার সই লাগবে কেন?'

ভাশুর যেন বিরক্ত হইয়া উঠিলেন, 'কিসের আবার, ও'কে দিয়ে কি দশ হাজার টাকার হ্যান্ডনোট লিখিয়ে নিচ্ছি? বলি কাজকর্ম চালাতে হবে তো, সামনে সেটেল-মেন্টের সময় আসছে, উনিই যে তারকনাথের গার্জেন সেটার জন্যে আদালতে একটা দরখাস্ত করতে হবে। তা উনি তো আর আদালতে যাবেন না, আমরাই জামিন হয়ে দরখাস্ত পেশ করে দোব।'

জাও তাড়া দিয়া উঠিলেন, 'দে দে, সইটা করে দিয়ে কাজ চুকিয়ে দে বাপু। অসুরের কাজ পড়ে চারদিকে, দাঁড়িয়ে থাকলে চলবে না।'

আর ইতস্তত করার সময় নাই, বৃথা সঙ্কোচে কাজ নষ্ট করারও না। আমি একা হইলে অন্য কথা এখানে সন্তানের স্বার্থ জড়িত, বাঘিনীর ন্যায় রুখিয়া দাঁড়াইতে হইবে। আমি ধীরে ধীরে কাগজখানা জায়ের দিকে ঠেলিয়া দিয়া বলিলাম, 'কিসে সই করছি, কি দরখাস্ত—না দেখে আমি সই করতে পারব না মেজদি, আমাকে মাপ করবেন।'

ছিলাকাটা ধনুকের মতোই বিষ্ণুচরণ যেন ছিটকাইয়া উঠানে পড়িলেন, 'কী, যত বড় মুখ নয় তত বড় কথা! না দেখে উনি সই করতে পারবেন না! তার মানে আমি জাল-জোচ্চুরি করে ওকে দিয়ে সম্পত্তি লিখিয়ে নিতে চাইছি!...আমাকে অবিশ্বাস! ...আমি ফস্‌বাজ, আমি জোচ্চোর, ঠগ!... জিগ্যেস করো মেজবৌ—কত লেখাপড়া উনি শিখেছেন যে দলিল দেখলে পড়ে উনি বুঝতে পারবেন কিসে সই করছেন!...বলে আমরাই তাই একবর্ণও বুঝি না।...যার জন্যে চুরি করি সেই বলে চোর! ওর ছেলের জন্যেই করা, হাজার হোক বংশের সন্তান—নইলে ওর জন্যে তো আমার ভেবে ঘুম হচ্ছে না! কচি ছোঁড়াটাকে আমার চুসে খেয়ে শেষ করে দিলে!...আমি জুচ্চুরি করব মনে করলে উনি এক কাঠা জমিও খুঁজে পাবেন—তারক যখন সাবালক হবে? এই সেটেল-মেন্টে যদি সব আমার নামে লিখিয়ে নিই, উনি টের পাবেন, না ঠেকাতে পারবেন? শিবে তো বলছিলই—আমিই ভালমানুষি করতে গেলুম, তার এই ফল! নচ্ছার, নাংখোর মেয়েমানুষ—আমার মুখের ওপর এতবড় কথা!'

চেঁচামেচিতে অন্য ভাশুরেরা—হাতপর নাই শাশুড়ি ছুটিয়া আসিলেন। সকলেই এক এক প্রস্থ—যাহার যাহা অন্তরে ছিল—বিষ ঢালিয়া গেলেন। শাশুড়ি সগর্বে বলিলেন, 'কেন, আমি যখন বলি তখন যে বড় মন্দ হয়ে যাই!...তুইই তো সেদিন আমাকে কত লম্বা লম্বা লেকচার ঝাড়লি, হাজার হোক ছেলেমানুষ, কুপুত্র যদ্যপি হয় কুমাতা কদাচ নয়—সে সব কি হল এখন? বাবা, ও যে কী বেউড়বাঁশের ঝাড় খুব চিনে নিয়েছি আমি, হাড়ে হাড়ে চিনেছি। এইবার তোরা চেন, দ্যাখ কী চীজ!' ইত্যাদি।

আমি তো ইহার জন্য প্রস্তুতই ছিলাম। দুই চারি ঘা মার খাইলেও বিস্মিত হইতাম না। স্থির হইয়া বসিয়া সমস্ত ঝড়টাই সহ্য করিলাম। দুটি ঠোঁট ফাঁক করি নাই, হাতের কাজও বন্ধ করি নাই। বোবার শত্রু নাই—এটা অবশ্য ঠিক নয়, অনেক সময় প্রতিবাদ না করিলেই বরং আক্রমণকারীর ক্রোধ বাড়িয়া যায়—তবে আপাতত আমি সেই নীতিই অবলম্বন করিলাম। ফলে বকিয়া বকিয়া উঁহাদেরই মুখে ফেকো পড়িয়া গেল, আমাকে ঝগড়ার মধ্যে টানিতে পারিলেন না।...

(ক্রমশঃ)

শিশু-কোলে আনন্দ-বিহ্বল পাবলো পিকাসো

প্রদর্শনী

ইউ এস আই এস অডিটোরিয়ামে ২২ থেকে ২৮ অক্টোবর শ্রীমতী করুণা সাহার আধুনিকতম ষোলখানি ছবির একটি সুসজ্জিত প্রদর্শনী হয়ে গেল। মাঝারী মাপের ক্যানভাস। রেখা এবং রং-এর প্যাটার্নগুলির একটা নিজস্ব মাধুর্য আছে। একটু-আধটু নীরদ মজুমদার ও পিকাসোর রীতির ছোঁয়া থাকলেও ছবিগুলির মধ্যে একটা স্বকীয়তার ছাপ চোখে পড়ে। রঙের প্রয়োগে বৈচিত্র্য আনার চেষ্টাটাও লক্ষ্য রাখার মত। 'মেলন সেলারের' নিম্ন-গ্রামের রং ও 'ফেস্টিভ মুড' এবং 'জয়' ছবির ঔজ্জ্বল্য, 'মাদার অ্যান্ড চাইল্ড' আর 'দি টু'-এর সংহত রেখার কম্পোজিশন বা 'অন দি ওয়ে' ছবির ডেকরেটিভ প্যাটার্ন গোটা প্রদর্শনীতে একটা বৈশিষ্ট্য এনে দিয়েছে যেটা প্রধানতঃ একটা আনন্দময় পরিবেশ সৃষ্টির কাজেই সহায়তা করেছে। সমকালীন 'যুগযন্ত্রণা' ছাড়াও যে জীবনের অন্য একটা সহজ সরল আনন্দের দিক আছে, সেটাই শ্রীমতী সাহার প্রদর্শনীর মূল বক্তব্য মনে হল।

নিজের জীবদ্দশায় কিংবদন্তীতে রূপান্তরিত হবার সৌভাগ্য পৃথিবীতে অতি অল্প ব্যক্তির ভাগ্যেই হয়ে থাকে। এই রকম এক অসাধারণ মানুষ হলেন পাবলো পিকাসো, এবারে তিনি নব্বই বছরে পড়লেন। তাঁর জন্মোৎসব উপলক্ষ্যে লণ্ডনে নব্বইটি শাদা পায়রা ওড়ানো হল। বিভিন্ন দেশে তাঁর সম্মানার্থে তাঁর ছবির প্রদর্শনীর অনুষ্ঠান করা হয়েছে। ফ্রান্সে যে কাসলে তিনি বাস করছেন সেখানে হাজার [illegible] লোক তাঁকে অভিনন্দন জানাতে [illegible] কিন্তু পিকাসো তাঁর স্টুডিও থেকে বাইরে বেরোতে অনিচ্ছুক।

বাস্তবিক এত বড় শক্তিধর শিল্পী পৃথিবীতে অল্পই জন্মেছেন। নব্বই বছরের মধ্যে প্রায় তের হাজার ছবি আঁকার পরও তাঁর কাজে কোন ক্লান্তি নেই। খাবার সময়টুকু ছাড়া তাঁর কাজে কামাই হতে দেখা যায় না।

স্পেনের মালাগার ড্রয়িং মাস্টারের ছেলে পাবলো পিকাসো এই শতাব্দীর প্রথমে প্যারিসে আসেন। ইম্প্রেসানিস্ট আন্দোলনের শেষ দিকে তাঁর জন্ম হলেও তিনি সে পথে পা দেননি। সমাজ সচেতনতার ফলে সে সময় তিনি দরিদ্র জন-জীবনের প্রতিচ্ছবি ফুটিয়ে তোলায় মন দেন। এ যুগের ছবি ব্লু ও পিঙ্ক পিরিয়ড [illegible] বিখ্যাত। অল্পদিনের মধ্যেই শিল্পা-[illegible]নের পথিকৃৎ হিসেবে তাঁর নাম [illegible] পড়তে থাকে এবং সমকালীন

বিখ্যাত শিল্পী সাহিত্যিক, সংগীতজ্ঞ ইত্যাদির সংগে তাঁর ঘনিষ্ঠতা হয়। এর পর আফ্রিকান ভাস্কর্যের সংগে তাঁর পরিচয় ও ব্রাকের সংগে কিউবিজম সৃষ্টি আজ ইতিহাস হয়ে গিয়েছে।

কিন্তু এখানে তিনি থামেননি। তাঁর বিভিন্ন স্টাইলের এক্সপেরিমেন্ট এবং বিভিন্ন মাধ্যমের ওপর তাঁর কাজের তালিকার শেষ নেই। পটারী, ভাস্কর্য, গ্রাফিকস, মঞ্চসজ্জা ইত্যাদি সব কাজেই তিনি হাত দিয়েছেন এবং সর্বত্রই তাঁর মৌলিকত্বের ছাপ রেখে দিয়েছেন। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের প্রাক্কালে আঁকা 'গের্নিকা' যুদ্ধবিরোধী প্রতীক হিসেবে বিখ্যাত হয়ে আছে। এক্ষেত্রে তিনি তাঁর দেশেরই দেড়শ বছর আগেকার আরেক শিল্পী গয়ার উত্তরসাধক।

একজন শিল্পীর জীবিতকালে তাঁকে নিয়ে যত বাদবিতণ্ডার সৃষ্টি হয়েছে তত বোধ হয় আর কাউকে নিয়ে হয়নি। সাফল্যের সংগে সংগে অর্থাগমও হয়েছে প্রচুর। পৃথিবীতে তিনজন মাত্র শিল্পী কাসল কিনেছেন। এ'রা হলেন এল গ্রেকো, রুবেন্স এবং পিকাসো। তাঁকে নিয়ে সত্য-মিথ্যা যত কাহিনী সৃষ্টি হয়েছে তা সম্পূর্ণ একটি বৃহদাকার বই হয়ে যায়। শোনা যায় তাঁর 'গের্নিকা' ছবি দেখে জনৈক নাজি সৈন্যাধ্যক্ষ নাকি নাক সিঁটকে বলেন এটা আপনার কর্ম? পিকাসো অনুরূপ তাচ্ছিল্যের সংগে জবাব দিয়েছিলেন 'আজ্ঞে না, এটি আপনাদের কীর্তি।'

শিল্পী : করুণা সাহা

শিল্পী : শুচিব্রত দেব

•

অ্যাকাডেমি অব ফাইন আর্টসে শান্তিনিকেতনের পাঁচজন প্রাক্তন ছাত্র তাঁদের গ্রাফিক, ড্রয়িং ও পেন্টিং-এর পঞ্চম বার্ষিক যৌথ প্রদর্শনীর অনুষ্ঠান করলেন। শিল্পীদের অধিকাংশই কলকাতার বাইরে থাকেন, বছরে একবার প্রদর্শনীর সূত্রে মিলিত হন।

প্রদর্শনীতে অপেশাদারী ছবির সংখ্যাই বেশী মনে হল। গ্রাফিকগুলি মাপে ছোট। শান্তনু ভট্টাচার্যের 'শপ', 'মার্কেট' ও পার্থপ্রতিম দেবের 'ড্রীম' পরিষ্কার ছবি। সমীর দে-র অয়েলগুলি প্রতীকধর্মী ফিগারেটিভ কাজ. চিন্ময় দে-র ডেকরেটিভ প্যানেল এবং অমিত রায়ের ফিগার ও জ্যামিতিক ডেকরেশনের রং আরেকটু পেশাদারীভাবে প্রয়োগ করা যেতে পারত। জহর দাশগুপ্তের নর-নারী নিয়ে রচনা কয়েকটি ছবিকে এক্সপেরিমেণ্টাল বলা চলে। শুচিব্রত দেবের 'নন্দী' 'চাঁদমিনার' 'প্যাঁচা' 'রাসলীলা' প্রভৃতি জল রঙের কাজগুলিতে আধুনিক রীতির সংগে প্রথাগত ভারতীয় রীতির একটা সমন্বয় হয়েছে। এগুলি বেশ পরিচ্ছন্ন কাজ।

—চিত্ররসিক

অবিস্মরণ কাল

অসীম রায়

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

সেদিন সকালে ক্রসওয়ার্ড পাজল কর-করছিলেন ভবনাথ। ছুটির দিনের সকাল। সাইকেলটা যথাস্থানে না থাকায় বুঝলেন পুত্রদ্বয় বেরিয়েছেন। বুড়ী পাশের ঘরে উইলিয়াম দ্য কঙ্কারারের পরাক্রম যে তর্কাতীত তাই গুন গুন করে পড়ছে আর মাঝে মাঝে নাকে কাঠি দিয়ে হাঁচছে। একবার ডেকে জিজ্ঞেস করলেন ভবনাথ, 'বাঁদরগুলো কখন বেরিয়েছে?' তারপর উত্তরের অপেক্ষা না করেই উইলিয়াম সেকসপীয়রের একটি বিখ্যাত উক্তি দিয়ে শূন্যস্থান পূরণে মনোযোগ দিলেন। ঘন্টাখানেক পরে যখন স্বর্ণসুন্দরী বেশ ভাবতে শুরু করেছেন ঠিক সেই মুহূর্তে সাইকেলের রডে টুটুলকে বসিয়ে চোঙা ফিরল। রোদ্দুরে তাদের মুখ লাল। ঘরে ঢুকেই চোঙা চেঁচিয়ে উঠল, 'মা সর্বনাশ। সুধীরদার পক্স হয়েছে।'

স্বর্ণসুন্দরী বড়ি দিচ্ছিলেন। ডালবাটা মাখা হাতেই উঠে এসে বললেন, 'সে কি?'

'আমরা ঢুকতেই সুধীরদার মা বেরিয়ে এল। তারপর আমাদের বাইরে নিয়ে গিয়ে বললেন।'

'কিরকম পক্স?' ভবনাথও ভেতরের বারান্দায় উঠে এসে জিজ্ঞাসা করেন।

'ঠিক বলতে পারছি না। চোখ বন্ধ হয়ে গেছে, চেঁচাচ্ছে।'

প্রথম কথাটা ঠিক, কিন্তু চেঁচাচ্ছে কিনা সে সম্পর্কে কিছু শোনেনি চোঙা। কিন্তু অবস্থার গুরুত্ব বুঝে কথাটা বলে ফেললে।

'বুঝেছি, বুঝেছি! এখনও বোধহয় গুটিগুলো বেরোয় নি, কষ্ট পাচ্ছে। তোমরা ছেলেরা জামা কাপড়গুলো বারান্দাতে খুলে রাখো।' স্বর্ণসুন্দরী উঠে গিয়ে চিঠি লিখতে বসলেন সুধীরের মায়ের কাছে। বিকেলে চিঠির উত্তর এল। সাংঘাতিক স্মল পক্সে সুধীরের চোখ অন্ধ হয়ে গেছে। রোমকূপ কেটে রক্ত পড়ছে। বাঁচার কোন আশা নাই।

দিন পনেরো পর চকোলেট রং-এর বিশাল শেভ্রলে গাড়িটা আবার টুটুলদের বাগানে এসে ঢুকল। এবার হুইলে বসে অপরিচিত চালক, বাজখাই গোঁফ, মাথায় টুপি। ভবনাথকে সসম্ভ্রমে সেলাম করে দাঁড়িয়ে থাকল।

গাড়িতে উঠে টুটুলের সব কিছু ভোজবাজির মতো লাগে। স্পিডোমিটারের কাঁটাটা ঠিক আগের মতোই আছে. আগাটা একটু চটা-ওঠা। আবার কি ডুয়ার্সের রাস্তায় গাড়ি ছুটছে?

থমথমে বাড়ি সামনে গাড়ি এসে থামে। টুটুলের চোখ পড়ে একতলা বাড়িটার মাথায়। বিশাল সজনে গাছটা ফুলে ফুলে ঝলমল করছে।

কদিন যেতে না যেতেই শীতটা টপ করে কমে যায়। সঙ্গে সঙ্গে হাওয়া ওঠে। বাড়িটার ওপর নীচে পাক খেতে খেতে হাওয়া ঘোরে। বোগেনভিলিয়ার রঙিন পাপড়ি দোতলার বারান্দায় উড়ে আসে।

টুটুল হাঁটুর চকলা উঠিয়েছে সাইকেল থেকে পড়ে। গৌরী গরম জল তুলো দিয়ে ঘা পরিষ্কার করছিল। বুড়ী একটি পত্রিকার পাতায় বিদেশিনীদের বেশভূষার পাতাখানা দেখছিল গভীর মনোযোগ দিয়ে। গেট খোলার আওয়াজ আসে। তারপর নুড়ির ওপরে সাইকেল চাকার শব্দ।

হাতে একখানা খাম নিয়ে ভবনাথ ঢুকলেন। গোপীনাথের জ্বর। স্বর্ণসুন্দরী লুচি ভাজছিলেন। ফুটন্ত ঘিয়ে ক্রম-

বর্ধমান লুচির দিকে চেয়ে ভবনাথ বললেন, 'আবার বাঁধাছাঁদা করো।'

'এবার কোথায়?'

'কলকাতায়।'

কয়েকদিন পর ভোরের কুয়াশায় খোলা দুখানা ট্যাক্সিতে ভবনাথের পরিবার যখন শহরে ঢুকছিল, তখন টুটুল চোঙা জলপাইগুড়ির কথা প্রায় ভুলতে বসেছে। সাদা হাফপ্যান্ট-পরা এক ফিরিঙ্গি ছোকরা তাদের দিকে চেয়ে চেয়ে সিগারেট টানছে। সেদিকে মুগ্ধ দৃষ্টিতে তারা চেয়ে থাকে। গৌরী খালি টুটুলের হাতে চাপ দিয়ে বললে, 'ভগবানকে ডাক, আবার যেন আমরা কলকাতার বাইরে যেতে পারি।'

দিন সাতেক যেতে না যেতেই রোদ চড়ে আর কলকাতার সেই চিরপরিচিত বসন্তকাল আসে যখন ঘুঁটে লেপা দাদের আর ইঁদুরে মারা বিষের দেবদারু গাছ-গুলো হঠাৎ হলদে-সবুজ সুট পরে ঝলমল করে হাওয়ায়। স্মৃতি ওড়ে ডাস্ট-বিনে শালপাতার ঠোঙায়, ভাবিষ্যতের দিকে হাত বাড়াবার জন্যে কিশোর-কিশোরীদের মন ছলছল করে আর চল্লিশোত্তর মানুষ নিজেদের বাল্যকালের দিকে চায়। এ রকম বসন্তে ভবানীপুরের এক স্কুল থেকে কালীঘাট পার্কের সামনে নামে চোঙা আর টুটুল। ট্রাম-বাসে ওঠা-নামা সম্পর্কে পাখী পড়ার মতো নির্দেশ দেওয়া হয়েছে তাদের কিন্তু তবু টুটুল এখনও সবটা ধাতস্থ হয় নি। নেমেই তারা দৌড়য় বরফ কুচি আইসক্রিম্ খাওয়ার জন্যে। একটা গামছায় কয়েক টুকরো বরফ রেখে তাকে বাড়িয়ে বাড়িয়ে গুঁড়ো করে কাঠের সঙ্গে লাগিয়ে লাল সিরাপ ছিটিয়ে যে এক পয়সার আইসক্রিম তা দু'ভাইয়ের খুব প্রিয়। এ জন্যে তারা সবটা ট্রামে না গিয়ে মাঝপথে নেমে বাকী পথটা হাঁটে। ইতিমধ্যে একদিন পথে 'সাঙ্গু-ভ্যালি'-তে দু-আনার ডবল ডিমের মামলেট দুজনে ভাগ করে খেয়ে প্রচুর আত্মবিশ্বাস অর্জন করেছে। রসাল বরফের কুচিগুলো জিভে নাড়াচাড়া করতে করতে তারা দুজনেই অবাক হয়ে খাওয়া বন্ধ করে মুহূর্তের জন্যে। গেটের কাছে চিনেবাদামওয়ালার সামনে বেশ বড়রকম ভিড়। ভিড়ের ভেতর থেকে একটা বিকট চীৎকার আসছে। টেলিগ্রাম, টেলিগ্রাম। দুজনেই ভিড়ের দিকে এগোয়। হাতে হাতে লম্বা ইংরেজী খবরের কাগজের একটা পাতা। পাতা জুড়ে দুদিকে দুটো বিশাল মুখ— চেম্বারলিন আর হিটলারের।

'এইবার বাছাধন জব্দ হবে। হিটলার বাবা যে সে লোক নয়!' ভিড়ের মধ্যে থেকে একজন বললে।

'আমাদের কি হবে? আমাদের?' আর একজনের গলা এল।

খাকি হাফশার্ট পরা কুচকুচে একটা কালো মোটাসোটা লোক। বোধহয় বাড়ি-মুখী ট্রাম কন্ডাকটর। চোখে পিচুটি, হাসিতে মুখ উজ্জ্বল। এবং সে জন্যে কাঁচাপাকা গোঁফের নীচে গন্নাকাটা ঠোঁটের ভেতর থেকে দুটো দাঁত ঝলকে ওঠে। 'হাম লোক পল্টন বনে গা', ভারী গলায় বলে লোকটা।

চোঙা আর টুটুল ভিড় ঠেলে ভেতরের দিকে ঢুকবার চেষ্টা করে। চোখে চশমাপরা এক যুবক ঘাড়ভর্তি কোঁকড়া চুল ঘুরিয়ে টুটুলের দিকে তাকায়। তারপর অন্যমনস্ক ভাবে বললে, 'কোথায় যুদ্ধ হবে, আর কোথায় আমরা হট্টগোল করছি। ইংল্যান্ড-জার্মানী যুদ্ধ করে মরুক, আমাদের কি!'

'আর কদিন বাদেই বুঝবেন আমাদের কি!' মাঝবয়সী এক ভদ্রলোক পাশ থেকে ফস্ করে বললেন। আরও গলা চড়িয়ে বললেন, 'ইন্‌ফ্লেশান! ইন্‌ফ্লেশান!'

'তার মানে?'

'তার মানে? এই যে মাস মাস বিশটা টাকা মেসে ফেলে দিচ্ছো আর পোনামাছের ঝোলভাতটি হাজির হচ্ছে, এটি যাবে। হ্যাঃ।'

কোঁকড়া চুলওয়ালা পরিচিত যুবকটির দিকে চেয়ে বললেন, 'জিনিসপত্তর সব মাগ্‌গি হয়ে উঠবে, বুঝলে? বাপের হোটেলে থেকে সাহিত্য চর্চাটর্চা আর চলবে না।'

ঘামে ভিজে মুখ লাল করে দুই ভাই ভিড় থেকে বেরিয়ে আসে অমৃত বাজারের পাতাখানা হাতে নিয়ে। টুটুল ক্ষানিকক্ষণ সেই বিশাল দুখানা মুখের দিকে চেয়ে থাকে। দুজনেই প্রচুর তর্জন গর্জন করেছে। আর ছাপার হরফে সেই তর্জন গর্জন এত সুদূরে লাগে দুই ভাইয়ের কাছে যে তারা চারপাশের উত্তেজনার হদিস পায় না। পার্কে বাস্‌কেট বল খেলার তোড়জোড় চলেছে। বগলকাটা গেঞ্জিপরা ফর্সা একটি সুঠাম তরুণ শূন্যে সমস্ত শরীরখানা স্প্রিং-এর মতো ছুঁড়ে দেয় বল গোল আংটার মধ্যে ফেলার জন্যে। মেয়েরা দাঁড় লাফিয়ে আর সাদাকালো পমেরিয়ান কুকুর নিয়ে এক বৃদ্ধ বৈকালিক ভ্রমণ শুরু করেন। এর ওপর হঠাৎ কি অনাগত ভবিষ্যৎ ছায়া ফেলছে তা বুঝতে না পেরে বিহ্বলভাবে হিটলারের গোঁফের দিকে চেয়ে থাকে টুটুল।

বাড়িতে ঢুকেই কিন্তু পরিশ্রান্ত দুভাই ছুটতে ছুটতে, ওপরে উঠে আসে। 'মা, যুদ্ধ লেগেছে। যুদ্ধ!' চোঙা চেঁচায়।

'সে আবার কি?'

স্বর্ণসুন্দরীর হাতে ছেলেমেয়েদের কতগুলো গরমজামা। বাক্সে তুলতে যাচ্ছেন।

'এই দ্যাখো', কাগজটা বাড়িয়ে দেয় চোঙা।

তারপর দুই নায়কের ওপর যখন তিনি চোখ বোলান তখন চোঙা আবার চেঁচায়, 'সব জিনিসপত্তর মাগ্‌গি হয়ে যাবে।'

'বাবা কি যুদ্ধে যাবে?' টুটুল জিজ্ঞেস করে।

'দূর। ওসব কিছু হবে না। সব ঠিক হয়ে যাবে।'

।। শেষ ।।

হ্রদের নাম বৈকাল

ছেলেবেলায় বিদ্যালয়ে পাঠাভ্যাসকালে জেনেছিলাম 'বৈকাল' নামে এক হ্রদ আছে। নামটা সুন্দর মনে হয়েছিল ভালও লেগেছিল। কিন্তু ঐ নাম পর্যন্ত, বিশদ বিবরণ কিছু জানবার সুযোগ হয় নি। অনেককাল পরে আবার সেদিন একখানি রুশীয় মাসিক পত্রিকার পাতা ওলটাতে ওলটাতে ঐ বৈকাল হ্রদের একটি বর্ণনা চোখে পড়ল এবং অবাক লাগল সেটা পড়ে। মনে হল, এটা তো আর পাঁচটা হ্রদের মতো নয়? এর যেন জাত আলাদা। প্রকৃতির তো রহস্যের অন্ত নেই। বৈকাল হ্রদও যেন প্রকৃতির এক রহস্য, এক খেয়াল-সৃষ্টি!

সত্যি, কী বিচিত্র এই হ্রদ, আর কী বা এর মহিমা।

সোভিয়েট রাশিয়ার অন্তর্গত সাইবেরিয়ার দক্ষিণ-পূর্ব দিকে এই বৈকাল হ্রদের অবস্থান।

বৈকাল পৃথিবীর বৃহত্তম ও গভীরতম হ্রদ। এর দৈর্ঘ্য ৪০০ মাইল আর প্রস্থ ৫০ মাইল। গভীরতা ৫৭৫০ ফুট। আসলে একটা হ্রদ, কিন্তু সমুদ্রের মতোই এর বিশালতা, এর বিস্তার। স্থানীয় অধিবাসীদের কাছে তো এটা একটা সমুদ্রই!

একটি দুটি নয়, তিন শতটি নদী এসে পড়েছে এই বৈকাল হ্রদে, আর এটা থেকে বের হয়েছে মাত্র একটি, নাম আঙ্গারা।

সারা বছর নির্মল জলে ভর্তি থাকে এই হ্রদ। পৃথিবীতে যে-পরিমাণ অ-লবণাক্ত জল আছে তার এক-পঞ্চমাংশই রয়েছে এখানে।

অপরাপর হ্রদ বা সমুদ্রের তুলনায় এই হ্রদের জল বেশি স্বচ্ছ; ১২৫ ফুট গভীরেও চোখের দৃষ্টি যায়।

গ্রীষ্মকালে সূর্যের তাপে হ্রদের জল গরম হয়ে ওঠে ৬৫০ থেকে ৮০০ ফুট নিচে পর্যন্ত। তাই সাইবেরিয়ার অমন কড়া শীতেও এর জল সহজে জমাট হয় না।

এই হ্রদে উদ্ভিদ ও জীবজন্তু আছে ১৮০০ রকমের; এর মধ্যে আবার ১৩০০ হল এই হ্রদেরই বৈশিষ্ট্য, পৃথিবীতে আর কোথাও এদের দেখতে পাওয়া যায় না। বৈকালের খ্যাতির তাও একটা কারণ।

এক কালে স্থানীয় উপজাতিদের কাছে বৈকাল হ্রদ ছিল পবিত্র, পুণ্যতোয়া। ওরা যত কিশোরী মেয়েদের ধরে ধরে এনে তীরবর্তী সামান পর্বতের উপর থেকে ছুঁড়ে মারত ওদের, বিসর্জন দিত হ্রদের জলে। আজও ঐ হ্রদ অঞ্চলের অধিবাসীদের ধারণা বৈকালের জল পবিত্র।

অমরেন্দ্রনাথ দত্ত

হ্রদের তীরে তীরে অসংখ্য কবর এবং তার প্রত্যেকটিতে একটা করে কাঠের ক্রস। লোকের বিশ্বাস, যারা সাঁতার কাটতে নেমে বা অন্য কারণে হ্রদের অতল জলে ডুবে মরেছিল কবরগুলি তাদেরই।

সেই প্রস্তর যুগ থেকে নানান জাতের মানুষ বাস করত এই হ্রদের তীরে তীরে; তাদের মধ্যে শিকারী আর মৎস্যজীবীর সংখ্যা ছিল বেশি। সে যুগের অনেক নিদর্শন যেমন, হাড়, পাথরের কুঠার, তীরের ফলা, সূঁচ, বঁড়শি, খোলাকুচি ইত্যাদি প্রত্নতত্ত্বজ্ঞরা খুঁজে পেয়েছেন। কোনো কোনো স্থানে আবার বহু প্রাচীন তথ্যাদি গোচরে এসেছে, পাওয়া গেছে সেকালের মানুষের জীবনযাত্রার আভাসও।

বৈকালের পশ্চিম তীরে দাঁড়িয়ে আছে মারবেল পাথরের এক মস্ত বড় পাহাড়। তার পাদদেশে রয়েছে বিরাট বিরাট প্রস্তর-খণ্ডে আঁকা ৬০ খানি চিত্র। সেগুলির রচনাশৈলী ও বৈচিত্র্য বিশেষ আকর্ষণীয়। ঐ সকল ছবির বিষয়বস্তু প্রধানত মানুষ। কিন্তু গৃহপালিত এবং বন্য পশুপাখীও স্থান পেয়েছে তাতে। এদের মধ্যে আবার বিশেষ প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে রাজহংসকে। সাইবেরিয়ার কোনো কোনো অঞ্চলে নাকি সে যুগে রাজহংসের পুজো প্রচলিত ছিল। অংকনরীতি ও বিষয়বস্তু থেকে যতটা অনুমান করা যায়, চিত্রগুলি সম্ভবত ২২০০ থেকে ২৫০০ বৎসর আগেকার।

পুরাকালের একটা গুহামন্দিরের অস্তিত্বও আবিষ্কৃত হয়েছে হ্রদ এলাকায়। ওখানে রয়েছে ব্রোঞ্জ ও রৌপ্য নির্মিত অসংখ্য বৌদ্ধ বিগ্রহ। অন্যান্য ধর্মীয় নিদর্শনেরও ছড়াছড়ি ঐ গুহার আশে-পাশে। কথিত আছে, চেংগিস খান পরিদর্শন করেছিলেন ঐ সামান গুহা।

মানুষ বৈকাল হ্রদকে দেখেছে জেনেছে সেই স্মরণাতীত কাল থেকে। কিন্তু হ্রদে যে অফুরন্ত সম্পদ লুকানো রয়েছে তার খোঁজখবর রাখে নি কখনো, কোনো চেষ্টাই করে নি হ্রদের প্রাকৃতিক সম্পদ আহরণের। যুগ যুগ ধরে বৈকাল হ্রদে কেবল মাছই ধরা হয়েছে,—হেরিং সালমন ও অন্য দু-চার রকমের মিষ্টি মাছ। এক জাতের ছোট ছোট মাছ এই হ্রদের বৈশিষ্ট্য; এর নাম গোলামিয়াংকা। আকার ছোট, কিন্তু নামটা বড়। সাদা ধবধবে রং মাছটির, দেখতে বেশ সুন্দর। আকারে ছোট হলে কী হবে, এতে চর্বি আছে শতকরা ৩৫ ভাগ, আর প্রচুর পরিমাণ এ ভিটামিন। আর আছে বিশেষ এক জাতীয় সীল। মাংস, চর্বি ও চামড়ার জন্য বৈকালের এই জীবটি বিখ্যাত। কিন্তু কী করে এই জীব মহাদেশের অভ্যন্তরে বৈকাল হ্রদের জলে এসে ঠাঁই নিয়েছে লোকে তা আজো ভেবে পায় না। বর্তমানে এই হ্রদে ঐ জাতীয় সীলের সংখ্যা ৩৫ হাজার। যা হোক, হ্রদের প্রাকৃতিক সম্পদের প্রতি ইতিপূর্বে লোকের দৃষ্টি পড়ে নি; ঐ সম্পদ যে দেশের নানাবিধ কল্যাণকর্মে নিয়োজিত হতে পারে এই সম্প্রতি সেটা লোকের খেয়ালে এসেছে এবং কাজও শুরু হয়েছে বিপুল উদ্যমে। মৎস্য-চাষের ব্যবস্থা খুব জোরদার করা হয়েছে; স্থানে স্থানেই মাছের ডিম ফোটানোর ব্যবস্থা আছে। একটা পৃথক সংস্থা গঠন করা হয়েছে হ্রদের সুষ্ঠু রক্ষণাবেক্ষণের উদ্দেশ্যে। বৈকাল ও আংগারার তীরে তীরে স্থাপন করা হয়েছে বহু হাইড্রো ইলেকট্রিক কেন্দ্র। সাইবেরিয়ার প্রাকৃতিক সম্পদ তো অফুরন্ত? বৈকাল হ্রদটাকে ঘিরে রয়েছে সারি সারি পাহাড়-পর্বত। তার ঢালু প্রদেশে সে কী বিশাল গভীর অরণ্য। শতাব্দীর পর শতাব্দী কেটে গেছে মানুষ ঐ অরণ্যের ধারে-কাছেও ঘেঁষে নি। বনাঞ্চলে ছিল আতংক। কিন্তু বর্তমানে সেই অচল অবস্থার পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়। বিজ্ঞান-সম্মত উপায়ে বনাঞ্চল উন্নয়ন ও তত্ত্বাবধানের ব্যবস্থা করা হয়েছে। কাঠ কেটে কেটে বন্য জঙ্গল সাফ করা হচ্ছে; কিন্তু যথেচ্ছভাবে নয়, একটা নির্দিষ্ট পন্থায়। আর, ঐ কাঠ দিয়ে কারখানাসমূহে তৈরি হচ্ছে যত রেলের স্লিপার।

বৈকালের জলে লবণের অংশ কম। এতে করে বিভিন্ন শিল্প সামগ্রী তৈরির দিক দিয়ে বিশেষ সুবিধা হয়েছে। সেলুলয়েড ইত্যাদি নানা শিল্পের কারখানা গড়ে উঠেছে তীরে তীরে। ওদিকে হ্রদের জল যাতে না দূষিত হয় তার প্রতিও দৃষ্টি রাখা হয়েছে। জল দূষিত হবার সম্ভাবনা আছে এমন কোনো শিল্পের কারখানা হ্রদের তীরে স্থাপন করা নিষিদ্ধ; এমন কি, কাষ্ঠাদির স্তূপও হ্রদের জলে ভাসানো বারণ।

প্রাকৃতিক সম্পদ পুরাপুরি কাজে লাগানোর উদ্দেশ্যে সম্প্রতি আর একটা পরিকল্পনাও করা হয়েছে। হ্রদ অঞ্চলে একটা পার্ক তৈরি করা হবে, নাম স্টেট ন্যাশনাল পার্ক। ওটা তৈরি হবে এক বিস্তীর্ণ অঞ্চল, প্রায় ৩৫ হাজার বর্গ-মাইল জায়গা জুড়ে। ওখানে থাকবে জল-প্রপাত, গিরিখাত, ছোট ছোট হ্রদ, তৃণভূমি, পাহাড়পর্বত আর বনজঙ্গল। শেষ পর্যন্ত ঐ পার্কটাকে পরিণত করা হবে এক গবেষণা কেন্দ্রে। সে এক আশ্চর্য পরিকল্পনা।

বলা বাহুল্য, খুবই স্বাস্থ্যকর স্থান এই হ্রদ অঞ্চল। এক কথায় বলবীর্যের উৎস। প্রাচীনকাল থেকেই লোকে লক্ষ্য করে আসছে যে, শুধুমাত্র হ্রদের তীরে বসে থাকলেই শরীর মন চাঙ্গা হয়ে ওঠে, যথেষ্ট তেজবল অনুভূত হয়। রুগ্নপীড়িত ব্যক্তিরা দু-চার দিনের মধ্যেই সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে ওঠে, আর দুর্বল যারা অচিরে তারাও শক্তিমান হয়। আশ্চর্য!

কী জানেন, পৃথিবীর আর হাজারটা হ্রদের মতো নয় এই বৈকাল হ্রদ। এমন বিশালতা এমন অত্যাশ্চর্য রূপশোভা আর কোন হ্রদের নেই, নেই এত প্রাকৃতিক সম্পদও। এর ভাবগম্ভীর পরিবেশ এক অদ্ভুত সাড়া জাগায় মনের অন্তস্তলে। তীরবর্তী ধূসর রঙের পাহাড়-পর্বত আর সবুজ রঙের গাছগাছড়ার পটভূমিকায় বৈকালের নীল জলরাশি আর উপরে নীল আকাশ এ দুই যেন এক পরম রমণীয় মায়াজাল বিস্তার করেছে।

সুবর্ণশিরি

অমরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

।। সাত ।।

পরদিন সন্ধ্যায় তুকারাম এসে বসল রাবণের সামনে। তার মুখ দেখে রাবণের মনে হল, সে যেন বাপ-মার মৃত্যুর পর শ্রাদ্ধ-শান্তি ক'রে শুচি হয়ে এসেছে। সেই মুখের পানে সে তাকিয়ে রইল উদগ্রীব ও উৎকণ্ঠিত ভংগীতে।

কিছুক্ষণ দুজনেই চুপ করে রইল। তারপর তুকারাম ধীর-গম্ভীর স্বরে কথা শুরু করল। আগের দিনের আলোচনার জের টেনে বললে—কাল শুনেছিস তো আমি কি করে মেথর হলাম। মেথর ছেলে-মেয়ের বাপ হলাম।

পূর্ব অপরাধের দায় থেকে রাবণ তখনও মুক্ত করাতে পারেনি নিজেকে। সে অস্ফুট স্বরে বলল—হুঁ।

—আমার নতুন মা-বাবা ছিল তিন-সুকিয়ার এক চা-বাগানে। তারা আমায় খুব ভালবাসত। তাই যতদিন তারা বেঁচে-ছিল, আমি সেখান থেকে বের হতে পারিনি। একদিন তারা মরে গেল, এক মাসের আড়াআড়ি দুজনেই মরল। আমিও সেখান থেকে বেরিয়ে পড়ি। এখানে সেখানে ঘুরে শেষে রেলের এই চাকরিটা জোগাড় করে নি। কাজটায় ইজ্জত আছে। এখানে থাকার জন্য বহু লোকের সংগে দেখাশোনা, চেনাজানা হয়। দেখ না, এখান থেকেই তো বড় মেয়েটার বিয়ে দিয়েছি কেমন ইজ্জতদার ছেলের সংগে।

রাবণ জানে তুকারামের পারিবারিক বৃত্তান্ত। তার বড় জামাই সুবর্ণশিরির বাগানে বড় সাহেবের বাংলোর জমাদার। বাগানটা মস্ত বড়, এখান থেকে বেশ দূরে। সেখানকার বিস্তারিত বিবরণ জানবার সময়, বা সুযোগ হয়নি কখনো। তুকারামের মনে সহজ ভাব ফিরিয়ে আনার পক্ষে, সেই বিষয়ে আলোচনা করার কথাটা ভালই মনে ধরল। তাই রাবণ তখন জানতে চাইল তার জামাই-মেয়ের কথা, বাগানটার কথা।

মুহূর্তে তুকারাম গা-গতর ফুলিয়ে, চোখ দুটো টেনে বড় করল। দু-হাত বিস্তার করে বলল—ওরে বাব্বা! মোস্ত ভাগ্গর মুনিজ্ঞার বাগান (ভাবটা বড় বাগান, ইংরেজ ম্যানেজার)। সাত ডিভিশনে সাতটা ম্যানেজার, তার ওপর বড় ম্যানেজার। সব সাহেব।

প্রসঙ্গটা বদলে যেতে তুকারামও বদলে গেল রাবণের আশানুরূপ। সে মাথা দুলিয়ে, হাত নেড়ে ব'লে চলল একটার পর আর একটা। রাবণ তা অবাক হয়ে শুনতে লাগল। মাঝে মধ্যে এক-আধটা প্রশ্নও করল তার কৌতূহলের নিষ্পত্তি করে নিতে।

—এক-একটা ডিভিসনের পাতায় কত মন-চা হয় জানিস? —পাঁচ দশ হাজার মণ। দশ-পনের মাইল লম্বা চওড়া বাগানটা। সমান জমি প্রায় সব, দু-চারটে মাত্র টিলা আছে। কুলিদের খেত-খামারও আছে—ধান, কলাই, মুশুড়ি, মাকই (ভুট্টা), কুঁহিয়ার (আখ), আরো কত কি জন্মায়। বন-জঙ্গলেও ভরে আছে আশ-পাশে কত জমি। বাপ, কি সব জন্তু-জানোয়ার সেখানে।

—জন্তু-জানোয়ারও আছে?

—পাহাড়-জঙ্গল রাজ্যে জীবজন্তু থাকবে না তো কোথায় থাকবে! কেন, তোদের ওখানে নেই নাকি?

—দার্জিলিং-এ নেই, সেখানে তো শীত। নীচের তরাই অঞ্চলে আছে। ওখানে সমান জমি নেই। সব বাগানেই পর্বতের গায়ে থাক থাক চা-গাছ লাগানো। আমাদের বাগানটা দার্জিলিং থেকে নীচে শিলিগুড়ি পর্যন্ত থাক থাক নেমে গেছে। রোপ-ওয়েতে ডাব্বা বোঝাই পাতা আসে কার-খানায়—কারখানা থেকে চা-এর পেটি যায় শিলিগুড়ি স্টেশনে। সেখানকার বাগানে চীনা চারা। এখানে দেখছি মণিপুরী-বীজেরই বেশীর ভাগ।

—ওঃ! এ বাগানটা দেখলে আশ্চর্য হবি।

জামাই-এর বাগানটা দেখেশুনে তুকারাম যতখানি আশ্চর্য হয়েছে, ততখানি ক'রে তুলতে চাইল রাবণকে তার কথার ভঙ্গিমায়। সে হাত দুটো ঘুরিয়ে ফিরিয়ে বললে—হাজার হাজার একর চা-এর খেত। এখানে একটাও চীনাগাছ নেই। ওতে আজকাল খরচ পোষায় না। পুরোনো চীনা গাছ তুলে আসাম-বীজের গাছ লাগানো। সব শিরীষ মুখুটিয়ার ছায়ায় ঢাকা। ছায়ার নীচে চায়ের খেতটা যেন ঘোর সবুজের একখানা গালিচা—ওপরে শিরীষ মুখুটিয়ার পাতা-গুলো যেন ফিকে সবুজের চাঁদোয়া। যেন দেব-দানবের আসর, অনন্তকাল ধরে পড়ে আছে। খেতের বুকে অসংখ্য সড়ক। কোনটা লাল কাঁকরে ঢাকা, কোনটা বা পাথরের—এক-একটা পড়ে আছে প্রকাণ্ড ময়ালের মতো। এঁকে-বেঁকে গেছে কোনটা, কোনটা সিধে, কোনটা গোল হয়ে লেজে-মুখে মিলে রয়েছে গুমটির গোল বাগানটার পরের লাইনে—পর পর সমান্তরাল রেখার মতো অমন আছে কয়েকটা। ঐ ময়ালের মুখগুলো গুমটিতে এক হয়ে গুঁজড়ে আছে, আর লেজগুলো কোথায় গিয়ে মিলেছে! তা আর চোখে পড়ে না। ঐ গুমটির ধারে কারখানার ঘর-বাড়ীগুলো খাড়া হয়ে আছে—গোল ফুল বাগানটার চারপাশে। এমন সাজানো-গোছানো এতবড় বাগান দেখিনি। আকাশ থেকে মনে হবে একখানা ডোরাকাটা জাজিম। তাতে 'পিলা-পিলা' সোনার তারার ঝিলিক মারে যখন শিরীষ গাছের কুঁড়িতে ফাগুয়ার রং লাগে। আঁকা-বাঁকা পাহাড়ে নদীটা যেন জাজিমটার এক পাশের 'পিলা-পিলা' 'বগা-বগা' (ভাবটা—সোনালী রুপোলী) জরির পাড়। আর এক পাশের পাহাড় নেই, আকাশের মেঘ নেমে এসে লুকিয়ে রেখেছে কতকাল ধরে। মাঝে মাঝে কেবল নালাগুলো রন্দি করে দিয়েছে অমন সুন্দর জাজিমটা।

জাজিমটাকে রন্দি করার কথা বলার সংগে তুকারামের নাক-মুখ কুঁচকে এল, তার অমন ভাবও হঠাৎ থমকে গেল। অকস্মাৎ সে গম্ভীর হল। প্রসঙ্গটারও

সংক্ষেপ করে বললে— খুব বঢ়িয়া বাগান, সিখনে যাই দেইখে লিবি।

বন্ধুর কথায় রাবণ বিশেষভাবে আকৃষ্ট হয়ে পড়ল বাগানটার ওপর। সে জানতে চাইল কেমন ক'রে সেটা দেখা যায়।

বন্ধু তখন রাবণকে বুঝিয়ে বললে—তোরা যখন বাগানেই থাকতে চাস তখন বাগানের মতোই চলতে হবে। তুই যদি বিলি-মাকে বোন, বা অন্য কোন পরিচয় দিস তবেও মুশকিল আছে। ডেন্ডুরোর (অবিবাহিত ছেলের) দল তাকে বিরক্ত করে মারবে। জানিস তো বাগানের লোকের কুলি-কামলা বা বাবুভায়া সকলের স্বভাব?—অথচ তোর সঙ্গ ছেড়ে থাকতেও পারবে না ওরা দু-মা-বেটা।

বন্ধুকে রাবণ সম্মান করে, তার উপদেশ সে মাথা পেতে নিতে সম্মত। সে জানতে চাইল, তবে কি তার কর্তব্য।

এদিক-ওদিক মুখ ফিরিয়ে তুকারাম সাটে বুঝিয়ে দিল কিভাবে তাদের থাকতে হবে বাগানে গিয়ে।

রাবণ বেশ একটু লজ্জিত হল। বিলিকে নিজের স্ত্রী-রূপে পরিচয় দিতে হবে, আর মেঘুকে নিজের ছেলে!

রাবণের মনের মধ্যে কথাটার বিশেষ কোন প্রতিক্রিয়া করবার অবকাশ না দিয়ে জানাল—ছোট মেয়েটার বিয়ের ব্যবস্থা করতে, একবার বড়মেয়ের কাছে সুবর্নশিরি চা-বাগানে তার যাওয়া একান্ত প্রয়োজন। তার কাছে তুকারাম চিঠি লিখেছিল রাবণদের বিষয় জানিয়ে। মেয়ে-জামাই ভরসা দিয়ে জবাব লিখেছে। তাই রাবণকে সে সঙ্গে নিয়ে যেতে চায়। যা হয় একটা কাজের ব্যবস্থা করে দিয়ে আসবে। মেয়ের কোয়ার্টারে বাড়তি ঘর আছে। অনায়াসে সবাই মিলে সেখানে ওঠা যাবে। কাজ হলে তো ঘরই পাওয়া যাবে। সাহেবকে বলে তার জামাই দুখানা ঘরের ব্যবস্থাও করেছে।

কুলিদের পক্ষে প্রায় সকল বাগানের দরজাই অবারিত। সর্দারী বা অমন ধরনের কাজ সব সময় জোটে না। রাবণ কার্সিয়াং-এ সর্দারী করেছে। আরও বড় কাজ করেছে দার্জিলিং-এর বাগানে। তাকে তো আর ছোটখাট কাজ দেওয়া যায় না। তার পদ-মর্যাদা অনুযায়ী কাজও সে ক'রে দিতে পারে। কিন্তু তেমন কাজ তো সাহেবদের বাংলোয়। তাতে তো আর বাড়তি কামাই নেই। তাদের চাই এমন কাজ, যাতে কামাইটা থাকে হাতের মুঠোয়। এই অবস্থায় যতটা ভাল হতে পারে, তেমন একটা কাজের যোগাড় ক'রে দেবার জন্য সে ব্যস্ত।

তুকারামের উপদেশ পালনের মধ্যে যত লজ্জা-সংকোচের কথাই থাক না কেন, রাবণের মনে তখন ঢাকা পড়ে গেল সেসব চিন্তা। সে শুধু কৃতজ্ঞ চিত্তে ভাবতে লাগল যে, তুকারাম তার সমস্যা নিয়ে এতটা গভীরভাবে চিন্তা করে? তার এ ঋণ সে কি দিয়ে শোধ দিতে পারবে?

তাকে আর কোন কথা বলবার ফুরসত না দিয়ে তুকারাম উঠে দাঁড়াল। এবং রাবণের উঠান ছেড়ে যাবার আগে জানিয়ে দিলে—ঘরে কথাবার্তা বলে যেন কালই যাবার জন্য তারা প্রস্তুত হয়।

।। আট ।।

নিজেকে যে গৌরবের আসনে বসাবার আশা-আকাঙ্ক্ষা নিয়ে বিলি জনসনের ঘরে গিয়েছিল, সন্তানের ভবিষ্যত গড়ে তোলবার যে সুখ-স্বপ্ন সে দেখেছিল, তা তার পূর্ণ হল না। জনসন তার কাছে যত বড়ই হক না কেন—বিলির কাছে তার স্মৃতির যতখানি মূল্যই থাক না কেন, তার মৃত্যুর পর ভূমিষ্ঠ এই ছেলেটার কাছে সে ঘরের কতটুকু মূল্য! হলই বা সে ধনী ইংরেজের ঔরসজাত। কিন্তু অনাথিনীর অবৈধ সন্তান এই সংসারে কতটুকু মর্যাদা পাবে? যা সে হারিয়েছে, যা তার নেই, তার মধ্যে নিজেকে জড়িয়ে রাখলে হয়তো তার মেঘনাদের জীবনও একদিন অভিশপ্ত হয়ে উঠবে। যে পিতৃত্ব তার সন্তানকে পিছনে টানবে তা মেঘনাদের মাথায় চাপিয়ে দিতে চাইল না সে। যেখান থেকে তাকে নেমে আসতে হয়েছে, সেখানে নিজের সন্তানকে অধিষ্ঠিত রাখার মধ্যে কোন গৌরব কোন সার্থকতা খুঁজে পেল না সে। এইটুকু সে নিজের জীবন দিয়েই বুঝেছে। এত রূপ-গুণ থাকা সত্ত্বেও, মায়ের মৃত্যুর পর তার এমন একটি আশ্রয় জোটে নি, যাতে আজ সে পাঁচজনের সামনে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে থাকতে পারত। জনসনের কাছ থেকে সে যথেষ্ট ভালবাসা পেয়েছে, কিন্তু সমাজের একপাশে একটু ঠাঁই পায় নি। জনসন দিতে চায় নি, শেষ পর্যন্ত সেও চায় নি তা নিতে। যে জিনিসটা তার স্বেচ্ছার রচনা, সেটাই একদিন মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে। বিলিকে সুখী করবার শত যত্নের মধ্যেও জনসনের ঐ একটি আপত্তি, একটি বিমুখতার ব্যথা তার বুকের এক-পাশে মাঝে মাঝে ঠেলা দিয়ে উঠেছে। তাতে সে কম বেদনা পায় নি। সেই ব্যথার নির্ঝরে একদিন অমৃতের প্লাবন দেখা দিয়েছিল। এমন একদিন এসেছিল তার জীবনে, যেদিন বিলির কথায় জনসন সব কিছু করতে পারত। কিন্তু তখন অনেক দূর এগিয়ে গিয়েছে তারা। যেখান থেকে যাত্রা শুরু হয়েছিল, সেখানে ফিরে যাবার আর কোন উপায় ছিল না। ফিরে গিয়ে নতুন করে যাত্রা শুরু করবার আর কোন পথ ছিল না। ইচ্ছার গাছে তখন ফল ধরেছে। ফল-সমেত গাছ এ-দেশের মাটিতে ভাল ফলবে না। প্রতীচ্যের ক্ষীণালোকে যা সম্ভব, প্রাচ্যের উজ্জ্বল আলোকে তা সম্ভব নয়। এ যুগ এগিয়ে চলার। মহাভারত একটা প্রাচীন পুঁথি মাত্র। সে যুগের দৃষ্টান্ত খণ্ড-ভারতে ফিরিয়ে আনলে, ভারতকে পিছিয়ে পড়তে হবে।

জনসন ইংরেজ, কিন্তু তার নামটা নরউইজিয়ন। হয়তো তার পূর্বপুরুষ সে-দেশ থেকে এসেছিল। অন্ততঃ তার চরিত্রে দুটো দেশেরই ভাব বিদ্যমান—ইংরাজের দৃঢ়তা, ও নরউইজিয়নের আন্তরিকতা। একদিন তার অন্তর জেগে উঠেছিল, একদিন রূপমুগ্ধের মাথা নত হয়েছিল। তখন সে গুণমুগ্ধ। সেই গুণের মর্যাদা সে দিতে চেয়েছিল। কিন্তু বিলি তখন বেঁকে দাঁড়িয়েছে। বিলির মর্তবিমুখতায় তা দিতে না পেরে জনসনও কম মর্মাহত হয় নি।

দুস্তর বাধাবন্ধন অতিক্রম করে, এক দেশের বিধিব্যবস্থা আর এক দেশে প্রচলিত হয়, এক দেশের শাস্ত্রকার অপর দেশের কত সমস্যার সমাধান করে থাকে। কিন্তু এই দুটি প্রাণী একান্ত কাছাকাছি থেকেও তাদের একটি সমস্যার সমাধান করতে পারে নি।

তাই আজ বিলির দাঁড়াবার কোনও স্থান নেই। নিজের জন্মের জন্য কোন অপরাধ, কোন দায় তার নেই। কিন্তু সন্তানের জন্মের জন্য সে দায়ী, অপরাধিনী। তার ভবিষ্যত গড়ে তোলার দায় বিলির। বিলির জন্মের পর তার মা রাজকুমারী নিঃসঙ্গ জীবনযাপন করেছে, শুধু একটি ত্রুটি, একটি অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত করতে। সেই দায়মুক্ত হতে, বিলিকে গড়ে তুলতে, তার মা আজীবন কত কষ্ট করে গেছে। কত চেষ্টা, কত যত্ন করেছে মেয়ের অন্তরে নিজেকে প্রতিষ্ঠা করতে; যাতে রাজকুমারী বিলির শ্রদ্ধাভাজন হতে পারে, যাতে বিলি স্বাবলম্বিনী হতে পারে। কিন্তু নিয়তি তার সে সব ইচ্ছা পূর্ণ হতে দিল না। রাজকুমারী মরে গিয়ে বেঁচে গেছে। নিয়তির নিয়ন্ত্রণ পূর্ণ করতে সহায়তা করেছে।

একদিন হয়তো এমন কত কি প্রশ্নের মুখোমুখি হয়ে বিলি বিব্রত হয়ে পড়বে, সন্তানের বিরক্তি-ভাজন হবে। হয়তো তার জন্য হারাতেও পারে তার শেষ আশা-ভরসার কেন্দ্র, তার জীবনের শেষ সম্বলটুকু।

তাই বিলি চেয়েছিল পৃথিবীর কোন এক নিভৃত কোণে অজ্ঞাতবাস। যেখানে বিগত জীবনের গ্লানির পাশ থেকে মেঘুকে মুক্ত করে রাখতে পারা যায়। তাতে তার গৌরব যদি যায়, তবে যাক। পুরোনো দিনের সবকিছু থেকে আড়াল করে লুকিয়ে রাখতে চেয়েছিল তার বাকী জীবনের একমাত্র সম্পদটিকে, তার স্নেহের টুকরো-টিকে। জনসনের স্মৃতি তার নিজস্ব, তার সঙ্গে তার সন্তানের কোন যোগাযোগ রাখতে চাইল না বিলি। তাই তাকে তুলে দিল রাবণের হাতে। রাবণ ধর্মসাক্ষী করে তাকে গ্রহণ করল ধর্মপুত্ররূপে। তাই তার নাম রাখল মেঘনাদ—রাবণের পুত্র মেঘনাদ। বাইরে প্রকাশ রইল বিলি রাবণের ঘরণী। এই অসময়ে তুকারামই একমাত্র বন্ধু, শুভাকাঙ্ক্ষী। সে যেমন পরামর্শ দিল, তেমনই করল তারা।

সুবর্নশিরি বাগানে গিয়ে তুকারাম শুনল তারা পৌঁছবার দিন-দুই আগে তিনজন সর্দার নিযুক্ত হয়েছে। তবু আশা আছে। কুলি চালান দেবার কোম্পানি জানিয়েছে—মাসখানেক পর একদল নতুন কুলি চালান হয়ে আসবে। তখন কয়েকজন সর্দার নেওয়া হবে। আরো শুনল বাগানে

একটা নতুন সেকসন তৈরি হচ্ছে। পাকা হাত ছাড়া এ-কাজ দেওয়া হয় না, ফলও ভাল হয় না তাতে।

শীতের দিনে চা-গাছের বীজ ছায়ায়-ঢাকা মাটিতে বুনে রাখে। সেই সঙ্গে আর একদিকে তৈরি হয় পুলি (চারা) লাগাবার জমি। আর এক শীতে নার্শারী থেকে পুলিগুলো তুলে এনে বসাতে হয় ঐ নতুন জমিতে। শিরীষ, মেড়োলার ছায়ায় ঢাকা জমি। কড়া রোদে মরে যেতে পারে গাছ—তাই ছায়া চাই। চা-গাছের সারি লাগাবার অনেক ব্যবস্থা, অনেক কায়দা। টিলার জন্য টেরেসের একরকম সারি, সমভূমির জন্য অন্যরকম। মোটামুটি তিন থেকে পাঁচ ফুট দূরত্ব রাখা হয় একটা থেকে আর একটা গাছের। অতি আধুনিক ও লাভজনক হল হেজ-প্ল্যানটেশন—দু-ফুট অন্তর দু-লাইন পুলি তারপর পাঁচ ফুট ফাঁকা গলি। লোকজন চলাফেরা করবে, দরকার মতো লাঙলও চালিয়ে দেবে সেই গলিতে। এটার জন্য চাই সমান জমি।

চা-বাগানের কাজ দু-অংশে ভাগ করা। একটা কারখানায়—সেখানে অপরাপর প্রতিষ্ঠানের মতো আট ঘণ্টা হাজির থাকতে হয়, কাজ করতে হয়; অপরটা বাগানের—সেখানকার যতকিছু কাজ সবই ঠিকা, সবই নির্দিষ্ট হারে বাঁধা হাজিরা কাজ। এক কথায় বলা দুই-আড়াই বা তিন ঘণ্টা কাজ করলেই একটা হাজিরা কামাই হয়। আগে বাগানের কাজও করতে হত আট ঘণ্টা। পরে সারা দিনের প্রত্যেকটা কাজ মাপজোখ করে নির্দিষ্ট কাজের ওপর হাজিরা ধার্য হল—সময়ের ওপর নয়। এখন দেখা গেল, পাতা তোলা বাদে, বাগানের সব রকম হাজিরা-কাজ শেষ হতে পারে ঘণ্টা দু-তিনেকের মধ্যে। বিলেতে 'গো স্লো মুভমেন্টের' কথা এখন শোনা যায়, ওরা অনেক আগেই তার মহলা দিয়ে জিতেছে। তবে আধুনিক কারা!

পশ্চিম দেশের প্রায় সকল মজুরই কাজ করে ঘণ্টা আন্টেক। কিন্তু হাজিরা কাজের 'নর্ম' বাঁধা। তার কম হলে বিশেষ কিছু যায় আসে না। তবে দলের লোকরা অসন্তুষ্ট হয়—তেমন ঢিলে লোককে অনেক সময় দল থেকে বাদ দেয়। কারণ, বেশি কাজ হলে তার ওপর বোনাস পায় সবাই। ওরা কাজ করে, কামাই বাড়ায়। চা-বাগানের কর্মীরা চায়—সময় যত হাতে থাকে, পয়সা নয়।

ট্রান্সপ্ল্যানটেশনের কাজে ঐটুকু সময়ে আরো বেশী কামাই হতে পারে। এ-কাজে নিপুণ হাত চাই। কাজটা শেষও করতে হবে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে, শীতের মধ্যে। তাই কর্তৃপক্ষের ঢালা হুকুম—যাতে তৈরি চারাগুলো তাড়াতাড়ি লাগানো হয়ে যায়। অন্য কাজে সাধারণতঃ এক হাজিরা কাজই কর্তৃপক্ষ দিয়ে থাকে। কিন্তু এ-কাজে পুল লাগানো হিসাবে পয়সা।

রাবণের তখন পয়সার দরকার। সর্দারীতে বাঁধাবরাদ্দ পাওনা। তার অভাব সে কাজে মিটবে না কোনমতে। তাই ট্রান্সপ্ল্যান্টেশনের কাজই সে নিল।

নবেম্বর শীত পড়েছে। পাতা তোলার কাজ তখনও জের টেনে চলেছে। কাজমী শেষ পাতা তুলতে। বাগানের সব কাজই তার জানা, যখন পাতা তোলা বন্ধ হবে তখন সে যাবে চা-গাছ ছাঁটাই করতে।

রাবণ খুশী হলেই তুকারাম খুশী। একটা মস্ত দায় তুকারামের মাথা থেকে নামল, সে বেশ হালকা বোধ করল। কিন্তু একটা দুঃখ, এবার এদের ছেড়ে যেতে হবে ডিব্রুগড়ে। আর আগের মতো দেখাসাক্ষাৎ হবে না, দৈনন্দিন সুখ-দুঃখের খবরও পাবে না। একমাত্র ভরসা চিঠিপত্র, তাতে কি সব কথা বলা যায়! সকলকে শুভেচ্ছা জানিয়ে তুকারামকে ফিরতে হল। মনের মধ্য বইতে থাকল সুখ-দুঃখের জোয়ার-ভাটা।

বিলি ধীরে ধীরে ভাল হয়ে উঠল। মনের নিভৃতে তার সন্তানের যে রূপই ফুটে উঠুক না কেন, মেঘু দিন-দিন বড় হয়ে উঠতে থাকল জনসনের রূপলাবণ্য নিয়ে। পড়াশোনা করবার বয়সও হল। কিন্তু এই বয়সেই তার দুরন্তপনার কাছে হার মানল প্রতিবেশীদের ছেলেরা। ছেলেদের সঙ্গে হুটোপাটি করে বেড়াতে ভালবাসে মেঘু। কিছুতেই সে বই নিয়ে বসতে চায় না। মায়ের শত চেষ্টা ব্যর্থ হল। সব কথাই শোনে, কিন্তু বই নিয়ে বসলেই মায়ের কোলে বসে হাই তোলে, মায়ের স্নেহ-বেষ্টনের মাঝে সে ঘুমিয়ে পড়ে।

ঘুমন্ত শিশুর মুখখানা বিলি দেখে আর ভাবে জনসনের কথা। মাত্র কয়েকটা বছর সে জনসনের সঙ্গ পেয়েছে। তারই মধ্যে যেটুকু তার কাছে সে পেয়েছিল তার রেশ এতদিনের মধ্যে এতটুকু কমল না, বরং বেড়েই চলেছে।

চা-বাগানের বাইরে জনসনের সংসারে নতুন করে পরিচয় দিয়ে, নতুন ধরনের জীবনযাত্রা সে চায় নি। আসামের এক-একটা বাগান এমন দুর্গম স্থানে, দুর্গম পরিবেশের মধ্যে অবস্থিত, যা আপাত-দৃষ্টিতে যেন পৃথিবীর বাইরে। এক-একটা বাগানই যেন স্বয়ংসম্পূর্ণ পৃথিবী, অথবা পৃথিবীর প্রান্তে একটা মরুদ্বীপ। যদিও, ব্যবসার দিক দিয়ে, চা-বাগানের সঙ্গে রাষ্ট্রীয় নিয়ম-কানুনের, সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক আবর্তন-বিবর্তনের যথেষ্ট সম্বন্ধ আছে। আছে আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতা। সে-সব কর্তৃপক্ষের কথা। তার সঙ্গে নগণ্য কুলী-মালীদের সরাসরি কোন যোগাযোগ নেই। এককালে তো কিছুই ছিল না। আজকাল হয়েছে অনেক কিছু।

এক-একটা বাগানের কর্তৃপক্ষ ছিল রাজা, প্রজা হল কুলি-কর্মচারী। এককালে সে-সব রাজ্যে বহু সামন্তীয় প্রথার প্রচলন ছিল। কত জাঁকজমক, কত রঙমহল শিশমহলের কথাই না শোনা যায়। বর্তমান পরিস্থিতির চাপে পড়ে সেসব কবরস্থ হয়েছে অন্তরের অন্দরমহলে।

॥ নয় ॥

এক দেশ ছেড়ে অন্য দেশে এসেছে। তবুও এটা তো চা-বাগান। এখানকার যা কিছু দেখে তাতেই বিলির মনে জেগে ওঠে পূর্বস্মৃতি। জুলিয়েনের কাছে নিরাশ্রয় হয়ে বসে থাকে। চা-গাছের ওপর পড়ে থাকে তার অপলক চোখ দুটি। সাহেবের বাংলোর সামনে গেলে পা-দুটো স্থির হয়ে যায়। তার ওপর মেঘু! তাকে দেখে সে যতখানি খুশী হয়, ততখানি দুঃখে ভরে পাড় তার মন। মেঘুর মুখখানা তার মনে যেমন ভুলিয়ে দেয় তার বাপের কথা, তেমনি মনেও করিয়ে দেয়। এমনিভাবে দিন-রাত জনসনের কথা ভাবতে-ভাবতে বিলির সমস্ত বোধশক্তি আবার শিথিল হয়ে আসে। কোন কাজের, কোন কথার সঙ্গে তাল রেখে চলতে পারে না তার স্মৃতি, তার বোধশক্তি। কে আর দুরন্ত ছেলের রাশ টেনে ধরে, কে তাকে লেখাপড়া শেখায়? আর লক্ষ্মী ব্যস্ত থাকে বাগানের কাজে, ঘর-সংসারের কাজে। বিলি সারা দিন ঘরে বসে আপন মনে কথা কয়, হাসে-কাঁদে, গান গায়, কত কাণ্ড করে। প্রতিবেশিনীদের সামনে চুপ করে বসে থাকে, কথা কয়, হঠাৎ থেমে যায়—উদাস চোখ দুটো মিলিয়ে যায় দিগন্তে। মেঘু ঘুরে বেড়ায় বাগানের পথে-ঘাটে, ঝোপে-জঙ্গলে—কখনো বন্ধুদের সঙ্গে, কখনো একলা।

সংসারের সমস্ত দায়িত্ব এসে পড়ে লক্ষ্মীর ওপর। রান্নাবান্না ধোয়ামোছা তার ওপর বাগানের হাজিরা খাটা। শীতের কটা মাস পাতাতোলা বন্ধ। তখন কলম-কাটা, খেত নিড়ানো, বা অমনই কোন একটা কাজে যায়। যাবার আগে এক বাটি লাল চা-এর জলে দুটি চিঁড়ে-মুড়ি ভিজিয়ে যায়। আঙুলের ডগায় একটু নুন খুঁটে ঠেকায় জিভে, প্রতি গ্রাসের সঙ্গে। কখনো বা নুন গুলে নেয় চা এর জলে। গুড় চিনিও খুঁটে ওঠায় কখনো। ঘরের সবাই তাই খায় সকালে উঠে। তারপর ওরা দুজন যায় কাজে। ফিরে এলে হবে রান্না। ভাতের সঙ্গে ডাল, মাটি-কলাই, মাটি-আলু, মিঠা-লাউ, পানি-লাউ বা অন্য কোন শাক-সবজীর ব্যঞ্জন। মাছও হয়। যখন পড়শী-দের ঘর থেকে আসে উপহার, তাছাড়া কিনতে পাওয়া যায় সুবিধা দরে, রাবণও ধরে আনে সুবর্ণশ্রীর জল থেকে। মেঘু শিকারী। সেও মাছ ধরে আনে, পাখী মেরে আনে প্রায়ই। অন্য মাংসও খায়। পাঁঠা, শুয়োর—পালে-পার্বণে, যখন কেউ মারে তখন এক ভাগ নিয়ে আসতে হয় কিনে-কেটে। রাজ-ভোগ্য হরিণের মাংস। তাও এদের জোটে। মেঘুর কীর্তি সেটা, জোট বেঁধে খেলা-শিকারে গিয়ে পেয়ে ফেলে। অপরের কৃতিত্বেরও অংশলাভ হয়। শিকারীদের মধ্যে ভাগাভাগি হয় সেটা খণ্ড-খণ্ড করে।

সোমের পর যখন পাতা তোলা শুরু হয়, তখন পান্তাভাতের এক ভাগ যায় খেয়ে, এক ভাগ নিয়ে যায় ছাঁদা বেঁধে। তার সঙ্গে লাল চা। পেটে যখন খিদে ধরবে দুপুরে, তখন খাবে, খিদেটা তাড়াবে। গলা শুকিয়ে গেলে, চা। কোনদিন বা পান্তাভাত নিয়ে যায় পেট পূর্ণ করে,

আঁচলে বাঁধে চিঁড়ে-মুড়ি। একটু নুন বা গুড় কাগজে মোড়া, ঘটিতে লাল চা। ওটা চাই-ই। খাবার না থাকলেও চলে। বিলিকে, মেঘুকে খাইয়ে যায় তেমনই, বা তার চাইতে কিছু ভাল। একটু বেশী গুড়-চিনি, ভাতের সঙ্গে কিছু ব্যঞ্জন। এক-একদিন এক-এক রকম। রেখেও যায় দুপুরের জন্য। ফিরে এসে গা-হাত ধোয়, জল তোলে, ভাত বাঁধে, আঞ্জা (ব্যঞ্জন) পাকায়, নিয়ে বসে গরম-গরম। লুব্ধ চোখের সামনে, জ্বলন্ত অন্ত্রের কাছাকাছি। পরম তৃপ্তির সঙ্গে সবল দাঁতের চাপে পিষে লালামিশ্রিত করে নামিয়ে দেয় তা গহ্বরে গপ্ গপ্ করে গিলেও নামায়। ক্ষুধার্ত পেট কৃতজ্ঞতার সঙ্গে গ্রহণ করে পাঠিয়ে দেয় তা অন্ত্রের উদ্দেশে। অন্ত্রের বিভিন্ন অংশে সেগুলো সানন্দে ঘুরে বেড়াতে থাকে রাতভোর, যে যার ভাগ নিয়ে পরিপাকে নীত করে।

সবাই পেট ভরে খেয়ে ওঠে। শরীরের আনাচে-কানাচে ভরে ওঠে তৃপ্তি ও আনন্দের আবেশ। দুটো কথা কয়, কথা শোনে, হাসে-গায়, ঘুমোয় অঘোরে। খড়ের ছাউনি, ছিটে বেড়ার ওপরে মাটির প্রলেপ, চার পাশ বন্ধ ঘর। এক ঘরে মা-বেটা, আর একটায় রাবণ ও লছমী। তাতে ধোঁয়ার কুণ্ডলী পাক খেয়ে ফেরে সারা রাত। তুষের সঙ্গে জ্বলতে থাকে একটা লাকড়ীর গোড়। তবু মশা পালায় না। রক্তের গন্ধে পাগল তারা। পেট ফেটে মশাগুলো মরে যায়, তবু ঘুম ভাঙে না কারো। ঘুম ভাঙে মাত্র একটিবার, রাত্রি শেষ হলে। পৃথিবীর ঘুম ভাঙারও আগে, নয়তো একই সময়ে। একবার ঘুমোয়, একবার জাগে। রোজই জেগে ওঠে শরীরের পেশীতে পেশীতে উদ্যমের জোয়ার সমেত। আবার তাতে ভাঁটা আনতে হবে। কোমর বাঁধে। শিলার পিঠে চন্দনকাঠ ঘষলে তবে তিলক কাটা যায়। শরীরটাকে সুখে রাখতে হলে তাকে দুঃখ দিতে হবে, পেশীগুলোকে সজীব রাখতে হলে তাদের বল ক্ষয় করতে হবে। আবার রাত্রে তৃপ্তির আসরে ঘিরে বসে।

রাবণ এত খাটে, কিন্তু মুখ তুলে চায় নি কোনদিন। পরম তৃপ্তি পায় খেটে। খাটার জন্য তৃপ্তি, তৃপ্তির জন্য খাটা। লছমী এত কাজ করে, তবুও একদিনের জন্যও বেজার হয় নি। রাবণের সুখই তার সুখ। মেঘু ও বিলির সুখেও সে সুখী সমভাবে। লছমী ও রাবণের ভালবাসা অনবদ্য ও অকৃত্রিম বিলি ও মেঘুর ওপর। মেঘুও তার বুকের মধ্যে তাদের দুজনকে বসিয়ে রেখেছে—বাবা আর ছোট-মা। বাপের আসনে রাবণ, মায়ের আসনে-লছমী ও বিলি।

মেঘু আরো বড় হল। তার চেহারা, তার কথাবার্তা, চাল-চলন ও সাহস ভাল লাগে সকলের। শুধু একটি জিনিসের অভাব—লেখাপড়ার আগ্রহের। সেটা তো ঘরের কথা। মা-বাবার কথা। কুলির ছেলে লেখাপড়া শিখবে! কে তা আশা করে? তাই মেঘুর যা আছে একটা কুলির পক্ষে তা যথেষ্ট, অনেক-বেশীই।

বছরের পর বছর মেঘু দেখে — তার খেলার সাথীরা সবাই বাগানে যায় কাজ করতে, বাবুদের ছেলেরা যায় পড়াশোনা করতে। সেসব দিকে মেঘু উদাসীন। তার যেন কোন কিছু করবার নেই, অথবা অনেক কাজ তার। অন্য দিকে মন দেবার ফুরসৎ নেই। বাল্য, কৈশোর, যৌবন—যৌবনে পা দিয়ে এগিয়ে চলল। এর মধ্যে এদিক দিয়ে তার কোন ভাবান্তর দেখা গেল না। কিন্তু ওদিকে হয়েছে যথেষ্ট। দেহের বাড়নের সঙ্গে মনের খিদেও বেড়েছে। সেই খিদের সঙ্গে মনের প্রসারতাও হয়েছে। তার অনেক পরিচয় পাওয়া গেছে। ছেলের দলে মেঘুর খুব নাম। তার কথায় ছেলেরা অনেক কিছু করতে পারে। করেও।

হঠাৎ একদিন মেঘু রাবণের কাছে বায়না ধরল—বাবা, আমিও কাজ করতে যাবো।

মেঘুর মুখে এ কি কথা? সবাই আশ্চর্য!

রাবণ বললে — সে কি রে! এতটুকু ছেলে, এখনি কাজ করবি কেন? তার চাইতে তুই বই নিয়ে বস।

মেঘু জানে, তার চাইতে অনেক ছোট ছোট ছেলেরাও কাজ করতে যায়। সে বুঝেছে, এতদিন কাজ করতে না যাওয়াটা অন্যায় হয়ে গেছে। তবুও তার বাপ কেন তাকে কাজে পাঠাতে চায় না? কারণটা সে বুঝে ওঠে না। যেভাবেই হোক বাবাকে রাজী করাতে হবে। যে কথায় একদিন সে ঘুমিয়ে পড়েছে, সেদিন কিন্তু ঘুমাল না, জেগে রইল। বলল—আচ্ছা, আমি কাজও করব, পড়তেও বসব।

রাবণ ভাবল ওটা কথার কথা। মেঘু পড়তে বসবে না, ওকে কাজও করতে দিতে হবে না। সে বললে—আচ্ছা, তাহলে কাজ করতে দেব।

নিজের গরজে মেঘু পুরোনো বই-শ্লেট বের করে বসে গেল। রাবণ তাকে অক্ষর চিনিয়ে দিলে, শ্লেটে অক্ষর লিখে তার ওপর মকশ করতেও শিখিয়ে দিলে। আশার অতিরিক্ত কাজ দেখিয়ে পরদিন সকালে মেঘু যেতে চাইল কাজে। রাবণের ইচ্ছা ছিল না মেঘুকে এই খাটা-খাটুনির কাজ করতে দেয়। কিন্তু সে নিজের কথায় আটকে পড়েছে। প্রতিশ্রুতি রাখতে হল।

চা-গাছে নানা জাতের পোকা জন্মায়—কোনটা দৃশ্য, কোনটা বা অদৃশ্য। সে-সব পোকা গাছের পাতা, ডালগুলোর ভিতর-বাইরে খেয়ে দেয়। গাছগুলো তাতে নির্জীব হয়ে পড়ে, তার বাড়ন নষ্ট হয়, মরেও যায়। সে-সব পোকা নষ্ট করবার বিভিন্ন পন্থা, কখনো পোকানাশক ওষুধের কণা পিচকারি দিয়ে ছিটিয়ে বা অন্য উপায়ে। এক জাতের পোকা জন্মায় ফাল্গুন-চৈত্রে, বা অমনই একটা সময়ে। কপি-পোকার মতো। সেগুলো তুলে আনতে হয়। চিমটে দিয়ে খুঁটে বোতলে ভরে হাজির করতে হয় বাবুর কাছে।

কাজটা খুব ছোট ছোট ছেলেরাই করে। রাবণ মেঘুকে পাঠাল সেই পোকা-বাছা কাজে। পোকা গণনা করে এর মজুরী দেওয়া হয়। যেন নাতি-নাতনী দিয়ে পাকা চুল তোলানো। যখন পোকা বেড়ে যায়, তখন বেশী পোকায় কম পয়সা, যখন কম থাকে তখন বেশী। প্রথম দিনই মেঘু সকলের চেয়ে বেশী পোকা আনল, হিসাব করে দেখল পয়সার অঙ্ক। নি-কামাই মেঘু কামাই করতে শিখল। কত গর্ব অনুভব করল মনে মনে। এদিকে বর্ণপরিচয়টাও যেন পোকা-বাছারই সামিল। বিশেষ করে উল্টো অ—আ—ক—খ। তাই বাগানের কাজে যেমন মজা, ঘরে বইয়ের সামনেও তেমনি। কিন্তু কাজটা বড্ড ছোট ছেলের, আর যারা আয়েশী তাদের। ও-কাজে তার বড় লজ্জা। তাছাড়া সমবয়সী বন্ধুদের সঙ্গ পায় না সেখানে, যেজন্য তার কাজ করতে আসা।

বর্ণ শেষ করে এল শব্দ শিখতে। মেঘু বায়না ধরল—বাবা, আমি চাঁচ-কোদালির কাজে যাব, নয়ত ফর্কিং।

রাবণ বুঝল কথাটা। সে পড়ে গেল মহামুশকিলে। তার ইচ্ছা মেঘু পড়ে, শুধুই পড়ে। বললে—তোকে কাজ করতে হবে না, তুই শুধু পড়াশোনা কর। তুই এখন ছোট—

—আমি ছোট! লাইনের ছেলেদের নাম ধরে নজির দেখায় মেঘু। তার চাইতে কত ছোট ছেলে কত শক্ত কাজ করে। পোকা বাছা তো দুদিনের কাজ। বৃষ্টি পড়লেই বন্ধ। তারপর যেতে হয় অন্য কাজে, কত শক্ত কাজে! পেশীগুলো ফুলে ওঠে, লাল হয়ে যায় কালো চামড়া, ঘেমে নেয়ে যায়। হোঁসফোঁস করে, জিরোয়, বকুনি খায়।

জাতকের জন্মচক্রে যে গ্রহ সূর্যরাজের দীপ্তাংশে পড়ে যায়, সে গ্রহ বলহীন হয়। রাবণের দুর্ভাগ্য—নিপীড়িত জীবনের ঠিকুজীখানার গ্রহ-সন্নিবেশ জানা নেই। কিন্তু তার চরিত্র গঠনে যে-কটি মানুষের স্নেহ-মমতার প্রভাব পড়েছে তা জানা আছে। রাজ্যশূন্য বাপের কন্যা রাজকুমারী। তারই দীপ্তাংশে রাবণের জন্ম। তার ওপর বিলি—যেন একখানা সোনার পাতের ওপর রৌদ্রের ঝলক। যেখান থেকে তার অন্ধকার বুকের মধ্যে ঠিকরে এসেছে জ্ঞানের আলো। তারই সন্তান মেঘু, শিরা-উপশিরায় আভিজাত্যের ধারা। রাবণের চোখের সামনে একখানা কোহিনুর। সেই মেঘুর সঙ্গে তর্ক করার মতো যুক্তি সে খুঁজে পায় না, চায়ও না। শুধু বুকভরা মমতা নিয়ে তার সঙ্গে কথা কয় রাবণ। সে চায় মেঘুর কল্যাণ।

মেঘু চারপাশে যেমন দেখে, তেমনি যুক্তি দেখায়। যেমন বোঝে, তেমনি বোঝাতে চায়। কিন্তু রাবণ কি করে মেঘুকে বোঝাবে তার মনের কথা? যদিও রাবণ জানে—কুলি-জীবনে একজনের কামাই দিয়ে পাঁচজনের ভাত-কাপড় চালানো দায়। তাই তাদের ছেলেমেয়েদের শৈশবেই যেতে

হয় গতর খাটিতে। সাশ্রয় নয়, নিছক দানার সংস্থানে। তাই রাবণ ও লছমী অক্লান্ত পরিশ্রম করে। হাজিরা খাটে, বাড়তি কাজ করে, দুটি মানুষকে বসিয়ে খাওয়ানো-পরানোর জন্য, দুটি মানুষকে।

মেঘুর বই নিয়ে বসার পিছনে আরো কথা ছিল : রোজ সন্ধ্যায় রাবণের উঠানে অনেক সহকর্মীর সমাবেশ হয়। কৃত্তিবাসী রামায়ণ, বা কাশীরাম দাসের মহাভারত রাবণ যখন সুর করে পড়তে থাকে, মেঘু প্রতিদিন তা শোনে। বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে ভাবে—কত গল্প, কত কাহিনী তার মধ্যে। এত বড় বই এমন করে পড়ে যায় তার বাপ! কত তার বিদ্যা!

রোজ রামায়ণ পাঠ শুনতে শুনতে অনেক ঘটনা সে জেনেছে, অনেক অংশ তার মুখস্ত হয়ে গেছে। বই-এর পাতা উলটে, মুখস্ত কথাগুলো আওড়ে, বই পড়ার ভাব দেখানোর বয়স তার পার হয়ে গেছে। তবুও মাঝে মাঝে সে মুখস্ত শ্লোকগুলো আবৃত্তি করে, দু-চারটে পাতাও ওলটায়। তারপর সকলের দিকে চায়, হেসে ফেলে।

হঠাৎ একদিন মেঘু রাবণকে বলে—বাবা, আমিও রামায়ণ পড়ব।

রাবণ খুশী হয়। জবাব দেয়—বেশতো এটা পড়তে হলে খানকতক ছোটখাট বই শেষ করতে হবে। আগে তাই কর।

তাতো ঠিকই। কিন্তু তার মধ্যে নানা রকমের আঁকাকুঁকি দেখে মেঘু দমে যায়। পড়বার কথা আর মুখেও আনে না। তারপর জানায় কাজ করবার ইচ্ছা। সেই ইচ্ছা পূর্ণ করতে সে বই নিয়ে বসল। অচেনা-অজানা আঁকিকুঁকিগুলো যখন অক্ষর হয়ে ধরা দিল তার মনে, তখন মন্দ লাগল না বই-এর পাতা ওলটানো। প্রতিদিন নতুন নতুন শব্দ শিখে সে কম খুশী হয়নি। কিন্তু রাবণ যখন শুধু লেখাপড়া নিয়েই তাকে থাকতে বলে, তখন সে নিরুৎসাহ হয়ে পড়ে। বই নিয়ে বসা অভ্যাস হয়ে গেছে তাই বসে, কিন্তু শব্দের ওপর তার চোখ বিচরণ করতে চায় না। বই-এর ওপর চোখ রেখে সে ভাবে বাগানের কথা, বন্ধুদের কথা।

মেঘুকে বই নিয়ে বসতে দেখে বিলিও খুব খুশী হয়েছে। তার পড়ার সামনে বসে থাকে, পড়ায়ও। মেঘুর সামনে বই-এর পাতা ওলটানোর সঙ্গে বিলির সম্বিত ফিরে আসে ধীরে ধীরে। তার মনে পড়ে যায় কনভেন্ট-এর শিক্ষার প্রণালী। খেলার ছলে শিশুদের পড়াবার কথা তাদের সহজাত মনোবৃত্তি সুষ্ঠুভাবে কাজে লাগাবার কথা। বিলি রাবণকে বললে—কাজ করতে দিলে তবে ও খুশী হবে, পড়বেও। যাক না কাজ করতে।

বিলির মুখের ওপর রাবণ চোখদুটো স্থির রেখে জবাব দেয়—তবে যাক।

আবার মেঘু কোদাল নিয়ে যায় কাজে, ঘরে ফিরে এসে মন দিয়ে পড়তে শুরু করে।

।। ছয় ।।

বাগানের কুলিদের যেসব সুখ-সুবিধে দেবার ব্যবস্থা আছে তাতে বেশ খরচ হয়। যেমন অল্পমূল্যে রেশন, নি-খরচে চিকিৎসা, ঘরদোর, এমন কত কি নিয়ম আসছে, যাচ্ছে, থাকছে—যাওয়াটা কথার কথা, থেকেই যায়। কাজের জন্যই দেশ-বিদেশ থেকে খরচপত্র করে মানুষ আনা, খরচ করে রাখা। তারা কাজ না করলে সবই লোকসান। তাই কুলির ঘরে কাউকে বসে থাকতে দেওয়া হয় না। মাথাপিছু খরচের অঙ্কটাই থেকে যায় তাতে। রাবণ যখন এ-বাগানে কাজ করতে এসেছে, তখন অতশত নিয়ম ছিল না। ধীরে ধীরে একটার পর একটা এসে জুড়েছে। নিয়মিত হাজিরার সঙ্গে মাগ্গি ভাতা,

ক্রেশে ও কম্পাউণ্ডের জিনিসপত্র দেবার ব্যবস্থা হয় দুধের মধ্যে।

সকলের কাজ করার নিয়ম আছে বটে, কিন্তু বসেও থাকে অনেকে। বিশেষ করে মেয়েরা। যারা ছোট ছোট ছেলেমেয়ে নিয়ে উৎব্যস্ত হয়ে পড়ে। সংসারের কাজেও কখনো আটকে যায় কেউ কেউ। কিন্তু দরকার মতো তারা কাজেও যেতে পারে, যায়ও। বিলি তো তা পারবে না। যেখানে সঙ্কোচ, ভয়ও সেখানে। তাই ভয় থেকে দূরে থাকার চেষ্টা, নিজেদের সাফাই রাখার চেষ্টা স্বাভাবিক। কুলির ঘরে থেকেও বিলিকে কোনদিন কাজে যেতে হয়নি। প্রথম দিকে সে ছিল অসুস্থ। তারপর বাচ্চা নিয়ে ঘরে থাকবে, ঘরের কাজ করবে। আরো পরে মাথা খারাপ। লছমী ও রাবণের কাজে কর্তৃপক্ষ খুব খুশী। তাই ওদের ওপর জুলুম করবার কথা কারো মনেও আসেনি। নয়তো সুন্দর মুখের জয় সর্বত্র। অথবা ওদের দুজনের কাজের আড়ালে থেকে গেল বিলি। তবুও বিলিকে নিয়ে রাবণ থাকত খুব সাবধানে। সে কখনো বাগানের হাস-পাতাল থেকে বিলির জন্য ওষুধ আনত না। যদি ওপরওয়ালাদের চোখে পড়ে যায় বিলির নামে ওষুধ খরচের তালিকাটা। যদি তারা বিলিকে কাজে পাঠাবার জন্য জুলুম করে!

একদিন নিয়ম হল প্রত্যেক বাগানেই প্রাথমিক শিক্ষালয় স্থাপন করতে হবে। কুলি কর্মচারীর ছেলেমেয়েদের শিক্ষার সুযোগ দিতে হবে।

এর অনেকদিন আগেই বাবুদের উদ্যোগে বড় ক্লাবঘরের একপাশে একটা পাঠশালা বসানো হয়েছে। বাবুদের অনুরোধে শিক্ষকের বেতন বাগানের তহবিল থেকে দেওয়া হয়। এটা একটা কোচিং ক্লাসের মতো। উঁচুনীচু অনেক শ্রেণীর পড়াশোনার ব্যবস্থা এখানে আছে। বাবুদের ছেলেমেয়েরা সেখানেই পড়াশোনা করে। দু-চারটে কুলির ছেলেমেয়েও স্থান পেয়েছে ওখানে। সেই সঙ্গে শর্মিষ্ঠাও।

এখন ইস্কুলের আয়তন অনেক বাড়াতে হবে। শিক্ষক-শিক্ষয়িত্রী চাই। খবরটা বিলির কানেও গেল। সে রাবণকে বললে—শুধু শুধু ঘরে বসে কি হবে? আমিও একটা কাজের চেষ্টা করি। আমি কাজ করলে তোমাদের এত খাটতে হবে না। অথচ সংসারে কোন কষ্ট হবে না।

বিলিকে কোন কাজ করতে দিতে চায় না রাবণ। এতদিন কেটে গেলেও একটা দুশ্চিন্তা তার ছিল। হয়তো একদিন বিলির ওপর কাজের তাগিদ আসতে পারে। তার চাইতে ইস্কুলের কাজে যাওয়া ভাল। সুযোগটা ছেড়ে দিলে হয়তো কোনদিন মুশকিলে পড়তে পারে। তবু সে একটু মৃদু আপত্তি জানাল, পরে রাজীও হল। বলল—হ্যাঁ, না-না, যা ভাল হয়।

জেনারেল ম্যানেজার গট্‌ফ্রিড—জন্মে অভিজাত জর্মন, বা স্যাক্সন যাই হোক তবে স্বভাবে ইংরেজ। বৃদ্ধ, দীর্ঘ, বলিষ্ঠ, সুন্দর। বাংলোর অফিসঘরে বসেছেন এক-গাদা দরখাস্ত নিয়ে। হঠাৎ টান হয়ে বসলেন। ভ্রুজোড়া ওপরে উঠে তার প্রশস্ত ললাট অপ্রশস্ত করে দিল, ঝুলেপড়া লম্বা নাকটা হল আরো লম্বা। আশ্চর্য! কুলির মাইকী হতে চায় শিক্ষয়িত্রী। কোটর থেকে বেরিয়ে এল দু-চোখ। হাতেলেখা দরখাস্তের লাইন বেয়ে বেয়ে বহুদূরে চলে গেল তাঁর মন। হুকুম হল, প্রার্থীকে সামনে হাজির করবার।

গট্‌ফ্রিড হিন্দী ভাষায় বিলিকে প্রশ্ন করলেন—তুমি কতদূর পড়েছ?

সাহেবের মুখের ওপর থেকে চোখ নামিয়ে বিনীত কণ্ঠে জবাব দিল বিলি, ইংরেজীতে—দরখাস্তে যা লিখেছি; বাংলাও জানি।

—যথেষ্ট। সার্টিফিকেট সঙ্গে এনেছ? বলে বড় সাহেব সাগ্রহে হাত বাড়ালেন সার্টিফিকেটটা দেখার জন্য।

বিলি একটু অপ্রতিভ হল। বলল—আমার কাছে তার কোন প্রমাণ নেই। দয়া করে কনভেণ্টে চিঠি লিখে যদি জেনে নেন।

সাহেবও যেন একটু লজ্জিত হলেন। বিলি চাকরির দরখাস্ত করেছে, অথচ একটা সার্টিফিকেট দেখাতে পারল না। সেটা যেন বিলির ত্রুটি নয়, তাঁরই। সাহেব বললেন—না-না, তোমায় অবিশ্বাস করছি না।

সাহেবের বিস্মিত চোখদুটো পড়ে রইল বিলির মুখের ওপর। তার ইংরেজী উচ্চারণ শুনে গট্‌ফ্রিড অবিশ্বাস করতে পারেন না বিলিকে; কিন্তু বিশ্বাসই বা করেন কি করে? কি যেন একটা প্রশ্ন তাঁর মনের মধ্যে ঘুরে বেড়াচ্ছে।

বিলি তা বুঝল। নিমেষে তার মনের মধ্যে জেগে উঠল অতীতের স্মৃতি। বিশ বছর পূর্বের কয়েক বছরের ওপর দিয়ে তার মন ঘুরে এল এক মুহূর্তে। জন-সনের সঙ্গে কয়েক বছর। যে সত্য সে মিথ্যা দিয়ে ঢেকে রেখেছে এতকাল, তা খুলে ধরতে চাইল বড় সাহেবের কাছে। জনসনের জাত-ভাইয়ের কাছে ঢেলে দিতে চাইল তার মনের যত রুদ্ধ আবেগ। পরমুহূর্তেই মনে জেগে উঠল তার স্নেহের মেঘুর ভবিষ্যৎ। যেখান থেকে সে একদিন তার সন্তানকে ফিরিয়ে দিয়েছে, বিসর্জন দিয়েছে, সেখানে ফিরিয়ে নিয়ে যাবার কোন পথ নেই। সে পিতৃত্বের ভারে নুয়ে পড়বে মেঘুর মাথা। সে বেশ আছে।

সাহেবের কৌতূহলের মীমাংসা করতে সে দুটি কথা বলল—রাবণও লেখাপড়া জানে। আশৈশব আমরা একই বাগানে ছিলাম, বাগানে থাকাই ভাল লাগে।

সাহেব মনে মনে তারিফ করলেন বিলির বুদ্ধির। তিনি কৌতূহল দমন করতে জানেন। বোঝেনও অনেক। যৌবনে সবই সম্ভব। অল্প লেখাপড়া রাবণের সঙ্গে বিলির মিলন অসম্ভব মনে হয় না। বাগানে নির্মল মনও জীবনসঙ্গী বাছাই করে নিতে পারে। সমাজের বাধা বিদ্রূপের উপকরণে যে সেতু গড়ে ওঠে তার ওপর দিয়ে চলা-ফেরা করতে করতে দুটি প্রাণীর অন্তর অন্তরঙ্গ হয়ে উঠতে পারে, দুটি মানুষের মন অবিচ্ছেদ্য হতে পারে। কিন্তু লছমী আসে কি করে! এক স্ত্রী থাকতে এরা আর একটা ধরে আনে। তবে কে আগে? একটা রহস্য থেকে যায়। যাই হোক, তিনি আর কোন প্রশ্ন করলেন না। বিলির আবেদন মঞ্জুর হল, নির্দিষ্ট বেতনের দশ টাকা বেশীতে। প্রধানা শিক্ষয়িত্রীর কাজ। পদটি তৈরি হল সিনিয়র কেম্বারজ পাশ করা প্রার্থীর মর্যাদা দিতে।

মেয়ের জন্ম সম্বন্ধে কুলিদের মনে যাই থাকুক, অপরাপর সাহেবদের ধারণা অন্য রকম। তারা অনেক দেখে, অনেক বোঝে। তবে বড় সাহেব গট্‌ফ্রিড মেয়েকে আশৈশব পছন্দ করেন, ভালবাসেন। তাঁর ভালবাসা তখন থেকে ছড়িয়ে পড়ল ওদের সকলের ওপর। সাহেব রাবণকে বহুবার সর্দারী কাজ দিতে চেয়েছেন। কিন্তু তাতে বাড়তি রোজগার হবে না, তাই সে রাজী হয়নি। এবার আর সাহেব তাকে ছাড়লেন না।

বিলিও চায় না যে রাবণ এত পরিশ্রম করে। তার দরকারও নেই বিলি কাজ শুরু করবার পর। এখন সকলকে বসিয়ে খাওয়াতে পারে সে।

কুলিদের ঘরে একটা মাইকী আনতেই আধেক জীবনের সঞ্চয় নিঃশেষ হয়ে যায়। বাকী জীবনে আর বড় একটা সঞ্চয় হয় না। মেয়েটাকে কাপড় পরাতে (পাকা দেখা) যায় প্রায় এক কুড়ি। কখনো তারও বেশী। মেয়ের মাথায় সিঁদুর ঘষবার সময় শ্বশুরের হাতে গুণে দিতে হয় কয়েক কুড়ি। যেমন ঘরের মেয়ে তেমন টাকা। নীচু ঘরের ছেলের উঁচু ঘরের মেয়ে আনতে লাগে বেশী। কুলের কৌলীন্য চমক লাগিয়ে দেয়। তার ওপর জাত-কুটুমদের আপ্যায়িত করবার খরচ। হাঁড়িয়া, ভাত—ভাতের সঙ্গে গোশ্‌ত। যৌবনে পা দিয়ে এই তাদের চিন্তা। সংক্ষেপও আছে অনেক রকম। এরা আদিম জনস্রোতের বংশধর। এদের জীবন যাপনের প্রথাও পুরানো। এমন কি বৈদিক যুগের বিবাহ পদ্ধতিরও জের টেনে চলে

বাল্মীকির কাব্য এরা বোঝে না, ব্যাসদেবকে চেনে না। কিন্তু রামায়ণ মহাভারত চলে আসছে এদের মুখে মুখে। যৌবনের সঙ্গে টাকার অঙ্ক তাল রাখতে না পারলেই আদিম প্রথা। কেউ কাউকে নিয়ে পালিয়ে যায় দেশান্তরে। ধরাও পড়ে কখনো। কলি-কালের কাছারিগুলো বেদ-পুরানের নজির মানে না। যুগই অধর্মের। তাই দ্রুপদরাজা, জনকরাজার মতো কেউ স্বয়ম্বর সভা ডাকে না। এমন বীর নেই যে অর্জুনের মতো সুভদ্রা হরণ করে। এমন ধার্মিকও নেই যে তার মর্ম বোঝে। তাই টাকা দিয়ে মেয়ে আনাটা বর্তমান 'ধরমশূন্য' কালের প্রভাব।

অনিবার্য কারণে মেঘুকে কোলে করে, রাবণের ঘরণী সেজে, বিলি এই বাগানে বসবাস করতে এসেছে। এখানকার লোক-গুলো অবাক হয়ে গেছে তাদের দেখে। একটা আনতেই জান খতম, রাবণের দুটো মাইকী। কি করে তা সম্ভব হল! কৌতূহল হয়েছে মনে, আগ্রহ হয়েছে খুবই কথাটা জানবার। কিন্তু সুযোগ কারো হয়নি কোন দিন। তাছাড়া রাবণের চালচলন বাঁধাধরা, গম্ভীর। তার সঙ্গে সকলের হৃদ্যতা আছে বটে, কিন্তু তা ততটা গড়ায় নি যার জোরে তাকে তেমন প্রশ্ন করা যায়। সে কোন নেশাও করে না। তাই কোন আড্ডায় গিয়ে বসবার দরকার হয় না। কারো কোন কথায় থাকে না সে, তাদের কেউ না।

কাজ শেষে হাতমুখ ধুয়ে নিজের দাওয়াটিতে, নয়তো উঠানে গিয়ে বসে রাবণ। গলা ছেড়ে পড়তে থাকে রামায়ণ। এমন কেউ দেখেনি, শোনে নি। রামায়ণ শুনে পুণ্য সঞ্চয় করতে অনেকেই আসে তার কাছে। আজে বাজে গল্পগুজব তো হয় না তখন। তাই সকলের সকল কৌতূহল মনের মধ্যে থাকে চাপা। যখন আসর ভেঙে যায়, তখন রামের দুঃখের পাষাণখানা চেপে রেখে দেয় তাদের মনের অন্য যত কথা। রাবণের ঘরেও টুঁ-শব্দটি শোনা যায় না, যাতে কিছু অনুমান করা যেতে পারে। ওটা অস্বাভাবিক লোকের অস্বাভা-বিক কথা। সময়ের স্তরে স্তরে চাপা পড়ে যায় সুন্দরী বিলির কথা, রাবণের দুটো মাইকীর কথা।

রামায়ণ পড়তে পড়তে রাবণের চুলে পাক ধরল, রামায়ণ শুনতে শুনতে যুবতী বিলি ও লছমী প্রৌঢ়া হল। শিশু মেঘনাদও বড় হল, তার গায়ে যৌবনের হাওয়া লাগল।

দু-একজন ছাড়া বিলির এতখানি গুণের কথা সকলেরই অজানা। বিলির কাজের কথা সকলেই শুনলো। কুলিমহলে বাবুদের ঘরে সোরগোল পড়ে গেল। সবাই নতুন চোখে দেখতে লাগল বিলিকে। কুলিদের গৌরব রাবণের ঘর।

রাবণ ও বিলির পূর্ব কাহিনী জান-বার আগ্রহ নতুন করে জেগে উঠল সকলের মনে। সুযোগ আর হয় না। এতদিন রাবণের কাজ ছিল পুরুষদের সঙ্গে। এখন সে সর্দার হয়েছে, তার কাজ মেয়েদের নিয়ে পাতা তোলাতে যাওয়া। এ কাজের মজুরী দেওয়া হয় পাতা ওজন করে। তাই যায় খুব ভোরে, ফিরতে প্রায় সন্ধ্যা। পুরুষের পক্ষে যা সম্ভব মেয়েদের দিয়ে তো তা হয় না। তার সঙ্গে যখন পুরুষের দেখা তখন সে রামায়ণ নিয়ে বসে গেছে। তাছাড়া এতদিন পর কি করে আর এমন কথা পাড়া যায়।

কৌতূহল দমন করা সহজ নয়, বিশেষ করে কুলিদের পক্ষে। সংসারে পরশ্রীকাতর মানুষের, পরনিন্দা প্রচারক মানুষেরও অভাব হয় না। কে একজন অনুমান করল, এটা রাবণের ভাগিয়ে-আনা তিরি (স্ত্রী); তাই দুজন চুপচাপ থাকে। কেউ ভেবে দেখল না—কার চুপচাপ থাকার কথা, আর কার নয়। এক্ষেত্রে লছমীর কি করবার কথা তা কারো মনেই এল না।

কথাটা মুখে মুখে রটে গিয়ে খবর হয়ে দাঁড়াল। কেউ বিশ্বাস করে, কেউ বা করে না। যারা বিশ্বাস করে তাদের কাছে খবরটা শ্রুতিরোচক, যারা বলে বেড়ায় তাদের মুখরোচক।

তুকারামের প্রথম জামাই কাজ করে বড় সাহেবের বাংলোয়। তার চেষ্টায় তুকা-রামের দ্বিতীয় মেয়ের বিয়েটাও হয় এখানে। তার সঙ্গে রাবণদের জানাশোনা ডিব্রুগড়ে। সেখান থেকেই মেয়েটি শুনে এসেছে ওদের সব কথা। মানুষের জীবনে কোথা দিয়ে যে কি হয়ে যায় তা কেউ ভাবতে পারে না। তার বাবার জীবন দিয়েই তা বুঝেছে সে। বাবার দুঃখটাও তার বুকের পাঁজরের ফাঁকে লুকানো আছে। তাই বোধহয় বিলির আসল পরিচয়টা বুকের মধ্যে চেপে রেখে শাস্ত্রের বচনটা সে মিথ্যা প্রমাণ করেছিল। তুকারামের দিবিটার ব্যূহ ভেদ ক'রে মেয়েটার মুখ থেকে কথাটা বেরিয়ে আসতে পারেনি এতদিন। কিন্তু খবরটা যখন তার কানে গেল, সে আর চুপ থাকতে পারল না। মনের উত্তেজনায় ভুলে গেল দিব্যির কথা। বিলির গৌরব অক্ষুণ্ণ রাখতে সে ব'লে দিল সব কথা।

সবাই জানে তুকারামের সঙ্গে বিলিদের আগের চেনা। সে-ই ওদের এখানে রেখে গেছে। এতদিন পর সঠিক খবরটা পাওয়া গেল। প্রথম থেকেই কথাটা প্রকাশ থাকলে ততটা গুরুত্ব দেবার মতো কিছু পাওয়া যেত না, বোধহয়, ততটা জটিলতাও থাকত না, যতটা হ'ল তা এতকাল পরে প্রকাশ পেয়ে।

এতই সহজ! এটা তো গৌরবের কথা! তবে এত লুকোছাপা কেন? নিশ্চয়ই আরো অনেক গূঢ়ার কথা আছে। তুকারামের মেয়ের মুখে অত বিবরণ শুনেও আগের অমন মুখরোচক খবরটা তারা উড়িয়ে দিতে পারে না। বরং প্রচারকার্যের প্রমাণ-স্বরূপ একটার সঙ্গে আরেকটা জুড়ে গিয়ে মুখে মুখে ঘুরে বেড়াতে থাকল।

মেয়েটি বুঝল না, কি ক'রে বসল সে! বিলির গৌরব অক্ষুণ্ণ রাখতে গিয়ে কত-খানি ক্ষুণ্ণ ক'রে দিল।

•

বিলির এতদিনের সকল চেষ্টা ব্যর্থ হ'ল। শর্মিষ্ঠার কাছ থেকে অপমানিত হ'য়ে মেঘু ঘরে ফিরল মায়ের কোলে কলঙ্কের কালিমামাখা মুখখানা ঢাকল।

ঘৃণায় লজ্জায় বিলি তলিয়ে গেল পাতালের অতল-তলে। মান-অপমানের জ্বালা যন্ত্রণার অনুভূতি বিলির বুকের ভিতরটা মুচড়ে ধরল। অপমানিত পুত্রের লজ্জার আভা আগুনের তেজে দগ্ধ করল মাতার অন্তর। সে যেন পুড়ে ছাই হ'য়ে গেল।

নিষ্পলক দু-জোড়া চোখ। নিস্তব্ধ দুটি অন্তর। নীরব দুটি প্রাণী।

মুখ তুলে চাইল মেঘু। পুত্রের সর্বাঙ্গ স্পর্শ করল মাতার লজ্জা, অতীতের অন্ধকার ভেদ করে।

অপমানিত সন্তানের ব্যথায় মাতার মমতা মূর্ত হ'য়ে উঠল করুণ দুটি চোখে। সেই করুণাধারায় সিক্ত হ'ল সন্তানের অন্তর। বিলির অন্তরের অনুভূতি মেঘু উপলব্ধি করল সমস্ত অন্তর দিয়ে। মেঘুর চিত্ত বিগলিত হ'ল বিলির স্নেহকাতর দুটি চোখের ধারায়, সূর্যকিরণে বিগলিত শৈল-তুষারের মতো। অতীতের যে স্মৃতি স্তরে স্তরে বিলির বুকে পাথরের মতো জমাট বেঁধে ছিল, তা ভেঙে চুরমার হ'য়ে পড়ল মেঘুর বেদনাহত চোখের দৃষ্টিতে। বেদনাহত কৌতূহলী কটাক্ষে ছিন্ন হ'ল মেঘুর জন্ম-রহস্যের ডোর। দুজনের মনের সব কিছুরই যেন ওলটপালট হ'য়ে গেল! চোখ ফেটে নামল জলের ধারা। বুক ভেঙে বেরিয়ে এল নিঃশ্বাস।

মেঘু রাবণের পুত্র নয়। সে মর্মাহত হ'ল। তার অন্তরের ব্যথা স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল রাবণের স্নেহের দরজায়, মন্দিরের সামনে ব্যথিত ভক্তের মতো। বিলির বৈধব্য-জীবনের শুচিতায় স্নান ক'রে উঠল মেঘুর দেহ-মন। মাতা-পুত্রের নতুন পরিচয়। এই যেন মেঘু প্রথম দেখল তার মাকে। জনুসনের পিতৃত্বের গর্বে স্ফীত হ'য়ে উঠল মেঘুর হৃদয়। একই সঙ্গে কত সুখ-দুঃখের ব্যথায় ভরে গেল তার বুক। কত সুখ, কত দুঃখ। সব মিলিয়ে সে এক অভাবনীয়, অনির্বচনীয় আনন্দ অনুভব করল। বুক ফুলিয়ে দাঁড়াল সে।

(ক্রমশঃ)

বিজ্ঞানের কথা

আকাশ থেকে বিদ্যুৎ ধরে মোটর চালানো

বেনজামিন ফ্রাংকলিন আকাশে ঘুড়ি উড়িয়ে বিদ্যুৎ ধরতে চেয়েছিলেন, সে-গল্প সবাই জানেন। আমেরিকান বিজ্ঞানীরা প্রায় অনুরূপ একটি কাণ্ড করে আকাশ থেকে বিদ্যুৎ ধরে বৈদ্যুতিক মোটর চালিয়েছেন। কাণ্ডটা বুঝুন একবার, কয়লা কিংবা তেল পোড়াতে হবে না, জলের তোড়ে টারবাইন ঘোরানো নয়, আকাশের বিদ্যুতকে দিয়েই মোটর চালানো হচ্ছে! আর একটা মোটরকেই যদি চালানো গেল তাহলে আর অভাব রইল কিসের! বিনা খরচে একটা মোটর চালাতে পারা তো আলাদিনের প্রদীপ হাতে পাবার শামিল। এমন কোন কাজ আছে যা বিদ্যুতের অসাধ্য? একজন আমেরিকান বিজ্ঞানীর কথাতেই শোনা যাক, ব্যাপারটা কী। এই বিজ্ঞানীর নাম ডঃ ওলেগ জেফিমেংকো, মর্গানটাউনের পশ্চিম ভার্জিনিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে যুক্ত। (বিজ্ঞানের কথার পাঠকদের হয়তো মনে আছে, সাইবেরিয়ার আকাশে টারবাইন উঠিয়ে, হাওয়াকলের সাহায্যে সেই টারবাইন ঘুরিয়ে, বিনা খরচে বিদ্যুৎ তৈরির একটি পরিকল্পনা সোভিয়েত বিজ্ঞানীরাও করেছেন।)

ডঃ জেফিমেংকো বলছেন, "আমাদের পরীক্ষাকার্য থেকে প্রমাণ পাওয়া গিয়েছে, পৃথিবীর বিদ্যুৎ-ক্ষেত্রের শক্তিকে অবিরাম যান্ত্রিক গতিতে রূপান্তরিত করা যেতে পারে।"

আকাশের বিদ্যুৎ-ক্ষেত্রের শক্তি যে কী বিরাট, সে-সম্পর্কে চোখের দেখাতেও খানিকটা ধারণা করা সম্ভব। ঘটনাটি হচ্ছে বাজ-পড়া। আকাশের বিদ্যুৎ যখন মাটিতে নেমে আসে, তার গতিপথে মানুষ তো কোন ছার আস্তো একটা তালগাছ থাকলেও পুড়ে ছাই হয়ে যেতে পারে। আকাশে বিদ্যুৎ চমকাতে দেখে বা পৃথিবীর মাটিতে বাজ পড়তে দেখে বিজ্ঞানীদের মাঝে মাঝে মনে হয়েছে বটে যে শক্তির এই বিরাট উৎসকে যদি কোনো রকমে কাজে লাগানো যেত! এতদিনে কয়েকজন আমেরিকান বিজ্ঞানীর চেষ্টায় এই ভাবনা বাস্তব রূপ নিতে চলেছে বলা চলে। তবে ব্যাপারটা এখনো রয়েছে নিতান্তই প্রাথমিক স্তরে। বিজ্ঞানী কী বলছেন শোনা যাক।

"এই ঘটনার ফল কী দাঁড়াবে তা আগে থেকে বলা শক্ত। আমরা যে মোটর তৈরি করেছি তার অংশগুলো ও তার ডিজাইন নিশ্চয়ই আরো উন্নত করা চলে। আমাদের মোটর আমরা তৈরি করে নিয়েছি ল্যাবরেটরীতে, যে-অবস্থার মধ্যে তাকে একেবারেই আদর্শ অবস্থা বলা চলে না।"

আকাশের বিদ্যুৎ ধরতে হলে একটা কিছু ব্যবস্থা থাকা দরকার। আকাশে ঘুড়ি উড়িয়ে বেনজামিন ফ্রাংকলিন এমনি ব্যবস্থা করতেই চেয়েছিলেন। পৃথিবীর মাটিতে বসানো মোটর আকাশের বিদ্যুৎ দিয়ে চালাতে হলেও এমনি ব্যবস্থা চাই, ঘুড়ি উড়িয়ে নয়, আরও পাকাপোক্ত রকমের। রেডিয়োতে বেতার-তরঙ্গ ধরতে হলে এরিয়াল বা অ্যান্টেনার দরকার হয়, এক্ষেত্রেও তাই। বিজ্ঞানী বলছেন, এই পরীক্ষাকার্য চালাবার সময়ে তাঁরা যে অ্যান্টেনা ব্যবহার করেছিলেন তার কার্যকারিতা উঁচুমাত্রার ছিল না, সেদিকে তাঁরা নজরও দেন নি। প্রাথমিক পরীক্ষাকার্যে তাঁরা শুধু দেখতে চেয়েছিলেন মোটরটি সত্যিই চলে কিনা।

সত্যিই চলেছিল। যদিও মোটরটি ছিল খুবই দুর্বল, উৎপন্ন শক্তির মাত্রা ছিল দশ লক্ষ ভাগের একভাগ (বাড়িতে জল তোলার পাম্প চালাবার জন্যে যে মোটর ব্যবহার করা হয় তার উৎপন্ন শক্তির মাত্রা অর্ধ অশ্বশক্তি—একথা মনে রাখলে দশ লক্ষ-ভাগের একভাগ অশ্বশক্তি সম্পর্কে একটা ধারণা হতে পারে।)

বিজ্ঞানী তারপরে বলছেন, প্রয়োগগত উন্নতি ঘটলে পৃথিবীর বিদ্যুৎ-ক্ষেত্র একটি ছোটমাত্রার অতিরিক্ত শক্তির উৎস হতে পারে। যেমন, ধরা যাক, সৌরশক্তি যে-ধরনের ক্ষমতার উৎস।

ডঃ জেফিমেংকো বলছেন, 'এ-বিষয়ে কোনো প্রশ্ন নেই যে পৃথিবীর বিদ্যুৎ-ক্ষেত্রের সাহায্যে শক্তি উৎপন্ন করা যেতে পারে। তবে মুশকিল এই যে, এই ক্ষেত্র থেকে যদিও খুব উচ্চমাত্রার ভোলটেজ পাওয়া সম্ভব, কিন্তু উচ্চমাত্রার বিদ্যুৎ-প্রবাহ বা কারেন্ট নয়, অন্ততপক্ষে বর্তমান অবস্থায় যে-ধরনের আয়োজন করা সম্ভব তার সাহায্যে।"

তাহলে আসল সমস্যাটা কী দাঁড়াচ্ছে? এমন নতুন ধরনের মোটর উদ্ভাবন করা দরকার যা চলবে অপেক্ষাকৃত উচ্চমাত্রার ভোলটেজে কিন্তু যাতে কারেন্ট খরচ হবে যৎসামান্য মাত্রার।

কী হতে পারে এই নতুন ধরনের মোটর? বিজ্ঞানী বলছেন, শেষ পর্যন্ত যে মোটরটি উপযুক্ত বিবেচিত হল তা হচ্ছে 'ইলেকট্রিক' ইলেকট্রোস্ট্যাটিক টাইপের। ইলেকট্রেট কী? ইলেকট্রেট হচ্ছে এমন একটি পদার্থ যার একদিকে রয়েছে স্থায়ী পজিটিভ চার্জ বা আধান, অন্যদিকে নেগেটিভ আধান। এমনি একটি ইলেকট্রেট, কয়েক টুকরো প্লাস্টিক ও অ্যালুমিনিয়ম, দুটি মাইকার চাকতি, দুটি সূক্ষ্ম তার, একটি অ্যাকসল ও দুটি মুক্তোর বেয়ারিং—এই দিয়ে সম্পূর্ণ মোটরটি তৈরী।

পৃথিবীর বিদ্যুৎ-ক্ষেত্র সব জায়গায় সমান নয়, আবহাওয়ার অবস্থা ভেদে ভিন্ন হয়ে থাকে। আবার যদি সব বিষয়ে সমানও হয় তাহলেও ভূপৃষ্ঠ থেকে উচ্চতার তারতম্যে ক্ষেত্রের তারতম্য ঘটে থাকে। কতখানি? প্রতি এক ফুট উচ্চতার তারতম্যে প্রায় ৩০ ভোলট। আবহাওয়া যদি পরিষ্কার থাকে তাহলে ভূপৃষ্ঠের এক বর্গমাইল আয়তনের ওপরকার বাতাসে বিদ্যুৎ ছড়ানো থাকে প্রায় ৩০০০ জুল। সেটা কতখানি? ১০০ ওয়াটের একটি বাল্ব ৩০ সেকেণ্ড ধরে জ্বালাবার মতো। কিন্তু বৈদ্যুতিক ঝড়ের সময়ে এই এলাকার বাতাসে বিদ্যুতের পরিমাণ হতে পারে একের পরে বারোটি শূন্য বসালে যে-সংখ্যাটি পাওয়া যায় ততো জুল। সেটা কতখানি? ১০০ ওয়াটের ৫০০টি বাল্ব এক বছর ধরে জ্বালাবার মতো।

বিজ্ঞানী তারপরে বলছেন, "কিন্তু কেউ এখনো জানে না বাতাসে ছড়ানো এই বিদ্যুতের শতকরা কত অংশ প্রয়োজনীয় কাজে লাগানো যেতে পারে এবং এই শক্তির খানিকটা অংশ টেনে নেবার পরে সেই স্থান পূরণ হতে কতটা সময় লাগতে পারে।"

এখন কী হচ্ছে? এই শক্তি কি অটুট ও অক্ষয় থেকে যাচ্ছে? মোটেই নয়। মাটিতে বাজ পড়বার ফলে ও আকাশে বিদ্যুৎ চমকাবার ফলে এই শক্তির অপচয় হচ্ছে শুধু। যেমন তেমন মাত্রার নয়, বিজ্ঞানীদের হিসেব অনুযায়ী দশ লক্ষ কিলোওয়াট থেকে একশো-কোটি কিলো-ওয়াট পর্যন্ত। শেষোক্ত সংখ্যাটির দ্বারা যে কী বিরাট মাত্রার শক্তি বোঝাচ্ছে সে-সম্পর্কে ধারণা হতে পারে যদি বলা যায় যে বর্তমানে গোটা পৃথিবীতে উৎপন্ন বিদ্যুৎ-শক্তির চেয়েও তা বেশি।

এই পরীক্ষাকার্যের জন্যে পশ্চিম ভার্জিনিয়ায় যে-সব ইলেকট্রোস্ট্যাটিক মোটর পরখ করে দেখা হচ্ছে তা মোটামুটি তিন ধরনের : স্পার্ক, করোনা ডিসচার্জ ও ইলেকট্রেট।

স্পার্ক ইলেকট্রোস্ট্যাটিক মোটর চালাবার জন্যে প্রয়োজন কয়েক হাজার মাত্রার ভোলট। কিন্তু এই মোটর বিশেষ শক্তিশালী হয় না।

তার চেয়ে অনেক বেশি শক্তিশালী করোনা মোটর। ২০০০ ভোলটেই এই মোটর চলে। করোনা মোটর সম্পর্কে একথাটি বলা দরকার যে একশো বছর আগে উদ্ভাবিত হওয়া সত্ত্বেও এখনো পর্যন্ত বাজারে প্রচলিত নয়।

কিন্তু ডঃ জেফিমেংকো বলছেন, করোনা ইলেকট্রোস্ট্যাটিক মোটরই এক্ষেত্রে সবচেয়ে বেশি কাজের হবে মনে হচ্ছে। উৎপাদিত অশ্বশক্তির তুলনায় এই মোটরের ওজন হয়ে থাকে খুবই হাল্কা। করোনা মোটরের আরো একটি সুবিধে হচ্ছে এই যে তত্ত্বগতভাবে এই মোটর অশেষ বেগ-সম্পন্ন হতে পারে। ডঃ জেফিমেংকোর ল্যাবরেটরীতে নির্মিত একটি করোনা মোটরের আবর্তন হয়েছিল প্রতি মিনিটে ১০,০০০ বার।

গোড়ায় ভাবা হয়েছিল যে পৃথিবীর বিদ্যুৎক্ষেত্র থেকে একটি করোনা মোটর চালাতে হলে বিশেষ ধরনের এরিয়ালের প্রয়োজন হবে। কিন্তু বাস্তব পরীক্ষাকার্যে

যে এরিয়াল ব্যবহার করা হল তা নিতান্তই কাজ চালিয়ে নেওয়া গোছের একটা ব্যবস্থা মাত্র। একটা এগারো-তলা উঁচু বাড়ি থেকে ৫৫ সে-মি লম্বা একটা পিয়ানোর তার হিলিয়াম-ভরা বেলুনের সাহায্যে তুলে ধরা—এই হল গিয়ে এরিয়াল। তার প্রান্তটি র‍্যাঁদা দিয়ে ঘষে ঘষে ছুঁচলো করা হয়েছিল। এরিয়ালটি মোটরের সঙ্গে যুক্ত প্রায় ১০০ মিটার লম্বা সূক্ষ্ম তার ও ভারী দড়ির সাহায্যে।

এই হল গিয়ে আকাশ থেকে বিদ্যুৎ ধরার আয়োজন, বেনজামিন ফ্রাঙ্কলিনের ঘুড়ি উড়িয়ে বিদ্যুৎ ধরার চেয়ে খুব যে একটা উন্নততর আয়োজন তা বলা চলে না।

এবারে দেখা যাক এমনিভাবে আকাশ থেকে সংগ্রহ করা বিদ্যুতের সাহায্যে মোটরটি চলছে কিনা। ডঃ জেফিমেঙ্কো দেখলেন, চলছে। তবে ল্যাবরেটরীতে পরীক্ষামূলক চালাবার সময়ে যতোটা জোরে চলেছিল ততোটা জোরে নয়। ডঃ জেফিমেঙ্কো হিসেব করে দেখলেন মোটরে দশ হাজার-ভাগের একভাগ অশ্বশক্তি উৎপন্ন হচ্ছে।

তারপরে এরিয়ালটি যুক্ত করা হয়েছিল ইলেকট্রেট মোটরের সঙ্গে। এই মোটরটি কিন্তু এত প্রচণ্ডভাবে চলতে শুরু করল যে মোটরের কামউটেটর ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে এই আশঙ্কায় মোটরের সঙ্গে এরিয়ালের সংযোগ খুলে নেওয়া হল। এই পরীক্ষাকার্য চলার সময়ে ৬০০০ ভোল্ট পর্যন্ত মাত্রার ভোল্টেজ পাওয়া গিয়েছিল।

ডঃ জেফিমেঙ্কো বলছেন, এই পরীক্ষাকার্য প্রমাণ করছে, ঠিকমতো এরিয়াল যদি ব্যবহার করা যায় তাহলে পৃথিবীর বিদ্যুৎ-ক্ষেত্র থেকে বৃহৎ বৃহৎ ইলেকট্রোস্ট্যাটিক মোটর চালানো যেতে পারে।

মানবমন—

বিশেষ অকটোবর পাভলভ সংখ্যা

গত দশ বছর ধরে "মনোবিজ্ঞান জীব-বিজ্ঞান সমাজবিজ্ঞানের আধুনিক ধারা পরিচায়ক ত্রৈমাসিক পত্রিকা" মানবমন নিয়মিত প্রকাশিত হয়ে চলেছে, এ ঘটনা থেকে বোঝা যায় বাংলাভাষায় বিজ্ঞানের এই গুরুতর বিষয়গুলো পড়তে চান এমন পাঠকদের বড়ো একটি সংখ্যা আমাদের দেশে তৈরি হয়েছে। এটি একটি মস্ত শুভলক্ষণ। অন্যদিকে ডঃ ধীরেন্দ্রনাথ গাঙ্গোপাধ্যায় যে অসাধারণ নিষ্ঠার সঙ্গে এই পত্রিকাটি সম্পাদন করে থাকেন সেজন্যে বাঙালী পাঠকও তাঁর কাছে কৃতজ্ঞ থাকবেন।

পাভলভের ১২২তম জন্মদিবসে পাভলভ স্মরণে এই বিশেষ সংখ্যাটি প্রকাশ করা হয়েছে। সম্পাদক বলছেন, "পাভলভের স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন বস্তুবাদী মনোবিজ্ঞানের প্রতি আনুগত্য জ্ঞাপন এবং রহস্যবাদ, নির্জ্ঞানবাদ, যান্ত্রিক জড়বাদ, অস্তিত্ববাদ ইত্যাদি অবৈজ্ঞানিক ভাবধারা ও ঈশ্বরবাদী চিন্তাধারার প্রভাবমুক্ত হবার আন্তরিক ইচ্ছার অভিব্যক্তি।"

এই আনুগত্য জ্ঞাপন ও প্রভাবমুক্ত হবার আন্তরিক ইচ্ছার সম্মুখ একটি আয়োজন ১১৫ পৃষ্ঠার এই বিশেষ সংখ্যাটিতে সাজিয়ে তোলা হয়েছে। শুধু প্রবন্ধে নয়, পূর্ণাঙ্গ একটি নাটকেও।

একটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য প্রবন্ধ লিখেছেন মনোবিদ। প্রবন্ধটির নাম আক্রামকের মন ও সমাজ, পাভলভীয় আলোচনা। প্রবন্ধটি পড়লে আমাদের দেশের বর্তমান কালের অনেকগুলো লক্ষণ সম্পর্কে বিচার করার পাভলভীয় সূত্র পাওয়া যাবে। প্রবন্ধের আলোচ্য বিষয়গুলো প্রবন্ধের গোড়াতেই কতকগুলো প্রশ্নের আকারে এইভাবে তোলা হয়েছে: "আক্রমণমুখিনতা, হিংস্রতা, স্বজাতি-বিরোধিতা কি মানুষের স্বভাবধর্ম? মানবমস্তিষ্কে কি হিংস্র আক্রমণপ্রবণতা-সূচক কোনো কেন্দ্র আছে? ক্রোমোসোম কি আক্রমণ-ধর্মী কোনো জিনের বাহক; বিশেষ পরিবেশে আত্মরক্ষার • সহজাত তাগিদে মানুষ মানুষকে আক্রমণ করে? না আক্রমণপ্রবৃত্তি পূর্বসূরীদের কাছ থেকে পাওয়া মানবধর্মের এক অনায়াসলব্ধ ধর্ম?"

বিষয়গুলোকে বিস্তৃতভাবে আলোচনা করার পরে লেখক অবশেষে বিচ্ছিন্নতা ও আক্রমণপ্রবণতার কথা তুলেছেন। "ব্যক্তি মানুষের সঙ্গে মানবজাতির সম্পর্কচ্যুতির মধ্যেই নিহিত রয়েছে পাশবিকতা আক্রমণ-প্রবণতার বীজ।"

"একথা কখনোই বলা চলে না যে অন্তর্নিহিত পশুত্ব বা মানবত্বের কেন্দ্র আছে মানবমস্তিষ্কের অভ্যন্তরে।"

"নিজের শ্রমোৎপন্ন ফল থেকে বঞ্চিত ধনতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থায় মানুষের অবস্থা অতীব করুণ ও অসহায়। সর্বব্যাপারে স্ব-বিরোধিতা বিদ্যমান। অর্থ এই সমাজে সব রকমের ঘটন-অঘটন পটিয়সী। সবকিছুর মূল্যই কাঞ্চনমূল্যে নির্ধারিত। অর্থ আস্থাকে অনাস্থা, প্রেমকে ঘৃণা, ঘৃণাকে প্রেম, পুণ্যকে পাপ, পাপকে পুণ্য, প্রভুকে ভৃত্য, ভৃত্যকে প্রভুতে রূপান্তরিত করে। পাভলভীয় মনস্তাত্ত্বিক পরিভাষায় বলা চলে ধনতান্ত্রিক সমাজের মানুষের স্নায়ুসংস্থা অতি-স্ববিরোধী অবস্থায় ও অস্থিরতাব্যাধি ভুগছে।"

'মানবমন' পত্রিকার বর্তমান সংখ্যায় ডাঃ রুদ্রেন্দ্রকুমার পাল লিখেছেন 'বার্ধক্য-জনিত মানসিকতা ও তার প্রতিষেধ' সম্পর্কে। প্রবন্ধের শেষদিকে তিনি কয়েকজন মানুষকে দৃষ্টান্ত হিসেবে উপস্থিত করেছেন, যাঁরা বার্ধক্যজনিত মানসিকতা থেকে আশ্চর্যরকমের মুক্ত। বিজ্ঞানের কথার পাঠকদের কাছেও এঁদের পরিচয় দিতে চাই: "অতি বৃদ্ধবয়সেও যে বহু জ্ঞানী, বিজ্ঞানী ও গুণী ব্যক্তি একনিষ্ঠভাবে নিজেদের কাজে কর্মে ব্যাপৃত থেকে এরূপ অবাঞ্ছিত মানসিকতার হাত এড়াতে পেরেছেন, বহু প্রাচীনকাল হতে বর্তমানকাল পর্যন্ত তার দৃষ্টান্তের অভাব নেই। বিখ্যাত পারসীক কবি ফিরদৌসী এবং বাস্তান ও গুলিস্তানের লেখক আর একজন শ্রেষ্ঠ পারসীক কবি এবং ভেনিসের 'দীর্ঘজীবী কী করে হওয়া যায়'-এর লেখক লুইগী করোনারোও শতায়ু ছিলেন। আমাদের দেশেও অতিবৃদ্ধ বয়স পর্যন্ত কর্মিতকর্মা। চৈতন্য চরিতামৃতের লেখক কৃষ্ণদাস কবিরাজ, (৯৮ বছর বয়সে রচিত) বিবাদ ভঙ্গার্ণবের রচয়িতা জগন্নাথ তর্কপঞ্চানন, এমনকি বর্তমান যুগেও প্রসিদ্ধ ইঞ্জিনীয়ার ডকটর বিশ্বেশ্বরায়া এবং খ্যাতনামা শিক্ষাবিদ ও সমাজসেবী ডকটর কার্ভেও একান্ত কর্মনিষ্ঠভাবে শতাধিক বৎসর জীবিত ছিলেন। বিখ্যাত গ্রীক দার্শনিক সফোক্লিস প্রায় নব্বই বছর বয়সে ঈডিপাস অ্যাট কলোনাস লেখেন, প্রখ্যাত ঐতিহাসিক জেনোফোন এবং দার্শনিক জেনোফ একশ'র কাছাকাছি সময়ে নিজ নিজ বিষয়ে সক্রিয় ছিলেন। তেমনি ছিলেন ইতালী দেশীয় প্রখ্যাত শিল্পী দুজন; মাইকেল অ্যাঞ্জেলো এবং টিসিয়ান। রুশ-দেশের শ্রেষ্ঠ বিজ্ঞানী পাভলভ ও মহাত্মা টলস্টয়, জার্মানির শ্রেষ্ঠ দার্শনিক ও কবি গ্যয়টে, সেনাপতি হিণ্ডেনবার্গ ও চ্যান্সেলর আদেনুয়ের, ফরাসী দেশের শ্রেষ্ঠ লেখক ভলটেয়ার ও ভিকটর হুগো, ইংলণ্ডের রাজকবি টেনিসন, দার্শনিক ও বিজ্ঞানী বারট্রাণ্ড রাসেল, নাট্যকার বার্নার্ড শ' শারীরবিজ্ঞানী চার্লস শেরিংটন, রাজনীতি-বিদ গ্ল্যাডস্টোন ও চার্চিল প্রভৃতিও সুদীর্ঘ জীবনের শেষ পর্যন্ত অতি সক্রিয় ছিলেন। এ প্রসঙ্গে মার্কিন দেশের বিজ্ঞানী ও রাজনীতিক ফ্র্যাঙ্কলিন, পৃথিবীখ্যাত আবিষ্কারক এডিসন, অত্যাশ্চর্য মনস্বিনী মহিলা হেলেন কেলার প্রভৃতির নামও উল্লেখযোগ্য। বিজ্ঞানী আইনস্টাইন ও ফ্রয়েডও দীর্ঘজীবী মনীষার জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত। আমাদের দেশেও জীবিত-দের মধ্যে রাজাগোপাল আচারিয়র নামও উল্লেখযোগ্য। জগদ্বিখ্যাত চিত্রশিল্পী পাবলো পিকাসো ও অর্ধেন্দু গাঙ্গুলি নব্বই বছর বয়সে এবং আমাদেরই যামিনী রায় চুরাশি বছর বয়সে আজও নব নব সৃজনী প্রভায় ভাস্বর।"

বুড়ো না হওয়ার বিষয় নিয়ে বিজ্ঞানের কথায় আমরাও আলোচনা তুলেছি। এই দৃষ্টান্তগুলো চোখের সামনে থাকলে যে-কোনো পাঠক স্বীকার করবেন "বাহাত্তর বছর হলেই যে 'বাহাত্তুরে' ধরবে, সে-কথা সত্যি নয়।"

সংশ্লিষ্ট বিষয়ে আরো অনেকগুলো প্রবন্ধের জন্যে, এবং নাটকটির জন্যেও, মানবমনের এই বিশেষ পাভলভ সংখ্যাটি পাঠকমহলে সমাদৃত হবে আশা করা চলে।

—[illegible]

অঙ্গনা

ট্রেড ইউনিয়নে নারী

ভেনেজুয়েলার শ্রীমতী ম্যাগডালেনা সে-দেশের সর্বাপেক্ষা বৃহৎ শ্রমিক সংগঠন ভেনেজুয়েলান ওয়ার্কার্স কনফেডারেশনের সঙ্গে যুক্ত। এদেশের ট্রেড ইউনিয়ন মূলতঃ রাজনীতির সঙ্গে জড়িত। ম্যাগডালেনার ক্ষেত্রেও তার ব্যতিক্রম হয়নি। প্রায় দু' দশক আগে তিনি যুব আন্দোলনে অংশ নেন। পরে সম্পূর্ণভাবে রাজনীতিতে নেমে পড়েন। একই সঙ্গে তিনি ট্রেড ইউনিয়নেও অংশ নিতে শুরু করেন। ক্রমে তিনি পাবলিক এমপ্লয়ীজ ইউনিয়নের প্রচার-সচিবের পদ লাভ করেন। এমনিতে কোন শিক্ষাগত যোগ্যতা তাঁর ছিল না। কিন্তু অভিজ্ঞতার মাধ্যমে তিনি যোগ্যতার স্বীকৃতি লাভ করেন এবং একটি আঞ্চলিক ট্রেড ইউনিয়ন সম্মেলনে মহিলা কর্মীদের সমস্যা সম্পর্কে বক্তব্য রাখার জন্য আমন্ত্রিত হন। এখানে তিনি যে বক্তব্য রাখেন, তাতে উপস্থিত অনেক নেতাই বিশেষভাবে মুগ্ধ হন এবং ট্রেড ইউনিয়নের পরবর্তী জাতীয় সম্মেলনে তিনি মহিলাদের ট্রেড ইউনিয়নে অংশগ্রহণ সম্পর্কে বক্তব্য রাখার জন্য নির্দিষ্ট হন। এখানে তিনি ট্রেড ইউনিয়নে মহিলা শাখা স্থাপনের প্রস্তাব রাখেন। তাঁর এই প্রস্তাব বিপুল ভোটাধিক্যে গৃহীত হয় এবং কেন্দ্রীয় ট্রেড ইউনিয়ন সংস্থায় মেয়েদের শাখা খোলা হয়।

কেন্দ্রীয় ট্রেড ইউনিয়নে মেয়েদের শাখা খোলার সঙ্গে সঙ্গেই কিন্তু তাঁর দায়িত্ব শেষ হলো না। বরং তাঁর কাজ আরো বাড়লো। বিভিন্ন ইউনিয়নের সঙ্গে যুক্ত মহিলাদের নিয়ে তিনি ছয় সপ্তাহের একটি ট্রেনিং কোর্স চালু করলেন। এর উদ্দেশ্য হলো যাতে মেয়ে-কর্মীদের স্বার্থ আরো ভালোভাবে সুরক্ষিত হয়। এতে যে শুধু কর্মক্ষেত্রে সুবিধা হবে তাই নয়, পারিবারিক ক্ষেত্রেও অনেক সুবিধা হবে। কিছু-দিনের মধ্যেই হাতে হাতে ফল পাওয়া গেল। সরকার কর্মী-মেয়েদের সন্তানদের সুব্যবস্থার জন্য আরো চাইল্ড নার্সারী খোলার জন্য একটি আইন প্রণয়ন করেন। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে, শ্রীমতী ম্যাগ-ডালেনা তিনটি সন্তানের জননী।

পেরুভিয়ান ওয়ার্কার্স কনফেডারেশন সম্প্রতি এক মহিলা ব্যাঙ্ক-কর্মীকে কেন্দ্রীয় কমিটিতে গ্রহণ করেছেন। এই মহিলা হলেন শ্রীমতী কুইন্টানা। দীর্ঘদিন ধরে তিনি ব্যাঙ্কে কাজ করছেন এবং স্বাভাবিকভাবেই ট্রেড ইউনিয়নের সঙ্গে যুক্ত। কিন্তু সহসা এরকম একটি দায়িত্ব এসে পড়বে তা তিনি ভেবে উঠতে পারেননি। যাহোক প্রাথমিক বিহ্বলতা তিনি কাটিয়ে উঠেছেন এবং পুরোপুরি এখন মহিলা কর্মীদের উন্নয়নে কাজ শুরু করে দিয়েছেন। তিনি মনে করেন যে, মহিলাদের যে-দুটি জিনিস সর্বাগ্রে দরকার, তা হলো শিক্ষা এবং ট্রেনিং। কেন্দ্রীয় ট্রেড ইউনিয়ন এবং বিভিন্ন আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানের সহযোগিতায় তিনি অনেকগুলি সেমিনারের ব্যবস্থা করেছিলেন মহিলাদের জন্য। এতে মহিলা-দের মধ্যে খুবই উৎসাহের ভাব পরিলক্ষিত হয়। এসব সেমিনারে অংশগ্রহণে মহিলাদের উৎসাহ এতো প্রবল যে তাঁরা এজন্য অফিস কামাই করতেও দ্বিধা করেন না।

এসবের জন্য অর্থের প্রয়োজন। তিনি সেদিকেও নজর রেখেছেন। এমনিতে সেমিনার উপলক্ষে স্থানীয় মেয়েরা কিছু সাহায্য করেন। কিন্তু এতে সব সময় কুলিয়ে ওঠা যায় না। সেজন্য তিনি মাঝে মাঝে নানা অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করেন। এরকম অনুষ্ঠানে পরিবারসহ অসংখ্য লোক যোগ-দান করেন। এই অনুষ্ঠানে নানা আমোদ-প্রমোদের যেমন ব্যবস্থা থাকে, তেমনি শিক্ষামূলকও অনেক কিছু থাকে। সুযোগ এবং সুবিধা বুঝে শিক্ষামূলক বক্তৃতারও ব্যবস্থা করা হয়। অর্থসংগ্রহ এতে মোটা-মুটি ভালোই হয়। পুরুষেরাও এর সঙ্গে সহযোগিতা করে চলেন।

এই সঙ্গে আর একজনের নাম করতে হয়, তিনি হলেন শ্রীমতী ডাক্তিনিয়া। বলতে গেলে ট্রেড ইউনিয়নে মহিলাদের মধ্যে তিনি এদেশে পথিকৃৎ। তিনিও রাজনীতি থেকে ট্রেড ইউনিয়নে এসেছেন। পূর্বে তিনি ছিলেন লাতিন আমেরিকান রেভুলুশনারি পপুলার এলায়েন্স দলের মহিলা শাখার সভানেত্রী। এখন তিনি শ্রমিক আইনে অন্যতম বিশেষজ্ঞ। সবাই তাঁকে ভালবাসে এবং শ্রদ্ধা করে। বর্তমানে তিনি ভগ্নস্বাস্থ্য কিন্তু রাজনীতি এবং ট্রেড ইউনিয়ন উভয় ব্যাপারেই এখনো তাঁর উৎসাহের অন্ত নেই।

পেরুর পাশাপাশি কলম্বিয়াতেও মহিলাদের মধ্যে ট্রেড ইউনিয়নের প্রসার ঘটেছে। সেদেশে শ্রীমতী টেরেসা ভালেন্সিয়া মহিলা কর্মীদের মধ্যে বিশেষ শ্রদ্ধা এবং সম্মানের আসনে অধিষ্ঠিত। ট্রেড ইউ-নিয়নে তিনি সব সময়ের কর্মী নন। নিজের কাজের অবসরে যাতে তিনি ট্রেড ইউনিয়নের কাজকর্ম দেখাশোনা করতে পারেন, সেজন্য তাঁকে ড্রয়িং অফিসের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। এর ফলে স্বাধীনভাবে কাজ করার তিনি সুযোগ পেয়েছেন। তাঁর কাজের মধ্যে প্রধান হলো শিক্ষা এবং ট্রেনিং।

শ্রীমতী ভ্যালেন্সিয়ার পাশাপাশি এগিয়ে এসেছেন আরো মহিলা। এঁদের একজন হলেন শ্রীমতী টলেডো। তিনি একজন শিক্ষিকা এবং বর্তমানে নতুন স্থাপিত ন্যাশনাল টিচার্স [illegible] সাধারণ সম্পাদিকা। প্রায় পঁচাত্তর হাজার শিক্ষক এই সংস্থার অন্তর্ভুক্ত। নতুন প্রতিষ্ঠিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে এই সংস্থা অনেক উল্লেখযোগ্য কাজ করেছে। শিক্ষক-দের অনেকদিনের মাইনে বাকি ছিল। নানাভাবে চেষ্টা করেও টাকা আদায় করা যাচ্ছিল না। অবশেষে সমস্ত শিক্ষক দল-বদ্ধভাবে পায়ে হেঁটে রাজধানী অভিযান করেন প্রতিবাদ জানাতে। এরপর তাঁদের দাবী আদায়ে আর অসুবিধা হয়নি। সম্প্রতি এই সংস্থা শিক্ষা সম্পর্কে একটি বিরাট সম্মেলনের আয়োজন করে বিশেষ আলোড়ন এনেছে।

ছোটখাটো চেহারার এই ভদ্রমহিলাকে দেখে মনেই হয় না যে, তিনি এতো বড় একটি সংগঠন চালাতে পারেন। তারপর পরপর যে-দুটি কাজ তিনি করেছেন, তা কলম্বিয়ার ট্রেড ইউনিয়নের ইতিহাসে সবিশেষ উল্লেখের দাবী রাখে। গোড়ায় ছোট্ট এক অফিসে বসে তিনি কাজ করতেন। দিনের পর দিন অক্লান্ত প্রয়াসে গড়ে তুলেছেন এই সংস্থা। শুধু নিজে যে তিনি এই সংস্থার সাধারণ সম্পাদিকা তা নয়, তিনি ছাড়া কোষাধ্যক্ষের দায়িত্বপূর্ণ পদটিও একজন মহিলার অধীনে। এই কোষাধ্যক্ষ ভদ্রমহিলা কঠোর পরিশ্রম করেছেন সম্মেলন সফল করার জন্য। সকল সভ্যের কাছ থেকে চাঁদা আদায় করার ঝকমারি যে কতো সে অভিজ্ঞতা আমাদের অনেকেরই নেই। অবশ্য সংস্থার সভাপতির পদটিতে একজন পুরুষ আছেন।

আর্জেন্টিনা বিরাট রাজনৈতিক দুর্যোগে ভুগছে। কিন্তু ট্রেড ইউনিয়ন সেদেশে বে-আইনী নয়। কিন্তু এদেশে শ্রমিকে শ্রমিকে সংঘর্ষ লেগেই আছে। এর ফলে মাঝে মাঝে ট্রেড ইউনিয়ন অফিসের উপরও হামলা হয়। তা সত্ত্বেও ট্রেড ইউ-নিয়নে জনসমর্থন যথেষ্ট।

বহু মহিলা এগিয়ে এসেছেন এদেশে ট্রেড ইউনিয়নের কাজে। তাঁদের মধ্যে পারস্পরিক বোঝাপড়া এবং কাজকর্মের সংহতির জন্য সেমিনারের আয়োজন করা হয়। এখানে সবাই মন খুলে কথা বলতে পারেন। আর যেসব মেয়েরা ট্রেড ইউ-নিয়নের দিকে ঝুঁকছেন, তাঁরা বয়সের দিক থেকে সবাই তরুণী। সুতরাং দেশের অস্বাভাবিক অবস্থা বা হামলার ভয়ে তাঁরা মুখ বুজে থাকেন না। এরকমই একজন হলেন শ্রীমতী এলেনা পিক। আর্জেন্টিনার দ্বিতীয় বৃহত্তম ট্রেড ইউনিয়নের মহিলা শাখার ভারপ্রাপ্ত এই ভদ্রমহিলা মেয়েদের সংগঠিত এবং শিক্ষিত করে গড়ে তোলার প্রচেষ্টায় ইতিমধ্যেই অনেকখানি সফল হয়েছে। তিনি ইন্টারন্যাশনাল কাউন্সিল অফ সোস্যাল ডেমোক্রাটিক ইউনিয়ন থেকে বৃত্তি পেয়েছিলেন। বর্তমানে তিনি ট্রেড ইউনিয়নের মাধ্যমে আর্জেন্টিনার নারী-সমাজকে [illegible]

—[illegible]

পারাণির কড়ি

বুন ঘোষ

অভাবী মানুষ ফকির। কারবার কোরে খায়। সংসারে কতো ছলাকলা আছে। কতো মায়া-মোহিনী তন্ত্র-মন্ত্র আছে। তারা বেহুঁশ মানুষকে ভেড়া বানিয়ে রাখে। ভেড়া বানিয়ে একটা চির সরা, একটা উপুড় সরার মধ্যে তাদের আটক করে রাখে। হে প্রভু! তোমার দাস এই ফকিরের হুঁশটি তুমি ঠিক রেখো। সে পেটের দায়ে কলকাতা যায়। পাড়ায় চল্লিশ ঘর গেয়েল আছে তার। সে অম্বর মাকে নিয়ে ঘর করে। ঘরে তার কুচোকাঁচা ছেলেমেয়ে আছে। গাই বাছুর আছে। প্রায় চব্বিশ ঘন্টাই তাকে ঘরের বাইরে পা বাড়াতে হয়। তাকে তুমি বেহুঁশ কোরো না প্রভু!

ফকির নিমেষের মধ্যে প্রণাম সেরে নেয়। কলকাতা যাচ্ছে সে। বড়ো বাজারে ছানার খোটি। বারোটায় ট্রেন তার। ইস্টিশনে সময় মতো পৌঁছুতে না পারলে ট্রেনটা ফেল হয়ে যাবে। আর ফেল হয়ে গেলে সর্বনাশ হয়ে যাবে তার। তাহলে বড়বাজার থেকে বাড়ি ফিরতে নির্ঘাৎ মাঝরাত হয়ে যাবে। ছেলেটা বার্লি পাবে না। আগল-পাগলগুলো হামলে মরবে গোয়ালে। তার কপিলার সান্নিপাত। অম্বর মা মেয়েমানুষ, রান্নাঘরের দাওয়ায় একলাটি লম্প জেলে বসে থাকবে। ফকির জানে, ঘুমে চোখ ছিঁড়ে পড়তে চাইলেও অম্বর মা ঠিক জেগে থাকবে। মানুষটা ঘরে ফেরেনি পোড়া চোখে ঘুম কি আসতে পারে তার?

ফকিরের শিরদাঁড়া সামনে ঝুঁকে পড়েছে। পেটখানা বুকের সঙ্গে প্রায় ঠেকে যায় বলে ফকিরকে আজকাল কেমন কুঁজো মতন দেখায়। তবে তার দুটি পেশীবহুল হাত—চওড়া কব্জি আর পায়ের ডিমে বহু দিনের অভ্যাস এখনো যেন ধরা পড়ে আছে। মাথায় আধপাকা চুল। চোখ দুটো বসা। খোঁচা খোঁচা রাসি দাড়ি। পরনে আট হাতি কাপড়। এবং তার পালিশ, পোক্ত খাওয়া দেহটায় ঐ হাত দুটি আর পা দুখানি কেমন তাই বেমানান বলে মনে হয়।

ফকির যখন [illegible] পাড়ায় বেরিয়ে [illegible]

কি পায় না—সে বিড়ি মুখে নিয়ে বাঁকের দিকে দুলিয়ে সবই দখতে পায়। দেখতে পায়, টাউরকাটার ঝোপের পাশে ফণীমনসার ঝাড়। এইখানে খরিশ গোখরো খেলা করে। সে তার পদ্মের পাপড়ির মতো ডালি দুলিয়ে দুলিয়ে ফণীমনসার ঝাড় থেকে বেরিয়ে আসে। কখনো তার রাস্তা জুড়ে লম্বালম্বি শুয়ে থাকে। কি চিকন গা তার! যেন তেল চুইয়ে পড়ে গা থেকে। ফকির হাত জোড় কোরে কপালে ঠেকিয়ে রাখে। সে মুখখু মানুষ, কিসে কি হয় সে তার কি জানে! পথেঘাটে দেবতার লীলা; মানুষকে সাবধানে পা ফেলতে হয়। মায়ের কৃপা হলে খরিশ ফকিরকে পথ ছেড়ে ঝোপের মধ্যে ধীরে ধীরে সিঁধিয়ে যায়। ফকির তখন পথ পায়। সেও আবার চলা শুরু করে। ফণীমনসার ঝাড় পার হয়ে সে যখন বেলগাছটার তলায় চলে আসে তখন সে চাঁপাফুলের গন্ধ পায়। সে স্পষ্ট বুঝতে পারে [illegible] কেউ যেন [illegible] নরম [illegible] শরীর। গায়ে

তার ভুর ভুর করছে কাঁঠালি চাঁপার গন্ধ। ফকির চেনে, এ গন্ধ কার গায়ের। ফকির জানে, এই গন্ধ যার নাকে লাগে সে মানুষ হোক, কি অবলাজীব হোক—সে পাগল হয়ে যায়। আর যে পাগল হয় না সে বড় শক্ত জীব। সে জীব যদি মানুষ হয়, সে মানুষ সংসারে মন বসাতে পারে। সে মানুষ ঘরে ফিরে অন্নর মাকে চিনতে পারে। মন তার উচাটন হয় না।

এই ধূলিমাটির পৃথিবীতে দেবতা আসে লীলা করে। মানুষ সে ক্ষুদ্র জীব বই তো নয়। ফকির তাই ভাবে, সে আর কতোটুকু দেখতে পায়, তার দেখার বাইরেও তো দেবতার লীলা চলে। আর ফকির তা দেখতে পায় না বোলে—সে অভাবী মানুষ, তেনাদের ডিঙিয়ে ডিঙিয়েই হয়ত চলে যেতে হয়। সে তো ফকিরের পাপ। সেই পাপ ফকির কোথায় রাখবে? অন্নর মা মেয়েমানুষ, না হলে তাকে বলতো—দেবতার লীলার কথা। সে যে কতো কী দেখে! ভোর রাত্রে তেনারা লীলা সাঙ্গ করেন। আর দিনের আলো সে তো দেবতারই দান। দিনের আলোয় অভাবী মানুষ, জীব জন্তুরা সব খেটে খায়। ফকিরও খেটে খায়। দেবতার কৃপা আছে তার ওপর। তাই কাঁঠালি চাঁপার গন্ধেও ভয় ডর করে না তার।

শরবনের আশেপাশে পুকুরের পাড়ে ডাহুক চরে বেড়ায়। মাছরাঙার চোখ জুড়োনো পালক। এবং শরের পাতায় বসা ফড়িঙের ডানার ওপর তিরতিরে রোদ নাচছে। ফকির অনুভব করে এই যে কাদা-মাটির পৃথিবী—তার এতো রূপ। এই গাছগাছালি, পশু-পাখি, কীটপতঙ্গ, সব অবলাজীব এবং দেবতা—এদের কাউকে অস্বীকার করে মানুষ বাঁচতে পারে না। সে বাঁচবে কি! তার একার শক্তি আর কতোটুকু! ওরা না পথ ছাড়লে কই ফকির তো যেতে পারে না। ফকিরও তো একজন মানুষ। অবশ্য সে অভাবী মানুষ। তার কতো অপরাধ হয়ে গেছে এদের সবার কাছে। তবুও প্রভু! এই হুঁশটুকু তার বজায় রেখো। সবার সঙ্গে এক হয়ে বাঁচতে চায় সে। একা একা বেঁচে তার সুখ কি? সেও তো গাছপালা জীব-জন্তুদেরই মতন একজন। সবাইকে সঙ্গে নিয়ে থাকা সেই তো আনন্দের।

ফকিরের শরীরটা আজকাল ভাল যাচ্ছে না। অম্বল ঢুকেছে শরীরে। পাঁজরার দুপাশে একটা ব্যথা ঘোরাঘুরি করে। কখনো শিরদাঁড়ার গায়ে গায়ে। কখনো বা বুকের মধ্যিখানটা যাতনায় মুচড়ে মুচড়ে ওঠে। বুকের কষ্টটা খুব বেড়ে গেলে সে সোডা খায়। সোডা খেলে অনেক সময় কষ্টটা কমেও যায়। যখন কমে না তখন নিরুপায় হয়েই সে ডাক্তারখানা যায়। ফকির ছাপোষা খেটে খাওয়া মানুষ। তার কি ঘরে বসে থাকবার সময় আছে। সে আজ অসুখে পড়ে থাকলে তার পাড়ার দুধ আনবে কে? এই বাজারেও তার চল্লিশঘর গেয়েল আছে। তাদের ঝক্কি পোহাতে হয় তাকে। ভোরবেলা ঘর থেকে বেরিয়ে গোয়েলবাড়ির দোরে দোরে ঘুরে বেলা ন'টা দশটার মধ্যে আবার দুধ নিয়ে ফিরতে হয়। সেই দুধে ছানা কাটানো। তারপর নাকে মুখে গুঁজেই আবার সেই ছানা কাঁধে কোরে ইস্টিশনে ছোটা। মাল বিক্রি না হলে তার সংসার চলবে না। গোয়েলরা দুধ বন্ধ কোরে দেবে। সেই ফকিরের কি অসুখ নিয়ে পড়ে থাকা চলে? ফকির পড়ে থাকলে—সে একা মানুষ—অন্নর মা চোখে দিশে পাবে না তাহলে। অন্নর মায়ের শরীরও এখন আর তেমন নেই। ভাঙটা পড়েছে শরীরে। তার ওপর মাত্র পাঁচ ছমাস আগে সে আঁতুড় তুলেছে আবার। তারও তো একহাতের সংসার। ঘরের কাজ তাকেই সব করতে হয়। আর অন্নর বয়েস?

সে আর কতো, বছর ন'দশ হবে। সংসারের কাজের কি বোঝে সে।

অন্নর পর গৌর। ছ বছরের। তার পরেরটির বয়েস মাত্র ছ মাস। তবে অন্ন তাদের জ্যেষ্ঠ সন্তান নয়। জ্যেষ্ঠ হলো অনিল তার বয়েস ছাব্বিশ। অনিল এখন তার বাপ-মাকে পর কোরে দিয়েছে।

অনিল জন্মাবার পর দীর্ঘ ষোল বছর কোনো সন্তান আসেনি তাদের। ফকির মুখখু মানুষ, প্রভুর লীলা খেলার কথা সে কি বুঝবে? তাই অবাক হয়ে সে শুধু দেখেছে, দীর্ঘ ষোল বছর পরে বড়-বউ আবার পোয়াতী হয়েছে। বড়বউ ষোল বছর পরে অন্নর মা হয়েছে আবার।

অন্নকে কোলে নিয়ে ফকির বড় বউয়ের মাথায় হাত রেখেছিল, বড় বউ তুই আবার মা হলি এ যে আমার কি সুখ!

বড়বউ মুহূর্তেই প্রসবকালীন শরীরের সমস্ত বেদনার অসহ্যতা ভুলে গেছিল! সে চোখের দৃষ্টি মাটিবাগে আনত রেখে মুখময় এক অদ্ভুত হাসি ছড়িয়ে দিয়েছিল। ফকিরের মনে হয়েছিল, বড়বউয়ের এই হাসি সাধারণ হাসি নয়। সে দেখেছে মুখুজ্জেদের দুর্গাদালানে ঠাকুরের গায়ে গামতেল মাখালে যেমন জ্যোতি বেরোয়—বড়বউয়ের হাসিতেও অমনি এক দিব্য জ্যোতি ছিল।

ফকির ডাক্তারখানা গেলে ডাক্তার বলে,—তোমার ব্যারাম তো ভালো হবে নে হে। বিশ্রাম চাই বুঝলে। বিশ্রাম।

ফকির বলে—গরীব মানুষ বাবু বিশ্রাম কি আমাদের সইবে? ছেলেবেলা থেকে দাপিয়ে বেড়ানো অভ্যেস, এখন তাই এক-বেলা ঘরে বসে থাকলে গায়ে যেন গরল ফোটে। খেতে যাই বাবু।

এরপর চুপচাপ থাকে ফকির। ডাক্তার বিড়ি দেয়। ফকির বসে বসে টানে। ডাক্তার রোগী দেখে। ফকির ওদের দেখে। এক সময় ফকির বলে, তা দিন না বাবু একটা মিকচার। বেশ তেজী শক্তিশালী একটা পাচন বানিয়ে?

ডাক্তার বলে, দেবো।

ফকির ভাবে, আহা বড় ভালো মানুষ এই ডক্তারবাবু। কতো মানুষের দায়-দায়িত্ব তার মাথায়। মানুষের ভালো করবার জন্যে তার চিন্তার কি শেষ আছে! সে একজন অভাবী মানুষ, ক্ষুদ্র—ফকির দাস। প্রভুর দাস, সকলের দাস। তার বুকের ভিতরটা কেমন আইঢাই কোরে ওঠে। তার বড়ো ইচ্ছে করছিল, ডাক্তারবাবুর সঙ্গে দুটো মনের কথা বলে। তার বুকটা তাহলে হালকা হয়ে যেতো। কিন্তু ডাক্তারের সে সময় কোথা? চারপাশে তার রোগীরা ভিড় কোরে রয়েছে। তারা ঠিক ঠিক ওষুদ চায়। ঠিক ঠিক ওষুদ না দিলে তাদের ব্যারাম ভালো হবে না। তাদের মরণ বাঁচন ডাক্তারের হাতে। অতএব ফকির ডাক্তারখানায় আর অনর্থক দেরি করে না। ট্যাঁকে ওষুদ গুঁজে সে উঠে পড়ে। তার কতো কাজ পড়ে আছে। বসে বসে গল্প করলে কি তার চলে!

ফকির ছানার বাঁকটা কাঁধ পাল্টায়। বুকের মধ্যে দম যেন বেঁধে যেতে চাইছে। আষাঢ়ের মেঘলা আকাশ। তবুও শরীরে তার ঘাম ফুটে বেরুচ্ছে। পা বাড়াবার জায়গা নেই পথে। পথের কাদা তার হাঁটু ছাড়িয়ে উঠে এসেছে। কিন্তু পথ এখনো অনেকটা। ইস্টিশন! ইস্টিশন তো কাছের রাস্তা নয়!

ফকির ভাবে তাই তো ক'টা বাজে এখন? আকাশটা মেঘলা বলে, না কি শরীরটা তার ভাল নেই বলে, সে যেন সময়টা এখন আর ঠিক মালুম করতে পারছে না। সে দেখলে—(সবই প্রভুর ইচ্ছে)—সামনে একটি মানুষ আসছে। কাদার রাস্তায় মানুষটি পা বাড়াতে পারছে না। ফরসা মাজা ধুতিখানা গুটিয়ে ধরে পা গুনে গুনে ফেলছে। মানুষটি কাছাকাছি আসতে ফকির জিজ্ঞেস করে—কটা বাজলো বাবু?

পোশাকে কাদাজল ছিটিয়ে যাবে বলে মানুষটি ফকিরকে পথ ছেড়ে দিয়ে এক-পাশে সরে দাঁড়িয়ে আছে। তার মুখে বিরক্তি। তবুও বাঁ-হাতের কব্জিটা চিতিয়ে নিয়ে জবাব দিলো মানুষটা।

শুনে ফকির যেন হাঁফ ছাড়লে। যাক। সময় আছে এখনো।

গত রাতে ভারি কষ্ট গেছে ফকিরের। অবশ্য ফকির জানতে পেরেছিল আগে থেকেই। বগনাটা আজকেজে হয়ে উঠেছে। দু-এক দিনের মধ্যেই ব্যথা উঠবে ওর। তবে ফকির এতোটা বুঝতে পারেনি যে, কাল রাতেই হতভাগী খালাস হবে। আর তা বুঝতে পারেনি বলেই গতরাত্রে খাওয়া-দাওয়ার আগে একবার আখড়ায় গিয়েছিল সে। মন্দিরের চাতালে বসে সকলের সঙ্গে ফকিরও তাই প্রভুর নাম কীর্তনে মেতে উঠেছিল। সেই সময় অমু এসেছিল ডাকতে—বাবা গো, বগনাটা কেমন করছে।

অমুর ডাকে ফকিরের মনটা হঠাৎ যেন ছিটকে আসে। যে খাদে মনটা তার এতোক্ষণ রইছিল সেই ডুবগভীরে আর কিছুতে নিজেকে ধরে রাখতে পারে না। তাইতো! কি হলো বগনাটার! এই সেদিন একরাশ টাকা দিয়ে ঘরে এনে তুলেছে। কচি কচি শিং দুটিতে তেল মাখিয়ে সধবা মেয়ের মতো কপালে আর সিঁথিতে সিঁদুর পরিয়ে দিয়েছে বড়বউ। পা ধুইয়ে গামছা দিয়ে মুছিয়ে দিয়েছে। অমু দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে পাখা নিয়ে বাতাস করেছে। এবং ফকির গলবস্ত্র হয়ে প্রণাম করেছে। মা ভগবতী তোমার অনেক অযত্ন হবে। গরীবের সংসার, মানিয়ে নিও মা।

গায়েন ভক্তদের কাছ থেকে অনুমতি চেয়ে নেয় ফকির। আখড়ার সকলের উদ্দেশে বলে, চলি গো দাদারা মেয়েটা আবার ডাকতে এসেছে। কিন্তু ফকির, প্রভুর দাস—সে যে এই অসময়ে আখড়া থেকে চলে যাচ্ছে—এই অপরাধ তাকে বার বার অপরাধী করে তোলে। অতএব ফকির তার অন্তরের ভিতরে ঠাঁই কোরে প্রভুর রাঙা চরণ দুখানি জড়িয়ে ধরে। আর এই সময় তার অন্তরে ঘোর লাগে বলে সে দুনিয়ার আর সব কিছু বুঝি ভুলে থাকে। প্রভু তাকে যেমন চালায় সে শুধু তেমনি চলতে থাকে।

ফকির গোয়ালের সামনে এসে দেখলো, অমুর মা একা, মেয়েমানুষ—সে এই রাত-কালে কি করবে—সে শুধু তারই জন্যে কেমন হানটান করছে। তাই কর্তাকে আসতে দেখেই বড়বউ বললে,—অবস্থা ভাল নয় গো। তুমি একটু দ্যাখো দিকিনি।

তাড়াতাড়ি গোয়াল ঘরের মধ্যে ঢুকে যায় ফকির। দেখে, দাপাদাপি শুরু করে দিয়েছে। কিছুতে তিষ্ঠুতে পারছে না। এই শুচ্ছে, তো এই উঠছে। চেন দিয়ে বাঁধা খোঁটার চারপাশটা যেন চষে ফেলছে সে। ব্যথায় কাতর হয়ে ছটফট করছে ভগবতী। তার এই ভয়ংকর মূর্তি দেখে গোয়ালের আর সব অবলাজীবগুলো ভীত সন্ত্রস্ত। এখনই ওরা খোঁটা ভেঙে দড়া ছিঁড়ে একটা হুলুস্থুল কাণ্ড বাধিয়ে ছাড়বে। তাই ফকির, তার ব্যথায় কাতর ভগবতীকে গোয়ালঘর থেকে বাইরের চালায় এনে বাঁধল। পাইলী বগনা, আহা! কত্তো কষ্ট পাবে মা আমার। ফকির জলদি বড়বউকে একবাটি গরম জল আনতে বলে।

অমুর মা জল গরম নিয়ে এলে ফকির বেশ কোরে তার হাত দুটি গরম জলে ধুয়ে নেয়। এবং তারপর প্রভুকে স্মরণ কোরে ভগবতীর গর্ভের মধ্যে হাত দেয়। চমকে ওঠে সে।—বড়বউ সর্বনাশ হয়ে গেছে—বাছুর বেপালোটে পড়েছে!

অমুর মা, তার অভাবের সংসার, সেও শিউরে উঠেছে,—সে কি গো!

ফকির বহু চেষ্টা করলো। কিন্তু কিছুতেই কিছু হলো না। যে বিভীষিকা সে এড়াতে চেয়েছিল তাকে এড়ানো গেল না। বহুক্ষণ চেষ্টা করার পর ফকির ক্লান্ত শরীরে প্রসব বেদনায় অচৈতন্যপ্রায় তার ভগবতীর গর্ভ থেকে একটি মৃত বাছুর টেনে বার করে আনলো।

বাছুর মরলো। কিন্তু তার কপিলা—সেও আর উঠে দাঁড়াতে পারল না। গতরাত থেকেই সে অসুখে পড়ল। সান্নিপাত।

খালাস হবার পর এই সান্নিপাতিক অসুখ, ফকির জানে, এ বড় সাংঘাতিক অসুখ। কিন্তু এ নিয়ে কোনো খেদ নেই তার। খেদ কোরে কি করবে ফকির। ফকির একজন সামান্য মানুষ। আর মানুষের ইচ্ছেয় কি কখনো দিনরাত্তির হয়?

ভাইয়ে ভাইয়ে আলাদা হবার সময় ছোটভাই সংসারের দেনা দেখালে।

দেনার দায়ে জমিজমা বিক্রি করতে হবে। নইলে ঋণ পরিশোধ হবে না। পার্টিশান-সালিশিরা একমত হয়ে সেই-রকমই বন্দোবস্ত কোরে দিলে। ভায়ের নামে হয়ে গেল পৈতৃক ক্ষেত-খামার সব।

ফকির আর কি করবে! সে কি ভায়ে ভায়ে মামলা-মোকদ্দমা করতে যাবে?

না। ফকির তেমন গাধা হয়ে জন্মায় নি।

সে শুধু তার মাটির ঘরে বাঁশের খুঁটি যোগাবার মতো সামর্থ্যটুকু চেয়েছে তার প্রভুর কাছে। সে ফকির দাস—প্রভুর দাস, সকলের দাস—সে রাজা হবার সাধ রাখে না মনে। শুধু পৃথিবীর গাছ-গাছালি, কীটপতঙ্গ, জীবজন্তু, পাখ-পাখালি আর দেবতা—এদাদের মাঝখানে মিলেমিশে থাকতে চায় সে। প্রভুর ইচ্ছেয় সৃষ্টি হয়েছে এই পৃথিবীর যাবতীয় সব জিনিস। মানুষ সে তো তাদেরই মধ্যে এক ক্ষুদ্র জীব।

ফকির সেই ক্ষুদ্র মানুষদেরই মাঝ দীন-দরিদ্র একজন। সে জানে, এই পৃথিবী বড় কঠিন ঠাঁই। এখানে কেউ বেহুঁশ হয়ে পড়লে সে ভেড়া বনে যায়। দুঃখে দারিদ্র্যে উতলা হয়ে পড়লে, তার চলে না। ফকির কেবল সেই দিনরাত্তির মালিককেই স্মরণে রাখতে চায়। কিন্তু তবুও, তার বৃদ্ধ বুকের গভীরে কবে যেন একটি ক্ষতের সৃষ্টি হয়েছে। মাঝে মাঝে ফকির টের পায়, তার এই শরীরের মধ্যে যেন রক্ত চুঁইয়ে চুঁইয়ে পড়ে। সেই রক্তে তার জ্যেষ্ঠপুত্র অনিলকে সে খেলা করতে দেখে।

অনিল বউ নিয়ে এখন শহরে থাকে। শহরেই চাকরী করে দুমানুষে। ফকির জানে না—তার বউমা বা অনিল কি চাকরী করে। তবে, সে লোকের মুখে শুনেছে, অনিল অনেক টাকা মাইনে পায়। আজ এ শহরে, কাল সে শহরে—তার ঘোরাঘুরির চাকরী।

ফকির নিজে না খেয়ে না দেয়ে তার এই জ্যেষ্ঠ পুত্রকে বুকের মধ্যে কোরে মানুষ করেছে একদিন। তার রক্ত-জল-করা টাকায় লেখাপড়া শিখিয়েছে অনিলকে। আর আজ, সেই ছেলের সঙ্গে তাদের কোনো সম্পর্ক নেই।

ফকির বরাবর ভেবেছে, ছেলে তার লেখাপড়া শিখুক। দশজনের একজন হোক। সুখে থাকুক। সে নিজে মুখ্যুসুখ্যু মানুষ বলে ছেলেকে সে লেখাপড়া শিখিয়েছে। মুখ্যু থাকার কি জ্বালা তা সে জানে বলেই ছেলেকে ফকির কিছু-তেই নিজের মতো করে রাখবার সাহস পায় নি। আজ তার অনিল লেখাপড়া শিখে চাকরী করে, অনেক টাকা মাইনে পায়—একথা শুনলেও তার বুকটা যেন গর্বে ভরে ওঠে। শিক্ষিত ছেলে তার। গাঁয়ে পড়ে পড়ে কি কাদা কেঁচো ঘাঁটবে? এখানে কে দাম দেবে তার। শহরে তার কতো নাম।

তবুও অনিল তাদের জ্যেষ্ঠ সন্তান। অনিল যদি মাঝে মধ্যেও বাড়িতে আসতো। সে তো অনিলের কাছে টাকা পয়সার প্রত্যাশী নয়। শুধু চোখের দেখা দেখতে চায় ছেলেকে। ফকির মুখ্যু হোক আর যাই হোক, তবু তো সে তার বাপ। মুখ্যু

বাপকে দেখবার জন্যে কি শিক্ষিত ছেলে আসে না কখনো। সে যদি একবার এসে বলত—বাবা ভাল আছো? আর বউমা যদি তার শাশুড়ীকে মা বলে এসে পেন্নাম করত—তবে, ফকিরের ছাতিটা দশ হাত হয়ে যেত।

ফকিরের কি ইচ্ছে করে না তার পুত্র-বধূকে দেখতে? বউমা—বউমা—ফকিরের যে বড় সাধ হয় তার পুত্রবধূকে বউমা বলে ডাকে। ফকির জানে, তাকে লুকিয়ে লুকিয়ে বড়বউ অন্ধকারে কাঁদে। চোখের জলে বড়বউয়ের কোলের কাপড় ভিজে যায়।

ফকিরও কাঁদতে পারলে বেঁচে যেত। কিন্তু চোখ দিয়ে তার কান্না ঝরে না। বড় কঠিন প্রাণের মানুষ ফকির। তার কেবল দীর্ঘশ্বাস পড়ে। এইরকম দীর্ঘশ্বাস পড়লে ফকির মাঝে মাঝে চমকে ওঠে। এই দীর্ঘশ্বাসের সঙ্গে কি তার কান্না মিশে থাকে?

ফকির যখন ইস্টিশনের কাছাকাছি এসে পেঁাছুলো বারটার ট্রেন তখন প্ল্যাটফরম ছেড়ে চলে যাচ্ছে। কাঁধের বাঁকটা নাবাতেও ফকিরের তখন আর খেয়াল ছিল না, সে যেন কি এক নিবিড় রহস্যের দিকে কেবল দৃষ্টি মেলে রেখেছে—ঠিক অম্নর মতো গাঢ় চোখে সেই অপসৃয়মান ট্রেনখানার দিকে ফকির শুধু তাকিয়ে রইল।

ট্রেনটা চলে যাচ্ছে। ব্রীজ পার হচ্ছে—ঝম-ঝম-ঝম। মেঘলা আকাশের নিচে কালো কালো গাছের কালচে পাতাপুতির ভেতর দিয়ে ট্রেন ক্রমে অদৃশ্য হয়ে গেল।

প্ল্যাটফরমের এক পাশে কাঁধের বাঁকটা নাবিয়ে রাখে ফকির। তার সারা শরীরে ঘাম ছুটছে। দর দর কোরে ধারা বইছে গা বেয়ে। ফকির গামছা দিয়ে গায়ের ঘাম মুছতে মুছতে টের পেল বুকের ব্যথাটা যেন গুড়ো গুড়ি হয়ে সারা শরীরকে জারিয়ে তুলছে। ফকির অভাবী মানুষ বলে ব্যথাটাকে আমল দিতে চাইছিল না। কেবল গায়ের তাপটা খানিক কমাবার জন্যে সে তার হাতের গামছা ঘুরিয়ে কয়েক ঝলক বাতাস পাবার চেষ্টা করছিল। তার সামনে দিয়ে মানুষজন প্ল্যাটফরম থেকে নেবে যাচ্ছে কল কল কোরে। তাদের সকলেরই ব্যস্ত পা। সেদিকে তাকিয়ে তাকিয়ে ফকির যেন তাদের মনের ইচ্ছেটিকে ধরতে পারছিল। কেন না, তারা কোথাও না কোথাও পেঁাছুতে যাচ্ছে, তাদের পায়ে পায়ে ফকির যেন একটি শব্দই ধ্বনিত হতে শুনছিল, বার বার ধ্বনিত হচ্ছিল—হুঁশিয়ার—হুঁশিয়ার—হুঁশিয়ার।

কিন্তু ফকির সেই ভীড়ের মধ্যে চোখ রেখে সহসা খুব চমকে গেল।

কে?

কে ও?

অনিল!

তার অনিল! আহ্! বাবা আমার।

কিন্তু না। অনিল তার বাবাকে দেখতে পায়নি। ফকির দেখল, অনিল চলে যাচ্ছে। ভীড়ের মধ্যে দিয়ে অনিল তার নিজের পথে হেঁটে যাচ্ছে। ঠিক যেন রাজপুত্তুরের মতো চেহারা হয়েছে অনি-লের। রং যেন ফেটে পড়ছে শরীরে।

এইরকম চেহারা আর এইরকম পোশাক পরা মানুষদের ফকির বাবু বোলে কথা বলে। ফকির জানে, এনারা সব উঁচু ঘরের মানুষ। এনারা বাবুর জাত। ফকিরের যদি মন ভাল থাকতো, সে যদি অনিলকে তার ছেলে বলে চিনতে না পারত, তাহলে, ফকির কথা প্রসঙ্গে নির্দ্বিধায় হয়তো এই অনিলকেই জিজ্ঞেস করতো,—আচ্ছা বাবু, বাংলাদেশ থেকে এই যে সব মানুষ-জন বাপঠাকুরদ্দার ভিটেমাটি ছেড়ে পালিয়ে আসছে এ দেশে, তাদের কি হবে বাবু? আত্মীয়স্বজন—তাদের ছেলেপুলে, পরি-বার?

ফকির তার চোখকে বিশ্বাস করতে পারে না। সে কি সত্যিই দেখেছে অনিলকে? না কি তার চোখের ভুল?

অনিলকে আর দেখা যায় না। হয়তো এখানেই কোথাও কাজে এসেছে অনিল। এখুনি আবার কাজ মিটিয়েই চলে যাবে। পিতৃহৃদয়ের একটি আবহমানকালের বাসনা ফকির করজোড়ে তার প্রভুর উদ্দেশে জানায়—প্রভু ওকে সুখে রেখো তুমি।

বুকের ব্যথাটা বড় কষ্ট দিচ্ছিল বলে, না কি ফকিরের মাথাটা যেন ঘুরছিল। মাথাটা দু-হাতে চেপে ফকির বসে পড়ল প্ল্যাটফরমের ভিজে মাটিতে। তার দু-চোখ ঘামের জলেই বুঝি বা ঝাপসা হয়ে এলো। দু পায়ে কি বীভৎস কাদা। যেন গিলে রেখেছে পা দুটোকে। তার কুঁজো শরীরখানা তখনো ঘেমে চলেছে ক্রমাগত।

গামছার খুঁটে চোখ দুটো পরিষ্কার করে নিয়ে ফকির দেখল, চায়ের দোকানের নিতাই এদিকে আসছে।

—কি খুড়ো আজ গেলে তো ফেল হয়ে?

—আর বলিসনে বাপ, রাস্তায় বড় কাদারে ধন। শুনে নিতাই খামোকাই হাসে।

হাসতে হাসতে বলে,—রাস্তায় কাদা কি আজ নতুন খুড়ো?

নিতাই একটা বিড়ি এগিয়ে দেয়।

ফকির বলে,—না। থাক। ঘামটা মরুক।

—তুমি এই কোরেই কোনদিন মরবে খুড়ো। এ সব করার আর কি বয়েস আছে তোমার? এবার ছেলেদের ছেড়ে দাও। তাদের সংসার তারা বুঝে নিক।

লোহার শিক পুড়িয়ে কেউ যেন ফকিরের বুকের ভিতরে ছ্যাঁকা দিয়ে দিলে। ফকির অধো মুখে বসে বসে তার পায়ের কাদা খুঁটতে থাকলো।

নিতাই চলে যাচ্ছিল বলে সেও যেন একটু শান্ত হবার চেষ্টা করছিল। সে ফকির দাস। একদিন এই পৃথিবীতে এসেছে। তার চাল্লিশঘর গেরস্ত আছে। তার কপিলার সম্প্রপাত। সংসার আছে তার। সে অম্নর মাকে নিয়ে ঘর করে। এই পৃথিবীর পাট চুকিয়ে ফকির যেখান থেকে একদিন এসেছে—সে আবার সেখানেই ফিরে যাবে তার কর্মফল সঙ্গে নিয়ে। কিন্তু—, কিন্তু অম্নর বিয়ে-থা দিতে হবে। তার গৌর যে বড় নাবালক। কোলেরটি এখন মাত্র ছ' মাসের।

ফকির অতি ক্ষুদ্র জীব। অভাবী মানুষ, প্রভুর ইচ্ছার কথা সে জানে না। সে কেবল জানে দেবতার লীলা এই পৃথিবীজুড়ে। এখানে বেহুঁশ হলে আর রক্ষে নেই কারো। সে প্রভুর দাস—প্রভুর কাছে মিনতি করে, এই অধম তোমার দাস, ফকিরের, কেবল হুঁশটুকু তুমি ঠিক রেখো প্রভু। সে দেখতে পায়, রেললাইনের শান্ত কেমন এক গম্ভীর রূপ। ওপরে ছায়া ছায়া আকাশ। দুপাশে মাটি, পথ, ঘাট, গাছগাছালি আর সহস্রজীবের উথালি-পাথালি সুখ-দুঃখের মাঝখান দিয়ে বহু দূরে যেন কোন্ রহস্যলোকে গিয়ে মিশে গেছে এই রেললাইন।

ফকির ভাবে, প্রভুর ইচ্ছেতে দিনরাত্তির হয়। তেনার ইচ্ছে হলে, কারো কোনো আর পিছুটান ধরে রাখতে পারে না। তারা একদিন না একদিন পার হয়ে যায়। কিন্তু বেহুঁশ হয়ে যারা এই পৃথিবীতে ভেড়া বনে যায়, তারাও কি অবশেষে মুক্তি পায়?

ফকির প্ল্যাটফরমে অপেক্ষায় থাকে।

জনবিস্ফোরণ ও উৎপাদন

মলয়কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

রঙচঙে একটা রবারের খেলনা বেলুন নিয়ে তাতে যদি আমরা ক্রমাগতই ফুঁ দিয়ে চলি, তাহলে অল্পক্ষণ পরেই সেটি ফটাস্‌ করে ফেটে যাবে এটা হল বিস্ফোরণের ফল। ফুটবলের ভিতরে যে রবারের ব্লাডার থাকে, যার মধ্যে বাতাস ভরিয়ে ফুলিয়ে তুললে তবে বলটা খেলার উপযুক্ত হয়ে ওঠে, সেই ব্লাডারে যদি আমরা একনাগাড়ে হাওয়া 'পাম্প' করে যেতেই থাকি, তবে শেষ অবধি এমন একটা অবস্থা আসে যখন ব্লাডারটি আরো বেশি ফুলতে না পেরে সশব্দে ফেটে যায়। এও বিস্ফোরণ। মোটরগাড়ির টায়ারের মধ্যেকার টিউবেও মাত্রাছাড়া বাতাস জোর করে ঢোকাতে গেলে ঐ একই ব্যাপার অর্থাৎ বিস্ফোরণ ঘটে।

এগুলো ঘটে কেন? বেলুন, ব্লাডার বা টিউব, যা-ই বলুন না কেন, সেটা রবারের তৈরি, তার স্থিতিস্থাপকতার অর্থাৎ পেটে বাতাস পুরে রাখবার ক্ষমতার একটা নির্দিষ্ট সীমানা আছে, সীমানা ছাড়িয়ে অতিরিক্ত হাওয়া ঠেসে দিতে গেলেই বিপত্তি ঘটবে, বাধ্য হয়ে বিস্ফোরণ হবে জিনিসটা যাবে ফেটে। দোষটা ব্লাডার, টিউব বা বেলুনের নয়, বেহিসেবীর মতো যে হাওয়া পুরছে—তার।

আমাদের দেশে এই ধরনের একটা বিপর্যয় বা বিস্ফোরণ আমরা আজ দেখতে পাচ্ছি। এ-বিপর্যয় ভারতের জনসংখ্যা সম্পর্কে। উপমা দিয়ে বলা যায়, ভারত আজ ঐ বেলুন, টিউব বা ব্লাডার আর জনসংখ্যা হচ্ছে তার মধ্যেকার হাওয়া। বল্গাছাড়া রকমে যদি ঐ জনসংখ্যার বাতাস দেশের ভিতরে অনবরত উত্তরোত্তর বেশি বেগে চাপ দিতে থাকে, তবে সামাজিক এবং অর্থনৈতিক বিস্ফোরণ ঠেকাবে কে?

এই বিপর্যয় বা বিস্ফোরণেরই অধুনা নাম দেওয়া হয়েছে জনবিস্ফোরণ। এ বিস্ফোরণ অবশ্য একমাত্র এদেশেরই সমস্যা নয়, সারা পৃথিবীরই শিরঃপীড়ার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। এ যেন ভরা কোটালের ক্রমস্ফীয়মান জলরাশি, যা প্রথমে বান এবং পরে সর্বগ্রাসী বন্যায় সারা জগৎকেই বিলুপ্ত করে দিতে উদ্যত হয়েছে।

প্রসঙ্গটা আজকের দিনে শিক্ষিত সচেতন মানুষের কাছে অজানা অপরিচিত নয়। তাঁরা অনুভব করছেন, করেছেন, যে এই অর্থনৈতিক আর সামাজিক বিস্ফোরণের উৎসমুখ বন্ধ করতে হলে বেহিসেবী হারে মানুষ বাড়তে দেওয়াটা সমগ্র পৃথিবীর পক্ষেই যে বিপজ্জনক এ-কথা বোঝার ও বোঝাবার সময় এসে গেছে। অনেকে নিজেরা হাড়ে হাড়ে সে-বিপদ টের পাচ্ছেনও। জনবিস্ফোরণ যে বোমা-বিস্ফোরণের চাইতে কোনও অংশেই কম ক্ষতিকর নয়, তা একটু ভেবে দেখলে স্বীকার করবেন সকলেই।

১৯৭১ খৃষ্টাব্দ অর্থাৎ চলতি বছরে ভারতে যে সার্বজনীন লোকগণনা হয়ে গেল, তাতে জানা গেছে যে, এই দেশের মোট লোকসংখ্যা ৫৪, ৬৯, ৫৫, ৯৪৫-এর ঘরে গিয়ে পৌঁছেছে। দশ বছর আগে অর্থাৎ ১৯৬১ খৃষ্টাব্দে যে লোকগণনা হয়েছিল তাতে লোকসংখ্যার হিসাব পাওয়া গিয়েছিল ৪৩,৯০,৭২,৫৮২। তার মানে দশ বছরে ১০ কোটি ৭৮ লক্ষেরও বেশি, অর্থাৎ বছরে ১ কোটি ৭ লক্ষেরও বেশি লোকবৃদ্ধি হয়েছে এই দেশে।

আরেকটু খুচরো হিসেব নিলে দেখা যায়, লোকসংখ্যায় ভারতের রাজ্যগুলির মধ্যে শীর্ষস্থানীয় হচ্ছে উত্তরপ্রদেশ - ৮২,৯৯৪,৩৫০। এর পরে ক্রমান্বয়ে স্থান হচ্ছে বিহার (৫৬,৩৮৭,২৯৬), মহারাষ্ট্র (৫০,২৯৫,০৮১) এবং পশ্চিমবাংলার (৪৪,৪৪০,০৯৫)। অর্থাৎ ক্রমানুসারে পশ্চিমবাংলার আজকে স্থান হচ্ছে চতুর্থ। ১৯৬১ সালের হিসাব মতো পশ্চিমবাংলার স্থান ছিল পঞ্চম। ১৯৮১ সালের সমীক্ষায় এই রাজ্য তৃতীয় স্থানে উন্নীত হবে কিনা, কে বলতে পারে?

ইউরোপীয় রেভারেন্ড টমাস ম্যালথাস আজ থেকে শ'খানেক বছর আগে এই মত প্রকাশ করেছিলেন যে, মানুষের বংশবৃদ্ধি ঘটে থাকে ২ বা ২-এর গুণিতকের হিসেবে, অর্থাৎ ২, ২×২=৪, ৪×২=৮, ১৬, ৩২...এই হারে। কিন্তু খাদ্যের বেলায় কী ঘটছে? কে খাবার খেয়ে তবে মানুষ বেঁচে থাকে? ম্যালথাস সাহেবের মতে, খাদ্যবস্তুর উৎপাদন বাড়ানো যায় ১, ২, ৩, ৪, ৫, ৬...এই হারে।

এই হিসেব থেকে এটা বোঝা যায় যে, খাদ্য বা খাবার স্বাভাবিক নিয়মে যতটা বাড়ানো বা জন্মানো যায়, তাতে কুলিয়ে উঠতে গেলে পৃথিবীর জনসংখ্যাকে সীমাবদ্ধ রাখা অত্যাবশ্যক—যথেচ্ছ বাড়তে দেওয়া সর্বনাশকর। এর অন্যথা হলেই দুনিয়ার খাবারের ভাঁড়ার 'বাড়ন্ত' হতে বাধ্য। আর তার মানেই যে পুষ্টির অভাব, অনাহার, অল্পাহার, দুর্ভিক্ষ, রোগ, মহামারী আর অশান্তি—এ আর কে না জানেন?

ম্যালথাস সাহেবের এই মতবাদকে আজকের কালের পণ্ডিত ও বিশেষজ্ঞরা সর্বথা নির্ভুল বলে মনে করেন না। তাঁরা বলছেন, ম্যালথাসের দৃষ্টিভঙ্গী ঈষৎ কুণ্ঠিত এবং শতবর্ষ আগেকার মনুষ্যপ্রগতির ধারার হিসেবে কিঞ্চিৎ অপরিণত। আজকের দিনে বৈজ্ঞানিক উন্নততর পন্থায় জলসেচন ও সার প্রয়োগ করে জমির উর্বরক্ষমতা বাড়ানো সম্ভব হচ্ছে। কিন্তু তা হলেও, সেচ এবং সারপ্রয়োগেরও তো একটা মাত্রা আছে, সীমা আছে— আগে যে-জমিতে বছরে একবার ফলন হত, এখন সেখানে বিজ্ঞানের সাহায্যে না-হয় তিন-চারবার ফসল তোলা যাচ্ছে; কিন্তু তাই বলে সেই জমিতে দশবার ফলন করা সম্ভব কি?—সম্ভব নয়।

অথচ দেশে খাওয়ার মুখ হু-হু করে বেড়েই চলেছে দিনের পর দিন। চাহিদা আছে, যোগান নেই। হিসেবে দেখা যায়, এক হাজার মানুষ যেখানে, সেখানে ফি-বছরে মারা যাচ্ছে (রোগ বা বার্ধক্যের ফলে) বড়জোর ১৬ জন, অথচ সে-তুলনায় নতুন শিশু জন্মাচ্ছে অন্ততপক্ষে ৪০।৪৫ জন অর্থাৎ প্রত্যেক বছরে প্রতি হাজারে বেড়ে যাচ্ছে প্রায় ৩০টি মুখ। এই হারে বাড়তে থাকলে, আমাদের দেশের বর্তমান জনসংখ্যা (প্রায় ৫৫ কোটি) বছর-ত্রিশেক বাদে ১০০ কোটিতে গিয়ে ঠেকবে। কী ভয়ংকর বাড়বাড়ন্ত—ভেবে দেখুন তো! ঐ ১০০ কোটি মানুষ তখন খেতেই বা পাবে কী, আর বাস করবেই বা কোথায়?

অবশ্য অর্থনৈতিক উন্নতি বা জাতীয় অর্থসম্পদ বৃদ্ধির পক্ষে জনবৃদ্ধির একটা অনুকূল প্রভাব যে নেই তা নয়। লোকসংখ্যা বাড়লে মাথাপিছু আয়বৃদ্ধি হবারও সম্ভাবনা (যদিও দুঃখের কথা, আমাদের দেশে তা ঘটে না, এবং জাতীয় ভিত্তিতে এর কারণ নানা); তার ফলে জীবনযাত্রার মানবৃদ্ধি হবার সম্ভাবনা; জীবনযাত্রার মানবৃদ্ধি হলে একটা সুবিধে হতে পারে এই যে, মৃত্যুহার কমানো এবং বংশবিস্তার সীমিত রাখা, দুটোই মানুষের হাতের নাগালে চলে আসতে পারে। ব্যক্তিগত জীবনমান উন্নত হওয়া মানেই সামাজিক মানোন্নয়ন ও জাতীয় আয় বৃদ্ধি।—কিন্তু এই রীতি বা নীতিরও মূলে থাকতে হবে জন্মরোধকরণের সচেতনতা, যা কয়েকটি উন্নত দেশে আছে। আমাদের দেশে কিন্তু সেরকম অনুকূল সামাজিক ও মনস্তাত্ত্বিক পরিবেশ ও প্রস্তুতি এখনো গড়ে ওঠেনি।

আমাদের জন্মহার যে-হারে বাড়ছে, সে-তুলনায় মৃত্যুহার কমে গেছে, মাথাপিছু তথা জাতীয় আয় বাড়ার বদলে কমের দিকেই রয়েছে এখনো, এবং বিভিন্ন খাতে উৎপাদনও এযাবৎ আশাব্যঞ্জক হয়ে ওঠেনি।

আমাদের দেশের জনসাধারণ (এবং সরকারও) যদি ব্যবহার্য প্রয়োজনীয় সামগ্রীর পরিমাণের চাইতে জাতীয় উৎপাদনের পরিমাণটি বাড়াতে সমর্থ হতেন, তাহলে জনবিস্ফোরণ রোধ করবার প্রয়োজনীয়তা এদেশে এত বেশি হয়ে দেখা দিত না। কিন্তু যেহেতু নানা কারণে আমাদের দেশের জাতীয় উৎপাদন অনুন্নত ও অনগ্রসর, সেই হেতুই এখানে জন্মরোধের আবশ্যকতা অত্যন্ত তীব্র। আমাদের সামনে এখন দুটি মাত্র বিকল্প : হয় রীতিগত-ভাবে পরিকল্পনানুসারে জনসংখ্যার স্ফীতি রোধ করতে হবে (বলা বাহুল্য, যতই প্ল্যানিং করিনা কেন, হাতে হাতে ২/১ বছরের মধ্যে ফল দেখা যাবে না, তবে অদূর বা দূর ভবিষ্যতে এই পদ্ধতি সুফল দর্শাবেই), নতুবা জনবৃদ্ধির হারের সঙ্গে সমান তাল রাখতে সেই হারে সামগ্রিক উৎপাদন বৃদ্ধি করে চলতে হবে। আর এ-দুইয়ের কোনটাই যদি না করা যায়, তবে জাতি হিসাবে আমাদের বিনাশ অবশ্যম্ভাবী।

এই দারুণ জনবিস্ফোরণের প্রতিকার করবার, এই আসন্ন ঘোর দুর্দিনের মোকাবিলার দায়িত্ব আমার একার নয়, আপনার একার নয়, শাসন-কর্তৃপক্ষের একার নয়—এ-দায়িত্ব জাতীয়, এ দায়িত্ব সামগ্রিক। এক হাতে উৎপাদন বাড়াতে হবে : তা হল খাদ্যবস্তুর উৎপাদন। অন্য হাতে উৎপাদন কমানো চাই : তা হল নতুন সন্তানের উৎপাদন। বিজ্ঞানের নতুন নতুন আবিষ্কার মানুষের আয়ু বাড়িয়ে দিয়েছে, কমিয়ে এনেছে অকালমৃত্যুর হার। কিন্তু জন্মের হার এখনো আশানুরূপভাবে কমে যায়নি। যদিও অস্ত্রচিকিৎসা এবং গর্ভরোধক ওষুধপত্রের সাহায্যে এক কোটিরও বেশি—অনেকের মতে, প্রায় দেড় কোটি—শিশুর জন্ম-প্রতিরোধ করা সম্ভব হয়েছে (সমীক্ষা ও পরিসংখ্যান অনুযায়ী), তা সত্ত্বেও ভারতে প্রতি দেড় সেকেণ্ডে এখনো একটি নতুন শিশু ভূমিষ্ঠ হয়ে চলেছে।

এই প্রসঙ্গে খাদ্যোৎপাদন বাদে অন্যান্য সামগ্রীর উৎপাদন সম্পর্কে কয়েকটা কথা বলতে চাই। ধরুন, খনিজ উৎপাদন। খনিজ সম্পদ ভারতে যথেষ্টই আছে (কেউ কিন্তু যেন মনে না করেন, সে-সম্পদ অসীম, অফুরন্ত), যথাযথ প্রয়োগকৌশলের [illegible]বৃদ্ধি পরমায় কথা, তার দরুণ দেশের অর্থনৈতিক উন্নতি হবে এবং কিছু বেকার কর্মপ্রার্থী মানুষ রুজি-রোজগারের উপায় পাবে। কিন্তু জন-বিস্ফোরণ-সমস্যার কোনও সুরাহা সে-পথে হবে না।

ধরুন, বনজ উৎপাদন—কাঠ, মধু ইত্যাদি। সেদিকে দৃষ্টি দিলে অল্প কিছু লোকের কর্মসংস্থান হতে পারে, দেশের আর্থিক উন্নতিও হবে। কিন্তু বনজাত সামগ্রীও অফুরান নয়, বন ও বনজ সম্পদ কেটে ব্যবহার করে শেষ করতে হাজার হাজার বছর লাগবে না। তেমনি ধরুন, শিল্পজ বস্তু; নানা প্রকল্প, কলকারখানা, শিল্পব্যবসায় (industry) ইত্যাদির উৎপাদনের মাধ্যমে জাতীয় সম্পদ বৃদ্ধি, অর্থস্বাচ্ছল্য বৃদ্ধি, বেকার সমস্যার (আংশিক) সমাধান—এসব সম্ভব; কিন্তু বনজ যেমন শিল্পজ উৎপাদনও তেমনি জনপ্লাবন বন্ধ করবার কোনও উপায় বাৎলাতে পারে না।

তারপরে ধরুন, ভেষজ উৎপাদন অর্থাৎ ঔষধপত্র তৈরির ব্যবস্থা। নিত্যনতুন আরো সব দরকারি ওষুধ হয়ত বার হতে লাগল, দামও সস্তা করে দেওয়া গেল, সেসব ওষুধে রোগের দাপট কমাতে পারল, পারল মৃত্যুকে আরও দূরে রাখতে, আর অধিকারী হল অনাকাঙ্ক্ষিত সন্তানজন্ম বশে রাখার পূর্ণ ক্ষমতার। —বেশ কথা। কিন্তু ওষুধের ক্ষমতা থাকলে কী হবে, সে ক্ষমতার যথোচিত সুষ্ঠু প্রয়োগ করবে তো জনসাধারণ—তা, সেই জনসাধারণই যদি জন্মনিয়ন্ত্রণের উপযোগিতা সম্বন্ধে উদাসীন কিংবা অজ্ঞ থাকে, তাহলে জন-বিস্ফোরণ বন্ধ হয় কী করে?

এবার দেখা যাক খাদ্যোৎপাদনের ব্যাপারটা। প্রধানতঃ কৃষি থেকেই মানুষের মুখ্য আহার্যগুলি আহৃত হয়—চাল, ডাল, গম, জোয়ার, বাজরা ইত্যাদি চাষের দ্বারাই মেলে। শাক-সব্জি ফল-ফুলুরিও মাটিতেই জন্মায়, এগুলো সবই আমাদের খাদ্য তথা প্রাণধারণের উপায় : এসবের উৎপাদন যদি বাড়ে তবে তা দেশের সমৃদ্ধির পরিচায়কও বটে, আর ক্রমবর্ধমান লোকসংখ্যার ক্ষুধা মিটানর উপায়ও বটে। এই খাদ্যের উৎপাদন তাই প্রাণপণে বর্ধিত করতে হবে।

কিন্তু হবে বললেই কিছু আর তা হয়ে যায় না। আমরা আগেই বলেছি, খাদ্যবস্তুর উৎপাদন সীমাহীনভাবে বাড়িয়ে ফেলা সম্ভব নয়—এমন কী, বিজ্ঞানের সাহায্য নিয়েও। অতএব আমাদের সমষ্টিগত লক্ষ্য হওয়া দরকার : দেশে যতখানি পরিমাণ জমি (চাষযোগ্য) আছে তাতে [illegible] কত পরিমাণ খাদ্যশস্য উৎপন্ন—[illegible] তার হিসেব ঠিক করা। এর পরে দেখতে হবে, ঐ খাদ্য মোট কতজন মানুষের স্বাস্থ্য ভালভাবে বজায় রাখতে পারে। তারপরে ঠিক করতে হবে, এই হিসাব অনুযায়ী দেশে সন্তানোৎপাদন কী হারে কমাতে ও সীমাবদ্ধ রাখতে পারলে সর্বদিক রক্ষা হয়।

এই প্রসঙ্গে, ভারতে প্রস্তুত খাদ্যোৎ-পাদন কতটুকু এগিয়েছে সেদিকে একনজর তাকিয়ে নেওয়া যাক। ১৯৫১ খৃষ্টাব্দের পর থেকে ১৫ বছরে এই দেশের উৎপাদন সতেরো 'মিলিয়ন' টন বৃদ্ধি পেয়েছে, অর্থাৎ এইটিই হল তিনটি পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার মোট ফলশ্রুতি। (ডঃ রাম-সুভগ সিংহের মতানুসারে, ১৯৫১ খৃষ্টাব্দে খাদ্যোৎপাদনের পরিমাণ ছিল ৫৫ মিলিয়ন টন এবং ১৯৬৮ খৃঃ, অর্থাৎ ১৭ বছর বাদে, তা দাঁড়িয়েছে ৯৫ মিলিয়ন টনে।) অথচ আশ্চর্য মনে হতে পারে এই যে, ঐ পনেরো বছরে মাথাপিছু প্রাপ্তব্য খাদ্য ১২·৮ আউন্স থেকে ১২·৪ আউন্সে কমে গিয়েছে!

মোদ্দা কথা এই, জনবিস্ফোরণ ব্যাপারটি একটি অতি গুরুত্ব সমস্যা, যাকে কব্জা করতে হবেই। আর সেই লক্ষ্যে পৌঁছতে-যদি না, এবং যতক্ষণ না, আমাদের জাতীয় উৎপাদন যথেষ্ট কার্যকর ও ফলপ্রসূ হয়—আমাদের হাতিয়ার থাকবে জন্মনিরোধ—সীমিত পরিবার—আটটি নয়, দশটি নয়, গুটিতিনেক মাত্র সন্তান। এ বিস্ফোরণ প্রতিহত করবার বীজমন্ত্র হবে 'আপনা হাত জগন্নাথ'—'ভগবানের হাত' বা 'প্রকৃতির দান', এ ধরনের ওজর এখানে চলবে না।

আশা আর আশ্বাসের কথা, এই ব্যাপারে ভারতে কিছু কাজ দেখা যাচ্ছে বলে মনে হয়। পৃথিবীর মধ্যে এই দেশই প্রথম সরকারীভাবে উদ্যোগী হয়েছে লোক-বৃদ্ধি রদ করতে। পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা-গুলিতে ক্রমশই বেশি করে মনোযোগদান ও অর্থবরাদ্দ করা হচ্ছে এই খাতে। কেবল পশ্চিমবাংলাতেই নয়, সারা ভারতেই মোট জন্মহার হ্রাস পাবার একটু যেন লক্ষণ দেখা যাচ্ছে। কর্তৃপক্ষের হিসাবমতো, ১৯৬৮ খৃঃ প্রতি এক হাজার মানুষের ক্ষেত্রে জন্মহার ছিল ৩৯; ১৯৮০-৮১ খৃঃ এই হার কমে গিয়ে দাঁড়াবে (হাজারে) ২৬টিতে। তাছাড়া সমীক্ষায় দেখা গেছে, জনবৃদ্ধি হারের দিক থেকে এশিয়ার অন্যান্য দেশের তুলনায় ভারত যথেষ্ট পিছনে রয়েছে। এ ছাড়া, ভারতকে উন্নয়নমূলক সাহায্য দিতে আগ্রহশীল যেসব দেশ আছে তাদের consortium বা সংগঠন এদেশের পরিবার পরিকল্পনা কর্মসূচীর উত্তম [illegible]

নির্মল সরকার

প্রিয়লাল মজুমদার নামজাদা না হ'লেও গণ্যমান্য ব্যবসাদার। এদিকের বস্তী ভেঙ্গে যখন সি আই টি স্কীম তৈরী হ'ল তখন তিনি জায়গাটা কিনে বাড়ী করেছিলেন। সি আই টি রোডের পূর্বদিকে প্রকান্ড বস্তী। যেমন বিচিত্র তার বাড়ীঘর তেমনি বিচিত্র তার অধিবাসীরা। বস্তীর অস্বাস্থ্যকর হাওয়া মিঃ মজুমদারকে পীড়িত করেছে। সব থেকে তিনি ভয় পেয়েছেন ভাইপোর অবস্থা লক্ষ্য করে। অনুপ আজকাল প্রায়ই বস্তীর লোকেদের সঙ্গে মিশে থাকে বলে তিনি শুনেছেন।

প্রিয়লাল মজুমদারের বয়স প্রায় পঞ্চান্ন। বয়স হলেও মিঃ মজুমদারের শক্ত সমর্থ চেহারা। ব্রেকফাস্ট শেষ করে একটা চুরুট ধরালেন তিনি। ড্রেসিং গাউনের কোমর বাঁধাটায় একটা ফাঁস দিয়ে অফিস ঘরের দিকে এগিয়ে গেলেন।

—মাস্টার, ডাকলেন মিঃ মজুমদার গম্ভীর গলায়।

—এই যে, চেয়ারের পেছনে মাস্টারমশায় দাঁড়িয়ে; যেন মেঝে ফুঁড়ে উঠলেন তিনি। দেখলেই বোঝা যায় অতি নিরীহ প্রকৃতির লোক—নিজের ঘর ছাড়া আর কোথাও যান না বিশেষ।

তোমার ছাত্রের কান্ড লক্ষ্য করেছ? চুরুটে একটা টান দিলেন মিঃ মজুমদার।

—অনুপকে আমার ছাত্র না বলাই ভাল, আমার সঙ্গে তিন বছর প্রায় কোন সম্পর্কই রাখে নি।

—তাহ'লে কি করা যায়, আমরা দায়িত্ব এড়িয়ে যেতে পারি কিন্তু তাতে সমস্যার সমাধান হবে কি?

—না তা হবে না, মাস্টারমশায় নস্যির ডিবেটা নিয়ে নাড়াচাড়া শুরু করলেন।

—অনুপের বয়স বাইশ বছর হ'ল। [illegible] আশা করেছিলাম ও [illegible]
[illegible]

—দুঃখের কথা—আস্তে মন্তব্য করলেন মাস্টারমশায়।

—অনুপ যদি আমার নিজের সন্তান হ'ত তাহলে আলাদা কথা ছিল, কিন্তু ভাইপোকে মানুষ করতে গিয়ে তাকে যদি বাঁদর তৈরী করে থাকি তাহলে কেউ ছেড়ে কথা বলবে না।

—কেউ বলবে, মাস্টারমশায় কথাটা ঠিক বুঝতে পারলেন না।

—কি আশ্চর্য। মাস্টার, তুমি সমাজের কথা ভুলে গেলে।

—না, তা ভুলিনি, আমতা আমতা করলেন মাস্টারমশায়।

—তাহ'লে হোয়াট আর ইউ গোয়িং টু ডু।

—একটা চাকরী।

—চাকরী? কে ওই গণ্ডমূর্খটাকে দেবে, উত্তেজিত হলেন মিঃ মজুমদার। আমি ওকে আমার অফিসে কতদিন যেতে বলেছি—গেছে কি?

—কুসংসর্গে পড়েছে, মাস্টারমশায় নস্য নিলেন একটিপ।

—ভেবেছিলাম ও নিজেকে শুধরে নেবে, কিন্তু ওর স্বভাবচরিত্র আরও জঘন্য হয়ে যাচ্ছে।

মধ্য কলকাতার একটা পোদ্দারের দোকান থেকে একতাড়া নোট পকেটে নিয়ে অনুপ একটা ট্যাক্সি ডাকল। সুঠাম চেহারা অনুপের। জুলপিটা চওড়া হয়ে গালের মধ্যভাগে এসে নেমেছে। একটা সিগারেট মুখে দিল অনুপ, তারপর সুদৃশ্য লাইটারটা বের করে তাতে অগ্নিসংযোগ করল। সুমনাই তাকে লাইটারটা উপহার দিয়েছে।

ট্যাক্সির ভাড়া মিটিয়ে অনুপ দীর্ঘ পদক্ষেপে উঠে গেল গ্রীন ম্যানসনের তেতলায়। কলিং বেল টিপতেই দরজাটা খুলে গেল।

—এসো, কি দেখছো হাঁ করে, হাসল সুমনা।

—তোমাকে—ভেতরে ঢুকে অনুপ একটা সোফায় গা এলিয়ে দিল।

—ড্রিঙ্ক দেবো? জিজ্ঞেস করল সুমনা।

—দাও, তবে তার আগে একটু কাছে বোসো। পকেট থেকে নোটের বাণ্ডিলটা বার করে দিল অনুপ সুমনাকে। বাণ্ডিলটা সম্ভ্রম আর বিস্ময় সৃষ্টি করল সুমনার।—কি হ'ল টাকাগুলো তুলে নাও, হাসিমুখে বলল অনুপ।

—কোথা থেকে পেলে, পাশে ঘনিষ্ঠ হয়ে বসল সুমনা।

—রিজার্ভ ব্যাঙ্ক থেকে জোরে হেসে উঠল অনুপ।

ড্রয়িংরুমের পাশে করিডোর এবং তারই শেষ প্রান্তে মাস্টারমশায়ের ঘর। ঘরের একপাশে একটি মাদুর পাতা। এইটি তাঁর শয্যা। অপরপাশে রংচটা একটি টিনের ট্রাঙ্ক। মাদুরের ওপর মাস্টারমশায় চুপ করে বসে রইলেন কিছুক্ষণ। তারপর বাক্সের ভেতর থেকে একটা ছবি বার করলেন। দেয়ালের গায়ে সেটা টাঙান দিয়ে রেখে অনেকক্ষণ চুপ করে বসে রইলেন তিনি।

অনুপ পরের দিন ঘুম থেকে অনেক দেরীতে উঠল। অনুপের ফুটবল এবং হকিতে যথেষ্ট সুনাম আছে; অনেক সময় বাইরে থেকে খেলার আমন্ত্রণ আসে। হঠাৎ গতরাত্রের কথা মনে পড়ে গেল অনুপের। সুমনা কি ধরনের মেয়ে তা সে জানে। পয়সা দিয়ে ভালোবাসার কথা শুনতে এবং সুন্দর শরীরের স্বাদ পেতে অনুপের ভালোই লাগে। ঘর থেকে বেরিয়ে কার্তিককে দেখে কাকার কথা জিজ্ঞেস করল অনুপ।

—তিনি তো বেরিয়ে গেছেন, উত্তর দিল কার্তিক।

খবরটা শুনে খুশী হল অনুপ। ধীরে ধীরে সে কাকার ঘরের দিকে অগ্রসর হল। দরজাটা খোলাই ছিল। ঘরে ঢুকে একবার চারিদিকে তাকিয়ে নিল অনুপ। লোহার আলমারীর হ্যাণ্ডেল ধরে টানাটানি করল কিছুক্ষণ, সেটা নড়ল না। হাফপ্যান্টের পকেট থেকে এবারে একটা চাবি বার করল অনুপ। আলমারীতে লাগিয়ে একটু ঘোরাতেই খুট করে সেটা খুলে গেল। হঠাৎ ফোনটা বেজে উঠল, চমকে উঠেছে অনুপ আকস্মিক শব্দটা শুনে।

—হ্যালো কাকে চান?

—মিঃ মজুমদার আছেন? স্ত্রী কণ্ঠে প্রশ্ন হ'ল।

—না, তিনি বেরিয়ে গেছেন, আমি তার ভাইপো অনুপ মজুমদার।

লাইনটা কেটে গেল সঙ্গে সঙ্গে। আশ্চর্য হয়ে দাঁড়িয়ে রইল অনুপ। কোথায় যেন শুনেছে সে এই স্বরটা, ঠিক বুঝতে পারল না অনুপ।

কাকার ঘর থেকে বাইরে বেরিয়ে কার্তিককে দেখতে পেল অনুপ।

—আপনাকে সবাই নীচে ডাকছে—বলল কার্তিক।

—সবাই মানে?

—গোপাল, পাঁচু, লচুয়া—

—ও, বসতে বল, আমি যাচ্ছি—

কিছুক্ষণ পরে অনুপ নীচে নামল।

—কিরে ক্লাবে যাসনি কেন? জিজ্ঞেস করল গোপাল।

—কাল একজায়গায় আটকে গিয়েছিলাম। ড্রয়িংরুমে গিয়ে সবাইকে নিয়ে বসল অনুপ। কী খাবি? জিজ্ঞেস করল অনুপ।

—ওসব সহ্য হবে না ভাই, আমরা গুপীর দোকানে গেলাসে করে চা খাই। গুপী যা চা করে না মাইরি—একেবারে এক নম্বর—মন্তব্য করল লচুয়া।

সামনের বস্তীতে থাকে ওরা, অনুপের সঙ্গী।

—আজ যাবি তো ক্লাবে গোপাল তাকায় অনুপের দিকে।

—আজ আর যাওয়া হবে না—এন্টালীর হয়ে হকি খেলতে হবে।

ইতিমধ্যে কার্তিক একটা ট্রেতে চা আর একপ্লেট আলুভাজা রাখল টেবিলে। সুইই—ই—সিটি মারল লচুয়া পরম উল্লাসে. তারপর কার্তিককে ধরে একপাক নেচে নিল। এই শালা ছি

করছিস—বলল গোপাল। কে আসবে? উত্তর দেয়—পাঁচু, সায়েবকো পগারপার আর বড়ো এতক্ষণ আফিং খেয়ে, ঘুমুচ্ছে—। গোপাল অনুপের কাছে এগিয়ে এসে নিম্নকণ্ঠে বলল—শুনেছিস, কাল ওরা এসেছিল, আমাদের একজনকে জখম করেছে। আজ আর হবে না, কালই যেতে হবে। সকলেই খুশী হল অনুপের সিদ্ধান্তে, বিবিপাড়ায় দলের বদলা নিতেই হবে।

সুমনা ফ্ল্যাটে একলা থাকে না, সঙ্গে ওর একজন ছোকরা বেয়ারা থাকে। বিষ্টু চালাক চতুর আর কাজের লোক। হঠাৎ কলিং বেলটা বেজে উঠল—দরজাটা খুলে দিল বিষ্টু। সায়েবের মতো ঝকঝকে কোট প্যান্ট পরে মুখে মোটা চুরুট লাগিয়ে লোকটা দিদিমণির সঙ্গে ফ্রেন্ডশিপ করে।

—কি রে, মেমসায়েব কোথায়? মুখ থেকে চুরুট নামাল লোকটা।

—ভেতরে আছেন। আপনি বসুন, বসবার ঘরের দিকে ইঙ্গিত করল বিষ্টু। একটা সোফায় হেলান দিয়ে বসল লোকটা। কিছুক্ষণ পর হাসিমুখে সুমনা ঢুকল ঘরে।—এত সকালে যে!—হাসিমুখে সুমনা বসল লোকটার পাশে।

—তাড়াতাড়ি বাড়ী ফিরতে হবে, শরীরটা ভাল নয়। এই নাও একটা জুয়েলারির বাক্স এগিয়ে দিল সুমনার দিকে। বাক্সের মধ্যে হীরের ব্রেসলেটটা দেখে অবাক হল সুমনা।

মাস্টারমশায় আলোয়ানটা গায়ে দিয়ে চাবি দিয়ে ড্রয়িংরুমের দেয়াল ঘেঁষে চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলেন।

—তোমায় আমি অনেকদিন বলেছি, পড়তে যদি ভাল না লাগে, আমার অফিসে জয়েন কর। তাও তুমি শোন না। মিঃ মজুমদার একদৃষ্টে তাকিয়ে রইলেন অনুপের দিকে।

—তুমি কি ভাবছো সারাজীবন বস্তীর লোফারদের সঙ্গে আড্ডা দিয়ে কাটাবে?

—না, আড্ডা আর দিলুম কোথায়?

—তাহ'লে সারাদিন কি কর?

—এই এখানে ওখানে ঘুরি, তাচ্ছিল্য ভরে উত্তর দিল অনুপ।

—বিবিপাড়ায় একটা দলের ওপর বোমা ফেলার জন্যে থানা থেকে ওসি তোমার বিরুদ্ধে কমপ্লেন করেছে জান। আমি এসব সহ্য করব না, চীৎকার করে উঠলেন মিঃ মজুমদার।

মিঃ মজুমদারের পায়ের শব্দ শুনে চট করে সরে গেলেন মাস্টারমশায়। ড্রয়িংরুম থেকে বেরিয়ে মিঃ মজুমদার সোজা নিজের ঘরে এসে ঢুকলেন। কাঠের আলমারীটার সামনে দাঁড়িয়ে কি যেন ভাবলেন তিনি। আলমারীটা খুলে মিঃ মজুমদার অবাক হয়ে গেলেন। কার্তিকের কাছে খোঁজ নিয়ে জানলেন কাল অনুপ তাঁর ঘরে ঢুকেছিল। অনুপকে তিনি আবার ডেকে পাঠালেন।

—তুমি আমার ঘরে কাল কেন ঢুকেছিলে? প্রশ্ন করলেন মিঃ মজুমদার।

—ফোন ধরেছিলাম, একজন কে মেয়ে-ছেলে ফোন করেছিল।

—আমার আলমারীতে তুমি হাত দিয়েছিলে? হীরের আংটিটা চুরি হয়ে গিয়েছে জান? আস্তে কথাটা উচ্চারণ করলেন মিঃ মজুমদার।

—তুমি আমায় সন্দেহ করছ নাকি? রুখে দাঁড়াল অনুপ।

—বাড়ীতে যারা আছে তাদের প্রত্যেককেই আমি সন্দেহ করি আর তাছাড়া তুমি দিন দিন অমানুষ হয়ে যাচ্ছ।

—তার জন্যে দায়ী তুমি। বিনে মাইনের একজন বুড়ো মাস্টার রেখে আর দুবেলা দুমুঠো খেতে দিয়েই তুমি তোমার কর্তব্য শেষ করেছ। কার্তিক চাকরের থেকে আমার স্থান এবাড়ীতে কি ওপরে?

—তুমি কার্তিকের চেয়েও অধম, চোর কোথাকার! তোমাকে আমি পুলিশে দেব।

—স্বচ্ছন্দে; তাচ্ছিল্যভরে ঘর থেকে বেরিয়ে এল অনুপ।

মাস্টারমশায়ের দরজায় টোকা দিল কার্তিক।

—কে, ঘরের বাইরে এসে দাঁড়ালেন মাস্টারমশায়।

—আমার দেশ থেকে একটা চিঠি এসেছে, একটু পড়ে দেবেন বাবু। মাস্টারমশায় চিঠিটা নিয়ে দেখে বললেন,

—তোদের জমির খাজনা অনেক বাকী পড়েছে, হয়ত নীলেম হয়ে যাবে সব।

—কতটাকা বাবু—

—প্রায় সাতশো টাকা। টাকা না দিতে পারলে জমিগুলো সবই যাবে।

দুঃসংবাদের কঠিন নিষ্পেষণে হঠাৎ বিভ্রান্ত হয়ে পড়ল কার্তিক।

বস্তীর অধিবাসীদের সম্পর্কে মিঃ মজুমদারের অবজ্ঞা আর ঘৃণার কথা সকলেই জানে। সেদিন মিঃ মজুমদারের বাড়ীর আশেপাশে গোপালের দল ওৎ পেতে দাঁড়িয়ে আছে। মিঃ মজুমদারের গাড়ীটা দূরে দাঁড়িয়ে গেল। সুই-ই-ই একটা সিটি মারল লচুয়া। গাড়ীটা গেটের কাছে আসতেই ফোঁস করে একটা আওয়াজ হল। উত্তেজিত হয়ে গাড়ী থেকে নেমে পড়লেন মিঃ মজুমদার।

—আপনার গাড়ীটা অচল হয়ে গেল স্যার—গোপাল সামনে এগিয়ে এল।

—তার মানে, রুখে দাঁড়ালেন মিঃ মজুমদার।

—অতো মানে কি আমরা বুঝি—আমরা যে বস্তীর লোক স্যার। সিটি মারল লচুয়া।

—কি চাও তোমরা?

—আমাদের কি আর চাওয়ার শেষ আছে —গাড়ী থেকে শুরু করে আপনার এয়ার-কন্ডিশান্ড করা ঘরটা পর্যন্ত সবই চাই। এতোদিন তো ভোগ করলেন, এবার ছাড়ুন।

টাকা ভর্তি পোর্টফলিওটা ধরে ছুটে বাড়ীর মধ্যে ঢুকে গেলেন মিঃ মজুমদার।

ড্রয়িংরুমে ঢুকে হাঁপাতে লাগলেন তিনি। কফি দে, হুকুম করলেন তিনি।

—দিচ্ছি, কার্তিক একবার টেবিলে রাখা মোটা ব্যাগটার দিকে লুব্ধ দৃষ্টিতে তাকালো।

—কি দাঁড়িয়ে আছিস কেন? সবারই দৃষ্টি ব্যাগটার দিকে।

—না যাচ্ছি। নিষ্ক্রান্ত হল কার্তিক।

লৌহনগরী জামসেদপুর। কর্মচঞ্চল প্রাণবন্ত শহর, প্রাণস্পন্দনের উচ্ছ্বাসে উদ্বেল। অল্পবয়সেই প্রিয়লাল ব্যবসায়ে কৃতিত্ব দেখিয়েছে। এল টাউনের রাস্তা দিয়ে দ্রুতপদে হাটছিল সে। হিমাংশু—হঠাৎ একজন পথচারীকে দেখে দাঁড়িয়ে পড়ল সে।

—প্রিয়লাল? অবাক হয়ে গেছে হিমাংশু। তুমি এখানে?

—হ্যাঁ, ব্যবসার খাতিরে আসতে হয়েছে।

—চল, আমার বাসা থাকতে, তোমায় অন্য কোথাও থাকতে হবে না।

হিমাংশুর সহৃদয়তাকে দারিদ্র্য মলিন করতে পারেনি।

—একটি চেনামুখের সন্ধান পাবে আমার ওখানে—রহস্যময় ভঙ্গী করল হিমাংশু।

—কে বলতো? উৎসুক হয় প্রিয়লাল।

—সুপর্ণা, আস্তে নামটা উচ্চারণ করল হিমাংশু।

প্রিয়লালের মনে পড়ে গেল ধনী-কন্যা সুপর্ণার কথা। ইতিহাসের ছাত্রী ছিল সে। হিমাংশুর বাসায় এসে সুপর্ণাকে দেখে মুগ্ধ হয়ে গেল প্রিয়লাল।......ঢং ঢং ঢং চমকে উঠেছেন মিঃ মজুমদার। অয়েল পেনটিং থেকে দৃষ্টিটা ঘড়ির ওপর গিয়ে পড়ল তার। টেলিফোনটা তুলে একটা নম্বর ডায়াল করলেন তিনি।

—হ্যালো, মিঃ দত্ত, আমি মজুমদার কথা বলছি।

—এতরাত্রে? চেম্বার থেকে ওঠার আয়োজন করছিলেন সলিসিটর দত্ত।

—আমার উইলটা পালটাতে চাই। আমার সম্পত্তি ভাইপো অনুপকে দিচ্ছি না। লোফারটাকে শিক্ষা দিতে চাই আমি।

—কাল রবিবার, পরশু তাহলে—

—বেশ, দেরী যেন না হয়, লাইনটা কেটে দিলেন তিনি। দরজার দিকে হঠাৎ নজর পড়ল মিঃ মজুমদারের। অনুপ হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

—কাকা, তুমি আমায় সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত করছ তাহলে? হাসছে অনুপ।

—হ্যাঁ করছি—। তুমি মদ খেয়েছো? তীব্ররোষে কন্ঠরুদ্ধ হল মিঃ মজুমদারের।

—খেয়েছি এবং প্রায়ই খেয়ে থাকি—তোমার আপত্তি আছে বলে জানতাম না তো।

—চরিত্রহীন, লম্পট, চোর, বেরিয়ে যাও, গেট আউট—চীৎকার করে উঠলেন প্রিয়লাল মজুমদার।

—যাব, বেরিয়ে যাব, তবে তার আগে একটা হিসেব নিকেশ করতে হবে তো। সে যাক, উপস্থিত তোমার একটা হারিয়ে যাওয়া জিনিস পেয়েছি, মাফলারটা টেবিলের ওপর রাখলো অনুপ।

—মাফলার, কোথায় ছিলো?

—সুমনার ফ্ল্যাটে ভুল করে ফেলে এসেছিলে, কি বুঝতে পারলে না? গ্রীন ম্যানসনের সাতের নম্বর ফ্ল্যাটে থাকে সুমনা, বিল্টু বলে তার একটা ছোকরা চাকর আছে—দাঁত বার করে হাসতে লাগল অনুপ।

—আমি ও নামে কাউকে চিনি না, শেষ চেষ্টা করলেন মিঃ মজুমদার।

—আরেকটা খুব বিপদ হয়েছে; তুমি যে হীরের রিস্টলেটটা সুমনাকে দিয়েছিলে সেটা ও যাচাই করেছে—ওটা নকল। পরম পূজ্যপাদ শ্রদ্ধেয় খুল্লতাত মহাশয়, তোমার বাকরুদ্ধ কেন—শুদ্ধভাষা শুরু করল অনুপ—শুদ্ধচেতা মহামানব আপনি নীরব কেন? আপনি কি জানিতেন না, ঐ বিশেষ স্ত্রীলোকটির সহিত আমারও কিছু যোগাযোগ রহিয়াছে। চীৎকার করে হেসে উঠল অনুপ।

—অনুপ, বাধা দিতে চেষ্টা করলেন মিঃ মজুমদার; তুমি চলে যাও, মিনতি করলেন তিনি।

—যাব বৈকি, কিন্তু তার আগে, হে শুকদেব ব্রহ্মচারী আপনি বলিলেন কি, যিনি একজন সামান্য বেশ্যাকেও বঞ্চিত করেন তাহাকে কি বলিয়া অভিহিত করিব? হে শুদ্ধাত্মা মহর্ষি পিতৃব্য—নির্বাক কেন?

—প্লীজ অনুপ, আমায় রেহাই দাও।

—রেহাই? তুমি আমায় দিয়েছিলে? একদিনের জন্যেও আমি শান্তি পাইনি। ধরা পড়ে ভালোমানুষ সাজা হচ্ছে। লম্পট, চরিত্রহীন কে এবার নিশ্চয় বুঝতে পেরেছ।

—অনুপ, আর নয়—

—দাঁড়াও হিসেবের এখনও কিছু বাকী আছে; তোমার হীরের আংটি আমি আলমারী ভেঙে চুরি করেছি। কিন্তু তুমি আমার কি ভেঙেছ জানো? অকস্মাৎ শান্ত হয়ে গেল অনুপ। তারপর একসময় চীৎকার করে বলে উঠল, এর শোধ আমি তুলব।

পরের দিন দেখা গেল মিঃ মজুমদারের দেহটা ঘরের মধ্যে পড়ে রয়েছে। পাশেই একটা রক্তাক্ত হকিস্টিক। চম্পাদেবীর অয়েল পেন্টিংটা চূর্ণ বিচূর্ণ; ফোলিও ব্যাগ থেকে টাকা উধাও, সেই সঙ্গে কার্তিকও নিখোঁজ।

প্রিয়লাল মজুমদারের হত্যার তদন্ত করতে এসেছেন মিঃ ঘোষ আর সুব্রত।

—মাথার পেছনের হাড় ভেঙেছে বলে মনে হচ্ছে, বললেন মিঃ ঘোষ।

—হ্যাঁ, আমারও তাই মনে হচ্ছে—বলল সুব্রত।

—বাড়ীতে কে কে থাকে?

—বুড়ো মাস্টারমশায়, ভাইপো আর চাকর, অবশ্য চাকরের এখন আর খোঁজ পাওয়া যাচ্ছে না।

—তাহ'লে মাস্টারমশায়কেই প্রথমেই ডাকা হোক্।

প্রিয়লালবাবুর মৃতদেহটা মর্গে পাঠানোর পরে মাস্টারমশাই এলেন।

—আপনার নাম?

—সলিল দত্ত, উত্তর দিলেন মাস্টারমশায়।

—এ হকিস্টিকটা কার?

—কি জানি, বলতে পারবো না।

—প্রিয়লালবাবুর সঙ্গে আপনার কত দিনের পরিচয়?

—আমি ছ'বছর এখানে আছি।

—আচ্ছা, ওর সঙ্গে কারো মনোমালিন্য ছিল বলে জানেন? জিজ্ঞেস করল সুব্রত।

—গতকাল বস্তীর গোপালের দল এসে শাসিয়েছিল আর মাঝে মাঝে অনুপের সঙ্গে তর্কাতর্কি হতে শুনেছি—এক টিপ নস্যি নিলেন মাস্টারমশায়।

—এ ব্যাগটায় কি ছিল?

—একটা পেমেন্টের জন্যে তেইশ হাজার টাকা।

—কার্তিককে কখন থেকে পাওয়া যাচ্ছে না?

—আজ ভোর থেকেই তাকে দেখছি না।

—এই মাফলারটা কার জানেন?

—জানি, ওটা প্রিয়লাল বাবুরই, অবশ্য গত রাত্রে অনুপের হাতে আমি ওটা দেখেছি।

—কখন?

—যখন ও ট্যাক্সি থেকে নেমে টলতে টলতে ড্রয়িংরুমের দিকে যাচ্ছিল, তখন—একটিপ্ নস্যি নিলেন মাস্টারমশায়।

—তাহলে মিঃ মজুমদার আর অনুপের মধ্যে কি কথা হয়েছিল তাও শুনেছেন নিশ্চয়।

—না, মানে অল্প কয়েকটা কথা কানে গিয়েছে—

—কি কথা বলুন—

—অনুপকে চরিত্রহীন লম্পট বলে তার কাকাকে গালাগাল দিতে শুনেছি আর অনুপও তার কাকার ওপর শোধ নেবে বলে শাসিয়েছিল।

মিঃ ঘোষ সুব্রতর দিকে তাকিয়ে সামান্য হাসলেন, তারপর প্রশ্ন করলেন,—ও ছবিটা কার জানেন?

—প্রিয়লালবাবুর স্ত্রীর।

—কিন্তু ছবিটা এভাবে নষ্ট করল কে জানেন?

—বলতে পারবো না—অন্যদিকে মুখ ফেরালেন মাস্টারমশায়।

মাস্টারমশায়কে বিদায় দেবার পর অনুপকে ডাকা হ'ল।

—কাল সন্ধ্যায় আপনি কোথায় ছিলেন? প্রশ্ন করল সুব্রত।

—ঠিক মনে পড়ছে না—মানে ড্রিঙ্ক করেছিলাম কিনা—প্রায় এক বোতল হুইস্কি—যেন লজ্জিত হ'ল অনুপ।

—বাড়ীতে কখন ফিরেছিলেন?

—তাও বলা শক্ত কারণ ঘড়িটা আগের দিন বেচে দিয়েছিলাম, আর সময় দেখার মতো অবস্থাও আমার ছিল না—একটু হাসল অনুপ।

—এ মাফ্‌লারটা কি আপনি ব্যবহার করেন? জিজ্ঞেস করল সুব্রত।

—না, ওটা আমার কাকার।

—তাহ'লে গত রাত্রে আপনার হাতে এটা ছিল কেন?

—আমার মনে নেই।

—এ হকিস্টিকটা কার?

—আমার, সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দিল অনুপ।

—এই হকিস্টিক দিয়েই মিঃ মজুমদারকে মারা হয়েছিল—কথাটা আস্তে আস্তে উচ্চারণ করল সুব্রত।

—তার মানে? আপনারা কি আমাকে সন্দেহ করছেন? উত্তেজনায় দাঁড়িয়ে উঠল অনুপ।

—করা যায় বইকি; সে যাক্, এ ছবিটা কার?

—আমার কাকীমার।

—কাকীমাকে দেখেছেন?

—হ্যাঁ, মনে পড়ে; আমার পাঁচ বছর বয়সের সময় উনি মারা যান—গলার স্বরটা ভারী হয়ে এসেছে অনুপের।

—এবার বলুন, কাকার মাফ্‌লারটা কোথায় পেয়েছিলেন?

—কাকার গাড়ীতে।

—মিথ্যে কথা বলবেন না, আমরা জানি সেদিন আপনি ট্যাক্সি করে ফিরেছিলেন।

—গ্রীন ম্যানসন, সাতের নম্বর ফ্ল্যাটে, স্বীকার করল অনুপ।

—ধন্যবাদ, এবার আপনি যেতে পারেন।

সুমনা ফ্ল্যাটেই ছিল। মিঃ ঘোষ, আর সুব্রতকে পুলিশের লোক বলে চিনতে দেরী হ'ল না তার। একটু ভয় পেল সে।

—আপনি প্রিয়লাল মজুমদার আর অনুপবাবুকে কতদিন চিনতেন? প্রশ্ন করলেন মিঃ ঘোষ।

—মিঃ মজুমদারের সঙ্গে চার বছর আর অনুপের সঙ্গে মাস ছয়েকের আলাপ—একটু ভেবে উত্তর দিল সুমনা।

—ওরা কি জানতো যে দুজনেই আপনার কাছে আসে।

—আগে জানতো না; গতকাল মিঃ মজুমদারের ফেলে যাওয়া মাফলারটা আমিই অনুপকে দেখিয়েছিলাম।

—কিন্তু এতদিন পরে কথাটা হঠাৎ ওকে জানাবার কি প্রয়োজন ছিল, প্রশ্ন করলেন মিঃ ঘোষ।

—একটা ঝুটো গয়না আসল বলে চালিয়েছিলেন মিঃ মজুমদার। উনি যে এভাবে আমার সঙ্গে বঞ্চনা করবেন এটা আমি আশা করিনি। তাই।

—তাহ'লে অনুপকে কথাটা জানিয়ে আপনি প্রতিকারের আশা করেছিলেন বলুন?

—প্রতিকার কিনা জানি না; তবে অনুপ মিঃ মজুমদারকে শিক্ষা দিক এটা চেয়েছিলাম বৈকি!

—কাকাকে ভাল শিক্ষাই দিয়েছে অনুপ—কথাটা বলে উঠে দাঁড়ালেন মিঃ ঘোষ।

কার্তিককে মেদিনীপুর থেকে অ্যারেস্ট করে আনা হ'ল। তার স্যুটকেসে হাজার টাকা পেয়েছে বলে স্থানীয় পুলিশ রিপোর্ট দিয়েছে।

—বাকী টাকা কোথায় রাখলে? চোখ নাচালেন মিঃ ঘোষ।

—আমি নিই নি হুজুর, মাথা নাড়ল কার্তিক।

—বেশ টাকা না হয় নাওনি, কিন্তু তোমার বাবুকে ওভাবে মারলে কেন?

আচমকা কথাটা শুনে কয়েক মুহূর্ত চুপ করে রইল কার্তিক। তারপর হাউ হাউ করে কেঁদে উঠে বলল—আমি বাবুকে মারিনি হুজুর।

—তাহ'লে দেশে পালিয়েছিলে কেন?

—ভয়ে। ভোরবেলায় উঠে আমি ড্রয়িং-রুমে ঢুকেই দেখি বাবু ওই অবস্থায় পড়ে আছেন। তখুনি আমি স্যুটকেস নিয়ে হাওড়া স্টেশনে চলে গিয়েছিলুম।

—বেশ করেছ, অতি উত্তম কাজ করেছ; এখন এখানে কিছুদিন ঝোলভাত খাও—বললেন মিঃ ঘোষ।

থানার বাইরে এসে সুব্রত বলল—মিঃ ঘোষ, চলুন আর একবার মিঃ মজুমদারের বাড়ীতে যাই।

বস্তীর মস্তানরা গুপীর চায়ের দোকানে বসে আছে।

—গুপী তিনটে চা ছাড়ু আর ক'টাকা বাকী আছে বল্।

—সাত টাকার মতো—উত্তর দিল গুপী।

—চপবাজী করছিস্ কেন? পুরো [illegible] নয়—গিনিয়ে না দিলে শালা তোমার ঘাঁট ভাঙবে না।

—কি গুরু কি হয়েছে? শাচু একটু [illegible]

এগিয়ে এসে বসল সে। হঠাৎ লচুয়ার সিটির আওয়াজ—

—কে এল? সচকিত হয় ওরা। একটু পরেই পুলিশ হাজির হ'ল।

—এই যে গোপাল, চা খাচ্ছ? বেশ বেশ—তা আজকাল কারবার কিরকম চলছে? মিস্টার ঘোষ একটা টিনের চেয়ারে বসলেন।

—আমাদের আর কারবার কি স্যার—মাথা চুলকায় গোপাল।

—বুড়োটাকে সাবড়ে কিছু ভাগ পাওনি বলতে চাও?

—স্যার, মাইরি বলছি আমরা ওকাজ করিনি। দলে দলে লড়াই হলে বোমা পাইপ-গান নিয়ে ছুটব কিন্তু লোক খুন—

—আহা, তুমি না কর তোমার দলের লোক করেছে—অনুপ তোমার দলের লোকই তো।

—হ্যাঁ, ও আমাদের সঙ্গে মেশে, স্বীকার করল গোপাল।

কয়েকদিন পর মিঃ ঘোষ আর সুব্রত আবার মিঃ মজুমদারের বাড়ী এলেন। মাস্টারমশায়কে তলব করা হল—

—মাস্টারমশায় আপনার নাম কি?

সলিল দত্ত—একটিপ নস্যি নিলেন তিনি।

—আপনি টাটাতে কখনো ছিলেন?

—না।

—এ ছবিটা কার জানেন?

—প্রিয়লালবাবুর স্ত্রী—চম্পা দেবীর।

—আপনার নামটা কবে থেকে পাল্টেছেন? তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল সুব্রত।—হিমাংশু রায়কে চেনেন?

—ও নাম আমি কখনও শুনি নি—এক-টিপ নস্যি নিলেন মাস্টারমশায়।

—এ ছবিটা আপনার ট্রাঙ্কে ছিল—এরা কারা?

—চিনি না—সরাসরি অস্বীকার করলেন মাস্টারমশায়।

—চেনেন, তবে এখন অস্বীকার করছেন, বলল সুব্রত—এর মধ্যে একজন হিমাংশু, মাঝে তার স্ত্রী সুপর্ণা এবং পাশে প্রিয়লাল।

—হতে পারে কিন্তু প্রিয়লালের মৃত্যুর সংগে তার সম্পর্ক কি? সোজা হয়ে বসলেন মাস্টারমশায়।

—তাহ'লে স্বীকার করছেন, আপনি টাটার হিমাংশু রায়।

—হ্যাঁ, করছি, কিন্তু তাতে কি হল?

—সুপর্ণা দেবী প্রিয়লালবাবুর সংগে পালিয়ে গিয়েছিলেন, একথা সত্যি?

—হ্যাঁ, অনেকেরই স্ত্রী পালিয়ে যায়—। সুপর্ণার যদি প্রিয়লালকে পছন্দ হয় তাহলে তাকে আমি ধরে রাখবো কি করে?

—না, তা রাখতে পারেন নি, কিন্তু এতদিন পরে আবার প্রিয়লালবাবুর কাছে ফিরে এলেন কেন?

—পেটের জ্বালায়—উত্তর দিলেন মাস্টারমশায়।

—পেটের জ্বালায় না মনের?

—না, বরাবরই আমার অর্থাভাব ছিল। তাই ভাবলাম প্রিয়লালের কাছে যাওয়াই ভাল।

—উনি আপনাকে চিনতে পেরেছিলেন? জিজ্ঞেস করল সুব্রত।

—প্রথমে পারে নি, পরে চিনেছিল।

—আপত্তি করেন নি?

—না, হয়তো আত্মতুষ্টির প্রশ্ন ছিল। আমাকে এবাড়ীর একজন কর্মচারী হিসেবে দেখতে ওর বোধহয় ভালোই লেগেছিল।

—গোড়া থেকেই সেটা আপনি বুঝে-ছিলেন নিশ্চয় আর সেজন্যে প্রতিশোধ নিতেও ছাড়েন নি।

—প্রতিশোধ? একটিপ নস্যি নিলেন মাস্টারমশায়। অবাক চোখে তাকালেন তিনি সুব্রতর দিকে।

—কি বুঝতে পারলেন না?

—না, আপনার কথা আমি ঠিক বুঝতে পারছি না।

—তাহলে ব্যাপারটা আপনাকে ভালভাবে বুঝিয়ে দিই—আপনি কিন্তু ভুল করলেন দুজনকে জড়াতে গিয়ে—। কার্তিকের বাক্সে টাকা রেখে তাকে বাড়ী যেতে দিয়েছিলেন আর অনুপের সঙ্গে তার কাকার যখন মারাত্মক ঝগড়া চলছিল তখন তারই হকিস্টিক ব্যবহার করে তাকে ফাঁদে ফেলার চেষ্টা করলেন।

—কিন্তু প্রমাণ কোথায়? চেঁচিয়ে উঠলেন মাস্টারমশায়।

—প্রতিহিংসার জ্বালায়—আপনি তখন অন্ধ হয়ে গিয়েছিলেন তাই সুপর্ণা ওরফে চম্পা দেবীর ছবিটা ওভাবে নষ্ট করলেন। তা না হলে এটা নিশ্চয় বুঝতেন যে কার্তিক বা অনুপের ও ছবিতে হাত দেবার প্রয়োজন ছিল না।

—কিন্তু, প্রমাণ কোথায়, আমি যে মেরেছি তার প্রমাণ কি? চেঁচিয়ে উঠলেন মাস্টারমশায়।

—প্রমাণ আছে বইকি। না, আঙুলের ছাপ নয়। সেটা আমরা অনেক চেষ্টা করেও কোথাও পাইনি, তবে একটা জিনিস পেয়েছি—ফোলিওব্যাগটা নস্যিমোছা রুমাল দিয়ে মুছেছিলেন, তার চিহ্ন পাওয়া গেছে। সুব্রত এগিয়ে এল মাস্টারমশায়ের দিকে। সঙ্গে সঙ্গে মাস্টারমশায়ের মুখটা পাংশু হয়ে গেল। অসাড় আঙুলের ফাঁক দিয়ে নস্যির ডিবেটা পড়ে গেল সশব্দে।

নাট্যচিন্তা
একাল-সেকাল
বিকাশভানু

পরিবর্তনকে মানতেই হয়।

সেই জন্যই একালের নাট্যগোষ্ঠীগুলির প্রাণান্তকর প্রচেষ্টা। নাটকের চিন্তা, ভাবনা আর উপস্থাপনা নিয়ে নাট্যকার, পরিচালক এবং সর্বোপরি দর্শককুলেরও ঘুম নেই। নতুন আংগিকে, নতুন রূপরেখায়, নতুন সমস্ত কিছুতে চমক সৃষ্টি করাই ইদানীং-কালের নাটকের বিষয়বস্তু হয়ে দাঁড়িয়েছে।

চমকের মধ্যে বাহাদুরির আছে সন্দেহ নেই, কিন্তু তা যখন 'সস্তা'তেই বাজীমাৎ করে তখন আর যাই হোক, আর্ট হোয়ে ওঠে না।

ইউরোপ আমেরিকায় মুক্ত আকাশের নীচে অভিনয়ের যখন ব্যবস্থা হচ্ছিল, তখন নাট্যকার এবং পরিচালকদের মূল চিন্তা ছিল নাটককে বাস্তবানুগ করে তোলা। সস্তা চমক সৃষ্টির কোন প্রচেষ্টাই তাতে ছিল না। সেই জন্যই ইউরোপ আমেরিকায় 'মুক্তাঙ্গনে' নাটকের প্রচলন করার চেষ্টা।

যদিও এই প্রথাটা একালের নয়।

সিসিলিতে প্রায় দু হাজার বছর আগেই এই প্রথা চালু ছিল। মুক্ত আকাশের নীচে অভিনয় করার কোন বাধা ছিল না—কোন কৃত্রিম দৃশ্যপট থাকতো না। সেখানে এমন একটি মুক্তাঙ্গনের খবর আছে, যেখানে পাহাড় কেটে দশ হাজার দর্শক শ্রোতার স্থান সংকুলান করা হোয়েছে। নৈসর্গিক দৃশ্যে স্থানটি এমনি মনোরম ছিল যে, যে সমস্ত নাটক সেখানে অভিনীত হোত তার সঙ্গে দর্শককুল একাত্ম হবে উঠতেন। এই প্রাচীন মুক্তাঙ্গনের অবস্থান এমন ছিল যে অসীম সাগরের অনন্ত প্রবাহ সামনে দিয়ে বয়ে যেতো। জানা গেছে এই মুক্তাঙ্গনে যাতে আবার নতুন করে নাটক সুরু করা যায় তার প্রচেষ্টা চলছে। এখানে সেকালের বিখ্যাত গ্রীক ট্রাজিক নাটকগুলো যাতে অভিনীত হোতে পারে তার ব্যবস্থা হয়েছে।

এ থেকেই বোঝা যায়, একালের এই দ্রুত পরিবর্তনশীল যুগে বসেও সেকালের দিকে ফিরে তাকানর অর্থ নেহাৎ অকারণ নয়।

একালের এই 'চীপ্ স্টান্ট'ই সেকালের কালোত্তীর্ণ সৃষ্টিগুলোকেই ফিরিয়ে আনার ব্যবস্থা।

•

আর্টের সবচেয়ে বড় শত্রু হচ্ছে ব্যস্ততা। এখনকার কালের নাটকগুলোর মহলা 'স্টেজে মেরে দেবো' গোছের। এর ফলে নাটকের যে রস তা ক্ষুন্ন হয়ে যাচ্ছে।

তৎকালীন রাশিয়ার সবচেয়ে বড় অভিনেতা -পরিচালক মিঃ স্ট্যানিসলসকি কোন নতুন নাটক করবার আগে কখনোই তাড়াহুড়ো করতেন না। তাঁর মতে, কোন নাটক নিখুঁতভাবে অভিনয় করতে হলে কমপক্ষে তিন-চারশো বার রিহার্সাল না দিলেই নয়। সেই জন্যই তাঁর এক একটি নাটক 'স্টেজ' করতে এক বছরেরও বেশী রিহার্সালের দরকার হোত।

এর ফলে মিঃ স্ট্যানিসলস্কির প্রতিটি নাটকই রুশ জনসাধারণ খুব আগ্রহের সঙ্গেই গ্রহণ করেছিলেন।

সেকালের রুশ জনসাধারণ শিক্ষা-দীক্ষায় সমস্ত ইউরোপের মধ্যেই পশ্চাৎপদ জাতি ছিল। কিন্তু সেই 'আনকালচারড্' জনসাধারণকে খুসী করবার জন্য মিঃ স্ট্যানিসলস্কি কোন দিনই নিম্নস্তরে নামেন নি। তাঁর আর্টের সৌন্দর্যই সেই রুশ জনসাধারণকে খুসীই করতে পেরেছিল।

একালের কলা সমালোচকেরা বলে থাকেন জনসাধারণের মনকে আগে শিক্ষিত করে তোলা উচিত। কথাটার মধ্যে তথা-কথিত নাট্য সমালোচকদের অহমিকার ভাব-টাই বেশী পরিমাণে প্রকাশ পায়—কারণ নাটকের সবটাই যেন তাঁরা জেনে শুনে বসে আছেন এবং তাঁদের জানাটাই যেন ঠিক।

যদি তাই-ই হয়, তবে সেকালের অজ্ঞ রুশ জনসাধারণ কিভাবে দিনের পর দিন গোগোল, তুর্গেনিভ, টলস্টয়, শেখভ, আন্দ্রীভ, গোর্কী প্রভৃতি প্রথম শ্রেণীর নাট্যকারদের নাটক দেখেছেন?

সেকালের রুশ জনসাধারণ অপেক্ষা ইংল্যাণ্ডের জনসাধারণ শিক্ষায়-দীক্ষায়, কালচারে অনেক উন্নত ছিল, কিন্তু সেখানে কোন দিনই কোন 'সিরিয়াস' নাটক জমে ওঠেনি। হাসি-ঠাট্টা-মস্করা ইত্যাদি জাতীয় সস্তা নাটক নিয়েই বিলাতী 'কালচার' গড়ে উঠেছিল।

সুতরাং বলা যেতে পারে, সার্থক নাটক সৃষ্টি করতে গেলে অকারণ চমক সৃষ্টি করলে চলবে না। তাকে বাস্তবানুগ করে তুলতে হবে। এবং বলা যেতে পারে নাটকের মূল শত্রু যে ব্যস্ততা—সেই ব্যস্ততাকে পরিহার করতে হবে। নাটুকে দলকে অনুশীলনের জন্য প্রস্তুত থাকতে হবে। অহেতুক নিজেকে বড় অভিনেতা কিম্বা বড় পরিচালক ভেবে এই সমস্তকে এড়িয়ে গেলে চলবে না। সস্তায় বাজীমাৎ করা যেতে পারে কিন্তু তা কোন দিনই মানুষের মনে রেখাপাত করে না।

•

নাটক সম্বন্ধে 'নাচঘর' লিখেছেন, 'আমেরিকার রঙ্গালয়ের বিখ্যাত অনুষ্ঠাতা ম্যাকসরেনার্ড একখানি নাটকের অভিনয় আয়োজন করেছিলেন, তার নাম হচ্ছে 'দি মিরাকল'। এই নাটকের অভিনয়ের সময়ে রঙ্গমঞ্চে আদৌ যবনিকা ব্যবহৃত হয়নি। প্রতি অঙ্কের শেষে রঙ্গমঞ্চ অন্ধকারে পরিপূর্ণ হয়ে উঠত, তারপর ধীরে ধীরে আবার আলো এলে দেখা যেত, রঙ্গমঞ্চ জনশূন্য এবং নট-নটীরা স্বপ্নের মত কোথায় মিশিয়ে গেছে।

'ম্যাকসরেনার্ডের এই আয়োজনের আর এক বিশেষত্ব, দর্শকদের কাছে অনুরোধ জানানো হয়েছিল যে, অভিনয়ের সময়ে তাঁরা যেন হাততালি না দেন! বলাবাহুল্য, দর্শকরা সকলেই অনুরোধ রক্ষা করে-ছিলেন।

'পৃথিবীর মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ রঙ্গালয় 'মস্কো আর্ট থিয়েটারে'ও হাততালি নীরব হয়ে থাকে। প্রশংসা করবার জন্যে হাততালি দেবার প্রথাটা আমাদের রঙ্গালয়ে এসেছে সমুদ্রের ওপার থেকে। কিন্তু পাশ্চাত্য দেশেই এখন এই উপদ্রবকে 'বয়কট' করবার চেষ্টা করা হচ্ছে।

'আমাদেরও ইচ্ছা বাংলা রঙ্গালয় থেকেও ঐ উৎপাতটি লুপ্ত হয়ে যাক। কারণ, প্রথমতঃ হাততালি দেওয়ার প্রথাটা হচ্ছে বিদেশী; আমাদের দেশে হাততালি ব্যবহৃত হয় অন্য অর্থে, আমরা লোকের পিছনে হাততালি দি—ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ করবার জন্যে।

'দ্বিতীয়তঃ, হাততালির আওয়াজে সূক্ষ্ম, কোমল ও সরস অভিনয়ের মাধুর্য নষ্ট হয়ে যায়। পরন্তু হাততালির চোটে

নবীন নট-নটীরা অনেক সময়ে আপনাদের সাধনাকে কলঙ্কিত করেন। একবার যে হাততালি-প্রিয় হয়ে পড়ে, তার অভিনয়ে কলা-সৌন্দর্যের পূর্ণ বিকাশ আর সম্ভব নয়। হাততালির মোহ যে কোন অভিনেতার পক্ষেই সাংঘাতিক।

লক্ষ্য করলে দেখা যাবে, বিশেষভাবে হাততালির জন্ম 'গ্যালারির' মধ্যে রঙ্গালয়ের যে প্রান্ত অরসিক-সাধারণের প্রধান আড্ডা বলে চির প্রসিদ্ধ। সুতরাং যথার্থ রসিকের উচিত, ও আপদের সঙ্গে কোন সম্পর্কই না রাখা। হতে পারে, রঙ্গালয়ের শ্রীবৃদ্ধি হয় প্রধানতঃ 'গ্যালারি' ও 'পিটে'র দৌলতেই। কিন্তু ওখানকার হাততালির শব্দে কলালক্ষ্মী একেবারে মূর্ছিত হয়ে না পড়লেও তাঁর রূপের স্বপ্ন ছুটে যায় নিশ্চয়ই। অতএব 'গ্যালারী' ও 'পিট'কে শাসন করা দরকার।

'হাততালি সামান্য মানুষকেই প্রশংসা করে— যে গুণ বা বস্তুর জন্যে মানুষের আদর, তার প্রতি সে কিছুমাত্র মর্যাদা প্রকাশ করে না। আমরা যখন শ্রেষ্ঠ স্থাপত্য ভাস্কর্য, চিত্র বা সাহিত্যের স্পর্শে আসি, তখন তো হাততালির কথা আমাদের মনেও থাকে না। আমরা যখন অনন্ত সাগরের সন্তরণশীল তরঙ্গমালা দেখি, তখন শ্রদ্ধা ও আনন্দে গম্ভীর হয়ে থাকি : কিন্তু সেই সাগরের বুকেই যখন কোন মানুষকে সাঁতার দিয়ে সামান্য কিছুদূর যেতে দেখি তখনি হাততালি দিয়ে পশুর মতন চীৎকার করে উঠি! এ থেকেই প্রমাণিত হবে, হাততালি চায় কেবল তুচ্ছতাকে। কাজে কাজেই হাততালি ভক্তদের আমরা রসলেশহীন নিম্ন-শ্রেণীর লোক ছাড়া আর কিছু ভাবতে পারব না।'

•

ভারতবর্ষ তথা বাংলাদেশে বরাবরই নাটকের চর্চা হয়ে এসেছে। এ সম্বন্ধে 'সংবাদ প্রভাকর' (১৮৬০) লিখেছেন, 'নাটকাভিনয় প্রদর্শনের সুনির্মল প্রথা পুরাকালে এই রাজ্য মধ্যে প্রকৃষ্টরূপে প্রচলিত ছিল ইহা ঐতিহাসিক বিবরণ দ্বারা এবং বহুবিধ কবিবর গুণাকরের বিরচিত নাটক দ্বারাই বিশিষ্টরূপে প্রকাশ আছে। অতএব এতদ্দেশীয় বিদ্যামোদী ব্যক্তিগণ সম্প্রতি নাটকাভিনয় প্রদর্শন বিষয়ে যে উৎসাহ প্রকাশ করিতেছেন, ইহাকে কোন মতে নূতন বলা যাইতে পারে না, এবং তাহাতে তাঁহারা ইংরাজদিগের দৃষ্টান্তের অনুগামী হইয়াছেন, আমরা একথাও বলিতে পারি না।'

'প্রভাকরে'র মতে ঐতিহাসিক সত্যতায় প্রমাণিত, এদেশে নাট্যচর্চার প্রচলন 'পুরাকাল' থেকেই। এবং বলা যেতে পারে ভারতবর্ষই নাট্যচর্চার পীঠস্থান।

নাট্য আন্দোলনে বাংলাদেশ কোনদিনই পিছিয়ে ছিল না—যদিও একালের মত হয়তো তেমন সোচ্চার ছিল না, কিন্তু আন্তরিকতারও অভাব ঘটেনি কোন দিন। একালের পত্রপত্রিকা আর পথ জোড়া মিছিলে মিছিলে নবনাট্য আন্দোলন এগিয়ে চলেছে, 'জাতীয় নাট্যশালা'র জন্য বক্তৃতামঞ্চ মুখর হয়েছে—হচ্ছে; তবুও শতাধিক বছর আগের সমস্যা যেন আজও ঠিক তেমনি ভাবেই রয়ে গেছে এবং বলা যেতে পারে, যেন আরো তা প্রকট হয়েছে।

'রবীন্দ্র সদন'কে যদি 'জাতীয় নাট্যশালা' বা রঙ্গমঞ্চ বলা যায় তবে এই রকম নাট্যশালার প্রয়োজন আরো—আরো অনেক। কারণ নবনাট্য আন্দোলনের যাঁরা হোতা তাঁদের সাধ থাকলেও সাধ্যে কুলোয় না ওখানে অভিনয়ের উৎকর্ষতা প্রদর্শন করার।

কলকাতার পাবলিক থিয়েটারের সমস্যা নিয়ে 'প্রভাকর' লিখেছেন, 'কলিকাতা পাবলিক থিয়েটার অর্থাৎ মহানগর কলিকাতার প্রকাশ্য নাট্যশালা স্থাপনাভিপ্রায়ে শ্রীযুক্ত বাবু রাধামাধব হালদার তথা শ্রীযুক্ত বাবু যোগীন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ইংরাজী ভাষায় একখানি অনুষ্ঠানপত্র মুদ্রাঙ্কন করিয়া আমারদিগের নিকটে প্রেরণ করিয়াছেন। আমরা তাহা পাঠ করিয়া সন্তোষ রসে অভিসিক্ত হইলাম। সাধারণের আমোদার্থ এই রাজধানী মধ্যে একটি প্রকাশ্য নাট্যালয় হয় এবং তাহার রঙ্গভূমিতে এতদ্দেশীয় কৃতবিদ্য ব্যক্তিগণ বিবিধ নাটক গ্রন্থের অভিনয় দেখাইয়া সকলকে সন্তুষ্ট করেন, ইহা অনেকেরই প্রার্থনা।......

'এই কলিকাতা রাজধানী এবং ইহার নিকটস্থ স্থান নিবাসী কতিপয় অতি-সম্ভ্রান্ত ধনাঢ্য পরিবারের বিশেষানুকূল্যে কয়েকবার কয়েকস্থানে নাটকাভিনয় হইয়াছিল, তাহার বিস্তারিত বিবরণ আমরা প্রভাকরে প্রকাশ করিয়াছি। পাঠক মহাশয়েরা পাঠ করিয়া থাকিবেন। ফলতঃ ঐ সকল মহাত্মারা কেবল আপনাদিগের ও আত্মীয়গণের আমোদার্থ তাহা করিয়াছিলেন, সাধারণের নিমিত্ত তাহা হয় নাই। এই রাজধানী মধ্যে সাধারণের আমোদ নিমিত্ত এক নাট্যশালা হয় এবং সাধারণের সাহায্যে তাহার সমস্ত ব্যয় ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় কার্যাদি নির্বাহ হইতে পারে এই অভিপ্রায়েই শ্রীযুক্ত বাবু রাধামাধব হালদার তথা শ্রীযুক্ত বাবু যোগীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় পূর্বোক্ত অনুষ্ঠানপত্র প্রকাশ করিয়াছেন। যে নিয়মে ঐ নাট্যশালা হইবেক তাহার সংক্ষেপমাত্র উক্ত অনুষ্ঠানপত্র হইতে অনুবাদ পূর্বক নিম্নভাগে প্রকটন করিলাম।

'প্রস্তাবিত নাট্যশালা এই রাজধানীর এমত প্রকাশ্য স্থানে স্থাপিত হইবেক যথায় ইংরাজ ও দেশীয় মহাশয়েরা অনায়াসে গমনাগমন করিতে পারেন।

উৎকৃষ্ট ২ লেখকদিগের বিরচিত উত্তমোত্তম নাটকাভিনয় সকল ঐ নাট্যশালার রঙ্গভূমিতে প্রদর্শিত হইবেক।'

•

১৯৬৯ সালের ১৮ই এপ্রিল 'যুগান্তর' লিখেছেন, 'সৎ মনোভাবাপন্ন ও গভীর উপলব্ধির শিল্পীদের স্বার্থে একটি সংস্কৃতি কেন্দ্র গড়ে তোলার জন্য বাংলা নাট্যমঞ্চ প্রতিষ্ঠা সমিতি গঠিত হয়েছে। এদের উদ্দেশ্য এমন একটি নাট্যমঞ্চ স্থাপন করা, যার লক্ষ্য ব্যবসায়িক নয়। নাট্য শিল্পীর সাধনার ক্ষেত্র ছাড়াও এখানে ক্রমশঃ চিত্রকলা, সংগীতকলা ইত্যাদি নানান শিল্পকলা বিকাশ ও প্রদর্শনের ক্ষেত্র প্রস্তুত করা হবে।'...

গোলাপনামা

সলিলকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

'বলি, ও আমার গোলাপ-বালা,
বলি, ও আমার গোলাপ-বালা
তোলো মুখখানি, তোলো মুখখানি—
কুসুমকুঞ্জ করো আলা।'—

কবিগুরুর কাঁচা বয়সের কোর্টসিপের কাকলি। গোলাপফুলের সঙ্গে লাজনত মুকুলিত কুমারীর তুলনা, ইংরাজি কাব্যের চিরাচরিত প্রথা। শেকসপীয়ারের শূন্য সিংহাসনের অধিকারী বোমণ্ট ও ফ্লেচার খোলাখুলি বলেছেন—'সি থিঙ্কস দি রোজ ইজ দি বেস্ট অফ অল ফ্লাওয়ারস। ইট ইজ দি ভেরি এম্বলেম অফ এ মেড। ফর হোয়েন দি ওয়েস্ট উইন্ড কোর্টস হার জেন্টলি। হাউ মডেস্টলি সি ব্লোস, অ্যান্ড পেন্টস দি সান। উইথ হার চেস্ট ব্লাসেস'। অভাবের তাড়নায় এহেন লাজুক গোলাপ-বালাদের আপন দেশ ছেড়ে 'দ্বিধায় জড়িত পদে, কম্প্র-বক্ষে, নম্র নেত্র পাতে, স্মিত হাস্যে' বিদেশে বাসকশয্যায় আত্ম-সমর্পণের জন্য পাড়ি দিতে হচ্ছে—মায়ের জন্য কিছু রোজগারের ধান্দায়। রূপক ছেড়ে ব্যাপারখানা খোলসা করে বলি।

নানা অভাবের মধ্যে ভারতমাতার দিন কাটছে। তার মধ্যে বিদেশী মুদ্রার অনটন নাকি বড়ই সঙ্গীন। সেই অভাব কিছুটা ঘোচাবার উদ্দেশ্যে ভারত সরকার ক'বছর ধরে এ-দেশের গোলাপফুল বিদেশে চালান দিয়ে কিছু বিদেশী মুদ্রা ঘরে তুলেছেন। কোমলাঙ্গী কুসুমের এতে আপত্তি করার আর কি আছে? 'বৃন্তহীন পুষ্পসম আপনাতে আপনি বিকাশ' সে তো ফোর্টোন। ভারতমাতার কোলে তার জন্ম। এখানকার মাটির নিচে তার নাড়ী পোঁতা রয়েছে। সেই মাটির রসে সে প্রতিপালিত। মাতৃঋণ শোধ করতে হবে তো! তাছাড়া পরের ঘরে যাবার জন্যই তো মেয়েদের জন্ম। নারী-হৃদয়ের চিরন্তন এই গোপন ব্যথা প্রকাশ পেয়েছে কবিগুরুর 'বধূর অনুযোগে—ফুলের মালা গাঁথি, বিকালে আসিয়াছি। পরখ করে সবে করে না স্নেহ।' সৌভাগ্যের বিষয় ভারতের গোলাপ পরখের পরিখা পার হয়ে স্বদেশে ও বিদেশে স্নেহ ও সুখ্যাতি লাভ করেছে।

পঞ্জাব সরকারের চণ্ডীগড়ে একুশ একর জমি জুড়ে জাকির হোসেন গার্ডেন নামে একটি গোলাপবাগান আছে। সারা এশিয়ার মধ্যে এটি সবচেয়ে বড় গোলাপ-বাগ। এই বাগান থেকে প্রত্যহ কম-সে-কম পাঁচ হাজার টাটকা গোলাপফুল উড়ো-জাহাজের সওয়ারি হয়ে বিক্রির জন্য ইউরোপে চালান যায়। বিদেশে মাল রপ্তানি নিয়ন্ত্রণের জন্য ভারত সরকার স্টেট ট্রেডিং কর্পোরেশান নামে নিজেদেরই এক সংস্থা খাড়া করে রেখেছেন। সেই শিখণ্ডীর সঙ্গে যুদ্ধ বেধেছে বাগানের মালিক পঞ্জাব সরকারের—গোলাপের দর-দস্তুর নিয়ে।

কর্পোরেশান এক ডজন ফুলের দাম ছ'টাকার বেশী দিতে চাইছে না। চণ্ডী-গড়ের হুজুরেরা দর হেঁকেছেন—নয় রুপিয়া। উত্তরে কর্পোরেশান জানিয়েছে দাম অত চড়া হলে তাদের লোকসান হবে, তবে দাম একটু বাড়াতে তারা রাজি আছে ফুলগুলি যদি দিল্লীতে পৌঁছে দেওয়া হয়। ফুল প্যাক করা ও দিল্লীতে পৌঁছে দেবার খরচের ভার বইতে পঞ্জাব সরকার রাজি হচ্ছে না। কর্পোরেশান গুনতি হিসাবে হাঙ্গামায় না গিয়ে থোক সব গোলাপ বিক্রি করে যা লাভ হবে তা থেকে নিজেদের মজুরি বাবদ কিছু না কেটে রেখে সবটাই পঞ্জাব সরকারের হাতে তুলে দিতে রাজি, কিন্তু পঞ্জাব সরকার সে-কথায় কান দিচ্ছে না। আর একটি বিষয়ে দু' পক্ষের মধ্যে মতের মিল হচ্ছে না। কর্পোরেশান চাইছে দর যা ঠিক হবে, সেটা তিন বছর চালু থাকবে। পঞ্জাব সরকারের দাবী—দর এক বছর অন্তর বদলাবে। রাজায় রাজায় যুদ্ধে উলুখড়ের প্রাণ যায়। এক্ষেত্রেও তাই হয়েছে। গোলাপের চালান বন্ধ হয়ে গেছে। এই দরকষাকষি নিয়ে দু' পক্ষের মধ্যে বেজায় মন-কষাকষি চলছে। দু' পক্ষেরই মেজাজ এখন বেজায় গরম। ঠাণ্ডা হতে সময় লাগবে। এই ফাঁকে গোলাপের গোটানো লম্বা জীর্ণ জন্ম-পত্রিকাখানা একবার মেলে ধরা যাক।

যে বংশে গোলাপের জন্ম তা যে কতদিনের পুরাতন তা কুলাচির কুলপঞ্জিকায় বোধহয় বলতে পারে না। কবি ওয়াল্টার দি লা মেয়ার বলেছেন—'নো ওয়ান নোজ/থ্রু হোয়াট ওয়াইল্ড সেঞ্চুরিস/রোভস ব্যাক দি রোজ।' চতুর্দশ শতাব্দীতে মহাকবি চসারের সমকালীন স্যার জন ম্যাণ্ডেভিল ছিলেন ভবঘুরে। ১৩৫৬ খৃষ্টাব্দে ভয়েজ অ্যাণ্ড ট্রাভেল নামে একখানি বই-এ তাঁর ভ্রমণবৃত্তান্ত তিনি লিখে গেছেন। গোলাপের জন্ম-রহস্যের সন্ধান সেখানে পাওয়া গেছে। জিল্লা নামে বেথলেহেমের এক ইহুদি কুমারী এক দুর্বৃত্তের প্রেম প্রত্যাখ্যান করায় দুর্বৃত্তটি প্রতিহিংসা নেবার উদ্দেশ্যে মেয়েটির নামে মিথ্যা অপবাদ দিয়েছিল যে—সে ভুতগ্রস্থা। ফলে আগুনে পুড়িয়ে মারার শাস্তি হয় মেয়েটির। তাকে ঘিরে চিতার কাঠ যখন জ্বলে উঠেছে, সেই সময়ে ভগবান আবির্ভূত হয়ে তার প্রাণরক্ষা করেন। তাঁর প্রভাবে চিতার কাঠগুলি গোলাপগাছে পরিণত হোল। জ্বলন্ত কাঠগুলিতে ফুটে উঠলো রক্তগোলাপ—বাকি কাঠগুলিতে সাদা গোলাপ। পুরাতন নিয়মের বাইবেলের আদি পর্ব, বুক অফ জেনিসিসে ভগবান কর্তৃক পৃথিবী, গাছপালা ও নন্দনকাননের সৃষ্টির কথা আছে। সেখানে কোন উদ্ভিদের নাম উল্লেখ করা না থাকলেও, পরবর্তী দুটি পুস্তকে একবার করে উপমাছলে গোলাপের উল্লেখ আছে। খৃষ্টজন্মের পূর্বে গ্রীসের আদি কবি হোমার ও ল্যাটিন কবি ভার্জিল, হোরেস, বিয়ন তাঁদের কাব্যে গোলাপের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করে গেছেন। এইসব দেখে মনে হয় অতিপ্রাচীন কাল থেকে গোলাপ পৃথিবীতে বিরাজ করছে।

উচ্চ কুলে যে গোলাপের জন্ম সে-বিষয়ে সন্দেহ নাই। ফুলের সমাজে রূপেগুণে তার সমকক্ষ কেউ নাই। ম্যাগনোলিয়া গ্র্যাণ্ডিফ্লোরার নামের বহর আছে কিন্তু রূপের বাহার নাই। কাঞ্চনবরণ চাঁপার রং এর চটক আছে। কিন্তু তার গন্ধ বড় উগ্র। স্যার উইলিয়ম জোনস্ বিশেষ জোর উদ্ধৃতি দিয়েছেন যে, ও-ফুলে মৌমাছি বসে না। সাহিত্যসম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র এর গন্ধ বরদাস্ত করতে পারেননি। 'ফুলের বিবাহ' বরযাত্রীরূপে আগত চাঁপার চড়া গন্ধের চোটে তার কাছে ঘেঁষতে না পেরে তিনি তাকে গাল পেড়েছেন—'ব্যাটা ব্রাণ্ডি টানিয়া আসিয়াছিল।' বেল, বকুল, জুঁই, শিউলি, চামেলি, রজনীগন্ধা, গন্ধরাজ প্রভৃতি ফুলের সৌরভ আছে, রূপ নাই। হিন্দু বালবিধবার মত তাদের তনু অপুষ্ট বসন শুভ্র। আর গোলাপ! রূপ-রস-গন্ধ-স্পর্শ চারিটিতে সমান- ষোলো কলায় পরিপূর্ণ। সর্বত্র সকলে তাকে শ্রেষ্ঠ আসনে বসায়। হুড ঠিকই বলেছেন—'দি কাউজলিপ ইজ এ কাণ্ট্রি ওয়েনচ/দি ভায়লেট ইজ এ নান/বাট আই স্যাল উ দি জেনাইট রোজ/দি কুইন অফ এভরিওয়ান।' তাঁর বহু পূর্বে খৃষ্টজন্মের দুশো বছর আগে গ্রীসের মহিলা কবি স্যাফো গোলাপকে 'কুইন অফ ফ্লাওয়ার্স' বলে অভিনন্দিত করেছিলেন। স্বয়ং বঙ্কিমচন্দ্র ফুলের বিবাহের ঘটকালিতে গোলাপের বংশপরিচয় দিয়েছিলেন বর্ণশ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ নৈকষ্য কুলীন সমাজের মুকুটমণি ফুলের মুখুটি বলে—আর গঙ্গোপাধ্যায় কৌলিক উপাধিতে তাকে ভূষিত করেছিলেন। এক্ষেত্রে সকলে নিঃসন্দেহে অব্রাহ্মণ নহ তুমি মাতঃ/তুমি দ্বিজোত্তম, তুমি সত্য কুলজাত' বলে বাহু মেলে গোলাপকে বরণ করে ঘরে তুলতে পারেন।

গোলাপের আদি জন্মভূমি যে কোথায় তা নিয়ে নানা মত আছে। কিম্বদন্তি আছে যে, মহাকবি হোমারের মৃত্যুর পর তাঁর জন্মভূমি বলে দাবি জানিয়েছিল সাতটি শহর। অনেকগুলি দেশ গোলাপের জন্মভূমি হওয়ার সম্মান দাবি করে। স্যার জন ম্যানডেভিলের বৃত্তান্ত যদি বিশ্বাস করা যায়, তাহলে যীশু খৃষ্টের জন্মভূমি বেথলেহেমে গোলাপগাছ প্রথম দেখা গিয়েছিল—'ফাস্ট সিন অন আরথ্ সিন্স্ প্যারাডাইস ওয়াজ লস্ট'। চীনের খোলা দুয়ার দিয়ে এক সময়ে সভ্যতা সারা জগতে ছড়িয়ে পড়েছিল। চীনেরা বলে গোলাপ তাদের দেশে প্রথম জন্মেছিল। এক জাতের গোলাপ এখনও চায়না রোজ নামে পরিচিত। ড্যামাস্ক্ রোজ নামে এক জাতের গোলাপ আছে বলে আরবের লোকেরা দাবি করে যে গোলাপ তাদের দেশের ফুল। ইরাকের বসরাই গোলাপের খুব নাম। ইরাকিরা বলে পৃথিবীর সব গোলাপগাছই বসরাই গোলাপের বংশধর। ইরান বলে গোলাপ তাদের দেশের ফুল—দেশময় ছড়ানো রয়েছে গোলাপ—খালি গোলাপ—তাদের কাব্য পর্যন্ত গোলাপের খুসবুতে ভুরভুর করে। রোড্স মানে গোলাপ। সেই জোরে রোড্স আইল্যাণ্ডের লোকেরা দাবি করে গোলাপের জন্ম তাদের দেশে। মুদ্রার ওপর গোলাপের ছাপ বসিয়ে দিয়ে তারা দাবি পাকা করে নিয়েছে। 'ভারত শুধুই ঘুমায়ে রয়'। ভারতে অনেক প্রদেশে বিস্তীর্ণ গোলাপবাগান আছে। আর এখানকার গোলাপের পৃথিবীময় খুব সুনামও আছে। কিন্তু শাস্ত্রগ্রন্থে ও প্রাচীন সাহিত্যে কোথাও গোলাপের নামগন্ধ নাই। প্রাচীন গুহাচিত্রে ও ভাস্কর্যে কোথাও গোলাপ রূপায়িত হয়নি। গোলাপফুল বোঝাবার মত কোন শব্দ সংস্কৃত বা প্রাদেশিক ভাষার অভিধানে খুঁজে পাওয়া যায় না। দাবি পেশ করার মত উপযুক্ত হাতিয়ারের অভাবে ভারতকে হাত গুটিয়ে বসে থাকতে হয়েছে।

গোলাপ এখন পৃথিবীর সব দেশে দেখা যায়। পুরুষানুক্রমে ফুলবিলাসীদের অক্লান্ত পরিশ্রম যত্ন ও গবেষণার ফলে এখন কয়েক হাজার জাতের গোলাপের সৃষ্টি হয়েছে। আদ্যি কালের অতি সাধারণ পাঁচটি পাপড়িযুক্ত ফুলের আয়তন ও পাপড়ির সংখ্যা বাড়াতে বাড়াতে তাঁরা বড় বড় শতদল গোলাপ রোজা সেন্টিফ্লোরা ফলাতে সক্ষম হয়েছেন। ফুলের রংও তাঁরা বদলাতে পেরেছেন। এখন হরেক রং-এর এমনকি দোরঙা গোলাপও পাওয়া যাচ্ছে। সম্প্রতি নীলাভ গোলাপের সৃষ্টি হয়েছে। তবে সাত নকলে আসল খাস্ত। সেগুলি 'নির্গন্ধাঃ ইব কিংশুকাঃ।'

আমাদের দেশের ফুল নয় বলে আমাদের পুরাণে গোলাপের নামগন্ধ না থাকলেও গ্রীক পুরাণে গোলাপের উল্লেখ আছে। সেখানে এটি রতিদেবী ভেনাসের প্রিয় ফুল। ফুলটি তিনি পুত্র কামদেব কিউপিডকে দান করেছিলেন। মার গুপ্ত-প্রেমের কথা যাতে ব্যাপ্ত না হয় এই উদ্দেশ্যে কিউপিড আবার ফুলটি ঘুষস্বরূপ গোপনের দেবতা হারপোক্রেটসকে উৎসর্গ করেছিলেন। গ্রীক পুরাণ মতে এই দেবতাটির ঠোঁটের ওপর তাঁর তর্জনীটি সোজা করে ঠেকানো—যেন ইঙ্গিত জানাচ্ছেন মুখে চাবি—স্পিকটি নট। সেই থেকে গোলাপ গোপনতার প্রতীক হয়ে দাঁড়িয়েছে। সাব-রোজা বলে একটা কথারই সৃষ্টি হয়েছে—যার মানে হচ্ছে গোপনতার অন্তরালে। বিলাতে সামাজিক ভোজে খানাপিনা চলার সময় অতিথিদের মন খুলে যায়। সে সময়ে তাঁদের মুখ ফসকে অনেক কেচ্ছা গুপ্তকথা বেরিয়ে পড়ে। সেসব কথা যাতে বাইরে চাউর না হয়, সে সম্বন্ধে তাঁদের সাবধানতা অবলম্বনের ইঙ্গিতস্বরূপ গৃহকর্ত্রী টেবিলের ওপর একগাছা গোলাপফুল ঝুলিয়ে রাখেন। আর যেসব ভোজকক্ষে হামেশা বড় বড় ভোজ হয়, সেখানে মাথার ওপরে ছাদের ভেতরের দিকে গোলাপফুলের নক্সা খোদাই করা থাকে। ওদেশে খাওয়ার আগে হাত ধোয়ার ও খাওয়ার পর আঁচানোর পাট নাই। কিন্তু খুব উঁচু দরের ভোজে খাওয়ার পর ডান হাতের দু-তিনটা আঙুলের ডগাটুকু জলে একটু চুবিয়ে নেবার উদ্দেশ্যে টেবিলের ওপর জলভরা একটি ছোট পাত্র ফিঙ্গার বোল থাকে। সেই জলের ওপর মাঝে মাঝে গোটাকতক গোলাপের পাপড়ি ছড়িয়ে দেওয়া হয়। উদ্দেশ্য জলটুকু একটু সুগন্ধি করা আর ঠারেঠোরে অতিথিদের সাব-রোজার ইঙ্গিতটুকু শেষবারের মত মনে করিয়ে দেওয়া। ডিকেন্সের এ টেল অব টু সিটিস-এ পানশালার অধিকারিণী ম্যাডাম ডিফার্জ অপরিচিত কাউকে পানশালায় ঢুকতে দেখলে সবাইকে সাবধান করে দেবার উদ্দেশ্যে গোপনতার ইঙ্গিতস্বরূপ নিজের মাথার টুপিতে একটি গোলাপফুল এঁটে দিতেন।

গোলাপ ইউরোপে সামাজিক জীবনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে মিশে গেছে। সেখানকার মেয়েদের অতিজনপ্রিয় চলতি সাধারণ নাম—রোজ। এদেশে মেয়েপুরুষ, উভয় ক্ষেত্রে গোলাপ নামের ব্যবহার থাকলেও নামটি জনপ্রিয় নয় বলে প্রচলন বড় কম। ওদেশের লোক ফুল বড় ভালবাসে। দৈনন্দিন জীবনে ফুলের অল্পবিস্তর ব্যবহার প্রায় সব পরিবারে আছে। বোকে-বাঁধা ফুল কোটের

বটনহোলে গোঁজা সেখানে সৌখিন রুচির পরিচায়ক। ঘরে টেবিলের শোভা বাড়ায় ফুল। ফুল উপহার দেওয়া সেদেশে প্রীতির পরিচায়ক। আমাদের শাস্ত্রে যে পাঁচটি ফুল দিয়ে মদনের ফুলধনু গাঁথা, তার মধ্যে গোলাপের স্থান নেই। ওদেশে প্রেমলীলায় গোলাপ দূতিয়ালি করে। ভিন্ন ভিন্ন জাতের ও অবস্থার গোলাপ বিভিন্ন বাণী বহন করে। ফুলের ভাব ও ভাষা বোঝবার জন্য ইংরাজিতে দুখানি বই দেখেছি—সেণ্টিমেণ্টস্ অফ ফ্লাওয়ারস ও ল্যাংগুয়েজ অফ ফ্লাওয়ার্স। উৎসবে, আনন্দে, সামাজিক ক্রিয়াকর্মে ফুলের ছড়াছড়ি দেখা যায়। সে উপলক্ষ্যে ফুলের ডালি উপহার দেওয়া সামাজিক শিষ্টাচার। এমনকি রোগশয্যায় ও মৃত্যুর পর শবাধারে ও সমাধিতে ফুলের ডাক পড়ে। পরিচিত যাঁরা সে-সময়ে আসতে পারেন না তাঁরা ফুলের অর্ঘ্য ফ্লোরাল ট্রিবিউট পাঠিয়ে মৃতের প্রতি শ্রদ্ধা জানান। সব ক্ষেত্রেই অন্য ফুলের সঙ্গে গোলাপের বড় রকমের অংশ থাকে। উৎসবে, ব্যসনে ও শ্মশানে বান্ধবরূপে হাজির থেকে গোলাপ কালোপযোগী পরিবেশের শোভা ও গাম্ভীর্য বৃদ্ধি করে। যুগপরিবর্তনে আমাদের দেশেও সব ক্ষেত্রে গোলাপ ক্রমে ক্রমে অন্য ফুলকে স্থানচ্যুত করছে।

ইতিহাসের পৃষ্ঠায় গোলাপ অবিনশ্বর ছাপ রেখে গেছে। প্রাচীন রোমে রাজপ্রাসাদ, উৎসবক্ষেত্র, প্রেক্ষাগৃহ, ক্রীড়াভূমি প্রভৃতি গোলাপফুল দিয়ে সাজানো হোত। সম্রাট নিরোর বড় বড় গোলাপবাগান ছিল। ভাল গোলাপ ফোটাবার জন্য অকাতরে তিনি অর্থ ব্যয় করতেন। শীতপ্রধান ইউরোপে গ্রীষ্মকাল হচ্ছে ফুলের ঋতু। 'এপ্রেল সাওয়ার্স ব্রিং ফোর্থ মে ফ্লাওয়ার্স'। রোমসম্রাট ডোমিটান অনেক খরচ করে শীতকালে গোলাপ ফোটাতেন। যুদ্ধজয়ের পর বিজয়ী বীর যখন দেশে ফিরে আসতেন তখন তাঁকে অভ্যর্থনা করার জন্য সমবেত লোকেরা গোলাপে রাজপথ ঢেকে দিত। 'ইট ওয়াজ রোজেস, রোজেস অল দি ওয়ে' কবি ব্রাউনিং-এর বর্ণনা। সে-সময়ে বিলাসিতা ও আরামের অংগ ছিল গোলাপ। বেড অফ রোজেস এখন রূপক হিসাবে ব্যবহার হয়। কিন্তু রোমের বিলাসীরা সত্য সত্যই গোলাপফুল বিছান বিছানায় শুতেন। নিরোর শিক্ষক সেনেকা এক সৌখিন ধনী শয্যাবিলাসীর নাম উল্লেখ করে লিখেছেন যে একটি গোলাপের একটি পাপড়ি কুঁচকে যাওয়ায় সে বিছানায় শুয়ে তার ঘুম হয়নি। মার্ক অ্যাণ্টনি যখন মিশরে গিয়েছিলেন, তখন তাঁর সম্মানে রানী ক্লিওপেট্রা যে-ভোজ দিয়েছিলেন, সেই ভোজকক্ষের মেঝের ওপর ১৮ ইঞ্চি উঁচু করে টাটকা গোলাপ বিছিয়ে দেওয়া হয়েছিল।

যে-বংশে নেপোলিয়নের মহিষী যোসেফিনের জন্ম—তার উপাধি ছিল রোজ। সম্রাজ্ঞী গোলাপের বড় ভক্ত ছিলেন। পৃথিবীর সব জাতের গোলাপ তাঁর বাগানে ছিল। আর গোলাপ ছাড়া অন্য কোন ফুল তিনি বাগানে ফোটাতেন না। তাঁর অনুরোধে শিল্পী জোসেফ রেদো নানারকম গোলাপের সুন্দর সুন্দর রঙিন ছবি এঁকে রেমব্রাণ্ট অফ দি রোজেস নামে বিখ্যাত হয়েছিলেন। সিংহাসন নিয়ে ল্যাংকাস্টার ও ইয়োর্ক বংশের রক্তক্ষয়ী গৃহযুদ্ধে ইংলণ্ডের ইতিহাস কলঙ্কিত। পক্ষদের মধ্যে একের প্রতীকচিহ্ন ছিল লাল গোলাপ—অন্যের সাদা। সেজন্য যুদ্ধটি ওয়ার অফ দি রোজেস নামে পরিচিত। যুদ্ধের নিষ্পত্তি হয়েছিল ল্যাংকাস্টার বংশের সপ্তম হেনরীর সংগে ইয়র্ক বংশের এলিজাবেথের বিবাহে। সে উপলক্ষ্যে ঐ দু' জাতের গোলাপের সংমিশ্রণে টিউডর রোজ নামে দোরঙা এক জাতের গোলাপের সৃষ্টি হয়—গোলাপ, ইংলণ্ডের জাতীয় প্রতীকচিহ্নরূপে গৃহীত হয়—রাজদণ্ডে ও মুদ্রায় গোলাপের ছাপ দেওয়া হয়। পরে তৃতীয় এডওয়ার্ড ৬ শিলিং ৮ পেন্স দামের মুদ্রা নোবল-এর পিঠের দিকে গোলাপের ছাপ দিয়েছিলেন। লোকে সেটিকে বলত রোজ নোবল। এখনকার ফ্লাগ-ডে-র অগ্রদূত রোজ ডে-র প্রবর্তন করেন রাজা সপ্তম এডওয়ার্ডের রানী আলেকজান্ড্রা। প্রথমবার ১৯১২ সালের ২৬ই জুনে লণ্ডনের রাস্তা থেকে বিশ হাজার পাউণ্ডের বেশী সংগৃহীত হয়েছিল তাঁর দানভাণ্ডারে।

ভারতে মোগলরাজত্বে প্রথম গোলাপগাছ আমদানি হয়েছিল। মোগল বাদশা-বেগমদের ছবিতে তাঁদের হাতে গোলাপফুল দেখে মনে হয় তাঁরা গোলাপ ভালবাসতেন। তাঁদের স্নানের জন্য চৌবাচ্চার জলে গোলাপ ভিজিয়ে রেখে যে গোলাপজল তৈরী হাত, তা থেকে আতর আবিষ্কার করেছিলেন নূরজাহান। সেই থেকে রাজ দরবারে মান্য অতিথিদের আপ্যায়নের জন্য পান বিড়ির সময় আতর বিতরণের ব্যবস্থা প্রচলিত হয়। সে রেওয়াজ ইংরাজ আমলেও বজায় ছিল। মোগল-বাদশাদের চেষ্টায় এ-দেশে বড় বড় বাগান তৈরি করে গোলাপের চাষ আরম্ভ হয়। গাজিপুরের বিখ্যাত গোলাপ বাগিচাগুলি সেই সময়ের তৈরি।

গোলাপ ইংলণ্ডের জাতীয় ফুল। সুতরাং ইংরাজ রাজত্বে গোলাপ চাষের আরও উন্নতি হয়েছিল। গোলাপের জন্য বিখ্যাত গাজিপুর বড়লাট লর্ড কর্ণওয়ালিশের অতি প্রিয় স্থান ছিল। কলিকাতা থেকে খুব বেশী দূরে না হওয়ায় প্রায় তিনি সেখানে যেতেন এবং হঠাৎ অসুস্থ হয়ে সেখানে তিনি দেহরক্ষা করেছিলেন। গোলাপ-বাগিচার মধ্যে তাঁর দেহ সেখানে আজও সমাহিত অবস্থায় আছে। ইংরাজ আমলে রোজা ইণ্ডিকা বা বেঙ্গল রোজ নামে উঁচু জাতের গোলাপ এদেশে জন্মেছিল। এখান থেকে ইংলণ্ডে পাঠান তার চারায় প্রথম ফুল ফুটেছিল ১৮১০ সালে। কাছাকাছি কোথায়ও ভাল ফুলের বাগান না থাকায় কলিকাতাবাসী ইংরাজদের টাটকা গোলাপ-ফুল পাওয়ার অসুবিধা হোত। তাঁদের উৎসাহে বাঙ্গালী ব্যবসায়ীরা সাঁওতাল পরগণায় মিহিজাম, মধুপুর, যোশিদি, দেওঘর প্রভৃতি যায়গায় গোলাপ ও অন্যান্য ফুলের বড় বড় বাগান গড়ে তুলেছিলেন। সেই সব বাগান থেকে অতি শীঘ্র গোলাপ ও অন্যান্য ফুল কলিকাতায় এসে যাতে সকালেই বড়লাটসাহেব ও অন্যান্য ইংরাজদের প্রাতঃরাশের টেবিলে শোভা পায়, সেই উদ্দেশ্যে ফুল নেবার জন্য কিছুতি পথে পঞ্জাব মেলকে যোশিডি ও মধুপুর স্টেশনে থামতে হোত। স্বাধীন হওয়ার পর ভারতে গোলাপের আরও উন্নতি হয়েছে। গোলাপের আদরও বেড়েছে। পণ্ডিত জহরলাল নেহরুর কালে গোলাপ-প্রীতি ও সাদিদা[illegible] লালবাহাদুর শাস্ত্রীর [illegible] গোলাপ-প্রীতির কথা সকলেই জানেন।

কবিদের কাছ থেকে গোলাপ যতটা প্রশংসা পেয়েছে, অন্য কোন ফুল ততটা পায়নি। গোলাপের ভুবনভোলানো রূপ, মনমাতানো সৌরভ, পরিপাটি, স্বল্পস্থায়ী সৌন্দর্য কাব্যের বিষয়বস্তুর অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। গোলাপকে ঘিরে নানারকম রূপকের সৃষ্টি করেছেন কবিরা। ইউরোপের প্রাচীন সাহিত্যে গোলাপের উল্লেখের কথা গোলাপের জন্ম-বৃত্তান্তে বলা হয়েছে। শেকসপীয়ারের লেখার মধ্যে অন্ততঃ ষাটবার গোলাপের কথা আছে। ১৭ শতাব্দীর কবি হেরিকের গোলাপ সম্বন্ধে লেখা কবিতাগুলি বড় মধুর। শেলি রাশি রাশি গোলাপ দিয়ে প্রিয়তমার শয্যারচনার কথা বলেছেন। প্রিয়তমার শেষ শয্যায় ম্যাথু আরনল্ড গোলাপ ছাড়া অন্য কোন ফুল দিতে নারাজ—'রোজেস, রোজেস নেভার এ স্প্রে অফ ইউ'। লুই ক্যারলের অ্যালিস সম্বন্ধে বইদুখানিতে গোলাপের কথা আছে। বিউটি অ্যাণ্ড দি বীস্ট নামে বিখ্যাত রূপকথাটি গড়ে উঠেছে একটি ছোট মেয়ে তার বাবার কাছ থেকে একটি গোলাপ চাওয়ার ঘটনাকে কেন্দ্র করে। অসকার ওয়াইল্ডের করুণ কাহিনীতে নাইটিঙ্গেল পাখি বুকের রক্ত দিয়ে সাদা গোলাপকে লাল করেছিল—এক প্রেমিকার সাধ মেটাবার জন্য।

ত্রয়োদশ শতাব্দীতে লেখা ফরাসী সাহিত্যে রোমান ডি লা রোজ নামে একটি চমৎকার কাব্য আছে। তার নায়িকা হচ্ছে গোলাপের একটি ছোট কুঁড়ি। রোমান্স অব দি রোজ নাম দিয়ে চসার তার খানিকটা ইংরাজিতে অনুবাদ করেছিলেন।

ইরানের কবিরা তাঁদের কাব্যে গোলাপ, বুলবুলি, সরাপ ও সাকির টানাপোড়েনে অপূর্ব কল্পনার জাল বুনে গেছেন। সাদি বলতেন—গোলাপ শুকিয়ে যায় কিন্তু আমি যে 'গুলিস্তা' লিখে যাচ্ছি তা কখনও শুকাবে না। ওমর খৈয়ামের রুবাইৎ রূপান্তরিত করে ফিটজেরাল্ড ইরানি কাব্যের মধু সুরে ইংরাজ পাঠকদের শুনিয়েছিলেন। প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের এই দুই কবির মধ্যে এই অবিস্মরণীয় যোগাযোগ অক্ষুণ্ণ রাখার উদ্দেশ্যে ১৮৯৩ খৃষ্টাব্দে ফিটজেরাল্ডের মৃত্যুর দশ বছর পরে ইংলণ্ডের এক অখ্যাত গ্রামে তাঁর সমাধির ওপর রোপণ করা হয়েছিল নৈশাপুরে ওমর খৈয়ামের কবর থেকে তুলে আনা একটি গোলাপফুলের গাছ। সেই উপলক্ষ্যে প্রসিদ্ধ সুধী অ্যানড্রু ল্যাং-এর লেখা এই মিলনের প্রশস্তিবাচক একটি কবিতা শিলাফলকে উৎকীর্ণ করে সেখানে স্থাপিত হয়েছিল।

সুকুমারশিল্পে গোলাপের দান অবিস্মরণীয়। চিত্র, ভাস্কর্য, দেওয়ালচিত্রণ, অলঙ্কার, বেনারসী বস্ত্র, ছিটের কাপড়, কার্পেট, বাসন, আসবাব, দোয়াতদান, আতরদানি, গোলাপপাশ, চীনামাটির পাত্র প্রভৃতি নানা জিনিসে গোলাপের রূপ প্রতিফলিত হয়।

'রন্ধনশালাতে যাই তুয়া বঁধু গুণ গাই।' আহাররূপে গোলাপের ব্যবহার আছে কিনা তার সন্ধান কথা-সাহিত্যিক শ্রীবিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়ের 'মধুমিতা' গল্পের ফুলভোজী নায়ক হয়ত দিতে পারেন। পোলাও, পরমান্ন, পায়েস, পুডিং ও পানীয়ে গোলাপনির্যাস দিয়ে সেগুলিকে সুবাসিত ও রুচিকর করার প্রথা প্রচলিত আছে। অনেক রকম সুস্বাদু মিষ্টান্নকে সুবাসিত ও লোভনীয় করার উদ্দেশ্যে পাকের পর সেগুলিতে আতর বা গোলাপজল দেওয়া হয়। সুদৃশ্য করার জন্য তাদের ওপরে গোলাপের পাপড়ি বসিয়ে দেওয়া হয়। 'যে বাঁধে সে কি চুল বাঁধে না?' কেশপাশ সুরভিত করার জন্য বিলাসিনীরা যে সুবাসিত তৈল ব্যবহার করেন, তা প্রস্তুতে গোলাপ নিজের দেহদান করে গন্ধসুধা বিতরণ করে। বিকশিত গোলাপ কবরীর শোভা বাড়ায়।

গোলাপ ডাক্তারিও করে। গোলাপজল চোখের রোগে ব্যবহার হয়, মাথায় দিলে মাথা ঠাণ্ডা হয়—মন প্রফুল্ল হয়। বরফ দেওয়া রোজ সিরাপের সরবৎ ক্লান্তি দূর করে উত্তেজনা যোগায়। আতর মাখলে মন-মেজাজ খুশিতে ভরে যায়। পচা আতর দিলে কানের পুঁজ শুকিয়ে যায়। হাকিমরা গোলাপের শুখনা পাপড়ি ওষুধ হিসাবে ব্যবহার করেন। তাঁরা গোলাপের পাপড়ি মিছরীর রসে সিদ্ধ করে 'গুলকান্দ' নামে সুগন্ধ, মুখরোচক মৃদু বিরেচক তৈরি করেন। ইটালীতে গ্রাম অঞ্চলে গোলাপ থেকে কামোদ্দীপক একরকম মদ তৈরি হয়। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় গোলাপকুঁড়ির গুটি ভিটামিন সি-র বদলে ব্যবহৃত হয়েছিল।

গোলাপের প্রতি নাইটিংগেল বা বুলবুল পাখীর আসক্তি—কবিদের কল্পলোকের কিম্বদন্তি। গোলাপের গন্ধ পেলে বুলবুলি এসে জুটবেই সেখানে। সৌন্দর্যের জন্য নির্যাতিতা নুরজাহানের শেষ মিনতি ছিল—বুলবুলিকে আকৃষ্ট করার জন্য আমার কবরে গোলাপ দিও না—পতঙ্গকে পুড়িয়ে মারার জন্য সেখানে চেরাগ জেলো না। লাহোরে তাঁর সমাধির শোচনীয় দুর্দশা দেখে বর্ধমানের মহারাজাধিরাজ স্যর বিজয়চাঁদ মহাতাব নিজ ব্যয়ে সেটি বহুমূল্য আবরণে ঢেকে রাখার ব্যবস্থা করেছিলেন।

বিলাসিতার অঙ্গ হলেও ধর্মক্ষেত্রেও গোলাপ স্থান পেয়েছে। গোলাপের পাপড়ির মত গোল আকারে সাজানো প্যানেলযুক্ত বড় বড় জানালা-রোজ উইন্ডো-গির্জার শোভা ও গাম্ভীর্য বৃদ্ধি করে। খৃষ্টভক্তদের মতে আদিম অবস্থার গোলাপের পাঁচটি পাপড়ি ক্রুশবিদ্ধ যীশুর দেহের পাঁচটি রক্তাক্ত ক্ষতস্থানের দ্যোতক—পাপড়ির লাল ছোপ, ধর্মের জন্য ভক্তদের উৎসৃষ্ট রক্তের প্রতীক। খৃষ্ট-জননী মেরী তাঁর মাথার ওড়না একটি গোলাপঝোপের ওপর শুকাতে দিয়েছিলেন। সেই পূত স্পর্শে গোলাপগুলি শুভ্রবর্ণ ধারণ করেছিল। সেই থেকে সাদা গোলাপ মেরী মাতার প্রিয় ফুল। ধর্মগুরু পোপ সোনার গোলাপগাছ উপহার দিতেন ভক্ত রাজন্যবর্গকে। ভগবানের সুন্দরতম সৃষ্টি গোলাপ ঝরে পড়ার সময় সৌন্দর্যের নশ্বরতা প্রচার করে যায়—তার কণ্ঠস্বরে ধ্বনিত ঝঙ্কৃত হয় শাশ্বত বাণী—'নো রোজ উইদাউট এ থর্ন'—'দুঃখ বিনা সুখ লাভ হয় কি মহীতে?' যাবার আগে সে এই কথাটি বলে যায়—'দলঝরা কুসুমের মিনতি লইও, শুধু মনে রাখিও।' তাই তার অদর্শনে 'রূপ লাগি আঁখি ঝুরে, গুণে মন ভোর।'

অতীত যেখানে মুখর

রাণা বসু

জেরুজালেমের ক্রশ উপত্যকার পশ্চিমের শৈলমালা—কয়েক বছর আগেও যেখানে ছিল শেয়ালের বিচরণভূমি—আজ সেখানে সুরম্য অট্টালিকার সমাবেশ ও প্রাকৃতিক সৌন্দর্য পরিবেশে গড়ে উঠেছে ইস্রাইল প্রদর্শশালা। ১৯৬৫ খ্রীষ্টাব্দের ১১ মে ইস্রাইল প্রদর্শশালার দ্বারোদ্ঘাটন হয়। এই প্রদর্শশালার উদ্যোক্তা ও পৃষ্ঠপোষকরা সঙ্গত কারণেই এটিকে রোম এবং টোকিওর মধ্যে সর্ববৃহৎ জাদুঘর বলে চিহ্নিত করেছেন। এই সীমানা টোকিও-র ওপারে সমস্ত প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চল এবং উত্তর ও দক্ষিণ আমেরিকার বেশ কিছু অংশ জুড়ে বৃদ্ধি করলে হয়তো অতিশয়োক্তি হবে না।

একুশ একর জমির ওপর নির্মিত ইস্রাইল প্রদর্শশালা প্রকৃতপক্ষে একাধিক জাদুঘরের সমন্বয়। এটির প্রকল্প তৈরি করতেই একটা যুগ কেটে যায়। কুড়ি লক্ষ পাউন্ড এই প্রকল্পের কাজ শুরু হয় ১৯৬১ খ্রীষ্টাব্দে। যুক্তরাষ্ট্র সরকার তিন লক্ষ পাউন্ড অর্থ সাহায্য দিয়ে এই জাদুঘর নির্মাণের কাজে বিশেষ সহায়তা করেন। অন্যান্য ব্যক্তিগত সাহায্য এই দানকে অতিক্রম করে গেছে। যেমন, কানাডার মদ্যপ্রস্তুতকারক সামুয়েল ব্রনফমান প্রত্নতত্ত্ব ও বাইবেল সম্পর্কীয় প্রদর্শশালার জন্য এবং নিউ ইয়র্কের কাগজের মণ্ড রপ্তানীকারক ও মহাজন ডি সামুয়েল গোটেসমান শ্রাইন অফ দি বুক নির্মাণ ও সেখানে রক্ষিত চারটে ডেড সী স্ক্রলস কেনার ব্যয়ভার বহন করেন। আর আছেন ব্রডওয়ের নাট্যপ্রযোজক বিলি রোজ। রোজ একটা উদ্যান নির্মাণ করিয়ে দেন। সেখানে তাঁর দশ লক্ষ ডলার মূল্যের ব্যক্তিগত ভাস্কর্য-সংগ্রহ স্থান পেয়েছে।

যদি কোনো ব্যক্তি ঐতিহ্যময় গলগথার মঠগুলো অতিক্রম করে অনুচ্চ জুডিয়ান পর্বতমালার পশ্চিমদিকে অগ্রসর হয়ে ক্রশ উপত্যকার মধ্যে ক্রমশ এগুতে থাকেন তাহলে তাঁর দৃষ্টিপথে আসবে জলপাই বৃক্ষরাজির অদূরে পাথরে তৈরি বহু অট্টালিকা। দূর থেকে দেখলে মনে হয় গ্যালিলি অঞ্চলের কোনো আরব গ্রাম অনুভূমিক অবস্থায় যেন পাহাড়ের গায়ে গাঁথা। এই ভবনগুলো ললিতকলার বেজালেল সংগ্রহশালা ও ব্রনফমানের বাইবেল ও প্রত্নতত্ত্বের জাদুঘর। চারটে সমান্তরাল রাস্তায় বিভক্ত রাজপথ ধরে খানিকটা এগলেই ডানপাশে চোখে পড়বে অতিকায় নেসেট (পার্লামেন্ট) ভবন। আরও কিছুদূর এগলেই নজরে আসবে একটা সাদা রঙের গম্বুজ এবং কালো পাথরের দেয়াল। এরা শ্রাইন অফ দি বুককে সূচিত করে। আধুনিক পরিকল্পনায় নির্মিত ভূগর্ভস্থ এই কক্ষের ভেতর রাখা হয়েছে জুডিয়ান অরণ্যের একটা গুহা থেকে পাওয়া কুমরাণ লিপি ও প্যাপিরাই। 'শ্রাইন'-এর অদূরে পনরো ফুট উঁচু ধূসর রঙের একটা ব্যাসল্টের পিরামিড ও দুটো উন্মুক্ত পাথরের দেয়াল যা পশ্চিম উপত্যকা পর্যন্ত প্রসারিত ভাস্কর্যশোভিত রোজ উদ্যানের পরিচয় দিচ্ছে।

ললিতকলা ও প্রত্নতত্ত্বের সংগ্রহশালা আন্তঃযুক্ত আটাশটা শ্রেণীবদ্ধ ভবনের সমষ্টি। প্রদর্শনীর উদ্দেশ্যে ব্যবহারের জন্যে তত্ত্বাবধায়করা এখানে এক লক্ষ ষাট হাজার বর্গফুট স্থান বা জায়গা পাবেন। এ সমস্ত পরিকল্পনা এমনভাবে করা হয়েছে যে একটা দেয়াল ভেঙে দিলেই অতিরিক্ত নব্বই হাজার বর্গফুট স্থান এর সঙ্গে যুক্ত হবে। প্রত্যেকটা ঘরের ছাদ পরাবৃত্তাকার অর্ধ-মেঘনাকৃতি—অনেকটা বাথ-টাবের মতো, যা তৈরির সময় দর্শকদের বিস্মিত করেছিল। প্রতিটা ঘরের মাঝখানে একটা ফাঁপা স্তম্ভের ভেতর

ভাস্কর্যের অনুপম সৃষ্টি : শ্রাইন অব দি বুক। কোণাকৃতি এই সৃষ্টিকর্মের বিপরীত পৃষ্ঠে সমতল ও অনন্য।

আছে শীতাতপ নিয়ন্ত্রণ, বিদ্যুৎ সরবরাহ ও বৃষ্টির জল নির্গমনের জন্যে অসংখ্য তার এবং নল। দেয়ালগুলো মুক্ত করলেও স্তম্ভগুলো থাকার জন্যে ঘরগুলোর ছাদ অত্যন্ত স্থিতিস্থাপক। প্রত্যেকটা প্রদর্শনী-কক্ষ একই তলে অবস্থিত। যদিও ভূসংস্থানের বিভিন্নতার জন্যে তলের উচ্চতার কিছু তারতম্য ঘটেছে, তবু দর্শকদের প্রবেশের জন্য নির্মিত খিলানগুলোর সংস্থাপন আরো ভালো হওয়া উচিত ছিল।

বেজালেল সংগ্রহশালাকে আকর্ষণীয় করার জন্যে সংগ্রহশালার প্রধান অধ্যক্ষ কার্ল কাট্‌স বেশ কিছু চিত্তাকর্ষক নিদর্শন সংগ্রহ করেছেন। ওল্ড টেস্টামেন্টের বিষয় নিয়ে সত্তরটা উৎকৃষ্ট শিল্পকর্ম (শিল্পী রেমব্রাণ্টের একটা তৈলচিত্র সমেত—মোজেস দু হাতে প্রস্তরফলক তুলে ধরে আছেন), বাইবেলে বর্ণিত বিষয় অবলম্বনে রেমব্রান্টের আঁকা ও খোদাই-কাজের পঞ্চাশটা নিদর্শন, আশ্চর্যজনকভাবে সুসংরক্ষিত দেবদারু কাঠের ওপর খোদাই করে আঁকা ষোলটা চিত্রের এক পূর্ণ সংকলন—একসময় এগুলো ফুস্টাটের বেন এজরা প্রার্থনালয়ের শোভাবর্ধন করত; ইস্পাহান থেকে আনা ষোড়শ শতাব্দীর মুসলমানদের প্রার্থনার জন্যে ব্যবহৃত কুলুঙ্গি, ফরাসী শিল্পদ্রব্য, চিত্রিত পর্দা ও আসবাবপত্রে সজ্জিত অষ্টাদশ শতাব্দীর রথচাইল্ডের একটা কক্ষ, সপ্তদশ শতাব্দীর ষাটজন উপাসকের বসার উপযোগী এক ইতালীয় ভজনালয়। প্রাচ্যকলাবিশারদ কাট্‌স এগুলো দর্শকদের জন্যে সংগ্রহ করেছেন খৃষ্টপূর্ব পঞ্চম শতকের রাজকীয় পারসিক স্বর্ণদ্রব্যাদি। ইস্রাইলীদের পক্ষে গৌরবের বিষয় যে, বেজালেল সংগ্রহশালায় এই প্রথম দেখানো হচ্ছে ইহুদীর আনুষ্ঠানিক শিল্পসম্ভার যা বিশ্বের সবচেয়ে পূর্ণাঙ্গ বলে দাবী করা হয়।

বাইবেল সম্পর্কীয় ও প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের প্রদর্শশালার সংগ্রহগুলো কালানুক্রমে সাজানো। দশ লক্ষ বছরের পুরনো হাতির দাঁত থেকে শুরু করে জেরিকো থেকে পাওয়া কেনানাইট যুগের কিছু নিদর্শন; অসংখ্য ও বহুবিধ অস্থি এবং মাটির পাত্র; মাজাদা থেকে পাওয়া দ্রব্যাদি; চতুর্থ থেকে ষষ্ঠ শতাব্দীর ইহুদী ভজনালয় থেকে পাওয়া রঙিন পাথরের টালি। কয়েক বছর আগে সিজারিয়ায় ইতালীয়দের আবিষ্কৃত এক ভিত্তিপ্রস্তর এই প্রদর্শশালার বিশেষ আকর্ষণ; পাথরে খোদাই করা পন্টিআস পিলেটাস নামটি একদা ওই নামেরই কোনো ব্যক্তির অস্তিত্বের সাক্ষ্য দিচ্ছে। এছাড়াও আছে ওয়াইলডারনেস অফ জুডায়ার এক গুহা থেকে পাওয়া তামা, ব্রোঞ্জ, হাতির দাঁত ও পাথরের তৈরি জিনিসের অদ্ভুত সংগ্রহ এবং আব্রাহামের প্রায় দেড় হাজার বছর আগের এক নরকঙ্কালের ভগ্নাবশেষ। এগুলো এখনো সম্পূর্ণ অক্ষত অবস্থায় রাখা আছে এবং এর কোনো কোনোটাকে দেখলে মনে হয় যা কখনো ব্যবহার করা হয়নি। এগুলো হল গদা, রাজমুকুট, রাজদণ্ড, অস্ত্রশস্ত্র, ধর্মীয় অনুষ্ঠানে ব্যবহারের জন্যে নকশাকরা বিভিন্ন সরঞ্জাম, দড়ির তৈরি নকশা, খোদাই করা রমণীয় বন্য ছাগ ও হরিণ মূর্তি ইত্যাদি। সাধারণ মানুষের কাছে এগুলো নলামস্ত্রীর যন্ত্রপাতি বলে মনে হবে, কিন্তু বিশেষজ্ঞরা এ সম্পর্কে নিশ্চিত নন।

ইহুদি ভাস্কর জ্যাকুইজ লিপচিৎস-এর রমণীয় ভাস্কর্যকৃতি : মা ও তার শিশুসন্তান

কলা ও প্রত্নতত্ত্ববিভাগীয় সংগ্রহশালার পশ্চিমদিকে পাঁচ একর জমি জুড়ে তৈরি বিলী রোজের ভাস্কর্য-উদ্যান। ব্রডওয়ে-নিবাসী এই শিল্পরসিক মানুষটির এ উদ্যান নিঃসন্দেহে সর্বাপেক্ষা স্থায়ী কীর্তি। উদ্যানের নকশা তৈরির ভার ছিল ক্যালিফোর্নিয়ার প্রসিদ্ধ ভাস্কর ইসামু নোগুচির ওপর। নোগুচি নিকটবর্তী অঞ্চল থেকে পাথর কেটে একটা বৃত্তাকার প্রাচীর এবং প্রাচীরের গায়ে দশ হাজার টন মাটির প্রলেপ দিয়ে কুড়ি ফুট উঁচু সীমাঙ্কিত এক ঢালু পাহাড় তৈরি করেন। জেরুজালেমের নির্মল আকাশকে পটভূমি করে নোগুচি অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে মৃত্তিকাস্তুপের ওপর যেসব ভাস্কর্য স্থাপন করেছেন তাদের মধ্যে রডিন-এর নগ্ন 'আদম', আর্কিপেঙ্কোর কিউবিক্ট ধাঁচে গড়া 'কেশবিন্যাসরতা নারী', মুর-এর 'অর্ধশয়ান অবয়ব', মেলল-এর 'শৃঙ্খলিত স্বাধীনতা' এবং রেগ বাটলার-এর 'প্রসুপ্তা নারী' বিশেষ উল্লেখযোগ্য। জার্মেইন রিচিয়ার ও জ্যাকুইজ লিপচিৎস-এর মতো নোগুচির নিজেরও কিছু ভাস্কর্য এখানে স্থান পেয়েছে। এছাড়া আছে লেডী এপস্টাইনের কাছ থেকে দানস্বরূপ পাওয়া এপস্টাইনের দুশটা প্লাস্টারের ভাস্কর্য। নোগুচি বলেছেন :

> 'I wished to retain a dialogue of earth and sky with no symmetry other than that given by the walls without any arbitrary paths to break the swell of the earth. The sculptures by their placement will act as the delineators of another leve of relationship to people, to the walls, to each other, to the spaces and the sky above. It is what I call a non-Euelidian garden cencept...."

ইহুদিদের উৎসব উপলক্ষ্যে ব্যবহৃত কয়েকটি অপরূপ কারুকার্যখচিত দ্রব্য

ভাস্কর্য-উদ্যানের ঠিক উত্তরে পাঁচ একর জমির ওপর গড়ে উঠেছে শ্রাইন অফ দি বুক। আধুনিককালে সৃষ্ট ভাস্কর্য-স্থাপত্যের ক্ষেত্রে এটি সবচেয়ে বেশি উদ্দীপনার সঞ্চার করেছে। এটিকে কেন্দ্র করে জেরুজালেমে বহু আলোচনা হয়ে গেছে। তিরিশ ফুট উঁচু বৃত্তাকার এই গম্বুজের বাইরেটা চার ইঞ্চি মাপের এক লক্ষ ছিয়াত্তর হাজার টালি দিয়ে তৈরি। এর ব্যাস পঁচাত্তর ফুট, পরিধি দুশ ফুট এবং এটিকে তুলনা করা হয়েছে শালগম, পেঁয়াজ ও প্যাগোডার সঙ্গে। স্থানীয় সংবাদপত্রে এটিকে নারীর স্তনের সঙ্গে তুলনা করলে সেখানের ইহুদী পুরোহিত সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রবল উত্তেজনার সৃষ্টি হয়। তাদের অবশ্য বলা হয় যে, পাত্রের মধ্যে লিপিগুলো পাওয়া গিয়েছিল প্রকৃতপক্ষে এই গম্বুজ তারই অগ্রভাগের অনুকরণে নির্মিত। কিন্তু এর অন্যতম স্থপতি আর্মন্ড বারটোস এই উপমার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়ে বলেছেন : "গম্বুজের গঠনশৈলীর মাধ্যমে আমরা দুটো পরাবৃত্তাকার বক্রতলের রূপ দেবার কথাই চিন্তা করেছিলাম।"

বারটোস পরাবৃত্তাকার বক্রপৃষ্ঠের যে ইঙ্গিত দিয়েছেন তা কাছ থেকে দেখতে হলে একটা ক্রমিক আনত পথে আরোহণ করে এক প্রশস্ত উদ্যানে উপস্থিত হতে হবে। এই উদ্যানের নিম্নদেশ থেকেই গম্বুজটা উঠেছে এবং মনে হবে প্রস্তরটালি ঘেরা নীল জলাশয়ের মধ্যে যেন ওটা ভাসছে। ফোয়ারা থেকে উদ্গত জলকণা গম্বুজটাকে সিঞ্চিত করছে। গম্বুজের [illegible] কালো রঙের একটা ব্যাসল্টের প্রাচীর—গম্বুজের মতো এটাও উদ্যানের ভূমি থেকে ওপরে উঠে এসেছে। প্রাচীরের পাশ দিয়ে শ্বেত-পাথরের সিঁড়ি দুটো শীর্ণ পিপুলবৃক্ষ-শোভিত এক উন্মুক্ত প্রাঙ্গণে নেমে গেছে। সেখানে দর্শকের দৃষ্টিগোচর হবে এমন কিছু যা দেখতে অনেকটা সদ্য আবিষ্কৃত মাইসেনীয় সভ্যতার একটা সমাধির মতো। দুটো ব্রোঞ্জের তৈরি আয়তাকার দরজা দিয়ে এর ভেতরে প্রবেশ করার সময় দর্শককে সামনের দিকে মাথা নীচু করে এগোতে হয়। ব্যাপারটা যেন কোনো গুহার ভেতর দর্শক প্রবেশ করছেন। এর কারণ, কংক্রীটের 'ভাসমান' একটা ছাদ উভয় প্রান্তে ধনুকের মতো নেমে এসেছে। আয়তাকার এক বৃহৎ কক্ষ থেকে পথটা দুটো ব্রোঞ্জদণ্ডনির্মিত দ্বারের মধ্য দিয়ে অতিক্রম করেছে। ভূগর্ভস্থ এই কক্ষের ভেতর নেমে আসা পূর্বোক্ত ব্যাসল্ট প্রাচীরের পাদদেশে ছিদ্র কেটে দাঁতগুলো বসানো। অগ্রভাগে একটা দীর্ঘ অধোগামী অলিন্দের দুপাশে পাঁচটা করে কাঁচের শো-কেস আছে। শো-কেসের ভেতর রাখা নিয়ন-বাতিতে বারান্দাটা আলোকিত। শো-কেসগুলোর মধ্যে আছে জুডিয়ান অরণ্যের গুহা থেকে পাওয়া বারকোখবার আমলের (২য় খ্রীষ্টাব্দ) চিঠি, দলিল, চুক্তি-পত্র ইত্যাদি। তির্যকাকৃতি খিলানগুলো পর্যায়ক্রমে বাঁ ও ডান পাশে হেলে থাকায় সুড়ঙ্গপথে চলার সময় দর্শকের শিহরণ বৃদ্ধি করে আর কুলুঙ্গিগুলো সেই আকাঙ্ক্ষিত রহস্য সৃষ্টি করেছে। অলিন্দের শেষ প্রান্তে একটা শ্বেতপাথরের ছোট্ট দালান আছে। দুটো আয়না থেকে ঈষৎ রঞ্জিত ধূসর আলো দেয়ালের দু পাশে রাখা কুমরান পাত্রগুলোর ওপর প্রতিফলিত হয়। অতি মসৃণ দুটো ব্রোঞ্জের তৈরি দরজা দিয়ে সামান্য পথ অতিক্রম করলেই গম্বুজের ভেতর প্রবেশ করা যায়। গম্বুজের শীর্ষ দিয়ে প্রবিষ্ট দিবালোকে ক্ষণিকের জন্যে সবকিছু অন্ধকারাচ্ছন্ন মনে হয়। গম্বুজের কংক্রীটের দেয়াল [illegible] বা কোঁচকানো। মাঝখানে একটা বৃত্তাকার বেদীর ওপর সংবদ্ধ দণ্ডের মাথায় [illegible] উঁচু একটা ব্রোঞ্জের পাত্র স্থাপন করা আছে। পাত্র থেকে বেগে নির্গত বারিধারা শীর্ষের মধ্য দিয়ে গম্বুজের বহির্পৃষ্ঠে পড়ে জলাশয়ে মিশছে এবং চক্রাকার পথে আবার পাত্র থেকে নির্গত হচ্ছে। দণ্ডটা বেষ্টন করে বসানো একটা ব্রোঞ্জের ফ্রেমের মধ্যে রাখা আছে আট মিটার দীর্ঘ আইজেয়ার লিপি। এটি সর্বাপেক্ষা প্রাচীন হিব্রু রচনা—বাইবেলের সর্বপ্রথম গ্রীক অনুবাদের চেয়েও পাঁচশ বছরেরও বেশি পুরনো। জরুরী অবস্থা দেখা দিলে ফ্রেমটা সমেত বেদী থেকে পনেরো ফুট নীচে একটা কুয়োর মধ্যে নামিয়ে দেওয়া যায়।

গম্বুজের প্রাচীর ঘিরে এগারো ফুট উঁচু কতকগুলো শো-কেস আছে। এদের মধ্যে রাখা আছে আরও ছটা কুমরান লিপি এবং মরুসাগরের নিকটবর্তী জুডিয়ান গুহা থেকে পাওয়া অন্য লিপি ও [illegible] কিছু রচনা।

দুটো ঘোরানো সিঁড়ি গম্বুজের তলায় গুহার মতন একটা প্রদর্শনী কক্ষ পর্যন্ত গেছে। এই ঘরটার [illegible] মূর্তি-পাথরের দেয়ালের গায়ে নানা প্রতিকৃতি ও [illegible] শো-কেসে দেখতে পাওয়া যাবে [illegible] বিদ্রোহীদের নিত্য ব্যবহার্য কাঠের পাত্র, লোহার ছুরি, চাবি, পাথরের চাকা, লাল পোশাক, প্রার্থনাকালে ব্যবহারের শাল ইত্যাদি দ্রব্য।

আমেরিকার প্রখ্যাত ভাস্কর ও স্থপতি ফ্রেডারিক কিসলার ইস্রাইল প্রদর্শশালার স্মৃতিবিজড়িত পবিত্র শ্রাইনের অন্যতম নকশা রচয়িতা ছিলেন। তিনি বলেছেন : 'আমি পৃথিবীকে একটি নতুন স্থাপত্য উপহার দিয়েছি।' তাঁর মতে গম্বুজের শ্বেতবর্ণ হল শুচিতা ও সততার প্রতীক। ব্যাসল্টের প্রাচীরটা নির্বাসিত ইহুদীদের একটানা দু' হাজার বছরের ক্লেশ ভোগের প্রতীক। গম্বুজের ওপর বর্ষিত বারিধারা ও ব্যাসল্টের প্রাচীরের ওপর প্রজ্জ্বলিত অগ্নিশিখা জন্ম, মৃত্যু ও পুনর্জন্মের প্রতীক।

স্মৃতি-বিজড়িত পবিত্র বেদিকা এবং সমগ্র জাদুঘরের প্রশংসা করে কিসলার আরো বলেছেন : '১৯৫৭ খ্রীষ্টাব্দে যখন প্রথম জেরুজালেমে আসি, তখনই ডেড সী স্ক্রলের আবিষ্কার ও ইস্রাইল-এর জন্ম—এই দুই ঘটনার একই সময়ে সংঘটনে আমার চিত্ত বিচলিত হয়েছিল। এখানে যা-কিছু দেখা যায় সবই একের উদ্দেশে নিবেদিত—তা হল পুনর্জন্ম।'

মুন্ডা-বিবাহের রীতিনীতি

সুধীর করণ

'পোলো তাম্‌দো চিলকা সারি তানা
নম্‌ নগেন্‌ জিগে লে তানা—'
এর মানে হচ্ছে,

'পায়ের আঙুলে ঝিনিঝিনি কিংকিনো—
(ওগো মেয়ে তুমি ধন্য)
হৃদয় আমার পুড়ছে তোমারই জন্য।"

কোন মুন্ডা তরুণীকে দেখে, কোন মুন্ডা তরুণ না-হয় এ গান গাইলো-ই, কিংবা আরো গাইলো—

নামো দিন্‌দো নাইও দিন্‌দো
দা চাটু যেমন দিন্‌দো—
অর্থাৎ—'কি সুখে কাটাবো, তুমি যদি
আস ঘরে,
তুমিও যেমন কলসী,—
আমিও তেমনি তোমার বিঁড়ে।"

হয়তো মন দেওয়া-নেওয়া হয়ে গেল, ওদের, কিন্তু শুধু গান গাইলেই ঘর-বাঁধার কাজ হয়ে গেল, তা নয়,— উভয়-পক্ষের গুরুজনদের সম্মতি না হলে, কোন মুন্ডা যুবকযুবতীর বিবাহ হতে পারে না। আগে তো নিয়মই ছিল,— লাঙল চালাতে না পারলে, কোন ছেলেই বিয়ে করতে পারে না; মেয়েদের বেলাতেও তাই;—চাটাই বুনতে পারে? মাদুর বুনতে পারে? কাপড় বুনতে পারে?—পারলে, ভালো। নৈলে এ মেয়েকে কেউ ঘরে নেবে না। (বলা বাহুল্য, মুন্ডা সম্প্রদায়, ছোট-নাগপুরের আদিম অধিবাসী) সব যদি ঠিক থাকে, তাহলে বরপক্ষ থেকে 'দুতম্‌' পাঠানো হবে কনের বাড়ীতে। কনের বাড়ী থেকে যদি সম্মতি পায় তাহলে দুতম্‌ কনে দেখার দিন ঠিক করে আসবে। তারপর নির্ধারিত দিনে দুতম অর্থাৎ ঘটক বরের অভিভাবক এবং তার দু-একজন আত্মীয়-স্বজনকে সঙ্গে নিয়ে রওনা হবে। যাত্রাপথে শুভ-অশুভ দর্শনের উপরই বিবাহ-ব্যাপারটি চূড়ান্তভাবে নির্ভরশীল। দর্শন যদি শুভ হয়, তাহলে 'কুড়ী' অর্থাৎ তরুণী দেখার জন্য যাওয়া হবে, অশুভ হলে, সেইখানেই ছেদ পড়বে। যদি দেখা যায়, গাই-বাছুর পরস্পরকে ডাকছে,— শেয়াল যাচ্ছে বাঁদিক থেকে ডাইনে,—কেউ নিয়ে যাচ্ছে জলভরা কলসী,—জোয়ালে জোড়া হচ্ছে গরু, কেউ বয়ে নিয়ে যাচ্ছে ধান কুঁড়ো চাল,—তাহলে শুভদর্শন হয়ে গেল। কিন্তু যদি দেখা যায়, কুড়ুল দিয়ে কেউ গাছ কাটছে কিংবা কোদাল-কুড়ুল-শাবল হাতে কেউ হেঁটে যাচ্ছে, কিংবা অকারণেই একটি গাই হাম্বা-হাম্বা করছে, তাহলে অশুভ দর্শন। শুভ-অশুভ দর্শনের এই ব্যাপারটি মুন্ডা-বিবাহপ্রথার বিশেষ একটি রীতি। এর নাম,—চেঁড়ে-উঁন। অশুভ-দর্শন হলেই রাস্তা থেকে ফিরে আসবে সবাই। বিবাহের কথাবার্তা সেইখানেই শেষ।

আর যদি শুভ-দর্শন ঘটে যায়, তাহলে বরপক্ষের লোকেরা পেঁাছে যাবে কনের বাড়ীতে। তখন চাটাই পেতে বসানো হবে ওদের। কনেপক্ষের 'দুতম্‌' বরপক্ষের 'দুতম্‌'কে বলবে—কি কি শুভ লক্ষণ দেখেছো, বল। বরপক্ষের দুতম্‌ তার বিশদ বর্ণনা দেবে। কনেপক্ষের 'দুতম' যদি বলে যে—ঠিক আছে, তাহলে ওরা হাঁফ ছেড়ে বাঁচবে। কনেপক্ষের দুতম্‌ যদি, ওদের লাঠিছাতা ইত্যাদি, নিয়ে একসঙ্গে গুছিয়ে রাখে, তাহলে বুঝতে হবে, কনে-পক্ষের আপত্তি নেই। এরপর বাড়ীর মেয়েরা এসে বরপক্ষের লোকেদের পা ধুইয়ে দেবে। তারপর—ইলি বা হাঁড়িয়া খাওয়ার পালা। খাওয়া-দাওয়া শেষ করে সবাই সবাইকে 'জোহার' করবে অর্থাৎ প্রীতি-নমস্কার জানাবে। তারপর কনেপক্ষের অভিভাবককে ওরা আমন্ত্রণ জানাবে বরপক্ষের বাড়ীতে যাবার জন্য।

নির্ধারিত দিনে কনেপক্ষের 'দুতম্‌' কনের অভিভাবকদের নিয়ে বরের বাড়ীতে যাবে। পথে যদি শুভ-দর্শন হল তো ভালো, নৈলে, ওদেরও ফিরে আসতে হবে।

বরপক্ষের বাড়ীতে পেঁাছে কনেপক্ষের দুতম জবাব দেবে বরপক্ষের দুতম্‌-এর কথার। তারপর লাঠিছাতা গুছিয়ে রাখা, পা ধুইয়ে দেওয়া এবং হাঁড়িয়া খাওয়ার প্রাথমিক পর্ব শেষ হলে কন্যাপক্ষ থেকে একজন একটি শালপাতার 'দোনায়' হাঁড়িয়া ভরে দোনাটি বাঁহাতে ধরে, ডানহাতে 'জোহার' করবে সবাইকে। তারপর বলবে—

স্বর্গে আছেন সিং বোঙা
ধরতীতে আছেন পশু।
লক্ষণ সব ভালো।
এই বরকনের মিলন হবে শুভ।
আজ, বরের বাবা—আর কনের বাবা,—
দুটো ঘরের চাল
একই খড়ে ছেয়ে দেবেন।
সিং বোঙা—
এই দুটো চাল,
চিরকাল এক করে রাখুন।"

তারপর আবার জোহার। যাকে দিয়ে এই কাজটি করানো হয়, তাকে বলা হয় জোহারনী।

কিন্তু এত তাড়াতাড়ি প্রস্তুতিপর্ব শেষ হয়ে যায় না।

এরপর বরপক্ষ আবার একদিন যাবে কনের বাড়ীতে। সেদিন ভোজ উৎসব। মদ-হাঁড়িয়া-মাংস। তারপর 'কন্যাপণ' দেবার পালা। মুন্ডা-সমাজে বর-পণ-প্রথা নেই। বরের বাবা, কনের বাবাকে, দেবে 'গোনোংটাকা'। কোনরূপ টাকা পয়সা তক্ষুনি দিতে হয় না। কনের বাবা তার দুতম-এর হাত দিয়ে পাঠাবে মাটির কয়েকটি গুলি, আর কয়েকটি পাকানো-শালপাতা, সুতো দিয়ে জড়ানো। বরের পিতা, যতটাকা দিতে পারবে ততটি মাটির গুলি নিজের কাছে রাখবে, বাকীগুলি ফিরিয়ে দেবে দুতমের হাত দিয়ে; যটি শাড়ী দিতে পারবে, ততগুলি সুতোর মোড়া শালপাতা নিজের কাছে রেখে, বাকীগুলি ফেরং দেবে সেইভাবে।

কনের বাবা হয়তো আরো কিছুর জন্য আবেদন জানালো, গুলি পাঠিয়ে, শালপাতা পাঠিয়ে, বরের বাবা হয়তো সে আবেদন শুনলো, কি শুনলো না,—এক সময় কিন্তু টাকার অংক আর শাড়ীর হিসেব ঠিক হয়ে গেল। এর জন্য বাকবিতন্ডা বাক্য-ব্যয়ের প্রয়োজন হয় না।

এরপর দুই বৈবাহিকে কোলা-কুলি। এর নাম হাপারুর-জোহার। এসব হয়ে গেলে এ গাঁয়ের পাহান্‌ অর্থাৎ পুজারী ও-গাঁয়ের পাহানের হাত ধরবে, করমর্দন করার ভঙ্গীতে। বলবে—

'আমরা হাত ধরে আছি কেন?"
—'অমুক অমুক কোড়া-কুড়ীর
(ছেলে-মেয়ে) জন্য।'
'কে এই হাতের সৃজন করেছে?"
সিং বোঙা।"

'এই যে হাত ধরেছি,—এ যেন ঠিক থাকে। কোনরূপ কথার খেলাপ হলে, তোমার হাত কাটবে।'

এই হচ্ছে পরস্পরের কথোপকথন। দুই পাহানের বাক্যালাপ।

এরপর 'লগনতোল্‌' অনুষ্ঠান। কনে বসবে নিজের মামার কোলে। কনের কোন সঙ্গিনী, বরপক্ষের কোন একজনের কোলে বসে, ভাবী বধূর হাতে দেবে— যৎকিঞ্চিৎ

চাল, কয়েক টুকরো হলুদ আর কয়েকটি পান।

বিয়ের দিন নির্ধারিত হলে বরপক্ষের দূতম্, কনের বাড়ীতে গিয়ে গজংটাকা বা কন্যাপণ দিয়ে আসবে, কন্যার বাবার হাতে।

এরপর বিবাহ উৎসব। মুন্ডারী ভাষায় এর নাম অড়ংদি।

বিয়ের তিনদিন আগেই, দু বাড়ীতেই 'মাড়োয়া' অর্থাৎ মন্ডপ তৈরী করা হয়। মাড়োয়ার চারদিকে চারটি কচি শালগাছ পুঁতে দেওয়া হয়, মাঝখানে,—'ভেলোয়া' চারা এবং বাঁশ একত্রে পুঁতে দেওয়া হয়। যে-যার বাড়ীর মাড়োয়ার মধ্যে বর এবং কনেকে বসিয়ে তেল-হলুদ মাখানো হয়। এই উৎসবের নাম 'সাসাংগোসো'। গায়ে হলুদ অনুষ্ঠান।

বিয়ের ঠিক আগের দিন, দুজায়গাতেই 'চুমন' উৎসব। হলুদ রঙে ছোপানো কাপড় পরে বর-কনে সেজেগুজে বসে থাকবে। বাড়ীর এবং পাড়াপড়শী মেয়েরা এসে চুমু খাবে ওদের। চুমু খাওয়ার রীতি—, ওদের চিবুকে হাত ঠেকিয়ে,—পরে, নিজের আঙুল নিজের ঠোঁটে ঠেকানো।

বরযাত্রীরা যখন বরের বাড়ী থেকে, কনের বাড়ীর দিকে যাত্রা করবে, তখন গ্রাম ছেড়ে যাবার আগে আর একটি অনুষ্ঠান—যার নাম 'উলিসাখি'। উলি-র অর্থ আমগাছ। আমগাছকে সাক্ষী রেখে, যাত্রা হবে সুরু। আমগাছের গুঁড়িতে বর একটি সুতো জড়িয়ে দেবে, পিটুলিগোলা দিয়ে দাগ টানবে। বরের মা, বরকে কোলে নিয়ে বসবেন আমগাছের তলায়। মা বলবেন—কোথায় যাচ্ছো? বর বলবে—'আমি একটি 'কুড়ী' আনতে যাচ্ছি, যে তোমার সেবা করবে আর সবাইকে ভাত-তরকারী রেঁধে দেবে।' বলেই, বর,—আমপাতার বোঁটা আর গুড় চিবিয়ে, মাকে খেতে দেয়। মা, সেই চর্বিত অংশটুকু গিলে ফেলেন।

ঘাসীবাদ্যকাররা বাজনা বাজাবে। সুরু হবে শোভাযাত্রা। পালকী, চৌদোল হলো তো ভালোই, নৈলে গ্রামসীমান্ত পর্যন্ত বরকে বয়ে নিয়ে যেতে হয়। কয়েকজন মেয়েও বরযাত্রী হয়ে, শোভাযাত্রায় যোগ দেয়।

গ্রামের কাছাকাছি এসে পৌঁছুলে, কন্যাপক্ষের লোকেরা এসে তাদের অভ্যর্থনা করে নিয়ে যায়। বর, কনে-বাড়ীর উঠোনে পৌঁছুলে—মেয়েরা ঘটিতে জল নিয়ে আসবে। আমপাতায় সেই জল নিয়ে বরের মাথায় ছিটিয়ে দেবে। তারপর একটি নোড়া দেখিয়ে বলবে—দেখ, কোড়া,—কপালে আছে শিলের নোড়া; চোর কিংবা ভন্ড, হলে এই দন্ড। 'জুমবুড়ি-রে দোম কুমবুরে দোম্ নে লোকাম।' এরপর বরকে অন্য এক জায়গায় নিয়ে যাওয়া হবে। ফিরে না হওয়া পর্যন্ত সেইখানেই অবস্থান। জায়গাটিকে বলা হয় 'জালোম্'।

পরের দিন 'চাউলি-হেপের' অনুষ্ঠান।

পরের দিন সকালে, বরকে বহন করে নিয়ে আসা হবে, কনের বাড়ীতে। বর এলে, কনেকে একটি ঝুড়ির মধ্যে বসিয়ে, বরের চারদিক প্রদক্ষিণ করানো হবে তিনবার। বর তিনবার তিনমুঠো আতপ চাল কনের মাথায় ছিটিয়ে দেবে। কনেকেও ঐই করতে হয়।

বর-কনেকে এরপর 'উলি-দায়ুরে কাছে' যেতে হয়। আমগাছের চারদিক প্রদক্ষিণ করে, আমগাছকে সাক্ষী রাখা হয়।

এরপর 'জালোম্' থেকে—অর্থাৎ বর এবং বরপক্ষের লোকেরা যেখানে ছিল,—সেখান থেকে বরপক্ষের মেয়েরা কনে-বাড়ীতে আসবে কনে-কে তেল-হলুদ মাখাবার জন্য। কনে-পক্ষের মেয়েরা জালোমে গিয়ে বরকে তেল-হলুদ মাখাবে। বরকে আবার ক্ষৌরকর্ম করিয়ে নিতে হয় সেই সময়। তার কড়ে আঙুল থেকে একটু রক্ত বার করে—একটি ন্যাকড়া কিঞ্চিৎ ভিজিয়ে নিতে হয়। কনের বাড়ীতেও এই প্রক্রিয়া। বর-কনের রক্তে ভেজানো ন্যাকড়া দুটি বলা হয় 'সিনাই'।

পাঠকবর্গের প্রতি নিবেদন

'পূজো উপলক্ষে অমৃতের কার্যালয় এক সপ্তাহের জন্য বন্ধ থাকায় অমৃতের ২২ সংখ্যাটি ১লা অক্টোবরের পরিবর্তে ৮ই অক্টোবর প্রকাশিত হয়েছে।

সারকুলেসন ম্যানেজার
অমৃত পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ

বিকাল হলে, বরকে আবার নিয়ে যাওয়া হয় কনের বাড়ীতে। তখনই আসল বিয়ে। বর-কনেকে বহন করে তিনবার 'মাড়োয়া' ঘোরানো হবে। এরপর দুটি শালপাতার উপর, দুজনকে দাঁড় করানো হয় মুখোমুখি। কনের মুখ থাকে পূর্ব-দিকে। বর, নিজের বাঁ পায়ের বুড়ো আঙুল দিয়ে, কনের ডান পায়ের বুড়ো আঙুলে একটু চাপ দেয়। তারপর তার নিজের 'সিনাই'—নিজের ঘাড়ে ছুঁইয়ে, কনের গলায় ছোঁয়ায়, দু-দুবার। এরপর স্থান পরিবর্তন করে, কনেকেও ঐ রীতি পালন করতে হয়।

তারপর যে-যার নিজের পাতার উপর এসে দাঁড়ায়। সুরু হয় 'সিঁদুরদান' উৎসব। বর এবং কনে নিজেদের কপালে তিনটি দাগ কাটে সিঁদুর দিয়ে—এবং পরস্পরকে কপালেও সিঁদুরের তিন-তিনটি দাগ কেটে দেয়। এবার বর-কনের উত্তরীয় একত্রে গিঁট দিয়ে বেঁধে দেওয়া হয়। দুজনে এবারে ঘরের মধ্যে যায়। যাবার সময় বর থাকবে আগে, কনে যাবে বরের পিছনে।

ঘরে ঢোকার আগে, কনের দিদিকে অবশ্য কিছু উপহার দিতে হয়, নৈলে পথ আগলে দাঁড়িয়ে থাকবে। ঘরে বসিয়ে, বর-কনেকে চিঁড়ে-গুড় খাওয়ানো হয়।

বিবাহ উৎসবের পরিসমাপ্তি।

কিন্তু, না—শেষ হয় নি। আরো কিছু অনুষ্ঠান বাকী। বিয়ের পরবর্তী অনুষ্ঠান: দা-আউ এবং তুরিং এতেল।

বরপক্ষের দুজন আর কনেপক্ষের দুজন আইবুড়ো 'কুড়ী' মাথায় কলসী নিয়ে কাছাকাছি কোন ঝর্ণা থেকে জল আনতে যাবে। ওদের সঙ্গে থাকবে 'ঘাসী'বাদ্যকর। আর ওদের পথ দেখিয়ে নিয়ে যাবে দুজন বয়স্কা মুন্ডানী। একজনের হাতে থাকবে খোলা তরোয়াল, আরেকজনের হাতে তীর-ধনুক। জলভরা শেষ হলে, তরোয়াল-ধারিণী, পেছন ফিরে নিজের কাঁধের উপর দেয়; ধনুকধারিণীকেও তাই করতে হয়। তারপর, সেই জলবাহী শোভাযাত্রার সামনে তরোয়াল ঘুরিয়ে বীরদর্পে তরোয়াল-ধারিণীকে পথ চলতে হয়। সেই জল দিয়ে বর-বধূকে স্নান করানো হয়, 'কাদাখেঁড়' করানো হয়। এরপর বরের শক্তিপরীক্ষা। একটি সুপুষ্ট 'খাসী' নিয়ে আসা হবে, তরোয়ালের এক কোপে, সেই খাসীটিকে হত্যা করতে হয় তাকে। সেই খাসীর মাংসে সহযোগেই ভোজ হবে।

ভোজের সময় বর, সকলের জন্য শাল-পাতার তৈরী এক একটি গোলাকৃতি 'পাত' দিয়ে যাবে, কনে দেবে এক একটু নুন। তারপর বর-বধূও সকলের সঙ্গে খেতে বসবে।

এরপর বিদায়-লগ্ন। এক বিচিত্র অনুষ্ঠান। কনের মা বসবেন দোরগোড়ায়। কনে এসে মায়ের দিকে পেছন ফিরে বসবে। এক কুলো ধান আসবে তখন। সেই কুলো থেকে আঁজলাভরে ধান নিয়ে—পরপর তিন-বার নিজের মাথার উপর দিয়ে মাকে দেবে সেই ধান। মা নিজের আঁচলের খুঁটে বাঁধবেন।

এই অনুষ্ঠান শেষ হলে, পাহান, মাহাতো আর পঞ্চের সামনে—কনের পিতা মেয়েকে সমর্পণ করেন বরের পিতার কাছে।

যাবার সময় দুচোখে জল ভরে কনের সখীরা এসে পথ আগলে দাঁড়াবে। ওদেরও কিছু দিয়ে, বর-কনের যাত্রা সুরু হয়,—পালকী চড়ে। ঢাক-ঢোল বেজে ওঠে গুরু গুরু গুম্ গুম্ রবে।

এরপর 'কুন্দরু' লতার মতো, সেই নববধূ,—শালগাছের মতো তার বরের গায়ে জড়িয়ে থাকবে। আর যদি, সিং বোঙা দুজনের মন ভেঙে দিতে চান, তাহলে বর কিংবা কনের যে কেউ একজন পঞ্চের সামনে একটি শালপাতা দু'টুকরো করে ছিঁড়ে দিলেই বিবাহ অসিদ্ধ হয়ে গেল। কিন্তু না,—এ ধরনের ঘটনা খুব কমই ঘটে। সিং বোঙা ওদের দাম্পত্যজীবনে কোন অশান্তির সৃষ্টি করেন না।

নাট্যবিচার প্রসঙ্গে

অজিতকুমার ঘোষ

গত কুড়ি বছর ধরে বাংলাদেশের নব-নাট্য আন্দোলনের অগ্রগতি ঘটেছে প্রধানত নাট্যপ্রতিযোগিতাকে কেন্দ্র ক'রে। এই নাট্য-প্রতিযোগিতা উপলক্ষ্যে নোতুন নোতুন নাট্যকার আত্মপ্রকাশ করেছেন, তাঁদের নানারকম ভাবনা ও নাট্যআঙ্গিক পরিকল্পনা নাটকে রূপ পেয়েছে। এসেছেন নোতুন নোতুন নাট্য-পরিচালক সেই সব নাটক প্রয়োগ করতে। মঞ্চ-আঙ্গিক ও প্রয়োগ-রীতিতে তাঁরা আনলেন চমকপ্রদ নূতনত্ব। দর্শকেরা খুশি হয়েছেন অথবা হননি, তাঁরা হাত তালি দিয়েছেন অথবা ধিক্কার জানিয়েছেন। কিন্তু এই সব নাটক ও নাট্যপ্রয়োগের যথার্থ স্বীকৃতি ও মূল্য নির্ধারিত হয়েছে শুধুমাত্র নির্ভীক ও নিরপেক্ষ নাট্যবিচারের মাধ্যমে। সাধারণ দর্শকেরও একটা বিচার আছে, কিন্তু তা শুধু ভালো লাগা অথবা মন্দ লাগা। নাট্য-বিচারককে বলতে হবে, বোঝাতে হবে, কেন ভালো লাগছে অথবা লাগছে না। তাঁকে যুক্তি দিতে হবে, বিশ্লেষণ করতে হবে এবং বস্তুনিষ্ঠ সিদ্ধান্ত ঘোষণা করতে হবে।

নাট্যাভিনয়ের বিচার দু'ভাগে হ'তে পারে। এক, সংবাদপত্রে সমালোচনার মাধ্যমে অভিনয়ের দোষ-গুণ আলোচনা করা যেতে পারে। দুই, প্রকাশ্য অভিনয় ক্ষেত্রে তাৎক্ষণিক বিচারও হ'তে পারে। আমাদের দেশে বর্তমানে বিভিন্ন সংবাদপত্রে নিয়মিত ভাবে অভিনীত নাটকের সমালোচনা প্রকাশিত হয়। যাঁরা সমালোচনা করেন তাঁরা অনেকেই সূক্ষ্মদর্শী ও বিচক্ষণ সমালোচক কিন্তু তাঁদের কাজ খুব সহজ ও নিষ্কণ্টক নয়। অভিনয়ের আগে ও পরে তাঁরা যথেষ্ট আদর-আপ্যায়ন লাভ করেন বটে, কিন্তু তাঁদের সমালোচনা যদি একটু প্রতিকূল ও কঠোর হয় তবে অনেক লাঞ্ছনাই তাঁদের ভাগ্যে জোটে। অর্থাৎ, আদর-আপ্যায়নের পরিবর্তে ঘটে কৈফিয়ত তলবে ও ভীতি-প্রদর্শনে, পরবর্তী অভিনয়ে নিমন্ত্রণ বন্ধ হয়ে যায় এবং শাস্তিমূলক ব্যবস্থা হিসাবে কাগজে বিজ্ঞাপন দেওয়াও বন্ধ হ'তে পারে।

যে-সব বিচারক নাট্যপ্রতিযোগিতা বিচার করেন তাঁদের অবস্থা সময় সময় আরও শোচনীয় ও করুণ হ'তে পারে। তাঁদের সিদ্ধান্তে যাঁরা পুরস্কারের যোগ্য বিবেচিত হন তাঁরা ছাড়া প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ-কারী আর কেউ তেমন সন্তুষ্ট হন না। কখনো তাঁদের অসন্তোষ চাপা থাকে, আবার কখনো বা প্রকাশ হ'য়ে পড়ে। ক্লান্ত হ'য়ে বাড়ি ফেরার মুখে বিচারকদের অনেক রকম বেয়াড়া ও রুক্ষ প্রশ্নে বিব্রত হতে হয় যথা, 'স্যার, আমার নাটকে কোথায় কোথায় দোষ আছে বলুন,' 'আমাদের নাটক এখানে পুরস্কার পেল না বটে, কিন্তু অমুক অমুক জায়গায় আমরা প্রাইজ নিয়ে এসেছি,' 'আমার অভিনয় আপনাদের ভালো লাগল না বটে, কিন্তু অমুক অমুক বিচারক আমার অভিনয়ের খুব প্রশংসা করেছিলেন', 'নাটকে আমরা যা বলতে চেয়েছি তা আপনারা বোধ হয় ঠিক ধরতে পারেন নি', 'আপনারা যে অমুক দলকে ফার্স্ট করবেন তা আগেই আমরা বুঝেছিলাম',—ইত্যাকার। মফঃস্বলে স্থলে পরিস্থিতি আরো গুরুতর হ'তে পারে। ফাঁকা পথে, স্টেশনে, গাড়িতে বিচারকদের ভীত-সন্ত্রস্ত করার সুযোগ অনেক বেশি। 'কেন আমাদের টিম প্রাইজ পেল না' —এর সন্তোষজনক উত্তর না দেওয়া পর্যন্ত ক্রুদ্ধ জনতার বেষ্টনী থেকে ছাড়া পাওয়া অনেক সময় শক্ত হ'য়ে ওঠে।

বিচারকের কাজ যে কত অপ্রীতিকর ও বিপজ্জনক তার কিছু নমুনা উপরে দেওয়া গেল। কিন্তু তবুও বিচারক না হ'লে চলে না, সেজন্য বিচারকদের ধন্যবাদবিহীন বিচার-কাজ চালিয়ে যেতে হয়। বিচারকের প্রতি আস্থা ও শ্রদ্ধা না থাকলে কোনো দল প্রতি-যোগিতায় অংশ গ্রহণ করতে উৎসাহ পাবে না। সেজন্য বিচারককে তাঁর ব্যক্তিত্ব, বিশ্লে-ষণীশক্তি, নিরপেক্ষতা প্রভৃতির মধ্য দিয়ে সকলের আস্থা ও শ্রদ্ধা অর্জন করতে হবে। তাঁকে এমন কতকগুলো গুণের অধিকারী হ'তে হবে যেগুলোর জন্য মনে মনে কেউ অখুশি হ'লেও বাইরে থেকে প্রতিবাদ করতে সাহস পাবে না। প্রথমত, তাঁকে নাটক ও নাট্যমঞ্চ সম্বন্ধে পুঁথিগত ও কার্যকরী বিদ্যা পরি-পূর্ণভাবে অর্জন করতে হ'বে। নাট্যআঙ্গিক ও মঞ্চআঙ্গিক সম্বন্ধে তাঁর পরিণত জ্ঞান থাকা আবশ্যক। দেশবিদেশের নাটক ও প্রয়োগরীতি সম্পর্কেও তাঁর পরিচ্ছন্ন ধারণা থাকা প্রয়োজন। দ্বিতীয়ত, তাঁকে কঠোর নিরপেক্ষতা বজায় রাখতে হবে। কেউ তাঁকে প্রশংসা করবে, কেউ বা করবে নিন্দা, কেউ প্রলুব্ধ করতে চাইবে, কেউ করবে প্রতি-রোধ। কিন্তু সব অবস্থাতেই তাঁকে অবিচল থাকতে হবে। দর্শকরা কোনো নাটক দেখে হয়তো ভাবাবেগে চালিত হ'য়ে প্রচণ্ড করতালি দ্বারা ওই নাটককে সম্বর্ধনা জানাল। তখন কিন্তু বিচারককে দেখতে হবে নাটকটির মধ্যে সস্তা হাততালির উপাদান রয়েছে না সত্যকার নাট্যগুণ রয়েছে। আবার দর্শকরা যখন কোনো নাটকের বক্তব্য সমর্থন না করতে পেরে উচ্চকণ্ঠে ধিক্কার জানায় তখনো বিচারককে খুঁটিয়ে দেখতে হবে নাটকটির মধ্যে উচ্চাঙ্গের কলাকৌশলের কোনো পরিচয় আছে কিনা। বিচারকের নিজস্ব কোনো রাজনৈতিক মতবাদ থাকতে পারে, কিন্তু সেই মতবাদ তাঁর সিদ্ধান্তকে যেন কোনোরকমেই আচ্ছন্ন না করে সে-দিকে তাঁকে কঠোরভাবে সচেতন থাকতে হবে। তাঁর নৈতিক আদর্শ ও বস্তুনিষ্ঠতা সব সময়ে অক্ষুণ্ণ রাখতে হবে। তৃতীয়ত, সংযম ও পরিমিতিবোধ বিচারকের পক্ষে একান্ত আবশ্যক। যাকে তিনি পুরস্কারযোগ্য মনে করবেন তার সম্বন্ধে অতি-রিক্ত উচ্ছ্বাস ব্যক্ত করা ঠিক নয়, আবার যাকে তিনি অযোগ্য মনে করবেন তাকেও কঠোর ভাষায় ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ করা উচিত নয়। তাঁর উদারতা ও সহানুভূতির পরিচয় পেলেই প্রতিযোগিবৃন্দ তাঁর কথাগুলি শুনবে এবং তাঁর উপদেশ অনুযায়ী নিজেদের সংশোধন করার চেষ্টা করবে। প্রতিযোগিতা চলবার সময়ে অংশগ্রহণকারী লোকেদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে মেলামেশা না করাই সঙ্গত এবং শেষ সিদ্ধান্ত জানাবার আগে কখনো কোনো বিষয়ে আলোচনা করাও উচিত নয়। অনেকে খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে বিচারকদের সিদ্ধান্তের কিছু পূর্বাভাস জানতে চায়, এ সব ক্ষেত্রে মুখ খোলা কখনই সমীচীন নয়। অনেকে বিচারকদের খুব অন্তরঙ্গ হয়ে নিজেদের সিদ্ধান্ত দ্বারা তাঁদের প্রভাবিত করবার চেষ্টা করে, যথা, 'অমুক দলই তো ফার্স্ট হচ্ছে, কি বলেন', অমুক ব্যক্তিই যে 'শ্রেষ্ঠ অভিনেতার পুরস্কার পাবে একথা তো সকলেই বলাবলি করছে' ইত্যাদি। এই সব অন্তরঙ্গ উপদেষ্টার কাছ থেকে বিচারকদের দূরে থাকাই নিরাপদ। চতুর্থত, বিচারককে

পুরস্কার সিম্থান্ত জানালেই চলবে না, তাঁকে ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণও করতে হবে। তিনি কেন এক জায়গায় পুরস্কার দিলেন, এক জায়গায় দিলেন না তার কারণ তাঁকে ব্যাখ্যা করতে হবে। এই ব্যাখ্যা শুনলে যাঁরা পুরস্কার পেলেন না তাঁরা সন্তুষ্ট হবেন এবং তাঁদের দোষত্রুটি সংশোধন করতে উৎসাহ বোধ করবেন। এর ফলে নাটক ও অভিনয়ের মান উন্নত হবে এবং নাট্য-আন্দোলনের সামগ্রিক কল্যাণ সাধিত হবে। প্রতিযোগিতার শেষে পুরস্কার বিতরণের আগে সমস্ত দলের নাটক, নাট্যপ্রয়োগ ও অভিনয়ের বিশদ আলোচনার রীতি আমরা প্রবর্তন করেছি, এবং এই রীতি সর্বত্র অভিনন্দিত হয়েছে। সব জায়গাতেই দেখেছি দর্শকবৃন্দ নাট্য-আলোচনা শোনার জন্য অনেক রাত্রি পর্যন্ত প্রবল আগ্রহ নিয়ে অপেক্ষা করেছে। এই আলোচনার ফলে বিচারকগোষ্ঠীর সঙ্গে দর্শকসমাজের পারস্পরিক বিশ্বাস এবং অন্তরঙ্গতা গড়ে ওঠে এবং নাট্যকলা সম্পর্কে দর্শকদের জ্ঞানের পরিসর অনেকখানি বেড়ে যায়।

নাটকের বিচার-পদ্ধতি কিরূপ এবং কিভাবে বিচারকরা তাঁদের সিম্থান্তে উপনীত হন তা' এবার আলোচনা করা যাক। প্রথমেই নাটক নির্বাচনের কথা। আমরা সব সময়েই মৌলিক নাটককেই অগ্রাধিকার দিয়ে থাকি। নাট্য-প্রতিযোগিতার উদ্দেশ্য হওয়া উচিত নোতুন নোতুন নাটক ও নাট্য-প্রয়োগরীতির উদ্ভবে সাহায্য করা। যদি প্রতিষ্ঠাবান নাট্যকারদের বহু-অভিনীত নাটকগুলিই বার বার অভিনীত হয় তা' হলে নবীন নাট্যকারগণ নাটক লিখতে উৎসাহ পাবেন কি ক'রে? আর একটি কথা। অল্প কয়েকজন ব্যক্তিই বিভিন্ন প্রতিযোগিতায় বিচারকের কাজ করে থাকেন। বহু-অভিনীত নাটকগুলির বার বার অভিনয় দেখে তাঁরা বিরক্ত হয়ে পড়েন এবং কোনো জায়গায় নোতুন ক'রে ওই সব নাটকের অভিনয় দেখতে তাঁরা উৎসাহ বোধ করেন না, অভিনয় ও প্রয়োগরীতির উৎকর্ষও তাঁদের বেশি আকর্ষণ করে না। স্থানীয় নাট্যচিন্তাশীল ব্যক্তিদের দ্বারা নাটক লিখিয়ে সেই সব নাটক নিয়ে প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হওয়া উচিত। বিষয়বস্তুর বৈচিত্র্য, সমস্যার নূতনত্ব সকলকেই আকর্ষণ করে, এমন কি বিচারকদেরও। নাটক নির্বাচনের সময় এমন নাটক নির্বাচন করতে হবে যার ভূমিকাগুলিতে অভিনয় করার মত যোগ্য চেহারা ও ক্ষমতাসম্পন্ন লোক দলে আছে। দলের সদস্যদের দিকে দৃষ্টি রেখেই সব সময়ে নাটক নির্বাচন করা উচিত। বিদেশী নাটক নিয়ে অনেক দল প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণ করেন। সেই সব জোরালো নাটকে অভিনয় ও প্রয়োগনৈপুণ্য দেখাবার সুযোগ আছে বটে, কিন্তু মনে রাখতে হ'বে নাটক নির্বাচনের কৃতিত্ব বিচারে মৌলিক নাটক অপেক্ষা এ-সব বিদেশী নাটকের কম মূল্য দেওয়া হ'লে থাকে। অনেক দল আবার বিদেশী নাটকের চরিত্র ও পরিবেশের নাম বদল ক'রে তাকে দেশী রূপ দিয়ে অভিনয় করেন। বহু জায়গায় মূল নাটকের কোনো স্বীকৃতি থাকে না। তবে বিচারকগণ অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এই কারচুপি ধরে ফেলেন এবং বলা বাহুল্য এ-সব জায়গায় নাটকের কৃতিত্ব খুব সামান্য বলেই বিবেচিত হয়। নাটক-বিচারে বস্তু-গঠনকৌশল, চরিত্রসৃষ্টির ক্ষমতা, সংলাপ-রচনাচাতুর্য, বক্তব্যের উপস্থাপনারীতি, সংগতি, পারম্পর্য, স্বাভাবিকতা, সব কিছুই বিবেচনা করা হ'য়ে থাকে। নাটকবিচারের পর আসে অভিনয়বিচার। এই অভিনয়-বিচারে বিচারকদের একটু মুশকিলে পড়তে হয়। কোনো কোনো প্রতিযোগিতায় শ্রেষ্ঠ অভিনেতা, সহ-অভিনেতা ও টাইপ অভিনেতার জন্য পুরস্কার নির্দিষ্ট থাকে। আবার কোনো কোনো জায়গায় প্রথম অভিনেতা, দ্বিতীয় অভিনেতা ও টাইপ অভিনেতার জন্য পুরস্কার ধার্য থাকে। মুশকিল হল সহ-অভিনেতা নির্ধারণে। একাঙ্ক নাটক-গুলিতে, বিশেষ ক'রে জনতাপ্রধান নাটক-গুলিতে কে প্রধান অভিনেতা এবং কে সহ-অভিনেতা তা নির্ণয় করা কঠিন। একজন বিচারক প্রধান অভিনেতা ভেবে যাকে নম্বর দিলেন, অন্য আর একজন তাকে হয়তো সহ-অভিনেতা ভাবলেন। সেজন্য সহ-অভিনেতার জন্য পুরস্কার নির্দিষ্ট না রেখে শ্রেষ্ঠ অভিনেতা এবং দ্বিতীয় অভিনেতার জন্য পুরস্কার নির্দিষ্ট রাখলেই ভালো হয়। টাইপ অভিনেতা নির্ণয় করা অপেক্ষাকৃত সহজ। সে চরিত্রের মধ্যে বিশেষ কোনো কথা, ক্রিয়া ও আচরণের পৌনঃপুনিকতা লক্ষ্য করা যায়, দৈহিক অথবা মানসিক উদ্ভট্টত্ব অথবা বিকৃতি দেখা যায় তাই হ'ল টাইপ চরিত্র। প্রধানত কৌতুকরস-সৃষ্টিই টাইপ চরিত্রের উদ্দেশ্য। অভিনেতার কৃতিত্ব বিচারে তার চেহারার উপযোগিতা, আঙ্গিক ও বাচিক অভিনয়নৈপুণ্য সব কিছুই বিচার করা হয়। আজকাল চড়া সুরে অভিনয়ের দিকে একটা প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়। এ-ধরনের অভিনয় কিছুক্ষণ পরেই একঘেয়ে ও ক্লান্তিকর মনে হয়। উচ্চারণের স্পষ্টতা ও বিশুদ্ধির দিকেও আজকাল তেমন যত্ন নেওয়া হয় না। দ্রুত অভিনয়ে উচ্চারণ প্রায়ই অস্পষ্ট ও দুর্বোধ্য হয়ে পড়ে। 'ড'-এর প্রবণতা, 'র'কে 'ড়' এবং 'ড়'কে 'র'-এর মত উচ্চারণের ঝোঁক প্রভৃতি আজকের অভিনয়ে ব্যাপকভাবে লক্ষ্য করা যায়। আবেগ ও রসসৃষ্টিতে সক্ষম হ'লেও অনেক অভিনেতা উচ্চারণদোষের জন্য পুরস্কার লাভে বঞ্চিত হন। হঠাৎ কোনো ভুল কথা বলে ফেলা কিংবা চলাফেরা যদি কোনো জায়গায় একটু আড়ষ্ট ও বাধাপ্রাপ্ত হয়ে যায় তা' হ'লে সমগ্র অভিনয়কৃতিত্বই নষ্ট হ'য়ে যেতে পারে। অভিনেত্রীর অভিনয়কৃতিত্ব বিচার করা অনেক সহজ ব্যাপার। বহু একাঙ্ক নাটকে কোনো স্ত্রীভূমিকাই থাকে না। কোনো কোনো নাটকে থাকলেও একটি কিংবা দুটির বেশি থাকে না। স্ত্রী ভূমিকাগুলি সাধারণত সু-অভিনীত হ'য়ে থাকে, কারণ প্রায়ই দেখা যায়, আধা-পেশাদার অভিনেত্রীরাই স্ত্রী-ভূমিকায় অভিনয় ক'রে থাকেন। বহু-অভিনয়ের ফলে অভিনয়ে স্বাভাবিক পটুতাই তাঁদের এসে যায়। তবে দলগুলি যদি নিজেদের সদস্যাদের মধ্য থেকে নোতুন নোতুন অভিনেত্রী গ'ড়ে তোলেন তবেই ভালো হয়। টাকা দিয়ে অভিনেত্রী এনে তাঁদের দিয়ে অভিনয় করানোর মধ্যে কৃতিত্ব কোথায়?

দলগত অভিনয়নৈপুণ্য, দৃশ্যসজ্জা, আলোকসম্পাত, নেপথ্য শব্দ ও সংগীত-প্রয়োগ, রূপসজ্জা প্রভৃতির কৃতিত্ব পরিচালকের। পরিচালকের যোগ্যতা বিচারে ওই মঞ্চ-আঙ্গিকগুলির প্রয়োগ-নৈপুণ্য বিবেচনা করা হয়। আধুনিক বাস্তবধর্মী নাটকে দলগত অভিনয়নৈপুণ্যের দিকে বিশেষ নজর দেওয়া হচ্ছে। চলাফেরা নিখুঁত জ্যামিতিক নিয়মে নিয়ন্ত্রণ করা হচ্ছে এবং একসঙ্গে বহু লোকের বিচিত্র ক্রিয়াকলাপ মঞ্চে দেখানো হচ্ছে।

নিখুঁতভাবে পার্ট মুখস্থ ক'রে দ্রুত লয়ে অভিনয়ের দিকে বর্তমানে অভিনেতাদের ঝোঁক দেখা যায় ব'লে দলগত অভিনয়-নৈপুণ্যে নাটকের মধ্যে যথেষ্ট গতিবেগ সঞ্চারিত হয়। অভিনেতাদের পারস্পরিক বোঝাপড়া কেমন হবে এবং কখন কার 'অ্যাকশান' কিরকম হবে তা' ঠিক করেন পরিচালক। দৃশ্যসজ্জা, আলোকসম্পাত, শব্দপ্রক্ষেপ, রূপসজ্জা প্রভৃতি প্রয়োগের সম্পূর্ণ দায়িত্ব পরিচালকের। এ-সব আঙ্গিক নিয়ন্ত্রণ করেন সাধারণত পেশাদার অথবা আধা পেশাদার কলাকুশলীবৃন্দ। তাঁরা শুধু নির্দেশমত কাজ করেন, তাঁদের নিজস্ব কোনো চিন্তা ও পরিকল্পনা প্রায়ই থাকে না। সুতরাং এ-আঙ্গিকগুলি প্রয়োগের সাফল্য অথবা অসাফল্য সম্পূর্ণ পরিচালকের। প্রতিযোগিতায়, বিশেষ ক'রে একাঙ্ক নাটক প্রতিযোগিতায় দৃশ্যসজ্জার জটিলতা না থাকাই ভালো। কারণ প্রতিযোগিতায় প্রতিদিন একাধিক নাটকের অভিনয় হয়। একটি নাটকের পর আর একটি নাটকের দৃশ্য সাজাতে যদি খুব বেশি দেরি হয় তা' হ'লে দর্শকদের সঙ্গে বিচারকদেরও ধৈর্যচ্যুতি ঘটে। বহুক্ষণ ধ'রে হাই তুলে তুলে অপেক্ষা করবার পর হয়তো এমন একটি জবরজঙ্গ দৃশ্য দেখা গেল নাটকে যার কোনো প্রয়োজনই নেই। স্বল্পস্থায়ী নাটকের জন্য দৃশ্যসজ্জা যতদূর সম্ভব সরল ও ইঙ্গিতবহ হওয়াই উচিত। দৃশ্যসজ্জায় বস্তুসম্ভারের আধিক্য অপেক্ষা পরিচ্ছন্ন, কল্পনাগ্রাহ্য প্রয়োগই অধিকতর কাম্য। আলোক সম্পাতের চাতুর্য আজকাল অনেক নাট্যপ্রয়োগের ক্ষেত্রেই দেখা যায়। তবে দেখতে হবে আলোকসম্পাত যেন নাটকের অনুবর্তী না হ'য়ে অনুবর্তী হয়। নিজস্ব আলোর যাদু দেখিয়ে সাধারণ দর্শক-

দের ভোলানো যায়। কিন্তু বিচারকদের ভোলানো শক্ত। অকারণ আলোর কেরামতি একেবারেই অসহ্য। অনেক অনভিজ্ঞ আলোকনিয়ন্ত্রণকারী অকারণে বারে বারে আলো একবার জ্বালে, একবার নেভায়। এসব ক্ষেত্রে পরিচালক সম্পর্কে বিরূপ বিচারকদের ধারণা খুবই বিরূপ হয়ে পড়ে। আজকাল নেপথ্য-সঙ্গীতের ব্যবহার প্রায় উঠেই যাচ্ছে। সঙ্গীত থাকলেও তা টেপ রেকর্ডে ধরা থাকে, কিন্তু সেই রেকর্ডে ধরা গান জীবন্ত কণ্ঠনিঃসৃত গানের মত কখনই স্বাভাবিক হয় না। নাটকের বিভিন্ন অংশে হঠাৎ চমক ও উত্তেজনা সৃষ্টি করতে এবং দর্শকদের মনকে আচমকা আঘাতে নাড়া দেবার জন্য যন্ত্রবাহিত নানা রকম শব্দ সৃষ্টি করা হয়ে থাকে। এই সব শব্দপ্রয়োগ সম্বন্ধে একটি মাত্র বক্তব্য আছে এবং তা হচ্ছে এই যে, শব্দপ্রয়োগ যেন মাত্রাছাড়া গোলমাল না হয়। হঠাৎ অতিরিক্ত জোরালো শব্দ কানের পক্ষে পীড়াদায়ক এবং তা রসবোধেও আঘাত হানে। রূপসজ্জায় চমকপ্রদ কিছু দেখাবার সুযোগ আজকালকার নাটকে খুব কম। ঘরোয়া পারিবারিক নাটক অথবা বাস্তবধর্মী শ্রেণীসংগ্রামমূলক নাটকে রূপসজ্জার তেমন কোনো প্রয়োজন হয় না। তবুও চরিত্রের বৈশিষ্ট্য ফুটিয়ে তোলার জন্য অনেকভাবে কিছুটা বাড়াবাড়ি করা হয়ে থাকে — বিশেষ দাড়ি, গোঁফ, চুল, ও অন্যান্য কিছুর ভূমিকা আপনা আপনিই হয়। কোনো কোনো পরিচালক কিছুটা রূপসজ্জা ব্যবহার করতে চান না। ... এক সময় ... বাস্তব ... অনুকরণ ... বাস্তব।

... যে সব বিষয়ে নির্বাচিত হয় সে সম্বন্ধে অনেকের ধারণা খুব স্পষ্ট নয়। নাট্যাভিনয়ের সব বিভাগে যে দল সর্বাপেক্ষা বেশি কৃতিত্ব দেখাতে পারে সেই দলই শ্রেষ্ঠ দলরূপে স্বীকৃতি পায়। অর্থাৎ, নাটকনির্বাচন, অভিনয়, মঞ্চ ও আলোর প্রয়োগ সব বিভাগেই কৃতিত্ব দেখাতে হবে, তবেই শ্রেষ্ঠ দলরূপে নির্বাচিত হবার সম্ভাবনা থাকে। বলা বাহুল্য, নাট্যপ্রতিযোগিতার শ্রেষ্ঠ পুরস্কার হ'ল, এই শ্রেষ্ঠ দলরূপে স্বীকৃত হওয়া।

প্রতিদিনকার নীরব বিচারকদের সিদ্ধান্ত দর্শকরা জানতে পারে প্রতিযোগিতার শেষ দিনে। কিন্তু সেই সিদ্ধান্তের আগে বিচারকরা অনেক খুঁটিয়ে দেখেছেন, অনেক ভেবেছেন, অনেক তর্কবিতর্ক করেছেন। বিচারকদের মধ্যে যে মতভেদ হয় না তা নয়, খুবই হয়। কেউ হয়তো কোনো অভিনয় দেখে খুশিতে আত্মহারা হ'য়ে সত্তর নম্বর দিলেন, আবার কোনো উন্নাসিক বিচারক কিছুতেই সন্তুষ্ট হন না, তিনি দিলেন চল্লিশ। বিচারকদের এই মতভেদ এবং নম্বরের গুরুতর ব্যবধান দূর করা যেতে পারে যদি বিচারকরা সিদ্ধান্ত ঘোষণার আগে একবার নিজেদের মধ্যে আলোচনা করে নেন। আলোচনার সময় প্রত্যেকেই আত্মপক্ষ সমর্থন করবেন এবং অপরকে প্রভাবান্বিত করতে চেষ্টা করবেন। অবশেষে সকলের যুক্তি বিবেচিত হবার পরে একমতে পৌঁছনো সম্ভব হয়। আমার পরলোকগত অভিন্নহৃদয় বন্ধু ডঃ সাধনকুমার ভট্টাচার্যের সংগে অনেক বিষয়েই গুরুতর মতভেদ ঘটত এবং উভয়েই ঘোর তর্কবিতর্কের পর একে অন্যের যুক্তি স্বীকার করে সিদ্ধান্তে উপনীত হতাম। বিচারকদের মধ্যে কোনো কোনো ক্ষেত্রে মতভেদ ঘটলেও বাইরের দর্শক ও প্রতিযোগিদের ... তা কখনো জানতে দেওয়া উচিত নয়। অনেক সময় প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণকারী ব্যক্তিগণ কোন বিচারক কাকে কত নম্বর দিয়েছেন তা জানতে উৎসুক হন। এই ঔৎসুক্য অবাঞ্ছনীয় এবং নম্বরের তারতম্যের কথা বিচারকদের পক্ষে কখনো বাইরের লোককে বলা উচিত নয়। অভিনেতাদের পক্ষে যেমন, বিচারকদের পক্ষেও তেমনি টিমওয়ার্ক একান্ত প্রয়োজনীয়।

চিত্র-সমালোচনা

বেকার জীবন ও কালো পথ

আমি, আপনি, রাজ্য সরকার এবং কেন্দ্রীয় সরকার—সকলেই জানি, পশ্চিমবঙ্গের সবচেয়ে গুরুতর সমস্যাটি কি? চোখ চাইলেই দেখতে পাওয়া যায়, আমাদের সুস্থ, সবল, কর্মক্ষম ছেলেরা কর্মহীনতার অভিশাপে ভুগছে—হাজার হাজার নয়, লাখ লাখ ছেলে বেকার হয়ে বসে আছে। এবং এদের মধ্যে আছে উচ্চ শিক্ষিত সাধারণ ভাবে শিক্ষিত, অর্ধ-শিক্ষিত এবং অশিক্ষিত। আছে আট দশ বছরের অশিক্ষিত বা অ-আ-ক-খ পড়া ছেলে থেকে বি-এ, এম-এ, বি-এস-সি, এম-এস-সি পাশ বিশ, বাইশ, চব্বিশ, ছাব্বিশ বছর বয়স্ক যুবক পর্যন্ত। এমন কোনো রাস্তা এদের সামনে খোলা নেই, যে পথে চললে এরা সৎভাবে জীবিকা উপার্জন করে নিজেদের এবং এদের উপর নির্ভরশীল পরিবারের গ্রাসাচ্ছাদনের ব্যবস্থা করতে পারে। সুস্থ, সবল দেহ থাকা সত্ত্বেও কর্মহীন হয়ে থাকার যন্ত্রণার সঙ্গে নিজের এবং আশ্রিতদের ক্ষুধার তাড়না মিশে এদের এক বৃহৎ অংশকে করে তুলেছে বেপরোয়া, মরীয়া। 'যেন তেন প্রকারেণ' নিজেকে কর্মব্যস্ত রাখতে হবে এবং টাকা রোজগারের ব্যবস্থা করতে হবে—এই সংকল্পে তাদের টেনে নামিয়ে নিয়ে যায় কালো পথে, যে-পথে চলার দরুণ তাদের আমরা 'সমাজবিরোধী' আখ্যায় ভূষিত করেছি। এদেরই একটি দল আজ চিৎপুর, শালিমার প্রভৃতি রেল-ইয়ার্ডে মালগাড়ী ভেঙে মাল পাচার করবার কাজে মেতে উঠেছে। এদের নাম হয়েছে 'ওয়াগন-ব্রেকার'। এবং এদের অত্যাচার থেকে মালগাড়ীগুলিকে বাঁচানোর জন্যে রেলরক্ষী পুলিশবাহিনীর সৃষ্টি হয়েছে। পাহারাদার এই রেলরক্ষী পুলিশবাহিনীর সঙ্গে এদের সংঘর্ষ লেগেই আছে এবং ফলে এদের দলের কিছু লোক কখনও সখনও ধরা পড়ে; কিন্তু বেশীরভাগ লোকেই পালাতে গিয়ে আহত বা নিহত হয়।

যেমন নিহত হয়েছে এম, এল, প্রোডাকসন্স নিবেদিত "আটাত্তর দিন পরে"র নায়ক ফটিক। বিধবা মা, পড়াশুনা-করা ছোট ভাই ও নিজে—এই তিনের ছোট্ট সংসারটিকে জয়ন্তী মিলের সাধারণ কর্মী ফটিক সামান্য মাইনেপত্তরের সাহায্যে কোনোক্রমে টেনে নিয়ে চলেছিল। কিন্তু বিনা মেঘে বজ্রাঘাতের মতো কারখানা বন্ধ হওয়ায় ফটিকের ওপর এল বরখাস্তের নোটিশ। অভাবের কালো ছায়া নেমে এল সংসারে। দিশেহারা ফটিক তার অনুচর কার্তিক ও কয়েকজন ছেলেকে সঙ্গী করে ওয়াগন ব্রেকারের দল

জীবন সৈকতে অপর্ণা সেন ও সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়। পরিচালনা : স্বদেশ সরকার। প্রযোজনা : রাধারাণী পিকচার্স। —ফটো : অমৃত

প্রেক্ষাগৃহ

গড়ে বসল। এই কাজে পিছন থেকে ইন্ধন জোগাবার লোকের অভাব হল না। ওদের এই কাজ থেকে মুনাফা লোটবার জন্যে লংকা মুখুজ্জে ওদের খরচার টাকা যুগিয়ে যায়।

লক-আউট-করা জয়ন্তী মিলের গেটের সামনে ইউনিয়ন-নেতা হেমন্তের উৎসাহে অনশন- ধর্মঘট চলছিল। হেমন্ত ফটিকের সমাজবিরোধী কাজকে কোনোদিনই সমর্থন করতে পারেনি। এই নিয়ে দুজনের মধ্যে প্রায়ই কথা কাটাকাটি হত। দুজনের বিরোধের আর একটি উপলক্ষ্যও ছিল; সে হচ্ছে ঝন্টি—কুঞ্জবুড়োর মেয়ে। বাল্যে ঝন্টি ফটিকের খেলার সাথী ছিল। কিন্তু বয়ঃপ্রাপ্তা ঝন্টি যখন দেখল, ফটিক অন্ধকারপথের যাত্রী, তখন থেকে সে তার সংস্রব ত্যাগ করে চলতে চাইল। ফটিকের এটা সহ্য হল না; কারণ সে ঝন্টিকে ভালোবেসে ফেলেছে। তাই কুঞ্জবুড়ো যেদিন মারা গেল, সেদিন ফটিকই তাকে আশ্রয় দিতে চাইল এবং ঝন্টিকেও অনেকটা ভয়ে ভয়েই তার আশ্রয় গ্রহণ করতে হল ফটিকের প্রতি মনে মনে ঘৃণার ভাব থাকা সত্ত্বেও। ফটিকের আশ্রয়ে এসে ঝন্টি ফটিকের ভাইয়ের মধ্যে যেন তার মনের দোসরকে খুঁজে পেল।—আর ফটিক! একদিকে ঝন্টি চায়, সে সংভাবে মানুষের মতো জীবন যাপন করুক, অন্যদিকে মা চান, সংসার চালাবার জন্যে টাকা—অসুস্থ ছোট ভাইয়ের চিকিৎসার জন্যে টাকা। না, তবু সে আর অন্যায় পথে চলবে না; সে নিজেকে সৎ প্রতিপন্ন করে ঝন্টিকে বিবাহ করে সুখী জীবন যাপন করতে চায়। কিন্তু অভাবের তাড়না, লংকা মুখুজ্জের প্ররোচনা এবং সমাজবিরোধী কাজের শত্রু—রেলপুলিশের বন্দুকের গুলী—সবে মিলে ফটিকের সুখী জীবনের স্বপ্নকে কেমন করে ধূলিসাৎ করে দিল, তাই নিয়েই 'আটাত্তর দিন পরে' ছবির শেষ দৃশ্যগুলি গড়ে উঠেছে।

ছবিটিতে ওয়াগন-ব্রেকারের কাজকে সমাজবিরোধী এবং অন্যায় বলে ইউনিয়ন-লীডার হেমন্ত, ঝন্টি প্রভৃতির মুখ দিয়ে বহু উপদেশাত্মক কথা বলা হয়েছে, কিন্তু কর্মহীন বেকার যুবকেরা সংভাবে জীবন যাপন করবার কোন্ খোলা রাজপথে চলবে, তার কোনো ইংগিত নেই। কারণ সেই শুভ পথের সন্ধান যদি আমরা জানতুম, তাহলে হয়ত এই ছবি তৈরী করবার প্রয়োজনই হত না। তাই, 'আটাত্তর দিন পরে' ছবিটি হয়েছে বর্তমানের বিভ্রান্ত যুবসমাজের অসহনীয় জীবনযন্ত্রণার একটি বাস্তব চিত্র।

ছবির গঠনের মধ্যে বেশ কিছুটা ত্রুটি আছে। ছবিতে অদৃশ্য মিলমালিক তিন মাসের ওপর লক আউট-এর পরে হঠাৎ মিল খোলবার তাগিদ অনুভব করলেন কেন, যে শ্রমিকেরা এই লক-আউটের বিরুদ্ধেই অনশন ধর্মঘট করে, হঠাৎ তাদেরই সরিয়ে দেবার জন্যে ফটিকের দলকে বোমা প্রভৃতি ছোঁড়বার জন্য নিয়োজিত করা হল কেন প্রভৃতি প্রশ্নের কোনো সদুত্তর ছবিতে নেই। এসব যেন মাত্র ঘটনার জন্যেই ঘটনা। একদিকে ঝন্টি, অপরদিকে সংসারের অভাব—এই দুই বিপরীত শক্তির মধ্যে দ্বিধাগ্রস্ত ফটিককে নিয়ে ঢের বেশী মর্মস্পর্শী পরিস্থিতি সৃষ্টিরও অবকাশ ছিল। এই দ্বন্দ্বের শিকার হয়েই ফটিক শেষপর্যন্ত প্রাণ হারালেও পরিচালক কিন্তু বাস্তবের কাঠিন্যের মধ্যেই বিচরণ করেছেন—দর্শকের মর্ম ছোঁবার চেষ্টা করেন নি।

অভিনয়ে নিঃসন্দেহে নায়ক ফটিকের ভূমিকায় সমিত ভঞ্জ প্রাপ্ত সুযোগের যথাসম্ভব সদ্ব্যবহারের চেষ্টা করেছেন। ঝন্টির কাছ থেকে সংপথে বিচরণ করবার প্রেরণা লাভের পরমুহূর্তেই মার মুখ থেকে 'যেখান থেকে যেমন করে হোক টাকা আনবার তাগিদ' শুনে ফটিকের উভয় সংকট সম্পর্কে মনোভাব দীর্ঘ দিন মনে রাখবার মতো। আবার যখন ফটিক তার ভাইয়ের মুখ থেকে স্বীকারোক্তি শোনে যে, সেই ঝন্টির হবু-সন্তানের জনক, তখন তার অন্তরের বিচিত্র প্রতিক্রিয়া যেভাবে শ্রীভঞ্জ অভিব্যক্ত করেছেন, তাও তাঁর নাট-নৈপুণ্যের সার্থক-পরিচায়ক। নায়িকা ঝন্টির চরিত্রের ব্যথা, বেদনা, সহনশীলতা, নিরুচ্চার প্রেম ঘৃণা প্রভৃতি সকল ভাবই জয়া ভাদুড়ীর অভিনয় মাধ্যমে পরিস্ফুট হয়েছে। ফটিকের দোসর কার্তিকের ভূমিকায় চিন্ময় রায় তাঁর বাচন ও মুখমন্ডলের অভিব্যক্তি দ্বারা দর্শকমাত্রেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করবেন। ইউনিয়ন-লীডার হেমন্ত বেশে অনুপকুমার বলিষ্ঠ বাচনের মাধ্যমে চরিত্রটিকে একটি বাস্তব রূপ দিতে সক্ষম হয়েছেন। কুঞ্জর কাছ থেকে হাজার টাকার পাওনাদার ও ঝন্টির প্রতি লোভাতুরের ভূমিকায় মনীশ রায় একটি বিচিত্র টাইপের সৃষ্টি করেছেন। ফটিকের বিধবা মায়ের ভূমিকায় বিগত যুগের প্রথিতযশা অভিনেত্রী চন্দ্রাবতী একটি জীবন্ত চরিত্র রূপায়িত করেছেন। হেমন্তর পিসিমার চরিত্রটি সমগ্র কাহিনীতে বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। কোনো কোনো নারীর কাছে জীবন-দর্শন কত স্বচ্ছভাবে প্রতিভাত হয় তারই এক বিচিত্র নিদর্শন হচ্ছে পিসিমা। এবং এই মধুর চরিত্রটি মধুরতরভাবে চিত্রিত হয়েছে তিত্রিশ ও চাল্লিশ দশকে বাঙলা চলচ্চিত্র-

সুচিত্রা সেন ফরিয়াদ চিত্রের নায়িকা। পরিচালনা ঃ বিজয় বসু।

জগতের জনপ্রিয় নায়িকা ভারতী দেবী দ্বারা। লক্ষ্য মুখুজ্জেরূপে কালী বন্দ্যোপাধ্যায় এবং ফটিকের ভাইয়ের চরিত্রে ভাস্কর চৌধুরীর অভিনয় চরিত্রানুযায়ী যথাযথ। ছবিটিতে আরও বহু ছোট ছোট চরিত্র আছে ইতস্তত ছড়িয়ে। এইসব চরিত্রে শিল্পীরা প্রয়োজনানুযায়ী কর্তব্য সম্পাদন করেছেন।

ছবির কলাকৌশলের বিভিন্ন বিভাগের কাজ মধ্যম পর্যায়ের। ছবিতে বহু বহির্দৃশ্য আছে—দিন ও রাত্রির। রাত্রির দৃশ্যগ্রহণে ক্যামেরাম্যান বিজয় দে যথেষ্ট দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন। ঘরের বাইরের কিছু কিছু শট ব্যঞ্জনাধর্মী। ছবির সম্পাদনায় গোবিন্দ চট্টোপাধ্যায় সুন্দরভাবে ছবির গতিকে বজায় রেখেছেন। ছবির গানগুলি সুগীত ও সুগৃহীত। তবে "ননদ গো তোর ভাই কোন্ বিদেশে" গানের উৎপত্তিস্থল না দেখিয়ে ওটিকে আবহসংগীতরূপে প্রয়োগ করার সমীচীনতা সম্পর্কে প্রশ্ন উঠতে পারে।

বর্তমান পশ্চিমবঙ্গের যুবসমাজের এক অংশের জীবনযন্ত্রণার অতিবাস্তব চিত্র হচ্ছে 'আটাত্তর দিন পরে'। —নান্দীকর

স্টুডিও থেকে

শর্মিলা

গত ৪ অক্টোবর ক্যালকাটা মুভিটোন স্টুডিয়োতে দেবনারায়ণ গুপ্ত রচিত 'শর্মিলা' ছায়াছবির শুভ মহরত অনুষ্ঠিত হয়েছে। এবং ছবির কাজও পুরোদমে শুরু হয়েছে সঙ্গে সঙ্গে। ছবিটির পরিচালন দায়িত্ব সুনীল ঘোষের এবং চিত্রনাট্য রচনাও তাঁর। নামভূমিকায় আছেন কৃষ্ণা বসু, নায়ক শুভেন্দু চট্টোপাধ্যায়। অন্যান্য ভূমিকায় হারাধন বন্দ্যোপাধ্যায়, পদ্মা দেবী, শৈলেন মুখোপাধ্যায়, বাসন্তী চট্টোপাধ্যায়, দিলীপ রায়, কণিকা মজুমদার, রবি ঘোষ ও অন্যান্য শিল্পীবৃন্দ। সংগীত, আলোকচিত্র, সম্পাদনা ও শিল্পনির্দেশনায় যথাক্রমে আছেন—সুধীন দাশগুপ্ত, সুনীল চক্রবর্তী, অনিল সরকার, অমিতাভ বর্ধন। পরিচালক ঘোষ একটানা সুটিং করলেন তিন দিন দিলীপ রায়, কণিকা মজুমদার ও কৃষ্ণা বসুকে নিয়ে। এ মাসের শেষে আবার পুরোদমে সুটিং চলবে।

বসন্ত বিলাপ

দীনেন গুপ্তের আগামী ছবি 'বসন্ত বিলাপ'। বিমল করের কাহিনী অবলম্বনে চিত্রনাট্য রচনা করেছেন শেখর চাটার্জী। বিভিন্ন ভূমিকায় রয়েছেন সৌমিত্র চাটার্জী, অপর্ণা সেন, চিন্ময় রায়, রবি ঘোষ, কণিকা মজুমদার, সুমিত্রা মুখার্জী ও কাজল গুপ্ত। সুর সংযোজনায় রয়েছেন সুধীন দাশগুপ্ত। কালী পূজার দিন থেকে এ ছবির নিয়মিত চিত্র গ্রহণ শুরু হচ্ছে।

ফরিয়াদ :

অমর কথাশিল্পী তারাশংকর রচিত 'ফরিয়াদ' এই সপ্তাহে বিশিষ্ট বাঙলা চিত্রে মুক্তি। বিশ্ববন্দিতা শিল্পী সুচিত্রা সেন এই চিত্রের নায়িকা। বিজয় বসু ছবিটি পরিচালনা করেছেন। পরিচালকের সহযোগিতায় চিত্রনাট্য রচনা করেছেন প্রখ্যাত কথাসাহিত্যিক সমরেশ বসু। সুরযোজনা করেছেন নচিকেতা ঘোষ।

'ফরিয়াদ' এক নির্যাতিতার কাহিনী। লালসার অক্টোপাশে বাঁধা একটি মুখোশ-জীবন। সুরা নাচ গানের আড়ালে একটি অশ্রুময় ইতিহাস।

'ফরিয়াদ' ছবিতে অভিনয় করেছেন উৎপল দত্ত, বিকাশ রায়, পার্থ মুখার্জি, চন্দ্রাবতী, আনন্দ মুখার্জি, বঙ্কিম ঘোষ, সোম মুখার্জি।

মিনার, বিজলী, ছবিঘরে ছবিটি মুক্তিলাভ করেছে।

জিন্দগী জিন্দগী'-পরিচালক তপন সিংহ ও ওয়াহিদা রহমান। —ফটো : অমৃত

মঞ্চাভিনয়

ফেরারী ফৌজ : দেন্ট্রাল [illegible] অফিস রিক্রিয়েশন ক্লাবের শিল্পীরা সম্প্রতি 'কলামন্দিরে' উৎপল দত্তের 'ফেরারী ফৌজ' নাটকটি সাফল্যের সঙ্গে পরিবেশন করেছেন। শিল্পীদের সামগ্রিক অভিনয়দক্ষতায় নাটকটির প্রযোজনা বিশেষ মনোজ্ঞ হয়ে ওঠে।

চরিত্রচিত্রণে যাঁরা বিশেষভাবে কৃতিত্বের দাবী রাখেন তাঁরা হোলেন, অশোক মজুমদার (নীলমণি), দেবেশ রায় (অশোক), অজিত রায়চৌধুরী (হিরেন), [illegible] (জ্যোতির্ময়), দীপক গুপ্ত (প্রবীর), দিলীপ মিত্র (মহেন্দ্রবাবু), কানন সেনগুপ্ত (দেবব্রত), দুলাল সরকার (জীবন), মমতা চ্যাটার্জি (মা)। তাছাড়া বিশ্বজিৎ কেয়া তার প্রাণবন্ত অভিনয়ে দর্শকদের একেবারে অভিভূত করে দিয়েছে।

নাটকটির নির্দেশনায় মুন্সিয়ানার পরিচয় দেখিয়েছেন সুভাষ চট্টোপাধ্যায়। নাটক শুরু হবার আগে তপন দে আজকের যুগে নাট্যাভিনয়ের প্রয়োজনীয়তার উপরে কিছুটা আলোকসম্পাত করেন।

নিউ প্রভাস অপেরার আগামী আকর্ষণ : পাকিস্তানের সামরিক শাসকদের বিরুদ্ধে বাংলাদেশের বীরবিপ্লবীদের যে স্বাধীনতা সংগ্রাম আজ মুখর হয়ে উঠেছে, তাকে কেন্দ্র করেই একটি অনবদ্য পালা পরিবেশন করতে চলেছেন নিউ প্রভাস অপেরার শিল্পীরা। পালাটির নাম 'মুক্তির [illegible]'। নাট্যরচনা ও পরিচালনায় রয়েছেন অরুণ রায়। আশা করা যায় শিল্পীদের [illegible] ও [illegible] মধ্যে এটিও আর একটি বলিষ্ঠ সংযোজন হবে।

কয়েকটি বিশিষ্ট ভূমিকায় আছেন [illegible] ভট্ট, অভয় হালদার, অনাদি চক্রবর্তী, [illegible] কুমার রাধারমণ পাল, শঙ্করকুমার, বিশ্বনাথ চৌধুরী, কল্যাণী ভট্টাচার্য, [illegible] ভট্টাচার্য, বীণা সেন। আলোকসম্পাতে রয়েছেন [illegible]।

শিল্পীমহলের কোহিনূর : শিল্পীমহলের পরিচালনায় সম্প্রতি সেন্ট্রাল টেলিগ্রাফ ইনস্টিটিউটে রাজেন দেব 'কোহিনূর' নাটক পরিবেশিত হল। এই ঐতিহাসিক নাটকটির পরিচালনায় দক্ষতার স্বাক্ষর রেখেছেন সুধাংশু মণ্ডল। অভিনয়ের ব্যাপারে যাঁরা বৈশিষ্ট্যের দাবী রাখেন তাঁরা হোলেন সিদ্ধেশ্বর ব্যানার্জি (শাহ্ আলম), সতীশ নন্দী (আকবর হোসেন), বিপুল ব্যানার্জী (গোলাম কাদের), সুধাংশু মণ্ডল, রসরাজ চক্রবর্তী ও সবিতা মিত্র। অন্যান্য কয়েকটি ভূমিকায় ছিলেন বিজন বিশ্বাস, কানাই ব্যানার্জি, অময় চক্রবর্তী, গণেশ মুখার্জী, হৃষিকেশ ব্যানার্জি, বাদল দত্ত, নীলা চক্রবর্তী, বীণা রায়, সরলা রায়।

আমি মন্ত্রী হবো : ফ্যাক্টরীজ ডাইরেক্টরেট রিক্রিয়েশন ক্লাবের শিল্পীরা

সংসার/ অনুপমা এবং নবীন নিশ্চল

সম্প্রতি 'স্টার' রঙ্গমঞ্চে 'আমি মন্ত্রী হবো' নাটকটি সাফল্যের সংগে পরিবেশন করেছেন। কয়েকটি বিশিষ্ট ভূমিকায় অংশ নেন নন্দলাল মুখার্জি, অনিল নস্কর, বিভূতি চক্রবর্তী, সুকুমার রায়চৌধুরী, বিজন সান্যাল, বিশ্বরঞ্জন ব্যানার্জি, অমিয় মুখার্জি, চন্দন দত্ত বিশ্বাস, আরতি ঘোষ, সবিতা মুখার্জি।

কিন্তু নাটক নয় : সম্প্রতি পার্ক সার্কাস ময়দানে বিন্ধ্যাচল নাট্যসংস্থার শিল্পীরা 'কিন্তু নাটক নয়' নাটকটি কৃতিত্বের সংগে মঞ্চস্থ করলেন। সামগ্রিক অভিনয়ের মধ্যে বিভিন্ন চরিত্রের রূপকারদের সাবলীলতা দর্শকদের স্বীকৃতি পেয়েছে। স্বপন চট্টোপাধ্যায় নির্দেশিত এই নাটকটির বিভিন্ন ভূমিকায় অভিনয় করেন প্রেমনাথ সিনহা, কানু ভট্টাচার্য, অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়, অমিত বসু, স্বপন বিশ্বাস, সন্দীপ বসু, তারাপদ ভট্টাচার্য, দীপালি বিশ্বাস, স্বপন ঘোষ, অসিত চট্টোপাধ্যায়, অরুণ কুণ্ডু, তপন রায়।

'ফাঁস' ও 'লৌহকপাট' : সম্প্রতি পাইকর হাইস্কুল নাট্যমঞ্চে দুদিনব্যাপী এক নাট্যানুষ্ঠানে কস্তুরী নাট্যগোষ্ঠীর শিল্পীরা পরিবেশন করলেন 'ফাঁস' ও 'লৌহকপাট'। দুটি নাটকের নির্দেশনায় ছিলেন দুর্গাদাস ঘোষ। যাঁদের অভিনয় মোটামুটি সবার প্রশংসা অর্জন করেছে তাঁরা হোলেন অমিয় চ্যাটার্জি, ইন্দ্রদেব পালধী, প্রজিতা চট্টোপাধ্যায়, জয়প্রকাশ লাহা, হিমাংশু দত্ত, লোটন চ্যাটার্জি, দুর্গাদাস ঘোষ, চন্ডী মুখোপাধ্যায়, সাধন মালাকার, সন্তোষ চট্টোপাধ্যায়, রবী চৌধুরী, তুষার ঘোষ।

'ছেঁড়া তমসুক' ও 'শিকার' : ক্যানিংয়ের সৌখীন নাট্যগোষ্ঠী 'পথিক' সম্প্রতি স্থানীয় একটি হলে রবীন্দ্র ভট্টাচার্যের 'ছেঁড়া তমসুক' ও শচীন ভট্টাচার্যের 'শিকার' একাঙ্ক নাটকদুটো অভিনয় করলেন। অভিনয়ে নৈপুণ্যের পরিচয় রাখেন প্রদীপ চক্রবর্তী, অপূর্ব ঘোষ, অমলেন্দু ভাস্তী, আনন্দ মন্ডল, রঞ্জন [illegible] দাস, [illegible]

একাঙ্ক নাট্যপ্রতিযোগিতা

গোন্দলপাড়া ন্যাশনাল ক্লাব আয়োজিত একাঙ্ক নাট্যপ্রতিযোগিতা আগামী ডিসেম্বর মাসে অনুষ্ঠিত হবে। যোগদানের শেষ তারিখ নির্ধারিত হয়েছে ১৫ই নভেম্বর। ঠিকানা : যুগ্ম সম্পাদক : গোন্দলপাড়া ন্যাশনাল ক্লাব, গোন্দলপাড়া, মরাগ রোড, চন্দননগর।

২৬-এর পল্লী পরিচালিত একাঙ্ক নাট্যপ্রতিযোগিতা শুরু হবে আগামী ডিসেম্বরের প্রথম সপ্তাহে। যোগদানের শেষ তারিখ ৮ই নভেম্বর। যোগাযোগের ঠিকানা : সম্পাদক, ২৬-এর পল্লী রিক্রিয়েশন ক্লাব, ৪৭।জি এ রাজা রামমোহন রায় সরণী, পোঃ শ্রীরামপুর, হুগলী।

তরুণ সংসদের 'হারানো ছন্দ'

কুমারটুলি সার্বজনীন দুর্গোৎসবের পুজা-প্রাঙ্গণে বিজয়া সম্মিলনী উপলক্ষে কদিন আগে তরুণ সংসদ নাটক অভিনয়ের এক আসর বসিয়েছিলেন। নাটকটির নাম 'হারানো ছন্দ'। লেখক 'মীরাটলাল' (হরিদাস ঘোষের ছদ্মনাম)-এর সুখ্যাত উপন্যাস 'হারানো ছন্দ'কে নাট্যরূপ দান করেন জোছন দস্তিদার। পরিচালনার ভার ছিল হরিদাস ঘোষের ওপর। দলগত অভিনয় ছিল চড়া সুরে বাঁধা—ফলে অভিনয় হয়েছিল সর্বাঙ্গসুন্দর। দীপক চক্রবর্তী (অমিতাভ), রবীন ভট্টাচার্য (শশাঙ্ক), অলোক ঘোষ (রামচরণ), অরুণ ভট্টাচার্য (অমরনাথ), প্রণতি ভট্টাচার্য (শাশ্বতী) ও তপতী রায় (তপতী) প্রমুখের অভিনয় কুশলতার পরিচয় রেখেছেন স্ব স্ব চরিত্রাভিনয়ে। এছাড়া কুমারেশ ঘোষ, তপন ব্যানার্জি, গোবিন্দ গোস্বামী, হীরেন পাল ও শ্যামল দত্তের অভিনয়ও চিত্তাকর্ষক। সম্প্রতি ২৫ অক্টোবর লোকান্তরিত হয়েছেন দিলীপকুমার পাল। তাঁর অভিনয়ও বিশেষ উল্লেখের দাবী রাখে।

বি এফ জে এ প্রদত্ত সম্বর্ধনা সভায় পোলান্ডের চিত্র-পরিচালক মর্গেনস্টার্ন ও অভিনেতা ইয়ানজোর।
—ফটো : অমৃত

বারাণসীতে নাটকাভিনয়

বারাণসী দুর্গোৎসব সম্মিলনী এ বছর সুবর্ণজয়ন্তী উপলক্ষ্যে তিন দিনব্যাপী উৎসব অনুষ্ঠানের আয়োজন করেন। নাটক-অভিনয়ই ছিল প্রধান আকর্ষণ। এতে অংশ গ্রহণ করেন দুটি স্থানীয় নাট্য সংস্থা। মহানবমী রাত্রে রবীন্দ্রসংসদের সভ্যবৃন্দ রতনকুমার ঘোষের 'অমৃতস্য পুত্রাঃ' নাটকটি মঞ্চস্থ করলেন। অভিনয়ে প্রথমেই উল্লেখ্য 'সনাতন'-এর ভূমিকায় শ্রীঅমল সেনগুপ্তের নাম। এছাড়া অন্যান্য চরিত্রে সফল রূপদান করেন মণ্টু বাগচী, চন্দ্রশেখর সেন, প্রেমব্রত দাশগুপ্ত, অজিত চক্রবর্তী, তপন ব্যানার্জী, শিবচন্দ্র সাধু, ডঃ পি কে সেন, জহর সেনগুপ্ত, প্রবাল লাহিড়ী, সুবোধ চক্রবর্তী ও অমর চক্রবর্তী, কমলা ভট্টাচার্য, রেণুকা মজুমদার ও বসুমতী বল্লভ। আবহসংগীতের ভার ছিল শ্রীবিকাশ বন্দ্যোপাধ্যায় ও গোরম দাসের ওপর ও শব্দযোজনায় ছিলেন মৃত্যুঞ্জয় ভট্টাচার্য।

বঙ্গের বাইরে বাংলা নাটক

সম্প্রতি শারদোৎসব উপলক্ষ্যে বাঙ্গালী সমিতির প্রযোজনায় স্থানীয় 'প্রয়াসী' নাট্য সংস্থা গোরক্ষপুরে রমানাথ লাহিড়ী দুর্গা বাড়ীতে সত্য বন্দ্যোপাধ্যায় রচিত 'নহবত' ও লিউইজি পিরানদেলওর মূল রচনা 'এনরিকো দ্যা ফোর্থ' ও অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায়ের রূপান্তরিত 'শের আফগান' নাটক দুটি মঞ্চস্থ করে নাট্যরসিক মহলে প্রচুর আলোড়ন সৃষ্টি করেছেন। ভিন্ন স্বাদের নাটক দুটির সাফল্যের মূলে রয়েছে দলগত অভিনয়নৈপুণ্য, আঙ্গিকের অভিনবত্ব ও প্রকাশের ভঙ্গী—তার জন্য কৃতিত্বের দাবী রাখেন প্রয়োগ-প্রধান অপর্ণা ভট্টাচার্য। 'নহবতে'র অভিনয়ে নায়িকা কেয়ার ভূমিকায় পরিচালিকা অর্পণা ভট্টাচার্য ও জ্যাঠামশাইর চরিত্রে অমিয়কান্ত ভট্টাচার্য বিশেষভাবে উল্লেখ্য। এছাড়া সতোন দত্ত, অরবিন্দ সরকার, শ্রীমতী দুর্গারাণী নাথ, কুমারী ইতি চট্টোপাধ্যায়, রসময় দে, মুকুল দাশগুপ্ত, গোকুল সেন, সলিলকুমার চক্রবর্তী, অশোক বোস, মিহির দাস, অনিল দত্ত, সুবীর দত্ত, হরেন আচার্য, জগতবিকাশ মুখোপাধ্যায়, রবিশঙ্কর সরকার প্রমুখ নিজ নিজ ভূমিকায় সুঅভিনয় করেন।

'শের আফগান' নাটকের প্রধান আকর্ষণ নাম ভূমিকায় শ্রীঅমিয়কান্তি ভট্টাচার্যের অভিনয়। শ্রীমতী মুখোপাধ্যায় রূপী অপর্ণা ভট্টাচার্যও সুন্দর। অন্যান্য ভূমিকায় উল্লেখযোগ্য অভিনয় করেন—সতোন দত্ত, দুর্গা ব্যাস, সুবীর দত্ত, কমলাকান্ত দাস, নৃপাশঙ্কর সরকার, মিহির দাস, নলিনী চট্টোপাধ্যায় অরবিন্দ সরকার, কুমারী ইতি চট্টোপাধ্যায় ও মমতা ভদ্র, অশোক বসু, গোকুল সেন, মুকুল দাশগুপ্ত, হরেন আচার্য।

আসামে মাধবী নাট্য কোম্পানী

সুপরিচিত যাত্রাদল মাধবী নাট্য কোম্পানী আসামে গৌহাটি, ডিগবয়, তিনসুকিয়া, ও ডিব্রুগড়ে পালা গান করে প্রচুর সুখ্যাতি অর্জন করেছে। বিশেষ করে যে পালাটি দর্শকদের অকুণ্ঠ প্রশংসা অর্জন করেছে, সেটি হলো সুপরিচিত নাট্যকার কিরণ মৈত্রের 'বহ্নিশিখা'। কাহিনীর অভিনবত্বে, উপস্থাপনার বৈচিত্র্যে এবং সুর মাধুর্যে, পালাটি এ বৎসরের অন্যতম শ্রেষ্ঠ প্রযোজনারূপে স্বীকৃতি লাভ করেছে। পরিচালনা, পণ্টু সেনের। সুর সংযোজনা অপরেশ লাহিড়ীর।

জোড়াসাঁকো সংসদের 'শ্রীরামকৃষ্ণ'

প্রখ্যাত সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান 'জোড়াসাঁকো সংসদ' নাট্যকার হরিপদ বসুর শ্রেষ্ঠ ভক্তিমূলক নাটক 'শ্রীরামকৃষ্ণ' পরিবেশন করলেন গেল ২৯ অক্টোবর জগদ্ধাত্রী পূজো উপলক্ষ্যে জোড়াসাঁকোর 'রাজেন্দ্রলাল দত্তের বাড়ির পুজোপ্রাঙ্গণে সন্ধ্যা সাতটায়। সুর ও আবহ সঙ্গীতের ভার ছিল সুখ্যাত সুরকার উমাপতি শীলের ওপর।

অভিনয় অন্তে অনুষ্ঠানের সভাপতি সুখ্যাত নাট্যসমালোচক ডক্টর অজিত ঘোষ তাঁর ভাষণে নাটক এবং নামভূমিকায় অবতীর্ণ অভিনেতা—অনিল সেনের ভূয়সী প্রশংসা করে বলেন যে এমনটি এর আগে আমি দেখি নি। চলনে বলনে ভক্তিরস যেন অভিনেতার মধ্যে মূর্ত হয়ে উঠেছিল। নরেন ও গিরিশ ঘোষের চরিত্রাভিনয়ে নৃপেন মল্লিক ও নিশিকান্ত ঘোষ প্রাণবন্ত অভিনয় করেন। গোকুলমুদি হিসেবে গোবিন্দ দে ভালো তবে আতিশয্য বাদ দিতে পারলে আরো সুন্দর হত। পাগলিনীরূপিণী সান্ত্বনা দেবীর গান ও অভিনয় অনিন্দ্যসুন্দর। 'শ্রীমা'র ভূমিকায় গোবিন্দ দত্ত অভিনয়ে বৈশিষ্ট্যের স্বাক্ষর রেখেছেন—তাঁর গানের অনুরণন অনেকদিন মনের মধ্যে গুঞ্জন করে ফিরবে। বিশ্বনাথ দত্তের চাকররূপী প্রমথ ঘোষের অভিনয় চরিত্রানুগ। দলগত অভিনয়ের গুণে নাটকটি সর্বাঙ্গসুন্দর হয়ে ওঠে। নাটক রচয়িতা, অভিনেতাদের সঙ্গে সুষ্ঠু সুর ও আবহসঙ্গীতের জন্যে সুরকার উমাপতি শীলও কৃতিত্বের দাবী করতে পারেন।

পঞ্চানন্দ নাট্য সঙ্ঘের উদ্যোগ

গত ২২শে এবং ২৩শে অক্টোবর '৭১ পঞ্চানন্দ নাট্য সঙ্ঘের উদ্যোগে হুগলীর শিবরামবাটীতে 'সম্রাট অশোক' এবং 'সাধক রামপ্রসাদ' নাটক দুটি অভিনীত হয়। উল্লেখযোগ্য ভূমিকায় অংশগ্রহণ করেন অশোক চট্টোপাধ্যায়, রঞ্জন ব্যানার্জি, কানাই সাঁতরা, বনমালী চক্রবর্তী।

বিবিধ সংবাদ

পলিডর রেকর্ডে পূজোর গান

রেকর্ড-সঙ্গীত জগতে 'পলিডর' নব আগন্তুক। বাংলা গানের আসরে এই এর প্রথম পদার্পণ। বলা বাহুল্য, পূজো উপলক্ষ্যে মুক্তিপ্রাপ্ত বিভিন্ন ধরনের রেকর্ডগুলি প্রত্যাশা-পূরণ ও প্রতিশ্রুতির দীপ্ত স্বাক্ষরে ভাস্বর।

প্রথমেই নাম করতে হয় লং-প্লেয়িং রেকর্ডে শ্রীসুখরঞ্জন চক্রবর্তীর 'শ্রীশ্রীদুর্গাপুজো'র। বিশুদ্ধ উচ্চারণ, সুললিত কণ্ঠ, শ্রদ্ধাপ্লুত আবেগ এবং সঙ্গীত-সহযোগিতার দরুণ শ্রীচক্রবর্তীর শ্রীশ্রীচন্ডীপাঠ মনের অনেক গভীরে একটা তৃপ্তি ও স্নিগ্ধতার প্রলেপ বুলিয়ে দেয়। সব মিলিয়ে পুজো-পুজো পরিবেশটি রম্য ও হার্দ্য হয়ে ওঠে।

জপমালা ঘোষ ছড়াগানের প্রতিশ্রুতিময়ী গায়িকা। তাঁর কন্ঠে দুটি ছড়া গান : 'মেঘ গুরু গুরু দুপুরে' ও 'আয় আয় চাঁদমামা' তাঁর পূর্ব সুনামকে আরো বৃদ্ধি করেছে। সুনামী সনৎ সিংহের গাওয়া দুটি কাব্যগীতি : 'শোনো ভাই শোনো' ও 'ছোট্ট সোনা বাবুমণি' দারুণ জমেছে। সুখ্যাত গীটার-বাদক বটুক নন্দী ই পি রেকর্ডে চারটি গান বাজিয়ে তাঁর অনুরাগীদের মন ভরিয়ে দিয়েছেন।

প্রতিভাবান কিছু তরুণ সঙ্গীত-শিল্পীকে জনসাধারণের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিয়েছেন 'পলিডর'। এ'দের মধ্যে ইন্দ্রাণী গঙ্গোপাধ্যায়ের 'নির্জনে এই ঝাউবনে' ও 'সে তো বোঝে না', কুমকুম চট্টোপাধ্যায়ের 'আমার এ গান' ও "ওগো প্রিয় আমার', মানস মুখোপাধ্যায়ের 'ও আমার প্রাণসজনী' ও 'শুধু তোমার জন্যে' এবং প্রশান্ত ভট্টাচার্যের 'ও মালিনী. মালিনী' ও 'আমায় অন্ধ করে দাও' গানগুলিও সুখশ্রাব্য।

রামকুমার চট্টোপাধ্যায়ের শ্যামাসঙ্গীত

শ্রীরামকুমার চট্টোপাধ্যায় ভক্তিবিষয়ক গানে—বিশেষ করে শ্যামাসঙ্গীতের সুখ্যাত শিল্পী। তাঁর গানে ভক্তমনের আত্ম-নিবেদনের শ্রদ্ধাপ্লুত আমেজটি তাঁর গায়কী এবং গানের বাণীতে একটা স্বাতন্ত্র্য দীপ্তি এনে দেয়। এবছর শ্রীচট্টোপাধ্যায় হিন্দুস্থান রেকর্ডে বিখ্যাত দুটি শ্যামাসঙ্গীত 'লোহারি বাঁধনে বেঁধেছে সংসার' ও 'অপরাধ নিও না মা' বাণীবদ্ধ করেছেন। এ দুটি গানেও শ্রীচট্টোপাধ্যায় তাঁর বৈশিষ্ট্যের স্বাক্ষর রেখেছেন।

বাংলাদেশের ছবি 'জীবন থেকে নেয়া'

গেল শুক্রবার, ২৯ অক্টোবর বেকালে কলিকাতার সার্কাস অ্যাভেনিউয়ে অবস্থিত বাংলাদেশ মিশনে একটি উল্লেখযোগ্য অনুষ্ঠান হয়ে গেল চিত্রসাংবাদিক ও স্থানীয় চলচ্চিত্রজগতের সুধিজনদের উপস্থিতিতে। বাংলাদেশের সুখ্যাত পরিচালক-প্রযোজক জহীর রায়হান বাংলাদেশে 'জীবন থেকে নেয়া' নামে যে ছবিখানি ঐ দেশে রাহুগ্রাস আরম্ভ হবার অব্যবহিত পূর্বেই শেষ করতে পেরেছিলেন এবং যেটিকে তিনি বহু আয়াসে পশ্চিমবঙ্গে নিয়ে আসতে সমর্থ হয়েছেন, সেই 'জীবন থেকে নেয়া' ছবিখানিকে তিনি বাংলাদেশ মিশনের হাতে নিঃস্বার্থভাবে তুলে দিয়েছেন এই আশায় যে এই ছবি থেকে সংগৃহীত সমুদয় অর্থ বাংলা দেশের মুক্তি সংগ্রামে ব্যয়িত হবে। ঐদিন বৈকালে উপস্থিত জনগণের সমক্ষে বাংলাদেশ-এর হাইকমিশনার মিঃ এম হোসেন আলির কাছ থেকে স্থানীয় চিত্র-পরিবেশক সংস্থা বলাকা পিকচার্স ঐ ছবিখানির পরিবেশনস্বত্ব গ্রহণ করেন প্রথম কিস্তিতে একলক্ষ পঁচিশ হাজার টাকার একটি চেক দিয়ে। এই উপলক্ষ্যে প্রদত্ত একটি নাতিদীর্ঘ বক্তৃতায় মিঃ হোসেন আলি বলেন : বাংলাদেশ ও ভারতের সঙ্গে প্রথম বাণিজ্যিক আদানপ্রদান হল এই ছবিটির পরিবেশনস্বত্ব দানের মাধ্যমে। আমি আশা করব, দুই দেশের মধ্যে, দুই দেশের জনগণের মধ্যে বন্ধনকে দৃঢ়তর করবার পথে এইভাবেই আমরা এগিয়ে যাব। ছবির প্রযোজক-পরিচালক জহীর রায়হান তাঁর এই ছবির প্রতিপাদ্য বিষয়টির কথা অল্পভাষায় ব্যক্ত করবার পরে করতালিধ্বনির মধ্যে চুক্তিপত্রটি স্বাক্ষরিত হয়। ছবির নায়িকা ও ব্যক্তিগতজীবনে শ্রীরায়হানের স্ত্রী সুন্দরী সুচন্দাও এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন।

অনিন্দিতা/মৌসুমী চট্টোপাধ্যায় ও স্বপন মুখোপাধ্যায়। পরিচালনা : হেমন্ত মুখোপাধ্যায়। —ফটো : অমৃত

বি-এফ-জে-এ দ্বারা পোলিশ চলচ্চিত্রপ্রতিনিধিদ্বয় সম্বর্ধিত

ভারত-পোল্যান্ড সাংস্কৃতিক বিনিময়ের কার্যসূচী অনুসারে অক্টোবরের শেষ সপ্তাহে পোলিশ চলচ্চিত্র উৎসব শুরু হয়েছে নিউ দিল্লীতে। এই উৎসবের অঙ্গ হিসেবে প্রদর্শিত হচ্ছে সাতটি পূর্ণদৈর্ঘ্য ছবি এবং ঐ সঙ্গে সাতটি ছোট ছবি। এই উপলক্ষ্যে দুই সদস্যবিশিষ্ট যে প্রতিনিধিদলটি ভারত সফরে এসেছেন, তাঁদের মধ্যে আছেন চিত্রপরিচালক ইয়ানুজ মর্গেনস্টার্ন ও চিত্রাভিনেতা তাদেয়ুস ইয়ানজার। গেল শনিবার সন্ধ্যায় ইস্ট ইন্ডিয়া মোশন পিকচার অ্যাসোসিয়েশন-এর সভাগৃহে বেঙ্গল ফিল্ম জার্নালিস্টস অ্যাসোসিয়েশনের সভ্যবৃন্দ পোল্যান্ড থেকে আগত এই দুই বিশিষ্ট ব্যক্তিকে সম্বর্ধিত করেন। এ'দের স্বাগত জানিয়ে সংস্থাসম্পাদক পশুপতি চট্টোপাধ্যায় সভ্যবৃন্দের কাছে এ'দের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিয়ে আঞ্চলিক সেন্সার অফিসার শ্রী এ কে সরকারকে অনুরোধ করেন এ'দের আগমনের উপলক্ষ্য সম্পর্কে বিস্তৃতভাবে কিছু বলতে। শ্রীসরকার বলেন, কলকাতায় পোলিশ ফিল্ম ফেস্টিভ্যাল যদিও ২৬ নভেম্বর থেকে ২ ডিসেম্বর পর্যন্ত জ্যোতি সিনেমায় অনুষ্ঠিত হবে, কিন্তু আমাদের সম্মানিত অতিথিরা ততদিন পর্যন্ত ভারতে থাকতে পারবেন না। তাই তাঁরা দিল্লী, কলিকাতা, মাদ্রাজ ও বোম্বাই শহরে তিন বা চারদিন করে থেকেই দেশে প্রত্যাবর্তন করবেন। আলাপচারীভাবে মিঃ মর্গেনস্টার্ন জানালেন, বহুদিন থেকেই তাঁর বাংলাদেশ দেখবার ইচ্ছা প্রবল; কারণ তিনি জানেন, ভারতের মধ্যে একমাত্র বাংলাদেশেই জীবনধর্মী ছবি তৈরী হয়ে থাকে এবং এ-বিষয়ে বাংলাদেশের

সঙ্গে পোল্যান্ডের মিল আছে। আগে যদিও পোল্যান্ডে যুদ্ধ-সংক্রান্ত ছবি তৈরী হত, কিন্তু বর্তমানে সেখানে জীবনাভিত্তিক ছবি তৈরী হয় বেশী। মিঃ মর্গেনস্টার্নের দু'খানি ছবি আসচে উৎসবে দেখানো হবে। মিঃ ইয়ানজার হচ্ছেন বিখ্যাত পোলিশ ছবি 'কানাল'-এর নায়ক। তিনি আজ পর্যন্ত অন্তত সাতাশখানি ছবিতে নায়কের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছেন। করকম্পনের মাধ্যমে এই প্রীতি অনুষ্ঠানটি সুসম্পন্ন হয়।

বি-এফ-জে-এ'র নতুন কর্মপরিষদ

গেল শনিবার ৩০ অক্টোবর অনুষ্ঠিত বি-এফ-জে-এ'র বার্ষিক সভায় যে নতুন কর্মপরিষদ গঠিত হয়, তার মধ্যে আছেনঃ সভাপতি—মনুজেন্দ্র ভঞ্জ; সহ-সভাপতি—মহেন্দ্রনাথ সরকার ও কালীশ মুখোপাধ্যায়; সম্পাদক—সেবাব্রত গুপ্ত; সহকারী সম্পাদক অশোক মজুমদার ও তাপস বন্দ্যোপাধ্যায়; কোষাধ্যক্ষ— গোপালচন্দ্র পাল; কার্যনির্বাহক সমিতির সদস্যঃ বাগীশ্বর ঝা, ধীরেন মল্লিক, প্রেমনাথ উপাধ্যায়, নির্মল ধর, জ্যোতির্ময় মসুরায়, শৈলেশ মুখোপাধ্যায়, বিশ্বরঞ্জন সান্যাল, রবি বসু, গোপেন লাহিড়ী, রণধীর সাহিত্যালঙ্কার, রইসুদ্দীন ফরিদি, সৌমেন কুন্ডু ও সমর বন্দ্যোপাধ্যায়। আমরা নবাগত কর্মপরিষদকে স্বাগত জানাচ্ছি।

এলাহাবাদে অতুলপ্রসাদ শতবার্ষিকী

সম্প্রতি প্রয়াগ বঙ্গসাহিত্য সভার উদ্যোগে এলাহাবাদে সাড়ম্বরে অতুলপ্রসাদের শতবার্ষিকী উদযাপিত হয়। এই সভায় পৌরোহিত্য করেন 'নর্দার্ন ইন্ডিয়া পত্রিকা'র সহসম্পাদক শ্রীসুনীল বসু ও প্রধান অতিথির আসন অলংকৃত করেন সর্বজনপরিচিত শ্রীভূষারকান্তি ঘোষ। প্রধান অতিথি একশোটি বিজলী বাতি প্রজ্জ্বলিত করে অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন। এরই সঙ্গেই গ্রামোফোনে বাজতে থাকে অতুলপ্রসাদের স্বকন্ঠে গীত 'মিছে তুই ভাবিস মন' গানটি। চমৎকার একটি পরিবেশ সৃষ্টি হয়। প্রধান অতিথি ও সভাপতি অতুলপ্রসাদের অন্যতম কর্মস্থল এলাহাবাদে এই শতবার্ষিকী উদযাপনের তাৎপর্য ব্যাখ্যা করেন এবং অতুলপ্রসাদের স্বদেশপ্রেম ও গানের প্রকৃত গবেষণা হওয়া উচিত বলে উল্লেখ করেন। শ্রীঅতুল মুখোপাধ্যায়ের লুকারগঞ্জের বাটীতে প্রবাসী বাঙালী ও অগণিত সুধী সমাবেশে এই মনোজ্ঞ অনুষ্ঠান হয়।

এরপর আরম্ভ হয় অনুষ্ঠানের বিশেষ আকর্ষণ, প্রয়াগ বঙ্গ সাহিত্যসভার সভাপতি সুসাহিত্যিক শ্রীশিবকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়ের বহু তথ্যপূর্ণ অসংখ্য অপ্রকাশিত ঘটনা সন্নিবেশে গবেষণামূলক অতুলপ্রসাদ প্রসঙ্গে কথিকা এবং তৎসঙ্গে কোলকাতার বিখ্যাত গায়ক শ্রীসত্যেশ্বর মুখোপাধ্যায়ের ও শ্রীমতী এষা মুখোপাধ্যায়ের অনবদ্য অতুলপ্রসাদী সঙ্গীত। শ্রীমতী মুখোপাধ্যায়ের সুরেলা রেওয়াজী কন্ঠের সঙ্গে টপ্পা ও ঠুংরীর ছোট ছোট কাজগুলি অপূর্ব লাগছিল— বিশেষ করে তার 'পাগলা মনটারে তুই বাঁধ', 'সবারে বাসরে ভালো' ও 'ওগো নিঠুর দরদী' গানগুলি। সত্যেশ্বর মুখোপাধ্যায়ের দরাজ কন্ঠে, কবির রচিত গীতিকাব্যের ভাবাবেগ শ্রোতৃমন্ডলীকে অভিভূত করে। স্বদেশ, প্রেম, পূজা, প্রকৃতি, মানব ও বিবিধ সঙ্গীতের মধ্য থেকে গানগুলি অপূর্ব দক্ষতার সঙ্গে পরিবেশিত হয়। প্রায় দু' ঘন্টাকাল এই অপূর্ব অনুষ্ঠান শ্রোতাদের মুগ্ধ করে রাখে। সভান্তে অধ্যাপক ধীরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য সকলকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন।

সোস্যাল এন্টারপ্রাইজের 'চিত্রাংগদা'

সোস্যাল এন্টারপ্রাইজের উদ্যোগে রবীন্দ্রনাথের নৃত্যনাট্য 'চিত্রাঙ্গদা' আগামী ২০শে নভেম্বর রবীন্দ্রসদন রঙ্গালয়ে অনুষ্ঠিত হবে। সন্তোষ সেনগুপ্তের পরিচালনায় সংগীতাংশে অংশগ্রহণ করবেন কণিকা বন্দ্যোপাধ্যায়, সুচিত্রা মিত্র ও দ্বিজেন মুখোপাধ্যায়। নৃত্যাংশে অংশ নেবেন নরেশকুমার, সুমিত্রা মিত্র ও আরতি মজুমদার। নৃত্যনির্দেশনার দায়িত্ব নেবেন শক্তি নাগ। সমগ্র অনুষ্ঠানটির পরিচালনভার গণেশ সিনহার।

হেমন্ত-কণিকার সংগীতাসরে

রবীন্দ্রসদনে সুরসপ্তক আয়োজিত হেমন্ত মুখোপাধ্যায় ও কণিকা বন্দ্যোপাধ্যায়ের একক ও দ্বৈত-সংগীতের আসর সম্প্রতি কালের সংগীতাসরের এক স্মরণীয় অনুষ্ঠান। জনপ্রিয়তার শীর্ষে আসীন দুই শিল্পীকে একাসনে পরিপূর্ণ সংগীত ব্যক্তিত্বে পাওয়ার দুর্লভ লগ্ন তাদের ধ্যানমহলে যে কতখানি উদ্দীপনা সঞ্চার করেছিল তারই জাজ্জ্বল্যমান স্বাক্ষর যেন সেদিনের পূর্ণ প্রেক্ষাগৃহ।

কণিকা বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'হে মোর দেবতা'—গান দিয়েই অনুষ্ঠানের সূচনা ঘটে। প্রথমটায় শিল্পী যেন কিছু দ্বিধাগ্রস্তা, সুরবিস্তারের পদক্ষেপে সঙ্কোচজড়িত, কিন্তু কয়েক মুহূর্তের মধ্যেই সুরের অন্দরমহলে প্রবেশের সঙ্গে সঙ্গেই তিনি যেন আত্মস্থ হয়ে আপনাকে ফিরে পেলেন। মেঘমুক্ত চাঁদের মতই তিনি আপন পূর্ণতায় ঝলমলিয়ে উঠেছেন—মহাবিশ্বের মহাকাশের সঙ্গে। রূপদী অঙ্গে গানের সুর। যেন ভক্তিমতীর কণ্ঠে দেবতার মহিম্ন স্তুতি। তারপরই 'অকল জনম ভরে' 'আমি জেনেশুনে তবু' 'বিরহ মধুর হল' 'চির-উন্মাদে' গানগুলিতে সেই চির-আপনার আর্তি, কত আকুতির মাধুর্যে সম্ভ্রমের বিনতিতে আরাধিকার হৃদয়াবেগ যেন দ্যুতিময় রত্নহারের মতই নানারঙা আলোয় বিচ্ছুরিত। নানান লয়, সুরের অন্তহীন ওঠা-পড়ার মধ্যেও ভোলা যায় না—

> 'সেথা আসন হয়নি পাতা
> সেথা মালা হয়নি গাঁথা
> আমার লজ্জাতে হেঁট মাথা'—

বাণীবিভব শিল্পীর ব্যঞ্জনাধর্মী কণ্ঠের সূক্ষ্ম কারুকার্য—সবার ওপর ধ্যানশীল হৃদয়ের ঐশ্বর্য ও সলাজ মধুরতা।

দ্বিতীয় পর্বের গানগুলিতে যেন ক্লিষ্টচিত্তের আর্তি বেজে উঠল 'যেদিন সকল মুকুল' 'দূরে কোথায়', 'ওলো সই' 'যেতে যদি হয়' 'দিনান্তবেলায়' 'আজি যে রজনী' 'মরণরে তুঁহু মম'। সুর ও ভাবের যে মায়াজাল তিনি রচনা করেছিলেন ক্ষুণ্ণ হোলো অকস্মাৎ মাঝখানে 'ওলো সই' গানটির অবতারণায়। কিন্তু এ ত্রুটি সুদে আসলে কণিকা যেন ভরিয়ে দিলেন 'মরণরে তুঁহু মম' গানটিতে।

হেমন্ত মুখোপাধ্যায় সুরু করলেন 'আমি শরত তপন' দিয়ে। হেমন্তবাবু ঠিক রবীন্দ্রসঙ্গীতশিল্পী বলতে যা বোঝায় তা নন। কোনো বিশেষ 'কনভেনশনে' তাঁর গায়কী বাঁধা নয় বলেই এই ভিন্নস্বাদের গানে বৈচিত্র্যের একটা আনন্দ পাওয়া যায়। তাঁর গাওয়া নানারকমের সঙ্গীতধারার একটি ধারা রবীন্দ্রসঙ্গীত। যদিও রবীন্দ্রসঙ্গীতকে জনপ্রিয় করে তোলার ব্যাপারে তাঁর অবদান সামান্য নয়। হেমন্তবাবু মোট চোদ্দখানি গান গেয়েছেন। গাননির্বাচনে ভাবসঙ্গতির চেয়ে বৈচিত্র্যসৃষ্টির প্রয়াসেই পরিলক্ষিত। জনপ্রিয় গান-পরিবেশনেও। এতে অবশ্য জনরুচির প্রতিই তাঁর শ্রদ্ধা প্রকাশ পেয়েছে। তাঁর গান শ্রোতাদের খুশী করতে পেরেছে। বিশেষ করে 'আমার এ পথ' 'মোর ভাবনারে' 'আমার নয়ন'। প্রধান আকর্ষণ তাঁর সুস্পষ্ট, শিক্ষিত উচ্চারণ। শ্রোতাদের দৃষ্টি যেদিকেই থাক গানের বাণী ঠিক কানে পৌঁছবেই। বড় শিল্পীদের অন্যতম সম্পদ বোধহয় এই কথার যথাযোগ অণুরণন তথা বক্তব্যের যথার্থ প্রতিফলন এ সম্পদে হেমন্তবাবু অপ্রতিদ্বন্দ্বী। আরো ভাল লাগত তাঁর কন্ঠে 'প্রাঙ্গণে মোর' গানটি শুনতে পেলে।

যুগ্ম আসরে পরিবেশিত দুটি গান 'আমার মন মানে না' ও 'সেদিন দুজনে।' সাঙ্গীতিক ধর্মে উভয়ে ভিন্নলোকের বাসিন্দা, একজন রবীন্দ্রসংস্কৃতিসম্পন্না অন্যজন আগেই বলেছি কোনোরকম সঙ্গীত-সংস্কারে বাঁধা নেই তবুও এঁদের মিলিত গান যে ভাল লেগেছিল তার কারণ উভয়ের ইচ্ছের কোনো খাদ ছিল না।

ইরাণী ট্রফি হাতে বিজয়ী ভারতীয় অবশিষ্ট দল

খেলাধুলা

দর্শক

ইরাণী ট্রফি

ভারতীয় অবশিষ্ট দল ১১১ রানে উপর্যুপরি ১৩-বারের রঞ্জি ট্রফি বিজয়ী বোম্বাইকে পরাজিত করে ইরাণী ট্রফি জয় করেছে। ইরাণী ট্রফির খেলা হয় রঞ্জি ট্রফি বিজয়ী দলের সঙ্গে অবশিষ্ট ভারতীয় দলের। এ পর্যন্ত ইরাণী ট্রফি পেয়েছে বোম্বাই ৭-বার (১ম ইনিংসের রানের ভিত্তিতে ৫-বার, সরাসরি ১-বার এবং যুগ্মবিজয়ী ১-বার) এবং ভারতীয় অবশিষ্ট দল ৩-বার (সরাসরি জয়)। তিনবার (১৯৬১, ১৯৬২ ও ১৯৬৯) প্রতিযোগিতা স্থগিত ছিল।

১৯৭১ সালের প্রতিযোগিতায় দুই প্রখ্যাত টেস্ট খেলোয়াড়—দিলীপ সারদেশাই বোম্বাই দলে এবং বিষেণ সিং বেদী অবশিষ্ট দলে অংশ গ্রহণ করেননি। অবশিষ্ট দলের জয় সম্পর্কে অনেকেরই যথেষ্ট সংশয় ছিল যেহেতু ব্যাটিংয়ের দিক থেকে দলটি দুর্বল ছিল এবং দলগঠনও ঠিকমত হয়নি। বোম্বাই দলের অধিনায়কত্ব করেন অজিত ওয়াদেকার এবং অবশিষ্ট দলের ভেঙ্কটরাঘবন। অবশিষ্ট দলে বাংলাদেশ থেকে একমাত্র গোপাল বসু নির্বাচিত হন এবং তিনি চরম ব্যর্থতার পরিচয় দেন—প্রথম ইনিংসে ২ এবং দ্বিতীয় ইনিংসে ৩ রান।

প্রথম দিনের খেলায় ভারতীয় অবশিষ্ট দল ৮ উইকেট খুইয়ে ২৫৭ রান সংগ্রহ করেছিল। জয়ন্তীলাল (৬৫ রান), সুরীন্দর অমরনাথ (৪৮ রান) এবং মহীন্দর অমরনাথ (নট আউট ৩১) দৃঢ়তার সঙ্গে খেলেছিলেন।

বিশ্বনাথ

দ্বিতীয় দিনে অবশিষ্ট দলের ১ম ইনিংস ২৮৭ রানের মাথায় শেষ হলে বোম্বাই ৭ উইকেটের বিনিময়ে ১৭১ রান সংগ্রহ করেছিল। বোম্বাইয়ের পার্কারের ৫৮ রান দর্শকদের প্রভূত আনন্দদায়ক হয়েছিল।

তৃতীয় দিনে বোম্বাইয়ের ১ম ইনিংস ১৯৫ রানের মাথায় শেষ হলে অবশিষ্ট দল ৯২ রানে এগিয়ে গিয়ে ২য় ইনিংস খেলতে নামে। এই দিনেই অবশিষ্ট দলের ২য় ইনিংস ২৩৬ রানের মাথায় শেষ হয়। খেলায় জয়লাভের জন্যে যেখানে বোম্বাইয়ের ৩২৯ রানের প্রয়োজন ছিল সেখানে তৃতীয় দিনের ৫ মিনিটের খেলায় তারা একটা উইকেট খুইয়ে মাত্র ২ রান তুলেছিল।

চতুর্থ দিনে চা-পানের ১৫ মিনিট আগে বোম্বাইয়ের ২য় ইনিংস ২১৭ রানের মাথায় শেষ হলে অবশিষ্ট দল ১১১ রানে জয়লাভের গৌরব লাভ করে। চন্দ্রশেখরের বোলিংই বোম্বাইয়ের জয়লাভের পথে প্রধান অন্তরায় হয়েছিল। খেলার এক সময় তাঁর বোলিং পরিসংখ্যান ছিল মাত্র ৭ রানে ৮ উইকেট।

সংক্ষিপ্ত স্কোর

অবশিষ্ট দল : ২৮৭ রান (জয়ন্তীলাল ৬৫, এস অমরনাথ ৪৮, এম অমরনাথ ৫৭ রান। শিভালকার ৫৬ রানে ৭ উইকেট)

● ২৩৬ রান (জয়ন্তীলাল ৬৪ এবং বিশ্বনাথ ১০৯ রান। ইসমাইল ২৬ রানে ৪, রেগে ৭৬ রানে ৩ এবং সিভালকার ৬১ রানে ৩ উইকেট)

বোম্বাই: ১৯৫ রান: (পার্কার ৫৮ রান। আবিদ আলী ৫৪ রানে ৩, চন্দ্রশেখর ৪৮ রানে ৩ এবং ভেঙ্কটরাঘবন ৩৯ রানে ৩ উইকেট)

● ২১৭ রান: (গাভাসকার ৪৮, ওয়াদেকার ৪৪ এবং পাই ৫০ রান। চন্দ্রশেখর ৬৩ রানে ৪, ভেঙ্কট ৫৫ রানে ৩ এবং আবিদ আলী ৪৪ রানে ২ উইকেট)

জাতীয় সন্তরণ প্রতিযোগিতা

আমেদাবাদের কর্পোরেশন সুইমিং পুলে ২৮তম জাতীয় সন্তরণ প্রতিযোগিতায় সার্ভিসেস পুরুষ বিভাগে, মহারাষ্ট্র মহিলা ও বালিকা বিভাগে এবং পশ্চিম বাংলা বালক বিভাগে দলগত চ্যাম্পিয়ান হয়েছে। মহারাষ্ট্র মহিলা বিভাগের দলগত খেতাব ছাড়া পুরুষ বিভাগের ৩য় স্থান এবং বালক বিভাগের ২য় স্থান লাভ করেছে। অপরদিকে পশ্চিম বাংলা পুরুষ বিভাগের ২য় স্থান, মহিলা বিভাগের '৪র্থ স্থান এবং বালিকা বিভাগের ৮ম স্থান পেয়েছে। মহারাষ্ট্রের কুমারী স্লিনিস হাউস মহিলা বিভাগের ব্যক্তিগত অনুষ্ঠানে ৭টি স্বর্ণ পদক জয় করে অসাধারণ ব্যক্তিগত ক্রীড়ানৈপুণ্যের পরিচয় দিয়েছেন। প্রতিযোগিতায় তিনিই সর্বাধিক স্বর্ণ পদক জয়ের রেকর্ড করেছেন।

প্রতিযোগিতায় মোট ২০টি জাতীয় সন্তরণ রেকর্ড ভাঙ্গে—পুরুষ বিভাগে ৯টি, বালক বিভাগে ৯টি এবং বালিকা বিভাগে ২টি।

বাসাকা সিং (সার্ভিসেস) ১০০ মিটার ফ্রিস্টাইল সাঁতার ৫৯·৭ সেকেন্ডে শেষ করে ভারতীয়দের মধ্যে সর্বপ্রথম এই অনুষ্ঠানে এক মিনিটের গন্ডী অতিক্রম করার গৌরব লাভ করেন।

দলগত অবস্থান

পুরুষ বিভাগ: ১ম সার্ভিসেস (১৬৬ পয়েন্ট), ২য় পশ্চিমবাংলা (৬৪ পয়েন্ট), ৩য় মহারাষ্ট্র (৬০ পয়েন্ট), ৪র্থ উত্তরপ্রদেশ (৩৪ পয়েন্ট), ৫ম রেলওয়ে (৩১ পয়েন্ট), ৬ষ্ঠ কেরালা ১০ পয়েন্ট), ৭ম পাঞ্জাব (৯ পয়েন্ট)

মহিলা বিভাগ: ১ম মহারাষ্ট্র (১০১ পয়েন্ট), ২য় গুজরাট (৪২ পয়েন্ট), ৩য় কেরালা (৪০ পয়েন্ট), ৪র্থ পশ্চিমবাংলা (১৭ পয়েন্ট), ৫ম দিল্লী (১০ পয়েন্ট)

বালক বিভাগ: ১ম পশ্চিমবাংলা (৭৪ পয়েন্ট), ২য় মহারাষ্ট্র (৭১ পয়েন্ট), ৩য় দিল্লী (২২ পয়েন্ট), ৪র্থ রাজস্থান (২১ পয়েন্ট), ৫ম অন্ধ্রপ্রদেশ (১৩ পয়েন্ট), ৬ষ্ঠ গুজরাট (৮ পয়েন্ট), ৭ম উত্তরপ্রদেশ (৭ পয়েন্ট)

বালিকা বিভাগ: ১ম মহারাষ্ট্র (৫৪ পয়েন্ট) ২য় দিল্লী (৩৭ পয়েন্ট), ৩য় রাজস্থান ১৫ পয়েন্ট), ৪র্থ কেরালা (১০ পয়েন্ট), ৫ম গুজরাট (৫ পয়েন্ট), ৬ষ্ঠ তামিলনাড়ু (৪ পয়েন্ট), ৭ম পাঞ্জাব (৩ পয়েন্ট), ৮ম পশ্চিমবাংলা (২ পয়েন্ট)

পদক জয়ের তালিকা

পুরুষ বিভাগ

	স্বর্ণ	রৌপ্য	ব্রোঞ্জ
সার্ভিসেস	১৩	৮	২
মহারাষ্ট্র	১	৪	৩
পশ্চিমবাংলা	০	২	৮
রেলওয়ে	০	০	২
উত্তরপ্রদেশ	০	০	১
পাঞ্জাব	০	০	১
কেরল	০	০	১

মহিলা বিভাগ

	স্বর্ণ	রৌপ্য	ব্রোঞ্জ
মহারাষ্ট্র	৮	৭	০
গুজরাট	১	১	৭
কেরল	০	১	৩
দিল্লী	০	০	১
পশ্চিমবাংলা	০	০	১

বালক বিভাগ

	স্বর্ণ	রৌপ্য	ব্রোঞ্জ
মহারাষ্ট্র	৫	০	[illegible]
পশ্চিমবাংলা	৩	৬	[illegible]
দিল্লী	০	২	[illegible]
রাজস্থান	০	০	[illegible]

বালিকা বিভাগ

	স্বর্ণ	রৌপ্য	ব্রোঞ্জ
মহারাষ্ট্র	৩	৪	[illegible]
দিল্লী	২	১	[illegible]
রাজস্থান	০	০	[illegible]

আফ্রো-এশিয়ান টেবল টেনিস প্রতিযোগিতা

এশিয়া এবং আফ্রিকা মহাদেশের অন্তর্ভুক্ত বিভিন্ন দেশের টেবল টেনিস খেলোয়াড়দের মধ্যে সৌহার্দ বন্ধন সুদৃঢ় করার এবং টেবল টেনিস খেলার মানোন্নয়নের উদ্দেশ্যে প্রজাতন্ত্রী চীনের রাজধানী পিকিংয়ে প্রথম আফ্রো-এশিয়ান টেবল টেনিস প্রতিযোগিতার আসর বসেছে। ভারতবর্ষকে নিয়ে [illegible] দেশ প্রতিযোগিতায় যোগদানের আমন্ত্রণ গ্রহণ করেছে। চীনের ভূখণ্ডে ভারতীয় টেবল টেনিস সদস্যরা যেভাবে সাদর সম্বর্ধনা লাভ করেছেন তা রাজনৈতিক পর্যবেক্ষক মহলের ধারণায় চীন-ভারত মৈত্রী বন্ধনের হয়ত সহায়ক হবে।

ভারতবর্ষের খেলা পড়েছে পুরুষ বিভাগের ৮নং গ্রুপে এবং মহিলা বিভাগের ৩নং গ্রুপে। যোগ্যতার ক্রমপর্যায় তালিকায় ভারতবর্ষ উভয় বিভাগেই ৪র্থ স্থান লাভ করেছে।

ভারতীয় দলের খেলোয়াড়বৃন্দ

পুরুষ বিভাগ: জি জগন্নাথ (রেলওয়ে), মীর কাশিম আলী (অন্ধ্রপ্রদেশ), দীপক বাদেরা (দিল্লী) এবং দিলীপ বাঙ্ সারকানা (অন্ধ্র)

মহিলা বিভাগ: কেটি চার্জমান (মহারাষ্ট্র), রুপা মুখার্জি (বাংলা) এবং শৈলজা সালোখে (মহারাষ্ট্র)

বালক বিভাগ: এ টি এস ইয়াহিয়া (অন্ধ্র)

বালিকা বিভাগ: এন গাওলা (মহারাষ্ট্র)

আবুল কালাম আজাদ ট্রফি

১৯৭০-৭১ সালের বিভিন্ন আন্তঃবিশ্ববিদ্যালয় ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয় সাফল্যের গড় তালিকায় শ্রেষ্ঠত্বের পরিচয় দিয়ে ভারত সরকার প্রদত্ত 'আবুল কালাম আজাদ ট্রফি' জয়ী হয়েছে। এই তালিকায় বোম্বাই দ্বিতীয় স্থান এবং দিল্লী তৃতীয় স্থান লাভ করেছে। এই ট্রফি ১৯৫৬-৫৭ সাল থেকে দেওয়া হচ্ছে এবং এ পর্যন্ত মাত্র এই চারটি বিশ্ববিদ্যালয় আবুল কালাম আজাদ ট্রফি জয়ী হয়েছে: পাঞ্জাব ৯-বার, দিল্লী ৩-বার, বোম্বাই ২-বার এবং কুরুক্ষেত্র ১-বার।

অমৃত পাবলিশার্স প্রাইভেট লিঃ-এর পক্ষে শ্রীসুপ্রিয় সরকার কর্তৃক পত্রিকা প্রেস, ১৪, আনন্দ চ্যাটার্জি লেন, কলিকাতা-৩ হইতে মুদ্রিত ও তৎকর্তৃক ১১।১, আনন্দ চ্যাটার্জি লেন, কলিকাতা—৩ হইতে প্রকাশিত।

নিয়মাবলী

বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

লেখকদের প্রতি

১। অমৃতে প্রকাশের জন্যে প্রেরিত সমস্ত রচনার নকল রেখে পাঠাবেন। মনোনীত রচনার খবর দু-মাসের মধ্যে জানান হয়। অমনোনীত রচনা কোনক্রমেই ফেরৎ পাঠান সম্ভব নয়। লেখার সঙ্গে কোন ডাকটিকিট পাঠাবেন না।

২। প্রেরিত রচনা কাগজের এক পৃষ্ঠায় স্পষ্টাক্ষরে লিখিত হওয়া আবশ্যক। অস্পষ্ট ও দুর্বোধ্য হস্তাক্ষরে লেখা প্রকাশের জন্যে গৃহীত হয় না।

৩। রচনার সঙ্গে লেখকের নাম ও ঠিকানা না থাকলে 'অমৃতে' প্রকাশের জন্যে গৃহীত হয় না।

এজেণ্টদের প্রতি

এজেন্সীর নিয়মাবলী এবং সে সম্পর্কিত অন্যান্য জ্ঞাতব্য তথ্য 'অমৃত' কার্যালয়ে পত্র দ্বারা জ্ঞাতব্য।

গ্রাহকদের প্রতি

১। গ্রাহকের ঠিকানা পরিবর্তনের জন্যে অন্ততঃ ১৫ দিন আগে 'অমৃত' কার্যালয়ে সংবাদ দেওয়া আবশ্যক।

২। ভি-পি-তে পত্রিকা পাঠানো হয় না। গ্রাহকের চাঁদা নিম্নলিখিত হারে মণিঅর্ডারযোগে 'অমৃত' কার্যালয়ে পাঠানো আবশ্যক।

চাঁদার হার

	কলিকাতা		মফঃস্বল	
বার্ষিক	টাকা	২৫·০০	টাকা	৩০·০০
ষাণ্মাষিক	টাকা	১২·৫০	টাকা	১৫·০০
ত্রৈমাসিক	টাকা	৬.২৫	টাকা	৮·০০

'অমৃত' কার্যালয়

১১/১ আনন্দ চ্যাটার্জি লেন,

কলিকাতা—৩

ফোন : ৫৫-৫২০১ (১৪ লাইন)

১১শ বর্ষ
৩য় খণ্ড

অমৃত

২৭ সংখ্যা
মূল্য
৫০ পয়সা

Friday, 12th November, 1971 শুক্রবার, ২৫শে কার্তিক, ১৩৭৮ **50 Paise**

সূচীপত্র

প্রচ্ছদ : শ্রীকাশীনাথ কংসবণিক

এক নজরে

জাতি ও ধর্ম : শুধুমাত্র ধর্মের ভিত্তিতে যে একটি জাতি গড়ে উঠতে পারে না তা আজ পাকিস্তানে সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণ হয়েছে। দেখা যাচ্ছে, অপর ধর্মভিত্তিক রাষ্ট্র ইস্রায়েল প্রায় একই সময়ের ব্যবধানে সমরূপ সঙ্কটের সম্মুখীন হচ্ছে। তেইশ বছর আগে বিশ্বের বিভিন্ন রাষ্ট্রের ইহুদি ধর্মাবলম্বী ব্যক্তিদের নিয়ে আরবের বুকে যে রাষ্ট্রটি গড়ে উঠেছিল তা আত্মরক্ষার প্রয়োজনে আরবদের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ থাকলেও অভ্যন্তরীণ বিরোধে এখন রীতিমতো সংকটের সম্মুখীন। ইস্রায়েলের ইহুদিরা এখন মোটামুটিভাবে আস্কেনাজিক (ইউরোপীয়) এবং শেফার্ডিক (ওরিয়েণ্টাল-প্রাচ্য) এই দুই জোটে বিভক্ত। মুখ্যত উত্তর আফ্রিকা ও এশিয়া থেকে যাওয়া শেফার্ডিকরা ইস্রায়েলের ইহুদি জনসংখ্যার প্রায় ৬৫ শতাংশ। কিন্তু ইস্রায়েলের রাষ্ট্রীয় কর্মযজ্ঞে তাদের অধিকার ও স্বীকৃতি নগণ্য বললেও বেশি বলা হয়। ইস্রায়েলের উচ্চ সরকারি কর্মচারীদের মাত্র তিন শতাংশ শেফার্ডিক এবং সে রাষ্ট্রের পার্লামেণ্ট নেসেট্-এ তাদের সংখ্যা এক-পঞ্চমাংশ। ইস্রায়েলের ১৮-সদস্য মন্ত্রিসভার মাত্র একজন অ-ইউরোপীয় এবং ইরাকি বংশোদ্ভূত সেই ইহুদি ভদ্রলোকের হাতে আছে গুরুত্বহীন পুলিশ দপ্তর। প্রায় ৬০ শতাংশ শেফার্ডিক ছেলেমেয়ের স্কুলের পড়াই সাঙ্গ হয় না, এবং কলেজের ৯৫ শতাংশ ছাত্রই ইউরোপ থেকে আসা ইহুদিদের সন্তান।

ইস্রায়েলের যেসব ব্যক্তির মাসিক আয় ১৪৫ ডলারের কম এবং তা দিয়ে অন্তত আটজনের ভরণপোষণের দায়িত্ব বহন করতে হয় তাদের দারিদ্র্য সীমার নীচের লোক বলে ধরা হয়। ইস্রায়েলের প্রায় বিশ শতাংশ লোক ঐ হিসাবমতে দরিদ্র এবং তারা সকলেই শেফার্ডিক। শিক্ষার সুযোগ থেকে বঞ্চিত ঐ দরিদ্র পরিবারের ছেলেরা ধীরে ধীরে কাজের সুযোগ থেকেও বঞ্চিত হচ্ছে এবং তার ফলে অনিবার্যভাবে ইস্রায়েলের শহরগুলিতে অপরাধের সংখ্যা দ্রুত বৃদ্ধি পাচ্ছে। ইস্রায়েলের রাজধানী তেল-আবিভে গত এক বছরে লুঠতরাজ ডাকাতি বেড়েছে প্রায় একশ পঁচিশ শতাংশ, খুন বেড়েছে দ্বিগুণ, পথেঘাটে চুরি ছিনতাই স্বাভাবিক ঘটনা হয়ে দাঁড়িয়েছে এবং যে ইস্রায়েলে একদিন পতিতাবৃত্তি সম্পূর্ণ লোপ পেয়েছিল তার রাজধানীতেই চারশতাধিক পতিতা প্রকাশ্যে পথে দাঁড়িয়ে পথচারীদের আকৃষ্ট করছে। যে ইস্রায়েল একদিন সারা বিশ্বের ইহুদিদের স্বর্গরাজ্য বলে প্রতিভাত হয়েছিল, প্রাচ্যের ইহুদিদের কাছে তার দরজা এখন সম্পূর্ণ রুদ্ধ। একারণে মোহমুক্ত বহু ইহুদিই আবার তাদের ছেড়ে যাওয়া 'পরদেশে' ফিরে আসছে। আমাদের দেশেও কেরল রাজ্যের একপ্রান্তে যে ইহুদি উপনিবেশটি গড়ে উঠেছিল তা কয়েক বছর আগে সম্পূর্ণ জনহীন পুরীতে পরিণত হলেও আবার সেখানে প্রাণের স্পন্দন অনুভূত হচ্ছে, অর্গলমুক্ত হচ্ছে দীর্ঘদিন বন্ধ থাকা সিনাগগগুলি।

সুইজারল্যাণ্ড ও নারী : ইউরোপের অন্যতম প্রাচীন ও সুসভ্য রাষ্ট্র সুইজারল্যাণ্ড। বরাবরই সে রাষ্ট্র গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে শাসিত হয়ে এসেছে এবং তার চারটি ক্যাণ্টনে (প্রদেশ) এখনও প্রত্যক্ষ গণতন্ত্র প্রবর্তিত আছে। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় যে সুইজারল্যাণ্ডের নারীদের এতদিন পর্যন্ত কোন ভোটাধিকার ছিল না। তার প্রধান কারণ, ১৮১৫ সালে ভিয়েনা কংগ্রেসের সিদ্ধান্তক্রমে সুইজারল্যাণ্ড একটি স্থায়ী নিরপেক্ষ রাষ্ট্রে পরিণত হওয়ায় তার রাজনীতিতে মতবৈষম্যের সুযোগ প্রায় স্থায়ীভাবেই লোপ পায়। তারপর নানা কারণে ঐ পার্বত্য সুরম্য রাজ্যটির আর্থিক অবস্থা বরাবরই সচ্ছল, তাই দারিদ্র্য ও বৈষম্যকে মূলধন করে কোন উত্তেজনা সৃষ্টিকারী রাজনৈতিক দলও সেখানে মাথাচাড়া দিয়ে উঠতে পারেনি। ফলে সুইজারল্যাণ্ডের রাজনীতিতে বরাবরই নরমপন্থী রক্ষণশীলদের প্রাধান্য বজায় থেকেছে যাঁরা রাজনৈতিক বিরোধ-বৈষম্য থেকে মেয়েদের দূরে থাকাই উচিত বলে মনে করেন। তাঁরা বরাবরই বলে এসেছেন : মেয়েরা পুরুষের সঙ্গে একমত হলে সেটা অধিকন্তু ব্যাপার মাত্র, আর মেয়েরা পুরুষের সঙ্গে ভিন্নমত হলে সেটা বিপজ্জনক, যে বিপদ ডেকে এনে সুইজারল্যাণ্ডের শান্ত পরিবেশ ও শান্তির সংসারগুলিকে উত্যক্ত করার কোন প্রয়োজন নেই। কিন্তু সুইজারল্যাণ্ডের নারীকুল এ স্তোকবাক্যে ভুলে থাকতে চাননি। তাঁরা দাবি তোলেন, সারা বিশ্বের সব দেশে যে অধিকার স্বীকৃত সুইজারল্যাণ্ডে তার ব্যতিক্রম হতে পারে না। —এতদিনে সুইজারল্যাণ্ডে নারীর রাজনৈতিক অধিকার স্বীকৃতিলাভ করেছে। গত ৩০শে অক্টোবর সুইজারল্যাণ্ডে যে সাধারণ নির্বাচন হয়ে গেল তাতেই সে দেশের নারীরা প্রথম ভোটাধিকার প্রয়োগ করলেন। এবার সুইজারল্যাণ্ডে ভোটদাতার সংখ্যা ছিল ৩৬ লক্ষ, যার মধ্যে নারীর সংখ্যা ছিল ১৯ লক্ষ। তাঁরা শুধু যে ভোট দিলেন তাই নয়, ছয়জন নারীও সুইজারল্যাণ্ডের ইতিহাসে এই প্রথম, ন্যাশনাল কাউন্সিল-এর (সুইস পার্লামেণ্টের নিম্ন সভা) সদস্য নির্বাচিত হলেন। প্রাচীনতম গণতন্ত্রের দেশ সুইজারল্যাণ্ড এতদিনে প্রকৃত ও পূর্ণাঙ্গ গণতন্ত্রী রাষ্ট্রে পরিণত হল।

পুজোর জন্য নয় : চাঁদা তোলার পদ্ধতি প্রায় একই : সপ্তাহান্তের দুটি দিনে লোকের বাড়ি বাড়ি ঘুরে, দোকানে দোকানে ধর্না দিয়ে, মাঝপথে গাড়ি থামিয়ে বেলজিয়ামের ছেলেরা সেদিন সাড়ে তিন কোটি ফ্রাঁ, অর্থাৎ চুয়াম লক্ষ টাকা সংগ্রহ করে। এধরনের সংগ্রহ ওরা ১৯৬৬ সাল থেকে প্রতি বছরই এই সময়ে দুদিনের জন্য করে আসছে। কিন্তু সেটা ওরা করে কোন পুজোয় আতসবাজি পোড়াতে বা ভোজের আয়োজন করতে নয়। ওরা সংগ্রহ করে বেলজিয়ামের তরুণদের দ্বারাই পরিচালিত বিশ্বের কয়েকটি দরিদ্র দেশের দাতব্য প্রতিষ্ঠানের ব্যয় সঙ্কুলান করতে। ঐ অর্থ ব্যয় হয় শিক্ষায়, স্বাস্থ্যোন্নয়নে ও বিবিধ জনকল্যাণে। তাই বেলজিয়ামের ছেলেমেয়েরা যখন বছরের নির্দিষ্ট দুটি দিনে অর্থসংগ্রহ করতে দুয়ারে দুয়ারে ছোটাছুটি করে বা রাস্তায় দল বেঁধে গাড়ি আটকায় তখন কেউই আতঙ্কিত হয় না বা পুলিশে খবর দেওয়ার কথা চিন্তা করে না। স্বেচ্ছাদানেই সংগ্রহের ভাণ্ডারগুলি অনতিবিলম্বে পূর্ণ হয়ে ওঠে, জোর করে বেশি চাইলেও সেটা কারও জবরদস্তি বলে মনে হয় না।

এবার সংগ্রহকারীদের উৎসাহ ও তৎপরতা একটু বেশিই ছিল। কারণ তারা পূর্বেই সিদ্ধান্ত নেয় যে, এবারের সংগ্রহের বিশ শতাংশ তারা বাংলাদেশের উদ্বাস্তু ত্রাণে ব্যয় করবে।

অভিনব হুমকি : মাদ্রাজ শহরের মেয়র শ্রী এস এ গণেশন ক'দিন আগে বোম্বাইতে অনুষ্ঠিত সারা ভারত মেয়র সম্মেলনে বলেছেন, লোকসংখ্যা অনুপাতে লোকসভায় সকল রাজ্যের আসন নির্দিষ্ট হয় বলে তামিলনাড়ুর আসন যেভাবে বারবার কমানো হচ্ছে তা যদি বন্ধ না হয় তবে তামিলনাড়ুকে সরকারিভাবে পরিবার পরিকল্পনা বন্ধের কথা চিন্তা করতে হবে। তিনি বলেন, ১৯৬২ সালে একবার তামিলনাড়ুর লোকসভার জন্য নির্দিষ্ট আসন সংখ্যা ৪১ থেকে কমিয়ে ৩৯ করা হয়। আবার শোনা যাচ্ছে যে, অন্যান্য রাজ্যের লোকসংখ্যা তামিলনাড়ুর তুলনায় বেশি বৃদ্ধি পাওয়ায় তামিলনাড়ুর আসন সংখ্যা আরও কমিয়ে তাদের বৃদ্ধি করা হবে। শ্রীগণেশন বলেছেন, এ ব্যবস্থা তাঁরা কিছুতেই মেনে নেবেন না, এবং দরকার হলে তাঁরা উল্লেখিত ব্যবস্থাবলম্বনে বাধ্য হবেন।

৪।১১।৭১ —প্রত্যক্ষদর্শী

সম্পাদকীয়

দুর্গত উড়িষ্যা

উড়িষ্যার ভয়াবহ ঘূর্ণীঝড়ের ক্ষতির সঠিক পরিমাণ জানতে এখনও অনেক সময় হয়ত লাগবে, তথাপি এখনই যেটুকু সংবাদ প্রকাশিত হয়েছে তার দ্বারা এই সর্বনাশা ঝড় যে কি পরিমাণ ধ্বংস সাধন করেছে তা অনুমান করা কঠিন নয়। সকল প্রকার যোগাযোগ ব্যবস্থা ছিন্ন হয়েছে, অজস্র নর-নারীর প্রাণহানি ঘটেছে, গবাদি পশু জলে ভেসে গেছে, বাড়ি-ঘর নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। বঙ্গোপসাগরের উপকূলস্থ অঞ্চলে ঘূর্ণিঝড়ের প্রকোপ নতুন নয়, প্রতি বৎসরই এইভাবে মৃত্যুদূতের প্রচন্ড প্রকোপে প্রলয়ঙ্কর অবস্থা সৃষ্টি হয়। উড়িষ্যাতে যা ঘটেছে তা মহাপ্রলয় না হলেও প্রায় প্রলয় বলা যায়। ১৭৩৭ খৃস্টাব্দে এক তীব্র ঝড়ে প্রচন্ড ক্ষয়ক্ষতি ঘটেছিল। মাত্র এক বছর পূর্বে পূর্ব-বাংলার প্রচন্ড ঘূর্ণীঝড়ের প্রকোপ এবং সামুদ্রিক জলোচ্ছ্বাসের স্মৃতি আজও ম্লান হয় নি অনেকের মনে। এই সর্বনাশা ঝড়ের পর যে সব তথ্যাদি সংগৃহীত হয়েছিল তদ্দ্বারা জানা যায় ঝড়ের আক্রমণ ক্রমশঃ তীব্রতর হয়ে বার বার উপকূলবর্তী অঞ্চলকে পর্যুদস্ত করতে পারে। বর্তমান বৎসরে ইতিমধ্যেই তিনবার ঘূর্ণীঝড়ের আবির্ভাব ঘটে গেছে, এবং এই সম্পাদকীয় নিবন্ধ রচনাকালে আবার আবহাওয়া অফিস থেকে সতর্ক করে দেওয়া হয়েছে। শুক্রবার অপরাহ্নে (৫ই তারিখে) ঘূর্ণিঝড় কলিকাতার প্রায় ৬০০ কিলোমিটার দূরে এসে পৌঁছেছে। সুন্দরবন এবং চব্বিশ পরগণা আক্রান্ত হতে পারে এইবারকার ঝড়ে। গত ২৯শে সেপ্টেম্বর থেকে এই নিয়ে একই বছরে এবং প্রায় একই কালে বার বার চারবার ঘূর্ণিঝড়ের আগমন ঘটে গেল। এ অবস্থা নিঃসন্দেহে অস্বাভাবিক এবং অভাবনীয়। আবহাওয়াতাত্ত্বিক বিজ্ঞান এবং আধুনিক যোগাযোগ ব্যবস্থার ফলে অবশ্য পূর্বাহ্নে সতর্কতা জ্ঞাপন করা সম্ভব। কিন্তু উপকূল-প্রান্তে যে সব দরিদ্র জনগণ সাধারণত বাস করে তারাই বা স্বল্পমেয়াদী নোটিশে যায় কোথায়? সিলভার আয়োডাইড ক্রিসট্যাল বিমানযোগে যদি শূন্য থেকে সিঞ্চন করা যায় তাহলে নাকি ঝড়ের তীব্রতা হ্রাস করা যায়। এই পরীক্ষা নাকি সফল হয়েছে। অবশ্য এই ব্যবস্থা নাকি ব্যয়বহুল। রাশিয়ানরা নাকি শিলাবৃষ্টি সংহার করতে সক্ষম হয়েছেন। সুতরাং বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে ঝড় নিয়ন্ত্রণ করার ব্যবস্থা গ্রহণ করা অবিলম্বে কর্তব্য। উপকূল অঞ্চলের অন্ততঃ তিন-চার মাইল জনহীন করা প্রয়োজন। শুধু অক্ষম অসহায়ের ভঙ্গীতে বসে থেকে কপাল চাপড়ে সব দোষ ভগবানের কাঁধে চাপিয়ে দেওয়ার দিন আর নেই। মৃত্যু এবং মহামারী রোধ করা সর্বাগ্রে প্রয়োজন।

উড়িষ্যা একটি অনুন্নত রাষ্ট্র, সুতরাং এই ট্র্যাজেডির গুরুত্ব আরও বেশী। মৃতের সংখ্যা সরকারী বিবরণে দশ হাজার, বে-সরকারী বিবরণে পঁচিশ হাজার। যে পরিমাণ ফসল নষ্ট হয়েছে তার আনুমানিক মূল্য ২০০ কোটি টাকা। শুধু মাত্র জাম্বু নামক দ্বীপের সব গ্রামগুলি নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। যারা কোনো রকমে বেঁচে আছে তাদের আশ্রয় নেই, অন্ন নেই, বস্ত্র নেই। এই সর্বনাশা ঝড়ের গুরুত্ব সম্পর্কে মনে হয় বিদেশে কেন ভারতের সকল অঞ্চলেও যথেষ্ট প্রচারিত হয় নি, বা ধ্বংসের গুরুত্ব সকলের যথাযথ উপলব্ধি সম্ভব হয় নি। কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী চৌহান সরেজমিনে তদন্ত করে সরাসরি কেন্দ্রীয় তহবিল থেকে দু কোটি টাকা বরাদ্দ করেছেন। আমাদের মনে হয় অর্থ সংগ্রহটা সমস্যা নয়, দুর্গতদের দুঃখহরণে যথাযথ ত্রাণ ব্যবস্থা গ্রহণ করাটাই সর্বাগ্রে প্রয়োজন—মহামারী এবং দুর্ভিক্ষ নিবারণে সরকারী ও বে-সরকারী ত্রাণব্যবস্থায় অগ্রণী হওয়া প্রয়োজন। আশা করা যায় দুর্গতদের এই নিদারুণ সংকটত্রাণে সহানুভূতিশীল সহৃদয় কর্মীর অভাব হবে না। উড়িষ্যার জনগণ আজ যারা ভারতের মানুষের কাছে এই দুঃসময়ে চায় শান্তি ও স্বস্তির বাণী এবং সহযোগিতা।

ঘূর্ণিঝড়ে বিধ্বস্ত কটক জেলার একটি অংশ

দেশে বিদেশে

ওড়িশার উত্তর উপকূলে গোবারি নদীর মোহানায় অবস্থিত একটি বদ্বীপ, নাম জম্বুদ্বীপ। এর প্রায় তিন দিকেই সমুদ্র, বঙ্গোপসাগর। বছর দশেক আগে সেখানে পূর্ববঙ্গ থেকে চলে-আসা কিছু উদ্বাস্তুকে নিয়ে আসা হয়েছিল পুনর্বাসনের জন্য। ভাগ্যতাড়িত ঐ মানুষগুলি সেই বিচ্ছিন্ন, জলবেষ্টিত ভূখণ্ডে সুখেদুঃখে এক রকম দিন কাটাচ্ছিলেন। এবার সেখানে ভাল ফসল হয়েছিল। আর দুই তিন সপ্তাহের মধ্যেই সোনার ধান ঘরে ওঠার কথা ছিল।

কিন্তু প্রকৃতির অন্ধ, অকরুণ আক্রোশ সব হিসাব ওলট-পালট করে দিল, সব স্বপ্ন চূর্ণ করে দিল। ২৯ অকটোবর শুক্রবার রাত নয়টা নাগাদ বঙ্গোপসাগরের বুক থেকে ছুটে এল তুফান আর তার পিছু পিছু জলোচ্ছ্বাস। ঘণ্টায় দেড় শ' কিলোমিটার বেগে ছুটে এসে ঝড়ো বাতাস সব কিছু তছনছ করে দিল আর পাঁচ মিটার উঁচু লোনা জলের একটা দেওয়াল এসে ভাসিয়ে নিয়ে গেল ঘরদুয়ার, মানুষ, গরু, ক্ষেতের ফসল, সামনে যা পড়ল। মহাপ্রলয় হয়ে গেল। কত লোক প্রাণ হারাল, কত পরিবার গৃহহারা হল, কত গরুবাছুর মরল, ফসল ও অন্যান্য সম্পত্তির ক্ষতি কি পরিমাণ হল, এসব হিসাব এখনও সম্পূর্ণ হয় নি। তবে সেই মহাপ্রলয়ের ছয় দিন পরে একজন সাংবাদিক সেখানে গিয়ে খবর নিয়ে এসেছেন, ঐ অঞ্চলের মোট ৭৬টি গ্রামের সব কটি মুছে গেছে এবং মৃতের সংখ্যা কমপক্ষে ৪৫৪৯। ঐ সাংবাদিক নদীর ধারে বহু মৃতদেহ পড়ে থাকতে দেখেছেন। তিনি শুনেছেন, যদিও শত শত মৃতদেহ গাদা করে মাটিতে পুঁতে ফেলা হয়েছে তাহলেও ধ্বংসস্তূপের তলা থেকে এখনও অনেক লাশ বের করে আনতে বাকী আছে।

এক শতাব্দী কালের মধ্যে ওড়িশার এই বৃহত্তম বিপর্যয়ে যেসব অঞ্চল সর্বাধিক ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে জম্বুদ্বীপ সেগুলির

অন্যতম। গোবারি নদী ও লুনা নদী দুটি যেখানে বঙ্গোপসাগরে গিয়ে মিলিত হয়েছে সেখানে ও তার আশেপাশে একটা বিস্তীর্ণ অঞ্চল এই প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের শিকার হয়েছে। এই বিধ্বস্ত অঞ্চলের মধ্যে পারাদীপ বন্দর ও চাঁদবালি পোতাশ্রয়ও রয়েছে। বিধ্বস্ত অঞ্চলগুলির মধ্যে আছে—কটক জেলার কেন্দ্রাপাড়া, জাজপুর, জগৎসিংপুর, কটক সদর, রাজনগর ও মহাকালপাড়া এবং বালেশ্বর জেলার চাঁদবালি ও বাসুদেবপুর।

রেকর্ডে দেখা গেছে, ওড়িশায় এই ধরনের বিধ্বংসী ঝড়জল সর্বশেষ হয়েছে ১৮৮৫ সালে।

মৃতের সংখ্যা সম্পর্কে সর্বশেষ সরকারী অনুমান হচ্ছে দশ হাজার। বেসরকারী অনুমান এর অন্ততঃ দ্বিগুণ। পারাদীপ বন্দরে ক্ষতির পরিমাণ দু কোটি টাকা। সেখানে তিনটি লঞ্চ ডুবে গেছে, ৫০০ টনের একটি ড্রেজার চড়ায় আটকে গেছে এবং আরও কিছু ক্ষতি হয়েছে যেগুলি পূরণ করতে বেশ কতক দিন সময় লাগবে। অর্থাৎ এই বন্দর বেশ কিছুদিনের জন্য এখন অকেজো হয়ে থাকবে।

যদিও ওড়িশা মন্ত্রিসভা জরুরী বৈঠকে মিলিত হয়ে স্থির করেছেন যে, যুদ্ধকালীন ভিত্তিতে ত্রাণের ব্যবস্থা গড়ে তোলা হবে তাহলেও সংবাদে দেখা যাচ্ছে, দুর্গতদের অনেকের কাছেই এখন পর্যন্ত কোন রকম সাহায্য পৌঁছয় নি। প্রথম কাজ হল যেসব অঞ্চল এখনও বিচ্ছিন্ন হয়ে রয়েছে তাদের সঙ্গে যোগাযোগ পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করা। একটা বড় অসুবিধা হয়েছে এই যে, এই অঞ্চলে যত নৌকা ছিল সেগুলি প্রায় সবই সমুদ্রের জলে ভেসে গেছে। সামরিক বাহিনীর নৌকাগুলিকে যোগাযোগ স্থাপনের কাজে লাগান হচ্ছে। হাজার হাজার মানুষ এখনও কোথাও কোথাও জলবেষ্টিত অবস্থায় আটকে পড়ে রয়েছেন। তাঁদের কাছে খাদ্যসামগ্রী পৌঁছে দিতে হবে এবং তাঁদের উদ্ধার করে আনতে হবে। ইতিমধ্যে কোন কোন এলাকা থেকে কলেরার খবর আসছে। রোগ যাতে না ছড়ায় এবং মহামারী দেখা না দেয় সেদিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখতে হবে।

ভবিষ্যতের জন্য আর একটি গুরুতর সমস্যা তৈরি হয়ে রইল। যে অঞ্চলের উপর দিয়ে এই দুর্যোগ বয়ে গেল সেটি ওড়িশার ধানগোলা বললেই চলে। এই দুর্যোগের ফলে এবারকার ফসল তো গেলই, সমুদ্রের নোনা জল ঢুকে আগামী কয়েক বছরের জন্যও ফসলের সম্ভাবনা নষ্ট হয়ে গেল।

ওড়িশার এই বিপর্যয় আর একবার স্মরণ করিয়ে দিল যে, আমাদের দেশে এই ধরনের ঘূর্ণিঝড় ও সামুদ্রিক জলোচ্ছ্বাসের আকস্মিক আঘাত থেকে মানুষের প্রাণ ও সম্পত্তির রক্ষার ব্যবস্থা খুবই অকিঞ্চিৎকর। বছরের বিশেষ বিশেষ সময়ে বঙ্গোপসাগরে ঘূর্ণিঝড় প্রায় নিয়মিত ঘটনা। (১৯৭০ সালের ১২-১৩ নভেম্বর তারিখের ঘূর্ণিঝড়ে পূর্ববঙ্গের সমুদ্রোপকূলে পাঁচ থেকে দশ লক্ষের মধ্যে মানুষ মারা গিয়েছিলেন।) কৃত্রিম উপগ্রহ 'এসসা'র কল্যাণে আজকাল আমাদের দেশের আবহাওয়াবিদরা অতীতের তুলনায় অনেক আগে ও অনেক নিখুঁতভাবে ঝড়ের সংকেত পাচ্ছেন এবং সেটা জনসাধারণকে জানিয়েও দিচ্ছেন। প্রশ্ন হচ্ছে, এই পূর্বাভাষের সাহায্যে আগে থেকে এমন ব্যবস্থা অবলম্বন করা যায় কিনা যাতে ক্ষয়ক্ষতি অনেকটা কম হয়? আমাদের দেশে এ বিষয়ে সম্প্রতি নজর দিতে আরম্ভ করা হয়েছে। ঘূর্ণিঝড় সম্পর্কে হুঁশিয়ারি দেওয়ার উদ্দেশ্যে ভারতের পূর্ব ও পশ্চিম উপকূলে কয়েকটি শক্তিশালী রেডার যন্ত্র বসাবার পরিকল্পনা করা হয়েছে। বিশাখাপত্তনমে এই ধরনের একটি রেডার গত বছর এপ্রিল মাস থেকে চালু রয়েছে। কলকাতা, মাদ্রাজ, ভুবনেশ্বর মাসুলিপত্তনম, নাগপট্টিনম, গোয়া ও বোম্বাইয়েও এই উদ্দেশে রেডার বসাবার কথা আছে। এই রেডারগুলির সাহায্যে চারশ কিলোমিটার পাল্লার মধ্যে ঝড়ের হদিশ করা সম্ভব হবে এবং সমুদ্রোপকূলে কোন জায়গায় সেই ঝড়ের ঝাপটা লাগতে পারে সেটা ২৪ ঘণ্টা আগে থেকে আরও সঠিকভাবে নির্দিষ্ট করে দেওয়া যাবে। উপকূলবর্তী অঞ্চলগুলিতে কয়েকটি অবজারভেটরি স্থাপনেরও পরিকল্পনা আছে যেগুলির কাজ হবে হাওয়ায় কোন অস্বাভাবিকতা দেখা গেলে সেটা ঝটিকা পূর্বাভাষ কেন্দ্রকে জানিয়ে দেওয়া। ঘূর্ণিবাত্যাজনিত ক্ষয়ক্ষতির সম্ভাবনা কমাবার জন্য কি ব্যবস্থা অবলম্বন করা যায় সে-বিষয়ে সরকারের কাছে উপযুক্ত সুপারিশ পাঠাবার জন্য ভারত সরকার ডিরেকটর-জেনারেল অব অবজারভেটরিজের নেতৃত্বে একটি কমিটি গঠন করেছেন। এই কমিটি আলোচনায় সমস্যার কতটা সুরাহা হয়েছে এবার ওড়িশায় অবশ্য তার কিছুই পরিচয় পাওয়া গেল না।

•

বৃটেন সফর শেষ করে আমেরিকা অভিমুখে যাত্রা করার সঙ্গে সঙ্গে ভারতের প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর এবারকার বিদেশ যাত্রার প্রথম পর্ব শেষ হল। এই পর্বে তিনি বেলজিয়াম, অস্ট্রিয়া ও বৃটেনে ঘুরে গেলেন।

সব দেশেই প্রধানমন্ত্রী বাংলাদেশ প্রশ্নটিকে ভারতের দৃষ্টিভঙ্গী থেকে সঠিকভাবে উপস্থিত করেছেন। সেদিক থেকে অবশ্য বেলজিয়াম ও অস্ট্রিয়া সফরের গুরুত্ব ততটা নেই যতটা রয়েছে বৃটেনের। কেননা, আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে প্রথমোক্ত দুটি দেশের প্রভাব-প্রতিপত্তি খুবই সীমাবদ্ধ। সুতরাং তারা বাংলাদেশ সংক্রান্ত প্রশ্নে ভারতের সঙ্গে একমত কিনা তাতে এই প্রশ্নের মীমাংসায় কোন সুরাহা হবে

বলে আশা করা যায় না। বাংলাদেশের সমস্যার একটা সন্তোষজনক সমাধানে পৌঁছতে বেলজিয়াম ও অস্ট্রিয়া পাকিস্থানের উপর প্রভাব বিস্তার করতে পারবে কিনা, এই প্রশ্নও ওঠে না।

কিন্তু বৃটেনের কথা স্বতন্ত্র। যদিও সেদেশের নেতারা বোঝাবার চেষ্টা করেছেন যে, ইসলামাবাদে তাঁদের বিশেষ প্রভাব নেই তাহলেও পাকিস্থানের সঙ্গে বৃটেনের যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রয়েছে সে-বিষয়ে সন্দেহ নেই। বৃটেন এই ব্যাপারে নিজেকে খুব বেশী জড়াতে চায় না বলেই হয়তো পাকিস্থানের উপর তার প্রভাবটা কমিয়ে দেখাতে চাইছে। ইতিমধ্যে পাকিস্থানের প্রেসিডেন্ট জেনারেল ইয়াহিয়া খাঁ অবশ্য এই বলে আস্ফালন করেছেন যে বৃহৎ শক্তিবর্গের মধ্যে বৃটেনই বাংলাদেশের ব্যাপারে পাকিস্থানের সবচেয়ে বেশী শত্রুতা করছে।

প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী গান্ধী বৃটেনে প্রধানমন্ত্রী এডওয়ার্ড হীথ, পররাষ্ট্রমন্ত্রী স্যার আলেক ডগলাস হিউম ও একদল বৃটিশ এম-পির সঙ্গে কথাবার্তা বলেছেন। এই সব আলাপ-আলোচনার ফলে বাংলাদেশ প্রশ্নে বৃটিশ মনোভাবের কোন নাটকীয় পরিবর্তন হবে এটা সম্ভবত কেউই আশা করেন না। তবে, পর্যবেক্ষকরা যতটুকু বুঝেছেন তাতে অনুমান করা যায় যে, শ্রীমতী গান্ধী এই বিষয়ে ভারতের কয়েকটি বক্তব্য ভালভাবে বোঝাতে সমর্থ হয়েছেন। হোয়াইট হলের নেতাদের তিনি একথা

হয়তো বোঝাতে পেরেছেন যে, ভারত ও পাকিস্থানের মধ্যে সংঘর্ষের সম্ভাবনা কি করে বন্ধ করা যায় সেদিকেই সবটুকু নজর দিলে সমস্যার মূল যেখানে সেই বাংলাদেশের প্রশ্নটিই অমীমাংসিত থেকে যাবে। তিনি সম্ভবতঃ এটা ভালভাবেই জানিয়ে দিয়েছেন যে, ভারত-পাকিস্থান শীর্ষ সংলাপ অথবা রাষ্ট্রসংঘ পর্যবেক্ষক নিয়োগের প্রস্তাব ভারত মেনে নেবে না। বৃটিশ সরকার ভারতীয় প্রধানমন্ত্রীর সংগে এ বিষয়ে একমত হয়েছেন যে, বাংলাদেশ সমস্যার রাজনৈতিক সমাধান দরকার। কিন্তু ঐ রাজনৈতিক সমাধান কিভাবে হতে পারে সেবিষয়ে দুই দেশের মধ্যে মতভেদ থাকাই সম্ভব। বৃটিশ সরকার মনে করেন যে, প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খাঁ আওয়ামী লীগ নেতাদের সংগে কথা বলে রাজনৈতিক সমাধান বের করবেন, এটা বাঞ্ছনীয় হলেও, বাস্তব নয়। বিশেষ করে তাঁদের ধারণা, স্বাধীনতার দাবীর ভিত্তিতে কথাবার্তা বলবেন, প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খাঁর কাছ থেকে এমন আশা করা যায় না। পাকিস্থানের দুই অংশের একটা শিথিল কনফেডারেশনের ভিত্তিতে মীমাংসা হতে পারে, এমন একটা ধারণা লণ্ডনের সরকারী মহলে দানা বাঁধছে। ভারতের বক্তব্য হল, রাজনৈতিক মীমাংসা একমাত্র নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের সংগেই (অর্থাৎ আওয়ামী লীগ নেতাদের সংগে) হতে পারে, সেই মীমাংসা কনফেডারেশনের ভিত্তিতে হবে কিনা তা ভারত, বৃটেন বা অন্য কোন দেশ বলে দিতে পারে না।

•

রাষ্ট্রায়ত্ত মডার্ন বেকারিতে প্রোটিন-সমৃদ্ধ ও ভিটামিনযুক্ত পাউরুটি তৈরি করার জন্য বছরে যে প্রায় ৫০ হাজার মেট্রিক টন গমের দরকার হয় তার শতকরা ৭০ ভাগই অস্ট্রেলিয়া ও ক্যানাডা থেকে আমদানি করতে হয়। ভারতে এই বেকারির যে আটটি কারখানা আছে তার যন্ত্রপাতি অস্ট্রেলিয়া সরকারের কাছ থেকে দান হিসাবে পাওয়া গেছে। এই যন্ত্রগুলির গড়নই এমন যে, পুরাপুরি দেশী গমের ময়দা দিয়ে সেগুলি চালান যায় না। ফলে, দেশে গম উদ্বৃত্ত হলেও এই 'পুষ্টিকর রুটির' কারখানাগুলির জন্য বিদেশী গম আমদানী করতে হবে।

দিল্লিতে সম্প্রতি একটি আলোচনাচক্রে এই তথ্য প্রকাশ পেয়েছে।

৫।১১।৭১ —পুণ্ডরীক

সোভিয়েত ল্যাণ্ড পুরস্কার

রাষ্ট্রপতি শ্রীভি ভি গিরি আগামী ১৫ নভেম্বর নয়াদিল্লীতে এক বিশেষ অনুষ্ঠানে ১৭ জন ভারতীয় লেখককে সোভিয়েত ল্যাণ্ড নেহরু পুরস্কার দেবেন।

পুরস্কারগুলির সম্মান মূল্য হল আট হাজার, তিন হাজার ও দেড় হাজার টাকা। তাছাড়া এবছর একটি বিশেষ পুরস্কার দেওয়া হবে ত্রিবেন্দ্রামের একজন প্রকাশককে ভারত-সোভিয়েত মৈত্রীর ক্ষেত্রে সহযোগিতার জন্য।

শ্রীগুরবক্স সিং, শ্রীঅমৃত রায়, শ্রীএন কৃষ্ণ ওয়ারিয়ার এবং শ্রীঅনন্ত কানেকর পাবেন আট হাজার টাকার পুরস্কার। এঁরা দু সপ্তাহ নিখরচায় সোভিয়েত দেশ ভ্রমণ করতে পারবেন। তিন হাজার টাকার পুরস্কার পাবেন এবং দু সপ্তাহ নিখরচায় সোভিয়েত দেশ ভ্রমণ করবেন শ্রীবিক্রমকুমার সিং, শ্রীগোপীকৃষ্ণ গোপেশ, শ্রীজে নরেন্দ্রদেব এবং শ্রীমণীন্দ্র রায়। শেষ পুরস্কার পাবেন ডঃ রাজেন্দ্র অবস্থী, ডঃ প্রভাকর মাচওয়ে, শ্রীআর এইচ নীথন, শ্রীকে ভি সুভান্নে, শ্রীবালাসাহেব পাতিল, শ্রীএম জি শাহ, শ্রীপারেশমালা বড়ুয়া, শ্রীগৌরচরণ পট্টনায়ক এবং শ্রীআবদুলকুমার মোড়াক।

ওপরে—পাঞ্জাব সীমান্তে জওয়ানদের সামনে ভাষণ দিচ্ছেন প্রতিরক্ষামন্ত্রী শ্রীজগজীবন রাম।

নীচে—[illegible] নিহত অসহায় একজন আদিবাসী।

কল্লোলের বিশ্বকর্মা দীনেশরঞ্জন দাশ

জীবেন্দ্র সিংহ রায়

বিশ শতকের বাংলা সাহিত্য ও সংস্কৃতির ইতিহাসে দীনেশরঞ্জন দাশ অবিস্মরণীয়। তিনি ছিলেন একজন করিৎকর্মা ও উদ্যোগী পুরুষ। তাঁর সোৎসাহ পরিচালনায় ফোর আর্টস ক্লাব যেমন অত্যল্প কালের মধ্যে সাড়া জাগাতে পেরেছিলো, তেমনি তাঁর সুযোগ্য সম্পাদনায় কল্লোল পত্রিকা বাংলা সাহিত্যে একটা নতুন যুগ রচনা করতে সমর্থ হয়েছিলো। সে-যুগ কল্লোল-যুগ নামে সুপরিচিত। অনেকের মতে এই যুগেই চিন্তাগত ও প্রকরণসম্পর্কিত আধুনিকতার বীজ বাংলাসাহিত্যে প্রথম প্রোথিত হয়েছিলো। সে দাবী গ্রাহ্য কিনা সেটা স্থানান্তরে বিচার্য। তবে এটা ঠিক, কল্লোল ছিলো একটা স্বয়ংপ্রভ ইনস্টিটিউসান এবং সেদিক থেকে তার ভূমিকা ঐতিহাসিক। এই কল্লোলের মতো একটা সৃজনধর্মী প্রতিষ্ঠানকে বুঝতে হলে তার কলাকর্মশালার বিশ্বকর্মা দীনেশরঞ্জনকে জানতে হবে। কিন্তু দুঃখের বিষয়, তাঁর জীবন ও কার্যকলাপ সম্পর্কে তাঁর মৃত্যুর পর কিছু সময়োচিত মন্তব্য ও বন্ধুজনোচিত গুণগান ছাড়া আজ পর্যন্ত বিশেষ কিছু বলা হয়নি।

দীনেশরঞ্জন দাশ

দীনেশরঞ্জনের জন্ম চট্টগ্রামে—২৯'শ জুলাই, ১৮৮৮ সালে। তাঁদের আদি নিবাস অবশ্য ঢাকা বিক্রমপুর পরগণার ফমোরপুর গ্রামে। তাঁর পিতার নাম ছিলো রায় কৈলাশচন্দ্র দাশ বাহাদুর। তিনি নববিধান ব্রাহ্মসমাজের[1] অন্তর্ভুক্ত উচ্চপদস্থ রাজকর্মচারী ছিলেন। অল্প বয়সে তাঁর মৃত্যু হয়। মাতার নাম ছিলো ইচ্ছাময়ী। তিনি মহৎ ও মার্জিত মনের অধিকারিণী ছিলেন। তিনি কবিতা লিখতেন। তাঁর যে কাব্যগ্রন্থটি প্রকাশিত হয়েছিলো, তার নাম ছিলো 'আকাশকুসুম'। গ্রন্থটির নামকরণে কৈলাসচন্দ্রের চট্টগ্রামের নিজস্ব বাসগৃহ—'আশাকুটীরের' প্রভাব আছে। অল্পবয়সে পিতৃহারা সন্তানেরা মায়ের কাছেই পেয়েছিলেন প্রাথমিক শিক্ষা ও রুচি।[2] যে সমস্ত মায়ের সন্তানদের সঙ্গে সম্পর্ক সূতিকাগৃহ বা বাল্যকাল পর্যন্ত ইচ্ছাময়ী তাঁদের একজন ছিলেন না[3]। তিনি ছিলেন দীনেশরঞ্জনদের সংগঠনশীল চরিত্র ও বাঁধভাঙা মনের আজীবন ধাত্রী।

শৈশবে মৃতদের সংখ্যা বাদ দিলে কৈলাসচন্দ্রের ছিলো চার পুত্র ও তিন কন্যা। তাঁরা প্রায় সকলেই চট্টগ্রামে জন্মগ্রহণ করেছেন। মনোরঞ্জন, বিভূরঞ্জন, দীনেশরঞ্জন ও প্রিয়রঞ্জন এই চার পুত্র। চারুবালা, তরুবালা এবং নীরুবালা বা নিরুপমা এই তিন কন্যা। দীনেশরঞ্জন ছিলেন পিতার তৃতীয় পুত্র ও চতুর্থ সন্তান।

এঁদের মধ্যে মনোরঞ্জন কল্লোলের নিয়মিত গ্রাহক ও প্রাপক ছিলেন। তাঁর স্বহস্তে সংরক্ষিত ও সুবিন্যস্ত কল্লোলের সংখ্যাগুলিই বর্তমান আলোচনায় ব্যবহৃত হয়েছে। এঁর মেয়ে মণিকা দেবীই কল্লোলের গোরাবাবু অর্থাৎ সতীপ্রসাদ সেনের স্ত্রী। বিভূরঞ্জনের পটুয়াটোলা লেনের বাড়িতে কল্লোলের অফিস ছিলো। এঁর স্ত্রী কমলা দাশ কল্লোলের তরুণ লেখকগোষ্ঠীর কাছে মাতৃসমা ছিলেন। ইনি প্রায় প্রতিদিন তাঁদের ক্ষুধার অন্ন—অন্ততঃ রুটি-তরকারী যোগাতেন।[5] মেজ বোন তরুবালার সঙ্গেও দীনেশরঞ্জনের সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ ছিলো—তাঁর ১নং মিন্টো রোডের বিরাট বাড়িতে প্রতি বছর ২৯'শ জুলাই দীনেশরঞ্জনের জন্মোৎসব ঘরোয়াভাবে পালিত হতো—তাতে তাঁর কর্মজগতের বন্ধুরা—সায়গল, শচীনদেব বর্মণ, পঙ্কজ মল্লিক ইত্যাদি আসতেন[6]। প্রিয়রঞ্জনও[7] ছিলেন দীনেশরঞ্জনের প্রিয়। তবে সবচেয়ে ছোট বোন নীরুবালা ওরফে নিরুপমাই ছিলেন সেজদার খুব ঘনিষ্ঠ। কারণ অন্যান্য ভাইবোনদের মধ্যে তাঁর সাহিত্য-চেতনাই অগ্রজের কাছে কিছুটা স্বীকৃতি পেয়েছিলো। সুতরাং দেখা যাচ্ছে, দীনেশরঞ্জনের পরিজন পরিবেশ তাঁর সাহিত্যচর্চা ও শিল্পানুশীলনের পক্ষে অনুকূলই ছিলো।

কৈলাসচন্দ্রের অকালমৃত্যুর পর দাশ-পরিবার চট্টগ্রাম ছেড়ে কলকাতায় চলে আসে এবং সেখানেই মোটামুটিভাবে বাস করতে থাকে।

দীনেশরঞ্জন চট্টগ্রামের স্কুল থেকে এন্ট্রান্স পাশ করেন। তারপর ভর্তি হন ঢাকা কলেজে। কিন্তু সেখানে তাঁর পড়াশুনা বেশি দূর এগোয়নি। স্বদেশী আন্দোলনের সময় তিনি কলেজ ছেড়ে দেন। সুতরাং তাঁর আনুষ্ঠানিক বা ছাপমারা বিদ্যার্জন ঐ এন্ট্রান্স পাশ পর্যন্তই। তবে তিনি আর্ট স্কুলে কিছুদিনের জন্যে ভর্তি হয়েছিলেন বটে, কিন্তু সেখানে বিশেষ কিছু শেখেননি। তিনি যে ভালো ছবি ও কার্টুন আঁকতে পারতেন সে শুধু সহজাত বা স্বোপার্জিত বিদ্যার গুণেই।

আজীবন অবিবাহিত ছিলেন দীনেশরঞ্জন। এই কৌমার্যব্রত পালনের একটা ছোট্ট ইতিহাস আছে। কোলকাতার এক বিশিষ্ট ও শিক্ষাবিদের পরিবারে তাঁর যাতায়াত ও ঘনিষ্ঠতা ছিলো। শিক্ষাবিদের একটি ছোট মেয়ে ছিলো। সে তখনও ফ্রক পরতো। ক্রমশঃ সেই মেয়েটির সঙ্গে দীনেশরঞ্জনের অন্তরঙ্গতা হয়। কিন্তু সামাজিক দৃষ্টিতে দীনেশ প্রথম শ্রেণীর পাত্র ছিলেন না। তাই মেয়েটির বাবা-মা বিয়েতে আপত্তি তোলেন এবং মেয়েকে বিলেতে পাঠিয়ে দেন। পরে দীনেশরঞ্জনের এক বন্ধুকেই মেয়েটি বিয়ে করে, কিন্তু

গোকুলচন্দ্র নাগ

কল্লোলের প্রচ্ছদপটের একটি নমুনা। এর অন্তর্নিহিত আইডিয়া বিদ্রোহাত্মক এবং সে কারণেই পত্রিকাটির দিক থেকে খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

দীনেশরঞ্জন বিয়ের কথা আর জীবনে ভাবেননি।

নিরবচ্ছিন্ন কর্মজীবন যাপন করা দীনেশরঞ্জনের স্বভাব ছিলো না। তিনি, পূর্বেও বলেছি, প্রথম চাকুরী শুরু করেন মেট্রোপলিটান কলেজের ক্রীড়াবিদ-অধ্যক্ষ সারদারঞ্জন রায়ের স্পোর্টস্ গুডস-এর দোকান এস রায় এ্যান্ড কোং-এর৮ সেলসম্যানরূপে। সেখানে এককালে চাকুরী করতেন সাহিত্যিক প্রেমাঙ্কুর আতর্থীও। দোকানটিতে কিছুকাল কাজ করার পর তিনি চলে যান লিন্ডসে স্ট্রীটের এক ওষুধের দোকানে।৯ সেখানে তিনি খদ্দেরের সঙ্গে এমন সুন্দর ব্যবহার করতেন যে, সবাই তাঁকে একজন অতি সজ্জন বলে ধরে নিতেন। তিনি অনেক সময় ডাক্তারের মতো ওষুধ নির্বাচনে ক্রেতাদের সাহায্য করতেন। কিন্তু সেখানেও তিনি বেশি দিন টিকে থাকতে পারেন নি। তখন কার্টুন আঁকা ও অল্পসল্প লেখাই ছিলো তাঁর জীবিকা।১০।

কল্লোল প্রকাশের পর তিনি তা নিয়েই ব্যস্ত হয়ে পড়েন। গোকুলচন্দ্র যতদিন জীবিত ও সুস্থ ছিলেন ততদিন তিনি পত্রিকাটির 'সৃষ্টির' দিক দেখতেন আর 'কর্মের' দিক দেখতেন দীনেশরঞ্জন। বিজ্ঞাপন সংগ্রহ, টাকা আদায়, ছাপাখানার কাজ দেখাশুনা করা, বিক্রি ও প্রচারের ব্যবস্থা করা ইত্যাদি নানা বিচিত্র কাজের ভার তিনিই গ্রহণ করতেন। তদুপরি 'আলোচনা', 'ডাকঘর' ইত্যাদি বিভাগে লেখা১১ কার্টুন আঁকা, কবিতা ও গল্প রচনা করায় তাঁর উৎসাহের অন্ত ছিলো না। কল্লোল পত্রিকার মালিকানা থেকে যে সামান্য আয় হতো তাতে ভালোভাবে গ্রাসাচ্ছাদন হওয়ার কথা নয় যদি মেজদা বিভুরঞ্জনের দাক্ষিণ্য না থাকতো। এমনিতর অবস্থায় তিনি আরেক দুঃসাহসিক কাজ করে বসলেন--১৩৩১ সালের বৈশাখে স্থাপন করলেন, কল্লোল পাবলিশিং হাউস১২। বৈশাখ থেকে শ্রাবণ পর্যন্ত (১৩৩১) পাবলিশিং হাউসের কার্যালয় ছিলো কল্লোল পত্রিকা অফিসে ১০।২ পটুয়াটোলা লেনে, তারপর ভাদ্র (১৩৩১) থেকে স্থানান্তরিত হয় ২৭, কর্নওয়ালিশ স্ট্রীটে১৩, আবার পটুয়াটোলা লেনে ফিরে আসে ১৩৩২ সালের ফাল্গুনে ১৪। এই প্রকাশক সংস্থা থেকে প্রথম বার হয় সুবোধ রায়ের 'নাট-মন্দির'১৫ — তিনটি একাংক নাটিকার সংকলন। শৈলজানন্দের 'রাঙা বাড়ী' প্রকাশের যে আকাঙ্ক্ষা দীনেশরঞ্জনের ছিলো তা-ও ফলবতী হয়। প্রথম দিকে ফোর আর্টস ক্লাব প্রকাশিত কয়েকখানি বই-এর এজেন্সী ছিলো, ক্রমে বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়, প্রবাসী কার্যালয়, এম সি সরকার এন্ড সন্স, ইন্ডিয়ান বুক ক্লাব, আর্য পাবলিশিং হাউস প্রভৃতি পুস্তকালয়ের গ্রন্থগুলি বিক্রির এজেন্ট হিসেবে কাজ করার অধিকারও কোম্পানিটি লাভ করেছিলো পাবলিশিং হাউস থেকে প্রকাশিত ও বিক্রেয় বইগুলির একটি বিজ্ঞাপন১৬ উদ্ধৃত করছি—

কল্লোল পাবলিশিং
প্রকাশক ও পুস্তকের এজেন্ট
২৭নং কর্নওয়ালিশ স্ট্রীট, কলিকাতা

রবীন্দ্র-জন্মতিথি — রবীন্দ্রনাথের গান ও কবিতা হইতে শ্রীসুনীতি দেবী সংকলিত। বাংলা ভাষায় প্রথম জন্মতিথি পুস্তক। মূল্য আড়াই টাকা।

শিবনাথ—শ্রীসুনীতি দেবী প্রণীত। সাধু শিবনাথ শাস্ত্রী জীবন-লিপি ছেলে-মেয়েদের উপযোগী করিয়া লেখা। মূল্য আট আনা।

শ্রীশৈলজা মুখোপাধ্যায় প্রণীত—হাসি-উপন্যাস (বাঁধাই) পাঁচসিকা, লক্ষ্মী—উপন্যাস (বাঁধাই) বার আনা।

ঝড়ের দোলা—শ্রীসুনীতি দেবী, শ্রীগোকুল-চন্দ্র নাগ, শ্রীমণীন্দ্রলাল বসু, শ্রীদীনেশ-রঞ্জন দাশ এই চারিজন সুলেখকের চারটি গল্প। মূল্য বার আনা।

উতঙ্ক — দীনেশরঞ্জন দাশ প্রণীত—পৌরাণিক গল্প হইতে বিদ্যালয়ের ছাত্র ও ছাত্রীদের অভিনয়ের ও পাঠের উপযোগী করিয়া লেখা কাব্যগ্রন্থ। মূল্য আট আনা।

শ্রীগোকুলচন্দ্র নাগ প্রণীত — রূপ-রেখা—(রূপক সমষ্টি) মূল্য : এক টাকা।

শ্রীউমা গুপ্ত প্রণীত—ঘুমের আগে—ছেলে-মেয়েদের গল্প ও ছড়ার বই, মূল্য : ছয় আনা।

মিলনের পথে—শ্রীললিতকুমার দে প্রণীত। মূল্য : চার আনা।

মায়াপুরী—শ্রীমণীন্দ্রলাল বসু লিখিত গল্পের বই। মূল্য : দেড় টাকা।

কাজী নজরুল ইসলামের—বিষের বাঁশী—বিদ্রোহী কবির নূতন কবিতা পুস্তক। মূল্য : এক টাকা ছয় আনা।

শ্রীসনৎকুমার সেনের—অর্ধাঙ্গিনী (উপন্যাস) দাম : এক টাকা।

প্রতিমা (উপন্যাস)—দাম : এক টাকা—

লাভের কপাল — নাটিকা, অনাবিল হাস্যরসে ভরা। দাম : আট আনা।

বাণিজ্যে বাঙ্গালীর স্থান — (ব্যবসায় সম্বন্ধে কথা)। দাম : আট আনা।

শ্রীশৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়ের নূতন উপন্যাস—বাংলার মেয়ে—এক টাকা বার আনা (কাপড়ে বাঁধাই)।

রাঙা শাড়ী—দেড় টাকা (কাপড়ে বাঁধাই)।

শ্রীসত্যেন্দ্রকৃষ্ণ গুপ্তের—কমলের দুঃখ, এক টাকা বার আনা।

শ্রীহেমন্তকুমার সরকারের—বন্দীর ডায়েরী—এক টাকা।

বিপ্লবের পঞ্চ ঋষি—চার আনা।

শ্রীযতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্তের—মরীচিকা (নূতন সুরের কবিতা)—খদ্দরে বাঁধাই। এক টাকা।

ডাক্তার প্রতাপচন্দ্র গুহরায় প্রণীত—প্রজ্ঞা-শক্তি (উপন্যাস)—এক টাকা।

শ্রীসুরেন্দ্রচন্দ্র চক্রবর্তী প্রণীত—উড়ো চিঠি—দেড় টাকা।

শ্রীবারীন্দ্রকুমার ঘোষ প্রণীত—দ্বীপান্তরের কথা (২য় সংস্করণ) মূল্য : এক টাকা।

শ্রীউল্লাসকর দত্তের — কারাজীবনী (২য় সংস্করণ)—মূল্য এক টাকা।

কবি বিজয়চন্দ্র মজুমদারের—হেঁয়ালী—এক টাকা, পঞ্চকমালা—এক টাকা, কথা-নিবন্ধ—এক টাকা, গীতগোবিন্দ—এক টাকা, থেরীগাথা—এক টাকা, তপস্যার ফল (গল্প)—আট আনা।

কিন্তু দীনেশরঞ্জনের আপ্রাণ চেষ্টা সত্ত্বেও গ্রন্থালয়টি ভাল চলে নি। এর কুফল ভোগ করতে হয়েছে কল্লোল পত্রিকাকে—কারণ দোকানের ক্ষতির ভাগ নিতে হয়েছিল পত্রিকাটিকে। কোন রকমে বছর দুই চালাবার পর বইয়ের দোকানটি ২৭, কর্ণওয়ালিস স্ট্রীট থেকে উঠে যায়১৭, অবিক্রীত বইগুলি চালাবার দায়িত্ব দেওয়া হয় পত্রিকা অফিসের উপর। সুতরাং এটা স্পষ্ট যে, কল্লোল পাবলিশিং কল্লোলের নতুন লেখক-গোষ্ঠীর সাহসিক সৃষ্টির ফলভোগী হয় নি।১৮

দীনেশরঞ্জনের জীবিকা-নির্বাহের একটা উপায় ছিলো ছবি (প্রচ্ছদপট) ও কার্টুন আঁকা, একথা আগে বলেছি। এ বিষয়ে তিনি বেশ সুনাম অর্জন করেছিলেন। তার কারণ, সে-সময়ে কার্টুনিস্ট বলতে বিশেষ কেউ ছিলেন না। চঞ্চল চট্টোপাধ্যায় নামে একজনের ও দীনেশরঞ্জনের আঁকা কার্টুনই পত্র-পত্রিকায় বেশী বার হতো। আর প্রচ্ছদশিল্পে তাঁর দক্ষতার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত পাওয়া যায় নজরুল ইসলামের 'বিশের বাঁশী' (১৩৩১) এবং জগদীশচন্দ্র গুপ্তের 'বিনোদিনী'র (১৩৩৪) প্রথম সংস্করণের অঙ্গসজ্জায়। তাঁর আঁকা ছবি বা কার্টুনে প্রায়শঃই D.R. স্বাক্ষর থাকতো। বিভিন্ন ডিজাইন আঁকার কাজও তিনি যে নিতেন তা নিচের বিজ্ঞাপন থেকে বোঝা যায়—

পুস্তক বা পত্রিকার
কভার, হেডপিস বা অন্যান্য ডিজাইন
আমাদের দিয়া করাইবেন
চিত্রশিল্পী ডি আর দাশ দ্বারা পরিচালিত
প্রেস আর্ট কোম্পানী
১০।২ পটুয়াটোলা লেন, কলিকাতা

এই বিজ্ঞাপনটি প্রকাশিত হয় কল্লোলের ১৩৩৫ সালের শ্রাবণ সংখ্যায়। এই জাতীয় বিজ্ঞাপন আমরা কল্লোলের দ্বিতীয় বর্ষ প্রথম সংখ্যা বৈশাখ, ১৩৩১ থেকে দেখতে পাই। এই সময়ে পত্রিকা ও তার সম্পাদকের আর্থিক অবস্থা শোচনীয় হয়ে দাঁড়িয়েছিল। তখন দীনেশরঞ্জনের প্রায় না-খেতে-পাবার মতো অবস্থা, ঋণজালে তিনি জর্জরিত। এর ফলে কল্লোলের শেষ বছরে তিনি সিনেমা লাইনের দিকে পা বাড়ান। তিনি ১৯২৯ সালে রবীন্দ্রজামাতা নগেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের ভাই ও গোকুলচন্দ্র নাগের সহপাঠী ধীরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত বৃটিশ ডোমিনিয়ন ফিল্মসের সঙ্গে সিনারিও লেখক ও পরিচালক হিসেবে জড়িত হয়ে পড়েন।

এই সময় থেকে তাঁর মন যে চলচ্চিত্রমুখী হয়েছিল এবং তার বিভিন্ন সমস্যা সম্বন্ধে তিনি যে চিন্তা করতে শুরু করেছিলেন তার প্রমাণ আছে 'ডি-আর' নামে 'চলচ্চিত্র' শীর্ষক চারটি আলোচনায়।১৯ নির্বাক-যুগের অভিনেতাদের মূকাভিনয়, ক্যামেরার ফোকাসের সীমাবদ্ধতা, স্টেজ ও চলচ্চিত্রের অভিনয়কলার পার্থক্য, আলোকসম্পাতের অপর্যাপ্ত ব্যবস্থা ও রাত্রিতে ছবি তোলার অসুবিধা২০, রূপসজ্জা ও পরিচালনা, ক্লোজ-আপ, মিডল ও লং সট, আণ্ডার ও ওভার অ্যাকটিং, চলচ্চিত্র ব্যবসায়, শিক্ষিত নারী-পুরুষের সিনেমায় যোগদানের প্রয়োজনীয়তা, স্টুডিয়োর পরিবেশ ও অভিনেত্রীদের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা, সিনারিও লেখায় শিক্ষিত ও অভিজ্ঞ সাহিত্যিকদের আত্মনিয়োগ ইত্যাদি বহু বিষয়ে তিনি আলোচনা করেছেন। তাঁর সমস্ত বক্তব্যের মধ্যেই ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার ছাপ আছে—'কোন ইংরাজী বই থেকে পড়ে না শিখে আমার অভিজ্ঞতায় এ দেশের সুবিধা-অসুবিধা থেকে যতটুকু আহরণ করতে পেরেছি, তাই আপনাদের সঙ্গে আলোচনা করবার আমার ইচ্ছা।'২১ সিনেমা জগতের সঙ্গে তিনি এই যে যুক্ত হলেন তা আমৃত্যু অক্ষুণ্ণ ছিল।

দীনেশরঞ্জন ভাল অভিনয় করতেন। তাঁর অভিনয় ক্ষমতার প্রথম জনস্বীকৃতি হয় ব্রাহ্মসমাজের মারফৎ। কেশবচন্দ্র সেনের বাড়ি 'কমল-কুটিরে' নব-বিধান ব্রাহ্মসমাজের তরফ থেকে কেশবচন্দ্র রচিত 'নব-বৃন্দাবন' নাটকের অভিনয় বেশ জনপ্রিয়তা অর্জন করে। দীনেশরঞ্জন সেটি পরিচালনা করেছিলেন। এবং তার একটি চরিত্রে অভিনয় করেছিলেন।

অভিনেতা ও পরিচালক হিসেবে নির্বাক ও সবাক যুগের চলচ্চিত্রের সঙ্গে দীনেশরঞ্জনের যোগাযোগের ধারাবাহিক বিবরণ হচ্ছে এই—

(১) ১৯২১ খৃঃ। অহীন্দ্র চৌধুরীদের ফটো প্লে সিণ্ডিকেটের তোলা (১৯২১ খৃঃ নির্মিত, ১৯২২ খৃঃ মুক্তিপ্রাপ্ত) 'সোল অব এ স্লেভ' চিত্রের ড্রাফটসম্যান আর্টিস্ট ও অন্যতম অভিনেতা ছিলেন গোকুলচন্দ্র নাগ। সেই সূত্রে দীনেশরঞ্জন দাশ কোম্পানীর আপিসে ও ছবির সুটিং দেখতে গিয়েছিলেন। কোম্পানীর পরবর্তী বই সম্বন্ধেও অহীন্দ্রবাবুর সঙ্গে দীনেশরঞ্জনের আলোচনা হয়েছিল।২২

(২) ১৯২৯ খৃঃ। ৪০, দমদম রোডে যে বৃটিশ ডোমিনিয়ন ফিল্মস লিমিটেড জন্মলাভ করে তার অন্যতম ডিরেকটর ছিলেন দীনেশরঞ্জনের অনুজা তরুবালা সেন। এই কোম্পানীর মধ্য দিয়েই পরবর্তীকালের অনেক খ্যাতিমান পরিচালক—দেবকীকুমার বসু, প্রমথেশ বড়ুয়া, সতীশচন্দ্র ঘোষ, দীনেশরঞ্জন দাশ, সুকুমার দাশগুপ্ত ইত্যাদি—প্রতিভা বিকাশের পথ খুঁজে পেয়েছিলেন।২৩ একজন প্রত্যক্ষদর্শী লিখেছেন—'...এর কিছু দিন পরেই ১৯২৮(?)-এর গোড়ার দিকে শুনেলাম, দমদম রোডে বহু ধনীর অর্থপুষ্ট বৃটিশ ডোমিনিয়ন ফিল্ম কোম্পানী গড়ে উঠেছে ধীরেন্দ্রনাথের নেতৃত্বে। নাচঘর সাপ্তাহিকের সহকারী সম্পাদকরূপে আমরা দেখলুম বহু শিল্পী ও কর্মীর সমাবেশ। ওইখানে পরিচিত হলুম দেবকীকুমার বসু, প্রমথেশ বড়ুয়া, ক্যামেরাম্যান কৃষ্ণগোপাল প্রভৃতির সঙ্গে। দেখা হলো কল্লোল-সম্পাদক দীনেশরঞ্জন দাশের সঙ্গে।২৪

(৩) ১৯৩০ খৃঃ। বৃটিশ ডোমিনিয়নের প্রথম চিত্র 'ফ্লেমস অব ফ্লেস' ('কামনার আগুন') পার্ল সিনেমায় (জ্যোতি) মুক্তিলাভ করে (২২শে ফেব্রুয়ারী)। এ ছবিতে আলাউদ্দিন খিলিজির ভূমিকায় অভিনয় করেছিলেন দীনেশরঞ্জন দাশ। এছাড়া দেবকীকুমার বসুর সঙ্গে তিনিও সিনারিও লেখার ভার পেয়েছিলেন। তখনকার সংবাদে বলা হয়েছে—'দমদমায় বৃটিশ ডোমিনিয়ন ফিল্ম লিমিটেড কোম্পানী নায়াস্কোপ'পর ছবি তোলেন। তাঁদের ছবির জন্য শ্রীযুক্ত দীনেশরঞ্জন দাশ ও শক্তি পত্রিকার ভূতপূর্ব সুসাহিত্যিক শ্রীযুক্ত দেবকীকুমার বসু দুটি সিনারিও লিখেছেন।২৫ আর্টিস্ট সংগ্রহ ও আপ্যায়নে তাঁর ভূমিকা স্মরণীয়।২৬

কল্লোলের নামপত্রের প্রতিলিপি

কল্লোল

তৃতীয় বর্ষ

চতুর্থ সংখ্যা

শ্রাবণ, সন ১৩৩২ সাল

প্রতি সংখ্যা চারি আনা ৷

মাশুলসহ বার্ষিক তিন টাকা আট আনা

সম্পাদক—শ্রীদীনেশরঞ্জন দাশ

সহ-সম্পাদক—শ্রীগোকুলচন্দ্র নাগ

কল্লোল পাবলিশিং হাউস

২৭ নং কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট কলিকাতা

চিত্রটির পরিচালক হিসেবে তাঁরই নাম বিঘোষিত হয়।২৭

(৪) ১৯৩০ খৃঃ। বৃটিশ ডোমিনিয়নের দ্বিতীয় চিত্র দেবকীকুমার বসু পরিচালিত 'ব্লাইন্ড গড' ('পঞ্চশর') কর্ণওয়ালিশ থিয়েটারে মুক্তিলাভ করে (১লা নভেম্বর)। ছবিটিতে মহেন্দ্রের ভূমিকায় অভিনয় করেন দীনেশরঞ্জন।২৮

(৫) ১৯৩১ খৃঃ। ধীরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় পরিচালিত শরৎচন্দ্রের 'চরিত্রহীনের' চিত্ররূপ মুক্তিলাভ করে (৯ই মে)। ছবিটির যে চরিত্রলিপি ঘোষিত হয় তাতে বেহারীর ভূমিকায় দীনেশরঞ্জনের নাম পাওয়া যায়।২৯

(৬) এর পর দীনেশরঞ্জন অসুস্থ হয়ে পড়েন এবং দীর্ঘদিন কলকাতার বাইরে চট্টগ্রাম প্রভৃতি স্থানে বাস করেন। তখন তাঁর আর্থিক দুরবস্থা চরমে পৌঁছায়।৩০ ফিরে এসে ১৯৩৪ খৃঃ দীনেশরঞ্জন ডিরেকটররূপে নিউ থিয়েটার্সের কর্মমণ্ডলীতে যোগদান করেন। মৃত্যু পর্যন্ত তিনি ঐ প্রতিষ্ঠানের সঙ্গেই যুক্ত ছিলেন।

(৭) ১৯৩৪ খৃঃ। দীনেশরঞ্জন দাশ একখানি তামিল চিত্র (Kovalan) শেষ করেন। তিনি তামিল ভাষা জানতেন না, দোভাষীর সাহায্যে কাজ চালাতেন।৩১ চিত্রটির প্রযোজনা নিউ থিয়েটার্সের।

(৮) ১৯৩৫ খৃঃ। নিউ থিয়েটার্স প্রযোজিত, প্রমথেশ বড়ুয়া পরিচালিত ও ৩০শে মার্চ চিত্রায় মুক্তিপ্রাপ্ত 'দেবদাস' ছবিতে দীনেশরঞ্জন পার্বতীর স্বামী ভুবনের ভূমিকায় অভিনয় করেন। তাঁর সে অভিনয় খ্যাতি অর্জন করেছিল।৩২ নিউ থিয়েটার্স প্রযোজিত ও ২৪শে আগস্ট চিত্রায় মুক্তিপ্রাপ্ত তিন রিলের হাসির ছবি 'অবশেষে' পরিচালনা করেন দীনেশরঞ্জন।৩৩ দেবকী বসু পরিচালিত হিন্দী ছবি 'পূরণ ভকত'-এর (১৯৩৩) তামিল সংস্করণও তাঁর পরিচালনায় তুলবার ব্যবস্থা এই সময়ে হয়। বইখানির তামিল নাম রাখা হয় 'পূর্ণচন্দ্র'। সবচেয়ে বড় সংবাদ, দীনেশরঞ্জনের পরিচালনায় শরৎচন্দ্রের বিজয়ার চিত্রগ্রহণ শুরু হয়। ধীরেন গঙ্গোপাধ্যায়ের তিন রিলের কৌতুকচিত্র 'অচিন প্রিয়ায়' জগুয়া (ভজুয়া?) চরিত্রে তিনি অভিনয় করেন।

(৯) ১৯৩৬ খৃঃ। দীনেশরঞ্জন পরিচালিত 'বিজয়া' ২২শে অকটোবর রূপবাণীতে মুক্তিলাভ করে।৩৪

(১০) ১৯৩৮ খৃঃ। দীনেশরঞ্জন অভিনীত 'অচিন প্রিয়া' দীর্ঘ তিন বৎসর পর ২৯শে অকটোবর নিউ সিনেমায় মুক্তি পায়।৩৫

(১১) ১৯৩৯ খৃঃ। প্রমথেশ বড়ুয়া পরিচালিত ও দীনেশরঞ্জন দাশ অভিনীত 'রজত-জয়ন্তী' চিত্র ১২ই আগস্ট চিত্রা ও নিউ সিনেমায় আত্মপ্রকাশ করে।৩৬

(১২) ১৯৪০ খৃঃ। নিউ থিয়েটার্স দ্বারা পরোক্ষভাবে পরিচালিত আলোছায়া প্রোডাকসনের প্রথম চিত্র 'আলো-ছায়া' পরিচালনা করেন দীনেশরঞ্জন। ছবিটি ৬ই জুলাই চিত্রা ও পূর্ণ থিয়েটারে মুক্তিলাভ করে।

(১৩) ১৯৪১ খৃঃ। বাংলা 'আলো-ছায়া' চিত্রের হিন্দী সংস্করণ 'আঁধি'-ও দীনেশরঞ্জন পরিচালনা করেন। ছবিটি ঐ সালেই মুক্তিলাভ করে। নিউ থিয়েটার্সের প্রযোজিত ও নীতীন বসু পরিচালিত 'পরিচয়' ছবি ২৫শে এপ্রিল চিত্রায় আত্মপ্রকাশ করে। এতে সতীর পিতার ভূমিকায় অভিনয় করে দীনেশরঞ্জন প্রশংসা অর্জন করেন—'দেবদাস-এ পার্বতীর স্বামীর ভূমিকায় ও অধুনা প্রদর্শিত পরিচয় চিত্রে সতীর পিতার ভূমিকায় স্মরণীয় অভিনয় নৈপুণ্যের পরিচয় দিয়ে গেছেন'।৩৭

'Dineshranjan also proved his worth as a capable actor on the screen and among his many characterisation he will be best remembered for his role in Devdas and Parichaya' 38

১২ই মে, ১৯৪১-এ মৃত্যুর পূর্বে তিনি নিউ থিয়েটার্স প্রযোজিত ও হেমচন্দ্র পরিচালিত 'প্রতিশ্রুতি' চিত্রে অভিনয় করে যান। ছবিটি তাঁর মৃত্যুর পর ১৪ই আগস্ট চিত্রায় মুক্তিলাভ করে।৩৯

নিউ থিয়েটার্সে কাজ করার কালে দীনেশরঞ্জন সকল শ্রেণীর কর্মচারীর কাছে জনপ্রিয় ছিলেন। সকলেই তাঁকে 'বড়দা' বলে ডাকতেন। সায়গল, শচীন দেববর্মণ, পঙ্কজ মল্লিক, পাহাড়ী সান্যাল ইত্যাদির অনেকেরই ব্যক্তিগত বন্ধু হিসেবে গণ্য হতেন। অভিনেতা ও ডিরেকটর হিসেবে চলচ্চিত্র সেবার ফলে তিনি জীবনের শেষ কয়েক বছর আর্থিক সচ্ছলতা লাভ করেছিলেন। তখন তাঁর কল্লোলের ঋণ শোধ হয়৪০—টাকা-পাই-ও হয়।

কল্লোলের শেষ বৎসরে নানা কাজে অত্যধিক পরিশ্রমের ফলে তাঁর স্বাস্থ্য

একেবারে ভেঙে পড়ে এবং তিনি দীর্ঘদিনের জন্য কলকাতার বাইরে চলে যান। স্বাস্থ্য কিছুটা ভালো হওয়ার পর তিনি ফিরে এসে নিউ থিয়েটার্সে যোগ দেন বটে, কিন্তু পূর্বের স্বাস্থ্য আর ফিরে পান নি। ১৯৪১ সালে 'প্রতিশ্রুতি' চিত্রে নিজের ভূমিকার কাজ শেষ করার পরই ডিউডেনাল আলসার রোগে শয্যাশায়ী হয়ে পড়েন এবং মাসাধিককাল রোগভোগের পর তিনি তাঁর ভগ্নীপতি ব্যারিস্টার এস, কে, সেনের (তরুবালার স্বামী) ১, নিউ রোড আলিপুরস্থ বাসভবনে ১২ই মে সোমবার বেলা ৩টা ৩৫ মিনিটে পরলোকগমন করেন।

মৃতের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করতে যাঁরা বাসভবনে অথবা শ্মশানে উপস্থিত ছিলেন তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছেন : নিউ থিয়েটার্সের ম্যানেজিং ডিরেক্টর শ্রীবীরেন্দ্রনাথ সরকার, রাইচাঁদ বড়াল, ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রমোদরঞ্জন রায়, পাহাড়ী সান্যাল, যতীন মিত্র সস্ত্রীক খাঁ সাহেব আমিনুল হক, সস্ত্রীক ডঃ এ, করিম, লেঃ কঃ ডি দাশ, সস্ত্রীক এস কে সেন, ডাঃ সত্য সেন, নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়, এস ব্যানার্জি, রামচন্দ্র নাগ, এন সি সিংহ, এস, বি, রায় প্রভৃতি।

দীনেশরঞ্জনের আদ্যশ্রাদ্ধের নিম্নোদ্ধৃত বর্ণনা নববিধান ব্রাহ্ম সমাজের মুখপত্র 'ধর্মতত্ত্বে' (১৬ই জ্যৈষ্ঠ, শুক্রবার, ১৩৪৮ সাল) প্রকাশিত হয়েছিলো—'গত ২৫শে মে, ১নং নিউ রোডে, ব্যারিস্টার মিঃ এস. কে, সেনের গৃহে, তাঁহার শ্যালক, চট্টগ্রামের 'আশা কুটিরের' সুসন্তান স্বর্গীয় দীনেশরঞ্জন দাশগুপ্তের পবিত্র আদ্যশ্রাদ্ধ তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্রকন্যাগণ কর্তৃক সুন্দরভাবে যথারীতি সম্পন্ন হইয়াছে। ময়ূরভঞ্জের মাননীয়া মহারাণী সুচারু দেবী উপাসনা করেন, ভাই অক্ষয়কুমার স্তোধ পাঠ শেষ ও প্রার্থনা করেন। কনিষ্ঠ ভগ্নীপতি শ্রীযুক্ত সুকুমার দাশগুপ্ত পরলোকগত আত্মার প্রতি স্বকীয় ভক্তি ও প্রীতির অঞ্জলি দান করিয়া তাঁহার পত্নী কর্তৃক লিখিত সংক্ষিপ্ত সুন্দর জীবনী পাঠ করেন। জ্যেষ্ঠ ভ্রাতুষ্পুত্র শ্রীমান সুকুমার দাশগুপ্ত প্রধান শোককারীর প্রার্থনা পাঠ করেন। শ্রীমতী বাণী বসু সঙ্গীতে নেতৃত্ব করেন। উপাসনার প্রারম্ভে ও শেষে শ্রীযুক্ত মানিকলাল দের জ্যেষ্ঠপুত্র সুমধুর কীর্তন করেন।

স্বর্গগত আত্মার তৃপ্তির জন্য তাঁহার পরিবারবর্গ মিলিতভাবে শ্রদ্ধার সহিত নিম্নলিখিত স্থানে দান করিয়াছেন—

কলিকাতা সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজ ৫৲, নববিধান ব্রাহ্ম সমাজ ৫৲, সম্মিলন সমাজ ৫৲, ঢাকা নববিধান সমাজ ৫৲ চট্টগ্রাম নববিধান ব্রাহ্ম সমাজ ১০৲, ভগিনী সমিতি ৫৲, দুর্ভিক্ষ ফাণ্ডে ৫৲, যাদবপুর যক্ষ্মা হাসপাতাল ১০৲, অন্ধ বিদ্যালয় ৫৲, মূক ও বধির বিদ্যালয় ৫৲, অনাথ আশ্রম ৫৲, প্রচার আশ্রম ৫৲, ভাই অক্ষয়কুমার লোধের সেবার জন্য ৫৲, দুঃস্থ ব্রাহ্ম পরিবারের সাহায্যার্থ ১৫৲, ঢাকা দুঃস্থ পরিবারের সাহায্যার্থ ৫৲ টাকা। নববিধান সমাজের নীতি বিদ্যালয়ে যে ছাত্র বা ছাত্রী 'ঈশ্বরে বিশ্বাস' সম্বন্ধে ভাল প্রবন্ধ লিখিবেন, তাঁহাকে রৌপ্যপদক দেওয়া হইবে। (কনিষ্ঠ ভ্রাতা শ্রীযুক্ত প্রিয়রঞ্জনের বিশেষ দান) প্রতি বৎসরেই স্বর্গীয় দীনেশরঞ্জনের স্মৃতিরক্ষার জন্য তাঁহার পরিবারবর্গ নীতি বিদ্যালয়ে এইভাবে একটি বিশেষ দান করিবেন। এতদ্ভিন্ন ১৬ খানা নূতন বস্ত্র দান করা হইয়াছে।

দীনেশরঞ্জনের অকাল মৃত্যুর সংবাদ সংক্ষিপ্ত জীবনীসহ আজাদ, যুগান্তর, আনন্দবাজার, অলকা, প্রবাসী, ভারতবর্ষ, কৃষক, Hindusthan Standard, দৈনিক মাতৃভূমি, সচিত্র ভারত, Dipali, Advance, Amrita Bazar, বাতায়ন, কর্পোরেশনের কথা প্রভৃতি সব উল্লেখযোগ্য কাগজে বার হয়। কোন কোন কাগজে বিশেষ প্রবন্ধ বা সম্পাদকীয় মন্তব্য আত্মপ্রকাশ করে। নিচে তার কিছু নমুনা উদ্ধৃত করছি—

কল্লোল সম্পাদক দীনেশরঞ্জন দাশের মৃত্যু সংবাদে আমরা আত্মীয়-বিয়োগ বেদনা অনুভব করিতেছি। দীনেশরঞ্জনের সমস্ত জীবন সাহিত্য ও কলালক্ষ্মীর সেবায় উৎসর্গীকৃত হইয়াছিল। তাহার সম্পাদিত কল্লোল পত্র একদা বাংলার সাহিত্য ক্ষেত্রে নবযুগের সৃষ্টি করিয়াছিল। তাঁহার রচনা বাংলা সাহিত্যে সমাদৃত হইয়াছে। সর্বশেষে সাহিত্যক্ষেত্র ত্যাগ করিয়া যখন তিনি চিত্রাভিনয় ও চিত্রপরিচালনার ক্ষেত্রে প্রবেশ করেন তখন সে ক্ষেত্রেও তিনি যথেষ্ট খ্যাতিলাভ করেন। চিত্রাঙ্কনেও তাঁহার যথেষ্ট দক্ষতা ছিল। সমস্ত জীবন তিনি তাহারই সাধনা করিয়াছেন। আমরা তাঁহার সন্তপ্ত আত্মীয়স্বজনের শোকে গভীর সহানুভূতি জ্ঞাপন করিতেছি।

—সম্পাদকীয়, আনন্দবাজার (১৫-৫-৪১)

অধুনালুপ্ত কল্লোল নামক মাসিক পত্রের প্রতিষ্ঠাতা ও সম্পাদক শ্রীযুক্ত দীনেশরঞ্জন দাশ মহাশয়ের মৃত্যুতে আধুনিক লেখক সমাজ ও সাহিত্যোৎসাহী মাত্রই মর্মাহত হইবেন। আঠারো বৎসর পূর্বে কয়েকজন অজ্ঞাতনামা লেখকের সাহায্যে কল্লোল প্রতিষ্ঠা করিয়া ক্রমে উক্ত মাসিক পত্রের মারফৎ নবলেখক সম্প্রদায়ের নূতন সুরের রচনা প্রকাশ করিয়া তৎকালীন বাংলা সাহিত্যে তিনি যে আন্দোলন তুলিয়াছিলেন, তাহা পাঠক সাধারণ মাত্রই স্মরণ করিবেন। সেদিনকার তরুণ লেখকদল—যাঁহারা আজ লব্ধপ্রতিষ্ঠ আধুনিক সাহিত্যিক, তাঁহাদের প্রতি স্নেহ, বন্ধুতায়, সেবায় দীনেশরঞ্জন যে আন্তরিক হৃদয়বত্তার পরিচয় দিয়াছিলেন তাহা অসামান্য। দীনেশরঞ্জন নিজে ভুঁই চাঁপা, দীপক প্রভৃতি গল্প-পুস্তক রচনা করিয়া খ্যাতি অর্জন করিয়াছিলেন।

—সম্পাদকীয়, যুগান্তর।

শৈলজানন্দ প্রেমেন্দ্র মিত্র অচিন্ত্য সেনগুপ্ত, বুদ্ধদেব বোস প্রমুখ যে সব লেখক আধুনিক সাহিত্যকে নূতনতর

দীনেশরঞ্জন অঙ্কিত কার্টুন

'প্রেমের ফাঁদ পাতা ভুবনে—'

—রবীন্দ্রনাথ

প্রকাশভঙ্গি ও চিন্তা দ্বারা সমৃদ্ধ করে তুলেছেন, দীনেশবাবু তাঁর সম্পাদিত অধুনালুপ্ত মাসিক পত্রিকা 'কল্লোল'-এ এঁদের বহু সমাদরে স্থান দিয়ে পাঠক সমাজের সহিত এঁদের ঘনিষ্ঠতর পরিচয় করিয়ে দিয়েছিলেন। দীনেশবাবুর একান্ত উৎসাহ ও অনুপ্রেরণায় বাংলা সাহিত্যের এই নবযুগের স্রষ্টারা তাঁদের দীপ্তিকে অতি অল্পকালের মধ্যেই প্রখরতর করে তুলতে সক্ষম হয়েছিলেন। দীনেশবাবু শুধু সাহিত্যিক ছিলেন না—তিনি সাহিত্যিকদের বন্ধুও ছিলেন।...

—সম্পাদকীয়, কৃষক।

স্বর্গত দীনেশরঞ্জন দাশ যখন অধুনালুপ্ত কল্লোল নামক পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন তখন তাঁর সঙ্গে পরিচয় হয়েছিল। তিনি তাঁর কাগজটিতে লিখবার নূতন ধারা প্রবর্তনের চেষ্টা করেছিলেন। এমন কোন কোন নূতন লেখককে তিনি উৎসাহ দিয়েছিলেন যাঁরা এখন খ্যাতনামা হয়েছেন। কল্লোল সম্বন্ধে এ কথা খুব কম লোকেই জানেন যে, প্রসিদ্ধ ফরাসী মনীষী রমাঁ রলাঁর ভগ্নী শ্রীমতী মাদলীন রলাঁ কল্লোল পড়তেন। দীনেশবাবু মিষ্ট প্রকৃতির বন্ধুবৎসল লোক ছিলেন। কল্লোল বন্ধ হয়ে যাবার পর তিনি একটি সিনেমার পরিচালক হয়েছিলেন এবং এই কাজে খ্যাতি অর্জন করেছিলেন।

—বিবিধ প্রসঙ্গ, প্রবাসী (শ্রাবণ, ১৩৪৮)

Mr. Das started his career as a journalist and a literateur and was the founder and associate editor of the now defunct periodical "Kallol", which had made a distinct mark on modern Bengali literature. He took up the motion picture career under the banner of "British Dominions Films" in the year 1930 and was responsible for the direction of their initial silent venture 'Flames of Flesh', in which he also interpreted a prominent role. This picture played a very important part in the growth and development of the future film industry of Bengal. He joined New Theatres Ltd. in the year 1936 as a director, his first work there being the picturization of "Bijoya", adapted from Sarat Chandra's immortal fiction, 'Datta'. Subsequently he directed a number of Tamil pictures and some Bengali two reelers there. His last directorial works were "Alo-Chhaya" in Bengali and "Andhi" in Hindi. He also displayed much acting ability while working as a director, and made some successful appearances in a number of New Theatres productions. His last piece of successful acting so far is conveyed in the current N. T. release "Parichaya". He is to be seen for the last time in Hem Chunder's next N. T. picture "Pratisruti" now under production.

—Amrita Bazar

Mr. Das was a connoisseur of art and was a writer of repute. He was the founder-editor of the "Kollol", the well-known Bengali monthly magazine, now defunct. He was the founder of the "Four Arts Club", a pioneer literary association. "Matir Nesha", a Bengali novel was published by him many years ago. "Rater Basa" and "Dipak" appeared in the "Kollol". A drama "Utanka" written for boys received wide appreciation and was successfully staged by boys in various parts of the province.

He was a cartoonist of no mean order and the cartoons drawn by him were published in many newspapers and magazines and were highly appreciated by the public. He was a pioneer in this field as well.

Mr. Das was a well-known figure in the Indian cinema industry. He began his career as a director of the British Dominion Film Corporation. He first appeared as an artiste in the "Flames of Flesh". At the time of death he was on the staff of the New Theatres Ltd. as a director. Amongst pictures directed by him for the New Theatres, mention might be made of "Bijoya", "Alo-Chaya", "Abaseshe" .... He also directed some Tamil pictures. He appeared in a leading role in "Parichay" now showing at Chitra, "Debdas" and other films.

—Hindusthan Standard

The bigger public however came to know of Dinesh Ranjan when he started his much-praised and much-maligned monthly magazine, "Kallol", which laid the real foundation of a modern movement in Bengal's fictional literature. Many of today's reputed fiction-writers started their literary career in "Kallol", which was also edited by Dinesh Ranjan. Besides his literary activities Das soon came to be well-known as a clever cartoonist and his political drawings created at one time quite a flutter in interested quarters.

But his leanings for the dramatic arts drove him to join the British Dominion Film Co. in 1929, and its first picture "Flames of Flesh" was directed by D. R. Das, who also played its male lead. It may be noted in this connection that this film first introduced to the public two names, who are celebrities today in their own right. They are Debaki Kumar Bose, who played a romantic role in the picture in addition to authoring its story, and Sabita Devi, who appeared as the heroine's companion.

—Dipali

স্বজনপ্রিয়, বন্ধুবৎসল ও সাহিত্যসেবী দীনেশরঞ্জন রোগশয্যায় মৃত্যুকে ভয় করেন নি। তাই মৃত্যুও তাঁর স্মৃতিকে ম্লান করে দিতে পারে নি। তিনি আত্মীয়-পরিজন, বন্ধুমণ্ডলী ও গুণগ্রাহীদের স্মৃতিচারণায় আজও আমাদের মধ্যে বেঁচে আছেন, তাঁর ঐকান্তিক সাহিত্য-ব্রত-উদ্‌যাপন তাঁকে বাংলা সাহিত্যের আধুনিক অধ্যায়ে অমর করে রেখেছে। পরবর্তীকালে তাঁর প্রতি প্রদত্ত স্মৃতি-তর্পণের কিছু উদাহরণ তাই সঞ্চয় করে রাখছি :

'বাহিরে সৌন্দর্য বিধাতা তোমাকে যথেষ্ট দিয়াছিলেন, অন্তরের সৌন্দর্যেও তুমি পরিপূর্ণ ছিলে। তরুণ বয়স হইতেই তুমি বাণীর সাধনা করিয়া আসিয়াছ। তখন তুমি ছিলে তরুণ লেখক, আর আমরা তোমার মুগ্ধ শ্রোতা। শৈশবে তোমার কত নাটক অভিনয় করিয়াছি, তোমার লেখা কবিতা এখনও আমার কণ্ঠস্থ আছে। ...১৮ বৎসর পূর্বে কয়েকজন তরুণ লেখকের সাহায্যে কল্লোল নামক পত্রিকা প্রতিষ্ঠা করিয়া, বাংলার সাহিত্যে যে নূতন সুরের রচনা করিয়াছিলে, তাহার রেশ এখনও আকাশে বাতাসে ধ্বনিত হইতেছে। সৃষ্টিতে যেমন আনন্দ আছে, ব্যথাও আছে তাহার চেয়ে অনেক বেশী। অনেক বিরুদ্ধতার সঙ্গে সংগ্রাম করিয়া, অনেক শক্তি ক্ষয় করিয়া, তুমি বন্ধু গোকুলচন্দ্রের সাহায্যে কল্লোলকে দাঁড় করাইয়াছিলে। এই সময় হইতে তোমাদের দুই বন্ধুর স্বাস্থ্য ভগ্ন হইয়া পড়িয়াছিল। আজ তোমরা দুজনেই পরলোকে, কল্লোলও অধুনালুপ্ত, কিন্তু সেদিনের সেই তরুণ লেখকগণ আজ লব্ধপ্রতিষ্ঠ সাহিত্যিক, এ কি তোমার কম গৌরবের কথা! তাঁহাদের প্রতি স্নেহে, বন্ধুতায় সেবায় যে প্রাণের পরিচয় দিয়াছিলে, তাহা অসামান্য। তাঁহারা অনেকেই তোমার মুগ্ধ ভক্ত ছিলেন। সাহিত্যিক বন্ধুগণ শ্রদ্ধা ও প্রীতির সহিত আজ তাঁহাদের পত্রিকাগুলিতে তোমার ছবি, তোমার জীবনী নিপুণ হস্তে আঁকিয়া দেশের কাছে, দেশের কাছে তুলিয়া ধরিয়াছেন। ...ব্যঙ্গ চিত্রাঙ্কনেও তুমি দক্ষ শিল্পী ছিলে; সে যুগে কত পত্রিকায় তোমার এই চিত্রগুলি সমাদর লাভ করিয়াছে। তোমার কর্মজীবন সকলেরই সুপরিচিত।'৪২

—নিরুপমা দেবী।

দীনেশরঞ্জনকে সংক্ষেপে আমরা D. R. বলতাম। সত্যি সত্যি তিনি dear ছিলেন। শুধু শোভনদর্শন ছিলেন না ছিলেন শোভনহৃদয়। শুধু সুজন ছিলেন না, ছিলেন স্বজন, আপনার লোক।

গোকুল আর দীনেশ—এই দুই বন্ধুর সাধনা বর্তমান বাংলাসাহিত্যের প্রেরক ছিল একথা কিছুতেই ভোলবার নয়। ...কালক্রমে অনেক লেখক ম্লান হয়ে পড়লেও তাঁরা কখনো ম্লান হবেন না। আর কারু কথা বলতে পারি না, কিন্তু আমি নিজে যেটুকু লিখতে পেরেছি তার পিছনে গোকুল আর দীনেশের প্রশ্রয় ছিল। এত বড় অভিমানী যেন না হই যে এটুকু কৃতজ্ঞতা জানাতে কুণ্ঠিত হব।

কিন্তু সাহিত্যের চেয়েও দীনেশের হৃদয় ছিল অনেক বড়, অনেক বড় ছিল তাঁর ব্যক্তিত্ব। কী আকর্ষণে আমরা একগুচ্ছ প্রাণী ছোট একটা কুঠুরিতে এসে দিনের পর দিন সমবেত হতাম ভাবতে এখনো আশ্চর্য লাগে। দীনেশের ঘর ছিল ছোট কিন্তু হৃদয়ে স্থানাভাব ছিল না। সেদিন যে আমরা সমবেত হতাম নিশ্চয় শুধু তা রুটি-তরকারির লোভে নয়, সমবেত হতাম এমন একটি ব্যক্তিত্বের আকর্ষণে যা সাহিত্যিক হয়েও স্বার্থপর নয়, যা পর-প্রশংসায় ক্লিষ্ট না হয়ে বরং গৌরবান্বিত বোধ করে, যা দুঃখে দৈন্যে আঘাতে অপমানে কখনো আদর্শভ্রষ্ট হয় না। স্বর্গের স্বপ্ন যে না দেখেছে সে আর্টিস্ট নয়—এই স্বপ্ন সেদিন দেখেছিলেন দীনেশ—দেখিয়েছিলেন আমাদেরকে।...

...আজ মন থাকলেও দল থাকলেও সেই দলপতি পাব না, যে সকলের অগ্রণী হয়েও সকলের পিছনে। যার তত বিনয় তত স্নেহ তত স্বার্থবোধশূন্যতা।... কল্লোলকে তিনি ব্যবসার চোখে দেখেননি, দেখেননি লোভীর চোখে; তিনি দেখেছেন তা স্রষ্টার চোখে, পূজারীর চোখে, নিজের চিত্তের আনন্দের প্রতীকের মত। তাই সেদিনের সোনায় কোন খাদ মেশেনি, সেদিনের সাধনায় ছিল না এতটুকু মেকি।... দীনেশ কখনো বিচলিত হননি তাঁর পথ থেকে, তাঁর তীক্ষ্ণ অনুসন্ধান থেকে, তলোয়ারকে তিনি কখনো ছাই করে নামিয়ে নিয়ে আসেননি। তিনি যে কত বড় প্রাণবান ছিলেন, কত বড় আত্মপ্রত্যয়ী যোদ্ধা তা সেদিনকার কল্লোলের প্রতি পৃষ্ঠায় লেখা আছে।

কিন্তু সাহিত্যিক দীনেশের চেয়ে মানুষ দীনেশই দীনেশরঞ্জনের বড় প্রকাশ। আমরা জীবনের নানা অবস্থায় নানারকম বন্ধু পাই......কিন্তু দলের গণ্ডি পেরিয়ে অন্তরের এমন অঙ্গ হয়ে ওঠা বন্ধু দীনেশের মত কম পাওয়া যায় সংসারে। সাহিত্যিক অনেক দেখেছি কিন্তু এত বড় বন্ধুবৎসল দেখেছি বলে মনে পড়ে না। সবচেয়ে যেটা দেখে মুগ্ধ হয়েছি তাঁর চরিত্রে যেটা তাঁর সহজ অন্তর্দৃষ্টিতে, কার কোথায় কী ঠেকছে বা লাগছে সেটা একচক্ষে বুঝে নেওয়া। নিজের অভাব সত্ত্বেও তা গোপন করে কত অভাবগ্রস্তকে যে তিনি সাহায্য করেছেন তা বলা যায় না। বন্ধুর দুঃখ বা বৈফল্য নিজের দুঃখ বা বৈফল্য বলে দেখেছেন। প্রাণপণ চেষ্টা করেছেন তাকে প্রতিষ্ঠা দিতে, তার ভার লাঘব করতে।

আমার জীবনের যে কটি বছর দীনেশ-রঞ্জনের সাহচর্য ও কল্লোলের পরিচর্যায় কেটেছে তা আমি আমার জীবনের একটি গৌরবময় অধ্যায় বলে মনে করি এবং যদি এখনো সাহিত্যরচনা থেকে বিরত না হয়ে থাকি তার পেছনে দীনেশরঞ্জনেরই স্নেহ ও প্রেরণা দীপ্যমান আছে।

—অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত৪৩

অল্প বয়স থেকে দীনেশরঞ্জন সাহিত্য-সাধনা করেছেন। তিনি সেকালের নানা পত্র-পত্রিকায় লিখতেন। তিনি ছিলেন কল্লোলের প্রতিষ্ঠাতা; সম্পাদক৪৪, ছোট গল্পকার, উপন্যাসিক, কবি ও প্রবন্ধ লেখক। সেই অনন্য সাহিত্যকর্মের বিস্তৃত মূল্যায়ন অন্যত্র করবো। কল্লোলের পরি-চালনা ও সম্পাদনা করে, তার প্রতি সংখ্যায় কিছু-না-কিছু লেখার খোরাক জুগিয়ে তাঁর হাতে সময় থাকবার কথা নয়। তবু দেখতে পাই, কল্লোলের তৃতীয় বর্ষে তিনি বিজলীর ষষ্ঠ বর্ষের সম্পাদনাভার গ্রহণ করেছেন। ১৩৩২-এর ফাল্গুন সংখ্যা কল্লোলের 'ডাকঘর' বিভাগে দীনেশরঞ্জন লিখছেন—'কল্লোলের এই কাজের সঙ্গে সুপরিচিত সাপ্তাহিক পত্রিকা বিজলীর সম্পাদনাকার্যও আমি নিয়েছি। বিজলী ও কল্লোল দুইটি ভিন্ন পত্রিকা। একটির সঙ্গে অন্যটির কোনও সম্বন্ধ নাই। বিজলী পরিচালনা করে' কল্লোলের পরিচর্যা করা আমার পক্ষে আরও সুবিধা হবে, এও বিজলীর সম্পাদনাভার গ্রহণ করার একটি কারণ।...বিজলীর ষষ্ঠ বর্ষ আরম্ভ হোল, ফাল্গুনের প্রথম সপ্তাহে নূতন বৎসরের প্রথম সংখ্যা বের হবে স্থির হয়েছে।' এর আগে ১৩৩১-এর ভাদ্র সংখ্যা কল্লোলে তিনি বিজলী ৪৫ সম্পর্কে লিখেছিলেন—'আশা করা যায়, বাঙালী পাঠকবর্গ বাজে রুচির ও বাজারে লেখার সাপ্তাহিকগুলি হাট-বাজারের জন্য রাখিয়া এই উন্নত রুচির ও সুলিখিত পত্রিকাখানি পড়িবেন। নবপর্যায়ের বিজলীকে আমরা সাদরে সম্ভাষণ করিতেছি। ইহার প্রচ্ছদপটের পরিকল্পনার মতই ইহা অবস্থার দুর্গমতার ভিতর দিয়া আপনার সামর্থ্যে পথনির্দেশ করিয়া চলুক।'

দীনেশরঞ্জনের গ্রন্থাকারে প্রকাশিত রচনার তালিকা হচ্ছে এই :

(১) **উতঙ্ক**—রূপক-নাট্য। প্রথম প্রকাশ : ১৯২১ (১৩২৭)। প্রকাশক : ব্রহ্মানন্দ গুপ্ত, ৯৩।১এ, বহুবাজার স্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য আট আনা। পৃষ্ঠা-সংখ্যা ৮০। 'পরিচয়ে' লেখক বলেছেন—'কয়েক বৎসর পূর্বে কলিকাতা নীতি-বিদ্যালয়ের উৎসবের দিনে অভিনয়ের জন্য একখানা বই লিখিয়া দিতে অনুরুদ্ধ হই।... উতঙ্ক নীতি বিদ্যালয়ে অভিনীত হইবার পর বিদ্যাসাগর স্কুলের ছেলেরা আরেকবার অভিনয় করেন। তাহার পর এতদিনে আজ বন্ধুর (গোকুলচন্দ্র?) আগ্রহ ও উৎসাহে 'উতঙ্ক' ছাপিয়া বাহির হইল।' এ নাটকে মেয়েদের ভূমিকা গ্রহণ করিবার মত কোনও অংশ নাই। অনেক চিন্তা করিয়া এটুকু আমাকে বজায় রাখিতে হইয়াছে।'

(২) **মাটির নেশা**—গল্প-সংগ্রহ। প্রথম প্রকাশ : শ্রাবণ, ১৩৩২। প্রকাশক : বরদা এজেন্সী, কলেজ স্ট্রীট মার্কেট, কলিকাতা। মূল্য পাঁচসিকা। পৃষ্ঠা সংখ্যা : ১৩০। এই সংগ্রহে ছয়টি ছোটগল্প আছে—পার্বতী, কমল-মধু, রামগতি, গাঁয়ের মাটি, সরাই-খানা, পাষাণপুরী। গ্রন্থটি পথিক-বন্ধু শ্রীগোকুলচন্দ্র নাগকে উৎসর্গ করতে গিয়ে তিনি লিখেছেন—'এই ধরার মাটিকে ভালবাসিয়া, জীবনের সুখ-দুঃখের ভিতর প্রসন্নচিত্তে এই মাটির ভুবনকে স্বীকার করিয়া যাহারা মৃত্যুর পূর্বে শত মরণকে জয় করিয়া বাঁচিয়া থাকে, তাহাদের নামে এই মাটির নেশা তোমাকে অর্পণ করিলাম।'

(৩) **ভুঁই চাঁপা**—গল্প-সংগ্রহ। প্রথম প্রকাশ : ১৯২৫ (শ্রাবণ, ১৩৩২)।

প্রকাশক : শ্রীশিশিরকুমার নিয়োগী এম-এ, বি-এল, বরদা এজেন্সী, কলেজ স্ট্রীট মার্কেট, কলিকাতা। মূল্য পাঁচসিকা। পৃষ্ঠা সংখ্যা ১৩৬। এই সংগ্রহে সাতটি গল্প আছে—চম্পা, বকুল, মুক্তা-ভস্ম, তারপর, রূপ, বেনামী-জিনিস, বালুবেলা। উৎসর্গপত্রে তিনি লিখেছেন—'বাসিফুলে, মনে হয়, কঠিন মাটির বুক চিরে যে ভুঁই-চাঁপা ফুটে ওঠে অমৃত-লোক হতে এ যেন তাদেরই চোখের-চাওয়া; ভুঁই-চাঁপা তাই তোমার নামে অর্পণ করলাম। সংশয়ের শঙ্কতা হতে এই অমরত্ব, মানুষের জীবনে জন্ম-লাভ করুক।'

গ্রন্থকারের অপ্রকাশিত উপন্যাস

(১) **দীপক**—এটি কল্লোলের বৈশাখ সংখ্যা, ১৩৩৪ থেকে চৈত্র, ১৩৩৫ পর্যন্ত প্রকাশিত—কার্তিক, ১৩৩৪ সংখ্যা বাদে। প্রচলিত ধারণা, দীপক অসম্পূর্ণ উপন্যাস। কিন্তু তা ঠিক নয়। ১৩৩৫ সালের চৈত্র-কিস্তির পর যথারীতি 'সমাপ্ত' কথাটি আছে।

(২) **রাত্রের বাসা**—এটি কল্লোলের জ্যৈষ্ঠ সংখ্যা, ১৩৩৬ থেকে পৌষ, ১৩৩৬ পর্যন্ত প্রকাশিত; মাঝে আশ্বিনের কিস্তি বাদ গেছে। ঐ পৌষেই কল্লোল অকস্মাৎ বন্ধ হয়ে যাওয়ায় উপন্যাসটি সমাপ্ত হয়নি, পৌষ কিস্তির শেষে 'ক্রমশ' কথাটি আছে। সুতরাং রাত্রের বাসা স্পষ্টতঃই অসম্পূর্ণ রচনা।

সাময়িক পত্রে প্রকাশিত দীনেশরঞ্জনের কিছু রচনার উল্লেখ করছি—

গল্প

(১) **রামগতি**—ভারতী, অগ্রহায়ণ, ১৩৩০
(২) **পার্বতী**—ভারতী, ফাল্গুন, ১৩৩০
(৩) **ফুলের আকাশ**—কল্লোল, বৈশাখ, ১৩৩০
(৪) **বেনামী জিনিষ**—কল্লোল, জ্যৈষ্ঠ, ১৩৩০
(৫) **ফুলের গান**—কল্লোল, আষাঢ়, ১৩৩০
(৬) **ফুলের পূজা**৪৬—কল্লোল, আষাঢ়, ১৩৩০
(৭) **দয়িতা**—কল্লোল, ভাদ্র, ১৩৩০
(৮) **ছুটির দিনে**—কল্লোল, ভাদ্র, ১৩৩০
(৯) **গায়িকা**—কল্লোল, আশ্বিন, ১৩৩০
(১০) **আঁধারের আশা**—কল্লোল, কার্তিক, ১৩৩০
(১১) **সরাইখানা**—কল্লোল, অগ্রহায়ণ, ১৩৩০
(১২) **গাঁয়ের মাটি**৪৭—কল্লোল, পৌষ, ১৩৩০
(১৩) **বকুল**—কল্লোল, ফাল্গুন, ১৩৩০
(১৪) **চম্পা**—কল্লোল, চৈত্র, ১৩৩০
(১৫) **বালুবেলা**—কল্লোল, আষাঢ়, ১৩৩১
(১৬) **পাষাণপুরী**—কল্লোল, আশ্বিন, ১৩৩১
(১৭) **কমলমধু**—কল্লোল, চৈত্র, ১৩৩১
(১৮) **নিখিল স্রোত**৪৭—কল্লোল, পৌষ, ১৩৩৩
(১৯) **সত্যব্রত**—কল্লোল, জ্যৈষ্ঠ, ১৩৩৪
(২০) **কালের প্রতিভা**৪৮—কল্লোল, আষাঢ়, ১৩৩৬
(২১) **সংস্কার**৪৯—চিত্রপত্রী, পৃঃ ৪৬১—৪৬৫
(২২) **নগর-কীর্তন**৪৯— নাগরিক, পৃঃ ৩৯—৪৩

কবিতা

(১) **কল্লোল**—কল্লোল, বৈশাখ, ১৩৩০
(২) **লক্ষ্মীছাড়া**—কল্লোল, জ্যৈষ্ঠ, ১৩৩০
(৩) **শ্রাবণ-শেষে**—কল্লোল, অগ্রহায়ণ, ১৩৩০
(৪) **ওঠ বীর**—কল্লোল, মাঘ, ১৩৩০
(৫) **কে লইবে**—কল্লোল, শ্রাবণ, ১৩৩১
(৬) **যৌবন-বিদায়**—কল্লোল, ফাল্গুন, ১৩৩১

প্রবন্ধ

(১) **গোকুলচন্দ্র নাগ**—কল্লোল, অগ্রহায়ণ, ১৩৩২
(২) **সুকুমার ভাদুড়ী**—কল্লোল, চৈত্র, ১৩৩২
(৩) **নীলিমা বসু**—কল্লোল, বৈশাখ, ১৩৩৪
(৪) **চলচ্চিত্র**৫০—কল্লোল, আষাঢ়, ১৩৩৬
(৫) **চলচ্চিত্র**৫০—কল্লোল, শ্রাবণ, ১৩৩৬
(৬) **চলচ্চিত্র**৫০— কল্লোল, অগ্রহায়ণ, ১৩৩৬
(৭) **ছবি তোলার কাজ**—দীপালী, পূজা সংখ্যা, ১৩৩৪
(৮) **সবাকের গল্প**—চিত্রালী, আষাঢ়, ১৩৪৪

অন্যান্য রচনা

(১) **কাজের মানুষ** (বাঙ্গ রচনা)—কল্লোল, জ্যৈষ্ঠ, ১৩৩০
(২) **কাহিনী** (আরণল্ড বেনেটের পরিচয়)—কল্লোল, মাঘ, ১৩৩০

পাদটীকা

১। 'এই আশা কুটিরে (কৈলাসচন্দ্রের বাসগৃহে) একটি উপাসনাগৃহ ছিল এবং প্রতিদিন তথায় পিতামাতা বন্ধুবান্ধব লইয়া ভগবানের চরণতলে বসিতেন। নিজের সন্তান ছাড়া তাঁহারা বহু সন্তানকে ধর্মসন্তান বলিয়া মানুষ করিয়াছিলেন।' —সেজদার জীবনী, নিরুপমা দেবী। এই হস্তলিখিত জীবনীটি আমাদের সংগ্রহে আছে। ২৫শে মে, ১৯৪১ দীনেশরঞ্জনের শ্রাদ্ধবাসরে এটি পঠিত হয়েছিলো। এটি মুদ্রিত হয় নব-বিধান ব্রাহ্ম সমাজের মুখপত্র 'ধর্মতত্ত্বের' ১৬ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩৪৮ সংখ্যায়।

২। 'আমাদের পিতৃদেব অতি শৈশবেই আমাদের ছাড়িয়া চলিয়া যান। জননী ইচ্ছাময়ী দেবী অতি ধার্মিকা ও মহিমময়ী রমণী ছিলেন। এত বড় বিপদেও তিনি ধৈর্য হারান নাই, ভগবানের উপর বিশ্বাস রাখিয়া এতগুলি সন্তানকে পালন করিয়াছেন। তিনি সকল প্রকার সংকীর্ণতার ঊর্ধ্বে ছিলেন, কখনও কোন ভাল কাজে আমাদের বাধা দেন নাই।' তদেব, পৃঃ ৩।

৩। ১৬ বছর বয়সে দীনেশরঞ্জন চট্টগ্রাম কালীবাড়িতে কলেরা রোগীর সেবা করতে যান। অনেকে মারা গেলেও একজনকে তিনি বাঁচাতে পেরেছিলেন। তাতে ইচ্ছাময়ী অসাধারণ তৃপ্তি পেয়েছিলেন। দীনেশরঞ্জন খুবই মাতৃভক্ত ছিলেন। কেশবচন্দ্রের বাড়িতে 'নব-বৃন্দাবন' নাটকের অভিনয়ের দিন অসুস্থ জননীর কাছে থাকতে তিনি চেয়েছিলেন, কিন্তু মাতৃ-আদেশে তিনি কর্তব্য-কর্ম স্থিরভাবে করে এসেছিলেন।' —পূর্বোক্ত রচনার প্রাপ্ত তথ্য।

৪। তাঁর কন্যা মণিকা সেনের সংগৃহীত বেশ কিছু সংখ্যা অবশ্য বর্তমান আলোচনায় ব্যবহৃত কল্লোলের সেটের মধ্যে আছে। কল্লোল যখন প্রথম প্রকাশিত হয় তখন মনোরঞ্জন থাকতেন ঢাকায়।

৫। এ-সম্পর্কে 'কল্লোল যুগ' গ্রন্থে উল্লেখ আছে। নিরুপমা দেবী আমাদের জানিয়েছেন, "না-খেতে-পাওয়া একদল ছোকরা" সাহিত্যিক কল্লোলকে ঘিরে থাকতো। সকলেই প্রায় ছাত্র। কারও এক পয়সা উপার্জন নেই। অনেকেই অভুক্ত আসতেন। মেজো বৌদি তাঁদের রোজ রুটি-তরকারী পাঠিয়ে দিতেন।' পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায় ও ভূপতি চৌধুরীর কাছেও এ-ধরনের কথা শুনেছি।

৬। সেইসব ঘরোয়া জন্মোৎসবে কল্লোল-গোষ্ঠীর বন্ধুরা সাধারণত নিমন্ত্রিত

হতেন। অবশ্য তখন কল্লোল ছিলো না।

৭। 'রোগশয্যায় অল্প কয়েকদিনের জন্য বিদেশে কর্মরত তোমার কনিষ্ঠ ভ্রাতাকে কাছে পাইয়া আমাদের বলিয়াছিলে, আমি জানি, আমার অসুখের খবর পাইলে, ভাই আমার না আসিয়া থাকিতে পারিবে না। কোন বাধাই সে মানিবে না। দেখিলে আমার কেমন ভাই?' —সেজদার জীবনী (হস্তলিখিত), নিরুপমা দেবী, পৃঃ১২।

৮। ঠিকানা—১১।১ এসপ্লানেড ইস্ট, কলিকাতা।

৯। কারো কারো মতে, সেই ওষুধের দোকানের তিনি অংশীদারও ছিলেন।

১০। দীনেশরঞ্জন ক্লাইড ফ্যান কোম্পানীতে কিছুদিন কাজ করেছিলেন, একথা আমাদের জানিয়েছেন ভূপতি চৌধুরী। বোধহয় এস. রায় এণ্ড কোং-তে কাজ করার আগে।

১১। পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায়, ভূপতি চৌধুরী ও সতীপ্রসাদ সেনের কাছ থেকে জানা গেছে।

১২। কল্লোলের ঐ সংখ্যার বিজ্ঞাপন দ্রষ্টব্য।

১৩। কল্লোলের বৈশাখ, শ্রাবণ ও ভাদ্র সংখ্যায় বিজ্ঞাপন দ্রষ্টব্য।

১৪। 'কল্লোল পাবলিশিং হাউসও ১০।২ পটুয়াটোলা লেনেই স্থানান্তরিত হয়েছে।' —ডাকঘর, কল্লোল, ফাল্গুন সংখ্যা, ১৩৩২।

১৫। 'কল্লোল-যুগ' (৪র্থ সং), পৃঃ ৪৬ ও ৪৭।

১৬। কল্লোল, ভাদ্র, ১৩৩১ বিজ্ঞাপন-বিভাগ দ্রষ্টব্য। প্রবাসী, আশ্বিন, ১৩৩১-৩৩ সালে বিজ্ঞাপন আছে।

১৭। বিজলীর সম্পাদন-ভার গ্রহণও এই স্থানান্তরের অন্যতম কারণ। বিজলীর অফিস ছিলো ১৪।এ শরৎ ঘোষ স্ট্রীট, ইণ্টালী। দুটি কার্যালয় কাছাকাছি থাকলে কাজের সুবিধা হবে মনে করে কল্লোল পত্রিকা ও পাবলিশিং-এর কার্যালয় পটুয়াটোলা লেনে সরিয়ে আনা হয়।

১৮। সুকুমার সেন 'বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে' (৪র্থ খণ্ড, ১৯৫৮) লিখেছেন— 'কল্লোল পত্রিকার মাহাত্ম্যের এক ভাগীদার আছেন। তিনি ডি. এম. লাইব্রেরীর অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত গোপালদাস মজুমদার। কাজী নজরুল হইতে আরম্ভ করিয়া প্রায় অধিকাংশ কল্লোল-গোষ্ঠীর রচনা পুস্তকাকারে ইনিই প্রথম ছাপাইয়াছিলেন। তাহা না হইলে ইঁহাদের মধ্যে অনেককেই হয়ত সাহিত্যক্ষেত্র হইতে বিদায় লইতে হইত।' আমার মনে হয়, এ প্রসঙ্গে বরদা এজেন্সী, আর, এইচ, শ্রীমানী এণ্ড সন্স, ইণ্ডিয়ান পাবলিশিং হাউস, গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স, এম. সি. সরকার এণ্ড সন্স ইত্যাদি প্রতিষ্ঠানও স্মরণীয়।

১৯। প্রবন্ধগুলি প্রকাশিত হয়েছিলো ১৩৩৬ বঙ্গাব্দের কল্লোল পত্রিকার আষাঢ়, শ্রাবণ, অগ্রহায়ণ ও পৌষ সংখ্যায়।

২০। ফোটোগ্রাফিং-এ বিশেষজ্ঞ ধীরেন্দ্রনাথের অধীনে কাজ করার জন্য এ বিষয়ে প্রত্যক্ষ জ্ঞানলাভের সুযোগ তাঁর হয়েছিলো।

২১। কল্লোল, অগ্রহায়ণ, ১৩৩৬।

২২। অহীন্দ্র চৌধুরী, নিজেরে হারায়ে খুঁজি [প্রথম পর্ব : ১৮৮৪ শকাব্দ] পৃঃ ২৬০, ২৬৫-৭, ৩৩১।

২৩। কালীশ মুখোপাধ্যায় বাংলা চলচ্চিত্র শিল্পের ইতিহাস [অসিত চৌধুরী প্রকাশিত] পৃঃ ৫৯।

২৪। নান্দীকর, অমৃত, ১৯শে চৈত্র, ১৩৭৭, পৃঃ ৭১১।

২৫। কল্লোল, আষাঢ়, ১৩৩৬, সাহিত্য সংবাদ। ডি-আর লিখিত চলচ্চিত্র-বিষয়ক দ্বিতীয় প্রবন্ধটির (কল্লোল, শ্রাবণ, ১৩৩৬) 'ফ্রেমস অব ফ্লেসের' মুদ্রিত স্টিলে দীনেশরঞ্জনকে চেনা যায়। বস্তুত দেবকীকুমার ছিলেন 'শক্তি' (বর্ধমান) পত্রিকার সহ-সম্পাদক, সম্পাদক ছিলেন বলাই দেবশর্মা।

২৬। বাংলা চলচ্চিত্রশিল্পের ইতিহাস, পৃঃ ৬১।

২৭। তদেব, পৃঃ ৬২।

২৮। তদেব, পৃঃ ৬২।

২৯। নবশক্তি, ১৬ই আগস্ট, ১৯২৯।

৩০। এই সময়ে দীনেশরঞ্জনের লেখা কয়েকটি চিঠি উত্তরা-সম্পাদক সুরেশ চক্রবর্তীর কাছে আছে।

৩১। তাঁর অনুজা নিরুপমা দাশগুপ্তের কাছে শুনেছি।

৩২। দীপালি, মে ১৬, ১৯৪১।

৩৩। বাতায়ন, মে, ১৯৪১।

৩৪। বাংলা চলচ্চিত্রের ইতিহাস, পৃঃ ১৪৪ [ও বাতায়ন, মে, ১৯৪১]।

৩৫। তদেব, পৃঃ ১৫৮।

৩৬। তদেব, পৃঃ ১৬৫।

৩৭। পঙ্কজ দত্ত, বাতায়ন, মে, ১৯৪১।

38. Dipali, May 16, 1941

39. 'He is to be seen for the last time in Hem chandra's next N.T. picture Pratisruti, now under production'—Amrita Bazar Patrica, May 13, 1941.

৪০। দীনেশরঞ্জন কনিষ্ঠা নিরুপমাকে বলেছিলেন—'কল্লোলকে বাঁচাবার জন্যই নিউ থিয়েটার্সে চাকুরী নিলাম। অনেক ধার হয়ে গেছে।' —নিরুপমার বিবৃতি।

৪১। মেজবোন তরুবালা, ছোটবোন নিরুপমা, ভ্রাতুষ্পুত্র-বধূ প্রতিমা, মাতৃহীনা ভ্রাতুষ্পুত্রী মণিকা রোগের অসহ্য যন্ত্রণার দিনে তাঁর অক্লান্ত সেবা করেছিলেন। তবু তাঁর কষ্টের তেমন উপশম হয়নি। সেই মৃত্যু-যন্ত্রণার দিনেও দীনেশরঞ্জন কখনও বলেননি, 'ভগবান, আমাকে বাঁচাও।' তখন তিনি নিত্য স্মরণ করতেন পরলোকগতা জননীকে, আত্মীয়-স্বজন ও বন্ধুজনকে, জ্যেষ্ঠা ভ্রাতৃবধূ কুমুদিনী দেবীকে, কেশবচন্দ্রের কন্যা 'বড়দিদি' মহারাণী সুচারু দেবীকে। —সেজদার জীবনী, নিরুপমা দেবী।

৪২। তদেব, পৃঃ ৮-৯।

৪৩। দীনেশরঞ্জনের জন্মবাসরে প্রদত্ত লিখিত ভাষণ। লেখকের স্বহস্ত-লিখিত এই নোটটি মণিকা সেনের কাছ থেকে পাওয়া গেছে।

৪৪। 'এই কল্লোল পত্রিকার সম্পাদনা ভার আমার উপরে ন্যস্ত।' আমার অক্ষমতা একে যতখানি ক্ষুণ্ন করেছে তার জন্য আমি দায়ী। যা পারিনি তা নিশ্চয়ই আমার ক্ষমতার বাইরে; আর এই তিন বৎসর সমস্ত বাধাঘাতকে অতিক্রম করে যে শক্তি-বলে কল্লোলের পরিচর্যা করতে পেরেছি, তার জন্যও আজ প্রসন্ন-মনে সকলের কাছে অন্তরের কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি। —দীনেশরঞ্জন দাশ, 'ডাকঘর', কল্লোল, ফাল্গুন, ১৩৩২।

৪৫। সম্পাদক—সাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়, সহ-সম্পাদক—সুবোধ রায়।

৪৬। ঠিক ছোটগল্প নয়, কথিকা-জাতীয় রচনা।

৪৭। অনুপম গুপ্ত ছদ্ম নামে লিখিত।

৪৮। সরল সেন ছদ্ম নামে লিখিত।

৪৯। পারিবারিক সূত্র থেকে যে 'কাটিং' পেয়েছি, তাতে সাল-তারিখ নেই। পত্রিকাগুলি লাইব্রেরিতে দুষ্প্রাপ্য।

৫০। ডি-আর নামে লিখিত।

ক্যামো ফ্লেজ ॥ আল মাহমুদ

নিজেকে বাঁচাতে হলে পরে নাও সবুজ পোশাক
হরিৎ শাড়িটি পরো ম্যাচ করে প্রজাপতিরা যেমন
জন্মজন্মান্তর ধরে হয়ে থাকে পাতার মতন।
প্রাণের ওপরে আজ লতাগুল্ম পত্রগুচ্ছ ধরে
তোমাকে ঢাকতে হবে হতভম্ব সন্ততি তোমার।

•

নিসর্গের ঢাল ধরো বক্ষস্থলে। যেন
হত্যাকারীরা এখন
ভাবে বৃক্ষরাজি বুঝি বাতাসে দোলায় ফুল
নৈসর্গিক পাতার বাহার।

জেনো, শত্রুরাও পরে আছে সবুজ কামিজ।
শিরস্ত্রাণে লতাপাতা, কামানের ওপরে পল্লব—
ঢেকে রেখে নখ দাঁত লিপ্সা হিংসা
বন্দুকের নল
হয়ে গেছে নিরাসক্ত বিষকাটালির ছোটো ঝোপ।

বাঁচাও, বাঁচাও বলে এশিয়ার মানচিত্রে কাতর
তোমার চিৎকার শুনে
দোলে বৃক্ষ, নিসর্গ, নিয়ম।

চক্রব্যূহ ॥ আরতি দাস

কাঁটালতায় বিঁধলে বুক, কান্না চুপিচুপি
গোলাপ তোর লাঞ্ছনাকে জানি
জানি, তুষার ঝরলে তোর রক্তরাঙা বুকের
সারা রাতের লড়াই,
কি উন্মত্ত হাওয়ার সওয়ার শীত ঋতুর সেনা!

কাঁটালতার বাইরে গোলাপ, হিমশাসন সীমার
বাইরে আয়, ভালবাসার দুহাতে হাত রাখি।

ভালবাসা, কপোতবুকের তপ্ত কোমলতায়
ডুবতে গিয়ে এ কী গোলাপ, দেহের সীমানাতেই
শাসনরশির একশ' বাঁধন! নখরে বুক চিরে
আবারো সেই আটক সীমার বাইরে যাবার লড়াই
শেষ না হতেই, দ্যাখরে গোলাপ
পিছনে কার ছায়া!

মৃত্যু তুমি? সামাল গোলাপ, ক্ষিপ্র সতর্কতায়
এবার মৃত্যু আটক করবে সকল কালের সীমায়,
ত্বরায় এখন ফিরতে হবে কাঁটালতার বেড়ায়
দিতেই হবে আবার তোকে রক্তঝরা লড়াই।

ভালবাসা, হায়রে গোলাপ
ভালবাসার অন্য উপায় নেই।

বেগনী ঘোড়ার রক্ত ॥ তুষার চৌধুরী

কেন্দ্রবিন্দু ঢেকে আছে কদমঝোপের ফাঁদ, দেহ ও দেউল
হলুদ নদীর পাশে চিতা, কারা পর্যটনে যায়
বেগনী ঘোড়ার রক্ত মেখে শ্যামলিমা মরে গেলে
কেন্দ্রবিন্দু চরাচর অস্বাভাবী জ্বলনে উল্লোল
কদম্ববাগান পুড়ে যায়
বালক ও বাউলেরা জৈবনিক তৃষ্ণার বারান্দা থেকে
নেমে দেখতে পায়
বেগনী ঘোড়ার রক্ত মূর্ছা গেছে হরিৎ হাওয়ায়।

কস্তুরী গাছের নীচে

অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়

এভাবে সে চুপচাপ গাছটার নীচে বসে থাকত। চারপাশে যা কিছু যেমন রোদ বৃষ্টি ঝড় এবং সুদিনে-দুর্দিনে সে নড়তে চাইত না গাছের ছায়া থেকে। বেশ গাছটা। সবুজ পাতা গাছের ডালে। লাল রঙের ফুল বারোমাস গাছটায় ফুটে থাকে। ফুলগুলি যখন গাছটায় ফুটে থাকে তখন সব পাখিদের ভারি লোভ গাছটার উপর। ওরা উড়ে এলেই যত রাগ বাড়ে। একটা সামান্য ফুলের গাছ তার ছায়া এবং বিন্দু বিন্দু ঘাম শরীরে নিয়ে কি যে মায়া গাছটার জন্য। সে কোন পাখ-পাখালিকে গাছটায় বসতে দেয় না। গাছটা অধিকার করে নিলে তার আর থাকে না কিছু। সে ভীষণভাবে তখন একা এক জঙ্গলের অধিবাসী ভেবে কেমন গোলমাল করে ফেলে সব।

তখন চিৎকার, কার মায়া কোন যুবতীর পরানে ভাইসা যায়। আমি রূপবান এক যুবক বসে আছি গাছের তলায়। বলেই সে হাঁকে, নদীরে তুমি কোথায় যাও।

এগুলি বললে সে মনে মনে কেমন খুশী হয়। তখন মনে হয় মাথাটা ওর একটু হাল্কা হয়ে গেছে। এবং চিৎকার-চেঁচামেচি না করতে পারলে ঠিক সে কেমন ভোঁতা মেরে যায়। শরীরে তার ব্যথা-বেদনা হয় সে হাড় মুড় মুড় বেদনায় কেবল রাস্তায় গড়াগড়ি দেয়। এবং পথের মানুষরা পাগলের কি না কান্ড ভেবে হাসতে থাকে। সে সব টের পেলেও তেড়ে যায় না। লোকগুলো তার কাছে কেমন অর্থহীন মনে হলে জানুতে থাবড়া মেরে হাঁকে, আমার তরী গেছে নদীতে, নদীতে এক কুম্ভীর ভাইসা যায়। ও নদীরে তুমি কোথায় যাও।

এই তুমি কোথায় যাও, সবাইকে প্রশ্ন। কোথায় যাচ্ছ হে নবাবের বেটা। খুব পান খেয়ে চুনট-করা ধুতি পরে, সূর্যের দিকে মুখ রেখে তুমি কোথায় যাচ্ছ হে ঈশ্বরের পুত্র এমন বলার ইচ্ছা তার। আমার তরুরে দ্যাখেছ। ওর চোখ, যাদু করা, মায়া মাখানো। ওর চুল নমনীয় শীতের মতো, ওর বুক কোমল উষ্ণ আর আমি তার বুকে অন্তহীন সাম্রাজ্যের অধীশ্বর। বলেই সে কেমন বিমর্ষ হয়ে যায়। শরীরে তার ব্যথা বেদনা থাকে না। মাথাটা কেমন নীরেট ভোঁতা। হাতের আঙুলে ঘা, পায়ে ঘা, মুখে ঘা সব মিলে ওর কাছে একটা কস্তুরীপিন্ড এবং সে একা একা কস্তুরীপিন্ডটাকে ঘাড়ে করে অনর্থক বয়ে বেড়াচ্ছে। সে বলল, আমার নাম যাদু।

সে বলল, আমার নাম যাদু। গাছটার নাম কস্তুরী গাছ। গাছটাতে সবার বাসা বাঁধবার ইচ্ছা।

সে ফের বলল, জমি-জায়গা আমার নেই। এই গাছের ছায়াটা আমার আছে। এখান থেকে আমি নড়ি না। কে এসে আবার দখল করে নেবে। দখল করে নিলে আমি পৃথিবীতে ভূমিহীন হয়ে যাব। সে কেমন সুন্দর সাজিয়ে কথা বলতে পারছে ভেবে কেমন খুশী হয়ে উঠল। আর একটু এমন করে বলার অভ্যাস করতে পারলে সে ভাল হয়ে যাবে।

সে চারপাশে তাকাল। এখন সকালবেলা। বাবুরা থলে হাতে বাজারে যাচ্ছে। ছোট ছোট ছেলেরা স্কুলে যাচ্ছে। মা জননীরা কেমন বোকা বোকা চোখ করে তাকিয়ে দেখছে ওকে। সারাটা মাস সারাটা বছর পাগলটা গাছতলায় বসে থাকে, নড়ে না। ভারী হাসি পায় মা জননীদের। যেন জানে না কিছু বোঝে না কিছু এমন মুখ। সারা রাত মা জননীরা কতক্ষণ ঘুমিয়েছ, তোমার বয়সে মা জননী। রাতে ঘুম আসে না। তোমার সুন্দর মুখ, কপালে বড় সিঁদুর আর রাতের বিহার চোখেমুখে, পাউডারের পাফে রাতের বিহার এবং

শরীরের গন্ধ মরে না। সে গাছতলায় বসে সব টের পেলে দেখল, ওর পায়ের নীচে এসে রোদ নেমেছে। দুটো পাখি পাশে কি খুঁটে খুঁটে খাচ্ছে। একটা ট্রামগাড়ি চলে গেল। *তিনটা বাস। চারটা ট্রামগাড়ি, চারটা বাস গাড়ি। সে এক দুই করে গুনতে থাকে। সারাক্ষণ তার একটা কাজের দরকার। যখন যেমন। কখনও সে দিনমান বাস ট্রাম গোনে, কখনও সে বসে থাকে এবং দিনমান আকাশ দেখে। সে আকাশে কটা পাখি দেখতে পেল তা গুনে রাখে। তখন মা জননীরা পায়ে হেঁটে রাস্তা পার হয়ে গেলে দেখতে পায় সে আকাশের দিকে* মুখ করে তাকিয়ে আছে। সকালেও এমন দেখতে পায়। বিকেলেও এমন দেখতে পায়। ভারি আশ্চর্য লাগে—সেই কখন থেকে শরীর শক্ত করে রেখেছে মানুষটা। গাছের নীচে বসে সেই যে আকাশে মুখ রেখেছে আর নামাচ্ছে না। বড় অর্থহীন এ-সব।

তখন গাছের নীচে সে ভেবে পায় না, এরা যায় কোথায়, এদের কি রহস্য বাঁচায়। ওর মতো সবাই কেন নয়। কোথায় এদের থাকার জায়গা—ওরা থাকে কেন, খায় কেন, এবং ছেলেপুলে বিয়োলে ঈশ্বরের মহিমা আর কত বাড়ে! তার কাছে মনে হয় এসবের মানে হয় না, মনে হয় না জীবনে এর চেয়ে অন্য কোন বাঁচার মহিমা আছে।

সে দেখল পাখি দুটো খুঁটে খুঁটে তখনও কি খাচ্ছে। কি খেতে পায় আর। বোধ হয় বাসি রুটির কিছু ছেঁড়া-ফাটা অংশ পড়ে আছে। সে যা খেয়েছিল, এবং খেতে খেতে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে দিয়েছিল চার পাশে—তা এখন ওরা খুঁটে খুঁটে খাচ্ছে। ওর ভীষণ রাগ। কারণ সে উঠে গেলেই ওরা এসে গাছের নীচে বসে যেতে পারে, এবং উড়ে যেতে চাইবে না আর। তখন জায়গাটা বেদখল হয়ে যাবে। বড় ভাবনা এই জায়গাটুকুর জন্য। মনে হয় সে উঠে গেলেই কেউ কেড়ে নেবে। কখনও সে নড়তে চায় না। কেবল গভীর রাতে যখন শহরের পাখ-পাখালিরা পর্যন্ত জেগে থাকে না তখন তার সামনের ডাস্টবিন সম্বল। সে তাড়াতাড়ি যা কিছু উচ্ছিষ্ট সংগ্রহ করে রাখে। তার ভারী অবাক লাগে —কারা এমন সুস্বাদু খাবার ফেলে দিয়ে যায়। সে তখন হাই তোলে, ঘুমায়। আশ্চর্য স্নিগ্ধ এক ভাব থাকে রাজপথের। এবং নীল আকাশের অজস্র নক্ষত্র কিরণ দিলে টের পায় না—নক্ষত্রের আকস্মিক কোন মৃত্যু আছে। সে সারা রাত তখন তারা গুনতে থাকে।

সে তারা গুনতে থাকলে মনে হয়, এক রাতে মাঠের ভিতর, বোধহয় সেটা শীত শেষে বসন্তের রাত, সে আর তরু গম যবের খেতে দাঁড়িয়ে রাতের আঁধারে তারা গুনছিল। তারা গোনার বাজি তার আর তরুর ভিতর। তরুর ছিল ছোট্ট উঠোন। সে তরুর জন্য একটা করবী গাছ এনে লাগিয়েছিল। একটা শেফালি গাছ। তরু নীল রঙের ডুরে শাড়ি পরতে ভালবাসত। সে শাড়িতে ব্লাউজ পরে দিতে পছন্দ করত না। ওর শরীরে ভীষণ জ্বালা ছিল। এবং সে জানে নদী থেকে তরু স্নান করে এলে ভিজা কাপড়ে বড় স্নিগ্ধ দেখাত। তরু দিনে তিনবার নদীর ঘাটে স্নান করতে *যেত। গরমকালে জল থাকত না নদীতে। পুকুরের জল শুকিয়ে যেত। তরুর জন্য সে ঘড়া ঘড়া টিউকল থেকে জল এনে দিত। বলত, তুই স্নান করে নে তরু।* আমি তোর *স্নান করা দেখি।*

গ্রাম মাঠ জায়গা। ভালবাসার জায়গা বড় সুন্দর। তরু নীল ডুরে শাড়িটা পরে পিঁড়িতে দাঁড়াত। চার পাশে সবুজ ঘাস। এবং সামনে দু ঘড়া জল। বড় ঠাণ্ডা জল। সে ঘড়া কাঁধে করে নিয়ে এসেছে। তরু স্নান না করে শুতে যেতে পারে না। ছোট্ট সংসারে তরু বড় তকতকে ঝকঝকে ছিল। একটা আগাছা বাড়ির চারপাশে কোথাও বাড়তে পারে নি। কুটো গাছটা উঠোনে পড়ে থাকতে দেয় নি। উঠোনের চার পাশে রাঙ চিতার বেড়া। এবং গাছগুলো বড় হয়ে প্রায় মাথা সমান হয়ে গেছে। রাস্তা থেকে বাড়ির ভিতর দেখা যায় না! কেবল রাস্তা ধরে গেলে মনে হয় বাড়ির ভিতর দুটো গাছ দাঁড়িয়ে আছে। একটা শেফালি গাছ, একটা করবী গাছ। সেই গাছের নীচে রাতের জ্যোৎস্নায় সে আর তার বউ তরু। দুই গাছের নীচে দুজন। শেফালি গাছটার নীচে ঘাসের উপর হাত-পা ছড়িয়ে বসে সে। আর করবী গাছের নীচে তার বউ। মাথার উপর সাদা জ্যোৎস্না। কোথাও দুটো-একটা কীট-পতঙ্গ ডাকছে। পিঁড়ির উপর খালি পা। শরীর খালি করে দাঁড়িয়ে আছে তার বউ। কোমরে রুপোর বিছা ঝক ঝক করছে। আর কি রঙ তার শরীরে। কি সুষমা তার কোমল নাভিমূলে।

তরু বলত, তুই আমার দিকে তাকালে ভারী লজ্জা করে যাদু।

—আমাকে দেখলে লজ্জা! যা! আমি আর তুই একসঙ্গে এই মাঠে বড় হতে হতে তোর বাবা আমার মা ঠিক করে বিয়ে দিয়ে গেল। আর তুই আমি মাঠের উপর দৌড়ালে সবাই বলত, দুটো খরগোস ছুটছে। লজ্জার কিছু ছিল না আমাদের।

তরু তখন কথা বলত না। সে জানে এটা তরুর কথার কথা। তরুরও খুব ভাল লাগছে। ওর সামনে করবী গাছের নীচে তরু খালি গা, খালি পা ছড়িয়ে দিয়েছে। খুব ধীরে ধীরে ঘাড়ে পিঠে বুকে ঠাণ্ডা জল ঢালছে। আর বলছে বড় ভাল লাগছে রে যাদু। আঃ কি যে ভাল লাগছে। চারপাশের গাছপালা মাটি থেকে কেবল গরম বের হচ্ছে, এবং ঘাম হচ্ছিল দর দর করে। এখন এই ঠাণ্ডা জল শরীরে এক মনোরম স্নিগ্ধ ভাব বয়ে আনছে। তরু ধীরে ধীরে জল ঢালছে আর হাতে পায়ে সাবান ঘসে দিচ্ছে। সে চাষী মানুষ। হাট থেকে সে তার বউ-এর জন্য দামী সাবান আনছে। এবং রাতে সেও টিউকল থেকে স্নান করে একটা জল কাচা কাপড় পরে নেয়। সব কিছুই তরুর করা। তরু খুব ছিমছাম থাকতে ভালবাসে। এই মাঠের ভিতর অথবা গ্রামের ছায়ায় সুন্দর এক কুঠি বানিয়ে নিয়েছে। চাষবাসের ভিতর সাদা জ্যোৎস্নায় একটা ডাহুক পাখির ডাক শুনতে চায়। এই যে সে বসে আছে, গাছের নীচে তরু দাঁড়িয়ে, কখনও উপুড় হয়ে, পিঠের শিরদাঁড়া নুয়ে গেলে চারপাশের হলুদ রঙের আশ্চর্য এক রঙ, স্তনে ফোঁটা ফোঁটা জল জমে আছে আর নীচে সুন্দর সুদৃশ্য এক জগত, মনে হয় সাদা তরমুজের দু পিঠ, আর রক্তরাঙা আকাশের মত ওর নীল রঙের শরীর ফাঁক হয়ে যায় মাঝে মাঝে, যেন একটা কোড়া পাখি ডাকছে, ঢুব ঢুব—পাখিটার ডাক কানে এলে যাদু স্থির থাকতে পারে না।—বউ আমি জল ঢেলে দিচ্ছি তোর শরীরে। ঘাসের ভিতর পা ডুবিয়ে বস। মাথা নীচু করে দে। না এভাবে বসলে ঠিক নাগাল পাই না, বলে সে হাত দিয়ে পা টেনে কেমন শরীরের ভিতর ঢুকে যেতে চাইলে তরু বলত, তর সয়না!

এই ছিল তরু। আর এই ছিল যাদু। তরু শহরে যেত। তার মামার বাড়ি সেখানে। শহর থেকে এলেই তরুর আর কিছু কিছু বিলাস বেড়ে যেত। একবার তরু যাদুকে না বলে না কয়ে ঠোঁটের রঙ কিনেছিল। এবং রাতে যাদু ঘরে ঢুকে তাজ্জব। বউ-এর রঙ, চোখ মুখ একেবারে পাল্টে গেছে। ছবি দেখার বাই ছিল না যাদুর। বরং তার চাষবাস, জমি-জায়গা, মাটি আর দুটো হালের বলদ, কিছু ছাগল হাঁস নিয়ে সে যখন ঠিক গ্রামের মানুষ হতে চায় তখন তরু কাজল দিয়ে চোখ বড় করে ফেলে। ঠোঁটে রঙ মেখে আয়না দিয়ে মুখ দেখে। বর্ষায় পায়ে হাতে হাজা হলে তরুর মাঝে মাঝে বমি পায়। সে তখন নিরাময়ের জন্য অষুধ কিনে আনে। নিরাময় না হলে তরু মুখ ভার করে রাখে। একসঙ্গে শুতে চায় না।

সে ছিল, আর ছিল তরু। দুই হালের বলদ, এক জোড়া হাঁস একটা ছাগল, বিঘা চারেক ভুঁই এবং সব মিলে ছোট্ট সংসারে গাছের ছায়ায় বেশ ছিল তারা বনবাসী হয়ে। কুটিরে কেউ এসে দাঁড়ালে ফেরাত না তরু। ফলমূল এবং ঘরের যা কিছু আছে তার থেকে সামান্য দিয়ে যায়। পবিত্র এক ইচ্ছার ভিতর দিন যাপন করছিল যখন, কে যে এল তখন তার কাছে—নাম, কি যেন নাম, সে তখন হাঁকে, আমার তরু গেছে নদীতে, নদীতে এক কুম্ভীর ভাইস্যা যায়...!

এই কুম্ভীরকে ভয় সকলের। কিন্তু যাদুর ছিল অন্য প্রাণ। সে চাষবাস নিয়ে থাকে। সরল সহজ প্রাণ। বৃষ্টিপাতের দিনে সে বারান্দায় বসে বাঁশি বাজায়। হাঁস দুটো উঠোনে ঘুরে বেড়ায় এবং পোকামাকড় খায়। বৌ তরু কাঁঠাল বীচি ভেজে দেয়। গরম গরম কাঁঠাল বীচি ভাজা খেতে খেতে সে অন্যমনস্ক হয়ে গেলে শুনতে পায়, কোথাও একটা পাখি ডাকছে। তরু জানালায় বৃষ্টিপাতের শব্দ শুনতে শুনতে কি যেন ভাবছে। বুঝি একটা ছবির কথা।

ছবি দেখার বাই খুব তরুর। শহরে গঞ্জে গেলেই তরু ছবি দেখে আসে। রাতে শুয়ে শুয়ে সে-গল্প ওকে শোনানো চাই। তরুর যে কি স্বভাব, না শোনাতে পারলে সে শান্তি পায় না। যাদু ঘুমিয়ে গেলে কেমন অভিমান বাড়ে। বুকের ভিতর কি যে একটা ইচ্ছা থাকে সে বোঝে না। তার মাঝে মাঝে সাদা জ্যোৎস্নায় এই মাঠ ঘাট পার হয়ে যেতে ইচ্ছা হয়। যাদু মাঝে মাঝে খুব দূরের মানুষ হয়ে যায়। যাদুকে নীরস কঠিন এবং বেকুফ মনে হয়।

তবু সংসারে ছিল তরু। তরু নানা রকম ফুলের গাছ বাড়ির চার পাশে লাগাতে ভালবাসত। তরু নিজের হাতে লাগিয়েছে একটা করবী গাছ, একটা শেফালি গাছ। ঝুমকোলতার গাছ লাগিয়েছে পথের দু পাশে। শ্বেত জবার ডাল এনে লাগিয়েছে। সন্ধ্যামালতীর ফুল ফুটলে কেমন গন্ধ ছড়ায়। এবং বিকেল হলেই তরু হাত পা ধুয়ে অথবা গা ধুয়ে খোঁপায় বেলফুলের মালা জড়িয়ে রাখে। যাদু তখন তরুর কাছে যেতে ভয় পায় অথবা সঙ্কোচ হয় তার। বউ তার মহামূল্য হয়ে আছে। সে তার নাগালের ভিতর তরুকে খুঁজে না পেলে কেমন বিমর্ষ হয়ে যায়। তরুর সুন্দর মুখ, লাবণ্য চোখে, চিকন তার কোমর, হাত দিলে একটা শীতল সাপের মতো, কেবল পিছলে পিছলে যায়। আর ভাল লাগে এবং আবেশে চোখ বুজে আসে যখন তরু দু হাতে গলায় জড়িয়ে ধরে, চুমু খায়. কি পুষ্ট শরীর, ঠিক ধানের শীষের মতো, সব সময় ফুটে থাকার স্বভাব। এ-স্বভাবের সঙ্গে যাদু কেন পারবে. সে মাটির মানুষ, ওর শরীরে ধানের গন্ধ, এবং সে জমি থেকে উঠে-আসা মানুষ, হাতে পায়ে কাদা লেগে থাকে, সেই নিয়ে খেতে বসলে তরুর কি হাসি! তুই বন-জঙ্গলের মানুষ যাদু। তুই কেমন করে যে থাকিস!

যাদু কিছু বলত না। সে তার বউকে খুব ভালবাসত। বউ এমন এক জগতের বাসিন্দা হয়ে থাকে যে, সে প্রায় মনে মনে এক সাধারণ মনুষ্য হয়ে যায় আর তরু তার কাছে নিশীথের পরী, নিজেকে সে কোনমতেই তরুর শামিল ভাবতে পারে না। তরুর মন খারাপ হলে সদরে গঞ্জে মামার বাড়ি চলে যায়, ছবি দেখে আসে, কেমন চাঙ্গা থাকে তখন তরু। যাদুর আর তখন ভাবনা থাকে না।

যাদুর ভাবনা থাকে না ঠিক তবু তরুর বয়স আর বাড়ে না যেন, এবং এভাবেই একবার তরু মামার বাড়ি গিয়ে আর ফিরে এল না। সে দু রাত নিঃশব্দে কাটাল। তৃতীয় রাতে সে স্থির করল খবর নেবে। সে বৌ বাদে এক রাত কাটাতে পারে না। এবং গিয়ে শুনল, তরু চলে এসেছে। চলে এসেছে তো গেল কোথায়। কার সঙ্গে চলে এসেছে। কে সে মানুষ! সে কের বাড়ি ফিরে এল। ডাকল, তরু তরু করে। কোন বন ঝোপ থেকে উঁকি দেবে মনে হল, কিন্তু না, কেউ সাড়া দিল না। তরুর একটা চিঠি ছিল কুলুঙ্গিতে।—যাদু আমার কিছু ভাল লাগে না রে। আমি চলে যাচ্ছি। আর আসব না। কত সহজভাবে যে সে লিখে রেখে গেছে। কে এমন ছিল তরুর, কার জন্য তবে তরু এত সেজে থাকত। সে কেমন ভাবতে ভাবতে বিহ্বল হয়ে গেল। প্রতিবেশী কাউকে সে কিছু বলল না। চাষাবাদ বন্ধ করে দিল। হাঁস দুটো ছেড়ে দিল। বলদ দুটোকে ঘাস খাওয়াতে নিয়ে গেল মাঠে এবং ছেড়ে দিয়ে চলে এল। একা একা হাঁটতে থাকল, আবার বাড়ি ফিরে এসে ডাকল, তরু এসেছিস। তরু যদি ভুল বুঝতে পেরে চলে আসে। সে বলল, তরু তুই এমন কেন করলি। আমি তোর জন্য বাঁশি বাজাতে শিখলাম, আমি তোর জন্য কত দূর দেশ থেকে ফুলের গাছ নিয়ে এলাম, আমি তোর জন্য সারা মাস কাল জমিতে ফসল ফলিয়েছি—তারপর ওর আরও যেন কি বলার ছিল, কিন্তু বলতে পারল না। কেমন গোলমাল হয়ে যাচ্ছে মাথায়। প্রতিবেশীরা এসে দেখে যায়। কথা বলে, সে কিছু শুনতে পায় না। কেবল মনে হয় তার বাড়িটার চার-পাশে তরু তার হেঁটে বেড়াচ্ছে এবং ফুলের গাছ লাগিয়ে যাচ্ছে।

চার পাশে তাকালেই কেউ না কেউ তার চোখের সামনে ফুলের গাছ লাগিয়ে যাচ্ছে। সে এখন হেঁটে হেঁটে অনেক দূর চলে যায়। কোনদিন ফেরে না। কোনদিন ফিরে এলে করবী গাছটার নীচে কলাপাতা বিছিয়ে শুয়ে থাকে। তারপর আবার রওনা হয়, সে প্রতিবারই রওনা হয় এই ভেবে, কোথাও না কোথাও সে তরুকে খুঁজে পাবে অথবা দেখে ফেলবে। তরু ওকে দেখলেই আর নড়তে পারবে না। সে যত ভালবাসা নিয়েই বসে থাকুক, ওর ভাল-বাসার মূল্য কম দেবে না তরু। অথবা যেন মনে হয় তরু দেখে ফেললেই স্থির চোখে তাকাবে, কি মানুষটা কি হয়ে গেল! তরু আর তখন নড়তে পারবে না। এবং এভাবে যখন ভাবনা পেয়ে বসে এবং সে ক্রমান্বয় রাস্তা পার হয়ে কেবল চলে যায় তখন ঠিক থাকে না সে কোথায় যাচ্ছে। সে নিজের ভিতর এক ছবি হয়ে থাকে, তার মনে থাকে না, পৃথিবীতে তরু বাদে অন্য কোন গাছপালা পাখি অথবা বন আছে। সে হাঁটতে হাঁটতে এভাবে একদিন এক বড় নগরীতে এসে ফেরার কথা ভুলে গেল। ক্ষুধা পিপাসায় মানুষ স্থির থাকতে না পারলে যা হয়—সামনের কোন হোটেলের উচ্ছিষ্ট খাবার তার কাছে পরম উপাদেয় খাদ্য, সে বসে থাকে, কখনও খেতে পায়। খাওয়ার চিন্তা করতে করতে সে তার ভালবাসার কথা ভুলে গেল। কেবল এক পার্কের ধারে একটা করবী গাছ দেখে মনে হল গাছটা খুব চেনা। তার নীচে বসে থাকলে তাকে কেউ আর সরাতে পারবে না। তার কিছু আর নতুন করে কেড়ে নিতে পারবে না।

সেই থেকে সে বেশ আছে। গাছটার নীচে শুয়ে থাকে। কোন পাখি এলে পর্যন্ত তাকে বসতে দেয় না। সে নিজেও উঠে যায় না কোথাও। উঠে গেলেই কারা এসে জায়গাটা দখল করে ফেলবে। সে তখন ভূমিহীন অন্নহীন হয়ে যাবে।•

বেশ ছিল এভাবে যাদু। সকাল হলে সে ট্রামের তারে পাখি বসে আছে দেখতে পেত। বিকেল হলে দেখতে পেত ছাদে সুন্দরী রূপালী মেয়েরা খোঁপায় ফুল গুঁজে সতীর মতো মুখ করে বসে আছে। এবং খুব চেষ্টা করলে সে তখন একটা মুখ দেখতে পেত চারপাশে, কেবল তরুর মুখ। তরু দু পায়ের ফাঁকে হাত রেখে খোলাতে কাঁঠাল বীচি ভাজছে। চারপাশে কাঁঠাল বীচি ভাজার গন্ধ উঠছে। এবং ম' ম' করছে চারপাশটা। সে তখনই স্থির থাকতে পারত না। সে তাকাত চারপাশে। এবং পার্কে দেখতে পেত, চারজন মেয়ে সাদা হাফ প্যান্ট সাদা সার্ট গায়ে দিয়ে একটা বল, সঙ্গে একটা ডাণ্ডার মতো কি নিয়ে লাফালাফি করছে। পায়ের নরম পেশী দোল খাচ্ছে। নীল শিরা-উপশিরায় কি আশ্চর্য মায়া। যেন কার কার হাত দিলে এক নরম পবিত্র স্থান খুঁজে পাওয়া যাবে। ঈশ্বরের অপার মহিমা করুণা ঘন হয়ে আছে। হাত দিলেই জব জব করে মহিমাঘরা বারিধারা স্রোতের বেগে নেমে আসবে।

যাদুর আরও যে কি মনে হয়! মনে হয় সে উঠে গেলেই গাছের নীচে আর কেউ এসে বসে যাবে। সে উঠে গেলেই পাখিরা আস্তানা গাড়বে ডালে, শাখা-প্রশাখায়। ফুল ফুটতে দেবে না। এবং ডালে পাতায় হেগে রাখবে। সে গাছটার চারপাশে ফুল ফুটবে বলে নানাভাবে কখনও কখনও পরিচর্যা করে এবং সে হাঁক দেয়, নদীর জলে কুম্ভীর ভাইস্যা যায়। গাছটার দিকে কখনও কখনও তাকিয়ে থাকে—কখন গাছটাতে ফুল ফুটবে। সে পাখি এসে বসলেই হুস হাস তেড়ে যায়। এবং এ-ভাবে কোন বৃষ্টিপাতের দিনে সে কোন গাড়িবারান্দায় আশ্রয় নিলেও খুব দূরের গাড়িবারান্দায় চলে যায় না, কাছের কোন গাড়ী বারান্দায় শুয়ে রাতের আঁধারে জেগে থাকতে থাকতে দেখতে পায় ঝড়ে করবী গাছটার ডালপালা মাটিতে বসে যাচ্ছে। ওর ভারি কষ্ট হয়। একটা ডাল ভেঙে পড়লে সে কেমন চঞ্চল হয়ে ওঠে। যেন তার একটা বুকের পাঁজর ভেঙে গেল। ঝড় বৃষ্টি থেমে গেলে সে সেই ভাঙা ডাল নিয়ে গাছটার সঙ্গে নানাভাবে

জোড়া লাগাবার চেণ্টা করলে মানুষেরা হাসে। ওকে বেকুব মনে করে, অথবা পাগলের কি না কাণ্ড ভেবে সকলে চলে যায়। দুর্গন্ধে কাছে যাওয়া যায় না. পোটলা পুটলিতে কত কিছু যে আছে, পার্কের দারোয়ান ওকে কতবার যে হাঁকিয়ে গেছে. সে তবু নড়ছে না. উঠছে না। বেশ হাসি হাসি মুখ করে বসে থাকে অথবা শুয়ে থাকে। তার এখন কোন কাজ নেই। একটা কাজ মাত্র, গাছটার সঙ্গে ডালটা জুড়ে দেওয়া। সে নানাভাবে তাই চেণ্টা করছিল যখন, একটা পাখি এসে বার বার গাছটার মাথায় বসছে। ওর ভারি রাগ। সে তেড়ে যাবে ভাবল। এবং তখনই দেখল পাখিটার মুখে খড়কুটো। ভয়ে পাখিটা গাছের মাথায় বসতে পারছে না। কেবল গাছটার মাথায় উড়ে বেড়াচ্ছে। ওর তখন কি যে মনে হল, সে হাতে ডালটা নিয়ে হাঁটতে থাকল। কারণ পাখিটা সে থাকলে কিছুতেই বাসা বানাবে না, ডিম পাড়বে না। সে পাখিটার জন্য গাছটার দখল ছেড়ে চলে যাচ্ছে। হাতে তার করবী গাছের ডাল।

পাখিটা তখন নিশ্চিন্তে ডালে বসে খড়কুটো দিয়ে বাসা বানাচ্ছে।

মানুষেরা দেখল, পাগলটা আর সেখানে নেই। ওর পোটলাপুটলিও নেই। শুধু আছে গাছটা। আর আছে দুটো পাখি। পাখি দুটো কিচির মিচির করে গাছের ডালে নেচে বেড়াচ্ছে।

সাহিত্য ও সংস্কৃতি

ইমার্সন সর্বদা শ্রীমদ্‌ভগবদ্গীতা সঙ্গে রাখতেন। তিনি বলতেন—'চিন্তার এক সাম্রাজ্য'। 'এ্যান এমপায়ার অব থট'। জার্মান পণ্ডিত আগস্ত ভিলহেল্‌ম্‌ ফন্ শ্লেগেল গীতা পাঠ করে আনন্দের আতিশয্যে বিহ্বল হয়ে বলে উঠেছিলেন—

> Hail to thee! author of the mighty poem whose oracles lift up the soul, in Joy in efable, toward all that is sublime, eternal, divine! Full of veneration, I salute thee above all singers, and I worship unceasingly the trace of ' ' y footsteps".

বহু দেশের বহু মনীষী শ্রীমদ্‌ভগবদ্গীতাপ্রসঙ্গে অনুরূপ মন্তব্য করেছেন। ফ্রানৎসবপ ম্যাকসমুলার, মনিয়ের উইলিয়ামস, সিলভা লেভি, লুই রেনো, ওয়েবার প্রমুখ পণ্ডিতগণ গীতার দার্শনিকতত্ত্ব ও অনন্যসাধারণ সাহিত্যিকমূল্য বিশ্লেষণ করেছেন। ১৭৮৫ খৃষ্টাব্দে চার্লস উইলকিনস কর্তৃক অনূদিত গীতা সর্বপ্রথম য়ুরোপে প্রকাশিত হয়। ম্যাথু আর্নল্ড এই গ্রন্থের অনুবাদ করেছেন ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দে। গান্ধীজী ব্যারিস্টারি পড়ার সময় বিলাতে দু-একজন নিরামিষাশী বন্ধুর অনুরোধে ম্যাথু আর্নল্ডের 'দি সং সিলেশচ্যুয়াল' পড়েন এবং গীতার অসাধারণত্বে সেই তাঁর বিস্ময়ের শুরু। ভারততত্ত্ববিদ বহু বিদেশী পণ্ডিত গীতার মাধুর্যে আকৃষ্ট হয়ে তার অনুবাদ করেছেন বা গীতার নানাবিধ ব্যাখ্যা করেছেন। ইদানীংকালের দুজন মহাকবি ইএটস ও এলিঅট গীতার দ্বারা প্রভাবিত হয়েছেন। কিছুকাল আগে স্বামী প্রভবানন্দ ও ক্রিস্টোফার ঈশারউডের যুগ্ম প্রচেষ্টায় মার্কিন মুলুকে গীতার আধুনিকতম অনুবাদ প্রকাশিত হয়েছে। এই অনুবাদগ্রন্থের ভূমিকা লিখেছেন অলডাস হাক্‌সলি। হাক্‌সলি বলেছেন—

> The focus of Indian religion is also one of the clearest and most comprehensive summaries of this Perennial Philosophy ever to have been made. Hence it's enduring value not only for Indians but for all mankind".

সমগ্র মানবজাতির কাছে তাই শ্রীমদ্‌ভগবদ্গীতার এক বিশেষ মূল্য আছে। হাকসলি তাঁর ভূমিকায় বলেছেন যে, গীতার কতকগুলি মূলসূত্র খৃষ্টীয় ও ঐস্লামিক চিন্তাধারার সমান্তরাল, এই চিন্তাসাদৃশ্য ধর্মগ্রন্থে থাকায় ধর্মীয় সমন্বয়ের একটি ইঙ্গিত পাওয়া যায় গীতাগ্রন্থে। গীতার কর্মযোগ ও ভক্তিযোগ বাইবেলে কথিত মার্থা (কর্ম) ও মেরী (ভক্তি) নাম্নী দুই বোনের কাহিনীর মধ্যে বিধৃত। কর্মযোগ, জ্ঞানযোগ ও ভক্তিযোগের দ্বারা মানব আত্মা পরম লক্ষ্যে উপনীত হতে পারে।

প্রতীচ্যে গীতার প্রভাব কতটুকু তার ইতিহাস এই ক্ষুদ্র আলোচনা নয়। গীতার মাহাত্ম্য এবং গীতার অন্তর্নিহিত বক্তব্য যে দেশের ভৌগোলিক সীমা পার হয়ে আগ থেকে দীর্ঘকাল পূর্বেই বিশ্বের পণ্ডিতজনকে আকৃষ্ট করেছে সেই কথা স্মরণ করাই আমাদের উদ্দেশ্য। ডঃ অমলেন্দু বসু, অতুলচন্দ্র সেন অনূদিত শ্রীমদ্‌ভগবদ্গীতার সদ্যপ্রকাশিত দ্বিতীয় সংস্করণে এই বিষয়ে এক মহামূল্যবান আলোচনা করেছেন। সাম্প্রতিককালে এত সংক্ষেপে এমন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের পূর্ণাঙ্গ আলোচনা আর চোখে পড়েনি।

এই গ্রন্থে আরো একটি বিচিত্র আলোচনা সংযোজিত হয়েছে যা অতুলচন্দ্র সেনের অনূদিত এই গীতাগ্রন্থের মূল্যবৃদ্ধি করেছে, সেই প্রবন্ধটি লিখেছেন ভূপেন্দ্রকিশোর রক্ষিতরায়। ভূপেন্দ্রকিশোর স্বয়ং বিপ্লবী ছিলেন এবং বাংলায় বিপ্লববাদের ইতিহাস সম্পর্কে তিনি সম্পূর্ণ ওয়াকিবহাল সেই কারণে তাঁর এই তথ্যসমৃদ্ধ আলোচনাটি অত্যন্ত মনোজ্ঞ হয়েছে। তিনি বলেছেন—বিপ্লবীদের জীবনে গীতার প্রভাব ছিল অনন্য।......বিপ্লবী গুপ্ত সমিতিতে ঢুকতে হত গীতা স্পর্শ করে শপথ নিয়ে। দেশের প্রতি দলের প্রতি আনুগত্যের শপথ বিপ্লবীকে জীবনের শেষদিন পর্যন্ত রাখতে হত। গীতা ছিল তাঁর (বিপ্লবীর) জীবনের অন্তিমকাল পর্যন্ত অবিচ্ছেদ্য সঙ্গী।

> "ক্লৈব্যং মা স্ম গমঃ পার্থ নৈতৎ
> ত্বয্যুপপদ্যতে।
> ক্ষুদ্রং হৃদয়দৌর্বল্যং ত্যক্ত্বোত্তিষ্ঠ
> পরন্তপ॥"২॥৩॥

ক্ষুদ্র হৃদয়দৌর্বল্য পরিহার করে উত্তিষ্ঠ হও, ক্লীবত্ব দূর করো। গীতার এই বাণী বাঙালী বীর বিপ্লবী সেদিন তার অন্তরে গ্রহণ করেছিল। শ্রীঅরবিন্দ থেকে ত্রৈলক্য মহারাজ, কানাইলাল থেকে যতীন দাস, দীনেশ, ভকত সিং ভবানী ভট্টাচার্য, উধম সিং প্রমুখ বিপ্লবীদের ধ্যানজ্ঞান ছিল এই ভগবদ্‌গীতা। ভূপেন্দ্রকিশোর রক্ষিতরায়ের আলোচনাটি তাই সংক্ষিপ্ত হলেও মূল্যবান। হিরন্ময় বন্দ্যোপাধ্যায় লিখেছেন—'গীতার দার্শনিক চিন্তা'। তিনি বলেছেন গীতা বোধহয় একমাত্র ব্রহ্মসূত্রের সঙ্গে তুলনীয়। শঙ্করাচার্য এবং নানাশ্রেণীর ভক্তিবাদী দার্শনিক যথা রামানুজ, বল্লভাচার্য, নিম্বার্ক প্রমুখ মনীষীগণ উভয় গ্রন্থের উপর ভাষ্য রচনা করেছেন। ব্রহ্মসূত্র মূলতঃ বিশ্বতত্ত্বের চিন্তায় সীমাবদ্ধ এবং তা বিশুদ্ধভাবে দর্শন গীতায় বিশ্বতত্ত্ব সম্পর্কিত চিন্তা যেমন আছে অতিরিক্তভাবে নীতি ও ধর্ম সংক্রান্ত আলোচনাও আছে। তিনি আরও বলেছেন—ঠিক বলতে কি ধর্মতত্ত্বই যেন গীতার মূল আলোচনার বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে—অন্য আলোচনা আনুষঙ্গিক। হিরন্ময় বন্দ্যোপাধ্যায়ের ব্যাখ্যা অতি প্রাঞ্জল এবং জ্ঞানগর্ভ। ঈশ্বর সম্পর্কে তিনটি মূলতত্ত্বের কথা তিনি উল্লেখ করেছেন—অক্ষর ব্রহ্ম, বিশ্বের এবং প্রকৃতির নিয়ন্তা ঈশ্বর—এই পরিকল্পনা চতুর্ভুজ বিষ্ণুর এবং পরিশেষে ভগবান বিষ্ণুর অবতাররূপী পুরুষোত্তমবেশী মানবদেহধারী কৃষ্ণে তাঁর প্রকাশ। বিশ্বের অন্তর্নিহিত ধারক।

পণ্ডিত ত্রিপুরাশঙ্কর সেনশাস্ত্রীকৃত 'গীতাভাষ্য পরিক্রমা' নামক প্রবন্ধে গীতার ভাষ্যকার যথা শঙ্করাচার্য, আনন্দগিরি, রামানুজাচার্য, আচার্য নীলকণ্ঠ, সুরী, শ্রীমধুসূদন সরস্বতী, শ্রীধর স্বামীপাদ, বলদেব বিদ্যাভূষণ, বল্লভাচার্য, নিম্বার্কাচার্য, ডাঃ গিরীন্দ্রশেখর বসু, দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর, বঙ্কিমচন্দ্র, নবীনচন্দ্র, শ্রীঅরবিন্দ, রামদয়াল মজুমদার, ত্রৈলক্য মহারাজ, বালগঙ্গাধর তিলক, গান্ধিজী, আচার্য বিনোবাভাবে প্রমুখের বক্তব্য সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। রাজশেখর বসু কৃত ভগবদ্গীতার

অনুবাদ এবং রাজশেখরের মূল্যবান ভূমিকাটির কথা তিনি উল্লেখ করেন নি।

অধ্যাপক অতুলচন্দ্র সেন প্রচুর পরিশ্রমে সংস্কৃতানভিজ্ঞ এবং অল্পসংস্কৃতজ্ঞদের জন্য ১৯৩৬ খৃষ্টাব্দে (বাংলা—১৩৪৩) এই গ্রন্থটির প্রথম সংস্করণ প্রকাশ করেন। তাঁর প্রধান অবলম্বন ছিল শ্রীঅরবিন্দের 'এসেস অব দি গীতা', এবং অনেকস্থলে শ্রীঅরবিন্দের ব্যাখ্যাই তিনি গ্রহণ করেছেন। এছাড়া রামদয়াল মজুমদার মহাশয়ের গীতাও তাঁকে সাহায্য করেছে। এছাড়া বঙ্কিমচন্দ্র, গান্ধী, তিলকমহারাজ ও কৃষ্ণানন্দ স্বামীর গীতাও তিনি আকরগ্রন্থ হিসাবে গ্রহণ করেছেন। অধ্যাপক অতুলচন্দ্র একজন ন্যায়নিষ্ঠ শিক্ষাব্রতী ও দেশপ্রাণ মনীষী ছিলেন। ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দে তাঁর জন্ম হয় এবং ১৯৬৮ তাঁর তিরোধান ঘটে। অতুলচন্দ্র সেনের জীবন ও কর্ম সম্পর্কে যাঁর কোনো জ্ঞান নেই তিনিও এই মহাগ্রন্থ থেকে অতুলচন্দ্র সেনের পরিচয় পাবেন। অতুলচন্দ্র বিগত যুগের বাঙালীসমাজের এক স্মরণীয় প্রতিনিধি। তাঁর উপযুক্ত পুত্রকন্যারা যে এই মূল্যবান গ্রন্থটির নূতন সংস্করণ প্রকাশ করেছেন তজ্জন্য তাঁরা অভিনন্দনযোগ্য। আচার্য রমেশচন্দ্র মজুমদার এই গ্রন্থের ভূমিকায় যথার্থই বলেছেন—"এই গ্রন্থপাঠে অনেকে গীতার প্রকৃত মর্ম অনুধাবন করিতে পারিবেন।"

সাধু টি এল ভাসওয়ানী ছিলেন মরমী কবি, দার্শনিক ও ভারতীয় সংস্কৃতি ও সাধনার এক সুমহান উদ্গাতা। এই শিক্ষাব্রতী ও মানবপ্রেমিক ১৮৭৯ খৃষ্টাব্দে হায়দ্রাবাদ সিন্ধুতে জন্মগ্রহণ করেন। ১৯৬৬-র ১৬ই জানুয়ারী তারিখে তাঁর মর্ত্যের বন্ধন ক্ষয় হয়। সারাজীবনব্যাপী আত্মত্যাগ ও জনসেবার দ্বারা সাধু ভাসওয়ানী এক পরম গৌরবের আসন অধিকার করেছেন। 'দি ভাগবদগীতা' বা 'দি সং অব লাইফ' নামক গ্রন্থে তিনি শ্রীমদ্ভাগবদ্গীতার ইংরাজীতে অনুবাদ করেছেন এবং ব্যাখ্যা দান করেছেন। প্রতিটি অধ্যায়ের তিনি একটি করে নতুন নামকরণ করেছেন—যথা: প্রথম অধ্যায়: অর্জুনের নিঃসঙ্গতা, দ্বিতীয় অধ্যায়: শিক্ষারম্ভ, তৃতীয় অধ্যায়: কর্মের পথ, চতুর্থ অধ্যায়: ত্যাগের পথ ইত্যাদি।

সাধু ভাসওয়ানী গীতার ভূমিকা প্রসঙ্গে বলেছেন—

"The Gita is a Song: and song is a synthesis. The Gita is music; it, many notes are blended, one with the other; in a beautiful whole. A Hindu teacher of wisdom rightly says: "All the Upanishads are the cows, the Lord Himself is the Milker. Arjuna is the calf, those of purified ununderstanding are the drinkers of the milk, the Supreme nectar of the Gita".

সঙ্গীতের মাধ্যমে দর্শনের এই জাতীয় পরিবেশন বিশ্বসাহিত্যে তুলনাহীন একথা বলেছেন সাধু ভাসওয়ানী।

সাধু ভাসওয়ানীকৃত এই অনুবাদটি গীতাপ্রেমিকদের কাছে এক মূল্যবান সম্পদ।

শ্রীযুক্ত হরলাল ভট্টাচার্য একজন জ্ঞানী সাধক। তিনি গীতাগ্রন্থের কোনোরূপ টীকা, ভাষ্য বা অনুবাদ করেন নি—অথচ গীতা থেকে মাত্র আটটি শ্লোক নির্বাচন করে নিয়ে নিজস্ব ভঙ্গীতে তার ব্যাখ্যা অত্যন্ত সহজ এবং সাধারণবোধ্য ভাষায় কবিতাকারে প্রকাশ করেছেন। শ্রীযুক্ত ভট্টাচার্য 'বিশ্বাসে মিলায় কৃষ্ণ তর্কে বহুদূর' এই নীতিতে বিশ্বাসী। তাই তিনি দার্শনিক বা তাত্ত্বিক জটিলতা দ্বারা গীতার বক্তব্যকে কঠিন করে তোলেন নি। নিষ্কাম-কর্মবিষয়ক শ্লোকগুলি থেকে তিনি কয়েকটি শ্লোক নির্বাচন করে তার সুললিত পদ্যানুবাদ করেছেন। গ্রন্থের সূচনায় গ্রন্থের পরিচয় সুস্পষ্ট। তিনি বলেছেন—"সর্বকর্ম ফলত্যাগী / তারে কহে সর্বত্যাগী/নিষ্কাম-কর্ম কর সদাক্ষণ/ কর্ম বিরত না রবে কখন।" তিনি বুঝেছেন গীতার মর্মকথা কর্ম এবং কর্মছাড়া আর পথ নেই। আশীটি নির্বাচিত শ্লোককে পাঁচটি শ্রেণীতে তিনি ভাগ করেছেন এবং প্রতিটি শ্লোকের সূচনায় তার সামগ্রিক ব্যাখ্যা দান করেছেন।

গতানুগতিকতামুক্ত এই গ্রন্থটি চিত্তাকর্ষক এবং সহজবোধ্য। হিরন্ময় বন্দ্যোপাধ্যায় ভূমিকায় বলেছেন:

"পুস্তকখানির অভিনবত্ব আছে। এটি তুলনায় গুরুত্বপূর্ণ শ্লোকগুলির ঠিক সংকলন নয়। অপরপক্ষে গতানুগতিক পথে গীতার ব্যাখ্যাও নয়। পুস্তকের বিন্যাসে ও ব্যবস্থায় ভাষ্যকারের একটি স্বকীয় দৃষ্টিভঙ্গী পরিস্ফুট।"

এই নিষ্কাম কর্ম সম্পর্কিত 'সহজ গীতা পাঠ' সকলের অবশ্যপাঠ্য বিশেষতঃ চরিত্রগঠনের জন্য ছাত্রসমাজে এই জাতীয় গ্রন্থের বহুল প্রচলন প্রয়োজন।

ডঃ রাধাগোবিন্দ বসাক যথার্থই বলেছেন—'যাঁহারা ধর্মপিপাসু তাঁহারাও এই পুস্তক হইতে কতকগুলি সারগর্ভ ধর্মোপদেশ হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবেন।'

পণ্ডিতপ্রবর হরলাল ভট্টাচার্য ইতিপূর্বে 'আমি কে জানতে হবে' গ্রন্থটি রচনা করে যে খ্যাতির অধিকারী তাঁর সেই পূর্বগৌরব এই গ্রন্থের দ্বারা বৃদ্ধি পাবে সন্দেহ নেই।

—অভয়ঙ্কর

(১) শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা (ব্যাখ্যা ও অনুবাদ) অতুলচন্দ্র সেন। প্রকাশক: অতুলচন্দ্র স্মারক সমিতি। ২৪০, যোধপুর পার্ক, কলিকাতা: ৩১। প্রাপ্তিস্থান: জিজ্ঞাসা কলিকাতা। দাম: পনেরো টাকা।

2 THE BHAGAVAD GITA THE SONG OF LIFE By T L VASWANI— GITA PUBLISHING HOUSE: MIRANAGAR: 1): PRICE Rs 12 only

(৩) সহজ গীতা পাঠ—শ্রীহরলাল ভট্টাচার্য প্রণীত। ডঃ হিরন্ময় বন্দ্যোপাধ্যায় কৃত ভূমিকা সম্বলিত।— প্রকাশক: পূর্ণিমা ভট্টাচার্য। ১১বি, ফার্ন রোড, কলিকাতা—১৯। দাম: এক টাকা মাত্র।

নতুন বই

রানীকাহিনী (উপন্যাস): গজেন্দ্রকুমার মিত্র প্রণীত। প্রকাশক: রবীন্দ্র লাইব্রেরী। ১৫/২, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা—১২। মূল্য: সাত টাকা মাত্র।

বাংলা সাহিত্যের ঐতিহাসিক উপন্যাসের শাখাটি একদা পরিপুষ্ট ছিল, স্বয়ং বঙ্কিমচন্দ্র যে পথ প্রদর্শন করেছিলেন সেই পথ অনুসরণ করেছিলেন রবীন্দ্রনাথ এবং বঙ্কিমের উত্তরসূরী আরো অনেক শক্তিমান উপন্যাস লেখক। এইসব লেখকদের মধ্যে রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, হরিসাধন মুখোপাধ্যায়, নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত প্রমুখ লেখকবৃন্দ বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে স্মরণীয় হয়ে আছেন। কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্তও 'ডঙ্কা নিশান' নামে একটি ঐতিহাসিক উপন্যাস 'প্রবাসী'র পৃষ্ঠায় শুরু করলেও অকালমৃত্যুর জন্য তা সম্পূর্ণ করতে পারেন নি। সাম্প্রতিককালে যে মুষ্টিমেয় খ্যাতনামা বাঙালী লেখক ঐতিহাসিক উপন্যাস লিখে থাকেন তাঁদের মধ্যে গজেন্দ্রকুমার মিত্র এই বিভাগে স্বীয় প্রতিভার স্বাক্ষর রেখেছেন। ইতিপূর্বে তাঁর কয়েকখানি ঐতিহাসিক উপন্যাস জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে। 'রানী কাহিনী' গজেন্দ্রকুমার মিত্রের সাম্প্রতিক ঐতিহাসিক উপন্যাস এবং এই উপন্যাসের কাহিনীঅংশসংগ্রহে তিনি আচার্য রমেশচন্দ্র মজুমদারের সহায়তা পেয়েছেন। একদা বঙ্গদেশের একটি খণ্ডরাজ্যের সঙ্গে ব্রহ্মদেশের একটি অংশরাজ্যের সঙ্গে মনদেয়ানেয়ার সম্পর্ক স্থাপিত হয়েছিল সেই প্রায়-বিস্মৃত কাহিনীটি কাব্যধর্মী ভাষায় একটি

অনবদ্য গীতিকবিতার মতো বিধৃত করেছেন লেখক। বাংলার রাজা রণমল্লদেব আর ত্রিভুবনাদিত্যের কন্যা সেবন্তী উভয়ের প্রেম-কাহিনী এই প্রানীকাহিনী। নরপতি সিধুর কাছে দুর্বলরোগজীর্ণ বন্ধ্যা সেবন্তী তাঁর মনের কথা বললেন। তিনি সিধুকে আশীর্বাদ করলেন, বললেন—ভদ্র আপনি আমাকে নিশ্চিন্ত করলেন। সিধু বললেন—আপনার ইচ্ছা আমি পূরণ করব। আদেশ পালন করব। পাটিকেরার স্বর্গত রাজার অংগুরীয় তিনি সিধুকে দিলেন। ভ্রাতৃবধূ সেবন্তী এর পরই দেহ রাখলেন। নরপতি সিধু, তাঁর উদ্যানের শালগাছকে উঁইপোকার দংশনে জীর্ণ হতে দেখেছেন, সেবন্তীর মৃত্যুতে তাঁর সেই শালগাছের কথা মনে জাগে।

গজেন্দ্রকুমারের মিঠে হাত, অসামান্য সংযমে এক করুণ মধুর বিরহমিলন গাথা তাঁর হাতে তাই সার্থক হয়েছে। 'বহ্নিবন্যা'র লেখকের পূর্বগৌরব এই উপন্যাস আরো বর্ধিত করবে এ বিষয়ে আমরা নিঃসন্দেহ। গ্রন্থটির ছাপা এবং বাঁধাই মনোরম।

এখন... রাখাল (কবিতা সংকলন)—সম্পাদনা : অজিত দত্ত। বিশ্বজ্ঞান, ৯।৩ টেমার লেন, কলকাতা-৯। পাঁচ টাকা।

আয়োজনটা অভিনব। চমকপ্রদ সেই কারণেই। কবিতা সংকলন স্রোতের মধ্যে দৃষ্টিভঙ্গীর অভিনবত্ব ও ভিন্ন স্বাদের জন্যেই আলোচ্য সংকলনটি কবি এবং কবিতা পাঠকদের সানুরাগ পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করবে। দুই বিপরীত মেরুতে অবস্থানকারী মাত্র চারজন কবির এমন সহাবস্থান এর আগে কোন কবি সংকলনে দেখা যায়নি। দুজন সুখ্যাত কবি, অন্য দুজন স্বল্প-পরিচিত—এদের প্রত্যেকের বারোটি করে ভিন্নরসের ও মেজাজের কবিতা এতে সংকলিত হয়েছে। প্রথম দুজন হলেন শক্তি চট্টোপাধ্যায় ও সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় আর স্বল্প পরিচিতেরা হলেন শ্যামল পুরকায়স্থ ও অভিজিৎ ঘোষ। সম্পাদনা করেছেন প্রবীণ কবি শ্রীঅজিত দত্ত। সম্পাদক শ্রীদত্তের বিশ্লেষণধর্মী ভূমিকাটি কাব্যকণিকাগুলির রসগ্রহণে সাধারণ পাঠকদের অনেকখানি সহায়তা দেবে।

সবারে করি আহ্বান—রাখাল রায়চৌধুরী। প্রভাত কার্যালয়, ২বি, নবীন কুণ্ডু লেন, কলকাতা-৯। দেড় টাকা।

রবীন্দ্রনাথের নানান রূপের ও রঙের গান ও কবিতা থেকে সুষ্ঠু নির্বাচন, চয়ন এবং গ্রন্থনের ফলশ্রুতি আলোচ্য সঙ্গীত-আলেখ্যটি। বিশ্বপ্রকৃতির সঙ্গে মানবমনের অন্তরবীণা এক সূত্রে বাঁধা—এই বিষয় ও ভাব সোচ্চার হয়ে উঠেছে সঙ্গীত ও আবৃত্তির মেলবন্ধনে। সঙ্গীত-আলেখ্যটি মূর্ত এবং হৃদ্য হয়ে উঠতে পারে এই দুটি ধারার—সঙ্গীত এবং কবিতা—সংগে তৃতীয় ধারা—নৃত্যের মিলন ঘটাতে পারলে।

ভেলা (উপন্যাস)—মানসী দাশগুপ্ত প্রণীত। প্রকাশক : পাঁথকৃৎ। ২৪, পন্ডিতিয়া রোড। কলিকাতা—২৯। মূল্য : ছয় টাকা মাত্র।

লেখিকা হিসাবে মানসী দাশগুপ্ত নামটি তেমন সুপরিচিত নয় কিন্তু 'ভেলা' উপন্যাসে তিনি যে অসামান্য শক্তিমত্তার পরিচয় দিয়েছেন তাতে বিস্মিত হতে হয়। তাঁর লিপিকুশলতায় একজন পাকা লিখিয়ের মুন্সিয়ানার ছাপ আছে। এক অতিশয় জটিল বিষয়বস্তুকে তিনি অতি অনাড়ম্বর ভংগীতে সহজ ভাষায় পরিবেশন করেছেন। উপন্যাসের কাহিনী গতানুগতিক নয়। তার বক্তব্য সমকালীন সমাজের সমস্যা। 'ভেলা'র নায়িকা বিনতা বিদেশ থেকে ফিরে একা ঘরে অধিক রাতে ভাবছে বিগত জীবনের কথা। বিস্মৃত স্মৃতি ভেসে এল স্বপ্নের মত। বিনতা ভাবে—"এ সবই অর্থহীন অবান্তর। সেই চলে যাওয়া, এই ফিরে আসা—সব, সব। সেই অংগ হারানোর খেদ নিয়ে খাপার মত ছুটে বেড়ানো। আর এই আজ ফিরে এসে দাঁড়ানো।"

যা আগে ছিল তা আর নেই। মা নেই, দাদা বাড়ির ভোল পালটিয়েছেন। বিদেশ থেকে ফিরে বিনতা সেসব দেখে অবাক হচ্ছে। দাদা বৌদিরা কিন্তু দেখছেন বিনু পাল্টায় নি, কথা কইলেও ঝকঝক করছে। না কইলেও ঝকঝক করছে। অতীশ বিনতাকে বিয়ে করেছিল, এর কিছু পরে আকস্মিক দুর্ঘটনায় বিনতার পা নষ্ট হয়ে গেল, সে পংগু হয়ে রইল। তার এই অবস্থার ফলে একটা অস্বস্তিকর অবস্থার সৃষ্টি হল, ফলে শ্বশুরবাড়ি থেকে বাপের বাড়ি এসে উঠল বিনতা। সে পড়াশোনায় আত্মনিয়োগ করল, পরিচয় হল ডাঃ সুমন্দ্র মজুমদারের সঙ্গে। তাঁরই সাহায্য পেয়েছিল বিদেশ যাত্রায়। দেশে ফিরে এসে আবার স্বামীর ঘরে এগার বছর পরে ফিরে গেল—ইতিমধ্যে স্বামীর দ্বিতীয়া স্ত্রী লিজার মৃত্যু হয়েছে—লিজার ছবির দিকে তাকিয়ে স্বামী ফিসফিস করে বললেন—"ও আমায় বলেছিল আবার আমি তোমায় ফিরে পাব।"

অতীশের ভাষায় বিনাবিচ্ছেদে দুজনে এক মুহূর্তের জন্য এক হল। জীবনে এক-দিন শিবেন্দুর আবির্ভাব ঘটল। সে কণ্ঠ-বদলের প্রস্তাব দেয়। ডাঃ মজুমদার ক্লিনিক থেকে ওকে সরিয়ে দিয়ে বিদেশে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। তারপর এই পুনর্মিলন। শেষ দৃশ্যে বিনুর সন্তান জন্ম নিচ্ছে। বিনু শুনছে কে যেন বলছে বৌমাকে সরিয়ে নাও। বিনু চাইছে চোখ মেলে দেখতে। সে অতিকান্ত শূন্যে ভাসমান—জীবনের ভেলায় গভীর অন্ধকারে তলিয়ে আছে।

লেখিকা আশ্চর্য সংযমের সংগে এদিনের সংসারের যে কাহিনী পরিবেশন করেছেন তা বাস্তবানুগ ও স্পষ্ট হয়েছে। স্বচ্ছ সুন্দর ভাষায় বিধৃত 'ভেলার' কাহিনী পাঠকের মনকে আকর্ষণ করে। বিনতা, অতীশ সুমন্দ্র ডাক্তার প্রভৃতি প্রতিটি চরিত্র সার্থক, নিখুঁত হয়ে জীবন্ত মানুষ হয়ে উঠেছে তাই তাদের জীবনের বিচিত্র ও জটিল মুহূর্তগুলি এত স্বাভাবিক হয়েছে। খালেদ চৌধুরী অঙ্কিত প্রচ্ছদচিত্রটি মনোরম।

পাকিস্তান বনাম পাকিস্তান ফলাফল বাংলাদেশ (প্রবন্ধ)—রঞ্জু নাগ। রক্ত-করবী, ব্লক : এ ফ্ল্যাট : ৮, ১১ সেন্টর সিঁথি রোড, কলকাতা—৫০। চার টাকা।

দুয়ের সংঘাত আর দ্বন্দ্বের মধ্যে দিয়েই জীবপ্রকৃতির চিরাচরিত নিয়মনীতিকে মান্য করেই আগমন ঘটে তৃতীয় আর এক-জনের। পশ্চিম পাকিস্তান আর পূর্ব পাকি-স্তানের মধ্যে তীব্র সংঘাত আর রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষে জীবপ্রকৃতির ধারাকে অনুসরণ করেই জন্ম নিল 'বাংলাদেশ' নামে নতুন দেশ যার অবয়বে চরিত্রে চিন্তায় এবং দৃষ্টিভঙ্গীতে পশ্চিম পাকিস্তান বা পূর্ব পাকিস্তান—কারুরই বিন্দুমাত্র চিহ্ন নেই। পাকিস্তান সৃষ্টির প্রায় জন্মলগ্ন থেকেই পূর্ব বাংলাকে পশ্চিম পাকিস্তান শোষণ ও দোহন শুরু করে। শাসনের নামে একতরফা শোষণ চির-কাল চলতে পারে না—ধর্মের নাম ভাঙিয়েও নয়। বাংলাদেশের উদ্ভব হল কেমন করে এই প্রশ্নের সদুত্তর নিহিত রয়েছে এই শোষণের কলঙ্কজনক অধ্যায়ের মধ্যে। পূর্ব

বাংলা কিভাবে ১৯৪৯ সাল থেকে শোষিত হয়েছে নানান পরিসংখ্যান তথ্য ও তত্ত্বের মধ্যে দিয়ে তাই বিশেষ দক্ষতার সাক্ষ্য-প্রমাণসহ জনসাধারণের সামনে উপস্থাপিত করেছেন লেখক রঞ্জু নাগ। বাংলাদেশপ্রেমী সকল বাঙালীর কাছে এটি অবশ্যপাঠ্য গ্রন্থ বলে বিবেচিত হবে।

শ্রীম-দর্শন (ধর্মগ্রন্থ : অষ্টম ভাগ)—স্বামী নিত্যাত্মানন্দ। জেনারেল প্রিন্টার্স অ্যান্ড পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, ১১৯ ধর্মতলা স্ট্রীট, কলকাতা : ১৩। আট টাকা।

যুগাবতার শ্রীরামকৃষ্ণের অন্তরঙ্গ পার্ষদদের মধ্যে ভক্তিভাজন 'শ্রীম' অন্যতম। তিনি শ্রীরামকৃষ্ণ-মণ্ডলীর বিশেষ 'চিহ্নিত' ব্যক্তি। শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জীবন, বাণী এবং তাঁর লীলারহস্য প্রচারে শ্রীম যে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন 'কথামৃতে' তার শ্রেষ্ঠ নিদর্শন রয়েছে। বস্তুত শ্রীরামকৃষ্ণকে সাধারণ বাঙালীর জীবনে তিনি প্রতিষ্ঠিত করে গেছেন। 'চাপরাশপ্রাপ্ত' এই মানুষটি ছিলেন গৃহী-সন্ন্যাসী। তিনি তাঁর ইষ্টগুরু ও পথপ্রদর্শক শ্রীরামকৃষ্ণের মতোই অতি সাধারণ ভাষায় ভক্তজনসমাজে তত্ত্বকথা শোনাতেন ও ঈশ্বর-প্রসঙ্গ আলোচনা করতেন। শ্রীরামকৃষ্ণের ভাষ্যকার শ্রীম কথিত উপদেশ, তত্ত্ব আলোচনা ও ঈশ্বর প্রসঙ্গ ভক্তসাধারণের জন্যে 'শ্রীম'-র মতোই ভক্তিশ্রদ্ধান্তরে প্রশংসনীয়ভাবে সংকলন করেছেন। 'শ্রীম'-র নিত্য-সহচর স্বামী নিত্যাত্মানন্দ। স্বাদে মেজাজে ভঙ্গিতে এক আত্মিকবন্ধন দেখা যায় 'কথামৃত'এর সঙ্গে এ গ্রন্থখানির। 'কথামৃত'-এর যেখানে শেষ সেখান থেকেই এ গ্রন্থের শুরু। বলা বাহুল্য, এ গ্রন্থখানি 'শ্রীরামকৃষ্ণ-সাহিত্যে' বিশিষ্ট সংযোজন বলে বিবেচিত হবে।

অধ্যাত্ম-সাধনা (ধর্মগ্রন্থ)— ইগ্নেসিয়াস লয়োলা। বঙ্গানুবাদ : দীপা সর্বাধিকারী। জেভিয়ার প্রকাশনী, ৩০ পার্ক স্ট্রীট, কলকাতা : ১৬। চার টাকা।

খৃস্ট-অনুরাগী সন্ত ইগ্নেসিয়াস, যীশু সঙ্ঘের প্রতিষ্ঠাতা, খৃস্টান জগতের এক স্মরণীয় পুরুষ। ইউরোপীয় নবজাগরণের যুগে ক্যাথলিক মণ্ডলীর মধ্যে সংস্কার আন্দোলনের পুরোধা ছিলেন সাধু ইগ্নেসিয়াস। নিজের জীবনে ঈশ্বর-সান্নিধ্য ও সেবার যে অনুভূতি ও পদ্ধতি-প্রকরণ খুঁজে পেয়েছিলেন তারই বাণী-রূপ এই অধ্যাত্ম-সাধনা গ্রন্থটি। মূল গ্রন্থটি স্প্যানিশ ভাষায় লেখা। বিভিন্ন ভাষায় ভাষান্তরিত এই গ্রন্থটির সর্বশেষ বঙ্গানুবাদ করেছেন দীপা সর্বাধিকারী প্রশংসনীয়ভাবে। যীশু-ভক্তদের শুধু নয়—অধ্যাত্মবাদে বিশ্বাসীদের অ-খৃস্টানদের কাছেও এ গ্রন্থটি আদরনীয় হবে।

সংকলন ও পত্র-পত্রিকা

বাংলার মুখ (সেপ্টেম্বর, ৭১)—তপন বন্দ্যোপাধ্যায়। পূর্বপুটিয়ারী, চাকদহ, ২৪-পরগণা। ষাট পয়সা।

তরুণ কবিদের এবং কিছু প্রতিষ্ঠানাম্য কবিদের কবিতা এ সংকলনে স্থান পেয়েছে। আছেন মণীন্দ্র রায়, বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, সত্য গুহ, আলোক সরকার এবং আরো অনেকে। 'সাম্প্রতিক কবিতা পত্রিকা ও তরুণ কবিদের সম্পর্কে' তপন বন্দ্যোপাধ্যায়ের দৃষ্টিপাতে নতুনত্ব আছে।

কন্ঠস্বর—সম্পাদক : সত্যরঞ্জন বিশ্বাস। ৪৯।এল।৭ নারকেলডাঙ্গা নর্থ রোড, কলিকাতা—১১। ৫০ পয়সা মাত্র।

উল্লেখযোগ্য যে পত্রিকাটি ৫ম বর্ষে এসেও গতানুগতিকতার শিকার হয়নি। শুধু মাত্র তরুণ কবিদের কবিতা, আলোচনা ও প্রবন্ধ নিয়ে একটি কবিতা পত্রিকার নিয়মিত প্রকাশ নিশ্চয়ই প্রশংসার যোগ্য। এ সংখ্যায় ৪৯টি সরস কবিতা ও কয়েকটি মূল্যবান প্রবন্ধ পত্রিকাটির মর্যাদা বাড়িয়েছে।। সাম্প্রতিক বাংলা কবিতায় সমকালীনতা প্রবন্ধ দুটি (শ্যামলকুমার ঘোষ ও শঙ্কর মজুমদার) বেশ মননশীল ও বিতর্কের ঝড় তুলবে। ডঃ অমরেন্দ্র সান্যালের প্রবন্ধটি তরুণ কবিদের উৎসাহিত করবে।

উর্ক—সম্পাদনা : পদ্মমিত্র। হাসপাতাল রোড, করিমগঞ্জ, আসাম। দেড় টাকা।

সীমান্ত—শহর করিমগঞ্জের ঐতিহাসিক সাহিত্য পত্রিকাটি প্রবাসী বাঙালীদের সাহিত্য প্রীতির ও সাহিত্য সৃষ্টির উজ্জ্বল নিদর্শন। সুখ্যাত লেখক ও তরুণ কথাকারদের নানান ধরনের লেখায় ভরা। আশুতোষ ভট্টাচার্য, বঙ্কিম মাহাত, পান্নালাল দাশগুপ্ত, ডঃ পঞ্চানন ঘোষাল, সৌমেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, মিহিরকুমার দেব পুরকায়স্থ-প্রমুখের সাহিত্য সংস্কৃতি, রবীন্দ্রনাট্য ও বিজ্ঞানের ওপর লেখা প্রবন্ধগুলি সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। এছাড়া লিখেছেন : হরপ্রসাদ মিত্র, তরুণ সান্যাল, নচিকেতা ভরদ্বাজ, হেনা হালদার এবং আরো অনেকে।

মূল্যায়ন — সম্পাদক : সত্যেন্দ্রনারায়ণ মজুমদার, নরহরি কবিরাজ। সমীক্ষা প্রকাশনী, ১০, বণ্ডেল রোড, কলকাতা—১৯।

রাজনীতি, সমাজবিদ্যা, অর্থনীতি প্রভৃতি আলোচনা পত্রিকা হিসেবে 'মূল্যায়ন' ইতিমধ্যেই পাঠকদের সমাদর লাভ করেছে। ঠিক এ-ধরণের প্রধানতঃ মতাদর্শগত পত্রিকা বাংলাদেশে নেই। এই সংখ্যায় প্রকাশিত রচনাগুলির মধ্যে জাতীয় গণতান্ত্রিক বিপ্লব ও অধনতান্ত্রিক পথ সম্পর্কে তিনটি প্রবন্ধ, ইন্দিরা কংগ্রেসের শ্রেণীচরিত্র সম্পর্কে একটি আলোচনা, বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টি সম্পর্কে পর্যালোচনা এবং প্রখ্যাত কমিউনিস্ট রজনীপাম দত্তের প্রবন্ধ মূল্যবান বলে বিবেচিত হবে। এগুলির বেশীর ভাগই বিতর্কমূলক। লেখকগোষ্ঠীর মধ্যে আছেন সুকুমার মিত্র, আলেকজান্ডার আবুখ, রণধীর দাশগুপ্ত, নির্মালা বাগচী, পরিমলচন্দ্র ঘোষ, নরহরি কবিরাজ, রণেশ দাশগুপ্ত, অমলেন্দু সেনগুপ্ত, তপন বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ।

ঢেউ—সম্পাদনা : দীপক সামন্ত ও ঈশানচন্দ্র মিত্র। শান্তিনিকেতন, তেঁতুলমুড়ি টেঙ্গুনিয়া, কাঁথি, মেদিনীপুর। ষাট পয়সা।

গল্প আর কবিতা নিয়েই শারদ-সংকলন। তরুণ সাহিত্য-প্রয়াসীদের প্রশংসনীয় উদ্যম।

স্বরসন্ধান—সম্পাদক : সুভাষচন্দ্র সাহা। নামখানা রোড, কাকদ্বীপ, ভুবননগর, ২৪ পরগণা। এক টাকা।

গ্রাম বাংলা থেকে প্রকাশিত এই সাহিত্য সংকলনটিতে গল্প, কবিতা, প্রবন্ধ, অনুবাদ কবিতা ইত্যাদি লিখেছেন তরুণ সাহিত্য পিপাসুরা। বিশেষ উল্লেখ্য রচনা হল : সন্তোষবর চট্টোপাধ্যায়ের 'শব' (গল্প), স্বদেশরঞ্জন দত্তের 'বিপন্ন বাংলাদেশ ও সাম্প্রতিক কবিতা' (প্রবন্ধ) এবং নচিকেতা ভরদ্বাজ ও সিদ্ধার্থ পালের অনুবাদ কবিতা। এছাড়া লিখেছেন : সত্য সিংহ, ফণিভূষণ আচার্য, মলয়শঙ্কর দাশগুপ্ত, সত্য গুহ, শান্তি লাহিড়ী এবং আরো অনেকে।

তৃষা—সম্পাদক : শিমুল রায়। ২ কান্তিচন্দ্র গোস্বামী লেন, বালী, হাওড়া। এক টাকা।

নতুন কবিতা—সম্পাদনা : সজল বন্দ্যোপাধ্যায়, দীপক রায়। খালিসানী, গড়বাড়, চন্দননগর। ত্রিশ পয়সা।

সর্বার্থ (সাপ্তাহিক) পূর্ণেন্দু সেন। বিনয় সরকার ইনস্টিটিউট অব সোস্যাল সায়েন্স।

ভবানীয়া (পাক্ষিক) সম্পাদক: হারাধন মহাপাত্র, শ্যামসুন্দর মাইতি। চৈতন্যপুর, মেদিনীপুর। কুড়ি পয়সা।

হাওড়া বার্তা (শারদীয়া) সম্পাদক : অভয়চরণ পাল। ৩৭৪ গ্রান্ড ট্রাঙ্ক রোড (নর্থ) সালকিয়া, হাওড়া। পঁচাত্তর পয়সা।

পশ্চিমবঙ্গের অর্থনীতি

ভবানী ঘোষ

সবে গড়ে উঠেছে এমন কতগুলি দ্বীপের চারদিককার সমুদ্র যদি শুকিয়ে গিয়ে সবটাই একটা মরুভূমিতে পরিণত হত? —সে কথা কল্পনা করা যায় না, কল্পনা করলেও গায়ে কাঁটা দিয়ে ওঠে। তবে কল্পনা বিসর্জন দিয়ে বাস্তবে এমনি একটি ঘটনাকে বিবেচনা করলে দেখা যাবে, সমুদ্র শুকিয়ে গিয়ে যে মরুভূমিটা সৃষ্টি হয়েছে ঠিক তার কিছুদিনের মধ্যেই সমুদ্রবুকে সদ্য গড়ে ওঠা দ্বীপগুলিও আস্তে আস্তে ওই মরুভূমির একটি অংশে পরিণত হয়েছে।

স্বাধীনতা-উত্তর-কালের জাতীয় শিল্প উদ্যোগকে যদি সমুদ্রের পরিসরের সংগে তুলনা করা যায় তবে বোধহয় বিশেষ বাড়িয়ে বলা হবে না। কারণ ২০০ বছরের ব্রিটিশ শাসনকালে এই দেশে যতটুকু শিল্প প্রয়াস দেখা গেছে সেই উদ্যোগের মধ্যে উন্নত মানসিকতা ও জাতীয়তা বোধের পরিচয় থাকলেও দেশের প্রয়োজনের অনুপাতে সেই প্রয়াসকে কোন হিসাবের মধ্যেই আনা যায় না। ব্রিটিশ শাসকগণ চিরকালই ভারতের জাতীয় শিল্প উন্নতির ক্ষেত্রে বাধা সৃষ্টি করে রেখেছিলেন, কারণ ভারত উপমহাদেশকে সবসময়ই তারা তাদের তৈরী জিনিষের লাভজনক বাজার হিসাবে ব্যবহার করেছেন এবং ভারতীয় উপমহাদেশকে ব্রিটেনের কৃষিজাত কাঁচা মাল সরবরাহের পশ্চাত ভূমি হিসাবে ব্যবহার করেছেন।

ভারতবর্ষ স্বাধীন হবার পরেই জাতীয় সরকার ভারতের শিল্প উন্নতির জন্য যে সমস্ত বহুমুখী উদ্যোগ গ্রহণ করলেন তার ফলে বর্তমানে যে কোন আধা-উন্নত দেশের তুলনায় ভারতীয় শিল্পের উন্নতি অনেক দ্রুত গতিতে এগিয়ে গেছে, এমন কি কোন কোন ক্ষেত্রে ভারত অগ্রবর্তী দেশগুলির কাছাকাছি পৌঁছে গেছে। কিন্তু গোটা ভারতবর্ষের শিল্প উন্নতির মানচিত্রটি যেখানে সম্পূর্ণ সুস্থ ও সচ্ছন্দ ভবিষ্যতের ইঙ্গিত বহন করছে, তারই পাশাপাশি পশ্চিমবঙ্গের শিল্প উন্নতির যে বর্তমান চিত্রটি আমাদের সামনে আজ বাস্তব আকার ধারণ করছে সেটি বিরাট এক প্রাণবন্ত সমুদ্রের মরুরূপ ধারণের মতোই করুণ ও দুঃখজনক। এবং উদ্যোগের ক্ষেত্রে যখন এই মরুদশা, তখন সদ্য গড়ে ওঠা শিল্পগুলির অবস্থাও যে শুকিয়ে যাওয়া সমুদ্রের বুকে দ্বীপগুলোর মতো হবে তাতে আর আশ্চর্যের কি?

পশ্চিমবঙ্গের অর্থনীতি :—

ভারতের শিল্প উদ্যোগের ইতিহাসে পশ্চিমবঙ্গের নেতৃত্ব অনস্বীকার্য। ১৮৬০ সাল থেকে ১৯৬০ সাল—এই এক'শ বছর পশ্চিমবঙ্গের ইতিহাস ক্রমবর্ধমান শিল্প উদ্যোগের ইতিহাস। ব্রিটিশ আমলে যাতায়াতের সুবিধার জন্য রেল পথ প্রবর্তনের সংগে সংগেই এই রাজ্যে চা, পাট ও কয়লাজাত শিল্পের প্রধান কেন্দ্র স্থল হয়ে উঠেছিল। এছাড়া ইঞ্জিনীয়ারিং শিল্পের প্রথম উদ্ভবও এই রাজ্যেই। যেখানে ভারতবর্ষের অন্যান্য রাজ্যে সবেমাত্র কিছু কিছু 'সারাই-ঝালাই' কারখানার মধ্যে ইঞ্জিনীয়ারিং শিল্প সীমাবদ্ধ ছিল, তখন এই পশ্চিমবঙ্গে, কলকাতার বুকে এবং তার ধারে কাছে গড়ে উঠেছে স্বয়ংসম্পূর্ণ ইলেকট্রিক পাখার ও ল্যাম্প কারখানা, তৈরি হয়েছে ভারতের প্রথম মটর গাড়ী নির্মাণের কারখানা এবং কার্পাসজাত দ্রব্যের কারখানার প্রয়োজন মেটাবার যন্ত্রপাতি তৈরির কারখানা। এইভাবে ইঞ্জিনীয়ারিং শিল্প এগিয়ে গেছে দ্রুত গতিতে।

পশ্চিমবঙ্গে শিল্প উন্নতি যখন এমনি ধারায় দ্রুত অগ্রসর হচ্ছে, ঠিক তখনই তাকে আরো দ্রুততর করবার জন্য পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার নতুন সরকারি উদ্যোগও তার পিছনে এসে দাঁড়িয়েছে। পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার ১৫ বছরের মধ্যে ইঞ্জিনীয়ারিং শিল্পেও অন্যান্য ছোট-বড় সবরকমের শিল্পে বিনিয়োগ বাড়তে শুরু করে। এবং ইঞ্জিনীয়ারিং শিল্পের ক্ষেত্রে পশ্চিমবঙ্গ ভারতের অন্য সমস্ত রাজ্যগুলিকে অনেক পিছনে ফেলে এগিয়ে গিয়েছিল। এই শিল্পের ক্ষেত্রে অন্য সব রাজ্যের তুলনায় ১৯৫১ থেকে ১৯৬৫ সাল পর্যন্ত পশ্চিমবঙ্গে শতকরা ২৮১ ভাগ বিনিয়োগ বৃদ্ধি পায়। যার ফলে অনেকে মনে করেছিলেন যে পশ্চিমবঙ্গের ইঞ্জিনীয়ারিং শিল্প এই ধরনে দ্রুত হারে চলতে থাকলে অতি শীঘ্রই ভারত ইঞ্জিনীয়ারিং শিল্পে স্বয়ংসম্পূর্ণ হয়ে উঠবে। এছাড়া, এই সময় কলকাতা-হাওড়া এলাকায় [illegible] দ্রুত শিল্প প্রসার ঘটতে থাকে। ১৯৫৫ থেকে ১৯৬৫ সালের মধ্যে দুর্গাপুরের ইস্পাত কারখানা এবং ভারি যন্ত্রপাতি তৈরির কারখানাকে কেন্দ্র করে বর্ধমান-আসানসোলের সমস্ত অঞ্চলটাই শিল্প উদ্যোগের কেন্দ্র হয়ে উঠছে। ১৯৬৫ সালের 'ম্যানুফ্যাকচারারস—সেনসাস' থেকে দেখা যায় যে, এই বছরে গোটা ভারতে মোট ৬,৪২০ কোটি টাকার বিভিন্ন ধরনের শিল্পজাত জিনিষ তৈরী হয়েছে; তার মধ্যে কেবলমাত্র পশ্চিমবঙ্গেই হয়েছে ১,৩৭৫ ক্রোটি টাকার জিনিস, সমস্ত ভারত জুড়ে যে জিনিস তৈরি হয়েছে তার শতকরা ২১ ভাগ একমাত্র পশ্চিমবঙ্গেই তৈরি হয়েছে। যার মধ্যে সারা ভারতের শতকরা হিসাবে ইঞ্জিনীয়ারিং শিল্পে পশ্চিমবঙ্গের উৎপাদন শতকরা ৩০ ভাগ। এছাড়া অন্যান্য বিষয়ে যেমন,—শতকরা ৩০·৭ ভাগ কাঁচা লোহা তৈরির ক্ষেত্রে; তৈরি লোহার ক্ষেত্রে শতকরা ২৬·৬ ভাগ, সেলাইকলের উৎপাদনে ৬৫·৭ ভাগ; বৈদ্যুতিক পাখা তৈরির ক্ষেত্রে শতকরা ৭৪·৯ ভাগ, রেল ওয়াগন তৈরিতে শতকরা ৫৯·৩ ভাগ এবং সাইকেল তৈরিতে শতকরা ১৯ ভাগ কেবলমাত্র পশ্চিমবঙ্গেই উৎপাদন হয়েছে, কিন্তু ১৯৬৬ সালের পর থেকে ১৯৭১ সাল পর্যন্ত এই উন্নতি এমনি দ্রুত ভাবে নিম্নগতি হয়েছে যে এই মন্দা আরো কিছুদিন চললে এই রাজ্যের সামনে যে অন্ধকার নেমে আসবে তাকে একমাত্র যুদ্ধপরবর্তীকালের ধ্বংসপ্রাপ্ত দেশের সংগেই তুলনা করা চলবে।

শিল্পে নৈরাজ্য :—

শিল্প উন্নতির স্বপক্ষে সব রকমের কার্য-কারণ বিদ্যমান থাকা সত্ত্বেও আত্মঘাতি রাজনৈতিক কার্যকলাপ দেশের যে কোন উন্নতির পক্ষে যে কি ধরনের বাধা সৃষ্টি করতে সক্ষম তার বাস্তব দৃষ্টান্ত পশ্চিম বাংলার বর্তমান অবস্থা। ১৯৬৬ সাল থেকে ১৯৭১ সাল পর্যন্ত পশ্চিমবঙ্গে শিল্প বিকাশের ক্ষেত্রে উন্নতি-অবনতির সঙ্গে ১৯৬৬ সালের পূর্বেকার অবস্থার যদি একটি তুলনামূলক বিচার করা যায় তবেই দেখা যাবে যে বর্তমান কলুষিত রাজনৈতিক আবহাওয়াই এই অবস্থার জন্য মূলত দায়ী। ১৯৫১ সালে যেখানে পশ্চিমবঙ্গে মোট শিল্প সংস্থার সংখ্যা ছিল ২,৫৯৬, এই সংখ্যা ১৯৬৬ সালে এসে দাঁড়িয়েছিল ৫,৭১৩টিতে এবং এই শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলিতে ১৯৫১ সালের ৬,৫১,৯৪৪ জন লোকের কর্মসংস্থান ১৯৬৬ সালে বেড়ে ৮,৮০,২৭০ জনে দাঁড়ায়। কিন্তু তার পরবর্তী বছরগুলির যে হিসাব পাওয়া যায় তার থেকে দেখা যায় যে এই কর্মসংস্থান এসে দাঁড়িয়েছে ৭ লক্ষ ১০ হাজারে (১৯৬৯—৭০) এবং শিল্প প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা কিছুটা একদিকে বাড়লেও (৬০১৯টি ১৯৬৯ সালে) অন্যদিকে বহু কারখানা বন্ধ হয়ে গেছে এবং অনেকগুলি প্রায় অচল অবস্থায় [illegible]

জনসংখ্যার তুলনামূলক বিচারে, জনসংখ্যার চাপ পশ্চিমবঙ্গেই সর্বাধিক।

অসুস্থ রাজনৈতিক আবহাওয়া পশ্চিমবঙ্গের শিল্প উন্নতির পথে মস্ত-বাধা বলে স্বীকার করে নেবার পরও কিছু কিছু কথা থেকে যায়। যেমন এই উন্নতির পথে অন্যতম প্রধান অন্তরায় হয়ে দাঁড়িয়েছে কাঁচা মালের অভাব। সম্প্রতি কলকাতাতে অর্থমন্ত্রী ওয়াই বি চৌহানের সঙ্গে এক সাক্ষাৎকারে এই রাজ্যের বিভিন্ন শিল্প সংস্থার মালিকগণ অভি-যোগ করে বলেছেন যে, অন্য সমস্ত রাজ্যের চাইতে পশ্চিমবঙ্গকে কার্পাস, মেথিল স্পিরিট, কস্টিক সোডা প্রভৃতি অপরিহার্য কাঁচা মালগুলির জন্য অন্য রাজ্যের চাইতে শতকরা ৪০ ভাগ থেকে ২০০ ভাগ বেশি দাম দিতে হয়ে থাকে। এছাড়া ইস্পাতের ক্ষেত্রেও পশ্চিমবঙ্গ প্রয়োজন আনুপাতিক কাঁচা মাল সরবরাহ থেকে বঞ্চিত হচ্ছে।

তবে একথা একই সঙ্গে এখানে বলে রাখা প্রয়োজন যে দুর্গাপুর ইস্পাত প্রকল্পটিকে যদি জাতীয় সম্পদের মর্যাদা দিয়ে ঠিক মতো কাজে লাগান যেতো বা এখনও কাজে লাগানো যায়, তবে ইস্পাত-জাত কাঁচামালের জন্য পশ্চিমবঙ্গের পর-মুখাপেক্ষিতার অবসান হতে পারে। বর্তমানে দুর্গাপুরে ইস্পাত কারখানার যে চেহারা দাঁড়িয়েছে তার দ্বারা কিন্তু এই ধরনের আশা-পোষণ করাও স্বপ্ন বিলাসিতা বলে মনে হয়। একমাত্র ১৯৬৫ সাল ছাড়া, দুর্গাপুর কারখানায় আজ পর্যন্ত কোনদিনই কোন লাভ হয়নি। এবং ১৯৬৭ সালের পর থেকে ক্ষতির পরিমাণও ক্রমবর্ধমান। ১৯৭০—৭১ সালে দুর্গাপুরে ইস্পাত প্রকল্পে সরকারের ক্ষতির পরিমাণ দাঁড়িয়েছে মোট ২১ কোটি টাকা। এর জন্য অবশ্য মাথাভারি প্রশাসন ও শ্রমিক ইউনিয়নের বিবেকহীন কার্যকলাপ দুই-ই সমানভাবে দায়ী। এই মর্মে ১৯৭০—৭১ সালের দুর্গাপুর কারখানার কাজকর্মের একটুখানি হিসাব দিলে ব্যাপারটি আরো পরিষ্কার হয়ে যাবে। ১৯৭০—৭১ সালে দুর্গাপুরে কাজের সময় নষ্ট হয়েছে ১,৭৬৩,০০০ ঘণ্টা (ম্যান-আওয়ার); ২৬৯টি কার্যবিরতি, ৯টি ঘেরাও, ১১৬টি দাবী আদায়ের মিছিল, ১টি লক আউট, ৭১৯টি আস্তে চলো, ২০৫৯টি ক্ষেত্রে কাজ করতে অসম্মতি প্রকাশ, ৫টি বন্ধ, ৩টি ক্ষেত্রে সুপারভাইসারি স্টাফকে ধরে শারীরিক নির্যাতন, এবং দুটি সাধারণ ধর্মঘট।

দ্বিতীয় পরিকল্পনার প্রথমদিক থেকে যে দুর্গাপুরকে নিয়ে পশ্চিম বাংলার সাধারণ মানুষ স্বপ্ন দেখতে শুরু করে-ছিল এবং যে দুর্গাপুরকে বাঙালী পশ্চিমবঙ্গের শিল্প উন্নতির রশ্মিকেন্দ্র বলে মনে করেছিল, সেই রশ্মিকেন্দ্রেরই যদি এই অস্তমিত চেহারা দাঁড়ায় তবে সেখানকার সাধারণ শিল্পের উন্নতি যে অতি অনিবার্য কারণেই ব্যাহত হবে সে কথা মূর্খেও বোঝে। উদাহরণ স্বরূপ দেখান যায় যে, ১৯৬০ সালের পর থেকে ১৯৬৬ সাল পর্যন্ত দুর্গাপুর অঞ্চলের উন্নতির মুখ চেয়ে ৯০টি বৃহৎ শিল্প প্রতিষ্ঠান দুর্গাপুর উন্নয়ন সমিতির কাছে দুর্গাপুর অঞ্চলে জমি লিজ নেবার জন্য আবেদন করেছিলেন। কিন্তু ১৯৬৭ সালের পর এই প্রতিষ্ঠানগুলি তাদের সেই আবেদন প্রত্যাহার করে নিয়েছেন! এই শিল্পপতিদের কাছে এই সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করলে তারা বলেন যে, 'মাদার-প্ল্যান্টেরই' যখন কোন টিকে থাকার গ্যারান্টি নেই, তখন সেখানে নতুন শিল্প গড়ে উঠবে কোন আশায়।

বর্তমানে কেন্দ্রীয় উদ্যোগে শ্রীসিদ্ধার্থ-শংকর রায় পশ্চিমবঙ্গের শিল্প উন্নতির জন্য এক ১৬-দফা প্রস্তাব দাখিল করেছেন এবং সেই প্রস্তাবকে কার্যকরি করবার জন্য সমস্ত রকম সরকারী সহ-যোগিতার আশ্বাস দিয়েছেন। কিন্তু যতক্ষণ না পশ্চিমবাংলার এই কণ্ঠরোধকারি রাজনৈতিক দাবা খেলার অবসান হবে ততক্ষণ শিল্পপতিগণের কাছ থেকে বিশেষ কোন সাড়া পাওয়া যাবে বলে আশা করা যায় না। যার জন্য এই দুই মাসে কেন্দ্রীয় মন্ত্রীদের সঙ্গে বিভিন্ন সাক্ষাৎকার শিল্প-পতিদের বিভিন্ন সংস্থা ওই একই কথা বার বার বলেছেন। তবে বহু কথা না বলে পশ্চিমবঙ্গে শিল্প-উন্নতির সপক্ষে বলতে গিয়ে একথা প্রথমেই বলা যায় যে, সেই পুরানো পারমিট ইস্যু করে শিল্প উন্নতির পথে গেলে আবার সেই গোলক ধাঁধায় পড়ে যেতে হবে। এই মুহূর্তে শিল্প উন্নতির প্রথম পদক্ষেপ হিসাবে পুরোনো খোল-নলচে বাদ দিয়ে নতুন খোল-নলচের দরকার, এবং এর জন্য বাস্তব অভিজ্ঞতাসম্পন্ন লোকজন প্রয়োজন। এ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ সার্ভিসের বড়কর্তাগণ ও তাদের সাঙ্গ-পাঙ্গরা সেখানে বিশেষ প্রয়োজনে আসবেন না। যারা হাতে কলমে সব ব্যাপারটাকে ত্বরান্বিত করে থাকেন তাদের পরামর্শই এই ব্যাপারে কার্যকরী।

বর্তমান রাজনৈতিক অস্থিরতার জন্য যেমন শিল্প উদ্যোগ ব্যাহত হচ্ছে ঠিক তেমনিভাবেই বর্তমানের রাজনৈতিক কাদা ছোঁড়া-ছুঁড়ির বাইরে সুস্থ সমাজ গঠনের প্রয়োজনে সমস্ত শক্তি নিয়োগ করে যদি এই রাজ্যে শিল্প উদ্যোগের মাধ্যমে নতুন নতুন কর্মসংস্থানের রাস্তা না খোলা যায়, তবে এই অলস যুবশক্তি দিন দিন সমস্ত রকম উন্নতির পথে বাধা হয়ে উঠবে। শিল্প উন্নতির তাই মূল সুরই হবে, বৃহৎ সমাজকে সংগঠিত করে এক ভারতীয় 'জাতীয় সমাজ' তৈরির পথ ত্বরান্বিত করা। এই সুরটি ব্যাহত হলে সমস্ত উদ্যোগই বৃথা হয়ে যাবে।

পূর্বপুরুষ

গজেন্দ্রকুমার মিত্র

॥ ৫ ॥

ইহার পর আবার কয়েকটা দিন চুপচাপ কাটিল।

ইঁহারা যে অত সহজে ছাড়িবেন না—তাহা তো জানা কথাই। আবার কী না জানি মতলব আঁটিতেছেন আঁচ করিতে না পারিয়া 'ঠাকুর ঠাকুর' করিতে লাগিলাম।

এমনি স্তব্ধতায় আরও দিন আষ্টেক কাটার পরে আমার মেজভাশুর আবারও, যাহাকে বলে রঙ্গমঞ্চে অবতীর্ণ হইলেন।

সেও অমনি একটা সকালবেলায়, উঠানে ধান মেলিয়া দিতেছি, আমাকে লক্ষ্য করিয়া স্ত্রীকে উপলক্ষ্য ধরিলেন, 'তোমার বুঝদার জাকে বলো মেজবৌ, আমাকে বা আমাদের যদি বিশ্বাস না হয়—তাহলে ও'কেই সদরে যেতে হবে। আদালতে গিয়ে গাজেনর্নামার দরখাস্ত পেশ করতে হবে—কোথায় মোক্তার কোথায় মুহুরী ছুটোছুটি করতে হবে।... সে কি উনি আমাদের সঙ্গে যাবেন, না একাই যাবেন ঠিক করুন। জমি-জমার ব্যাপার তো ফেলে রাখা যায় না।'

মেজজা একবার অপাঙ্গে আমার দিকে চাহিয়া লইয়া ঝঙ্কার দিয়া উঠিলেন, 'তোমাদেরও হয়েছে তেমনি নিঘিন্নে নিপিত্তে স্বভাব। ওদের সম্পত্তি হেজে যাক মজে যাক—তোমাদের কি? এত সাধ্যি সাধনাই বা কিসের?'

'তা তো হয় না মেজবৌ', ভাশুর উদার গম্ভীর কণ্ঠে বলিলেন, 'এর পর বড় হয়ে তারক যখন বলবে জ্যাঠা আমার ভাগের ভাগ বুঝিয়ে দাও, তখন কি জবাব দোব? বলবে তোমরা এতগুলো গুরুজন মাথার ওপর থাকতে আমি তোমাদেরই বংশের ছেলে বঞ্চিত হলুম!... তখন তো তোমরাই দুষবে। বলবে একটা মেয়েছেলে বুদ্ধিহীন সে কি করেছে না করেছে তার জন্যে নিজের ভাইপোটাকে পথে বসালে!'

যেন অগত্যাই আমার জা আমার দিকে ফিরিয়া বলিলেন, 'বলি ব্যালেস্টার সাহেব, এখন কি বলবে বলো—শুনলে তো সব দাঁইড়ে দাঁইড়ে!'

আমি বধূজনোচিত ব্রীড়ার সহিত সাধ্যমতো অনুচ্চকণ্ঠে জবাব দিলাম, 'যদি আদালতে যেতে হয় তো যাবো। উনি বা ও'রা যেদিন বলবেন—ও'দের সঙ্গেই যাব!'

বোধকরি এইটাকেই মোক্ষম চাল মনে করিয়া আমার মেজভাশুর উল্লসিত হইতেছিলেন, এখন আমার জবাবে কিছুক্ষণের জন্য যেন নির্বাক হইয়া গেলেন। কেবল জা কয়েক মুহূর্ত গালে হাত দিয়া অবাক হইবার ভঙ্গী করিয়া বলিলেন, 'বলিস কী লো! ভদ্দর ঘরের মেয়েছেলে আদালতে যাবি, তা আবার ভাশুরদের সঙ্গে?'

'দরকার পড়লে যেতেই তো হয় মেজদি। শুনেছি বড় বড় রাণীরাও দরকার পড়লে দলিলে সই দিতে আদালতে যান—পাল্কী করে।...আর ভাশুরের সঙ্গে এক বাড়িতে বাস করছি, একটু সঙ্গে গেলে কী এত দোষ তা তো বুঝতে পারছি না!

এবার আমার জা দোদমা বাজীর মতো ফাটিয়া পড়িলেন। বলিলেন, 'তোমার কিছুতেই দোষ নেই, তুমি ধনি মেয়েছেলে ...তোর এত অবিশ্বাস তোর ভাশুরকে?.. ওলো, তাতেই কি ছেলের বিষয় আগলাতে পারবি? পুরুষের বুদ্ধির সঙ্গে তুই পারবি পাল্লা দিতে? ওরা মন করলে তোকে পথে বসাতে কতক্ষণ? আর কী এমন দশ বিশ হাজার টাকার বিষয় যে এত ফন্দি করে তোর ছেলেকে পথে বসাতে যাবে?.. তা তো নয়, তুমি চাইছ এখন ছুতো করে বাইরে বাইরে পুরুষ মানুষের সঙ্গে ফুর্তি করবে। মা-ই ঠিক চিনেছিলেন, পিচেশে-পাওয়া মেয়েছেলে তুমি!...বামুনের ঘরের মেয়ে বলে তো বিশ্বেস হয় না। তা তাই যাও না বাপু, কেন আমাদের এই পোকা-তাপার ঘরে অশান্তি করছ, বাইরে বেরিয়ে গিয়ে খাতায় নাম লেখাও গে, খাসা গতরখানি আছে—মোট মোট টাকা রোজগার হবে।'

আরও কত কি বলিয়া গেলেন, আমি আর শুনি নাই। উত্তর দিতে পারিতাম—বলিতে পারিতাম, আমার মতো হইলে তুমি অবস্থাটা বুঝিতে পারিতে, এখন স্বামীর দিক টানিতেছ নিজের দিক মনে করিয়া—ঈশ্বর না করুন অতি বড় শত্রুরও এ অবস্থা কামনা করি না—যদি তোমার স্বামী এমনি চলিয়া যান, জ্ঞাতিরা আসিয়া এইভাবে চক্রব্যূহে ঘেরিয়া ধরে—পারিবে এই কথা বলিয়া তাহাদের সমর্থন করিতে? ..কিন্তু কিছুই বলা হইল না। প্রথমত ঘৃণায় কণ্ঠরোধ হইয়া আসিতেছিল, দ্বিতীয়ত কোথা হইতে তপ্ত অশ্রু আসিয়া চোখের কোণে জমা হইয়া গেল। ধান মেলিয়া দেওয়া হইয়া গিয়াছিল, তাড়াতাড়ি বাঁশের আলনা হইতে গামছাখানা টানিয়া লইয়া ঘাটে চলিয়া গেলাম। স্নানের নামে পুকুরে নামিয়া কিছুক্ষণ তো কাঁদিয়া আসিতে পারিব।...

ইহার পর আর কোন আগল রহিল না। ভাশুর ও শাশুড়ি মুখোশ খুলিয়া ফেলিয়া স্ব-রূপেই রণাঙ্গনে অবতীর্ণ হইলেন। কুৎসিত গালি-গালাজ শুরু হইল। সেই সঙ্গে নানাবিধ ভীতি প্রদর্শন। ভাশুর বলিলেন, 'বিশ্বেস যখন করলে না, তখন আমিও এই বলে দিলুম, আমার নামেই আমমোক্তারনামা লিখে দিয়ে রেজেস্টারী করে দিতে হবে—নইলে এক পয়সার জিনিস আর তোমাদের বলতে থাকবে না। দশদিন দেখব, তারপর খোরাকিও বন্ধ করব। যার অত আইনে দখল সে যাক—আদালতের দোর তো খোলাই আছে—মকদ্দমা করে আদায় করুক তার হিস্যে।'

সেটাও বড় কথা নয়। ভয় হইল ছেলেটাকে লইয়াই। এমন ব্যবহার চলিতে লাগিল—মনে হইল গলা টিপিয়া শত্রুর শেষ করা ইহাদের পক্ষে কিছুই আশ্চর্য নয়।... যে ঝিটি বাসন মাজিত, সে একদিন পুকুর-ঘাটে চুপি চুপি আমাকে বলিল, 'খুব সাবধানে থেকো নতুন বৌদি, এরা সব পারে, হয়ত কোনদিন ছেলেটাকে মেরে ফেলে তোমাকে ধুতরোর বিষ খাইয়ে পাগল করে দেবে। এক পয়সায় মরে বাঁচে এরা। বড়বৌদিকেও এমনি খুন করেছে বিষ খাইয়ে—রাতারাতি পুড়িয়ে এসে রটিয়ে দিলে ওলাউঠো হয়েছিল।...আমার ননদ বলে এদের জ্বালায় সে নিজেই আপিং খেয়েছিল সর্ষের তেলে গুলে।... তা সে যা-ই হোক একই কথা।... ওলাউঠো হল অথচ আমরা টের পেলুম নি—দুবেলা এ বাড়ি আসছি।'

আরও যেন সর্বশরীর হিম হইয়া গেল। কী করিব, কেমন করিয়া ছেলেটাকে বাঁচাইব এই রাক্ষসের পুরীতে—কিছুই যেন ভাবিয়া পাইলাম না। ইহাদের যে হিংস্র মূর্তি ক্রমে ক্রমে প্রকট হইতেছে—তাহাতে অসম্ভব কিছুই মনে হইল না, ছেলেটাকে কি আমাকে বিষ দেওয়া এমন কি কঠিন ব্যাপার!

একটা শাপের বর হইল এই যে, আমার শাশুড়ি বোকার মত বলিয়া বসিলেন, 'ওর কুঁড়ে পাত্তর আমরা কেন যোগাব রোজ রোজ, মেজ বৌমা, তুমি খবরদার ওর রান্না রাঁধবে না।...বাইরে দাওয়ায় উনুন আছে যোগানো আছে, ওর ইচ্ছে হয় ঐ থেকে নিজে রেঁধে খাক!'

তবু কিছুটা বাঁচিয়া গেলাম। নিজে হাতে চাল ধুইয়া নিজের আনা জলে ভাত চাপাইয়া দিতাম। বাগানে যা ফসল হয়—কাঁচকলা ডুমুর ঝিঙা ইত্যাদি—দুই একটা ভাতে ছাড়িয়া দিতাম, কোনমতে তাই একত্র চটকাইয়া গোরুর মতো খাওয়া। উহাদের তেল বা লবণ লইতে ভয় করিত—তবে এক চিমটি লবণে আর কতটা বিষ দিতে পারে—এই ভাবিয়া কিছুটা আশ্বস্ত হইতাম। ছেলেটার দুধ বন্ধ করিয়া দিয়াছিল তাহাকেও ঐ গলা ভাত ফেনের সঙ্গে মিশাইয়া খাওয়াইতাম, রাত্রেও উহার মতো কয়েক দানা ভাত ফুটাইতে হইত। আমি তো বিধবা হইবার পর হইতেই রাত্রে উপবাসী থাকি। আমার শাশুড়ি মুড়ি চাল ভাজার নাড়ু, কলা প্রভৃতি খাইতেন, আমাকে কে দিবে?

তবু, এততেও ঠিক নিশ্চিন্ত হইতে পারি না। নিত্য নূতন হুমকী, নিত্য নূতন ভয় প্রদর্শন। মনে হইল চারিদিক হইতে বেড়া আগুনে ঘিরিতেছে—পোড়াইয়া মারিবার ব্যবস্থা। আমার ভাশুরপোরা তো—কাহারও শিখানোতে কিনা জানি না—ফাঁক পাইলেই ছেলেটাকে চিবু-চিবাইয়া দেয়। এমন অমানুষিক প্রহার করে যে তাহাতেই ঐ ক্ষীণজীবী ছেলেটার প্রাণ যাওয়ার কথা। একদিন চোখ লক্ষ্য করিয়াই খোঁচা দিতে গিয়াছিল, অল্পের জন্য চোখটা বাঁচিয়া গেল, পাশে রগের কাছে খানিকটা কাটিয়া রক্তারক্তি। অথচ, চার বছরের দামাল ছেলেকে কেমন করিয়া দিনরাত চোখে চোখে রাখি?... এক একদিন নিজের এই অসহায় অবস্থা, এই উপায়-হীনতায় নিজেই একা একা মাটিতে মাথা খুঁড়িতাম—নিজের মৃত্যু কামনা করিতাম। হায় রে, তখন যদি সত্যই মৃত্যু হইত! ভগবান যে অধিকতর দুর্ভাগ্যের জন্যই বাঁচাইয়া রাখিবেন আমাকে—তখন কে জানিত!

এ উপদ্রব তো কমিলই না, উপরন্তু নূতন উপদ্রব শুরু হইল।

এ একেবারে নূতন, এমন কখনও ভাবিও নাই।

আমার সেজ ভাশুর শিবচরণ অকস্মাৎ আমার উপর বড় প্রসন্ন হইয়া উঠিলেন।

একদিন—সেইদিনই প্রথম লক্ষ্য করিলাম—কী একটা কথা লইয়া মেজদাকে মৃদু তিরস্কার করিলেন। কথাটা আমার সম্পর্কে মেজদা অকারণে কটু কথা বলিতে ছিলেন বলিয়াই তিরস্কার, 'ও কী হচ্ছে মেজদা! তুমিও যে দেখছি মা-বৌদিদের মতো মেয়ে-কুটুনী ঝগড়া শুরু করলে। এসবে কোন কাজের কাজ হয় না।'

আর একদিন, মার সঙ্গেও বেশ খানিকটা বচসা হইয়া গেল। মা রণরঙ্গিনী মূর্তি ধরিতে গিয়াছিলেন, বেশ কিছু রূঢ় কথা শুনাইয়াই সেজভাশুরঠাকুর তাঁহাকে ঠান্ডা করিয়া দিলেন। স্মরণ করাইয়া দিলেন যে, পিতার মৃত্যুর পর বিষয় আশয় উঁহাদের কয় ভাইতে অর্শাইয়াছে, এখন আর মা যথেচ্ছাচার করার অধিকারিণী নন। এখন উঁহাদের বিষয় উঁহারা যেমন বুঝিবেন তেমনি করিবেন, মা যেন শুধু দুইবেলা নিরাপদে নির্বিবাদে আহার করিয়া ভগবানের নাম করেন, সেইটাই সর্বাংশে বাঞ্ছনীয়।

এই ধরনের অনুগ্রহ বা আনুকূল্যে অন্য যে কোন মেয়ে হইলে কৃতজ্ঞ হইত, গলিয়া যাইত। আমার এমন বদস্বভাব—আমি সিঁদুরে মেঘে আগুনের ছায়া দেখিয়া অধিকতর শঙ্কিত হইয়া উঠিলাম।

আর, সে শঙ্কা যে একেবারে অমূলক নয়—দুইদিন না যাইতেই প্রমাণিত হইল।

সেদিন ধানের পাট চুকাইয়া গা ধুইতে বেশ একটু বিলম্বই হইয়া গিয়াছিল, কাপড় কাচিয়া জল লইয়া যখন ফিরিতেছি তখন বেশ ঘোর-ঘোর ভাব ঘনাইয়া আসিয়াছে বাগানের পথে। দ্রুতই আসিতেছি, অকস্মাৎ একেবারে কাছে সেই কালোছায়ার মধ্যে একটা কি সাদামতো নড়িয়া উঠিতেই ভয় পাইয়া লাফ দিতে গিয়া হুমড়ি খাইয়া পড়িয়া যাইতেছিলাম—কে একজন কোথা হইতে সবলে আমাকে জড়াইয়া ধরিল।

'আহা, আহা—পড়ে যাবে যে! আস্তে! এই ভারী ঘড়া নিয়ে অন্ধকারে কেউ এমনভাবে চলে?'

তখনও চাহিয়া দেখিতে পারি নাই, সাহসেও কুলায় নাই, আর অত অন্ধকারে কীই বা দেখিব—কণ্ঠস্বরে চিনিলাম শিবচরণ।

জড়াইয়া ধরার সঙ্গে সঙ্গেই প্রায় ছাড়িয়া দিয়াছেন, তবু আকর্ষণটা যে নিতান্তই আকস্মিক নয়, এবং কোনমতে সামলাইয়া দেওয়ার মতোও নয়—সেটুকু বুঝিতে বিলম্ব হইল না। তাছাড়া এটা নিতান্তই অনাচার, ভাশুরের কাছে তখনকার দিনে ভাদ্রবৌ সকল অবস্থাতেই অস্পর্শনীয়া ছিল, কোনমতে দৈবাৎ স্পর্শ-দোষ ঘটিলে উভয়কেই স্নান করিতে হইত, বোধকরি কী একটা প্রায়শ্চিত্তের ব্যবস্থাও ছিল। এখন দেখি ভাশুরদের 'দাদা' বলার রেওয়াজ হইয়াছে। বোনের মতো পায়ে হাত দিয়া প্রণাম করে—গাড়িতে পাশাপাশি বসিয়া যায়, পাশাপাশি বসিয়া থিয়েটার বায়স্কোপ দেখে। তখন আমরা একথা ভাবিতেই পারিতাম না। এমন কি সামনে মেঝেতে ভিজা পায়ে ভাদ্রবৌরা কি ভাগ্নেবৌরা চলিয়া গেলে—ভাশুর মামাশ্বশুরেরা সে ছাপ সাবধানে এড়াইয়া হাঁটিতেন—জল শুকাইয়া নিশ্চিহ্ন হইয়া না যাওয়া পর্যন্ত।

আমার কান মাথা আগুন হইয়া উঠিল। রূঢ় কণ্ঠেই বলিলাম, 'এ কী করলেন, আমাকে ছুঁয়ে দিলেন!'

'নইলে পড়ে যাচ্ছিলে যে!'

'যেতুম যেতুমই। তাতে মরতুম না।... আর আপনিই বা এখানে খিড়কীর পুকুরের ধারে কেন—জানেন তো মেয়েছেলেরা এই পথে যাতায়াত করে!'

কথা বলা নিষেধ—কিন্তু তখন আমার মাথার মধ্যে আগুন জ্বলিয়া উঠিয়াছে, কোন জ্ঞানই ছিল না।

'না, মানে এত রাত্রে কেউ আসবে তা ভাবিনি। তা তুমিই বা এতে এত অস্থির হচ্ছ কেন? কেউতো আর জানছে না।'

আমতা আমতা করিয়া উত্তর দিলেন ভাশুরঠাকুর।

আমি বলিলাম, তখনও আমার মাথার আগুনটা নেভে নাই আর কথা যখন বলিয়াই ফেলিয়াছি তখন চুপ করিয়াই বা থাকিব কেন—'না-ই বা জানল! আমার তো পাপ। এখনই আবার নেয়ে আসতে হবে।'

'এই দ্যাখো!...খবরদার, খবরদার, অমন কাজও করো না। তাহলেই সকলে জিগ্যেস করবে কেন এত রাত্তিরে নেয়ে এলে!...ওরে বাপরে, সে ভীষণ ঘোঁট পাকাবে মাতে আর আমার বৌতে। আমি ওদিক চলে যাচ্ছি, লক্ষ্মীটি!...হঠাৎ হয়ে গেছে অজান্তে ওতে অত দোষ নেই।'

তিনি সত্যই ওদিকের পথে মুহূর্ত মধ্যে অদৃশ্য হইয়া গেলেন। আমিও দেখিলাম এইটাই বুদ্ধিমানের মতো কাজ, কেন আর এই ভরসন্ধ্যায় স্নান করিয়া রাজ্যের জবাব ডাকিয়া আনি। কিন্তু এব্যাপারে যে এইখানেই শেষ নয়—তাহাও বুঝিলাম, আর সেই জন্যই আতঙ্কটা আরও বাড়িয়া গেল।

ইহার দিন দুই পরে একদিন, ভোরবেলা ফাঁকে যাইব বলিয়া বাহির হইয়াছিলাম—তখনও বেশ অন্ধকার, তাই তখনই আর কাজে লাগিবার চেষ্টা না করিয়া পুনশ্চ ঘরে ফিরিতেছি—উঠানে পা দিবার মুখে চাপা গলায় কে ডাকিল, 'এই, শোন।'

শিবচরণবাবু।

বিস্ময়ে ভয়ে, ক্রোধে আমার সর্বাঙ্গ কাঁপিয়া উঠিল।

আমি না শুনিয়াই ভিতরে যাইতেছি, তিনি আরও চাপা গলায় বেশ একটু জোর দিয়াই ডাকিলেন, 'শোন। তোমার ভালোর জন্যেই বলছি। না শুনলে এরপর বিষম পস্তাতে হবে!'

অগত্যা স্থির হইয়া দাঁড়াইলাম। আতঙ্কে মুখ দিয়া স্বর বাহির হইতেছে না। কে কোথায় দেখিবে—শাশুড়ি ও নবো দুজনেরই খুব ভোরে বাগানে যাওয়া অভ্যাস—কেলেংকারীর শেষ থাকিবে না। এমনি তো প্রহার ছাড়া আর যত কিছু লাঞ্ছনা থাকিতে পারে—দিনেরাতে বর্ষিত হইতেছে, তাহার উপর এই দৃশ্য কাহারও চোখে পড়িলে সোনায় সোহাগা হইবে।

শিবচরণেরও বোধ করি সে ভয় ছিল। তিনি হাত তিনেক ব্যবধান বজায় রাখিয়াই চাপা গলায় দ্রুত বলিয়া চলিলেন, 'এদের মতলব ভাল নয়। তোমাকে সাবধান করে দিচ্ছি। এ শ্বশুরপুরীতে একমাত্র আমিই তোমার বন্ধু, হিতৈকাঙ্ক্ষী—মনে রেখো। যদি ছেলেকে বাঁচাতে চাও, তার বিষয়ের হিস্যে বুঝে নিতে চাও, আমার কথা-মতো চলতে হবে, আমাকে খুশী রাখতে হবে।'

আমি আর এক লহমাও দাঁড়াইলাম না। ওদিকে নবোদের দরজায় খিল খুলিবার শব্দ হইয়াছে। শিবচরণও—ঘরে ঢুকিয়া আগড়টা ভেজাইয়া দিতে দিতে দেখিলাম—

যেন ভোজবাজীর বলে সেই অন্ধকারে অদৃশ্য হইয়া গিয়াছেন।

দুশ্চিন্তার শেষ রহিল না। মতলব যে ভাল নয় সে আমার চেয়ে আর কে বোঝে। কিন্তু কতটা খারাপ? সেজভাশুর যাহা বলিতেছেন সত্য কি? কতটা সত্য? সত্যই কি ছেলেটাকে বাঁচাইতে পারিব না? আর তেমন বিপদ উপস্থিত হইলে উনিই কি ঠেকাইতে পারিবেন?...কথামতো চলাই বা কি? কোন সাধারণ কূট-কৌশল, না কি—নেক নজর?

যত ভাবিলাম—সেদিন ঝি আসিবে না বলিয়া গিয়াছে, অতএব গোয়ালকাড়া ছড়াঝাঁট দেওয়া সবই আমার উপরে—কাজ করিতে করিতে যতই চিন্তা করিতে লাগিলাম, শেষেরটাই অধিকতর সম্ভব বলিয়া মনে হইল।...অর্থাৎ উনি চান গোপনে আমি উঁহাকে ভজনা করি।

কথাটা মনে হইতেই ঘৃণায় সমস্ত দেহ শিহরিয়া উঠিল। স্বামী যেমনই হোন, হিন্দুর মেয়ের একরকম সহিয়া যায়, সেখানে দেহ সমর্পণ করিতে আর যাহাই হউক এতটা ঘৃণা বোধ হয় না। তাই বলিয়া এই পুরুষ!...এ বাড়ির বেটাছেলেরা কেহই দেখিতে ভাল নয়। সকলকারই হাত-পা সরু সরু পেটটি ডাগর—কতকটা রোগে কতকটা অতিভোজনে—এক একজন এক এক বেলায় প্রায় একসের চালের ভাত খায়—চক্ষু কোটরগত ও ঘরিপ্রান্ত। গুম্ফ শ্মশ্রু বিরল, যাহাও বা আছে খোঁচাখোঁচা তামাটে রঙের পনেরো দিন অন্তর ক্ষেউরী হয়—অতিরিক্ত তামাক খাওয়ার ফলে দাঁত-গুলি কালো কালো—এবং সর্বোপরি অর্ধশিক্ষিত, অসভ্য ও অসচ্চরিত্র। ইঁহাদের সকলেরই বাউরি পাড়ায় যাতায়াত আছে. আশেপাশের গৃহস্থবাড়ি ইঁহাদের জ্বালায় অস্থির। এতদিন এখানে আছি—কাহারও গুণে জানিতে বাকী নাই। এই লোকের কাছে ধর্ম ও সতীত্ব বিকাইয়া দিব? ধিক্।

ছেলের বিপদ তো আছেই। এখনও যে ঐ দুধের বালকটা বাঁচিয়া আছে—নিতান্তই ঈশ্বরের অনুগ্রহ। কিন্তু তেমন বিপদের সম্ভাবনা যদি থাকেই, ঐ লোকটার ঘৃণিত প্রস্তাবে মত দিলেই কি ঠেকাইতে পারিব? ওর বা কতটুকু সাধ্য। তাছাড়া এটা যে একটা বিরাট ষড়যন্ত্রেরই অঙ্গ নয়—তাহারই বা প্রমাণ কি?

[পরে জানিয়াছিলাম, অনেক পরে—তখন শিবচরণ বিষ্ণুচরণ কেহই বাঁচিয়া নাই—এই শেষের সন্দেহটাই ঠিক। হয়ত শিবচরণের লোভও কিছু ছিল—কারণ আমার চেহারা যেমনই হউক, সে গ্রামে অন্তত আমার অপেক্ষা রূপসী আর কেহ ছিল না এটা ঠিক—সে খুব সম্ভব এক ঢিলে দুই পাখী মারিবার মতলবেই মেজদাকে বুঝাইয়াছিল যে কোনমতে আমাকে নষ্ট করিতে পারিলেই প্রকাশ্যে ঝাঁটা মারিয়া তাড়ানো যাইবে, কোন 'বেটাবেটি' কিছু বলিতে পারিবে না। তখন যদি ছেলেটাকে লইয়া যাইতে চাই—দলিলে সই করাইয়া লইবে যে স্বেচ্ছায় তাহার সমস্ত দাবী ছাড়িয়া যাইতেছি!]

ইহার পর কয়দিন যথাসম্ভব সাবধানে রহিলাম। বেশ বেলা না হইলে, অন্তত শাশুড়ি বা নবৌয়ের সাড়া না পাইলে বাহিরে আসিতাম না। অপরাহ্ণেও অনেক-খানি বেলা থাকিতে—মেজজা বা সেজজা, অথবা নবৌয়ের সঙ্গে পুকুরঘাটের পাট চুকাইয়া আসিতাম। সন্ধ্যার দিকে জল পান করাই ছাড়িয়া দিলাম, পাছে রাত্রে ফাঁকে যাইবার প্রয়োজন হয়।

কিন্তু তাহাতে ঐ পাপিষ্ঠটাকে এড়ানো গেল না। শেষে ছেলের মারফৎ চিঠি আসিতে শুরু করিল। আঁকাবাঁকা হরফ, বানানের মা-বাপ নাই—আমিও তখন যে খুব বানান জানিতাম তা নয়, লেখাপড়া তে অনেক বেশী বয়সে করিয়াছি—তবু আমারই হাসি পাইত এমন বানানের ছিরি—সম্বোধনও নাই, স্বাক্ষরও নাই—'কী করিতেছ? এই শেষ সাবধান করিয়া দিতেছি, কথা না শুনিলে তুমিও মরিবে, ছেলেটাও মরিবে।' 'আমার কথা শুনিতেছ না—পস্তাইতে হইবে।' 'কাল শেষ রাত্রে উঠিয়া পিছনের বাগানে আসিও, সাক্ষাতে সব বুঝাইয়া দিব।' 'আমার কথা শুনিয়া চলিলে তোমার সব দিক বজায় থাকিবে, নহিলে মৃত্যু অবধারিত।' 'এই বয়স হইতে তো ঠিক থাকিতে পারিবে না জানা কথা, আমার কাছে ধরা দিতে দোষ কি? আমি কি আমার ভাইয়ের চেয়ে খারাপ দেখিতে?' ইত্যাদি—

আমারই নির্বুদ্ধিতা, চিঠিগুলি রাখিয়া দিই নাই, সঙ্গে সঙ্গে নষ্ট করিয়া ফেলিয়াছি। আরও নষ্ট করিয়াছি এই জন্য যে, শাশুড়িকে দিলে তিনি ছেলের দোষ দেখিতেন না, উহার মধ্য হইতে আমিই যে তাঁহার ছেলের মাথাটি চিবাইয়া খাইতেছি—এই পরম সত্যটাই আবিষ্কার করিতেন, আমার 'ডাইনীত্ব'ই প্রমাণিত হইত। একটা ছেলেকে খাইয়া আশা মেটে নাই। আর একটা ছেলের দিকে নজর দিয়াছি—এই গঞ্জনাই শুনিতে হইত। জাকে দিয়াও ফল হইত না, গোপনে স্বামীর সহিত ঝগড়া করিত হয়ত—কিন্তু সাক্ষ্য প্রমাণটাও নষ্ট করিয়া ফেলিত সঙ্গে সঙ্গে। অথবা কে জানে, ঝগড়াও করিত না তাহাকেও হয়ত পূর্বাহ্ণেই বুঝাইয়া রাখা হইয়াছে যে, নিতান্তই এটা বিষয় হস্তগত করার ছলনা।

যাহাই হউক, চিঠিগুলি থাকিলে—যখন শেষ পর্যন্ত কেলেঙ্কারী বহুদূর গড়াইল—তখন সর্বজন সমক্ষে বাহির করা চলিত। তবে এও মনে হয়, তাহাতেই কি আমার নিরপরাধ প্রমাণ হইত? হয়ত শেষ পর্যন্ত ব্যাখ্যা দাঁড়াইত—এবম্বিধ প্রলোভনে বা ভয়ে স্থির থাকিতে পারি নাই, স্বেচ্ছায় কুপথে পা দিয়াছি।

সে যাহা হউক, যখন রাখি নাই—তখন রাখিলে কি হইত ভাবা নিরর্থক। বড় কথা—দুর্ভাগ্য। অদৃষ্টে মন্দ থাকিলে কিছুতেই ঠেকানো যায় না। নহিলে অত সাবধানে থাকা সত্ত্বেও কেলেঙ্কারী ঘটিবে কেন?...

বোধকরি পাপিষ্ঠটা মনে মনে কালনেমির লঙ্কা ভাগ করিয়া রাখিয়াছিল। আমাকে উপলক্ষ্য করিয়া একটা বড় রকম সম্ভোগের স্বপ্ন দেখিতেছিল এতদিন। তাহার কিছুই সফল না হওয়াতে হতাশায় আর লালসায় অস্থির হইয়া একেবারেই হিতাহিত জ্ঞান হারাইয়া ফেলিল।...

সেদিন সন্ধ্যাবেলায়ই—তখনও পর্যন্ত বাড়ির ছেলেপিলেরা ঘুমায় নাই—একটু অন্ধকারের অবসরে দাওয়ার উপর আমাকে জড়াইয়া ধরিল।

গায়ে যত জোর থাক, সে পুরুষ—বয়সও এমন কিছু বেশী নয়, তিরিশের ভিতরেই হইবে—আমি মেয়েছেলে, তাহার সহিত পারিয়া উঠিব কেন? ঝটকা মারিয়া তাহার কবলমুক্ত হইতে চেষ্টা করিলাম, পারিলাম না—পশুটা বোধ হয় সেজন্য প্রস্তুতই ছিল—তখন একেবারে চোখে অন্ধকার দেখিয়া একটা লাথি মারিলাম। ভাগ্য-ক্রমে পাশ হইতে জড়াইয়া ধরিয়াছিল, পিছন হইতে নহে। তাই বাহুবন্ধন ছাড়াইতে না পারিলেও কতকটা সামনাসামনি ফিরিতে পারিয়াছিলাম। লাথি মারা সম্ভব হইয়াছিল। লাথি অত হিসাব করিয়া কিছু মারি নাই। কিন্তু দৈবাৎ সেটা সজোরে গিয়া উদরের নিম্নে একটা মোক্ষম জায়গায় লাগিল। পশুটা 'বাপরে' বলিয়া পড়িয়া অজ্ঞান হইয়া গেল।

এসবই কয়েক লহমার ঘটনা। ভয়ে, ক্রোধে, উত্তেজনায় আমিও জ্ঞান হারাইয়া-ছিলাম, স্থানটাও গাঢ় অন্ধকার, ঠিক কি ঘটিয়াছিল তাহা তখন ভাল বুঝি নাই। পরে অনুমান করিয়া লইতে হইয়াছিল। সেই অনুমানের কথাটাই আপনাদের বলিলাম।

এ ঘটনাও যেমন পরের ঘটনাও তেমনি—বেশির ভাগই অনুমান। সে সময় কি কি ঘটিয়াছিল, আমারই বা কি অবস্থা, কে কি করিল, কি বলিল—তাহা সবটা বুঝিতে পারি নাই। সে অবস্থা ছিল না, আমিও কতকটা অজ্ঞানের মতোই হইয়া গিয়াছিলাম। যতটা মনে আছে, পরে যাহা চেষ্টা করিয়া করিয়া মনে করিতে পারিয়াছি,—তাহাই বলিব।

পশুটার চিৎকারে এদিক ওদিক হইতে সকলে ছুটিয়া আসিলেন। সকলেরই এক প্রশ্ন, 'কি হইল', 'কি হইয়াছে'। দৃষ্টিটা আমাদের দিকেই, কারণ আমি তখনও দাওয়ায় দাঁড়াইয়া কাঁপিতেছি। আমি বলিয়াই দিলাম, 'আমি ও'কে লাথি মেরেছি।' ব্যস, আর যায় কোথায়! অজ্ঞান মানুষটা পড়িয়া রহিল। তাহার শুশ্রূষা বলিতে আমার ছোট দেওর আসিয়া যা একটু মুখে চোখে জলের ছিটা দিতে লাগিল—বাকী সকলে আমাকে লইয়া পড়িলেন।

তবু তখনও সবটাই অনুমানে ছিল, একটু জ্ঞান হইতেই শিবচরণ উঠিয়া বসিয়া অম্লান বদনে বলিয়া বসিল, 'ঐ সব্বনাশী মেয়েছেলে আমাকে ইয়ে করতে এসেছিল, কোঁচার কাপড় চেপে ধরেছিল সজোরে, আমি রাজী হইনি। ছাড়িয়ে নেবার জন্যে টানাটানি করেছি—সেই রাগে আমাকে লাথি মেরেছে।'

আমার ন ভাশুর শুধু বলিল, 'তা সেই অবস্থায় চেঁচিয়ে লোক জড়ো করতে পারলে না! আমরা তো এইখেনেই ছিলুম!'

সায় দিয়া জানোয়ারটা অক্লেশে বলিল, 'তাই করাই উচিত ছেল। আমি বলি বাড়ির কেলেঙ্কার কেচ্ছা— এ নিয়ে ঢাক পেটালে আমাদেরই তো মুখটা পুড়বে। আকাশের গায়ে থুথু ছুঁড়লে কার গায়ে এসে লাগে বলো!...এমন যে খুনে মেয়েমানুষ তা তো জানি না!'

ইহার পর আর কি কথা হইয়াছিল তাহা জানি না। কারণ শাশুড়ি আর সেজ-বৌ উভয়েই আমার উপর তখন ঝাঁপাইয়া পড়িয়াছে। কীল, চড়, ঘুষি, লাথি—কে কোনটা মারিয়াছে, কীভাবে কতটা লাগিয়াছে তাহার কোন হিসাব নাই। সে অন্ধকারে দেখি নাই, দেখার মতো অবস্থাও ছিল না। প্রতিবাদ করা কি সত্য কথা বলার অবসর মেলে নাই। সে অবসর কেহই দিল না। কাহারও একবার মনে হইল না যে আমারও কিছু বক্তব্য থাকিতে পারে। আমার তখন কোন কিছু চিন্তা করার শক্তিও লোপ পাইয়াছে। সমস্ত মনটাই কেমন যেন স্তম্ভিত জড় হইয়া গিয়াছে। মার যে খাইয়াছি তাহা পরে বুঝিয়াছিলাম, সমস্ত শরীরে কালসিটা পড়িয়া গিয়াছিল। শরীর একটু নাড়িবার অবস্থাও ছিল না। কিন্তু ঠিক সেই মুহূর্তে একটা সাধারণ যন্ত্রণা ছাড়া বিশেষ কিছু বোধ করার মতো অনুভূতিও ছিল না।

সেই সময়েই বোধহয় খুন করার কাজটা সারা হইয়া যাইত যদি না বাড়ির ছেলে-মেয়েগুলো তারস্বরে কাঁদিয়া উঠিত। আমার ছেলেটা তো বটেই—ভাশুরদের ছেলেমেয়েগুলিও ভয় পাইয়া একসঙ্গে কান্না জুড়িয়া দিল। আর সেই চিৎকার আমাদের বাসনমাজা ঝি, সে আমাদের বাগানের প্রান্তেই থাকে,আর ও পাশে এক-ঘর নিকিরী প্রজা ছিল—তাহারা ছুটিয়া আসিল।

অগত্যা তখনকার মতো ক্ষান্তি দিতে হইল। তবে তাই বলিয়া আকাশের গায়ে থুথুটা কম ছিটানো হইল না। বোধকরি নিজেদের ভবিষ্যতের সুবিধার জন্যই শাশুড়ি ঠাকুরুণ আমার রীত-চরিত্রের ঘৃণ্য কাহিনীটা সবিস্তারে বিবৃত করিলেন। যাহা ঘটিয়াছে বা ঘটিয়াছে বলিয়া ছেলেব মুখে শুনিয়াছেন তাহা তো বটেই—যাহা ঘটে নাই, ঘটিলে আমাকে আরও জব্দ করার সুবিধা হয়—তাহাও। আমার যে চরিত্রটাই ঐরকম, আমি যে আমার সব ভাশুরের সহিতই 'থাকিতে' চাই, এ রূপ লালসা প্রকাশ যে নূতন নয়, স্বামী বিদ্যমানে যে আমি ইহাকে উহাকে লক্ষ্য করিয়া ছোঁক ছোঁক করিয়া বেড়াইয়াছি, সেই দুঃখেই যে তাহার রোগা ছেলেটা মরিয়া গেল—তাহার ঝুড়ি ঝুড়ি কল্পিত বিবরণ বিস্মিত হতচকিত শ্রোতা-দের শুনাইয়া বার বার ললাটে করাঘাত করিতে লাগিলেন।..

অতঃপর আমার চুলের মুঠি ধরিয়া টানিতে টানিতে আমার ঘরে পুরিয়া বাহির হইতে দরজা বন্ধ করিয়া ও কুলুপ লাগাইয়াই যদি তখনকার মতো অব্যাহতি দেওয়া হয় তাহা হইলে অল্পেই পরিত্রাণ মিলল বুঝিতে হইবে।

সুখের বিষয় বাড়িতে কোন পরিত্যক্ত খালিঘর ছিল না। শহর বাজারে যেমন দেখিয়াছি প্রায় প্রতি বাড়িতেই একটা ঘুঁটে কয়লার ঘর থাকে—তেমন কোন ঘর থাকিলে আমাকে নিশ্চয় সেই ঘরেই পোরা হইত। এখানে তেমন আধখানি ঘরও নাই। আছে রান্না ও ভাঁড়ার, সেখানে রাখিলে অসুবিধা, গোয়াল ঘরে কপাট নাই, তাছাড়া ভোর হইতেই গোয়ালে ঢুকিবার দরকার হইবে। আমার পরের দেবরটির বিবাহের পূর্বে আমার ঘর যদি খালি না হয় তাহা হইলে অন্তত একটা চালাঘরও তুলিতে হইবে—মেজ ভাশুর আর শাশুড়িতে এ আলোচনা করছিল আগেও শুনিয়াছি। যাহা হউক, সেই কারণেই বাঁচিয়া গেলাম। যেমন-তেমনই হউক, ঘরে একটা বিছানাও ছিল—কোনমতে দেহটাকে ঐ কয় পা টানিয়া লইয়া গিয়া বিছানাতেই পড়িতে পারিয়াছিলাম।

তাহার পর আর আমার কোন জ্ঞান ছিল না। সত্য সত্যই মূর্ছিত হইয়া পড়িয়া-ছিলাম। শুধু, সেই অচৈতন্য অবস্থার মধ্যেই যেন মনে হইল ছেলেটা কোথায় একটানা কাঁদিয়া যাইতেছে, তবে সে যেন দূরে কোথাও, অনেক দূরে। সে বর্তমান কালের কথা না স্বপ্ন, তাহাও ঠাওর হইল না।

পরের সারা দিনটা সেইভাবেই পড়িয়া রহিলাম। প্রবল জ্বর আসিয়াছিল, সমস্ত শরীরে অসহ্য যন্ত্রণা আর ব্যথা। হাত-পাও নাড়িবার সামর্থ্য ছিল না। তাহার উপর আর একটা প্রবল অস্বস্তি, হয়ত কাহারও লাথিই আসিয়া লাগিয়া থাকিবে,—এমন একটা স্থান ফুলিয়া উঠিয়াছে যে প্রাকৃতিক কার্যের উপায় নাই। সমস্ত পেটটা টনটন করিতেছে।

তবু নিঃশব্দেই পড়িয়া রহিলাম। কেহ দরজা খুলিল না, কোন প্রশ্নও করিল না। প্রাকৃতিক কার্যের জন্য ফাঁকে 'যাওয়ারও ব্যবস্থা করিল না। আহারের তো প্রশ্নই ওঠে না। জ্বরে ও যন্ত্রণায় অস্থির হইয়া উঠিলাম। ছটফট করিলে এ পাশ ওপাশ করিলেও কিছু স্বস্তি বোধ হয়। সে ক্ষমতাও ছিল না। ছেলেটাকে উহারা বোধ-হয় সরাইয়া রাখিয়াছে, ভুলাইবার চেষ্টা করিতেছে। খুব দূর হইতে মধ্যে মধ্যে তাহার কান্না শোনা যাইতেছিল, 'আমি মার কাছে যাব। আমি মার কাছে যাব।' অসহায় শিশু জানে না তাহার মা কত অসহায়।

সেই মুহূর্তে যদি মরিতাম। কেবলই জ্বরের ঘোরে, সেই অর্ধঅচৈতন্য অবস্থায় আশা হইতেছে এই বুঝি মরিব। এ যন্ত্রণা কাহারও সহ্য করা সম্ভব নহে, নিশ্চয়ই মরিব।...হায়, তখন কি জানি, ঈশ্বর আমাকে দিয়া বহু লাঞ্ছনা সহ্য করাইবেন বলিয়াই এই অদ্ভুত স্বাস্থ্য দিয়াছেন—যাহা কিছুতে ভাঙ্গে না, যাহার সহ্য শক্তির শেষ নাই।

তবে, ইতিমধ্যেই যে সকালে ও দুপুরে আমার ঘরের বাহিরে বারান্দায় মন্ত্রণাসভা বসিয়াছে, সেটা আমি টের পাইয়াছি। ফিসফিস গলার আওয়াজ—একাধিক, মধ্যে মধ্যে এক আধবার উত্তেজনায় চড়িয়া উঠিতেছে—আবার কেহ হয়ত সতর্ক করিয়া দেওয়ায়, অকস্মাৎই নামিয়া যাইতেছে।

ইহারা আমাকে খুন করিবে—সেটা অবধারিত। হয়ত সেই উপায়টাই উদ্ভাবনের চেষ্টা হইতেছে। যাহাতে আমিও মরি, উহাদের গলাতেও না দড়ি পড়ে—এইরূপ একটা পথ খোঁজা হইতেছে। বড়জার ঘটনাটা—এখন বুঝিতেছি সত্যই। বোধ করি সেটা ঘটিয়াছে বলিয়াই, এত তাড়াতাড়ি সেভাবে কাজ সারিতে চায় না। ছেলেরাও এখন কিছু বড় হইয়াছে, তাহারা দেখিতে পাইবে—সে ভয়ও আছে। আবার এত বড়ও হয় নাই যে কথাটা চাপিয়া রাখিতে পারিবে। সুতরাং এবার বেশ সাবধানেই অগ্রসর হওয়া প্রয়োজন বৈকি!

আমার মনে হইল এইভাবে উপবাস করাইয়াই মারিবে। সে একরকম ভাল। যেমনভাবেই হোক, এ যন্ত্রণার অবসান হোক। কোনমতে যেন শীগগির মরিতে পারি।...

সারাদিন কাটিবার পর সন্ধ্যারও বেশ খানিকটা পরে, দরজায় কুলুপ খুলিবার শব্দ হইল। দেখি আলো হাতে আমার শাশুড়ি ও দুই ভাশুর। সহসা আমার মনে হইল—ছোটবেলায় চণ্ডীর গান শুনিয়াছি, যাত্রাও দেখিয়াছি পাড়ায়—এবার আমাকে বধ্যভূমিতে বা মশানে লইয়া যাওয়া হইবে। আমি যেমন পড়িয়াছিলাম তেমনিই পড়িয়া রহিলাম—দুই চোখ মুদিয়া; উঠিলামও না, মাথায় কাপড় দিবারও চেষ্টা করিলাম না। যে মরিবার জন্য প্রস্তুত তাহার আর লজ্জাই বা কিসের, ভয়ই বা কিসের?

কিন্তু না, দেখিলাম এখনও বোধ করি আমার বধের উপায়টা ঠিক উদ্ভাবিত হয় নাই। তাই সেরূপ কেহ কোন উচ্চবাচ্য করিল না। আসল কথা তারককে আর রাখা সম্ভব হইতেছিল না। কোনমতেই, তাই তাহাকে খাওয়াইয়া লইয়া আসা হইয়াছে, ভিতরে ঢুকাইয়া দিয়া আবার কুলুপ আঁটিয়া দেওয়া হইল। অন্ধকার ঘরে ঢুকিয়া ছেলেটা ককাইয়া কাঁদিয়া উঠিতেই আমি সম্বিৎ পাইয়া উঠিয়া তাহাকে বুকে টানিয়া লইলাম।...

পরের দিন সকালে আবার তেমনি মিছিল করিয়া আসিয়া ছেলেটাকে সরাইয়া লওয়া হইল। ছেলেটা প্রথমে যাইতে চাহে নাই, আমার কাপড় ধরিয়া দাঁড়াইয়া ছিল, শাশুড়ি ঠাকরুন তাহার গালে প্রচণ্ড একটা চড় মারিয়া এক ঝটকায় ছাড়াইয়া লইলেন 'হারামজাদা ছেলে, আমরা এত করছি তা নয় ঐ সর্বনাশীর কাছে না থাকলে চলে না। যতই যা করো, রক্তের দোষ যাবে কোথায়!'

সেদিনও তেমনি পড়িয়া রহিলাম। ইহাদের মতলব কি বুঝি না। প্রাকৃতিক কৃত্য সারিতেই হইবে—অনেকক্ষণ বাদে ফুলোটা একটু কমাতেই সম্ভবত—সেটা কাল সন্ধ্যাতেই সারিতে হইয়াছে। তাঁহার অসুখের সময় শেষের দিকে ঘরের নর্দমাতেই সব কাজ সারিতেন, সেই পথই ধরিতে হইল। ঘরে কলসীতে জল থাকিত, সেটাও কাজে লাগিল। কিন্তু তারপর? এভাবে কতদিন চলিবে? কি ভাবিয়াছে উহারা? কি স্থির করিল?

প্রশ্নটা যে আমার উপরই চাপিবে তাহা তখন ভাবি নাই। সন্ধ্যার পর আবার আলো হাতে করিয়া সদলবলে শাশুড়ি ঠাকরুন দেখা দিলেন। কিন্তু আজ আর ছেলেটাকে ঠেলিয়া দিয়াই পুনশ্চ কপাটে কুলুপ লাগাইলেন না, অল্প কিছুক্ষণ প্রদীপের আলোতে আমাকে দেখিয়া লইয়া, বোধকরি দুই দিনের উপবাসে অবস্থাটা কি দাঁড়াইয়াছে পর্যবেক্ষণ করিতেই—

বলিলেন, 'তা কি ঠিক করলে বাছা। তোমার যা ডাইনে-ভর-করা গতর, উপোবে তোমার কিছু হবে না, খাড়া টাঙিয়ে রাখলেও অমন দুমাস যুঝবে। অত দিন তো আমরা অপেক্ষা করতে পারব না। যদি অশেষ দুর্গতি থেকে বাঁচতে চাও—চালের মটকা আছে, পরনে কাপড় আছে। এই বাঁচবার পথ বাৎলে দিয়ে গেলুম। সাহস না থাকে, বিষ খেতে চাও বলো—কত্তার আপিং এখনও পড়ে আছে, সর্ষের তেলে ভিজিয়ে দিয়ে যেতে পারি।...আর একটা দিন দেখব, যদি কিছু না করো পাড়ার লোক ডেকে কেচ্ছা কেলেঙ্কারীর কথা আদ্যোপান্ত বলে, মাথা মুড়িয়ে গামছা পরিয়ে গাঁয়ের বার করে দিয়ে আসব—এই বলে দিলুম, তোমার কোন বাবা কোন ভাতার রুখতে পারবে না—আমার নাম শ্যামা বামণী—কে আমার সামনে দাঁড়ায় দেখি!'

বিচার তো আসামীর আড়ালেই হইয়া গিয়াছে, রায়টা পড়া শুধু বাকী ছিল, সে কাজ সারা হওয়ার পরই দরজায় আবার কুলুপ পড়িল।

ছেলেটা হাউ হাউ করিয়া কাঁদিতে লাগিল, 'মা তোকে ওরা মেরে ফেলবে, মা, আমার [illegible] ভাল লাগছে না, কেন এখানে প[illegible] আছিস। চল না আমরা চলে যাই।'

কী বুঝাইব ঐ দুধের বালককে, যে স্বেচ্ছায় পড়িয়া নাই, ভাল আমারও লাগার কথা নয়। এও বলিতে পারিলাম না যে শাশুড়ির যাহাই অভিরুচি হোক ভাসুররা এই এক ফোঁটা ভাইপোকেও বাঁচিতে দিবে না।...শুধু 'চুপ-চুপ', 'কাঁদে না লক্ষ্মীটি।' এ ছাড়া কোন সান্ত্বনা বাক্য দিতে পারিলাম না। অনেকক্ষণ কাঁদিয়া ছেলেটা এক সময় ঘুমাইয়া পড়িল। আমার চোখে ঘুম নাই, থাকা সম্ভবও নয়, চুপ করিয়া শুইয়াই রহিলাম, সবল সুস্থ দেহ, দুই দিনের উপবাস ও নির্যাতনে কিছু মরিয়া যায় না ঠিকই, কিন্তু সবল সুস্থ দেহেই উপবাসের যন্ত্রণা বেশী।

তেমনি পড়িয়া আকাশ পাতাল ভাবিতেছি। শাশুড়ির প্রস্তাবটাই গ্রহণ করিব নাকি? আমি আর কি সুখে বাঁচিব? আত্মহত্যা মহাপাপ—নরকে যাইতে হইবে? নরকে কি ইহার চেয়েও যন্ত্রণা? ছেলেটা ঘুমাইতেছে—ইহলোক ত্যাগ করার এই প্রকৃষ্ট অবসর—আবার ছেলেটার জন্যই ভয় হয়। ইহাকেও নিশ্চিত মৃত্যু ও লাঞ্ছনার মধ্যে ফেলিয়া যাইতে হয়।...কিছুই যেন দিশা পাইতেছি না এই অকূল অন্ধকারে, হঠাৎ মাথার কাছে সামান্য পদশব্দ হইল, ঘরে সামান্য ছায়া পড়িল।

মাথার কাছে একটি সামান্য গবাক্ষ ছিল, ছোট্ট একহাত চওড়া দেড়হাত লম্বা জানলা, ঘরের একমাত্র আলোবাতাস আসার পথ, সেইখানেই কে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। চাঁদিনি রাত নয়, অন্ধকার পথ—তবু নক্ষত্রের আলোরও একটা আভাস আছে, তাহাতেই ছায়াটা বুঝিলাম।

অন্য সময় হইলে ভয়ে চেঁচাইয়া উঠিতাম—কিন্তু আমার আর এখন ভয়টা কি, মরার বাড়া গাল নাই। আরও ভাবিলাম, সেই পশুটা নিশ্চয় আসিয়াছে, হয়ত আরও জঘন্য কোন প্রস্তাব লইয়া। তবে বেশীক্ষণ সংশয়ে থাকিতে হইল না, যে আসিয়াছিল, সে চাপা গলায় ডাকিল 'নতুন বৌদি ঘুমোচ্ছ?'

আমাদের ঝি কালীদাসী।

বোকার মতো বিছানা হইতে সাড়া দিলাম না। উহার বলার ভঙ্গীতেই

বুঝিয়াছি গোপনে আসিয়াছে। তাড়াতাড়ি উঠিয়া কাছে আসিলাম। ভাবিলাম উপবাস করিয়া আছি বলিয়া নিশ্চয় কিছু খাবার আনিয়াছে।

কাছে আসিতে হাত বাড়াইয়া আরও কাছে টানিয়া, কানের কাছে মুখ আনিয়া বলিল, 'বৌদি এদের মতলব ভাল না। ওরা মড় করেছে ঐ যে চেঁচিয়ে আপ্তঘাতী হবার কথা বলে গেল, এবার তোমার গলা টিপে মেরে নিজেরাই চালের আড়া থেকে ঝুলিয়ে পাড়ার লোক জড়ো করবে।...বৌদি তুমি পালাও।'

বেশী কথা বলার সময় নাই, সংক্ষেপে বলিলাম। 'কি করে পালাব—দোরে যে কুলুপ?'

'সে আমি ভেবে রেখেছি। ঠাকরুন রাত থাকতে উঠে গঙ্গার ধারে যায় সেখান থেকে পুকুর হয়ে ফেরে। চাবি তেনার কাছে থাকে, বালিশের নিচে। আমি তক্কে তক্কে থাকব উনি বেরোলেই গিয়ে চাবি এনে দরজা খুলে দোব।'

'তারপর কোথায় যাব? কার সঙ্গে?'

'সে ব্যবস্থাও করেছি। নীলুদার এমনিই আজ ভোরে কলকেতা যাবার কথা। তেনাকেই বলেছি। তিনিও রাজী আছে। তেনার বাড়ির পালকী বলে রাখবে—তুমি বেইরে এধার দে বাগানের বাইরে এলেই পালকীতে তুলে ছুটবে বেয়ারারা—একেবারে ইস্টাশনে পৌঁছে দেবে ওরা. নীলুদা হেঁটেই যাবে ওদের সঙ্গে। তোমাকে কলকেতার বাপের বাড়ি পৌঁছে দে নিজের কলেজে না কোথায় চলে যাবে।'

প্রস্তাবটা একেবারে খারাপ নয়, পারিলে নীলুই পারিবে। নীলু বা নীলাম্বর গ্রামের তিনি জমিদারের ছেলে। তাহার পয়সা আছে। সে কলিকাতায় হিন্দু কলেজে পড়ে তখন, কোন সাহেবদের বাসায় থাকে। এই লইয়া গ্রামে বেশ ঘোট হইয়াছিল কিন্তু এক জমিদার তায় টাকার জোর আছে—কিছু করা যায় নাই।...আমাকে লইয়া যদি কোন বদনামও ওঠে—উহার কোন ক্ষতি হইবে না। আর সে এসব গ্রাহ্যও করে না।

'কিন্তু তোর কি হবে? তোকে যদি মারধোর করে?'

'জানতে পারবে না। ভাববে তোমার সঙ্গে নীলুদার ষড় ছিল, সেই এসে কুলুপ খুলে দেছে। আর না হলেও—আমার কি করবে? আমি তো তোমাদের ভদ্দর ঘরের বৌ নই যে পড়ে মার খাব? অনেক কেচ্ছা জানি ওদের—আমিও হাটে হাঁড়ি ভাঙব না?...তা নয়, তুমিই সাবধান। ছেলেটা চেঁচাবে না তো—কথা কয়ে যদি ওঠে?'

'না রে, ওর খুব ভারী ঘুম, সেই সকাল অবদি ন্যাতার মতো পড়ে থাকে। ওকে কোলে করে নিয়ে যেতে পারব।'

'তাহলে ঐ কথাই রইল ওকে কোলে নিয়ে তৈরী হয়ে থেকো। আমি এইখানেই বসে রইনু—গিন্নী উঠলেই আমার কাজ সারব?'

'কিন্তু নবৌ? সেও তো ভোরে ওঠে?'

'ওমা শোনোনি? তিনি তো আজ বাপের বাড়ি চলে গেছে। তেনার বাপের বাড়াবাড়ি।'

মনে হইল ইহা ঈশ্বরেরই যোগাযোগ।

কয়দিনে যেন ভগবানের উপরই আস্থা হারাইয়া বসিয়াছিলাম, দেব-দেবী কেহ কোথাও নাই—থাকিলেও তাঁহারা অত্যাচারী কুচক্রীদের ভয় করিয়া চলেন—এমনিই একটা ধারণা হইতেছিল।

আজও, এখনও—একবার মনে হইতে লাগিল ভগবান বুঝি এবার মুখ তুলিয়া চাহিলেন। এতদিনে বুঝি দুর্ভাগ্যের দুর্গতির অবসান হইল—বোধ করি প্রায়শ্চিত্তের মাত্রা পূর্ণ হইল—যদিচ এমন যে কী পাপ করিয়াছি অনেক করিয়াও তাহা ভাবিয়া পাইলাম না—যাহা হউক কিন্তু সেই সামান্য আশ্বাসটুকুও বেশীক্ষণ রাখিতে পারিতেছিলাম না, পরক্ষণেই মনে হইতে লাগিল—এও বোধ করি অদৃষ্টের একটা বড় রকমের পরিহাস—একবার একটু আশার আলো দেখাইয়া আরও বড় রকমের সর্বনাশের মধ্যে নিক্ষেপ করিবে। আরও অনেক অপমান অনেক লাঞ্ছনা আছে কপালে—তাহারই একটা নিমিত্ত আসিয়া দেখা দিয়াছে মুক্তির উপায়ের বেশ ধরিয়া।

এও মনে হইল দুই একবার—কালীদাসীটা ওদের দূত খায় নাই তো—পালাইতে চেষ্টা করিতেছি—এটা প্রমাণ হইয়া যাইবে অথচ পালানোও যাইবে না, একেবারে শেষ মুহূর্তে সকলে ঘিরিয়া ফেলিয়া মারিবে?

কিন্তু না। তেমন তো মনে হয় না। মানুষটাকে পূর্বেও দেখিয়াছি, ইহাদের মতো পিশাচ নয়, দয়া মায়া আছে। হয়ত ইহার চেষ্টা আন্তরিকই—তবে আমার অদৃষ্টে নির্যাতন যদি এখনও শেষ হইয়া না থাকে তবে সে আর কতটুকু কী করিতে পারিবে।

এই আশা-নিরাশার অন্দে আরও যে কতক্ষণ কাটিল তাহা জানি না। আমার তো মনে হইল কয়েকযুগ কাটিয়া গেল। রাত্রি যে এত দীর্ঘ হয়, সময় যে এত মন্থর গতিতে চলে তাহা ইতিপূর্বে আর কখনও এমন করিয়া বুঝি নাই।

অবশেষে একসময় সেই নিদারুণ, জীবনের দীর্ঘতম প্রতীক্ষার অবসান ঘটিল, দরজায় সামান্য একটু 'খুট' করিয়া শব্দ উঠিল। খুবই সামান্য শব্দ, অন্য সময় হইলে কানেও যাইত না, নিতান্ত সেইদিকে উদগ্রীব হইয়া কান পাতিয়াছিলাম বলিয়াই শুনিতে পাইলাম। তবু তখনই ছেলেকে কোলে তুলি নাই। অজানা ভয়ে, বরং আশঙ্কাতেই বুকটা একবার কাঁপিয়া উঠিল।

কিন্তু দেখিলাম—নিঃশব্দে কপাট খুলিয়া কালীদাসীই ঘরে ঢুকিল, চাপা গলায়—প্রায় অস্ফুট কণ্ঠে ঈষৎ অসহিষ্ণু-ভাবেই বলিল, 'কৈ, তৈরী হওনি?'

সে কথায় আর কোন মৌখিক উত্তর দিলাম না, একেবারে ঘুমন্ত ছেলেকে তুলিয়া কাঁধে ফেলিয়া দরজার দিকে পা বাড়াইলাম।

তখনও ফরসা হয় নাই—রাত্রির অন্ধকার একটু হালকা হইয়াছে এইমাত্র। কালীদাসীকেও ভাল করিয়া ঠাওর হইল না, শুধু তাহার আড়াটা দেখিয়া আর গলার আওয়াজে চিনিলাম। সেই সাদা কাপড়টা লক্ষ্য করিয়াই নিঃশব্দে দ্রুত নামিয়া আসিলাম দাওয়ার সিঁড়ি বাহিয়া উঠানে, সেখান হইতে বাগানে পড়িয়া পূর্বদিকে নিকিরিদের উঠানের মধ্য দিয়া কালীদাসীর পিছু পিছু হাঁটিতে লাগিলাম। দুটা ভয় ছিল—ছেলেটা না ঘুম হইতে জাগিয়া উঠিয়া কান্নাকাটি জুড়িয়া দেয় অথবা রাস্তার কোন কুকুর না ডাকিয়া ওঠে বা তাড়া করে।...কিন্তু মনে হয় ভগবান মুখ তুলিয়াই চাহিয়াছেন এতদিনে, কোন গোলমালই হইল না। একসময় আমরা নিরাপদে বড় রাস্তায় আসিয়া পৌঁছিলাম।

নীলুদের পালকি প্রস্তুতই ছিল। নীলুও পালকির পাশে নিঃশব্দে দাঁড়াইয়া—আবছা আলোতেই চিনিতে পারিলাম। কোন কথাবার্তা হইল না, সে আমাকে দেখিয়াই নীরবে পালকির দরজা খুলিয়া দিল, আমি ছেলেটাকে কালীদাসীর কাছে দিয়া পালকিতে উঠিয়া বসিয়া হাত বাড়াইয়া ছেলেটাকে কোলে শোয়াইয়া লইলাম। কালীদাসী তৎক্ষণাৎ আবার নিজের বাড়ির পথ ধরিল, বৃথা কোন কথা বলার কি বিদায় লইবার চেষ্টা করিল না। নীলুর ইঙ্গিতে বেয়ারারাও সঙ্গে সঙ্গে পালকি তুলিয়া ছুটিতে শুরু করিল। বোধহয় বেয়ারাদের সাবধান করাই ছিল। তাহারা পালকি বওয়ার সময়ও কোনরূপ শব্দ করিয়া অভ্যাসমতো ক্লান্তি বিনোদনের চেষ্টা করিল না।

একদিন সমাদরে না হোক—সাড়ম্বরেই এ বাড়িতে আসিয়াছিলাম—এ বাড়ির সুন্দরী নববধূরূপে, অনেক আশা-আকাঙ্ক্ষা অনেক স্বপ্ন বুকে করিয়া—আজ চোরের মতো রাত্রির অন্ধকারে এই স্বপুরের ত্যাগ করিতে হইল, বিপুল মিথ্যা কলঙ্কের বোঝা মাথায় করিয়া—সম্ভবত চিরদিনের মতোই। আমি তো গেলামই, না জানি এই দুটি উপকারী মানুষ—নীলু ও কালীদাসীর আরও কী অনিষ্ট করিয়া গেলাম।

(ক্রমশঃ)

অমৃতবাজারের কার্টুন

কমল সরকার

"এই সময়ে অমৃতবাজারে বঙ্গের তদানীন্তন কোন উচ্চতম রাজকর্মচারী এবং একজন সবডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেটের ব্যঙ্গচিত্র প্রকাশিত হয়। এই চিত্র প্রকাশেও অমৃতবাজারের প্রসিদ্ধি বিস্তর বাড়িয়া যায়। তখন কলিকাতায় সকলেরই মুখে অমৃতবাজারের সেই রঙ্গভঙ্গময়ী রচনার কথা,—সেই ব্যঙ্গ-চিত্রের কথা ধ্বনিত হইতে লাগিল।"

—বঙ্গভাষার লেখক (১৩১১ বঙ্গাব্দ)

এদেশের সংবাদপত্রে কার্টুনের প্রবর্তন সম্পর্কে যদি কোনো নির্ভরযোগ্য আলোচনা কোনোদিন করা হয় তবে সে প্রসঙ্গে অমৃতবাজার পত্রিকার অবদান অবশ্যই উল্লেখযোগ্য হবে। কারণ, আধুনিক ব্যঙ্গ-চিত্রের ইতিহাসে অমৃতবাজারের ভূমিকা ঐতিহ্যময়।

হরিমোহন মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত বঙ্গ-সাহিত্য সম্পর্কিত গ্রন্থ 'বঙ্গভাষার লেখক'-এর উপরিউক্ত মন্তব্য অমৃতবাজারের সে ঐতিহ্যময় অধ্যায়ের উজ্জ্বল উদাহরণ।

আধুনিক সংবাদপত্রে কার্টুন সহজলভ্য বস্তু। কিন্তু উনিশ শতকে, যখন এদেশে সংবাদপত্র 'ইনডাস্ট্রি'তে পরিণত হয়নি, তখন ভারতীয় উদ্যোগে পরিচালিত সংবাদপত্রে কার্টুনের প্রবর্তন ছিল অচিন্তনীয়।

সে যুগের সংবাদপত্রে কার্টুন না থাকার মূলে ব্যঙ্গচিত্রশিল্পীর অভাবই ছিল প্রধান। দ্বিতীয়ত, ভারতীয় পরি-চালিত সংবাদপত্রগুলিতে কারিগরি ও যান্ত্রিক ব্যবস্থা পর্যাপ্ত পরিমাণে ছিল না। তবুও একশ বছর আগে কলকাতার অমৃতবাজার পত্রিকা প্রথম কার্টুন প্রকাশ করে এদেশের সাংবাদিকতায় যে আলোড়নের সৃষ্টি করেছিল তা অবশ্যই স্মরণীয়।

উনিশ শতকের অষ্টম দশক — এই সময়েই সাময়িকপত্র থেকে সংবাদপত্রে কার্টুনের আত্মপ্রকাশ। এর আগে ভারতীয় পরিচালিত সংবাদপত্রে পূর্ণাকারের রাজ-নৈতিক বা সম্পাদকীয় কার্টুন দেখা যায় না। সেদিক থেকে অষ্টম দশক ভারতীয় সাংবাদিকতার ইতিহাসে উল্লেখ্য অধ্যায়।

যশোরের অমৃতবাজার গ্রাম থেকে স্থানান্তরের পর ১৮৭১ খৃষ্টাব্দের ২১ ডিসেম্বর কলকাতায় প্রথম অমৃতবাজার পত্রিকার আত্মপ্রকাশ। অমৃতবাজার তখন বাংলা-ইংরেজী সাপ্তাহিক এবং হিদারাম ব্যানার্জি লেন থেকে প্রকাশিত হতো। কলকাতায় আত্মপ্রকাশের প্রায় দুই মাস পরে অর্থাৎ ১৮৭২ খৃষ্টাব্দের ২৮ ফেব্রুয়ারী অমৃতবাজার পত্রিকায় প্রথম কার্টুন প্রকাশিত হয়। মিউনিসিপ্যাল আইন প্রণয়নের পরিপ্রেক্ষিতে অমৃতবাজারের এই কার্টুন আঁকা হয়েছিল। কার্টুনে বাংলা ও ইংরেজী উভয় টীকাই ছিল। বাংলা টীকা : 'মিউনিসিপ্যাল সভা।' সঙ্গে লেখা—'গবর্ণমেন্ট বাঙ্গালীদিগকে মিউনি-সিপ্যাল সভা দ্বারা রাজ্য শাসন শিখাইতেছেন।'

অমৃতবাজার পত্রিকার প্রথম কার্টুন 'মিউনিসিপ্যাল সভা'। ১৮৭২ খৃঃ ২৮ ফেব্রুয়ারি কার্টুনটি প্রকাশিত হয়।

অমৃতবাজারের 'মিঃ ক্যাম্বেলস মডেল ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট' কার্টুন (১৮ এপ্রিল ১৮৭২ খৃঃ)। কার্টুনটি পরে 'হিন্দু পেট্রিয়টে' পুনর্মুদ্রিত হয়।

স্বাক্ষরবিহীন এই প্রথম কার্টুনের আত্মপ্রকাশের পর কলকাতার সম-সাময়িক সংবাদপত্রগুলি অমৃতবাজারকে অভিনন্দন জানায়। অমৃতবাজারের এই উদ্যোগ তৎকালীন 'হিন্দু পেট্রিয়ট'-এ সংবাদরূপে পরিবেশিত হয় পরের সপ্তাহে। 'হিন্দু পেট্রিয়ট'-এ সে সংবাদ উদ্ধৃত করা হলো:

"We are glad to observe that the Amrita Bazar Patrika proposes to supply in a small way the place of a Bengali Punch. In its last issue it gives a cartoon of a Mofussil Municipal Commission. It represents 'the Government teaching self-Government'. It is full of meaning. We wish our contemporary success in this new line.'

বাংলাদেশের লেফটান্যান্ট-গবর্ণর স্যার জর্জ ক্যাম্বেলকে কটাক্ষ করা হয়েছিল এই কার্টুনে। মফঃস্বল মিউনিসিপ্যাল কমিশন গঠনের পরিপ্রেক্ষিতে এই প্রথম কার্টুনটি রচিত হয়। অতিরিক্ত করভারের ইঙ্গিত থাকায় ক্যাম্বেলের বিলের বিরুদ্ধে এই কার্টুন। বলা বাহুল্য, অমৃতবাজারের এই প্রথম কার্টুনটির ব্লক কাঠের তৈরি।

প্রায় একমাস পরে আবার ক্যাম্বেলের মিউনিসিপ্যাল বিলের উদ্দেশে আঁকা 'হুজুর! ঘাড়ে আর সহে না' অমৃতবাজারের দ্বিতীয় কার্টুন (২৯ মার্চ, ১৮৭২)। কার্টুনে দেখা যাচ্ছে ক্যাম্বেল দরিদ্র জনসাধারণের মাথায় অতিরিক্ত ট্যাক্সের বোঝা চাপিয়ে দিচ্ছেন।

প্রায় এই সময়ে খরচ কমানোর উদ্দেশ্যে স্যার জর্জ ক্যাম্বেল জরীপ বিভাগের কানুনগোদের সাব-ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেটের পদে উন্নীত করার এক পরিকল্পনা গ্রহণ করেন। সরকারী পদমর্যাদায় কানুনগোরা সাব-ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেটদের চেয়ে নীচু শ্রেণীর কর্মচারী। অমৃতবাজার পত্রিকা ক্যাম্বেলের এই পরিকল্পনাকেও সমর্থন করেনি।

ক্যাম্বেলের এই পরিকল্পনা প্রসঙ্গে অমৃতবাজারেই লেখা হয়েছিল: '২৫ টাকা বেতনের কানুনগু কখনই তাহার পদোচিত মর্যাদা অনুভব ও তদনুসারে কার্য করিতে পারিবে না। এবং এদেশী সাহেবেরা যাহা চান তাহারা তাঁহাদের বেশ গোলামি করিতে পারিবে। ক্যাম্বেল সাহেব আবার ডিপুটি ম্যাজিস্ট্রেটগণের উপর যেমন লাগিয়াছেন তাহাতে বিচিত্র নাই যে তাঁহার ৫ বৎসর রাজ্য শাসনের মধ্যে অনেকগুলি ডিপুটি দূরীভূত হইবে, এবং সিবিলিয়ানের সংখ্যা বৃদ্ধি হইবে। সুতরাং আমরা চিরকাল কানুনগো ও সব-ডিপুটি লইয়া থাকিব; ক্যাম্বেল সাহেব ডিপুটি ম্যাজিস্ট্রেটি পদের গৌরব এইরূপে লাঘব করিয়া ক্ষান্ত থাকেন নাই। তিনি আবার এই চাকুরে-গুলিকে 'নেটিভ সিভিল সার্ভিস' নামে আখ্যাত করিয়াছেন।'

জরীপ বিভাগের কানুনগোদের পদোন্নতির পরিপ্রেক্ষিতে অমৃতবাজারে কার্টুন আঁকা হয় 'মিঃ ক্যাম্বেলস মডেল ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট' (১৮ই এপ্রিল, ১৮৭২)। কার্টুনে ইংরেজী টীকার সঙ্গে বাংলায় ব্যঙ্গ কবিতা লেখা হয়েছিল:

'সেলামে মজবুত অশ্বারোহণেতে।
লাঙ্গুল স্থানে চেন কম্পাস কাঁধেতে।।
তিন হাত সাত ইঞ্চি দুই আঙ্গুলে
পা দুটি।
আমাদের হুজুরের মন মত ডেপুটি।।'

বলা বাহুল্য এই ব্যঙ্গ-কবিতায় জরীপ বিভাগের কানুনগোদের উদ্দেশে বিদ্রূপ বর্ষণের সঙ্গে 'হুজুর' ক্যাম্বেলের প্রতিও বর্ষিত হয়েছিল কটাক্ষ। জরীপ বিভাগের কানুনগোদের সার্ভে সম্পর্কীয় কাজের জন্য ঘোড়ায় চড়তে হত এবং তাঁদের গান্টার চেন ও কম্পাস অপরিহার্য ছিল। কার্টুনের ছড়ায় সে ইঙ্গিত সুস্পষ্ট।

'মহাত্মা শিশিরকুমার ঘোষ' গ্রন্থের রচয়িতা অনাথনাথ বসু অমৃতবাজারের এই কার্টুনটির প্রসঙ্গ আলোচনাকালে লিখেছেন: 'চিত্রটি প্রকাশিত হইলে দেশ মধ্যে একটা মহা উত্তেজনা পরিলক্ষিত হইয়াছিল। ইংরেজ সম্প্রদায় মধ্যে অনেকেই উক্ত চিত্রটির জন্য অমৃতবাজার পত্রিকা ক্রয় করিয়াছিলেন।'

প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য, অমৃতবাজারের 'মিঃ ক্যাম্বেলস মডেল ডেপুটি' কলকাতার 'হিন্দু পেট্রিয়টে'র প্রথম পৃষ্ঠায় পুনর্মুদ্রিত হয়। নিজের পাঠকবর্গের অনুরোধ রক্ষার্থে পরের সপ্তাহে 'হিন্দু পেট্রিয়ট' অমৃতবাজারের এই কার্টুন পুনর্মুদ্রিত করে। 'পেট্রিয়ট' কার্টুন প্রকাশের সঙ্গে অমৃতবাজারের উদ্দেশে কৃতজ্ঞতা জানানো হয়েছিল। কারণ, পুনর্মুদ্রণের জন্য 'পেট্রিয়ট'কে কার্টুনের ব্লকটি সরবরাহ করেছিলেন অমৃতবাজার কর্তৃপক্ষ।

১৮৭২ খৃঃ ১০ অকটোবর অমৃতবাজারে প্রকাশিত এই কার্টুনটির বিষয় ফৌজদারী আইনের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ।

১৮৭২ খৃষ্টাব্দের ৬ মে মিঃ ক্যাম্বেলস মডেল ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট' কার্টুন পুনর্মুদ্রণ প্রসঙ্গে 'হিন্দু পেট্রিয়ট'এ লেখা হয়েছিল ঃ

"As a general desire has been expressed to see the cartoon of Mr Campbell's Model Deputy, printed by the 'Amrita Bazar Patrica', we have much pleasure in reprinting it for the delecta-tion of our readers. We are much obliged to our contemporary for kindly lending the block to us.'

স্যার জর্জ ক্যাম্বেলের নেটিভ সিভিল সার্ভিস পরিকল্পনাকে ব্যঙ্গ করে কয়েক সপ্তাহে আরও অনেকগুলি কার্টুন প্রকাশিত হয়। ১৮৭২ খৃষ্টাব্দের ১৬ মে এ বিষয়ে এক 'কলাম' একটি কার্টুনে উর্দী পরা এক চাপরাসীর ছবি এঁকে নিচে ক্যাপসান দেওয়া হয়ঃ 'এ জুনিয়ার মেম্বার অব দি নেটিভ সিভিল সার্ভিস।'

ভারতে আয়কর প্রচলন উপলক্ষে অমৃতবাজার পত্রিকা যে ভূমিকা গ্রহণ করেছিল তা' অবশ্যই স্মর্তব্য।, আয়কর আদায়ের ফলে সরকারের আয়কর বৃদ্ধি হবে এবং সে অর্থের সাহায্যে উন্নয়নমূলক কাজের পরিকল্পনা গ্রহণ সরকারের পক্ষে সহজেই সম্ভব হবে একথা উপলব্ধি করেছিলেন মহাত্মা শিশিরকুমার। এই কারণে ইনকাম ট্যাকস প্রবর্তনের পক্ষে তিনি অগ্রণী হয়েছিলেন।

উল্লেখযোগ্য, ইংরেজ সমাজে ইনকাম ট্যাকস প্রবর্তনের বিরোধী [illegible] ইংরেজ পরিচালিত প্রতিটি ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান ও সংবাদপত্র সরকার প্রস্তাবিত আয়করের বিরোধিতা করে।

'কিন্তু শিশিরকুমার অমৃতবাজার পত্রিকায় গভর্ণমেন্টের পক্ষ সমর্থন করিয়া, ইনকাম ট্যাকস দ্বারা দেশের বিশেষ কোন ক্ষতির আশংকা নাই, ইহাই প্রতিপন্ন করিতে লাগিলেন। ইংরেজদিগকে কোন ট্যাকস দিতে হয় না; ইনকাম ট্যাকস প্রচলিত হইলে লাট সাহেব হইতে সাধারণ ইংরেজ কর্মচারীকে পর্যন্ত, এবং দেশের ধনবানদিগকে তাহা দিতে হইবে...।'

ফলে ইংরেজ সম্প্রদায় প্রস্তাবিত ইন-কাম ট্যাকসের বিরুদ্ধে আন্দোলন শুরু করে। কলকাতার ইংরেজরা এ আন্দোলনে অভিজাত ভারতীয় ও রাজনীতিক মহলের সমর্থন লাভের চেষ্টা করেন।

'তখন আমাদের দেশের রাজনীতিকগণ কিরূপে ইংরেজদিগের কথায় আপন আপন মত গঠন করিতেন, তাহা দেখাইবার জন্য শিশিরকুমার অমৃতবাজার পত্রিকায় একটি ব্যঙ্গচিত্র প্রকাশ করেন। জনৈক চাপকান পরিহিত বাঙ্গালী বাবুর নাকে দড়ি দিয়া কর্নেল ইংরাজ টানিয়া লইয়া যাইতেছে।' ১৮৭৩ খৃষ্টাব্দের ২০ এপ্রিল অমৃতবাজারে এ কার্টুন প্রকাশিত হয়। কার্টুনটিতে কোনো ক্যাপসান ছিল না। নীচে দীর্ঘ রচনা।

১৮৭২ খৃষ্টাব্দ থেকে অমৃতবাজারের কার্টুন প্রচলনের যে চেষ্টা তা দীর্ঘকাল অব্যাহত ছিল এবং অমৃতবাজারই ভারতীয়-পরিচালিত সংবাদপত্রে কার্টুন প্রবর্তনের পথিকৃৎ। অমৃতবাজারের আগে ক্যেক্স হিউম-প্রবর্তিত সাপ্তাহিক সংবাদপত্র দি ইস্টার্ণ স্টার কার্টুন প্রকাশের বিষয়ে অগ্রণীর ভূমিকা গ্রহণ করেছিল। ১৮৬৮ খৃষ্টাব্দের ৫ জানুয়ারী 'ইস্টার্ণ স্টার' কলকাতায় আত্মপ্রকাশ করে এবং প্রকাশের কয়েক বছর পরে 'ইস্টার্ণ স্টার'এ লন্ডনের পাঞ্চের অ-রাজনৈতিক কার্টুন প্রকাশিত হতে থাকে। 'ইস্টার্ণ স্টার'এর কার্টুনগুলি ইউরোপীয় শিল্পীদের দ্বারা ইউরোপীয় বিষয়েই অংকিত। কিন্তু অমৃতবাজারের কার্টুনের বিষয় ও শিল্পী উভয়ই ভারতীয়।

অমৃতবাজারের আবির্ভাবের আগে কলকাতায় ভারতীয় উদ্যোগে পরিচালিত তিনটি উল্লেখযোগ্য সংবাদপত্র ছিল। যথাঃ হিন্দু পেট্রিয়ট, ইণ্ডিয়ান মিরার এবং দি বেঙ্গলী। কিন্তু এ পত্রিকাগুলির কর্তৃপক্ষের কেউই এই অভিনব বিষয়ে উৎসাহী ছিলেন

স্যার জর্জ ক্যাম্বেলের সময় গৃহীত 'ওথ অ্যাক্ট'-এর ধারায় বলা হয়েছিল যে, প্রত্যেক হিন্দুকে, আদালতের ক্ষেত্রে, গরুর গা স্পর্শ করে শপথ বা প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করতে হবে। ক্যাম্বেলের প্রস্তাবিত সেই অদ্ভুত আইনের প্রেক্ষাপটে অমৃতবাজারে প্রকাশিত (২৩মে, ১৮৭২) এই কার্টুনে জনৈক হাইকোর্টের জজের সামনে একজন ব্রাহ্মণ গরুর লেজ ধরে শপথ বা প্রতিজ্ঞা করছেন। কোর্টের একজন পিওন গরুর গলায় দড়ি ধরে দাঁড়িয়ে আছেন।

না। তাছাড়া, তৎকালীন বঙ্গদেশের ইংরেজ পরিচালিত বিরাট প্রতিষ্ঠান যথা, ইংলিশম্যান, ইণ্ডিয়ান ডেইলি নিউজ ও ফ্রেণ্ড অব ইণ্ডিয়া প্রভৃতি দৈনিক ও সাপ্তাহিকেও তখন কার্টুনের প্রবর্তন হয়নি।

প্রধানত সরকারী কার্যক্রমের সমালোচনাই ছিল সে যুগের অমৃতবাজারের কার্টুনের বিষয়-বস্তু। অমৃতবাজারে বিবিধ বিষয়ের জন্য একটি স্থান নির্দিষ্ট ছিল। গল্প, কবিতা, হাসি-ঠাট্টা প্রভৃতি বিষয় এই 'বিবিধ' স্তম্ভে মুদ্রিত হতো। অমৃতবাজারের কার্টুনেরও এই 'বিবিধ' স্তম্ভে স্থান নির্দিষ্ট ছিল।

ঊনিশ শতকের অমৃতবাজারের ব্যঙ্গচিত্রশিল্পীর পরিচয় আজও অজ্ঞাত। কারণ, অমৃতবাজারের সমস্ত কার্টুন স্বাক্ষর-বর্জিত। অনুমান সে যুগের খ্যাতনামা শিল্পী গিরীন্দ্রকুমার দত্ত (১৮৪০-১৯০৯) অমৃতবাজারের প্রথম ব্যঙ্গচিত্রশিল্পী। কলকাতা থেকে অমৃতবাজার প্রকাশিত হবার সময় মহাত্মা শিশিরকুমারকে নানাভাবে সাহায্য করেছিলেন শিল্পী গিরীন্দ্রকুমার। বিগত শতকের আলোড়ন সৃষ্টিকারী মাসিক ব্যঙ্গ সাময়িক 'বসন্তক'-এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ছিলেন গিরীন্দ্রকুমার এবং ব্যঙ্গচিত্রকে অবলম্বন করে তিনি খ্যাত হন। প্যারীচাঁদ মিত্রের 'আলালের ঘরের দুলাল' (২য় সংস্করণ) এবং মাইকেল মধুসূদন দত্তের গ্রন্থাবলীর

১৮৭৩ খৃঃ ২ আগস্ট প্রকাশিত এই কার্টুনটির বিষয় তুরস্ক ও জার্মানীর রণসজ্জা।

নিখোগাকার গিরীন্দ্রকুমারের নাম আজ বিস্মৃত।

গিরীন্দ্রকুমার প্রসঙ্গে মহাত্মা শিশির-কুমারের জীবন-চরিতলেখক অনাথনাথ বসুর মন্তব্য এক্ষেত্রে প্রণিধানযোগ্য : "কলিকাতায় আগমনের কয়েক মাস পরে (১৮৭২ খৃীঃ অঃ ফেব্রুয়ারীর মাসে) শিশিরকুমারের যত্নে ও চেষ্টায় অমৃত-বাজার পত্রিকা নূতন সৌষ্ঠবে পুনঃ প্রকাশিত হইতে লাগিল। এই সময়ে কলি-কাতা নিমতলা ঘাট স্ট্রীট নিবাসী জমিদার ও সুনিপুণ চিত্রশিল্পী স্বর্গীয় গিরীন্দ্র-কুমার দত্ত মহাশয়ও শিশিরকুমারকে পত্রিকা প্রচারে নানারূপে সহায়তা করিয়াছিলেন।"

উত্তরকালে শিশিরকুমার ও গিরীন্দ্র-কুমার একযোগে একাধিক জনহিতকর প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা করেন। প্রিন্স অব ওয়েলসের (সপ্তম এডোয়ার্ড) ভারত ভ্রমণের সময় (১৮৭৫-৭৬) এঁদের উদ্যোগে এবং লেফট্যানেন্ট-গভর্ণর স্যার রিচার্ড টেম্পলের পৃষ্ঠপোষকতায় 'অ্যাল-বার্ট টেম্পল অব সায়েন্স' প্রতিষ্ঠা হয়। 'ইণ্ডিয়ান লীগ' প্রতিষ্ঠার সময় গিরীন্দ্র-কুমার শিশিরকুমারকে প্রভূত সাহায্য করেন।

পরবর্তীকালে গিরীন্দ্রকুমারের সঙ্গে শিশিরকুমারের সম্পর্ক আরও ঘনিষ্ঠ হয়। শিশিরকুমারের জ্যেষ্ঠা কন্যা পঙ্কজনয়না দেবীর সঙ্গে গিরীন্দ্রকুমারের তৃতীয় পুত্র নগেন্দ্রকুমারের বিবাহ হয়।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, সাহিত্যসম্রাট বঙ্কিম-চন্দ্রকেও এক সময়ে অমৃতবাজারের কার্টুন নিয়ে আলোচনা করতে দেখা যায়। সাপ্তাহিক ইংরেজি সংবাদপত্র 'রেইস অ্যাণ্ড রায়ত' এবং 'মুখার্জি'স ম্যাগাজিন'-খ্যাত ডঃ শম্ভুচন্দ্র মুখোপাধ্যায়কে লিখিত কয়েকটি চিঠিতে অমৃতবাজারের কার্টুন সম্পর্কে বঙ্কিমচন্দ্র নিজের মতামত প্রকাশ করেছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্র তখন বহরমপুরে এবং সেখান থেকেই তিনি 'বঙ্গদর্শন' সম্পাদনা করছেন। নীচে বঙ্কিমচন্দ্রের এমন একটি চিঠি ১৩৩৬ বঙ্গাব্দের কার্তিক মাসের 'প্রবাসী' থেকে উদ্ধৃত করা হলো :

"প্রিয় শম্ভু, বহরমপুর
২৭শে নভেম্বর, (১৮৭৩)

......আমি স্যার জর্জ ক্যাম্বেলের ভক্ত নই। কিন্তু আমার মনে হয়, 'জর্জি বাবা' কিংবা 'জর্জ কীর' সম্বোধনে নামা তোমার উচিত হয় নাই। ......বয়স এবং খ্যাতি দুয়েতেই আমি তোমার ছোট। রুচি সম্বন্ধে তোমায় কিছু শিখাইতে যাওয়া আমার ধৃষ্টতা। তবে ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে এই-টুকু বুঝি 'Georgy Babu' প্রভৃতির মত ব্যঙ্গচিত্র 'অমৃতবাজার' পত্রিকার পক্ষে শোভন হইলেও, আমাদের সর্বশ্রেষ্ঠ সাহিত্য-পত্রিকার উপযোগী নয়।......"

শম্ভুচন্দ্র বঙ্কিমচন্দ্রকে 'বঙ্গদর্শনে' কার্টুন প্রবর্তনের বিষয় ভেবে দেখতে অনুরোধ করেছিলেন এবং তার উত্তরে বঙ্কিমচন্দ্রের যে অভিমত ব্যক্ত হয়েছিল তা এ চিঠিতে বিবৃত। শম্ভুচন্দ্র নিজের সাম-য়িক 'মুখার্জি'স ম্যাগাজিনে' (দ্বিতীয় পর্যায়, ১৮৭২-৭৬) কার্টুনের প্রবর্তন করেছিলেন। অমৃতবাজারে কার্টুনের জনপ্রিয়তার কথা ভেবে শম্ভুচন্দ্র বঙ্কিম-চন্দ্রকেও সে কথা উপলব্ধি করতে অনু-রোধ করেন।

প্রায় শতবর্ষ আগে সীমাবদ্ধ ক্ষমতা ও রাজনৈতিক পরিবেশে অমৃতবাজারের সমালোচনামূলক ব্যঙ্গচিত্র প্রবর্তনের প্রচেষ্টা নিঃসন্দেহে দুঃসাহসিক পদক্ষেপের পরিচায়ক। একমাত্র নতুন বিষয়ের অব-তারণাই নয়, সিপাহী বিদ্রোহের পরের বছরের মধ্যে নানা সরকারী কাজকর্মের ব্যঙ্গাত্মক চিত্রায়ন সেযুগে ভারতীয়-পরিচালিত সংবাদপত্রে কল্পনাতীত ছিল। বিশেষত, যে সময়ে কার্টুন অর্থে একমাত্র আক্রমণই মনে করা হতো তখন ছোট লাট ও তাঁর নীতির বিদ্রূপাত্মক সমালোচনা চরম দুঃসাহসিকতার নামান্তর।

উনিশ শতকের ভারতের রাজধানী কলকাতার সংবাদপত্রে এইভাবেই সম্পা-দকীয় কার্টুনের জন্ম এবং এবিষয়ে অমৃতবাজারের ভূমিকা স্মরণীয়। অমৃত-বাজারে কার্টুন প্রকাশের প্রথম বছরেই বৃটেনের কোন কোন সাময়িকপত্রে এবিষয়ে আলোচনাও হয়েছিল এবং সে আলোচনায় মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করা হয়েছিল যে, "হিউমারে হিন্দুরা সুনিপুণ"। বলা বাহুল্য, সে আলোচনায় ভারতের অন্যান্য বাঙ্গ-পত্রিকার সঙ্গে অমৃতবাজারের 'মিনিসিপ্যাল সভা' কার্টুনেরও উল্লেখ ছিল। এ প্রায় শতবর্ষ আগের কথা।

(প্রবন্ধের উল্লিখিত উদ্ধৃতিগুলি অনাথনাথ বসু রচিত 'মহাত্মা শিশিরকুমার ঘোষ' গ্রন্থ (১৩২৭) থেকে গৃহীত।)

বেপরোয়া দোকানটি

বাণী রায়

জোলো বাতাসে টিনের চালায় কাঠের চা-ঘরের আবহাওয়া জমাট আড্ডার।

আমরা চারজন বন্ধু নিত্যনৈমিত্তিক লেকের হাওয়া খেতে পদচারণে এসেছিলাম। বেকার যুবক চারটি, বাবার খোলা হোটেলে খেয়ে দেয়ে ঘুরে বেড়াই টো-টো করে আর কাজ খুঁজি।

আজ হঠাৎ ঈশানকোণ কালোজামের মত থোকা থোকা কাল মেঘে ভরে গেল, সোঁ-সোঁ করে হ্রদের বড় বড় গাছগুলোর মধ্যে বাতাস শুরুতে লাগল মাটির কয়েক ফোঁটা বৃষ্টিপাতে সোঁদা গন্ধ। কাক-চিল বাসা খুঁজছে দেখতে পেলাম আমরা। পুলের ওপর দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে জলে ঘাল-মুড়ি ভাসিয়ে মাছের খেলা দেখতে দেখতে আমরা চারজন হঠাৎ ঘনঘোর প্রাবৃটের আগমন সম্পর্কে সচেতন হয়ে পুল থেকে নেমে দ্রুত হাঁটাহাঁটি সুরু করলাম বাসের রাস্তার দিকে।

কিন্তু মনে হল হয়তো পৌঁছনো শক্ত হবে বৃষ্টি ও ঝড়ের আগে। গাছগুলো ভীতিজনকভাবে দুলছে, ক্রমেই বেড়ে চলেছে বৃষ্টির বেগ। শেষে অদৃশ্য বৃকোদরের মত বীরের বজ্রপ্রহারে আমরাও ভূপাতিত হব নাকি? ছুটে সম্মুখের চালা চা-ঘরে ঢুকে পড়লাম।

জীবিকার উদ্দেশে এই ঘরখানি কয়েকজন রেফিউজী (দেশবিভাগের পরের, এখনকার পশ্চিমা নির্যাতনের পরে নয়) খুলে মোটামুটি একটা ব্যবসা চালাচ্ছে। আমরা মধ্যে মধ্যে এখানকার খরিদ্দার হয়ে থাকি।

মা ভালবাসেন, তাই পকেটে উদ্বৃত্ত পয়সা কিছু থেকেই থাকে।

আমরা চার কাপ চায়ের অর্ডার দিয়ে বসলাম। একটু একটু ঝিরঝিরে বৃষ্টি পড়তে শুরু হয়েছে। জলের বুকে ছোট ছোট সাবুদানা যেন ছিটোচ্ছে আকাশের দাক্ষিণ্যে। সীমান্তের শরণার্থীদের জন্য আকাশ যেন কিছু খয়রাতি সাহায্য পাঠাচ্ছে। আন্তর্জাতিক মাথা যখন ব্যথা হয়ে গেছে তখন কিছু না করলে ভাল দেখায় না।

লোহিত, বলাই, রতন, আমি চারজনে আরামে চা-এ চুমুক দিচ্ছি। ভাল জাতের চা না হলেও আমার রস দেয় বৃষ্টির দিনে। বিশেষ যত্ন করে বলায়।

দোকানী যুবকটিকে বললাম, "দেশের খবর কি?"

লোকটির আত্মীয়স্বজনের মধ্যে অনেকে এখনও বাংলাদেশে আটক পড়ে আছেন। ইয়াহিয়া চক্রান্তের অসহায় বলি হিসাবে যাদের প্রাণ গেছে তো গেছেই।

মুখ বিষণ্ণ করে ছেলেটি বলল, "আর দ্যাশের কথা কি কইব! কওন যায় না, ভাবনও যায় না।"

ঠিক বিষাদ ঘনীভূত হবার পূর্ব মুহূর্তে মোটা ভারী জুতো মস্‌মসিয়ে একজন মোটা ভারী লোক ঢুকল। মোটা-সোটা লোকটির হাতে একটা গ্ল্যাডস্টোন ব্যাগ। চুলগুলো স্বল্প ও বিরল। বয়স প্রৌঢ়ত্বে না পৌঁছলেও মাথায় টাক পড়েছে সামনের দিকে। একটু উঁচু দাঁত, চোখ ছোট ও তীক্ষ্ম। তামাটে রং। পরনে খাকী ট্রাউজার ও শাদা হাতকাটা সার্ট। গলাটা খোলা, টাই বা কড়া কলার নেই।

"ওঃ, ঝড়ের হাত থেকে বেঁচেছি জোর।" একটা খাকী রংয়ের প্রকাণ্ড রুমালে কপাল ও চুল ক'গাছা মুছে সে চারদিকে তাকাল।

"বাঃ, লেকের ধারে দিব্যি ব্যবসাটি জমেছে। এই বাদলায়ও লোকজন বসেছে ঢের। দিন দাদা, আমাকেও এক কাপ চা।"

সাধারণ কথা, কিন্তু ঢোকার ভঙ্গি ও কথার ভঙ্গি যেন শাবল দিয়ে কেটে মাটির দেওয়ালে সিঁধ ফোটানোর মত। মনে মনে তৎক্ষণাৎ আমরা তাকে লেবেল চিহ্নিত করলাম, "বেপরোয়া।" কিছু পরে তার মুখেই নিজের প্রতি বিশেষণটি প্রযুক্ত দেখে নিজেদের নিপুণ বিশ্লেষণের শক্তিতে শ্লাঘা বোধ করলাম।

চা-বয়টার হাফপ্যান্ট ও ছেঁড়া-ময়লা হাফ সার্টপরা এক ও অদ্বিতীয় বয়টি কয়েকটা ডিম আনতে গিয়েছিল কাছে-পিঠে থেকে। সে হাঁফাতে হাঁফাতে ফিরে এল ডিম হাতে।

"এত দেরী করলি ক্যান?"

দোকানীর ধমকে ছোকরা একখানি সময়োপযোগী গল্প করে দিল হাত নেড়ে চোখ ঘুরিয়ে।

"দেরী করলাম সাধে! বনগাঁও থিক্যা যে রিফুজী আসছে তাগরের মধ্যে আমার দাদার সম্বুন্ধির বৌ আসছে। সম্বুন্ধিরে কাইট্যা পদ্মার জলে ভাসায়া দিছে পাকি-স্থানী খানসারের সৈন্য। বৌ পালায়া চইল্যা আসছে। বৃষ্টিতে ভিজ্যা সুব-চুপী। শুইন্যা একছুট দেইখ্যা আলাম। হাসানের চাচাতো বুনেরে ধইর্যা নিছে, শোনলাম।"

আর দ্বিতীয় কথা না বলে দোকানী ছেলেটার হাত থেকে ডিম নিয়ে উনুনের ধারে রাখল। ইতিমধ্যে মোটাসোটা ভদ্রলোকটির চায়ের জল হয়ে যাওয়ায় চা ভিজিয়ে দিল।

"টাটকা ডিম আছে, গেরস্তের হাঁসের ডিম। মামলেট খাবেন? বানাই?"

দোকানীর অনুনয়মিশ্রিত প্রশ্নে আমরা নিজেদের মধ্যে চাপা গলায় আর্থিক পরামর্শ করে ডিমে রাজী হলাম। এমন বর্ষার দিনে ছোট্ট দোকানটিকে ডিম খেয়ে যদি সাহায্য না করলাম তবে সোস্যাল ওয়ার্ক কি আর করলাম, বলুন?

লোকটি একচোটে ডাবল ডিমের অমলেট বলে দিল। আমরা নিঃশব্দে চেয়ে আছি দেখে সে আগ বাড়িয়ে বলে উঠল, "কি দেখছেন? আপনারা ছেলে-মানুষ, আমি বুড়ো লোকটা এত বেশী খাব কেন? তা, যা খাটুনী আমাকে খাটতে হয়, আমি সর্বদা ক্ষুধার্ত থাকি। এত ঘুরতে হয় সর্বদা।"

মোহিত একটা সিগারেট ধরিয়েছিল, ছাই ঝেড়ে বলল, "না, না, সেকি কথা? আপনি যা ইচ্ছে খাবেন। আপনার বুঝি ট্যুরে ঘুরতে হয়? কি কাজ করেন?"

"কি কাজ না করি, বলুন? সারা দেশ ঘুরে বেড়াই। পাড়াগাঁ, শহর কোন-টাই বাদ দেই না। সর্বত্র কাজ খুঁজি। ভাগ্য কখন কোথায় ওঁৎ পেতে বসে আছেন বলা যায় না। আমি, মশায়, বেপরোয়া।"

বাইরে বৃষ্টি মন্দীভূত হয়ে গেছে তখন। শুধু ছোটখাটো ঝাঁকুনি লেগে গাছের পাতার জলঝরা, বাতাসের হাহাকার শুধু দীর্ঘশ্বাস।

ছোকরা এক চিলতে গামছায় গায়ের জল মুছে কাজে মন দিল। কেরোসিন-কাঠের টেবিলে চায়ের কাপডিস ধুয়ে সাজাল। ডিম কলাইকরা বাটিতে ভেঙে চামচে নেড়ে ফেটাতে লাগল।

চা ততক্ষণে হয়ে গেছে। আমাদের সম্মুখে আবার কাপ বসিয়ে দোকানী সবিনয়ে বলল, "চা খাইতে খাইতে ডিম ভাইজ্যা দিতেছি।"

চায়ে চুমুক দিয়ে বেপরোয়া লোকটি বলল, "আঃ, ভারী চমৎকার চা বানিয়েছ হে! কথা বলতে বলতে গলা খিঁচে থাকে।"

"আপনার কাজে অনেক কথা বলতে হয় বুঝি?"

বলাই প্রশ্ন করে।

"কাজেও কথা, অকাজেও কথা। এখন কোন কাজটা করছি? তবু বকবকানির বিরতি আছে? অভ্যাস হয়ে গেছে।"

লোকটি ডিম পেয়ে গবগব করে খাওয়া সুরু করে দিল।

রতন বলল আস্তে আস্তে, "প্রফেসার নাকি? প্রফেসাররা যা বকতে পারেন। ক্লাশে মাথা ধরে যেত আমার।"

"না, অধ্যাপকের ধরন নয়। ডাক্তার নয়তো? ব্যাগটায় যন্ত্রপাতি।" বলাই বুদ্ধি দেখায়।

"টাকাকড়ি আছে বোঝা যায়, বেশ-ভূষাও পরিষ্কার। বোধহয় লেবার অফিসার।"

মোহিত বাৎলায়।

দোকানী আমাদের ডিম আনাতে আমরাও আহারে মন দিলাম। দোকানী আমাদের নীরব দেখে কথা বলা দরকার ভেবে কাছে দাঁড়িয়ে ঘ্যান্-ঘ্যান করে যা মনে হয় বলে চলল। দোকানে মাইক নেই, রেডিও অনুপস্থিত, গ্রামোফোন বা বাদ্যযন্ত্রের অভাব। অতএব মানুষ-যন্ত্র দ্বারা যেন পরিবেশ সৃষ্টি অথবা গ্রাহকদের মনোরঞ্জনের চেষ্টা হচ্ছে।

"কী একডা সময় পড়ছে! আমরা গরীব মানুষ এই দোকানডা লয়া দিন চালাই। ওই ছোঁড়া প্যাট-ভাতায় কাম শিখতেছিল। এহন উয়াক কিছু না দিলে উয়ার চলে না। দ্যাশ গেল চইল্যা।"

আমরা তক্ষুনি মুখে টেনে আনলাম সমবেদনা। গত এপ্রিল মাস থেকে বাংলা-দেশের কাহিনীর পরে আমরা সমবেদনা প্রকাশ করতে অভ্যস্ত, যান্ত্রিক হয়ে গেছি। আন্তরিক নয় বলব না, কিন্তু অতি-মাত্রায় সজাগ।

লোকটি ঠক্ করে কাপ নামিয়ে বলে উঠল, "দ্যাশের কথা এখানে বলে লাভ কি? যে-যা পেরেছে দিয়েছে। আমাদের কথায় বাংলাদেশের ভাগ্য ফিরবে না। বরঞ্চ অন্য গল্প বলে মনের কষ্টকে চাপা দেওয়া যাক।"

মোহিত ঈষৎ প্রতিবাদ করল, "এখন এটাই সবচেয়ে বড় গল্প।"

ইতিমধ্যে বাইরে খেয়ালী শ্রাবণ অঝোর বর্ষণে ভেঙে পড়ল। আকাশ তোলপাড় করে বর্ষা নামল। আর আর্ত-প্রাণের সাবুদানা-ভিক্ষা নয়, এবারে সে ধুয়ে মুছে দেবে সমস্ত অন্যায়, সমস্ত নিষ্ঠুরতা। গাছের পাতা ঝরিয়ে পাখীর ডিম বাসা সমেত উপড়ে ফেলে, জলে তুফান তুলে ভৈরবী বর্ষা দাপট সুরু করে দিল। সেদিকে চেয়ে বেপরোয়া বলল, "গল্প এ আর কি? কত সাংঘাতিক গল্প আছে এর চেয়ে। কত জমাটি গল্প আছে। বাইরে যা ঝড়-বৃষ্টি, ওঠা যাবে না দেখছি। জাঁতাকলে ইঁদুরের মত আমরা পাঁচজনে এখানে আটকা পড়ে গেছি। গল্প বলে সময়টা কাটানো যাক।"

আমরা মিন্‌মিন্ করে বললাম, "আমরা আর গল্প জানি কোথায়? আপনিই বলুন, স্যার।"

"তা বেশ। বলাই তো আমার অভ্যাস। সাংঘাতিক গল্প শুনে নাড়ী ছেড়ে যাবে। বরঞ্চ বর্ষার দিনে একটা জমাটি গল্পই বলা যাক, কেমন? অবশ্য এক অর্থে এটা সাংঘাতিক বলতে পারেন।"

আমরা চুপ করে রইলাম। এর কথা শোনা ভিন্ন অন্য উপায় নেই আপাততঃ। দোকানী শশব্যস্তে চারদিক বন্ধ করে জমাটি গল্পের জমাটি আবহাওয়া সৃষ্টি করে ফেলেছে। বাইরে ঝমাঝম্ বৃষ্টির একটানা শব্দ।

গল্পের মধ্যভাগে আর এক রাউন্ড চা দিতে বলে সেই মোটাসোটা কেপরোয়া লোকটি মুখ খুলল। আর বৃষ্টির জল-প্রবাহকে তুচ্ছ করে ওর মুখ থেকে স্রোতের মত কথা বয়ে আসতে লাগল।

লোকটি গল্প বলছে।

এক শ্যাওলাপরা, ছাতাধরা পুরনো বিরাট বাড়ী। একদিন সেখানে একটি নূতন বৌ এসে উঠল।

পুরনো বাড়ীর পুরনো জমিদারী সামান্য জমিজমা আর একটা কয়লা খনির অংশে ঠেকেছে। এখন জমিদারীর কাজ-কর্ম চালান যিনি, খনির ম্যানেজারি করেন, তিনিই শেষ বংশধর, বিষ্ণুপদ মুখোপাধ্যায়। লম্বা-চওড়া তামাটে শরীর। চুলে পাক ধরেছে, দাঁতও বাঁধনে সেজেছে। বেশী বয়সে গরীব ঘরের ডানাকাটা-পরীকে ঘরে আনলেন। বংশধর একজন চাই তাঁর পরে।

বাড়ীতে বিধবা বড় ভ্রাতৃজায়া ও তাঁর পড়ুয়া ছেলে ভিন্ন পরিজন নেই।

হৃষ্টপুষ্ট ফর্সা বৌদি, নাকে তিলক, গলায় তুলসীহার। সকাল বেলা নাম-জপে মালা হাতে বসেন, তবে মুখে জল দেন। সন্ধ্যায়ও পুজোর ঘরে পুজো অন্তে দোতালায় শোবার ঘরে আসেন। বয়স ভাটির টানে একদিনের উচ্ছল যৌবনকে ধ্বসে নামিয়েছে সবে মাত্র।

এছাড়া, বিষ্ণুবাবুর মায়ের নামের স্কুলের মাষ্টারমশাই বাইরে বৈঠকখানায় রাত্রে শোন। অন্দরে এসে দুবেলা খেয়ে যান।

আউটহাউসে মেস করে থাকে কয়লা খনির শ্রমিক কতকগুলো ছেলে। বয়স ষোল থেকে কুড়ি হলেও খুব তাগড়া যোয়ান।

এছাড়া রান্নাঘরে বুড়ো বামুনঠাকুর, ঘরের ঝি, বাইরের ঝি। চাকর একজন বাজার-হাট করে।

আর কোন লোকজন বিরাট বাড়ীতে নেই।

মনে রাখবেন আমি অতি সংক্ষেপে গল্পটি বলছি। ডালপালা দিয়ে রসালো করে বানালে এক থান ইঁটের মত উপন্যাস হয়।

যাই হোক, পরী-বৌ এলে বৌদি সন্তুষ্ট চিত্তে চাবিকাটি সঁপে দিলেন হাতে। দেওরকে দেখাশোনা করতে যেয়ে ধর্মকর্মে ব্যাঘাত হয়েছিল। এবার নিশ্চিন্ত। বার বছরের ছেলেটিকেও লেখাপড়ার দিকে চালানো যাবে।

মাষ্টারমশাই লজ্জায় অন্দরে আসা ছেড়ে দিলেন। আগে মধ্যে মধ্যে বৌদির ফরমাসে বা ওঁর ছেলেটিকে পড়াতে আসতেন। এখন মাথা নীচু করে চোখ নামিয়ে দুবেলা শুধু খাবার ঘরে বসে খেয়ে চলে যেতে লাগলেন বাহির বাড়ী।

খনির ছেলেগুলো শুধু সুযোগ পেল আনন্দ করবার। "বৌদি মিষ্টি খাওয়াব", "বৌদি, সিনেমার পয়সা দিন", "বৌদি, জামা ছিঁড়ে গেছে", ইত্যাদি নানা অবদার নিয়ে আসতে যেতে লাগল প্রধান অতিথির। আগে পর্বদিনে খাবারদাবার পেলেও আউটহাউসের গণ্ডি ছেড়ে বাড়ীতে ওরা আসেনি।

বিকুবাবু বিশেষ আপত্তি করলেন না। ক্রমবর্ধমান শ্রমিক অসন্তোষের দিনে স্ত্রী অন্ততঃ একাংশ শ্রমিককে ঠাণ্ডা করে রাখতে পারলে ও'র ম্যানেজারী ও অংশীদারী সহজসাধ্য হবে।

তাছাড়া স্ত্রী পরমা সতী। গরীব-ঘরের মেয়ে, বড়ঘরে পড়েছে. স্বামী দ্বিতীয় বর নয়, এতেই সে কৃতকৃতার্থ। একটু একা-একা বোধ করত নিশ্চয়। বিকুবাবু কাজকর্মের জন্য বাইরে বাইরে থাকায় বৃদ্ধস্যতরুণী ভার্যার কেস্ খোলা হয়নি। তবে শান্ত স্বভাব লক্ষ্মী-মেয়েটি ডানাকাটা পরী হলেও, সেলাইয়ে ঝোঁক ছিল। উল বুনে বাড়ীর সকলকে দিল। পিকচারগ্রাফ শিখে অতিকায় বক তৈরি করে দেওয়ালে ঝোলাল।

বেশ ছিল সে। হঠাৎ এক বিপর্যয় ঘটল। বৌটি উড়ো চিঠি পেল।

হ্যাঁ, হ্যাঁ, গাদা-গাদা উড়ো চিঠি। প্রেমপত্র। লাল নীল খামে নয়। ডাক-ঘরের ছাপ স্থানীয়, কখনও বা হাত-চিঠি রূপে চিঠির ঝোলানো বাক্সটায় ফেলা। সে চিঠি কে লিখতে পারে ভেবে ভেবে ডানাকাটা পরীর রং কালো হয়ে গেল, গালের আপেল ঝরে পড়ল।

চেপে রাখার চিঠিও নয়। সপ্তাহে দুই-তিনখানা করে আসছে।

বিকুবাবু প্রথমে হাস্যরত পরে ক্রুদ্ধ হয়ে উঠলেন। ভ্রাতৃজায়া গালে হাত দিলেন। কালীবাড়ী ছুটলেন গনৎকারকে দিয়ে গোনাতে কে পত্রপ্রেরক।

দেবর ও জায়ের অশান্তি দেখে তাঁরও শান্তি গেল।

মাষ্টারমশাই চোখ আরও নামিয়ে চলাফেরা করতে সুরু করলেন।

চিঠি গোপন করা যেত না, কারণ ক্রমাগত আগমন। খনির ছেলেরা 'হাতে পেলে শালাকে দেখে নেব' বলে আস্ফালন করতে লাগল।

ঘোরতর অশান্তি ও নিরানন্দ দেখা দিল বাড়ীর শান্ত পরিবেশে।

পত্র যে পাঠাত তার হাতের লেখা প্রত্যেকবার গোপনের চেষ্টা পেলেও একই হাত বোঝা যেত। চিঠিতে নানারূপে বয়ান থাকত, দীর্ঘ নয়, দু'চার লাইন মাত্র।

"তুমি দেখা দাও। আমি তোমাকে ভালবাসি।"......

"তুমিও আমাকে চাও বুঝেছি। তবে দেরী কেন?"......

"মাঠের ধারে অনেকক্ষণ ছিলাম। এলে না কেন?"......

"কোথায় দেখা হবে জানাও।"......

এই ধরনের চিঠি। কে লিখছে, কেন লিখছে বোঝা যেত না। কিন্তু লোকটি পরিচিত, নায়িকার জীবনযাত্রা লেখকের নখদর্পণে এ কথা সুস্পষ্ট ধরা পড়ত।

এখন আমার প্রশ্ন হচ্ছে আপনাদের কাছে, বলুন তো কে এই চিঠিগুলো লিখতে পারে?

লোকটি থেমে খাকী রংয়ের রুমালে মুখ মুছে নিল। আর এক রাউণ্ড চা হয়ে গেছে। মালিক ও বয় হাঁ করে গল্প গিলছে।

আমরা ততক্ষণে উত্তেজিত হয়ে উঠেছি ও যে-যার মত মানসিক গবেষণায় প্রবৃত্ত আছি।

মোহিত চট্ করে বলে উঠল, "সেই ইস্কুল মাষ্টার।"

"সে তো চোখ তুলে তাকাত না কোনদিন।"

লোকটি হেসে বলল।

"সেই নামানো চোখে যে বিদ্যুতের ঝিলিক খেলত না, কে বলতে পারে?"

মোহিত সিগারেট ধরাল।

"আচ্ছা, এক এক করে শোনা যাক। আপনি?"

বলাইকে আহ্বান জানাল সে।

ভেবে-চিন্তে বলাই বলল, "কোনও পুরনো প্রেমিক, বিয়ের আগেকার।"

"তাহলে ওখানে এসে থাকলে ধরা পড়ত না? তাছাড়া, হাতের লেখা বদলে উড়ো চিঠি না লিখে সে গোপনে সোজা চিঠি পাঠাবার চেষ্টা করত না? বউটিও অত শান্তভাবে স্বামীর ঘর করত না।"

লোকটি বলাইকে খণ্ডিত করে।

রতন বলল, "আমার মতে ওই খনির ছোকরারা। ওই বয়সে আকাঙ্খা প্রবল হয়। বুড়োর সুন্দরী স্ত্রীর মনে মনে অতৃপ্ত জেনে ছেলেছোকরা এগিয়েছিল বোধহয়।"

"তাহলে বিকুবাবু ধরতে পারতেন। সমবেতভাবে প্রেমপত্র লেখা সম্ভব নয়। একজন লিখলে অন্যেরা বুঝে ফেলত।"

লোকটি আমাকে বলল, "কই, আপনি কিছু বললেন না?"

আমি অনিচ্ছায় প্রশ্নের উত্তর দিতে নামি। লোকটির এ-রকম জেরা আমাকে সন্দিহান করছিল। স্পাইগিরির কাজ কিনা কে জানে? বেকার যুবক দেখলেই রাজ-নীতির লোক মনে করে নেয়। তাই চুপ-চাপ ছিলাম।

"আমার মতে বৌদি লিখেছে।"

"কেন?"

"আইবুড়ো দেওরের সঙ্গে বিধবা ভাই-বৌয়ের অবৈধ যোগ ছিল। চিঠি দেখে দেওরের মনে সন্দেহ ঢুকবে। দুজনের সুখ দেখতে পারছিল না ভাই-বৌ।"

"কিন্তু তিলক-কাটা, ধার্মিকা বে। জাকে কত যত্ন করত।"

লোকটির কথায় দোকানী উত্তেজিত হয়ে বলে উঠল,

"আরে রাখেন, রাখেন, কর্তা। কত না ধম্মিণ্ঠী দ্যাখছি। উ'য়ারি কাম এডা।"

ছোকরা খপ্ করে যোগ দিল, "ওই পড়ুয়া ছ্যাড়াডা ল্যাখছে না কি?"

দোকানী চোখ পাকিয়ে তাকাল, "অরে ছোঁড়া, এডা তোর মনে আইল ক্যান? অতটুকু পোলা, তারেও তুই সন্দ করস্! তুই নিজে নষ্ট।"

ছোকরা হাউ-মাউ করে প্রতিবাদ জানাল।

বেপরোয়া লোকটি উঠে দাঁড়াল, "বৃষ্টি বোধহয় থেমে গেছে। শব্দ শুনি না আর। ওহে, দরজা-জানালা খুলে দাও না। সারা রাত আটকে রাখবে না কি? এই চিঠি কে লিখেছে এক আমি জানি।"

"কে? কে? এদের মধ্যে কেউ?" আমরা সচীৎকারে জিজ্ঞাসা করি।

"আপনারা জানতে চান? খরচ করতে রাজী আছেন কিছু?"

আমরা অতিশয় কৌতূহলী ও উত্তেজিত অবস্থায় বলি, "হ্যাঁ, হ্যাঁ। সেই জায়গায় যেতে হবে তো? ঠিক আছে। মাকে বলে টাকা আদায় করে নেব।"

"বেশ, বেশ ভাই, এই তো চাই। এমন না হলে তরুণেরা দেশকে বাঁচাবে কি করে!"

"এই যে উত্তর এখানে লেখা আছে। হালের নভেলিস্ট মুরলী গোস্বামী দীর্ঘ উপন্যাসে বলে দিয়েছেন যে, কে উড়ো চিঠি লিখেছে। এক কপি করে নিয়ে যান। পড়ে দেখলেই বুঝবেন। ভাই, আমি বইএর ক্যানভাসার। এই যে নিন বই সকলে।

মোটাসোটা বেপরোয়া লোকটি এবার তার গ্ল্যাডস্টোন ব্যাগটি খোলে হাসিমুখে।

শ্যামদেশে বৌদ্ধধর্মের বিবর্তন

সবিতা ঘোষ

খৃষ্টপূর্ব তিন শতাব্দীতে অশোকের রাজত্বের পর ভারতবর্ষে বৌদ্ধধর্মের মধ্যে বিভেদ দেখা দেয়। ক্রমে বৌদ্ধধর্ম মহাযান ও হীনযান দুই শাখায় বিভক্ত হয়ে যায়। মহাযান অর্থে বৃহৎ যান। স্বয়ং বুদ্ধদেব যা বলে গেছেন, তার ওপর তাঁর দর্শন ও চিন্তাধারায় আরো অগ্রসর হয়ে অন্য অন্য পণ্ডিত-ভিক্ষুরা অনেক জটিল দার্শনিক ও ধর্মীয় তত্ত্ব বৌদ্ধধর্মে আরোপ করেছেন। বোধহয় যার জটিলতম ও সূক্ষ্মতম রূপ নিয়েছে জাপানের 'জেন বৌদ্ধধর্ম' (Zen Buddhism)। অপরদিকে হীনযান। বুদ্ধদেবের যথাযথ উপদেশ—তিনি নিজে যে জ্ঞানলাভ করেছিলেন, তা পাবার জন্যে ঠিক যে-পন্থা নির্দেশ করে দিয়ে গিয়েছেন, সেই পথেই অবিচল থাকা হল হীনযানপন্থীদের মত। হীনযান মানে ক্ষুদ্র বাহন। বলাই বাহুল্য এই তাচ্ছিল্যসূচক নামটি মহাযানদেরই দেওয়া। এই ধর্মে বিশ্বাসীরা স্বভাবতই এই নাম পছন্দ করতেন না। তাই বলতেন, 'থেরাওয়াডা' (Therawada) অর্থাৎ প্রবীণের বাণী (Doctrine of Elders)।

মহাযান ক্রমে উত্তর দিকে বিস্তার লাভ করে—চীন, জাপানে। থেরাওয়াডা যায় দক্ষিণে—বিশেষতঃ সিংহলে। সেখান থেকে আসে শ্যামদেশে—আজকের থাইল্যাণ্ডে। থাইল্যাণ্ডে এই ধর্মের অদ্ভুত সংমিশ্রণ হয়। স্থানীয় প্রকৃতিপূজো, ভূতপ্রেত, বিশ্বাস, ভাগ্য গণনা ও ভারত থেকে আমদানি হিন্দুধর্ম—তথা ব্রাহ্মণের প্রাধান্য ও দেবদেবী—শিব, বিষ্ণু ইত্যাদির পুজোর সঙ্গে। ফলে থাইল্যাণ্ডের বৌদ্ধধর্ম এক বিচিত্র রূপ নিয়েছে।

আমরা বলি বটে বৌদ্ধধর্ম তার জন্মস্থান—ভারতবর্ষে প্রায় লোপ পেয়েছে, অথচ সুদূর প্রাচ্য চীন, জাপান, থাইল্যাণ্ড, লাওস ইত্যাদি স্থানে প্রসার লাভ করেছে। কিন্তু দেখতে গেলে বৌদ্ধধর্ম প্রকৃত বুদ্ধদেবের ধর্ম আজ কোথাও বেঁচে নেই। ভারতে নামটা লোপ পেয়েছে—অন্যত্র তা সম্পূর্ণ অন্য রূপ নিয়েছে—নামটি না বদল করে।

১৫০,০০০ আন্দাজ বৌদ্ধভিক্ষু থাইল্যাণ্ডে আছেন। থাই ভাষায় মন্দিরকে বলা হয় 'ওয়াট'। যেমন—ওয়াট বেঞ্চামাবোপিৎ (marble temple); ওয়াট-প্রকাও (Temple of Emerald Buddha); ওয়াট অরুণ (Temple of Sun God) ইত্যাদি। অনেকগুলি ওয়াটের সঙ্গে সংলগ্ন মঠ আছে। সেখানে ভিক্ষু, শ্রমণ, টেম্পল-বয় অর্থাৎ সেবকরা থাকেন। থাই ভাষায় এই সেবক বালকদের বলে—"লুক্‌ছিদ্"—অর্থাৎ শিষ্য। এঁদের জন্যে মঠেই পাঠাগার আছে—সেখানে দুর্লভ সব পুঁথি, বৌদ্ধশাস্ত্র সংরক্ষিত আছে। প্রত্যেক মঠের একজন মঠাধ্যক্ষ থাকেন। তাঁর একটি কার্যনির্বাহক সমিতি থাকে কতকগুলি ভিক্ষুকে নিয়ে। বিভিন্ন ভিক্ষু বিভিন্ন দায়িত্ব নিয়ে থাকেন। এককভাবে বৌদ্ধ-সাধুদের 'ভিক্ষু' বলা হয়। সমবেতভাবে তাঁরা 'সংঘ' নামে অভিহিত।

মঠগুলি আশ্রম বা বোর্ডিং-এর মত। নিয়মশৃঙ্খলা মেনে না চললে মঠের গোষ্ঠীজীবন চলা অসম্ভব। তাই সমস্ত নিয়মকানুন যথাযথ পালিত হচ্ছে কিনা দেখার জন্যেও দায়িত্ব নিয়ে নির্দিষ্ট ভিক্ষু থাকেন।

ভোরের পাখী ডাকার সঙ্গে ঘণ্টা পড়ে। ভিক্ষুরা উঠে প্রাতঃকৃত্য সেরে ভিক্ষায় বের হন। ঘণ্টাখানেক ভিক্ষা করে যা পান তাই নিয়ে ফিরে আসেন। চা খান। তারপর সমবেত গান, প্রার্থনা করে দিনের কাজ শুরু হয়। সমবেতভাবে পঠনপাঠন নিজের নিজের ঘরে বসেও পাঠাভ্যাসের ও ধ্যানের সময় নির্দিষ্ট আছে।

দুপুরে বারোটার আগে ভিক্ষান্ন খেয়ে টেম্পল-বয়দের জন্য রেখে দেন। তারপর এই টেম্পল-বয়দের ইস্কুল বসে। সাধুরাই পড়ান। বিকেলবেলা সেবক-বালকেরা খেলাধূলা করে, ভিক্ষু ও শ্রমণরা বেড়াতে বের হন। সন্ধ্যায় আবার সমবেত প্রার্থনা, আচার্য উপদেশ দেন, সকলে একসঙ্গে পালি ভাষায় স্তব করেন। ভিক্ষুরা একাহারি—রান্নাকরা খাবার রাত্রে খান না, চা, দুধ, ফল ইত্যাদি খেতে পারেন। রাত্রে ধ্যানেরও নির্দিষ্ট সময় আছে। প্রতি মঠে মোটামুটি এই নিয়ম। এইসব মঠ সরকারের অনুমোদনসাপেক্ষ। থাইল্যাণ্ডের রাজা আছেন। বৃটিশ পার্লামেণ্টের অনুরূপ পার্লামেণ্ট আছে। সেই পার্লামেণ্টের বিশেষ সদস্য মঠগুলির পরিচালনার খবরাখবর রাখেন। বিশিষ্ট কয়েকটি মঠের অধ্যক্ষদের নিয়ে একটি ধর্মীয় সংসদ আছে। সমস্ত মঠের মধ্যে সামঞ্জস্য রক্ষার জন্যে এই সংসদ। এই সংসদ এক-একজন সংঘনায়ক দ্বারা মঠ পরিচালনা, বিদ্যাবিস্তার, জনহিতকর কাজ, সমাজসেবা ইত্যাদি পরিচালনা করেন। প্রদেশ ও জেলায় জেলায় এইসব কাজ পরিদর্শন করেন বিভিন্ন বিষয়ে ভারপ্রাপ্ত ভিক্ষুরা। ভিক্ষুদের প্রচুর পর্যটন করতে হয়। যেখানে যানবাহন নেই সেখানে পদব্রজে যেতে হয়। থাইল্যাণ্ডের যে-কোন অঞ্চলে, যে-কোন যানে—বিমানে, রেলে, বাসে ভিক্ষুরা বিনা ভাড়ায় ভ্রমণ করেন। থাই গভর্নমেণ্ট ভিক্ষুদের বিদেশ যাত্রার ব্যয়ভার বহন করেন। এই ধর্মীয় সংসদ থেকে রাজা নিজে একজন সংঘরাজ ঠিক করে দেন। এই সংঘরাজের সম্মান রাজসম্মানের চেয়েও বেশী। প্রায় পোপের মত। স্বয়ং রাজা এঁকে মেনে চলেন এই হল বৌদ্ধধর্ম প্রতিষ্ঠানের মোটামুটি কাঠামো।

ভিক্ষুদের নীচে থাকেন শ্রমণ। থাইল্যাণ্ডে শ্রমণের সংখ্যা প্রায় ৮৫,০০০। এঁদের পঞ্চশীল ও তার ওপর আরো আটটি অনুশাসন মেনে চলতে হয়। ১২০,০০০ লুকছিদ্, বা টেম্পল-বয় আছে।

থাই চাষীদের জীবনযাত্রা

(বাঁদিক থেকে) ভিক্ষু সোমানন্দ এবং থাই ভিক্ষু শ্রীপ্রসাদ প্রতগুণঃ

এরা ছোট ছেলে, সাধারণতঃ গরীব ঘর থেকে আসে। এরা ভিক্ষুদের ব্যক্তিগত দাস-এর মত থাকে। বিনিময়ে আহার, পোষাক, থাকবার আশ্রয় ও বিদ্যাশিক্ষা পায়। তাছাড়া ভিক্ষুসেবা করে পুণ্যার্জন করে। 'ব্যাঙ্কক ওয়ার্ল্ড'—দৈনিক পত্রিকায় এক থাই ভদ্রলোকের লেখা 'টেম্পল-বয়' সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ পড়ে এদের বিষয়ে অনেক কিছু জানতে পারি। ইনি বাল্যকালে নিজে একজন টেম্পল-বয় ছিলেন। আজ তিনি পাশ্চাত্য দেশ থেকে 'ডকরেট' ডিগ্রী নিয়ে এসেছেন। থাইল্যাণ্ডে ইংরাজী শিক্ষার চল কিছুদিন আগে পর্যন্ত ছিল না। গত দশ-বারো বছর ধরে থাইরা উঠেপড়ে ইংরাজী শিখেছেন। কিন্তু বরাবরই এখানে মাতৃভাষায় শিক্ষিতের হার খুব বেশী। শতকরা প্রায় নব্বই। প্রকৃত নিরক্ষর প্রায় কেউই নেই। এর একটি প্রধান কারণ এই টেম্পল-বয় প্রথা। প্রত্যেক ওয়াটের সঙ্গে একটি অবৈতনিক বিদ্যালয় থাকে। তার মুখ্য উদ্দেশ্য হল গরীব ছেলেদের অক্ষর পরিচয় করিয়ে ধর্ম পুস্তক পড়তে শেখানো। খুব গরীব চাষীর ছেলে যার অন্ন সংস্থান করে আবার বিদ্যাচর্চার সময় সুযোগ এবং অর্থ নেই—সে টেম্পল-বয় হয়। এক একজন ভিক্ষুর অধীনে তিন, চারজন টেম্পল-বয় থাকতে পারে যদি তাদের ভরণ-পোষণের ও শিক্ষার ভার সেই ভিক্ষু নেন। ভিক্ষুর ভিক্ষান্নেই তাদের অন্নসংস্থান হবে, পোষাক-পরিচ্ছদেরও ভিক্ষুকেই ব্যবস্থা করতে হবে। পরিবর্তে টেম্পল-বয়রা গুরুর সেবা করে, তাঁর জন্য কেনাকাটা, ঘর পরিস্কার ইত্যাদি যাবতীয় কাজ করে দেয়। এদের কোন নির্দিষ্ট পোষাক নেই। মঠে এদের রাত্রিবাস করতে হয়। অধিকাংশ ছেলেই চার-পাঁচ বছর এইভাবে কাটিয়ে লেখাপড়া শিখে বাবা-মার কাছে চলে গিয়ে সংসারের কাজে সাহায্য করে। কারো কারো বিদ্যা শিক্ষার দিকে বিশেষ ঝোঁক থাকলে তাদের উচ্চশিক্ষার ব্যবস্থা করা হয়। সরকার তার কলেজে পড়ার ও হস্টেলে থাকার সব খরচ বহন করেন। টেম্পল-বয়দের অবস্থা ঠিক কোন পরিবারে আশ্রিত ছেলেদের মত হয়। ভিক্ষুরা গৃহীদের তুলনায় অনেক বেশী বিবেচক, ক্ষমাশীল, ধৈর্যবান ও নিঃস্বার্থ হন। টেম্পল-বয়রা কিন্তু কখনো ভিক্ষার বের হবে না। গুরু ভিক্ষা করে এনে নিজে খাবেন, ও টেম্পল-বয়কেও সেই ভিক্ষান্নে প্রতিপালন করবেন। ভিক্ষু অর্থোপার্জন করতে পারবেন না কিন্তু টেম্পল-বয়ের পোষাক যোগাবেন—অর্থাৎ গৃহীরা তাঁকে যে বস্ত্র দান করবেন তাই থেকে তিনি তাকে দেবেন। টেম্পল-বয়রা প্রাইভেট বিদ্যালয়ে পড়তে যায়। সেখানে সাধারণ গৃহস্থঘরের—মধ্যবিত্ত পরিবারের ছেলেরা অনেক সময়ই এই টেম্পল-বয়দের কৃপার পাত্র মনে করে। অনেক সময় হীন চক্ষে দেখে। এসব অনুকম্পা উপেক্ষা তাদের সহ্য করতেই হয়। যতদিন টেম্পল-বয় হয়ে থাকবে ততদিন তারা বাড়ি যেতে বা বাবা-মা পরিবারের কারো সঙ্গে তেমন যোগ রাখতে পারে না। যে টেম্পল-বয় এই প্রবন্ধ লিখেছেন তিনি বলেছেন—তাঁর মত দরিদ্র ঘরের ছেলের টেম্পল-বয় হবার সৌভাগ্য হয়েছিল বলেই তিনি অতোদূরে লেখাপড়া শিখতে ও বিলেত, আমেরিকা যেতে পেরেছিলেন। যেসব চাষী পরিবারে অনেক সন্তান তারা একটি দুটিকে এরকম টেম্পল-বয় করে দিতে পারলে নিজেদের ধন্য মনে করেন। থাইদের ধারণা টেম্পল-বয় হয়ে ভিক্ষুদের সেবায় লাগতে পারলে অনেক পুণ্য লাভ হয়।

মার্বেল টেম্পল

বৌদ্ধধর্ম মতে একজন আদর্শ গৃহী হলেন তিনিই যিনি প্রথমে নিজেকে পরিবারের একজন। ক্রমে গ্রামের একজন ও পরে সংলগ্ন ওয়াটের একজন ও শেষে জাতির একজন বলে গণ্য করেন।

জনসাধারণের কাছ থেকে খাদ্য ভিক্ষা করে সঙ্ঘের সভ্যরা জীবনধারণ করেন আগেই বলা হয়েছে। টাকা পয়সা তাঁরা

পায়তপক্ষে স্পর্শ করেন না, অনেক বিধি-নিষেধ মেনে চলতে হয়। গাছের ফল, পাতা, ফুল তো ছিঁড়তে পারেনই না, শুকনো পাতার ওপর থুথু ফেলতে ও প্রস্রাব করতেও পারেন না। গৈরিকবাস পরেন। লম্বা বড় দুখানি কাপড়, একটি পরে, একটি জড়িয়ে থাকেন। শীতে মোটা কাপড় ও গরমে পাতলা। চটি (সামনে খোলা, পোকা-মাকড় যাতে না থাকতে পারে—প্রাণী হত্যার ভয়) ও ছাতা ব্যবহার করতে পারেন। একটি গেরুয়া কাপড়ের ঝোলাও থাকে। যখন পিতামাতা বা কোন আত্মীয় কাউকে শ্রমণ হিসেবে কোন নির্দিষ্ট মঠে দান করেন—তখন তার সংগে আটটি জিনিষ দিয়ে দেওয়া বিধি। গেরুয়াবস্ত্র, ছাতা, চটি খোলা ছাড়া আরো চারটি বস্তু যা তাদের সংগে সর্বদা থাকা চাই তাহল একটি ক্ষুর—কারণ শ্রমণ বা ভিক্ষুদের মুণ্ডিত মস্তক হতে হয়, দাড়ি গোঁফও রাখতে পারেন না। একটি ছাঁকনি—জল সর্বদা ছেঁকে পান করা নিয়ম জীব হত্যার ভয়ে। সুঁচ-সুতো। পরিধেয় বস্ত্র ছিঁড়ে গেলে তা নিজে সেলাই করতে হয়। আর ভিক্ষা-পাত্র—একটি বিশেষ ধরণের গোলাকৃতি বড় কাঁসার (?) হাঁড়ি গোছের—সেটিতে কালো ঢাকনি দেওয়া থাকে। গৃহী বৌদ্ধধর্মাবলম্বী লোকদেরও পঞ্চশীল পালন করতে হয়—তাহল—প্রাণী হত্যা, মিথ্যা কথা বলা, চুরি করা, মাদকদ্রব্য সেবন করা ও ব্যভিচার করা বারণ। অন্ততঃ এই শীলগুলি যতদূর সাধ্য পালন করার কথা। শ্রমণদের আরো আটটি নিষেধ আছে—কামিনি, কাঞ্চন রৌপ্য ত্যাগ। বেলা বারোটার পর অন্ন গ্রহণ নিষিদ্ধ। সৌখীন সজ্জা, গন্ধদ্রব্য ব্যবহার গহনা ও নাচ, গান ত্যাগ করতে হবে। শয়নের শয্যা সম্পর্কেও নির্দিষ্ট বিধি আছে—তা মাটি থেকে একহাতের চেয়েও নীচু হবে ইত্যাদি। শ্রমণ থেকে উন্নত স্তর হল ভিক্ষু। ভিক্ষু হলে প্রাত্যাহিক জীবনে, দৈনন্দিন কাজে প্রায় দুই শত ছোট-বড় বিধি-নিষেধ পালন করতে হয়।

বৌদ্ধধর্ম বলে—প্রাপ্তবয়স্ক হবার পর সম্ভবত ২০ বৎসর বয়সের পর থেকে যে কোন সময়ে কিছুদিনের জন্যে অন্ততঃ শ্রমণ হওয়া অবশ্য কর্তব্য। এটা থাইরা সকলেই প্রায় মেনে চলেন। তিনদিন থেকে সুরু করে যত বছর ইচ্ছা শ্রমণ থাকা যায়। ভিক্ষুজীবন থেকেও যে কোন সময় মানুষ সংসারে ফিরে যেতে পারে, গৃহী হতে পারে। শ্রমণ থাকাকালে মঠে রাত্রিবাস করতে হবে ও সমস্ত অনুশাসন মানতে হবে। সাধারণত পিতা-মাতার ভেতর কেউ মারা গেলে ছেলেরা পরিবারের পুণ্যের জন্যে অস্থায়ী শ্রমণ হয়। দীক্ষা নেবার প্রকৃষ্ট সময় হল বর্ষাকালের তিনমাস। 'বুদ্ধিস্ট লেন্ট' বলে ইংরাজীতে—থাইদের 'বর্ষাব্রত।' জমিতে বীজ বপন ও ধান কাটার মধ্যবর্তী সময়ে। অস্থায়ী শ্রমণরাও গেরুয়া পরেন। তাঁরা ভবিষ্যতে ইচ্ছে হলে ভিক্ষু হতে পারেন। সাত বছর বয়সের আগে শ্রমণ হওয়া যায় না। কুড়ি বছর বয়সের নীচে ভিক্ষু হওয়া যায় না।

শ্রমণ বা ভিক্ষুজীবন খুব কঠোর পরিশ্রম বা কৃচ্ছ্রসাধনের নয়। কিন্তু আরাম, আয়েসেরও নয়। জনসেবার কাজে শারীরিক পরিশ্রম আছে, পড়াশোনা ধ্যান ইত্যাদিতে মস্তিষ্কের কাজ আছে। ধর্ম সম্পর্কে পড়াশোনা, পরীক্ষা দিয়ে উপাধি লাভ—সমস্ত ব্যবস্থা আছে। বিভিন্ন দেশের ভিক্ষুদের সরকারী বৃত্তি দিয়ে থাইল্যাণ্ডে পড়াশোনার চর্চার জন্যে আনার ব্যবস্থা আছে। তেমনি থাই ভিক্ষুদের পড়তে বা প্রচারের কাজে সরকার খরচ দিয়ে বিদেশে পাঠান। গৃহী বৌদ্ধরা নানাভাবে পুণ্য সঞ্চয় করেন। থাই সংসারে গৃহিণী খুব ভোরে উঠে রান্না সেরে নেন প্রতিদিন। কারণ ভিক্ষুরা ভোর-বেলাই ভিক্ষাপাত্র হাতে বের হন। উৎসব অনুষ্ঠানে, ব্যক্তিগত নানা কারণে ভিক্ষু ভোজন করানো একটি পুণ্য কর্ম বলে গণ্য হয় আমাদের দেশের ব্রাহ্মণ ভোজন করানোর মত। এরা জন্মান্তর বিশ্বাসী। প্রতি জন্মে যাতে উন্নত থেকে উন্নততর হয়ে নির্বাণ লাভ করে সেজন্য সচেষ্ট। সাময়িক ভিক্ষুজীবনযাপন প্রায় অবশ্য কর্তব্য। যাঁরা না করেন তাঁরা সমাজের চোখে হেয় হন। ভিক্ষুদের অন্নদান, নিত্য ব্যবহার্য সামগ্রী দান, মন্দির তৈরী করতে অর্থদান ইত্যাদি পুণ্যকর্ম। অনেক কাজেরই সার্থকতা খুঁজে পাওয়া যায় না। যুক্তিও হাস্যকর মনে হয়—ভিক্ষুরা নিজেরা এতে কতটুকু বিশ্বাস করেন জানি না। যেমন—আবদ্ধ জীব, বা পাখীকে মুক্তিদানেও পুণ্যলাভ। মন্দিরের সামনে দেখা যায় বহু লোক ছোট ছোট পাখী খাঁচায় ভরে বিক্রী করছে। দলে দলে সাধারণ লোক মন্দিরে পুজো দিয়ে ফেরার সময় পাখী কিনে তাকে ছেড়ে দিয়ে পুন্য সঞ্চয় করে। এমন ব্যবসায়ীও আছে যে পাখীদের এমন শিক্ষা দিয়েছে যে ছাড়া পেয়েই সে আবার উড়ে এসে খাঁচায় ঢোকে, আর একজন পুন্যার্থীকে পুন্যলাভের সুযোগ দিতে। ব্যবসায়ীর দুদিক দিয়ে লাভ হয়। ধর্ম, অর্থ দুই-ই হয়। এতো লোককে পুন্যলাভ করতে সহায়তা করাও কি কম পুন্য? ভিক্ষুরা বলেন, প্রাণীহত্যা পাপ হলেও তাঁদের খাদ্য হিসেবে আমিস খেতে বারণ নেই। গৃহীরাও খেলার ছলে, স্পোর্টস হিসেবে মজা করা ছাড়া, খাবার জন্যে প্রাণী মারতে পারেন। এমন ছেলেমানুষী মজার যুক্তি বই-এ পড়া। এ বড় সাধুর মুখেও শোনা—জেলে মাছ ধরলে সেটা পাপ নয়—কারণ সে তো শুধু তাকে জল থেকে তুলে রাখছে মাত্র, বধ তো করছে না। সে হতভাগ্য তো নিজেই মরে যাচ্ছে।

ভিক্ষুরা সর্বসাধারণের সামনে আদর্শ জীবনযাপনের দৃষ্টান্ত স্বরূপ। গৃহী-লোকের অনেক উৎসবে, পুন্যদিনে অনেক সামাজিক অনুষ্ঠানে এঁরা পৌরোহিত্য করেন। এই আচার অনুষ্ঠান এসেছে হিন্দু-

ধর্ম থেকে কারণ বুদ্ধদেব কোন ক্রিয়া-কাণ্ডের বিধান দিয়ে যাননি। এই সব অনুষ্ঠানের অন্যতম হল মৃতদেহ সংকারের সময়। বিশাখাবুজো ইত্যাদি পুজো পার্বনও আছে। স্ত্রীলোকের স্থান বৌদ্ধধর্মে পুরুষের অনেক নীচে। ভিক্ষুণীও আছেন কিন্তু সংখ্যায় খুব কম। তাঁদের পদ ভিক্ষু, শ্রমণদের চেয়ে নীচে। এ'রা চুল ছোট করে ছাঁটেন, শ্বেত বস্ত্র পরেন। এ'রাও ধর্মোপাসনা করেন। থাই-ল্যাণ্ডের গৃহস্থের বৌদ্ধধর্ম পালনের সবচেয়ে বাস্তব রূপ হচ্ছে প্রতিটি বৌদ্ধ-ধর্মাবলম্বী ব্যক্তি উপার্জনের শতকরা পাঁচ থেকে দশ ভাগ স্থানীয় মন্দিরে দান করেন—এ নিয়ম বাধ্যতামূলক।

ধর্ম মানেই কোন কিছুতে বিশ্বাস—সে বিশ্বাস ঈশ্বরেই হোক বা কোন নীতিতেই হোক। বুদ্ধদেব নাকি ঈশ্বর সম্বন্ধে নির্বাক ছিলেন। নিজেকে ঈশ্বর, কি ঈশ্বরের সন্তান বা সেবক কিছুই বলেননি। তিনি বলেছেন—তিনি তপস্যা করে মুক্তির উপায় খুঁজে পেয়েছেন। মনুষ্য জন্ম থেকে মুক্তি চাইলে তার পথ তিনি বলে দিতে পারেন—তাঁর বিশ্বাস ছিল। সে হিসেবে তিনি নিজেকে পথ-প্রদর্শক বলে বিশ্বাস করতেন। পৃথিবীতে জন্মলাভ করলেই দুঃখ, এই দুঃখ এড়িয়ে কি করে বাঁচা যায় তাই তিনি শিক্ষা দিয়েছেন। বৌদ্ধধর্ম চারটি মহৎ সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত। জীবন হল দুঃখের সমষ্টি। আকাঙ্খাই দুঃখের মূল। আকাঙ্খার অতৃপ্তি থেকেই পুনর্জন্ম। আকাঙ্খার নিবৃত্তিতে—মানে আকাঙ্খিত বস্তু পেয়ে নয়, আকাঙ্খাকে লোভকে জয় করে—দুঃখেরও শেষ পুনর্জন্মেরও শেষ। অর্থাৎ নির্বাণ লাভ। মুক্তির জন্যে আটটি ধাপের পথ বুদ্ধ নির্দেশ করেছেন—সত্যোপলব্ধি (Right understanding) সত্য উদ্দেশ্য, সত্য উক্তি, সত্য কর্ম, সত্য পথে জীবনযাপন, সত্য চেষ্টা নিত্য সত্য সম্বন্ধে সচেনতা আর ধ্যান।

থাই বৌদ্ধধর্ম আবার দুটো ভাগে ভাগ হয়েছে। মহানিকায়া এবং ধম্মায়ুতিকা। এই ধম্মায়ুতিকা (Thammayutika) শাখা গত শতাব্দীর মধ্যভাগে রাজা মংকুত (রাজা হবার পূর্বেই) কর্তৃক প্রবর্তিত হয়। সম্ভবতঃ তাঁর ক্যাথলিক পাদ্রীদের সঙ্গে সংখ্যের ফল। মহানিকায়া বিশ্বাসীদের (mahamikaya) সংখ্যা অনেক বেশী—ধম্মায়ুতিকাপন্থীদের প্রায় পঁয়ত্রিশ গুণ বেশী। দুটির পার্থক্য হল ধম্মায়ুতিকায়া-পন্থীরা ধর্মের অনুশাসন আরো কঠিনভাবে মেনে চলেন। এই সম্প্রদায়ের ভিক্ষুরা কাগজের নোট পর্যন্ত স্পর্শ করেন না। এ'দের ওয়াটে (মন্দিরে) ভিক্ষুদের জীবন-যাত্রা আরো সাদাসিধে। বয়স্ক ভিক্ষুদের শিক্ষা দেবার দিকে এ'দের নজর বেশী। এ'রা সংখ্যায় কম কিন্তু যেহেতু রাজা স্বয়ং এটা প্রতিষ্ঠা করেছেন, রাজবংশের সকলেই স্বভাবত এই শাখার ভিক্ষু। সেই জন্যেই বর্তমান রাজা (ভূমিবল অদুল্যদেজ) তিন সপ্তাহের জন্যে ১৯৫৬ সালে যখন ভিক্ষু-ব্রত নেন, তখন এই ধম্মায়ুতিকায়াদের মন্দির "বভর্ণিবস"-এ ছিলেন। এই মঠেই এ'র প্রপিতামহ রাজা মংকুত ছাব্বিশ বছর ভিক্ষু জীবনযাপন করে শেষ জীবনে আবার রাজত্ব করেছিলেন।

১৯৩২ সালে যখন থাই শিশুদের শিক্ষার ভার পুরোপুরি রাষ্ট্রের দায়িত্বে এল—তখনো পর্যন্ত শিক্ষামন্ত্রী তাঁর ধর্মানুষ্ঠান বিভাগের মারফৎ সংঘের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ রেখেছেন। সমস্ত থাই বিদ্যালয়ে বৌদ্ধধর্ম শিক্ষা বাধ্যতামূলক, সে বিদ্যালয় ওয়াট এলাকার মধ্যে হোক আর নাই হোক। ভিক্ষুদের যে হাসপাতাল আছে তাও রাষ্ট্র এবং সংঘ যুক্তভাবে পরিচালনা করেন। এখানে শুধু অসুস্থ ভিক্ষুদের চিকিৎসাই (শারীরিক ও মানসিক) হয় না, এরই মাধ্যমে শহরে, গ্রামে ভিক্ষুরা স্বাস্থ্য সম্বন্ধে জ্ঞানদান, লোকসেবাও করেন। বর্মার ভিক্ষুরা ইংরেজের বিরুদ্ধে স্বাধীনতা সংগ্রামে যুক্ত ছিলেন। সিংহলেও বৌদ্ধ ভিক্ষু রাজ-নৈতিক নির্বাচনে যুক্ত থাকেন। কিন্তু থাইল্যাণ্ডের ভিক্ষুরা রাজনীতি সম্পর্কে সম্পূর্ণ নির্বিকার।

থেরাওয়াডা বৌদ্ধধর্ম থাইল্যাণ্ডকে বর্মা, কাম্বোডিয়া আর লাওসের সঙ্গে যুক্ত রেখেছে।

মহামকুত নামে একটি বিশ্ববিদ্যালয় মত শিক্ষায়তন প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, সেখানে শুধুমাত্র বৌদ্ধধর্ম চর্চাই হয় না, পাশ্চাত্য দর্শন, ইতিহাস ও তুলনামূলক ধর্ম পঠন-পাঠন হয়। মহাচুলালংকর্ণ বিশ্ববিদ্যালয়ও স্থাপিত হয়েছে। জ্যোতিষ শাস্ত্রের মূল্য থাইদের কাছে খুব বেশী। জীবনের সর্ব-ক্ষেত্রে এমন কি সরকারের আয়োজিত লটারীতেও জ্যোতিষিরা ভবিষ্যৎবাণী করেন। বহু মন্দিরেই ভাগ্য গণনা করার অদ্ভুত অদ্ভুত ব্যবস্থা আছে।

থাই গভর্ণমেন্ট সব ধর্মকেই স্বীকৃতি দিয়েছেন। রাজার একটি উপাধি আছে, সেই উপাধির অর্থ হল 'সর্ব ধর্মের রক্ষক'। থাই ভিক্ষু ও শ্রমণদের প্রশান্ত মুখভাব ও সংযত ব্যবহার দেখলে শ্রদ্ধা হয়। গৃহীরা কিন্তু সাধারণভাবে বেশ বেপরোয়া জীবনযাপন করেন। বৌদ্ধধর্ম—মদ ও তামাক খাওয়াকে সুনজরে দেখে না। কিন্তু থাইরা প্রচুর মদ্যপান ও ধূমপান করেন। প্রচণ্ড ভোজনবিলাসীও বটে। জুয়া খেলাতেও সমান আসক্তি। খাও, দাও, ফুর্তি করো—এই যেন এ'দের মতবাদ। অথচ এ'রাই আবার যখন সাময়িক শ্রমণ বা ভিক্ষু হন, তখন মঠের জীবনযাত্রাও অতি সহজেই মেনে নেন। কারণ সব সত্বেও থাইরা ধর্মভীরু জাত। অনেকে একাদিক্রমে কয়েক বছরও শ্রমণ বা ভিক্ষু জীবনযাপন করেন।

এই দুই সম্পূর্ণ বিপরীত জীবন-যাত্রায় থাইরা আশ্চর্য রকম অভ্যস্থ। একটা থেকে অন্যটায় অতি অনায়াসে চলে যেতে পারেন। তাই সমগ্র থাইজাতির মুখে তৃপ্তির ছাপ—কি ভিক্ষু কি গৃহী। এ'রা যখন যা করেন তা সজ্ঞানে করেন। একারণে কোন ক্ষোভ, অপরাধবোধ যাকে 'গিল্টি কনশেন্স' বলে তা নেই। এক কথায় বলা যায়—থাইরা ধর্মে বৌদ্ধ, কর্মে 'এপিকিউরিয়ান।' এদের এর চেয়ে ভাল সংজ্ঞা বোধহয় আর নেই।

এই প্রবন্ধ লিখতে চট্টগ্রামের দুটি বাঙালী সাধু—ভিক্ষু সোমানন্দ ও ভিক্ষু বসু মিত্র—বহু তথ্য সরবরাহ করে সাহায্য করেছেন। এ'রা গত চার বছর থেকে ব্যাংককে 'ওয়াট বোওরামাবোপীং' ও 'ওয়াট পথিকারাম'—এর মঠে আছেন। আমরা ছয় মাস ব্যাংককে ছিলাম, তখন এ'দের সঙ্গে আলাপ হয়।

"Thailand — An introduction to modern Siam" — by Noel F. Busch, এবং Thailand (Its people, its society, it culture) — Editon Thomas Fitz simmons — —বই দুটিরও সাহায্য নেওয়া হয়েছে।

অঙ্গনা

সময়ের পরিপ্রেক্ষিতে

আগেকার দিনে রীতি ছিল গৌরীদান। মেয়ে আট বছরে পা দেবার সঙ্গে সঙ্গে তাকে পাত্রস্থ করা মহাপুণ্যের কাজ হিসেবে বিবেচিত হতো। কিন্তু এই বাল্যবিবাহ প্রথা 'গৌরী' নামের সঙ্গে সংযুক্ত হলেও এটি সেই সংস্কারপ্রসূত নয়। গিরিরাজ-দুহিতা গৌরী কঠোর তপস্যা করে শিবকে পতি হিসেবে লাভ করেন। এখানে সে তপস্যা অনুপস্থিত। এমনকি যাকে সম্প্রদান করে অভিভাবকরা গৌরীদানের পুণ্যলাভ করছেন তার এ সম্পর্কিত কোন ধারণা বিকশিত হওয়ার সুযোগই তখন অনুপস্থিত। বিবাহ এবং তপস্যা এই দুটি জিনিসই তার কাছে পুতুলখেলার মতো। আরো মজার কথা যে, পুতুলের বিয়ে দিতে গিয়েই সে প্রথম কথাটির সঙ্গে পরিচিত হয়। আর অভিভাবকরা এরই সুযোগ গ্রহণ করে গৌরীদানের পুণ্য সঞ্চয় করতেন। এর পেছনে শ্বশুর-শাশুড়ীরও একধরনের প্রচণ্ড আকাঙ্ক্ষা ছিল। তাঁরা চাইতেন যে কনে-বউকে নিজেদের মনের মতো করে গড়ে নেবেন। ঠিক যেন নিজেরই মেয়ে। একদিকে মা-বাবার পুণ্য সঞ্চয়ের আগ্রহ এবং অন্যদিকে শ্বশুর-শাশুড়ীর কনে-বউকে কোলেপিঠে করে মানুষ করার আকাঙ্ক্ষা থেকেই সেদিনের সমাজে গৌরীদান প্রথার উদ্ভব হয়েছিল। এমনও দেখা গেছে যে ছোট্ট একরত্তি মেয়েকে থালায় বসিয়ে বিবাহকার্য সম্পন্ন করা হচ্ছে। আবার কখনও দেখা গেছে যে, মেয়ে ঘুমে বিভোর আর ছেলে ড্যাবড্যাব করে এই অদ্ভুত কাণ্ড নিরীক্ষণ করছে। তার মাথায়ও এই জিনিসটা তখন পরিষ্কার নয়। নেহাত সংস্কারের বশে এবং শখ চরিতার্থ করতে গিয়েই এই ঘটনা সমাজে বাসা বাঁধতে পেরেছিল। এর ফলাফল সর্বত্র শুভ হয়নি। কোথাও কোথাও বিয়ে হয়ে যাওয়ার পর এ সম্পর্কে মেয়ের জ্ঞান হওয়ার আগেই হয়তো স্বামী কালের প্রকোপে পড়েছেন। সেক্ষেত্রে মেয়েটিকে সারাজীবন বৈধব্য ভোগ করতে হয়েছে। সেই সঙ্গে তার জীবনে নেমে এসেছে সামাজিক অনুশাসন যা উপেক্ষা করে সমাজে বেঁচে থাকাই ছিল তার পক্ষে অসম্ভব। এ ব্যবস্থা আজ লুপ্ত হয়েছে ঠিক কথা কিন্তু আমাদের জ্যোতিষ-ঠাকুরদের মধ্যে খুঁজলে এরকম এখনও অনেক পাওয়া যাবে। বাল্যবিবাহের কথা পুঁথিপত্তরের চেয়ে তাঁদের মুখে বেশি জীবন্ত।

আমাদের সমাজ এই অভিশাপ কাটিয়ে উঠেছে। উপনিষদের সেই প্রার্থনা : 'আমাকে অন্ধকার থেকে আলোয় নিয়ে চল'—শিক্ষার আলোকে আমাদের জীবনে বাস্তবে পরিণত হতে চলেছে। একথা বলার অর্থ এই যে গোটা দেশ এবং সমাজ আজো পরিপূর্ণ আলোকে প্রদীপ্ত হবার সুযোগ পায়নি বা হয়ে ওঠেনি। তাই নানা সংস্কার এখনও সমাজের আনাচে-কানাচে বাসা বেঁধে আছে। বাল্যবিবাহ তাই পুরোপুরি দূরীভূত হয়েছে একথা এক্ষুনি জোর দিয়ে বলা সম্ভব নয়। দেশ গাঁয়ে আটের জায়গায় বার বছরে মেয়েদের বিয়ে এখনো হতে শোনা যায়। একমাত্র শিক্ষার প্রসারেই এর মূলোচ্ছেদ সম্ভব। গোটা দেশ এবং সমাজই সেদিন এর ফলে সকল সংস্কারের দাসত্ব অস্বীকার করে মেরুদণ্ড সোজা করে ঋজু হয়ে চলতে পারবে।

আমাদের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতায় গৌরীদান এখন আর নেই বললেই চলে। আজকের সমস্যা ভিন্ন। এখন অনেকেই বিয়ের ব্যাপারটা এড়িয়ে চলতে চায়। কেউ সহজে মাথা নোয়াতে রাজি হয় না। এককালে বিয়ে করার ব্যাপারে ছেলেদের একতরফা প্রাধান্য ছিল। তাঁদের মতামত গ্রাহ্য করা হতো। এরও আগে অবশ্য কোন পক্ষেরই কোন মত চলতো না। উভয়পক্ষের মা-বাবা এবং আত্মীয়স্বজন সব ঠিক করে রাখতেন আর নির্দিষ্ট দিনে ছেলেকে হাজির থেকে কর্তব্য সমাধা করতে হতো। আর মেয়ের তো কথাই নেই। তার মতামতের কথা কেউ জানতেও চাইতেন না এবং তার প্রয়োজন আছে বলে মনেও করতেন না। এরপর অবস্থা কিছুটা পরিবর্তিত হয়ে ছেলেদের দিকে গেছে। মেয়েরা সেদিনও মতামত জ্ঞাপনের ঊর্ধ্বে ছিল। অনেক সময় বিয়ের আগে কেউ কাউকে দেখার সুযোগ পর্যন্ত পেতো না।

কিন্তু এখন আর সে অবস্থা নেই। উভয়পক্ষের মতামত ব্যতিরেকে বিবাহ যে এগুনোই চলে না। আগে যেমন কথায় কথায় মেয়েদের তাচ্ছিল্য করে ছেলেরা বেঁকে বসতো এখন আর সেটা সম্ভব হয় না। উভয়কেই সমান মর্যাদা দিতে হয়। কেউ কারো চেয়ে কম নয়। মেয়েরা বিয়ের ব্যাপারে এতদিনে তাঁদের বাঞ্ছিত অধিকার অর্জন করেছে। তবু সমস্যার সমাধান আজো সহজে হচ্ছে না। সেই সব অনেক [illegible] অধিকার পাওয়ার পর সবাই সচেতন হয়ে গিয়েছে। [illegible] কেউ বাকি [illegible] চান না। এ ব্যাপারে ছেলে এবং মেয়ে সমান।

এই এক অদ্ভুত ব্যাধিতে আমরা এখন ভুগছি। এককালে ছিল গৌরীদান। অনেক দীর্ঘশ্বাস আর চোখের জল সেদিন জমা হয়েছিল। সমবেত প্রচেষ্টায় সেই নিদারুণ দুঃস্বপ্নের দিনগুলি আমরা পেরিয়ে এসেছি। এখন আমরা স্বাধিকারে প্রতিষ্ঠিত। কিন্তু সব জিনিসটা তবু সহজ হচ্ছে না। এদিকে পশ্চিমী দেশগুলির দিকে তাকালে ভিন্ন চিত্র পাই। সেদেশে বিয়ের পাটটা একটু তাড়াতাড়ি চুকিয়ে ফেলার দিকেই অধিকাংশের আগ্রহ। ওদেশে লেট ম্যারেজ অনেকেই আর পছন্দ করছেন না। এজন্য অবশ্য দায়ী ওদেশের সুযোগ-সুবিধা। যথাযথ যোগ্যতা থাকলে চাকরি ওদেশে কোন সমস্যা নয়। বিনা দ্বিধায় যে কেউ একটা চাকরি ছেড়ে আর একটা ধরতে পারে। কয়েকটি দেশে আবার চাকরির প্রাচুর্য এতো যে, বয়সের বাছবিচার মেনে চলা দায়। তাহলে কাজ করার লোক পাওয়া যায় না। কোথাও কোথাও মেয়েদের ছেলেদের কাজ করতে হচ্ছে। একথা ঠিক যে আজকের দিনে মেয়েদের এবং ছেলেদের কাজের তফাৎ ক্রমেই কমছে। তা সত্ত্বেও কারখানার চিমনি রঙ করতে কোন মেয়েকে দেখা গেলে ধরে নিতেই হয় যে মেয়েরা ছেলেদের কাজে এগিয়ে এসেছেন।

পশ্চিমী দেশগুলিতে আর একটা ধারা সম্প্রতি লক্ষ্য করা যাচ্ছে। বিয়ের ব্যাপারে ওঁরা কেউ খুব একটা দেরি করছেন না। বিয়ের আগে মেয়েরা যথারীতি কাজে বহাল হচ্ছেন। কাজকর্ম করছেনও। চাকরি করতে করতেই বিয়ে করছেন। কিন্তু বিয়ে হয়ে যাওয়ার সংগে সংগে বিবাহিত জীবনকে পুরোপুরি উপভোগের জন্য স্ত্রী চাকরি ছেড়ে দিচ্ছেন। এবার তিনি সম্পূর্ণভাবে সাংসারিক কাজে আত্মনিয়োগ করেন। এমনিভাবে কাটে বেশ কয়েক বছর। ইতিমধ্যে সংসারে নবজাতক এবং নবজাতিকার আগমন ঘটে। হাঁটি-হাঁটি পা পা করে তারা চলতে ফিরতে শেখে এবং ক্রমে স্কুলে যায়। ওরা স্কুলে যাওয়ার সংগে সংগে মায়ের মনে এবার অন্য চিন্তার ওঠাপড়া। সংসারের খরচ বেড়েছে। এবার চাকরিতে ফিরে গেলে কেমন হয় এই চিন্তা করেন তিনি। সংগে সংগে পুরোনো দিনের নানা ছবি স্মৃতির পথ থেকে ভেসে উঠে তাঁর সামনে হাজির হয়। তিনি উজ্জীবিত হন। কিন্তু সেই জীবন যে আর পুরোটা ফিরে পাওয়া যাবে না তা তিনি বোঝেন। তবু [illegible] সংসার অনেক [illegible] এই একঘেয়েমিরও অবসান

হবে। নিশ্চিন্ত অবসরে অনেকদিন তো বিবাহিত জীবনের স্বাদ উপভোগ করা গেল। এবার পুরোন জীবনে ফিরে নতুন-ভাবে এই জীবনকে উপভোগ করা যাক।

এই সমস্যাই কিন্তু আমাদের দেশে বিয়ের পক্ষে অন্তরায়। অর্থনৈতিক সমস্যায় আমরা এতো জর্জরিত যে বিয়ের কথা ভাবা যেন আমাদের পক্ষে মহা অপরাধ। প্রসঙ্গ উঠলেও আমরা তেমন আমল দিতে চাই না। সাত-পাঁচ কথা তুলি। যুক্তিতে না আঁটতে পারলে অমোঘ অস্ত্রে হাত বাড়াই। এইতো হাল তারপর আর বিয়ের চিন্তা করা যায় না। সে চিন্তাও ঘোরতর অন্যায়। আমাদের অক্ষমতায় যদি ভবিষ্যৎ বংশধর প্রশ্ন করে তো দেবার মতো জবাব জানা নেই। তাই সবদিক ভেবে এধরনের চিন্তা থেকে বিরত থাকাই ভাল। আগেই বলেছি যে একটা সময়ে শুধু ছেলেরাই এরকম সিদ্ধান্তের অধিকারী ছিলেন কিন্তু এখন আর তা নয়। কারণ, শিক্ষার প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে আমাদের মেয়েরা সর্বত্র নিজের স্থান করে নিচ্ছেন। যথাযথ যোগ্যতায় নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করছেন। সুতরাং সবকিছুর মতো এ ব্যাপারেও সিদ্ধান্ত নেবার ক্ষমতা তাঁদের আছে।

কিন্তু অর্থনৈতিক টানাপোড়েনই হলো আজকের মূল সমস্যা। যেখানে দুজনেই চাকরি করে সেখানে বিয়ে এতটা আটকাচ্ছে না। কিন্তু সর্বত্র এরকম অবস্থা নয়। সাধারণ রোজগার যার এরকম, ছেলে যেমন বিয়ে করতে সংকোচ বোধ করে তেমনি মেয়েও ভাবে যে এরকম জায়গায় বিয়ে হলে সেই সমস্যায় ভুগতে হবে। কিন্তু অদূর ভবিষ্যতে এ সমস্যার সুরাহা হওয়া সম্ভব নয়। আবার আমরা সংস্কার ফিকে হওয়ার দোহাই যতই পাড়ি না কেন এখনও নানা সংস্কারের বেড়াজালে আমরা আটকা পড়ে আছি। পুরুষদের কেউ কেউ এখনও মেয়েদের চাকরি করা পছন্দের চোখে দেখেন না। যদিও তাঁরা মেয়েদের সঙ্গে ঘোরাফেরা খুবই পছন্দ করেন। এই সংস্কারের আসল কারণ হলো মানসিকতা। এক অদ্ভুত মানসিক রোগে তাঁরা ভুগছেন। এ ব্যাধি নিরাময়ের একমাত্র ওষুধ হলো উদার দৃষ্টিভঙ্গি।

এদিকটা ছেড়ে অন্যদিকের কথা ভাবা যাক। স্বামী এবং স্ত্রী চাকরিজীবী। দুজনেরই সারাদিন কেটে যায় কর্মক্ষেত্রে। প্রকৃত অর্থে তাঁরা বিবাহিত জীবনের আনন্দ উপভোগ থেকে বঞ্চিত থেকে যান। নীল আকাশ এবং বিকেলের শোভা দেখার সুযোগ তাঁদের ঘটে না। একজন বন্ধুকে আক্ষেপ করে বলতে শুনেছি যে অফিস ছাড়তেই সন্ধ্যে গড়িয়ে যায় তাই বিকেল যে কি বস্তু তা বুঝে উঠতে পারি না। অথচ বিয়ের পর মেয়েরা যে চাকরি ছেড়ে দেবে সেরকম কোন সুযোগও নেই। তাহলে সংসার অচল হয়ে যাবে। এভাবে দেখা যায় যে বিবাহিত জীবনের মাধুর্য থেকে ওরা বঞ্চিতই রয়ে গেল। স্বামী-সংসার-সন্তান সবই হলো কিন্তু একটা প্রচণ্ড অপ্রাপ্তির বেদনা ওঁদের গ্রাস করে রাখে। জীবনের সিঁড়ি ভাঙতে ভাঙতে ওঁরা এই বেদনায় গুমরে ওঠেন। কিন্তু সরাসরি বিদ্রোহ করার কোন পথ খোলা নেই।

এদিকে বিয়ে করতে করতে দুজনেরই বয়স বেড়ে যায়। সবচেয়ে মজার কথা যে আমাদের গৌরীদানের দেশে এখন অবস্থা যা দাঁড়িয়েছে তাতে বিয়ের কোন নির্দিষ্ট বয়স নেই। সবাই এ ব্যাপারে ভেবেচিন্তে পা বাড়ানোর পক্ষপাতী। অবশ্যই ব্যাপারটা ভাবনাচিন্তাসাপেক্ষ। কিন্তু পশ্চিমী দেশগুলি পূর্বে এই চিন্তার পরিপোষক হয়েও এখন আর সে মতবাদে নিজেদের আটকে রাখেন না। বরং উল্টোটাই করে চলেছে। বিয়ের ব্যাপারে ওঁরা একটু দ্রুত এগুচ্ছেন। আর আমরা পেছিয়ে যাচ্ছি। অর্থনৈতিক সমস্যার সুরাহা না হলে এই অবস্থা থেকে কবে নাগাদ মুক্তি পাওয়া যাবে সে ভবিষ্যদ্বাণী করা সম্ভব নয়। তবু এরই মধ্যে একটু ভাবনার অবসর আছে। বিয়ের ব্যাপারটা একটু তাড়াতাড়ি মিটিয়ে ফেলার চেষ্টা করা যায় কিনা সেটাই ভাববার কথা।

চাকরি আমাদের দেশে অঢেল নয়। আর সব মেয়ে চাকরি করতেও চায় না। সেদিক থেকে ভেবে এবং যে মেয়েরা চাকরি করতে চান তাঁদের কথা মনে রেখে একটা নতুন পথের কথা চিন্তা করা যাক। বিয়ে যদি একটু তাড়াতাড়ি নিষ্পন্ন করা যায় তবে বোধহয় এ সমস্যার একটা সুরাহা হয়। বিয়ের পর বেশ কয়েক বছর নিশ্চিন্তে ঘরসংসার করা গেল। ইতিমধ্যে নবজাতক বা নবজাতিকার আগমন ঘটলে মায়ের অভাব সে আর অনুভব করবে না। এর ফলে মায়ের অভাবে সন্তানের গোড়ার ভিত যেভাবে দুর্বল হয়ে যায় সে সম্ভাবনাও আর থাকছে না। বিশেষ প্রয়োজনীয় সময়টা মা নিজেই সন্তানকে আগলাতে পারছেন। তারপর সন্তান স্কুলে যেতে শুরু করলে মা সুযোগ-সুবিধা বুঝে সংসারের বর্ধিত খরচের দায় মেটাতে এবং সংসারকে আরো স্বচ্ছল করতে চাকরি নিলেন।

এটাই বোধহয় এই সংকট থেকে ত্রাণের একমাত্র পথ। না হলে এ অবস্থা চললে সংসারজীবন আমাদের দেশে বিপর্যস্ত হয়ে পড়বে। চাকরির প্রাচুর্য এজন্য প্রয়োজন। আমরা আশা করবো চাকরির ক্ষেত্রে আজকের নৈরাশ্যজনক অবস্থার অবসান ঘটবেই। তখন সমস্যা এতোটা সুতীব্র থাকবে না। সেই সঙ্গে বিবাহিত জীবন উপভোগের জন্য চাকরি ছেড়ে দিয়ে আবার চাকরিতে ফিরে আসার কথাও ভেবে দেখতে হবে। বয়সের দোহাই পেড়ে তখন তাঁদের ফিরিয়ে দিলে চলবে না। এ ব্যাপারে একটি পরিকল্পিত উদ্যোগ বাঞ্ছনীয়।

—[illegible]

পল ভালেরি

বিজয় দেব

বিশ শতকের উল্লেখযোগ্য ফরাসী প্রতীকবাদী কবি পল ভালেরি। কবি এবং সমালোচক বলে তিনি সুপ্রতিষ্ঠিত হয়ে আছেন ফরাসী সাহিত্যে। ১৮৭১ সালের ৩০শে অকটোবর ভূমধ্যসাগর তীরবর্তী 'সীতে' বন্দরে জন্মগ্রহণ করেন। বাবা ফরাসী মা ইতালীয়ান। বাল্যকালে ছুটীর অবসর কাটতো ইতালীতে বিশেষ করে জেনোয়ায়। যার অত্যুৎকৃষ্ট স্থাপত্যশিল্প তাঁর মনে স্থায়ী ধারণা বিস্তার করে। স্কুলে পাঠরত অবস্থায় তাঁর ভাল লাগতো কাব্য। ভাল লাগতো স্থাপত্যশিল্প। ১৮৮৯ সালে একদিন কাব্যের জগতে আবিষ্কার করে বসলেন দুটো নাম : মালার্মে ও ভেরলেন। ১৮৯০ সালে অপ্রত্যাশিত সাক্ষাৎ ঘটে পিয়ের লুই এবং আঁদ্রে জিদের সঙ্গে। তখন পল ভালেরি প্যারিসে। তরুণ কবি বলে পিয়ের লুই তখন প্রায় প্রতিষ্ঠিত। মঁত পেলার বিশ্ববিদ্যালয়ের ৬ শত সমাবর্তন উৎসবে পিয়ের লুই ভালেরির সঙ্গে পরিচিত হবার সুযোগ লাভ করেন। এবং পিয়ের ভালেরিকে প্যারিস গোষ্ঠীর সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেন। তারপর একদিন একুশ বছরের আঁদ্রে জিদ প্যারিসে এলেন ছুটী কাটাতে। সেই সময় ভালেরির সংস্পর্শে এসে পড়েন। ভালেরির হাতে তুলে দেন মালার্মে এবং ভেরলেনের কাব্য। ১৮৯১ সালের শেষের দিকে কোন এক সন্ধ্যায় বিখ্যাত কবি মালার্মের সঙ্গে পল ভালেরি দেখা করেন। যার প্রভাব ছড়িয়ে রয়েছে তাঁর সমগ্র রচনার কেন্দ্রবিন্দুতে। বস্তুতঃ নিঃসন্দেহে ভালেরি যে কোন কারণেই মহৎ কবি বলে চিহ্নিত। ভাষা এবং ছন্দবিষয়ক ধারণায় দক্ষ। তাছাড়া তিনি ছিলেন বিমূর্ত বিষয়ের সঙ্গে ইন্দ্রিয়জ প্রতিমূর্তির সংযম প্রকাশ করার ক্ষমতার একমাত্র অধিকারী যা ফরাসীকাব্যে প্রায় অপ্রতিদ্বন্দ্বী।

পল ভালেরির ১৯২৫ সালে ফরাসী আকাদমীতে আনতোল ফ্রাঁসের পদ অধিকারের সম্মান লাভ করেন। তাছাড়া তাঁর জীবনে যে অপ্রত্যাশিত গৌরব প্রতীক্ষায় দিন গুনেছিলো তা হলো ১৮৮৫ সালের ২২শে মে'র ভিক্তর হুগোর জীবনেরই পুনরাবৃত্তি মাত্র। সেদিন হুগোর অন্তিমযাত্রা রাজকীয় সম্মানে অলংকৃত ছিলো। তারপর এলো ১৯৪৫ সালের ২০শে জুলাই, দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ প্রায় শেষ। দা গল প্রশাসন ভালেরির মহাপ্রয়াণকে রাজকীয় সম্মানে ভূষিত করে তাঁর মরদেহ কবির অভিলাষ অনুযায়ী সিন্ধুতীরের সমাধিভূমিতে সমাহিত করেন। ফ্রান্সের ইতিহাসে এক উল্লেখযোগ্য ঘটনা।

ভালেরির কবিতা তখন Ermitage, Conque এবং Revue Independante এ প্রায়ই প্রকাশিত হতো। এমন কি তরুণ প্রতীকবাদী বলে নিজেকে পরিচয় দিতেও তিনি কুণ্ঠাবোধ করতেন।

তাঁর জীবনে যে ঘটনা সবচেয়ে গভীর আলোড়ন সৃষ্টি করে তা হলো ১৮৯২ সালের কোন এক রাতে লিগারিয়ান উপকূলে সংঘটিত প্রচণ্ড ঝড়। সে রাত কাটে ভালেরির নিদ্রাহীন অবস্থায়। সে স্মৃতি বহন করে তিনি লন্ডন এবং প্যারিসের উদ্দেশ্যে পাড়ি দেন। লন্ডনে তিনি জর্জ মেরিডিথের সঙ্গে দেখা করেন। প্যারিসে ফিরে আসার পরই লিও' দোদে তাঁকে দা ভিঞ্চি সম্বন্ধে লিখতে অনুরোধ করেন। সাহিত্য সমালোচক হিসেবে ভালেরির যেমনি ছিলো কৌতুহল তেমন তিনি আরোপ করতেন গুরুত্ব। কবিতা সম্বন্ধে তাঁর ধারণা ছিলো রোমান্টিক আলোচনার চেয়েও উত্তরতঃ রহস্যমূলক এবং বিজ্ঞানভিত্তিক। ১৮৯৫ সালের ১৫ই আগষ্ট Nouvelle Revue পত্রিকায় ভালেরির Introduction to the method of Leonardo da Vinci প্রকাশিত হয়।

এই রচনা মূলতঃ শিল্পের আলোচনা। ভালেরির মতে শিল্প কর্ম যে মনের মধ্যে উপস্থাপিত হয় সেখানে সে স্বভাবতঃ প্রভাব বিস্তার করে। এমন কি, রাসায়নিক প্রক্রিয়ার মনোযোগ আরোপ করলেও শিল্পকর্ম 'রহস্যময়' রূপে অপরিবর্তিত থাকে, এবং সেই শিল্পকর্ম অধিকতরভাবে প্রভাব বিস্তার করে সাহিত্যের বিশেষ কোন বিভাগ কাব্যে। গদ্যের ও একমাত্র ইন্দ্রিয়গোচর বস্তুর জন্য চেতনা বর্তমান। কিন্তু কবিতায় ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তু শুধুমাত্র রহস্যময় নয় আপাতঃদৃষ্টিতে অধিকতর ইন্দ্রিয়াতীত।

গদ্য এবং কবিতা কি মূলতঃ মানবীয় দিক থেকে পরস্পর যোগাযোগের রীতি নয়? যুগে যুগে সভ্যতার সঙ্গে সঙ্গে যে প্রণালীর বিভিন্ন ভূমিকা পৃথক উদ্দেশ্যে তা ব্যবহৃত হয়েছে। প্রাচীন গ্রীসে কবিতাকে ইতিহাস বা কাহিনীর জন্য ব্যবহার করা হতো। এমন কি গ্রীক এবং এলিজাবেথীয় যুগে নাটকের আঙ্গিক হিসেবে তা ব্যবহৃত হতো। যদি ভালেরির সংজ্ঞা নির্ভুল বলে প্রমাণিত হয় তবে হোমর, ভার্জিল, দান্তে, শেকস্‌পীয়র এবং গ্যয়টে সম্বন্ধে কি তা প্রয়োগ করা চলে? তাঁরা প্রত্যেকে যে অনুভূতি, ইঙ্গিত দিয়ে 'সঠিক ধারণা'কে জ্ঞাপন করেছেন এবং সংজ্ঞাগুলো যেভাবে গঠিত হয়েছে তা ভালেরি, মালার্মে বা প্রতীকবাদী যেকোন কবিদের উপরই প্রযোজ্য হতে পারে।

১৮৯৭ সাল থেকে ১৯০০ সাল পর্যন্ত ভালেরি সমর বিভাগে কাজ করতেন। তখন মালার্মে গোষ্ঠীভুক্ত মাদমজোয়েল গোবিলার্দের সঙ্গে পরিচয় ঘটে এবং পরিণতিতে বিয়ে হয়। সেই সময়ই হাভানা নিউজ এজেন্সির সঙ্গে ভালেরি নিজেকে যুক্ত করেন।

১৮৯৮ সাল থেকে ১৯১৭ সাল পর্যন্ত ভালেরির কোন রচনাই প্রকাশিত হয়নি। যদিও এই সময়ে তিনি কোন কবিতা রচনা করেন নি, তবুও তাঁর মন যে সাধনায় তন্ময় ছিলো তাহলো তাঁর চিন্তাশৈলী আবিষ্কার। 'যেদিনের জন্য আমার প্রতীক্ষা তা আর এলো না।' ১৮৯৮ সালে মালার্মে মারা গেলেন। ভালেরি তখন ব্যক্তিগত সংকট অতিক্রম করছেন। সেই সঙ্গে যুক্ত হলো মালার্মের মৃত্যু সংবাদ। তাছাড়াও ভালেরির নৈতিক এবং বুদ্ধিগত সংকটের মূলে ছিলো দুর্ভাগ্যজনক প্রেমপর্ব।

ভালেরি রাতের পর রাত কাটিয়েছেন আবেগের সঙ্গে তীব্র সংগ্রাম করে : 'সংকল্পকে যথাস্থানে ফিরিয়ে আনা হলো ... ঝড়ের রাতে সেই মহৎ সংকটে যে মহার্ঘ বিজয়লাভ ঘটে তাহলো লিগুরিয়ান উপকূলের ঝড়ে বৃষ্টির আধিক্য ছিল না। কিন্তু বিদ্যুতের মুহুর্মুহু চমক দিব্যলোকের ভ্রান্তি ছড়িয়ে দিয়েছিলো।' এখানে গুরু মালার্মের কাছ থেকে দূরত্ব বাঁচিয়ে এগিয়ে চলেছিলেন যা শিল্পীমাত্রেরই

একান্ত কাম্য।

তাঁর রচনা 'La Jeune Parque' ফরাসী ভাষায় দুরূহতম কবিতা বলে পরিচিত। এই কবিতা প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে যা স্পষ্ট হলো তা ভালেরি স্বাতন্ত্র্যবোধে নিজকে চিহ্নিত করে নব দিগন্তের আলোকে রচনাকে উদ্ভাসিত করে রেখেছেন। এখানে কোন তথ্য বা প্রেরণার ইঙ্গিত নেই বরং তিনি এখানে মানবিক আয়তনে একটি অভিজ্ঞতাকে ব্যবহার করেছেন। এই রচনায় প্রত্যক্ষ করা যায় স্বপ্ন এবং জাগরণের সীমান্ত। যেখানে অদ্ভুত তাৎপর্যপূর্ণ প্রতিমা, উজ্জ্বলতা, বৈশিষ্ট্যহীনতা অস্পষ্ট পশ্চাদভূমিতে ক্রমশঃ বিলীয়মান। এবং সেই মুহূর্তেই আমাদের বোধশক্তিকে দেখা যায় স্বপ্নের অর্ধচৈতন্য বিশৃংখলায় পুনরায় ডুবে যেতে। এই স্বপ্ন পৃথিবীই আত্মার অংশমাত্র। এই রচনা সম্পর্কে থিবোদে বলেছেন : 'যুদ্ধের সংকটকালে এর প্রকাশ এমন কি মালার্মের 'Afternoon of a Faun' এর চেয়েও দুর্বোধ্য বলে প্রতিভাত।' তাছাড়া সমালোচকদের কাছে এই কবিতা ভালেরির শ্রেষ্ঠ অবদান হিসেবে স্বীকৃতি পেতে বিন্দুমাত্র অসুবিধে হয়নি।

'La Jeune Parque' প্রকাশিত না হলে গদ্যের পাশাপাশি কাব্যের জন্য ভালেরিকে দ্বিতীয় শ্রেণীভুক্ত প্রতীকবাদী কবি বলে চিহ্নিত করা যেতো। মূলতঃ এই কবিতা এক হিসেবে মালার্মের প্রক্রিয়া এবং বিষয়বস্তুর ধারাবাহিকতায় পরিণতি-সদৃশ বলে চিহ্নিত হয়ে আছে। এই কবিতার বিষয়বস্তু পবিত্র আত্মার নাটক বলে নির্দিষ্ট। এখানে বিশেষ চেতনার অবয়ব, বুদ্ধিজীবির জীবনে অস্তিত্ব এবং অনস্তিত্ব যা নিজের জাগ্রত অবস্থাকে বিস্ময়ের সঙ্গে প্রত্যক্ষ করে। বিরাট চেতনায় আত্মার জন্মবৃত্তান্তের মধ্যে নিহিত হয়ে আছে কবিতার গূঢ়রহস্য। যেমন ভালেরি বলেছেন : 'যথার্থ প্রসঙ্গ হলো মনস্তত্ত্ব প্রতিফলনের অনুক্রমের চিত্রমাত্র, এবং মূলতঃ রাত্রির পরিমাপে চেতনার পরিবর্তন। আমি এমন কি অবিশ্বাস্য প্রচেষ্টার বিনিময়েও একটি জীবনের সুরের পরিবর্তন ব্যাখ্যা করতে চেয়েছি।'

১৯২২ সালে লেখা চিঠিতে ভালেরি মঁসিয়ে লা ফঁতেন (La Fontane) বলেছেন যে, 'তাঁর কবিতা জাগরস্বপ্নমাত্র। সেখানে জাগর স্বপ্নের অমিল, নতুনত্বকরণ এবং আকস্মিকতাও বর্তমান। সেই সঙ্গে জাগরস্বপ্নে সচেতন চেতনাই উভয়তঃ অভিপ্রায় এবং জ্ঞেয় বিষয়। কল্পনা করুন কেউ মধ্যরাতে জেগে উঠছে এবং সমগ্র জীবন তার সামনে এসে দাঁড়িয়ে তার সম্বন্ধে কথা বলছে। কামুকতা, স্মৃতি, আবেগ, দৈহিক অনুভূতি, স্মৃতির গভীরতা। এমন গ্রন্থিযুক্ত সত্তার শুরু নেই, শেষ নেই। আমার স্বগত উক্তির মধ্যে আমি যা আরোপ করেছি তা হলো মানুষ শুরু করার আগে নিজের [illegible] বিষয়ের উন্মোচনের মতই কঠিন।'

দৈহিক সত্তার মধ্যেই নাটকীয় [illegible] [illegible] নিহিত। যেমন একদিকে [illegible] অনুসন্ধান হলো অনিয়ন্ত্রিত চেতনা [illegible] একমাত্র শক্তি হলো প্রচলিত জীবন থেকে বিচ্ছিন্নতার দায়িত্ব। অন্যদিকে মনের [illegible] বস্তু অবস্থান। যা স্বাভাবিকভাবে [illegible] আনন্দদায়ক জীবন এবং তার [illegible] সহজভাবে গ্রহণ করে অহরহ সেই [illegible] জড়িত দুটো অবস্থা। তখন [illegible] অপরিহার্য ভাবে পরিবর্তনশীল হয়ে প্রথম পর্যায়ের অখণ্ড বিশৃংখলার [illegible] পরিত্যাগ করেছে বলেই অনুক্ষণ জীবনের অনধিকার প্রবেশে তা দূষিত হচ্ছে।

এইভাবেই আমাদের কাছে স্পষ্টতঃ প্রতীয়মান হয় বুদ্ধিবাদী ও সৌন্দর্যতত্ত্বের সমস্যা। যা ভালেরিকে পূর্ণভাবে অধিকার করে রেখেছে।

'La Jeune Parque' হলো ভালেরির অনুভূতিপ্রবণ বুদ্ধিবাদী কবিতা। [illegible] গ্রীক আত্মকথায় কবিতাটি সংযুক্ত [illegible] প্রচলিত ফরাসী কাব্যে অন্তর্ভুক্ত হয় [illegible] ভালেরিকে তাই বলতে শুনি : 'আমার রীতি, আমার প্রণালী এবং [illegible] ভঙ্গুর অবস্থার সঙ্গে প্রাচীন গ্রীস [illegible] রোমের শ্রেষ্ঠ লেখকদের অননুকরণীয় প্রয়োগরীতির বিস্ময়কর সংযোগ [illegible] সপ্তদশ শতাব্দী [illegible] এবং কি এই রচনায় প্রত্যক্ষ করা যায়। [illegible] [illegible] শয্যায় [illegible] অবস্থায় [illegible] [illegible] তার অর্থাৎ জাগরস্বপ্নে কবি স্বয়ং [illegible] এক সীমা এবং [illegible] পরিমাপের জন্য মানবিক চেতনার পরিক্রমণ : [illegible] নির্জন ভাবনা, কর্ম, নিদ্রা এবং [illegible] নিষ্ক্রিয় ধ্যানে এসেছে জীবনের সঙ্গে [illegible] সংঘাত। সে এখানে সহানুভূতিহীন বোধের অস্তিত্ব যার ধর্মই হলো সার্বজনীনতা এবং সেই সঙ্গে দুর্লভ নবীন সুলভ গুণে ভূষিতা। যা কবির মনের প্রতিমা সদৃশ। যার মাধ্যমে কবি তাঁর বোধের চেতনার বাস্তবতা এবং সার নিয়ে ধ্যানে মগ্ন হতে পারেন।

ভালেরি লিখেছেন : 'যারা আমার কবিতার পাঠক কি করে হওয়া যায় সে বিষয়ে পরিচিত তারা অপর্যাপ্ত সারবস্তুর জন্য আত্মজীবনীর প্রতিমূর্তি অবশ্যই পাঠ করবেন...আমি তারা থেকে শুরু করেছি বলে একটি পৃষ্ঠার আয়তনে এই কবিতাকে দীর্ঘ করার সুযোগ পেয়েছি।'

ভালেরি ব্যক্তিগতভাবে কাব্যের কাহিনীবস্তুকে গদ্যের রীতিতে সংরক্ষণ করে রাখার সর্বপ্রকার প্রচেষ্টাকে নিন্দনীয় বলে ঘোষণা করেছেন। তিনি জানতেন যে, কবিতার কাহিনী বা বিষয়বস্তু মূল্যায়নের পক্ষে নিতান্ত তুচ্ছ এবং নিরর্থক যেমন কোন বিমূর্ত শিল্পের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য।

কবিতার নাম এখানে অধিক বুদ্ধিশক্তিসম্পন্ন। কারণ বিশুদ্ধ আত্মার ভালেরির প্রত্যক্ষরূপে দর্শন করেছেন নতুন নিয়তিকে। 'La Jeune Parque' পতিমূর্তি থেকে জীবনের আলোকে এসে কোন দূরবর্তী থেসেলীয়ান সমুদ্রতটে জেগে উঠে। তার জাগরণ, তার ভাবনা, তার ধ্যান, বিকশিত তৃণপুষ্পের মধ্য দিয়ে পদচারণা। তাকে ঘিরে পার্থিব প্রতিক্রিয়া, তার সর্পের ভয় এবং পবিত্রতার তরে আকুল আকাঙ্ক্ষা সহজেই বোধগম্য।

এখানে কিছুই বর্ণনা করা হয় নি। বরং প্রতিটি বক্তব্য শব্দের পরিমিতিতে ব্যঞ্জনায় বা ইঙ্গিতে নির্দিষ্ট। ভালেরি আমাদের কোন গ্রাহ্য মুহূর্তে কোন এক নির্জন সমুদ্রতটের শিলাস্তরের উপর দিয়ে যান। তিনি সেখানে প্রতিমায় সংযোগ স্থাপন করেন: একটি বাহু, এক ফোঁটা অশ্রু, গহ্বরময় পাহাড় ও সমুদ্রের আকস্মিক জোরে আকর্ষণ এবং সশব্দে পতিত দীর্ঘ নিঃশ্বাস, সেই সঙ্গে জাগরিত ভাবনার তীব্র যন্ত্রণা।

'La Jeune Parque' কবির মানসলোকের প্রতিমাসদৃশ। সেখানে কামনা-বাসনাকে অস্বীকার করে অশ্রুতে, করুণায়, বিশুদ্ধ আবেগে স্পষ্ট করে তুলেছেন : Tris imminent larme, et seul a me repondre.......'

'আমার অনুরূপের সাড়া নিটোল এক ফোঁটা অশ্রু...'

আঁদ্রে জিদ্ এই কবিতায় পেয়েছিলেন আত্মজিজ্ঞাসার আধিক্য। কিন্তু যখন এর বিষয়বস্তু মনের আন্তরিক আত্মপরীক্ষণকে নির্ভর করে গড়ে উঠেছে সেখানে এ ধরনের দুর্লভ আলোচনা প্রায় গ্রহণযোগ্য। কোন কোন অংশে দেখেছেন নম্র গুণের সমাবেশ যা একমাত্র মালার্মের কাব্যেই ঘনিষ্ঠ।

মালার্মের Herodiane-এর সঙ্গে ভালেরির La Jeune Parque এর প্রায় তুলনা করা সংগত। ভালেরি এই কবিতায় যে সার্থকতার সোপানে আরোহণ করেছেন তার জন্য মালার্মে বহু পূর্বে ব্যাকরণের সম্পর্ক শূন্য কাব্যের বিশিষ্ট সৌন্দর্য সৃষ্টির স্বপ্নে বিভোর ছিলেন।

কাব্যে যে উন্নত চিন্তাশীলতা এবং বিশুদ্ধতার জন্য সারা জীবন মালার্মে কঠোর সংগ্রাম করেছেন তা যেন ভালেরির পক্ষেই সম্ভব হলো। ভাষার অনুপম অসীম ক্ষমতার মাধ্যমে বাক্য গঠনের অজ্ঞাত বিভিন্ন দিক যেন উদ্ঘাটিত হয়ে উঠলো। মালার্মে সে সাফল্য সম্মানিত ছিলেন। শিষ্য ভালেরির জন্য হয়তো অলিখিতভাবে নির্দিষ্ট ছিলো যে বিশ্লেষণ এবং পদবিন্যাসের ঘনিষ্ঠতার ভাবনা এবং শব্দের অধিকতর পূর্ণতা বিকশিত হবে যা চিরায়ত শিল্পের ভবিষ্যৎ ধারণাকে গঠন করবে।

ভালেরির কাব্যের মধ্যে বহু আলোচিত প্রশংসিত এবং অনূদিত কবিতা 'Le Cimetiere Marin'. পল ভালেরির জীবিতকালেই বহু ব্যাখ্যায় ভূষিত এই কবিতা উজ্জ্বল হয়ে আছে। এই কবিতায় দীর্ঘ নিরুদ্যম সময়ের বিরতির পর ভালেরি প্রত্যাবর্তন করেছেন। এখানে *কবি সমুদ্রতীরবর্তী সমাধিভূমির পাশে মধ্যাহ্নে এসে থেমেছেন।* সূর্য মাথার উপরে, ছাদের উপর দিয়ে যেমনি ঘুঘু চলে যায় তেমনি জলের সমতলের উপর দিয়ে ভেসে চলেছে সূর্য। সেই মুহূর্তে পৃথিবীর প্রতিমাকে দেখাচ্ছে পূর্ণ, যার দিকে ভালেরি মুখ রেখেছেন। এবং দীর্ঘ বছরগুলোতে তিনি আবিষ্ট ছিলেন। তবুও তিনি চীৎকার করে বলে উঠছেন : 'হে মধ্যাহ্ন তোমার সমগ্র নিশ্চলতায় আমি তোমার মধ্যে রহস্যময় রূপান্তর। আমি তোমার প্রকাণ্ড হীরের মধ্যে আকস্মিকভাবে প্রচণ্ড প্রকাশ।' কিন্তু যারা মৃত তারা নীচে শায়িত, আবার তারাই শূন্যে মিলিয়ে গেছে। এবং প্রকৃতির নিস্তেজ অংশরূপে চিহ্নিত। পৃথিবী গতির বৃত্তে আবার প্রবেশ করে এবং সেই সঙ্গে কবিও জীবনে ফিরে আসেন।

গুস্তাফ কোহেন মন্তব্য করেন : 'একটি দ্বিপদী বিয়োগান্ত কাব্য। এখানে পাঁচ অংক নয় চার। গীতিধর্মী এবং নাটকীয় সংলাপে গ্রীক ট্র্যাজেডির তিনজন অভিনেতা। প্রধান অভিনেতা এখানে অনস্তিত্বের ভূমিকায়, দ্বিতীয় চরিত্র মানব এবং কবির চেতনা, তৃতীয় ব্যক্তিই লেখক নাটকে একই সঙ্গে অভিনেতা এবং দর্শক, যা সে আবেগভরে ধ্যান করছে।' ভালেরি কোহেনের মন্তব্য পড়ে লিখেন : 'আমার কাব্যবোধের জগতে যা বিচরণশীল এবং তাদের সহৃদয় পাঠকই তা দান করেছেন।'

ভালেরির মত বিবেকসম্পন্ন মনের কাছে একটি কবিতা কখনো সম্পূর্ণ নয় কিন্তু কোন এক পর্যায় আসে তখন তা পরিত্যাজ্য। 'Le Cimetiere Marin' কবিতা ছন্দ সম্বন্ধীয় প্রতীক থেকেই সৃষ্টি যা কবিকে আবিষ্ট করে রাখতে সক্ষম হয়েছিলো।

এখানে বিষয়বস্তুর সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে সমুদ্র, আলো, ভূমধ্যসাগরের কোন উপকূলে সেঁতের সমাধিভূমি। কাহিনী মৃত্যুতে কেন্দ্রস্থ যা বিশুদ্ধ ভাবনাকে গভীরভাবে স্পর্শ করে।

ভূমধ্যসাগর আবির্ভূত হলো পৃথিবীর কেন্দ্র।

বিশুদ্ধ সুরার রঙের সাগর যা ভালেরির চিন্তার পটভূমিকায় ছিলো অপরিহার্য। যার ফলে তিনি তার চিরায়ত আত্মাকে সনাক্ত করতে সক্ষম হয়েছেন।

তাঁর একমাত্র মিনতি পাঠকরা যেন সময়ের তাৎপর্য নিয়ে একবার ধ্যানে মগ্ন থাকে। ভালেরি আবার জীবনের দিকে ফিরে তাকিয়েছেন। সাগরের দিকে স্থির কবিতায় অস্তিত্বের স্তব সংগীতের সঙ্গে সঙ্গে যেন অন্তিম স্তবকের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হয়ে চলেছে অনন্ত কালের সমুদ্র-বায়ু।

ভালেরির কাব্যিক প্রতিভার সাফল্যের সঙ্গে জড়িত হয়ে আছে ১৯২২ সালে প্রকাশিত গীতিধর্মী রচনা 'Charmes' প্রায় কবিতাই 'Le Jeune Parque' র পরবর্তী পর্যায়ের। তখনই ভালেরি কাব্য নিয়ে গবেষণা এবং গীতিধর্মী গুণের *তৎপরতায় মগ্ন ছিলেন, যা অনুক্ষণ তাঁকে সুখী করে রেখেছিলো।*

ভালেরি যখন এই কবিতাগুলো রচনা করেন তখনই মালার্মে ভেরলেনকে লিখিত চিঠিতে মন্তব্য করেছিলেন : 'স্থাপত্য বিষয়ক এবং পূর্ব পরিকল্পিত রচনা। প্রেরণার সুযোগে রচিত সংগ্রহ নয়। মোট কথা অপূর্ব।' এই হলো ভালেরির সেই 'Charmes' এখানে দ্বিতীয় কবিতা 'Au Platane' প্রতীকের ব্যবহারে মনকে দেহের সীমিতত্বকে বন্দী হিসেবে দেখানো হয়েছে। নৈরাশ্য এবং সীমাবদ্ধতার অনুভূতি এই দীর্ঘ কবিতায় ব্যক্ত হয়ে আছে।

'Charmes' এর প্রথম পর্ব La Dormeuse এ ঘুমন্ত কন্যা অলিখিত কবিতার ইঙ্গিত বহন করে। যা কবির মনে প্রতীক্ষারত অবস্থায় রয়েছে। এখানে কবিকে প্রস্তুতি এবং তাঁর কবিতায় প্রথম পদক্ষেপকে ব্যঞ্জনাময় করে তোলা হয়েছে।

দ্বিতীয় অংশ 'Fragments du Narcisse'-র মধ্যে কবিকে দেখা যায় আত্মবিশ্লেষণ এবং উন্মাদনার পর্যায়ে।

'Charmes' এর গীতিধর্মী সুর সৃষ্টির বুদ্ধিবাদী কার্যক্রমকে প্রকাশ করেছে যা কবিতায় পথ দেখিয়ে নিয়ে যায়। সুযোগ, ভ্রমণ অথবা বিলম্বিত ধ্যানের মাধ্যমে বিভিন্ন দিক থেকেই কবিতার মধ্যে প্রবেশ করা যায়। এখানে বিশেষ আকর্ষণীয় হলো অন্তর্দৃষ্টি যা দ্বারা কবির মানসলোককে উদ্ভাসিত করে রাখা হয়েছে।

'Ebauche d'un Serpent' এ দীর্ঘস্থায়ী এবং ধৈর্যসহ ধ্যানের পরিণতি। যার চুম্বক হলো জ্ঞান। কবির চিন্তাশক্তির সচেতনতার সঙ্গে বিশ্বের সংযোগ ঘটেছে। এবং তার প্রতিফলন তাঁর ভাবনায় পড়েছে। এই কবিতা সুগভীরভাবে আত্মিক এবং একই সঙ্গে আমোদজনক হয়ে উঠেছে। মূলে বিষয়বস্তু হলো ঈশ্বর প্রলোভন এবং শয়তানের প্রতিক্রিয়ায় সৃষ্টিক্রমের সম্পর্ক। যা এখানে কবিকেই বোঝায়। সাপ এখানে কবির ভাবনার প্রতীক। তাঁর সচেতনজ্ঞানের প্রতীক সূর্য। সেই সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে তাঁর উদ্ভাবনী শক্তি।

'Charmes' এর সমাপ্তি 'Palme' কবিতায়। যা সমগ্র রচনাকে সম্পূর্ণ করে। এমনকি 'Ebauche d'un Serpent' এবং Le Cimetiere Marin এর অনুসন্ধানের কিছুটা মীমাংসা এই রচনায় প্রত্যক্ষ করা যায়।

ভালেরির Variete র লক্ষণীয় বিষয়বস্তু হলো সমালোচনার একটি বিশেষ পদ্ধতি। যা সমকালীন রীতির স্পষ্ট বিরোধী। এখানে তিনি সমালোচনামূলক আলোচনাচক্র গঠনের পূর্বে কতগুলো নতুন লক্ষণ আরোপ করেছেন। এবং এইভাবেই Sainte-Beuve র প্রত্যক্ষ বিরোধী বলে চিহ্নিত হন। এখানে ভালেরি ইনটেলেকচুয়্যাল কমেডির সংজ্ঞা নির্ধারণ

করতে গিয়ে উল্লেখ করেছেন মানুষের মনের নাটক।

সমালোচনার প্রণালী সহজ করতে গিয়ে ভালেরির পদ্ধতি সম্বন্ধে আমাদের সে ধারণা জন্মে তা হলো কবির স্বস্থানে নিজেকে অর্পণ করা। দৃষ্টান্তস্বরূপ মালার্মে, পো, র‍্যাবোর উপর অংশবিশেষ এক হিসেবে ভালেরির কাছে আত্মজীবনী সদৃশ হয়ে দেখা দেয়। সমালোচকের দায়িত্ব সম্পর্কে তাঁর যে ধারণা ছিলো সে প্রসঙ্গে মন্তব্য করেছেন : "বিবেচনাধীন ভাবে লেখকদের নির্দিষ্ট চিন্তাপ্রসূত সংকল্পকে বিশ্লেষণ করা।' সমালোচকের প্রকাশভঙ্গী পরীক্ষা করে দেখা উচিত যেমন অনুভূতি, বাক্যগঠনের রীতি, প্রতিমার ধারণা যা দ্বারা কবিকে তার কর্মক্ষমতা ও বিচক্ষণতাকে প্রসারিত করতে পারেন। লা ফোঁতেন, বোদলেয়ারের উপর সমালোচনার নতুন পদ্ধতি প্রয়োগ করা হয়েছে। ভালেরির বোদলেয়ারকে ধ্রুপদী সাহিত্যিক বলে দাবী করার পেছনে রয়েছে ব্যক্তিগতভাবে তাঁর মধ্যে অঙ্কুরিত ছিলো সমালোচনার প্রবৃত্তি। ভালেরিই সর্বপ্রথম ঘোষণা করেন যে, ফরাসীরা বোদলেয়ারের কাছে ঋণী : 'কাব্যের প্রত্যাবর্তন নিজেরই অস্তিত্বে।' মন্তব্য শেষ করতে গিয়ে বলেছেন—বোদলেয়ারের মহৎ সম্মানের মধ্যে ছিলো ভবিষ্যৎ কবিগোষ্ঠীর উপর তাঁর চূড়ান্ত প্রভাব। যেমন ভেরলেন এবং র‍্যাবো বোধ এবং অনুভূতিতে বোদলেয়ার থেকে শুরু করেছেন সেখানে মালার্মে তাঁর সফলতাকে বিস্তৃত করেছেন বিশুদ্ধ কাব্যের অধিকৃত ভূমিতে। প্রসঙ্গতঃ ভালেরির বুদ্ধিবাদী বিশ্লেষণের পরিধি সৃজনশীল সংজ্ঞা এবং কবিসুলভ উন্মাদনার মধ্যে সংযোগ ঘটিয়েছে। এবং নিঃসন্দেহে বোদলেয়ারের মহৎ উত্তরসূরীরূপে ভালেরি সেখানে প্রতিষ্ঠা লাভ করেন।

ভালেরি লক্ষ্য করেছেন যে আমাদের প্রাত্যহিক প্রয়োজন—অনুভূতি, অভিজ্ঞতা প্রসূত ভাবনাকে প্রচলিত নিয়মে ধ্রুপদী শিল্পে শিক্ষিত করে তোলে। এইভাবেই চিন্তাশক্তি সব কবিতায় লক্ষণীয়। সে আপাতদৃষ্টিতেই হোক বা পরোক্ষেই হোক। 'যেমন কাব্যকে সাঁতার কেটে জলের বাইরে নিয়ে আসা।'

ভালেরির 'নোটবুক' থেকে উদ্ধৃতির সংগ্রহ ১৯২৬ সালে প্রকাশিত হয়। এখানে ঐক্যসংযোজনের কোন নির্দিষ্ট প্রচেষ্টা ছিল না। তাছাড়া কোন বিশেষ ভাবনা-দ্বারা ধারণার মধ্যে সংযোগ ঘটানোর প্রয়াস ছিল না। কিন্তু বিভিন্ন সংজ্ঞায় তা সুবিন্যস্ত ছিল। ভালেরির অতি দ্রুত ভাবনাগুলো প্রত্যেকেই স্বাবলম্বী বলে আনুক্রমিকভাবে বহুদূরে পর্যন্ত নিক্ষিপ্ত করা যায়।" আত্মজীবনীর দিক থেকে এর মূল্য অবিসংবাদিত। সেখানে দেখা যায় ভালেরির চিন্তার কার্যক্রম। এই ছিন্ন অংশগুলো ছাড়া তাঁর মানসিক কৌশল বুঝতে আমাদের পক্ষে অন্য কোন উপায়েই তা সম্ভব হয়ে উঠতো না। সমগ্র রচনা পর্যালোচনা করলে যা আমাদের কাছে ধরা পড়ে তা হলো যে কোনো প্রসঙ্গই হোক না কেন তার কাছে পৌঁছানোর রীতি তার অত্যন্ত নিখুঁত আত্মজিজ্ঞাসাসদৃশ। পরবর্তী পর্যায়ে 'নোট'-এর টুকরো টুকরো ধারণাকে সম্প্রসারিত করে ভালেরি Variete শ্রেণীতে অন্তর্ভুক্ত করেছেন। এবং সেই-সঙ্গে বহু বিষয় যেমন অতিকথা, কাব্য, স্বপ্ন, জাগরণ, চেতনা, জ্ঞানের উৎপত্তি এখানেই তিনি সন্নিবিষ্ট করে রেখেছেন।

"১৯৪০ সালের কোন একটি দিনে বিস্ময়ের সঙ্গে লক্ষ্য করলাম যে আমি দুটো স্বরের সঙ্গেই কথা বলে চলেছি এবং সেই সঙ্গে উঠে গিয়ে যা' মনে এসেছিলো তাই লিখলাম।" এইভাবেই ভালেরি তাঁর পাঠকদের সঙ্গে 'Le Solitaire' এর টুকরো অংশ 'Lust' এর পরিচয় করিয়ে দেন। অবশ্য তাঁর মৃত্যুর পর অসমাপ্ত রচনা হিসেবে 'Mon Faust : Ebanches' ১৯৪৬ সালে প্রকাশিত হয়। নাটকীয় দিক থেকে বিচার করলে দুটো রচনাই অসম্পূর্ণ। এগুলো মূলতঃ সংলাপসমষ্টি মাত্র। নাটক নয়। যা ভালেরির অপর সংলাপের মত। কবির মনের বিভিন্ন পর্যায়ের সঙ্গে অথবা ভালেরির লেখার নির্বাচিত অংশের সঙ্গে যেন এই ঘনিষ্ঠ আলাপ।

গ্যয়টের ফাউস্টের দ্বৈতসত্তার সঙ্গে তুলনা করলে দেখা যায় যে ভালেরির ধারণায় প্রতিটি মানব মনের চেতনায় বহু সত্তার সমাবেশ ঘটেছে। গ্যয়টের ফাউস্ট দৃঢ়প্রত্যয়ের সঙ্গে বলেছেন : দুঃখজনকভাবে আমার মধ্যে দুটো আত্মার বাস। একটির অবিরত ঝোঁক অন্যের কাছ থেকে বিযুক্ত হওয়া। একজন প্রাণবন্ত আবেগপ্রবণ যা সংসারের সঙ্গে তার জৈবিক পৃথিবী নিয়ে জড়িত। অপরজন যে রাত্রি তাকে ঘিরে রেখেছে তা দূরে নিক্ষিপ্ত করে স্বর্গীয় বাসস্থানের জন্য সে পথ বের করে নেবে।' গ্যয়টের প্রতিভায় ছিলো কেন্দ্রাপসারী প্রবৃত্তি, বহুরূপী প্রলোভন, পরস্পর বিরোধী উচ্চাকাঙ্ক্ষার বিশৃঙ্খল মিশ্রণ। অন্যদিকে ভালেরির ফাউস্টে ছড়িয়ে আছে নিয়ন্ত্রিত মানবের আত্মা। এখানে কল্পনার জীবনকেই বিরাট তাৎপর্যপূর্ণ করে দেখানো হয়েছে। বরং যে জীবনকে পার্থিব পরিস্থিতির অবিরত পরিবর্তনশীলতা এবং পশ্চাৎদিকের প্রবাহ নিয়ন্ত্রণ করে আছে তাকে নয়। কারণ প্রতিটি কার্যকেই স্বনির্ভর হতে হচ্ছে এবং পরিশেষে জাগতিক পারিশ্রমিকের উপরই বিশুদ্ধ আত্মার জয় ঘোষণা। 'Le Solitaire' এর মূল ধারণা এখানেই স্থির।

ভালেরি গ্যয়টের ঐতিহ্যাশ্রয়ী ফাউস্ট ও মেফিস্টোফিলিসের অনুগত শিষ্যকে গ্রহণ করেছেন। কিন্তু তিনি তাদের নিজের বিশ্বে আপন আবিষ্কারের চরিত্র আরোপ করেছেন : Lust (Joy) ফাউস্ট এবং তার অশুভ সহচর ভালেরির কাছে চিরায়ত মন এবং সেভাবেই নতুন বিশ্লেষণে মানবিক এবং অমানুষিকতার চূড়ান্ত দিককে প্রকাশ করার জন্যে তাদের ব্যবস্থা করতে হয়েছে।

ভালেরি এবং গ্যয়টে দুজনেই তাদের বিশেষ সমস্যার অন্তরে প্রবেশের জন্য বিভিন্ন প্রক্রিয়ায় উপনীত হতে চেয়েছেন। গ্যয়টে ব্যাপকভাবে রোমান্টিক ছিলেন। জীবনকে পূর্ণভাবে গ্রহণ করার জন্যে কিছুই প্রত্যাখান করেন নি। অসঙ্গতি এবং প্রতিপক্ষরা তাঁকে পথভ্রষ্ট করতে পারে নি। আবেগপ্রধান গীতিধর্মী শক্তির সঙ্গে তখন সংযোগ ঘটেছিলো উদ্ভিদবিদের অপরিসীম ধৈর্যের যা একান্তভাবে তাঁর মনে বিস্তার লাভ করে। তবুও গ্যয়টে ছিলেন বিশ্লেষণধর্মী।

শিল্পের প্রতি ভালেরির ধারণা ছিলো অন্তহীনভাবে অতি সূক্ষ্ম বা অন্তর্দর্শী। কাব্য তাঁর কাছে ছিলো ভাবনার ভিত্তিতে কল্পনার নির্মাণ। তিনি তাঁর বুদ্ধিবাদী ক্রিয়ার উপর পর্যবেক্ষণের জন্য তাঁর চেতনাকে সচেতন করে তুলেছিলেন। যাতে ক্ষণস্থায়ীভাবে প্রক্রিয়াগত ধাপে গাণিতিক মাধ্যমেই সেই রূপান্তরসদৃশ অনুক্রম লক্ষণীয় হয়ে ওঠে। তিনি সবকিছুই জয় করেছিলেন, অতিক্রম করেছিলেন অথবা গ্রহণ করেছিলেন যাতে বিশুদ্ধ জ্ঞানের স্বচ্ছ নৈর্ব্যক্তিকতায় পৌঁছানো যায়।

ভালেরির উনিশ শতকের পজিটিভিজমের সঙ্গে গ্যয়টের অষ্টাদশশতকের রোমান্টিসিজমের বৈষম্য বিশেষভাবে লক্ষণীয়। একই ধারণা দুজন কবির কাছে বিভিন্ন দিক থেকে প্রতিভাত হয়েছে। অতীন্দ্রিয় কবিতায় আত্মজ্ঞানের শক্তি চরম উৎকর্ষে উপনীত হয়ে প্রকাশিত হয়েছে। 'আমি যা' ঠিক তাই' ফাউস্টের চীৎকার ভেসে উঠে, 'এর জন্যে এত আশা, এত নৈরাশ্য, এত জয়, চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছানোর জন্য এত ধ্বংসের প্রয়োজন ছিলো......, আমি আমার শিল্পের শীর্ষ, ধ্রুপদী যুগের শিল্পভাবনায়...' নিজে সেই সমতানে পৌঁছে ভালেরি এখানে বলেছেন : 'অতি দ্রুত তিনি দেখেছেন উৎপত্তি বিধি এবং তাৎপর্য।'

ফাউস্ট এবং মেফিস্টোফেলিসের সংলাপের মধ্যে ভালেরি নিজের ধারণায় মানুষের ক্রমবিকাশের সমস্যাকে দেখতে চেয়েছেন, শুধুমাত্র গ্যয়টের রোমান্টিসিজম থেকে নয়। সম্ভবতঃ প্রাচীন বিশ্বাস থেকেও যেখানে ফাউস্ট উপাখ্যানের সঙ্গে সংযুক্ত হয়ে আছে। গ্যয়টের কাব্যিক আদর্শের অভিপ্রায় এবং "স্বাধীন দেশের মুক্ত মানুষের জন্য পৃথিবীতে স্বর্গ" রচনার চূড়ান্ত দূরদৃষ্টি যেখানে স্থির হয়ে আছে সেখানে ভালেরি প্রত্যাবর্তন করেন ব্যক্তির সমস্যার যা মূলতঃ চিরায়ত সমস্যাও বটে।

মার্কিণ আবহসংক্রান্ত উপগ্রহ এসা—৮ ২৯ অকটোবর সকালে ঘূর্ণিঝড়ের গতির যে ছবি পাঠায় তা আলিপুরে মানমন্দিরের স্বয়ংক্রিয় চিত্র প্রেরণ কেন্দ্রে ধরা পড়ে। এই সময় ঝড়ের কেন্দ্রস্থল ছিল কলকাতার তিনশ মাইল দক্ষিণে। ছবির মধ্যস্থলে লিখিত ইংরাজী 'সি' কথার দ্বারা কলকাতা ও 'পি' কথার দ্বারা পুরী বোঝাচ্ছে। কাঁথি (মেদিনীপুর) রয়েছে এই দুটি স্থানের মধ্যে।

বিজ্ঞানের কথা

উড়িশার সাইক্লোন—ইতিহাস ও বিজ্ঞানের চোখে

ব্যাপারটা নতুন নয়, আচমকাও নয়। পশ্চিমবাংলা ও ওড়িশার উপকূল অঞ্চল সাইক্লোনের প্রকোপে আগেও পড়েছে, যে-কোনো সময়েই পড়তে পারে। আর এবারে, মার্কিন আবহাওয়া উপগ্রহ এসা-৮-এর মাধ্যমে অন্যান্যবারের চেয়ে আরো সময় থাকতেই জানা গিয়েছিল যে সাইক্লোন আসছে, তার চোখ রয়েছে কাঁথি বা ওড়িশার উপকূলের দিকে। এইসঙ্গে এবারে আরো জানা ছিল যে মাত্র এক বছর আগে নভেম্বর মাসের ১২-১৩ তারিখের সাইক্লোনে পূর্ববাংলার পাঁচ লক্ষ থেকে দশ লক্ষ মানুষ প্রাণ হারিয়েছে। তবু কিন্তু এবারেও, ১৯৪২ সালে মেদিনীপুরের সাইক্লোনে মানুষকে যে-ভাবে মরতে হয়েছিল, তেমনিভাবে কিংবা তার চেয়েও খারাপ অবস্থায় পারাদীপ জম্বু ও সন্নিহিত উপকূল-এলাকার লক্ষ লক্ষ মানুষকে অসহায় মৃত্যুর মধ্যে ফেলে রাখা হয়েছিল। খবরের কাগজের হিসেবে প্রকাশ, পঁচিশ হাজার মানুষ মারা পড়েছে, গবাদি পশু মারা যাওয়ার সংখ্যাও অনুরূপ, ক্ষতিগ্রস্তের সংখ্যা চল্লিশ লক্ষ। কোনো কোনো গ্রামের চিহ্নমাত্র নেই। অথচ এটা ১৯৪২ সাল নয়, এমনকি, ১৯৭০ সালও নয়—১৯৭১ সাল। পারাদীপ থেকে খুব বেশি দূরে নয়, বিশাখাপত্তনমে বিরাট এক রেডার-কেন্দ্র স্থাপিত হয়েছে এবং গত বছরের এপ্রিল থেকে সেটি চালু হয়েছে—বিজ্ঞানের কথার পাঠকরা তা জানেন। এই রেডার-কেন্দ্রটির অন্যতম কাজ দূরবর্তী ঝড়ের সংকেত ধরা। এবারের সাইক্লোনের সংকেতও নিশ্চয়ই ধরা পড়েছিল, কিন্তু তাতে অন্তত আমাদের মতো দেশে কোনো লাভ হবার নয়।

অথচ হতে পারত, হওয়া উচিত ছিল। বৈজ্ঞানিক-প্রায়োগিক অগ্রগতির সঙ্গে আমরাও যে তাল রেখে চলেছি, বিশাখাপত্তনমের রেডার-যন্ত্রটি অবশ্যই তার একটি

ওপরে উত্তর গোলার্ধের ছবি নিচে দক্ষিণ গোলার্ধের। উচ্চ চাপের এলাকা থেকে বায়ুর প্রবাহ ঘড়ির কাঁটা যেদিকে ঘোরে সেদিকে নিম্ন চাপের এলাকায় তার প্রবেশ ঘড়ির কাঁটা যেদিকে ঘোরে তার বিপরীত দিকে। দক্ষিণ গোলার্ধে ব্যাপারটা ঠিক উলটো।

উচ্চ চাপের বায়ু

নিম্ন চাপের বায়ু

উচ্চ চাপের বায়ু

নিম্ন চাপের বায়ু

জমকালো নিদর্শন। ওড়িশার বিপর্যয়ের পরে বাধ্য হয়েই বলতে হচ্ছে, শুধু নিদর্শনই। এই রেডার-কেন্দ্রের পর্যবেক্ষণ-লব্ধ খবর অনুযায়ী ব্যবস্থা অবলম্বন করার আয়োজনও যদি সঙ্গে সঙ্গে আমরা করে রাখতে পারতাম তাহলেই এই বিরাট উদ্যোগটির পত্তন সার্থক হত।

কী হওয়া উচিত ছিল তার দৃষ্টান্ত আমাদের দেশে না থাকলেও বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যায় অগ্রসর অন্যান্য দেশে যথেষ্টই। আমি আজ থেকে দশ বছর আগের, যখন আবহ উপগ্রহের সবেমাত্র সূত্রপাত, দু-একটি দৃষ্টান্ত দিচ্ছি।

১৯৬১ সালের সেপ্টেম্বরে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের আটলান্টিক উপকূলে ভয়াবহ একটি ঘূর্ণিঝড়ের ধাক্কা পৌঁছবার আশংকা দেখা দিয়েছিল। খবরটি জানা গিয়েছিল আগেই, পর্যবেক্ষক বিমান বা পর্যবেক্ষক জাহাজের মারফৎ জানার অন্তত দু-দিন আগে। কি ভাবে? আবহ উপগ্রহের সাহায্যে। কেননা তার আগেই চার-চারটি 'টাইরস' উপগ্রহ আকাশে উঠে গিয়েছে এবং টেলিভিশন ছবির মাধ্যমে আসন্ন ঝড়ঝঞ্ঝা ও টাইফুনের খবর পাঠাচ্ছে। ('টাইরস' কথাটি তৈরি হয়েছে কয়েকটি ইংরেজী শব্দের আদ্যক্ষর সাজিয়ে। পুরো কথাটি হচ্ছে টেলিভিশন অ্যান্ড ইনফ্রা-রেড অবজারভেশন স্যাটেলাইট।) সঙ্গে সঙ্গে টাইরসের খবর অনুযায়ী কাজ শুরু হয়ে গেল। বিপন্ন এলাকা ছেড়ে মানুষজন সরে এল পাহাড়ের ওপরে, গবাদি পশু সমেত।

ওদেশে প্রত্যেকটি ঘূর্ণিঝড়ের আলাদা আলাদা নাম দেওয়া হয়। ১৯৬১ সালের সেপ্টেম্বরের ঘূর্ণিঝড়টির নাম ছিল ইস্থার। আমেরিকানরা যে-সব ঘূর্ণিঝড়ের খবর প্রথম টের পেয়েছে তাদের সবাকার নাম মেয়েদের নামে। সম্ভবত মেয়েদের নামে নামকরণ করার কারণ এই যে, শূন্য ফুঁড়ে বেরিয়ে আসা একটা আক্রোশ আচমকা প্রচণ্ডভাবে ফুঁশে উঠে গায়ের ওপরে আছড়ে পড়ছে আর তারপরে দীর্ঘশ্বাস ফেলে মিলিয়ে যাচ্ছে—তার নাম মেয়ের নাম হওয়া ছাড়া আর কী হতে পারে! যাই হোক, ইস্থারও প্রচণ্ড আক্রোশ নিয়ে আছড়িয়ে পড়ল, তারপরে আবার মিলিয়েও গেল—কিন্তু এবারে প্রাণের ক্ষয়ক্ষতি সামান্যই। এমনি ধরনের ঘটনায় যে হাজার হাজার পশু প্রাণ হারাত তারাও বেঁচে গেল।

ইস্থার যে ধাবমানা সে-খবর প্রথম যদিও পাওয়া গিয়েছিল টাইরস থেকে কিন্তু পরে পর্যবেক্ষক বিমান থেকেও চাক্ষুস দেখা হয়েছিল। না দেখলেও ক্ষতি ছিল না। উপগ্রহের খবর যে অনেক বেশি পাকা তার প্রমাণ আগেই পাওয়া গিয়েছিল।

ঘটনাটি সেই একই বছরের জুলাইয়ের মাঝামাঝি সময়ের। একারে টাইরসের খবর, মেক্সিকোর উপকূলের কাছে ট্রপিক ঝড় তৈরি হয়েছে। আমেরিকান ধরনে যথারীতি এই ঝড়ের নাম দেওয়া হল লিজা। তার অবস্থান নির্ণীত হল ২১ ডিগ্রী উত্তরে ও ১২৩ ডিগ্রী পশ্চিমে। তবে অনেক আবহ-বিশেষজ্ঞ মত প্রকাশ করলেন যে লিজা মিলিয়ে যেতে শুরু করেছে।

কিন্তু সেইদিন বিকেলেই টাইরসের খবর হল অন্যরকম। লিজা ধেয়ে আসছে। এখন তার অবস্থান ২৫ ডিগ্রী উত্তরে ও ১২১ ডিগ্রী পশ্চিমে—অর্থাৎ প্রথম যেখানে দেখা গিয়েছিল সেখান থেকে প্রায় ৫০০ কিলোমিটার সরে এসেছে। সঙ্গে সঙ্গে সান ফ্রান্সিসকো ওয়েদার ব্যুরোর কাছে খবর চলে গেল, সঙ্গে সঙ্গে ঝড়ের সংকেত।

পরের দিন সেই একই টাইরসের মারফৎ আবার নতুন খবর। মেক্সিকোর উপকূলের ৬০০ মাইল দূরে থেকে নতুন আরেকটি ঝড়ের ছবি এসেছে। এবারে আর অপেক্ষা করা হল না। সান ফ্রান্সিসকো থেকে ঝড়ের সংকেত দেওয়া হল। মেকসিকো ও দক্ষিণ ক্যালিফোর্নিয়া থেকে মাছ ধরার জন্যে যে বিরাট নৌবহর সমুদ্রে পাড়ি দিত, এই খবর তাদের বাঁচিয়ে দিল।

পরের মাসে এই একই টাইরস থেকে জাপানীদের কাছে দু-দুটি টাইফুনের খবর পৌঁছেছিল। একটির নাম ন্যান্সি, অপরটির নাম পামেলা। একটির গতিবেগ ঘণ্টায় ২৮৮ কিলোমিটার, অপরটির ঘণ্টায় ৩০৪ কিলোমিটার। দুটিই ছিল অতি ভয়ংকর রকমের টাইফুন, কিন্তু আগে থেকে খবর পাওয়ার দরুন বিশেষ ক্ষতি করতে পারে নি।

এমনি আরো অনেকবার। আবহাওয়ার পর্যবেক্ষণে টাইরস নতুন যুগের সূত্রপাত করেছিল।

এসব দশ বছর আগের ঘটনা। টাইরস-১ আকাশে উঠেছিল ১৯৬০ সালের এপ্রিল মাসে। প্রথম তিন মাসে এই উপগ্রহটি পৃথিবীতে ছবি পাঠিয়েছিল ২৩,০০০। প্রথমটির পরে আরো তিনটি টাইরস আকাশে উঠেছিল। সাত মাস থেকে এক বছরের মধ্যে তাদের আকাশে থাকার আয়ুও ফুরিয়েছিল। কিন্তু এই চারটি টাইরসের কাণ্ডকারখানা দেখে বিজ্ঞানীরা নিঃসংশয় হয়েছিলেন যে প্রাকৃতিক দুর্যোগ ও দুর্বিপাক আর কখনোই এই গ্রহের মানুষকে অপ্রস্তুত অবস্থায় ধরতে পারবে না। এই ডাকিনীর নাম লিজাই হোক বা পামেলাই হোক, প্রাণ নিয়ে ছিনিমিনি খেলার সুযোগ থেকে সে বঞ্চিত হবে।

তবে আমাদের দেশে নয়, যে-দেশটি এই গ্রহেরই একাংশে।

নইলে আবহ উপগ্রহ তার কাজ ঠিক-মতোই সম্পন্ন করেছিল। 'কাঁথি অঞ্চলে প্রচণ্ড সাইক্লোন হতে পারে' এই শিরোনামায় শনিবার ৩০শে অকটোবর তারিখে যুগান্তরের খবর ছিল এই :

"কলকাতা ২৯শে অকটোবর—আবার সাইক্লোন ধাক্কা মারতে পারে। এবার হয়ত কাঁথির পালা।...

মার্কিন 'এসা-৮' উপগ্রহ প্রতিদিনের ন্যায় শুক্রবার সকালে মেঘের যে ছবি পাঠায়, তা থেকে আলিপুরের আবহাওয়া-বিদেরা মনে করছেন এই সাইক্লোন 'স্টেজ এক্স ক্যাটিগরি ফোর' ধরনের হবে। এই সাইক্লোন ভয়াবহ জাতের এবং ঘূর্ণিঝড়ের

কেন্দ্রবিন্দু, যাকে আবহাওয়াবিদেরা 'চক্ষু' বলে থাকেন, তা দেখা যায়। এই ঘূর্ণিঝড়ের গতিবেগ ঘণ্টায় ১৭০ কিলোমিটার অবধি হতে পারে।"

খবরে আরো বলা হয়েছে, শুক্রবার বিকেল থেকেই হুগলি ও উত্তর উড়িষ্যার বন্দরগুলিতে ভীষণ-বিপদ সিগন্যাল উড়িয়ে দেওয়া হয়েছে।

খবরের সঙ্গে ছবিও আছে, ২৯শে অক্টোবর অর্থাৎ শুক্রবার সকালে ঘূর্ণিঝড়ের গতিবেগের ছবি। ছবিটি আবহ উপগ্রহ থেকে পাওয়া।

তারপরে যা অবশ্যম্ভাবী তাই ঘটেছে। কিন্তু যা এড়ানো যেত তার কোনো আয়োজনই ছিল না। অন্যান্য দেশে দশ বছর আগে আবহ উপগ্রহ টাইরসের সময় থেকেই যা সম্ভব হয়েছে, আমাদের দেশে তার অনেক পরে তার চেয়ে অনেক উন্নত আবহ উপগ্রহের যুগে এসেও তা সম্ভব হয় নি।

ব্যাপারটা এমন নয় যে, শুক্রবার আচমকা ঘটে গিয়েছে, আর ঘটবে না। এমনও নয় যে জানানি না দিয়েই এসে পড়েছে, জানা থাকলে আসাটাই বন্ধ করা যেত।

সাইক্লোন যাতে তৈরি না হয় এমন ব্যবস্থা করা এখনো পর্যন্ত বিজ্ঞানীর যেমন অসাধ্য, তেমনি সাইক্লোন তৈরি হবার পরে তাকে থামিয়ে দেওয়াও।

সাইক্লোন কেমন করে তৈরি হয়ে থাকে? এই ভূমিকার পরে এই বিষয়টি নিয়ে এবারের বিজ্ঞানের কথায় আলোচনা তুলতে চাই।

বায়ু, সমুদ্র ও সাইক্লোন—

উড়িশার উপকূলে সমুদ্রের প্লাবন পনেরো ফুট উঁচু হয়ে ছুটে এসেছিল। সমুদ্রের জলকে এমন প্রকাণ্ড একটা ঢেউয়ের মতো উঁচু করে ছুটিয়ে আনল কে?। আর কেউ নয়—বাতাস। একই সময়ে আকাশ কালো মেঘে ঢেকে গিয়েছিল আর সেই মেঘ থেকে অজস্র বৃষ্টি ঝরে পড়েছিল। এই মেঘ আনল কে? বাতাস। বৃষ্টি ঝরাল কে? তার মূলেও বাতাস।

সাইক্লোন মাত্রই আসলে বাতাসের খেলা। শুধু সাইক্লোন নয়—ঝড়, ঝঞ্ঝা, টাইফুন, ঘূর্ণি ইত্যাদি সবই তাই। কয়েকটি ক্ষেত্রে বাতাসের দাপটে সংগে সংগে সমুদ্রও তেড়ে আসে। বলতেই হবে বাতাসের এ বড়ো মারাত্মক খেলা।

তাই বলে বাতাসের সমস্ত খেলাই মারাত্মক নয়। আমরা জানি মেঘ থেকে বৃষ্টি হয়, কিন্তু বাতাস না থাকলে মেঘ হতে পারত না, মেঘ না থাকলে বৃষ্টি নয়। বাতাস আছে বলেই শহরের ওপর থেকে দূষিত ধোঁয়া ও গ্যাস উড়ে যেতে পারে। বাতাসের মঙ্গলকর ভূমিকা এমনি আরো অনেক।

বাতাস যে এমন হাজারো রকমের ভূমিকা নিতে পারছে তার মূলে রয়েছে বাতাসের বিশেষ একটি গুণ : সব সময়ে চলে বেড়ানো।

ডিপ্রেশন বা সাইক্লোন—সাদা দাগে গরম বাতাস দেখানো হয়েছে, কালো দাগে ঠাণ্ডা বাতাস। ঠাণ্ডা বাতাসের প্রবাহ কলকের মতো গরম বাতাসের প্রবাহের নিচে সেঁধিয়ে যাচ্ছে।

গরম বাতাস

ঠাণ্ডা বাতাস

বাতাস কেন চলে বেড়ায়? কেন কোনো সময়েই স্থির নয়? তার মূলে রয়েছে আমাদের এই সূর্য। সূর্যের তাপে গোটা পৃথিবীর বায়ু সমান মাত্রায় উত্তপ্ত হয় না, এক-এক জায়গায় এক-এক রকম। ফলে বায়ুর চাপে ভিন্নতা থেকে যায়। এ-ব্যাপারটাকে শোধরাবার জন্যেই—অর্থাৎ উচ্চ চাপ আর নিম্ন চাপকে সমান করে দেবার জন্যেই—বাতাসের ছোটাছুটি। আবার এই ছুটোছুটিটাও নির্বিঘ্ন নয়, অন্য অনেকগুলো টান ও ধাক্কা এসে পড়ছে তার ওপরে। সূর্যের ও চন্দ্রের টান আছে বলে যেমন জোয়ার-ভাটা হতে পারে, তেমনি বায়ুমণ্ডলেও একই ধরনের টানাপোড়েন ঘটে। এই টানাপোড়েনও বায়ুর গতির একটি কারণ। অন্যদিকে ভূ-গোলকটি নিজের অক্ষদণ্ডের চারদিকে লাট্টুর মতো পাক খাচ্ছে। তার জন্য বায়ু বাইরের দিকে ছিটকে বেরিয়ে যেতে চায়, ফলে বায়ু গতিশীল হয়। উচ্চ চাপের বাতাস উঁচুতে ওঠে, নিম্ন চাপের বাতাস নিচে নামে—একটির স্থানে অপরটির দখল নেবার ব্যাপারেও অনেক টানাপোড়েন এসে পড়ে।

বায়ুমণ্ডলকে তুলনা করা চলে মহাসাগরের সঙ্গে, সূর্য ও চন্দ্রের টানে এই বায়ুমণ্ডলেও জোয়ার ওঠে। জোয়ারের ঢেউ পৃথিবী বেড় দিয়ে পৃথিবীর যেদিকে সূর্য রয়েছে সেদিকে পৌঁছয়। সূর্যের তাপে উত্তপ্ত হয়ে উঁচুতে ওঠে। একই সময়ে পৃথিবীর আবর্তনের দরুন (পশ্চিম থেকে পূবে) সম্মুখের দিকে তাড়িত হয়। অন্য দিকে পৃথিবীর যেদিকে তখন রাত্রি সেখানে অপেক্ষাকৃত শীতল বায়ুর ঢেউ। এমনিভাবে এই পৃথিবীকে ঘিরে সর্বক্ষণ চলেছে নিম্নচাপের বায়ুর পিছনে ধাবমান উচ্চচাপের বায়ুর চরকিপাক।

বায়ুর এই চলমানতার (চলমান বায়ুকে আমরা বলেছি বাতাস) মূলে রয়েছে সূর্য। সূর্যের তাপ বায়ুর অণুগুলোকে গতিশীল করে তোলে। যতো বেশি তাপ ততো বেশি উত্তেজনা। বায়ুর পৃথক পৃথক অণুগুলো তখন আরো দূরে দূরে সরে যায়। এমনিভাবে উত্তপ্ত বায়ুর ঘনত্ব কমে এবং সেই কম-ঘন বায়ু ওপরে উঠে যায়। উত্তপ্ত বায়ুর ওপরে ওঠার এই হচ্ছে কারণ। এখানে বিশেষভাবে জেনে রাখা দরকার বায়ু উত্তপ্ত হয় ভূপৃষ্ঠে ঘা খেয়ে ঠিকরে আসা সূর্যের কিরণে। তার মানে বায়ুমণ্ডল উত্তপ্ত হতে শুরু করে নিচে থেকে। নিচের উত্তপ্ত বায়ু তখন ওপরে ওঠে। প্রচণ্ড গরমের দিনে খোলা মাঠের দিকে তাকিয়েও নিচের উত্তপ্ত বায়ুর ওপরে ওঠার দৃশ্য ঢেউয়ের মতো দেখা যেতে পারে। উত্তপ্ত বায়ু যখন ওপরে উঠতে শুরু করে তখন চারদিক থেকে অপেক্ষাকৃত শীতল ও ঘন বায়ু তার জায়গা নেবার জন্যে প্রবাহিত হয়। বাতাসের এই প্রবাহকে বলা হয় 'পরিচলন প্রবাহ'।

এই ব্যাপারটি ঘটে চলেছে পৃথিবীর গোটা স্থলভাগ জুড়ে। স্থলভাগের ওপরকার বাতাস সূর্যের কিরণে উত্তপ্ত হয় ও বিরাট এলাকা জুড়ে সৃষ্টি হয় নিম্নচাপের বায়ু। নিম্ন চাপের বায়ু ওপরে ওঠে, উচ্চ চাপের বায়ু সে-জায়গা দখল করার জন্যে প্রবাহিত হয়। উচ্চ চাপের এলাকা থেকে নিম্ন চাপের এলাকায় চলমান বায়ুকে (এয়ার) বলা হয় বাতাস (উইণ্ড)।

কিন্তু আগেই বলেছি, বিবিধ কারণে ব্যাপারটা ঠিক একটা সরল রেখায় ঘটতে পারে না। উচ্চ চাপের এলাকা থেকে নিম্ন চাপের এলাকায় বায়ুর প্রবাহ হয়ে থাকে স্পাইর‍্যাল বা পেঁচালো। অর্থাৎ একটা পাক খাওয়ার মতো ব্যাপার চলে। উত্তর গোলার্ধে এই পাক ঘড়ির কাঁটা যেদিকে ঘোরে সেদিকে, অর্থাৎ দক্ষিণাবর্ত। দক্ষিণ গোলার্ধে ঘড়ির কাঁটা যেদিকে ঘোরে তার বিপরীত দিকে, অর্থাৎ বামাবর্ত।

ভূপৃষ্ঠের সবচেয়ে উত্তপ্ত এলাকাটি রয়েছে বিষুব রেখা বরাবর। কেননা এই এলাকায় সূর্যের কিরণ খাড়াভাবে এসে পড়ে। এই এলাকা থেকে যতোই দুই মেরুর দিকে যাওয়া যায়, সূর্যের কিরণ ততোই তেরচা এবং মেরুতে গিয়ে সমান্তরাল। ফলে পৃথিবীর দুইটি মেরু হচ্ছে সবচেয়ে শীতল এলাকা। অর্থাৎ বিষুব এলাকাটি হয়ে দাঁড়ায় নিম্ন চাপের, মেরু এলাকাটি

উচ্চ চাপের। ফলে উচ্চ চাপের এলাকা থেকে নিম্ন চাপের এলাকার দিকে একটি বায়ু-প্রবাহের সৃষ্টি। কিন্তু পৃথিবীর আবর্তনটি যদি না থাকত তাহলে মেরু থেকে বিষুব পর্যন্ত সরাসরি একটি প্রবাহ, আমরা পেতাম। কিন্তু পৃথিবী চব্বিশ ঘন্টায় এক-বার পশ্চিম থেকে পূবে আবর্তিত হচ্ছে। এই আবর্তনের বেগ বিষুব এলাকায় ঘন্টায় ষোল শত কিলোমিটার, তারপরে ব্যাস কমতে থাকার দরুন মেরুর দিকে ক্রমান্বয়ে কম। পৃথিবী আবর্তিত হয় তার সঙ্গের বায়ুমন্ডলটি সমেত। অর্থাৎ বায়ুর আবর্তন-বেগও বিষুবে সবচেয়ে বেশি, মেরুতে সবচেয়ে কম। ফলে মেরু থেকে বিষুব পর্যন্ত বায়ু-প্রবাহটি যাত্রা শুরু করে খুবই কম মাত্রার আবর্তন-বেগ নিয়ে। কিন্তু যতোই বিষুবের দিকে অগ্রসর হয় ততোই নিচের ভূপৃষ্ঠের আবর্তন-বেগ বাড়ে। ফলে মনে হতে থাকে, বায়ুকে পিছনে ফেলে ভূপৃষ্ঠ আগু বাড়িয়ে যাচ্ছে, অর্থাৎ মনে হতে থাকে বায়ুর এই প্রবাহটি পৃথিবীর আবর্তনের বিপরীত দিকে (পূব থেকে পশ্চিমে)।

বায়ুর প্রবাহ সৃষ্টি হবার আরো বহু-বিধ কারণ ঘটে থাকে। মহাসাগরের চেয়ে মহাদেশ উত্তপ্ত হয় অপেক্ষাকৃত তাড়া-তাড়ি, আবার উত্তাপ ছেড়েও দেয় অপেক্ষা-কৃত তাড়াতাড়ি। অরণ্যের এলাকার চেয়ে মরুভূমির এলাকা উত্তপ্ত হয় অপেক্ষাকৃত তাড়াতাড়ি। এ কারণে, একই অক্ষাংশে অবস্থিত হওয়া সত্ত্বেও দুটি স্থানের তাপ-মাত্রায় ও বায়ুর চাপে বিভিন্নতা ঘটতে পারে।

সব মিলিয়ে কোথাও নিম্নচাপ, কোথাও উচ্চচাপ, এবং বায়ুর পক্ষে একদন্ড স্থির হয়ে থাকার উপায় নেই। তাকে অনবরত ছুটতে হচ্ছে ও পাক খেতে হচ্ছে।

এই সঙ্গে মেঘ তৈরি হওয়া সম্পর্কেও গোড়ার কথাটি জেনে রাখা দরকার।

একটি ভিজে কাপড় মেলে দিলে শুকিয়ে যায়। কি করে? জলের অণুগুলো বাষ্পের আকারে ভিজে কাপড় থেকে বাতাসে বেরিয়ে আসে। যতো তাড়াতাড়ি বেরিয়ে আসে ততো তাড়াতাড়ি কাপড় শুকোয়। কড়া রোদে বা জোর হাওয়ায় কাপড় এ জন্যে তাড়াতাড়ি শুকোয়। কিন্তু বাদলার দিনে বাতাসে জলীয় বাষ্পের পরিমাণ এমনিতেই বেশি, ফলে ভিজে কাপড় থেকে জলের অণু টেনে নেবার ক্ষমতা কম।

ভিজে কাপড় পেলেই যে-বাতাস তার ভিতর থেকে জলের অণুগুলোকে টেনে নিতে পারে, সেই বাতাস যখন মহাসাগরের ওপর দিয়ে বয়ে যায় তখন তো সূর্যের সহায়তা পেলে জলের অণু টেনে নেবার ব্যাপারটা বিপুলভাবে চলতে পারে। সূর্যের সহায়তা থাকেই, কাজেই চলেও থাকে। তারপরে সেই জলীয় বাষ্পে ভরা বাতাস যখন ওপরে ওঠে তা শীতল হতে থাকে — প্রতি ৩০০ মিটারে ৫ ডিগ্রী ফারেনহাইট হিসেবে। আবার যতো ওপরে ওঠে, বায়ুমন্ডলের চাপ ততো কমে—

ফিজিওলজি ও মেডিসিনে নোবেল পুরস্কার (১৯৭১) বিজয়ী ডাঃ আর্ল ডব্লু সাদারল্যান্ড (জুনিয়র)

ফলে সেই বাতাস ততো ছড়িয়ে পড়তে পারে। যতো ছড়ায় ততো তাপ কমে। এমনিভাবে তাপ কমতে কমতে এমন একটা সময় আসে যখন সমস্ত জলীয় বাষ্প ধরে রাখার ক্ষমতা সেই বাতাসের থাকে না (জলীয় বাষ্প ধরে রাখার ক্ষমতা গরম বাতাসের বেশি ঠান্ডা বাতাসের কম)। তখন বাড়তি জলীয় বাষ্প ঘনীভূত হয়ে জলকণার রূপ ধারণ করে। আকাশের অনেক ওপরে ঠাসাঠাসি করে থাকা এই জলকণাগুলিই হচ্ছে মেঘ। মাটিতে শিশির পড়ে এই একই ভাবে।

মেঘ তৈরি হবার মোট কথাটা হচ্ছে এই। মেঘ আছে দশটি বিভিন্ন প্রকারের :চেহারা ও আকার দেখে নামকরণ। কোনো মেঘে ঝিরঝিরে বৃষ্টি, কোনো মেঘে মুষলধারে, ইত্যাদি ইত্যাদি।

এবারে আর একবার বায়ুমন্ডলের দিকে তাকানো যাক। এক-এক জায়গায় এক-এক রকম উত্তাপ, এক-এক জায়গায় এক-এক রকম চাপ। বিরাট একটি এলাকা জুড়ে অনেকগুলো পর্যবেক্ষণ-কেন্দ্র বসিয়ে ভিন্ন ভিন্ন উত্তাপ ও চাপের মাপ নেওয়া হল, তারপরে মানচিত্রের ওপরে সমান উত্তাপের জায়গাগুলো ও সমান চাপের জায়গাগুলোকে দাগ টেনে টেনে যোগ করা হল। এবারে যে মানচিত্রটি পাওয়া যাচ্ছে সেটি আবহাওয়ার নির্দেশক। যেমনটি খবরের কাগজে মাঝে মাঝে প্রকাশিত হয়। দেখা যাবে দাগগুলো প্রায় গোল হয়ে এক-একটি এলাকাকে যেন ঘিরে রয়েছে। কোনোটি উচ্চ চাপের এলাকা এবং কোনোটি নিম্ন চাপের এলাকা।

নিম্ন চাপের এলাকাকে বলা হয় সাই-ক্লোন বা ডিপ্রেশন। উচ্চ চাপের এলাকাকে অ্যান্টি সাইক্লোন। বাতাসের যা-কিছু খেলা (ঘূর্ণিঝড় ইত্যাদি) সবেরই উৎস নিম্ন চাপের এলাকা বা ডিপ্রেশন। ওড়িশার সাইক্লোন বঙ্গোপসাগরে এমনি একটি ডিপ্রেশন সৃষ্টি হবার ফলে। পূর্ববাংলায়, পশ্চিমবাংলায়, উড়িশায়, অন্ধ্রে ইতিপূর্বে যতো সাইক্লোন ঘটে গিয়েছে সবেরই কারণ এই।

ব্যাপারটা ঘটে এইভাবে। বায়ুর দুটি প্রবাহের মধ্যে যোগাযোগ হয়েছে, কিন্তু তারা একসঙ্গে মিশে যায় না, ঠান্ডা প্রবাহটি ফলকের মতো সেঁধিয়ে যায় গরম প্রবাহের নিচে। দুটি প্রবাহের ভেদরেখাটি হয়ে থাকে খানিকটা তেরচা। এই ভেদরেখা বরাবর গড়ে ওঠে বায়ুর একটি তরঙ্গ। গরম বাতাসের কিনারগুলো ঠান্ডা বাতাসের ছোঁয়া পায় আর লাফিয়ে ওঠে। গরম বাতাসের এই চুড়োগুলোর চাপ ঠান্ডা বাতাসের চেয়ে কম, ফলে সেগুলো ওপরে উঠে যায়। এই হচ্ছে শুরু এবং এই কান্ডটি চলতে চলতে এক সময়ে বিপুল পরিমাণ বাতাস পেঁচিয়ে পেঁচিয়ে পাক খেতে শুরু করে। এই প্রকান্ড আলোড়নটি যেমন উঁচু দিকে ওঠে তেমনি চারদিকের বিরাট এলাকা জুড়ে ছড়িয়ে পড়ে। আর বাতাস যতো ছড়ায় ততো ঠান্ডা হয়। ঠান্ডা হতে হতে সেই সময় আসে যখন সমস্ত জলীয় বাষ্প ধরে রাখার ক্ষমতা সেই বাতাসের থাকে না, তৈরি হয়ে যায় মেঘ। এই মেঘ থেকে জোরালো বৃষ্টি হয়ে থাকে। আর বাতাসের তাড়নায় সমুদ্রে তৈরি হয় প্রকান্ড প্রকান্ড ঢেউ।

আর এই প্রচন্ডভাবে পাক খাওয়া বাতাস, এই জোরালো বৃষ্টির মেঘ, এই প্লাবন ঘটাবার ঢেউ যখন একসঙ্গে উপ-কূলের এলাকায় হামলা করে—আমরা বলি সাইক্লোন বা ঘূর্ণিঝড়।

কখনো আচমকা এসে পড়ে না। অনেকগুলো সংকেত দেয়। দূরের আকাশে ঘোড়ার লেজের মতো মেঘ হচ্ছে চোখের দেখায় প্রথম সংকেত। তারপরে আরও। সতর্ক হবার যথেষ্ট সময় পাওয়া যায়।

আর আবহ উপগ্রহের যুগে এখন তো চোখের দেখার সংকেতের জন্যে অপেক্ষা করতেও হয় না। তারও অনেক আগে টেলি-ভিশনের ছবির মাধ্যমেই খবর এসে পৌঁছয়। টেলিভিশনেও পাওয়া যায় সেই মেঘেরই ছবি, সাইক্লোন বা ডিপ্রেশন তৈরি হলে যে-ধরনের মেঘ হয়ে থাকে।

ওড়িশার বেলাতেও এই ছবি এসে-ছিল। আমরা সতর্ক হতে পারি নি। ভীষণ বিপদ বলে নিশান উড়িয়েই লক্ষ লক্ষ মানুষকে বরাতের ওপরে ছেড়ে দিয়েছি। ত্রাণকার্যে কুড়ি কোটি টাকা কেন, কুড়ি টু দি পাওয়ার ইনফিনিটি খরচ করলেও এখন আর পঁচিশ হাজার প্রাণ ফিরে পাওয়া যাবে না। এবং যেহেতু বিজ্ঞানীরা কেউ বিধাতা নন, অতএব সাইক্লোন বা ডিপ্রেশন তৈরি হবেই এবং আবহ উপগ্রহের মাধ্যমে বিশাখ-পত্তনমের রেডার কেন্দ্রে তার খবরও পৌঁছবেই।

—অয়স্কান্ত

সুবনশিরি

অমরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

।। এগারো ।।

বাগানে দরমাহা দেওয়া হয় সপ্তাহে একবার, নয়তো দু-সপ্তাহে একবার। সাধারণত হাটবার, বা আগের দিন। এক এক অঞ্চলে এক এক নিয়ম। এখানে বেতন দেওয়া হয় শনিবার। হাট বসে শনি-রবি দু-দিন।

টাকাটা হাতে নিয়ে কেউ করে এক-দিনের সংস্থান, কেউ বা সাতদিনের। কারো টাকা গড়িয়ে যায় হাঁড়িয়ার হাঁড়িতে একরাত্রে, কারো হয় সাতদিনের ব্যবস্থা। কেউ চলে সোজা পথে—ঘর-সংসারের ব্যবস্থা করে; কেউ ধরে আঁকাবাঁকা পথ—সাতদিনের মধ্যে যত কিছু মতলব গজিয়েছে, পুষ্ট হয়েছে, সে সব হাসিল করে। ফৌজদারী ও দেওয়ানী আদালতে কাঠগড়ায় দাঁড়ানোর যোগ্য যে-সব কাজ। কিন্তু আদালতের বিধিব্যবস্থার সামনে তাদের হাজির করা যায় না বড় একটা, সমুচিত ব্যবস্থাও দেওয়া হয় না।

হাট থেকে ঘরে ফিরে ভাদুয়া খুঁজে পায় না তার মেয়ে—সে ভেউ ভেউ করে কেঁদে গড়িয়ে পড়ে। তার সর্বনাশ করে গেল মেয়েটা। দৈনিক কামাই-এর পয়সাটা তো গেলই; ওদিকে থোক টাকা পাওয়ার আশাটাও নির্মূলে হল। আপসোস করে, তখন দর কষাকষি না করে মেয়েটাকে কারো হাতে তুলে দিলে একটা তো অন্তত বজায় থাকত।

ভাদুয়ার অবস্থা দেখে আর সবাই সাবধান হয়।

ছাতুয়া পায় না তার বাপকে; নিধুয়া পায় না তার ভাইকে; গেঁদুয়া পায় না তার বোনটাকে। ফতুয়া ফতুর হয়ে গেছে! —তার বৌটা কোথায় পালিয়েছে। আবার কবে ছ-কুড়ি টাকা জমাবে তবে আর একটা বৌ ঘরে আনতে পারবে।

মনিয়ার কাঁথায় জড়ানো বাচ্চাটা পড়ে কাঁদে, বড়গুলো ঘুরে বেড়ায় পাড়ায় পাড়ায়—কেঁদে বেড়ায়।

উত্তমর্ণ খুঁজে ফেরে অধমর্ণ। কেউ গা-ঢাকা দেয় টাকা দেবার ভয়ে। কেউ পালায় জোড় বেঁধে। এমন কত কি!

দিনান্তে শুরু হয় হাঁড়িয়ার কাজ। ডাক্তারের কাছে গিয়ে ব্যাণ্ডেজ বাঁধে গায়ে-মাথায়। ফিরে আসে ঘরে। কেউ থাকে হাসপাতালের খাটে।

রাত্রে শুয়েও শান্তি নেই। ঘরের বেড়াগুলোও ফাঁক হয়ে যায়। উদ্দেশ্য অনেক রকম—জীবন, যৌবন, ধনমান—যা পাওয়া যায়। যে যেমন গন্ধ পায়, যার যেমন মাথায় চাগে।

পালে-পার্বণে দ্বিগুণ হয়ে ওঠে উত্তেজনা। পর্যবেক্ষকরা চলে চৌগুণে। তবুও হয় সে-সব। বোঝা যায় না, কারা কতগুণ সজাগ। সক্রিয়দের খোঁজ করা হয়, কিন্তু আদালতের কোডগুলো তাদের খুঁজে পায় না। যাদের পাওয়া যায় না তাদের না-পাওয়ার জন্য, আর যাদের পাওয়া যায় তাদের অন্য কারণে। স্বয়ং-সম্পূর্ণ রাজ্যের অলিখিত বিধানে সেসব অভিযোগ সরকারী আদালতের তালিকাভুক্ত হয় না বড় একটা। খুনের নীচে পর্যন্ত সকল বিচার-মীমাংসা এখানেই হয়ে যাবার কথা। খুনের কথাও গুম হয়ে যেতে পারত অনেক সময়। তা বলে যে সুবিচার হয় না, তা নয়। বরং আদালতের ঝঞ্ঝাট থেকে রেহাই পাওয়াটাই লাভের। এই অলিখিত বিধিব্যবস্থা অপ্রচলনে চা-বাগান-হেন-রাজা প্রজাশূন্য হবে। কথায় কথায় আদালতের সমীপে হাজির হওয়াটা কম্বলের রোঁয়া বাছারই শামিল। অতএব, অলিখিত বিধি-ব্যবস্থা লিখিতভাবে চা-বাগানের পক্ষে লাভেরই। অনিবার্য প্রয়োজনীয়।

• •

সেদিন শনিবার। নাচ-গান পানাহারের দিন। সন্ধ্যার পর রাঘবের উঠানে জমায়েত হয়েছে তার দলের যত মটা-মাইকী (স্ত্রী-পুরুষ)। মন-মেজাজ কারো ভাল নয়। গান-বাজনা দিয়ে আসরটা জমিয়ে তোলার খুবই চেষ্টা হল, কিন্তু জমল না। হাঁড়িয়া মন-মেজাজের খাতির রাখে না। শুধু তারই ক্রিয়া শুরু হয়েছে। কেউ মাথা ঝাঁকানি দেয়, অঙ্গভঙ্গি করে, কেউ বা আবোল-তাবোল বকে, হেঁচকি তোলে।

উঠানের তিন ভিটেতে ঘর, খড়ের চালা, ছিটে বেড়া। একটায় শোয়, দাওয়াতে রান্নার ব্যবস্থা। আর একটা গোয়াল, তারই সঙ্গে ঢেঁকির চালাটা কাত করা। অপরটা এমনি পড়ে থাকে, বা ধানকাঁড়া রাখে। আর একদিকের ঘরখানা সংস্কার হচ্ছে। সেখানে শুধু ভিটেটা আছে, চালাটা নেই। তাতেই চট ফেলে বসেছে রাঘব। নামটাই, চেহারা ঠিক উল্টো। অর্থাৎ রাবণের মতো, তবে মাথা নেই দশটা। সেটা পূরণ করেছে তার মেজাজ। সেটার থই পায় না কেউ বড় একটা। তবে একজনের কাছে ঢিট—সে তার বৌ, শুক্রী।

আমোদ প্রমোদটা শেষ হলেই রাঘব লেগে যাবে বিচার-কার্যে, তারই জন্য তৈরি হচ্ছে মনে মনে। কিন্তু বসবার ধরনটা অন্য দিনের মতো নয়। হাঁটুজোড়া খাড়া, দুহাতে বেড় দিয়ে বাঁধা। কুঞ্চিত কপালের নীচে চোখ দুটো স্থির হয়ে আছে কর্ণাভুর গ্রন্থির ওপর। ভিটের নীচে সারা উঠানে সারি দিয়ে বসেছে তার সভাসদ—এক একটা জ্বালানী কাঠের টুকরো নিয়ে কেউ বা নিয়েছে পিঁড়ে।

নাচগান হয়ে গেছে কয়েকবার, কয়েকটা হাঁড়িয়াও নিঃশেষ হয়েছে। মেয়েরা চলে গেছে শুক্রীর সঙ্গে ঘরে। হনুমান নতুন হাঁড়িটা ঢালতে শুরু করে দেয়। প্রথমেই গেল রাঘবের হাতে একটা বাটি। তারপর পেল বাকী সবাই। সব শেষে এক বাটি কাত করে দিল নিজের মুখে। খালি বাটিটা মাটিতে রাখার সঙ্গে অন্তর থেকে ঝাঁজটা বের করে দেবার শব্দ—এাঁ-ঃ।

লক্ষ্মণ বলে—এ ভেইয়া, যোনে (যে) মোর রাঘবজীর মান খেদাইছে তাক ধরি কেনে বিচার করিব লাগিব।

—হয়, বিচার করিব লাগিব। ভরত সায় দেয়।

বিচার সভা। তাই শুরু হয় অসমীয়া ভাষায় কিন্তু মনের উত্তেজনায় বেরিয়ে আসে নিজেদের কথা।

হনুমান এগিয়ে যায়, বলে—রাবণের গুষ্টিক্ খতম্ করি দিবেক। হামি এখনেই যাবেক্, উ'কে বাঁন্দকে আন্‌বেক্।

বিভীষণ বাধা দেয়—র হন্ বাপা, (দাঁড়াও বাপু), তয় অকলে যাই (তুই একলা গিয়ে) কি করিবি। বহুত মানু' (মানুষ) লাগ্‌বে ন' হয়।

—হয় হয়, মানু' লাগবে। ময় মানু' মাতিব যাউ' (আমি লোক ডাকতে যাই)' ভরত চলে যেতে চায় উঠানের বাইরে।

ভরতের হাতটা টেনে ধরে হনুমান, বলে—বেটা, সর্দারের মান যেতে বসেছে আর তুই আছিস পালাবার তালে!—এ' ভীষণ (বিভীষণ), তুই কি বললি? আমি একলা পারব না! তুই জানিস না, লক্ষ্মণ ভাই তোর 'বাপের ঝিয়ারীর' নাক কেটে আনতে পারে? আমি তোর রাবণের লংকা জ্বালিয়ে ক্ষার করে দিতে পারি, লঙ্কা তুলে নিয়ে আসতে পারি? আমি বীর হনুমান! এক লাফ দিয়ে এগিয়ে বিভীষণের নাকে নাক ঠেকিয়ে হনুমান বলে—জানিস না তুই?

তাকে ঠেলে সরিয়ে দেয় বিভীষণ, বলে—নে রে বাবা, সর। —হনুটা বড় গরম হয়েছে। তুই কি তুলে আনবি? লঙ্কা থাকলে তো—

—হয়, লংকা থাকলে তো—সায় দিয়ে একটা ঢোক গিলল ভরত।

বিভীষণের রসিকতাটা হনু বোঝে না। তার কথায় হনুর বীরত্বে আঘাত লাগে। সে ফুঁসে ওঠে—কী! আমি তুলে আনতে পারব না? এখনই আনব।

—হয়, এখনি আনব।

—তবে চল। —তোরা দেখবি। বলে, লক্ষ্মণ হনুর হাত ধরে টানে।

—তোরা দেখবি। বলে, ভরতও তার পিছনে চলে।

বিভীষণ ধমক দেয়—এই বীর হনুমান! কোথায় যাবি? পরভুর হুকুম নিয়েছিস?

দুজন নাক-কান মলা খেয়ে দাঁড়ায় রাঘবের সামনে—পরভু হুকুম দিয়া।

রাঘব হুংকার দেয়—এই বানদরের দল! আর নিশা ন' খাবি।

—হুয়, নিশা ন' খাবি।

—তুই হুকুম দেবার কে রে? ভরতের ওপর রুখে দাঁড়ায় হনু, ঘোষণা করে—পরভুর হুকুম, কোনেও নিশা ন' খাবি। —পরভু! মোর কারণে হুকুমটা না রাখিবি। ময় গোটেই বিলাক্ (সব কটাকে) সিধা (সায়েস্তা) বনাই দিম।

কথার সংগে হনুর হাতটা একপাক ঘুরে আসে সব কটাকে সায়েস্তা করবার ভঙ্গিতে।

—তেন্তে (তবে) চাপচুপ খাই থাক্‌, হাই-কাইজা ন' করিবি।

প্রভুর হুকুমে সায় দিয়ে ভরত কলসি কাত করে। হনু ধরে ফেলে তার হাত, আর কারো নেশা খাবার হুকুম নেই।

—বেটা! পরভু কি তোর একলার? বলে রুখে দাঁড়ায় ভরত।

—অরুর, ময় বীর—হিক্কা উঠে হনুর কথাটা আটকে যায়। পরে দু-হাত জোর করে বলে—আর রাঘবজী আমার পরভু। কথার শেষে সাষ্টাংগে প্রণাম করতে গিয়ে মাটিতে গড়িয়ে পড়ে হনু।

সেও জানায়—সে ভরত ভাই, সামনে তার প্রভু।

হনু লাফিয়ে উঠে ভরতকে জড়িয়ে ধরে—আমি বীর হনুমান, তুই ভরত ভাই।

—হয়, তয় (তুই) ভরত ভাই।

হনুর মনে পড়ে না—সায় দেওয়াটা ভরতের মুদ্রাদোষ, নয়তো মুদ্রাগুণ। কথাটা বেথাপ্পা লাগে, মুর্খটা দাসকে বলে ভাই! প্রভুর অপমান অসহ্য—এমন লোককে সে মেরে তাড়াবে।

ভরত তৎপর রফা করে নেয়। শুরু হয় দুজনের ঢালাঢালি।

বিভীষণ দেখছে—ভাই আর দাস তাদের দিকে ফিরেও তাকায় না। সে বলে—ওরে! তোরা দুজন মিলে সবটা শেষ করিস নি, এদিকে মিতা বিভীষণ আর ভাই লক্ষ্মণ বসে আছে, রাঘবজীর অন্য ভক্তরাও আছে।

এক কথায় সব ঠান্ডা। নতুন করে রাঘবজীর প্রসাদ বিতরণ হতে থাকে।

সকলকে চমক খাইয়ে রাঘব হাঁকে—শর্মি!

ঘর থেকে বেরিয়ে আসে শর্মিষ্ঠা। সাড়া দিতে গিয়ে কেঁপে ওঠে তার গলার স্বর।

রাঘব সরোষে মেয়ের দিকে তাকিয়ে বলে—মেঘু যখন রাস্তা আগলে ধরল, তুই তার গালে এক থাপ্পড় দিলি না কেন? লাথি মেরে চলে এলি না কেন?

—হ্যাঁ, লাথি মেরে চলে এলি না কেন? পঞ্চায়েতের মতো লক্ষ্মণ বলে।

হনু ওকালতি করে শর্মিষ্ঠাকে রক্ষা করতে যায়—শুর্মা ভুল করেছে পরভু।

লক্ষ্মণ উকিলের ভুল শুধরে বলে—ন' হয়, ভুলে গেছল বোধ হয়।

সকলের সকল কথারই ধুয়া ধরে ভরত।

বিভীষণের স্থির বুদ্ধি। নেশা করে, কিন্তু নেশায় থেঁতলে থেবড়ে যায় না, বুদ্ধিটাও ভোঁতা হয় না। সবাই তা জানে, মনে মনে তার মানও দেয়। রাঘবও দেয়। তার উগ্র মেজাজ উগ্রতর হয়ে উঠলে বিভীষণ তা মানিয়ে চলে। সে মেয়েটাকে রাঘবের কোপ থেকে রক্ষা করতে এগিয়ে যায়। সে বুঝিয়ে দেয়—সে ভুলে যায় নি, ভুলও করে নি। তার মিতার মেয়ে লেখাপড়া করে, বড় ঠান্ডা। সে ঝগড়া-ঝাঁটি করতে চায় নি।

ভরত বেশ মুশকিলে পড়ে। সে ভেবে পায় না এতগুলো কথার মধ্যে কোন কথাটা বেছে নেবে। "ঠান্ডা" কথাটাই ঘুরছিল তার মাথার মধ্যে, সে বলে—হাঁ, বড় ঠান্ডা ছোয়ালী—

রাঘব লাল চোখে তাকায়—ঠান্ডা ছোয়ালী! আজি মোর মান খেদালি।

—হয়, মান খেদালি। কথার সংগে ভরতের মাথাটা একপাক ঘুরে যায় রাঘবের হুঙ্কারে হাওয়া লেগে।

—কী! কে পরভুর মান নষ্ট করেছে? তাকে আমি কেটে ফেলব। হঠাৎ হনু গর্জে ওঠে, মাথা ঝাঁকায়। তার চোখ দুটো ঘুরে বেড়ায় অপরাধীর খোঁজে।

—হাঁ কেটে—। বাকী কথাগুলো আটকে থাকে ভরতের মুখে।

—শর্মি! এদিকে আয়। তোকে আজ কেটেই ফেলব। বলে, রাঘব এবার খাড়া হয়ে বসে।

শর্মিষ্ঠা কেঁপে ওঠে ভয়ে। সে জানে এটা বিচারসভা। তার মা মান নিয়ে সরে থাকে এখান থেকে। মেরে হাড় গুঁড়িয়ে দিলেও কেউ রক্ষা করবার নেই। এক কোপে কেটে দিলে তো নিস্তার পায় সব দায় থেকে, কিন্তু হাড় গুঁড়িয়ে দিলে!

শর্মিষ্ঠাকে সান্ত্বনা দিয়ে ভরত বলে—ইপিনে আহা (এদিকে আয়) একো (কোন) ভয় নাই। কাটি হে পেলাব—ইয়ার বেশী একো করবা না দিম্। (শুধু কেটে ফেলবে, এর বেশী আর কিছু করতে দেব না)।

এক চমকে হনুর মাথা থেকে নেশাটা ঝরে গেল। সে বললে—কাক্ কাটিব, শুর্মাক্! পরভু, উ বড়ু মরমরু ছোয়ালী। শুর্মাক্ ন' কাটিবি, মোক্ কাটি পেলা। কথার সংগে হনু মাথাটা এগিয়ে দেয়।

ভরত হতচকিত! শর্মী বড় ভাল মেয়ে, বড় আদরের মেয়ে—সে কি করল? তাকে কেন কাটতে হবে? চারপাশে কত লোক—ভালমন্দ সবই আছে, তাদের কাউকে কাটলেই তো হয়। এমন কত কি ভরত আওড়ে গেল।

উকিলের ওকালতি, পঞ্চায়েতের অভিমত রাঘবের রাগ উড়ে যায়। সে ঘোষণা করে—উয়াক্ কাটবাই লাক্‌বেক, উ মোর মান খেদাইছে।

চমকে উঠল ভরত, কিন্তু অভ্যাস বশে বললে—হয়-হয়, মান খেদাইছে—। ঢোক গিলে 'কাটবার' কথাটা টপকে বললে—লাগবো তো।

বিভীষণ বোঝে, আর চুপ করে থাকা যায় না। সে বলে—না সর্দার! ও মান খেদায় নি।

খুব খুশী হয়ে ভরত বিভীষণের গা-ঘেঁষে তার কথাটাই আওড়ে যায়।

রাঘব জানতে চায়, ও নষ্ট করে নি তো কে মান নষ্ট করেছে?

বিভীষণ বোঝাতে চেষ্টা করে—কেউ মান নষ্ট করতে পারে নি।

রাঘবের ভাবটা, সে যেন খুবই গরম। কিন্তু আসলে বিশেষ ভাবনায় পড়েছে। বিভীষণের কথায় একটু স্বস্তি পায়। সে জানতে চায়—তবে কি হয়েছে? এখন তার বিচার হবে।

—হয়, বিচার হব। —কথাটা ভাল করে বল, পরভু বড় গরম হয়েছে। ঠান্ডা কর তাকে। বলে, জোড়হাতে ভরত মিনতি করে বিভীষণকে।

—হাঁ, শীঘ্র পরভুকে ঠান্ডা কর নইলে তোকে মেরে তাড়াব। হনু হাত ঘুরিয়ে তাকে শাসায়।

হনুর হাতটা ঠেলে রাঘবের পানে তাকিয়ে বিভীষণ বলে—মান নষ্ট করতে এসেছিল মেঘনা।

—কী রাবণের বেটা মেঘনাদ, তাকে মেরেই ফেলব। বলে, হনু লাফিয়ে ওঠে।

নদীর ধারের ঘটনাটা পুনরাবৃত্তি করে বিভীষণ বলে—হাসির চোটে সব মেয়েগুলো ফেটে পড়ে আর কি—

রাঘবের কান খাড়া হয়, চোখ বড় করে মাথাটা এগিয়ে দিয়ে বলে—তারপর?

—তারপর মেয়েগুলো হাসতে হাসতে চলে যায়, মেঘনা মান হারিয়ে কাঁপতে থাকে।

সকলের সামনে বিভীষণ রাঘবের মান রাখল বটে, কিন্তু রাঘব তাতে নিশ্চিন্ত হতে পারল না। সে তখন নিজের মানের কথা ছেড়ে, গেল মেঘুর মানের কথায়। সে হাঁক দিল—শর্মি! তুই মেঘনাকে এমন অপমান করেছিস?

শর্মিষ্ঠা কাঁপতে কাঁপতে বলতে যায় তার কথা।

এক ধমক দিয়ে তাকে থামিয়ে দেয় রাঘব, বলে—তোকে দিকনারি দিচ্ছিল, তুই থাপ্পড় দিলি না কেন? লাথি মারলি না কেন?

ভরত ভাবনায় পড়ে যায়, বলে—হয় হয়, লাথি মারলে তো হোইত। তবে তো অপমেন হোইত না।

রাঘব গর্জে ওঠে শর্মিষ্ঠার ওপর—কে তোকে মেঘনার জনম্‌-কথা কহিছে?

শর্মিষ্ঠা মাথা নীচু করে জবাব দেয় না।

রাঘব বোঝে ওদিক দিয়ে কাউকে জড়ানো যাবে না, কথাটা মেয়েমহলের। ওদের বিচার সভায় হাজির করাতে গেলে ঝঞ্ঝাট বেড়ে যাবে। অথচ যে ভাবনাটা তার মাথার মধ্যে ঢুকে বসেছে, তা এদের কাছে ফাঁস হয়ে গেলেও মান থাকে না। তাই নিজের দুর্বলতা ঢাকতে, নিজের দম্ভ ক্ষমতা বজায় রাখতে সে ফুঁসে ওঠে—নাঃ! আমি ছাড়ব না, এর বিচার হবে।

দুহাত জোড় করে ভরত নতজানু হয়ে বসে পড়ে রাঘবের পায়ের কাছে, বলে—হয়, বিচার যদি করবি পরভু, দুর্মার মাথাটা কাটবি না।

উৎকণ্ঠিত হনু একটা উপায় বাতলায়—আমি এখনি মেঘনাকে চড় আর লাথি মেরে আসছি। তা যদি না পারি তবে নিজের হাতে নিজের গালে চড় খাব। নিজের গায়ে লাথ খাব। এখনি যাই, মেরে—। নানা অঙ্গভঙ্গির সঙ্গে কথাটা শেষ না করেই হনু পা বাড়ায় যাবার জন্য।

—হাঁ চল, মেঘনাকে—

লক্ষ্মণও তাদের সঙ্গে যাবে, বলে—তুই আর আমি না গেলে পরভুর কাজ কে করবে?

বিভীষণ সাবধান করে—ওই, হৈ-হল্লা করবি তো আমাদের গায়ে দায় আসবে। জানিস না, বড় সাহেব মেঘুকে ভালবাসে। হত সব গরু!

বিভীষণের কথায় রাঘবের মনে যে প্রতিক্রিয়া হয় তাতে হঠাৎ সে মুষড়ে পড়ে। সে বলে—সেই কথাই তো ভাবছি। বোকা মাইকীগুলোর উসকানি খেয়ে, মেয়েটা যে কাণ্ড করে বসেছে তাতে দায় এসে গেছে আমাদের ওপর। এখন কি করা—!

যতবড় বীরই হোক, যত নেশাই করুক, গায়ে দায় এসে গেলে ওদের বীরত্ব ঘুচে যায়, নেশাও কেটে যায়। ভরত সঙ্গে সঙ্গে কথাটা বুঝল। ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে সে বলে—দায় এসেছে! পরভু রক্ষা করো (কর)।

হনু লুটিয়ে পড়ে—হয় (হাঁ) পরভু, রক্ষা করো! ময় কলম-ছুরি (চা-গাছ কাটবার ছুরি) ধরবো না-জানো। পভুর কিরপায় বাই আছো। পরভু গেলে ময় তিরি-ছোলি (স্ত্রীপুত্র) লেই ভুক্কে মরিম।

—হয়, ভুক্কে মরিম।

—ময় তো উলটা ছুরি চালাই থাকো।

ওদের ভাব দেখে রাঘব নিজেকে সামলে নেয়। সে রুখে দাঁড়ায়, ফোঁস-ফোঁস করে—নাই বিচার হবাই লাগবে! ময় কাটি পেলাম, নিজে কাটিম।

ভাবের ভাবনায় যেমন ভেঙে পড়ে, তেমন কাটাকাটির কথায় চাঙ্গাও হয় এরা। অনেকের যেমন হয়, পূর্ব পশ্চিম ভেবে দেখার বোধশক্তি যখন মানুষ হারায়।

ভরতও চাঙ্গা হয়ে বলে ওঠে—হয়, পরভু নিজে কাটিব। ময় জানো।

ব্যাপারটা ঐখানেই স্থগিত রাখতে রাঘব বলে—তোরা আজ যা, কাল বিচার হবে। তোদের কিছু করতে হবে না। কাল বিচার করব, তারপর কাটব।

ওদের আর কোন কথা বলবার সুযোগ না দিয়ে শর্মিষ্ঠাকে নিয়ে রাঘব দরবার ছেড়ে চলে যায়। সে গেল বটে, কিন্তু তার কথার ভঙ্গিতে ওদের নেশার রসে চুবিয়ে নিয়ে গেল। সেই সঙ্গে পূর্ব মুহূর্তের উৎকণ্ঠাও উবে গেল।

বিভীষণ ছাড়া বাকী সবাই বলে উঠল—কাটবাই লাগবে।

—হাঁ, কাটতেই হবে। আমি কাটব।

হনু রুখে দাঁড়ায়—তুই কি কাটবি? আমি কাটব।

কে কাটবে তাই নিয়ে বেধে যায় একটা গোলমাল। বিভীষণ ঝগড়া মেটাতে বলে—তোরা কী কাটবি? কাকে কাটবি?

হনু মাথা ঝাঁকানি দিয়ে বলে—কাটিম আরু (কাটব আর কি)।

ভরত ভেবে দেখল, একটা কাউকে কাটলেই মেয়েটা বেঁচে যায়। সে বললে—কেন? মেঘুকে কাটব।

সকলের বুদ্ধি ফিরে এল। এবার জোর গলায় ভরতের কথায় সায় দিয়ে তাকে জড়িয়ে ধরল।

বিভীষণ মুশকিলে পড়ল। কি করে এখন মাতালগুলোকে সামলায়। সে বললে—বেশ, কাটবি যে, পরভুর হুকুম নিয়েছিস?

সবাই বলে ওঠে মস্ত ভুল হয়ে গেছে। কেউ বা জিব কাটে, কেউ বা চোখ কপালে তোলে। হুকুম নিতে হবে। কিন্তু তার জন্য রাঘবের ঘরে না ঢুকে, সবাই রাস্তায় গিয়ে দাঁড়ায়।

—বারো—

পশ্চিম দেশে মদ্যপানটা সামাজিক প্রথা, ধর্মেরও অংশ বটে। কিন্তু সেখানকারই মিশনারীদের প্রবর্তিত প্রাচ্যের শিক্ষা প্রণালী বিপরীত। তাই মিশনারী ইস্কুলে শিক্ষার সময় মাদক দ্রব্য বিলির বীতস্পৃহা জন্মায়। তার শাসনে জনসনের আজীবন অভ্যাসে সংযম দেখা দেয়। রাবণ তা আশৈশব স্পর্শ করতে পারেনি। তাই

রাবণের ঘরে হাঁড়িয়ার বৈঠক বসে না। কিন্তু সেদিন তার ভক্তেরা রামায়ণ ছেড়ে হাঁড়িয়া নিয়ে বসেছে, রাবণের ঘরের পাশেই একটা ফাঁকা জায়গায়। অনুগতদের আগ্রহ ও আব্দার রক্ষা করতে রাবণকেও বসতে হয়েছে সেখানে।

মেঘুর অপমানে তাদের মনে বড় ব্যথা লেগেছে। তার উপযুক্ত প্রতিশোধ নেওয়া তাদের উদ্দেশ্য। এমন গুরুত্বপূর্ণ কাজের কথা হাঁড়িয়া ছাড়া চলে না। হাঁড়িয়ার হাঁড়ি নিঃশেষ হয়েছে কয়েকটা। নেশা হয়েছে, তবুও সকলের কর্তব্যজ্ঞান টনটনে। হাঁড়িয়ার স্রোতে তাদের বুদ্ধি ভেসে যায়নি, এবং ভেসে উঠে স্থির হয়ে আছে। রসের প্রভাবে সিদ্ধিখোরের মতো সকলের বুদ্ধি নানাদিক ঘুরেফিরে চলেছে।

শর্মিষ্ঠাকে ধরে এনে মেঘুর সংগে বিয়ে দিতে হবে। নিজেদের মধ্যে এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা হ'য়ে গেছে রাবণের আড়ালে। সবাই একমত। এর জন্য যার যা ক্ষমতা তা প্রয়োগ করতে রাজী, আগ্রহান্বিত। কথাটা রাবণের সামনে ঝালাই ক'রে নিতে জমায়েত হয়েছে সবাই।

যুদ্ধের উপযুক্ত পরিস্থিতি। এমন অবস্থায় পড়ে তাদের পিতৃপুরুষের কে কবে কি করেছে একে একে সবাই তা আওড়ে গেল। হাত পা নেড়ে, মাথা হেলিয়ে দুলিয়ে, চোখ লাল ক'রে, অন্তস্তল থেকে হুংকার তুলে সকলের কথা শেষ হল। রামায়ণ-মহাভারতের বীরোচিত ঘটনার সংগে তুলনীয় সেসব ঘটনা। তারা ভুলে যায়নি যে ভারতবর্ষের চাইতেও পুরোনো তাদের জাত বংশ। দেব-দানবের সংগে বেপরোয়া হ'য়ে যুদ্ধ করেছে এমন সব লোকের বংশধর তারা। কারো বীর দর্পে দেবকুল তটস্থ, কারো প্রতাপে অসুরকুল ছিল সন্ত্রস্ত। কেউ বা সম্মানের রাজ্য বিস্তৃত করেছিল তিন জগতের প্রাণীর ওপর —খেচর, ভূচর ও জলচর।

এমন সব লোকের বংশধর হয়েও, কপালের ফেরে ম্লেচ্ছ রাজ্যে কুলি হ'য়ে পেটের সংস্থান করতে বাধ্য হয়েছে তারা। কপালের লিখন কেউ খন্ডন করতে পারে না। কিন্তু সাহস বীর্যের জয়ও কেউ ঠেকিয়ে রাখতে পারে না শেষ পর্যন্ত।

দেব হোক, দানব হোক, তাদের পূর্ব পুরুষ যে ভক্ত ছিল, তা আজও কেউ অস্বীকার করতে পারবে না। তাদের জাতের কথা রামায়ণ-মহাভারতের, পুরাণেতিহাসের পাতায় পাতায়। তাদের পূর্ব পুরুষ শিব-দুর্গার দর্শন পেয়েছে, শিবের ভক্ত ছিল তারা, শিব কি না করেছেন ভক্তের কথায়। এই ম্লেচ্ছ রাজ্যে তারা আজ কুলি বটে, কিন্তু রাবণের ভক্ত। অমন সব বীরের জাত হয়ে তারা এই সামান্য বিশ-পঞ্চাশটা মানুষের ভয়ে পিছিয়ে থাকবে, জাতের মুখে কালি মাখাবে!

একে একে সবাই এগিয়ে এল রাবণ সর্দারের সামনে। যে যার ক্ষমতা প্রকাশ করল, ঘোষণা করল ঃ

ঝন্টু রুখে দাঁড়াল।

—হামার লাঠির সামনে কুনো মানুষ (কোন মানুষের) দাঁড়াইতে ক্ষেমতা নাই আছে। হামার লাঠি বন্দুকের গুলি ফিরাই দিব পারে।

ঝন্টুর কথার সংগে হাত দুটো ঘুরে ফিরে যেন দু-দশটা গুলী ফিরিয়ে দেয় তার লাঠি, কয়েকটা মানুষ খুন-জখমও হয়।

ছটুটুর তীর-ধনুক।

—হাজার গজ দূরসে হামার তীর দুইদশ দুশমন গাঁথি লিবে।

ছটুটুর এক পা পিছনে, এক পা সামনে—সে ধনুকের বাণ নিক্ষেপ করবার ভংগিতে দাঁড়ায়। এক চোখ বুজে দেখে নেয়, তার বাণ কতদূরে গিয়ে ক'টা মানুষ বিদ্ধ ক'রে ফেলে।

মন্টুর অব্যর্থ গুলিতে।

দুশমনের চোখগুলো হমার গুলতির গুলী এ'টা করি' খাই দিবে।

মন্টুর হাত থেকে যেন নিক্ষিপ্ত হয় গুলি, মানস চোখে দেখে নেয় তার লক্ষ্য বস্তু বিদ্ধ হয়েছে।

বাস্, যুদ্ধের আয়োজন সব প্রস্তুত। হুকুম চাই, শুধু হুকুম।

—হয়, দিয়া, হুকুম দিয়া সর্দার। হুকুম।

রাবণ শংকিত হয়ে তর্জনী নাড়া দেয়—উ কথা নাই কহিবি।

মন্টু যেন কথাটা বুঝে নিল। হাত নাড়া দিয়ে সবাইকে বললে—হাঁ, উ কথা নাই কহিবি। সর্দার কি কম কম লাজ খাইছে রে! বোল্ বোল্ (চল চল) কাম্ করকে দেখাই দে।

——হাঁ-হাঁ— ঠিক ঠিক, বোল্ বোল্। এ সুখা, এ দুখা—

—জলদি মানু নিকলো, লড়াই লাগছে। দশ জান দিস্ তো শ-জান খাই লিস্।

রাবণ উৎকন্ঠিত হ'য়ে বললে—নাই, নাই, মানুর জান নাই খাবি!

—আরে জান নাই খাবি তো লড়াই কি রকম হইবো রে সর্দার!

—হাঁ রে একটা লড়াই তো লাগ্‌বো দে —পিছে দেখবি কইনা (কন্যা)।

—কইনা! রাবণ অবাক হ'ল।

—আরে সর্দার, তুই মেঘুয়াকে সাজাই রাখ কাপুড়-কানি আরু (আর) ফুল দেইকে, হামরা কইনা (কন্যা) লই আহো (নিয়ে আসি)।

রাবণ মাথা নীচু করে বলল—কাইজা করবা না লাগে, লড়াই না লাগে।

—কাইজা নাই করবি তো কইনা কেইসে আইসে রে! আরে তু' ঘাবড়াইছিস কেনে? কিষণজীকা নাতি (নাতি) অরিধা (অনিরুদ্ধ) ইথাজন্দে বাণরাজার কইনা উখাকে (ঊষাকে) লই গেলো আরু হামরা একটা কুলির ছোলী (মেয়ে) লিনাই নাই আনিস তো কি মরণ আছি?

রাবণ মাথা চুলকে জবাব দিল—তুরা তো ঠিকই কইছিস, লেকিন মেঘুয়া কইছে—পীতার না লাগে।" ই পড়া-লিখা করেকে।

সবাই হতবুদ্ধি! যেন বেড়ালের গায়ে জল পড়ল। সকলের এত বড় ইচ্ছা, এত আয়োজন সব ব্যর্থ হবে!

মন্টু মাথা চাপড়ে বললে—ই সর্দার, কোন্ লেড়কাটার মাথা খাই দিছে। উ ছোকল নাই লাগে তো দোসরা ভাল্ ছোলি আনি দিম্। সোব ঠিক হই যাব। লিখাপড়া করবা নাই দিবি, ভাত নাই মিলবেক্।

ছটুটু সায় দিল—কাম্ নাই কোরবে তো ভাত মিলবে কেইসে রে!

ঝন্টু আপসোস করে—ই দেখ্, হামার লেড়কাটা পড়ালিখা করবা দিছিলু। পরথমটা ভালই পড়লো, হামি বি খুশ্ হোইলি। তারপোর পড়া এড়লো, কাম্ বি নাই করলো। বেটা কহে—"পড়ালিখা কবিলু কী খাতিরে? কুলি খাটবা কারণে?" এখনে জুলুম করি হমার টকা-পইসা লেইকে বাবু-রকম ঘুরি বেড়ায়, সিগ্রেট ফুঁকে, শহর যাইকে সিনমা দেখে।

মন্টু বলে—হাঁরে ভেইয়া ঠিক কহেছিস। হামকে একটা আমারিকান সাব কইছে—উদের দেশে ছোলীগুলো (ছেলে-মেয়েরা) বেশী পড়ালিখা নাই কোরে। ছোটাসে কাম্ শিখ্‌বা যায়। সর্দার, তুঁ উয়াকে কোনো একটা কাম্ শিখ্‌বা দে।

রাবণ—বললে—উ কামও শিখবো, কলঘরের কাম্।

সবাই রাবণের পানে তাকাল, কথাটা ভাল করে বুঝে নেবার জন্য। ওদের কৌতূহলী চোখের সামনে রাবণ প্রকাশ করল মেঘুর কথা। শর্মিষ্ঠার কাছে অপমানিত হয়ে সে ঘরে ফিরল, মায়ের কোলে মাথা রেখে কাঁদতে কাঁদতে শুনল নিজের জন্ম বৃত্তান্ত। পরদিন খুব ভোরে গটাফেড্ সাহেবের বাংলোতে গিয়ে তাঁর কাছে প্রকাশ করল সব। জনসন্ সাহেবের কথা কে না জানে, মেঘু তার ছেলে! বড় সাহেব খুব আশ্চর্য হল, দুঃখিত হল মেঘুর অদৃষ্টের কথা শুনে।

—হয় হয়, দুখ্ তো পাবই। ই সাহেবটা যে দেওতা রকম আছে।

নিজেদের সঙ্গে সাহেবের মনের প্রতিক্রিয়াটা খতিয়ে দেখার জন্য সকলে উদ্‌গ্রীব হ'য়ে উঠল।

—পিছে কি হোইল?

—বড়া সাহব শুধলো, মেঘু কি চাহে তাঁর কাছে?

—মেঘু কি চাহিলো?

—মেঘুয়া সাহেবকে কহে দিলো, সে আংরেজকা বাচ্চা, আংরেজ মতো হোইতে চাহে।

—আংরেজ মতো! সি কি রকম?

রাবণ বললে—সাহেবটা খুব ভালো আছে। পুছ্‌ কোরল—"কি রোকমে আংরেজ মতো হইতে চাহে?"

—মেঘু কি কহিলো?

—মেঘুরা খাড়া বাত্ কহে দিল, সি আংরেজ!

সেই খাতিরে আংরেজি বোলি শিখে লিবে।

—আংরেজি শিখবেক্?

কুলির পক্ষে নিতান্ত দুরাশার আশা। সকলের চোখ বড় হয়ে উঠল কপাল ঠেলে।

—হাঁ-রে, তারপোর কলঘরে কাম্ শিখবে, মিসিন্-কাম্। তারপোর—

—মিসিন্-কাম? তারপোর?

—পিছে সাহাব যিমন বোলে তেইসি কোরবে।

—সাহাব কি কহিলো?

—সাহাব খুশ্ হোইল, লাফায়ে উঠলো। একটো আংরেজি কিতাব ভি মেঘুয়ার হাতমে দিলো, মাসমাস বকশিস সাধলো, পড়ালিখার বিলকুল সুবিধা দিলো।

মণ্টু তার কথাটা লুফে নিয়ে বললে—হাঁ, জরুর পাহিলি কিতাব দিছে।

রাবণ তার কথার রেশ ধরে বলে চলল—জাড়াদিনে কলঘর বন্দ্ হোবে, তোখন বিলকুল মিসিন্ খুলা হোবে তো!

—হাঁ, তো কি হোবে?

—তোখন কাম্ শিখা সুবিধা হোবে রে, খুলা মিসিন দেখা পা'লে মেঘুরা ঝটপট সোব শিখে লিবে যে রে। বড় সাহাব তো বিলকুল কায়দা জানে। তাই উটা জাড়াদিন তক্ থাক্‌বা দিল।

ছুট্‌টুর মাথায় তখনও বকশিসের কথাটাই লটকে আছে। সে বললে—হাঁ, টকা কেত্‌না দিলো রে?

—সাহাব ঠেনে উ কিতাবটা লিয়ে লিল, টকাটা নাই লিল রে।

—টঙ্কা, নাই লিল? কী রোকম বোকারে!

—হাঁরে ভেইয়া, উ সাহাবকে কহে দিল, কাম্ করুকে খাবেক, মুফৎ মাফিক মায়ের ঠেনে পড়বেক্।

ছুট্‌টু ভুলে গেল টাকার কথাটা, বললে—মাইজী ঠেনে পড়বে? তো ঠিক আছে।

—পিছে উ কিতাবটা খতম করুকে জাড়াদিনে মিসিন্ কাম্ যাইবে। মেঘু যবান দিল সাহাব ঠেনে।

—সাহাব মেঘুয়ার যবান লিলো?

—আউর বিয়া-সাদি?

—সাদি এখন নাই ধরবে।

—সাদি নাই কোরবে?

সবাই একসঙ্গে তাকাল রাবণের দিকে।

—নাই কোরবে, তো মাজী কী কহিছে?

—মেঘুয়ার মা ভি ওহি তো কহে দিলো।

আসরটা যেন নতুন রূপ ধারণ করল।

মেঘুর কথা শুনতে শুনতে সবাই ভুলে গেল তাদের দৃঢ় সঙ্কল্পের কথা, রণযাত্রার কথা।

ঝণ্টু বললে—ঠিক আছে রে ভেইয়া, উ তো কাম্ এড়া নাই রে।

কি একটা ভেবে মণ্টু বললে—হাঁ, উ জরুর বিয়া কোরবো, তাই টকা-কামাই জোর দিছে। ঠিক আছে রে সর্দার, তুঁ হুকুম দি, ময় (আমি) ছোলী (মেয়ে) আনি দিম্। এনে ছোলী যি আদমি-মগজ ঘুর যাব। দি, হুকুম দি।

—ধুরে বাপা, তার মা-কু পুঁছি লউ। পিছে হুকুম দিম্।

মণ্টু উৎসাহ দিয়ে বললে—জরুর পুছি লাবি। হামরা সোব ধুমধুম করি বিয়া লগাই দিম্, পাঁচটা কি পচাশটা পাঁঠা, আউর যিমান হাঁড়িয়া লাগে। আবু ছোলিবেটাকু কাপড়ে-কানি, ভালু আমরিকান রঙা শাড়ী।

—হে মণ্টু, হামি বি একজোড়া, হামার পসন্ নাই আছে। হামরিকা, ইংলিস্ নাই জানি, তু পসন্ কোরি দিবি।

ছুট্‌টু বুকে হাত চেপে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করল—মেঘু তাদের বহু উপকার করেছে, কামাই বাড়িয়ে দিয়েছে। তার বিয়েতে খুব জাঁকজমক হওয়া চাই। সবাই একবাক্যে তা অনুমোদন করল। এমনই ভাবে আলোচনা হতে থাকল যেন বিয়েটার দিন, স্থির না হলেও নিতান্ত কাছাকাছি।

কথার সঙ্গে সকলের মনেরও মোড় ঘুরল। প্রথম দিকে একটা গুরুতর কাজ সামনে রেখে নেশাটা তেমন ভোগ করতে পারছিল না। সকলের মাথা ঝিরঝিরে বাতাসের স্পর্শে সজনে পাতার মতো হেলেদুলে উঠল। মনের সঙ্গে মৌজের হ'ল কোলাকুলি। শুরু হ'ল আবার কলাস কাত করা। সেই অবসরে সকলের চোখের সামনে ভেসে উঠল মেঘুর কাজের ছবি। কানের পাশে বাজতে থাকল তার কত কথা। তাদের সঙ্গে মেঘুর মতের অমিলের কথা, মিলের কথা।

বাগানে কাজ করতে গিয়ে মেঘু ঢেলে দিয়েছে তার সমস্ত উদ্যম। কাজও তার ভাল—টিপিং, প্লাকিং, হোয়িং, প্রুনিং এমন কত কি। এসব খাটুনির ও কায়দার কাজে সে অনায়াসে দু'তিন হাজিরা কামাই করে আসে, তার সঙ্গে কেউ থাক বা না থাক।

বাগানের মধ্যে কেউ একা কাজ করে না। কোন অপরাধের শাস্তির বিধানেই এমন হয়ে থাকে। তাই কেউ একা কোন কাজ নিয়ে বাগানে যায় না, থাকে না। যদি আর সবাই মনে করে তার সাজা হয়েছে। সকলেই জানে মেঘুর সেটা স্বেচ্ছাকৃত, তবুও তার এই সৃষ্টি ছাড়া আচরণে তার জাত ভাইরা মেঘুর ওপর বড় অসন্তুষ্ট। জোট বেঁধে একদিন তারা মেঘুর কাছে অভিযোগ করে—তুই কি আমাদের ভাত মারতে চাস?

—কেন আমি কি করেছি?

—তুই এত কাজ করলে আমাদের কাজ মিলবে কি করে?

মেঘু অবাক হয়ে চেয়ে থাকে। ভেবে পায় না, কাজ করলে ভাত মারা যায় কেমন করে? বেশী কাজ করলে বরং ভাতের সঙ্গে ঘি জোটে। মেঘু সকলকে তার মতো করতে বলে।

সবাই তাকে ভালবাসে, তবু রাগ সামলাতে পারে না। সেদিনকার ছেলে মেঘু, বুদ্ধি দিতে এসেছে বুড়ো বুড়ো লোকগুলোকে। কেউ বা ধৈর্য ধরে তাদের মতামতটা বুঝিয়ে দেয়—সবাই বেশী কাজ করলে পরে কাজ মিলবে না। সাহেব বসিয়ে দেবে; সপ্তাহে দু'একদিন কাজ বন্ধ হবে। নয়তো হাজিরা কাজের নিরিখ বাড়িয়ে দেবে। তখন কাজ দিতে হবে জাস্তি, সবাই পয়সা পাবে কম্‌তি।

তাদের সঙ্গে মেঘুর বুদ্ধির তুলনা হয় না, তবুও সে তার মত বাস্ত করতে পিছু হটে না। বাগানে কত কাজ! আবাদের কাজগুলো শেষ হয় কোন মতে। বাগানের সব কাজ, এমন কি সব সেকশনের সার দেওয়াটাও হয়ে ওঠে না। বাইরের লোক ফুরোনে কাজ করে মোটা মোটা টাকা নিয়ে যায়। আর এখানকার লোকগুলো এক হাজিরা কাজ করে বাচ্চাকাচ্চা নিয়ে আধপেটা খেয়ে দিন গুজরায়। হাতের কাজ জলদি শেষ করলে, সেসব কাজ সাহেব বাগানের কুলিদেরই দেবে। বেশী কাজ করলে, নিরিখ বাড়িয়ে আমাদের ক্ষতি করে, সাহেব নিজের ক্ষতি করতে যাবে কেন?

নিজেদের ভাবেই খোরাক্ত থাকে তাদের মন। তারা বোঝে না মেঘুর কথা। বলে—তা কেন রে, সাহেব নিজের লাভের খাতিরেই তেমন করবে।

—এতদিন যে রকম কাজ হয়ে আসছে তার অদলবদল করে সাহেব গোলমাল বাধাতে যাবে কেন রে?

কথার জবাবে যুক্তি লাগে, কিন্তু হাসিতে তার দরকার হয় না। তাই কথার না পেরে হেসে ওঠে সবাই। সেই ফাঁকেতে একজন ভেবে বার করল একটা ছুতো। বাগানের কাজ শেষ করে তারা নেমে যায় পাথারে (ক্ষেতে)। ধান, কলাই, বেগুন (সরষে)—যার যেমন চিজ থাকে, সেসব বিক্রি করেও তো পয়সা পেয়ে থাকে তারা। বাগানে সারাদিন আটকে থাকলে ওসব দেখে কে? খেতির আমদানীতে ঘাটা হবে তা হলে।

তার জবাবে মেঘুও ধর্মকথা শোনাল। যে সাহেব মাটি দিল, রুটি দিল তার কাজটা আধামাধা করে সবাই পাথারে নেমে গেলি, বেইমানি করলি। সালভোর দশ বিশদিন কাজ করে, একটা দুটো ফসল তুললি, নিজের মনকেও ফাঁকি দিলি—তোরা খুব খেতিকাম্ করিস।

মেঘু একে ছেড়ে তাকায় ওর পানে, বুঝিয়ে যায়—এদিকে দু-ঘণ্টার ওপর আরো দু-চার ঘণ্টা বাগানে গতর খাটালে

তোদের কামাই যে দুগুন, তিনগুন বেড়ে যেতে পারে তা কেউ ভেবে দেখিস না। কোম্পানি সুযোগটা দিতে চায়, কিন্তু সেটা নেবার কেউ নেই। নিজেদের ছেলেমেয়ে, সংসারের সুখসুবিধার কথা ভেবে কামাই বাড়িয়ে নেবার জন্য কেউ আগে বাড়ে না।

—তুই বড় বেশী কথা বলছিস। তোর বুদ্ধি নিয়ে কাজ করতে যাব তো ফাঁকে পড়ে যাব। তোর ক্ষমতা হবে যেন, আমাদের টেনে ওঠাতে পারবি যেন?

—কেন ফাঁকে পড়ে যাবি? কেন টেনে ওঠাতে হবে? শুধু শুধু সবাইকে সন্দেহ করে ভয়ে জবুথবু হয়ে থাকিস সব। যেন দুনিয়ার সব মানুষগুলোই ফাঁকিবাজ, তোদের ফাঁকি দেবার ফিকিরই খুঁজে ফেরে তারা। শোন, সাহেবরা চতুর বটে, কিন্তু তোরাও কম নয়, ফাঁকি ধরে ফেলবার মতো বুদ্ধি তোদেরও আছে। তা সাহেবরা বেশ বোঝে।

তাদের মন থেকে যে জিনিসটা সরিয়ে দেবার জন্য মেঘু এত কথা বললে সেটারই মধ্যে তারা বেশ ঘুরপাক খেতে থাকল। ছেলেটা তো মালিক পক্ষের ওকালতি করছে, মালিকের স্বার্থের কথাই বলছে। এর মধ্যে নিজেদের সুখ-সুবিধার কোন সন্ধানই পাওয়া যায় না।

—আরে, তোর মুখে এত্না বাত্, এসব তুই কোথায় পেলি?

কেউ রুখে দাঁড়ায়—ছেলেটা বড় ফক্‌কড়। তবে চাষবাস ছেড়ে কি শুধু ওর সাহেবের বাগান নিয়ে পড়ে থাকতে বলে আমাদের?

ওদের রাগ দেখে মেঘুও একগাল হাসে, কিন্তু সেটা তার যুক্তির উৎস—তা কেন? কেউ কেউ একটা দুটো ফসল করে থাকে, কেউ বা তার ভাগের জমিটা অপরকে আধিয়া দিয়ে রাখে। ফসল কখনও ভাল, কখনও মাঝামাঝি কখনও বা নষ্ট হয়। ওটার ঠিক আছে, আবার নেইও। এদিকে আজ কাজ করলে, কাল নগদ পয়সা। চাষের দোহাই দিয়ে সারাটা বছর কুঁড়ের মতো বসে থাকে না? সেটাই তো আমার ভাল লাগে না।

—কী! আমরা বসে থাকি সারা বছর? দিনে তিন ঘণ্টায় আমরা যতগুলো গাছের কলম কাটা শেষ করি, গাঁয়ের লোকের তাতে লাগে ছসাত ঘণ্টা। তবু আমাদের মতো ভাল কাজ হয় না।

কথাটা মেনে নিলে মেঘু। সে জানে, কতগুলো কাজ বাগানের কুলিরা এত অভ্যস্থ যে গাঁয়ের লোকরা পেরে ওঠে না তাদের সঙ্গে। আবার কোন কোন কাজে গাঁয়ের লোকরা এত পটু যে কুলিরা তাদের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে চলতে পারে না। যারা যে কাজে ওস্তাদ তারা সে কাজ তো ঝটপট করবেই।

মেঘুর তর্কটাতো তা নয়। তার যুক্তি সময়টার সদ্ব্যবহার করা। কামাইটা বাড়ানো। চোখে আঙুল দিয়ে বুঝিয়ে দেয় মেঘু—সারাটা দিনের মধ্যে মাত্র ঘণ্টা দুই তিন তারা কাজ করে, বাকী সময়টা প্রায় বসেই থাকে। অন্ততঃ কামাই হবার মতো কিছু করে না। যারা নিজেদের দোষ স্বীকার করে না, নিজেদের ভালমন্দ বুঝতে চায় না তাদের সঙ্গে অমন কথা কাটাকাটি ভাল লাগে না। সেখান থেকে চলে যাবার জন্য মুখ ফেরায় সে।

হঠাৎ একজনের মনে পড়ে মেঘু তো তাদেরই একজন। সে সাহেবদের চতুর বলেছে, কিন্তু তাদেরও বোকা ঠাউরে নেই নি। তবুও মন জানে যে বুদ্ধি বাড়ে বিদ্যায়, তাদের বিদ্যা নেই বুদ্ধিও নেই। বিদ্যা আছে এমন বাপ-মায়ের ছেলে মেঘু, নিশ্চয়ই কিছু বুদ্ধি তার আছে। সে পথ আগলে ধরে, বলে—খং (রাগ) করলি কেন! শুন্ শুন্ তোর বুদ্ধিটা হামদের ভাল্‌সে বুঝাই দি না।

মেঘু ঘুরে দাঁড়ায়। রাগটা নেমে আসে অভিমানে, বলে—তোরা যা ভাল বুঝবি তাই করবি।

তারা ধরে বসে—নাই হামদের বুঝাই দে তু'র কথাটা। তু'র রকম বুদ্ধি হামদের নাই আছে?

নতুন মন দিয়ে সবাই শোনে মেঘুর কথা। মনে মনে সায় দেয়—মেঘুর কথাটা তো ঠিকই। ক্ষেতের কাজে লাভ লোকসান দুটোই আছে, কিন্তু সেদিন ক্ষতির অংকটাই বড় হয়ে উঠল। হাঁড়িয়ার কলসি কাত করার সঙ্গে এমন কত কথা তাদের মনে হল একে একে।

কবে কার ধান শুখিয়ে গেল জল না পেয়ে, কারো বা গেল পচে বেশী জলে, বানের জলে কচুরি পানা ভেসে এসে কারো ক্ষেতের ধান দিল খেয়ে। কবে কাকে দুবার ক'রে চারা লাগাতে হয়েছিল—প্রথমবার কি কারণে যেন চারাগুলো নষ্ট হয়ে যায়। এমন সব আপদ উৎরে যদিবা ফসল হ'ল, তবে যত রাজ্যের পাখী, বাঁদর, ইঁদুর, হরিণ ও শুয়রের উৎপাত। এদের কবল থেকে ফসল রক্ষা করা কি সহজ কথা! দিন নেই, রাত নেই ক্ষেতে পাহারা দেও। তাতেও ভয় আছে। যারা খেতে আসে ধান, তাদের খেতে আসে বাঘ।

রাত্তিরে পাহারা দিয়ে দিনে কাজে গিয়ে ঝিমায়। কবে মন্টু ধরা পড়ে যায় বড় সাহেবের হাতে। মন্টুর কৈফিয়ৎ শুনে সাহেব বলে—শরীর খারাপ তো ছুটি নিলি না কেন?

—ছুটি লিম্, হাজিরা নাই পাম্, তো কি খাম হুজুর?

মন্টুর ফাঁকিটা সাহেব বুঝল না। সে তখনই ছুটি পেল, ভাটিবেলা সাহেবের বাংলোয় দেখা করবার হুকুম হল। বিকেলে সাহেবের কাছে গিয়ে মন্টু পায় দরমাহা (সাপ্তাহিক বেতন) সমেত সাত দিনের ছুটি, পাঁচ টাকা বকশিস্ আর এক বোতল ওষুধ। ছুটি আর টাকাটা সে ভোগ করল, ওষুধটা ফেলে দিল হাবি-জঙ্গলে। সেই হাবি একদিন তার কোঠিয়া (ধানের চারা) খেয়ে দিল। মন্টুর বুকের ভিতরটা চমকে উঠল। ওপর থেকে একজন দেখল, মন্টু ভালমানুষকে ফাঁকি দিয়েছে, দেবতার রাগ উঠে গেল। সে হাবিকে হুকুম দিল—মন্টুর চারাগুলো যেন খেয়ে দেয়, তার ফাঁকির শোধ নেয়। কিন্তু মন্টু কখনও মনে করে—সাহেবই তার ফাঁকির কথা জানতে পেরে জঙ্গলকে বলে দেয় মন্টুর চারাগুলো খেয়ে ফেলতে। তারপর দূরে থেকে সাহেবকে দেখতে পেলেই মন্টু মাথা ঢাকে হাবির নীচে। কথার শেষে নাক-কান মলা দিয়ে মন্টু বললে—ফাঁকি মারবার ফল হামি হাতে হাতে পাই গেছি, আজি সাহাব ঠেনে যাই দোষ কথা কহি হাল্‌কা হবা লাগবো।

গালভরা হেসে মেঘু বলে—ধ্যাৎ! সাহেবের কি তেমন হিংসা আছে রে, এসব সামান্য ব্যাপার নিয়ে মাথা ঘামাবার সময় তাঁর কোথা?

মেঘু বুঝিয়ে দেয় ওটা দৈব দুর্ঘটনা।

নেশার ঝোঁকে মানুষ অনেক কিছুই করে থাকে। নতুন কিছু গ্রহণ করা, আবার পুরোনোটা ভেঙ্গে দেওয়া—সবই হয়। অমন পুরোনো একটা বিষয় মেঘুর বলার ভঙ্গিতে নতুন হয়ে দেখা দিল তাদের সামনে। নগদ আমদানীর লোভে সকলের মন নেচে উঠল। ভেসে উঠল চোখের সামনে সন্ধ্যায় মজ-লিসের ভবিষ্যত ছবিটা—হাঁড়িয়ার পর হাঁড়িয়া আসবে, শেষ হবে। তাতে আর ভাঁটা পড়বে না। সব কথা ছেড়ে দিয়ে ঐ একটা সুখের আশাতেই নেচে ওঠে সকলের মন-প্রাণ। প্রাণভরে হেসেকেঁদে তখনই লুটিয়ে পড়তে চায় সবাই। আরে! কামাইটা তো তাদের হাতের মুঠোয়। এমন করে তো কেউ হুঁশিয়ার করে দেয় নি তাদের। আর কি তারা মেঘুর কথা না শুনে পারে! আর বাকবিতণ্ডায় সময় নষ্ট করতে চায় না।

—কি কোরতে হোবে কহি দি না। পইসা মিলবে তো তিরিশ কি তিন-তিরিশ ঝাপ্‌পড় মারি তিন হাজিরা কামাই লমু, আরু তিন কি তিরিশ হাঁড়িয়া লেইকে বাঁস যাম্।

কথা শেষ ক'রে ছটটু চারপাশে চোখ ফিরিয়ে সকলকে দেখে নিল, সকলের অনু-মোদন পাবার আশায়। সবাই চোখ টেনে—হাঁ-হাঁ, ক'রে উঠল। হাঁড়িয়া মিলবে তো তিন কি তিন-তিরিশ ঝাপ্‌পড়—।

মেঘু ভেবে নেয়, আগে কামাই তো করুক, পরে দেখা যাবে তার খরচের তালিকাটা—হাঁড়িয়াটা।

—কায়দাসে কাম্ করবি তো তিনজনার কাম্ একজন কোরতে পারবি।

অতি সংক্ষেপে ভূমিকা শেষ করে মেঘু চলে যায় কাজের কথায়। ছুরি কাটারি ধার দেওয়া থেকে কাজের কায়দা ও সুবিধার বিষয় অনেক কথা বুঝিয়ে দেয়।

তারা স্বীকার করে—ছোকরা বটে, কিন্তু কাজ মেঘু জানে। তার বুদ্ধিতে চলে সকলের কামাই ডবল হয়েছে। মেঘু আরো চটপটে। যেটুকু সময়ে সবাই দু-হাজিরা শেষ করে, তার মধ্যে মেঘুর হয় তিন হাজিরা। আরও বেশী পারত। কিন্তু একটু

পরপর সে চা-ঝোপের টিলা থেকে নেমে যায় নীচে, তার মায়ের কাছে। ইস্কুলের কাজ শেষ হলে বিল্লি যায় মেঘুর কাজ দেখতে। কোনদিন সে তা না পারলে, বারবার মেঘু এদিক-ওদিক তাকায়। সেদিন তার কাজ হয় সকলের সমান।

—মাইজীর সংগে মেঘু কি ফিস্‌ফিস্‌ কহে।

ছুট্‌টু বললে—নাইরে, উ ইজ্ঞিরি শিখে। উ সিপ্‌লিং-কো সিংকিলিং কহে. গাছকে কহে টি, মানুকে মন্‌, গরুকে কো, আরু বকরিকে বোট—

মণ্টু হেসে বললে—আরে ভেইয়া সিংকিলিং নাই আছে সিক্‌লিং, আংরেজরা গাছকে কহে ট্রি।—তার ভুল কাটা সে শুধরে দিলে।

মণ্টুর মনে পড়ল, যুদ্ধের সময় এক সাহেবের কাছ থেকে সে কত ইংরেজী শব্দ শিখেছে। ও-দেশের কুলিদের কাজকর্মের, তাদের জীবনযাত্রায় কত কি সুখসুবিধার কথা শুনেছে। এমনকি সাহেব তাকে বিলেতে নিয়ে যেতেও চেয়েছিল—কিন্তু বোটা, পিয়ারী যেতে দিলে না। সেসব কথা সকলকে শুনিয়ে দিলে।

—উথানকার কুলিরা খুব কাম্‌ কোরে, বহুত টাকা পায়, কোট-প্যাণ্ট পিন্ধে, ভাল ঘরমে থাকে, সিন্‌মো দেখে, নাচে গায়, মেম লেইকে ভাল হোটেলমে যাইকে খানাপিনা কোরে, ঘরে বি রোজ গোস্থ্‌ খায়, বিয়াম খায়, হুস্কি পিয়ে।

ছুট্‌টু শেষের কথা দুটো বুঝল না। জানতে চাইল—বিয়া হুকি খানাপিনা কোরে কেনে রে?

আরে নাই—বিয়ার, হুস্কি। উসব বিলাইতী মদ, খুব কড়া। হামি সাহাবটার চাপরাসি ছিলি যেরে, সব জানেছি। উর লগ্‌ ধরলে হামি বি এত্‌না এত্‌না খাবা পারলি হয় রে। এ পিয়ারী, তুঁকি করলি রে। এখ্‌নে বসি হাঁড়িয়া খাই মরিবি রে, মচ্ছর কামর খাবি রে, লেংটি পিনি ঘুরবি রে।

ঝণ্টু তাকে সান্ত্বনা দেয়—কেনে লেংটি পিনবি রে। মেঘনা কইছে—ছয় মাহিনা ভিত্‌রে বিলকুল ভোল্‌ ফিরাই দিব, পেণ্ট পিনাই দিব, মচ্ছরদানি বি লাগাই দিব। আউর পেণ্ট পিনলে তো বিলাইতী মদ খাবি-ই। ছ-মাহিনা তার বাত্‌সে চল্‌বো লাগবো।

ছুট্‌টুর তখনই হাই ওঠে—ছ—মাহিনা! বহুত দূর আছে, কালই উ চিজ্‌টার স্বোয়াদ লিতে হোবে।

ঝণ্টুর নেশাটা কেটে যায়, তার তখনই চাই। সে বলে—এ মণ্টু ভাই, দেখনা একবার বিচার (খোঁজ) করকে, দেখ ভাই দেখ—

মণ্টু চোখ টেনে একটু হাসে—এ ঝণ্টু ভাই, তুঁ কি পাগ্‌লা হোইলি নাকি? উ মদ খালে গোশ' নাই খাবি তো পেট-বিমারি হই মরি যাবি। এ পিয়ারী তুঁ মেম-সাহেব হোই গেলি হয় রে, আরু হামে সাহেব—

—হাঁ ভেইয়া, পিয়ারী ভাল্‌ করা নাই।

ছুট্‌টু একটু ভেবে জানতে চায়—গলায় পাইপ ঢুকিয়ে তার মাথায় লাগানো ফুন্দেলে ও জিনিসটা ঢেলে দিতে হয় কিনা। সে ছোট সাহেবের ঘরে অমন একটা জিনিস দেখেছে।

—উ দোসরা চিজ্‌। বহুত মদ খাই পেটকা বিমারী হোইলে, উ ফানিল্‌সে পানি ঢালি পেট সাফা কোরে।

ছুট্‌টু ভয় পায়—উ খাইলে কি পেট-বিমারী হোই যায় নাকি রে? মরি যায় না কি রে?

মণ্টু জবাব দেবার আগেই বিভীষণ ছুটতে ছুটতে সেখানে হাজির হল। রাঘব সর্দারের দল মেঘনাকে কাটতে আসছে! খবরটা ওদের জানিয়ে দিয়ে, সাহেবকে খবর দেবার জন্য সে তৎপর মুখ ফেরাল।

সামনেই হনুমান, ভরত ও লক্ষ্মণ! ওদের পিছনে আরও কয়েকজন। রাগে ফুলে উঠে হনু বিভীষণের পথ আগলে দাঁড়াল।

—রামায়ণের বিভীষণ লংকা ছেড়ে এসেছিল রাঘবের ঘরে মিতালী করতে, আর ই বিশাসঘাত্‌ (বিশ্বাসঘাতক) রাঘবের ঘরে হাঁড়িয়া খেয়ে পেটের কথা নিয়ে এসেছে রাবণের কাছে চুকলি করতে।

—আগে তোর মাথা ভাঙ্গাম, পিছে দোসরা কথা।

—হয়, পিছে দোসরা—

—ওরা লাঠি তুলে ধরল। চোখের নিমেষে ওদের দুজনের হাতের লাঠি চলে গেল ঝণ্টুর হাতে। এরপর আর লক্ষ্মণদের সেখানে দাঁড়িয়ে থাকা উচিত নয়, সেটাই ঝণ্টু ওদের বুঝিয়ে দিতে চাইল।

—রাঘবের 'ভীষণ' যখন লঙ্কায় এসেছে, তখন কি করবি? এখন কার মাথা ভাঙ্গে সেটা যদি দেখতে না চাস তো ভাগ ইঁহাসে।

—হনু গর্জন করে উঠল—বাপের বেটা হবি তো লাঠি দেইকে বাত্‌ করবি। নাই তো মাথা ভাঙ্গ দিমু।

—হয়, ভাঙ্গ দিমু।

—লাঠি তো হামার হাতে, ভাঙ্গবি কেইসে রে?—হাইলে লাঠি, ভাংগ মাথা।

লাঠি দুটো ফিরে গেল ওদের দু-জনের হাতে।

—আবে, জান খতম করতে না চাইবি তো পালা।

—আবে গুলতিওলা চুপ থাক। বলে, লক্ষ্মণ ধনুকে তীর লাগাতে গেল। ছুট্‌টুর হাত থেকে তীর ছুটে গিয়ে তার ধনুকের ছিলাটা ছিঁড়ে দিল।

—বেশী ফুটানি করবি তো আমার গুলতি তোর চোখ খেয়ে দেবে।

বেটা গুলতির ভয় দেখাতে এসেছে।

—হয়, কেতনা গুলতি খাই দিলু।

গুলতি খেলে তোর চোখ থাকত না, খেয়েছিলি গুলি। মণ্টুর কথার সংগে হাত দুটোও উঠল ভরতের মুখের সামনে গুলি পাকাবার ভংগতে।

হনু ও ভরত রাগে জ্বলে উঠল। দু-জনের লাঠি একবার মণ্টুর মাথার ওপর ঘুরে আবার চলে গেল ঝণ্টুর হাতে।

মণ্টু শুয়ে পড়ে পা-দুটো দিয়ে কি যেন একটা করল—শত্রুপক্ষের দুজনই সংগে সংগে মাটিতে চিৎ হয়ে পড়ল।

হঠাৎ সোরগোল শুনে বিল্লি ছুটে এল সেখানে। শান্তভাবে বললে—সর্দার, এদের কাউকে যেন মারধোর করা না হয়। শুধু এখান থেকে সরিয়ে দিও।

সে মুহূর্তে বড় সাহেব (গেটফিল্ড) পিস্তল হাতে সেখানে উপস্থিত হলেন, তাঁর সঙ্গে কয়েকটি সশস্ত্র গুর্খা চৌকিদারও।

মণ্টু ধড়ফড় করে উঠে দাঁড়াল। ঝণ্টুর হাতে দুটো লাঠি, সে বেশ ভয় পেল। যদি সাহেব মনে করেন ওই দুটো মানুষ তারই লাঠির ঘায়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়েছে!

রাবণও বেশ চিন্তিত হ'ল, সে সেলাম ক'রে দাঁড়াল। আর সবাই ভয়ের চোটে সেলাম করার কথা ভুলে গিয়েছিল। রাবণের দেখাদেখি ভুলটা শুধরে নিল তারা।

কেউ কিছু বলবার আগে ওরাই সাহেবের পায়ের কাছে লুটিয়ে পড়ল। নিজেদের অপরাধ স্বীকার করল, মাপ চাইল।

সাহেব চারপাশে চোখ ফিরিয়ে মেঘুকে দেখতে পেলেন না। জানতে চাইলেন, মেঘু কোথায়?

এত অল্প সময়ের মধ্যে এতগুলো ঘটনা ঘটে গেল যে আর কারও কথা বলার ক্ষমতা ছিল না। বিল্লি বিনীত কণ্ঠে জবাব দিল—সে পড়ছে। ডাকছি তাকে।

—এখানে এত গোলমাল, আর সে পড়ছে!

—সে জানে, যারা এখানে আছে তাতেই হবে, তার থাকবার দরকার নেই।

—স্ট্রেঞ্জ!

(ক্রমশঃ)

...নিদ্রা...সুখ নিদ্রা...

মিনতি সেন

সুখনিদ্রার দিন চলে গেছে বলে আমরা অনেকেই ক্ষোভ প্রকাশ করে থাকি। শহরজীবনের জটিলতা, দুশ্চিন্তা, দুর্ভাবনা এবং নীরস যান্ত্রিকতা আমাদের সুনিদ্রা ও সুখভোগে বঞ্চিত করছে প্রতিদিন। তবে এরই মধ্যে যাঁরা মানসিক পরিশ্রম অপেক্ষা শারীরিক পরিশ্রম বেশী করেন এবং দুশ্চিন্তা ও দুর্ভাবনাকে ঘেঁষতে দেন কম, তাঁদের অনেক ক্ষেত্রেই সুনিদ্রার সুখভোগে বঞ্চিত হতে হয় না।

কিন্তু প্রকৃতপক্ষে নিদ্রা যে কি তার সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বিশ্বের তাবৎ বিজ্ঞানী নাস্তানাবুদ হচ্ছেন অন্ততঃপক্ষে গত দশ বৎসর ধরে। আর তাই নিদ্রাকে ব্যাখ্যা করতে গিয়ে তাঁরা প্রাণী-মাত্রের নিদ্রাবস্থার কতকগুলি লক্ষণের কথা বলেছেন। নিদ্রা একটি বিশেষ অবস্থা যখন প্রাণী তার পারিপার্শ্বিকতাকে সক্রিয়ভাবে অনুভব করতে পারে না। দেহের অধিকাংশ পেশীর কার্যক্ষমতা সাময়িকভাবে কমে যায় বা একেবারেই লোপ পায়। চলাফেরা বা নাড়াচড়া বন্ধ থাকে। অথচ এই অবস্থা থেকে প্রাণী তাঁর সক্রিয় অবস্থা সহজেই ফিরে পায়। ক্ষেত্রবিশেষে নিদ্রাকালে বিভিন্ন প্রাণীর দেহভঙ্গিমার কথাও তাঁরা বলেছেন। যেমন বিড়াল নিদ্রিত অবস্থায় দেহটিকে গুটিয়ে গোল বলের মতো করে ফেলে। পাখীরা দেহটিকে ছোট করে চোখের পাতা বুজিয়ে নিশ্চল অবস্থায় ঘুমোয়। ইলেকট্রিকের তারকে আঁকড়ে ধরে দেহটিকে পায়ের ওপর ঠেসে ধরে অনেক পাখীকে ঘুমোতে দেখা যায়। সাধারণভাবে এগুলি সত্য হলেও এর বিচ্যুতিও কম নেই। যথা : ঘোড়া দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ঘুমায়।

শেকসপীয়ারের নাটকের সঙ্গে যাঁরা পরিচিত তাঁদের কাছে লেডি ম্যাকবেথের ঘুমন্ত অবস্থায় ঘুরে বেড়ানোর কাহিনী অজানা নয়। জনৈক কারাধ্যক্ষের লেখা থেকে জানা যায়, রাতের বহু প্রহরীই নিদ্রিত অবস্থায় কাঁধে বন্দুক নিয়ে নির্দিষ্ট দূরত্বে নির্ভুলভাবে ঘুরপাক দিয়ে থাকেন। রাতে সামান্যতম শব্দে এঁরা সজাগ অবস্থার মতোই হুকুমদার বলে চিৎকারও করে থাকেন। পরীক্ষা করে দেখা গেছে তাঁদের অনেকের সমস্ত কাজই চলেছে গভীর নিদ্রার মধ্যে। প্রতিটি দিনরাতের অভ্যাস সুনিদ্রাভোগের ব্যাঘাত না ঘটিয়ে তাঁদের কর্তব্যপালনের এই ক্ষমতা যুগিয়েছে। টানাপাখার যুগে পাংখাপুলারদের অনেক সময় গভীর নিদ্রার মধ্যেও দাঁড় টানার কাজটি নিখুঁতভাবে করতে দেখা যেতো। নিদ্রাকে তাই দেহভঙ্গি, স্থাবিরতা ইত্যাদি লক্ষণে ব্যাখ্যা করা যায় না।

পারিপার্শ্বিকের সংগে যোগাযোগ বন্ধ হওয়ার ব্যাপারেও মতদ্বৈধতা লক্ষ্য করা যায়। পরিচিত শব্দ বাড়ীর পোষা কুকুরটির নিদ্রায় কোন বিঘ্ন ঘটে না। অথচ সামান্যতম অপরিচিত শব্দও মুহূর্তে তাকে সচকিত করে তোলে।

এক সময় মনে করা হত নিদ্রা মস্তিষ্ককে নিষ্ক্রিয় করে রাখে। যদিও বিজ্ঞানীরা লক্ষ্য করেছিলেন ঘুমের মধ্যে অনেকে কথা বলেন, স্বপ্ন দেখার ফলে মুখে আনন্দ বা দুঃখের অনুভূতিও প্রকাশ পায়। কিন্তু তখনও পর্যন্ত উপযুক্ত যন্ত্রপাতির অভাবে এর সঠিক ব্যাখ্যা দেওয়া যায়নি। নিদ্রিত অবস্থায় মস্তিষ্ক যে নিষ্ক্রিয় থাকে না তার পরিচয় পাওয়া যায় ইলেকট্রো-এন সেফালোগ্রাম যন্ত্রের সাহায্যে। বিজ্ঞানীরা একে সংক্ষেপে বলেন ই-ই-জি। যন্ত্রটি নিদ্রিত প্রাণীর মস্তিষ্কের সক্রিয়তা বিশ্লেষণ করে বলে দিতে পারে কখন সে গাঢ় ঘুমে, কখন বা পাতলা ঘুমের মধ্যে আছে। এমন কি কখন সে স্বপ্ন দেখছে কিংবা সামান্য তন্দ্রা বা বিশ্রাম উপভোগ করছে তাও ধরে ফেলতে পারে।

সমসাময়িক বিজ্ঞানীরা ই-ই-জি বিশ্লেষণে দেখেছেন প্রাণীর সজাগ অবস্থায় থাকার জন্য যেমন মস্তিষ্কের বিভিন্ন অংশ দায়ী, নিদ্রার জন্যও তেমনি অপর কতকগুলি অংশ দায়ী থাকে। চেতন অবস্থার মতোই ঘুমের মধ্যেও মস্তিষ্ক থাকে সমানভাবে সক্রিয়। তবে এই দুই প্রকারের সক্রিয়তার মধ্যে যথেষ্ট পার্থক্য দেখা যায়।

কোন স্তন্যপায়ী প্রাণীর ঘুমন্ত অবস্থার একটানা ই-ই-জি নিলে দেখা যাবে নিদ্রা দুটি ধাপে বিভক্ত। এ সময় মস্তিষ্ক দুটি পরিবর্তনীয় অবস্থার মধ্যে দিয়ে চলে। প্রথম ধাপটির নাম মৃদুতরঙ্গ ঘুম বা সহজ কথায় পাতলা ঘুম। এটি ঘুমের প্রাথমিক পর্যায়। দ্বিতীয় ধাপটিকে বলে দ্রুত তরঙ্গ ঘুম বা সোজা কথায় গাঢ় ঘুম। বিজ্ঞানের ভাষায় একে বলা হয় স্বপ্নকালীন ঘুম বা প্যারাডক্সিকাল স্লিপ। এই অবস্থাতেই আমরা স্বপ্ন দেখি। প্রথম অবস্থায় কোন স্বপ্নের আবির্ভাব হয় না।

মৃদুতরঙ্গ ঘুমে চোখের তারা স্থির থাকে। তবে কোন কোন পেশী বেশ সক্রিয় থাকে। কিন্তু গাঢ় ঘুমে চোখের তারা মিনিটে প্রায় পঞ্চাশ থেকে ষাট বার করে নড়তে থাকে। অনেক পেশীও সক্রিয়তা হারায়; যেমন ঘাড়ের পেশী। গাঢ় ঘুমের স্থায়িত্ব গড়ে ছয় থেকে সাত মিনিট মাত্র। এরপর পর্যায়ক্রমে চলতে থাকে গাঢ় ও পাতলা ঘুমের কাল। মাঝে মাঝে আসে জাগরণের পালা। কিন্তু জাগরণ ও গাঢ় ঘুমের মাঝে সবসময় থাকে পাতলা ঘুমের পর্যায়টি। অনেককে বলতে শোনা যায় তিনি স্বপ্ন দেখেন না বা দেখলেও খুব কম। কিন্তু তা ঠিক নয়। কারণ, প্রতিদিনের বাস্তব অভিজ্ঞতা, কল্পনাবার্তা, অপূর্ণ আশা-আকাঙ্ক্ষা ইত্যাদি সবসময় আমাদের মনে ছাপ ফেলে যাচ্ছে। চেতন মনে আমরা তার খবর রাখি না। কিন্তু গাঢ় ঘুমের অবসরে ঐগুলি প্রতি রাত্রেই আমাদের মস্তিষ্কে ফিরে আসে চলচ্চিত্রের এক একটি দৃশ্যের মতো। যে দৃশ্যটির প্রভাব যত বেশী মস্তিষ্কে সেটি ততো আলোড়ন তোলে। তুলনায় যেটি নিষ্প্রভ তারজন্য অনুভূতিতেও ঘাটতি দেখা যায়। তাই ঘুম ভাঙার পরে প্রতিটি স্বপ্নের কথা আমরা মনে রাখতে পারি না। কোন ব্যক্তিকে ঘুম পাড়িয়ে ই-ই-জি নিলে বেশ বোঝা যায় কখন তিনি স্বপ্ন দেখছেন এবং ঐ স্বপ্নের প্রভাবই বা কেমন। ঐ সময় ঘুম ভাঙালে তিনি স্বপ্নের কথাও বলতে পারেন। স্বপ্নের সময়ে যে দৃশ্যগুলির আবির্ভাব হয় তার প্রতিক্রিয়া মস্তিষ্কে উত্তেজনার সৃষ্টি করে। উত্তেজনা যত বাড়ে চোখের তারার গতিও তত বেড়ে যায়। উন্নতজীব মানুষের ক্ষেত্রে যে রকম উন্নত ধরনের স্বপ্নের সৃষ্টি হয়, অনুন্নত জীবের ক্ষেত্রে তা হয় না। কিন্তু স্বপ্ন সৃষ্টি, গাঢ় ও পাতলা ঘুমের পর্যায় ইত্যাদি একইভাবে হয়ে থাকে। পাখীদের ক্ষেত্রেও ঘুমের দুটি পর্যায় দেখা যায়। তবে স্বপ্নের কাল তাদের খুব কম। সরীসৃপ জাতীয় প্রাণী অথবা মাছের ক্ষেত্রে কেবলমাত্র পাতলা ঘুমের অস্তিত্বই দেখা গেছে।

ঘুম কেন আসে তা আজও অজানা। এ সম্বন্ধে বিজ্ঞানীরাও ভিন্ন ভিন্ন মত পোষণ করেন। একদল বিজ্ঞানীর মতে দীর্ঘ সময় জেগে থাকায় মস্তিষ্কের কোষগুলিতে এক ধরনের রাসায়নিক পদার্থ জমা হয়। ঘুমের মধ্যে তা দূরীভূত হয়ে মস্তিষ্ককে পুনরায় সতেজ করে তোলে। বিজ্ঞানী লিজেন্ডার তাঁর পরীক্ষায় একটি পরিশ্রান্ত কুকুরের মস্তিষ্ক থেকে কিছুটা তরল পদার্থ বের করে একটি সতেজ কুকুরের মস্তিষ্কে প্রবেশ করালেন। দেখা গেল কিছুক্ষণ পরেই কুকুরটা ঘুমিয়ে পড়ল। তিনি অজানা এই রাসায়নিক পদার্থটির নাম দিলেন হিপনোজেন। বিজ্ঞানী রুল ও মনিয়ার এই তরলটিকে পৃথক করতে পারলেন। পরীক্ষা করে দেখলেন এর প্রয়োগে যে কোন প্রাণী সতেজ ও সজীব অবস্থা থেকে কিছুক্ষণের মধ্যেই ঘুমিয়ে পড়তে বাধ্য হয়। কিন্তু আজ পর্যন্ত এই তরল পদার্থটির প্রকৃত পরিচয় জানা যায়নি।

হিপনোজেনের স্বরূপ সম্পর্কে গবেষণা করতে গিয়ে অনেক বিজ্ঞানীর অনুমান, মস্তিষ্কে যে সেরোটোনিন, নরঅ্যাড্রেনালিন, ডোপামিন প্রভৃতি অ্যামিনগুলি আছে, তারাও ঘুমের কারণ হতে পারে। পরীক্ষা করে দেখা গেল সেরোটোনিন নামক অ্যামিন মৃদুতরঙ্গ ঘুমের জন্য দায়ী। আবার নর্-অ্যাড্রেনালিন অ্যামিনটি দ্রুত তরঙ্গ বা স্বপ্নকালীন ঘুমের জন্য দায়ী। পরীক্ষায় আরও দেখা গেল সেরোটোনিনের পরিমাণ কমিয়ে দিলে নরঅ্যাড্রেনালিনের পরিমাণ অপরিবর্তিত থাকা সত্ত্বেও উভয় প্রকার ঘুমই বন্ধ হয়ে যায়। ফলে অনিদ্রা রোগ দেখা দেয়। এর থেকে আন্দাজ করা হল, উভয় প্রকার ঘুমের মধ্যে হয়তো একটা ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক আছে। আবার নিয়ালামাইড প্রভৃতি কতকগুলি ওষুধের প্রয়োগে গাঢ় ঘুম বন্ধ হয়ে যায়। কিন্তু পাতলা ঘুমের কোন ক্ষতি হয় না। এর থেকে অনুমান করা হল পাতলা ঘুমের জন্য দায়ী সেরোটোনিন অ্যামিনই হয়তো জারিত হয়ে এমন একটি যৌজের সৃষ্টি করে যা গাঢ় ঘুমকে নিয়ে আসে। তাঁরা এই নূতন পদার্থটিকে তাই গাঢ়ঘুমের আহ্বায়ক বলেছেন।

পাভলভ-অনুসারী বিজ্ঞানীদের মতে পরিবেশই আমাদের ঘুম পাড়িয়ে দেয়। অভ্যস্থ স্থান, ভাল বিছানা, অন্ধকার নিস্তব্ধ পরিবেশ, নির্দিষ্ট সময় এবং সর্বোপরি ঘুমের ইচ্ছা আমাদের ঘুমিয়ে পড়তে সাহায্য করে এবং এগুলির অভাবে নিদ্রা বিঘ্নিত হয়। কিন্তু শিশুরা পরিবেশ-সচেতন নয়। তাদের ঘুমের ক্ষেত্রে কি ব্যাখ্যা দেওয়া যাবে? বয়স্কদের ক্ষেত্রেও দেখা যায় অনেকেই যে কোন পরিবেশে ঘুমোতে পারেন। তাছাড়া নিস্তব্ধতা, অন্ধকার পরিবেশ, যদি ঘুমের কারণ হ'ত তাহলে এস্কিমোরা প্রত্যেকেই এক-একটি কুম্ভকর্ণ হয়ে যেতে পারত। পরিবেশ হিসাবে যা সুখশয্যা নিদ্রা-বিধানে ব্যর্থ হয়ে তা যে কণ্টকশয্যায় পরিণত হতে পারে, এ অভিজ্ঞতাও তো বিরল নয়। কাজেই পরিবেশকে ঘুমের ব্যাপারে এত গুরুত্ব দেওয়া যায় না।

অনেক বিজ্ঞানী মনে করেন দেহের মধ্যে যে একটি অদ্ভুত ও অদৃশ্য ছন্দ আছে বিজ্ঞানের ভাষায় যাকে জৈব-ঘড়ি (বায়োলজিকাল ক্লক) বলা হয়, তারই প্রভাবে আমরা কখনও জাগ্রত বা কখনও নিদ্রিত থাকি। সারাদিন জেগে থাকা ও নানা কাজ করার পর রাতে ঘুমিয়ে পড়ি। আবার রাত জেগে যাঁদের কাজ করতে হয় তাঁরা দিনের বেলায় ঘুমিয়ে পড়েন। ছন্দবাদী এই বিজ্ঞানীদের মতে দেহের এই ছন্দই মস্তিষ্কের নিদ্রা কেন্দ্রে হিপনোজেনের সরবরাহ নিয়ন্ত্রণ করে। কিন্তু এরও কোন প্রমাণ নেই।

ঘুমের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কেও সঠিক তথ্যটি আমাদের অজানা। তবে একথা ঠিক যে, নিদ্রা সুখদায়ী বিলাসিতা মাত্র নয়; সুস্থ ও স্বাভাবিক জীবনধারণের জন্য প্রতিটি প্রাণীরই নিদ্রা একান্তভাবে প্রয়োজন। দীর্ঘদিন ধরে যদি কোন ব্যক্তির পূর্ণ বা আংশিকভাবে ঘুম বন্ধ করে দেওয়া হয়, তাহলে 'সিজোফ্রেনিয়া'র মত অবস্থা হবে। তাঁর স্মৃতিশক্তি আংশিকভাবে লোপ পাবে, চেনা লোককেও চিনতে কষ্ট হবে, ব্যক্তিত্ব কমে যাবে, এবং অনেক ক্ষেত্রেই তিনি ধৈর্যহারা হয়ে পড়বেন। এ সময় তাঁর মধ্যে আলোকভীতিও (Photophobia) দেখা দেবে। তিনি আলোর দিকে তাকাতে পারবেন না। অনিদ্রার দরুণ মস্তিষ্কের কোষগুলির আকৃতিগত পরিবর্তনের জন্যই এরকম অবস্থা ঘটে থাকে।

বিজ্ঞানী আয়ন অসওয়াল্ডের মতে গাঢ় ঘুমে প্রোটিন তৈরীর মধ্যে দিয়ে আমাদের মস্তিষ্কের বিভিন্ন অংশে মেরামত হয়। আর পাতলা ঘুমে আমাদের দেহ মেরামত হয় প্রোটিন তৈরীর মাধ্যমে। এর পিছনে কোন বৈজ্ঞানিক যুক্তি না থাকলেও সাধারণভাবে দেখা গেছে যে, যে সকল বাচ্চাদের জন্মের সময় স্নায়ুতন্ত্র অপুষ্ট থাকে, যেমন মানুষের বাচ্চা তাদের গাঢ় ঘুম বেশী হয়। কিন্তু স্নায়ুতন্ত্রের পুষ্টির সঙ্গে সঙ্গে তাদের গাঢ় ঘুমের মাত্রা কমে গিয়ে পাতলা ঘুমের পরিমাণ বেড়ে যায়। সাধারণতঃ মানুষের ক্ষেত্রে মোট জেগে থাকার পরিমাণ হল শতকরা পঞ্চাশ ভাগ, পাতলা ঘুম হল শতকরা পঁয়ত্রিশ ভাগ আর গাঢ় ঘুমের পরিমাণ হল মাত্র শতকরা পনেরো ভাগ।

গাঢ় ঘুমে ক্লান্তি দূর হয় আমাদের এরকম একটা ধারণা আছে। কিন্তু অনেকক্ষণ ঘুমিয়েও ক্লান্তি কমে না, সজীবতা ফিরে পান না এমন লোকেরও অভাব নেই। অথচ লেখক, কবি, বৈজ্ঞানিক, রাজনীতিক, শাসক ইত্যাদি কর্মব্যস্ত লোকেরা খুব অল্পক্ষণ ঘুমিয়েই পরের দিনের কাজে দিব্যি মন দিতে পারেন। অনেকে মনে করেন ইচ্ছাশক্তির প্রভাবেই তাঁরা নিদ্রাকে জয় করে থাকেন। কিন্তু এইসব ঘটনা নিদ্রা-রহস্যকে আরও জটিল করে তুলেছে।

সভ্যতার সঙ্গে সঙ্গে আমাদের জীবনযাত্রা ক্রমশঃ জটিল হয়ে পড়ছে। কর্মব্যস্ততার চাপে ঘুমের সময়ে টান পড়ছে। বিজ্ঞানীরা তাই ক্রমাগত চেষ্টা চালাচ্ছেন কিভাবে মানুষের জীবনের বিরাট অংশকে ঘুমে নষ্ট না করেও শরীর ও মনকে সুস্থ রাখা যায়, নিদ্রাকে সংযত করে কাজের সময়কে দীর্ঘায়িত করা যায়। কিন্তু প্রতিদিনের জীবনসংগ্রামের তিক্ততাকে ভুলে থাকার জন্য সাধারণ মানুষে আমরা আহার ও বাসস্থানের সঙ্গে সঙ্গে চাইব আরও দীর্ঘায়িত নিদ্রা, সুখনিদ্রা।

ফিলিপস্ অফ ইণ্ডিয়া লিমিটেডের মিঃ এস দাশ ওস্তাদ আমীর খানকে স্টিরিও রেকর্ড প্লেয়ার উপহার দিচ্ছেন।

যন্ত্রসঙ্গীতের বিশেষ অনুষ্ঠান ছিল এম জনার্দন ও ভি রাঘবনের সেতার ও বীনের যুগ্ম অনুষ্ঠান। যথাক্রমে উত্তর ও দক্ষিণ ভারতীয় পদ্ধতিতে উভয় শিল্পীর বাদনশৈলী রসসৃষ্টিতে সক্ষম হয়েছে। এ'রা বাজান নলিনী-কান্তি ও নবরস কানাড়া—প্রথমটি কতকটা উত্তর ভারতীয় তিলক কামোদ এবং দ্বিতীয়টি ঝিনপোটি ধাঁচের। প্রথমে এ'রা পুরোপুরি কর্ণাটিক ঢঙে ত্যাগরাজ-রচিত কীর্তন বাজিয়ে শোনালেন। কিন্তু 'মালকোষ' রাগে এম জনার্দন হিন্দুস্থানী অঙ্গে এবং রাঘবন দক্ষিণ ভারতীয় অঙ্গে বাজিয়ে বেশ বৈচিত্র্য সৃষ্টি করেছেন। তবলা ও পাখোয়াজ সংগতে ছিলেন যথাক্রমে কুমার-লাল মিশ্র ও গুরু গুরুআয়ুব দয়াল।

ধ্রুপদী অঙ্গে পরিবেশিত আহমেদ রেজা খানের বিচিত্র বীনে 'মারু বেহাগ' বড় মধুর। সময় অভাবেই হয়ত এর আরোহী অঙ্গের আকস্মিক দ্রুতগতির কারণ যার জন্য এমন সুন্দর সূচনাটি উপযুক্ত উপসংহারে পৌঁছতে পারেনি।

কি সুর, কি লয়—কি সুর-শুদ্ধতায় প্রবীন সেতারী শ্রীকালীজীবন সেনের 'জয়-জয়ন্তী' আসর মাতিয়ে তুলেছিল। এম জনার্দনের একক সেতারে মধুকোষ ভালই। পণ্ডিত ভি জি যোগ তাঁর যথা-যোগ্য মানেই বাজিয়েছেন।

শ্রীগোকুল নাগের মার্কিনী শিষ্য পিটার রো-র সেতার সত্যিই আনন্দ দিয়েছে এই কারণে যে ভারতীয় রাগসঙ্গীতের যথার্থ মেজাজটি ইনি আহরণ করতে পেরেছেন। ওস্তাদ আবদুল হালিম জাফর ছিলেন যন্ত্রসঙ্গীতের উজ্জ্বল তারকা। এ'র বাজনায় দীপ্তির অভাব ছিল না।

নৃত্যে ছিলেন নীরজা দেবী (ভারত-নাট্যম) ও শর্মিষ্ঠা (কথক)।

সংগতে শান্তাপ্রসাদ ত ছিলেনই. এ ছাড়াও শ্যামল বসু, মানিক দাস গোবিন্দ বসু যথেষ্ট আনন্দ দিয়েছেন।

সাংবাদিক সম্মেলনে ইমরাৎ খাঁ

'সৌরভ' আয়োজিত এক সঙ্গীতাসরে বিদেশ প্রত্যাগত ইমরাৎ খাঁর বাজনা শুনলাম অনেকদিন পরে। তার আগে সৌরভের তরফ থেকে একটি ঘরোয়া সাংবাদিক সম্মেলনের ব্যবস্থা করেছিলেন শ্রীজ্ঞানপ্রকাশ ঘোষ। সভার উদ্বোধন করে শিল্পীর সফর তালিকার সংক্ষিপ্তসার সাংবাদিকদের কাছে মেলে ধরলেন সংস্থা-সভাপতি অদ্রিজা মুখোপাধ্যায়।

ইমারতের বিদেশ সফর এই প্রথম নয়। ১৯৬৮ অব্দে দাদা ও গুরু বিলায়েৎ খাঁ সাহেবের সঙ্গে তিনি ওদেশে গেছেন এবং এককভাবে এই তাঁর তৃতীয় বার বিদেশ পরিক্রমা। বিভিন্ন অনুষ্ঠানে সেতার বাজানো ছাড়াও, লেকচার ডেমন-স্ট্রেশন, সঙ্গীত প্রতিষ্ঠানে শিক্ষাদান ও টেলিভিশনে বাজানোও তাঁর কর্মসূচীর অন্তর্ভুক্ত ছিল।

ইমরাৎ বরাবরই প্রদোচ্ছল, আনন্দময়। এবারে দেখলাম তাঁকে সপ্রতিভ এবং আত্ম-বিশ্বাসী। সাংবাদিকদের প্রত্যেকটি প্রশ্নের প্রাঞ্জল, স্পষ্ট ও দৃঢ়তাব্যঞ্জক উত্তর শিল্পীর চিন্তা ও অনুশীলনেরই ফলশ্রুতি।

ইমরাৎ খাঁ হল্যাণ্ড, ফ্রান্স, ফিনল্যাণ্ড, ফ্লোরেন্স, আয়ারল্যাণ্ড ও জার্মাণীর বিভিন্ন অনুষ্ঠানে অংশ গ্রহণ ত করেইছিলেন এছাড়া প্রতিবারের মত টি-ভিতে বক্তৃতা ও আলোচনাচক্রে যোগদান করেও প্রচুর সুনাম অর্জন করেছেন।

শ্রোতা হিসাবে ভিনদেশীদের তুলনা মেলে না। ওরা সু-শিক্ষিত আগ্রহী এবং প্রকৃত রসবোদ্ধা। ভারতীয় সঙ্গীত শ্রবণের উপযুক্ত গ্রাহক মন ও অন্তর-প্রস্তুতির কৃতিত্ব আলি আকবর, রবিশঙ্কর ও বিলায়েৎ খাঁ সাহেবের। জনপ্রিয়তার বিচারে ওদেশে রবিশঙ্কর নিঃসন্দেহে শ্রেষ্ঠ। ইমারৎ খাঁ ওদেশে নিজের বাজনায় কোনোরকম কম্প্রোমাইজ করেননি। পুরোপুরি ভারতীয় সংগীতের শাস্ত্রীয় মতেই বাজিয়েছেন এবং এই অবিমিশ্র শুদ্ধতা ওদেশের বড় শিল্পী ও সংগীতজ্ঞের সশ্রদ্ধ স্বীকৃতি পেয়েছে। শিক্ষার্থী হিসাবেও ওরা আদর্শ পরিশ্রমী ও আন্তরিক।

ভারতীয় শিল্পীদের মধ্যে ইমারৎ খাঁই প্রথম গ্রামে সেতার বাজান। তাঁর সঙ্গত-কারী লতিফ আমেদও যথেষ্ট সমাদৃত হয়েছেন।

আলাপচারীর পর পান করালেন সংগীতসুধা। ইমরাৎ খাঁ পরিবেশিত ইমন কল্যাণ প্রার্থনার সুর ও সংযত অলংকরণে সকলের প্রশংসা আদায় করে নিয়েছে। কেশবরাৎ খাঁর তবলা সঙ্গতে সাফল্যের একটা বড় অংশের দাবীদার।

ফিলিপস কোম্পানীর আমীর খাঁ সম্বর্ধনা

গত ২৩শে অক্টোবর ফিলিপস কোম্পানীর পক্ষ থেকে পদ্মভূষণ বিভূষিত ওস্তাদ আমীর খাঁকে সম্বর্ধনা জানানো হোলো হিন্দী হাইস্কুলে আয়োজিত এক সান্ধ্য আসরে। প্রতিষ্ঠানের পক্ষ হতে ওস্তাদের হাতে স্টিরিও রেকর্ড-প্লেয়ার তুলে দিলেন শ্রীএস দাস। এই উপলক্ষে একটি সংগীতের আসর বসে।

অনুষ্ঠান শুরু হয় মায়া চট্টোপাধ্যায়ের কথক নৃত্য দিয়ে। কথকের বিভিন্ন অঙ্গ দক্ষতার সঙ্গেই প্রদর্শিত। লক্ষ্ণৌ ঘরানার ঢঙে গানের সঙ্গে নূপুরের বোলও আনন্দ-দায়ক। এই অঙ্গে সম্প্রতিকালে বিরজু মহারাজ সকলের প্রাণ নিয়ে নিয়েছেন। বাংলা কথক শিল্পীগোষ্ঠীর মধ্যে মায়া চট্টোপাধ্যায়ের নৃত্যেই এই প্রয়াস দেখা গেল এবং এ প্রয়াস অবশ্যই অভিনন্দনীয়। তবে তবলার বোলের সঙ্গে নূপুরের বোলের সংগতিচ্যুতির জন্য শিল্পীর সঙ্গে সঙ্গে তবলচিকেও আমরা দায়ী করব।

ওস্তাদ আমীর খাঁ পরিবেশিত প্রিয়া কল্যাণ নূতন করে খাঁ সাহেবের প্রতি আকর্ষণ বাড়িয়ে দিল, তার কারণ তাঁর মিষ্টিসিজমের সঙ্গে মিশেছে রোমান্টি-সিজম। থেকে থেকে কোমল নিষাদ ও ধৈবতের চকিত ছোঁয়ার আবেশ যেন ভোলা যায় না। শিল্পী পরিবেশিত অন্যান্য রাগ-গুলি হোলো বাগেশ্রী কানাড়া, সাহানা ও যোগ। জ্ঞানপ্রকাশ ঘোষের হার্মোনিয়ম এ অনুষ্ঠানের আর এক আকর্ষণ। তবলায় ছিলেন গোবিন্দ বসু।

—চিত্রাঙ্গদা

চিত্র-সমালোচনা

শিল্পীঃ। আরতি ভট্টাচার্য। পরিচালনাঃ ইন্দর সেন। ফটোঃ অমৃত

বিষাক্ত জীবনের ছবি

পরিবার প্রতিপালনে অসমর্থ ব্যক্তি নিজের রূপযৌবনধন্যা স্ত্রীকে বা রূপসী কন্যাকে ধনী বন্ধুর ভোগ্যা করে তুলেছে, এমন ঘটনার কথা আমাদের নেহাত অজানা নেই। অবশ্য স্ত্রী বা কন্যার কাছে এমন প্রস্তাব মানুষ করে কি করে বা এই প্রস্তাবে স্ত্রী বা কন্যার মনে প্রথম প্রতিক্রিয়া কি হয় এবং কি ধরণের অবস্থায় পড়ে তারা এই হীনতা স্বীকার করে, তার বিশদ বিবরণ আমাদের কাছে অজ্ঞাত। বোধ করি, সাহিত্যও এ ব্যাপারে নীরব।

বছর দুয়েক আগে একটি পূজো সংখ্যায় প্রকাশিত 'ফরিয়াদ' কাহিনীতে তারাশঙ্কর লিখেছেন যে, দধীচি আয়রণ ওয়ার্কস-এর মালিক শিবেন ভট্টাচার্য অবস্থাবৈগুণ্যে পড়ে নিজের স্ত্রীকে পাঠিয়েছিল পাড়ার বড়লোক চাটুজ্জেদের বাড়ির বড়ছেলের কাছে এবং তারও পরে নগদ দু' হাজার টাকা নিয়ে মেয়েকে বরেন মল্লিকের কাছে বেচেছিল। মল্লিক যখন ঐ টাকার তোড়া মেয়ের সামনে বাড়িয়ে দিয়েছিল, তখন বাপ শিবেন ভট্টাচার্য অনুনয়ের সুরে বলেছিল 'নে মা নে, আমাকে বাঁচা। নইলে আমাকে জেলে যেতে হবে।' পরে মেয়ের হাত থেকে নোটের তোড়াটা টেনে নিয়ে নিঃশব্দে ঘর থেকে বেরিয়ে চলে গিয়ে মেয়েকে বরেন মল্লিকের কামনার আগুনে দগ্ধ হতে দিয়ে। এরপরে মেয়েটি আর একবার বিক্রি হয়েছিল ঐ বরেন মল্লিকেরই কাছে তার নিজের স্বামীর দ্বারা। তবে সেটা ভিন্ন অবস্থায়। টাকার জোরে যে শয়তান স্ত্রীর সতীত্ব হরণ করেছে দিনের পর দিন, তাকে খুন করতে গিয়ে যখন তার স্বামী মল্লিকের দৈহিক শক্তির কাছে পরাস্ত হয়, তখন সে জেল ভয়ে ভীত হয়ে নিজের হাতে লিখেছিল, 'আমি এবং আমার স্ত্রী ষড়যন্ত্র করে স্ত্রীর রূপযৌবনের লোভ দেখিয়ে নিজেদের বাড়ীতে এনে তাকে (মল্লিককে) খুন করবার প্ল্যান করেছিলাম।' এতে স্বামী-স্ত্রী দুজনেই সই করেছিল। মল্লিক ঐ সঙ্গে স্বামীর হাতে দু' হাজার টাকা দিয়ে টাকাটা যেন ধার হিসেবে দিচ্ছে, এইভাবে দস্তখত করিয়ে নিয়েছিল। চাঁপাকে মেয়েটির ডাক নাম চাঁপা এবং ভালো নাম রত্নমালা—বরেন মল্লিক বলেছিল, 'তোমার বাবা তোমাকে বেচেছেন আমার কাছে। তুমি এখন আমার।' বরেন মল্লিককে মনে মনে ঘৃণা করেও চাঁপা অত্যন্ত ভয়ে ভয়েই অনিচ্ছা সত্ত্বেও তার কাছে আত্মসমর্পণ করেছে দিনের পর দিন। তারাশঙ্কর চাঁপার মুখ দিয়ে বলিয়েছেন, যখন সেই লোক (মল্লিক), যে লোক সেদিন দু'হাজার টাকা আমার হাতে দিয়ে আমার অবশ-বিবশ অসাড় দেহখানাকে ছিনিমিনি খেলার নজীর মনে পড়িয়ে দিয়ে আমাকে কিনেছে বলে মুখের কথার দলিল আমার সামনে ধরলে তখন আমার মনে হল আমার বুঝি উপোষ করে কি বিষ খেয়ে মরবারও অধিকার নেই। লোকটা বোবা আমাকে দিয়ে যে মৌন সম্মতির সই বা টিপছাপ দিয়ে নিয়েছে তা আমার অস্বীকার করবার সব জোর এক মুহূর্তে হারিয়ে গেল। তার চোখের দিকে তাকিয়ে আমি কেঁপে উঠলাম।'

কিন্তু তারাশঙ্করের চাঁপা আর পর্ণা পিকচার্স নিবেদিত ও বিজয় বসু পরিচালিত 'ফরিয়াদ' ছবির চাঁপা এক বস্তু নয়। তারাশঙ্করের মূল কাহিনীর চাঁপা

প্রতিদিন সকালে গঙ্গাস্নান সেরে পাড়ার চাটুজ্জেবাড়ীতে ঠাকুরঘরের কাজ করতে যায় আর সন্ধ্যায় সেজেগুজে নিজের ঘরে অপেক্ষা করে বসে মল্লিককে অভ্যর্থনা করবার জন্যে। আর ছবির চাঁপা শুধু বরেন মল্লিকের ভোগ্যবস্তু নয়, সে বরেন মল্লিক পরিচালিত মার্লিন হোটেলের রূপসী গায়িকা রমলা; সে গান গায়ঃ
I am the sin, you are are sinners, I am the loser, you are the winners.
ধারালো চকচকে ছোরা হাতে নানা অঙ্গভঙ্গী সহযোগে গাইতে থাকেঃ ধারাল ধকধকে সর্পিণী লকলকে এই ছুরি। নিয়েছে জর্জর জানে না ডরডর এই ছুরি! বলতে পারা যায়, সে শুধু সুগায়িকাই নয়, সে শিক্ষিতা এবং আধুনিকা। তার নিশ্চয়ই জানা উচিত, বরেন মল্লিক যতই তাকে দিয়ে আত্মবিক্রয় কোবালা লিখিয়ে নিক না কেন, ওই অসিদ্ধ, অসঙ্গত দলিলকে সে কোনোদিনই আদালতে পেশ করতে পারবে না; কারণ পেশ করলেই সে নিজে জেলে যাবে। মিথ্যা ভয় দেখিয়ে কোনো অনিচ্ছুক নারীকে শয্যাসঙ্গিনী করার শাস্তি বরেন মল্লিকের নিশ্চয়ই জানা আছে। চাঁপা বা রমলা কি বাপ ও স্বামীর পাপের প্রায়শ্চিত্ত করবার জন্যেই নিজেকে বরেন মল্লিকের লালসার আহুতি দিয়েছিল? কিংবা তার বাবা ও স্বামী জেলের হাত থেকে পরিত্রাণ পাবার জন্যে হাজার হাজার টাকার বদলে তাকে যে মল্লিকের হাতে তুলে দিয়েছিল, সেই ভাবনা তাকে বাধ্য করেছিল মল্লিকের ইচ্ছার অনুবর্তিনী হতে? এবং এই নৈতিক চিন্তাই কি তাকে বরেন মল্লিকের প্রাণটি নিজের হাতে নেওয়ার পথে বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছিল? সে তো ইচ্ছে করলেই নিজের হাতের ছোরা দিয়ে বরেনকে হত্যা করতে পারত, কিংবা তার পানীয়ে বিষ মিশিয়ে। কিংবা নিজের ইচ্ছার বিরুদ্ধে পনেরো বছর ধরে সে কেমন করে মল্লিকের রক্ষিতা হয়ে আছে, এই প্রশ্নের মূল-কাহিনীর জবাবে চাঁপা যে কথা বলেছিল, তাই ঠিক? সে বলেছিল, 'সংসারে দেহের একটা কামনা আছে—পেটের খিদের মত একটা খিদেও আছে। অভ্যাসেরও একটা আকর্ষণ আছে।'

জেলে যাবার ভয়ে চাঁপার বাপ ও স্বামী—দুজনেই অত্যন্ত কাপুরুষের মতো চাঁপাকেই করেছে পণ্য; বরেন মল্লিকের কাছে তাকে বিক্রয় করে অর্থ লাভ করেছে—চাঁপা এদের অমানুষিক আচরণ সয়েছে আহত এবং স্বামীর ছেলে মানুষ করেছে, তার সন্তান প্রশান্তকে নিজের কাছ থেকে দূরে রেখেছে নিদারুণ অবজ্ঞাভরে। নিজের মাতৃহৃদয়ের সহজাত স্নেহকে সে অবদমিত রেখে চলতে চেয়েছিল। কিন্তু যখন সে দেখেছে, প্রশান্ত স্কুলে ক্রমেই দুর্ধর্ষ হয়ে উঠছে, তখন সে ছেলেকে শহর থেকে দূরে দার্জিলিংয়ে রেখে পড়াতে চেয়েছে। প্রশান্ত মায়ের মনস্কামনা পূর্ণ না করেই পালিয়ে এসেছে আবার শহরে এবং হয়ে পড়ে মস্তানদের মধ্যমণি। দুই দলের বোমা প্রতিযোগিতার মধ্যে প্রশান্ত হঠাৎ আবিষ্কার করে তার বাপের ফোটো এবং বাপের লেখা কথাগুলি সম্বলিত প্যাড: প্রণব চক্রবর্তীর ছেলে প্রশান্ত চক্রবর্তী। তার মনে প্রশ্ন জাগে: তাহলে ও লোকটা কে? ঐ যার নাম বরেন মল্লিক? মায়ের জীবনের সকল জ্বালা যন্ত্রণা, ব্যর্থতা, নির্দয় নির্যাতনের কাহিনী শুনে মরীয়া হয়ে উঠল প্রশান্ত এবং মাকে মল্লিকের হাত থেকে চিরতরে উদ্ধার করবার সংকল্প নিয়ে প্রশান্ত বরেন মল্লিককে খুন করে স্বেচ্ছায় ধরা দিল পুলিশের কাছে। এবং পুলিশ ভ্যানে করে চলল বিচারের আশায়।—চিত্রটির এইখানেই সমাপ্তি।

তারাশঙ্করের মূল-কাহিনীকে অবলম্বন করে যুগ্মভাবে সমরেশ বসু ও পরিচালক বিজয় বসু যে চিত্রনাট্য রচনা করেছেন, তার পটভূমিকা মূল থেকে বহু দূরে। উনিশশো চল্লিশ দশকের গ্রাম্য পটভূমি থেকে আজকের কলকাতা শহরের পার্ক স্ট্রীটের যে ফারাক, মূল ও চিত্রটির আবহাওয়ায় সেই পার্থক্য। এছাড়া চরিত্রানুগ মূল-কাহিনীর চিত্রায়ণে অসঙ্গতি ও অতিশয়োক্তি এড়িয়ে চিত্রনাট্যকারদ্বয় যে দু'টিকে অপেক্ষাকৃত অল্প চরিত্রে বিশিষ্ট পরিচ্ছন্নতর করবার দিকে নজর দিয়েছেন তা নিশ্চয়ই সমর্থনীয়। এছাড়া চিত্রনাট্যটিতে বহু আধুনিক রীতি সন্নিবেশিত করা গেছে। যেমন, চাঁপা বাড়ী ফিরে যখন দরজা থেকে দেখল ছেলে পীড়িত হয়ে শুয়ে আছে বিছানায়, তার কপালে জলপটি, তখন তার মাতৃহৃদয়ে ইচ্ছা জেগেছিল সে কিছুক্ষণ মাকে ছুটি দিয়ে নিজে সন্তানের সেবা করে।— এই অন্তরেচ্ছাটি সঙ্গে সঙ্গে দৃশ্য মারফত দেখানো হয় এবং পরক্ষণে আবার আসল বাস্তব দৃশ্যে ফিরে এল। এছাড়া কয়েকটি স্থানে চরিত্রের মনের চমক কয়েকটি সাদা ফ্রেমের মাধ্যমে রূপায়িত হয়েছে সার্থকভাবে। চিত্রনাট্যটি অত্যন্ত সুসংবদ্ধ।

'ফরিয়াদ'-এর শ্রেষ্ঠ আকর্ষণ হচ্ছে চাঁপা ওরফে রমলার ভূমিকায় সুচিত্রা সেনের অসাধারণ প্রাণবন্ত অভিনয়। চরিত্রের প্রতিটি অনুভূতি প্রকাশে তাঁর অভিনয় আশ্চর্য নৈপুণ্যের সঙ্গে। তাঁর সুক্ষ্মাতিসুক্ষ্ম প্রকাশভঙ্গী দর্শকদের প্রচুর মুগ্ধ করেছে মুগ্ধ, বিস্মিত, চমৎকৃত। তিনি যে কি অভাবনীয়ভাবে চরিত্রটিকে ফুটিয়েছেন, তা না দেখলে হৃদয়ঙ্গম হয় কঠিন। খলচরিত্র বরেন মল্লিকের ভূমিকায় উৎপল দত্ত অত্যন্ত বলিষ্ঠরূপে অভিনয় নিদর্শন রেখেছেন। এবং এই চরিত্রটিকেও উপভোগ্য করে তুলেছেন তাঁর বাচন ও ভঙ্গীর সাহায্যে। তরুণ প্রশান্তর বেশে পার্থ মুখোপাধ্যায় সাবলীল অভিনয় করেছেন এবং মায়ের প্রকৃত বেদনার পরিচয় পাওয়ার পরে তাঁর চোখ ও ভঙ্গী হয়েছে অত্যন্ত মর্মস্পর্শী। এছাড়া বিকাশ রায় শিবেন চট্টোপাধ্যায়, আনন্দ মুখোপাধ্যায় (প্রণব চক্রবর্তী), চন্দ্রাবতী দেবী (শিবেনের স্ত্রী), বঙ্কিম ঘোষ (মাড়োয়ারী ব্যবসাদার), প্রভৃতি সব ভূমিকায় যোগ্য অভিনয় করেছেন।

কলাকৌশলের বিভিন্ন বিভাগের কাজ উচ্চ প্রশংসার যোগ্য। বিশেষ করে দিলীপরঞ্জন মুখোপাধ্যায়ের চিত্রগ্রহণের কাজ অত্যন্ত প্রশংসনীয়। সম্পাদনায় প্রণব ঘোষের কাজও দক্ষতার পরিচায়ক। ছবির গানগুলির সুরযোজনায় নচিকেতা ঘোষ অভিনবত্ব আনবার প্রয়াস পেয়েছেন। আবহসংগীতও বৈশিষ্ট্যপূর্ণ।

সুচিত্রা সেনের অভিনয়দীপ্ত পপুলার পিকচার্স নিবেদিত ও বিজয় বসু পরিচালিত 'ফরিয়াদ' একটি স্মরণীয় চিত্র।

মঞ্চাভিনয়

এস-বি থিয়েটার ইউনিটের 'অচেনা মন':

বিশ্বের সাহিত্য-রসিকদের নিবিড় উপলব্ধির সংগে লিও টলস্টয়ের অমর সৃষ্টি 'আনা ক্যারানিনা'র রয়েছে এক আন্তর যোগসূত্র। এই পরিচিতির গভীরতাই সেদিন নতুন করে প্রাণবন্ত ভাষা পেলো বালীগঞ্জ শিক্ষাসদন হলে উপন্যাসটির নাট্যরূপ পরিবেশনের মধ্য দিয়ে। অভিনয়ের আয়োজন করেছিলেন এস-বি-থিয়েটার ইউনিট। নাট্যরূপে উপন্যাসটির বাংলা নাম হয়েছে 'অচেনা মন'। এই সুবৃহৎ মানবতাবোধে প্রদীপ্ত উপন্যাসটির ঘাত-প্রতিঘাত, হৃদয়ের অতল আন্দোলনকে নাট্যাভিনয়ের সীমিত সময়ের মধ্যে মেলে ধরা সত্যি এক দুরূহ ব্যাপার। কিন্তু আশার কথা সেই কঠিন কাজটি আশ্চর্য স্বাভাবিক ছন্দে ও কুশলতায় সম্পাদন করেছেন শ্রীবিশ্বনাথ মুখোপাধ্যায়। শ্রীমুখোপাধ্যায়ের আন্তরিক নিষ্ঠা ও ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় 'অচেনা মনে' আন্দোলিত হয়েছে 'আনা কারেনিনা'র দুর্বার জীবন-সংঘাত ও মৌল জীবন সত্য। 'নবরাগ', 'অনুরাগ' আর 'অন্তরাগ'-এই তিনটি পর্বের মধ্য দিয়ে শ্রীমুখোপাধ্যায় মূল উপন্যাসটির নির্যাসটুকু তুলে ধরতে পেরেছেন তাঁর সাবলীল নাট্যরূপে। লিও টলস্টয়ের মূল বক্তব্য থেকে 'অচেনা মন' কোথাও এতটুকু সরে যায়নি। এই নাট্য-প্রযোজনাকে কেন্দ্র করে এস-বি-থিয়েটার ইউনিট নাট্যানুরাগীদের মনকে যে বিশেষ ভাবে আপ্লুত করেছে তাতে সন্দেহ নেই।

যে ধরণের সংঘবদ্ধ প্রচেষ্টা ও নিষ্ঠা থাকলে এই ধরণের ক্লাসিক সৃষ্টির নাট্যরূপকে মঞ্চের আলোয় সুস্পষ্টভাবে মূর্ত করে তোলা যেতে পারে তার স্বাক্ষর চিহ্নিত হয়েছে শিল্পীদের চরিত্রচিত্রণে। যিনি প্রথমেই অভিনয়ের ব্যাপারে প্রশংসার দাবী রাখেন তিনি হোলেন নায়িকা 'পরী'র ভূমিকাভিনেত্রী স্বাগতা চক্রবর্তী। স্বামী কর্তৃক অবহেলিতা হোলেও অন্তরের অতলে ভালোবাসা পাওয়া এবং দেওয়ার সীমাহীন তৃষ্ণা, আর অপরদিকে সন্তানের প্রতি সুগভীর স্নেহ-উদ্বেলতা—এই বিমুখী সংঘাতের অভিব্যক্তি শ্রীমতী চক্রবর্তীর চরিত্রচিত্রণে আশ্চর্য সুন্দরভাবে ধরা পড়েছে। দাম্পত্যজীবনে উদাসীন এবং কঠোর স্বভাবের মানুষ পরীর স্বামী 'অলকে'র চরিত্রটি রঞ্জিত মুখোপাধ্যায়ের দৃঢ় অভিনয়ে রূপ লাভ করেছে। মাষ্টার গৌতম মুখোপাধ্যায়ের 'সরোজ'ও হয়েছে একটি মর্মস্পর্শী চরিত্রচিত্রণ। পরীর রূপমুগ্ধ প্রেমিক 'ভ্রমরে'র রূপকার গোবিন্দ বসু মোটামুটিভাবে চরিত্রের কাছে পৌঁছতে পেরেছিলেন, কিন্তু কণ্ঠস্বরে আরো একটু আবেগবিহ্বলতা থাকলে চরিত্রটিতে গভীরতা আরো বেশী করে সঞ্চারিত হোতে পারতো। অসীমা চট্টোপাধ্যায় 'কিটি'র ভূমিকায় বেশ স্বচ্ছন্দ অভিনয় করেছেন।

অন্যান্য চরিত্রে ছিলেন বিনয় ধর (তপন), অজন্তা চৌধুরী (ডলি), বিপ্লব মুখোপাধ্যায় (ললিত), মণিমোহন চট্টোপাধ্যায় (প্রবোধবাবু), বিশ্বনাথ মুখোপাধ্যায় (সঞ্জীব), বাসুদেব বন্দ্যোপাধ্যায় (সমর), কৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায় (গোবিন্দ), বিকাশ নাগ (শম্ভু), অসীম ঘোষ (ডাক্তার)।

শ্রীবিশ্বনাথ মুখোপাধ্যায়ই সমান নিষ্ঠার সংগে নাটকটির নির্দেশনার দায়িত্ব বহন করেন। মঞ্চের আলোয় বিশেষ কয়েকটি মুহূর্ত সৃষ্টি নিঃসন্দেহে তাঁর শিল্পবোধের পরিচয় মেলে ধরে। কিন্তু আলোক সম্পাতের দিকে তাঁর আরো একটু নজর দেওয়া প্রয়োজন ছিল। আবহসংগীত মোটামুটিভাবে নাটকটির গতি অক্ষুন্ন রেখেছে।

নাট্যানুষ্ঠানে প্রধান অতিথির আসন অলঙ্কৃত করেন প্রখ্যাতা লেখিকা শ্রীমতী আশাপূর্ণা দেবী।

বি, এস, বি, ই-র 'প্রত্যাবর্তন' নাটক

গত ২৭ অক্টোবর ষ্টার থিয়েটারে বি এস বি ই রিক্রিয়েশন ক্লাবের প্রত্যাবর্তন নাটকটি সাফল্যের সংগে অভিনীত হয়। নাটকটি পরিচালনা করেন মনু মুখার্জি। পরিচালনগুণে নাটকটি উপস্থিত দর্শকদের প্রশংসা লাভে সক্ষম হয়। অভিনয়ে কৃতিত্বের পরিচয় দেন চিন্ময় ডাক্তারের ভূমিকায় ঠাকুরদাস মণ্ডল এবং সুনন্দার ভূমিকায় কল্পনা মুখার্জি। অপরাপর ভূমিকায় যাঁরা অভিনয় করেন তাঁরা সর্বশ্রী

বি এস বি ই রিক্রিয়েশন ক্লাবের প্রত্যাবর্তন নাটকের একটি দৃশ্যে কল্পনা মুখার্জি ও ঠাকুরদাস মণ্ডল

ভানু গোয়েন্দা জহর অ্যাসিস্ট্যান্ট। শুভেন্দু চট্টোপাধ্যায়, জহর রায় এবং ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়।

শঙ্কর রায়, কল্যাণ মণ্ডল, প্রতুল লাহিড়ী, ঠাকুরদাস মণ্ডল, রণজিৎ সাহা, কল্পনা মুখার্জি, বেবী মুখার্জি, বীণা রায়, দীপালি চৌধুরী, বরেন্দ্রকুমার দাস, প্রফুল্ল পাত্র, অঞ্জলিপ্রসাদ তরফদার, গোপাল রায়, শ্যামল দত্ত, বাদল ব্যানার্জি প্রভৃতি।

অটল সংঘের দুটি একাঙ্ক :

উত্তর কলকাতার পরিচিত নাট্যগোষ্ঠী **'অটল সংঘে'র** প্রযোজনায় কয়েকদিন আগে মহাজাতি সদনে দুটি একাঙ্ক নাটক পরিবেশিত হোল। নাটক দুটি হোল রবীন্দ্র ভট্টাচার্যের 'আলোর নিশানা' ও শ্যামলতনু দাশগুপ্তের 'রক্তাক্ত রোডেশিয়া'।

নিরন্তর সংগ্রামের মধ্য দিয়ে যে কৃষকেরা সুস্থভাবে বাঁচার প্রতিজ্ঞা নিচ্ছে, তাদের জীবনকে কেন্দ্র করেই গড়ে উঠেছে **'আলোর নিশানা'** নাটকটির সংঘাত। **'রক্তাক্ত রোডেশিয়া'** রূপ দিয়েছে রোডেশিয়ার সাদা-কালোর বৈষম্যের আন্দোলনকে। দুটি নাটকের নির্দেশনায় সমর মিত্র শিল্পবোধের পরিচয় রাখেন। সামগ্রিক অভিনয়ে মাঝে মাঝে শৈথিল্য আসা সত্ত্বেও শিল্পীদের চরিত্রচিত্রণে নিষ্ঠা মোটামুটি অক্ষুণ্ণই ছিল।

বিভিন্ন ভূমিকায় ছিলেন সুভাষ ঘোষ, দেবেন ভট্টাচার্য, প্রশান্ত সরকার, সমর মিত্র, অমল মৈত্র, অজিত বিশ্বাস, পরিমল ব্যানার্জী, অজিত পাঞ্জা, কমল ঘোষ, মলয় গুহ, অমিতাভ ঘোষ, সুশান্ত মৈত্র, অমল মৈত্র, অসীম দাস।

'রূপকথা'র নিয়মিত অভিনয় :

হাওড়ার প্রগতিশীল নাট্যগোষ্ঠী 'রূপকা'র শিল্পীরা গত ৭ই নভেম্বর থেকে বেন জনসনের 'ভলপোন' নাটকের বাংলা অনুবাদ অভিনয় করতে শুরু করেছেন শীশমহল মঞ্চে। আগামী ৪ঠা ডিসেম্বর পর্যন্ত প্রতি শনি ও রবিবার এই নাটকটি পরিবেশিত হবে। নাটকটির বাংলা রূপান্তর করেছেন সুশীল সেন এবং নির্দেশনার দায়িত্বও নিয়েছেন তিনি।

'লাইম লাইটে'র 'শাস্তি'

'লাইম লাইটে'র শিল্পীরা সম্প্রতি রবীন্দ্রনাথের 'শাস্তি' গল্পের নাট্যরূপ পরিবেশন করলেন প্রতাপ মেমোরিয়াল হলে। নাট্যরূপ দিয়েছেন সলিল চট্টোপাধ্যায়। রবীন বসু নির্দেশিত এই নাটকের বিভিন্ন চরিত্রে ছিলেন তপন দত্ত, অতীন ভট্টাচার্য, রবীন বসু, দীপালি ঘোষ, নির্মল চ্যাটার্জী, শ্যাম বড়ুয়া, বিমল মিত্র, মলয় চক্রবর্তী, মীনা হালদার, সুভাষ দে, হুজুর সিং শ্যামল বর্মন, বিশ্বনাথ রায়, বিপুল চক্রবর্তী, অনিল সাহা, মোহন মুখার্জী।

'টিপু সুলতান' : কল্যাণী স্পিনিং মিলস্ অফিসার্স এসোসিয়েশনের প্রযোজনায় সম্প্রতি ঐতিহাসিক নাটক 'টিপু সুলতান' সাফল্যের সঙ্গে পরিবেশিত হোল। উন্নত ধরণের অভিনয়দীপ্ত এই নাটকের কয়েকটি বিশিষ্ট ভূমিকায় ছিলেন প্রবীর বসু (টিপু), দেবব্রত দত্ত (মুর্শিদে লালী), বলাই চক্রবর্তী (হায়দার), বিভূতি রায় (নানা ফারনাবীশ), পার্থ মজুমদার, অভয় চক্রবর্তী, নিখিল মজুমদার, প্রশান্ত ঘোষ, শীলা প্রধান, ঝরা কুমার, মণি সেনগুপ্ত।

-০- একাঙ্ক নাট্য প্রতিযোগিতা -০-

'অগ্রণী' আয়োজিত একাঙ্ক নাট্য প্রতিযোগিতা শুরু হবে আগামী ১৫ই ডিসেম্বর। যোগদানের শেষ তারিখ ২০শে নভেম্বর। যোগাযোগের ঠিকানা : ৫৮, ক্ষেত্র মিত্র লেন, সালিখা, হাওড়া।

'পরবেশ' পরিচালিত একাঙ্ক নাটকের প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হবে আগামী ১৮ই ডিসেম্বর থেকে। যোগদানের শেষ তারিখ ২৫শে নভেম্বর। ঠিকানা : পরবেশ, ১৪, মনসাতলা রো, খিদিরপুর, কলকাতা-২৩

স্টুডিও থেকে

এই সপ্তাহে 'ভানু গোয়েন্দা জহর অ্যাসিস্টান্ট'

বাদলরাজ সিনহা প্রযোজিত জয়দীপ পিকচার্সের মজার ছবি 'ভানু গোয়েন্দা জহর অ্যাসিস্ট্যান্ট' আজ শুক্রবার, ১১ নভেম্বর বসুশ্রী বীণা ও শহরতলীর অন্যান্য চিত্রগৃহে মুক্তিলাভ করবে। প্রণব রায়ের কাহিনী ও চিত্রনাট্য অবলম্বনে ছবিটা পরিচালনা করেছেন পূর্ণেন্দু রায়চৌধুরী। সুর সৃষ্টিতে রয়েছেন—শ্যামল মিত্র। গানগুলিতে কণ্ঠদান করেছেন—সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়, লীনা ঘটক ও শ্যামল মিত্র। অমিয় মুখোপাধ্যায় ছবিটির সম্পাদক। প্রধান চরিত্রগুলি রূপায়িত করেছেন—ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়, জহর রায়, শুভেন্দু চট্টোপাধ্যায়, লিলি চক্রবর্তী, পাহাড়ী সান্যাল, পদ্মাদেবী, বঙ্কিম ঘোষ, হরিধন মুখোপাধ্যায়, নৃপতি চট্টোপাধ্যায়, আশা দেবী, বীরেন চট্টোপাধ্যায় ও শ্যাম লাহা। ফিল্ম ফাইনান্সিং কর্পোরেশন ছবিটির পরিবেশক।

'শ্রাবণ সন্ধ্যা' সমাপ্তির পথে।

প্রান্তিক গোষ্ঠী পরিচালিত ও কালীমাতা ফিল্মস পরিবেশিত 'শ্রাবণ সন্ধ্যা' ছবিটির চিত্রগ্রহণ প্রায় সমাপ্তির পথে। ছবিটির চিত্রনাট্য রচনা করেছেন—শেখর চট্টোপাধ্যায়। সংগীতবহুল এই ছবিটির সংগীত পরিচালনা করেছেন—[illegible] ঘোষ। নেপথ্যে কণ্ঠদান করেছেন—মান্না দে, আরতি মুখোপাধ্যায় ও সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়। বিশ্বনাথ নায়ক ছবিটির প্রধান সম্পাদক। চরিত্র-চিত্রণে আছেন—সমিত ভঞ্জ, সুমিত্রা মুখোপাধ্যায়, শেখর চট্টোপাধ্যায়, জহর রায়, সাধনা রায়চৌধুরী, বঙ্কিম ঘোষ, কল্যাণী ঘোষ, তৃপ্তি দাস, তপতী বর্মণ এবং সুচিত্রা সেন।

বিলেত ফেরৎ। অপর্ণা সেন ও সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়। পরিচালনা : চিদানন্দ দাশগুপ্ত।
ফটো : অমৃত

বিবিধ সংবাদ

সম্ভাবনার আগামী বিচিত্রানুষ্ঠান

আসচে ১৪ নভেম্বর, রবিবার সকাল ১০টায় গৌতম মুখোপাধ্যায়ের উদ্যোগে সম্ভাবনা সাংস্কৃতিক গোষ্ঠী একটি বিচিত্রানুষ্ঠানের আয়োজন করেছেন। এই অনুষ্ঠানে কন্ঠসঙ্গীতে আছেন হেমন্ত মুখোপাধ্যায় ও শ্যামল মিত্র যন্ত্রসঙ্গীতে ভি বাল্সারা ও তাঁর সম্প্রদায় এবং আবৃত্তি করবেন কাজী সব্যসাচী।

গ্লোবে জেমস বন্ড পর্যায়ের শ্রেষ্ঠ 'অন হার ম্যাজেস্টিজ সিক্রেট সার্ভিস'

'ডাক্তার নো', 'ফ্রম রাশিয়া উইথ লাভ', 'গোল্ড ফিঙ্গার', 'থান্ডারবল' প্রভৃতি জেমস বন্ড পর্যায়ের ছবিগুলি যে আজ অসাধারণ-ভাবে জনপ্রিয়, একথা নির্দ্বিধায় বলা চলে। কাহিনীকার আয়ান ফ্লেমিং, চিত্রনাট্যকার রিচার্ড মেবাম, যুগ্ম প্রযোজক আলবার্ট আর ব্রোকোলি ও হ্যারী সালট্জম্যান এবং সুরকার জন ব্যারি—এঁদেরই সম্মিলিত নৈপুণ্যে ছবিগুলি এই জনপ্রিয়তা লাভ করেছে। এঁরা এবার এঁদের সর্বশক্তি প্রয়োগ করে নতুন যে ছবিটি উপহার দিয়েছেন, সেই 'অন হার ম্যাজেস্টিজ সিক্রেট সার্ভিস' টেকনিকলার মণ্ডিত হয়ে প্যানাভিশনে দেখানো হচ্ছে গ্লোব সিনেমায় গেল ৪ নভেম্বর থেকে। এই ছবিটি পরিচালনা করেছেন অভিজ্ঞ সম্পাদক পিটার হান্ট। নায়ক রূপে অবতীর্ণ হয়েছেন চলচ্চিত্রে নবাগত অস্ট্রেলিয়াবাসী জর্জ ল্যাজেনবী এবং এঁর বিপরীতে নায়িকা হয়েছেন নামকরা টেলি-ভিশন অভিনেত্রী ডায়না রিগ। ছবির বহির্দৃশ্যগুলি সুইজারল্যান্ড ও পোর্টু-গালের রম্য প্রাকৃতিক পরিবেশে তোলা হয়েছে।

প্রযোজক নেপাল দত্ত চিকাগো গেলেন

চিকাগো আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবে যোগদানের জন্যে প্রযোজক নেপাল দত্ত গেল বৃহস্পতিবার, ৪ নভেম্বর চিকাগো রওনা হয়ে গিয়েছেন। এখানে গেল ৭ নভেম্বর ভারতের তরফে সরকারীভাবে যোগদানকারী ছবি সত্যজিৎ রায় পরি-চালিত 'প্রতিদ্বন্দ্বী' দেখানো হয়েছে। পরে শ্রীদত্ত লণ্ডন চলচ্চিত্রোৎসবেও যোগ দেবেন। ওখানে ১৮ এবং ২১ নভেম্বর শ্রীরায়ের 'প্রতিদ্বন্দ্বী' প্রদর্শিত হবে।

কেরলে সি-এল-টি

কেরলের অপরূপ সৌন্দর্যমণ্ডিত দেশ পরিক্রমা করে শিশু রংমহল গোষ্ঠী কলকাতায় ফিরেছে। ৫৫০০ কিলোমিটার

ভ্রমণ ছোটদের একটি আশ্চর্য কীর্তি। ত্রিচুর থেকে ১৯ মাইল দূরে গুরুভায়ুরে তাদের প্রথম প্রবেশ। অভ্যর্থনাতে সমস্ত গুরুভায়ুরের ছোট-বড়দের সঙ্গে ছিল তিনটি স্বর্ণলংকার ভূষিত হাতী। মন্দিরটি কেরলে সর্বাপেক্ষা পবিত্র। এখানে-ওখানে অসংখ্য হাতী বাঁধা সবই মন্দিরের সম্পত্তি। মন্দিরের নিজস্ব ধর্মশালাতে ছিল দলটি। কত দেশ-বিদেশ থেকে আসেন তীর্থযাত্রীরা। সন্ধ্যায় সমস্ত গুরুভায়ুর ভেঙে পড়ে সংগ অফ ইণ্ডিয়া দেখতে। এখানে ছিলেন বহু কথাকলি গুরু এবং তাদের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা অর্জন করে সি-এল-টি চলে আলোয়েতে আঁকা-বাঁকা পথ ধরে। আলোয়ে কোচিন থেকে ১২ মাইল মাত্র। উদ্যোগমণ্ডলের উদ্যোগে সং অফ ইণ্ডিয়ার দুটি শো হয়। এবার আরো অভ্যর্থনা—আরো প্রশংসা এবং একটি আশ্চর্য উপহার—প্রায় আধ মণ ওজনের একটি বাতিদান। ছোটরা আর্ণাকুলাম ও কোচিন পরিক্রমা শেষ করে চলল কোট্টায়াম। কি সুন্দর পাহাড়ী শহর কি সুন্দর বালভবন। এটি তৈরী হয়েছে কে পি এস মেনন-এর উদ্যোগে। সমস্ত দলটি বালভবনেই ছিল কত সুপরিকল্পিতভাবে কেরল সরকার এগিয়ে চলেছেন তা এই বালভবনগুলি দেখলেই বোঝা যায়। কোট্টায়ামে হল রামায়ণ। অনেক টাকা তুলেছে এরা—সবই বালভবনের উন্নতিকল্পে যাবে। পাহাড় আর সমুদ্রের মিশ্রণে কেরলের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য মনকে অভিভূত করে। কোট্টায়াম থেকে পুরো দলটি চলল কন্যাকুমারিকায়। বিবেকানন্দ স্মরণী দেখে এল ত্রিবান্দ্রমে। কেরল মুখ্যমন্ত্রী বাচ্চাদের সরকারী অভ্যর্থনা জানালেন রাজউদ্যানে। সন্ধ্যায় হল রামায়ণ। অসংখ্য হাততালিতে সেনেট হল মুখরিত হল। অচ্যুত মেনন বললেন, 'অপূর্ব'। রাজ্যপাল বিশ্বনাথন বললেন, কি সুন্দর—সবাইকে আমার শুভেচ্ছা জানিও।' গুরু গোপীনাথ বললেন, 'আশ্চর্য!' আলো, নৃত্য ও তিমিরবরণের ছন্দে—এককথায় একটি সার্থক সৃষ্টি।' কিছু কথাকলির ব্যাকরণ শুদ্ধ করেও দিলেন। দুদিন ত্রিবান্দ্রমে থেকে ফেরবার পথে সি-এল-টি নামল কুইলনে। একটি রামায়ণ প্রদর্শনী দেখিয়ে এরা ৭০০০০, তুললেন; এখানে নতুন বালভবন হবে। গুরু গোপীনাথ শিশু রংমহলকে একটি বাতিদান উপহার দিলেন।

কুইলন থেকে ২৫০০ কিঃ মিঃ পথ ফেরবার পালা। ৬০ জনের দলটি খানিকটা ক্লান্ত অথচ প্রফুল্ল ও সুস্থ চিত্তেই ফিরল পুরাতন কলকাতায়। দূরের কেরল কিন্তু আর দূরে নেই, সমস্ত দলটির গায়ে নারিকেল লাঞ্ছিত সমুদ্রের হাওয়া মাখা রয়েছে। আর বাংলার খানিকটা সুস্থ হাওয়া এরা দিয়ে এসেছে কেরলবাসীকে।

'নেতাজী ডানপিটেদের আসর'-এর অনুষ্ঠান

গত ১লা নভেম্বর পুরুলিয়া জেলার মানবাজারস্থিত নেতাজী ডানপিটেদের আসর'-এর সদস্যারা অরুণ দে রচিত 'আগন্তুক' নাটকটি সাফল্যের সঙ্গে অভিনয় করেন। অভিনয়ে মনোজ মুখার্জি (কেলো) ও অনিমেষ পাত্র (চাকর) দর্শকবৃন্দের অকুণ্ঠ প্রশংসা লাভ করেন। অন্যান্য অভিনেতাদের মধ্যে অর্জুন ধবলবাবু, তারাশংকর হালদার, সরোজ মুখার্জী, গৌতম দত্ত, বিশ্বনাথ সরকার, অরুণ সেন ও জগন্নাথ দত্তের অভিনয়ও উল্লেখযোগ্য। নাটকটি পরিচালনা করেন শ্রীকুমার সরকার। আবহসংগীত রচনা ও পরিচালনা করেন অজিত ভট্টাচার্য ও অমিতাভ ঘোষ। নাটকটির ব্যবস্থাপনায় 'আসরের' পক্ষে ছিলেন শক্তি দত্ত ও সমীর মুখার্জী।

তরুণ যন্ত্রসংগীতশিল্পী

তরুণ পিয়ানো অ্যাকর্ডিয়ান শিল্পী শ্রীপ্রশান্ত মুখোপাধ্যায় বাংলা ও বাংলার বাইরে বহু অনুষ্ঠানে যন্ত্রসংগীত পরিবেশন করে সুনাম অর্জন করেছেন। সম্প্রতি নদীয়ার এক অনুষ্ঠানে যন্ত্রসংগীত পরিবেশন করে দর্শকদের অকুণ্ঠ প্রশংসা লাভ করেন। শ্রীমুখোপাধ্যায় ও তাঁর সম্প্রদায় সম্প্রতি বিহার ও উড়িষ্যা সফর করে এসেছেন। ইনি সুরকার ও স্বরলিপিকার পরিমল আচার্য মহাশয়ের সঙ্গে যুক্ত আছেন। যন্ত্রসংগীতে প্রথম হাতেখড়ি কল্যাণ সেনের কাছ থেকে। তারপর সেই শিক্ষা পরিণতি লাভ করে অমিয় মন্ডলের নিকট। শুধু পিয়ানো-অ্যাকর্ডিয়ান নয়, মাউথ-অর্গান বাজনাতেও ইনি সমান পারদর্শী। শিল্পীর সঙ্গে সহযোগিতায় আছেন—প্রদীপ সেনগুপ্ত, মিঃ উইলিয়ামস, কমল সিং, মিঃ মাইকেল প্রভৃতি।

মৌম মুখোপাধ্যায়ের বর্তমান ছবি কবিয়াল। আগামী ছবি আলোর ফেরা। ফটোঃ অমৃত

১৯৭১ সালের আই এফ এ শীল্ড বিজয়ী মহমেডান স্পোর্টিং দল

খেলাধুলা

দর্শক

আই এফ এ শীল্ড

১৯৭১ সালের আই এফ এ শীল্ড ফাইনালে মহমেডান স্পোর্টিং ২—০ গোলে টালিগঞ্জ অগ্রগামী দলকে পরাজিত করে পঞ্চমবার আই এফ এ শীল্ড জয়ের গৌরব লাভ করেছে। অপরদিকে টালিগঞ্জ অগ্রগামী দলের পক্ষে এই প্রথম আই এফ এ শীল্ড ফাইনাল খেলা। এখানে উল্লেখ্য, মহমেডান স্পোর্টিং দল এই নিয়ে সাতবার আই এফ এ শীল্ডের ফাইনালে খেলে পাঁচবার জয়ী হল (১৯৩৬, ১৯৪১, ১৯৪২, ১৯৫৭ ও ১৯৭১)। তারা ১৯৩৮ এবং ১৯৬৩ সালের শীল্ড ফাইনালে পরাজিত হয়।

১৯৭১ সালের আই এফ এ শীল্ড প্রতিযোগিতায় মোহনবাগানের অনুপস্থিতি এবং সেমি ফাইনালে টালিগঞ্জ অগ্রগামী দলের কাছে ইস্টবেংগল দলের অপ্রত্যাশিত পরাজয়ের ফলে শীল্ড খেলার আকর্ষণ একেবারে কমে যায়। কলকাতার ফুটবল খেলার আসরে মোহনবাগান এবং ইস্টবেংগল দল গত একযুগ ধরে বিরাট প্রাধান্য বিস্তার করে আছে। এই দুই দলের খেলাই ফুটবল অনুরাগীদের কাছে প্রধান আকর্ষণ। এ পর্যন্ত মোহনবাগান ৯-বার আই এফ এ শীল্ড জয়ী হয়েছে এবং প্রথম বিভাগে লীগ চ্যাম্পিয়ান হয়েছে ১৪-বার (সর্বাধিকবার লীগ খেতাব জয়ের রেকর্ড)। অপরদিকে ইস্টবেংগল ১০-বার প্রথম বিভাগে লীগ চ্যাম্পিয়ান হয়েছে এবং আই এফ এ শীল্ড পেয়েছে ১০-বার (সর্বাধিকবার জয়লাভের রেকর্ড)। প্রথম বিভাগের লীগ এবং আই এফ এ শীল্ড প্রতিযোগিতায় মোহনবাগান এবং ইস্টবেংগল পরস্পরের অতি পুরাতন প্রতিদ্বন্দ্বী এবং এই দুই দল কলকাতার মাঠে বিপুল সংখ্যক দর্শকদের আকর্ষণ করে থাকে।

প্রথম বিভাগের ফুটবল লীগ

১৯৭১ সালের প্রথম বিভাগের ফুটবল লীগ প্রতিযোগিতায় ইস্টবেংগল অপরাজিত অবস্থায় লীগ চ্যাম্পিয়ান হয়েছে। এই নিয়ে তারা ১০-বার প্রথম বিভাগের লীগ খেতাব পেল। এখানে উল্লেখ্য, সর্বাধিকবার লীগ খেতাব জয়ের রেকর্ড মোহনবাগানের (এ পর্যন্ত ১৫-বার)। অথচ সেই মোহনবাগানই এ বছর তাদের শেষ চারটে লীগের খেলায় যোগদান না করে ৮ পয়েন্ট নষ্ট করেছে। অপরদিকে ইস্টবেংগল দলের বিপক্ষে নির্দিষ্ট খেলায় টালিগঞ্জ অগ্রগামী, উয়াড়ী এবং পোর্ট কমিশনার্স যোগদান না করায় ইস্টবেংগল পুরো পয়েন্ট পেয়েছে। ফলে ইস্টবেংগল দলের খেতাব জয়ের পথ সহজ হয়ে যায়। এ বছরের লীগ প্রতিযোগিতায় রাণার্স-আপ হয়েছে মহমেডান স্পোর্টিং। লীগ তালিকায় মোহনবাগান এবং মহমেডান স্পোর্টিংয়ের সমান পয়েন্ট দাঁড়ায়—চারটে ম্যাচ না খেলে মোহনবাগানের ২৯ পয়েন্ট, অপরদিকে সমস্ত ম্যাচ খেলে মহমেডান দলের ২৯ পয়েন্ট। এই অবস্থায় রাণার্স-আপ খেতাব নির্ণয়ের উদ্দেশ্যে লীগ সাব কমিটি মোহনবাগান বনাম মহমেডান দলের যে খেলার ব্যবস্থা করেন তাতে মোহনবাগান অনুপস্থিত হওয়াতে মহমেডান দলকে শেষ পর্যন্ত রাণার্স-আপ ঘোষণা করা হয়েছে।

ইস্টবেংগল দলের লীগ জয়

১০-বার: ১৯৪২, ১৯৪৫-৪৬, ১৯৪৯ ১৯৫০ (অপরাজিত অবস্থায়), ১৯৫২, ১৯৬১, ১৯৬৬ ১৯৭০ এবং ১৯৭১ (অপরাজিত অবস্থায়)

জাতীয় মহিলা হকি প্রতিযোগিতা

চণ্ডীগড়ে আয়োজিত ২০তম জাতীয় মহিলা হকি প্রতিযোগিতার ফাইনালে গত বছরের বিজয়ী পাঞ্জাব ২-০ গোলে পেপসুকে পরাজিত করে লেডি রতন টাটা ট্রফি জয়ী হয়েছে। গত বছরের রাণার্স-আপ মহারাষ্ট্র প্রতিবাদ হিসাবে প্রতিযোগিতা বর্জন করে।

আন্তঃ জেলা ফুটবল

দুর্গাপুরের নেহরু স্টেডিয়ামে আয়োজিত ১৯৭১ সালের আন্তঃ জেলা ফুটবল প্রতিযোগিতার ফাইনালে গত বছরের বিজয়ী ২৪-পরগণা জেলা দল ২—০ গোলে দার্জিলিং দলকে পরাজিত করে কাপ জয়ী হয়। এ বছরের প্রতিযোগিতায় ১৬টি জেলা যোগদান করেছিল। ফাইনাল খেলা উপলক্ষ্যে খেলার মাঠে প্রায় ১৫,০০০ দর্শক উপস্থিত ছিলেন।

আফ্রো এশিয়ান টেবল টেনিস প্রতিযোগিতা

পিকিংয়ে আয়োজিত প্রথম আফ্রো-এশিয়ান টেবল টেনিস প্রতিযোগিতায় জাপান পুরুষ বিভাগে এবং প্রজাতন্ত্রী চীন মহিলা বিভাগে দলগত চ্যাম্পিয়ানশিপ লাভ করেছে। পুরুষ-এবং মহিলা বিভাগে রাণার্স-আপ হয়েছে উত্তর কোরিয়া। ভারতবর্ষ পুরুষ বিভাগে ৫ম এবং মহিলা বিভাগে ৪র্থ স্থান লাভ করেছে।

এশিয়ান বাস্কেটবল প্রতিযোগিতা

টোকিওতে আয়োজিত ৬ষ্ঠ এশিয়ান বাস্কেটবল প্রতিযোগিতার লীগ তালিকায় বর্তমানে জাপান এবং তিনবারের এশিয়ান বাস্কেটবল চ্যাম্পিয়ান ফিলিপাইন অপরাজিত অবস্থায় শীর্ষস্থান অধিকার করে আছে। এই দুটি দেশ পাঁচটা খেলায় ১০ পয়েন্ট করে সংগ্রহ করেছে। এখানে উল্লেখ্য, এই এশিয়ান বাস্কেটবল প্রতিযোগিতার চ্যাম্পিয়ান এবং রাণার্স-আপ দলই আগামী ১৯৭২ সালের মিউনিখ অলিম্পিক বাস্কেটবল প্রতিযোগিতায় এশিয়া মহাদেশের পক্ষে প্রতিনিধিত্ব করবে।

এশিয়ান ভারোত্তোলন প্রতিযোগিতা

ম্যানিলার ইউনিভারসিটি জিমনাসিয়ামে আয়োজিত প্রথম এশিয়ান ভারোত্তোলন প্রতিযোগিতায় ইরাণ সর্বাধিক পয়েণ্ট সংগ্রহের সূত্রে দলগত চ্যাম্পিয়ানশিপ লাভ করেছে। প্রতিযোগিতায় স্বর্ণপদক জয় করে : ইরাণ ৫টি (ব্যাণ্টমওয়েট, লাইটওয়েট, লাইট হেভীওয়েট মিডল হেভীওয়েট এবং হেভীওয়েট), ইন্দোনেশিয়া ২টি (মিডলওয়েট এবং সুপার হেভীওয়েট), ফিলিপাইন ১টি (ফ্লাইওয়েট) এবং দক্ষিণ কোরিয়া ১টি (ফেদারওয়েট)।

ভারতবর্ষের বিখ্যাত রাইফেল সুটার শ্রীমতী গীতা রায় সিউলে (দক্ষিণ কোরিয়া) সদ্য সমাপ্ত ২য় এশিয়ান সুটিং চ্যাম্পিয়ানসীপে 'আউটস্ট্যাণ্ডিং স্পোর্টসম্যানসীপ ট্রফি গ্রহণ করছেন।

চূড়ান্ত ফলাফল

১ম ইরাণ (৪৭ পয়েণ্ট), ২য় দক্ষিণ কোরিয়া (৩৬ পয়েণ্ট), ৩য় ইন্দোনেশিয়া (৩২ পয়েণ্ট), ৪র্থ ফিলিপাইন (৩১ পয়েণ্ট), ৫ম ইস্রাইল এবং অস্ট্রেলিয়া (১৯ পয়েণ্ট) এবং ৬ষ্ঠ তাইওয়ান। ৫ম ইস্রাইল এবং অস্ট্রেলিয়া (অতিথি হিসাবে যোগদান) —১৪ পয়েণ্ট এবং তাইওয়ান (৭ পয়েণ্ট)।

এশিয়ান সুটিং চ্যাম্পিয়নশিপ

সিউলে দ্বিতীয় এশিয়ান সুটিং চ্যাম্পিয়ানসীপে দক্ষিণ কোরিয়া চূড়ান্ত পদক জয়ের তালিকায় শীর্ষস্থান লা[ভ] করেছে। চার বছর আগে অনু[ষ্ঠা]ন প্র[থম] এশিয়ান সুটিং প্রতিযোগিতার চ্যাম্পিয়ান জাপান পেয়েছে দ্বিতীয় স্থান। ... পিজিয়ন ট্রাপ (২০০ পাখী) অনুষ্ঠানে ১৮০ পয়েণ্ট সংগ্রহের সূত্রে ডঃ কা[রণী] সিং (বিকানীর) ভারতবর্ষের পক্ষে একমাত্র স্বর্ণ পদক জয় করেন।

পদক জয়ের চূড়ান্ত তালিকা

	স্বর্ণ	রৌপ্য	ব্রোঞ্জ
দঃ কোরিয়া	১৩	৯	৬
জাপান	৮	১২	৬
থাইল্যাণ্ড	৩	২	৩
ভারতবর্ষ	১	০	২
তাইওয়ান	০	১	০
মালয়েশিয়া	০	১	০
সিংগাপুর	০	০	২

বিশ্ব দাবা প্রতিযোগিতা

ব্যক্তিগত বিশ্ব দাবা প্রতিযোগিতার সেমিফাইনালে আমেরিকার ববি ফিসার ৬½—২½ পয়েন্টে রাশিয়ার প্রাক্তন বিশ্ব দাবা চ্যাম্পিয়ান তাইগ্রেন পেট্রোসিয়ানকে পরাজিত করে ফাইনালে রাশিয়ার বরিস স্প্যাস্কির সঙ্গে খেলবার যোগ্যতা লাভ করেছেন। এখানে উল্লেখ্য, ৪৩ বছর ধরে রাশিয়ার দাবা খেলোয়াড়রাই বিশ্ব দাবা প্রতিযোগিতায় একচেটে প্রাধান্য অটুট রেখেছেন।

অমৃত পাবলিশার্স প্রাইভেট লিঃ-এর পক্ষে শ্রীসুপ্রিয় সরকার কর্তৃক পত্রিকা প্রেস, ১৪, আনন্দ চ্যাটার্জি লেন, কলিকাতা-৩ হইতে মুদ্রিত ও তৎকর্তৃক ১৯।১, আনন্দ চ্যাটার্জি লেন, কলিকাতা—৩ হইতে প্রকাশিত।

মাথায় খুস্কি হয়েছে? ক্লিনিক লাগালেই পরিষ্কার!

'ক্লিনিক' ঠিক আর পাঁচটা শ্যাম্পুর মত নয়। সম্পূর্ণ নতুন ও বিজ্ঞানসম্মত প্রক্রিয়ায় চুলের গোড়ার খুসকি একেবারে সাফ করে দেয়। শক্তিশালী জীবাণুনাশী টিসিসি* থাকায় 'ক্লিনিক' প্রথমবার লাগিয়ে ধুলেই খুসকি পরিষ্কার হ'য়ে যায়। নিয়মিত ব্যবহারে এমন একটা শক্তি গড়ে তোলে যাতে খুসকি হওয়া বন্ধ হয়।

'ক্লিনিক' খুসকির চরম শত্রু হ'লেও আপনার চুলের কিন্তু পরম বন্ধু। চুলে যে অতি-প্রয়োজনীয় স্বাভাবিক তেল থাকে তা ধুয়ে দেয় না, অন্যান্য ঔষধমিশ্রিত শ্যাম্পুতে প্রায়ই যায় সম্ভাবনা থাকে। 'ক্লিনিক' ব্যবহারে আপনার চুল স্বাস্থ্যে ও সৌন্দর্যে ঝলমল করবে।

*০·১৫%৩.৪.৪. ট্রাইক্লোরোকারবানিলাইড

Clinic
SHAMPOO
Contains 0.15% 3 4 4
Trichlorocarbanilide
Clears dandruff from hair and scalp

'ক্লিনিক' কিভাবে কাজ করে

ক্লিনিক শ্যাম্পু

হিন্দুস্থান লিভার লিমিটেডের একটি উৎকৃষ্ট জিনিস।
কেবলমাত্র কলকাতা শহরেই পাওয়া যায়।

HDL 21[illegible]

১১শ বর্ষ | ৩য় খণ্ড

২৮ সংখ্যা, মূল্য ৫২ পয়সা

অমৃত

Issued on 25th November, 1971
Friday, 19th November 1971 শুক্রবার, ২রা অগ্রহায়ণ, ১৩৭৮ 52 Paise

সুচীপত্র

প্রচ্ছদ : শ্রীশঙ্কর সেন

'এক নজরে'

একটি আলোকবর্ষ সংখ্যা : সোভিয়েট ইউনিয়নের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী পরলোকগত ক্রুশ্চেভ একদা বিশ্বব্যাপী সামরিক প্রস্তুতির অপব্যয়ের ভয়াবহতা বর্ণনাকালে বলেছিলেন, সারা পৃথিবীর ছোট-বড় ধনী-দরিদ্র দুর্বল-শক্তিশালী সকল দেশ প্রতি বছর সমরসজ্জায় যে অর্থ ব্যয় করে তার সবটুকু যদি একটা বছরও পৃথিবীর সামগ্রিক উন্নয়নে ব্যয় হত তবে এই গ্রহের যে অশেষ কল্যাণ সাধিত হ'ত তা আমরা কল্পনাও করতে পারি না। তিনি বলেছিলেন, ঐ টাকা দিয়ে হিমালয় পর্বতে সুড়ঙ্গ কেটে ও পক প্রণালীতে সেতু বেঁধে মস্কো থেকে কলম্বো পর্যন্ত রেলপথ স্থাপিত হত, এবং একইভাবে ডোভার ও বেরিং প্রণালীর বাধা লঙ্ঘন করে লন্ডন থেকে ট্রেন চলত ওয়াশিংটন পর্যন্ত। সব মহাদেশের প্রতিটি মরুভূমি হতে পারত ফলে-ফুলে শ্যামল সুন্দর; সারা পৃথিবী হত রোগমুক্ত এবং প্রতিটি মানব পরিবারের জন্য নির্মিত হতে পারত স্বতন্ত্র বাসভবন। কিন্তু দর্পী মানুষ, আতঙ্কিত মানুষ, মূঢ় মানুষ সব জেনেও স্বেচ্ছায় নিজেকে ঐ স্বর্গরাজ্য থেকে বঞ্চিত করে রেখেছে।

রাষ্ট্রসংঘের এক সাম্প্রতিক হিসাবে প্রকাশ, এখন প্রতি বছর সারা পৃথিবীতে সামরিক প্রস্তুতিতে ২০ হাজার কোটি ডলার, অর্থাৎ এক লক্ষ পঞ্চাশ হাজার কোটি টাকা ব্যয় হয়ে থাকে। আর যে হারে প্রতি বছর সকল রাষ্ট্রে সামরিক খাতে ব্যয় বাড়ছে তা যদি অপরিবর্তিত থাকে তবে দশ বছর বাদে ঐ ব্যয়ের অঙ্ক হবে ৩৫ হাজার কোটি ডলার। ঐ ব্যয়ের চার-পঞ্চমাংশই করে থাকে পৃথিবীর ছয়টি দেশ—যুক্তরাষ্ট্র, সোভিয়েট ইউনিয়ন, চীন, ফ্রান্স, বৃটেন ও পশ্চিম জার্মানী। অর্থাৎ, যে অগ্রসর দেশ কটি পৃথিবীর সর্বাধিক কল্যাণে লাগতে পারত, তারা তাদের জাতীয় সম্পদের বৃহত্তর অংশই ব্যয় করে দিচ্ছে পৃথিবী ধ্বংসের প্রস্তুতিতে। বিশ্বের চোদ্দজন বিশেষজ্ঞের প্রস্তুত ঐ রিপোর্টে তাই পরিশেষে শক্তিগুলির কাছে অবিলম্বে অস্ত্রসংবরণের জন্য ও তরবারীকে লাঙলের ফলকে রূপান্তরিত করার জন্য আবেদন জানান হয়েছে।

কারো পৌষ মাস, কারো সর্বনাশ : রোমে সম্প্রতি রাষ্ট্রসংঘের খাদ্য ও কৃষি সংস্থা 'ফাও'র বার্ষিক সম্মেলনে থাইল্যান্ডের কৃষিমন্ত্রী শ্রীচক্রটং টংগিয়াই এশিয়ায় সবুজ বিপ্লবকে দীর্ঘশ্বাসের সঙ্গে অভিনন্দন জানিয়ে বলেছেন, এশিয়ার দেশে দেশে আধুনিক কৃষিবিজ্ঞানের কল্যাণে যে সবুজের প্লাবন এসেছে তা সবচেয়ে বিপন্ন করেছে থাইল্যান্ডকে। থাইল্যান্ডের সোনা-ফলা মাটিতে সামান্য পরিশ্রমেই যে ফসল ফলেছে এত দিন তা ভারে ভারে রপ্তানী হয়েছে দেশ-দেশান্তরে আর ততোই পূর্ণ হয়ে উপচে পড়েছে থাইল্যান্ডের অর্থভাণ্ডার। একারণে অন্য কোন শিল্পোন্নয়নের তাগিদ থাইল্যান্ড এত দিন অনুভব করে নি, এমন কি তার কৃষি ব্যবস্থা আধুনিককরণের কথাও ভাবে নি সে। চিরকালের মতো আজও মোষ দিয়ে লাঙল টেনে চাষ হয় সেখানে এবং ট্রাক্টর, রাসায়নিক সার, কীটঘ্ন ওষুধ প্রভৃতি কৃষির আধুনিক সরঞ্জাম প্রায় সম্পূর্ণই অজ্ঞাত থাই কৃষকদের কাছে। তবু তার শস্যভান্ডারগুলির প্রায় ছাদ ছুঁয়ে জমা হয়েছে ধান-চালে পূর্ণ বস্তার সারি। থাই কৃষিমন্ত্রী তাই সক্ষোভে বলেছেন, এশিয়ার প্রাচুর্যই অভিশাপ হয়ে দেখা দিয়েছে থাইবাসীদের জীবনে।

ইঁদুরের জয়যাত্রা : সম্প্রতি ইংলন্ডের ওয়াশিংটন পৌরসভার এক বৈঠকে সেখানকার হেলথ ইন্সপেক্টর নরমাল বাকলে বলেছেন, যুগ যুগ ধরে বিড়াল-ইঁদুরের যে লড়াই চলে আসছে তাতে এখন প্রায় একতরফা ইঁদুরের জয় শুরু হয়েছে। এর জন্য তিনি আধুনিক জীবনের প্রাচুর্যকেই সর্বাধিক দায়ী করেছেন। জোড়া জীব, তার মুখে খাবার ধরে গৃহকর্ত্রীরা তাদের কোলে

জোড়া জীব, তার মুখে খাবার ধরে গৃহকর্ত্রীরা তাদের কোলে

নিয়ে ঘুম পাড়ান। ফলে ক্ষুন্নিবৃত্তির তাড়নায় বিড়ালদের আর ইঁদুরের পেছনে ছুটোছুটি করতে হয় না। আস্তে আস্তে বিবর্তনের স্বাভাবিক নিয়ম অনুসারে ওরা ইঁদুর ধরতেই ভুলে যাচ্ছে। আর ইঁদুররা সেই সুযোগে মনের আনন্দে বংশবৃদ্ধি করে যাচ্ছে। বাকলে বলছেন, ইঁদুরের বংশবৃদ্ধির হার, বিশেষ করে শহরগুলিতে, পূর্বের তুলনায় এখন অনেক বেশী। আরও বিপদের কথা যে, বংশপরম্পরায় ইঁদুর মারা ওষুধগুলিও ওদের ধাতস্থ হয়ে গেছে। ইঁদুর মারতে ত কামান দাগা যায় না, অথচ বাঁধভাঙা বন্যার স্রোতের মতো এই যে বিধ্বংসী বাহিনী দুর্নিবার গতিতে এগিয়ে আসছে তাকে প্রতিরোধ করা যায় বা ধ্বংস করা যায় কেমন করে? প্রাচুর্যের এও যে এক অভিশাপ তাতে কোন সন্দেহ নেই।

গাণিতিক কারণে অসম্ভব : দিল্লীতে কদিন আগে জন-নিয়ন্ত্রণ নীতি ও কর্মসূচী নিয়ে যে পশ্চিম আঞ্চলিক সম্মেলন হয়ে গেল তাতে বোম্বাইর নওরোজি ওয়াদিয়া মেটার্ণিটি হাসপাতালের ডীন ডঃ বি এন পুরন্দরে সম্প্রতি প্রবর্তিত গর্ভপাত আইনের প্রতি পূর্ণ সমর্থন জানিয়েই বলেন যে, নানা কারণে ঐ আইনের প্রয়োজনীয়তা থাকলেও জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণের কাজে তা সামান্যই সহায়ক হতে পারবে। জাপান ও সোভিয়েট ইউনিয়নে গর্ভপাত জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণের কাজে বিশেষ সহায়ক হয়েছে। কিন্তু ভারতের মতো জনবহুল দেশে গর্ভপাতের সাহায্যে জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ প্রায় সম্পূর্ণই অসম্ভব কাজ। তিনি হিসাব করে দেখিয়েছেন যে, ভারতে প্রতি বছর দু কোটি বিশ লক্ষ মেয়ে অন্তঃসত্ত্বা হয়, জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণের জন্য যার অন্ততঃ দুই-তৃতীয়াংশ অঙ্কুরেই বিনষ্ট হওয়া দরকার। যার মানে হল, ধাত্রীবিদ্যায় পারদর্শী সারা ভারতের বড়জোর পাঁচ হাজার ডাক্তারের দৈনিক এক লক্ষ গর্ভপাতের দায়িত্ব বহন করতে হবে। অর্থাৎ, প্রতিদিন প্রতি ডাক্তারকে তার অন্যান্য কর্তব্য পালনের বাইরে বিশটি করে গর্ভপাত ঘটাতে হবে। যেটা শুধু অসম্ভবই নয়, নানা কারণে অবাঞ্ছিতও। প্রথমত এদেশের যোগাযোগ ও পরিবহন ব্যবস্থা এমনই অপ্রতুল যে সব অংশে যথাসময়ে চিকিৎসকদের উপস্থিত হওয়া সম্ভব হয় না। তার ওপর এত হাসপাতালও দেশে নেই যার সুযোগ দেশের সব লোক সহজেই নিতে পারে। কলকাতার মতো বড় শহর, যেখানে এত ডাক্তার ও এতগুলি হাসপাতাল, সেখানেও প্রয়োজনের সময় শয্যার অভাবে কি অসুবিধায় পড়তে হয় তা কারও অজানা নয়। আর ধাত্রীবিদ্যা ও স্ত্রীরোগ-বিশেষজ্ঞ সব ডাক্তারকে যদি দিন-রাত্রি গর্ভপাত নিয়েই ব্যস্ত থাকতে হয় তবে অন্যান্য রোগের প্রয়োজনীয় চিকিৎসার অভাব ঘটবে। অন্য রোগের কথা বাদ দিলেও শুধু গর্ভপাতের জন্যই সংশ্লিষ্ট রোগীর দিকে যে কিছু দিন বিশেষ নজর রাখা দরকার সেটাও সম্ভব হবে না। ফলে উপযুক্ত চিকিৎসা থেকে বঞ্চিত নারীদের সারা জীবন নানা যন্ত্রণায় ভুগতে হবে।

ডঃ পুরন্দরে এই কারণে জন-নিয়ন্ত্রণ পরিকল্পনায় গর্ভপাতের উপর খুব বেশী জোর দিতে বারণ করেছেন। তিনি বলেছেন, এ আইনের সুযোগ সবটুকুই নিতে হবে কিন্তু একই সঙ্গে জোর দিতে হবে শিক্ষা, জনস্বাস্থ্যের উন্নতি ও জীবনযাত্রার মানোন্নয়নের উপরে। আর ব্যাপকভাবে বিতরণের ব্যবস্থা করতে হবে জন্মনিরোধক বিভিন্ন সামগ্রীর।

সম্পাদকীয়

শান্তির তীর্থযাত্রা

প্রায় তিন সপ্তাহব্যাপী বিশ্ব-পরিক্রমা শেষ করে আমাদের প্রধানমন্ত্রী স্বদেশে ফিরেছেন। তাঁর এইবারকার যাত্রা শান্তির তীর্থযাত্রা। এই উপমহাদেশে যুদ্ধ যাতে অনিবার্য না হয়ে ওঠে সেই উদ্দেশ্যে বিশ্ববিবেককে সচেতন করাই ছিল তাঁর প্রধান লক্ষ্য। আজ তিনি ফিরে এলেন অন্তরে গভীর স্বস্তি নিয়ে। যেসব দেশ তিনি পরিভ্রমণ করেছেন, সেই সব দেশে আজ পূর্ববাংলার সমস্যা অনেকটা স্পষ্ট হয়েছে। বেলজিয়াম অস্ট্রিয়া, গ্রেট ব্রিটেন, যুক্তরাষ্ট্র, ফ্রান্স ও ফেডারেল রিপাবলিক অব জার্মানী প্রভৃতি দেশগুলি বুঝেছেন যে, পূর্ববঙ্গের ব্যাপারে একটা রাজনৈতিক সমাধান প্রয়োজন এবং গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে নির্বাচিত প্রতিনিধিরাই সেই মীমাংসায় অংশীদার হবেন। শ্রীমতী গান্ধী বলেছেন যে, শান্তিরক্ষা করা যদি কাম্য হয় তাহলে মহৎ শক্তিবর্গের নিষ্ক্রিয় হয়ে থাকা অনুচিত। অবিলম্বে তাঁদের এমনকিছু করা প্রয়োজন যদ্দ্বারা ইয়াহিয়া খান পূর্ববঙ্গ সমস্যার একটা রাজনৈতিক সমাধান সম্ভব করতে পারেন। এই ব্যাপারে প্রথমতম কর্তব্য হল শেখ মুজিবরের বন্ধনদশার অবসান ঘটানো। ঠিক যে কি ধরনের প্রতিক্রিয়া ঘটবে তা এখনই বলা কঠিন। বন-এ অনুষ্ঠিত ইনস্টিট্যুট অব ফরেন এফেয়ার্সের এক ভোজসভায় প্রধানমন্ত্রী বলেছেন—ভারত মহাদেশের সামনে আজ যে সংকট উপস্থিত তা নিবারণে তাশখন্দ চুক্তি জাতীয় কোনোরকম ব্যবস্থা কার্যকরী হবে না। তিনি বলেছেন, কোনোরকম মধ্যস্থতার দ্বারা এ-সমস্যার মীমাংসা সম্ভব নয়, যে কারণে বাংলাদেশে বর্তমান পরিস্থিতির উদ্ভব হয়েছে, তার মূল কারণ অনুসন্ধান করা প্রয়োজন। তিনি আরো বলেছেন যে, এই শুভেচ্ছা-সফরে মহান শক্তিবর্গের প্রধানদের কাছে ভারতীয় উপমহাদেশের বর্তমান বিস্ফোরক পরিস্থিতির একটা সুস্পষ্ট চিত্র তিনি তুলে ধরেছেন।

শ্রীমতী গান্ধীর স্বদেশ প্রত্যাবর্তনের পর এখন কূটনৈতিক মহলে জল্পনা চলেছে ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধ আদৌ ঘটবে কি ঘটবে না! প্রাচ্য এবং প্রতীচ্যের কিছুসংখ্যক কূটনীতিবিদ যাঁরা যুক্তরাষ্ট্র এবং চীনদেশের মনের কথা সম্পর্কে ওয়াকিবহাল, তাঁদের মতে এই দুই মহাদেশই চায় যে বাংলাদেশ ব্যাপারে 'ন যযৌ ন তস্থৌ' অবস্থাটা জীইয়ে রাখাই বাঞ্ছনীয়।

প্রচার করা হচ্ছে পৃথিবীর বৃহত্তম রাষ্ট্রগোষ্ঠীর ওপর চাপ দেওয়ার জন্যই ভারতবর্ষ শরণার্থী-সমস্যা জীইয়ে রেখেছে এবং মুক্তিবাহিনীকে সাহায্য করছে—নইলে কবে এসব ব্যাপার মিটিয়ে ফেলা যেত। ১লা নভেম্বর বি বি সি-র টেলিভিসন ইন্টারভিউ-তে বারবার একটি প্রশ্ন ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে বলা হয়েছে যে, বিরামবিহীন শরণার্থী আগমন বন্ধ হত যদি ভারত মুক্তিবাহিনীর গেরিলাদের সাহায্যদানে বিরত থাকত। এই কথায় শ্রীমতী গান্ধী বলেছেন যে, গেরিলাবাহিনীর একজনও রঙ্গমঞ্চে আবির্ভূত হওয়ার অনেক পূর্বেই পূর্ববাংলায় দানবীয় হত্যালীলা শুরু হয়েছে। এই সূত্রে তিনি হিটলারের ইহুদী দলনের কথা তুলে যে পাল্টা প্রশ্ন করেছেন তার জবাব প্রশ্নকর্তা দিতে পারেননি। কাশ্মীর, পশ্চিমবাংলা ইত্যাদি সম্পর্কেও তিনি চমৎকার জবাব দিয়েছেন। শ্রীমতী গান্ধী এক নতুন ইতিহাস রচনা করেছেন এই পরিক্রমায়। বিশ্ববিজয়িনী ইন্দিরাকে সমগ্র ভারত আজ তাই অভিনন্দন জ্ঞাপন করছে।

প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী পশ্চিম জার্মান চ্যান্সেলার উইলি ব্রান্ট-এর সংগে আলোচনার জন্য বন্-এ জিমনিখ্ প্রাসাদে চ্যান্সেলর-সহ উপনীত হন।

দেশে বিদেশে

প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী গান্ধী মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে গিয়ে প্রেসিডেন্ট নিকসন ও পররাষ্ট্র সচিব উইলিয়াম রজার্সের সংগে কথাবার্তা বলেছেন। জনাব জুলফিকার আলি ভুট্টো পাকিস্থানের প্রতিনিধিদল নিয়ে গিয়েছিলেন পিকিং। এই দুই সফরের কোনটি সম্পর্কেই সরকারীভাবে যুক্ত ইস্তাহার প্রকাশ করা হয়নি বা যৌথ ঘোষণা প্রচার করা হয়নি।

তার মানে কি এই যে, দুজনই শূন্য হাতে ফিরেছেন?

ভুট্টোর পিকিং সফরের সময় তবু চীনের অস্থায়ী পররাষ্ট্রমন্ত্রী চি পেং-ফেইয়ের কিছু মন্তব্য শোনা গেছে যা থেকে চীনের ভাবগতি সম্পর্কে কিছুটা জল্পনা-কল্পনা করা চলে। অপরপক্ষে, শ্রীমতী গান্ধীর মার্কিন সফরের সময় সে-দেশের নেতারা মূল প্রশ্নগুলি সম্পর্কে এমনভাবে মুখে কুলুপ এঁটে রইলেন যে, তাঁদের মনোভাব সম্পর্কে কোনরকম অনুমান করার উপায় থাকল না। আনুষ্ঠানিক ভোজসভায় বক্তৃতা করতে গিয়ে প্রেসিডেন্ট রিচার্ড নিকসন এমন সযত্নে বাংলাদেশ প্রসংগ এড়িয়ে গেলেন, এমনভাবে ভোজসভা গৃহের ঐতিহাসিক মাহাত্ম্যবর্ণনায় ও শ্রীমতী গান্ধীর নির্বাচন-সাফল্যের প্রশস্তিতে ব্যস্ত হয়ে উঠলেন যে, দুই দেশের নেতা যে বৈঠকে বসে দুদিন ধরে প্রধানত বাংলাদেশ প্রসংগ নিয়ে কথাবার্তা বলেছেন সেটা বোঝাই গেল না।

যদিও প্রধানমন্ত্রীর সফরের সঙ্গে কোন সম্পর্ক আছে কিনা বলা কঠিন তাহলেও দেখা গেল, শ্রীমতী গান্ধীর সফরের শেষে ঘোষণা করা হয়েছে যে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র পাকিস্থানকে আর সামরিক সাহায্য দেবে না। পাকিস্থানের সম্মতি নিয়েই এই সিদ্ধান্ত করা হয়েছে বলে জানান হল। কিন্তু মার্কিন সরকারের এই ঘোষণার উপর খুব বেশী গুরুত্ব আরোপ করা যায় না। কারণ, প্রথমত, ওয়াশিংটন থেকে এর আগেও বলা হয়েছে যে, ইতিপূর্বে প্রতিশ্রুত সামরিক সাহায্য দেওয়া হয়ে গেলে পাকিস্থানকে নূতন আর কোন সামরিক সাহায্য দেওয়া হবে না। দ্বিতীয়ত, মার্কিন সরকার এই কথা বলার পরও কোন না কোন ছুতায় ইসলামাবাদকে সমরসম্ভার যুগিয়ে যেতে অতীতে আমেরিকার আটকায় নি। ভবিষ্যতেও ওয়াশিংটন যদি ইসলামাবাদকে সমরসম্ভার যোগাতে চায় তাহলে সেজন্য অজুহাতের কোন অভাব হবে না, এটাই নয়াদিল্লির সরকারী মহলের ধারণা। তৃতীয়তে, প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী গান্ধী বলেছেন, এই নিষেধাজ্ঞা অনুযায়ী তৃতীয় কোন দেশের মারফৎ পাকিস্থানকে সামরিক সাহায্য দেওয়াও বন্ধ হবে কিনা সেটা পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে না।

দিল্লির একটি সংবাদে প্রকাশ যে, শ্রীমতী গান্ধীর সঙ্গে যাঁরা ওয়াশিংটনে গিয়েছিলেন তাঁদের কাউকে কাউকে প্রেসিডেন্ট নিকসনের উপদেষ্টা ডাঃ হেনরি কিসিঙ্গার সাফ কথাতেই বলে দিয়েছেন যে, বাংলাদেশের ব্যাপারে ভারত যেন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সহানুভূতি আশা না করে। এই ব্যাপারে ভারত নাকি সম্প্রতি এমন কিছু আচরণ করেছে যাতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ঘরোয়া রাজনীতিতে নিকসনকে বিলক্ষণ বিড়ম্বিত করা হয়েছে। প্রেসিডেন্ট নিকসনের অন্যতম প্রধান রাজনৈতিক প্রতিপক্ষ এডওয়ার্ড কেনেডিকে নিয়ে ভারত যেভাবে নাচানাচি করেছে মার্কিন সরকারী কর্তৃপক্ষ সেটা লক্ষ্য করেছেন। পাকিস্থানকে সামান্য যে কিছু সামরিক স্পেয়ার পার্টস দেওয়া হয়েছে তা নিয়ে ভারত এমন হৈ চৈ করেছে যেন পাকিস্থানের দশ ডিভিসন বাহিনীকে অস্ত্রসজ্জিত করার মতো অস্ত্র-শস্ত্র আমেরিকা থেকে এসেছে।

প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী গান্ধীর সঙ্গে কথা বলার পর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র পাকিস্থানের জঙ্গী শাসকদের পরোক্ষ প্রশ্রয় দেওয়া বন্ধ করবেন, আশ্রয়প্রার্থীরা যাতে নিরাপদে ও সসম্মানে ফিরে যেতে পারেন তার জন্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ইসলামাবাদের উপর চাপ দেবে, এমন আশা নিয়ে দেখলে নিশ্চয়ই মনে হবে, প্রধানমন্ত্রীর মার্কিন সফর ব্যর্থ হয়েছে। কিন্তু অন্য একটা দিক থেকেও দেখা যেতে পারে। শ্রীমতী গান্ধী নিশ্চয়ই প্রেসিডেন্ট নিকসনকে একথা বুঝিয়ে এসেছেন যে, বিশ্বের বৃহৎ শক্তিগুলি যদি পাকিস্থানের উপর চাপ দিয়ে তাকে আশ্রয়প্রার্থীদের ফিরে যাওয়ার উপযুক্ত পরিবেশ তৈরি করতে বাধ্য না করে তাহলে ভারত অনির্দিষ্ট কাল পর্যন্ত আশ্রয়প্রার্থীদের দায়িত্ব বহন করবে না। তিনি আমেরিকায় প্রকাশ্যে একথাও বলেছেন যে, দেশের নিরাপত্তা রক্ষায় তাঁর যে দায়িত্ব আছে সেটা তিনি ত্যাগ করতে পারেন না। ভারতের প্রধানমন্ত্রী যদি মার্কিন প্রেসিডেন্টকে একথা ভালভাবে বুঝিয়ে আসতে পেরে থাকেন যে, এইসব প্রশ্নে ভারত [illegible]

কাছে নতিস্বীকার করবে না, তাহলে ভারত ও পাকিস্থানকে একই সঙ্গে সীমান্ত থেকে সৈন্যবাহিনী সরিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য অথবা ভারত-পাক সীমান্তে রাষ্ট্রসংঘের পর্যবেক্ষক মোতায়েন করার জন্য আমেরিকা হয়তো আর পীড়াপীড়ি না করতে পারে।

শ্রীমতী গান্ধী নিজে নয়াদিল্লীতে ফিরে এসে বলেছেন যে, তাঁর সঙ্গে প্রেসিডেন্ট নিকসনের মতের কোন মিল হয় নি, বিদেশী সংবাদপত্রগুলির এই মন্তব্য সম্পূর্ণ সঠিক নয়। শ্রীমতী গান্ধীর এই উক্তি নিছক সৌজন্যমূলক নাও হতে পারে।

তবে, প্রধানমন্ত্রীর পক্ষে যেটা সবচেয়ে পীড়াদায়ক হবে সেটা হল এই যে, তাঁর এই সফরের পরও ওয়াশিংটন দুই দেশকে এক আসনে বসিয়ে সমান গলায় উপদেশ দিয়ে যাচ্ছে।

•

জনাব জুলফিকার আলি ভুট্টোর নেতৃত্বে পাকিস্থানী প্রতিনিধিদলের চীন সফর সম্পর্কে দুটি লক্ষণীয় বিষয় হল, এই সফরের সংবাদ ঘোষণা করা হয়েছে সম্পূর্ণ আকস্মিকভাবে, প্রতিনিধিদল পিকিং-এ পৌঁছবার পর, প্রায় ডাঃ কিসিংগারের গোপন দৌত্যের কায়দায়। দ্বিতীয়ত, এই প্রতিনিধিদলের নেতৃত্ব দেওয়া হয়েছে জনাব ভুট্টোকে—যাঁর এখন পর্যন্ত কোন সরকারী পদাধিকার নেই।

আগে থেকে না জানিয়ে আকস্মিকভাবে এই প্রতিনিধিদল পাঠিয়ে পাকিস্থান সম্ভবত একটা চমক সৃষ্টি করতে চেয়েছিল। ভারতের প্রধানমন্ত্রী যখন বিশ্বের বিভিন্ন দেশে ঘুরে বেড়িয়ে পৃথিবীর মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করছেন তখন দেশের ভিতরে ও বাইরে পাকিস্থান শাসকরা ইসলামাবাদের সঙ্গে পিকিংয়ের বন্ধুত্বটা নাটকীয়ভাবে তুলে ধরার প্রয়োজন অনুভব করেছেন।

ভুট্টোর মতো একজন বেসরকারী মানুষকে এই প্রতিনিধিদলের নেতৃত্ব দেওয়া হল কেন সেটা বোঝা কঠিন। সম্ভবত পাকিস্থানের রাজনীতিকদের মধ্যে যিনি সবচেয়ে বেশী ভারত-বিদ্বেষী ও পিকিং-এর সবচেয়ে কাছের মানুষ বলে পরিচিত তাঁকে চীনে পাঠানই বুদ্ধিমানের কাজ বলে পাকিস্থানের শাসকরা মনে করেছিলেন। অথবা, এমনও হতে পারে যে, ইসলামাবাদে ক্ষমতার দ্বন্দ্ব শুরু হয়ে গেছে এবং সামরিক বাহিনীর যেসব অফিসার জেনারেল ইয়াহিয়া খাঁকে সরাতে চাইছেন তাঁদেরই চাপে ভুট্টোকে প্রতিনিধিদলের নেতৃত্ব দিতে হয়েছে।

তৃতীয় আর একটি অনুমান এই যে, প্রধানত সামরিক অফিসারদের একটি দলকে পাকিস্থান সরকারের প্রতিনিধিরূপে মর্যাদা দিয়ে গ্রহণ করতে চীন অনিচ্ছা প্রকাশ করে থাকতে পারে।

পিকিং সফরের শেষে ফিরে এসে জনাব জুলফিকার আলি ভুট্টো খুশী-খুশী গলায় বলেছেন, 'আমরা সন্তুষ্ট হয়েছি বললে কম

জয়তু ইন্দিরা

ইন্দিরা গান্ধী

১৯শে নভেম্বর : ১৯৭১

বলা হয়।' তিনি আরও বলেছেন, 'আমাদেরও কিছু বন্ধু আছে যারা আনুষ্ঠানিক চুক্তি না করেই আমাদের সঙ্গে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে লড়াই করবে।'

কিন্তু এই সফরের প্রসঙ্গে চীনের তরফ থেকে সরকারীভাবে যেটুকু বলা হয়েছে তার ভিত্তিতে ভুট্টোর এই আশাবাদ কতকটা ফাঁকা বলেই মনে হবে। একথা ঠিক যে, চীনের অস্থায়ী পররাষ্ট্রমন্ত্রী চি পেং-ফেই পাকিস্থানকে 'বৈদেশিক আক্রমণের বিরুদ্ধে দৃঢ় সমর্থন'-এর প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। কিন্তু এই কথাগুলি থেকেই ধরে নেওয়া চলে না যে, ভারতের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে পাকিস্থানের পাশে চীনের সৈন্য-বাহিনীকে নামাবার আগাম প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে। ভিয়েতনামের প্রতিও চীনের এই ধরনের 'দৃঢ় সমর্থন'-এর প্রতিশ্রুতি আছে। কিন্তু সেজন্য চীন প্রত্যক্ষভাবে নিজেকে ভিয়েতনামের লড়াইয়ের সঙ্গে জড়ায় নি।

দ্বিতীয়ত, পাকিস্থানের প্রতি চীনের এই প্রতিশ্রুতির পাশাপাশি মনে রাখা দরকার, মিঃ চি 'পূর্ব পাকিস্থানের সংকট নিরসনের জন্য পাকিস্থানের জনগণ কর্তৃক একটি যুক্তিযুক্ত সমাধানে' পৌঁছবার কথাও বলেছেন। পূর্ববঙ্গে পাকিস্থানের শাসকরা যে সত্যি একটা সঙ্কটের সম্মুখীন হয়েছেন, এই সঙ্কট যে স্রেফ ভারতের সৃষ্টি নয় এবং এর নিরসনের জন্য যে একটা 'যুক্তিযুক্ত সমাধান' খুঁজে বের করা দরকার, এই কথা-

গুলি এমন স্পষ্টভাবে চীন এই প্রথম বলল। সে পরোক্ষভাবে স্বীকার করে নিল যে, অসামরিক শাসন প্রতিষ্ঠার জন্য ইয়াহিয়া খাঁ যেসব ব্যবস্থা অবলম্বন করছেন সেগুলি যথেষ্ট নয়। 'বৈদেশিক আক্রমণ'-এর কথা সুনির্দিষ্টভাবে উল্লেখ করে চীনের শাসকরা সম্ভবত একথাও বুঝিয়ে দিতে চেয়েছেন যে, মুক্তিবাহিনীর হাতে পাকিস্থানী ফৌজ যে মার খাচ্ছে, তার ধাক্কা সামলাবার জন্য চীনের সাহায্য পাওয়া যাবে না।

পাকিস্থান যেভাবেই দেখাবার চেষ্টা করুক না কেন, পর্যবেক্ষকদের ধারণা, পিকিং থেকে পাকিস্থান সাহায্যের অস্পষ্ট প্রতিশ্রুতির বেশী আর কিছু সম্ভবত পায় নি। লণ্ডনের টাইমস পত্রিকা লিখেছেন, পাকিস্থানী প্রতিনিধিদলের সফরের শেষে যে কোন যুক্ত ইস্তাহার প্রকাশিত হয় নি তাতেই বোঝা যাচ্ছে, চীনারা কোনরকম পাকা কথা দিতে অনিচ্ছুক। তাঁরা আরও লিখেছেন, পিকিংই একমাত্র রাজধানী যারা পাকিস্থানী প্রতিনিধিদলকে গ্রহণ করতে ইচ্ছা প্রকাশ করেছে—এ থেকেই পাকিস্থানের বক্তব্যের দুর্বলতা ধরা পড়ে।

আমেরিকার বৈদেশিক সাহায্যের কর্মসূচীর বিরুদ্ধে অতীতে সে দেশের নানা মহল থেকে প্রায়ই সমালোচনা শোনা গেছে। সেদেশের আইনসভার সদস্যরা বিভিন্ন সময়ে অভিযোগ করেছেন যে, বৈদেশিক সাহায্যের বিলি-ব্যবস্থায় দুর্নীতি, অপচয় ও অব্যবস্থা বাসা বেঁধেছে, এই কর্মসূচীর মারফৎ বিদেশে (যেমন গ্রীসে ও ব্রাজিলে) মিলিটারি ডিকটেটরদের পুষবার জন্য ডলার ব্যয় করা হয়েছে, এই সাহায্য কর্মসূচীই শেষ পর্যন্ত আমেরিকাকে ইন্দোচীনের যুদ্ধের সঙ্গে জড়িয়েছে, সামরিক ও বৈষয়িক সাহায্য একই কর্মসূচীর অন্তর্ভুক্ত করে এই কর্মসূচীর প্রকৃত চিত্রটি অস্পষ্ট রাখা হয়েছে, ডলার খরচ করে বিদেশে আমেরিকা যত বন্ধু সংগ্রহ করতে পেরেছে তার চেয়ে বেশী শত্রু জুটেছে ইত্যাদি।

• •

১৯৬৮ সালে প্রেসিডেন্টকে মার্কিন কংগ্রেস অনুরোধ জানান যে, তিনি যেন মার্কিন সরকারের বৈদেশিক সাহায্য কর্মসূচী সম্পর্কে পূর্ণাঙ্গ অনুসন্ধান করে এই কর্মসূচীর সংস্কারের প্রস্তাব কংগ্রেসের সামনে উপস্থিত করেন। কংগ্রেসের এই অনুরোধ অনুসারে প্রেসিডেন্ট নিকসন ১৯৬৯ সালের সেপ্টেম্বর মাসে ব্যাঙ্ক অব আমেরিকার প্রেসিডেন্ট রুডল্ফ এ পিটারসনের নেতৃত্বে একটি কমিটি গঠন করে তাঁদের উপর মার্কিন বৈদেশিক সাহায্য কর্মসূচী পুনর্বিবেচনার ভার দেন। ১৯৭০ সালের মার্চ মাসে পিটারসন কমিটি যে রিপোর্ট দেন তার প্রধান কয়েকটি সুপারিশ ছিল: (১) উন্নয়নশীল দেশগুলিকে সাহায্য দেওয়ায় আমেরিকার গভীর জাতীয় স্বার্থ রয়েছে এবং আমেরিকার উন্নয়ন সাহায্য কমার যে লক্ষণ দেখা যাচ্ছে সেটার প্রতিবিধান করতে হবে। (২) আমেরিকার সাহায্য কর্মসূচীগুলিকে তাদের ভিন্ন ভিন্ন উদ্দেশ্য অনুযায়ী ভিন্ন ভিন্ন সাংগঠনিক খাতে চালিত করতে হবে। কোন্‌টা দীর্ঘমেয়াদী বৈষয়িক উন্নয়ন বাবদ সাহায্য, কোন্‌টা মানুষের দুঃখকষ্ট লাঘবের উদ্দেশ্যে সাহায্য, আর কোন্‌টা নিরাপত্তা রক্ষার উদ্দেশ্যে সাহায্য তা পরিষ্কার করে চিহ্নিত করে দিতে হবে। (৩) আন্তর্জাতিক সংগঠনগুলির মারফৎ ও তাদের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করে সাহায্য দেওয়ার উপর আরও বেশী জোর দিতে হবে। (৪) বেসরকারী উদ্যোগ এবং বেসরকারী সম্পদের অধিকতর ব্যবহারে উৎসাহ দিতে হবে।

পিটারসন কমিটির এই সুপারিশগুলি নিকসন সরকারের বিবেচনাধীন ছিল। এরই মধ্যে মার্কিন সিনেট বৈদেশিক সাহায্য বিল নামঞ্জুর করে দিয়ে ২৫ বৎসরব্যাপী মার্কিন বৈদেশিক সাহায্যের গোটা কার্যক্রমটিকেই লাটে তোলার দাখিল করেছেন। সিনেটের অধিবেশনে ২৭-৪১ ভোটে বৈদেশিক সাহায্য বিলটি নামঞ্জুর হয়ে যাওয়ার পর আমেরিকার আন্তর্জাতিক উন্নয়ন সংস্থার (এ-আই ডি) ডিরেক্টর ডাঃ জন এ হান্না

বলেছেন যে, আগামী ১৫ নভেম্বরের মধ্যে কংগ্রেস যদি তাঁদের সিদ্ধান্ত না বদলান তাহলে সংস্থার কাজকর্ম বন্ধ হয়ে যাবে, এই সংস্থার ১২ হাজার কর্মীকেও আর বেতন দেওয়া যাবে না।

সিনেট যে বৈদেশিক সাহায্য বিলটি অগ্রাহ্য করেছেন তাতে ১৯৭২ সালের জুলাই থেকে ১৯৭৪ সালের জুন মাস পর্যন্ত মোট ৪০১ কোটি ডলার অর্থাৎ প্রায় ৩১০০ কোটি টাকা খরচ করার প্রস্তাব ছিল। যেসব খাতে এই টাকা খরচ করার প্রস্তাব ছিল সেগুলোর মধ্যে ভারতে আশ্রয়প্রার্থীদের দরুণ সাহায্যের প্রস্তাবও ছিল। অন্যান্য প্রস্তাবগুলির মধ্যে ভিয়েত-নাম, কাম্বোডিয়া, লাওস, থাইল্যান্ড ও জর্ডানকে সাহায্যের বরাদ্দও ছিল।

মার্কিন সাহায্য কর্মসূচীর বিরুদ্ধে সিনেটররা হঠাৎ এভাবে খড়গহস্ত হয়ে উঠলেন কেন তার নানা ব্যাখ্যা দেওয়া হয়েছে। বলা হয়েছে যে, ভিন্ন ভিন্ন কারণে যেসব সদস্য এই কর্মসূচীর প্রতি অসন্তুষ্ট ছিলেন তাঁরা সরকারকে হারাবার জন্য এক-জোট হয়েছিলেন। একদল উদারনৈতিক সদস্যের প্রধান আপত্তি ছিল, বিদেশে প্রতি-ক্রিয়াশীল সামরিক চক্রকে ক্ষমতায় বসিয়ে রাখার জন্য এই সাহায্যের কর্মসূচীটিকে ব্যবহার করা হচ্ছে। অপর পক্ষে কিছু রক্ষণশীল সদস্যের আপত্তির কারণ হল যেসব ছোট ছোট দেশ আমেরিকার সাহায্যের উপর নির্ভরশীল তারাও আমেরিকার বিরুদ্ধাচরণ করছে এবং রাষ্ট্রসংঘ থেকে তাই-ওয়ানকে বহিষ্কার করার প্রস্তাবে যেভাবে আমেরিকার বিরুদ্ধে ভোট দেওয়া হয়েছে তাতেই বৈদেশিক সাহায্য কর্মসূচীর ব্যর্থতা প্রমাণিত হয়েছে। আর কিছু সদস্য চাইছি-লেন যে, আমেরিকার মধ্যেই যেখানে বহু সমস্যা দেখা দিচ্ছে এবং সেইসব সমস্যা সমাধান করার জন্য যথেষ্ট অর্থ সংগ্রহ করা যাচ্ছে না, সেখানে বৈদেশিক সাহায্যের কর্ম-সূচীটি ছাঁটাই করা হোক। মার্কিণ বৈদে-শিক সাহায্য কর্মসূচীর এই ভিন্নমতা-বলম্বী সমালোচকরা সকলেই একসঙ্গে হাত মিলিয়ে প্রেসিডেন্ট নিকসনের বৈদেশিক সাহায্য বিলটিকে খতম করেছেন।

মার্কিন সিনেটের এই নাটকীয় ভোটের আর একটি ব্যাখ্যা হল এই যে, এই বিলের উপর ভোট নেওয়া হয় শুক্রবার রাতে। তার আগে ছয়দিন ধরে বিলের উপর বিতর্ক হয়ে গেছে। সদস্যরা তখন ক্লান্ত ও সপ্তাহশেষে শনি-রবিবারের ছুটিতে বেরিয়ে যাওয়ার জন্য ব্যস্ত। ভোট গ্রহণের সময় সিনেটের ৩২ জন সদস্য যদি অনুপস্থিত না থাকতেন তাহলে ভোটের ফলাফল অন্যরকম হতে পারত।

সিনেটের এই সিদ্ধান্তের ফলে হয়তো মার্কিন বৈদেশিক সাহায্য কর্মসূচী চির-কালের জন্য বন্ধ হয়ে যাবে না। এই কর্ম-সূচী চালু রাখার জন্য ইতিমধ্যে 'চেষ্টা' শুরু হয়েছে। তবে যা করার খুব তাড়াতাড়ি করতে হবে। কেননা, বৈদেশিক সাহায্য বাবদ বর্তমান বাজেটের মঞ্জুরী আগামী ১৫ নভেম্বর শেষ হয়ে যাচ্ছে। আর ঐ তারিখেই আমেরিকার আইনসভার অধি-বেশন এই বছরের মতো শেষ হয়ে যাচ্ছে।

শেষ পর্যন্ত বৈদেশিক সাহায্য বিলটি যে আকারেই গৃহীত হোক না কেন, দুটি বিষয় নিশ্চিত। প্রথমত, নিকসন সরকার যা চাইছেন তার তুলনায় বেশ কিছু কম বরাদ্দ নিয়েই তাঁদের সন্তুষ্ট থাকতে হবে। দ্বিতীয়ত, সামরিক ও বৈষয়িক সাহায্য এখন থেকে একই মার্কিন প্রক্রিয়ায় ছেড়ে বিলি করা চলবে না।

•

নয়াদিল্লীতে ১৩ বছর বয়সের এক 'গুরুর' সন্ধান পাওয়া গেছে। বালযোগে-শ্বর শ্রীসন্তজী মহারাজ নামধারী এই বালক-গুরুর শিষ্য সংখ্যা নাকি তিন লক্ষ এবং এই তিন লক্ষ শিষ্যের মধ্যে হাজার দশেক নাকি বিদেশী। দেরাদুনের একটি স্কুলের ছাত্র এই বালযোগেশ্বর পাঁচ মাস বিদেশ সফর করে সম্প্রতি ফিরে এসেছেন এবং বর্ণবৈষম্য দূর করার জন্য আগামী জানুয়ারী মাসে তিনি দক্ষিণ আফ্রিকায় যাওয়ার বাসনা রাখেন।

'কিভাবে আপনি বর্ণ-বৈষম্য দূর কর-বেন,' সাংবাদিকদের এই প্রশ্নের উত্তরে বালযোগেশ্বর শুধু বলেছেন, 'অপেক্ষা করলেই দেখতে পাবেন।'

১২-১১-৭১ —পুণ্ডরীক

বাংলাদেশের ব্যঙ্গ কবিতা

• রমেন্দ্র নারায়ণ নাগ •

ইতিহাসের কোন্ পর্যায়ে কাব্যশিল্পের কোন্ লক্ষণ তীব্র হয়ে দেখা দেবে, তা নির্ভর করে সমাজকাঠামোর ওপর। যা এখন বাংলাদেশ, যে ঐশ্লামিক রাষ্ট্রের অংগীভূত হল, সেখানকার কবিতায় প্রাথমিক পর্যায়ে মুসলিম জাতীয়তাবাদ কেন সোচ্চার হয়ে উঠেছিল, আমরা বুঝতে পারি। ফরাজী, মোহাম্মদী ও আহলে-হাদিস আন্দোলন বাংলাদেশের সামাজিক-রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডেও প্রভাব বিস্তার করেছিল। বাঙ্গালী সমাজ থেকে অনৈশ্লামিক উপাদানাবলী দূরীকরণ এবং ইসলামের মৌল শিক্ষার ওপর সমাজের পুনর্বিন্যাস তখন ছিল সব আন্দোলনের মূল লক্ষ্য। আজাদী প্রাপ্তির উন্মাদনায় তখন হয়ত কোন কবির পক্ষে বলা সম্ভব ছিল : 'এবার পেয়েছি পথ/কথা ও কর্মের মাঝে যে পথ/উৎকীর্ণ করে রেখেছেন আমার হজরত'।

কিন্তু কবিরাই আবার যেহেতু তৃতীয় নয়নের অধিকারী, তাঁদের চোখে অনতি-বিলম্বেই আসল সত্যটা ধরা পড়ে গেল। পাকিস্তানী জাতীয়তা এবং ইসলামী ঐতিহ্যের পুনরুজ্জীবনের নামে বাংলা-দেশকে আসলে পশ্চিম পাকিস্তানীরা তাদের উপনিবেশে রূপান্তরিত করে ফেলল। পাকিস্তানের অর্থনৈতিক উন্নয়ন-সংক্রান্ত তথ্যাবলী এই সত্যের প্রতি নির্মম অঙ্গুলী-সংকেত করে। বাংলাদেশ এবং পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যে আঞ্চলিক উন্নয়নের বৈষম্যের যে তীব্রতা বুদ্ধিজীবী-দের চিন্তিত করে তুলেছিল, তা হাসান হাফিজুর রহমানের এই পংক্তিগুলিতে কী তীব্র বেদনার সঞ্চার করে : আশার রক্তিম আনন্দ থেকে আশাভঙ্গের যন্ত্রণার নীল অতলান্ত যেন একটি প্রশ্নে সমুদ্যত হয়ে ওঠে :

স্বপ্ন আমাদের উঁচু থেকে
উঁচুতর হয়ে অভ্রংলিহ; নগরীর স্বপ্ন
হাতের মুঠোয় পাবো বলে
নিয়নের ঘন লালিমায়
আমাদের মনের দেউলিয়া রোশনাই,
দম্ভ-থমথমে লনে, কেয়ারী-করা বন
বাগানের সুনামে সেজে আছে,
এই বুঝি জন্মভূমি?
স্রোতাবহ সন্ততির আঁতুরঘর?
বংশপরম্পরায়
কলোনী স্বদেশ আমার?
—গ্রহণ-গ্রস্ত নগরী

এই কলোনীকে ভোগদখলে রাখবার জন্য পাকিস্তানের রাষ্ট্রনেতারা যে-দুটি ইন্সটি-টিউশনের ওপর নির্ভর করেছেন, তা হল ব্যুরোক্র্যাসী এবং আর্মি। এ-দুয়ের সহ-যোগিতায় এবং পৃষ্ঠপোষকতায় নদীমাতৃক বাংলাদেশের বুকে দাঁড়িয়ে অপূর্ববংগ-বাসীদের হস্তগত বিগ বিজনেস বেমালুম লুট চালিয়ে গেছে। এবং এর ফলে বাংলা-দেশের গ্রামীণ অর্থনীতি ভেঙ্গে যেমন যায়, তেমনই সুষম শিল্পায়নও ঘটেনি। ফলত দারিদ্র্য, যার আরেক নাম রাষ্ট্রযন্ত্রের মাধ্যমে অর্থনৈতিক শোষণ-পীড়ন। মুক্ত স্বাধীন দেশে তাই জঙ্গী শাসনের রক্তঝড় বয়ে যেতে থাকে তীব্র ভয়ংকর।

এই জঙ্গী শাসকগোষ্ঠীকে স্বার্থহীন ভাষায় তাই মাশুকর রহমান চৌধুরী বলেন : ওরা হননকারী, ওরা পিশাচ, ওরা লোভী :

ওদের মাথায় আজ সর্বনাশা
জিঘাংসার নেশা
নির্মল হাওয়ার অন্তরে অন্তরে ওরা
ছড়িয়েছে মৃত্যুনীল বিষ
নোনা দরিয়ায় রক্তের বান।
ওরা শান্তির বীজ পুড়িয়ে
পৃথিবীর অঙ্গনে বুনেছে মৃত্যুর বীজ
আর পৃথিবীকে ঠেলে দিচ্ছে
তিলে তিলে কোন এক অন্ধকার বিবরে।
—অন্ধকার বিবরের মুখে

অর্থনৈতিক দিক থেকে পূর্ব পাকি-স্তানকে শুষে নিতে হলে, পশ্চিম পাকি-স্তানের শাসকগোষ্ঠী বুঝেছিলেন, ইসলামের দোহাই দিয়ে বাঙ্গালীদের স্বতন্ত্র সাংস্কৃতিক চারিত্র্যকেও হনন করতে হবে। উর্দুকে রাষ্ট্রভাষা হিসেবে প্রবর্তন এবং বাংলার বদলে আরবী হরফের প্রচলনের তাই সরকারী অপপ্রয়াসের স্পর্ধা দেখিয়েছিলেন তাঁরা। কিন্তু সমুচিত জবাব দিয়েছিলেন বাংলাদেশের আপামর জনসাধারণ। পবিত্র ভাষা-আন্দোলন শহীদের রক্তে রঞ্জিত হয়ে উঠল। স্বৈরাচারী শাসনের সেই রক্তিম পট-ভূমিকায় আলাউদ্দীন আল আজাদের তাই অবাক জিজ্ঞাসা :

কেউ কি দেখেছে মৃত্যু এমন
শিহরে যাহার ওঠে না কান্না,
ঝরে না অশ্রু?
হিমালয় থেকে সাগর অবধি সহসা বরং
সকল বেদনা হয়ে ওঠে এক পতাকার রং
এ কোন মৃত্যু? কেউ কি দেখেছে
মৃত্যু এমন
বিরহে যেখানে নেই হাহাকার?
কেবল সেতার
হয় প্রপাতের মহনীয় ধারা, অনেক কথার
পদাতিক ঋতু কলমেরে দেয়
কবিতার কাল?
—একুশে ফেব্রুয়ারী

এই কবিতার কালকে বিস্মৃত হলে বাংলাদেশের ব্যংগকবিতার প্রকৃত তাৎপর্য বোধহয় অনুধাবন করা যাবে না। যেহেতু সৃষ্টির ক্ষেত্রে স্রষ্টা যতই একক হন না কেন, সামাজিক জীবনের অভিজ্ঞতা তাঁর আবেগ এবং মননের ওপর অভিঘাত হানবেই। আর সেই অভিজ্ঞতা যদি হয় তীব্র যন্ত্রণার, যখন চতুষ্পার্শের অসংগতি অন্বিষ্ট শৃংখলাকে করে ব্যাহত; তখন কাব্যশিল্পে নাও থাকতে পারে অনু-ভূতির প্রশান্ত সৌন্দর্য, ব্যংগের ঝাঁঝালো দীপ্তি তখন কাব্যশিল্পকে সংক্রামিত করতে পারে। সমাজজীবন যখন তুমুলভাবে আলোড়নমথিত হয়ে ওঠে, প্রত্যাশা যখন পূর্ণ হয় না, বঞ্চনা হয় জ্বালাময়, অধিকার যেখানে স্বীকৃত হয় না, স্বৈরাচার হয় প্রকট, সংবেদনশীল কবি তখন সমাজ রূপান্তরের আন্তরিক প্ররোচনা বোধ করেন। এবং সেই প্রণোদনায় তিনি অসিহস্তে যদি সম্মুখসমরে নাও বা যান, মসিহস্তে প্রতিপক্ষকে ঘায়েল করতে পারেন। এবং তা পারেন প্রতিপক্ষের আসল কুটিল চেহারাটাকে নগ্নভাবে তুলে ধরে; ফলত জনমানস থেকে প্রতিপক্ষের স্বপ্রতিষ্ঠিত ভাবমূর্তিটির অবাস্তবতাকে উদ্ঘাটনের দ্বারা বিনষ্ট করে।

শুধু এই উদ্দেশ্যমূলকতা কী ব্যংগ-কবিতাকে কবিতা হিসেবে আস্বাদ্য করতে পারে? পারে না; তার জন্য চাই কবির বিশেষ বাণীভংগী। তা হওয়া চাই এমন অনিবার্যভাবে সহজ এবং কৌতুকপ্রদভাবে প্রত্যক্ষ যে তার তাৎপর্য অনুধাবনের জন্য গভীর কোন ব্যঞ্জনার বা নিগূঢ় কোন সংকেতের রহস্য আবিষ্কার করতে হবে না। বাংলাদেশের অধিকাংশ ব্যংগকবিতাই প্রকাশভঙ্গীর দিক থেকে 'সহজ শ্রেষ্ঠত্বের দাবী করতে পারে'। এবং 'বিষয়বস্তুর দিক থেকে এগুলো বৈচিত্র্যপূর্ণ।'

যে ধর্মভিত্তিক রাষ্ট্র-ব্যবস্থার পত্তন হয়েছিল বাংলাদেশে, তাকেই মোহাম্মদ মোস্তাফা, বোধহয় একটি ছড়াতে বলে-ছেন, 'ধর্মের ষাঁড়'। কিন্তু এই ধর্মের ষাঁড়, মোস্তাফার নিভুল পর্যবেক্ষণ, 'হাল টানে না/মই টানে না/নয় কোন কাজ-কর্মের'। এই ধর্মরাষ্ট্র যে সাধারণ মানুষের কোন অভাবই মেটাতে পারেনি এবং নির্লজ্জভাবে সেই অক্ষমতাকে ধর্মের দোহাই দিয়ে ঢেকে রেখেছে রাষ্ট্রের কর্ণ-ধারেরা, তা কী নিপুণ ব্যঙ্গে ধরা পড়েছে মোস্তাফারই আরেকটি ছড়ায় :

হুজুর দেশে বললো মজুর
পাইনে কিছু খাটছি হুজুর
দিন নেই আর রাত নেই।
আসলো পরে এক ঝামেলা
বললা : হুজুর কি ঝামেলা
ঘরটা আছে, ছাত নেই।

বললো এসে গাঁয়ের চাষী
ঠোঁটের কোণে শুকনো হাসি
হাল চাষ ঠিক, ভাত নেই।
বললে হবু : কি আর বলার
সবই লীলা ওপরঅলার
আমার কিছু হাত নেই।

কিন্তু সাধারণ মানুষ কী অপরের তাড়নায় অহর্নিশি জ্বলতে থাকলে, ওপর-অলার দোহাই মুখ বুজে মেনে নেয়? যদি না নেয়, তারও দাওয়াই আছে হবুর দেশের গবুচন্দ্র মন্ত্রীর হাতে। মোহাম্মদ মোস্তাফার ছড়ায় তার কর্মকাণ্ড :

খুয়ান ছড়ি বেদম জোরে
দুপুরে রাতে সন্ধ্যে ভোরে
অভাব নামের ভূত ছাড়ান।
সোনার দেশে নাইরে অভাব
চেঁচিয়ে চাওয়ার নেইকো স্বভাব
মানুষকে সব ঘুম পাড়ান।

এই সব গবুচন্দ্ররাই যে জঙ্গীশাহীর ধারক ও বাহক ছিলেন, সেই কথাটাই আমসুর রহমানের ব্যঙ্গে ধরা পড়েছে :

মেষের মেষ তুই আছিস বেশ
মনে চিন্তার নেইকো লেশ।
ডানে বললে ঘুরিস ডানে
বামে বললে বামে
হাবেভাবে পৌঁছে যাবি
সোজা মোকামে। —মেষতন্ত্র

এই মেষতন্ত্রের অন্যতম শরিক হল আমলারা, যারা অগাধ দক্ষিণায় ডুবুরী, আর্দালীর কুর্নিশে গর্বিত, অফিসে সর্বক্ষণ অন্যের পদোন্নতির বাধা, বাড়িতে এসে বন্ধুর প্রমোশনে ঈর্ষিত। অতএব তাদের স্ত্রীদের ঠোঁটের রেভলন শুকিয়ে আসে, বৈকালের নিমন্ত্রণ বাসি হয়ে যায়। তখন এরা দ্বিতীয় পুরুষের চিন্তায় উন্মনা হয়ে আবিষ্কার করে : পুরাতন প্রেমিক বিবাহিত। আর বর্তমানে নিজেদের সম্ভাব্য ভূমিকা : তরুণদের মাসী, সাব-অর্ডিনেটের আম্মা, বোনের সংসারে নানী। অবশ্য আমলা-স্বামীদের উষ্ণ প্রেমের ঘাটতির প্রৌঢ় ক্ষতিপূরণ হিসেবে স্ত্রীরা পেয়ে থাকেন : বালিশের ভাঁজে উদ্বৃত্ত হাতখরচ, আয়নার দেরাজে হেলেন কার্টিস, এনিগ্রেন্স মিল্ক, এলিস্টন জেট, ডিওডরেন্ট, হ্যান্ডলোশন, রেভলন, ক্রিশ্চিয়ান ডিয়োর এবং মু বিনস্টিন। কিন্তু তাতেও কী বিস্রামবিধ্বস্ত এই সব আমলার স্ত্রীদের দুঃখ ঘোচে? আবদুল গণি হাজারী তাদের মুখ দিয়েই বলিয়েছেন :

পরিবার পরিকল্পনায় আমরা নিঃস্ব
সময় আমাদের পিষ্ট করে যায়......
কোমরের উপত্যকায় মেদের আক্রমণ
উদরের স্ফীতি
চিবুকের শিথিল
স্তনের অস্বাস্থ্যে শংকিত
হে প্রভু আমরা
চর্বির মসোলিয়ামে হাঁসফাঁস
আমরা কতিপয় আমলার স্ত্রী......
হে প্রভু
যে কোন একটা কাজ দাও
নিজেদের নিক্ষেপ করি
তার গহ্বরে।
—কতিপয় আমলার স্ত্রী

আমলাদের মত জননেতারাও ব্যঙ্গের আক্রমণ থেকে রেহাই পাননি। নির্বাচনের পরে, হয় হবুর দেশে গবুচন্দ্র মন্ত্রী নতুবা মন্ত্রীর তাঁবেদার হয়ে জনগণ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যেতেন জননেতাদের কেউ কেউ। অথচ জনতার ভোটেই তাঁরা নির্বাচিত প্রতিনিধি হতেন। শাহবুবুল হক এইরকম একজন নেতার কথা বলেছেন :

এক যে নেতা আমার জানা ছিল
ভোটের জন্য ঘুরতো সবার দ্বারে
দেশদরদের অনেক কথা বলে
ইলেকশনে উৎরে গেল চলে।
কিন্তু শুনি ইলেকশনের পর
বেড়েছে তার দর
যাদের ভোটে জিতেছে সে, তারা
তার পিছনে ঘুরে ঘুরেই সারা।
—আমার জানা ছিল

সেনাবাহিনী, আমলাতন্ত্রের সঙ্গে বাংলাদেশের অনেক জননেতাও যে পশ্চিম পাকিস্তানের ঔপনিবেশিক শাসনব্যবস্থার তাঁবেদার হয়েছিল, তার অনেক তথ্যই ইতিমধ্যে প্রকাশিত হয়ে গেছে। স্বাধীন রাষ্ট্রকাঠামোর মধ্যেও যে ঔপনিবেশিক প্রশাসন-ব্যবস্থার ঘটল না স্বভাবজ বিকাশ। তাই একদিকে যেমন হঠাৎ মুনাফা কুড়িয়েছে মুষ্টিমেয় কিছু ব্যবসায়ী, অন্যদিকে দারিদ্র্যের জন্য পয়সার বিনিময়ে মানুষের দেহ বিক্রয় চলেছে। অর্থনৈতিক বৈষম্যের জন্যই সামাজিক জীবন থেকেও যেন সুস্থতা অপসৃত হয়ে যায়। দেখা দিল মূল্যবোধের বিপর্যয়। তাই প্রেমের ক্ষেত্রে পুরুষের মাধুকরী বৃত্তির একটি নিটোল ছবি পাই আলতাফ হোসেনের কবিতায় :

নীতা যদি চলে গেলে, এলা তবে এসো
বীথির মতোন ভালোবাসো।
তোমাকে বলব আমি রেহানার কথা
প্রেমে তার ছিল যে কিরূপ অটলতা...
—এলা তুমি এসো

প্রেমের ক্ষেত্রে নারীও যে তার আত্মসমর্পণের মূল্য মুদ্রার ওজনে মাপতে শিখেছে, দিলওয়ার হোসেন তা নির্ভুল লক্ষ্য করেছেন :

এক মাঝবয়সী পুরুষ এক তরুণীকে
বলল : হাসি
আমি তোমাকে ভালোবাসি।

তরুণী রাগ করে ঘাড় বাঁকালো
কিছুক্ষণ ভেবে আবার তাকালো...
'আচ্ছা, আপনার পেশা কী?'
'আমি ব্যবসায়ী, মাসিক আয়,
তিন হাজার তিনশ' আশি—
মেয়েটি বলল : 'তাহলে আমিও
তোমাকে ভালোবাসি'।

—প্রেম

বিকিকিনির হাটে রমণীরা কেমন সুন্দর বিকোচ্ছেন; তাদের শরীরের বিশেষ বিশেষ অংশের মূল্যেরও তারতম্য ঘটছে। কী নিদারুণ যন্ত্রণায় মাহবুবউল্ল চৌধুরী তাই লেখেন :

উলঙ্গ উরু শুধু দু' টাকায়
ফুটপাতে পাবে রোজ সন্ধ্যায়
নোটের গুচ্ছে আরও পাওয়া যায়
কর্সেটে বাঁধা ভারী ভারী স্তন
মদের নেশায় ঠোঁটে চুম্বন
হীরকখণ্ডে কুমারীর মন
আহা কি সুলভ! আহা কি বেশ!
এই তো আমার পাখীডাকা আর
ছায়ায় ঢাকা
সোনার দেশ।

—বারমাসী

ঘটনাচক্রে বর্তমান লেখক এপারের অধিবাসী আজ, তবু তাঁরও মনে এই কবিতা কী তীব্র আলোড়ন তোলে; যেহেতু ওপারের মাটিতেই যে তাঁর জন্ম, ওপারের রোদে-জলে-হাওয়ায় কেটেছে কৈশোর। সেই সোনার দেশ যে এক অবাক দেশে রূপান্তরিত হয়েছিল, বাংলাদেশ হিসেবে আত্মপ্রকাশের পূর্বে, তার এই বিচিত্র জাতীয় সঙ্গীতটি রচনা করেছেন সিকান-দার আবু জাফর :

মূল গায়েন। আমাদের সব আছে ভাই
সব আছে
সাজ আছে রূপসজ্জা আছে
হাড়ের নলে মজ্জা আছে
গরজমত গলায় গলায়
হুক্কাহুয়া রব আছে।
দোহার। হুক্কাহুয়া রব আছে।
সকলে। হুক্কাহুয়া রব আছে।
সব আছে ভাই সব আছে।।
মূল গায়েন। আমাদের হাঁক আছে আর
ডাক আছে
দোহার। ডাক আছে
মূল গায়েন। হঠাৎ বড়র হাঁক আছে
দোহার। হাঁক আছে
মূল গায়েন। আমাদের সুমুখ পিছন
দুই দিকেতেই
হুড়কো দেবার ফাঁক আছে।
সকলে। হুড়কো দেবার ফাঁক আছে
সব আছে ভাই সব আছে।।
মূল গায়েন। আমাদের ঢাক আছে আর
ঢোল আছে
দোহার। ঢোল আছে
মূল গায়েন। নানারকম ভোল আছে
দোহার। ভোল আছে
মূল গায়েন। দুপুর রাতে ঘরে ফিরেও
খোকার মায়ের কোল আছে
সকলে। খোকার মায়ের কোল আছে
সব আছে ভাই সব আছে।।
মূল গায়েন। আমাদের আইনকানুন
ধর্ম আছে
দোহার। ধর্ম আছে
মূল গায়েন। ইমানদারীর ধর্ম আছে
দোহার। ধর্ম আছে
মূল গায়েন। বাইরে ঘরে ক্লান্তিবিহীন
নিত্যকুকিকর্ম আছে।
সকলে। নিত্যকুকিকর্ম আছে
সব আছে ভাই সব আছে।।
মূল গায়েন। আমাদের যম আছে আর
কাল আছে
দোহার। কাল আছে
মূল গায়েন। শূল আছে আর শাল আছে
দোহার। শাল আছে
মূল গায়েন। তাই কাজল বাজাই
দুচোখ রেখে
মাঠের নেড়া তালগাছে।
সকলে। মাঠের নেড়া তালগাছে
সব আছে ভাই সব আছে।।
মূল গায়েন। শুধু নেই তো রে ভাই
খালি খোলে
একটি ছটাক ঘৃত
তাই বলে কি আমরা সবাই
পশুর খাঁচায় ধৃত?
সকলে। তাই বলে কি আমরা সবাই
পশুর খাঁচায় ধৃত?
দোহার। না—না—না—আমরা স্বাধীন
সকলে। আমরা স্বাধীন।
তবলার বোল। ধাগে ধিনাগ ঢাকিটি
ধিনাগ
তাক তাক তাক ধিনাগ
ধিনাগ।।
মূল গায়েন। এমন স্বাধীন কে আরে আছে
সকলে। এমন স্বাধীন কে আরে
আছে
সব আছে ভাই সব আছে
গরজমত গলায় গলায়
হুক্কাহুয়া রব আছে।
তবলার বোল। দিদ্দা ঝি নাক তেটে তেটে
থে টা ধাঁ তা
গুরু-গুরু গুরু-গুরু।।

—অবাক দেশের জাতীয় সঙ্গীত

আধুনিক কবিতা সম্পর্কে যাঁরা দুর্বোধ্যতার অভিযোগ তোলেন, দুর্বোধ্যতার স্বাভাবিকতাটুকু উপলব্ধিতে অনীহা যাঁদের এবং যাঁরা গভীর ভাবের কবিতা-পাঠে অভ্যস্ত নন, শুধুমাত্র তাঁদেরই এই কবিতাগুলি ভালো লাগবে, এমন নয়।

চোখ বুঁজে আছি, তবু ॥ সুনীলকুমার নন্দী

ড্রাইভার, স্পীড্ তোলো—
চোখ বুঁজে পার হই সাহারার মাঠ,
মাঠময়
ইতস্তত
ছড়ানো ব্যাঙের ছাতা
তাঁবু,
অপরূপ
বৃষ্টিতে মাঠ-ভাসা জল গড়ায়, তাঁবুর তলে
কাদা-জলে খসে-পড়া বকুল বকুলগন্ধ বালিকা বধূটি
ভুলে জট, মুখ খড়ি
হায়, বাংলাদেশ
বেআবরু…
নির্লজ্জ চোখ

পৌরুষ বিগত স্মৃতি নির্বীর্য
চারদিক
ভয়ঙ্কর আলো নিয়ে লুকালুকি, অদ্ভুত শীতল
পিত্তলে-পালিশে যেন তুলতে চাইছে সুবর্ণের জ্যোতি।

চোখ বুঁজে আছি, তবু চোখের পাতায় ম্লান ছায়া ফেলছে
ছায়া ফেলছে বাংলাদেশ বালিকা বধূটি…
ড্রাইভার, স্পীড্ তোলো—
অদূরে এয়ারপোর্ট, নিয়ন ঝলমল
চোখ
আলোর নেশায় চুর,
টলতে টলতে ঝাঁপ দেয় আন্তর্জাতিক ঐ আলোর ম্যাজিকে।

পশুভয় ॥ - মহাদেব সাহা

পশুরা মানুষ মারে জানি, মানুষের মাংস খায়
রক্ত চোষে ভীষণ জল্লাদ
তাই পশুদের বড়ো ভয় করি
ওদের মাংসাসী বলি, দূরে থাকি, ছোঁয়াচ এড়াই
পশুকে ঘৃণা করি,
সিংহ ব্যাঘ্র যারা বনে বাস করে
ওরা বড়ো ভয়ংকর
হিংস্র, নরখাদক, স্বভাবে দুর্জন
ওদের বিশ্বাস নেই কোনো, সহসা হালুম
শব্দে লাফিয়ে পড়ে, মুণ্ড ছেঁড়ে তীক্ষ্ণ নখরে,
মানুষের রক্ত খায়
পশুরা হিংস্র জীব, ভয়ংকর
পশুকে দারুণ ভয়
তাই বন কাটি,
আদিম অরণ্য ছেঁটে বসাই নগর, সভ্যতার ভিত,
বন্য শার্দুল মারি তীরে, বাণে মারনাস্ত্রে
মানুষের সমাজের নিরাপত্তা চাই,
অদম্য উৎসাহে করি পশু হনন—

এখন তেমন নেই বন্য পশুর ভয়
একদা যা ছিলো, বন নেই, নেই আদিম অরণ্য
অরণ্যে জংগলে আজ মানুষের সভ্যতা বিস্তৃত,
তবু মনুষ্য সমাজে কই নিরাপত্তা
শান্তি, স্বস্তি, নির্বিঘ্ন জীবন?
মানুষ মানুষ মারে, রক্ত খায়
দুর্বৃত্ত মানুষ দুঃশাসন
পশুদের চেয়ে তাই মানুষকে বেশী ভয় আজ
মানুষের হাতে সর্বক্ষণ হিংসার খঞ্জর, আগ্নেয়াস্ত্র
মানুষকে বড়ো ভয়, পাশাপাশি চলতে ভয়
কানে কানে টুঁ শব্দ করতে ভয়,
মানুষের ভয়ে আজ মানুষের সমাজ থেকে
পালায় মানুষ
মানুষের হিংস্রতায় পালায় শান্ত পাখি,
নিসর্গের দূত, গৃহপালিত প্রাণী
মানুষ অরণ্য কেটে নিজেরাই ফিরে যায়
সভ্যতার নিবিড় অরণ্যে।

তুমি কিছু মনে করো না ॥ নলিনীকান্ত রায়

তুমি কিছু মনে করো না,
জন্মান্তর রূপান্তর ঘটেছে
তোমার আমার
আর এই পৃথিবীর।

আলোর মশাল জেবলে
মুঠো মুঠো অন্ধকার নিয়ে
লুকোলুকি করছে কারা
এতো অন্ধকার যে কিছু দেখা যায় না
না তোমার, না আমার মুখ
না আর কারো।

●

শব্দ শোনা যায় কেবল…
হয়তো রণদামামা
বা আদিম মত্ততার মাদল
অথবা অট্টহাসি,

মনুষ্যত্বের ব্যঙ্গ চিত্র।
তুমি কিছু মনে করো না
দিন পাল্টেছে, পাল্টাচ্ছে সব
কেবল আদিম মত্ততা স্থাবর স্থাণু
কেবল আদিম অন্ধকার নিশ্চল;
আলো জ্বলছে আলেয়ার মতো।

তুমি কিছু মনে করো না
রূপান্তর ঘটেছে
তোমার আমার
আর এই পৃথিবীর
সব কিছু ঠিক আছে
আবার ঠিক নেই
এ গোলকধাঁধা তুমি বুঝতে চেয়ো না…
তুমি কিছু মনে করো না।

ঘৃণা

সুভাষ সিংহ

অবনীশ

এখন এই বাড়িটাকে ঘিরে ভৌতিক স্তব্ধতা। একটু আগেও পাশের বড় বসবার ঘরে অনেক লোকজন ছিল। ঝাড়-লণ্ঠনের আলোর নীচে ওরা আমাকে গোল হয়ে ঘিরে দাঁড়িয়েছিল। সবার হাতে ছিল গ্লাস, সোডা ঢালার পর ফেনা উপচে পড়ছিল, টেবিলের ওপর সারি সারি হুইস্কীর বোতল রাখছিল সাদা উর্দিপরা এবং হাসিমুখে বেয়ারাগুলি। অতিথিরা একই সংগে গ্লাস শূন্যে তুলে আমার, অবনীশ দাশগুপ্তের, পঞ্চাশ বছর পূর্তি উপলক্ষ্যে শুভকামনা করছিল। তারপর শুরু হয়েছিল মৃদু স্বরে কথাবার্তা আর মদ্যপান। হৈ-হট্টগোল একটু একটু করে বাড়ছিল। অতিথিদের মধ্যে ছেঁড়া ঘুড়ির মত এদিক-ওদিক গ্লাস হাতে টলছিলাম আমি। আমার নজর ছিল দরোজার দিকে। কেননা যে-কোন মুহূর্তে আমি নিপুর উপস্থিতি আশা করছিলাম। হাসি-গল্প-ঠাট্টার পার্টি বেশ জমে উঠেছিল। তারপর ডিনার খেয়ে শুভরাত্রি জানিয়ে যে-যার বিদায় নিয়েছে একটু আগে।

হালকা নীল আলো-জ্বলা ঘরে নরম গদীর উপর শুয়ে আমার ভয়ানক গরম লাগছে। অথচ মাথার উপর পাখা ঘুরছে ফুলস্পীডে। ডিসটেম্পার করা দেয়ালে মাত্র দুটি ছবি। একটি আমার স্ত্রীর। অন্যটি আমার একমাত্র বংশধর নিপুর। সারাদিন কাজের পর রাত্রে বিছানায় শুয়ে ঘুমোবার পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত আমি ওদের দেখি। স্ত্রী মারা গেছে সেই সতেরো বছর আগে যখন নিপুর বয়স পাঁচ বছর। আমি আর দ্বিতীয়বার বিয়ে করিনি। নিপু মানুষ হয়েছে বোর্ডিংয়ে থেকে। [illegible] নিপু এম-এ পাশ করে বাড়িতে বসে আছে।

ইদানীং আমি ঘুমের মধ্যে টের পাই হালকা পায়ে ঘরে কে যেন চলাফেরা করছে। মাঝ রাত্রে হঠাৎ ঘুম ভেঙে যায়। দূর থেকে ভেসে আসা বাতাসকে মনে হয় কারুর গভীর দীর্ঘনিঃশ্বাস। ঘড়ির টিক্-টিক্ শব্দে চমকে উঠি। জল খেয়ে ফের ঘুমোবার চেষ্টা করি। তারপর আবার বিদঘুটে স্বপ্ন দেখা। কখনও নিপুর রক্তাক্ত মুখ দেখি। নির্জন বাগানে বকুলগাছের তলায় মাটিতে চিৎ হয়ে শুয়ে নিপু— তলপেটে আমূল বিদ্ধ ছোরা, বড় বড় দুটো চোখের আতঙ্কিত দৃষ্টি মেলা আকাশের দিকে। মাঝে মাঝে আমার স্ত্রী [illegible] কাছে এসে আমাকে ফিসফিস করে ডাকে। ঘুম ভেঙে [illegible] শরীরের সমস্ত স্নায়ু পায়চারী করা [illegible] উপায় থাকে না। [illegible] আলোয় আবার সব ঠিকঠাক হয়ে ওঠে। সমস্ত [illegible] [illegible] ওদের কথা প্রায় [illegible] থাকে না আমার।

স্কুল আর কলেজের দিনগুলি বোর্ডিংয়ে থেকে নিপু আমার জীবন থেকে অতদূরে সরে যাবে এটা ছিল রীতিমত অবিশ্বাস্য। আজ আমার অভাব কিছু নেই। বাড়ি গাড়ি জমজমাট ব্যবসা। আমি চেয়েছিলাম নিপু আমার অবর্তমানে দক্ষতার সঙ্গে ব্যবসা চালাবে। আমার যা কিছু বিষয়আশয় সবই ওর। ওর কোন আগ্রহ নেই আমার ব্যবসার প্রতি। আমি নিপুকে ঠিক বুঝতে পারি না। ও কি চায় জানি না। মাঝে মাঝে ওর অবাধ্যতা দেখে আমার ভীষণ রাগ হয়। কিন্তু নিজের মনে আহত হওয়া ছাড়া করার কিছু থাকে না। শৈশবে মাতৃহীন একমাত্র ছেলের প্রতি শেষপর্যন্ত কঠোর হতে পারি না। আমার এই অন্ধস্নেহ নিপুকে কোথায় টেনে নিয়ে যাবে জানি না। আমি টের পাই নিপু আমাকে ভালবাসে না। বরং ঘৃণা করে আমাকে। ওর দু'চোখের দিকে তাকালে সেটা আমি বুঝতে পারি।

ভীষণ দুঃখে আমি মাঝে মাঝে একা কাঁদি। আমার চারপাশে অনেক লোক-জনের ভিড়। ওরা আমাকে ঘিরে থাকে কিছু পাবার আশায়। কিছু পেলে ওরা আমাকে খুশী রাখার জন্য ভাল ভাল কথা বলে। আমার কর্মক্ষমতার প্রশংসা করে। আমি নাকি ভাগ্যবান পুরুষ। আমি পুরুষ-সিংহ। ওদের সুন্দর সুন্দর কথাবার্তা মাঝে মাঝে ভাল লাগে আমার। কিন্তু এই ভাললাগা সাময়িক। যখনই নিপুর কথা মনে হয় সব বিস্বাদ ঠেকে। নিপু কিছু চায় না। নিপু হাসিমুখে কথা বলে না। পোশাক-আশাকের দিকে ওর কোন নজর নেই। কখন বাড়িতে থাকে, কখন বেরিয়ে যায় টের পাই না। অথচ রাত্রে রোজ খাবার টেবিলে ওর জন্যে অপেক্ষা করি। অপেক্ষা করতে করতে রাত বেড়ে যায়। শেষে সামান্য কিছু মুখে দিয়ে শুয়ে পড়ি। আর নিপুর জন্যে অপেক্ষা করি। এপাশ ওপাশ করতে করতে রাত গভীর হয়। সামান্য শব্দে চমকে উঠি। এভাবে আর বেশিদিন বোধহয় আমি বাঁচবো না।

মাথাটা কেমন ঝিমঝিম করছে। আর বমি-বমি ভাব। একটু আগে একবার বমি করে এসেছি। বারবার চোখেমুখে জলের ঝাপটা দিয়েও অস্বস্তি একদম কাটেনি। মনে হচ্ছে সমস্ত শরীর দিয়ে যেন আগুন ঠিকরে বেরুচ্ছে। হ্যাঁ, একটু বেশি হয়ে গিয়েছে মদ্যপান। রোজ দু'পেগ আমার বরাদ্দ। আজ সতেরো বছর এই নিয়মের ব্যতিক্রম হয়নি। এমনকি হোটেল বা পার্টিতে দু' পেগের বেশি কেউ অফার করলে সবিনয়ে প্রত্যাখ্যান করেছি। আজ আর মাথার ঠিক নেই। কেননা নিপু তিনদিন হল বাড়ি ফেরে না।

থানা-পুলিশ খবরের কাগজে বিজ্ঞাপন, এসব ক্ষেত্রে যা যা করা দরকার, কোন কিছুই আমি বাকি রাখিনি। কিন্তু নিপুর কোন খোঁজ নেই। নিপুর ঘর তালা বন্ধ। ঘরে কোন চিঠিপত্র রেখে গেছে কিনা জানি না। কোথায় যেতে পারে নিপু তাই ভাবছি তিনদিন ধরে। আমার কোনরকম আত্মীয়স্বজন নেই। নিপুর মত আমিও ছিলাম বাবা মা-র একমাত্র ছেলে। বাবা-মা স্ত্রী কেউ বেঁচে নেই। নিপুর বন্ধুদের চিনি না। ওর আদৌ কোন বন্ধু আছে কিনা জানি না। কেননা ওর সঙ্গে কোন-দিন ছেলেমেয়েদের এ বাড়িতে ঢুকতে দেখিনি। তবে নিপু গেল কোথায়?

এরপর যে আশঙ্কার কথা মনে হয়... সজ্ঞানে আমি সবকিছু ভুলতে চেষ্টা করি। না, মনকে আমি সংযত করতে পারি না। কেননা চারপাশের যা অবস্থা, রোজ যেভাবে প্রতিদিন খবরের কাগজে খুনোখুনির সংবাদ পাঠ করি, কয়েকদিন হল খবরের কাগজ দেখি না, নিপুর কোনকিছু হলে আমি জানি, আমার হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়া আপনা থেকেই বন্ধ হয়ে যাবে। নিপু ফিরে আসুক প্রতি মুহূর্তে কামনা করছি। যা কোনদিন করিনি অর্থাৎ ঈশ্বরকে স্মরণ— আজ তিনদিন আমি নিয়মিত মন্দিরে ঢুকে ঠাকুরের সামনে দু'চোখ বুজে ঘণ্টার পর ঘণ্টা বসে থাকি। প্রার্থনা জানাই : আমার নিপুকে ফিরিয়ে দাও।

আমি অস্থিরভাবে বিছানা থেকে নেমে ভেজানো দরোজা ঠেলে বাইরে এলাম। লম্বা টানা বারান্দা। বারান্দার কোণের দিকে নিপুর ঘর। একতলায় ঠাকুর চাকর থাকে। আমি বারান্দায় রেলিংয়ে হেলান দিয়ে সামান্য ঝুঁকে নীচের দিকে তাকাই। স্তব্ধতার ভিতর শুধু হৃৎপিণ্ডের শব্দ শুনি। কোথায় যেন পেটা ঘড়িতে ঢংঢং করে তিনটে বাজল। হঠাৎ আমার গা-টা ছমছম করে উঠল। মাঝে মাঝে এ-রকম হয়। ডাক্তার বায়ু পরিবর্তনের উপদেশ দেন। আমিও যাব যাব করে বছরের পর বছর এই বাড়িতে কাটিয়ে দিলাম।

নিপুর ঘরের সামনে দাঁড়িয়ে আমি একটার পর একটা চাবি দিয়ে তালা খোলার চেষ্টা করি। কোনদিন নিপুর ঘরে ঢুকিনি। ওর হাবভাবে মনে হোত ঘরে যেন না ঢুকি। অনেক চেষ্টার পর কষ্ট করে তালাটা খুলে যায়। এ সময়ে বাড়ির ঠাকুর চাকর দেখলে নির্ঘাৎ আমাকে পাগল ঠাওরাবে। ঘরে ঢুকে আমি আলো জেলে

দিলাম। অত্যন্ত সাধাসিধে ঘরের চেহারা। একটা খাট, আলনা, ছোট্ট একটা টেবিল আর দু'খানা চেয়ার। দেয়ালে একটি মাত্র ফটো। নিপুর মা'র ফটোর গায়ে একটা রজনীগন্ধার মালা। ফুলগুলি মনে হয় এখনও টাটকা। আমি সুন্দর গন্ধ টের পেলাম। টেবিলের উপর এলোমেলো কয়েকখানা বই। আলনায় অবহেলার সঙ্গে পড়ে রয়েছে প্যান্ট শার্ট। ঘরের সর্বত্র কেমন একটা উদাসীন ভাব। নিপুর মুখেও আমি ইদানীং এক ধরনের বিষাদ লক্ষ্য করতাম যা ওর বয়সী ছেলেদের মানায় না। বিছানার তলা তন্নতন্ন করে খুঁজলাম। নিপু নিশ্চয়ই দু'চার লাইন লিখে গেছে। অন্ততঃ তাই করা উচিত। প্রতিটি বই-এর পাতা উল্টে দেখলাম। অধিকাংশ বই দর্শন আর ইতিহাসের। খুঁজতে খুঁজতে আমি ক্রমশঃ হতাশ হয়ে উঠলাম। সামান্য আশ্বাস না পেলে আমি সহজভাবে নিঃশ্বাস নিতে পারবো না। দিনরাত্রি অসহ্য হয়ে উঠবে। নিশ্চয়ই কোথায়ও কিছু রেখে গেছে নিপু এই আশায় আমি নতুন উদ্যমে ঘরের প্রতিটি জিনিস উল্টেপাল্টে দেখতে থাকি। আর নানারকম জিনিস ঘাঁটতে ঘাঁটতে আমি হাতে তুলে নিলাম একটা ডায়েরি। প্রথম পাতা খুলতেই আমার চোখে পড়ল গোটা গোটা অক্ষর। দু-চার লাইন পড়ার পর মাথা ঘুরতে থাকে। ডায়েরি হাতে করে টলতে টলতে কোনরকমে নিজের ঘরে ঢুকে দরোজা বন্ধ করে বিছানায় শুয়ে পড়ি। তারপর বেডল্যাম্প জেলে নিপুর ডায়েরি পড়তে থাকি। না পড়াই ভাল ছিল। কেননা আমার কিছু ব্যক্তিগত ব্যাপার, যা আমার চোখে অসুন্দর কিছু নয়, আমার কিছু কার্যকলাপ যার মধ্যে আমি নিন্দার কিছু দেখি না, নিপুর চোখে সেসব অন্যভাবে এসেছে। ডায়েরি পড়তে পড়তে কখনও পড়া থামিয়ে গভীর ক্ষোভের সঙ্গে ভাবি, নিপুর চোখে কী এতই হেয় আমি?

নিপুর ডায়েরি থেকে

আমার ভাল নাম নৃপেন দাশগুপ্ত। দিদিমাকে আমি দেখিনি। উনি বেঁচে থাকলে আমাকে 'নেপো' বা 'নেপা' নামে ডাকতেন এ বিষয়ে আমার কোন সন্দেহ নেই। এই ডাকনামের ভিতর দিয়ে প্রকাশ পায় আন্তরিক ভালবাসা ও স্নেহ। মা-র চেহারা আমার স্পষ্ট মনে পড়ে। মনে পড়ে বিকেল বেলায় গা ধুয়ে চুল বেঁধে মা বারান্দায় আমাকে কোলে নিয়ে বসত। মা দেখতে যে খুব একটা সুন্দরী ছিল তা নয়, তবে তার চেহারায় একটা আলগা শ্রী ছিল। আর তার শরীর থেকে আমি ফুলের গন্ধ ঝরে পড়ছে টের পেতাম। মা আমাকে নানারকম গল্প শোনাত। সেসব গল্পের কাহিনী আজ আর মনে নেই। শুধু মনে আছে বিচ্ছিন্ন কিছু ছবি। দাশগুপ্ত সাহেব অর্থাৎ আমার পিতৃদেব, আমার শৈশব ও কৈশোরের যম, যার কাছে আমি শুধু নিপু—সেই ভদ্রলোকের সামনে কেন জানি না আমি ও মা মাথা নীচু করে থাকতাম। দৈবাৎ কোনদিন বাবা বাড়িতে একটু তাড়াতাড়ি ফিরলে মা এ ঘর সে ঘর ছুটোছুটি করত। ঘাম চিক্‌চিক্‌ করত মার ছোট্ট সুন্দর কপালে। বাবার সেবায় মা এতই ব্যস্ত থাকত যে, আমার কথা মনে পড়ত না। আমি আয়ার হাত থেকে দুধের গ্লাস টেনে ছুঁড়ে ফেলার অনেক চেষ্টা করেছি কিন্তু যে-মুহূর্তে বাবার নাম উচ্চারণ করেছে আয়া, আমি ভাল ছেলের মত দুধ খেয়ে বিছানায় শুয়ে কখন ঘুমিয়ে পড়েছি টের পাইনি। মাঝে মাঝে ঘুম ভেঙে গেছে মৃদু কান্নার শব্দে। আবছা অন্ধকারে টের পেয়েছি মা উপুড় হয়ে শুয়ে দু'হাতে মুখ ঢেকে কাঁদছে। আমি মা-র কান্না দেখে নিজেকে সামলাতে পারিনি। আমার কান্না থামাতে মা-কেই শেষ পর্যন্ত চুপ করতে হয়েছে।

আমার মা আমাকে কখনও 'নিপু' নামে ডাকত না। ডাকত 'নিপ' বলে। তেমন মধুরভাবে ডাকতে আর কাউকে শুনিনি। আমি ভালবাসার এত কাঙাল ছিলাম বলেই এত তাড়াতাড়ি এই পৃথিবীতে একমাত্র ভালবাসার লোক অর্থাৎ মা হঠাৎ আমাকে ছেড়ে চলে যায়। যতদূর জানি তার কোন রোগ ছিল না। স্বাস্থ্য ছিল বেশ মজবুত। সেই মাকে একদিন ভোরবেলায় হাসপাতালে নিয়ে যায় বাবা। হাসপাতাল থেকে আর ফেরে না মা। আমি ঠিক আজও বুঝতে পারি না কি হয়েছিল মা-র। কেন পুলিশ এসেছিল বাড়িতে! বাবার সঙ্গে তর্কাতর্কি, তারপর পাশের ঘরে বাবার সঙ্গে পুলিশের যাওয়া এবং কিছুক্ষণ পর হাসতে হাসতে দুজনের বেরিয়ে আসা। সমস্ত ব্যাপারটা আজও আমার কাছে রহস্যময়। মনে হয় স্বাভাবিক নয় মার মৃত্যু। তখন থেকেই বাবাকে আমি ঘৃণার চোখে দেখি।

পাঁচ বছর বয়স থেকেই বোর্ডিংয়ে থাকার ব্যবস্থা হয় আমার। মার ঐরকম মৃত্যু আমাকে খুব দাগা দেয়। আমি ক্রমশঃ টের পেলাম আর পাঁচটা ছেলের মত আমার জীবন নয়। ভালভাবে কারুর সঙ্গে মিশতে পারলাম না। সেই অল্প বয়স থেকে বিষাদ আমাকে পেয়ে বসল। মৃত্যুর পর মানুষ কোথায় যায় নির্জনে বসে ভাবতাম। জ্যোৎস্না রাত্রে চাঁদের দিকে তাকিয়ে মনে হোত মা হাতছানি দিয়ে ডাকছে আমাকে। কোন কোনদিন রাত্রে হঠাৎ ঘুম ভেঙে যেত কার কোমল কণ্ঠস্বরে। যেন শিয়রের কাছে দাঁড়িয়ে কেউ ডাকছে 'নিপ! নিপ!' অন্ধকার ঘরে বালিশে মুখ ডুবিয়ে আমি নিঃশব্দ কান্নায় ভেঙে পড়তাম।

প্রথমবার বাড়ি ফিরি এক বছর পর। পুজোর বন্ধের ছুটিতে সবাই বাড়ি যায়। ফলে আমিও বাড়ি এলাম। বাবা হেসে কথা বলল। পড়াশুনার কথা জিজ্ঞেস করল। তারপর বেরিয়ে গেল কাজে। আমি বাড়িতে নতুন মানুষ দেখলাম। নতুন আয়া। পান খেয়ে ঠোঁট দুটি লাল। আগের আয়ার চেয়ে এর বয়স অনেক কম। আর ছিমছাম চেহারা। ও হেসে যখন আমার হাত ধরল, মনে আছে, এক ঝটকায় হাত সরিয়ে নিয়েছিলাম। কেন জানি না ওকে প্রথম দেখেই, ওর মুখের মুচকি হাসি, পানের রসে টুকটুকে লাল ঠোঁট, কায়দা করে চুল বাঁধা—আমার ভাল লাগেনি, তাই ও আমার হাত ধরতেই রেগে উঠেছিলাম। কিন্তু এই নতুন মানুষটিও বোধহয় জানত আমাকে কিভাবে বশ করতে হয়। ও যখন গাল ফুলিয়ে জানাল যে, ওর কথা না শুনলে বাবার কাছে নালিশ করবে, আমার আর করবার কিছু থাকে না। ফলে ও আমাকে হিড়হিড় করে টেনে নিয়ে যায় রান্নাঘরে।

নতুন আয়ার প্রতি বিরূপ ভাবটা ক্রমশঃ বাড়ল যখন দেখলাম আমার সামনেই বাবা ওর সঙ্গে হেসে হেসে কথা বলে। আরও অবাক হলাম দেখে যে, বাবার সঙ্গে আয়া ঠিক সম্ভ্রমের সুরে কথা বলে না। বরং কথা বলার সময় আয়ার চোখমুখে অদ্ভুত চাপা হাসি লক্ষ্য করি। ওরা হয়ত আমার

কথা তেমনভাবে ভাবেনি। অথবা আমার মত একটা বাচ্চা ছেলে কিই বা বুঝবে... একদিন রাত্রে কোমল কণ্ঠে 'নিপু' ডাক শুনে ঘুম ভেঙে যায়। আমি হঠাৎ খুব ভয় পেলাম। আমার ঘরেই আয়া ঘুমোয়। পাশাপাশি আমাদের খাট। আয়ার শোবার জন্যে খাট, প্রথমদিন দেখে আমার অদ্ভুত লেগেছিল। আগের আয়া মার মৃত্যুর পর আমার ঘরে ঘুমোত। কিন্তু তার জন্যে খাট তো দূরে থাক, একটা ছোট্ট তক্তপোষও ছিল না। সে আমার খাটের কাছে মেঝেতে বিছানা পেতে ঘুমোত। যাই হোক, ভয় পেয়ে আমি পাশের খাটে গিয়ে মশারি তুলে দেখলাম বিছানায় আয়া নেই। একা ঘরে আমার ভয় আরও বেড়ে যায়। আমি তাড়াতাড়ি ছুটে দরোজা খুলে বাবার ঘরের দরোজার কাছে দাঁড়ালাম। বন্ধ দরোজায় ধাক্কা মারতে গিয়ে থেমে যাই। কেননা আমি স্পষ্ট শুনতে পেয়েছি ওদের হাসি কথাবার্তা। আমার ভীতিভাব মুহূর্তে উবে যায়। আমি বয়স্ক হয়ে ফিরে এলাম ঘরে।

সতেরো বছরের ইতিহাস ডায়েরিতে ধরে রাখা যায় না। প্রতিবার ছুটিতে এসে আমি নতুন আয়া দেখেছি। আমার পিতৃদেব, দাশগুপ্ত সাহেব, এই সেদিনও মার ফটোর সামনে দাঁড়িয়ে চোখের জল ফেলেছে। মানুষের ভণ্ডামীর একটা সীমা আছে। এই যে দাশগুপ্ত সাহেবের আজকে এত প্রতিপত্তি, বিস্তর কালো টাকা, বাড়ি গাড়ি—অনেকের মত এই ভদ্রলোকও এসব অর্জন করেছে মনুষ্যত্ব বিকিয়ে। ভদ্রলোকের ধারণা তার নিপু এসব কিছুই জানে না। আমি জানি অনেক কিছুই। আমি শুধু ঘৃণা করতে পারি লোকটাকে। এই লোকটা আমার জন্মদাতা ভাবতেও আমার কষ্ট হয়। আমি চেষ্টা করেছি বাবাকে ভালবাসতে। শত হলেও সে আমার জন্মদাতা। তার সম্পর্কে আমার বিদ্বেষ ভাব কিছুতেই কাটিয়ে উঠতে পারিনি। তার আর আমার মাঝখানে প্রাচীরের মত দাঁড়িয়ে আছে মা।

দাশগুপ্ত সাহেবকে দেখি আজকাল ঘরের দরোজা বন্ধ করে বন্দুক নিয়ে নাড়াচাড়া করতে। সামান্য শব্দে চমকে এদিক ওদিক তাকায় ভদ্রলোক। তার আশঙ্কার কারণ আমি বুঝতে পারি। এখন বাবা আমাকে আঁকড়ে ধরে বাঁচতে চায়। তার অসহায় অবস্থা দেখে আমি মনে মনে হাসি। এম, এ পাশ করার পর আমি ঠিক কি করবো ভাবতে ভাবতেই দুটো বছর পার হয়ে গেল। না, বাবার ব্যবসার সঙ্গে নিজেকে জড়াবো না। কেননা আমি জানি কিভাবে বাবার ব্যবসা দিন দিন ফুলে ফেঁপে উঠেছে। কনট্রাকট পাওয়ার জন্যে সংশ্লিষ্ট অফিসারকে মোটা টাকার ঘুষ, সুন্দরী মেয়ে সাপ্লাই, বাবার এসব পাপ আমার অজানা নয়। আরও জানি, উচ্ছিষ্টের মত ডাস্টবিনে ফেলে দেওয়া পুরনো আমাদের কেউ কেউ অশ্রুসজল চোখে বাবার কাছে সামান্য টাকার জন্যে, আশ্রয়ের জন্যে দাঁড়িয়েছে—বাবা নির্মমভাবে তাদের তাড়িয়ে দিয়েছে। এসব জানি বলেই বাবাকে ভালবাসার বা ক্ষমা করবার কথা কখনও মনে হয়নি। বরং আমি তার চোখের সামনে থাকবো, তার সমস্ত রকমের পাপের সাক্ষী হয়ে—আমার চোখের দিকে সে কোনদিন মাথা উঁচু করে তাকাতে পারবে না। দিনদিন তার কমপ্লেক্স তাকে কুরে কুরে খাবে। তার রাত্রের ঘুম নষ্ট হবে, তন্দ্রার মধ্যে নিজের ছায়া দেখে চমকে উঠবে, আহারে রুচি থাকবে না—এই তার পুরস্কার, এইভাবেই হয়ত একদিন সে পাগল হয়ে যাবে। সুতরাং বাবাকে ছেড়ে আজও আমি চলে যাইনি। নইলে অনেক আগেই মাস্টারী নিয়ে বাইরে চলে যেতাম। তার আগে দেখতে চাই বাবা তার কৃতকর্মের জন্যে অনুশোচনা অনুভব করছে কিনা। তার যন্ত্রণার চেহারাটা আরও স্পষ্টভাবে দেখার ইচ্ছে আমার। সুতরাং আমাকে আরও কিছুকাল এ বাড়িতে থাকতে হবে।

নিপু

আমার ঘর খোলা। ঘরের মধ্যে জিনিস-পত্র বিশৃঙ্খলভাবে এধার-ওধার ছড়ানো ছিটানো। বিছানার চাদর এলোমেলো, একটা বালিশ মেঝেতে পড়ে আছে। টেবিলের উপর বইগুলি এ ওর গায়ে মুখ থুবড়ে...যেন কিছুক্ষণ আগে কোনকিছু উদ্ধারের আশায় জেমস বণ্ড আমার ঘরে ঢুকেছিল। আমি বুঝতে পারলাম জেমস বণ্ডটি কে হতে পারে। ঠিক সেই জিনিসটি নিয়ে গেছে যা আমি খুব যত্নের সঙ্গে লুকিয়ে রেখেছিলাম। রোজ রাত্রে গোপনে আমি ডায়েরি লিখতাম। কোনদিন এক লাইন, কখনও কয়েক লাইন। সমস্ত ডায়েরি জুড়ে ছিল বাবা।

খোলা জানালার কাছে দাঁড়িয়ে আমি অসংখ্য তারাভরা আকাশ দেখলাম। ভোর হতে এখনও কিছুটা বাকি। আমি রাত থাকতেই বুড়ী আয়ার কাছ থেকে চলে এসেছি। বুড়ী আয়ার প্রতি আমার ভয়ানক দুর্বলতা। সে আমাকে মায়ের মত স্নেহ করত। তিনদিন আগে রাস্তায় হঠাৎ তার সঙ্গে দেখা। তার শরীর খুব দুর্বল, ভালভাবে হাঁটতে পারছিল না, রাস্তায় দাঁড়িয়ে ভিক্ষা করছে। আমাকে দেখে ভিড়ের মধ্যে মিশে পালিয়ে যাবার চেষ্টা করেছিল বুড়ী আয়া। আমি তাকে অনুসরণ করে ধরে ফেলেছি। তারপর শহরতলীর এক জায়গায় সে আমাকে নিয়ে যায়। মাটির ঘর। টালির চাল। কয়েকদিন বুড়ী আয়ার শরীরের গন্ধে মাকে খুঁজে পেয়েছি। আর ওকে ভিক্ষে করতে দেব না। আমার আশা, একদিন না একদিন, আমাদের দেশটা এমন হয়ে যাবে যে, রাস্তাঘাটে একটা ভিখারিকেও দেখা যাবে না। আমার এরকম আশার কথা শুনলে বন্ধুরা বিদ্রূপ হেসে উঠবে মনে হয়।

এখন দাশগুপ্ত সাহেব অর্থাৎ আমার পিতৃদেব, বন্ধ ঘরের ভিতর হিংস্র বাঘের মত পায়চারী করছে নিশ্চয়ই। আর মনে মনে ভাবছে নিপু এসব জানল কিভাবে। বাবার সম্পর্কে নিপুর ধারণা তাহলে এই রকম ঘৃণ্য? আমার জন্যে আবার চিন্তাও করছে বুঝতে পারছি। হয়ত ভাবছে আমি খুন হয়ে গেছি। যাকগে, আমার সম্পর্কে বাবা কি ভাবছে তা নিয়ে আমি মোটেও চিন্তিত নই। আমি এতদিনে জানতে পেরেছি আমার মার মৃত্যুর কারণ। বুড়ী আয়া সবটা বলেনি। যা বলেছে তাই আমার পক্ষে যথেষ্ট। শোনার পর আমি রাস্তায় চিৎকার করে কেঁদেছি। সমস্ত রাত পুলিশ আর গুণ্ডাদের এড়িয়ে ফুটপাতে আর পার্কে কেটেছে। একটা ছোরা এখন আমার পকেটে। আমার চোখের সামনে ভেসে উঠল...মার মুখের সমস্ত প্রসাধন চোখের জলে ভেসে গেছে। বাবা কঠিন দৃষ্টিতে মার দিকে তাকিয়ে। মার হাত ধরে বাবা দরোজা খুলে এক ধাক্কায় মাকে ভিতরে ঢুকিয়ে দেয়। আর একটা কালো লোমশ হাত মার মুখ চেপে ধরে...সেই বছর নাকি বাবা এক লাখ টাকার একটা মস্তবড় কনট্রাকট পেয়েছিল। আর মা? তীব্র প্রতিক্রিয়ায় মার সুন্দর মুখ নীল হয়ে উঠেছিল।

না, আর দেরি নয়। আমি তোয়ালে মুড়ে ছোরা হাতে বাইরে এলাম। এখনও ভালভাবে আলো ফোটেনি। লম্বা টানা বারান্দা পেরিয়ে বাবার ঘরের সামনে দাঁড়ালাম। কি ভেবে জানালার সামনে এসে একটা পাল্লা সামান্য সরিয়ে ভেতরে তাকিয়ে আমি স্তম্ভিত। মার ফটোর সামনে দাঁড়িয়ে বাবা দেয়ালে মাথা ঠুকছে। বাবার সমস্ত মুখ রক্তাক্ত। দু'চোখ বেয়ে জলের ধারা নামছে। আমার হাত কাঁপতে থাকে। পায়ের নীচে মাটি থরথর করে কাঁপে। আমি কোনরকমে ফিরে এলাম ঘরে। বালিশের নীচে ছোরা রেখে বিছানায় শুয়ে পড়লাম।

মার ফটোর দিকে তাকিয়ে আমার কি যেন হয়ে যায় একটু আগে। মা যেন ঘৃণার দৃষ্টিতে আমাকে দেখছিল। মাথা নীচু করে পালিয়ে আসা ছাড়া আমার কোন উপায় ছিল না। ভীষণ অবসন্ন বোধ করলাম আমি। তারপর কখন যেন ঘুমিয়ে পড়লাম।

একটা কান্নার শব্দে আমার পাতলা ঘুম ভেঙে যায়। আমি দু'চোখ রগড়ে তাকিয়ে দেখি আমার মুখের উপর ঝুঁকে রয়েছে একটি মুখ। চোয়াল ঝুলে পড়া দু'চোখ গর্তে বসা লোকটার ধসে যাওয়া চেহারার দিকে আমি তীব্র ঘৃণার দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলাম।

সাহিত্য সংস্কৃতি

১৮৯৪ খৃষ্টাব্দের এক অন্ধকারময় দিন। 'আর্মস অ্যান্ড দি ম্যান' নাটক অভিনয় শেষে যবনিকা পড়ল, দর্শকজন স্তব্ধ হয়ে বসে রইল, যা দেখেছেন তম্বারা তাঁরা ভীত, চকিত, সন্ত্রস্ত হয়ে উঠেছেন। প্রায় নীরবে সবাই একে একে উঠে গেলেন, দু-চারজন এর মধ্যে কটু মন্তব্যও করতে লাগলেন। কারণ নাটকটা অপ্রিয় সত্য।

এই বিরূপতা ও তিক্ত মনোভংগী সৃষ্টির জন্য যিনি দায়ী তাঁর নাম জর্জ বার্নাড শ'। পরবর্তীকালে এই নাম প্রায় উপকথায় পরিণত হয়েছে। ১৯২৫-এ তাঁকে সাহিত্যের জন্য নোবেল পুরস্কার দেওয়া হল, আর তারই চার বছর পরে ১৯২৯-এ স্যার ব্যারী জ্যাকসন ম্যালভার্ণে 'শ ফেসটিভ্যাল' প্রবর্তন করলেন।

১৯৫০-এর ২রা নভেম্বর জর্জ বার্নাড শ'র মৃত্যু হয়। বার্নাড শ'কে সমাহিত করার সময় কিছু অজ্ঞাতপরিচয় মানুষ ভিড় করে এসে দেহটা অধিকার করে নেয় এবং তারাই শবদাহের ভার নিজেদের হাতে নেয়, আর গ্রাম থেকে হাজার হাজার নর-নারী ছুটে এসে বার্নাড শ' আজীবন যে শান্তি এবং সৌন্দর্যের আরাধনা করেছেন তা বিঘ্নিত করে। বার্নাড শ'র উইল প্রকাশিত হলে দেখা গেল তাঁর সম্পত্তির মোট মূল্য ৩৬৭,২৩৩ পাউণ্ড এবং ১৩ শিলিং, তাঁর গ্রন্থাবলীর স্বত্বের মূল্য ৪৩০,০০০ পাউণ্ড। অবশ্য এই উইল প্রকাশিত হওয়ার পর অনেকে বার্নাড শ'কে ধিক্কার দিয়েছে, কারণ এককাল নিদারুণ দারিদ্র্যের মধ্যে আছি এই বলে তিনি প্রার্থীদের নিরস্ত করেছেন। ১৮৫৬ খৃষ্টাব্দে ২৬শে জুলাই তারিখে মিসেস কার শ'র কোলে তাঁদের তৃতীয় সন্তান হিসাবে বার্নাড শ' ভূমিষ্ঠ হন। বার্নাড শ'র জীবন বাল্যকাল থেকে মোটেই মধুর ছিল না। মাত্র তের বছর বয়সে সামান্য একটা ব্যবসাপ্রতিষ্ঠানে 'বয় পিওন' হিসাবে তাঁর কর্মজীবনের সূত্রপাত। অতিশয় কঠোর জীবনসংগ্রামের পর তাঁর খ্যাতি ও প্রতিষ্ঠা লাভ সম্ভব হয়েছিল। লণ্ডনে দশ বছর শিক্ষানবিশীর পর স্বীকৃতি এলো যুক্তরাষ্ট্র এবং কনটিনেণ্ট থেকে, ইংলণ্ড তখনও বার্নাড শ'কে গ্রহণ করতে পারেনি।

লণ্ডনে শ'র প্রতি বিরূপতার কারণ তিনি যখন-তখন যেখানে-সেখানে নানা-রকম অপ্রিয় মন্তব্য করতেন। জনসাধারণের মনোভংগী যেখানে রক্ষণশীল সেখানে অদ্ভুত এবং উদ্ভট মন্তব্য করলে সবাই বিরক্ত হয়, তলিয়ে বোঝার চেষ্টা করে না।

সুবক্তা হিসাবে বার্নাড শ'র খ্যাতি হয়েছিল সুলেখক এই পরিচিতিলাভের অনেক আগে। রঙ্গমঞ্চে তাঁর নাটকের অভিনয় শুরু হয়েছে, কিছু মানুষ নতুন কিছু শোনার জন্য রংগমঞ্চে গিয়ে ভিড় করে। এদিকে ছোটো-বড়ো সবরকম চার্চে ভাষণ দেওয়ার আমন্ত্রণ আসে। স্কুলের পুরস্কারবিতরণী সভা থেকে শুরু করে যেসব সভায় হোমরাচোমরা পীয়র বা টোরী পার্টির সদস্যরা উপস্থিত থাকেন সেখান থেকেও বার্নাড শ'এর আহ্বান আসে।

এই সময় নিউ রিফর্ম ক্লাবে এক ভাষণ দেওয়ার আমন্ত্রণ গ্রহণ করলেন বার্নাড শ'। সেখানে তাঁর বক্তৃতার বিষয়-বস্তু 'আধুনিক ধর্ম'। সেখানে তিনি নাটক সম্পর্কে একটি কথাও বলতে নারাজ। বললেন, আমার সংগে নাটকের ব্যক্তিগত সম্পর্ক আছে তাই এই ক্লান্তি।

তারপর নিউ রিফর্ম ক্লাবে বক্তৃতা দিতে উঠে বার্নাড শ' প্রথমেই যা বললেন তা শুনে শ্রোতাদের ত' চক্ষুস্থির। তিনি বললেন—

'আজকের এই সভায় এই বিষয়ে বলার একমাত্র হেতু অতিসাধারণ। আমি দেখেছি যে-মানুষের ধর্মপ্রীতি নেই, সেই ধর্ম-বিরহিত মানুষ কাপুরুষ এবং কুৎসিত। বর্তমান সভ্যতা যে-স্তরে পৌঁছেছে, সেই পঙ্ক থেকে তাকে উদ্ধার করতে হলে আমাদের প্রয়োজন ধর্মের।'

তিনি আরো বললেন, মানুষকে আত্মা বিষয়ে অধিকতর আগ্রহান্বিত করাই তাঁর জীবনের উদ্দেশ্য। যে-কারণে আত্মা মানুষের দেহে একটি বিশেষ যন্ত্র তা বোঝানো প্রয়োজন।

বার্নাড শ' এইভাবে এক-একটি আসরে এক একরকম কথা বলেন, তাই সবায়ের মুখে মুখে তাঁর নাম। বার্নাড শ' যেন বিভিন্ন মানুষ। তিনি সবরকম লোকের কথা বলাতেন তাই সবাই তাঁর কথা বলত।

ধর্মপ্রাণ মানুষ বলতে তিনি কি বুঝেছেন কে জানে। তাঁর ধারণা ছিল ধর্মপ্রাণ মানুষ বেশী নেই। কিন্তু লাইফ-ফোর্সের মাপকাঠিতে বিচার করলে ধর্মবিচ্যুত মানুষকেও জালে টানা যায়।

বার্নাড শ'র মতে ক্যাপিটালইজম বা ধনতন্ত্র একটা অধর্ম। এই অধর্মের যন্ত্র অতি অল্পসংখ্যক মানুষের চেষ্টায় ধীরে ধীরে ভেঙে চুরমার হয়ে পড়বে। একদিন এর চিহ্নটুকুও আর অবশিষ্ট থাকবে না। 'লাইফফোর্স' একমাত্র ধর্ম, এই ধর্মে প্রার্থনা নেই, কৃচ্ছ্রসাধনা নেই, ব্রতোপবাস নেই, কোনোরকম তোড়জোড় করারও দরকার নেই। এই তাঁর ব্যক্তিগত ধর্ম। এই তাঁর স্বর্গ। এই ধর্মের জন্য আত্ম-ত্যাগের প্রয়োজন নেই।

'আর্মস অ্যান্ড দি ম্যান' নাটকেও তাই বার্নাড শ'র স্পষ্টবাদিতাই তাঁর প্রতি রক্ষণশীল সমাজের মনে বিরূপতা সৃষ্টি করেছিল। জনসাধারণ 'কনভেনশ্যন' বা বাঁধাধরা নীতিতেই বিশ্বাসী। জীবনটাকে ভাবালুতার গোলাপী স্বপ্নের চশমা পরে দেখতেই তাঁরা অভ্যস্ত। ধীরে ধীরে এই সংস্কার চূর্ণ করার চেষ্টা না করে বার্নাড শ' আঘাত হেনেছেন সোজাসুজি। যুদ্ধের রোমান্স তিনি নাটকের নায়ক ক্যাপ্টেন ব্লাণ্টাচিলির মুখের উক্তি দিয়ে একেবারে নস্যাৎ করে দিয়েছেন। এই বাস্তবানুগ উক্তি যেহেতু বর্ণে বর্ণে সত্য তাই জনসাধারণের অন্তরে আঘাত হেনেছে।

বার্নাড শ' লেখক, নাট্যকার, বক্তা বা সমাজসংস্কারক ইত্যাদির চেয়েও অনেক ঊর্ধ্বে, তিনি একজন 'প্রফেট' বা যাকে বলা হয় 'এ ম্যান উইথ এ মিশন' একটা বিশেষ উদ্দেশ্য নিয়ে তিনি কাজ করেছেন। মানবকল্যাণের মুখ চেয়ে। তিনি রঙ্গ-মঞ্চের সাহায্য নিয়েছিলেন তার একমাত্র কারণ এই যে, এইভাবে জনসাধারণের রুচি পরিবর্তন করা সহজ হবে। তাঁর বক্তব্যপ্রচারে এই মাধ্যম প্রয়োগ করে তিনি সফল হয়েছেন। মঞ্চস্থ হওয়ার অনেক আগেভাগেই তাঁর নাটকগুলি প্রকাশিত হত, তার সংগে সংযুক্ত থাকত সুদীর্ঘ ভূমিকা। এইভাবে সৌভিয়ান দর্শকদের একটি বিশেষ শ্রেণী গড়ে উঠেছিল।

বার্নাড শ' বিশেষ করে স্মরণীয় হয়ে উঠলেন একটি বিশেষ কারণে তাঁর একান্ত বিশ্বাস ছিল যে, প্রচুর দুষ্কৃতির মধ্যেও এক কণা কল্যাণকর বস্তু থাকা সম্ভব। তিনি মানবকল্যাণে আত্মোৎসর্গ করেছেন এই খ্যাতি ধীরে ধীরে প্রচারিত হয়েছে। তাঁর চিন্তার ব্যাখ্যা হিসাবে তিনি নাটকের

বার্নাড শ'র আত্মজীবনী

ভূমিকা রচনা করেছেন, এবং এইভাবে যেন তিনি সরাসরি পাঠকদের সঙ্গে কথা বলে গেছেন।

বার্নার্ড শ'র 'ম্যান অ্যান্ড সুপারম্যান' নাটকের মধ্যেই বার্নার্ড শ' তাঁর 'লাইফ-ফোর্স' তত্ত্বটি পরিস্ফুট করেন।

বার্নার্ড শ'র জীবন ও কর্ম বিষয়ে শুধু ইংরাজী ভাষাতেই প্রায় পাঁচশতাধিক গ্রন্থ রয়েছে। বার্নার্ড শ'র সঙ্গে যাঁরা ব্যক্তিগতভাবে পরিচিত ছিলেন, তাঁরাও অনেকে অনেকগুলি বই লিখেছেন। বিশেষতঃ ফ্রাঙ্ক হ্যারিসের চটুল জীবন-বৃত্তান্ত ত' বার্নার্ড শ'র জীবদ্দশাতেই প্রকাশিত।

বার্নার্ড শ'কে ফ্রাঙ্ক হ্যারিসের গ্রন্থটি সম্পাদনাও করতে হয়েছে এবং সেই সময় তিনি 'সিকস্‌টিন সেলফ স্কেচেস' নামক আত্মজীবনীমূলক একটি গ্রন্থ প্রকাশ করেন। বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন সূত্রে নিজের কথা বলতে গিয়ে তিনি যা লিখেছেন, এই গ্রন্থটি তারই সঞ্চয়ন।

সব দেশেই সর্বকালে যেসব মহাপুরুষের আবির্ভাব ঘটে তাঁদের জীবনের টুকরো সংবাদ কিছু তাঁরা নিজেরাই লিখে রেখে যান, নয়ত পরবর্তীকালে নানা সূত্রে জীবনীকাররা তাঁর জীবনের খুঁটিনাটি নিয়ে গবেষণা শুরু করেন। যদি আত্মজীবনী লিখে যাওয়া সম্ভব না হয়, তাহলে পরবর্তীকালে অক্ষম বা দায়িত্বজ্ঞানহীন জীবনীকারদের হাতে তাঁদের লাঞ্ছনা ঘটে। সম্প্রতি মিঃ স্ট্যানলী উইনট্রাউব নামক জনৈক গবেষক কাঁচি এবং আঠার সাহায্যে বার্নার্ড শ'র একটি সুদীর্ঘ 'আত্মজীবনী' (?) সংকলন করেছেন।

বার্নার্ড শ' দুটি কারণে আত্মস্মৃতি রচনা করেননি। অনেক দিক থেকেই তিনি 'পাবলিকম্যান' না হয়ে 'প্রাইভেটম্যান' থাকাটাই শ্রেয় মনে করতেন। তাঁর ব্যক্তি-জীবনের রোমান্স বা বিভিন্ন নারীর সঙ্গে অন্তরঙ্গতার কাহিনী লিপিবদ্ধ করার জন্য অনেকে তাঁকে প্রলুব্ধ করলেও তিনি রাজী হননি। দ্বিতীয়তঃ 'জি বি এস' নামক বস্তুটির যে 'পাবলিক' মুখোশ তাঁর ছিল তার জীবনী সম্ভব মনে হয়নি। একটি গ্রন্থে তাঁর জীবনী-সংকলন সম্ভব নয়। আলোচ্য গ্রন্থটি দুটি খণ্ডে সম্পূর্ণ। দীর্ঘ জীবন পেয়েছিলেন বার্নার্ড শ', তার ফলে স্মৃতিচারণমূলক অনেকগুলি খণ্ড চিত্র তাঁর বিভিন্ন রচনাবলীর মধ্যে ছড়ানো আছে।

মিঃ উইনট্রাউব অশেষ পরিশ্রমসহকারে সেই সব মালমশলা সংগ্রহ করেছেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় মিঃ উইনট্রাউবের শিল্প-চেতনার অভাব আছে, নতুবা তিনি সহজেই বুঝতেন যে, অসংলগ্ন অনেক রচনাংশ শুধুমাত্র 'ডট' চিহ্ন এবং ফুট-নোটসহযোগে পাঠযোগ্য করা যায় না, অন্ততঃ তা সুখপাঠ্য হয় না। কোনো কিছু পড়তে বসে পাঠককে যদি ক্রমাগত বাধা ঠেলতে হয়, তাহলে পাঠকের বিরক্তি বৃদ্ধি পায়।

যেখানেই সেভিয়ান যুগের কাহিনীর আকর্ষণ বৃদ্ধি পেয়েছে, সেখানেই পাঠককে সহসা থামতে হয়েছে, কারণ সামনে... তারপর রচনাশৈলীতে পার্থক্য, বক্তব্যবস্তুর গতি শ্লথ, নতুবা একেবারে অন্যএক নতুন প্রসঙ্গ সামনে উপস্থিত।

বার্নার্ড শ'র জীবনী যাঁরা লিখেছেন, বিশেষতঃ যাঁরা জীবনের কাহিনী লিখে গেছেন, তাঁদের মধ্যে হেসকেথ পীয়রসন এবং সেণ্ট জন আর্ভিন স্মরণীয়। তাঁরা অতিশয় আকর্ষণমূলক কাহিনী পরিবেশন করেছেন। হেসকেথ পীয়রসনের গ্রন্থটির প্রথম খণ্ড ত' বার্নার্ড শ'র জীবদ্দশায় প্রথম প্রকাশিত হয়েছিল।

মিঃ উইনট্রাউব কিন্তু দু খণ্ডে সম্পূর্ণ 'আত্মজীবনী' উপহার দিয়ে আমাদের হতাশ করেছেন। এই গ্রন্থটি পাঠ করলে মনে হবে প্রতিটি খ্যাতিমান মানুষের উচিত আত্মকথা নিজেই লিখে যাওয়া, ভবিষ্যতের হাতে সে ভারটুকু না রাখাই শ্রেয়। জানি না আমাদের দেশে যাঁরা সন্ন্যাস গ্রহণ করেন, তাঁরা নিজেদের শ্রাদ্ধ কি কারণে সজ্ঞানে নিজেরাই করে যান।

— অভয়ঙ্কর

SHAW: AN AUTOBIOGRAPHY: Vol: 1 (1856-1898), vol II (1898-1950)-(pages 352 and 344) selected from his writings by : STANLEY WEINTRAUB. Published by MAX REINHARDT: London Price £3.15 each.

নতুন বই

উনিশ শতকের সমাজ ও সংস্কৃতি (আলোচনা)—অমিতাভ মুখোপাধ্যায়। জেনারেল প্রিন্টার্স অ্যান্ড পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ। ১১৯, ধর্মতলা স্ট্রীট। কলিঃ—১৩। দাম ছয় টাকা।

উনবিংশ শতকে সমগ্র ভারত এক জটিল যুগ-সন্ধির পর্যায় অতিক্রম করে প্রবেশ করে ইতিহাসের নতুন অধ্যায়ে। সাহিত্য, ধর্ম, সমাজ, জাতীয়তার ক্ষেত্রে বিকাশ লাভ করে স্বাধীন চিন্তা। জড়তা-মুক্ত হিন্দুজাতি নব-আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে ওঠে। যদিও যুগান্তকারী চিন্তাধারা তের শতক থেকে আঠার শতকের মধ্যে নানাভাবে জাতীয় ভাবনার মূলে আঘাত হেনেছিল, তবুও গভীর ছাপ সৃষ্টি করতে পারেনি জাতির মানসিকতায়। তা সম্ভব হয়েছিল উনিশ শতকে। উনিশ শতকের ভারতীয় সমাজ ও সংস্কৃতি নিয়ে বহু গ্রন্থ এযাবৎ লেখা হয়েছে। সম্প্রতি বেরিয়েছে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস অধ্যাপক শ্রীঅমিতাভ মুখোপাধ্যায়ের 'উনিশ শতকের সমাজ ও সংস্কৃতি'। ভূমিকায় প্রখ্যাত ঐতিহাসিক ডঃ রমেশচন্দ্র মজুমদার লিখেছেন : 'উনিশ শতকের বাঙালির সমাজ—বিশেষ ভাবে জাতিভেদ, বর্ণ ও বৃত্তি, কৌলীন্য প্রথা, বিধবা বিবাহ এবং চড়কপুজো ও নরবলির ন্যায় নিষ্ঠুর প্রথা প্রভৃতির সঙ্গে বাংলায় হিন্দুর নব-জাগরণ এবং প্রত্যক্ষ ভাবে যে দুইজন মহাপুরুষ রামমোহন ও বিবেকানন্দ এই নব-জাগরণের অগ্রদূত এবং পরোক্ষভাবে যাঁরা এর সাহায্য করেছেন—মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার ও বাল গঙ্গাধর তিলক তাঁদের সম্বন্ধে পৃথক পৃথক ভাবে আলোচনায় সমৃদ্ধ এই গ্রন্থখানি বাংলা-সাহিত্যের একটি গুরুতর অভাব মোচন করেছে। এইটুকুই যথেষ্ট নয়। সংকলিত তেরোটি

প্রবন্ধে লেখক পুরোন কথার চর্বিত-চর্বন না করে নতুন তথ্যকে বিশ্লেষণের চেষ্টা করেছেন। শ্রীমুখোপাধ্যায় ইতিহাসের অধ্যাপক এবং একজন মননশীল প্রাবন্ধিক। তার স্পষ্টপরিচয় ফুটে উঠেছে প্রতিটি প্রবন্ধে। 'বাল গঙ্গাধর তিলক ও উনিশ শতকের রাজনীতিতে সন্ত্রাসবাদের সূচনা' এবং 'উনিশ শতকের বাংলার নব-জাগরণের প্রকৃত সীমারেখা' প্রবন্ধদুটি আরও বিশ্লেষিত হলে ভালো হোত। যাঁরা ভারত ইতিহাসের এই বিশেষ অধ্যায় সম্পর্কে গভীর পড়াশুনার আগ্রহী, তাঁদের পক্ষে বইখানি বিশেষ সহায়ক হবে।

বাংলাদেশ—প্রদীপ্তকুমার সান্যাল। দেজ বুক স্টোর্স। বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রীট। কলকাতা-১২। দাম ছয় টাকা।

ইতিহাসের পথ ধরেই এসেছেন শেখ মুজিবর রহমান। অকস্মাৎ তাঁর আত্মপ্রকাশ নয়। তাঁর রাজনৈতিক থিসিস হোল ইতিহাসেরই নির্দেশ। তাঁকে অস্বীকৃতির অর্থ, ইতিহাসকে অগ্রাহ্য করা। স্বাধীন বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার চিন্তা শুরু হয়েছিল ইংরেজ বিতাড়ন পর্বের সমাপ্তি লগ্নে। সর্বভারতীয় নেতৃবৃন্দের কূট ষড়যন্ত্রে সে-স্বপ্ন বাস্তবায়িত হয়নি। কিন্তু বাঙালীকে যে বিভক্ত করা যায় না, অন্যায় আর অসত্যের জোরকে বাঙালীত্বকে ধ্বংস করা যে অসম্ভব, তার উজ্জ্বল নিদর্শন আজকের বাংলাদেশ।

সাম্প্রদায়িকতার জাল বিস্তার করে শাসকগোষ্ঠী বাঙালীর সর্বনাশ করেছে ষোল আনা। দ্বিজাতিতত্ত্বের ভিত্তিতে গঠিত হোল ভারত-পাকিস্তান। আর এই দ্বিজাতিতত্ত্বের জন্ম সাম্প্রদায়িকতা থেকে। এই ব্যবস্থা যে শুভ নয়, তা প্রথমেই বাংলাদেশের পূর্বাংশের বেশ কিছু মুক্তচিন্তাসম্পন্ন মানুষ উপলব্ধি করেছিলেন। তাই সাম্প্রদায়িকতার বিষ সমূলে উৎপাটন করতে তাঁরা তৎপর হোয়ে উঠেছিলেন। তাঁদের সে-প্রয়োগ সার্থক হতে থাকে ধীরে ধীরে। ভাষা-আন্দোলনে শহীদ হলেন হিন্দু-মুসলমাননির্বিশেষে বাঙালী। ধীরে ধীরে সম্প্রদায়গত চেতনা বিসর্জন দিয়ে তারা একটি মাত্র পরিচয়ে উঠে দাঁড়াল। সে-পরিচিতি বাঙালী নামেই। ৭০-এর ডিসেম্বরে বাঙালীর জয় হোল। আর মার্চে শুরু হোল বাঙালীদের বাঙলাদেশ প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম।

শেখ মুজিবর কেন পূর্ব-পাকিস্তানকে স্বাধীন করতে চাইলেন? ইসলামের মাদকতা মুক্ত করে কেন তিনি একটি স্বাধীন দেশ প্রতিষ্ঠা করতে চাইলেন? এর উত্তর রয়েছে ধর্মীয় রাষ্ট্র পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার মধ্যে। পশ্চিম-পাকিস্তানী শাসকগোষ্ঠী বাঙলাদেশকে এতকাল শোষণ করেছে। তেইশটি পরিবার ফুলে ফেঁপে উঠেছে। ভাষায় এবং ভাতে বাঙালীকে মারবার ষড়যন্ত্র হয়েছে। সব সময় প্রতিবেশী বিদ্বেষকে জাগিয়ে দিয়ে বাঙলাদেশের উন্নয়নকে করা হয়েছে ব্যাহত। দাবি-দাওয়া নিয়ে যখনই কোন আন্দোলনে নেমেছে জনতা পুলিশ আর মিলিটারি দিয়ে স্তব্ধ করা হয়েছে তাকে। বাঙলার সোনার মাটিতে ঝরেছে রক্ত। রক্তমাটির বুকে দাঁড়িয়ে বাঙালীর ছেলে প্রতিশোধের প্রতিজ্ঞা নিয়েছে। সেই প্রতিজ্ঞা বাস্তবরূপ পেয়েছে সাম্প্রতিক মুক্তিযুদ্ধে।

শ্রীপ্রদীপ্তকুমার সান্যাল বাঙলাদেশের জীবন্ত ইতিহাস রচনা করেছেন। তিনি দেখিয়েছেন, বাঙলাদেশে পশ্চিমী শাসক গোষ্ঠী কি বর্বর শোষণ ও শাসন চালিয়েছে। বিভাগপূর্ব ভারতের রাজনৈতিক ঘটনাবলী উল্লিখিত হয়েছে প্রসঙ্গক্রমে। দুটি বিপরীত মুখীন সংস্কৃতির সহাবস্থান যে অসম্ভব তার ওপর লেখক আলোকপাত করেছেন। পাকিস্তানের ভাষাগোষ্ঠী, বিভিন্ন ভাষাভাষী জনসংখ্যা ধর্ম, কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব, কৃষিভূমি পরিমাণ, দৈনিক সংবাদপত্র, শস্য উৎপাদন, বিদ্যুৎ উৎপাদন, প্রধান প্রধান শিল্পদ্রব্য, শিল্পউদ্যোগ, কেন্দ্রীয় বাজেট এবং আরো বহু তথ্য লেখক সরকারী এবং বিভিন্ন সূত্রে সংগ্রহ করেছেন। তাছাড়া মুক্তিযুদ্ধপরবর্তীকালীন ঘটনাপঞ্জী, খান-সেনাদের বর্বর অত্যাচারের কাহিনীও লেখক সংগ্রহ করেছেন। লেখকের আন্তরিকতা এবং ইতিহাস-আনুগত্য উল্লেখযোগ্য। তবে তাঁর অতি-আবেগপ্রবণতা কোথাও কোথাও ঐতিহাসিক তথ্যের পক্ষে হানিকর হয়েছে।

•

নতুন করে পাব বলে (উপন্যাস)—সুখরঞ্জন মুখোপাধ্যায়। সাহিত্য প্রয়াসী, ৪৫, যাদব দাস লেন, হাওড়া ঃ ২ঃ সাড়ে পাঁচ টাকা।

বংশগতি এবং পরিবেশ মানুষের জীবনের কি একমাত্র নিয়ামক? মানুষের সুরুচি ও সৌন্দর্যবোধকে যৌনবোধের ওপর জয়ী করা কি যায় না? এই প্রশ্নকে সামনে রেখেই কাহিনীর বিস্তার। কানাগলির বাসিন্দা তরুণ পুলস্ত্যকে ঘিরেই এ-কাহিনী আবর্তিত হয়েছে। তাঁর জীবনকে ছুঁয়ে গেছে বস্তিবাড়ীর জনপদবধূ কালোসোনা, ব্রহ্মপুত্রের উপত্যকাভূমির পাণ্ডুর অপাপবিদ্ধ তরুণী ঋতু, পোস্ট-গ্রাজুয়েট ক্লাসের বান্ধবী আভিজাত্য-গর্বিতা বিপাশা। এতে কেবল আবর্ত আর ঘূর্ণিরই সৃষ্টি হয়েছে। তারই তীব্র স্রোতে জীবনের ঘাটে ঘাটে উন্মাদের মতো ঘুরে

বেরিয়েছে পুলস্ত্য। শেষে স্নিগ্ধসুন্দর জীবনে উত্তরণ তার ঘটল তরুণী শীলার প্রাণবন্ত ভালবাসার আশ্বাসে। আজকের জীবনের ছবি লেখক মুন্সিয়ানার সঙ্গে ফুটিয়ে তুলতে পেরেছেন। কাব্যধর্মিতার রম্যতায় গ্রন্থটি নিষিক্ত। তাই সুখপাঠ্যও।

দেশে দেশে (ভ্রমণকাহিনী)—নিরঞ্জনপ্রসাদ চৌধুরী। গ্রন্থপ্রকাশ, ১৯, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলকাতা ঃ ১২। তিন টাকা।

পড়াশোনার জন্যে ইয়োরোপে প্রথম পাড়ি দেওয়া, ছাত্রজীবন অন্তে কর্মজীবনের নানা প্রয়োজনে এশিয়া ও আফ্রিকার নানান দেশ লেখক পরিভ্রমণ করেছেন। এই সমস্ত দেশের মানুষজনের রীতিনীতি, আচার-ব্যবহার সম্পর্কীয় নানান কৌতূহলোদ্দীপক বিবরণ প্রবাস থেকে স্বদেশের আত্মীয়দের কাছে লিখতেন। চেহারাটা ছিল পত্রাকারে—প্রবাস থেকে পাঠানো পত্রাবলী মন্থন করেই এই অনবদ্য ভ্রমণ-কাহিনীর সৃষ্টি। সাধারণ ভ্রমণ-কাহিনীতে অপরিচিত দেশের ঘরোয়া ছবি বড় একটা দেখা যায় না—দেশে দেশে সে অদেখা ছবিই ফুটেছে চমৎকারভাবে। বিজ্ঞানকর্মী হয়েও সাহিত্যসাধকের বিরল দৃষ্টি লেখক লাভ করেছেন। গ্রন্থটি ভ্রমণ-পিপাসুদের কাছে আদরণীয় অবশ্যই হবে।

রোগ চিকিৎসায় আয়ুর্বেদ (প্রথম খণ্ড)—কবিরাজ রঘুনাথ মাইতি, কাব্যতীর্থ, বৈদ্যশাস্ত্রী। প্রকাশক, আয়ুর্বেদমন্দির, কাঁথি, মেদিনীপুর। দু টাকা।

মানবসেবার দৃষ্টিকোণ থেকে বইখানি রচিত। গ্রামের সাধারণ দরিদ্র মানুষ স্বল্পব্যয়ে যাতে চিকিৎসা-সাহায্য পেতে পারেন, সেই উদ্দেশ্য নিয়েই বইখানি লেখা। লেখক একটি আয়ুর্বেদ কলেজের অধ্যক্ষ, দীর্ঘদিন এই চিকিৎসায় নিযুক্ত। বইটির বিশেষত্ব রোগের চিকিৎসা বিজ্ঞানসম্মত বিবরণ, রোগের কারণ, চিকিৎসা, মুষ্টিযোগ, পথ্য, প্রভৃতির সহজবোধ্য ভাষায় বর্ণনা।

প্রতিটি রোগের ইংরেজী নাম, আধুনিক চিকিৎসা পদ্ধতির সঙ্গে তার সম্পর্ক—এসব বিষয়ও বইটিতে উল্লেখিত হয়েছে। কয়েকটি খণ্ডে সমস্ত রোগের বিবরণ ও পরিচয় পাওয়া যাবে। আমরা বইটির বহুল প্রচার কামনা করি।

স্বদেশ ও শিল্প (ব্যবসা-বাণিজ্য)—সুভাষচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। রকমারী বুক হাউস, ৭৭ মহাত্মা গান্ধী রোড, কলকাতা—৯। দশ টাকা।

জনস্ফীতি, কর্মসম্প্রসারণের অসুবিধা, উপযুক্ত কর্মসংস্থানের অভাব, চালু কলকারখানাগুলি একাধিক কারণে বন্ধ হয়ে যাওয়া ইত্যাদি কারণে বেকার-সমস্যা এদেশের প্রাণঘাতী হয়ে উঠেছে। নানান পরিকল্পনা করেও সরকার হালে পানি পাচ্ছেন না।

এই সমস্যা সমাধানের একটি উপায় আংশিকভাবে আছে তা হল চাকরীর জন্যে কাঙালের মত অপেক্ষায় না থেকে সামান্য কিছু পুঁজি নিয়ে শিল্প-সামগ্রী তৈরী—ব্যবসা-বাণিজ্যে আত্মনিয়োগ করা, বিশেষ করে যখন জাতীয়করণীকৃত ব্যাঙ্ক থেকে সহজ সর্তে ঋণদান করা হচ্ছে। তাছাড়া সরকারীসূত্রে কিছু আর্থিক সহায়তাও উদারভাবে দেবার ব্যবস্থা হয়েছে।

আলোচ্য বইটিতে শ্রীচট্টোপাধ্যায় পঞ্চাশ রকমের নানান ধরনের শিল্পসামগ্রী তৈরীর রীতি-প্রকরণ, কাঁচা মাল পাবার বিস্তৃত তথ্য, সরকারী অর্থানুকূল্য কোথায় পাওয়া যাবে, কাকে কিভাবে লিখতে হবে ইত্যাদি বিষয়ে বিস্তৃতভাবে সরল ভাষায় আলোচনা করেছেন।

এই সব কারণেই বাজার-চলতি আরো পাঁচটা বইয়ের চেয়ে স্বদেশ ও শিল্প হয়ে উঠেছে সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য গ্রন্থ।

ভগবান কে ও কি (ধর্মগ্রন্থ)—চন্দ্রশেখর পাণ্ডা। বঙ্গানুবাদ ঃ অনিলকুমার মল্লিক। শ্রীগুরু লাইব্রেরী, ২০৪, বিধান সরণী, কলকাতা ঃ ৬। সাড়ে তিন টাকা।

চন্দ্রশেখর পাণ্ডা পেশায় গণিতের শিক্ষক—হরিহর মন্দিরের প্রতিষ্ঠার আয়োজনে নিজেকে নিবেদন করার সময়ই এই বইটি ওড়িয়া ভাষায় লেখেন। ভগবদ ভাবনা, জীবনের রহস্যভেদ, ঈশ্বর-উপলব্ধি প্রভৃতি বিষয় নিয়ে নানান আলোচনা এর মধ্যে স্থান পেয়েছে। মুখ্যত হিন্দুধর্ম এবং সংস্কৃতি নিয়ে বিস্তৃতভাবে আলোচনা হলেও বিশ্বের অন্য প্রধান ধর্ম এবং ধর্মমতগুলি বাদ যায়নি। অনুবাদক বঙ্গানুবাদে মুন্সিয়ানার পরিচয় রেখেছেন।

ব্রহ্মবিদ বলরাম (জীবনী)—বিজ্ঞানকিঙ্কর সুরেশ দাস। শ্রীবলরাম ধর্মসোপান (প্রকাশন বিভাগ), খড়দহ, ২৪ পরগণা (উত্তর)। দু টাকা।

ব্রহ্মবিদ বলরাম ভারতীয় ধর্মজগতের এক স্মরণীয় পুরুষ। বৈষ্ণব ধর্ম প্রচারে ও প্রসারে তিনি নিজেকে নিবেদন করেছিলেন। বালক বয়সে আরা জেলার ধামোয়া গ্রাম ত্যাগ করে তিনি ঈশ্বর-সন্ধান এবং জ্ঞানলাভের ব্যাকুল বাসনায় সারা ভারত ভ্রমণ করেছিলেন। এই গ্রন্থে ব্রহ্মবিদ বলরামের ধর্ম-জীবনের বিচিত্র ও আশ্চর্য কাহিনী অনুপমভাবে বিবৃত করেছেন লেখক। এই সঙ্গে যুক্ত হয়েছে তাঁর উপদেশাবলী। গ্রন্থটি খড়দহ শাখার রজত-জয়ন্তী গ্রন্থমালার প্রথম বই। সাধারণ মানুষের জন্য ধর্মের সারতত্ত্ব, ধর্মগুরুদের জীবনী ও ভারতীয় ধর্ম-গ্রন্থগুলি সহজ ভাষায় আরো চব্বিশটি বই আকরগ্রন্থ হিসাবে প্রকাশের পরিকল্পনা খড়দহ শাখার আছে। বলা বাহুল্য ধর্মপিপাসুদের কাছে আলোচ্য গ্রন্থটি বিশেষভাবে আদরণীয় হবে।

সংকলন ও পত্র-পত্রিকা

নবান্ন ভারতী— সম্পাদক ঃ জ্যোতির্ময় ঘোষ। ৪৩ নিমু গোস্বামী লেন, কলিকাতা—৫। সাড়ে তিন টাকা।

তিনটে উপন্যাস, ছ'টা গল্প প্রবন্ধ কবিতা এবং নানান ধরণের লেখা নিয়েই নবান্ন ভারতীর শারদ সংকলন। ছোটদের বিভাগও আছে। নবীন ও প্রবীণ বিশিষ্ট লেখকদের মধ্যে আছেন ঃ অন্নদাশংকর রায়, ডঃ রমা চৌধুরী, ডঃ হরপ্রসাদ মিত্র, বনফুল, প্রেমেন্দ্র মিত্র, ডঃ পঞ্চানন ঘোষাল, অখিল নিয়োগী, তারাশংকর বন্দ্যোপাধ্যায় শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়, শান্তিপদ রাজগুরু, বীরু চট্টোপাধ্যায়, শান্তশীল দাশ প্রমুখ। প্রচ্ছদটি আকর্ষণীয়, এঁকেছেন শিল্পী ত্রিভঙ্গ রায়।

সৌভ্রাত্র (বিশেষ সংখ্যা '৭১)—সম্পাদনা ঃ বিভূতিভূষণ রায়, নীহাররঞ্জন চৌধুরী। ১।১এ আশু বিশ্বাস রোড, কলকাতাঃ ২৫।

বিভিন্ন সংস্থা-সংগ-প্রতিষ্ঠানের বিশেষ পর্ব উপলক্ষে প্রকাশিত পুস্তিকাগুলি ক্রমশঃ সাহিত্য-গুণান্বিত হয়ে উঠছে। কল্যাণী স্পিনিং মিলস অফিসার্স এসোসিয়েশনের মুখপত্র 'সৌভ্রাত্র' তারই বিশিষ্ট নিদর্শন। বিশিষ্ট লেখকদের মধ্যে আছেন নন্দগোপাল সেনগুপ্ত ও কৃষ্ণ ধর। তাছাড়া লিখেছেনঃ আনন্দ চক্রবর্তী, ('শ্রীরামকৃষ্ণ গুরু তোতাপুরী'), বিভূতিভূষণ রায় ('একটি দৃষ্টিকোণ'), 'বাংলাদেশ'-র হাই কমিশনার শ্রী এম হোসেন আলি ('বাংলাদেশ ঃ এ রিয়েলিটি'-ইংরেজিতে), আবদুল লতিফ (দেশাত্মবোধক সঙ্গীত') ও সৌরীন্দ্রনাথ ঘোষের ইংরেজিতে লেখা প্রবন্ধটি।

পোলট্রী (কার্তিক-পৌষ '৭৮)—সম্পাদক শম্ভুনাথ মুখোপাধ্যায়। ৫০এ সুরি লেন, কলকাতা ঃ ১০। তিন টাকা।

রসনাতৃপ্তিকর স্বাস্থ্যবর্ধক খাদ্য হিসাবে মুরগী বিশ্ব-সমাদৃত। তার পালন এবং চর্চা হালে এদেশে প্রচুর বেড়েছে। কুটীর-শিল্প হিসেবে সরকারী ও বেসরকারী বা ব্যক্তিবিশেষের আয়োজনে এই মুরগীপালন এখন অর্থকরী ব্যবসায়ের অঙ্গ হয়ে দাঁড়িয়েছে। বেকার-সমস্যা সমাধানের এটিও একটি উল্লেখযোগ্য ভূমিকা নিচ্ছে। আলোচ্য ত্রৈমাসিক পত্রিকাটি মুরগীপালনের নানা সমস্যার ওপর আলোকপাত করেছে। পাঞ্জাব, দিল্লি, হরিয়ানার মুরগী-খামার সম্বন্ধে অনেক তথ্য ও তত্ত্বের সন্ধান এর মধ্যে পাওয়া যাবে। পশ্চিম বাংলায় সম্বন্ধেও। লিখেছেন মুরগী পালন সম্পর্কে বিশেষজ্ঞরা—বিশিষ্ট হলেন ঃ নিমাই নন্দী, ডঃ গণেশ

সাহা ও ডঃ লীলা সাহা, ডাঃ সন্তোষকুমার মুখোপাধ্যায়, অধ্যাপক সুব্রত পাল, শম্ভুনাথ মুখোপাধ্যায়, দেবীপ্রসাদ নাগ প্রমুখেরা।

ফাল্গুনী (শারদীয়া)—সম্পাদক : মনীষী-কুমার উকিল ও মনোরঞ্জন দাস। ৫ বাচস্পতিপাড়া রোড, দক্ষিণেশ্বর, কলকাতা—৫৭। চল্লিশ পয়সা।

ছাপা ভালো। সম্পাদকীয় মান উন্নত। গল্পগুলি আকর্ষণীয়। এই সংখ্যায় লিখেছেন মণীন্দ্র রায়, গৌরাঙ্গ ভৌমিক, জীবন সরকার, কল্যাণকুমার সিংহ, শামসুল আলম সাঈদ, জিতেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী, এবং আরো অনেকে। ভাস্কর সেনের লেখা 'আধুনিকতায় বাংলা কবিতা' শীর্ষক প্রবন্ধটি পাঠকের মনোযোগ আকর্ষণ করার মতো।

চারুবাক (তৃতীয় বর্ষ, চতুর্থ সংখ্যা '৭৮)—সম্পাদক : অরুণ মুখোপাধ্যায়। টাটা ইন্ডাস্ট্রিজ স্পোর্টস ক্লাব, ৪৩ চৌরঙ্গী রোড, কলকাতা : ১৬। দেড় টাকা।

অফিস পাড়ার একমাত্র সাহিত্য ত্রৈমাসিক 'চারুবাক' — শিল্প-সাহিত্যের ললিত-লাবণ্যের বাঙ্ময় রূপ। এই জন্যেই ইতি-মধ্যে পাঠক সাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। আলোচ্য সংখ্যায় তারই প্রতিভাস যেন আরো বৃদ্ধি পেয়েছে। রচনাগুলি নানান রসের। সুলিখিতও। কবিতা লিখেছেন কিরণশঙ্কর সেনগুপ্ত, বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, গৌরাঙ্গ ভৌমিক প্রমুখ। প্রবন্ধ তিনটিই সবিশেষ উল্লেখযোগ্য : সূর্য মুখোপাধ্যায়ের 'সাহিত্যের বাজার', অমিতাভ চট্টোপাধ্যায়ের 'বাংলা চলচ্চিত্রে সমকাল' ও মাণিকুমারের 'অফিস পাড়ায় ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনের কার্যক্রম'। এই সংখ্যায় আকর্ষণ দুটি উপন্যাস—দুটিই প্রথম বাংলায় অনূদিত। বিশ্বের খ্যাতনামা দুই দিকপালের—লিওনার্দো দ্য ভিঞ্চির ও শার্ল বদল্যার উপন্যাস দুটির বঙ্গানুবাদ করেছেন তারেশ দাশ ও শঙ্করানন্দ মুখোপাধ্যায়। এছাড়াও লিখেছেন আশানন্দ চৌধুরী, জনমেজয় করাণক, কালীবিলাস ভট্টাচার্য, প্রমুখ।

মনীষা (২য় বর্ষ : ২য় সংখ্যা '৭১)—প্রধান সম্পাদক : নারায়ণচন্দ্র চন্দ্র। টাকী হাউস, ২৯১বি আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড, কলকাতা—৯।

গভর্নমেন্ট স্পনসর্ড মালটিপারপাস স্কুলের (বালক বিভাগ) মুখপত্র : 'মনীষা' ছাত্র এবং শিক্ষকদের নানান ধরনের রচনায় সমৃদ্ধ। ছাত্রদের লেখাই বেশী। বিজ্ঞান ও সাহিত্য সম্পর্কে আলোচনাগুলিতে ভবিষ্যৎ প্রতিশ্রুতির ছাপ রয়েছে। প্রাথমিক বিভাগের রচনাগুলি সম্পাদনা করেছেন : লতিকা দত্ত। একাদশ শ্রেণীর শশাঙ্কশেখর মজুমদারের, সপ্তম শ্রেণীর দেবাশিস দাশের ও অষ্টম শ্রেণীর সুগত দত্তের আঁকা ছবিগুলি বিশেষভাবে প্রশংসা করার মত।

ছন্দক (দেওয়ালী সংখ্যা)—সম্পাদক : রবি-রতন ভৌমিক। বিবেকানন্দ নগর, পুরুলিয়া, পশ্চিমবঙ্গ। পঞ্চাশ পয়সা।

কলকাতার বাইরে থেকে প্রকাশিত সাময়িক পত্রিকাগুলির মধ্যে ছন্দক বিশেষভাবে উল্লেখিত হবার মতো বিশেষ করে দুটি কারণে—ছিমছাম পরিচ্ছন্ন মুদ্রণে আর সুনির্বাচিত বিবিধ রসের রচনার বিদগ্ধতায়। আলোচ্য সংখ্যায় লিখেছেন : কালিদাস রায়, পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায়, রাজলক্ষ্মী দেবী, বাণী রায়, প্রমুখেরা। এ সংখ্যার বিশেষ আকর্ষণ : পুরুলিয়াতে তারাশঙ্করের শেষ ভাষণ ও বিভিন্ন ভাষা থেকে অনূদিত কবিতাগুলি।

আবেক্ষণ (সাহিত্য ত্রৈমাসিক)—সম্পাদক : রাধু গোস্বামী। ২৭২ বঙ্কিম পল্লী, সোদপুর, ২৪ পরগণা (উত্তর)। পঞ্চাশ পয়সা।

শহরতলি থেকে প্রকাশিত সাহিত্য পত্রিকাটির সর্ব অবয়বের পরিচ্ছন্নতা পাঠক-দৃষ্টি আকর্ষণ করে। গল্প-কবিতা-প্রবন্ধ রয়েছে অনেকগুলো। যথেষ্ট চিন্তার খোরাক আছে প্রবন্ধগুলিতে। বিশেষ উল্লেখ্য রচনা : রবীন্দ্রনাথ সামন্তের 'সমুদ্র ও রবীন্দ্রকাব্য'। অপূর্ব মুখোপাধ্যায়ের 'শেষ সংখ্যা' গল্পটিও ভালো জাতের।

বাজ পাখি (চতুর্থ সংকলন '৭১)—সম্পাদনা : নীহার বন্দ্যোপাধ্যায়, শচীন বিশ্বাস। কাঁঠালপোতা, কৃষ্ণনগর, নদীয়া। এক ১৷ টাকা।

গাল-গল্প আর রম্যকথা যাঁরা ভালোবাসেন এ সংকলন তাঁদের জন্যে নয়। কলকাতার বাইরে থেকে সাহিত্য ও সমাজ-ভাবনায় প্রোজ্জ্বল এ ধরনের সাহিত্য পত্রিকা প্রকাশ সত্যিই প্রশংসনীয়। বিভিন্ন ধাঁচের সিরিয়স প্রবন্ধগুলি সুলিখিত — লেখন-ভঙ্গি চিত্তাকর্ষী। সবশেষে ছাপা দেবদাস আচার্যের 'অ-নাগরিক চিন্তাভাবনা' সিরিজ পাঠকদের সবচেয়ে বেশি ভাবাবে। অন্যান্য উল্লেখ্য লেখা হল : দীপক বিশ্বাসের 'গ্রামীণ সংস্কৃতি ও তার অর্থনৈতিক বিশ্লেষণ : একটি সমীক্ষা', সমর বিশ্বাসের 'গ্রাম-বাংলার পালাগান', নির্মাল্যভূষণ ভট্টাচার্যের 'অথ উত্তমর্ণ অধমর্ণ কথা', স্নেহাশিস শুকুলের 'বড় গঙ্গার লাল জল'।

সবুজ কলি (দীপাবলী সংখ্যা '৭৮)—কুমার হোম রায়। ১৩৮ বিধান সরণী, কলকাতা : ৪।

পশ্চিমবঙ্গের শিশু ও কিশোর সমাজের মুখপত্র পাক্ষিক 'সবুজ কলি'-র দীপাবলী সংখ্যায় ছোটদের উপযোগী গল্প-শিকার-কাহিনী-কবিতা-ছড়া-জীবনী ইত্যাদি ছাপা হয়েছে। বিশেষ উল্লেখ্য রচনা হল ভৈরব-প্রসাদ হালদারের ঐতিহাসিক গল্প : 'আজ নগরের লড়াই' ও অর্ধেন্দুশেখর সেনগুপ্তের কিশোরদের 'প্রথম বন্ধু' 'গল্পের যাদুকর গল্পদাদা'র জীবনী।

মণির খনি (দীপান্বিতা সংখ্যা '৭৮)—সম্পাদনা : বেনুগোপাল মোদক। বিদ্যার্থী মণিমেলা, পোড়ামাতলা, নবদ্বীপ, নদীয়া। পঞ্চাশ পয়সা।

শিশু কিশোরদের মুখপত্রটির আলোচ্য সংখ্যায় ছোটদের জন্যে লিখেছেন ছোট এবং বয়স্করাও। নানান ধরনের রচনা ছোটদের অবশ্যই খুশী করবে।

কাকলি—(ছোটদের ত্রৈমাসিক)— সম্পাদক : পারুল দাশ। অভয়নগর, আগরতলা, ত্রিপুরা। এক টাকা।

পরিচ্ছন্ন ঝকঝকে দু'রঙে ছাপা 'কাকলি' ছোটদের মন হরণ করে নেবে। বাইরের জলুস শুধু নয়—ভেতরটা গল্প, কবিতা এবং রকমারী নানান মজার কাহিনীতে ভরা। ছোটদের জন্যে কলম ধরেছেন বড়রাই—এঁদের বিশেষভাবে নাম করতে হয় : শান্তশীল দাস, পতিতপাবন বন্দ্যোপাধ্যায়, স্বপনবুড়ো, ক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য প্রমুখেরা যাঁরা ছোটদের জন্যে লিখেই নাম করেছেন। ছোটদের লেখাও কিছু আছে।

চলমান—সম্পাদনা : নিত্যানন্দ মজুমদার। দুর্গাপুর, বর্ধমান।

রিসার্চ অ্যান্ড কন্ট্রোল ল্যাবরেটরী রিক্রিয়েশন ক্লাবের মুখপত্র—'চলমান' শারদ-সংকলনটি দুর্গাপুর শিল্পনগরীর চলমান জীবনের প্রতিবিম্ব। তরুণ মনের ভাবনায় ভাস্বর। নানান বিষয় নিয়ে লিখেছেন ক্লাবের সদস্যরা। কবিতা, গল্প, রম্যরচনা, অনুবাদ, নাটক, রস-রচনা, প্রবন্ধ ইত্যাদিতে চলমান ভরা। বিশেষভাবে উল্লেখ্য হল : প্রতিম সরকারের বিতর্কমূলক প্রবন্ধ : 'সাহিত্যে সংকট ও বাস্তবতা'।

প্রান্ত—সম্পাদক : নির্মলেন্দু ভট্টাচার্য। ২৩, জানমহম্মদ ঘাট রোড, মহাকালী-তলা, নৈহাটি। পঞ্চাশ পয়সা।

চতুর্থ বর্ষের তৃতীয় সংখ্যাটি শারদ-সংকলন হিসেবে প্রকাশিত হয়েছে স্থানীয় সাহিত্য-প্রয়াসীদের নানান ধরনের লেখা নিয়ে। কিছু নামী লেখকের লেখাও আছে। এর মধ্যে আছেন প্রেমেন্দ্র মিত্র, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, দিব্যেন্দু পালিত, শুদ্ধসত্ত্ব বসু। গল্পগুলি সুখপাঠ্য। স্থানীয় কিছু সুখ্যাত, কিছু প্রতিশ্রুতিবান সঙ্গীত-শিল্পী ও মঞ্চশিল্পীদের পরিচিতি দান প্রশংসনীয়।

সাহিত্যসেতু—সম্পাদক : শুভেন্দু সেন-গুপ্ত। বাঁশবেড়িয়া, হুগলী। দু'টাকা।

মফস্বল থেকে প্রকাশিত সাময়িক-পত্রিকাগুলির মধ্যে একটা বিশিষ্ট স্থান ইতিমধ্যেই অধিকার করে নিয়েছে সাহিত্য-সেতু রচনা-বৈশিষ্ট্যে এবং প্রগতিবাদিতার জন্যে। শারদ সংখ্যাটি বিশেষ সংখ্যা হিসেবে প্রকাশিত হয়েছে। লিখেছেন তরুণ প্রতিশ্রুতিবান কথাকাররা—নির্মলেন্দু গৌতম, নিখিল বসু, শংকর দাশগুপ্ত, বৈদ্যনাথ মুখোপাধ্যায়, সমীরকুমার মুখোপাধ্যায়, মায়া বসু, কমল সাহা। তরুণ লেখকদের পরিচিতি ভালো লাগলো।

চতুষ্কোণ (একাদশ বর্ষ। ষষ্ঠ সংখ্যা। ১৩৭৮) — সম্পাদকমণ্ডলী সম্পাদিত। ৭৭।১ মহাত্মা গান্ধী রোড, কলকাতা-৯। দাম দু টাকা।

প্রগতিশীল পত্র-পত্রিকার মধ্যে চতুষ্কোণ স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যের দাবী রাখে। দীর্ঘদিন যাবৎ সংস্কৃতি চিন্তায় চতুষ্কোণ অগ্রণী ভূমিকা নিয়েছে। পত্রিকাটির প্রবন্ধ নির্বাচন বিশেষ উল্লেখযোগ্য। বর্তমান বিশেষ সংখ্যায় প্রবন্ধ লিখেছেন বিজনবিহারী ভট্টাচার্য, প্রবোধচন্দ্র সেন, নীহাররঞ্জন রায়, নন্দগোপাল সেনগুপ্ত, গোপিকানাথ রায়-চৌধুরী, অশোককুমার ভট্টাচার্য, রবীন্দ্রনাথ গুপ্ত, দ্বিজেন্দ্রলাল নাথ, পশুপতি শাসমল, রঞ্জিৎকুমার সেন এবং নগেন দত্ত। নন্দ-গোপাল সেনগুপ্তের 'হিন্দুধর্ম : ইতিহাসে ও আচার অনুষ্ঠানে' এবং নগেন দত্তের 'রামায়ণ পাঁচালী সাহিত্যে সমাজবোধ' প্রবন্ধ দুটি নতুন চিন্তাসূত্রের সন্ধান দেয়। গল্প লিখেছেন চিত্ত ঘোষাল, দেবদত্ত রায়, সাধন চট্টোপাধ্যায় এবং মিহির আচার্য, মণীন্দ্র রায়, শুদ্ধসত্ত্ব বসু, সুশীল রায়, কৃষ্ণ ধর, শ্যামসুন্দর দে, গৌরাঙ্গ ভৌমিক, আশিস সান্যাল, জিয়াদ আলি, সুনীথ মজুমদার, কবিরুল ইসলাম, দুর্গাদাস সরকার, আশিস সেনগুপ্ত, জিতেষ আচার্য, তুষার চট্টোপাধ্যায়, সনৎ বন্দ্যো-পাধ্যায়, অমিতাভ চট্টোপাধ্যায় এবং আরো কয়েকজন কবিতা লিখেছেন।

নান্দী (শারদীয়া)—সম্পাদক : দীপক দে। ৭৪।২বি রাজকুমার মুখার্জি রোড, কলকাতা—৩৫। দাম : ২০ পয়সা।

মূলত তরুণেরাই এ সংখ্যার লেখক। নানারকম লেখায় সমৃদ্ধ। গল্প, কবিতা থেকে সিনেমা সংবাদ কিছুই বাদ যায় নি।

তরুণের অভিযান—সম্পাদক: সুনির্মল চট্টোপাধ্যায়, নারায়ণ দেবনাথ। ১৭ জাস্টিস দ্বারকানাথ রোড, কলকাতা-২০। দু' টাকা।

ত্রৈমাসিক সাহিত্য পত্রিকাটি যুবমনের দর্পণ—সৃষ্টিধর্মী মানসের এক আশ্চর্য নিদর্শন। পরিচ্ছন্নতা এর সর্বাঙ্গে—চটকের সঙ্গে আছে চমকও তাই পাঠকমনকে সহজেই আকৃষ্ট করে। তরুণ লেখক লেখিকাদের গল্প আর কবিতায় ভরা।

দৈনিক কবিতা (মে-সেপ্টেম্বর '৭১)—সম্পাদনা : শক্তি চট্টোপাধ্যায়। ১৬বি গোবিন্দ ঘোষাল লেন, কলকাতা : ২৫। দেড় টাকা।

শুরু জন্মলগ্নে 'দৈনিক' হিসেবে কিন্তু অধুনা ত্রৈমাসিক। কবি, কবিতা এবং কাব্যভাবনার ওপর বিদগ্ধ রচনা এর উপ-জীব্য। কবিতা আছে বিস্তর, কিছু নামী আর কিছু স্বল্পনামী প্রতিশ্রুতিবান কবি-দেরও রবীন্দ্রনাথের ওপর তিনটি আলোচনা যথাক্রমে আবদুল মান্নান সৈয়দের 'রবীন্দ্র-নাথের কণ্টাভাস', উজ্জ্বলকুমার মজুমদারের 'রবীন্দ্রনাটকে গদ্য পদ্য গান' ও দেবতোষ বসুর 'বিশ্বের কবি : কবির বিশ্ব'—বিশেষ মূল্যবান।

শিলীন্দ্র—সম্পাদনা : অমল মুখোপাধ্যায়, কণাদ গঙ্গোপাধ্যায়, কমল মুখো-পাধ্যায়। ১০-এ, বাঘা যতীন রোড, কলকাতা-৩৬। এক টাকা।

ত্রৈমাসিক সাহিত্য পত্রিকাটির শারদ-সংকলনটি পরীক্ষা-নিরীক্ষামূলক গল্প ঠাসা। লিখেছেন বলরাম বসাক, বাণীব্রত চক্রবর্তী, তমোনাশ দাস, শংকর দাশগুপ্ত, দিব্যেন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়, সুনীল দাশ, অপূর্ব মুখোপাধ্যায় প্রমুখ তরুণ কথাকাররা।

প্রাপ্তি স্বীকার

নীরা—সম্পাদক : দীপক দত্ত, মানবেন্দ্র চক্র-বর্তী। ১।২৫, যতীন দাস নগর, বেল-ঘরিয়া, কলকাতা : ৫৬। তিরিশ পয়সা।

সোনাঝুড়ি (পাক্ষিক)—সম্পাদক : ফণিভূষণ জানা। সোনাকাড়ি, বলরামহাট, মেদিনী-পুর। পাঁচ পয়সা।

কথা (দ্বিমাসিক সাহিত্য পত্র)—সম্পাদনা : বিপ্লব সরকার, পরিমল ভৌমিক। জিরানীয়া, বীরেন্দ্রনগর, ত্রিপুরা। পঞ্চাশ পয়সা।

সংলাপে—অগ্নিযুগ-স্রষ্টা যতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

(শ্রীমদ্ স্বামী নিরালম্ব)

ত্রিভঙ্গ রায়

এক

বর্ধমান জেলায় বনপাস গ্রামে মস্ত বড় দোকান। সোনা-রুপোর ওপর নকসা, পাথর আঁটা, ছেলাই, আংটি এনগ্রেভের কাজ। মস্ত বড় বৈঠক—পাড়াগাঁয়ের দোকানে সারেরী, আধাসায়েরী, নবীশ—সব মিলে সতেরো-আঠারোজন সাকরেদ কারিগর। সবাই বলে—ঝন্টুর দল।

দোকানদার অগ্রজ সত্যদুলাল রায়—নিখুঁত শিল্পী। নামডাক খুব—ঢাকাই নকসাও হার মানে তাঁর কাছে। আঁটা ছেলাই-এর তো কথাই নাই, মণিকাঞ্চনে তেমন সুসংযোগ এ-তল্লাটে কেউ পারে না। আশপাশ চারি-চতুর্দিকের দূর দূর গ্রাম, দূর দূর শহর থেকে আসে কাজের ফরমাশ। দিনরাত কাজ হয়। সকাল থেকে সন্ধ্যে, সন্ধ্যে থেকে রাত ২টা পর্যন্ত কাজ করে ঝন্টুর দল। শুধু নাওয়া-খাওয়ার জন্যে দুপুরে আর কুস্তি-কসরতের জন্যে বিকেলে ছুটি পায় ঘণ্টাখানেক করে। আর পায় মাসে দু'-একদিন পুরো ছুটি।

ঐ দুদিন সকালবেলা শাকসব্জী আনাজপাতি, ফলের বোঝা ঘাড়ে, ঘি-এর টিন, দই-এর হাঁড়ি, মণ্ডামিঠাই-এর ঝুড়ি হাতে ঝন্টুর দল কোথায় যায় ওস্তাদের সঙ্গে। ওস্তাদের বন্ধুবর্গ—গদাই রায়, গদাই দাস, গোপী মিস্ত্রী, গোপাল খাঁ, সত্য দাস, শংকর দাস, ননী সাহা, ভোলা খাঁ, হরেরাম, অহীভূষণ, জ্ঞান দাস—যিনি যখন দেশে থাকেন ঝন্টুর দলের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে ওস্তাদের দল ভারী করেন।

সন্ধ্যে হয়। সন্ধ্যে উৎরে রাত। হাসি-হল্লার তুফান তুলে হৈ-হুল্লোড়ে সবান্ধব ওস্তাদের সঙ্গে ফেরে ঝন্টুর দল।

সকালবেলা দোকানে পড়তে গিয়ে শুনি কত রকমের কত গল্প—কী মজা, কী ফুর্তি, কী আনন্দ। নদীতে ঝাঁপাই ঝুড়ে নাওয়া, পেটভরে মাংস-পোলাও-কালিয়া-কাবাব, দই-সন্দেশ খাওয়া, হেউ হেউ ঢেকুর তুলে খাঁ খাঁ রোদ্দুরে নদীর বাঁকে গাছের ছায়ায় মখমলি ঘাসের ওপর শোয়া—সে যে কী আরাম আহা—হা।

চোখ ডাগর করে শুনি। সবাই খেপায় —জানিস কোথায় যাই? চাম্না আশ্রমে। খড়ি নদীর দ'এর মত বাঁকে আম কাঁঠাল, শিউলী শিমুলের শীতল ছায়ায় সুন্দর আশ্রম। আর সেই আশ্রমের স্বামীজি—যেমন রূপ তেমনি গুণ যেমন শক্তি তেমনি জ্ঞান। ইয়া লম্বা চওড়া দশাসই চেহারা, সিঁদুরে মাজা সোনার মত টক-টকে রঙ, চওড়া ছাতি, চওড়া কপাল, বড় বড় চোখ, হাসি-জড়ানো রাঙা ঠোঁট—সে যে কী সুন্দর, দেব-দেবতাও হার মানেন। কথা কী—যেমন মিষ্টি তেমনি জ্ঞানের। শুনতিস্ তো উদ্ধার হয়ে যেতিস্। কেমন মজা—তোকে তো আর নিয়ে যায়নি। যাবেও না কোনদিন—বসে বসে মাটি দিয়ে ঠাকুর গড়গে যা।

সহজে চটি না—ছল ছল চোখে মুখ নামিয়ে বসে থাকি। মানসপটে ফুটে ওঠে এক অপরূপ ছবি—স্বচ্ছসলিলা তমসার তীরে দূর্বাশ্যামল অবারিত মাঠ, তারই মাঝে বট, অশ্বত্থ, তাল, তমাল, শাল, পিয়াল, আমলকি হরিতকী ইহুদী—তপোবন তরুর স্নিগ্ধ ছায়াতলে শান্ত আশ্রম। আশ্রমে তপস্বীশ্রেষ্ঠ বাল্মীকী।

আহা, যদি যেতে পেতুম। সবার অলক্ষ্যে দু' ফোঁটা চোখের জল পড়ে মাটিতে।

না চটলে কি হবে—ঝন্টুর দল চটাবেই। তাই একদিন চটেমটে বলি—নাই বা নিয়ে গেলে তোমরা, স্বামীজি নিজে এসে নিয়ে যাবেন আমাকে।

তখন বছর-দশেক বয়স।

বন্ধুবান্ধবসমেত ওস্তাদ আর সাকরেদ ঝন্টুর দলের নাম গাঁয়ে গাঁয়ে, পাড়ায় পাড়ায়, মাঠে ঘাটে। গ্রামবধূরা বলেন—মা গো, ঐ যে ঝন্টুর দল—ওদের ছায়া মাড়ালে নাইতে হয়। না আছে জাতজম্ম, না আছে ধম্মাধম্ম জ্ঞানগম্যি। এঁটোকাটা বাছে না, খেয়ে আঁচায় না, হেগে শৌচায় না। অমন যে জলজ্যান্ত মড়াগঙ্গের পুণ্যে আসে তা একটা ডুবও দেয় না। ওদের ছুঁলে ডুব দিতে হয়। আচার-বিচার কি কিছু আছে গো? হাঁস-মুরগী, ভেড়া-ছাগল, গরু-শুয়োর—যা পায় তাই খায়। জাতজম্ম মানে না—মুচি-মুসলমানের সঙ্গে খায়। ইস্রোত ইস্রোত—কী ইস্রোত মা গো! আবার বুকের পাটা কী—আস্পদ্দা কত। এখনো চাঁদ সুয্যি উঠছে, দিনরাত হচ্ছে, আর বলে কিনা—ঠাকুর-দেবতা কিছু নাই, ভগবান-টগবান চুলোর ছাই—যত সব গাঁজা-খুরি। মা গো। গায়ে কাঁটা দেয়। এ অধম্ম সইবে না, সইবে না—উচ্ছন্নে যাবে। নিজেরাও যাবে আর গাঁটাকেও উচ্ছন্নে দেবে। যত সব স্বয়েং জজার দল হয়েছে চাম্না যেয়ে। ঐ যে চাম্নার কালী বাঁড়ুজ্জের বেটা যতীন বাঁড়ুজ্জের ছিল বরোদার রাজার বাঁটি গাট (বডি গার্ড)। কত যুদ্ধ করেছে, কত মানুষ মেরেছে আর আজ হয়েছে পৈতেপুড়ী বেহ্মচারী। গেরুয়াধারী সন্ন্যাসী হয়ে আসর জাঁকিয়ে বসেছে আশ্রম খুলে। যত সব হোমড়া-চোমড়া ছেলে-ছোকরাগুলোর মাথা খাচ্ছে স্বয়েংজজার দলে টেনে।

খেতুর মাসী নিরক্ষরা স্বাস্থ্যবতী সুন্দরী যোগমায়া দাসী দু' হাতের পাতা দু'দিকে মেলে বাহু নাড়া দিয়ে বলে—আবার নাম নেবার ছিরি কি দিদি? সন্ন্যাসী হলে যাগযজ্ঞি হোম করে নিজের ছেরাদ্দ নিজে করে পুরোনো নাম ছেড়ে নতুন নাম নিতে হয় জানি। তা নাম নেবার বাহার কি?—'নিরেলম্বই সোয়ামী'। ছেলে-ছোকরা আগড়া জোয়ানদের মাথা খাবার যম—একাই একশ'। তোর আবার 'নিরেলম্বই' নাম নেয়া কেনে এক কম করে? ঐ যে কথায় বলে না—উনো হাতীর দুনো বল? তাই বুঝি এক উনো করে নাম নিয়েছে—নিরেলম্বই। মরণ আর কি!

পাকা চুলে সিঁদুর-পরা পাকা আমের রঙের বুড়ী মুখ্তিরে নোলক-ভাঙা নথ নেড়ে বলেন—আর কি বাড় বেড়েছে গো ঐ ঝণ্টুর দল। বিত্তেব কি? বলে কি না—শালগ্রাম তো খেলাবার ভাটা. কি করতে পারে ওটা? এই দিচ্ছি ফেলে. দেখি কত শক্তি ধরে—কীই বা আমার করতে পারে? বলেই আকাচা কাপড়ে এঁটো হাতে সর্-সর্ করে ঠাকুরঘরে উঠে সিংহাসন থেকে শালগ্রাম নিয়ে দিলে উঠোনে ছুঁড়ে। মা গো কী তেজ. কি বিত্তেব! তা ফল পেতে হবে না? ভগবান দেখবে না ওদের?

রামায়ণ-মহাভারত-পুরাণ পড়া কোন বুড়ী বলেন—আবার বলে কিনা জানিস দিদি? বলে—ভগবান আবার কে? আমিই তো ভগবান। আমি যদি মনে করি হয় হয়. করী করি. আদি শক্তির মূলাধার আমি। তেজ দেখেছিস?

তু যদি ভগবান তা করতো দেখি—পূবের সূর্যিটা পশ্চিমে ওঠা তো দেখি। বলে—কত হাতী ঘোড়া হল তল কাড়ি বলে কত জল? ছুঁচো যায় সাগর মাপতে। কত মুনি-ঋষি সাধু-সন্নিসী যুগ যুগ তপিস্যা করে যার কণিকে ঠাওর করতে পারলে না—তু বলিস কি না—আমিই সেই ভগবানের জানিস কি? খালি তেজ, খালি দম্ভ! নিপাত যাবে—নিপাত যাবে, মুখ খসে যাবে।

আবার কেউ দোকান পানে তর্জনী তুলে গলা খাটো করে বলেন—যত নষ্টের গোড়া পালের গোদা ঐ দুলাল। এমন ভাকাবুকো ছেলে, যেমন বুদ্ধি তেমনি বল। কত জনের কত দায়দৈবে বুদ্ধি দিয়ে যুক্তি দিয়ে গতর দিয়ে কত উপকার করিস—আর তোর কিনা এই কাজ? পর নয়, বিরেনা নয়—আপন গর্ভধারিণী মা মলো, অশুচ গা. ঘরে দুধ নেয়ে আতেলা আহলাদ খেয়ে পেট ভরে না, তা করে কি—রোজ রাতে রথ ঘরের রোয়াকে তোলা উনুন জেবলে ঝণ্টুর দল নিয়ে ফিস্টি করে ডিম, মাংস, লুচি-পরোটা খায়। তোর আক্কেলটা কি? অমন যে মা—যা থেকে পিথিবী দেখলি, তার গতির কথাটা ভাবলি না? পেট পেট করেই গেলি? একটা মাস আর নোলা সামাই করতে পারলি না? অমন পেটে ছুরি মারি।

ভাগবত, গীতা, চণ্ডী-পড়া গম্ভীর প্রকৃতি মহারানি ভিক্টোরিয়ার মত রূপবতী প্রৌঢ়া কেষ্টপিয়া বলেন—আর মা? হতভাগী জীবনেই বা কি সুখটা পেলে? চোখের জল তো কোনদিন শুকোলো না। একটা নয়, দুটো নয়—দশ-দশটা ছেলে-মেয়ের মা, বয়েসও আড়াই কুড়ির ওপর. এত বড় সংসারে দুবেলা হাঁড়ি ঠেলে ঠেলে হাড় কালি হল। কত আর পারে? কেঁদে কেঁদে ছেলের হাতে ধরে বলে—হেঁই বাবা. একটি মা এনে দে বিয়ে করে। শিখিয়ে পড়িয়ে বুঝিয়ে-সুঝিয়ে সংসারের ভার দিয়ে যাই তার হাতে তুলে। তা ছেলে বলে—কিসের—মা-ই বা কে, বাবাই বা কে? কেউ কারুর নয়—সব মায়া। আবার নতুন করে মায়ার বাঁধনে পরি আর কি? বাঁধনের ওপর বাঁধন। বিয়ে-টিয়ে করব না—সন্নিসী হব। গাল টিপলে দুধ বেরোয়, সেদিনকার ছেলে—তার মুখে এই কথা! বলি—মায়ার তু জানিস কি? কী মায়া নয়? তোর কায়া মায়া, ছায়া মায়া, ক্ষিদে মায়া, তেষ্টা মায়া, বিদ্যে মায়া, বুদ্ধি মায়া, জ্ঞান মায়া, অজ্ঞান মায়া, জনম মায়া, জীবন মায়া, মরণ মায়া। মায়া ছাড়া কি আর কিছু আছে রে? সবই মায়া, মহামায়ার মহামায়া। তো মায়া এড়িয়ে যাবি কোথা? এই যে বেহ্ম বেহ্ম করিস, আমি বেহ্ম—আমি বেহ্ম মুখে বলিস—তা তোর এই বেহ্ম কি মায়া ছাড়া? 'এক আমি অনেক হব'—এই ইচ্ছেটাই তো আদ্যাশক্তি মহামায়া। তা ইচ্ছাময় আর ইচ্ছেটা কি আলাদা হল? ইচ্ছা থাকলে তবে তো ইচ্ছাময়। তা মায়া মায়াই কর, আর বেহ্ম বেহ্মই কর, মায়া আর বেহ্ম আলাদা নয়—ও একে একে দুই নয়, একে একে এক—এ-কথাটা যতদিন না জানবি ততদিন তোরা অজ্ঞানই থাকবি।

বার বার হাজারবার বলেও যখন বিয়েতে রাজী করাতে পারলে না, তখন কি বললে জানিস? বললে—সন্নিসী কখনো হতে পারবি না, আমি মলেই তোকে বিয়ে করতে হবে। মা গো—গায়ে কাঁটা দেয়, সতীলক্ষ্মীর কথা কি মিথ্যে হয়? মা-ও মলো আর বাসি হেরুদের পরের দিনই বহরবী ছেলেন্দ করে নেড়া মাথায় বিয়ে করে এল। সেই বিয়েই যদি করলি তো মাকে এত কাঁদালি কেন? মায়া—মায়া—মায়ার হাত এড়ানো কি এত সোজা রে? সে পারে শুধু মহাদেব, মায়ার পায়ে আপনাকে সঁপে দিয়ে তবে মায়াতীত হতে হয়। তেয়াগী হব—যার কিছু নাই, তার আবার তেয়াগ কিসের? যার বাঁধন নাই তার আবার মুক্তি কি? যত সব ছোট মুখে বড় কথা!

তখন বোলপুরে পড়ি। ছুটিতে ছুটিতে এসে শুনি সব। ব্যথা পাই—মনে পড়ে মায়ের মৃত্যু-অশৌচের কথা। আশ্রমে নিয়ে না গেলেও ঘুম থেকে তুলে জোর করে নিয়ে যাওয়া হত ফিস্টের আড্ডায়। অশুচ-টশুচ ওসব মেয়ে-পাঁচালী কুসংস্কার ছাড়তে হবে। মাংসের নামে ঘেন্না হত, বড় কান্না কাঁদতুম, জোর করে ডিম গেলানো হত। তারপর বমি করতে করতে বাড়ী ফিরে ঘুমিয়ে পড়তুম। সেই ডিম খাওয়ার হাতে খড়ি।

তা হোক, ঝণ্টুর দলকে কিন্তু না ছুঁয়ে উপায় ছিল না। ষণ্ডা-গণ্ডা শক্তিমান ছোকরা সব—গদাই রায়ের দোকানের লাগাও পাঁচীল ঘেরা মস্ত মাঠে ডন, বৈঠক, ডম্বল, মুগুর বারবেলে ব্যায়াম আর লাঠি খেলা ছিল এদের নিত্যনৈমিত্তিক কাজ। ছোটখাট নবীশরাও রেহাই পেত না এ থেকে—যাকে বলে, বাধ্যতামূলক। আর কাজ ছিল কোথাও আগুন লাগলে আপন আপন ঘরের বালতি নিয়ে ছুটে গিয়ে আগুন নেভানো, নির্বান্ধব কেউ মারা গেলে কোমরে গামছা বেঁধে শ্মশানসংগী হয়ে সৎকার করা, ওস্তাদের পল্লীমঙ্গল সমিতির জন্যে রোজ এক-এক মুঠো চাল জমাবার ছোট ছোট মাটির হাঁড়ি ঘরে ঘরে বিলি করা, কি রবিবারে চাল সংগ্রহ করা, দুস্থ দরিদ্র অনাথা বিধবাদের গোপনে গোপনে সেই চাল বিলি করা। এছাড়া ওদের সবচেয়ে আমোদের কাজ ছিল—কোথাও চুরি হলে একে একে দুয়ে দুয়ে গিয়ে নানা ফন্দি-ফিকির কৌশল করে চোর ধরে সটান ওস্তাদের কাছে হাজির করা। তারপর স্যাণ্ডো চেহারার ওস্তাদের কাজ শাস্তি দেওয়া। সে যে কী শাস্তি—গাঁয়ের চৌকীদার ভূষণ ডোম, নোয়া হাড়ী কখনো কল্পনাও করতে পারত না, সাহসও করত না। চোরের চোদ্দপুরুষেও সে শাস্তির কথা ভুলতে পারত না, চোরই শুধু জন্মের মত চুরি ভুলত।

মনে খটকা লাগে—বুড়ীদের কথা আর ঝণ্টুর দলের কাজ—দুটো দুমুখো। যত মন্দ তত ভাল—সমাজদ্রোহিতা, ধর্মদ্রোহিতা আবার জনকল্যাণ-পরায়ণতা। আলো-আঁধারে পাশাপাশি মেশামিশি। মনে পড়ে বাসন্তীতলায় গণেশ অপেরা পার্টির 'পঞ্চনদ' পালার বিবেকের গান—'আলো-আঁধারে অভেদ যেথায়, চল চল যাই সেখানে।' এ কী করে হয়? কার শিক্ষা? স্বামীজির? সংসার-ছাড়া গেরুয়া-পরা এ কেমন ধারা সন্ন্যাসী? কী তাঁর শিক্ষা? তাঁকে না দেখলে, তাঁর মুখের কথা না শুনলে তো বোঝা যাবে না কিছু। মন আকুলি বিকুলি করে স্বামীজিকে দেখবার জন্যে। কিন্তু উপায় নাই—শাস্তি দিয়ে চোরকে চুরি ভোলানো যেত, কিন্তু ঠাকুর গড়া ভোলানো যায়নি. বেড়ে গিয়েছিল—তবে এ-বাড়ী ও-বাড়ী পোড়ো বাড়ীতে, বাঁশঝোড়ের আড়ালে আনডালে লুকিয়ে লুকিয়ে। তা লুকোবার যো কি—ঝণ্টুর দলের সার্চলাইট চোখ এড়ানো কি সহজ কথা? যথাসময়ে ওস্তাদের কাছে ধরে যায়। তারপর সে কী মার, বাপ্‌স্‌, ঠাকুরগুলো তো ভাঙেই, পিঠখানাও আস্ত থাকে না। কাজেই মাটি খুঁড়ি, ঠাকুর গড়ি, মহাপৌত্তলিক আমাকে কিছুতেই নিয়ে যাওয়া হবে না জ্ঞানমার্গের মহাজ্ঞানী স্বামীজির কাছে। পথও চিনি না। বারকতক একা একা বেরিয়ে মোহনপুর পেরিয়ে গা ছমছমে দক্ষিণ শ্মশানের পাশ দিয়ে আমবাগানের কাছে গিয়ে থমকে দাঁড়িয়েছি। বাগান না বন—মস্ত বড় গাছে লতায় জড়াজড়ি বনের ভেতর অন্ধকারের খবরদারি। এটা ছিল ঠ্যাঙারেদের মস্ত বড় ঘাঁটি। তাই আশপাশ গাঁয়ের লোক সবাই বলে—

যদি যাবে চাম্না
ঘরে উঠবে কান্না

চাম্না আর যাওয়া হয় না, কান্না পায়। যাই যাই আর বনের ধারে বসি, মনের সাধ, মনের দুঃখু মনে চেপে ফিরে আসি।

ওস্তাদসহ ঝণ্টুর দল

বছর কতক পরে। বোলপুরে তখন থার্ড ক্লাসে পড়ি। ওস্তাদের সহপাঠী অন্তরঙ্গ বন্ধু পদ সাহার বাসাবাড়ীতে থাকি। হঠাৎ একদিন সারা বাড়ী ধোয়া-মোছা পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করবার তাড়া পড়ে যায়। চায়ার স্বামীজির অপূর্ব বিদুষী সহধর্মিণী সন্ন্যাসিনী চিন্ময়ী-মা এসেছেন উকীলপটির জমিদার সুরেন্দ্র-বাবুর বাড়ীতে। তিনিই চরণধূলি দেবেন এখানে। বিকেলে সুরেন্দ্রবাবুর গাড়ী থেকে নেমে এসে চেয়ারে বসলেন চিন্ময়ী-মা।

কী যে দেখলুম! অতসীকুসুমবর্ণা দুর্গা প্রতিমার মত বিশ্বমাতৃকা মূর্তি। তাম্বুলপত্রাকৃতি মুখ। সুদীর্ঘ কেশভার শিরশীর্ষে চূড়াকারে বাঁধা, তার ওপর দিয়ে উজ্জ্বল গৈরিক বসনাঞ্চল মনে করিয়ে দেয় মহাতপস্বিনী অপর্ণার কথা। মুখমণ্ডলে ধীর প্রশান্তি, আয়তোজ্জ্বল দুটি চোখে স্নেহমমতা বিগলিত করুণাধারা, স্মিত অধরে মৃদু-মধুর অমৃতবর্ষী স্বল্প কথা, সর্বাঙ্গে প্রজ্ঞাজ্যোতি বিচ্ছুরিত।

শ্রদ্ধায় সম্ভ্রমে আভূমি প্রণাম করে চরণধূলি মাথায় নিয়ে নির্বাক বিস্ময়ে পাথা হাতে দাঁড়ালুম পাশে।

দিনের শেষ আলোটুকুর সঙ্গে সঙ্গে সারা বাড়ী অন্ধকার করে গাড়ীতে উঠে চলে গেলেন চিন্ময়ী-মা। যাবার সময় পদ-ধূলি নিতে সস্নেহে মাথায় হাত দিয়ে চিবুক স্পর্শ করে বললেন—বড় ছুটিতে আশ্রমে যাস্।

হঠাৎ হাজার আলোর রোশনি থেকে মনের গহনে নেমে আসে তিমির অন্ধকার। ইনি যাঁর সহধর্মিণী, না জানি সেই স্বামীজি কেমন! দুর্ভাগ্য যে এখনও এঁদের পুণ্যদর্শন লাভ হয়নি। স্বামীজিকে দেখবার জন্যে একটা তীব্র আকাঙ্ক্ষা জাগে মনে।

দুই

আরও তিন বছর পরের কথা। ১৯২৭ সালের মার্চ মাস। বোলপুর উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয় থেকে সিউড়ীতে প্রবেশিকা পরীক্ষা দিয়ে এসেছি বাড়ীতে। ফল বের হবে তিন মাস পরে। লম্বা ছুটি—পড়া-শুনোর তাড়া নেই। খেলাধুলো, ঠাকুর-গড়া, খুশিমত গল্পের বই পড়া আর ঘুরে বেড়ানো ছাড়া কাজ কি?

বৈশাখ মাস। স্বামীজি-ভক্ত ননী সাহার বড় মেয়ের বিয়ে। বাড়ীতে প্রথম শুভ কাজ। চায়া থেকে স্বামীজিকে নিয়ে এলেন সাহামশায়। ঝেড়েমুছে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন-করা ওস্তাদের দোকানে হল স্বামীজীর থাকবার জায়গা।

নাওয়া-খাওয়া বিশ্রামের পর আঙিনায় ইজিচেয়ারে বসেছেন স্বামীজি। কত লোকের ভিড়। ভিড়ের মধ্যে মিশে গিয়ে এক সময়ে প্রণাম করে দাঁড়ালুম পাশে।

ঝণ্টুর দল মিথ্যে বলেনি। দু' চোখ ভরে দেখলুম সারনাথের বুদ্ধমূর্তির বাস্তব রূপ। একটা আকর্ষণ। সবচেয়ে ভালবাসি বুদ্ধমূর্তি, সবচেয়ে শ্রদ্ধা করি মহামানব বুদ্ধকে। নিজের অজান্তে সব-টুকু নিঃশেষে উজাড় হয়ে [illegible] জীবন্ত বুদ্ধের চরণতলে—কিসের টানে কে জানে, এ যেন—শিশু যেমন মাকে নামের নেশায় ডাকে-র মত। নাওয়া-খাওয়ার সময়টুকু ছাড়া প্রায় সব সময়েই থাকি স্বামীজীর কাছে। কত লোকের সঙ্গে কত ভাল কথা, কত সৎ আলোচনা শুনি সারাদিন ধরে, রাত পর্যন্ত। কত লোকের কত জটিল সমস্যার সমাধান হয়ে যায় কত সহজে।

বিবাহ-উৎসব শেষ হয়। দুদিন পরেই স্বামীজি ফিরবেন আশ্রমে। কিন্তু ফেরা আর হল না। অসুস্থ হয়ে পড়লেন স্বামীজি, দু' পাঁজরে ভীষণ ব্যথা—পার্শ্ববেদনা, উঠতে-বসতে চলতে-ফিরতে পারেন না, নিঃশ্বাস নিতেও কষ্ট হয়।

শুকনো মুখে ভক্তদলের ছুটোছুটি। সবচেয়ে বড় ডাক্তার এসে ওষুধ আর মালিশের ব্যবস্থা দেন।

মনটা কেমন যেন হয়ে যায়। সব সময় বসে থাকি স্বামিজীর কাছে। ঘড়ি ধরে ওষুধ দেওয়া, মালিশ করা, সময়মত গরম জলে নাওয়ানো, আর খাওয়ানো ছিল কাজ। পাঁচ দিনে স্বামীজি বেশ সুস্থ হয়ে উঠলেন।

দলের সবচেয়ে বয়োজ্যেষ্ঠ, জ্ঞানলুব্ধ, মিষ্টভাষী গদাই রায়ের কাছে পরিচয় পেয়ে স্বামীজি বললেন—তুমি দুলালের ভাই? কাজকর্মে তো বেশ নিখুঁত ছিমছাম কেতাদুরস্ত। চটপটেও বেশ, তা—শরীরটি এমন কেন—রোগা ডিগ্‌ডিগে? ব্যায়াম কর না?

আশ্রমের মতই আখড়ার দরজাও বন্ধ ছিল আমার কাছে।

এবার আশ্রমে ফেরবার পালা। ভক্তরা কেউ চান না—বড় আনন্দে দিন কাটছে তাঁদের। তবু যেতেই হবে। যাবার দিন ঠিক হল।

মন খুঁত খুঁত করে—স্বামীজির দর্শন পেলুম, কথাও শুনলুম কিছু, কিন্তু আশ্রম তো দেখা হল না।

যাবার আগের দিন সন্ধ্যেবেলা স্বামীজি বললেন ওস্তাদকে—খোকার তো এখন লম্বা ছুটি, ও যাবে আমার সঙ্গে আশ্রমে। শরীরটা ওর বড় রোগা। আশ্রমে কিছুদিন থাকলে চেঞ্জের কাজ হবে, শরীর ভাল হয়ে যাবে। খালি পড়াশুনোয় কি হবে? শরীর ভাল রাখা চাই।

গুরু বাক্য কি লঙ্ঘন করা যায়?

মনটা আনন্দে উল্লসে উঠল। বললুম ঝণ্টুর দলকে—কেমন হল তো? যা বলেছি তাই। এ আর সকালে গিয়ে সন্ধ্যায় ফেরা নয়, সারা ছুটিটা কাটাবো আশ্রমে। কেমন? স্যাকরার ঠুকঠাক আর কামারের এক ঘা, তোমাদের যত বারের যাওয়া সব শোধ হবে আমার একবারে।

পরদিন সকালে ভাল বিছানাপাতা গরুর গাড়ী এসে দাঁড়াল দোকানবাড়ীর দরজায়। ব্যথা-কাতর মুখে ভক্তরা পদধূলি নিয়ে প্রত্যেকেই কিছু না কিছু উপচার নিবেদন করলেন স্বামীজিকে। গাড়ী প্রায় বোঝাই হয়ে এল। স্বামীজি বসলেন গাড়ীতে। উঠে বসলুম তাঁর পাশে।

এ ওর মুখ পানে চেয়ে মুখ নামালো ঝণ্টুর দল।

মোহনপুর, দক্ষিণ শ্মশান ঠ্যাঙারে আমবাগান পেরিয়ে ঘণ্টা দুই পরে নতুন গাঁয়ের পশ্চিম সীমান্তে গাড়ী পৌঁছতেই কানে এল মন-মাতানো প্রাণ-গলানো মধুর কীর্তন গান—নাথ নাথ বিহি তোহে অনাদি পুন তোহে সমায়ত, নাহি তব আদি অবসানা'।

গাড়ী থেকে মুখ বাড়িয়ে দেখি বকুল, পারুল, টগর, কাঞ্চন, কুন্দ, করবী, চাঁপা, চামেলী গাছে ঘেরা মস্ত বড় আঙিনার উত্তর প্রান্তে একটি কুটীর। কুটীরের

সামনে আঙিনার ঠিক মাঝখানে মালতী আর মাধবীলতা জড়াজড়ি হয়ে ছাতার আকারে পাতা ছড়িয়ে অজস্র ফুলের সমারোহে দাঁড়িয়ে। তার নিচে মাটির উঁচু তুলসী মঞ্চে ফুলের মালা জড়ানো তুলসী তলায় ফুলের মালা পরানো ফ্রেমে আঁটা রাধাকৃষ্ণের বৃন্দাবনী পট। গলায় তুলসীর কণ্ঠী, নাকে কপালে চন্দনের তিলক ফোঁটা আধা বয়সী এক বোষ্টম খোল বাজাচ্ছেন সামনে বসে, পাশে মন্দিরা বাজিয়ে কীর্তন গাইছেন কিন্নরকণ্ঠী বোষ্টমী। ফুলে ভরা ফুল গাছে ঘেরা ছোট্ট আখড়া, গোবর মাটি দিয়ে লেপা ঝকঝকে তকতকে আঙিনা, ফুল ছড়ানো মাধবীতলা, তার ওপরে সুললিত কীর্তন—মন ভরে গেল এক অপার্থিব মাধুরিমায়।

দুপাশে কুশ কাশ আর শরবন, মাঝে ঢালু রাস্তা। মুখ নামিয়ে গাড়ী চলেছে একেবারে নদীগর্ভে। ছোট নদী 'খড়ি' এঁকে বেঁকে কুলু কুলু বয়ে চলেছে। কী স্বচ্ছ নির্মল তার জল— নিচের সোনালী চিকচিকে বালিগুলি পর্যন্ত দেখা যায়। দু মিনিটে নদীর হাঁটুজল পার হয়ে গাড়ী উঠল ওপারে। তারপর এক দৌড়ে এসে দাঁড়াল আশ্রমের পশ্চিম প্রবেশ পথে পল্লবঘন ফলন্ত কাঁঠাল গাছের স্নিগ্ধ ছায়াতলে। স্বামীজি নামলেন গাড়ী থেকে। আশ্রম পরিচারক রেণুপদ গাড়ীর জিনিসপত্র বয়ে নিয়ে গেল আশ্রমে।

দক্ষিণের বারান্দায় আগে থেকেই বিছানা পাতা। মুখ হাত-পা ধুয়ে মুছে স্বামীজি বসলেন বিছানায়। পাশে ক'খানি দর্শন শাস্ত্র।

ন'টার সময় রেণুপদ জলখাবার দিল—ফল মিষ্টি গরম দুধ। জলযোগের পর গুড়গুড়ির নল মুখে দিয়ে স্বামীজি বসলেন বই খুলে। এই সুযোগে বেরিয়ে পড়লুম আশ্রমের চতুঃসীমাটা দেখতে।

গ্রীষ্মে স্বচ্ছসলিলা খড়ি স্বল্পতোয়া হলেও বেশ খরস্রোতা। গতিভঙ্গীও তেমনি লীলায়িত—অল্প জায়গার ব্যবধানেই মুখ ফিরিয়ে ফিরিয়ে চলেছে সর্পিল গতিতে। নতুন গাঁয়ের পশ্চিম সীমান্তে পূর্ববাহিনী খড়ি হঠাৎ মুখ ফিরিয়ে চলেছে পশ্চিম মুখে। একটু যেতে না যেতেই দক্ষিণবাহিনী। তারপর প্রায় সমকোণে একটা গভীর দহের সৃষ্টি করে মুখ ফিরিয়েছে পূর্ব দিকে। দক্ষিণ বাহিনী খড়ির পশ্চিম ও পূর্ববাহিনী খড়ির দক্ষিণ পাড়ে বট অশ্বত্থ আম জাম শিউলী শিমুল অর্জুন পলাশের স্নিগ্ধ ছায়া-শীতল প্রকাণ্ড জায়গায় আশ্রম।

পূর্ববাহিনী খড়ির দক্ষিণ পাড়ে চারিদিকে খোলা বারান্দাওলা দক্ষিণ-দুয়ারী দুখানি প্রশস্ত ঘর—মাটির দেয়াল, খড়ের চাল—স্বামীজির থাকবার মত আশ্রম। এর পশ্চিমে পাকদুয়ারী রান্না ও ভাঁড়ার ঘর। দক্ষিণ বাহিনী খড়ির পশ্চিম পাড়ে চারিদিকে খোলা বারান্দাওলা হলঘরের মত একখানি দক্ষিণ দুয়ারী বড় ঘর অতিথি অভ্যাগতদের জন্যে।

আশ্রমের দক্ষিণে প্রশস্ত আঙিনা, পূর্ব প্রান্তে ফুলে ভরা বেল চামেলী কুন্দ অতসীগাছে ঘেরা পঞ্চচূড় মন্দির—চিন্ময়ী মায়ের সমাধি। খিলানের ওপর প্রস্তর ফলকে লেখা—

মাতচিন্ময়ী,

শান্তি তুমি মূর্তিমতী ধরায় করিলে গতি
করুণার স্রোতস্বতী রূপে।
গৃহোদ্যানে কল্পলতা অপাদমৃতি পতিব্রতা
দীন দুঃখী অতিথির প্রপা।।
সোহমাস্মি তত্ত্বমসি শুনি চিন্তি দিবানিশি
ব্রহ্ম বিদ্যা স্মরি অবিরাম,
পতিসহ দেশে দেশে ভ্রমি উদাসিনী বেশে
সার্থক করিলে নিজ নাম।।

চকিতে মন 'হায়' 'হায়' করে উঠল। এই তো সেদিন বোলপুরে শুনেছুম মায়ের সস্নেহ ডাক, আর আসবার সৌভাগ্য হল যখন আশ্রম মাতৃহীন। অশ্রু বাধা মানল না—মন্দিরের ছায়ায় বসে পড়লুম ঘাসের ওপর।

সমাধি মন্দিরের পূর্বদিক বড় বড় গাছের ছায়ায় সুশীতল আর পশ্চিমে রাস্তা, আশ্রমের দক্ষিণ সীমান্তে মালতী মাধবী কুঞ্জে ঘেরা প্রধান প্রবেশ পথ পর্যন্ত। ঐ রাস্তাটিই কখনো আলপথ কখনো মেঠোপথ হয়ে বরাবর দক্ষিণে চলে গেছে চান্না গ্রাম পর্যন্ত। আশ্রমের ভেতরের রাস্তাটির পশ্চিমে বেশ বড় ফুল বাগিচায় ফুলে ভরা যাতী যুথী, বেল মালতী কুন্দ কাঞ্চন, শিউলী চামেলী, অতসী জবা, রঙ্গন চাঁপা, গন্ধরাজ, করকরবী ও টগর গাছ। প্রাকারহীন চারিদিক ফুলে ফলের গাছে ঘেরা। আশ্রমের পশ্চিম সীমান্তে অবারিত দূর্বাশ্যামল প্রকাণ্ড মাঠ। মাঠের শেষে আগুন-রঙা ফুলে ভরা শিমুল গাছের ছায়ায় সাঁওতাল পল্লী। তারই মাঝে আশ্রমের গোয়াল ঘর। গরুর সেবা-যত্ন করে মঙ্গলা মাঝি। দুবেলা গাই দুয়ে আশ্রমে দুধ আনে রেণুপদ।

বেলা প্রায় দুপুর। রেণুপদর ডাক শুনে ছুটে আসি সাঁওতাল পাড়া থেকে। তারপর নাওয়া খাওয়া ও বিশ্রামের পালা। রান্নাঘরের ভার শাটীনন্দী গ্রামের আত্মীয়হীনা বর্ষীয়সী বিধবা উষাদেবীর হাতে। কাছে বসে মায়ের মত যত্ন করে খাওয়ালেন তিনি। খাওয়ার পর বিশ্রাম। ছোট্ট নতুন অতিথির থাকবার জায়গা অতিথিশালার হল ঘরে।

বেলা তিনটে। বিশ্রামের পর স্বামীজি বসেছেন দক্ষিণের বারান্দায়। ইতিমধ্যেই গাঁয়ে রটে গেছে স্বামীজির আসার খবর। একে একে দুইয়ে দুইয়ে কজন যুবা প্রৌঢ় বৃদ্ধ এসে প্রণাম করে বসলেন স্বামীজির কাছে। কুশল প্রশ্নাদির বিনিময় হল। কিছুক্ষণ পরে সকলেই উঠলেন হাসিমুখে।

প্রায় সাড়ে পাঁচটা। স্বামীজি উঠে লম্বা লাঠিটি হাতে নিয়ে মাঠের পথে বের হতে হতে বললেন—যাও খোলামাঠে খোলা হাওয়ায় বেড়িয়ে এস। খুব খানিকটা বেড়াবে।

বেশ জোরে জোরে পা চালিয়ে স্বামীজি বেড়াতে লাগলেন সারা মাঠে—কখনো লম্বালম্বি কখনো আড়াআড়ি। চেষ্টা করলুম সঙ্গে বেড়াতে। সাধ্য কি? স্বামীজির চলন, আমার দৌড়। আশ্রম থেকে সাঁওতাল পাড়া একবার-পাড়ি দিতেই হাঁপিয়ে পড়লুম। কাজেই রণে ভঙ্গ দিয়ে সঙ্গ ছেড়ে একাই বেড়াতে চললুম সাঁওতাল পাড়া পেরিয়ে। মাঠের আড়ে দীঘে কতবার সমান তালে পায়চারি করলেন স্বামীজি। শেষবার সাঁওতালদের ঘরে ঘরে প্রত্যেকের খোঁজখবর নিয়ে গোয়ালে গাই বাছুরের তদ্বির করে ফিরলেন আশ্রমে।

পশ্চিম দিগন্তে সূর্যাস্তের রঙের সমারোহ তখন সাঁঝের আঁধার প্রলেপে মলিন হয়ে এসেছে। আশ্রমের দক্ষিণ আঙিনায় চাদরপাতা খাটিয়া। বেড়ানো শেষ করে স্বামীজি এসে বসলেন সেখানে। পাখা হাতে বসলুম পাশের চৌকিতে। একটু পরে কলকেয় অম্বুরী তামাক ধরিয়ে গুড়গুড়ির নলটি স্বামীজির হাতে দিয়ে গেল রেণুপদ। রেণুপদ অশিক্ষিত মেটে বাগদী, কিন্তু তার প্রতিটি কাজের নিখুঁত পারিচ্ছন্নতা, আচার-ব্যবহারের শহুবত, সৌজন্য ও বিনয় অনেক উচ্চশিক্ষিত ভদ্রসমাজেও দুর্লভ।

গুড়গুড়ির নল টানতে টানতে একসময়ে একটু হেসে জিজ্ঞেস করলেন স্বামীজি—কেমন লাগছে জায়গাটা?

বললুম—খুব ভাল, ঠিক যেন ব্রহ্মাবর্তের বাল্মীকি আশ্রম।

——দেখেছ নাকি ব্রহ্মাবর্ত?—হাসতে হাসতে জিজ্ঞাসা করলেন স্বামীজি।

বললুম—দেখি নি, রামায়ণে আশ্রম বর্ণনা পড়েছি, আর যাঁরা দেখেছেন তাঁদের কাছে শুনেছি। তফাৎ—সেখানে গঙ্গা তমসা সঙ্গম আর এখানে শুধু খড়ি। সেখানে গাছে গাছে ময়ূর, বনে বনে হরিণ, এখানে ও-দুটি নেই। থাকলে অবিশ্যি খুব ভালই হত, তবে না থাকলেও কম সুন্দর নয় জায়গাটি।

—বাড়ীর জন্যে মন কেমন করবে না? একলা থাকতে পারবে এখানে?—গম্ভীর হয়ে জিজ্ঞাসা করলেন স্বামীজি।

—না, মন কেমন করবে না, এই তো কাছেই বাড়ী। একলা কোথা? উষাপিসিমা, রেণুদা, আপনি, সাঁওতাল পাড়া ভর্তি ছেলেমেয়ে, লোকজন। বেশ থাকতে পারব এখানে—বললুম আস্তে আস্তে।

চুপচাপ স্বামীজি খানিকক্ষণ গুড়গুড়ি টানলেন। তারপর একমুখ ধোঁয়া ছেড়ে নল নামিয়ে রেখে বললেন—আচ্ছা, পরীক্ষা

দাগে কেমন? কোন্ বিষয়ে সব চেয়ে বেশি নম্বর থাকবে বলে মনে হচ্ছে?

বললুম—মোটামুটি সবই ভাল হয়েছে, তবে সবচেয়ে বেশি নম্বর থাকবে সংস্কৃতে।

—সংস্কৃতে? ইংরেজী, বাঙলায় নয় কেন?—মুখ পানে দৃষ্টি রেখে বললেন স্বামীজি।

—কেমন মিষ্টি ভাষা, যেন গানের সুরের ছন্দে বাঁধা, ভাল লাগে খুব। তাই মনেও থাকে বেশি—বললুম বেশ জোরের সঙ্গে।

—বাঃ, ঠিক বলেছ। মিষ্টি বলে মিষ্টি, একেবারে মধুর।

গন্ধং মধুরম্ সকলম্ মধুরম্,
চলনম্ মধুরম্ মলনম্ মধুরম্
মধুরাধিপতেঃ সকলম্ মধুরম্।।

তবে আর ভাবনা কি? বেশ সময় কেটে যাবে। আছে কিছু সংস্কৃত আর বাংলা বই আশ্রমের আলমারিতে। পড়তে পড়তেই সময় কেটে যাবে বেশ।

রাত প্রায় ন'টা, খাবারের ডাক পড়ল। খাওয়ার পর আঙিনায় কিছুক্ষণ পায়চারি করলেন স্বামীজি।

আঙিনায় খাটিয়ার ওপর বিছানা পেতে তাকিয়া বালিশ দিয়ে মশারি টাঙ্গানো হল স্বামীজির শোবার জায়গা।

অতিথিশালার পূর্বদিকে খাড়ামুখো বারান্দায় বিছানা পেতে শুয়ে পড়লুম মশারি টাঙ্গিয়ে।

(ক্রমশঃ)

প্রাচীন ভারতের শব-ব্যবচ্ছেদ

মাধবেন্দ্রনাথ পাল

ঊনবিংশ শতকে যেদিন কলিকাতা মেডিক্যাল কলেজে মধুসূদন গুপ্ত শব-ব্যবচ্ছেদ করতে উদ্যত হন, সেদিন কি ধুম! তোপধ্বনি সহকারে ক্ষণটিকে অভিনন্দিত ও স্মরণীয় করা হল। হয়ত ইংরাজ শাসকগোষ্ঠী সেদিন এই আনন্দে উল্লসিত হয়ে থাকবেন যে ভারতের মানুষের উপকারের জন্য ইউরোপ থেকে শব-ব্যবচ্ছেদ প্রথা এনে দিলেন। কিন্তু তাঁদের সেইরূপ ধারণার কোনই কারণ নেই। যদি তাঁরা একবার ডাঃ পুশম্যান রচিত 'হিষ্টি অব মেডিক্যাল এডুকেশন' গ্রন্থ পাঠ করতেন, তবে অবাক না হয়ে পারতেন না, যখন দেখতেন:

> 'Dissection of the human subject was in the first centuries of the middle ages, opposed by religious and political ordinances, and also by social prejudices".

মোট কথা, মধ্যযুগের প্রথম শতকে ইউরোপের ধর্মযাজক, রাষ্ট্রনীতিবিদ এবং সামাজিক বিধানদাতা সকলেই শব-ব্যবচ্ছেদের বিরোধিতা করতেন।

অথচ, প্রাচীন ভারতে নিয়ম ছিল, চিকিৎসক হতে হলে, শরীর সম্পর্কে হাতে-কলমে জ্ঞান অর্জন করা অবশ্য কর্তব্য। চরকের অভিমত স্মরণীয়: 'শরীরং সর্বথা, সর্বং সর্বদা বেদো যো ভিষক। আয়ুর্বেদং স কাৎস্নেন বেদলোক সুখপ্রদম।।' অর্থাৎ, মানুষের শরীর বিষয়ে যিনি সকল প্রকার উপায়ে জেনেছেন, শরীর সংক্রান্ত সকল জ্ঞান সকল সময়ে যাঁহার বুদ্ধিতে উপস্থিত হয়, তিনিই লোকহিতকর আয়ুর্বেদ বিষয়ে প্রকৃত জ্ঞানলাভ করেছেন। সুশ্রুত আরও অগ্রসর ছিলেন; তিনি শরীর বিষয়ে প্রত্যক্ষ-জ্ঞান লাভ করবার পথের ইংগিত দেন: 'শরীরে চৈব দৃষ্টার্থঃ স্যাদ বিশারদঃ। দৃষ্টশ্রুতাভ্যাং সন্দেহমবাপোহ্যাচরেৎ ক্রিয়া।' অর্থাৎ, শাস্ত্রের অধীত বিদ্যা বা জ্ঞান শরীরের সহিত তুলনা করে বা মিলিয়ে নিজ শরীর বিষয়ে নিপুণতা লাভ করা জান। শাস্ত্র অধ্যয়নকালে অধ্যাপকের নিকট শোনা ও শরীর বিষয়ে প্রত্যক্ষ-দর্শনের সাহায্যে নিঃসন্দেহ হতে হয় এবং তবেই চিকিৎসা করা সম্ভব। তিনি আরও বলেন: 'প্রত্যক্ষতশ্চ যদ দৃষ্টং শাস্ত্রদৃষ্টঞ্চ যদ্ ভবেৎ। সমাসতস্তদুভয়ং ভূয়োজ্ঞান বিবর্ধনম।।' অর্থাৎ, যা স্বচক্ষে দেখা যায় ও যা শাস্ত্র-পাঠে শোনা যায়, এই উভয় প্রকার বিদ্যার মধ্যে মিলন হলে, জ্ঞান বিশেষভাবে বৃদ্ধি পায়। সুশ্রুত সেজন্য স্পষ্ট নির্দেশ দিলেন: 'শোধয়িত্বা মৃতং সম্যক্ দ্রষ্টব্যোঽঙ্গবিনিশ্চয়ঃ' মৃতদেহ সম্যক রূপে পরিশোধন, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করবার পর শাস্ত্রে লিপিবদ্ধ অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের বিবরণ স্বচক্ষে মিলিয়ে দেখবে ও তাদের বিষয়ে নিশ্চিত জ্ঞানলাভ করবে।

কিভাবে মৃতদেহ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করতে হবে, কিরূপ মৃতদেহ প্রয়োজন ইত্যাদি বিষয়ে সুশ্রুতসংহিতায় বিশেষ আলোচনা করা হয়েছে। প্রথমে, শব নির্বাচনের কথা। শবের যেন সকল অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ বর্তমান থাকে, সেটি যেন কোনরূপে বিষক্রিয়ার দ্বারা বিনষ্ট না হয়ে থাকে, এবং দীর্ঘদিন ধরে কোনরূপ ব্যাধি-পীড়িত এবং শতবর্ষ বয়স্কের শবদেহ হলে কাজ চলবে না। এরপর নির্বাচিত শব পরিশোধনের ব্যবস্থা। শবের নাড়িভুঁড়ি, মলাদি-দ্রব্য বের ক'রে ফেলে দিতে হবে। জনহীন স্থানে অবস্থিত স্রোতোহীন জলাশয়ে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন শবটিকে পচাতে হবে। মাছ ইত্যাদি জলচর জীব যাতে মৃতদেহটি না খেয়ে ফেলে বা অন্য কোন স্থানে সরে না যায়, সেজন্য জলের মধ্যে একটি মাচা তৈরী ক'রে তার উপর শবটিকে রাখতে হবে, এবং মুঞ্জবল্কল কুশ বা শন ইত্যাদির যে কোন একটিতে প্রস্তুত দড়ি দিয়ে শবটির চারিদিক ভালভাবে বেঁধে রাখতে হবে। এইভাবে সাতদিন রাখলে, পচন সম্পূর্ণ হবে: তখন শবটিকে সযত্নে তুলে আনতে হবে। বেনার মূল, চুল, বাঁশের চুয়াড়ী বা কুঁচি দিয়ে ধীরে ধীরে ঘষতে হবে, তাহলে ত্বক (গাত্রচর্ম) হতে আরম্ভ করে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সকল ক্রমশঃ চোখে দেখা যাবে। এইভাবে শব-ব্যবচ্ছেদ করাকে সুশ্রুতে 'অবঘর্ষণ' বলা হয়।

অবঘর্ষণ সাহায্যে শব-ব্যবচ্ছেদ ও বর্তমানে প্রচলিত পদ্ধতির মধ্যে কত প্রভেদ। বর্তমান প্রচলিত পদ্ধতির কার্যকারিতা সম্পর্কে কেহ কেহ সন্দেহ প্রকাশ করেন এবং প্রাচীন ভারতে প্রচলিত অবঘর্ষণ পদ্ধতিতে শব-ব্যবচ্ছেদ কত বেশী পরিপাটি ও বিজ্ঞানসম্মত, সেই বিষয়ে ইংগিত দেন। বর্তমান প্রচলিত পদ্ধতিতে ছুরি চালিয়ে বরাবর ত্বক কেটে ফেলা হয়, অতি সূক্ষ্ম শিরা-উপশিরা, স্নায়ুজাল ছিন্নভিন্ন হয়ে যায়, সেগুলি অবিকৃত অবস্থায় প্রায়ই দেখা যায় না, এরূপ কথা অনেকে বলেছেন। অথচ, প্রাক্-প্রাগৈতিহাসিক কালে উদ্ভাবিত অবঘর্ষণ পদ্ধতির বৈশিষ্ট্য লক্ষণীয়। চুল, বেনার মূল, ইত্যাদির গুচ্ছে নির্মিত বুরুশের সাহায্যে ধীরে ধীরে ঘষবার ফলে, গাত্রচর্মের উপরিতল থেকে সুরু করে ত্বক ও তৎপরবর্তী অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ স্তরের পর স্তরে একে একে প্রকাশিত হয় এবং জলে পচনের ফলে, ফুলে-উঠে সূক্ষ্ম ও অতিসূক্ষ্ম অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সমূহ পর্যন্ত ক্রমশঃ স্পষ্ট হয়ে চোখে ধরা পড়ে। পাশ্চাত্যে উদ্ভাবিত শব-ব্যবচ্ছেদ পদ্ধতি অপেক্ষাকৃত সহজ এবং যে কেউ যখন তখন করতে পারে সত্য, কিন্তু কোনক্রমেই নিখুঁত বলা চলে না। কবিরাজ কুঞ্জলাল ভিষগরত্ন, এম, আর এ এস (লণ্ডন) 'দি সুশ্রুত সংহিতা' নামক তাঁর ইংরাজি গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ডের ভূমিকাতে মন্তব্য করেন:

> 'Susruta's Avagharsana is now considered by many as the only perfect mode of dissection that the layers of epidermis and dermis could be disclosed, and blood vessels with their minute branches could be counted as many as thirty millions. Not only this, but also in the opinion of several European savants, susruta still stands as a model of surgery, and European surgery has borrowed many things from Susruta and has yet many things to learn".—

অনেকেই এখন বিবেচনা করেন যে, শব-ব্যবচ্ছেদের সুশ্রুতের অবঘর্ষণ পদ্ধতিই একমাত্র নিখুঁত উপায়; ইহার সাহায্যে উপত্বক ও ত্বকের স্তরসমূহ উন্মোচন করা যায়, শিরা উপশিরার শাখা-প্রশাখায়

রক্তাধারগুলির তিন কোটির মত গণো যায়। শুধু তাই নয়, বহু ইউরোপীয় জ্ঞানীজনের অভিমত এই যে, এখনও পর্যন্ত শল্যবিদ্যায় সুশ্রুত আদর্শস্থানীয় এবং ইউরোপের শল্যবিদ্যা সুশ্রুত থেকে বহু কিছু ধার করেছে, এবং এখনও তাদের আরও বহু বিষয় শিখবার আছে।'

এত উন্নত-কৌশল শব-ব্যবচ্ছেদ পদ্ধতি কিভাবে দেশ থেকে লোপ পেল, তার ইতিহাস অনুধাবনযোগ্য। কবিরাজ গণনাথ সেন মহাশয় মন্তব্য করেন,—'বৌদ্ধযুগ হইতেই রাজাজ্ঞায় শব-ব্যবচ্ছেদ প্রথা রহিত হইয়া যায়। বৌদ্ধধর্মের প্রভাববশতঃই হউক অথবা পরবর্তীকালে নিরন্তর যুদ্ধ-বিগ্রহ হেতু মহান বিপ্লব ঘটিবার কালেই হউক, ভারতীয় রাজগণ বা জনসাধারণ শব-ব্যবচ্ছেদ প্রথা পুনঃ প্রচলিত করিবার জন্য চেষ্টা করেন নাই। কিন্তু মুসলমান রাজগণেরও এ বিষয়ে কোন উৎসাহ ছিল না। ফলে, শব-ব্যবচ্ছেদ একেবারে বিলুপ্ত হয় এবং আয়ুর্বেদীয় চিকিৎসক শারীর-তত্ত্বে নিতান্ত অনভিজ্ঞ হইয়া পড়েন। এইরূপে শরীরজ্ঞান বর্জিত চিকিৎসকের সংখ্যার আধিক্যবশতঃ আয়ুর্বেদের যথেষ্ট অবনতি ঘটে।' তিনি শুধু মন্তব্য করেই ক্ষান্ত ছিলেন না। স্বয়ং শব-ব্যবচ্ছেদ করে প্রাচীন শারীরজ্ঞান সংকলন করেন, উহার সহিত আধুনিক জ্ঞানের যোগ সাধন করেন, এবং সংস্কৃত ভাষায় লিখিত 'প্রত্যক্ষ-শারীর' গ্রন্থখানি রচনা করেন।

আশার কথা, পশ্চিমবঙ্গ সরকার আয়ুর্বেদমতে চিকিৎসা প্রণালীর পুনরুজ্জীবনের জন্য নানারূপে পরিকল্পনায় নিযুক্ত। যামিনীভূষণ অষ্টাঙ্গ আয়ুর্বেদ বিদ্যালয় ও আরোগ্যশালা রাষ্ট্রায়ত্ত করা হয়েছে, এবং উক্ত প্রতিষ্ঠানের পাতিপুকুর শ্যামা হাসপাতালে অবস্থিত শব-ব্যবচ্ছেদের জন্য ব্যবহৃত গৃহটির 'গণনাথ শব-ব্যবচ্ছেদ ভবন' নামকরণ হয়েছে। কবিরাজ গণনাথ সেন মহাশয়ের প্রত্যক্ষ-শারীর গ্রন্থখানি বাংলা ভাষা তথা অন্যান্য দেশী ও বিদেশী ভাষায় অনুবাদ হইলে, প্রাচীন ভারতীয় লুপ্তপ্রায় শব-ব্যবচ্ছেদের প্রতি স্বদেশবাসীর কিছুটা আগ্রহ প্রকাশ পাবে। ফলে, আদর্শস্থানীয় শল্যবিদ্যাবিশারদ সুশ্রুতের প্রতি কিছুটা শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করা হবে; অবশ্য, বর্তমান পরিবেশের সহিত সামঞ্জস্য বিধান করে অবঘর্ষণ পদ্ধতি প্রয়োজন মত সংস্কার করার পর, উহার সাহায্যে সুশ্রুতের আদর্শমত শব-ব্যবচ্ছেদ গৃহীত হওয়া উচিত। যে ভালভাবে শোনে বা যার কথা ভালভাবে শোনা হয়, এমন লোককেই 'সুশ্রুত' নামের পরিচয় দেওয়া যায় এবং বস্তুতপক্ষে, সুশ্রুত ছিলেন, শোনা কথা পরীক্ষা-নিরীক্ষার সাহায্যে যাচাই করে দেখার নীতির সমর্থক; সেই-জন্য অবঘর্ষণ পদ্ধতি যাচাই করে প্রয়োজনবোধে সংস্কারের প্রশ্ন তোলা হয়েছে। একমাত্র কালই বলতে পারে, কোন ভারতীয় বা কোন বিদেশী অবহেলা ও অব্যবহারের কবল থেকে সুশ্রুতে বর্ণিত শব-ব্যবচ্ছেদের পদ্ধতি উদ্ধার করার জন্য এবং রোগ-ক্লিষ্ট মনুষ্য সমাজের কল্যাণে তা নিয়োগ করে, গৌরব অর্জন করতে এগিয়ে আসবে।

প্রদর্শনী

বিড়লা অ্যাকাডেমি অব ফাইন আর্টসে শিল্পী গোপাল ঘোষের গত বিশ বছরের শিল্পচর্চার একটি বৃহৎ প্রদর্শনী ২ থেকে ১৪ নভেম্বর অবধি অনুষ্ঠিত হয়ে গেল। নিসর্গ দৃশ্যের ছোট বড় মাঝারি সাইজের প্রায় দেড়শখানির মত প্যাস্টেল, জলরং ও শাদাকালো ড্রয়িং-এর এত বড় প্রদর্শনী অনেক দিন অনুষ্ঠিত হয়নি। যদিও শ্রীঘোষের শ্রেষ্ঠ ছবিগুলির নিদর্শন এখানে বিশেষ নেই, তবু তাঁর স্টাইলের অনেক উৎকৃষ্ট নমুনা এখানে উপস্থিত ছিল। সবচেয়ে আকর্ষণীয় ছবি ছিল তাঁর ছোট পোস্টকার্ড সাইজের জলরং-এর বিভিন্ন মেজাজের নিসর্গ দৃশ্যগুলির মধ্যে। 'লাল-পাখি' 'নীল ঢেউ' 'জীবনের প্রদীপ' 'মেঘে ঢাকা চাঁদ' 'রাতের উৎসব' 'অরণ্যের শোভা' ইত্যাদি ছবির মধ্যে রঙের দ্যুতি এবং জড়োয়া গয়নার মস্ত বাহার দৃষ্টি এড়ায় না। প্রদর্শনীর বড় মাপের নিসর্গ দৃশ্যের চাইতে এই ছোট কাজ গুলিতেই যেন শিল্পী নিজেকে বেশী করে খুঁজে পেয়েছেন। বড় ছবির মধ্যে তাঁর আমেরিকা ও ইউরোপ ভ্রমণকালের কিছু দৃশ্য এবং কয়েকটি পাহাড়ী নিসর্গ দৃশ্যে স্টাইলের বৈচিত্র্য লক্ষ্য করা যায়। ফুলের স্টাডি এবং ছোট খাটো কতকগুলি পেন্সিল বা কলমে আঁকা দু'চার লাইনে সম্পূর্ণ প্রতিকৃতি তাঁর কাজের আরেক দিকের পরিচয় বহন করে। তবে ফিগার ড্রয়িংগুলি না থাকলেই ভাল ছিল।

•

শ্রীমতী কমলা ঘোষ অ্যাকাডেমি অব ফাইন আর্টসে ১ থেকে ৭ নভেম্বর তাঁর ১৬ খানি ক্যানভাস প্রদর্শিত করেন। শিশুদের ড্রয়িং-ঘেঁষা ছবি থেকে শুরু করে জ্যামিতিক অ্যাবস্ট্র্যাক্ট প্যাটার্ণ পর্যন্ত নানা ধরনের ছবি নিয়ে তিনি পরীক্ষা করেছেন। ছবিগুলি মোটামুটি ম্যাট ফিনিশ করা রঙের প্যাটার্ণ অ্যাবস্ট্র্যাক্ট কাজ গুলিতেই বেশী খুলেছে। তবে সবচেয়ে ভাল কম্পোজিশন হয়েছে ঘুড়ির

শিল্পী : রঞ্জিত ভট্টাচার্য

দোকান ছবিটিতে। এখানে ফিগারেটিভ ও অ্যাবস্ট্র্যাক্ট কাজের সমন্বয় রং ও প্যাটার্ণের সুসজ্জিত রূপ পরিস্কার ভাবে ফোটানো হয়েছে।

•

৫ থেকে ১৪ নভেম্বর অ্যাকাডেমি অব ফাইন আর্টসে ইন্দো-চেকোশ্লোভাক কালচারাল সোসাইটি অব ওয়েস্ট বেঙ্গলের উদ্যোগে চেকোশ্লোভাকিয়ার শিশুদের একটি শিল্পপ্রদর্শনী হয়ে গেল। চেক ফোক স্কুল অব আর্ট-এর ৬ থেকে ১৭ বছরের ছেলেমেয়েদের আঁকা প্রায় তিনখানি জলরং প্যাস্টেল ও গ্রাফিকের বাছাই-করা নিদর্শন নিয়ে এই প্রদর্শনী সাজানো হয়। ছেলেমেয়েদের দৃষ্টিভঙ্গীর সুন্দর কতকগুলি নিদর্শন এখানে উপস্থিত ছিল। ব্লাঙ্কা স্মুহালোভার মেয়ে জিমনাস্ট-এর শাদাকালো গ্রাফিকটি আট বছরের মেয়ের কাজ বলে বিশ্বাসই হয় না—এত পরিণত এর রেখাভঙ্গী। এছাড়া ই ক্রিশনারের জলরং-এর রাস্তার দৃশ্য, টি থিয়েরের রূপকথার সুন্দর একটি ডেকোরেটিভ ছবি, একটি বেড়ালের লিথোগ্রাফ ও জিরিনা ক্রুম্পারোভার ড্রাই পয়েন্টে করা কয়েকটি ফিগার উৎকৃষ্ট কাজের নমুনা। সমগ্র প্রদর্শনীর উজ্জ্বল বর্ণসমাবেশ সহজেই দৃষ্টিকে আকৃষ্ট করে।

•

রণজিৎ ভট্টাচার্য ৮ থেকে ১৪ নভেম্বর অ্যাকাডেমি অব ফাইন আর্টসে কুড়িখানি ক্যানভাস প্রদর্শিত করলেন বিভিন্ন স্টাইলে কাজ করে থাকলেও প্রধানতঃ নিসর্গ দৃশ্যেতেই তাঁর কাজের সাফল্য দেখতে পাওয়া যায়। প্যালেট তাঁর উজ্জ্বল কিন্তু ড্রয়িং সে তুলনায় সবল নয়। কখনো ইম্প্রেসানিজম-ঘেঁষা, কখনো বা পোস্ট-ইম্প্রেশানিজমের দিকে তাঁর ঝোঁক দেখা যায়। ভাঙা চেয়ার, ছাতা এবং জুতো নিয়ে কম্পোজিশন। ছোট ছোট ইম্প্যাস্টো চালিয়ে নিজের প্রতিকৃতির পটভূমি তৈরী করার চেষ্টা, এই সব প্রবণতা সহজে চোখে পড়ে। চেয়ারের ছবিতে আলোর ব্যবহারটি চমৎকার। একটি মাছ নিয়ে স্টিল লাইফ কম্পোজিশন উল্লেখযোগ্য এবং গুটিতনেক নিসর্গদৃশ্য বেশ সাফল্যের সঙ্গে আঁকা।

•

ডিরেক্টর অব কটেজ অ্যান্ড স্মল স্কেল ইন্ডাস্ট্রিজের উদ্যোগে ওল্ড কোর্ট হাউস স্ট্রীটের রিজিওনাল ডিজাইন সেন্টারে সর্বভারতীয় হস্তশিল্প সপ্তাহ উপলক্ষ্যে পশ্চিমবঙ্গের হস্তশিল্পের একটি সুদৃশ্য প্রদর্শনী ১১ থেকে ১৮ নভেম্বর উদযাপিত হল। সাড়ে তিনশ'র ওপর হস্তশিল্পের নিদর্শনের মধ্যে বাঁশ, শোলা, মাদুর, মোষের শিং, ঢোকরা এবং বয়নশিল্পের অনেকগুলি সুন্দর নিদর্শন রক্ষিত হয়। কাগজ ও বাঁশের তৈরী দুটি সরস্বতীপ্রতিমা ও শোলার একটি দুর্গাপ্রতিমা প্রদর্শনীর বিশেষ আকর্ষণ। মোষের শিং-এর অনেকগুলি সুন্দর কাজ এবং বালুচরী নকশার কয়েকটি শাড়ি বিশেষ লোভনীয় হয়েছিল। [illegible] হাতি থেকে ছোট ছোট পুতুলের মধ্যে

বৈচিত্র্যের অভাব ছিল না। তাছাড়া ওপর থেকে ঝোলানো কতকগুলি শোলার ডেকরেটিভ পীস চমৎকার কাজ। প্রদর্শনী-সংলগ্ন বিক্রয়-কেন্দ্রে বিক্রয়ের ব্যবস্থাও ছিল। তাছাড়া প্রদর্শনীর প্রধান উদ্দেশ্য হল হস্তশিল্প-ব্যবসায়ীদের সঙ্গে শিল্পী-দের শিল্পকর্মের পরিচয় সাধন। এদিক দিয়ে প্রদর্শনী সাফল্য অর্জন করতে পারে বলে মনে হয়।

•

শ্রীমতী নিলুফের বিলিমোরিয়া একটি ছোট আঠরো ইঞ্চি মাপের পুতুল নিয়ে এলেন শিল্পী বিকাশ ভট্টাচার্যের স্টুডিওতে। বায়না হল পুতুলটার ভুরুটা একটু স্পষ্ট করে এ'কে দিতে হবে। পুতুলটা দীর্ঘকাল যাবৎ স্টুডিওতে পড়ে-ছিল। হঠাৎ এক সময় তার দিকে শিল্পীর নজর পড়ে যায়। পুতুলটা যেন কিছু বলতে চায়। তখন থেকেই পুতুলটা শিল্পীর মাথায়ও চেপে বসল। এটাকে নিয়ে কিছু যেন করা দরকার। নইলে এ-ভূত ঘাড় থেকে নামবে না। শুরু হল একটি ছবির সিরিজ। সবশুদ্ধ প্রায় চোদ্দ-খানি ছবি এবং ড্রইং এই পুতুলকে কেন্দ্র করে সৃষ্টি হল, যার এক বৈশিষ্ট্যপূর্ণ প্রদর্শনী গত ১২ থেকে ১৭ অক্টোবর বিড়লা অ্যাকাডেমির প্রদর্শনীগৃহে জন-সাধারণ উপভোগ করতে পেরেছিলেন। পুতুল কখনো কলকাতার অন্ধকার ফুট-পাতে অসহায়ভাবে পড়ে রইলো, কখনো বা দেখা গেল ছাদের কাপড় শুকোবার দড়ি ধরে তাকে দুলতে, কখনো সে শিল্পীর দেরাজ হাতড়াচ্ছে, কখনো বা চিলেকোঠার ছাদ ফুটো করে ঊর্ধ্বে পলায়নের চেষ্টা করছে, কখনো আবার কোন অদৃশ্য আক্রমণকারীকে দেওয়ালের আড়াল থেকে উ'কি মেরে দেখছে। কখনো দেখা গেল এক ঝাঁক পুতুল সবুজ শ্যাওলাধরা দেওয়ালের ওপর থেকে কাদের দিকে যেন চেয়ে রয়েছে। এই ধরনের বিভিন্ন ফ্যান্টাসির সমাবেশে কোথায় যেন একটা রূপক কাহিনীর মায়াজাল সৃষ্টি হয়েছে। শ্রীভট্টাচার্যের প্রথম একক প্রদর্শনীতে শহরের কয়েকটি দৃশ্য ছিল। বর্তমান প্রদর্শনীতে সেই ধরনের কাজেরই আরো উন্নত সংস্করণ দেখতে পাওয়া গেল। রং এবং টেক্সচার সৃষ্টির কৌশল এবং আলো ও টোনের সুপরিকল্পিত সজ্জা ক্যানভাসে

শিল্পী : বিকাশ ভট্টাচার্য

অনেকখানি গভীরতা, উজ্জ্বল্য এবং একটা অর্থবহ ভাব আনতে সমর্থ হয়েছে। ছবি-গুলো মাপে খুব ছোট নয় কিন্তু অনা-বশ্যক বাহুল্যবর্জিত। এই সংযমটুকু বিশেষ করে নজরে পড়ল। ড্রয়িংগুলিতে স্প্রে ব্যবহার করার দরুণ টেক্সচারের বৈচিত্র্য বিশেষ আসেনি, এমনকি একটু ফোটোগ্রাফি-ঘে'ষাও বলা চলে।

অন্যান্য ছবির মধ্যে একটি বড় পূর্ণাঙ্গ আত্মপ্রতিকৃতি—যার রঙ ও সুপরিকল্পিত ফর্মের বিকৃতিসাধন নজরে পড়ে। 'ডেথ অব এ হিরো' একটু অ্যাকা-ডেমিজম ঘে'ষা কাজ। 'দি রেবেল' ছবি খণ্ডমূর্তির ভিত্তিতে আঁকা। 'ম্যান অন দি সুইং' পূর্বে প্রদর্শিত, তবে নতুন করে রং চাপানো হয়েছে। দোলনায় একটি লোমশ নগ্নমূর্তি মানুষকে যেন পশুর স্তরে নিয়ে আসা হয়েছে—কিন্তু নেহাৎ অসহায় মূর্তি। 'ডেথলেস অ্যান্টিক' ছবিতে তিন-জন দৃষ্টিহীন নরনারী খাটে-শোয়া গোপাল মূর্তির পাশে বসে। মূর্তিটি উজ্জ্বল নামাবলী দিয়ে ঢাকা। কিন্তু মধ্যদেশ কেমন যেন অস্বাভাবিক উ'চু। সমগ্র প্রদর্শনীতে শিল্পীর মুন্সীয়ানার ছাপ সুস্পষ্ট।

•

১১ থেকে ১৭ অক্টোবর অ্যাকাডেমি অব ফাইন আর্টসে জাপানের আধুনিক বহু-বর্ণ ফটোগ্রাফির একটি সুন্দর প্রদর্শনী হয়ে গেল। প্রদর্শনী উদ্বোধন করেন শিল্পী দেবীপ্রসাদ রায়চৌধুরী ও সভাপতিত্ব করেন জাপানী কনসাল এইচ কোবারাসি।

পঞ্চাশখানি রঙীন ফটোগ্রাফির নিদ-র্শনের মধ্যে যেটা সবচেয়ে আগে চোখে পড়ে তা হল সমগ্র প্রদর্শনীর জাপানী আমেজ। প্রায় প্রতিটি ছবিরই কম্পোজিশন ও রঙে একটা বিশিষ্ট জাপানী দৃষ্টিভঙ্গী আছে যার সঙ্গে জাপানের প্রাচীন শিল্পের একটা পরিষ্কার যোগসূত্র আবিষ্কার করা যায়। প্রয়োজনমত ছবিতে সমতল ভাব বা রিলিফ ভাব আমদানী করতে এ'রা কুণ্ঠিত হননি। উদাহরণস্বরূপ 'ফিশিং বোটস' ও 'রিলিজিয়াস ট্যাবলেট' এই দুটি ফটোগ্রাফের নাম করা যেতে পারে। 'ক্যানাডিয়ান প্যাভিলিয়নে'র ছবিতে পুরোনো জাপানী জলরঙের তুলির টানের ছাপও চমৎকারভাবে প্রতিফলিত হয়। আধুনিক শিল্পরীতির প্রভাবও ফটোগ্রাফিতে প্রতিফলিত হতে দেখা যায়—'অ্যাপরিশন' ও 'অ্যানাদার ওয়ার্ল্ড'-এর উৎকৃষ্ট নিদর্শন। সমগ্র প্রদর্শনীতে নানা বিষয়ের ছবি থাকলেও জাপানের প্রকৃতির প্রতি সহজাত আকর্ষণের নিদর্শনই সবচেয়ে বেশী ও সবচেয়ে সার্থক সৃষ্টিরূপে প্রতি-ফলিত হয়েছে।

—চিত্ররসিক

পূর্বপুরুষ

গজেন্দ্রকুমার মিত্র

।।৬।।

সেই শেষ রাত্রেই একটা ট্রেন ছিল—কলিকাতায় যখন আসিয়া পৌঁছিলাম তখন সকাল হইয়াছে মাত্র, ভাল করিয়া শহরের ঘুম ভাঙে নাই। নীলু ট্রেনের হিসাব করিয়াই সময় ঠিক করিয়াছিল। আরও সৌভাগ্যের বিষয় এই, আমার পূজনীয় শাশুড়ি ঠাকরুনের নাকি অন্য-দিনের অপেক্ষা অনেক আগেই গঙ্গারধারে যাওয়ার প্রয়োজন হইয়াছিল. তাই স্টেশনে আসিয়া দুই মিনিটও দাঁড়াইতে হয় নাই. সংগে সংগেই গাড়ি পাওয়া গিয়াছিল।

ট্রেনে সারাটা পথই নীলু চুপ করিয়া বসিয়াছিল—আমার সহিত একটাও কথা বলে নাই। বোধহয় লজ্জাতেই—জানালা দিয়া প্রাণপণে বাহিরের দিকে চাহিয়া ছিল। আমার তো সংকোচ বোধ করারই কথা—বিশেষ আজ পর্যন্ত কোন পরপুরুষের সংগে কথা বলি নাই। আমিও চুপ করিয়া বসিয়া রহিলাম। আর কথা বলার মতো অবস্থাও ছিল না তখন, যতই প্রাণপণে চাপিবার চেষ্টা করি ততই অবাধ্য উত্তপ্ত অশ্রু বাহির হইয়া আসে বারবার।

একেবারে কলিকাতায় নামিয়া প্রথম শব্দ উচ্চারণ করিল নীলু, প্রশ্ন করিল. 'তারপর? এখন কোথায় পৌঁছে দেব আপনাকে?'

আমি ঠিকানাটা দিয়া বলিলাম, 'আপনাকে বাড়িতে যেতে হবে না, গলির মোড়ে নামিয়ে দিলেই হবে. মিছিমিছি আর এর মধ্যে আপনাকে টানতে চাই না। এমনিই তো হয়ত এর জন্যে আপনাকে অনেক ভুগতে হবে।'

'তা হোক। আমার জন্য ভাববেন না বৌ-ঠাকরুন। ...দুটো প্রাণ রক্ষা পেয়েছে সেইটেই বড় কথা—তার জন্যে যদি কিছু ক্ষতি স্বীকার করতে হয় তো হাসিমুখেই করব। আর আমার কিছু করতেও পারবে না কেউ। যাকে বলেই এসেছি—কোন মিথ্যে দুর্নাম তাঁরা বিশ্বাস করবেন না। তবে তাহলেও, আমি আপনার সংগে আপনার বাড়ি অবধি যেতে চাই না, কারণ তাতে হয়ত আপনিই আরও বিব্রত হবেন, ছত্রিশ রকমের কথা উঠবে।'

ঘোড়ার গাড়িটা আমাদের গলির মুখে দাঁড় করাইয়া আর একবার শুধু প্রশ্ন করিল, 'তাহলে আমি যাই?'

'যান। ভগবান আপনার ভাল করুন—আর কি বলব!' একটু ইতস্তত করিয়া আর একটিবার কথা কহিল নীলু, 'টাকা পয়সা কিছু দরকার আছে?'

প্রবল বেগে ঘাড় নাড়িলাম, 'টাকা পয়সায় কি হবে, তবে আমার কাছে কিছু নেই—গাড়ি ভাড়াটা—'

এই গাড়ি নিয়েই তো আমি চলে যাচ্ছি বৌঠাকরুন—ভাড়া দেওয়ার তো এখন দরকারই হচ্ছে না।'

সেই নীলুর সহিত শেষ দেখা। আর তাহার কোন খবরও পাই নাই। বাঁচিয়া আছে কিনা তাও জানি না। তবে তাহার পর হইতে বহুদিন পর্যন্ত, যখনই মনে পড়িয়াছে কথাটা ভগবানের কাছে প্রার্থনা জানাইয়াছি—'আমার যা করবার করো, ওদের দুজনে যে এতটা করলে—এর পুরস্কার যেন ওরা পায়, ওদের যেন ভাল হয়।'

কে জানে ভগবান অভাগিনীর এ প্রার্থনাটুকু শুনিয়াছিলেন কিনা।

বাপের বাড়িতে ঢুকিতেই প্রথম দেখা হইয়া গেল বাবার সংগেই।

দেখিলাম ঘরের সামনের বারান্দায় একটা জলচৌকির উপর বসিয়া আছেন, বোধকরি পুত্রবধূর কোন আসন্ন সেবার অপেক্ষায়।

বাবা আমাকে দেখিয়া বিস্মিত হইবেন ব্যস্ত হইবেন এইটুকু আশা করিয়াছিলাম এমন কঠিন হইয়া উঠিবেন, তাহা ভাবি নাই।

দেখিলাম চোখের নিমেষে তাঁহার মুখখানা ভ্রুকুটি-কুটিল ও ভয়ংকর হইয়া উঠিল, দৃষ্টিতে যে ঘৃণা ও ক্রোধ ফুটিয়া উঠিল তাহা আর কখনও তাঁহার চোখে দেখি নাই, বরাবরই একটা উদাসীন নিস্পৃহভাব বজায় রাখিয়া চলেন। ক্রুদ্ধ হইলেও সে ক্রোধ তাঁহার ভঙ্গীতে বা বাক্যে এমন রূঢ়ভাবে কখনও প্রকাশ পায় না।

চরম বিপদে পড়িয়া একটু আশ্রয় ও আশ্বাসের জন্য যাহার কাছে ছুটিয়া আসিয়াছি তাহার এই কঠোর মুখভাব দেখিয়া হঠাৎ কেমন যেন অবসন্ন হইয়া পড়িলাম। গত দুদিনের উপবাস ও প্রহারের ফলেও আমাকে এতটা দুর্বল করিতে পারে নাই, এখন যেন মনে হইল পা দুটো ভাঙিয়া পড়িতেছে, মনে হইল পায়ের নিচের মাটি সরিয়া যাইতেছে—মাথাও ঘুরিতে শুরু হইল, 'বাবা' বলিয়া একবার অস্ফুট স্বরে ডাকিয়া সেইখানে সেই উঠানেই বসিয়া পড়িলাম।

এবার বাবা কথা কহিলেন।

বলিলেন, 'তুমি কে, তোমাকে তো আমি চিনি না। কী মনে করে এসেছ এখানে?...তোমার মতো একটা মেয়ে আমার ছিল বটে নারায়ণ তাকে নিয়েছেন। আর কোন সম্পর্ক তোমার সংগে আমার মনে পড়ছে না!'

ইহার পর কিছুক্ষণ আমার যেন বাকস্ফূর্তি হইল না। কী বলিব, কেমন করিয়া কথা বলিব—সর্বোপরি কাহাকে বলিব। এই কি আমার পিতা। জন্মদাতা, স্নেহময়জনক। প্রাণভরে, নির্যাতন সহিতে না পারিয়া একমাত্র সন্তান এই গুঁড়াটুকু লইয়া আশ্রয়ের জন্য ইঁহার নিকটই আসিয়াছি।'

তবে আমাকে কিছু বলিতে হইল না। তিনিই বলিলেন, 'তোমার জন্যে আমাকে যে কথা শুনতে হল—আমার জীবনে—আমাদের বংশে কেউ কখনও শোনেনি। আমাদের গুরু বংশ, সাধকের বংশ—মহাপুরুষের আশ্রিত আমরা। ছেলে-মেয়েদের চিরকাল ধর্মপথে থাকারই উপদেশ দিয়ে এসেছি। নিশ্চয়ই কোন পাপ ছিল আমার, কোন ত্রুটি—তাই এই লাঞ্ছনা সইতে হল!...তোমার সতীসাধ্বী মা স্বর্গে গিয়ে বেঁচে গেলেন—আমার অদৃষ্টে এই অপমান ছিল বলেই ভগবান নেননি।...ছি-ছি-ছি! ধিক! এও আমাকে শুনতে হল যে আমার মেয়ের স্বভাব চরিত্র ভাল নয়, সদ্যোবিধবা মেয়ে তার ভাশুরকে নষ্ট করার চেষ্টা করেছে—এমনই শিক্ষা দিয়েছি আমি। তাঁরা লিখেছেন যে ভাল চাই তো আমি যেন মেয়েকে নিয়ে আসি।...আমি তার জবাব দিইনি এই জন্যে যে আমি এইটুকু আশা করে-ছিলুম—আমার মেয়ে এরপর আত্মহত্যাই করবে, পোড়ামুখ আর ভদ্র সমাজে দেখাবে না!'

এবার আমিও কঠিন হইয়া উঠিলাম। জন্মাবধি এই স্বার্থপর লোকটার অবিচার সহিয়া আসিয়াছি, ইহার প্রকৃতিও দেখিয়া আসিয়াছি—ইহার নিকট কাতর কণ্ঠে করুণা ভিক্ষা করিতে প্রবৃত্তি হইল না। করিলেও তো ফল হইবে না, মিছামিছি ছোট হই কেন?

আমি জবাব দিলাম, 'আপনি মেয়েকে তাহলে এমনভাবেই শিক্ষা দিয়েছেন, মানুষ করেছেন যে আপনার এই বিশ্বাস হয়ে গেছে যে আপনার আত্মজার কথার থেকে কতকগুলো অশিক্ষিত মূর্খ পরলোকের কথাই বিশ্বাসযোগ্য। এ আপনারই উপযুক্ত বটে!...আপনার একবার একথাটা মনে হল না যে আমারও কিছু বলার থাকতে পারে, আমার কথাটাও একবার শোনা দরকার। খুব বড় অপরাধী আসামীদেরও জজেরা তাদের কৈফিয়ৎ দেবার অবকাশ দেন, তারপর বিচার করেন। তারা আমার এই বাচ্চাটুকুকে বিষয়ে বঞ্চিত করার ষড় করেছিল, তাতে রাজী হইনি নাদাবীনামার দলিলে সই করিনি বলে এত দুর্নাম দেওয়া, এত লাঞ্ছনা। মার খেয়ে একটা দিন-রাত উঠতে পারিনি, দুদিন এক ফোঁটা জল পর্যন্ত খেতে দেয়নি—চাবি দিয়ে রেখেছিল। জানেন এসব কথা? শেষ পর্যন্ত গলাটিপে খুন করে দড়িতে ঝুলিয়ে দেবে—এই ঠিক করেছিল। আজ পালাতে না পারলে আর বেঁচে আসতে হত না!'

'ভালই হত এ জীবন রাখার চেয়ে সে ঢের ভাল হত। তারা বিষয় চেয়েছিল সে বিষয় তাদের ছেড়ে দিয়ে সম্মানটুকু নিয়ে চলে আসতে পারতে। তাহলে বিধবা মেয়েকে মাথায় করে রাখতম।'

'কার বিষয় ছাড়ব বাবা। এই বাচ্চাটাকেও। সে যখন বড় হবে আমাকে বলবে কেন ছেড়ে দিলে, কৈফিয়ৎ তলব করবে? কী জবাব দেব তাকে। আর এত কাণ্ডের পরও আপনারা আনলেন না, খবর নিলেন না—তখন কী ভরসায় আমি সব ছেড়ে দিয়ে আসব?'

'এখন কার ভরসায় এলে। এতই যদি ভরসার অভাব—ঐ মুখ দেখাতে এখন এলে কেন!...বলছো তারা কুলুপে দিয়ে রেখেছিল মারবে বলে—এখন এলে কীভাবে তাহলে কার সঙ্গে?'

'তাদের দয়া হয়নি। ছোট জাত দি, তার দেহে দয়া-মায়া আছে—সে লুকিয়ে চাবি এনে খুলে দিয়েছে, সেই বলে দিয়ে-ছিল—পাড়ার একটি তিলিদের ছেলে এসে পৌঁছে দিয়ে গেল!'

'সে কোথায়!'

'সে চলে গেছে। তাকে আমিই যেতে বলেছি। তাকে আর কেন জড়াই।'

'ঠিকই তো! তার কাজ সারা হয়ে গেছে আর কী দরকার। তুমি যেতে বলোনি, সেই চলে গেছে। নিজের লালসা চরিতার্থ করে ফেলে দিয়ে গেছে। বাঃ, বেশ! এই মেয়ে আমি জন্ম দিয়েছি, আমার সাধ্বী স্ত্রী পেটে ধরেছেন! ধিক!...তোমার ভাশুর কিছু মিথ্যা বলেননি! তুমি তো নিজে মুখেই স্বীকার করলে—তোমার চরিত্র ভ্রষ্ট হয়েছে। একটা কুটনী মেয়ে-ছেলের সহায়তায় পরপুরুষের সঙ্গে বেরিয়ে এসেছ—! তোমার জাতধর্ম সবই গেছে। আর কোন ভদ্রঘরেই তোমার ঠাঁই হবে না। আমার ধর্মের ঘর এখানে পাপের জায়গা নেই। তুমি দূর হও, যে পথে নেমেছ—সেই পথেই করে খাও গে। না হয় মা গঙ্গায় জলের অভাব নেই!—

শেষ ফতোয়া জারী করিয়া আমার ধার্মিক পুণ্যবান সাধক পিতাঠাকুর ঘরের মধ্যে ঢুকিয়া গেলেন। আমার ভাই ও ভ্রাতৃবধূ দুজনেই কথা বলার আওয়াজ পাইয়া বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইয়াছিল, তাহারাও নীরব হইয়া রহিল। কাহারও সাহস হইল না যে আমাকে ডাকিয়া বসায় কি অন্তত একটু জল খাইয়া যাইতে বলে। একটা কি দুটো টাকা পর্যন্ত হাতে দিবার কথা কাহারও মনে পড়িল না।

অগত্যা উপবাসে নির্যাতনে দুশ্চিন্তায় ক্লান্ত দেহটাকে টানিয়া আবারও বাহিরে আসিতে হইল।

এই বয়সেই পিতৃকুল শ্বশুরকুল—দুই কূল হারাইলাম।

রূপসী যুবতী মেয়ে নিঃস্ব নিঃসম্বল অবস্থায় ছেলে কোলে করিয়া পথে আসিয়া দাঁড়াইলাম।

[উত্তরাংশ : বর্তমান লেখকের ভাষায়]

॥ ৭ ॥

মানুষ যে এত অসহায় বোধ করতে পারে, এমন বিহ্বল দিশাহারা হয়ে পড়তে পারে কখনও—এর আগে পর্যন্ত সে সম্বন্ধে হেমন্তর কোন ধারণাই ছিল না। বাপের বাড়ি থেকে আজন্ম পরিচিত নিরাপদ আশ্রয় থেকে যখন বেরিয়ে এল—অন্ধের মতো হাতড়ে হাতড়ে—তখন সুদ্ধমাত্র একটা সংস্কারেই তার পা দুটোকে চালিয়েছে, সে যে চলছে তা সে বুঝতেও পারেনি। পায়ে কোন জোর ছিল না, বিন্দুমাত্র জোর ছিল না মন বা মস্তিষ্কে—যা সেই পা দুটোকে টেনে নিয়ে যাবে। দৃষ্টি যে ঝাপসা হয়ে গেছে সে চোখের জলে নয়—চারিদিক থেকে অদৃষ্টের এই প্রতিকারহীন মর্মান্তিক মার খাওয়ার ফলে চোখে আর জলও ছিল না—চোখে যে দেখতে পাচ্ছিল না সেও এই বিহ্বলতারই ফল।

কী যে হল সেইটেই যেন মাথাতে ঢুকছিল না, কী যে হবে সে প্রশ্ন তো অবান্তর। তা করারও শক্তি নেই, ভেবে দেখে উত্তর দেওয়ারও না।

বাইরে তখন রোদ উঠে গেছে, যদিও সে রোদ তখনও আশ-পাশের বাড়ির ছাদের কার্নিশেই আটকে আছে—নিচের দিকে নামেনি। তবে শহর জাগতে শুরু করেছে, বেশ কিছু লোক চলাফেরা শুরু করেছে পথেঘাটে। তার মধ্যে দু-একজন দেখছেও চেয়ে চেয়ে।

সম্বিৎ ফিরল তাদের এই কৌতূহলী দৃষ্টির আঘাতেই।

এ পাড়া পরিচিত। এখানেই জন্মেছে, এখানেই মানুষ হয়েছে। অনেকেই চেনে তাকে এ পাড়ায়। এমন বেশী দিন শ্বশুর বাড়ি ছিল না যে তার মুখ ভুলে যাবে সকলে। চেনা লোকের সঙ্গে দেখা হলেই হাজার প্রশ্ন, হাজার জবাবদিহি। অপমান ও লজ্জা—নিজের কাছেই যথেষ্ট। আর নতুন ক'রে তা বাড়িয়ে দরকার নেই। এ পোড়ামুখ নিয়ে অন্য কোথাও চলে যেতে হবে—দ্রুত, বেশী লোক জাগবার বা পথ-চলা শুরু করার আগেই।

কঠিন শাসনে স্নায়ুকে সক্রিয় ক'রে তোলে। মনের মধ্যে যুক্তির চেহারাটা নতুন ক'রে মাথা তোলার চেষ্টা করে। তার ফলে অবসন্ন অবশ পা দুটো আবার চলতে শুরু করে।

অন্য কোথায়—যেখানে হোক, যেমন ক'রেই হোক। কী হবে সে পরের কথা—আগে শুধু এ পাড়া থেকে চলে যেতে হবে, যত তাড়াতাড়ি সম্ভব।

প্রাণপণ ইচ্ছাশক্তিতে সীমাহীন লজ্জা থেকে অব্যাহতি পাবার কথা মনে রেখে যখন চলছিল তখন শরীরের কথা ভাবেনি একবারও। যন্ত্রের মতোই হেঁটে গেছে শুধু। কিন্তু শ্যামবাজারের কাছাকাছি এসে—কোথায় এসেছে সে সম্বন্ধে সচেতন হ'তেই আর এক পাও চলতে পারল না। যখনই মনে হ'ল বাপের বাড়ির পাড়া থেকে বহুদূরে চলে এসেছে—তখনই সমস্ত শরীর যেন নিমেষে ভেঙে পড়ল। মাতালের মতো টাউরি খেতে খেতে সামনের একটা রকে বসে পড়ল।

ছেলেটার ঘুম ভেঙেছে অনেকক্ষণ—বাবার সঙ্গে কাথা কাটাকাটির সময়ই। কিন্তু কে জানে কেন ঐটুকু শিশু এই চরম বিপদের কোন আভাস পেয়েছে কিনা তার মতো করে—কোন কান্নাকাটিই করে নি। অচেনা জায়গা চারিদিকে অপরিচিতের

মুখ দেখে কেমন যেন হকচকিয়ে গেছে, ফ্যালফ্যালমুখী হয়ে চেয়ে চেয়ে দেখছে শুধু।

তবু—এখানে বেশীক্ষণ থাকবে না। খিদে পাবেই, পেয়েছেও নিশ্চয়। কখন খেয়েছে ওখানে, কী খেয়েছে কতটুকু খেয়েছে হেমন্ত তা জানে না তবু যতই খেয়ে থাক, খিদে পেয়েছে নিশ্চয়ই। এখনই খেতে চাইবে, না পেলে কাঁদবে। সুতরাং যা হোক একটা করতেই হবে, যে কোন একটা উপায়।

অগত্যা আবারও, মরা ঘোড়াকে চাবুক মারার মতো ক'রে শরীরটাকে ঠেলে তুলতে হ'ল। এতক্ষণ ধরে ছেলেকে কোলে রাখার ফলে হাতটাও অবশ আড়ষ্ট হয়ে উঠেছে। ছেলেকে নামিয়ে দিতে চাইল—একটু হেঁটে গেলে ভাল হয়, পারবেও হাঁটতে—কিন্তু সে চেষ্টা মাত্রেই ছেলেটা যেন সভয়ে ওকে আঁকড়ে ধরল সজোরে, কিছুতেই কোল থেকে নামল না।

অগত্যা সেই ভাবেই এগোতে হ'ল আবার।

এগনো মানে চলা। যার কোন গন্তব্য-স্থান নেই, যার পথের কোন লক্ষ্য স্থির হয়নি তার আর এগনো কি!

কী করবে তাও সে জানে না।

কোথাও কোন কাজ বা চাকরির যোগাড় করার চেষ্টা করবে?

কী কাজই বা করবে, কি কাজ চাইবে কার কাছে? কেই বা দেবে, কি ভরসায় দেবে!

এমনি সহস্র প্রশ্ন ওঠে মনের মধ্যে, যার কোন উত্তরই মেলে না কোথাও থেকে।

রান্নার কাজ করতে পারে। আশৈশব মায়ের কাছে থেকে অনেক ভাল রান্না শিখেছে—যেসব খাবার কি তরকারির কথা ওসব পাড়াগাঁয়ে কেউ কখনও শোনে নি পর্যন্ত। ঝিয়ের কাজ করতেও আপত্তি নেই তার। ক বছর শ্বশুর বাড়ি থেকে ক্ষার কাচা, ধানভানা, ধানসিদ্ধ, উঠোন ঘর নিকনো, বাসন মাজা সব কাজেই দক্ষতা এসেছে। কিন্তু আসল কথা কাজ পাওয়া। একটা ছেলেসুদ্ধ এই বয়সে কে কাজ দেবে। তার কোন পরিচয়ই তো দিতে পারবে না।

অথচ আর সময়ও নেই। দ্বিধা সঙ্কোচের অবকাশ নেই আর...

মূঢ়ের মতো অন্ধের মতো আবার চারদিকে তাকায় হেমন্ত।

সামনেই চোখে পড়ে এক বাড়ির রকে একটি বৃদ্ধ ভদ্রলোক বসে আছেন। খালি গা—বুকে যজ্ঞোপবীত পড়ে আছে অর্থাৎ ব্রাহ্মণ। বেশ সম্ভ্রান্ত ও সৌম্য চেহারা—তার দিকেই তাকিয়ে আছেন।

আর কিছু ভাবল না। হঠাৎ মনে হ'ল এ ঈশ্বরেরই নির্দেশ ওকে আশ্রয় দেবেন বলেই এঁকে এখানে বসিয়ে রেখেছেন।

সে অনেকখানি অকারণ নির্ভয়ে এগিয়ে গেল।

কিন্তু এ জীবনে কখনও এ ধরনের প্রার্থনা [illegible] কাছে কখনো প্রয়োজন হয়নি [illegible] এ ধরনের করুণা ভিক্ষা করতে শেখেওনি—তার পক্ষে এ কথা পাড়াই দুঃসাধ্য। কি বলতে হবে কেমন করে বলতে হবে তা জানে না, একটু ভেবে দেখারও সময় নেই। সে আর একটু কাছে গিয়ে বলে ফেলল, 'দেখুন শ্বশুর বাড়ির যন্ত্রণা সহ্য করতে না পেরে ছেলেকে নিয়ে কলকাতায় পালিয়ে এসেছি। এখানে কিন্তু চেনা লোক কেউ নেই। আমিও ব্রাহ্মণের মেয়ে—এই গুঁড়োটুকুকে নিয়ে বিধবা হয়েছি। যদি দয়া ক'রে একটু আশ্রয় দেন—যা করতে বলবেন তাই করব। রান্না বাসন মাজা যা বলবেন। আমি মাইনেও চাই না—শুধু যদি একটু আশ্রয় দেন আর দুটি খেতে দেন—'

কথা শেষ করতে পারল না। বৃদ্ধ ভদ্রলোকটির কদর্য মুখভঙ্গীর দিকে চেয়ে গলায় বাকী কথাগুলো যেন আটকে গেল। অমন প্রশান্ত সুদর্শন মুখ যে এমন কদাকার ও হিংস্র হয়ে উঠবে তা একটু আগে ভাবতেও পারা যায়নি। বৃদ্ধ একটা অদ্ভুত গলার স্বর টেনে এনে চোখদুটোর কুৎসিত ভঙ্গী করে বললেন, 'উঃ! তার কমে আর নেশা জমবে কেন! আমাকে কি একেবারে ভূষণ্ডোর বাঙাল পেয়েছ—যে তোমার ঐ কথা বিশ্বাস করব। যার সঙ্গে রস করে বেরিয়ে এসেছিলে তাকে আটকে রাখতে পারবে না? কদ্দিন ঘর করেছিলে? এ বাচ্চুরটিও কি তার? না বাচ্চুর সুদ্ধুর করে এনেছেল। তাই দুদিনেই শখ মিটে গেল ফেলে গঙ্গাস্নান করে দেশে ফিরে গেছে?'

না, চোখে আর জল নেই, কোন আঘাতেই আর চোখে জল আসে না।

অনুভূতিটাই যেন কেমন আচ্ছন্ন হয়ে গেছে। আঘাতের তীব্রতা বোধ হয় না—যতটা হওয়া উচিত।

তবু চোখমুখ জ্বালা করে উঠল আজও। বলল, 'কী বলছেন এসব! আমি আপনার মেয়ের মতো—'

'ইঃ! মেয়ের মতো। আমার মেয়ে হলে, ভদ্দরলোকের ঘরে জন্মালে এ কালামুখ আর দেখাতে না। তার আগে গলায় দড়ি দিতে কি গঙ্গায় গিয়ে ডুবতে!...লজ্জা ঘেন্না থাকে তো এ পাপ না বাড়িয়ে সব সুদ্ধু গঙ্গায় গিয়ে গা-ঢালা দাও। পাপের মূল সুদ্ধু নষ্ট হওয়াই ভাল। বিষের চারা গাছকেও বিশ্বাস নেই।—যাও যাও, আর কথা বাড়িও না। বেশী ন্যাকরা করলে কনেস্টবল ডেকে ধরিয়ে দোব।'

কথা আর বাড়াল না হেমন্ত।

বাড়ানোর কিছু নেইও।

সুস্পষ্ট নির্দেশ—বাবারও বাবার বয়িসী এই বৃদ্ধেরও।

গঙ্গায় গিয়ে গা-ঢালা দাও। গঙ্গার জল তো আর ফুরোয়নি।

তাই যাবে সে। এ জীবন আর রেখে লাভ নেই। মা গঙ্গার কোলে সব জ্বালার শেষ ক'রে দেওয়াই ভাল।

গঙ্গা কোন দিকে—আবছা ধারণা একটা ছিল।

সেই দিকে, পশ্চিম দিকে পথ খুঁজল আবার।

ঘুরতে ঘুরতে এক সময় গঙ্গার ধারে এসে পৌঁছল।

বোধহয় সামনেই এটা নিমতলার ঘাট। বাতাসে মড়া পোড়ার গন্ধ। কিন্তু কোন ঘাট জেনেই বা লাভ কি? ওর কাছে সবাই সমান। জল থাকলেই হল।

আন্দাজে আন্দাজে মেয়েদের ঘাটের দিকে এগিয়ে গেল। মেয়েদের ভীড় দেখে বুঝল মেয়েদের ঘাট এটা। বহুকাল আগে এক আধবার মার সঙ্গে গঙ্গাস্নান করতে এসেছে—সে কথা কিছুই প্রায় মনে নেই। গাড়ি করে এসেছে, গাড়ি যেখানে থেমেছে সেইখানেই নেমে গেছে। আশপাশে তাকিয়ে দেখবার দরকার হয়নি।

ঘাটে ঢুকল কিন্তু জলে নামা হ'ল না।

অথচ—এই সময়ই নানা সুবিধে—সেটা না বোঝার কথা নয়।

বহু মেয়েছেলে চান করছে—তার মধ্যে কে কতদূরে এগিয়ে গেল কে আর উঠল না অত লক্ষ্যও করবে না কেউ।

সব বুঝেও শেষ মুহূর্তে কেমন একটা ভয়। ইচ্ছাতুর যুক্তি কতগুলো—যা নিজের মনের কাছেই ওজর বলে মনে হচ্ছে।

যদি না ঠিক ডুবতে পারে! ডোবার চেষ্টা করলেও ডোবা যায় না অনেক সময়। আপনিই ভেসে ওঠে। সেই জন্যে ভরা কলসী গলায় বেঁধে ডোবে মেয়েরা কিম্বা ইঁট বা পাথর।

যদি ডুবে মরতে গিয়ে ডোবা না হয়—সে বড় কেলেঙ্কারী। লোক জানাজানি হৈ চৈ, থানা পুলিশ।

সে শুনেছে আত্মহত্যার চেষ্টা করলে পুলিশে ধরে। সাজা হয়। ভেসে না উঠলেও—কেউ যদি দেখে ফেলে? সে ডুবে মরার চেষ্টা করছে কেউ যদি লক্ষ্য করে?

দরকার নেই। তার চেয়ে অপেক্ষা করাই ভাল। আর একটু নির্জন হোক।

আশা বুঝি শেষ মুহূর্তেও যেতে চায় না।

নিজের এই মনকে আঁথিঠারটুকু নিজের কাছেও ধরা পড়ে। লজ্জিত হয়। তবু সেই ওজরটুকু আঁকড়ে ধরেই সময় নেয় খানিকটা। ঘাট জনহীন হবার অপেক্ষায় ঘাটেরই একটা ভিজে সিঁড়ির ওপর বসে পড়ল।......

অল্প বয়স, জীবনের সবটাই এখনও সামনে পড়ে আছে।

সম্ভোগের অনেক সম্ভাবনাই বিধবা হবার সঙ্গে সঙ্গে ঘুরে গেছে এটা ঠিক—তবু শুধু বেঁচে থাকারও একটা আনন্দ আছে বৈকি।

যে দুঃখে মেয়েছেলে—বা মানুষ আত্মহত্যা করে—সে দুঃখ এটা নয়। স্বামীর সঙ্গে এমন ভালবাসার সম্পর্ক হয়নি যে, সে বিবাহ বিচ্ছেদে আত্মঘাতী হতে ইচ্ছে করবে।

আঘাত যা পেয়েছে সে শুধু অবিচারের আঘাত, অন্যায়ের আঘাত। তাতে মন ক্ষুব্ধ হয়, রুষ্ট হয়। প্রতিশোধের কথা আসে। সে অন্যায় অবিচার অকারণ নির্যাতন মেনে নিয়ে নিঃশব্দে মরে যেতে চায় না।

তাছাড়া এই ছেলেটা। এ জীবনের প্রতি প্রবল আকর্ষণ। কঠিনতম স্নেহের বন্ধন। অবলম্বন, আশা।

এর জন্যেই আরও বাঁচতে ইচ্ছে হয়।

একে বড় করার, মানুষ করার, সুখী হবে এ—মনের সমস্ত কামনা আকাঙ্ক্ষা এখন এই একটি বিন্দুতে এসে কেন্দ্রীভূত হয়েছে।

একে সুদ্ধ নষ্ট করবার—এই জীবন মুকুলটিকে অকালে ছিঁড়ে ফেলার কী অধিকার আছে তার? সে-ই নিয়ে এসেছে। এর চেয়ে সেখানে রেখে এলে হয়ত তারা প্রাণে মারত না, হয়ত নিজের বংশের ছেলেকে বাঁচিয়েই রাখত শেষ অবধি।

একে রেখে যাবে না কি?

এই দুঃখের শিশুকে দেখে কি কারও দয়া হবে না? একটু আশ্রয় দেবে না কেউ?

সঙ্গে সঙ্গেই মনে হল ভিখিরীরা এই সব ছেলেদের নিয়ে যায়—কানা খোঁড়া করে

দেবা ইচ্ছে করে। মাগো, সে দুর্গতির কথা যে ভাবাই যায় না! তারচেয়ে মেরে ফেলা ভাল। আত্মহত্যা করলে নাকি নরকে যায় মানুষ, তবু দুজনে একসঙ্গে যেতে পারবে তো!

এলোমেলো চিন্তার শেষ নেই।

বিহ্বল শূন্য দৃষ্টিতে গঙ্গার দিকে তাকিয়ে রইল। লক্ষ্য করার চেষ্টা করল, মনটা কষ্টকর দুশ্চিন্তা থেকে যদি সরিয়ে আনা যায়।

কত মেয়ে স্নান করছে। কেউ নামছে, কেউ স্নান সেরে উঠে যাচ্ছে। কেউ-বা জলে দাঁড়িয়েই আহ্নিক সেরে নিচ্ছে। ওর মধ্যেই আবার দু-তিনজনে দাঁড়িয়ে গল্প করছে কোথাও, কোমর বা বুক পর্যন্ত জলে নেমে—দাঁড়িয়ে থাকার কারণ হিসেবে অকারণেই কুলকুচো করছে খানিকটা পর পর।

এরা সকলেই কত সুখী, কত নিশ্চিন্ত। তার মতো এমন দুর্ভাগিনী বোধ হয় কেউ নেই এদের মধ্যে। ভগবান সমস্ত দুর্দশা ও দুঃখ শুধু বুঝি তার জন্যেই রেখে দিয়ে-ছিলেন. অদৃষ্টের সমস্ত ষড়যন্ত্র শুধু এই অনাথা অধীরা মেয়েছেলেটির জন্যই।

ভাবতে ভাবতে আপনিই এক সময় যেন বুক চিরে একটা হাহাকার ও দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এল, 'মা মাগো!'

সঙ্গে সঙ্গেই সচেতন হয়ে উঠল, কে কি ভাববে, কারও কানে গেল কিনা। ছি ছি। কেউ যদি এখনই প্রশ্ন করে, 'কি হয়েছে বাছা তোমার?'

নিজে নিজেই অপ্রতিভ হয়ে উঠে তাড়াতাড়ি মুখ তুলে চারিদিকে তাকাতে গিয়ে নজরে পড়ল. এর ভেতর—সে এতক্ষণ অন্য দিকে তাকিয়ে ছিল বলে দেখতে পায় নি—একটি মহিলা এসে তার খুব কাছে দাঁড়িয়েছেন এবং এক দৃষ্টিতে তাকে লক্ষ্য করছেন।

কতক্ষণ ধরে এমন দেখছেন কে জানে, কখন এসে দাঁড়িয়েছেন তা সে টেরও পায় নি—তবে দাঁড়িয়ে থাকার ভঙ্গীতে মনে হল অনেকক্ষণই এসেছেন।

এই অযথা ও অভদ্র কৌতূহলে বিরক্ত হবারই কথা, বিরক্ত বোধ করেও ছিল। সর্বনাশের সামনে দাঁড়িয়ে মানুষ তখন দিশাহারা হয়ে বাঁচবার জন্য আকুলি-বিকুলি করে, নিজের চিন্তাতেই ক্লিষ্ট ও উত্তাক্ত থাকে তখন অপরিচিত লোকের গায়ে পড়া অন্তরঙ্গতা অসহ্য মনে হয়। কিন্তু, ভুরু কুঁচকে মুখটা ফিরিয়ে নিতে গিয়েও ফেরাতে পারল না, চোখ দুটো কেমন যেন আটকে গেল। দেখল কৌতূহল বা কৌতুক নয়—মহিলার সুন্দর দুটি চোখ থেকে সহানুভূতি ও আন্তরিকতাই যেন ঝরে পড়ছে।

এবার ভাল করে তাকিয়ে দেখল।

মধ্যবয়সী মহিলা—বয়স ত্রিশ থেকে পঁয়ত্রিশ হবে—খুবই রূপসী ছিলেন নিশ্চয় এককালে তবে এখন বয়সের সঙ্গে শরীর একটু ভারী হয়ে পড়ায় তত জৌলুস আর নেই। তবে মোটা নন, কুরূপা তো ননই। স্থিরযৌবনা বলা চলে অনায়াসে। পরনে চওড়া পাড় সাদা গরদের শাড়ি, গায়ে এক গা গহনা—ধনী গৃহিনী তাতে কোন সন্দেহ নেই।

এবার মহিলা কথা বললেন, 'কি হয়েছে ভাই? অমন করে বসে আছ কেন?...আহা, মরে যাই, মরে যাই—বাছাটার মুখখানা শুকিয়ে গেছে যে। কোন বিপদ হয়েছে—? বলতে নেই—কেউ মারা-টারা যায় নি তো?'

উত্তর দেবার চেষ্টা করল হেমন্ত কিন্তু সে চেষ্টায় ঠোঁট দুটোই কাঁপল শুধু, গলা দিয়ে কোন স্বর বেরোল না। যে চোখের জল চিরদিনের মতো শুকিয়ে গেছে বলে মনে হয়েছিল—মনে হয়েছিল অন্তরে অশ্রুর উৎস পর্যন্ত শুকিয়ে গেছে—সহসা দুই চোখ জ্বালা করে সেই জলই দু চোখের কূল ছাপিয়ে ঝর ঝর করে ঝরে পড়ল।

এতেই বোধ করি অনেকখানি উত্তর পেয়ে গেলেন ভদ্রমহিলা। তিনি ওর পাশে কাদামাখা সিঁড়ির ধাপটাতেই বসে পড়লেন। বোধহয় কোন দাসী বা আশ্রিতা কেউ সঙ্গে ছিল, সে ব্যস্ত হয়ে কি বলতে গেল, বোধহয় দামী শাড়ির পরিণামের কথাটাই—ইঙ্গিতে তাকে নিরস্ত করে সরে যেতে বলে একেবারে ওকে জড়িয়ে ধরলেন, 'আহা বাছারে।...এমন করে বসে আছিস—মরবার মতলব এঁটেছিলি বুঝি? কদিন খাস নি?...এমন ফুলের মতো সুন্দর মুখ শুকিয়ে আমসি হয়ে গেছে।...কি হয়েছে বল দিকি? কপাল তো এই বয়সেই পুড়ে গেছে দেখছি. নইলে ভাবতুম বরের সঙ্গে ঝগড়া করে ডুবে মরতে এই-ছিস।...কি হয়েছে খুলে বল আমাকে? আমি তোর বড় বোনের মতো—আমার কাছে লজ্জা করিস নি।'

সেটুকু বাঁধ তখনও ছিল—লজ্জার সংকোচের সম্ভ্রমবোধের—এই সহানুভূতি ও স্নেহের বন্যায় তা ভেসে তলিয়ে গেল। হেমন্ত ওঁর বুকের মধ্যে মুখটা গুঁজে দিয়ে হুঁ হুঁ করে কেঁদে উঠল।

মহিলা বাধা দিলেন না, বৃথা সান্ত্বনা দেবারও চেষ্টা করলেন না। খানিকটা পরে—আবেগের প্রাথমিক প্রবণতা কমে এসেছে বুঝে সস্নেহে সযত্নে ওর মুখটা একটু তুলে ধরে আস্তে আস্তে বললেন. 'চার-দিকে ভিড় জমে গেছে ভাই. এখনই নানানখানা কথার ছিষ্টি হবে: চ' ভাই একটু কষ্ট করে উঠে, আমার বাড়ি চ'—গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে. এই কাছেই বাড়ি যেতে যেতে সব শুনব। কিম্বা বাড়ি পৌঁছেই সব বলিস ঠাণ্ডা হয়ে।'

'বাড়ি' শব্দটা শুনে উঠতে গিয়েও একবার একটু ভয়চকিত দৃষ্টিতে তাকাল হেমন্ত ওঁর মুখের দিকে।

চোখের পলকে সে তাকানোর অর্থ বুঝে নিয়ে মহিলা হেসে বললেন, 'ভাবছিস যে আমি ভুলিয়ে নিয়ে গিয়ে কোন বিপদে ফেলি?...তা মরতেই তো যাচ্ছিলি, মরার বাড়া আর গাল কি?'

'মরার বাড়াও জিনিস আছে বৈ কি দিদি মেয়েদের। আপনিও তো মেয়েছেলে, জানেনই তো।...আমি ভদ্রঘরের মেয়ে, বামুনের মেয়ে—আমার কাছে প্রাণের চেয়ে ইজ্জতের দাম বেশী। সেই বাঁচাতেই আজ এখানে মরতে এসেছিলুম।'

মহিলা স্থির দৃষ্টিতে ওর মুখের দিকে চেয়ে বললেন, 'ইজ্জৎ যে বাঁচাতে চায়—কারও সাধ্য নেই তার সে ইজ্জৎ নষ্ট করে। আর কিছু না হোক মরা তো রইলই। সেটা তো হাতের পাঁচ!'

আর কথা বাড়াল না হেমন্ত। সত্যিই চারিদিকে তখন কৌতূহলী স্নানার্থীদের ভিড় জমে গেছে। তা ছাড়াও, একে অবিশ্বাস করার জন্য একটু লজ্জিতও মনে মনে। এঁর দ্বারা তার কোন অনিষ্ট হবার আশঙ্কা আছে তা মনে হয়ও নি, এখনও হল না। এক মুহূর্তের জন্য সামান্য যে দ্বিধাটুকু দেখা দিয়েছিল সে নিতান্তই সংস্কারবশে—তার মূলে কোন সত্যকার যুক্তি ছিল না।

ঘাটের বাইরেই গাড়ি দাঁড়িয়েছিল, বড় জুড়ি গাড়ি।

সহিস দোর খুলে দিতে আগে হেমন্তকে উঠিয়ে নিজে তার পাশে উঠে বসলেন। সঙ্গের মেয়েছেলেটিও উঠতে যাচ্ছিল, তাকে বললেন, 'তুমি আজ একটু কষ্ট করে হেঁটেই এসো চারুদি, এর সঙ্গে নিরিবিলি দুটো কথা বলতে চাই।'

চারু খুশী হল না, বলাই বাহুল্য। কিন্তু বলতেও পারল না কিছু। পরে জেনে-ছিল হেমন্ত, সে ওপরতলার অর্থাৎ সঙ্গে সঙ্গে থেকে ফাই-ফরমাস খাটা, তেল-মাখানোর, বাতাস করার ঝি। উনি বয়স হিসেবে সব দাসীদেরই কাউকে দিদি কাউকে মাসী বলেন।

চারু বেজার মুখে ভিজে কাপড়ের পুঁটুলিটা সামনের সীটের গদীতে আলতো ফেলে দিয়ে হন হন করে এগিয়ে গেল।

মুচকি হেসে ভদ্রমহিলা দরজা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে কোচম্যানকে ডেকে বললেন, 'আনন্দময়ী তলায় একটু একবার রেখো তো সওয়ার সিং, একটু পেন্নাম করে নোবো।'

তারপর হেমন্তর দিকে ফিরে বললেন, 'দুধের বাছা কিনেছে নৌকোয় পড়েছে একেবারে। পুজুরী আমার চেনা, খুব ভালবাসে, খাতিরও করে। চাইলেই এক মুঠো মোণ্ডা তুলে দেবে'খন—পেসাদ। ছেলেটাকেও খাওয়া, নিজেও দুটো মুখে দে। মায়ের পেসাদে দুর্গতির নাশ করে—বিপদ-আপদ কাটিয়ে দেয়।'

—ক্রমশঃ

একটি বিস্মৃত গ্রামীণ শিল্পীচরিত

• মৃণাল গুপ্ত •

প্রাত্যাহিক চেনা-অচেনার ভিড়ে হঠাৎ এক একটি দুর্লভ মুখাবয়ব তাঁর অন্তরের কান্না-হাসির অব্যক্ত ভাষা নিয়ে আমাদের হৃদয়ের আঙিনায় ক্ষণিকের অতিথি হয়ে এসেও স্মৃতির নিভৃত অন্দরে আত্মীয়ের মত অনায়াসেই ঢুকে পড়ে। এরপর ক্ষণ যায়, দিন যায়, মাস ফুরায়, বছরও কাটে। তারপর কর্মব্যস্ততার হয়তো কোন এক ক্লান্ত অবসরে সেই মুখ সেই অবয়ব অনেক স্মৃতি-বিস্মৃতির ঘোলা জল ঠেলে শম্বুক প্রাণীর মত মহাশূন্যে প্রশ্নবোধক মুখ তোলে। যেন বলে, ভুলে গেছ কি আমায়? নতুন পুরানো কত মুখের আদলে আমার মুখচ্ছবি কি মনে পড়ে? পুরনো স্মৃতি তখন নড়ে-চড়ে ওঠে। পিছু ফিরি। স্মৃতির রঙ-রসে মনের ক্যানভাসে চোখ রাখি। রেখা টানি—প্রশস্ত ললাটের সেই বলিরেখা, সেই অর্ধনিমীলিত অক্ষিপটের নীচে স্থির চাহনি, পক্ককেশ, শুভ্র শ্মশ্রু, নাকের দুপাশে চিবুকের স্খলিত মেদের বঙ্কিম ভঙ্গী। পুরোপুরি মুখখানিই মনে পড়ে। অবয়বটি চোখে ভাসে। কানে বাজে তাঁরই স্বর, তাঁরই ভাষা। মনে হয় তখন, সেই শান্ত সকালে আবার দুজনে মুখোমুখি বসি—কথা বলি।

কিছুদিন ধরে শতায়ু রাখাল মিস্ত্রী আমার মনের স্মৃতিকে এমনি করেই আচ্ছন্ন করে রাখছিল। কিন্তু মন চাইলেই সাক্ষাৎ দর্শনের সুযোগ যে ছিল না। কারণ, আমার ও রাখাল মিস্ত্রীর জগৎ সম্পূর্ণ আলাদা। আমি কর্মব্যস্ত রাজধানী কলকাতার ব্যস্ততার সামিল হয়েছি আর রাখাল মিস্ত্রী রাজধানীর শতাধিক মাইল দূরে এক জেলা শহরের শেষে ছোট্ট এক শান্ত গ্রামের মাটি ঘেরা ঘরের ছনের তলার পুংগু অধিবাসী। তবুও গিয়েছিলাম দীর্ঘ সাত বছর বাদে, এই পূজাবকাশে। সাত বছর আগে চৌষট্টির গোড়ায় এক শীতের সকালে আমাদের দুজনের প্রথম সাক্ষাৎ—বরং বলি পরিচয়। জেলা মুর্শিদাবাদের শিল্প ও স্থাপত্যের নিদর্শনগুলোকে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখছিলাম। ছবি নিচ্ছিলাম। শহর বহরমপুর ও গঞ্জ কাশিমবাজারের কিছু মন্দির ও বালাখানার চুন-বালির অপূর্ব অলংকরণ দেখে বড় অভিভূত হয়ে ছিলাম। বহরমপুরে এক কাণা গলির পাশে গোপেন মৈত্রের শ্যামসুন্দর মন্দির, খাগড়ার ব্যবসায়ী মহল্লায় প্রতাপ সাহার গৃহ-দেবতার মন্দির, কাশিমবাজার রাজবাড়ীর অভ্যন্তরে লক্ষ্মী-নারায়ণ মন্দির—এদের গায়ের আভরণে এমন কিছু বৈশিষ্ট্য ছিল যা দেখে মুগ্ধ না হয়ে পারি নি। কর্ণিক ও হাতের কারিগরিতে মন্দিরের গায়ে গায়ে এমন সজীব ধানের শিষ, লতাপাতার লীলায়িত ভঙ্গিমায় চমৎকার রুক্ষকথা, পত্র শোভিত ফলবতী কদলী বৃক্ষের আনত ভঙ্গি, মঙ্গলকলসের মাঙ্গলিকা, প্রস্ফুটিত পদ্মের সুষমা, প্রকৃতি, প্রাণী, ফুল, লতা-পাতার অলংকরণে সুন্দর অর্থবহতা এনে ধর্মীয় তত্ত্বকথার ভাবব্যঞ্জনা, এ সবই আমাদের বড় মুগ্ধ করেছিল। এমন মুগ্ধ তো আমরা কতবারই হই। কোণারক, খাজুরাহো, হালেবিদ কিংবা কোন বিখ্যাত মন্দিরের অলংকরণ ও মূর্তি ভাস্কর্যের দেহবল্লীর ছন্দময় বিন্যাস দেখে আমরা বহুবারই বিমোহিত হই। তাদের মুখভঙ্গিমায় কখনো পার্থিব বা অপার্থিব উপলব্ধির অভিব্যক্তিতে একেবারে মোহাবিষ্ট হয়ে পড়ি। কিন্তু এদের পশ্চাতের শিল্পী মানুষটির দেহাবয়বের প্রতি কতটুকু আকর্ষণ অনুভব করি! তাঁর কতটুকু পরিচয়ই বা আমরা পাই।

দেব-দেউলের সংখ্যা বাংলায়ও বড় কম নয়। ভৌগোলিক প্রতিকূলতার সঙ্গে যুঝে দু-তিন শতকের অনেক জীর্ণ মন্দির তাদের বুকের আভরণ নিয়ে শহরে গ্রামে গঞ্জে দাঁড়িয়ে রয়েছে। এদের দিকে দৃষ্টিকে প্রসারিত করলে বিচিত্র রসের আস্বাদ মেলে। পোড়ামাটি অথবা চুনবালির উপরে জীবনের ধ্যান-ধারণার বিচিত্র মিছিল। রামায়ণ, মহাভারত, কৃষ্ণলীলার বিচিত্র কথা; সমসাময়িক জীবনের শোভাযাত্রায় কত রাজা, কত মহারাজা, কত বিবি, কত সাহেব,—জ্যামিতিক গঠনেও কত মনমুগ্ধকর কারুকারিতা! এদের সবার মাঝে এক জায়গায় ফলকে খোদিত দেখা যায় বিত্তবান ধর্মপ্রাণ ব্যক্তির মন্দির প্রতিষ্ঠার সাল-তামামির ঠিকুজিসহ স্বীয় নামের প্রচার কথা। কিন্তু কোথাও মিলবে না শিল্পীদের নাম-ধাম ঠিকানার কথা। তাই শহর বহরমপুর আর গঞ্জ কাশিমবাজারের মন্দির দেখতে গিয়ে যখন শতায়ু রাখাল মিস্ত্রীর নাম-ঠিকানার হদিশ পেলাম তখন শিল্পী সন্দর্শনে না যাওয়া পর্যন্ত মনে মনে বড় অস্বস্তি বোধ করছিলাম। চৌষট্টির শীতের এক সকালে উঠেই বড় উত্তেজনা নিয়ে শিল্পী সন্দর্শনে গিয়েছিলাম। ফিরে এসেই রুদ্ধনিঃশ্বাসে সাক্ষাৎকারের জবানবন্দী লিখেছিলাম। সেই জবানবন্দীর মুসাবিদা থেকেই লিখি।

•

খুব বেশী দূরে নয়। শহর বহরমপুরের প্রান্ত ছাড়িয়ে যে পথ কলকাতামুখী হয়ে গেছে, তাকেই ধরে কিছুটা এগিয়ে বাঁহাতে সাদাসিধে গ্রাম 'বোলতলা'। গ্রামের মেঠো পথে নামি। শিল্পী দর্শনের যাত্রী আমি। রদ্যাঁরও নয়, এঞ্জেলোরও নয়, যেন সর্বযুগের নাম না জানা শিল্পীদলের প্রতিনিধিরই দর্শনকামী।

'—ও কে এলো? কে গা? উঃ, কথা বলছো না কেন গা? ... কি জানি, কারা যেন এলো!'

অতি সন্তর্পণে যেন চোরের মতই এসে দাঁড়ালাম আমরা দুজন। কথা আমরা সত্যিই বলিনি তখনও। দু চোখ ভরে শুধু দেখছিলাম। দেখছিলাম, রাখাল মিস্ত্রীর বাহ্যাবরণটাকে। যেন কোন ভাস্কর্যকেই খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখছি। শুভ্র কেশ আর শুভ্র শ্মশ্রু। তারি মাঝে মুখানি যেন বয়স

শতায়ু রাখাল মিস্ত্রী

চুনবালি দিয়ে রাখাল বহরমপুরে শ্যামসুন্দর মন্দিরে ফলবতী কদলী-বৃক্ষ রচনা করেছেন।

কাশিমবাজার রাজবাড়ীর মন্দিরগাত্রে রাখালের হাতের কারিগরি।

আর নিঃসঙ্গতার ভারে বড় বেশী ভারী। দৃষ্টিহীন চোখের তারা দুটো স্থির ও নিশ্চল। শুধু তারার উপর চোখের পাতা-দুটোই কেবল বিরামহীন চঞ্চল। পরনে ছোট্ট গামছা। গায়ে খণ্ড আস্তরণ। নিম্নাঙ্গ অতি শীর্ণকায়। রক্তহীনতায় ঊর্ধাংশ স্ফীতকায়। বয়সের ছাপ যতটা নেমেছে দেহে ততটা নামেনি মুখে।

তাঁর নড়বড়ে মাটির ঘরের কাছেই প্রশস্ত দাওয়া। আশেপাশে ফলবতী বৃক্ষের প্রসারিত ছায়া। তারই তলে এক কোণে অবিন্যস্তভাবে পাতাভেজা ছেঁড়া চট। তার উপরেই একাকী বসে শতায়ু রাখাল মণ্ডল। পাশেরই মেঠো পথে কর্মচঞ্চল কত মানুষের আনাগোনা। পঙ্গু রাখাল মিস্ত্রীর বসে বসে কেবল তাদেরই পদধ্বনি শোনা। আর কর্মহীন অলস দিনগুলোর মুহূর্ত গোনা।

প্রশ্ন আর প্রশ্নবোধের মাঝে নীরবতার সমস্ত প্রাচীর ভেঙে দিয়েছিলাম, বলে-ছিলাম, 'আমরা এসেছি আপনার কাছে, আপনাকে দেখতে, আপনার সঙ্গে কথা বলতে।'

হঠাৎ চমকে উঠলো রাখাল মিস্ত্রী। আনত মাথাটাকে তুলে ধরে ভ্রূযুগল কুঞ্চিত করে, দৃষ্টিহীন চোখদুটোকে বিস্ফারিত করে বলেছিলো, 'কে? কে গা?'

—'শহর থেকে আসছি আমরা। আপনার হাতের কাজ দেখে আমাদের খুব ভাল লেগেছে। তাই আজ ভোরে উঠেই চলে এলাম আপনাকে দেখতে।'

—'আমাকে?' গলায় পুরোপুরি অবিশ্বাসের সুর। কিছুক্ষণ নীরব থেকে মুখে নির্লিপ্ত হাসির রেখা টেনে,—'তা কি দেখছেন?' মুহূর্তেই মিলিয়ে গেল হাসির রেখা। মুখে চোখে থমথমে ভাব। তারপরই বিকল চোখদুটো দিয়ে ক্রমাগত অশ্রুপাত।

—'এ কি! আপনি কাঁদছেন! কতদূর থেকে এলাম আমরা আপনার সঙ্গে কথা বলবো বলে। কার কাছে আপনি কাজ শিখেছিলেন, কোথায় কোথায় আপনি কাজ করেছেন, কেমন করে আপনি কাজ করতেন? —এমন কত কথা জানার আছে।'

—'ভুলে গেছি, ভুলে গেছি। সব মনে হয় না। কিছু কিছু মনে হয়।' গামছায় চোখ মুছে অত্যন্ত কাঁপা কাঁপা স্বরে কথা বলে রাখাল মিস্ত্রী।

বিস্মৃত আজ রাখাল মিস্ত্রী। তাঁর সুদীর্ঘ কর্মমুখর জীবনের সমস্ত সুখ স্মৃতি আজ বিস্মৃতির অতলে ডুবে গেছে। স্মৃতির সমস্ত অংশই আজ বন্ধপ্রায়। তবু, তাঁকে বার বার নানাভাবে প্রশ্ন করি, যেন তাঁর স্মৃতির শুষ্ক সরোবরে ছোট ছোট ঢিল ছুঁড়ে মাঝে মাঝে তরঙ্গ তুলি। থেকে থেকে স্মৃতি জাগে, পুরনো কথা কিছু কিছু মনে পড়ে। কবে বাংলার আর আসামের কোন কোন প্রত্যন্ত শহরের মন্দির আর বালাখানার খিলানে খিলানে কারুচিহ্ন রেখেছিল তারই এক অস্পষ্ট বর্ণনা। এরই সঙ্গে মাঝে মাঝে দু-একজন সহৃদয় পৃষ্ঠপোষকের চরিত্র-চিত্রণ, মাঝপথে আবার বিস্মরণ, 'ধুত্তোর কিছু মনে পড়ে না, ধুত্তোর ভুলে গেলাম। সব ভুলে গেলাম।' কপালে বার বার সজোরে করাঘাত। সে এক বড় করুণ দৃশ্য! বলুন, ভাবা দিয়ে এমন ছবি কেমন করে আঁকি!

'...বাবার চাষের কাজে কিছুতেই মন বসলো না আমার। বাবার সঙ্গে ঝগড়া করলাম। ষোল বছর বয়সে দুর্লভ মিস্ত্রীর যোগানদার হলাম। ধীরে ধীরে কর্ণিক ধরলাম। তারপর...' তারপর সেই কর্ণিক হাতে করেই শুরু হল রাখাল মিস্ত্রীর জীবনের পথ-পরিক্রমণ। এ-গ্রাম থেকে সে-গ্রাম, এ শহর থেকে সে শহর, এ জেলা থেকে সে জেলা, এ প্রদেশ থেকে সে প্রদেশ। কত মন্দিরের মাথা উঁচু হলো, কত বিগ্রহের প্রাণ প্রতিষ্ঠিত হলো, কত কোঠাবাড়ী অলঙ্কৃত হলো, কত পরিবারই সুখে ঘর বাঁধলো, কিন্তু রাখাল মিস্ত্রীর ঘর চিরকাল অবাঁধাই থেকে গেল। জিজ্ঞাসা করলাম, 'কেন আপনি বিয়ে করলেন না?'

মুচকি হেসেছিল, 'এই রাজের কাজই ছিল আমার পরিবারের বড় সতীন। তাই স্ত্রী আমার ঘরেই ঢুকলো না। যখন রাজে খেটেছি, তখন ক'দিনই বা বাড়ীতে থেকেছি। রাতদিন কেবল কাজের কথাই ভেবেছি, আর কাজের পেছনেই ছুটেছি।'

—'বহরমপুরে আপনার সব কাজই তো

বহরমপুরের শ্যামসুন্দর মন্দিরে রাখালের হাতের চিহ্ন

আমরা দেখেছি। এমন নিখুঁত শঙ্খ, এমন সজীব ধানের শিষ, এত সুন্দর লতাপাতা, এমন চমৎকার কৃষ্ণকথা আপনি কেমন করে মন্দিরে গেঁথে দিতেন?'

—'কাজ যখন করতাম, তখন তন্ময় হয়ে করতাম। খাওয়া-পরা সব ভুলে যেতাম। আমার চারিদিকে যা কিছু দেখতাম, যা কিছু শুনতাম,—গাছপালাই বলুন, ফলমূলই বলুন, আর কৃষ্ণকথাই বলুন, মনে হতো এরা যেন সব কথা বলে! এদের ভেতরের অনেক কিছুই যেন আমি দেখতে পাই! গভীর রাতে প্রায়ই স্বপ্ন দেখতাম, যেন আমি প্রাণপণে কর্ণি চালাচ্ছি সেই রূপকে ধরবার জন্য। যে ছবি আমি চোখে দেখছি তা যেন এক্ষুনি হারিয়ে যাবে। ...হঠাৎ ঘুম ভেঙে যেতো। প্রতিদিন বালিশের কাছে শ্লেট-পেন্সিল আর লম্ফ নিয়ে শুতাম। মাঝরাতে উঠে বসেই শ্লেটের গায়েই সেই স্বপ্নের রূপকে এঁকে নিতাম। এমন কত রাতে হয়েছে! কিন্তু দিনের বেলায় যখন কর্ণি দিয়ে সেই রূপকে ধরতাম তখন মনে হতো এ যেন কিছুই হলো না। ভীষণ দুঃখ হতো তখন। মনে হতো কর্ণি চালানোই ছেড়ে দেব। কিন্তু ছাড়তে কি পারতাম!'

যে শিল্পী মানুষটির সঙ্গে কথা বলছি তার চেয়েও একজন বড় শিল্পী তার অন্তরে বসে রয়েছে। এ আক্ষেপ শুধু রাখাল মিস্ত্রীর নয়, এ যে সর্বযুগের, সর্ব মহান শিল্পীর অন্তরের অসীম আক্ষেপ।

—'আসুন, আমরা একটা মন্দির তৈরী করি। খুব বড় মন্দির, খুব সুন্দর মন্দির। আপনি বসে বসে শুধু কর্ণি চালাবেন, আর আমরা আপনার সমস্ত কাজের যোগানদারি করবো। কত সুন্দর কাজ থাকবে তাতে, কত রকমের কথা! কোন রাম কথাও নয়, কোন কৃষ্ণ কথাও নয়। থাকবে আপনার কথা, আমার কথা, আমাদেরই মত সাধারণ পাঁচজনের কথা। কি পারবেন না?'

—'কেন পারবো না! পা-দুটো নাড়তে পারি না, কিন্তু হাত দুটো? হাতে তো এখনও জোর আছে। রাজের কত সরু কাজ করেছি, কত পুরস্কার পেয়েছি, কত বাবুরা ভালো বেসেছেন। কাশিমবাজারের রাজা, দীঘাপাতির রাজা...।' নিষ্প্রভ প্রদীপটা যেন আর একবার দপ করে জ্বলে ওঠে। পঙ্গু মনের সামনে থেকে আয়ুর প্রতিটি ধাপে তিলে তিলে জমে ওঠা মহাকালের জগদ্দল পাথরটা যেন মুহূর্তের জন্য সরে যায়। পঙ্গু, স্থবির, নিশ্চল মনের অস্বচ্ছ দর্পণে যেন আর একবার প্রতিফলিত হয় সারি সারি মন্দির, বড় বড় কোঠাবাড়ী, কারুময় প্রশস্ত খিলান, ...মণীন্দ্র নন্দী, মহিত মৈত্র, দীঘাপতি, রাজা।—হ্যাঁ, হ্যাঁ, পারবো, পারবো। সবই তো পারবো। কিন্তু কি দিয়ে দেখবো? কোন চোখে কর্ণি চালাবো?' এত উচ্ছলতা, এত প্রবণতা, এত আত্মবিশ্বাস মুহূর্তেই যেন একেবারে ধ্বসে গেলো। রাখাল মিস্ত্রী আবার কান্নায় ভেঙে পড়লো।

অপ্রয়োজনীয় আজ রাখাল মিস্ত্রী। তাঁর সকল সহযাত্রীই এখন গতায়ু হয়েছে। কেবল রাখাল মিস্ত্রীই তাঁর ভাইয়ের নাতি আর নাতবৌয়ের শান্তির সংসারে অশান্তির বোঝা হয়ে চেপে আছে। বিশ বছর হল তার চোখের আলোটি নিভে গেছে। পৃথিবীর রূপ-বৈচিত্র্যের আর কোন বার্তাই তার কাছে ধরা পড়ে না, প্রকৃতিও আর কথা বলে না। এত আলোময় পৃথিবীর অধিবাসী হয়েও আলোহীন এক অন্ধকারে নির্বাসিত সে। পঙ্গু, স্থবির, চলৎশক্তিহীন,—তবুও মৃত্যুহীন। চিকিৎসার দৌলতে জীবনের সমস্ত সম্পদই একে একে খোয়া গেছে। অমূল্য পুরস্কার, অমূল্য মেডেল মূল্যহীন দামে বিকোতে হয়েছে, তবুও দেহ নীরোগ হল কৈ? বয়সের সমস্ত রোগই তো আরও বেশী করে জাঁকিয়ে বসেছে। পা-দুটো অবশ হয়েছে, শিরদাঁড়ায় টান ধরেছে, মাজায় ব্যথা নেমেছে। শরীরের অনেক যন্ত্রই অনেক বেশী অকেজো হয়েছে।

•

তারপর দীর্ঘ সাত বছর কেটে গেছে। এবার পুজোনকালে বহরমপুরে পৌঁছে রাখাল মিস্ত্রীর বাড়ী গিয়েছিলাম। পশ্চিমের মেঘকাটা তখন নরম রোদ। সবুজ মাঠ, টলটলে ডহর, বন-বাদাড়ের মাথায় মাথায় আলো-ছায়ার নাচুনি। বাস থেকে নেমে মেঠো রাস্তা নিয়েছি। ছ' বছরের পরিবর্তন লক্ষ্য করছি মাঝে মাঝে কুঁড়ে ঘরের জায়গায় পাকা বাড়ী। মুদিখানায় মনোহারি জিনিষের ভিড়। তারপরে ট্রানজিস্টার। পাশের এক উপচানো ডহর থেকে জল রাস্তা পাড়িয়ে পাশের ডহরে সশব্দে পড়ছিল। কয়েকটি খালি গায়ে লেংটি পড়া ছেলে গামছা ধরে এই সুযোগটাকে কাজে লাগাচ্ছিল। জল ডিঙিয়ে, কিছুটা এগিয়ে ডাইনের বাঁক ধরেছি। বাঁয়ে বকুলের গাছ ঘিরে বারোয়ারী গ্রামীণ পুজোর এক বাঁধানো থান, যার উপর খড়ের কাঠামো শোয়ানো। ও-পাশের মাঠ থেকে আট-ন' বছরের একটি নেংটো ছেলে পায়ে ধুলো উড়িয়ে আসছিল। আমাদের দেখেই থমকে দাঁড়ালো।' তাকে জিজ্ঞাসা করলাম, 'এই, রাখাল মিস্ত্রীর বাড়ীটা চিনিস?' মাজা বেঁকিয়ে, এক পায়ে ভর দিয়ে আমাদের দিকে নীরব বিস্ময়ে তাকালো শুধু। মনে হচ্ছিল, সামনে বাঁধানো বেদীর ডাইনেই তো ওর বাড়ীটা ছিল। কিন্তু সেই দাওয়া, সেই ঘর, সেই শাখাবতী কাঁঠালের ছায়া। সব কিছু যেন মিলছিল না। পাশের রাংচিতার বেড়া-ঘেরা আঙিনার কোণ থেকে এক ঘোমটা ঢাকা বৌ হাত নেড়ে দেখালো—'ঐ যে রাখাল মিস্ত্রীর বাড়ী। যান, ঢুকে যান।' আমার স্ত্রী বাড়ীর আঙিনায় ঢুকে গেল, আমি আশা-নিরাশায় দোদুল্যমান মনে বাইরে দাঁড়িয়ে রইলাম।

কিছুক্ষণ বাদে স্ত্রীর পিছু পিছু এক দেহাতী মেয়ে এল। ঘোমটার ফাঁকে দেখলাম তার চোখ দুটো অশ্রু-সজল। আমার কাছে এসে প্রায় সশব্দে কাঁদতে বসলো। সেই রাখালের নাতবৌ। তার মুখেই শুনলাম, শতায়ু রাখাল মিস্ত্রী আজ পাঁচ বছর হল গতায়ু হয়েছে।

আলো অন্ধকার

সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়

এক একটা দিন ভোলা যায় না। জীবনে সেই সব দিন যেন নোঙর-করা নৌকোর মত স্মৃতির ভারে দুলতে থাকে। একটু দেরী হল অফিসে পৌঁছতে। আজকাল আর সময়কে কোন কিছুতেই বাঁধা যায় না। সময়ের হিসেবে স্থানের দূরত্ব যেন বেড়েই চলেছে। একই যানবাহনে একই জায়গা থেকে আগে যে সময়ে ডালহাউসী পৌঁছোতুম এখন তার চেয়ে অনেক বেশী সময় লাগে। এর একাধিক কারণ। আমরা যে অঞ্চলে রয়েছি সেখান থেকে অনিবার্য কারণে অনেক সুযোগ-সুবিধেই ক্রমশ অন্তর্হিত হচ্ছে। একটা বড়, প্রধান বাস রুট উঠে গেছে। অন্যান্য বাসের সংখ্যাও অনেক কমে গেছে। দুধ পাওয়া যায় না। পোস্ট অফিস নেই। বাজারের অবস্থাও খারাপ। জিনিসপত্রের চালান নেই। স্কুল, কলেজ অনির্ধারিত। মানুষের সঙ্গে মানুষের যোগাযোগ নেই বললেই চলে। প্রতিটি মানুষই গৃহের গণ্ডীতে

অন্তরীণ। আজকাল দেরীতে অফিস পৌঁছলে কেউ কিছু মনে করে না। কারণ সব কিছুই অনিশ্চিত। সকলেরই এক অবস্থা। বলতে গেলে—'ফাদার উই আর অল দি সেম বোট'।

অফিস পৌঁছে আজকাল আর প্রস্তুতির সময় পাওয়া যায় না। ঢুকেই কাজ নিয়ে বসতে হয়। কোন কোন দিন এক ঘর 'ভিজিটার' নানা সমস্যা নিয়ে মুখিয়ে বসে থাকে। পোর্ট ফোলিও এক কোণে ফেলেই কাজের স্রোতে নিজেকে ছেড়ে দিতে হয়। এর মাঝে ঐ একটু 'রিলিফ'—মলয় এক কাপ চা যখন দিয়ে যায়। চুমুকে চুমুকে চা খেতে খেতে মাঝে মাঝে আকাশের দিকে তাকানো পনের-কুড়ি মিনিটের জন্যে অন্য জগতে, কল্পনার জগতে মুক্তি। টেলিফোন বেজে উঠলো। চায়ের সময় ফোন বড় বিরক্তিকর। তবুও রিসিভার তুলতে হল। ও প্রান্তে কাবেরী। কি হল! এই তো মাত্র দু ঘণ্টা আগে তাকে ছেড়ে এলাম। 'কি হল কাবেরী'। একটু তাড়াতাড়ি চলে আসব। আচ্ছা, তুমি যদি এই রকম কর, কাজকর্ম কি করে করব। লোকে আমাকে স্ত্রৈণ বলবে যে। আচ্ছা আজকের দিনটা। বেশ তাই হবে। কিন্তু নট বিফোর ফোর।

একটা জরুরী ডেসপ্যাচ ছিল। তাড়াতাড়ি শেষ করে ফেললুম। দুটো নোট পাঠিয়ে দিলুম বড়কর্তার ঘরে। এক বৃদ্ধ ভদ্রলোক এলেন তাঁর মেয়েকে নিয়ে। মেয়েটির বয়স বেশী নয়। এমন করুণ চেহারা যে দেখলেই মায়া হয়। ভদ্রলোক বছরখানেক আগে মেয়ের বিয়ে দিয়েছিলেন। তারপর বিপর্যয়। এখন মেয়েকে কোন হাতের কাজ শিখিয়ে স্বাবলম্বী করতে চান। মনে যে ঝড় বইছে তা তো আর কমান যাবে না, এখন দেহটাকে বাঁচাবার ব্যবস্থা করতে হবে। কিছু আন্তরিক ব্যবস্থাপত্র দিলেও, কাজ কি হবে বলা শক্ত। কিন্তু বৃদ্ধ খুশী হয়ে চলে গেলেন। আশা এমন জিনিস, কিছু একটা হতে পারে এই চিন্তায় তিনি হয়ত কয়েক দিন স্বপ্নের দিন কাটিয়ে দেবেন।

কাবেরীকে কথা দিয়েছি—একটু আগে বেরোবো। সুতরাং কাজ সারতে হবে চটপট। এর পর সামান্য কিছু কেনা-কাটাও আছে। আমার সেই ছোট্ট ফ্ল্যাটের আকর্ষণ প্রকৃতই অসাধারণ। সাজানো-গোছানো ছিমছাম। কাবেরীর শিল্পী মনের ছাপ সর্বত্র। পর্দা থেকে শুরু করে বিছানার চাদর, টেবলক্লথ সোফা সেটের ঢাকা সব এক রঙের। অল্প-স্বল্প পালিশ-করা ফার্নিচার। জাপানী কায়দায় ফুল সাজানো। দেয়ালের কয়েকটি নির্বাচিত জায়গায় কাবেরীর নিজের আঁকা [illegible] এবং স্কেচ বাঁধিয়ে টাঙিয়ে [illegible]। আমার [illegible] [illegible] [illegible] কিছু [illegible] [illegible]। [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] দিয়েই কাহিনীর শুরু। এ্যাকাডেমীতে কাবেরীর একক চিত্র প্রদর্শনীতে পরিচয়ের শুরু। শেষ আমার ফ্ল্যাটে। নির্ঝঞ্ঝাট, নির্বিবাদী মানুষ শিল্পী না হলেও শিল্পসত্তা একটা আছে, স্ত্রী একজন রুচিসম্পন্না প্রকৃতই গুণবতী শিল্পী। যোগাযোগ অদ্ভুত। ভাগ্য দেখে হিংসে করলে কিছু করার নেই। সবই ভবিতব্য। তবে আমি এই-টুকুই জেনেছি, জীবন থেকে এই পাঠই নিতে পেরেছি। সুখ আর দুঃখ চাকায় বাঁধা, জীবনে ঘুরে ঘুরে আসে। উৎফুল্ল হবার কিছুই নেই। একটা মুক্ত অনাসক্ত মন নিয়ে চলতে হবে।

সাড়ে তিনটে হল। এবার বেরোতে হবে। দিনের কাজ শেষ। কয়েক দিন দেখছি কাবেরী সঙ্গ চাইছে। ভীষণ 'মুডি' মেয়ে। যখন ছবি নিয়ে থাকে তখন তার সেই জগতে আমার প্রবেশ নেই। আবার হঠাৎ হয়ত ডেকে নেবে। 'দেখতো কেমন হচ্ছে—সমালোচক মশাই'। ইজেলের ধারে দাঁড়ান তার দীর্ঘ শরীর, হাতে তুলি, রঙীন শাড়ী, তেলহীন অবিন্যস্ত চুলের ঢল পিঠে ভেঙে পড়ছে—সে তখন নিজেই একটা ছবি। কাকে দেখবো? ক্যানভাসের ছবি, না জীবন্ত ছবি। তখন স্বভাবতই একটু অন্য রকম আবেগ মনের মধ্যে টগবগ করে উঠে। দুজনের নিভৃত সংসারে স্থান, কাল পাত্রের তো কোন বাধা নেই। কাবেরী হয়ত একটু মৃদু আপত্তি জানায়। সে আর কিছুই নয় ব্যাপারটাকে আরো একটু আকর্ষণীয়, উদ্বেল করে তোলা। আমি তখন বলতে চাই—'দিস ইস লাইফ মাই ডিয়ার লেডী'। তখন সেই অফিস অথবা জীবন সংগ্রাম, কিম্বা শহর-জীবনের কাটাকাটি হানাহানি, অথবা রাজনীতি ইত্যাদি তখন অনেক দূরে। যেন সমুদ্রের গর্জন। কানে আসছে কিন্তু যেহেতু জলে নামি নি সেইহেতু যেন একটা অন্য স্বাদ। সব মিলিয়ে জীবন।

আজকাল ট্যাক্সি কিম্বা অফিসের গাড়ী পাড়ায় ঢুকতে চায় না। মানুষের নিরাপত্তা ক্রমশই কমছে। কেউ কেউ বলতে শুরু করেছেন জঙ্গল এখন শহরের চেয়ে অনেক নিরাপদ। বাঘ অথবা হিংস্র অন্যান্য জন্তু-জানোয়ারের গতিবিধি অথবা আচার-আচরণের একটা বাঁধা নিয়ম আছে, কিন্তু মানুষের চাল-চলনের নাকি আজকাল কোন ঠিক নেই। সেই গল্পের সিংহ যে উপকারীর উপকার মনে রেখেছিল। 'এরেনার' সমস্ত মানুষ রুদ্ধনিশ্বাস। বন্দী আর ক্ষুধার্ত সিংহ মাথামুখি। সিংহ বন্দীর পায়ের তলায় লুটিয়ে পড়ল। কারণ একদা এই বন্দীই তার পা থেকে কাঁটা বের করে দিয়েছিল। কিন্ত মানুষ। বিদ্যাসাগর মশাই বলেছিলেন—'অমুকে আমার সম্বন্ধে যা তা বলছে কেন [illegible] আমি তো তার কোন উপকার করেছি বলে মনে পড়ছে না'। [illegible] [illegible] পাল্টায় নি। মানুষের স্বভাব সেই একই আছে।

নিউ মার্কেট থেকেই পর্দার কাপড় কিছু কিনে নি। একটা বাথ টাওয়েল। আর একটা বিলিতী সেন্ট। কাবেরীকে একটু 'সারপ্রাইজ' দিয়ে দেব। কেনাকাটা সাধারণত বিনা দর-দস্তুরে হয় না। ভারতবর্ষে একটা জিনিসের ঠিক কি দাম, বোঝবার উপায় নেই। মুনাফার পরিমাণ কত কেউ বলতে পারবে না। বিক্রেতাদের মেজাজ অত্যন্ত চড়া পর্দায় বাঁধা। বেশী কথা বলার উপায় নেই।

কেনাকাটা শেষে একবার ট্যাক্সির চেষ্টা করে দেখতে ইচ্ছে হল যদি পেয়ে যাই। দুটো ট্যাক্সি ফ্ল্যাগ ডাউন করে উর্ধশ্বাসে চলে গেল। আমার মত যাত্রীর আবেদন অথবা অনুরোধ শোনার কোন ইচ্ছেই দেখা গেল না। একজন থামলেন কিন্তু তিনি আমি যে দিকে যেতে চাই তার উল্টোদিকে ছাড়া যাবেন না। আর একজন বললেন, তিনি খাওয়া-দাওয়া না করে এক পাও নড়বেন না এবং সেই আহারপর্ব কখন কোথায় শেষ হবে তিনি জানেন না। এর পর ট্যাক্সি করে বাড়ী যাওয়ার ইচ্ছে বিসর্জন দিতে হল। যদিও সেই সপ্তাহ ছিল ট্যাক্সি চালকদের সৌজন্য সপ্তাহ।

চৌরঙ্গীর মোড়ে তখন জমজমাট অবস্থা। চারিদিক থেকে পতাকাধারী মানুষের মিছিল একের পর এক আসছে। কোন যানবাহনই চলার রাস্তা পাচ্ছে না। এই শতকের মানুষ প্রায়শই সমস্যাগুলোকে দার্শনিকের চোখে দেখে থাকেন। কোন কিছুই আর তেমন করে মনে দাগ কাটে না। মানুষকে বিদ্রোহী করে তোলে না। অন্য সময় হলে আমিও এতটা ছটফট করতুম না, বাড়ী যাবার জন্যে। কাবেরী এখন এই সময়টা আমার একটু সঙ্গ চায়। আমার অভিজ্ঞতা কম কিন্তু শুনেছি মেয়েদের এই সময়টায় নানা রকম মানসিক উপসর্গ দেখা দেয়। বলতে পারে না মুখ ফুটে। শরীর অপটু হয়, মনের মধ্যে সাগরের ঢেউ আছড়া-আছড়ি করে। বাড়ীতে মা, অথবা বর্ষীয়ান কোন মহিলা থাকলে এই সময়, ঠিক এই সময়ে হয়ত অনেক সাহায্যে আসতেন। অন্য সময় হলে এই ভীষণ বিভ্রান্তিকর অবস্থা থেকে দূরে থাকার চেষ্টা করতুম। কোন একটা সিনেমার যে কোন মূল্যের একটা টিকিট কেটে ঢুকে বসে থাকতুম। ইতিমধ্যে মিছিলের মানুষ, জমে-থাকা অসংখ্য যানবাহন, ঘরমুখো মানুষ সময়ের ভেলায় চেপে এই কেলাস্থ রণাঙ্গন ছেড়ে যে যার দিকে চলে যেত। হয়ত বাস, ট্রাম অথবা অন্যান্য যানবাহন বন্ধ হয়ে যেত। বেশী রাতে হয় হেঁটে না হয় ভাগ্যে ট্যাক্সিতে বাড়ী ফিরে যেতুম।

হঠাৎ একটা প্রায়খালি আমার রুটের গাড়ী মোড় ঘুরতে দেখে অনেকটা জীবনের মায়া ছেড়েই কোনক্রমে উঠে পড়লাম এবং একটা বসার জায়গাও পাওয়া গেল। এই সব 'ছাপাখাট' মানুষিক [illegible] নিয়ে চড়া অথচ এর থেকে যে কোন মুহূর্তে সব রকমের বিপদ ঘটতে পারে। অথবা জীবন

মানেই ঝুঁকি। এর পর গাড়ী চলবে। শম্বুক গতিতে। জ্যামে আটকাবে। কয়েক-বার রাস্তা পাল্টাবে। আকণ্ঠ মানুষ বোঝাই করবে। যেখানে খুশী থামবে। টিকিটের পয়সা নিয়ে ঝগড়া হবে। যাত্রী-দের মধ্যে ফাটাফাটি হবে। এ এক চলমান রঙ্গমঞ্চ। এরই মধ্যে চোখ বুজিয়ে বসে থাকা। ঝিমুনি আসতে পারে। কখন বিরক্ত হয়ে নেমে যাবার ইচ্ছে হতে পারে। অবশেষে নিজের গন্তব্য স্থানে পৌঁছে যন্ত্রণার হাত থেকে মুক্তি। কিন্তু আজ আর গন্তব্যে পৌঁছান গেল না। তার আগেই যাত্রাশেষ। বাস যাবে না। নেমে যান। কে একজন ভয়ে ভয়ে ফিস ফিস করে বলল—সামনেই মার্ডার হয়েছে। ভারী ভিড়ার ছিল। অনেক আতঙ্কগ্রস্ত কণ্ঠের সমবেত প্রশ্ন—কে, কে কি নাম। হেঁটে যাওয়া যাবে তো ভাই সামনে। এসব প্রশ্নের তো কোন উত্তর নেই। সকলেই পালাতে চাইছে।

প্যাকেট ইত্যাদি নিয়ে নেমে পড়তে হল। এসব ঘটনা এই শহরজীবনে বেশ গা-সওয়া হয়ে গেছে। আমি তো মরি নি, এখনও বেঁচে আছি, অতএব ভাববার কি আছে। জীবনটাকে একটা মোড়কের মত করে সাবধানে বাড়ী অবধি নিয়ে যেতে হবে। হয়ত কোন সময় ফসকে পড়ে যেতে পারে, কিন্তু সেই হারাবার মুহূর্তে সাময়িক একটা আপশোষ, খুব অল্প সময়ের জন্যে। কেউ কেউ অবশ্য হারাতে হারাতেও ফিরে পেয়ে যেতে পারেন। সে এক ভীষণ অভিজ্ঞতা।

কিন্তু যতই এগোচ্ছি রাস্তা নির্জন, থমথমে, সমস্ত দোকান বন্ধ। এখনও দিনের আলো নেভে নি। দিন আর রাত্রির সন্ধিক্ষণ। ঘটনার কেন্দ্রস্থল থেকে সকলেই যেন দূরে চলে যেতে চাইছে। ভীত পশুর মত। জানি জিগেস করলে কোন উত্তর পাওয়া যাবে না। সামনে হয়ত কিছু দূরে মানুষেরই কোন প্রতিনিধি, ধুলোয়, রক্তে গড়াগড়ি যাচ্ছে। সেই মৃত্যুর জন্যে কোন শোক নেই, কোন করুণা নেই, কারণ আমরা এখন প্রকৃতই দার্শনিক। সেই মৃত্যুর জন্যে কোন কৌতূহল প্রকাশ করাও উচিত নয়। প্রশ্ন—আমার নিরাপত্তা আছে কিনা। আমি ঐ পথ দিয়ে সোজা, অক্ষত আমার সাজান সুন্দর ফ্ল্যাটে পৌঁছতে পারব কিনা, যেখানে আমার জীবনের অনেক নরম মুহূর্ত আমার অপেক্ষায় রয়েছে।

একবার ঘাড় ফিরিয়ে দেখে নিয়ে, কাঁপা কাঁপা, দুরু দুরু বুকে যতটা সম্ভব দ্রুত স্থান ত্যাগ। একটা টাটকা মৃত্যু। দৃশ্যটা অসহনীয়। মাত্র পনেরো-কুড়ি মিনিট আগের ঘটনা। স্থান জনশূন্য। সকলেই নিজের নিজের নিরাপত্তা নিয়ে ব্যস্ত। সকলেই স্থান ত্যাগ করেছে। আমিও করছি। এ ছাড়া কি করার আছে। পশু হলে হয়ত মৃতদেহের পাশে এসে শুঁকে দেখতুম, বিলাপ করতুম। চখা চখী পাখীর গল্প শুনেছি। কাকের মৃত্যুও দেখেছি। মানুষ আজকাল পথে-ঘাটে নিঃসঙ্গ মরে। মৃত্যুর আর যেন সেই গ্ল্যামার নেই।

সেই নির্জন রাস্তায় হঠাৎ কিছু চরিত্রের আবির্ভাব হল। চার-পাঁচটি ছেলে, প্রত্যেকেরই দু হাতে গোলাকার পদার্থ। মৃতদেহের কাছাকাছি এসে, একটা গলির মধ্যে, সেই বিস্ফোরক দু-একটা ছুঁড়ে দিল। আমি একটু ভয় পেয়েছিলাম। ভেবেছিলাম আমার শবদেহের উপর দিয়েই চলে যেতে চাইবে। কিন্তু আমাকে তারা উপেক্ষা করল। আমার শরীর একটু ঘর্মাক্ত হল। আমার গতি দ্রুত হল। আমার কণ্ঠ তালু শুষ্ক হল। এখন কি কোন রিক্সা পাওয়া যাবে? আমার পথের সঙ্গী? কোথায় কি, পথ জনশূন্য। যত দূরে দৃষ্টি চলে, সরীসৃপ রাস্তা প্রসারিত। সেই প্রসারিত রাস্তায়, মৃত্যুকে সঙ্গী করে আমি যেন কত যুগ ধরে চলেছি। অবশেষে পৌঁচেছি আমার সেই কোমল, কমনীয় গৃহের গণ্ডীতে।

কাবেরী উৎকণ্ঠিত। 'তুমি আসছ না কেন?' 'আমি ভাবছি। চারটে বলেছিলে। তারপর, কি গোলমাল এই দিকে। তুমি এসেছ।' কাবেরী আনন্দে আমাকে জড়িয়ে ধরল। আরো কি সব করে ফেলল আবেগের মুহূর্তে। একবার মনে হল সেই পথের চার মোহনায় যে পড়ে আছে, তারও জন্যে হয়ত এমনি কেউ জানালার গরাদে মাথা রেখে অপেক্ষা করছে। আমার অক্ষত ফিরে আসার পুরস্কার এই আদর, এই চুম্বন। অবশেষে গরম কফি, কিছু সুস্বাদু ভাজা। জীবনের ছোট ছোট অথচ গভীর সুখ।

রান্নাঘর থেকে প্রেসার কুকারের ষ্টিম, মাংসের সুগন্ধ নিয়ে আসছে। ভাগ্যিস ঐ সব গোলমাল শুরু হবার আগেই কিনে এনেছিলাম। কাবেরী যেন বিজয়ীর হাসি হাসল। মানুষ কত অল্পে, কত তৃপ্ত। মাংস কেনা আর রাজ্য জয় করা যেন দুটো সমান ওজনদার জিনিস। মাংস না পেলেই বা কি অসুবিধে হত। কিছুই না ডিম ছিল। কাবেরী একটু ছড়িয়ে বসল। শরীর বেশ ভারি হয়েছে। এই সময়টা মেয়েদের কেমন যেন ক্লান্ত অথচ উজ্জ্বল দেখায়। কফি খেতে খেতে কথা হচ্ছে। কিছু প্রাসঙ্গিক কিছু অপ্রাসঙ্গিক। চারিদিক নিস্তব্ধ। রাস্তা অন্ধকার জনশূন্য। আলো নিভিয়ে দেওয়া হয়েছে। কোন বাড়ীতে একটা রেডিওও বাজছে না। একটা থমথমে আবহাওয়া। কখন কি ঘটে যায়। একটু আগে জীবনকে মেডেলের মত গলায় ঝুলিয়ে যে ঐ পথে এসেছি এ যেন বিশ্বাসই হচ্ছে না। আশে-পাশে এখনও অনেকে ফিরতে পারে নি। কিন্তু তাতে আমাদের কফি খাওয়া অথবা ছোট ছোট গল্পের কোন অসুবিধে হচ্ছে না। কারণ আমি তো ফিরে এসেছি। যারা আসে নি তারা আসবে হয়ত আসবে না। কি করা যাবে। আজকাল আর কিছু করা যায় না। ঘটনার স্রোতকে প্রতিরোধ করা যায় না।

চারিদিক অস্বাভাবিক নিস্তব্ধ। তা না হলে হয়ত গান গাওয়া যেত কিম্বা রেডিও-গ্রামে কিছু রেকর্ড বাজান যেত। কিন্তু ইস্পাতের পাতের মত এই দুর্ভেদ্য নিস্তব্ধতাকে শব্দ দিয়ে ভেদ করতে ইচ্ছে করছে না।

'তোমাকে আজ সকাল সকাল আসতে বলেছিলুম, তা না হলে, কি হত বলত। যত রাত বাড়ত ততই গোলমাল বাড়ত। পথঘাট বিপজ্জনক হত। আর আমি একলা এই শরীরে কেবল ঘর-বার করতুম।' 'তা ঠিক। তবে কি জান, তুমি কোন দিন ফুট-বাথ নিয়েছ। প্রথমে গরম জলে পায়ের তলা ছ্যাঁক করে ওঠে। পা তুলে নিতে হয়, তারপর সইয়ে সইয়ে আস্তে আস্তে আধ-খানা পা সহজেই চলে যায় জলের তলায়। এখন যদি ঐ অন্ধকার ঘন রাতে, আতঙ্কের মধ্যে দিয়ে আমাকে আসতে হত, উপায় নিশ্চয়ই একটা বের করে নিতুম। ছায়ায় ছায়ায় মিশে মিশে, বিপদকে ডাইনে, বাঁয়ে, সামনে, পিছনে রেখে, দেখতে ঠিকই এসে উঠেছি তোমার এই ঘরে। দেখবে আমার পরেও এমনিভাবেই অনেকে এসেছে।'

এর পর আমাদের সেই শান্ত গৃহকোণে বাইরের জগতের নানা খবর ভেসে আসতে লাগল। অনেক ঘুরে, অনেক বিপদের ঝুঁকি নিয়ে, হাত মাথার উপর তুলে অনেকে ফিরে এলেন। দোকান পুড়েছে। বাড়ী জ্বলছে। অসংখ্য জীবন্ত মানুষ অসংখ্য মৃত্যু দিয়ে একটি মৃত্যুর শোক ভুলতে চাইছে। কে যাবে, কে থাকবে বলা শক্ত। অনেকে এমন কথাও বললেন, আমরা নাকি কেউই নিরাপদ নই। কাবেরী যেন আমার খুব কাছাকাছি এসে একটু নিরাপত্তা খুঁজতে চাইছে। সে যেন এই মুহূর্তে জানলায়, ঘরের কোণে কোণে, এমন কি সিলিং-এ পর্যন্ত অসংখ্য কালো মুখ দেখছে।

রান্না বেশ ভাল হয়েছে। আয়োজনে কোন ত্রুটি নেই। সাজান খাবার টেবিল, পরিষ্কার টেবিল ঢাকা, দুধশুভ্র চীনে-মাটির পাত্রে ভোজ্যসামগ্রী। কিচেন থেকে ধোঁয়ার মৃদু গন্ধ ভাসছে। এই গার্হস্থ্য সুখে। পরি-বেশ, বিলাস কিম্বা ভারতীয় আধ্যাত্মবাদ অথবা অনেক কৃচ্ছ্র সাধনের কথা ভুলিয়ে দেয়। জৈবিক আর আত্মিকের অপূর্ব সমন্বয়। যৌবনবতী স্ত্রী, উষ্ণ, কমনীয় সুস্বাদু ভোজ্যসামগ্রী। একটা সৌন্দর্যবোধের পরিবেশ। কিছু মূল্যবান প্রতিভা, দুটো বিচারশীল মন।

কিছু মানুষ হয়ত এখন [illegible] কিম্বা হাসপাতালের ইমার্জেন্সী বিভাগে অথবা অপারেশন টেবিলে, কিম্বা ক্রিমে-টোরিয়ামে, এমন সমস্ত পরিবেশে যেখানে ঐহিক সুখ নেই, মানসিক স্থৈর্য নেই, কিন্তু আমরা এখন দুজনে পরম নিশ্চিন্তে একটি সুকোমল শয্যায় শয়ন করিতে যাচ্ছি। এর [illegible]

নিঃশব্দে, একরাশ পাখির মত, আমার মেয়ে নেমেছে।

কাবেরী প্রথমে একটু উসখুস করছিল। যেন ঠিক আরাম পাচ্ছে না। একটু অস্বাচ্ছন্দ। একবার জিগেস করল কটা বাজল। এগারটা বেজে দশ মিনিট। কিছুক্ষণ নিস্তব্ধতা। হঠাৎ কাবেরী মাথার বালিস জড়িয়ে ধরে যন্ত্রণায় কুঁকড়ে গেল। সমস্ত শরীর কেঁপে কেঁপে উঠছে। 'কি হল তোমার'? 'অসহ্য ব্যথা, অসহ্য যন্ত্রণা। তুমি যা হয় একটা কিছু ব্যবস্থা কর। আমি আর পারছি না'।

'কি সর্বনাশ। এখন এই ভীষণ সময়ে আমি কোথায় পাব ডাক্তার, কোথায় পাব গাড়ী। রাস্তায় বেরোবো কি করে? এ তোমার মনের আতঙ্ক। এখন ব্যথা কি? তোমার তো এখন সময় নয়। পুরো দু মাস বাকি। এ তোমার 'ফলস' ব্যথা। চাপ খাওয়া হয়েছে, গ্যাস হয়েছে পেটে। দাঁড়াও আমি তোমাকে একটা অ্যান্টাসিড কিছু দিচ্ছি। আমার স্টকে আছে'।

দাঁতে দাঁত চেপে কাবেরী বললে—'কিচ্ছু হবে না। আমার প্রচণ্ড যন্ত্রণা হচ্ছে। আমি তোমাকে বলে বোঝাতে পারব না। এ সেই ব্যথা। তুমি যা হয় একটা কিছু কর'।

হা ঈশ্বর, এ কি দুর্দিন। এখন তো সুখশয্যা ছাড়তে হয়। বলা যায় না প্রথম সন্তানের জন্ম ভীষণ বিপজ্জনক। কি হতে, কি হয়ে যায়। মৃত্যু। না না কাবেরীকে হারাতে চাই না। ঘরে মৃত্যুর ছায়া, বাইরে মৃত্যুর ছায়া। উঠতে হল। ঘরের সবুজ আলোকে জোর করতে হল। কাবেরীর মাথায় একটু হাত বুলিয়ে দিলুম। এখন কি করি। এই সমস্যাকে কিভাবে আক্রমণ করব। কাছাকাছি কোন বাড়ী থেকে ডাক্তারকে ফোন করব। অথবা কোন নার্সিং-হোমে ফোন করে এম্বুলেন্স পাঠাতে বলব। কিন্তু সমস্ত 'কল অফিসই' তো বন্ধ। কোন্ বাড়ীতে ফোন আছে তাও তো জানা নেই। প্রথমে থানায় যাই, পুলিশের সাহায্য চেয়ে দেখি, কিন্তু কাবেরী কি একলা থাকবে, তাই বা কি করে হয়?

রাস্তা কি ভীষণ অন্ধকার। পাশের বাড়ীর সাহায্য নিতেই হবে। এখন আর ভাববার সময় নেই, সমস্ত কাজ অত্যন্ত দ্রুত সারতে হবে। কলিং বেলে চাপ দিলুম, একবার, দুবার, তিনবার, চারবার, কোন সাড়া নেই। কোন ঘরে আলো জ্বলল না। শুধু মনে হল কারা যেন ফিস, ফিস করে বলছে, 'ঐ এসে গেছে। সাড়া দিও না, কজন আছে, কে জানে। ওরা এখন হন্যে হয়ে আততায়ীকে খুঁজছে। আমাকে ঘাতক ভেবেছে। কি সর্বনাশ বলা যায় না কোন অলক্ষ্য স্থান থেকে কিছু ছুঁড়ে মারতে পারে। আবার আমিও দাঁড়িয়ে আছি একেবারে উন্মুক্ত রাস্তায়। আমি চিৎকার করে বললুম—দরজা খুলুন। কোন ভয় নেই। আপনাদের প্রতিবেশী। আমার স্ত্রী ভীষণ অসুস্থ। আপনাদের একটু সাহায্য চাই'—না কেউ দরজা খুলল না। সেই ফিস ফিস গলা— খুলো না, ওসব চালাকি। সেই দরজা খুলবে।

আমার সময় খুবই কম। ঐ তো আমার জানলায় আলো জ্বলছে। কাবেরী প্রসব বেদনায় ছটফট করছে। আমি তখন ছুটছি। থানা, থানাতেই হয়ত সাহায্য পাওয়া যাবে। এই নির্জন রাস্তায় আমি একলা ছুটন্ত পথিক। আমাকে পেছন থেকে অথবা সামনে থেকে কিম্বা চার পাশ থেকে আক্রমণ করতে পারে। দূর থেকে দেখলে আমাকে পলাতক মনে হবে।

অফিসার-ইন-চার্জ ভীষণ ব্যস্ত মানুষ। ইতিমধ্যে তাঁর এলাকায় তাণ্ডব শুরু হয়ে গেছে। মৃতদেহ আসছে একে একে, ছিন্ন-ভিন্ন রক্তাক্ত। কি সাহায্য করতে পারি আপনাকে? আমাদের গাড়ী নেই। সব টহল দিতে বেরিয়ে গেছে। তবে ফোনটা ব্যবহার করতে পারেন। ফোন, শুধু ফোনে কি হবে। একটা গাড়ী না হলে রুগীকে নার্সিংহোমে অথবা হাসপাতালে নেবো কি করে?

'কি যে করেন মশাই, আপনারা এই দুর্দিনে। একটু সংযম অভ্যেস করতে পারেন না। এই কি সন্তান আনবার সময় না পরিস্থিতি। দেখছেন দেশ জুড়ে লণ্ড-ভণ্ড চলছে। দিন থাকতে থাকতে গোল-মালের আগে হাসপাতালে দেন নি কেন? সেই দুঃসময়েও আমার গল্পের ডুবে-যাওয়া সেই ছেলেটির কথা মনে পড়ল। ডুবছে সে, সাহায্য চাইছে তীর থেকে তাকে উপদেশ ছুঁড়ে দেওয়া হচ্ছে, সাঁতার না জেনে জলে নেমেছিলে কেন?

অবশেষে ফোন। গৃহ চিকিৎসক। 'আমি কি করব মশাই, এ তো আমার কেস নয়, কোন গাইনাকোলজিস্টকে যোগাযোগ করুন। তাছাড়া আমার জীবন এমনিতেই বিপন্ন আজ তো কোন কথাই চলে না। হাসপাতাল। একের পর এক। রুগী নিয়ে আসুন। এ্যাম্বুলেন্স নেই। কোথায় পাব এ্যাম্বুলেন্স। প্রথমত হাউস স্টাফরা আগের মত কাজ করে না। এছাড়া আজকের 'প্রেসার'টা বুঝতে পারছেন না। আপনিও তো আচ্ছা 'ক্যালাস', এসব 'কেস' বাড়ীতে ফেলে রাখে।

'বলছেন কি রুগী বিনা চিকিৎসায় মারা যাবে। যাবে কি করা যাবে। ও সব 'সেন্টিমেন্টাল' কথা বলবেন না। ওতে আর চিঁড়ে ভেজে না।'

—কি করি বলুন তো। প্লিজ আপনি একটু সাহায্য করুন। আমার স্ত্রী... আমি আর বলতে পারলুম না। অফিসার-ইন-চার্জ সিগারেট খেতে খেতে একটি মাত্রই জবাব দিলেন—শেষ জবাব—'কাঁধে করে নিয়ে যান।'

আমি প্রায় উড়তে উড়তে ফিরে এলুম আমার ফ্ল্যাটে। সমস্ত বিছানায় চাদর হাত দিয়ে খামচাতে খামচাতে কাবেরী যন্ত্রণায় দুমড়ে, মুচড়ে প্রায় বনুকের মত হয়ে গেছে। সমস্ত মুখে তার আতঙ্কের ছায়া। না অসহ্য এ দেখা যায় না। জীবন দিয়েও আমাকে কিছু একটা করতে হবে। ভাবছি আমি। ইতিমধ্যে ঘামে শরীর ভিজে গেছে। বুদ্ধি আর চিন্তাশক্তি ঘোলাটে হয়ে গেছে।

দরজার কড়া নড়ে উঠলো। ভারী উত্তেজিত গলার আওয়াজ। আলো নেভান। এই একটা কথায় আমি যেন আলো দেখতে পেলুম। তাড়াতাড়ি সিঁড়ি ভেঙে নীচে নেমে গিয়ে দরজা খুলে দাঁড়ালুম। হাতে ধারালো অস্ত্র চারজন যুবক। আমি দ্বিতীয় কোন কথা না বলে, সরাসরি আত্মসমর্পণ করলুম—'ভাই তোমরা আমাকে বাঁচাও'। 'আপনাকে মারতে আসিনি আমরা। আলো নেভান। আমাদের কাজের অসুবিধে হচ্ছে'। 'না সে কথা নয়। আমার স্ত্রী, আমার স্ত্রী আসন্ন প্রসবা। এই মুহূর্তে সে যন্ত্রণায় ছটফট করছে। আমি কোন-ভাবেই তাকে হাসপাতালে নিতে পারছি না। তোমরাই আমার ভরসা। তোমরা বাঁচালে বাঁচবে তোমরা মারলে মরবে'।

—'পল্টু, দাদা কি বলছে রে। কি করতে হবে আমাদের?'

—একটা গাড়ী ভাই। কোন রকমে আমার স্ত্রীকে হাসপাতালে পৌঁছে দিতে হবে। আমাকে সাহায্য করার মত কেউ নেই। তোমরা ছাড়া।'

—ঠিক আছে, বিশু তুই ঝট করে একটা রিকশা ধরে নিয়ে আয়। শালারা এমনি আসতে চাইবে না। জোর করে ধরে আনবি। কাছাকাছি যে ডাক্তাররা আছে তাদেরও তো পাবি নি, সব 'লকারে' বসে আছে। শালা প্রাণের কি মায়া। একটা গোঙানির আওয়াজ আসছে?'

—ঐ তো, ঐ তো আমার স্ত্রী, যন্ত্রণায় ছটফট করছে।

—শালা ঠিক 'মার্ডার' করলে যেমন আওয়াজ হয় তেমনি হচ্ছে।

—পল্টু তোর কোন বুদ্ধি নেই, একে বলে প্রসব বেদনা। আমাদের মায়েদেরও এমনি হয়েছিল, বুঝেছিস।

বিশু নামক ছেলেটি একটা রিকশা ধরে নিয়ে এল। ঘুম-জড়ানো চোখে অথবা নেশার ঘোরে রিকশাওয়ালা জিগেস করল কোথায় যেতে হবে? 'হাসপাতালে' দাদা সময় আমাদের কম, বৌদিকে নামান, গোটা কতক বালিশ আনবেন, বেশ করে সাজিয়ে বৌদিকে আরামে বসান, কিম্বা কোলে নিন। একলা নামাতে পারবেন?'

'দেখি চেষ্টা করে।'

ওরা পাঁচজন নীচে দাঁড়িয়ে রইল, আমি একরকম দৌড়ে করে সিঁড়ি ভেঙে

ওপরে উঠে গেলুম। কাবেরীর তখন অন্তিম অবস্থা। যন্ত্রণা যে কত ভয়ানক! একটা প্রাণ পৃথিবীতে আসতে চাইছে, সে যে কি অসহ্য দৃশ্য, জন্ম যে এত বেদনাদায়ক, আমার জানা ছিল না।

কাবেরীকে কোন রকমে পাঁজাকোলা করে তুলে সবে সিঁড়িতে পা রেখেছি প্রচণ্ড শব্দে একটা বোমা ফাটল, কাবেরী চমকে উঠল, যন্ত্রণা যেন সাময়িকভাবে অপসৃত হল, অন্য রকম একটা আতঙ্কে। বারুদের গন্ধ এল নাকে, একটা আগুনের ঝিলিক, কিছু শক্ত কঠিন জিনিস দেয়ালে, কাঁচে লাগল। সিঁড়ির শেষ ধাপে দরজার সামনে তখন ধোঁয়ার কুণ্ডলি।

কিন্তু একি, দরজার সামনে বিশু পড়ে আছে রক্তাক্ত, ক্ষত-বিক্ষত, জীবন আছে কি নেই বোঝা যাচ্ছে না। রিকসা দাঁড়িয়ে আছে, রিকসাওলা নেই, নেই আর চারটি ছেলে। কাবেরীর যন্ত্রণা আবার ফিরে এল। আমার জামাটা খামচাতে লাগল, দাঁত দিয়ে টুকরো টুকরো করল শাড়ীর আঁচল। ভাবছি এখন কি করব! তারা কোথায়? হঠাৎ অন্ধকার থেকে পল্টু বেরিয়ে এল— 'ভাববেন না কিছু, বৌদিকে বসান রিকসায়।'

—কিন্তু বিশু, বিশুকে তো আগে হাসপাতালে নেওয়া দরকার। ওকি বাঁচবে? দৃশ্য দেখে কাবেরী তখন মূর্ছিত।

—আপনি কিছু ভাববেন না দাদা, আমরা মরতেই জন্মেছি, ওকে আমরা কাঁধে করেই নিয়ে যাব। আর সময় নেই আপনি উঠে বসুন, ব্যাটা রিক্সাওলা ভয়ে ভেগেছে, আশেপাশেই আছে, ধরে আনছি।

ইতিমধ্যে অন্ধকার ঠেলে ঠেলে আর তিনটি ছেলে ফিরে এল।

—শালা, ওরা তিনজন ছিল। দুটো পালিয়েছে, একটাকে খতম করেছি। শালা, কি রক্ত মাইরি, যেন পিচকারী। মানুষের শরীরে এত রক্ত থাকে। দেখ, জামা-প্যাণ্টের কি অবস্থা।

—তুই আর এগোসনি, বৌদি ভয় পেয়ে যাবে। তোরা একজন রিক্সাওয়ালাটাকে ধরে নিয়ে আয়, তারপর চল, বিশুটাকেও হাসপাতালে নিয়ে যাই। যদি বাঁচে।

রাত তখন কটা! হাসপাতাল যেন ক্লান্ত। মৃদু আলোকিত করিডর সারি সারি নিদ্রিত রোগী। কোথাও কোন রোগী আধবসা, ঘুম তার আসছে না, কেউ কাৎরাচ্ছে যন্ত্রণায়। ওয়ার্ড খালি, কোথায় নার্স, কোথায় হাউস সার্জেন! কিন্তু এতদূর যখন আসতে পেরেছি তখন বাকিটারও ব্যবস্থা করতে হবে।

কে যেন বল্লে—রাত এখন তিনটে। উনিশ নম্বর মারা গেছে। একটু জল, নার্স আমাকে একটু জল।

আপনি ডাক্তার ভাই, আমার স্ত্রী, একেবারে শেষ অবস্থা। কি কেস? ডেলিভারি কেস। এখানে কি? তবে? চলুন, চলুন, ডেলিভারি ওয়ার্ডে। সার্জেন—কি হয়েছে সিস্টার, ইমার্জেন্সি ওয়ার্ডে আর একটা ছেলে এসেছে। কিছু নেই, একেবারে টুকরো টুকরো হয়ে গেছে, 'বম্ব ইনজুরি'—এখনও প্রাণ আছে। তাপসকে বলুন, এটেণ্ড করতে এখুনি, স্যালাইন রেডি করুন। আমার ডেলিভারি কেস।

—ডেটল, ইথার, ইউরিন্যাল, সব মিলিত, মিশ্রিত গন্ধ। বড় বড় চওড়া চওড়া করিডর, খোলা গরাদহীন জানালা, উঁচু উঁচু ছাদ, সারি সারি লোহার খাটে, সরু সরু লম্বা রডে পাখা ঝুলছে, ঘুরছে, হাইহীল জুতোর খট খট, চকচকে, বড় বড় বেঞ্চি। কাবেরী এখন ঐ 'ডেলিভারি' লেখা দরজার ওপাশে। 'কি হচ্ছে সিস্টার এত দেরী কেন?' সিস্টার ঐ যে ছেলেটি এল রক্তে সব ঝাঁঝরা, ওর নাম কি বিশু?' সিস্টার, তাপসবাবু কি ওকে এটেণ্ড করছে?

—খবর আছে, খবর, কি হল কাবেরীর, সিস্টার। শি ইজ অল রাইট। ভাল আছে সে, আপনার একটা ছেলে হয়েছে, সাড়ে ছ পাউণ্ড ওজন। ঠিক চারটে পঞ্চাশ মিনিটে জন্মেছে। না এখন দেখতে পাবেন না। সকালে আউটডোরে আসবেন। সিঁড়ি বেয়ে নেমে আসছি। পূবের আকাশে আলোর ছোঁয়া লেগেছে। ছেলে হয়েছে? তুমি সন্তান? কার মত দেখতে হয়েছে কে জানে! কি নাম রাখব। নামটা নিশ্চয়ই ভাল চিন্ত। কেমন হবে। নিশ্চয়ই খুব বড় হবে। হাকিম ষ্টোরের মিষ্টি খাওয়াব, আর ঐ ছেলেদের, ওরা না থাকলে কি করতুম।

—দাদা একটা সিগারেট দেবেন?

—কে পিন্টু, তুমি?

—হ্যাঁ দাদা, কি হল আপনার, বৌদি ভাল আছেন তো?

—হ্যাঁ ভাই, ছেলে হয়েছে; কিন্তু বিশু সে কেমন আছে।

পিন্টু ধোঁয়া ছেড়ে প্রচণ্ড একটা দার্শনিকের মত বল্ল—নাঃ বাঁচল না, একেবারে ফর্দাফাই হয়ে গেছে, চারটে পঞ্চাশ মিনিটে সব শেষ হয়ে গেল। শালা বোমটা বেশ জবর-দস্ত ছিল। ওর মা-টার বড় কষ্ট হবে। ঐ একটাই তো ছেলে। যাকগে, অতসব ভাবলে চলে না।

মনটা ভারাক্রান্ত হল। পুত্রলাভের আনন্দ অনেকটা পুত্রশোকের ব্যথায় যেন মিলিয়ে গেল।

—আমার জন্যেই হল ভাই।

—দূর দাদা, কি যে বলেন ওতো হবেই। আমরা এই আছি এই নেই। আপনি কিছু ভাববেন না। এখন শালা ভেজবাঁজি যার করাই মৎ। হ্যাঁপা, পোস্টমর্টেম হবে মর্গে যাবে। সেই পচে ফুলে উঠবে তবে শালারা ছাড়বে।

—তোমরা একদিন এস ভাই। একটু মিষ্টিমুখ করা যাবে।

—কি যে বলেন দাদা। আমাদের চেনেন না ভাই। পাড়ার খবর তো রাখেন না। আমাদের সঙ্গে বেশী দোস্তি মানেই জানেন তো—এই। পিন্টু গলার কাছে হাতের চেটো নেড়ে একটা ভঙ্গী করল যার মানে —জবাই। পিন্টু সিগ্রেট খেতে খেতে করিডোরের আবছায়ায় মিলিয়ে গেল।

অঙ্গনা

পাহাড় পর্বতে

বাঙালী মেয়েদের বড় দুর্নাম। ওরা ঘর ছেড়ে বাইতে বেরুতে জানে না। দীর্ঘদিন এই দুর্নাম ঘাড়ে নিয়ে আমরা চুপচাপ বসেছিলাম। বাদ-প্রতিবাদ করার কোন উপায় নেই। হাতের কাছে এমন কোন নজির ছিল না যে রুখে দাঁড়াই। কিন্তু সব দিন সমান যায় না। কালের চাকা ঘোরে। আমাদের এই ঘরকুনো অপবাদ ঘোচাতে এগিয়ে এলেন শ্রীমতী আরতি সাহা। দুরন্ত ইংলিশ চ্যানেল পার হয়ে বাঙালী মেয়েদের সামনে সাহসিকতা ও অ্যাডভেঞ্চারের এক নতুন দৃষ্টান্ত স্থাপন করলেন। দিকে দিকে সাড়া পড়ে গেল। বাঙালী মেয়ের এই অ্যাডভেঞ্চারকে স্বাগত জানালেন অনেকেই। আবার কেউ-বা ঘুরে দাঁড়িয়ে মন্তব্য করলেন, নেহাতই ব্যতিক্রম।

কিন্তু সেদিন ওঁদের মূল্যায়নে একটু ভুল হয়েছিল। শ্রীমতী আরতির ইংলিশ চ্যানেল জয়ের ঘটনা বাঙালী মেয়েদের ক্ষেত্রে ছিল নবজাগরণের সূচনা। তাই কিছু দিন যেতে না যেতেই দেখি বাঙালী মেয়েরা আবার নতুন অ্যাডভেঞ্চারের নেশায় মেতে উঠলেন। এবার ওঁদের পদক্ষেপ নতুন দিকে। অজানাকে জানবার এবং অজেয়কে জয় করবার দুরন্ত নেশায় এই মেয়েরা বেছে নিলেন পর্বতশিখর। ঠিক এর আগেই বাংলাদেশেরই এক দল ছেলে জয় করে এসেছেন নন্দাঘুন্টি। প্রথমে ওঁরা স্থির করলেন নন্দাঘুন্টি শৃঙ্গে আরোহণ করবেন। কিন্তু পরে মত পাল্টে ঠিক হলো নন্দাঘুন্টির পরিবর্তে গাড়োয়াল হিমালয়ের রোণ্টি শৃঙ্গ। ১৮,৮৯৩ ফুট উঁচু এই শৃঙ্গ জয়ের উদ্দেশ্যে বেরিয়ে পড়লেন নয়জনের একটি দল। আটজন অভিযাত্রী এবং একজন ডাক্তার নিয়ে এই অভিযাত্রী দল। আর ওঁদের সঙ্গী হলেন বিখ্যাত শেরপা পাশাং ফুতার। হাওড়া স্টেশনে অনেকেই সেদিন জড়ো হয়েছিলেন ওঁদের সাফল্য কামনা করে বিদায় জানাতে। সবাই উৎসাহিত হয়েছিলেন এই ভেবে যে, পারুক আর না পারুক তবু বাঙালী মেয়েরা পর্বতের আহ্বানে সাড়া দিয়ে বেরুতে পারলো।

কিন্তু সব সন্দেহ এবং আশঙ্কা অমূলক হয়ে গেল। রোণ্টি শৃঙ্গে ওঁরা বিজয় পতাকা উড্ডীন করলেন। বাঙালী মেয়েদের প্রথম অভিযানেই এহেন সাফল্যে সারা দেশে আনন্দের বান ডাকলো। কলকাতা ফিরে আসতে সভা-সম্বর্ধনায় ওঁদের অভিনন্দিত করা হলো নানাভাবে। কলকাতা কর্পোরেশন থেকে ওঁদের সম্বর্ধনা জানানো হলো। আর একটি সম্বর্ধনা-সভায় ওঁদের নিয়ে যাওয়া হলো শোভাযাত্রা করে। প্রধানমন্ত্রী এবং রাষ্ট্রপতি সবাই ওঁদের অভিনন্দিত করলেন। বাঙালী মেয়েদের এই সাফল্যে সবাই সমান আনন্দিত। ১৯৬৭ সালের ২৮ অকটোবর চিহ্নিত হয়ে রইলো এই বিজয়গর্বিত সাফল্যের স্মারক হিসেবে। আর এই বিরাট সাফল্যের নেত্রী শ্রীমতী দীপালি সিংহ জনমনে অধিষ্ঠিত হলেন সাফল্যের এক নতুন দিশারী হিসেবে।

কিন্তু কাজটা খুব সহজ ছিল না দীপালির পক্ষে। সেই সবেমাত্র তিনি অ্যাডভান্স ট্রেণিং শেষ করে ফিরে এসেছেন দার্জিলিং-এর হিমালয়ান মাউন্টেনিয়ারিং ইন্সটিটিউট থেকে। এ-ও নেহাতই একটা যোগাযোগের ব্যাপার। টালিগঞ্জ আনন্দ আশ্রমের ছাত্রী ছিলেন দীপালি। স্কুল ফাইনাল পরীক্ষায় সিট পড়েছিল স্ত্রীশিক্ষায়তনে। বাবার সঙ্গে পরীক্ষা দিতে আসতেন রোজ। স্ত্রীশিক্ষায়তনের পরিবেশ বাবার খুব পছন্দ। তিনি মেয়েকে বললেন যে, পাশ করলে তাঁকে এই কলেজে ভর্তি করে দেবেন। কথানুযায়ী কাজ। পাশ করে দীপালি ভর্তি হলেন স্ত্রীশিক্ষায়তনে। শুধু পড়ায় মন বসে না তাঁর। এক্সট্রা-কারিকুলার অ্যাকটিভিটিস-এর দিকেও তাঁর সমান ঝোঁক। তিনি যোগদান করলেন এন সি সি'তে। এখান থেকেই তিনি মনোনীত হলেন মাউন্টেনিয়ারিং ট্রেণিং-এর জন্যে। ১৯৬৪ সালে বেসিক ট্রেণিং নিতে এলেন দার্জিলিং। সঙ্গে ছিলেন বিখ্যাত অ্যাথলীট শ্রীমতী অনিতা মুখার্জি। এর আগে কিন্তু দীপালির কোন পরিকল্পনাই ছিল না পাহাড়ে চড়ার। নেহাত সুযোগের সদ্ব্যবহার করতেই তাঁর দার্জিলিং আসা। এখানে আরো নানা রাজ্যের শিক্ষার্থীর সঙ্গে পরিচয় হতেই তাঁর মনটা খিচড়ে গেল। ওঁরা সরাসরি দীপালিকে বলে বসলেন, বাঙালী মেয়ের আবার এই শখ কেন? ওঁরা তো শুধু ঘর-সংসার করার জন্যই নির্দিষ্ট। কথাটা দীপালির খুব খারাপ লাগলো। মুখে কিছু বললেন না। কিন্তু ভীষণ জেদ চেপে গেল। মনে মনে সঙ্কল্প করলেন যে, বছর বছর পর্বতাভিযান করে ওঁদের এই অভিযোগের উত্তর দিতে হবে। বেসিক

ট্রেণিং-এর দীর্ঘ তিন বছর পর তিনি অ্যাডভান্স কোর্সের সুযোগ পেলেন ১৯৬৭ সালে। সরকারী বৃত্তিতেই ট্রেণিং-এর ব্যবস্থা হয়েছিল। অন্যান্য রাজ্য থেকে অবশ্য আগ্রহীরা নিজেও আসেন ট্রেণিং নিতে।

অ্যাডভান্স কোর্স করতে এসে দীপালি জানতে পারলেন যে, ইতিপূর্বে একাধিক বাঙালী মেয়ে এখান থেকে ট্রেণিং নিয়ে গেছেন। তিনি ও'দের নাম-ঠিকানা নিলেন ফিরে গিয়ে যোগাযোগ করার উদ্দেশ্যে। আর এখানেই পরিচয় হলো শীলা ঘোষ এবং লক্ষ্মী পালের সঙ্গে। ও'রা তখন বেসিক ট্রেণিং নিচ্ছেন। ও'দের সঙ্গে দীপালি কথাবার্তাও বললেন ট্রেণিং-এর পর পর্বতাভিযান নিয়ে। এই প্রস্তাবে ও'রা দুজনে খুবই উৎসাহ দেখালেন। ও'দের কাছ থেকে উৎসাহব্যঞ্জক সাড়া পেয়ে দীপালির কল্পনা আস্তে আস্তে দানা বাঁধতে শুরু করলো। কলকাতা ফিরে এসে আর দেরী করলেন না। নাম-ঠিকানার খাতাটা বের করে বসলেন। সবাইকে চিঠি দিলেন। অভিযানের কথা লিখলেন না, নিছক পরিচয়ের উদ্দেশ্যেই চিঠি লিখলেন। সকলে একসঙ্গে হলে আসল কথাটা পাড়বেন এই উদ্দেশ্য নিয়ে। তারপর নির্দিষ্ট দিনে ও'রা মিলিত হলেন। গোল পার্কে রামকৃষ্ণ মিশনের কাছে একে অপরের সঙ্গে পরিচিত হলেন। প্রথম দিন প্রাথমিক আলাপ পরিচয়েই কেটে গেল। এর পর দিন ও'রা কোথায় মিলিত হবেন ঠিক হলো। কথামত সবাই এলেন। সেখানেই অভিযানের কথাটা উঠলো। সবাই একবাক্যে রাজি। কিন্তু মুশকিল হলো যে ও'দের কোন অফিস নেই। এই ভাবনা থেকে ও'দের রেহাই দিলেন দীপালির বাবা ডাঃ দেবেন্দ্রচন্দ্র সিনহা। তিনি নিজের বাড়ির বাইরের ঘরটা ছেড়ে দিলেন ও'দের। এবং ও'দের প্রতিষ্ঠানের নামকরণও তিনি করলেন 'পথিকৃৎ'। এবার শুরু হলো অভিযানের আসল কাজ। নানাদিক থেকে ও'রা খুব সাড়া পেলেন। সকলের শুভেচ্ছা নিয়ে বেরিয়ে ও'রা রোণ্টিতে সফল হয়ে ফিরলেন।

এবার পর্বতের নেশা পেয়ে বসলো দীপালির। এক বছর পর আবার অ্যাডভান্স কোর্স করার জন্যে তিনি বেরিয়ে পড়লেন। এবার ট্রেণিংস্থল উত্তর কাশী। এই ট্রেণিং-এর উদ্দেশ্য নিজেকে আরো সুস্পষ্ট করে গড়ে তোলা। বাঙালী মেয়েদের দুর্নাম ঘোচাবার সংকল্প যখন নিয়েছেন তা তিনি ভালভাবেই পালন করবেন। সেজন্য পর্বতারোহণ বিষয়ে কোন ত্রুটি রাখতে চান না। ট্রেণিং শেষ করে ফিরে এলেন। ১৯৬৯ সালেই আবার শুরু হয়ে গেল নতুন অভিযানের তোড়জোড়। লক্ষ্য এবার কুলু লাহুল হিমালয়ের বড় শিগরি। রোণ্টির উচ্চতা ছিল ১৯,৮৯৩ ফুট। এবারের উচ্চতা একটু বেশী ২১,৭৬০ ফুট। তবে সব সময় পর্বত-শিখরের উচ্চতা দিয়ে অভিযানের গুরুত্ব বিচার করা যায় না। দুর্গমতাই হলো অভিযানের আসল ব্যাপার। এদিকে লক্ষ্য রেখে বেশী উচ্চতার পরও কম উচ্চতার পর্বত অভিযানে কোন বাধা নেই।

এবারে ডাক্তার নিয়ে অভিযাত্রীর সংখ্যা সাতজন। অভিযানের নেত্রী এবারও দীপালি। প্রথম সাফল্যের উৎসাহে ও'দের প্রাণে উৎসাহের যে জোয়ার এসেছিল তাতে ভর করে এবারও ও'রা যাত্রা করলেন শুভেচ্ছা নিয়ে। আর সকলের উৎসাহ এবং আকাঙ্ক্ষা সফল করে এবারও ও'রা পর্বত-শৃঙ্গে বিজয়কেতন প্রোথিত করলেন। ক্রমাগত সাফল্যে পর্বতাভিযানের নেশা ক্রমেই বাড়তে লাগলো। ভয়কে জয় করে সফল হয়ে যাঁরা ফিরে এসেছেন সবাই তাঁদের কাছে নতুন মন্ত্রে দীক্ষা নিতে শুরু করলেন। ঘরকুনো বাঙালী মেয়ের অপবাদ ঘোচানোয় দীপালির সংকল্প অসাধারণ-ভাবে সফল হলো।

দীপালি কিন্তু এখানেই থেমে থাকলেন না। ইতিপূর্বে তিনি ক্যাম্প লীডারশিপ ট্রেণিং নিয়েছেন মাউণ্ট আবু'তে। এর উদ্যোক্তা ছিল ইয়ুথ ইণ্ডিয়া হোস্টেল এসোসিয়েশনের। সেটা ছিল ১৯৬৮ সাল। উত্তরকাশীতে অ্যাডভান্স কোর্স-এর ঠিক পরেই। এবার তিনি বেরুলেন ট্রেকিং-এ। ১৯৭০ সালে কুলু হিমালয়ে চন্দ্রতাল অভিযান করেন। তুষারপাতের জন্য ভীষণ-ভাবে বাধাপ্রাপ্ত হন। কিন্তু অদম্য উৎসাহে ট্রেণিং সমাপ্ত করে ফিরে এলেন। আবার ১৯৭১ সালে পিণ্ডারি গ্লেসিয়ারে যাত্রা করেন এই একই উদ্দেশ্যে। এবারে তিনি ক্যাম্প লীডার। প্রসঙ্গতঃ দীপালি জানালেন যে, এই ট্রেণিং করতে গিয়েই ট্রেইল গিরিবর্ত্মে প্রাণ হারান অনিমারি

সামনে পড়ে আছে আরো দুর্গম পথ...

...ক্ষণিক বিরতি

অর্থাৎ শ্রীমতী অনিমা সেন। কেউ কেউ মনে করেন যে, তিনি পর্বতারোহণের উদ্দেশ্যেই বেরিয়েছিলেন। কিন্তু এই ধারণা ঠিক নয়। তবে তাঁর মৃত্যু খুবই বেদনাবহ। পর্বতে সব সময় বরফের চাঁই ভেঙে পড়ছে। এই চাঁই যে কোন সময় অভিযাত্রীর প্রাণনাশের কারণ হতে পারে। এজন্য অভিযাত্রীকে সব সময় খুবই সতর্ক থাকতে হয়। তবু কখন যে কি ঘটে যায় কিছুই বলা যায় না। এমনি একটি বরফের চাঁই সরাসরি শ্রীমতী সেনের মাথায় এসে পড়ে এবং তিনিই প্রথম মহিলা পর্বতে প্রাণ হারান। ভয়-ভীতির বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে পাহাড়ে চড়ার ব্যাপারে তিনি নিঃসন্দেহে পথিকৃতের মর্যাদার অধিকারী। তাই দীপালির ইচ্ছে এ বছর ওঁরা যে শৃঙ্গটি জয় করেছেন তার নামকরণ করবেন স্বর্গতা অনিমা সেনের নামে।

এ বছর আবার ওঁরা অভিযান করেছেন। মাত্র তিনজন অভিযাত্রীর একটি দল নিয়ে দীপালি বেরিয়ে পড়েছিলেন। এ-ও সম্ভব হতো না তাঁর বাবার উৎসাহ ছাড়া। বিশেষতঃ গত বছর সফল পর্বতাভিযানের পর ফিরতে পথে প্রাণ হারান সুজয়া গুহ এবং কমলা সাহা। সুজয়া গুহ আবার ঐ অভিযানে দলের ম্যানেজার ছিলেন। এই [illegible] এসেছে শোকের ছায়া এবং কেউ কেউ একটু ভীতও হয়ে পড়েছেন। কিন্তু ভয় পেলে চলবে না আর বিপদ তো যে কোন মুহূর্তে ঘটতে পারে সুতরাং অভিযান চালিয়ে যেতেই হবে। অন্ততঃ মহিলা পর্বতারোহীদের মনোবল চাঙ্গা করার জন্য এর প্রয়োজন আছে। এরকম একটি দুর্ঘটনায় শিকার এবার দীপালির নিজেরই হওয়ার সম্ভাবনা ছিল। পর্বত থেকে ফেরার সময় একটি বরফের চাঁই এসে পড়ে। অল্পের জন্য প্রাণে বাঁচেন। কিন্তু ডান হাত জখম হয়। এজন্য তো আর অভিযান থেকে পিছিয়ে আসা চলে না।

এই মনোভাব থেকে এবং মুখ্যতঃ দীপালির বাবার অনুপ্রেরণায় তিনজনের দল তো তৈরী হলো কিন্তু টাকা-পয়সার কি হবে? এই ভাবনা সকলের। প্রথমে অভিযাত্রীরা নিজেদের পুজোর জামা-কাপড়ের টাকা দিয়ে ফাণ্ড খুললেন এবং অনেক চেষ্টাচরিত্র করে টাকা যা সংগৃহীত হলো অভিযান চালানোর পক্ষে তা খুবই সামান্য। তাছাড়া দলে ডাক্তার নেই। শেরপা তো দূরের কথা। সব কষ্ট স্বীকার করে শুধু নিজেদের মনোবলে ভর করে ওঁরা বেরিয়ে পড়লেন ১৭,৫০০ ফুট উঁচু ছোটো শিগরি অভিযানে। এরও অবস্থিতি কুলু লাহুল হিমালয়ে।

এবারে দীপালির সহযাত্রী অন্য দুজন হলেন [illegible] এবং [illegible] ঘোষ। শীলা ইতিপূর্বে ওঁদের দলে ছিলেন। কিন্তু ফুজরার পর্বতাভিযান সম্পূর্ণ নতুন। বেস ক্যাম্প থেকে পর্যায়ক্রমে দুটো ক্যাম্প স্থাপিত হলো। প্রথম থেকেই তুষারপাত ওদের হুমকী দেওয়ার চেষ্টা করছিল। কিন্তু বিশেষ সুবিধা করতে পারে নি। সামিট ক্যাম্প থেকে যাত্রা করে ওঁরা পর্বত চূড়ায় উঠলেন। উড্ডীন করলেন বিজয় পতাকা। পর্বতশীর্ষে এবার দীপালিকেও দেখা যায়। পর পর তিনটি সফল অভিযানের নায়িকার শীর্ষারোহণ এই প্রথম। ইতিপূর্বে দলনেত্রীর স্বাভাবিক দায়িত্ব পালন করতে গিয়েও ওঁর পক্ষে শীর্ষারোহণ হয়ে ওঠে নি।

আরও অভিযানের কথা উঠতেই দীপালি জানালেন যে, কুলু অঞ্চলেই যাওয়ার ইচ্ছে আছে। এখানে এমন অনেক শৃঙ্গ আছে যার নামকরণ পর্যন্ত হয় নি। তাছাড়া বিদেশী অভিযাত্রীরাও এদিকটা এড়িয়ে গেছেন। তাই এই অঞ্চলে আরো আবিষ্কারের নেশায় মেতে থাকাই আমার ইচ্ছে। এর চেয়ে বেশী কিছু আর হবে বলে মনে হয় না। একে তো এক-একটি অভিযানে প্রচুর পয়সার দরকার কিন্তু ইদানীং তেমন আর কেউ উৎসাহ দেখাচ্ছেন না। শুনে অবাক হতে হয় যে এবার ওঁরা অভিযানে বেরিয়ে পয়সার অভাবে মাল বইবার জন্য 'পনি' ভাড়া করতে পারেন নি। সব মাল নিজেদের বহন করতে হয়েছে। তবু যে ওঁরা বিজয়ী হয়ে ফিরতে পেরেছেন এতেই ওঁদের আনন্দ। যদি আরো অনেকে এতে উৎসাহিত এবং অনুপ্রাণিত হন তবেই ওঁদের এই কষ্ট স্বীকার সার্থক হবে। জনমনে যে ওঁদের অভিযান নিয়ে খুব একটা উৎসাহের সৃষ্টি হয় না এজন্য দীপালি খবরের কাগজকে দায়ী করলেন। খবরের কাগজগুলি যথাসময়ে একটু প্রচার-ব্যবস্থা করলে ওঁদের পক্ষে লোকজনের কাছে বক্তব্য রাখার সুবিধা হয়। কিন্তু এই অভাবে ওঁদের প্রচেষ্টা অনেকখানি ব্যাহত হয়। দীপালির তাই আবেদন এ ব্যাপারে যেন খবরের কাগজের কর্তা-ব্যক্তিরা একটু উদ্যোগী হন।

খেদের সঙ্গে দীপালি বললেন, এই আমাদের হাল। পর্বতাভিযানে এখনো গুজরাটের মেয়েরাই এগিয়ে আছে। চার-পাঁচটি অভিযাত্রী দল সেই রাজ্য থেকে পর্বতের ডাকে সাড়া দেয় প্রতি বছর। এরকমটা আমাদের কেন হবে না?

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতক দীপালি পেশায় শিক্ষিকা। কিন্তু পর্বতের আহ্বান এলে তিনি পেশার কথা ভুলে যান। পর্বতের শিখরে শিখরে ঘুরে দীপালি আরো অনেক দূর এগুতে চান। এজন্য প্রয়োজন আরো সহযোগিতা, উৎসাহ ও সহায়তা।

দীপালির এ আবেদন কি [illegible]?

—[illegible]

সুবনশিরি

অমরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

।। জেলো ।। [illegible]

মেঘুর শৈশবের প্রথম দিকটা কেটেছে নিতান্ত নিভৃতে। চার পাঁচ বছর বয়স পর্যন্ত সে নিজের ঘরের বাইরে যাবার বিশেষ সুযোগ পায় নি। বিশিরও পাড়ায় ঘুরে বেড়ানো অভ্যাস ছিল না। কাচিৎ কখনো লাইনের দু-একটা ছেলেমেয়ে তাদের উঠোনেই আসত মেঘুকে দেখতে, তার সঙ্গে ভাব করতে। এক আধবার সেও পালিয়ে যেত আশ-পাশের ঘরে। ঐ না-জানা ঘরের ভিতরটা জানবার আগ্রহ সে দমন করতে পারত না। তখনই বিশি ধরে নিয়ে আসত তাকে। অতটা সে পছন্দ করত না নিশ্চয়ই। কিন্তু সে জন্য মেঘুর কোন অভিযোগ ছিল না। অর্থাৎ কাঁদাকাটা করত না, নির্বিবাদে উৎপাতটা সহ্য করে যেত। তখন সে শান্ত-শিষ্ট। তবে অমন পালাবার সুযোগ সন্ধানে থাকত তার মন, এবং তার অবহেলা করত না কখনো।

রাবণ ও রাঘবের ঘর দুই পৃথক লাইনে। একটু দূরেও। মাঝে আবার একটা নালা, তার ওপর বানানো সেতু—গাড়ী চলাচলের জন্য। সে পথ দিয়ে যেতে গেলে খানিকটা ঘুরতে হয়। শিশুর পক্ষে এতটা ঘুরে মিতালি করতে যাওয়াটা তেমন সম্ভবপর হত না। ঐ নালাটা এই দু-লাইনের ছোট ছেলেমেয়েদের মেলামেশায় বেশ একটু ব্যবধান রেখে দিত। অন্ততঃ নির্দিষ্ট একটা বয়স পর্যন্ত। বিশেষ করে মেঘুর মতো আদুরে শিশু। সেই নালার কোথাও বা দু-একটা গাছের গুঁড়ি ফেলে রাখা হত। তাও একটু বড়দের যাওয়া-আসার জন্য, শিশুর পক্ষে তা মোটেই নিরাপদ নয়।

ক্রমে মেঘু বড় হল। আর তাকে ঘরে আটকে রাখা যায় না, তার প্রয়োজনটাও নেই তেমন। ছেলেমেয়েদের কাছে তার খাতিরটা ক্রমশঃ পরিণত হল। সময়ে তার আধিপত্য বিস্তার হল সমস্ত পাড়ায়। তার অমন প্রতিপত্তি তার সীমাবদ্ধ থাকতে চায় না। [illegible] দৌরাত্ম্যে পাড়াকে [illegible]।

[illegible]

মেঘুর মেলামেশা না থাকলেও দেখাশোনার পরিচয়টা পুরানো। তাই তাদের সঙ্গে মেঘুর চেহারার কাক বকের মতো পার্থক্য বোধটা প্রায় মনের তলায় তলিয়ে ছিল। যেদিন সে তাদের সামনে প্রথম হাজির হয়, সেদিন বোধ হয় সেই পার্থক্য বোধটা সামান্য একটু মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে। তাতে মেঘু হেরে গিয়েও জিতে আসে। তারপর থেকে সে পাড়ার ছেলেমেয়েরাও মেঘুর নেতৃত্ব স্বীকার করে নেয়। নতুন সর্দারের নতুন পরিকল্পনায় সকলের মনে জেগে ওঠে নতুন উদ্যম। নতুন উৎসাহ নিয়ে তারা এক-একদিন এক-একদিকে অভিযানে বেরিয়ে পড়ে— জলে-স্থলে, ঝোপে-জঙ্গলে, গাছের ডালে, পাড়ায় পাড়ায়, খেলায়-ধুলোয়, মারামারিতে, জয়-পরাজয়ে। রাজ্যের পর রাজ্য লাভ করে এগিয়ে চলে সে। এমন কত অভিজ্ঞতার আগুনে পুড়ে মেঘু হয়ে ওঠে এক দুরন্ত।

তার সূচনা হয় এক দুপুরে। মেঘু সদলবলে যায় রাঘবদের পাড়ায়। নবাবের দপ্তরেও অনেক ক্ষুদ্র নবাব থাকে। রাঘব একজন খানদানী সর্দার। তার পাড়ার ছেলেগুলোও যেন ক্ষুদ্র সর্দার। সে পাড়ার ছেলেগুলো এ পাড়ার কাকের দলটা ঘিরে দাঁড়াল—চোখ পাকিয়ে তাকাল তাদের সঙ্গের বকটার পানে। শুধু কাক হলে হয়তো অতটা হত না। বিশেষ ওই বকটার ওপর। ওটাকে ঠিট করতে পারলেই সব ঠিক হবে। রাজ্যে শত্রুর ফৌজ ঢুকেছে। পাঠান রাজ্যে মোগল। সংখ্যাধিক্যের জোর তাদের। হঠাৎ একজন এগিয়ে এসে ঠাস করে একটা চড় বসিয়ে দিল মেঘুর গালে। এতটা সহ্য করবার পাত্র সে নয়। কিন্তু ঘটনাটা অত্যন্ত অকস্মাৎ। ভাববার মতো, কিছু একটা করার মতো সময়ও পেল না। তার আগেই আর একটা ঘটনা!

ছোট্ট একটা মেয়ে ছুটে এসে আক্রমণকারী ছেলেটার পেট লক্ষ্য করে ছাড়ল একটা ঘুষি—সঙ্গে সঙ্গে ছেলেটার হাতও উঠে পড়ল ঘুষিটাকে বার্থ করতে। সেই সংঘর্ষে মেয়েটার হাতের কাগাছা কাঁচের চুড়ি ভেঙ্গে পড়ল, একটু রক্ত দেখা গেল তার হাতের কব্জিতে। আর কোন ছেলেটা পালাল, পিছনে ছুটল তার সঙ্গীরা।

মেয়ের কাছে হারল ছেলেরা! ছোট্ট মেয়ের সখীরা বিজয় উৎসব করল। তাদের হাসির কলরবের সঙ্গে তাল রেখে আশ-পাশের ডাল থেকে পাখীগুলো নেচে গেয়ে উঠল।

মেঘুর হাতটা ধরে ছোট্টো মেয়েটা জিজ্ঞাসা করল—তুই কি বগা (অর্থাৎ ফর্সা) মেঘু?

মেঘু তার এমন নাম শোনে নি কখনো। মেয়েটির দুটি স্থির সরল চোখের সামনে বিহ্বল হয়ে দাঁড়িয়ে রইল মেঘু, কোন জবাব দিতে পারল না। শুধু ভাবতে লাগল—কবে মেয়েটি তাকে দেখেছে, সে মেয়েটিকে দেখেছে?

মেঘুর জবাব না পেলেও, মেয়েটির বুঝতে কিছুই বাকী ছিল না। সে বলল— আমি শর্মা, চল আমাদের ঘরে।

শর্মা ভেবে নিল তার ছোট্টো নামটাই যথেষ্ট তার পরিচয় দেবার পক্ষে, তার আদেশ মেঘুর মতো ছেলের মেনে চলার পক্ষে। বিজয়গর্বে ভরে উঠল শর্মার ছোট বুকখানা। মেঘুর মতামতের কোন অপেক্ষা করল না শর্মা। টানতে টানতে সে মেঘুকে নিয়ে এগিয়ে চলল তাদের ঘরের দিকে।

পিছন পিছন তার সখীরা লাফিয়ে-ঝাঁপিয়ে, কলরব করে চলল—বগা মেঘু আইছে রে, বগা মেঘু—

এক বিপদ থেকে মুক্ত হয়ে মেঘু পড়ল আর একটা বিপদে! এমন অবস্থায় সে কখনো পড়ে নি। এর হাত থেকে রেহাই পাবার কোন পথ তার জানা হয়নি। এবং তা থেকে উদ্ধার লাভের কোন চেষ্টাই সে করতে পারল না। মুহূর্ত পূর্বে সে অতবড় একটা ছেলেকে ঘায়েল করল। শুধু তাই নয়, আরো কিছু দেখলো সে মেয়েটার মুখেচোখে। যার হাতে সে বাঁধা পড়েছে— তার সঙ্গে সে যেতে হবে, সে বিষয়ে মেঘুর মনে কোন সংশয় রইল না। কাল কুকুরের কবলে বাঁধা পড়ে সাদা কুকুরের লেজটা নেমে গেল। একই সঙ্গে হার জিতের দুঃখ ও আনন্দের মধ্যে পড়ে সে যেন গুটিয়ে গেল।

মেঘুর বন্ধুরা হতাশ, নয়তো হতভম্ব হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। ভাবতে থাকল মেঘুর দুর্গতির কথা!

শক্রী দূর থেকে দেখল, তার মেয়ে কাকে ধরে নিয়ে আসছে। তারা সামনে আসতে সে খুব খুশী হল। এই ছেলেটিকে জানবার, তার স্পর্শ লাভের আশা-আকাঙ্ক্ষা সে অনেক দিন ধরে মনের মধ্যে পোষণ করে আসছে। ছুটে গিয়ে সে তাকে কোলে তুলে নিল, যেন একটি শশক শাবকের মতো, কত আদর করল। মায়ের কোল থেকে মেঘুর কুলেপড়া পা দুটো ধরে দাঁড়িয়ে রইল শর্মিষ্ঠা।

মেঘুর যত ওজর আপত্তি উপেক্ষা করে শক্রী অনেক স্বাদু বস্তু তাকে খাওয়াল। সেটা নেহাত মন্দ লাগল না। অপরের ঘরে বসে এমন খাওয়া, অনাত্মীয়ের কাছে এত আদর-যত্ন পাওয়া, মেঘুর জীবনে এক নতুন অধ্যায়, নতুন অভিজ্ঞতা। কিন্তু তার মতন একটা দিগ্বিজয়ীর সঙ্গে অমন শিশুর মতো ব্যবহার তেমন ভাল লাগছিল না। তবুও সব মিলিয়ে কি যেন একটা উপভোগের বস্তুও সে পেয়েছিল তার মধ্যে। শুধু একটি ত্রুটির কথা মাঝে মাঝে মনের কোণে ঠেলে উঠে তার মাথাটা লজ্জায় হেঁট করে দিতে চাইছিল। সেটি তার চড় খাওয়ার পাল্টাটা ফিরিয়ে দিতে না পারার ত্রুটি। কিন্তু শেষ পর্যন্ত কেউ তুলল না সে কথা। শর্মারা বলল না। সে সোয়াস্তির নিঃশ্বাস ছাড়ল—মনে মনে তারিফ করল শর্মাদের বুদ্ধির।

ওদের দাওয়ায় শক্রীর কোলে বসে কত গল্প করল, কত প্রশ্নের জবাব দিল মেঘু। আদর আপ্যায়ন শেষ করে শক্রী বললে—চল্ তোকে ঘরে পৌঁছে দিয়ে আসি।

এতক্ষণ পর মেঘু সুযোগ পেল তার বীরত্বের কথা সকলের সামনে জাহির করবার। সে চোখ দুটো টেনে হাত ঘুরিয়ে বললে—কেন! আমি একলা কতদূর যাই।

শক্রীর কোল ছেড়ে মেঘু দাঁড়াল। তার দিগ্বিজয়ের কত বিস্ময়কর ঘটনা হাত-পা নাড়া দিয়ে উল্লেখ করল। কিন্তু অত কথা শোনার পরও শক্রী তাকে কোলে তুলে নিল, কত লোকজনের চোখের সামনে তাকে কোলে নিয়ে পথ চলল। সাঁকোটা পার করে তাদের ঘরের কাছে তাকে নামিয়ে দিলে। এর কারণটা সে বুঝল না। শুধু তাই নয়। তাকে নামিয়ে দিয়ে পথ থেকেই ফিরে যেতে চায় শর্মিকে নিয়ে। এটাও বেমানান লাগল তার কাছে।

—চল্ না আমাদের ঘরে। শক্রীর আঁচল টেনে বললে মেঘু। সে দেখাতো তার মাকে—কত বড় লোকের সঙ্গে তার ভাব।

—আর একদিন আসব। বলে, শর্মিষ্ঠাকে নিয়ে দূরে দাঁড়াল শক্রী। যেন ওদের ঘরের কারো চোখে না পড়ে যায়।

মেয়েটাও ভাবতে থাকল—ওদের ঘরের সামনে থেকে মা ফিরে যায় কেন? তবে এতটা এল কি করতে!

।। চোদ্দ ।।

ঘরে ফিরে মেঘু সকলের কাছে খুব ফলাও করে বলে তার সেদিনকার অভিযানের কাহিনী। শুধু একটা বাদ দেয় খাবার কথাটা। সেটা লজ্জার জন্য নয়—পাছে ঘরের বাইরে যাওয়া বন্ধ হয়ে যায়। অপরের মুখে তাদের ঘরে মেঘুর অনেক অভিযানের খবর পৌঁছুবার ফলে, সময় সময় তাকে যে সব মুশকিলে পড়তে হয়েছে তার সব কষ্ট একসঙ্গে মনে পড়ে গেল। তাই, ঐ অংশটা বাদ না রেখে উপায় ছিল না।

ঘরের সবাই খুশী হল ওদের আদর-যত্নের কথা শুনে, নতুন বান্ধবীর কথা শুনে। তারা ভাবল অমন ভাল ঘরের মেয়ের বন্ধুত্বে বাঁধা পড়লে মেঘুর ঘুরে বেড়ানোর অভ্যাসে হয়তো কিছু ভাঁটা পড়তে পারে, হয়তো পড়াশোনা করা মেয়েটার সংস্পর্শে এসে তার মতিগতি ফিরতে পারে।

সেই থেকে মেঘু নিয়মিত ওদের ঘরে আসা-যাওয়া করে। শর্মিষ্ঠাও আসে এদের ঘরে। খায়দায়, কথা কয়, খেলা করে দুজনে মিলে। দুটি শিশুকে অবলম্বন করে দু-ঘরের মেলামেশা আন্তরিকতা ঘনিয়ে ওঠে।

এর আগেও শক্রী চলতে ফিরতে বিলিকে দেখেছে। শক্রী শ্যামবর্ণা হলেও সুগঠনা, সুশ্রী। তবে বিলির সঙ্গে তার তুলনা হয় না। অনেকের মতো শক্রীও একদিন ভেবেছিল—বিলির পা মাটিতে পড়ে না তার রূপের দেমাকে। শক্রী অত বড় নাম করা সর্দারের গৃহিণী। তার সঙ্গে ভাব করতে, ভাব রাখতে সবাই ব্যস্ত। তাই শক্রী আশা করেছিল বিলিই এসে তার সঙ্গে আলাপ করবে। তার সে আশা পূর্ণ হয় নি। রূপ যতই থাক—দিনমজুরের ঘরণী, তার এত ডাঁট। রাগে, ঈর্ষায় শক্রীর দেহমন ফুলে ওঠে। এক থাক নীচে থেকে সে এত পুরানো একটা সমস্যার এমন সমাধান হয়ে যেতে পারে তা সে ভাবতেও পারে নি। শর্মিষ্ঠার সঙ্গে মেঘুকে দেখে তার ঈর্ষার ঢেউটা কেমন করে কোথায় মিলিয়ে গেল শক্রী তার কিছুই বুঝতে পারল না। সে মুগ্ধ হল বিলির সঙ্গে আলাপ করে।

মায়ের দুটো গুণই পেয়েছে শর্মিষ্ঠা—বর্ণ ও গড়ন। কথা কয় বড় মিষ্টি। বিলিও খুশী হয়েছে শর্মিষ্ঠাকে পেয়ে, তার মায়ের সঙ্গে বন্ধুত্ব পাতিয়ে।

বিলির প্রকৃতির যে অংশটা অনেকে দেমাক বলে মনে করে সেটা তার ঔদাসীন্য। তার সে ভাব কেটে যায় কারো সঙ্গে কথায় বসলে, আবার এসেও যায় কথা বলতে বলতে। লক্ষ্মী আড়ালে বুঝিয়ে দেয় শক্রীকে, ওটা তার মাথার দোষ। দুঃখে অনুকম্পায় ভরে ওঠে শক্রীর মন। এমন সুন্দর মেয়ের এমন হল।

শর্মিষ্ঠা যায় ইস্কুলে—মেঘু তখন ঘুরে বেড়ায়, দুরন্তপনা করে। ইস্কুল থেকে ফিরে মেঘুর জন্য বসে থাকে শর্মিষ্ঠা। মেঘুও দল ছেড়ে তখন ছুটে যায় ওদের ঘরে। কত হাসাহাসি, ঠাট্টা তামাসার কথা হয় দুজনের। কখনো বা নতুন বই খুলে শর্মিষ্ঠা ধরে মেঘুর সামনে, তাকে নিয়েও যেতে চায় ইস্কুলে। এক সঙ্গে যাবে, একসঙ্গে পড়বে, আবার একসঙ্গে ফিরবে—একসঙ্গে কত সময় থাকবে দুজন।

দুজনে একসঙ্গে অত সময় থাকার কথায় মনটা নেচে ওঠে। কিন্তু ঐ নীরস বইগুলো! আর বন্ধুদের সঙ্গে ভবঘুরেপনাও বন্ধ করতে হবে তাতে। মুখর মেঘু হঠাৎ চুপ করে যায়। নির্বাক মেঘুর পানে তাকিয়ে শর্মিষ্ঠার মনে জাগে আর একটা প্রশ্ন। সারাদিন সে কোথায় ঘোরে, কি করে? জানতে চাইল তা।

মেঘুর চোখমুখ হেসে ওঠে, নেচে ওঠে সারা দেহ। বললে—ওঃ, আমরা কত রকম খেলি, দেখবি—যাবি আমার সঙ্গে? দেখবি আমাদের যাত্রাগান?

—যাত্রাগান? নেচে ওঠে শর্মিষ্ঠার মন। পারে তো তখনই যায় মেঘুর সঙ্গে।

পরদিন ইস্কুল থেকে ফিরে শর্মিষ্ঠা গেল মেঘুর সঙ্গে তাদের বস্তির পিছনের বাগানটায়। সকল ব্যবস্থাই সে করে রেখেছিল আগে থাকতে। সেখানে কি বীরত্বই না সে দেখল মেঘুর। কী ভীষণ যুদ্ধ হল মেঘুর সঙ্গে মুখোশ পরা তাড়কা রাক্ষসীর।

শর্মিষ্ঠার ইস্কুলে মেঘুর যাওয়া হল না, উল্টে শর্মিষ্ঠা মেঘুর আখড়ায় অবসর মতো যাওয়া-আসা করতে করতে নিজেই একদিন দ্রৌপদী সেজে বসল। দুঃশাসন মজা দেখতে দেখতে শাসনের বাইরে গিয়ে মেঘুর হাতের থাপ্পড় খেল। শর্মিষ্ঠা ছুটে পালাল।

আর একদিন মেঘু সূর্পণখার নাকে এমন মোচড় দেয় যে বেচারা খেঁদি কেঁদে ওঠে। সে জন্য শর্মিষ্ঠার হাতের এক থাপ্পড় খেয়ে তিন ডিগবাজী দিয়ে মেঘু দাঁড়িয়ে যায় তার সামনে আর একটা গাল বাড়িয়ে।

একদিন বতীকে কুন্তী সাজিয়ে মা-মা বলে শর্মিষ্ঠার হাসি ঠাট্টার বস্তু হয়ে পড়ে মেঘু।

সীতার অগ্নিপরীক্ষা দেখাতে গিয়ে একদিন শর্মিষ্ঠার আঁচলটাই দিল পুড়িয়ে। রাগ করে শর্মিষ্ঠা এক রাত এক দিন কথা কয় নি মেঘুর সঙ্গে। মেঘুও ভয়ে যেতে পারে নি ওদের ঘরে। পরদিন শর্মিষ্ঠা খেঁদির ঘর থেকে ফেরবার পথে মেঘুকে দেখতে পায় বাগানের জামগাছটার ওপর। লুব্ধ রসনাকে সংযত করতে না পেরে তার বাক্য সংযম হারায়। গাছ থেকে নেমে এসে মেঘু জাম দিয়ে ভরিয়ে দেয় শর্মিষ্ঠার আঁচলের খুঁড়ি।

শর্মিষ্ঠা অভিযোগ করে—হ্যাঁরে, তুই আমাদের ঘরে যাস নি কেন?

—তুই রাগ করে চলে গেলি।

—সে তো কাল, আজ কেন গেলি না?

তা বটে! কিন্তু আজ না যাওয়ার কৈফিয়ৎটা দিতে পারে না। মেঘুর মনের কোণে তখনো চাপা আছে আর এক ভয়। সে ফিসফিস করে বলে— হ্যাঁরে, জেঠিকে বলে দিয়েছিস কাপড় পোড়ার কথা?

—ধ্যাৎ, তা হলে যে আমায় মারবে, আর যেতে দেবে না তোদের ওখানে খেলতে।

এমনিভাবে চলাফেরা করে পাশাপাশি দুজন বড় হতে থাকে। সময় এল—মেঘু বই নিয়ে বসল, কাজও করতে গেল। সেসব দেখে বিলি খুশী হল। ধীরে ধীরে তার দুশ্চিন্ত ফিরে গেল, ইস্কুলের কাজ শুরু করল। ছেলেমেয়েদের পড়িয়ে বিলি ঘরে

খেয়ে, সংসারের কাজও করে, মেঘুর খাবার নিয়ে যায় চা-খেতের পাশে। মেঘুর খাওয়া শেষ হলে বিলি দাঁড়িয়ে দেখে তার কম-চঞ্চলতা, কর্মনিষ্ঠা। কতবার মেঘু আগে মায়ের কাছে, শিখে যায় দু-চারটে নতুন শব্দ। গাছের গোড়ায় গিয়ে গিয়ে মেঘু কর্ক চালানোর তালে তালে নতুন শব্দের আবৃত্তি করে। ঘরে ফিরেও মায়ের কাছে বই নিয়ে বসে। দুজনের কাজের ফাঁক দিয়ে কেমন করে যে সময় বয়ে যায় তার কোন খবর রাখে না অন্যা। এর মধ্যে আর কোন ভাবনা চিন্তার অবকাশ নেই কারো। নয়তো তাদের কর্মধারার সঙ্গে চিন্তার ধারাও বদলে যায়। অন্ততঃ অপরের কাছে, অথবা অপরের সুবিধের জন্য তা প্রত্যক্ষ হয়ে ওঠে।

মেয়েদের মন যেমন সহজেই কিছু গ্রহণ করে তেমনি ছেড়েও দেয় সহজে। বিশেষ করে কুলিদের মেয়ে। দুটি ঘরের অত ভাব, অত মেলামেশা, সবই অকারণে অকস্মাৎ উবে গেল। অনিবার্য, অপরিহার্য তার আনুষঙ্গিক পরিণাম। ভোগ করতে হবে তার বিষময় ফলাফল। সেজন্য সকল দায় একটি পক্ষের। এত ব্যস্ত তারা, এমনই সময়ের অভাব তাদের! পাল্টা দেখা দিতে যাওয়া তো দূরের কথা, বিলির ঘরে এসেও শঙ্করী তার মুখে তেমন কথা বলবার আগ্রহ দেখতে পায় না।—ঠিক তা নয়। আগ্রহ দেখেছে, বিলি কত খুশী হয়েছে শঙ্করীকে দেখে। কাজের মধ্য দিয়ে সময়টা যে কেমন গড়িয়ে যায় তাও সে বলেছে তাকে। কিন্তু ভুল বোঝার সময় যখন আসে তখন অমনই হয়। কোন কৈফিয়ৎ কাজ দেয় না।

আগে সকলের ধারণা ছিল বিলি যৎসামান্য লেখাপড়া জানে। কিন্তু পরে তার এতখানি গুণের কথাটা প্রকাশ পাবার সঙ্গে সেখানে দুটি দলের সৃষ্টি হয়। একটি গর্বের—তাদের মধ্যে, তাদের ঘরে এমন মেয়ে আছে। অপরটি হিংসার। শেষোক্ত দলের মনে অনেক দিন আগেই হিংসার বীজ বোনা হয়েছিল—যেদিন তারা সদারের ঘরণীকে সম্মান দিতে এসে দেখেছে তার সাজসজ্জার তৎপরতা বিলির ঘরে যাবার জন্য, যেদিন তার সঙ্গে গল্প-গুজবে সময় কাটাতে এসে তারা পেয়েছে তার তাচ্ছিল্য, যেদিন থেকে সবাই তার মুখে শুনতে শুরু করেছে বিলির প্রশংসা। এককালে তারাই ছিল তার সকল অবসর আগলে, তখন থেকে তাতে ভাগ বসল। ভাগ তো নয়, এক রকম পুরোপুরি দখল। এমন অবস্থায় পড়ে কারা আর ফুল নিয়ে বসে থাকে! কিন্তু উপযুক্ত উপচারের অভাবে তাতে ফুল-ফল জন্মাতে পারে নি এতদিন। সময় এল হক কথা শোনাবার, ধর্মের ঢাক বাজাবার। যুগটাই হিংসার, সেটারই জোর বেশী। পরিণাম যাই হোক, তার বাহ্যিক ফলটা না হলেও, আরামটা নগদ। তাই প্রথম দলের ভাবের আবেগ দগ্ধ হয়ে উবে যায় শেষের দলের হিংসার অনলে। শঙ্করীর মনে এতটুকু সন্দেহ বিতৃষ্ণার আবাদে ছড়িয়ে পড়ে অসংখ্য তিক্ততার বীজ। একটা কথার সঙ্গে মিশে যায় পাঁচদিক থেকে পাঁচটা কথার ফোড়ন।

দখল ফিরে পাবার উপযুক্ত পরিস্থিতি গড়ে ওঠে।

ওদের ঘরে মেঘুও আর তেমন যেতে পারে না। হাজিরা, বাড়তি হাজিরা তার ওপর পড়াশোনা, তারই বা সময় কোথা? কিন্তু এখানে কে বুঝতে চায় তা। সবাই যখন সুযোগ পেয়েছে তখন শর্মিষ্ঠার বান্ধবীরাই বা পিছিয়ে থাকবে কেন? পুরুষ জাতের বিরুদ্ধে যত পুরোনো কথার পুনরাবৃত্তি হয় শর্মিষ্ঠার সামনে।

এত লোকের এত কথা শোনে তবুও তা বিশ্বাস করতে চায় না শর্মিষ্ঠা। সারা রাত শুয়ে শুয়ে কত ভাবে। ব্যথায় ডুকরে ওঠে বুকের ভিতরটা, চোখ দুটো তার ফেটে বেরিয়ে আসতে চায়। চোখ জ্বলে ওঠে, ঘুম আসে না। মনের তরঙ্গ উত্তাল হয়ে উঠে চোখ দুটো তার গলিয়ে দেয়, ভাসিয়ে দেয়। পৃথিবীর ঘুম আসে, ঘুম ভেঙ্গে যায়—শর্মিষ্ঠা জেগেই থাকে। ভোর হলে উঠে যায় সে ঘরের বাইরে, ঘুমন্ত শিশুর মতো চোখ রগড়াতে রগড়াতে। আলোর আঘাতে বাতাস বাষ্পহীন। সারা রাত কান্নায় চোখের জলের শেষ, নিঃশ্বাসে আর হাওয়া বয় না। বুকের ব্যথাটা জমাট বেঁধে আড়ষ্ট করে দেয় শর্মিষ্ঠার দেহমন। তবুও মনের অগোচরে পা-দুটো চলে যায় মেঘুর ঘরের দিকে। নয়তো আশা-নিরাশায় হেলতে দুলতে চলে যায় তার মন দেহটাকে নিয়ে সেখানে, সেখানকার দুটি চোখের স্পর্শে ধুইয়ে মুছিয়ে দিতে পারে তার মনের যত গ্লানি, দুটি ওষ্ঠের মৃদু কম্পনে আনন্দমুখর হয়ে উঠতে পারে তার মন। যত জ্বালা-যন্ত্রণার, ব্যথা-বেদনার অবসান হবে মেঘুর চোখের স্পর্শে, তার মুখের দুটি কথায়।

প্রশস্ত ললাট থেকে অবনত উন্নত নাকের দুপাশে, ঘন কালো ভ্রূর নীচে, মেঘুর ভাসাভাসা দুটি চোখ আরো ভেসে ওঠে, হেসে ওঠে শর্মিষ্ঠাকে অতি একান্তে তার ঘরের মধ্যে পেয়ে। সারা রাত সঞ্চিত বুকের যত ব্যথা-বেদনা, আশা-নিরাশার কথা সব এক হয়ে ফুটে ওঠে শর্মিষ্ঠার চাহনিতে। চরম আত্মনিবেদনের অনাবৃত সুন্দর অবিচলিত অভিব্যক্তি সে চাহনিতে। এমন দৃষ্টির সঙ্গে মেঘুর সেই প্রথম পরিচয়। শর্মিষ্ঠার অমন রূপ সে কখনো দেখেনি। সেই মুখের পানে তাকিয়ে স্থির হয়ে যায় মেঘু, কোন কথাই বলতে পারে না। মেঘুর শঙ্কাবিহীন চোখ দুটো সে রূপলাবণ্য শুধু লেহন করে নিয়ে শঙ্কায় দুলে ওঠে—ভেসে যায় লজ্জার বন্যায়। কি যেন একটা নতুন ভাব ফুটে ওঠে মেঘুর চোখেমুখে শর্মিষ্ঠার মুখের পানে তাকিয়ে তাকিয়ে। মুগ্ধের নিস্পন্দ-নির্বাক সে চাহনি, প্রেমিকের উন্মাদনা ভরা সে চাহনি, লালসায় উজ্জ্বল। কাব্যের শুচি-সৌরভ ভরা স্মৃতি; কৈশোরের নির্মল আদর্শে অনুপ্রাণিত প্রথম প্রেম ধরয়ে ভেসে যেতে চায় যৌবনের প্রথম লজ্জার চাহনিতে। মেঘু যেন শর্মিষ্ঠাকে নিরাবরণ করে দিতে চায় তার দৃষ্টিবাণে।

সেই অচেনা-অজানা দৃষ্টির পানে তাকিয়ে তাকিয়ে শঙ্কায় দুলে ওঠে শর্মিষ্ঠার বুকের ভিতরটা। আবার থেমেও যেতে চায় বুকের স্পন্দন, গলা আসে শুকিয়ে। জিভটা নড়েচড়ে ওঠে শুকনো ঠোঁটদুটো একটু ভিজিয়ে নিতে। কণ্ঠের নলী কেঁপে ওঠে গলায় একটু রস নামিয়ে দিতে।

শর্মিষ্ঠার নিস্তব্ধ দেহের ঐটুকু স্পন্দনে বাতাস আলোড়িত হয়ে ওঠে, কেঁপে ওঠে মেঘুর সমস্ত শরীর।

দিনের নতুন আলোর সামনে নতুন সম্পর্ক হতে পারে না। এই বুঝি শর্মিষ্ঠা চিৎকার করে বলে—হয়েছে, থামো। আতঙ্ক-চকিত ক্ষিপ্রতায় ঘর থেকে ছুটে বেরিয়ে যায় শর্মিষ্ঠা।

ছুটে গিয়ে ঘরের দরজার সামনে নিস্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে মেঘু—বুকের ভিতরটা দ্রুত নিঃশ্বাসের তালে স্ফীত ও সঙ্কুচিত হতে থাকে। থেমে যায়, বেড়ে যায় বুকের স্পন্দন।

একদিন শর্মিষ্ঠা ছিল তার হাতের মুঠোর মধ্যে—যখন শর্মিষ্ঠা জীবনের কিছু কথা জেনেছে, নয়তো জানবার আগ্রহ ফুটে উঠেছে তার উন্মুখ উৎসুক, রক্তিম চোখে-মুখে। আগানেবাগানে তার সামনে কতদিন লুটিয়ে পড়েছে শর্মিষ্ঠার মূর্ছিত, অর্ধ মূর্ছিত দেহটা। উত্তপ্ত অঙ্গ থরথর করে কেঁপে উঠেছে, লাল চোখদুটো ঘুরেছে বাণবিদ্ধা হরিণীর মতো। সেই মুখের দিকে তাকিয়ে মেঘু ত্রস্ত, সন্ত্রস্ত হয়ে উঠেছে। সেই অচেনা অজানা ভাবের মুখ দেখে সে ভয় পেয়েছে। সরল বিশ্বাসে বাপ-মায়ের দৃষ্টি শিথিল থাকে সে বয়সের ছেলেমেয়ের প্রতি, সেই বয়সে স্বভাবই তাদের রক্ষা করে অমনভাবে। সেই বয়সে একজনের কাছে যা ছিল অতি সহজ, আর একজনের তা হয় অত্যন্ত কঠিন। একদিন সে যা নিতে পারেনি, আর একদিন তা নিতে গিয়ে ব্যর্থ হল। সেদিন দুজনেরই যে আতঙ্ক ভরা আগ্রহ ছিল সেই দেওয়া-নেওয়ার মধ্যে আর একদিন তা কোথায় গেল! মা-বাবার ভয় ও সম্মান দুজনেরই আছে। কিন্তু সেদিন থেকে মেঘু ভয় করতে শুরু করল শর্মিষ্ঠাকেও।

আলোর আগুনে বারবার ফিরে আসে কীটপতঙ্গ। শর্মিষ্ঠা আবার আসে, বসে দুজন মুখোমুখি। সায়াহ্ন সন্ধ্যায়, মেঘু তখন বই নিয়ে বসে। প্রদোষের অন্ধকারে ঢাকা পড়ে যায় দিকদিগন্ত। বাইরে আশ্রয়ের মতো অন্ধকার, ঘরে প্রদোষের প্রদীপ।—জ্বলে ওঠে দুজনের অন্তরের আলো। স্থির হয়ে থাকে দুজনের চোখ—একজন ফেলে রাখে আর একজনের ওপর। একটু—আর একটু! একজনের চোখে দুগ্ধ-শ্বেত মণ্ডলের মাঝে কৃষ্ণ-কালো মণি, আর একজনের নীলাভ মণ্ডলের মাঝে নীল মণি। যা দুজন এতদিন দেখে আসছে, যা তারা এতদিন দেখেও দেখেনি। অপূর্ব, অদ্ভুত! একটা থেকে ঠিকরে পড়ে আলো আর একটার চলে যায় ভিতরে, আরো ভিতরে। দেখে, আরো দেখে! আরো!

হয়েছে! আর কিছু চায় না। একটু কথা! এই নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করে কিছু কথা—বাধা-বন্ধহীন, অর্থহীন যা হোক কিছু গড়িয়ে পড়ুক শর্মিষ্ঠার কানে।

ভাবের যেখানে উদ্দাম তরঙ্গ, ওষ্ঠ স্পন্দনহীন সেখানে।

মৃদু আলো শর্মিষ্ঠার চোখে ফুটিয়ে তোলে ছোট ছোট ফুলকি। শর্মিষ্ঠার মসৃণ মুখের কেন্দ্রে রক্তাভ ঠোঁটের পানে চেয়ে চেয়ে হিল্লোলিত হয়ে ওঠে আর একজনের রক্ত।

মেঘু হাসতে চায়, হাসেও মুগ্ধাবিষ্ট শর্মিষ্ঠার দিকে তাকিয়ে।

শর্মিষ্ঠা চমকে ওঠে আবার। দিনের সে চমক নয়—ঘরে মৃদু আলোর আবছা আবরণে ঢাকা লজ্জার সে চমক, বাইরে অন্ধকারের আশ্রয়ে জেগে উঠে লুকিয়ে থাকতে পারে সে চমক। আলোর স্পর্শে মুক্তি লাভের আকাঙ্ক্ষায় পতঙ্গের মতো ঝাঁপিয়ে পড়বার জন্য সে চমক। চরম লজ্জা নিবেদনের লজ্জায় ভরা সে চমক।

সম্ভাবনা হল বুঝি!

হঠাৎ মেঘুর মনে পড়ে সকাল বেলার কথা। মেঘুর উত্তপ্ত আরক্ত চোখের সামনে শর্মিষ্ঠার শঙ্কাসংকুল চোখদুটো। মেঘু যাকে ভয় করতে শিখল। স্পন্দনমুখী বুকের ভিতরটা হয় নিস্তব্ধ নিস্পন্দ—উষ্ণ রক্ত হয় শীতল, রক্তে জমাট বাঁধে। হাসতে চেষ্টা করে, মিলিয়ে যায় তা শুষ্ক মুখমণ্ডলে। মুখে মুখের ওপর আর একবার হাসি ফুটিয়ে তোলে জোর করে, আবার জোর করে মেঘু,

ফিরিয়ে আনে তার আতঙ্ক নিপীড়িত চোখ। চোখদুটো ফেলে রাখে তার বই-এর পাতার ওপর—অবাধ্য চোখ কোন কাজ করে না।

কিছুই হল না, একটা কথাও শুনল না।

বিলি এসে বসল মেঘুর পাশে। দুটি জমাট বাঁধা বুকের মাঝামাঝি, অনির্দিষ্ট একটা স্থান জুড়ে।

সূচনার শেষ, বেদনার শুরু।

বিলি হাসে শর্মিষ্ঠার পানে চেয়ে—মিষ্টি মধুর সে হাসি। সে হাসির জবাব ফুটে ওঠে না শর্মিষ্ঠার মুখে। কথাও বলে বিলি—তারও জবাব দিতে পারে না সে। বুকের বেদনাটা তখন ছড়িয়ে পড়েছে সারা অঙ্গে—অসাড় ক'রে রেখেছে তার দাঁতের মূল।

বিলি যেন বোঝে তার মনের ভাবটা। বোধ হয়, বোধ হয় তাই সে মুখ ফিরিয়ে নেয়। নয়তো অভ্যাস মতো। বইখানা হাতে নিয়ে পড়াতে শুরু করে মেঘুকে।

শর্মিষ্ঠা স্বস্তি পায়। ধীরে ধীরে মুখ তুলে তাকায়, চেষ্টা করে চোখ দিয়ে কথা শোনবার। চুপ করে বসে থেকে একটু সহজ হয়। তারপর বিদায় নিয়ে উঠে আসে।

ঘরে ফিরে শর্মিষ্ঠা ভাবে মেঘুর কথা। কেন অমন চেয়ে থাকে মেঘু তার মুখের পানে? কি দেখে সে? আয়নার সামনে দাঁড়ায় নিজেকে যাচাই করতে। দেখে—কিন্তু কিছুই খুঁজে পায় না। আবার দেখে, বার-বার। তবুও কিছু পায় না।—হঠাৎ দেখল। এই যেন সে প্রথম দেখল নিজেকে—দেখল তার রূপযৌবন। মুগ্ধ হল, মাতাল হল নিজেকে দেখতে দেখতে।

আসে গেনী, আসে কেতি আর বতী।

—কি কথা হ'ল রে

কথা তো হয়নি কিছুই! যা হয়েছে তা যে কথার চেয়ে অনেক বেশী। তবু কি সে বোঝায় সখীদের? রাঙা হয়ে ওঠে শুধু, বান্ধবীদের প্রশ্নবাণে বিদ্ধ হয়ে।

বান্ধবীদের কাছে তাকে শুনতে হয় পুরুষ জাতের কথা। আর প্রতিবেশিনীদের কাছে শোনে মা-বেটার রূপের দেমাকের কথা, মায়ের বিদ্যার অহঙ্কারের কথা। আরো কত কি কথা। বলার যখন সময় আসে তখন কথার অভাব হয় না। শুনতেও হয় তা। ওরা চলে যায় ওদের কাজ করে—আগুন জ্বালিয়ে দিয়ে। বিমুগ্ধ শর্মিষ্ঠা দম্ভ বিভ্রান্ত হয়ে পড়ে। তার ওপর সখীদের প্রতিকূল বাক্য-বাণে বিদ্ধ জর্জরিত তনুমন।

রূপের দেমাক! দুঃখে ভেঙে পড়ে, রাগে জ্বলে ওঠে। সে ভাবে। রূপ! কি এমন রূপ? রংটাই যা ফর্সা—তাতেই এত! সে তার চাইতে কম কিসে? রংটা তার কালো তাতে এত তাচ্ছিল্য! কিষণজীও তো কালো—তাতেই সে পাগল করেছে মথুরা বৃন্দাবন, সেখানকার গোপগোপীদের। কিন্তু সে যাবে কোথায়, কাকে পাগল করতে? খুঁজে পায় না কোন উত্তর। নিজেই পাগল হয়ে মরে। অভিমানে, দুঃখে, রাগে গুমরে ওঠে। ফেটে পড়তে চায়—সে খানদানী সর্দারের মেয়ে, একমাত্র মেয়ে, আদরের মেয়ে।—দিনমজুরের ছেলে মেঘু। সেদিন পর্যন্ত হাজিরা খেটেছে তার বাপ। নিজেও হাজিরা খাটে। তার এত দেমাক! মায়ের বিদ্যা আছে! তাতে ছেলের কি? বুড়ো হাতী ছেলে বাচ্চাছেলের বই পড়ে এখনো। তাতেই এত? সকলে হক কথাই তো বলে—যদি দেমাক করবার কিছু থাকে, সেটা তারই আছে। তাই সে করবে, নিশ্চয়ই করবে। কেন করবে না? ও যদি করে, তবে সে-ই বা না করবে কেন? ঘরের দরজা বন্ধ করে। আবার দাঁড়ায় আয়নার সামনে। এই তো, কি তার নেই? এতবড় বাগানে, এতগুলো মেয়ের মধ্যে তার মতো কে? কুলি তো দূরের কথা—বাবুদের ঘরেও নেই। নেই, নেই, নিশ্চয়ই নেই।—ফুঁপিয়ে ওঠে, কেঁদে ওঠে, বিছানায় উপুড় হয়ে পড়ে, বালিসে মুখ গোঁজে।

।। পনেরো ।।

সংসারের কাজকর্মের ফাঁকে ফুরসতে শুক্রীর গল্প-কেচ্ছার কথা হয় অকেজো বুড়ীদের সঙ্গে। তারপর একে একে আসে মাইকীরা তাদের কাজ শেষ হলে। তখন বসে জোর আসর। সেই আসরে হয় বিলি-দের ঘরের প্রত্যেকের স্বর্গারোহণ ও আদ্য-শ্রাদ্ধের ব্যবস্থা। সারাদিনের চেষ্টায় যার যত খবর সংগ্রহ হয় সেসব পেশ করা হয় ঐ মজলিশে। কখনো কেউ নতুন খবর এনে জমিয়ে তোলে, কখনো বা নতুনের সঙ্গে পুরানো কাহিনীটা জুড়ে তার রূপ বদলানো হয়, আর কখনো বা পুরানোটাই ঢেলে নতুন করে সাজিয়ে গুছিয়ে মুখরোচক করে হেসে ফাটাফাটিও হয়। রোজই এমন একটা কিছু না করতে পারলে ওদের ভাত হজম হওয়া দুষ্কর, ঘুমেরও বিঘ্ন ঘটে। কিন্তু যার জন্য এত করা হয়, সেই শুক্রীর যে তাতে বিশেষ কোন সুরাহা হয় না, এ খবরটা কারো জানা নেই। আর যাদের অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়ার জন্য এত আয়োজন তারা এ সবের কোন খবর তো রাখেই না। এখানে যত তরঙ্গই উঠুক না কেন তার ঢেউ সে পর্যন্ত পৌঁছায় না।

গীতার উপদেশ শিরোধার্য করে, পরম-পিতার হাতে ফলাফল অর্পণ করে, অনাসক্ত ও নির্বিকার চিত্তে কাজ করাটা সকলের মনঃপূত নয়। অন্ততঃ শুক্রীর মতো আশা-বাদী ও আত্মকেন্দ্রিকের পক্ষে তা নিশ্চয়ই সম্ভব নয়। তাই শাস্ত্রের উপদেশ লঙ্ঘনের পরিণাম অখণ্ডনীয়। তাই তার ভোগের জন্য থাকে বিনিদ্র রজনী ও তার আনু-ষাঙ্গিক হিসাবে আসে যত ভাবনা চিন্তা।

শুক্রী সাঁওতালের মেয়ে, বিলি ল্যাপচার। রাঘব ও রাবণের পূর্বপুরুষ এসেছে পূর্ণিয়া থেকে। একজন ভূমিজ, আর একজন কামার। দুটোই খাঁটি জাত। শর্মিষ্ঠা ও মেঘুর জন্মে সংকর দোষ আছে। মায়ের দিক দিয়ে ওরা দুজনই এক ধাপ নীচে নেমে গেছে। ওটা কাটাকাটি যেতে পারে। কিন্তু বাপের দিকে ঠিক পালটি ঘর। সব মিলিয়ে এমনটি সচরাচর পাওয়া যায় না। দু পক্ষের কারো কিছু নেই ওজর আপত্তি করবার। তা ছিলও না। শুক্রীর এতদিনের আশা। ছেলেমেয়ের মনই বা কোন মা-বাপের অজানা থাকে? তার মধ্যে এমন হয়ে গেল। কথাটা যদিও বড়-দের মধ্যে খোলাখুলিভাবে হয়নি এতদিন, কিন্তু দু পক্ষের বুঝতে বাকী ছিল কার? এখন বিলি বড় কাজ পেয়েছে, ছেলেটাও বেশ দু-পয়সা কামাই করছে, তার ওপর দু-পাতা পড়াশোনাও করে। তাই তারা ভেবে নিয়েছে এখন দর বেড়েছে তাদের। যখন কথাটা পাকাপাকি করে ফেলার সময় এসেছে তখন সম্পর্কটা উঠিয়ে দিতে চায়—শুক্রীর সঙ্গে বিলির, শর্মিষ্ঠার সঙ্গে মেঘুর। তাছাড়া আর কি! দুজনের এক-জনেরও দিনান্তে একবারও কি আসতে পারে না শুক্রীর ঘরে! ক'টা মাসের মধ্যে একদিনও সময় হল না দুজনের একজনের। বিলির ঘরে গেলেও বড় একটা সামনে বসে না, ভাল করে দুটো কথা বলার সময় দেয় না। প্রায়ই লছমীর সঙ্গে দুটো কথা বলে ফিরে আসতে হয়। বিলি নিশ্চয়ই লছমীকে ঠেকিয়ে দিয়ে নিজে এড়িয়ে থাকতে চায় কাজের ছুতায়। এত ব্যস্ত! কই আগে তো এমন ছিল না! এতদূর এগিয়ে, এখন পিছিয়ে যায় কি করে? শুধু লোক হাসা-হাসি হবে। এতো দাঁড়িয়ে অপমান করা। এখন তো লোকের কাছে মুখ দেখানো ভার। অসহ্য।

এমন সময় রটে গেল মেঘুর জন্ম-বৃত্তান্তের কথা। কথাটা লুফে নিল শুক্রী। তার মনপ্রাণ নেচে উঠল আহ্লাদে। না হলেও তার পড়শীরা নাচিয়ে তুলল।

সকলেই শুনল, শর্মিষ্ঠাও শুনল সে কথা। সবার সঙ্গে একতালে নেচে উঠে করে বসল এক কাণ্ড। নিজের মান রাখতে, মা-বাবার মান রাখতে জ্ঞাতগোষ্ঠীর ও বংশের গরিমা বজায় রাখতে তা না করে তার উপায় ছিল না। কিন্তু মেঘুর জীবনে তা যে এমন পরিবর্তন এনে দেবে সে-কথা স্বপ্নেও ভাবতে পারেনি কেউ। সবাই ভেবে-ছিল—অপমানের জ্বালায় জ্বলেপুড়ে মরবে মেঘু, তার মা বিলি।

আমড়া গাছে আম! পাঁকের মধ্যে পদ্ম! মেঘনাদ রাবণের ছেলে নয়? জনসনের! কলঙ্কের কালিমা ভেদ করে পূর্ণচন্দ্রের আলো। সুবর্ণশ্রী নদীর পাড়ে এক তাল সোনা!

(ক্রমশঃ)

ফুলের দিন

দিলীপ মুখোপাধ্যায়

কি সুরেলা কণ্ঠে সেই মনোরম সুরবিহার। রাগ সংগীতের এক অপরূপ করুণ-মধুর আস্বাদন। বাংলা গানে সুর-সৃজন ও বিস্তারের এমন অনায়াস লীলা-মাধুরী, যেন মৌলিক সংগীতধারা: একাধারে কাব্যসংগীতের হৃদয়াবেগ ও রাগ-রূপের প্রাণ প্রতিষ্ঠা। তিন মিনিটের এক-একটি রেকর্ডেও যেন সুরের নব নব দিগন্ত উন্মোচিত হয় আর বিমুগ্ধ শ্রোতা-দের চিত্তলোকেও তার উদভাসন। 'ফুলের দিন হল যে অবসান...' জয়জয়ন্তীর কি আকুল করা আবেদন! দেশী তোড়ির বেদনাভরা উচ্ছ্বাস—'তব লাগি ব্যথা উঠে গো কুসুমি...।' ঊষার উন্মেষে রাম-কেলিতে (রামকেলি) মর্মস্পর্শী জাগরণের সাড়াঃ 'জাগো আলোক লগনে...।' ভৈরবীর সুর-মায়ার দায়িত্বের প্রভাতী মিলন-গুঞ্জন—'নবারুণ রাগে তুমি সাথী গো...।'

ভীষ্মদেবের সেসব গান একদা বাংলার সংগীতরসিকদের মনে উন্মাদনা সৃষ্টি করেছিল। ভুল করে রাগপ্রধান বলা হলেও তাঁর ওই গানগুলি আসলে বাংলা খেয়ালের সংক্ষিপ্ত সংস্করণ! বাংলার এই সব ছোট খেয়ালের মাধ্যমে রাগসংগীতের অপরিমেয় ঐশ্বর্যের আভাস ভীষ্মদেব সেযুগের শ্রোতাদের দিয়েছিলেন। সীমা-বদ্ধতার মধ্যেও পরিস্ফুট করেছিলেন তার চির-বিচিত্র সৌন্দর্যের প্রপঞ্চ। তাঁর (এবং জ্ঞানেন্দ্রপ্রসাদ গোস্বামীরও) দৃষ্টান্তে ছোট বাংলা খেয়ালের আদর্শ অভিনবভাবে সেকালে দেখা দিয়েছিল। রাগ-রূপের গভীরতার সঙ্গে শিল্পীর অনুভবের দ্যোতনা যুক্ত হয়ে গানগুলিকে আদরের সামগ্রী করে তুলেছিল শ্রোতৃসাধারণের কাছে। রাগের জাতি কুল ও প্রকরণ না জেনেও সকলে আবিষ্ট হয়েছিল। ভারতীয় সংগীতের মূল ধারা অর্থাৎ রাগসংগীতের ঐতিহ্যের দিকে বাঙালী শ্রোতাদের চিত্তাকর্ষণ করেছিলেন ভীষ্মদেব। নিজের সেই পুরনো দিনের বাংলা (ও হিন্দী) গানের রেকর্ড সম্পর্কে উত্তরজীবনে তিনি মন্তব্য করেন যে, গানগুলিতে তাঁর স্বকীয় 'স্টাইল' ফুটে উঠেছে।...

ভারতীয় সংগীত-পরম্পরা আত্মস্থ করে তাকে আপন প্রতিভার বাহন করেন ভীষ্মদেব। সেই আত্মীয়করণ তাঁর সংগীত-স্বভাবের অনুসারীই হয়েছিল। একনিষ্ঠ সাধনার সঙ্গে স্বতঃস্ফূর্ততার এক আশ্চর্য সমন্বয়। বিকচ কুসুমের সৌরভ যেমন দশদিক আমোদিত করে ভীষ্মদেবের সুর-লহরীও তেমনি সংগীত-ক্ষেত্রকে নিষিক্ত করেছিল। জাত সুর-শিল্পীর স্বভাবজ আত্মপ্রকাশ...

ভীষ্মদেবের সংগীত-প্রতিভা অবশ্য হিন্দী খেয়াল গানেই সর্বাধিক মূর্ত ছিল। দ্রুত ও মধ্য লয়ের বন্দিশে তাঁর বৈদ্যুতিক ভাবক্রিয়ার সমারোহ, প্রাণোচ্ছল গতিবেগ, সার্গমের স্বচ্ছন্দ সম্ভার, বিচিত্র স্বরবিন্যাস ইত্যাদি স্ফূর্তিলাভ করত স্বমহিমায়। ললিত বসন্ত, গৌড়মল্লার, মালকোষ, পট-দীপ, বেহাগ, দেশী তোড়ি, ভীমপলশ্রী নটবেহাগ, বাহার ইত্যাদি রাগের হিন্দী গানে তিনি তাঁর প্রদীপ্ত শিল্পীসত্তার হৃদয়গ্রাহী পরিচয় দিয়েছেন। সে সবই তাঁর দৃপ্ত প্রতিভার মধ্যাহ্নকালের কথা।

কি তরুণ বয়সেই ভীষ্মদেব সংগীত-জগতে আত্মপ্রতিষ্ঠ হয়েছিলেন। মাত্র ২৫ বছর বয়সের মধ্যেই নেতৃস্থানীয়দের স্বীকৃতি পেয়েছিলেন সর্বভারতীয় সম্মেলনগুলিতে গুণপনা প্রদর্শন করে। নবীন বয়সেই সংগীত-প্রবীণ। তার পট-ভূমিতে অবশ্যই ছিল দীর্ঘকালের নিরলস সাধনা। শুধু স্বভাবদত্ত নৈপুণ্যে—যা তাঁর বাল্যকালেই প্রকাশ পায়—রাগ-সংগীতের বিপুল ভাণ্ডারে সিদ্ধিলাভ করা যায় না। ভীষ্মদেবের সংগীতজীবনও এই সত্যের এক উজ্জ্বল উদাহরণ।...

১৯০৯ সালের ৮ নভেম্বর তাঁর জন্ম হয়। জন্মস্থান ও পৈত্রিক নিবাস হুগলী জেলার পাণ্ডুয়ার কাছে সরাই গ্রামে। পিতা শ্রীআশুতোষ চট্টোপাধ্যায় ও মাতা প্রভাবতী দেবী।

শৈশবেই ভীষ্মদেবের সংগীতকণ্ঠ এবং গান শুনে তা গাইবার ক্ষমতা প্রকাশ পায়। ঈশ্বরদত্ত এই অনুরাগ ও নৈপুণ্য লক্ষ্য করে পিতা তাঁকে উৎসাহ দিতেন গানে। ভীষ্মদেবের শিশু বয়সেই তিনি সংগীত শিক্ষার ব্যবস্থা করে দেন। এইভাবে কলকণ্ঠ ভীষ্মদেবের ৬।৭ বছর বয়সে তাঁর প্রথম সংগীত শিক্ষক হন শ্রীহরিদাস বন্দ্যোপাধ্যায়।

রানাঘাটের খেয়াল ও টপ্পা গায়ক উক্ত হরিদাস ছিলেন রানাঘাট নিবাসী সংগীতা-চার্য শ্রীনগেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্যের এক শিষ্য। গায়ক ভিন্ন হাস্যরসের নটরূপেও হরি-দাসের একটি পরিচয় ছিল। কমিক চরিত্রের অভিনয়ে চলচ্চিত্রেও আত্মপ্রকাশ করেছিলেন তিনি। তাঁর হাসির গানের নিদর্শনও গ্রামোফোন রেকর্ডে বিধৃত আছে। আচার্য নগেন্দ্রনাথের শিষ্যরূপে এক মহান সংগীতিক ঐতিহ্যের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন তিনি। একাধারে ধ্রুপদ, খেয়াল, টপ্পা ও ঠুংরি অঙ্গের সাধক ভট্টাচার্য মহাশয় রানাঘাটে যে কৃতী শিষ্যমণ্ডলী গঠন করেছিলেন হরিদাস ছিলেন সেই গোষ্ঠীভুক্ত। সেজন্যে প্রথম সংগীত শিক্ষকের সূত্রে সেই ধারার সঙ্গে ভীষ্ম-দেবের শৈশব থেকেই যোগাযোগ ঘটে। দ্বিতীয় সংগীত গুরুর কারণে আরো ঘনিষ্ঠ হয় সেই যোগসূত্র।

হরিদাসবাবু ছাত্রের গৃহেই অবস্থান করে তাঁকে সংগীত শিক্ষা দিতেন। বছর দুয়েক শিক্ষাদানের পর তিনি বালকের অসামান্য মেধার পরিচয় পেয়ে তাঁর অগ্রসর তালিমের ব্যবস্থা করে দেন গুরুভ্রাতা নগেন্দ্রনাথ দত্তের কাছে। খেয়াল ও টপ্পায় পারদর্শী দত্ত নগেন্দ্রনাথ ছিলেন ভট্টাচার্য নগেন্দ্রনাথের এক শ্রেষ্ঠ শিষ্য।

মাত্র ৯ বছর বয়সে ভীষ্মদেব দ্বিতীয় সংগীত গুরুর অধীনে রীতিমত সংগীত-শিক্ষা আরম্ভ করলেন। তাঁর পদ্ধতিগত চর্চার সূচনা তখন থেকেই ধর্তব্য।

খেয়াল ও টপ্পা অঙ্গ শিক্ষায় শিষ্যের অপরিসীম কৃতিত্বে দত্ত নগেন্দ্রনাথ মুগ্ধ হলেন এবং পর্যাপ্ত গান দিতে লাগলেন। এমন অনায়াস পটুত্ব ভীষ্মদেবের ছিল যে বিশেষ কষ্ট করে শিখতে হয়নি কোনদিন। অন্তরের প্রেরণায় দিনের অনেকখানি সময় বালকের সংগীতচর্চায় অতিবাহিত হত। সে সময় তাঁরা বাস করতেন উত্তর কলকাতার বলরাম দে স্ট্রীটের একটি বাড়িতে। নগেন্দ্রনাথ দত্তও কিছুদিনের মধ্যেই নিকটবর্তী উমেশ দত্ত লেনে বাস করতে আসেন। চাকুরি সূত্রে কলকাতা নিবাসী হয়ে তিনি সপ্তাহান্তে যেতেন রানাঘাটের গৃহে।

উমেশ দত্ত লেনের বাসায় দত্ত নগেন্দ্র-নাথ অন্যান্য ছাত্রদেরও শিক্ষা দিতেন। ভীষ্মদেব সেসময় প্রায় সর্বক্ষণ নগেন্দ্র-নাথের সাঙ্গীতিক সান্নিধ্য লাভ করতেন, কারণ তাঁর কোন নির্ধারিত সময় ছিল না সংগীতশিক্ষার জন্যে। তখন প্রতি শনিবার গুরুর সঙ্গে তিনি রানাঘাটেও যেতেন। সেখানে দত্ত নগেন্দ্রনাথ যখন রবিবারে ভট্টাচার্য নগেন্দ্রনাথের কাছে শিক্ষার্থী রূপে উপস্থিত হতেন, তখনো সঙ্গী হতেন ভীষ্মদেব। ভট্টাচার্য মহাশয়ের সদাব্রত সংগীতভবনে তাঁর দুই শ্রেষ্ঠ শিষ্য পদ্মবাবু (নির্মলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়) ও দত্ত নগেন্দ্রনাথের গান ভীষ্মদেব ঘনিষ্ঠভাবে শোনবার সুযোগ পেতেন; উপরন্তু ভট্টাচার্য নগেন্দ্রনাথেরও। কলকাতায় দত্ত নগেন্দ্রনাথের সাহচর্যের সঙ্গে রানাঘাট আচার্য-গৃহের আবহও কিশোর ভীষ্মদেবের সংগীতজীবনকে গভীরভাবে প্রভাবিত করে। ভট্টাচার্য নগেন্দ্রনাথও এই বালক প্রতিভার গৌরবোজ্জ্বল ভবিষ্যতের সম্ভাবনার কথা বলতেন সেসময়ে।

এমনি পরিবেশে ভীষ্মদেবের সংগীত-সত্তা নিতান্ত কৈশোরেই বিকশিত হতে থাকে। মাত্র ১৩ বছর বয়সে এবং দত্ত নগেন্দ্রনাথের কাছে শিক্ষার্থী জীবনেই তাঁর গানের প্রথম রেকর্ড হয়—দুখানি

বাংলা টপ্পা। 'এত কি চাতুরি সহে প্রাণ' (সম্ভবত নিধুবাবুর রচনা) ও 'সখি কি করে লোকেরি কথায়।' দুখানি গানেই সেই বয়সে তিনি যে পারদর্শিতা দেখান তা বিস্ময়কর। টপ্পা ও খেয়াল দু রীতিরই চর্চা তিনি সেসময় করতেন।

ওই ১৩ বছর বয়সেই উপনয়ন হয় ভীষ্মদেবের। সেই উপলক্ষে যে গৈরিক বসন পরিধান করেন, পিতৃ-নির্দেশে তা তিনি দণ্ডীঘরের পরেও পরিত্যাগ করেননি। গৈরিক বেশবাস কয়েক বছর যাবৎ অঙ্গে রেখেছিলেন সঙ্গীতসাধনার আনুষঙ্গিক স্বরূপ। প্রবেশিকা পরীক্ষার পরে কলেজের ছাত্রজীবনেই ভীষ্মদেব উদীয়মান গায়ক প্রতিভারূপে যখন খ্যাতিমান হন তখনো তিনি গৈরিকধারী।

নগেন্দ্রনাথ দত্তের কাছে শিক্ষাকালেই তাঁর সঙ্গীতজীবনের ভিত্তি সুগঠিত হয়ে যায়। প্রথম জীবনেই তিনি যে তান লয়ে দক্ষতা অর্জন করেন সেবিষয়েও পরম সহায়ক হয় নগেন্দ্রনাথের নির্দেশ। গুরুর কাছে ভীষ্মদেব প্রচুর বন্দেশী গান ও রাগালাপ শিখেছিলেন।

নগেন্দ্রনাথের কাছে ভীষ্মদেব ৫।৬ বছর শিক্ষার্থী থাকবার পর ওস্তাদ বাদল খাঁর সঙ্গে যোগাযোগ ঘটে দত্ত মহাশয়ের। তখন থেকে বাদল খাঁর নিকটেও নগেন্দ্রনাথ অনুশীলন ও সংগ্রহ করতে থাকেন। নগেন্দ্রনাথ তখনো তাঁর প্রধান গুরু ভট্টাচার্য মহাশয়ের কাছে রানাঘাটে শিক্ষার্থীরূপে যেতেন প্রতি সপ্তায়। বাদল খাঁর নিকটে যাতায়াত আরম্ভ করবার আগেই নগেন্দ্রনাথ দত্তের সঙ্গীতজীবন প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, একথা বলা বাহুল্য।

এদিকে দত্ত নগেন্দ্রনাথের সঙ্গে বাদল খাঁর সাহচর্যের ফলে ভীষ্মদেবের সঙ্গেও খাঁ সাহেবের যোগসূত্র স্থাপিত হল। প্রায়ই সাক্ষাৎ হত তাঁর সঙ্গে। নগেন্দ্রনাথ হয়ত নিজের বাসায় ছাত্রদের শিক্ষা দিচ্ছেন, এমন সময়ও বাদল খাঁ উপস্থিত হতেন। সেখানেই ১৮।১৯ বছর বয়সী ভীষ্মদেবকে প্রথম দেখেন খাঁ সাহেব। এই প্রতিভাদীপ্ত তরুণের গান শুনে বাদল খাঁও তার প্রতি বিশেষ আকৃষ্ট হলেন। ক্রমে এমন হল, নগেন্দ্রনাথকে গান দেবার সময় খাঁ সাহেব ভীষ্মদেবকেও এক একদিন বাৎলে দিতে লাগলেন স্বেচ্ছায়। পরে, ওস্তাদ বাদল খাঁ শুধু নগেন্দ্রনাথের বাসায় নয়, ভীষ্মদেবের বাড়িতে এসেও তাঁকে নির্দেশাদি দিতেন। ভীষ্মদেব নগেন্দ্রনাথের কাছে যেমন লাভ করতেন, তেমনি খাঁ সাহেব শেখাতে চাইলেও নিতেন তাঁর কাছে।

শেষ পর্যন্ত বাদল খাঁর আগ্রহে ভীষ্মদেব আপন গৃহেই তাঁর শিক্ষাও পেতে লাগলেন। ক্রমশ নগেন্দ্রনাথের কাছে শিষ্যের যাতায়াত প্রায় বন্ধ হয়ে এল। তিনি হয়ে পড়লেন বাদল খাঁর শিষ্য।

* এই ঘটনা পরম্পরা সম্পর্কে উত্তরকালে দত্ত মহাশয় আক্ষেপ করে বলতেন যে, খাঁ সাহেব ভীষ্মদেবকে কৌশলে তাঁর কাছ থেকে নিজের শিষ্য করে নিয়েছিলেন। সে যা হোক, বাদল খাঁর কাছে ভীষ্মদেব সংগ্রহ করেছিলেন কিছু বন্দেশী গান। কিন্তু তিনি আসলে খাঁ সাহেবের তালিমে তান কর্তবের ব্যাপারে লাভবান হন। তবে ভীষ্মদেবের গানে 'বাড়ৎ' অংশ তাঁর নিজস্ব কৃতি।

এইভাবে প্রথম যৌবনেই প্রস্তুতিপর্ব সম্পন্ন করে তাঁর সঙ্গীতজীবন পূর্ণতার পথে জয়যাত্রা করেন।

প্রথমে জি শার্পে গাইতেন ভীষ্মদেব, পরে এফ শার্পে—এত উদাত্ত কণ্ঠ। দ্রুত ও মধ্য লয়ের গানেই তাঁর প্রতিভা সর্বাধিক স্ফূর্তিলাভ করত। তারা সপ্তকে সুরবিহার প্রথম থেকেই তাঁর সঙ্গীত প্রক্রিয়ার এক ভাস্বর বৈশিষ্ট্য।

বিদ্যুতের দীপ্ত চমকে ভীষ্মদেবের সঙ্গীতজগতে আবির্ভাব ঘটেছিল। বিদ্যাসাগর কলেজে ছাত্রাবস্থায় একবার আন্তঃ মহাবিদ্যালয় সঙ্গীত প্রতিযোগিতায় যোগ দেন তিনি। সেখানে (১৯৩০ সালে) খেয়াল, টপ্পা ও ঠুংরিতে শীর্ষস্থান অধিকার করলেন, তা এমন বড় কথা নয়। কিন্তু যে উচ্চমানের সঙ্গীতনৈপুণ্য প্রকাশ করেন, তাতে চমৎকৃত হয়ে যান বিচারকের আসনে বসে আচার্য গিরিজাশংকর চক্রবর্তী।

তার চার বছর পরে সিনেট হলে, রবীন্দ্রনাথ উদ্বোধিত প্রথম নিখিল বঙ্গ সঙ্গীতসম্মেলনের আসরে পশ্চিমা গুণীদের সঙ্গে একাসনে বসে ভীষ্মদেব দুর্গা ও তিলঙ রাগের খেয়াল গানে সাড়া জাগালেন।

ওই বছরেই (১৯৩৪ সালে) বারাণসীর নিখিল ভারত সঙ্গীত সম্মেলনে আমন্ত্রিত হলেন তিনি। সেবার যে আসরে তিনি গাইলেন সেখানে ওঙ্কারনাথ ঠাকুর, নাসিরুদ্দিন খাঁ, এনায়েৎ খাঁ শ্রীকৃষ্ণ রতনজনকর প্রমুখ গুণী উপস্থিত ছিলেন। তাঁরা সকলেই উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেন তাঁর গানের। আর সে গানও তাঁর স্বকীয়তার এক অভিনব নিদর্শন। তিনি সে আসরে মালকোশ শুনিয়েছিলেন পঞ্চম ও ঋষভ এই দুই বিবাদী স্বর প্রয়োগ করে, অথচ রাগের সুসম্পূর্ণ রূপে কোন হানি না ঘটিয়ে। তাঁর সেই রূপায়নে কোন গুণী কোন ত্রুটি দেখা দূরের কথা, ধ্রুপদী নাসিরুদ্দিন পর্যন্ত বিস্ময়ে বিমুগ্ধ হয়েছিলেন। ভীষ্মদেবের গানের আগে আসরে এক বিতর্ক হয়েছিল পণ্ডিত ওঙ্কারনাথ ও রতনজনকরের মধ্যে, তোড়ি রাগের ধৈবত নিয়ে। সেই সূত্র ধরে নাসিরুদ্দিন খাঁ এই ধরনের কথা ওঙ্কারনাথকে বলেন, 'পণ্ডিতজী, আপকো বোলনা আচ্ছা হৈ, লেকিন গানা তো ইয়ে বাচ্চা নে গায়া হৈ।'

বারাণসীতে সেই নিখিল ভারত সঙ্গীত সম্মেলনে গাইবার পর থেকে প্রায় প্রতি বছরেই ভীষ্মদেব এলাহাবাদ, কাণপুর, আগ্রা, মথুরা, ফৈজাবাদ, দিল্লী, শিকারপুর প্রভৃতি স্থানের সঙ্গীত সম্মেলনে যোগ দিয়ে তরুণ বয়সেই সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে সুপ্রতিষ্ঠিত হন।

এমনি এক সময়ে (১৯৩৫ সালে) ওস্তাদ ফৈয়াজ খাঁর সঙ্গে তাঁর পরিচয় হয়। তার সূচনা ওই বছরে এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি সঙ্গীত সম্মেলনে। এ প্রসঙ্গ বিশেষভাবে উল্লেখ করা দরকার। কারণ, উত্তরকালে ভীষ্মদেব সম্পর্কে এমন কথা রটনা হয় যে তিনি ফৈয়াজ খাঁর শিষ্য হয়েছিলেন। কিন্তু প্রকৃত ঘটনা অন্য প্রকার। এলাহাবাদ সম্মেলনে ফৈয়াজ খাঁ উচ্ছ্বসিত সাধুবাদ করেছিলেন ভীষ্মদেবের গানের এবং তখন তাঁদের মধ্যে পারস্পরিক আলাপ পরিচয় ঘটে। সে সময় অধ্যাপক ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের আগ্রহে ভীষ্মদেবের সঙ্গে কয়েকখানি গান বিনিময় হয় ফৈয়াজ খাঁর। ভীষ্মদেব কটি গানের স্থায়ী ও অন্তরা নেন ফৈয়াজ খাঁর কাছ থেকে এবং খাঁ সাহেবও তেমনি ভীষ্মদেবের কাছে কোন কোন গানের স্থায়ী ও অন্তরা নিয়েছিলেন। তার বেশি কিছুই নয়। প্রবীণ ফৈয়াজ ও নবীন ভীষ্মদেবের মধ্যে হলেও কোন প্রকার শিক্ষাদানের বিষয় এ প্রসঙ্গে ছিল না। স্বয়ং ভীষ্মদেবও একথার সমর্থক। তারপর থেকে ফৈয়াজ খাঁর উপস্থিতিতে নানা আসরে ও সম্মেলনে গান গেয়েছেন ভীষ্মদেব। ফৈয়াজ খাঁর অবস্থানস্থল বরোদাতেও সঙ্গীতানুষ্ঠান করতে গিয়েছেন। কিন্তু খাঁ সাহেবের কাছে তালিম তিনি নেননি কোন দিন।

যেমন পশ্চিমাঞ্চলের আসরে তেমনি বাংলাদেশেও ভীষ্মদেব বিপুল যশ ও মর্যাদার অধিকারী হয়েছিলেন এবং তরুণ বয়সেই। কতদিক থেকে কত সসম্মানে তখন তাঁর গানের আমন্ত্রণ আসে। অথচ সেই চূড়ান্ত খ্যাতি ও প্রতিপত্তির দিনেও ভীষ্মদেব ছিলেন পরম নিরহঙ্কার।

সেই যৌবনকালেই ভীষ্মদেবকে ঘিরে একটি শিষ্যমণ্ডলী গড়ে উঠেছিল, যদিও তাঁর প্রতিভার যোগ্য উত্তরসাধক হওয়া তাঁদের পক্ষে সম্ভব ছিল না। অপরপক্ষে তাঁর শিষ্যবৃন্দের মধ্যে একাধিক ব্যক্তি ছিলেন তাঁর চেয়ে বয়োজ্যেষ্ঠ এবং কেউ বা সঙ্গীতজগতে সুবিখ্যাত ও সুপ্রতিষ্ঠিত। তাঁর শিষ্য তালিকা এখানে দেওয়া হল : কৃষ্ণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, কুমার শচীন্দ্র দেববর্মণ, কুমার শ্যামানন্দ সিংহ (বিহারের বনেলি এস্টেটের), শৈলেন্দ্রকুমার চট্টোপাধ্যায়, শচীন্দ্রকুমার মুখোপাধ্যায়, রবীন্দ্রমোহন মৈত্র, যূথিকা রায়, বিমল চট্টোপাধ্যায়, বিনয় গঙ্গোপাধ্যায়, প্রকাশকালী ঘোষাল প্রভৃতি। সিনেমার সূত্রে কাননবালাও তাঁর কাছে কিছু কিছু গান শিখেছিলেন।

ভীষ্মদেব সেসময় শুধু বিভিন্ন সম্মেলন, আসর ইত্যাদি থেকে আমন্ত্রিত হতেন না, বিশেষ অনুরোধে সিনেমার সঙ্গেও যুক্ত হন সঙ্গীত-পরিচালক ও সুরকাররূপে। এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য, ফিল্ম কর্পোরেশন অফ ইণ্ডিয়া নিবেদিত ১৪ খানি চলচ্চিত্রে তিনি প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে সঙ্গীত পরি-

চালনা করেছিলেন। চিত্রগুলির নাম—চাঁদ সদাগর, বলিদান (এই ছবিতে মালকোশ রাগে ভীষ্মদেব একটি গানও গেয়েছিলেন), রাজগী, মুক্তিস্নান, দস্যুরমত টকী, অমর-গীতি, রিক্তা, তটিনীর বিচার—এই আটখানি বাংলা ছবি। তাছাড়া ছয়টি হিন্দী চিত্রেও তিনি সঙ্গীত পরিচালক ও সুরকার ছিলেন, যথা—হরিকীর্তন, আশা, রাইজ, দিলহি তো হ্যায়, কয়েদী, হিন্দুস্থান হামারা।

সিনেমা যে ভীষ্মদেবের প্রতিভার প্রকাশ ক্ষেত্র নয়, একথা বলা বাহুল্য। তাঁর উপযুক্ত ক্ষেত্র রাগসঙ্গীতের জগতে তিনি মহা-মহিমায় বিরাজ করতে লাগলেন। ৩০ বছর বয়সেই সাফল্যের তুঙ্গ শিখরে আরোহণ করলেন তিনি। তাঁর সমস্ত গ্রামোফোন রেকর্ডগুলিও ঐ সময়ের মধ্যে হয়েছিল।

কিন্তু তার পরেই তাঁর জীবন নাট্যে তথা সঙ্গীত জীবনে এক অকল্পনীয় সঙ্কট ঘনিয়ে এল। সার্থকতার সেই চূড়ান্ত পর্যায়ে দেখা দিল নিদারুণ দুর্বিপাক। গায়কের পক্ষে যার বড় বিপর্যয় আর কিছু হতে পারে না, তা-ই ভীষ্মদেবের ভাগ্যে ঘটল।

কি থেকে কিসের উৎপত্তি, কোন্ নিগূঢ় কার্যকারণসূত্রে ভীষ্মদেবের জীবন-ধারা এমন অভাবিত খাতে প্রবাহিত হল, বাইরের কারুর পক্ষে তা জানা সম্ভব নয়। একদিন অকস্মাৎ তাঁর অগণিত অনুরাগী শ্রোতারা স্তম্ভিত হয়ে শুনলেন যে, সঙ্গীত জগৎ থেকে বিদায় নিয়েছেন ভীষ্মদেব চট্টোপাধ্যায় এবং উদাসীনের জীবন যাপন করছেন পণ্ডিচেরির শ্রীঅরবিন্দের আশ্রমে।

কিন্তু কেন যে এতদিনের সঙ্গীত-সাধনের সুবর্ণফল অবহেলে ত্যাগ করে গেলেন তা রহস্যে আবৃত হয়ে রইল। অবশ্য নানা ধরনের কল্পিত ব্যাখ্যা যুগপৎ সৃষ্ট হতে লাগল তাঁর গুণমুগ্ধ ও নিন্দুকদের উর্বর মস্তিষ্কে। তবে এই অকাল অবসর গ্রহণের ফলে ক্ষতি যা হয়ে গেল তা অপূর-ণীয়। শুধু ভীষ্মদেবের সঙ্গীত জীবনে নয়, বাংলার সঙ্গীত জগতেও।

১৯৪০ সালের ১০ই অগস্ট তিনি কলকাতা ত্যাগ করে পণ্ডিচেরি চলে গেলেন। তারপর মাসের পর মাস, বছরের পর বছর তিনি অজ্ঞাতবাস করতে লাগলেন সেখানে। প্রথম দিকে আশ্রমে কখনো হয়ত গেয়েছেন, যেমন তৎকালীন পণ্ডিচেরী আশ্রমিক দিলীপকুমার রায় মহাশয়ের সেখানকার কক্ষে ; কিংবা কোন কোন দিন সমুদ্রতীরে ভ্রমণকালে। কিন্তু ক্রমে সেটুকু সঙ্গীতচর্চাও অন্তর্ধান করলো। সুরের জগৎ থেকে সম্পূর্ণভাবে বিদায় নিলেন সঙ্গীতরত্ন।

বাংলার বেদনার্ত সঙ্গীত সমাজে তাঁর স্মৃতি শেষে অবসান হয়ে এল। সেই সঙ্গে কোন কোন মহলে পণ্ডিচেরি আশ্রমের প্রতি এক বিরুদ্ধ সমালোচনা হতে লাগল এই ব্যাপারে। ভীষ্মদেবের সঙ্গীত ক্ষেত্র থেকে বিদায় গ্রহণের দায়িত্ব-ভাগী যেন শ্রীঅরবিন্দ আশ্রম। মহাযোগী, ভারতীয় আধ্যাত্মিকতার মহান প্রবক্তা শ্রীঅরবিন্দের পুণ্য সাধনভূমি সম্পর্কে এমন ধারণা পোষণ কিন্তু যেমন অনুচিত, তেমনি অযৌক্তিক ও অসার। ভীষ্মদেবের সঙ্গীতজীবনের ট্র্যাজেডি নিতান্তই তাঁর ব্যক্তিগত, সে প্রসঙ্গে আশ্রমকে জড়িত করা অর্থহীন।

ভীষ্মদেব তখন পণ্ডিচেরিতে ৭ বছর আশ্রমিক জীবন যাপন করছেন এমন সময় (১৯৪৭ সালের অকটোবর মাসে) বর্তমান লেখক দক্ষিণ ভারত ভ্রমণ উপলক্ষ্যে পণ্ডি-চেরিতে আসেন। সেখানে ভীষ্মদেবের সঙ্গে সাক্ষাৎ প্রসঙ্গে তাঁকে জিজ্ঞাসা করেন, সঙ্গীতজগৎ থেকে বিদায় নিলেন কেন?

উত্তরে ভীষ্মদেব এইভাবে জানিয়ে-ছিলেন : ১৯৪০ সালের মাঝামাঝি তাঁর সঙ্গীতকণ্ঠ অসুস্থ হয়ে পড়ে এবং চিকিৎ-সকের পরামর্শে তখনকার মতন গানক্রিয়া বন্ধ রাখতে হয়। চিকিৎসার সময় ভীষ্মদেব জানতে চেয়েছিলেন সঙ্গীতকণ্ঠ পরে আবার ফিরে আসবে ত? বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক বলেন, your voice may not recover. একথায় অত্যন্ত নিরাশ হয়ে পড়েন ভীষ্ম-দেব এবং ভাবেন যে তিনি আর গান গাইতে সক্ষম হবেন না। তখন তিনি কলকাতা এবং সঙ্গীতজগৎ থেকে বিদায় নেবার সংকল্প করে চিঠিপত্রে যোগাযোগ স্থাপন করেন পণ্ডিচেরি আশ্রমের সঙ্গে। অবশেষে আশ্রমে যোগদানের অনুমতি পেয়ে এখানে আশ্রমিক জীবন যাপন করতে চলে আসেন। পিছন পানে আর চেয়ে দেখেননি। অতীতের সমৃদ্ধ পরিচয়কে বিনা মায়া-মমতায় ফেলে এসেছেন পশ্চাতে।

পরে কিন্তু তিনি বুঝতে পারেন যে, আগেকার কণ্ঠ আবার প্রায় ফিরে পেয়েছেন। কিন্তু তখন আর গান আরম্ভ করলেন না পূর্ববৎ। কারণ তাঁর সেই গায়ক-সত্তা আর বর্তমান ছিল না। কি এক দুর্জ্ঞেয় পরি-বর্তন ঘটে গিয়েছিল ইতিমধ্যে, মানসলোকে। তাই সঙ্গীতকণ্ঠ পুনরায় লাভ করেও কেন তিনি সঙ্গীতজগতে প্রত্যাগত হবার প্রেরণা পেলেন না তার উত্তর তাঁর অন্তর্জীবনের সেই জটিল গ্রন্থিতেই নিহিত রয়ে গেল।

পণ্ডিচেরিতে পূর্ণ ৯ বছর বাসের পর অবশেষে ১৯৪৯ সালের সেপ্টে-ম্বর মাসে কলকাতায় প্রত্যাবর্তন করলেন ভীষ্মদেব। তখন তাঁর বয়স ৪০ বছর।

সংবাদ পেয়ে তাঁর অনুরাগী ও শিষ্য-বৃন্দ সোৎসাহে তাঁকে সঙ্গীতক্ষেত্রে পুনঃ-প্রতিষ্ঠিত করতে সচেষ্ট হলেন। ৯-১০ বছর স্থগিত রাখবার পর খেয়াল গানকে পুনরায় উজ্জীবিত করা প্রায় অসম্ভব। কিন্তু সঙ্গীতে অমিত শক্তিধর ভীষ্মদেব তাকেও ক্রমে সম্ভব করে তুললেন আংশিক-ভাবে।

প্রথম জীবনের সাধনালব্ধ ক্ষমতায় আবার তিনি সঙ্গীতক্ষেত্রে আত্মপ্রকাশ করলেন। কিন্তু ঠিক লাভ করা গেল না আগেকার সুপরিচিত ভীষ্মদেবকে। তবু মাঝে মাঝে যে গান তিনি গাইছেন তাতেই গুণমুগ্ধ শ্রোতারা অদূর ভবিষ্যতে তাঁর পূর্ণ স্বরূপ দেখবার আশা করতে লাগলেন।

তবে অসুবিধা ঘটতে লাগল তাঁর ব্যক্তি সত্তাকে নিয়ে এবং তা অতীব দুঃখকর। এ এক ধরনের অবোধ্য অসুস্থতা। সেজন্য তাঁর সম্বন্ধে অনির্দেশ্য অনিশ্চয়তা বিরাজ করত। অনেক সময়েই কঠিন হত পূর্ব বিজ্ঞপিত অনুসারে তাঁর আসরের আয়োজন করা। কখন যে সুস্থতার অভাব হবে বা তাঁর গানের মেজাজ আসবে না তার কোন ঠিক ঠিকানা নেই। হয়ত কোন পূর্ব নির্ধা-রিত আসরে উপস্থিত হয়েও ফিরে আসেন বিনা সঙ্গীতেই, গানের ইচ্ছা না জাগায়। হয়ত কদাচিৎ কোন আসরে সঙ্গীত পরি-বেশন করে শ্রোতাদের পরিতৃপ্ত করেন। পূর্ব প্রতিভার ঝলক হঠাৎ দেখা দেয় তখন।

স্বভাবও অনেক পরিবর্তিত হয়ে গেছে। কোথায় সেই আগেকার সদাপ্রসন্ন চিত্ত, উদ্ভাসিত মুখভাব। কখনো বিষণ্ণ, কখনো বিরক্ত। বেশির ভাগই সময় কাটান নিঃসঙ্গ অবস্থায়। অবসাদগ্রস্ত যেন। বাড়িতেও সঙ্গীতচর্চা তেমন হয় না।

এমনি অনিবন্ধভাবে চলে যায় দিন। বছরের পর বছর আবর্তিত হয় কালচক্র।

বর্তমানের সঙ্গীতজগতে কতজন আর সেই ভীষ্মদেবকে স্মরণে রেখেছেন? এই কলকাতায় বিদ্যমান থেকেও তিনি অজ্ঞাত-বাস করছেন লোক-লোচনের অন্তরালে।

এখনো ইচ্ছা করলেই ভালভাবে গান গাইতে পারেন। কিন্তু ইচ্ছা জাগে কদাচিৎ। এবং সেইটিই বিয়োগান্তক।

হায়, এমন করে সুরশিল্পীর জীবন অতিবাহিত হবে?

বাঁশরি কি বাজিবে না আর?
কুজনের দিন হবে কি অবসান?*

---

* ৮ই নভেম্বর সঙ্গীতরত্ন ভীষ্মদেব চট্টোপাধ্যায়ের ৬২তম জন্মতিথি উপলক্ষ্যে রচিত।

বন্ধ জানালা

সুনীল গুহ

নিচের জমি থেকে রেল লাইনে উঠবার ঢালুটায় হঠাৎ থমকে গিয়ে পিছন ফিরে তাকালো অলক। দেখল শমিতা নিচের জমিতেই থেমে গেছে। সামনের দিকে পা ফেলতে অস্বস্তি বোধ করছে। চোখেমুখে সেই অস্বস্তির ছাপ স্পষ্ট। চারিদিকে ইতস্তত পাথর-নুড়ি ছড়ানো। পায়ের শ্লিপার বাগ মানবে কিনা সম্ভবত সেইটেই ভাবছিল শমিতা। তাই দেখে হাসি পেলো অলকের। হাসল। এবং সহাস্যে হাত বাড়িয়ে দিল শমিতার দিকে। এবং শমিতাও অসংকোচে নিজের হাত বাড়িয়ে দিল অলকের হাতে। তারপর সেই হাতে ভর করে লাইনের পাশের মসৃণ জমিতে উঠে এলো। এই প্রথম ওরা একের হাত দিয়ে আরেকের হাতের উষ্ণতা অনুভব করল। রোমাঞ্চিত হল দেহমন। অসংযত-ভাবে বারবার একজনের দৃষ্টি আরেকজনের দৃষ্টিকে লুফে নিতে লাগল। আর সেই থেকে ওরা পরস্পর পরস্পরের হাত জড়িয়েই রেখেছিল, বলা বাহুল্য এ কারণে ওরা যথেষ্ট ঘনিষ্ঠ হয়ে পাশাপাশি হাঁটছিল। অবশেষে এক সময় সম্বিত ফিরে আসতেই নিজ নিজ হাত নিজ নিজ দৈহিক সীমার মধ্যে টেনে নিল।

ওরা এই আকস্মিক রোমাঞ্চে এক অনাস্বাদিত পুলক অনুভব করল। আর দু' জোড়া চোখ ঘন ঘন দৃষ্টি বিনিময়ের দ্বারা ঘন ঘন আবেগ সঞ্চারের প্রয়াস পাচ্ছিল। সেই আবেগের প্রতিক্রিয়ায় পাশাপাশি চলতে চলতে কখনো বা ওদের কাঁধে কাঁধে দৈহিক সংঘর্ষও ঘটে যাচ্ছিল। কিন্তু ওরা তাতে কোন অসুবিধে বোধ করছিল না। মাথার উপর নির্মেঘ নীল আকাশ, এই জনহীন শূন্যতায় সেই আকাশটাই যেন ওদের একমাত্র সংগী। রেল লাইন ধরে ওরা হাঁটছিল ঠিক বেড়াতে আসার মতই ধীর পদক্ষেপে। দু' পাশের টেলিগ্রাফের তার ওদের প্রতিযোগী। মাঝে মাঝে শালিক, চড়ুই বা লেজঝোলা পাখিরা বসে থেকে বিশ্রাম নিচ্ছিল বা নতুন নিশানা তাক করছিল।

অনেক সময় ধরে ওরা কোন কথা না বলার ফলে এক অস্বস্তিকর নৈঃশব্দ ঘনিয়ে এসেছিল। এক সময় সেই নৈঃশব্দ ভঙ্গ করে শমিতা বলল,—'এ কেমন জায়গায় বেড়াতে নিয়ে এলে বলত?'

মুগ্ধ দৃষ্টি নিয়ে অলক তাকালো সঙ্গিনীর দিকে। তারপর বলল,—'কেন, ভালো লাগছে না?'

শমিতা বিব্রত স্বরে বলল,—'না, আমি ঠিক তা' বলছিনা, খুব ভালো জায়গা, তবু কেমন যেন।'

—'কেমন যেন বলত?'

—'কী জানি, কেমন যেন।'

ওরা এইভাবে কথা বলতে বলতে এগুচ্ছিল। হাওয়া ওদের বিপরীতমুখী। ফলে শমিতার শাড়ির আঁচল ক্ষণে ক্ষণে অসংযত হয়ে পড়ছিল। বিকেল গড়িয়ে চলেছে। সন্ধ্যা আগতপ্রায়। তাই শমিতা এক সময় শঙ্কিত হয়ে শুধলো,—'ফিরবে না, রাত হয়ে যাবে যে।'

—'থাক না, অন্ধকারেই ফিরব।'

শমিতা সম্ভবত ভয় পেলো। সে কারণে দ্রুত শঙ্কিত হয়ে উঠল। বলল,—'সে কি কথা এখুনি ফিরে চল।'

অলক এবারে যেন গলা ফাটিয়ে হেসে উঠল। এ যেন ফিরবার কথা নয়। হাসির কথা। আর এই নির্জন নিরালায় বাতাস ছুটে এলো ওর মুখ থেকে সেই হাসির শব্দ লুফে নিতে।

আজ ওদের এমনি বেড়াতে আসার একটু পূর্বকথা আছে। অথবা বলা চলে যে, ঘটনার গতি ওদের টেনে নিয়ে এসেছে এখানে।

কাল বিকেলে কফি হাউসের এক কোণে দুটি চেয়ার দখল করে মুখোমুখি বসে ছিল দুটিতে। বসে একথা সেকথা নিয়ে গুনগুন করছিল। হঠাৎ অলক বলে উঠেছিল,—'সিনেমায় যাবে নাকি?

—'তুমি নিয়ে গেলেই যাব।' সঙ্গে সঙ্গে শমিতা উত্তর দিয়েছিল।

অলক সেই মুহূর্তে যথেষ্ট আশ্বস্ত বোধ করেছিল। ভেবেছিল, শমিতা হয়ত ওর এই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করবে। কেননা এই ঘনিষ্ঠতার বয়স ত দীর্ঘদিনের নয়। এখুনি অন্ধকার ঘরে পাশাপাশি বসতে চাইবে কেন? ভয় ডর বলেও ত একটা কথা আছে। সাধারণত মেয়েদের যা' থাকে। একটু ভেবেচিন্তে নিয়ে অলক আবার বলেছিল, 'তা হলে কালই চলো।'

—যাওয়া, না যাওয়া, কখন কোথায় সবই তোমার উপর নির্ভর করে।'

চমৎকার। ভিতরে ভিতরে খুশীতে ডগমগ হয়ে উঠল অলক। কথাগুলি শুধু শুদ্দর মার্জিতই নয়, আন্তরিকতার ছাপও সুস্পষ্ট।

আজকের এই বিচিত্র অভিনয়ের এইটুকুই পূর্বকথা। আজ দুপুরে পূর্ব নির্ধারিত একটা জায়গায় দুজনের দুদিক থেকে এসে যথাসময়েই মুখোমুখি হয়েছিল। দেখা হতেই শমিতা জিজ্ঞেস করেছিল,—'কী বই দেখবে বলত?'

তাইত। দুজনে সিনেমায় যাবে, অন্ধকার ঘরে পাশাপাশি বসবে, এই আনন্দের কথাই ভেবেছে অলক। কী বই দেখতে যাবে সেটা মোটেই ভেবে দেখেনি। তবু শমিতার প্রশ্নটাকে বেশী পুরনো হতে না দিয়ে তাড়াতাড়ি বলল, 'চল গিয়েই দেখি না, কোনটাতে টিকেট পাই।'

—'এ মা, সে আবার কী কথা, যে কোন একটা ছাইপাঁশ দেখলেই হল নাকি?'

অলক কিন্তু তাই ভেবেছিল। হলেই হল একটা। এইত মাত্র শুরু। পরে বেছে বেছে, বিচার করে দেখা যাবে। প্রথম ত ওর ধারণা হয়েছিল যে, শমিতা রাজিই হবে না। এ কথা সে কথার ছুতো তুলে এড়িয়ে যাবে। পরে যখন এক কথাতেই রাজি হয়ে গেল তখন আর কোন বাছা-বাছির ঝামেলার মধ্যে মনটা যেতে চাইল না।

এখন অবশ্য শমিতার কথায় মনে মনে এ প্রশ্নের যথার্থতা স্বীকার করল ও। একটা কিছু ভেবে রাখা উচিত ছিল। তবু যখন কিছু একটা নির্বাচন করে রাখেনি তখন আর প্রশ্নটা নিয়ে বেশী পর্যালোচনা করে কোন লাভ নেই।

পাশাপাশি হাঁটছিল ওরা। কিন্তু নিঃসংশয়ে নয়। একটা গোপন উদ্বেগে কিছু সচকিত। চারিদিকে অগণিত লোকের যাতায়াত, ট্রাম বাসের ছুটোছুটি, জানা-শোনা বা আত্মীয়স্বজনদের মধ্য থেকে কে কোথা থেকে দেখে ফেলে তার ঠিক নেই। তাই ওরা একটা পরামর্শ করে শেষ পর্যন্ত গিয়ে শহরতলীর একটা বাসে চেপে বসল।

এতক্ষণে ওরা বেশ খানিকটা নির্বিঘ্ন বোধ করল। হ্যাঁ, অযথা ঝামেলা বাড়িয়ে কোন লাভ নেই। বলা ত যায় না। কেউ হয়ত দেখেই ফেলল। আর যার ফলে বাড়ি ফিরে নানান ঝামেলা ত হবেই, উপরন্তু নতুন কোন নিয়মের বেড়াজালে আটকে হয়ত আর বেরুনো সম্ভব হবে না। বিশেষ করে শমিতার পক্ষে ত সেটা মারাত্মক হয়েই দেখা দেবার সম্ভাবনা।

শহরতলীর সিনেমা হল এবং কোন স্টপে নামতে হবে সেটা মুখস্ত ছিল অলকের। সে ব্যাপারে অবশ্য কোন বেগ পেতে হল না। যথাস্থানে এসে অত্যন্ত সহজভাবেই দুটিতে নামতে পারল। কিন্তু একটু দেরী যে হয়ে গিয়েছিল সেটা বাসে বসে অলক হাতঘড়িটায় চোখ রেখেই বুঝতে পেরেছিল। মনে মনে ভেবেছিল, তা হোক, মোটের উপর ত দেখা যাবে। তা হলেই হয়। তাই ওরা বাস থেকে নেমে হনহন করে পা চালিয়ে সিনেমা হল পর্যন্ত এগিয়ে গিয়েছিল। কিন্তু ভাগ্যে কুললো না। টিকেট নেই। এখন থেকেই পরের শো'য়ের জন্য লোক লাইন দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। আর ওরা হতাশ হয়ে দরজার সামনে ঝোলানো 'হাউস-ফুল' লেখা বোর্ডটাকে বারবার পড়তে লাগল।

অবশেষে বোর্ডটার উপর থেকে দৃষ্টিটা সরিয়ে এনে অলক হাসল। ব্যর্থতার হাসি। শমিতাও অলকের দিকে তাকিয়ে হাসল। সে হাসিতে সহানুভূতি মাখা। অলক বলল, 'কলকাতার বাইরেও আজকাল যা' ভিড়।'

—'তা ত দেখতেই পাচ্ছি।'

—'এখন কি করা যায় বলত?'

—'কী জানি।' এতক্ষণে শমিতার কণ্ঠেও হতাশার সুর বেজে উঠল।

দু'জনে ঘুরে দাঁড়ালো। সিনেমা যখন দেখা হবে না, তখন ফিরে ত যেতেই হবে। কিন্তু এই দুপুরে এখুনি ফিরে গিয়ে বাড়িতে কৈফিয়ত দেবে কি ওরা। সেদিক থেকে দু'জনেরই এক অবস্থা। দু'জনেই কলেজের একস্ট্রা ক্লাসের নাম করে বেরিয়েছে। অতএব ফিরে গিয়ে যে কোন একটা কিছু বললেই হয় না। শমিতার বাবার আবার বেশী প্রশ্ন করার অভ্যাস। সে কারণে শমিতা ত পারলে বাবার ধার কাছ ঘেঁষে না। অবশ্য দু'জনেরই মন চাইছিল না যে, ছাড়াছাড়ি হয়ে যাক এখুনি। তাই রোদ মাথায় করেই দু'জনে এলোমেলো হাঁটতে হাঁটতে এই রেল লাইন পর্যন্ত আসা।

ঘনায়মান সন্ধ্যা এই রেল লাইনের ধারের নির্জনে শমিতাকে যতটা শঙ্কিত করে তুলছে, ততটা অলককে নয়। কেননা, এই বিকেলে, আজকের এই অভিসারে অলক যেন নিজেকে অনেকখানি লাভবান বলে মনে করছে। এতটা ঘন ঘনিষ্ঠতার কথা ও এই মুহূর্তেই আশা করেনি। সিনেমায় ডেকেছিল, শমিতা এসেছে। দেখা হোক বা না হোক এসেছে ত। সেই প্রাক্-অপরাহ্ণ থেকে সঙ্গে সঙ্গে ঘুরেছে। হাত বাড়িয়ে দিয়েছিল, হাতে হাত রেখেছে। এক বিচিত্র নির্জনে একজন আরেকজনের ঘনিষ্ঠ তাপ অনুভব করেছে।

খানিক বাদে শমিতা আবার বলল,—'সন্ধ্যা হয়ে এলো যে, ফিরবে না?'

—'এখানে যখন ঘর বাঁধা যাবে না, তখন ফিরতেত হবেই।' অলক এই নৈঃশব্দ ভরা পরিবেশে নতুন প্রসঙ্গ তোলার প্রয়াস পায়। এখন যেন ওর ভিতরে ক্রমাগত নতুন কথার জন্ম হচ্ছে। আরো যেন কত কথা আছে বলবার। যে কথাগুলি ও গুছিয়ে গাছিয়ে এক এক করে শমিতাকে বলতে চায়। কিন্তু আজ আর সম্ভব হবে না। সন্ধ্যা এলো। তাই আর নয়। এবারে আরেকটা ঢালু বেয়ে নামতে লাগল অলক। শমিতা বিস্মিত হল। বলল, 'এ কি, কোথায় যাচ্ছ?'

—'যাচ্ছি চলো।'

এবারে আর কথার বাড়াবাড়ি করল না শমিতা। ভিতরের ভয়টা বুদ্ধির দিকে। সত্যি কিসের ভয়। এই একটা কথাই বারবার ভিতরে ধ্বনি প্রতিধ্বনি তুলল। অলককে কি কিছু ভয় করার আছে এখনো? না, তা' নেই অবশ্য। তবু ভয়। কিসের যেন ভয়। সেটা ও মনে মনে নিজের কাছেও জবাবদিহি করতে পারল না।

ওরা ঘড়িতে সমতলে নেমে এলো। এখান থেকেও বাস পাওয়া যায় ফিরবার। রেল লাইনের সীমারেখার ওদিকে নতুন করে কলকাতাটা গড়ে উঠছে। সেদিকে একবার তাকালো দৃষ্টিতে। তারপর রাস্তা পেরিয়ে গিয়ে বাস স্টপে অপেক্ষা করতে লাগল।

সেই কোন এক বিকেলে মামার বাড়ির জানালার পাশে দাঁড়ালো অলক। চায়ের কাপ হাতে। ওদিকের বাড়ির মুখোমুখি জানালাটা বন্ধ। স্তব্ধ বিস্মিত। নিজের মনে চায়ে চুমুক দিচ্ছিল। হঠাৎ সেই বন্ধ জানালাটা খুলে গেল হা করে। হুহু করে ঢুকলো বাতাস, সেই সঙ্গে অলকের দৃষ্টি। কী, কী ওখানে? কার মুখ? আয়ত চোখে উদাস দৃষ্টি। মুহূর্তে অলক মুগ্ধ। তারপর যেন কী হল। মনে নেই। অলকের যখন সম্বিত ফিরে এলো, তখন দেখল জানালাটা বন্ধ। সে নেই। যেমন করে আসা, তেমন করে উধাও।

সেই প্রথম। দেখেও যেন দেখা হল না। তাই বুকের মাঝখানে বাসা বাঁধল এক অতৃপ্তির। সেই অতৃপ্তি যেন ওকে দিনরাত তাড়িয়ে নিয়ে চলল। কোথায়? কোনদিকে? কেবলি মামার বাড়ির দিকে মনটা ছটফট করে। যায়। গিয়ে দাঁড়ায় সেই জানালার মুখোমুখি, দু চোখের দৃষ্টিতে ওর বিচিত্র বিস্ময়। কখনো জানালা বন্ধ, কখনো খোলা। কখনো দেখে, কখনো দেখে না। যখন দেখে তখন মনে হয় অপরূপ, যখন দেখে না তখন দু' চোখে অন্ধকার। সেই আলো-আঁধারী খেলার মাঝেও দিনের পর দিন চলে গেল।

তখনো কি জানা ছিল যে, আরেক বিস্ময় অপেক্ষা করে আছে ওর জন্য। সেই প্রথম দেখা থেকে, পরে আরো কয়েকদিনের দেখাতে, যেন অতৃপ্তিটা বেড়েই চলল। আত্মভোলা করে তুলল ওকে। আর দিক-দর্শন যন্ত্রের কাঁটার মত মনটা কেবল সেইদিকে সেই জানালাটার দিকে, মুখ করে থেকেছিল। কোন কোন সময় ভেবেছিল, হঠাৎ এত ঘন ঘন মামার বাড়ি যাওয়াটা ভালো দেখায় না। কিন্তু মনটা মানেনি। যখন তখনই গিয়ে হাজির হত।

অবশেষে একদিন চরম বিস্ময়ের মুখোমুখি হল।

বৃষ্টি। কী বৃষ্টিই না সেদিন এসেছিল কলকাতায়। মেঘ যেন গিলে ধরেছিল আকাশটাকে। বিরামহীন বৃষ্টিতে অনেক লোকের সঙ্গে কলেজ স্ট্রীটে অলকও আটকে গিয়েছিল। রাস্তায় জমা জল হাঁটু ছাড়িয়ে উঠবার উপক্রম। বাস ট্রাম বন্ধ। গুড় গুড় আও-য়াজের সঙ্গে বিজলিহানা আকাশটার দিকে তাকানো যাচ্ছিল না। অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে ছিল ও। শেষ পর্যন্ত ধৈর্যের আর বাঁধ থাকল না। কোন রকমে মাথাটা বাঁচিয়ে গায়ের খানিকটা ভিজিয়ে গিয়ে একটা চায়ের দোকানে উঠল। সেখানেও ভিড়। অনেক লোকের ঠেলাঠেলি। প্রত্যেকের চোখে মুখেই অধৈর্যের ছাপ ফুটে উঠেছে। দোকানের ভিতর দিকে ঢুকতে গিয়ে অলক যেন আকাশ থেকে পড়ে মুহূর্তখানেকের জন্য সম্বিত হারিয়ে ফেলল। কে? কে ওখানে? বেশী সময় তাকিয়ে থাকতে পারে নি সে-দিকে, পলক পড়তেই পলকের মধ্যে দৃষ্টি ফিরিয়ে নিয়ে হৃদপিণ্ডের আওয়াজ অনুভব করছিল। ওর পাশের সিটটা খালি ছিল। এত মানুষের মধ্যে এতখানি সাহসী পুরুষ ওখানে কেউ ছিল না যে নাকি অত সময় ধরে দাঁড়িয়ে থাকার ক্লান্তি অপনোদনের জন্য অন্তত চেয়ারটা দখল করে বসে। অলক কিন্তু বেশীক্ষণ দেরী করে নি। একটু বাদেই অত্যন্ত সাধারণভাবে গিয়ে চেয়ারটা দখল করে বসল, এবং চারিদিকের বিক্ষিপ্ত দৃষ্টিগুলিতে এক ব্যর্থতার ছাপ স্পষ্ট হতে দেখে যারপরনাই কৌতুক অনু-ভব করল।

মামার বাড়ি থেকে দৃশ্যমান সেই জানালাটা নিশ্চয় এখন বন্ধ। অলক ভাবল মনে মনে। নিজের বুকের ভিতরের আও-য়াজটা ক্রমশঃ কমে আসছে। তা-ও অনুভব করল। মেয়েদের পাশে এভাবে বসলে এখন আর প্রতিবাদ করে না ওরা। তাছাড়া এই দুর্যোগে, এতগুলি মানুষের সামনে একটা লোভনীয় সীট এভাবে পড়ে থাকবে, সেটাই বা কেমন কথা। ঠিক করেছে অলক। এতে অশোভনীয় কিছু নেই। সেই এক পলকের পর আর এ পর্যন্ত দ্বিতীয় পলক তুলে ধরতে পারে নি ওর মুখোমুখি। এতক্ষণে অলকের মনে প্রশ্ন উঠল, ঠিক সে ত? অত্যন্ত সাহস করে, নিজের বুক শক্ত করে আরেকবার দৃষ্টি বুলিয়ে আনল সেই মুখের উপর দিয়ে।

আর কোন সংশয় থাকে নি। এখন সেই জানালা বন্ধ। সত্যি খোলা নেই। থাকতে পারে না। বাইরে তখনো অবিশ্রান্ত বৃষ্টি। বাড়ি ফেরার সমস্যাটা মনের কোণে উঁকি দিচ্ছিল বটে, কিন্তু সেভাবে বসে থাকতেই যেন বেশী ভালো লাগছিল। কী নাম ওর? সেদিন প্রথম ঘনিষ্ঠ হয়ে এই প্রয়োজনীয় প্রশ্নটি জেগেছিল মনে। নামটা নিশ্চয় খুব মিষ্টি হবে। কিন্তু কোন কথা সুরু করতে সাহস পাচ্ছিল না অলক। যদি হঠাৎ বেঁকে বসে বা উল্টো প্রশ্ন তুলে ক্ষত-বিক্ষত করার চেষ্টা করে। তাহলে হয়ত এতগুলি লোকের মধ্যে এখুনি একটা সোরগোল উঠবে। চাই কি চরম একটা কিছু ঘটে যেতে পারে। হঠাৎ মেয়েটিই ওকে প্রশ্ন করে বসল, 'আপনার মামা কী রকম আছেন?'

—'ভালো।' খুব তাড়াতাড়ি উত্তর দিল ও। নিজে সুরু করতে না পারায় যে সংকট ওকে বিমর্ষ করে দিয়েছিল, সে সংকট কেটে যাওয়ায় যথেষ্ট পুলক অনুভব করল ও। কিন্তু পরক্ষণেই ওর মনে প্রশ্ন এলো, মামার কথাটা উঠল কেন?

মেয়েটি আবার বলল, 'রাধিকাবাবু আপনার মামা হন ত, না?'

—'হ্যাঁ।' আবার চটপট উত্তর দিল অলক। কিন্তু এমন প্রশ্ন কেন, আর কি কোন কথা নেই! কথা বলার সাহস যখন আছে, তখন অন্য কত রকম কথা দিয়ে কথা সুরু করা যায়।

—'আপনার নাম ত অলক, না?' মেয়েটি আবার কথা তোলে।

—'আশ্চর্য, আমার নামও আপনি জানেন নাকি?' অলক হাসল।

—'আমার নাম শমিতা।'

এতক্ষণে অলকের ভেতর থেকে দুরু-দুরু ভাবটা কেটে গেল। ব্যাপারটাকে যত কঠিন ভেবেছিল, আসলে তা নয়। ওর মনের দুর্বলতাই ওকে বেশী জব্দ করে রেখেছিল। নইলে ওর সামনে বসে একটি মেয়ে হয়ে শমিতা যে সাহসটুকু প্রকাশ করতে পারল, সেটুকু ও নিজে পারল না কেন?

পারেনি। সেদিন মনের মধ্যে যে প্রশ্নের উদয় হয়েছিল, আজো সে প্রশ্নটা অবিকৃত রয়েছে। শমিতা পেরেছিল ও পারে নি। তার আগের দিন রাত্রে অবশ্য মামার শরীরটা খুব খারাপ হয়েছিল, সেটা প্রতিবেশীদের মধ্যে অনেকেই জানে। কিন্তু তখন ও জানত না। যদিও শমিতার প্রশ্নের চটপট জবাব দিতে কোন দেরী করে নি। আজো এই বাসের জন্য দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতে সেই পরিচয়ের প্রথম পর্বের কথা ওর মনের কোণে হাঁক দিয়ে গেল।

—'সেই চায়ের দোকান, সেই ভিড়, সেই কথা বলার সুরু, মনে আছে তোমার?' আজো মাঝে মাঝে এ প্রশ্নটা তুলে ওর মুখের দিকে বিজয়িনীর হাসি নিয়ে তাকায় শমিতা।

—'আছে, মনে আছে, সেইটেই ত আসল সুরু আমাদের।'

সেই সুরু। সেটা আজো ওরা ভুলতে পারে নি। তার আগে এ বাড়ি থেকে ও বাড়ি পর্যন্ত দৃষ্টি লোফালুফিটা ত একটা সাধারণ ব্যাপার মাত্র।

আরেক দিন শমিতা বলল, —'আর আমি এখন ভাবতে পারি না আরেকজন পুরুষের কথা।'

সপ্রশ্ন দৃষ্টি নিয়ে অলক তাকিয়েছিল ওর দিকে। শমিতা অলকের বিস্মিত বিমূঢ় দৃষ্টির দিকে তাকিয়ে না হেসে আর পারল না। খানিক হেসে বলল,—'মাঝে বাড়িতে মাঝে মাঝে বিয়ে-থা'র কথা ওঠে কিনা, তাই বললাম।'

—'ও, তাই বল,—আমারও তাই মনের মধ্যে তোমার মুখখানাই কেবল ভাসে, কেন এমন হয় বলত?'

—'কী জানি কেন, বুঝতে পারি না ঠিক।'

তারপর দিনের পর দিন ওরা পাশাপাশি হেঁটেছে গড়ের মাঠে। অকারণ। পথের মাঝখানে বৃষ্টি নেমে গেলে, কোন ছাউনির নিচে দাঁড়ায় নি। ভিজেছে। সিনেমা দেখার অজুহাত তুলে ছুটে গেছে দুটিতে নিকট মফঃস্বলের কোন শহরে। কখনো সিনেমা দেখেছে, কখনো দেখে নি। দেখেও যে আনন্দ না দেখেও সেই আনন্দই পেয়েছে। যখনই

মিলেছে দৃষ্টিতে, তখনই ওদের কথা। কত যে কথা, তার যেন কোন শেষ সীমা নেই।

রোজই ওরা কলেজের শেষে এসে একটা জায়গায় মিলিত হয়। আগে থেকে নির্দিষ্ট করা থাকে। কখনো গঙ্গার ঘাট। কখনো মনুমেন্টের তলা। কখনো দক্ষিণেশ্বরের মন্দির। এমনিভাবে যতক্ষণ সম্ভব ওরা, কথা বলে, হাঁটে। কখনো বা চায়ের দোকানে বসে। কখনো আবার গঙ্গার বাঁধানো ঘাটে পাশাপাশি বসে। কখনো গান গায় শমিতা। মনোযোগ দিয়ে তা শোনে অলক। সেই সুরটা এমনি করে পরিবেশটাকে নিবিড় করছিল।

কফি হাউসের কোণে মাঝে মাঝে বসে ওরা।

আগের মত এখন আর তত নিশ্চিন্ত নয়। মোটের উপর নিঃশঙ্কচিত্তেই বসে। শুধু যতটা সম্ভব কোণ বেছে নেয়। সেইখানে বসে অলক বলে, —'আর পারি না শমিতা, আমাদের কী হবে বলত?'

কী হবে তাই তো। শমিতাও ভাবে তাই। পথে ঘাটে ঘুরে ঘুরে আর কাঁহাতক পারা যায়। শমিতা বললে, 'তুমি আর আমি সারাক্ষণই বাইরে বাইরে ঘুরেছি, সত্যি সেটা আর ভালো লাগে না।'

—'কী হলে ভালো হয় বলত?'

—'তুমি বাইরে, আমি ঘরে, সেটা নিয়ম, সেটাই যে চাই।'

কোন কথা জোগালো না অলকের মুখে। শুধু তাকিয়ে একবার দেখল শমিতার মুখখানা। যেন অনেক দিন পরে দেখল,

তেমন করেই শমিতার মুখের উপর দৃষ্টি ছড়িয়ে দিল অলক। তারপর হঠাৎ হেসে ফেলে বলল, 'তাহলে আগে আমাদের ঘরটা দরকার, না?'

—'তার আগে আমার তোমাকে দরকার।'

কেমন যেন ওদের কথার পিঠে কথা এসে যায়। অলক আবার বলল, 'ঘর এবং আমি দুটিই তোমার দরকার।' বলেই হো-হো করে হেসে উঠল অলক।

এবারে অলকের মুখের দিকে তাকাল শমিতা। আজ পর্যন্ত অনেকভাবে অলককে হাসতে দেখেছে শমিতা, কিন্তু এমন করে হাসতে আর কখনো দেখেছে বলে মনে পড়ছে না ওর। এই হাসির মধ্যে যতটা উচ্ছ্বাস, তার চেয়ে বেশী যেন কিসের প্রতি একটা তাচ্ছিল্য।

অলক হাসি থামিয়ে বলল, 'তারপর আরো যা যা দরকার, তার কথা ত বললে না।'

—'আর কিছু চাই না আমার।' দৃঢ়-কণ্ঠে উত্তর দেয় শমিতা।

—'কেন শাড়ি, গয়না, আরো কত কি, সে সব ত বললে না।'

মনে মনে আহত হল শমিতা। অলকের কথাবার্তা যেন কেমন তির্যক হয়ে উঠছে। শুনতে ভালো লাগছে না। তাই বলল, 'তুমি এমন করে কথা বলছ কেন বলত?'

অলক তাকিয়ে দেখল শমিতার চোখে-মুখে এই মুহূর্তে কেমন এক বিমর্ষ ভাব ফুটে উঠেছে। বলল, 'না, এমনি বললুম, তোমাকে ছাড়া এসব কথা এত সহজে আর কাকে বলতে পারি বল?'

মুহূর্তে শমিতার চোখ-মুখ স্বাভাবিক হল। অলক তাকিয়ে দেখল আবার ওর মুখখানা। বেশ মন্দ নয়। সেই মামার বাড়ি থেকে ওদের জানালা দিয়ে এই মুখখানাই দেখতে পেয়েছিল ও। বলতে গেলে সেই থেকেই ত সুরু। তারপর সেই একদিন বৃষ্টির মধ্যে চায়ের দোকানে বসে প্রথম আলাপ।

শমিতা বলেছিল, 'আপনি আমাদের ঐ জানালাটার দিকে এসে তাকিয়ে থাকতেন।'

—'থাকতাম।'

—'কী দেখতেন?'

—'মনে নেই, কী যেন দেখতাম।'

শমিতা হেসেছিল। শমিতা নিজেও কিসের তাগিদে এসে যেন জানালা খুলে সেখানেই দাঁড়াতো। প্রায় সময় মিলিয়ে। তারপর আকাশের দিকে তাকিয়ে পুরনো পরিচিত আকাশটাকেই চেয়ে চেয়ে দেখত। আর অলক, দেখত শমিতাকে। অবশেষে সেই দেখা যেন আর ফুরোতে চাইত না।

অবশেষে সেই চায়ের দোকানে আলাপ।

অনেকক্ষণ বসে থেকে অলক বলেছিল, 'তবু আপনার সঙ্গে দেখা হয়ে গেল তাই।'

—'তাই কি?'

—'একটু কথাবার্তা বলে সময় কাটানো গেল।'

—'এ রকম দেখা হয়ে গেলে মন্দ হয় না, না?'

—'তা যা বলেছেন।'

আজ অলকের মনে হয়, ব্যাপারটা অনেক পুরনো হয়ে গেছে। এখন ওরা মাঝে মাঝে নিজেদের বিয়ের প্রসঙ্গ পর্যন্ত তোলে। লজ্জা সঙ্কোচের দিনগুলিও পেরিয়ে এসেছে ওরা। এখন ওরা নিজেদের প্রয়োজন সম্পর্কে একে অপরকে সচেতন করিয়ে দেবার প্রয়োজন অনুভব করে। এখন ওরা একজনের প্রয়োজনের কথা জানিয়ে অপরের কাছে মন খারাপের কথা জানাতেও কোন দ্বিধা করে না।

তারপর একদিন ওরা ঘুরতে ঘুরতে এসে বসল গঙ্গার ঘাটে।

তখন সূর্য পশ্চিম দিগন্তে ধীরে ধীরে ডুবে যাচ্ছিল। তখন গঙ্গার জলে শেষ বিকেলের রক্তিমাভা জলের স্রোতের সঙ্গে বয়ে চলেছে। তখন এক তির্যক রেখায় সম্মিলিত হয়ে বকের দল পাড়ি জমিয়েছে দিগন্তের দিকে। ওরা দুজনে নিঃশব্দে গঙ্গার এই বিচিত্র শোভা দেখতে লাগল।

অবশেষে নীরবতা ভেঙে শমিতা বলল,— 'তোমার দিকে তাকাতে আজ কেমন যেন ভয় করছে আমার?'

হাসল অলক। বলল,—'কেন বলত?'

—'তোমাকে কেমন দেখাচ্ছে যেন।

অলক এবারে শমিতাকে দেখল। যেন এতক্ষণ দেখেনি ওকে। এখন দেখল। ওদিকে পশ্চিম আকাশের রং পাল্টে গেছে। গঙ্গা স্রোতে আলো আঁধারীর খেলা। মৃদু হাওয়ায় শমিতার চুলগুলি অসংযত হয়ে পড়ছিল। অলক কোন কথা না বলে শুধু তাকিয়েই রইল শমিতার দিকে।

শমিতা খানিক সময় বাদে আবার বলল, —'তোমার চোখের নিচে কালি জমেছে, ঠোঁটদুটো শুকানো, কেন এমন হয়েছে বলত?'

—'জানি না।'

—'আগের মত আর সময় জ্ঞান নেই তোমার, কেন এরকম হয়ে যাচ্ছ বলত?'

—'ঠিক বুঝতে পারছি না।'

আজো অলক দেরী করেছিল। আজ মিলিত হওয়ার কথা ছিল মনুমেন্টের নীচে। শমিতা ত প্রায় আশা ছেড়েই দিয়েছিল। আরো একদিন আসেনি অলক। সেদিনের মত আজো আসবে না বলেই ধরে নিয়েছিল শমিতা। এক সময় ও ফিরে যাবার কথা ভাবছিল, ঠিক তখন এসে হাজির হয়েছিল অলক। শুকনো মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠেছিল শমিতার।

পরের দিন শমিতা দাঁড়িয়েছিল স্টেশনের গোল ঘড়িটার ঠিক নীচে। আরো ক'দিন এ রকম দাঁড়িয়েছে। অলক এসেছে। দুজনে মিলেছে। তারপর গাড়ি ধরে কাছা-কাছি কোন স্টেশনে নেমে গেছে সিনেমায়। অথবা, বন-জঙ্গলের ধার ঘেঁষে উদ্দেশ্যহীন-ভাবে কাঁচা মাটির পথ ধরে ঘুরেছে।

আজো একটু সিনেমায় যাওয়ার কথা আছে ওদের।

নিজের হাতঘড়িটায় একবার, আরেকবার মাথার উপরে গোল ঘড়িটার দিকে চোখ বুলাচ্ছিল শমিতা। অলক আসছে না এখনো। সময় পেরিয়ে গেছে। নির্ধারিত সময়ের জ্ঞানটা আজকাল অলকের থাকছে না। সেটা জানা আছে শমিতার। ইচ্ছে করলে ও নিজেও আধ ঘন্টা পরেও আসতে পারত।

গলার ভিতরটা কাঠ হয়ে আসছে। তেষ্টা পেয়েছে। একটু জল খেয়ে নিলে হত। একটু দূরে জল রয়েছে। অথবা গেটের বাইরে গিয়ে লেমোনেড খেয়ে আসা যেত। কিন্তু সেটা এখন সম্ভব নয়। এরই মধ্যে অলক এসে যদি খুঁজে ফিরে যায়।

নিজের ঘড়িটার সঙ্গে রেলের ঘড়িটার দু-এক মিনিট এদিক ওদিক আছে, সেটা এতক্ষণে লক্ষ্য পড়ল ওর। সেটা মিলিয়ে নিল। তারপর আবার স্রোতের লোকেদের যাওয়া আসার দিকে তাকিয়ে রইল। মনে মনে ভাবল, আর একটু বাদেই বোধহয় অলককে দেখতে পাওয়া যাবে। মাঝে মাঝে সার্ট প্যান্টের রং দেখে কোন কোন আগন্তু-কের প্রতি ওর দৃষ্টি আকৃষ্ট হচ্ছিল। কিন্তু পরক্ষণেই লোকের আকৃতি-প্রকৃতি লক্ষ্য করে নিজের ভুল বুঝতে পারে।

নির্ধারিত সময়ের পরেও পুরো একটি ঘন্টা পেরিয়ে গেল।

সামনে বিকেল। তারপরেই সন্ধ্যে। অলক না এলে ফিরে যাওয়াই ভালো। শুধু শুধু বাড়ি গিয়ে একটা মিথ্যে কথার ঝামেলা বাড়িয়ে ত লাভ নেই কোন। গোটা স্টেশনটা কলরোলে মুখরিত। লোকের আসা যাওয়ায় কোন বিরাম নেই। গাড়িগুলিও লোক বোঝাই করে কোনটা আসছে, কোনটা যাচ্ছে।

তারপরেও অনেক সময় কেটে গেল।

অলক আসছে না। একবার খুব জ্বর নিয়েও সে সময়ের মর্যাদা দিয়েছিল। শমিতাই সেদিন রেগে গিয়েছিল। এত শরীর খারাপ নিয়ে আসার কী দরকার ছিল। তবু সে এসেছিল তাতে ও কম আনন্দ পায়নি।

আরো এক ঘন্টা কেটে গেল।

এবারে শমিতা আর অপেক্ষা করার প্রয়োজন আছে বলে মনে করল না। তবু দাঁড়িয়ে রইল। এগুতে পারছিল না। রাগে দুঃখে একাকার হয়ে যাচ্ছিল। মাথার উপর ঘড়িটা আর দেখতে পাচ্ছে না। কেমন আবছা হয়ে গেছে। মনে পড়ল প্রথম দিনের সেই জানালা খোলার কথা। এমন জানলে ও জানালাটা খুলেই [illegible] বন্ধ করে দিতে পারত।

পটভূমি

সীমান্তে যখন রণদামামা বাজছে, ঠিক তখনই নির্বাচনের ঢাকে কাঠি পড়ার উপযুক্ত সময় নিশ্চয়ই নয়। কারণ, আসছে বছরের গোড়ায় আদৌ পশ্চিমবাংলায় কোনো নির্বাচন হবে কিনা, তা নির্ভর করছে ঐ যুদ্ধ লেগে যাবে কিনা তার ওপর। তবু কিন্তু ভোটসর্বস্ব নানা দল নির্বাচনী-কাঁঠাল গাছে থাকা সত্ত্বেও এখন থেকেই জোট পাকানোর গোঁফে তেল দিতে শুরু করে দিয়েছে। যুদ্ধ যদি না-ও লাগে, বাংলাদেশ নিয়ে যদি এখনকার মতো একটা অচল অবস্থাই বজায় থাকে, তবুও কিন্তু পশ্চিমবাংলায় এখন নির্বাচন অনুষ্ঠানে বিরাট বাধা রয়েছে। সেই বাধা বিপুল সংখ্যক শরণার্থীর উপস্থিতি। এই শরণার্থীদের সামলাতে গিয়ে পশ্চিমবাংলার প্রশাসনের ওপর এখন একটা দারুণ চাপ এসে পড়েছে, যার ফলে অনেক জেলায় অন্যান্য কাজ প্রায় একরকম বন্ধ। এই অবস্থায় একটি নির্বাচন পরিচালনার দায়িত্ব নেওয়া প্রশাসনের পক্ষে অত্যন্তই গুরুভার হয়ে দাঁড়াবে। এ-কথা সরকারও জানেন, সাধারণ মানুষ কিছুটা বুঝতে পারেন, রাজনৈতিক দলগুলো তো জানেনই।

১৯৭১ সালের গোড়াতেও সারা দেশে লোকসভার মধ্যবর্তীকালীন নির্বাচনের সঙ্গে এই রাজ্যে নির্বাচন হবে কিনা তা নিয়ে বেশ কিছু অনিশ্চয়তা ছিল এবং সেই অনিশ্চয়তা কাটতে বেশ কিছু সময়ও লেগেছিল। কিন্তু গত মার্চে পশ্চিমবাংলায় নির্বাচন না করে কেন্দ্রীয় সরকারের কোনো উপায় ছিল না। কারণ, নির্বাচনী আইন-কানুন অনুযায়ী ঐ সময় লোকসভার জন্যে এই রাজ্যে ভোট গ্রহণের ব্যবস্থা করতেই হত। আর লোকসভার জন্যে ভোট গ্রহণ করে বিধানসভার নির্বাচন মুলতুবি রাখার চেষ্টা করা হলে তাতে কেন্দ্রীয় সরকারের উদ্দেশ্যের সততা সম্পর্কেই গুরুতর সন্দেহ দেখা দিত এবং সেই সন্দেহকে জাগিয়ে বিপক্ষ দলগুলিই লাভবান হত। এবার ঐ ধরনের কোনো জটিলতা কেন্দ্রীয় সরকারের সামনে নেই।

অন্যান্য কয়েকটি রাজ্যে ফেব্রুয়ারি-মার্চে বিধানসভার নির্বাচন হওয়ার কথা আছে ঠিকই এবং অভাবিতপূর্ব কিছু না ঘটলে তা হবেও। কিন্তু নির্বাচনী কানুনে এমন কোনো বাধ্যবাধকতা নেই যে, সেই সঙ্গে পশ্চিমবাংলাতেও নির্বাচন হতে হবে।

সুতরাং অনুমান করা যায়, পশ্চিমবাংলা বিধানসভার পরবর্তী নির্বাচন কবে হবে তা সম্পূর্ণভাবেই নির্ভর করছে দুটি বিষয়ের ওপর। একটির কথা আগেই বলেছি—বাংলাদেশ সমস্যা এবং সেই সমস্যা থেকে উপজাত শরণার্থী সমস্যা। দ্বিতীয়টি হল, পশ্চিমবাংলা সম্পর্কে নয়াদিল্লীর (অর্থাৎ কংগ্রেসের, অর্থাৎ প্রধানমন্ত্রীর) রাজনৈতিক মূল্যায়ন।

নয়াদিল্লীর পক্ষ থেকে যিনি এই রাজ্যের কাজকর্মের তদারকি করছেন সেই সিদ্ধার্থশঙ্কর রায় অবশ্য আশু নির্বাচনের সম্ভাবনা বাতিল করে দিয়েছেন। প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি আবদুস সত্তারও প্রকাশ করেছেন একই ধরনের অভিমত। অবশ্য তাঁরা মুখে যা বলছেন, মনেও তাই ভাবছেন, এমন না হতেও পারে। তবে কেন্দ্রীয় সরকার নির্বাচন সম্পর্কে কোনো সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে অবশ্যই সমগ্র অবস্থাটা যাচাই করে দেখবেন।

এবার পশ্চিমবাংলায় রাষ্ট্রপতির শাসন প্রবর্তনের পর প্রশাসনের সামনে প্রধান সমস্যা ছিল দুটি—(এক), আইন-শৃঙ্খলার শোচনীয় অবস্থার কী করে উন্নতি করা যায় এবং (দুই), বৈষয়িক অবস্থাকে চাঙা করে তোলা যায় কীভাবে। প্রথম সমস্যাটার দিকেই সিদ্ধার্থবাবু প্রথম নজর দেন সঙ্গত কারণেই। এর জন্যে একদিকে যেমন সেনাবাহিনীকে ব্যাপকভাবে কাজে লাগানো হয়, তেমনই সব রাজনৈতিক দলের মধ্যে একটা সমঝোতার জন্যেও চেষ্টা শুরু হয়ে যায়। প্রথম ব্যবস্থাটায় কোনো ফল হয়েছে কিনা তা বোঝা অপেক্ষাকৃত সহজ, কিন্তু দ্বিতীয় ব্যবস্থার ফলাফল অনেকটাই ঝাপসা হতে বাধ্য। ঠিক কী কারণে কেউই এখন ঠিক করে বলতে পারছেন না, তবে এ-সম্বন্ধে এখন কোনো সন্দেহ নেই যে, আইন-শৃঙ্খলার অবস্থার চোখে-পড়ার মতো উন্নতি ঘটেছে। লোকে এখন অনেক বেশি স্বস্তিতে দিন কাটাচ্ছেন, সদাসর্বদা আতঙ্কের ভাবটাও কেটে গেছে। দৈনিক খুনের ফর্দও ছোট হয়ে এসেছে। এখন মাঝে মাঝে যে কয়েকজন নিহত হচ্ছে তার একটা বড় অংশের প্রাণ যাচ্ছে পুলিশের সঙ্গে সংঘর্ষে। চোরাগোপ্তা আন্তর্দলীয় খুনোখুনি অনেক কম।

আগেই বলেছি, কেন এই উন্নতি ঘটেছে তার সঠিক বিশ্লেষণ এখনও হয়নি। তবু প্রশাসন নিশ্চয়ই দাবি করবেন যে, তাঁদের দৃঢ়তাই এই প্রার্থিত সুফল এনেছে। এবং সেই দৃঢ়তা সম্ভব হয়েছে রাষ্ট্রপতির শাসনের ফলেই। এই মূল্যায়নে রাষ্ট্রপতির শাসনের কৃতিত্বের দিকটাই ধরা পড়ে। সুতরাং এই উন্নতির ধারাটা যদি বজায় রাখতে হয়, তবে নয়াদিল্লীর পক্ষে আরো বেশ কিছু দিন রাষ্ট্রপতির শাসন চালিয়ে যাওয়ার সিদ্ধান্ত করাই স্বাভাবিক।

•

আইন-শৃংখলার সমস্যা মোকাবিলায় রাষ্ট্রপতির শাসন কিছুটা সফল হলেও দ্বিতীয় সমস্যাটি সম্পর্কে সে-কথা বলা চলে না। শিল্পোন্নয়নের জন্যে ১৬-দফা কর্মসূচী ঘোষিত হয়েছে প্রায় মাস-তিনেক হতে চলল, কিন্তু তারপর আর বিশেষ কিছু এগোয়নি। ১৬-দফার মধ্যে মাত্র একটি দফা সম্পর্কে এপর্যন্ত নির্দিষ্ট ব্যবস্থা গৃহীত হয়েছে—অর্থাৎ পশ্চিমবাংলার কয়েকটি কারখানা রেল-দপ্তর থেকে কয়েক হাজার ওয়াগন তৈরির বরাত পেয়েছে। কিন্তু বাকি দফাগুলি এখনও প্রধানতঃ কাগজে-কলমেই আটকে পড়ে আছে। বন্ধ ও বিপন্ন কলকারখানা খোলার জন্যে রাষ্ট্রপতি অর্ডিন্যান্স জারি করেছেন। কিন্তু তার সুযোগ নেওয়ার মতো প্রস্তুতি এখনও রাইটার্স বিল্ডিংসের নেই। নতুন কল-কারখানা খোলার বিশেষ লক্ষণও চোখে পড়ছে না।

ইতিমধ্যে অবশ্য ১৬-দফার বাইরে কেন্দ্রীয় সরকারের কোনো কোনো সিদ্ধান্ত পশ্চিমবাংলার পক্ষে সুসংবাদ বয়ে এনেছে। হলদিয়া সার কারখানা স্থাপন সম্পর্কে নয়াদিল্লী অনেক গড়িমসির পর একটা সিদ্ধান্তে এসেছে। কলকাতায় মাটির নিচে রেল চলবে, এটাও এখন একরকম পাকা বলে ধরে নেওয়া যায়। ফরাক্কা সেতু দিয়ে রেল চলাচল শুরু হয়ে গেছে। হুগলী নদীর ওপর দ্বিতীয় সেতু তৈরির কাজও শীঘ্রই শুরু হবে।

এই সব সিদ্ধান্ত পশ্চিমবাংলার বৈষয়িক অবস্থাকে শুধু চাঙাই করবে না, সেই সঙ্গে এই রাজ্য সম্পর্কে নয়াদিল্লীর আগ্রহের প্রমাণ হিসেবেও গৃহীত হবে। তবু কিন্তু এখনও এ-কথা বলার সময় আসেনি যে, সামগ্রিকভাবে বৈষয়িক অবস্থার উন্নতি ঘটেছে, অথবা সেই উন্নতি ঘটবার মতো পরিবেশ তৈরি হয়েছে। এক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য সাফল্য লাভ করার আগেই কি কেন্দ্রীয় সরকার নির্বাচন করতে রাজী হবেন? কারণ, আইন-শৃংখলার ফ্রন্টের চেয়ে এই ফ্রন্ট মোটেই কম গুরুত্বপূর্ণ নয়, বরং দীর্ঘমেয়াদী বিচারে অনেক বেশি জরুরী। এখানে যদি রাষ্ট্রপতির শাসনের (অর্থাৎ দিল্লীর, অর্থাৎ কংগ্রেসের) রেকর্ড উজ্জ্বল না হয় তবে নির্বাচকদের সামনে হাজির হওয়ায় অসুবিধে রয়েছে।

●

এসব কথা জানা থাকা সত্ত্বেও কিন্তু রাজ্যের এযাবৎ নিস্তরঙ্গ রাজনীতিতে ছোট ছোট ঢেউ উঠছে এবং পড়ছে। তার কারণ, হঠাৎ যদি ফেব্রুয়ারি-মার্চে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়, তবে কেউই অ-প্রস্তুত হতে চান না। তাই চোখে পড়ছে কিছু যাওয়া-আসা, কিছু কিছু আলোচনা, কিছু স্বীকৃতি, কিছু অস্বীকৃতি। অর্থাৎ ছবিটা এখনও মোটেই স্পষ্ট নয় কী যে দাঁড়াবে তা-ও বলা শক্ত, তবু জোট পাকানোর চেষ্টা চলছে ঠিকই।

গত নির্বাচনের পর এ-কথাটা পরিষ্কার হয়ে গেছে যে, এই পশ্চিমবাংলার রাজনীতি আবর্তিত হবে দু'টি দলকে কেন্দ্র করে। সেই দু'টি দল কংগ্রেস এবং সি পি এম। তার মানে কিন্তু এই নয় যে, ছোট দলগুলির কোনো ভূমিকাই নেই। বরং গত নির্বাচনের পরও দেখা গেল যে, ছোট দলগুলির হাতেই আসল চাবিকাঠি। তারা যেদিকে যায়, তারাই শেষপর্যন্ত সরকার গড়তে পারে। মাঝের দলগুলি সি পি এম-কে সমর্থন জানালো না বলেই একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা সত্ত্বেও তারা শেষপর্যন্ত সরকার গড়তে পারলো না। ছোট দলগুলির এই গুরুত্বের কথা ভেবেই তাদের দলে টানার ইচ্ছে দু' পক্ষেরই।

সি পি এম-এর হাতে অবশ্য এখনই একটা তথাকথিত ফ্রন্ট রয়েছে, যার নাম সংযুক্ত বামপন্থী ফ্রন্ট। সকলেই জানেন, এটা নামেই ফ্রন্ট, আসলে সি পি এম-ই এই ফ্রন্টের আদি-অন্ত-মধ্য। এই যড়বামের অন্যতম শরিক বিপ্লবী বাংলা কংগ্রেস। যাকে উপলক্ষ্য করে বাংলা কংগ্রেস থেকে কিছু লোক বেরিয়ে এসে বিপ্লবী বাংলা কংগ্রেস গড়েছিলেন সেই সুকুমার রায়ের সম্প্রতি মৃত্যু হয়েছে। ফলে এই ভাঙা-দলটির গুরুত্ব এখন আরো কমেছে। বলশেভিক পার্টি দু'টুকরো হওয়ার পর একটি টুকরো এই ফ্রন্টে ছিল। সম্প্রতি দু'টুকরো জোড়া লেগেছে। কিন্তু তাঁরা কোন্‌দিকে থাকবেন তা এখনও পরিষ্কার হয়নি। বাকি তিন শরিক ওয়ার্কার্স পার্টি, মার্কসবাদী ফরওয়ার্ড ব্লক এবং সুধীন-কুমারের আর সি পি আই এখনও সি পি এম-এর সঙ্গেই আছে।

তবে এই গোষ্ঠীর বাইরে সি পি এম নির্বাচনের আগে নতুন কোনো সাথী জোটাতে পারবে কিনা, সে-সম্পর্কে এখন ঘোরতর সন্দেহ দেখা দিয়েছে। অন্যান্য প্রধান বামপন্থী দল প্রত্যেকেই এ-পর্যন্ত সি পি এমের সঙ্গে হাত মেলাতে অস্বীকার করেছে। সি পি আই প্রকাশ্যেই জানিয়ে দিয়েছে যে, আজ কংগ্রেস-বিরোধিতার ভিত্তিতে কোনো ফ্রন্ট গড়তে তারা আগ্রহী নয়। ফ্রন্ট যদি গড়তে হয় তবে তার মধ্যে কংগ্রেসের প্রগতিশীল অংশকেও নিতে হবে। কিন্তু কংগ্রেসের কোনো কোনো অংশ সি পি এম, সি পি আই প্রভৃতি দলের সঙ্গে এক ফ্রন্টে যোগ দিতে আগ্রহী এমন হদিস এখনও পাওয়া যায় নি। ফরওয়ার্ড ব্লকের সাম্প্রতিক রাজ্য সম্মেলনে যে নতুন নীতি গৃহীত হয়েছে সেই নীতি অনুযায়ী সি পি এমের সঙ্গে তারা এক ফ্রন্টে শামিল হবে না। এই দুই দলের তুলনায় এস ইউ সি যদিও সি পি এমের নিকটতর, তবু মার্কসবাদীদের "সংকীর্ণতার নীতি" এবং একটি "আচরণ বিধি" তৈরিতে রাজী না-হওয়া দু'দলের সহযোগিতার পথে বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে। আর এস পি যদিও এযাবৎ প্রায় সব ব্যাপারেই সি পি এমকে সমর্থন জানিয়ে এসেছে, তবু ইদানীং মনে হচ্ছে মার্কসবাদীদের সম্পর্কে তাদের উত্তাপও যেন কিছুটা কমে এসেছে। তা যদি না হত, তা হলে ফরওয়ার্ড ব্লক ও এস ইউ সিকে নিয়ে আর এস পি একটি তৃতীয় ফ্রন্ট গড়তে উদ্যোগী হত না। আর এস পি'র এই প্রয়াস এখনও নিতান্ত প্রাথমিক পর্যায়ে রয়েছে, তবু পশ্চিম বাংলার রাজনীতিতে এটা একটা নতুন উদ্যোগ।

কিন্তু সি পি এম, সি পি আই প্রভৃতি দলের সমাহারে একটি ব্যাপক বামপন্থী ফ্রন্ট গঠনের আশু সম্ভাবনা দেখা যাচ্ছে না বলে কি ধরে নেওয়া যেতে পারে যে, সি পি এম-বিরোধী একটা বড় ফ্রন্ট তৈরি হবে? অবশ্যই কংগ্রেস চায় এই ধরনের একটা জোট গড়ে উঠুক এবং এ-সম্বন্ধে কংগ্রেস নেতারা ইতিমধ্যে উদ্যোগীও হয়েছেন। ছোটখাটো সাফল্যও তাঁরা লাভ করেছেন। কাশীকান্ত মৈত্রের নেতৃত্বে কিছু সমাজতন্ত্রী কর্মী ইতিমধ্যেই কংগ্রেসে যোগ দিয়েছেন। পি-এস-পি'র একটা অংশও (সুধীর দাস গোষ্ঠী) ঐ পথেই যাবেন বলে মনে হয়। বিদ্রোহী পি এস পি'র একটি গোষ্ঠী (বিদ্যুৎ ঘোষের নেতৃত্বাধীন) এখনও নতুন সমাজতন্ত্রী দলে যোগ দেন নি বলে অনেকে মনে করেছেন তাঁরাও কংগ্রেসের মধ্যে বিলীন হবেন। এমন কি যে-অজয় মুখোপাধ্যায় একদা ঘোষণা করেছিলেন "কংগ্রেসে যোগ দেওয়ার আগে বিষ খাবো" তিনিও হয়ত আবার কংগ্রেসে ফিরে আসতে পারেন। তবে এখানে একটু অসুবিধে হয়েছে এই যে, তাঁর দলের অনেকে কংগ্রেসের মধ্যে সম্পূর্ণ আত্মবিসর্জন না দিয়ে বাংলা কংগ্রেসের পৃথক অস্তিত্ব বজায় রেখে কংগ্রেসের সঙ্গে সহযোগিতার পথে চলতে চান। এই পথে চললে, তাঁদের ধারণা, তাঁদের দর-কষাকষির সুযোগটা শেষ পর্যন্ত থাকবে। যেমন ধরুন, নির্বাচনের পর যদি কংগ্রেস নিরঙ্কুশ গরিষ্ঠতা না পায় তবে হয়ত গোটা তিনেক আসন পেয়েও বাংলা কংগ্রেস থেকে একজন মন্ত্রী হতে পারেন।

এটা তো গেল কংগ্রেসের সঙ্গে সরাসরি মার্জারের প্রশ্ন। আবদুস সত্তার সাহেব নিজেই বলেছেন যে, কংগ্রেস মার্জারই চায়। কিন্তু সব দল তো আর মার্জারে রাজী হতে পারে না। এমন কি সি পি আইয়ের পক্ষেও তা সম্ভব নয়। তবে সি পি আই কংগ্রেসের সঙ্গে বোঝাপড়ায় যে খুবই আগ্রহী তা সকলেই জানেন। সেটাই তাদের দলের জাতীয় নীতি। ইদানীং পাকিস্তানের সঙ্গে যুদ্ধের আশংকা আবার সি পি আইকে সরকারের সঙ্গে সহযোগিতার একটা নতুন প্ল্যাটফর্ম তৈরি করে দিয়েছে। সি পি আই পাড়ায় পাড়ায় পোস্টার মারছে—"অসামরিক প্রতিরক্ষা সংক্রান্ত নিয়মকানুন মেনে চলুন।"

কিন্তু সি পি আই চায় কংগ্রেসের সঙ্গে অন্যান্য কয়েকটি বামপন্থী দলও বোঝাপড়ায় আসুক। তবে সেখানে বাধ সেধেছে ফরওয়ার্ড ব্লকের সাম্প্রতিক সিদ্ধান্ত। সি পি এম তো বটেই, কংগ্রেসকেও তারা পরিহার করতে চায় কারণ ফরওয়ার্ড ব্লকের মতে কংগ্রেস হল দেশের শাসক শ্রেণীর প্রতিনিধি। যে-কংগ্রেসকে গত নির্বাচনের পর সরকার গড়তে ফরওয়ার্ড ব্লক সাহায্য করেছে এবং ডেমোক্র্যাটিক কোয়ালিশন সরকারের পতনের পরও যে-কংগ্রেসকে ফরওয়ার্ড ব্লকের সাধারণ সম্পাদক অশোক ঘোষ "বামপন্থী ও গণতান্ত্রিক দল" বলে আখ্যা দিয়েছে তার সম্বন্ধে এত শীঘ্র এই মোহমুক্তি নিশ্চয়ই কিছুটা আশ্চর্যজনক। কিন্তু আপাততঃ অন্ততঃ বাহ্যতঃ যখন ঐটেই ফরওয়ার্ড ব্লকের লাইন তখন সি পি এম-বিরোধী ফ্রন্ট তৈরির পথে একটা বাধার সৃষ্টি হয়েছে। ফরওয়ার্ড ব্লকের কংগ্রেস ও সি পি এম, উভয়কে পরিহার করার এই নীতির ফলেই শুরু হয়েছে তৃতীয় ফ্রন্ট গঠনের সম্ভাবনা সম্পর্কে জল্পনা।

১২-১১-৭১ —[illegible]

তুমি কি একা আছ?

তৃপ্তি বসু

তুমি কি একা আছ? যদি না থাক তাহলে একটু অপেক্ষা কর। দিনের কোলাহলে এক নিঃশ্বাসে এ চিঠি তুমি পড়তে যেও না। অপেক্ষা কর, একটু অপেক্ষা কর। গোধূলির রাঙা আলো ম্লান হতে হতে উদাস বিষণ্ণতায় ভরে দিক মন। নামুক আঁধার : আসুক রাত্রি। তারপর সেই রাত্রির গভীরতায় নিত্যদিনের বাঁধা নিয়মে তোমার নৈশভ্রমণ শেষ করে ফিরে এস তুমি। বাইরের উঠোনে দাঁড়িয়েই কাপড় ছাড়, জামা ছাড়, তারের উপরে রাখা গামছাটাকে টেনে নিয়ে ছেড়ে ফেল অন্তর্বাস। স্নানঘরে ঢুকে ভাল করে ধুয়ে নাও সমস্ত শরীর। ভাঁজকরা পরিষ্কার ধুতি লুঙ্গির মত জড়িয়ে নিয়ে ঘাড়ে, বুকে, বগলে অনেকখানি পাউডারের সঙ্গে সঙ্গে স্নিগ্ধ গন্ধ ছিটিয়ে গুনগুনিয়ে গানের কলি ভাঁজতে ভাঁজতে প্রসন্নমনে চলে যাও সেইখানে যেখানে তোমার সাধ্বী স্ত্রী, তোমারই সাত-সাতটি সন্তানের জননী আমাদের সেই নিরীহ, শান্তিপ্রিয় মাটি ওই অতরাতেও ক্লান্ত শরীরে, ঘুমজড়ান চোখে আহার সাজিয়ে বসে আছেন শুধু তোমারই প্রতীক্ষায়।...আরও পরে, চারদিক যখন প্রায় নিঃশব্দ হয়ে এসেছে, তোমার আর এক ক্ষুধার হাত থেকে নিষ্কৃতি পেয়ে আমাদের সেই ম্লানমুখী মাও যখন শ্রান্ত অবসাদে তলিয়ে গেছে ঘুমের অতলে তখন, ঠিক তখনই, সেই নির্জন মুহূর্তে তুমি আমার এ চিঠি পড়তে শুরু কোর—তার আগে নয়, কিছুতেই নয়।

ভাবছ, কি এমন আমার বলার কথা যা নির্জন মুহূর্তে নিঃসঙ্গ একাকীত্ব ছাড়া জানান চলে না তোমায়? আছে, আছে, তোমাকে জানাবার মত অনেক কথাই সঞ্চয় আছে আমার। তোমার সন্তান আমি, তুমি আমার জন্মদাতা পিতা। তোমাকে বলার মত কথার সঞ্চয় আমার না থাকলে আর কারই বা থাকতে পারে দুনিয়ায়? এতদিন বলিনি, বলতে পারি নি। শুধু ড্যাবা চোখে চেয়ে চেয়ে তোমার দিকে তাকিয়ে দেখেছি। দেখেছি, জেনেছি, বুঝতে চেষ্টা করেছি। দেখেছি সন্তানের দৃষ্টি দিয়ে, দেখেছি পুরুষের দৃষ্টি দিয়ে। সেই দেখায় যা জেনেছি, বুঝেছি এক এক করে নিবেদন করে যাচ্ছি তোমায়—ভাল করে খুঁটিয়ে দেখ হিসেবে কোথাও আমার ভুল রয়ে গেল কিনা।

আমাদের জাহাজ কয়েক দিনের জন্যে তখন নোঙর নামিয়েছে কলকাতার বন্দরে। বিতর্কিত লেখকের বিতর্কিত উপন্যাসখানায় চোখ বুলিয়ে যাচ্ছিলাম অলস অবসরে। কানে এল রমেনকে তুমি বকছ। মোড়ের মাথায় পথ চলতি কোন মেয়েকে নাকি চুটকি ঠাট্টা ছুঁড়ে দিয়েছে, সুর তুলে শুনিয়ে দিয়েছে অশ্লীল গানের এক কলি। সেই দুর্লভ মুহূর্তে তুমিও বুঝি পাস করছিলে সেখান দিয়ে। তাই নাকি দৈবাৎ জানতে পারলে যে কত খারাপ হয়ে গেছে তোমার ওই ছোট ছেলে রমেন। শাসন করতে করতে তুমিই বলেছিলে কথাটা। বলেছিলে, 'ভাবতেও পারি নি যে আমার ছেলে কখনো এমন লোচ্চা হতে পারে!' আশ্চর্য, এমনভাবে বলছ যেন কত বড় সৎ পিতা তুমি! ভেজানো দরজার ফাঁক দিয়ে তোমার কাণ্ডকীর্তি লক্ষ্য করতে করতে মনে হল বলে উঠি, এত বিস্ময় কেন? তোমার সন্তান বলেই ত রমেনের, আমার, আমরা যারা অদৃষ্টের অনুগ্রহে তোমারই ঔরসজাত তাদের ত সবারই জন্মসূত্রেই অধিকার আছে লোচ্চা হবার, উচ্ছন্নে যাবার। তুমি আমাদের সাত-সাতটি ভাইবোনের জন্মদাতা, তোমার মাথের পাশে পড়েছে গভীর ভাঁজ, কপালে ত্রিবলী, কানের দু-পাশে, কালো কেশের মাঝে মাঝে ছাই-পাক (তোমারই গূঢ় কেরামতিতে যা আবার কখনো সখনো কালচে লাল হয়ে ওঠে), ধুতির কাঁস দীর্ঘদিন ধরে হাতে বাঁধতে বাঁধতে কোমরে বসেছে বিবর্ণ ছোপ, সেই তুমিও প্রতি সন্ধ্যায় সেজেগুজে বেরতে পার, গভীর রাতে ফিরে এসে রাত-জাগা বড় বড় ছেলেমেয়েদের চোখের সামনে দিয়ে শরীর ধুয়ে ঘরে উঠতে পার। বাড়া হয়ে [illegible] এক [illegible] স্কুল-ফাইনাল পাশ করে ঘরে বসে [illegible] তোমার আঠার বছরের জোয়ান ছেলে রমেনই বা তোমার চেয়ে অনেক কম বয়সে ওসব পারবে না কেন? মোটামাট পড়াশুনায় ও খারাপ ছিল না। কলেজের গণ্ডীতে ঢুকে তোমার সাহায্যও চেয়েছিল। শুনেছি তোমার কালের পরীক্ষায় বেড়াগুলো নাকি তুমি অনায়াসেই টপকে এসেছিলে। কাজেই তথাকথিত শিক্ষিত তুমি। অথচ আশ্চর্য দেখ, সন্তানের প্রয়োজনের দিনেও একদিনের তরে সেই শিক্ষিত ব্যক্তিটির সান্ধ্য-বিহারে ছেদ ত পড়লই না উপরন্তু কোচিং ক্লাসের সুবিধাটুকুও তুমি তাকে নিতে দিলে না খরচের হিসেব তুলে। তবু যথাসাধ্য চেষ্টা করেছিল সে। এর ওর কাছ থেকে একটু আধটু দেখিয়ে নিয়ে, রাত জেগে নোট মুখস্ত করে পরীক্ষাটা দিয়েছিল। তুমি বাপ হয়ে এতটুকুও সাহায্য করলে না অথচ যখন অকৃতকার্য হল তখন বিদ্রূপভরে বলে উঠলে, সাধে কি আর কোচিং-এ টাকা ঢালতে রাজী হইনি? জানি ত ও শুয়োরের পালের পেছনে টাকা ঢালা আর জলে ঘি ঢালা একই ব্যাপার। শুয়োরের পাল! শুয়োরের পাল! শুয়োরের পাল কিন্তু আকাশ থেকে আমদানী হয়নি। বুনো শুয়োর আর বুনো শুয়োরের বিনিময়কাল ইন্টারকোর্সেই যে সে পালের সৃষ্টি, কথাটা বলার আগে সেটা তোমার মনে রাখা উচিত ছিল—তোমার বিবর [illegible] তীব্র [illegible] আমার মনে হয়েছিল।

অনুভব করতে পারছি যে এতখানি পড়তে পড়তেই রাগে অস্থির হয়ে উঠেছ তুমি। আর বেশী রেগে গেলে তোমার তোমার সেই গালের ছোপ লাগা [illegible] ভাঙা উঁচু-নীচু দাঁতগুলো ওপর-নীচে নাড়িয়ে নাড়িয়ে কেমন এক বিশ্রী [illegible] কড়মড়ে আওয়াজ বের কর হয়ত এতক্ষণে তাই-ই করতে শুরু করেছ, মেঘের কোলে জমেছে রক্তিম আভা, নাকের পাটা উঠছে ফুলে ফুলে। কাঁচা, পাকা ভুরু জোড়াও নিশ্চয়ই শুরু করেছে উঠতে নামতে—উত্তেজিত হয়ো না তুমি নিজেকে সংযত করে রাখ। দাঁড়াও, দাঁড়াও। অত অধৈর্য হলে কি চলে? ধৈর্য ধর। এখনও যে অনেক বাকী তোমার কীর্তি-কাহিনীর প্রতি সন্ধ্যার নির্ধারিত পালা শেষে আয়নার বুকেতে তাকে যাচাই কর তুমি, আর নিজেকে যাচাই করে নাও তোমারই সন্তানের মনের আয়নায়। তা হলে জানবে যে আয়নায় তুমি নিত্য নিজেকে দেখে থাক সে আয়না শুধু ছবিই আঁকতে পারে, আঁকতে পারে জলের জলের আলপনা। [illegible]

ধারণ করে আছি ততদিন আমার এ মনের আয়নার লয় নেই, ক্ষয় নেই।

শেষ পর্যন্ত মানুষ হতে পারল না রমেনটা। বিশ্ববিদ্যালয়ের সেরা সেরা ছেলে-মেয়েরা যখন জীবিকার অভাবে হতাশ হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে তখন সেকেণ্ড ডিভিশনে স্কুল ফাইনাল পাশ বিদ্যেয় আজকের দিনে ভদ্রমত কিই বা সে করতে পারে? সাধ অনেক, সাধ্য সামান্যই। রমেন আমার ভাই কিন্তু তোমার আত্মজ। এ পৃথিবীর রঙ্গ, রস, গন্ধ, বর্ণের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিয়েছ। তোমারই অনুগ্রহে সে অঙ্গে মেখেছে এর আলো-হাওয়া। তার ওপর তোমার দায়িত্বই সবচেয়ে বেশী। অথচ তুমিই...। এবার ট্রান্সভাল থেকে ছুটিতে ফিরে ওর সম্বন্ধে যে মারাত্মক খবরটি পেয়েছি তা যদি তোমার গোচরে আনি, আমার জানতে ইচ্ছে করে, তাহলেও কি এক মুহূর্তের জন্যেও সন্তানের ভবিষ্যৎ-চিন্তায় তুমি ব্যাকুল হয়ে ওঠ না? বিশ্বাস কর আমার সত্যি জানতে ইচ্ছে করে। শোন, নিষিদ্ধ জিনিস চালান দেবার এক চোরা-কারবারীদের সঙ্গে কমিশন বেসিসে কাজ শুরু করেছে রমেন—আমার ভাই, তোমার আত্মজ। খবরটা শোনামাত্রই তোমার মতই ক্রোধে, ঘৃণায় উন্মত্ত হয়ে উঠেছিলাম কিন্তু সব উন্মত্ততা নিমেষে স্তব্ধ হয়ে গেছল রমেনের জবাব শুনে। আজও কানে ভাসছে সেই ঋজু অথচ তীক্ষ্ণ কণ্ঠস্বর—'বলতে পার বড়দা, এ ছাড়া আমি আর কি করতে পারতাম? বাঁচতাম কি করে? তুমি পড়ার জন্যে টাকা পাঠাতে, বাবা সে টাকা উড়িয়ে দিত। উপরন্তু রাতদিন ব্যঙ্গ-বিদ্রূপে ক্ষত-বিক্ষত করত আমায়, এমন কি খাওয়ার সময়ও রেহাই পাওয়া যেত না। সে দুঃখ যে কি তা তুমি কেমন করে বুঝবে? তাই বাবার হাতে হঠাৎ একদিন অনেক টাকা তুলে দিয়ে বাবাকে অবাক করে দেবার ইচ্ছেয়, বাবার চোখে নিজেকে মূল্যবান করে তোলার নেশায় আশাহীন, আলোহীন আকাশের মত শূন্য ভবিষ্যতের দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে অনেক ভেবেছি, অনেক কেঁদেছি। সৎ থাকতে চেয়েছি আমি বড়দা, থাকতে পারিনি, থাকতে দেয় নি আমায়—শেষদিকে কান্নায় তার কণ্ঠ প্রায় বুজে এসেছিল।

রমেনকে আশ্বাস দিয়ে এসেছিলাম। বলেছিলাম, নেক্সট রিক্রুটমেণ্ট-এ ও যাতে সিলেক্ট হতে পারে তার চেষ্টা করব ভেতর থেকে। ইতিমধ্যে কোনও হাঙ্গামায় যেন জড়িয়ে না পড়ে। এমন করে ওকে ভেসে যেতে দেব না আমি, দেব না ওর শক্তির অপচয় হতে। সে আর কদিনই বা আগের কথা? তারপরই কেমন যেন এলোমেলো হয়ে গেল জীবনটা। জীবনেরও বুঝি একটা নিয়ম নীতি আছে। যদিও বাইওলজিক্যাল প্রসেস থেকেই তার উৎপত্তি তবু তারও একটা নির্ধারিত পথ আছে, গতি আছে। যে জীবন এইমাত্র পৃথিবীতে এল, কাঁদল, হাসল, ছোট্ট দুটি মুঠি তুলে জানিয়ে দিল আপন দাবী, সে জীবন প্রকৃতির আলো, হাওয়া, হাসি-আনন্দের মধ্যে দিয়ে বেড়ে উঠবে ঠিকই কিন্তু তার স্বভাব বা মানসিক গঠনের জন্যে দায়ী হবে তার পরি-বেশ, তার শিক্ষা। যে শিক্ষা পাবে সে তার অভিভাবকের কাছ থেকে। তোমরা মা আর বাবা সেজে তোমাদের ছেলেখেলার মধ্যে দিয়ে হঠাৎ কখন তোমাদেরও অজানতে আমাদের মত এক একটা জ্যান্ত পুতুলকে সংসারে এনে ফেল অথচ তার পরের দায়িত্ব আর ঠিকভাবে পালন করে উঠতে পার না। কারণ সে শিক্ষাই তোমাদের নেই। তাই মাঝে মাঝে অবাক হয়ে ভাবি যে সংসারে কত তুচ্ছতম ব্যাপারেই না আমরা ট্রেনিং-এর প্রয়োজন অনুভব করি অথচ জীবনের সবচেয়ে বড় ব্যাপারটার ট্রেনিং সম্বন্ধেই উদাসীন। গার্জেনশিপ-এর ট্রেনিং, বলিষ্ঠ-মনা মানুষ গড়ার ট্রেনিং। শিক্ষা, স্বাস্থ্য, বুদ্ধি বা বয়সের বালাই না রেখেই সামা-জিক স্বীকৃতির মধ্যে দিয়ে হঠাৎ একটি শয্যাসঙ্গী বা সঙ্গিনী জুটে গেলেই যত-শিগগির সম্ভব সন্তানের জন্ম দিয়ে ওই গার্জেনশিপ-এর কোন ট্রেণিং ছাড়াই রাতা-রাতি আমরা গার্জেন হয়ে বসি। আমাদের মত সাধারণ জীবনের প্রধান ট্র্যাজেডি এই-খানেই। কাজেই ঠিকমত সন্তান পালন না করার দোষে তোমাকে একলাই বা দোষী করি কি করে?

আসলে আমার সবচেয়ে মুশকিল কোথায় জান? এতদিন উচিত কথা তোমাকে

কখনই উচিতভাবে বলে উঠতে পারি নি: কলাও চলত না তোমার। কারণ তুমি একবার স্ট্রোকের রুগী। তাই দ্বিতীয় স্ট্রোক বা আঘাত যাতে শাণ দেওয়া খাঁড়ার মত তোমার উপর নেমে না আসে তার জন্যে তোমার জীবনটাকে বাজী ধরে আমি, আমরা, সংসারের আর সবকটি প্রাণীই হাড়িকাঠে গলা এগিয়ে বসে আছি। আশ্চর্য আমাদের পিতৃভক্তি, আমার মায়ের পতি-প্রেম! এরজন্য দায়ী তুমি নও। দায়ী আমাদের মা। তোমার সতীসাধ্বী স্ত্রী। তুমি কখনও আমাদের শেখাও নি যে স্বর্গের চেয়েও জননী বড়। অথচ মা আমাদের সেই অস্ফুট জ্ঞানের দিনটি থেকেই ময়না-মুখস্তের মতই মুখস্ত করিয়ে এসেছে পিতা স্বর্গ, পিতা ধর্ম ইত্যাদি। শুধু তাই নয়, বোধহয় ভবিষ্যতে তোমার ব্যবহারে যদি বিস্মৃত হই, বিচ্ছিন্ন হয় সে বিশ্বাস তাই কার্পেটের কাপড়ে লাল, সবুজ পশমের টুকরো দিয়ে ছুঁচের ফোঁড়ে ফোঁড়ে ফুটিয়ে তুলেছে সে আপ্ত-বাক্য (সম্ভবতঃ আমাদের জন্মের আগেই; নইলে অত সময় তিনি পেলেন কোথায়?)। শুধু ফুটিয়ে তুলেই কি ক্ষান্ত হয়েছে? চারধারে ফ্রেম লাগিয়ে যত্ন করে টাঙিয়ে রেখেছে ঘরের দেওয়ালে। আজ সে ফ্রেমের চটনা গেছে উঠে, কাঁচও ফেটে গিয়ে হয়ে রয়েছে ধুলোয় ধুলোয় বিবর্ণ। তবু কিন্তু একবার স্ট্রোকের কল্যাণে তুমি জেতা ঘুঁটি মুঠোয় নিয়ে বসে আছ। ইচ্ছেমতই যে কোনও মুহূর্তে যেন জীবনের এই সচল ছকটার ওপর ওই শেষ দানটাকে অবহেলাভরে ছুঁড়ে দিয়ে বাজী নিতে বেরিয়ে যেতে পার তুমি। আর কখন তুমি ক্ষেপে গিয়ে ফেলে বসবে সে দান সেই আশঙ্কায় সবাই যেন আমরা রুদ্ধশ্বাসে তোমার দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে প্রতিক্ষণে তোমায় বাঁচিয়ে বাঁচিয়ে চলেছি।

কিন্তু কত আর বাঁচিয়ে চলব? আর কত অভিনয় করব অসহায় দর্শকের ভূমিকায়? দিনে দিনে নতুন নতুন রূপে তোমায় আবিষ্কার করতে করতে এক এক সময় সন্দেহ জেগেছে নিজের বুদ্ধির সুস্থতায়। মনে হয়েছে শরীরের সব রক্ত বুঝি ক্রমশঃ মাথার দিকে উঠে যাচ্ছে, মনে হয়েছে তুমি নও, তোমার আগেই বুঝি সেরিব্রাল হেমারেজ-এ আমিই বাজী জিতে বেরিয়ে যাব।...নইলে শুধুই কি রমেন? সরযূর বেলায়ই বা তুমি কি করলে? কি দোষ করেছিল সে? নিজের মনের মানুষ নিজেই বেছে নিয়েছিল এইটুকুই? সরযূর বয়স হয়েছে, বুদ্ধি হয়েছে। সে কি বোঝে নি যে, তার নিজের সংসার খুঁজে দেখার কোনও বাসনাই আপাততঃ তোমার নেই। কেন নেই? সে কি তোমার সংসারে বিনা মাইনের দাসী বলে, নাকি অন্য কোনও কারণে? বারে বারে এ সংসারে আতুড় তোমার কাণ্ডারী বলে? রাগ কোর না। তোমরা একবারও লক্ষ্য করলে না গায়ে-গতরে খাটাপেটা সুস্থ সবল বোনটা আমার যৌবনের জ্বালায়, শারীরিক নিপীড়নে দিনে দিনে কি ভীষণ রুক্ষ, অসন্তুষ্ট হয়ে উঠতে শুরু করেছিল। অথচ তোমরা উদাসীন থাকলেও প্রকৃতি কিন্তু উদাসীন থাকতে পারে নি। তাই সরযূর বাড়ন্ত শরীরটা কবে যেন আর একটা শরীরের টানে সাড়া দিয়ে ফেলেছিল। আর সেই সাড়া দেবার ফলেই বাধল গণ্ডগোল। বোকা মেয়েটা সামলাতে পারল না। এতক্ষণে টনক নড়ল তোমার। চাড়া দিয়ে উঠল নীল রক্ত—যে রক্তের আজ আর ঐতিহ্য বলে কিছু নেই, জাগল পিতৃত্বের দম্ভ। তাই ইচ্ছে করলেই যা তুমি করতে পারতে তা কিছুতেই করলে না। একটা ভদ্রসম্মত রূপ দিতে পারতে ব্যাপারটায়—পারতে সেই অন্য শরীরটাকে ভয় দেখিয়েও সামাজিক অনুষ্ঠান স্বীকার করিয়ে নিতে। কিন্তু তোমার প্রবৃত্তিই সে পথে তোমায় যেতে দিল না। পরিবর্তে তোমার চেনা-জানা কোন এক ডাক্তারের হাত দিয়ে ঘটালে তোমারই আত্মজার গর্ভপাত। তুমি আমাদের জন্মদাতা পিতা, তোমার প্রীতির মধ্যে দিয়েই নাকি সমস্ত দেবলোকের প্রসন্নতা আশীর্বাদ হয়ে আমাদের ওপর ঝরে পড়বে। এ শিক্ষা আমাদের মায়ের। সন্দেহ হয়, ওই শিক্ষণীয় বাক্যটি সত্যিই কি কোনও সাধু মহাত্মার স্বকণ্ঠনিঃসৃত অথবা তোমারই মত কোনও যথেচ্ছাচারী পিতার স্বরচিত নীতিশাস্ত্র?

এ চিঠি তোমায় লেখবার প্রয়োজন থাকলেও হয়ত কোনও দিনই লেখা হয়ে উঠত না। কারণ আমার শ্রদ্ধার আসন থেকে যদিও তুমি অনেকদিনই বিচ্যুত তবু তোমার সম্বন্ধে কোথায় যেন একটা দুর্বলতা অনুভব করতাম যে কারণে কোনদিনই সহজে তোমায় দুঃখ বা আঘাত দিতে পারি নি। সে কি তোমার রক্তের ঋণ? সে কি আমার মায়ের শিক্ষা? কিন্তু আমার সে দুর্বলতার পাঁচিল এতদিন যতই দৃঢ় থেকে থাক আজ কিন্তু তা ভেঙে গুঁড়িয়ে ধুলোর সঙ্গে মিশিয়ে গেছে। তুমিই মিশিয়ে দিয়েছ তোমার সম্প্রতিতম কীর্তি দিয়ে। ধন্যবাদ, তোমায় ধন্যবাদ। আমার পাথরভারী মনটাকেও মুহূর্তে হাল্কা হাওয়ায় ভরিয়ে তুলেছ তুমি, জানতে দিয়েছ কাকে বলে মুক্তির আস্বাদ। তাই

আজ আমার একান্ত পরাজয়ের লজ্জা, গ্লানি, অন্ধ সন্দেহ সবকিছু নিয়েই উত্তীর্ণ হয়েই এ চিঠি লিখতে বসেছি তোমায়। কারণ সেই পঙ্কিল ভাঙা জলের প্রবল বন্যায় নিজেকে চিনতে পেরেছি নিজেকে। চরম সর্বনাশের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে আজ প্রথম বুঝতে পেরেছি যে যোগ্য পিতার আমি সুযোগ্য উত্তরাধিকারী। জন্মমুহূর্ত থেকেই তোমার সঙ্গে সম্পর্ক আমার সুনির্দিষ্ট। তবু ব্যবধান একটা ছিলই—ছিল আমার নিজস্ব স্বাতন্ত্র্যবোধ। অথচ আজ মনে হচ্ছে আমরা যে স্বতন্ত্র থাকি, অন্যের চেয়ে নিজেদের আলাদাভাবে চিহ্নিত করতে চাই, আমাদের সেই শ্রেষ্ঠত্ববোধ বা মূল্যবোধের সত্যিই কোনও মূল্য নেই। এ এক প্রচণ্ড ফাঁকি, প্রবল মিথ্যে। বালুচরে গড়া নয়নলোভন প্রাসাদ। নইলে আমি, যে আমি জ্ঞান হয়ে পর্যন্ত তোমাকে পৃথিবীর ঘৃণ্যতম জীব বলে মনে করে এসেছি এতকাল, পিতা বলে পরিচয় দিতেও লজ্জায় মরে গেছি মনে মনে সেই আমি, সেই আমিই আবার কি করে—

এ চিঠি লিখতে শুরু করেছিলাম তিনদিন আগে। একসঙ্গে অনেকখানি লেখার ক্ষমতা আজ আর আমার নেই। নিষেধও আছে। অথচ এ চিঠি শেষ না করেও আমার উপায় নেই। আমি যে তোমার কতবড় উপযুক্ত সন্তান সে খবর তোমায় বিস্তারিত না জানান পর্যন্ত আমার নিস্তার নেই। কিছুতেই স্থির হতে পারছি না। ... জানতে পারলাম সম্ভ্রম রক্ষা বা লোকলজ্জার খাতিরে যে কাজ সরযূর বেলায় তুমি করেছিলে সেই কাজই আবার তুমি করেছ নিজেরই অষ্টম সন্তানের আগমনের সম্ভাবনায়। আশ্চর্য, লাল ত্রিভুজের বর্ডার লাইন সেই কবেই ত তুমি পেরিয়ে এসেছ তাহ'লে এতদিনে কেন এ জঘন্য প্রবৃত্তি? একি আধুনিকতা? একি সরযূকে দেখে শেখা নিষ্কৃতির সহজতম উপায়? জীবনভোর অনেক অন্যায়ই ত করে এসেছ তুমি। নিজেকে ছাড়া কখনো কাউকে চেন নি, কাউকে জানতে চাও নি, ভালবাস নি। তোমার মত স্বার্থপর আর আত্মসুখী লোক আমার চোখে দ্বিতীয় রহিত। তবু যতবড় আত্মসুখীই হও এই বয়সে ভ্রূণহত্যার—নিজের বৈধ সন্তান হত্যার কলঙ্কের সঙ্গে নিজেকে আর না জড়ালেই পারতে তুমি। কিন্তু না, হয়ত এরও প্রয়োজন ছিল। প্রয়োজন ছিল তোমার এই হত্যাকারী পরিচয়ের। নইলে নিজেকে সান্ত্বনা দিতাম কি দিয়ে? উপায় নেই, উপায় নেই। রক্তের শাসনকে অস্বীকারের উপায় নেই কারও। আমি, রমেন, সরযূ কেউই পারি নি তাকে উপেক্ষা করতে। তোমার আর চারটি নাবালক সন্তানও যে আগামী দিনে তাকে অস্বীকার করতে পারবে না তাও নিশ্চয়ই জেনে গেছি। পাশববৃত্তির আত্মীয়তা তোমাকে আমাকে অনেক কাছাকাছি এনে দিয়েছে, তুলেছে ঘনিষ্ঠ করে। আজ তাই তোমার কাছে মুক্তকণ্ঠেই বলতে পারছি যে, তোমার যে পশুরক্ত গোপন স্রোতে বয়ে চলেছে আমার শিরায় শিরায় সে রক্ত আমাকেও স্থির থাকতে দেয় নি। সে আমায় উন্মত্ত আবেগে তাড়িয়ে নিয়ে ফিরেছে বন্দরে বন্দরে, ঘাটে ঘাটে, দেহপসারিণীদের বারো-ইয়ারী হাটে। যে জীবনের হয়ত সম্ভাবনা ছিল, সম্ভাবনা ছিল পঙ্কজ হয়ে ফুটে ওঠার তাকেই আমি তলিয়ে দিয়েছি পঙ্কের অতলে। তাই তোমার মতই আমিও হত্যাকারী। একটা সুস্থ সুন্দর জীবনের স্বপ্ন-সম্ভাবনাকে আমিও গলা টিপে তিলে তিলে হত্যা করে ফেলেছি। যন্ত্রণার অস্ফুটতম আওয়াজও কেউ তোমরা শুনতে পাওনি। দৃশ্যজগতের আড়ালে কাঠে যখন ঘুণ ধরে অনেকদিন পর্যন্ত তার বাইরের কাঠামোটা থাকে অবিকৃত। ভেতরের শূন্যতা সেইদিনই ধরা পড়ে যেদিন হঠাৎ তা পড়ে ভেঙে। মানুষের শরীরের কাঠামোর রীতিও সেই একই। ভেতর যে আমার ঘুণপোকায় কুরে কুরে খেয়ে যাচ্ছে এবার ছুটিতে থাকাকালীন কেউই কি তোমরা তা বুঝে উঠতে পেরেছিলে? ফিরে এসে সামান্য কটা দিনের প্রবল জ্বর, সমস্ত দেহে যন্ত্রণা আর সারা শরীরে ছোট ছোট ইরাপশন! কটা দিন—সামান্য কটা দিন! ধীরে ধীরে সব ক্ষতের দাগই একসময় গেল মিলিয়ে। দেহের কোথাও কোনও চিহ্নই আর রইল না। প্রাণের খুশীতে আমি উজ্জ্বল হতে চাইলাম। দু-হাত তুলে সোচ্চারে বলতে চাইলাম, 'কিওরড্ আই এ্যাম কিওরড্। এ্যাবসোলুটলি কিওরড্! সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে গেছি আমি।' আবার বুকভরে নিঃশ্বাস নিলাম। আবার স্বপ্ন দেখলাম। এক সুস্থ, সুন্দর, পবিত্র জীবনের স্বপ্ন। নিজেকে এবার নতুন করে গড়ে তুলব, গড়ে তুলব রমেনকে, সরযূকে খুঁজে দেব তার নিজের সংসার। দুখানা কর্মঠ হাত, সুস্থ বুদ্ধি, দৃঢ়তা, বিশ্বাস আর ধৈর্যের হাতিয়ার দিয়ে জয় করব জীবনের সমস্ত বিরূপতাকে। নতুন প্রাতের সূর্যকরের কাছে অনেক প্রত্যাশা নিয়ে কবে যেন আকাশের নীলিমায় ডানা মেলেছিল একটি ছোট্ট পাখী। কল্পনাও করে নি যে সেই তার শেষ প্রভাত। শিকারী বাজের তীক্ষ্ণ চঞ্চু তার প্রত্যাশা আর আনন্দের ওপর নিমেষে টেনে দেবে সমাপ্তির নির্মম রেখা। তাই অকস্মাৎ—অকস্মাৎই একদিন আতঙ্কে হিম হয়ে উঠল শরীর। বুকের ভেতর প্রচণ্ড চাপ, নিশ্বাসের বাতাসের আকুলতা। কয়েকটা প্রশ্ন করেই অমোঘ বিধাতার মতই নিরাসক্ত কণ্ঠে ডাক্তার উচ্চারণ করল—'নিউরোসিফিলিস'। সিফিলিসের থার্ড স্টেজ বা টারসিয়ারী স্টেজ। শুধু রক্তে বাসা বেঁধেই ক্ষান্ত হয়নি সে রাক্ষস। এতদিনে ছড়িয়ে গেছে দেহকোষের বিভিন্ন রসে। ইচ্ছে করলেই এখন সে লিভার, লাংস, হার্ট, আই বা ব্রেন—এককথায় যে-কোনও অরগ্যানকেই ড্যামেজ করে দিতে পারে। আইসাইট আমার বরাবরের জন্যে নষ্ট হয়ে যাবে ঠিকই, পুরোপুরি অন্ধই হয়ে যেতে হবে তবে সাবধানে থাকলে প্রাণটা বেঁচে যাওয়ার সম্ভাবনা। ... সেই অদৃশ্য ঘুণপোকা! সত্যি সত্যিই সে অদৃশ্য হয়ে যায়নি। রেহাই দেয়নি আমাকে। তাই দিনে দিনে দৃষ্টিশক্তি ক্ষীণ হয়ে এসেছে মাঝে মাঝে অন্ধকার হয়ে এসেছে সবকিছু। আর মূর্খ আমি তখনও স্বপ্ন দেখে চলেছি! মুক্তির স্বপ্ন! রেহাইয়ের স্বপ্ন! নতুন করে জীবন গড়ার স্বপ্ন!

...আর না। আর পারছি না। তোমাকে আর কিছু বলারও নেই আমার। আত্মাকে আমি অনেক আগেই হত্যা করেছি, আজ এসেছে আমার আত্মহত্যার অধিকার। ডাক্তারের নিষেধ অমান্য করে দীর্ঘ তিনটি দিন, তিনটি রাত্রি ধরে লিখে চলেছি এ চিঠি। আজ তাই চোখের যন্ত্রণায় মরে যাচ্ছি। সবকিছু অন্ধকার হয়ে আসছে আমার। মনে হচ্ছে এক আদিম অন্ধ গুহার আঁধারে কে যেন জোর করে ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছে আমায়। একফোঁটা আলোর তৃষ্ণায় প্রাণটা বার বার ছটফট করে উঠছে। কান্না জড়ানো কণ্ঠে কার কাছে যেন আকুল আকুতি জানাচ্ছে—'ও লাইট! মো লাইট!'

অমিত আলোর তৃষ্ণা নিয়ে শেষ হোক এ জীবনের অন্ধকার।

বের্টল্ট ব্রেখট

দিলীপ মৌলিক •

অশ্রু, রক্ত আর স্বপ্নের ঘূর্ণিতে বিংশ শতাব্দীর প্রশ্নমথিত হৃদয়গুলো যন্ত্রণায় দগ্ধ আর বিচ্ছিন্নতায় ক্লান্ত হয়ে শিল্পী, সাহিত্যিকের অনুভূতির আন্দোলনে চাইছে দূরপ্রসারী জীবনসংগ্রামের দৃপ্ত শপথের দীপ্তি। যাঁর কণ্ঠ, যাঁর লেখনী জনজীবনের এই আন্তর কামনার সঙ্গে সেতুবন্ধনে সোচ্চার হয়ে উঠেছে, বঞ্চিত মানুষের দল তারই সৃষ্টির মধ্যে এক নতুন আলোয় আর প্রশান্ত বাতাসে নিঃশ্বাস নিয়ে আবার জীবনের গভীরতর অর্থের অন্বেষণে ব্রতী হয়। কবিতায়, উপন্যাসে আর নাটকের আসরে প্রতিদেশেই জনদরদী বলিষ্ঠ শিল্প-স্রষ্টার আবির্ভাব হয়েছে। নাটকের ক্ষেত্রে এমনি একজন বলিষ্ঠ সর্বজনস্বীকৃত স্রষ্টা হোলেন, জার্মানীর বের্টল্ট ব্রেখট্। শুধু জার্মানী নয়, সারা পৃথিবীর সংগ্রামী মানুষ তাঁর সৃষ্টিকে জানিয়েছে অকুণ্ঠ অভিনন্দন। জার্মানীর নাট্যআন্দোলনই যে শুধু তাঁর আশ্চর্য মননশীলতা আর প্রতিভার ছোঁয়ায় নতুনতর এক দিগন্তে উপনীত হোতে পেরেছে তা নয়, বিশ্বের সামগ্রিক নাট্যচিন্তাতেই ব্রেখট্ তুলেছেন এক তীব্রতর আন্দোলন।

গত শতাব্দীর শেষের দিকে নাট্যজগতের দুটি প্রোজ্জ্বল প্রতিভা গর্ডন ক্রেগ এবং স্ট্যানিস্লাভস্কি তাঁদের অভিনয়রীতি আর প্রযোজনার দ্বারা সমস্ত পৃথিবীর রঙ্গজগতে এক নতুন যুগের প্রবর্তনা করেছিলেন বটে, তবে তাঁরা নিজেরা নাটক লিখে তা মঞ্চের আলোয় তুলে ধরেননি। এ বিষয়ে ব্রেখটের বোধ হয় কোন তুলনা নেই। তিনি একদিকে প্রথম শ্রেণীর নাট্যকার, অপরদিকে বলিষ্ঠ অপ্রতিদ্বন্দ্বী প্রযোজক। ইউরোপে যখন স্ট্যানিস্লাভস্কি অভিনয় পদ্ধতি পুরোনো হয়ে এসেছে এবং নাট্যরসিকেরা মনে প্রাণে অনুভব করছেন একজন নতুন পথিকৃতের পদক্ষেপের প্রয়োজন। এর কিছু পরেই রঙ্গমঞ্চের আসরে এলেন জার্মানীর বেরটল্ট ব্রেখট। চেকভ ও স্ট্যানিস্লাভস্কির যৌথপ্রচেষ্টায় এক সময়ে রাশিয়াতে যে নাট্যআন্দোলন মুখর হয়ে উঠেছিল, একা ব্রেখট্ই এই দুদিক সামলাবার দায়িত্ব নিলেন নিজের ওপর এবং তাঁর স্বকীয় চিন্তায় থিয়েটারকে 'আর্ট প্রভোকিং' করে তোলার দিকে নজর দিলেন। অতীতের থিয়েটার সম্পর্কে কাল্পনিক মায়ামোহ, অস্পষ্ট ভ্রান্তি ও ধোঁয়াটে দূরাশার বিরুদ্ধে তাঁর বিদ্রোহ হোল সোচ্চার। তাঁর Epic Theatre আন্দোলন সমগ্র বিশ্বের নাট্যজগৎ কাঁপাতে এনেছে নতুন জোয়ার এবং অন্যান্য দেশের মতো ভারতবর্ষের তথা বাংলাদেশের নাট্যপ্রযোজনাতেও লেগেছে এর দোলা।

ব্রেখটের আবির্ভাবের আগে জার্মানীতে যে প্রচলিত রীতি অনুসারে নাট্যপ্রযোজনা হোত, তাকে এক কথায় বলা যেতে পারে 'ব্যারোক' বা অত্যধিক সজ্জা এবং অলঙ্কার ও আড়ম্বরে ভরা নাট্যাভিনয়। রাইনহার্টের প্রযোজনায় এই রীতি চরম উৎকর্ষ লাভ করে। রাইনহার্টের সঙ্গে সঙ্গেই এই রীতির অবসান হওয়া উচিত ছিল, কিন্তু তা হয়নি। বরঞ্চ দেখা দিল নাৎসী প্রবর্তিত নতুন ব্যারোক থিয়েটার। কিছুদিন পরে জার্মানীর রঙ্গমঞ্চের আসরে ব্রেখট্ এসে এই ক্ল্যাসিক্ অভিনয় ধারার মধ্যে রূপান্তর আনলেন। নতুন পদ্ধতিতে নাট্যপ্রযোজনা শুরু হোল 'বার্লাইনার এনসেমবলে' (Berliner Ensemble) ব্রেখট এই পদ্ধতির নাম দিলেন Epic 'এপিক থিয়েটার' শব্দ দুটি ব্রেখট্ এরউইন পিসকেটোর কাছ থেকে পেয়েছেন। মার্কসবাদে দীক্ষিত হবার পরই Epic Theatre আন্দোলনকে মুখর করে তুলতে চাইলেন ব্রেখট্।

প্রধান হাতিয়ার হোল বিচ্ছিন্নতা ('Alienation Estrangement') । ব্রেখটের কাছে এপিকের এই আঙ্গিক সামাজিক ও রাজনৈতিক চারিত্রিক। এ বিষয়ে ওয়ালটার বেঞ্জামিনের একটি মন্তব্য বিশেষভাবে স্মরণীয় :

> 'Epic theatre is directed towards interested parties who do not think unless they have reason to do so .... wanted to cause not empathy but astonishment'

'ঘটনার স্থানান্তর, ব্যবধানের বিযুক্তি যথার্থ থেকে অনেকদূরে'—এই হোল epic theatre -এর প্রধান কৌশল।

রচনার কারিগরীর দিকটা ছাড়াও সামাজিক জীবনের ওপর একটা ব্যাপক প্রভাব ছড়িয়ে দেয় এপিক থিয়েটার। সংগ্রামমুখর জীবনের নানাবিধ সমস্যাকেই স্বাধীনভাবে এবং দ্বিধাহীন কণ্ঠে উচ্চারণ করাই এই থিয়েটারের নিগূঢ়তম উদ্দেশ্য। দর্শক এই থিয়েটার থেকেই তার জীবনের আসল রক্তাক্ত রূপটি চিনে নেয় এবং তারপর নিজের চারপাশের গ্লানি ও দুঃখকষ্টের অন্ধকার দূর করবার সংগ্রামে লিপ্ত হয়। এই এপিক থিয়েটারের মধ্য দিয়েই চেষ্টা করা হয় সেই সব সমস্যার সমাধান করতে যা সব সময় প্রতিকূলতা সৃষ্টি করছে জীবনের দুর্বার [illegible] এবং যার সমাধানের জন্য দার্শনিক বৈজ্ঞানিক ও কলাবিদরা সব সময়ে তৎপর থাকেন।

এপিক থিয়েটারের প্রধান অবলম্বন 'এ্যালিনিয়েশন' রীতির প্রধান উদ্দেশ্য হোল মঞ্চ ও প্রেক্ষাগৃহের আবেগের পৃথকীকরণ (vertremdurg) । এই পৃথকীকরণ অবশ্য শৈল্পিক আবেদনকে কোন রকমে ব্যাহত না করেই সৃষ্টি হয়। এই থিয়েটারে শিল্পীর অভিনয় এমনভাবে অনুষ্ঠিত হবে যাতে দর্শকেরা ভাবাবেগের যাদুমায়ায় বিভোর হয়ে তার নিজস্ব বিচারশক্তি যাতে হারিয়ে না ফেলে। অ্যারিস্টটলের 'ক্যাথারসিস' থেকে এইখানেই 'এ্যালিনিয়েশন এফেক্টের' পার্থক্য। ব্রেখটের এই 'অ্যালিনিয়েশন' বা বিচ্ছিন্নতা সৃষ্টির উদ্দেশ্য হোল দর্শক ও অভিনেতার মাঝখানে এক দূরত্ব স্থাপন করা: দর্শক ও অভিনেতা উভয়ের পক্ষ থেকে থাকে এক নৈর্ব্যক্তিক ধ্যানস্থ উদাসীনতা, যাতে দু' পক্ষই অভিনীত নাটকগুলোর চরিত্রের অতলে নিজেদের হারিয়ে না ফেলে, তারা যেন বুদ্ধি দিয়ে চরিত্রগুলো বোঝবার চেষ্টা করে, আবেগ দিয়ে নয়। 'এ্যালিনিয়েশন এফেক্ট' এনে ব্রেখট রঙ্গমঞ্চের আপাতঃ বাস্তবিকতার মায়া ও বিভ্রান্তির বিরুদ্ধে যে সংগ্রামকে সোচ্চার করে তুলেছেন তা তাঁকে গোটে ও শিলার-এর পাশে আসন করে দিয়েছে। ব্রেখট কিন্তু গোটে ও শিলারের সঙ্গে তাঁর সমকক্ষতা তাঁর বিখ্যাত নাটকগুলো রচনা করার পর উপলব্ধি করতে পেরেছেন।

ইউরোপে ব্রেখটের নাট্যরচনার ধারাকে বলা হয়ে থাকে Narrative Realism [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] কাহিনী-প্রধান বাস্তববাদ। ব্রেখটের [illegible]

সজীব ও সুন্দর শব্দবিন্যাসের সাহায্যেও এ্যালিনিয়েশন সৃষ্টি করা যায়। তাঁর সংলাপের কাব্যিক সৌন্দর্য ও মাধুর্যও বিচ্ছিন্নতার বোধকে স্পষ্ট করতে যথেষ্ট সাহায্য করেছে।

সর্বোপরি বিশিষ্ট বৈজ্ঞানিক দৃষ্টি-ভঙ্গীকেই ব্রেশট্ তাঁর সমস্ত নাটকে কাজে লাগিয়েছেন। তাঁর মতে প্রত্যেক সমাজেই একদল স্বার্থান্বেষী লোক থাকে। সমাজ-ব্যবস্থার কোনরকম সংস্কারে তাঁদের স্বার্থে আঘাত লাগতে পারে, এই আশঙ্কায় তাঁরা পরিমার্জন ও সংস্কারের কাজে বিরোধিতা করেন। বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিতে তাঁরা কখনো সমাজের আসল চেহারাটা খুঁটিয়ে দেখেন না। এঁদেরই বিরুদ্ধে ব্রেশটের অভিযান। এঁদের আচ্ছন্ন চোখগুলো যাতে খুলে যায়, এবং এঁরা যাতে সমাজের সবরকম অব্যবস্থা সম্পর্কে সজাগ ও সচেতন হয়ে উঠতে পারেন, তাই জন্য ব্রেশটের নাট্যসাধনা। এই প্রসঙ্গে তাঁর 'ডায়ালেকটিক থিয়েটারে'র উপযোগিতাও উপলব্ধি করা যায়। এর আসল উদ্দেশ্য হোল সমাজ জীবনের আসল যথার্থ চেহারাটা মঞ্চের আলোয় উপস্থিত করে দর্শকের মনকে প্রস্তুত করা সমাজ-জীবনের কাঠামো পরিবর্তনের দিকে। ব্রেশটের নাটক যে কোন দর্শককেই এই বৈপ্লবিক চিন্তার অংশীদার করে তুলবেই।

এবারে ব্রেশটের কয়েকটি নাটক আলোচনা করলেই তাঁর নাট্যসাধনার বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে ধারণা স্পষ্ট হবে। 'মাদার কারেজ' ব্রেশটের একটি বিখ্যাত নাটক। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের ঠিক আগে তিনি জার্মান ভাষায় এ নাটকটি লেখেন। এক সর্বনাশা ধর্ম-যুদ্ধে জার্মানীর যে সমূহ ক্ষতি হয়েছিল এবং দেশের প্রায় অর্ধেক লোক ধ্বংসের মধ্যে তলিয়ে গিয়েছিল তারই প্রেক্ষাপটে গড়ে উঠেছে 'মাদার কারেজ' নাটকটি। 'মাদার কারেজ' নাটকের 'কারেজ' একজন শক্ত-সমর্থা বৃদ্ধা নারী যিনি তিরিশ বছরের যুদ্ধের আগুনে দগ্ধ হয়ে বেঁচে আছেন। যুদ্ধের সবরকম ক্রিয়া-প্রক্রিয়ার সঙ্গে তাঁর গভীরতম যোগ। 'কারেজ চুরি করছেন, মিথ্যা বলছেন, দুষ্প্রাপ্যতার সুযোগ নিয়ে মুনাফা লুটছেন, আর এইভাবে সকলের দুঃকষ্টের জোয়ারের স্রোতে বয়স্কা বোবা মেয়ে ও অভিমানী বদরাগী ছেলেদের নিয়ে তিনি ভেসে চলছেন'।

'ককেসিয়ান চক সার্কেলের' কাহিনী নেওয়া হয়েছে একটি হারানো চাইনীজ গল্প থেকে। একটি শিশুর মাতৃত্বের দাবী নিয়ে দুজন মহিলার একজন বিচারকের কাছে আসার ওপরে ভিত্তি করেই এই নাটক গড়ে উঠেছে। 'মাদার কারেজ' ও 'ককেসিয়ান চক সার্কল' দুটি নাটকই যখন 'বার্লাইনার এনসেম্বলে' পরিবেশিত হয়েছে তখন তার সেটিং-এ কোনরকম চোখ ঝলসানো দৃশ্য থাকেনি। আর ব্রেশট্ প্রযোজিত নাটকে অকারণে 'সেটিং'কে চোখ ঝলসানো ঝলমলো করা হয়নি কোথাও। 'দি গুড উইমেন অফ সেযুয়ান' নাটকে ব্রেশট্ আগামী বিজ্ঞানভিত্তিক এবং সমাজ-তান্ত্রিক যুগে নাট্যরচনারীতি কোন্ পথে এগিয়ে যাবে তার একটি চমৎকার উদাহরণ আমাদের চোখের সামনে তুলে ধরেছেন। 'দি থ্রি পেনী অপেরা'য় আছে সমাজের নীচের তলার হাসিকান্নার কাহিনী। সাধারণ জীবনের জমাট বাস্তবিকতায় গড়ে ওঠা ব্রেশটের নাটকে বিচ্ছিন্ন সমাজের বিচ্ছিন্ন ব্যক্তির প্রতীকী সংগ্রামকেই মুখর ভাষা দেওয়া হয়েছে। এই ব্যক্তি কখনো করছে প্রতিবাদ, কখনো মুখর হয়ে উঠেছে প্রচণ্ড বিক্ষোভে, আবার কখনো বা হয়তো সব কিছু মেনে নিচ্ছে। 'গ্যালিলিও গ্যালিলা'ও ব্রেশটের আর একটি অসাধারণ নাটক।

তাঁর অন্যান্য যে কটি নাটক নাট্য-আন্দোলনের ধারাকে প্রসারিত করেছিল তা হোল 'ড্রামস্ ইন দি নাইট', মান হসথ মান, 'দি ডিসিপ্লিনারী মেজার', রাইজ এ্যান্ড ফল অফ মেহগনী, 'মাদার' (গোর্কীর উপন্যাসের নাট্যরূপ), দি কনডেমনেশন অফ লুকুলাস, দি ডিসনস অফ সিমন মাচার্ড, দি ডেইজ অফ দি কমিউন, দি রেড-শপ, কোরিওলান (সেকসপীয়র অবলম্বনে), দি প্রাইভেট লাইফ অফ দি মাস্টার রেস, সেন্ট জোয়ান অফ দি স্টকইয়ার্ড, ইত্যাদি। ব্রেশট্ই একমাত্র নাট্যকার প্রযোজক যিনি জার্মান নাটকে ও থিয়েটারে রচনা ও প্রয়োগে সুষ্ঠুভাবে প্রয়োগ করতে পেরেছেন। এই বৈজ্ঞানিক নাট্যধারাই আজকের জার্মানীর নানাবিধ নাট্যপ্রযোজনায় মূর্ত হয়ে উঠছে।

ব্রেশটের সামাজিক নাট্যসাধনার অতলে ডুবে তাঁর জীবনীকার মার্টিন এস্লিন বলেছেন :

> 'He sought to spread the cold light of logical clarity and produced a rich texture of poetic ambiguity'.

সেইজন্যই তো ককেসিয়ান চক সার্কেলের নিঃস্বার্থপরায়ণা পরিচারিকা 'গ্রুশে' আর গুড উইমেন অফ সেজুয়ানের মহৎপ্রাণ দেহব্যবসায়িনী 'সেনতে' আমাদের মনকে নিবিড়ভাবে আকর্ষণ করে।

'বারলাইনার এনসেমবলে' স্বাধীনভাবে নাট্যচর্চার সুযোগ পেয়েছিলেন ব্রেশট্ এবং এই থিয়েটার থেকেই তাঁর সব বলিষ্ঠ নাটক-গুলো অভিনীত হয়েছে। পূর্ব জার্মানী সরকারের প্রচুর অর্থানুকূল্যও তিনি পান। তাঁর এবং তাঁর অভিনেত্রী স্ত্রী হেলেনে ভাইগেলের পরিচালনায় এই থিয়েটারের শিল্পীরা ইউরোপের অনেক দেশে অভিনয় করে পূর্ব জার্মানীর বিশিষ্ট অভিনয় রীতির প্রোজ্জ্বল স্বাক্ষর রাখেন। এ ব্যাপারে ব্রেশট্ জার্মানীর বহু পুরস্কার এবং অন্যান্য দেশের অকুণ্ঠ স্বীকৃতি পান।

ব্রেশটের গীতি-কবিতাও পূর্ব জার্মানীর সামগ্রিক সাহিত্যের আসরে এক প্রদীপ্ত সম্পদ। এইসব কবিতার মধ্যে কিছু রাজনৈতিক গীতিনাট্যও যেমন রয়েছে, তেমনই আছে বুদ্ধিদীপ্ত মননের ছোঁয়া-লাগা কিছু। সব মিলিয়ে প্রকাশভংগীর মাধুর্য, আর স্বচ্ছ সৌন্দর্যবোধের স্বাক্ষর। শিল্পী-জীবনের শুরুতে ব্রেশট্ গীতিনাট্য এবং এইসব রচনায় ধনতান্ত্রিক সমাজ-ব্যবস্থাকে বিদ্রূপ করে, উপেক্ষিত, অবহেলিত সাধারণ মানুষের সঙ্গে একাত্মতা স্থাপন করেন। তাঁর 'লিজেন্ড অফ দি ডেড সোলজার' এই ধরনের রচনার একটি বিশিষ্ট উদাহরণ।

সম্প্রতি সমাজবাদী নাট্যকার, কবি ও অসাধারণ নাট্যপ্রযোজকের পঞ্চদশ মৃত্যু-বার্ষিকী উদযাপিত হোল। এই উপলক্ষে বারলাইনার এনসেম্বলে একটি থিয়েটার প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়েছিল। এতে ব্রেশটের নাটক, নাটক সম্পর্কে তাঁর বিশিষ্ট চিন্তা, ও তাঁর নাটকের বিভিন্ন চরিত্রের রূপদাতাদের ছবি এবং থিয়েটার প্রসঙ্গে আরো অনেক কিছু নতুন আলোতে তুলে ধরা হয়েছে।

পৃথিবীর যে কোন দেশে যেখানে নাট্যচর্চা একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছে, সেখানেই ব্রেশটের নাট্যবোধ ও প্রযোজনার রীতি দারুণ আলোড়ন তুলেছে। ভারতবর্ষে তথা বাংলার নাট্যমঞ্চে ব্রেশট প্রবর্তিত নাট্যচর্চা কিছুদিন হোল একটা রূপান্তরের ঢেউ তুলছে। অবশ্য খুব বেশী করে এই ধারার নাটক অভিনীত এখনো হয়নি। এ বিষয়ে বাংলার অন্যতম নাট্যগোষ্ঠী 'নান্দী-কারের'র প্রয়াস দ্বিধাহীন ভাবেই অভিনন্দন যোগ্য। তাঁদের 'দি থ্রি পেনী অপেরা'র ভাবানুবাদ 'তিন পয়সার পালা'র প্রযোজনা নিঃসন্দেহে বাংলা সিরিয়াস নাট্যচর্চার আসরে একটি বলিষ্ঠ পদক্ষেপ। 'ককেসিয়ান চক সার্কেলের' একটি অভিনয় মুক্তঅংগনে অভিনীত হোতে দেখেছি। কিছু বাংলা নাটকে দেখছি বেশ সচেতন ভাবেই ব্রেশটের নাট্য-রীতি অনুসৃত হোচ্ছে। নাট্যমঞ্চে অনুষ্ঠিত ঘটনাকে খুঁটিয়ে দেখছেন দর্শক ; যেখানে গরমিল ঠেকছে সেখানে সে প্রশ্ন করছে, অভিযুক্ত করছে মঞ্চের আলোয় বিকশিত চরিত্রকে। Active participation of the audience বোধহয় এই প্রযোজনায় মূর্ত হয়ে উঠছে। শুধু নাটকে নয়, বাংলা চলচ্চিত্রেও এর আভাস পরিস্ফুট হয়ে উঠেছে। মৃণাল সেন পরিচালিত 'ইনটারভিউ' ছবির শেষের দিকে এই ধারাই কি প্রযুক্ত হয়নি?

যেসব বিদেশী নাট্যকারদের নাটক এবং সেইসব দেশের প্রযোজনার বৈশিষ্টকে আজকের বাংলা নাট্যচর্চায় মঞ্চের আলোয় উপস্থিত করা হোচ্ছে, তার মধ্যে ব্রেশটের আবেদনই বোধহয় সর্বাধিক। ভাবাবেগের মধ্যে নিজের অস্তিত্বকে সম্পূর্ণভাবে না হারিয়ে ফেলে ; চিন্তার দর্পণে, মননের প্রখরতায় ব্রেশট যে নাটকীয় ঘটনাগুলোকে দেখেছেন, তাই তো আজকের জটিল-জীবনের একটি নিষ্ঠুর সত্য। সেই সত্যের সান্নিধ্য পেলে বাস্তব জীবনটাকে অনেক আন্তরিকতায় চেনা যায়, অনেক দুঃখ কষ্ট গ্লানি মুছে দিয়ে জীবনকে সুন্দর করে গড়ে নেবার সংগ্রামে বিজয়ী হওয়া যায়।

তবু রীতির দিক থেকে নয় ; চিন্তা ও বোধের দিক থেকেও ব্রেশটের নাটক বাংলার নাট্যচর্চাকে আরো অনেক খ্যাতি দিতে পারে।

ওয়েস্টার্ণ ছবি ও হৃদয়হীনতা

কিছুদিন আগে জন ট্রেভেলিয়ন-এর একটি লেখা পড়ছিলুম। তার একস্থানে তিনি এই মর্মে বলেছেন, ফিল্মের মাধ্যমে যদি ক্রমাগত হিংস্রতার দৃশ্য প্রচারিত হয়, তাহ'লে দর্শকরা কিছুদিন যেতে না যেতেই এই হিংস্রতাকে একটি স্বাভাবিক (নর্মাল) নিত্যকার ঘটনা ও সেই কারণেই গ্রাহ্যবস্তু ব'লে মেনে নেবে এবং বিশ্বাস করবে যে, সমস্যার সমাধানে এই হিংস্রতাই হচ্ছে একমাত্র পথ।"

ব্রিটেনে যিনি কমপক্ষে বারো বছরেরও বেশী সময় ধ'রে সুখ্যাতির সঙ্গে ফিল্ম সেন্সারের কাজ ক'রে এসেছেন, সেই জন ট্রেভেলিয়ন-এর উপরি-উক্ত মতবাদটি বিশেষ প্রণিধানযোগ্য। আমেরিকান ওয়েস্টার্ণ ছবি প্রসঙ্গেই তাঁর এই মতবাদ এবং এই মত প্রকাশের পরে তিনি আরও বলেছেন যে, এই ছবিগুলি প্রায় জনসাধারণের অজ্ঞাত-সারে সমাজের ওপর এই ধরণের কু-প্রভাব বিস্তার করে ব'লেই তিনি ব্যক্তিগতভাবে এই ছবিগুলিকে জনসাধারণের দর্শনীয় ব'লে বিবেচনা করেন না এবং এদের সাধারণ প্রদর্শনীর ছাড়পত্র (ইউ-সার্টি-ফিকেট) দেওয়ার বিরোধী।

আমাদের দেশে আমেরিকান ছবির অবাধ প্রচারের ফলে এবং আমাদের সেন্সার বোর্ডের সদস্যদের অধিকাংশেরই দূরদৃষ্টি-সম্পন্ন না হওয়ার ফলে আমেরিকান ওয়েস্টার্ণ ছবি ভুরি ভুরি প্রদর্শিত হয় আমাদের শহর-কলকাতা ও দেশের বিদেশী ছবির চিত্রগৃহগুলিতে। গেল দু'বছরে প্রদর্শিত দি প্রোফেশনাল, দি ওয়ে ওয়েস্ট, লাস্ট ওয়ারিয়র, মার্সিনারিজ, ওয়ান্স আপ্অন এ টাইম ইন দি ওয়েস্ট, টিজ্‌মে, ট্রু গ্রীট, হেভেন উইথ এ গান প্রভৃতি ওয়েস্টার্ণ ছবির জনপ্রিয়তার কথা পাঠক-সাধারণের অজানা নেই। এই ছবিগুলির নায়ক বা প্রতিনায়ক রূপে বার্ট ল্যাংকাস্টার, লী মার্ভিন, কার্ক ডগলাস, রবার্ট মিচুম, জন ওয়েন, হেনরী ফণ্ডা, রড টেলার, গ্লেন ফোর্ড, ইউল ব্রেনার, ফ্রাঙ্কো নীরো প্রভৃতি শিল্পী যে-ভাবে রিভলভার, বন্দুক, মেশিনগান ইত্যাদির সাহায্যে অবলীলাক্রমে যথেচ্ছভাবে প্রতিপক্ষীয়দের ধরাশায়ী ক'রে দর্শকমধ্যে চরম উত্তেজনার সৃষ্টি করেন, তা বলে ব্যক্ত করা যায় না।

এই ওয়েস্টার্ণ ছবিগুলি দেখতে দেখতে দর্শকচিত্তে ধারণা হওয়া অস্বাভাবিক নয় যে, প্রতিপক্ষীয় ব্যক্তিকে হত্যা করা একটি অত্যন্ত স্বাভাবিক ধর্ম এবং এই হত্যা-ক্রিয়াটি আদৌ মারাত্মক কোনো ঘটনা নয়। বিশেষ যখন জানা থাকে যে, হত্যা ক'রে যদি ধরাও পড়তে হয়, তাহ'লেও বিশেষ কিছু ঘটবে না অর্থাৎ জেল বা ফাঁসী যেতে হবে না, তখন হত্যাকারীর মনে ভয় ব'লে কোনো বস্তু থাকে না। অকুতোভয়ে দিন-দুপুরে প্রকাশ্য রাজপথে হত্যালীলা করা তখনই কারুর পক্ষে সম্ভব, যখন সে জানে, হত্যা করবার পরে সে বিনাবাধায় গা-ঢাকা দিতে পারবে এবং যদি কোনো ব্যক্তি স্বচক্ষে তাকে হত্যা করতে দেখেও থাকে, সে ব্যাপারটা বেমালুম চেপে যাবে, সাত চড়েও রা কাড়বে না।

হিংস্রতাই হচ্ছে একমাত্র পথ নতুন সমাজ গড়তে গেলে,—এই কথা কিছু রাজ-নৈতিক নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিরা শিখিয়েছেন তাঁদের অনুগামীদের। যাকে বা যাদের মনে হবে, আমাদের কর্মধারার বিরোধী, তাকে বা তাদের সরিয়ে দাও পৃথিবীর বুক থেকে যেন-তেন-প্রকারেণ। অনুগামী বা সমর্থকরা তাই ক'রে চলছিলেন দ্বিধাহীন চিত্তে। আশ্চর্য নিস্পৃহ এই হত্যাকাণ্ড! এই আশ্চর্য নিস্পৃহ হত্যাকাণ্ডের জন্যে কিন্তু ঐ রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ যতখানি না দায়ী, তার চেয়ে ঢের বেশী দায়ী ঐ আমেরিকার ওয়েস্টার্ণ ছবিগুলি। এই ছবিগুলির দর্শক হিসেবে আমাদের লঘুচিত্ত যুবকবৃন্দ মনেও রাখেন না, এই ছবিগুলির ঘটনাকাল হচ্ছে আমেরিকার অতীত বর্বর যুগের—যে-যুগে সেখানকার অধিকাংশ অঞ্চলে, বিশেষ ক'রে পশ্চিম আমেরিকায় কোনো সভ্যতার অস্তিত্ব মাত্র ছিল না, আইনশৃঙ্খলা তো দূরের কথা। তারা তো আজকের যুগে এই ছবিগুলি নির্মিত ও প্রদর্শিত হ'তে দেখছে। তারা দেখছে, এই ছবির নায়কেরা এবং প্রতিনায়কেরা যে অনায়াসভঙ্গীতে,

অর্পিতা। কৃষ্ণা বসু। পরিচালনা : সুনীল ঘোষ। ফটো : অমৃত

প্রেক্ষাগৃহ

অবলীলাক্রমে দু'হাতে বিভজনবাদ, শটগান মেশিনগান চালিয়ে যথেচ্ছভাবে নরহত্যা করে, তাতে তাদের বীরপনার প্রশংসাই করতে হয়। নরহত্যা সম্পর্কে স্বাভাবিক আতঙ্কবোধ করা দূরে থাকুক, নরহত্যাকে একটা বীরত্বের নিদর্শক খেলা ব'লে বোধ হয়, ফুটবল খেলা, বক্সিং বা স্ট্রীট ফাইটিং-এর সমপর্যায়ভুক্ত খেলা ব'লেই ভ্রম হয়। চোখের বদলে চোখ, দাঁতের বদলে দাঁত, এমনকি প্রাণের বদলে প্রাণ নেওয়াকেও আমরা চিরকাল বর্বরতা ব'লেই জেনে এসেছি। কিন্তু আজ যখন দেখি, কোনো-কিছুর বদলা হিসেবে নয়, মাত্র মারণোল্লাসের জন্যেই হত্যা করা হচ্ছে, তখন সন্দেহ হয়, আমরা কি সত্যিই সভ্যসমাজে বাস করছি! কিংবা যুদ্ধে শত্রুপক্ষীয়কে হত্যা করা যেমন কোনও কালে অপরাধ বা নৃশংসতা ব'লে গণ্য হয় না, এও তেমনই কোনো ঠাণ্ডা লড়াইয়ের প্রকাশ ব'লে গণ্য হওয়া উচিত?

বিবিধ সংবাদ

তরুণ নাট্যশিল্পীর জাতীয় সাংস্কৃতিক বৃত্তিলাভ

এবছর যে দু'জন নাটকে জাতীয় বৃত্তিলাভ করেছেন তার মধ্যে একজন পশ্চিমবঙ্গের তরুণ- অনুপকুমার ঘোষাল। শ্রীঘোষাল উত্তর কলিকাতার রূপাঙ্কন নাট্য-সংস্থার একজন সক্রিয় শিল্পী ছিলেন এবং সংস্থার পক্ষে তিনি বিভিন্ন নাটকে অভিনয় করেন। বর্তমানে শম্ভু মিত্রের তত্ত্বাবধানে বহুরূপী নাট্যসংস্থায় শিক্ষালাভ করছেন। শ্রীঘোষালের বহু নাটক তাঁর নিজস্ব পরিচালনায় বিভিন্ন স্থানে মঞ্চস্থ হয়েছে।

রূপাঙ্কন

উত্তর কলিকাতার প্রখ্যাত নাট্যসংস্থা রূপাঙ্কন "রতনকুমার ঘোষের" "সিঁড়ি" নাটকটি শ্রীদিলীপ মৌলিকের পরিচালনায় আগামী মাস থেকে নিয়মিতভাবে মঞ্চস্থ করবেন। অন্যান্য বিভাগের দায়িত্বে আছেন কাশীনাথ (মঞ্চ), সলিল মিত্র (আবহ-সঙ্গীত) ও দিলীপ দত্ত (আলোকসম্পাত)। প্রধান কর্মসচিব তারাচাঁদ ভাদুড়ী ও মোহন গঙ্গোপাধ্যায়।

আঙ্গিক গোষ্ঠীর 'এই মন সেই মন' অভিনয়

আঙ্গিক গোষ্ঠীর সফল নাটক "এই মন সেই মন" অভিনীত হবে মুক্তঅঙ্গনে আগামী ২২শে নভেম্বর সন্ধ্যা সাতটায়।

হাইলাকান্দিতে (কাছাড়) নাট্যাভিনয়

সম্প্রতি হাইলাকান্দি (কাছাড়, আসাম) সংবাদ পরিবেশন কেন্দ্রে মহকুমা সরকারী কর্মচারী সংস্থা বিজয়া সম্মেলন উপলক্ষে তাদের এ মরশুমের প্রথম নাট্য-নিবেদন 'ঝিন্দের বন্দী' অপূর্ব সাফল্যের সঙ্গে মঞ্চস্থ করেন। প্রযোজনায় কৃতিত্ব রাখেন মহকুমাধিপতি শ্রীবি কে মিত্র আই-এ-এস। নির্দেশনায় ছিলেন বাংলা-দেশের প্রখ্যাত নির্দেশক-শিল্পী শিবু ভট্টাচার্য। আহ্বায়ক শ্রীবেণীমাধব চৌধুরীর (বি-ডি-ও) আন্তরিক আয়োজনে ও সাংবাদিক সন্তোষ মজুমদারের ব্যবস্থাপনায় নাটকটির অভিনয় সার্থক সফলতা লাভ করে। নাট্য চরিত্রগুলির গভীরে অভিনেতারা প্রবেশ করতে পেরেছিলেন বলেই অভিনয় হয়েছিল সর্বাঙ্গসুন্দর। বিশেষভাবে উল্লেখ্য হলেন পূর্ণেন্দু ভট্টাচার্য, বেণীমাধব চৌধুরী, প্রবীর ভট্টাচার্য, গোপাল গণে, গীতাঞ্জলি গোস্বামী, প্রীতিকণা পাল ও গৌরী ভট্টাচার্য। ছোট ভূমিকায় সন্তোষ মজুমদার মুন্সিয়ানার ছাপ রাখেন। সবচেয়ে আনন্দের কথা মহকুমা কর্মচারী সংস্থার এই প্রথম নাট্য নিবেদন হাইলাকান্দির জনসাধারণকে প্রভূত আনন্দ দিয়েছে।

আমরা সবাইয়ের শ্যামা

গেল রবিবার ৭ই নভেম্বর সন্ধ্যায় কলকাতা থেকে মাত্র ষোল কিলোমিটার দূরে সোদপুরে (২৪ পরগণা উত্তর) হাউসিং এস্টেটের সেণ্ট্রাল পার্কে মুক্তাঙ্গনের আসরে কিশোর-কিশোরীদের সংস্থা 'আমরা সবাই' বিপুল উদ্দাম-উৎসাহের মধ্যে 'শ্যামা' নৃত্যনাট্যের রূপাভিনয় করে নুখ্যাতির সঙ্গে বিরাট জনমণ্ডলীর সামনে। মুক্তাঙ্গনে নৃত্যনাট্য মঞ্চস্থ করা হয়েছিল। নাচে আর গানে আর ভাবাভিনয়ে কিশোর-কিশোরীরা যেন সংকীর্ণ মঞ্চের নানান অসুবিধেকে একেবারে উড়িয়ে দিয়েছিল। মোটের ওপর অনুষ্ঠানটি হয়ে উঠেছিল হৃদ্য ও মনোরম। এতে অংশগ্রহণ করেছিলেন—নৃত্যে : পারমিতা ঘটক, তপস্বী ভট্টাচার্য, উমা চক্রবর্তী, কৃষ্ণকলি বন্দ্যোপাধ্যায়, কেকা সেন, রূপালী দাস, বরুণা বন্দ্যোপাধ্যায় ও গীতা ভট্টাচার্য, সংগীতে ছিলেন—জগন্নাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, জয়ন্তী চট্টোপাধ্যায়, বিমল চালদার, শ্যামসুন্দর বন্দ্যো-পাধ্যায় ও জয়শ্রী গুপ্ত। সংগীত পরিচালনা করেন জগন্নাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। নৃত্য-পরিচালনায় ছিলেন দীপ্তি বন্দ্যো-পাধ্যায় এবং সংগীতে সহযোগিতায় সঙ্গীত মুখোপাধ্যায়, সত্যেন চৌধুরী, সুদেবী গুহ, শান্তা ঘোষ প্রমুখের নাম উল্লেখযোগ্য। অনুষ্ঠান শুরু হয় সম্মেলক গান ও ছোট দু'টি ছেলেমেয়ের আবৃত্তি দিয়ে। অনুষ্ঠানের পৌরোহিত্য করেন শ্রীমতী বাণী গুহ এবং প্রধান অতিথি ছিলেন সাংবাদিক বিমল বসু।

একটি উপভোগ্য ও সুন্দর সন্ধ্যার জন্যে 'আমরা সবাই'কে আন্তরিক ধন্যবাদ।

সুরসভার বিজয়া সম্মেলন

গত ৫ নভেম্বর সুরসভার বিজয়া সম্মেলন শ্রীমতী অনিমা সরকারের পৌরোহিত্যে অনুষ্ঠিত হয়। এই উপলক্ষে আয়োজিত এক মনোজ্ঞ সংগীতানুষ্ঠানে রবীন্দ্রসঙ্গীত, নজরুলগীতি, হিমাংশুগীতি, অতুলপ্রসাদী, পল্লীগীতি প্রভৃতি পরিবেশিত হয়। এতে অংশ নেন সুস্মিতা রায়চৌধুরী, বীথি দাস,

আরতি বসু, প্রমিতা শীল, প্রগতি রায়, মমতা ঘোষ, রেখা বসু, হাসি দত্ত, মণিদীপা শ্যাম, সংযুক্তা দেব, মৈত্রেয়ী দেবী রায়, রত্না সেন ও উর্বশী নিয়োগী। সবশেষে উচ্চাংগ সংগীতের আসরে প্রথমে কান্তি মৈত্র 'বেহাগ' রাগে খেয়াল পরিবেশন করেন পরে গৌর বসাক 'মধুবন্তী' রাগে খেয়াল গেয়ে শোনান। এ'দের সংগে তবলায় ও হারমোনিয়ামে সহযোগিতা করেন দুলাল ভট্টাচার্য, শৈলেন মুখোপাধ্যায়, রথীন চৌধুরী, স্বপন মুখোপাধ্যায় ও শম্ভু পাল। শম্ভু ঘোষ কর্তৃক ধন্যবাদ জ্ঞাপনের পর অনুষ্ঠান শেষ হয়।

উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহণের অনুষ্ঠানে 'মিছিল'

কোচবিহারে বিগত ২৫শে অকটোবর উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহণের এক অনুষ্ঠানে ২৭ জন পরিবহণ কর্মীকে কর্মতৎপরতা ও তাঁদের অক্লান্ত নিঃস্বার্থ প্রচেষ্টায় একটি বাস উদ্ধারের জন্য অনুষ্ঠানের সভাপতি, উত্তরবঙ্গ বিভাগের কমিশনার শ্রীবি, এস, রাঘবন একটি করে ব্রেজার ও প্রশংসাপত্র দিয়ে সম্মানিত করেন।

সভায় উদ্বোধন সংগীত গেয়ে শোনান তপন চৌধুরী। এছাড়া কলকাতা বেতার কেন্দ্রের শিল্পী নরেন পাল ও কার্শিয়াং বেতার কেন্দ্রের শিল্পী মন্টু নন্দী আসর মাতিয়ে রাখেন। সংগীতে বিমল মুখোপাধ্যায় প্রশংসা পাবেন। এই উপলক্ষে কবি-নাট্যকার নীরজ বিশ্বাসের একাংক নাটক 'মিছিল' অভিনীত হয়। এই নাটকে পরিবহণ কর্মীদের জীবনের ভাঙাচোরা স্বাদ-আহ্লাদ, ছোট-বড় সুখ-দুঃখের জীবন কথাই ফুটে উঠেছে।

নাট্যকার নীরজ বিশ্বাস স্বয়ং মুখ্য ভূমিকায় অভিনয় করে দর্শকসাধারণকে অভিভূত করেছেন। নাটকের অন্য একটি চরিত্রে ষষ্ঠী ভৌমিকের অভিনয় বিশেষ কৃতিত্বের দাবী রাখে। এছাড়া অন্যান্য অভিনয়ে যাঁরা অভিনয়-প্রতিভার স্বাক্ষর রাখেন তাঁরা হলেন—প্রফুল্ল দাশগুপ্ত, স্বরাজ সোম, ছানা গুপ্ত, পীযুষ ধর, সুনীল সরকার ও কল্যাণী দাশগুপ্ত। নাটক পরিচালনার গুরু দায়িত্ব সুষ্ঠুভাবে পালন করেন নীরজ বিশ্বাস ও প্রফুল্ল দাশগুপ্ত।

শিক্ষক-শিক্ষণ কেন্দ্রের সমাপ্তি উৎসব

২৪ পরগণা জেলা জাতীয় ক্রীড়া ও শক্তি সংঘ পরিচালিত দ্বিতীয় বার্ষিক শিক্ষক-শিক্ষণ কেন্দ্রের সমাপ্তি উৎসব বাওয়ালী চকমাণিক প্রাথমিক বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে গত ৭ই নভেম্বর, বিপুল সমারোহের মধ্যে হয়ে গেল। অনুষ্ঠানে সভাপতি ও প্রধান অতিথির আসন অলংকৃত করেন যথাক্রমে ২৪ পরগণা জেলা জাতীয় ক্রীড়া ও শক্তি সংঘের কার্যকরী সভাপতি প্রভাসচন্দ্র সিনহা ও বাটা কোম্পানীর সিকিউরিটি অফিসার কর্ণেল অমর সেন। কর্ণেল সেন পতাকা উত্তোলন ও শিক্ষার্থীদের অভিবাদন গ্রহণ করেন। শিক্ষার্থিগণ মার্চপাস্ট, ড্রিল, কো-অর্ডিনেশন ড্রিল, লেজিম ড্রিল, ছড়ার ব্যায়াম ও ব্রতচারীর অভিপ্রদর্শনী দেখিয়ে উপস্থিত সহস্রাধিক দর্শককে আনন্দদান করে। জেলার শিক্ষক মহঃ সোফি লাঠি খেলা দেখিয়ে সুনাম অর্জন করেন।

অনুষ্ঠানে ভাষণ দেন কার্তিকচন্দ্র দাস, প্রভাসচন্দ্র সিনহা, অমর সেন, অমর সাউ, সমরেন্দ্রনাথ মণ্ডল, রবি বন্দ্যোপাধ্যায়, মুরারীমোহন সাহা প্রমুখ। প্রধান অতিথি সময়োপযোগী ভাষণে কিশোর-কিশোরীদের মধ্যে এরূপ স্বাস্থ্য চর্চা ও নৈতিক চরিত্র গঠনের পরিকল্পনার জন্যে ২৪ পরগণা জেলা জাতীয় ক্রীড়া ও শক্তি সংঘের ভূয়সী প্রশংসা করেন। সৈকত সেন, অরুণাংশু মণ্ডল, রঞ্জিত রায়, মণ্টু সাহা, অভিজিৎ রায়, মহম্মদ সোফি, স্বপন ভট্টাচার্য, অলোক রায়চৌধুরী, রমেশ সামুখাঁ, তপন কর শিক্ষকদের আন্তরিক প্রচেষ্টায় ও গ্রামবাসীদের অক্লান্ত পরিশ্রমে ও সহযোগিতায় শিক্ষণ কেন্দ্রের সমাপ্তি উৎসব সম্পূর্ণ সফল ও সার্থক হয়। দর্শকগণকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন অমর সাউ।

'ইন্টারন্যাশনাল'-সংগীত শতবার্ষিকী উদযাপন

এক আড়ম্বরপূর্ণ এবং পরিচ্ছন্ন পরিবেশের মাঝে বিশ্ব-বিখ্যাত 'ইন্টারন্যাশনাল'-সংগীতের শতবার্ষিকী ও তার মহান স্রষ্টা ইউজিন পোত্তিয়ার-এর জন্ম-বার্ষিকী উদযাপন করেন। উৎসবে সভাপতিত্ব করেন শ্রীগুণধর মাঝী। কবি-সমালোচক নিমাই মান্না 'ইন্টারন্যানাল' সংগীতের তাৎপর্য ও ইতিহাস ব্যাখ্যা করে ইউজিন পোত্তিয়ার-এর জীবনী বিস্তৃতভাবে আলোচনা করেন। ভারতীয় গণনাট্য সংঘের আমতা শাখার সদস্যবৃন্দ নিখুঁতভাবে 'ইন্টারন্যাশনাল' সংগীত পরিবেশন করে বিভিন্ন গণসংগীত পরিবেশন করেন। আবৃত্তিতে অংশগ্রহণ করেন শ্যামাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য ও আরও অনেকে। সভাপতি মহাশয় তাঁর ভাষণে 'ইন্টারন্যাশনাল' সংগীত সৃষ্টির ইতিহাস ও প্রেরণার কথা বলেন।

মহেন্দ্র-জ্ঞানদা স্মরণিকার উৎসব

দক্ষিণ কলিকাতার কল্যাণমূলক প্রতিষ্ঠান মহেন্দ্র-জ্ঞানদা স্মরণিকার বার্ষিক উৎসবে সম্পাদিকা শ্রীমতী বীণাদেবী সেনের গত এক বছরের কার্যবিবরণী থেকে জানা গেল নিম্নমধ্যবিত্ত পরিবারকে সাহায্য ছাড়াও বন্যা ও বাংলাদেশের ব্যাপারেও তাঁরা সাধ্যমত অর্থ সাহায্য করেছেন। সুদীপ্তা চৌধুরীর আবৃত্তি দিয়ে অনুষ্ঠান শুরু হয়। রবীন্দ্রসংগীত ও অতুলপ্রসাদী সঙ্গীত অংশগ্রহণ করেন সুপ্রীতি ঘোষ ও ডক্টর অঞ্জলি মুখোপাধ্যায়। সেতার বাজিয়ে শোনালেন সুচন্দ্রা চৌধুরী। আকর্ষণীয় সংগীত পরিবেশন করেন পাহাড়ী সান্যাল। এ'র গাওয়া রাগাশ্রিত গানগুলি মনে রাখবার মত।

মনোরমা বিচিত্রানুষ্ঠান

গত ২৩ অক্টোবর চাতরা গৌরচন্দ্র-ঘাট (শ্রীরামপুরে) সার্বজনীন শ্রীশ্রীশ্যামা-পূজা কমিটি নন্দলাল স্কুল প্রাঙ্গণে বিশেষ আড়ম্বর-উদ্দীপনা ও প্রচুর দর্শক সমাগমের মধ্যে এক বিচিত্রানুষ্ঠানের আয়োজন করেন। প্রত্যেক শিল্পীর উচ্চ-মানের অনুষ্ঠানের জন্য বিচিত্রানুষ্ঠানটি বিশেষ আকর্ষণীয় হয়। অংশগ্রহণ করেন সর্বশ্রী সুদাম বন্দ্যোপাধ্যায়, ললিতা ধর-চৌধুরী, হৈমন্তী শুক্লা, কল্যাণ মুখার্জি, রিনা সরকার, মধুময় গাঙ্গুলী, রমেশচন্দ্র দাস, কাশীনাথ অধিকারী (বাউল), শিব-নাথ দাস ও দিলু চট্টোপাধ্যায় (ব্যঙ্গ-গীতি), বেনু সেনগুপ্ত (হাস্যকৌতুক), মৃত্যুঞ্জয় দাস (অর্কেস্ট্রা), সোনালী রায় (নৃত্য) ও মন্টু ভট্টাচার্য (হরবোলা ও হাস্যকৌতুক)। এ-ধরনের আকর্ষণীয় অনুষ্ঠানের জন্য উদ্যোক্তারা সমবেত সুধী-মণ্ডলীর অকুণ্ঠ প্রশংসা অর্জন করেন।

হলদিয়া ডক প্রোজেক্ট কন্ট্রোল অফিস রিক্রিয়েশন ক্লাবের চতুর্থ বার্ষিক সম্মেলন

আগামী ৩ ডিসেম্বর শুক্রবার হলদিয়া ডক প্রোজেক্ট কন্ট্রোল অফিস রিক্রিয়েশন ক্লাবের সভাবৃন্দ সন্ধ্যা ৫ ঘটিকায় রবীন্দ্র-সদনে নীহাররঞ্জন গুপ্তের 'বহ্নিশিখা' নাটকটি মঞ্চস্থ করবেন। বিভিন্ন চরিত্রে রূপ দেবেন সর্বশ্রী দিলীপ দে, তপন ভট্টাচার্য, প্রশান্ত মিত্র, রাধাশ্যাম সোম, রত্নেশ্বর চৌধুরী, জ্যোতির্ময় গাঙ্গুলী, তৃপ্তি ভট্টাচার্য, দীপেন ভট্টাচার্য, চন্দ্রনাথ দে প্রভৃতি।

নান্দীকারের তিন পয়সার পালা

নান্দীকার নামের সঙ্গে এখন যে নাটকের কথা মনে পড়ে তা হলো তিন পয়সার পালা। ব্রেখ্ট রচিত 'থ্রি পেনি অপেরা' অনুসরণে এই নাটকটির দ্বিশততম অভিনয় উৎসব অনুষ্ঠিত হবে রঙ্গনায় আগামী ২০ নভেম্বর শনিবার। নান্দী-কারের অন্যান্য জনপ্রিয় নাটকগুলিও শতাধিক রজনী অতিক্রম করেছে। এপর্যন্ত কোনোরকম সরকারী আনুকূল্য না নিয়ে শুধুমাত্র দর্শকদের ওপর নির্ভর করে কোনো অপেশাদার নাট্য সংস্থা আমাদের দেশে তো নয়ই, বাইরেও কোথাও এই কৃতিত্ব অর্জন করেছেন বলে আমাদের জানা নেই। দ্বিশততম অভিনয় উৎসবের শেষে 'তিন পয়সার পালা' মঞ্চস্থ হবে। এই উৎসবের বিশেষ আকর্ষণ রাইফেলস্ অব সেনোরা কারার ও ব্রেখ্ট-ডায়ালগস চলচ্চিত্র প্রদর্শনী।

উপভোগ্য অনুষ্ঠান

সম্প্রতি ক'দিন আগে এক সন্ধ্যায় শ্রীশ্রীশ্যামাপূজা উপলক্ষে বরাহনগর থানা সমন্বয় সমিতি থানা প্রাঙ্গণে বিচিত্রানুষ্ঠানের আয়োজন করেছিলেন। এই উপলক্ষে আনন্দ অনুষ্ঠানের কথা বরাহ-নগর বাসিন্দারা দীর্ঘদিন স্মরণে রাখবেন। জীবনকৃষ্ণ মণ্ডল উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত শিল্পী হিসাবে প্রখ্যাত হলেও তাঁর শ্যামাসঙ্গীত-গুলি মনে দাগ কেটেছে বিশেষ করে নাট্যকার হরিপদ বসু রচিত 'দিন ত গেল সন্ধ্যা হল এবার মন তুই কালী বল' ও গণপতি পাঠকের লেখা 'দিন যে আমার গেল বয়ে' ক্ষণে ক্ষণে অতীত দিনের স্মরণীয় সংগীত সাধকদের মনে করিয়ে দিচ্ছিল। জহর রায় এর পর এলেন আসরে। তাঁর আসরে আসা মানেই হাসির হল্লোড় বইয়ে দেয়া। 'আমি মন্ত্রী হব'—কৌতুক নকশাটি ব্যঙ্গ-বিদ্রূপে শ্লেষ ও হাসিতে উজ্জ্বল। হাসির রাজ্যের রাজা—জহর রায় নতুন করে তার প্রমাণ রাখলেন। কুমারী বন্দনা সেন নৃত্যের আসরে নামী মেয়ে। এ'র উচ্চাঙ্গ কথক নৃত্য ললিত-লাবণ্যে অপরূপ হয়ে উঠেছিল। এর সাথে সঙ্গতে ছিলেন ওস্তাদ জুম্মান খাঁ (তবলা) ও পণ্ডিত বাচ্চেলাল মিশ্র (সারেঙ্গী)। শ্রীমণ্ডল দিয়ে যে মনোজ্ঞ অনুষ্ঠানের সুরু ও কুমারী সেনকে দিয়ে যার মধুরেণ সমাপয়েৎ—সে অনুষ্ঠানের ফাঁকে ফাঁকে স্থানীয় শিল্পীরা অংশগ্রহণ করে তাঁদের বৈশিষ্ট্যের ছাপ রেখেছিলেন।

খ্যাতিসম্পন্না নৃত্যপটিয়সী কুমারী বন্দনা সেন। অপর্ণা আর্ট সেন্টারের উচ্চাঙ্গ নৃত্যের শিক্ষয়িত্রী।

'দেবীর মত মেয়ে'

সেন্ট্রাল ইনল্যান্ড ওয়াটার ট্রান্সপোর্ট কর্পোরেশন তাঁদের আগামী নাটক নাট্যকার হরিপদ বসুর বহু অভিনীত 'দেবীর মত মেয়ে' ষ্টার রঙ্গমঞ্চে মঞ্চস্থ করবেন বলে ঠিক করেছেন। বর্তমান সমাজব্যবস্থা ও তার পারিপার্শ্বিক পঙ্কিল পরিবেশ নিয়েই শ্রীবসুর এ নাটকখানি রচিত। সম্প্রতি এ'দের ফেয়ারলী প্লেসের ক্লাব ভবনে এই নাটকের শুভ সূচনানুষ্ঠান হয়ে গেল বিশেষ আড়ম্বরের সঙ্গে। এই আনুষ্ঠানিক মহরতে প্রথমে জয় বাংলার ওপরে করেক-খানি মনোজ্ঞ সংগীত পরিবেশন করলেন তরুণ সংগীতশিল্পী অংশুমান রায়। পরে উদীয়মান অভিনেত্রী বাসন্তী চ্যাটার্জি ও প্রমথ ঘোষকে নিয়ে নাটকের একটি দৃশ্যের মহড়া চলে। নাটকখানি পরিচালনা করবেন শ্রীবিনয় মিত্র।

দেবকীকুমার বসুঃ শ্রদ্ধাঞ্জলি

বাংলা, তথা ভারতীয় চিত্রশিল্পের সর্বজনবরেণ্য এক অমর পথিকৃৎ, শ্রদ্ধেয় দেবকীকুমার বসুর তিরোধানের সংবাদটি আজ শুধু আমাদের ভারতীয় চিত্রশিল্পের অগণিত ব্যক্তিকেই নয়, প্রত্যেক ভারতীয় নরনারীর চিত্তকেই ব্যাকুল করে তুলেছে।

৭৩ বৎসরের পরিণত বয়সে, রাষ্ট্রের ও দেশবাসীর প্রত্যেকের অন্তরের শ্রদ্ধা ও ভালবাসার মুকুট মাথায় নিয়ে, চিত্রশিল্পের ইতিহাসে তাঁর প্রতিভার অম্লান স্বাক্ষর রেখে, দেবকীবাবুর মতো মৃত্যু হয়তো যে-কোন লোকের পক্ষেই বরণীয়। কিন্তু তবু, দেবকীবাবুর মতো একটি খাঁটি শিল্প-সাধক ও মানুষ, জীবনভোর যিনি নীরবে সৌন্দর্যের সাধনাই করে গেছেন, তাঁর মৃত্যুর নিশ্চয় আছে একটি সূক্ষ্ম তাৎপর্য, যা জাতিকে আজ উপলব্ধি করতে হবে গভীর অনুভূতি ও শিল্পমমতা দিয়ে।

দেবকীবাবুর মৃত্যু আমাদের জাতীয় শিল্পচেতনাকে আঘাত করল এক অপূরণীয় ক্ষতির মতো। রবীন্দ্রনাথ ও শরৎচন্দ্রের উত্তরসাধক তারাশঙ্করের মতো দেবকী-কুমারের প্রতিভার অঙ্কুরও উদ্ভূত হয়েছিল রাঢ় বাংলার শ্যামল মাটি-মায়ের বুকেই। কোন বিশেষ আমদানী করা ভাব বা শিক্ষার প্রভাব তাঁকে কখনো ভ্রান্ত করেনি। শিক্ষা-জীবনের শেষ না হতেই অসহযোগ আন্দোলন ও জাতীয় মুক্তিসংগ্রাম তাঁকে

এন-কে-জি

উদ্বেল করে তুলেছিল। 'শক্তি' নামক একটি জাতীয়তাবাদী পত্রিকার সম্পাদনার মধ্যে তাঁর যে মানবপ্রেম ও জাতীয়তাবোধের উন্মেষ এই সময় ঘটল তারই স্বাভাবিক পরিণতি দেখা দিল এই শতাব্দীর ২য় দশকের শেষে চিত্রশিল্পে তাঁর যোগদানে, ব্রিটিশ ডোমি-নিয়ান্স ফিল্মের Flames of Flesh ছবির কাহিনীকার ও চিত্রনাট্যকাররূপে। দু' একটা চিত্রে নায়কের অংশে অবতীর্ণ হবার পর অবশেষে ডাক এল পরিচালনার প্রাঙ্গণে। আর এমনি করেই একদিন তাঁর চিত্রজীবনের প্রথম বৃহৎ সাধনার ফলরূপে দেশবাসী পেল তাঁর হাত থেকে নিউ থিয়েটার্সের পতাকাতলে 'চণ্ডীদাস' ছবি। যার অরুণিমা জাতির মনকে উদ্ভাসিত করে তুলল। তারপর থেকে প্রায় চারদশক ধরে, বহু চিত্রের মধ্য দিয়ে তিনি বাংলার চিত্রশিল্পকে যে অনুপম লাবণ্য ও রসের স্রোতে উদ্বেল করে গেছেন তা গোটা ভারতীয় চিত্রশিল্পকে অতুল মর্যাদার আসনে বসিয়েছে। এইসব ছবির মধ্যেও যেগুলির স্মৃতি বিশেষ করে আমাদের মনে গেঁথে রয়েছে তা হল বিদ্যাপতি, সীতা, পুরাণ ভকত, ভগবান শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য, সোনার সংসার, কবি, রত্নদীপ, মীরাবাঈ, চন্দ্রশেখর, নবজন্ম ও সাগর সংগমে। শেষোক্তটি প্রেসিডেন্টের স্বর্ণপদক পেয়েছেন। দেবকীকুমার, প্রমথেশ বড়ুয়া, ও পরে নীতিন বসু, বিমল রায় প্রমুখ স্রষ্টারা তাঁদের প্রতিভার স্পর্শে যে স্বর্ণ যুগ আনলেন আমাদের ছবিতে, দেবকীকুমারকে তাঁর প্রথম দিগ্‌দর্শক বলা যায়।

দেবকীকুমারকে হারানোর যে মনঃক্ষত তা আমাদের মর্মে আজ রক্তক্ষরণ করছে। তাঁর সমগ্র শিল্পরস বিচারের আলোচনা করবার মতো মন, মেজাজ বা রুচি ঠিক এই মুহূর্তে থাকবার কথা নয়। তবু এইটুকু না বললে বোধহয় অন্যায় হবে যে দেবকীকুমারের মতো স্রষ্টার মহৎ শিল্প-লালিত্যকে শুধু তাঁর সৃষ্টির শিল্পগত বিচার দিয়ে উপলব্ধির আয়াস বোধ করি মিথ্যা। কেননা তাঁর শিল্পসাধনা তো তাঁর সমগ্র জীবনসাধনারই ছিল এক অচ্ছেদ্য অঙ্গ। দেবকীকুমার ছিলেন, আধুনিক জীবনের কৃত্রিম সভ্যতার নাগপাশ থেকে মুক্ত, এক জীবন-নদীর নাইয়া। তাই তাঁর প্রাণরসের উদ্বেলতা ও বিস্তৃত ছায়াছবির নিখুঁত বিন্যাস ও কারুকার্যকে অতিক্রম করেও চলে যেত জীবনের গভীরে।

দেবকীকুমারের চরিত্রের আর যে ক'টি অসামান্য গুণ আমি দেখেছি নিকট থেকে, তার মধ্যে একটি হল তার অন্তর্গত মানব-প্রেম, যা তাঁর ছবি আলো করে রাখত। তাঁর অহঙ্কারশূন্য সরল সামাজিকতাবোধ ও তার একান্ত খাঁটি বাঙালীপনা, মুক্তার মতো যা জ্বলজ্বল করত।

শিল্পে আধুনিকতার যে সূক্ষ্ম বিবর্তনের ধারাটি তাঁর মুক্ত মনে সত্যজিৎ রায়ের প্রতিভার আবির্ভাবের পর ক্রিয়া করতে দেখেছি, সেইটি বলে শেষ করব। পথের পাঁচালির জন্য সত্যজিতের এক সম্বর্ধনা সভায় তিনি বলেছিলেন : "ছবি আমরা অনেক করেছি, কিন্তু পরাজয় যে কতো মধুর হতে পারে আজ তা সত্যজিত-বাবুর কাছে শিখলাম।"

(আকাশবাণী কলিকাতা কেন্দ্র থেকে প্রচারিত)।

চিত্র-সমালোচনা

এদেশে হাসির ছবি করার এবং দেখার প্রায় একটি অলিখিত নিয়ম হচ্ছে—সযত্নে যুক্তিটাকে একপাশে সরিয়ে রেখে কল্পনার (উদ্ভট হলেও আপত্তি নেই) পালে ভর করে যত্রতত্র বিচরণ করা। এই অতিসরল নিয়মটাকে মনে রেখে জয়দীপ পিকচার্সের 'ভানু গোয়েন্দা জহর অ্যাসিস্ট্যান্ট' (রচনা, চিত্রনাট্য ও গীতরচনা প্রণব রায়ের)।

ছবিটি দেখতে বসলে মনে কোন ক্ষোভ থাকার সম্ভাবনা নেই। কেননা এ-ছবিতে গোয়েন্দাপ্রবর ভানু ও তার অ্যাসিস্ট্যান্ট-

জোড়াসাঁকো সংসদের হরিপদ বসু রচিত 'শ্রীরামকৃষ্ণ' যাত্রাভিনয়ের একটি আবেগময় দৃশ্যে নামভূমিকায় অনিল সেন এবং গিরিশ ঘোষ চরিত্রে নিশিকান্ত সেন। দর্শকদের মধ্যে বামদিকে বসে আগ্রহভরে অভিনয় দেখছেন ডঃ অজিত ঘোষ।

দের নানা মজার [illegible] কাণ্ডকারখানা, সরস সংলাপ, রঙ্গরসিকতা, দু'-একটি চরিত্র বাদে প্রায় প্রতিটি শিল্পীরই হাস্যরস বিতরণের সুযোগ অতি অরসিককেও বেশ হাসাবে তাতে কোন সন্দেহ নেই। এবং এই হাল্কা মেজাজের হাসির বইটা দেখে বেশ হাসতে হাসতেই ঘরে ফেরা যায়। কেননা, পরিচালক এ-বইতে অযথা 'বোদ্ধা সাজার' চেষ্টা করেননি এবং দর্শকদের মাথায় তথা-কথিত ইন্টেলেকচুয়ালিজম-এর বোঝা চাপিয়ে দেননি।

যাক ও প্রসঙ্গ, এবার এ-বই-এর কাহিনীর কথায় আসা যাক। বই-এর নামের মধ্যেই ইঙ্গিত রয়েছে যে, গোয়েন্দাপ্রবরদ্বয়ের নাম ভানু ও তার সহকারী জহর (ওই দুই চরিত্রে অভিনয় করেছেন ভানু ব্যানার্জি আর জহর রায়)। তারা যে কতবড় গোয়েন্দা তার প্রমাণ প্রথমেই তাদের ঘণ্টামার্কা কলিং-বেল আর হারানো গরুর খোঁজ করতে আসা মহিলার কথায় বোঝা যায়। এই গোয়েন্দাগিরির পেশায় এসে নানাদিক থেকে দেনায় দেনায় তারা যখন বিপর্যস্ত সেই সময় কাগজের একটা বিজ্ঞাপন তাদের চোখে পড়ে। দিল্লীর ডাক্তার দিগম্বর চ্যাটার্জির মেয়ে কুমারী নূপুরের খোঁজ দিতে পারলে ১০ হাজার টাকা পুরস্কার পাওয়া যাবে। এক কালো বেঁটে রেড়ীর তেল ব্যবসায়ীর সঙ্গে বাবা তার বিয়ের সম্বন্ধ করেছে মামার কাছ থেকে এ-খবর শুনেই সুন্দরী, বিদুষী, নৃত্যে ও সংগীতে পারঙ্গম নূপুর কলকাতায় এসে হাজির হলো। এক রেস্টুরেণ্টে জহর তাকে দেখেই চিনল এবং তারপরই শুরু হলো তাড়া করা আর পালানোর পালা। নূপুর গিয়ে বিখ্যাত সঙ্গীতশিল্পী অচল মুখার্জির গাড়ীতে লুকিয়ে থাকে এবং গাড়ী চলতে শুরু করলে দেখা যায়, ভানু-জহর তাদের মার্কামারা গাড়ীতে করে এদের অনুসরণ করছে। হঠাৎ গাড়ীতে নূপুরকে দেখে অচলকুমার গাড়ী থামায় এবং নূপুরের কাতর অনুনয়ে তাকে বাড়ীতে নিয়ে আসে। এরপর জহর ও ভানু ধরি ধরি করেও ওদের দুজনাকে ধরতে পারে না, আর ওরাও ধরা পড়তে পড়তে পালিয়ে বেড়ায়। শেষে মেয়েবিদ্বেষী অচল আর বিয়ে-বিদ্বেষী নূপুর কী করে যেন প্রেমের ফাঁদে ধরা পড়ল এবং ভানু ও জহর কুমারী নূপুর চ্যাটার্জির বদলে শ্রীমতী নূপুর মুখার্জিকে ধরিয়ে ডাঃ দিগম্বরের কাছ থেকে পুরস্কার থেকে বঞ্চিত হলো তাই দেখিয়েই এ-ছবি শেষ হয়েছে।

[illegible] রাখতে হবে, তাই নূপুর কাগজে তার ছবি ও পুরস্কার ঘোষণার কথা দেখেও রেস্টুরেণ্টে খেতে গেল, তাই থিয়েটার-মঞ্চে জহরকে কিম্ভূত পোষাক পরিয়ে ভানুর ঠেলে নামিয়ে দেওয়া সম্ভব হলো আর জহর তার কাজ ভুলে মেয়েদের সঙ্গে নাচতে লাগলো, তাই অচল নূপুরকে নিয়ে পালাবার সময় কোথায় যাচ্ছে তা বাড়ী-ওয়ালাকে বলে গেল আর তাই বাস্তবতা ও সম্ভাব্যতার প্রশ্ন না তোলাই ভাল।

পূর্ণেন্দু রায়চৌধুরী পরিচালিত ছবিটি সম্পাদনা ও অভিনয়ের গুণে বেশ গতিসম্পন্ন এবং নিঃসন্দেহে চিত্তবিনোদক হয়েছে। ভানু ও জহর তাঁদের স্বভাবসিদ্ধ অভিনয় করেছেন। অচল ও নূপুরের ভূমিকায় শুভেন্দু চ্যাটার্জি ও লিলি চক্রবর্তী সুন্দর। অন্যান্য চরিত্রে অভিনয় করে দর্শকদের নির্মল হাসিতে মাতিয়ে তোলেন বঙ্কিম ঘোষ, শীতল ব্যানার্জি, নৃপতি চ্যাটার্জি, হরিধন মুখার্জি, পাহাড়ী সান্যাল, শ্যাম লাহা প্রভৃতি। পরিচালক শ্রীরায়চৌধুরী কয়েকটি দৃশ্য-পরিকল্পনায় যেমন কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন, তেমনই সম্ভবত বক্স অফিসের দিকে নজর রেখেই বেশ যৌন-উত্তেজক একটি নাচের দৃশ্যও উপহার দিয়েছেন।

শ্যামল মিত্র সুরারোপিত গানগুলি সব সময়ে প্রয়োজনে না হলেও সুগীত, সুশ্রাব্য। গানগুলি গেয়েছেন সন্ধ্যা মুখার্জি, লীনা ঘটক ও শ্রীমিত্র স্বয়ং।

চিত্রগ্রহণে রামানন্দ সেনগুপ্ত কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন। কয়েকটি দৃশ্যগ্রহণে তাঁর ক্যামেরা সুন্দর কাজ করেছে এবং বাঙ্ময় হয়ে উঠেছে। অন্যান্য কলাকৌশলের কাজও সুন্দর।

*

গুড্ডী

এ-সপ্তাহের মুক্তিপ্রাপ্ত চিত্রের মধ্যে এন সি সিপ্পী নিবেদিত হৃষীকেশ মুখার্জি পরিচালিত বসন্ত দেশাই সুরারোপিত 'গুড্ডী' চিত্রটির বিভিন্ন ভূমিকায় আছেন : ধর্মেন্দ্র, জয়া ভাদুড়ী, শমিত ভঞ্জ, সুমিতা সান্যাল, বিজয় শর্মা ও উৎপল দত্ত।

রাখওয়ালা

দ্বিতীয় মুক্তিপ্রাপ্ত চিত্রের মধ্যে এস কৃষ্ণমূর্তি প্রযোজিত এ সুব্বারাও পরিচালিত 'রাখওয়ালা' চিত্রটির সংগীত-পরিচালনা করেছেন কল্যাণজী আনন্দজী। বিভিন্ন ভূমিকায় আছেন : ধর্মেন্দ্র, লীনা চন্দাভারকর বিনোদ খান্না, মদন পুরী প্রভৃতি।

খোঁজ

শ্রীযুগলকিশোর প্রযোজিত ও পরিচালিত রহস্যঘন চিত্র 'খোঁজ' এ-সপ্তাহের একটি বিশেষ আকর্ষণ। চিত্রটির বিভিন্নাংশে আছেন দীপককুমার, ফরিদা, জয়শ্রী প্রভৃতি। সঙ্গীতপরিচালনায় ঊষা খান্না।

হিলডেগার্ড ফালক ইয়াজে (পঃ জার্মানী)ঃ ইনি ৮০০ মিটার দৌড় ১ মিঃ ৫৮·৩ সেকেণ্ডে অতিক্রম করে বিশ্বরেকর্ড করেছেন এবং মহিলাদের পক্ষে দু' মিনিটের কম সময়ে উক্ত পথ অতিক্রম করার প্রথম গৌরব লাভ করেন।
উইবেমার (পঃ জার্মানী) ঃ ইনি ৭৪-৯০ মিটার দূরত্বে হাতুড়ী নিক্ষেপ করে বিশ্বরেকর্ড করেছেন (ছবির ডানদিকে)।

খেলাধুলা

দর্শক

এশিয়ান বাস্কেটবল প্রতিযোগিতা

টোকিওতে আয়োজিত পুরুষদের ৬ষ্ঠ এশিয়ান বাস্কেটবল প্রতিযোগিতায় জাপান এবং ফিলিপাইন যথাক্রমে চ্যাম্পিয়ান এবং রানার্স-আপ খেতাব জয়ের সূত্রে আগামী মিউনিখ অলিম্পিকের বাস্কেটবল প্রতি-যোগিতায় এশিয়া মহাদেশের পক্ষে প্রতি-নিধিত্ব করার যোগ্যতা লাভ করেছে। আলোচ্য প্রতিযোগিতায় যে ৯টি দেশ যোগদান করেছিল তাদের মধ্যে একমাত্র জাপানই অপরাজেয় ছিল। গতবারের চ্যাম্পিয়ান দক্ষিণ কোরিয়া তৃতীয় স্থান পায়। তারা দুটো খেলায় হেরেছিল—জাপান এবং ফিলিপাইনের কাছে। প্রতি-যোগিতার [illegible] পেয়েছে ৬ষ্ঠ স্থান—হার ৫ এবং জয় ৩। ভারতবর্ষ জয়ী হয়েছে, তালিকার নীচের দিকের তিনটি দেশের বিপক্ষে—থাই-ল্যাণ্ডের বিপক্ষে ৭৫—৬৭ পয়েণ্টে, সিঙ্গাপুরের বিপক্ষে ৮০—৭৯ পয়েণ্টে এবং হংকংয়ের বিপক্ষে ১০১—৭৪ পয়েণ্টে।

চূড়ান্ত ফলাফল

	খেলা	জয়	পরাজয়
জাপান	৮	৮	০
ফিলিপাইন	৮	৭	১
দঃ কোরিয়া	৮	৬	২
তাইওয়ান	৮	৫	৩
মালয়েশিয়া	৮	৪	৪
ভারতবর্ষ	৮	৩	৫
থাইল্যাণ্ড	৮	২	৬
সিঙ্গাপুর	৮	১	৭
হংকং	৮	০	৮

অলিম্পিকে চীনের আমন্ত্রণ

পশ্চিম জার্মানীর অলিম্পিক কমিটির সভাপতি এক সাংবাদিক বৈঠকে বলেছেন, আগামী মিউনিখ অলিম্পিক গেমসে যোগদানের জন্য প্রজাতন্ত্রী চীনকে আমন্ত্রণ [illegible] টেনিস প্রতি-যোগিতায় যোগদানকারী চীনা টেবিল টেনিস দলের ম্যানেজার সম্প্রতি পরিষ্কার-ভাবে ঘোষণা করেছেন, মিউনিখ অলিম্পিক গেমসের আসরে তাইওয়ানকে আমন্ত্রণ করা হলে প্রজাতন্ত্রী চীন কোনক্রমেই মিউনিখ অলিম্পিক ক্রীড়ানুষ্ঠানে অংশ গ্রহণ করবে না। কারণ হিসাবে তিনি বলেছেন, মিউনিখ অলিম্পিক গেমসে প্রজাতন্ত্রী চীন এবং তাইওয়ান অংশ গ্রহণ করলে দুই চীনের অস্তিত্ব স্বীকার করা হবে—সাম্রাজ্যবাদী চক্রের এই তৈরী ফাঁদে আমরা কোনমতেই পা দিচ্ছি না। তিনি আরও বলেছেন, টেবিল টেনিস ছাড়া অন্যান্য আন্তর্জাতিক খেলা-ধুলার আসরেও প্রজাতন্ত্রী চীন অংশ গ্রহণে খুবই উৎসুক, তবে ইণ্টারন্যাশনাল অলিম্পিক কমিটি এবং অলিম্পিক গেমস আলাদা ব্যাপার। এই দুই সংস্থায় যোগদান ব্যাপারে আমাদের পূর্ব নীতির বিন্দুমাত্র পরিবর্তন ঘটেনি, বিশেষ করে রাষ্ট্রসংঘে চীনের সদস্যপদ লাভের পর আমাদের নীতি আরও দৃঢ় হয়েছে। এই ব্যাপারে ইণ্টারন্যাশনাল অলিম্পিক কমিটির সভাপতি এবং আমেরিকার ধনকুবের মিঃ অ্যাভেরী ব্রাণ্ডেজ বলেছেন, রাষ্ট্রসংঘে যাই ঘটুক, তাইওয়ানকে সরিয়ে প্রজাতন্ত্রী চীনকে

অলিম্পিক গেমসে যোগদানের জন্যে আমন্ত্রণ করা হবে না।

বর্ণবৈষম্যের ধ্বজাধারী দক্ষিণ আফ্রিকাকে ১৯৬৮ সালের মেকসিকো অলিম্পিক গেমসে যোগদানের আমন্ত্রণ পত্র দিয়ে শেষ পর্যন্ত তা প্রত্যাহার করতে বাধ্য হয়েছিলেন অলিম্পিক কমিটির এই সভাপতি মিঃ ব্রাণ্ডেজের দল। আজ আবার তিনি তাইওয়ানের পক্ষ নিয়ে আসরে নেমেছেন। জল ঘোলা করার খেলাটাই যেন তাঁকে আজ পেয়ে বসেছে।

আন্তঃ বিশ্ববিদ্যালয় কুস্তি

আন্তঃ বিশ্ববিদ্যালয় কুস্তি প্রতিযোগিতায় দিল্লী ২৯ পয়েণ্ট সংগ্রহের সূত্রে দলগত চ্যাম্পিয়ান হয়েছে।

চূড়ান্ত দলগত অবস্থান ঃ ১ম দিল্লী (২৯ পয়েণ্ট), ২য় পাঞ্জাব (১৪ পয়েণ্ট), ৩য় গুরু নানক (৯ পয়েণ্ট), ৪র্থ কুরুক্ষেত্র (৬ পয়েণ্ট) এবং ৫ম শিবাজী (৫ পয়েণ্ট)

স্পোর্টস কলেজ

উত্তরপ্রদেশ স্পোর্টস কাউন্সিলের তত্ত্বাবধানে লক্ষ্মৌতে একটি স্পোর্টস কলেজ খোলা হচ্ছে। এখানে শিক্ষার্থীরা হাতে-কলমে ফিজিক্যাল এডুকেশন এবং স্পোর্টস ট্রেনিং সম্পর্কে শিক্ষালাভ করবেন।

ভারতীয় হকি প্রসঙ্গ

বার্সিলোনায় বিশ্ব হকি প্রতিযোগিতার সেমি-ফাইনালে ভারতবর্ষের পরাজয় উপলক্ষ্য করে নানাদিক থেকে বিরুদ্ধ সমালোচনার ঝড় উঠেছে। পৃথিবীর সর্বকালের শ্রেষ্ঠ হকি খেলোয়াড় 'যাদুকর' ধ্যানচাঁদ সমালোচনা প্রসঙ্গে বলেছেন—ব্যক্তিগত বিদ্বেষ, সংকীর্ণ প্রাদেশিকতা, প্রশাসনিক কাজ-কর্মে ত্রুটি-বিচ্যুতি এবং স্বেচ্ছাচারিতার কারণেই ভারতীয় হকি খেলার মান ক্রমশ নেমে যাচ্ছে। তিনি প্রশাসনিক কর্তাদের স্বেচ্ছাচারিতার একটি দৃষ্টান্ত উল্লেখ করে বলেছেন, ১৯৬০ সালে অলিম্পিক হকি দল নির্বাচন উপলক্ষে কর্মকর্তারা স্বেচ্ছাচারিতা নীতি গ্রহণ করায় তিনি এবং কে ডি সিং (বাবু) নির্বাচকমণ্ডলী থেকে পদত্যাগ করেছিলেন। ভারতবর্ষ ১৯৬০ সালের অলিম্পিক হকি প্রতিযোগিতায় হেরেছিল। কিন্তু এই ঘটনা থেকে কর্তাদের কোন শিক্ষা হয়নি। তাঁরা আজও সংকীর্ণ প্রাদেশিকতা এবং একদেশদর্শিতার ব্যাধিতে ভুগছেন। ধ্যানচাঁদ আরও একটি বড় ত্রুটির উল্লেখ করে বলেছেন, আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতা উপলক্ষে দল গঠনের পর নির্বাচিত খেলোয়াড়দের যাতে খেলার অভিজ্ঞতা বৃদ্ধি পায় তার জন্য বিভিন্ন অঞ্চলে হকি খেলার ব্যবস্থা করা দরকার। এই ব্যবস্থার পরিবর্তে বর্তমানে শুধু পাঞ্জাব এবং তার কাছাকাছি অঞ্চলে অথবা মাদ্রাজে নির্বাচিত ভারতীয় হকি দলের সফর ব্যবস্থা করা হচ্ছে। এই থেকেই প্রমাণ হয়ে যায় ভারতীয় হকি আজ কাদের কুক্ষিগত। ধ্যানচাঁদ দুঃখ করে বলেছেন, অনুশীলনে খেলোয়াড়রা যথেষ্ট নিষ্ঠার পরিচয় দিচ্ছেন না। তিনি বিগত দিনের ব্যবস্থার উল্লেখ করে বলেছেন, আমরা দিনে একসের করে দুধও পেতাম না। অথচ আজকাল খাইখরচ খাতে প্রত্যেক খেলোয়াড়কে দৈনিক আট টাকা করে দেওয়া হয়। ভারতীয় হকি খেলার মানোন্নয়ন সম্পর্কে ধ্যানচাঁদের প্রস্তাব হল, স্কুল পর্যায়ে হকি খেলার বিস্তার হওয়া উচিত।

ভারতীয় হকি দলের ম্যানেজার বলবীর সিং এই অভিযোগ করেছেন যে, বার্সিলোনায় বিশ্ব কাপ হকি প্রতিযোগিতায় ভারতবর্ষের পরাজয়ের জন্যে এক চক্রান্ত তৈরী হয়েছিল এবং এই চক্রান্তের সঙ্গে জড়িত ভারতীয় নির্বাচকমণ্ডলীর প্রাক্তন ...ম্যান জিমি নাগরওয়ালা। বলবী... বলেছেন, ভারতীয় হকি ফেডা... ইচ্ছার বিরুদ্ধে নাগরওয়ালা টেক... কমিটিতে যোগ দিয়ে বার্সিলোনায় ...ছিলেন এবং তাঁর একমাত্র লক্ষ্য ... পাকিস্তানের হাতে যাতে ভারতবর্ষ ... যায়। বলবীর সিং আরও অ... করেছেন বিভিন্ন বৈঠকে উপস্থিত ... নাগরওয়ালা ভারতবর্ষের স্বার্থের ... কাজ করেছেন।

বিজয় অমৃতরাজ

ক্যালকাটা হার্ডকোর্ট টেনিস প্রতি... সিঙ্গলসের খেতাব-বিজয়ী। ইনি ... ফাইনালে খ্যাতনামা খেলোয়াড় ... লালকে পরাজিত করেন।

অমৃত পাবলিশার্স প্রাইভেট লিঃ-এর পক্ষে শ্রীসুপ্রিয় সরকার কর্তৃক পত্রিকা প্রেস, ১৪, আনন্দ চ্যাটার্জি লেন, কলিকাতা-৩ হইতে মুদ্রিত ও তৎকর্তৃক ১১।১, আনন্দ চ্যাটার্জি লেন, কলিকাতা—৩ হইতে প্রকাশিত।